ISSN 2583 – 0848
IIFS IMPACT FACTOR 7.0

ত্রিসঙ্গম

TRISANGAM INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL

A DOUBLE-BLIND PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL ON LANGUAGE, LITERATURE & CULTURE

Volume : V, issue : I, January 2025



EDITOR IN CHIEF
PROF. DIPAK KUMAR ROY

EDITOR
MR. PRASENJIT ROY

Published by

TIRJ

e ISSN : 2583 – 0848

ত্রিসঙ্গম

TRISANGAM INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume : V, Issue : I, January issue 2025
Published Date : 10th March, 2025
IIFS Verified Impact Factor 7.0

Additional services & information for
TRISANGAM INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL
Can be found at:

(*IIFS*) Journal Impact Factor : https://impactfactorservice.com/home/journal/2298

Journal Indexing : https://tirj.org.in/indexing/

Journal DOI : http://doi.one/10.1750/TIRJ

About the Journal : https://tirj.org.in/about-us/

Journal Editorial Board : https://tirj.org.in/editorial-board/

Submission Guidelines : https://tirj.org.in/author-guidelines/

Contact : https://tirj.org.in/contact-us/

Published by
TIRJ
Scholarly Indexing Online Journal
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
The online version of this article can be found at: https://tirj.org.in/
Office: Shiv mandir, (Near NBU Campus), Siliguri, Darjeeling, West Bengal, India -734011
Contact email: info@tirj.org.in / tirj.org.in@gmail.com Phone: +918016929279

OPEN ACCESS

সূচিপত্র

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 01 - 06
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারীর বয়ানে নারীর ভাষ্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

সুকন্যা মাইতি
গবেষিকা
বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sukanyamaiti2025@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
women's distinct language, women's commentary, stereotype, communication style, language, men, women, women's, presentation attitude.

Abstract
Like other female-led poems of the Middle Ages, women have also gained prominence in Baru Chandidas' 'ShriKrishnakirtan'. There is also own dialogue of women. Therefore, the analysis of women's language in the context of their own dialogue deserves a discussion. The two main women whose dialogues cover a wide range in the poem under discussion are - Radha and Barai. Numerous differences are observed between the words of women and men throughout the poem. Where the tone of women is soft and pleading, in most cases the seriousness of men is evident. Where the male character Krishna expresses his thoughts directly and clearly, the female characters, in most cases, resort to deception, keeping in mind the knowledge of time, and present them in a very elaborate manner. Similarly, various topics used in the words of Radha and Barai have emerged, which are distinct from the male language. The abundance of two-syllable and phonetic words, the dramatic presentation of words, the abundance of proverbs and sayings, the use of similes, etc., are used uniquely in women's language. And in the main discussion, all these issues have been discussed extensively with examples. In this context, it can be seen that women's language has moved away from men's language and has taken its place as a separate dialect. In the poem 'Shrikrishnakirtan', a description of women's language in early-Central Bengal has been developed through the women's own narration.

Discussion
বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আদি-মধ্য বাংলার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের মতোই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নারী প্রধান কাব্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় এর মূল উপজীব্য হলেও কিংবা শিরোণামে কৃষ্ণের প্রাধান্য থাকলেও এ কাব্যের সকল রস আত্মসাৎ করেছে রাধা। শুধু রাধা নয়, বড়াইও এই কাব্যের এক অন্যতম আকর্ষণ। তাই নারী প্রধান কাব্য হিসেবে, নারীর ভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। কাব্যে ভাষার যে বৈচিত্রময় রূপ ফুটে উঠেছে, তা হল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষা। আলোচ্য কাব্যে কবি সুনিপুনভাবে নারী-পুরুষের ভাষার তারতম্য উপস্থাপন করেছেন, যা একদম বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। নারী না হয়েও নারীর কথনকে খুব নিঁখুতভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। কবির বিবৃতিতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নয়, নারীর নিজস্ব কথনের প্রেক্ষিতেই নারীর ভাষা অনুসন্ধানের চর্চায় অগ্রসর হব। উক্ত কাব্যে প্রধানা দুই নারী - রাধা ও বড়াই এর নিজস্ব বয়ানকে সামনে রেখে নারী ভাষ্যের আলোচনায় প্রয়াসী হব।

প্রাথমিকভাবে, নারী ভাষার যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হল কথা ও সুরের কোমলতা। যেখানে পুরুষের কথায় গাম্ভীর্য ও বীরত্ব প্রকাশিত হয়। সেইরূপ, আলোচ্য কাব্যেও দেখি কৃষ্ণের উক্তিতে গাম্ভীর্য, বীরত্ব ও অহংকার প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ বার বার নিজেকে 'দেব চক্রপাণি' বলে প্রতিপন্ন করেছে। সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাধার কথনে বার বার অনুনয়ের কোমল সুর প্রকট হয়েছে। যেমন –

"চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ তোক্ষারে।
ছাড় একবার কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘরে।।"[১] (দানখণ্ড)

সুতরাং, উভয়ের ভাষার সুরের পার্থক্য একেবারে বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাব্যে কোনো কোনো স্থানে এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর পরিসর একেবারেই কম। এরূপ একাধিক বিষয় রয়েছে যা নারীর ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচ্য কাব্যে রাধা ও বড়াই এর কথনে শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি শব্দদ্বৈত হল – 'খনে খনে', 'নিতি নিতি', 'না বোলো না বোলো', 'দিঠী দিঠী', 'নিষধ নিষধ', 'চমকী চমকী', 'না জীবোঁ না জীবোঁ', প্রভৃতি। কাব্যে নারী ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ হল – 'আনমনে', 'খলখলি', হুলাহুলী', 'টলবল' প্রভৃতি। কাব্যে কৃষ্ণের কথনে বিলক্ষণ কোথাও এরূপ শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নারী ভাষার আর একটি দিক হল – কথাকে গুছিয়ে, যুক্তি দিয়ে, কালজ্ঞান মাথায় রেখে সুকৌশলে উপস্থাপন করা। আবার অনেক সময় মূল কথাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলা। আলোচ্য কাব্যে সুচতুর বড়াইয়ের কথনে তা একেবারে স্পষ্ট। তাম্বুলখণ্ডে, রাধা যখন কৃষ্ণের প্রেরিত তাম্বুল বড়াইকে ফিরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণকে সুরতির আশা ত্যাগ করার কথা জানাতে বলেন, বড়াই তখন সুকৌশলে তা ব্যক্ত করেন। এরপর কৃষ্ণ এই সংবাদ পেয়ে রাধার দর্শন প্রার্থনার কথা বড়াইকে জানাতে বললে, বড়াই অনেক দীর্ঘায়িত করে তা রাধার কাছে উপস্থাপন করেন। রাধাবিরহের কয়েকটি পদেও দেখা যায়, রাধার কৃষ্ণ-বিরহের করুণ অবস্থাকেও বড়াই কৃষ্ণের কাছে আরও অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিপুনতার সঙ্গে ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর উদ্দেশ্যে সহজেই সফল হতে পারেন। এটি নারী ভাষার এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এরূপ কথন বৈশিষ্ট্য কিন্তু কাব্যমধ্যে পুরুষের কথন তথা কৃষ্ণের কথনে কোথাও পাই না। কৃষ্ণের কথনে দেখা যায়, তাঁর মনের ভাব তিনি সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

নারী ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, কথায় কথায় নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য হাহাকার করা, নিজেকে ধিক্কারর দেওয়া, বিধাতাকে দোষারোপ করা, আবার অনেক সময় কথায় কথায় নিজের মরণের ইচ্ছা প্রকাশ করা। আলোচ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার কথনে এরূপ একাধিক বার উচ্চারিত হয়েছে – 'ধিক জাউ নারীর জীবন', 'তেকারণে বিধি...দুখগণ লেখিল সাঠীহারে', 'আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী', 'ধিক জাউ নারীর যৌবন', 'হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল', ' নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধি' ইত্যাদি। নারীর কথায় কথায় মরণের ইচ্ছা প্রকাশ করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল। যেমন - 'হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ', 'সাগর সঙ্গম জলে তেজিবোঁ মো কলেবরে তথাঞিঁ মরিবো কিবা খাইবোঁ গরলে', 'বাঘ ভাল্লুকে রা আহ্মার খাউ। কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ।' 'যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে। তবে লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে।' ইত্যাদি। বড়াইও যেহেতু একজন নারী তাই তাঁর কথনেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে– 'বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে', 'পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে' ইত্যাদি।

আমাদের সমাজে নারীর কথায় কথায় অভিসম্পাত দেওয়ার ব্যাপারটি রাধার কথনেও লক্ষ্য করা যায়। তা অপরকে হোক বা নিজেকে, এরূপ কথন বৈশিষ্ট্য কিন্তু নারীর ভাষাতেই পাওয়া যায়। বংশীখণ্ডের একটি পদে রাধা বলেছেন–

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী। যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী।।
যবেঁ মো চুরি কৈলোঁ হঁআ নারী সতী। তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতি।।"[২]

সমাজে নারীদের বিভিন্ন ব্রত-অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। যা তাদের আগামী জীবনের আশীর্বাদস্বরূপ বলে মনে করা হয়। কাব্যে রাধা একাধিক বার উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বজন্মে খণ্ডব্রত করার কারনে বিধাতা তাঁকে দুখিনী করেছেন, কিংবা এই কারণেই তিনি কৃষ্ণকে হারিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর কথায় আরও এরূপ কথা উঠে এসেছে। যেমন- 'আর তার মুখ দেখিঁতে না পাইলোঁ করমফল আহ্মারে', 'জরম গেল করমের খঅ কাল কাহ্নায়ির হাথে' ইত্যাদি। নারী মনে যেহেতু জীবনের প্রথম থেকেই এই সকল ধারণার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেওয়া হয়, তাই তারা এই সব কু-সংস্কার, বিশ্বাসকে একেবারে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে থাকে।

এ সকল উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, তৎকালীন বাঙালি নারী জন্মান্তর, কর্মফল ও অদৃষ্টবাদে যথেষ্ট বিশ্বাসী ছিল। অসহায় নারী সমাজে অবহেলিত হওয়ার কারনে স্থান-যোগ্যতা-ক্ষমতায় পিছিয়ে থাকায়, নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করে। আর এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে নিজের মৃত্যু কামনা করে থাকে। অনেক সময় এর মধ্য দিয়ে তাদের অভিমানের দিকটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। আর এ সব কিছুর প্রতিফলন তাদের কথার মধ্যে ফুটে ওঠে। বর্তমান সমাজেও নারী মনস্তত্ত্বের এই চিত্র একেবারে বিরল নয়। কিন্তু কাব্যমধ্যে কৃষ্ণের কথনে এরূপ ভাষ্য একেবারেই বিরল।

আমাদের সমাজে একজন গৃহবধূর কাছে তাঁর স্বামী ও শ্বাশুড়ির অত্যাচারকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করা হয়। কাব্যমধ্যে বড়াইয়ের কথনেও সেই চিত্র আমরা অনুমান করতে পারি। যদিও বড়াই এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবতী, কারণ তাঁর ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটেনি –

"কোঁপে কভোঁ মোকে হাথেঁ না ছুইল সামী।
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী।।"[৩]

'গালাগালি'র পরিচয় আমাদের সমাজে ছেলেদের ভাষায় যতটা পাওয়া যায়, মেয়েদের ভাষায় ততটা পাওয়া যায় না, বা তার উপস্থাপন একটু ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে মেয়েদের ভাষায়, ছেলেদের ব্যবহৃত গালাগালের প্রয়োগ দেখা যায়, তবে তুলনামূলকভাবে তার পরিমাণ অনেক কম। ছেলেরা গালাগালি দিলে তা তাদের পৌরূষত্বের পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই একই নীতি নারীর ক্ষেত্রে খাটে না। পরিবর্তে সেই নারীকে এরূপ শব্দ ব্যবহারের জন্য পরিবারে কঠোর শাসন করা হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কৃষ্ণ অকপটেই রাধাকে 'নঠী বড় রাধা', 'নটকী গোআলী ছিনারী পামরী' বলে গালাগালি দিয়েছেন। কিন্তু বড়াই বা রাধার কথনে কোথাও এরূপ কোনো শব্দের উল্লেখ পাই না। কিন্তু তাই বলে রাধা একেবারে নীরব থাকেননি। কৃষ্ণকে তাঁর 'গোত্র' তুলে কিংবা 'বাপ' তুলে গালাগালি দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলেছেন–

'কাহাক দেখাও এ কাঠদাপে। বান্ধিতে না পারে তোহ্মার বাপে।'[৪]

তাম্বুলখণ্ডের একটি পদে বড়াইকেও রাধা একই ভঙ্গিতেই বলেছেন –

'দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহি লাজ।'[৫]

এখানে বঙ্গদেশের গ্রাম্য নারীর নিজস্ব ভাষা স্বরলাভ করেছে।

সতীত্বের ধারণা নারীর জন্য এক কঠিন সংস্কার। কোনো কোনো নারীকে সতী বললে সে যেন পরম পারিতোষিক পাওয়ার আনন্দ অনুভব করে। আবার এই 'সতী' শব্দের ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েই কোনো নারীকে একেবারে দুর্বল করে নীচে নামিয়ে আনা যায়। নারী যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই নারীর পরম শত্রু, তাই এই শব্দের আঘাত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপর এক নারীর কাছ থেকেই একজন নারী পেয়ে থাকে। তাই, আলোচ্য কাব্যেও দেখি বড়াই, রাধার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েও কৃষ্ণের সম্মুখে রাধার সম্পর্কে বলেছেন –

"সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।"[৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার লজ্জাকে যেহেতু নারীর একমাত্র ভূষণ বলে মনে করা হয়, একজন নারী তাই অনায়াসেই অন্য একজন নারীকে এই শব্দের প্রয়োগে তিরস্কার করতে পারে। বড়াইও কাব্যে সেইরূপ রাধাকে তিরস্কার করে বলেন –

"নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক পাপমতী না বাসসি লাজে।"[৭]

সামাজিক বিধিনিষেধ বা 'ট্যাবু'র ব্যবহার নারী ভাষার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর মূলে থাকে কিছু সংস্কার, বিশ্বাস, কুসংস্কার বা ধারণাগত অস্বচ্ছতা। এটা শুধু নারীর নিজস্ব সম্পদ নয়, সব স্তরের মানুষেরই এর ওপর অধিকার আছে। তবে, নারীর কথনেই এর প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। আলোচ্য কাব্যে আমরা রাধার কথনে বেশ কিছু এই ট্যাবুর প্রয়োগ দেখতে পাই। বংশীখণ্ডের একটি পদে রাধা তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে জানান –

"কোন আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ। হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ।।
শুন কলসী লই সখি আগে জাএ। বাঁঞের শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।।
কথো দূর পথে মো দেখিলোঁ সগুনী। হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গঁএ যোগিনী।।
কান্ধে কুরুঅ লআঁ তেলী আগে জাএ। সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।।"[৮]

অর্থাৎ রাধা, হাঁচি, টিকটিকির বাধা মানেননি, হোঁচট খাওয়াকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর সামনে দিয়ে সখীরা শুন্য কলসী নিয়ে গিয়েছিল, বাম দিকের শেয়ালকে দান দিকে যেতে দেখেন, হাতে খর্পর নিয়ে এক যোগিনী ভিক্ষা করছিল, কাঁধে তেলের পাত্র নিয়ে এক তৈলিক তাঁর আগে আগে গিয়েছিল, শুকনো ডালে কাক বসে ডেকেছিল – আর এই সকল জিনিসকে নারীরা তাদের জীবনে অশুভ সংকেত বলে মনে করে। আর এই বিশ্বাস, সংস্কার তাদের ভাষাতেও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়। যা রাধার এই কথনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল–

"মাএঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল।
না করিহ গোঠ সঘনে। সেহো বোল না শুনিল কানে ল।
আল হের বড়াই হে। তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে।। হে।।"[৯]

সুতরাং কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী চুরির কারন হিসেবে মনে করেন, তিনি মায়ের নিষেধ অমান্য করে গোষ্ঠে শয়ন করেছিলেন, আর সেই জন্যই তাঁর সাথে এরূপ হয়েছে। এটাও এক রকমের বিশ্বাস কিংবা সামাজিক বিধিনিষেধ (ট্যাবু) বলতে পারি। কিন্তু তা বলে এটা কোনো কুসংস্কার নয়। নারী ও পুরুষের ভাবনাগত ও ভাষাগত পার্থক্য উপরোক্ত রাধা ও কৃষ্ণের কথনে স্পষ্ট।

আমাদের সমাজে যেখানে বিবাহিত মেয়েদের নিজের স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করা চলে না, সেখানে বড়ুর রাধা অনেকটা এগিয়ে। তিনি নিঃসংকোচেই বলেন 'সামী আইহন'। বর্তমান নারী শিক্ষার প্রসারে এই সংস্কার যদিও অনেকটাই লোপ পেয়েছে। কিন্তু নারীর যেহেতু নিজের কোনো পরিচয় সমাজ দেয়নি, অন্যের পরিচয়ই তার আশ্রয়, তাই, কাব্যে রাধা তাঁর নিজের পরিচয় একবারও 'চন্দ্রাবলী' বা 'রাধা' বলে উল্লেখ করেননি। 'আইহনের রানী', 'বড়ার বহুয়ারী', 'বড়ার ঝী' বলেই পরিচয় দিয়েছে। নারীর একমাত্র আশ্রয় যেহেতু পুরুষের চরণ, পুরুষের দাসী বলেই সে সমাজ গণ্য, তাই বড়াই রাধাকে 'আইহনের দাসী' বলেও সম্বোধন করেছেন।

আলোচ্য কাব্যে কৃষ্ণ তাঁর অহংকার, গর্ব, ক্ষোভ, রাগ ইত্যাদি সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। রাধা কিংবা বড়াই সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, শ্লেষ, সুরের ওঠানামা, নাটকীয়তা কিংবা কথার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির ব্যবহারে মনের ভাবকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বংশীখণ্ডের একটি পদের কিছু অংশ তুলে ধরা হল। যেখানে রাধার নাটকীয়তার ঢং এ ছলনা করে বলেছেন –

"বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী তার মন বুঝিতে না পারী
দুঠ মন মিঠ দেখে আত্ম সম পর দেখে চাহা বাঁশী তাক মুরারী।।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেখি তোক্ষা আসুখ মোর মণে বড় দুখ মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।”[১০]

কথার মধ্যে আবার অনেক সময় উপমা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে তা আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। তৎকালীন সময়ে নারীর শিক্ষা-দীক্ষার সেরকম কোনো অবকাশ প্রায় ছিল না বললেই চলে। সেক্ষেত্রে এই প্রবাদ-প্রবচন কিংবা লৌকিক উপমার ব্যবহার ছিল নারীর নিজস্ব ক্ষেত্র। কৃষ্ণের কথনেও কিছু উপমার পরিচয় পাই কাব্যে। রাধার দেহ সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় তিনি অনেক উপমা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা সংস্কৃত উপমা। কিন্তু কাব্যে বড়াই কিংবা রাধার কথনে বড়ু কবি সচেতনভাবেই পল্লীজীবন থেকে সংগ্রহ করে, লৌকিক উপমার ব্যবহার করেছেন। যার মধ্যে নারী ভাষার স্বতন্ত্র সুর প্রকট হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীর ভাষায় লৌকিক প্রবাদ, উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে, কাব্যে রাধা ও বড়াইয়ের ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি উপমার উল্লেখ করা হল –

১) চাঁপাকুটী দেখিতে রুপসে। তাত নাহি গন্ধের পরসে।। ল।।
বিকসিলে মোহে মুণিমণে। হেন সব নারীর যৌবনে।। (দানখণ্ড)
২) বিরহে পুড়িয়া কাহ্ন হাকল বিকল। জরুয়া দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল।। (দানখণ্ড)
৩) আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।। (দানখণ্ড)
৪) তপত দুধ নালে না পীএ জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ।
নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ।। (দানখণ্ড)
৫) আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞি মরণ ইছসি। সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী।।
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা। আলপ বয়সে তেহ্ন বিরহের চিন্তা।। (ভারখণ্ড)
৬) বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আতী তাক নাহি কিছু পরকার।
ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন বড় মানে তিন উপকার।।
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনীদলজল চঞ্চল দুঈহো পাড়িহাসে। (বৃন্দাবন খণ্ড)
৭) বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।। (বংশীখণ্ড)

সমগ্র কাব্যজুড়ে এরূপ অসংখ্য লৌকিক উপমা নারীর কথায় ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণের কথনে খুব কম পরিমাণে এরূপ উপমার ব্যবহার দেখতে পাই। নারীর ভাষায় ব্যবহৃত উপমার মতোই লৌকিক প্রবাদ-প্রবচনের প্রাচুর্য রাধা ও বড়াইয়ের কথনে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল –

১) কার কাঁচ আলিতে না দেঁও মোএঁ পাএ
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।। (দানখণ্ড)
২) পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক। (দানখণ্ড)
৩) পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী। (দানখণ্ড)
৪) মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। (দানখণ্ড)
৫) দেখিয়া সাধুর ধন চোর পুড়ি মরে। (ভারখণ্ড)
৬) কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত। (রাধাবিরহ)
৭) সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ কাহার বাপে (রাধাবিরহ)
৮) ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়িবাক পারী। উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী।।
যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট। তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।। (রাধাবিরহ)

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে এরূপ প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্ত আমরা কৃষ্ণের কথনেও পেয়ে থাকি, কিন্তু তার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। সমাজেও মূলত মেয়েরাই এ সকল প্রবাদ-প্রবচন, উপমার ব্যবহার বেশি মাত্রায় করে থাকে। তাদের প্রবাদের মুখ্য বিষয় হয় পারিবারিক নানা সম্পর্কের তিক্ততা-মধুরতা, অভিমান-অভিযোগ, খেদ, বিভিন্ন

সামাজিক প্রথা, সতীত্ব, সতীন সমস্যা, পতিনিন্দা, নারীর রূপগুণ ইত্যাদি। পারিবারিক অনেক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিংবা বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে অনেক সময় মেয়েদের সরাসরি কথা বলা চলে না। সংযমের ফলে তাদের না বলা কথাগুলো মনের কুটীরে জমা হয়। সেই জায়গায় তারা সংক্ষেপে এই সকল প্রবাদের আশ্রয় নেয়। এখানে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কখনও কখনও তাদের মধ্যে বিদ্রুপ কিংবা রসিকতার ভাব লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং, সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়ে আদি মধ্য বাংলার এক এবং অন্যতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আমরা নারীর নিজস্ব কথনের প্রেক্ষিতে নারীর নিজস্ব ভাষার স্বরূপের সন্ধান পেলাম। একই সমাজে বাস করেও নারী ও পুরুষের ভাষায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুরের কোমলতা, ওঠানামা, নাটকীয় উপস্থাপন, অনুনয়, কাতরোক্তি, খেদ; দুর্ভাগ্যের জন্য কথায় কথায় বিধাতাকে ডেকে আনা, নিজেকে দোষারোপ, নিজের মৃত্যু কামনা করা, অসহায়তায় নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অভিশাপান্তর শব্দের ব্যবহার করা ইত্যাদি নারীর ভাষায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে নারীর নিজের ভাষার এক স্বতন্ত্র স্বরূপের পরিচয় পাই। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পুরুষের ভাষায় খুব একটা চোখে পড়ে না। নারীর নিজের কথার মধ্য দিয়ে আরও ভালোভাবে নারীর সামাজিক অবস্থান, নারী মনস্তত্ত্বের গভীর ও জটিল দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়াই ও রাধার নিজস্ব কথনে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বড়ু কবি খুব সুন্দর ও নিঁখুতভাবে উপস্থাপন করেছেন। যার নিরিখে আমরা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে নারীর নিজস্ব বয়ানের প্রেক্ষিতে এক স্বতন্ত্র নারী ভাষার পরিচয় পেয়েছি।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', আশ্বিন, ১৪২১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২২০
২. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', আশ্বিন, ১৪২১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৯৭
৩. তদেব, পৃ. ২১৫
৪. তদেব, পৃ. ২৫৫
৫. তদেব, পৃ. ২১৪
৬. তদেব, পৃ. ২০৮
৭. তদেব, পৃ. ৪৪৯
৮. তদেব, পৃ. ৩৯৫
৯. তদেব, পৃ. ৩৯৪
১০. তদেব, পৃ. ৩৯৬

Bibliography:

কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত', ফাল্গুন, মার্চ, ২০১৩, শিলালিপি ৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৯
চট্টোপাধ্যায়, অশোক, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সন্দর্শন', ১৪৩০, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
বসুদত্ত, শর্মিলা, 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা', ডিসেম্বর, ২০১৪, প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', আশ্বিন, ১৪২১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
হুমায়ুন, রাজীব, 'সমাজভাষাবিজ্ঞান', ২০২৩, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 07 - 16
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জনজীবন : প্রসঙ্গত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

ছন্দমঞ্জরী চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : manjareec96@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Upper strata, Lowborn, Dalit, Mangalkavya, Society, Dignity, Deprived, Domination, Struggle

Abstract
Literature mirrors the society in which it is written. The medieval Bengali literature is not an exception. The Mangal kavyas are one of the most significant subgenres of poetry written in Bengali during this era. The 'Manasa Mangal' and the 'Chandimangal' kavyas are the two of the most notable ones. Following the common tradition of Mangalkavyas, they sing the greatness of Manasa and Chandi. The two kavyas mainly narrate the stories of two non-Aryan goddesses accepting the challenges for the upliftment of their status to that of the chief goddesses of the superior Aryan society. It is as if another kind of class struggle of the deprived people for equality and dignity. In Manasamangal goddess Manasa is dishonored repeatedly as low caste by the upper caste merchant Chand Sadagar. For this reason Manasa forms public opinion with the help of numberless people from the lower strata of society who somehow are also subjugated by Chand Sadagar. Manasa now leads these people. This struggle for gaining the social rights of equality and dignity under the leadership of Manasa succeeds in the end. The upper class has to submit to this combined strength of the deprived. In a similar way the 'Banikkhanada' of Mukundaram's 'Chandimangal' depicts the struggle of goddess Chandi against dominant merchant Dhanapati. But Chandi's is her own struggle against deprivation, no combined strength of class struggle works here. But in the 'Byadhkhanda' of the same the plot centres around the struggle of Kalketu as a person from the deprived class of society. He in his life of a hunter has to undergo many sufferings in the hands of the dominant class. Even when he achieves kingship he has to bow down to the upper class. He is unable to oppose his humiliations rather is compelled to surrender to them. The two Mangal kavyas also record several pitiful events of the oppression of deprived lowborn people as well as the dalits and portray their struggles of class consciousness that are flowing like undercurrents in the body of the main narratives.

Discussion

১

> "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা প্রতিপালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে – জীবন-যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে - উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"[১]

'রাশিয়ার চিঠি'-তে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের বঞ্চিত, অবহেলিত, শ্রমজীবী অন্ত্যজ মানুষের সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে এককথায় যাদের 'দলিত' বলা হয়। চতুর্বর্ণের শেষ বর্ণ ও চতুর্বর্ণের বাইরে যে খণ্ডিত, বিভক্ত শ্রেণি যারা এদেশের আদি অধিবাসী সেই অনার্য জাতি, বৈদিক যুগ থেকে যারা পরিচায়িত হয়েছে রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি ঘৃণাবাচক শব্দবলয়ে তারাই বর্তমানে অন্ত্যজ বা ব্রাত্য বা দলিত নামে পরিচিত। এই সকল প্রতিশব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই শ্রেণির মানুষের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ের বহু প্রাচীন স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যত। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পাদদ্বয়কে এই শ্রেণির উৎপত্তিস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদী আর্যদের রচিত সুপ্রাচীন গ্রন্থ ঋকবেদ। রথের রশির মতো বিপুলায়াতন সভ্যতার রথটিকে আজন্মকাল টেনে চলেছে অথচ এই অন্ত্যজরা সমাজে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য। দেবমূর্তির স্রষ্টা হয়েও দেবপূজায় নেই এদের অধিকার। বৈষম্যের এই রাজনীতি যুগ যুগ থেকে চলে আসছে। প্রজাপালক রামচন্দ্রের হাতেও তার অন্যথা হয়নি। তিনিও পরিচালিত হয়েছিলেন উচ্চবর্ণের কূটনীতির দ্বারা। তাইতো বনগমনকালে যে রামচন্দ্র গুহকচণ্ডালকে জড়িয়ে ধরেছেন মিত্ররূপে, সম্রাট হয়ে শূদ্র শম্বুককে তিনিই ছল করে হত্যা করেছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে। সমাজ তো বটেই সামাজিক দর্পণ যে সাহিত্য তা প্রবর বর্ণের দ্বারা সৃষ্ট। তাই সেখানে মুখ্য ভূমিকাতে এই প্রবরবর্গকেই দেখা গেছে। অবরেরা এসেছে গৌণভাবে। সাহিত্যে তারা চির উপেক্ষিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগও তার ব্যতিক্রম নয়। খ্রিস্টিয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই মধ্যযুগের বাংলাদেশে শাসকের পালাবদলের সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বদল ও সংমিশ্রণ সামাজিক স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দিয়েছিল। হিন্দুধর্মের জটিল অচলায়তনের প্রাচীরে বৌদ্ধধর্মই প্রথম আঘাত হেনেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে তাই বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া পন্থায় আকৃষ্ট হয়ে এই ধর্মের আশ্রয়ে এসেছিল সমাজের নিম্নশ্রেনীর মানুষেরা। একমাত্র সেই সুদূর চর্যার যুগেই তারা পেয়েছিল ধর্মচর্চার সাথে সাথে সাহিত্যচর্চার অধিকার। ডোম্বীপাদ, শবরপাদ, তন্ত্রীপাদের কথা পাই যারা বাংলা ভাষায় প্রথম দলিত সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সান্ধভাষার অন্তরালে যারা নিজেদের সমাজের কথা, উচ্চবর্গের হীনতার কথা বলতে পেরেছিলেন। চর্যার যুগের পর আসে দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অন্ধকার যুগ। হিন্দুধর্মের শিকড়ে জোরে টান পড়ে বিজাতীয় শাসকের বিজাতীয় ধর্মের আঘাতে। সেই ইতিহাস আত্মস্থ করেই তৈরি হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলি। উচ্চবর্গের প্রতিনিধিরা হিন্দুধর্মের ক্ষীণ স্রোতধারাকে মিশিয়ে দিতে চাইলেন লোকজ ধর্মের সাথে। পৌরাণিক দেবদেবীরা মিশে গেলেন লৌকিক দেবদেবীর সাথে। ধ্যানী যোগী দেবাদিদেব মহাদেব পরিণত হলেন সাধারণ গৃহস্থ কৃষকে। হিমালয়দুহিতা পার্বতী পরিণত হলেন পশুরক্ষাকর্ত্রী দেবী চণ্ডীতে। এভাবেই সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের লোকজ ধ্যানধারণাকে, বিশ্বাসকে নিজ ধর্মে মেলাতে বাধ্য হয়েছিল বিপন্ন হিন্দুধর্মের ধারকেরা। অন্যদিকে, লৌকিক দেবদেবীরও বিপরীতমুখী প্রয়াস চলেছিল পৌরাণিক মর্যাদা লাভের জন্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই শাখা 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য দুটিতে দুজন অনার্য দেবীর আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সেই কাহিনি রয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল উচ্চবর্ণ পরিচালিত সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। দুই দেবীর সেই প্রচেষ্টা যেন উচ্চবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে গিয়ে মধ্যযুগীয় সমাজের অবহেলিত, অস্পৃশ্য অন্ত্যজজনের সামাজিক মর্যাদা লাভ করার কাহিনি। কাব্যদুটিতে দেবকথার আড়ালে থাকা সেইসব বঞ্চিত মানুষের প্রতিরোধের কাহিনি তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে এই প্রবন্ধে।

২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'মনসামঙ্গল' কাব্য আলোচনার পূর্বে দেবী মনসার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মনসা হলেন সর্পের দেবী বা নাগেদের দেবী। যে দেবীর পূজার প্রচলন ভারতীয় আর্য সমাজে ছিল না। প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে এই নাগপূজা ছিল। এছাড়া মহাভারতে নাগজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়; যারা টোটেম হিসবে সাপের ফণাকে ব্যবহার করত। মনসামঙ্গলের কাহিনি কোনো পুরাণপ্রসূত নয় তা লৌকিক কাহিনি। মনসামঙ্গল কাব্যে আরেকটি নারী চরিত্রের কথা পাই তিনি হলেন মনসার সহচরী, তার সর্ব কাজের সহায়ক ও পরামর্শদাত্রী নেতা। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই নেতা চরিত্রের উৎস সন্ধান করেছেন এইভাবে -

> "মনে হয় কোন রজকের কন্যা বিষনাশকারী কতকগুলি প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভ করিয়া কালক্রমে সাধারণ জনগণের মধ্যে দেবীত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা মনসা হইতে প্রাচীনতর।"[২]

এই মন্তব্যে একথা বেশ স্পষ্ট যে নেতা কোনো পৌরাণিক চরিত্র নয়। সে এই মর্ত্যেরই সাধারণ মানবী যে সামাজিক মর্যাদা পেয়েছিল নিজ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করে। একই যুক্তিতে মনসাকেও একজন নিম্নবর্ণের মানবী বলা যায়, যার সংগ্রাম চলেছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের। সে অনার্য-বংশদ্ভূতা তাই আর্যসমাজে নিজ পরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তার সঙ্গী হয়েছিল একজন অভিজ্ঞ অন্ত্যজ নারী নেতা ধোপানী। এদের মিলিত লড়াই চলেছে উচ্চবর্গের সবথেকে ধনী বণিক সম্প্রদায়ের নেতা চাঁদ সদাগরের বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে অগণিত নিম্নশ্রেণির মানুষেরা যারা শোষিত, নির্যাতিত হয়েছে চাঁদ সদাগরের দ্বারা। মনসা যেন এদের সকলের নেত্রী।

আবার মনসাকে 'মনসামঙ্গল'-এর কবিরা যে পৌরাণিক আবরণে তাঁর অনার্য পরিচিতিকে বা লৌকিক পরিচিতিকে আড়াল করতে চেয়েছেন সেই কাহিনিটিতে মনসা হল দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা। মনসার বাস পাতালে। অপর দিকে নেতার জন্ম মহাদেবের স্বেদবিন্দু থেকে। স্বর্গের দেবদেবীর নজরে এরা হীন। নেতা পেয়েছে দেবদেবীর বস্ত্র পরিষ্কারের কাজ। অন্যদিকে মনসা পেতে চেয়েছে স্বর্গীয় দেবীর মর্যাদা। দেবী মনসাকে ও 'মনসামঙ্গল'-এর কাহিনিকে এভাবে দেখলে শেষপর্যন্ত মর্যাদা লাভের কথাটাই বড় হয়ে ওঠে। তা সে একজন লৌকিক দেবীর পৌরাণিক দেবীর মর্যাদা লাভের কাহিনিই হোক কিম্বা প্রান্তজনের দলনেত্রী রূপে সম্মান, অধিকার, হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লড়াই।

মনসা উচ্চবর্গের দ্বারা পূজিত হলে তবেই পৌরাণিক দেবীর সম্মানে সম্মানিত হবে। দেবসমাজের এরূপ শর্তে মনসার লড়াই শুরু হয়েছিল। এই উচ্চবর্গের প্রধান প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর। সে সপ্তডিঙা ভরে ধনসম্পদ নিয়ে আসে দেশ-বিদেশ থেকে। সে স্বর্গবাসী দেবতাদেরও দেবতা মহাদেবের ভক্ত। তাই স্বর্গীয় দেবীর মর্যাদাহীন মনসার প্রতি তার রয়েছে তাচ্ছিল্য মিশ্রিত তীব্র ঘৃণা। প্রতিপত্তিশালী চাঁদ তার নগর থেকে বিতাড়িত করেছে অন্ত্যজ নাগজাতিদের যারা মনসার অনুগত। মনসা বুঝতে পেরেছিল চাঁদকে পূজারী রূপে পেতে হলে অর্থাৎ নিজ মর্যাদা আদায় করতে হলে নাগজাতির মতো চাঁদ সদাগরের রাজ্যে অন্যান্য অবহেলিত, নির্যাতিত, অস্পৃশ্য সকল মানুষকে নিজ পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। তাই সে সমাজের অন্তেবাসী মানুষের কাছে নিজেকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। যারা শক্তিহীনবলে পরিচিত তাদের মিলিত শক্তিই উচ্চবর্গকে বাধ্য করবে মনসাকে তথা ব্রাত্য সমাজের এক প্রতিনিধিকে সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে।

মধ্যযুগীয় সমাজ বিভিন্ন বৃত্তি ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সেইসমস্ত বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তিধারী মানুষের সামাজিক অবস্থানের ছবি পাওয়া যায়। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের পাশাপাশি মনসামঙ্গল কাব্যে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের নিম্নশ্রেণির সেইসব মানুষের অতিসাধারণ জীবনযাপনের ছবি। যেমন কাব্যের প্রথমদিকে রাখাল সমাজের কথা পাই। সেখানে মনসার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে তাদের কাছে দুধ চাওয়ার এবং কাঙালি ও 'বাদিয়ার মায়্যা' ভেবে রাখাল কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ার কাহিনি রয়েছে। এই ঘটনাতে দুটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়। প্রথমত, রাখলরা ব্রাত্য হলেও ব্রাত্য জনজীবনের মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল। তারা বেদে সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখত সেইজন্য এই শ্রেণির মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। কারণ এরা অত্যাচারিত হত উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণির হাতে। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণী বৃদ্ধাবেশী মনসাকে উত্যক্ত করার ফলে সে রাখালদের গোধন হরণ করেছে এই ঘটনায় উচ্চবর্গের শ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসাবে পরিচিত

ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করার ফল যে কতটা ভয়ানক হতে পারে সেই বার্তাই যেন এখানে ঘোষিত হয়েছে। তবে, মনসার লক্ষ্য যেহেতু চাঁদকে পরাজিত করা তাই সে সর্বপ্রথম নিম্নবর্ণের রাখাল সমাজকে নিজপক্ষে এনেছে। প্রতাপশালী হাসন কাজী রাখালদের উপর অত্যাচার করলে মনসার নির্দেশে ব্রাত্য নাগজাতি অত্যাচারী হাসন কাজীকে পর্যুদস্ত করেছে-

"বেড়িল নাগের দল অতি ভয়ঙ্কর।
...
ভাগে ভাগে বেরিল নাগের পাটোয়ায়।
মাজিল হাসন হাটী নাহি প্রতিকার।।"[৩]

এছাড়া পাটনী, গোয়ালিনী, মালিনি, ডোমনী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর উল্লেখ কাব্যে পাই। মনসা জন্মের পূর্ব কাহিনিতে দেখি শিবের পাটনী বেশী পার্বতীকে দেখে কামার্ত হওয়ার ঘটনা। বৃদ্ধ শিবের পাটনীর প্রতি এই ধরণের হীন আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গভীর সামাজিক সত্যটি। উচ্চবর্ণের কাছে নিম্নবর্ণের মানুষেরা অচ্ছুত হলেও সময় বিশেষে নিম্নবর্ণের নারীদের সাহচর্যে তাদের জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় থাকে না। শিব তাই বলে -

"সম্বিধান দেহ মোরে পাটনীর ঝি।
তুয়া আলিঙ্গন বিনে আমি নাঞি জি।।"[৪]

এর উত্তরে পাটনী বলেছে - "হেনকর্ম আমরা না করি কোন কালে"[৫] অর্থাৎ দরিদ্র হলেও এধরনের হীনতা তাদের সমাজে নেই। শুধু মধ্যযুগেই নয় চিরকাল অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীরা উচ্চবর্ণের পুরুষের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। চাঁদসদাগরও নিম্নবর্ণের পূজিত দেবীকে বারংবার 'লঘুজাতি কানী' বলে অপমান করেছে অথচ অন্ত্যজ শ্রেণিরই বেশ্যা বা নটীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। ডোমনী বেশী বেহুলার উক্তিতে ডোম সমাজের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় -

"অতি কুলহীন মোরা হই ডোম জাতি।।
ধুচনি চুপড়ি বুনি আর বুনি ডালা।
সিয়নী বিয়নী বুনি আর বুনি কুলা।।"[৬]

সামাজিকভাবে এরা কুল ও গোত্রহীন হয়ে সমাজের প্রান্তে বসবাস করত। ডালা, কুলো এসব বানিয়ে ডোম নারীরা নগরের ভিতর বিক্রয় করত। অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা তাদের সমাজে অন্তঃপুরবাসিনী ছিল না। স্বাধীনভাবে তারা জীবিকা অর্জন করতে পারত।

রাখাল সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মনসার পরবর্তী লক্ষ্য হয় জেলে সমাজ। কাব্যে রয়েছে জালু-মালু বা জেলে-মালো সম্প্রদায়ের কাহিনি। এই কাহিনির দ্বারা সমাজের উচ্চবর্ণের হাতে নিপীড়িত, অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের মানুষের বিভীষিকাময় জীবনযাত্রার ছবিই উঠে আসে। এরাও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। এদের জীবিকা মাছ ধরা। চম্পক নগর প্রান্তে এদের বাস। তারা চাঁদবেনের দাস। তাই চাঁদবেনের 'শতভার মৎস্য' আনয়নের ভার পড়ে তাদের উপর। এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করা জালুমালুর পক্ষে সম্ভব নয় তাই বাধ্য হয়ে তারা নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ করতে চায়। তৎকালীন সমাজে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের বাসভূমি ত্যাগ বোধ হয় খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু চাঁদ সদাগর তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয় –

"মৎস্য নাহি দিবে যদি গাড়ি একুঠাঁই।।"[৭]

এর প্রতিবাদ তারা করতে পারেনি তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। মনসা এই চরম সময়টির সদ্ব্যবহার করে জালু-মালুর পাশে দাঁড়িয়েছে। মনসার সাহায্য লাভের পর জালু-মালুর সংসারে উন্নতি দেখে চাঁদের স্ত্রী সনকা বিস্মিত হয়ে যা বলেছে তাতে অন্ত্যজ শ্রেণির দারিদ্র্যজীর্ণ জীবনই ধরা পড়ে -

"অতি বড় দুঃখী ছিল জালু মালু দাস।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চালেতে না ছিল খড়, পরিবারে বাস।।
মোর বাড়ি ভাড়া ভান্যা আন খুদকুড়া।
মৎস্য কুটিয়া আন তার পোঁটা মুড়া।।”[৮]

চাঁদ বণিক ও সনকার জালু-মালুকে ‘দাস’ সম্বোধনে মধ্যযুগেও যে দাসপ্রথা ছিল তা বোঝা যায়। পরিবারের সকলে মিলে বিত্তশালী গৃহে এই সমস্ত ব্রাত্যজনেরা বেগার খাটত। মেয়েরা দাসীবৃত্তি করে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট বর্জিত অংশে সংসার চালাত আর পুরুষদের যে কোন সময় সামান্য মূল্যে ইচ্ছেমতো খাটিয়ে নিত চাঁদের মতো ধনবান ব্যক্তিরা। এহেন অন্ত্যজ পরিবারে ধুমধাম করে মনসার পুজো হয়েছে। চাঁদের সাম্রাজ্যে বাস করে নিম্নবর্ণের দরিদ্রপ্রজার এরূপ আস্পর্ধায় চাঁদ স্তম্ভিত হয়েছে। মনসাকে কেন্দ্র করে তাদের এই উৎসব যেন আধিপত্যকামী চাঁদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের জয়যাত্রার প্রথম সূচনা।

চাঁদসদাগরের মতো সামন্ত প্রভুর অত্যাচারের আরও ছবি রয়েছে। লোহার বাসর ঘর বানানোর জন্য তারাপতি কর্ম্মকারকে চাঁদ শুধু নিয়োগ করেনি মৃত্যুভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করেছে -

“স্ত্রী-পুত্রের দয়া থাকে প্রাণে থাকে ডর।
সবে মিলি কর ঘর লোহার বাসর।।”[৯]

শ্রমজীবী এই সব মানুষেরা বেশিরভাগই নিম্নবর্ণের। দূরে সরিয়ে রাখলেও এদের সহযোগিতা ছাড়া চাঁদ বণিকের জীবন যাপন করা দুষ্কর। অথচ বারংবার প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখলে বোঝা যায় অন্ত্যজজনের জীবনের কোনো মূল্য ছিল না উচ্চবর্ণের কাছে।

বানিজ্যে যাওয়ার পূর্বে নৌকা মেরামতির জন্য চাঁদ সদাগর সূত্রধরদের নিয়ে আসতে তার চাকড় ধনাকে পাঠায়। ধনা তাদের ধরে আনতে গিয়ে বেঁধে আনে -

“যত বদ্ধকী বান্ধে হাতে গলায়।
ততক্ষণে মেলে গিয়া সদাগর যথায়।।”[১০]

সামন্তপ্রভু চাঁদ সদাগরের ছিল চাকর ধনার মতো লোকবল। এদেরই সাহায্যে সে শ্রমজীবী সকল মানুষকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখত। ধনাও নিশ্চিত রূপে নিম্নবর্ণেরই একজন অথচ নিজের শ্রেণির প্রতি নেই তার সহমর্মিতাবোধ। আসলে চাঁদ আশ্চর্য কৌশলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের একে অপরের শত্রু বানিয়ে রেখেছে। নিম্নবর্ণের শ্রেণিচেতনাকে আচ্ছাদিত করে রাখার এ ছিল সামন্তপ্রভুদের এক কূটচক্রান্ত।

চাঁদের ছিল মহাজ্ঞান ও নাগজাতিদের জব্দ করার জন্য শঙ্কর গাড়ুরির মতো ব্যক্তি। তাই মনসার নেতৃত্বে চাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নাগেদের বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু নির্যাতিত নাগজাতি সহজে পরাজয় স্বীকার করে নি। চাঁদকে জব্দ করতে তাই ব্রাত্য নাগজাতিরা মনসার শরণাপন্ন হয়েছে। মনসাকে চাঁদের অতিলৌকিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে অন্ত্যজ নারী নেতা ধোপানী। মনসা চাঁদের রাজ্যে পরাজিত ব্রাত্য নাগজাতির সাহায্যে চাঁদের ওই দুই প্রধান শক্তি কেড়ে নিয়েছে। নাগেরা মনসার নেতৃত্বে চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করে তার মনোবল যেমন ভেঙে দিয়েছে তেমনি যে অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে চাঁদ দরিদ্র প্রজার উপর আধিপত্য বজায় রাখে; বাণিজ্যে প্রাপ্ত সেই সকল ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে নাগেরা তাদের উপর হওয়া সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে।

চাঁদ সদাগর ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচার, উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে সকল শ্রমজীবী অন্ত্যজ মানুষেরা চাঁদের প্রতিপক্ষ মনসাকে এভাবেই আঁকড়ে ধরেছে। তারা এই অবিচারের বিচার চেয়েছে। মনসা তাদের কাছে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু চাঁদ তাদের দেবীকেও চূড়ান্ত অমর্যাদা করেছে। বাণিজ্যে যাওয়ার পূর্বেই মনসার মন্দির ধ্বংস করে নৌকার মাঝিদের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছে। কাব্যে দেখানো হয়েছে মনসার পরামর্শে কখনো কর্মকারেরা লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র রেখে, কখনো নৌকার মাঝিরা সপ্তডিঙার হাল ছেড়ে দিয়ে মনসাকে সাহায্য করেছে চাঁদ সদাগরকে পর্যুদস্ত করতে। আসলে, চাঁদ বণিকের নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মনে দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়েছিল,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যার বহিঃপ্রকাশ এতদিন সম্ভব হয়নি। মনসার মতো কুশলী নেত্রীর পরিচালনায় তাদের সেই ক্ষোভ তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে যেন কখনো বিদ্রোহের আকারে, আবার কখনো প্রতিশোধের আকারে সঠিক পথে রূপায়িত হয়েছে। মনসাও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মনসা কৌশলে চাঁদকে লোকবলহীন করেছে। চাঁদের স্ত্রী সনকা ও পুত্রবধূ বেহুলার কাছে মনসার দৈবীশক্তি প্রমাণিত হয়েছে, তাই তারা মনেপ্রাণে মনসাকে ভক্তি করতে শুরু করেছে। ঘরে-বাইরে সবাই চাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে মনসাকে দেবী হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। ক্ষমতাশালী উদ্ধত চাঁদের লোকবল ও মনোবল কেড়ে নিয়ে শেষপর্যন্ত চাঁদকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে মনসা। এইভাবে মনসার নেতৃত্বে নিম্নবর্ণের সকল মানুষের নীরব লড়াই চাঁদকে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

৩

মঙ্গল কাব্যধারার অন্তর্গত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখ্যানে রয়েছেন দেবী চণ্ডী। দেবী মনসার মতো এই দেবীও অনার্যসংস্কৃতিসম্ভূতা। এ ব্যাপারে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন –

> "... বৈদিক সংহিতায় চণ্ডীর নাম নাই, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোনো পুরাণেও এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই।"[১১]

দেবী চণ্ডী অরণ্যের দেবী, পশুকুল রক্ষাকর্ত্রী। বন্যপ্রাণীর মতো অরণ্যচারী অন্তেবাসী মানুষেরও আরাধ্যা। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ড'-এ দেবীর গোধিকারূপ ধারণের মধ্যে সেই অনার্য কৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট। প্রাচীন ভারতে গোধা নামক এক জনজাতি ছিল। যারা টোটেম হিসেবে গোধা বা গোধিকা ব্যবহার করত। মহাভারতেও এদের উল্লেখ রয়েছে। অনেকেই মনে করেন গোধাবাহিনী দেবী 'চাণ্ডী' হল 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর দেবী চণ্ডী। এই কাব্যেরই 'বণিক খণ্ড'-এ দেবী চণ্ডীর 'কমলেকামিনী' রূপ দেখা যায় যে রূপের সাথে পার্বতী, গজলক্ষ্মী দেবীর রূপ মিলে গেছে। 'মনসামঙ্গল'-এর দেবী মনসার মতো এখানে দেবী চণ্ডীর বণিক সমাজে পূজাপ্রচারের কাহিনি রয়েছে। চাঁদ সদাগরের মতো প্রতিপত্তিশালী বণিক ধনপতিও অনার্য দেবী চণ্ডীকে দেবী হিসেবে মর্যাদা দিতে রাজি নয়। তাই ধনপতির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে চণ্ডীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কিন্তু সেই সংগ্রাম তার একার। মনসামঙ্গলের মতো অন্ত্যজজনেরা সেই লড়াইয়ে সামিল হয়নি। বণিক ধনপতির গার্হস্থ্য জীবন ও বাণিজ্যযাত্রাকে কেন্দ্র করে এই খণ্ডের সমগ্র ঘটনা আবর্তিত হয়েছে।

অন্যদিকে 'আখেটিক খণ্ড'-এর কাহিনি সম্পূর্ণ পৃথক। 'আখেটিক খণ্ড'-এর কাহিনি কালকেতু ও ফুল্লরা নামের এক ব্যাধদম্পতিকে কেন্দ্র করে। তারা কীভাবে দেবী চণ্ডীর কৃপা লাভ করেছে সেই কাহিনিই এখানে বর্ণিত। সরল বন্য এই সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চণ্ডীকে কোনো বাধা পেতে হয়নি। অন্ত্যজ সমাজে তার প্রতিষ্ঠা সহজেই হয়েছে। কিন্তু তার ভক্ত কালকেতু নিম্নবর্ণের হওয়ায় সামাজিক মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে তাকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'আখেটিক খণ্ড'-এর কাহিনি তাই সমাজের উচ্চ শ্রেণির বিরুদ্ধে কালকেতুর সংগ্রামের কাহিনি। জাতিতে ব্যাধ হওয়ায় চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজের বাইরে তাদের বাস। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের সমাজের সাথে তারা সম্পর্কহীন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কর্তৃক কালকেতুর শারীরিক মানসিক আচার-আচরণের যে পরিচয় পাই তা থেকে ব্যাধসমাজ সম্পর্কে উচ্চশ্রেণির মনোভাব স্পষ্ট হয়। কবি কাব্যের প্রথমদিকে কালকেতুর আহারের বর্ণনা করেছেন এইভাবে -

> "শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিটকাল
> ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তা ল।
> ভোজনসমইয়ে গলা করে ঘড়ঘড়
> কাপড় ঊষায করে যেন মরাই-বড়।"[১২]

অন্ত্যজ সমাজের মানুষ সম্পর্কে সঠিক পরিচিতির অভাবই কি কবির এই বর্ণনার সহায়ক হয়েছে নাকি অরণ্যচারী হওয়ায় তাদের আহার রুচিহীন ও অমার্জিত হবে তা কবি শুধুমাত্র কল্পনাই করেছেন? আবার, ফুল্লরা কালকেতুকে যে সমস্ত খাবার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিবেশন করেছে তাতে মিষ্ট জাতীয় খাবারের বা ঘৃতের ব্যবহার নেই। শুধুমাত্র দইয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়টি থেকে এটা ধারণা করা অমূলক হবে না যে উচ্চমানের কিছু খাদ্য ব্রাত্যজীবনে হয়তো নিষিদ্ধ ছিল।

কালকেতু নিম্নবর্গের মানুষ হওয়ায় চাষবাস করার অধিকার তার নেই। সে বনে বনে পশু শিকার করে আর সেইসব শিকার করা পশুর মাংস, চামড়া তার স্ত্রী ফুল্লরা হাটে বিক্রি করে দিনযাপন করে। তাদের এতটাই দৈন্যদশা যে একদিনের শিকারের অভাবে তাদের ঋণ করতে হয়। অভাব-অনটনের সংসার অন্ত্যজ সমাজের সকলেরই তবুও বিপদে এরা একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। ফুল্লরা তাই ছুটে গেছে তার সইয়ের কাছে দু-মুঠো চাল ধার করতে। সইকে আক্ষেপের সুরে জানিয়েছে -

> "বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা
> চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।"[১৩]

আবার ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে ফুল্লরার বারমাস্যা বিবরণে সেই দারিদ্র্যের চরম রূপই প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নতুন মাসের সাথে আসা দুঃখ-কষ্ট তাদের জীবন দুর্বিষহ তো করে তোলেই, যে সকল মাসে 'সুখী জগজন'[১৪] সেসব সময় তাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া নিম্নশ্রেণির মানুষদের আরও বিপদে ঠেলে দেয়। ফুল্লরা আক্ষেপের সুরে বলে উৎসবের আনন্দে যখন -

> "উত্তমবসন বেশ করয়ে বনিতা
> অভাগি ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা।"[১৫]

শীত উপভোগ বা উৎসব আয়োজন তাদের জীবনে কোনো বৈচিত্র্য আনে না। বেশভূষার প্রতি নারীর থাকে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ। কিন্তু অভাবের জ্বালায় ফুল্লরাকে সেসব সাধ বিসর্জন দিতে হয়েছে। দু-মুঠো আহারের ব্যবস্থা করাই যখন তাদের কাছে সাধ্যাতীত ব্যাপার তখন উৎসবে যোগদান তো বাহুল্য মাত্র। ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে দেখে ফুল্লরার বারমাস্যা বিবরণ তাই মিথ্যা পাঁচালি মাত্র নয় বরং তাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের বাস্তব উপলব্ধি।

বহুবিবাহ সেযুগে নিম্নবর্গীয়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না বোধ হয় অথবা থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গাঢ়তা অনেক বেশি ছিল। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকারবোধ ছিল। অসময়ে দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হোত না তারা। সেইজন্য রূপসী যুবতী নারী বেশী দেবী চণ্ডীকে সপত্নী ভেবে কালকেতুর প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে ফুল্লরা -

> "পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে
> কাহার সোলস্যা কন্যা আনিয়াছ ঘরে।
> এতদিনে মহাবীর পাপে গেল মন
> আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কার রাবণ"[১৬]

ফুল্লরার এই নারীব্যক্তিত্বের পরিচয় আমরা 'বণিকখণ্ডে' দেখি না। ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়বার বিবাহে লহনার নিষ্ফল অভিমানই সার হয়েছে। বণিক কপট যুক্তি দিয়ে জানিয়েছে - "রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।"[১৭] স্বামীর প্রতি প্রেমের অধিকার লহনার ছিল না। নিঃসন্তান হওয়ায় তার দর কমে গিয়েছে। সংসারে এমন নারীর আশ্রয় পাওয়াই তার প্রাপ্ত অধিকারের চাইতে যেন অধিক ছিল। উচ্চবর্গের সমাজে নারীর প্রতি এই অমর্যাদার ছবি এখানে স্পষ্ট। লহনা ও ফুল্লরাকে পাশাপাশি রাখলে দুই সমাজের পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়।

এছাড়াও উচ্চবর্গের নারীরা নিজের ভরণ-পোষণের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষী ছিল। অন্যদিকে নিম্নবর্গের নারী হওয়ায় 'ফুল্লরা পসার করে নগরে চাতরে'।[১৮] সে অনেক বেশি স্বাধীন। সংসার চালাতে স্বামীর উপর নির্ভরশীল নয় বরং সে স্বামীর কাজের সহায়ক।

অন্ত্যজ কালকেতুর উপর দেবী চণ্ডীর অহেতুক কৃপা তার স্বাধীন জীবনে যেন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কালকেতু তাই দেবীকে জানিয়েছে -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী।"[১৯]

অস্পৃশ্য বলে তার ঘরে দেবী চণ্ডীর প্রতিষ্ঠিত মূর্তি পূজোর জন্য কোনো ব্রাহ্মণ আসবে না তা সে জানে -

"অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড়
কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।"[২০]

মধ্যযুগে রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যে অস্পৃশ্য ছিল তা বেশ স্পষ্ট। কালকেতু দেবীকে জানিয়েছে তাকে স্পর্শ করলে স্নান করা উচিত। বারবার নিজেকে 'নিচ জাতি' হিসেবে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে আছে কালকেতুর আজন্ম লালিত হীনমন্যতা। উচ্চকোটির সমাজ এই হীনমন্যতাবোধকে সৃষ্টি করেছে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের মনে। কালকেতু কখনই সেই বোধের বাইরে যেতে পারেনি। প্রতিভা ও দক্ষতার দ্বারাও যে সামাজিক মর্যাদা আদায় করা যায়, সেই চিন্তাধারাকে কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি বংশ কৌলীন্যের গর্বে অন্ধ উচ্চবর্গ। তাই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে নীচ বংশের ভেবে কালকেতুর আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অশিক্ষিত, বন্য মানুষের সরলবিশ্বাসের সুযোগ নিত উচ্চবর্গের মানুষজন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মুরারী শীল এমনই এক চরিত্র। নগদ দাম না মিটিয়ে কালকেতুর কাছে জিনিসপত্র কিনতে সে অভ্যস্ত ছিল। এই শঠ মুরারী শীলের কাছে কালকেতু দেবীপ্রদত্ত আংটির মুল্য নির্ধারণ করতে গেলে মুরারী তাকে ঠকাতে চেয়েছে। তার উদ্দেশ্য সফল না হলেও কালকেতুর মতো সাধারণ মানুষদের ঠকিয়ে যে মুরারী শীলের মতো ধূর্ত মানুষেরা লাভবান হতো তা বোঝা যায়।

কালকেতু ব্রাত্য জাতির হয়েও দেবীর কৃপা লাভ করেছে ও রাজা হয়েছে। এরূপ ঘটনা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদী সমাজে বিস্ময়জনক তো বটেই চরম অপ্রীতিকরও। তাই রাজা হলেও সে কখনো সমাজে মান্যতা পায়নি। কালকেতুও ভালো ভাবেই জানে - "নিচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন।"[২১] ধনবান হলেও সামাজিক মর্যাদা সে কখনোই লাভ করবে না। রাজা হওয়ার পরেও তাই ভাঁড়ুদত্তের মতো সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে কালকেতুকে অপমানিত হতে হয়েছে একাধিকবার। এক পতিত জাতির যুবককে রাজা হিসেবে মেনে নেওয়া ভাঁড়ুদত্তের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার জাত্যাভিমানে একথা কাঁটার মতো বিঁধেছে। কালকেতুর রাজা হওয়া তার কাছে নীচের স্পর্ধা মনে হয়েছে। কালকেতুকে তাই রাজত্বহীন করতে সে বদ্ধপরিকর। সে ঠিক করে -

"হাটে বদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি।
...
পুনর্বার হাটে মাস বেচাং ফুল্লরা।"[২২]

ভাঁড়ু চক্রান্ত করে কালকেতুর সাথে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ বাধিয়েছে। সামান্য এক ব্যাধ হয়েছে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী কলিঙ্গরাজও এ কথা মেনে নিতে পারেনি। কলিঙ্গরাজের উক্তিতে তার সেই জাত্যাভিমান ও ব্রাত্য হিসেবে কালকেতুর প্রতি তীব্র ঘৃণা মিশ্রিত অশ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে -

"কাঠারিআ বেটা ছিল কলিঙ্গ-নৃপতি
ধন দিআ রাজা তারে কৈল ভগবতী।"[২৩]

রাজার উপযুক্ত সম্মান নয় বরং কলিঙ্গরাজ যেন এক অন্ত্যজ নিম্নবর্ণের মানুষকেই শিক্ষা দিতে চেয়েছে তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘনের।

মধ্যযুগীয় সমাজে বর্ণ বিভাজনের গুরুত্ব কতটা ছিল তা কালকেতুর নগরবিন্যাস রীতিতেই টের পাওয়া যায়। রাজা হয়ে কালকেতু সকল ধর্মের ও সমাজের মানুষকে তার নগরে বসতি স্থাপনের জন্য আহ্বান জানায় কিন্তু তার অধিক আগ্রহ ছিল ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি -

"যত বৈসে দ্বিজবর   তার নাহি নিব কর

চাষভূমি বাড়ি দিব দান।”[২৪]

কালকেতু তাই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বিনা খাজনায় বাসভূমি ও নিষ্কর চাষজমি দিতে চায়। কালকেতু তার ব্যাধজীবনে চতুর্বর্ণের বাইরের পতিত জাতি ছিল। কিন্তু যখনই সে রাজা হয়েছে তখনই সে উচ্চবর্ণের বর্ণভেদকে মান্যতা দিতে শুরু করেছে। রাজা হলেও সে যে সমাজের চোখে অন্ত্যজ তা বুঝেই নিজ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বোধহয় তার এই প্রচেষ্টা। কালকেতুর নগরের কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ জাতি বসবাস করেছে। এরপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সবশেষে নগর প্রান্তে বসে চণ্ডাল, কিরাত, ধীবর, কলু, বাইতি, কেওরা, পাটনি প্রভৃতি জাতির মানুষ। আশ্চর্যের বিষয় হল অন্ত্যজ, পতিত জাতির রাজার রাজত্বেও এই সমস্ত অস্পৃশ্য মানুষের ঠাঁই হয় না নগরের কেন্দ্রে বাস করার অথবা তারা পায় না ব্রাহ্মণ প্রজার মতো নিষ্কর জমি। কালকেতু নিজে রাজা হয়েও কেবল ‘ব্রাহ্মণের দাস’[২৫] হয়ে থাকতে চেয়েছে। সমাজের নজরে উঁচু হওয়ার জন্য অনার্য দেবীর মতো এও যেন নিম্নবর্ণের মানুষের উচ্চবর্ণের সাথে মিলিত এক চুক্তি।

৪

মঙ্গলকাব্যের দুই ভিন্ন কাহিনিতে দুই দেবীর মাহাত্ম্য কথার আড়ালে এইভাবেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির লৌকিক জীবন সংগ্রাম। উচ্চবর্ণের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কখনো সেই সংগ্রামে মিলিত হয়েছে সমাজের সকল অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা তাদের সংস্কৃতিকে সার্বিক মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছে। আবার, কখনো নিম্নবর্গের কোনো একক ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা টিকিয়ে রাখার লড়াই চলেছে উচ্চবর্গের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে উচ্চবর্গ লালিত সামাজিক নিয়ম কানুনের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আর তাই অন্ত্যজ, পতিত তথা দলিত শ্রেণির আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত সংগ্রামের কাহিনিরই এক ক্ষণের সাক্ষী হল ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ১১
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২২৭
৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭০
৪. নস্কর, সনৎ (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৫
৫. তদেব, পৃ. ১৫
৬. তদেব, পৃ. ২৩৮
৭. তদেব, পৃ. ১১৪
৮. তদেব, পৃ. ১২৩
৯. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৮৩
১০. ভট্টাচার্য, বসন্ত কুমার (সংকলক), বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, বাণী নিকেতন, কলকাতা, ১৩৩৫, পৃ. ১০৯
১১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪৬
১২. সেন, সুকুমার (সম্পা), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৬
১৩. তদেব, পৃ. ৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ৬১
১৫. তদেব, পৃ. ৬১
১৬. তদেব, পৃ. ৬২
১৭. তদেব, পৃ. ১১৯
১৮. তদেব, পৃ. ৪৫
১৯. তদেব, পৃ. ৬৩
২০. তদেব, পৃ. ৬৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২১. তদেব, পৃ. ৬৫
২২. তদেব, পৃ. ৮৫
২৩. তদেব, পৃ. ৯২
২৪. তদেব, পৃ. ৭৭
২৫. তদেব, পৃ. ৭৭

Bibliography:

সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা, ২০১৭
নস্কর, সনৎ (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৭
বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯
বিশ্বাস, অচিন্ত্য, (সম্পা.), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০২
ভট্টাচার্য, বসন্ত কুমার, (সংকলক) বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, বাণী নিকেতন, কলকাতা, ১৩৩৫
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২০
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালের যাত্রা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৭৮
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৩৯
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫
রায়, দেবেশ, (সম্পাদক ও সংকলক), দলিত, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা ২০০৪
মণ্ডল, চিত্ত এবং প্রথমা রায় মণ্ডল, (সম্পা.), দলিত সাহিত্য, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২৩
বেরা, জয়দেব (সম্পা.), দলিত, নায়রা বুকস, বিষ্ণুপুর, ২০২০
পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯
মণ্ডল, সন্দীপ, মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫
রায়, বিশ্বনাথ (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 17 - 26
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চৈতন্য বিষয়ক প্রবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sunimaghosh70@gmail.com
ও
রেশমিকা পারভীন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : resmikaparvin2017@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Chaitanyadev, Little Magazine, Regional culture, Gour, Ramkeli, Rup-Sanatan.

Abstract
A Little Magazine reflects the rich and diverse essence of Bengali creativity and introspection. It offers a platform for writers and poets to freely share their deepest emotions and thoughts. Though small in size, these magazines carry extensive ideas and innovative perspectives. They have played a crucial role in shaping Indian literature, particularly Bengali literature, by going beyond mainstream literary traditions. These magazines capture the essence of regional culture, customs, rituals and folklore in an organic and straightforward way. The same is true for the Little Magazines of Malda district.

Malda, located in the remote part of West Bengal, often lags in areas like education, healthcare and economy. Yet, through these Little Magazines, writers and poets strive to highlight the district's history. One significant historical focus is the arrival of Chaitanyadev in Gour. Chaitanya visited Gour on Jyeshtha Sankranti in the year 912 of the Bengali calendar, which corresponds to June 1515 in the Gregorian calendar. This event is vividly described in essays published in Malda's Little Magazines.

While major biographies of Chaitanya, such as 'Chaitanyabhagavat', 'Chaitanyacharitamrita', and 'Chaitanyamangal', touch upon his visit to Gour briefly, the essayists of Malda have gone beyond these texts. They have gathered additional details and explored different perspectives on his journey. These essays also delve deeply into the socio-economic and political conditions

of Gour during Chaitanya's time, the history of Ramkeli, and his association with Rup and Sanatan.

The essays in Malda's Little Magazines provide valuable insights into Chaitanyadev's life, his impact on society, and his contributions to literature. They help readers distinguish between historical facts and legends, while also exploring instances where history and legend intertwine to form new interpretations. Since Chaitanya's visit, an annual fair has been held in Ramkeli on Jyeshtha Sankranti to honor his memory. This fair attracts visitors from across India and abroad, boosting local trade and commerce and emphasizing Chaitanya's lasting influence. These essays have significantly enriched the study of Bengali history, especially regarding Chaitanyadev's legacy. Their importance in understanding his life and its impact on society and culture cannot be overstated.

Discussion

> "চিন্তাধারাকে লুকিয়ে রাখার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই, তা প্রকাশ করতে যদি লজ্জাবোধ হয়, তবে সে ধরনের চিন্তা না করাই ভালো।"
>
> — প্রাচীন গ্রিক কবি ইউরিপিদিস

প্রকাশের এই তাগিদ থেকেই লিটল ম্যাগাজিনের উদ্ভব। লিটল ম্যাগাজিন হলো বাঙালির আত্মানুভূতির বহুরৈখিক প্রাণস্পন্দন। এখানে লেখক ও কবিগণ নিজের আত্মানুভূতি স্বাধীনভাবে বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন। তাই লিটল ম্যাগাজিন 'লিটল' হলেও ভাবনায় বৃহৎ এবং ব্যঞ্জনায় অভিনব। এই লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্য। তাই সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গ এলে যে নামটি সর্বাগ্রে আসে সেটি হল লিটল ম্যাগাজিন। প্রচলিত সাহিত্য ধারার বাইরে মুক্তচিন্তা ও আন্দোলনের ফসল এই লিটল ম্যাগাজিন। এখানে প্রান্তিক অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, আচার-আচরণ কিংবা কোনো ঐতিহাসিক স্থানের নানান লোককথা সাবলীলভাবে ফুটে উঠে। মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য।

মালদার সুসন্তান রাধেশচন্দ্র শেঠের সম্পাদনায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কুসুম' পত্রিকার মাধ্যমে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনের পথ চলা শুরু। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনগুলির ধারা অব্যাহত। সেই সূত্রে জেলা এবং জেলার বাইরের বহু খ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম ঠাঁই পেয়েছে জেলার লিটল ম্যাগাজিনে। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলা মালদা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পিছিয়ে থাকা জেলা হিসেবে এখানে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর যে লড়াই, সেই লড়ায়ের মধ্যেই নিজের জেলার ইতিহাসের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন লিটল ম্যাগাজিনের লেখকরা। সেই ইতিহাসচর্চার মধ্যে অন্যতম হলো গৌড়ে চৈতন্যদেবের আগমন পর্বটি।

প্রাচীন বাংলায় উত্তর-পূর্ব ভারতের এক স্বীকৃত রাজধানী ছিল গৌড়। পাটলিপুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গৌড় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। গৌড়ের প্রতিষ্ঠা করেন প্রাচীন বাংলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক। তারপর দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে রাজধানী হিসেবে ঐতিহ্য বহন করেছে এই গৌড়। বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান নৃপতিগণ গৌড়ের সিংহাসনে বসে রাজ্যের রাজকার্য ও শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ-সংঘর্ষও করেছেন। তাই গৌড়ভূমি কখনও রণক্ষেত্র, কখনও বধ্যভূমি, কখনও বা মন্ত্রণাগৃহে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কোনো রাজাই তাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। গৌড়ভূমিকে সেই সম্মানের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন একমাত্র চৈতন্যদেব। গৌড়ের শাসকরা পাঁচশো বছরে যা করে যেতে পারেননি, শ্রীচৈতন্যের কয়েক দিনের পাদস্পর্শে গৌড়কে সর্বভারতীয় পরিচিতি ও সম্মান এনে দিয়েছে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের আগমনের ফলে গৌড় তথা মালদার সংস্কৃতিতেও এসেছে নতুন জোয়ার। তাঁর এই আগমনের ইতিহাসটিকে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকগণ নিখুঁত ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের প্রবন্ধে। নিম্নে এই বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হল —

প্রবন্ধের নাম	প্রাবন্ধিক	পত্রিকা	প্রকাশকাল
গৌড়ীয় ধর্মদর্শন ও শ্রীচৈতন্যের আদর্শ-প্রসারে রামকেলি	দিলীপকুমার দত্ত	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলিতে ভক্তি আন্দোলন : শ্রীচৈতন্য, রূপ-সনাতন	গোপাল লাহা	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
শ্রীচৈতন্যের রামকেলি আগমন : এক অচর্চিত ইতিহাস	লায়েক আলি খান	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলি পরিচয়	কল্যাণ মুখোপাধ্যায়	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ	সুখেন্দুশেখর রায়	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
শ্রীচৈতন্যের গৌড় পরিক্রমা	অনন্যা গোস্বামী	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
গৌড়নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ	কেদারনাথ গুপ্ত	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলি গ্রাম ও শ্রীচৈতন্যদেব — এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সুস্মিতা সোম	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
উজ্জ্বলনীলমণির খোঁজে গৌড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ	আইরিন শবনম	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলিতে চৈতন্যদেবের আগমন : সময় থেকে সময়ান্তরে	বিকাশ রায়	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
সাধনতীর্থ রামকেলির পথে পথে	রাধাগোবিন্দ ঘোষ	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
গৌরগরবিনী এ গৌড় রাজধানী	ফণী পাল	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রূপ ও সনাতন যখন গৌড় মালদায়	কমল বসাক	গৌড় মালদা সংবাদ	শারদীয়া ১৪১২
শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে আগমনের পেছনে কী কোন গোপন অভিসন্ধি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল?	অরুণ কান্তি ভট্টাচার্য	গৌড় মালদা সংবাদ	শারদীয়া ১৪১৫

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব একজন মাইলস্টোন এবং বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ শতাব্দী চৈতন্যের নামানুসারে করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ‘চৈতন্য যুগের’ আগের ও পরের সময়কে বলা হয়ে থাকে ‘চৈতন্য পূর্বযুগ’ ও ‘চৈতন্য উত্তরযুগ’। বাঙালি জাতির এক মহাসংকট কালে আবির্ভূত হয়ে, সেই জাতির ক্ষয়িষ্ণু, হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে আবার তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন তিনি। একা একজন ব্যক্তির পক্ষে এতটা প্রবল শক্তি সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু চৈতন্যদেব তা করে দেখিয়েছেন। চৈতন্য জীবনীকার, গবেষক এবং ইতিহাসকারেরা চৈতন্যের জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন — গৌড় পর্ব, পরিব্রাজক পর্ব, নীলাচল পর্ব।[১] জীবনের শুরুর দিন থেকে চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় গৌড় পর্ব। মধ্যযুগে বঙ্গদেশের নাম ছিল গৌড়। গৌড়ের সীমানা অনেকখানি স্থান জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের নাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম'। দ্বিতীয় পর্ব হলো পরিব্রাজক পর্ব। এই পর্বে তিনি তাঁর জীবনের পাঁচটি বছর দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, মথুরা-বৃন্দাবনসহ বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেছেন। এই পর্বেই চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে এসেছিলেন। তৃতীয় এবং শেষ পর্বটি হল নীলাচল পর্ব। জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি নীলাচল তথা পুরীতে অতিবাহিত করেন।

জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বে দক্ষিণ ভারত ও নীলাচল পরিভ্রমণের পর বৃন্দাবন যাবার পথে গৌড় তথা মালদহে ক্ষণকালের জন্য আসেন তিনি। চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের নানান উদ্দেশ্য ছিল। তবে চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের পূর্বে গৌড়ের কিঞ্চিত ইতিহাস উল্লেখ করা প্রয়োজন। তৎকালীন সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে একদিকে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের শোষণ পীড়ন, আর একদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ। মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা সে কথায় বলেছেন —

> "তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় চেতনার দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় উচ্চবর্ণের মানুষের শোষণের শিকার হয়েছিল নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠী। সমাজে মর্যাদা পাননি তারা। ...অপারদর্শী, অসংস্কৃত নিম্নবর্গের হিন্দুর এবং ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে হতাশা, ঘৃণা ও ব্যর্থতার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। বঙ্গে ইসলামের আগমন এবং মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠাকালে বা প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম শাসকবর্গ এবং ধর্মপ্রচারক রাজশক্তি সহায়তায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে উপরে বর্ণিত ত্রুটির সুযোগ নিয়ে ইসলাম প্রচারের সুযোগকে কাজে লাগান। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে ইসলামের প্রচার শুরু করেন।"[২]

চৈতন্যদেবের সমকালে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন শাহ। তার রাজত্বকাল ছিল ১৪৯৩ - ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতান সিংহাসনে বসেছেন, তথাপি তার মনের শান্তি নেই। কেননা হিন্দু প্রজাগণ সুলতানকে উদার চিত্তে গ্রহণ করেননি। তাই সুলতান হুসেন শাহ উজিরকে ডেকে বলছেন —

> "সকল সংগ্রামে আমি বিজয়ী হই। তথাপি হিন্দু প্রজাগণ আমাকে অদ্যপি উদার চিত্তে গ্রহণ করে নাই।"[৩]

কথাটি গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তীও বলেছেন। সুলতান হুসেন শাহকে ধর্মনিরপেক্ষ শাসক বলা হলেও হিন্দু প্রজা ও রাজকর্মচারীগণ তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন না —

> "হোসেন শাহ, তৎকালে হিন্দুদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ-কালে, তথাকার হিন্দু দেব দেবী ও হিন্দুদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা সকলের মনে ছিল; তজ্জন্য উল্লিখিত রাজ-কর্মচারিগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না।"[৪]

উজির তখন সুলতানকে আশ্বস্ত করে বললেন যাদের প্রতি হিন্দু সমাজের প্রবল আনুগত্য ও ভক্তি রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের রাজ দরবারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। সেই দুজন ব্যক্তি হলেন কুমারদেব গোস্বামীর দুই পুত্র অমর ও সন্তোষ। এই অমর সন্তোষই পরবর্তীকালে রূপ সনাতন নামে পরিচিত লাভ করবে। রূপ সনাতনের পূর্বপুরুষ রূপেশ্বর কর্ণাট প্রদেশের কোনো এক রাজ্যের রাজা ছিলেন। পরবর্তীকালে রূপ সনাতনের পিতা কুমারদেব বঙ্গে চলে আসেন এবং গৌড়ের নিকটবর্তী মাধাইপুর নামক স্থানে হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কারের কন্যা রেবতী দেবীকে বিবাহ করেন। কুমারদেব ও রেবতী দেবীর পুত্রদের মধ্যে অমর ও সন্তোষ ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। এই অমর সন্তোষকেই সুলতান তার রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক সুখেন্দুশেখর রায়ের মতে —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান, জনসংযোগ ও জনহিতকর কার্য্যাবলী সম্পর্কে আমি অবহিত হইয়াছি। তাই তোমাদের ন্যায় এহেন গুণবান, উদারচিত্ত ও জনপ্রিয় যুবককে আমি রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।"[৫]

রাজার এই আজ্ঞা অমর ও সন্তোষ পালন করলেন। এরপর থেকেই অমর ও সন্তোষ গৌড় রাজদরবারে কাজ করতে লাগলেন। রাজদরবারে এসে একজনের উপাধি হল দবির খাস। আর একজনের উপাধি হল সাকর মল্লিক। এদের মধ্যে কে দবির খাস আর কে সাকর মল্লিক এ নিয়ে ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক কেদারনাথ গুপ্ত, সুখেন্দুশেখর রায়, বিকাশ রায়, লায়েক আলি খান প্রমুখের মতে রূপ হলেন সাকর মল্লিক আর সনাতন হলেন দবির খাস। আবার প্রাবন্ধিক অনন্যা গোস্বামী, গোপাল লাহা, এমনকি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেনের মতে দবির খাস হলেন রূপ এবং সাকর মল্লিক হলেন সনাতন। দবির খাস অর্থাৎ সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারি। সাকর মল্লিক অর্থাৎ অর্থ আধিকারিক বা ফিনান্স অফিসার। দুইভাই উচ্চপদে থাকা সত্ত্বেও তাদের মনের মধ্যে শান্তি বিরাজ করতো না। তাই দুইভাই ব্যাকুল চিত্তে দিনরাত ভাবতেন কী করে এই রাজ বন্ধন থেকে ছিন্ন হওয়া যাবে। এমন সময় সংবাদ পাওয়া যায় নবদ্বীপে চৈতন্য নামের এক ব্যক্তি হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আপামর জনগণকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। সেই সময়ে রূপ ও সনাতন শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্যে 'দৈন্যপত্রী' নামে পত্র প্রেরণ করেন। রামকেলিতে রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনের অনুকরণে একটি গুপ্ত বৃন্দাবন নির্মাণ করেছেন। এর অন্যতম আকর্ষণ হল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, যা মন্দির কক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন রয়েছে বিশাল কুঞ্জ–শ্যামকুঞ্জ ও রাধাকুঞ্জ। কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা শোভিত কদম্ব কানন। রাজকার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে রূপ ও সনাতন এই স্থানে সময় অতিবাহিত করে থাকেন। সেরকমই একদিন এই গুপ্ত বৃন্দাবনে কথোপকথন কালে শ্রীচৈতন্যের এক পত্র আসে রূপ সনাতনের উদ্দেশ্যে। তাতে লেখা –

> "যদি কোন নারী পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের কর্মে নিযুক্ত থাকে তাহলে তাহার এমন কোনও আচরণ করা উচিত নহে যাহাতে পতির হৃদয়ে পত্নীর সম্বন্ধে পরপুরুষের প্রেমিক রূপে গণ্য করিবার ভ্রমণ উৎপন্ন হয়। সেই নারী যেমন কর্মেই ব্যাপৃত থাকুক না কেন, তাহার হৃদয়ে যেন সদাসর্বদা স্বীয় পতিদেবতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।"[৬]

এইভাবে সাংকেতিক ভাষায় তাদের দুই ভাইকে আশ্বস্ত করেছিলেন চৈতন্যদেব। এর কিছুদিন পরেই চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন ঘটে। এই আগমনের পেছনে কারণ কী ছিল তা উল্লেখ করেছেন চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ –

"গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমণ।"[৭]

অর্থাৎ রূপ সনাতনের উদ্দেশ্যেই চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন ঘটেছে। কিন্তু মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকগণ রূপ সনাতনের পাশাপাশি আরও অন্যান্য উদ্দেশ্যের কথাও তাদের প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। সেই উদ্দেশ্যগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হল –

প্রথমত, একথা সর্বজন বিদিত যে রূপ সনাতন তথা সাকর মল্লিক ও দবির খাস ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের দুই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। এই দুজনকে চৈতন্যদেবের প্রয়োজন ছিল। কেননা উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, রায় রামানন্দের মধ্যস্থতায় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর এই উড়িষ্যাকে তৎকালীন সময়ে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন গৌড়ের রাজা হুসেন শাহ। এই আক্রমণের শক্তি দুই ভাই - দবির খাস ও সাকর মল্লিক। সেই শক্তি থেকে দুজনকে সরিয়ে নেওয়াটা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রাবন্ধিক লায়েক আলী খান মনে করেছেন। দুই ভাই গৌড় থেকে সরে গেলে হোসেন শাহ দুর্বল হয়ে পড়বেন, তাই চৈতন্যদেবের গৌড়ে আসার পরিকল্পনা।

দ্বিতীয়ত, চৈতন্যদেব ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভেবেছিলেন যে রূপ ও সনাতনকে বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনে দীক্ষিত করতে পারলে পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্মচর্চারও সমৃদ্ধি ঘটবে। এই উদ্দেশ্যেও তাঁর গৌড়ে আগমন।

তৃতীয়ত, গৌড় আগমনের নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল মাতা শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সাধারণত সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সাংসারিক বিষয়ে সমস্ত মায়া বন্ধন ত্যাগ করে নিরাসক্ত চিত্তে বেড়িয়ে পড়েন। কিন্তু চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। গৌড় যাত্রাকালে পথিমধ্যে নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেব শচীমাতার সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাতে শচীমাতা পুত্রের প্রতি একটি নিবেদন জানালেন। চৈতন্য যেন দাদা বিশ্বরূপের মতো একেবারে হারিয়ে না যায়। তাই চৈতন্যদেব মাতাকেই তার থাকার স্থান নির্বাচন করে দিতে বললেন। তখন শচীমাতা চৈতন্যের জন্য নীলাচলে থাকার অনুমতি দিলেন। কেননা ভক্তদের গমনাগমনের মাধ্যমে শচীমাতা সর্বদা পুত্রের খবর পেয়ে যাবেন। মাতার এই আদেশ চৈতন্যদেব শিরোধার্য মনে করলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নীলাচলেই ছিলেন। এইভাবে গৌড়দেশ যাত্রাকালে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য নিয়েও বেড়িয়েছিলেন তিনি।

চতুর্থত, গৌড়ে চৈতন্যদেবের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল আরও গভীর। লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক সুস্মিতা সোমের মতে – চৈতন্যদেব জানতেন যে ইসলামে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের নায়ক একই ব্যক্তি হন। সে সময় এই দুই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। নবদ্বীপে হুসেন শাহের প্রতিনিধি চাঁদ কাজির সঙ্গে চৈতন্যদেব আংশিক ভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু গৌড়ে এসে দবির খাস ও সাকর মল্লিককে নিজের দলে টেনে নিয়ে হুসেন শাহের সঙ্গে সেই সংঘর্ষকে পূর্ণ করলেন। প্রাবন্ধিক সুস্মিতা সোমের উক্তিটি সর্বদা সত্য নয়। গোড়াতে ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিই হয়েছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলে জায়গা থেকে। আর সেই জায়গায় হযরত মুহম্মদ (সাঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই ভাবনাটি ইসলাম ধর্ম উদ্ভাবনের পেছনে সত্য ছিল। কিন্তু ইতিহাস তা বলেনা – রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্মনায়ক একই ব্যক্তি হবেন। যদি ইতিহাসের দিকে আমরা লক্ষ করি তবে দেখতে পাবো যে — রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মকে প্রচার ও প্রসার করতে চেয়েছিলেন। ফলে চৈতন্যদেব উক্ত ভাবনাটি ভেবেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রাবন্ধিকের এই ভাবনাটি আমাদের অতিশোয়ক্তি বলে মনে হয়েছে।

পঞ্চমত, চৈতন্যদেব তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি আন্দোলনকে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি অন্যতম কেন্দ্র হল গৌড়। তৎকালীন সময়ে গৌড় বঙ্গের রাজধানী হওয়ায় এই আন্দোলনের ধারা খুব ভালোভাবে এখান থেকে বিকশিত হতে পারবে। এই উদ্দেশ্যও চৈতন্যদেব গৌড়ে ভ্রমণ করেন। তাই রামকেলিতে এসে বৈষ্ণব আন্দোলনের কেন্দ্র তৈরি করা খুব প্রয়োজন ছিল বলে প্রাবন্ধিক বিকাশ রায় মনে করেছেন।

এইসব পটভূমিতেই গৌড়ে আবির্ভাব ঘটে শ্রীচৈতন্যের। তৎকালীন সময়ে গৌড়ের অদূরে অবস্থিত রামকেলি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক সময় রামকেলি ছিল সংগীতচর্চা ও সংস্কৃত চর্চার অন্যতম জনপ্রিয় কেন্দ্র। 'রামকেলি' হল সংগীতের এক সুর। 'রামক্রী' রাগ থেকে সৃষ্ট রামকেলি সুর। প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা সে কথায় বলেছেন —

> "'রামক্রী' থেকে সৃষ্ট 'রামকেলি' একাধারে 'রাগ' ও স্থাননামের দ্যোতক। সংস্কৃত চর্চা, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংগীত চর্চা, গৌড়ীয় নৃত্য, গৌড়ীয় ব্যাকরণ চর্চা, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য চর্চা ব্যাপক ভাবে হ'ত গৌড়-রামকেলিতে, তাই রামকেলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"[৮]

চৈতন্যদেব রামকেলিতে পদার্পন করেন ৯১২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন। ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে। রামকেলিতে আগমনের পর একটি তমাল বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। গৌড়ে এসে চৈতন্যদেব বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। তিনি যে ঠিক কতদিন গৌড়ে ছিলেন এ নিয়ে নানা মতান্তর রয়েছে। কারোর মতে তিনদিন, কারোর মতে চারদিন, আবার কেউ বলছেন পাঁচদিন। চৈতন্যদেব ঠিক কতদিন গৌড়ে অবস্থান করেছিলেন এ নিয়ে নানান মতামত থাকলেও তাঁর ভ্রমণের গুরুত্ব সময়ের প্রেক্ষিতে যাচাই হয়নি, হয়েছে গৌরবের গুরুত্বে। গৌড় রাজ হুসেন শাহ তার রাজপ্রাসাদ থেকে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখছেন। এমন সময় দূরে গঙ্গার তীরে দেখতে পেলেন এক মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী, তাঁকে অনুসরণ করে পিছনে বিশাল জনস্রোত ক্রমশ গৌড়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সন্ন্যাসীর এই আগমনে সুলতান হুসেন শাহ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অমাত্যরা জানালেন তিনি একজন সামান্য হিন্দু সন্ন্যাসী মাত্র। তিনি রাজকার্যের কিছু ক্ষতি করবেন না। এতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন হুসেন শাহ। চৈতন্যদেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে গৌড়ে এসেছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হল। গৌড়ের রামকেলিতে এসে চৈতন্যদেব রাজকর্মচারী অমর ও সন্তোষ – এই দুই ভাইয়ের নাম পাল্টে রাখলেন রূপ ও সনাতন। পরবর্তীকালে এই নামেই তাঁরা পরিচিতি লাভ করেন। এরপর থেকেই রূপ ও সনাতন চৈতন্যদেবের শিষ্য হয়ে উঠলেন। চৈতন্যদেব গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই রূপ বাদশাহ হুসেন শাহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর রাজকার্য পরিত্যাগের প্রার্থনা জানান – কেননা তার মধ্যে বৈরাগ্যভাবের জন্ম নিয়েছে, তাই রাজসভার কাজ করা আর তাঁর দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। রূপ তাঁর বাকি জীবন বৃন্দাবনে গিয়ে হরিসাধনায় উৎসর্গ করতে চান। সুলতান তখন চিন্তা করলেন যে – রাজকার্যের প্রতি যার এমন অনীহা জন্মেছে তাকে রাজকার্যে বেঁধে রাখা লাভ হবে না। অতএব তাকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়। তাই সুলতানের আদেশ পাওয়ার পর রূপ বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বাকি জীবন কৃষ্ণের লীলাভূমির সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োজিত করলেন। রূপের চলে যাবার পর সনাতনের মধ্যেও বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। তার মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত রাজসভার কাজে অনুপস্থিত থাকতে লাগলেন তিনি। সনাতনের এই আচরণে সুলতানের মনে তাঁর প্রতি সন্দেহ জন্মায়। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সুলতান স্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে – সনাতন একান্ত মনে ভাগবত পাঠ করছেন এবং তাঁর চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু নির্গত হচ্ছে। সুলতানকে মিথ্যে বলার অপরাধে হুসেন শাহ তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করেন। বেশ কিছুদিন কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়েছিল সনাতনকে। তারপর একদিন কারারক্ষী হবু শেখের মাধ্যমে বৃন্দাবন থেকে রূপ প্রেরিত পত্র পেয়ে সনাতন কিছুটা আশ্বস্ত হন। পত্রে লেখা — বিশ্বস্ত মুদীর কাছে রূপ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে গিয়েছেন, সেই মুদ্রা কাজে লাগিয়ে সনাতন যেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদিকে সমকালীন সময়ে হুসেন শাহ উড়িষ্যা প্রদেশ আক্রমণ করতে গিয়ে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হবু শেখের মধ্যস্থতায় কারা থেকে পালাতে সক্ষম হন সনাতন। অবশ্য এর জন্য হবু শেখকে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিতে হয়েছিল। বাকি তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাঁর যাত্রাপথের কাজে লাগে। এইভাবে প্রথমে রূপ ও পরে সনাতন - দুই ভাই গৌড় রাজদরবারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চৈতন্যদেবের অনুসরণে বৃন্দাবনে গিয়ে বাকি জীবন কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেন।

চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন ও রূপ সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিষয়টি সব জীবনীকার তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। বৃন্দাবন দাস গৌড় যাত্রার কথা উল্লেখ করলেও রূপ সনাতনের কথা উল্লেখ করেননি। একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজই এই দুইজনের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। কারণ তিনি পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ সনাতনের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা শুনেছিলেন। লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক অনন্যা গোস্বামী সে কথায় বলেছেন তাঁর প্রবন্ধে —

> "... কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ সনাতনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকেই প্রকৃত ঘটনা শুনেছিলেন। সুতরাং এ ঘটনাটি সঠিক এবং এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যও অপরিসীম।"[৯]

এইভাবে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকরা তাঁদের কলমে চৈতন্য জীবনের একটি বিশেষ পর্যায় – গৌড় ভ্রমণের পর্বটিকে তাঁদের প্রবন্ধে সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা, কমল বসাক, অরুণকান্তি ভট্টাচার্য, সুস্মিতা সোম, সুখেন্দুশেখর রায়, বিকাশ রায়, আইরিন শবনম প্রমুখেরা প্রত্যেকেই স্থানিক ব্যক্তি এবং স্থানিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তাদের প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছে। কারণ 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি চৈতন্যজীবনী বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলির মধ্যে চৈতন্যের জীবনের সামগ্রিক দিক ফুটে ওঠায়, একটি ছোট্ট অংশ হিসেবে গৌড় ভ্রমণের পর্বটিকে দেখানো হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকরা চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে যা আছে তার বাইরেও তথ্য সংগ্রহ করে চৈতন্য আগমনের প্রেক্ষিতগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি, রামকেলির ইতিহাস, রূপ সনাতনের

সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া প্রবন্ধগুলির মধ্যে আরও একটি দিক ধরা পড়েছে — সুলতান হুসেন শাহ সম্পর্কে। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান হুসেন শাহ ছিলেন বহু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সাহিত্যিক কাব্য রচনা করে নানান উপাধিও পেয়েছেন। এটি ছাড়াও তাঁর আরও একটি দিক মূল ইতিহাসের ধারায় সেভাবে বিচার্য হয় না। কিন্তু স্থানিক ইতিহাসচর্চার মধ্যে চৈতন্যদেবের আগমনের কারণগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে – হুসেন শাহকে যতটা ইতিবাচক শাসক হিসেবে আমরা সাধারণভাবে দেখি, তা কিন্তু সর্বদা সত্য নয়। সেটি আংশিক সত্য মাত্র। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণকালে বহু মন্দির-মঠ ধ্বংস করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের নাম সংকীর্তন করার ওপরেও বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন। কেননা তাঁর প্রতিনিধি হয়েই নবদ্বীপে চাঁদ কাজি চৈতন্যদেবের হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাই প্রাবন্ধিকদের এই বিশ্লেষণগুলি ইতিহাস রচনায় মূল্যবান সংযোজন বলে আমাদের মনে হয়েছে। এছাড়াও প্রাবন্ধিকরা চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য নিয়েও নানান কথা আলোচনা করেছেন। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর রহস্য নিয়ে চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থে বিশেষ কিছু বলেননি। তবে জয়ানন্দ ও লোচনদাস তাঁদের ‘চৈতন্যমঙ্গল’-এ চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু অস্পষ্ট কথা বলেছেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ আছে —

“আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে।।”[১০]

লোচনদাস তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ বলেছেন —

“তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।”[১১]

অর্থাৎ পুরীতে রথ যাত্রার দিন রথের সামনে নৃত্যরত অবস্থায় রথের চাকার সামনে চলে আসেন তিনি। সেই রথের চাকার আঘাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। আর দ্বিতীয় মতামতটি হলো পুরীর সমুদ্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে সমুদ্রের জলে বিলীন হন চৈতন্যদেব। উপরোক্ত এই দুটি কারণ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি মতামত রয়েছে চৈতন্য মৃত্যুর — চৈতন্যদেব যেভাবে ধর্মসংস্কার করে জাত পাতের ভেদাভেদ ও কুসংস্কার দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আঘাত হেনেছিল। তাই চৈতন্যদেবকে তারা এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবার মন্ত্রণা কষছিল। সেই মতো একদিন রাতে যখন তিনি জগন্নাথের মন্দিরে তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করতে যান, তখন এই মৌলবাদী স্বার্থান্বেষী মানুষেরা তাঁকে হত্যা করে সেই মন্দিরের মেঝেতে তাঁর সমাধিস্থল খুঁড়ে রাতারাতি মৃতদেহটিকে সমাধিস্থ করে দেয়। আর চারিদিকে রটিয়ে দেয় যে চৈতন্যদেব জগন্নাথ প্রভুর সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছেন। তৃতীয় এই মতামতটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মানতে চান না। তাঁর মতে —

> “এই শেষোক্ত বর্ণনাটি নিশ্চয়ই গল্পবুভুক্ষু সাধারণ মানুষ উর্বর কল্পনাপ্রসূত, পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গুণগ্রাহী ছিলেন, পুরীর বহু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ওড়িয়া ভক্ত মহাপ্রভুকে গুরুর মতো ভক্তি করিতেন, নিত্য তাহার দর্শনালাভের জন্য প্রচুর লোকসমাগম হইত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করিয়া সমাহিত করার লোমহর্ষক ডিটেকটিভ গল্প কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।”[১২]

কিন্তু মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক অরুণকান্তি ভট্টাচার্য এই মতামতটি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে চান না। চৈতন্যদেব জগন্নাথ প্রভুর সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছেন - কথাটি রটানোর পেছনে প্রাবন্ধিক কারণ দেখিয়েছেন যে —

> “চৈতন্যদেবের দেবত্ব বা অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচার করা। তিনি যে রক্ত, মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন না, এঘটনা প্রমাণ করা, কারণ তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য অপেক্ষা যদি মানব প্রেম এবং মানব মাহাত্ম্য

> প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে ভক্তবৃন্দের কাছে তাঁর দৈব্যসত্ত্বা ম্লান হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ তাকে নিজের মত করে দেখতে ভাবতে শিখবে, তাঁর অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ হবে।”[১৩]

কারণ এইসব ধর্মব্যবসায়ীরা চায় না চৈতন্যদেবের মানবিক মহিমা প্রকাশিত হোক। তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করতে হবে।

মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চৈতন্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি চৈতন্যদেবের জীবনের ইতিহাস তথা সমাজ ও সাহিত্যে তাঁর প্রভাব বিষয়ক তথ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যা বাংলার ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। চৈতন্যদেবকে ঘিরে রয়েছে নানান ইতিহাস, নানান কিংবদন্তি। এর মধ্যে কোনটি ইতিহাস আর কোনটি কিংবদন্তি প্রবন্ধগুলি পাঠে পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আবার কোনো কোনো জায়গায় ইতিহাস ও কিংবদন্তি মেলামেশা করে এক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যযুগে গৌড়ে চৈতন্যদেবের আগমন ও তাঁকে ঘিরে গৌড়ের জনজীবনে যে প্রভাব তার কথা প্রবন্ধ পাঠে যেমন জানা যায়, তেমনি জানা যায় মালদাবাসীর মনে এক নির্ভীক সত্তা জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। গৌড়ের প্রজাদের মধ্যে হিন্দু-বিদেশি শাসকের সকল ভয়কে উপেক্ষা করার সাহস যুগিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। তাছাড়া চৈতন্যদেবের আগমনের পর থেকে তাঁকে স্মরণ করেই রামকেলিতে প্রতিবছর জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসেন নানান মানুষ। মেলাকে ঘিরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য তা চৈতন্যদেবের প্রভাবেই আবর্তিত হয়েছে। ফলে বাংলা সামগ্রিক চৈতন্যচর্চাতেও এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

Reference:

১. গোস্বামী, অনন্যা, শ্রীচৈতন্যের গৌড় পরিক্রমা, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ২৮

২. লাহা, গোপাল, রামকেলিতে ভক্তিআন্দোলন : শ্রীচৈতন্য, রূপ-সনাতন, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ৫৭

৩. রায়, সুখেন্দুশেখর, রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ, উৎসারিত আলো, সম্পা. দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ১৮

৪. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৩৯

৫. রায়, সুখেন্দুশেখর, রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ১৯

৬. রায়, সুখেন্দুশেখর, রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ২০

৭. কবিরাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ – ২০১৯, গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ১৭৩

৮. লাহা, গোপাল, রামকেলিতে ভক্তিআন্দোলন : শ্রীচৈতন্য, রূপ-সনাতন, উৎসারিত আলো, সম্পা. দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ৫৮

৯. গোস্বামী, অনন্যা, শ্রীচৈতন্যের গৌড় পরিক্রমা, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ৩০

১০. জয়ানন্দ, জয়ানন্দ বিরচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’, সম্পা.- বিমান বিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ - জুন ২০১৬, ১ পার্কস্ট্রীট কলকাতা - ৭০০০১৬, পৃ. ২৩৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. লোচনদাস, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, সম্পা. বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ: শ্রাবণ ১৪০৭, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা - ০৬, পৃ. ৩৩৩

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৬, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ২০৭-২০৮

১৩. ভট্টাচার্য, অরুণ কান্তি, শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে অবস্থানের পেছনে কী কোন গোপন অভিসন্ধি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল?, গৌড় মালদা সংবাদ, সম্পা. অভিজিৎ চৌধুরী, শারদীয়া ১৪১৫, মালদা, পৃ. ২৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 27 - 37
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সহজিয়া বৈষ্ণব এবং ঔপনিবেশিক নৈতিকতা : গৌণধর্ম এবং যৌনতার একটি অধ্যয়ন

সেন্টু কোনাই
গবেষণা
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sentu9733046689@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Vaishnavism, Sahajiya, Gaudiya, Minor Religion, Sexuality, Morality, Obscene.

Abstract
Vaishnavism gained new momentum in Bengal during Chaitanyadeva's period (1486 - 1534 A.D). Vaishnava ideology descends from the place of devotion of the elite and enters the cottages of the poor and untouchables. Vaishnavism, from the grip of Brahmanism, established a new society among the poor people of Bengal under the Sultanate's rule through only devotion and namsankirtan. Untouchables continued to enter Vaishnavism freely. However, after the death of Chaitanya, the dominance of Brahmins in this religion started to increase again. Henceforth, to initiate the Vaishnava religion, obedience to a Brahmin Guru or Gonsai became necessary. Untouchables were again subjected to humiliation. People from the lower strata of society adopted the Vaishnava religion as their own beliefs and practices outside of the dominance of the Brahmins which led to create many popular beliefs. As many Lokayat or popular sects preached bhakti rasa distinct from the original Vaishnava religion, the upper-caste Vaishnava sect took a skewed view towards them. The Sahajiya Vaishnava was one of the sects which was most attacked. The elite Gaudiya Vaishnav continued to preach that the religious practices of the Sahajiyas were similar to those of the tantric or sexo-cult sect. During the colonial period, with the spread of the printing presses, Western education, and the ideas of the capitalist society, the attitude toward Sahajiya Vaishnav began to be discussed through the new lens of colonial morality in Bengal. Sahajiya Vaishnavas like the Kartabhajas and the Bauls as well as other minor sects, also came under harsh criticism in society for their illicit sexual rituals. The beliefs and practices of the Sahajiyas in contemporary news outlets became obscene and promiscuous, caught in the net of rigorous arguments. Therefore, this essay tried to discuss why and how sexuality entered into the religious beliefs of these communities and how they became a barbaric and uncivilized culture, during colonial Bengal with a special reference of Sahajiya Vaishnav.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর সমাজের নীচু তলার মানুষ ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বাইরে বৈষ্ণব ধর্মকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করে ও সেই ধর্মের লোকায়ত বিশ্বাস গড়ে ওঠে। পৃথক পৃথক লোকায়ত সম্প্রদায় মূল বৈষ্ণব ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র বৈষ্ণব মতে ভক্তি রস প্রচার করার ফলে উচ্চকোটির কুক্ষিগত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। সহজিয়া বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের গুলির মধ্যে অন্যতম, যাদের প্রতি আক্রমণ ছিল সবচেয়ে বেশি। সহজিয়াদের ধর্মীয় প্রথা গুলি তান্ত্রিক দেহাত্মবাদী সম্প্রদায়ের অনুরূপ বলে গৌড়ীয়রা প্রচার করতে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আদর্শে সমগ্র বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতামত গুলি নতুনভাবে আলোচিত হতে থাকে। কর্তাভজা এবং বাউলদের মতো সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও দেহত্ববাদী যৌন আচার অনুষ্ঠান সমাজে সমালোচনায় বিদ্ধ হতে থাকে। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পত্রিকা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় সহজিয়াদের মতামত গুলি কঠোর যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আটকে অশ্লীল ও ব্যভিচারে পরিণত হয়। কেন সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রতি এই বিদ্বেষ, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস গুলি সম্পর্কে জানা দরকার।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অসংখ্য শাখা ভিন্ন নাম ও ভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। বহুধাবিভক্ত এই সম্প্রদায় গুলিতে অঞ্চলভেদে, জাতিভেদে এবং বর্ণভেদে তারতম্য ছিল। এক এক জায়গায় এক এক রকমের তত্ত্বের অথবা মতবাদের উদ্ভব হচ্ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভাজন ও নানান মতাদর্শ প্রবেশ করেছিল সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তি তোতারামের বক্তব্যে। অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবদের শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি দেখে ব্যথিত হয়ে তোতারাম বলেছিলেন -

> "আউল বাউল কর্তা ভাজা ন্যাড়া দরবেশ সাঁই।
> সহজিয়া সখী ভাবুকী, স্মার্তজাত গোঁসাই।।
> অতিবড়ী চুড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।
> তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ না করি।"[১]

তেরোটি গৌণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আউল-বাউল, দরবেশ, সাঁই এমনকি কায়াবাদী সাধনার পাশে সহজিয়া আর জাত বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্রুপ ও বিদ্বেষ লক্ষণীয়। পরে এই সমস্ত উপ-সম্প্রদায় গুলিতে ক্রমে সংখ্যায় ও আচরণে বৈচিত্র বেড়ে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধিক্কার তাদের প্রতিহত করতে পারেনি তোতারাম এ কারণেই আবার খেদোক্তি করে বলেছেন -

> "পূর্ব কালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়
> তিন তেরো বাড়িল এবে ধর্ম রাখা দায়।।"[২]

তিন তেরো অর্থাৎ ঊনচল্লিশটি নতুন গন ধর্মের কথা তো তারা উল্লেখ করেছে যাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। নিশ্চয়ই সম্প্রদায়গুলির আচার-আচরণ এবং বিশ্বাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার, তোতারাম কিন্তু নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞাবহ ছিলেন। নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র তোতারামকে নদীয়ার নবদ্বীপে ছয় বিঘা জমি দান করেছিলেন।[৩] রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেমন চৈতন্য বিদ্বেষী ছিলেন, ঠিক তোতা রামেরও এই একই মনোভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। সেই কারণে হয়তো বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন শাখার প্রতি তাঁর এই মনোভাব। এই সময় বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে অসংখ্য উপসম্প্রদায় গুলি বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দলগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল - অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য-সম্প্রদায়। নিত্যানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়। শ্রীখন্ডের 'গৌরনাগরবাদী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়। গদাধর পন্ডিতের অনুগামী 'গদাই গৌরাঙ্গ' সম্প্রদায়। চৈতন্য-পূজক 'গৌর পারম্যবাদী' সম্প্রদায়। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 'ভক্ত-সম্প্রদায়'।[৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই সমস্ত বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের গুলির মধ্যে এমন আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করতে থাকে যা প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজ বিরোধী। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ যেখানে মান্যতা পায়, এরা সেই সামাজিক প্রথার বিপরীত ধারণা গুলি মেনে চলতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে নরোত্তম দাস স্বরূপ কল্পতরী পুঁথিতে লিখেছিলেন -

"জগৎ যারে মন্দ বলে আমি বলি আনন্দ।
জগৎ যারে ভালো বলে আমি বলি মন্দ।।
জগত যারে পিতা বলে আমি বলি মাতা।
জগৎ যারে সত্য বলে আমি বলি মিথ্যা।।
জগত যারে ধর্ম বলে সে আমার অধর্ম।
জগৎ যারে অধর্ম বলে সে আমার ধর্ম।।"[৫]

অর্থাৎ প্রচলিত সামাজিক দায়বদ্ধতা বা রীতিনীতি এই সমস্ত উপ-ধর্ম সম্প্রদায়গুলিতে একেবারেই প্রাধান্য পায়নি বরং সমাজ প্রচলিত বিপরীত ক্রিয়া-কলাপ তাদের আচার অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতার মাধ্যমে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখায় প্রবেশ করে যৌনমিলন ও যৌন আচার অনুষ্ঠান। তবে, রমাকান্ত চক্রবর্তী মনে করেন চৈতন্য পরবর্তী নিত্যানন্দ ও নরহরি সরকারের সময় থেকেই বৈষ্ণবদের মধ্যে এই যৌন আচার-আচরণ প্রবেশ করতে থাকে।[৬] রমাকান্ত চক্রবর্তী মনে করেন যৌনতার প্রবেশের ফলেই বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বগুলি ব্যক্তিভেদে পৃথক হতে থাকে। ফলস্বরূপ, মূল বৈষ্ণব ধর্ম একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম থেকে উদ্ভূত ৩৩টি উপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন।[৭] এই সম্প্রদায়গুলি হল - আউল, বাউল, বলরামী, কর্তাভজা, সহজিয়া, সখীভাবুকী প্রভৃতি।[৮] সহজিয়া বৈষ্ণব এদের মধ্যে অন্যতম। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যেও আবার একাধিক বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সহজিয়াদের বিশ্বাসে দেহত্ববাদী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সহজিয়াদের সাধনায় প্রেম ও ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষ অর্থাৎ দেহমিলনের উপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য মূল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে সহজিয়াদের বিশ্বাসের ব্যবধান বাড়তে থাকে। সহজিয়ারা পরিণত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শত্রুতে। ঔপনিবেশিক আমলে কোন কোন বিশ্বাস সহজিয়াদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে হেয় করে তুলেছিল এবং কীভাবে সহজিয়াদের প্রতি আক্রমণ নেমে এসেছিল সে বিষয়গুলির ওপর দৃষ্টি দেওয়া যাক।

আলোচনার শুরুতেই ঢাকার বাংলা একাডেমী পত্রিকার মাঘ চৈত্র ১৩৭০ সংখ্যায় বাংলাদেশের নামকরা পন্ডিত আহমদ শরীফের একটি নিবন্ধের একটি চমকিত তথ্য উল্লেখ করা যাক। আহমেদ শরীফ লিখেছেন যে, জনশ্রুতি জাত ধারণা যে, স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গূহ্য সাধন প্রণালী ছিল। এ সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক।[৯] এ বক্তব্যের একটি জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় সুধীর চক্রবর্তীর রচনায়। নদীয়া জেলার বার্নিয়া গ্রামের শ্রীনন্দন ঘোষের কাছে সুধীর চক্রবর্তী এমনই একখানা প্রাচীন পুঁথি পেয়েছেন, যে পুঁথিতে চৈতন্যদেবের মৈথুনাত্মক বিষয়টির সমর্থন মেলে। শ্রীনন্দন ঘোষ ছিলেন সহজিয়া বৈষ্ণব আনুসারী। যে পুঁথিটি সুধীর চক্রবর্তী শ্রীনন্দন ঘোষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন, সেটি ছিল মুকুন্দ দাসের লেখা 'আদ্যকৌমুদী' পুঁথির একটি অংশ। এই পুঁথির একটি শ্লোক হল -

"সন্ন্যাস করিয়া প্রভু সাধে পরকীয়া।
সার্বভৌম নন্দিনী শাটি কন্যাকে লইয়া।।
মহাপ্রভুর পরকীয়া শাটি কন্যা লইয়া।
অটল রতিতে সাধে সামান্য মানুষ হইয়া।।"[১০]

সুধীর চক্রবর্তীর ধারণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের এই পরকীয়ার বিষয়টি জানেন না, তাই এটি আজও লোক চক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই বিষয়টি জানলেও হয়তো তা হজম করতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের ভাবমূর্তির অবমাননা মেনে নেবেন কিনা সেটা একটি বিতর্কের বিষয়। তবে, এই সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের যৌন জীবনকে যে কখনোই ভালোভাবে গ্রহণ করত না সেটা বলার অপেক্ষা

রাখেনা। কিন্তু এই পুঁথির সত্যতা নিয়েও সন্দেহ আছে। যে পুঁথিটি সুধী চক্রবর্তী সংগ্রহ করেছিলেন তা কিন্তু কখনোই তিনি সম্পূর্ণ প্রকাশ করেননি। তার সামান্য অংশই তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর লেখায়। শ্রীনন্দন ঘোষের পুঁথিটির বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য ছিল পূর্বজন্মে চৈতন্যদেবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতার কামনার রজবীজে জন্ম হয়নি। তাই তিনি ছিলেন স্বভাবে কামনা-শূন্য। কাম ছাড়া প্রেমে উদ্দীপনা আসে না। আবার প্রেম ছাড়া সহজ সাধনা হয় না। তাই তিনি এবার রজবীজের কামনাময় দেহ নিয়ে নদীয়ায় চৈতন্য রূপে জন্ম নেন এবং শাটিকে নিয়ে পরকীয়া সাধনে লিপ্ত হন।[১১] সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় যারা দেহতত্ত্ববাদী আচার অনুষ্ঠান বা যৌন কার্যকলাপ তাদের সাধন মার্গের পথ গ্রহণ করেছে, তাদের উপস্থাপিত এই বক্তব্য কতটা সত্য তা প্রশ্নাতীত নয়। সহজিয়া বৈষ্ণব মতাদর্শে বিশ্বাসী শ্রীনন্দন ঘোষের এই বক্তব্য তাঁর গুরুর দ্বারা প্রচলিত জনশ্রুতি নাকি তাঁর নিজ কল্পনা প্রসূত কাহিনী তা সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও বৈষ্ণবদের একাংশ যে পরকীয়া যৌন মিলনে বিশ্বাসই ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু রঘুনন্দন ঘোষের বক্তব্যই নয়, চৈতন্যদেব যে শাটি কন্যার সঙ্গে পরকীয়ায় যুক্ত ছিল সে কথা সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'চৈতন্য প্রেম তত্ত্ব-নিরূপণ' পুঁথিতেও আছে -

"সার্ব্বভৌম ভট্রাচার্য্য মহা ভাগ্যবান।
যার গৃহে শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বানুসন্ধান।।
ষাটি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদায়ী বিহরে।।"[১২]

এছাড়াও চৈতন্যদেবের পরকীয়ার কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থেও আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সার্বভৌমের স্ত্রী চৈতন্যদেবের পরকীয়া সঙ্গিনী শাটিকে 'রাড়ী' বা বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেন। এই গালমন্দ ছিল চৈতন্য দেবের বিরুদ্ধে পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য সামাজিক লাঞ্ছনা।

"হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলিন নিন্দুক তেঁহো ষাটি কন্যার ভর্ত্তা।।...
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।।
শুনে ষাটির মাতা বুকে শিরে হাত মারে।
ষাটি আজি রাড়ী হোক বলে বারে বারে।।"[১৩]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে এই পরকীয়া বা যৌন মিলনের বিষয়টির উদ্ভব হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে সময়ে। তাঁর মতে বজ্রযান, কালচক্র যান প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃত রূপ থেকে সহজিয়াদের মধ্যে পরকীয়া মতবাদ ও যৌন মিলনের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে।[১৪] সনাতন গোস্বামী ভাগবতের বৃহৎ তোষণী টীকায় (১০/৪৭/৬৯; ও ৬১) রাধা-কৃষ্ণের অপ্রকট লীলার স্বকীয়া ও প্রকট লীলায় পরকীয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।[১৫] চৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরাদের মধ্যেও এই পরকীয়া তত্ত্বটি দেখা যায়। মুকুন্দ পরবর্তীকালের সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, লীলা শুকের সঙ্গে চিন্তামণির, চন্ডীদাসের সঙ্গে তারা ও রজকিনীর, বিদ্যাপতি সঙ্গে লছমীর, জয়দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর ভগিনী রোহিনীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। যাকে সহজিয়ারা পরকীয়া সম্পর্ক বলেই মনে করে।[১৬] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বাংলায় সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরকীয়া মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে।

তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে পরকীয়ার তত্ত্বটি মানতেন না, তা মনে করার কারণ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে যে পরকীয়া প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে তাদের মতামত –

"গোলোকে পারকীয় স্বকীয় রসের অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিল হয়। পারকীয় সার যে স্বকীয় নিবৃত্তি এবং স্বকীয় সার যে পারকীয় নিবৃত্তিরূপ স্বরূপ শক্তি রমণ অর্থাৎ বিবাহ বিধি শূণ্য রমন তদুভয়ে একরস হইয়া উভয় বৈচিত্রের আধার রূপে বিরাজমান। ...জ্ঞান চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি চেষ্টার অনুভূতি লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ প্রতীতির উদয় হয় তাহা অবশ্য ত্যাজ্য। মায়া প্রতীতি শূণ্য শুদ্ধ পরকীয় রস অতি দুর্লভ। তাহা যেরূপে গোকুল লীলায় বর্ণিত আছে তদবলম্বন করিয়া ভক্তজন সাধন করিবেন। সিদ্ধিকালে তাহার অধিক উপাদেয় মূল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয় চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেক স্থলে জড়গত বৈধর্ম্মরূপে পরিণত হয়।"[১৭]

বৈষ্ণবদের মধ্যে পরকীয়া মতবাদ যে প্রচলিত আছে এই তথ্যই শুধু এই পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া এবং স্বকীয়ার মধ্যে কোন মতবাদটি গ্রহণ করেছিলেন সে তার উত্তর আছে ভক্ত বিজয়কুমার ও বৈষ্ণব গুরু গোস্বামীর কথোপকথনের মধ্যে।[১৮] স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পরকীয়া মতবাদকে মেনে নিয়েছেন।

সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি আস্থাশীল শ্রীনন্দন ঘোষের বক্তব্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা চৈতন্যের জীবনীতে কেন এই পরকীয়া বা মৈথুন কার্যকলাপ ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায় সহজিয়াদের সাধনায়। যৌন সম্পর্কের মধ্যে সহজিয়ারা গ্রহণ করেছে পরকীয়াকে। স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সহজিয়াদের বিশ্বাস পরকীয়াই হল আসল প্রেম, যা শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিবেদন করেছিলেন। সহজিয়াদের পরকীয়া প্রেমের উল্লেখ মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্য পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত-এর আদি লীলায় স্বকীয়া এবং পরকীয়া প্রেমের মধ্যে পরকীয়াকে উত্তম প্রেম বলে অভিহিত করা হয়েছে -

"স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।"[১৯]

পরকীয়া প্রেম বা অন্য নারীর সহিত যৌন মিলন যে সহজিয়া বৈষ্ণবদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় সে কথা চন্ডীদাসও লিখেছেন -

"পরকীয়া ধন সকল প্রধান
যত করিয়া লয়।
এবং
পরকীয়ার রতি করহ আরতি
সেই সে ভবনে সার।"[২০]

সহজিয়া বৈষ্ণবদের এই পরকীয়া প্রেম শুধু দেহাত্ববাদী যৌন তৃপ্তি নয়, এ প্রেম ভক্ত এবং পরমাত্মার দূরত্বকে কমিয়ে আনে। সহজিয়া বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করে ভক্তিতে একপ্রকার ভয় ভক্তের মধ্যে থেকে থাকে, যে ভয় ভক্ত এবং আরাধ্য দেবতার মধ্যে ব্যবধানকে স্পষ্ট করে। ভক্ত কখনোই সবকিছু অর্পণ করে নির্ভয়ে পরমাত্মার সাথে বিলীন হতে পারে না। কারণ, সেখানে ভক্ত নিজেকে অতি ক্ষুদ্র এবং আরাধ্য দেবতাকে অসীম বলে মনে করে। শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু বলেছেন যে, বৈষ্ণবগণ প্রেমের সাধনায় এই পরকীয়া রসকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেছেন। এটিই মাধুর্য উপাসনার শ্রেষ্ঠ স্তর বলে তারা বিশ্বাস করেন। কোন প্রকার খেয়ালের বশে তাঁরা তা করে না। কারণ, মানবীয় মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ঐশ্বর্যময় ভগবানের কল্পনায় যে প্রীতির উদ্রেক হয়, তা ভয় মিশ্রিত; তাই ভক্তিরূপে কথিত হয়ে থাকে। ভগবান অসীম শক্তিশালী দেবতা, আর আমি ক্ষুদ্র জীব, এইরূপ ধারণার ওপর ভক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রেমপন্থী বলে এইরূপ বড় ছোট ভাব নিয়ে যে প্রীতি তা পছন্দ করেন না। ছোট বড় ভাব নিয়ে প্রকৃত

প্রেম হয় না, কারণ প্রেমের রাজ্যে উভয় পক্ষই সমভাবাপন্ন।[২১] সহজিয়াদের বিশ্বাস পরকীয়া মতবাদ নতুন নয়, বরং প্রাচীন। এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে সহজিয়াদের একটি গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ -

"পূর্বে রাধা ছিলে তুমি আমার অন্তরে।
এবে রাধা আমি রই তোমার অন্তরে।।"[২২]

অর্থাৎ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যখন জন্মেছিলেন তখনই তাঁর অন্তরেই ছিলেন রাধা। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর অন্তরে ছিলেন রাধা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকের অন্তরে অন্তঃশায়িত হয়ে থাকেন রাধা, সেই জন্যই বলা হয় অন্ত কৃষ্ণ বর্হিরাধা।[২৩] এজন্যই সহজিয়া বৈষ্ণব অনুগামীরা নিজেদের প্রত্যেকের মধ্যে রাধাভাব বা রাধার স্বভাবকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন। একজন পুরুষ সে নিজেকেও নারীরূপে বা রাধারূপে ভাবিত করে থাকেন। এই ভাব নিয়েই সহজিয়া সাধকরা চৈতন্যের বাণী বা বৈষ্ণব ধর্ম মত প্রচার করেন। কীভাবে পুরুষের মধ্যে এই রাধা ভাবের উন্মেষ প্রসঙ্গে Melville . T. Kennedy লিখেছেন -

> "The worshiper is to think of himself as Krishna and is to realize within himself the passion of Krishna for Radha, who is represented by the female companion of his worship. Through sexual passion, salvation is to be found. The Radha-Krishna stories are held at the justification of their practices, which are secret and held at night."[২৪]

পরকীয়ার মাধ্যমে যে নারী সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌন ক্রিয়ায় মিলিত হয়েই রাধা কৃষ্ণের উপাসনা সম্ভব। রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলেই সাধক সেই তরে উন্নত হয় যেখানে সে নিজে কাম গন্ধহীন সত্তায় পরিণত হয়। তাহলে কি বৈষ্ণবদের মধ্যে পূর্ব থেকেই সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌন মিলনের বিষয়টি উল্লেখিত ছিল? এ প্রসঙ্গে রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, চৈতন্য পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যেই এই যৌন আচার-আচরণ প্রবেশ করে। তিনি লিখেছেন –

> "This Sexo- Yogic Sahajiya cult received almost a new lease of life from the theories of the Gaudiya Vaishnava philosopher... They practiced illicit sexual intercourse as a religious rife."[২৫]

Edward c. Dimock ও একই কথা বলেছেন। তবে তিনি সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে যৌনতার চেয়ে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ কীভাবে প্রবেশ করে তার প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন।[২৬] প্রমাণ স্বরূপ তিনি প্রেমদাসের 'আনন্দভৈরবী' গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন সহজিয়া বৈষ্ণবদের যৌন মিলনের কারণ হল বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। মহাযান বৌদ্ধমতের করুণা ও শূন্যতা এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের উপায় ও প্রজ্ঞা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ ও রাধায় রূপান্তরিত হয়েছে। নর ও নারী যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার প্রতিরূপ এবং তাদের মিলনেই সহজ মহাসুখের উদ্ভব হয় - সহজিয়া বৈষ্ণবের এই বিশ্বাস এবং এই মিলন দুই প্রকার স্বকীয়া ও পরকীয়া।[২৭] সহজিয়াদের বিশ্বাস চৈতন্য জীবনেও এই রতিক্রিয়া বা যৌন মিলন ছিল। এর সমর্থন পাওয়া যায় নৃসিংহ রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম, থেকে। গ্রন্থটির সম্পর্কে রমাকান্ত চক্রবর্তী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে একটি বিশদ নিবন্ধ প্রকাশ করেন।[২৮] মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থটিতে তিনি কয়েকটি বিষয়ে জোর দিয়ে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করেছেন। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটির কয়েকটি শ্লোকের ভাবার্থ নির্ণয় করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হল - লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাহের পরেও নবদ্বীপের গোয়ালার মেয়ে মালতীর গৌরাঙ্গ সম্পর্কে রাধাভাব, গৌরাঙ্গের বংশীবাদনে তাঁর দেহ থেকে গোপিনীদের আবির্ভাব; তাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গের রাসলীলা; গৃহে পত্নী লক্ষ্মী দেবী থাকলেও 'কায়বূহ' প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'কামশাস্ত্রপ্রবীণ' গৌরাঙ্গ অসংখ্য নায়িকার সঙ্গে রতিলীলা করতেন এবং গৌরাঙ্গ সমস্ত পুরুষের রূপ ধারণ করে 'সর্বনারীরুপধৃতাং' বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে রতিক্রীড়া করতেন।

সহজিয়াদের বিশ্বাসগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব ধর্মের আচার -অনুষ্ঠান রূপে মেনে নিতে পারেনি। পরকীয়া বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কিংবা চৈতন্যদেবের যৌন জীবনের আলোচনা গৌড়ীয় মতে বৈষ্ণব বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া

তত্ত্বের সমর্থনে সহজিয়া বৈষ্ণবরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরকীয়া সম্পর্ককে যেভাবে মেনে চলতে শুরু করেছিল, তার পরিণতি হিসেবে গৌড়ীয়গণ তাদের অনুগামীদের জন্য আরো কঠিন নিয়ম প্রচলন করতে থাকে। চৈতন্য জীবনের যৌনতার সমর্থনে সহজিয়ারা একই বাণী প্রচার করতে থাকে। ফলস্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের থেকে সহজিয়াদের সাধনার দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। সহজিয়াদের ধর্মীয় প্রথা গুলি তান্ত্রিক দেহাত্মবাদী সম্প্রদায়ের অনুরূপ বলে গৌড়ীয়রা প্রচার করতে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আদর্শে সমগ্র বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতামত গুলি নতুনভাবে আলোচিত হতে থাকে। কর্তাভজা এবং বাউলদের মতো সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও দেহত্ববাদী যৌন আচার অনুষ্ঠান সমাজে সমালোচনায় বিদ্ধ হতে থাকে। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পত্রিকা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় সহজিয়াদের মতামত গুলি কঠোর যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আটকে অশ্লীল ও ব্যভিচারে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হালিশহর ও সোমপ্রকাশ পত্রিকায় সহজিয়াদের সমালোচনা ছিল সবচেয়ে বেশি। হালিশহর পত্রিকা বৈষ্ণব ধর্মে ব্যভিচারী কার্যকলাপের নিন্দা করে লিখেছে –

> "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যত প্রকার ব্যাভিচার সমুদয়ই বিকৃত প্রেম হইতে উৎপন্ন। কর্ত্তাভজাদিগের স্বাধীনভাবে নির্লজ্জ কুক্রিয়ায় তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এমনকি মদ্য ও মাংস ব্যতীত, শাক্তদিগের সমুদয় কুক্রিয়ায় বৈষ্ণব মতে প্রবিষ্ট হইল। শাক্ত সম্প্রদায়ের 'ভৈরবীচক্র' চৈতন্য সম্প্রদায়ের 'কিশোরী ভোজনের' সহিত নাম মাত্র বিভিন্ন উভয় মতেই গুরুদেব কর্তৃক ব্যাভিচার প্রসিদ্ধ আছে। শাক্তেরা যে রূপ চক্রভোজনে জাতি ভেদ স্বীকার করে না বৈষ্ণবেরাও সে রূপ পংক্তি ভোজনে জাতি বিভিন্নতা দোষ মনে করে না। শাক্ত মতে যেমন সমুদয় পুরুষই শিব ও সমুদয় স্ত্রীই শক্তি, বৈষ্ণব মতে সেরূপ সমুদয় পুরুষই কৃষ্ণ, সমুদয় স্ত্রীই রাধা। শিব-শক্তি ও রাধা-কৃষ্ণের মিলন অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই মত অত্যন্ত পাপ স্রোত প্রবাহক।"[২৯]

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শাক্ত ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যভিচার প্রবেশ করেছে বলে সম্পাদক মনে করেন এবং এই সাধনা পাপদায়ক। সমস্ত বিকৃত প্রেম সাধনার নামে লালন করে এই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা। উনিশ শতকের লোক কবি দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালীতে বৈষ্ণবদের যৌন আচার-আচরণকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন -

"গৌরাঙ্গের কিবে দোহাই।
ভাতার মলে বিধবা নাই।।
এক মেয়ে শত জামাই।
বাবা বলে অশৌচ নাই।।"[৩০]

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ হিন্দু শাস্ত্র নির্ধারিত সমাজ ব্যবস্থার আচার-আচরণ অস্বীকার করে ছিল - এজন্যই এ আক্রমণ। একটি মেয়ের শত জামাই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা যে পরকীয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী অর্থাৎ একজন নারী বা পুরুষ একাধিক নারী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এ ধারণাটি শিক্ষিত ভদ্র সমাজের পরিপন্থী ছিল। পাশ্চাত্যের নৈতিকতার প্রভাব বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ঔপনিবেশিক পর্বে সব থেকে বেশি দেখা যায়। এই আক্রমণ ওই চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। যে উদ্দেশ্য ও সাধনা নিয়ে সম্প্রদায় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল তাতে ধীরে ধীরে নেমে এসেছিল একশ্রেণীর মানুষের কর্দয্য দৃষ্টি। এর ফল ভোগ করতে হয়েছে এই এই সম্প্রদায়কে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে কলকাতায় যে সমস্ত বেশ্যা পল্লীগুলি গজিয়ে উঠেছিল তাতে বাবু সম্প্রদায়ের স্বরূপ মনোভাব থাকলেও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় রুচিশীল বাঙালীদের ব্যক্তিদের কাছে তা ছিল অশ্লীল ও সামাজিক ব্যাধি। বেশ্যাদের শেষ জীবনের পরিণতির কথা তারা সহজেই অনুমান করতে পারত। প্রতিষ্ঠিত সমাজে একজন যৌনকর্মী যে ধিক্কার ও লাঞ্ছনা শিকার হত, শেষ বয়সে তা বৃদ্ধি

পাওয়া সম্ভাবনাই বেশি ছিল। এই লাঞ্ছিত ভবিষ্যৎতের কথা ভেবেই বারাঙ্গনারা মুক্তির পথ হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হতো। এ কথাই William Ward লিখেছেন -

> "At Calcutta nearly all the women of ill fame profess the religion of Choitunya before their death, that they may be initiated to some sort of funeral rites."[৩১]

উনবিংশ ও বিংশ শতকে কলকাতায় বেশ্যাদের শেষ জীবনের আশ্রয় ছিল বৈষ্ণব ধর্ম। সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় দ্বারা অবহেলিত বেশ্যারা অর্থ ও নিজস্ব প্রভাব প্রতিপত্তির দৌলতে দীক্ষিত হত বৈষ্ণব ধর্মে। শেষ জীবনে অন্তত: পক্ষে তাঁদের শেষ ক্রিয়াটি যেন কোন ধর্ম মতেই সম্পন্ন হয়, সে আশায় তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করত। এই পরিস্থিতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তাদের ধর্মের নৈতিক মানদন্ড বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। কেননা, এই নব্য দীক্ষিত বেশ্যারা যারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা গোপনে দেহ ব্যবসা চালিয়ে যেত বলে তারা মনে করত। ফলে বেশ্যার চারিত্রিক গুণ বা ব্যভিচারী মানসিকতা তাঁদের কর্মের উপর আরোপিত না হয়ে আরোপিত হতো বৈষ্ণব ধর্মের উপর। এমন অসংখ্য বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত অথচ গোপনে দেহ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল মহিলাদের বিবরণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্রে।[৩২] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে প্রশাসনিক দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় সেখানে এমন মহিলাদের লক্ষ্য করেছেন যারা গোপনে দেহ ব্যবসা করছিল অথচ তারা ছিল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক বন্ধন খুবই দুর্বল। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্মের উদারতাই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নারীদের ব্যভিচারিনী হতে সাহায্য করে।[৩৩] ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এই শ্রেণীর নারীদের ধর্মের আবরণে আবৃত বেশ্যাবৃত্তির অনুগামী বলে অভিহিত করেছেন।[৩৪]

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নারীদের ব্যভিচারের একই কথা অবিভক্ত বাংলার রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কাশী কিংকর সেনের কণ্ঠস্বরেও শোনা যায়। কাশী কিংকর মনে করেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নারীরা সমাজ বহির্ভূত যৌনতার প্রতি বেশি আসক্ত। তারা বেশ্যাবৃত্তির পথ সহজেই গ্রহণ করে। তিনি মনে করেন সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মই এই শ্রেণীর নারীদের বেশাবৃত্তিতে নিয়োগ করতে সমর্থন জোগায়। কাশী কিংকর সেনের মন্তব্য –

> "They are found to be the daughters of Vaishnabs, a class of religious who recognize... Females also under similar circumstances become converts to this religion, particularly women who have been prostitutes."[৩৫]

এই শ্রেণীর মানুষ যারা বৈষ্ণব ধর্মকে গ্রহণ করে, তাদের নিজ পেশা বা কর্মের জন্য তারা বহিষ্কৃত হয়েছে, সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছে আপন সম্প্রদায়ের কাছে। তাঁরাই সহজেই বৈষ্ণব ধর্মের মোহন্ত বা গোঁসাইদের কাছে দীক্ষা লাভ করেছে। গোঁসাইদের কাছে এই মানুষরা ছিল সমাজে অবহেলিত ও নিপীড়িত। গৌতম বুদ্ধ যেভাবে তৎকালীন সময়ে অবহেলিত বারাঙ্গনাদেরও তাঁর ধর্মমতে দীক্ষা দেন সেই, একই কাজ উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোঁসাই করেছিলেন। বৈষ্ণব গোঁসাইদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লিখেছেন-

> "Buddha himself accepted the hospitality and gift from a courtesan just as some of the Chaitanite Gossain of Calcutta are known to do at present."[৩৬]

এই দীক্ষার ফলেই ধীরে ধীরে বৈষ্ণবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলায় বৈষ্ণবদের সংখ্যা ছিল ৪২৮০০০ জন।[৩৭] এদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, জাত বৈষ্ণব বা সহজিয়া বৈষ্ণবদের সংখ্যা বিভাজন তেমন ভাবে নেই। যেহেতু নব দীক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাই এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, সহজিয়া বা জাত বৈষ্ণবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই উপসম্প্রদায় গুলির প্রতি আক্রমণে মুখর হয়েছে। শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলী কেমন হয় সে প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রচার করেছে –

> "সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সর্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করবেন।"[৩৮]

এর বিপরীত চরিত্রের যে সমস্ত বৈষ্ণবরা এই সমস্ত কার্যকলাপ পদ্ধতি অনুসরণ না করে ব্যভিচারী জীবনযাপন করে; তারা যে প্রকৃত বৈষ্ণব নয়, সে কথাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় উল্লেখ করেছে –

> "কতগুলি সম্প্রদায় আছে যাহারা অবৈষ্ণব কিন্তু সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব দিকের অনেক অপকার করেন। ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি প্রধান রূপে পরিগণিত। ইহারা সকলেই শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ প্রভুর দোহাই দেন ও বৃন্দাবন রাধা কৃষ্ণ ইত্যাদি উপাসনার অভিমান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা যে সকল উপদেশ প্রচার করেন ও সাধন অঙ্গের যে সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন, সে সমস্তই বৈষ্ণব ধর্মের বিপরীত। ...সহজিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে মীরাবায়ের মিলন উদ্দেশ্য করিয়া আপনাদের কর্দয্য মত স্থাপন করেন।"[৩৯]

সাধনার নামে ব্যভিচার বা পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই সহজিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেনি। সাধনার নামে পরস্ত্রী সংসর্গ কিংবা নারীর সতীত্ব হরণ - সহজিয়াদের কর্মকান্ড উনবিংশ শতাব্দীতে আরো তীব্রভাবে সমালোচিত হতে থাকে। পরস্ত্রী বা নারীর সঙ্গে পরকীয়ার যে তত্ত্ব সহজিয়া বৈষ্ণবসহ গৌণ ধর্মগুলি প্রচার করে আসছিল, তাতে ব্যভিচার আর ধর্মের নামে লালসা ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে আর কিছুই ছিল না-

> "বৈষ্ণব মতে স্ত্রীসঙ্গ প্রবৃত্তি নিতান্ত অহিতকর। যে পর্যন্ত ঐ প্রবৃত্তিটি সাধক হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই, সে পর্যন্ত দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিবাহিত স্ত্রী স্বীকার করিতে দোষ নাই। বিবাহিত স্ত্রী স্বীকার করিয়া সাধক গৃহী বৈষ্ণব নাম প্রাপ্ত হয়। ত্রিসঙ্গ প্রবৃত্তি টি ভক্তি প্রবল হইলে সহজে থব্বিত হয়, পরে বৈরাগ্যের আতিশয্যক্রমে অগৃহ রূপে বৈষ্ণব বিচরণ করিতে পারেন। অতএব তৎ সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণ গৃহী ও অভ্যাগত-এই দুইটি ভাগে বিভক্ত। বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি ভাক্ত বৈষ্ণবেরা প্রায়ই বিবাহিত স্ত্রী পরিত্যাগপূর্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করেন এবং ঐ অসৎ কার্য্যকে সাধন বলিয়া ব্যক্ত করেন। ঐ দুষ্ট কার্য্যকে অপরের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এরূপ প্রচার করেন যে তাঁহারা স্ত্রীগণের নিকট উপাসনা অভ্যাস করেন; কখনই ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন না। আহা! এই কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম! ইহা যদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম হয় তবে আধুনিক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কেন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আদর করিবেন? এই সমস্ত সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।"[৪০]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় যারা ইন্দ্রিয় সাধনায় বিশ্বাসী তাদেরকে সমাজের অনতি দূরে সরিয়ে ফেলার প্রয়াস এখানেই থেমে থাকে নি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ডক্টর প্রিয়নাথ নন্দী প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য প্রকারিণী সভা'। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চকোটির বৈষ্ণব অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব অনুগামীদের থেকে Deviant বা বিপথগামী অচ্ছুত এবং অজাচারে পরিপূর্ণ বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং সমাজ ব্যবস্থার বাইরে নিক্ষেপ করা। অপরদিকে বিপথগামী বৈষ্ণবদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের অবৈষ্ণব বলে অভিহিত করা হয়, যেমন - যে সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া, বিবাহের জটিল প্রক্রিয়া না মেনে চলা, বিবাহ বিচ্ছেদ সামাজিকভাবে না ঘটানো ইত্যাদি।[৪১] এই নির্দেশনামাটি পরে প্রকাশিত হয় সজ্জন তোষণী পত্রিকায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নামে যে ধর্মগুলি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সাধনা করছিল তাদের কথা আলোচিত হয়েছে শ্রীনারায়নদাস চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শ্রীভক্তিবিনোদবির্ভাব' নামক শিরোনামাংশে।[৪২]

এই অংশে উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবদের নিম্ন শ্রেণীর ধর্মাচরণকে উপেক্ষা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে নৈতিক মানদন্ডে ধর্ম আবদ্ধ, সেখানে যৌনতার ব্যবহার ধর্মকে অধর্মে পরিণত করে। পাশ্চাত্যের এই ধারণাটি ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষিত মহলে আঁকড়ে ধরেছিল। যে সমস্ত ধর্মাচরণ গুলি যৌনতাকে তাদের ধর্ম সাধনের পথ হিসেবে ব্যবহার করছিল তারা ধীরে ধীরে সমাজ ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। একই পরিণতি ঘটে সহজিয়া বৈষ্ণবদের। সহজিয়াদের প্রতি সামাজিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এরা নাকি সামাজিক উপদ্রব সৃষ্টি করে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছিল, সমাজের সহজ সরল মানুষদের বিপথে পরিচালিত করছিল। তাই এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের চিহ্নিতকরণ জরুরী হয়ে ওঠে। এদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তার সঙ্গে, ঔপনিবেশিক বাংলার সভ্য সমাজের মার্জিত ধর্মীয় সংস্কৃতিতে সহজিয়াদের দেহজ ও যৌন সম্পর্কের বিশ্বাসগুলি অপসংস্কৃতি ও পশ্চাদপদতার দিক বলে চিহ্নিত হতে থাকে। উৎপাদন ব্যতীত যৌনতার বহিঃপ্রকাশ বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অশ্লীলতায় পরিণত হয়। ফলে সহজিয়া বৈষ্ণবসহ অন্যান্য গৌণ ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে।

Reference:

১. দাস, শ্রীহরিদাস, শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, দ্বিতীয় খন্ড, নবদ্বীপ: শ্রী হরিবোল কুটির, ৪৬৫ গৌরাব্দ (১৯৫১ খ্রিঃ), পৃ. ৩৮

২. তদেব

৩. দাস, অজিত, জাত বৈষ্ণব কথা, কলকাতা: চারুবাক, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯

৪. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম ও তার প্রভাব, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১২৫

৫. ঝা, শক্তিনাথ, বস্তুবাদী বাউল, কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ৩৬৪

৬. Chakraborty, Ramakanta. Vaishnavism in Bengal, 1486-1900. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1985, p. 149. Henceforth VIB

৭. VIB, p. 350

৮. লক্ষ্য করার বিষয় রমাকান্ত চক্রবর্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা হিসাবে বা বৈষ্ণব প্রভাবিত একাধিক সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের সঙ্গে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন মিল নেই।

৯. চক্রবর্তী, সুধীর, গভীর নির্জন পথে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ১৭০

১০. তদেব, পৃ. ১৭১

১১. তদেব, পৃ. ১৭২

১২. মজুমদার, শ্রীবিমান বিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ. ৫৩৭

১৩. কবিরাজ, কৃষ্ণ দাস বিরচিত, চৈতন্যচরিতামৃত, কুমার সেন সম্পাদিত, কলকাতা: সাহিত্য একাডেমি, অষ্টম সংস্করণ ২০২১, পৃ. ১১৩

১৪. শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬

১৫. মজুমদার, শ্রীবিমান বিহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭

১৬. তদেব

১৭. সজ্জন তোষণী পত্রিকা, নবম খন্ড, অষ্টম সংখ্যা, ১৮৯৭-৯৮, পৃ. ৭৫-৭৬

১৮. তদেব, পৃ. ৭৮

২০. চৈতন্যচরিতামৃত, পৃ. ৫

২১. চন্ডীদাস, পদ সংখ্যা ৭৯৫ এবং ৭৭১

২২. বসু, শ্রীমণীন্দ্রমোহন, রাগাত্মিকা পদ : টিকা ও সমালোচনা, কলিকাতা: কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩২, পৃ. ১০-১১

২৩. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৮

২৪. তদেব, পৃ. ১৭৯

২৫. Kennedy, T. Melville. The Chaitanya Movement : A Study of the Vaishnavism of Bengal. Calcutta: Association Press, 1925, p. 210-211

২৬. VIB, p. 119

২৭. Dimock, C. Edward. The Place of the Hidden Moon: Erotic Mysticism in the Vaishnava- Sahajiya Cult of Bengal. Chicago and London : The University of Chicago Press, 1966. p. 52

২৮. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, শক্ত ধর্ম ও তন্ত্র, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১৪৪

২৯. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, নৃসিংহ রচিত শ্রীচৈতন্য মহাভাগবতম, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বর্ষ- ৯১, সংখ্যা - ১, পৃ. ৩২-৪২, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম : একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ১১৮-১১৯

৩০. হালিশহর পত্রিকা, ২য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

৩১. মুখোপাধ্যায়, শ্রী হরিমোহন সম্পাদিত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, বঙ্গবাসি স্ট্রিম মেশিন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪২

৩২. Ward, William. Account of the Writings, Religion, and Manners, of the Hindoos. Vol - 2, Serampore, The Mission Press. First published in 1811, p. 262

৩৩. Bankim Chandra Chattopadhyay to the Magistrate of Moorshedabad, April 19, 1872, Memoranda, October 1872, B. No 252-335, West Bengal State Archives

৩৪. তদেব

৩৫. Mitra, Durba. Indian Sex Life: Sexuality and the Colonial Origins of Modern Social Thought. Princeton, Princeton, Princeton University Press, 2021, p. 70

৩৬. Baboo Kasi Kenkur Sen, Magistrate of Rajshaye, to the Magistrate of Rajshaye, May 24, 1872, Memoranda, October 1872, B. No. 252-335, West Bengal State Archives, mentioned in Durba Mitra, Indian Sex Life. p. 70

৩৭. Bhattacharya, Jogendra Nath. Hindu castes and Sects: An Exposition of the Origin of the Hindu Caste. Calcutta: Thacker Spink, 2017 (1896), P. 280

৩৮. Beverey, H. Report of the Census of India, 1872. Calcutta: The Bengal Secretariat Press, 1872

৩৯. সজ্জন তোষণী, পঞ্চম বর্ষ, দশম সংখ্যা, পার্ট - টু, ১৮৯৩-৯৪, পৃ. ১৯৭

৪০. সজ্জন তোষণী পত্রিকা, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৮৮৫, পৃ. ৬৭-৬৮

৪১. তদেব, পৃ. ৬৮-৬৯

৪২. VIB. p. 333-334

৪৩. সজ্জন তোষণী পত্রিকা, একবিংশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯১৮

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 38 - 47
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ইকোফেমিনিজম তত্ত্ব : ক্যারেন জে. ওয়ারেন ও ভাল প্লামউডের তত্ত্বের আলোকে ভারতীয় পৌরাণিক নারী চরিত্রের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ

সাদিয়া আফরিন
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ [ইউল্যাব]
Email ID : sadia.afrin@ulab.edu.bd

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Ecofeminism, mythology, women, nature, oppression, Warren, Plumwood, dual values, qualitative change.

Abstract

Since the beginning of the world, women and nature have been identified as identical. A woman's creativity, endurance, and generosity are like a reflection of nature in a woman's body. Like nature, women are the guardians of life. Similarly, both women and nature are neglected and oppressed in patriarchal society. Women's marginalization and biodiversity loss go hand in hand. The theory of ecofeminism was formed to protect women's rights and prevent environmental degradation. Man's oppression of nature and patriarchy's dominance over women are inextricably linked. In the late 20th century, Françoise d'Eaubonne coined the term ecofeminism in her book 'Le Feminismeou la mort'. But it can be seen that in our Indian subcontinent, the myth-puranas that have been prevalent for ages have always been about the connection between nature and women and oppression. Ecofeminism's prominent philosopher Karen J. Warren and Val Plumwood in their essays 'The Power and Promise of Ecofeminism' and 'Feminism and the Mastery of Nature' analyze the theory of ecofeminism to reveal the oppression of women and nature by patriarchal society. They think that it will be possible to reduce the inequality between men and women only if there is a qualitative change in the values of the people living in the society. Though Daupradi born from fire, Sita born from earth or Shakuntala protected by birds are all associated with nature, they are burdened by the cruel blows of this patriarchy. On the other hand, when the qualitative change of the society is achieved, characters like Gargi, Satyavati, Maitrayi, Lopamudra, Amba or Shikhandi are found who are wise, intelligent and skilled. This Article will show through Warren and Plumwood's Ecofeminism theory how patriarchal society has dominated women in Indian mythology due to dual values. On the other hand, if the qualitative change of the society is achieved, the process of changing the social

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

status of women will be revealed in this article by analyzing the character of mythical women.

Discussion

নারী ও প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। প্রকৃতির মতোই নারী প্রাণের প্রতিপালক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও প্রকৃতি উভয়ই অবহেলিত, নিপীড়িত। নারীর প্রান্তিকীকরণ এবং জীববৈচিত্র্যের বিনাশ পরস্পর সহযোগী। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে থাকা এই সম্পর্ক থেকেই গড়ে উঠেছে নতুন এক তত্ত্ব। যাকে ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পেই ইকোফেমিনিজমের জন্ম। প্রকৃতির ওপর মানুষের নিপীড়ন ও নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য দুটোই যেন একসূত্রে গাঁথা। ১৯৭৪ সালে ফ্রাঁসোয়া দ্য ওবোঁন (Françoise d'Eaubonne) তাঁর 'লে ফেমিনিজম উলামো' (Le Feminismeou la mort) গ্রন্থে 'ইকোফেমিনিজম' প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় -

> "Ecofeminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and the subordination and oppression of women. It emerged in the mid-1970s alongside second-wave feminism and the green movement. Eco-feminism brings together elements of the feminist and green movements, while at the same time offering a challenge to both. It takes from the green movement a concern about the impact of human activities on the non-human world and from feminism the view of humanity as gendered in ways that subordinate, exploits and oppress women."[১]

বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক যথাক্রমে ক্যারেন জে. ওয়ারেন, ভাল প্লামউড, বন্দনা শিবা, মারে বুকচিন, মারিয়া মাইজ, জিম চেনি প্রমুখ ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন। তাঁরা সবাই নারী নিপীড়ন ও প্রকৃতির নিপীড়নের মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। পরিবেশের প্রতি মানুষের অবাধ অধিকার রয়েছে। এ ধারণা থেকে মানুষ পরিবেশকে তাঁর নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে পরিবেশ অবনয়নের সৃষ্টি করছে। নারীবাদী দার্শনিকরা মনে করেন, পরিবেশ অবনয়ন ও পরিবেশ নিপীড়ন নারীবাদী ইস্যু। তার কারণ হচ্ছে, পরিবেশ শোষণ করলে যেমন পরিবেশ নিপীড়িত হয় তেমনি নারীর উপর শোষণের ফলে নারী নিপীড়িত হয়। পরিবেশ ও নারী উভয়ই পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিপীড়িত, শোষিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। নারীবাদীরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পান।

> "পরিবেশ অবনয়নকে তাঁরা তাই নারী বিষয়ক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেন।"[২]

ক্যারেন জে. ওয়ারেন তাঁর 'The power and promise of Ecological Feminism' প্রবন্ধে ও ভাল প্লামউড তাঁর 'Feminism and the Mastery of Nature' প্রবন্ধে ইকোফেমিনিজম তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নারী ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্ব এবং কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক দ্বৈততা নারী ও পরিবেশ নিপীড়নের জন্য দায়ী তা প্রকাশ করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে 'প্রকৃতিকরণ' এবং প্রকৃতিকে 'নারীকরণ' করার মাধ্যমে উভয়ের উপর নিপীড়ন চালায়। নারীর প্রকৃতিকরণ করা হয় যখন নারীকে প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদান রূপে চিহ্নিত করা হয়। তেমনি প্রকৃতির নারীকরণ করা হয় যখন প্রকৃতিকে 'She' বলা হয় এবং 'মাতা' হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তাই ওয়ারেন মনে করেন যে, পুরুষতন্ত্র যখন নিজেকে প্রকৃতির মালিক বা মনিব মনে করে, তখন প্রকৃতির মতো নারীকেও একই দৃষ্টিতে দেখে। প্রকৃতির সঙ্গে নারীর এই অনিবার্য সম্পর্কের কারণে নারী ও প্রকৃতি উভয়ই নিগৃহীত হচ্ছে। ওয়ারেন তাঁর 'The Power and Promise of Ecological Feminism' প্রবন্ধে নারী ও প্রকৃতির নিপীড়নকে 'ধারণাগত কাঠামো' বলে আখ্যায়িত করেন।[৩] ধারণাগত কাঠামো বলতে তিনি এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুমান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝান, যা ব্যক্তিকে নিজস্ব ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। এ ধারণাগুলো হল সমাজের বদ্ধমূল ধারণা; আর এই বদ্ধমূল ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই সৃষ্টি। পুরুষতন্ত্র নিজেদের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই ধারণা তৈরি করেছেন যে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত আর নারী তার অধস্তন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারী ও প্রকৃতির এই নিপীড়নের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্ট দ্বৈত মূল্যবোধ। দ্বৈত মূল্যবোধ থেকে মানুষের মনে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে, নারী ও প্রকৃতি হল অধস্তন আর এদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার রয়েছে এবং এই কর্তৃত্ব করবে পুরুষতন্ত্র। তাই,

> "পরিবেশবাদীরা একমত যে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে।"[৪]

প্রাচীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই মূল্যবোধ জন্মাতে শুরু হয়েছে যে, নারী ও প্রকৃতি দুর্বল এবং পুরুষতন্ত্রের অধস্তন। নারী আবেগময়ী, পরনির্ভরশীল, সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম অন্যদিকে পুরুষ শক্তিশালী, সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বনির্ভর এই ধারণায় সমাজ লালন করে আসছে। পরিবেশ নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়াশ চালায়। ওয়ারেন ও প্লামউড দুইজনেই নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নের অন্যতম কারণ হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধকে দায়ী করেছেন। ওয়ারেনের মতে, -

> "পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো যখন পিতৃশাসিত হয় তখন তা নারীকে অধস্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করে।"[৫]

বিখ্যাত নারীবাদী দার্শনিক সিমোঁন দা বোভোয়ার দেখিয়েছেন সমাজে নারীর পরিচয় হচ্ছে দ্বিতীয় লিঙ্গ (Second Sex) হিসেবে। নারী ও পুরুষ সমান ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও মূল্যায়িত হচ্ছে 'অপর' হিসেবে। অপরপক্ষে প্রকৃতি মানুষের জীবনে অফুরন্ত সম্পদ দান করলেও প্রকৃতিকে মানুষ সহায়ক মূল্য হিসেবে গণ্য করে। সমাজের এই দ্বৈত মূল্যবোধের কারণেই নারী ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের মূল্যায়ন এইরকম। সিমোঁন, ওয়ারেন, প্লামউডের পাশাপাশি বন্দনা শিবাও মনে করেন পুরুষতন্ত্র নারীদের অধীনস্থ করে রাখার জন্য সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধ তৈরি করে রেখেছে।

ওয়ারেন ও প্লামউড নারী ও পুরুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে (নারী দুর্বল ও হীন এবং পুরুষ সবল ও উচ্চ প্রকৃতির) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাঁরা জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে স্বীকার করেন কিন্তু সমাজ নির্মিত লিঙ্গকেন্দ্রিক বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। প্লামউড মনে করেন, -

> "সমাজ নারীকে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে গণ্য করলে নারী সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির সত্তা অর্থাৎ সহায়ক ভূমিকা পালনকারী সত্তা হিসেবে গণ্য হতো না।"[৬]

তাছাড়া নারীর মূল্যবোধ, নারীর অনুভূতি কখনো পুরুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নারীর Care attitude (নারীর আবেগ, অনুভূতি, পরিচর্যানীতি) নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন করেছে। ওয়ারেনের মতে, নারীদের অনুভূতিগুলো ব্যক্তিক যা সার্বিক নয়। আর নারীদের অনুভূতিগুলো সার্বিক নয় বলেই পুরুষতন্ত্র এগুলোকে অগ্রাহ্য করে, কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সর্বজনীন ধারণা হচ্ছে ব্যক্তিককে গুরুত্ব না দিয়ে নৈর্ব্যক্তিককে গুরুত্ব দেয়া। ফলে নারী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নারীর জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা (গর্ভপাত, গর্ভধারণ) আছে, যা পুরুষ কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। পুরুষের মধ্যেও Loving বা Affection এর বোধ কাজ করে তবে তা নারীর মতো নয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে এবং তাকে স্বীকার করতে হবে ও মর্যাদা দিতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নারীর অভিজ্ঞতা, নারী প্রেক্ষিত ও নারী মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। নারী ও প্রকৃতিকে সহায়ক মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা বন্ধ করে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর হয়তো তখনি মানুষের মূল্যবোধের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন করা সম্ভব হলেই সমাজের পরিবর্তন নিশ্চিত করা যাবে। তাই সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলেই প্রকৃতপক্ষে নারী ও প্রকৃতির ওপর নিপীড়ন, বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব বলে মনে করেন ওয়ারেন ও প্লামউড।

সভ্যতার শুরু থেকেই নারীই মূলত প্রকৃতিকে দিয়েছে এক সুশৃঙ্খল সুন্দর রূপ। আদি নারী ইভ বা হাওয়া প্রকৃতির প্রতি অসীম কৌতূহল বশত স্বর্গের বাগানে রাখা সেই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলেছিল। আর সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে নারীকে নিক্ষিপ্ত করা হয় পৃথিবীর প্রতিকূল অরণ্য প্রকৃতিতে। গাছের পাতা আর বাকলে নিজের দেহকে আবৃত করে নারীই প্রথম প্রকৃতিকে মানুষের বন্ধু করে নেয়। প্রাচীনকালে নারীর হাত ধরেই শুরু হয় আদি কৃষিব্যবস্থা। একদিকে মানব সমাজ গঠন অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র দুটোই গড়ে উঠেছে নারীর হাত ধরে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মে নারীকে দেখা হয়েছে সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির ঈশ্বর বা দেবী হিসেবে। আদি নারী ইভ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ তৈরি করে গেছেন; নারীজাতির প্রতিনিধি হয়ে প্রকৃতির প্রতি মানুষের আগ্রহ ও কৌতূহলকে জাগিয়ে

তুলেছিলেন। তেমনি সনাতন ধর্মে দেবী পার্বতীকে (দূর্গা) মনে করা হয় প্রকৃতির দেবী। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও জ্ঞানরূপে সর্বভূতে বিরাজ করেন। জীবনের জন্য (প্রকৃতিতে) অবধারিত সমস্ত শক্তি যেমন ধন, ধান, বিদ্যা, শিল্প ইত্যাদির দেবীরূপে নারীকেই বন্দনা করা হয়। এমনকি শুধু ভারতীয় মিথ-পুরাণে শুধু নয় গ্রিক মিথেও লক্ষ করা যায়, ভেনাস ও আফ্রোদিতে হচ্ছেন প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবনকে সম্পদে, সম্মানে, প্রেমে ও বীর্যে গৌরবময় করে তোলার শক্তিরূপিণী দেবী। আফ্রোদিতের হাতে থাকে প্রেমের প্রতীক আপেল। জীবনের শক্তি ও আনন্দের সঙ্গে আদিকাল থেকেই নারী ও প্রকৃতির যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এই শক্তিময়ী দেবী তারই প্রতীক।

নারী ও প্রকৃতির এই যোগসূত্রতার কথা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইকোফেমিনিজম ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে যে মিথ-পুরাণ প্রচলিত আছে তাতে প্রকৃতি ও নারীর যোগসূত্রতা এবং নিপীড়নের বিষয়টি সর্বদাই প্রচলিত। 'পুরাণ' অর্থাৎ প্রাচীন কথা বা প্রাচীন কাল সম্বন্ধীয় শাস্ত্র।[৭] পুরাণ শব্দটি আক্ষরিক অর্থ "পুরাতন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা সর্বকালীন মানবজীবনে চির নতুন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।"[৮] কারণ প্রকৃতপক্ষে পুরাণ সাহিত্য প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি জীবন্ত ইতিহাস। ভারতীয় পুরাণের বিস্তার খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে শুরু করে খ্রিস্টের জন্মের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত, পরিবেশিত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংকলিত নানান আদি গ্রন্থ, মূলত ধর্মগ্রন্থে লক্ষ করা যায়। যেমন - বেদ ও উপনিষদ, উপবেদ, বেদান্ত, স্মৃতি সংহিতা, গীতা, পুরাণ, আগমশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী এবং ষড়দর্শন। এইসব আদি ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণে নানান দেবদেবীর কর্মকাণ্ড এবং তাঁদের বন্দনা ও উপাসনার পদ্ধতি যেমন ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে তেমনি এই মিথ পুরাণের কাহিনির মধ্যে নারী ও প্রকৃতির অভিন্নতা ও নিপীড়নের বিষয়টিও সমানভাবে লক্ষণীয়। যেমন বলা হয়, মহাভারতের কথা অমৃতসমান। কিন্তু মহাভারতের অনেক স্থানেই নারী সম্পর্কে মনুসংহিতার প্রভাব লক্ষণীয়। মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মের উপলব্ধি "মানুষের চরিত্রে যত দোষ থাকতে পারে, সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। জন্মান্তরীয় পাপের ফলে জীব স্ত্রীরূপে (শূদ্ররূপেও) জন্মগ্রহণ করে।" (ভীষ্মপর্ব ৩৩/৩২) মহাভারতে আরো বর্ণিত আছে "তুলাদন্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, দাবানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করিলে ভয়ানকত্বে উভয়ই সমান সমান হবে।" (অনুশাসনপর্ব ৩৮) নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে "অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম/ বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।।" (৯ : ২) "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/ রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।"(৯ : ৩) অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের স্বামীসহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনরাত পরাধীন রাখবেন, নিজের বশে রাখবেন...; স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী জীবনে, স্বামী যৌবনে ও পুত্র বার্ধ্যক্যে রক্ষা করে; (কখনও) স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়।[৯]

পুরাণের নারীচরিত্রগুলো পর্যালোচনা করলে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। ওয়ারেন ও প্লামউড তাঁদের প্রবন্ধে নারী ও প্রকৃতির উপর পুরুষতন্ত্রের যে কর্তৃত্বের কথা বলেছেন তা পৌরাণিক নারী চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার পৌরাণিক নারী চরিত্রগণ। শকুন্তলা, দ্রৌপদী কিংবা সীতা যেমনভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত তেমনি তাঁরা পুরুষতন্ত্রের নির্মম আঘাতে জর্জরিত। আবার ওয়ারেন ও প্লামউড এই নিপীড়নের সমাধান হিসেবে যে সমাজের গুণগত পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন সেটা সম্ভব হলে গ্রার্গী, সত্যবতী, মৈত্রয়ী, লোপামুদ্রা ও অম্বা থেকে শিখণ্ডী হয়ে ওঠা প্রতিবাদী, সাহসী, বিদূষী পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলোর উদাহরণও আমরা দেখতে পাই। গবেষণা প্রবন্ধের এই পর্যায়ে ওয়ারেন ও প্লামউডের ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের আলোকে ভারতীয় পৌরাণিক নারীদের সামাজিক অবস্থান আলোচনার করার প্রয়াশ করা হল -

শকুন্তলা : ঋষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার মিলনের ফলে মেনকার গর্ভে জন্ম হয় শকুন্তলার। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র মেনকাকে ছেড়ে দিলে মেনকাও তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে বন-মধ্যে মালিনী নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। "এই পরিত্যক্ত কন্যা শকুন্ত মানে পাখি দ্বারা রক্ষিত হয় বলেই তাঁর নাম হয় শকুন্তলা।"[১০] কণ্বমুনির আশ্রমে প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে প্রকৃতির কন্যা শকুন্তলা। কণ্বের তপোবনে মানুষ আর মানবেতর প্রাণিরা নির্বিবাদে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাস করে। সেই তপোবন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি দুষ্মন্ত এলেন প্রকৃতির উপর তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করতে। তিনি (দুষ্মন্ত) অরণ্যের মানুষ নন। তিনি নির্বিবাদে প্রকৃতির উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন মৃগ হত্যার মাধ্যমে। পরবর্তীতে দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে কথা বিস্মৃত হওয়া ও তাঁকে প্রত্যাখানের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন প্রকৃতির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা প্রকাশিত হচ্ছে আর অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার দ্বৈত মূল্যবোধের প্রকাশও লক্ষণীয়। অপরদিকে শকুন্তলা পতিগৃহে যাবার সময় পশুপক্ষী, গাছপালা সবাই কেঁদে উঠেছে। শকুন্তলাকে পতিগৃহ পাঠানোর সময় কণ্ব তপোবন তরুদের সম্বোধন করে বলেন -

> "হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জলসেচন না করে কদাচ জলপান করতেন না, ভূষণপ্রিয়া হয়েও কদাচ যিনি তোমাদের পল্লবভঙ্গ করতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হলে যাঁর আনন্দের সীমা থাকত না, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাচ্ছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন করো।"[১১]

এই উক্তি থেকে শকুন্তলার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের জায়গাটি স্পষ্ট হয়। শকুন্তলার নিজস্ব পরিচিত স্থান থেকে বেরিয়ে আসার কারণে দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা প্রচণ্ডভাবে বিচ্ছিন্ন অনুভব করেছেন। কালিদাস এই চিন্তা থেকেই বলতে চেয়েছেন মানুষ প্রকৃতির কাছাকাছি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণে সে সুখে থাকে, প্রকৃতির বাইরে গেলেই তার মানসিক সংকট শুরু হয়। ওয়ারেন ও প্লামউড পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে দ্বৈত মূল্যবোধের কথা বলেছেন, তাঁর প্রমাণ শকুন্তলা চরিত্রটি। প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত শকুন্তলা পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিভূ দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিতাজ্য হওয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের পরিচয় প্রকাশিত হয়।

সীতা : রামায়ণে বর্ণিত মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় জনক সীতাকে লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন। ক্ষেতে হল মুখ থেকে উৎপন্ন বলে এঁর নাম সীতা।[১২]

প্রকৃতিজাত সন্তান সীতা জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের আরেকটি উত্তম নিদর্শন লক্ষ করা যায় রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাম-সীতার বিবাহের পর রাজা দশরথ রামকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করলে দশরথ পত্নী কৈকেয়ীর প্রার্থনায় রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ হয়। পরবর্তীতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করলে নিজের পৌরুষ প্রমাণ করে রাবণকে পরাজিত করে তিনি সীতাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যখনি যুদ্ধে জয়লাভের পর সীতা রামের নিকট উপস্থিত হয়, রাম সীতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং সীতাকে যথা ইচ্ছে যেতে বলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ জাতি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও নারীকে তার অধস্তন চিন্তা করে বিধায় রামচন্দ্র নিজের পুরুষত্ব প্রমাণ করার জন্য রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছেন স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসের স্থানে আর রাখতে পারছেন না তাঁর সহধর্মিণীকে। সীতা প্রকৃতির সন্তান, মাটির ফলা থেকে উদ্ভূত হয়ে তাঁর জন্ম, সেই সীতাকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হয়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। এমনকি তাঁর সতীত্ব প্রমাণের পরও প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য রাম সীতাকে নির্বাসিত করেছে বাল্মীকির আশ্রমে। রাম যখন জানতে পারেন সীতার পুত্র লব ও কুশ, তখন তিনি নিজের বংশের অগ্রগতির চিন্তায় আবারো সীতাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। শর্ত এবারও আত্মশুদ্ধি দিয়ে শপথ নেয়া। এই পর্যায়ে এসে নিজের সতীত্ব পরীক্ষা দিয়েছেন, নিজেকে সতী প্রমাণ করতে গিয়ে ভূমিজ সীতা পৃথিবী দেবীর আশ্রয় চেয়েছেন এবং বসুমতী তাঁকে উভয় বাহুতে ধারণ করে রসাতলে প্রবেশ করেন। মাটি থেকে উত্থিত সীতা চিরতরে মাটিতে হারিয়ে গেলেন। সীতা নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হয়েছেন বারংবার। তেমনি রাম রাবণের যুদ্ধের পর রাম যখন রাবণকে বধ করেন তখন রামের ইচ্ছায় বিভীষণ রাবণের বিধবা স্ত্রী মন্দোদরীকে বিয়ে করেন। কিন্তু মন্দোদরী যুদ্ধে রাবণের সঙ্গে রামের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করেছিলেন। রাবণের ভাই হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করে রামের সঙ্গে হাত মিলানো বিভীষণকে বিয়ে করতে মন্দোদরীর মত ছিল কিনা তা রাম বা বিভীষণ বিবেচনা করেন নাই। কারণ পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে নারী পুরুষের অধস্তন এই চিন্তা থেকেই হয়তো মন্দোদরীর সিদ্ধান্ত জানার প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা। এমনকি

লঙ্কা যাওয়ার পথে রাম ও বানরজাতি কর্তৃক সাগরের বুক ছিড়ে বানানো সেতুও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি উদাহরণ। পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে পুরুষ প্রকৃতি ও নারীর উপর এইভাবেই তাঁদের নিপীড়ন চালিয়ে যান।

দ্রৌপদী : মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদী। পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন অরূপে দ্রুপদ তাঁর বাল্যবন্ধু আচার্য দ্রোণকে বধ করার জন্য যজ্ঞ শুরু করেন। যেই যজ্ঞবেদীর যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হলেন এক নারী তারই নাম দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করেন অর্জুন। কিন্তু দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তীর নিকট উপস্থিত হলে কুন্তী না দেখেই আদেশ দেন "তোমরা সকলে মিলেই সেই জিনিস ভোগ কর।"[১৩] দ্রৌপদী কেবল এক স্বামী অর্জুনকে চাইলেও তাঁকে পঞ্চস্বামীকে মেনে নিতে হয়। দ্রৌপদীর ইচ্ছে-অনিচ্ছার বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গণ্য করেননি। পুরুষশাসিত সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের জায়গাটি এমন যে, দ্রৌপদীকে প্রতিবার একস্বামী থেকে অন্য স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে নতুন করে সতীত্ব ও পবিত্রতা অর্জন করতে হত। কিন্তু স্ত্রী দ্রৌপদীকে রেখে অর্জুন ব্রহ্মচর্যের জন্য বনবাসে গিয়ে তিন তিনটি বিয়ে করে ঘরে ফিরেন তবে তাঁকে অবশ্যই এই শুদ্ধ বা পবিত্র হতে হয়নি। পুরুষশাসিত সমাজে একজন নারীর উপর যত অত্যচার হওয়া সম্ভব তার সবই ঘটেছিলো অগ্নি থেকে উদ্ভূত দ্রৌপদীর উপর। পৃথিবীর বিখ্যাত চার আদি মহাকাব্যের অন্যান্য নারী চরিত্রগণ দ্রৌপদীর মতো এত লাঞ্ছনা সহ্য করেননি। পুরুষের লোভ, লালসা ও বাসনার শিকার হতে হয়েছিল পেনেলোপিকেও তবে তা অডিসিয়াসের অনুপস্থিতে। স্বামীর অনুপস্থিতে সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়েছিল কিন্তু তথাকথিত পঞ্চপাণ্ডব ভুবনজয়ী স্বামীদের উপস্থিতিতে দ্রৌপদীর উপর যে লাঞ্ছনা হয় তা সত্যি অবিশ্বাস্য। এমনকি দুর্যোধন পান্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করলে সেখানে সব হারিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধের ফলে পুরুষরা নিজেদেরকে নারীদের প্রভু হিসেবে গণ্য করেন আর তাই হয়তো দ্রৌপদীর মতামত ছাড়াই তাঁকে খেলার পণ করা হয়েছে। এমনকি যখন যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেল তখন সে একটিবারও তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি বা স্ত্রীর অপমানের প্রতিবাদ করেননি। এইভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত যজ্ঞবেদী উদ্ভূত দ্রৌপদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হয়েছেন বারংবার। প্রাচ্য-পুরাণে লক্ষ করা যায়, সতীত্ব সর্বদা নারীরই পালন করতে হয়। পঞ্চতন্ত্রে বলা আছে, নারীরা তখনই কেবল সতী যখন তার আর কোনো সুযোগ নেই বা প্রার্থীপুরুষ নেই। স্মৃতিশাস্ত্রে সরাসরি পুরুষের প্রভুত্ব আর নারীর দাসত্বের উল্লেখ রয়েছে। তাই ওয়ারেন ও প্লামউডের ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের আলোকে দ্বৈত মূলবোধ ধারণাটি স্পষ্ট ভাবে এই চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রকাশ পায়।

পুরাণ অধ্যয়ন করলে আরো উপলব্ধি করা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের জায়গাটি; এমনকি পুরাণের ছত্রে ছত্রে নারীবিদ্বেষ ও নারীর অধস্তনতার বিষয়টি লক্ষণীয়। উপনিষদের বিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নারীকে নিজের দেহের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে : সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে বস্ত্র এবং অলংকার দিয়ে রাজি করাতে হবে। তাতেও সম্মত না হলে হাত দিয়ে, লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার করতে হবে। ওয়ারেন ও প্লামউড নারীদের Care Attitude এর কথা বলেছেন যা পুরুষ থেকে ভিন্ন তারও উদাহরণ মিথ-পুরাণে লক্ষ করা যায়। পুরাণের অনেক স্থানে লক্ষ করা যায় মুনি-ঋষিরা যৌনকাতর হয়ে পড়ে এবং শারীরিক ক্ষুধা মিটলেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে যেতেন। সেই অনাগত নারীর সন্তানের কোনো দায়িত্ব বা সংবাদ তাঁরা নিতেন না। সন্তানের সব দায়িত্ব পড়তো মায়ের উপর। স্বয়ং অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আর দুষ্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে একই কাজ করেছেন। তাঁরা তাঁদের সন্তানের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও শকুন্তলার তাঁদের সন্তানের প্রতি সবসময় দায়িত্ববান ছিলেন।

ওয়ারেন ও প্লামউড বলেছেন নারী ও প্রকৃতিকে সহায়ক মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা বন্ধ করে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাঁরা সমাজের গুণগত পরিবর্তনকে নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া যে সম্ভব তারও নিদর্শন আমরা মিথ-পুরাণের চরিত্র থেকে পাই। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা তাঁরা বিদুষী নারী ছিলেন। তাঁরা দর্শন রচনা ও চর্চা করতেন, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের আয়ত্তে তীর-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধনুক চালনা, জাদুবিদ্যা, শিক্ষকতা ও গুরুর দায়িত্ব ছিল। সবচেয়ে বড় বিষয় তাঁরা তথাকথিত পুরুষতন্ত্রের বিপক্ষে প্রশ্ন করতে পেরেছেন। সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞানে পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন তাঁরা এবং পুরুষদের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় বসে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করারও উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের কারো কারো বেশ কিছু শিষ্যও ছিল। তাই বলা যায় সমাজের মানুষের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলে এই ধরনের প্রতিবাদী, বিদুষী নারী চরিত্রও সমাজে উঠে আসা সম্ভব। যেমন -

গ্রার্গী : বৈদিক যুগের একজন বিদুষী ঋষিকন্যা। ইনি গর্গমুনির কন্যা। "বেদের অনেক সূক্ত ও মন্ত্রের রচয়িতা এই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।"[১৪] মিথিলার রাজা জনকের যজ্ঞে জনক শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও ব্রহ্মিষ্ঠ নির্ণয়ের ঘোষণা দিলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে এর যোগ্য বলে ঘোষণা দেন। গ্রার্গী সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে বিচার করতে শুরু করেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে তিনি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে সক্ষম হন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করার এই সৎসাহসেই গ্রার্গীকে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শক্তিমতী ও ব্রহ্মবাদিনী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের ফলে নারী ও প্রকৃতিকে নিয়ে যে 'ধারণাগত কাঠামো' গড়ে উঠেছে, পুরুষই যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী সে স্থান থেকে গ্রার্গী নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। ওয়ারেন ও প্লামউড ঠিক এই প্রসঙ্গেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নারীদের স্বতঃমূল্য সত্তা প্রকাশের কথা বলেছেন।

মৈত্রেয়ী : বৈদিক যুগে নারীজাতি যে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে ও দার্শনিক সমাজে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হতেন, তার উদাহরণ হিসেবে মৈত্রেয়ীর নাম উল্লেখ করা যায়। তাকে ভারতীয় বিদূষীদের এক প্রতীক মনে করা হয়। তিনি ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানার্জন স্পৃহা ছিল অদম্য। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার আশ্রম ত্যাগ করার কথা বলেন তখন মৈত্রেয়ীর সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তিনি তখন বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভ করা সম্ভব কিনা এই বিষয়ক প্রশ্ন করেন তাঁর স্বামীকে। যজ্ঞবল্ক্য যখন তাঁকে উত্তর দিলেন বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের সম্ভবনা নেই, মৈত্রয়ী তখন জীবনের পরম সত্য আবিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁর স্বামী যজ্ঞবল্ক্যকে অমরত্বের ব্যাখ্যা দিতে বললেন। মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তাঁর যুক্তি বুদ্ধির পরিচয় যেমন দিয়েছেন। একই ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈত মূল্যবোধকে ভেঙ্গে সহায়ক সত্তা থেকে স্বতঃমূল্য সত্তায় উপনীত হয়েছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে এই কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি হিন্দু দর্শনের আত্মা-সংক্রান্ত ধারণাটি পর্যালোচনা করেছেন। এই ধারণা থেকেই অদ্বৈত দর্শনের মূল কথা যা একজন নারী আবিষ্কার করেছেন। এই থেকে অনুধাবন করা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্ট ধারণাগত কাঠামোতে নারীকে যেভাবে সহায়ক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় গ্রার্গীর মতো মৈত্রেয়ীও সেটির পরিবর্তন দেখিয়েছেন। আর তাই ওয়ারেন ও প্লামউডের ইকোফেমিনিজম চিন্তার আলোকে বলা যায়, মানুষের গুণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলেই মৈত্রয়ীর মতো চরিত্র সমাজে উঠে আসা সম্ভব।

লোপামুদ্রা : নিজের ব্যক্তিত্বকে বলবান রাখার এক আদর্শ প্রকাশ হচ্ছে লোপামুদ্রা। তিনি মহর্ষি অগস্ত্যের সহধর্মিণী। যিনি "নারীদের রূপাভিমান লোপ করেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেন।"[১৫] অগস্ত্য চিরকাল অকৃতদার থাকার সংকল্প গ্রহণ করলেও তাঁর পিতৃপুরুষের কথায় তাঁর নিজের জীবনসঙ্গিনী তিনি তাঁর কল্পনায় সৃষ্টি করলেন। বিদর্ভরাজা তখন সন্তান কামনায় তপস্যারত থাকায় লোপামুদ্রাকে তাঁর কাছে অর্পণ করলেন। লোপামুদ্রা পূর্ণ যৌবনাবতী হলে অগস্ত্য তাঁকে প্রার্থনা করলেন। লোপামুদ্রা তাঁর সমস্ত স্বপ্নসৌধ দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত ঋষির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু বিবাহের পর অগস্ত্যের অনুভূতিহীন মনোভাব লোপামুদ্রার স্বপ্নকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একদিন অগস্ত্য লোপামুদ্রার প্রতি তাঁর ভালেবাসা অনুভূত হলে সে লোপামুদ্রাকে আহ্বান করেন। লোপামুদ্রা সে আহ্বানে সাড়া দেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সেই হাসি, প্রাণচাঞ্চল্য আর প্রকাশিত হয় না। অগস্ত্য সেই হাসি, প্রাণচাঞ্চল্যকে প্রত্যাশা করলে লোপামুদ্রা তাঁকে রত্ন-আভরণ নিয়ে আসতে বলেন। অগস্ত্য রিক্ত ঋষি প্রার্থী হয়ে বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করে লোপামুদ্রার জন্য অজস্র রত্ন নিয়ে

আসেন। কিন্তু লোপামুদ্রা অনাবরণ অঙ্গশোভায় একটি বল্কলে আবৃত হয়েই অগস্ত্যের কাছে আসেন। অগস্ত্য প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, -

> "আমি রত্ন প্রেমিকা নই ঋষি। আমার স্মিত হাসি দেখার লোভে যাঁর হৃদয় আজ ব্যাকুল হয়েছে, আমি তাঁরই প্রেমিকা।"[১৬]

এইভাবে লোপামুদ্রা নিজের জীবনের খেলায় বিজয়িনী হয়েছেন। ভালোবাসার সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছেন। ওয়ারেন তাঁর প্রবন্ধে নারীর আবেগ, অনুভূতি, পরিচর্যানীতিকে পুরুষের আবেগ থেকে ভিন্ন বলেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর আবেগ ও অনুভূতিকে সার্বিক মনে না করে সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমনটি লক্ষ করা যায় লোপামুদ্রার ক্ষেত্রে। প্রথমে তাঁর অনুভূতির বা আবেগকে গুরুত্ব দেয়নি অগস্ত্য কিন্তু সেটির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজের ভালোবাসাকে অর্জন করে নিয়েছেন এই সংগ্রামী নারী। প্লামউড যেমনটি বলেছেন, নারীকে সহায়ক সত্তা থেকে বেরিয়ে স্বতঃমূল্য সত্তায় বিবেচনা করতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এইভাবেই লোপমুদ্রা স্বতঃমূল্য সত্তা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

সত্যবতী : সত্যবতী চেদীরাজ উপরিচর বসু এবং শাপগ্রস্তা মৎস্যরূপিণী অপ্সরা অদ্রিকার কন্যা। ধীবরদের রাজা দাশ তাকে তার যমজ ভাইয়ের সাথে অদ্রিকার উদরে পান। রাজা বসু পুত্র সন্তানটিকে নিজের কাছে রেখে সত্যবতীকে দাশের কাছে প্রতিপালন করতে দেন। সত্যবতীর গায়ে তীব্র মাছের গন্ধ থাকায় তার আরেক নাম মৎস্যগন্ধা। এজন্য কেউ তার কাছে আসতে চাইতো না। তাই পালকপিতার নির্দেশে তিনি যমুনার বুকে নৌকা চালানো আর জেলেনী হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তীতে রাজা শান্তনু তার সৌন্দর্য ও গায়ের সৌরভে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়েন এবং দাশরাজের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলে দাশ বলেন যদি তার কন্যার সন্তানেরা রাজা হন তবেই তিনি কন্যাদান করবেন। এজন্য শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম রাজা হননি। সত্যবতী শান্তনুর মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম দেন। চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে রেখে ভীষ্মই রাজকার্য চালান আর এই আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং রাজমহিষী সত্যবতী। গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ প্রাণ হারালে বিচিত্রবীর্যকে রাজ্য অভিষিক্ত করা হয়। বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হয় অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে। কিন্তু কোনো সন্তানের জন্ম দেয়া ছাড়াই মৃতুবরণ করলেন বিচিত্রবীর্য। রাজবংশের বাতি এগিয়ে নিতে সত্যবতী তখন অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নেন। তিনি তাঁর আরেকপুত্র মহর্ষি দ্বৈপায়নকে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান দিয়ে হস্তিনাপুরের রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য আহবান করেন। তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হয়। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র আর অম্বালিকার ঘরে পাণ্ডুর জন্ম হয়। সত্যবতীর দীর্ঘ জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁর চরিত্রের বলিষ্ঠ প্রকাশ সহজেই চোখে পড়ে। নদী পারাপারের সহজ সরল জীবনযাত্রা থেকে উঠে আসা সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত এক নারী যিনি রাজপরিবারের জটিল অনেক পারিবারিক পরিস্থিতিতেও দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনে থাকা অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন যা তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের স্বতঃমূল্য সত্তাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিলেই সত্যবতীর মতো দৃঢ় মানসিকতার চরিত্র সমাজে উঠে আসা সম্ভব। শান্তনু ও ভীষ্ম যেভাবে সত্যবতীকে সহায়ক সত্তা হিসেবে না ভেবে তাকে স্বতঃমূল্য সত্তা বা তাঁর মত প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এটিই প্রয়োজন সমাজের গুণগত পরিবর্তনের জন্য।

অম্বা থেকে শিখণ্ডী : অম্বা কাশীরাজের প্রথম কন্যা। ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করে আনেন। সলজ্জ অম্বা ভীষ্মকে জানান, তিনি পূর্বেই মহারাজ শাল্বকে মনে মনে বরণ করে নিয়েছেন। ভীষ্ম তখন অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলে শাল্ব অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের উপর হওয়া অন্যায় থেকে অম্বা তপস্যায় রত হন। পরশুরামে সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে, পরশুরাম ভীষ্মকে অনুরোধ করেন অম্বাকে গ্রহণ করার জন্য। ভীষ্ম অস্বীকার করলে, গুরু-শিষ্যের তুমুল সংগ্রাম হয় এবং পরশুরামের পরাজয় ঘটে। মানুষের হাতে ভীষ্মের সংহার সম্ভব নয় বলে অম্বা শিবের তপস্যা শুরু করেন। শিব আর্শীবাদ করেন অম্বা পরবর্তী জন্মে দ্রুপদ রাজার ঘরে প্রথমে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবেন - পরে পুরুষদেহ পাবেন। বর পাওয়ার পর অম্বা চিতাগ্নির মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর

হৃদয়ের মূল্য না দিয়ে তাকে বস্তু বা সহায়ক সত্তা হিসেবে চিন্তার বিপরীতে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে অম্বা। তাঁর সাধনা ও আত্মত্যাগের মধ্যে তাঁর প্রতিবাদেরই জ্বলন্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

পরবর্তীতে অম্বা দ্রুপদ রাজার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। শিখণ্ডী পরবর্তীতে পুরুষ হবে ভেবে হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ দেন দ্রুপদের স্ত্রী। কিন্তু কিছুদিন পর সব জানাজানি হলে দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন হিরণ্যবর্মা। এই অবস্থায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন বলে শিখণ্ডী অরণ্যে চলে যান। সেখানেই স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ বাস করতো। সে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে তাঁর পুরুষত্ব শিখন্ডীকে দান করেন। আর তারপর শিখণ্ডী ধনুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে ভীষ্ম বধের জন্য প্রস্তুত করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডী নয়টি বাণ নিক্ষেপ করেন ভীষ্মের বক্ষে আর শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে শরাঘাতে জর্জরিত করেন। আর এইভাবেই পূর্বের জন্মের প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন অম্বা অরূপে শিখণ্ডী। অম্বা থেকে শিখণ্ডী হয়ে ওঠার এই যাত্রাতে আমরা দেখি এক নারীর সংগ্রাম ও নিজের প্রতিজ্ঞাকে পূরণ করার লক্ষ্যে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যখন অম্বার অনুভূতিকে মূল্য না দিয়ে তাকে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে, সেই স্থান অম্বা শিখণ্ডী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নিজের স্বতঃমূল্য সত্তাকে প্রকাশ করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজের অধীন থেকেও শিব, দ্রুপদ, স্থূণাকর্ণ যে মানবিক গুণাবলির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর হাত ধরেই সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভব। আর সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলেই অম্বা থেকে শিখণ্ডীর হয়ে ওঠা সম্ভব।

তাই বলা যায়, পুরাণের পরতে পরতে নারীদের অধস্তনতার কাহিনি লিপিবদ্ধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী ও প্রকৃতিকে নিজের অধীনস্থ ভাবতে পছন্দ করেন, তারই প্রকাশ এই পৌরাণিক চরিত্ররা। সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হওয়া নারীরা যুগ যুগ ধরে চিহ্নিত হয়ে আসছে সমাজের সহায়ক সত্তা হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে তখনি সমাজে ভারসাম্য আসবে যখন সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে এবং নারী ও প্রকৃতি সহায়ক সত্তা থেকে স্বতঃমূল্য সত্তায় প্রকাশিত হবে। ক্যারন জে. ওয়ারেন ও ভাল প্লামউড তাঁদের ইকোফেমিনিজম তত্ত্বে এই বিষয়টিই প্রকাশ করেছেন। পৌরাণিক নারীর সামাজিক অবস্থান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, পরিবেশ নারীবাদ তত্ত্বটি তুলনামূলক আধুনিক একটি চিন্তা কিন্তু ভারতীয় এই সমাজে হাজার বছর ধরে প্রচলিত মিথ-পুরাণে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী এবং প্রকৃতির উপর নিপীড়ন, অধস্তন করে রাখার ইতিহাস প্রচলিত রয়েছে। মিথ-পুরাণে নিপীড়নের চিত্র যেমন ভাবে লক্ষ করা যায় ঠিক তেমনি প্রতিবাদী, সাহসী, বিদুষী নারী চরিত্রও লক্ষ করা যায়, যারা সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। ওয়ারেন ও প্লামউড নারী ও প্রকৃতির উপর নিপীড়ন বন্ধের জন্য যে সমাধানের কথা বলেছেন (সমাজের গুণগত পরিবর্তন) তা সম্ভব তখনি, যখন ব্যক্তি পর্যায়ে সবার মূল্যবোধের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

Reference:

১. Mary, Mellor (1997) *Feminism & Ecology*, New york University Press, New york, USA; P. 1

২. খানম, রাশিদা আখতার (২০০৫) *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সাহিত্যিকা, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ৭০

৩. Warren, K. J. (1997) *The power and promise of Ecological Feminism* in H. LaFollete, ed, Ethics in Practice, Blackwell, Oxford; P. 658

৪. Tong, Rosemarie Putnam (1998) *Feminist Thought*, West View Press, USA, P. 247

৫. Warren, K. J. (1997) *The power and promise of Ecological Feminism* in H. LaFollete, ed., Ethics in Practice, Blackwell, Oxford; P. 658

৬. Plumwood, Val. (1993) *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London, P. 21

৭. দাস, সচ্চিদানন্দ (২০১৬) *বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ১৯

৮. ভুঁইয়া, আর কে (২০১৬) *মিথ-পুরাণ ও জ্যোতিষ বিজ্ঞান*, রেডিক্স সার্ভিস, ঢাকা- ১২১৭, পৃ. ১৮

৯. সিংহ, কঙ্কর (২০০৫) *মনুসংহিতা ও নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ৭২-৮০

১০. সরকার, সুধীরচন্দ্র (১৩৩৫) *পৌরাণিক অভিধান*, দাস অফসেট প্রসেসর, কলকাতা - ৭০০০৩৬, পৃ. ৩৩৮
১১. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র(২০১৪) *শকুন্তলা*, বিদ্যাসাগর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি-কলম, কলকাতা - ৯, পৃ. ১৩১
১২. সরকার, সুধীরচন্দ্র (১৩৩৫) *পৌরাণিক অভিধান*, দাস অফসেট প্রসেসর, কলকাতা - ৭০০০৩৬, পৃ. ৪৩৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দ্রনাথ (২০১৮) *মহাভারতের নারী*, অক্ষরবিন্যাস, শ্যামাচারণ দে স্ট্রিট, কলকাতা৭০০০৭৩, পৃ. ১৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 48 - 54
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 48 - 54
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘প্রভু আমার, প্রিয় আমার’ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকৃত বন্ধুত্ব ও আত্মিক যোগের অপরিহার্যতা : একটি পর্যালোচনা

ড. রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলী
Email ID : rubelpalsans513@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Bhagvadgeeta, Krishna, Arjuna, Companionship, Self, Awakening, Renunciation, Salvation.

Abstract

Shrimad Bhagavad Gita presents a comprehensive thesis on companionship in its exploration of multiple shades of bond between Lord Krishna and Arjuna. In the vast battlefield of Kurukshetra, Arjuna appeared to be baffled as he faced his kins as enemies. As he is occupied with a dilemma concerning his participation of war, which would result in massacre and sacrifice of his kins, Lord Krishna came forward as his mentor and facilitator. He explains the transience of life and eternity of soul. He further explained the source and components of wisdom, selfless action, devotion, knowledge and various dimensions and ways of life and their philosophical implications. This, as Gita evidences, is the role of companion, to stand with friends in times of extreme crisis, in dilemma and to accomplish the assigned task together as a team without much ado.

Who is a friend? A friend is the companion with whom the individual shares an inseparable bond, a symbiotic attachment, who never leaves one unguarded.

As the dialogue progresses, Lord Krishna unfolds before Arjuna, the secrets of life. He elucidates before him the strategies of survival. His sermons serve as the elixir to result in the resurgence of self-esteem in Arjuna. The correspondence in Gita, therefore serves as a metaphor of self-introspection of Arjuna. Krishna, the friend, the minion turned mentor functions as a motif as well as character. As Lord Krishna asked Arjuna to look within and find out who he is, we have an echo of the Upanishad, 'Look within! You are the manifestation of the Supreme Being'.

The purpose of this paper is to explore the definition and dimensions of friendship and the need for a mentor to survive in life and to pursue the desired goal, as explained and theorised in Srimad Bhagvat Geeta.

Discussion

গীতার মূল বিষয় হল অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কিছু উপদেশ। অর্জুন কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত তৎপর ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সৈন্যদল প্রস্তুত করে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই হঠাৎ অর্জুনের মনে অত্যন্ত ভীতি, সংশয় ও চঞ্চলতার উদয় হয়। অর্জুন এতটাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে যে, যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে সুসজ্জিত শত্রুপক্ষকে দেখা সত্ত্বেও সে কাঁপতে শুরু করে। তার সমগ্র শরীর ঘামতে শুরু করে এবং মুখ শুকনো হয়ে যায়। এইরকম এক পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুন সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে রথের উপর বসে পড়ে এবং যুদ্ধ না করার ঘোষণা করে। অর্জুনের বুদ্ধি এতটাই বিভ্রান্ত হয় যে, সে যুদ্ধ করার পরিবর্তে নিজের প্রাণ বিসর্জন করতেও প্রস্তুত হয়ে পড়ে। অর্জুন সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় যে, এটা কেবল রাজ্য লাভ বা সুখ ভোগের জন্য কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়, এটা আসলে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ। এর ফলে অর্জুনের সারথী, তার প্রিয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ নিজেও একটু হতচকিত হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তার তেজোদ্দীপ্ত, স্বপ্রতিভ জ্ঞানের দ্বারা অর্জুনকে বিভিন্ন বাক্যের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সে একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় বীর। তার পক্ষে এই ধরনের কাপুরুষোচিত নপুংসকের মত আচরণ কোন যুক্তিতেই শোভা পায় না। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে এই দেহের অনিত্যতা, আত্মার নিত্যতা, চার বর্ণের কর্তব্য কর্ম, প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ, কর্মপদ্ধতি, নিষ্কাম কর্ম, যোগ, যাগ-যজ্ঞ, আহার, বিহার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, তপস্যা, নিষ্ঠা, ইত্যাদি নানান সদগুণের উপদেশের মধ্য দিয়ে একজন প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় পাশে থেকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। পরিশেষে প্রকৃত বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সদুপদেশে কিভাবে অর্জুনের সমস্ত মোহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নষ্ট হয় এবং তার বুদ্ধি প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুনরায় সে স্মৃতি ফিরে পায়, বর্তমানে এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র গীতার প্রেক্ষাপটে আমরা উপলব্ধি করব মানবজীবনে একজন প্রকৃত বন্ধুর প্রকৃতপক্ষে কি প্রয়োজনীয়তা।

একজন সখাই জীবনে প্রকৃত সুখ বা আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু কে সেই সখা বা বন্ধু? যে মন এবং বুদ্ধিকে একত্রিত করে সর্বদা ছুঁয়ে থাকে সেই ব্যক্তি আসলে প্রকৃত সখা। জীবন যখন বিভিন্ন সমস্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তখনই প্রকৃত সখার গুরুত্ব অনুভূত হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন অধিক মাত্রায় উপলব্ধ হয়। যেমন অর্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণ, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্লিপ্ত যতক্ষণ অর্জুন একেবারে জীবন - সমস্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে না পড়ছে। অর্জুনের এমনই খারাপ অবস্থা যে তিনি কোনোভাবেই তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। অর্জুন বলে ওঠে -

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"[১]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! এই মন ভীষণ চঞ্চল। বায়ুকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য তেমন এই মনকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা অতি দুঃসাধ্য। বস্তুতপক্ষে মন হল পদ্ম পাতায় (কচু পাতায়) জলের মতো, সদা টলমল করছে। যখন খুশি নিচে পড়ে যেতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় মন একটা সর্ষের পুটলি, যদি একবার বাঁধন খুলে যায় তবে সেই সর্ষেগুলো এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যে তাকে আবার একত্রিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এখানে অর্জুনের মতো মহান বীর ও জ্ঞানী ব্যক্তির মন যুদ্ধক্ষেত্রে এমনভাবে টলমল করতে শুরু করেছে যে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রাণ বিসর্জন করতে (শত্রুর হাতে মরতে) প্রস্তুত, তবুও একটি তীর নিক্ষেপ করতে চাইলো না তার শত্রুপক্ষের দিকে। প্রচন্ড বিলাপ করতে করতে ঘর্মাক্ত শরীরে কম্পিত বদনে অর্জুন বলে ওঠে, -

"যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেত্॥"[২]

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলের হামারা হাতে কোন অস্ত্র না দেখে আমাকে এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে মেরেও ফেলে সেটাও আমার ক্ষেত্রে মঙ্গল, তবুও আমি কিছুতেই যুদ্ধ করব না। এই বলে সে ধনুর্বন সমস্ত ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়ল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 48 - 54
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"এবমুক্ত্বার্জুনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থ উপাবিশত্।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥"[৩]

অর্থাৎ, রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বান ত্যাগ করে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে রথের উপরে উপবেশন করিলেন। ভাবা যায় কিছুক্ষণ আগেও পর্যন্ত সমগ্র মহাভারত জুড়ে যে অর্জুন হৃতরাজ্য উদ্ধার, দ্রৌপদীর সরম রক্ষা এবং প্রজাদের পালন ইত্যাদি নানান কারণে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মারতে উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধের জন্য এত লম্ফঝম্ফ করল, সম্মুখ সমরে দাঁড়িয়ে তার মন কতটা চঞ্চল হয়েছে যে, সে একথা অত্যন্ত ক্ষত্রিয় বীর যোদ্ধা হওয়া সত্বেও কাপুরুষের মতো বলতে একটুও লজ্জাবোধ করছে না।

অর্জুন নিজের মুখেই নিজের অসহায় পরিস্থিতির কথা বলতে থাকেন, -

"সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥"[৪]

অর্জুন বলছেন, সম্মুখ সমরে তার ভাই, গুরুজন, শালা, সমন্ধী ইত্যাদি সকল আত্মীয় পরিজনদের দেখে তার সমগ্র শরীর ঘর্মাক্ত হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে আসছে, তার রুমহর্ষ হচ্ছে অর্থাৎ শরীরে কাঁটা দিচ্ছে এবং সমগ্র শরীরে কাঁপুনি হচ্ছে। তিনি আরো বলেন তার হাত থেকে শারীরিক দুর্বলতার কারণে তার ধনুর্বাণ গান্ডীব পড়ে যাচ্ছে, তার চামড়ায় প্রচন্ড জ্বালাপোড়া হচ্ছে, তার মন এতটাই ভ্রমিত অর্থাৎ বিষাদগ্রস্ত হচ্ছে যে যে, সে কিছুতেই এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছে না -

"গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥"[৫]

অর্থাৎ হে কেশব, আমি এখন স্থির থাকতে পারছি না। আমি বিভ্রান্তি বোধ করছি, আমার চিত্ত উৎভ্রান্ত হচ্ছে। হে কেশীদৈত্যহন্তা শ্রীকৃষ্ণ, আমি কেবলই অমঙ্গল সূচক লক্ষণ দর্শন করছি।

এরকম এক পরিস্থিতিতে অর্জুন আত্মীয় স্বজনদের নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখছে না। সে যুদ্ধে জয়লাভ করতে চায়না, রাজ্যসুখ ভোগের কামনাও করছে না। বরং যুদ্ধ করার ফল সে বিপরীতই অনুভব করছে।

"নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥"[৬]

অর্জুন কাপুরুষের মতো আরও বললেন -

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥[৭]
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥"[৮]

অর্থাৎ আমাদের রাজ্য কি প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারণই বা কী প্রয়োজন, যখন দেখছি যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগ সুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত। অর্জুনের বক্তব্যে তাৎপর্য হল এইযে, তিনি যুদ্ধে রাজ্য জয় করবেন যাদের জন্য তারাই যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মরে যান তাহলে তিনি রাজ্য দিয়ে কি করবেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই অর্জুন মনকে সংযত করা 'কঠিন' - বলে কৃষ্ণের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র গীতা জুড়ে এটাই দেখবার বিষয় যে, এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে প্রকৃত সখারুপে অর্জুনকে অর্থাৎ অর্জুনের মনকে প্রকৃত পরামর্শ দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলছে। এখানে কি অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ

উভয়ই পরস্পরের মনে স্থান পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে, বরং শ্রীকৃষ্ণের মন অর্জুনের মনের এই অবস্থা দেখে আরো বেশি বিচলিত হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যথেষ্ট আশ্চর্য হয়ে বলেই ফেললেন -

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥"[৯]

অর্থাৎ এরকম একটা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে, এইরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্জুনের এরকম অনার্যের মতো মনের অবস্থা কিভাবে তৈরি হল। শুধু তাই নয়, প্রকৃত সখা হয়ে কৃষ্ণ এটাও ভাবলেন যে এতে তো অর্জুনের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মান যশ এবং সর্বপ্রাপ্তি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাহত হবে। সমাজে তার বন্ধু অর্জুনের কুকীর্তি ও অপবাদ ছড়িয়ে পড়বে। অর্জুন তার নিজের ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন করে পাপের ভাগীদার হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন -

"অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥"[১০]

অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে এসে অর্জুন যদি কর্তব্য কাজ না করে তাহলে সে কুকীর্তি এবং পাপের ভাগী হবে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন অর্জুন একজন ক্ষত্রিয় বীর। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে স্বধর্মের দৃষ্টিতে অর্জুনের যুদ্ধ করাটাই একমাত্র শ্রেয় কাজ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন -

"স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥"[১১]

অর্থাৎ, হে অর্জুন, ক্ষত্রিয় রুপে তোমার স্বধর্ম বিবেচনা করেও তোমার দ্বিধাগ্রস্থ হওয়া উচিত্ নয়। কারণ ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করা থেকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের এতসব উপদেশ শোনার পরও অর্জুন সংশয় মুক্ত হতে পারেননি। অর্জুনের মনে কোনটা তার কর্তব্য কর্ম, এই বিষয়ে নানা প্রকার সংশয় তখনও বাসা বাঁধতে থাকে। অর্জুন তার স্বধর্ম পালন বিষয়েও তখনও সন্ধিহান হয়। অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাকে বন্ধুভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্য যোগে বলেছেন যে, স্বধর্ম কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ স্বধর্ম ত্যাগ করলে তার মান-সম্মান নষ্ট হবে ও কাপুরুষতার পরিচয় সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায় আবার সেই স্বধর্মের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, কোন ক্ষত্রিয় ব্যক্তির পক্ষে স্বধর্মে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়া ভালো। কিন্তু কখনোই স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম পালন করা উচিত নয়।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাত্।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।" ৩/৩৫

অর্জুন তখনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন যে মানুষ তার নিজের ভুল বুঝতে পারে। তবুও কার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বলপূর্বক সেই ভুল কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল এইরকম -

'অর্জুন উবাচ - অথ কেন প্রযুক্তোয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।'
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।" (৩/৩৬)

অর্থাৎ অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন - হে শ্রীকৃষ্ণ, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচারণে প্রবৃত্ত হয়?

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর ভাবে দুটি সমাধান অর্জুনের সামনে রাখেন। একটি হলো কাম, আরেকটি হলো ক্রোধ। বস্তুতপক্ষে এই কামনার আগুন এতটাই এতটাই জ্বলনশীল, যাকে নেভানো অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ফলে এই কামনার ক্ষুধা কখনোই মানুষের পুরণ হয় না। আর এই কামনা উৎপন্ন হয় প্রকৃতির যে তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ,ও

তমঃ, এই রজঃ গুণের প্রভাবে। পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণ গীতার সপ্তদশ, ত্রয়োদশ ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায়ে এই ত্রিগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অর্জুনকে খুব সুন্দরভাবে উপদেশ দিয়েছেন। এখানে কি ধরনের খাদ্যাভ্যাসের ফলে এই ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায় মানুষের মধ্যে, তারও বিস্তারিত আলোচনা আছে। বস্তুতপক্ষে এই রজোগুনান্বিত কামনার প্রভাবে মানুষের মধ্যে যখন প্রচন্ড ক্রোধের উৎপন্ন হয়, তখন সে তার স্মৃতিকে হারিয়ে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় এই ধরনের ধ্বংসাত্মক পাপাচারে লিপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শঙ্খ যোগে এই কাম ও ক্রোধের উৎপত্তির ক্রমিক কারণ সমূহ ও তার ভয়ানক ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বলেছেন -

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাত্ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোভিজায়তে।। ২/৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি।।” ২/৬৩

অর্জুনের প্রকৃত সখা এইভাবে তার মানসিক পরিস্থিতির বিষয়টা মর্মে মর্মে অনুভব করে এবং সে নিজে প্রশান্তচিত্তে অর্জুনকে নানান উপদেশ দিয়ে অর্জুনের বিচলিত মনকে শান্ত করার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ তার খুরুদার বুদ্ধি দিয়ে অর্জুনের মনের সাথে সমভাবাপন্ন হয়ে কিছুটা অর্জুনের কথা কি মান্যতা তাকে ধীরে ধীরে শান্ত করতে থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে অর্জুন! তুমি যে কথা বলছো সে কথা সত্যি ঠিক। মনের স্বভাবই চঞ্চল। তাই মনকে নিজের বশে আনা যে কঠিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবুও তোমাকে বারংবার অভ্যাস এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয়কে ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজের মনকে শান্ত করতে হবে।

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥”[১২]

অর্থাৎ হে অর্জুন, মনকে নিজের বশে আনা যে কঠিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তোমাকে অভ্যাস এবং বৈরাগীর দ্বারা নিজের মনকে সংযত করতে হবে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য বা ত্যাগের বিষয়টি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন -

“অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥”[১৩]

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তাহলে অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করার চেষ্টা কর। এখানে তাৎপর্য হল এই যে, আমি তোমাকে যেভাবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি, সেই বিষয়ে যদি তুমি তোমার মনকে সত্যিই একাগ্রচিত করতে না পারো, তাহলে অবশ্যই নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমার কথা পালন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করো। এরপর ভগবান বলেন -

“অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥”[১৪]

অর্থাৎ, যদি তুমি এই ভাবে অভ্যাস করতে অসমর্থ হও, তাহলে আমার জন্য কর্ম করতে চেষ্টা কর। কারণ আমার জন্য কর্ম করতে করতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধিলাভ করবে। আর যদি এরকম শরণাগতি না থাকে তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সকল কর্মফল ত্যাগের অর্থাৎ বৈরাগ্যের উপদেশ দেন। তিনি বলেন -

“অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥”[১৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 48 - 54
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ, যদি ঐ প্রকারে শরণাগত হয়ে কর্ম করতে অক্ষম হও, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে কর্মের ফল ত্যাগ কর। বস্তুত কর্মফল ত্যাগের মধ্যেই অর্থাৎ বৈরাগ্যের মধ্যেই চিরশান্তি লাভ করা যায়। তাই বলা হয়েছে -

"শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎকর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥"[১৬]

অর্থাৎ, তুমি যদি সেই প্রকার অভ্যাসে সক্ষম না হও, তাহলে জ্ঞানের দ্বারা অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারণ এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে পরম শান্তি লাভ হয়। শুধু তাই নয় এই এই অভ্যাস এর জন্য অর্জুনকে যে পরিমিত আহার, পরিমিত বিহার, পরিমিত কর্ম প্রচেষ্টা এবং পরিমিত স্বপ্ন ও নিদ্রার প্রয়োজন তাও শ্রীকৃষ্ণ তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দেন -

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"[১৭]

অর্থাৎ যিনি পরিমিত আহার বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা জাগরণ নিয়মিতই তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। তিনি এইভাবে সমগ্র গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে অর্জুনকে অভ্যাসের সুষ্ঠু পদ্ধতি খুব সুন্দরভাবে শেখাতে থাকেন এবং এই সমস্ত করতে যে অর্জুন নিজেই সক্ষম তাও তিনি অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, তুমি তোমারে নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। অর্থাৎ তোমার মধ্যেই সমগ্র শক্তি বিদ্যমান। তুমি চাইলে এই পরিস্থিতি থেকে নিজেই উদ্ধার হতে পারো। এই ভাবে তিনি অর্জুনকে ইতিবাচক (Positive energy) প্রেরণা দিতে থাকেন।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েত্।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"[১৮]

এইভাবে অর্জুন তার প্রকৃত সখা শ্রীকৃষ্ণের নানান প্রেরণাদায়ী কথায় এক সময় তার ব্যাকুলিত মনকে শান্ত করতে সচেষ্ট হয়। অর্জুন নিজেই স্বীকার করেন,

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"[১৯]

অর্জুন বলে, হে প্রিয় সখা! তোমার অনুগ্রহে আমার সমস্ত মোহ নষ্ট হয়েছে, আমি এখন আমার স্মৃতি আবার ফিরে পেয়েছি, আমার মন এখন শান্ত হয়েছে, আমার সংশয় বা দ্বন্দ্ব দূরে সরে গেছে। আমি এখন আবার আমার কি করা উচিত সেটা বুঝতে পেরেছি। তাই আমি এখন তোমার সমস্ত কথা শুনব, মেনে চলব অর্থাৎ তোমার কথা অনুযায়ী আমি আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

বস্তুতপক্ষে আমাদের জীবনেও মাঝেমধ্যে ধেয়ে আসে এরকমই নানান সমস্যার অন্ধকার। তখন আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বুঝতে পারি না আমাদের কোনটা করা উচিত, আর কোনটা করা উচিত নয়। উদ্ভ্রান্তির মত ছুটতে থাকি এদিক থেকে ওধিক। মূহুর্মূহ দুচোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রু নদীর ধারা। সহ্য করতে হয় রাতের পর রাত শুধু দুচোখের পাতা এক না করতে পারার মতো ভীষণ যন্ত্রণা। তখন শুধু খুঁজতে থাকি একজন প্রকৃত মানুষের, একজন প্রকৃত মনোবিদের (Counselor or Phychiatrist), যে আমাকে দুদন্ড শান্তি দেবে। আমার মনকে বুঝে, আমার ভাবে ভাবিত হয়ে আমার মনকে শান্ত করে তুলবে। আর এই কাজ শুধু একজনই করতে পারে, - শ্রীকৃষ্ণের মত একজন প্রকৃত সখা বা বন্ধু।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 48 - 54
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক - ৩৪
২. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুন বিষাদ যোগ, শ্লোক - ৪৬
৩. তদেব, প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ, শ্লোক - ৪৭
৪. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ২৯
৫. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩০
৬. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩১
৭. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩২
৮. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩৩
৯. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যয়োগ, শ্লোক - ২
১০. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যয়োগ, শ্লোক - ৩৩
১১. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যয়োগ, শ্লোক - ৩১
১২. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ, শ্লোক - ৩৫
১৩. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ৯
১৪. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ১০
১৫. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ১১
১৬. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ১২
১৭. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ, শ্লোক - ১৭
১৮. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ, শ্লোক - ৫
১৯. তদেব, অষ্টাদশ অধ্যায়, মোক্ষসন্ন্যাসযোগ, শ্লোক - ৭৩

Bibliography:

উপনিষদ্ (ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, বাংলা), গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০০৮
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* কোলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১০
পাল, বিপদভঞ্জন, *সাংখ্যকারিকা,* কলকাতা, সদেশ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
রামসুখদাস, স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০০৮
বন্দোপাধ্যায়, শান্তি, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০০
বসু, অনিলচন্দ্র, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পরিক্রমা,* কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০
বেদান্তচঞ্চু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র, *সাংখ্যকারিকা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
শ্রীমদ্ভগবদগীতা, গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০০৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম-কথিত (প্রথম খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮
সাহা, ঐশানি, *শ্রীমাকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* কলকাতা, আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স, ২০১১
স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ,* কলকাতা, দা ভক্তিবেদান্ত বুক্ ট্রাস্ট, ২০০৮
Amal, Brahmacharini, *Swami Vivekananda Life and Teachings* (Published on the occasion of 150th birth anniveraary of Swami Vivekananda), Howrah, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 2012
Pramananda, Swami, *Self-Mastery*, Madras, Ramakrishna Math Priting press, 2010

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 55 - 63
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সাহিত্যে অভিশাপ প্রসঙ্গ : কালিদাস, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল

মনিকা রায়
শিক্ষিকা, সংস্কৃত বিভাগ
আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স
Email ID : manikaroypurbasalbari@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Kalidasa, Abhisap, Abhigyanshakuntala, Meghduta, Raghuvamsha, Kumarasambhav, Vikramorvasi, Chandimangal, Manasamangal.

Abstract
Kalidasa was a greatest poet, writer and playwright of Sanskrit Literature. In all his poetic dramas, the topic of various types of anathemas has been discussed on the portrayal of different characters. Among them 'Abhigyanshakuntalam', 'Meghaduta', 'Raghuvamsham', 'Kumarasambhavam am', 'Vikramorvasiyam' the multiples reconciliation are seen as a result of cursing. This reconciliation is found in separation. Through the way of anathema, the monotony of reunion is transmuted into universality. Besides, the practice of cursing has also observed in the most important sub-genres of Medieval Bengali literature Mangalkavya. In 'Manasamangal' and 'Chandimangal', the reference of it is noticed in the depiction of different characters such as Kalketu, khullara, Behula, Lakhindar, Madandeb, Maladhar, Ratnamala and so on. They are all cursed and cursed when they have neglected to perform their duties. As a result, they are separated from each other with sadness. In short, anathemata are separation and reconciliation and complementary each other.

Discussion

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যের সুনামধন্য কবি হলেন মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র যার আবির্ভাব ও জীবন বৃত্তান্ত তিমিরাবৃত কালিদাস তাঁর কাব্যশৈলী সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের সাহিত্যভূমিকে করেছে সুমধুর। তার অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি ছন্দে, অলংকার, রূপ, রসের এক অন্যান্য বাতাবরণ সৃষ্টি করে সাহিত্য দরবারে। কোথায় প্রকৃত বর্ণনা, নায়িকার নিপুন সৌন্দর্যের বর্ণনা, হাস্যরস, নায়কের সুঠাম চরিত্র, অভিশাপ ইত্যাদির বর্ণনায় কাব্য নাটকে কালিদাসের অবদান অপরিসীম। তিনি 'কুমার সম্ভবম; 'মেঘদূতম্; 'রঘুবংশম' এবং 'ঋতুসংহার' এই চারটি কাব্য রচনা করেন। নাটকের মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্র, 'বিক্রমোর্বশীয়' এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি হল মহাকবি কালিদাসের সর্বজনে সমাদৃত একটি প্রসিদ্ধ নাটক। কালিদাসের সাহিত্যগুলি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে মনে হবে দ্রাক্ষাফলের মত অনায়াস আস্বাধ্য, সহজবোধ্য। কিন্তু যদি গভীরে প্রবেশ করা যায় তবে দেখা যাবে, এ যেন এক অতল গভীর সমুদ্র যার কুলকিনারা নেই। কালিদাসের কাব্য, নাটক এখন ও বিশ্ব সাহিত্য সমাজে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ যোগ্য।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কালিদাসের কাব্য-নাটকে যে চরিত্রগুলির নিদর্শন রেখেছেন সবগুলির চরিত্রের মূল্যবোধের বিকাশ লক্ষ্য করলেই দেখা যায় সামাজিক বর্গের উচ্ছ্বাস ও অকপট প্রশংসা। কালিদাসের কাব্য-নাটকে চরিত্র চিত্রনে যে গুণ দিয়েই ভরা তা নয় গুণ-দোষ মিলিয়ে প্রত্যেকটি চিত্র অঙ্কণ ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু মাত্র দোষগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে সাহিত্যের চাবিকাঠির ইতি টেনেছেন তা নয় সেই সব চরিত্রের দোষগুলিকে সমস্যার সমাধান করে বলতে গেলে একপ্রকার চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির দ্বারা সমস্ত দোষের কালিমাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে চরিত্রগুলিকে নির্মল করে সাহিত্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাই কালিদাসের সাহিত্য ভবনে কাব্যে, নাটকে আমরা দেখতে পাই অভিশাপ। সত্যি বলতে এই অভিশাপের জন্যই হয়ত কাব্য-নাটকে বিরহের একেকটি হৃদয় বিদারক করুণ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। পাপের কারণে যে শাপ বর্তেছিল তা দূর করে কবি আনন্দলাভ করেছেন।

অভিশাপ কথার অর্থ হচ্ছে অন্যের অমঙ্গল কামনা করা। শপ্ ধাতু থেকে ‘শাপ’ শব্দের উৎপত্তি। শপ্ ধাতুর অর্থ আক্রোশ প্রকাশ করা। উপলম্ভণ এর অর্থ হল শপথ করা। কৈয়ট, শাকটায়ন প্রভৃতির মতে প্রকাশন হল উপালম্ভনের অর্থ –

> “উপালম্ভনং প্রকাশনম। দেবদত্তায় শপতে এবম্ভূতোহসাবিতি দেবদওমাচষ্ট ইত্যর্থঃ। অথবা স্বাভিপ্রয়াস্য পরত্রাবিষ্করণমুপালম্ভনং শপথঃ। দেবদত্তায় শপতে বাচামাত্রাদিশারী সম্পর্শনেন দেবদত্তে স্বাভিপ্রয়াং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ।”[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শপ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট ‘শাপ’ শব্দের মধ্যে মিথ্যা নিরসন করে সত্যের উপলব্ধির অর্থ আছে এবং কালিদাস কৃত কাব্য-নাটকে অভিশাপগুলিতে এই নিদর্শন লক্ষিত হয়। অভিশাপের দ্বারাই অনেক ঘটনার সত্য উন্মোচিত হয়। কারোর অমঙ্গলের জন্যেই যে অভিশাপ প্রদত্ত হত তা নয় সেটি নায়ক বা নায়িকা তাদের কর্তব্য বিচ্যুতির জন্যই হয়ত ডেকে এনে কাব্যে-নাটকে বিরহের পটভূমি তৈরি করে। তাই তখন মনে হয় যে অভিশাপ তাদের প্রাপ্যই ছিল পাপ স্বীকার করে সত্যের উন্মোচন করে প্রকৃতপক্ষে মানুষত্বেরই পরিচয় মেলে। তাই সেক্ষেত্রে অভিশাপ আশীর্বাদেরই অপর রূপ। অভিশাপ এমনি এমনি কারো মাথায় বর্ষিত হয় না, ডেকে এনে কোনো অতিথিকে যেমন নিন্দা করা উচিত নয় তেমনি অভিশাপেরও নিন্দা করা উচিত নয়। অভিশাপ গুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে অভিশাপ প্রাপ্য ছিল নায়ক-নায়িকার। সেই পাপ স্বীকার করে পর্যাপ্ত শাস্তি গ্রহণ করে সংস্কৃত হওয়াতেই প্রকৃত মানুষের পরিচয়। অভিশাপ প্রাপ্তির মহত্ব এখানেই পরিলক্ষিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে সত্যের স্বরূপ উদঘাটন সাধারনত দুঃখের দ্বারাই সৃষ্ট অশ্রুজলের দ্বারাই সম্ভব –

> “দুঃখের বরষায় চক্ষের জলে যেই নামল
> বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।
> মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায়;
> অর্পিনু হতে তার, খেদ নাই আর মোর খেদ নাই।”[২]

কালিদাস সাহিত্যে যে সমস্ত অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে সবগুলি কখনো মূল উৎস বা কবিপ্রতিভার কল্পনা প্রসূত থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে যা কবির এক অভিনব আলোর নিরিখে গ্রথিত। কালিদাসের সাহিত্য সৃষ্টির সর্বোচ্চ যে নাটকে সেটি হল ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকটি সাতটি অঙ্কে রচিত। চতুর্থ অঙ্কে নাটকের সর্বাপ্রেক্ষা গুরত্তপূর্ণ বিষয়টি হল ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ। মহাভারতের মূল কাহিনীতে দুর্বাসার অভিশাপ বিষয়টি নেই। মহাকবি কালিদাস তার রচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকে চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় মহাভারতের পুরু বংশীয় রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে সকলের অগোচরে মহর্ষি কণ্বের দুহিতা (পালিত কন্যা) শকুন্তলাকে বিয়ে করেন। কিছুদিন পর রাজা রাজকার্যপরিচালনার জন্যে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে রেখে হস্তিনাপুরে ফিরে যান। যাবার সময় শকুন্তলাকে প্রতিশ্রুতি দেন অনতিবিলম্বেই সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাবেন ৩২। অনেকদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও হস্তিনাপুর থেকে কোনো বার্তা এসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পৌছায়নি শকুন্তলার কাছে। সেই চিন্তায় শকুন্তলা এতটাই বিভোর ছিল যে সম্মুখে মহর্ষি দুর্বাসা উপস্থিত ছিলেন সেটাও বুঝতে পারলেন না। মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতে আশ্রমের ভার ছিল শকুন্তলার উপর কিন্তু শকুন্তলা আগত অতিথির অভ্যর্থনা করতে ব্যর্থ হলেন, অতি ক্রোধান্বিত মহর্ষি দুর্বাসা নিজের অপমান সহ্য করতে না পেরে শকুন্তলাকে অভিশাপ প্রদান করলেন –

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমনসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিত হপি সন
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"[৩]

যাকে অন্য মনে চিন্তা করতে করতে তুই উপস্থিত তপস্বী আমাকে অবমাননা করলি সে কিন্ত তাকে বার বার তাকে মনে করিয়ে দিলেও, পাগল যেমন তার পূর্বস্মৃতি ভুলে যায় যতই তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয না কেন? তার স্মরণে থাকে না সুতরাং সে তোমাকে মনে করতে পারবে না। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার কর্মফলের জন্য যে পাপ অর্জন করে তার জন্যই দুর্বাসার অভিশাপ ন্যস্ত হয়, যে প্রণয় প্রণয়ী বা প্রণয়িণীকে আপন কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত করে তোলে, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে ভুলে কেবলমাত্র একান্তই স্বার্থপর হয়ে ওঠে এবং সেই প্রনয় হয় সংকীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর তখন কর্মে দেখা যায় বিচ্যুতি আর তখনই মাথায় বর্ষিত হয় অভিশাপ। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে যদি দুর্বাসার অভিশাপ না থাকত তবে শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রেমের পরিণতি অন্যরকম হত সেটা রোমান্টিক হতো না। অভিশাপ থাকার দরুন নায়ক – নায়িকার প্রেম এক অন্যমাত্রা স্থান পেয়েছে। প্রথমে বিরহ দেখা দিলেও পরবর্তীতে যে মিলন ঘটেছে তা ছিল অত্যন্ত সুমধুর। প্রেমের মধ্যে যদি বিরহ না আসে তবে প্রেমের গভীরতা বোঝা যায় এক্ষেত্রে মহাকবি কালিদাস অভিশাপের মাধ্যমে প্রেমকে বিরহ থেকে শেষে শাপমোচন করে আশীর্বাদ স্বরূপ মিলন দেখিয়েছেন।

'মেঘদূতম্' হল মহাকবি কালিদাসের খন্ডকাব্য। আবার 'মেঘদূতকম্' দূতকাব্য রূপেও পরিচিত। 'মেঘদূতে' শুরুতেই মহাকবি কালিদাস অভিশাপ দিয়ে কাব্যতি শুরু করেছেন -

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগামিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।"[৪]

যক্ষ ছিলেন ধনপতি কুবেরের স্বর্ণপদ্মবনের উদ্যানরক্ষক। কোনো একদিন যক্ষের স্বকর্তব্যচ্যুতির জন্যে পদ্মবন মত্তহাতির দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় তখন ধনপতি কুবের হিমালয়ের অলকা থেকে যক্ষকে একবছরের জন্য পত্নী থেকে দূরে দক্ষিন ভারতের রামগিরিতে নির্বাসন দেন। সদ্যবিবাহিত যক্ষ নতুন পত্নীকে অলকায় রেখে রামগিরি পর্বতে জীবন অতিবাহিত করছে। এখানেও কর্তব্য পালনে বিচ্যুতি লক্ষিত হয়। 'মেঘদূতে' শাপের মাধ্যমেই যেন প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষা নিচ্ছেন মহাকবি কালিদাস। অনেক ঘাত প্রতিঘাত কাটিয়ে অবশেষে সেই অভিশপ্ত নায়ক অভিশাপ কাটিয়ে নায়িকাকে কাছে পান। ভোগের মহিমা যখন আত্মবিকাশের পথে বাঁধা হয় তখনই অভিশাপ এসে কড়া নাড়ে। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে প্রিয়ামিলন সুখ থেকে যক্ষ বঞ্চিত থাকুক এটা কবির অভিপ্রায় নয়। কবি চেয়েছেন যক্ষ সেই সীমিত গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ব প্রকৃতির মাঝেও যে প্রেমকে আলিঙ্গন করা যায় তার প্রয়োজন দেখিয়েছেন। সেটি অভিশাপের দ্বারাই সম্ভবপর। আর সেই কারণেই কামী যক্ষ পৃথিবীর প্রাণ নিষ্প্রাণ প্রায় সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রিয়াকে খুজে পেয়েছে। কখনো শ্যামাধানের ঢেউতে প্রিয়ার দেহবল্লরি তো কখনো নদীর তরঙ্গে প্রিয়ার ভ্রুবিলাস দেখলেন -

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেসষু কেশান্।

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডী সাদৃশ্যমস্তি।।"[৫]

যে জিনিস সহজে পাওয়া যায় তার গুরুত্ব অনেক কম। সেটি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রেমকে চিরস্থায়ী করতে হলে শুধুমাত্র সুখ থাকবে তা নয় থাকতে হবে বিরহ তবেই সুখের আস্বাদন মধুময় হয়ে উঠবে। তৎসঙ্গে প্রেম ও কর্তব্য দুটিই একে অপরের পরিপূরক প্রেম দিয়েই সবকিছু সম্ভব তা নয়। যেমন রোগীকে ভালোবাসার জন্য ডাক্তার রোগীর রোগকে প্রশ্রয় দিয়ে আনন্দে রাখতে চান তার রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান না সেই চিকিৎসক তো ঘাতকের মতো। অপরদিকে চিকিৎসকের কর্তব্য অনুযায়ী যদি সেই রোগীর কোনো অঙ্গচ্ছেদ করে রোগটিকে নির্মূল করে তবে তিনিই প্রকৃতপক্ষে হিতকাঙক্ষী একজন সূচিকিৎসক। প্রকৃতপক্ষে দুঃখ থেকেই দুঃখের লাভ হয়। আসলে যে যত কর্তব্য পরায়ণ হবে সে ততই সুখী ব্যাক্তি হবে।

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে ২০টি সর্গ নিয়ে রচিত। প্রথম সর্গে রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিনা পুত্রার্থী হয়ে বশিষ্ঠ আশ্রমে পৌছালে মুনি তাদেরকে জানান যে কোন একসময় রাজা দিলীপ ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করার সময় পথিমধ্যে সুরধেনু সুরভিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করায় তিনি সুরভী দ্বারা অভিশপ্ত হন –

"অবজানাসি মাং যস্মদতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা॥"[৬]

'রঘুবংশে' র পঞ্চম সর্গে মতঙ্গ মুনি কতৃক গন্ধর্ব তনয় প্রিয়ম্বদ অভিশপ্ত হন এবং গজদেহ প্রাপ্ত করেন –

"মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।"[৭]

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের অষ্টমসর্গে ইন্দুমতি পুরাকালে সুরাঙ্গনা নামে এক হরিণী ছিলেন। ইন্দ্র মহর্ষি তৃণবিন্দুর কঠোর তপস্যায় শঙ্কিত হলেন। অতপর মহর্ষির তপস্যা বিঘ্নের জন্যে হরিণীকে পাঠালেন। তারপর যা হওয়ার তাই হল। মহর্ষি তৃণবিন্দুর তপস্যা হরিণীর জন্য বিঘ্ন হওয়ার দরুন হরিণীকে মুনি অভিশাপ দিলেন নরলোকে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহন করার জন্য –

"তপঃপ্রতিবদ্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শম বেলা প্রলয়োস্মিণা ভূবি।।"[৮]

নবসর্গে অভিশাপের উদাহরণ হিসাবে পরিলক্ষিত হয় রাজা দশরথ হরিণ ভেবে অন্ধক মুনির পুত্রকে তীক্ষ্ণবাণ বিদ্ধ করে হত্যার জন্যে পুত্রশোকে কাতোর হয়ে অন্ধকমুনি দশরথকে অভিশাপ প্রদান করে –

"দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবন্তম্।"[৯]

মহাকবি কালিদাসের 'কুমার সম্ভবম' মহাকাব্যটি সতেরোটি সর্গে রচিত। তারকাসুরকে নিধনের জন্য কুমার কার্ত্তিকের জন্ম। কিন্তু শিব ও পার্বতীর বিবাহ না হলে তা সম্ভব নয়। তাই শিব ও পার্বতীর বিবাহকে সম্পন্ন করার জন্যে অভিশাপ এখানে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। সতীর মৃত্যুর পর মহাদেব নিজেকে সংসার ধর্ম থেকে দূরে রেখে কঠোর তপশস্যায় মগ্ন ছিলেন। অন্যদিকে সতী পরবর্তী জন্ম গ্রহণ করেন হিমালয় কন্যা পার্বতী রূপে। পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের বিয়ের জন্য দেবাদীদের মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ বাধ্য বাধকতা ছিল। তাই ইন্দ্রের আদেশে কামদেবকে দায়ীত্ব দেওয়া হল মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করে তার হৃদয়ে পার্বতীর জন্যে স্থান জন্মানো। সেই কথামত মদনদেব তার স্ত্রী রতিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন শিবের তপস্যা ভঙ্গ করতে। মদন যেই পঞ্চশর বান নিক্ষেপ করেন ঠিক তখনই দেবাদিদেব মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হলেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোভ্রূভঙ্গদুষপ্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার।।"[১০]

তপস্যাভঙ্গের জন্য কোপবিশিষ্ট মহাদেব বিকট মুখ ভ্রুভঙ্গিঁতে অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠল এবং মহাদেবের কপালের তৃতীয় নেত্র হতে সহসা উর্দ্ধজ্বালা বিশিষ্ট অগ্নি নির্গত হল। 'প্রভো! ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন' অমর বৃন্দের এই উক্তি আকাশে যখন উথিত হল, ঠিক সেই সময়েই মহাদেবের তৃতীয় নয়নের হুতাশন মদনদেবকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

মদনভস্মে যে অভিশাপ নিহিত ছিল তা 'কুমারসম্ভবম্' এর আকাশবাণীতে বলা হয়েছে - প্রজাপতি ব্রহ্মার অভিশাপে মদনের এই শাস্তি –

"অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগ্রহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদম্বভূৎ।।"[১১]

কোনো একসময় প্রজাপতি ব্রহ্মা কামপ্রভাবে বিকৃতেন্দ্রিয় হয়ে স্বীয় শরীরের প্রতি অনুরক্ত হন। তারপর তিনি ইন্দ্রিয়বেগ রুদ্ধ করে কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই জন্যই কামদেব নিজের ফল ভোগ করেছে।

'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যে দেখা যায় যে মদনের পরাভাব ও পার্বতীর জ্ঞানের উদয়। মদন হল প্রেমের দেবতা সে অন্যের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবে এবং নিজে অভিশপ্ত হবে এটি হল তার পরাভাব। নিজস্ব গরিমায় মদন নায়ক – নায়িকার প্রেমকে সুমধুর গড়ে তোলে। পার্বতী তার অপরূপ সৌন্দর্যের দ্বারা শিবকে ভোলাতে পারল না। কেবল সৌন্দর্য হল সৌন্দর্যমাত্র যখন সৌন্দর্যের সঙ্গে উদারতার মিল হয় তখন সেটি হয় প্রকৃত সুন্দর। শিবের ভাবনায় যতক্ষণ ব্রতী হতে পারেননি পার্বতী ততক্ষণ শিবকে পায়নি। অন্য ধর্মকে সম্মান না করলে নিজ ধর্মের পালন করলেই ধর্ম হয়না। সন্তানহীনা রাজা দিলীপ গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে যাচ্ছিলেন কিন্তু 'পূজ্যপূজাব্যতিক্রম' করতেই তিনি অভিশাপে শাপিত হন।

মহাকবি কালিদাসের পঞ্চম অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক হল 'বিক্রমোবর্ষীয়'। স্বর্গের প্রেয়সী অপ্সরা উর্বশী ও মর্ত্যের রাজা পুরুরবার প্রণয় কাহিনী হল নাটকের মূল উপজীব্য, নাট্যকাহিনীটি প্রাচীনতম উৎস ঋগ্বেদ্ পুরুরাবাউর্বশী নামক সংবাদ যুক্ত (১০/৯৫)। তাছাড়া পুরুষরা উর্বশীর কাহিনীটি পরবর্তীতে শতপথ ব্রাহ্মণে, মহাভারতে এবং পূরাণ সাহিত্যেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোবর্ষীয়' নাটকে অভিশাপের বৃত্তান্তে জানা যায় যে রাজা পুরুরবা সূর্যপূজা করে অপরদিকে ঊর্বশী কৈলাসে শিব পূজা করে ফিরে আসছিলেন। মাঝপথে কেশীদানব ঊর্বশীর সহচরী চিত্রলেখা সহ উর্বশী অপহরণ করে। তাদের সাহায্যর্থে পুরুরবা কেশীকে হত্যা করে অপসারাদের রক্ষা করেন। রথে মুচ্ছিতা ঊর্বশীর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পুরুরবা পঞ্চশরে বিদ্ধ হলেন। জ্ঞানলাভে অপূর্বসুন্দর সুন্দর পুরুষ পুরূরবার প্রেমে প্রেমাসক্ত হন। পরবর্তী সময়ে ঊর্বশী ইন্দ্র সভায় ভরতমুনির 'লক্ষ্মী-স্বয়মবর' নাটকে অভিনয় কালে উন্মনা ঊর্বশী 'পুরুষোত্তম' এর জায়গায় 'পুরুরবা' বলে ফেলেন। তখন নাট্যকার ভরতমুনি ঊর্বশীকে অভিশাপ দেন।

"যেহেতু তুমি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করেছ, স্বর্গে তোমার থাকা চলবে না।"[১২]

ঊর্বশীর নিকট স্বর্গত্যাগের অভিশাপ তার কাছে আশীর্বাদ হল। অভিশাপের ফলে ঊর্বশী পুরুরবার পত্নী হতে পারলেন। তবে একটি শর্তে পুরুরবা যেদিন ঊর্বশীর গর্ভজাত সন্তানের মুখ দর্শন করবে ঠিক সেদিনই ঊর্বশীকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। এটি মহেন্দ্রের করুনাবসত অভিশাপের অবসান। কিন্তু অভিশাপের নিবৃত্তি কোথায় এবার তো আবার বিরহ শুরু। আশীর্বাদের বিরহ! 'বিক্রমর্বশীয়ম্' নাটকে কালিদাস বোঝালেন আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুটি আলাদা নয়। এই দুটি যে একটি টাকার এপিঠ ও ওপিঠ যা জীবনের দুই'ই সমান কোনটারই দাম কম নয় শাপের মধ্যে আশীর্বাদ লুকিয়ে থাকে আবার আশীর্বাদের মধ্যে শাপ ও লুকিয়ে থাকে। ঊর্বশীর প্রাপ্ত অভিশাপে পুরুরবার সঙ্গে মিলনকে আমরা বর ভেবেছিলাম। কিন্তু

অভিশাপের দ্বারা উর্বশীকে রাজার সঙ্গে মেলালেও ভোগ, কামনা, বাসনায় এতটাই অন্ধ হলেন যে পরিপূর্ণ সন্তানসুখের যে পারিবারিক শান্তিসুখ সেটি তার কপালে হলনা। 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর' নাটকে উর্বশী যে ভুল করেছে তার জন্য রাজ্যসুখকে তিনি বেছে নিয়েছেন। অপরদিকে পুরুরবা উর্বশীকে সত্যি কি পেলেন? যদিও বা উর্বশীকে পেয়েছেন সেটি বিরহের মধ্যে যখন উর্বশী কুমার বনে লতায় পরিণত হয় তখন পুরুরবা উর্বশীর বিরহে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে উর্বশীকে অনুভব করলেন। পর্বত যা কিনা নিশ্চল নিথর তার কাছে প্রিয়ার অনুসন্ধান করছে –

"সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রাম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া।"[১৩]

হে পর্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি আমার বিরহিনী সর্বাঙ্গ সুন্দরী স্ত্রীকে; এই সুন্দর বণভূমিতে দেখেছ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পর্বতের উত্তর এল প্রতিধ্বনিতে – 'সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী' – তোমার বিরহে থাকা সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে আমি এই বণভূমিতে দেখেছি, একথা শোনার পর পুরুরবা উল্লাসিত হলেন। কিন্তু সেই সুখ সাময়িক ছিল ঠিক যেন মরুভূমিতে পথিকের ভ্রান্ত মরিচিকার মত ভ্রম।

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার বিরহ, দুষ্মন্তের অনুশোচনায় ব্যক্ত হয়েছে সৌন্দর্য ও কল্যাণ। শকুন্তলা আশ্রম ধর্ম পালনের ত্রুটির জন্য অনেক বড় অভিসাপে শাপিত হয়েছে ভাবলে পাঠক সমাজ প্রথমত রচয়িতার ওপর ক্ষোভ হলেও পরবর্তীতে কালিদাসের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তা ঠিকই হয়েছে। আত্মভাবনা সমাজ ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে তা অমঙ্গলসূচক বার্তা বহন করে। শকুন্তলাও দুষ্মন্তের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপ যথাযোগ্য বলে মনে হয়। কোনো স্থানে হঠাৎ করে সূর্যের তাপের ফলে সেখানকার বায়ুমণ্ডল দ্রুত উষ্ণ হয় এবং বায়ু উর্ধগামী তখন চারিপাশে বায়ু সেই স্থানটিকে পূরণ করতে ঘূর্ণিপাক তৈরি করে। জীবনেও কামনা বাসনা বেশি হলে কর্তব্য পালনে বিভ্রান্তি ঘটে তখন ঘূর্ণিপাকের মত জীবনে নেমে আসে অভিশাপ। ঘূর্ণিপাক যেমন সাজানো সমস্ত কিছুকে নিমেষের মধ্যে লন্ডভন্ড করে তেমনি অভিশাপ জীবনে সব তছনছ করে। প্রকৃতিতে ঘূর্ণিপাক যেমন একটা ঝড় তেমনি জীবনের ঘূর্ণিপাক হল সমতার অগ্রগামী দূত। শকুন্তলা নিজে কর্মের ফল স্বরূপ অভিশাপ পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে মহর্ষি দুর্বাসাকে দোষারূপ উচিত নয়। মহাভারতে দুর্বাসার অভিশাপের বৃত্তান্ত নেই। কিন্তু সেই মহাকাব্যে শকুন্তলা দুঃখ ভোগ করেনি? করেছে সন্তান সম্ভবা শকুন্তলকে রাজা পরিত্যাগ করার পর শকুন্তলার পুত্র সন্তান হয়েছে যিনি যুবরাজ্ হবেন তখনও রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অন্বেষণ করেনি। যখন শকুন্তলা ও তার পুত্রের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ঘটে তখন রাজা দীর্ঘ বছর শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করার জন্য নিজ আত্ম অনুশোচনা করতে বাধ্য হন।

রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন কান্ড, সর্গে অভিশাপ বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই রামায়ণ, মহাভারতকে মূল উপজীব্য করে মহাকবি কালিদাস বিভিন্ন কাব্য নাটকে অভিশাপ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে। তদুপরি আমরা দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে লৌকিক দেব দেবীদের অবলম্বন করে যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার জীবনকে আশ্রিত করে নর-নারীদের চরিত্রের প্রশংসা করা হয়েছে তা হল বাংলার মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে অন্যতম হল মুকুন্দরাম রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'। এই মঙ্গলকাব্যে অভিশাপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে গৌরীরূপে সতীর পুনজন্ম কাহিনীতে দৃশ্যমান হয় যখন হিমালয়ের অনুরোধে দেবাদিদের মহাদেব তাঁর তপস্যার সময়েও গৌরীর পূজা গ্রহণ করেন। সেই সময় স্বর্গে দৈত্যগণের অত্যাচার শুরু হয়। তখন তারকাসুর দ্বারা ইন্দ্র পরাজিত হন। সকল দেবতারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়ে তাদের বললেন –

"মহেশের পুত্র হইবে নামে ষড়ানন।
গৌরীর উদরে হইবে তার জনম।।
তার বানে তারকের হইবে নিধন।
সবে মিলি শিবের বিবাহেতে দেয় মন।।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এদিকে মহাদেব তখনও তপস্যায় ব্যস্ত কিন্তু গৌরী তাঁর অর্চনায় লীন। মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র প্রেরণ করলেন রতি ও কামদেবকে। পুষ্পময় ধনু ও পুষ্পময় পঞ্চবাণ নিয়ে কামদেব শিবের নিকট চললেন। তারপর আকর্ণ পুরে পঞ্চশর বাণ নিক্ষেপ করললেন। সেই বানে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ হল -

"ধ্যানভঙ্গ হৈলা হর চারিদিকে চান।
সন্মুখে দেখিয়া চাপধারী পাঁচ বাণ।।
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন।।"[১৫]

ধ্যানভঙ্গ হলে দেবাদিদের চারিদিকে তাকিয়ে সামনেই দেখতে পেলেন মদনকে তার তৃতীয় নেত্রের কোপদৃষ্টে মদন ভস্ম হয়ে গেল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মহাদেব অভিশাপ দেওয়ার সময়টুকুও দেননি। সে যেন আগেই থেকে তৈরী ছিল। এখানে আপাতদৃষ্টিতে অভিশাপ শাপ হলেও পরবর্তীতে আহশীর্বাদ রূপ ধারণ করে। কারণ মদনের ভস্মীভূত হওয়ার পর মদনপত্নী রতি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চলেছিলেন। সেই সময় দৈববানী হয় রতি দেহত্যাগ না করে অদ্য হতে মায়াবতী নাম ধারণ করে স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের অপেক্ষায় থাকবে। পরবর্তী সময়ে এই কামদেবেই রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এটি অভিশাপ রূপ আশীর্বাদ।

চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের জন্য অভিশাপকে টেনে আনা হয়েছে। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর প্রত্যহ পিতার আজ্ঞাবশত পুষ্পচয়ন করত শিবপূজার জন্য। কিন্তু এদিকে চণ্ডী ক্ষুদ্ধ হয়ে যান এবং পরিকল্পনা করেন কি করে শিবপূজার ব্যাঘাত ঘটিয়ে নীলাম্বরকে অভিশপ্ত করে তাঁর পূজা মর্ত্যে প্রচলিত করবে তাই তিনি ছলনা করে একটি পলাশফুলের মধ্যে কীট রূপে প্রবেশ করেন।

"কুসুমভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দারু পিপীলিকা হৈয়া।।"[১৬]

অতপর সেই পুষ্প ইন্দ্র দেবাদিবের মস্তকে অর্পণ করলে অমনি -

"দারু পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিলে হর হইল আকুলে।।"[১৭]

তখন মহাদেবের কর্ণে সেই বিষাক্ত পিপীলিকা প্রবেশ করলে তার কামড়ে মহাদেব ব্যথায় আকুল হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে গেলেন। তখন ইন্দ্র বলেন যে পলাশ পুষ্পটি আপনার মস্তকে নিবেদন করছি নীলাম্বর চয়ন করেছে তাই এই দোষ তাঁর নয় নীলাম্বরের। তখন মহাদেব নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন -

"মোরা সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর সাধ।
বসুমতী চল ঝাট হও গিয়ে ব্যাধ।।"[১৮]

অর্থাৎ তুমি আমার সেবা না করে অন্য কিছু করার ইচ্ছা হয়েছে তাই তোমাকে অভিশাপ দিলাম যে মর্ত্যে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ কর। তখন মন্দাকিনীর জলে শয্যায় নীলাম্বর দেহত্যাগ করলেন। তার স্ত্রী শোকার্ত হয়ে তিনিও সহমরণে প্রাণত্যাগ করলেন। পরবর্তী সময়ে এক ব্যাধ রূপে জণ্মগ্রহণ করে নীলাম্বর ও তার পত্নী ব্যাধ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে।

চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর পূজা গ্রহণ করার পর দেবী চণ্ডীর মর্ত্যলোকের স্ত্রীগণের নিকট পূজা গ্রহণের বাসনা জাগলো। তখন চণ্ডী দেবরাজ ইন্দ্রের নর্তকী রত্নমালাকে নৃত্য করার জন্য ডাকলেন। সেই নৃত্য অনুষ্ঠানে সমস্ত দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় দেবর্ষি নারদের বীণাধ্বনি ও অপূর্ব সঙ্গীতে দেবতাগনের করতালিতে মুখরিত হচ্ছে চতুর্দিক

আর অসামান্য নৃত্য প্রদর্শন করছেন। সেই সময়ই কামদেব দেবীর আদেশে রত্নমালাকে সম্মোহন বাণ মারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই রত্নমালার নৃত্য ভঙ্গ হল।

নৃত্যভঙ্গ রত্নমালাকে ভবানী অভিশাপ দিলেন যে, ইচ্ছানি নগরে লক্ষ্যপতি বনিকের গৃহে রম্বাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে ও উজানি নগরের শৈব উপাসক সদাগরের সাধুচ ধনপতির দ্বিতীয় পত্নী খুল্লনা নামে আবির্ভূতা হবে। অভিশপ্ত রত্নমালা বিলাপ করতে করতে দেবীর কাছে অভিশাপের সমাধান পথ খুঁজতে লাগলেন। তখন দেবী প্রসন্ন্যা হয়ে পুত্রবর দিলেন।

ইন্দ্রপুত্র মালাধরের মর্ত্যে আগমনে অভিশাপ দলিত হয়। সুরপুরে কালিয়াদমন লীলা অভিনয়ে দেবর্ষি নারদের প্রাণ মাতানো সুরে, ছন্দে চারিদিক সুমধুর ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে। সেই ধ্বনি ছন্দে নৃত্যে তালরত রয়েছেন ইন্দ্রের তনয় মালাধর। হর পার্বতী যশোদা নন্দন কৃষ্ণ ও সমস্ত দেবগন সেই লীলায় উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দ্রতনয় মালাবরের নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত দেবগন বিভিন্ন মনিমুক্তা খচিত হার উপহার দিচ্ছেন। সেই সময়ই দেবাদিদেব একটি তাঁর প্রিয় কণ্ঠহারটি মালধরকে উপহার দিলেন। মালাধর সেই সাধারণ কণ্ঠহারটি নিতে অস্বীকার করে উপহাস করে বললেন –

“মণি আভরণ মাঝে   হাড়মালা নাহি সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর।
আর সবার অন্তর্যামী   বুঝিয়া প্রথম স্বামী।
কোপ দৃষ্টে চাহেন শঙকর।।”[১৯]

মণির আভরণের মাঝে কেবলমাত্র শিবের দেওয়া হাড়মালা একেবারেই মূল্যহীন। তাই দেখে হাসেন মালাধর। মালাধরের এরূপ বিরূপ উপহাস আচরণ দেবাদিদের মহাদেব অর্থের প্রতি লোলুপ্য মালধরকে অভিশাপ দিলেন –

“যেন মতি তেন গতি ঝাট চল বসুমতী
কূলে জন্ম লহ বেনিয়ার।”[২০]

যার যেরকম কর্ম তার সেরকম ফল অতএব তুমি তোমার কর্মফল ভোগ করার জন্য মর্ত্যে জন্মগ্রহণ কর। কেতকদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। এই অভিশাপ বর্ণিত না হলে মনসামঙ্গল কাব্যে পরিপূর্ণতা লাভ করত না। মনসামঙ্গলের নায়ক নায়িকা বেহুলা ও লখিন্দর। এই নায়িকা বেহুলা পূর্বে ঊষা ও নায়ক লখিন্দর পূর্বে অনিরুদ্ধ ছিলেন। শিবের অভিশাপে পরবর্তীতে মা সনকার গর্ভে লখিন্দরের জন্ম অপরদিকে এমলার গর্ভে জন্ম নিল বেহুলা -

“ঊষা অনিরুদ্ধে শাপ দিলা শূলপানী।
ঋতুবতী হৈল রামা, সনকা বা ন্যানী।।
চাঁদ বান্যা কৈল তার ঋতু অপেক্ষণ।
সনকার গর্ভে হৈল লখাই জনম।।
তার কথ দিনান্তরে নিছনি নগরে।
বেহুলার জন্ম হৈল এমলা উদরে।।”[২১]

মনসা মঙ্গলে অভিশাপ চিত্র ফুটে উঠেছে যখন বেহুলা পুকুরে স্নান করার সময় মনসা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে বেহুলার নিকট আসে তখন বেহুলার পায়ের একফোটা জল ব্রাহ্মণীর গায়ে লাগলে ব্রাহ্মণী বেহুলা কে অভিশাপ দিলেন, বিবাহের রাত্রিতে স্বামীর মৃত্যু হবে। লখিন্দরের মৃত্যুর পর কলার ভেলায় বেহুলা ভেসে চললো। পথিমধ্যে গদা বেহুলাকে আটকে বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চাইলে বেহুলা গদাকে অভিশাপ দেন –

‘আমা ছাড়ি না পাইবা অনুপম নিধি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"প্রধান করিয়া ঘরে এড়িব তোমারে।।
শুনিয়া বেহুলা সতী শাপ দিল তারে
মাজষ বড়ষি দিয়া টানি আনি কূলে।
বেহুলার শাপে গোদা নাবালেতে ওলে।।"[২২]

মানব ইতিহাসে অভিশাপ যে কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা নয়, পৌরাণিক আখ্যান বাদ দিলেও আমাদের আদি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে অনেকগুলি অভিশাপ পরিলক্ষিত হয়। সেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি মূল উৎস থেকে পরবর্তী যেসমস্ত সংস্কৃত কাব্য, নাটক এবং বাংলা সাহিত্য রচনা হয়েছিল তাতে বিশেষভাবে অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচিত প্রত্যেক অভিশাপের অন্তর্নিহিত অর্থ গভীরভাবে লুক্কায়িত রয়েছে। আসলে জীবনের পথে সবসময় যে গোলাপফুল বিছানো থাকবে তা নয়। কখনো কখনো গোলাপে কন্টকও থাকে। জীবনযুদ্ধে যদি হেরে না যাওয়া হয় তবে বিজয়ী সুখ স্পর্শ করবে না। তাই অভিশাপ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে খুব অমঙ্গল হলেও পরবর্তীতে তা আর্শীবাদ। অভিশাপ থাকার ফলে প্রতিটি কাব্য, নাটক পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

Reference:

১. দাস, শাস্ত্রী, দ্বারিকা, 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি', দ্বীতীয় সংস্করণ, তারাবুক এজেন্সী, ১৯৮৩, পৃ. ৩৮২
২. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খন্ড, গান নং ৯২৩, ১৯৮০, পৃ. ৩৮২
৩. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ২৩৬
৪. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ন, 'মেঘদূত ও সৌদামনী', দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৫, পৃ. ৮৯
৫. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ন, 'মেঘদূত ও সৌদামনী', দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৫, পৃ. ৩২৯
৬. বন্ধোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র এবং বন্ধোপাধ্যায়, অনিতা, "রঘুবংশম্", প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩, পৃ. ১৭৭
৭. বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ এবং মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, "কালিদাসের গ্রন্থাবলী", প্রথম ভাগ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃ. ৭২
৮. তদেব, পৃ. ১৩৬
৯. তদেব, পৃ. ১৫৮
১০. ভট্টাচার্যেণ, বিদ্যানিধি, শ্রীমদগুরুনাথ, 'কুমারসম্ভব', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৭, পৃ. ১২০
১১. তদেব, পৃ. ১৪৪
১২. দ্বিবেদী, রেবাপ্রসাদ, 'কালিদাস গ্রন্থাবলী', কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৬, পৃ. ৩৭০
১৩. তদেব, পৃ. ৩৮৫
১৪. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, 'চণ্ডীমঙ্গল-পরিক্রমা', প্রথম খন্ড, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৪, পৃ. ১৩৮
১৫. তদেব, পৃ. ১৩৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৪৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৮. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৬৬
২০. তদেব, পৃ. ১৬৬
২১. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, 'আদি-মধ্য-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৬ পৃ. ৭২৫
২২. তদেব পৃ. ৭২৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 64 - 72
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 64 - 72
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে শোষক ও শোষিতের চিত্রণ

অর্পন ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : arpanghosh2500@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Social picture, Chandimangal, picture of exploiters and exploited by political-economic-religion in society, the position of women in society.

Abstract
In Bengali literature, the origin of 'Mangal Kavyas' is based on the greatness of non-Aryan gods and goddesses. In ancient India, which was built on the basis of Aryans and non-Aryans, the dominance of the Aryans can be observed. Bengal was no exception in India. Over time, many colors of the social picture started to change with the evolution of a new era. It is recorded in the pages of history and literature of that time. After the Turkish invasion in the 13th century, we got to know the new culture of Bengal in the social portrait of Mangalkavya. It was a meeting ground of Arya and non-Arya culture. Chandi, Durga, Sheetala, Kalika, Mahamaya were considered as the wives of Shiva. The neglected non-Aryan goddesses Chandi, Manasa, Kalika became anxious to be worshipped by the elite community. Day after day the Mahatmya Geet of the Goddesses was sung. The goddesses were worshipped. At the root of the division between Arya and Anarya was patriarchy and matriarchy, Shiva and Shakti. For a long time, the caste Hindus had ignored the so-called lower-class people and the gods. But the question remains, did the neglected non-Aryan people get their due respect? Or did they remain in the left corner of society (one corner of society) like the worship of the left hand of Chandrasadagar. That is, they remained in the real whale. To find the answer to this question, one has to turn the pages of literature with the help of contemporary history. When one looks at the position of this neglected or deprived people, the first thing that comes to mind is the political, economic andreligious system of governance of contemporary society. From this system of governance, two classes emerge in society. One, the ruling class and the other, the exploited class. The main theme of our article is to draw "The depiction of the exploiter and the exploited in the poem 'Chandimangal' by poet Mukundaram".

Discussion

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল’ কাব্যটি রচনাকাল নিয়ে নানা মতপার্থক্য রয়েছে। কবির গ্রন্থে কালজ্ঞাপনের পরিচয় কয়েক ছত্রে পাওয়া যায় -

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 64 - 72
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"শকে রস রস বেদে শশাঙ্ক গণিতা
কতদিনে দিলা গীত গাইল মুকুন্দ।"[১]

পণ্ডিতমহলে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল বিতর্ক থাকার সত্ত্বেও ষোড়শ (প্রায় ১৫৪৪ - ১৬০০ খ্রীঃ) শতকের রচনা বলে গণ্য করেন। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনি – আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। প্রথমটিতে কালকেতু-ফুল্লরার আখ্যান এবং দ্বিতীয়টিতে ধনপতি-শ্রীমন্ত-খুল্লনার কাহিনি বর্ণিত। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ। বর্ণিত কাহিনিতে সমাকালীন বাস্তব সমাজ চিত্রেরই রূপায়ণ। সুতরাং কাহিনি বয়নে ও চরিত্র চিত্রণে কবিকঙ্কণ যে জীবনরস-রসিকতা ও জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশ্নাতীত। জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, সেই দৃষ্টিই ছিল তাঁর কাব্যের মূলধন। তাই কাব্যে কবির আত্মপরিচয়ে যে বিবৃত পাওয়া যায়, তাতে সেকালের রাজনীতির ভায়বাহ রূপ পরিলক্ষিত। রাষ্ট্রিক উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, উপদ্রব, অত্যাচার ও ঝড়ঝঞ্ঝায় রাজ্য বিপর্যস্ত। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাঠান কররানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটে, মুঘল রাজত্বের সূচনা ঘটে। এই সময় দিল্লির সম্রাট আকবর রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনে গৌড়, বঙ্গ, উৎকলের সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত করেন মানসিংহকে। সম্রাট আকবরের প্রিয়পাত্র ছিলেন মানসিংহ। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ব শত্রু বারভূঁইঞাদের দমন করে আকবরের রাজ্যবিস্তার করা। রাজা তোডরমল্ল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে তৈরি করেছিলেন 'সুবেবাঙ্গালা'। সেই 'সুবেবাঙ্গালা'র একটি পরগণা ছিল 'সুলেমাবাদ', মুকুন্দের কাব্যে যা 'সিলিমাবাজ' নামে পরিছিত হয়েছে। অর্থলোভী রাজা ও তার কর্মচারীদের জোর-জুলুমে প্রজাদের অবস্থা শোচণীয় হয়ে উঠেছিল। জমির নতুন জরিপ ব্যবস্থা করে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জমির দৈর্ঘ্য মাপা হতে থাকলো কোণাকোণি হিসেবে, উর্বর জমির হিসেবে পতিত জমির উপর খাজনা বসালো। এমন সব কত অন্যায়মূলক কর্ম অধর্মী রাজার শাসনে ও তাঁর ডিহিদার সরীপ মামুদের অধীন হয়েছিল। কবির আত্মবিবরণীতে তা স্পষ্ট উল্লেখিত -

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ
অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।"[২]

রাজার আয়ুক্ত কর্মচারীগণ প্রতিনিয়ত প্রজাদের উপর নানা অন্যায়মূলক কর্ম করছে জেনেও, তার প্রতিকার করার চেষ্টা করেননি। বরং রাজ শৃঙ্খলার বাইরে এই নীচ জাতির প্রজারা কোনো বিরোধমূলক কাজ করলে তাঁদের দুর্ভোগের সীমা থাকত না। তা কালকেতুর আক্ষেপ সুরেই প্রকাশিত -

"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি
নিকটে কলিঙ্গ রাজ বড়ই দুর্বার।"[৩]

আবার দেবী চণ্ডীর বচনেও তা স্পষ্ট -

"কোন দেশ হাজার হাজার
পর-পীড়া দেখি লাগে ডর।"[৪]

প্রজাদের এমন শাসনে তাঁদের জীবনে ঘন অন্ধকার নেমে আসে। জীবন-যাপনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অপরদিকে রাজকোষের ভাণ্ডার পূর্ণ হতে থাকলে মামুদ সরীপ রাজকোষের তকমা লাভ করেন। উজির-সরকার-পোতদার-মণ্ডলরা নিজেদের আখের গোছাতে, সহজ-সরল প্রজাদের ঘাড়ের উপর একবারে জোঁক হয়ে বসে পড়েন। রাজ্যের নিয়মানুসারে বিঘা কুড়ি কাঠাতে হয়। অথচ রাজ্যের সরকার বা উজির কোণাকোণি মাপ-জোখা করে পনের কাঠায় বিঘা বলে, জমি প্রজাদের নামে লিখে দিত। এসব অনাচার প্রজারা বুঝতে পারলেও তাঁদের কথা শাসক আমল দেয় না। বরং শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, রাজার কাছে নালিশ করে তাঁদের মুখ বন্ধ করত। কারণ রাজস্বের বাড়তি মুনাফা নিজের পকটে যেত। নচেত এমন অনৌচিত্য

কর্ম করত কেন। রাজস্ব আদায়ের সময় আদায়কারীরা পুরো কুড়ি কাঠা অর্থাৎ বিঘা দামে রাজকর নিতেন। সেকালের উত্তম জমিতে বিঘা প্রতি কুড়ি মণ ফসল ফলে। প্রজাদের রাজস্ব দিতে হত উৎপাদিত ফসলের ১/৩ অংশ। পাঁচ বিঘা জমিতে রাজস্ব হত ৩৩-১/৩ মণ। প্রজাদের কাছে পাঁচ বিঘা সমান পঁচাত্তর কাঠায় তার প্রকৃত রাজস্ব হত পঁচিশ মণ ফসল। কিন্তু রাজকর্মচারীরা বলপূর্বক অত্যাধিক যন্ত্রণা দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে প্রায় তেতত্রিশ মণের বেশি ফসল আদায় করতেন। এই বাড়তি রাজস্ব রাজদরবারে না গিয়ে রাজকর্মচারীর পকেট ভরাত। ফসল বিক্রি করে টাকা পেয়ে ভাঙাতে যেতে হত পোতদার বা মহাজনের কাছে। মহাজনও ওঁত পেতে বসে থাকে একটু রস পাবে বলে। প্রজাদের কাছ থেকে মহাজন টাকা প্রতি আড়াই আনা বাটা নিত। আবার টাকা ধার করলে প্রতিদিন এক পাই করে সুদ দিতে হত। এই ভাবে প্রজারা সকলকে ভাগ দিতে দিতে, নিজের ভাঁড়ার শূন্য হয় পড়ে। সার বছরের অন্ন পর্যন্ত কুলাত না। বাড়ির শিশু কাঁদত এক মুঠো ভাতের জন্য। বাড়ির সকলে অনাহারে জল পান করে অর্ধেক দিন কাটাত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ্যের চিত্র লক্ষিত -

> "তৈল বিনে করি স্নান কেবল উদক পান
> শিশু কান্দে ওদনের তরে।"[৫]

অরাজকতায় পূর্ণ গোটা রাজ্যের চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। প্রজারা ধীরে ধীরে নিঃস্ব হল আর মুষ্টিমেয় ব্যাক্তিদের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দির প্রবন্ধিক বঙ্কিচন্দ্রের কথা এখানে আমদের স্মরণার্থ -

> "আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলের কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকেরই শ্রীবৃদ্ধি নাই।"[৬]

সর্বকালের শ্রমজীবীদের চরম দুর্দশার মূলে রয়েছে রাষ্ট্রের গুরুভার করপ্রথা ও রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত আদায়কারীদের নির্মম অত্যাচার-অনাচার। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছত্রে ছত্রে তার অভিন্ন চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর। প্রজারা অভাব-অনটনে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে ধান, গরু হাল ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে অন্য রাজ্যে পলায়ন করত। কিন্তু পেয়াদারের চোখ এড়িয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করাও কঠিন ছিল। আবার প্রবল পরাক্রমী শাসকদের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পায়নি। তাঁদের এই নিদারুণ দৃশ্য কাব্যের পশুদের মুখে ধ্বনিত হয়েছে -

> "বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে
> ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে।"[৭]

কবি মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'কালকেতু' চরিত্রটিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমে বলবান কালকেতু রোজ পশুর মাংস বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে। পশুরা আপন মাংসের জন্য নিজের শত্রু হয়ে উঠেছে। তাঁদেরকে ব্যাধের অত্যাচারে নিত্য মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয়। নির্দয় কালকেতুর নৃসংশ অত্যাচার, পশুদের করুণ আর্তনাদে পরিস্ফুটিত -

> "গণ্ডা বলএ আমি বড় দুঃখ পাই
> খড়্গের জ্বালায় মোর মইল দুটি ভাই।
> কপি বলে রায় মোর করম বিশংস
> কালকেতু ঠুঠারে বেচিল মোর বংশ।
> বারসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান
> ধরণি লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান।

করিল নিধন কালকেতু পরিবার
বিফল জনম মাতা মৃত সুত দার।
রাণ্ড হইআ হরিণী কান্দয়ে উভরায়
পতিসুখহীন হইনু জিতে না জুয়ায়।"[৮]

পশুদের মাংসের জন্য কালকেতু তাঁদের হত্যা করে। সমাজেও উৎপাদকদের ফসলের জন্য অর্থশোষকদের হাতে নিপীড়িত হতে দেখি। 'অর্থই যে অনর্থের মূল' - এই 'অর্থের' (ফসল) জন্য রাজা থেকে পেয়াদা পর্যন্ত সকল শাসকগোষ্ঠীর কাছে প্রজাদের নিষ্পেষিত হয়। কারুর কাছ থেকে মুক্তি পায় না। আর এই শোষকদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে তাঁদের চরমতম দুর্দ্দশা ঘনিয়ে আসে। জীবন হয়ে উঠে বিপন্ন, হারাতে হয় নিজের আত্মীয়-স্বজনদের, কারুর বাবা-কাকা-ভাই বা পুত্রদের। বধুদের বৈধব্যে প্রাণহীন দুরূহ জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কালকেতুর মত শোষকরা যেন হয়ে উঠে যমের দোসর। প্রতিবাদের ভাষা যেখানে মৃত্যু সেখানে নীরবে মৃত্যুসম যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া প্রজাদের কোন গতি ছিলনা। তাই প্রজারা নিরুপায় হয়ে দেবী চণ্ডীর কাছে শাসকদের নিগ্রহ থেকে উদ্ধার হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক শাসনে ও অর্থনৈতিক শোষণের বলে সমকালীন সমাজের পীড়ক ও নিপীড়িতের চিত্রখানি সহজেই উন্মোচিত হতে দেখি। রাজ্যের রাজা হল প্রদেশের সর্বেসর্বা। অন্যায়ভাবে প্রজাপীড়ন হয় রাজ্যের একবারে উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত (Tup to Bottam)। রাজা আপন কর্তব্য অর্থাৎ প্রজাপালনের কথা ভুলে গিয়ে নাগরিক জীবন - যাপন মশ-গুল থাকেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা একেবারে ভুলে যান। তাঁদের শুধু সময় মত রাজস্ব পেলেই হল। সেই সুযোগে গ্রামের শাসনকর্তারা মোড়লগিরি চালু করেন। ধৃত মোড়লরা তাঁদের শাসন কৌশলে গ্রামবাসীদের নির্যাতনে নাজাহাল করে তুলেন। তাঁদের জ্বালায় কেউ কেউ দেশ ছাড়াও হয়। সহজ-সরল প্রজাদের কাছ থেকে ঠকিয়ে সর্বস্ব আত্মসাৎ করতে চাইতেন। মূর্খ গ্রামবাসীদের মিষ্টি কথা ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করত। এই শ্রেণীর মানুষ সর্বকালের সমাজে রয়েছে। একালেও চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে, মুরারি শীলের চরিত্রটি এমনই এক কপট চরিত্রের মানুষকে পাই। কবির বর্ণনাতে তার পরিচয় পাওয়া যায় -

"বন্যা বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা-জোখা করে টাকা-কড়ি।"[৯]

মুরারি শীল জমি-জায়াগা দলিলপত্র লেখা-জোখার কাজ করে। গরীব প্রজাদের টাকা ঋণে দিয়ে মোটা সুদে টাকা আদায় করত। এছাড়া প্রজারা টাকা ভাঙাতে এলে প্রতি টাকায় বাটা নিত, এছাড়াও ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম দাম দেয়। সে টাকা কাল দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবটুকু আত্মসাৎ করত। আবার সরল প্রজাদের সোনা-রোপার ভাঙানোর সময়ও বাজার মূল্যে না দিয়ে, পরিবর্তে সামান্য কিছু টাকা বা চাল, ডাল দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দামি রত্ন হাসিল করার চেষ্টা করত। আত্মলোভী মুরারি কালকেতুর সাত কোটি দামের সোনার অঙ্গুরি কৌশলী বুদ্ধি সাহায্যে স্বল্প মূল্যে হাতিয়ে নেওয়ার অদম্য চেষ্টা করেছিল -

"একুন হইল অষ্টাপণ আড়াই বুড়ি
চালু ডালি কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।"[১০]

এইভাবে শঠ প্রবঞ্চক মুরারি দিনের পর দিন দীন-হীন প্রজাদের ঠকিয়ে নিজের আখের গোছাতে থাকে। রাজ্যের রাজার দ্বারা প্রজারা একরূপে পীড়িত হয়। আবার রাজ অধীনস্ত কর্মচারীদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে গরীব আরও গরীব হয়। এই গ্রমকর্তারা গ্রামবাসীদের সর্বদা নিজের চাকরতুল্য প্রজা মনে করত। দেবী চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু গুজরাট নগরে রাজা হয়ে বসেন। এই নগরে এমনি এক ধূর্ত মোড়ল চরিত্রের মানুষ ভাঁড়ু দত্ত। কপট ভাঁড়ুর ব্যভিচারে সারা গ্রামের মানুষ ব্যতিব্যস্ত। খেটে-খাওয়া প্রজারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাত। সেই ফসল হাটে বিক্রি করলে তবে টাকা বাড়িতে আনতে পারে। কিন্তু দুষ্ট ভাঁড়ু মাগুলিক হয়ে জোরপূর্বক তোলা তো তোলে, এছাড়া প্রজাদের আনা দ্রব্য বিনামূল্যে হাতানোর চেষ্টা

করে। প্রজারা তার কুবুদ্ধি বুঝতে পেরে তাকে কাছে ঘেঁষতে না দিলে প্রজাদের কষ্ট জল করা ফসল এদিক-ওদিক করে নষ্ট করে ফেলে -

"পসরা লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপাড়ি
জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাঞি দেয় কড়ি।
লণ্ড ভণ্ডে গালি বলে শালা মালা।"[১১]

ভাঁড়ু দত্ত রাজশক্তির অপব্যবহার করে প্রজাদের আনা ফসল বিনামূল্যে না পেলে সমস্ত দ্রব্য লণ্ড-ভণ্ড করে। তারপর অসহায় প্রজাদের ক্রমাগত কিল, লাথি মারতেও ছাড়ে না। ভাঁড়ুর এমন সব অনাচার থেকে প্রজাদের নিষ্কৃতি নেই। তোলার নামে অত্যাচার সে নিরন্তর করে চলে। গ্রামের মানুষ তাঁর জ্বালায় মর্মাহত। শঠ ভাঁড়ু নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য সব রকমের অহিত কাজ করতে প্রস্তুত। রাজা কালকেতু অন্যায় ভাবে ভাঁড়ুর তোলা তুলা ও গ্রমাবাসীদের প্রতি অহেতুক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ফলে ভাঁড়ু সম্রাটের কাছে কালকেতুর নামে মিথ্যে নালিশ জানায় এবং কৌশলী বুদ্ধির সাহায্যে কালকেতুকে একেবারে সর্বশান্ত করে ছড়ে। এই ধূর্ত প্রকৃতির মানুষরা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে নিজের হাতে রাখত। তাঁরা যেমন খুশি প্রজাদের উপর অনাচার পীড়ন করলেও রাজার কান অবদি পৌঁছাতো না। বরং প্রজারা তাঁদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানালে, তাঁদের বিবিধ সাজা দেওয়ার পথ তৈরি করে দিতেন। যথা -

"ধূতি খ্যায়া বুল বেটা কোটাল আমার।"[১২]

ধূর্ত ভাঁড়ুর কপটতার ফলে কালকেতুর জীবনে নেমে আসে চরম দুর্দ্দশা। সমকালীন সমাজকাঠামোর যূপকাষ্ঠে অসহায় প্রজাদের প্রতিনিয়ত লঘু দোষে কখনো বা বিনা দোষে গুরু দণ্ড পেতে দেখা যায় -

"লঘু দোষে গুরু দণ্ড করে নৃপবর।"[১৩]

রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গড়ে উঠা সমাজের দুর্বলশ্রেণীর মানুষরা সর্বসময় নিপীড়িত হচ্ছে। অর্থলোভী রাজকর্মচারীরা স্বার্থের জন্য সকল ধর্মের পথ ভুলে গিয়ে অধর্মের পথ বাঁধতে দেখা যায়। তাঁদের পদলেহনে গোটা নিম্নশ্রেণীরা নিষ্পেষিত হচ্ছে। ফলত প্রজারা অন্য রাজ্যে পালিয়ে যায়। রাষ্ট্র ভেঙে পড়ে। বৈদেশিকরা সহজে রাজ্য জয় করে। রাজ্যে শুধু রাজা ও প্রজা শাসক ও শোষিত ছিল না, তার পাশাপাশি আরও নানান ভাবে বিবিধ শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য অংশে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ পাওয়া যায়।

সমগ্র পৃথিবীর মানুষ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভিক্ত - নারী ও পুরুষ জাতি। অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অর্ধেকাংশ নারী। সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থান অবলোকন করলে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। বলবান পুরুষজাতি সুবিধাভোগের লোভে গোটা নারী জাতির উপর নিপীড়নের কৌশল আঁটতে থাকেন। প্রাচীন যুগে আর্যদের আগমনের পরবর্তী সময় শাস্ত্রবিধিতে নারীদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা কথা বর্ণিত হয়েছে, তা বর্তমানের সমাজেও অভিন্ন চিত্র দৃষ্টিগোচর। ষোড়শ শতাব্দীতে কবি মুকুন্দরাম একই চিত্র দেখেছেন। মানব দরদি কবি মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমমঙ্গল' কাব্যে সেকথা সুস্পষ্ট। এখানেও প্রথাগত সমাজবিধির নিয়মানুসারে ধর্মের নামে চরমভাবে নির্যাতনের শিকার হতে দেখি অবলা জাতিকে। এখনো সমাজে প্রচলিত সতীদাহপ্রথা, সহমরণ প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদির ধর্মচক্রে নারীদের প্রতিনিয়ত পুরুষ-সমাজের কাছে শোষিত হতে দেখি। নারীদের কলঙ্কের আরোপ দিয়ে প্রচলিত সতীদাহ ও সহমরণ প্রথাগুলি সর্বকালের ন্যায় একালেও সমাজে এক ঘৃণ্যতম ঘটনা। ধর্মের নামে এমন ব্যভিচার অত্যাচারেরই নামান্তর। ষোড়শ শতকে সে দৃশ্য ব্যতিক্রম ছিলনা। কাব্যে কলিঙ্গ যুদ্ধের বর্ণনাতে সেকথা স্পষ্টাকারে বলা রয়েছে -

"জেই জন মৈল তোমা সনে করি রণ
অনুমৃতা হইতে জায় তার নারীগণ।"[১৪]

আবার দেবী চণ্ডীর কথাতেও সুস্পষ্ট -

"দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন তেজিল সতী
পতির অনলে ছায়াবতী।"[১৫]

সমাজে সহমরণ প্রথার মত বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহও পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের যেন নির্যাতনের এক এক পন্থা। পরিবারে, বহুবিবাহের ফলে সমাজে নারীদের অবমাননা বাড়তে থাকে। কামুক পুরুষ অধিক বিবাহে আসিক্ত। ফলত অনেক পত্নীরা স্বামীর কাছে নিপীড়িত হতেন। স্বামীর ভালোবাসা হাসিল করার লোভে অনেক সময় নারী হয়ে নারী বিদ্বেষী রূপ ধারণ করেন। গড়ে উঠে সতীন সম্পর্ক। নারী হয়ে নারী নির্যাতন শুরু হয়। এইরূপ অত্যাচারের কথা আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরা কথায় দেবী চণ্ডীর বক্তব্যে ফুটে ওঠে। আবার বণিক খণ্ডে খুল্লনার প্রতি লহনার অমানবিক আচারণে তা জাজ্বল্যমান-

"চুল ধরে কিল লাথি মারে তার পিঠে
জৈষ্ঠ মাসে গোহালা গোহালি জেন পিটে।
খুল্লনা জতেক দেই সাধুর দোহাই
অনাথ দেখিআ লহনার দয়া নাই।"[১৬]

আবার -

"দারুণ সতিনী লহনা বাঘানী
কেবল যমের যন্ত্রণা।"[১৭]

নারীদের সম্মান সমাজে ধীরে ধীরে খর্ব্ব হতে থাকে। মনু শাসিত সমাজ থেকে আমরা দেখে আসছি সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী বংশ পরম্পরায় পুরুষরা পায়। ফলত, কন্যা সন্তানের বদলে পুত্র সন্তান মান বেশি। অনেক ধর্মশাস্ত্রে বলা আছে পুত্র সন্তান ছাড়া পিতা-মাতার স্বর্গলাভ অসম্ভব। তাই সমাজে পুত্র সন্তানের মান বাড়তে থাকে। এইরূপ বিবিধশাস্ত্র অনুসারে সমাজে নারীদের একচোখে করে রাখে। সেই কারণে নারীদের আজীবন দুর্ভোগ পেতে হয়। কাব্যেও ধর্মকেতুর স্ত্রী কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তান লাভে অধিক পিয়াসী। আবার সেকালের সাধু-সন্তদের 'পুত্রবতী' হওয়ার আর্শীবাদ দিতে দেখা যায় -

"পরাণার হেতু-ভিক্ষা দেহ গো পরাণরক্ষা
অচিরাতে হবে পুত্রবতী।"[১৮]

দুখিনী মায়ের ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম হলে পরিবারবর্গ একভাবে আতঙ্কে থাকে। বড় হলে তাঁর বিবাহকালে এক মোটা অঙ্কের পণ দিতে হবে। আবার সঠিক সময়ে বিবাহ না দিলে সমাজ দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় গোটা পুরুষশাসিত সমাজের শাসনে ও ধর্মের কষাঘাতে নারীদের অবস্থান কেবল নিপীড়িতা হিসেবে।

ধর্মনীতির নিষ্ঠুর শাসনে দুর্বল জাতি চিরতরে পাপ্য অধিকার থেকে শুধু বাদ পড়তেন তা নয়। তাঁদের প্রতি উচ্চকোটি শ্রেণীরা নীচ-হীন অস্পৃশ্য মনে করে পশুসুলভ আচারণও করতেন। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা 'প্রাচীন ভারতীয় শূদ্র' গবেষণা পত্রে জানিয়েছেন -

> "শূদ্ররাই যে ছিলেন সেবকশ্রেণি সে কথা পরবর্তী রচনায় নিহিত আছে মাত্র। কিন্তু এই (মৌর্য) যুগের ধর্মসূত্রে সুস্পষ্টভাবে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে শূদ্রদের কর্তব্য হলো তিন বর্ণের সেবা করা এবং এই ভাবেই আশ্রিতদের ভরণ-পোষণ করা।"[১৯]

প্রাচীনকালে থেকে সৃষ্ট এই বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণির মানুষদের বঞ্চিত ও নিপীড়িত হতে দেখা যায়। ষোড়শ শতকে দাঁড়িয়ে সমকালীন সমাজে তা অব্যাহত। কাব্যে আমরা দেখি ব্যাধকুলের মত নিম্নজাতিতে জন্মগ্রহণ করা যেন পাপকাজ। অস্পৃশ্য ঘৃণ্য জাতিকে সমাজ কতখানি কুৎসিত নজরে দেখে তা রাজার উক্তিতে ধরা পড়ে -

"ছুঞিতে বা জুয়ার বেটা অতি নিচজাতি
সভা মাঝে বসিআ কথার দেখ ভাঁতি।"[২০]

সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত ধর্মের শাসনে গোটা সমাজ কুসংস্কারের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আর সেই ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষরা চিরকাল নিম্নজাতির উপর কৌশলে অনাচার করে চলছে। এই ধর্মের নামে অত্যাচারের ছবি 'চণ্ডীমঙ্গলে' যত্র-তত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

অনাদিকাল ধরে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মানুষেরা সমাজ ও সভ্যতাকে দংশন করে আসছে। শাসকশ্রেণী সমাজের বিষবৃক্ষ স্বরূপ। রাজ্যের প্রজাসাধারণ প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনীতির কবলে অবহেলিত, নিপীড়িত ও নির্যাতনের শিকার হয়। ফলত, রাজ্যে সর্বকালের ন্যায় ষোড়শ শতকেও ধনীরা আরও ধনী হয় আর গরীবরা আরো গরীব হয়। সমাজবদ্ধ জীবনে নিপীড়ক ও নিপীড়িতের সংখ্যা সমানুপাতিক। বৈদিক পর্বে আর্য জাতির হাত ধরে যে শোষকশ্রেণীর পথ তৈরি হয়েছিল ষোড়শ শতকের বাঙালির জনজাতির মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখা দেখতে পাওয়া যায়। সেকালের শাসক ও শাসননীতির বলে নির্যাতিত শোষিতের অবিকল চিত্র বর্তমান কালেও দৃশ্যমান। সে-কারণে শোষিতদের জীবন হয়েছে আরও বিপদসঙ্কুল, মর্মান্তিক ও ভয়াতুর। কালে কালে তাঁদের রূপের রূপান্তর ঘটলেও গুণগত বৈশিষ্ট অবিকৃত। তাই আজও বিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি -

"রাজা আসে যায়　　রাজা বদলায়
নীল জামা গায়　　লাল জামা গায়
এই রাজা আসে　　ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের　　রং বদলায়
দিন বদলায় না।"[২১]

তাই আজকের দিনেও শাসকগোষ্ঠীর হাতে সমজে এই রকম অন্যায়মূলক কর্ম সহজেই চোখে পড়ে। সমাজে এমন বিষবৃক্ষের জাতকে সমূলে উৎপাটন করাই আমাদের দায়-দায়িত্ব। তাই, আমার মনে হয় আলোচ্য নিবন্ধটি তৎকালীন সমাজে তাৎপর্যবহ।

Reference:

১. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, (সম্পাদনা), কবিমুকুন্দের, *চণ্ডীমঙ্গল,* শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেটড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৪০০
২. চট্টোপাধ্যায়, ড. রবিরঞ্জন, (সম্পাদনা), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত, *চণ্ডীমঙ্গল,* চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৬৮
৩. তদেব, পৃ. ১১৩
৪. তদেব, পৃ. ১২৬
৫. তদেব, পৃ. ৬৯
৬. তদেব, পৃ. ৮৯
৭. তদেব, পৃ. ৮৭
৮. তদেব, পৃ. ১১৫

৯. তদেব, পৃ. ১১৭
১০. তদেব, পৃ. ১৪৪
১১. তদেব, পৃ. ১৪৮
১২. তদেব, পৃ. ১৬৩
১৩. তদেব, পৃ. ১৭২
১৪. তদেব, পৃ. ৭৫
১৫. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, (সম্পাদনা), কবিমুকুন্দের, *চণ্ডীমঙ্গল,* শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০২০, পৃ. ২৪০
১৬. তদেব, পৃ. ২৪১
১৭. চট্টোপাধ্যায়, ড. রবিরঞ্জন, (সম্পাদনা), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত, *চণ্ডীমঙ্গল,* চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৭৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৬৪
১৯. শর্মা, রামশরণ, *প্রাচীন ভারতের শূদ্র,* কে পি বাগচী অয়াণ্ড কোম্পানী ২৮৬ বিপীনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২, পৃ. ৯২
২০. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১১৫

Bibliography:

আহমেদ, অয়াকিল, *বাংলা মুসলমানের শিকড় ও আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ),* আহমেদ কাওসার, বইপত্র ৩৮/৪ বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০, ফাল্গুন, ১৪২৮

আলীম, এ. কে. এম. আবদুল, *ভারতের মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস,* আহমেদ মাহমুদুল হক মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৭৬

চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *বাংলার বারোভুঁইয়া ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য,* সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৩, মাঘ, ১৪২৯

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, *আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* বিকাশ সাধুখাঁ, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯

দাস, অপু, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ: *নারীবাদী পাঠ, অবনীন্দ্রনাথ বেরা,* বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, পূনর্মুদ্রণ, ২০২১

ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল বি, এ, কলিকাতা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, ১৩৪৬

ভদ্র, গৌতম, *মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ,* সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেট পক্ষে ৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড কলিকাতা-০৯, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪২০

মজুমদার, অরুণকুমার,*প্রাচীন জরীপের ইতিহাস,* নেপালচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারাবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৪০২, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

রায়, ড. মিহির কুমার,*ভারতের ইতিহাস আদি মধ্য ও মধ্য (তুর্কো-আফগান) যুগ ৬৫০-১৫৫৬,* শ্রীনিতাইচন্দ্র ভক্ত ৩৩ কলেজ রো কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৬

সিনহা, গোপাল চন্দ্র, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ (প্রথম খণ্ড),* শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং ৩, মুক্তরামবাবু লেন কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৫

হাবিব, ইরফান, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ মার্কসীয় চেতনার আলোকে,* অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭৩

হাবিব, ইরফান, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা,* সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক) শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রীট, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ,১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-২০ এবং কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং ৩, মুক্তরামবাবু লেন কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্কারণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৯

পত্র-পত্রিকা :

তবু একলব্য, *মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা,* অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর ড. দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পাদনায়), দি গৌরী কালচারল এণ্ড এডুকেশনাল অয়াসোসিয়েশান সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র, বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৩ ক্রমিক ৪৫ 2nd Edition: june 2002, ISSN 0976-9463

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 73 - 80
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শ্রীরাধা : ‘গোপালচম্পূ’ ও পরবর্তী বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

ড. রাকা মাইতি
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
বাজুকল মিলনী মহাবিদ্যালয়, বাজুকল
Email ID : rmaitibengali@bajkulcollege.org

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Six Goswami, Vaishnavism, Love of Radhaand Krishna, Vrindavana, Social impact.

Abstract
Srijiva Goswami was one of the sixteen Goswamis of Vrindavan. He was the son of Srirupa and SrisanatanaGoswami. He did not see Lord Chaitanya with his own eyes and was also deprived of the divine presence of Lord Chaitanya. Nevertheless, the role of the learned Jiva Goswamigives a solid philosophical foundation to Premadharma introduced by Mahaprabhu is in no way insignificant. Along with this, SrijivaGoswami recovered the lost glory of Vrindavanbhoomithrough multifaceted actions. Just like Srirupa, Srisanatana gave a strong philosophical foundation to the Premadharmaof Mahaprabhu, the newer Gaudiya Vaishnava philosophy also endeavoured to give a permanence to the foundation of that religion. No doubt he was successful in this action. His books are Gopalchampu, Shat Sandarbha, Madhava Mahotsava etc. ItexploresGopalachampuand the novelty of the character of Sriradha in the poem andits influence of the same in later Padavali literature. The date of composition ofthis poem is 1588 AD. The theme of the epic poemGopalachampu is the Krishna Lila, as depicted in the tenth skandha of theSrimadBhagavatam.The value of this book is that it is in the form of a philosophy bookas well asSaraskavya. According to GaudiyaVaishnava philosophy, this text proudly asserts the superiority of Krishna, and Vrindavanlila, and the recognition of the superiority of Sri Radha's character over Krishna. Not only this, SrijeevSriradha has introduced two fundamental approachestoexploring Sri Radha's character. Firstly, Sri Radha's social position, and secondly, Krishna's marriage to Sri Radha. From the perspective of these twobasic views, we will try to analyze the mixed spark of Tattva and Rasa by reviewing the role ofheroine Sriradha in the entire Gopalchampu poem.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি ছিলেন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি স্বচক্ষে চাক্ষুষ করেননি ও চৈতন্যদেবের দিব্য সান্নিধ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তথাপিও মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্মকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি দানে পণ্ডিতপ্রবর জীব গোস্বামীর ভূমিকা কোন অংশে তুচ্ছ নয়। এই সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনভূমির লুপ্ত মহিমা উদ্ধার করেছিলেন নানামুখী কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনের মতো-ই মহাপ্রভুর প্রেম ধর্মের আদর্শকে তিনি যেমন সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি দান করেছিলেন, তেমনি নবতর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সমন্বিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করে সেই ধর্মের ভিত্তিকে একটি স্থায়ী অস্তিত্ব দিতেও তৎপর হয়েছিলেন। সন্দেহ নেই এই কর্মে তিনি সর্বতোভাবে সফল হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল - 'গোপালচম্পূ', 'ষট সন্দর্ভ', 'মাধব মহোৎসব' প্রভৃতি। পণ্ডিত জীব গোস্বামীর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে এইসব গ্রন্থগুলিতে। আমার আলোচ্য 'গোপালচম্পূ' - কাব্যের শ্রীরাধা চরিত্রের অভিনবত্ব ও পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের শ্রীরাধা চরিত্রে তার প্রভাব। এ কাব্যের রচনাকাল ১৫৮৮ খ্রিঃ।

সুবৃহৎ কাব্য 'গোপালচম্পূ' - এর বিষয়বস্তু হল শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা। 'গোপালচম্পূ' - কাব্যের দু'টি খণ্ড আছে। পূর্ব খণ্ডের ৩৩টি পূরণে কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও উত্তর খণ্ডের ৩৭টি পূরণে কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত। মূলত দর্শনগ্রন্থ ও সরসকাব্য রূপে এ গ্রন্থের মূল্য অসামান্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে এ গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধা চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সগর্বে সূচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় শ্রীজীব শ্রীরাধা চরিত্র নির্মাণে দুটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত, শ্রীরাধার সামাজিক অবস্থান অর্থাৎ রাধা বৃন্দাবনের ধনী ব্যক্তি বৃষভানুর কন্যা, দ্বিতীয়ত শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন অর্থাৎ এ গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা, পরকীয়া নয়। এই দুই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে-ই সমগ্র 'গোপালচম্পূ' কাব্যে নায়িকা শ্রীরাধার ভূমিকা পর্যালোচনার মাধ্যমেই তত্ত্ব ও রসের মিশ্র স্ফুরণ যে ঘটেছে, তা আমরা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হবো।

মহাকাব্য 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থে শ্রীরাধার জীবন বৃত্তান্ত শ্রীজীব গোস্বামী এক অভিনব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ নামে দুই সূতকুমার-যাঁরা ছিলেন দেবর্ষি নারদের আশীর্বাদপুষ্ট সর্বজ্ঞ, এই দুই সূতকুমার-ই কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে কথকরূপে এই বিশালকায় গ্রন্থের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে-ই শ্রীরাধা চরিত্রের অভিনবত্ব পরিলক্ষিত। অন্যদিকে, কৃষ্ণ ও রাধা দুজনেই আবেগে বিহ্বল হয়ে সূতকুমারদ্বয় কর্তৃক কাহিনি শ্রবণ করেছেন। মহাকাব্য 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের এই অভিনব কাহিনি নির্মাণ নিঃসন্দেহে শ্রীজীব গোস্বামীকে একক স্বাতন্ত্র্য মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। যাইহোক এই অভিনব কাহিনি পরিবেশনের মাধ্যমেই শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্ট শ্রীরাধা চরিত্রের অভিনবত্ব আমরা অবলোকন করব।

'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের পূর্বচম্পূর অন্তর্গত প্রথম পূরণে শ্রীরাধার পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে শুধু শ্রীজীব বলেছেন যে - পদ্মপুরাণ, স্কন্ধপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহদ গৌতমীয় তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্তনুযায়ী শ্রীরাধা-ই গোপিনীবৃন্দের মধ্যে প্রধানা। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে রাধাকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত অতীতের ঘটনার মতো শ্রীজীব গোস্বামী উপস্থিত করেছেন কথকদ্বয় কর্তৃক। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা স্বয়ং উপস্থিত থেকে সেই মধুর কাহিনি আস্বাদন করেছেন।

পূর্বচম্পূর দ্বিতীয় পূরণে দেখা যায়, শ্রীরাধার মধ্যে বংশীধ্বনি শ্রবণজনিত পূর্বরাগ উদয় হয়েছে। প্রথমেই শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার প্রেমিকাসত্তা উন্মোচনে পূর্বরাগ দশা অঙ্কিত করেছেন। শুধু তাই নয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই ব্রজের অন্যান্য নারী অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে অত্যন্ত সুচারুভাবে। এখানে বলরামজননী রোহিনী বলেছেন যে সর্বগুণান্বিতা রাধাকে যশোদা যেন রন্ধনকার্যে অনুমতি প্রদান করেন, সেইসঙ্গে সকল নারীগণ যেন রাধার অনুগতা হয়, শুধু তাই নয় এই পূরণে দেখা যায় রাধার মধ্যে নারী জাতিসুলভ সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমবোধ রাধা চরিত্রকে সাধারণ রমণীর পাশে এনে উপস্থিত করিয়েছে। কৃষ্ণ গোচারণের জন্য বনে গমন করবে, তাই রাধার মধ্যে বিরহজনিত ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। এই ব্যাকুলতা যদি গুরুজন সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে রাধা কি করবেন? এখানেই রাধা সাধারণ নারীর মতোই মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এখানেই দেখা যায়, শয়নগৃহে রাধা কৃষ্ণসংস্পর্শে আসতে লজ্জাশীলা হয়েছেন, পরে অবশ্য

লজ্জাশীলা রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই পূরণে শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার ভূমিকা যেরূপে চিত্রিত করেছেন, তা নিঃসন্দেহে মৌলিকতার গুণে সমৃদ্ধ। কারণ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় যশোদার নির্দেশে রাধার রন্ধনকার্য ও শয়নগৃহে রাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটন বর্ণনার মাধ্যমেই শ্রীজীব গোস্বামী চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্যপরবর্তী সকল পদকর্তার ও বৃন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামীবৃন্দ থেকে নিজের অবস্থানকে স্বতন্ত্র মহিমায় চিহ্নিত করে নিয়েছেন।

এরপরে পূর্বচম্পূর চতুর্দশ পূরণের শেষের দিকে কৃষ্ণের মাধ্যমে রাধার পরোক্ষ উপস্থিতি প্রকাশিত, সেই সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের মধ্যে প্রধানা যে রাধা, তা-ও সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত—

> "অতএব প্রেয়সীদিগের মধ্যে যে প্রধানা, যাহার নাম রাধিকা, বিম্বের মতো যাহার ওষ্ঠ, সখীগোষ্ঠীর মধ্যে যে উপবেশন করিয়া আছে, এই অত্যন্ত সুনিপুণ রস পরিপাটি প্রথমেই বিস্তার কর।"[১]

পূর্বচম্পূর পঞ্চদশ পূরণের প্রথমেই দেখা যায়, উদ্যানভবনে কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে রাধার চিত্তে পূর্বরাগের উদয় হয়েছে। এখানেও রাধার পূর্বরাগ দশার সহায়ক পরিবেশ-যমুনার তীর নয়, উদ্যানভবন। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই কাহিনি বর্ণনে এক নবতর পদ্ধতি শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ রাধা চরিত্র নির্মাণে শ্রীজীব প্রথমে প্রেমিকাসত্তার উন্মোচন প্রসঙ্গে বৃন্দাবনেশ্বরীরূপ শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্বকে তাঁর কাব্যে সূচিত করেছেন - যা গৌড়ীয় দর্শনের মূল সূত্র ছিল। তারপর ঘটনা বর্ণনের ক্রমান্বয়ে শ্রীরাধার জীবনবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উত্থাপিত হয়েছে। দুই কথকের (মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ) কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে কাব্যের নায়িকা চরিত্রের প্রকৃত পরিচয়দানে এরূপ কৌশল নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ও অভিনব। আমরা জানতে পারি, বৃন্দাবনে ধনী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৃষভানুর কন্যারূপে শ্রীরাধা কৃষ্ণের জন্মের পরবর্তী বর্ষে 'অনুরাধা' নামক নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই নক্ষত্র অনুযায়ী রাধার নামকরণ তদ্রূপ হয়েছিল। এরপরে শ্রীরাধা ধীরে ধীরে কিরূপে কৌমার দশা প্রাপ্ত হলেন, তা সম্পূর্ণরূপে এস্থলে বর্ণিত, সেই সঙ্গে রাধার চিত্তে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের উদ্রেকে অপূর্ব নারীমনস্তত্ত্বও নিপুণরূপে অঙ্কিত —

> "কটাক্ষে স্পষ্টই কৃষ্ণবর্ণ আভা, অধর যুগলের অরুণ বর্ণের গরিমা, কপোল যুগলের মধ্যে নির্মলতা, বক্ষঃস্থলে স্তনোদ্রেকের শোভা।"[২]

কিংবা,

> "অমৃত অপেক্ষাও অত্যন্ত আস্বাদযুক্ত 'কৃষ্ণ' এই শব্দ, এই বংশী বাদ্য, কর্ণ পথে প্রবেশ করিলে আমার মনে সহসা পরিচিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। কিন্তু যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, অচিরাৎ সহসা প্রাণবর্গ বহির্গত হইবে।"[৩]

এখানে স্পষ্টতই প্রকাশিত যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাধার দেহঅন্তর কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। বাল্যাবস্থায় রাধা কৃষ্ণকে দর্শন করলেও অনুরূপ ভাবাবস্থা প্রাপ্তা হননি। এরূপ বিজ্ঞানমনস্কতা ও বাস্তবমনস্কতা থেকেই শ্রীরাধা চরিত্র নির্মিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এখানে শ্রীরাধা চরিত্রের সামাজিক ভিত্তি হল তিনি ধনী গৃহের কন্যা, কোন দরিদ্র গোপকন্যা নন - যেখানে চণ্ডীদাসের রাধা গ্রামের অশিক্ষিতা দরিদ্র গোপবধূ। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্ট শ্রীরাধা চরিত্রের সামাজিক ভিত্তি অভিনবত্ব গুণে সমৃদ্ধ। এরপরে দেখা যায়, রাধা বিবাহযোগ্যা হলে গুরুজনবর্গ যখন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে পাত্রস্থ করবেন চিন্তা করেন, তখন রাধা প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করলেন। এই সঙ্গে অন্যান্য গোপিনীবৃন্দও তা স্থির করলেন। কিন্তু এক দৈববাণী তাঁদের সকলকে প্রাণত্যাগ থেকে বিরত করে।

ষোড়শ পূরণে শ্রীরাধা অনুপস্থিত। সপ্তদশ পূরণে দেখা যায়, প্রেমিকা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমপূর্ণ বিবিধ ভাবাবেশ। তবুও পৌর্ণমাসীর আদেশক্রমে রাধাসহ ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য পুরুষকে বিবাহ করে বিবাহিত জীবন গ্রহণ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা তীব্র অন্তর্দাহে জর্জরিতা হয়েছেন। এরপর কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রতিটি অংশে শ্রীরাধার প্রেমব্যাকুলতা অপূর্বরূপে প্রকাশিত - যা কৃষ্ণের লীলাকেন্দ্রিক অন্যান্য ভূমিকাকেও যেন নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। যেমন- গোবর্ধন পর্বত ধারণকালীন (অষ্টাদশ পূরণ) কৃষ্ণের বিলম্বের জন্য শ্রীরাধার অসীম প্রেমব্যাকুলতা, বিংশ পূরণে কৃষ্ণের বরুণলোকে গমন নন্দরাজকে আনয়নের জন্য তখন রাধার শরীর শ্বশুরগৃহে অবস্থানকরলেও চিত্ত পরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে ধাবিত হয়েছিল কৃষ্ণের প্রতি। একবিংশ পূরণে কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ লীলাতেও বাহ্যজ্ঞানশুন্যা রাধার জ্ঞান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আনয়নে সচেষ্ট হলেন পৌর্ণমাসী ও মধুমঙ্গল, অবশেষে কৃষ্ণকে লাভ করে শ্রীরাধা শান্ত হলেন, এস্থলে শ্রীরাধার কঠোর মান ভঞ্জন করেছিলেন কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণ চলে গেলে রাধার বিরহব্যাথা পূর্ববৎ থেকে গেল। ত্রয়োবিংশ পূরণে সংঘটিত কৃষ্ণের রাসলীলায় অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাগণ সক্রিয়রূপে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাধা এখানে প্রত্যক্ষরূপে অনুপস্থিত। এখানেও শ্রীজীব অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। রাসলীলায় শ্রীরাধা প্রত্যক্ষরূপে অংশগ্রহণ না করেও বিরহব্যাথায় ব্যথিতা রাধিকাকে দর্শন করে কৃষ্ণ ব্যথিত। প্রকৃতপক্ষে এখানে রাধচরিত্রের উৎকর্ষ প্রকাশের জন্যই কৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাবর্গের সঙ্গে রাসলীলায় নিযুক্ত হয়েছেন। তাই চতুর্বিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধিকাকে নিয়ে লুক্কায়িত হয়েছেন –

> "সুতরাং সকল গোপীর সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত নিখিল গুণাধিক্য রাধিকাকে লইয়াই আমি অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান করিব।"[৪]

এখানেই শ্রীরাধার মুখ্য ভূমিকা পরিস্ফুট। এখানেও কৃষ্ণ ও রাধা পরস্পর পরস্পরের প্রতি মান প্রকাশ করেছেন।

সপ্তবিংশ পূরণে যমুনায় জলকেলিলীলা বর্ণিত আছে। এখানেও রাধা কৃষ্ণকে পরাজিত করেছেন, কৃষ্ণ রাধার অনুগামী হয়েছেন।

ঊনবিংশ পূরণে কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা প্রেমের ক্ষেত্রে মানিনী থেকে অভিসারিকাতে উত্তরণ করেছেন। এখানেও রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর সম্পর্ক নিয়ে পুনরায় মান প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় মানসিকভাবে বিপর্যস্তা রাধা যখন নিজের চিত্তকে আশ্বস্ত করেছেন, তখন সখীগণ কর্তৃক কৃষ্ণনিন্দায় তিনি বাধা দিয়েছেন। অথচ নির্জনে একাকী রাধা অনুশোচনায় দগ্ধা হয়েছেন, এখানেই রাধা কলহান্তরিতা নায়িকা হয়েছেন। এই পূরণে রাধার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল - তিনি সখীকে প্রেরণ করেছিলেন কৃষ্ণের বংশী হরণের নিমিত্তে, কিন্তু সখী বংশী হরণ করতে পারেনি। শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণপ্রেমের বিবিধ স্তর অতিক্রম করছেন, তখন তাঁর সামনে আরো কঠিন বাধা উপস্থিত হল। পরিবারের-সমাজের রক্তচক্ষু, নিন্দার বাধার জন্য রাধা গৃহ মধ্যে বন্দী হলেন। এই কঠিন সময়ের মধ্যেই রাত্রিকালে কৃষ্ণ বিবিধ বেশ ধারণ করে রাধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে এরূপ অভিনব পন্থা অবলম্বন চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে বিরলদৃষ্ট ছিল।

ত্রিংশ পূরণে বর্ণিত হোরিকাযুদ্ধেও কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একত্রিংশ পুরণেও রাধিকার উৎকর্ষ স্থাপিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণ কর্তৃক অরিষ্টাসুর বধ, কৃষ্ণ কর্তৃক শ্যামকুণ্ড সৃষ্টি, এসব কর্মসম্পাদনের মধ্যেও শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে –

> "যেরূপ রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, সেইরূপ কুণ্ডও রাধিকার প্রিয়। সকল গোপীগণের মধ্যে সেই একমাত্র রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেয়সী ছিলেন।"[৫]

দ্বাত্রিংশ পুরণে রাধা অনুপস্থিত। ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে শ্রীরাধা পরোক্ষভাবে উপস্থিত হয়েও তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত –

> "এই বৃন্দাবন সরোবরের তুল্য। ইহাতে ললিতা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজলক্ষ্মীগণ যেন বিকশিত পদ্মপংক্তির তুল্য, ইহাদের মধ্যে একমাত্র রাধিকাই সকলের শ্রেষ্ঠ।"[৬]

কাজেই দেখা যাচ্ছে, 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের পূর্বচম্পূর পূরণগুলি অবলম্বনে শ্রীরাধার ভূমিকা কৃষ্ণের মতো অতটা সক্রিয় না হলেও গোস্বামীপ্রবর শ্রীজীব কিন্তু সুকৌশলে শ্রীরাধা চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকে পুন পুন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু তাই নয়, রাধার মানবী তথা প্রেমিকাসত্তা বিকাশের স্তরগুলি অঙ্কনের মাধমেই রসের স্ফূরণ ঘটেছে। ফলে তত্ত্ব ও রস যুগপৎ প্রকাশিত হল।

পরবর্তী উত্তরচম্পূর প্রথম পূরণে শ্রীরাধার পরোক্ষ উপস্থিতি বর্ণিত। তবে পূরণ শেষে দেখা যায়, রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে শয়নগৃহে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পূরণে দেখা যায়, রাধা প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত থেকে কথক কর্তৃক পূর্বের বিরহবৃত্তান্ত শ্রবণ করেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। পরে অবশ্য অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনা বলে শ্রীরাধা নিজেকে সংবরণ করে শান্ত হয়েছেন। তৃতীয় পূরণে দেখা যায় কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা বিরহবার্তা উপশম করার এক অভিনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন –

> "তৎকালে প্রবল সুশীতল নয়ন পতিত জলবিন্দু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দ যুগলকে মস্তকদ্বারা সেবা করিয়া বহুক্ষণ অভিষিক্ত করিলেন।"[৭]

পরবর্তী চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম পূরণগুলিতে দেখা যায় মথুরা যাত্রার পূর্বে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বিরহিনী শ্রীরাধার বিবিধ ভাববিকার পরিলক্ষিত। এই বৃত্তান্ত যদিও অতীতের, তবুও কথকদ্বয় কর্তৃক তা শ্রবণ করেই শ্রীরাধা বার বার অতীত ও বর্তমানের পরিস্থিতি বিস্মৃতা হয়ে ব্যাকুলা হয়ে পড়েছেন। এখানে স্পষ্টতই রাধার এই দিব্য ভাব তুলনীয় মহাপ্রভুর দিব্য উন্মাদ দশার সঙ্গে।

একাদশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা প্রেমের ক্ষেত্রে কলহান্তরিতা নায়িকা হয়েছেন। তিনি এখানে এক ভ্রমরকে দূতরূপে ভেবে তার প্রতি নানা তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করেছেন –

> "ওরে ধূর্ত মিত্র! কেন তুমি এইস্থানে সরল প্রকৃতির মত স্বচ্ছন্দভাবে আগমন করিতেছ। এক্ষণে দূরে গমন কর। আমি ধূর্তের বন্ধু নয় এবং স্বয়ং আমার ধূর্ততাও ঘটিতে পারে না। এই কারণে সম্যকরূপে ছল অবলম্বন করিও না।"[৮]

এখানে রাধা প্রকৃত-ই দিব্য উন্মাদদশা প্রাপ্তা হয়েছেন।

দ্বাদশ পূরণে দেখা যায়, উদ্ধবকে রাধার উক্তিতে কৃষ্ণের প্রতি শুভচিন্তকমনোভাব প্রতিফলিত –

> "শ্রীকৃষ্ণের কথা যেরূপ তুমি আমাকে সহসা বলিয়াছ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদিগের রূপ সহসা বলিও না। কারণ আমি বজ্রতুল্য কঠিন, অর্থাৎ ঐরূপ বাক্য শুনিলেও আমার প্রাণ নির্গত হয় নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই নবনীতের মত কোমল। অর্থাৎ আমাদের এইরূপ দুরবস্থা শ্রবণ করিলে শীঘ্রই ক্ষীণ হইয়া পড়িবেন।"[৯]

এরপর কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেও শ্রীরাধা সর্বদাই কৃষ্ণের জন্য নানা দুশ্চিন্তায় কাতরা হয়েছেন, যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত হয়েছে। ত্রয়োদশ পূরণে এটিই বিবৃত হয়েছে।

চতুর্দশ পূরণে শ্রীরাধার সক্রিয় ভূমিকা অনুপস্থিত। পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ পূরণে শ্রীজীব গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ক্ষেত্রে এক মৌলিক বিষয় সংযোজিত করেছেন। এরই মাধ্যমে শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্ট শ্রীরাধা চরিত্র চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যউত্তর বিবিধ পদকর্তা, বৃন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামীবৃন্দ নির্মিত শ্রীরাধা চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আছেন। মৌলিক বিষয়টি হল – কৃষ্ণ মথুরায় অবস্থান করে রাধার সঙ্গে পত্র মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। সেই পত্রেরই উত্তর দিয়েছেন রাধা এইভাবে –

> "তুমি কুঞ্জ করিবার জন্য যেসকল মাধবী লতাদিগকে পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছ, আমরা তাহাদিগকে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শীতল জল দ্বারা সেক পাইয়াও আমাদের ত্বদিয় বিরহজনিত উষ্ণ নেত্রজলে পুনর্বার শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।"[১০]

রাধিকার এই পত্রের উত্তরেও নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা প্রকাশিত। অন্যদিকে দেখা যায়, মথুরায় অবস্থানকালীন কৃষ্ণের জীবনের বিবিধ কর্তব্যকর্মের মধ্যেও কৃষ্ণ যন্ত্রণাদীর্ণ হয়েছেন বৃন্দাবনের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করে –

> "আমি এই প্রবাসে যে যে বাহ্যিক বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি তৎসমুদয়ই বাহ্য বলিয়া বিবেচনা কর। কিন্তু আহা! অন্তরে সেই তোমার সেই আমি পরস্পরেই কেলি করিতেছি।"[১১]

এখানে প্রকাশিত কৃষ্ণের জীবনে রাধাই একমাত্র জীবনওষধি স্বরূপ। তাই বিচিত্র কর্ম কোলাহলের মধ্যেও কৃষ্ণের অন্তরে সর্বক্ষণ রাধার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এইখানেই রাধাচরিত্রের সক্রিয়তা গভীরতর অর্থে তাৎপর্যযুক্ত।

পরবর্তী ত্রয়োবিংশ পূরণে দেখা যায়, রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব ভিন্ন মহিমায় পরিবেশিত অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের মহিষীগণই রাধার অপূর্ব অসীম কৃষ্ণপ্রেমের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন।

সপ্তবিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ পত্রমাধ্যমে রাধাসহ ব্রজাঙ্গনাগণকে ব্রজে ফেরার আশ্বাস প্রদান করেছেন। এখানেই শ্রীজীব মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিশ্বাসেই শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বিশেষত শ্রীজীব কর্তৃক শ্রীরাধা-চরিত্র এক অভিনব গুণে মণ্ডিত হয়েছে। ত্রিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে প্রত্যাগমন করেছেন। এ কথা শ্রবণ করেই শ্রীরাধা নানাবিধ ভাববিকারে আক্রান্তা হয়েছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরবর্তী একত্রিংশ থেকে উত্তরচম্পূর পঞ্চত্রিংশ পূরণ পর্যন্ত কৃষ্ণরাধার বিবাহ-আয়োজন, বিবাহ সম্পন্ন প্রভৃতি ঘটনাবলী শ্রীজীব সৃষ্টি করেছেন। এই অভিনব বিষয় সৃষ্টি করে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি একক স্বাতন্ত্র্য মহিমায় আসীন হয়ে আছেন। একত্রিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার বিবাহ নিরূপণে পৌর্ণমাসীর পরামর্শ গ্রহণে কৃষ্ণ দ্বিধাগ্রস্ত। পৌর্ণমাসী নানারূপ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা বিবাহের ব্যাপারে কৃষ্ণের সম্মতি আদায় করলেন। এস্থলে রাধা প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর একটি উজ্জ্বল প্রভাব অবশ্যই আছে। অন্যদিকে রাধার সংশয়ও পৌর্ণমাসী এইভাবে দূর করেছেন —

> “তোমার পিতার নাম বৃষভানু, তোমার মাতার নাম কীর্তিদা। নন্দরাজের পত্নী তোমার শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) বিশাখাদি সখীগণের সহিত ললিতা প্রভৃতি তোমার সহচরী। শ্রীকৃষ্ণ যেসকল কাননে বিহার করিতেন, সেই সকল বনশ্রেণী তোমার বাসস্থান। শ্রীকৃষ্ণই তোমার সর্বদা পতি।”[১২]

পরবর্তী ত্রয়োত্রিংশ পূরণে বিবাহে শ্রীরাধার অভিষেক বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমূহ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রীজীব গোস্বামী সামাজিক রীতিনীতিকে যথেষ্টরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাছাড়া দেখা যায়, এখানে রাধার বার বারই অবিশ্বাসের ছায়ায় অর্থাৎ কৃষ্ণ হয়ত তাঁকে বিবাহ করবেন না, এই মনোভাবের বশবর্তিনী হয়েছেন। তবে পরক্ষণে রাধার সেই ভ্রম দূরীভূত হয়েছে। চতুত্রিংশ পূরণে বর্ণিত হয়েছে বিবাহের জন্য সজ্জিতা শ্রীরাধার নানা অলংকারাদির বর্ণনা। এই অবস্থায় তিনি পুনরায় কৃষ্ণভাবিতা হয়েছেন। পঞ্চত্রিংশ পূরণে বর্ণিত হয়েছে সেই অভিনব বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধার বিবাহ প্রক্রিয়া। এই পূরণে বিবাহের সমূহ আচার অনুষ্ঠান পালনে শ্রীরাধার সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত। যেমন - বরের আগমন সূচক বাদ্যধ্বনি শ্রবণেই রাধা কম্পিতা হলেন। তৎপরে রাধাকে সপ্ত প্রদক্ষিণ করিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশন করানো হল। এরপরে শুভদৃষ্টি, খৈ আহুতি প্রভৃতি সকল মাঙ্গলিক কর্ম রাধার মাধ্যমে সম্পন্ন হল। বিবাহ শেষে রাধা গোপরাজকে প্রণাম করলেন। শ্বশুরগৃহে গমনের পূর্বে পিতা বৃষভানু রাধাকে উপদেশ দিলেন, যেন রাধা শ্বশুরবাড়ির সমূহ রীতিনীতি মেনে চলেন। অবশেষে শ্রীরাধা বহুকাঙ্ক্ষিত গোপরাজের গৃহে নববধূবেশে উপস্থিত হলেন, যশোদা রাধিকাকে বধূরূপে গ্রহণ করলেন। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামীই রাধিকাকে স্বকীয়া নায়িকারূপে অঙ্কন করে চূড়ান্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরবর্তী ষড়ত্রিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধার অনুরোধে রাধারবেশ ধারণ করে অন্যান্য গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এখানে রাধার মধ্যে নারীসুলভ স্বভাবজনিত ঈর্ষা তো নেই-ই উপরন্তু রাধা এক মহত্ত্বর মহিমায় মহিমান্বিতা হয়ে আছেন। অর্থাৎ বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধা চরিত্রের উৎকর্ষ প্রকাশিত।

সমগ্র ‘গোপালচম্পূ’ গ্রন্থের পূর্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ অংশের অন্তর্গত প্রতিটি পূরণ অবলম্বনে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতিতে স্বকীয়া নায়িকারূপে অঙ্কিতা হয়েছেন যা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য ধারায় নিঃসন্দেহে অভিনব সংযোজন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামী একক স্বাতন্ত্র্য মহিমায় মহিমান্বিত। সর্বোপরি শ্রীজীব অঙ্কিত শ্রীরাধার সামাজিক অবস্থান বৃন্দাবনে ধনী ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৃষভানুর কন্যারূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ, রাধা-চরিত্রের এই সামাজিক অবস্থানের সূত্রটি চৈতন্য পরবর্তী ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যেও গৃহীত হয়েছে। যেমন জ্ঞানদাসের রাধা গর্বিতা ভঙ্গিতে বলেছেন —

> “আমি রাজনন্দিনী ভাল মন্দ নাহি জানি
> নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।”[১৩]

কিংবা গোবিন্দ দাসের রাধা বলেছেন —

> “এই মনে বনে দানী হইয়াছ
> ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
> রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
> কিসের রভস রঙ্গ।”[১৪]

সপ্তদশ শতাব্দী, অষ্টাদশ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে অঙ্কিত শ্রীরাধা চরিত্র অনুরূপভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ চরিত্র হয়ে উঠেছে। যেমন — দীনবন্ধু দাস, নিমানন্দ দাস, উদ্ধব দাস, শশিশেখর - এঁরা সকলেই শ্রীরাধাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। দীনবন্ধু দাসের রাধা বলেছেন —

"রাজকন্যা আমি কংসের যোগানি
মথুরা নগর কাছে।"[১৫]

আবার, দীনবন্ধু দাস রাধার জন্মকথা 'গোপালচম্পূ' অনুসরণে বিবৃত করেছেন —

"আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী দিনার্ধের কালে।
অনুরাধা নক্ষত্র হইল সেই বেলে।।
শুভদিন দশ দিশ ভেল সুপ্রকাশ।
সভাকার অন্তরে আনন্দ অভিলাষ।।
হেন কালে কীর্তিদা পরম কুতূহলী।
প্রসবিল কন্যা নাম রাধিকা সুন্দরী।।"[১৬]

এখানেই শেষ নয়, দীনবন্ধু দাসের রাধা স্বকীয়া নায়িকা রূপে ভূমিকা পালন করেছেন 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থ অনুসরণে। অর্থাৎ তাঁর রাধা কৃষ্ণের গৃহে গমন করে রন্ধন করেছেন, কৃষ্ণকে ভোজন করিয়েছেন। এছাড়া চৈতন্য পরবর্তী যুগে বাংলা বৈষ্ণব পদকর্তারা শ্রীরাধার শিশু অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বয়ঃবৃদ্ধির স্তরগুলি সুনিপুণরূপে অঙ্কন করেছেন। এই বিষয়টি 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থেও বিদ্যমান। সর্বোপরি বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক বর্ণনা চৈতন্যউত্তর যুগের বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সহকারে সম্পন্ন করেছেন। যেমন - পদকর্তা চন্দ্রশেখর এইরূপই চিত্র অঙ্কন করেছেন —

"রাইক নরপতি বেশ বনায়ত
কুসুম-বিপিনে হরি-রায়।
কাঞ্চন ছত্র দণ্ড তারে দেওল
নিজ করে চামর ঢুলায়।।
সখি হে দেখ দেখ রাইক ভাগি।
কার অভিষেক যমুনা জল সুশীতল
চলিতহি অনুমতি মাগি।।"[১৭]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থে শ্রীরাধা চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে অভিনব বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করেছেন, সেগুলি হল- রাধার সামাজিক অবস্থান সূচিতকরণ, স্বকীয়া নায়িকা রূপে প্রতিস্থাপন, বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধার অভিষেক সম্পাদন ও কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উৎকর্ষতা নিরূপণ। এই বিষয়গুলি-ই পরবর্তী বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধা চরিত্রের ভূমিকায় অনুসৃতি সুপষ্টরূপে পরিস্ফুট।

পরিশেষে বলা যায়, বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামী-ই শ্রীরাধা চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রে মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন, এর-ই প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৃহৎ গ্রন্থ 'গোপালচম্পূ' - এর শ্রীরাধা চরিত্র। তবে একই সঙ্গে শ্রীরাধা চরিত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারী তত্ত্বমুখী ও কৃষ্ণের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হলেও শ্রীরাধা কিন্তু কখনোই সজ্ঞানে কৃষ্ণকে অতিক্রম করেননি। এইখানেই রাধা চরিত্র তত্ত্বকেন্দ্রিক হলেও এক মানবিক মহত্ত্বর মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। সর্বোপরি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীরূপে শ্রীরাধার দাম্পত্য জীবন নির্বাহ রাধা চরিত্রকে মৌলিকতা গুণে মণ্ডিত করেছে। তাই বলা যায় 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের নায়িকা শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতিতে স্বকীয়া নায়িকারূপে উদ্ভাসিতা এবং এই উদ্ভাসনে উজ্জ্বল পরবর্তী পদাবলীর শ্রীরাধা-চরিত্র। একইসঙ্গে নারীমনস্তত্ত্ব, প্রেমমনস্তত্ত্ব উপাদানের সমন্বয়ে শ্রীরাধা তত্ত্ব ও মানবীয় রসের মিশ্রিত জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. গোস্বামী, শ্রীজীব, *গোপালচম্পূ*, (সম্পাদনা- শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ), প্রথম সংস্করণ, মহেশ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ-১৪০৩, পূর্বচম্পূ, পৃ. ৫৮৫
২. তদেব, পৃ. ৬২৭
৩. তদেব, পৃ. ৬২১
৪. তদেব, পৃ. ১০৫০
৫. তদেব, পৃ. ১৩৩৫
৬. তদেব, পৃ. ১৫২২
৭. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ১০৫
৮. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৩৬৮
৯. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৪৫১
১০. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৪৫৫
১১. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৭২৫
১২. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ১২১৪
১৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৬১, পদসংখ্যা ১৫৩, পৃ. ৪২৪
১৪. তদেব, পদসংখ্যা ২২১, পৃ. ৬৫১
১৫. তদেব, পদসংখ্যা ৯৫, পৃ. ৯৯৯
১৬. তদেব, পদসংখ্যা ১৩, পৃ. ৯৭৮
১৭. তদেব, পদসংখ্যা ৫১, পৃ. ১০৪৪

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

গোস্বামী, শ্রীজীব, *গোপালচম্পূ*, (সম্পাদনা- শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ), প্রথম সংস্করণ, মহেশ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ-১৪০৩
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬১

সহায়ক গ্রন্থ :

খান, লায়েক আলি, *প্রসঙ্গ- বৈষ্ণব সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, প্রতিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪০২
গিরি, সত্য, *বৈষ্ণব পদাবলী*, প্রথম সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৪০১
গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, প্রথম সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৮
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শন ও সাহিত্য*, চতুর্থ সংস্করণ, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৮০
মজুমদার, বিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*, প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৬৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 81 - 87
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধুসূদনের সনেটে রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলীর প্রভাব প্রসঙ্গ

অরূপ কুমার রায়
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স
Email ID : kumararup93@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Kirtivas, Sitadevi, valmiki, mahabharat, subhadra, godayudha, urbashi, dusashan, srimonter topor, annopurnar jhapi, bijoya dashami, aswin mas.

Abstract
Madhusudan wrote the first sonnets in Bengali and perhaps his sonnets are still considered to be the best sonnets written in Bengali. His Chaturdaspadi Kavitavali was published in Granthkara in 1866. The book contains more than 100 sonnets and the sonnets describe different subjects. The sonnets are filled with strange and multifarious themes as the memory of Madhusudan's lost days unfolds. There are rivers, villages, Ramayana, Mahabharata, Kalidasa, Kavikankan, Bharatachandra, Vidyasagar through which the identity of his native soul can be found. Several of his sonnets have references to Ramayana, such as Kirtivas, Sita Devi, Sita - Banvase, Valmiki etc. Notable among his sonnets in which the context of Mahabharata appears are Kashiramdas, Mahabharata, Subhadraharan, Gogriha-rane, Gada Yudha, Subhadra, Urvashi etc. Besides, Mukundaram Chakraborty's Chandimangal poetry is influenced in his Kamale Kamini, Srimant's Topar sonnets and Bharatchandra's Annadamangal poetry is influenced in Annapurna's Jhampi and Ishwari Patni sonnets. Shaktpadavali is influenced by his Vijaya Dasami and Ashwin mas sonnets. As Madhusudan has portrayed mythological stories and characters through these sonnets, we can easily understand the special pull of his heart towards mythological stories by reading his sonnets.

Discussion

মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন এবং সম্ভবত তাঁর রচিত সনেটগুলিই এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত সর্বোত্তম সনেটরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। ১৮৬৫ খ্রীঃ নির্বান্ধব প্রবাস জীবনে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েই সম্ভবত নিজের আত্মার মুখোমুখী দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ রচিত হয় ‘চতুর্দ্দশপদী কবিতা’ বা সনেট। নিজের আপনজনকে, দেশকে, জাতিকে যথার্থভাবে জানতে হলে বোধহয় একটু দূর থেকেই দেখতে হয়; হিমালয়ের বুকে বসে হিমালয়ের বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র দূর থেকে দেখলেই তার সমগ্রতার বোধ আসে। তেমনি মধুসূদনও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দূর প্রবাসে অবস্থানকালেই স্বদেশ স্বজনের স্মৃতিতে উদ্বেল হয়ে তার যথার্থ মূল্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। অবশ্য সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনার হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর স্বদেশে থাকতেই, সম্ভবত মাতৃভাষায় কাব্য রচনার প্রারম্ভেই। ১৮৬৬ সালে মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' কলকাতায় গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ১৮৬৫ সালে বাংলা কথা সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়। একটি বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং অন্যটি মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। আর এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীই হল মধুকবির কবিজীবনের পূর্ণাহুতি। তাঁর রচিত সনেটে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলীর প্রভাব।

তাঁর 'কৃত্তিবাস' সনেটটিতে কৃত্তিবাস ওঝার প্রভাব আছে। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। কবি মধুসূদন নিজেও সর্বপ্রথম এই কাব্য থেকেই রামচরিতের স্বাদ গ্রহন করেছিলেন। তিনি নিজেও রামায়নের একাংশ নিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেছেন। এই সনেটটিতে তিনি কবি কৃত্তিবাসের বন্দনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মহাকবি কৃত্তিবাসের যে মহিমাময় স্থান এবং মাইকেলের কাছে কৃত্তিবাসের যে ঋণের বহর তা সনেটটিতে ফুটে উঠেছে। সনেটটিতে মধুসূদন বলেছেন, কৃত্তিবাস নামটি শুভক্ষনেই দেওয়া হয় কবিকে, এমন সার্থক নাম আর হয় না –

"জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে, ..."[১]

কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, কীর্তির এমন চির-অধিষ্ঠান যে এই নামে ঘটবে, এটা বুঝেই যেন কৃত্তিবাস নাম দেওয়া হয়েছিল। কৃত্তিবাসের কাব্যের মাধুর্য এমন অপরিসীম যে, কবি মনে করেছেন যে সরস্বতী নিজেই যেন তাঁকে রামায়নের কথা বলে দিয়েছেন এবং কবি তা লিখে নিয়েছেন। এছাড়া মধুসূদন রামায়নের কাহিনী থেকে কল্পিত উপমা দিয়ে কৃত্তিবাসের কাব্যের মাধুর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। হনুমান যেমন অশোকবনে বন্দিনী সীতার সংবাদ রামের কাছে বর্ণনা করেছেন, কৃত্তিবাসও তেমনি বাঙালীর কাছে রামনাম গান করেছেন।

মধুসূদনের 'সীতা দেবী' সনেটটিতে রামায়নের প্রভাব আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'তে মধুসূদনের হাতে রামায়ণের রাম-চরিত্র অপেক্ষা রাবন চরিত্র উজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু তাঁর কবি হৃদয়ের কারুণ্যের অনেকখানি জায়গা মুড়ে আছে সীতা চরিত্রটি। তাই চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনাকালে অশোক কাননে বন্দনী-সীতার কথা কবি ভুলতে পারেননি এই চরিত্রের মাধুর্য্যের স্মৃতি তাঁর মনকে আলোকিত করায় আলোচ্য সনেটে তিনি সীতার একটি কারুণ্য মণ্ডিত স্মৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন–

"অনুক্ষণে মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহী! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতী, অশোক, কাননে, ..."[২]

এছাড়া তাঁর 'সীতা-বনবাসে' সনেটটিতে রাময়নের সীতা চরিত্রের ছায়া আছে। সনেটটিতে কবি সীতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমর্ত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। সীতা চরিত্রের দুঃখ, বিচ্ছেদ, বেদনার যে নির্ঝর তিনি প্রবাহিত করেছেন তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। কবিতায় রাবণের দ্বারা সীতা হরণকে তিনি রাবণের মূঢ়তা বলেছেন এবং রাক্ষসের এই বিড়ম্বনাতেই যে রাক্ষস বংশের পতন হয়েছে ভর্ৎসনা বাণীও উচ্চারণ করেছেন।

'বাল্মীকি' সনেটটিতেও মধুসূদনের পুরাণপ্রীতি রয়েছে। কথিত আছে যে, রামায়নের রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন, তাঁর নাম ছিল রত্নাকর। একদিন নারদের সাঙ্গে ব্রহ্মা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রত্নাকর যে বনে দস্যুবৃত্তি করতেন, সেই বনে গিয়েছিলেন। রত্নাকর তাঁকে বধ করে ধন লুণ্ঠন করতে চাইলে অপর কেউ তাঁর এই নরহত্যা পাপের অংশ গ্রহন করবে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। রত্নাকরের পরিজনবর্গ কেউ তাঁর পাপের অংশভাগী হতে স্বীকার না

হওয়ায় রত্নাকর দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে, তপস্যায় নিমগ্ন হন। এরপর ব্রহ্মার বরে কবিত্বশক্তি লাভ করে, তিনি রামায়ণ রচনা করেন। মধুসূদন এই প্রাচীন উপাখ্যানটি স্বপ্নে দেখা কাহিনী রূপে বর্ণনা করে এই সনেটটি রচনা করেন –

"স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব একজন
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ
দ্রোণ যেন ভয় শূণ্য কুরুক্ষেত্র রণে।"[৩]

মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র অনেক কবিতাতে মহাভারতের প্রভাব আছে। যেমন - কাশীরাম দাস, মহাভারত, সুভদ্রাহরণ, গদা-যুদ্ধ, গোগৃহ-রণে, সুভদ্রা, উর্বশী, দুঃশাসন, হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু ইত্যাদি সনেট। রামায়ণের মতো মহাভরতও মধুসূদনের অতিশয় প্রিয় ছিল। তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব' বা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র বিষয়বস্তু মহাভারত থেকেই গৃহীত হয়েছে। ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের কথা কবি মধুসূদনের স্মৃতিপটে নানাভাবে উদিত হয়েছে। 'মহাভারত' সনেটটির মধ্য দিয়ে মধুসূদন এখানে তাঁর বিচ্ছিন্ন ভবনার এক অস্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করেছেন। সনেটটিতে অল্প কয়েকটি ছত্রে মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রকে আমাদের মানসপটে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। মহাভারতের চারজন মহাবীর দুর্যোধন, ভীম, কর্ণ ও অর্জুনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সনেটে কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘোর নির্ঘোষের কথা স্মরণ করেছেন। পবনপুত্রের পবন-গতির কথা কবি বিশেষভাবে স্মরণ করে দিয়েছেন। এছাড়া আছে পাণ্ডবগণ যখন মৎসরাজ্যে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন সুশর্মা মৎসদেশ আক্রমণ করলে বিরাটরাজ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান। এই অবসরে কৌরবগণ বিরাটরাজের অসংখ্য গাভী হরণ করে। এরপর বিরাট রাজপুত্র উত্তর বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথী করে কৌরবদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার করতে যান, কিন্তু অসংখ্য কুরুসৈন্য দেখে ভয়ে কম্পমান হন।

'কাশীরাম দাস' সনেটে কবি মধুসূদন অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা অনবদ্য। তিনি বলেছেন 'ভারত রস' ঋষি দ্বৈপায়ণ সংস্কৃত ভাষায় যে মহাভারত রচনা করেছিলেন, তা যেন ছিল শিবের জটাজলে আবদ্ধ জাহ্নবীর মতোই স্রোতহীন। স্রোতহীন কারণ সংস্কৃত ভাষা সকলের পক্ষে অধিগম্য নয়। তাই তা হ্রদের মতোই বিস্তৃত অথচ তরঙ্গ গতিহীন। সাধারণ বাঙালীর প্রাণে তাই সে মহাভারতের তৃষ্ণা জেগে থাকতো। কবিশ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাস সেই সংস্কৃত হ্রদে আবদ্ধ মহাভারতকে বাংলায় ভাষান্তর করে তাকে যেমন গতিময় করে তুলেছেন, তেমনি ভারত রসের স্রোতে গৌড়বঙ্গের তৃষ্ণা মিটিয়ে বঙ্গবাসীকে পবিত্র করে তুলেছেন মহাভারতের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। তাই তিনি মহাভারতের শ্রোতাদের 'পুণ্যবান' বলে অভিহিত করেছেন। মধুসূদন এই জন্যই তাঁর সনেটে কবিস্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন–

"হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান।"[৪]

মহাভারতের কাহিনীর অনেকগুলি চিত্রই মধুসূদনের কবি কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ মহাভারতের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। গদাযুদ্ধের প্রসঙ্গে এই দুই বীরের যুদ্ধের কথাই মনে আসে। কবি মধুসূদন এই দুই বীরের দ্বৈপায়ন হ্রদের কাছে গদাযুদ্ধের একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করে 'গদা-যুদ্ধ' সনেটটি রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা খুবই কম। বিশেষত আয়তনে ছোট কবিতায় যুদ্ধ বর্ণনা খুব একটা নেই। মধুসূদনের এই কবিতাটি যুদ্ধ বর্ণনা বিষয়ক কবিতার সার্থক নিদর্শন।

মহাভারতের বিরাট পর্বের গোগৃহের কথাকে অবলম্বন করেই মধুসূদন 'গোগৃহ-রণে' সনেটটি রচনা করেছেন। অর্জুন যে একাকী বিরাট কুরুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং সেই যুদ্ধে কৌরবদের বিপর্যস্ত করে দিয়ে গোধন মুক্ত করেছিলেন। এই ঘটনাটি মধুসূদনের কল্পনা আকর্ষণ করেছিল। এখানে তিনি বিশেষভাবে অর্জুনের এই বীরত্বকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সুভদ্রা' সনেটটির মধ্যে মধুসূদন যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন, তা কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতে সুভদ্রা হরণের আগেই সত্যভামার পরামর্শে সুভদ্রা ও অর্জুনের গোপন গান্ধর্ব

বিবাহের কথা আছে। অর্জুন প্রিয়সখা কৃষ্ণের গৃহে অবস্থানকালে তাঁর বোন সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হন, সুভদ্রাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। একদিন রাত্রে সত্যভামা সুভদ্রাকে নিয়ে এসে তাঁদের গান্ধর্ব বিবাহের আয়োজন করেছেন, আলোচ্য সনেটটিতে কবি সেই ঘটনাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'উর্বশী' সনেটটির চিত্রও মহাভারত থেকে সংকলিত হয়েছে। অর্জুন যখন অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এরপর ইন্দ্র উর্বশীর প্রতি অর্জুন অনুরক্ত মনে করে উর্বশীকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অর্জুন তাঁকে গুরুস্থানীয় জ্ঞান করে প্রত্যাখান করেন। উর্বশী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে অর্জুনকে বর্ষাকালে ক্লীবরূপে অবস্থান করার অভিশাপ দেন। এরপর অর্জুন বিরাট নগরে নপুংসক বেশে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষকরূপে অজ্ঞাতবাস করেন। এই কাহিনীটিই মধুসূদন আলোচ্য সনেটে ফুটিয়ে তুলেছেন। মধুসূদন মূলত বীর রসের কবি। কিন্তু শৃঙ্গার ও বীর রস সৃষ্টিতেও তার বীণার তার ঝংকৃত হয়েছে। তার উর্বশী সনেটটিতে ষট্কবন্ধ সবচেয়ে স্বার্থক হয়েছে –

"উন্মদা মদন মদে কোহিলা উর্বশী;
কামাতুরা আমি নাথ তোমার কিঙ্করী
সরের সুকান্ত দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে; অধর দিয়া অধর পরশে,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"[৫]

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'দুঃশাসন' সনেটটিতে মধুসূদন রৌদ্র রসাশ্রিত বীভৎস রসের পরিচয় দান করেছেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশ ধরে কৌরব সভায় নিয়ে আসায় ভীমসেন তার রক্ত পান করবেন এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে দুঃশাসনের মৃত্যু এবং ভীমের দ্বারা দুঃশাসনের রক্তপান মহাভারতের বিশিষ্ট ঘটনা। কবি সেই ঘটনাটির একটি চিত্র তুলে ধরেছেন আলোচ্য সনেটে –

"মেঘ রূপ চাপ ছাড়ি, ব্রজাগ্নি যেমনে
পরে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভিমসেন ধাইলা সরোষে,
পদাঘাতে বসুমতি কাঁপিলা সঘনে;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।"[৬]

কবিতাটির নাম দুঃশাসন হলেও বাস্তবে এটি প্রতিহিংসাপরায়ণ ভীমের চরিত্রেরই একটি রুপায়ণ। সনেটের ক্ষুদ্র দেহে যে মহাকাব্যের বীর্য সঞ্চারিত করা যায়, এই কবিতাটি তারই বলিষ্ঠ উদাহরণ।

'হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু' সনেটটিতে মধুসূদন মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বতের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সঙ্গে মহাপ্রস্থানে গমন করেন। এই সময়ে হরিপর্বতে দ্রৌপদী দেহত্যাগ করেন। দ্রৌপদীর মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করে যুধিষ্ঠির বলেন যে, পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হলেও অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাত ছিল। সেই পাপে তাঁকে দেহত্যাগ করতে হয়। দ্রৌপদীর মৃত্যুতে পঞ্চপাণ্ডবের শোকের যে বর্ণনা মধুসূদন আলোচ্য সনেটে তুলে ধরেছেন তা জীবন্ত ও মনোজ্ঞ হয়েছে –

"মহা শোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে।"[৭]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কমলে-কামিনীর কল্পনা আছে। ধনপতি সদাগর যখন সিংহলে সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন কালিদহ নামক স্থানে দেখেন যে, কমলবনে এক সুন্দরী নারী হাতি গিলছে এবং পরমুহূর্তেই উগরিয়ে ফেলছেন। কিন্তু সিংহল রাজাকে এই দৃশ্য দেখাতে না পারায় ধনপতি সদাগর কারারুদ্ধ হন। কবি মধুসূদন বাল্যকালেই চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আলোচ্য সনেটে তিনি কমলে কামিনী উপলক্ষ করে বাস্তবিকপক্ষে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামকেই স্মরণ করেছেন।

'শ্রীমন্তের টোপর' সনেটটি মধুসূদন কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে একটি দৃশ্য অবলম্বন করে রূপদান করেছেন। সনেটটিতে বর্ণনীয় বিষয় অতি সামান্য। শ্রীমন্ত টোপর জলে ফেলে দিলে দেবী চণ্ডী তা নিজে ধরে ফেলেন, এই বিষয়টিকেই রূপে-রঙে মধুসূদন সাজিয়ে তুলেছেন সনেটে। সনেটে মহামূল্য মনিমুক্তাখোচিত টোপরকে মাছরাঙা পাখি এবং সোনার কল্যাণীমূর্তিধারিণী দেবী চণ্ডীকে বাজপাখি মনে করে বর্ণনা করা হয়েছে যা একমাত্র খেয়ালী কবি মধুসূদনের হাতেই সম্ভব –

"বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।"[৮]

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' সনেটটিতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রভাব আছে। রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত আছে। দেবী একবার মানবীর ছদ্মবেশে ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় চড়ে খেয়া পার হন এবং পারানির দক্ষিনা ভবানন্দ মজুমদারের ঘর থেকে আনতে বলেন। তিনি বলেন যে, ভবানন্দের পূজার ঘরে কুলুঙ্গিতে যে ঝাঁপি আছে, তাতে টাকা আছে। ভবানন্দ ঈশ্বরী পাটনীর মুখে এই কথা শুনে বিস্মিত হন এবং ঝাঁপিতে টাকা দেখে দেবীর প্রসন্নতায় আনন্দিত হন। কবিতায় তিনি ভাগ্যবান ভবানন্দকে বলেছেন –

"ধন স্রোতে তব ভাগ্যতরি,
ভাসিবে অনেকদিন জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চল ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল; ..."[৯]

মধুসূদনের আলোচ্য সনেটটি মোটামুটি কমলে কামিনীর সম গোত্রীয়। প্রায় একই ছাঁচে কবি একটি মূল কাব্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ বেছে নিয়ে তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং মূল কাব্যটির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। চণ্ডীমঙ্গলে 'কমলে কামিনী'র চিত্র প্রসঙ্গ আর এখানে অন্নপূর্ণার ঝাঁপির গল্প বলে 'অন্নদামঙ্গলের' প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। সনেটটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে ভবানন্দ মজুমদারের দেবীর কৃপায় অসীম ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার ঘটনা। এটিই এই সনেটের মূল বিষয়।

কৃত্তিবাসী রমায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের মতোই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যও কবির একান্ত প্রিয় কাব্য ছিল। এই কাব্যের মধ্যে দেবী অন্নপূর্ণার দ্বারা ঈশ্বরী পাটনীকে ছলনা করার যে কাহিনীটি আছে, তা 'ঈশ্বরী পাটনী' সনেটের মূল বিষয়। ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া নৌকায় একদিন দেবী স্বয়ং সামান্য রমণীর ছদ্মবেশে উঠেছিলেন। ঈশ্বরী প্রথম তাঁকে সাধারণ নারী মনে করেছিল; কিন্তু তাঁর পাদস্পর্শে কাঠের সেঁউতি সোনা হয়ে যাওয়ায় সে তাঁকে দেবী বলে বুঝতে পারে–

"কাঠের সেঁউতি তোর পদ পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়!"[১০]

মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'বিজয়াদশমী' ও 'আশ্বিন মাস' সনেট দুটিতে শাক্তপদাবলীর প্রভাব আছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে অবগাহন করলেও বাংলার পৌরাণিক কাহিনী ছিল মধুসূদনের অতি প্রিয় বস্তু। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যে নাড়ীর টান ছিল তার প্রকাশ বেশ বিচিত্র। বিজয়া দশমী তিথিতে পূজার শেষে বাঙালীর হৃদয়ে যে বৈরাগ্যের সুর জেগে ওঠে তিনি হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করেছেন। বাঙালীর দুর্গা পূজা কেবল পূজামাত্র নয়, এ যেন তিন দিনের জন্য মাতা

মেনকার গৃহে কন্যা উমার আগমন; প্রিয় কন্যার আগমনে মাতার মনে যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তাই যে এই শারদীয় উৎসবের আনন্দ। নবমীর শেষ রাত্রে কন্যা বিরহের সম্ভাবনায় কাতর মাতৃ হৃদয়ের একান্ত কামনাটি কবি এখানে নিপুণভাবে 'বিজয়াদশমী' সনেটটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন –

"যেয়ো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!"[১১]

বাৎসল্যরস চেতনাই যে বাঙালী হৃদয়ের গভীরতম চেতনা তা বিজয়া দশমীতে বাংলার ঘরের বাংলার মায়ের প্রাণের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আশ্বিন মাস' সনেটটি যখন মধুসূদন রচনা করেন তখন তিনি ফরাসী দেশে প্রবাসী। কিন্তু স্বদেশের স্মৃতিতে তাঁর মন পরিপূর্ণ। যখন আশ্বিন মাস এসেছে তখন দেশে দুর্গাপূজার উৎসবের যে কী বিপুল আয়োজন হয়েছে তা তিনি স্মরণ করেছেন। দুর্গা প্রতিমার বিচিত্র সৌন্দর্যের কল্পনা করতেই তাঁর মন ভরে উঠেছে। সনেটটিতে পৌরাণিক কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে মধুকবির কলমে –

"সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভক্তের ঘরে...।"[১২]

মধুসূদন সম্পর্কে এমার্সন বলেছেন -

> "কবি প্রতিভা যেন ওস্তাদ জহুরী; খাঁটি রত্ন দেখলেই চিনতে পারে; তার সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্রই তাকে আহরণ করে এমন স্থানে বসিয়ে দেবে যাতে সে পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। মধুসূদনের কবিকৃতি সম্পর্কে এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"[১৩]

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, এর বেশিরভাগ কবিতায় কবি অতীতের ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি ভারতবর্ষের অতীত গৌরব সম্পর্কে নব চেতনা লাভ করেছে। যা উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তাই বাংলার কবিদের মধ্যে মধুসূদনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কন ও ভারতচন্দ্র। আর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে, গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের মুক্ত ত্রিবেণীধারাতেই প্রাচীনবাংলা সাহিত্যের ধারা পল্লবিত। সেজন্য রামায়ণ, মহাভারত সম্পর্কিত আলোচিত সনেটগুলি ও কবিকঙ্কন সম্পর্কে 'কমলে কামিনী' ও 'শ্রীমন্তের টোপর' আর ভারতচন্দ্র সম্পর্কে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' ও 'ঈশ্বরী পাটনী' এই প্রতীকগুলিই কবিকৃতির মহিমা ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্যের সৌন্দর্য সন্ধানই যদি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা হয়, তাহলে মধুসূদনের এই সনেটগুলিও শ্রেষ্ঠ কবিভাষ্য।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১২৬
২. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৭২
৩. তদেব, পৃ. ২৯৯
৪. তদেব, পৃ. ১২৪
৫. ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ভারবি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. তদেব, পৃ. ৭০

৭. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৪৯

৮. তদেব, পৃ. ৩০০

৯. ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ভারবি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৯৩

১০. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৮৩

১১. মিত্র, দিলীপ কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, দিশারী প্রকাশনী কলকাতা ২০১৭, পৃ. ২৫১

১২. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৫৩

১৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ভারবি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১০১

Bibliography:

দত্ত, গার্গী, মধুসূদনের রচনায় ভারতীয় উপাদান, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯

ভট্টাচার্য, শ্রীপরেশ চন্দ্র, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২

সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, মিথ পুরাণের ভাঙ্গা গড়া, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০১৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 88 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 88 - 96
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মৃত্যুর গতিবিধি

রণজিৎ দাস
Email ID : ranjitdas7384@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Death, Stereotypes, Hedonism, Truth of life, Philosophy of life, Perceiving death, Philosophy of death, The eternal flow of life and death.

Abstract
Death is an extreme fact of human life. No matter how much we love life, one day we have to accept death. But no one wants to accept death easily. Standing on the threshold of death, we still have the urge to live. But life and death are so interrelated. Even one life attains perfection only with death. Therefore, the idea of death appears repeatedly in the thoughts of various writers. Because literature is not something outside society, literature is a mirror of society itself. Since human life and human society are included in sorrow, the subject of sorrow as well as the subject of death is generally present in literature. This study examines the concept of death in Rabindranath's poetry. Analyzing Rabindranath's death thoughts, it is seen that there is diversity in his death thoughts. In the early poems, he presents death in one way, and in the later poems in another way. In this case, Rabindranath Tagore's philosophy of life has definitely influenced his poetry.

Discussion

মৃত্যু মানব জীবনের এক চরম সত্য। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে কখনোই প্রকৃতির নিয়ম সম্পূর্ণতা পায় না। জীবন এবং মৃত্যু একই মুদ্রার দুটি পৃষ্ঠ, যারা উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। তবে এই জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে পরম্পরাগতভাবে বাঁধাধরা কিছু বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে আমরা জীবনকে যতটা সহজ ভাবে এবং ভালোবেসে বরণ করে নেই, মৃত্যুকে ঠিক ততটাই ভীষণ ভেবে এবং ভয় পেয়ে দূরে ঠেলে দেই। যদিও মানুষের এইরূপ আচরণের জন্য দায়ী মানবসুলভই এক প্রবৃত্তি, যাকে দার্শনিকরা 'Hedonism' বা 'সুখবাদ'[১] বলে উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল দুঃখকে পরিহার করে সব সময় সুখের অন্বেষণ করা। মানুষ তার ক্রিয়াকলাপ-এর মাধ্যমে সব সময় সুখকে পেতে চায়। মতবাদটিকে সমর্থন করে শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সুখ না দুঃখ?' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায় বা যে যা বুঝে, তাহারই জন্য অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন।"[২]

কিন্তু আমাদের চাওয়া না চাওয়ার উপর ভিত্তি করে দুঃখ বা মৃত্যু আসা-যাওয়া করে না। এরা আসে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এবং অমোঘ সত্যরূপে। তবে একথাও ঠিক যে মৃত্যু ভাবনাতেই যে আমরা কেবলমাত্র দুঃখ পাই, তা নয়। আমাদের জীবনের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে নানান দুঃখদায়ক উপাদান। স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর শেষ জীবনে লিখিত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 88 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'রূপনারানের কূলে' কবিতায় ঘোষণা করেছেন সেই বাণী। তিনি এখানে বলেছেন - "আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন।"[৩] বৌদ্ধ মতাবলম্বী দার্শনিকদের মতানুযায়ী এই জগৎ দুঃখময়। যেহেতু এই জগৎটাই দুঃখময়, তাই জাগতিক জীব হিসেবে আমাদের সর্বত্রই দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়।

অন্যদিকে সাহিত্য সমাজেরই একটি দর্পণ। সমাজে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে সাহিত্যে। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাস্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যেও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরুপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"[৪]

সুতরাং অন্যান্য ফলের মতো সাহিত্যও তার নির্দিষ্ট ফল অনুযায়ী সমাজে ঘটে যাওয়া সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, ন্যায়- অন্যায়, জীবন - মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছে। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বলেছেন –

> "প্রতি ঘরেই জন্ম হয়, বিবাহ হয়, মৃত্যু হয়। এই তিনটি নিয়াই সংসার। এ তিনের সাহায্যেই প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।"[৫]

এবং এই প্রকৃতিকে নিয়ে, সংসারকে নিয়ে, সমাজকে নিয়েই হয় সাহিত্য। মৃত্যু যেহেতু সেই সংসারেরই এক অনবদ্য অঙ্গ, তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে মৃত্যু প্রসঙ্গ। মৃত্যু ভাবনা নানান সময়ে নানান ভাবে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের ভাষায় এবং ভাবনায় স্থান করে নিয়েছে। আবার অনেক সময় কোনো একজন নির্দিষ্ট সাহিত্যিকই বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুকে বিভিন্ন রূপে দেখেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই পর্যায়েরই একজন কবি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনায় মৃত্যুকে নব নব রূপ পেতে দেখা গিয়েছে। সূচনাপর্বের কবিতার মৃত্যু ভাবনার এবং অন্তিম পর্যায়ের কবিতার মৃত্যুভাবনায় বিশাল তফাৎ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ফুটে ওঠা মৃত্যুচেতনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোকপাত করা হল -

বাংলা সাহিত্যের নানান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবদান রাখলেও তিনি ছিলেন মূলত একজন কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছে যেমন কবিতা দিয়ে, তেমনই জীবনের অন্তিম সময়েও কবিকে ব্যস্ত দেখা গিয়েছে কবিতা নিয়ে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদানের জন্য তিনি ভূষিত হয়েছেন বিশ্বকবি, কবিগুরু প্রভৃতি নানান উপাধিতে। পাশাপাশি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-এর সাথে প্রায় সর্বদাই যুক্ত থাকতে দেখা যায় 'রোমান্টিক' বিশেষণটিকে। কবির সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তিনি রোমান্টিক কবি, জীবনের সমস্ত কিছু ভালো, মঙ্গল, সুখকর, তৃপ্তিদায়ক প্রভৃতি দিক নিয়েই কবির কারবার; অন্যদিকে যা কিছু মন্দ, অমঙ্গলময়, বেদনাদায়ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে কবির বিচরণ ততটা হয়নি। একথা কখনোই সম্পূর্ণরূপে সত্যি নয়। কবি স্বয়ং একবার 'চিত্রা'-র ভূমিকায় লিখেছেন –

> "লোক-জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমায় দিয়েছেন।"[৬]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে দুঃখ-কষ্ট কম ছিল না। তবে তিনি সর্বদাই দুঃখকে পরিহার করে সুখকে আশ্রয় করে থাকতেই পছন্দ করতেন। কবির এই মনোভাব তাঁর একটি উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' – এর মূল চরিত্র নিখিলেশের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। নিখিলেশের উক্তি -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 88 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো।"[৭]

কবির এতটা সচেতনতা সত্ত্বেও, এতটা বাছাইধর্মী প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও, কবির কবিতায় বার বার জায়গা করে নিয়েছে কখনো দুঃখ আবার কখনো মৃত্যু প্রসঙ্গ। কারণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই 'সাহিত্য' প্রবন্ধের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' অধ্যায় থেকে বলা যায়,

"বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর- একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত - তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।"[৮]

মানব জীবনকে অনেকেই নদীর সঙ্গে তুলনা করেন। নদী যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাঁক নিতে নিতে এক সময় সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, ঠিক তেমনই মানব জীবনও নানান ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনও বিভিন্ন সময়ে নানান ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনস্মৃতি'-এর 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন –

"ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মার যখন মৃত্যু হয়, আমার তখন বয়স অল্প।"[৯]

কবির নিজস্ব মতানুযায়ী অল্প বয়সের কারণে কবি মায়ের মৃত্যুর স্বরূপকে তখন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে কবির খুবই প্রিয় একজন মানুষ ঠাকুরবাড়ির 'কনিষ্ঠা বধূ' কাদম্বরী দেবীর অকাল মৃত্যুতে কবি খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। কবির নিজস্ব বয়ানে –

"আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।"[১০]

মৃত্যুচেতনা কোনকালেই কবিকে সম্পূর্ণ বিবশ করে তুলতে পারেনি। তাইতো এতসব আঘাত- সংঘাতের পরেও কবি রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছেন –

"জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে - দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।"[১১]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যু বিষয়টিকে কখনোই প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রত্যাশিত রূপে দেখেননি। তিনি বরাবরই এ বিশ্বাস রেখেছিলেন মৃত্যু জীবনেরই একটি পর্যায়। সর্বোপরি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি জীবন সম্পূর্ণতা পায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো একই ধরনের কথা যেন ফুটে উঠেছে প্রাবন্ধিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকার বাদল সরকারের লেখনীতেও। প্রাবন্ধিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার সাহিত্য- জীবন'- এ উল্লেখ করেছেন মেয়ে 'বুলু'-র কথা, যে মারা গিয়েছিল মাত্র ছয় বছর বয়সে। এই মৃত্যুর পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনেকটা একই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন –

"আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিলে। জীবন প্রবাহের মোড় ফিরে গেল। আমার জীবনে চলার পথে যে দু-নৌকায় দু-পা রেখে চলা তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় করে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না - এলে বোধহয় তা হত না। এবং জীবনে এই বেদনার সুগভীর সমুদ্রে যদি না - পড়তাম, তবে বেদনা-রসকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।"[১২]

আবার নাট্যকার বাদল সরকার তাঁর 'বাকি ইতিহাস' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে যেখানে সীতানাথের 'দুঃশাসনের রক্তপান', 'জোয়ান অফ্ আর্ক', 'স্পেনের গৃহযুদ্ধ', 'রোমান সম্রাটের নৌবিহার' প্রভৃতি উদ্ভট সমস্ত ছবি সংগ্রহ করার কথা রয়েছে সেখানে শরদিন্দু ও সীতানাথ চরিত্রদ্বয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একই ভাবনা -

"শরদিন্দু : এ সব কী ছবি?
সীতানাথ : (শান্ত স্বরে) খবরের ছবি শরদিন্দু।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 88 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শরদিন্দু : বেছে বেছে এইসব ছবি জমা করছো কেন?
সীতানাথ : এই তো ইতিহাস।
শরদিন্দু : ইতিহাস!
সীতানাথ : মানুষের ইতিহাস। জীবনের ইতিহাস।
শরদিন্দু : মিথ্যে কথা! এ মৃত্যুর ইতিহাস।
সীতানাথ : (স্মিত হাস্যে) মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়?”[১৩]

সাহিত্যিকদের সাহিত্য ভাবনাকে প্রভাবিত করে তাদের নিজস্ব জীবন দর্শন। যেকোনো সাহিত্যিকই তাদের জীবন দর্শনের দ্বারা একটি গভীর সত্যের সন্ধান পায় এবং নির্দিষ্ট একটি তত্ত্বের স্থাপনা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা জীবনে প্রথাগত ব্যবস্থার চেয়ে প্রথা বহির্ভূত ব্যবস্থাই ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ঠাকুর পরিবার এবং পরিবেশ। ঠাকুর পরিবারের প্রতিটি সদস্যতো বটেই, এমনকি তাদের সমস্ত কর্মচারী এবং চাকর-বাকররাও যেন সুশিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বিশাল প্রভাব পড়েছে। ছোটবেলায় তিনি তার পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনবরত চর্চা করে গিয়েছেন গায়ত্রী মন্ত্র, ধর্মীয় বিভিন্ন উপাসনা এবং উপনিষদের মন্ত্র ইত্যাদি। এই উপনিষদের ভাবনার প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথের সূচনা পর্বের কবিতাগুলিতে। উপনিষদের ভাবনায় ভাবিত হয়েই তিনি এই পর্যায়ে মৃত্যুকে বিভীষিকাময় কোনো কিছু হিসেবে দেখতে চাননি। তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন চিরসত্য, শাশ্বত, মধুর এবং চির শান্তির একটি প্রবাহ স্বরূপ। একদিকে ঔপনিষধিক ভাবনা, অন্যদিকে যৌবনকালের তেজ এবং প্রচন্ডতা কবিকে বারবার ভুলিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর বিভীষিকা। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করার ক্ষমতা শুধু মানুষের কেন জীবকুলের কারোরই নেই। তাই না চাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকে স্বীকার করতেই হয় শেষপর্যন্ত এবং এভাবেই অনিবার্যভাবে মৃত্যু প্রসঙ্গ জায়গা করে নিয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়।

‘মরণ’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন -

“মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।”[১৪]

কবির এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে মৃত্যু কবির কাছে বিভীষিকাময় কিছু ছিল না। উপনিষদের মিষ্টি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জীবন এবং মৃত্যুকে অনন্তকালীন এক যাত্রা হিসেবেই দেখেছেন। মৃত্যুকে শ্যামের মতো কাঙ্খিত এবং আরাধ্য হিসেবে মনে করেছেন। রাধার কাছে শ্যাম যতটা আপন, যতটা প্রিয়জন; কবির কাছে মৃত্যুটাও যেন সেই রকমই কোনো একটা প্রিয় বিষয়। তিনি আরও বলেছেন -

“মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যামসমান।।”[১৫]

কবির মতে মৃত্যু মানুষকে অমৃত দান করে। মৃত্যু মানুষকে শাশ্বত, চির সুন্দর করে তোলে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিলীন হয়ে যায় সমস্ত পাপ, তাপ এবং পূর্ণতা পায় একটি জীবন। তাইতো এই মৃত্য কবির কাছে কাম্য এক বিষয় ছিল। কবি মৃত্যুকে আহ্বান করে বলেছেন -

“তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আও রে আও।।”[১৬]

নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘নানা রঙের দিন’ নাটকে অভিনেতা রজনী বাবুর মুখ দিয়ে বলেছেন –

“আমি লাস্ট সিনে প্লে করব না ভাই, আমাকে ছেড়ে দিন।”[১৭]

অর্থাৎ তিনি মহাকালের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যেন তাকে মৃত্যুর জগতে না নিয়ে যাওয়া হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সত্যটিকে চরমভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সুন্দর এই ভবসংসারে চিরকাল বেঁচে থাকার এক তীব্র বাসনা কবির মধ্যে

থাকলেও তিনি জানতেন যে সশরীরে তিনি কোনোভাবেই বেঁচে থাকতে পারবেন না। তাই তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার এক অনবদ্য উপায় খুঁজে নিয়েছেন। কবি 'প্রাণ' নামক একটি কবিতায় বলেছেন -

"মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর- আলয়।
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভী যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।"[১৮]

কবির এই সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার বাসনা আরও তীব্রভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় 'সোনার তরী' নামক একটি কবিতায়। যেখানে কবির সমগ্র জীবনের সাধনার সম্পদ মহাকাল গ্রহণ করে নিলেও সশরীরে সেখানে কিন্তু কবির জায়গা হয়নি। সাহিত্যকর্মের সাথে সাথে কবিকেও গ্রহণ করার আর্জি জানালে মহাকাল তার জীবনতরীতে একটুও জায়গা নেই বলে সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কবির ভাষায় সেই আকুল আবেদনটি হল -

"এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে-
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে।।"[১৯]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনেক কবিতায় মৃত্যুকে অমৃতের সাথে তুলনা করেছেন, আবার অনেক কবিতায় মৃত্যুকে দেখেছেন সুখ শান্তির এক আশ্রয় হিসেবে। যেখানে সমস্ত ক্লান্তির অবসান হয়ে যায়, যেখানে রয়েছে শুধুমাত্র শান্তি আর শান্তি। মৃত্যুর এই রকমই একটি রূপ ফুটে উঠেছে কবির 'মৃত্যুর পরে' কবিতার মধ্য দিয়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন-

"আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুল ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে
রাত্রিদিন ধুঁকধুঁক তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।"[২০]

আবার এই কবিতারই শেষের দিকে বলেছেন -

"যা হবার তাই হোক, ঘুচে যাক সর্ব শোক
সর্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্তজন্মশিখা।
সব তর্ক হোক শেষ- সব রাগ, সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।।"[২১]

- অর্থাৎ কবি বলেছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়, শান্তি পেয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত মায়া-মমতা, চিন্তা-চেতনা সমস্তকিছু থেকে চিরতরে ছাড়া পেয়ে যায়।

'মৃত্যু' নামক এক কবিতায় কবি বলেছেন আমরা বৃথাই মৃত্যুকে নিয়ে ভয় পাই। মৃত্যু আদতে ততটা ভয়ানক নয়। মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের মধ্যে যে অজ্ঞানতা, সেই অজ্ঞানতাই এই ভীতির কারণ। মৃত্যু সম্পর্কে এই অজ্ঞানতা যেদিন কেটে যাবে সেদিন মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের ধারণাও পাল্টে যাবে। জীবনের মতো সেদিন মৃত্যুকেও আমরা ভালোবাসতে পারবো। কবির দৃঢ় বিশ্বাস তিনি জীবনকে যেমন ভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন, মৃত্যুকেও ঠিক তেমনি ভাবেই ভালোবাসতে পারবেন। উক্ত কবিতায় তাই কবি জানিয়েছেন -

"জীবন আমার
এত ভালোবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিবো নিশ্চয়।।"[২২]

কবির এইরূপ ভয়হীনভাবে মৃত্যুকে দেখার মতো একই ধরনের মানসিকতা ফুটে উঠতে দেখা যায় রাসসুন্দরী দাসী-র 'আমার জীবন' গ্রন্থের প্রথম ভাগের ত্রয়োদশ রচনায়। সেখানে তিনি বলেছেন –

> "এই পৃথিবীতে যত লোক দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর নামে অতিশয় ভয় পাইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। লোকে না বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুর আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে!"[২৩]

কবি বরাবরই জন্ম এবং মৃত্যুকে চিরন্তনের এক যাত্রা হিসেবে দেখেছেন। তাই তিনি মৃত্যুকে সীমাবদ্ধ এই জীবন থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ বিবেচনা করেছেন। কবির কাছে মৃত্যু শ্বাশ্বত, চিরসত্য এবং চিরকালীন একটি প্রবাহ। এই প্রবাহের মধ্য দিয়ে কবি প্রবাহিত হতে চেয়েছেন। নতুন নতুন রূপে সমগ্র বিশ্বসংসারে বিচরণ করতে চেয়েছেন। তাই তিনি 'জন্ম ও মরণ' নামক কবিতায় বলেছেন -

"কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।।"[২৪]

শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতা ছাড়া কবি চিরকালই মৃত্যুকে দেখেছেন চির সুন্দর এবং চির শান্তির এক জায়গা হিসেবে। কবি তাই মৃত্যুকে দেখে কখনোই ভীত হয়ে পড়েননি। 'মৃত্যুঞ্জয়' নামক এক কবিতায় রয়েছে মৃত্যুর মিথ্যা দম্ভ ভাঙ্গার কথা। এখানে তিনি বলেছেন মৃত্যুকে দূর থেকে দেখে যতটা বড় বলে মনে হয়, সামনাসামনি ঠিক ততোটাই ছোটো। আর এভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করে হয়ে ওঠেন মৃত্যুর চেয়ে বড়ো। এইরকম মুহূর্তে কবি সোচ্চারে ঘোষণা করেন -

"যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও
'আমি মৃত্যু- চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।"[২৫]

'ইস্টেশন' কবিতায় তিনি মানবজীবনকে স্টেশনের সাথেই তুলনা করেছেন। স্টেশনে দেখা যায় বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন দিকে যাত্রা। প্রতিটি মানবজীবনও সেইরকমই অনন্ত যাত্রার যাত্রী। চিরকাল ধরে যেখানে হয়ে চলেছে আসা-যাওয়া। তবে এই যাত্রা নিয়ে কবির মধ্যে কোনো আক্ষেপ নেই। কেননা তিনি লিখেছেন -

"চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া- পেটা-
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।"[২৬]

'আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু' কবিতায়ও কবির বিস্মরণের অতলে হারিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। কবি বলেছেন একসময় তিনি থাকবেন না, কিন্তু থেকে যাবে তাঁর নানান আভাস, নানান গুঞ্জন; থেকে যাবে কবির নানান সৃষ্টি। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে কেউ মনে না রাখলেও মানুষের হৃদয়ের অতলে চিরদিন থেকে যাবে তার নানান সৃষ্টিমূলক কীর্তি। তাঁর নিজের ভাষায় -

"আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে-
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন, ভুলে যাবে তার মানে।"[২৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 88 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এর পরবর্তী পর্যায়ের কয়েকটি কবিতায় অর্থাৎ জীবনের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছে তিনি ভিন্ন রকম এক ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েছেন। এই সময়কার কবিতাগুলোর মধ্যে প্রথম জীবনের কবিতার মতো মিষ্টিক অনুভূতি সম্পন্ন ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে মৃত্যুকে আর ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। কেননা যে উপনিষদের ভাবধারায় কবি সারাজীবন ধরে চালিত হয়ে এসেছিলেন, সেই ভাবনায় বাঁধা পরে এই পর্বে এসে। এমনকি এই সময়ে কবি ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্ধিহান হয়ে পড়েন। কবিকে বারবার বিভিন্ন প্রশ্ন ছুড়ে দিতে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি। তিনি 'প্রথম দিনের সূর্য' নামাঙ্কিত কবিতায় লিখেছেন -

"দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-
কে তুমি ?
পেল না উত্তর।।"[২৮]

এখানে উঠে আসা প্রশ্ন 'কে তুমি?'[২৯] এই প্রশ্ন আসলে কবির নিজের প্রতি নিজের, এই প্রশ্ন বিশ্বসংসারের প্রতি এবং সবশেষে এই প্রশ্ন সৃষ্টিকর্তার প্রতি। আলোচ্য কবিতার ভাবধারা থেকেই পাওয়া যায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুচেতনার ভাবনায় মোড় বদল-এর ইঙ্গিত। পূর্বে যেখানে তিনি মৃত্যুকে দেখে এসেছেন চিরসত্য এবং চিরন্তন এক প্রবাহস্বরূপ, সেখানে তিনি এখন ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্ধিহান হয়ে পড়েছেন এবং মৃত্যুকে নতুন করে দেখতে শুরু করেছেন অনিশ্চয়তার এক ক্ষেত্রস্বরূপ। তাইতো জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে লিখা 'রূপনারানের কূলে' নামক একটি কবিতাতেই তিনি উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর জীবনের সমস্ত খেদোক্তি। এখন তিনি জগৎ সম্পর্কে আবার নতুনভাবে উপলব্ধি করেন। জীবনকে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেন। প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া নানান আঘাত- বেদনার মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে শেখেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সত্যে উপনীত হন যে মৃত্যু নামক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি, তাই আমাদের সকলেরই সেই কঠিন সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কেননা সত্য কঠিন হলেও সেটি কখনোই আমাদের বঞ্চনা করে না। কবির ভাবনায় -

"সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম-
সে কখনো করে না বঞ্চনা।"[৩০]

এখন কবি বুঝতে পেরেছেন মৃত্যু নামক কঠিন সত্যই মানুষের জীবনের চরম পরিণতি এবং এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষ তার জীবনের সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় জীবনবেদী থেকে। লক্ষ্য করার বিষয় এই পর্যায়ে কবি বারবার মৃত্যুকে কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যু কবির কাছে এখন কঠিন এক সত্য বলে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে এই কঠিন সত্যই মানুষের সর্বশেষ পরিণতি। কবির ভাষায়-

"আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন-
সত্যের দারুন মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।।"[৩১]

পরিশেষে বলা যায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় বারবার ফুটে উঠেছে মৃত্যুচেতনা। তবে কবি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ধরে এই মৃত্যু ভাবনা তার গতিপ্রকৃতি বদলাতে থাকে। কখনো তিনি মৃত্যুকে আপন ভেবে, মধুর ভেবে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন, আবার কখনো কঠিন ভেবে পরিত্যাগ করার জন্য শিউরে উঠেছেন। কবির মৃত্যুচেতনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে প্রাথমিক জীবনের মৃত্যুচেতনার সাথে কবির পরবর্তী জীবনের মৃত্যুচেতনার মধ্যে স্বাতন্ত্রতা রয়েছে, রয়েছে মৌলিকত্বও। প্রথম পর্যায়ে ঔপনিষদিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মৃত্যুকে দেখেছেন চির সুন্দর, চির মধুর এবং চির আনন্দময় এক উপলব্ধি রূপে। কালের পর কাল ধরে বিকশিত হয়ে চলেছিল এই সমস্ত উপলব্ধি।

জীবনের এই প্রবাহ ছিল তাই মৃত্যুহীন। কবি মৃত্যুকে কল্পনা করেছেন কখনো অমৃতের স্বরূপ হিসেবে, কখনো বন্ধু হিসেবে, কখনো প্রেমিক হিসেবে আবার কখনো বা চির শান্তির এক আশ্রয় হিসেবে। কিন্তু শেষ জীবনের দিকে কবি হয়ে পড়েন সংশয়বাদী। এই সংশয় নিজেকে বুঝতে এবং জানতে, এই সংশয় সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পেতে। প্রথমে যেখানে দেবতার প্রতি নানান স্তুতিবাক্য প্রয়োগে রুচি দেখিয়েছেন, সেখানে পরবর্তীকালে স্রষ্টাকে জানার প্রতি, বোঝার প্রতি এবং স্রষ্টার প্রতি নানান প্রশ্নকরণেই বেশি উদ্যোগী ছিলেন। শেষ পর্যায়ে কবি মানব জীবন, মানবজগৎ এবং সবশেষে এই সমস্ত কিছুর আয়োজক-এর প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়েছিলেন। তাই কবির শেষ জীবনের কবিতাগুলো থেকে সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং আনন্দ প্রভৃতি অপসারিত হয়ে গিয়ে উন্মোচিত হয়ে যায় মৃত্যুর কঠিন একটি রূপ। যে রূপ কবিকে বাস্তব সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেছে, মৃত্যুর সম্যক ধারণাকে প্রদান করেছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৭১
২. সিংহ, রতিরঞ্জন (প্রকাশক), জিজ্ঞাসা, শিবনারায়ন দাস লেন, কলিকাতা-০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ৫
৩. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৬২২
৪. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র), ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ২০১২, পৃ. ২২৯
৫. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, মাইতি বুক হাউস (প্রকাশক), ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯৭
৬. আইয়ুব, আবু সায়ীদ, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বাবিংশ সংস্করণ, মাঘ ১৪২৪, পৃ. ৩৫
৭. সাহা, অর্জুন (প্রকাশক), রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০, ১ লা বৈশাখ, পৃ. ৬৩৮
৮. সাধুখাঁ, বিকাশ (প্রকাশক), রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২২ শে শ্রাবণ ১৪১০, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৮০
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ (প্রকাশক), ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৫১
১০. তদেব, পৃ. ১৫২
১১. তদেব, পৃ. ১৫৪
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য- জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (প্রকাশক), ১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০, পঞ্চম মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৫০
১৩. দত্ত, পি. (প্রকাশক), নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৯, পৃ. ৮৮
১৪. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ১৩
১৫. তদেব, পৃ. ১৩
১৬. তদেব, পৃ. ১৩
১৭. পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (প্রকাশক), সাহিত্যচর্চা, ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ), প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৫০
১৮. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ২২-২৩

১৯. তদেব, পৃ. ৭১

২০. তদেব, পৃ. ১৫৪

২১. তদেব, পৃ. ১৫৯

২২. তদেব, পৃ. ৩১৮

২৩. দাসী, রাসসুন্দরী, আমার জীবন, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৯২

২৪. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩৪৩

২৫. তদেব, পৃ. ৪৮১

২৬. তদেব, পৃ. ৫৯৩

২৭. তদেব, পৃ. ৬০৮

২৮. তদেব, পৃ. ৬২৩

২৯. তদেব, পৃ. ৬২৩

৩০. তদেব, পৃ. ৬২৩

৩১. তদেব, পৃ. ৬২৩

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 97 - 105
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

জীবনানন্দের কবিতায় দ্বন্দ্ববোধ, অস্তিত্বের বহুরূপতা ও চৈতন্যের উত্তরণ

ড. অচিন্ত্য মাজী
সহকারী অধ্যাপক
চিত্ত মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ, জার্গো, পুরুলিয়া
Email ID : achintamajee12@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
কবিতায় দ্বন্দ্ববোধ, চৈতন্যের জাগরণ, অস্তিত্বের বহুমাত্রাকে অন্বেষণ, সত্তার উত্তরণ।

Abstract
জীবনানন্দের কবিতায় দ্বন্দ্ববোধ তাঁর কবিতাকে দিয়েছে অদ্ভুত এক ব্যাপ্তি এবং গভীরতা। তাঁর কবিতার অন্তর্গত দ্বন্দ্বের বিন্যাসে আমরা পাই মানব চৈতন্যের বহুধা বিচ্ছুরণ, মূল্যবোধকে জাগিয়ে রাখার আশ্চর্য আলোকরেখা, বৃহত্তর পৃথিবীর পরিধিতে শাশ্বত মানবকণিকাকে প্রতিস্থাপনের অভিলাষ। সাম্প্রতিকের বিষবাষ্প এবং ক্লেদ প্রতিমুহূর্তে সত্তার ভেতরে নিহিত থাকা নান্দনিক সুষমাকে ধ্বস্ত করে দিচ্ছে। কবি টের পাচ্ছেন অজস্র গরমিলের মাঝে লুকোনো গরল, অস্তিত্বের ভেতরে তার গোপন গ্রাস তছনছ করে দিচ্ছে সমস্ত সামঞ্জস্য। কবির চৈতন্য এই সার্বভৌম আলোড়নে আহত হয়ে দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই পেতে চাইছে কোনো স্থিতির ভূমি। কবির অন্বেষণ তাই ধাবিত হয় সাম্প্রতিকের বাস্তবকে আত্মস্থ করে অতীত ও ঐতিহ্যের সরণি বেয়ে স্থবিরতার বিপরীতে মানবতাকে জাগানোর আয়োজনের অভিমুখে। প্রেম ও প্রকৃতিকে সন্ধানের সাধারণ সমীকরণের বাইরে তাঁর বোধ নতুন অঙ্গীকারের অঙ্গারে নিষিক্ত হয়ে ওঠে। এই অন্বেষণের স্পর্শেই জাগ্রত চৈতন্য অপরূপ শান্তির দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের আলোচনা দ্বন্দ্বের বিন্যাসে জাত এই চৈতন্যের অন্বেষণের বহুরূপতা ও সত্তার পরিক্রমণের গন্তব্যটি।

Discussion

যেকোনো কবিই কবিতা লেখার মুহূর্তটিতে তীব্র আবেগের সম্মুখীন হন। কবির সেই আবেগের চরমক্ষণে লগ্ন হয়ে থাকে যেমন কবির ভেতর, তাঁর অন্তঃসত্তা তেমনি তাঁর চারপাশও। অর্থাৎ সত্তার গভীরে যে বোধের উৎসার তার জন্ম নিভৃতির মধ্য দিয়ে সূচিত হলেও তাকে ধারণ করে থাকে বাইরের মাটি আলো হাওয়া দেশ সমাজ। ফলতই ব্যক্তিগত যে স্তর থেকে একটি কবিতার প্রসব হয় তা আর শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত থাকে না, মিলে যায় বহুত্বের সমন্বয়ে। এ এক আশ্চর্য সংশ্লেষণ। অনুভূতি আর কল্পনা, দৃষ্টি আর পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা আর আবেগের মিশেলে যা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে তাকে ছুঁয়ে থাকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরম্পরা, ঐতিহ্য তাকে গড়ে তোলে, সংস্কৃতি তাকে পরিণতি দেয়। এভাবে জীবন ও জগৎ থেকেই কবি নিংড়ে নেন কল্পনার আধার ও উৎসকে। স্নায়ুর ভেতর থেকে যে সঞ্চার জারিত হয় তা আসলে জীবন জিজ্ঞাসার গভীর প্রতীতি।

কবিতা লিখতে গিয়ে তাই কবিকে নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। এ দ্বন্দ্ব যেমন সৃষ্টির তেমনি স্বরের। পরিপার্শ্ব প্রবলভাবে মননকে ধাক্কা দেয়, সত্তাকে প্রশ্নমুখী করে তোলে। সমাজ ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তোলে; আবার জীবন কখনোই বিশেষ ধরাবাঁধা ছকে চলে না। এইদিক থেকে নিরন্তর সংঘর্ষ চলে জীবন ও যাপনের। তাঁর যা কিছু অর্জন, যা কিছু বিকশিত হয়ে ওঠা সবই সমকালে সম্পৃক্ত হয়ে, অন্যদিকে তার ভেতরের গঠনের প্রধান সহায়ক ঐতিহ্য। কখনো কখনো সময় এমনভাবে সমস্তকিছুকে ওলট পালট করে দেয় যে মানুষের চেনা উপলব্ধিগুলি তার নিজস্ব পথে চলতে পারে না। তখনই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। সূচিত হয় কল্পনা আর বাস্তবতার বিরাট ফারাক। মনোগহনের অতলেও এই ভাঙচুর চলতে থাকে। কবির অনুভূতি পৌঁছে যায় চারদিকের কোলাহল আর বিপর্যয়ের আড়ালে গভীর গোপন কোনো অলিন্দে। যুগযুগ ধরে চলে আসা রীতি প্রবণতা যখন সাম্প্রতিক আলোড়নের জোয়ারে এলিয়ে পড়ে তখন কবির বিশ্বাসের ভেতরেও অজস্র ঘাত প্রতিঘাত ওঠানামা করতে থাকে। এই স্পন্দন তো আসলে যাপনচিত্রেরই অনবদ্য উন্মোচন পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে ইন্দ্রিয়কোষে। জীবনানন্দের কবিতা এই আত্মসংঘর্ষের ফসল, অনুপম প্রদাহ ও জ্বালা নিয়ে, স্থৈর্য আর ভূমা নিয়ে স্বয়ম্ভর হয়ে আছে নাক্ষত্রিক আভায়।

আমরা জীবনানন্দের কবিতায় দ্বন্দ্বের এই বহুকৌণিক মাত্রাটিকে ধরতে প্রয়াসী। এই দ্বন্দ্বের বোধ অস্তিত্বের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সমকালের সংক্ষুব্ধ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি প্রায়শই চলে যান চরম নেতির বলয়ে, ক্ষুধা-ক্ষোভ আর অবক্ষয়ের গভীর ধ্বসের ভেতর অথচ তার মাঝেই ধরা থাকে নেতিহীনতার সূক্ষ্ম ধূপছায়া। এই প্রত্যয় চুপিচুপি এগিয়ে চলে চরম বেদনার মাঝে আশ্চর্য সত্য হয়ে। কবির কথায় -

> "আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়, - একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়; এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।"[১]

এই যে 'মৃদুতম সচেতন অনুনয়' এর কথা কবি বললেন তা নিবিড় একটি স্পর্শের মতো গভীর লাবণ্যের জ্যোতিতে স্নিগ্ধ হয়ে জেগে থাকে। বাইরের কোলাহল ও বাচালতা এ অনুনয়কে ছিঁড়ে দেয়। জীবনানন্দের কবিতায় আমরা দেখতে পাই সময়ের জ্বরে আক্রান্ত একটি ব্যথাতুর গুঞ্জন কীভাবে অজস্র রঙ আর দ্যুতি, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের আস্বাদে ভরিয়ে দিয়েছে বাংলা কবিতার বেশবাস। সংস্কারকে ছিঁড়ে ফেলে সংস্কৃতির রাস্তায় তার চলাচল। ফলতই সত্তার বহুমাত্রিক বিকিরণ সম্ভব হয়। কবি অগ্রসর হন পরিণতির বিশেষ ভূমির দিকে। সংঘাত আর পীড়ন সত্তাকে নিয়ে যায় আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিজ্ঞার দিকে।

একদিকে জায়মান সময়ের সত্য অন্যদিকে অস্তিত্বের ধ্বস - এ দুয়ের প্রক্ষোভে এক কবি প্রতিনিয়ত সত্তাকে বিয়োজন করছেন। অস্তিত্বের রেখায়, সত্তার স্তরে জীবনের যে তুমুল আগুন অদৃশ্যভাবে একজন কবির হয়ে ওঠাকে নির্ধারণ করছে জীবনানন্দ দাশ এ থেকে রেহাই পাননি। দেশ ও কালের খণ্ডিত রূপ থেকেই একজন কবি ভেতরের উৎসকে অপরিসীম লাবণ্য দিতে চাইছেন কিন্তু অনির্দেশ্য কোনো আঘাতে সেই উৎস ঠিকমতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে না। কবি অন্বেষণ করছেন চৈতন্যের বিশুদ্ধ ভূমিটিকে কিন্তু সমাজ ও জীবনে এমনই এক অচলায়তন তৈরি হয়েছে যা থেকে উত্তরিত হওয়া সংবেদনশীল সত্তার পক্ষে দুঃসাধ্য এবং তখনই জন্ম হয় দ্বন্দ্বের। নিরলস আত্মখননের পর বিষ মন্থন করে যা উঠে আসে তা যাপনের ক্ষয় থেকে জাত এমন এক বোধ যা কবিকে কোনোভাবেই তৃপ্ত থাকতে দেয় না। এই অন্তর্মুখী অভিযাত্রায় বারে বারে নিজের পরিচয়কে প্রতিস্থাপিত করতে চান বৃহত্তম সামাজিক পরিমণ্ডলে। কিন্তু সেখানেও আত্মীকরণের কোনো ধ্রুব বিন্দু নেই, প্রতিমুহূর্তে পালটানো সময়স্বভাবে নিষিক্ত হয়ে সামাজিক অভিজ্ঞানও দুমড়ে মুচড়ে পড়ে। গ্রহণের আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে তাই বর্জনের চোরাটান এসে দুলিয়ে দিয়ে যায় চৈতন্যকে। জীবনের তাৎপর্য তখন বদলে যায় নেতিবাচক অভীক্ষায়। একজন কবি শুষে নিচ্ছেন এইসব ক্লেদ, তমসা, আদিম কুহেলিকা। যে জীবনে শুধুই আত্মরতির উদ্‌গার, শুধুই স্বেচ্ছাবৃত সুখ সন্ধান, বস্তুগত তৃপ্তির পেছনে ছোটা সেখানে সত্যদ্রষ্টা কবির মনে সংগতির সূত্র সন্ধান বারবার ছিঁড়ে যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবি তখন নিজের ভেতরেই আলো ফেলেন। সত্তার চিত্রল বলয়ে বিপন্ন মনের ধূসর ছায়া পড়ে। তবুও সমস্ত সামাজিক বিপর্যাস এবং সময়ের অন্ধ চলাচলের মধ্যে কবিসত্তা স্থির কোনো অভিভবের দিকে অগ্রসর হতে চায়। এই পরিরাজনের পথে বিষাদ আর বেদনা তীক্ষ্ণ হয়ে বেজেছে। তিনি বুঝেছেন অতীতের ভেতরে যে পূর্ণতা আর তৃপ্তি ছিল, সৌন্দর্যকে অন্বেষণের যে আকুলতা ছিল এখন সেই সন্ধান আর নেই। কারন এখন জীবন অনেক বেশি অন্ধকারের ঢেউ দিয়ে গড়া, মানুষের চাহিদা অনেক বেশি গভীর। বস্তুর বহুবিস্তারী চমকে ক্ষতবিক্ষত হয় আটপৌরে সৌন্দর্য ও সুষমাগুলি। দ্বন্দ্বময় এই মানসিকতার কারণেই সংবেদনশীল মানুষ সত্তার ভেতরে এক আশ্চর্য সংকট ও অনটন টের পায়। তখন প্রকৃতির কাছে আশ্রয় পেতে চায় মানুষ। প্রকৃতির মেদুর আর রূপময় লাবণ্যে ভিজিয়ে দিতে চান অন্তরকে -

> "দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
> হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
> ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ
> চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা"
>
> 'মৃত্যুর আগে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন প্রকৃতিকে ঘিরে যে কল্পনা, স্বান্তনা বা তার রহস্য চৈতন্যকে নব পরিসরে জাগিয়ে দিতে পারত তা এখন আর সম্ভব নয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক অন্তর্ঘাত, জখম, রক্তপাত লড়াই মানুষের মধ্যে দেখার যে সহজিয়া প্রাণময় প্রকাশ ছিল তাকে মুছে দিয়েছে। এখন রক্ত আর আঁধারে মেশা বিরাট অট্টহাস যেন মৃতের শীতলতা নিয়ে স্ফীত হয়ে উঠতে চায়। মৃত মাছের চোখে মিশে আছে যে কালো শ্যাওলার আস্তরণ তা ছাপোষা মধ্যবিত্তের কনীনিকাতেও আটকে আছে। তাকে সরিয়ে প্রাকৃতিক নিরালা রূপটানে সিক্ত হওয়ার পিপাসা আজ মরে গেছে। গূঢ় প্রকৃতিচেতনাতেও কবি ডুবে গিয়েছেন কিন্তু ডুবে যাওয়ার মুহূর্তেই পিঙ্গল চামড়ার ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে দগ্ধ রক্তবিন্দু। সেই সমর্পণ, সেই আশ্বাস নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার সুতীব্র আকুলতা অনুভবের ভিন্ন প্রতিবেশ নিয়ে দ্যোতিত হয়ে ওঠে –

> "আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই- নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই- রূপ ঝরে পড়ে তার
> শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তার।"
>
> 'অবসরের গান', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'

জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন প্রকৃতির স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেননা মানুষ স্বাভাবিক নেই। তার মননের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘূণ পোকা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে কাঁপন তাকে সজীব আর সচল করে, যে স্পন্দনের ভেতরে আছে মৃত্যুহীন এক অঙ্গীকার সেই সংযোগ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে প্রকৃতিকে আর তেমন করে পাবার উপায় নেই। প্রকৃতির মধ্যে চারিত হয়ে থাকা জীবন তার প্রভূত তেজ নিয়ে বিকিরণ করছে না। প্রকৃতি তাই পটভূমি, বীজক্ষেত। জন্ম ও মৃত্যুর যাতায়াতে প্রকৃতি মানবকে লালনের অনিবার্য আশ্রয়ভূমি। সৌন্দর্যবোধের সেই পুলক আর আত্মতন্ময় শিহরণ নয় বরং প্রকৃতি গড়ে তুলেছে পরম্পরা, বস্তু পৃথিবীর শিরা ও শিকড় ভেদ করে কোনো রহস্যময়ী আলোর পরিবর্তে সামাজিক উত্তরণের জিজ্ঞাসাগুলি প্রধান হয়ে উঠল। প্রকৃতি হয়ে উঠল গভীর অস্তিত্ব সংকট এবং অবচেতনার গূঢ় রহস্যকে প্রতিফলিত করার ভাষা। অবর্ণনীয় জটিল সংকেত মনস্তত্ত্বের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ধূপছায়া মেখে অশরীরী দিব্যতায় প্রস্ফুটিত -

> "আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভেতর
> পৃথবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল
> আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
> আমার জানলার ভিতর দিয়ে সাঁইসাঁই করে,
> সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরে অজস্র জেব্রার মতো"

-- 'হাওয়ার রাত', 'বনলতা সেন'

প্রতিনিয়ত মানুষের হাতে স্থূলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে পৃথিবী, বাস্তবকে নিষ্পেষণ করে তাকে নীরক্ত করে দেওয়ার মধ্যে যে পৃথুল সুখ ফেনায়িত হয়ে উঠেছে সেখানে প্রকৃতিকে নতুন করে পাওয়ার মতো কিছুই নেই। কেননা সবকিছুই মোটা দাগের, আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব পৃথিবীতে শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বরই এখানে প্রধান। যাপনের এই শুষ্কতা, গ্লানি থেকে অতিক্রমণের জন্যই আরও কোনো গভীর দহনে নীল হওয়া প্রয়োজন; বাইরে থেকে অদ্ভুত এক ঝলক এসে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে দেবে অলস স্তরগুলি। জীবনের এই স্থির কেন্দ্র মুছে দিয়ে সত্তাকে যে দেবে তছনছ ও ঘূর্ণি তা এই প্রকৃতি। কেননা 'মানুষের লালসার শেষ নেই', 'অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ নেই'। যারা অন্ধ তারাই বেশি দ্যাখে। চারদিকে ভিড় করে আছে বিকলাঙ্গ, অন্ধ বধিরের দল। আত্মসর্বস্ব এই দুনিয়ায় কি সত্যিই মুক্তি সম্ভব? ঘূণ ধরা সামাজিক কাঠামোতে তাই নিরন্তর চোরাবালির হাতছানি। সুস্থ চিত্তে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই পরাবাস্তবতার প্রখর নির্মিতি। কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আচড়ানো শাদা রহস্যময় বেড়াল খুঁটিয়ে তুলবে চামড়ার সফেন পলেস্তারা। স্বপ্নময় অস্তিত্বের সঙ্গে এভাবেই জাগ্রত জগতের মেলবন্ধন ঘটবে, আঘাত করবে অনড় ব্যক্তিত্বের মূল ধাতুতে। দ্বন্দ্বের মাঝেই জাগবে অস্তিত্বের উত্তরণ। অস্তিত্ব ছড়িয়ে যাবে অতীতের বিবর থেকে উদ্ভিদ জগৎ বা প্রাণী জগতের মায়াজালে, সত্তা বিকিরিত হবে আলো-ছায়াময় রহস্যের প্রাচীন গোপন উপকূলে। বিচ্ছেদের খুব গূঢ় অথচ রেখাময় স্বর, অতৃপ্তির নীলাভ পরতগুলি গভীর ইন্দ্রিয় অনুভূতির সঙ্গে মিশে অভূতপূর্ব এক ইন্দ্রজালের ব্যঞ্জনা দিয়েছে যেন অপরিসীম ধাঁধার ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে নিজেরই আত্মসন্ধান, নিজেকে জাগানোর প্রক্রিয়া -

"রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়- আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে"

'একটি কবিতা', 'সাতটি তারার তিমির'

বাস্তবতার বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে যে অনৈক্য যে উচাটন তার মধ্যে ক্রিয়াশীল আন্তঃসম্পর্কের সংঘর্ষ। সার্বভৌম শূন্যতা তখন আদিম মুকুট খসিয়ে নাড়ির ঘ্রাণে দিব্য ও দ্যোতমানা। আত্ম আবিষ্কারের নেশায় তখন গভীরতর সুপ্তির ভেতরেই চলে বুনো তরঙ্গকে পাবার আয়োজন। তাই তমসার অভিজ্ঞানই সত্তার উৎকর্ষ চেনায়। কেননা -

> "বিষণ্ণ হেমন্তের যে অন্ধকারে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের এবং সভ্যতার তৎকালীন নিরাশ্বাস উদ্যমহীনতার ছায়া, সে-অন্ধকারে সচেতন ব্যক্তি আত্মসম্বিত অর্জনের যে সুযোগই নিক, তার বিষণ্ণতায় কোনো সন্দেহ নেই। এ অন্ধকারে নক্ষত্রই একমাত্র আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সূর্যের আলোকে যে অনাহত সৌন্দর্যচেতনা পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বিকীর্ণ হয়েছে, আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা এঁকেছে, জীবনান্দীয় জগতে সে প্রত্যয় নেই – থাকার কথাও নেই। অন্ধকার সেখানে সমাসন্ন, কুয়াশায় কম্পমান নক্ষত্রটুকুই সেখানে ভরসা।"[২]

অন্ধকারের এই আয়োজন সার্থক হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পের আশ্চর্য মায়া দিয়ে। আদিম রাত্রির ঘ্রাণ, মরা মানুষের শাদা হাড়ের মতো আন্দোলিত গাছের প্রশাখা, হরিতকী গাছের হেমন্তের রাঙা ও গোল সূর্য, পিপুল গাছে বসে থাকা পেঁচা, নীল ভোর, জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করে ওঠা নীল ডিম, সুপক্ক রাত্রির গন্ধ, প্রবাল পিঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাস, হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশ ইত্যাদি চিত্রকল্পে কবি স্পর্শ করেছেন প্রকৃতিকে, সময়কে এমনকি চৈতন্যের সূক্ষ্ম তরঙ্গকে -

"মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে
প্রস্তর যুগের ঘোড়া যেন – এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়,

বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে ইস্পাতের কলে
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়াল ছানার মতো- ঘুমে ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের পাইস রেস্তোরাতে
প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে"
'ঘোড়া', 'সাতটি তারার তিমির'

এ যেন এক রূপকথার বাস্তব, সম্মোহন আর জাদু দিয়ে গড়া রূপালি পাটাতনের ওপর রচনা করছে আঁকাবাঁকা অপরিচয়ের নকশা। জ্যোৎস্নার উৎসবে ঘন হয়ে উঠেছে শান্ত নির্জনতা। বাস্তবের দ্বন্দ্বময় উত্থানের বাইরে অন্তরের হীরক স্তব্ধতার আরক। নির্মিত হল পশুপক্ষী প্রাণীদের নিয়ে ভিন্ন এক জগৎ। শেয়াল-শকুন-ঘোড়া-সিংহ-উট-তিমি-সিন্ধুসারস-বুনোহাঁস-তিতির-হাঙর-অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণীদের নিয়ে এই জগৎ অস্তিত্বের আরেকটি দিককেই উদ্ভাসিত করে তুলল। শুধু প্রাণীদের তুলে আনা নয় তাদের উল্লেখে প্রকটিত হল মানব পরম্পরার, সময়সচেতনার বিশেষ দিক হিসেবে। যা আমাদের স্বস্তি ও সন্তোষ, তৃপ্তি আর প্রাপ্তির বাইরে জন্ম-মৃত্যু, কামনা-বাসনা, মনোজগতের অবচেতন রঙ রূপে যা দেদীপ্যমান। ঘোড়া তখন হয়ে ওঠে মনোগহনের আলো আঁধারির উৎসার কিংবা সময়চেতনার জ্বলন্ত শিখা। ইহজগতের জ্যান্তব বহমানতায় ঘোড়ার প্রতীকে মানুষের সংবৃত আত্মার পদধ্বনি ও পরিক্রমণের সংলাপ যেন রচিত হয়ে চলল নিওলিথ স্তব্ধতাকে ছুঁয়ে।

এই দ্বন্দ্ব কখনো মানবমনকে বিক্ষত করে ভিন্ন প্রশ্নে। অস্তিত্বের সংশয়ই তখন অবারিত হয়ে দাঁড়ায়। প্রখর শূন্যতাবোধে চালিত হয়ে কবি মন উদ্বেগে অধীর হয়। এই অন্তর্গত শূন্যতাবোধকে অতিক্রম করা কখনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অভাবে যেমন শরীর জীর্ণ হয় তেমনি অতিপ্রাপ্তিতেও মন বিবর্ণ হয়ে পড়ে। যেমন 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সব সফলতা প্রাপ্তির পরে মানুষের অসহায় বিচ্ছিন্নতা বোধ। ফাল্গুনের রাত। পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে। বধূ আর শিশুর পাশে ঘুমোচ্চে স্বামী অথবা পিতা। প্রেম, আশা কিংবা সুখ কোনোটিরই অভাব ছিল না তার। স্ত্রীর ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত নয় সে। অথচ 'আট বছর আগেকার একদিন' কবিতার নায়ক মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা বলেছিল 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশীরও জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জেগেছিল। সাময়িক চাওয়া পাওয়ার অভাব নয় আরও বড় আর গভীর সমস্যাতে ভুগছিল ব্যক্তিটি। ভেতরে উথলে ওঠা এই বোবা আর্তনাদকে সে চাপা দিতে পারেনি। সংগুপ্ত আর অন্তর্শায়ী সে আঘাত এতটাই প্রবল যে তা আত্মঘাতেরই নামান্তর হয়ে ওঠে। অথচ এই আঘাত বাইরে থেকে আরোপিত নয়, এই প্রক্ষোভ ব্যক্তিটির অন্তর্গত রক্তের। জীবন সম্পর্কে সে এমন এক মৌলিক জিজ্ঞাসায় কাতর যার উত্তর সে খুঁজে পায়নি। কারণ কোনো অর্থের অভাব, কোনো সাংসারিক পীড়ন, অতৃপ্তি বা অপ্রাপ্তি তার ছিল না -

"কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই
বিবাহিত জীবনের স্বাদ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু – আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে"
'আট বছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী'

এছাড়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাটিও তার ছিল না -

"হাড় হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই”

'আট বছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী'

সাধারণ মানুষের যা যা দরকার কোনো কিছুরই খামতি ছিল না। বরং যা ছিল বেশিই ছিল।

“তবুও সে তৃপ্তি পায় নি-
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে”

'আটবছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী'

'তাই' নামক অব্যয়টিই বদলে দেয় কবিতাটিকে। বদলে দেয় জীবনের মানেকেও। মনোগহ্বনের রহস্য যে কত ব্যাপক আর বিচিত্র হতে পারে তা সাধারণ আটপৌরে যাপনের মধ্যেও খুলে দিতে পারে তার বর্ণিল ঝাঁপি। সবকিছু থাকা সত্তেও সে কেন আত্মহত্যা করল? অপরিসীম আত্মঘাতী ক্লান্তি যেন পাঠককেও বিপর্যস্ত করে দেয়। বিদ্রুপ আর শ্লেষের ঝাঁঝ নিয়ে উঠে আসা এক চোরা চমকে সৃজনশীল মন আহত হয়। বোধহীন মানুষদের জীবন সম্পর্কে কোনো অভিমান হয় না বলেই তারা বোবা থাকতে পারে। আড়ম্বর আর সুখের সস্তা বিলাসে তাদের সুখী চামড়া আরও চিকন হয়ে ওঠে। স্তব্ধতার যে ঐশ্বর্য রয়েছে তার স্বাদ পেলে বিমূঢ় হতে পারে মানুষ। এই 'বিপন্ন বিস্ময়ে' দগ্ধ হয়েছিল যুবকটি। অনুভূতিহীন কেরিয়ার স্বর্বস্ব মানুষ এই 'বিপন্ন বিস্ময়ে' বিচ্ছুরিত হয় না। কেননা 'বিপন্ন বিস্ময়' সকলের জন্য নয়। কোনো সংবেদনশীল সত্তার কাছে -

> “জীবন তার অর্থ, তার চরিতার্থতা হারায়, মানুষ যখন নিজের জীবনকে ভারবাহী জন্তুর মতো টেনে নিয়ে চলে নিছক - সেই জীবন তো মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। এমন অবাঞ্ছিত জীবনের থেকে পরিত্রাণ পেতে সে আত্মহত্যা করতে পারে, অথবা এর চেয়েও সূক্ষ্ম এর চেয়েও গভীর কিছু দ্বন্দ্ব জটিলতা থাকতে পারে 'আনপ্রেডিকটেবল' মানুষের সাদায় কালোয় বিভাজিত এই ভাবনাবর্গের বাইরেও কিছু ধূসর ক্ষেত্র থেকে যেতে পারে, কেতাবি ক্ষেত্রসমীক্ষণের বাঁধা ধারণা যার খোঁজই পায় না।”[3]

জীবনের চেনা পরিচিত ছক থেকে সরে দাঁড়ালেই জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহা সঞ্চারিত হয়। উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ভৌতিক আহ্বান তখন শুনতে পায়। সাজানো সংসারে যে ভ্রম যে চ্যুতি, যে অনর্থক অহরহ ইঁদুড়দৌড় তার থেকে পালাতেই যেন মৃত্যুর শান্ত শিখাতে আশ্রয়। তবে কবি এই বিসর্জনের জয় ঘোষণা করেননি। অনেকেই এ কবিতাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনেরই জয়গান বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ মৃত্যু আসলে বীরত্বেরই ভিন্ন অঙ্গীকার। পশুর মতো বেঁচে থাকাকে যা প্রত্যাঘাত করে। একজন সংবেদনশীল মানুষ নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণ করে গেলেন বেঁচে থাকার আসল সত্য কী? এই বিসর্জন তাই বিচ্যুতি নয় বরং বিবেককে জাগানোরই যেন প্রকৃষ্ট উপায়। আত্মহননের মধ্য দিয়ে আত্মউন্মোচন, আত্মধ্বংসের ভেতর দিয়ে সার্বভৌম চৈতন্যকে জাগানোর প্রয়াস। এক দ্বন্দ্বের নিরসনে বহু দ্বন্দ্বের মিলন।

নারীকে ঘিরেও কবির চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনো জৈবিক স্থূলতায় সংবেদনশীল সত্তাকে না মানানোর প্রশ্নে, কখনো অদ্ভুত প্রত্যাঘাত জনিত বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে। নারীর প্রতি পুরুষের টান এবং পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ কখনোই নিঃশেষ হবার নয়। পুরুষ যেমন যুগযুগ ধরে তার প্রেমতৃষ্ণা নিয়ে নারীর কাছে কাছে এসে দাঁড়ায় তেমনি নারীও তার সত্তার পূর্ণ প্রকাশের লক্ষ্যে আপন সুষমার বিকাশের জন্য পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হয় তখনই যখন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানা সমস্যা এই সংকটের ভেতর চাপ সৃষ্টি করে। নারীও তখন নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের কবিতায় নারীর এই নীরস শুষ্ক রূপটি ঘিরে দ্বন্দ্ববোধ প্রখর হয়ে ওঠে। কবি নারীর কাছে পৌঁছাতে চাইছেন নারীকে যুগযুগ ধরে যেভাবে আঁকা হয়েছে সেভাবেই। আত্মের ভেতর বেড়ে ওঠা ক্ষোভ ও জুগুপ্সার প্রশমন করার জন্য কবি নারীর চিরন্তন সৌন্দর্য প্রতিমার তলে এসে দাঁড়াতে চান। আর বিরোধ

বাঁধে এখানেই। কবির চাওয়ার মধ্যে যে শুদ্ধ আকাঙ্খার প্রকাশ, নারীকে ঘিরে শুদ্ধতার বিকাশ যুগের স্বেচ্ছাচার ঐ শুদ্ধতাকেই দাহ করে দিচ্ছে। কবি পেতে চেয়েছেন নারীর ভেতরে মানবের নিষ্কলুষ উত্থানকে। শিল্পীসত্তা বারে বারে নারীর মাধুর্যের কাছে, স্নিগ্ধতার কাছে অবনত হতে চেয়েছে, কিন্তু কবি যা চাইছেন তা পাচ্ছেন না। ফলতই এক ধরনের বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে -

"ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
আমারে সে ভালোবাসিয়াছে
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চলে গেছে যখন ডেকেছি বারে বারে
ভালোবেসে তারে।"

'বোধ', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'

লক্ষ্যণীয় 'মেয়েমানুষ' শব্দবন্ধটি। নারী নয়, মেয়ে নয় প্রেমিকা নয় 'মেয়েমানুষ'। ঘৃণা, উপহাস, ক্রোধ সমস্ত কিছু পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ শব্দবন্ধে। নারী সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে জীবনানন্দের এই দ্বিধা ও ক্ষোভ কতটা তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে উৎসারিত তার ভূমিকাও নিশ্চয়ই আছে তবে এই অতৃপ্তির বোধ শুধু ব্যক্তিজীবন থেকে নয় তা সময়ের ক্রান্তিপিঠে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভঙ্গি থেকেও উৎসারিত। নারীর সৌন্দর্য যেমন সত্য তেমনি সত্য এই সৌন্দর্যের আড়ালে কুশ্রীতাটুকুও। কবি পেতে চাইছেন ওই মধুর স্পর্শ, তাঁর স্বপ্নে আকাঙ্খায় কল্পনায় নারীর রূপের প্রতি বার্তা ফুটে উঠেছে অথচ বাস্তবে অন্যরূপ। পেমের প্রতিদানে পাচ্ছেন ঘৃণা, আশ্রয়ের পরিবর্তে উপেক্ষা, শান্তির পরিবর্তে হঠকারিতা। এবং তখনই মনে হচ্ছে 'এই ভালোবাসা ধুলা আর কাদা'। আবার প্রেমের চিরন্তন প্রতিমাটিও একেবারে মন থেকে মুছতে পারেন না - "আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে" (নির্জন স্বাক্ষর, ধূসর পাড়ুলিপি)। এই নিরন্তর দ্বন্দ্বে কবি ক্ষতবিক্ষত। বাইরের ভিড়, হুল্লোড়, হট্টগোল, হিসাব, কারবার, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি হৃদয়কে নির্জীব করে তোলে। তাই "কোনো এক মানুষের মনে/ কোনো এক মানুষের তরে/ যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে" (নির্জন স্বাক্ষর) তাকে পাওয়া বড়ই অনিশ্চিত। কেননা 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। (সুচেতনা, বনলতা সেন) এখন আর সম্ভব নয় ধ্রুব আশ্বাসে ভর করে কোনো কিছু গড়ে তোলা তাই শনি শেয়াল ভাঁড় ধূর্তদের পৃথিবীতে নারী আজ মহিলা। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সূত্র ধরে যে নারী যুগযুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে কল্পনা মানসীর উৎসরূপে সেই 'মানুষী'র প্রেমের কোনো আবেদন আজকের যুবক কবিদের মনে কোনো সাড়া ফেলতে পারে না, তারা নিছকই মহিলা। সে মহিলার জঙ্ঘা দেখে কর্পোরেট পৃথিবী হো হো করে হেসে ওঠে। তার ভেতরে প্রেমের প্রেরণা নেই, আলোও নেই। যুবক কবিরা সুন্দরীদের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখলেও সুন্দরীদের মনে তার কোনো প্রভাবই পড়ে না -

"একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে- একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চলে গেলো যুবকের দল;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আরেক কথা – এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি তবু আহা, ইহাদেরই কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকের দল
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে – একবার বেদনার পানে।"

'ইহাদেরি কানে', 'মহাপৃথিবী'

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 105
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একদিকে আছে প্রেমিক কবি শিল্পীর দল অন্যদিকে আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব মহিলা। যে মহিলা নিজের প্রেমকে চিনতে পারেনি। এই সুন্দরীরা কবি শিল্পীদের নিয়ে প্রীত নয় বরং প্রীত বাস্তবের অনুসরণকারী যুবকদের প্রতি। এক্ষেত্রে মনে দ্বন্দ্ব এসেছে কিন্তু গভীর সত্য তাঁকে আগুনের মুখোমুখি করেছে। আবহমান নারীর এমন পরিণতি দেখে কবি আহত হচ্ছেন, বেদনার্ত হচ্ছেন। তাঁর অন্তঃকরণ চাইছে না পৃথিবীর রূঢ় সফলতার মুখ দেখতে। জীবনানন্দের কবিসত্তা কখনো দ্বন্দ্বে তীব্র হয়ে উঠছে, কখনো জিজ্ঞাসায় আকুল হচ্ছে, কখনো বেদনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উঠছে।

এই দ্বন্দ্ব এই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেতেই জীবনানন্দ তাঁর প্রেম চেতনাকে অন্যভাবে নির্মাণ করে নিলেন। যুগের অবক্ষয়তা, ক্রান্তি ধ্বসকে এগিয়ে গিয়ে কল্পনায় আশ্রয় নিলে বাস্তববোধহীন হবেন আবার রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হতে গিয়ে তাঁর অন্তঃকরণ একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এ দুয়ের টেনশন থেকে মুক্তি পেতেই তিনি ভাবনাকে একেবারে নতুন করে গড়ে তুললেন। নারীকে কল্পনার আধার নয়, রোমান্টিকতার ম্যাড়মেড়ে ছায়া নয় আবার অস্থিমজ্জার নিরাভরণ উপস্থাপনও নয় তিনি খুঁজে নিলেন প্রকৃত শ্রেয়োবোধের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রেমের গভীর গোপন আলোটিকে। কবি সেই বিশেষ নারীটিকে খুঁজে পেতে চান যার রূপের আড়ালে আছে জ্ঞান আর ধৈর্যের উদ্ভাস, আছে শান্তির দীপ। কিন্তু তা হয়তো বর্তমানের ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত সময়ের পাদপিঠে দাঁড়িয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য চাই প্রকৃত প্রেমবোধের নিরন্তর অনুসন্ধান। এই সন্ধানই ফুটিয়ে তুলবে প্রকৃত প্রেমের জ্যোতি। যা নিভে গেছে তা আবার জ্বলে উঠবে যা পুড়ে গেছে তা আবার জাগবে। চাই প্রকৃত ধ্যান প্রকৃত দৃষ্টি। কবি তাই ইতিহাস অতীত ঐতিহ্য প্রকৃতি থেকে আহরণ করে নিলেন ধ্যানের মঞ্জরীটি যে প্রেম ক্ষত বিক্ষত হতে হতে ধ্বস্ত হয়ে ছিঁড়ে যায় নি বরং যন্ত্রণায় আলো ছড়িয়েছে। বহুযুগ আগেও নারীকে নিয়ে এরকমই স্থূলভাবে ব্যবহার করেছিল মোটাদাগের মানুষেরা; কিন্তু প্রেমের শুদ্ধতা তার আপন শক্তিতেই পথ খুঁজে পেয়েছিল। ক্লেদ বিকৃতি ক্ষয়ের মাঝেও অমেয় ছিল তার দীপ্তি। তখন কোথা থেকে পেয়েছিল প্রেম তার শক্তিকে? প্রকৃত প্রেমকে পাবার তাড়নাই হল প্রকৃত প্রেম যা যুগযুগ ধরে রয়ে যায় মানুষের মনে। এই অন্বেষণের অপর নাম হয়তো প্রেম। পৃথিবী সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকেই চলছে এই অন্বেষণ, চলছে স্থবিরতা আর ভ্রান্তিকে ভেঙে নীড় গঠনের প্রচেষ্টা। কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না স্বপ্নের ঘর। প্রকৃত প্রেমিক সত্তা চিরকালই অবিরত সংগ্রামে রত, সংগ্রামে সংগ্রামে সন্ধান আরও সংহত হয়ে ওঠে –

> "অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
> দেখেছি মণিকা আলো হাতে নিয়ে তুমি
> সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
> দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি"
>
> 'মিতভাষণ', 'বনলতা সেন'

ইতিহাস, প্রকৃতির মধ্যে যে স্থৈর্য যে ধীরতা আছে তাও গড়ে এই সুষমাকে। এবং এই অন্বেষণ থেকেই জগৎকে দেখার অভিমুখটি বদলে যায়। প্রকৃতি সেই পটভূমি যেখানে চৈতন্য সঞ্চয় করে নেয় অক্ষয় ধী, পবিত্রতা। বেদনায় ঝরে গিয়েও আবার জেগে উঠতে পারে। অখণ্ড বিশ্বের চলমানতার প্রতীক নারী সেই প্রাণের গতিতে নিজেকে অভিষিক্ত করে নেয়। যে কোনো একটি সময়পটে তাই এ উত্থানকে পাওয়া মুশকিল। আবহমান সময় পরিধির মধ্যে বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে এ চেতনা মিশে আছে প্রকৃতির মধ্যে। ইতিহাসের প্রাচীন সুষমা, অতীতের উদার প্রেক্ষাপট, পাখপাখালি নদী শিশির বৃক্ষের শান্তিময় বাতাবরণে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিচ্ছে শান্তির স্থির আভাস। বিকৃতির চোরাবালি বারে বারে তাকে ঢেকে দিতে চাইছে কিন্তু মানুষের শুভবোধ আর স্বপ্ন সে বালিকে সরিয়ে পুনরায় আবিষ্কার করছে ঐ গুঞ্জন। প্রকৃত প্রেমের খোঁজ না থাকলে আত্মানুসন্ধান হয় না। এই খোঁজ থাকলে তবেই তো নক্ষত্রের দীপ্তি একদিন আঁখিতে জ্বলে ওঠে। এই আহ্বানই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় -

> "সব পাখি ঘরে আসে – সব নদী - ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

'বনলতা সেন', 'বনলতা সেন'

ভাঁড়, মাতাল, বকধার্মিক, উঞ্ছবৃত্তিধারীরা বারবার নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছে, বাণিজ্যিক পৃথিবী তাকে ব্যবহার করেছে উন্নাসিকরা তাকে নিয়ে খেলেছে – এত সবের মাঝখানে নারীও তার সুষমা হারিয়েছে। এই সৌন্দর্য, বিশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির লাবণ্যকে পেতে হলে আমাদের যেতেই হবে সুদূর অতীতে বা প্রকৃতির নির্জন সন্নিপাতে। বস্তুর নিবিড় পক্ষপাতিত্ব আর বহু ব্যবহারে ভোঁতা হয়ে গেছে সকল সূক্ষ্ম চেতনা। পার্থিব প্রীতির ভীড়ে তার শ্রী ঢেকে গেছে। প্রেম আর প্রজ্ঞার মিশেলে জ্বলে ওঠা আলোটি নিভে গেছে। আধুনিক ব্যস্ত পৃথিবী, সামাজিক সংকটের এই দিনে, আদর্শহীনতার এই সময়ে প্রাচীন অচেনা অনুভূতি কোথায়? সেই শুদ্ধ চেতনাকে পাওয়ার জন্য কবির সন্ধান চিরন্তন, সে আহ্বানের নিকট কবির অপেক্ষা শাশ্বত।

Reference:

১. দাশ, জীবনানন্দ, 'কবিতার কথা', কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. ৯

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'সময় গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ', বাংলা কবিতার কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৫৭

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, 'অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে-আট বছর আগের একদিন', আমার জীবনানন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৫ পৃ. ৮৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 106 - 118
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লিমেরিক ও বাংলা ছড়া-কবিতা

মহম্মদ ওমর
সহকারী অধ্যাপক
দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়
Email ID : mdomar8@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Limerick, Lear, Light Verse, Children, Rhyme, Metre, Form, Variation, Fun, Matching etc.

Abstract
The huge flow of poetry that once flooded the soil of rural Bengal, made the sky and air resound and made childhood and youth laugh, today it has turned into a dead river. This one of the oldest ingredients of our folk culture has not been spared from the omnivore of urbanization and globalization. But there is hope that several eminent poets and renowned rhymers who have become active to keep the childhood of our new generation green and safe. They are constantly providing new rhymes suitable for the new age. In this case, they are trying to follow our folk-tradition properly, as well as they are liberal to take loans from abroad. Limerick is one such form of poetry that is imported from Ireland. In spite of its Europe origin, our distinguished poets have made it their own and are using it to colour the minds of Bengalis regardless of whether they are men or women, children or elderly.

Discussion

আমরা জানি যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাখা, তা সে Literary Epic হোক বা Five Act Play, কিংবা Tragedy, Comedy, Farce, Sonnet, Elegy, Haiku, Novel, Short Story ইত্যাদির ভাব ও রূপ আমরা কোনো না কোনোভাবে ধার করেছি ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে। এগুলোর কোনো আভাস যে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে তা ছিল একেবারেই প্রচ্ছন্ন রূপে, অনেকটা বীজের সত্তায়। আমাদের আজকের আলোচনাও এই রকমই একটা ধার করা সাহিত্যরূপ 'লিমেরিক'কে অবলম্বন করে আবর্তিত হবে। 'লিমেরিক'-এর উৎস কিংবা প্রবর্তক সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা না গেলেও এর আবির্ভাব যে আয়ারল্যান্ড নামের ইউরোপিয়ান দেশে, সেবিষয়ে পণ্ডিতরা একমত।

লিমেরিকের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই মনে আসে একালের স্বনামধন্য এক কবির বহুপঠিত এই রচনাটি -

"দুচোখ জুড়ে হাজার ছবি ভাসছে দেদার, ভাসুক না
ভাসতে ভাসতে আসছে খাতায়, আসছে যখন আসুক না।
ভাঙছে ছবি গড়ছে ছবি/ পাঁচ লাইনেই ধরছি সবই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিজের মনে খেলছি ছড়া হাসলে লোকে হাসুক না।"[১]

(প্রবেশক/ পঞ্চিকা ছড়া)

সীমার মধ্যে সীমাতীতকে ধরার চেষ্টা, গণ্ডীর মধ্যে বৃহৎকে আনার চেষ্টা লক্ষিত হয় এই পদ্যরূপে। জাগলার যেমন ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে তার অসাধারণ দক্ষতায় বিস্ময়কর সব জাগলিং দেখায়, ফুটবলার যেমন ড্রিবলিং দেখায় প্রতিপক্ষের পায়ের ভিড়ে, ছড়াকারও তেমনি লিমেরিকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর বহুবিচিত্র কেরামতি দেখান।

একটি মাত্র স্তবক ও পাঁচটি পংক্তির নির্ধারিত ছকে, প্রধানত লঘু সুরে রচিত একধরনের ক্ষুদ্রকায় কবিতা হলো লিমেরিক। কেউ কেউ একে 'লিয়েরিক' নামেও অভিহিত করে থাকেন অন্যতম সফল ও বিখ্যাত লিমেরিক-রচয়িতা এডওয়ার্ড লিয়র-এর নাম অনুসরণে। বাংলায় একে 'লিমেরিকে'র পাশাপাশি 'পঞ্চিকা', 'পাঁচ পংক্তির কবিতা' ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করা হয়। 'লিমেরিক' কথাটির উৎপত্তি কোথা থেকে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণ এখনো একমত নন। কেউ কেউ বলেন ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে একদল আইরিশ সৈন্য যখন তাঁদের লিমেরিক নামের শহরে ফিরেছিলেন (আনুমানিক ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে), তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন এই বিশেষ জাতের পদ্য। আর একদল বলেন লিমেরিক প্রথম দেখতে পাওয়া যায় শিশুতোষ ছড়া-কবিতার সংকলন 'Mother Goose's Melody' নামক বইতে (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে)। আর এক মত অনুযায়ী, আয়ারল্যান্ডের লিমেরিকে অনুষ্ঠিত সামাজিক সমাবেশে একধরনের খেয়ালরসের কবিতা তথা আজগুবি-অর্থহীন ছড়া গাওয়ার রেওয়াজ ছিল, যেখানে ধুয়া হিসাবে বারবার উচ্চারিত হত এই পংক্তি - 'Will you come up to Limerick?' - এখান থেকেই লিমেরিকের উৎপত্তি। আবার এমন জনশ্রুতিও আছে যে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একদল আইরিশ কবি সরাইখানায় মদ খাওয়ার সময় এই ধরনের কবিতা রচনা করতেন বিনোদনের অংশ হিসাবে ('ড্রিঙ্কিং সং')।

শুরুর দিকে লিমেরিক মূলত ছিল 'ওরাল পোয়েট্রি' বা মৌখিক কবিতা (অনেকটা বাংলাদেশের লোকছড়া, কবিগানের মতো) – নির্মিত ও অনুষ্ঠিত হতো ক্লাব, মেস, কমনরুম, বন্ধুদের আড্ডা, খেলার মাঠ ইত্যাদি জায়গায়, তাৎক্ষণিকভাবে। এবং সবক্ষেত্রেই স্রষ্টা-শ্রোতার লক্ষ্য থাকতো, শেষ লাইনটা যেন বেশ মজাদার হয় অথবা একটা চমকপ্রদ উপসংহারে শেষ হয় কবিতাটি। স্বভাবে লিমেরিক স্বয়ংসম্পূর্ণ, রসাত্মক এবং কৌতুককর। সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি বা স্থানের নাম ও বিশিষ্টতা নিয়ে লিমেরিক রচিত হত। এক অমার্জিত বা স্থূল ঐতিহ্য/ রুচির পরিচয় বহন করতো উৎসভূমির লিমেরিকগুলো। ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী কলকাতাতেও একসময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল চটুল কবিগানের লড়াই। কবিগানের সঙ্গে লিমেরিকের উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য আছে।

অন্য অনেক পদ্য-রূপের মতো লিমেরিকও অচিরেই মন জয় করে বাঙালি সাহিত্যিকদের। অশ্লীলতাকে বাদ দিয়ে তাঁরা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে শুরু করেন নতুন এই কবিতা-রূপকে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম লিমেরিকের রস আমদানি করেন সুকুমার রায়। তবে তিনি সরাসরি পাঁচ পংক্তির ধাঁচা কিংবা ১-২-৫/ ৩-৪ অন্ত্যমিলসজ্জাকে অনুসরণ করেননি। তিনি লিমেরিকের উদ্ভট রস তথা খেয়াল রসকে বাংলা কবিতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন এডওয়ার্ড লিয়ার ডং, জাম্বলি, পব্‌ল, ক্লাঙ্গল-ওয়াঙ্গল, ব্লু বস্‌-ওয়স্‌ ইত্যাদি আজগুবি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন কিংবা লুইস ক্যারল করেছেন 'জ্যাবারওয়াকি'র প্রাণীগুলো, বাংলায় সুকুমারও তেমনি একের পর এক সৃষ্টি করেছেন কুমড়োপটাশ, কিম্ভূত, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, ট্যাঁশ গরু ইত্যাদি উদ্ভট চরিত্র। অর্থাৎ সুকুমার ইংরেজি লিমেরিকের 'ফর্ম' নয়, 'কনটেন্ট'কে অনুসরণ করেছেন অননুকরণীয় ভাবে-ভাষায়-স্বাদে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই' ব'লে আক্ষেপ করেছিলেন তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে। আসলে তিনি 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস' তথা 'লৌকিক ইতিহাস'[২] রচনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিজেই উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ, ১৩০১) 'ছেলেভুলানো ছড়া' সংকলনের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় কবিগুরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা যে কর্তব্য, সে-বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। ...অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"[৩]

তাঁর এই মহতী আহ্বান ও সেইসঙ্গে নিজে সংগ্রহ করে ছড়া প্রকাশের দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করে সমসময়ের অনেক মাতৃভাষাসেবীদের। আমাদের লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এই ছড়া সর্বস্তরের বাঙালি-জীবনের সঙ্গে সেই আদিকাল থেকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে, - ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বাচ্চা-বুড়ো, ছেলে-মেয়ে, বালিকা-কুমারী-যুবতী-প্রৌঢ়া, সধবা-বিধবা নির্বিশেষে। বিশিষ্ট লোকসাহিত্য-গবেষক ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক একারণেই মন্তব্য করেছিলেন -

> "ছড়া বাঙালির জাতীয় একটি সাহিত্যিক ঢং...সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, প্রাত্যহিক – সর্ববিষয়কেই ব্যক্ত করতে ছড়াকে আশ্রয় করা হয়েছে...।"[৪]

ছড়া-সাহিত্যের এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে বাংলা ভাষার বেশ কিছু নিষ্ঠাবান সেবক এই আধুনিক সময়েও বহন করে চলেছেন লিমেরিকের আধারে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – কবি সুকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। পাশাপাশি আছেন সত্যজিৎ রায়ের মতো বহুমুখী প্রতিভা। আছেন বর্তমান সময়ের স্বনামধন্য ছড়াকারেরা, যেমন - অপূর্ব দত্ত, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমল পাল প্রমুখ। আমরা আগেই বলেছি কবি সুকুমার রায় সরাসরি লিমেরিকের নির্ধারিত আঙ্গিককে অনুসরণ করেননি। লিমেরিকের উদ্ভট রস তথা খেয়াল রসকে তিনি বাংলা কবিতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। সুকুমার রায়ের পর কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ই প্রথম লিমেরিকের গঠন-বৈশিষ্ট্যকে সরাসরি বাংলা কবিতায় আমদানি করেছেন। এছাড়া আরো বহু কবিদের বহু রচনাই লিমেরিকের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র-ধর্ম বহন করে। এইভাবে লিমেরিক বাঙালি-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছড়া'কে নতুন রূপে, নতুন ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের সমাজে-পরিবারে যে ছড়া সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে তার দুটো অভিমুখ আমরা লক্ষ করি। যথা – উদ্ভট (অ্যাবসার্ড) ও অর্থহীন (ননসেন্স) ছড়া এবং শিশুতোষ পদ্য (যেখানে অঙ্কিত হয় শিশুদের খেলার বা ঘুম পাড়ানোর উপযোগী এক মনোরম জগৎ)। বিষয়টি লোকছড়ার প্রথম সৃষ্টিশীল আলোচক রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিল। ছড়া সম্পর্কে একবার তিনি বলেছেন – "অসংগত, অর্থহীন, যদৃচ্ছাকৃত শ্লোক...।"[৫] আবার অন্যত্র বাংলাদেশের সমাজ-পরিবার-ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে গ্রাম-বাংলার ছড়াগুলোর এক আত্মিক যোগ অনুভব করে তিনি লেখেন –

> "ছড়াগুলিকে টুকরো জগৎ বলিয়া আমার মনে হয় ...প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় একটি বাংলাদেশের মূর্তি, একটি গ্রামের সংগীত, একটি গৃহের আস্বাদ পাওয়া যায়।"[৬]

লোকছড়ার এই দ্বিমুখী ঐতিহ্যকে লিমেরিক রচনার ক্ষেত্রেও একালের কবিরা যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। এখানে প্রথমে আমরা এমন কিছু নমুনা পেশ করবো যেখানে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য এক অদ্ভুত ও মজাদার জগৎ উপহার দেওয়া হয়েছে। যেমন -

ক. "এক যে ছিল অসুর/ রাবণ তার শ্বশুর।
দুবেলা তার বাবার/সামান্য জলখাবার/ তিরিশ হাজার পশু।।"[৭]
(লিমেরিক/ রাঙা ধানের খৈ)

খ. "এক যে ছিল মানুষ/ নিত্য ওড়ায় ফানুষ।
অবশেষে এক দিন/ব্যাপার হলো সঙ্গীন-/ ফানুষ ওড়ায় মানুষ।।"[৮]
(লিমেরিক/ রাঙা ধানের খৈ)

কচিকাঁচারা তাদের বাবা-মা, দাদু-দিদার কাছ থেকে রামায়ণের কাহিনিতে রাবণের নানা কীর্তিকলাপের কথা শুনে থাকবে, কিন্তু রাবণের শ্বশুরকে তারা চেনে না। মহাপরাক্রমী রাবণের রাক্ষস-শ্বশুরের জলখাবার হিসাবে তিরিশ হাজার পশু খাবার

খবরে তারা যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হবে। দ্বিতীয় লিমেরিকটিতে কবি অন্নদাশঙ্কর রায় ফানুসের দ্বারা মানুষ ওড়ানোর উলটপুরাণ শুনিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের পাশাপাশি আমরা স্মরণ করতে পারি সত্যজিৎ রায়ের ‘তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম’ গ্রন্থের রচনাগুলোকে। সুকুমার রায়ের মতো তাঁর সুপুত্র সত্যজিৎ রায়ও এডওয়ার্ড লিয়র ও লুইস ক্যারলের বেয়াড়া ও সৃষ্টিছাড়া আজগুবি জগতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রমাণ তাঁর পূর্বোক্ত সচিত্র গ্রন্থটি, যেখানে তিনি উক্ত দুজনের অনুসরণে মজার মজার ছড়া উপহার দিয়েছেন। বিশেষ করে লিয়রের ‘ননসেন্স রাইমে’র ছবিগুলোকে অনুসরণ করে তিনি যে ২৮টি লিমেরিক রচনা করেছেন, তা যে কেবল নতুন ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়, বাংলা সাহিত্যে তা এক নতুন ধরনের পদ্য রচনার প্রেরণাস্থল হয়ে উঠেছে, কিংবা বলা যায়, লিমেরিক রচনার আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। আজগুবি দুনিয়া, আনকোরা শব্দ, বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভট সব কীর্তিকলাপে হাসির ফোয়ারা ছুটে যায় বড়ো থেকে ছোট সবার মুখে। সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় সত্যজিৎ ইংরেজি লিমেরিককে নিয়ে এসেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্দরমহলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত -

গ. “খুদে বাবু ফুল গাছে ব’সে যেন পক্ষী/ মৌমাছি এসে বলে ‘এ তো মহা ঝক্কি!
মধু খাব, সরে যাও!’/ বাবু বলে ‘চোপ রাও!
তুমি আছ বলে গাছে বসবে না লোক কি?’”[৯]
(লিমেরিক ১৪/তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম)

ঘ. “ওই দিকে দেখ দেখি তাকিয়ে-/ বিদঘুটে রাক্ষস নাকি এ?
আরে না না এযে হরু/ হয়েছে সে এত সরু
মামা তার রাখে তারে পাকিয়ে।”[১০]
(লিমেরিক ১১/ তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম)

উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তে ফুল গাছের অধিকার নিয়ে পাখিতে-মানুষে দ্বন্দ্ব আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিকায় ক্ষীণকায় হরু নামক যুবককে নলের মতো গুটিয়ে রাখার ঘটনা শিশুদের নিয়ে যায় এক কিম্ভূত দেশে, যেখানে সবকিছুই উদ্ভট ও কৌতুককর। ননসেন্সের এই সব-সম্ভবের দেশে ধ্বনির তোড়ে ভেসে যায় শব্দ, অর্থরা হয় বেসামাল, আর শিশুরা মেতে ওঠে এক বিশৃঙ্খলার খেয়ালি খেলায়। নিচে আরও দু’জন বিখ্যাত ছড়াকারকে উদ্ধৃত করলাম -

ঙ. “‘চলার সময় সামলে চোলো দুটোই আছে চোখ তো!’
এই বলে মা খুড়ি পিসি সবাই তাকে বকত।
নিজেকে তাই সামলাতে সে/ কানের মধ্যে তুলো ঠেসে
ঠ্যাংদুটোকে শেকল দিয়ে বাঁধল পাকাপোক্ত।”[১১]
(লিমেরিক ৬/ সবকিছুতেই খেলনা হয়/ শঙ্খ ঘোষ)

চ. “সারাগিতো ধামাচাপা সারেগামা ধাপানি
লাগাসাই তাকাহামি কাতুকুতু লাফানি।
ছোটোকাকা মিলিটুরি,/ ফালাকাটা শিলিগুড়ি
ঘুরে এসে বলেছিল গানখানা জাপানি।”[১২]
(ছড়া ২১/ বাক্সভরা একশো ছড়া/ অপূর্ব দত্ত)

এখানে আমরা দেখলাম লোকছড়ার পরম্পরাকে আধুনিক সময়ের ছড়াকারেরা যথাযথভাবে অনুসরণ করে একালের শৈশব-কৈশোরকে মজাদার নানা ‘ননসেন্স রাইম’ উপহার দিয়েছেন। এগুলোর পাশাপাশি এমন ধরনের লিমেরিকও প্রচুর লেখা হয়েছে বা হচ্ছে যেগুলো পূর্বের দৃষ্টান্তগুলোর মতো এলোমেলো, অসংলগ্ন, অর্থহীন নয়; যাদের গঠনে মেঘ, স্বপ্ন কিংবা পাখির ঝাঁকের মতো মুহুর্মুহু পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। অর্থহীন, কৌতুকরসে ভরপুর লিমেরিকের পাশাপাশি শৈশবস্মৃতি-মেদুর ছড়া-লিমেরিকও লেখা হয়েছে কবিদের দ্বারা। নির্ধারিত ও দৃঢ় এক বাঁধুনি দিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের কায়া। কোনো কোনো লিমেরিকে পাওয়া যায় ‘একটি রেখা একটি কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে'[১৩] উপস্থাপিত হয়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইসিএস অন্নদাশঙ্করের হাত থেকে বেরিয়েছে এমন সুন্দর এক শৈশব চিত্র -

ক. "এক যে আছে পেয়ারা গাছ/ পাড়ার শিশু তারই কাছ।
পাড়া যখন শুতে যায়/বাদুড় এসে পেয়ারা খায়।/ গাছ রে তুই ফুরিয়ে বাঁচ।"[১৪]
(লিমেরিক/ ডালিম গাছে মৌ)

পেয়ারা খেতে বালক-বালিকা যেমন ভালোবাসে, বাদুড়ও তেমনই। বালক-বাদুড়ের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে স্বয়ং গাছ। শিশুদের জন্য এই ঘটনা যেমনই সত্য, তেমনই আনন্দদায়ক। আরও মনে পড়ে কবি অপূর্ব দত্তের একটি বহুপঠিত লিমেরিক-

খ. "দশ টাকাতে ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া/ চাঁদনি রাতে দেখতে গেলুম ভিক্টোরিয়া।
গ্যে' দেখি তার শরীর বেয়ে/ ফুটফুটে এক পরীর মেয়ে –
আমায় দেখে হেসে ফেলল ফিক্ করিয়া।"[১৫]
(ছড়া ৫/ কলকাতা তোর জন্মদিনে)

খোকাখুকুদের জন্য চাঁদনি রাতে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ভিক্টোরিয়া ঘুরতে যাওয়া আর চাঁদ হাতে পাওয়ায় কোনো তফাত নেই। সুতরাং আমরা দেখলাম আবোল-তাবোল ছড়া রচনার পাশাপাশি শৈশবের মনোরম ছবি রচনার ক্ষেত্রেও লিমেরিক কবিদের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এছাড়া লিমেরিক কখনো কখনো ইঙ্গিতপূর্ণ, গভীর ভাবের রচনাকেও তার অঙ্গে ধারণ করেছে। উদাহরণ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই রচনাটি -

গ. "খাঁচা খুলে উড়িয়ে সে দেবে তার ময়না কি?
দিলে দিক, তাতে কারও ক্ষতি কিছু হয় নাকি?
সব পাখি দূরে যাক,/ খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাক,
বুকের খাঁচায় যেন একটিই রয় পাখি।"[১৬]
(পাঁচ পঙ্ক্তির পাঁচটি/ হাসলে, ভালবাসলে)

এখানে বনের পাখিদের মুক্তির পাশাপাশি মানুষের প্রাণপাখির বন্দীত্ব তথা স্থায়িত্ব কামনা করেছেন কবি। সুতরাং আমরা দেখলাম অর্থহীন ছড়া হোক বা অর্থময়, উভয়ক্ষেত্রেই লিমেরিক একালের কবিদের অবলম্বন ও আস্থা যুগিয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে।

এখন আমরা দেশের রাজনৈতিক চালচিত্র, রাজনীতি সম্পর্কে কবি তথা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি রূপায়ণের ক্ষেত্রে লিমেরিকের ব্যবহার পর্যালোচনা করবো। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ধরনের কর্তৃত্বের[১৭] কথা বলেছেন – সাবেকি কর্তৃত্ব (Traditional Authority) – বংশানুক্রমিক ভাবে শাসন করছেন এমন, গণমোহিনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণাবলির ভিত্তিতে জনমানসে যে বৈধতার সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে গণমোহিনী কর্তৃত্ব এবং আইনগত-যুক্তিসঙ্গত কর্তৃত্ব (Legal-Rational Authority)। লিমেরিকের বেশ কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে আমরা দেখাবো এখনকার নেতা-মন্ত্রীরা হয় বংশানুক্রমে নেতা হয়েছেন কোনো যোগ্যতা ছাড়াই অথবা 'ক্যারিশমা' কথাটির বিকৃত অর্থকে গ্রহণ করে নেতা হবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। কেউ কাজ না করে কেবল বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, কেউ দেদার টাকা ছড়াচ্ছেন, কেউ ধোপদুরস্ত পোশাক-আশাকের গ্ল্যামারে জনগণের চোখ ঝলসে দিচ্ছেন। কবি শঙ্খ ঘোষের কলমে আমরা এমনই এক লিমেরিক আস্বাদ করি -

ক. "মঞ্চে উঠে হাত পা ছুঁড়ে বাজবিদ্যুৎ চমকাও
হুঁশ থাকে না ঘণ্টা-মিনিট কিংবা শ্রোতার সংখ্যাও
চোখের জলে ভিজল গরদ!/ পরের দুঃখে এমন দরদ
যৎসামান্য কমতে পারে একটু যদি কম খাও।"[১৮]
(লিমেরিক ৫/ সবকিছুতেই খেলনা হয়)

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সত্যি কথা বলতে কি এরকম বকমবাজ, ধান্দাবাজ নেতারাই এখন সংখ্যাগুরু। 'অর্থশাস্ত্র'কার কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে একজন আদর্শ নেতার চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন[১৯] -

১. রাজ্যের সকল সম্পত্তি তাঁর অধীনে থাকবে কিন্তু তিনি কখনো ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্য তা ব্যবহার করবেন না।

২. শাসকের কর্তব্য পালনে কখনোই যেন ক্ষমতার ঔদ্ধত্য দেখা না যায়।

৩. কথায় ও কাজে একইরকম ব্যবহার করা, সত্যবাদী হওয়া এবং তাঁর পারিষদবর্গ হবেন গুণবান।

কিন্তু এখনকার নেতারা ধার ধারেনা এমন কাগুজে নীতি-আদর্শের। বরং ভোটের আগের বিনয়ে গদগদ ভাবমূর্তি জেতার পরেপরেই বদলে যায় ১৮০ ডিগ্রি। তখন তাঁদের হাবভাব, আচার-আচরণ একজন ভিআইপির মতো, লিখেছেন কবি অমল পাল-

খ. "পথ ছেড়ে দাও পথ ছেড়ে দাও যাচ্ছে দাদার গাড়ি
দাদা নাকি ভোটের আগে আসত তোমার বাড়ি?
আসত তাতে হলটা কী/এই দাদা নয় সেই দাদাটি
দাদা এখন দেশনাট্যের মস্ত অধিকারী।"[২০]
(লিমেরিক ১৬/পঞ্চিকা ছড়া)

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 'আত্মসম্পদগুণ'[২১] নামে নেতার আরেক গুণের কথা বলা হয়েছে, যার মূল কথা হল - আগামী বিষয়ে (ভবিষ্যৎ ব্যাপারে) মনন, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের দক্ষতা ইত্যাদি। একালের নেতাদের মধ্যেও কবিরা অনুরূপ গুণাবলির সমাহার লক্ষ করেছেন। উদাহরণ নিচের লিমেরিকটি -

গ. "দেখে এলাম আজব দৃশ্য, সাপে-নেউলে সম্প্রীতি
একই মঞ্চে গাইছে তারা দরদভরা লোকগীতি।
শুধোই তাদের কানে-কানে/এই ঘটনার আসল মানে
বললে তারা, 'বুঝলে ভায়া, একেই বলে রাজনীতি'।"[২২]
(লিমেরিক ৪২/ পঞ্চিকা ছড়া)

ব্যঙ্গের সুরে লেখা এই লিমেরিকে আমরা বুঝতে পারি যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান ও আশংকাগ্রস্ত হয়েই একালের নেতারা ভোটরঙ্গের ঠিক আগেই নির্লজ্জভাবে নেমে পড়ে দলবদলের খেলায় কিংবা ঘোড়া কেনাবেচায়। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখালাম যে রাজনৈতিক ভাবনা কিংবা বার্তা প্রকাশের ক্ষেত্রেও লিমেরিক নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হয়ে উঠেছে কবিদের হাতে।

বর্তমান সময়ের নানা অনাচার, অবিচার, ব্যভিচারকে লিমেরিকের পাঁচ চরণের শরীরে নিপুণভাবে ধরে দিয়েছেন অপূর্ব দত্তের মতো স্বভাব-ছড়াকারেরা। যেমন -

"শ্যামবাজারের শ্যামলবাবু জমি কিনলেন গড়চায়
ইচ্ছে ছিল, বাড়ি করবেন সাধ্যমত খরচায়।
কিন্তু এমন কপাল ভায়া,/ছাড়তে হল জমির মায়া
অন্য লোকে দখল করে লক্ষ টাকা দর চায়।"[২৩]
(ছড়া ৬/ কলকাতা তোর জন্মদিনে)

একালের জমি-মাফিয়াদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমরা কেউই অজ্ঞ নই। এখানে সেই জবরদখলকারীদের দাদাগিরির একটা নমুনা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরেছেন কবি। জমি-ডাকাতির পাশাপাশি পণের মতো অভিশপ্ত ও চিরকালীন সমস্যাও অত্যন্ত সার্থক ও মর্মস্পর্শী ভাবে-ভাষায় ধরা পড়েছে এই রচনাটিতে -

"সব বাবারাই মেয়ের জন্য মনের মত বর চায়
কিন্তু মাথায় আকাশ ভাঙে পণের মোটা খরচায়।

গৃহবধূর আত্মহনন/করবে কে তার সংখ্যা গণন!
যুবসমাজ উঠুক মেতে পণবিরোধী চর্চায়।"[২৪]
(ছড়া ৩১/ ছড়ায় ছড়ায় ছড়াক্কার)

কেবল সমস্যার কথা বলেই নিজের দায়িত্ব পূরণ করেননি কবি, সমগ্র যুবসমাজকে ডাক দিয়েছেন এই গভীর সামাজিক ব্যাধির মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে। পণবিরোধী প্রচার হিসাবে ছড়ার ব্যবহার এর আগেও আমরা শুনেছি কিছু লোকছড়ায়, যেমন -

"এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে,
এখন কেন কানছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে!"
কিংবা এই ছড়াটি –
"টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলুম, কানে মদনকড়ি,
বিয়ের বেলা দেখতে এলুম, বুড়ো চাপদাড়ি।"

দেখাই যাচ্ছে, একালের লিমেরিক বাঙালির চিরকালীন ছড়াকে অত্যন্ত সার্থকভাবে সময়ের সাথে সাথে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পণের পাশাপাশি খেলাধুলায় বেটিং নিয়েও সোচ্চার হয়েছেন কেউ কেউ। উদাহরণ এই লিমেরিকটি -

"বেটিংবাজির এই বিচ্ছিরি অসুখে
ঘাবড়ে না গিয়ে ডাক্ কার্তিক বসুকে।
তিনি এসে ঠিকমতো/ওষুধে সারিয়ে ক্ষত
ঘোড়া বানাবেন যত কান-ঝোলা পশুকে।"[২৫]
(কার্তিক-গনেশ/ নদীনালা গাছপালা)

আমরা দেখলাম, পণ হোক বা বেটিং, সবক্ষেত্রেই কবিগণ এইসকল অনাচার নির্মূলকল্পে উপযুক্ত দাওয়াই-এর নিদান দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের এক দুরারোগ্য সামাজিক তথা মানবিক ব্যাধি হলো পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রবণতা। নিম্নের ছড়াটিতে সেই প্রবণতার এক ভয়ানক ছবি ফুটে উঠেছে -

"জুলজুল চোখে এদিকে-ওদিকে কেন দিচ্ছেন উঁকি?
আমরা তো স্যার একটু-আধটু করবই টোকাটুকি।
যদি না শোনেন কথা আমাদের/এখুনি পাবেন 'হাড়ে হাড়ে' টের
খামোকা কেন যে নিচ্ছেন স্যার বড় রকমের ঝুঁকি।"[২৬]
(লিমেরিক ৩০/ পঞ্চিকা ছড়া)

একদা যা ছিল বিরল ও গোপন, এখন তা ক্রমশ সর্বজনীন ও ব্যাপক হওয়ার পথে উদ্বেগজনকভাবে এগিয়ে গেছে। যাঁরা শিক্ষকতার পেশায় আছেন তাঁরা হাড়েহাড়ে টের পান এই প্রবণতার নগ্ন রূপটি। অচিরেই এই ক্ষয়রোগটিকে সমূলে উৎপাটন করতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। লিমেরিকটিতে কবির গভীর উদ্বেগ ধরা পড়েছে।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা'তে মন্তব্য করেছিলেন – 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। কিন্তু এখন যে হারে কবি জন্ম নিচ্ছেন ও কবিতা লেখা হচ্ছে, তাতে মনে হতেই পারে যে সকলেই বোধ হয় কবি, কেউ কেউ কবি নয়। কবিতা তো লেখা হচ্ছে, তবে তার গুণাগুণ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। পদ্যের মান নিয়ে সংশয়ের আভাস প্রকাশ পেয়েছে এই লিমেরিকটিতে -

"ঘ্যানঘেনিয়ে প্যানপেনিয়ে পদ্য বলে কীসব লিখছ ছাই
বাংলা এমএ পাশ করলেও দেখছি আমার বোঝার সাধ্য নাই।
'বুঝবি কী তুই আকাট হাঁদা/কাব্যলোকের জটিল ধাঁধা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোঝার জন্য নয় রে এসব, টং টং টং বাজার জন্য ভাই'।"[২৭]

(ছড়া ৫৭/ পঞ্চিকা ছড়া)

জিজ্ঞাসা ওঠে একালের কিছু কলমচির সততা নিয়েও। কবিযশোপ্রার্থী কেউ কেউ যে নানা অসৎ পন্থা অবলম্বন করে বিখ্যাত হয়ে উঠতে চায়, সেকথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো বিখ্যাত সম্পাদক ও কবি -

"লেখক হিসেবে খ্যাত ধার্মিক বক।
তবে নিন্দুকে বলে, সে কুম্ভিলক।
অন্যের বই থেকে/ টুকে গ্রন্থাদি লেখে,
এ-দিকে কপালে আঁকে ফোঁটা ও তিলক।"[২৮]
(পাঁচ পঙ্ক্তির পাঁচটি/ হাসলে, ভালবাসলে)

কবি-লেখক হিসাবে খ্যাত হবার এই কাঙালপনা কাউকে দিয়ে চুরি করায়, আবার কাউকে চুড়ি পরায়। স্বাভিমান ত্যাগ করে তাঁরা হয়ে ওঠেন মোসাহেব। নিচের ব্যঙ্গাত্মক রচনাটিতে কবি লিখেছেন -

"রাজা যদি হেসে কথা বলে দুটো দেয় রাজকীয় খোরপোষ
নিন্দুকদল যা বলে বলুক রাজকবি হতে নেই দোষ।
সংকোচহীন মহা-আনন্দে/ রাজপদে তেল মাখাব ছন্দে
রাজ-আজ্ঞায় না-হয় করব সকাল-সন্ধ্যা ওঠবোস।"[২৯]
(ছড়া ৫৬/ পঞ্চিকা ছড়া)

ছোট কবিদের পাশাপাশি বহু স্বনামধন্য কবিকেও বর্তমানে এই তেল মাখাবার কাজে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে দেখা গেছে। অবশ্য 'রাজকবি' হলে ফায়দা দুদিকেই। অর্থ ও প্রতিপত্তি - দুইই তখন হাতের মুঠোয়। এমন সহজ-সিদ্ধি কি হেলাফেলার বস্তু!

সুতরাং আমরা দেখলাম লিমেরিককে অবলম্বন করে বেশ কিছু কবি বর্তমান সময় ও সমাজের মূল্যবোধহীনতা ও অবক্ষয়ের বহুমুখী চিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরে মানুষকে সজাগ ও সচেতন করতে চেয়েছেন। লিমেরিক এক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে কবির হাতের আয়ুধ-স্বরূপ।

চরিত্র-বিশেষের রূপাঙ্কনেও লিমেরিক নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করেছে। এখানে আমরা দুটো উদাহরণ দিলাম। যেমন-

ক. "বন্ধক-কারবারি অনঙ্গ সেন/ শুধু লোক ঠকাবার অঙ্ক কষেন।
কেউ কিছু বোঝে পাছে/সকলকে ডেকে কাছে/ বলেন মিষ্টি হেসে, 'আসেন, বসেন।'"[৩০]
(পাঁচ পঙ্ক্তির পাঁচটি/ হাসলে, ভালবাসলে)

খ. "'ভিক্ষে করতে এসেও যদি গায় ছোঁয়াবি হাত/
একটা চড়ে পুঁচকে ছোঁড়া করব কুপোকাৎ'-বলতে বলতে পটের বিবি/
গুছিয়ে নিয়ে চুলের ঢিবি
বাসের ভেলায় উঠতে গিয়ে লোকের ঠেলায় কাৎ।"[৩১]
(লিমেরিক ৭/ সবকিছুতেই খেলনা হয়)

পাঁচ চরণের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক বন্ধক-কারবারি ও এক উন্নাসিক পটের বিবির মিষ্টি-দুষ্টু আচরণ চমৎকার ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। নিতান্ত স্বল্প আয়োজনে একটা চরিত্রের বাহ্যরূপ, আচার-আচরণ, মন-মানসিকতা, বাক্‌রীতি ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে লিমেরিক দুটোতে। শঙ্খ ঘোষের আর এক লিমেরিকে আমরা একালের ছদ্ম মানব-দরদী, মেকি সমাজসেবকদের স্বরূপ উন্মোচিত হতে দেখি -

"বাড়ি ফিরে এলেন বাবু বিশ্বপ্রেমের প্ল্যান দিয়ে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রকম দেখে ভয় হয় যে প্রাণটা বুঝি দেন দিয়ে।
বাইরে এমন লোক্‌মান্যি –/ ঘরে ফিরে জল পাননি
রাগ করে তাই ভাতের থালা ছুঁড়ে দিলেন ঠ্যাং দিয়ে।"[৩২]
(লিমেরিক ১০/ সব কিছুতেই খেলনা হয়)

আমাদের আশেপাশে এমন ভণ্ড মানুষের সংখ্যা যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বেশ কিছু লিমেরিক আমাদের লোকায়ত ছড়াকে ভিত্তি করে বর্তমান সময়ের নানা জ্বলন্ত সমস্যাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার অঙ্গীভূত করেছে। এসব ক্ষেত্রে লিমেরিক যেন অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল -

ক. "এ তো বড় রঙ্গ মামা এ তো বড় রঙ্গ/ সকালবেলায় চমকে উঠি নিদ্রা হলে ভঙ্গ।
টুকটুকে লাল গায়ের জামা/ সবুজ হয়ে গেল মামা/ কে আমাকে সঙ্গে নেবে কাহার পাব সঙ্গ!"[৩৩]
(লিমেরিক ৭/ পঞ্চিকা ছড়া)

খ. "ভূতগুলো সব পুত রে আমার পেত্নীগুলো ঝি/ গুন্ডা-পুলিশ হাতেই আছে করবি তোরা কী?
তোদের কেয়ার করি থোড়া/ ফুল ফোটাব জোড়া জোড়া
দেখবি যত জ্বলবি তত – পান্তাভাতে ঘি!"[৩৪]
(লিমেরিক ৯/ পঞ্চিকা ছড়া)

গ. "পুরোনো গল্প, মানুষ দিয়েছে মানুষ দিচ্ছে মানুষের মাথা গুঁড়িয়ে
শুনতে শুনতে দাদুরা বুড়োলো, বাবারা বুড়োলো, আমরাও যাই বুড়িয়ে।
বলা কি যায় না ছেলেরা ঘুমোক
এপাড়া-ওপাড়া-বেপাড়া জুড়োক
আদি গল্পের নটে গাছটিকে দেওয়া কি যায় না জন্মের মতো মুড়িয়ে?"[৩৫]
(লিমেরিক ৬১/ পঞ্চিকা ছড়া)

ঘ. "কীসের মাসি কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন/ টাকার কাছে সব ঝুটা হ্যায় টাকাই বড় ধন।
টাকায় কান্না টাকায় হাসি/ টাটকা টাকা না হয় বাসি
টাকায় টাকা টানতে থাকে টাকা আপনজন।"[৩৬]
(লিমেরিক ৩১/ পঞ্চিকা ছড়া)

প্রথম তিনটে দৃষ্টান্ত সমসাময়িক রাজনীতির অবক্ষয়কে বিবস্ত্র করেছে। প্রথম দুটো লিমেরিক অবলম্বন করেছে যথাক্রমে 'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ' এবং 'ভূত আমার পুত,/ শাঁখিনী আমার ঝি' ছড়া দুটোকে। একালের নেতাদের অন্তঃসারশূন্যতা, আদর্শহীনতা ও ধান্দাবাজি উক্ত রচনাদুটোতে বাস্তবসম্মতভাবে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃত তৃতীয় দৃষ্টান্তে একইসঙ্গে দুটো ছড়াকে ব্যবহার করা হয়েছে, যথা– 'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল,/ বর্গি এল দেশে' এবং 'আমার কথাটি ফুরুল,/ নটে গাছটি মুড়ুল'। এখানে স্বার্থান্ধ মানুষের হিংস্রতাকে উপড়ে ফেলার জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। আর চতুর্থ লিমেরিকে পুনর্নির্মিত হয়েছে এই লোকছড়াটি –

"মাসি-পিসি বনগাঁবাসী, বনের মধ্যে ঘর,/ কখনো মাসি বলেন না যে, খই-মোয়াটা ধর!
কীসের মাসি, কীসের পিসি, কীসের বৃন্দাবন,/ এত দিনে জানিলাম, মা বড়ো ধন।"

উক্ত চতুর্থ লিমেরিকে 'মা'-এর জায়গায় 'টাকা'কে বসিয়ে বর্তমান সময়ে মানুষের হীনতা ও নীচতাকে অনাবৃত করেছেন কবি। লিমেরিকে কখনো কখনো পুরাণ-কাহিনি কিংবা পৌরাণিক চরিত্র-বিশেষের পুনর্নির্মাণ ঘটানো হয়েছে। যেমন -

"দুর্যোধন আর দুঃশাসনে খেলছিল যে সাট্রা
গলাতে লাল রুমাল বাঁধা, গালেতে গালপাট্রা।
হঠাৎ এল শকুনি/ দিল ভাষণ বকুনি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'উচ্ছন্নে গেছিস' বলে লাগাল দুই গাঁট্টা।"[৩৭]

(ছড়া ১৭/ ছড়ায় ছড়ায় ছড়াক্কার)

সাট্টা খেলাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এখানে। এইভাবে সমসাময়িক নানা বিষয়কে কবিরা লিমেরিকের সহজ রূপে উপাদেয় ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। পাশাপাশি এর দ্বারা নানা জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মানুষকে উৎসাহ ও সহযোগিতা জুগিয়েছে।

এখন আমরা লিমেরিকের চিত্রধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলবো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে - ছড়ায় অসংলগ্ন ছবি-পরম্পরা যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে চলে। ছড়া, তাঁর চোখে, কখনো নিয়ত পরিবর্তনশীল মেঘরূপে, কখনো অধরা এক স্বপ্নরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ছড়াগুলিকে 'টুকরো জগৎ' বলে মনে করতেন তিনি। কোনো কোনো ছড়ার ছবি 'একটি রেখা একটি কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে' উপস্থাপিত হয়। আবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার মধ্যে ক্যালিডোস্কোপের গুণাগুণ লক্ষ করেছেন। ক্যালিডোস্কোপে যেমন একটি চোঙের মধ্যে কয়েকটি কাঁচখণ্ড নিয়ে যেমন খুশি ঘোরালে একটি নয়ন-মোহন figure পাওয়া যায়, ছড়াতেও তেমনি। তাইতো অসংগত ও অসংলগ্ন পংক্তিগুলিও একটি রস বা সৌন্দর্যের আভাস দেয়। ছড়ার এই বিশেষ গুণটি অধরা থাকেনি লিমেরিকের শরীরেও। সেই কারণেই অপূর্ব দত্ত লিখেছেন -

"অমিতাভ চৌধুরীর 'ইকড়ি-মিকড়ি'
হাতে নিয়ে ভাবি রোজ কী করি কী করি!
কত রঙে চিত্রিত,
এঁকেছে কে, পত্রী তো?
তুলি আর কলমেতে 'হটকেক' বিক্রি।"[৩৮]

(ছড়া ২৭/ বাক্সভরা একশো ছড়া)

আকর্ষক ছবি না থাকলে ছোটদের বই বাজারে বিকবে কেন। প্রথম দিকে যাঁরা সাহিত্যিক ছড়া লিখতেন, তাঁদের বেশিরভাগই নিজের হাতে ছবিও আঁকতেন, - বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য। যেমন রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ। আবার কেউ কেউ ইলাস্ট্রেশন করিয়েছেন অন্য কোনো চিত্রশিল্পীকে দিয়ে। যেমন - অন্নদাশঙ্কর রায় (প্রণবেশ মাইতিকে দিয়ে), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (প্রণবেশ মাইতিকে দিয়ে), শঙ্খ ঘোষ (দেবব্রত ঘোষকে দিয়ে) প্রমুখ। লিমেরিকের ছবিগুলো যেহেতু বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে রচিত, তাই ছবিগুলো মূলত এক্সপ্রেসিভ ধরনের হয়। বেশিরভাগ ছবি কালি-কলম দিয়ে আঁকা। কোথাও ডিপ লাইন, কোথাও কেবল লাইন ড্রয়িং, কোথাও আলোছায়া, স্ক্রাচিং সহযোগে ছবির ভাবকে ফোটানো হয়েছে। তবে এখন যাঁরা ছড়া কিংবা লিমেরিক লিখছেন, তাঁদের বেশিরভাগই রচনার পাশাপাশি বিষয়ানুগ ছবি আঁকছেন না বা রাখছেন না। তা সে অপূর্ব দত্ত হোন বা ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। বিষয়টা শিশুসাহিত্যের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। হয়তো একারণেই একালের শিশুরা বই পড়ার বদলে মোবাইল বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভাসা ছবিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

ছোট্ট এই ত্রুটি থাকলেও বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আকাশে লিমেরিকের আস্বাদ্যমানতা ও গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বেড়ে গেছে যে নিজের গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হিসাবেও কবি অপূর্ব দত্ত এই লিমেরিকেই ভরসা রেখেছেন -

"ছন্দে গড়া বাক্সভরা একশো ছড়ার ডালি
ছু-মন্তর উড়ুৎ-ফুড়ুৎ, পাঁচ মিনিটেই খালি।
চমক-জাগা ছন্দরাশি/ ব্যাজার মুখে ফুটবে হাসি,
নেবার হলে আজ নিয়ে যান, ফুরিয়ে যাবে কালই।"[৩৯]

(প্রবেশক, বাক্সভরা একশো ছড়া)

সুতরাং আমরা দেখলাম লিমেরিক নামক 'ফর্ম'টি 'ছড়া' নামক শিশুসাহিত্যের প্রাণভোমরাকে অবলম্বন করে ডানা মেলে দিয়েছে কবিতার সম্ভাব্য সকল রাস্তায়। লিমেরিকের বাঁধাধরা রূপেই কবিরা সাহিত্যের রসকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস করেছেন

এবং সেই প্রয়াস যে সফল হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই একালের শিশুরাও যেন উচ্ছ্বসিত সুরে গেয়ে ওঠে -

"হই হই হই, এই তো সে বই, মন ভোলাবার ফন্দি
লিমেরিক নিয়ে কালি-কলমের আজব যুগল-বন্দি।
মিলের গন্ধে আমেজি ছন্দে
মন ভরে যায় পরমানন্দে,
ভেবে দিশেহারা, কোনটাকে ছেড়ে কোন ছড়াটায় মন দি।"[৪০]
(ছড়া ৯৪/ বাক্সভরা একশো ছড়া)

মাঝে মাঝে এমন এক ভাবনা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে যে, উর্দুতে যেমন 'মুশায়রা' হয়, বাংলাতেও তেমন আড়ম্বর ও উদ্দীপনার সঙ্গে কবি-সম্মেলন বা সাহিত্য-বাসর আয়োজিত হচ্ছে। সেখানে কবিগণ সেলিব্রিটির মর্যাদা পাচ্ছেন। উত্তেজিত দর্শকগণের মুহুর্মুহু করতালিতে অনুষ্ঠান-কক্ষ গমগম করছে। আর তার মাঝে কবিগণ একের পর এক আবৃত্তি করে চলেছেন অভাবনীয় ও চমৎকার সব পাঁচ লাইনের লিমেরিক। আমার ধারণা, কবিতাকে আবার সভাধন্য করে তুলবার ক্ষমতা আছে এই বিশিষ্ট কবিতা-রূপের।

Reference:

১. পাল, অমল, পঞ্চিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৭

২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), কামিনী প্রকাশালয়, ১১৫ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৩৩০

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ. ৬০৯

৪. ভৌমিক, ড. নির্মলেন্দু, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা: সমীক্ষা ও সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে), সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৭৯, বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ১৮

৫. দাস, অনাথনাথ ও রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), ছেলেভুলানো ছড়া (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ২০৪

৬. ঐ, পৃ. ২১৫

৭. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়াসমগ্র, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৪১

৮. ঐ, পৃ. ৪১

৯. রায়, সত্যজিৎ, তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম, আনন্দ পাব্. প্রা. লি., ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, অষ্টম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ৩৫

১০. ঐ, পৃ. ৩২

১১. ঘোষ, শঙ্খ, ছড়াসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৩৩

১২. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র: প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৬৮

১৩. দাস, অনাথনাথ ও রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), ছেলেভুলানো ছড়া (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ২১৩

১৪. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়াসমগ্র, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৭৯

১৫. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র : প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ২১

১৬. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, হাসলে, ভালবাসলে, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৯, পৃ. ৩৯

১৭. মুখোপাধ্যায়, গৌতম, রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচয় : মৌলিক ধারণা, সেতু, ১২/এ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা ০৬, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৩৪

১৮. ঘোষ, শঙ্খ, ছড়াসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৩২

১৯. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১৩, পৃ. ১৮

২০. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২৪

২১. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১৩, পৃ. ১৮

২২. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৪৬

২৩. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র: প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৬

২৪. ঐ, পৃ. ১১০

২৫. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ছড়াসমগ্র ২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০০৬, অগ্রহায়ণ, ১৪১৩, পৃ. ৩০

২৬. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৮

২৭. ঐ, পৃ. ৬০

২৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, হাসলে, ভালবাসলে, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৩৯

২৯. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৫৯

৩০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, হাসলে, ভালবাসলে, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৩৯

৩১. ঘোষ, শঙ্খ, ছড়াসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৩৪

৩২. ঐ, পৃ. ৩৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৩. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৫
৩৪. ঐ, পৃ. ১৭
৩৫. ঐ, পৃ. ৬৪
৩৬. ঐ, পৃ. ৩৯
৩৭. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র : প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১০৬
৩৮. ঐ, পৃ. ৬৯
৩৯. ঐ, পৃ. ৬১
৪০. ঐ, পৃ. ৯৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 119 - 145
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় নদী তীরবর্তী জনজীবন : প্রসঙ্গ শ্রেণিসংগ্রাম

কবির আহমেদ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Email ID : kahmed14322@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Class struggle, Bengal, Riverbanks, Poetry, Humanity, Lower class, Social conflicts, Caste, Folk culture, Literature.

Abstract
Mohammad Rafiq (1943-2023) is a renowned poet of the sixties decade. He achieved excellence and honour in life through his poetry. His poetry has shown an absolute loyalty to the people who lead their lives close to the soil, and extraordinary compassion for the people who live their lives on the banks of the river. Just as the reality of soil, man and land within the multidimensional structure of nature is revealed in his poetry, so is the map of the uprooted people. The various perspectives regarding the similarity and contrast of life and nature, the analysis of the primitive spirit of myth or mythology, the characteristics of folk life and art, the correlation between falling in love, separating and loving again in human life are reflected in Rafiq's poetry. The life story of the common people who work on the banks of the rivers are elemental to his poetry. The life of the struggling people living close to the soil, their struggle against deprivation, their suffering, lamentations, and their resistance against injustice have been portrayed in his poetry. He is a skilled storyteller of the lives of the exploited, oppressed, persecuted, and destitute people of rural Bengal. In the light of class struggle, Mohammad Rafiq has made this conflicting struggle and the hunger to exist within these hardworking people an artistic triumph in his poetry. The multidimensional images of class struggle have been given a close focus in his poetry. The unveiling of the nature of lived experience on the banks of the river in the light of class struggle is the focus of this article.

Discussion

ষাটের দশকের বেশিরভাগ কবির প্রবণতা যেখানে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের দ্বন্দ্বময় টানাপোড়েন, তাঁদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতাজনিত বিষাদ ও মনোজটিলতা উন্মোচন, সেখানে কবি মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩-২০২৩) নিমগ্ন ছিলেন গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরের শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মানুষের মানবেতর জীবন উপস্থাপনায়। মোহাম্মদ রফিকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবিতায় নৈসর্গিক আবহে লালিত আধুনিক মানসচেতনার দৃষ্টান্তবাদী মনীষার প্রচ্ছাপ লক্ষ করা যায়। যেন, রফিক গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের কাব্যবয়ান করেছেন, নৌকোর দৌড়াদৌড়ি অবলোকন করেছেন, কাব্যে রূপায়িত করেছেন নদীনির্ভর সংগ্রামী জীবনের ব্যস্ততা। বাংলার জল-মাটি ও সাধারণ মানুষের মুক্তিচেতনার শিল্পভাষ্য রফিকের কবিতা। মোহাম্মদ রফিক নদীতীরবর্তী গ্রামীণ জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। জল ও জলকেন্দ্রিক মানুষ তথা নদীতীরবর্তী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্যকেই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস ও ব্রাত্য-প্রান্তিক জীবনকাঠামো নিয়ে কথাসাহিত্যে উত্তুঙ্গ শিল্পসিদ্ধির পর কবিতায় রফিকের প্রচেষ্টা নান্দনিক একইসঙ্গে নিরীক্ষাধর্মী। তাঁর কবিতায় অনেকটা বর্ণনাত্মক রীতিতে নদীতীরবর্তী শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযাপন, সংস্কার, মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে বিরাট ক্যানভাসে। রফিকের কবিতায় শেকড়ের কাছাকাছি হবার প্রয়াস থেকে আবহমান বাংলার একান্ত নিজস্ব অনুষঙ্গ ব্যবহারের যে প্রবণতা তা নান্দনিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যুগ যুগ ধরে মানুষের লালিত স্বপ্ন একটি সুষম, সুন্দর এবং সর্বসাধারণের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ। কিন্তু সমাজ শাসনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ একভাগে শোষিত এবং অন্যভাগে শাসিত-এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। শাসকশ্রেণির যাবতীয় বিলাসিতার উৎস মূলত শাসিতদের শোষণ নিপীড়নের মধ্যেই নিহিত। সময়ের বিবর্তনে কেবল শাসনকাঠামোর ধরনটি পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু শোষণ-নিপীড়নের ধরনে কোনো রকমফের ঘটেনি। মার্কসীয় সাম্যবাদের একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে বলা হয়েছে যে এ যাবত বিদ্যমান সমস্ত সমাজের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।[১] কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) বলতে চেয়েছেন যে সকল সমাজে শ্রেণিসংগ্রাম ছিল। ব্যক্তিমালিকানায় যখন থেকে উৎপাদনসম্পর্ক মূর্ত হয়েছে তখন থেকেই মানবসমাজ বিভক্ত হয়েছে শ্রেণিতে। উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দাসমালিকের অবয়ব তৈরি হয়েছে। শ্রেণিসংগ্রামই সামাজিক ইতিহাসের বিকাশের চালিকাশক্তি এবং ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তির ওপরই অবস্থান নিয়ে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। বলা যায় যে, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে। এঙ্গেলসও (১৮২০-১৮৯৫) বলেন যে, যেহেতু এক শ্রেণির দ্বারা অপর শ্রেণির শোষণ সভ্যতার ভিত্তি, সেজন্য এর সমগ্রবিকাশ অবিরাম বিরোধকণ্টকিত, একটি শ্রেণির প্রতিটি নতুন মুক্তির অর্থই এক শ্রেণির উপর নতুন উৎপীড়ন। শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। কার্ল মার্কস কথিত 'অবিরাম লড়াই' এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমে দাসদের নেতা স্পার্টাকাস-এর নেতৃত্বে এক লক্ষ অত্যাচারিত ক্রীতদাসদের বিদ্রোহে। ক্রীতদাস ও মালিকের মধ্যে সংঘটিত হয় চরম সংঘর্ষ। সামন্তযুগে অনেক স্থানে ভূস্বামী- সামন্ত প্রভুদের সাথে কৃষকদের সংঘর্ষ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইংল্যান্ডের টাইলারের বিদ্রোহ (১৪শ শতক), ফ্রান্সে জাকিরের বিদ্রোহ (১৪শ ও ১৫শ শতক), জার্মানীর কৃষকযুদ্ধ (১৬শ শতাব্দী), রাশিয়ার বোল্টজনিক ও রাজিনের সংগ্রাম (১৭শ শতক)। ভারতীয় উপমহাদেশে ও সুতাকলের শ্রমিক ধর্মঘট, ট্রাক-রেলশ্রমিক ধর্মঘট, কৃষকদের তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪২-১৯৪৮) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২]

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কোন শ্রেণি ছিল না। উৎপাদনের উপকরণ এবং হাতিয়ারগুলো সবই ছিল যৌথ মালিকানায় এবং উৎপাদিত সামগ্রীর ভোগ-দখল ছিল যৌথভিত্তিক। এরপর ধীরে ধীরে যখন উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ায় শ্রম-বিভাগের সূত্রপাত ঘটে তখন উৎপাদন ও ভোগদখলের সমষ্টিগত চারিত্র্য ক্ষুণ্ন হয় এবং ব্যক্তিগত দখলদারিত্ব প্রাধান্য লাভ করে। তখন অনিবার্যভাবেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গোত্রের সম্পত্তির বিপরীতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির বিকাশ ঘটে তখন অর্থনৈতিক অসাম্য প্রকট রূপ লাভ করে। বিপরীত শ্রেণি ও শোষণের উৎপত্তিতে এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। দাস মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থার মূল প্রোথিত হওয়া ও আদিম কৌলিক ব্যবস্থাতে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণিবিভক্তির উৎসারণ ঘটে এগুলোর বিপরীত অবস্থানই তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের উৎস। যুগে যুগে পৃথিবীর অনেক চিন্তাশীল মনীষী একটি বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। অধিকারহীন, দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমতা প্রকাশ করে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার প্রতি এসব মনীষী অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি কখনো কখনো শোষিত জনগণকে নিপীড়নকারী অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, দীক্ষা দিয়েছেন। পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোয় পুঁজিপতি শাসকশ্রেণির শোষণের হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ

করেছিলেন কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)। মার্কসীয় দর্শন এবং চিন্তা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির ইতিহাসে পৃথিবীর সামূহিক মুক্তিকামী মানুষকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে। শোষণহীন, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ বিকাশের পূর্বতন মতবাদ, অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা বিচার বিশ্লেষণ করে নবতর বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন মার্কস যা মার্কসবাদ নামে পরিচিত। মার্কসীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির মানুষকে জাগিয়ে তোলা। মার্কসীয় দর্শন মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে তখনই যখন শ্রমিকশ্রেণির জাগরণ তৈরি হবে। শ্রমিকের শ্রমে গড়ে ওঠে পুঁজিপতিদের সম্পদের পাহাড়, বিলাসিতার সাম্রাজ্য কিন্তু শ্রমিক জানে না যে তার শ্রম চুরিই করে পুঁজির মালিক হয় পুঁজিপতিরা, যে পুঁজির উৎপাদক শ্রমিকরা। পুঁজিবাদী সমাজবাস্তবতায় শ্রমিকদের এ সামাজে তাদের ভূমিকা উপলব্ধি-ই হলো শ্রেণিচেতনা। এই শ্রেণিচেতনা ব্যতীত শ্রমজীবী মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমাজবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগ্রত হবে যখন কেবল তখনই শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যদিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, কৃষক-শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বাধীন যে সমাজব্যবস্থা জন্ম নেবে সেখানেই পাবে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বরূপ।

যুগ যুগ ধরেই সংবেদনশীল, চিন্তাশীল কবি-শিল্পীর চিত্তলোক স্পর্শ করেছে, তাঁদের লেখনীর রসদ জুগিয়েছে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্তর্গত শ্রেণিদ্বন্দ্ব-শ্রেণিসংঘাত। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে টমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫) এর *ইউটোপিয়া'* (১৫১৬), টমাস কম্পানালার (১৫৬৮-১৬৩৮) *সিটি অব দি সান* (১৬২৩), ফ্রান্সিস বেকনের *নিউ এ্যাটলান্টিস* (১৬২৭), জেমস হ্যারিংটনের *ওসিয়ানা* (১৬৫৬) প্রভৃতি গ্রন্থে। উনিশ শতকে ফ্রান্সে সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫), চার্লস ফরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭), ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) প্রমুখ মনীষী, চিন্তাবিদ প্রচলিত সমাজকে পুনর্গঠন, ধনী দারিদ্যের বৈষম্যের অবসান ও শোষণহীন একটি আদর্শের স্বপ্ন দেখেছেন। সমালোচক হাননান এ প্রসঙ্গে বলেন –

> "সমাজ জীবন থেকেই শিল্পীরা তাঁদের উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। আর শ্রেণীদ্বন্দ্বে আর্কীণ সমাজ জীবন থেকে তাঁরা যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তাও শ্রেণীসংগ্রাম আশ্রিত হবে তাই তো স্বাভাবিক। তবে সাহিত্য আশ্রিত শ্রেণিসংগ্রাম রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে সম্ভবত আরো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।"[৩]

আরেক সমালোচক বলেন –

> "মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণি ও সাহিত্যের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছিন্ন। সমাজ-মানসের ভাষিক ও নান্দনিক প্রকাশই সাহিত্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলমান অবিরাম শ্রেণিসংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় সমাজের গতিপ্রকৃতি। আর এ শ্রেণিসংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট শ্রেণিচেতনা যেমন সমাজ-প্রতিবেশকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি এ শ্রেণিচেতনা থেকেই উন্মেষিত হয় সমাজ প্রগতির লক্ষণ।"[৪]

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কৌলীন্য প্রথা ও গোঁড়ামির কারণে লৌকিক অনার্যসংস্কৃতির ধারায় নিম্নশ্রেণির মানুষের অনবরত সাংগ্রামিক জীবন ও প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগে রচিত কাব্যে বিদ্যমান। কৌলিন্য, বিলাসিতা ও আভিজাত্যের বাহ্যিক অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামির চিত্র চর্যাপদের কবিরাও এঁকেছেন অবলীলায় –

> "নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়ি
> আছোই ছোই যাইসো বামহন নাড়ি আ।"[৫]

মঙ্গলকাব্যে সামন্ত সমাজে দুর্বলদের উপর নায়েব-ডিহিদার-মহাজন প্রভৃতি সবলের-অত্যাচার-নিপীড়ন এবং দুর্বলদের প্রতিবাদ ও পরিত্রাণ-প্রার্থনা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার শুরুতে মানবপ্রত্যয়ের নান্দনিক সত্যটি গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈষম্যের উপরে গুরুত্ব দিয়ে 'বিড়াল', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বিড়াল' প্রবন্ধে ধনবৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বিড়ালের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন বঞ্চিত মানুষের দুর্গতির কারণ প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে জমিদারশ্রেণিকে এদেশের কৃষককূলের শোষণের মূল হোতা বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের কবিতায় মানুষের ভেদাভেদ, কৌলিন্যজাতপাত ভুলে সাম্যমৈত্রীর আদর্শে পিনদ্ধজীবনের মহিমা উচ্চকিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) প্রমুখ কবির কবিতায় জীবন ও মানুষের মাহাত্ম্য, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সংক্রম ঘটেছে। উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০ - ১৯১৯), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৬৩-১৯৪৩) প্রমুখের কবিতায় পরদুঃখকাতরতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে ব্রাত্য জীবনচর্চা থেকে শুরু করে বিশ্বমানবতার মহিমান্বিতরূপ প্রকাশিত হয়েছে। 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', 'এবার ফিরাও মোরে', 'ঐকতান', 'বাঁশি', 'ওরা কাজ করে' কবিতায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা আছে। 'দুই বিঘা জমি' শীর্ষক কবিতায় বাস্তুহারা চাষি উপেনের মর্মন্তুদ চিত্র যেমন অঙ্কন করেছেন তেমনি জমিদারের সর্বগ্রাসী দৃষ্টি কতদূর হঠকারী হতে পারে সেটিও অকপটে তুলে ধরেছেন যদিও রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। এই ম্লান মূঢ় মানুষেরা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, তাদের জীবনে মুক্তপ্রাণের হাওয়া যাতে বইতে পারে এজন্যই তিনি শোষক-শোষিতের, শাসক-শাসিতের পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান কমাতে চেয়েছেন। উচ্চারণ করেছেন –

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' এই অনবদ্য আকুতিই সকল শ্রেণিচেতনা এবং সংক্ষুব্ধতা থেকে তাঁকে নিষ্ক্রান্ত করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২১) কবিতায় পৃথিবীতে বর্ণবাদ, ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু, জাতিত্ব-সংস্কার, কৌলীন্য, ধর্মীয় উগ্রতা-সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির চেয়ে মানবতা ও মানবসত্যের স্থান যে অনেক উপরে তা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) ধ্বংসলীলা ও বিভীষিকাময় মৃত্যুর পটভূমিকায় যে নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, শূন্যতা, বিষাদের জন্ম হয়েছিল, রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্যে নব্য মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক আশাবাদ, মার্কসীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রেণিচেতনা, শোষিত – অত্যাচারিত – নিপীড়িত - বঞ্চিতের প্রতি সহানুভূতি তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙালি মনন ও চিত্তে প্রভাব ফেলেছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এস.এ ডাঙ্গে, মুজাফফর আহমদ প্রমুখ মার্কসীয় মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও উচ্চকিত ছিলেন, তাঁদের প্রচেষ্টায় মার্কসীয় চেতনা তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাংলায় সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রথম বাঙালি কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভূত হন। বিশের দশকে 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা ও সক্রিয় কর্মতৎপরতা কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির লক্ষ্যেই উচ্চকিত ছিল। ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে নজরুল যেমন বিদ্রোহ করলেন তেমনি শোষণে-নিষ্পেষণে জর্জরিত শ্রমজীবী মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য আনলেন প্রখর শ্রেণিচেতনা। 'নবযুগ' পত্রিকায় 'ধর্মঘট' প্রবন্ধটি ছিল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির স্বপক্ষে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। 'দ্য লেবার স্বরাজ পার্টি অভ্ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত 'লাঙ্গল' (১৯২৫) এর প্রথম সংখ্যায় নজরুলের 'সাম্যবাদী' নামে দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়। পরবর্তী সংখ্যাগুলোয় প্রকাশিত হয় 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান' কবিতা।

"ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙল
আমরা মরতে আছি - ভাল ক'রেই মরব এবার চল॥"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কার্লমার্কস প্রকৃত বিপ্লবশ্রেণি হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণিকে, একই সঙ্গে তাদেরকে শ্রমশোষণের প্রধান শিকার হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এই শ্রমিক শ্রেণিকে শিল্পমালিকেরা দাসে পরিণত করে। শ্রমিক শোষণ প্রসঙ্গে নজরুলের তাই উচ্চারণ –

"যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা।"[৮]

জাতিভেদ, কৌলীন্য, বর্ণ, ছুঁৎমার্গ, ধর্মীয় ভণ্ডামির দ্বারা শ্রমজীবী মানুষরা বরাবরই নির্যাতিত শোষিত হয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন সমাজে সৃজন করেছে ধনী-নির্ধন, খাতক-মহাজন, রাজা-প্রজা, কুলি সাহেব, শ্রমিক-মালিক প্রভৃতি, তেমন-ই এই বৈষম্য থেকেই সামাজিক জীবনে নিম্ন পেশাজীবী ও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শ্রেণিগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। সর্বহারা, চোর, ডাকাত, কুলি-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, ধীবর, মেথর প্রভৃতি বিত্তহীনদের সামাজিক অমর্যাদা ও অস্বীকৃতি তিনি মেনে নিতে পারেননি। *পাঁক* উপন্যাসের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) কবিতায় শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ জনশক্তির প্রতি আস্থা ও নতুন দিনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবিতায় উচ্চারণ –

"আমি কবি যত কামারের আর কাসারির আর ছুতারের
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে আর নাই।"[৯]

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম রূপকার। তার *পূর্বলেখ (১৯৪১), সাতভাই চম্পা (১৯৪৫), সন্দ্বীপের চর (১৯৪৭),* প্রভৃতি কাব্যে শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য-অত্যাচার-শোষণ-বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি, সমকালীন সংকটের লেখচিত্র, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, যুদ্ধবিরোধিতা, দুর্ভিক্ষ অপনোদনের অভীপ্সা, দাঙ্গা বিরোধিতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন সাম্যবাদী চেতনার সামগ্রিক উন্মীলন আত্মবিচ্ছিন্নতা ও স্বশ্রেণিসুলভ চৈতন্যসংকট উপস্থাপিত হয়েছে প্রাতিস্বিক দক্ষতায়। আলোচ্য কাব্যগুলোতে শোষণ বঞ্চনার মূলোৎপাটন করে সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষদের সংগ্রাম ও কবির আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা ব্যক্ত হয়েছে। যুগ-যুগান্তের সামন্তবাদী শোষণ থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে স্পৃষ্ট মানুষের দুঃখ, মালিক- মহাজন কর্তৃক শ্রমজীবীদের শোষণ, বঞ্চনা ও মুজুরি ফাঁকির ঘটনা, গণমানুষের দারিদ্র্য ও তাঁদের জীবন-সংগ্রামের দৃশ্য যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি, তেমন বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতিতে পরিপূর্ণ জীবনের আশ্রয় ও আস্বাদন কবি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কবিতার চরণ -

"অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্ণীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে,
সেখানে জুয়াড়ি স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধর ভিড়ে মাতে,
মানুষ সেখানে শুধু ছিনিমিনি কড়ি কেনা দরে।
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অনুকার, মনুষ্যত্ব-তুচ্ছ সে বৈভবে।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অরুণ মিত্রের (১৯০৯-২০০০) কবিতার শব্দানুষঙ্গ ও ধ্বনিব্যঞ্জনায় ধারণ করে আছে সাম্যবাদী শোষণহীন সমাজ-ভাবনার নান্দনিক সংবেদনার বার্তা। শানিত বাগভঙ্গি উপস্থাপন, ব্যতিক্রমী উপমা, চিত্রকল্প ও নব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ, শ্রমজীবী শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও মমত্ববোধ, তাদের ক্রমমুক্তির প্রত্যাশা সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। শ্রেণিচেতনা ও সংগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতি তাঁর কাব্যের শরীর নির্মাণ করেছে। দুর্ভিক্ষের হাহাকার, জঠরজ্বালা, নিরন্ন মানুষের ক্ষুধার আদিম চাহিদা, কৃত্রিম খাদ্যসংকট সৃষ্টি করে মহাজন-বণিক-সওদাগরের অধিক মুনাফা অর্জন, নিরন্ন মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও মহাজন-বণিক-সওদাগর শ্রেণির প্রতি ঘৃণা তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। মার্কসীয় তত্ত্ব অরুণ মিত্রের কবিতার শৈলীতে এনে দিয়েছে সাম্যবাদী সমাজ নিমার্ণের বৈপ্লবিক গতিবেগ। শ্রমজীবী মানুষ সাংগ্রামিক উত্থান ও জাগরণের প্রত্যয়দীপ্ত বর্ণনা অরুণ মিত্রের কবিতার প্রাণ। 'লাল ইস্তিহার' তারই উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে -

"প্রাচীরপাত্রে পড়োনি ইস্তেহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়
ঝলসাবে কাল জানো!
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ
(ভোঁতা হয়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)
যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো
নতুন ইস্তিহার।"[১১]

'কাস্তে কবি' দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫) চল্লিশ দশকের বাংলা কাব্য পরিক্রমায় সাম্যবাদী মননের ধারক। প্রখর সমাজ মনস্কতা, রাজ্যনৈতিক সচেতনতা, শ্রমিক সর্বহারার প্রতি সমর্থন তথা মানবিক প্রত্যয়, প্রতিবাদী চেতনা, শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'কাস্তে', 'চায়ের কাপে', 'লালমেঘ', 'ব্যাংক', 'কেরানী' 'গোলামখানা', 'বামপন্থী', 'হাতুড়ী', 'আন্দামান : ১৯৩৭', 'ব্ল্যাক আউট: ১৯৭৩' প্রভৃতি কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা ঋদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী চেতনা যেমন মূর্ত তেমন পুঁজিবাদী সমাজ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শোষণের স্বরূপটিও তুলে ধরেছেন কবি তাঁর কবিতায়। 'শ্রমসিক্ত' চা শ্রমিকের 'রোদে-পোড়া তামাটে মুখ, মজুর দলের 'চকচকে গাঁইতি' প্রভৃতি শব্দবন্ধ শোষণ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষকে জাগ্রত করার মন্ত্র হিসেবে পৌনঃপুনিক উচ্চকিত হয়েছে। কবি লেখেন -

"সোনালী আলোয় চকচক গাঁইতিগুলো
শত শত বর্শার মত ঝলসে উঠেছে –
যেন হাজার হাজার সৈনিক
শানিত অস্ত্র নিয়ে
বন্ধ্যা মাটিতে ট্রেঞ্চ কাটছে।"[১২]

বাংলা সাম্যবাদী চেতনানিষ্ঠ কবিতাচর্চায় যিনি সরাসরি নিজেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন মার্কসিস্ট হিসেবে তিনি সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। কাব্য যাত্রার শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চাপ, বিবর্ণ নগরীর বিচ্ছিন্নতা-বিবিক্ততা, অস্তিত্বহীন জীবন, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, বণিকসভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, বৃহৎ সমাজ স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণি স্বার্থের বিরোধ তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ। ধনতান্ত্রিক যুগ-যন্ত্রণা থেকে উৎসৃষ্ট ডিকাডেন্ট (Decadent) জীবন ও সমাজের ভয়াবহ পরিণতি তাঁর কবিতার বিদ্রোহের উৎস তৈরি করেছে। সাম্যবাদী চেতনার আকাঙ্ক্ষিত সংগ্রামের অন্তরায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, পুঁজিবাদী শোষণ এবং দেশীয় বুর্জোয়া রাজনীতির নগ্ন চেহারা উন্মোচন করেছেন কবিতায়। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তির ঐকান্তিক সংগ্রাম ও সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েছেন কবিতায় -

"যারা মাঠে ঘাটে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে
ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা
তাদের মিতালি খুঁজি।"[১৩]

পদাতিক এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনা এবং সমকালীন শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক সংকট, দুর্ভোগ-দুর্ভাবনাকে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করে তাঁদের মুক্তির মন্ত্রণা দান করেছেন। বৃহত্তর জনসংলগ্নতা ও গণমুক্তির প্রত্যাশিত প্রত্যয়, সাম্যবাদী জীবনদর্শনের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আস্থা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়। কবিতায় গণদারিদ্র্যের চিত্র এঁকেছেন নিখুঁতভাবে। নগর ও গ্রামজীবনের অন্তর্মূলে যারা অবস্থান করে মাঠে-ঘাটে-কলে-কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখে, তারা বরাবরই মাৎসন্যায় পদ্ধতিতে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। মালিক, মহাজন, মজুতদার, বণিক, সওদাগর ও জমিদারিতন্ত্র কৃষক-মজুর-শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণিকে বরাবরই শোষণদণ্ডে মথিত করে। এসব শোষিত-নির্যাতিত নিরন্ন মানুষের কথা বলেছেন সুভাষ। সমকালীন সমাজ পরিস্থিতি খুবই দূর্যোগপূর্ণ, ভয়াবহ তাই শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে:

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের সেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না-
পরো পরো যুদ্ধের সাজ।"[১৪]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫) বিপর্যস্ত সমকাল এবং দেশমাতৃকার অর্ন্তগত আর্তনাদকে অবলোকন করে আপন ঐহিত্যের শেকড় সন্ধানে ব্রতী হন। গণমানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন কবিতায়। *লখিন্দর* (১৯৬৫), *জাতক* (১৯৬৮),*সভা ভেঙে গেলে* (১৯৬৪) *মুখে যদি রক্ত ওঠে* (১৯৬৫), *ভিসা অফিসের সামনে* (১৯৬৭), *মহাদেবের দুয়ার* (১৯৬৭), *তৃণতরঙ্গ' রৌদ্র/রাত্রি শিবরাত্রি* (১৯৬৭), *মানুষের মুখ* (১৯৬৮) প্রভৃতি কাব্যে সাম্যবাদী চিন্তার শিল্পিত রূপায়ণ ঘটেছে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-২০০২) কবিতায় উন্মূল, উদ্বাস্তু, বিপন্ন মূলত শ্রমিকশ্রেণি, শ্রমজীবী মানুষ-মার্কসীয় তত্ত্বে যাদেরকে প্রলেতারিয়েত বলা হয়েছে তাদের কথাই কবির গাঢ় অনুভূতিস্পর্শে উত্তীর্ণ হয়েছে। নতুন শব্দচয়ন, স্বকীয় বাক্যবিন্যাস ও অখণ্ড ভাবকল্পনা নির্মাণে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন কবি।

ক্ষণায়ু সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) সমাজ, সময় ও ইতিহাসের বিস্তৃত, বিসর্পিল পটভূমিকে আত্মস্থ করেই উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রাতিস্বিক সৃষ্টিশীলতায়। সুকান্ত জীবনবীক্ষণ ও শিল্প অন্বেষার ক্ষেত্রে নতুনতর গণমুখী সাহিত্য ধারার প্রবর্তক একইসঙ্গে শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজচেতনার সার্থক রূপকার। *ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই (১৩৫৭), পূর্বাভাস (১৩৫৭), মিঠেকড়া (১৩৫৮)* ইত্যাদি কাব্যে শ্রেণিসংগ্রাম এবং সাম্যবাদী চেতনা অসাধারণ সাফল্য নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। শোষক ও শোষিতের শ্রেণিচরিত্রের রূপায়ণ, শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের স্বরূপ চিত্রায়ন, গণমানুষের মুক্তি ও কল্যাণ ভাবনা, সহজ ও নিরাভরণ ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ ও বাকপ্রতিমা নির্মাণ, কবিতায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নির্মিতি তাঁর কাব্যকে প্রোজ্জ্বল করেছে। গণমানুষের জীবনে আবর্তিত অভাব-বঞ্চনার কারণ হিসেবে কবি নির্দেশ করেছিলেন কতিপয় মানুষের হৃদয়হীন লুব্ধতাকে, সওদাগর-মহাজন-বণিক-মালিক-মজুতদার সমাজের এই কতিপয় মানুষের পরস্বাপহরণ মনোবৃত্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের দুর্গতির কারণ। শ্রমজীবী মানুষদের নিগ্রহ, অত্যাচার, শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন

সুকান্তের আরাধ্য ছিল। সামাজিক অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ও শোষিত মানুষের হয়ে ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা তাঁকে বিপ্লবী দ্যোতনা ও সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রেণি সংগ্রামের মন্ত্রণা রচনায় অনুপ্রাণিত করে। শোষিত জনগোষ্ঠীদের ঐক্য-সংহতির মাধ্যমে দুশ্চর সংগ্রামের দ্বারাই বৈষম্য ও শোষণের গ্লানি দূর করা সম্ভব। কবির তাই উদাত্ত আহ্বান কবিতায় এভাবে প্রর্মূত হয়েছে –

> "টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
> অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী
> শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
> একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।"[১৫]

ষাটের দশকের কবি মোহাম্মদ রফিকের কবিতা বাংলাদেশের মাটি-কাদা-জল-হাওয়া-মেঘের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা চেতনাশীল নান্দনিক শব্দশিল্পের অনুভূতিমালা। বাংলা কবিতার প্রাকরণিকতা এবং চেতনায় একটি নব ধারার সূচনা করেন দেশজরীতি এবং চিত্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে। শেকড়সন্ধানী কবি রফিক নিজদেশ ও কাল-লগ্ন হয়ে কবিতাকে মানুষের জীবনযাপনের সংগ্রামে মিলিয়ে নেন। কবিতায় প্রয়োগ করেন কথ্যরীতি তথা মুখের ভাষা (common speech) এবং প্রচুর আঞ্চলিক শব্দ। তাঁর কবিতায় শব্দ বিন্যাস অভিনব ও নান্দনিক, শব্দ আর ছন্দের মিল পাওয়া কঠিন, এমনকি উপমা-উৎপ্রেক্ষার পরিচিত অবয়ব নেই। কবিতার শরীরে স্বদেশী নিঃশ্বাস সঞ্চারিত করেছেন কবি। প্রেম, প্রকৃতি, লৌকজ ঐতিহ্য পুরাণ, রাজনৈতিক চেতনা তাঁর কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে। মোহাম্মদ রফিকের প্রেমচেতনা অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা জারিত। এই ভালোবাসার মমত্ব প্রণয়ন করেই কবি তাঁর কবিতায় প্রেমকে রোমান্টিক তাৎপর্যে উত্তীর্ণ করেছেন। কবিতার চরণ -

> "ওলো ও বেগুনী, তোর নাগর এসেছে আজ ঘরে
> চুড়ো করে খোঁপা বাঁধ ওই শোন জোয়ারের জল
> শাঁই শাঁই ছোটে খ্যাপা কীর্তিনাশা আশ্লেষে আতুর,
> উষ্ণ ঘন শ্বাস ফেলে শাওনি পূর্ণিমার ভরা চাঁদ।"[১৬]

রফিক কবিতায় প্রেম ও কামচেতনাকে প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তুলনায় উপস্থিত করেন। সমালোচক বলেন –

> "তিনি বাঙালির জীবনযাপনকে বাংলাদেশের প্রকৃতির জীবন-যাপনের ভেতর থেকে, নাড়ির সংযোগ থেকে আবিষ্কারের নান্দনিক প্রক্রিয়া চালান। তাই প্রেমকে তিনি উপস্থাপন করেন গভীরার্থক চেতনা থেকে। ...মূলত তাঁর প্রেমচেতনা সামষ্টিক বাঙালির, যারা গ্রামে বসবাস করে তাদের প্রেমচেতনার অনুভবে।"[১৭]

প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য ও আনন্দ রফিকের কবিতায় এক অনবদ্য বিষয়। প্রকৃতি রফিকের কবিতায় উপস্থিত হয়েছে চিত্র ও দার্শনিক অন্বয়ের ভিত্তি হিসেবে যেখানে কবির অনুভূতিশীল ব্যক্তিচেতনায় বস্তুবিশ্ব, মনোবিশ্ব ও প্রকৃতি একটি গভীর সংযোগে সংযুক্ত। কবি প্রকৃতিতে কখনো আরোপ করেন মানবত্ব, কখনো তাকে রূপকাশ্রয়ী ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। সমালোচক বলেন –

> "প্রেম প্রকাশে কবি আশ্রিত প্রকৃতি এক রকমের প্রাণায়িত (anthro pomorphic) সমগ্রতায় উপস্থিত। কবি নির্ধারিত প্রকৃতিচেতনায় একদিকে বিধৃত তার স্নিগ্ধ রূপবৈচিত্র্য অন্যদিকে বিনাশ-বৈনাশিকতা।"[১৮]

বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশ। এদেশের মানুষের জীবনযাপনচর্যা, তার কর্মপ্রক্রিয়া ও মানসভুবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-বাংলাদেশ বহুবৈচিত্র্যের সমাহার-সংযোগ ও স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ। এদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল, পরিবেশ-প্রতিবেশ, নির্সগ-প্রকৃতি, নদ-নদী এদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ, জীবনধারণা ও মনস্তত্ত্বে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঞ্চার করেছে এক ভিন্নতর আবহ। বাংলা সাহিত্যে নদী কোনো অপরিচিত বিষয় নয়। প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত নদীর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলা কবিতায় নদী ও নদীকেন্দ্রিক খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ বহুমাত্রিক আঙ্গিক, ভিন্ন প্রকরণে ও মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। একদিকে নদীর ব্যাপকতা-বিশালত্ব অন্যদিকে নদী সংশ্লিষ্ট মানুষের হাহাকার-বেদনা, সুখ দুঃখের জীবন বৈচিত্র্যের হৃদয়ঘন মুহূর্তগুলো বাংলা কবিতায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। মোহাম্মদ রফিক গ্রামে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বৈশাখী পূর্ণিমা* থেকেই প্রকৃতির ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের সাথে জীবনকে সংযুক্ত করে সামষ্টিক বাঙালির ও বাংলার ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী, নদীতীরবর্তী মানুষ, তাদের জীবন মোহাম্মদ রফিকের কবিতার বিষয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতায় নদী ও নদীতীরবর্তী খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রায়ই এসেছে। তবে মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় যেন কবির রক্তের সাথে নদী ও জলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমালোচক বলেন –

> "বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিষয়ে কোনো রকম ধারণা নেই এমন পাঠকের কাছেও মোহাম্মদ রফিক শীতল জলের স্পর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। অবশ্য বিক্ষুব্ধ স্রোতের অস্বাভাবিক অস্থিরতাকে মনে করিয়ে দিতে তিনি বিলম্ব করেন না। পাঠককে কিছুতেই ভুলতে দেন না যে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে রত যে মানুষ, তাদের জীবন-যন্ত্রণাকে বিচিত্র করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জলজ অনুভবের এমন অম্লান উপস্থিতি তার কবিতায় যে লাবণ্য সঞ্চার করেছে। তা থেকে উৎসাহী পাঠক নদী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।"[১৯]

একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা এবং জীবনব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে নদী। বাংলার অর্থনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বাঙালির সমাজ মনস্তত্ত্বে নদীর ভূমিকা অপরিহার্য। বাঙালির জীবনধারা ও সমাজ প্রবাহের এই যে বিচিত্রতা তার মূলে রয়েছে নদী। নদীর কল্যাণে যেমন এই বাংলা সুজলা সুফলা হয়েছে, বণিকবৃত্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছে তেমনি এই নদীপথকে অবলম্বন করেই বণিকরূপী লুটেরা শ্রেণি এসেছে; নদী ভাঙনে নিঃস্ব, রিক্ত, বাস্তুহারা, স্বজনহারা হয়েছে। নদীর এই বিপরীতধর্মী ভূমিকা বাঙালির জীবনধারা, জীবনযাপন ও সমাজ মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে নদী কখনো নিয়ামক শক্তি কখনো পটভূমি আবার কখনও নদীর বিকাশ বৃত্তান্তের সঙ্গে নদীতীরবর্তী জনপদের বিকাশ-বৃত্তান্ত জড়িত। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় নদীতীরবর্তী সংগ্রামশীল মানুষের দৈনন্দিন জীবনাকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। নদীপ্রবাহ জীবনপ্রবাহ ও সময় প্রবাহকে একীভূত করে কবিতার প্রতিটি চরণে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টা তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। নদীর ভাঙন, খরা, বন্যা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরাভব না মেনে নদীতীরবর্তী জনপদ নতুন জীবনের আশায় জেগে ওঠে। প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের এই বিশেষ দিকটি উন্মোচিত করতে গিয়ে কবি নদীর আশ্রয় নিয়েছেন। নদী তার কবিতায় নিজস্ব চাঞ্চল্য, স্ফূর্তি ও তেজ নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। মোহাম্মদ রফিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বৈশাখী পূর্ণিমা* থেকে যে নদীর কলধ্বনির যাত্রা শুরু তা অব্যাহত থাকে *ধূলোর সংসারে এই মাটি* কাব্যগ্রন্থেও। এ কাব্যগ্রন্থগুলোতে নদী মানুষের বাঁচা-মরা, তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতা, সামঞ্জস্য-বিচ্ছিন্নতা, তাঁদের লড়াই ও জয়পরাজয়ের অনিবার্য পটভূমিকা তৈরি করে। এই নদীভাবনা রফিকের কবিতার শিল্পবোধকে নদীর স্রোতের মতো বহমান করে রাখে তেমনি বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। রফিকের কবিতায় স্বদেশের নদ-নদী আর নদীর ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা তাদের সম্পূর্ণতা নিয়ে উপস্থিত হয়। সমালোচক বলেন –

> "নদীর একটি ঢেউয়ের উত্থানে বাঁকানো গ্রীবার আহ্বান, চোখের শ্যামল পাতার আড়ালে ভেঙ্গে যাওয়া, শরীরের ভাঁজে অনাদি জলের টান, হাঁটার সঙ্গে জোয়ারে কলকল, নর্তকের নানান মুদ্রায় জলের আবিষ্কার, নৌকার বৈঠায় ক্লান্তি বহু প্রতিমার পর প্রতিমা গড়ে ওঠে এই সব শব্দকে ঘিরে। জল, জল নিয়েই যদি ধরা যায়, শেষ নেই যেন তার বৈচিত্র্যের।"[২০]

আরেক সমালোচক লেখেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "নদীপ্রবাহ মানবজীবন প্রবাহের প্রতিরূপ, নদীতরঙ্গ মানবজীবনের ভাঙ্গাগড়ার চিত্র, নদীর শব্দ মানবজীবনের শব্দাবলীর অনুরণন।"[২১]

রফিক তাঁর কবিতায় অসংখ্য নদীর নাম উচ্চারণ করেছেন। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনার পাশাপাশি কালিন্দী, কীর্তিনাশা, অলকানন্দা, ভৈরব, মাতামুহুরি, দড়াটানা, আগুনমুখা কত নামের নদীর কলকল ধ্বনি শোনা যায় তাঁর কবিতায়। বাংলার শ্রমজীবী মানুষ নদীকেও মাতৃজননীর মতই ভালোবাসে। নদীতীরের এই সমস্ত মানুষের আনন্দ-বেদনা, শখ আহ্লাদ, জীবন-মৃত্যু একাকার হয় নদীর স্রোতের সাথে। নদীর সাথে বাংলার শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষের এই আমৃত্যু সম্পর্ককে কবিতায় এনেছেন কবি। কবিতায় এসেছে নদীতীরবর্তী মানুষ ও তাদের জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গ। প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের সাথে কবি মনের আবেগকে মেলাতে চান নদীর চিত্রকল্প তৈরি করে। কবিতায় ভাষ্য -

"বনের অঞ্জলি ঘিরে
কী গভীর রাত্রি আঁকে
আনত প্রণাম ধীরে, নদীর ধারাকে ডেকে নিয়ে
প্রান্তরে প্রান্তরে কাঁদে যেখানে ছড়িয়ে থাকে
অনন্ত গোধূলি আর শোকাহত নীরবতা
শ্বাপদের দীন প্রেমে, বনে বনে ফুলের সুবাশে,"[২২]

লোকজ ঐতিহ্য ও পুরাণের সংযোগ রফিকের কাব্য শরীরে সুগভীর জীবনবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের এক ঘনিষ্ঠ অন্বয় তৈরি করে কবিতাকে দেয় আলাদা দীপ্তি। ব্যালাড বা গীতিকা জাতীয় কবিতাগুলোতে কবি খাঁটি বাঙালি পুরাণ ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন। রূপকথা, লোকগাঁথা, পুরাণ, লোকছড়া, প্রবাদ, মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য, গীতিকা, লোক সংগীতের ধারণা প্রয়োগ করেন কবিতায় যা বাঙালি লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় রাজনীতি ততটা প্রকটভাবে আসেনি। কিন্তু কবির রাজনৈতিক বোধের কারণে প্রত্যেকটি কবিতাতেই আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের স্পর্শ রয়েছে। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক চেতনার একটি দৃষ্টান্ত -

"সব শালা কবি হবে; পিপড়ে গোঁ ধরেছে, উড়বেই;
বন থেকে দাঁতাল শুয়োর রাজাসনে বসবেই;
হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে তৃতীয় বিশ্বের গঞ্জে-গাঁয়ে
হুট করে নেমে আসে জলপাই লেবাস্যা দেবতা;
পায়ে কালো বুট; হাতে রাইফেলের উদ্যত সঙ্গিন"[২৩]

রফিক ঐতিহ্য-ইতিহাস-লোকপুরাণকে উপাদান করে মৃতিকা-সংলগ্ন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতাকে কবিতায় দৃঢ়মূল করেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রচলিত লোকগাঁথার চরিত্রগুলোকে অনুপ্রবেশ করান কবিতায়। রফিকের অসংখ্য কবিতার মোটিফ ইঁদুর। গ্রাম্য লোককথার ইঁদুর যেমন সকল অনিষ্টের প্রতীক, তেমনি এটি আবার কৃষিশিল্পের ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করা হয়। *খেলা কবিতা* কাব্যে ইঁদুরকে শোষকের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শকুনের নখ থেকে জন্ম নেয়া এ ইঁদুর ছেয়ে ফেলে বাংলার আকাশ-বাতাস সমস্ত কিছু। শোষিত, ভীত সন্তস্ত্র মানুষ ইঁদুরের অত্যাচারে অতিষ্ট। অথচ তাদের কিছু করার নেই, সবাই স্বেচ্ছাচারী ইঁদুরের ইচ্ছাধীন। ইঁদুর প্রতীকের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংকটাপন্ন অবস্থাকে এভাবে তুলে ধরেন -

"শকুনের নখ থেকে জন্মাল ইঁদুর
নাকে রক্ত পায়ে রক্ত রক্তাক্ত শরীরে
লোমের দুর্গন্ধে, রক্ত রক্তের ধারায়
রাজপথে মার্চ পাস্ট সহস্র ইঁদুর"[২৪]

মোহাম্মদ রফিকের *গাওদিয়া* কাব্যের 'কমরেড তাজুল ইসলাম' শীর্ষক কবিতায় বাংলায় দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটিশদের প্রসঙ্গ এনেছেন। বাংলাকে শোষণকারী সমস্ত অপশক্তির নির্যাতনের ইতিহাসকে বিধৃত করেছেন শব্দের বুননে। শেষপর্যন্ত অপশক্তির পতন ঘটেছে, মেহনতি মানুষের বিজয়গাঁথা সূচিত হয়েছে। কবি বলেন -

"রক্তের ভাটাও আনে রক্তের জোয়ার বাঁকে বাঁকে
আর্বতে তলিয়ে গেছে কত মহাজনী নাও, কত
ভাস্কর দস্যুর ডিঙা পাকিস্তানি ব্রিটিশ বেনিয়া,
লেখা আছে নদীর চড়ায়, কান পাতো শোনো যাবে
সহস্র বিজয় বার্তা।"[২৫]

মেহনতী সংগ্রামশীল শ্রমজীবী মানুষই ইতিহাস বদলায়। কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লবের ডাকে খোক্কসরা (কবি শোষক শ্রেণিকে খোক্কস বলেছেন) ভয়ে পালায় আর বিজয়ের মহাকাব্য লেখে শ্রমজীবী বিপ্লবী মানুষ। কবির উচ্চারণ -

"কেউ আর একা নই, আজ
জনতা-মিছিলে ভাঙে সহস্রবর্ষের বালিবাঁধ
আদিম শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ঝড়ে এ ঝঞ্ঝায়;
কলম-কালিতে নয় ঘামে শ্রমে রক্তের বিপ্লবে
শ্রমিক দিয়েছে সাড়া, মহাকাব্য লেখা শুরু আজ।"[২৬]

কপিলা কাব্যে কবি বিধৃত করেছেন মেহনতি মানুষের জাগরণকে -

"কথা হোনো
এইবার ঠিক মতো কাম চাই কামের হিস্যাও চাই
আরও জোরে বেজে ওঠে ভেঁপু। কাতরে কাতরে
একসাথে পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে কারখানার গেট ভেঙ্গে রাজার প্রসাদ
কলরব করে ওঠে সেপাই সান্ত্রী ডাক ছাড়ে শাসনযন্ত্রের
ঝনঝনে মরচে পড়া তলোয়ার"[২৭]

আমাদের ভূখণ্ড তথা বাংলার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক সুগভীর। এখানে নদীর সাথে সংযুক্ত সমাজ, মানুষ, প্রাণ। নানাভাবে, নানা অনুষঙ্গে নদী বাংলা কবিতায় প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিশেষ করে জীবনমুখী চেতনা নদীকেন্দ্রিক বাংলা কবিতার প্রধান অহংকার। বাংলা কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জীবন পরিক্রমা বিস্ময়কর সৃষ্টি। নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতায় আছে যুদ্ধ, আছে লড়াই-সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার আর্তি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দুর্বোধ্যতা। একদিকে অস্তিত্বের সংকট, অপরদিকে অস্তিত্বগ্রাসী নদীর মোহনায় ফিরে যাওয়া আর প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনা। বেঁচে থার স্বপ্ন, চিরন্তন জীবনাকাঙ্ক্ষা বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক কবিতাগুলোকে অনন্যতা দান করেছে। 'আমার মায়ের ক্ষত' শীর্ষক কবিতায় মা, মাটি, নদী-সব এক হয়েছে।

"এক একটি ভরা পূর্নিমায় মরে আসে কাল-যমুনার সোঁতা
আমার মায়ের রক্ত থেকে পুঁজ, দৃষ্টি থেকে আলো,
মরণকাঠির প্রান্ত ছুঁয়ে বহু-বহু দীর্ঘ শবযাত্রা জীয়নকাঠির
মানচিত্র ও ভূ-প্রকৃতির এক সমীচীন বিবাহসংবাদ;
সাতচল্লিশে একাত্তরে লুট হওয়া নথ-বিছা, সাতনরী হার,
দাদাশ্বশুরের ভিটেমাটি, তালশীর্ষ আগলে মধ্যদুপুরে
খান-খান চিলে চিৎকার!"[২৮]

জলের সাথে নৌকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। নদীর শান্ত সমাহিত জলে নৌকা চলার শব্দ আর মাঝির বৈঠার আঘাতে নদীতে সৃষ্ট ঢেউ অপূর্ব সুরের দ্যোতনা তৈরি করে। নৌকার গলুইয়ে বসে কবি নদী-জলের সেই অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে পান। রফিক বাংলার জল, মাটি, বাংলার প্রান্তর, রূপকথা ও নদীতীরবর্তী মানুষকে ধারণ করেই কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। গ্রামের ঘোমটা টানা বউ, জেলে সম্প্রদায়ের নদীতে দাঁড় টানার ছপ ছপ শব্দ, মুরগী ছানার ডানা নাড়ার দৃশ্য, গাঁয়ের মেঠোপথ, কচু পাতার পানি, পাল তোলা নৌকা, নিড়ানির ক্ষেত, তমালের ডাল, পেঁচা, মটর-কালাই, শালিধান, পাতিহাঁস, জলকাদামাখা মাঠের রাখাল, নদীর জলে জাল ফেলার দৃশ্য, বাংলার মাটি-ঘেঁষা মানুষের যাপিত জীবন, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। গ্রামীণ আটপৌরে জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর কবিতায় মিশে আছে নিসর্গ-প্রকৃতি। কবির ধমনীতে মিশে একাকার হয় কখনো দক্ষিণবঙ্গের, কখনো উত্তরবঙ্গের গ্রামবাংলার সবুজ শিহরন নদীর ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস। বাঙালি নাড়ির নিবিড়তম ধ্বনি, উষ্ণ শিহরন রফিকের কবিতায় অনন্যতা অর্জন করে। মাটি ও মানুষকে এভাবে চিহ্নিত করেন কবি -

"এই ঘ্রাণ বহুচেনা। পচা পাট, কর্ষিত মাটির।
জালার ভেতরে ধান। গলে যাওয়া কাঁচা সুপারির।
বর্ষার গলিত পথে কুয়াশার আস্তরণ ফুঁড়ে
ছনের চালের সাথে আধনোয়া বাতাবির পাতা
বাঁশের ঝোপের নিচে ঘন শটিবন। অন্ধকার
ভেজামুখ। কপোলের ধার ছুঁয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে
সবুজ মাঠের শেষে নেমে যায় একবিন্দু জল
লবণাক্ত চোখের কুয়াশা জ'মে দীর্ঘ বেনা ঘুম।"[২৯]

বৃত্তিজীবী মানুষদের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জরাজীর্ণ জীবনের ছবি অসংখ্য কবিতায় গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদীর রুদ্ররোষ, মনুষ্যসৃষ্ট শোষণ ও শাসনযন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের জীবন। 'ফুল্লরায় দায়', 'স্বদেশ ও সংসার', 'খণ্ডকাব্য-১', 'খণ্ডকাব্য-৩', 'ডাক' প্রভৃতি কবিতায় সংগ্রামী সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ অঙ্কিত হয়েছে। কবির বর্ণনাংশ নিম্নরূপ -

ক. অকালে কর্ষিত ভুঁই পোড়া রূপ,
ঘানি টানে ধান ভানে
খাটে এলে জাপটে ধরে উনুনে নিভন্ত পোড়া ছাই,
রোদ, খরা, এই নিয়ে তাপিত স্বদেশ।[৩০]

খ. নদীর ভাঙন বন্যা বৈশাখী তাণ্ডব ওলাওঠা
ভেদবমি ম্যালেরিয়া পিত্তজ্বর ক্ষয় কাশ
ওকে হেলে ফেলে উগরে দিল।[৩১]

নদীকেন্দ্রিক কবিতাগুলোতে কবি মোহাম্মদ রফিক নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবন-জীবিকার পাশাপাশি তাদের সমাজবাস্তবতা, নদীতে চর জাগলে তা দখলকে কেন্দ্র করে লড়াই, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জনের নানামাত্রিক পথ, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অসহায়ত্ব, অর্থনীতির বিভিন্নতা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিপরীতে লোকায়ত সংস্কৃতির রূপচিত্র, সুখ-স্বপ্ন, জেলেদের মাছ ধরা, মাছ কেনা-বেচা, নদীর মর্জির ওপর জলজীবন, নদীতীরবর্তী বহুমাত্রিক সমাজ-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ, যৌনতা, প্রেম, কলহ, ঈর্ষা, গোষ্ঠীজীবনের আধিপত্য প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। রফিকের কবিতায় বাংলার লোক-প্রান্তর, গ্রাম্যজীবনের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ঘটেছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। রফিক তাঁর কবিতায় প্রাতিস্বিকভাবেই শৈশব-কৈশোরে ফেলে আসা জীবন এবং দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানামাত্রিক ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে লোকসঞ্জাত বিষয় নির্ভর আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন: ক্যান, গতর, জাড়, খইস্যা, চাপি, চোতের, ট্যাহা, প্যাট, দ্যাহেন, থাহুম, ছিক্যা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জইম্যা, তর, খুয়ে, ফুডা, বইস্যা, বিয়োবে, মাইস্যা, মনিষ্যি, রাহে, হাথি, ল্যাজা ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় প্রচুর স্ল্যাং বা অশ্লীল শব্দ ও দৃষ্টিগোচর হয়।

সমকাল চেতনা, ঐতিহ্য ও ইতিহাসচেতনা মহৎ কবির সৃষ্টিকর্মে অনিবার্যভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রফিক তার কবিতায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতার সাথে ব্যবহার করেন বাঙালির গণজীবনের ঐতিহ্য; লালন করেন প্রেরণার অগ্নিমশাল, স্বপ্নের বীজমন্ত্র। তাই সাওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় এসেছে অনিবার্যভাবেই। সাওতাল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে চার ভাই সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব; তাদের মধ্যে সিধু ও কানুর সংগ্রামের অস্ত্র তীর, বর্শা, ডঙ্কা, শিঙা প্রভৃতি অনুষঙ্গের মাধ্যমে কবিতায় শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী পাঁচালী বিবৃত করেন। ‘বস্ত্র উন্মোচনের পালা’ কবিতায় কবি উচ্চারণ করেন -

“দুই এক সহস্র বা শতাব্দীর গোর চাপা চর্বি ফুঁড়ে
কোন কণ্ঠ বেজে ওঠে হেই সিঁধু বাহে হেই কানু
ভাঙন ডিহির মাঠে তীরে ও বর্শায় পড়ে পড়ে
বৃহস্পতি শুক্র শনি ছায়াপথ চন্দ্র ও সুরুজ
এই গাঁ ওই গাঁ দূর দূর গাঁ বাজে ডঙ্কা বাজে শিঙা
বাজে ঢোল বাড়ি পড়ে পিতলের বাসনে হাঁড়িতে
সাজ-সাজ রব ভেঙ্গে ফেল চতুর্দিকে আদাড়-বাদাড়।”[৩২]

গ্রাম বাংলায় যখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবার উপক্রম হয় তখনই সেই ব্রিটিশ আমলে গজিয়ে ওঠা দুঃসহ সাম্প্রদায়িকতার স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রফিকের কবিতায় হিন্দু-মুসলমানের দ্বিখণ্ডায়নের দুঃসহ সেই যন্ত্রণার কাতরতা *কালের মান্দাস* কাব্যে দৃষ্টিগোচর হয় পাঠকের। কবিতায় প্রাসঙ্গিক অংশ -

তুমি আমি যোগ-বিয়োগের ফলাফল
একটি দাঙ্গা তোমাকে করেছে ভিনদেশি-
আর আমি পরবাসী নিজ দেশে
তুমি আজ বিস্মৃতির সহচর[৩৩]

নদীতীরবর্তী সংগ্রামী মানুষের জীবনচিত্র প্রকাশিত হয়েছে ‘প্রাকৃতিক/৫’, ‘কবিতা/৭’ এবং *কীর্তিনাশা* কাব্যের ‘আ’ শীর্ষক কবিতায়। নদী ভাঙন, নতুন কূল, নতুন চর, নতুন আশা, আবার মহাজন-মাতব্বরের শোষণে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া- এই নিয়ে তাদের জীবনের প্রবাহমানতা। কবি বলেন -

“ধুলো মাখা, নৌকার বৈঠার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন জলের
পানারাশি ডোবে ভাসে নিরন্তর ডুবতে ডুবতে ভেসে থাকে;”[৩৪]

‘প্রাকৃতিক/৫’ শীর্ষক কবিতায় নদী ভাঙ্গনের শব্দকে বলেছেন ‘শব্দ সন্ত্রাস’। জলে ভেসে যায় ঘরবাড়ি, ধানের ক্ষেত, সর্ষের খেত, গরু। কবির বর্ণনায় -

“ভাঙ্গন এসেছে জলে দুড়-দাড় ভাঙে পাড়
চতুর্দিকে শব্দের সন্ত্রাসে ভীত তীব্র আর্তনাদ
ভেসে যায় ঘরবাড়ি ধানের সর্ষের চষাক্ষেত” [৩৫]

নদী তীরবর্তী মানুষের বিরহ, জটিল সংগ্রামী জীবন, তিক্ত শৈশব স্মৃতি নদীর প্রবহমানতার সাথে সমীকৃত হয়:

“প্রতিটি ভোরের শিউলি সামান্য রোদ্দুরে খসে পড়ে
উতলা নদীর জল বাঁকে বাঁকে মাথা ঠুকে-ঠুকে
একদিন বালুর চড়ায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে;”[৩৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নদীতে চর জাগলে সেই চরের দখল নেবার জন্য লড়াই নদীতীরবর্তী মানুষের সাধারণ ঘটনা। মোড়ল-মহাজনরা চর দখলের জন্য লাঠিয়াল বাহিনী পোষে। এই চর দখলের লড়াইয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটে। মোহাম্মদ রফিকের কাব্যবোধে এই লড়াই কেবল দখল-হত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, নিহত লাঠিয়ালের বিধবা স্ত্রীর আকুতি দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠেছে নদীর জোয়ার, নদীর বুকে চর জাগার মতো নারীর পাঁজরেও জাগে চর। কবিতার চরণ -

"বাঁশের বেড়ায় দুটো সড়কি, লেজা, বল্লম, রামদা,
জ্বলজ্বলে নিদ্রাহীন; অপেক্ষায় বেড়ে যায় রাত;
চর জাগে বুকের পাঁজরে ভেজা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
তিন বিধবার মুখ ভাঁট-চোখ আড়িয়ালখাঁয়
চর জাগে অন্ধকারে শ্বাস পড়ে শব্দ শোনে তার"[৩৭]

নদীতীরের মানুষদের ঝড়-ঝাপটা, বহুমাত্রিক বিপদকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে হয়। এসব মানুষদের চোখের জলকে মেঘনার কালো জলের সাথে সমীকৃত করেন কবি। বাংলার সংগ্রামী মানুষ, তাদের ইতিহাস, স্মৃতিরোমন্থন, ত্যাগ-তিতিক্ষার সাক্ষী হয় নদী -

"এইখানে দাদার কবর ঐখানে দাদিমার
বাতাবী নেবুর ফুল, ঐ বায়ে রেখে বাঁশঝাড়
মহানন্দা ক্ষুদ্র এক বাঁক নিয়ে থির বয়ে চলে।"[৩৮]

'স্বদেশ ও সংসার' শীর্ষক কবিতায় নদীতীরবর্তী মানুষের আটপৌরে জীবনের বর্ণনা রয়েছে। নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারী তাদের জীবনের অনিবার্য অংশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখনো কখনো বীভৎস হয়ে উঠে। কবির বর্ণনায়:

"এপারে গঙ্গা
ওপারে গঙ্গা, মধ্যেখানে চর, পদ্মা-মেঘনা ঠিকানা। আগুনে পুড়ছে বসুদের
ভিটে। মিত্তিরের মন্দির-চাতাল মিয়াদের বৈঠকখানা।"[৩৯]

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ধর্ষণ, বিকৃত যৌনতা তার কবিতায় সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

"বাঁশের কঞ্চিতে ছেঁড়া কামিজ ওড়না ব্লাউজ
নাবালিকার মৃতদেহ চেটে নিচ্ছে চারটি কিশোর
'এর মধ্যে একটি কি আমার নাতি!
এই ওরাই দশটার দিকে তখনও শুরু হয়নি টেলিভিশন সংবাদ গোলায়
আগুন ধরিয়ে দিল..."[৪০]

অন্য একটি কবিতায় কবির উচ্চারণ -

"আগুন লেগেছে ফের ঘোষদের গাঁয়
হাউমাউ মরাকান্না অনূঢ়া বালিকা বনিতা এলোকেশী
ঝাঁপ দেয় পায়রার জলে।"[৪১]

নদীর একূল ভাঙে অন্যকূল গড়ে। নদীভাঙনে বিনষ্ট হয় তীরবর্তী মানুষের আবাসন, কৃষিক্ষেত্র, বনাঞ্চল। নদীভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষকে চলে যেতে হয় একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। নদীভাঙন থেকেই আবার জন্ম হয় নতুন চরের, নতুন জমির। এই জেগে ওঠা চর অনেকের ভাগ্য ফেরায়, অনেকের কপাল পোড়ায়। বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা-যমুনা সহ অনেক নদীতেই চরের সৃষ্টি হয়। নদীতে চর পড়লে একদিকে নতুন বসতি, কৃষি, বাড়তি জনসংখ্যার আবাস সৃষ্টি হয় অন্যদিকে চর দখলকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য মোড়লের লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে সাধারণ মানুষের বিবাদ বাধে। চর দখলের লড়াই নদীকেন্দ্রিক মানব সমাজের মাঝে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মুনতাসীর মামুন বলেন –

> "জমিই বাঙালির জীবিকার প্রধান নির্ভর এবং তা সীমিত। তাই চর মানে নতুন জমি। ফলে প্রাচীন কাল থেকেই চর নিয়ে বিবাদ বিসংবাদের শেষ নেই। বাংলাদেশে প্রবাদ আছে 'জোর যার চর তার'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত দেখা গেছে, নতুন চরের মালিক হচ্ছে সবসময় জমিদার এবং জোতদাররা।"[৪২]

নিম্নবিত্ত আটপৌরে জীবনকে মোহাম্মদ রফিক বর্ণনা করেন তাঁর কবিতায় পরম মমতা। 'আমার একজন পরিচিত বৃদ্ধকে' শীর্ষক কবিতায় কবি একজন গরিব বৃদ্ধের ক্লিশে জীবনকাঠামোকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। রৌদ্র-কাদা মাটি জলের হৃদ্যতায় বেড়ে ওঠা বৃদ্ধের জীবনকে শব্দের গাঁথুনিতে প্রকাশ করেছেন কবি এভাবে -

"শৈশবে পায়নি খেলনা ভুলে গেছে সে দুঃখ বুঝি বা
যেহেতু এমন বৃদ্ধ জীবনের বিজন অন্তিমে
ম্রিয়মাণ দৃষ্টি দিয়ে মৃত নম্র সূর্যের আলোকে
বুঝেছে জীবন ছিল উপাসী সে খেলনা এক
ধীরে ধীরে ঝরে পড়া অভিমানী ইচ্ছার গভীরে।"[৪৩]

'কবিতা/৫' শীর্ষক কবিতায় কবি তুলে আনেন ভিক্ষুকের জীবনকাঠামো। বর্ষাসিক্ত ঘিনঘিনে পিচ্ছিল রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে বসে ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তি ও অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী সমাজ সভ্যতার বিধিলিপিকে বিধৃত করে। কবির উচ্চারণ -

"ভিক্ষুকের জরাজীর্ণ থালার ওপর এসে পড়ে
অচল দুআনি সিকি মরচে-পড়া লোহার আকার
চোখের ভূভাগ জুড়ে দু-একটা কাক খুঁটে খায়।"[৪৪]

নিচুতলার মানুষের ওপর শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন এবং এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনার চেষ্টা করেছেন তাত্ত্বিকরা। তাঁদের লেখনীতে স্থান পায় প্রান্তিক মানুষেদের প্রাত্যহিক জীবনবীক্ষা। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিটি সমাজেই দাসমালিক, সামন্তপ্রভু, বুর্জোয়া শ্রেণি, শাসকগোষ্ঠীর বিপরীতে দাস, ভূমিদাস, শ্রমিক, কৃষক, অন্ত্যজ প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নিপীড়ক, শোষকগোষ্ঠী, বুর্জোয়া শ্রেণি এবং নিপীড়িত, শোষিত. প্রলেতারিয়েত শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁদের লেখনীতে ধরা পড়ে। ক্ষমতার কেন্দ্র ও প্রান্তের বিন্যাসে উচ্চ ও নিচুতলার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রান্তে অবস্থান করা অন্ত্যজ, দারিদ্র্য, প্রান্তিক মানুষ কেন্দ্রে থাকা ক্ষমতাসীন বা ধনিকশ্রেণির দ্বারা শোষিত। অত্যাচারী, ক্ষমতাধর বা ধনিকশ্রেণির দ্বারা তারা শোষিত। অত্যাচারী বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির সামনে তুলে দাঁড়াবার বা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দুর্বল সাধারণ মানুষের থাকে না। 'কাপুরুষ' শীর্ষক কবিতায় বলেন -

"ওরা কি জেনেছে
প্রতিরাতে শেয়ালের দল ওঁৎ পেতে বসে থাকে
হাঁসের খোপের ধারে ধারে
হরিণের পিছে ছোটে বাঘ
ওরা কি দেখেছে
সাপের ফণার মুখে ভীত-ত্রস্ত ব্যাঙ
বাজের শানিত নখে মেষের শাবক।"[৪৫]

মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। জীবনধারণের নিমিত্তে মানুষকে কোনো না কোনো কাজ অবলম্বন করতে হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস মানে শ্রমজীবী তথা পেশাজীবী মানুষের ইতিহাস। রফিকের কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় জীবন ও জীবিকার প্রসঙ্গ রয়েছে। এ সমস্ত শ্রমশিল্পী মানুষ কঠোর দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করেন। এসব মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়।

তারপরেও রয়েছে ন্যায্য পাওনা বা দাবি থেকে বঞ্চিত হবার ইতিহাস। 'কিষাণের দিনলিপি' শীর্ষক কবিতায় কবি কৃষকের জীবনপরিধিকে বর্ণনা করেন এভাবে -

"হালের ফলা লেগে ঝুরঝুরে বালি কিছু মাটি
এখন ভাটার টান খালের ঘোলাটে ম্রিয়মাণ
জলরেখা, সারাটা আকাশে আলো গলে গলে ছায়া,
হালের বলদ একা ঘুরে ফেরে, একাকী কিষাণ
দাওয়ার ফ্যাকাশে রোদে চুপচাপ মূঢ় জবুথবু;
সারাদিন খাটাখাটি এন্তার কাজের চাপে ভাঙা
মুমূর্ষু চিন্তার ছোপ অস্পষ্ট বালুর কারুকাজ।"[৪৬]

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতায় বন্দি-বঞ্চিত-বিড়ম্বিত মাঝি ও জেলের জীবন চিত্র রফিকের কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় এ সমস্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি, মানবচারিত্র্যের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন অন্ত্যজ জীবনের সংগ্রামশীলতা ও দৈনন্দিন বাস্তবতা, তাদের প্রত্যাশা ও অচরিতার্থতা প্রধান উপজীব্য। অস্তিত্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার মধ্যে জীবনাকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। অসম সমাজ কাঠামোয় শোষিত জেলে, মাঝি, কৃষাণের ক্ষয়িষ্ণু জীবনকাহিনী কবি তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির রুদ্র-রোষ, মহাজনী শোষণ এসবের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াইয়ের এক অনবদ্য আলেখ্য তাঁর কবিতা। নিদারুণ দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মাঝি-জেলেদের জীবিকা সংগ্রহের জন্য নিত্যদিনের কঠোর পরিশ্রম, তাঁদের জীবনকাঠামো, তাদের অর্থনৈতিক পারিবারিক-গোষ্ঠীজীবনের বহুমাত্রিক সমস্যার কথা তাঁর কবিতার শব্দের বুননে উঠে এসেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী তার পূর্ণ সত্তা বজায় রাখতে পারে না। সমাজের আর্থিক তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। মাঝি ও জেলে জীবনের এ জাতীয় ক্ষয়িষ্ণু জীবনবেদ গ্রন্থন করেছেন মোহাম্মদ রফিক তাঁর কবিতায়। 'মাঝি' সিরিজের কবিতাগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে। 'মাঝি ও তার দিন' শীর্ষক কবিতায় বলেন-

"ছোটো খাটো মাছ ধরে এই জন্যে তৈরি তার জাল
কোমল ঢেউয়ের ঘায়ে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি দোলে হালকা লয়ে
দিনান্তে চালের দাম সবকিছু তার মাপাজোকা
কূলেতে ঠেকিয়ে নাও জাল সারে রোদ্দুরে শুকোয়।
বাড়িতে প্রচুর মুখ দুই বউ ছেলে পিলে ঢের;
স্বপ্নে জালের ভেতর ঢোঁড়া খেয়ে নেয় মাছ"[৪৭]

মাঝির সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তার সংগ্রাম, জীবন-মৃত্যু কিছুই বাদ যায়নি তাঁর কবিতায়। নদীতে জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত জলের সাথে পথচলা রক্তমাংসের মাঝিই তাঁর কবিতায় দেখা যায়। বাংলার শেকড়কে সন্ধান করেন বলেই কবি জানেন যে, মাঝির জীবনে দিন নেই, রাত নেই, কেবলই ডিঙি নৌকা নিয়ে নদীর ঢেউয়ে বয়ে চলা, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়ও বিরামহীন চলা তাদের জীবনের অংশ। ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মাঝিকে নৌকা বাইতে ও দাঁড় টানতে হয়। কেননা স্ত্রী সন্তানের ভরণপোষণের জন্য তাকে রোজগার করতে হবে। মাঝি ঝড়ের দিনে ছুরির ফলার মতো বৃষ্টি উপেক্ষা করে, নদীর তীর্যক ঢেউয়ের সাথে অসম যুদ্ধ করে হলেও নৌকা বেয়ে যায়। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় মাঝিকে পাই দুঃখদৈন্যসহ। ছোট মাছ পাবার আশা নিয়ে মাঝি জাল হাতে নৌকায় অপেক্ষমাণ। 'মাঝি ও তার দুঃখ' শীর্ষক কবিতায় কবির উচ্চারণ -

"ছলাৎ ছলাৎ জল ভাঙতে থাকে দুলে ওঠে ডিঙি
পরনের গামছা ছেঁড়া ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে জল
নিজস্ব নিয়ম মেনে দুড়-দাড় ভেঙে পড়ে পাড়
যদি কিছু মাছ মেলে চুনোপুঁটি স্বচ্ছল সন্ধ্যায়"[৪৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'মাঝি ও তার রাত্রি' কবিতায় কবি বলেন -

"অস্পষ্ট ডিঙির ছায়া হাল ধরে থমথমে মুখ
পাড়ের কিছুটা অংশ বালি ঝুপঝাপ ভেঙ্গে নামে
মিশমিশে জলের সুতীব্র টান একরোখা স্রোত
নদীর বুকের মধ্যে অন্ধকার দ্রুত শ্বাস ফেলে।"[৪৯]

নদীতীরবর্তী শ্রমজীবী মানুষের সার্থকতম রূপকার মোহাম্মদ রফিক। সংগ্রামী মানুষের লড়াইয়ের কথা, তাদের পৌরুষের কথা, অপরাজেয় মনোবলের কথা রফিক চিত্রিত করেছেন তাঁর কবিতায়। রফিক যেমন তাঁর কবিতায় মাঝির কথা বলতে গিয়ে নদীর কথা, নৌকার প্রসঙ্গ আনেন, আবার মাটির সাথে নিবিড় সংযোগ যে কৃষকের, তাদের কথা বলতে গিয়ে কৃষিকাজের নানা প্রসঙ্গ আনেন। 'কৃষাণের দিনলিপি' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রফিক শৈশব-কৈশোর গ্রামে অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত মনন দিয়েই রচনা করেন 'প্রচুর আলু চাষ' কবিতাটি। শীতকালে বাংলার গ্রামে আলু চাষ করে যে কৃষক, বৃষ্টি ভয় না থাকায় সে প্রচুর ফসলের স্বপ্ন দেখে। অথচ অসময়ের বৃষ্টি সে কিষাণের স্বপ্নে ধস নামায়। আশাহত কৃষক তবু হতাশ হয়না, প্রচুর আলু ফলনের স্বপ্ন দেখে। কবিতার চরণ -

"চারার গোড়ায় জল পচে ওঠে প্রতিটি শেকড়
শরীর পেঁচিয়ে ওঠে লিকলিকে জোঁক,
প্রচুর আলুর চাষ ভেবেছিল দাঁড়াবে স্বভাবে;
অবাঞ্ছিত জলে ভাসে ফলনের থৈ থৈ ক্ষেত"[৫০]

প্রকৃতির নির্মমতা ও সামাজিক শক্তিগুলোর ঘাত প্রতিঘাতে নদীতীরবর্তী মানুষের নিঃস্ব হয়ে যাবার করুণ গাঁথা রফিক তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন। কীর্তিনাশার ভাঙনে সর্বস্ব হারানো স্বামী-পুত্রহীনা এক বিধবার আর্তি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায় এভাবে -

"ছেলে নিলি স্বামী নিলি একটিমাত্র মেয়ে তাকে নিলি
কী করবি তুই বড়জোর আমাকেও নিবি,"[৫১]

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান পেশা কৃষি। রফিক গ্রাম্যজীবনের মর্মমূল থেকে বেড়ে ওঠেন বলে গ্রাম্যজীবনের বহুমাত্রিক উপাদান তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র নিয়ে উপস্থিত। কৃষি-সংক্রান্ত উপকরণ রফিকের কবিতায় নান্দনিকতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, তাদের দিনযাপন, জীবনসংগ্রাম, দুঃখঘেরা জীবন রফিকের কবিতায় মাটিগন্ধী স্বাতন্ত্র্য বহন করে। 'ঢেকিতে পড়ে পাড়' শীর্ষক কবিতায় কৃষিনির্ভর জীবনের অপরিহার্য উপকরণ ঢেঁকি, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল ভাঙানো আর সেই চালের পিঠা কৃষকের জীবনের আনন্দময় আবহকে মনে করিয়ে দেয়। হেমন্ত ঋতু শেষে সোনালি ধান কাটার পর শীতের শুরুতে কৃষকের ঘরে এই সাময়িক স্বচ্ছলতার ছবি রফিকের শিল্পীমনের হৃদ্যতায় প্রাণ পেয়েছে -

"ঢেঁকিঘর নিকোনো উঠোন পৈঠা কখনো দেহের
গন্ধে ঘামে কখনো-বা ধানের খুশির উষ্ণশ্বাসে
থমথম...
ধূসর আঙ্গিনা জুড়ে প্রতিটি ঢেঁকিতে পড়ে পাড়।[৫২]

নদীতীরবর্তী নিম্নবিত্ত মানুষের স্বপ্ন, সুখদুঃখ ও কঠোর সংগ্রামের নির্মল চিত্র রয়েছে রফিকের কবিতায়। দারিদ্র্য জর্জরিত নদীতীরবর্তী এ সমস্ত মানুষেরা মহামারী, মড়কে বিপর্যস্ত হয়। প্রকৃতির কাছে গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্বের কাব্যিক প্রকাশ ঘটে বারবার রফিকের কবিতায়। রফিক অন্তর দিয়ে অবলোকন করেছেন তাদের মনোবেদনা। কবি লেখেন -

"মারা গেছে গতকাল কিংবা গত পরশু হয়তো বা

গাঁয়ে গঞ্জে লেগেছে মড়ক জ্বর বমি ওলা ওঠা
অনাহার; চালে পোকা ধানে লক্ষ-লক্ষ পঙ্গপাল"[৫৩]

নদীকেন্দ্রিক প্রান্তিক নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষকে একদিকে জীবিকার সন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আরেকদিকে উচ্চবিত্তের মানুষ দ্বারা চিরবঞ্চিত, শোষিত হয়। রফিকের কবিতায় বাংলার লোকায়ত জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গ, প্রতীক, উপমা, রূপক, প্রভৃতি লোককাহিনি ও উপকথার নানা চরিত্রেরা ভিড় করে। লোককাহিনির ঘৃণিত চরিত্রগুলোর মধ্যদিয়ে শোষকদের প্রতি ঘৃণা জানান। তাঁর কবিতায় অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত পেঁচা, অজগর, শেয়াল, শকুন, ভাম, বাদুড় প্রভৃতির প্রসঙ্গ এনেছেন। এসমস্ত চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লোলুপতা, হিংস্রতাকে কবিতায় তুলে ধরার মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের চারিত্র্যকে চিত্রিত করেছেন। কবিতায় কবির উচ্চারণ -

"সমস্ত নদীর জল ওলট-পালট বৈপ্লবিক
ভারি মহাজনী নাও কায়েমী দুপাড় কম্পমান
নির্যাতিত ইচ্ছাগুলো সদ্যজাগা আক্রোশে উন্মাদ,"[৫৪]

'শুকতারা সন্ধ্যাতারার গপ্পো' কবিতার দুর্ভিক্ষকালীন শ্রমজীবী মানুষের ওপর সম্পন্নদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। কবিতাটির শুরু থেকেই কবি দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও অনিশ্চিত নিয়তির হাতে সমর্পিত মানুষেদের জীবন কথা বলতে চেয়েছেন। মোড়লের পুত্র কর্তৃক মোমেনার মার ধর্ষিত হওয়া, ধর্ষণের পর খুন, মোমেনার বাপের মৃত্যু একটি মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। রিপু করা পিরান কামিজ, ছাইভরতি উঠানের কোণে মরচে পড়া দাও (কৃষি উপকরণ) মেহনতী শ্রমজীবী মানুষগুলোর ক্লিষ্টতার স্মারক। এসমস্ত মানুষের নিদারুণ আত্মবঞ্চনা, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন কবির নিরুচ্ছ্বাস অতিরেক বর্জিত ভাষায় নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে -

"মাথার ওপরে ভাঙা বাঁশের বেড়ায়, নিষ্পলক
মাথাল, জোয়াল, যত্নে রিপু করা পিরান কামিজ;
গাঁয়ের উত্তর-ঢিবি বঁইচি ঝোপের মাঝামাঝি
মোমেনার মা'র লাশ আবিষ্কার করে আঁতকে ওঠে
শুকতারা। একবার মুখ ঢাকে, ফের চেয়ে দেখে
বিব্রত বিস্ময়ে, আড়াআড়ি পড়ে আছে ন্যাংটো লাশ।
...
পাশাপাশি, মোমেনার মায়ের ছায়ার বামপাশে
কার ছায়া, চেনা ভার, হয়তো বা মোড়লের পোলা;"[৫৫]

'আরজ আলী' শীর্ষক কবিতায় মাতব্বর শ্রেণির জাল দলিল তৈরি করে জায়গা-জমি দখলের প্রসঙ্গ এভাবে এসেছে -

"আর একটু
হাঁটলেই পুরনো বাড়ির গাছে ঢাকা
কার্নিশের ছায়া দাদামশায়ের কাল থেকে ভাঙা,
(অঞ্চলের মাতব্বর হাল আমলের সরকারি দলের নবীন পাণ্ডা রহমত জাল দলিলের ফাঁস এঁটে দীর্ঘে প্রস্থে পুরো মাঠটাই আগামীতে চাষ দিতে পারে)[৫৬]

'ইঁদুরের মাহাত্ম্য বন্দনা', 'ইঁদুরের প্রজন্ম-সংবাদ', 'ইঁদুর-শকুন সমাচার', 'ইঁদুরের বাণিজ্য-বেসাত', 'ইঁদুরের আহার-বিহার', 'ইঁদুরের স্বাগত ভাষণ', 'ইঁদুর লাদির তেজস্ক্রিয়া', 'ইঁদুর-চরিত্রে ভয়ভীতি', 'ইঁদুরের অমরত্ব প্রাপ্তি' প্রভৃতি কবিতায় স্বৈরাচারী-অত্যাচারী শাসক-শোষকদের কীর্তি প্রকাশে রফিক ইঁদুর, শকুন, ভাম, অজগর, বাদুড় প্রভৃতির পাশাপাশি ডাইনি ইমেজ ব্যবহার করেছেন। লোকবিশ্বাস অনুসারে ডাইনি মানুষের রক্তপান করে তৃষ্ণা মেটায়। বাংলা লোককথাগুলোতে ডাইনিদের মুখের কথার নাসিক্যধ্বনির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ডাইনির মুখনিঃসৃত ধ্বনিতে নাসিক্যতা ডাইনি চরিত্রের ভয়ংকরতা

বীভৎসতার মধ্য দিয়ে বিপন্ন-শোষিত-অসহায় মানুষের ওপর পীড়নকে ইঙ্গিত করে। রূপকথার বহুমাত্রিক অপরিহার্য উপাদান যেমন–রাক্ষস খোক্কস, সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি, পঙ্খীরাজ ঘোড়া, ডাইনি বুড়ি, সোনার পালঙ্ক। রফিকের *কপিলা* কাব্যগ্রন্থটি বাংলার লোক সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিক উপকরণের প্রাচুর্যে ভরপুর। রূপকথার রাজকুমার কুঁচবরণী কন্যাকে বিয়ে করতে চায়, যার মাথায় মেঘের মতন চুল। রফিকের কবিতায় নারী সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হলেও দারিদ্য তাদের ভূষণ। অভাবের পীড়নে বিধ্বস্ত। রফিক তার কবিতায় ছেলে ভুলানো ছড়াকে ব্যবহার করেছেন বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত প্রদানের জন্য। রফিক তাঁর কবিতায় অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা চাষী ও তার বউয়ের প্রথম জীবনের সুখ ও পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত ও মোড়ল, মাতব্বর শ্রেণির শোষণের চিত্র তুলে ধরতে লোকসংগীতের সুরের আশ্রয় নেন। কবিতার মধ্যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করেছেন এ সমস্ত গানের লাইন। তাঁর কবিতায় ডাইনি ইমেজ, ছেলে ভুলানো ছড়া এবং লোকসংগীতের ব্যবহার এভাবে এসেছে -

ক. আঁই লোঁ, মাঁই লোঁ নাঁতীন লোঁ লোঁ নাঁতীন লোঁ
তোঁর মঁনে এঁই ছিঁল লোঁ।
তোঁর মুঁণ্ডুটা চিবিঁয়া খাঁই লোঁ [৫৭]

খ.
ও গরু তুই	হাসস ক্যা
ও কুত্তা তুই	ক্যাঁদস ক্যা
ও কুকিল	গাছে ফুরুত ফুর
ডালিম গাছে	বসস ক্যা
মরণ দেইখ্যা	হাসস ক্যা
কাঁদন দেইখ্যা	কাতুর কুর
মান দেইখ্যা	নাচস ক্যা
গলা মাংসের	ভুরুত ভুর
গন্ধে চিলা	কাঁদস ক্যা[৫৮]

গ. জমিন হয়েছে টুডা এবং আসমান ফাডা ফাডা[৫৯]

রফিকের কবিতা অজস্র লোকজ উপাদানের সমাহারে ঋদ্ধ। নদীতীরবর্তী শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ আয়োজনে লোকসংস্কৃতির নিবিড় উপস্থিতি লক্ষণীয়। এসমস্ত মানুষের চিন্তাচেতনা, মনোভঙ্গি এবং জীবনধারায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলা কবিতায় প্রান্তিক লোকজীবনের আলেখ্য রূপায়ণের সচেতন প্রবণতা রফিকের লেখনীর অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির নানামাত্রিক উপাদান যেমন লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার তাঁর কবিতায় অনন্যতা অর্জন করেছে। প্রকৃতি নির্ভর শ্রমজীবী মানুষের অদৃষ্টবাআদী জীবনদৃষ্টি ও লোকচেতনার নান্দনিক সম্মিলন তাঁর কবিতায় এসেছে এভাবে -

ক. অচেনা পেঁচার কান্না, আচমকা গভীর রাতে ঘুম
ভেঙে যাওয়া জড়িত বিব্রত স্বরে শিশুর ক্রন্দন
শকুন ঝাপটায় ডানা, গাছের পাতারা নেমে আসে; [৬০]

খ. অভিশপ্ত ছোঁয়াছুঁয়ি কামিনীর বৈধব্যের থান
তক্ষকের তীক্ষ্ণ চোখ বেণী থেকে ফণা তোলে চুল
ডেকে ওঠে টিকটিকি, এরা কী করে যে বুঝে নেয়। [৬১]

গ. কৃষ্ণ চলেছেন দোলে পাখা মেলবে এবার ময়ূর। [৬২]

ঘ. বদর বদর হাঁকে মাঝ গাঙে দূর মধ্যরাতে। [৬৩]

ঙ. মিথ্যে তেপান্তরে ঘোরে শাপগ্রস্ত ডালিমকুমার।[৬৪]

চ. কাল রাত থেকে ভেদ বমি। জ্বর। ফকিরের দোয়া,
পানি পড়া, কড়ি কাঠে ছুলে আছে ভয়ার্ত নিঃশ্বাস।[৬৫]

ছ. অলুক্ষণে কাকটি কেন অমন ডাকে।[৬৬]

জ. কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে সবাই যেন সুখে থাকে।[৬৭]

নদীকূলবর্তী মানুষের জীবন কত তুচ্ছ, তাদের মৃত্যু যেন কোনো প্রভাবই ফেলে না। 'কবিতা/৯' এবং 'ডাক' শীর্ষক কবিতায় কবির উচ্চারণ -

ক. তুমি মাঝি ছিটকে গেলে নৌকার গলুই থেকে দূরে
কিছুটা হাওয়ার দোলা সামান্য জলের উৎপাতে।[৬৮]

খ. গতকাল ভেসে গেছে নাও জাল তার সাথে নাওয়ের পাল ও কাছি
শূন্যের হাওয়ার তার খাটিয়ে বাদাম শূন্য জেলে
একা বসে অঝোর কান্নার জল।[৬৯]

নদীতীরবর্তী প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নদীকে কেন্দ্র করেই। নদী এদের কাঁদায় ভাঙনে ভাসায়, সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। আবার সেই নদীকে ঘিরেই কতশত স্বপ্ন। নদীও দরদী হয় তাদের জন্য। বিধ্বংসী সর্বগ্রাসী নদীতীরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে নদীকেন্দ্রিক মানব সমাজ। ভাঙনপ্রবণ মাটি উপরেই ঘর বাঁধে, বাঁচার স্বপ্ন দেখে, সুখের অন্বেষণ করে। রফিক তার *স্বদেশী নিঃশ্বাস তুমিময়* কাব্যের 'নিত্যকালের বাঁশি' শীর্ষক কবিতায় চিরায়ত বাংলার শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের নিত্যদিনকে এভাবে রূপ দেন শব্দের গাঁথুনিতে -

"জলে জলে জাল ফেলে বুক তার গাঙের মোহনা,
(যদিও বা নাম আছে, লোকে ডাকে দামদর মাঝি);
মাঠে মাঠে হাল চাষ দেহ তার কর্ষিত বে-ভুঁই
(তবুও তো লোক চেনে, ওই ব্যাটা খাল্যেকের পুত),
মাটি কেটে বুক দেগে বসে গেছে কোদালের কোপ
(শরম জড়ায়ে ঠোঁট বউ কয়, আহারে মরদ);"[৭০]

কবি আবারও লেখেন -

"খালেক মালেক যদু নিতান্ত দরিদ্র চাষাবুষা
এরা
ভাত কচুপাতা কিংবা ডাল সেদ্ধ গোগ্রাসেই গেলে
এদের মৃত্যুর ক্ষণ জন্মের উল্কিতে আঁকা হয়।
ভাগ্য ফেরে
সামান্য পান্তাও যদি
জুটে যায় খায়-দায়
উন্মুক্ত প্রান্তর পেলে লুঙ্গির খোটাটা তুলে
যোগ দেয় প্রাকৃতিক কাজে,"[৭১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। রফিকের নদী সংশ্লিষ্ট কবিতায় একদিকে নদী নির্ভর শ্রমজীবী মানুষ অন্যদিকে অত্যাচারী শোষকগোষ্ঠীর চিত্রও আভাষিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে বৃত্তিজীবী কৃষক-মাঝি-জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার সন্ধান এবং তাদের কষ্টের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। শ্রমজীবী মানুষদের একদিকে যেমন ভয়াবহ নদীভাঙনের সঙ্গে তাদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ অন্যদিকে মানুষরূপী মহাজন, মোড়ল সুদখোর-দাদন ব্যবসায়ী-ঠকবাজদের শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন-দৌরাত্ম্য। নদী জীবনের অনিশ্চয়তার মাঝেই তাদের জীবন-জীবিকার সন্ধান। রফিকের *মেঘে এবং কাদায়* কাব্যের ‘চলচিত্র-১’, ‘চলচিত্র-২’, ‘চলচিত্র-৬’ প্রভৃতি কবিতায় জেলে-মাঝি-মালো কৃষক জীবনাচরণ, স্বপ্নসাধ, ব্যথাবেদনা, প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক চরণসমূহ -

ক. চড়িত দাঁড়ের শব্দ। মাঝিদের গুণটানা হেই।
অন্ধকার!
সে পদ্মাপারের মেয়ে
মা’টা গেছে সওদাগরী নায়ে। তার লজ্জা
চাঁদপুর কিনে নিল আড়তের মহাজন। কবে?
কত দামে? বিনা সুদে।[৭২]

খ. মোহন হাসির ঠারে দিন বাড়ে চাষি লাঙল জোয়াল কাঁধে
চলে আল পথ
মেয়ে গেছে ছেলে গেছে গাই গেছে জমি গেছে
আছে শুধু সখিনার মায়।[৭৩]

গ. মরা গরু ভেসে যায় জলে ভাসে লাশ,
উড়ে এসে খাবলে খায় শকুনের পাল,
এইসব নিতান্ত কাহিনি[৭৪]

পেঁচা, ইঁদুর, শেয়াল, শকুন, বাদুড় প্রভৃতি ঘৃণিত প্রাণীদের অবাধ বিচরণের রাতকে তিনি শোষিত মানব বসতিতে চেপে বসা শোষণের অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন -

“নিড়ানির খেত হতে হামাগুড়ি দিয়ে দীর্ঘ রাত
ভারী হয়, তমালের ডালে পেঁচা, জ্বলে ওঠে চোখ,
চিনে নেয় কোনটা ব্যাঙ, কাচপোকা নধর ইঁদুর
শিকারি ডানার তীক্ষ্ণ ঝাপটায় শিউরে ওঠে বন;

পাঁকে-পাঁকে অন্ধকার পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে অজগর
গিলে ফেলে সারাটা আকাশ দু-একটা ভীত তারা
দক্ষিণের পুকুরঘাটায় তীর ঘেঁষে তেজী ভাম
তীক্ষ্ণ হয় খাড়া নখ, নাকে রোহিতের আঁশটে ঘ্রাণ;

অশরীরী অন্ধকার জমাট নিঃশব্দ তাল-তাল
ঘুমন্ত বসতি জুড়ে চেপে বসে দুঃসহ গুমোট,
ঝলসে ওঠে কুচকুচে বাদুড়ের হিংস্র চেরা দাঁত
ভয়ে কাঁপে থরথর ফলন্ত ডালিম, নত ডাল;

শেয়ালের চিৎকারে খসে পড়ে ছেঁড়াখোঁড়া পাতা
শুধুমাত্র হা-হুতাশ করে ফেরে বাউরি বাতাস।”[৭৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বছরের প্রথম দিন ছিন্নমূল সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো সুখের বার্তা আনে না। যাদের মহজনী সুদ গুণে দিন যায়। তাদের দৈন্যাবস্থা চিরায়ত। দুঃখ, দারিদ্র্যবেষ্টিত বঞ্চনাপ্রধান জীবনে আছে শুধু লড়াই-সাংগ্রাম। নিয়তির দাক্ষিণ্য ও ধ্বংসলিপ্সু চারিত্র্য দিয়ে এসমস্ত মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। কবির ভাষায় -

"পহেলা বৈশাখ আজ। ভোর হলো। আমেনা মা'র
কাল রাত থেকে ভেদ-বমি। জ্বর। ফকিরের দোয়া,
পানি পড়া, কড়িকাঠে ঝুলে আছে ভর্য়াত নিঃশ্বাস
... ...
ফজরের আজান শুনে চোখ খোলে ফাতেমার বাপ।
বেড়া ভেঙ্গে এক লাফে নেমে গেল তিনটে শেয়াল,
দুলতে থাকে অভুক্ত চুলের বেণী, বাউরা সকালে।"[৭৬]

বাংলার লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গে ঋদ্ধ রফিকের শিল্পবোধ গ্রাম্যজীবনাভিজ্ঞতার পটভূমিতে সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরে। তাঁর কবিতায় রয়েছে সোঁদাগন্ধী গ্রামজীবনের চিত্রপট। বাংলার গ্রামীণ মানুষের নির্সগ প্রকৃতি কেন্দ্রিক জীবনসংগ্রাম ও তাদের দারিদ্র্যঘেরা নিত্যতার ভেতর কবির শিল্পচেতনা প্রকটিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, ঐতিহ্য, লোককল্প, লোকপুরাণ, স্বদেশভাবনার সঙ্গে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নির্মমতায়। কবি রফিক লোকায়ত পটভূমির লোককাহিনি নান্দনিক প্লট তৈরি করেন পীড়ন শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত গণচেতানার স্বরূপ উদ্ঘাটনে। ঋজু জীবনের বহমানতা, জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গাভিঘাত তাঁর কবিতায় এসেছে এভাবে -

"কেঁদে কেঁদে খালেকের বউ মারা গেছে গত সনে
কাশির গমক ওঠে। ধস নামে পাহাড়ের গুহায়
হাঁস ক'টা ছেড়ে দিলে ! উহ কী ভীষণ জাড় আজ।

আগামী বছর শীতে, খালেক ঘুমোবে ঠিক দেখো,
বাঁশপাতা, দূর্বাঘাস, সোঁদামাটি, খড়, এইসব
মুড়ি দিয়ে, বাগানের এক কোণে, খুব নিরিবিলি
ভূমিহীন ভূমিদাস নিজরাজ্যে ভৌমিক তোষকে।"[৭৭]

সমকালীন ঘটনা বোঝাতে রফিক পুরাণ ও লোককথার নব রূপায়ণ ঘটান তাঁর কাব্যে। কবিতায় তিনি যে পুরাণ ব্যবহার করেন তা নদীকেন্দ্রিক গ্রাম বাংলার একান্ত নিজস্ব পুরাণ। তাঁর কবিতায় বেহুলা লখীন্দর কিংবা মহুয়া সুন্দরী- নদ্যার ঠাকুরের প্রসঙ্গ এসেছে দুঃখ-দারিদ্র্য শাসিত বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বরূপ বর্ণনায়। অত্যাচারী ও শোষণযন্ত্রের স্বেচ্ছাচার বোঝাতে কবি বেহুলা লখীন্দরের বাসর ঘরে লিকলিকে কালো সাপের আশ্রয় নেন। চাঁদ সওদাগরের সাজানো সংসার ধ্বংস করতে মনসা বেহুলা আর লখীন্দরের বাসর ঘরে সাপ রাখে। রফিক সমকাল তুলে ধরেন লখীন্দর-বেহুলা লোকপুরাণকে ব্যবহার করে। মৃত স্বামীর ভেলা নিয়ে ভেসে যেতে যেতে বেহুলাকে সহ্য করতে হয়েছিল নদীতীরবর্তী মানুষের অশালীন ও অপমানজনক কটুবাক্য। সমকালীন মানুষের হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশকে তিনি কবিতায় এভাবে তুলে ধরেন -

"সাপ গর্ত খোড়ে, যদি কোন সুযোগ ঘটে
ছোবল মারেও ঠিক
বেহুলার বাসরের লুকানো ছিদ্রের খোঁজ
আজও মেলেনি তাই,
লখীন্দর হাঁটু মুড়ে বসে আছে তোমার দাওয়ায়,"[৭৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 145
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের নায়িকা ফুল্লরাকে রফিক নিছক বাঙালি বউ হিসেবে কবিতায় ঠাঁই দিয়েছেন। ফুল্লরা-কালকেতুর সংসার দারিদ্র্যক্লিষ্ট। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। বাংলার সাধারণ প্রান্তিক মানুষদের দুঃখ-দারিদ্যক্লিষ্ট জীবনের বাস্তবতা নিরূপণে মৈমনসিংহ-গীতিকার পালা থেকে কাব্যোপকরণ সংগ্রহ করেছেন। নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়ার ট্রাজেডির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বাঙালির দুঃখ দুর্দশার স্বরূপ। 'দোমাটির মুখ' শীর্ষক কবিতায় *মনসামঙ্গল* কাব্যের বেহুলা আর *মৈমনসিংহ গীতিকা*'র মহুয়াকে একসুতোয় বেঁধেছেন।

"নদীপাড়ি, এলোচুল বসে আছে বেহুলা মহুয়া
তুই না আমার ছোট বোন, ফিরে এলি,
না রে দিদি, সে কথা নিয়তি লেখে নাই;
দুইজনের শাড়ি বেয়ে ভিজে উঠছে বাংলাদেশ
তুই না ভাসালি ভেলা, তারপর কী যে হলো,
আর তুই ঝুলে রইলি বিষলক্ষ্যা ছুরির ডগায়।"[৭৯]

মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় সত্যবতী কাহিনি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রসঙ্গ এসেছে। বসুরাজের কন্যা সত্যবতী মাঝি সম্প্রদায়ের কাছে লালিত পালিত হন বলে যমুনা নদীতে খেয়া পার করতেন। রফিকের কবিতায় নৌকার পাটাতন প্রসঙ্গে শ্রমজীবিনী নাইয়া সত্যবতী পুরাণের ব্যবহার নদীবাহিত জীবনের ইঙ্গিত প্রদান করে। রফিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্রগুলোকে তাঁর কবিতার নির্মিতিতে প্রয়োগ করেছেন। রফিকের কবিতায় চরণভুক্ত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) সৃষ্ট চরিত্র কুবের কপিলা-শশী-হারান এক অনন্যমাত্রা সংযোজন করেছে কবিতার অবয়বে। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কপিলার নামানুসারে একটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন। *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের চরিত্র শশী-কুসুম-হারান বসবাস যে গ্রামে তার নাম গাওদিয়া। উক্ত নামেও রফিকের একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। *গাওদিয়া* কাব্যে কুবের-কপিলার দারিদ্র্যের-সংগ্রামের চিত্র কবিতায় এঁকেছেন এভাবে:

ক. হ একখান গীত ক। হিম হাড় কাঁপানো জারের
ঘরেতে পোয়াতী বউ, পোলা-মাইয়া কী করুম ক, না
নিজে গো জোটেনা খাওন।[৮০]

খ. খেতের ওপারে খেত জলাশয়ে কঁকিয়ে কঁকিয়ে দুর্লক্ষ্য জলের বন্দী
নিয়তির কুবের কপিলা[৮১]

বাংলাসাহিত্যের এক অনন্য বিস্ময় মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য।* যদিও এর আখ্যান বাল্মীকির *রামায়ণ* থেকে নেওয়া এবং বলাবাহুল্য পাঠক রামায়ণের রসের বিপরীত রস আস্বাদন করেন এই কাব্য পাঠে তথাপি পাঠকের রসভঙ্গ হয় না। এর কারণ মাইকেলের কবি প্রতিভা। যে প্রতিভা বাল্মীকির সমতুল্য। তাই একই আখ্যান ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বিপরীত রসের আস্বাদ নেওয়ার পরেও পাঠক বিব্রত বা হতাশ হন না বরং মুগ্ধ এবং চমৎকৃত হন। বহুকালের এই সিদ্ধরসকে ভাঙার মতো কবি প্রতিভা ছিল মধুসূদনের তাই তিনি *মেঘনাদবধ কাব্য-* এর মতো অনন্য সৃজনশীল এক কাব্য সৃষ্টি করে পাঠকের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু রফিক এই ক্ষেত্রে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছেন। মানিকের *পুতুল নাচের ইতিকথা* বা *পদ্মা নদীর মাঝি-* এর কালজয়ী সিদ্ধরসকে ভাঙার মতো প্রতিভা তিনি প্রদর্শন করতে পারেন নি। মানিকের আখ্যান বা চরিত্রের নব রূপায়ণ তো হয়নি বরং সিদ্ধরসের অপব্যবহারে পাঠকের রসভঙ্গ হয়েছে। পাঠক হয়েছেন হতাশ, পলে পলে পাঠক মানিকের সৃষ্টির স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন।

নদীতীরবর্তী গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। বাড়ির হর্তাকর্তা তারাই। ঘরে স্ত্রী নারীরা মানবেতন জীবনযাপন করে। *কীর্তিনাশা* কাব্যের 'ঊ' শীর্ষক কবিতায় কবি চিরায়ত মাতৃত্বের স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন। 'এ' শীর্ষক কীবতায় নারীর বৃত্তাবদ্ধ জীবন অঙ্কিত হয়েছে পরম যত্নে। কবিতাটিতে দুশ্চরিত্র পিতা-পুত্রের কুকীর্তি শাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে বৌয়ের জবানিতে বিধৃত হয়েছে। 'ঐ' শীর্ষক কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সংসার জীবনে নারীর অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছি। আটপৌরে গ্রামীণ জীবনে নারীর কর্মব্যস্ততা, জীবনযাপন এভাবে কবিতায় ধরা পড়ে -

ক. মার কোনো বর্তমান ভবিষ্যৎ নেই
শুধুমাত্র রয়েছে অতীত, তাই নিয়ে কান্নাকাটি। [৮২]

খ. ওর বাবা তাও ও এই এক আধটু মদ-ভাঙ-গাঁজা
নেশা ছিল, মেয়ে মানুষের দোষ তাও কিছু কিছু
সারা রাত ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কেঁদেছি আমিও।[৮৩]

গ. কে আর কইবে এতো দুশ্চিন্তার ভার, রান্নাবান্না;
কেউ এলে আপ্যায়ন, সময় সে কাটে না সহজে; [৮৪]

এ বাংলার শ্রমজীবী মানুষ কখনো কোনো `vwi`ª¨ বা জীবনযন্ত্রণার কাছে মাথা নত করেনা। উঠে দাঁড়াতে চায় ঋজু ভঙ্গিমায়, আপন উচ্চারণে, জীবনের Zvrch©gq চেতনার আঁধারে যে ইতিহাস-HwZn¨, যে চেতনা-মনন তা বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির অংশ। গ্রাম বাংলার ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথার অন্তরঙ্গ রূপায়ণে রফিকের কবিতা হয়ে উঠেছে বিপুল মানুষের জীবনদর্পণ। সমালোচক বলেন –

> "...আবার একইরূপে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের শোষণ, স্বেচ্ছাচারিতা যেমন আছে তেমনি চিরায়ত স্পন্দমান জীবনও আছে। এমন সমান্তরাল সমাজ AwfÁZv †gvnv¤§` iwd‡Ki KweZvi welq| GLv‡b Kwei cÖZ¨ÿ সামূহিক AwfÁZvi সঙ্গে যুক্ত হয় পঠনের DrKxY© মনন শক্তি। ফলে আঙ্গিকটি পায় আধুনিক অবমুক্ত মাত্রা।"[৮৫]

তিরিশের পর বাংলা কাব্যসাহিত্যে এখন পর্যন্ত উজ্জ্বল দশক ষাট। অবশ্য ষাটের দশকটি দ্বিবিধ প্রজন্মের মেধাশাসিত পরীক্ষা নিরীক্ষা, কর্ষণে-বপনে আপন মৃত্তিকায় ফলপ্রদায়ক। ষাটের কবিতার ফলোন্মুখ আবির্ভাবের একটি উজ্জ্বল নাম মোহাম্মদ রফিক। মাটি সংলগ্ন শিকড়ঘেঁষা মানসিকতা তাঁর লেখক চৈতন্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাটি-মাখা শ্রমজীবী মানুষ এবং মৃত্তিকার গন্ধভরা মানুষীর প্রতি মোহাম্মদ রফিকের কবিতার বিশেষ আকর্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশাল ক্যানভাসে নদীপাড়ের বৃত্তান্ত রূপময় পঙক্তিমালায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। বাঙালি জাতির যুগযুগের সংগ্রামশীলতা ও শক্তিমত্তার সবচেয়ে উজ্জ্বল উপমা রফিক খুঁজে পেয়েছেন এদেশের শ্রমজীবী মানুষের দুর্মর জীবন সংগ্রামের মধ্যে। তাঁর কবিতার পঙক্তিগুলো যেন অনিবার্যভাবে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম-ঘাম-কল্পনা-স্বপ্নের সঙ্গে মিলে মিশে শিল্পের এক স্বতন্ত্র নন্দনতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। কবিতায় থাকতে হয় ভাব (mood), আর প্রকাশের সামঞ্জস্যতা, গণমানুষের ভাব-ভাবনার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতা এবং পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনা যা মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় পঙক্তির নির্মাণ-বিন্যাস-বিস্তার এ অনন্য। দারিদ্র পীড়িত নদীতীরবর্তী মানুষের প্রতি কবির একটি দরদের জায়গা ছিল। সেই দরদী চেতনার দ্বারা নির্মিত জীবনকথা তাঁর কবিতাসমূহ। নদীতীরবর্তী সংগ্রামী মানুষদের উত্তাপজর্জর জীবন ভর করেছিল কবির হৃদয়ে ও চোখে। শ্রেণিবৈষম্য, সামাজিক জটিলতা, অস্তিত্ব সংকট, সাম্প্রদায়িক বিভেদ-কলহ উত্তাপজর্জর পরিণতির গুণে রফিকের কবিতা সমৃদ্ধ ও জীবন্ত বাংলার নদীবিধৌত বেদনাযন্ত্রণাঘন মানুষের সময়ের সন্ধিকে কবিসত্তার নিরন্তর ভাবোচ্ছ্বাস, স্মৃতি, দর্শন, উপলব্ধির সাথে সমীকৃত করেছেন মোহাম্মদ রফিক।

Reference:

১. মার্কস, কার্ল, এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ: 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৩০
২. মাওলা, আহমেদ, 'চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ' বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ২৭
৩. হান্নান, মোহাম্মদ, 'বাংলা সহিত্যে মতাদর্শ বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব', বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ০৩

৪. আল-জোবায়ের, মো, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: প্রসঙ্গ শ্রেণিদ্বন্দ্ব' সাহিত্য পত্রিকা; বর্ষ: ৫৮ সংখ্যা ১-২, ফাল্গুন, ১৪২৯, পৃ. ১৮১

৫. Shahidullah, Muhammad, 'Buddist Mystic Song' Mowla Brother, 1960, Page. 48

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ২২শ খণ্ড, পু.মু. বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৮৫, পৃ. ৫৮

৭. নজরুল ইসলাম, কাজী, 'নজরুল রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৮০

৮. তদেব, পৃ. ১১০

৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, 'শ্রেষ্ঠকবিতা' আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৪, পৃ. ২৩

১০. দে, বিষ্ণু, 'কবিতা সমগ্র' প্রথম খণ্ড; (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত) আনন্দ পাবলিশার্স লি: কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১৭৬

১১. মিত্র, অরুণ, 'কাব্য সমগ্র' প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৫

১২. দাস, দীনেশ, 'দিনেস দাসের কাব্যসমগ্র', মনীষা, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ১৭

১৩. সেন, সমর, 'গৃহস্থ বিলাপ' তিনপুরুষ, অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, ১৯৮৯, পৃ. ২১

১৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'কবিতা সংগ্রহ-১', সুবীর রায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২২

১৫. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, 'কবিতা সংগ্রহ-১' ১৯শ মুদ্রণ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ৬১

১৬. রফিক, মোহাম্মদ, 'কবিতাসমগ্র' প্রথম খণ্ড, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৪

১৭. হক, মামুদুল, 'বাংলাদেশের কবিতায় নন্দনতত্ত্ব', বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫০

১৮. ইকবাল, শহীদ, 'বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০)', রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১

১৯. রেজা, তারেক, 'কবিতাকালের কণ্ঠস্বর' গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা:) লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮৪-৮৫

২০. সেন, অরুণ, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা' প্রতিক্ষণ পাবিলকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২১

২১. জলদাস, হরিশংকর, 'নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন' বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৪৬

২২. রফিক, মোহাম্মদ, 'কবিতা সমগ্র' প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২৩. তদেব, পৃ. ২৫৫

২৪. তদেব, পৃ. ১৯০

২৫. তদেব, পৃ. ১৪৮

২৬. তদেব, পৃ. ১৪৯

২৭. তদেব, পৃ. ২৬০

২৮. রফিক, মোহাম্মদ, কবিতাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ইত্যাদি প্রকাশ, ৩৮/৩, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২২৮

২৯. তদেব, পৃ. ১৭০

৩০. তদেব, পৃ. ৫০

৩১. তদেব, পৃ. ৫১

৩২. তদেব, পৃ. ৭৪

৩৩. তদেব, পৃ. ৬০

৩৪. তদেব, পৃ. ৩৮

৩৫. তদেব, পৃ. ৪৯

৩৬. তদেব, পৃ. ৭৪

৩৭. তদেব, পৃ. ১৩৫

৩৮. তদেব, পৃ. ১৫

৩৯. তদেব, পৃ. ৫০
৪০. তদেব, পৃ. ১২৮
৪১. তদেব, পৃ. ১৩০
৪২. মামুন, মুনতাসীর, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ পৃ. ১৪
৪৩. তদেব, পৃ. ১৫
৪৪. তদেব, পৃ. ৪০
৪৫. তদেব, পৃ. ৪৬
৪৬. তদেব, পৃ: ৫১
৪৭. তদেব, পৃ. ৫৭
৪৮. তদেব, পৃ. ৫৭
৪৯. তদেব, পৃ. ৫৮
৫০. তদেব, পৃ. ৫৮
৫১. তদেব, পৃ. ৬৬
৫২. তদেব, পৃ. ৫০
৫৩. তদেব, পৃ. ৭৩
৫৪. তদেব, পৃ. ৯৫
৫৫. তদেব, পৃ. ১৩৭
৫৬. তদেব, পৃ. ১৪২
৫৭. তদেব, পৃ. ২৫৯
৫৮. তদেব, পৃ. ২১৯
৫৯. তদেব, পৃ. ২৯৮
৬০. তদেব, পৃ. ৫১
৬১. তদেব, পৃ. ৬৮
৬২. তদেব, পৃ. ৭৭
৬৩. তদেব, পৃ. ৮৯
৬৪. তদেব, পৃ. ১০৫
৬৫. তদেব, পৃ. ১০৬
৬৬. তদেব, পৃ. ১৪৫
৬৭. তদেব, পৃ. ১৪৫
৬৮. তদেব, পৃ. ৫৬
৬৯. তদেব, পৃ. ৫৬
৭০. তদেব, পৃ. ২৭০
৭১. তদেব, পৃ. ৩০৮
৭২. তদেব, পৃ. ১৭-১৮
৭৩. তদেব, পৃ. ৪৬
৭৪. তদেব, পৃ. ৪৭
৭৫. তদেব, পৃ. ৭১, ৭২
৭৬. তদেব, পৃ. ১০৬

৭৭. তদেব, পৃ. ১২৯

৭৮. তদেব, পৃ. ২৮৭

৭৯. তদেব, পৃ. ৬৪

৮০. তদেব, পৃ. ২৫৩

৮১. তদেব, পৃ. ১২৪

৮২. তদেব, পৃ. ৭০

৮৩. তদেব, পৃ. ৭০

৮৪. তদেব, পৃ. ৭১

৮৫. ইকবাল, শহীদ, ‘বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০) রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 146 - 152
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রোমান্টিসিজম ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

সুপর্ণা হালদার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suparnahalder208@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Romanticism, Nature Consciousness, Spirituality, Love And Despair, Melancholy, Divine Pursuit, Contrast, Modern Life.

Abstract
Romanticism emerged in Western literature in the early 18th century, in opposition to classicism. One of the main foundations of which was nature consciousness, nature love, spirituality, love and despair and past conduct. Romanticism had a major impact on Western literature after the publication of Lyrical Ballads by William Wordsworth and Coleridge in 1798. As a result of which the romantic poets of that time tried to create a separate world based on their poetry. Wordsworth brought the natural beauty of nature into his poetic thought. Coleridge took his poetry into a mystical world. Another characteristic of Romanticism in Shelley's poetry was spontaneous lyricism. And Keats brought pictorials into his poetry. However, Romanticism had a direct impact not only on Western literature but also on Eastern literature. Just as the vibration of romanticism is heard in the creative thought of Rabindranath, the clear influence of romanticism is also seen in the creative thought of the poets after Rabindra. Just as Rabindranath Tagore's poems like 'Manasi', 'Sonar Tari', 'Chitra', 'Chaitali' are characterized by romanticism, in the case of modern Bengali poetry, echoes of romantic spirit are heard again and again in Jibanananda Das's' Jhara Palak ',' Dhusar Pandulipi ',' Banalata Sen ',' Maha Prithibi ', in the poetry collections of Buddhadeb Basu such as 'Kankabati', 'Draupadi's Sari', in the poems of Samir Sen, in Subhash Mukhopadhyay's poetry collections like ' Ful futuk na futuk aj Basanta', 'Jato durei jay', 'Kal Madhumas', and in Sunil Gangopadhyay's collections like ' Hotat Nirar jonno', ' Vorer upohar ', etc., can repeatedly hear the echoes of romantic consciousness.

Although it is not easy to imbue the color of romantic beauty in the colorlessness of modern life. Yet, modern poets have sought to infuse the flower of romanticism in the heart of the citizen's consciousness. And one of those who was able to spread the softness of romanticism in this land of harsh reality is Shakti Chattopadhyay. His poetry has echoes of Romanticism. He has used various natural resources as materials for his poetry. He wanted to realize the divine presence in the eternity of nature's natural beauty. In his poetry, the pursuit of the beauty of nature has become the name of divine pursuit. Just as the melancholy, loneliness, despair and alienation of the urban people have

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

found a place in his poetry, love has also played a very important role in his poetry, which has been manifested in the natural context. Nature can only perfect the inadequacies and inefficiencies of individual life. So the poet, tired of the stresses of life, has repeatedly called the reader into nature because this place is not for humans, only God exists here.

Discussion

১

শিল্প ও সাহিত্যে যুগের দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। 'রোমান্টিসিজম'-ও এই রকম একটি সাহিত্যিক আন্দোলন। যা পূর্ববর্তী 'ক্ল্যাসিসিজম'-এর আঙ্গিক, রীতিনীতি, শিল্পদর্শন ও জীবনদর্শনের প্রতিবাদ করে উৎপত্তি লাভ করে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এবং অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে রোমান্টিকতার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। পূর্ববর্তী 'ক্ল্যাসিসিজম'-এর যুক্তিনিষ্ঠ কঠোর আনুগত্যকে ত্যাগ করে রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক জগতের মোহাবিষ্ট হয়ে এক নতুন ধরনের সাহিত্য সঞ্চয়নে মনোনিবেশ করলেন। পূর্ববর্তী ক্ল্যাসিক সাহিত্যে যেখানে ছিল শব্দের আড়ম্বর সেখানে রোমান্টিক কবিদের হাতে শব্দ হয়ে উঠল সহজ সরল প্রাঞ্জল। যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের উর্ধ্বে গিয়ে প্রকৃতি চেতনা, অতীতচারিতা, আধ্যাত্মিকতা, আনন্দ ও বিরহের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটল রোমান্টিক সাহিত্যে। ব্যক্তি জীবনের আবেগ, স্পন্দন ও কল্পনার যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠল সাহিত্য।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত ঘটে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ কর্তৃক প্রকাশিত 'Lyrical Ballads'-এর মাধ্যমে। 'Lyrical Ballads'-এর ভূমিকা অংশে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই নব্য কাব্য আন্দোলনের অভিপ্রায় সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা বলেছেন তার মধ্যে সেখানে তিনি কবিতা রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বলা যেতে পারে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কর্তৃক লিখিত এই ভূমিকা অংশটিই রোমান্টিসিজমের ধারণার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা।

> "that a series of poems might be composed of two sorts. In the one, the incidents and agents were to be, in part at least, supernatural; and the excellence aimed at was to consist in the interesting of the affections by the dramatic truth of such emotions, as would naturally accompany such situations, supposing them real... For the second class, subjects were to be chosen from ordinary life; the characters and incidents were to be such as will be found in every village and its vicinity, where there is a meditative and feeling mind to seek after them, or to notice them, when they present themselves."[১]

অর্থাৎ, একটি কবিতার সিরিজে মূলত দুটি অংশ থাকে। যেখানে প্রথম অংশে উল্লিখিত ঘটনা এবং চরিত্রগুলিকে আংশিক অতিপ্রাকৃত রূপে বর্ণিত হবে। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই কবির অনুভূতিগুলো প্রকাশ পাবে। আর দ্বিতীয় অংশে বাস্তবজীবন থেকেই ঘটনা নির্বাচন করতে হবে। যাতে পাঠক সহজেই লিখিত ঘটনাগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। তাই রোমান্টিক সাহিত্যে কখনই ধ্রুপদী সাহিত্যের আভিজাত্যপূর্ণ, প্রথানির্ভর, কঠোর আনুগত্যপূর্ণ জীবনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার পরিবর্তে প্রকৃতির চিরন্তনতা ও সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিরহ, আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন রয়েছে রোমান্টিক সাহিত্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে।

রোমান্টিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটস, ওয়াশিংটন আরভিং, জন উইলিয়াম পলিডোরি প্রমুখ। রোমান্টিক সাহিত্য রচনার কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তি এবং তার প্রকৃষ্টরূপে বিকাশ সাধন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাই তাঁর কবিতায় বারবার তুলে ধরেছেন প্রকৃতির চিরন্তনতাকেই। তাঁর 'Wandered lonely as a cloud'-কবিতাতে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির অনুষঙ্গে কবি তুলে এনেছেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অন্তর্মানসকে। মেঘের সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন নিজেকে নিজের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্তর্মানসকে। মেঘ যেমন বাতাসে বাহিত হয়ে বিভিন্ন নামী অনামী পাহাড়, পর্বতের উপর দিয়ে সোনালী ড্যাফোডিলের রূপময়তার সাক্ষী হয়ে দিগন্ত জুড়ে বিচরণ করছে, তেমনি কবিও তাঁর নিজের মনকে মেঘের মতোই হাল্কা করে ভেসে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির চিরন্তনতাতে। আবার 'The prelude' কবিতাতে কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের হতাশা, নৈরাশ্যতা, অসহায়তা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আপাত প্রভাবকে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি হিসেবে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখেছেন। যেখানে প্রকৃতিই হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানুষের পার্থিব সমস্যা সমাধানের একমাত্র চাবিকাঠি। তাই 'The world is too much with us'-কবিতাতে কবি বারবার বার্তা দিয়েছেন প্রকৃতিকে রক্ষা করতে, প্রকৃতির সৌন্দর্যতাকে রক্ষা করতে। কেননা মানবজীবনের অক্ষমতাগুলিকে একমাত্র প্রকৃতিই সক্ষমতা দান করতে পারে। মানুষ তার নিজস্বার্থের জন্য প্রকৃতির ওপর ক্রমাগত কুঠারাঘাত করে চলেছে। যা কবির সংবেদনশীল চিত্তকে বারবার বিঘ্নিত করছে। তাই তিনি বলতে চেয়েছেন সভ্যতার থেকেও প্রকৃতির গুরুত্ব অনেক বেশি।

কোলরিজের কাব্যে রোমান্টিকতার কিছু ভিন্নধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। রোমান্টিকতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকৃতি ও তার রূপময়তা, আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা, অতীতচারিতাকে দাবী করলেও কোলরিজ 'অতীন্দ্রিয়বাদ' কেও রোমান্টিকতার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরেও একটি মোহময় জগত রয়েছে, যা অতীন্দ্রিয়। আর সেই অতীন্দ্রিয় জগতকেই কোলরিজ তার সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। 'Frost at midnight' কাব্যে তিনি প্রকৃতি সাধনাকেও ঐশ্বরিক সাধনার একটি অংশরূপে দেখিয়েছেন। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও গ্রাম্য সৌন্দর্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যের সম্পর্ক ও দূরত্বকেও চিহ্নিত করেছেন। এই ধ্বনিই যেন কালে কালে ফিরে এসেছে প্রতিটি ভাষার সাহিত্যে। আবার 'Dejection : an ode', 'Fears in solitude' কাব্যে কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিষণ্ণতাকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায়। তিনি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করেছেন অন্য এক জগতে। যা কবির কাছে যেমন একদিকে রোমাঞ্চকর তেমনি অন্যদিকে ভীতিজনক।

রোমান্টিক যুগের অন্যতম কবি শেলির কাব্যে রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে এসেছে গীতিময়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সুরের মাধুর্য, বিষণ্ণতা এবং আত্ম-করুণা। তাঁর 'To a Skylark' কবিতায় দুটি জগতের বৈপরীত্যকে কবি তুলে ধরেছেন। একদিকে রয়েছে স্বর্গীয় আনন্দ আর তার বিপরীতে আছে ব্যক্তিমানুষের দুঃখ জর্জরিত করুণ জীবন। এখানে কবি স্কাইলার্ক-কে বিশুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা প্রকৃতির মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। আর মানুষ এই বিশুদ্ধ আনন্দকে সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে না, স্কাইলার্কের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিমানুষ সেই আনন্দে সামিল হয় এবং 'The cloud' কবিতাতেও কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যতাকে একটি অন্যমাত্রা দিয়েছেন। প্রকৃতি যদিও কখনো কখনো ভয়ঙ্করী, তবুও সে সুন্দর, সে মহিমান্বিত। 'Ode to the west wind' কবিতাটিতে একদিকে যেমন রয়েছে ধ্বংসের চিত্র তেমনি অন্যদিকে বর্ণিত হয়েছে নব সৃষ্টির উল্লাস। আবার 'Stanzas written in dejection near Naples' এবং 'The Indian Serenade' - কবিতা দুটিতে বর্ণিত হয়েছে কবির বিষণ্ণতা, হতাশা এবং নৈরাশ্যতা। দুঃখকাতরতায় জর্জরিত কবি ব্যক্ত করেছেন হৃদয়ের করুণ ভাবাবেগকে। কিন্তু তবুও তা শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতাকে গীতিময়তার রসাবেশ থেকে স্থানচ্যুত করেনি।

আবার জন কীটস তাঁর কাব্যে অতীতচারিতা, নিসর্গপ্রীতি ও চিত্ররূপময়তাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকার অভিপ্রায়ে তিনি একটি নিজস্ব ভাবের রাজ্যে বিচরণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বারবার ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অতিক্রান্ত জীবনধারার কাল্পনিক সৌন্দর্যে। তাঁর 'Isabella or the pot of Basil', 'Lamia' প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীন রূপকথার অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। আবার 'Ode on a Grecian urn' কবিতায় ব্যক্তিমানুষের প্রয়োজনীয়তাকে ছাপিয়ে গেছে তার সৌন্দর্যচেতনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত থেকেই জন্ম নেয় শিল্প। 'Ode to a Nightingale'- কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে কবির 'আশাবাদী' মনোভাব। কবি এখানে মানুষের জীবনের অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের গভীরে অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। যেখানে সৌন্দর্য এবং যন্ত্রণা একত্রে বিদ্যমান এবং জীবন সর্বদা রোগ এবং মৃত্যুর হুমকির দ্বারা পীড়িত এবং 'To Autumn'- কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও চিত্ররূপময়তা। 'Ode on Melancholy'- কবিতাটিতে রয়েছে বিষণ্ণতাকে স্বীকার করার অভিপ্রায়। আনন্দ ও দুঃখ

পরস্পরের সহাবস্থানে থাকে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থেকে দুঃখের জন্ম। আর এই দুঃখই হল জীবনের নিত্যসঙ্গী। দুঃখকে বরণ করে নিলেই দুঃখকে জয় করা সম্ভব। ফলত, বিষণ্ণতা উপভোগ ও বিষণ্ণতা থেকে উত্তরণ তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হয়েছে উঠেছে।

২

পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমান্টিকতার প্রভাব প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ওপরেও পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের কাব্যে ছড়িয়ে রয়েছে রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে রোমান্টিসিজম। প্রকৃতির সৌন্দর্যময়তা, ব্যক্তিজীবনের বিষণ্ণতা, প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব বারে বারে ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যভাবনায়। কবি প্রকৃতির অনুষঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা নির্বাচন করেই তাকে সাধারণের সীমানা ছাড়িয়ে অসাধারণের সীমায় নিয়ে গেছেন। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬), 'কল্পনা' (১৯০০), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫), 'মহুয়া' (১৯২৯) - প্রভৃতি কাব্যে কবির নিসর্গপ্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও অতীতানুরাগের নিদর্শন রয়েছে।

আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'ঝরাপালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৫২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) প্রভৃতি কাব্যে কবি তুলে ধরেছেন গ্রামবাংলার অপরূপ রূপ মাধুর্য। আর তার অনুষঙ্গে উঠে এসেছে ব্যক্তি জীবনের অনুভূতিগুলি। কবি যেন বিচরণ করছেন 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে'।[২] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরের রহস্যাচ্ছন্ন জগতকে কবি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে বারে বারে এসে ধরা দিয়ে গেছে।

আবার বুদ্ধদেব বসুর কাব্যেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব দেখা যায়। তাঁর কাব্যে গ্রাম্য প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি নগর কেন্দ্রিক সভ্যতারও রূপময়তা চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সৌন্দর্য কখনই গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্যের বিকৃত রূপ হিসেবে ফুটে ওঠেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে একে অপরের দোসর। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, নৈরাশ্যতা যেমন তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে, তেমনি নিঃসঙ্গতা ও নৈরাশ্যতার প্রতীক হয়ে উঠে এসেছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ। 'পৃথিবীর পথে' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি ও ব্যক্তিমানুষের পীড়িত জীবন যেন একাত্ম হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে সমর সেনের কবিতা যেন হয়ে উঠেছে আদ্যোপান্ত রোমান্টিক। তাঁর কবিতায় যেমন রয়েছে নাগরিক চেতনা, তেমনি তার পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে 'মহুয়ার দেশ'। নাগরিক জীবনের ক্লান্তিতে কবি যেন বারে বারে ফিরে যেতে চেয়েছেন শান্ত সুনিবিড় প্রকৃতির মাতৃক্রোড়ে। তাই তো তিনি তাঁর মানসলোকে কল্পনা করেছেন এক নিস্তব্ধ স্বপ্নপুরী 'মহুয়ার দেশ'। যেখানে গিয়ে কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন প্রকৃতির মাদকতাকে। নাগরিক চেতনার অন্তরে কবি প্রজ্বলিত করেছেন আরেক চেতনা। সেখানে যেমন রয়েছে হৃদয়ের দগ্ধতা তেমনি রয়েছে প্রকৃতির অনুষঙ্গে নিজেকে ফিরে পাওয়ার আকুতি।

স্নিগ্ধ ও সুন্দরের পরিপন্থী হল প্রেম। আর প্রেমানুভূতি হল আবেগনির্ভর - আধুনিক মানুষের নাগরিক চেতনার অভিঘাতে বাস্তবের সঙ্গে প্রেমের যে বৈপরীত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেখানে কবির কল্পনাশক্তির অবাধ বিচরণ বিঘ্নিত হয়। তবুও যেন বাস্তবের রুক্ষমাটিতেই প্রেমের আবেগ জন্ম নেয়। দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিতে ও টানাপোড়েনে প্রেমের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেলেও তবুও প্রেম, প্রেমই থাকে। তবে সেখানে সংবেদনশীলতা লক্ষণ খুব কমই দেখা যায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম এসেছে এই বাস্তব রুক্ষতাকে স্বীকার করেই। কবি বাস্তবের নির্মমতার মাঝে প্রেমের বহু বিচিত্র রূপকে তুলে এনেছেন নিজের মুন্সিয়ানায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রোমান্টিসিজম কখনো তার চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেনি। এসেছে কিছুটা ভিন্ন রূপে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের কবিতাগুলিতে প্রেম ও প্রকৃতি এসেছে রাজনৈতিক আদর্শের অনুষঙ্গে। যেখানে কবির নিসর্গপ্রীতি রাজনৈতিক আদর্শের বেড়া অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। তবে রোমান্টিসিজমের একটি সুমধুর সুর যেন রেখে গেছে। তবে পরবর্তীতে তাঁর কবিতায়

রোমান্টিক চেতনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে তবে তাতে আবেগ নির্ভর ভাবালুতার প্রশ্রয় নেয়। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত' (১৯৫৭), 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'জল সইতে' (১৯৮১) - প্রভৃতি কাব্যে কবি তাঁর ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণে যেমন ব্রতী হয়েছেন তেমনি প্রকৃতিও যেন নানা রঙে সেজে হাজির হয়েছে তাঁর কাব্যে।

আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর কাব্যে রোমান্টিসিজমের জয় গান গেয়েছেন কিছুটা ভিন্ন রূপেই। রোমান্টিক কবিদের মতোই তাঁর কাব্যেও প্রকৃতি ও প্রেম প্রভাব বিস্তার করেছিল তবে সেখানে সর্বত্র জুড়ে অবস্থান করেছে কবির 'আমিত্ব' বোধ। প্রকৃতি সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন বরং প্রকৃতির মধ্যে তিনি নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছেন। তেমনি তাঁর কাব্যের আদ্যোপান্ত ছড়িয়ে আছে 'fragrance of love'। অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায়, শব্দচয়নের চারুতায় তিনি তাঁর একের পর এক কাব্যে রোমান্টিকতার রং দিয়েছেন। যা কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছেই নয় আপামর সাধারণ পাঠকের কাছে অত্যন্ত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। 'হঠাৎ নীরার জন্য', 'ভোরবেলার উপহার', 'সেই মুহূর্তে নীরা', 'যদি নির্বাসন দাও' - প্রভৃতি কাব্যে তাঁর রোমান্টিক চেতনার স্পন্দন শোনা যায়।

৩

'রোমান্টিসিজম' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পর এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় রোমান্টিসিজমের প্রভাব বিশ্লেষণ। শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাঁচের দশকের একজন অন্যতম কবি। তাঁর অসাধারণ রচনার বুননে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর কবিতা বাংলা ভাষার সাহিত্য প্রেমীদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। তিনি কবিতার মোহনীয় সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে কবিতা চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং তাঁর কাব্যভুবনকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর কবিতার বক্তব্য স্বতন্ত্রধর্মী। সমুদ্র, আকাশ, নদী, বৃক্ষ, নক্ষত্র, বৃষ্টি, জঙ্গল, মহুয়া, ফুল, বীজ, টিলা, জ্যোৎস্না, ঝিঁঝিঁ, অন্ধকার, রাত্রি, পাহাড়, পাথর, জীবন, মৃত্যু, জীবনের স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসা, ক্লেশ তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান সবকিছুর পাশাপাশি জীবনের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি উঠে এসেছে। নিজস্ব জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর আলাদা পদ্যরীতির বক্তব্য প্রকাশের সুদৃঢ় ভাষা কবিতাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। কালের প্রবাহে তাঁর কবিতা আড়ালে চলে যায়নি। বরং আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের সাহিত্যে যে রোমান্টিক যুগের সূচনা হয়েছিল তা পরিবর্ধিত রূপে বহুবছর অতিক্রম করেও যুগের দাবীকে মেটাতে সক্ষম হয়েছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্য কর্মে এবং রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্য কর্মেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে আধুনিক জীবনের বর্ণহীনতায় রোমান্টিক সৌন্দর্যের রং ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, ক্ষতবিক্ষত জীবনের নৈরাশ্যতা ও সর্বব্যাপী কর্মব্যস্ততার যুগে ব্যক্তিমানুষের প্রকৃতি চেতনা যেখানে দিনে দিনে ক্ষয়িত হচ্ছে, যেখানে ক্রমাগত সম্পর্কের অপমৃত্যু বেড়ে চলেছে, 'প্রেম' শব্দটির মাহাত্ম্য যেখানে পদে পদে ক্ষুণ্ন হচ্ছে, আর যন্ত্রসভ্যতার চোরাবালিতে মানুষের বিবেক বুদ্ধি যেখানে তলানিতে ঠেকেছে সেখানে দাঁড়িয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় শোনালেন প্রকৃতির গান। হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রকৃতির কোলে - সেই গভীর জঙ্গলে, যেখানে ঈশ্বর ঘর বাঁধেন।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৬১), 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (১৯৬৫) 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' (১৯৬৬), 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' (১৯৬৯), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৯৭০), 'ঈশ্বর থাকেন জলে' (১৯৭৫) - প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবির রোমান্টিক চেতনার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

'পাবো প্রেম কান পেতে রেখে' কবিতাটিতে কবি গভীর আত্ম-অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। 'প্রেম'কে খুঁজে চলেছেন তিনি, সেই প্রেম শ্বাশ্বত, দেবতার মতো, আকাশচুম্বী বৃক্ষের মতো। যার শিকড় মাটির অতলে বিস্তৃত আর শাখাগুলো ছড়িয়ে রয়েছে অজানা অসীমে।

কবি সেই শিকড়ে কান পেতে খোঁজেন পুরোনো সেই স্মৃতি, যেখানে জীবনের গোপন প্রেম লুকিয়ে ছিল। কিন্তু সেই বাগান আজ শূন্য, স্বপ্নের দীর্ঘছায়ায় ঢাকা। পুরোনো স্পর্শের মগ্নতা আর হৃদয়ে আসে না। দেবতা দূরে, প্রকৃতির নীলিমায় হারিয়ে গেছে তার সান্নিধ্য। তাই তিনি বলেন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার
পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো? বুঝি ভুলে গেলে।"[৩]

তবু কবি আশাবাদী - প্রেম বা দেবতার সুর যদি ধৈর্যের সঙ্গে কান পেতে শোনা যায় তবে তা প্রকৃতির স্তব্ধতায় একদিন মিলবেই। এ এক নৈঃসঙ্গের আর্তি, যা প্রেমের শাশ্বত খোঁজে হৃদয় জাগ্রত রাখে।

"নীলিমা ঔদাস্যে মনে পড়ে নাকো গোষ্ঠের সংকেত;
দেবতা সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে।"[৪]

'অন্ধকার শালবন' কবিতাটিতেও কবি তাঁর অন্তর্মানসের 'বন্ধু'টিকে খুঁজে চলেছেন অন্ধকার শালবনে। এখানে উল্লেখ্য কবিতাটিতে কবি অন্ধকার ও আলোর বৈপরীত্যকে দেখিয়েছেন। যে মন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, শালবনের মত ঘনবন্ধনে আবদ্ধ, যেখানে আলো চোরাই পথে যাতায়াত করে, সেই মনই তখন স্ফটিক জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যখন –

"...বাদামপাতার শিখরে লুপ্ত
সময়, হে মৃত ডুবো বিষণ্ণ ত্রস্ত মুখোশ
উড়ে চলে যাও,"[৫]

শালবনের গভীরেই প্রকৃতির সান্নিধ্যেই কবি তাঁর আত্মার কাছাকাছি যেতে পারেন। আবার 'ছায়ামারীচের বনে' কবিতাটিতেও কবির অন্তর্লোকের বিকাশ ঘটেছে প্রকৃতির মধ্যেই। কবির হৃদয় যখন নাগরিক চেতনার দুর্সহ বেদনার ও অবসাদের গন্ধে পূর্ণ তখন কবি যেতে চেয়েছেন সেই 'ছায়ামারীচের বনে'। যেখানে আছে, -

"স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ
হারু-মরু-নদী...ভরসা ফলের পাত...।"[৬]

কবি যেতে চেয়েছেন তাঁর সেই বন্ধনহীন মানসলোকে যেখানে মৃত্যু আর জীবন পাশাপাশি অবস্থান করে। মৃত্যুর আহ্বান যেখানে ঠিকই আসে তবুও মানুষ বাঁচে।

'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে 'কবিতাটিতে কবির রোমান্টিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। কবি আমাদের এক স্বরচিত 'ইউটোপিয়া'তে নিয়ে গেলেন যেখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে, জন্ম আছে মৃত্যু আছে। আর এত কিছুর পরেও আছে জীবনের বহমানতা। সেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবতা পরস্পরের সহাবস্থানে অবস্থান করে। কবি যখন বলেন, -

"দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত
কাল সারারাত তার পাখা ঝরে পড়েছে বাতাসে
চরের বালিতে তাকে চিকিচিকি মাছের মতন মনে হয়
মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হত।"[৭]

তখন মনে হয় কবি যেন তাঁর অন্তরের জমে থাকা পুরোনো শতচ্ছিন্ন স্মৃতিকে বিদায় জানিয়ে নতুন কিছুকে আহ্বান জানিয়েছেন। কবি তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন 'নক্ষত্র খামারে'। আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান পৃথিবীর সব রঙিন পর্দাগুলি আর 'শেফালীর চারা'।

আসলে বাস্তবের ভূমিতে যখন স্বপ্ন আর স্মৃতির অপমৃত্যু ঘটছে তখন কবি যেন তাঁর স্বপ্নজগতে রঙের, আলোর আর প্রাণের স্পন্দন জাগাতে চেয়েছেন। কবি তাঁর প্রেম ও প্রেয়সীকে সেই জগতেই পেতে চেয়েছেন যেখানে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেমন রয়েছে তেমনি প্রকৃতিও যেন প্রধান চরিত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার 'আনন্দভৈরবী' ও 'চাবি' কবিতা দুটিতে ধ্বনিত হয়েছে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের স্মৃতি আর সম্পর্কের জটিলতা। এখানে প্রেম এসেছে স্বতন্ত্রভাবে। 'আনন্দভৈরবী' কবিতাটিতে কবি 'প্রেম'কে হারিয়ে ফেলেছেন আর তার সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছেন আনন্দকে। তাই তিনি শান্ত প্রকৃতির মধ্যেই আবার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। অন্যদিকে 'চাবি' কবিতাটিতে কবি নিজে থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন জমে থাকা স্মৃতিগুলিকে।

অন্যদিকে 'ঝাউয়ের ডাকে' কবিতাটাতে কবির রোমান্টিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। গভীর রাতের সৌন্দর্যকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নিপুণ আঙ্গিকে। এখানেও কবি প্রকৃতির মাঝে নিজের অতীতকে দেখতে চেয়েছেন। তাই তো কবি বলেছেন, -

"ঝাউয়ের ডাকে তখন হঠাৎ মনে আমার পড়ল কাকে।"[৮]

কবির জীবনে প্রেম এসেছিল 'গতবার' অর্থাৎ গত জীবনে কিন্তু এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গভীর হয়েছে। তবুও সেই প্রেমের গাঢ়ত্ব বাড়েনি। কেবল মেঘে মেঘেই দিন ফুরিয়ে গেছে। তাই আজ প্রেয়সীর অবর্তমানে বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ করছেন। আর প্রকৃতির অনুষঙ্গে জীবনের প্রেমকে মিশিয়ে দিয়ে গভীর আত্মানুসন্ধানে মগ্ন হয়েছেন। 'বসন্তের ডাকে' কবিতাটিতে কবি প্রকৃতি ও সভ্যতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' কবিতাটিতেও কবি আধুনিক জীবনের নিঃসঙ্গতা, মূর্খতা, সম্পর্কের অবনতির মাঝেই প্রকৃতির সাধনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই জয় হয়েছে। 'সে মানে একটা বাগান ঘেরা বাড়ি' কবিতাটিতে কবির রোমান্টিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। কবিতাটিতে কবি ব্যক্তিগত প্রেম, স্মৃতি ও প্রকৃতির মধ্যের সম্পর্ককে দেখিয়েছেন। 'সুন্দরের স্বেচ্ছাচার' - কবিতাটিতে কবি তাঁর গভীর জীবনদর্শনের প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যক্তিমানুষের পীড়িত জীবনবোধ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি স্থান পেয়েছে কবির সৌন্দর্যবোধ। তিনি চিরদিনই বোহেমিয়ান। পিছুটানে না আটকে তিনি বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির শিকড়ে। গভীর জঙ্গলে কিংবা কোনো এক জ্যোৎস্নামুখর গভীর রাতে অথবা কোনো বর্ষামুখর দিনে তিনি খুঁজে পেয়েছেন নিজেকে। তাঁর কবিতায় 'বোহেমিয়ানিজম' যেন রোমান্টিসিজমেরই পরিপন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে। ভবঘুরে জীবন কেবল মুহূর্তের সঞ্চয়, পৃথিবীর রূপ রসের দরিয়ায় অবগাহন। যা কোনো কবির সংবেদনশীল চিত্তকে বিকশিত করে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝে চিরকাল থেকে যেতে চেয়েছেন তিনি। জীবন ও মৃত্যু, প্রেম প্রকৃতি ও পরিক্রমা, স্পৃহা ও নিস্পৃহতা সব যেন মিলেমিশে এক অদ্ভুত রহস্যময় ঘোরাটোপ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কবিতাগুলিতে। যথার্থ সৌন্দর্যের তৃষ্ণা, প্রেমের স্মার্ত অনুভব, প্রকৃতির রঙ ও রূপের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা এইসবের প্রেক্ষিতেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে রোমান্টিক কবি হিসেবে বিচার করা সঙ্গত বলে মনে হয়।

Reference:

১. V. de Selincourt, 'The Early Wordsworth', (Presidential Address to the English Association), Stephen Parrish's essay in PMLA, vol. 73, London, 1958, p. xx
২. দাশ, জীবনানন্দ, 'বনলতা সেন', ৮ম সংস্করণ, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা - ২৯, অক্টোবর, ১৪২৪, পৃ. ৯
৩. 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, অষ্টবিংশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০২১, পৃ. ২৭
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ২৯
৬. তদেব, পৃ. ৩০
৭. তদেব, পৃ. ৪১
৮. তদেব, পৃ. ৪৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 153 - 163
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা এবং বিনয় মজুমদারের কবিতায় গাণিতিক তত্ত্ববিশ্ব

নরেশচন্দ্র মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সি এম জে ইউনিভার্সিটি, মেঘালয়
Email ID : nareshchandramajumder76@gmail.com
ও
গোপালচন্দ্র পাল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইউনিয়ন খ্রিস্টান ট্রেনিং কলেজ
Email ID : gchpal1971@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Poet Binay Majumdar, modernism, post-modernism, absurd-order of thinking, ambiguity of expression, one-line Poem, mathematical theories.

Abstract
Poet Binay Majumdar (1934 - 2006) is a wonder-person in the modern Bengali poetry genre. Binay Majumdar, who was really the star of Bengali poetry in the 60s, was not much discussed at the time; but controversy in life and creation never spared him. He left his high-ranking Govt.-job to pursue poetry. His relatives and aquaintances almost all considered him crazy, scorned or avoided him. He living alone for a whole life, living poetry alone — this is a great terrible achievement! He is almost a unique figure in history of modern Bengali poetry. His effortless move from modernism to post-modernism, in the constant review of poetry, broke style of poem by one line poetry, sometimes he gave it to a longer poem; Ambiguity of expression in sometimes strange arrangement of thoughts has pushed his creation into unknown circles. His creations are interspersed with the practical applications of mathematical theories.

Discussion

বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিকতার ধারাপাতে কবি বিনয় মজুমদার এক বিরল-ব্যতিক্রমী-ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশের দশকের আত্মপ্রকাশ এবং ষাটের দশকে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা ঘটলেও বাংলা কবিতার নক্ষত্র-প্রতিম কবি বিনয় মজুমদার সমকালে খুব বেশি আলোচিত বা চর্চিত হননি। কিন্তু জীবন ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিতর্ক কখনও তাঁকে রেহায় দেয়নি। প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাকুরিজীবীর চাকচিক্যময় জীবনের নিশ্চিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। কবিতার জন্যই সরকারি চাকরি ছেড়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আত্মজন এবং পরিচিত জনেরা প্রায় সকলেই তাঁকে পাগল প্রতিপন্ন করে ঠারে-ঠোরে অবজ্ঞা করেছেন কিংবা এড়িয়ে চলেছেন। আস্ত একটা জীবন একলা যাপন, একান্তই কবিতা যাপন—এ অতি ভয়াবহ কৃচ্ছ-সাধন! আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি প্রায় একক অন্য ব্যক্তিত্ব। আধুনিকতা থেকে উত্তর-আধুনিকতায় তাঁর অবিচল পদক্ষেপ!

আধুনিকতা : 'আধুনিকতা' শব্দটি শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি অমীমাংসিত বিতর্কের বার্তাবহ। ইংরাজি 'মডার্নিটি' বা বাংলা আধুনিকতার ধারণাটি যেমন সরল নয়, তেমনি আধুনিকতার সূত্রগুলিও খুব সহজ শর্ত-সাপেক্ষ নয়; আবার খুব সুনির্দিষ্ট নয় আধুনিকতার সূচনা-লগ্নের নির্দেশনাও।

বাংলাকাব্যে আধুনিকতার তত্ত্ব-সন্ধানী গবেষক অধ্যাপক দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক বাংলাকাব্যকে 'মিশ্র সংস্কৃতির উপাসক'[১] রূপে অভিহিত করছেন। আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণে কিছুটা নেতির আশ্রয় গ্রহণ করলেও আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব ও আঙ্গিকের বিচারে দ্বাদশ লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন তিনি। আধুনিক বাংলা কবিতার পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যতম বুদ্ধদেব বসু কাব্যে আধুনিকতার প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "...এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্altবিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিনতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।"[২]

রবীন্দ্র-ভক্ত দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট চিন্তাবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে একাধিক রবীন্দ্র-কবিতাকে স্থান দিয়েও ভূমিকায় আধুনিক বাংলা কবিতার ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্তত, মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। এইসব স্ববিরোধ-বিতণ্ডায় স্পষ্টত বোঝা যায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো শাখায়ই রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ঋদ্ধ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি, কবিতার আধুনিকতাতেও রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাব্যের প্রথম আধুনিক কবি। তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান কর্ণধার কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'পিতৃ-পদপাচ্য'; তিনি 'দিনান্ত' প্রবন্ধে দ্বিধাহীনভাবে বলছেন, -

> "রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের পিতৃ-পদবাচ্য নন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে-প্রক্রিয়ার নাম আরোপ, তারই সার্বভৌম অভিব্যাপ্তিতে তিনি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর মানস প্রতিমূর্তি;"[৩]

স্বাভাবিকভাবে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাতও রবীন্দ্র-কলমেই; বুদ্ধদেব বসুও মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক কবি। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় - "পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? ...এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।"[৪] কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর *কবিতার কথা*-য় বলছেন, -

> "বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে অন্যত্র নয় একথা ঠিক নয়।"[৫]

প্রসঙ্গত তিনি আরও লিখছেন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে এবং মহৎ লেখকের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।"[৬]

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁদের সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা* সংকলনের ভূমিকায় বলেছেন, -

> "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত; অন্তত, মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"[৭]

কিন্তু উক্ত সংকলনে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা স্থান পাচ্ছে। স্বভাবত প্রশ্ন জাগে 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী' এবং 'ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত; অন্তত, মুক্তি প্রয়াসীর' স্বকৃত-তত্ত্ব-সীমা প্রাজ্ঞ ও মনস্বী প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব নিজেই তাঁদের সংকলনে রক্ষা করতে পারলেন না বা সচেতনভাবেই রক্ষা করলেন না। সংকলনের সূচনা করেছেন রবীন্দ্র-কবিতা দিয়ে, তাও সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতা দিয়েই। পরবর্তীতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*-এ স্পষ্টতই স্বীকার করে নিলেন, 'আধুনিকতার সংজ্ঞা দেওয়া দুঃসাধ্য'। অন্তত রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আধুনিকতার অর্থ সন্ধান একেবারেই অর্থহীন। তাই তিনি আরও বললেন, -

> "আধুনিকতার ধারণা স্বভাবতই গতিশীল, ধাবমান। সেকালের যৌবন মদমত্ত আধুনিকতা একালে লোলচর্ম, পলিতকেশ; আবার একালের ঝকঝকে আধুনিকতা পঁচিশ, পঞ্চাশ কি একশ বছর পরে বেজায় সেকেলে হয়ে যাবে।"[৮]

সুতরাং বলা যেতেই পারে, আধুনিকতা স্থান-কাল-পাত্র রূপেণ-সংস্থিত কোনো বিষয় নয়। একই স্থানের একই কালের সকল স্রষ্টা আধুনিক হবেন এমন নিশ্চিয়তা যেমন থাকে না, তেমনি একই স্রষ্টার সকল সৃষ্টি আধুনিকতার মাত্রা অতিক্রম করবে এমনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এইদিক থেকে আধুনিকতা নিশ্চিতভাবেই একটি আপেক্ষিক ধারণা, কিন্তু তা সর্বাংশে সময়-নিরপেক্ষও নয়। ভারতচন্দ্র তাঁর সময়ে অন্যান্য মঙ্গল কবিদের নিরিখে আধুনিক স্রষ্টা, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর স্রষ্টা ও সৃষ্টির মানদণ্ডে তিনি অনাধুনিক। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর স্রষ্টা ও সৃষ্টি আধুনিক মনে হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ-এর দেশকালে ইংরাজি কাব্য-কবিতা যে অর্থে আধুনিক সৃষ্টি, সেই একই কালের বাংলা কাব্য-সাহিত্য আধুনিকতার দাবি রাখে না। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতার জন্য এক মহাযুদ্ধের অপেক্ষার অনিবার্যতা দেখতে হয়।

আধুনিক কাব্য-গবেষক অধ্যাপক দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* গ্রন্থে, 'আধুনিক' শব্দটি আপেক্ষিক ধরে নিয়েও সীমায়িত ধারণায় ভাবের দিক থেকে এবং আঙ্গিকের দিক থেকে বারোটি ক'রে লক্ষণ-সূত্র নির্দেশ করেছেন, অধ্যাপিকা ত্রিপাঠীর মতে, ভাবের দিক থেকে লক্ষণ-চিহ্নিত আধুনিকতা হল,[৯] - ১. নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত। ২. বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবাদ। ৩. আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব। ৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হ'তে সচেতন গ্রহণ। ৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা। ৬. ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ও প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর প্রভাব। ৭. মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার, প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা। ৮. মননধর্মিতা— অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি। ৯. বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন - প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ। ১০. দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। ১১. ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস। ১২. রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথসন্ধান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একই ভাবে আঙ্গিকের দিক থেকে লক্ষণ-চিহ্নিত আধুনিকতা হল,[১০] - ১. বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে অতি-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার। ২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কাব্য অথবা ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন। ৩. প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ, যথা—ছিনু। গেনু, মনে, হিয়া, প্রভৃতি বর্জন। ৪. প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি। ৫. শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা। ৬. এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্য বর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি, আপাত-দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অসম্বন্ধ। ছড়ার উল্লম্ফনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক। ৭. নামবাচক বিশেষ্য, বহুওপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ। ৮. প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের (internal rhyme) সৃষ্টি। ৯. গদ্যছন্দের ব্যবহার। ১০. ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার। ১১. শব্দালংকার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালংকারের ব্যবহার। ১২. বিষয়-বৈচিত্র্য।

উপরিউক্ত লক্ষণ-সূত্রাদি থেকে এটুকু স্পষ্টত উপলব্ধ হয়, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরোধিতা ছাড়া বাকি সব লক্ষণ-সূত্রই রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে কম-বেশি লক্ষ করা যায়। তথাকথিত আধুনিক কিংবা আধুনিকতার বিদ্রোহটা ছিল মূলত অন্ধ-রবীন্দ্রানুসরণের বিরুদ্ধে। তাই বিষ্ণুদে'র মতো প্রতিনিধিস্থানীয় আধুনিক কবির কাছে ২৫শে বৈশাখের অকপট ভাষ্য ছিল,

> "রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
> চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
> আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, ..."[১১]

শুধুমাত্র সময়-চিহ্নে নয়, ভাব-স্বভাব কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা-শৈলীতেও বিনয় মজুমদার পুরোদস্তুর আধুনিক। কিন্তু আধুনিকতার সীমাতেও তিনি সীমায়িত নন।

> "দোতলার রূপকথা থেকে উঠে তেতলায় যাওয়া যায় অনুরূপ সিঁড়ি ভেঙে
> সিঁড়ি ভেঙে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ..."[১২]

উত্তর-আধুনিকতা : উত্তর-আধুনিকতা বহতা সময়ধারার আরও এক উদ্বেজিত কালপর্ব। সময় কখনও থামে না। বৌদ্ধিক মাত্রায় আধুনিকতাও সময়ের সমান্তরালে চিরবহমানতার ধারাপাত। তাই কোনো খণ্ডিত কালপর্বের সৃষ্টিকে আধুনিক বলে দাগিয়ে দেওয়াটা যেমন সঙ্গত মনে হয় না, তেমনি উত্তর-আধুনিকতাও কোনো কালচিহ্নে খণ্ড-চিহ্নিত ধারণা হতে পারে না। কালের পেষণে পিষ্ট বা পরিপুষ্ট উপাদান সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিরত্ব। কালোত্তীর্ণ না-হলে সাহিত্যের সহিতত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও সব দেশ সব ভাষার শিল্প-সংস্কৃতিতেই আধুনিকতার ধারণাটি বিখণ্ডিত কালের গণ্ডিতেই সীমায়িত করা হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে আধুনিকযুগ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে অষ্টাদশ-উত্তর শতাব্দী, অর্থাৎ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী এবং উত্তরকালকে। কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে নিহিত কবিতা কিংবা কথাসাহিত্যেও যখন আধুনিকতার লক্ষণ-সূত্র সন্ধান করা হয়, তখন সময়ের সমগ্রতাকে বিখণ্ডিত বহুখণ্ডিত ক'রেই ভিন্ন মাত্রায় আধুনিকতাকে ধরার চেষ্টা দেখা যায়। তাই তথাকথিত এক আধুনিক সময় প্রবাহের মধ্যেই অন্য আধুনিকতার সন্ধানে অধুনান্তিক বা উত্তর-আধুনিকতায় পৌঁছে যাওয়া। যদিও অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য বলছেন, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "প্রতীচ্যের আধুনিকোত্তর জীবন বীক্ষণ যখন সংস্কৃতির নানা দিগন্তে, বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমে, গৃহীত পরীক্ষিত-বিতর্কিত হচ্ছে প্রবল পরাক্রমে সে-সময় বাংলা সাহিত্যেও উত্তর আধুনিকতার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রচুর বিতণ্ডা চলছে।"[১৩]

আবার পোস্টমর্ডান কবিতা বিচার গ্রন্থে সমীর রায়চৌধুরী লিখেছেন, -

> "অধুনান্তিকতা বা পোস্টমর্ডানিজম লক্ষণাত্মক। লক্ষণগুলি আলাদা। অধুনান্তিক কবিতা ওপেন এন্ডেড, ক্রমশ বেরিয়ে এসেছে বদ্ধ আঙ্গিক থেকে। যেকোনও বিন্দু থেকে শুরু হয়ে যেকোনও জায়গায় শেষ হতে পারে। এলোমেলোর মধ্যে যে খেলা থাকে তাকেই বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঠাঁই দেয়। অথচ খাপছাড়া বলা যাবে না। প্রতি পরতে আবিষ্কার করতে চায় অর্থবোধকতার নতুন এলাকা। প্রবাল দাশগুপ্ত যাকে বলেছেন নবাঞ্চল। সচেতন অনায়াস যেখানে গন্তব্য।"[১৪]

সমীর রায়চৌধুরী মশাই আরও লিখছেন, -

> "কবিতার ভাষা এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসম্বন্ধ, অসংলগ্ন, বাক্যগুলো বিয়োজক, শব্দগুলো আকস্মিক, অভূতপূর্ব সম্পর্কসূত্রে নিয়োজিত, প্রতিটি চরণে বা পদক্ষেপে আলাদা থিম। দ্রুত পাঁয়তারা বদল। আধুনিক কবিতায় এ ধরনের বৈচিত্র্য বা প্লুরালিজম ছিল প্রায় অসম্ভব।"[১৫]

আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতার এই উত্তরণের ইশারা পাঁচ বা ছয়ের দশকের কিছু কিছু সৃষ্টিতেও প্রকাশ পেয়েছে। পাঁচের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' উক্ত লক্ষণাবলির ইঙ্গিতবহ। পরে রচিত উৎপলকুমার বসুর 'বাইশ লাইন' বা 'সাড়ে উনিশ লাইন' এই জাতীয় ইশারার সুনিশ্চিত ফসল। মেজাজে ভাষায় ছন্দে, এমন কি নামকরণেও দুরন্ত দুর্দান্ত প্রথা ভাঙার খেলা আছে এখানে। কবির কণ্ঠস্বরের কোনো প্রাধান্য নেই, নেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ; বরং আছে নির্মুখোশ যৌথ যাপনের অনায়াস প্রয়াস।

এই লক্ষণ ক্ষুধার্ত প্রজন্মের থেকে আট ও নয়ের দশকের বাংলা কবিতার সব অঞ্চলকেই কম-বেশি দখলে নিয়ে নেয়। কবি বিনয় মজুমদারের *ফিরে এসো চাকা* বা পরবর্তীতে রচিত সব কাব্যেই কবিতার নবাঞ্চল সন্ধানের এই প্রয়াস, প্রথা ভাঙার এই খেলা প্রবলভাবে সক্রিয় থেকেছে। যে-কোনও বিন্দু থেকে শুরু হয়ে যে-কোনও জায়গায় শেষ হওয়ার লক্ষণে বিনয় মজুমদার পুরোদস্তুর আধুনিকোত্তর। এলোমেলোর মধ্যে খেলাতেও তাঁর কাব্যিক বিশেষত্ব স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত।

"আমি একা একা হাসি একা একা কথা বলি
আমার এ ঘরে আমারই তো কথাকলি।"[১৬]

বিনয় মজুমদারের কাব্যচর্চা : আমরা জানি, বাংলাকাব্যের ধারাপাতে প্রথম-পর্বের আধুনিকতার সূত্রপাত মধুসূদন-বিহারীলালের কলমে। বাংলা কাব্যের ভাব-ভাষা ও ছন্দমুক্তির প্রথম ধাপটি নির্মাণ করেছিলেন মধুসূদন এবং বিহারীলাল। প্রকৃত আধুনিক বাংলা কবিতার নিঃসংশয়িত সূচনা রবীন্দ্র-কলমে। গীতিকবিতার বহুল-বিচ্ছুরিত ভাবরাশি, আধুনিক ভাষা ও ছন্দের নিত্যনব নিরীক্ষায় এবং বহু-বিচিত্র আঙ্গিকের নির্মাণে আর সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ নির্বিকল্প স্রষ্টা। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিকতায় 'কল্লোল' সেতুর এপারে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, মধ্যখানে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত প্রমুখ আরও পরে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু-অমিয় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার পঞ্চপাণ্ডব রূপে অভিহিত। বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশক ভরিয়ে রেখেছেন, ভুলিয়ে রেখেছেন মূলত এঁরাই। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্ণময় পাঁচ, ছয় ও সাতের দশকেও উঠে এসেছেন শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রীসহ বিশিষ্ট আরও সব কবির

দল। এবং তাঁদের কারো কারো হাত ধরে সূচিত হয়েছে বেশ কিছু কবিতা আন্দোলন; আর তারই সূত্রে বাংলা কবিতাতেও এসে গেছে উত্তর-আধুনিকতার প্রভাব। প্রভাত চৌধুরী, মলয় রায়, যশোধরা রায়চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়, চন্দন ভট্টাচার্য, সমীরণ ঘোষ, শম্ভু রক্ষিত, সুমিতেশ সরকার, অংশুমান কর, উত্তর বসু, অমিতাভ মৈত্র, জহর সেনমজুমদার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, নাসের হোসেন, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অসংখ্য কবি উত্তর-আধুনিকতার শর্তকে বহন করেছেন শর্তহীনভাবে।

আজ বাংলা কবিতা আর ইংরাজি তথা ইউরোপীয় কবিতা একই সরণির সহযাত্রী। সময় কখনও থামে না, স্বভাবত বাংলা কবিতার সময়ও কখনো থামেনি। গুপ্ত-কবির ব্যঙ্গ-রসাত্মক জাত্যাবেগ পেরিয়ে রঙ্গলাল-মধুকবির জাতীয়তার আবেগ থেকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছায়া-প্রচ্ছায়া; বিহারীলালের মর্মবেদনার ভাব-ভাষা থেকে স্বয়ম্ভু ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্লেটোনিক প্রেম ও আস্তিক্য চেতনার সুগভীর অন্তহীনতা এবং সেই অন্তহীন অভিযাত্রায় সঙ্গ দিতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ একদল রবীন্দ্রানুসারীর দিশাহীন ঘূর্ণি-বিভ্রম; 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি' সেতু বেয়ে তথাকথিত রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতা এবং অধুনান্তিকতা আরও আরও দূর যাত্রা -

"একটি শহরের পথ ধ'রে চলেছি। কলকাতা কিম্বা
অন্য কোনো পরিচিত শহর নয়। স্বপ্নেরই স্বকল্পিত
শহর। রাত্রির হয়েছে। দুপাশের বাড়িগুলো খুব
উঁচু নয়। এই রাস্তাই সেই রাস্তা যেখানে সে থাকে।"[১৭]

গায়ত্রী থেকে ঈশ্বরী ভাবনার চক্রাবর্তনে গণিতের শূন্যাবদান :

কবিতা কবির কল্পনা-লতা; কিন্তু কবিতা কেবল শব্দার্থের খেলা কিংবা ছন্দালঙ্কারের সৌখিন মজদুরি মাত্র নয়, নয় শ্রেষ্ঠ শব্দের শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসও; প্রকৃত কবিতা কবির স্বগতোচ্চারণ — বলা ভালো, স্বগত সত্যোচ্চারণ। প্রকৃত কবির জীবন ও কবিতায় প্রকৃতার্থে কোনো ভিন্নতা থাকে না; জীবনই কবিতা হয়ে ওঠে এবং কবিতাই জীবন হয়ে যায়। বিনয় মজুমদার সেই কবি, যার জীবন ও কাব্যকে আলাদা করা বস্তুত অসম্ভব। প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাকুরিজীবীর চাকচিক্যময় জীবনের নিশ্চিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। কবিতার জন্যই উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি ছেড়েছেন। এ-দৃষ্টান্ত বিশ্ব-কাব্য সংসারেই বিরলতম। মুদ্রিত সংস্করণে বিনয় মজুমদার বিরচিত কাব্য-সম্ভারের প্রথম প্রকাশকালসহ একটি তালিকা এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে — *নক্ষত্রের আলোয়* (আশ্বিন, ১৩৫৬/ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮); *গায়ত্রীকে* (ফাল্গুন, ১৩৬৭/ মার্চ, ১৯৬১); *ফিরে এসো চাকা* (ভাদ্র, ১৩৬৯/ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২); *আমার ঈশ্বরীকে* (জৈষ্ঠ্য, ১৩৭১/ জুন, ১৯৬৪); *ঈশ্বরীর* (ভাদ্র, ১৩৭১/ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪) *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (ভাদ্র, ১৩৭১/ জুলাই, ১৯৬৫); *অধিকন্তু* (ভাদ্র, ১৩৭৪/ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭); *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (শ্রাবণ, ১৩৮১/ জুলাই, ১৯৭৪); *বাল্মীকির কবিতা* (শ্রাবণ, ১৩৮৩/ জুলাই, ১৯৭৬); *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮১); *আমাদের বাগানে* (ভাদ্র, ১৩৯১/ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪); *আমি এই সভায়* (পৌষ, ১৩৯১/ জানুয়ারি, ১৯৮৪); *এক পংক্তির কবিতা* (পৌষ, ১৩৮১/ জানুয়ারি, ১৯৮৮); *আমাকেও মনে রেখো* (পৌষ, ১৪০২/ ডিসেম্বর, ১৯৯৫); *আমিই গণিতের শূন্য* (পৌষ, ১৪০৩/ জানুয়ারি, ১৯৯৬); *এখন দ্বিতীয় শৈশবে* (পৌষ, ১৪০৬/ জানুয়ারি, ১৯৯৯) কবিতা বুঝিনি আমি (পৌষ, ১৪০৮/ জানুয়ারি, ২০০১)।

উক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কবি বিনয় মজুমদারের সৃষ্টিসত্তা মূলত দুটি পর্বে বিবর্তিত হয়ে পরিণতি-পরমতা খুঁজেছে। কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮) আলোক-সন্ধানী কবি সবিনয়ে পূর্বজ প্রজ্ঞাবান কবি জীবনানন্দ দাশের অনুসারী হয়ে অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞায় অবগাহন করছেন। নিজের সৃষ্টিসত্তার পরিমাপ করছেন। নিজেকে ইচ্ছে মতন ভাঙছেন। ইচ্ছে মতন গড়তে চাইছেন।

প্রথমত, ঈশ্বরী-পর্ব : *ফিরে এসো চাকা* (১৯৬২) থেকে *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (১৯৬৫) হয়ে *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (১৯৭৪)-য় ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ - প্রায় দুই দশক জুড়ে এক বিনয় মজুমদারকে বিশিষ্ট কবি রূপে পাওয়া যায়। এই পর্বকে চিহ্নিত করা যায়, ঈশ্বরী-পর্ব নামে, এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিসমূহ - *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮), *গায়ত্রীকে* (১৯৬১), *ফিরে এসো*

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চাকা (১৯৬২), *আমার ঈশ্বরীকে* (১৯৬৪), *ঈশ্বরীর* (১৯৬৪) *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (১৯৬৫), *অধিকন্তু* (১৯৬৭), *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (১৯৭৪) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়, শূন্য-পর্ব : *আমাদের বাগানে* (১৯৮৪) থেকে *আমিই গণিতের শূন্য* (১৯৯৬) হয়ে *কবিতা বুঝিনি আমি* (২০০১) অবধি ১৯৮৪ থেকে ২০০১—প্রায় দুই দশক সময়কাল ব্যাপী আমরা পেয়ে যায় অন্য এক বিনয় মজুমদারকে; যে কবি শিশুর মতো সরল, শিশুর মতোই অভিমানী। এই পর্ব অভিহিত হতে পারে, শূন্য-পর্ব নামে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিসমূহ—*আমাদের বাগানে* (ভাদ্র, ১৩৯১/ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪); *আমি এই সভায়* (পৌষ, ১৩৯১/ জানুয়ারি, ১৯৮৪); *এক পংক্তির কবিতা* (পৌষ, ১৩৮১/ জানুয়ারি, ১৯৮৮); *আমাকেও মনে রেখো* (পৌষ, ১৪০২/ ডিসেম্বর, ১৯৯৫); *আমিই গণিতের শূন্য* (পৌষ, ১৪০৩/ জানুয়ারি, ১৯৯৬); *এখন দ্বিতীয় শৈশবে* (পৌষ, ১৪০৬/ জানুয়ারি, ১৯৯৯) কবিতা বুঝিনি আমি (পৌষ, ১৪০৮/ জানুয়ারি, ২০০১) ইত্যাদি।

এই দুই পর্বের মধ্যরেখায় অবস্থান করছে একটি সন্ধি-পর্ব কিংবা উপপর্ব, যা কবির সৃষ্টিসত্তার দুর্বিনয় বিপর্যয়-পর্ব রূপে চিহ্নিত হতে পারে। *বাল্মীকির কবিতা* (১৯৭৬)-র ছাপান্নটি কবিতা তর্কে-প্রতর্কে কবির মগ্ন-চৈতন্যের দ্বন্দ্বময় বিপর্যয়ের স্বরূপকেই প্রকাশ করে।

সব মিলিয়ে ১৯৫৬ থেকে ২০০৬ - বিনয় মজুমদারের পাঁচ দশকের কাব্য-যাপন স্পষ্টত দুটি পর্বে বিভাজিত। *নক্ষত্রের আলোয়* উন্মেষিত ঈশ্বরী-পর্ব; যেখানে জীবনানন্দ পেরিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্য দিগন্ত সন্ধানী বিনয় মজুমদার। *বাল্মীকির কবিতা* পেরিয়ে শূন্য-পর্ব; যেখানে কবি বিনয় মজুমদারের যেন জন্মান্তর—আধুনিকতা পেরিয়ে অধুনান্তিকতায় অবগাহন।

বিনয় মজুমদারের কবিত্ব-খ্যাতির প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে *ফিরে এসো চাকা (১৯৬২)* কাব্যটি। *গায়ত্রীকে* গ্রন্থটি কবির *ফিরে এসো চাকা* কাব্যের ১ম সংস্করণের অন্য নাম রূপে অনেকেই মনে করেন। এবং তার সঙ্গত কারণও রয়েছে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যে গৃহীত হয়েছে। কিছু কবিতা নেওয়া হয়েছে সরাসরি বা অবিকৃতভাবে, আর কিছু নেওয়া হয়েছে পরিমার্জিত রূপে।

কবির ইচ্ছে-কর্মে *গায়ত্রীকে* প্রথম সংস্করণ; দ্বিতীয় সংস্করণে 'ফিরে এসো চাকা'; আর তৃতীয় সংস্করণে *আমার ঈশ্বরীকে*— এভাবেই বদলে বদলে যায় কাব্য নাম। কবিতা সংখ্যার তারতম্য ঘটে। সংযোজন বিয়োজন পরিমার্জন চলতেই থাকে। গায়ত্রীকে কাব্যের প্রথম কবিতাটিই *ফিরে এসো চাকা* কাব্যের প্রথম কবিতা। শুধুমাত্র ১৩ সংখ্যক পংক্তিতে সচেতন কিছু পরিমার্জন আছে; *গায়ত্রীকে*-তে 'ক্লান্ত ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করে।' *ফিরে এসো চাকা*তে হয়েছে, 'দীর্ঘ-দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;' গায়ত্রী - ঈশ্বরী - মনোলীনা - বিস্মরণী একইরূপে নানাভাবে কবির মানসলোকে বিবর্তিত হতেই থাকেন এক নারী। অপরূপা নারী থেকে অরূপা ঈশ্বরীর ধ্যানে-অনুধ্যানেই কবির সৃষ্টিসত্তা মুখর হয়ে ওঠে; ঈশ্বরীর অনুভবনে কখনো তিনি নীরব, কখনো তিনি নিরাশ, আবার কখনো নিরঙ্কুশ দ্বন্দ্বে তাঁর অন্তঃক্ষরণ কিংবা আত্মদংশনে তাঁর কাব্য-যাপন।

"কবিতা কিংবা গাণিতিক তত্ত্ববিশ্বে অবগাহন
অন্তত গণিতশাস্ত্রে যেসব নিয়ম আছে, সূত্র আছে
তারা সব ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্তা, শাসক;
তাদের কর্মের ক্ষেত্র বিশ্বময়, সর্বত্র বিস্তৃত;
তাদের ক্ষমতাবলী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সীমাহীন, ..."[১৮]

উত্তর-আধুনিকতার ভাব-ভাষা-আঙ্গিকে বাংলা কবিতায় আঙ্কিক মাপন-কুশলতা দিয়ে গেলেন আপন খেয়ালে এবং অঙ্ক নিয়ে খেলতে খেলতেই পরিণতি পরমতায় যেন বলে গেলেন *কবিতা বুঝিনি আমি*। এ-ও যেন এক অনির্বাণ অভিমান! তিনি কবিতা বোঝেননি না কবিতার পাঠক তাঁকে বোঝেনি? ঈশ্বরীর ধ্যানে-অনুধ্যানে আর কবিতার এই বোঝা না-বোঝাতেই বিনয় মজুমদার আধুনিক বাংলা কবিতার মাইলস্টোন হয়ে রইলেন। এই অসামান্য অবদান সূত্রেই অঙ্ক-প্রিয় ইঞ্জিনিয়ার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবি গাণিতিক তত্ত্ববিশ্বে সংযুক্ত করে গেলেন তাঁর সৃষ্টি-পাগল নির্মুখোশ কবি-মনটিকে। লিখে ফেললেন, *আমিই গণিতের শূন্য* [১৯৯৬]।

"আমিই গণিত-এর শূন্য। গণিতের বইতে শূন্য
ছাপা হয় এইভাবে ০ — এই ছাপা শূন্য আমি।
আমার সন্তানদল, এসেছ? খোঁজ ক'রে দেখুন
পাঠক পাঠিকাগণ ০ বিষয়ক যত তত্ত্ব পৃথিবীর
লোকে শুনেছে ও জেনেছে তার সব তত্ত্বই
একজন মাত্র লোক আমি বলেছি।"[১৯]

একটি ছয় পংক্তির কবিতা 'আমিই গণিতের শূন্য'। একই নামে, একই সঙ্গে একটি কাব্যগ্রন্থও। কাব্যটি প্রকাশিত হয় কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৬-তে। উৎসর্গ করা হয়েছে গায়ত্রী চক্রবর্তীকেই। *আমিই গণিতের শূন্য* কাব্যে কবিতার সংখ্যা চল্লিশ।

সংখ্যা তত্ত্বে 'শূন্য' অনিবার্য এক আশ্চর্যবিনিশ্চয়। শূন্য দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। আপাত অর্থে 'শূন্য' মূল্যহীন, অর্থহীন উপেক্ষা-চিহ্ন মাত্র। গাণিতিক বীক্ষণে 'শূন্য' আদি এবং অন্তহীনতার ইঙ্গিতবহ; প্রকৃতার্থে 'শূন্য'ই গণিতকে অশেষ করেছে। ভারতীয় গাণিতজ্ঞ সর্বশ্রদ্ধেয় রামানুজন দেখেছিলেন, সংখ্যার পরিমাপের একদিকে জিরো বা শূন্য, অন্য দিকে ইনফিনিটি। এই দুইয়ের সমন্বয়েই শূন্যতা ভাষা ও অর্থ খুঁজে পায়।

শূন্যের ধারণা নিছক অঙ্কের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; সাহিত্যে বিশেষত বাংলাসাহিত্য শূন্যের উত্তরাধিকার বহন করেছে চর্যাপদের কাল থেকেই। মধ্যযুগের কবি রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' শীর্ষক মঙ্গলকাব্যি লিখেছিলেন 'ধর্মমঙ্গল'-এর আদলে, যেখানে স্বয়ং 'ধর্মঠাকুর'ই হলেন 'নিরঞ্জন' বা 'শূন্য'। কিন্তু মধ্যযুগ-উত্তরকালের কবিরা শূন্যের মধ্যে ধর্ম বা ধর্মের মধ্যে আর শূন্যের সন্ধান করলেন না। মধু-কবি কিংবা বিহারীলাল পর্বে শূন্যতা দ্যোতিত হয়েছে নিঃস্বতার, নিঃসঙ্গতার হাহাকারে। রবীন্দ্রনাথ শূন্যতাকে পূর্ণতার বিপরীতার্থে গ্রহণ করেননি। তাঁর দার্শনিক অনুভবে— 'তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যাথ্যাময়।'

নিরঞ্জন শুভ্রশূন্যতার পথেই অবগাহন করেছেন কবি বিনয় মজুমদার। 'আমিই গণিতের শূন্য' বলতে কবি নিঃসঙ্গতাবোধের সাথে পূর্ণতাবোধের এক প্রচ্ছায়ায় ডুবে থাকেন। যখন বলেন, -

"...বুড়ো হয়ে গেছি, নারী
দেখলে আর কোনো আকর্ষণবোধ করি না।
'শুধু আশা কোনদিন দীর্ণ বৃদ্ধ হবো।
মৃত্তিকায় পড়ে রবে বয়োত্তীর্ণ রসহীন বীজ,
উৎসুক হবে না কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবতার সাবে।"[২০]

বার্ধক্য, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুচেতনার সমন্বয়ে বিনির্মিত এই 'শূন্যতা'। জীবন-যন্ত্রনার আর এক নাম 'শূন্য'; যে 'শূন্য' থেকেই জন্ম-জন্মান্তরের অবিরত ইশারা হাতছানি দেয়। আর আঙ্কিক উদ্বেজনায় কবি উচ্চারণ করেন, -

"সমীকরণের মতো উপস্থিত শর্তাবলী
পৃথকতা থেকে এসে একীভূত হবার নিয়মে
কিছু পরিবর্তীদের বহিষ্কারে শেষে নিয়ে আসে
সম্ভব স্বাধীনতার রূপতল, আকার, প্রকৃতি—"[২১]

তবে গণিতবিদ্ কবি শেষাবধি বৈষয়িক সংখ্যাতত্ত্ব বা গাণিতিক ধারণাকেই জগৎ ও জীবনের শেষ সত্য বলে মনে করেননি। একটি কবিতায় তাঁর সেই অনুভব ব্যক্ত করেছেন আত্যন্তিক স্পষ্টতায়, -

"অনেক কিছুই আছে যা গণিত দিয়ে

সমাধান করা অতীব কঠিন এক কাজ।
যেমন পরমেশ নামক প্রাণীটি।
পরমেশের উপরে কোনো দেবতা আছে কি, এই
কথা গণিত দিয়ে সমাধান করা এক দুরূহ ব্যাপার।
নানান জটিলতা দেখা দেয়
গণিত দিয়ে এই ব্যাপার সমাধান করার বেলায়।
এমতাবস্থায় ব্যাকরণ দিয়ে সমাধান করতে হয়।
ব্যাকরণ ব্যাকরণ পুনরায় ব্যাকরণ।"[২২]

অতঃপর কবি পৌঁছে গেলেন যেন জন্মান্তরে। লিখলেন, *এখন দ্বিতীয় শৈশবে* (১৯৯৯); সাধারণত মানুষের জীবনে শৈশব একবার আসে; কিন্তু জীবন নিয়ে খেলা-করা কবির এক-জীবনে একাধিকবার শৈশব আসতে বাধা থাকে না; মানসিক দিক থেকে কবি বিনয় মজুমদার যথার্থই দ্বিতীয় শৈশবে পৌঁছে ছিলেন। যৌবনের কলকাতা ত্যাগ করে এসে শৈশবের শিমুলপুরের বিনোদিনী কুঠিতে তাঁর যে যাপন তা তো শৈশব-যাপনেরই নামান্তর। 'একসঙ্গে তিনটি কবিতা'তে কবি যা লিখছেন তাতে শৈশব-বৃত্তির মৌল প্রকাশ দেখা যায়,[২৩]

একটি পংক্তি

"কতদিন ট্রামে চড়িনি!"

'ভাত'

"রেখা আমাকে ভাত রান্না ক'রে দেয়।"

'আমার বাড়ি'

"দৈব আমার বাড়িতে থাকে।"

আবার 'পৃথিবী নামক' কবিতায় কবি অনায়াসে লিখতে পারেন, -

"পৃথিবী নামক গ্রহের নাম
পালটে ফেলা হয়েছে।
সকলেরই কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক
পৃথিবীর বদলে এই গ্রহের
নতুন নামটি কী?
সবার অবগতির জন্য জানাই
নতুন নামটি 'রবীন্দ্র গ্রহ'।
পৃথিবীব সব ভূগোলের বইতে
ছাপুন 'আমরা রবীন্দ্র গ্রহে বাস করি।"[২৪]

সাধারণ মানুষ যখন স্মৃতি আর স্বপ্নে ছাড়া শৈশবকে আর ছুঁতে পারেন না, তখন কবি বিনয় মজুমদার স্বভাবে-বিশ্বাসে, সরলতা-ব্যবহারে, জীবনে-যাপনে এ-ভাবেই শৈশবের বোধে উপনীত হয়েছিলেন। কবিতার স্বয়ং এক বোধিবৃক্ষ যখন লেখেন '*কবিতা বুঝিনি আমি*' তখন বিরল বিরোধাভাস ঘটে। কিন্তু তাঁর পাঠক বিভ্রান্ত হন না, আমরাও বিভ্রান্ত হই না; বরং মনে করি, নিশ্চিত কবির এ-কোনো আত্মঘোষণা নয়; এক অমল অভিমানে *কবিতা বুঝিনি আমি* কবি এমন উচ্চারণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করছেন। আমি সব জানি, আমি সব বুঝি— এ স্পর্ধার গৌরবে বিনয় মজুমদার কোনোদিন গৌরবান্বিত হতে চাননি। যিনি গণিতের সৌন্দর্যে সমর্পিত তিনি নান্দনিক তৃপ্তি পান, গণিতের নির্দিষ্ট রূপকে সুন্দর করে আনন্দ উপভোগ করেন, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা মাঝেও তিনি হর্ষের মনন-জগতে বসবাস করেন। যাঁরা বিনয় মজুমদারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁরা জানেন যে উত্তর দেবার সময়ে তিনি হঠাৎই রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে উঠতেন এবং শিমুলপুরে থাকাকালীন কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন।

ওমর খৈয়ামও এমিলি ডিকিনসনও গণিতের সৌন্দর্যের বনেদে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কাব্য। গণিতের সঙ্গে কবিতা ও সংগীতের, এমনকী পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের আরাধ্য পুস্তকগুলোর গাণিতিক লেখনবিন্যাসে (যেমন বেদ, গীতা, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, কোরান, গুরুগ্রন্থ, তোরা, তালমুদ, কিতাব-ই-আকদাস, অগমসমূহ, কোইজিকি ইত্যাদি) পার্থক্য খুঁজে পান না গণিত ও কবিতার বিস্ময়ে আক্রান্ত বেশ কয়েকজন গণিতবিদ। কবিতা ও সংগীতের মতো তাঁদের মননে গণিত অনির্বচনীয়, তা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ক্রিয়ায় বিদ্যমান। গাণিতিক সৌন্দর্যের বিখ্যাত উদাহরণটি হল পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি।

বিনয় মজুমদারের সঙ্গে জীবনানন্দের প্রধান তফাৎ এখানেই। বিনয় দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট, অবহেলা, অসুস্থতা, নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও থাকতেন আনন্দের প্রভায় জ্যোতির্ময়। কবিতাকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করেছেন বিনয় মজুমদার।

২০০০ সালে প্রকাশিত ডেভলিন কিথ্ (J. Devlin Keith, Born 16 March, 1947) তাঁর *‘ডু ম্যাথেমেটিশিয়ানস হ্যাভ ডিফারেন্ট ব্রেইনস’* গ্রন্থে হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ্ পল্ এরডস্-কে উদ্ধৃত করে গণিতের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক স্পষ্ট করেছেন। তাছাড়া গণিতের সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা ইউরোপ আমেরিকায় বহুকাল যাবৎ লেখা হচ্ছে। যেমন মারিয়ান মুর-এর ‘দি আইকোস্যাস ফিয়ার’, কার্লস্যান্ড বার্গের ‘অ্যারিথম্যাটিক’, ওয়ালেস স্টিভেন্সের ‘ল্যান্ডস্কেপ ফাইভ’, ভ্যাচেল লিন্ডসের ‘ইউক্লিড’ ইত্যাদি। বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদ যথার্থই বলেছিলেন, ‘বিনয় অগোছালো একজন কবি আর আমি খুব গোছানো কবি’, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন ধর্মে, যখন কিনা বিনয় মজুমদার ধর্মকে ছোঁয়াচে রোগের মতো পরিহার করে গণিতের আশ্রয় নিয়েছেন, এবং গণিত যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের মতন বিনয় মজুমদার একজন বেপরোয়া কবি। বিনয়ের এই গাণিতিক কবিতার মতো আল মাহমুদ কোনোদিন রহস্যময় কবিতা লেখেননি, লেখা সম্ভবও ছিল না তাঁর শেষ পর্যায়ের মৌলবাদী জীবন পরিসরে।

বিনয় মজুমদার লিখিত একটি গান (গণিতাশ্রিত গান) :[২৫]

$x = 0$
এবং $y = 0$
বা $x = 0 = y$
বা $x = y$
শূন্য 0 থেকে প্রাণী x ও y সৃষ্টি হল
এই ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

বিনয় মজুমদারের ‘কবি’ হয়ে ওঠার আত্ম-বৃত্তান্ত চমৎকার ধরা পড়েছে তাঁর ডায়েরির অংশে —

> “আমি গত তিরিশ বছর ধরে একটা বিষয় ভেবেছি। ভেবে ভেবে শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। পৃথিবীতে কত মানুষ সৎ আর কত মানুষ অসৎ — এই ছিল আমার চিন্তার বিষয়।” [ঈশ্বরী ও আমি ও সময় পৃ. ১৭]

সরল শিশুর মতন ভানহীন, ‘বিনয় প্রকৃতপক্ষে বিধাতার এক অপূর্ব অট্টহাসি; সুস্থতা আর অসুস্থতার ক্রমবিপরীত ডিজাইনে বোনা তাঁর জীবন। মাঝখানের যেটুকু অসামান্যতা তাও বিপুল ছোঁয়।’ তাঁর কাব্যতত্ত্ব যেন গাণিতিক তত্ত্ববিশ্বের প্রচ্ছায়া মাত্র। গায়ত্রী — ঈশ্বরী — চাকা আর শূন্যের অভিনব এক গাণিতিক সমীকরণে কবি বিনয় মজুমদারের একত্ব এবং মহত্ব।

Reference:

১. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় (১৯৯২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
২. বসু, বুদ্ধদেব সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা কবিতা, (ভূমিকাংশ), পৃ. ১০
৩. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, কুলায় ও কালপুরুষ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২০; পৃ. ৬৯
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের পথে, 'আধুনিক কাব্য' (১৯৩৬), বিশ্বভারতী, পৃ. ১৩১
৫. দাশ, জীবনানন্দ, কবিতার কথা (১৪১৩ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১১০
৬. দাশ, জীবনানন্দ, কবিতার কথা (১৪১৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১২
৭. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, সম্পা., আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৯৯), দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, পৃ. ৪০
৮. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, সম্পা., আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৫), দে'জ পাবলশিং, কল-৭৩, পৃ. ১৪
৯. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় (১৯৯২), দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩ পৃ. ২-৩
১০. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় (১৯৯২), দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩ পৃ. ৩-৪
১১. দে, বিষ্ণু, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : কবিতা সমগ্র-২ (১৯৯০), আনন্দ পাবলিশার্স, কল-৯ পৃ. ৯৫
১২. মজুমদার, বিনয়, কবিতার খসড়া/ ৭ : বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র-২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল-২ পৃ. ৪৬
১৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর (১৯৯৫), পুস্তক বিপণি, কল - ৯ পৃ. ৬
১৪. রায়চৌধুরী, সমীর, পোস্টমর্ডান কবিতা বিচার (১৯৯৮), কবিতা পাক্ষিক, কল - ২৬, পৃ. ৩২
১৫. রায়চৌধুরী, সমীর, পোস্টমর্ডান কবিতা বিচার (১৯৯৮), কবিতা পাক্ষিক, কল - ২৬, পৃ. ৩২
১৬. নতুন কবিতা : বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৪৪
১৭. পাণ্ডুলিপি থেকে 'গায়ত্রীকে'-১, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৫১
১৮. তবু গল্পের মতোন মনে হয়/ ঈশ্বরীর, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল – ২, পৃ. ২০
১৯ আমিই গণিতের শূন্য/ ঐ, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৭২
২০. আমার কবিতায় আছে/ আমিই গণিতের শূন্য, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৭২
২১. অধিকন্তু – ৯, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র-১ম খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ৭৬
২২ অনেক কিছুই আছে/ আমিই গণিতের শূন্য, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৫৯
২৩ এখন দ্বিতীয় শৈশবে, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র-২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৮৩
২৪ পৃথিবী নামক/ এখন দ্বিতীয় শৈশবে, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৮৫
২৫ একটি গান, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৯৩

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 164 - 169
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শামীম রেজার কবিতায় বিপন্ন গাছের কথা

অভিষেক মণ্ডল
গবেষক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : abhishek.mondal13111987@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword

Abstract

Discussion

গাছ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার দরকারি পারিপার্শ্বিক অবস্থা হল পরিবেশ। এই পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে গাছের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নয়ের দশকের কবি শামীম রেজার কবিতায় গাছের কথা এসেছে বারবার। কবি শামীম লেখেন –

> "আমাকে অতদূর ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুলে/ খুঁজতে যেও না প্রিয়তমা, বৃক্ষের পাঁজরে লেখা আছে/ আমার আপন ঠিকানা।"[১]

গাছ শামীমের বন্ধু-আত্মীয়। গাছের কাছে গেলে কবি শামীমের মন অপার প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। গাছের মৃত্যু তাঁর কাছে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথার সমান। কবি নিজেকে বলেন –

> "নিঃসঙ্গ শিশুবৃক্ষ আমি।"[২]

আসলে কবির আত্মার আত্মীয় গাছ। এই গাছের কাছে সভ্যতার যে ঋণ তা পরিশোধ হবার নয়। গাছ মায়ের মতো আমাদের জীবনকে আগলে রাখে। গাছের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই কবি শামীম রেজা বারবার গাছ হয়ে জন্মাতে চান –

> "কতবার ভেবেছি উদ্ভিদজন্ম হতো যদি, তোমার জলে,/ অবগাহন শেষে পুনঃপুনঃ জন্ম নিত কবি।"[৩]

আমাদের অনেকেরই মনে আছে রবীন্দ্রনাথের বলাই গল্পের কথা। বলাই গল্পের বলাই ও কবি শামীম রেজার গাছের প্রতি ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় - 'কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এই জন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আম্‌লকী পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু-পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্‌ করে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়-ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে, বেড়িয়েছে— এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোট ছোট, ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল, পাখিতে - খাওয়া নিম ফলের বিচি প'ড়ে ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা- সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই। এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, ‘ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে,’ কাকি বলে, ‘বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্‌। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।’

> “বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা পেরেছিল সম্পূর্ণ ওর একলারই- ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।”[৪]

রবীন্দ্রনাথ ‘ছিন্নপত্রাবলী’র ৭৪ সংখ্যক পত্রে লিখেছেন -

> “...আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।”[৫]

স্মরণে আসছে আবুল বাশারের ‘মাধবসুন্দরী’ উপন্যাসে আদিত্যের গাছের প্রতি ভালোবাসার কথা। এই উপন্যাসের কাহিনি: মহিতোষের সাথে নির্মলার বিবাহ ঠিক হয়। মহিতোষের বাবার দাবি-মতো সোনার হার কেনার টাকা ‘মাধবসুন্দরী’ নামের চারপুরুষের গাছ বিক্রি করে নির্মলার বাবা সংগ্রহ করতে চায়। কিন্তু নির্মলা ও তার মা তাদের এই গাছটি বিক্রি করতে চান না। শোনা যায় আদিত্য - বংশের ‘মাধবসুন্দরী’ নামে কোনো নারী এই গাছটি রোপণ করেছিলেন। সেই থেকে এই গাছের নাম হয় - ‘মাধবসুন্দরী’। আদিত্যের মায়ের মতো এই গাছ। আদিত্য চায় না এই গাছ বিক্রি হোক। এই গাছের ডালে ডালে পাখির কলতান তাকে মুগ্ধ করে। এই গাছে গায়ে বাঁশের মাচা বেঁধে আদিত্য দোকান করেছে, বাপ-মা মরা ছেলে আদিত্য নিজের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি বিক্রি করে, সেই টাকায় গাছটিকে রক্ষা করে। নির্মলা বুঝতে পারে আদিত্য তার জমি মহিতোষ বাবুর বাবার কাছে বিক্রি করেছে। অর্থলোভী ভাবি শ্বশুরকে নির্মলা জানিয়ে দেন - তাঁর ছেলেকে বিবাহ করবেন না। আদিত্যের দোকান থেকে নির্মলা সিঁদুর ও পুথির মালা সংগ্রহ করে এবং আদিত্যকেই বিয়ে করে। নির্মলা উপলব্ধি করে— যে ছেলে গাছকে ভালোবাসে প্রকৃতিকে ভালোবাসে, সে তাকেও সুখে রাখবে।

কবি শামীম রেজা ও আবুল বাশারের প্রার্থনা-আর্তি একই : গাছ বেঁচে থাকুক, গাছ নিধন বন্ধ হোক। কিন্তু এযুগের মানুষ গাছ-ধ্বংসের মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে আধুনিকতার মরণ পথে। কবি শামীম এযুগের মানুষের বন-উজাড়, উৎসব দেখে গভীর ব্যথায় লেখেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১. “নিবু নিবু বৃক্ষরা নিঃশ্বাস নেয়, জানায় বেঁচে থাকার উপস্থিতি, কাকে জানায়?”[৬]

২. “হে জৈতুন বৃক্ষ, তুমি তোমার শরীর খোল পিছনেই/ আততায়ীর তীর, লক্ষ স্থির-জৈতুন বৃক্ষ আমার কথা/ শুনলো, আর আগলে নিল তার আপন অন্দরে যেন/ প্রকৃত মা আমার, কিন্তু সার্থান্ধ জীবগুলা গাছটাকে টুকরা/ টুকরা করে ফেললো-আর আমি সেই থেইকা-কাঠের/ ভিতর জাইগা আছি- অসীম ক্ষমায়, আমৃত্যু তোমাদের/ গৃহে, গৃহের অন্তরে, অন্দরে।”[৭]

এই স্বার্থান্ধ মানুষদের সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -

> “মানুষ গৃধ্নভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুর ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে - এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল— অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। তাই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুণ এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছোঁয়া।”[৮]

শকুনের মতো প্রকৃতিকে গ্রহণ না করে, প্রকৃতিকে বন্ধুর মতো প্রিয়জনের মতো গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এযুগের মানুষ নিজের ভালো নিজে বুঝতে চায় না। আর তাই ঘটে চলে নির্বিচারে গাছ-নিধন উৎসব। এই ব্যভিচার দেখে কবি শামীম রেজা লেখেন -

> “শুধু পাতারা বুঝেছে বিশ্বস্ত আঁধার যদিও কালো/প্রতারক আলোর চেয়ে তবু ঢের ভালো।”[৯]

একথা স্বীকার করতেই হয়, গাছের উপরে আমাদের জীবন বহু বহু ভাবে নির্ভরশীল। যেমন —

১. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে বায়ু থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে সম-অনু অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে। ফলে পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেনের নিয়মিত যোগান পাওয়া যায়। এই কারনে গাছ ধ্বংস হলে প্রাণীজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
২. সবুজ উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল শোষণ করে পাতার মেসোফিল কলায় পাঠায়। অন্যদিকে, গাছ পাতার মাধ্যমে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে মেসোফিল কলায় পাঠিয়ে দেয়। সূর্য্যলোকের উপস্থিতিতে মেসোফিল কলার কোশগুলিতে এই জলও কার্বনডাই-অক্সাইড ক্লোরোফিলের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পাতার কোষে শর্করা জাতীয় খাদ্য, গ্লুকোজ তৈরি করে। এই খাদ্য যেমন উদ্ভিদ নিজে গ্রহণ করে, তেমনি ‘সমস্ত প্রাণীজগৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ করে। মানুষ ও তৃণভোজী প্রাণী গাছপালার বিভিন্ন অংশ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন— শাক-সবজি, ধান, গম, ভুট্টা, আলু মুলো, ছোলা, মটর ইত্যাদি, মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদের রাসায়নিক শক্তি তৃণভোজী প্রাণীদের মাধ্যমে মাংসাশী প্রাণীর দেহে সঞ্চারিত হয়।’
৩. গাছ-বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— জলচক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র এবং অক্সিজেন চক্র জীবনের এই চার চক্রকে সক্রিয় রাখা। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহের মাধ্যমে এই চক্র ক্রিয়াশীল থাকে। এই চক্র ক্রীয়াশীল না থাকলে ঘটে যাবে বিপর্যয়। গাছ-পালা এই চক্রগুলিকে সক্রিয় রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।
৪. কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন, জলীয় বাষ্প, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি গ্রীন হাউস গ্যাস গুলির তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই গ্যাস গুলির ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তাদের তাপ ধরে রাখার প্রবণতাও বাড়ে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ে। বেশি পরিমাণে গাছ-বন ধ্বংসের ফলে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সারা পৃথিবীতে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবের শসনের ফলে যে কার্বনডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তা গাছ গ্রহণ করে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগান দেয়। ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পরের আদান-প্রদানে প্রকৃতির ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু প্রতিনিয়ত বনভূমি ধ্বংসের ফলে, সেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে।

৫. গাছ বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহাজ্য করে।

৬. গাছের-বনভূমির বড়ো কাজ হল ভূমিক্ষয় রোধ করা।

৭. জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের আশ্রয়ভূমি বন। এই বন ধ্বংস হলে বনের প্রাণীরা তাদের জীবন রক্ষা করতে পারবেনা। ফলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

৮. গাছ ছায়া দানের মাধ্যমে প্রাণিজগতের উপকার করে।

৯. গাছের চওড়া পাতা শব্দ তরঙ্গকে বেশকিছুটা প্রতিহত করতে পারে। সেজন্য হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কারখানার চারপাশে চওড়া পাতার গাছ ঘন করে রোপন করা দরকার।

১০. বন থেকেই বেত, বাঁশ, ধুনা, রেজিন, রবার, উদ্ভিদজাত রং, বনৌষধি, শালপাতা, কেন্দুপাতা, ফল, শাক-সব্জি, মহুয়া, মধু, ফুল, তেল উৎপাদনক্ষম বীজ, তসরগুটি, জ্বালানি, ইত্যাদি নানান জিনিস পাওয়া যায়।

১১. পরিণত গাছের কাঠ থেকে আসবাপ তৈরি হয়।

১২. গাছের শোভা মানুষকে মুগ্ধ করে। মানুষের মনে, অপার প্রশান্তি দান করে।

১৩. গাছ কাটার ফলে— তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সালোকসংশ্লেষের হার বাড়বে। এর ফলে কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, গম, তুলো, পাট, সয়াবিন, ওট, বার্লি, তামাক-এর উৎপাদন হ্রাস পাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

১৪. উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বনভূমি ধ্বংস হবে। অনেক বিরল প্রজাতির গাছ নিশ্চিহ্ন হবে। উপকূলবর্তী এলাকায় বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

১৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য— হৃদরোগ, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ভাইরাল এনকেফেলাইটিস, ফাইলেরিয়া পীত্বজ্বর প্রভৃতি রোগের বিশ্বব্যাপী প্রকোপ বাড়বে।

১৬. তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বাস্তুতন্ত্র ও সমগ্র জীবজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

১৭. পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলে থাকা বরফ আরও বেশি করে গলবে। এবং ঐ বরফ-গলা জল সমুদ্রজলে যুক্ত হয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। বিভিন্ন কলকারখানার দূষিত গ্যাস, বর্জ্য, রাসায়নি উপাদান এখনই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ও বনধ্বংস বন্ধ করে, নতুন গাছ রোপণের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়নকে প্রতিরোধ করা দরকার।

১৮. বনভূমি ধ্বংসের ফলে বৃষ্টিপাত কমে ও খরা দেখা দেয়। মনে পড়ছে লোক কবি ঘনশ্যাম রাতুরির কথা। ভারতের তেহরি গাড়োয়াল অঞ্চলের পার্বত্য গ্রাম গোপেশ্বর। এই গ্রামে গাছ কাটাকে প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় মানুষরা আন্দোলন গড়ে তুললেন। আর লোককবি ঘনশ্যাম রাতুরি কবিতা লিখলেন গাছকে জড়িয়ে ধরতে আহ্বান জানিয়ে। সে কবিতা ছড়িয়ে পড়লো মুখে মুখে। সেই কবিতার একটি শব্দ ছিল ‘চিপকো’। গাড়োয়ালি এই কথার অর্থ জড়িয়ে ধরা। সেই শব্দ থেকে এই আন্দোলনের নাম হয়ে গেল ‘চিপকো’ আন্দোলন। এই আন্দোলনের চাপে ব্যবসায়ীরা গাছ কাটার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। কবি শামীম রেজা ও কবি ঘনশ্যাম রাতুরির প্রার্থনা অভিন্ন।

কবি শামীম লেখেন -

> ১. “প্রিয়বাবলাবন প্রণম্য তুমি...”[১০]
>
> ২. “কতটা সময় পার হলে, মানুষ মানুষ হবে.../ হবে নিমগাছ...বর্ণিল বনায়ন/ চারদিকে উড়ে ঢোলকলমির বিবর্ণফুল... হাওয়ায় ভাসে ভাঙা ঘাসী নাওয়ের গলুই/ উজান গাঙের জলহীন স্রোত ঠেলে আজ আমি কোন আগামীর দিকে/ তাকিয়ে বলবো, কত সায়র সময় পার হলে মানুষ/ মানুষ হবে? পাবে নিমশ্বাস হবে বিচিত্র সবুজ।”[১১]

নগরায়ন, কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন, বাসস্থান, শিল্পস্থাপন প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় জমির চাহিদা বনভূমি ধ্বংসের প্রকৃয়াকে বাড়িয়ে তুলেছে। কবি শামীম রেজা পরিবেশের এই অবক্ষয় দেখে চমকে উঠেন। প্রতিকার খোঁজেন। গাছ বাঁচানোর মরিয়া তাগিত হয়ে ওঠে অসামান্য এক-একটি কবিতা -

> "প্রিয় বটগাছটা ঝিমুচ্ছে, ঘুঘুপাখির বাসা থেইকা/ এখন আর ডিম চুরি কইরা কেউ একই জায়গায় রাইখা/ আসে না; কারণ পাখি নাই, বাসা বাঁধে না এ মরা গাছে,/ ...বটগাছটাও মরতে বসেছে, দীঘিটা ভইরা ফেলছে সেই কবে, এসব/ প্রশ্ন কোনদিন কি আর প্রকাশিত হবে?"[১২]

কবি শামীমের মতোই গাছের প্রতি গভীর মমতায় কবি শৈলেশ্বর ঘোষ লিখেছেন –

> "কাঠচোরের দল প্রতিটি বৃক্ষের কান্না দিয়ে ভরে তুলেছে বনানী।"[১৩]

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন -

> "মানুষ সুরক্ষা করে গুদোমে-গলায়/ধান চাল ও সুকীর্তি, ব্যাংকে টাকাসিকি।/গাছের শিকড়ে শুধু মাটি লেগে থাকে,/ ক্ষুরে ও থাবায় থাকে লেগে জলঘাস-/ বাঘের মস্তিষ্কে কোনো হরিণীর স্মৃতি। আর কিছু নয়, ওরা চায় না মুনাফা/কেনা-বেচা বলে নেই ওদের বাজারে,/ দোকানে ভেজাল নেই খাদ্যাখাদ্যে কোনো,/ ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে। ঝর্নায় জঙ্গলে।/ না, কোনো শহরে নয়, ঝর্নায় জঙ্গলে/ ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে।।"[১৪]

কবি রফিক আজাদ লিখেছেন -

> "সামান্য কলার পাতা- সে-ও খুব টানে মায়া হয়;/ বৃষ্টিভেজা কচি কলাপাতা বুকে ধরতে ইচ্ছে করে;/ সন্তানদের মুখের মণ্ডল ব'লে ভ্রম হয় এই গাছপালা-/ কোনোই আকাঙ্খা নেই আর— অন্তিম প্রার্থনা এই:/ গাছপালাদের হাত ধরে বেড়ে উঠবে আমার সন্তান।।"[১৫]

প্রতারক মানুষের হাতে প্রিয় নিম গাছেদের মৃত্যু দেখে কবি শামীম লেখেন -

> "কী কমু মুই, চাইয়া দেহি নিমের গাছ কাইটা সবাই বাঁচায় পরিবেশ।"[১৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য -

> "জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফ এও) 'স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ফরেস্ট – ২০১৬' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২৫ বছরে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার হেক্টর বনভূমি কমেছে। এর মধ্যে ২০১০-১৫ পাঁচ বছরেই কমেছে ১১ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর। বিশ্বের ২০০ টি দেশের মধ্যে ১৭ টি দেশের কৃষিজমি ও বনভূমি দুই-ই কমেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের নাম শীর্ষে রয়েছে।"[১৭]

Reference:

১. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১*, ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৬৮
২. তদেব, পৃ. ১৪৭
৩. তদেব, *দেবতা এক মুখোশের নাম*, এক সংখ্যক কবিতা, পৃ. ১৩৩
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ*, বলাই, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৭৬৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছিন্নপত্রাবলী*, ৭৪ সংখ্যক পত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ১১৫

৬. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১, কিশোরী ও আমরা কতিপয় জীবাশ্ম, নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে,* চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৭৩

৭. তদেব, ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, পৃ. ১৫২

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পল্লীপকৃতি,* রবীন্দ্র রচনাবলী এয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৫৩১

৯. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১, বিশ্বস্ত আঁধার ও প্রতারক আলো, পাথরচিত্রে নদীকথা,* চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৩১

১০. তদেব, *ওসালিয়া,* আদিপূর্ব, পৃ. ২৯

১১. তদেব, *মানুষ ও নিমশ্বাস, পাথরচিত্রে নদীকথা,* পৃ. ৩৯

১২. তদেব, *সাতচল্লিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে,* পৃ. ১২৫

১৩. ঘোষ, শৈলশ্বর, *শ্রেষ্ট কবিতা, বিস্ফোরণ,* দে'জ, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৪১

১৪. সেনগুপ্ত, সমীর সম্পা, *শক্তি চটোপাধ্যায়,* সমীর সেনগুপ্ত, *ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা-১২, পৃ. ১০৯

১৫. আজাদ, রফিক, *কবিতাসমগ্র, অন্তিম প্রার্থনা, ক্ষমা করো বহমান হে উদার অমেয় বাতাস (১৯৯২),* অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৩৫১

১৬. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১, বিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে,* চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা ২০১৮, পৃ. ১০৫

১৭. তৈয়্যব, ফয়েজ আহমদ, *বাংলাদেশের পানি, পরিবেশ ও বর্জ্য, বনভূমি কমছে আশঙ্কাজনক হারে,* আদর্শ, ঢাকা ১১০০, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, পৃ. ৩৪

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, ড. অনীশ; *পারবেশ,* টি.ডি. পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, আগস্ট ২০০৭

ভূমিস্বর্গের কবি : শামীম রেজার ৫০ বছর উদ্‌যাপন স্মারক গ্রন্থ, কথাপ্রকাশ, ঢাক ১১০০, ৮ মার্চ ২০২১

গঙ্গোপাধ্যায়, রিনি সম্পা.; *বাংলা কবিতা ও পরিবেশ ভাবনা,* ইতিকথা, কলকাতা ১২, জুন ২০২৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 170 - 176
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা : আঙ্গিকগত ভাবনা

সম্পা মাহাতো
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sampa.presidency1996@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword

Abstract

Discussion

পঞ্চাশের দশকের একজন অন্যতম প্রধান কবি হলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। তাঁর কবিতার আঙ্গিকগত দিক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে কবির জীবন অভিজ্ঞতার নানা দিক তাঁর নির্মাণকল্পে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সেখানে স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায় কবির মনের ভাবনা-কোণ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। সেই সঙ্গে তাঁর পঠন-পাঠনের জগতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মননের বিস্তৃত পরিচয়। অমিতাভ দাশগুপ্তের কাব্যভাষায় শব্দচিত্র নির্মাণ আর শব্দ চয়নের বৈচিত্র্য সীমাহীন। সেই শব্দ আর ভাষাদৃশ্যের উৎসমূলে আছে তাঁর বহুব্যপ্ত জীবন অভিজ্ঞতা। তাঁর কবিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যেমন -

> "ওগো গুঢ়তমা নারী, দক্ষিণ সমুদ্র
> থেকে আরজে ওঠা রক্ত বুদবুদ,
> হাততালি দিতে দিতে ফেটে গেল নিজস্ব পুলকে,
> জোয়ারে ছড়িয়ে গেল তন্তসার স্বপ্নমালা, কাম-"[১]

আলোচ্য পঙক্তি গুলিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে - গুঢ়তমা, রক্তবুদবুদ, পুলক, স্বপ্নমালা, তন্তুসার প্রভৃতি।

সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের বিন্যাসও লক্ষনীয় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায়। উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় এই যে, সমাসবদ্ধ পদটি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করলেও তার প্রয়োগ একেবারেই প্রথাসিদ্ধ নয়। যেমন - 'গুঢ়তমা নারী' - এই পদনির্মাণ ও নারী শব্দের বিশেষণ রূপে 'গুঢ়তমা' শব্দের প্রয়োগে অমিতাভ দাশগুপ্তের নিজস্ব শব্দ সন্ধান ও শব্দ নির্মাণের ক্ষমতা তা পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তৎসম শব্দ সহযোগে এমন আরও কয়েকটি কাব্যভাষার উদাহরণ হল -

> "নাছোর নারীর মত এত লেগে আছে অভিমান,
> আত্মার সমগ্রে এসে ঢুকেছে চিকন বিষ-দাঁত,
> ছাড়াতে পারি না, রাত্রি ফুঁসে ওঠে কাফি কানাড়ায়,
> মৃদু আলাপের পর যে রকম তান চক্করের

আলট্রামেরুল-ফাঁসে জব্দ থাকে মাঘের সবিতা-
আত্মার সমগ্রে এসে ঢুকেছে দংশন প্রিয় দাঁত।"[২]

চিকন বিষ-দাঁত, দংশন প্রিয় দাঁত আবার 'তাচ্ছিল্যের দামিনী বিলাস', 'আত্মার রক্ততিল' প্রভৃতি। তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা গেছে বাংলা, সংস্কৃত, আরবি-ফারসি শব্দ ও শব্দবন্ধের অবাধ ব্যবহার। যেমন -

"আঙুর নামে লাজুক মেয়েটি খুব চাপা গলায়
খশরুর বেশ কিছু শায়েরি পড়ে
মধ্যরাতে হঠাৎ চালিয়ে দিল আমীর খাঁ,
আর মেঘের পেট চিরে হায় হায় চলে গেল গুপ্তি।
একসময় মনে হল বুঝি ভর হয়েছে মেয়েটির,
রসে টসটস করতে লাগল আঙুরের বুক আর মুখ।
আমাদের ঠোঁটে ঠোঁটে তখন তরল আঙুর
চোখে চোখে আঙুরফল।"[৩]

সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে ইংরেজি শব্দের অবিচ্ছিন্ন মিশ্রণ। অনেক আরবি-ফারসি শব্দ সম্পূর্ণত বাংলা হয়ে গেলেও অনেক অভিব্যক্তি আছে যেখানে সেগুলি অতিরিক্ত এক তির্যক কটাক্ষ বহন করে। কিন্তু আরবি, ফারসি বাগভঙ্গি থেকে তুলে নেওয়া এ জাতীয় অংশ ঈশ্বরগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশেষ ধরনের কবিতায়)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ১৯৩৮-১৯৪০ সময়পর্ব থেকেই বাংলা কবিতার ভাষায় তা কমে যেতে শুরু করে এবং সেই জায়গাটা নিতে থাকে ইংরেজি শব্দ ও পশ্চিমি ভাষা সুলভ প্রয়োগ বিধি। আমরা জানি যে, বিভিন্ন কারণেই মধ্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা পূর্বকালের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গেছে। বিশ শতকের শেষ তিন দশক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সময়ে প্রবণতা সম্প্রসারণের দিকেই ধাবিত। এর কারণ অনেকটাই এসেছে সামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রয়োজনে এবং নিদিষ্ট কিছু শব্দ ও অভিব্যক্তির বাংলা বিকল্প না থাকায় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায় ইংরেজি শব্দ, শব্দবন্ধ ও বাগভঙ্গির অবিরল মিশ্রণ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত এক কাব্য ভাষারই অধিকারী করেছে তাঁকে। প্রয়োগের সিদ্ধি থেকেই অনুভূত হবে কবির কাব্যভাষা কতটা নিবিড়ভাবে যথাযথ হয়ে উঠেছে ইংরেজি শব্দাবলি ও বাক্যবন্ধের এই মিশ্রণ -

"টলন্ত নিঃশ্বাসে দোলে রোপওয়ে, টানা ট্রামলাইন,
দেয় নিরন্ধ্র মহড়া
গেরিলা প্রণালী বেয়ে মাংসভুক দু'চারটে পিকাপ,
ট্রলপ ট্রলপ শব্দে
হয়তো উঠেছে এসে দশ বিশ খাঁকি উর্দি
এতক্ষণে তোমারই ওঠোনে -
এড়ানো কি সরল গণিত?"[৪]

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রয়োগ এতটাই স্বাভাবিক যে সেগুলি যে বিদেশি, তা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না। খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। যেমন - ট্রামলাইন, পিকাপ, ট্রলপ প্রভৃতি শব্দ।আবার তাঁর 'আগুনের ভেলা' কবিতায় লক্ষ্য করা যায় -

"রিঙের চারপাশে আগুন
মাঝখানে ফ্লাই বিউটি গোলাপ
সামনে হান্টার হাতে গোমেজ
পেছনে আফিংখোর বাঘ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর চারপাশে
সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর
চোখের আগুনে পুড়ে যায়
জিভের লালায় ভিজে যায়
গোলাপ সুন্দরীর চামড়া কাটা কস্টিউম।”[৫]

কবিতাটিতে ফ্লাই বিউটি, হান্টার, কস্টিউম প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ লক্ষ্য করা গেছে। আবার তাঁর অপর একটি কবিতা ‘প্রিটোরিয়ার ফাঁসির মঞ্চ থেকে’ কবিতায় দেখা যায় -

“সলিটারি সেলে
বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত
পায়চারি করছেন নেলসন ম্যান্ডেলা,
আলট্রা-মেরুন অন্ধকারে
আদমের দিন থেকে ইচ্ছেয় শান দিচ্ছে
ডারবান স্যালিসবেরি নাটালের
পোড়ামাটির মানুষ।”[৬]

সলিটারি সেল, আলট্রা-মেরুন, স্যালিসবেরি প্রভৃতি শব্দ। বস্তুত তিনি আজকের যুগের বাস্তবতাকেই তুলে ধরবার চেষ্টা সবরকমের শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে করেছেন। কিন্তু অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার প্রধান ভাষাভঙ্গি মূলত একালের শিক্ষিত মানুষের ভাষা এবং মধ্যবিত্ত নাগরিকের ভাষা। আবার আঞ্চলিক ভাষা থেকে শব্দ তুলে নিতেও কোনো দ্বিধা করেননি তিনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা পেতে পারে ‘ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ’ - কবিতাটি। সমগ্র কবিতাটিই অভাবগ্রস্ত রুক্ষ জীবনের হতাশা আর ক্রোধ মেশানো ধারালো মৌখিক বাচনে উচ্চারিত। সম্পূর্ণ কবিতা। কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হল -

“চরায় বড়াই খই ফুটেছে তপ্ত খোলা
পাথর মাটি পাথর,
গোয়ালে গাই বিইয়েছে
তার দুধ বাঁটে নেই এক পো,
পুকুর-নদীর জল শুকিয়ে বাস্প,
কোলে কলসি, কাঁখে কলসি, কাতার কাতার
… … …
লে লে ছে আনা লে ঘা লিবি ছে আনা
আমি রাজার ভাতিজা এসেছি সদর থেকে।
গাঁও বুড়ো হবে ঘরের ঝিয়ারি,
বাল-বাচ্চাও শুধোয়-
তুমি কোচড়ে এনেছো কি?
… … …
হিস হিস হিস হিস
জমি জিরেত জ্বালিয়ে
ধা ধা কালকিউটের বিষ।”[৭]

ভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত দেশজ এবং চলিত শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন – সব কিছুর উপরেই কি অনায়াস দখল ছিল অমিতাভ দাশগুপ্তের তা এই কবিতাটি থেকে সহজেই বোঝা যায়। বিশ্বের ও দেশের সংস্কৃতির স্তরে স্তরে কবির ছিল অবাধ বিচরণ যা তাঁর কাব্যভাষার রূপ স্বতস্ফূতভাবে নির্মাণ করেছে, সেই সংস্কৃতিলোকের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচয় পাঠককে অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতার স্বাদ থেকে কিছুটা বঞ্চিত রাখবে। আদিবাসী ভারতীয়দের জীবন থেকে উঠে এসেছে তাঁর কবিতা -

> "কবে এ খেলার শুরু?
> সে কথা জানে না আর্য-প্রতিভা,
> জানেন মারাংবুরু,
> হো, মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল
> ভিড় করে আসে স্বপ্নে আমার
> মঙ্গোলয়েও মহাকাল।"[৮]

অমিতাভ দাশগুপ্তের চিত্রকল্প নির্মাণ কৌশলের উপর পূর্ণ অধিকার ছিল। অত্যন্ত সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'শেষ ঘোড়া' কবিতায় -

> "একত্রিশ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে
> এ আমার স্পেকুলেশন,
> তোমার ডাইনে সুইট ফায়ার,
> বাঁয়ে ব্লিডিং হার্ট,
> এক কদম পিছনে প্রিন্স কাতু
> নেক টু নেক ফুলমালা
> আমার একত্রিশ বছরের সুখ দুঃখ
> … … …
> তোমার পাঁজরের পিসটনে আমার হাঁফসে ওঠা বুক,
> তোমার ছুটন্ত ধমনীতে আমার
> টালমাটাল রক্ত,
> তোমার পতিটি গ্যালপে আমার বাদামি উরুর জলোচ্ছ্বাস
> তোমার অসহ তারুণ্য খানিকটা খিমছে নিয়েছে আমার বয়স।"[৯]

আলোচ্য কবিতায় কবি বলেছেন, তাঁর একত্রিশ বছরের সুখ দুঃখ আছে এই বাজির পিছনে, হোয়াইও স্ট্যান্ডে, 'বায়নাকুলারে' চোখ রাখা সেই 'একাগ্র দৃষ্টি', 'গ্যালপে গ্যালপে' 'ধমনীতে টালমাটাল রক্ত', 'উইন চাই উইন' প্রভৃতি চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে তাঁর কবিতাটিতে একাগ্রতার লক্ষ্য ভেদ করবার জন্য আজকের মানুষ আর মীনচক্ষু বিদ্ধ করবার জন্য নিজের হাতে ধনুর্বাণ তুলে নিতে সাহস করে না। সে বাজি ধরে ঘোড়ায় বৃহৎ অর্থে জুয়ার খেলায়ন। তার জীবন আঁকড়ে ধরবার আকাঙ্ক্ষা গভীর। আবার তিনি 'মেরিপিকনিক' এবং কার্নিভাল এর সমন্বয়ের চিত্রকল্প দিয়ে কবিতা রচনা করছেন-

> "ঘরে যত বাড়ন্ত চালডাল
> তত ময়দানে দুশো ফুর্তি,
> তত জড়াজড়ি, হামি, বেলেল্লা
> যত ট্যাংকের জলে পচা শব।
> মুছে পাইপগানের ছ্যাদা নল

নাচে ভৈরব, নাচে চণ্ডাল
আজ ঠিক নেই কিছু ঠিক নেই
মেরি পিকনিক তাই পিগমির।"[১০]

এই কবিতায় চিত্রকল্পের ইঙ্গিত অবশ্য অনেকটাই স্পষ্ট। কবি বলে দিয়েছেন যে অদ্ভুত আত্মবিস্মৃত ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন এক নেশাগ্রস্থ সমাজে বাস করছি আমরা, আমরা ভুলে থাকছি প্রকৃত বাস্তবকে, বর্তমানের সমূহ বিপদকে।

যখন অন্নসংস্থান নেই ঘরে তখনও ডুবে থাকছি নেশায়। এই কবিতায় কেবল 'মজা'র হুল্লোড় নয়, সেই মজায় যারা ডুবে আছে তাদের কবি 'পিগমি' বলে উল্লেখ করেছেন। এই শব্দের ব্যঞ্জনায় এক খর্বিত বিকলাঙ্গ মানব সমাজ চোখের সামনে ফুটে ওঠে - এইখানে তাঁর চিত্রকল্পটির মধ্যে অধিকতার তীব্রতা সঞ্চারিত হয়। তিনি তাঁর কবিতায় যে পূর্ণ চিত্রকল্পগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সবই দ্রুতবেগ সম্পন্নতার অনুভবে আমাদের প্রধানত আকৃষ্ট করে - ক্রিকেট, ঘোড়দৌড়, কার্নিভ্যাল-এর হুল্লোড়, পথচলা, মেরি-গো রাউন্ড, অর্কেস্ট্রা, নদী ইত্যাদি চিত্রকল্প লক্ষণীয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতায় যৌনতার অনুষঙ্গ কিছুটা প্রবল। তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতার চিত্রকল্প ব্যবহারের অনুষঙ্গে - 'দশটি তরঙ্গ' কবিতায় -

"তুমি সবই জানো, জানে যুবতীকে যেমন সাবান,
ওগো সমকামী জল, কোনও আলোড়ন নেই তোমার ভিতর,
যেসব রমণী স্নানে ঘন সুখ পেতে আসে, তুমি তাহাদের
নানান মাপের স্তন, শ্রেণী, জঙ্ঘা ডাক্তারের মত
নেড়ে নেড়ে ফসফরাস দিয়ে ধুয়ে মেজে
বলো; যাও, কলঘরে যাও।"[১১]

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায় কাব্যভাষায় যৌনতা সূচক এই ধরনের চিত্রকল্প যেমন 'সমকামী জল, নানান মাপের স্তন, স্নানে ঘন সুখ পেতে আসে চিত্রকল্প গুলি জীবনের সেই গভীর তলকেই স্পর্শ করতে চায় যার উপরিতলে আছে রক্তমাংসময় শরীর দেহকোষ ও চামড়ার আবরণ। তাঁর কবিতায় শরীরী বর্ণনার সমগ্র উপস্থাপনেই সেই নিহিত নিবিড় বাসনার টান বা সর্বগ্রাসী ভাবে সমগ্র জীবনকে পেতে যায়। চিত্রকল্প গুলি ইন্দ্রিয় বাসনা উত্তরণেরই দিক চিহ্ন – এ সত্য কোন কবিতা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবেনা।

একজন কবির কাব্যভাষার অন্যতম দিক হল ছন্দ। বাংলা ছন্দের প্রথাসিদ্ধ তিন ধারা- মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত; তার সাথে গদ্যরীতিতে তৎকালীন কবিরা অনায়াসে কবিতা লিখেছেন। অমিতাভ দাশগুপ্তও ব্যতিক্রম নন। কবিতা আলোচনার সূত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে ছন্দের নানাবিধ কারিগরিতে এক অসীম আগ্রহ ছিল তাঁর। সেকারনে ট্রিওলেট ছন্দে একটি কবিতা লিখেছিলেন যেখানে একথা বলেছেন তিনি যে- এই ছন্দে তাঁর পূর্বসূরি কবি বিষ্ণু দে-র অনুসরণ রয়েছে -

"ট্রিওলেটে লেখা কবিতায়
যদি এতটুকু হাওয়া দেয়
তোমার চোখের মৌন,
যেখানে যেটুকু ছড়িয়ে
আমি তো নিয়েছি কুড়িয়ে
নীরবে যৎসামান্য,
... ...
দিনরাত বলে যাচ্ছে -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সত্যি সত্যি সত্যি।"[১২]

'আলোচ্য' কবিতায় 'মাঘ নিশীথের সবিতা' পঙক্তিতে বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা' কবিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মিশ্রবৃত্ত ছন্দের কবিতায় পয়ারের চোদ্দ এবং আঠারো মাত্রার বন্ধন ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-র অনুসরণ করে মিশ্রবৃত্ত মুক্তক ছন্দে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। কলাবৃত্ত ছন্দের নানান কারিগরি তিনি তাঁর কবিতায় ছন্দে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার তুলনামূলক কম ব্যবহৃত করেছেন। কলাবৃত্ত ছন্দের আশ্চর্য একটি দৃষ্টান্ত তাঁর 'মেরি পিকনিক' কবিতাটি -

"(আজ) ঠিক নেই কিছু/ ঠিক নেই,
(মেরি) পিকনিকে তাই/ পিগমিরা
(এলো) ঢাল-সহরৎ/ বাজিয়ে
(সারা) শহর-গঞ্জ/ ঝমঝম,
(গোল) ছোট ছোট হাত/ পা নেড়ে
(জোর) নাচল তুখোড়/রুম্বা- (২+৬+৪)
(আজ) ঠিক নেই কিছু/ঠিক নেই (২+৬+৪)
(মেরি) পিকনিক তাই/পিগমির।"[১৩] (২+৬+৪)

এখানে লক্ষ করা গেছে (২)+৬+৪ কখনও আবার শেষ স্বরটি যেমন- বাজিয়ে, রুম্বা এই স্বর দুটি দ্বিমাত্রিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক সময়ই অমিতাভ দাশগুপ্ত ছন্দকে সাজিয়েছেন কবিতার উপলব্ধির যথার্থতার উপর ভিত্তি করে। তাঁর 'শেষ ঘোড়া' কবিতাটি ঘোড় দৌড়ের প্রসঙ্গে লেখা একটি কবিতা যা দলবৃত্ত ছন্দে লেখা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু অমিতাভ দাশগুপ্ত কবিতাটি মিশ্রবৃত্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের ঝোঁক ব্যবহার করে লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে কবিতাটি লেখার কারণে অনুভব করা যায় যে ঘোড়দৌড়ের সময় প্রতিটি ঘোড়া একই ছন্দে ও গতিতে চলে না; প্রতি মুহূর্তেই তারা এগোনো, পেছানো করে। কোনোরকম মাপা ছন্দে তাঁর এই কবিতাটির গতিময়তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের একসময় গিয়ে মনে হয় গদ্যছন্দে কবিতা লিখলে মনের ভাব অনেক সুদৃঢ় ভাবে প্রকাশ করা যাবে। তাই তিনি বেশিরভাগ কবিতা গদ্যছন্দে লিখেছিলেন নাগরিক মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করে। যেমন তাঁর 'গাছ' কবিতাটি লক্ষ্য করলে গদ্যছন্দের সুন্দর প্রয়োগে লক্ষ্য করা গেছে -

"দাঁড়িতে থাকতে থাকতে কখন গাছ হয়ে গেছ তুমি-
কেউ কি সে কথা বলে নি?
তোমার পায়ের শিকড় পাতালে চারিয়ে গিয়েছে কদ্দুর,
রোদ্দুরে জলে না - নড়াচড়ার কষ্ট
দেখে মানুষের বুকের পাথর তবুও কেন যে গলে নি
বুঝি না কিছুতে বুঝি না,
ঝোড়ো হাওয়া কেন তোমাকে দেখেই তটস্থ। আর চলেনি।"[১৪]

কবিতাটিতে 'গাছ'কে তিনি একজন জীবন্ত প্রতীক রূপে সমাজ বাস্তবতার কঠিন, কোঠর বাস্তব সত্যের রূপকে তুলে ধরেছেন এবং সেই কারণেই হয়তো তার গদ্যছন্দকে বেছে নেওয়া।

অমিতাভ দাশগুপ্তের 'আমার নাম ভারতবর্ষ' নামক কবিতাটিতে তাঁর শব্দ প্রয়োগের কৌশল লক্ষ্য করার মত। প্রথমের তিনটি স্তবকের প্রত্যেকটির শেষে লেখা হয়েছে তার নাম ভারতবর্ষ। অথচ কবিতাটির শিরোনাম 'আমার নাম ভারতবর্ষ'। মাঝের তিনটি ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নেই, আছে তার ক্ষুদ্র অঞ্চলের। শেষ স্তবকে তিনটি পৃথক অর্থবোধের উল্লেখ স্বদেশ, স্বাধীনতা, ভারতবর্ষ। তাঁর কবিতায় অলংকার প্রয়োগের কৌশলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়, অতিশয়োক্তি,

অর্থোৎপত্তি, বা উপমা প্রভৃতি বহু অলংকার প্রয়োগে কবিতাটির শিল্পশরীর নির্মিত। গদ্যছন্দের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ কবিতার ভাবকে প্রবাহমান ও গতিময় করে তুলেছে।তাঁর কবিতার ভাষা সচেতনভাবে যেখানে প্রতিবাদী সেখানে তা আবার কিছুটা আক্রমণাত্মক। কিন্তু বিদ্রূপের তির্যকতাও তাঁর কবিতায় খুব অঢেল নয়। জীবনের যেখানে বঞ্চনা ও অত্যাচার সেখানে ব্যঙ্গ-কটাক্ষের দৃষ্টি চালনা করবার মতো মানসিক দূরত্বে তিনি নিজেকে কখনোই অবস্থিত করতে পারেননি। কবিতার ভাষা সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত রেখেছেন তিনি কোনো বানানো বিষয়কে খুব বেশি প্রশ্রয় দেননি কবিতায়। এভাবেই অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর কবিতার আঙ্গিকগত দিক সযত্নে নির্মাণ করেছেন।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, অমিতাভ, অমিতাভ দাশগুপ্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ‘দশটি তরঙ্গ-৮’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭, পৃ. ২১
২. তদেব, ‘দশটি তরঙ্গ - ৩’, তদেব, পৃ. ১৯
৩. তদেব, ‘তুত রঙের মাঠকোঠা’, পৃ. ৬৮, ৬৯
৪. তদেব, ‘ক্ষমা? কাকে ক্ষমা’, পৃ. ১৭৫, ১৭৬
৫. তদেব, ‘আগুনের ভেলা’, পৃ. ১৫৩
৬. তদেব, ‘প্রিটোরিয়ার ফাঁসির মঞ্চ থেকে’, পৃ. ১০৪
৭. তদেব, ‘ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ’, পৃ. ১৬১, ১৬২
৮. তদেব, ‘অলৌকিকের হাঁস’, পৃ. ১৪৩, ১৪৪
৯. তদেব, ‘শেষ ঘোড়া’, পৃ. ১৮১
১০. তদেব, ‘মেরি পিকনিক’, পৃ. ১০৬
১১. তদেব, ‘দশটি তরঙ্গ-৬’, পৃ. ২০
১২. তদেব, ‘সত্যি’, পৃ. ২২
১৩. তদেব, ‘মেরি পিকনিক’, পৃ. ১০৬
১৪. তদেব, ‘গাছ’, পৃ. ১১১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 177 - 186
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লেখিকাদের স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের মেয়েলি ছাঁচ : সুখলতা রাও এবং আশালতা সিংহ

অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sauren@ugb.ac.in
ও
লোপামুদ্রা পাল
সহযোগী অধ্যাপক
ফকিরচাঁদ কলেজ
Email ID : lopamudra.palchakraborty@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
School, Discourse, Patriarchy, Power, Children, Protest, Observation, Lifestyle

Abstract
If we look at the stories written for children and teenagers in Bengali, we can understand that most of them are somehow related to school. In Bengali, we can call such stories 'Schooler Galpo'. The experiences that the storytellers have while observing the familiar environment are expressed through their creative works, brightened by the light of their own understanding and consciousness; but within the environment lies the rhetoric of power. As a result, the voice of women is suppressed next to the dominant patriarchal accent. In practice, the language of protest creates a language that is actually just a counter-narrative. But the women writer's language is also trapped in the patriarchal narrative. We have to find the own voice of women's personal space. We have tried to understand the feminine mold of school stories from the stories written by Sukhalata Rao and Ashalata Singha. Just as 'Barnaparichay' of Ishwar Chandra Vidyasagar not only introduces children to the alphabet, but also makes the duties and non-duties of life clear, similarly, Kamini Sundari Devi's 'Bamabodhika' mainly taught morals along with alphabetical lesson to girls. The timid, fearful, and gawky women shown in 'Bamabodhika' became the ideals for the main characters of women writers of later period. Even a review of school stories will show the dichotomous division of boy's and girls' food habits, clothing, language, habits, thoughts, and cognitions. The language and behaviour of the female characters created by the two writers are different from the male characters they wrote. For example, the life style of Ranu in Sukhalata Rao's story 'Bhalo Pari O Mondo Pari' is different from the male characters namely 'Buddhiman', 'Bittoban',

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

and 'Chittotosh' in the same writer's story 'Tin Bandhu'. Although, in Ashalata Singha's story 'Chhera Moja', Mini is the best student in class, the author has perfected her by transforming into the perfect wife of a man who returned from England. Although, there is a hint of the author's own voice in the story at some places. In the content of the story 'Subodhini', author Ashalata has shown her uniqueness. It is not a school story, but the story of entering into school is important for girls in colonial India, Ashalata has made it understand. The language style and narration of the women authors are also different.

Discussion

বাংলা শিশু সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসর পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় অধিকাংশ গল্পে বিদ্যালয়ের স্পর্শ লেগে আছে। আসলে গৃহের একক স্কুলের মাঠে হয়েছে যৌথ; বাড়ির সাধারণ, বিদ্যালয়ের আর পাঁচজনের মধ্যে বিশেষ হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রামধনুর উজ্জ্বলতা ও সম্ভাবনা কোন লেখকই বা এড়িয়ে যেতে পারেন? তাই শিশুসাহিত্যের জগৎ যে আসলে স্কুলের গল্পে ঠাসা থাকবে তা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশের তেরো বৎসর পর প্রকাশিত হয়েছিল কামিনীসুন্দরী দেবীর লেখা 'বামাবোধিকা'। এই শিশুপাঠ্য প্রাইমারের আখ্যাপত্রেই লেখিকা লিখেছিলেন, -

> "ইহা পাঠ করিলে বালিকাদিগের অবশ্যই বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ জন্মিবে...কেন না ইহাতে বালিকাদিগের স্বভাব বর্ণিত আছে।"[১]

অর্থাৎ লেখিকা বালিকাদের স্বভাব যে বালকদের স্বভাবের থেকে পৃথক প্রথমেই তা পাঠকমনে মুদ্রিত করে দিচ্ছেন।

বর্ণপরিচয়ে যেমন গোপাল-রাখাল, বামাবোধিকায় তেমনই বরদা-সারদার গল্প শোনা গেল। গোপাল এবং বরদা দুজনেই ভালো হলেও তাদের গুণাবলী পৃথক। তারা যথাক্রমে সকল বালক এবং সকল বালিকার আদর্শ। গোপাল 'একদিনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না।'[২] 'গোপাল কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না।'[৩] অর্থাৎ বালক বয়সে ভালোভাবে পড়াশোনা করা, বড়োদের কথার বাধ্য হওয়া, ভাইবোনদের স্নেহ করা, ঝগড়া মারামারি না করাই ভবিষ্যতের সুনাগরিকের কর্তব্য। গোপালের এবম্বিধ গুণাবলি দিয়ে বালকদের মান্য স্বভাবও স্থিরীকৃত হল।

অন্যদিকে বামাবোধিকার বরদা নারীর আদর্শ; সে 'স্বাভাবিক ধীরা', 'সর্ব্বদা সভয়া',[৪] পরোপকারিণী। গোপালের গায়ে শক্তি থাকলেও সে নিতান্ত ভদ্রতায় মারামারি করে না, অন্যদিকে বরদাদের সবসময় সন্ত্রস্ত থাকাই যেন দস্তুর।

স্বভাবের অন্য দিকটিও রাখাল ও সারদার ক্ষেত্রে পৃথক। রাখাল সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখলেন, 'খেলিবার সময় সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে', 'রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না'।[৫] অন্যদিকে সারদা 'ভারি কটুভাষিনী', 'ব্যঙ্গে-গালাগালিতে উচ্চাঙ্গের পটিয়সী'।[৬] অর্থাৎ রাখালের দুষ্টুমির ভাষা ও সারদা ভালো মেয়ে না হওয়ার কারণ পৃথক। শিশুপাঠ্য প্রাইমারই ঠিক করে দিচ্ছে সমাজে খারাপ হওয়ার শর্তাবলী।

বামাবোধিকার সবচেয়ে মোক্ষম নির্দেশটি দিয়েছিলেন 'বাঁড়ুয্যেদের রাজলক্ষ্মীর মা'। তিনি মুখুয্যে পরিবারের মেয়েদের বোঝান যে স্বামী ভিন্ন মেয়েদের গতি নেই। সভ্য শিক্ষিত ছেলেদের মনোমত হতে চাইলে মেয়েদের লেখাপড়ায় মন দিতেই হবে।

> "স্বামী আদর করিলেই মেয়ে মানুষের সৌভাগ্য, না করিলেই [যে] বিষম।"[৭]

অর্থাৎ ব্যক্তিগত কারণে নয়, স্বামীর মনোমত হতে পারাই স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব 'Calcutta Female School' প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে ভর্তি করে দেন। "দেশের হতভাগ্য নারীদের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হইয়া অজ্ঞানাস্বরূপ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস"[৮] বেথুন করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি 'শিশুশিক্ষা' নামে একটি প্রাইমার রচনা করে তাঁকেই উৎসর্গ করেন।

যে বইটি রচিত হল শিশুদের জন্য, বিশেষভাবে বালিকাদের জন্য সেখানে শিশুদের যা যা করণীয় তার তালিকা থাকলেও একটিমাত্র বালকের নাম উল্লেখ আছে।

'রামনাথ' নামে একটি বালক ছাড়া এই পুস্তকে কোনও বালিকার নাম নেই। যদিও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'য় বালক বালিকার বিভেদ অনেক কম। প্রায় নেই বললেই চলে।

ঊনবিংশ শতকের শিশুপাঠ্য প্রাইমার উপনিবেশের প্রাথমিক পর্বে বালক ও বালিকা দের বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য, অকর্তব্য স্থির করে দিল। পরবর্তীকালের শতাধিক বছরের বাংলা সাহিত্যে যেন তারই প্রতিফলন। সতীদাহ (১৮২৯ খ্রি.), বিধবা বিবাহ (১৮৫৬ খ্রি.), বহুবিবাহ রদ ইত্যাদির সংস্কারের জন্য আইন প্রণীত হল, নারীদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসা হল, কিন্তু পুরুষ ও নারীর খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, স্বভাব, ভাবনার সামাজিক দ্বিকোটিক বিভাজন থেকেই গেল। এমনকি লেখিকাদের রচনাতেও তার প্রতিফলন আছে। যদিও ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়।

আমরা এই আলোচনা প্রাঞ্জল করার জন্য সুখলতা রাও এবং আশালতা সিংহের কয়েকটি গল্প বেছে নিয়েছি।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়িতে যে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (১২৯২ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ সংখ্যা) 'পরীক্ষা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখিকা ইউনিভার্সিটির পরিক্ষার্থিণী জনৈকা বালিকা। লেখিকার বক্তব্য পুরুষদের পরীক্ষা পাশ করে চাকুরী পেতে হয় তাই তাদের পক্ষে পরীক্ষা জরুরী কিন্তু "বাস্তবিক মেয়েদের নামের পিছনে বি.এ., এম.এ. ডিগ্রি ও পৌরুষিক পদবীগুলো যে কীরূপ কিম্ভূতকিমাকার দেখায় তা বলা যায় না।"[৯] বলা নিষ্প্রয়োজন যে নারীশিক্ষা নারীদের কাছেই তাদের উদ্দেশ্যের স্পষ্টতায় ধরা দেয়নি।

যদিও স্কুলকেন্দ্রিক গল্প নয় তবুও রাধারানী দেবীর (১৯০৩ খ্রি. - ১৯৮১ খ্রি.) 'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ' গল্পটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। গল্পের নায়িকা বিন্দু বুদ্ধিমতী, ঋজু ও স্পষ্টভাষিণী, ভাগ্যের ফেরে মায়ের ইচ্ছায় সে বিয়ে করে বৈধব্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, লেখাপড়া সম্পূর্ণ করতে পারেনি। নিয়ম ভাঙ্গা নয়, যেন কঠোরভাবে নিয়ম পালনের মধ্যেই তার জীবনে প্রকাশ ও বিদ্রোহ ঘটেছে।[১০] অর্থাৎ স্কুলে পড়ার সুযোগ পাওয়ার গল্পও বাংলায় লেখা হয়েছিল।

এই দুই লেখিকাদের রচনায় স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের কন্যারা কীভাবে চিত্রিত, তাদের বাচন ভঙ্গিমাই বা কেমন, আবার এই লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্রগুলি কিঞ্চিৎ অন্যরকম কি না সবই আমরা অনুপুঙ্খভাবে দেখার চেষ্টা করবো।

সুখলতা রাও (১৮৮৬ খ্রি.-১৯৬৯ খ্রি.) :

সুখলতা রাওয়ের গল্প 'আলিভুলির দেশে' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে; ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। বহু পরে আরও কয়েকটি গল্প সহ 'আলিভুলির দেশে' শিরনামে একটি বই প্রকাশিত হয়। ছোটোদের গল্প হলেও এই গল্পগুলির সবকটিকে স্কুলের গল্প বলা যায় না। আমরা আলোচনায় কেবল স্কুলকেন্দ্রিক গল্পগুলিকেই বেছে নেব। লেখিকার আর দুটি বই 'সোনার ময়ূর' এবং 'নূতনতর গল্প' থেকেও একটি করে গল্প গৃহীত হল।

গল্পগুলির মধ্যে নূতনতর গল্পের 'ভালো পরী ও মন্দ পরী'র গল্পের নায়িকা রানু। একমাত্র এই স্কুল কেন্দ্রিক গল্পটির মুখ্য চরিত্র একটি বালিকা।

রানুর দুইকানে দুই পরীর বাস, ভালো পরী আর মন্দ পরী। ভালো পরী রানুকে ক্রমাগত ভালো ভালো পরামর্শ দেয়, কিন্তু অন্যদিকে মন্দ পরীও অন্যকানে অসৎ পরামর্শ দিতেই থাকে। রানু প্রথমে মন দিয়ে পড়াশোনা করলেও মন্দ পরীর কুপরামর্শে আজকাল সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে না। ইস্কুলের পড়া করে না। সকালবেলা কোনও রকমে বইতে চোখ বুলিয়ে স্কুলের গাড়ি চেপে সেখানে গিয়ে আর পড়া পারে না। তাড়াতাড়ি বই গোছাতে গিয়ে পেনসিল ভেঙে বাবার টেবিল থেকে পেনসিল নিতে গিয়ে দোয়াত উল্টে জরুরি কাগজপত্র নষ্ট হল। বকা খেয়ে গেল বাড়ির কাজের লোক। মন্দ পরীর পরামর্শে রানু তাও নিজের অপরাধ স্বীকার করে না। অবশেষে একদিন রানুর মা তাকে বোনকে দেখতে বলে রান্নাঘরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাজে গেলেন। কিন্তু উঠোনে বাঁদরওয়ালা ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখাতে এলে রানু মন্দ পরীর পরামর্শে ছুটে গেল খেলা দেখতে। বোন খাট থেকে পড়ে গিয়ে তার কপাল ফেটে গিয়ে প্রচুর রক্ত বেরোলে অবশেষে রানু অনুতপ্ত হয়।

> "সেই যে সেদিন রানু কান থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল মন্দ পরীকে, আর কখনও তাকে কাছে আসতে দিল না।"[১১]

সুখলতা রাও বিশ্বাস করতেন, -

> "আমি এই বুঝি যে সেই সাহিত্যই সার্থক যা মানুষকে জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে, শুভবুদ্ধির পথে অগ্রসর করে নিয়ে যায়।"[১২]

তাঁর অন্যান্য গল্পের মতোই আলোচ্য গল্পটিতেও তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যক্তি ও বৃহত্তর জগতের জন্য যা ভালো সুখলতা বরাবর তাঁর শিশুপাঠ্য সাহিত্যে তা পরিবেশন করেছেন। তবে গল্পগুলি আর একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে এক ধরনের নির্দিষ্ট বয়ান আছে যা ভবিষ্যতের নারীকেই প্রস্তুত করে। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোতে নারীর যে অবস্থান ঠিক করা আছে গল্পটিতে যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

রানু পুতুল খেলে। তার অপরাধ বা দুষ্টুমিও ঘরের মধ্যে সীমায়িত। বাবার দোয়াত উল্টে গেলে বাড়ির সুচারু পরিবেশ নষ্ট হয়; অন্যদিকে মা রান্নাঘরে গেলে যে ছোট বোনটিকে সামলানোর দায়িত্ব দিদির এ তথ্য ভারতীয় সমাজে কে না জানে?

রবীন্দ্রনাথ ও ১৯০৩ বঙ্গাব্দে 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে 'দিদি' কবিতায় লিখেছিলেন–

> "ভরা ঘট লয়ে মাথে,
> বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
> ধরি শিশুকর - জননীর প্রতিনিধি,
> কর্মভারে-অবনত অতি ছোটো দিদি।"[১৩]

সুখলতা রাও সাহিত্যের মাধ্যমে যে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হওয়ার কথায় বিশ্বাস করেন সেই চেতনা আগাপাশতলা পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতেই মোড়া।

উঠোনে বাঁদর নাচওলা ডুগডুগি বাজিয়ে ডাক দিচ্ছে। সে বলছে, "বাঁদরী শ্বশুরবাড়ি যাবে...এ।"[১৪] বাঁদরী লাল ঘাগড়া পরে, লাল ওড়নার ঘোমটা টেনে, ঘুরে ফিরে নাচছে। লক্ষণীয় গল্পটির বাঁদরনাচওয়ালাও ও স্ত্রী বানরটিকেও ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে চায়। কি বানরী, কি মানবী, সব প্রজাতির স্ত্রীজাতির এছাড়াও যে অন্য কোনও সমর্থনযোগ্য ভবিষ্যৎ হতে পারে সমাজ যেন তা মানতে পারে না। উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা, সুকুমার রায়ের দিদি ও ব্যতিক্রমী হতে পারেন নি। লেখিকার গল্পের মেয়েলি ছাঁচটি স্পষ্ট।

সুখলতার আরও তিনটি স্কুলকেন্দ্রিক গল্প আমরা প্রসঙ্গত আলোচনা করবো যেখানে মুখ্য চরিত্র ছেলেরা।

সুখলতা রাও তাঁর প্রথম গল্পের বই 'সোনার ময়ূর' এ 'তিন বন্ধু' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পের ছাঁচটি অনেকটা পঞ্চতন্ত্রের গল্প বা ভারতীয় অন্যান্য নীতিকথা মূলক গল্পের মতো। যদিও গল্পটি শেষে যে অসাধারণত্বে উত্তীর্ণ হয় তা বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। গল্পটির সঙ্গে একমাত্র তাঁর ভাই সুকুমার রায়ের 'অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'রাজার অসুখ' গল্পটিরই তুলনা চলে।

অবশ্যই উল্লেখ্য 'তিন বন্ধু' গল্পের চরিত্র তিনটি মেয়ে নয়। কিন্তু লেখিকা সুখলতা 'ভালো পরী ও মন্দ পরী' গল্পের রানুর পাশাপাশি যখন অন্য গল্পটিতে বুদ্ধিমান, বিত্তরাজ এবং চিত্ততোষের গল্প বর্ণনা করেন তখন তাঁর উপস্থাপনের ভাষা এবং চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যে বদল হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দেবো।

দেশের রাজার সভাপন্ডিতের ছেলে বুদ্ধিমান, বণিকপুত্র বৃত্তরাজ আর গঙ্গার ধারের শ্রমিকের ছেলে চিত্ততোষ গুরুগৃহে থেকে পড়ে।[১৫] তাদের গভীর বন্ধুত্ব; তারা পরস্পরের কাছে মনের কথা গোপন করত না। তারা গুরুগৃহ থেকে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেরিয়ে 'জ্ঞানীবাবা'র দর্শনে গেল উঁচু পাহাড়ে গভীর জঙ্গলে। তারা জ্ঞানী বাবার গুহায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় স্বপ্নে দেখতে পেল অপূর্ব এক মানুষকে যিনি একটি চাকা বনবন করে ঘোরাচ্ছেন। তারা জানতে পারল ইনি সময়।

তিনি বললেন, -

> "পাও না কি? সময়ে কাজ করলে সবই পেতে পারো। দেরী বা আলস্য করে সময় নষ্ট করলে কখনো বড় কাজ করতে পারবেনা।"[১৬]

বুদ্ধিমান রাজার মূল পরামর্শদাতা হলেও দেশে হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধে মারা যায়, বিত্তরাজের অগাধ অর্থের জন্য ছেলেরা মূর্খ হয়ে থাকে। এই দুই বন্ধু গরীব অসুস্থ চিত্ততোষের কাছে পৌঁছে দেখতে পায় সে তার জমির ধান গরীবের মাঝে বিলিয়ে আনন্দে আছে। চিত্ততোষ বলে, -

> "শোন, আজকাল প্রায়ই আমি সময়বুড়োকে স্বপ্নে দেখি। তাঁর চাকা থেকে ঝরে পড়ছে রাশি রাশি ফুল - কী সুন্দর, কী চমৎকার গন্ধ!"[১৭]

বিত্তবান ভাবে বাড়ি ফিরে সব অর্থ গরীবকে বিতরণ করে দেবে। কিন্তু পন্ডিত বুদ্ধিমান তাকে বুঝিয়ে বলে,-

> "কেবল টাকা দিলেই কি সুখী হওয়া যায়? যদি চিতুর মতো ভালবাসা দিতে পার, তবে বুঝি সুখী হতে পারো তার মতো।"[১৮]

সুখলতার অপূর্ব এই গল্পের আবেদন শুধু শিশু-কিশোরদের নয়, যে কোনও পাঠকের হৃদয় ভরিয়ে দেয়। এমন গভীর জীবনবোধের গল্প বাংলা স্কুলের গল্পের জগতের অনন্য সম্পদ।

লক্ষণীয় সমাজের তিনটি স্তর থেকে উঠে আসা তিন বন্ধু যে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে জীবনকে, সময়কে সার্বিকভাবে বুঝে নিতে চাইছে 'ভালো পরী ও মন্দ পরী'র রানুর ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনটি ছাত্রকে সুখলতা যে অবলীলায় গভীর জঙ্গলে জীবনের সত্য সন্ধানে পাঠিয়ে দেন রানু তা পারে না। সে তার ছোট্ট জীবনের কৈশোরের আহ্লাদ মেটাতে বারান্দায় বানর নাচের খেলা দেখার অনুমতিও পায় না। অনুজার তত্ত্বাবধানের বেড়ায় তাকে আটকে দেওয়া হয়। তার জন্য তৈরি হয় জীবনে বাঁচার অন্যতর মেয়েলি মাত্রা যা বৃহত্তর জীবনের কথা তো বলেই না, বরং পুরুষতান্ত্রিক খাঁচার বেঁধে দেওয়া কর্তব্যগুলিই প্রকট হয়ে ওঠে।

উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা, সুকুমারের অগ্রজা সুখলতা রাও নিজে কিছুটা ব্রাহ্ম পরিবারের মুক্ত পরিবেশের স্বাদ অর্জন করলেও তাঁর রচনার পুরুষ ও নারী শিশুচরিত্রগুলি আলাদা হয়ে গেছে।

'আলিভুলির দেশে' বই থেকে আর দুটি গল্প উল্লেখ প্রয়োজন, 'বাঁধন' আর 'বন্ধু'।

'বাঁধন' গল্পটিতে পোষ্যপ্রাণীর কষ্ট ও তার মুক্তির কথা বিবৃত করেছেন সুখলতা। স্কুল পড়ুয়া বালক ননী বাগানে গিয়ে দেখে গাঙশালিক, মধু টুনটুনি, মাছরাঙা। তার খাঁচায় আছে ময়না আর চন্দনা। ননী ভজুয়া চাকরের সঙ্গে যাওয়ার পথে এক বুড়ির পোষা বাঁদরকে দেখে ফেলে ও প্রতিদিন তার টিফিনের কলাটি দিতে থাকে। তার মনে হয়, -

> "বানরের মুখ কেমন মানুষের মুখের মতো, না? বানর ছানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ননীর চোখে কেবল জল আসতে লাগল।"[১৯]

ননী পরবর্তীকালে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বানরটিকে কিনে নেয় ও জন্মদিনে বানরছানা, চন্দনা, ময়না সবাইকে বাগানে মুক্ত করে দেয়। প্রথমে তারা ঘুরে ফিরে এলেও পরে আর আসতো না।

ননীর প্রথম থেকেই মায়ের কাছে প্রশ্ন ছিল, -

> "মা, তুমি যেমন আমাকে ভালোবাস, বানরের মাও কি তাকে তেমনি ভালোবাসে?

মা বললেন, বাসে, বই কি বাবা। তবে জীবজন্তু বাচ্চা যতদিন ছোট থাকে, যতদিন মা'র ভালবাসা না পেলে বাচ্চা বাঁচে না, ততদিনই ভালবাসে। বড় হলে বাচ্চাদের ভুলে যায়, চিনতেও পারে না।
মা, ওর বাচ্চার জন্য বানরটা এখন কাঁদছে? তার খারাপ লাগছে নিশ্চয়ই?
ঘুমোও বাবা। রাত হল।"[২০]

স্কুলপড়ুয়া এক বালকের সংবেদনশীলতার উন্মেষ এবং সেই অনুযায়ী তার পশু পাখিদের প্রতি পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে পাঠককে মুগ্ধ করে। লেখিকার যদি কোনও নীতিবাক্য শেখানোর উদ্দেশ্য থাকে তাও কোথাও শিল্পোৎকর্ষের চমৎকারিত্বে বিলীন হয়েছে।

লক্ষণীয় ননী এবং মায়ের কথোপকথন। মা যে আশ্বাস দিয়ে সন্তানকে ঘুমপাড়ান ও যে যত্নে তার একান্ত গোপন প্রশ্নগুলির জবাব দেন তারই প্রতিধ্বনি উদ্ধৃতাংশে। লেখিকার এই মেয়েলি ভাষা গল্পটিকে নিঃসন্দেহে অন্যতর মাত্রা দিয়েছে।

সুখলতা রাওয়ের 'বন্ধু' গল্পটি আবার অন্যরকমের।[২১] টুনু ও বুড়ো সহপাঠী হলেও টুনুরা বড়লোক, বুড়ো ক্লাসে ফার্স্ট হলেও খোলার চালের ঘরে থাকে। স্বভাবতই টুনুর মা চান না বুড়োর সঙ্গে টুনুর বন্ধুত্ব হোক। কিন্তু টুনুদের পোষা বেড়ালকে ফেলে বাড়িশুদ্ধ সবাই দার্জিলিং বেড়াতে গেলে বাড়ির কাজের লোক সেই পোষ্যর কথা ভুলেই গিয়েছিল। জানা গেল বুড়ো চালের ওপর উঠে লাঠির আগায় খাবার বেঁধে খাইয়ে এতোদিন মেনিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবার টুনুর মা বুড়োকে নিজের হাতে পিঠে বানিয়ে খাওয়ালেন আর দুই বন্ধুর মাঝখানে আর কোনও বাধা থাকল না।

সুখলতার বাকি গল্পগুলির তুলনায় এই গল্পটি দুর্বল। গরিবের ছেলে বুড়োকে যেন তার ভালোত্বের প্রমাণ দিতে হল। হয়তো সুখলতা নিজে নারী বলে টুনুর মায়ের অর্থের অহঙ্কার ও শ্রেণি সচেতনতাকে সহজে আঁকতে পেরেছেন। আবার তিনি যখন বুঝেছেন বুড়ো কত ভালো তখন তাঁরও মাতৃত্ব সহজ গতিতে এসেছে। সুখলতা রাও আসলে লেখিকা, এখানেই তাঁর মেয়েলি কলমের জয়।

আশালতা সিংহ (১৯১১ খ্রি.-১৯৮৩ খ্রি.) :

বিংশ শতকের ঔপন্যাসিক আশালতা 'অমিতার প্রেম' নিয়ে ঝড় তুললেও প্রচুর ছোটোগল্পও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কিশোরদের জন্য লেখা যে গল্পগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে দুটি গল্পকে স্কুলকেন্দ্রিক গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উত্তর জীবনে লেখিকা আশাপুরী নামে সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর গল্পের মধ্যে সব সময় এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিবেশ থাকে।

'ছেঁড়া মোজা' নামে আশালতার স্কুলকেন্দ্রিক গল্পটি তার বয়ান, ভাষা ও চলন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ।[২২] ক্লাসে মিনি ফার্স্ট হলেও তারা গরীব, মায়ের বাক্সে সেকালের আমলের দু একখানি বেনারসি, শালের শাড়ি, পুরোনো মোজা তোলা আছে। কালেভদ্রে সেই সবই ব্যবহার করা হয়। মিনি পড়াশোনায় নিয়মিত, ভালো কবিতা বলতে পারে ও বুদ্ধিমতী। সহপাঠী বেলার দাদা সোমেনবাবু বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলে বেলা সেই উপলক্ষে বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে বন্ধুদের সোনালি কাগজে ছাপা কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করে। বন্ধুদের মধ্যে অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত আগ্রহ বাড়ে এবং কে কী সাজগোজ করবে তাই নিয়ে আলোচনাও বাড়তে থাকে।

মিনি বেলার বিশেষ বন্ধু হলেও কারো বাড়ি সে যায় না। তার বাবা কর্পোরেশনের স্কুলে চাকরি করেন, শতখানেক টাকা মাইনে; তার তিনটি ভাই, দুই বোন, বৃদ্ধা দিদিমাও তাদের সঙ্গে থাকেন। দিদিমার আপত্তি থাকলেও মিনি অবশেষে মায়ের পুরোনো সবুজ সিল্কের শাড়িই পরে। দিদির একটু বড়ো পুরোনো একটা হিল জুতো ও একপাটি ছেঁড়া মোজা পরে বেলাদের বাড়ির নিমন্ত্রণে যায়। নামজাদা লোকেরা এসেছিলেন, গ্রামোফোন বাজছিল, আলো ঝলমল সেই অনুষ্ঠানে বিলাত ফেরত সোমেন বাবু ধুতি পাঞ্জাবি পরে পিয়ানো বাজালেন। অনুষ্ঠানে বেলার বন্ধু হেনা বলে তার গলাটা তেমন ভালো নেই, তাই গাইতে পারবে না। আর বান্ধবী বিজলী বলে বক্স হারমোনিয়াম ছাড়া বড় অর্গানে গাওয়ায় সে স্বচ্ছন্দ নয়। অবশেষে

বেলা সবাইকে জানায় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' থেকে আবৃত্তি করে মিনি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর কাছ থেকে সোনার মেডেল পেয়েছিল, বরং তাকেই কিছু বলতে বলা হোক।

মিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির কবিতা আবৃত্তি করলো -

"বিলেত দেশটা মাটির - সেটা সোনা রূপার নয়,
তার আকাশেতে সূর্যি ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।
*   *
সেথা পুঁটি মাছের বিয়োয় নাকো টিয়া পাখির ছা
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা।"

হাসলেন সোমেনবাবু, যিনি সদ্য বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, -

> "এই কথাটি যদি আমাদের দেশের ছেলেরা বেশ ভালোমতো বুঝতে পারে তাহলে খুবই উপকার হয়।"[২৩]

অবশেষে বেলার বাবা কৃষ্ণনাথ বাবু তাঁর বিলেত ফেরত পুত্রের জন্য মিনিকেই মনে মনে নির্বাচিত করে তার বাবাকে চিঠি লিখলেন, -

> "কাল রাত্রিতে মিনু মা যখন জুতো খুলছিলেন, তখন তাঁর ছেঁড়া মোজা দেখেই বুঝেছিলাম বড়লোকের ঘরের মেয়ে নন তিনি। তবু কাল রাত্রিতে তাঁর ওই কত লোক ও অত সমারোহের মাঝেও কী চমৎকার স্বপ্রতিভ ভাব, কী সরল ব্যবহার, আমি মুগ্ধ হয়েছি।"[২৪]

মিনি বেলার বৌদি হয়ে বাড়িতে আসার পর বেলা তার কানে বলে –

> "ভাই, ভাগ্যে সেদিন তুই ছেঁড়া মোজা পরেছিলি।"[২৫]

গল্পটি স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের চরিত্র বা চরিত্ররা মুখ্যত মেয়েরা না হলে এমন গল্প লেখা হাওয়াই সম্ভব নয়। বাংলায় ভালো ছেলে, দুষ্টু ছেলে, নেতা ছেলে, গ্রামের ছেলে, শহরের ছেলে, মিচকে শয়তান ছেলেদের বর্ণময় মিছিল থাকলেও কেবল তাদের ব্যক্তিগত গুণে বিবাহের সম্বন্ধ আসছে এমন গল্প রচিত হয়নি। কিন্তু স্কুলের কিশোরী শ্রেণিতে প্রথম হতে পারে, 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' থেকে আবৃত্তি করতে পারে বা বিলাত ফেরতের অভিনন্দন অনুষ্ঠানে বিলাত কে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করলেও তার জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা একটি উপযুক্ত বিবাহে। আশালতা সিংহ ব্যক্তি জীবনে শেষে বিবাহকে অস্বীকার করলেও শিশুসাহিত্যে মেয়েদের গল্পে কিন্তু তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন –

> "দৃকযন্ত্রের তুলনা অনুসারে মানস মন্ডলের স্থানিক আয়তনে অদলবদল ঘটানোর স্বাধীনতা বাংলা শিশুসাহিত্যের ছেলেরা প্রভূত পেলেও, মেয়েরা তেমন পায়নি - শৈশবলোকের সাহিত্য নির্মিতিতেও মোটের উপর বাঙালি শিশুকন্যার চোখ নজর আব্রু আঁটা; আশু গেরস্থালির আশা আশঙ্কায় অবরুদ্ধ তার মনোদেশ; জোটেনি তার সব প্রস্তুতিতে একাকী বিহারের অনুমতিপত্র।"[২৬]

মিনি কেন তার ভাবী শ্বশুরমশাই কৃষ্ণনাথ বাবুর পছন্দের কারণ হয়ে উঠলো সেই বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো। অতো লোকের মাঝে ছেঁড়া মোজা পায়ে গরিব হওয়া সত্ত্বেও মিনির সপ্রতিভতা ছিল, আর ছিল সরল ব্যবহার। তিনি মিনির বাবাকে আরো লিখেছেন, -

> "এমনই একটি লক্ষ্মী আমি চাই। আশা করি, আপনার কোনো অমত নেই। আপনারা তো আমাদেরই স্বজাত।"[২৭]

এই বাক্যগুলি আমাদের সমাজ বাস্তবতার গভীরটুকু দেখতে সাহায্য করছে। আসলে বুদ্ধিমতী, পড়াশোনায় ভালো নয়, স্বভাবে স্থির, অচঞ্চল কন্যাই সমাজের কাম্য। আশালতা দেবীও পুরুষতান্ত্রিক বয়ানে গঠিত সামাজিক খাঁচার বাইরে কিশোর পাঠককে নিয়ে যেতে পারলেন না বা চাইলেন না।

অন্যদিকে সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ, শিশুসাহিত্যের পাতাতেও স্থান পেল। যদিও যে কোনোও সাহিত্যই জীবনের সত্য নয়, আরো বড়ো কোনও সত্যের সন্ধান করে, তবুও এটা দুর্ভাগ্যজনক, গল্পের মুখ্য চরিত্র যখন কিশোরী কন্যা তখন তা সমাজও তার নীতি সংস্কারের নিগড়েই বাঁধা থাকে।

'ছেঁড়া মোজা' গল্পের উপস্থাপনশৈলী ও ভাষাও বিশেষ মেয়েলি ছাঁদের।

> "এই নাও ভাই। অবশ্য যেন সন্ধে সাতটার মধ্যে যেয়ো, দেরি করো না। এই তোমাদের ছাপানো নিমন্ত্রণ চিঠি।
> মিনতি জিজ্ঞেস করল, 'ভাই বেলা, তোমার দাদা বিলেত থেকে পিয়ানো বাজাতে শিখে এসেছেন?'
> 'শুধু পিয়ানো কেন, তিনি বেহালা বাজাতেও শিখেছেন, এমন চমৎকার ফটো তুলেছেন সেখানকার কত জায়গার। তোমরা যেয়ো, তখন সবই দেখবে।' বেলা তার চুলের ফিতেটা ভালো করে বেঁধে নিতে নিতে বলল।"[২৮]

কিশোরী মেয়েদের নিজের চুল ঠিক করতে করতে কথা বলা, কথায় কথায় ভাই সম্মোধন, দাদার গৌরবে গৌরবান্বিত বোনের কথার উপস্থাপনের অঙ্গভঙ্গি - এই সবকিছুর মধ্যে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটা ছাঁদ আছে। আশালতা সিংহের পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি একটি কিশোরী ছাত্রীকেও সেই ছকের বাইরে আঁকতে চাননি।

'ছেঁড়ামোজা' গল্পের রক্ষণশীলতার চূড়ান্ত প্রতীক মিনির দিদিমা। যিনি ঝংকার দিয়ে বলে ওঠেন, -

> "চোদ্দো পনেরো বছরের ধাড়ি মেয়ে আর নেমন্তনে যায় না। মা বাপে আদর দিয়েই এতখানি বাড়িয়ে তুলেছে।"[২৯]

তৎকালীন সামাজিক ছবি দিদিমার উক্তিতে স্পষ্ট, স্পষ্ট মিনির বেদনাবোধও। যদিও মিনির মা মেয়েকে সাজিয়ে নেমন্তনে পাঠাচ্ছেন কিন্তু মুখে কন্যাকে সুশিক্ষা দিয়ে বলেন, -

> "দিদিমার কথায় মন খারাপ করতে নেই। বুড়োমানুষ কখন কী বলতে কী বলে ফেলেন, তার ঠিক নেই।"[৩০]

অর্থাৎ সামাজিক পরিকাঠামোটি ধরে রাখার দায়িত্ব মিনিদেরই। শ্রেণিতে শুধু প্রথম হলেই হবে না, সমাজের ভবিষ্যৎটিও যেন তার নতুন যুগের নীতি নিয়মের বোলচালে ধ্বসে না পড়ে তার দায়িত্ব নিতে হবে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদেরই। উপনিবেশের ইংরেজী শিক্ষায়, বিদেশী বাজনায় ছাত্রী দক্ষ হয়ে উঠলেও অর্থশাস্ত্রী কৌটিল্য এবং মনুসহ যতেক স্মৃতিশাস্ত্রীর বয়ানে গড়ে ওঠা পরিবার তথা সমাজটিকে কোন মতেই দুর্যোগে ফেলা যাবে না। পশ্চিমের ডাকে ঘরের ছেলেরা বাঁধন কাটলেও নারীশিক্ষা এমনভাবেই গড়ে তুলতে হবে যাতে ঘরের সংস্কৃতির ভরাডুবি না হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে, শৈশবের ধারণা দানা বেঁধেছে ষোড়শ শতকীয় মানবতাবাদী চিন্তন চর্চা থেকে। সপ্তদশ শতকের এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকভাস্বর যুগ, ঊনবিংশ শতকের ধ্রুববাদী ও হিতবাদী (Positivist & Utilitarian) ঘরানার মধ্য দিয়ে নাগাড়ে পুনর্মূল্যায়িত হতে হতে 'শৈশব' ধারণাটি বর্তমানের আকার পেয়েছে। এখন বলা যায় 'শৈশব' এর যেমন একটি কালিক মাত্রা আছে, তেমনই কিন্তু স্থানিক মাত্রাও আছে। অর্থাৎ সব শৈশব, কৈশোর একইরকম নয়, দেশে দেশে সে আলাদা। আবার রুশো তাঁর 'Emile' বইতে বলেছিলেন, -

"Nature wants children to be children before they are men"[৩১]

অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগে শিশুরা শিশুই থাক। তাই তাদের মনকে বলা হয় ট্যাবুলা রাসা বা শূন্যপট। শিশু কিশোর সম্পর্কে আধুনিক ধারণা যদি এমন হয় তাহলে বাংলা স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের মেয়েদের সঙ্গে বা এই শিশুসাহিত্যের পাঠকের সঙ্গে আচরণটি যথাযথ হল কি না প্রশ্ন ওঠে। নিষ্পাপ শিশুদের এমন সামাজিক আচারের মধ্যে ফেলা কি ঠিক হল? বাংলা স্কুল কেন্দ্রিক গল্পের কিশোরদের ক্ষেত্রে এমন কদাপি ঘটেনি; অথচ কিশোরীদের গল্পে যা অনায়াসে দেখা গেল।

আশালতা সিংহের 'মনস্তত্ত্ব' গল্পটি এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। বাবা, মা এবং কন্যা এবং তার পড়াশোনা করা উচিত কিনা এই নিয়ে তিনজনের মধ্যে টানাপোড়েন এই গল্পের উপজীব্য। বাবা নারীপ্রগতির প্রতিবাদে এবং মেয়েদের লেখাপড়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট জোরালো ভাষায় কলম ধরেন। এমনই একদিন সকালবেলা তিনি যখন খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত তখন -

> "...মেয়েটি আসিয়া আব্দারের সুরে কহিল, বাবা আমি স্কুলে ভর্তি হবো। বীণা, রমা, ইলা, বেবী সবাই তো স্কুলে পড়ে। অবনী বাবু বলছিলেন আমি যদি স্কুলে ভর্ত্তি হই খুব অল্প বয়সেই ম্যাট্রিক দেব। আমি যেন একেবারে আকাশ হইতে পরিলাম। বীণা, রমা, বেবী এসব যে একেবারে অতি আধুনিক নাম। অল্প বয়সে ম্যাট্রিক এসব ভয়ংকর কথা সুবোধিনী শিখিল কোথা হইতে?"[৩২]

সুবোধিনী মা ও বাবার মতোই ধারণা পোষণ করলেও ন'বছরের মেয়েটি ততদিনে আদর্শ হিসাবে সামনে পেয়ে গেছে স্কুল শিক্ষিকা ননীদিকে। তিনি ন'টার মধ্যে তৈরি হয়ে স্কুলে যান, সুন্দর এমব্রয়ডারিও করতে পারেন। তিনি আবার বলেন মানুষের নাম জিনিসটাও ফেলনা নয়, ওটাও সুন্দর হতে হয়। ননীদি 'সুবোধিনী' নামটি বদলে 'সুচরিতা' করার কথা বলেছেন। মেয়ের মনের ইচ্ছে বাবাকে ভাবাচ্ছে। সেখানে পাশের বাড়ির আরেক নবীন শিক্ষিত দম্পতির জীবনযাপনও প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই বাড়ির বৌটি গাছে জল দেয়, পোলাও মাংস রান্না করে, বরের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায় এবং ছেলেকে পড়ায়।

সুবোধিনীর বাবার মানসিক পরিবর্তনে দ্রুততা আসে–

> "সকালে উঠিয়া সুবোধিনীকে চুপিচুপি ডাকিয়া কহিলাম, আজ তুই স্কুলে ভর্তি হবি। আমার কাছে টাকা নিয়ে রাখিস। ফর্ম্ম আনিস, আমি সব লিখে দেবো, ভেবে দেখলাম আমার আপত্তি নেই। সুবোধিনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, ফর্ম্ম কবে এনে রেখেছি। ননীদি সব ঠিক করে দেবেন বলেছেন।"[৩৩]

স্কুলকেন্দ্রিক গল্প বা স্কুলের গল্পের মুখ্য বিষয় হল স্কুল চলাকালীন শিক্ষক-ছাত্র, ছাত্র-ছাত্র বা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ছাত্র-অভিভাবকদের সম্পর্কের গল্প। আলোচ্য গল্পটি এমনই এক গল্প যা স্কুলে প্রবেশের গল্প বলে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশেই এমন সম্ভব। আশালতা সিংহের এই গল্পটি এখানেই অভিনব। ইংরাজ আমলে যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারদের বহু প্রচেষ্টায় নতুন করে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন করতে হয়েছিল সেখানে এমন গল্প সমাজের দর্পণ।

নারীজাতির শিক্ষা যে শুধু তাকেই শিক্ষিত করে না, পারিবারিক জীবনচর্যার মান উন্নত করে এই বার্তাটি ও লেখিকা দিচ্ছেন। ধীরগতির ভারী নাম আধুনিক বাঙালি রমণী বিংশশতকে আর পছন্দ করেনি, নাম ক্রমে ছোটো হয়ে এক কথায় 'স্মার্ট' হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে লেখিকার নাম সংক্রান্ত এই উল্লেখ ভালো লাগে। গল্পটির মনস্তাত্ত্বিক আবহ আশালতা সিংহের লেখনীর জোরকেই প্রমাণ করে।

সুখলতা রাও এবং আশালতা সিংহের ইস্কুলের গল্পগুলির আলোচনা ব্যতিরেকে বাংলা শিশু সাহিত্যের বিশ্লেষণ কখনও সম্ভব নয়। নিজস্ব কথনভঙ্গি, শব্দচয়ন, পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্য তাঁদের বিশিষ্টতা দান করেছে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা', গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০৫
২. শর্মা, ঈশ্বরচন্দ্র, ‘বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ’, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৫, সরস্বতী সংস্করণ, পৃ. ২৯
৩. তদেব, পৃ. ৩০
৪. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, ‘বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’, গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ. ১০৫
৫. শর্মা, ঈশ্বরচন্দ্র, ‘বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ’, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৫, সরস্বতী সংস্করণ, পৃ. ৩২
৬. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, ‘বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’, গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ. ১০৫
৭. তদেব, পৃ. ১০৬
৮. তদেব, পৃ. ১০৭
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, (সম্পাদিত), ‘বালক’, পারুল, ২০১৩, পৃ. ২৫৩
১০. দেবসেন, নবনীতা, রক্ষিত, সমীর, গুপ্ত, শ্যামলী, (সম্পাদিত), ‘নারী তুমি অর্ধেক আকাশ’, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮০
১১. রাও, সুখলতা, ‘রচনা সংগ্রহ-২’, থীমা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১০৭
১২. তদেব, পৃ. ২৮
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সঞ্চয়িতা’, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬, পৃ. ২১৮
১৪. রাও, সুখলতা, ‘রচনা সংগ্রহ-২’, থীমা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১০৭
১৫. তদেব, পৃ. ২৩
১৬. তদেব, পৃ. ২৫
১৭. তদেব, পৃ. ২৭
১৮. তদেব, পৃ. ২৭
১৯. তদেব, পৃ. ৮২
২০. তদেব, পৃ. ৮১
২১. তদেব, পৃ. ৯৪
২২. সেন, অশোক, দাশমুন্সী, শুভেন্দু, (সম্পাদিত), ‘ইস্কুলের গল্প’, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ২০০২, পৃ. ১৯৩
২৩. তদেব, পৃ. ১৯৭
২৪. তদেব, পৃ. ১৯৭
২৫. তদেব, পৃ. ১৯৭
২৬. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, ‘বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’, গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ. ১১৪
২৭. সেন, অশোক, দাশমুন্সী, শুভেন্দু, (সম্পাদিত), ‘ইস্কুলের গল্প’, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ২০০২, পৃ. ৯৭
২৮. তদেব, পৃ. ১৯৩
২৯. তদেব, পৃ. ১৯৪
৩০. তদেব, পৃ. ১৯৫
৩১. Rousseau, Jean-Jacques, ‘Emile Book II’, translated by Barbara Foxley, New York, 1955, p. 54
৩২. দেবসেন, নবনীতা, রক্ষিত, সমীর, গুপ্ত, শ্যামলী, (সম্পাদিত), ‘নারী তুমি অর্ধেক আকাশ’, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮০
৩৩. তদেব, পৃ. ১৮৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 187 - 196
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শওকত ওসমানের প্রথম পর্বের গল্প : দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগের ভিন্ন আখ্যান

ড. প্রতাপ ব্যাপারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, শালবনি
Email ID : pratapbapari@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Shaukat Osman, Short Story, Rural Life, Famine, Communal Riot, Partition, Religious Hypocrisy.

Abstract

In Bengali literature, Shawkat Osman holds a distinguished position as a storyteller of rare talent. Known for his insightful perspective, satirical humour, profound social awareness, and bold impartial voice, Osman crafted a unique identity. As an astute observer of society, he captured the intricate dynamics of life, the diverse problems plaguing society, and the political turmoil of his time with exceptional skill. His literature seamlessly weaves personal experience with the complexities of social and political structures, creating an artistic reflection of the multifaceted world around him. Shawkat Osman was fearless and honest in his approach, speaking with clarity and a protester's spirit. His stories reveal a profound understanding of human life, using art to illustrate the evolving society and state. The shifting tides of society, politics, the instability of power, and the tensions between tradition and change are meticulously examined in his work, reflecting the currents of his era.

The core themes of famine, communal violence, and partition characterize his early stories. The social upheavals of this period are vividly depicted in his collections — 'Pinjarapol' (1951), 'Junu Apa and Other Stories' (1951), 'Sabek Kahini' (1953), and 'Bigoto Kale Galpo' (1987). As a socially conscious artist, Osman adeptly portrayed the changes and crises within society, particularly in rural settings. His stories highlight the relentless poverty and inequality that plague village communities, where people struggle daily under the weight of social, economic, and religious pressures. Victims of exploitative production relations, these individuals bear the pain of being uprooted and continually face hardship, losing what little they possess to the powerful in society. This sensitivity to the diverse crises of his time is delicately captured in the rich and nuanced narratives of his early short stories.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে শওকত ওসমান এক বিশিষ্ট প্রতিভাধর কথাশিল্পী হিসেবে নিজের আসন পাকা করেছেন। রচনাশৈলীতে বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যঙ্গমিশ্রিত রসবোধ, সমাজচেতনার নিবিড় উপলব্ধি এবং সাহসী ও নিরপেক্ষ কণ্ঠ তাঁকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। তিনি সমাজের গভীর পর্যবেক্ষক; জীবনের জটিল প্রেক্ষাপট, সমাজের বহুবিধ সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার খুঁটিনাটি তাঁর লেখায় অনন্য নৈপুণ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর সমাজ-রাষ্ট্রের জটিল উপাদান শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে। শওকত ওসমান ছিলেন সাহিত্যে যেমন নির্ভীক ও সৎ, তেমনই স্পষ্টভাষী ও প্রতিবাদী। তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে মানুষের জীবনচিত্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল চিত্রকে শিল্পগুণে ফুটিয়ে তুলেছে। যুগ-পরিবর্তনের ধারায় সমাজ ও রাজনীতি, ক্ষমতার অস্থির প্রবাহ এবং ঐতিহ্যের টানাপোড়েন সবকিছু তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি কালের গতিময় চেতনা-প্রবাহকে পাঠকের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর সাহিত্যে চিন্তার গভীরতা এবং মানবজীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশ করেছে।

শওকত ওসমানের গল্পকার জীবনকে একাধিক পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি তুলে ধরেছেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রতিচ্ছবি। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ভারতীয় সমাজ শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকারও হয়। যুদ্ধের প্রভাব সরাসরি আর্থিক ক্ষেত্রেও দেখা দেয়; ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বন্ধ হয়ে যাওয়া, ঔপনিবেশিক শাসকের মুদ্রানীতির কারণে মুদ্রাস্ফীতি — সবকিছু মিলিয়ে অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। এই দীর্ঘ শোষণ, শাসন, বিশ্বমন্দা এবং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে দেখা দেয় ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এর মাঝেই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ পাশ হয় মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাব বা ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’, যা মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমির দাবি তুলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেয়। ১৯৪১ সালে জাপানের ভারত আক্রমণ এবং পরের বছর গান্ধীজীর নেতৃত্বে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। এরই মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র দ্বি-জাতি তত্ত্বের ছায়ায় ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ঘটে যায় নির্মম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যার ভয়াবহ স্মৃতি এবং দেশভাগের বেদনা নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে শওকত ওসমান কলকাতা ত্যাগ করে চিরতরে চলে আসেন পূর্ব-পাকিস্তানে।

দারিদ্র্যের আবরণে ঘেরা দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশভাগ— এই ত্রিমাত্রিক ঘটনাবলিই শওকত ওসমানের প্রথম পর্বের গল্পগুলির কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। এই সময়ের অস্থির সমাজচিত্র তাঁর প্রকাশিত চারটি গল্পগ্রন্থে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে— ‘পিঁজরাপোল’ (১৯৫১), ‘জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প’ (১৯৫১), ‘সাবেককাহিনী’ (১৯৫৩) এবং ‘বিগত কালে গল্প’ (১৯৮৭)-তে। সমাজসচেতন এক শিল্পী হিসেবে, সমাজের পরিবর্তন ও সঙ্কটকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তা তাঁর গল্পের উপজীব্য হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে গ্রামীণ সমাজের সীমাহীন দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চিত্র, যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় চাপের ভারে ন্যুব্জ মানুষরা প্রতিদিন সংগ্রাম করছে টিকে থাকার জন্য। অসম উৎপাদন সম্পর্কের শিকার এসব মানুষ শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা বহন করে চলেছে; তাদের জীবনে বারবার আঘাত আসে, সমাজের ক্ষমতাধরদের হাতে তারা ক্রমাগত নিঃস্ব হয়। এই বৈচিত্র্যময় সঙ্কটের রেখাচিত্র শওকত ওসমানের এই পর্বের ছোটগল্পগুলোতে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে বিধৃত হয়েছে।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ ছিল ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষগুলোর একটি। ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ শুধু খাদ্যাভাবের ফল নয়; এর পেছনে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সম্পদ ও শস্য সরবরাহকে নিজস্ব সামরিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহার করে। এতে খাদ্য সরবরাহে সংকট দেখা দেয়। ফলে এই দুর্ভিক্ষ ছিল একপ্রকার মনুষ্যসৃষ্ট সংকট। এর পাশাপাশি রেশন ব্যবস্থায় অসম বন্টন নীতি, স্থানীয় প্রশাসনিক অরাজকতা এবং আড়তদারদের বেআইনি শস্য মজুতের কারণে বাংলার গ্রামাঞ্চলে চরম দুর্দশা নেমে আসে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গেই আসে মহামারী। অনাহারের পাশাপাশি কলেরা, ম্যালেরিয়া, অপুষ্টিজনিত কারণে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দুর্ভিক্ষের সময় সমাজের ধনীদের ভূমিকা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল অমানবিক ও শোষণমুখী। বিত্তবানরা নিজ স্বার্থে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও ধ্বংস করে দিয়েছিল এই সময়।

এই কঠিন বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পে। গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত সমাজের হৃদয়বিদারক চিত্র উঠে এসেছে। মন্বন্তরের কঠিন সময়ে গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে মুনাফাখোর চোরাকারবারি আব্দুল জলিল তরফদার ও পুলিন সাহা রাতের আঁধারে ধান-চাল নদীপথে পাচার করে। এই দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে গ্রামের মানুষ একদিকে খাদ্যসংকটে, অন্যদিকে কলেরার আক্রমণে বিপর্যস্ত। এই পরিবেশে পুলিশের ডেপুটি মুস্তাফিজ সাহেব এক রাতে নদীপথ পাহারা দিতে গিয়ে বিশ-ত্রিশ মণ চালসহ জলিল তরফদারের নৌকা আটক করেন এবং সেখানেই দুর্ভিক্ষের অমানবিক রূপ তার সামনে উন্মোচিত হয়। কিন্তু সেই অন্ধকার রাতেই, আরেকটি নৌকা আটকালে দেখা যায়, এক যুবক কলেরা আক্রান্ত মৃত স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এই যুবকের সঙ্গে ডেপুটি মুস্তাফিজের কথোপকথনে উন্মোচিত হয় দুর্ভিক্ষের স্বরূপ —

> "— খুন আমরা করিনি।
> — তবে কে খুন করেছে?
> — হ্যাঁ আপনারা। ঘুষে চোরা-কারবারের সহায় হোয়ে আপনারা, যারা মানুষের বাঁচার সব আশ্রয়"[১]

এই উক্তিতে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ উন্মোচিত হয়েছে, যা মজুতদারদের লোভ ও নির্দয়তার প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত দেয়। গল্পটি যেন একদিক থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার দলিল, অন্যদিকে মুনাফাখোর শ্রেণির অমানবিকতার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ।

'ভাগাড়' গল্পে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্বের পাশাপাশি সমাজের ক্ষমতাশালী শোষকদের নির্মমতার চিত্র অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। মনসব আলি কুইনাইন, চাল, আটা, চিনি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চোরাকারবারি চালিয়ে মন্বন্তরের মধ্যেও নিজের ধনসম্পদ বাড়িয়ে তোলে। দুর্ভিক্ষের কঠিন পরিস্থিতিতে, যখন গ্রামের লোকেরা খাদ্যাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, তখন সে কাউকে সামান্য অন্নদান করেনি, অথচ এখন সে তাদের গরুর মাংস খাওয়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু দরিদ্র মানুষগুলো এই দয়ার দান গ্রহণ না করে, সেই মাংস ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে। মনসব আলি এর প্রতিবাদ করলে—

> "ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে একজন জবাব দিলঃ পঞ্চাশ সনে কাউর গরে চাউল ছিল না। আপনি দিছলেন কি?"[২]

তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুধু খাদ্যাভাবের দুর্যোগই ছিল না; এটি মানুষের মানবিকতা, স্নেহ-মমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে সমাজকে এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছিল। মানুষ তখন আর কেবল মানুষ ছিল না; পরিণত হয়েছিল বাজারের পণ্য, কেনাবেচার সামগ্রীতে। দুর্ভিক্ষের তীব্রতায় অর্থের বিনিময়ে খাদ্য জোগাড় করা দুরূহ হলেও জীবন্ত নারী ও শিশুদের বিনিময়ে লেনদেন তখন সম্ভব ছিল। এই মানবিক সঙ্কট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, অভাবী বাবা-মায়েরা কখনও সন্তানকে বিক্রি করে দেন কিছু অর্থের বিনিময়ে, আবার কখনও নিঃস্বতার গ্লানিতে নিঃস্বার্থভাবে তুলে দেন বিত্তবানদের হাতে। 'হুকুম নড়ে না' গল্পে ফুটে উঠেছে এমনই এক মর্মন্তুদ পরিস্থিতি —

> "এমন সময় ভিখারিনি মেয়েটাকে দুই হাতে তুলে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, কারো যদি দয়া হয়, হুজুর, মেয়েটাকে নিয়ে যান। আমার কাছে থাকলে না খেয়ে মরে যাবে। কারো যদি মেহেরবানী হয়।"[৩]

এটি শুধু মন্বন্তরের এক গল্প নয়; বরং মানবিকতার অপচয়ের এক নির্মম দলিল, যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী বস্ত্র-সংকট কেবল একটি সাধারণ দুর্যোগ ছিল না; এটি সমাজের মনুষ্যত্বকে এক নির্মমভাবে উলঙ্গ করে দিয়েছিল। খাদ্যের সংকটের সঙ্গে ছিল বস্ত্রের এতটাই অভাব যে, তা সমাজের দেহ ও মানসিকতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। মন্বন্তরের দুঃসহ কষ্ট এবং বস্ত্র-সংকটের করুণ রূপ আমরা যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে পাই, তেমনি শওকত ওসমানের 'কাঁথা' গল্পেও এর প্রতিফলন দেখি। এই গল্পে গৃহস্থ

চাষি লতিফ ও তার স্ত্রী বরু-বিবির একমাত্র শাড়ির দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে তাদের অপার লাঞ্ছনার কাহিনি ফুটে উঠেছে। তাদের সংসারে এতই অভাব যে, শাড়ির অনুপস্থিতিতে বরু-বিবি কাঁথা জড়িয়ে দৈনন্দিন লজ্জা নিবারণ করতে বাধ্য হয়, যা প্রায়ই তাঁদের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। গল্পকারের ভাষায় এই সংকটের দুঃখগাথা ফুটে উঠেছে —

> "অনুরোধের ভঙ্গীতেই হঠাৎ লতিফ কাঁথা ধরিয়া টান দিল। একি! বরু-বিবি একদম উলঙ্গ। বিবস্ত্রার চেয়েও বেশী লজ্জা পাইয়া কাঁথা ছুড়িয়া দিল লতিফ স্ত্রীর উপর।"[৪]

দৃশ্যটি যেন চিরন্তন বঞ্চনার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। কেবল বাহ্যিক বস্ত্রের অভাব নয়, বরং মানবিক মর্যাদার চরম অবনতির যে এক নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি, তারই দলিল এই গল্প।

তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পর বাঙালি সমাজকে আরেকটি চরম পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছিল ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার এই বিস্ফোরণ, এক অর্থে, রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দীর্ঘদিনের প্ররোচনার ফল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে সমাজের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে রেখেছিল, যা শেষপর্যন্ত বিস্ফোরণ আকারে প্রকাশ পায়। এই দাঙ্গার পর, প্রহসনের মতো করেই দুই পক্ষ নিজেদের 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'শান্তি কমিটি' স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে এ ধরনের কমিটি গঠন ছিল অর্থ সংগ্রহের একটি উপায়, যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের জন্যই লাভজনক ছিল। 'চুহা-চরিত' গল্পে ছেচল্লিশের দাঙ্গার ক্ষত এবং রাজনৈতিক কূটকৌশলের ভয়াবহ পরিণতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে —

> "দাঙ্গা চলিতে লাগিল। শান্তি কমিটি গজাইতে লাগিল। অনেক লোক চিচিং ফাঁক হইয়া গেল।"[৫]

এই ব্যঙ্গের ভাষায় ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজের অসহায়ত্ব আর রাজনৈতিক শক্তির নিদারুণ অমানবিকতা। শান্তি রক্ষার নামে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল, তা আসলে সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও অনিশ্চিত ও বিপন্ন করে তুলেছিল।

'থুতু' গল্পে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের দুঃখ-বঞ্চনার এক গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফাদার জোহানেস এক সৎ ও ধর্মপরায়ণ যাজক হলেও সমাজের দুঃখ-দুর্দশা তার দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফাদারের গৃহভৃত্য মনসুর, তার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট ও শোককে নিয়ে অসহায়ভাবে দিনযাপন করে। এই শোক ও যন্ত্রণা মূলত তার মা ও বোনের মৃত্যু। তারা মারা যায় পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে, যা ঔপনিবেশিক শাসনের বৈষম্য ও শোষণের পরিণতি। মনসুরের ক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রতিশোধের রূপ নেয় এবং এই প্রতিশোধের উপায় হিসেবে সে বেছে নেয় তার শরীরে বাসা-বাঁধা যক্ষ্মার জীবাণু। ব্রিটিশ জনস্টন পরিবার এবং ফাদার জোহানেসের খাদ্যে মনসুর গোপনে নিজের থুতুর মাধ্যমে যক্ষ্মার জীবাণু মিশিয়ে দেয়। ফাদার জোহানেস যখন তার এই কাজের কারণ জানতে চান, মনসুর তার দায় স্বীকার করে। গল্পকারের ভাষায় —

> "ফাদার জোহানেস পাথরের মত স্তব্ধ হোয়ে বসে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেনঃ তোম মেরা খানামে থুক্ দেতা?
> — কভি কভি, ফাদার।
> মনসুর নির্ভীককণ্ঠে জবাব দিচ্ছে।
> — কিঁউ এয়সা কাম করতা?
> — মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী- মেরা মা-
> মনসুরের গলা বুজে আসে। হঠাৎ মিইয়ে যায় সে। বক্তব্যের প্রকাশ-স্রোত ঝড়ে স্তব্ধ যেন।"[৬]

মনসুরের এই প্রতিশোধ কোনো ব্যক্তিগত বঞ্চনা নয়; এটি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের নিপীড়িত অংশের চাপা বিদ্রোহের প্রতীক, যা গল্পের মাধ্যমে এক গভীর প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে ওঠে।

জমিদার শ্রেণির প্রবল অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার প্রদর্শন, নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি তাদের অবহেলা এবং পশুর প্রতি কৃত্রিম সমবেদনাকে গল্পকার তীক্ষ্ণভাবে ব্যঙ্গ করেছেন 'পিঁজরাপোল' গল্পে। গল্পে মহারাজা গণ্ডেরীরাম এক সাদা গাভির মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে একটি বিশাল পিঁজরাপোল বা পশুর ক্লেশ নিবারণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় পাঁচশ বিঘা জায়গাজুড়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে পশুদের জন্য যেমন বিপুল আয়োজন, তেমনি মহারাজার নিজস্ব আরামদায়ক বাংলো এবং বাবুদের কোয়ার্টারও রয়েছে। কিন্তু বিপরীতে পশুদের দেখাশোনা করা চাকরদের জন্য নেই কোনো পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা— তারা পশুদের কোয়ার্টারে ঠাসাঠাসি করে বসবাস করে। এখানে ধনী শ্রেণির পশুর প্রতি যত্ন ও ভালোবাসা এবং নিম্নবিত্তের প্রতি উদাসীনতা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। নাইট উপাধিপ্রাপ্ত আসাদ আলীর গাভি যেমন আরামদায়ক মশারির নিচে থাকে, তেমনই অন্যদিকে কর্মচারীদের মশারি কিংবা ন্যূনতম জীবনযাত্রার সুবিধাও নেই। বিশ বছর ধরে মাত্র কুড়ি টাকায় চাকরি করতে থাকা এই প্রভুভক্ত মারু মিয়া আশা করেছিল, একদিন তার বেতন বাড়বে। গল্পকারের ভাষায়—

> "কিন্তু মারু মিয়ার মানস জগতের বিধাতারূপে শওকত ওসমান জানে, সে ভেবেছিল তার বেতন বাড়বে একদিন। এক কুড়ি টাকায় সে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। আরো কুড়ি বছর পরে পিঁজরাপোল বেড়েছে। কিন্তু মারু মিয়ার বেতন তেমনি অচল দাঁড়িয়ে আছে।"[৭]

নিপীড়িত মানুষের অসহায়ত্ব, ধনিক-শ্রেণির স্বার্থপরতা এবং উপেক্ষার চিত্রটি নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে এখানে।

'বকেয়া' গল্পটি জমিদারতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা ও সমাজের অসাম্যের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পাঁচু, যিনি একসময়ে জমিদারের বিশ্বস্ত পেয়াদা ছিলেন, কিন্তু সময়ের প্রবাহে জমিদারের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েন। জমিদারের কাছে খাজনা বকেয়া থাকায়, তিনি পাঁচুকে তার পৈতৃক ভিটে ছাড়তে বাধ্য করেন। এই নিষ্ঠুর নির্দেশের ফলে পাঁচু তার বসতভিটা হারিয়ে পথে বসে। গল্পের বেদনাদায়ক মুহূর্তটি আসে যখন পাঁচুর মেয়ে টুনি অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সন্তানের প্রতি গভীর মমতায় পাঁচু তার মেয়ের মৃতদেহ একটি কলা গাছের ভেলায় ভাসিয়ে জমিদারের পুকুরে ভাসিয়ে দেয়। এ তার মতো হতদরিদ্র গরীবের সামান্য প্রতিবাদ। জমিদার, যিনি জীবিত টুনির জন্য সামান্য কুড়ি টাকা মাফ করতে রাজি হননি, সেই তিনিই টুনির মৃতদেহকে 'সরস্বতীর আশীর্বাদ' হিসেবে গ্রহণ করেন। জমিদার এই আশীর্বাদের জন্য তিনশো টাকা দান ও পূজার আয়োজনের নির্দেশ দেন, যা জমিদারের ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুর মনোভাবকে প্রকাশ করে। শওকত ওসমান জমিদারতন্ত্রের এই নির্মম ও কপট আচরণের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। জমিদারতন্ত্রের ঠুনকো ভক্তি ও উপহাসাত্মক পূজার আড়ম্বরের পেছনে সাধারণ মানুষের দুর্দশার আখ্যানটি তীক্ষ্ণভাবে উন্মোচিত হয়েছে —

> "জমিদার বাবু গলার উড়ানি জড়াইয়া বার বার মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তিগদগদ হৃদয়। তাই দুই চক্ষুর অশ্রু উপচিয়া পড়িল।"[৮]

গল্পটির মাধ্যমে সমাজের শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি গভীর প্রতিবাদ ও সমবেদনার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের নির্মম বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে 'দুই চোখ কানা' গল্পে। মুনশী, যিনি নিজের শ্রম ও সততায় মালিক চৌধুরীর কারখানার উন্নতির ভিত্তিপ্রস্তর গেঁথেছেন, তিনি মালিকের কাছে শুধুমাত্র আরেকটি ব্যবহৃত সম্পদ। যতক্ষণ তার শ্রমে কারখানার লাভ বৃদ্ধি পায়, ততক্ষণই তিনি দরকারি; কিন্তু যখন আধুনিকায়নের অজুহাতে দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তিনি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যান। মুনশীর প্রতি অবজ্ঞা ও অপমানের এই রূপ শ্রমিকশ্রেণির সার্বিক দুরবস্থারই পরিচায়ক। মুনশীর দীর্ঘ পরিশ্রম, তার নিবেদিত শ্রম, অবশেষে মালিকের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ মুনশীর শেষ আশা ছিল তার বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে রাখা শ্রমের বিনিময়ে এক টুকরো নিরাপত্তা, কিন্তু মালিকের কাছে তা কেবল হিসাবের খাতায় একটা সংখ্যামাত্র। মালিক চৌধুরীর লোভ ও স্বার্থপরতার পেছনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণির প্রতি শোষকশ্রেণির বৈরী মনোভাব। মুনশীর অসহায় আর্তি যেন শ্রমিকশ্রেণির চিরকালীন প্রশ্ন হয়ে ফুটে ওঠে —

> "হুজুর, কত বছর এখানে কাটিয়ে দিলাম, এই বুড়ো বয়সে ছেলে-পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব?"[৯]

কিন্তু শোষণের নির্মমতায় এই কাতর প্রশ্নগুলো কেবলই নিস্তব্ধ প্রতিধ্বনির মতো ফিরে আসে। শ্রমিকশ্রেণির শোষণের এই চিত্র সামাজিক সত্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করিয়ে দেয়— যেখানে লাভ-ক্ষতির কাছে মানবিকতা মূল্যহীন এবং যে শ্রমিকদের তিলে তিলে নিঃশেষ করা হয়, তাদের মেধা ও শ্রমও নিঃশেষের পর আর কোনো মূল্য রাখে না।

'সাদা ইমারত' গল্পটি হাসিনা নাম্নী নারীর পরিত্যক্ত জীবনের লাঞ্ছনার রূপরেখা। অসুখে ভুগছে বলে স্বামী তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর, অতি দরিদ্র পিতা কালুর সংসারে ঠাঁই নেয় সে। কালুর উপার্জনের পথ চৌর্যবৃত্তি। এই কাজে হাসিনার আপত্তি থাকলেও সংসারের তাগিদে সেও এই কাজের শরিক হয়। একদিন কলা চুরির মত তুচ্ছ কাণ্ডে বাবার সঙ্গী হলে, পথে খেজুরের কাঁটা বিধে যায় তার পায়ে, সেখান থেকে সংক্রমণ হয় এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। তাকে ভর্তি করা হয় এক বিশাল সাদা হাসপাতাল ভবনে। কিন্তু সেখানে কিছুদিন কাটার পর হাসিনার দেখা দেয় নতুন অসুখ— বসন্ত। ডাক্তার বসন্ত রোগীকে সেখানে রাখতে নারাজ। হতভাগ্য হাসিনাকে তাই ফিরে আসতে হয়। বাড়ি ফেরার সময় পথেই থেমে যায় তার জীবন-প্রবাহ। তার মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনায় গল্পকার বলেন—

> "হাসিনা একনিষ্ঠ চোখে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে, যেন আল্লাহর প্রশান্ত নীল আকাশের অভিমুখে।"[১০]

যে 'সাদা ইমারত' তাকে সুস্থ জীবনে ফেরার আপাত আশ্বাস দিয়েছিল, চরম সংকটকালীন মুহূর্তে সেই সাদা ইমারতই তাকে ত্যাগ করলো। সাদা ইমারত সম্পর্কে এক সময়ের কৌতূহলী, রোমাঞ্চিত হাসিনা সমাজ, সংসার, এমনকি পৃথিবী থেকেও চিরতরে বিদায় নেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর প্রতি অবহেলা আর দারিদ্র্যের নির্দয় প্রহার যে নারীজীবনকে পঙ্গু করে দেয়, তারই করুণ চিত্র গল্পটি।

'ব্যবধান' গল্পে দেখা যায় স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, উচ্চবিত্তের গর্ব এবং ভদ্রতার আড়ালে অন্তরের সংকীর্ণতা কীভাবে সম্পর্কের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি করে। রাসেদী দরিদ্র হওয়ার কারণে তার দুই বিত্তবান ভাইয়ের কাছ থেকে তুচ্ছার্থিক কারণে উপেক্ষিত হয়। একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আরেকজন নামকরা ব্যবসায়ী— প্রতিপত্তি আর আভিজাত্যের দম্ভে তারা নিজেদেরকে ভদ্র সমাজের প্রতিনিধি মনে করে। এই কৃত্রিম ভদ্রতা রাসেদীকে তাদের রক্তের সম্পর্ক থেকেই বিচ্ছিন্ন করে তোলে। তবু মাতৃহৃদয় থেকে সন্তান দূরে সরে না। মামী নুরী বিবির নিখাদ মমতা আর মঙ্গল কামনা প্রাচুর্যের চৌকাঠ মাড়ায় না, বরং নিঃস্ব রাসেদীর জন্য তার মনের আকুতি আরও গভীর হয়। সমাজের যক্ষপুরীতে বসবাস করেও নুরী বিবি অভিজাত জীবনযাপনের আস্বাদ পান না; তার মতোই নিঃসঙ্গ তার বিত্তহীন পুত্রসম ভাগ্নেয় রাসেদীও। বৃদ্ধা হওয়ার কারণে নুরী বিবির সঙ্গে ছেলে-বউয়েরও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। নুরী বিবি, রাসেদীকে জানায় —

> "একা নিচে পড়ে থাকি, কেউ খোঁজও নেয় না, বাবা। কয়েদীর মতো সময় সময় খাবার দিয়ে যায়। হাত-খরচা বলে দুটো পয়সাও দেয় না।"[১১]

এ যেন প্রাসাদে থেকেও এক দুঃখময় বন্দিত্ব, যেখানে সেও আর দশজনের মতোই একজন উপেক্ষিত হতভাগ্য নারী। অর্থ সাহায্য না পাওয়া নিরাশ রাসেদী যখন বিত্তশালী ভাইদের কাছ থেকে ফিরে আসে, তখন তার চলার পথে এই সম্পর্কের ভঙ্গুরতা আর নিঃসঙ্গতার ব্যথা চিরন্তনভাবে ফুটে ওঠে —

> "এখানে বাহির দিগন্তের সীমানা, বিশাল মাঠের সূচনা। দশ-ক্রোশ পথ সম্মুখে। সড়কের পথে রাসেদী অনুভব করে সে আজ একা পরিব্রাজক নয়। তাহার দুই পাশে দুইজন যাত্রী। দুই জনের ছায়া-মূর্তি তার কাছে বাস্তব। একজন জান্নাৎ-বাসিনী জননী আর একজন ইহলোক বাসিনী মা-মা-।"[১২]

সমাজ এবং ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা বিকাশের প্রতিটি স্তরে ধর্মের ভূমিকা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তবে আস্তিক-নাস্তিক, ধর্মে আস্থাশীল ও ধর্মে আস্থাহীন মানুষের বিভিন্ন মাত্রার অভিব্যক্তির মাধ্যমে ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা দেখা যায়। অথচ এই ধর্ম কখনও কখনও শাসকশ্রেণির জন্য দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষকে শোষণের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এমনই এক ধর্মীয় ভণ্ডামীর পরিচয় পাওয়া যায় 'মো'জেজা' গল্পে। এই গল্পে দেখা যায়, গল্পকারের গ্রামে হঠাৎ উদয় হয়েছে জহুর মিয়া নামের সাতাশ বছরের এক যুবক। যুবকের মধ্যে অলৌকিক শক্তির আভাস পেয়ে যায় গ্রামের সাধারণ মানুষ। মক্তবের মৌলবী সাহেব তাকে আশ্রয় দেন। প্রথমে জহুর মিয়া তোতলামির ভান করে, কিন্তু পরে স্পষ্ট স্বরে কোরাণ পাঠ করে সবাইকে চমকে দেয় এবং দাবি করে, তাকে স্বয়ং জিব্রাইল আশীর্বাদ করে গেছেন। এই দাবি শুনে গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে তার প্রতি ভক্তি জাগ্রত হয়। গল্পকারের ভাষায় —

> "যাত্রীর শেষ নাই। যাত্রী আসিতেছে। সঙ্গে পয়সা আসিতেছে। সিকি, দুয়ানি, টাকা। কয়েকজন তো আবার শত টাকার নোটও ছুঁড়িয়া দিল।"[১৩]

কিছুদিন পরে, জহুর মিয়া সেই জমা হওয়া দানের টাকা আত্মসাৎ করে আচমকাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। গল্পকার তার এই তিরোধানের রহস্য উদঘাটন করেন পনেরো বছর পরে। দেখা যায়, পূর্ব পরিচিত এই জহুর মিয়া এখন নিজেকে হুজুর হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি ভিন্ন এক স্থানে, পীরের পরিচয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের ভক্তি আদায় করছেন। তার প্রভাব তখন গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। কথকের বন্ধু মুস্তাফা খানের নির্বাচনে সুপারিশের মাধ্যমে হুজুর সাহেব বলেন —

> "আমার পেয়ারা মুরিদান। এ-বার আপনাদের এলাকায় সদস্য পদ-প্রার্থী মৌলভী খান সাহেব, আমার সাচ্চা মুরিদান আপনাদের মতোই আমার পেয়ারা। পীর-ভাইএর ইজ্জৎ আপনারা রক্ষা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। আরজ গোজার শাহ সুফী।"[১৪]

শুধু তাই নয়, কথকের বন্ধু মুস্তাফা খান কৃত্রিম দাড়ি পরে ছবি তুলে, সেই ছবি নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করেছে। গল্পের প্রতারক জহুর, যে এখন ভণ্ড পীর হুজুর হিসেবে পরিচিত এবং কথকের বন্ধু মুস্তাফা খান— দুজনেই ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। জহুর তার জীবিকার জন্য সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে তাদের থেকে অর্থ আদায় করে, আর মুস্তাফা খান তার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। মুস্তাফা খানের কথায়, রাজনৈতিক কৌশলে ধর্মকে ব্যবহার করা যেন সাধারণ ব্যাপার। সে অকপটে বলে ফেলে —

> "কলকাতা গিয়েছিলাম ওইজন্যে। একটা নকল দাড়ী কিনতে হোলো। এই এলাকায় বড় ইলেকশনে বড় জব্দ হতাম নচেৎ। নিজে গেলাম না। ফটো আর আমার সার্টিফিকেট নিজের পেটুয়া লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।"[১৫]

এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট, ধর্মকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। এভাবে ধর্ম সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে এক ভোগ্য বস্তু হয়ে উঠেছে, যা প্রতারক এবং ক্ষমতালোভীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

'খোওয়াব' গল্পে ধর্মীয় ভণ্ডামির এক অনন্য চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মৌলানা সাহ হরক তুল্লাহ এখানে স্বঘোষিত ধার্মিক, যিনি ধর্মের নাম ভাঙিয়ে লোভ ও লালসার খেলা চালিয়ে যেতে অকুতোভয়ে বদ্ধপরিকর। গল্পে দেখা যায়, তার শিষ্য সওহর আবেগের বশে স্ত্রী রাবেয়াকে তালাক দেয়। পরে ভুল বুঝতে পেরে আবারও তাকে ঘরে তুলতে চায়। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের নিয়মে এটি সহজ নয়; স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে তাকে একবার অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহে প্রবৃত্ত করতে হবে। সেই পরপুরুষের সহবাসের পরই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা সম্ভব। গল্পের নাটকীয়তায়, সওহর তার স্ত্রীকে পীর কেবলার সাথে বিয়ে দিয়ে পরে তালাকের আশায় থাকে। কিন্তু কামনাপরায়ণ পীর তালাক দিতে অস্বীকৃত। গল্পকারের ভাষায় —

> "দরখাস্ত মঞ্জুর হোলো। কিন্তু ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো না। প্রথম রাত্রি যাপনের পর হুজুর বললেন, একজন বেকসুর বে-গোনা আওরৎকে তালাক দিয়ে গোনার ভাগীদার হোতে পারব না। মাল হাত-বদল হোয়ে গেলো। তারপরই শ্রীমতি পীর সাহেবের হেফাজতে (জিম্মাদারীতেও বলা চলে) আছেন। সুন্নত আদায়ের শেষ মওকা দিয়েছেন বলে সওহর-রত্নর রাবেয়ার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। রতনেই রতন চেনে।"[১৬]

ধর্মের নামাবলি পরা মৌলানা হরক তুল্লাহ, তিনজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্যের স্ত্রীর উপর লালসা চরিতার্থ করলে, তার বিবেক নীরবতা ভেঙে তাকে শয়তানের মুখোমুখি করে দাঁড় করায়। আসলে এই শয়তান তো তার নিজেরই নির্মল বিবেক। সেই বিবেকই তাকে সত্যের পথে প্ররোচিত করতে চায়। পীরের মনের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে গল্পকারের কথায়—

> "হুজুর হঠাৎ অনুভব করে কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে। বুক বেয়ে দর দর ঘাম ছুটছে। শয়তানের ভয়ে টিমটিম আলো জ্বলত সারারাত্রি। হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা চোখ খুললেন হুজুর। তার এক হাত নিজের গলদেশে অপর হাত রাবেয়ার শীর্ণ কণ্ঠে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। রাবেয়ার জিব বেরিয়ে গেছে। নিস্পন্দ মুখগহব্বর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।"[১৭]

এ গল্পে রাবেয়ার মতো এক নিরীহ নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভণ্ডামি ও কামলালসার নির্মম শিকার হয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে পরস্ত্রীকে চিরকাল ভোগ করার যে স্বপ্ন দেখেছিল পীর কেবলা, সেই 'খোওয়াব' বা স্বপ্নই দুঃস্বপ্নের মতো শয়তান হিসেবে তার জীবনে হাজির হয়ে তাঁর মুখোশ উন্মোচন করেছে।

শওকত ওসমানের গল্পগুলির মূলে রয়েছে গ্রাম-বাংলার জীবনচিত্র, যেখানে ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে নিমজ্জিত গ্রামবাসীর দারিদ্র্য, কষ্ট ও সীমাহীন দুর্ভোগই প্রধান উপজীব্য। এই গল্পগুলোতে গ্রামীণ জীবনের টানাপোড়েন, সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার আকুতি যেন এক মহাকাব্যের রূপ লাভ করেছে। সুখ-দুঃখের পারস্পরিক মিশ্রণে গড়ে ওঠা এই মানবিক চিত্রই শওকত ওসমানের প্রথম পর্বের গল্পগুলোর মূল সুর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'ইলেম' গল্পটির কথা। আলোচ্য গল্পে জহির মিয়া, পেশায় এক অতি সাধারণ মাঝি হলেও, নিজের অন্তরের এক অদম্য তাগিদে তিনি তাঁর পুত্র সমিরুদ্দিনকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে মনপ্রাণ ঢেলে দেন। তাঁর অশিক্ষিত জীবনের অভাব-অনটনের চাপে পিষ্ট থেকেও তিনি সন্তানের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথে কোনো ছায়া পড়তে দেন না। দারিদ্র্যের কঠিন কষাঘাতকে সহ্য করেও জহির মিয়া সেই উজ্জ্বল দিনের স্বপ্নে বিভোর থাকেন, যে দিন তাঁর সন্তান শিক্ষার আলোয় একটি দুঃখহীন, দারিদ্র্যমুক্ত জীবন গড়ে তুলবে। কিন্তু সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই স্বপ্নে বিপর্যয় নেমে আসে। একদিকে অসুস্থতার হাত থেকে মুক্তির আশায় যখন তিনি ডাক্তারের ঔষধে স্বস্তি খুঁজে পান না, তখন আশ্রয় নেন আফিমে। এরই মাঝে কাস্টমস অফিসারের চোখে পড়লে আফিম রাখার দায়ে তাঁকে মারধর করে এবং থানায় নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। পরিত্রাণ আসে এক কনস্টেবলের হাত ধরে— মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে। কিন্তু এই পুরো ঘটনায় জহির মিয়ার চোখে শিক্ষিত সমাজের একটি কুৎসিত চেহারা ফুটে ওঠে, যাকে তিনি কেবলই দেখে এসেছিলেন আলোর উৎস হিসেবে। তার মনে এক গাঢ় ধারণার জন্ম নেয়— এই তথাকথিত শিক্ষিতরা আসলে নীতিহীন, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর। এবং এখানেই ঘটে তাঁর মোহমুক্তি। পুত্রের শিক্ষার স্বপ্নটি তিনি নিজেই নস্যাৎ করে দেন, কারণ তাঁর কাছে মনে হয়, এই শিক্ষা কেবলই সুট-টাই পরা লোকদের আড়ালে থাকা কপটতার মুখোশ। তাঁর হতাশার ভাষায় ফুটে ওঠে সেই তিক্ততা—

> "হালার ইলেম! সুট বুট আর গুস। আরে বুট-সুট মারানীর পুত। সুট পাছাৎ, গুস মুখে, এই ইলেমে হৈব কী? বেজম্মার জাত!"[১৮]

এই একখণ্ড অভিজ্ঞতায়, জহির মিয়ার মনে শিক্ষিত সমাজের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, আর সেই শিক্ষা যা তাঁর জীবনের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে, তার প্রতি বিদ্বেষে তিনি তার সন্তানকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে নিজের জীবনের সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।

'তুচ্ছ স্মৃতি' গল্পটি সীমাহীন দারিদ্র্যের অনিবার্য পরিণতি চিত্রিত করেছে। আহাদ মিয়া তরমুজের খেতে দাঁড়িয়ে হারানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে; তার মেয়ে জাহানারার মুখের শেষ বায়নাটিই তার অন্তরে গভীর ক্ষতচিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে। বিগত বছর জাহানারা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মৃত্যুর আগে শুধু একবার তরমুজ খেতে চেয়েছিল, এমন ছোট্ট একটি ইচ্ছে, যা তার দরিদ্র পিতার সাধ্যের অতীত ছিল। গল্পকারের ভাষায়—

> "না, আমাকে তরমুজ দাও— তরমুজ দাও। ...কচি ওষ্ঠের সেই শেষ মুখর গুঞ্জরণ।"[১৯]

এই গল্পের আখ্যান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্পের সহায়হরিকে মনে করিয়ে দেয়। সেখানে ক্ষেন্তির জন্য সামান্য পুঁইশাক জোগাড় করতে পারেনি সহায়হরি। এখানেও দেখা যায় একই বেদনাবিধুর পরিণতি। জাহানারা ও ক্ষেন্তি, দুজনেই দারিদ্র্যের নির্মম ছোবলে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। তাদের শেষ চাওয়া পূরণ করতে না পারা বাবা-মায়ের বুকে রয়ে গেছে শূন্যতার অনিঃশেষ ব্যথা।

'নতুন জন্ম' মানবজীবনের কঠোর সংগ্রামের নিখুঁত চিত্রায়ণ। ফরাজ আলি ও তার পুত্র আক্কাসের সংসারে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যেন এক চিরকালীন সংকট। জীবিকার প্রধান অবলম্বন গোমতী নদী— নদীর বুকে নৌকা চালানোই তাদের জীবনের পথ। কিন্তু গোমতীর চিরন্তন ভাঙন আর প্রতিকূল স্রোত, কখনো কখনো ভয়ংকর রূপে হাজির হয়ে এই নদী তীরবর্তী মানুষদের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। গল্পের শেষ দৃশ্যে, বন্যার তাণ্ডবে সব হারিয়ে ভেসে যাওয়া সংসারের ধ্বংসাবশেষের মাঝে ফরাজ আলি ও তার পুত্র আক্কাস কেবল অপেক্ষা করে নতুন ভোরের। গল্পকার লিখছেন—

"বিবস্ত্র পিতার পাশে গামছা-পরিহিত পুত্র। দুইজনে ভোরের প্রতীক্ষা করে।"[২০]

এই অপেক্ষার মাঝেই যেন তাদের সংগ্রাম ও অদম্য জীবনীশক্তি ফুটে ওঠে— এক নতুন দিনের আশায়, নতুন জীবনের আশা।

'প্রতীক্ষা' গল্পেও গ্রামীণ সমাজের শোষণ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। গল্পের বাকের চরিত্রের মাধ্যমে শাসকশ্রেণি ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যকার ব্যবধান তুলে ধরা হয়েছে। স্ত্রী তাহেরার চিকিৎসার জন্য মাত্র ষাট টাকায় নিজের তিন বিঘা জমি বন্ধক রেখে সেই জমির পুনরুদ্ধারে আট বছর পেরিয়ে গেলেও বাকেরের মতো সাধারণ মানুষের জীবনের অসহায়ত্ব মখদুম সাহেবের কাছে কোনো গুরুত্বই পায়নি। রোগশয্যায় থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বাকের। গল্পকারের ভাষায় —

> "বাকের চাহিয়া থাকে। ঐত সড়কের পথ। কোন পথিক আসে না। বাতাসে পদধ্বনি শোনা যায় না। বাঁশ-বন শুধু-শুধুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ...বৈকালে তাহেরা আসিয়া দেখিল, বাকের সড়কের দিকে চাহিয়া আছে, সে-চোখে শুধু এতটুকু দৃষ্টিও নাই, নিষ্পলক চাহিয়া আছে মাত্র।"[২১]

'দেনা' গল্পে কাবুলিওয়ালা আগা সলিমের নির্দয় মনোভাব ও নিঃস্বার্থবিহীন বাণিজ্যিক চরিত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। সলিমের মূল উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে অর্থলাভ— এমনকি এতিম শিশু ভুলী এবং তার দুঃস্থ নানি আবিদন বিবির প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি বা মানবিকতা পর্যন্ত তার স্বার্থবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। গল্পে দেখা যায়, আবিদন বিবি ভুলীর জন্য জামাটি বাকিতে নিলেও, তার মৃত্যুর পর দু'বছর পার হয়ে গেলেও সলিম সেই ঋণ আদায়ে নির্মম ও অবিচল রয়ে যায়। আবিদন বিবি ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হলেও তার করুণ অবস্থা সলিমের নির্দয় বাণিজ্যিকতার পথকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। গল্পকারের ভাষায়, সলিমের অমানবিকতা যেন ক্ষুদ্র এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> "সলিমও হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় নিশিগ্রস্ত রোগীর মত। আবিদন বিবির ঠোঁটে কি যেন বলার প্রচেষ্টা চলছিল। সলিম আর বিলম্ব করল না। চকচকে টাকাটী খপ করে হাতে তুলেই সে দ্রুত পদক্ষেপে পলাতক চোরের মত পৈঠা বেয়ে ভিটা থেকে নেমে পড়ল।"[২২]

গল্পটি এভাবেই পাঠকদের কাছে এক কাবুলিওয়ালার বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি এবং মানবিকতাহীন নিষ্ঠুরতাকে প্রকাশ্যে হাজির করে, যেখানে তার চোখে স্বার্থবুদ্ধির জয় সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

'শেখজী' গল্পে লেখক এক অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং জীবন-সংগ্রামে অবিচল একজন শ্রমজীবী মানুষের চিত্র এঁকেছেন। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মোড়ানো এই চরিত্রটি সমাজের সাধারণ মানুষের একজন প্রতিনিধি। তিনি কখনো লন্ড্রিশ্রমিক, কখনো রাজমিস্ত্রী বা কারখানার শ্রমিকের ভূমিকায় নিযুক্ত থেকে জীবনের কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন। সমাজের মানুষদের স্বার্থবুদ্ধি ও চতুরতা দেখে ক্রমেই তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে তিনি একসময়ে হাকিমির পেশাকে গ্রহণ করেন। শেখজীর প্রকৃতির উপর আস্থা গভীর, তাই গাছ-গাছড়ায় তিনি নিরাময়ের বিশ্বাস রাখেন। গল্পকারের ভাষায়, শেখজী নিজেই বলেন—

> "আমি কি করতে পারি বলো। বিদ্যেয় যতটুকু কুলোয় ফাঁকি দিইনি বাবা। আজকাল কতগুলো গাছ-গাছড়া একদম লোকমান হেকিমের মত কাজ করে। সে-গুলোই চালাই।"[২৩]

এই বাক্যগুলো শেখজীর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচায়ক; তিনি প্রচলিত শিক্ষায় তেমন সাফল্য অর্জন না করলেও, প্রকৃতির উদ্ভিদকেই জীবনধারণের অবলম্বন করেছেন। শেখজীর এই সততা, মানবিকতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং প্রকৃতির প্রতি অগাধ আস্থা তাকে সাধারণ জীবন থেকে আলাদা করে তুলেছে এবং এক আদর্শ চরিত্রে পরিণত করেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায় শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মন ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রকৃতি, সমাজ, এবং জীবনবোধকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল। তাঁর গল্পগুলোতে স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই পর্বে সমাজের গভীরে প্রোথিত সত্য, ব্যক্তি ও ধর্মের মানসিকতার প্রকাশের মাধ্যমে এক সৃজনশীল বৈচিত্র্যের ধারায় তিনি গল্পগুলোকে গড়ে তুলেছিলেন। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, সংবেদনশীল রুচিবোধ, মানবিকতা, এবং প্রখর শিল্পবোধের সমন্বয়ে তিনি বাঙালি জীবনের অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা এবং

সম্ভাবনাকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্পগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতিফলন না থাকায়, পাঠক সহজেই লক্ষ করে গল্পকারের বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনার স্বাধীনতা। গ্রামীণ জীবনের আবেগময় চিত্রায়ণ, গ্রামজীবনের অভাব-অনটন এবং মূলত মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গল্পে। সেই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকট এবং দারিদ্র্যের বিভিন্ন রূপ ও প্রভাবও তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগের উন্মাদনা, মধ্যবিত্তের সংকট, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং ধর্মীয় ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে আঘাত তাঁর গল্পগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই পর্বের গল্পগুলোর মাধ্যমে শওকত ওসমান শুধু গ্রামীণ জীবনের দৈন্য এবং সংকটকেই নয়, বরং আধুনিক ভাবনার আলোকে সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকেও গভীর মানবিকতায় প্রকাশ করেছেন, যা তাঁকে গল্পকার হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

Reference:

১. ওসমান, শওকত, ‘দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস’, ‘পিঁজরাপোল’, গল্পসমগ্র ১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০২১, পৃ. ৯৫
২. ওসমান, শওকত, ‘ভাগাড়’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৯০
৩. ওসমান, শওকত, ‘হুকুম নড়ে না’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৯৫
৪. ওসমান, শওকত, ‘কাঁথা’, ‘পিঁজরাপোল’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১০৭
৫. ওসমান, শওকত, ‘চুহা-চরিত’, ‘বিগত কালে গল্প’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৪৬৭
৬. ওসমান, শওকত, ‘থুতু’, ‘পিঁজরাপোল’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৭১
৭. ওসমান, শওকত, ‘পিঁজরাপোল’, ‘পিঁজরাপোল’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৮১
৮. ওসমান, শওকত, ‘বকেয়া’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৮৬
৯. ওসমান, শওকত, ‘দুই চোখ কানা’, ‘জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৬৯
১০. ওসমান, শওকত, ‘সাদা ইমারত’, ‘জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৪৭
১১. ওসমান, শওকত, ‘ব্যবধান’, ‘বিগত কালে গল্প’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৪৭৬
১২. পূবোর্ক্ত, পৃ. ৪৭৯
১৩. ওসমান, শওকত, ‘মো’জেজা’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৮০
১৪. পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৮১
১৫. পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৮২
১৬. ওসমান, শওকত, ‘খোওয়াব’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৯৭
১৭. পূবোর্ক্ত, পৃ. ২০১
১৮. ওসমান, শওকত, ‘ইলেম’, ‘পিঁজরাপোল’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৮০
১৯. ওসমান, শওকত, ‘তুচ্ছ স্মৃতি’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ২১৯
২০. ওসমান, শওকত, ‘নতুন জন্ম’, ‘জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৫৫
২১. ওসমান, শওকত, ‘প্রতীক্ষা’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ২১৭
২২. ওসমান, শওকত, ‘দেনা’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ২২৫
২৩. ওসমান, শওকত, ‘শেখজী’, ‘বিগত কালে গল্প’, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৪৫০

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 197 - 207
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘নষ্টনীড়’-র বৃত্তান্ত : জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য

অধ্যাপক অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা
Email ID : prof.achinta007@gmail.com
ও
মৌসুমী সাধুখাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sadhukhanmousumi24@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Jibanananda Das, reproduction, marriage, fiction, autobiographical, era's pain,

Abstract

Institutions like family, marriage, etc., have been established along the path of social evolution. In this context, marital relationships have developed with the aim of fostering mutual understanding and reproduction between men and women. This concept has not only been confined to social evolution or relationships but has also found a place in various themes within the realm of literature. In modern literature, particularly in Bengali fiction, the theme of ‘marriage’ has been extensively explored. In the post-Tagore era, during the "Kallol" period, an exceptional trend emerged in fiction—yet, Jibanananda Das stood apart even from this trend. It was only several decades after his death that readers began to recognize the fiction writer Jibanananda Das, who was primarily known as a poet of the Kallol era.

This article discusses various facets of marital relationships as reflected in Jibanananda Das’s short stories and selected novels (such as Malyaban). For the convenience of analysis, different dimensions of marriage portrayed in his short stories are addressed separately. The characters in his novels and short stories have been examined in parallel with the tendencies of the poet Jibanananda Das's psyche. It goes without saying that most of the characters created by Jibanananda Das as a fiction writer are connected to autobiographical elements. The main article discusses, with supporting information, how the author and his characters navigated the pain and impact of their era.

Discussion

তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণের শ্লোকে (২/২/৫) বলা হয়েছে যিনি পত্নীহীন তিনি যজ্ঞাধিকার বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে ষোলটি সংস্কারের মধ্যে বিবাহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষ পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করতে পারে। ঋণ শোধ হয় সন্তানের মধ্যে দিয়ে। বৌদ্ধধর্মানুসারে বিবাহের মূল ভিত্তি – 'Understanding respecting each-others beliefs and privacy.' [(A Happy Married life : A Buddhist Perspective — Ven. K. Shri Dhammananda. Access to insight (BCBS Edition), 30 November 2013)] খৃষ্ট ধর্মে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নতুন সৃষ্টি। ইসলাম ধর্মে বিবাহ একটি চুক্তি – যার সঙ্গে প্রজনন বিষয়টি জড়িত। সোস্যাল সাইন্সে 'সুখ' বা 'happiness', জীবনের তৃপ্তি বা নিজের ভালো থাকা সমার্থক। বিবাহ যৌথ দায়িত্ব – পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, শ্রদ্ধার, ভালোবাসার বন্ধন – ফল সন্তান, সন্তানের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসার বেঁচে থাকা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তবে সিদ্ধান্তে আসাই যায় —

১. বিবাহের মাধ্যমে নরনারীর স্থায়ী যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দেওয়া।
২. সন্তান-সন্ততির দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করে দেওয়া অর্থাৎ সৃষ্টিধারা অব্যহত রাখা।
৩. নরনারীর পারস্পরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪. বৃদ্ধ বয়সে বা অসুস্থ অবস্থায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ের ওপর 'দাম্পত্য-সুখ' নির্ভর করে। 'দাম্পত্য-সুখ' বিষয়টি বিমূর্ত ভাবনা।

'দাম্পত্য' বিষয়টিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকরা কিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এই সূত্রে জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্প এবং 'মাল্যবান' উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের বৃত্তান্ত, সুখ-অসুখের সন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কবি জীবনানন্দ তাঁর স্বভাব ও মনোধর্ম মতোই সমকালীন প্রচারধর্মীতা থেকে দূরে ছিলেন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুবিশ্বের স্থূলতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন - কবিতায় আংশিক সাফল্য এলেও, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকার করতে খানিকটা বাধ্য হয়েছিলেন। জীবিতাবস্থায় কবি হিসেবে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি জীবনানন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অমূল্য কথাসাহিত্যের সন্ধান ও স্বরূপ উন্মোচনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল আরো অনেক বছর। তাঁর কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যও যে স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিতে অনন্য সে কথা বর্তমানে প্রমাণিত। প্রতিষ্ঠিত কবি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের জগৎ অনালোকিত ছিল সম্ভবত কবির ইচ্ছাক্রমেই। জীবনানন্দ দাশ মনে করতেন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে অনেকখানি সময়ের প্রয়োজন, জীবনকে ভালো করে বুঝে পরিষ্কার তাৎপর্য দেখে, তবেই বড় সাহিত্য তৈরি হয়।

প্রায় বাইশটি উপন্যাস, একশোর্ধ ছোটগল্প লিখেছিলেন জীবনানন্দ – যেগুলি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধু পরিমণ্ডলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। উত্তরাধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে জীবনানন্দ পৃথক মাত্রা সংযোজন করেছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ – পর্বে দাম্পত্য জীবনের শুরুতে দারিদ্র ও তজ্জনিত মানসিক বিমর্ষতা (সংসার সম্পর্কে সর্বত্র উপেক্ষিত জীবনানন্দের কবি সত্তা), সেই মানসিক বিমর্ষতা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা – যার প্রতিফলন তাঁর কথাসাহিত্যে সর্বত্র। উপন্যাস জীবনানন্দের কাছে 'বৈচিত্র্যময় আত্মজীবনী'। কিছু গল্প এবং উপন্যাস অসম্পূর্ণ ছিল, অনেক ক্ষেত্রেই নামকরণ করেননি – এক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততাকে দায়ী করা যায়। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থও ১৯৩৪ সালে লেখা, প্রকাশ পায় কবির মৃত্যুর পর – এখানেও হয়তো সেই দ্বিধা। ব্যক্তি জীবনের দুঃসময় এবং মানসিক দীনতাকে অতিক্রমের জন্য কথাসাহিত্যের জগতে কবির বিচরণ। কবির অন্তরস্থিত গভীরতম ভাবলোক ক্রমাগত একসময় একা করেছে তাঁকে। নষ্ট-দাম্পত্য, নিষ্ফল-জীবন থেকে ভিন্ন এক কাম-রণ-রক্ত-যশ-সফলতা — 'বোধ'-র জগতে কবির যাত্রা। পাকে-চক্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত হয়েছেন – বস্তুবিশ্বের স্থূলতাকে অতিক্রম করতে চেয়েও ফিরতে হয়েছে সেই বস্তুতেই। ফিরতে না চেয়েও ফিরে আসার দ্বন্দ্ব, পেশাগত জীবনের সংকট, ব্যক্তি জীবনের অনুভব প্রকাশ পেয়েছে কথাসাহিত্যে। প্রচণ্ড স্নায়ুচাপের মধ্যে দিয়ে সময় কাটছিল, জীবিকা ও পেশাগত বাস্তবতাই এই চাপের মূল কারণ। সঙ্গে তাঁর প্রবণতা, বিশ্বাস, আচরণ, সমষ্টিগত বিন্যাস, সমাজ ও রাষ্ট্রগত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাপ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে পুরো বিষয়টি হয়ে উঠেছিল বহুধাবিস্তৃত ও আপাত দুর্বোধ্য। সংবেদনশীল

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রোমান্টিক স্বপ্নলোকে বিভোর কবি প্রকৃতিমগ্ন হতে আগ্রহী। বাস্তবের নারীতে সুধা না পেয়ে সন্ধান করে ফিরেছেন কল্পনার নারীকে – The real কিশোরী or something materially poor but spiritually rich. জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে দাম্পত্য-চিত্র। সেখানে মনস্তত্ত্বের জটিল দ্বন্দ্বে পীড়িত পুরুষের দাম্পত্যে প্রবল অনীহা – শুধুই টিকিয়ে রাখার দায়, আত্মসংকটে জর্জরিত, অসহায়, পরিস্থিতির শিকার। তাদের বিশিষ্ট বোধের জগৎ এবং বাস্তবের দুনিয়া বিপরীতে চলে — একটা টানাপোড়েন সবসময় চলতে থাকে।

বিবাহ শুধু মন্ত্রপাঠ, রেজিস্ট্রি, সহবাস, সন্তান উৎপাদন নয় – 'দাম্পত্য-সুখ' বিষয়টি খুব গুরুত্বের দাবীদার। 'দাম্পত্য-সুখ' নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর – স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আশা পরিপূরণ, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ইত্যাদি। 'বিবাহ' জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ, সবচেয়ে বড় দৈব ঘটনা বা দুর্ঘটনা। ভারতীয় 'দাম্পত্য-নীতি' মূলত আধ্যাত্মিকতা নির্ভর। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ – এই চার পুরুষার্থ লাভ করতে দরকার স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রয়াস। সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রাখার উৎসবও এই বিবাহ। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ – আনন্দ উপভোগ, পুত্রলাভ এবং ধর্ম লাভ। 'মহাভারত' থেকে 'মনুসংহিতা' সর্বত্র নারী পুরুষের অধিগত; মন্ত্র ও নিজের দেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীর হীনতা ও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে যে দাম্পত্য তার উৎস আধিপত্যধর্মী অর্থ ব্যবস্থায়। বিশ-শতকের বাঙালির চিন্তা ও বোধের জগতে নবজাগরণ এলেও সম্পূর্ণরূপে সংস্কার-মুক্তি ঘটেনি। সতীদাহ রোহিতকরণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, হিন্দুত্ব বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ রোহিতকরণ, শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীর স্বামী ত্যাগের ক্ষমতা প্রাপ্তি – ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় ঘটলেও প্রকৃত অগ্রগতি ঘটেনি। আধুনিকতার আড়ালে রয়ে গেছে ঐতিহ্যের দোহাই। তাই 'নারী-শিক্ষা' দরকার 'উৎকৃষ্ট স্ত্রী' গড়ে তোলার জন্য। যৌথ পরিবারের পুরুষ 'কর্তা' এবং 'নারী' সর্বাপেক্ষা সমঝোতার দায়িত্বে থাকে। মূল্যবোধের ভাঙন, পারিবারিক ভাঙন, ব্যর্থতার দায় – বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দ দাশের বিচরণ।

জীবনানন্দের ছোটগল্পগুলিকে প্রবণতা অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা যায় — ১. প্রেম ভালোবাসার তত্ত্ব, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সেই তত্ত্বের সংযুক্তি, ২. দাম্পত্য জীবন, সফলতা-নিষ্ফলতার কথা ভেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। Happy ending কোন কোন ক্ষেত্রে এলেও তা প্রাণের থেকে আসেনি, ৩. এই পর্যায়ের গল্পে গভীর বিশ্লেষণ আছে, ৪. এই পর্যায়ের গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাবনায় নতুনত্ব চোখে পড়ে।

প্রথম ভাগের গল্পগুলিতে – প্রেম অতি উৎকর্ষের জিনিস, একই সঙ্গে তা বেদনারও — এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। 'নারী' (হাড়-জুড়ানি) কল্পলোকের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র শরীরি যারা তারা 'মেয়েমানুষ' (হাড়-জ্বালানি), তাদের শরীর তাই 'মাংস', মাধুরী নেই। স্ত্রী জাতির দুটি ভাগ 'নারী' ও 'মেয়েমানুষ'। কবিতায় এবং গদ্যে বারবার 'মেয়েমানুষ', 'মাংস' শব্দ দুটির ব্যবহার ঘটেছে। 'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা' গল্পে সত্যব্রত দেখেছেন ভালোবাসার ভিতরে কোন শান্তি নেই, আছে বেদনা। 'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস', 'বিবাহিত জীবন', 'উপেক্ষার শীত' — গল্পে প্রেম-ভালবাসা ব্যক্তি জীবনে এবং দাম্পত্য জীবনে যে বিচিত্র প্রভাব রাখে তার দৃষ্টান্ত আছে। 'প্রণয়-প্রণয়িনী' গল্পে দাম্পত্য জীবনের ওপর আঘাত হানতে চেয়েছে পূর্ব-প্রেমিক। 'জামরুলতলা' গল্পে সন্ন্যাস নিতে আগ্রহী অবনীর জীবনে এক মহিলা রত্নের আগমন ঘটে – যাতে অবনীর জীবনটার রঙই বদলে যায়। গল্পের 'আমি' চরিত্রটির মনে হয় — 'হৃদয়ের রঙ আশ্বিনের ঘাসের মত হয়ে ওঠে।'[১]

দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য – পুরুষ চরিত্রগুলি কমবেশি সর্বত্রই এক ছাঁদের। তুলনায় স্ত্রী চরিত্রগুলি কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ। ব্যবহারিক জীবনে অসফল, চাকরি নেই, একান্নবর্তী পরিবারের অনুগ্রহ-লালিত, স্ত্রী-সন্তান আছে প্রায় সব চরিত্রেরই। স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিমুখ – আপাত ব্যর্থ দাম্পত্যের পটভূমিতে কবির নিজের জীবনের মতই তাদের জীবন সাদা, সাধারণ, 'অনেকখানি কাজের বিনিময়ে অনেক কম টাকা' পায়। সময় পেলে নিঃসাড়ভাবে পড়ে থাকে গভীর স্বপ্ন ও মননের জগতে। স্ত্রী চরিত্রেরা প্রত্যেকে রূপসী – তাদের রহস্যময়তার কথা বোঝাতে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন 'এক-এক রকম পৃথিবী' গল্পে। 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' গল্পে 'আকাশে সাতটি তারা'-র কেশবতী কন্যার ইমেজের সঙ্গে সাপের ইমেজ যুক্ত হয়েছে। 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পে মাকে লেখা চিঠিতে 'আমি' অধরা-মাধুরী চারুলতার কথা বলেছে – যে জীবনের যবনিকার ওপারে কুয়াশামাখা সম্ভাবনার রাজ্যের মমতাময়ী রূপসী। গল্পগুলিতে দাম্পত্য জীবনের অনেক রকমফের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকলেও দাম্পত্য-চিত্রের অধিকাংশই ব্যর্থ। সংসারে এসে স্ত্রী প্রথমাবধিই স্বার্থপর। 'বাসর শয্যার পাশে' গল্পে দরিদ্র চারুকে নীহার বিবাহ না করে অর্থবান দেবব্রতকে বিবাহ করে। দেবব্রতের ধনে তার আগ্রহ। কিন্তু দেবব্রতকে স্বামীর স্থান দেয় না, বাসর রাতেই পূর্ব-প্রেমিকের কাছে চলে যায়। 'শাড়ি' গল্পের উষা স্বামী রণজিতের সামর্থ্যের কথা না ভেবেই দামি শাড়ি পড়তে চায়। স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন তার কাছে তুচ্ছ। 'বত্রিশ বছর পরে' গল্পের স্বর্ণের স্বার্থপরতা অভয়কে আহত করে। স্বামী-সন্তান-সংসার নয়, ভাল খাওয়া-পরাতেই তার অধিক আগ্রহ। 'হাতের তাস' গল্পে বেকার উকিলের স্ত্রী সুমিতার স্বামীতে আগ্রহ না থাকলেও বিবাহবিচ্ছেদে বিশ্বাসী নয় সে – এইসব স্ত্রী চরিত্রের বাস্তবতা গল্পকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। স্ত্রী-রা অতিরিক্ত স্বামী নির্ভর – 'রক্তমাংসহীন' গল্পে। উষা রক্তমাংসহীন পুতুলের মতো – নিজের ইচ্ছায় চলতে চায় না। স্বামী বাধা না দিলে বাপের বাড়ি যাওয়া থামাতে পারে না সে। উষা স্বামীগৃহে ফিরেও আসে না – আসে তার মৃত্যু সংবাদ। নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দাম্পত্যের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ – স্বামীর কাছে শুধুই দাবী, প্রেম-মমতাহীন দাবীর ফলে নির্যাতনের শিকার স্বামীর চরম ঔদাসীন্যে নারীও নির্যাতিতা। দাম্পত্য যখন শুধুই শরীর তখন তা ক্লান্তিকর। 'মেয়ে মানুষের রক্তমাংস' গল্পে লীলা অজিতের মধ্যে বিবাহ পূর্ববর্তী আকর্ষণ অনুভব করে না। অজিতকে সে ভালোবাসলেও বিরক্তি বোধ করে বেশি – কোনোরকম জুড়ে-তেড়ে চলা, ভাঙ্গা যায় না বলে সম্পর্ক বয়ে নিয়ে চলা, অন্তরের আঠা থাকে না সম্পর্কে। 'তিমিরময়' গল্পের জ্যোৎস্নার অচ্যুতের রকম-সকম, শান্ত লেখাপড়ার জগত অপছন্দ – তুলনায় দেবরের টেনিস খেলা, ফুর্তি করা, শিকার করা বেশি পছন্দের। 'সাত কোশের পথ'-এ উর্মিলা-প্রবোধের দাম্পত্যে নেই উষ্ণতা, চমক, বেদনা, বিরক্তি। স্বামীর অসচ্ছলতা, স্বামী-স্ত্রীর উদাসীনতাও দাম্পত্য নষ্ট হওয়ার কারণ। 'চাকরি নেই' - এর সুকুমার গল্প লেখে – দারিদ্রের কারণে কলকাতা ছেড়ে দেশে ফিরলে স্ত্রী নির্মলা স্বামীর দারিদ্র মেনে নিতে পারে না। 'বিবাহ অবিবাহ' গল্পে সরযূ নিস্পৃহ স্বামী ছাড়া সংসারের অন্যদের সঙ্গে ভালো থাকে। 'মেহগিনি গাছের ছায়ায়' গল্পে বৃদ্ধ চাটুজ্যে মশাই একা। স্ত্রী ও ছেলে নিজের মত ব্যস্ত। 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পে যক্ষ্মা আক্রান্ত অনাদিকে একা রেখে স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। স্ত্রীর উদাসীনতা ক্রমে দাম্পত্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। 'কিন্নরলোক' গল্পে সুবোধ-সরযূর দাম্পত্য এইভাবে অর্থহীন হয়ে যায়। রূপ ছেড়ে অরূপে যাত্রা করে সুবোধের স্বপ্নাভিসারী মনন।

জীবনানন্দের গল্পের পুরুষ নারীকে ব্যবহার করতে চায় বাধ্য প্রণয়-পুতুল হিসেবে। 'প্রণয় প্রেমের ভার' গল্পে পুরুষ চরিত্র সুবোধের স্ত্রী সতেরো বছরের হেমলতা যৌবনের সাধ-আহ্লাদ হারিয়েছে – স্বামীর কাম প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি বলে পুরুষ-মন আহত। সতেরো বছরের মেয়েটি প্রবীণ, কর্তব্য ভারাক্লান্ত – ছেলেমির বয়স তার জীবনে নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী ও প্রেমিকার সমন্বয়ের সুযোগ নেই – এই বিষয়টি গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং এই ব্যতিক্রমী মানসিকতা নারীকে নতুনতর সংকটে ফেলেছে। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের ছাঁচে গল্পগুলি গড়ে উঠেছে। নববধূরা তাদের স্থূল মনোবৃত্তি, আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার কাঠামোয় মূর্তিমান বিদ্রোহ। 'বাসর শয্যার পাশে' গল্পে শহরবাসী দেবব্রতর সঙ্গে গ্রামীণ নববধূ নীহারকণার উৎকট সাংস্কৃতিক পার্থক্য – নীহারকণার লোভ, অসহিষ্ণুতা, স্থূল রুচিবোধ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব – পারিবারিক যৌথ ভাবনার বিপরীত অবস্থানে জোরদার। বিপরীতে দেবব্রতর পিতৃপরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বাভাবিক ছবি। 'বাসর রাত'-এও নারীর অর্থলিপ্সায় ছয়-সাত দিনের দাম্পত্য শুরুতেই দুর্বিসহ, বিধ্বস্ত একান্নবর্তী জীবনের ছন্দ। দাম্পত্য এখানে কেবলমাত্র হৃদয় নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পর্ক নয়, বিত্ত-বৈষম্য একে সামাজিক ভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। 'কুষ্ঠের স্ত্রী'-এ সুশোভন উচ্চবংশজাত, সুগঠিত চেহারার পুরুষ। মুখে পোড়া সাদা দাগের কারণে (কুষ্ঠ ভ্রমে) উপযুক্ত পাত্রী জোটে না — আত্মগর্বী হীনরুচির মেয়ে অতসীর লোভ ও অর্থলিপ্সা দাম্পত্যের ভবিষ্যতকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দেয়। সুশোভনের সম্পত্তির অধিকার চেয়ে বসে আচমকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে – দাম্পত্যে মনের মধু তো জমলই না, বরং সুশোভনকে নিয়ে ফেলল 'কল্পনা ও স্বপ্নের দেশ থেকে দূরে।'

'সুখের শরীর', 'নষ্ট প্রেমের কথা', 'বাসর ও বিচ্ছেদ' গল্পেও নারীর স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা, একা-মানসিকতা সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরায়। 'সুখের শরীর' গল্পে ইন্দিরার স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সংঘাত ও অশান্তির মূলে – তার শরীর সচেতনতা। মমতাহীন দাম্পত্যের মূলে তার জৈব-মানসিক সঙ্কট। নিরূপম চায় একান্নবর্তী পরিবারের শান্তি, স্বস্তি। ইন্দিরার সৌন্দর্যভাবনায় মাতৃত্ব অস্বীকার করে সত্তর বছরেও যুবতী থাকার সাধ, তার দেহের অধিকার,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সিদ্ধান্তের ক্ষমতা – নিরূপমের পুরুষ মানসিকতায় আঘাত হানে। 'নষ্ট প্রেমের কথা' গল্পে নববধূ সুরূপার আচরণেও বিচ্ছিন্নতার মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট। 'বাসর ও বিচ্ছেদ' গল্পে পারিবারিক সংঘাত ও বিবর্তনের ছবি এঁকেছেন গল্পকার। সাধারণভাবে জীবনানন্দের গল্পে বিবাহ নির্ভর যৌনতার কোন রোমান্টিক স্বস্তিকর চিত্র নেই। সন্তান জন্মদানে উৎসাহহীনতা, পালনে বিরক্তি। বহু-সন্তানের ধারণা জীবনানন্দের গল্পে অনুপস্থিত। সহমর্মিতা, শান্তি ও সংযমের পারিবারিক আবহ — গল্পগুলিতে আসেনি। বিবর্তিত সমাজ ও দাম্পত্য কাঠামোয় পুরুষ আপন অধিকারবোধে নারীকে আয়ত্তে রাখতে চায়, স্ত্রীর সতীত্বও পুরুষের সম্পদ গর্বের মধ্যেই পড়ে। ষোড়শী বিরজার চল্লিশোর্ধ্ব স্বামী শশধরের সঙ্গে সামাজিক শ্লেষ নিয়েই দাম্পত্য।

পুরুষের ধারণা স্ত্রীকে ঠিক ভাবে গড়ে নিতে পারলে দাম্পত্য অর্থময় হয় – সেই গড়ে নেওয়ার চেষ্টা প্রায়ই অসফল। প্রথম জীবনে রূপশ্রীময়ী মৃণালকে পেয়ে দেবব্রতর ধারণা ছিল এইরকম। কিন্তু পরে দেখলো স্ত্রী আত্মবিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নয়। 'নকলের খেলায়' গল্পে এরকমই ছবি। 'মা হবার কোন সাধ' গল্পে রূপসী শেফালীর অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের কথা – তার স্বামী প্রমথ সন্তান চায় না – কিন্তু একবার অর্থনৈতিক সুবিধার কথা সম্ভাবনায় এলে সন্তানের বীজ বুনেছিল তারা – কিন্তু চাকরির সুবিধা হয় না – অথচ সন্তানের জন্মদান অনিবার্য। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে শেফালির মৃত্যু। মা-মরা সন্তান পালনের আশায় বুক বাঁধে প্রমথ। যদিও সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য তার কাটানো হল না এই সন্তানের জন্যই। আর্থিক অনটনে কোনঠাসা শেফালী-প্রমথর দাম্পত্য। একটা গাইগরু বিয়োলেও তার জন্য পরিবারে যে গুরুত্ব তার সামান্যও জোটেনি শেফালির ক্ষেত্রে। 'প্রেমিক স্বামী' গল্পে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসলেও প্রভাত উল্টো বুঝে স্ত্রীকে দূরে পাঠিয়ে ভালোবাসা গাঢ় করতে চায় – প্রভাতের ভুল সিদ্ধান্তে দাম্পত্য মাঝপথে গতিহারা।

মূলত স্ত্রী চরিত্রগুলির চিন্তাশূন্য, স্থূলরুচি, কর্কশ স্বভাব ও অর্থকেন্দ্রিক বহির্মুখীণতার বিপরীতে স্বামী চরিত্রেরা মননশীল, সূক্ষ্মচিন্তক, আত্মমগ্ন, সৃষ্টিশীল। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ব্যর্থ। স্বামী-সংসারের প্রতি বিমুখ হলেও স্ত্রীরা মর্মাহত না হয়ে নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছে। 'মানুষের মুখের আভা' গল্পে পার্বতী শচীনকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। 'প্রেম, আকাঙ্ক্ষা দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা'-তেও অজয়কে ছেড়ে নির্মলা তিন বছর বাপের বাড়িতে। অজয় ভাবে বিচ্ছেদকে মধুর করে তোলার পরিবর্তে কদাকার করে তুলেছে নির্মালা। অনিচ্ছা, অপ্রেম, অরুচি, অধৈর্য নিয়ে স্বামী-সঙ্গের গ্লানি থেকে সঙ্গ ত্যাগ অধিক শ্রেয় – গল্পে এমনটাই প্রতিপাদ্য। 'মায়াবী প্রাসাদ' গল্পে অন্যরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা – স্বামী-স্ত্রী যদি আকাঙ্ক্ষাহীন, মোহমুক্ত হতে পারে অথবা বিবাহ না করে একত্রে বসবাস করে সেক্ষেত্রে সাফল্য আসলেও আসতে পারে। 'মায়াবী প্রাসাদ' এবং 'ছায়ানট' গল্পে – সেই সংকেতই ধরা পড়ে।

নারী ও মেয়ে মানুষ সম্পর্কে শিল্পীর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গল্পে – সেখানে মূল চরিত্র একজন কবি বা কথাচিত্রকর। 'মহিষের শিং' গল্পে কবি চারুর সঙ্গে রানী ও শোভনা দুই বোনের সম্পর্ক। কালো রোগা রানী চারুর কবিতা বোঝে, আদর করে। আবার 'শোভনার চোখের ভেতর আয়েশ রয়েছে যেন দুরন্ত হরিণ' — চারুর কবিতাকে শোভনা অগ্রাহ্য করে। 'মাংসের ক্লান্তি' গল্পে পুরুষ চরিত্র অমূল্য নারীর কাছে কমনীয় অনুভব, সৃষ্টিশীল সংবেদনা ও মানবীয় মহত্বের সন্ধান করলেও স্ত্রী হেমের অবোধ আচরণ ও অহংকারে তা বিনষ্ট হয়। হেম যেন একটা খটকা, অমূল্য কিছুতেই তাকে মেনে নিতে পারে না। 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া' গল্পে বিরাজ মনে করে – 'বিয়ে করা আর্টিস্টের পক্ষে মারাত্মক' — কারণ স্ত্রী কমলার কাছে বিরাজের লেখাপড়া সবসময়ই অন্ধকার জিনিস। 'করুণার রূপ' গল্পে কবি ও তার স্ত্রীর দাম্পত্যের আলো-আঁধারি-অস্বচ্ছতা-ছলনার রূপ প্রত্যক্ষ হয়। 'আর্টের অত্যাচার' গল্পে নিখিল-অবিনাশ-দেবকুমার তিন জনই সাহিত্য চর্চা করে। ঔপন্যাসিক অবিনাশ ও কবি দেবকুমার মনে করে, 'লেখক ছাড়া আর কেউ আর্টিস্ট নয়।'[২] যারা ছবি আঁকে তাদের – 'মনের ভেতর কোনো খটকা নেই, তাহলে ওরা ছবি আঁকতো না, লিখতো।'[৩] নিখিল ভাবে সে কবি, জীবনকে বোঝে কিন্তু আস্বাদ করতে পারে কই – নিখিল আর্থিক সাফল্য পেতে পারত – কিন্তু আর্ট তাকে কিছু হতে দিল না। 'কারুবাসনা'-র হেমের মতো 'আর্ট' তাকেও নষ্ট করে দিল। 'বেশি বয়সের ভালোবাসা' গল্পে সুহৃদ কিছুই করতে পারল না, ওর বোন আভা মাস্টারী ছাড়ল, তিনটে প্রেম ব্যর্থ, গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখে। সুহৃদের মতে —

> "লেখা মানুষকে বড্ড নাকাল করে, আমার মনে হয় দু-চারজন লোকের শুধু লিখবার শক্তি থাকে, এক-একটা যুগে, বাকিগুলো পণ্ড পরিশ্রম করছে শুধু।"[৪]

'শেষ পছন্দের সময়' গল্পে সুবোধ দারিদ্রের পথই বেছে নিয়েছিল শুধুই লিখবে মনস্থির করেছিল। পরিবারের বড়রা সংসারের জন্য যারা প্রাণপাত করে চলেছে তাদের দেখে তার ধারণা বদল ঘটেছে। 'মানুষ অমানুষ', 'কল্প জিনিসের জন্ম ও যৌবন', 'প্রণয়হীণতা' গল্পে সফল লেখকদের বৃত্তান্ত আছে। 'মনোবীজ' গল্পে চন্দ্রপীড়ের কবিতা অমলেন্দু সেনের কাগজে ছাপা হল, তার নাম যশও হল – অন্যেরা তাঁর কবিতা নিয়ে গেল এবং অনেক লাইন বাদ দিয়ে নতুন লাইন যোগ করে নিজেদের মত করে ছাপলো – চন্দ্রপীড় বুঝল দেড়শ বছর না গেলে তাঁর কবিতা কেউ বুঝবে না। নিরাপদ জায়গায় তুলে রাখা উচিত সেগুলো।

নারী, মেয়েমানুষ, মানুষীর সঙ্গে যাপিত জীবনে প্রেমকে ভেবে ভেবে, পারস্পরিক ভালোবাসা, ঘৃণা, উপেক্ষা, প্রেম-অপ্রেমের দোলাচলময় জীবনের যে ছবি এবং তার অতিরিক্ত আর এক জীবনের কথা ছোটগল্পগুলোতে জীবনানন্দ আঁকতে চেয়েছেন 'বোধ' কবিতার সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়। গল্পগুলিতে থাকা আপাত রূঢ়, খানিকটা পুরুষতান্ত্রিক ভঙ্গিকে পেরিয়ে যদি মর্মে পৌঁছানো যায় তবে দেখা যায় — তিনি চেয়েছিলেন – স্ত্রী জাতি হবে স্বাধীন মনোভাবাপন্ন, সহনশীল, বৃহত্তর পরিসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো ক্ষমতা থাকবে তার মধ্যে, মানসিকভাবে উন্নত হবে সে – সাংসারিক তুচ্ছতা কাটিয়ে বৃহত্তর পটভূমিতে অংশ নেবার উপযুক্ত হবে। জীবনানন্দ নিজেও এই মানসিকতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। সংসারের কুম্ভীপাকে নিজের মায়ের কবিসত্তার স্ফূরণ যথাযথ না ঘটায় অভিযোগ ছিল তাঁর মনে। 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পে চিঠির ফর্মে লেখা 'আমি'-র অভিযোগের সঙ্গে এই প্রসঙ্গের মিল পাওয়া যায়। 'পৃথিবীটা শিশুদের নয়' গল্পটিতে গাঢ় বেদনার ছবি আছন্ন করে পাঠক মনকে। 'মজলিশে' গল্পের অমলা 'নারী' থেকে 'মেয়েমানুষে' পরিণত হয়েছে। 'পেঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' গল্পে কল্যাণী বিচ্ছেদ, নিঃসঙ্গতা বিষয়গুলি বড় একটা বুঝত না – সন্তানহীনতার জন্য গঞ্জনায় অভিমানে আত্মহত্যা করে সে। 'অঘ্রাণের শীত' গল্পে উমা জীবনটাকে অন্যরকম ভাবে দেখে – জীবন বিশ্বাসী হয়েও সংসারের দুর্বিপাকে বাঁচাতে পারে না নিজেকে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-তে শচী প্রকাশের স্ত্রী, বহুবল্লভ তার স্বামী প্রকাশ ও পূর্ব-প্রণয়ী সোমেনের মধ্যে তুলনা করে সোমেনের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করতে পারে না, স্বামীকেও ছাড়তে পারে না। খানিকটা 'মাল্যবান'-এর উৎপলা-মাল্যবান দাম্পত্যের মতোই। অথবা সুরেশ-মহিমের মাঝে অচলা। 'বাইশ বছর আগের ছবি' গল্পে চপলার বার্ধক্যহীন অনিঃশেষ প্রেম দ্বিজেনের আমৃত্যু বেদনার উৎস। অপ্রাপ্তির কারণে চপলা ও তার প্রেম চিরজীবনের ঐশ্বর্য লাভ করেছে দ্বিজেনের স্বপ্ন কল্পনার সংবেদনায়। কবিতায় যেমন বনলতা সেন, সুচেতনা, শ্যামলী – গল্পে তেমন চারুলতা, মালতীলতা, চপলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা গল্পকারের চেতনার নারী এবং খানিকটা শরীরী অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত। 'বিলাস' গল্পটি খানিকটা স্বতন্ত্র, চুয়াল্লিশ বছরের শান্তিশেখরের দুটি অতৃপ্তি – প্রথম, অনেক বই তার সংগ্রহে আছে যা কোনদিন পড়া হবে না, দ্বিতীয়, কাঙ্খিত নারীর সন্ধান না পাওয়ায় – কোনো নারীকে না-ভালবেসেই তাকে জীবন ত্যাগ করতে হবে। প্রেম ও যৌনতার পথ সন্ধান করলেও তার 'নারী' সাধারণ মেয়ে-মানুষ নয়। শান্তিশেখরের জন্য সংসার উপযুক্ত স্থান নয় – কল্পলোকের আদর্শে নির্মিত নারীই তার জীবনাবেগ ও চলার পথের প্রেরণা। কাদাখোঁচার মতো নয় রাজহংসীর সন্ধানে অক্লান্ত শান্তিশেখর, এভাবেই রক্তমাংসে নয় জীবনানন্দের ছোটগল্পে পুরুষ কোনো এক শাশ্বতীকে সন্ধান করে – যে সৃষ্টিশীল মানুষের চির অদৃপ্তির উৎস। আত্মস্থ এবং অনুচ্চারিত অনুভবে প্রেমের মুক্তি – প্রাত্যিকতায় নয়।

শুধু ছোটগল্পগুলিতে নয়, অনেক উপন্যাসেরও সম্পাতবিন্দু নিরর্থক নষ্ট-দাম্পত্য। উপন্যাসগুলির উপাদান বহুলাংশে আত্মজৈবনিক। উপন্যাসে জীবনানন্দ দাম্পত্যের যে ছবি আঁকলেন সেখানে সুস্থ দাম্পত্য খুঁজে মেলা ভার। এইসব বিচ্ছিন্ন চরিত্রগুলির ভাঙাচোরা দাম্পত্যের চিত্র প্রায় সব উপন্যাসেই কম বেশি আছে – 'কল্যাণী', 'কারুবাসনা', 'নিরুপম যাত্রা', 'সুতীর্থ', 'জলপাইহাটি', 'বাসমতীর উপাখ্যান', 'মাল্যবান'। বর্তমান আলোচনায় প্রধানত 'মাল্যবান' উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনানন্দের দাম্পত্য ভাবনা স্থান পেয়েছে। মাল্যবানের চিন্তায় এসেছে বিভিন্ন বিষয় – ফেলে আসা গ্রাম, বাঙালির সম্মান, সমাজবিপ্লব, জীবনের সার্থকতা – ইত্যাদি প্রসঙ্গ। অন্তর্মুখী, অবহেলিত মধ্যবিত্ত মাল্যবানের আরেকটি দিক বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে – যৌনতৃষ্ণার তীব্র সুখ ও তীক্ষ্ণতর যন্ত্রণা। শতকরা নব্বই জন বাংলাদেশের দম্পতির জীবনের নিষ্ফলতার প্রতীকী চিত্র উৎপলা-মাল্যবানের দাম্পত্য। না-দাম্পত্যের উপন্যাস 'মাল্যবান' - এ বিবেক ও বিবেকহীনতার প্রসঙ্গ আদ্যন্ত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জাগ্রত। জীবনানন্দের নায়কেরা রমণী খুঁজে পায় না, ভালোবাসার রাজপ্রাসাদের নিশুতি রাতে গুমরে কাঁদে প্রেম – নারী পুরুষের সাথে বা পুরুষ নারীর সাথে মিলতে পারে না সহজ সমীকরণে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষেরও আত্ম-ভাবনার জগতে বিচরণের ইচ্ছেটা নৈতিক। শুরুর দিন থেকে বেশ করে উল্টে-পাল্টে, নেড়ে-চেড়ে, চটকে-ছেনে মাঝবয়সি কোনো মানুষ দেখতেই পারে তার নিজের জীবনটাকে – 'কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম' – কী চায় সে? কী পাবে – প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে মাল্যবানের যাত্রা –

> "আজ বিশে অঘ্রান', মাল্যবান বললে, 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন; ঢের ভালো ব্যবহার হতে তো পারে জীবনের; তা হয়েছে; হয়নি? হবে? বোঝা কঠিন; মাঝে-মাঝে তুচ্ছ বেনে-বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি বলে মনে হয় সব, খাচ্ছি-দাচ্ছি সংসারের বেনেগিরি করছি। আছে অনেক ফাঁক, আলো, নানা রকম বড় আকাশ ঘাস ও-সব পাখিদেরও; কিন্তু সালতামামি আর সালপাহলির গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু কি আছে মানুষের?"[৫]

বস্তুপৃথিবীর নারী উৎপলার সঙ্গে বারো বছরের দাম্পত্য জীবনে সমানভূতি সমাশ্রয়ের অভাব। উৎপাদন ন'বছরের কন্যা মনু, তাদের দাম্পত্যজনিত যৌন সম্পর্কে নোঙর পড়ে গেছে। বিয়ের পর থেকে খুব অল্প দিনই স্বামীর কাছে থেকেছে উৎপলা। স্ত্রীকে প্রশান্তির জল হিসেবে পেতে চাইলেও সে বধির, নিশ্চল। না আছে ভালোবাসা, না আছে যৌনতার উত্তাপ। দুটি প্রাণীর আলাদা জগত, আলাদা আস্তানা একই বাড়িতে। মাল্যবানের সহবাস বিনিদ্র রাতে শহরের বিভিন্ন শব্দাশব্দির মধ্যে – চুনবালি খসা, অপরিচ্ছন্ন ঘরে – টিকটিকি, মাকড়সা, আরশোলা, ইঁদুর, মশাদের সঙ্গে। মাল্যবানের বকলমে জীবনানন্দও যৌনতাহীন ভালোবাসায় বিশ্বাসী নন – শরীরের সুখোস্বাদই ভালোবাসা, তাতেই অস্তিত্বের সার্থকতা বোধ চরিতার্থ হয় –

> "আমি মাটির মানুষ তো-মাটি ছাড়া টাল সামলাতে পারব না - হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভালো, তার চেয়ে মাটির শরীর; চালে গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে, কপ্পুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মতো তুমি আর আমি; তোমার কাছে এসেছি তাই, বসেছি তাই। দাও। দেবে না?"[৬]

ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের কাম চরিতার্থতা সম্পর্কে বরং মাল্যবান ভাবে – সমস্ত ইতর প্রাণীকে বিশ্লেষণ করে নাচিয়েই মানুষ তো হয়েছে মানুষ। জীবনানন্দের অন্য সব নায়কদের মতো মাল্যবানও স্বরচিত কল্পনার বৃত্তে বুঁদ থাকতে ভালোবাসে – যতদিন পাড়া গাঁয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার অস্তিত্ব – তার দেখাবার শোনাবার জিনিসগুলো ছিল সূক্ষ্ম, অতল সংবেদনময়, প্রকৃতিমগ্নতায় স্নিগ্ধ রঙের 'ওয়াস চিত্র'-র মতো। যার স্তরে স্তরে সযত্ন রঙের বিন্যাস খেলে যায় – সে সব মুহূর্তগুলো বিয়াল্লিশের দিনগত পাপক্ষয়ের বর্তমান স্মৃতি মেদুরতা নিয়ে ফিরে ফিরে ইঙ্গিতে ছুঁয়ে যায়। এসব কিছুকে ঢের পেছনে ফেলে গত পনের বছরে মাল্যবান খাটছে, খিদমদগারি করছে বটমলি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের অফিসের জন্য – কারণ পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি। এই বড় কঠিন বাস্তবের অন্তরে যে মন – সেটা চেয়েছিল অন্যরকম – অন্য কিছু হতে। রুচি শিক্ষা অনুসারে সেই জীবন স্বপ্নই থেকে যায় – এই অসুখ ক্রমে বাড়তে থাকে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায় – এ হল মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের অভিশাপ। 'সূক্ষ্ম মনে দুঃখ বেশি' বলেই অনিবার্য অন্তর্দহন, আকাঙ্ক্ষা মতো শান্তিময় প্রেমময় জীবন পায় না মাল্যবান। মাটির নীচে গেঁড় কন্দ খাওয়া শুয়োরের মতো অফিসগিরির জীবন বয়ে চলে। স্ত্রী-স্বামীর যৌথ বোঝাপড়ার জীবন নয়, 'সাপটে না খাবে তো জাপটে ধরব' দশা নয়, এখানে প্রেমের শতদল টলমল জলে ফোটে না – গন্ধে-রূপে-রসে ভরে ওঠে না – এখানে শুধুই বিবর্ণতা, তীক্ষ্ণ হৃদয়হীন আশ্লেষ, কিছু ঘৃণা, অবজ্ঞা, দূরত্বের প্রাচীর, তীক্ষ্ণ বাক্যবান প্রতিমুহূর্তে সপাট চাবুক মারে সময়ের স্নিগ্ধতাকে, মাল্যবানের দুনিয়াদারীকে। 'পরানে পরান বাঁধা' ভাব আপনা-আপনি চটকে যায় – মৃত্যুর-কঠিন হিম-শীতলতা ঘিরে ধরে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কলেজে পড়া উৎপলার মাল্যবানের সঙ্গে বিবাহ বিধিলিপি, অথচ স্বামীকে মেনে নিতে পারে না স্ত্রী। টেররিস্ট অনুপম তার কামনার মানুষ 'স্ফটিক জল'। মাল্যবানের সঙ্গে সম্পর্ক গরুর মুত – যার সংস্পর্শে উৎপলারূপী দুধ নষ্ট হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে অনুরাগ কোনকালেই জন্মায়নি –

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই উৎপলার যাবতীয় অপ্রেমের উক্তি একই সুরে বাঁধা। অপ্রেম উৎপলার কথার ধার বাড়িয়ে তুলেছে ক্রমাগত। যেসব কথা লোকে বাইরে নয়, মনে মনে বলে সেই অন্তর্বাস্তবটা সংলাপে প্রতিফলিত। উৎপলার প্রশস্ত খাটে শীতের রাতে স্বামী অবাঞ্ছিত —

> "একটা ডান যেন। ...আ, গেল যা! বসলে। রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ। ...বেরোও বলছি! ...ঘুম হচ্ছিল না বলে পরের ঘুমের নিকুচি করতে হবে?"[৭]

বিয়াল্লিশ বছরের জন্মদিনের বিশেষ রাতটিকে অন্তরঙ্গে স্ত্রীর কাছে যে জীবন-সঙ্গ-প্রেম তার আকাঙ্ক্ষা – উৎপলার তাল তার সঙ্গে আগে কিছু কিছু মিললেও – বর্তমানে উৎপলার সঙ্গে অনুভূতির সমতা নেই, সরসতা নেই – উৎপলা অনিবার্য – অথচ প্রায় অধরা। তিক্ততা, অপ্রেমে ভরা দম আটকানো দাম্পত্য –

> "এক জন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে এতটা দম আটকে আসত না আমার-"[৮]

ক্রমে ছক ভেঙে কেরানির ডেক্স ও উৎপলার স্বামীত্ব থেকে নিজেকে ঘুঁচিয়ে মেঠো ইঁদুর বা মুনিয়া পাখির জীবন পেতে চায় মাল্যবান। উৎপলার মেজদা-মেজবৌদির জন্য উৎপলা নিজের ঘর ছাড়বে, কৌশলে আগে থাকতেই ভাড়া করে নিয়েছে একটি ঘর। মাল্যবানও ঘরছাড়া হবে মেজদার ছেলেমেয়েদের জন্য – সেখানে উৎপলার জায়গা হলেও মাল্যবান বাড়তি। বাপের বাড়ির কোলে ঝোল টানা উৎপলার ব্যবস্থাপনায় ক্রমাগত নিশ্বাস ভারী হতে থাকলেও উৎপলাকে পাল্টা দেয় না মাল্যবান। এই নারীকে নিয়ে কী করবে সে? শুধু স্বামী হিসেবেই অসহায়, বিরস নয় – বাবা হিসেবেও সন্তানের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারা মাল্যবানের ছটফটানি বাড়ায়। অতৃপ্তির আগুনে অম্বলে-কাদায়-দধিতে মাখামাখি এই জীবনের থেকে পাখির হালকা স্বাধীন জীবন তো বেশ চমৎকার ছিল। কিন্তু, একা আইবুড়ো থেকে জীবন কাটানো খুব শক্ত তার পক্ষে।

উৎপলার জীবনের বিতিকিচ্ছিরি নিষ্ফলতা মাল্যবানকে ভাবায়। বেজোড় পাখিনী এসে পড়েছে ভুল করে মাল্যবানের জীবনে, মাল্যবানের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় হয়নি তাই 'পিতৃগ্রন্থী' অধিক সক্রিয় উৎপলার।

মাল্যবান-পত্নীর ধনবিজ্ঞান সচেতনতা চোখে পড়ার মতো। বাপের বাড়ির যত্ন-আদরের ত্রুটি তার সইবে না – মাল্যবানের সোনার বোতাম বিক্রি হয় – উৎপলা খুশি হয় – চিড়িয়াখানায় যায় মাল্যবান স্ত্রী-কন্যা সমেত। কিন্তু মাল্যবানের জন্য মন বা প্রেম বাজে খরচ করতে অরাজি। চিড়িয়াখানায় গিয়েও বিপরীত অবস্থানেই। বেশি বয়সের মাল্যবানকে মেসো বা মামাশ্বশুরের মত লাগে উৎপলার পাশে – মাল্যবানের হ্যাট টাই না পরা, না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি – সবেতেই সমস্যা উৎপলার। মাত্রা, দৃঢ়তা সবেতেই অভাব মাল্যবানে। হাতি দেখে মাল্যবান মুগ্ধ – উৎপলার কাছে হাতি অসাধ ও অস্বস্তির। মাল্যবানের চোখে লক্কা পায়রার মত মেয়েরা 'ছেনাল' আনন্দ আমোদের ইষ্টিকুটুম, তারাই উৎপলার গুরুত্বের বিষয়। সিনেমা দেখা নিয়েও দুজন দু প্রান্তে – বক্সের টিকিটে বসে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় উৎপলা – মাল্যবানের কাছে তা মিছামিছি পয়সাবাজি। উৎপলার চুয়ান্ন বছরের বৌঠানের মা হওয়ার খবরে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে বেনারসি আসে অথচ মাল্যবানের জন্ম নিয়ে তার মাকে জড়িয়ে অসম্ভব রকম কটু কথার বিষ উগরে দেয় উৎপলা।

মানুষ বড় হলে জননীগ্রন্থী স্বাভাবিক নিয়মে গুরুত্ব হারায় – বিয়ে না করলে চলে না, অথচ মাল্যবানের জন্য উৎপলার মনে অপ্রেম অসীম – বিয়ের আগের পৃথিবীর কথা ভাবতে থাকে সে। ঘরজোড়া নম্র বশ্য স্নিগ্ধতার বদলে বিবাহিত জীবন হল খড়ঘরে আগুন, অগ্নি ডাইনির মতো, নির্লজ্জ-নির্মম-ভুল-সত্য –

> "মানুষ তো মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে, পিছে ফিরে যেতে পারে না তো সে আর। তবে উৎপলা মনুকে বাদ দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগোতে পারা যায় বটে — একা। মার আমলে পারেনি, কিন্তু বৌ পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকে : সজ্ঞানে হেঁটে চলে যেতে পারে সে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে — অজ্ঞান মৃত্যুর দিকে।"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উৎপলার ঘরে বিচিত্র মানুষের আনাগোনা, ঠাট্টা রগড়ের ফোয়ারা – মাল্যবান গাছেই তাদের আশ্রয়। এইভাবে প্রেমস্পর্শহীন সমান্তরাল ধারায় দাম্পত্য বয়ে যায়। সত্যের অন্তরালে থাকা সত্যটা হল – উৎপলার বহুগামীতা। সহকর্মীর স্ত্রীর অসুস্থতায় চিন্তিত হয় মাল্যবান উৎপলার সুস্থতা নিয়ে। অফিস থেকে হ্যাঁচকা ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবরাখবর নিতে চায় – গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব থমকে যায় শ্রীরঙ্গের আগমনে। বিয়ে না হওয়া গাইয়ে-বউ নবনী মল্লিকের কাছে বেহালা শিখে উৎপলাকে শোনাতে এসেছে। শ্রীরঙ্গ শ্রীমন্ত সদাগর – উৎপলা কমলেকামিনী – এরকমই রঙ্গরসে উৎপলার দিন কাটে।

প্রতিবেশী সত্যেনের চব্বিশ-পঁচিশের স্ত্রী রমার মৃত্যু, স্বামীর শোক – উৎপলার তিরিখ-তিরিখ বোলচাল - সব অনির্বচনীয় সময়ের গর্ভে লীন হয়ে যায়। থাকে শুধু অফুরন্ত সময় – আসলে সুসময়কে ধরতে চান জীবনানন্দ —

> “একটি স্বামীর শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক, এখনও গভীর। কিন্তু এখনই তরল হয়ে যাচ্ছে সব; স্বচ্ছল সফল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তি জীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময় - সময় শুধু।”[১০]

ভাবতে গিয়ে দার্শনিক হয়ে যায় মাল্যবান —

> “আমাদের জীবনের নদীর নাম - অনুত্তরণ, মাল্যবান ভাবছিল, কোথাও কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না, কোনোদিন এ-নদীর পথে; কিন্তু, তবুও, কত লোক ব্যথা বিপদ বিফলতা মৃত্যুর বলে প্রতিদিন ওতড়াচ্ছে।”[১১]

নিজেকে ঠিকমত ভাবে প্রকাশের শক্তি তার নেই – সূক্ষ্ম গভীরতর কিছু বলা হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত উৎপলাকে। উৎপলার রাডারে ড্যামেজ এলিমেন্ট মাল্যবান, খারিজ হয়ে যাওয়া মানুষ – নেতা জোব্বার মতো নেতানো। সংসারের কর্তা সে - তার টাকাতে ঠাকুর চাকর নিয়ে উৎপলার রাজ্যপাট-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু উৎপলার ভাবনা তালিকার বাইরে মাল্যবানের ভালো-মন্দ। মোচড় দিয়ে ওঠা মনটাকে শাসন করতে নিজের ঘরের হাল নিজেই ফেরাতে চেষ্টা করে অসুস্থ হয়ে পড়ে মাল্যবান – কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাহীন অনন্তকে পাবার আর্তি তার পুরো হয় উৎপলার উপস্থিতিতে – এতেই তার অসুখে শান্তি, সব সুখ। মাল্যবান অনুভব করে –

> “...সময়ের কোনো শেষ নেই তো, ...সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহুতার ভেতর তোমার মা-রূপ ফুটে উঠল তো...”[১২]

কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই সুখ। মাল্যবানের সূক্ষ্ম অনুভবের, অন্তরের রক্তক্ষরণের খবর রাখে না উৎপলার লোকায়ত মন। মাল্যবান সম্পূর্ণ পৃথক মাত্রার মানুষ –

> “মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও; সে-জিনিশটা খুব নিয়ন্ত্রিত নয় যদিও। কাজেই চেতনার একটি সূর্যের বদলে অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ওপর আরো একটি ইন্দ্রিয় আছে খুব সম্ভব মাল্যবানের। বিজ্ঞানে যাকে বলে চতুর্থ বিস্তার,”[১৩]

সন্তান জন্মের আগে উৎপলাকে মাল্যবানের খামখেয়ালি কথা অবশ করত – কিন্তু ক্রমে ‘নারিকেল ঝুনা’ হয়েছে – উবে গেছে হৃদয়ের মধুরতা, বুকভরা স্নেহ ভালবাসা, রাত জেগে স্বামী সেবা করার পরিস্থিতি নেই আজ – মাল্যবানের প্রায় নতুন ধুতি (সাবান দিয়ে কেচে রাখা) দিয়ে বমি সাফ করে – মানুষটাকে নিষ্পেষিত করতে, নির্যাতন করতেই তার এই কাজ। তারপর মাল্যবানের ডাককে অগ্রাহ্য করে – ওপরে ‘আরো ওপরে... মিশে গেল কোথায়।’ উৎপলা-মাল্যবানের বিয়ের প্রশস্ত খাটে উৎপলার মেজদা-বৌঠান একসঙ্গে শুয়ে শান্তি পায়, শান্তি খুঁজতে চায় না উৎপলা। বিয়ে নামক চুক্তিতে সে ঠকে গেছে। মাল্যবান বারবার আলো জ্বালাতে চায় ‘নিভে যায় বারে বারে’। স্ত্রী পরিত্যক্ত নচ্ছার মানুষ বলে নিজেকে দেখাটা সয়ে নিয়েছে। ক্রমে রাত গভীরে ভালোবাসা না পেয়ে নিজেকেই বেশি ভালবাসতে লেগে যায় সে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ময়ূরকণ্ঠী নীলে অনির্বচনীয় উৎপলাতে নৃত্যরত উত্তরা-বৃহন্নলার সঙ্গে গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু বিছিন্ন উৎপলা-মাল্যবানের দাম্পত্যে সেই জীবনছন্দ নেই – বড় বেশি রকমের স্থির সম্পর্ক। কালোকিষ্টি রাতে বা জ্যোৎস্না রাতে পরীতে পাওয়া একজোড়া ধাড়ীর কৃতকর্মের ফসল বিড়ালছানা – যেটার প্রতি ধাড়ি জোড়ার কোনো দায়িত্ব নেই – মানুষের পৃথিবীরও সেই দশা। স্নেহ-প্রীতি হীন সমানুভূতি হীন অপ্রেমের রাজ্যে মানুষের বাস। ভাবতে ভাবতে অনবরত কান্নার পেনপ্যানানিতে মাল্যবানের ঘেন্না ধরিয়ে দিল সেই বিড়ালছানা – এক আছাড়ে ভবলীলা সাঙ্গ। কাদা পাঁকের ভেতরে শুয়োরের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করা জীবনে বিড়ালছানার মৃত্যু তাকে বেশ একটা চমৎকার মুক্তি দিয়েছিল; 'স্ত্রীর মমতা বিমুখতার ঢের ওপরে চলে গিয়েছিল সে' - কিছু মাত্রায় নির্বাসনা হওয়া অভ্যাস হয়েছিল – ভারহীন অন্তর্লঘু শিমুল তুলোর ওড়াউড়ির স্বাদ পেয়েছিল। মৌমাছির পাখায়, দূর আকাশের পাখির ডানায় নিঃসীম 'নিঃঝুম পরলোকের দেশে'। এক নির্বেদ অবস্থা। দুঃখকে জয় করতে গেলে আগে আকাঙ্ক্ষা শূন্য হওয়ার যে শর্ত অষ্টাঙ্গিক মার্গে আছে – প্রায় তার কাছাকাছি।

মাল্যবানের ঘরে রসে-বসে রক্তমাংসে পরিতৃপ্ত জীবন কাটায় মেজদা-বৌঠান। উৎপলার খুশির জন্য মাল্যবানকে শরীর-মনের অরুচি ও অস্বস্তি নিয়ে সাত মাস থাকতে হয় মেসে। অসুখী মাল্যবান দম্পতি মেজদা-মেজ বৌঠানের সুখের পালে হাওয়া লাগায়। অথচ জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না – যৌনবোধ চিমড়ে লুচির মতো নেতিয়ে যায়। মেসের সাত মাসে বিকৃত কামনার বেশ কিছু খণ্ড-চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক – রাতবাতিকের লোক, সংসার করার শক্তি নেই এমন লোক, সরস্বতী পুজোর বাই নাচ, মেসের ঝিকে জোর করে মদ গেলানোর ছবি, মেসের বোর্ডার, ঠাকুর, চাকর সকলের সঙ্গে ঝি-গয়মতির গতরের সম্পর্কের কোলাজ, ছিপছিপে যুবক যে শেষরাতে রাস্তা দিয়ে যায় কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ইত্যাদি ছবি।

মাল্যবান 'একটু উষ্ণতার জন্য' বারবার কাছে আসতে চাইলেও, উৎপলা – সহজ মানুষের পাশে মানুষী নয়, ষড়যন্ত্রী-অস্বচ্ছ-সুযোগ সন্ধানী নেকড়ে বা হায়না বা আরও নিচু প্রবৃত্তির। প্রেমহীন দীর্ঘজীবন কামনা করে না মাল্যবান। উৎপলার বরং বেঁচে থেকে ঢের লাভ – মেলা লোকজনের সোরগোলে মুখর তার কুঞ্জ। উৎপলা তাদের নিয়ে নরকে বসলেও তার পাশে একশোটা নষ্টচন্দ্র। এমন নির্মম দাম্পত্য পরিবেশ শিল্পীত ভঙ্গিতে এর আগে বাংলা উপন্যাসে আসেনি। মাল্যবানজাত কন্যাও চরম অযত্নের শিকার। করুণাহীনতার চরম এই সংকটকালে এক সর্বাত্মক করুণায় মাল্যবানের মন ভরে ওঠে – অপ্রেমের বদলে প্রেম, করুণাহীনতার বিপরীতে সর্বজীবে করুণা – এমনকি তা থেকে বঞ্চিত নয় তার স্ত্রী উৎপলাও।

সাত মাস পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে দাম্পত্য-নাট্যে নতুন চরিত্রের আগমন দেখল মাল্যবান – পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের লম্বা চেহারার বিবাহিত উচ্ছৃঙ্খল অমরেশ, হিমাংশু বা শ্রীরঙ্গ থেকে আলাদা। ইন্দ্রিয়জ ডাকে প্রকাশ্যে ও নির্দ্বিধায় শরীরে শরীর জড়িয়ে তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছে দু'জনে। উৎপলার 'সরমসরসতা'ময়ী ভাব, আহারে অরুচি, অন্যমনস্কতা, চোখে শূন্য দৃষ্টি, কথার ধার কমেছে, বেশবাস স্খলিত — যেন ভিন্ন কিছু ইঙ্গিত করতে চান ঔপন্যাসিক। আজকালকার এই শিশ্নোদরতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদর নয়, কিন্তু তবু 'উচ্ছৃঙ্খল' -এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি নেই মাল্যবানের – তার রাগ ক্ষোভ চুরুটের নিভে যাওয়ায় ধরা পড়ে। অমরেশের সঙ্গে উৎপলার আলাপ কীভাবে – জানতে 'মাল্যবানের স্বামীসত্তা, পুরুষ সত্তা মাঝে মাঝে চিতার মত জাগে, ঝিমিয়ে যায় বিড়ালের মতো। স্ত্রীর ভিন্ন পুরুষে আসক্তি প্রত্যক্ষ করেও প্রেমহীন দাম্পত্য বয়ে চলে। লম্পট, রুচিহীন অমরেশের অনিবার্য টান, মাংসের-রক্তের কানায় কানায় সাড়া জাগানো যৌনতা, উৎপলার অধিক আগ্রহের। স্বামী-স্ত্রীর একনিষ্ঠ থাকার সমাজ-শাসন টপকে যাবার ছবি এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। স্বরচিত বৃত্তে বুঁদ হয়ে ফাটা ডিমে তা দেওয়া উটপাখির মত। মাল্যবান-অমরেশ-উৎপলার সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করার পরও স্ত্রীকে নির্দোষ ভাবতে চায়, বিশ্বাস করতে চায়। জীবনের সৎ-অসৎকে ঘিরে এই বিশ্লেষণ মাল্যবানকে শালগ্রাম শিলার মতো স্থানু করে রেখেছে। অমীমাংসিত প্রশ্নের ঝড়ে এলোমেলো মাল্যবানের ঘুম এল, অজান্তে স্বপ্ন এল, স্বপ্নে খড়ের বিছানায় 'হাঁস-হাঁসিনে'র মতো চমৎকার আলোড়িত লম্বা অনন্ত এক শীত-রাত কাটাল দু'জনে। দু'জনার ইচ্ছুক অনুগত শরীর নিয়ে যে মিলন (?), চরিতার্থ দেহমিলন সকল সময়কে ছেদ করে চলে গেছে। স্বপ্নের সহবাসে সুখ, ওম। বাস্তবে হবে না – মাল্যবানের নিঃসঙ্গতার কষ্ট

উৎপলা উপলব্ধি করবে না, জেনেও সঙ্গ দেবে না। কোনটা সত্যি? স্বপ্নের ভিতর শুয়ে কথা বলা, না এঁটো টেবিলে ঘুমন্ত মাল্যবানকে পরিত্যাগ করে উৎপলার বিছানা করে ঘুমিয়ে পড়া?

'সত্যিই কি কিছু হবে না, কিছু সে করতে পারবে না।' শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয় আর হবে না। গভীরতর সংকট ঘনীভূত হয়, এক হিমশীতল নিদ্রায় মৃত্যু ঘোরের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে – 'বহিয়া বিফল বাসনা' – প্রসন্নতাহীন, প্রশান্তিহীনতায়, নিরাশ্রয় এলোমেলো। উৎপলা-মাল্যবানের যৌন-চেতনার গল্পে বাৎসল্যের প্রবেশাধিকার নেই। যে উৎপলার মধ্যে সজারুর ধ্যাষ্টামো দেখেছে তার মধ্যেই নব ময়ূরীর রূপও দেখে মাল্যবান – অস্তিত্বের ভাঁজে ভাঁজে বৈপরীত্য। বিষন্ন হয়েও মাল্যবান অবসাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেও 'স্বচ্ছল সফল' সময়কে খোঁজে। এভাবেই বেঁচে থাকে মাল্যবান, মাল্যবানেরা।

Reference:

১. দাশ, জীবনানন্দ, জামরুলতলা, জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র, সম্পা., দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৭, পৃ. ৪১৮
২. দাশ, জীবনানন্দ, আর্টের অত্যাচার, জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র, সম্পা., দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৭, পৃ. ১১৮
৩. তদেব, পৃ. ১১৮
৪. দাশ, জীবনানন্দ, বেশি বয়সের ভালোবাসা, জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র, সম্পা., দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৭ পৃ. ১৬৬
৫. দাশ, জীবনানন্দ, মাল্যবান, জীবনানন্দ দাশ তিনটি উপন্যাস, সম্পা., দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা ১৪, পৃ. ১৩৬
৬. তদেব, পৃ. ১৩৬
৭. তদেব, পৃ. ১৩২-১৩৩
৮. তদেব, পৃ. ১৫৫
৯. তদেব, পৃ. ১৮৬
১০. তদেব, পৃ. ১৯৬
১১. তদেব, পৃ. ১৯৭
১২. তদেব, পৃ. ২০৪
১৩. তদেব, পৃ. ২০৫

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 208 - 216
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন

জিতব্রতা গুহ
কলেজ শিক্ষক ও গবেষক
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি
Email ID : Jitabrota@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Bengali literature, short stories, Rabindranath Tagore, magazine, Anti-Scriptural Movement, Anti-fascist movement, external reality, Internal reality, mysterious, bizarre.

Abstract
A certain art form of the short story was solidified in Bengali literature by the pen of Rabindranath Tagore in the last decade of the nineteenth century. The roots of that story-concept were also in the ideals of the modern short story that emerged in the first half of the nineteenth century. In the first half of the nineteenth century, a standard of structure and style for the short story was established in the writings of Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, and others. This influence continued in the second half of the nineteenth century in the writings of Maupassant and other European short story writers. Rabindranath was also a follower of that trend.

Overall, it can be said that this ideal was valid in Bengali short stories from the last decade of the nineteenth century to the first decade after independence. The social background has changed with the flow of time. Many new subjects have emerged as the basis of stories, and new types of characters have appeared in keeping with the times.

Stories published in magazines like 'Kallol' and 'Kalikalam' between 1923-30, which depict the cruel and difficult aspects of life. After 1930, the anti-fascist movement left an impact on Bengali short stories. The Second World War took place between 1939 and 1945. During this time, the Quit India Movement, the Partition of Bengal, and the form of capitalist exploitation emerged in Bengali short stories. Nevertheless, the original mold of the short story remained the same.

The social, political, and economic conditions of Bengal were extremely complex and turbulent during the 1950s, from 1950 to 1959. From the middle of this decade, some writers began to perceive life and the realities of life in a slightly different way. They tried to reflect reality in literature from a different perspective. A new trend in storytelling emerged.

The writers of this new trend, by defying the conventional structure of the short story, created a circle of light and darkness around the subtle layers of political and psychological nuances. Starting from the 1950s, stories were written in various new trends like 'Desh', 'Porichoy', 'Notun Sahitya', 'Sahityapatra' and others. A new style emerged in Bengali short stories, a new trend in storytelling.

In the 1960s, a few new writers started writing stories in a new way, rejecting the conventional story trend. A turning point occurred in Bengali short stories, and the new internal realism emerged. The writers of this magazine named their storytelling style 'anti-scriptural' stories. The writers of the 1950s had given a clear and artistic form to reality, but they did not completely abandon narration. They wrote diverse stories in their own way. However, the anti-scriptural writers completely rejected the narrative element in stories.

Some of these new storytellers included Ramananda Ray, Shekhar Basu, Kalyan Sen, Ashish Ghosh, Subrata Sengupta, Amal Chanda, Balaram Basak, Sunil Jana, and others.

A turning point occurred in Bengali short stories. Internal reality was expressed more than external reality. In these stories, the plot and characters did not develop following the logical path of everyday reality. The feelings and experiences of the human mind, gains and losses, and the discourse of light and darkness became the central themes of these stories. Sometimes they were mysterious, sometimes bizarre, and sometimes the storytelling technique was mechanical. A new approach emerged in the planning of the structure of these stories. These writers expressed the mental state of individuals and society as they wished, which was completely different from the conventional structure of short stories.

Discussion

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে যখন রেনেসাঁস অর্থাৎ পুনঃজাগরণের কাল শুরু হল তখন থেকে শিক্ষার প্রসারের ফলে মানুষের মনে জেগে উঠতে লাগল প্রশ্ন এবং যুক্তি। তখনই কথাসাহিত্যের সৃষ্টি। গদ্যে রচিত প্রথম আখ্যান হল ইতালির বোক্কাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫) লিখিত শত গল্পসংকলন 'ডেকামেরন' (১৩৫৩)। প্লেগ পীড়িত দেশে একটি পুরনো বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া সাতজন নারী ও তিনজন পুরুষের প্রত্যেকের কথিত দশটি করে গল্প নিয়ে সংকলিত এই 'ডেকামেরন'। বোক্কাচ্চিও-এর এই গল্পগুলিকে আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রথম সূচক বলা যায়। কিন্তু ছোটগল্প বলা যায় না।

আধুনিক ভাষায় যাকে 'Short Story' অর্থাৎ 'ছোটগল্প' বলা হয় তার প্রথম আবির্ভাব ঘটে আমেরিকায়। আমেরিকান সাহিত্যিক ওয়াশিংটন আর্ভিং (১৭৮৩-১৮৫৯)-এর লেখা 'রিপভ্যান উইন্কিল' (১৮১৯) বিশ্বের প্রথম ছোটগল্প রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তারপর রাশিয়াতে নিকলাই গোগল (১৮০৯-১৮৫২)-এর লেখা 'ওভার কোট' (১৮৪২) গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল। এই দুটি গল্পকেই একেবারে প্রথম পর্যায়ের কালোত্তীর্ণ ছোটগল্প বলা যায়। তবে আধুনিক ছোটগল্পের শিল্পসম্মত রূপটি ফুটে ওঠে আমেরিকার ন্যাথানিয়েল হর্থন (১৮০৪-১৮৬৪) - এর রচনায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের সংকলন গুলি হল - 'Twice Told Tales', 'Mosses from an Old Man's ইত্যাদি। এরপর থেকে আমেরিকায় ছোটগল্পের বৈচিত্র্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। আমেরিকান সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) লেখায় ফুটে ওঠে সার্থক ছোটগল্পের শিল্পরূপ। তারপর অন্যান্য দেশেও ছোটগল্প প্রচলিত হয়।

বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'হিতবাদী' (১৮৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) - এর 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প রূপে ধরা হয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম পর্ব (১৮৯১-১৯১০); 'সবুজপত্র' (১৯১৩-১৯২১) পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পের এক ধারা দেখা যায়। বাঙালির সব রকম জড়তা, কুসংস্কারের বিরোধিতা করে জন্ম নেয় প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকাটি। এই পত্রিকাটিকে অবলম্বন করে ছোটগল্পের নতুন ধারার সূচনা হয়। 'সবুজপত্র' পত্রিকার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য সাধু ভাষার প্রভাবমুক্ত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রচলন ঘটে। চলিত ভাষাতেও যে মার্জিত রুচিসম্মত সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে তার পথপ্রদর্শক প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকা।

১৯২৩-৩০ এর মধ্যে 'কল্লোল', 'কালিকলম' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প যেগুলিতে জীবনের নিষ্ঠুর ও কঠিন রূপ ফুটে উঠেছে। ১৯৩০-এর পর ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাপ পড়েছে বাংলা ছোটগল্পে। ১৯৩৯-১৯৪৫ - এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে, তার পাশাপাশি ভারতছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, পুঁজিবাদী শোষণ, দেশভাগ এবং দাঙ্গার স্বরূপ ফুটে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পে।

ছোটগল্পের এক ধরনের শিল্পরূপ বাংলা সাহিত্যে স্থির হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে উনিশ শতকের শেষ দশকে। সেই গল্প-ধারণার মূলেও ছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গড়ে ওঠা আধুনিক ছোটগল্পের আদর্শ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছোটগল্পের গঠন-রীতির একটা আদর্শ তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওয়াশিংটন আর্ভিং, ন্যাথিয়াল হথর্ন, এডগার অ্যালান পো প্রমুখের লেখায়। তারই অনুবৃত্তি চলেছিল উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে মাপাসাঁ সহ অন্য ইউরোপীয় ছোটগল্পকারদের কলমে। বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা সেই ধারারই অনুসারক ছিলেন। এই গল্পের মূল ভাবনা ছিল দুটি — এক, বাস্তব জগতের একটি আখ্যান নিয়ে একটিমাত্র বক্তব্য বা অনুভবকে অনুকরণ করে গড়ে উঠবে ছোটগল্প। দুই, সেই গঠনে থাকবে না কোনো বাহুল্য কথন। সময়-প্রবাহের সঙ্গে সামাজিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। গল্পের অবলম্বন রূপে উঠে এসেছে অনেক নতুন বিষয়বস্তু, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেখা দিয়েছে নতুন ধরনের চরিত্র। তাসত্ত্বেও ছোটগল্পের আদি ছাঁচটা থেকে গিয়েছিল একই রকম। সেই ধারাতেই প্রথম অন্য পথে দিশা নিয়ে এলেন পাঁচের দশকের মধ্যবর্তীকালে কয়েকজন গল্পকার।

পাঁচের দশক অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ এই সময় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও আবর্ত সংকুল। তার প্রধান কারণ ছিল দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু বাঙালি পরিবার সবকিছু হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা। এই পাঁচের দশকেই মাঝামাঝি সময় থেকে কয়েকজন লেখক একটু অন্যভাবে জীবনকে এবং জীবনের বাস্তবতাকে অনুভব করতে শুরু করলেন। ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যে বাস্তবকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করলেন। নতুন এক গল্পধারার সম্ভাবনা দেখা দিল। গল্পগুলি সমাজ বাস্তবতা থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর গুলিকে ঘিরে রচনা করেছে আলো-অন্ধকারের এক বৃত্ত।

পঞ্চাশের দশক থেকে কোনো কোনো লেখক বাস্তবতাকে দেখলেন মননের দৃষ্টিতে, - এই বাস্তবতা যেন এক উত্তর বিহীন জিজ্ঞাসা। এক অর্থে গল্প ধারায় পরিবর্তন হল। চিরাচরিত বাস্তব দর্শনে দেখা দিল অচিরাচরিত অভিক্ষেপণ এবং নতুন প্রকরণ। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে 'দেশ', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'সাহিত্যপত্র' ইত্যাদি একাধিক নতুন ধারায় গল্প লেখা হল। এই গল্পগুলো ক্রমে পাঠকদের আকৃষ্ট করে তুলল। বাংলা গল্পে এল নতুন রীতি অর্থাৎ গল্পের নতুন ধারা। বাস্তবকে বহু কৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা এবং এক অবয়বহীন বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে লেখক তাঁর মনের ইচ্ছানুভূতি দিয়ে গল্প লিখলেন, যা বাংলা-সাহিত্যে এতকাল ছিল না। তাসত্ত্বেও ছোটগল্পের আদি ছাঁচটা থেকে গিয়েছিল একইরকম।

যদিও এই ঘটনা একই সঙ্গে লেখক ও পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে প্রথাসিদ্ধ কাঠামোর বাইরে নতুন ধরনের কাঠামো তৈরি করা গল্পের ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। এই বিশ্বাস জাগ্রত হবার ফলেই পাঁচের দশকের শেষ থেকে কথাসাহিত্যে ভিন্ন ধরনের শৈল্পিক অবয়বের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠল। বিশ্ব-সাহিত্যে বিশ শতকের প্রথমার্ধে চেতনা-প্রবাহ রীতির আবির্ভাব এবং দ্বিতীয়ার্থে ম্যাজিক রিয়ালিজম-এর নতুন শিল্প-ভাবনা লেখকদের মনের এই নতুন প্রবণতাকে উৎসাহিত করল। এই সব কিছুরই সম্মিলিত ফল বাংলা ভাষায় ষাটের দশকে শাস্ত্র-বিরোধী গল্পধারা।

ষাটের দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পে একদল নতুন গল্পকার তাঁদের নতুন গল্প-ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরা একটি নতুন পত্রিকায় নিজেদের নতুন চিন্তার কথা ঘোষণা করলেন। এই পত্রিকাটির নাম 'এই দশক'। এই নামে একটি বুলেটিনও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। বুলেটিনটি অনিয়মিতভাবে ১৯৬২-১৯৬৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'এই দশক' পত্রিকাটি ১৯৬৬-১৯৭৬ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরে এটি অনিয়মিত ভাবে দুই একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে, তারপর ১৯৮১ তে এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার লেখকরাই তাঁদের গল্প রীতির নাম দিয়েছিলেন 'শাস্ত্র-বিরোধী' গল্প। যদিও সমকালীন লেখকগোষ্ঠী প্রথমেই তাঁদের খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি। কারণ তাঁরা সাধারণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাঠকের প্রথাসিদ্ধ গল্প-রুচিকে যেমন তৃপ্ত করতে চাননি, তেমনই পাঠকরাও এই গল্পগুলি থেকে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারেননি। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁরা খুব বেশি গ্রহণীয় হয়ে ওঠেননি। কিন্তু তাঁদের এই গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াস বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত ধারাকে যথেষ্ট আঘাত করেছিল। পঞ্চাশের দশকের নতুন ধারার গল্পের মূল অবলম্বন ছিল বাস্তবতার বহুরূপ। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারগণ বলেছিলেন –

> "আমাদের সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা করা হয়। বলা হয়, আমরা প্রতিষ্ঠান বিরোধী। না আমরা প্রতিষ্ঠান বিরোধী নই। আমরা শাস্ত্রবিরোধী। আমরা সাহিত্যের প্রচলিত নিয়ম-নীতিগুলিকে উল্টে দিতে চেয়েছিলাম। ...শাস্ত্রবিরোধিতা আর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শাস্ত্র মানে অনুশাসন, নিয়ম-কানুন। আমরা এর বিরোধী ছিলাম।"[১]

পঞ্চাশের দশকের লেখকেরা বাস্তবকে স্বচ্ছ নমনীয়তার শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা আখ্যান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। তাঁরা নিজের নিজের মতো করে বহু বৈচিত্র্যময় গল্প লিখেছেন। কিন্তু লেখকগণ গল্পে সম্পূর্ণভাবে আখ্যানধর্মিতাকে অস্বীকার করলেন। এই নবীন গল্পকারদের মধ্যে ছিলেন- রমানাথ রায়, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, আশিস ঘোষ, সুব্রত সেনগুপ্ত, অমল চন্দ, বলরাম বসাক, সুনীল জানা প্রমুখ।

বাংলা ছোটগল্পের আবার বাঁকবদল ঘটল। বহির্বাস্তবতা থেকে অন্তর্বাস্তবতা বেশি প্রকাশ পেল। শাস্ত্রবিরোধী গল্প সম্পর্কে শেখর বসু বলেছেন –

> "শাস্ত্রবিরোধী লেখকরা গল্পই লিখেছিলেন। তবে প্রচলিত গল্পের সঙ্গে তার তেমন কোন মিল ছিল না। অমিল কোথাও - কোথাও খুব বেশি মাত্রার। ...গল্পের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে যে কৌতূহল ও রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, গল্প শেষ হওয়ার আগে তার থেকে মুক্তি নেই। ...ছোটগল্পের এই ধারণাটি শুধু উনিশ শতক নয়, বিশ শতকেও দীর্ঘ সময়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কিছু লেখক মানসিক অভিজ্ঞতার প্রবাহকে ধরার প্রথম সচেতন চেষ্টা করেন। যাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের গভীর থেকে আরও গভীরে যাওয়ার। শেষে বিশুদ্ধ অবচেতনায়। এই রাজ্যের অভিজ্ঞতা অনন্ত এবং অসম্পূর্ণ। সেকেলে প্লট বা মোটা দাগের গল্পের রূপরেখা এখানে একেবারে অচল। একান্ত এই অন্তর্জগতকে শিল্পসাহিত্যে যিনি তুলে আনছেন তিনিও আবার সাধারণ মানুষ।"[২]

এইসব গল্পে কাহিনি ও চরিত্র প্রাত্যহিক বাস্তবতার যুক্তিগ্রাহ্য পথ ধরে গল্পে বিকশিত হল না। মানবচিত্তের অনুভূতি-অনুভব, পাওয়া - না পাওয়া, একটা আলো-আঁধারের বক্তব্য এই গল্পগুলির কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠল। কখনো তা রহস্যময়, কখনো উদ্ভট, কখনো গল্পের শিল্পরীতি হয়েছে যান্ত্রিক ছকে। এই গল্পগুলি নতুন ধরনের হলেও তা বাস্তব বর্জিত নয়। সামাজিক শ্রেণি - বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসাম্য, লোভ-লালসা, যৌনতা - সর্বোপরি সামাজিক অনিশ্চয়তাই এই গল্প গুলির উৎস। কিন্তু নতুনত্ব দেখা দিল গল্পগুলির গঠনের পরিকল্পনায় সামাজিক পরিস্থিতি জাত ব্যক্তির মনোভাবকে এই লেখকেরা যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে প্রকাশ করলেন। কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি একেবারেই অবলম্বন করলেন না।

শাস্ত্র-বিরোধিতার সঙ্গে শাস্ত্র-ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এই শাস্ত্রবিরোধিতা মানে শিল্পসাহিত্যের গোঁড়ামি, নিয়মাবলি, সংস্কারের বিরোধিতা। অর্থাৎ শাস্ত্রবিরোধী লেখকগণ সাহিত্যে এতদিন ধরে যা প্রচলিত ছিল তাকে মানেন না। তাঁরা তাঁদের মতন করে গল্প লিখতে চান। তাঁদের লেখা এই ছোটগল্প গুলিকেই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'শাস্ত্রবিরোধী' গল্প। শাস্ত্রবিরোধী কথাটার মধ্যে রয়েছে প্রথাভাঙা ইঙ্গিত। এতদিন ছোটগল্প সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা ছিল তাকে ভেঙে দেয়ার ইঙ্গিত। নিয়মসিদ্ধ বা প্রথাসিদ্ধ গল্পের প্লট কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল ছিল। 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৬) শাস্ত্রবিরোধী লেখকগণ ঘোষণা করেছিলেন -

১. গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।
২. আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছেই মহৎ আমাদের কাছে নয়।

৪. গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করে মারা হবে।

অন্যের কথা বলার জন্য তাঁরা গল্প রচনা করবেন না। তাঁরা গল্পে নিজেদের কথা বলবেন। প্রথাসিদ্ধ গল্পে কাহিনির যে জাল বোনা হত সেখান থেকে তাঁরা গল্পকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। অন্তর্জগৎ সবসময় বাস্তবের সঙ্গে চলে না। আমরা এমন অনেক কাজ করি যার কোন কারণ নেই। শিল্পী তাঁর অন্তর্জগৎ থেকে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করেন। এই শাস্ত্রবিরোধী লেখকগণ সাহিত্যে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে একটা ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সাহিত্যে বহির্জগতের বাস্তবতা ছেড়ে অন্তর্জগতের কথা বলতে চাইলেন। 'এই দশক' পত্রিকায় লিখলেন -

> "ছোটগল্প আজ থেকে সমস্ত শর্তের বিরুদ্ধে। সমালোচকের সমস্ত সংজ্ঞার বেড়ি ভেঙে সে বেরিয়ে এসেছে। ছোটগল্প এখন কবিতার মতোই স্বাধীন ও মুক্ত। আমরা যা লিখব, যেমন করে লিখব তাই ছোটগল্প। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বাউল। আমরা শাস্ত্রবিধি মানিনা।"[৩]

সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের প্রচলিত ধারণাকে উড়িয়ে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত মনে নতুনভাবে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের কাছে সৎ-অসৎ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি শব্দগুলি ছিল অর্থহীন, রীতিমতো সংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিরক্তিকর। তাঁরা এই ধারণাগুলির বিরোধী ছিলেন। তাঁরা শাস্ত্র- বিরোধিতা বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন-

১. ছোটগল্পকে কোনো শর্তের মধ্যে বাঁধা যাবে না। তাঁরা যা লিখবেন, যেমন করে লিখবেন তাই ছোটগল্প।

২. কোনোরকম সামাজিক দায় থেকে তাঁরা ছোটগল্প লিখবেন না।

৩. আন্তরিক জীবন থেকেই গল্পের বিষয় তৈরি হবে।

৪. লেখক গল্পে কোনোরকম জ্ঞান বা বক্তব্য প্রচার করবেন না।

৫. তাঁদের মতে ছোটগল্পের ভাষা হবে সহজ, সরল, কৃত্রিমতা শূন্য, মিশ্র, অস্পষ্ট।

৬. সাজানো-গোছানো নাটকীয় ঘটনা সমৃদ্ধ ছোটগল্প তাঁরা লিখবেন না। জীবন এইভাবে চলে না। জীবন কখনো তা একঘেয়ে, এলোমেলো, যুক্তিবিরোধী - সেই কারণে গল্পের বিষয়বস্তুও তাই হবে।

৭. গল্পের চরিত্র তথাকথিত স্বাভাবিক চরিত্র হবে না।

৮. লেখক ঈশ্বর নন। তিনি শুধু তাঁর অনুভবের জগৎকেই প্রকাশ করবেন। তিনিও একজন সাধারণ মানুষ।

৯. কোনো ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি বা বিশেষ কোন মতবাদ নয়, লেখক তাঁর অন্তরাত্মার কথা বলবেন।

১০. গল্পের দাবি অনুযায়ী আঙ্গিক গড়ে উঠবে।

'শাস্ত্র বিরোধী' লেখকরা প্রকৃতপক্ষে কারুর বিরোধী ছিলেন না। তাঁরা 'এই দশক' পত্রিকাকে অবলম্বন করে স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী গল্প রচনা করেছেন। এই লেখকদের সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণা ছিল সেই মানসিকতা থেকেই তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন। শাস্ত্রবিরোধীরা বিশেষভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছিল না। তাঁরা সাহিত্যের প্রচলিত নিয়ম-নীতিগুলিকে উল্টে পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পরবর্তীকালে অনেকে 'শাস্ত্রবিরোধী' শব্দটির বদলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী শব্দটির ব্যবহার করেছেন তাই এই ভ্রান্তি। শাস্ত্র-বিরোধিতা আর প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ভিন্ন। শাস্ত্র মানে অনুশাসন, নিয়ম-কানুন। এই শাস্ত্র-বিরোধী লেখকরা সাহিত্যের এই নিয়ম-কানুন, অনুশাসনের বিরোধী ছিলেন। রমানাথ রায় বলেছেন –

> "আমরা চাই স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা তাই শাস্ত্র খাড়া করি না শাস্ত্রের কাজ নিয়ম তৈরি করা, আমাদের কাজ নিয়মকে ভেঙে দেওয়া।"[৪]

প্রচলিত বা প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যের প্রতি শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের বীতশ্রদ্ধা ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দাঙ্গার ইতিহাসের মধ্যে কিছুটা হলেও নিহিত ছিল। এই লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই জন্ম ১৯৩৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। যারা

স্বাধীনতার স্বাদ যেমন পেয়েছেন, তেমনই দেখেছেন প্রথাগত বা প্রচলিতকে ভেঙে ফেলার দৃশ্য। ফলে স্বাধীনতা এঁদের কাছে ছিল রক্তাক্ত ও স্বাদহীন, কিন্তু নতুন। আবহমানকাল ধরে বসবাস করা মানুষ নিজ ভিটে-মাটি-জল-হাওয়া ছেড়ে, শিকড় ছিঁড়ে অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি দিয়েছে। স্থান পেয়েছে রেলস্টেশন, জলাভূমি, পরিত্যক্ত স্কুল বাড়িতে। চারিদিকে শুধু না পাওয়ার হাহাকার। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অসহায় মানুষেরা স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেও এই শিকড় ছেঁড়া মানুষগুলোর যন্ত্রণা উপশম করতে পারেনি স্বাধীন ভারতবর্ষ। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে তখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল উদ্বাস্তু সমস্যা এবং খাদ্য-সঙ্কট। এরকমই যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশের মধ্যে এই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকারী লেখকদের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। সেই কারণেই হয়তো তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সবকিছুকে নস্যাৎ করে স্বাধীন হওয়ার প্রবণতা এবং তারই ফসল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন।

শাস্ত্রবিরোধী লেখক রমানাথ রায়ের ‘বলার কথা’ (১৯৬৬) গল্পটির মধ্যে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি কিছু বলতে চায়। কিন্তু বলতে গেলেই তার চার ফুট দেহ দেড় ফুট হয়ে যায়, জিভ জড়িয়ে যায়, তাই সে ঠিক করে সে যা বলবে তা লিখেই বলবে। তাতেও রেহাই পেল না। মধ্যরাতে সে লিখতে গিয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল। তার মনে হল –

> “বালিশ কাঁথা ঘুরতে লাগল তক্তপোশ দুভাগ হয়ে ঘুরতে লাগল টেবিল দুভাগ হয়ে ঘুরতে লাগল তক্তপোশের চারটে পা চারিদিকে ঘুরতে লাগল টেবিলের চারটে পা চারিদিকে ঘুরতে লাগল ড্রয়ার ঘুরতে লাগল কাগজ ঘুরতে লাগল কলম ঘুরতে লাগল আমার দু পা দুদিকে ঘুরতে লাগল আমার মাথা ঘুরতে লাগল আমার ধড় ঘুরতে লাগল।”[৫]

গল্পটিতে দাড়ি, কমা বা কোনো যতি চিহ্ন নেই। অথচ গল্পে ভাষার সঙ্গে ভাবনার অসঙ্গতি নেই। কিছু বলার অস্থিরতা থেকেই গল্পটি উঠে এসেছে। পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে নিপীড়িত সাধারণ মানুষ কিছু বলতে চান কিন্তু পারেন না। কথাগুলো না বলাই থেকে যায়।

রমানাথ রায়ের ‘গোগো’ (১৯৭০), ‘গিলিগিলি’ (১৯৭৫) প্রভৃতি গল্পে বাস্তবতার সমস্যা, সংকট অনুপস্থিত হলেও লেখক স্বচ্ছন্দে নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছেন। আর এখানেই গল্পগুলি প্রথাসিদ্ধ গল্প থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলির কথনরীতি, স্থান-কাল-কাঠামো, আঙ্গিকের মধ্যেই ছিল স্বাতন্ত্র্যের ছাপ। রমানাথ রায়ের ‘বলার কথা’ গল্পটির মধ্যে একজন বেবাক মানুষের কতগুলো অস্ফুট ধ্বনি, মুদ্রা বা ভঙ্গি ছাড়া বলার জন্য আর কিছুই নেই। পুরো গল্পটা জুড়ে অর্থের শূন্যতা। ‘গিলিগিলি’ গল্পটিতে গিলি গিলি শব্দটির কোন অর্থ নেই। এটি জাদুতে ব্যবহৃত হওয়া একটি শব্দ। যা অঘটনের সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িত। যা এক ধরনের তাৎপর্যহীন, অলীক বা ভেনিস হয়ে যাওয়া অস্তিত্ব বোধের অর্থকেই ইঙ্গিত করে।

আশিস ঘোষের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির এক চেহারা দেখা যায় ‘সাইকেল’ (১৯৬৮) গল্পটিতে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র একজন মোটর সাইকেল চালক। যেখানে যত রেস হয় তিনি সেখানেই সাইকেল চালাতে চলে যান। প্রথম হওয়া তো দূরের কথা কোনদিনই সে পুরস্কার পায় নি। কিন্তু তবুও সে তার চেষ্টা ছাড়ে না। সাইকেল চালানোই তার একমাত্র ভালোবাসা। সে প্রতিযোগিতায় নাম দেয় ঠিকই কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার তার একমাত্র উদ্দেশ্যই সাইকেল চালানো। তাকে কোনোদিন কেউ হাঁটতে দেখেনি। সবসময়ই মোটর সাইকেলেই তাকে দেখা যায়। গল্পের শেষেও হয় তার প্রতিযোগিতায় সাইকেল চালানোর প্রচেষ্টা দিয়েই। ‘সাইকেল’ গল্পটির বয়স্ক ব্যক্তির চরিত্রটি অন্য রকমের। সে কোনোদিন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায় না, তবুও তার উৎসাহের অভাব নেই। চেষ্টার অভাব নেই। ব্যর্থ হয়েও তিনি ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে পরাজয় স্বীকার করেন না। তিনি পরাজয়ের পরেও উঠে দাঁড়ান, আবার এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, আবার চলতে থাকেন - এটাই হয়তো আমাদের জীবন। এই চলার মধ্যেই আনন্দ।

সুব্রত সেনগুপ্ত এই একই আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর ‘চারিদিক’ (১৯৬৬) গল্পটি শুরু এবং শেষ অনুভবের জগতে। গল্পের ‘সে’ বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। কিসের স্বাদ, কিসের শব্দ শুনতে পেলেও আস্তে আস্তে তার পঞ্চেন্দ্রিয় চলে গিয়েছিল। পরে সেগুলি ফিরে এলেও মানুষটির বিভ্রান্তি দূর হয়নি। সুব্রত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেনগুপ্তর আরও একটি গল্প 'জামা' (১৯৬৬)। একটি জামা কেনার ঘটনাকে গল্পটির মুখ্য বিষয়। একটি জামা কিনে গায়ে দিলে আশেপাশের সবকিছু সুন্দর হয়ে ওঠে। জামা পড়ে গল্প কথকের নিজেকেই এতটা সুন্দর, স্মার্ট মনে হচ্ছিল, যে তার ইচ্ছে করছিল শিস দিতে। কথকের পরিচিত অমিয় এই জামাটা পড়ে কথককে দেখে বলেছিল –

"এই জামাটায় তোমার স্মার্টনেস অন্তত পনেরো পার্সেন্ট বেড়ে গেছে।"[৬]

কিন্তু বাড়ি ফিরে মায়ের মলিন মুখ দেখে সেই মানুষটির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরলেও শেষে জামাটিই গল্পের চরিত্রটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সুব্রত সেনগুপ্তর গল্পে বাইরের ঘটনা খুবই সামান্য। কিন্তু অন্তর্জগতের সংঘাত তীব্র।

অমল চন্দের 'বারান্দা' (১৯৬৬), 'ঘরে' (১৯৬৬) ইত্যাদি গল্পগুলি ছোট আকারের দু-তিন পাতার। 'বারান্দা' গল্পটিতে একজন ক্লান্ত বিপর্যস্ত ব্যক্তি তার গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে ঘরের লাগোয়া ছোট্ট একটি বারান্দায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। সংসারী এই মানুষটি সংসারের বিভিন্ন কাজে আবদ্ধ হয়ে বারান্দার দিকে তাকাতে পারে না। অথচ সংসারের বেড়াজাল থেকে মুক্তির খোঁজে সে বারান্দায় যেতে চায়, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মানুষটি ঘরের লাগোয়া বারান্দার যাওয়ার স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটিয়ে দেয়। শুধু ভাবে –

"বারান্দা, আমার বারান্দা, আমি একদিন বারান্দায় চলে যাবো।"[৭]

কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। 'ঘরে' গল্পটিতেও ঘরের মধ্যে বাইরের মৃদু কখনো আবার জোড়ালো শব্দ ভেসে আসে। সেই ঘরে একটি মানুষ তক্তপোশে বসে, শুয়ে, সিগারেট খেয়ে, চিন্তা ভাবনায় ডুবে থাকে। এই ভাবেই গল্পটি শেষ হয়।

শেখর বসুর 'অথচ' (১৯৬৮) গল্পে চরিত্রদের নাম নেই। ব্যক্তির প্রশ্ন তীব্র না হয়েও অনুভবের তীক্ষ্ণতা পাঠক বুঝতে পারে। দ্বন্দ্ব ও অনুভবের স্তর বিন্যাস এ গল্পে বড় হয়ে উঠেছে। লেখকের একটি অনবদ্য অনুভূতির গল্প 'সার্সি' (১৯৬৮)। গল্পটিতে পাহাড়ের উপর একটি ঘর এবং বাইরে অঝোরে পড়া বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সেই ঘরে একটি মাত্র জানালা। সেই জানালায় সার্সি দেওয়া। এক ব্যক্তি থাকে লেখক 'সে' বলেছেন তিনি শুধু ঘরের মধ্যে থেকে জানালার সার্সি দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। পুরো গল্পটা ঘিরেই 'সে'-এর অনুভূতি, একাকীত্ব, ক্লান্তি –

> "পাহাড়ের গায়ে মাথায় ঘন কুয়াশা। কুয়াশা দুলছে-কুয়াশা চলছে। ডানদিকে থেকে বাঁদিকে আবার বাঁদিক থেকে ডানদিকে। খুব পাতলা মেঘের মতো। তবে মেঘে যেমন ছবি তৈরি হয়- নানা ধরনের ছবি - তেমন ছবি কুয়াশায়! ...পাহাড়ের উঁচু - নিচুতে সবুজ। কালচে সবুজ। খুঁটিয়ে দেখার আগেই আবার গাঢ় কুয়াশা সব ঢেকে দিচ্ছে। কুয়াশার সামনে, বৃষ্টি পড়ছে। সামনে ঝিরিঝির করে। কুয়াশার ভেতরে বৃষ্টি।"[৮]

পাহাড়ের এই বর্ননা রিয়ালিটিতে স্পর্শ করে। এর অনবদ্য বর্ননা পাঠককে পাহাড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। একটা অনুভূতির মধ্যে দিয়ে পাঠক বৃষ্টিস্নাত পাহাড়ের ছবি দেখতে পান। এইভাবেই গল্পটি এগিয়ে চলে।

কল্যাণ সেনের 'ক-চ-ট-ত-প' (১৯৭২) গল্পটি অন্য মাত্রার গল্প। টেবিলের একদিকে গল্পের 'আমি' আরেকদিকে এক ভদ্রলোক। গল্পটি স্টিল ছবির মতো লেখা। গল্পে কোনো কাহিনী বা কাহিনীর আভাস নেই। শুধু উত্তম পুরুষ চরিত্রটির চিন্তাভাবনা বর্ণনা। গল্পের শেষে লেখকের বর্ণমালার অর্থহীন প্রয়োগ গল্পটিকে অর্থবহ করে তুলেছে।

বলরাম বসাকের 'ডিম' (১৯৭০) গল্পটিতে 'হাতুড়ি ঠোকার শব্দ', 'পোড়া কাঠি' এই শব্দগুলি ফুরিয়ে যাওয়ার প্রতীক। 'ডিম' শব্দে অশ্বডিম্ব অর্থাৎ শূন্যতাকে বা না পাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু লাইনগুলি বদলে দিলে গল্পটিতে কোন বক্তব্য নেই। শুধু গল্পের মধ্যে আছে একটি গুঞ্জরণ - যা একান্তভাবেই শুধুমাত্র ফর্মের জন্য। বলরাম বসাকের 'কার্পেট' (১৯৬৮) গল্পটি এক অভিনব প্রচেষ্টায় লেখা। শব্দগুলো এখানে গল্প তৈরি করেছে। গল্পটিতে কোনো কাহিনি নেই শুধু শব্দ জুড়ে জুড়ে গল্প এগিয়ে গেছে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী, প্রকৃতি, বিভিন্ন মানুষের অনুষঙ্গ এনে শব্দ সাজিয়ে গল্প বলেছেন লেখক। কোনো ঘটনা, কাহিনি বা চরিত্রের আভাস মাত্র নেই গল্পটি পড়ার পর পাঠকের মনে কোনো অনুভব ও অনুভূতির জন্ম নেয় না। সমগ্র গল্প জুড়ে যেন অর্থহীনতার ছবি -

"বারান্দা পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা পাতা
পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা
কালো ছায়া সাদা সাদা সাদা
দেয়াল
আলমারি
বই বই বই বই বই বই বই বই ..."[৯]

বলরাম বসাক তাঁর 'কার্পেট' গল্পে এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে গল্প লিখেছেন।

সুনীল জানার গল্পেও গল্পহীনতা এবং বিবৃতি মুখ্য কথনরীতি থেকে সরে এসে প্রথাভাঙ্গার ইঙ্গিত রয়েছে। 'সাক্ষাৎকার-২' (১৯৬৯) গল্পটির শুরু কথককে এক অজানা ব্যক্তির খোঁজ করতে আসা দিয়ে। এক একজন ব্যক্তি গল্প-কথককে খুঁজতে আসছে কিন্তু কোনোবারই কথকের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে না। কথকের বাড়ি, চায়ের দোকান, অফিস সব জায়গাতেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কথককে খুঁজে যাচ্ছেন আলাদা আলাদা পোশাক পরে কিন্তু কারোর সঙ্গেই তার দেখা হচ্ছে না। গল্পের প্রথম থেকেই এক রহস্য যেন দানা বেঁধেছে। কথক সেই অজানা লোকটির জন্য অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও কেউ এলো না কথকের সঙ্গে দেখা করতে। গল্প-কথকের অপেক্ষা, সংশয়, চিন্তা, উদ্বেগ দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। এছাড়াও লেখকের 'কম্পোজিশন-১' (১৯৭০), 'ঘটনা' (১৯৭১) প্রভৃতি গল্পের বিষয়ভঙ্গি, বিন্যাস প্রচলিত গল্পের ধারা থেকে অনেক আলাদা।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শাস্ত্রবিরোধী গল্পের আন্দোলন সময়ের দিক থেকে খুব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত রেখে গেছে। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারেরা বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে গল্প লেখা শুরু করলেও তাঁরা অধিকাংশই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও গল্প লিখে গেছেন এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদের সৃষ্টির ধারার সঙ্গে মিশে গেছে। বাংলা গল্প সাহিত্যের সুদীর্ঘ পূর্ববর্তী ধারায় যে ঘটনা নির্ভর প্লট, আদি, মধ্য,অন্ত সম্বলিত আখ্যান চরিত্র নির্মাণের প্রথাসিদ্ধ রীতি এবং সমাজ সম্মত ও বাস্তবসম্মত পরিমণ্ডল গড়ে তোলা - এই প্রতিটি প্রচলিত পদ্ধতিকে তাঁরা ভেঙে দিয়েছিলেন। তার ফলে পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদের সামনে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গন উন্মুক্ত হয়ে যায়, যেখানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলার কোনো অনুশাসন রইল না। আক্ষরিক অর্থে লেখকেরা যেমন ভাবে খুশি গল্প লেখাবার স্বাধীনতা অর্জন করলেন।

অবশ্য সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জক, প্রথাসিদ্ধ, আখ্যান সর্বস্ব গল্পের একটি ধারা সবসময় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত। এই ধারাটিকে আমরা বাণিজ্যিক ধারা বলে থাকি। এই ধারাতেও ভালো গল্প লেখা হয়। কিন্তু সেই ধারায় মানুষের সমাজ মনস্তত্ত্ব এবং ব্যক্তিমনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সন্ধান প্রায়শই থাকে না। এই প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন –

> "সব মিলিয়ে শাস্ত্র-বিরোধী গল্প এবং নব্য অন্তর্বাস্তবতার গল্প বাংলা সাহিত্যের গতিপথে অনুপেক্ষণীয় একটি বাঁকবদল সৃষ্টি করেছে। যদিও ষাটের দশক থেকে স্ফীত হয়ে ওঠা বাণিজ্যিক গল্পধারার পাশে তা ক্ষীনস্রোত এবং স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছাতে তেমন সমর্থ হয়নি। কিন্তু সে-কথা সব দেশে, সর্বকালে জনপ্রিয় ধারা-বিরোধী লেখকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"[১০]

বাংলা গল্প সাহিত্যের ধারায় শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পকারেরা প্রচলিত প্রথার বেড়াগুলিকে সহজ করে ভেঙে দিয়েছিলেন নিজেদের প্রতিভা দিয়েই। আবার সেই নতুনধারাকে প্রতিষ্ঠিতও করে দিয়েছিলেন নিজেদের সৃষ্টির মধ্যেমে। শাস্ত্রবিরোধী গল্পের প্রভাব সেজন্য পরবর্তী বাংলা গল্পের স্রোতে এমন ভাবে মিশে গেছে যে তাকে স্বতন্ত্র করা যায় না।

Reference:

১. 'এই দশক' পত্রিকা, ১ম সঙ্কলন, মার্চ, ১৯৬৬
২. বসু, শেখর, 'শাস্ত্রবিরোধীগল্প', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০

৩. 'এই দশক', প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন, ফাল্গুন ১৩৭২, পৃ. ২

৪. বসু, শেখর, 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প', এ বং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৮

৫. রায়, রমানাথ, 'বলার আছে', শেখর বসু (সম্পাদনা) : 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প', এ বং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৪৩

৬. সেনগুপ্ত, সুব্রত, 'জামা', তদেব পৃ. ৫৫

৭. চন্দ, অমল, 'বারান্দা', তদেব পৃ. ১০৩

৮. বসু, শেখর, 'সার্সি', তদেব পৃ. ৭২

৯. বসাক, বলরাম, 'কার্পেট', সৌমব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা) : 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', গাংচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২০৯

১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, জুন ২০০৪, পৃ. ৭১

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 217 - 223
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের অনুগল্পে জীবনভাবনা ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ

সুদেষ্ণা আদক
Email ID : sudeshnaadak733@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Imprint of identity, scientific attitude, heuristic conception, diversity, short vignettes, subtle incidents, wild flowers, colourful artistry, trivial incidents, harsh life reality.

Abstract
Banaful is one of the mostly noticeable and popular Author in the Bengali literature. His actual name is Balai Chand Mukhopadhyay. He was attentive about writing from his Childhood. He disguised himself by this pen name to keep his identity secret. He was a fiction writer, playwright, poet and essayist. By profession he was a doctor. He left his imprint of identity by writing innumerable poems, novels, short stories and essays. He was born on 19th July 1899 at village Monihari in Purnia district of Bihar of undivided India. Banaful wrote more than one Thousand of poems. Moreover, he composed 60 movels, near about 600 short stories, 5 dramas and lots of essays. He came in contact with familiar unknown people of different communities and different occupations coming every day to the Ganga Ghat and railway station adjacent to his house. The stories of those people evolved fluently in various compositions of Banaful and enriched his literature. Like Banaful, his father was also a doctor, and he was associated with social welfare work and various newspapers. Banaful's bountiful scientific attitude and heuristic conception made his literature at the peak of originality and individuality. His curious vision at human life and human characters made his writings filled with diversity and novelty. He portrayed subtle incidents of real life through simple stories. In short stories, he used simple languages with explicit messages. In Bengali the word 'Banaful' suggests 'collection of wild flowers'. Literally his compositions are also enriched with colourful artistry.

Banaful composed different shapes of short stories. The smallest short stories he composed are often just a half to one or two pages long. Banaful was mostly enthusiastic to compose these-format of shortvignettes. His short vignettes are free from dramatic and wordy sentences. Instead of fictitious words, he used deeply meaningful short words and sentences, which reflects the stories of real life. Banaful was a realistic author indeed. His level of drimagination did not incline to differ from reality. Most of his short stories creates deep thought attraction. By narrating a simple, trivial incident he gave a detailed account of harsh life reality. Most of his short vignettes are the manifestation of simplicity. In a few short meaningful sentences, he unveiled many complex issues of human life and character. His stories are the reflections of the experiences he had acquired throughout the life. In his short stories, Banaful beautified various feelings and emotions of human life in a

new way, new style. His short stories begins with the descriptions of simple neglected matters or incidents. But at the end of the story, only one or two sentences revealed the original flavour of the story. Banaful's short stories portrayed the greater meaning of the life.

Discussion

বাংলা সাহিত্য জগতের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং স্বনামধন্য লেখক হলেন বনফুল। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির বিষয়ে মনোযোগী হন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে আত্মপরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন। অজস্র কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক লেখার পাশাপাশি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তিনি স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার মনিহারী নামক গ্রামে ১৮৯৯ সালের ১৯শে জুলাই বনফুল জন্মগ্রহণ করেন। বনফুলের লেখা কবিতার সংখ্যা প্রায় এক হাজারেরও বেশি। এছাড়াও তিনি ৬০টি উপন্যাস, প্রায় ছ'শো মতো ছোটগল্প, ৫টি নাটক এবং অগুনতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বাড়ি সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট এবং রেলস্টেশনে নিত্যদিন আগত পুণ্যার্থীদের এবং চেনা-অচেনা বহু যাত্রীদের বনফুলের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষ-জনের সংস্পর্শে আসেন তিনি। সেই সব মানুষজনের কাহিনি বনফুলের বিভিন্ন রচনায় সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে এবং তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বনফুলের পিতাও একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনি সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পাওয়া সাহিত্যের পরিবেশ, পারিবারিক শিক্ষা ও অনুশাসনের বেষ্টনী যেমন বনফুলের সংযমী ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছিল, তেমনই তাঁর প্রত্যেকটি রচনাকে আদর্শ জীবন দর্শনের ভাবনায় আবদ্ধ রেখেছে। তাঁর উদার, বিজ্ঞানমনস্ক এবং অনুসন্ধানমূলক চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যকে মৌলিকতা ও স্বকীয়তার শীর্ষে স্থান দিয়েছে। মানবজীবন এবং মানব চরিত্রের প্রতি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিই তাঁর রচিত সাহিত্যকে বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব প্রদান করেছে। সহজ-সরল গল্পের মোড়কে বাস্তব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাবলীকে তিনি অবলীলায় তুলে ধরেছেন। তাঁর ছোটগল্পের ভাষা সহজ-সরল এবং স্পষ্ট বার্তাবাহক। 'বনফুল' - এই শব্দটির কথা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে সুদূর প্রসারিত গহীন অরণ্যের অসংখ্য বিচিত্র বন্য ফুলের সমাহার উদ্ভাসিত হয়, যা দৃষ্টি নান্দনিকতায় আনন্দদায়ক অনুভূতির আবেশ দেয়। আক্ষরিক অর্থে তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারও এমনই রঙ-বেরঙের শিল্পকলায় পরিপূর্ণ। ড. সুকুমার সেনের কথায় —

> "বলাইবাবুকে আমরা এখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ চম্পূ-লেখক, বলতে পারি। সুতরাং তাঁর 'বনফুল' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করা অসার্থক নয়। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে 'ফুল' আছে অর্থাৎ (কবিতা ও কাব্য) আছে, 'বন' অর্থাৎ উপবন— ফলপ্রসূ ও ছায়াবৃক্ষও আছে। তাঁকে আমরা আমগাছের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি আমের ফল সর্বজনগ্রাহ্য, আমের ফুল মধুকর ও কবিগণ জ্ঞাত।"[১]

বনফুল বিভিন্ন আকৃতির ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর রচিত সবথেকে 'ছোট' আকৃতির গল্পগুলো আধ পৃষ্ঠা থেকে এক বা দু-পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার 'মাঝারি' গল্পগুলো দু-পৃষ্ঠার থেকে বেশি কিন্তু পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বনফুল এমন আকৃতির অণুগল্প বিন্যাসে বেশি পরিমাণে উৎসাহী ছিলেন। একজন সাহিত্যিক যেখানে অনেক বড়ো বড়ো উপন্যাস রচনা করেছেন, সেই তিনিই কীভাবে মাত্র এক-দুই পৃষ্ঠার ছোটগল্প রচনা করতে পারেন— তা যথেষ্ট ভাবনার অবকাশ দেয়। বনফুলের ছোটগল্পগুলো অতিরঞ্জকতা এবং শব্দবহুল বাক্যের প্রয়োগ থেকে মুক্ত। কল্পিত শব্দমালার পরিবর্তে সংক্ষেপে অথচ গভীর অর্থপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের আশ্রয়ে বাস্তব জীবনের কাহিনিকে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিমায় সাহিত্যের পাতায় আবদ্ধ করেছেন। বনফুল প্রকৃতপক্ষে একজন বাস্তববাদী লেখক ছিলেন। কল্পনাকে তিনি বাস্তবের সাথে আলাদা হতে দেননি। পরিমিত শব্দপ্রয়োগ, কোনো ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের ঘটনাকে পাঠকগনের হৃদয়ে গভীরভাবে ভাবনার আকর্ষণ সৃষ্টি করে বনফুলের বেশিরভাগ গল্পগুলো। সবকিছু স্পষ্টভাবে না বলেও পাঠককে গল্পের সঠিক মর্মার্থ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাবতে বাধ্য করায় তার অণুগল্পগুলো। টানটান উত্তেজনার শেষে গল্পের রহস্য উন্মোচনের পর তাই শিহরিত হতে হয় প্রবল ভাবে। বনফুলের বেশিরভাগ অণুগল্পগুলোতে সরলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সরলতাকে নিরেটভাবে বুনন করেছেন, আলগা হতে দেননি কোথাও। মানবজীবনের অনেক জটিল বিষয়কে তিনি হাতেগোনা সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যের মধ্যেই বুদ্ধিদীপ্ত ও অর্থপূর্ণভাবে উন্মোচন করেছেন, যার মর্মার্থ হৃদয়ের অতলস্পর্শ করে জাগতিক অনুভূতির সঞ্চার করে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর প্রত্যেকটি গল্প জীবনবোধের ভাবনায় পরিপূর্ণ। অব্যর্থ উপমার প্রয়োগ তাঁর অণুগল্পগুলোকে পাঠককুলের অন্তরে স্থান দিয়েছে।

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল অনুভূতি। মানব চরিত্রের বিভিন্ন অনুভূতিগুলোকে বনফুল তাঁর গল্পে নবভাবে, নবরঙে, নবসাজে সজ্জিত করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ অণুগল্পের শুরুর দিকে সহজ সরল উপেক্ষিত বিষয়ের বর্ণনা থাকে। কিন্তু গল্পের শেষের দিকের কেবলমাত্র একটি বা দুটি বাক্যই যেন গল্পের আসল নির্যাসকে সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করে তোলে। আর এই শেষের দিকের একটি বা দুটি বাক্যই গল্পের প্রাণ ভোমরা রূপে সমগ্র অণুগল্পের কাহিনিকে অঙ্কন করে। অনেকটা ঠিক মেরুদণ্ড সোজা রাখার মতো গল্পের মূল বক্তব্যকে ধরে রাখে। ভাবতে বাধ্য করায় যে, এই একটি বাক্যই তো আসলে একটি গল্প, আলোড়িত করে পাঠক হৃদয়কে। বৃহত্তর জীবনের অর্থের সন্ধান মেলে বনফুলের গল্পগুলোতে। 'নিমগাছ' হল, বনফুল রচিত এমনই একটি গল্প। গল্পটিকে 'ছোটগল্প' না বলে 'অণুগল্প' বললেই বোধহয় এর বিচার যথার্থ ভাবে করা হয়। গল্পটি আকৃতিতে খুবই ছোটো, মাত্র আধপৃষ্ঠার। একঝলক দর্শনে গল্পটিকে কবিতা ভেবে দৃষ্টিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। গদ্য কবিতার আঙ্গিকে বিন্যস্ত কেবলমাত্র সাতাশটি বাক্যেই এই গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। সমগ্র গল্প জুড়েই বনফুল একটি নিমগাছের বর্ণনা যেভাবে অঙ্কিত করেছেন তা এককথায় প্রকাশ করা দুরূহ একটি নিম গাছের বর্ণনা যে এত সুন্দরভাবে কোনো সাহিত্যিক তুলে ধরতে পারেন, তা বনফুলের এই অণুগল্পটি পাঠ না করলে কল্পনা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। গল্পের প্রথম ছাব্বিশটি বাক্য জুড়েই রয়েছে একটি নিমগাছের অপূর্ব বর্ণনা, নিমগাছের ভেষজ গুণাবলী, মানব জীবনে তার উপকারিতার মাহাত্ম্যের জয়জয়কার। আর একদম শেষ বাক্যটি তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যে গল্পটি কেবলমাত্র আর একটি নিমগাছের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রইল না; গল্পটি হয়ে উঠলো বৃহত্তর মানবজীবনের স্বরূপ।

মানব জীবনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে নিমগাছ সম্পর্কযুক্ত। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ হিসেবে যেমন নিমগাছের ছাল বা পাতা ব্যবহৃত হয়, তেমনই নিমগাছের কচিপাতা সেবন করলে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আবার অনেকেই দাঁত ভালো রাখার উদ্দেশ্যে নিমগাছের কচি ডাল চিবোয়। মনুষ্য জগতে নিম খুবই উপকারী একটি গাছ হিসেবে পরিচিত। মানুষ সমস্ত রকম ভাবেই নিমগাছ থেকে উপকার গ্রহন করে। এমন বহুগুণ সম্পন্ন গাছ কবিরাজদের কাছে সবসময়ই প্রশংসা যোগ্য একটি বস্তু। কবিরাজের কাছে নিমগাছ যেসব কারণের জন্য এত প্রশংসনীয়, ঠিক সেই নিমগাছটিই কবির কাছে ভিন্ন মাত্রাই, ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত হয়ে গল্পটিকে এক অনন্যতা প্রদান করেছে। কবিরাজ ও কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য খুব নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন লেখক। কবিরাজের কাছে নিমগাছ প্রিয় কেবলমাত্র তার গুণাবলী ও ব্যবহারিক কার্যকারিতার জন্য, কিন্তু কবির দৃষ্টিমানসে অপরূপ সৌন্দর্য্যবোধ প্রাধান্য পেয়ে প্রকট হয়েছে।

"...ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।"[২]

গল্পের একদম শেষ লাইনে ব্যবহৃত এই বাক্যটিই রূপকের আড়ালে বাস্তবজীবনের যে চিত্র প্রতিচ্ছবিত করেছে, তা গল্পটিকে এক অসামান্য শিখরে স্থান দেয়। রূপকের আশ্রয়ে, ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যের মাধ্যমে বনফুল সমাজের চরম বাস্তবতা যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা তাঁকে অণুগল্পকার হিসেবে এবং অন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। মুক্তির প্রবল মনোবাসনায় অপেক্ষমান নিমগাছ ও 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটি' একাত্ম হয়ে গিয়েছে। কবির সাথে নিমগাছ চলে যেতে চাইলেও যেতে পারে না, কারন তার শিকড় যে মাটির অনেক গভীরতায় প্রবেশ করে সুদূর বিস্তৃত হয়েছে। একই রকম ভাবে আমাদের সমাজের গৃহবধুরা নিত্যদিন সাংসারিক জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। তাঁদের নিজস্ব চাহিদা, আশা-আকাঙ্খাগুলো বলিপ্রদত্ত হয় সাংসারিক বন্ধন, স্নেহ, মায়া, মমতা, সন্তান, পরিবার নামক প্রচলিত ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার জোরপূর্বক অভিপ্রায়ে। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব আর সামাজিক মূল্যবোধের আদর্শ তাঁদের কাছে অসহ্য

যন্ত্রণাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এই বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে না। মনের গভীরে মুক্তির প্রবল ব্যাকুলতাকে বিসর্জন দিতে হয় তাঁদের। সাংসারিক চাপে জর্জরিত নারী-হৃদয় কালের প্রবাহে ভুলতে বাধ্য হয় তাঁদের নিজ সত্তাকে, মনের সুপ্ত বাসনাকে, আকুলতাকে; স্থান দেয় হৃদয়ের অতলেই, কারণ নিম গাছটির মতোই তাঁদের জীবনমূল অনেক গভীরে সম্পৃক্ত। মুক্তির ইচ্ছে থাকলেও, উপায় নেই। কবিরাজ ও কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের আড়ালে বনফুল যেভাবে সমাজের কঠোর বাস্তবতাকে উলঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন তা শৈল্পিক নান্দনিকতায় অসাধারণ। গৃহবধূদের ওপর হওয়া নির্যাতন, মানসিক দ্বন্দ্ব নিমগাছের রূপকাশ্রয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। গল্পের শেষ বাক্যটি বৃহত্তর মানব জীবনের এক গভীর ব্যঞ্জনা প্রদান করেছে। বাড়ীর গৃহবধূ যদি উপকারী নিমের মতো গৃহকর্মে দক্ষ হন, লক্ষ্মী বউ হন তাহলে তিনি সর্বত্র কদর পান। সমাজের সবকিছুর বিচার ব্যবহারিক গুণাবলীর নিরিখেই বিবেচিত হয়, বাকি সমস্ত কিছুই সেখানে অবহেলিত। এত উপকারী হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে নিম গাছের কেউ যত্ন করে না, ঠিক তেমনই গৃহবধূরা পরিবারের জন্য যতই মঙ্গলদায়ক হোক না কেন তাঁদের স্থান হয় এক কোণে, অনাদরে অবহেলায়। নিম গাছের মতো তাঁদেরও কোথাও নড়বার পথ নেই। কয়েকটি বাক্যের এই গল্পটিতে বনফুল যেভাবে সমাজের চরম সত্যকে অনায়াসে রূপদান করেছেন, তা তাঁকে অণুগল্পের সাম্রাজ্যে এক বিশিষ্ট পদে আসীন করেছে।

বনফুল রচিত 'আত্ম-পর' অণুগল্পটি মাত্র উনিশটি বাক্যেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় না করেই বনফুল যেভাবে গভীরতম হৃদয়স্পর্শী আত্মবিশ্লেষণকে তুলে ধরেছেন তা তাঁর অসামান্যতার পরিচায়ক। গল্পের কথক সারা সকাল জুড়ে পরিশ্রম করার পর দুপুর বেলায় যখন একটু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছেন, —

> "অমনি মুখের উপর খপ্, ক'রে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখীর ছানা। লোম নেই - ডানা নেই- কিম্ভুতকিমাকার! রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল - টপ্ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিক পাখীদের আর্তরব শোনা যেতে লাগল।"[৩]

সামান্য অনুশোচনাবোধ নিয়ে গল্প কথক খানিকক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে নিদ্রা গেলেন। এই ঘটনার প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে হঠাৎ একদিন কথকের সবচেয়ে আদরের একমাত্র ছেলে শচীন সর্পাঘাতে মারা গেলেন। ডাক্তার-কবিরাজ-ওঝা-বদ্যি সবাইকে দিয়ে শচীনকে বাঁচানোর সমস্ত রকমের প্রয়াস ব্যর্থ হল। বহুদিন পর কথকের হঠাৎ করে সেই পাখির ছানাটির কথা স্মরণ হল। অসহায় ছানাটিকে বেড়ালটি খেয়ে নেওয়ার পর পাখীদের যে তীব্র রব তিনি শুনেছিলেন, তা আসলে সন্তান হারানো পক্ষীমাতাদের তীব্র আর্তনাদ আর বুকফাটা হাহাকার। তাদের তারস্বরে চিৎকারের মধ্যে যে কষ্টদায়ক যন্ত্রণা ছিল, তখন কথক তা উপলব্ধি করতে পারেননি। নিজের একমাত্র সন্তানকে হারানোর পর মাতৃহৃদয়ের সেই বুকফাটা আর্তরবকে তিনি অনুধাবন করলেন। আসলে পশু, পাখি, মানুষ নির্বিশেষে সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যেই জাগতিক অনুভূতিগুলো একই, শুধু প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হয়। গল্পটির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বার্তাও দিয়েছেন বনফুল। অন্যের ক্ষতিসাধন করলে নিয়তির অদ্ভূত পরিহাসে নিজেকেও ভবিষ্যত ক্ষতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাইশটি বাক্যের এমনই একটি অণুগল্প হল 'বাড়তি মাশুল'। গল্পকথকের একজন ছেলে তারকেশ্বরের মেলা দেখতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধানের পরেও ছেলেটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সময়ের কালপ্রবাহে ধীরে ধীরে সেই স্মৃতি অবলুপ্ত হতে থাকে কথকের মন থেকে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ একদিন বোম্বে মেলের একটি কামরায় বসা থাকা একজন ছেলের মুখের সাথে নিজের হারানো ছেলের সাদৃশ্য খুঁজে পান কথক। হারানো ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে কথকের হৃদয় উদ্বেলিত হয়, বাঁধনহারা খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠেন তিনি। বোম্বে মেলে উঠে ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিশ্চিত হন, এটিই তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছেলে। কিন্তু ছেলেটির সাথে কথা বলে নিরাশ হতে হয় কথককে। আসলে মুখাবয়বের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও এটি তাঁর হারিয়ে যাওয়া সন্তান নয়। ততক্ষণে কথক ভুল পথে নিজের গন্তব্য থেকে বহুদূরে চলে এসেছেন। বর্ধমানে নেমে কথক আবার বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরলেন। এর ফলে কথককে বাড়তি মাশুল অর্থাৎ অতিরিক্ত টাকা দিতে হল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'বাড়তি মাশুল' কথাটির মাধ্যমে বনফুল গল্পে অতিরিক্ত টাকার কথা উল্লেখ করলেও আসলে নিজের হারানো ছেলেকে নতুন করে আবার হারানোর মাধ্যমে কথকের হৃদয়ে হঠাৎ আগত দুঃখভরা যাতনাকে তীব্রভাবে উসকে দেওয়ার বাড়তি মাশুলের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। 'বাড়তি মাশুল' - এই কথাটি তাই উপমার আড়ালে কথকের অশ্রুসিক্ত অতিরিক্ত আবেগ ও যন্ত্রণার সমার্থক স্বরূপ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অণুগল্পগুলোর শব্দচয়নে বনফুল অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে গল্পগুলোকে একদম সাদামাটা বলে মনে হলেও গল্পগুলো ইঙ্গিতপূর্ণ গভীর বার্তাবাহক। গল্পের আসল কাহিনিরস বনফুল স্পষ্টভাবে লেখেন না, তা পাঠককে তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করার জন্য তুলে রেখে দেন।

'নিমগাছ' অণুগল্পে ভারতীয় সমাজে অবহেলিতা, নির্যাতিতা নারীদের যে স্বরূপ বনফুল এঁকেছেন, তা সূর্যালোকের ন্যায় আরো তীব্র হয় 'রামায়ণের এক অধ্যায়' নামক অণুগল্পে। অণুগল্পটি আকৃতিতে এমনিতেই খুব স্বল্প, বনফুল সেটিকে আবার প্রাসঙ্গিক দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বটি হল 'অভিনয় কান্ড'। দ্বিতীয় পর্বটির কোনো নামকরণ করেননি তিনি, সুচারু ভাবে তা পাঠকের জন্যে রেখে দিয়েছেন। গল্পটি পাঠ করার পর দ্বিতীয় পর্বের নামকরণ কী হতে পারে তা খুব সহজেই অনুমেয়। অণুগল্পকার হিসেবে বনফুলের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক এখানেই। তিনি খোলসা করে সবটা বলেন না, কিন্তু উপকরণ ও উপাদান সঠিক শব্দে বেঁধে পাঠকের হৃদয়ে মোচড় দেন। আধপৃষ্ঠার গল্পপাঠের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় গল্পের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে। অতি সামান্য, তুচ্ছ, সাধারণ ঘটনাবলীর শেষটা এমন টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয় যে তার রেশ হয় দীর্ঘস্থায়ী। গল্পের প্রথম পর্বে মঞ্চস্থ যাত্রায় সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে অনুশোচনাবোধে বিদ্ধ রামচন্দ্রের দর্শন মেলে। সীতার শোকে বিলাপ বকছেন রামচন্দ্র। মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত রামচন্দ্র দেবীরূপী সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে রাজত্ব, ঐশ্বর্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এমনকি কুলগুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে নীতিবাক্য শোনাতে শোনাতে নিষ্ফল হলেন। দ্বিতীয় পর্বে রামচন্দ্রের চরিত্রাভিনেতা নকুড় মাইতি ভোররাতে মদ্যপ অবস্থায় কোনো রকমে বাড়ি ফিরলেন। গভীরঘুমে আচ্ছন্ন স্ত্রী হরিমতি অনেকক্ষণ পরে দরজা খুললেন। রামরূপী নকুড় মাইতির ভন্ডামি প্রতিধ্বনিত হল - "হারামজাদি, আধঘন্টা ধরে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই?"[৪] অবলা স্ত্রীর উপর চলল মারধর, লাথি।

ভন্ডামি আর বাস্তবতার মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে তা বোঝানোর জন্য এই কয়েকটি বাক্যই যথেষ্ট। আদর্শ পুরুষের সংজ্ঞা বলতে গেলে সর্বপ্রথম যার নাম স্মরণ হয় তিনি হলেন শ্রীরামচন্দ্র। এত বৎসর পরেও রামায়ণ আমাদের সুশিক্ষা দান করতে পারেনি। রামের মুখোশধারী পুরুষরা সঠিক সময়ে ঠিক যেন রাবণ রূপে প্রকটিত হন। নারীদের ওপর হওয়া নির্যাতনের চিত্র এখনও সমমাত্রায় বিদ্যমান। বনফুল সংক্ষিপ্ত রসহীন কয়েকটি বাক্যে ভন্ডামির মুখোশে লুকিয়ে থাকা মানব চরিত্রের দ্বিচারিতাকে বাস্তবতার আয়নায় প্রতিফলিত করলেন।

'উৎসব দেবতা' অণুগল্পে জনৈক ব্যক্তির বাড়ি সাজ সাজ রবে মুখরিত হয়েছে। দেবতার কাছে করা মনের সুপ্তবাসনা পূর্ণ হয়েছে, তাই ঢাক-ঢোল, বাঁশি, সানাই বাজিয়ে মহাসমারোহে দেবতার পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তীব্র আওয়াজে সাধারণ কথাবার্তা শোনাও যাচ্ছে না। এত জাকজমকপূর্ণ আয়োজন সত্ত্বেও উৎসব দেবতা মন্ডপে প্রতিমূর্ত হননি। উৎসবের এত মুখরিত কলরব দেবতার কানে এসে পৌঁছায় নি -

"...ডাক তো আসেনি। কোন সাড়াশব্দও তো পাইনি। ...কই, শুনি নি তো।"[৫]

নর্দমার ধারে অনাবিল হাসিতে মেতে ওঠা, ক্রীড়ারত দুটো শিশুর থেকে উৎসবের ডাক পেয়েছেন তিনি। মনের আনন্দে শিশুদ্বয় ধূলো দিয়ে মন্দির তৈরি করছে, ভেঙে পড়ছে, আবার গড়ছে। নির্মল হাসি আর উচ্ছাসে মেতেছে তারা। কোনো আয়োজন নেই, তারস্বরে সঙ্গীত নেই, অথচ সত্যিকারের উৎসবে সামিল হয়েছে তারা। আর উৎসব দেবতাও সবার অজান্তে সেখানে বিরাজ করছেন। আড়ম্বর আর জাঁকজমকের বাহারের মাঝে প্রকৃত আনন্দ হারিয়ে যায়। উৎসবও তার রঙ হারায়। জৌলুসময় অপ্রয়োজনীয় দেখনদারির মাঝে অর্থের চাকচিক্য শোভা পায় শুধু, মনের পবিত্রতা, নির্মলতা আর উৎসবের আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় না। কোনো রকম ভনিতা ছাড়াই এক পৃষ্ঠার অণুগল্পে বনফুল মানুষের ভোগবিলাসি, ঢক্কানিনাদপূর্ণ জীবনযাপন ও উৎসবের আয়োজনকে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষে প্রতিস্থাপন করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অতি সংক্ষিপ্ত 'পাখীদের মধ্যে' অণুগল্পে কোকিলের বাচ্চাকে মা কাকের রোজ খাওয়ার খাওয়ানোর মাধ্যমে পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে উদ্ভূত আত্মকেন্দ্রিকতাকে কটাক্ষ করেছেন বনফুল। মানুষের মত রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ পাখীদের মধ্যে নেই। উদারতা, প্রেম-প্রীতি, সবাইকে আপন করে ভালোবাসার সুখানুভূতির বদলে মানুষ বড্ড বেশি শুধুমাত্র নিজেরটাই বুঝে নিতে রপ্ত হয়েছে। উপমার অন্তরালে তীব্র বিদ্রূপে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন তিনি। অপরদিকে 'তাজমহল' অণুগল্পে ফকির শাজাহান নামক এক হতদরিদ্র ভিখারির, আধখানা মুখ পচে যাওয়া স্ত্রীকে বাঁচানোর আপ্রাণ প্রয়াস এবং শেষে মৃত স্ত্রীর জন্যে নিজের হাতে কবর গাঁথাকে সম্রাট শাজাহানের প্রিয়তমার স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি তাজমহলের সাথে তুলনা করেছেন বনফুল। নিখাদ ভালোবাসার এই কাহিনি ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রেমের অনুভূতিগুলো যে সমান হয়, তারই জয়গান করে। ভিখারির এই পত্নীপ্রেম সম্রাট শাজাহানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। 'হাসির গল্প' অণুগল্পের মূলচরিত্র হরিহর চূড়ান্ত অর্থকষ্ট ও ব্যাধিতে আক্রান্ত। তীব্র জ্বর নিয়ে তাঁর পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েটি রোগশয্যায় শায়িত, বারান্দায় একটি শিশু ক্ষিদের জ্বালায় ক্রন্দনরত, পাওনাদার মুদি বিল নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত, আর এইদিকে সাংসারিক জ্বালায় জর্জরিত স্ত্রী রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করেছে। এমন এক অভাবী, ঋণগ্রস্ত হরিহর বাবু হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে গরম জলে পা দুটো ডুবিয়ে ফুটবাথ নিতে নিতে "...একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম।"[৬]

অভাব-অনটন আর সাংসারিক চাপে পিষ্ট হতে থাকা এমন মানুষগুলোই অন্যদের হাসি-খুশি, নির্মল আনন্দের খোরাক যোগান দিয়ে চলেছেন। একটি মাত্র বাক্যেই জীবনের চরম বৈপরীত্যকে আঁকলেন বনফুল। জীবনের রঙ্গ-তামাশার আড়ালে যে নিদারুণ নিয়তির পরিহাস অন্তর্নিহিত, তা ভাবনার উদ্রেক জাগায় তাঁর অণুগল্পগুলো। ঠিক এই কারণেই তাঁকে অণুগল্পের প্রকৃত রূপকার হিসেবে অভিহিত করা যায়।

'একফোঁটা জল' অণুগল্পে ছেলেবেলায় মাকে হারানো জমিদার শ্যামবাবু মাতৃদুগ্ধের অভাব কখনও টের পাননি। নিজের মাকে হারানোর স্মৃতিটুকুও নেই তাঁর কাছে। বাড়ির গাভী মঙ্গলার দুগ্ধ পান করেই তিনি হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন। সেই গাভীর মৃত্যু তাঁকে সত্যিকারের মা হারানোর যন্ত্রনায় বিদ্ধ করেছে। তাই তাকে হারিয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করেছেন। গরুকে শুধু মাতৃ সম্বোধন নয়, মাতৃরূপে পূজা করেছেন তিনি। 'ভিতর ও বাহির' অণুগল্পের বিপত্নীক রামকিশোরবাবু পেশায় উকিল হওয়ার কারণে তাঁর বাহ্যিক মন সর্বদা মিথ্যের আশ্রয়ে পরিচালিত। ফলত অন্তরাত্মা বহুদিন যাবৎ মৃতপ্রায়। এমন রামকিশোরবাবুর ভেতরের মনটা আত্মগ্লানিতে অসহায়ভাবে ডুকরে কেঁদে ওঠে, যখন ভুলবশত দেওয়া তারই পেশাদারি পরামর্শ সন্তান ধারণে অক্ষম নিজ কন্যাকে কল্পনাতীত ভাবে দাম্পত্য বিচ্ছেদের মত করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। হৃদয়স্পর্শী চিন্তা ভাবনাকে আমরা প্রায়শই বাহ্যিক সাময়িক লাভ-ক্ষতির আকাঙ্ক্ষাই দমিয়ে রাখি, সময়ের নির্দয়তা সেই লাভ-ক্ষতির হিসেবকে দাঁড়ি-পাল্লায় সমান ভাবে ওজনের নিমিত্তে চরমতম ভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনাদায়ক যাতনার সম্মুখীন করে। সামান্য কিছু ঘটনা জীবনে কীভাবে গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে, তার প্রতিফলনে বনফুল সত্যিই অসামান্য। বনফুলের অণুগল্পগুলোতে জীবনের এমনই খণ্ড খণ্ড চিত্র প্রতিধ্বনিত হয়। আর এই খণ্ডচিত্রই জীবনের হাজারো জটিল রহস্যের এক একটি অধ্যায়কে এক লহমায় উন্মোচিত করে।

বনফুলের আগেও অনেক অণুগল্প রচিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লিপিকা' গ্রন্থে বেশ কিছু সার্থক অণুগল্পের সন্ধান মেলে। তবে বনফুলের মত এত বিশাল পরিমাণে এবং এত বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ অণুগল্প রচনা করেননি। গল্প লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে বনফুল তাঁর প্রিয়বন্ধু পরিমল গোস্বামীর উৎসাহ ও আগ্রহের কথা বিশেষ ভাবে বলেছেন। তাঁর অণুগল্পগুলোতে একধরনের কাব্যিক মেজাজ ধরা পড়ে। 'অণুগল্পকার' ও 'বনফুল' শব্দদুটোকে একে অপরের সমার্থক বলা চলে। এত বেশি পরিমাণে লেখার কারণ হিসেবে বনফুল তাঁর ঋণ পরিশোধ করার তাড়নার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থ সমস্যায় জর্জরিত বনফুলের সমস্ত রচনা হয়তো সেই কারণে সৃষ্টির সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ হতে পারেনি বলে অনেকে সমালোচনা করেন। তাঁর লেখা অণুগল্পের সার্থকতা ও যথার্থতা নিয়ে যতই প্রশ্নচিহ্ন থাকুক না কেন, একজন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ঘটনার ঘনঘটা, শব্দ প্রাচুর্যতার পরিবর্তে বনফুল একটি ঘটনার সাথে অপর একটি ঘটনার তুলনা টেনে তাঁর বক্তব্যকে একমুখী ও স্পষ্ট ভাবে তুলে

ধরেছেন। তাঁর বেশিরভাগ অণুগল্পের শেষের বাক্যগুলো যেন সমস্ত জীবনের অর্জিত জীবনবোধের উপলব্ধি। মৃৎশিল্পীর ন্যায় শৈল্পিক কারুকার্যে বনফুল জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থকে, মানব চরিত্রের হাজারো ভালো-মন্দ দিকগুলোকে, জীবন সত্যকে তাঁর সাহিত্যদর্পণে অনায়াসে সহজ ভাষায় প্রাণদান করেছেন। বনফুলের গল্পগুলোর আকার-আয়তন যেমন ভিন্ন ধরনের, তেমনই গল্পের বিষয়বস্তুগুলো এতই বৈচিত্র্যময় যে একের অধিক গল্পগুলোকে বিশেষ কোনো শ্রেণীতে বা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা দুঃসাধ্য হয়ে দাড়ায়। তাঁর অণুগল্পে যেমন নির্মল হাস্যরসের উপাদান মেলে ঠিক সেভাবেই সমাজের রুক্ষ বাস্তবতা, কঠোরতা, প্রেম, বিচ্ছেদ, দুঃখ, গ্লানিময় জরাজীর্ণ পৃথিবীর ক্লান্তিকর অনুভূতিগুলো সীমাহীনভাবে উঠে আসে। সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি বনফুল একজন চিত্র শিল্পীও ছিলেন। বনফুলের সাহিত্যানুরাগী ড. সুকুমার সেন তাঁর ‘বনফুলের ফুলবন’ গ্রন্থের ‘ভূমিকা’ অংশে স্রষ্টা সাহিত্যিকদের দুটি জাতে বা শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন—একটি জাতকে তিনি অভিহিত করেছেন ‘গুটিপোকার দল’ বিশেষণে, আর অপর জাতটির নামকরণ করেছেন ‘বাবুই পাখির দল’ হিসেবে। দুটো জাতেরই জীবনধারণ প্রণালী, খাদ্য-সংগ্রহের প্রক্রিয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ড. সুকুমার সেনের ভাবনায় -

> “...গুটিপোকা-সাহিত্যিক খোঁজেন ভাবের বৈচিত্র্য, বাবুই-সাহিত্যিক খোঁজেন বিষয়ের ভিন্নতা। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক। তিনি কবিও ছিলেন। কবিতা বুঝতেন, কবিতা লিখতেন। তবে তাঁর চোখ ছিল সজাগ - বাইরের দিকে, অতন্দ্রিত ভাবে শুধু অন্তরের দিকে নয়।”[৭]

Reference:

১. সেন, সুকুমার, বনফুলের ফুলবন, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, দোলপূর্ণিমা ১৩৬৫, পৃ. ৬

২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫৮, পৃ. ৫২৪

৩. তদেব, পৃ. ৭

৪. তদেব, পৃ. ২৭

৫. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুল রচনাবলী (দশম খন্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃ. ৩৪৭

৬. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫৮, পৃ. ৩৭৭

৭. সেন, সুকুমার, বনফুলের ফুলবন, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ - দোলপূর্ণিমা ১৩৬৫, পৃ. ৯

Bibliography:

মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুল রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০

ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র, ছোটগল্পের পর্ব-পর্বান্তর, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 224 - 232
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রসঙ্গ কালের বিবর্তনে দরিদ্র জীবন সংগ্রাম : সুশীল জানা ও ভগীরথ মিশ্র

বৈশালী সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর
Email ID : baishalisarkar158@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Sushil Ranjan Jana, Bhagirath Mishra, short story, insulted people, will to live, their words in short stories.

Abstract
After the advent of Bengali fictional short stories, a significant shift in their central themes was taken place after the First World War. Moving beyond personal narratives, these stories began to reveal societal truths such as class-divided structures, class struggles, and the exploitation by rulers through the authors' writings. The struggles for survival faced by the poor and lower-class people, along with their deprivation, humiliation, and intense suffering, are vividly portrayed in the works of Sushil Jana, a contemporary writer of the time of the World War. However, the story of this lament does not stop even after the independence of India. Writer Bhagirath Mishra depicted a similar picture through his literary works. Although there is a gap of almost thirty years in the writings of the two writers, there is no particular difference in the life journey of the oppressed people portrayed in their stories. An attempt has been made to discuss these issues in this article.

Discussion

ভূমিকা : প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প - উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় এই তিনটি সাহিত্য রূপের জন্ম। এই তিনধারার মধ্যে ছোটগল্প পাঠক সমাজের কাছে বেশি প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটপ্রাণ-ছোটকথা-ছোটব্যাথা এবং শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার অনুভূতিই পাঠককে ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষিত করে তুলেছে। ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন পরিবেশ, সমাজ, শিক্ষা, সাধারণ মানুষ, অর্থ ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া যে কোনো বিষয়কে তার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা দিয়ে তুলে ধরেন পাঠকের কাছে। তার কাহিনী বর্ননার সহজ আঙ্গিক ও সত্যতা পাঠকের কাছে তার বার্তাকে পৌঁছে দেয় খুব সহজ ভাবে। ঊনবিংশ ও বিংশ এই দুই শতাব্দীতেই ছোটগল্প চর্চার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তবে দুই শতকের ছোটগল্পের বিষয়ে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে যেখানে নিটোল, খাঁচে বাঁধা, কাহিনি নির্ভর, একমুখী গল্প পাওয়া যায়, বিশ শতকে সেখানে গল্পের আঁটোসাঁটো ভাব ছেড়ে মনস্তাত্ত্বিক তীক্ষ্ণ নির্মাণ, সংকেতময় রচনা, সমাজের বাস্তব রূপকে লেখকেরা তাদের কলমে তুলে ধরলেন। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ছোটগল্পের স্রোতবদল ঘটেছে। রক্ত মাংসে

তৈরি মানুষের সমাজ, বেঁচে থাকার লড়াই, বাস্তবের পটভূমি নিয়েই গল্পকারগণ গল্প রচনা করতে থাকেন। যা মানবহৃদয়, মানসিকতা ও মানবজগৎ-র সত্য চিত্র পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত করে ফুটিয়ে তোলে।

সুশীল জানা : লেখক সুশীলরঞ্জন জানার জন্ম ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন। মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন তিনি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে তিনি লেখা শুরু করেছেন। তাঁর প্রথম গল্প 'শেষ রজনী' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় 'উত্তরা' পত্রিকায়। এছাড়া তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী', 'প্রবর্তক', 'অলকা' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রথম পর্বের তাঁর লেখায় যৌথ পরিবারের কাহিনী বর্নিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিম্নবৃত্ত, পিছিয়ে পরা সাধারণ মানুষ ও কৃষিজীবি মানুষদের কথা তাঁর কলমে তুলে ধরেছেন। দরিদ্রের জীবন সংগ্রাম, খাদ্য সংকট, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্ত সমস্যা ইত্যাদি তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাই তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে।

এমনি অত্যাচারিত, শোষিত মানুষদের নিয়ে তাঁর ১৯৪৪ সালে রচিত 'রাত্রির লেখা' গল্পটি। গল্পের শুরুতেই এই চাষা মানুষগুলোর বিদ্রোহীসত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায় –

> "বিরাট একটা ধানের স্তূপ পুড়ে খাক্ হয়ে যায়,..."[১]

এবং সেই কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে হাসে কালো নোংরা দাঁতওয়ালা মানুষগুলো। গ্রামের চারিদিক জ্বলছে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এমন দুঃসময়ে গল্পের নায়ক নবীন নিয়ে আসে পুলিস আর ফৌজ আসবার খবর। নবীনের ঘরে তার স্ত্রী তারিণীরও বাস। পুলিস এসে কেবল পুরুষদের ধরে নিয়ে বা মেরে দিয়ে যায় না, তাদের ঘরের স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। নবীনের সেই নিয়েই দুশ্চিন্তা, সে তারিনীকে বাপের বাড়ি রেখে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারিনীর যেন কোনো ভয় নেই, সে নিশ্চিন্তে আছে তার স্বামী সঙ্গে আছে বলে। তারিণীর কথায় –

> "স্বোয়ামী যার পাঁচ জনকে ভরসা দেয় -তার আবার ভয় কি!"[২]

তারিণীর রাত ভর বাচ্চাদের হাত ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে পালাতে ভালো লাগে না আর। পুলিস আসার খবরে পাশের চার পাঁচটি গ্রামের মানুষ ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়িয়ে পরে পথে, পুলিস থেকে লুকোতে। নবীন তারিণীকে তাড়া দেয় সব গুছিয়ে নেওয়ার। কিন্তু তারিণীর কণ্ঠে শোনা যায় তীব্র প্রতিবাদ –

> "কিসের জন্যে এই কুকুর-বেড়ালের মতো ঘোরা বাপু?"[৩]

তারিণী কেঁদে ফেলে। গত একমাসের মধ্যে নবীন কত শাঁখের ডাক, কত সভা সমিতি, কত বন্দুকের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে পরেছে। এই শোষনের বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রতিবেশী সাবিত্রির স্বামী মারা গেছে, গোকুল নিখোঁজ হয়েছে, তার ওপর নবীন ভীষন গোঁয়ার, তাই তাকে নিয়ে তারিণীর বড়ো ভয়। সে কথা চায় নবীনের কাছ থেকে, সে যেন মারামারি না করে এবং প্রাণে না মরে। এই অংশে এই তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষ যারা অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে পরেছে, তাদের মধ্যেও ভালোবাসার স্বরূপ লেখক তুলে ধরেছেন –

> "একটা রোগা কালো মেয়ের সভয় কণ্ঠস্বর আর ভীরু সশঙ্কিত দৃষ্টি যে এত ভালো লাগে-আর তাকে বেষ্টন করে বলতে ইচ্ছে করে নাঃ না- সে মারামারি করবে না।"[৪]

কথা দেওয়ার পর তারিণিকে বাপেরবাড়িতে পৌঁছে দেয়। সেখানে তারিণীর ফিরে না যাওয়ার আকুতিতে নবীন জানায়, পুলিস এসে প্রথমে খোঁজ করবে বড়লোক অবিনাশবাবুর বাড়ি। অবিনাশবাবু ও অন্যান্য বড়বাবুরা বার বার নবীনের কাছে সাহায্য চেয়েছে তাকে রক্ষা করার। আজ এমন বিপদের দিনে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চুপ করে লুকিয়ে বসে থাকবে কি করে নবীন। অন্ধকারে মিশে যায় নবীন, আর তারিণীর মনে ভাসতে থাকে –

> "মাথাটা থেঁৎলে গিয়েছে হয়ত লাঠির ঘায়ে অথবা সাবিত্রীর স্বামীর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জলার ধারে।"[৫]

ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে আসে তার। বড়দাদা অধরের কাছে কান্না কাটি করে তারিণী অধর ও আরো চার পাঁচজন বেরিয়ে পরে নবীনের গ্রামের উদ্দেশ্যে।

নবীনের গ্রামের সামনে গাঁয়ের জোয়ানেরা পাহাড়া দেয় শাঁখ হাতে, কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই তারা শাঁখ বাজায়। নবীনও আছে তাদের মধ্যে, হঠাৎ চোখে হালকা দেখা যায় একটি ছায়া মূর্তি, কিন্তু সে গ্রামের অন্ধ রামদাস

বৈরাগী। তার যাবার আর গতি নেয়, তাই সে বেরিয়ে পরেছে একলা ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে। বৈরাগীর সঙ্গে কথোপকথনের পরই তাদের কানে ভেসে আসে দূরের গগন ভেদী আর্তনাদ। তারা জমাট বাঁধা অন্ধকারে খুঁজতে থাকে তার স্রোত। তারপরই দেখা যায় কয়েকটি ছায়া মূর্তি ছুটে আসছে তাদের গ্রামের দিকে, তারা শাঁখ বাজাতে থাকে উদ্ধশ্বাসে। যারা ছুটে আসছিল তারা জড় হয় নবীনের বাড়ির দেওয়ায়। নবীন কঠিন অন্ধকারে শুনতে পায় তার নামের ডাক –

"কে ডাকে তার নাম ধরে! তারিণীর দাদা অধরের গলা না?"[৬]

– নবীন আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে। অধর নবীনকে জানায় তারিণীর অনেক অনুরোধের পর যখন তারা গ্রামের পথ দিয়ে ফিরছিল হঠাৎ তাদের সামনে পরে যায় পুলিস –

"শাল ভল্টু হ্যায়-পাকড়ো…"[৭]

তারা সবাই ছিটকে পরে একে অপরের থেকে। নবীন সজাগ হয়ে ওঠে, অন্ধকারে ধাবমান চিৎকার শুনতে পায় – "আরে পিয়ারে"[৮] তারিণীর আর্তনাদ ঝড়ের মতো তোলপার করে দেয় তার সমস্ত শরীর-

"…গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ে আবার নবীন।"[৯]

গল্পের শুরুতে যেমন দেখতে পাওয়া যায় লাঞ্ছিত মানুষদের আগুন জ্বালিয়ে চরম বিদ্রোহ, তেমনি আবার গল্পের শেষে এসে তাদের চূড়ান্ত হেরে যাওয়ার বর্ণনাও পাওয়া যায়। ক্ষমতা যখন বিদ্রোহী প্রাণগুলোকে কেড়ে নিতে পারে না তখন তারা অতি নিম্নে নেমে শিকার করে তাদের ঘরের স্ত্রীদের। কারণ তারা জানে এমন কঠিন জবাব দিতে জানা মানুষগুলোকে তারা বশ করতে পারবে মনের আঘাত দিয়ে। লেখক যেমন একদিকে অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার লড়াইকে তুলে ধরেছেন তেমনি অত্যাচারকারীর নিম্ন মানসিকতা ও মেয়েদের প্রতি নির্যাতনের চিত্রও তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

অত্যাচারের চিত্র অঙ্কনে লেখক ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে 'স্বাধীনতা দিবস' গল্পটি রচনা করেছেন। ১৯৪৪ সালে রচিত এই গল্পে ১৫ই আগস্ট নয়, স্বাধীনতার আশা নিয়ে পালিত ২৬শে জানুয়ারির স্বাধীনতা দিবসের প্রসঙ্গ এনেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইকারী বিপ্লবিদের অত্যাচাররের পাশাপাশি, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের উপর হওয়া অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। কিসান, তাঁতী, কুমোর, কামারদের গ্রামের জমিদার অম্বিকাচরণবাবু। মাঠে নতুন ফসল উঠার সময়, কিন্তু মাঠ ধূ ধূ ফাঁকা। অম্বিকাচরণ বৈঠকখানা থেকে দেখতে থাকেন ঝড়ে ভাঙা ঘরগুলো। কিন্তু ভাঙা ঘরগুলোর থেকেও তার মন টানে পীর আফজল শেখের পাঁচ কাঠা জমিটা। আর ভাবতে থাকেন, এই জমিটাই এবার তার চায়। কিন্তু তার ভাবনায় বাঁধা পরে চৌকিদার সাহেব আসার ফলে। চৌকিদার খবর দেয় - "দারোগাবাবুর ডাক।"[১০]

দারোগাবাবুর নামেই অম্বিকাচরণের বুক কাঁপতে থাকে। দারোগাবাবু ব্যঙ্গ করে তাকে এস-ডি-ও সাহব বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ মাস ছয় আগেই দারোগাবাবুর অফিসের ঘরদোর সব ভেঙে ফেলেছিল গ্রামের লোকেরা। তবে দারোগাবাবু এবার এসেছেন হুশিয়ারি জানাতে। বেঁটে-খাটো একটা রিভলভার নিয়ে খেলা করতে করতে তিনি জানান অম্বিকাচরণকে জানান, আর দিন পাঁচেক পরেই ২৬ জানুয়ারির স্বাধীনতা দিবস। তিনি আরো সতর্কবার্তা দেন-

"মাত্তর গুটিদশেক বন্দুক তো এনেছি, দেখি পাখি শিকার কেমন হয় এবার।"[১১]

দারোগার বরফের মতো জমাট বাঁধা কণ্ঠের প্রশ্নে অম্বিকাচরণ শুষ্ক কণ্ঠে জানায় পতাকা তোলার লোকজন সবাই জেলে বন্দি। আর যারা গ্রামে আছে তারা চাষাভূষা, খাবারের অভাবে তারা সব মরনাপন্ন। দারোগাবাবুর কাছ থেকে ঘরে ফিরে দাওয়ায় জমা ভিড় দেখে তার মনে পরে আজ ধান দেওয়ার দিন, বুভুক্ষগুলোর জমির বদলে। দারোগার আগমনের কথাটুকু জানিয়ে তিনি ডুবে যাব হিসেবে। জমির হিসেব তিনি নিজে করেন আর টাকার অঙ্ক কষে তার ছেলে উপেন। টিপসই দিয়ে বিক্রি করে দেয় অম্বিকাচরণকে দুই বা দশ বিঘা। অম্বিকাচরণের ধানের গোলা ঘিরে সর্বভুকের ভিড় জমে থাকে। সব হিসেব চুকানোর পর তিনি দারোগার কথাটি পারেন। স্বাধীনতা দিবস, দারোগার দশটা বন্দুকের কথা শুনে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। মাঠের পশ্চিমপ্রান্তের দিকে রিলিফ অফিসের পাশেই দারোগার তাঁবু পড়েছে। অম্বিকাচরণ তাদের বারবার সতর্ক করে চেয় দারোগাবাবু সম্পর্কে –

"দারোগা বলে দিয়েছে আমাকে। পতাকা-টতাকা তুললে এবারে স্রেফ গুলি।"[১২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উৎকণ্ঠিত দলের মধ্যের একজন শ্রীমন্ত, সবাই চলে যাবার পরও বসে থাকে দাওয়ার এক পাশে। শ্রীমন্ত টাকা চায় অম্বিকাচরণের কাছ থেকে রেজেস্ট্রির আগেই, কিন্তু অম্বিকাচরণ তা দেবে না। শ্রীমন্ত মায়ের অসুস্থতা জানিয়ে টাকা চায়। কিন্তু অম্বিকাচরণ রেগে মাত্র সাত কাঠা জমির বদলে যে পাঁচমণ ধান সে নিয়েছে তা ফেরৎ চেয়ে বসে। শ্রীমন্ত পায়ে পরে কাঁদতে থাকলে তিনি শ্রীমন্তর চার কাঠার মতো ভিটে জমির বদলে ওষুধের টাকা দিতে রাজি হন –

> "ভিটে...শেষকালে ভিটেটুকুও নেবেন বড় বাবু... চোখে জল, গলা কাঁপে শ্রীমন্তের।"[১৩]

শ্রীমন্তের কথাগুলো চাবুকের মতো দাগ কাটে অম্বিকাচরণের গায়ে। মাঠের পথে ফেরৎ আসার সময় শ্রীমন্তকে অন্যেরা জিজ্ঞাসা করে টাকা সম্বন্ধে, বড়বাবুর এমন নিষ্ঠুরতা শুনে তাদের সন্দেহ হয় তাদের বিক্রিত জমির টাকাগুলো সে আসলে দেবে কিনা। শ্রীমন্তরা দুই ভাই,ছোটো ভাই এখন নেই -

> "কিন্তু সে মুখ থুবড়ে মরেছে ছ-মাস আগে থানার সুমুখে।"[১৪]

শ্রীমন্তের নিজেকে পাগলের মতো মনে হয়। অন্যদিকে অম্বিকাচরণ দারোগার চাটুকারীতা করতে ব্যস্ত সারাদিন। দারোগা সশস্ত্র দল নিয়ে সফর করে গ্রামে গ্রামে। যেন ২৬শে জানুয়ারি নিয়ে কোথাও কোনো কিছুর আভাস না পান। দারোগাবাবুর সৈন্যদের কুচকাওয়াজের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় দূরে কেউ টেনে টেনে কাঁদছে। শ্রীমন্ত ভিটে জমি বেচতে আসে বড়বাবুর কাছে, টাকা গুনে সোজা চলে যায় ডাক্তারের কাছে। কিন্তু ফল কিছু হয় না, সময় প্রায় শেষ, শ্রীমন্তের মা মারা যায়। সে কাউকে কিছু না জানিয়ে সন্ধ্যাবেলায় দেহ চাটাই মুড়ে ফেলে আসে খালে। ঘরে ফিরে ভাইয়ের মুখ থুবরানো দেহ ও মায়ের খালের ধারে পরে থাকা শীর্ণদেহ মনে করে চোখের জল গড়িয়ে পরে, আর মনে হতে থাকে 'স্বাধীনতা দিবস'। মনে হতে থাকে শ্রীমন্তের সে যদি একবার একটা পাতাকা পেত তবে দেখিয়ে দিত শোষনকারীদের। কারণ যেমন অম্বিকাচরণ তেমনি দারোগা উভয়েই ভয় করে তিনরঙা পতাকাকে। শেষ রাত্রে প্রতিবেশী রাখালের ঘরে এসে শ্রীমন্ত জানায় সে চলে যাচ্ছে,কোথায় তার ঠিক নেই, ক্রমেই অন্ধকারে মিশে যায় শ্রীমন্ত। রাখাল দাঁড়িয়ে দেখে তাকে, রাগে গা কাঁপতে থাকে, আর মনে ভাবতে থাকে হয়ত তাকেও এভাবেই সব ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে হবে যেকোনো সময়। সে রাত্রি ভোর হওয়ার পর অধরের ভিটেতে বাঁশের আগায় খবরের কাগজের ওপর তিনরঙা জাতীয় পতাকা দেখতে পায় অম্বিকাচরণ। আর তার সঙ্গে দেখে কিসান পাড়া, কুমোড় পাড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো দেহের বুভুক্ষ মানুষগুলো। অন্যদিকে মাঠের দিক থেকে এগিয়ে আসছে দারোগার পলটন বাহিনী–

> "ছাব্বিশে জানুয়ারি-ছাব্বিশে জানুয়ারি কবে? হিসেব করেন অম্বিকাচরণ, আজই তো! পতাকাটার দিকে সভয়ে চেয়ে থাকেন তিনি।"[১৫]

গল্পে একদিকে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শত্রু সৈন্য বাহিনীকে দেখিয়েছেন, যারা নিযুক্তই হয়েছেন বিপ্লবীদের দমন করতে, অন্যদিকে জমিদার বা মহাজন সম্প্রদায়, যারা এই গ্রাম বাংলার মানুষ হয়েও নিজেদের প্রজাদের লুট করেছেন নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। প্রাকৃতিক কারণে যে মানুষগুলো খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের কাছে এমন নির্মম সময়েও মহাজন অম্বিকাচরণ কিছু ধান বা অর্থের বদলে জমি নিতে ছাড়েন নি। লেখক তাঁর লেখনীতে অত্যাচারী চরিত্রগুলোর মাধ্যমে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের বাংলার দুঃসময়ের কথা তুলে ধরেছেন।

গ্রামের বুভুক্ষু জীবন, দিনের পর দিন আধপেট বা কখন না খেয়েই কাটাতে হয়েছে সাধারণ মানুষদের। ১৯৪৪-র বিশ্ব সংগ্রামের শিকার হয়ে গ্রামের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। তারই চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক 'অসুখ' গল্পে। বিশ্বযুদ্ধের আকালে গ্রামের মানুষ পারি দেয় শহরে কিছু খাবারের আশায়। গল্পের অন্ধ মহেন্দ্র, নারায়ণী, মালতী, সৌরভবুড়ী ইত্যাদি বুভুক্ষু প্রায় তিরিশ ছেলে মেয়ে বুড়ো মিলে থাকে মফঃস্বল শহরের উপকণ্ঠে সারকারি আশ্রয়ে। যাদের সব নিঃস্ব, কিছু খেতে পাওয়ার আশায় তারা এসে জোটে এই ত্রাণ শিবিরে। সেখানে ধান ভানা, দড়ি পাকানোর কাজ করে এবং দুটো খেয়ে বাঁচে। কিন্তু ক্রমেই খবর আসে যাদের আত্মীয় স্বজনের খবর পাওয়া গেছে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাদের গ্রামে। ভয় আঁতকে উঠে সরকারি আশ্রয়ের সকলে, আবার সেই ধূ-ধূ প্রান্তর চারিদিকে, আবার না খেতে পাওয়ার চিন্তা গ্রাস করে তাদের। তার সঙ্গে নিজের বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে তিরস্কার পেয়ে তারা আরো পালিয়ে এসেছে গ্রাম থেকে। অন্ধ বুড়ো মহেন্দ্রকে তার ছেলে একমুঠোও খেতে দেয় নি, মেয়ে জামাই তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে, এসে পরেছে সরকারি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আশ্রয়ে। সৌরভীবুড়ীর চোখে ছানি পরেছে কিন্তু সে ফিরে যেতে চায় না গ্রামে। সৌরভীবুড়ী ও মালতী একই গ্রামের মানুষ। মালতীর স্বামী আছে কিন্তু তাকে ছেড়ে মালতীপালিয়ে এসেছে শহরে। দিনের পর দিন না খেতে পাওয়া, সংসার টেনে টেনে চালানো, তারপর আবার বিনোদের চেলা কাঠের মার মালতীর গায়ে দাগ ফেলেছে। আগের এইসব কথাগুলো মনে পড়তেই মালতীর শরীর শিউরে ওঠে। সরকারি আশ্রয়ে সাহেবের কুদৃষ্টি, অন্যান্য আশ্রয়কারীদের সঙ্গে ঝগড়া হলেও খেতে পায় সে, নিজের মতো করে বেঁচে থাকে। কিন্তু বরখাস্তের নোটিশের পর তার আর থাকা চলে না সেখানে। শ্রীনাথ চৌকিদারের সঙ্গে খেয়া ঘাটের পথ ধরে মালতী ও সৌরভী। কিন্তু খেয়া ঘাট আসার আগেই মালতী পালিয়ে যায়, সে ফিরতে চায় না ঘরে। সৌরভী ছানি পরা চোখে দেখতে পায় না সে কোথায়। তাই সে ফিরে আসে আবার গঞ্জের বাজারে আর গালি দিতে থাকে মালতীকে। দিন কয়েক পর আবার দেখা হয় তাদের বাজারে, কিন্তু দুইজনের কেউই খেয়া ঘাটের পথে যায় না আর। কিন্তু হঠাৎ একদন বাজারে মালতীকে ধরে ফেলে বিনোদ, সে এসেছিল কুইনাইন কিনতে। বিনোদের বোন-জামাই মারা যাবার পর তাদের ছেলে কালীকে নিজের ঘরে এনেছে বিনোদ, তার জ্বরের জন্য এই কুইনাইন। ধরে নিয়ে যায় মালতীকে, যে মালতী সরকারি আশ্রয়ে মুখরা ছিল আজ সে বোবা। ঘরে এসে সেই খসে পড়া চাল, ধসে আসা মাটির দেওয়াল, দাওয়ার এক পাশে নির্মিত কালিতে কালো দেওয়ালের রান্নাঘর, তার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে থাকা কালীকে দেখে তার কান্না আসে। মালতী কি করবে ভেবে পায় না, নিথর হয়ে বসে থাকে মাটিতে। গ্রামের প্রতিবেশীরা এসে মালতীকে দেখে নোংরা শাড়ি পরা, গায়ে পুরু ময়লা, আঁসটে গন্ধ সর্বাঙ্গে। স্বামীর প্রহারে কপালে কাটা দাগ নিয়ে হরিমতি শোনায়-

> "সাত জায়গায় ঘোরা ও মেয়ে, এবার টের পাবে বিনোদ।"[১৬]

মালতীর চরিত্রের যেন এক মিমাংসা করছে তারা। কিন্তু মালতী যখন মার খেয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বিনোদ তখন তাদের মনে আসে নি কোনো কথা। বিনোদ বাজার থেকে কিনে আনে একখানা শাড়ি, আর কালীর জন্য কিছু সাবু, বলে-

> "এই কটি সাবু-এক টাকা। সাতদিন যেন হয়।"[১৭]

মালতীর ভালো লাগে না অভাবের অভিযোগ, একজন পুরুষের অধিনে ধুকে ধুকে দিন যাপন তার অসহ্য লাগে। বিনোদ পুরোনো খড়ের বদলে নতুন খড় ছাইবার জন্য আনে। আর মালতীকে কলসি ভরে ভরে জল নিয়ে আসতে হয় খড় নরম করার জন্য। খড় দিতে দিতে মালতীর চোখ যায় দূর মাঠের দিকে-গঞ্জের বাজার, চালা ঘর শহরের পাশে, বাধাহীন দিন যাপন। তার ভয় করে বিনোদকে দেখে আবার হয়ত মারবে আবার হয়ত তাড়িয়ে দেবে।

মালতীকে আবার দেখা যায় গঞ্জের বাজারে। আড়তদার হাসি, খেয়াঘাটের মাঝি মোল্লাদের ইঙ্গিত কোনো কিছুকে তার ভয় লাগে না তার বিনোদের মতো। সরকারি রিলিফের ডাক্তারখানায় বেয়ারার কাছে বসে থাকে মালতী। ডাক্তার এসে মালতীকে দেখে বেয়ারার উপর চিৎকার করে উঠে – "...ফের যদি ওই সব মেয়ে মানুষ ঢোকাস এই ঘরে- দূর করে দেব। শূয়ার-"[১৮] –ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে আবার সামনে বিনোদ। হাত টেনে ঘরে নিয়ে যেতে চায়, মালতী মাটিতে বসে পড়ে –

> "খেতে দেবে না-পরতে দেবে না, ... যাবে না সে মরতে, ভিখিরির মতো খেয়ে বাঁচতে।"[১৯]

– বোকার মতো বিনোদকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায় মালতী। বিনোদ ডাক্তারের কাছে এই রোগের ওষধ চাইলে ডাক্তার জানায় তার কাছে এমন রোগের ওষধ নেই।

গল্পে দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি মানসিক যন্ত্রনার চিত্রও তুলে ধরেছেন। না খেতের পাওয়া কঠিন সময়ে কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে না, নিজেকে বাঁচানোর তাড়নায় সকলে ব্যস্ত দুটো ভাতের সন্ধানে। শহরের কঠিন নির্যাতনের মধ্যেও মালতীর মতো মেয়েরা বেঁচে থাকতে চায় খাবারের জন্য, নিজের মতো করে বেঁচে থাকার জন্য। লেখক গল্পে দেখিয়েছেন শোষন কেবল বাইরের ক্ষমতাশালী মানুষের দ্বারাই নয়, ঘরের আপনজনের দ্বারাও হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে।

ভগীরথ মিশ্র : ভগীরথ মিশ্র বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম এক নাম, যাঁর লেখার প্রতি ভাঁজে পাঠক বর্তমান সমাজের প্রতিরূপ দেখতে পায়। ভারতের স্বাধীনতার কিছু মাস পূর্বেই তাঁর জন্ম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁতরাপুর

OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রামে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে। গ্রামে জন্ম এবং জীবন যাপনের কারণে তাঁর লেখা গড়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে। ভগীরথ মিশ্রের লেখনীতে আর্থ-সামাজিক ফাঁদে পরা মানুষগুলোর জীবনের হাহাকার ধ্বনি শোনা যায় অবিরত। স্বাধীনতার পরেও প্রান্তিয় মানুষের জীবন ছিল বিপর্যস্ত। উচ্চ শ্রেণির মানুষ তথা শোষক সমাজ এবং নিয়তির দ্বারা লাঞ্ছিত মানুষের চরম বিপর্যস্ততা ও অসহায় পরিস্থিতির পরিচয় মেলে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। অর্থের কারণে বিপাকে পরা এবং তার ফল স্বরূপ তাদের সর্বস্ব নিঃস্ব হওয়া, কোনো ক্রমে বেঁচে থাকার লড়াই লেখকের কলমের আঁচড়ে পাঠক মনে দাগ কাটে। তাদের যৎসামান্য স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে যাওয়া ও তার পীড়া লেখকের লেখনীতে ধরা দিয়েছে বিভিন্ন ভাবে।

লেখক ভগীরথ মিশ্রের রচিত ১৯৬৬ সালে, তাঁর দ্বিতীয় গল্প 'তারা নয় জোনাকি'। এই গল্পে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের সাঁওতাল মেয়ের আদলে সমগ্র সাঁওতাল তথা গ্রামের দীনহীন মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন। বিহারের ছোট একটি গ্রাম খানুডি-র সাঁওতাল মেয়ে টুংরি। পড়ন্ত বিকেলে কথক মিলের কাছে এসেছেন, সেখানেই দেখা টুংরির সঙ্গে। কথক পরিবারসহ যেবার খানুডিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন, টুংরিই তখন তাদের কাজ কর্মের দায়িত্বে ছিল। টুংরির বিয়ে হয় তারই প্রতিবেশী সাঁওতাল ছেলে বাঁকার সঙ্গে, একটি ছেলেও হয়। কিন্তু বাঁকা টুংরিকে ছেড়ে সর্দারের মেয়ে মংলির রূপে আসক্ত হয়ে পরে। টুংরি ছেলেকে নিয়ে চলে আসে মিলে কাজ করতে। কিন্তু টুংরি কখনই মিলে কাজ করা পছন্দ করত না। টুংরির কথায়-

> "হোথায় মানুষের ইজ্জত থাকে নাই গো। সেথা যাবো কেনে?"[২০]

টুংরি রঙিন স্বপ্ন বেঁধেছিল বাঁকা ও তার নিজস্ব সংসার নিয়ে। নদীর ধারে তারা বাসা বাঁধবে, বাঁকা শিকারে পটু, তাই বাঁকা যখন শিকার করতে যাবে, টুংরি তখন ঘরের পাশে লাগানো ফসলের দেখা শোনা করবে। আর বাঁকা ফিরে এলে তার বাঁশি শুনে পরাণ জুরাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত টুংরির একটি স্বপ্নও পূরণ হয় নি। যে কদর্য মিলকে সে ঘৃণা করত, সেখানেই দিনযাপনের তাড়ণায় ছুটে এসেছে। কথক যখন খানুড়িতে ঘুরতে যান তখন টুংরির বয়স প্রায় বারো-তেরো, তখন সে লাল ফুলকাটা শাড়ি পরে খোঁপায় ফুল গুঁজে ঘুরে বেরাত। ফুল টুংরির খুব প্রিয়। কিন্তু যেমন গাছ থেকে ফুল ভেঙে নিলে খুব শীঘ্রই শুকিয়ে যায়, টুংরির জীবনেও তাই ঘটেছে। টুংরির কোলের শিশুটি অসুখ হয় অনেকদিন, টাকা অভাবে টুংরি তার ছেলেকে হারিয়েছে। টুংরির সব রঙিন স্বপ্ন নিঃস্ব হয়ে গেছে। এই কাহিনী শুধু যেন টুংরির নয়, মিলে কর্মরত প্রত্যেক মেয়ের গল্প -

> "মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকের কোলে একটি করে বাচ্চা।"[২১]

অর্থাৎ শুধু টুংরি নয়, তার মতো হাজার হাজার মেয়ে এমন কঠিন সমাজের শিকার। বাঁকার মধুর বাঁশির শব্দের পরিবর্তে টুংরির কানে বাজে মিলের বাঁশি। ফুলকাটা লাল শাড়ির বদলে যৌবনের ছাপ ফুটিয়ে তোলা ময়লা শাড়ি পরনে। জোনাকির অদৃষ্টে যেমন তার আলোর জন্য তার মৃত্যু লেখা থাকে, এই মানুষগুলোর অদৃষ্টও যেন তেমনি। তারার মতো উজ্জ্বল মানুষগুলো সমাজের কদর্যতায় জোনাকির মতো নিভে যায়। লেখক সাধারণ লেখনির মাধ্যমে সমাজের বিকৃত দিকটি ও সাঁওতাল জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন 'তারা নয় জোনাকি' গল্পে।

'তারা নয় জোনাকি'-র টুংরির মতোই 'খাঁচার পাখিরা' গল্পে সাঁওতাল পঞ্চুকেও সমাজের অর্থশক্তির দ্বারা অত্যাচারিত হতে হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র পঞ্চু অন্যের জমিতে ফসলের সময় কাজ করে। আর যখন কাজ কিছু পায় না, তখন সে বনে শিকার করে, পাখি শিকার। পঞ্চুর ঘরে তিনটি মানুষ, পঞ্চু নিজে, তার বউ ও ছেলে চৈতন। তবে এই তিনটি মানুষের পেট চালানোর দায়িত্ব তাদের পোষ্য একটি ঢ্যামনার। ওই ঢ্যামনার সাহায্যেই মাদি ডাহুকগুলোর শিকার করে পঞ্চু। ঢ্যামনা পাখিটার আকুলী ডাকে বনের মাদি ডাহুকগুলো ছুটে এসে ধরা দেয় জালে এবং পঞ্চু সেগুলো ধরে বিক্রি করে। পঞ্চুর বউ এই কাজ কর্মের বিরুদ্ধে, তার কথায় –

> "পাইখটা সনসার চালায় ক্যানে? সনসারের মরদটা কী করে?"[২২]

পঞ্চু চৈতনকেও এই ধরার প্রশিক্ষণ দেয়, বনে কোথায়, কখন গেলে বেশী ডাহুক ধরা যাবে সেই নিয়ে। কিন্তু পঞ্চুর বউ বলে-

> "লরকে যাবে তুমি।"[২৩]

পঞ্চু পাখিগুলো বিক্রি করতে গেলে, পঞ্চুর বউ পুকুর ঘাটে আসে। সেখানে দেখা হয় কুসুম, গল্পে উচ্চারিত কোসম মাসি-র সঙ্গে। কোসম গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দুয়ারি ঘোষ ওরফে মেজোবাবুর বাড়ির কাজের লোক। পঞ্চু যেমন মাদি ডাহুক ধরার জন্য ঢ্যামনা পাখির টোপ ফেলে, মেজোবাবুও গ্রামের নারী ধরার জন্য কোসমকে দিয়ে টোপ ফেলায়। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের অর্থ অবস্থা খারাপ, বিশেষত পঞ্চুর ভীষণ খারাপ, তাই কোসম মাসি পাঁচ টাকার টান টান নোট এগিয়ে দেয় পঞ্চুর বউ-র দিকে। নোটের উপর আঁকা পশুর জ্বলজ্বলে দুটো দেখে পঞ্চুর বউ ভয় পায়। রাত্রে স্বপ্নে দেখে সে সেই পশুর মুখ গহ্বরে ধরা পরেছে। ভেতরে একখানা কাঁচা সোনার ঘরে সে আঁটকা; সামনে বসে আছে মেজোবাবু, সে বলছে –

“এই দেখ, পঞ্চার বউ, এসবই তোর। আর তুই শুধু মোর।”[২৪]

এই ঘটনার পর পঞ্চু মেজোবাবুর কাছে এই নিয়ে কথা বলতে গেলে মেজোবাবু পঞ্চুকেই অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। পঞ্চু বনে পাখি ধরতে গেলে তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার পোষ্য ঢ্যামনার ডাক তাকে পাগল করে দেয়। ঢ্যামনার চোখগুলো তার মেজোবাবুর চোখ বলে মনে হয়। খাঁচার ভেতরে পাখিটা ডেকেই চলেছে মাদি ডাহুকে আকৃষ্ট করার জন্য। পঞ্চু আর থাকতে পারে না, খাঁচার ভেতর থেকে বের করে ঢ্যামনাটার গলা মোচড়াতে থাকে, কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পরে। ব্যথায় কেঁদে ওঠে পঞ্চু, দেখে পাখির গলা নয়, কয়েকটি বঁইচির ডাল চেপে ধরে আছে হাতের চেটোয়, তার কাঁটা ফুটে রক্ত ঝরছে। তাকিয়ে দেখে চার-পাঁচটা মাদি ঢ্যামনার দিকে গলা ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে, ফাঁদের দিকে নজর নেই তাদের আর। ঢ্যামনার চোখগুলোও যেন খরিশ সাপের মতো ঠান্ডা, শিকার কাছে। পঞ্চু ঢ্যামনাকে চুপ করাতে চায়, শিকার থেকে বাঁচাতে চায় ডাহোকগুলোকে, কিন্তু পারে না। বেরোনোর আগে ছেলে বলেছে কাল রাতে পেটের একটা কোণাও ভরে নি। ধীরে ধীরে জাল থেকে মাদিগুলোকে ছাড়িয়ে সরু লতানো ডাল দিয়ে বেঁধে ফেলল পঞ্চু, বিক্রি করার উদ্দেশ্যে।

গল্পে ঢ্যামনা, মাদি ডাহুক, ফাঁদ, টোপ দেওয়া সবই সমাজের কদর্য দিককে তুলে ধরে। অর্থের শক্তিতে সব মানুষকে বশ করা যায়। পঞ্চু ঢ্যামনা তথা মেজোবাবুকে শেষ করতে চাইলেও পারে না। অর্থাভাব, খাদ্যাভাব মানুষকে দিয়ে সব করায়, যা সে চায় না। গল্পের শেষে পঞ্চু পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে, সে চাইলেও তার কিছু করার ক্ষমতা নেই। নিজের এবং পরিবারের জীবন রক্ষার্থে সমাজের এই প্রতারণা তাকে সহ্য করেই এগিয়ে চলতে হবে। সমাজে সাপের লালসা, ফাঁদ ফেলা এবং তাতে শিকার-এইরূপ ক্রমাগত ভাবে চলতে থাকবে, এবং সাধারন মানুষ তার শিকার হবে ঠিক মাদি ডাহুক ও পঞ্চুর মতো।

কেবল সমাজের প্রতারণা নয়, উপোসী মানুষদের সমাজ ও প্রকৃতি উভয়ের কাছে থেকেই বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। দিন খেটে দিন খাওয়া মানুষগুলো প্রকৃতির প্রকোপে পরে না খেতে পেয়ে হাত পেতে বসে অর্থসম্বলিতদের পায়ের কাছে। সেই অর্থের চক্রে গভীর এক মজুরের গর্তে বন্দি থাকে সেই মানুষগুলো দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। যেন হাঁ করে বসে আছে সুযোগ নেওয়ার অপেক্ষায়, সেখানে প্রবেশ করলেই মুখ বন্ধ, আর বেরোনোর উপায় নেই, এমনি ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর ‘কার্তিকের কড়চা’ গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র করাতও এই চক্রের শিকার। শ্রাবণের ধারায় যখন আশ্বিন-কার্তিক ভরাডুবি তখন চলে প্রকৃতির চাবুক তাদের উপর। শস্য, ফসল যখন কিছুই থাকে না, শরীর নিজেই নিজেকে খেতে বসে। সংসারে কেউ কাউকে চিনতে পারে না, সকলেই এক একটি কাকতাড়ুয়ায় পরিণত হয়, তখন অর্থ ভর্তি মুখগুলো হাঁ করে বসে থাকে। পাঁচ কেজি ধানের বদলে, আঘ্রাণ-পৌষ মজুর খাটা। দুই মাস খেতে দিলে, পরের দুই মাসের না খেতে পাওয়ার বন্দোবস্তো আগে থেকেই করেন বাবুরা। কাঁপতে থাকা শরীরে করাতের মতো অন্য মানুষগুলোও পাঁচ কেজি ধান মাথায় নিয়ে ছুটে যায় ঘরে। প্রতি বছর একই ভাবে চলে, বর্ষার মাঠে কাজ নেই, সরকারের কোনো প্রকল্প কাজ চলে না, আর এই সুযোগেই বসে থাকে বাবুরা। কোনোরকমে একটু খেতে দিয়ে তাদের মজুর আদায়। অঘ্রান-পৌষ এলেই শুধু শোনা যায় মাঠে ধান কাটার শব্দ, ভাত রান্নার গন্ধ আর নেই। দাদন শোধের পীড়াপীড়িতে খেতে না পাওয়া মানুষগুলোর যেন প্রাণ যেতে বসে। করাতেরও বাবুদের কাছে দাদনের দায় গলা ডুবে। ভোর হতে না হতেই বাড়িতে তাদের হামলা চলে, কোন বাবু ধরে নিয়ে গিয়ে তার দাদন আদায় করবে তার লড়াই চলে। যে যেদিন করাতকে নিয়ে যায়, সেদিন তার জমিতে সারাদিন ধার কাটা চলে, পরিবর্তে করাত ও পরিবারের মেলে উপোসী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিন। উপোস থেকে বাঁচতে করাত, বউকে নিয়ে পালায় ভোরে দূর গ্রামে লগদা খাটতে। বদলে মিলবে কিছু মুড়ি, যা বাড়ি নিয়ে যেতে হবে সন্তানের জন্য। আর মিলবে বিউলি ডাল, ভাত, সেই খাবে অতিরিক্ত ভরপেট পরদিনের মতো পেট ভরিয়ে। কিন্তু প্রতিদিন ভোরে বউকে নিয়ে পালাতে পারে না, যেদিন ধরা পরে যায় সেদিন উপোস। শুধু উপোস নয় মাঠে কাজের সময় বাবুদের শকুন দৃষ্টির মোকাবিলা করতে হয় করাতের বউকে। সেদিনও সকালে পালাচ্ছিল বউকে সঙ্গে করে ঝোঁপ, ঝাড় পেরিয়ে কিন্তু পথে বাঁধা পরে শম্ভু মালিকের, তাকে দেখে লুকিয়ে যায় দুইজন। এদিকে মল্লিক বাবু নড়ে না, অন্যদিকে বেলা বেড়ে চলে। লগদা খাটার নিয়ম সূর্য চড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করার, সূর্য যাওয়ার পর শেষ। সময়ের সামান্য হের ফের চলে না। করাত ভয় পায়, আজ যদি কাজ না পায় তবে আগামী দুইদিন উপোস থাকতে হবে। মল্লিকের নজর এড়িয়ে কোণো ক্রমে ঝোপঝাড় পেরিয়ে, পাকা ধানের আল ধরে ছুটতে থাকে। কিন্তু কাজে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে যায়, কাজ মেলে না। স্বামী-স্ত্রীর হাজারো কাকুতি মিনতির পরেও কোনো লাভ হয় না। পাকা ধানের গন্ধে ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে টলতে টলতে ফিরে আসছে গ্রামের ঘরে। সামান্য খাবারের আশাটুকু অনাদিভঞ্জ বাবু পায়ের তলায় গুড়িয়ে দেয়। মাথায় একরাশ চাপ নিয়ে ফেরে করাত –

> "দন্ডে-দন্ডে পলে-পলে আরও একটা দীর্ঘ খাদ্যহীন দিন।"[২৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময় থেকেই বাংলা ছোটগল্পের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। পূর্বের ছোটগল্পের অপূর্ণ বাস্তব চিত্রগুলোকে লেখকেরা নতুন আঙ্গিকে সমাজের কঠিন বাস্তবতাসহ বিনা পর্দায় তুলে ধরে ছিলেন। সভ্য নীতি বোধের বাইরে সমাজকে তার কদর্য দারিদ্রতা, জীবনকে বাঁচানোর জন্য মানুষের কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াইয়ে তার ভেঙে পড়া, তার হীনতা ছোটগল্পকারদের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। শুধু বিদেশি শক্তির অত্যাচারে নয়, স্বাধীন দেশেও পিছিয়ে পরা মানুষদের জীবন একই নির্দয়তার সঙ্গে যাপন করতে হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে যেমন উদ্বাস্তু স্রোত, দাঙ্গা, মন্বন্তর বাঙালির জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তেমনি স্বাধীনতার পরেও বাঙালির জীবনে এই হাহাকার চলতে থাকে। কাগজে দেশ স্বাধীন হলেও, স্বাধীনতার স্বাদ খেটে খাওয়া মানুষদের ঘরে এসে পৌঁছায় নি, সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করার চেষ্ঠা করব-

- লেখক সুশীল জানার 'রাত্রির লেখা' গল্পে যেমন একদিকে দেখানো হয়েছে বিদ্রোহের আগুন, তেমন তিনি দেখিয়েছেন সেই আগুনের হল্কা বিদ্রোহীর পরিবারের উপরেও এসে পরেছে। শোষক যখন বিদ্রোহের অঙ্গার মেরে কেটে নেভাতে পারে না তখন হাত দেয় ঘরের মেয়েদের সম্মানে। একই ভাবে দৈনতার সুযোগে ঘরের স্ত্রীর উপর শোষকের তীব্র লালসার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'খাঁচার পাখিরা' গল্পে। প্রথম গল্পটি রচিত স্বাধীনতার প্রাককালে ১৯৪৪ সালে, এবং দ্বিতীয় গল্পটি রচিত স্বাধীনতার তেত্তিরিশ বছর পর ১৯৮০ সালে। কিন্তু দীর্ঘ তেত্তিরিশ বছর পরেও শোষকের লালসা, দীনকে শোষনের চিত্র একই দেখা যায়।
- সুশীল জানা ১৯৪৪ সালে দেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্প 'স্বাধীনতা দিবস' রচনা করেন। যেখানে না খেতে পাওয়া মানুষগুলো জমিদারের কাছে তাদের সর্বস্ব হারিয়ে দেয় শুধু একবেলা পেট ভরানোর জন্য। তাদের ফসলের জমি, তাদের মাথার ছাদও কেড়ে নেয় শোষক কিন্তু একমুঠো ভাত পায় না তারা, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পরে তারা। এমনি একবেলার ভাতের জন্য মানুষের আপ্রাণ চেষ্ঠার কাহিনী লেখক ভগীরথ মিশ্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'কার্তিকের কড়চা' গল্পে (১৯৮০ সাল)। দুইমাস খেতে দিয়ে তাদের থেকে দাদনের কড়া মূল্য তোলে শোষক বাবুরা। ঘরের সন্তানদের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে না পারা বাবা মায়ের বেদনার কথা এই গল্পে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার প্রাককাল বা স্বাধীনতার উওরকাল, উভয় ক্ষেত্রেই খেটে খাওয়া মানুষের জীবন একই ভাবে চিত্রিত হয়েছে।
- সুশীল জানার গল্প 'অসুখ' ১৯৪৪ সাল এবং ভগীরথ মিশ্রের গল্প 'তারা নয় জোনাকি' ১৯৬৬ সাল, দুটি গল্পেই ঘরের মানুষের অত্যাচারে বা বিশ্বাসঘাতকতায় ঘর ছাড়া হতে হয়েছে দুই মা-কে। একদিকে মালতী পেট ভরে খাবার আশায় পালিয়ে এসেছে শহরে, অন্যদিকে সাঁওতাল মেয়ে টুংরিও অন্নের আশায় কদর্য কারখানায়

ইজ্জতের পরোয়া না করে কাজ করতে এসেছে। কেবল বাইরের শক্তি নয় ঘরের ভেতরের অত্যাচারও মানুষকে কিভাবে ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, তারই পরিচয় মেলে এই দুই গল্পে।

কালের বিবর্তনে সভ্যতা এগিয়ে গেলেও, পিছিয়ে থাকা মানুষগুলো একই ভাবে পিছিয়েই রয়েছে, তারই চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পকারেরা। দুই লেখকের গল্প রচনা কালের মধ্যে প্রায় তিরিশ বছরের অন্তরাল থাকলেও তাঁদের লেখনীর প্রসঙ্গ অত্যাচারিত, শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষদের জীবন যাপন, যা প্রমাণ করে আমাদের সমাজের সত্য, নগ্ন বাস্তবতাকে।

Reference:

১. জানা সুশীল গল্পসমগ্র, সম্পাদনা সুমিতা চক্রবর্তী, একুশশতক, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৯, পৃ. ৬১
২. তদেব, পৃ. ৬১
৩. তদেব, পৃ. ৬২
৪. তদেব, পৃ. ৬২
৫. তদেব, পৃ. ৬৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৪
৭. তদেব, পৃ. ৬৫
৮. তদেব, পৃ. ৬৫
৯. তদেব, পৃ. ৬৫
১০. তদেব, পৃ. ৮৯
১১. তদেব, পৃ. ৮৯
১২. তদেব, পৃ. ৯০
১৩. তদেব, পৃ. ৯১
১৪. তদেব, পৃ. ৯১
১৫. তদেব, পৃ. ৯২
১৬. তদেব, পৃ. ৮৭
১৭. তদেব, পৃ. ৮৭
১৮. তদেব, পৃ. ৮৮
১৯. তদেব, পৃ. ৮৮
২০. মিশ্র ভগীরথ ‘গল্প সমগ্র ১’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৩, মাঘ ১৪২৯, পৃ. ২১
২১. তদেব, পৃ. ১৯
২২. তদেব, পৃ. ৫৭
২৩. তদেব, পৃ. ৫৮
২৪. তদেব, পৃ. ৫৯
২৫. তদেব, পৃ. ১১৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 233 - 241
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কণা বসু মিশ্রের গল্পভুবন : একটি আলোচনা

সুজিত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sujitmondal909@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Kana Basu Mishra, short stories, romantic stories, Social-stories, Married life stories, women's life stories, Juvenile stories, Artistic Vision.

Abstract
Kona Basu Mishra has been writing literature since the seventies, yet she remains in the background of the Bengali readership. He entered the world of Bengali literature by writing short stories. She wrote three hundred short story and many novels. Woman are the centre of she story writing. A woman writer, she feels, can't talk about girls the way male writers can. Countless woman have flocked to she novel and short stories. Those Woman have a different-difficulties in life and suffering. Even though women's words are predominant in the writer pen, Kana Basu Mishra cannot be called a feminist writer; Rather she is a woman-loving writer. The woman in her stories are modern but do not cross the boundaries of social reform beliefs. Her story is an unheard story of the tireless woman solders suffering from the war called duty in the helpless, deprived, degraded world of woman. Besides, he has revealed various problems of society in her story. Social ill like superstition, religion are the subject of her story. Her stories are romantic at the beginning of creation. But with mature age there is a change in the romantic mind. Even under the same roof, the aspects of love, complications, bitterness, conflict of married in an educated civil society is depicted in her stories. Also she wrote stories for children. Basically, he created juvenile literature. The adventures of the teenage mind, the curiosity to unravel the detective-like mystery, the reckless mentality aspects come out her stories. Kana Basu Mishra's varied story dynamics will be discussed in detail below.

Discussion

বাঙালি পাঠকের কাছে কণা বসু মিশ্র (১০ই মার্চ, ১৯৪৬) খুব একটা পরিচিত নন। অথচ, তিনি সত্তর দশক থেকে সাহিত্যরচনায় ব্রতী। ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। লিখেছেন তিনশোধিক ছোটগল্প এবং বহু উপন্যাস। স্কুলজীবন থেকেই তিনি গল্প বানানোর খেলায় মেতে ওঠেন। রূপকথার বদলে ধীরে ধীরে বাস্তব মানুষের জীবন তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ‘এক অ-কবির ডায়েরিতে’ (১৯৬১) প্রকাশিত হয়। তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় অসমে। অসমের নিসর্গ প্রকৃতির মাঝে নিজের সৃজনশীল সত্তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনায় অসমের প্রকৃতি, নদ-নদী, পাহাড়ের প্রসঙ্গ বারবার আসে।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর কলকাতায় আগমন। স্নাতকস্তরে ভর্তি হন বালিগঞ্জের 'মুরলীধর গার্লস কলেজ'এ। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় 'রায়বাড়ি ও সিংহাসনের মামলা' গল্প লিখে প্রথম হয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বাণী রায়। কলেজ ম্যাগাজিন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতেন। বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরে 'দেশ' পত্রিকার জন্য গল্প লেখেন। 'দেশ' পত্রিকার দপ্তর থেকে দুইবার গল্প ফেরত পাঠায়। তৃতীয় গল্পটি মনোনীত হয়; গল্পের নাম 'লেডিস কম্পার্টমেন্ট' (১৯৬৫)। তিনি ছিলেন বিমল করের স্নেহধন্য। এছাড়া কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও গুণীজনদের সান্নিধ্য তাঁর লেখনী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'তুলির কিছু সময়' (১৯৮০), এবং প্রথম উপন্যাস 'ওরা সবাই' (১৯৭৭)। লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন -

> "কি করে লেখক হলাম জানি না। কোন রোমান্টিক মনের যন্ত্রণা থেকে কলমটাকে ভালোবেসেছিলাম, তাতো জানি না। একটা বোহেমিয়ান মন যে কখনও থামতে জানে না, নিজের মধ্যে হারিয়ে নিজেকেই খুঁজে বেড়ায়।"[১]

অবিরত আত্মানুসন্ধানই লেখক হওয়ার বড় উদ্দেশ্য। সৃষ্টির প্রারম্ভপর্বে কণা বসু মিশ্রের গল্পগুলি প্রেমমূলক। কলেজ জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শোনা বা দেখা প্রেমকাহিনি ছিল তাঁর গল্পের বিষয়। কিন্তু পরিণত বয়সের সঙ্গে রোমান্টিক মনের বাঁকবদল ঘটেছে। সাধারণ রোমান্টিক গল্পের পরিবর্তে প্রেমমনস্তত্বের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'ঊর্মি' গল্পে ঊর্মি-সুগত-জয়ন্তানুজের ত্রিকোণ সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক জটিলতা প্রতিফলিত। ঊর্মির সঙ্গে সুগতর প্রেম কলেজ জীবনে। বিবাহের জন্য তারা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়, তবুও প্রেমের একটা তাগিদ রয়ে যায়। বেকার সুগত চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য দিল্লি রওনা দেয়। সুগতর অনুপস্থিতিতে বিবাহের জন্য পরিবারের চাপ, একাকীত্ব, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় জর্জরিত ঊর্মির জীবনে আকস্মিক উপস্থিত হয় জয়ন্তানুজ। ঊর্মির অতীতের আশাহত যন্ত্রণার নাম জয়ন্তানুজ। যৌবনের প্রথম দিনগুলোতে পরস্পরের মনে জন্মেছিল ভালোলাগা। কিন্তু জয়ন্তানুজের প্রেম নিবেদন করার ভীরুতায় ঊর্মির অষ্টাদশী মন হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। সেই জয়ন্তানুজ বহু বছর পর প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। দোলাচল মনে বর্তমান প্রেমিক সুগতর প্রতি ভালোবাসার গভীরতা মাপতে গিয়ে দেখে সেখানে কেবলই বালির চর। সঙ্গলাভের প্রয়োজনে সুগতর সঙ্গে প্রেম। স্বভাবে সম্পূর্ণ পরস্পরের বিপরীত। সুগতর কাছে প্রেম-ভালোবাসা কেবল সময়ের অপচয়, তার চেয়ে অনেক শ্রেয় শরীরী খেলা-

> "চোখে চোখে তাকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মতন ছেলে সুগত নয়। তার চেয়ে অনেক শ্রেয় ঊর্মির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শরীরের উত্তাপটুকুর স্বাদ নেওয়াটাকে সে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে থাকে।"[২]

শরীর সর্বস্ব সম্পর্কে ঊর্মির মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অসুস্থ সম্পর্কের পরেও ঊর্মি মনস্থির করে জয়ন্তানুজের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করা। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকা ঊর্মি যথারীতি জয়ন্তানুজের বলা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়। কারণ ঊর্মির কাছে পৃথিবীর সব প্রেমিক পুরুষই সমান। পুরুষের প্রেমশিখা দ্রুত নিভে গিয়ে নারী শরীর লোভী হয়ে পড়ে। তাই ভবিষ্যতের অজানা পথে পাড়ি দিতে বেকার সুগতর চেয়ে মোটা বেতনের জয়ন্তানুজ শ্রেয়। ঊর্মির শরীরটা কেবল এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের হাতবদল হবে। বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে প্রেম হয়েছে শরীরী খেলা ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা পাওয়া। প্রকৃত ভালোবাসা নয়, প্রেমকে অবলম্বন করে আত্মস্বার্থচরিতার্থ করাই উদ্দেশ্য।

প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা বর্তমান সময়ে মুখোমুখি হলে দুইজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে মনস্তাত্বিক জটিলতা। 'সংলাপের মধ্যে' গল্পে পৌলমী ও শুভায়ু যৌবনের প্রেম সামাজিক নানা বাধা বিপত্তির কারণে পরিণতি পায়নি। দীর্ঘ পনেরো বছর পর দুইজনের সাক্ষাৎ। সময়ের গতিতে দুইজনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক্ষণে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণায় দুজনেই আবেগতাড়িত। পরস্পরকে না পাওয়ার দুঃখবোধের মধ্যেই নিজেদের বর্তমান জীবন কতখানি সুন্দর সেই খেলায় দুজনেই মেতে ওঠে। বাস্তবে দুজনেই অসুখী, মেকি জীবন তুলে ধরলেও তাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত।

পরকীয়া প্রেমের নিদারুণ পরিণতির গল্প 'নীলাঞ্জনা'। এক সন্তানের জননী রায়া মধ্যবয়সী শমীকের সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে ক্লান্ত। প্রেমহীন শূন্যজীবনে উন্মাদনা পেতে রায়া নীলাঞ্জনের সঙ্গে পরকীয়ায় মত্ত হয়। প্রেমে অধিকারবোধের

দাবি এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা হারানোর ভয়ে রায়া নীলাঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে। একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতার অবসাদে ভুগতে থাকে নীলাঞ্জন। প্রেমে স্বার্থসর্বস্ব অসুস্থতার দিকটি গল্পে আলোচ্য।

শরীর সর্বস্ব প্রেমের আরেক গল্প 'আজকাল'। রমেন ও পারমিতার কলেজ প্রেম। কলেজে বদ্ধ ঘরে পারমিতাকে সঙ্গম করতে প্রেম উপচে পড়ে। কিন্তু পারমিতা গর্ভবতী হলে সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে রমেন। দায়িত্ব, কর্তব্য এলে মধুর ভালোবাসা তিক্ত সম্পর্কে পরিণত হয়। এছাড়া 'সোনিয়া', 'বাজী', 'চেনা ফুলটুসি' গল্পগুলিতে সদ্য যৌবনে পা রাখা তরুণ-তরুণীর প্রেমজীবন চিত্রিত হয়েছে।

লেখক সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী। একজন সুলেখক কখনো সমাজকে অতিক্রম করে সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। কণা বসু মিশ্র একজন দায়বদ্ধ শিল্পী, তাঁর গল্পে সমাজের নানান সমস্যা প্রকটিত। একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে। গ্রাম, শহর নির্বিশেষে কুসংস্কারের কারণে বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। তেমনই এক গল্প 'শোষণ'। পরাণের স্ত্রী নবাহ্নি তিনবার গর্ভবতী হলেও সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। পরাণের বিশ্বাস, নবাহ্নির প্রতি তার বন্ধু নজরার মনে গোপন ভালোবাসা ছিল। মাঠে দুইজনে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে নজরা মারা যায়। নজরার অতৃপ্ত আত্মা নবাহ্নির উপর ভর করেছে, তাকে বাবা হতে দিচ্ছে না। অপদেবতার নজর এড়াতে সাধু-গুণিনের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস -

> "গুণিনের মন্তরের জোরে কত বাঁজার ছেলে হয়। ধাই নাড়ি কাটতি না কাটতি মা মা বলে কেঁদে ওঠে। গুণিন যে সাক্ষাত ধন্বন্তরী-ডাক্তার বদ্যি তার কাছে হার মেইনে যায়। ডাক্তার বদ্যির সাধ্য আছে ভুত তাড়ানোর।"[৩]

'জ্যান্ত ছেলের বাপ হতে' পরাণ নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে নবাহ্নিকে নিয়ে এসেছে ষাটোর্ধ্ব গুণিনের কাছে। বহু মানুষের ভাগ্যবিধাতা গুণিন ট্যারা চোখে নবাহ্নিকে আপাদ-মস্তক দেখে লাল ছোপ পরা দাঁতে রহস্যের হাসি খেলে। ঝাঁড়ফুক করার অছিলায় নতুন কাপড়ের প্রয়োজনে গুণিন পরাণ ও হুদোবালাকে গ্রামে পাঠায়। সেই সুযোগে ভীত, বিস্ময়া নবাহ্নিকে একা পেয়ে গুণিন তাকে ধর্ষণ করে। উতপ্ত বালির উপর গুণিনের পাশবিক অত্যাচারে নবাহ্নি বিধ্বস্ত। কামচরিতার্থর পর গুণিন বলে –

> "কউ গো পরাণ ভাই, পুজো শেষ। ঘরের বউ কে ঘরে নিয়ে যাও।"[৪]

ধ্বস্ত নবাহ্নিকে দেখে পরাণের চওড়া বুকে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; তার দৃঢ় বিশ্বাস এবার সে 'জ্যান্ত ছেলের বাপ হবে'। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, লোকবিশ্বাসের কারণে আমাদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসে। কিছু ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামির কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

ধর্মের ভেকধারীদের আসল মুখোশকে কণা বসু মিশ্র তাঁর গল্পে খুলে দিয়েছেন। পরিশ্রমহীন অর্থোপার্জন, সামাজিক সম্মানের জন্য অনেক অসাধু ধর্মের ভেক ধরে। 'রাধারানী' গল্পে গণেশ জাতিতে ভুঁইমালী। নীচু বংশে জন্মের কারণে সমাজের উপেক্ষায় অপমানিত বোধ করে গণেশ ভুঁইমালী। তার মাথা চাড়া দেয় সামাজিক সম্মান প্রাপ্তির। ভবঘুরে গণেশের সেই আশা পূরণ হয় বৃন্দাবনে। সে দেখে বৃন্দাবনে সাধু-সন্ন্যাসীরা রাধা নাম জপ করা বিনামূল্যে খাদ্য ও অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সকলেই সম্মান করছে। গেরুয়া বস্ত্রের অপব্যবহার করে নিজের স্বার্থচরিতার্থ করার মনস্থির করে -

> "বৃন্দাবনের বাজার থেকে একখানা ধুতি কিনল গণেশ। তারপর দোকানে সেটা চুবিয়ে নিতেই গেরুয়া হয়ে গেল। তার গায়ের লং ক্লথের পাঞ্জাবীটাও গেরুয়া রঙ করে ফেলল গণেশ। সে চুল কেটে ন্যাড়া হল। পেছনে রাখল ছোট টিকি। এরপর তিলকমাটি ঘষে ফোঁটা তিলক কেটে পাক্কা সাধু বনে গেল।"[৫]

সাধু সাজে গ্রামে ফিরে গণেশ বড় মন্দির বানায়। গণেশ সাধুর অলৈকিক ক্ষমতার মাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে প্রণামী বাক্সখানি অর্থে ভরে ওঠে। ধর্মের ভেকধারী গণেশ পারেনি মনের বাসনা সংযম করতে। তাই সকলের অগোচরে শহরে গিয়ে আমিষ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভোজন করে এবং রাত্রে চটুল নাচ দেখে। গণেশের ধর্মব্যবসা নিয়ত ফুলে ফেঁপে ওঠে। গেরুয়া বসনের অপার ক্ষমতা গণেশ সেদিন অনুভব করে যেদিন জমিদার বাড়ির গিন্নিমাকে অভ্যাসবশত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে গেলে-

> "ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, করিস কী? করিস কী গণেশ! তুই যে এখন অন্য গণেশ। আর পায়ে হাতে নয়- গিন্নিও উল্টো দুহাত আকাশে তুলে পেন্নাম করলো। ছিঃ গণেশ! গেরুয়ার তো একটা মর্যাদা আছে? তুই তো তার কাছে ঠাঁই পেয়েছিস আমাদের তো কিছুই হল না রে।"[৬]

ধর্মের ভেকধারীরা মানুষের ভক্তিকে পুঁজি করে আত্মস্বার্থসিদ্ধি করে। অসৎ সাধুদের জন্য আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কার আজ অবক্ষয়ের মুখে।

পণপ্রথা সমাজের আরেক ব্যাধি। কণা বসু মিশ্র 'পণ চাই পণ' গল্পে ভয়ঙ্কর এই ব্যাধির কবলে বিপর্যস্ত নারীর জীবন চিত্রিত। মেয়ের বিয়ের সম্পূর্ণ পণ মেটাতে না পারায় শ্বশুরবাড়ির সমস্ত আক্রোশ পড়ে সুচেতার উপর। সুচেতার কাছে শ্বশুরবাড়ি হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। অত্যাচার এতটাই চরমে পৌছায় যে বাড়ির বধূকে বিষ দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সুচেতার প্রতিবাদীসত্তা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

পণপ্রথাকেন্দ্রিক এক ভিন্নধর্মের গল্প 'ছেলে বিক্রি'। মাতৃহীন আহ্লাদীর বিয়ের পণ জোগাড় করতে নিজের সর্বস্বটুকু বিক্রি করে গুবড়ে। এমনকি বরকর্তার অতি চাহিদা মেটাতে গুবরে নিজেকে মহাজনের কাছে বন্ধক রাখে। লেখক এখানে সমাজের গতানুগতিক প্রথা থেকে বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলের পিতা পণের পাওনা বুঝে নবদম্পতিকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়লে বেঁকে বসে ছেলে মদন। পিতার কর্মে লজ্জিত পুত্র বলে-

> "হেথা মানুষজন যারা রইছ শোন, আমার বাপ কুড়ি হাজার টাকায় আমার শ্বশুরের কাছে আমাকে বেচে দেছে। আমি এখন এবাড়ির কেনা গোলাম। এদের বাড়ি খাটব। এদের কথায় চলব।"[৭]

পণপ্রথায় ছেলেকে কিনে নেয় মেয়ের পিতা। নির্মলের মত প্রতিবাদী যুবকের চিন্তাভাবনায় আমাদের সমাজের একদিন পরিবর্তন হবে।

কণা বসু মিশ্র দাম্পত্য জীবনকেন্দ্রিক বহু গল্প রচনা করেছেন। একই ছাদের নীচে থেকেও দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা, জটিলতা, তিক্ততা, মনোদ্বন্দ্বের দিকগুলি গল্পে উঠে এসেছে। দাম্পত্য জীবনের গল্পগুলি প্রায়ই নাগরিক পটভূমিতে রচিত। শিক্ষিত নাগরিক সমাজে ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্যজীবন তাঁর গল্পে চিত্রিত। 'ফারাক' গল্পে উৎসা ও দীপকান্তের তিরিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে দেখা দিয়েছে জটিলতা। সংসারে স্বামী-সন্তানের জন্য সর্বস্বটুকু উজাড় করে দিয়ে উৎসা জীবনের একপ্রান্তে এসে অনুভব করে সে নিঃস্ব। ব্যস্ত দীপকান্তের জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক বলতে -

> "শুধু হঠাৎ কোনোদিন খেয়াল হল নেশাগ্রস্ত দীপকান্ত ময়াল সাপের মত পেঁচিয়ে ধরছে ওকে। এইতো ছিল ওদের প্রেম আর সংসার।"[৮]

সঙ্গে দীপকান্ত নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভুত্ব ফলিয়ে উৎসার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই নিজের হাতে সাজানো সংসার ছেড়ে নতুন করে বাঁচার তাগিদে উৎসা তার বন্ধু শ্রীজয়ের সঙ্গে নবসূচনার জন্য অজানা পথে পা রাখে। প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনে যন্ত্রবৎ সম্পর্ক পালনের ভঙ্গুর দিকটি গল্পে উঠে এসেছে।

লেখকের কলমে দাম্পত্য সম্পর্কে অসুস্থ বিকৃত মানসিকতার দিকটি প্রতিফলিত। 'কথায় কথায়' গল্পে সৌরদীপ ও রুপার দাম্পত্য জীবন বলতে একই ছাদের নীচে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলা। পরকীয়া সম্পর্কের বাসনা থাকলেও সৌরদীপ সামাজিক মান-মর্যাদার জন্য পিছিয়ে আসে। অন্যদিকে তাদেরই ফ্ল্যাটে অর্থবান শৌভিক রুপার প্রতি দুর্বল। বিকৃত মানসিকতার দুই পুরুষ নিজেদের যৌনস্বাদের পরিবর্তনের জন্য বউ বদলের ইচ্ছা প্রকাশ করে -

> "পাল্টাপাল্টির খেলাটা চলুক তাহলে? দেখা যাক দুজনের এক্সপেরিমেন্টে কে বেশি সফল হয়। আপনি না আমি? বলুন বউ পাঠাচ্ছেন কবে?"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দাম্পত্য সম্পর্কে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাই আমরা এই গল্পে।

কণা বসু মিশ্রের কিছু গল্পে দাম্পত্যজীবনের মনস্তত্ত্বের দিকটি প্রকাশিত। 'বন্ধন' গল্পে সঞ্জয় ও শ্রীরুপার দাম্পত্যজীবন বারো বছর পূর্ণ হয়। বিশেষ দিনটিকে উদযাপন ও স্মরণীয় করতে বাইরে কাটানো মনস্থির করে। বাইরের প্যাঁচপ্যাঁচে বৃষ্টির অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশ এখানে প্রতীকী - এই পরিবেশ দুজনের দাম্পত্যজীবনের প্রতিচ্ছবি। দুজনের মনেই প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়, এই দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে তারা পরস্পরের কাছ থেকে কি পেল? সঞ্জয়ের অন্তঃসংলাপে জিজ্ঞাসা-

> "কি পেলাম এই বারো বছরে? একটি সংসার দুটি ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী? এর মধ্যেই কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। শুধু সংসার সংসার, দায়িত্ব দায়িত্ব।"[১০]

টেবিলের অপরপ্রান্তে থাকা শ্রীরুপার আত্মজিজ্ঞাসা -

> "তাকে পেয়ে সঞ্জয় কি অসুখী? বারো বছরের এই এতগুলো দিন ধরে সঞ্জয় কে সে বুঝেছিল, জেনেছিল, সে কি কেউ নয়? সঞ্জয় কি বোঝেনি তাকে? তবে ওরা কিসের ঘর করল এতোদিন? কি পেল ওরা এই বারো বছরে।"[১১]

মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের সংকটকে লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার কারণে তারা বিবাহবিচ্ছেদের পথে যেতে পারে না; শত জটিলতার মধ্যেও ভালোবাসাশূন্য জীবনে কেবল দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে বেঁচে থাকে।

অসমবয়সী দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়নের গল্প 'আমি বুড়ো হতে চাই না'। পঞ্চাশের বিপত্নীক জ্যোতিশঙ্কর নিঃসঙ্গতা কাটাতে বিবাহ করে বাইশ বছরের সর্বাণীকে। অসমবয়সী দাম্পত্য সম্পর্কে একজনের অভিভাবকসুলভ নিরাপত্তা, অন্যজনের কেবল মানিয়ে চলা। জ্যোতিশঙ্করের সঙ্গে পা মেলাতে সর্বাণী নিজের প্রাণবন্ত মনটাকে গাম্ভীর্যের মুখোশ পড়িয়ে রাখে। অন্যদিকে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' সম্পর্কে নাকাল জ্যোতিশঙ্কর। শেষ বয়সে পাওয়া দাম্পত্য সুখের জন্য জ্যোতিশঙ্কর আরো কিছু বছর বাঁচতে চায়। কিন্তু অসমবয়সের দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় নানান জটিলতা ও অনিশ্চয়তা। জ্যোতিশঙ্করের বয়সোজনিত অক্ষমতার কারণে সর্বাণীর যৌবন কুঁড়ির মতো কাঁদে। জৈবিক চাহিদার অপূর্ণতার সঙ্গে সর্বাণী ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ভোগে। সে অনুভব করে কিছু বছর পর তাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে। তার সন্তানরা নিজের পিতাকে ঠিকভাবে চিনতেও পারবে না। দুই দম্পতির মনের মিল থাকলেও বয়স তাদের সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

কণা বসু মিশ্রের সাহিত্য মূলত নারীজীবনকেন্দ্রিক। সমাজের বিভিন্নপ্রান্তে থাকা সকল শ্রেণির নারীর জীবনযন্ত্রণার কথা তাঁর গল্পের আলেখ্য। তাঁর লেখনীর মুখ্যভাগে নারী হলেও তিনি উগ্র নারীবাদী নন, বরং তিনি নারীদরদী। তিনি তাঁর গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি হওয়া অত্যাচার, অবহেলা, বঞ্চনায় নিগৃহীত নারীর প্রতিবাদের মাধ্যমে উত্তরণের কথা বলেছেন। তাঁর গল্পের নারীরা পরনির্ভরশীল হয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে জীবনে বাঁচতে চায় না; নারীরা আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরও মাথা উঁচু করে নারীর বেঁচে থাকার গল্প 'বাঁচা'। পিতৃহীন জয়ন্তী দাদ-বৌদির সংসারে করুণার পাত্রী হয়ে বাঁচতে চায়নি। আর্থিক স্বাবলম্বী হতে স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি দুটো টিউশন পড়ায়। সংসার নির্বাহের জন্য উপার্জনের অর্ধেক টাকা দাদার হাতে তুলে দেয়। তবুও দাদা-বৌদির কাছ থেকে শুনতে হয় কটূক্তি। বাঁচার জন্য জয়ন্তী ঘরে-বাইরে লড়াই করে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে জয়ন্তীকে ভোগ করতে চায় -

> "জানোতো আজকাল চাকরি রাখতে গেলে স্কুলের কর্তৃপক্ষের মন রাখতে হয়। হে, হে। তা কর্তৃপক্ষ বলতে তো আমি।"[১২]

দাদ-বৌদি জয়ন্তীর নিশ্চিত ছাদটুকু কেড়ে তাকে অনাশ্রিতা করে। এমন সংকটপুর্ণ অবস্থাতেও জয়ন্তী অবিচলিত; সে চাঁদের আলোয় দেওয়ালে লেখা বিপ্লবের বাণী পড়ে – 'বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।' জয়ন্তীর মতো লড়াকু মেয়েদের বাঁচার পথ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সহজ নয়। আশ্রয়হীনা জয়ন্তীর চারপাশে পুরুষের লালসার জাল পাতা-তবুও সে আশাহত না হয়ে দিনের শুরুর সঙ্গে নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে নেয়।

সুষ্ঠভাবে বাঁচতে নারী চায় নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব ঠিকানা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব ঠিকানা নেয়। নারী পিতা-স্বামী-পুত্রের পরিচয়ে পরিচিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারী নিজের পরিচয় নিজেই তৈরি করে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর নিজস্ব ঠিকানা গড়ে তোলার গল্প 'শতরুপার ঠিকানা'। ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামে বাস শতরুপার। অভাবী ঘরে সুন্দরী ও মেধাবী হয়ে জন্মগ্রহণ করা তার জীবনের বড় অভিশাপ। মেধাবী শতরুপার উচ্চশিক্ষার খরচ জোগাতে না পারলে পরিবারের লোক তাকে বিবাহের হাটে বিক্রি করে। কিন্তু শতরুপার দুচোখে ছিল স্বনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন। অচেনা পুরুষের কর্তৃত্বে পরাধীনভাবে সারাজীবন কাটানোর চেয়ে মৃত্যু তার কাছে অনেক বেশি কাম্য। পরাশ্রিত জীবন থেকে বাঁচতে বিবাহের রাত্রে কলকাতায় পালিয়ে আসে। শুরু হয় বেঁচে থাকার সংগ্রাম। রাস্তায় নামলে পুরুষের ব্যঙ্গবিদ্রুপ তাকে ক্ষতবিক্ষত করে -

> "লেখাপড়া দিদিমণি ভাতারের ভাত খায় না, কেউ কেউ সিটি দেয়। বিকৃত গলার স্বরে বলে, আসবে নাকি? ঘর খালি। কেউ বলে, যাব নাকি রাত্রে তোমার ঘরে? কত তোমার রেট?"[১৩]

শতরুপার মতো অসহায় নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে সমাজের সকল শ্রেণির কামান্ধ পুরুষদের লালসা লালায়িত। টিউশনির স্বল্পমূল্যে দিনাতিপাত করা কঠিন তাই সে বিজ্ঞাপণের মডেলের কাজে যোগদান করে। সেখানে কোম্পানির উদ্ধর্তন কর্তা হোটেলে একরাতের বিনিময়ে শতরুপাকে কাজের প্রস্তাব দেয়। স্বাভিমানী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শতরুপা কোম্পানির কর্তা বা ইভটিজারদের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। স্বনির্ভর হতে শতরুপার মত নারীরা শরীরকে পুঁজি করে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিন তার নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব ঠিকানা হবে।

ঘরে-বাইরে পুরুষের অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার আরেক গল্প 'বাঁচবার তাগিদ'। বস্তিবাসী আসমানীর স্বামী যতীন রিকশা চালিয়ে উপার্জনটুকু নেশাতেই খরচ করে। তাই সংসার চালানোর সকল দায় এস পড়ে আসমানীর কাঁধে। আসমানী জানে কামিনের কাজে নারীর ইজ্জত হারাতে হয় তবু কামিনের কাজে কয়েকটি বেশি টাকায় সংসার সচ্ছলভাবে চালানোর জন্য সে কামিনের কাজেই যোগদান করে। পূর্বে স্বামীর পাশবিক অত্যাচার সহ্য করলেও বর্তমানে স্বাবলম্বী আসমানী স্বামীর অন্যায় অত্যাচারে প্রতিবাদ করেছে -

> "তোর টাকা আমার কী কাজে নাইগবে? আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে আমি মদ্দা পুষতেছি।"[১৪]

উপার্জন ক্ষমতায় আসমানীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে, তাই সে দৃড়কণ্ঠে বলতে পারে 'মদ্দা পুষতেছি'। ঘরে মাতাল স্বামীর অত্যাচার, বাইরে নারী শরীরলোলুপ পুরুষের হাত থেকে বাঁচার প্রতিনিয়ত লড়াই। আসমানী একজন বুড়ো রাজমিস্ত্রীর অধীনে কামিনের কাজ করে। পিতৃবয়সী রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কাজে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। কিন্তু সে জানে না নারীমাংসের জন্য যেকোনো বয়সের পুরুষ পশুত্বের আচারণ করতে পারে। কামাতুর বুড়ো রাজমিস্ত্রী আসমানীকে বশ করতে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের রঙীন স্বপ্ন দেখায়। আসমানীও চেয়েছিল স্বামী-সন্তান নিয়ে এক সুখের সংসার। স্বপ্নালু আসমানীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বুড়ো রাজমিস্ত্রী তাকে অক্টোপাসের মত পেঁচিয়ে ধরে। সুখের স্বপ্ন, বুড়োর ঘামের গন্ধ, খৈনির গন্ধ আসমানীকে নেশা ধরায়। নিজের শরীরটা বুড়োর কাছে সমর্পণ করতে গিয়েও শেষমুহূর্তে চৈতন্য ফিরে পায়। সম্বিত পেয়ে দেখে, যে স্তনে তার সন্তানের অধিকার তা এখন বুড়োর মুখে। প্রচণ্ড ঘৃণায় বুড়োকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে আসমানী বলে -

> "শালা খানকির ছেলে, তুই আমার চরিত্তির নষ্ট করতে চাস, গতর রইচে খেটে খাব। জান দোব, তবু মান দোবনি।"[১৫]

আসমানীর মতো নারীরা নিজেদেরকে পণ্যের মতো বিক্রি করে না। কঠিন কঠোর মাটিতে টিকে থাকতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কণা বসু মিশ্রের গল্পের নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শত প্রাচীন বদ্ধ নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। নারীকে চার দেওয়ালে বন্দী করে রাখার নিয়মনিগড়কে ধূলিসাৎ করে বিজয়কেতন উড়িয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের জীর্ণ নিয়ম বদলানোর গল্প ‘বদল’। গুণধরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মঙ্গলা। রোগে শয্যাশায়ী গুণধর, তাই সংসারের উপবাসী মানুষের মুখে অন্নসংস্থানের দায় মঙ্গলার। উপার্জনের জন্য মঙ্গলা যাত্রাদলে নাম লেখায়। দ্রৌপদী সাজে মঙ্গলাকে দেখে -

> “পঞ্চপাণ্ডব ছাড়াও আরো কত পুরুষের মাথা ঘুরে যায়! পুরুষের লোভী চোখের ছোবল মঙ্গলা হাড়ে হাড়ে টের পায়।”[১৬]

প্রত্যেক যুগেই দুঃর্যোধন, দুঃশাসনরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে। মঙ্গলার জীবনে দুঃশাসন যাত্রাদলের অধিকারী। অসহায়ত্বের সুযোগে নিয়ে মঙ্গলাকে শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দিতে দ্বিধা করে না। কামান্ধ পুরুষ সম্পর্কে মঙ্গলা সচেতন, সে জানে-

> “ওর যৌবন যতদিন থাকবে, ততদিনই না অধিকারীর। পুরুষ মানুষ মেয়ের শরীর চায়, মন চায় না।”[১৭]

দর্শকের লুভিষ্টি দৃষ্টি এড়িয়ে, অধিকারীর অশ্লীল প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেও মঙ্গলাকে স্বামীর কাছ থেকে শুনতে হয় ‘বেশ্যা’ ডাক। স্ত্রীর উপার্জনে জীবননির্বাহে অক্ষম গুণধরের পৌরুষত্বে আঘাত হানে। যাত্রামঞ্চে অধিকারির সঙ্গে কণ্ঠলগ্না মঙ্গলার ছবি গুণধরকে হিংস্র করে তোলে। প্রথম স্ত্রীকে বিষ দিয়ে হত্যা করলেও স্বাবলম্বী মঙ্গলার উপর প্রভুত্বের ছড়ি ঘোরাতে পারে না। একদিন দাম্পত্য কলহে স্ত্রীর মুখে পৌরুষত্বহীনতার কথায় ক্ষিপ্ত গুণধর বল্লম নিয়ে মঙ্গলাকে হত্যা করতে যায়। বল্লম ছোঁড়ার চরম মুহূর্তে মঙ্গলা স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে বলে-

> “অমন সোয়ামীর মুখে আগুন। তোর ঘর করবনি। আমি কি অক্ষম? যাত্রাদলে আধা সাইজলি বিশটা টাকা পাই।”[১৮]

স্বাবলম্বীতায় মঙ্গলাকে স্বামী নির্ভরতা ছেড়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার সাহস জুগিয়েছে। গ্রাম্য পরিবেশে সমাজকে উপেক্ষা করে ভদ্র ঘরে বধূ হয়েও যাত্রাদলে অভিনয় করার সাহাস সমাজের বদ্ধ নিয়মের সংস্কারে বদল আনার দিকটিকে সূচিত করে।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবলে আমরা অত্যাধুনিক যুগে বাস করি। সভ্যতার উন্নতি ঘটলেও চিন্তাভাবনায় আমরা এখনো সেকেলে। লিভ টুগেদার বা লেসবিয়ান সম্পর্ক আমাদের সমাজে এখনো একপ্রকার ব্যাধি। এ সম্পর্কে আমরা মুক্তভাবে কথা বলতে পারি না। লেখক ‘ওরা দুজন’ গল্পে সমাজের সেই স্টিরিওটাইপ ভাবনাকে ভেঙেছেন। গল্পে দেখি মধুশ্রী কন্যা সম্প্রদানে বিশ্বাসী নয়। বিবাহের দিন ছাদনাতলায় বসেছে, সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করেছে, স্বামীর হাতে সিঁন্দুর পরেছে, কিন্তু গোত্রান্তর পরিবর্তন করেনি। স্বামি ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিতে চায়লে স্বাবলম্বী মধুশ্রী প্রতিবাদ করেছে -

> “ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব আবার কী? আমি তো একটা চাকরি করি। দুজনের ফিফটি-ফিফটি আয়ে সংসার চলবে তাই তো কমিটমেন্ট ছিল তাই না।”[১৯]

বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে মতান্তর ঘটায় মধুশ্রী পারিবারিক অশান্তি বা আইনি ঝামেলায় না গিয়ে হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে। পিতা-মাতার কাছে আশ্রয় নিলে মধুশ্রীর উপর উপদেশের বাণী বর্ষিত হয়। একজন সহনশীল, গুণবতী, নম্র নারীর কর্তব্য সম্পর্কে তার মা জ্ঞান দেয়; সকলের ধারনা মধুশ্রীর জন্যই সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে। প্রতিনিয়ত সতী নারীর কর্তব্য জ্ঞানে মুখরিত পিতামাতার আশ্রয় ছেড়ে মধুশ্রী স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে বাঁচা শুরু করে। জীবননির্বাহের জন্য সে ব্যবসা শুরু করে, তার পার্টনার হয় সৃজলীনা। তারও পুরুষের প্রতি প্রবল অবিশ্বাস। পুরুষের আশ্রয় ছাড়া দুই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর একই ফ্ল্যাটে বাস করা সমাজ ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। সকলেই ওদের দুজনকে লেসবিয়ান বলে সমাজে একঘরে করতে চেয়েছে। সমাজের কুৎসায় ভ্রুক্ষেপ না করে মধুশ্রীর উত্তর -

> “মুখ বন্ধ করার কি দরকার? যারা নোংরা ঘাঁটতে ভালোবাসে তারা নোংরা ঘাটুক।”[২০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 241
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার কণা বসু মিশ্রের কিছু গল্পে নারীরা সমাজের মান-মর্যদার ভয়ে, সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, নিশ্চিত নিরাপত্তা হারানোর ভয়ে পুরুষের সকল অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে পায়ের শিকল ঝনঝনিয়ে ওঠে।

কণা বসু মিশ্র ছোটদের জন্য গল্প রচনা করেছেন। মূলত তিনি কিশোর সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। ‘ভূতুড়ে গাড়ির যাত্রী’ তাঁর কিশোর গল্প সংকলন। কৈশোর মনের অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা রহস্য উদঘাটনের কৌতূহলতা, বেপরোয়া মানসিকতার দিকগুলি তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। পাঠ্যবই ও টিউশনির চাপে কিশোর তার কৈশোরত্ব হারিয়ে ফেলছে। অভিভাবকরা কিশোর মনের প্রতি যত্নশীল না হয়ে শিক্ষার প্রতিযোগিতায় ঘোড়াদৌড় করায়। কিশোর মনকে বুঝতে না চাওয়ার গল্প ‘কেউ বোঝে না’। পড়াশুনা, অভিভাবকের প্রত্যাশার চাপে কিশোর মন ওষ্ঠাগত। তাই রাজার মনোইচ্ছাপূরণে কোনো অলৌকিক শক্তিই ভরসা -

> “একবার যদি কোনো দেবতার সঙ্গে রাজার দেখা হয়ে যায়, ও তাহলে প্রথমেই বায়না ধরবে, কিছু বাড়ি দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের জন্য কিছু খেলার মাঠ করে দাও না।”[২১]

বর্তমান সময়ে কৈশোরকাল থেকে খেলার মাঠ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। নম্বর আনার প্রতিযোগিতায় ক্লাসের সহপাঠী হয়ে উঠছে চরম শত্রু। অসুস্থ এক মানসিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা কৈশরকালকে।

অভিভাবকদের অতিরিক্ত শাসন কিশোর মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কৈশোরকালে স্বাভাবিক স্ফুরণে ব্যহত হলে তার প্রভাব পরবর্তীকালে দেখা যায়। ‘তাতার জ্যাঠামশায়’ গল্পে দেখি রাশভারী, কঠোর জ্যাঠামশায় পড়াশুনার বাইরে খেলাধূলা, গল্পের বই পড়াকে অযৌক্তিক মনে করে। ফলে তাতা একাকীত্বে ভুগতে থাকে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ঘরবন্দী করায় কৈশোরের প্রাণবন্ততাকে ছিনিয়ে নিয়ে অবসাদের মুখে ঠেলে দেয়।

আবার কণা বসু মিশ্রের গল্পের কিশোরদের পাঠ্যবইয়ের বাইরে অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনি তাদের প্রিয়। তারাও হতে চায় ফেলুদা, ব্যোমকেশ। লেখক তাঁর গল্পে কিছু ক্ষুদে গোয়েন্দার সৃষ্টি করেছেন। তেমনই এক গোয়েন্দাসুলভ কিশোরের গল্প ‘মেলা থেকে হারিয়ে’। ভুটুন পরিবারের সঙ্গে মেলা দেখতে গিয়ে অন্যমনস্কতার জন্য হারিয়ে যায়। ভুটুন ভয় না পেয়ে শান্ত মনে ভাবে ফেলুদা বা ব্যোমকেশ এমন বিপন্ন পরিস্থিতিতে কি করতো। শান্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ভুটুন বুদ্ধির জোরে কীভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার পেল, একদল ডাকাতকে কীভাবে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল তাই বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে কিশোররা মারকাটারি হিন্দি সিনেমায় ডুবে থাকে; সেখানে ভুটুনের গোয়েন্দা গল্পপ্রেম সমাজের ইতিবাচক দিকটিকে তুলে ধরে।

হাসির মোড়কে চিত্রিত আরেক কিশোর গোয়েন্দার গল্প ‘বুদ্ধর আবিষ্কার’। এই গল্পে বাড়ির আচার চোরকে হাতেনাতে পাকড়াও করে বুদ্ধ। পাশাপাশি কণা বসু মিশ্র কিছু অলৌকিক গল্প রচনা করেছেন। ‘ভূতুড়ে গাড়ির যাত্রী’, ‘পাহাড়ী রাস্তা’, ‘রাত্রি’ ভৌতিক গল্প।

কণা বসু মিশ্রের সাহিত্য বিষয়বস্তুতে বৈচিত্রময় তবুও তিনি পাঠকের অন্তরালে। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন -

> “আশির দশকের বাংলা সাহিত্য তিনজন ক্ষমতাসম্পন্ন লেখিকাকে সামনে এনেছে। সত্তরের দশকে আমরা অবশ্য কবিতা সিংহ এবং কণা বসু মিশ্রের গল্প পেয়েছি। কণা বসু মিশ্রেরও কিছু উত্তীর্ণ গল্পের কথা আমাদের মনে আছে। কিন্তু পারদর্শীতা সত্বেও তাঁদের গল্প যেন পঞ্চাশের দশকের গল্পধারার অনুবর্তন। সেখানে মধ্যবিত্তের মানুষের ছবি, মধ্যবিত্তের একান্ত ব্যক্তিক সংকটগুলির রুপায়ণ, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অসংশয় প্রতিষ্ঠা। দেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিধারার সঙ্গে প্রতি বিন্দুতে মানুষের গল্পকে মিলিয়ে দেখার যে প্রবণতা সত্তরের দশকের চরিত্র, তাঁরা থাকেন কিছুটা সে বৃত্তের বাইরে।”[২২]

সত্তর-আশির দশকের উত্তাল সময়ের প্রভাব সেভাবে না থাকলেও সমকালীন সময়ের ছাপ তাঁর বহু গল্পের বিষয়। কণা বসু মিশ্র এখনো সৃষ্টিশীল। গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে প্রতিনিয়ত তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। বৈচিত্রময় হয়ে উঠুক তাঁর সাহিত্য ভুবন।

Reference:

১. মিত্র, রঞ্জনা, সাহিত্য বিসারী পত্রিকা, লেখনীর ভাষায় জীবনের খোঁজ-কণা বসু মিশ্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১২
২. মিশ্র, কণা বসু, তুলির কিছু সময়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ৯৮
৩. মিশ্র, কণা বসু, সম্বুদ্ধ, প্রমা প্রকাশনী, ওয়েস্ট রেঞ্জ কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-মে, ১৯৯৭, পৃ. ১৫২
৪. তদেব, পৃ. ১৫৩
৫. মিশ্র, কণা বসু, স্বনির্বাচিত পঞ্চাশটি গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড়, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ২৬৬
৬. তদেব, পৃ. ২৬৮
৭. মিশ্র, কণা বসু, বন্ধ দরজা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানু, ১৯৯৯, পৃ. ৬
৮. তদেব, পৃ. ৪৫
৯. মিশ্র, কণা বসু, বাছাই গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড়, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ৭০
১০. মিশ্র, কণা বসু, ভালোবাসার হাটে, গ্রন্থতীর্থ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৮৬
১১. তদেব, পৃ. ৮৮
১২. মিশ্র, কণা বসু, জনারণ্যে একা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ৫৬ সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১১২
১৩. মিশ্র, কণা বসু, মলাটের শেষে, সৃষ্টি প্রকাশনী, ৩৩ কলেজ রোড়, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১, পৃ. ১১৮
১৪. মিশ্র, কণা বসু, বন্ধ দরজা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানু ১৯৯৯, পৃ. ৭৮
১৫. তদেব, পৃ. ৮২
১৬. মিশ্র, কণা বসু, জনারণ্যে একা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ৫৬ সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৬৪
১৭. তদেব, পৃ. ৬৭
১৮. তদেব, পৃ. ৭০
১৯. মিশ্র, কণা বসু, স্বনির্বাচিত পঞ্চাশটি গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড় কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ২০
২০. তদেব, পৃ. ২৪
২১. মিশ্র, কণা বসু, ভূতুড়ে গাড়ীর যাত্রী, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড় কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১০ পৃ. ১৬
২২. চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৯৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 242 - 250
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিশ্বায়নের আলোকে ও নারী ভাবনায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (নির্বাচিত) ছোটগল্প

রজনীতা ভৌমিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rajanitaslg96@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Globalization, Women empowerment, freedom, women, Capitalism.

Abstract
Globalization is an international phenomenon that originated in the late 1970's and has spread worldwide. As a result, radical changes can be observed in women's lives. It's influences are observed in Bengali and world literature. One such writer Suchitra Bhattacharya. Her motifs of writing different types of people. They came up in her stories. She is an eye witness to the misery of women's lives and this essay is about their lives influenced by globalization.

Discussion

নদী যেমন বয়ে চলার পথে আশেপাশে তার ছাপ রেখে যায় তেমনি সময়ও তার ছাপ রেখে যায় সমকালীন সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মের মধ্যে দিয়ে। তারই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল সাহিত্য। কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে পাঠককে বিভিন্ন সময়ের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিংবা রাজনৈতিক চিত্রের পরিচয় করিয়ে থাকেন। তেমনি বিশ শতকের শেষের দশক এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমকালীন সময়ের উত্থান-পতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। খুব অল্প বয়সে জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন। তাই নারীশিক্ষাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পাশাপাশি নারী মনের বেদনা-যন্ত্রণা কিংবা নারীদের অধিকার নিয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ‘অন্তরাগ’ কিংবা ‘ঠাট্টা’ বা ‘যখন দুজনে একা’ গল্প তাঁর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গল্পগুলো বিশ্বায়নের সক্রিয় প্রভাবযুক্ত। মূলত সত্তরের দশকের পরবর্তীতে সমাজ ও মানবজীবনে এল আমূল পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক বাজারের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকলো মানবজীবন। যার ফলে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে দেখা দিল বিস্তর ফারাক। সেখান থেকেই তৈরি হল মানুষে মানুষে ব্যবধান। সম্পর্কে দেখা দিল ফাটল। ব্যস্ততা ও যান্ত্রিকতার যুগে মানুষকে গ্রাস করতে থাকলো একাকীত্বের পাহাড়। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মধ্যে দেখা দিল মূল্যবোধের অবক্ষয় যা পরোক্ষে সমাজের জন্যে ক্ষতিকারক। এইসব বিষয়গুলিই গল্পকার তাঁর গল্পে নিখুঁত বুননের মাধ্যমে রচনা করেছেন।

তাঁর **‘টাইমজোন’** গল্পটি প্রবাসী রচনা এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। একই সঙ্গে লন্ডন, সিডনি ও কলকাতায় যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় তাকে। গল্পে রচনা চরিত্রটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। সে তার কাজের

পাশাপাশি পরিবারের খেয়াল রাখা ও তার যাবতীয় কর্তব্য পালন করতে চায়। 'চার মহাদেশে চরকি খাওয়া' তার স্বামী বরুণ ও রচনা ভোগবাদী যাত্রার অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেশ নতুন নতুন মানুষ নতুন নতুন আদবকায়দার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে "ষোলো বছর আগে তারা কলকাতা ছেড়েছিল, তারপর থেকে দু'জনে লাট্টুর মতো ঘুরছে তো ঘুরছেই।"[১] সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সে চেয়েছে তার ছেলে "সেরা আদবকায়দা শিখুক, শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হোক, সঙ্গে লেখাপড়া চলুক সমান তালে।"[২] ঘটনাচক্রে তার মায়ের মৃত্যু ঘটে এবং সবদিক সামলে তাকে কলকাতায় ফিরতে হয়। সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সময়ের দ্রুততার কারণে সে বাবা-মায়ের ছোট্ট দু'কামরার ফ্ল্যাটের বদলে গৌড়ীয় মঠে গিয়ে তার মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তির অনুষ্ঠান পালন করতে চায়। তার সঙ্গে পুরনো সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বদলে খুব সহজে ও কম সময়ে যতটুকু পালন করা সম্ভব সেগুলিই আয়ত্ত করে। কারণ সময় বাঁচিয়ে তাকে তার প্রবাসী স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হতে হয়। কিছুদিন এভাবে চলার পর তার বিদেশ ফেরার দিন ঘনিয়ে আসলে সে তার বাবাকে তার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার পরামর্শ দেয় কিন্তু তার বাবা পুরনো বাড়ি ও স্ত্রীয়ের যাবতীয় স্মৃতি ফেলে রেখে অন্য কোথাও যেতে রাজি হয় না।

> "বাবার এত চুপ থাকাটা রচনার সহ্য হচ্ছিল না। ভাত ভাঙতে ভাঙতে বলল, গুম মেরে থাকছ কেন? কথা বলো। যা খুশি।
> কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। চলছে আঙুল, নড়ছে মুখ, ব্যাস ওইটুকুই।
> নাহ্, বাবাকে একটু সমে ফেরাতেই হবে। রচনা গলা উঁচিয়ে বলল, আমি তো আজ চলে যাচ্ছি বাবা। সিডনি নয়, এবার কুইন্সটাউন।
> এবারও কোনো সাড়া শব্দ নেই শুনছে কিনা বোঝাই গেল না।
> রচনা আরও গলা ওঠাল, তুমি যাবে সেখানে? দারুণ সুন্দর জায়গা বিশাল লেক...নীল জল টলটল করছে...বরফে ঢাকা পাহাড়...ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, কলকাতার মতো ক্যালরব্যলর নেই..."[৩]

অপরপক্ষে রচনার স্বামী অফিসে পদোন্নতি পেয়ে সানফ্রানসিসকোতে চলে যায় যার ফলে একই সঙ্গে তিন চারটি জায়গায় টাইম-জোন অনুযায়ী যোগাযোগ রক্ষা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে তবুও মানসিকভাবে ক্লান্ত রচনা সময়-সমাজ ও সম্পর্ককে একই সুতোয় গেঁথে নিয়ে চলতে চায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের কাছে দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। টেকনোলজির উন্নতিতে মানুষে মানুষের মধ্যে যেমন দূরত্ব কমেছে তেমনি বেড়েছে মানসিক দূরত্ব যা গল্পে রচনা ও তার বাবার মধ্যে লক্ষ করা যায়। অপরদিকে সময় ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠান থেকে সেরা আদবকায়দাগুলি শিখতে রচনা তার ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়।

'অন্তরাগ' গল্পটিতে দুই বন্ধু সুজাতা ও বীথি তাদের 'নিজের একটি পৃথিবী'র সন্ধানে তাদের পুরনো জীবন ও বর্তমান জীবনের নানান স্মৃতি-চিত্র হাতড়ে বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবনের সামান্য সুখটুকু খোঁজার চেষ্টায় রত হয়েছে। গল্পের শুরুতে কোনো এক অঘ্রাণের দুপুরে আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ও একটা মলিন রোদের চাদর বিছানো শহরে কিছুটা অটোতে কিছুটা হাঁটা পথে সুজাতা তার ছোটবেলার বন্ধু বীথির সঙ্গে দেখা করতে যায় একটি বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে এসে তারা তাদের স্মৃতিরোমন্থনের পাশাপাশি কে কার চেয়ে বেশি সুখী তার তুলনায় পর্যবসিত হলেও শেষপর্যন্ত বুঝতে পারে তারা কেউই প্রকৃত সুখী নয়। গল্পের চরিত্র সুজাতা একজন চাকরিজীবী দুই সন্তানের মা হলেও জীবনের কুড়ি-পঁচিশটা বছর যেন তার কাজ, স্বামী ও দুই সন্তানের পড়াশোনা, কেরিয়ার ও তাদের ব্রাইট ফিউচার নিয়ে ভাবতে ভাবতেই চলে গিয়েছে। তারপর স্বাবলম্বী হয়ে যে যার মতন কর্মক্ষেত্রে ও নিজস্ব জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় হঠাৎ একদিন সুজাতা বুঝতে পারে 'জীবনটা বিলকুল ফাঁকা'।

> "তাই বোধহয় ছেলের সংসারে বেশি বেশি করে জড়িয়ে পড়ছিলাম। জোর করে। সনু ঠোক্কর দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিল, তুমি মা হতে পারো, কিন্তু আমার সংসারে তুমি অনুপ্রবেশকারী। সেটা এমনই মজ্জায় মিশে গেল, রাজার সংসারে আর স্বাভাবিক হতে পারলাম না। বীথি একটু দম নিল, এখানে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> এসে টের পাচ্ছি, আমি শুধু রাজা সুর মা নই, প্রশান্ত ঘোষালের বউ নই, এর বাইরেও একটা বীথিকা ছিল। যাকে ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। সেই বীথিকাটাই এখন এই শান্ত নীড়ে বাস করতে এসেছে।"[৪]

সংসারে বীথির প্রয়োজন মাত্র বাড়ির লোকজনের দেখাশোনা করা ও নাতি-নাতনিদের খেয়াল রাখা। সারাটি জীবন সংসারের ঘানি টানতে টানতে সুজাতারও মনে হয় বাড়িতে তার তেমন একটা প্রয়োজন না থাকলেও মাম্পি ভুতুমকে দেখাশোনা করা, তাদেরকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করাও তার একটা কাজ। কিন্তু সংসারের বাইরেও তার নিজের একটা অস্তিত্ব আছে তাই সে দেখা করতে চলে যায় তার ছোটবেলার বন্ধু বীথির কাছে। গল্পটিতে গল্পকার সুজাতার মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের পরিবার ও সংসার কেন্দ্রিক নারীদের জীবন-যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। পরিবারের দেখাশোনা ও সন্তান প্রতিপালন ছাড়াও নারীদের নিজস্ব একটি সত্তা থাকে, সমাজে সেটির প্রতিষ্ঠা তিনি তাঁর গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। তার ছেলে ও বৌমা চাকুরীরতা হওয়ায় সমস্ত সংসারের ভার যদিও তারই। তবে 'সংসারটা ছাড়া থাকে বলে তার কি ইচ্ছেমত বেরোনোর স্বাধীনতাও নেই?' তাই সে মাঝে মাঝে তার নাতি-নাতনিদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার নিজের ইচ্ছেগুলোও পূরণ করত। অপরদিকে বীথি সারাজীবন সংসারের ঘানি টানা সত্ত্বেও যেন সংসারে অপরের কাছে বোঝা সমতুল্য। নারীদের এই জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই গল্পকার গল্পটিকে সাজিয়েছেন। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় পরিবারগুলি হয়ে উঠেছে এক কেন্দ্রিক নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। অপরদিকে সমাজের সবদিক দিয়ে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যা বিশ্বায়নেরই পরোক্ষ প্রভাব।

'দাগবসন্তি খেলা' গল্পটি শুরু হয়েছে কলকাতার নাগরিক জীবনের চিত্র দিয়ে। গল্পের চরিত্র পৃথা সকাল সকাল স্টেশনে এসে পৌঁছেছে মনসাপুকুর গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। পৃথা একজন স্বনির্ভর স্বাধীনচেতা নারী অফিসের ব্যালান্সশিটের সাথে সাথে জীবনের ব্যালান্সশিটের সমীকরণ সুষ্ঠু ও সুসংহতভাবেই করতে জানে সে। একপাশে কলকাতার ভোগবাদী নাগরিক জীবনের ক্লান্তি অপরদিকে মনসাপুকুর গ্রামের পুরনো স্মৃতি আগলে প্রতিনিয়ত সে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। গ্রামের বামুনদিদি, পইতেবুড়ি, আলতাবউ, ধূপওলি মাসির খোঁজে ভূশণ্ডির মাঠ পার করে মায়ের কাছে পৌঁছে সে জানতে পারে যে, তাঁরা "এ বংশের সব কাজেই তো আসত একসময়— বিয়ে, শ্রাদ্ধ, আঁতুরতোলা। তারপর কত যুগ যে কোনও খোঁজ নেই আর। সেই যে কী এক রোগে ধরল তাকে, তারপর থেকেই...।"[৫] নাগরিক সভ্যতার উত্থানের ফলে গ্রামজীবন যেমন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় তেমনই গ্রাম থেকে হারিয়ে যায় নানান রকমের লোকাচার, তার সাথে যুক্ত বিভিন্ন মানুষজন। যেমন এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে আলতাবউ, পইতেবুড়ি কিংবা বামুনদিদির সাথে। বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্ব যেমন হাতের মুঠোয় তেমনি মানুষের মন হয়ে উঠছে সংকীর্ণ, বিশ্বের নতুন দিকগুলি যেমন উঠে আসছে তেমনই হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার নানান সংস্কৃতি, গল্পে তারই বর্ণনা রয়েছে। তারই সঙ্গে উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার নারী ও শহুরে চাকরিজীবী নারীজীবনের চিত্র। গল্পের মূল চরিত্র পৃথা কলকাতা শহরের বালিগঞ্জ এলাকায় বিলাসবহুল একটি ফ্ল্যাটে তার স্বামী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে থাকে। কলকাতারই একটি অফিসে কর্মরতা পৃথা একটি ছুটির দিনে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ছুটে যায় মনসাপুকুর গ্রামে শিরীষ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ার দেশে। যেখানে —

> "বাতাস খোলাখুলি চুমু খায় গাছের শরীরে, হঠাৎ কোনও একলা পাখি হারিয়ে যায় প্রকাণ্ড আকাশটায়।"[৬]

কিন্তু শহরের নাগরিক জীবনের ক্লান্তি দূর করতে গিয়ে পৃথাকে শুনতে হয় —

> "কলকাতার বড়বাড়ির, বড়লোকের বউ সে কিনা এসেছে একা একা গ্রামেগঞ্জে।"[৭]

গল্পে শহুরে জীবনের চালচিত্রের পাশাপাশি গ্রামের মানুষদের মন মানসিকতাও ফুটে উঠেছে সমানভাবে। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে গ্রামীণ জীবনেও এসেছে নানান পরিবর্তন। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার লোভে গ্রামের মানুষেরাও এখন শহরমুখী তা গল্পে প্রাণগোপালের বউয়ের কথায় বুঝতে পারা যায় — 'কলকেতাতে দু-চার ঘর যজমান যদি পাইয়ে দাও'। পুঁজিবাদী ভাবধারার প্রভাবে মানুষের তার অন্তরের রূপের চাইতে বাহ্যিক রূপের প্রতি ধ্যান বেশি। গল্পে এই বিষয়টিকেও

গল্পকার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন গল্পের চরিত্রগুলির কথোপকথনে। তারই একটি চিত্র — 'কলকাতাতে মানুষ কোথায় আলতা পরার? তেমন তেমন প্রয়োজনে বিউটি পার্লার মোড়ে মোড়ে। তাছাড়াও মানুষ এখন...' অর্থাৎ ভোগবাদী চাহিদার বশবর্তী হয়ে মানুষ তাদের জীবনে বাজারের নতুন নতুন বিলাসিতার আগমন ঘটালে পুরনো লোকাচারগুলি পুরোপুরি বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে। গল্পটিতে গল্পকার একাধারে গ্রাম ও নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্বায়ন এই দু-জায়গায় বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রায় ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা পরিবর্তনগুলিকে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

'যখন দুজনে একা' গল্পটি মূলত বিশ্বায়নের যুগে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা উঠে এসেছে। গল্পে পিনাকী ও কৃষ্ণার মেয়ে তানিয়া চাকরিতে পদোন্নতি পেয়ে সানফ্রানসিসকোতে যেতে চায়। ভোগবাদের যুগে সে নিজের জীবনের হাল নিজেই ধরতে প্রস্তুত হয়। নতুন দেশে গিয়ে নিজের মতন জীবনযাপন নিজের পছন্দের কাজ করতে চায় সে। জীবনের প্রতিটি রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণকে উপভোগ করে এগিয়ে যেতে চায়। তাই অফিস থেকে পদোন্নতির খবর পাওয়া মাত্রই কিছু না ভেবেই সে সুযোগের সৎ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। গল্পে তানিয়ার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে টেনেটুনে সংসার চালিয়েছে মেয়ে তানিয়াকে মানুষ করেছে কিন্তু এসবের মধ্যে তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ পাননি। তাই তিনিও এদেশের সমস্ত পাততাড়ি গুটিয়ে তানিয়ার সঙ্গে বিদেশ চলে যেতে রাজি হয়ে যান। সেখানে গিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলি আনন্দে কাটাতে চান। কিন্তু তার স্ত্রী কৃষ্ণা বিদেশ যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পুরনো ভাবধারার বশবর্তী হওয়ার দরুন তিনি মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে যেতে চান না। অপরপক্ষে সারাজীবন সংসারে খাটুনির পর শেষ জীবনটা স্বামীর সঙ্গে পুরনো স্মৃতিচারণ করে কাটিয়ে দিতে চান। কিন্তু তানিয়া তার ভোগবাদের জীবন উপভোগ করতে চায় গল্পে দেখা যায়—

> "চাকরিতে ঢুকেই সত্তর আশি হাজার মাইনে পাচ্ছে তো, টাকার মূল্য সম্পর্কে তাই কোনো আন্দাজ নেই মেয়ের। খোলামকুচির মতো পয়সা ওড়ায়।"[৮]

অপরদিকে পুরী, দার্জিলিং, হরিদ্বার, আর একবার কুলু-মানালি ছাড়া কোথাও তেমন একটা যাওয়ার সামর্থ্যে কুলোয়নি পিনাকীর। তাই সানফ্রানসিসকোতে যাওয়াটা তার কাছেও অনেকটা স্বপ্নের মতো। কিন্তু কৃষ্ণার অনীহা এবং মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে এ যাত্রায় সে বিদেশ না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বিশ্বায়নের যুগে দূরত্ব এখন কোনো সমস্যার বিষয় নয়। উন্নত টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ দূর থেকে কাছের মানুষের সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তাই গল্পে তা নিয়ে তানিয়া তার বাবাকে পরামর্শ দেয় "খুব সহজ। শিখিয়ে দেব'খন। স্কাইপে চ্যাট করার সময়ে মনেই হবে না আমি আমেরিকায়, আর তোমরা কসবায়। পৃথিবীটা এখন পুঁচকে গ্রাম হয়ে গেছে বাপি।"[৯] গল্পে নারী বিশ্বায়নেরও বিশেষ দিক লক্ষ করা যায়। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের ভাবধারার যেমন উন্নতি ঘটেছে তেমনি টেকনোলজিরও উন্নতিসাধন ঘটেছে। তাইতো কৃষ্ণা যখন তার মেয়ের সংসারে গিয়ে উঠতে অনীহা প্রকাশ করে তখন পিনাকী বলে ওঠে —

> "শুধু জামাই কেন, সংসার তো আমার মেয়েরও।"[১০]

কারণ বিশ্বায়নের যুগে মেয়েরা আজ অনেক এগিয়ে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তারা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে শিখেছে, শিখেছে পরিবারের দায়িত্ব নিতে। তাইতো গল্পের শেষে শেষপর্যন্ত তানিয়া বিদেশে পাড়ি জমায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং পিনাকী ও কৃষ্ণা তাদের পুরনো সাধের জীবনে ফেরে। জীবনযাপনের ব্যস্ততায় যা তারা এতদিন ভেবে উঠতে পারেনি তেমন জীবনের পথে তারা এগিয়ে চলে।

'অসাম্প্রদায়িক' গল্পটিতে উচ্চ সমাজে বসবাসকারী নিম্ন মানসিকতার কিছু মানুষের পরিচয় পাই। গল্পে আবাসনের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন প্রতিটি বাসিন্দা প্রত্যেকেই কেউ না কেউ অধ্যাপক, কেউ প্রাইভেট কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার। সামাজিক অবস্থান রক্ষার্থে প্রত্যেকেই ফ্ল্যাটে থাকেন। আবাসনের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যেকেই সচেতন হলেও এই ভোগবাদের যুগে তাদের মানসিকতা তলানিতে ঠেকেছে। গল্পে, আবাসনের কো-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অপারেটিভের লিডার প্রবীরবাবু তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ফ্ল্যাটটি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটের খোঁজে বেরিয়েছেন এবং পুরনো ফ্ল্যাটটি তিনি বিক্রি করতে চান। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার তেতলার রবিন ফ্ল্যাটের খদ্দের সম্পর্কে জানতে পারেন। আবাসনেরই আরেক জন সদস্য আলিপুর আদালতের আইনজীবী সুপ্রিয়ার মতে—

> "আমাদের সংবিধানে তো বলা হয়নি প্রত্যেকে সেম রিলিজিয়নয়ের হতে হবে।"[১১]

কারণ ফ্ল্যাটের ক্রেতা ডোমজুড়ের ছেলে একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী নাগরিক, পেশায় সোনারপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কাজের সুবিধার্থে কলকাতায় তিনি একটি ফ্ল্যাটের সন্ধান করছেন। তবে এই প্রসঙ্গে প্রবীরের মুখোমুখি ফ্ল্যাটের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারেরও একই বক্তব্য —

> "এমনিতে জাত-ধর্ম-টর্ম নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। আমার মিসেস হয়তো একটু খুঁত খুঁত করবে।"[১২]

প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মানুষ তার মানবিক গুণগুলোর দ্বারাই সমাজে পরিচিত হন। গল্পের চরিত্রগুলিও তেমনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে শিখলেও প্রকৃত অর্থে তাদের মানবিক গুণগুলির বিকাশ ঘটেনি। প্রতিবেশীদের যুক্তিজালে মোহিত প্রবীরবাবু শেষপর্যন্ত ফ্ল্যাটটির জন্য অন্য ক্রেতার খোঁজে প্রবৃত্ত হন।

'সীমার মধ্যে' গল্পটিতে শ্রাবণী ও মিহিরের দাম্পত্য জীবন আবর্তিত হয়েছে একটি ফ্ল্যাটকে কেন্দ্র করে। সীমাহীন চাহিদা ও সাধ্যের মধ্যে কোনো সংযোগ না থাকায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্কেও সমস্যা দেখা দেয়। গল্পের শুরু হয় একজন প্রমোটারের সঙ্গে শ্রাবণী ও মিহিরের কথোপকথনের মাধ্যমে। 'ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ' বুকিংয়ের ভাবনায় পাহাড় প্রমাণ লোণের ভাবনায় দিনগুলো কাটতে থাকে শ্রাবণী ও মিহিরের। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়ি এসে তারা দুজন যখন হিসাবের খাতা নিয়ে বসে তখন তাদের মাথায় শুধুই লোণের চিন্তা ঘোরাফেরা করে। ভোগবাদী জীবনযাত্রা বজায় রাখতে গিয়ে তাদের পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হলেও সমাজে 'স্ট্যাটাস' রক্ষার্থে তারা নিজেদের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিতেও রাজি। মানসিক চাপে ক্লিষ্ট মিহির তার স্ত্রীকে জানায় —

> "অনেকগুলো টাকার ব্যাপার। আর একটু ভাবলে হয় না।"[১৩]

কিন্তু "মিহিরের বউ-এর এখন একটাই স্বপ্ন, নিজের করে মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই চাই। চাই-ই।"[১৪] শ্রাবণীর দাবি তাদের কন্যা রুমির 'কিছু নিজস্ব প্রাইভেসি প্রয়োজন' তাই তার জন্য একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতেই তার এই ফ্ল্যাট কেনার উদ্যোগ। মিহিরের মনে হয় —

> "প্রাইভেসি কি শুধু রুমিরই দরকার? এই যে এখন দুজনের মাঝখানে পাঁচ হাতের একটা ফাঁকা জায়গা... এই যে এখন হাত বাড়ালেও শ্রাবণীকে ছুঁতে পারে না মিহির, কোনও কোনও দিন গভীর রাতে চোরের মতো দুজনকে উঠে যেতে হয় পাশের ছোট ঘরে, হাজার সংকোচ আর সাবধানতায় শব্দহীন মিলন...।"[১৫]

ব্যস্ততার জীবনে সমাজের আর পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনও ব্যাহত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির ভাবনাও গল্পটিতে উঠে এসেছে সুন্দরভাবে। কিন্তু বাড়িটি দেখতে গিয়ে তারা যখন জানতে পারে কর্পোরেট এবং গৃহ-ব্যবসায়ীদের মামলায় বাড়িটি হাইকোর্টে ইনজাংশন হয়ে পড়ে রয়েছে তখন তারা আশাহত হয়ে হতভম্ব ও নেশাচ্ছন্নের মতো গিয়ে দাঁড়ায় বাড়িটির সামনে। যেন মনে হয় —

> "পৃথিবীর কোন এক কোণে, দেড়খানা ঘরে, কোন শ্রাবণী মিহিরের ফ্ল্যাটের প্ল্যান আটকে রয়েছে তা নিয়ে কারোরই মাথাব্যথা নেই দুনিয়ায়।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু শেষমেশ দরদাম নিয়ে ঝামেলা হলে জীবনের সুখ ও পারিবারিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে নতুন একটি ভাড়াবাড়িতে গিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের চেষ্টা করে। তবুও "লণ্ঠনের আলোতে মিহির স্পষ্ট দেখতে পেল শ্রাবণীর দু'চোখ চিকচিক করছে।"[১৭] দিন শেষে নতুন বাড়িতে গিয়েও স্পন্দনহীন জীবনচর্যায় পর্যবসিত হয় তারা।

'ঠাট্টা' গল্পটিতে থোরাসিক সার্জেনের স্ত্রী মণিকা বিউটি পার্লারে গিয়ে নিজেকে একটু ঘষামাজা করে আসে, স্বামীর প্রমোশন হওয়ার সুবাদে আমেরিকার যাওয়ার উদ্দেশ্যে। জীবনের সমস্ত সুখ থাকা সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গসুখ থেকে সে বঞ্চিত। তাই সে তার কলেজ জীবনের বন্ধু সুরজিতকে তার সাথে রাখে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তার পরিবর্তে সুরজিতকে সে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নজরে দেখে। অবহেলিত সুরজিত একসময় নিজের জায়গা বুঝতে পেরে কলেজের অপর একজন বন্ধু জীবনযুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকা সীমাকে বিয়ে করে, যা শুনে মণিকা চরম অপমানিত হয়। কারণ সে চেয়েছিল সুরজিতকে টাকার ও ভালোবাসার লোভ দেখিয়ে চিরকাল তার দাস বানিয়ে রাখতে। গল্পের চরিত্রগুলি ভোগবাদী মানসিকতা বহন করে। গল্পের মূল চরিত্র মণিকা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। স্বামী আনন্দ পেশায় ডাক্তার হওয়ায় স্ত্রীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে কোনোকিছুর অভাব রাখেনি। বড় বাড়ি এয়ার কন্ডিশনিং গাড়ি ঘর সাজানোর জন্য ভ্যান গখের অরিজিনাল পেইন্টিং কিংবা মান্দারিনের ডাকস কিংবা টোকিও থেকে আনা লাফিংবুদ্ধের সঁপিস। অপরদিকে মণিকার বন্ধু সীমার —

> "জীবন মানে তো শুধু লড়াই, লড়াই আর লড়াই।"[১৮]

কলেজ পাশ করতে করতে তার বাবা মারা যায়, দাদার কোনো চাকরি না থাকায় তাকে একটি স্কুলে চাকরিতে ঢুকতে হয়। বাসে যাতায়াত করতে করতেই যার জীবনের অর্ধেক সময় পার হয়ে যায় তার কাছে মণিকার দেওয়া ফেংশুইয়ের পরামর্শ যেন বিলাসিতা মনে হয়। সমাজের নজরে রূপের জোরে মণিকা এগিয়ে গেলেও সীমা যেন ভালো ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপরদিকে — "একটা ওয়ান সাইডেড লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন খুলে সুরজিৎকে তার সেক্রেটারি বানিয়ে..."[১৯] রাখে মণিকা যেটা থেকে তার স্বামী আনন্দ এবং ছেলে পাপাই পৈশাচিক এক আনন্দ অনুভব করে। আধুনিক জীবনযাপনের নানান রং মাখতে গিয়ে মানুষের মধ্যে অন্য একটি মানুষের অনুভূতি খেলনার পাত্রে পরিণত হয়েছে। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তারা সমাজে অগ্রগতি লাভ করলেও মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে তারা আদিম যুগের সমপ্রায়। কিন্তু ঘটনা তখনই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায় যখন তারা জানতে পারে সুরজিত এবং সীমা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত হতে হতে জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা থেকে একে অপরের পাশে থেকে বাকি জীবনটা একসাথে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে কাটানোর ভাবনা থেকে বিবাহিত সম্পর্কে পদার্পণ করে, তা যেন মণিকা মেনে নিতে পারে না। বাহ্যিক দিক থেকে ধনী হলেও তার মনের কদাকার কুশ্রী রূপটি ধরা পড়ে যায়। টাকার ও ভালোবাসার লোভে সারাটা জীবন তার একাকীত্ব ও হিংসার স্রোতে কেটে যায়।

তেমনি **'বান্টি, বাবলি আর সে'** গল্পটি বান্টি ও বাবলির সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়া নিয়ে। গল্পে বাবলি একটি নামকরা সংবাদপত্রের কর্মচারী এবং তার স্বামী বান্টি কম্পিট্রনিক্সের কাজের সঙ্গে যুক্ত। কর্মব্যস্ততার কারণে একে অপরের সাথে তাদের দেখা হওয়া প্রায় দুষ্কর। বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তাদের কাছে মোবাইলই একমাত্র ভরসা।

> "টিভি চ্যানেলের চাকরির ঝক্কি সামলে বাবলি যখন ফ্ল্যাটে সেধোয়, বান্টি তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আর সকালে বাবলির যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়, বান্টি তখন ভাগলবা, পৌঁছে গেছে তার সেক্টর ফাইভের অফিসে। দু'জনে কথা চালাচালি করতে মোবাইলই যা ভরসা। টুকিটাকি সংবাদ এস-এম-এসেও চলে।"[২০]

সপ্তাহান্তের ছুটিটিই একমাত্র তাদের ভরসা। এরকমই একটি দিনে তারা ভবিষ্যতের পিতা-মাতা হওয়ার কথাটি জানতে পারে। কেরিয়ার সর্বস্ব বান্টি বাবলিকে জানায়—

> "ভাবাভাবির তো কিছু নেই। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। অ্যাবর্ট করে ফ্যালো।"[২১]

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 242 - 250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থান ও কাজের সুযোগগুলি বজায় রাখতে গিয়ে সন্তান সামলানোর ‘মেগা ইভেন্টে’ অংশগ্রহণ করতে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বাবলির বান্ধবী গার্গীর কথা অনুযায়ী —

> “ওয়াও! এ তো মহা মহা মহা সুসংবাদ। আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম তোরা ডিংকের মেম্বারশিপ নিয়েছিস।
> - ডিংকটা কী?
> - ডবল ইনকাম নো কিড। আজকাল প্রচুর কাঁপল ওই থিওরিতে চলছে। চার হাতে শুধু কামিয়ে যাও, বাচ্চা কাচ্চা নৈব নৈব চ।”[২২]

জবড়জং ঊনত্রিশ ইঞ্চির টিভি ও এসি বেডরুম থেকে তারা সিদ্ধান্ত নেয় সন্তানটিকে পৃথিবীতে আনার এবং দুজনেই সমান দায়িত্ব বণ্টনের। তারই সঙ্গে অফিসের কাজগুলিকে বাজায় রাখতে একে অপরের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। বর্তমান সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে খরচের হিসেবেও একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

> “এই জন্যেই তো বলছি, এখন থেকেই প্রপার প্ল্যান দরকার। অবিলম্বে ডিসাইড করতে হবে, বাচ্চাকে আগে প্লেহোমে পাঠাব, না সরাসরি নার্সারিতে। ক্লিশে দেব, না আয়ার কাছে।
> - আয়া না পেলে তো ক্রেশে দিতেই হবে গো। কিছু কিছু ক্রেশ আছে, যেগুলো প্লেহোমের মতোই। সেখান থেকেই নার্সারিতে উঠে সোজা স্কুল।
> - উঁহু। স্কুলের ব্যাপার অত সহজে সিদ্ধান্ত নিও না। আগে মনস্থির করো, কী ধরনের স্কুলে আমরা বাচ্চাকে পড়াতে চাই।
> - অবশ্যই কোনও ভালো স্কুলে।
> - ব্যস, ভালো বললেই হয়ে গেল? ভালোরও রকমফের আছে। ট্র্যাডিশনাল বিখ্যাত স্কুলে পড়াবে? নাকি নতুন ধাঁচের যে স্কুলগুলো তৈরি হয়েছে, তারই কোনও একটায় দেবে?
> - ওগুলোতে বিশাল খরচা না গো?”

অর্থাৎ সাধ্যে না কুলালেও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাখতে চায় তারা। এমনকি তাকে এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তার তৈরি করার কল্পনায় নিজেদের মধ্যে বচসার সৃষ্টি করে ফেলে—

> ‘- কেন, তোমাদের কম্পিউটার লাইন…। তার সঙ্গে যদি ম্যানেজমেন্ট করে…
> - ধুস, তদ্দিনে এই সেক্টর তো স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়তো গড়াগড়ি খাবে ফুটপাতে। বান্টি একটু থেমে থেকে বলল, আমার ধারনা, এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হবে ইন থিং।
> - বেশি ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে না? বাবলির চোখ জ্বলজ্বল, তার চেয়ে বরং মেডিকেল পড়ুক। রোগ যদ্দিন আছে, ডাক্তারের মার নেই।
> - বিশ বছর পর ডাক্তার-ফাক্তার আদৌ লাগবে কি? বান্টি তাচ্ছিল্যভরে হাসল,
> - কম্পিউটারে অসুখের সিম্পটম ফেলবে, দাওয়াইয়ের নাম সুড়সুড় বেরিয়ে আসবে।
> - তুমি বড্ড বাজে বকো। ওষুধেই কি সব হয়? সার্জারি নেই।
> - রোবট করবে। নির্দেশ দেবে কম্পিউটার, যন্ত্রমানব ছুরিকাঁচি চালাবে। …সময়টা চিন্তা করো। প্রকৃতির তখন কিন্তু ঘোর বিপন্ন দশা। সুতরাং পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের দর তুঙ্গে উঠবেই।’

বর্তমানে ‘বেস্ট কেরিয়ার’ ও ‘প্রপার এডুকেশনে’র কথা ভাবতে গিয়ে সন্তানকে তার জন্মের আগেই ইঁদুর দৌড়ে সামিল করে দিচ্ছে তাদের বাবা-মায়েরা। বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিকতার বশবর্তী

হয়ে পড়ছে। পুঁজিবাদ ও ভোগবাদী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছোট ছোট শিশুদের ক্রমাগত ইঁদুর দৌড়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলত যান্ত্রিকতার বশবর্তী হয়ে তাদের জীবন থেকে শৈশব হারিয়ে যেতে বসেছে। গল্পকার সুকৌশলে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন তাঁর এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমকালীন সমাজের প্রত্যক্ষদর্শী গল্পকার উক্ত সময়ের অবক্ষয় এবং ইতিবাচক দিকগুলোকে পাঠকের সম্মুখে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর উক্ত গল্পগুলির মাধ্যমে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'নির্বাচিত পঞ্চাশ', সাহিত্যম্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১০
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ২১
৪. তদেব, পৃ. ২৮
৫. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৫
৬. তদেব, পৃ. ২০
৭. তদেব, পৃ. ২১
৮. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'নির্বাচিত পঞ্চাশ', সাহিত্যম্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪৯
৯. তদেব, পৃ. ৫৫
১০. তদেব, পৃ. ৫৩
১১. তদেব, পৃ. ১৬৪
১২. তদেব, পৃ. ১৬৪
১৩. তদেব, পৃ. ১৭৮
১৪. তদেব, পৃ. ১৭৯
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৮৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৮৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৫১
১৯. তদেব, পৃ. ২৫৩
২০. তদেব, পৃ. ৩৫৫
২১. তদেব, পৃ. ৩৫৬
২২. তদেব, পৃ. ৩৫৮

Bibliography:

খান, ইয়াসিন (সম্পা.), 'সমকালীন ভাবনায় নারী', এডুকেশন ফোরাম, ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৫
দাস, শকুন্তলা (সম্পা.), 'নারী প্রগতি নানা ভাবনায়', এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৯

বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), 'প্রসঙ্গ : মানবীবিদ্যা', উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, পঞ্চম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০২১

বসু, রাজশ্রী, 'নারীবাদ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১২

চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), 'নারীপৃথিবী : বহুস্বর', উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, তৃতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২১

চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা ও দাস (বোস), বনানী (সম্পা.), 'বিশ্বায়নের যুগে নতুন আঙ্গিকে ভারতের বিদেশনীতি', মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২৩

চট্টোপাধ্যায়, আবীর, 'বিশ্বায়ন গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০১৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 251 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 251 - 259
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের বাস্তব-দর্শন

মৌলিকা সাজোয়াল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : moulikasajwal92@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Dibyendu Palit, story, realistic, mechanism, urban, megacity, life, darkness, helplessness.

Abstract
Life in a megacity is a constant performance. Crowds fill the streets, yet people are islands, drifting through seas of strangers. The rhythm is restlessness: rushing to work, chasing deadlines, navigating traffic, and returning to space that feel less like homes and more like temporary shelters. Time is currency, and no one seems to have enough of it to pause, connect, or even notice. Faces are full of facades and go through a training of corporate smiles, polite nods, but behind this Facades, the realities are raw and unpolished. Anxiety, loneliness and exhaustion simmer beneath the surface. In the inner world of city life, people are striving, sacrificing and often, quietly breaking. Relationships feel transactional. Conversations skim the surface, seldom delving into the depths of fear, dreams and struggles. Urban life thrives on ambition, but it often starves the soul. People become shadows of themselves, walking a tightrope between dreams and survival, with little room for authenticity in the chaos. City glows with glamour and brightness, but inside those lit windows are countless stories of solitude, nakedness and vulnerability. Dibyendu Palit captures those dark stories of city life without any filter. He presents his characters with their raw core of flesh and blood. These unmasked faces often startle us, sometimes leave us amazed. His stories hold up a mirror to our own faces, forcing us to confront ourselves. Dibyendu Palit essentially speaks of the preparatory phase of present dominance of artificial intelligence, highlighting the confusion and helplessness of people entangled in the intricate mechanisms of machines during this period.

Discussion

“দিব্যেন্দুর সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে একদম বহির্মুখী নয়। খুবই ইন্ট্রোভার্ট। এটা আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া খুবই অনেস্ট। কখনও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে দেখিনি। আর খুব পাংচুয়াল। যাকে যে সময় দেয় তার নড়চড় করে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজটুকু করার চেষ্টা করে।”[১]

নন্দিতা রায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দিব্যেন্দু পালিতের স্ত্রী শ্রীমতি কল্যাণী পালিত তাঁর অন্দরমহলপ্রেমী স্বামী সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি পোষণ করেছেন, দিব্যেন্দু পালিতের গল্প, উপন্যাসের কোণাখামচি পর্যন্ত সেসবের সাক্ষ্য বহন করে। গপ্পের ঘনঘটার বিপুল আয়োজন করে পাঠক মজানো লেখা তিনি লিখতেন না। স্বভাবজ অন্তর্মুখিনতা তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে নিত্তনৈমিত্তিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ, একঘেয়ে ঘটনা প্রবাহকে নিবিড়ভাবে কাটাছেঁড়া করার দিকে। সংসারের কিছু চিরন্তন সত্য, মানুষের অনুভূতি প্রবণতা, মানসিক অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত সুতীব্র দহন এবং শেষপর্যন্ত কখনো প্রবৃত্তির কাছে, কখনো আবেগের কাছে মানুষের করুণ পরাজয়ের গ্লানিরঞ্জিত রক্তাক্ত মনের অলিতে-গলিতে ভ্রমণ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত। সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন —

> “মনে পড়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুদ্ধদেব বসু একবার কোনও এক প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন যে, কল্পনাশক্তি, কাহিনিবয়নের ক্ষমতা, চরিত্র–নির্মাণ ও সংলাপ–রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে যে–কেউ একটু চেষ্টা করলেই লেখক হতে পারেন। তবে ‘সাহিত্যিক’ হতে গেলে দ্রষ্টা হতে হয়। কথাগুলি সেই থেকে আমার মননে গ্রথিত।”[২]

বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত দিব্যেন্দু পালিত কোনোদিনই লেখক হতে চাননি, চেয়েছিলেন ‘সাহিত্যিক’ হতে। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে রয়েছে সেই সুরে ধ্বনিত নিবিড় পর্যবেক্ষণ, মর্মস্থল থেকে তুলে আনা গভীর দর্শন।

১

দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম এই বাংলায় নয়। তিনি ১৯৩৯ এর ৫ই মার্চ রবিবার রাত ১০ টায় বিহারের ভাগলপুরে জন্মেছিলেন। বগলাচরণ পালিত এবং নীহারবালা পালিতের এগারো জন সন্তানের একজন ছিলেন তিনি। ভাগলপুরের দুর্গাচরণ হাই স্কুলে এবং তারপরে স্থানীয় মারোয়াড়ি কলেজ থেকে বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর ১৯৬১ সালে তিনি কলকাতায় এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। খুব অল্প বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। সমগ্র পরিবারসহ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। কল্যাণী দেবী জানিয়েছেন, লেখক ব্যক্তিজীবনেও অত্যন্ত দায়িত্ববান ছিলেন। সাধারণত কবি-সাহিত্যিকদের আমরা সাধারণ মানুষেরা যেমনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত — সংসার বিচ্ছিন্ন, হুজুগে, উড়নচণ্ডী, ভাবালুতায় ভাসমান, নিজের কল্পনার জগতে মজে থাকা শরিক, দিব্যেন্দু পালিত কিন্তু এই সাধারণীকরণের একেবারে বাইরের একজন মানুষ। ছোটো থেকে সংসার সামলানো, বন্ধুত্ব পালন ব্যক্তিজীবনের এই দায়িত্ববোধ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। সংসার সামলানোর জন্য নারী–পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো একজনকে নির্দ্বিধায় সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। দায়িত্ব নেওয়ার যে গল্প প্রতিটা সংসারের পিছনে লুকিয়ে থাকে সেই বহু পরিচিত অথচ অবজ্ঞাভরা গল্পগুলোকে সযত্নে তাঁর বহু গল্প–উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তিনি। যেমন ‘মাছ’ (১৩৬৪) গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই একটি নিতান্ত সাধারণ, সমাজের চোখে গুরুত্বহীন, অবহেলিত একটি মেয়েকে (নিরুপমা)। সে বৃদ্ধ বাবা, শয্যাশায়ী মা, দুটি ছোটো ছোটো ভাই এবং একটি অবিবাহিত বোনের সাংসারিক দায়ভারে ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত। বিষাদময় সকরুণ প্রাণহীনতা এই গল্পের প্রাণ। পেটের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা, যৌন-ক্ষুধা সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারের ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে মেয়েটি কেবলমাত্র দায়িত্ববোধ থেকে। প্রেমের হাতছানি, বিয়ের স্বপ্ন তার জীবনেও এসেছিল দাদার বন্ধু বিজনের হাত ধরে। কিন্তু পরিবারের মুখ চেয়ে সে নিজের স্বপ্নের সলিল সমাধি তৈরি করেছে নিজে হাতে, সুখের রঙিন চশমা খুলে চোখ ঝলসে নিয়েছে সংসারের দাবদাহে। গল্পটি একটি উদবাস্তু পরিবারের গল্প। অর্থাৎ, ৪৭ এর অব্যবহিত পরের তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে গল্পের পিছনে অথচ গল্পের কোথাও খুব সুস্পষ্টভাবে রাজনীতির নাম-গন্ধ নেই। দিব্যেন্দু পালিতের গল্পগুলি অধিকাংশই এরকম রাজনৈতিক ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে লেখা। বহিরাঙ্গিক উত্তপ্ত রাজনৈতিক ঘটনার চেয়ে ঘটনার ফলাফলস্বরূপ রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান পরিবারতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির চর্চা করায় তিনি অনেক বেশি আগ্রহী। তাঁর গল্পে ছড়িয়ে থাকে অন্তঃপুরের রাজনীতি। আর আমাদের দেশের অন্তঃপুর মূলত নারীমনের অন্তঃপুর। ‘মাছ’ গল্পেও প্রধানত

নিরুপমার মনের খবর দেওয়ার সূত্রে পরিবেশিত হয়েছে উদবাস্তু পরিবারগুলির সামাজিক অবস্থান। নিরুপমার মনকে কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে তার এক অদ্ভুত উত্তরণ লেখক দেখিয়েছেন। অন্ধকার জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দু-দণ্ড সময় কাটানোর জন্য অন্ধকার একটি জায়গায় নিশ্চিন্তে বসেছিল নিরুপমা। আকস্মিকভাবে চোখের সামনে তাদের মতো আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন, প্রায় সমমানের সামাজিক অবস্থানবিশিষ্ট একটি পরিবারে এক টুকরো মাছ নিয়ে একটি বাচ্চা ছেলে এবং রাক্ষুসে চেহারার এক বৃদ্ধার মধ্যেকার মারপিট দেখে তার মনের সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়। সে তার প্রেমিক বিজনদার সুখ আর নিরাপত্তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে, এতদিনকার স্বপ্নের মোহ-ভঙ্গ করে লড়াই জারি রাখবার পথকেই বেছে নেয়। অন্ধকারে বসে অন্ধকার থেকে উত্তরণের স্বচ্ছ, দৃঢ় পথ বেছে নেয় নিরুপমা। সে বোঝে বিজন তার একার আশ্রয়স্থল আর সে নিজে পরিবারের আরও পাঁচটি মানুষের আশ্রয়, ভরসাস্থল। তাই তাকে হতে হবে শক্ত, দায়িত্ববান। সে নিজের সমস্ত বেদনাকে পাথরের মতো বুকে জমিয়ে মাকে জানায়, -

“তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মা। আমার বিয়ে দিও না। আমি বিয়ে করতে পারব না।”[৩]

দায়িত্ববোধ— চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির বশেই খুব সম্ভবত দিব্যেন্দু পালিত শুধু লেখালিখিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেননি। আপসহীন সততার কারণে বৈবাহিক জীবনের শুরুতেই চাকরি ছেড়েছেন বটে, কিন্তু আবার নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। একদম শুরুর দিকে তিনি জ্বালানি ব্যবহারের সমীক্ষাকর্মী থেকে শুরু করে অডিট ফার্মের দিনমজুরের অ্যাসিস্ট্যান্টগিরির পদ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। অবশেষে, ১৯৬১ সালে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের* সাব–এডিটর হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানে অপছন্দের কিছু একটা ঘটায় দুম্ করে চাকরি ছেড়ে দেন। তবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকার দরুন কিছুদিন পরই প্রথমে অ্যাডার্টস্ অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে *ক্ল্যারিয়ন–ম্যাকান, আনন্দবাজার* এবং *দ্য স্টেটস্‌ম্যান* সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কিছুদিন *যুগান্তর* এবং *অমৃতবাজার পত্রিকার* সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৮৭ সালে ফের *আনন্দবাজার পত্রিকায়* সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। তিনি মূলত *রবিবাসরীয়* এবং সংস্কৃতি বিভাগের দিকটি সম্পাদনা করতেন। এরপর ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে অবসর নেন। পরবর্তী উনিশ বছর লেখক হিসেবে জীবন কাটানোর পর ২০১৯ এর ৩রা জানুয়ারি মারা যান।

২

নিতান্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতাবলে কোলকাতায় এসে অত্যন্ত ক্ষমতাবান, খ্যাতিমান একজন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অথচ তাঁর স্ত্রী এবং সতীর্থেরা বারবার তাঁর সততা ও চারিত্রিক সংযমের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গল্প–উপন্যাসগুলিও এমনই দৃঢ়, ঋজু, আঁটোসাটো, পরিমিতির নামান্তর। উপন্যাসগুলি খুব বেশি হলে বারো ফর্মার আর গল্পগুলিও পাঁচ–দশ পাতার বেশি পথ পেরোয় না। বাড়তি শব্দ, আবেগের উচ্ছ্বাস দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে রামগুড়ুরের ছানার মতোই সংযত। অথচ গল্পে সমাজ, পারিবারিক কাঠামো, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, বিশেষত প্রেম বা দাম্পত্য সম্পর্ক, ব্যক্তি মানুষের খুঁটিনাটিকে তিনি মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে চিরে চিরে বিচার–বিশ্লেষণ করেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের গল্প পাঠের অভিজ্ঞতাকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ই (১৯৩৩—২০০৫) যথার্থ আখ্যায় ভূষিত করেছেন—‘দি অ্যানাটমি ক্লাস অফ্ ডক্টর দিব্যেন্দু পালিত’। তাই হয়তো তাঁর গল্পের গতি কিছুটা বা শ্লথ। তাতে মানসিক দ্বন্দ্বজনিত টেনশন, সম্পর্কের টানাপোড়েন এলেও ঘটনাবহুল উত্তেজনা বা চোর–পুলিশ ধরার উৎকণ্ঠা প্রায় নেই বললেই চলে। *অন্তর্ধান* (১৯৮৯) উপন্যাসটি এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী, তবু সেখানেও ঘটনার তুলনায় মানসিক টেনশন, সম্পর্কের টানাপোড়েনের দিকে লেখকের পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল। দিব্যেন্দু পালিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯৩৫) তাঁর লেখা সম্পর্কে ‘ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন’-এর মতো করে মাপা, বিপুল সংযম নিয়ে শব্দ ব্যবহারের কথা বলছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিককে চিহ্নিত করছেন। তিনি বলছেন —

> “ওকে আমি একটা আত্মজীবনীমূলক লেখা লিখবার জন্য বলেছিলাম। ও যখন ভাগলপুরে ছিল, খুব কালারফুল জীবন ছিল ওর। বহুরকমের মজার ঘটনা, মজার চরিত্র ও দেখেছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 251 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> কখনও লেখেনি। লেখকদের কতগুলো পছন্দের ব্যাপার আছে। যে কি নিয়ে লিখব। কাদের নিয়ে লিখব আর কাদের নিয়ে কখনই লেখে না। কিন্তু ওর কাছে যখন ওর ছেলেবেলার ঘটনাগুলো শুনি, খুব মজা লাগে, খুব উপভোগ করি। ভাগলপুরের যে স্মৃতি ওর আছে তা নিয়ে বেশ বড়সড় একটা ভাল উপন্যাস তৈরি হতে পারে। কিন্তু দিব্যেন্দু ওর লেখায় কখনও সেইসব স্মৃতির ছায়া পড়তে দেয়নি। ওর ভেতরে একটা অদ্ভুত একক নাগরিকত্ব আছে।”[৪]

দিব্যেন্দু পালিত অধিকাংশ সময়ই কলকাতাকে বেছে নিয়েছেন তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে। বহু নদ–নদী এসে যেমন মহাসাগরের বুকে মিলিয়ে যায়, তেমনি কোলকাতা এমন এক বিচিত্র শহর যা পুষ্ট হয়েছে বাংলার সব আচার–বিচার, সংস্কার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, গ্রামীণ সংস্কৃতি, আদর্শ শিল্পকলা, রুচিবোধ এবং মানবিকতাকে শুষে নিয়ে। ঐতিহাসিক লুই মামফোর্ড (১৮৯৫—১৯৯০) মহানগর সম্পর্কে বলেছিলেন —

> “This metropolitan world, then is a world where flesh and blood is less real than paper and ink and celluloid. It is a world where the great masses of people, unable to have direct contact with more satisfying means of living, take life vicariously, as readers, spectators, passive observers: a world where people watch shadow–heroes and heroines in order to forget their own clumsiness or coldness in love…They become victims of phantasms, fears, obsessions, which blind them to ancestral patterns of behavior.”[৫]

মহানগরের এই কুৎসিত দিকগুলির সমালোচনা করে দিব্যেন্দু পালিত যেন একপ্রকার কলকাতাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে কড়া মাস্টারমশাইয়ের মতো শাসন করে গেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। যেমন ধরা যাক ‘সিগারেট’ (১৩৭৯) গল্পে আমরা দেখতে পাব একজন মধ্যবিত্তকে যার দামি সিগারেট ছাড়া দিন চলে না। সিগারেট তার কাছে এক বিকৃত ‘obsession’। মধ্যবিত্তের মতো বাসে ট্রামে চড়ে দিন কাটালেও রাজা–রাজড়ার মতো করে মৌজ নিয়ে সে যখন দামি ধোঁয়া টানে তখন সে উচ্চবিত্তের ভূমিকায় অভিনয় করে কিছুক্ষণের জন্য পরম তৃপ্তির আবেশে মজে ওঠে। এই লোকটিই একদিন সিগারেটের বসন্ত হাওয়া শুষতে শুষতে বাস ধরতে গিয়ে একজন ‘কুলি–চেহারার লোকের’ সঙ্গে ধাক্কা খায়। সিগারেটের ফুলকিতে তার টেরিলিনের দামি শার্ট বুকের কাছে সিকি ইঞ্চি পুড়ে গেছে দেখে বেদম তর্জন–গর্জন করতে যায় লোকটির ওপর, কিন্তু দেখে তার ছাইসুদ্ধ জ্বলন্ত সিগারেটটি রাজকীয় মেজাজে লোকটির চোখের নীচের চামড়ায় চেপে বসে আছে। অথচ সমগ্র ঘটনার নিরিখে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে নিম্নবিত্ত লোকটি। সিগারেট টেনে উচ্চবিত্ত হওয়ার ক্ষণিক সম্মোহনের জালকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দেয় এই দৃশ্য। বিত্তগত অবস্থানজনিত অসম্মান, মেকিপনার মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত একজন নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর প্রতি একজন মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীর নিদারুণ আচরণের ছবি তুলে ধরে।

৩

দিব্যেন্দু পালিত কোনোদিন খুব বিখ্যাত হওয়ার জন্য লেখেননি। যেমনটি তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি কোনোদিনই বহির্মুখী ছিলেন না। তাই হয়তো তাঁর রোমাঞ্চকর আত্মজীবনীর কিয়দংশেরও সদ্ব্যবহার করেননি তাঁর রচনায়। *আনন্দবাজার*-সহ কত নামিদামি পত্রিকার ক্ষমতাবান এডিটর ছিলেন তিনি। চাইলেই জনপ্রিয়তার পথ বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বিনম্র একরোখা মন লোকরঞ্জনের মোহমুক্ত গভীর জীবন দর্শন খুঁজে ফেরার পথেই অগ্রসর হয়েছে। তাঁর এই নির্লোভ দার্শনিকতা প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন —

> “জনপ্রিয় হব, লেখাটা বিক্রি হবে এরকম কোনও অ্যাটিটিউড ওর মধ্যে নেই। আমি ওকে বলে বলেও এই মনোভাব পাল্টাতে পারিনি। ও যা লিখবে তা লিখবেই...জনচিত্তমুখী হবেই এরকম লেখা যে লিখতে পারে না তা তো নয়, পারে, কিন্তু কিছুতেই লিখবে না। যখন আমরা আড্ডা দিই, বৈঠকী মেজাজে গল্প – সল্প করি তখন ওর বহুল কর্মব্যস্ত জীবনের নানা কথা শুনি...কতোবার ওকে বলেছি এগুলো লিখিস

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 251 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> না কেন। এসব অমূল্য জিনিস তো পরে হারিয়ে যাবে। কিন্তু ওকে দিয়ে লেখাতে পারিনি। হয়তো মনে করে যে সেগুলো ওর চরিত্র বহন করবে না...এইসব সতর্কতা ওর আছে। আর আছে খুঁতখুঁতুনি। লিখে যেন সন্তুষ্ট হতে পারে না। নিজের লেখার মধ্যেই নানারকম অসম্পূর্ণতা আবিষ্কারের চেষ্টা করে। আর একটা কথা আমরা যেমন নানারকম ধরণের লেখা লিখি, খানিকটা অসতর্ক লেখাও লিখে ফেলি, দিব্যেন্দু সেটা করে না...যেমন ফিচার ও লেখে না, সায়েন্স ফিক্শন নিয়ে ভালো লিখতে পারতো, কিন্তু সেখানে ঢোকেনি...আমরা হয়তো দশবার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারি, কিন্তু ওর সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না। একবার লিখবো না ঠিক করলে ওকে দিয়ে লেখানো মুশকিল। ওর দৃঢ় মানসিকতার এটা একটা দিক।”[৬]

গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত ব্যক্তি জীবনে যেমন সৎ, দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই ছিলেন তাঁর লেখার প্রতি। তাঁর গল্পগুলিও প্রায় একগামী, যার একমাত্র কাজ শহুরে মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, মানবিকতা, সততার পাশাপাশি দ্বিচারিতার কুৎসিততম দিকগুলি আয়নার মতো করে আমাদের সামনে তুলে ধরা। তিনি লেখেন মূলত শহরবাসী বা মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত পাঠকদের জন্য। তাদের জন্যই তাঁর একগামী নিরলস সাধনা। তাঁর পরিচিত জগতের ক্ষেত্র যতই বড়ো হোক না কেন তিনি শহরের পরিধির বাইরে যাবেন না, গেলেও বড়োজোর মফঃস্বল বা রহস্যময় নামহীন, ভৌগোলিক অস্তিত্ববিহীন কোনো জায়গা। এই প্রসঙ্গে দুটি গল্পের কথা বলা যায়, ‘নিয়ম’ এবং ‘অন্ধকার পেরিয়ে’। প্রথমটি রসুলগঞ্জ এবং দ্বিতীয়টি বেগমগঞ্জ নামের কোনো এক রহস্যময় জগতের কাহিনি। সেসব জায়গার রোজকার ছায়াছবি অনেকটা এই রকম –

> “...এক রহস্যময় অন্ধকার ক্রমশ বিস্তৃত ও ঘন হচ্ছে চারিদিকে। হয়তো রোজই হয়, এইভাবে।
> এত অন্ধকার জীবনে কখনো দেখিনি।”[৭]

এই অন্ধকার কুহকের বিবর জুড়ে বাস করে দুর্বোধ্যতা এবং অনিশ্চয়তা। অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতির মধ্যেকার এই অন্ধকারে আমাদের গল্পকার কিন্তু মুক্তির আস্বাদ পাননি, পেয়েছেন ‘প্রেতলোকের জঘন্য সংকেত’। ‘নিয়ম’ গল্পে আবার তিনি দেখিয়েছেন শহর কীভাবে গ্রামের নিষ্পাপ সারল্যকে নির্লজ্জের মতো গ্রাস করছে।

৪

মধ্যবিত্তদের জন্য অনেকেই লেখেন কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের লেখার হাত কোথাও যেন আলাদা। তাঁর পরিমিতিবোধ বিজ্ঞানধর্মী, যা সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল। নগরবাসীর জন্য লেখা গল্পগুলি কিন্তু নগরস্তুতি নয়। নগরের বৈভব, প্রলোভন, চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ, মিথ্যার বেশাতির প্রতি তীক্ষ্ণ সমালোচনা, ধিক্কার তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। নগরায়ণের ফাঁদে পড়া মানুষগুলোর আর্ত চিৎকার, মুখ ব্যাদন, সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, অমানবিকতা, সর্বোপরি অনন্ত একাকিত্ব নির্মাণ করে তাঁর গল্পের মেরুদণ্ড। ‘মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ’ (১৩৭৪) গল্পের কথক মধ্যবিত্ত ভীরুতা, নীতি-নৈতিকতা, লোক-লৌকিকতা, অসাড় দাম্পত্য জীবন, মানসম্মানের সামাজিক বন্ধনে জড়িয়ে কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করছে, কিন্তু ক্রমাগত বাইরের লোকেদের, কখনো কখনো নিজেকেও ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি জীবন চূড়ান্ত অসুখে ভুগে ক্লান্ত হয়ে গেলেও আমরা মেক-আপের বহিরাবরণ দিয়ে নিজেকে যেভাবে সর্বজনসমক্ষে পেশ করি, তার দুর্দান্ত একটি উদাহরণ এই গল্পটি। আলোচনার স্বপক্ষে গল্পের কথকের কিছু স্বগতোক্তি তুলে ধরলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় –

> “ঘরে যেমনই থাকি না কেন, বাইরে আমি খুব সুখী।”[৮]

প্রতিনিয়ত বাইরের লোকেদের বোকা বানানোর পাশাপাশি, নিজের মনকে শান্ত করে রাখার জন্য কথক নিজেকেও ভুল বোঝায়, মিথ্যে আশ্বাস দেয় –

> “আমার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা নিঃশ্বাস হইচই করে উঠল। ব্যাপারটা ভাল লাগল না। তখন চোখ বন্ধ করে, গতি আগলে, অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় আমি ভাবলুম আমিই নায়ক, আমার দুঃখটা বড়ই আধুনিক, আজকের যে-কোনো লেখক আমাকে নিয়ে দৈনিক, সাপ্তাহিকে গল্প লিখতে পারে।”[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 251 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' গল্পের কথক মুন্নির লাট্টুদা, যার বাইরের চাকচিক্য রয়েছে, বহু মানুষের তোষণ রয়েছে, কিন্তু অন্তরে প্রবল অশান্তি। স্ত্রীর সঙ্গে মন-কষাকষি তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। মধ্যবিত্ত ভীরুতা, নৈতিকতার বোধ তাকে সংসারে বেঁধে রাখে। স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যেস তাকে বহুতল অফিসের ঠান্ডা ঘরে কারারুদ্ধ করে রাখে। এই কারাবাসের মাঝেই মেকি আবরণহীন কিশোরী মুন্নির সতেজতা, অকৃত্রিম সান্নিধ্য তাকে বন্ধন-মুক্তির জন্য হাতছানি দেয়। মুন্নি যেন তার কাছে সমাজ-বহির্ভূত এক বেনামি নির্জন দ্বীপ, যেখানে প্রকৃতির বুক ভরা শীতল বাতাস আছে, অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্মানের গরাদবিহীন মুক্তির আস্বাদ আছে। কিন্তু এরা কেউই সমাজের দায় থেকে আর কোনোদিন মুক্ত হবে না কারণ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্যের অভ্যেসের মধ্যে প্রবেশ করার পথ আছে, তবে মৃত্যু ব্যতিরেকে এই অভ্যেস থেকে বেরোনোর আর কোনও পথ নেই। তাই সবশেষে গল্পের কথক (মুন্নির লাট্টুদা) বলে –

> "জানি, আজকের এই দেখা হওয়াটাও মিথ্যে। তোর সরল, নিষ্পাপ জগৎ থেকে আমি যে অনেক দূরে পড়ে আছি, মুন্নি!"[১০]

মুন্নি যেন যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির প্রতীক। কথক জানে স্বাচ্ছন্দ্য এবং অভ্যাসের এই যান্ত্রিক পরিসর থেকে তার মুক্তি নেই। সারল্যের সবুজ আভা তাকে এই বদ্ধতার মাঝে তাৎক্ষণিক শীতল বাতাসের আরাম দিতে পারে, কিন্তু চির-মুক্ত করতে পারে না। সামাজিক অবস্থান এবং দায়বদ্ধতার মাঝে তাকে মানসিক শূন্যতা নিয়ে এভাবেই চিরকাল গুমরে মরতে হবে। মাপা লেখনীর অসামান্য দক্ষতার পরিচয়বাহী প্রতিটি সংলাপ আমাদের মর্মমূলে এসে আঘাত করে। মুন্নির তরতাজা সারল্যের সুবাস, নব যৌবনের স্নিগ্ধতা, ছোটো ছোটো হ্যাংলামি, সহজতা লাট্টুদার মিথ্যের কঠিন আবরণকে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও –

> "মুন্নি আমার ঠিক সেই ব্যাথার জায়গাটায় ঘা দিল। ...মুন্নি জানে না এই মুহূর্তে আমি কী ভীষণ অসহায়, আমি যা বলছি সবই বানিয়ে বলছি। বলছি জোর করে। আমার কোনো কথাই কথা নয়।"[১১]

এই সামাজিক উপস্থিতির কোনো সারবত্তা নেই, কোনো ভিত্তিভূমি নেই, আছে শুধু মিথ্যার আস্ফালন, দেখনদারির নিষ্ফল প্রয়াস।

৫

ভূমেন্দ্র গুহ (১৯৩৩–২০১৫) দিব্যেন্দু পালিত সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন –

> "দিব্যেন্দু নিজেকে নিয়ে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকত: কোনও গূঢ় ব্যক্তিগত কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবাদেও আমার কাছে কখনও ভেঙেছে ব'লে আমার মনে পড়ে না।"[১২]

আমাদের সংযমী মিতভাষী গল্পকার মুখে গূঢ় ব্যক্তিগত সত্যগুলি না বললেও একটু খেয়াল করে তাঁর লেখা পড়লেই বুঝতে পারা যায়, কী অমোঘ সত্যের ভাণ্ডার সেগুলি। সেইসব গূঢ় সত্যের মুখোমুখি হলে আমাদের চমকে যেতে হয়, স্বরূপ দর্শন করে আঁতকে উঠতে হয়, লজ্জায়, হতাশায় চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে ওঠে। 'তিনকড়ির মা ও বোন' (১৩৭৪) গল্পটি এই প্রসঙ্গে একটি জোরালো উদাহরণ হতে পারে। এই গল্পে তিনকড়ির মা হলেন দুবেলা গীতা পাঠ করা, ধার্মিক প্রকৃতির, ইংরেজি জানা শিক্ষিত সংস্কৃতের মাস্টারের স্ত্রী তৃপ্তিবালা। বিশ বছর সংসার করার পর তার কর্তা যখন মারা যায়, তার পরপরই মান-অপমানের টনটনে বোধ যুক্ত তৃপ্তিবালা হয়ে যায় তিনুর মা। অর্থাৎ, এদ্দিন সে একজনের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিল, এখন তার দ্বিতীয় ধাপের পরিচয় শুরু হয় ছেলে তিনকড়ি ওরফে তিনুর মা হিসেবে। তার একটি মেয়েও আছে, নাম সুধা। কিন্তু সে যত না সুধার মা, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনুর মা। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিশ্চিত করে স্বামীর পর সংসারের পরবর্তী কর্তা তার ছেলে তিনকড়ি, মেয়ে সুধা নয়। তিনকড়ি বেকার, সংসারে টাকাকড়ি যা আসে সবটাই সুধা মারফত। তবু সুধা যেহেতু মেয়ে, তাই সমাজ-নির্ধারিত নিয়মে একদিন সে পরের বাড়ি চলে যাবে। তখন অল্পবিস্তর যাই রোজগার করুক, সেই ছেলের রোজগারের ওপরই তৃপ্তিবালাকে নির্ভর করতে হবে। সংসারের এই ক্লেদাক্ত একচোখোমিকে

সে অস্বীকার করতে পারেনি। বরঞ্চ এই স্বার্থপরতাকে মেনে নিয়েই সে মেয়েকে ধমক-ধামক দিয়ে, রাত–দিন গালমন্দ করে একজন যথপোযুক্ত ছেলেধরা বানানোর চেষ্টা করে যায় আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছেলেকে খাতির যত্ন করে। স্বামী মারা যাওয়ায় তাদের সুনিশ্চিত রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে। তারপর থেকে প্রখর অপমানবোধসম্পন্ন তৃপ্তিবালা নিজের মেয়েকে লুকিয়ে–চুরিয়ে বাড়িওয়ালার ছেলের ঘরে পাঠানোর মতো অবমাননাকর কাজ করতেও পিছপা হয়নি। তেইশ বছরের যে মেয়েকে পণ্য বানিয়ে সংসার নির্বাহ করে তৃপ্তিবালা, সংসারে সেই মেয়ের অবস্থান কিন্তু সবচেয়ে নিচু থাকে। মধ্যবিত্তের এই দ্বিচারিতা, চাদরের আড়ালে কুৎসিত লোভ–লালসা, পঙ্কিল জীবনযাত্রা, অভাব অনটন থেকে মুক্তির পথ হিসেবে হীনতা, ক্লিন্নতার পথ বেছে নেওয়ার নিদারুণ বাস্তবতার ছবি এই গল্পে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত। মেয়েদেরকে তিনি বরাবরই তাঁর লেখায় নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সরাসরি তিনি জানিয়েছেন, নারী-মন জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতার কারণে তাঁর কাছে খানিক বেশি গুরুত্ব পায়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সেই গুরুত্ববাহী। এই গল্পেও আমরা আমাদের সমাজের সেই সব গৃহবধূদের একজনকে পাই (তৃপ্তিবালা) যারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাবিকাঠি, যাদের কাজে লাগিয়ে সমাজ তার নিয়ামক শক্তি জারি করে, যারা মেয়ে হয়ে মেয়েদের শত্রুর ভূমিকা পালন করে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০-২০১৫) *দহন* (২০০১) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মেয়েদের শারীরিক শুচিতা সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তব্য রয়েছে —

> "—আমাদের মধ্যবিত্তদের এই দোষ। আগেই মেয়েটার সম্মান, শরীর এসব নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিই। আরে বাবা, ছেলেরা নিজেদের দরকারে মেয়েদের শরীরের সম্মান বাড়ায়। নিজেদের দরকারেই আবার তাকে বিবস্ত্র করতে ছাড়ে না। — আমরা ছেলেরা চাই বলে মূল্য (শারীরিক শুচিতার) আছে। আমরা না চাইলেই নেই। চেস্টিটিটা কী জানেন ম্যাডাম? আমার যে ছেলেটা জন্মাচ্ছে সেটা যে আমারই, মানে আমিই যে তার বাবা, সেটা নিশ্চিত করে রাখার একটা অস্ত্র। ও অস্ত্রটা আমরাই চালাই। আমি যে সম্পত্তি বানাব, টাকা জমাব, সেটা একটা কোকিলের ছানা এসে ভোগ করবে এতো হতে পারে না! ...নিজের কাছে সৎ থাকাই সতীত্ব। সে ছেলেদের ক্ষেত্রেই হোক বা মেয়েদের ক্ষেত্রে।"[১৩]

এই কথাগুলিকে মাথায় রেখেই দিব্যেন্দু পালিতের 'ধর্ষণের পরে' (১৪০৫) গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা যায়। ছত্রিশ বছর বয়সি জয়িতা এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে। সে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা রঙ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবতী। তার স্বামী, বছর চুয়াল্লিশের শোভন সওদাগরি অফিসে একটি মাঝারি মাপের চাকুরিরত কর্মচারী। তাকে সবাই 'বিবেকবান' পুরুষ হিসেবেই চেনে। সৎভাবে সমাজ-সেবা করার জন্য সে পার্টির লোকাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত, তবে সে রাজনৈতিক কেরিয়ার নিয়ে কোনও উচ্চাশা পোষণ করে না। একটি দশ বছরের ছেলে ও একটি সাত বছরের মেয়ের মা–বাবা তারা। একদিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে আকস্মিকভাবে তাদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। কিছু দুষ্কৃতকারীর দল শোভনকে আহত করে এবং জয়িতাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। শোভন পুলিশে রিপোর্ট করে। ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার তিনদিন পর সকালে সোনারপুরের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে জয়িতাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে গ্রেফতার হওয়া দুজন দুষ্কৃতী ছাড়াও আরও দুজন তাকে ধর্ষণ করে। এই নৃশংস ধর্ষণের ঘটনার পর কী কী ঘটে, সমাজ জয়িতাকে কীভাবে ফিরিয়ে নেয়, আদৌ ফিরিয়ে নিতে পারে কিনা, জয়িতার শ্বশুর–শাশুড়ি, স্বামী, সন্তানেরা জয়িতাকে নিয়ে স্বাভাবিক হতে পারে কিনা, গণ-ধর্ষণের পর সমাজ তাকে কীভাবে গ্রহণ করে, আদৌ করে কিনা সেটা নিয়েই গল্প। বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং বস্তুবাদী, ভীতু, অসহায়, স্বার্থপর সমাজ যাকে জায়গা দিতে পারে না তাকে সমাজ-সম্ভূত বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান জায়গা দেবে কী করে! জয়িতার শ্বশুর–শাশুড়ি চিত্তরঞ্জন এবং রেবা অন্তঃকরণ থেকে কামনা করে গেছেন 'পাঁচ পুরুষের এঁঠো' জয়িতা যেন আর তাদের সংসারে না ফেরে, সে যেন অত্যাচারের দরুন মারা যায় বা লজ্জায় গলায় দড়ি দেয়। অসুস্থতার কারণে বা অন্য যেকোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা আত্মীয়-পরিজনদের দুঃখিত করে, সত্যকারের না হোক দেখানো সহানুভূতির আবেগে আপ্লুত করে। কিন্তু ধর্ষণজনিত দুর্ঘটনা আত্মীয়, পাড়াপড়শি, গোটা সমাজের কাছে একটা বিশ্রী কৌতূহলের সঞ্চার করে। জয়িতার পরিবার একজন ধর্ষিতার পরিবর্তে লক্ষজনের সমাজকেই বেছে নেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 251 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'বিবেকবান' শোভন প্রাথমিকভাবে জয়িতার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সে নিজের ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক শিকড়কে উপড়ে ফেলতে পারেনি। সেও শারীরিক শুচিতা-পবিত্রতার অশুচি ধারণাগুলির দ্বারা গ্রস্ত হয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে কলুষিত করে ফেলে। শোভনের সর্বজনবিদিত সততা-নৈতিকতা তার নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ করেনি। শোভন-জয়িতার দাম্পত্যে বিচ্ছিন্নতার সূচনা কেবল এই দুর্ঘটনাটির কারণে নয়। পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর, অনৈতিক, অশোভনীয়, একপেশে ধ্যান-ধারণাগুলির কাছে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে শোভন। তার সৎ এবং বিবেকবান হয়ে ওঠার সচেতন প্রয়াসকে গ্রাস করে ফেলে সামাজিক বিশ্বাসের আগ্রাসন —

> "গা তারও গুলোচ্ছে, আজ নয়, আগে থেকেই। কিন্তু, সে জয়িতার স্বামী —এ সব কথা ওইভাবে বলতে পারে না। রেবার কথাগুলোর মানে বুঝে তখন একটি কথাই ভেবেছিল শোভন, জয়িতাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে! নিজের জন্যে? ছেলেমেয়েদের জন্যে? না কি নিজের সম্পর্কে তার যা ধারণা সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে? এর একটাও কিংবা সব কারণগুলোই যদি সত্যি হয়, তাহলে কাল রাতে আলমারি খুলে জয়িতার কাপড়-জামা বের করতে করতে কেন সে ভেবেছিল, যারা ওকে ধর্ষণ করেছিল তাদের কারও যে এডস বা আরও কোনও সংক্রামক যৌনরোগ নেই তা সে জানছে কী করে! নিজেকে বাঁচানোর জন্যে কাল থেকে কি সে আলাদা বিছানায় শোবে? কিংবা, যে-জয়িতাকে সে ভালবাসত বলে জানত—অপহৃত হবার পরে এবং গণধর্ষণের খবর পাবার আগে যার জন্যে সে কেঁদেছিল— এখন আর তার জন্যে কোনও টান অনুভব করছে না কেন?
>
> প্রশ্নগুলো নিজেকেই। কিন্তু, উত্তর ধরা দিচ্ছে না এখনও। বরং কেমন যেন হাত-পা ছাড়া লাগছে। কিছুটা অসহ্যও। এমনও মনে হচ্ছে, জীবিতের চেয়ে সে যদি মৃত জয়িতাকে আনতে যেত, সেটা অনেক বেশি সহনীয় হত।"[১৪]

সমাজের কাছে জয়িতারা নির্যাতিত বা অত্যাচারিত নয়, তারা শুধুই 'নষ্ট', 'বহুভুক্ত', কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানুষ হিসেবে নয়, বস্তুসামগ্রী হিসেবে দেখে। *দহন* উপন্যাসে এই রকমই এক দম্পতিকে দেখতে পাওয়া যায়। রমিতা আর পলাশ, তারা সদ্য বিবাহিত। ফুরফুরে মেজাজে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে রমিতাকে এক দল ছেলে আক্রমণ করে। পলাশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে রমিতাকে তারা গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল সেই সময় শ্রবণা সরকার নামক একজন অত্যন্ত সাহসী মেয়ে শুধুমাত্র ব্যাগ দিয়ে দুষ্কৃতীদের নাস্তানাবুদ করে। রমিতার শ্লীলতাহানি হয় বটে তবে সে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। তা সত্ত্বেও তার জীবন আর কোনোদিন স্বাভাবিক হয়নি। 'ধর্ষণের পরে' গল্পে জয়িতার শ্বশুর-শাশুড়ি যেমন শোভনের থানা-পুলিশ করা নিয়ে প্রবল আপত্তি করেছিল, ঠিক তেমনি শ্রবণা কেন রমিতাকে নিয়ে পুলিশে গেল, কেন রমিতা নিজের ছেঁড়া ব্লাউজ ছেড়ে থানার বড়ো বাবুর মেয়ের ব্লাউজ গায়ে চড়াল, তা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনেদের আপত্তির অবধি ছিল না। থানা-পুলিশ মানেই কোর্ট-কাছারি, লোক-জানাজানি আর তাতেই নাকি তাদের শ্বশুরবাড়ির দীর্ঘদিন ধরে লালিত বনেদিয়ানা, মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, দুষ্কৃতীদের শাস্তি পাওয়া নিয়ে সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধিদের কোনও মাথাব্যথা নেই, সমাজের আপত্তি এরকম কদর্য ঘটনা চাউর হওয়া নিয়ে। এক্ষেত্রে সমাজ নির্মমভাবে নির্যাতিত মেয়েটিকে সমাজ-দেহ থেকে বিয়োগ করবে কিন্তু সমাজের অভিভাবক পুরুষদের আঁচলের তলায় নিরাপদ আশ্রয় দেবে। ২০১৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর 'পিঙ্ক' নামের একটি হিন্দি ছবি মুক্তি পায়। তাতেও দেখানো হয়েছে মেয়েটির পোশাক, তার কুমারীত্ব আদৌ বহাল আছে কি নেই, সে মাদকাসক্ত ছিল কিনা, তা নিয়ে সমাজ যতখানি চিন্তিত, সেই তুলনায় দুষ্কৃতীদের দুষ্কর্ম নিয়ে মোটেই ভাবিত নয়। সিনেমায় অবশ্য শেষপর্যন্ত মেয়েটি সুবিচার পায় কিন্তু আলোচ্য গল্পে জয়িতা সুবিচার পেয়েছিল কিনা তা জানতে পারা যায় না। তবে এটুকু বোঝা যায়, পুরুষশাসিত সমাজ জয়িতাদের জীবিত অবস্থায় আগের মতো করে কোনোমতেই ফিরিয়ে নেবে না। শারীরিক ধর্ষণের ঘটনার পর সমাজ তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না, ক্রমাগত মানসিকভাবে ধর্ষণ করে যাবে। ধর্ষিতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় মরে গিয়ে বেঁচে যায় অথবা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ক্রমাগত মানসিক নির্যাতন করে তিলে তিলে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

গল্প মানে শুধুই বানানো কিছু গাঁজাখুরি মনোরঞ্জক নয়, গল্প হতে পারে জীবনের অমোঘ সত্য দর্শনের, নিজেদের স্বরূপ দর্শনের নিখুঁত কাহিনি। সেই ভাবনার দায়ভার বহন করেন গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত। কলকাতার নাগরিক হিসেবে তিনি এই নগরের এবং নাগরিকদের অখণ্ড জীবনসত্যকে সাহিত্যে পেশ করেছেন।

Reference:

১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি–মার্চ ২০০৩, 'কল্যাণী পালিত-এর সাক্ষাৎকার', সাক্ষাৎকার গ্রহণ : নন্দিতা রায়, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ৬৯-৭০

২. দত্ত, হর্ষ (সম্পা.), *বইয়ের দেশ,* জানুয়ারি–মার্চ ২০১৬, 'দিব্যেন্দু পালিত', সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়, এবিপি প্রা: লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১২১–১২২

৩. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১),* 'মাছ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৪৭

৪. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি – মার্চ ২০০৩, 'আপোসহীন লেখক : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়', গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৬

৫. Mumford, Lewis. *The Culture of Cities*. A Harvest/HBJ Book. Harcourt Brace Jovanovich. Orlando. Florida 32887. Copyright 1938 by Harcourt Brace Jovanovich. Inc. Copyright renewed 1966 by Lewis Mumford. P. 258

৬. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি–মার্চ ২০০৩, 'আপোসহীন লেখক : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৬ – ১৭

৭. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১),* 'অন্ধকার পেরিয়ে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৩৩

৮. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১),* 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১৮২

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

১০. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১),* 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১৮৭

১১. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১),* 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১৮৬

১২. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি–মার্চ ২০০৩, 'দিব্যেন্দু: ভূমেন্দ্র গুহ', গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ৩৭

১৩. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *দহন,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ৬৬

১৪. পালিত, দিব্যেন্দু, 'ধর্ষণের পরে', *গল্পসমগ্র (২),* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৫৩০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 260 - 269
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আবুল ফজলের ছোটগল্প : সমাজচিত্র

অধ্যাপক ড. মোমেনুর রসুল
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID : momenurrasul3@du.ac.bd

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Conflict, Poverty, Society, Crisis, Despair, Reality.

Abstract
Literature speaks of society, it speaks of people. Because a writer is the most emotional person in the society. Therefore, any special emotion, crisis, conflict in the life of the society, country, people makes the writer think. Abul Fazal, one of the great 20th century factionalists. He believed that only a writer could be able to express truth in society through his writings. Abul Fazal as a writer has explored various aspects of modern life reality in his short stories such as various crises of society, poverty, mental turmoil, fluctuations of hope and despair. In his short stories, the author depicts the reality of the obstacles that the subtle events of the society create in the way of individual life. On the other hand, short stories are the special medium of expression in literature where fragmentary images of social life are presented in terms of reality. Abul Fazal is a unique genius in drawing this picture.

Discussion

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পূর্বেই অবিভক্ত বাংলায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এর ফলে বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংঘ গঠনের ধারাবাহিকতায় সাহিত্য-সমাজ ভাবনায় প্রগতিশীল-সৃজনশীল কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)। কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৩৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) নেতৃত্বাধীন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র অন্যতম তরুণ সদস্য ছিলেন আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)। সমকালীন সাহিত্যে আবুল ফজলই সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিলেন।

> "এজন্য তাঁর জীবন-বীক্ষায় আমরা মুক্তবুদ্ধি স্বচ্ছচিন্তা ও উদার মানসিকতার পরিচয় পাই।"[১]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ আবুল ফজলের দীর্ঘ আশি বছরের জীবনকালে তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা - পরাধীন ব্রিটিশ আমল, বিভাগোত্তর পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ আমল। এ দীর্ঘ

সময়ে ছয়টি উপন্যাস, চল্লিশটি ছোটগল্প, এগারোটি নাটক, অজস্র প্রবন্ধ, তিনটি আত্মকাহিনি, পাঁচটি স্মৃতিকথা, একটি ভ্রমণ কাহিনি সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর সরব উপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য।

> "তবে তাঁর শিল্পীসত্তার মূল প্রবণতা কথাসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত।"[২]

সাহিত্যের সপ্তপর্ণে বিচরণ করলেও গল্প রচনায় তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে আছেন। মানবতন্ত্রী এই লেখকের গল্পসাহিত্যে বিষয় রূপে প্রতিফলিত হয়েছে প্রগতিশীল সমাজচেতনা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবালুতা, স্বপ্নকাতরতা প্রভৃতি। গল্পে মানবীয় বিষয়কে গল্পকার শাস্ত্রের কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি বরং শিল্পের স্বার্থে, শাস্ত্রীয় নির্দেশকে মানবীয় করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি একাধারে সৃষ্টিশীল ও মননশীল লেখক। আবুল ফজল মনে করতেন, মননশীল চর্চার দ্বারা ব্যক্তির চিত্ত জাগ্রত হয়। আর জাগ্রত চিত্ত অর্থাৎ নৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং জীবনের মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিই সমাজের সচলতা রক্ষা করে। তাঁর সমগ্র গল্পসাহিত্যে ব্যক্তি এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় আবুল ফজলের অবদান বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্ম চিহ্নিত। কারণ -

> "নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক অসঙ্গতির চিত্র-অঙ্কনের চল্লিশ দশকী মৌল প্রবণতার পথ ছেড়ে গল্পে তিনি বিচরণ করেছেন গ্রামীণ জীবনতটে, গ্রামের নিরন্ন-নিঃস্ব খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণা-সংগ্রাম ও দহনের পোড়াজমিতে, আবুল ফজল শ্রেণিসচেতন শিল্পী, তাই বস্তুবাদী সমাজচিন্তার আলোকে তিনি তুলে ধরেন গ্রামীণ মহাজনশ্রেণির শোষণের চিত্র, নির্মাণ করেন সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম ও উত্তরণের জয়গাথা। শাসন নামক শোষণ যেন এক প্রকার নিপীড়ন, সে কথা বোঝাতেই তাঁর প্রতিবাদী বাঁক।"[৩]

আবুল ফজলের গল্পগন্থের সংখ্যা তিন। এগুলো হল - *মাটির পৃথিবী* (১৯৪০), *আয়ষা* (১৯৫১) এবং *মৃতের আত্মহত্যা* (১৯৭৮)। এছাড়া *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬৪), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮) নামক দুটো গল্প সংকলন গ্রন্থ রয়েছে। *সপ্তপর্ণা* (১৯৬৪) নামে অন্য একটি গ্রন্থে বিবিধ রচনার সাথে পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়েছে। আবুল ফজলের বিভিন্ন গ্রন্থ ও সংকলন থেকে এ সমস্ত গল্প পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *আবুল ফজল রচনাবলী* (২য় খণ্ড) তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জনজীবনের সার্থক রূপকার আবুল ফজলের গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। সমাজসচেতন আবুল ফজল তাঁর গল্পসমূহে সমাজজীবনের নানাবিধ সমস্যা, যেমন - ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পশ্চাৎপদতা, ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট তথা মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন-প্রয়াস প্রভৃতি বিষয় রূপে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আবুল ফজলের গল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের বিচিত্রমাত্রিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সার্থকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এই মহৎ, মননশীল এবং মানবতাবাদী সাহিত্যিকের ছোটগল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বের স্বরূপ সমান্তরালভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক সুভাষ দে বলেছেন -

> "মূলত ছোটগল্পে আবুল ফজল সমাজ ও মানুষকে যেভাবে চিনেছেন সেই চেনাটাই বড় কথা নয়, বরং সমাজ ও মানুষগুলো তার চারপাশের জগৎকে চিনে, তার সব সবলতা দুর্বলতাগুলোকে নিরীক্ষা করে যদি পরিবর্তনের হাওয়াকে জড়িয়ে নিতে পারে তবেই সমাজ তার জগদ্দল অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে, এ মিশন ও ভিশন নিয়ে তিনি ছোটগল্পগুলি রচনা করেছেন। বিশেষত মুসলমান সমাজচিত্র অঙ্কনে এ ধরনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর আগে কেউ দেন নি। তাঁর ছোটগল্পের অধিকাংশ প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়েই তিনি পরিবর্তনের ইঙ্গিতটিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।"[৪]

আবুল ফজলের প্রথম গল্পগ্রন্থ *মাটির পৃথিবী*। এই গল্পগ্রন্থে মোট সতেরটি গল্প অন্তর্ভুক্ত। গল্পসমূহ হল - 'আয়ষা', 'একখানি হাসি', 'হাকিম', 'পরদেশিয়া', 'জয়', 'জনক', 'সংস্কারক', 'লাঠ্যৌষধ', 'আলো ছায়া', 'শরীফ', 'আহমদ', 'নবাব-আমীর-

বাদশাহ', 'চোর', 'পরিণাম', 'দুই রাত্রি', 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' এবং 'মাটির পৃথিবী'। অধিকাংশ গল্পেই লেখকের সমাজচেতনা দারুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। গল্পগুলোতে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন চিত্র, বিশেষত মুসলিম সমাজের নানামুখী চিত্র, ধর্মের আড়ালে মুখোশধারী মানুষের ভণ্ডামি। আবার রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারী আভিজাত্যগর্বী মুসলমান সম্প্রদায়ের অধঃপতনের চিত্র। ব্যক্তি ও সমাজের নানামুখী সংকট চিত্রণে লেখক অনন্য করণকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন এসব গল্পে। 'মাটির পৃথিবী' (১৩৪৩) গল্পে একটি বিশেষ অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজজীবনের, বিশেষত শিক্ষার আলো-বঞ্চিত দরিদ্র ও অন্ধ-সংস্কার-জর্জরিত জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পের প্রথমাংশে সমাজ সংকট ও ব্যক্তি সংকটের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংকুল পরিবেশে শাশুড়ি-পুত্রবধূর একঘেঁয়ে সনাতন ঝগড়ার বর্ণনা গল্পটিকে ক্লিশে করে তুলেছে। নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত এই পরিবারের অর্থনৈতিক ভিতটি যেমন মজবুত নয় তেমনি তাদের সামাজিক ভিতটিও সরল সুখের নয়। সমাজের এই সংকটাপন্ন শ্রেণিবিন্যাসে অতিষ্ঠ শাশুড়ি-পুত্রবধূর ব্যক্তিক সংকটও তাই লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে গল্পের শেষাংশে এসব জটিলতাকে উপেক্ষা করেও স্নেহবৎসল মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে গল্পের শিল্পসৌন্দর্য। একই সাথে গল্পে নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত, বিপর্যস্ত, কুসংস্কারদীর্ণ মুসলিম সমাজের সামগ্রিক জীবনচিত্র অঙ্কনে এবং আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ সৃজনে আবুল ফজলের ক্ষমতা অসাধারণ। সেকারণে ছলিমন, তজু, ফুলজানের মা, তজুর মা, তজুর স্ত্রী প্রভৃতি চরিত্র বিশেষত তজুর স্ত্রী খাতুন চরিত্র গল্পে উজ্জ্বলরূপে সংস্থাপিত হয়েছে। এ গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র তজু সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষ। সমাজের নিম্নে তার অবস্থান হওয়ায় ব্যক্তিক অবস্থানও তার নিম্নগামী। তাই সমাজের সংকট ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বময়তার সংকটে তজু নিমজ্জিত হয়েই নিজের সন্তানকে প্রহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। তজুর এরূপ ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কনে আবুল ফজলের ভাষা হয় নিম্নরূপ -

> "রাত্রে খাবার পালা।
> বড় ছেলে মন্নু ভাতের থালা নিয়ে ঠায় বসে আছে।
> টুনি বলে উঠল : অ-বাবা, ভাই খাচ্ছে না।
> কি রে শূয়রের বাচ্চা! কী খাবি, কী সালন খাবি?
> বলির পাঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে মন্নু বলে : আমি মুলা খাব না।
> দেরি হয় না, তজুর হাত কখনো ইতস্তত করে না, দুমদুম মন্নুর পিঠের উপর পড়তে থাকে : কী খাবি শালার বেটা শালা, ক?"[৫]

সন্তানকেই শুধু নয়; তজুর এই বিপর্যস্ত সংকটে তজুর স্ত্রীও তজুর তীব্র বাক্যবাণে পতিত হয় -

> "বৌকে লক্ষ্য করে তজু চেঁচিয়ে ওঠে : তুই শূয়র, তোর বাপ দাদা সাতগুষ্টি শূয়র!"[৬]

অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি সুদৃঢ় না হলে ব্যক্তির যে মনস্তাত্ত্বিক সংকট তীব্র হয় তার যথার্থ প্রকাশ আলোচ্য গল্পটিতে লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত নড়েবড়ে হওয়ায় তজুর ব্যক্তি সংকট সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছে।

'আয়ষা' (১৩৪৪) গল্পটি *মাটির পৃথিবী* ও *আয়ষা* গ্রন্থে 'আয়ষা' নামে পরিচিত হলেও শ্রেষ্ঠগল্পে তা 'মা' নামকরণে অন্তর্ভুক্ত হয়। সময় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত লেখকের *গল্প সমগ্রতে*-ও এ গল্পটি 'মা' নামকরণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রামীণ জনপদে বসবাস করেও দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত এ গল্পের 'আয়ষা' চরিত্রটি দৃঢ়চিত্ত ও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহী। নানাবিধ প্রাচীন মূল্যবোধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, মিথ্যা আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার অহমিকায় আক্রান্ত একটি পরিবারের সর্বস্বান্ত হওয়ার বাস্তবচিত্র গল্পে বর্ণিত হয়েছে। গ্রাম্য কোন্দল-দলাদলি-প্রতিশোধস্পৃহা, কৌলিন্য প্রথার সমান্তরালে বাঙালি নারীর শাশ্বত মাতৃরূপ ও স্বামীর প্রতি সততা-একনিষ্ঠতা এ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন মুসলিম সমাজপতিদের প্রদত্ত 'ফৎওয়া' জর্জরিত গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রকৃতরূপ উন্মোচনে লেখকের প্রচেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। ধর্মের নামে তাদের ফতোয়াবাজির নমুনা নিম্নরূপ -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "তাহারা আশেপাশের প্রায় দশটি গ্রামের মৌলবি হইতে দস্তখত করাইয়া এক ফৎওয়া আনিলÑ হামিদ তালাক দেওয়া বৌ লইয়া ঘর করিতেছে, তাহাকে একঘরে করা প্রত্যেক মোমিন মুসলমানের কর্তব্য।"[৭]

'একখানি হাসি' (১৩৪৫) গল্পের প্রধান অবলম্বন তির্যক ব্যঙ্গরস। রফিক মাস্টার উচ্চশিক্ষিত, পেশায় শিক্ষক অথচ আত্মঅহংকারী। তার ক্লাসের লাজুক ছাত্র মনিরের ঈষৎ বঙ্কিম হাসি তাকে পীড়া দেয় এবং এই হাসিজনিত পীড়া তার মানসিক বৈকল্য ঘটায়। ফলে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমেই অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। এক সময় চিত্ত-দৌর্বল্য তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয়ী করে এবং সে কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ গল্পে রফিক মাস্টারের ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। লেখাপড়ায় তুখোড় এই মানুষটির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন -

> "পুরাতন স্কুল, নূতন মাস্টার। বয়স ও ডিগ্রির খ্যাতি দেখে নিযুক্ত করা গেছে। সদ্য কলেজ বিজয়ী নন; ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দিকে তিনি কলেজ কুরুক্ষেত্র একরকম শ্রীকৃষ্ণের মতোই জয় করে সেরেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, দুর্ভাগ্য দেশের। তিনি ডিপুটিও হলেন না, উকিলও না; রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মোটা ফাইল পরিষ্কার করলে এত দিনে তিনি হেডের এসিস্ট্যান্ট অন্তত হয়ে যেতেন। কিন্তু ওই মোটা মাইনের লোভই তাঁর হল না কোনোদিন।"[৮]

শিক্ষকতার মহান ব্রত নিয়ে রফিক মাস্টারের শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্তিতে তার আত্মঅহংবোধ প্রতিপদে তাকে দ্বান্দ্বিক চরিত্রে পরিণত করেছে। ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় চাকরি থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে তাকে। সমাজ সংকটের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিপতিত হয়ে রফিক মাস্টার ব্যক্তিগত সংকটের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তার চাকরি থেকে অব্যাহতি দানের মুহূর্তে যখন নিকুঞ্জবাবা তাকে বলেন -

> এ কি ভাল করলেন? এ বুড়ো বয়সে খামখা আবার কোথায় গিয়ে চাকরি খুঁজবেন?[৯]

তখন এর উত্তরে রফিক মাস্টারের আত্মগর্বী উচ্চারণ -

> "গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার কাজ করে জীবন কাটালাম বলে নিজে এখনো গাধা হয়ে যাই নি। আগের চাকরিতে আমি রিজাইন দিইনি, চার মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিলাম।"[১০]

শিক্ষকতা-জীবনের রূঢ় কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা এই গল্পটিকে বেদনাঘন রসমূর্তিতে রূপায়িত করেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় স্কুল-শিক্ষকের বিড়ম্বিত জীবন লেখক আবুল ফজলের অন্তর্দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে এ গল্পে।

মানব জীবনের বিচিত্র কর্ম, দুর্জ্ঞেয় মন-রহস্য এবং প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' (১৩৪৫) গল্পের কাহিনি। গল্পটি আবাল্য হাঁপানি রোগাক্রান্ত ফুলির উপেক্ষিত-অত্যাচারিত জীবনকথার সফল চিত্রায়ণ। সুস্থ দেহ-মন নিয়ে ফুলি বেড়ে ওঠেনি বলে চতুর্থ স্ত্রীরূপে বিপত্নীক বসিরের সাথে তার বিয়ে হয়। চতুর্থ স্ত্রীর এক বছরের মধ্যে মৃত্যুর পর পঞ্চম স্ত্রী দীর্ঘজীবী হবে জ্যোতিষীর এরূপ ভবিষ্যতবাণী বিশ্বাস করে বসির রোগাক্রান্ত ফুলিকে বিয়ে করে। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ফুলি সুস্থ হয়ে ওঠে। এ গল্পে হতাশার অন্তরাল থেকে জীবনের ধ্বন্যাত্মক দিকে উত্তরণের লক্ষ্যে জীবনবাদী আবুল ফজল মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আবুল ফজল 'পরদেশীয়া' (১৩৩৪) গল্পে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় বাঙালি মুসলিম নারীরা যে খুব খারাপ অবস্থায় আছে তা উল্লেখ করেছেন। বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীরা ধর্মীয় গোঁড়ামি, পর্দাপ্রথা, অশিক্ষার কারণে প্রতিদিন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে তার উল্লেখ গল্পের মধ্যে দিয়ে করেছেন। একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের পর্দাপ্রথা নারীদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, অপরদিকে অশিক্ষা, কুসংস্কারও নারীসমাজকে নিমজ্জিত করেছেন তার উল্লেখ আলোচ্য গল্পটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম নারীদের যন্ত্রণাকে আবুল ফজল গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন।

আবুল ফজলের 'জনক' (১৩৩৪) গল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ ধারণ করেছে। চৌধুরী সাহেবের মতো মুখোশধারী লোকেরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় যত অন্যায়ই করুক না কেন টাকা দিয়ে সব ঢেকে দিতে পারেন, এ গল্পটিতে সমাজের সেই নৈতিকতার সংকটের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন লেখক। ব্যক্তি চৌধুরী জমিদার ও বড় ব্যবসায়ী হয়েও নৈতিক স্খলনের কারণে তার মানসিক সংকট সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। জীবনের বাকি সময়টা যখন তিনি মক্কায় গিয়ে কাটাতে চেয়েছেন ঠিক সে মুহূর্তে এক বিধবা প্রজা এসে তার নিজের সন্তানের জন্য জমিদারীর কিছু অংশের ভাগ চেয়ে বসে। যথারীতি জমিদার সাহেব তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এরপর কিছু দিনের মধ্যেই এই দেশ বিখ্যাত জমিদারের নামে এক সমন এসে উপস্থিত হল - ফাতেমা খোরাকির দাবি করে নালিশ করেছে। কিন্তু চৌধুরী সাহেব এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন, যে বড় মৌলবি সাহেব তাঁদের বিয়ের কার্য সম্পাদন করেছিলেন তিনি অনেক টাকা দিয়ে তাঁকে কিনে নিলেন। সমাজের বিপর্যস্ত এই রূপ আবুল ফজলের আলোচ্য গল্পে গভীর ছায়া ফেলেছে। চৌধুরী সাহেবের ব্যক্তিক সংকট এবং সামাজিক অবস্থানগত সংকটের মিথস্ক্রিয়ায় গল্পটি প্রাতিস্বিক হয়ে উঠেছে। বস্তুত জমিদার শ্রেণি, ব্যবসায়ী ও মৌলবিরা ইসলাম ধর্মের নামে কীভাবে মানুষকে শোষণ করে ও নারীকে ভোগ করে তার প্রকৃত বিবরণ আলোচ্য গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

আবুল ফজল 'জনক' (১৩৩৯) গল্পটির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের জমিদার, ব্যবসায়ী শ্রেণির মুখোশ আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন। আবুল ফজল একাধিক গল্পের মধ্য দিয়ে নারী-হৃদয়ের অনেক অব্যক্ত যন্ত্রণা পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন।

আবুল ফজলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *আয়না*-তে *মাটির পৃথিবী* গ্রন্থের নয়টি এবং নতুন চারটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে সংযোজিত নতুন চারটি গল্প যথাক্রমে 'নিজের মা ও পরের বাপ' 'উচ্চ ও তুচ্ছ', 'প্রিয়ার চেয়ে প্রিয়' ও 'তিনবার'। এ গল্পগুলোতে সামাজিক সমস্যার গূঢ়তম দিক ভাবগম্ভীরতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং স্যাটায়ারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। 'নিজের মা ও পরের বাপ' গল্পে অপত্য স্নেহকে কেন্দ্র করে মানুষের স্বার্থপরতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এই সত্যটিও গল্পটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাৎসল্যপ্রীতির প্রশ্নে ধনী-দরিদ্র কোনো ভেদাভেদ নেই। ধনী চৌধুরী সাহেব এবং তার দরিদ্র ঝি সন্তানপ্রীতির প্রশ্নে একই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে এই গল্পের মধ্যে। সামাজিক জীবনের অবস্থানগত সংকট স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে গিয়ে টিকতে পারেনি।

আয়না গ্রন্থের নতুন দ্বিতীয় গল্প 'উচ্চ ও তুচ্ছ' (১৩৪০)। এ গল্পটিতেও মানবজীবনের গূঢ়তম অথচ ব্যতিক্রমী দিকের উন্মোচন ঘটেছে। ক্রমবর্ধমান নগরজীবনে স্বল্পবেতনভুক্ত কর্মচারীর দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধ ও যুদ্ধের অভিঘাতে দীর্ণপ্রায় জীবনযাত্রার ছবি এতে অঙ্কিত হয়েছে। দরিদ্র কেরানি আসগর আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও চিররুগ্ন স্ত্রীর রুই মাছের মুড়ো খাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে যেদিন তা কিনে আনে সেদিনই তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। অস্বস্তিকর বিরুদ্ধ পরিবেশে ক্রমাগত অবস্থানের ফলে স্ত্রীবিয়োগে সে আপাত স্বস্তি বোধ করে এবং মুড়ো খাওয়ার প্রত্যয়ে স্থির থাকে। কিন্তু মৃত বাড়িতে রান্না করা নিষেধ - এমন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বাড়ির চাকর মাছের মুড়ো তার সহকর্মীকে দিয়ে দিলে আসগরের সে আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয় না। দাম্পত্যজীবনের সঙ্গী স্ত্রীর বিয়োগব্যথা এবং ক্ষুধার্ত দেহের আকাঙ্ক্ষা অপূরিত হওয়ায় আসগর বিপন্নবোধ করে। ব্যক্তি সংকটের দ্বন্দ্ব ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব এই গল্পে উজ্জ্বল রূপে উপস্থাপিত হয়েছে আসগর চরিত্রের ভেতর দিয়ে। বিপন্ন ও ক্রন্দনরত আসগরের দ্বন্দ্বময় প্রবৃত্তি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য -

> "আজ সারাদিনের মধ্যে একটুখানি কান্নার সুযোগও সে পায়নি অথবা নিস্ফল জেনে কাঁদে নি। কিন্তু আশ্চর্য, শুতেই তার দুই চোখ জলে ডুবে গেল, কান্না কিছুতেই সে আর রুখতে পারলে না। এই কান্না কিসের জন্য? দেহের জন্য না মনের জন্য? পত্নী প্রেমের উচ্চ আবেগে, দশ বছরের জীবন সঙ্গিনীর জন্য, না এক সের এক ছটাক ওজনের নেহাৎ এক তুচ্ছ বস্তুর জন্য।"[১১]

প্রকৃত পক্ষে 'উচ্চ' ও 'তুচ্ছ' বলতে মন এবং দেহের ব্যাপার বোঝানো হয়েছে। প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-মানবিকতা প্রভৃতি উচ্চ ও মহৎ বিষয়ের পাশাপাশি মাছের মুড়ো খাওয়ার লোভকে তুচ্ছ তথা দৈহিক বিষয়রূপে চিহ্নিত করে লেখক বিশেষ

পরিস্থিতিতে তুচ্ছের কাছে উচ্চের পরাজয় দেখিয়েছেন। এ গল্পে স্বল্প পরিসরে একটি যুদ্ধের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। মাছের মুড়ো কেনার সময় মেছুনির সাথে আসগরের কথোপকথনে জাপানিদের কলকাতায় বোমা বর্ষণের প্রসঙ্গ এসেছে। মানবতাবিরোধী যুদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনকেও তমসাচ্ছন্ন করে ফেলে। এ কারণে 'উচ্চ ও তুচ্ছ' গল্পে মেছুনি যেমন তার জীবিকা নিয়ে চিন্তিত তেমনি স্ত্রী-বিয়োগ সত্ত্বেও আসগর যুদ্ধ-পরাস্থিতিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে চিন্তিত এবং ক্ষুৎপীড়ায় কাতর। এ পরিস্থিতিতেও বন্ধু হামিদ তাকে সান্ত্বনা দেয় -

> "বাক্ আপ্ ইয়ংম্যান। এক বৌ যাবে, এক বৌ আসবে, আসগরের সিংহাসন, না না, তক্তপোষ খালি নাহি রবে।"[১২]

> "গল্পটিতে জীবন সম্পর্কে লেখকের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রকাশ লক্ষণীয়।"[১৩]

'তিনবার' (১৩৫৩) গল্পটি বিষয় বিন্যাসে অভিনব। অধ্যাপক ইন্দু এবং ছাত্রী স্নেহলতার পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্কে বর্ণ-সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ কায়স্থ ও বৈদ্য- এ দু'সম্প্রদায়ের অসবর্ণ বিয়ে হিন্দুরীতি সম্মত নয় বলে ইন্দু ও স্নেহলতা 'সিভিল ম্যারেজ' করে। স্নেহলতার জাঁদরেল আইনজীবী পিতা মি. সেন আইনের কৌশল বের করে এ বিয়েকে অসিদ্ধ বললে তারা পুরোহিত ডেকে হিন্দু মতানুযায়ী বিবাহ করে। এতেও স্নেহ লতার পিতা অসম্মতি জ্ঞাপন ও বিরুদ্ধাচারণ করলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিবাহ করে। এর ফলে স্নেহলতার সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হলেও বিয়ের তিন বছর পরে তাদের সন্তান জন্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ছিন্ন সম্পর্ক যোজিত হয় অর্থাৎ সন্তান দাদু-নাতির সম্পর্ক স্থাপন করে পিতা-কন্যা-জামাতার মিলন ঘটিয়ে দেয়। তিনবার বিয়ে ঘটনা ঘটেছে বলে গল্পের নাম 'তিনবার'। এ গল্পে লেখকের প্রগতিশীল সমাজচেতনা, পরিশীলিত মূল্যবোধের পরিচয় লক্ষণীয়। এই পরিশীলিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পের ইন্দু-স্নেহলতার সন্তানের নামকরণ প্রসঙ্গে। ইন্দুর মতে 'যিশু', স্নেহলতার মতে 'কৃষ্ণ' বা 'কানু', ইন্দুর বান্ধব অবরিন্দের মতে 'কৃষ্ণ-আহমদ' নামকরণ করা হলেও আবুল ফজলের মনের কথা উচ্চারিত হয়েছে মানবতার চেতনাদীপ্ত চরিত্র প্রীতির কণ্ঠে -

> "সব জাতের বিয়ের ফল এ, ওর কোনো জাত নেই, কোনো জাতের নামই ওকে দিয়ো না ও'র নাম রাখ শুকতারা, নতুন দিনের উদয়-চিহ্ন।[১৪]

আবুল ফজলের *শ্রেষ্ঠ গল্প* তিরিশটি গল্পের সংকলন। এ গ্রন্থে পূর্বের দুটি গ্রন্থের একুশটি ও নতুন নয়টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন - 'রাহু', 'সতীর সহমণ', 'কুমারী এ-মা', 'সাক্ষী', 'সিতারা', 'প্রেম ও মৃত্যু', 'বিবর্তন', 'কবিতার অপমৃত্যু' ও 'দ্বিতীয়বার'। উল্লেখ্য, এ পর্বের গল্পসমূহ দেশভাগ তথা ভারত-পাকিস্তানের জন্ম-উত্তরকালে রচিত। ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের তীব্র দ্বন্দ্বময়তার রূপটি এসব গল্পেও প্রযুক্ত হয়েছে লেখকের মননশীল চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে। 'সিতারা' (১৩৩৬) গল্পে প্রাচীন সামন্ত শ্রেণির জমিদার খানবাহাদুর-রায় বাহাদুর প্রভৃতির নৈতিক শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তঃসারশূন্যতার বাস্তব ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। বাইরে খান বাহাদুর জনাব এম মতিন হচ্ছেন একজন তসবিজপা পরহেজগার মানুষ। কিন্তু মাগরিবের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটান পতিতালয়ে। গল্পের নায়িকা সিতারা খান বাহাদুরের ঔরসজাত একজন পতিতার কন্যা। সুকৌশলে খান বাহাদুর কন্যা সিতারার বিয়েও দিলেন জমিদার পুত্র সৈয়দ আরশাদ হোসেনের সঙ্গে। এই জমিদারনন্দন জামাতার ও পতিতালয়ে গমনের অভ্যাস ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে সে উপস্থিত হল তার শাশুড়ি মনুজান বিবির ঘরে এবং সেখানে গিয়ে আরশাদ বুঝতে পারল সিতারার জন্ম রহস্য। খান বাহাদুরের কেলেঙ্কারি প্রকাশ না করার জন্য শ্বশুর তাকে অনেক ধন-সম্পত্তি দিতে চাইলে বাধ সাধে সিতারা। আরশাদকে উদ্দেশ্য করে সে বলে-

> "মনুজান-বাইজীর কাছে যখন গিয়েছিলে, শাশুড়ি ভেবে বা স্ত্রী মনে করে তো যাওনি, বেশ্যা ভেবেই তো গিয়েছিলে? তবে বেশ্যার মেয়ের প্রতি এত ঘৃণা যে? অথচ বেশ্যার মেয়ের টাকার পতি লোভ তো

এতটুকুও কম নয়? বেশ্যার মেয়ের টাকা চাও নাকি? চাইলেই পাবে, তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিতে চাই না। ঠোঁটে তার বিদ্রূপের বাঁকা রেখা। ... সত্যি এই টাকা চাও নাকি তুমি? চাইলে শরিয়ত মতো আমাকে তিন তালাক দাও, এক্ষণি সব টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বলো, তিন তালাক।"[১৫]

সিতারা অবশেষে তালাকের বিনিময়ে আরশাদকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করে দেয়। সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ে ব্যক্তি আরশাদের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের চিত্র রূপায়ণে আলোচ্য গল্পটি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছে। সমালোচক মাহবুব বোরহান মন্তব্য করেছেন -

"সিতারা গল্পে লেখক অভিজাত ক্ষয়িষ্ণু মুসলমানের পতিতাসক্ত ক্লেদময় জীবনকে রূপায়িত করেছেন। আবুল ফজল ক্ষয়িষ্ণু বনেদি মুসলমানের ক্লেদময় জীবনকে যেভাবে রূপায়িত করেছেন তা থেকে লেখকের জীবনভাবনার গভীরতা এবং বহুমুখিতার পরিচয় পাওয়ায় যায়।"[১৬]

'কুমারী এ-মা' (১৩৪১) গল্পটি অতি আধুনিকা একজন নারীর অধঃপতন নিয়ে রচিত। সমগ্র গল্প জুড়েই তথাকথিত অতি আধুনিকতাচিহ্নিত এক নারীর প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই গল্পের নায়িকা এ-মার দম্ভভরা মেকি ব্যক্তিত্ব গল্পটিতে হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। নারী স্বাধীনতা একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করার পর কোন উপায়ে একজন নারীকে সর্বনাশের পঙ্কে নিমজ্জিত করতে পারে তারই চিত্র গল্পকার এ-মার চরিত্রের ভিতর দিয়ে তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে আবুল ফজল অতি আধুনিক বাঙালি নারীর অন্তর্গত অসংগতিকে চিহ্নিত করেছেন। গল্পটির মধ্যে লেখকের মানবতান্ত্রিক জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে একজন মানুষ কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নিখুঁত চিত্র রয়েছে 'সতীর সহমরণ' (১৩৩৬) গল্পে। এই গল্পটিতে ব্যঙ্গ-রসাত্মক আবহের মাধ্যমে অন্তঃসারশূন্য সমাজকে সমালোচনা করা হয়েছে। শ্রীমন্ত বাবুর ছেলে শ্রীনাথ ছায়ার দিদিকে প্রেম নিবেদন করায় তার কিছুই হয়নি বরং ছায়ার দিদিকে সমাজ পরিত্যাগ করতে হয়েছে। ষাট বছরের বৃদ্ধের সাথে ছায়ার বিয়েতেও সমাজ কোনো আপত্তি তোলে নি। ছায়ার সহমরণে তার পিতা কমল বাবু নিজেকে ধন্য মনে করেছে। আর ছায়া সবাইকে অবাক করে দিয়ে শেষ মুহূর্তে স্বামীর চিতায় নিজেকে বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করল - হিন্দুর বিয়ে দেহগত নয়, শাস্ত্রগত। সমাজ সংকটের নিষ্ঠুরতায় ব্যক্তি মানসের দ্বান্দ্বিক চিত্র আলোচ্য গল্পটিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আবুল ফজলের 'রাহু' (১৩৩৯) গল্পেও ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী রাহেলার সাথে উচ্চ পদস্থ হাসানের সংসারজীবনের দ্বন্দ্বই এ গল্পে বর্ণিত। ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের হাসান প্রথমা স্ত্রীর সাথে নামের সাদৃশ্যের কারণেই রাহেলাকে বিয়ে করে। কিন্তু প্রথম পক্ষের কন্যা রাজুর সেবা যত্ন ও মৃত স্ত্রীর প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিচারণ রাহেলাকে হাসানের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলে। সংসারে প্রতি মুহূর্তে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব দানা বাঁধতে থাকে। তাদের দাম্পত্যপ্রেমে হাসানের মৃত স্ত্রীর ছবি ও কন্যা 'রাজু' মানসিক দূরত্ব সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে। দ্বন্দ্ব আরো ঘনীভূত হয় যখন সন্তানসম্ভবা রাহেলা স্বামীর অবহেলার শিকার হয় এবং তারই অবহেলাজনিত কারণে স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটে। এ পর্যায়ে রাহেলা প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে ওঠে এবং একদিন সুযোগ বুঝে কেরোসিনের আগুনে রাজুকে পুড়িয়ে হত্যা করে। সমাজ সংসারে উপযুক্ত মর্যাদার অভাব ও স্বামীর উপেক্ষা জনিত ভালোবাসা রাহেলার ব্যক্তি সংকটকে আরো তীব্র করে তোলে। যার চূড়ান্ত পরিণতি রাজুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়। হাসান সব বুঝতে পেরেও মানবিকতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে রাহেলাকে সুস্থ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। গল্পের শেষান্তে এসে হাসান-রাহেলার জীবন রাহুমুক্ত হয়।

'দ্বিতীয়বার' (১৩৩৮) গল্পে ব্যক্তির চারিত্রিক স্খলনের কারণে যে পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে তার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গল্পে ওয়াজেদের ব্যক্তিক সংকটের ফলে পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। দাম্পত্য-দ্বন্দ্বজনিত কারণে ওয়াজেদ কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত ফিরোজার হতদরিদ্র জীবনযাপন ও পরে ইদ্দতের মাধ্যমে পুনরায় মিলিত হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে নারীর অন্তরবেদনা প্রকাশ করেছেন আবুল ফজল; সেইসঙ্গে নারীদের আত্মনির্ভর হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত নিম্নরূপ -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "স্বামীর যথেচ্ছ তালাক ও পুনরায় বিয়ের পর স্ত্রীর মর্যাদাপূর্ণ আত্মোপলব্ধি বিষয়গুলো তিনি তাঁর গল্পে সামাজিক সমস্যা ও নারীর মর্যাদা রক্ষার দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। প্রায় সব গল্পেই আবুল ফজল দেখিয়েছেন নারীর পূর্ণব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার পথে সমাজ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে এবং এ সমাজের দৃশ্যমানশক্তি হচ্ছে পুরুষ জনগোষ্ঠী। যদিও পুরুষ এবং নারী একত্রিত হয়ে সমাজ-পরিবার গড়ে তোলে, তবু দেখা যাচ্ছে পুরুষ এগিয়ে যাচ্ছে, নারীর যাত্রাপথে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আবুল ফজল সমাজের এ একচক্ষু নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নারীর সমশক্তি, মর্যাদা, অধিকারের কথা বলেছেন।"[১৭]

ব্যক্তির নৈতিক সংকটের কারণে সমাজেও যে সংকট ঘণীভূত হয় তার যথার্থ পরিচয় রয়েছে 'বিবর্তন' (১৩৩৬) গল্পে। গল্পে দেখা যায় ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এবং সারা জীবন ধর্মানুসারে অতিবাহিত করেও শুধু একটি ভুলের কারণে মওলানা সাহেব সমাজের সবার কাছে ছোট হয়ে গেলেন। মওলানা সাহেব গতযৌবনা স্ত্রীর সঙ্গ লাভের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যখন আশ্রিতা পঙ্গু মেয়ে লুলির অনাঘ্রাত যৌবনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন তখন তিনি এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে না পারলেও পরবর্তীতে লুলি সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়লে এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে তিনি হজে যাওয়ার মনস্থ করেন। ব্যক্তির এই চরম সংকটের কারণে সমাজ সংকটও তীব্র হয়ে ওঠে। গল্পের অন্তিমে সমাজ ও ব্যক্তির এই সাংঘর্ষিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে মওলানা সাহেব লুলিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মুক্ত হয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় -

> "বিবর্তন গল্পে আবুল ফজল অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে এক মওলানা চরিত্রের অধঃপতন দেখানো হয়েছে, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে নিজেকে সংশোধন করার একটা রাস্তা দেখানো হয়েছে গল্পের শেষভাগে।"[১৮]

সাত রকম রচনার সংকলন *সপ্তপর্ণা*তে 'বিংশ শতাব্দী', 'গল্পের নমুনা', 'খেয়ালের খেলা', 'কবিতার কাঁটা' ও 'বিয়োগান্ত' শীর্ষক পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে প্রকাশিত হলেও এ গল্পগুলো আবু ফজলের প্রথম দিকের রচনা এবং সমকালে বিভিন্ন পত পত্রিকায় প্রকাশিত। 'বিংশ শতাব্দী' (১৩৩৭) গল্পে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। যে-সমাজ ফিরোজাকে পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করেছে সেই সমাজ তার মৃত্যুর পর মৃতের সম্মান দেখায় না এবং যে ডাক্তার পতিতালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে সে অসুস্থ পতিতা ফিরোজার চিকিৎসা করতে অস্বীকার করে মানবতার চরম অপমান ঘটায়।

'কবিতার কাঁটা' (১৩৩৭) গল্পের নায়ক মেয়েদের নিয়ে কবিতা লেখার জন্য সমাজে চরিত্রহীন বলে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, এ গল্পে সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে নায়কের ব্যক্তিক দ্বন্দ্বও উঠে এসেছে।

'স্বনির্বাচিত গল্প' আবুল ফজলের ষোলটি গল্পের সংকলন। এ গ্রন্থের ষোলটি গল্পের মধ্যে পনেরোটি নেয়া হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ গল্প' থেকে। এ গল্পের সংকলনে নতুন গল্পটির নাম 'আক্কেল গুড়ুম'। যদিও গল্পটিতে ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত।

আবুল ফজলের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'মৃতের আত্মহত্যা'। এ গল্পগ্রন্থে 'মৃতের আত্মহত্যা', 'নিহত ঘুম', 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর', 'কান্না' - এই চারটি গল্প স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের নামগল্প 'মৃতের আত্মহত্যা' (১৯৭৭) য় সেনাবাহিনীতে কর্মরত জনৈক মেজর য়ূনুসের স্ত্রী সোহেলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিধৃত। একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মেজর য়ূনুসের সম্পৃক্ততা জানতে পেরে স্ত্রী সোহেলি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তার জাগতিক অনুভূতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। ঘাতক স্বামী ও বিপর্যস্ত জীবন থেকে এক সময় সে পলায়ন করে এবং উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। এই গল্পে সোহেলির মানসিক দ্বন্দ্বের যে বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন তা বাস্তব। জন্মভূমি ও জন্মস্থানের প্রতি প্রেম ও মমত্ববোধই সোহেলিকে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে দিয়েছে। খুনী স্বামীর কৃতকর্মের প্রতিবাদ করেছে সে আত্মহত্যার মাধ্যমে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে লেখক অবশিষ্ট তিনটি গল্প রচনা করেছেন। 'নিহত ঘুম' (১৯৭৭) গল্পটি এক মেজরের আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড দর্শনে তার ঘুম নিহত হয়েছে

এবং তিনি 'ইনসমনিয়া' আক্রান্ত হয়েছেন। সমাজ সংকটের দ্বন্দ্বে মেজর চরিত্রটির ব্যক্তিক সংকটের দ্বন্দ্বও গল্পে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত হয়েছে।

সমাজ সংকটের দ্বান্দ্বিক অভিঘাতে পিষ্ট হয়ে ব্যক্তির মনোজাগতিক সংকটও যে তীব্র হয়ে উঠতে পারে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে 'কান্না' (১৯৭৭) গল্পে। ছোট একটি ছেলে শাহীনের মানসিক অবস্থার বর্ণনা এই গল্পের বিষয়বস্তু। ১৫ আগস্ট নিহত পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য রুশোর সঙ্গে শাহীনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্কুল থেকে ফেরার পথে বেশ কয়েকবার শাহীন রুশোদের বাসায় গিয়েছে। তার মায়ের সঙ্গে শাহীনের আলাপ হয়েছে। হঠাৎ এই বিভীষিকাময় রাতে রুশোর নিহত হওয়ার খবর শুনে তার মানসিক যে পরিবর্তন হয়েছে, 'কান্না' গল্পে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অস্বাভাবিক একটি মৃত্যু কিশোর মনেও যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তারই বাস্তবরূপ আমরা 'কান্না' গল্পটিতে দেখতে পাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনচেতনা ও শিল্পরীতি অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে প্রাক-সাতচল্লিশ ছোটগল্পের ধারায় আবুল ফজলের স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পে তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজবোধ এবং ব্যক্তির জীবন নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এক নৈতিক আদর্শবাদ লক্ষ করা যায়। ব্যক্তি সংকট ও সমাজ সংকটের দ্বন্দ্ব রূপায়ণে তাঁর ছোটগল্পসমূহ অনতিক্রান্ত ও প্রাতিস্বিকতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। এখানেই জীবনাশ্রয়ী আবুল ফজলের বিংশ শতাব্দীর অন্বিষ্ট জীবনান্বেষণের পূর্ণতা ও সার্থকতা। তবে ছোটগল্পে শিল্পভাবনার দুর্বলতা কিংবা সীমাবদ্ধতা তাঁর গাল্পিক সত্তাকে করেছে দ্বিধাবিভক্ত।

> "আবুল ফজলের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক, কিন্তু অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তিনি ছোটগল্পের সুঠাম কাঠামোতে সেই অভিজ্ঞতার সুষ্ঠুরূপ দিতে পারেন নি। ছোটগল্পের আকৃতি ও প্রকৃতিগত যে বন্ধন, সেই বন্ধন তাঁর গল্পে সুদৃঢ় নয়।"[১৯]

সমালোচকের এ মন্তব্যের স্বীকরণ করেও আমাদের বিবেচনায় এ কথা বলা যেতে পারে আবুল ফজলের ছোটগল্প বাংলাদেশের ছোটগল্প ধারার ভিত্তি নির্মাণে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে।

> "শিল্পর কৌতুহল নিয়ে নয়, বরং মানবতাবাদী সমাজকর্মীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি একটি যুগ ও সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য রচনা করে খণ্ডিত জীবনচেতনায় পূর্ণতা দান করেছেন।"[২০]

বলা যায় উদার, কুসংস্কারমুক্ত, উন্নত জীবনবোধ এবং পরিবর্তনকামী মানবতাবাদী প্রত্যয় আবুল ফজলের ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় ভাব-পরিমণ্ডল।

Reference:

১. মান্নান, মো: আব্দুল, *আবুল ফজলের প্রবন্ধে সমকালীন ভাবনা,* নভেন পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১
২. হক, সৈয়দ আজিজুল, *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৮৮
৩. আহমদ, আশরাফ উদ্দীন, *মূলধারা সাহিত্যের রকমফের,* অনুপ্রাণন প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৯
৪. আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল ও আবুল মোমেন (সম্পাদিত), *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ,* সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৮
৫. ফজল, আবুল : 'মাটির পৃথিবী', *গল্প সমগ্র,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ৩
৬. পূর্বোক্ত
৭. ফজল, আবুল : 'আয়ষা', *গল্প সমগ্র,* প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬
৮. ফজল, আবুল : 'একখানি হাসি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
১০. পূর্বোক্ত
১১. ফজল, আবুল : 'উচ্চ ও তুচ্ছ', 'গল্প সমগ্র', প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৮-১২৯

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

১৩. ডিনা, সরিফা সালোয়া, *কথাশিল্প অধ্যয়ন*, জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৫৪

১৪. ফজল, আবুল : 'তিনবার', 'গল্প সমগ্র', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৭

১৫. ফজল, আবুল : 'সিতারা', 'গল্প সমগ্র', প্রাগুক্ত; পৃ. ২২৮

১৬. বোরহান, মাহবুব, 'আবুল ফজলের ছোটগল্প : জীবনভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্য পত্রিকা, সিদ্দিকা মাহমুদা (সম্পাদিত), বর্ষ ৫০, সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৮৮

১৭. আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল ও আবুল মোমেন (সম্পাদিত), *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

১৮. আহমদ, আশরাফ উদ্দীন, *মূলধারা সাহিত্যের রকমফের*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৯. ইসলাম, আজহার, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮৪

২০. হক, খন্দকার সিরাজুল, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৬৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 270 - 277
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উওর-পূর্ব ভারত তথা আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পকার মিথিলেশ ভট্টাচার্য : জীবন ও সাহিত্য

পলান সাহা
অতিথি প্রভাষক
মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ
Email ID : Palansaha607@gmail.com

Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
North East, Barak Valley, Brahmaputra Valley, Meghalaya, Short Stories, Mithilesh Bhattacharya, Separation of country.

Abstract

Mithilesh Bhattacharya is a short story writer whose name is associated with special importance in the world of Northern and Eastern Bengali literature. He is a very socially and economically conscious writer who is sensitive to the environment. He has been regularly practicing short stories since the sixties and his writing is clear and reflective. His contemporary money, social environment, financial depression, moral decay, the turbulent environment of Assam, the struggle for life, etc. have come up in his stories. The context of his stories is basically the Barak Valley, his stories suggestive of the prevailing picture of Barak's socio-economic environment with the entire country. Present-day Barak Valley is a three-district valley in the southern part of present-day Assam

The plain Geographically, the Barak Valley is separated from the Brahmaputra Valley by the Barail Attavibhukhand from the greater part of Assam. Manipur and Mizoram states are on the eastern side of the valley, Tripura is on the south, Bangladesh is on the west, and Meghalaya is on the northwest. Valley connected to the defendant by North Cachar District (modern Dimasao District) on the north. So naturally the political ups and downs of Assam involve the political and civil life of Parak with the entire country connected by a national road and railway through the neighbouring hill district of Upachar North and a national highway through the state of Meghalaya. All three Yoga Sutras descend on the mountain's cols, so natural calamities breaking the Eye Sutras are an annual occurrence for Boracay. On top of that, the turbulent environment of the state of Meghalaya when the roadblocks interrupted Barak's communication and after this the author tried to show the pain of this political and economic partition in several stories. The economy of Mithilesh Bhattacharya's stories is particularly noteworthy.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

মিথিলেশ তাঁর গল্পে মুখ্যত বরাকের প্রেক্ষাপটে আসামের আর্থ-সামাজিক পরিষদ অবলোকন করা যায়। বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক একটা পরিচিতি রয়েছে। বাংলা তথা আসামের নির্মাণ বিনির্মাণে বরাক উপত্যকা শ্রীভূমি বরাক উপতাকা মূলত বঙ্গীয় সমভূমির পূর্ব প্রান্তীয় সমভূমি। ঔপনিবেশিক যুগে আসাম প্রদেশ গঠনের সময় ১৮৭৪ সালে কাছার ও শ্রীহট্টকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে। দেশভাগের সময় সিলেট গণভোটের কূটনৈতিক ফলে সিলেটের খন্ডিত অংশ করিমগঞ্জ জেলা ভারতভুক্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই অংশ বাঙালি অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি সংখ্যালঘু দেশভাগের উল্লেখযোগ্য চরিত্র বা প্রেক্ষাপটে ভূমিকা রাখে, কিন্তু বর্তমান শতকে ডি-ভোটার ও এন.আর.সির. প্রক্রিয়ায় মত হয়রানির যুগে গল্পে দেশভাগ ও নাগরিকত্ব গল্পের মুখ্য বিষয় হিসেবে নিয়ে কাহিনী নির্মাণ করে আসামের তরঙ্গতারিত বাঙালি জীবনকে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলোর পর্যালোচনায় স্বাধীনতার ভারতের সাথে বরাক ও বরাকের বাঙালি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে পূর্বদেশ-দ্বিতীয় ও অন্তীম পর্যায়ে প্রকাশিত পত্রিকা থেকে জানা যায় -

> "মিথিলেশ ভট্টাচার্য : লেখেন কম। কিন্তু প্রচন্ড শক্তিশালী। লেখার ভাব আমাদের ভেতর ভাবনা ছড়ায়। ভাবনা, কি করে এই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে লোভ থেকে অন্ধকার থেকে আলোর দেখতে পাবো।"[১]

জন্ম ও বংশ পরিচয় : মিথিলেশ ভট্টাচার্য জন্ম ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পুরোধা গল্পকারীর মতো তিনিও একজন। ১৯৬৭ সালে শিলচরের 'অনিশ' পত্রিকায় তার ছোটগল্প প্রথম প্রকাশিত হয়। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আসাম ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অজস্র ছোট পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা ছাপা হয়েছে। মৃদুস্বরে জলের মতো একা ঘুরে ঘুরে কথা কয় তার ছোটগল্প। এই দিরালাভ যেন মূলত নিজেরেই আপন সত্তার সঙ্গে কখনো কখনো যা নিঃসর্গে লীন। তার গল্পে ভাষায় অতিরিক নেই, আছে সহজের লাবণ্য সৌন্দর্যের মধুরতা। ইতিপূর্বে কক্ষপথ নামে প্রথম ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। চৈত্র প্রবনে তার দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ। তপোধীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিনি শতক্রতু নামে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেছেন ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নবপর্যায়ে তা আবার বেরুতে শুরু করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গল্প আন্দোলনে মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের লিখন যোদ্ধা মিথিলেশ ভট্টাচার্য বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের জগতের এক অনন্য প্রতিভা। পাশাপাশি শেখর দাস শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, অরিজিৎ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবনের এই গল্পকার ছোটগল্পকে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে বেছে নিয়েছেন। বরাক উপত্যকায় মূলত কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা সূত্রপাত হয়েছিল। তাই গল্প রচনার ইতিহাস এখানে খুব পুরনো নয় যেহেতু কবিতা রচনায় এই অঞ্চলে সাহিত্যিকদের মূল শক্তি ছিল সেজন্য গল্পকারদের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তাদের গল্পবিশ্বকে নিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে প্রতিফলিত সমাজ ও অর্থনীতি : বাংলা সাহিত্য সমাজ ও অর্থনীতি নির্ভর অর্থনীতি সাহিত্যের মূল চাবিকাঠি। সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই আসে সমাজ তারপর অর্থনীতি, অর্থনীতি বাদে বাকি যা - তা দেশভাগ, রাজনীতি, সংস্কৃতি শেষে লেখক এর অভিপ্রায় মননশীলতা। তাই আজ যাকে আলোচনা করব তার গল্পের প্রতিটি পাতায় পাতায় রয়েছে সমাজ-অর্থনীতির কথা, তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন বিশিষ্ট গল্পকার তথা বরাক উপত্যকার রত্ন মিথিলেশ ভট্টাচার্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোটগল্পের লেখক বর্তমান আলোচনা সামাজিক ভাবে আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প কেন্দ্রিক অনিবার্য ভাবে ফুটে উঠেছে সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি ও দেশভাগের উদ্বাস্তু সমস্যা যে জড়িত জনজীবনের জোয়ার। মিথিলেশ ভট্টাচার্য লেখক কম কিছু প্রচন্ড শক্তিশালী লেখার ভাব আমাদের ভেতর ভাবনা ছড়ায় ভাবনা কি করে এই সামাজিক এই নৈতিক এই রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে খুব খুব থেকে অন্ধকার অন্ধকার থেকে আলো দেখতে সর্বত্র সাহায্য করে।

'জগৎ পারাপারের তীরে' ১৯৭৩ গল্পে মিথিলেশ এক যুদ্ধের পটভূমিকায় মনুষ্য সৃষ্টি এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনজীবনে একদিকে মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত প্রতিযোগিতার লড়াই। ব্যক্তিক্রম উন্নতি অন্যদিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মধুর সবুজ কমলতা এবং অন্যদিকে প্রকৃতির সুখ মানুষের বৈপরীত্য সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ইচ্ছা ছিল বিশাল জলের ঢেউ উঠুক পৃথিবী জুড়ে, তির বেগে ঝড় আসুক, সবকিছু ধুয়ে মুছে ছাপ সুতো হয়ে যাক, অন্ধকারের পারাপারি আলোর দিশা হয়ে দেখা দিক নতুন পৃথিবী নতুন জীবন নতুন মূল্যবোধ।

'কক্ষপথ', 'শিকার' শতক্রুত পত্রিকায় প্রকাশিত যুব জননের আশা নিরাশা হতাশার গ্লানি এবং প্রেমের গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে মিথিলেশের দার্শনিক আদর্শ জীবন রীতি দৃষ্টিভঙ্গি কোন প্রতিফলিত ঘটনা বর্ণিত কাহিনী তুলে ধরতেন। আদর্শ জীবনধারী দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রতিফলিত ঘটেনি। ভালো লাগেনি শিকারের কাহিনী গল্পের একটি উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে।

> "যদি কোনদিন খাঁটি ভালো বাসার দেখা পাও তাহলে জীবনের অন্য সব দিকে তুচ্ছ করতে ইতস্তত করো না।"[২]

মিথিলেশের সহবাস চৈত্র ১৩৮২ বঙ্গাব্দে গল্পে বিজন মনে মনে এক রোমান্টিক প্রেমের জন্য একটি কিশোরী কন্যার জন্য সে মানসিকভাবে বিকিয়ে দিয়েছে মনের কাছে। মিলন হয়নি গল্পের চমৎকার তাদের প্রেমকাহিনী নির্মাণ, প্রেম আলাপ ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। শিউলি ধ্রুবতারা ও অভিনাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে আমাদের একটা জীবনবোধে উদ্দীপ্ত করতে চান এ ব্যাপারটা মিথিলেশের শুধু এ গল্পে নয় প্রায় সব গল্পেই ছড়িয়ে রয়েছে। অবিনাশী যে জীবন তা প্রেমরূপী এক ধ্রুবতারা কে লক্ষ্য করেই এগোতে চায় ভোরের শিউলির মত তাজা। যা জীবনের যৌবনেরই অপর নাম। এই প্রতি গল্পের মাঝে মাঝে প্রতীক ভেঙে বাস্তবকে ছুঁয়েছেন মিথিলেশ দুইয়ের মিলে এক অনাসাধিত বোধে উদ্দীপ্ত হই আমরা শব্দ ব্যবহারে চমৎকারিত্বের এক অভিনব নিদর্শন বরাক উপত্যকার কল্পকারীর মধ্য।

'গোপাল যখন বিচারক ও সময়' ১৯৮৪ গল্পে মধ্যবিত্ত কেরানি জীবনের আর্থিক দুর্দশা জীবনের ক্লান্তি হতাশাময় ডেকে যাওয়া জীবনের পরিস্থিতি অতিক্রমণের স্বপ্ন দেখে যায় গোপালের বিচারের গোপাল তার স্বপ্নে যদিও সত্যি বাস্তবতা নেই কিন্তু ভালো কিছুর স্বপ্ন যেন তারই তো করে গোপালকে মধ্যবিত্ত জীবনের গোপাল যেন বেঁচে থাকার খুঁজে পায়। সময় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে গল্পে মিথিলেশ দুই প্রায় পৌর শিকদার ও চৌধুরীর গল্প জানিয়েছেন। যাদের প্রায় উত্তীর্ণ যৌবনেও নারীর প্রতি লোপ প্রবল দেশকে ও দেশের জনতা কে ও সরকারকে ঠকিয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য মাদ্রাজের যাতায়াতের দুটো টিকিট নম্বর লাগে এল টি সি এর টাকা পাবার জন্য এমনকি শতকরা ত্রিশ টাকা ঘুষের বিনিময়েও আশ্চর্য এরাও আলোক পিপাসু –

> "মুগ্ধ চোখে ছোট আলোক বিন্দুর দিকে তাকায় চৌধুরী। সুন্দর আলো ছড়াচ্ছে। আর ভয় নেই। অন্ধকারে এ আলোকবিন্দু আর তীর্যক হবে। পথ দেখে হাঁটতে কোন অসুবিধা হবে না।"[৩]

'দৌড়' নবপর্যায় ১৯৮৭ গল্পে মিথিলেশ তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক দের বড় বড় বাক্য ১৪ দফা কর্মসূচি ৪০ দফা হয়ে যায়। তবুও অসাধু কিছু মানুষের জন্য বাঁধ হয় না রাস্তায়। বন্যায় সবকিছু ভেসে যায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ন্ত আকাশ শুয়ে সুরস সেট আরও মোটা হয় ভোটের রাজনীতি শুরু হয় অন্ধকার চারদিকে ঘনিভৃত হয় - রথীনভাবে 'অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর হবে - এর চে বেশি কি! 'তবুও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায় রথীন। স্ত্রীকে একান্ত পেয়ে সে বলে -

> "আহা তোমরা সবাই বড় গেল গেল রব তোলা এ সবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিন্তা ও তোমাদের মনে আসে না।"[৪]

কিন্তু কেউই এগিয়ে আসে না ফলে আর এক কুরুক্ষেত্র দেখতে পায় রথীন সেখানে দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা ক্রোধ অসহায়তা সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চায় গল্পটি ভীষণভাবে নাড়া দেয় আমাদের মনে মনকে প্রবোধ দিয়ে এগিয়ে চলে রথীন মত চরিত্রেরা আমরাও তার সঙ্গী কোথায় দৌড়ে পালাবো আমরা কোথায় রাবণের সিঁড়ি কোথায় স্বর্গের রথ স্বর্গের পথ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো কোথায় গিয়ে পৌঁছবে এই বেদনার কণ্ঠ।

মিথিলেশের গল্পে প্রতিফলিত রাজনীতি ও দেশভাগ : মিথিলেশ ভট্টাচার্য প্রতিফলিত রাজনীতি ও দেশভাগ একটি অনন্য নজির কেননা তার সে গল্পগুলিতে রাজনীতি রয়েছে তা খুবই সুনিপুণ দক্ষতায় কল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ইয়াসিন আমি এবং মৈত্রী সূত্র সাহিত্য নব পর্যায় ৮ জুলাই ১৯৮৯ সাল গল্পটি ভাব এবং ভাবনা প্রধান সংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের ভেতর দিয়ে দুটো বিশাল দেশের হৃদয়-রাশিয়া ও ভারত এক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতপাত, রাজনীতি ভাবনা অর্থনৈতিক কাঠামো সামাজিক গঠন সবকিছুই আলাদা হয়েও আমরা এক অটুট মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হই। কিন্তু কি বিচিত্র। সেই আমরাই পারি না রিকশা চালক ইয়াসিন এর সাথে মিত্রতা গড়ে তুলতে। কারণ সে মুসলমান। ফলে চোখের সামনে সাতজনের সংসার টানতে টানতে শিরদাঁড়া বেঁকে যায় ইয়াসিনের। মধ্যবিত্ত জীবনের করুন কাহিনী চোখ ফেটে রক্ত চলে আসে। ইয়াসিন পায়ের তলায় একটু মাটি খোঁজে পায় না। ফলে রিক্সাচালক ইয়াসিন সব্জি বিক্রেতা হয়ে যায়। সবজি বিক্রেতা ইয়াসিন হয়ে যায় শুটকি বিক্রেতা এবং শুটকি বিক্রেতা ইয়াসিন অবশেষে চোর হয়ে যায়। আর আমরা টিভিতে রাশিয়ার মিত্রতা দেখি আপ্লুত হই আনন্দিত হই।

লেখক এর অস্বস্তি আমাদের ভেতরেও সঞ্চারিত হয়। এখানেই সার্থক গল্পকারীর কৃতিত্ব। মিথিলেশকে ভালো লাগে এই কারণে যে তিনি শুধু আমাদের অন্ধকার দিক দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন না। সব সময়ই একটা ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়ে চলছেন এই অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর দিকে এবং তা কখনো প্রচার সর্বস্ব নয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ানুক। প্রতীক গল্পগুলোতে মিথিলেশ অসাধারণ যেমন তার চরিত্র সৃষ্টি তেমনি তার ভাষা ব্যবহার। এমন মজুমদার এবং ঝকঝকে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আসামের ছোটগল্পে কম দেখা যায় অভিধান গত অর্থকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায় তার ব্যঞ্জনা - যা মনস্ক পাঠককে অভিভূত করে। শুধু একটা কথা প্রতীক কখনোই গল্প নয় ওটা একটা ফর্ম হতে পারে। এই প্রতীকি তার কনটেন্ট এর সাথে আরেকটু বেশি সাহায্য সম্পন্ন হলে আমরা চমৎকৃত হতে পারি। মিথিলেশ বাবুর বেশিরভাগ গল্প উঠে এসেছে শহুরের নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা। তার গল্পের ভূমিকা সমকাল মূলত স্বাধীনতার দশক থেকে আবহমান পটভূমি। তার কিছু গল্পই রয়েছে সময় নামে যেমন দৌড় ৪০ সন ১৩৮১ অতএব তার গল্পে বর্ণিত সময় কালের পরিধি আছে তিনি গল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন স্বাধীনতার কালের অর্থ সামাজিক পরিবেশকে নিয়ে।

তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবার বলতে তিনি দেখিয়েছেন শহুরের চাকরিজীবী পরিবারদের, এমন নিদর্শন মূলত গল্পে যেমন – 'কক্ষপথ', 'গোপাল যখন বিচারক', 'দৌড় ৪০', 'সৌরকলঙ্কে তার ছায়া', 'মুরালিধর' ইত্যাদি। তার গল্পে আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে। তার গত শতাব্দীর রচনাগুলোতে 'কক্ষপথ', 'চৈত্র পবনে' গল্প সংকলনের গল্পগুলোতে স্বাধীনতার কালে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে বরাকের যে আর্থিক পরিস্থিতি তাকেই অবলোকন ও উপস্থাপন করেছেন গল্পগুলোতে গল্পকার। দেশভাগ উপদেশ ভাগীর যে করুন কাহিনী নিজের স্বচক্ষে প্রতিনিয়ত গল্পের বিষয় গড়ে তুলেছেন একজন দেশভাগের চোখে দেখা দেশভাগ করুন কাহিনী বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে।

তাঁর গল্পে যে গুলিতে দেশভাগের ছাপ সুস্পষ্ট – 'কক্ষপথ', 'চৈত্র ভবনে', 'গোপাল যখন বিচারক', 'দৌড় ৪০', 'সৌরকলঙ্ক তার ছায়া', 'মুরালিধর' ইত্যাদি স্বাধীনতার কালে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে বরাকের যে আর্থিক পরিস্থিতি তাকেই অবলোকন ও উপস্থাপন করেছেন। একাধারে দ্রব্য মুদ্রা, স্মৃতি অন্যদিকে সীমিত রোজগার মধ্যবিত্ত জীবন পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতে কিভাবে হিমশিম খেতে হয়েছে তার নিদর্শন রয়েছে। যেমন 'কক্ষপথ' গল্পে কথক মাসের শেষ দিকে রোগসজ্জায় থাকলেও ঔষধ নিতে পারছে না। 'গোপাল যখন বিচারক' গল্পে দেখি গোপাল অল্প আয়ের অবস্থায় অতিরক্ত খরচ না বাড়ানোর জন্য ফিতা ছেড়া চপ্পলকে সেলাই করে আরো কয়েক মাস চালিয়ে নিতে চেয়েছে। একদিকে আর্থিক দুরবস্থা অন্যদিকে গোপালের স্বল্প আয়, গোপালকে কৃপন করে তোলেছে। সে সময় পরিবেশ পরিস্থিতি যেন তাকে তৈরি করেছেন এরকমটা হতে।

'মুরালিধর' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে মধ্যবিত্তদের জীবন যাপনের আর্থিক হিসেব-নিকাশ খুব সংযমের মধ্য করতে হয়। কথক বছরে একবার ঘরে চুন-কাম করার ভাবনা ভাবতে পারবে না। কম মজুরি মজুর খুঁজে কাজ চালান।

সন ১৯৮১ গল্পে বরাকের প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন কেরোসিনের অভাব অন্যদিকে বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নির্দেশিত হয়েছে বন্যা প্লাবিত বরাক উপত্যকায় আর্থিক মন্দা নেমে এসেছিল তার উল্লেখ্য গল্পে দেখতে পাই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'দৌড় ৪০' গল্পটিতে যেন স্বাধীনতার ৪০ বছরের এক সম্মুখ পর্যালোচনা গল্পটিতে বিচ্ছিন্ন সামাজিক বক্তব্যের স্বাধীনতার ৪০ বছরের প্রাপ্তি বিফলতা ও পরিকল্পনার কোলাজ তৈরি করা হয়েছে। গল্পে প্রথমেই ভাঙ্গার আতঙ্কিত চিত্রের ছবি পাই, দ্বিতীয়ত স্বাধীনতার চল্লিশ বছর উপলক্ষে নেতার ভাষণ। ভাষণের উল্লিখিত হয়েছে যেমন -

> "একটি নতুন দেশ নতুন জাতি গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে একদিন আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম।"[৫]

> "বন্ধুগণ ১৪ দফা কর্মসূচি যখন ৪০ দফায় নিয়ে এসেছি আমরা এই কর্মসূচির সার্থক রূপায়নের মাধ্যমিক দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ম্বরতা লাভ করবে।"[৬]

উক্ত দুটি উদ্ধৃতি স্পষ্ট যে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও প্রতিশ্রুতি যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন ভারতের পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি। ৪০ বছর পরেও রাজ নেতাদের প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গনের ইতিহাস স্বপ্ন প্রলোভন দেখিয়ে তার বাস্তবিক না করা গল্পটিতে অর্থনৈতিক ও সাম্প্রতিক দুরবস্থার অভাব দেখানো হয়েছে। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও সে দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি। বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখা যায়।

কর্কটক্রান্তি গল্পে ১৮৯৮ সনের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি শিরোনাম উদ্ধৃতি হয় -

> "কিভাবে ভারতের দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব?"[৭]

তথ্যসূত্র দিয়ে সূচনা করেন গল্পকার গল্পটিতে এক নিম্নবিত্ত পরিবার অভাবের তাড়নায় কঠোর সংগ্রাম। শেষে সপরিবারের আত্মঘাতী হওয়ার এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির ছবি পাই। এই গল্পটিতে একদিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য তিনি অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঝড় বন্যা গড়া ইত্যাদিকে। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে গল্পের চিহ্নিত করেছেন কর্কটক্রান্তি নাম দিয়ে।

> "দূর চল্লিশে স্বাধীনতার ৪০ বছরে দেশের অন্যতম বিপত্তি উল্লেখ করেছেন।"[৭]

> "বন্ধুগণ দেশ আজ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে সন্ত্রাসবাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধর্ম ও ভাষার বিবেক।"[৮]

সর্বভারতীয় স্তরে এই বিভেদের চূড়ান্ত ভয়াল ডাঙ্গা মৈত্রী সম্প্রীতি তলা নিতে থেকেছে তারাই প্রেক্ষিতে ও প্রভাবে শান্তির দ্বীপ বরাকের সামাজিক পরিবেশ যে অবনতি ঘটেছে তার ওই নিদর্শন স্বরূপ তিনি লিখেছেন - একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র শেয়ালগুলো ইত্যাদি গল্প সাম্প্রদায়িক ও মানবিক অবক্ষয় প্রকাশ ধর্মী গল্পে শিল্পীর হস্তের মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয় বা দুর্যোগকে তিনি কত লোকিক বা অমানবিক হিংস্রতার প্রতীকে এঁকেছেন নারী অপহরণকারী দুষ্কৃতীদের রক্ত-মাংসের লোভী বুনো কুকুর বলেছেন সৌর কলঙ্কের তারা ছায়া গল্পে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংসকে অজগর আখ্যা দিয়েছেন। অজগরটি আসছে তেড়ে গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের শেয়ালের প্রতীকে এঁকেছেন শিয়াল গুলো, গল্পে দাঙ্গাকে এঁকেছেন এক অতি লৌকিক টান রূপে একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্রগল্পে সর্বভারতীয় দানা বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার নীতি প্রতিটি গল্পের পাতায় একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র গল্পটিতে উল্লেখ করেছেন। গল্পটিতে রয়েছে অসাধারণ ও নান্দনিকতার চিত্র গল্পটি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গা পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি অলৌকিক দানব বেশি শিলচর শহরের বুকে তাণ্ডব শুরু করেছিল।

মিথিলেশের গল্পে প্রতিফলিত সংস্কৃতি সমন্বয় : সাহিত্য আপন নবীর মত খেয়ালে চলে নিজের গতিকে সর্বদা ত্বরান্বিত করে এগিয়ে চলে বাংলা সাহিত্যে মিথিলেশের লেখা আসামের ছোটগল্পের পটভূমিকা যেন আপন বেগে পাঠক হৃদয়ে সমন্বয়ে তৈরি করেছে। সাম্প্রতিককালে আসাম বরাক উপত্যকার একজন প্রসিদ্ধ গল্পকার হলেন মিথিলেশ ভট্টাচার্য। আসামের বিপুল শরণার্থী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সংস্কৃতির সুরক্ষার অভাব তুমুল রাজনৈতিক তথা হিংসা আন্দোলন সংগঠিত হয়। কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকার তাদের আন্দোলনের দাবি মেনে নিয়েছে। দেশভাগের উর্ধ্বে যেন আরেক স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দেয়। সংস্কৃতিক সমন্বয় যেন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার গল্পে রুপ পায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহু বৈচিত্রের মধ্যে ভারতবর্ষ ঐক্যের সংস্কৃতিতে মহান প্রতিটি গল্পে ফুটে উঠেছে সংস্কৃতির মেলবন্ধন লেখকের সংস্কৃতির অস্তিত্ব আমাদের ভেতরে সঞ্চারিত করে। এখানেই তো সার্থক গল্পকারের কৃতিত্ব আমাদের। আমাদের ঘরের পাশের ঘরের ছেলে তিনি সবসময়ই যেন একটা সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে তার গল্পে। সর্বভারতীয় স্তরে বিভেদের চূড়ান্ত ভয়াল দন্তাঘাত একাগ্রতা। শান্তির দ্বীপ বরাকের সামাজিক পরিবেশ ও অগনিত ঘটনা ঘটে চলেছে, তারই নিদর্শন শুরু 'শান্তির দ্বীপ'গল্পটি তিনি লিখেছিলেন। সর্বভারতীয় বাংলা বিরোধী গল্পের ধারায় আসামের বিপুল শরণার্থী প্রয়োজনীয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীরা আর্থিক সংস্কৃতিক সুরক্ষার অভাব তুমুল রাজনৈতিক তথা হিংস্র আন্দোলন সংগঠিত হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের আন্দোলনের মুখে তাদের দায় মানতে বাধ্য হয়। ১৯৮৫সনে অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বিদেশী মুক্ত করতে হবে সেই থেকে আসামি বিভিন্ন বিদেশী চিহ্নয়ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ডাউট ফুল ফোটার প্রক্রিয়ায় যে ছিন্নমূল সমাজকে হয়রানি করা হচ্ছে। তার উল্লেখ পাই বর্জ্য পদার্থ ও ফকির চন্দ্রের ভিটেমাটি গল্পে। ‘ফকিরচন্দ্রের ভিটেমাটি’ গল্পে নির্দোষিত যে ডিপোটারের মতো প্রত্যেক ক্রিয়ার একজন নিম্নবিত্ত ও অল্প শিক্ষিত দুশ্চিন্ত ও হয়রান হয়, প্রথমত বুদ্ধির অভাব দ্বিতীয় পেলেও টাকার অভাব দি ভোটারের নামে যে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আসামে তার এক আতঙ্কিত চিত্র এঁকেছেন আলোচ্য গল্পে -

> “দেশের জাহাল হয়েছে যাকে ইচ্ছে বাংলাদেশী নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছে ডিপোটার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠেলে দিচ্ছে তুমি বেশ ঘাবড়ে গেছ দেখছি... ঘাবড়ার চিকিৎসাবে তুমি জানো এই যে দূরগা বস্তির কাজ ছিল নবীন যাকে তুমিও চেনো ওর বাবা-মার সকলেই এদেশের মানুষ সে নিজেও জন্মেছে এই বস্তিতে ওদের নামে এমন কি ওর মা মরা বাবার নামেও বিদেশি নোটিশ এসেছে।”[৯]

ডি ভোটারের মত ত্রুটিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ায় যে পরিমাণ ভুল নোটিশ এসে ন্যায্য নাগরিক কেউ হয়রানি করে ও তৎসঙ্গে সমগ্র বাঙালি সমাজকে আতঙ্কিত করে রেখেছে এসব নাগরিককিত চাচারের প্রতিক্রিয়া যখন আতঙ্ক চূড়ান্ত আত্মপরিচয় সংকট। প্রতিবাদ হীন অসহায় সত্য ভারতীয় সত্তা নিদ্রায় আর্তনাদ গড়ে উঠেছে -

> “মহারাজ আমরা এই দেশের আদি ও কৃত্রিম নাগরিক বর্তমান সরকার বাহাদুরের কাছে তা প্রমাণ করা বড় জরুরী হয়ে পড়েছে।”[১০]

‘তর্পন বিধি’ গল্পটির একটি শৈল্পিক ব্যঞ্জনা রয়েছে একাধারে রয়েছে ১৯-এর উল্লেখযোগ্য অপরাধের কিংসফোর্ড হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা প্রক্রিয়া অন্যদিকে স্বাধীন উত্তর কালীর উপর অসমীয়া জাতীয়তাবাদের প্রতাপ। আসামে সংস্কৃতিক শোষণের প্রতিবাদে গর্জে ওঠা ঐতিহাসিক দিন ১৯শে মে অত্যন্ত স্বাধীনতার কালে উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালি শোষণের এক চিহ্ন কিন্তু অপরাধে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বাঙালির সাধনা। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন দেশে হিন্দু বাঙালি গল্পে শরণার্থী জীবন ১৪ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভূমিহীন হয়ে বাঁচতে হয়েছে ভিন্ন সাংস্কৃতির। ভাঙনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে। শরণার্থীদের চাষের ভূমি ছিল না তাই অকৃষি জীবিকা গ্রহণ করতে হয়। সেই শূন্যহস্ত থেকে কঠিন আর্থিক ও সামাজিক সংগ্রাম করে ওঠা আসাম প্রদেশের মানুষেরা সংস্কৃতির মূলধারাকে বেছে নিয়েছে।

‘হরণ বা নির্বাসন পর্ব’ গল্পে তিনি আসামের ভয়ঙ্কর উগ্রপন্থী সমস্যার উল্লেখ করেছেন। উগ্রপন্থীদের আশ্রয় ভূমি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ লেখক বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের দেশে উগ্রপন্থীদের আশ্রয় ভূমি। হরণ বা নির্বাসন পর্বে দেখানো হয়েছে -

> “আজও ঘরে ফেরেনি ২৪ অপহৃত জন। কবে ফিরবে বা আদৌ ফিরতে পারে কিনা তা লাখ টাকার প্রশ্ন!”[১১]

আসলে হরণ বা নির্বাসন মানুষের জীবন কে কীভাবে গ্রাম করে, তারই ছবি ফুটে উঠেছে উক্ত গল্পে।

উপসংহার : মিথিলেশ ভট্টাচার্য সমকাল ও সমাজ সচেতন শিল্পী। তিনি ছোটগল্প চর্চায় সমাজ ভাবনাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন তার গল্পের মূল হাতিয়ার দেশ ভাগ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক তিনি অনেক গল্পে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন। যার রচনাগুলোর সমকালের ছবি তুলে রাখতেন তার গল্পের একটি

সমাচারখান পাওয়া যায় দৌড় ৪০ থেকে আবহমান গল্প অব্দি পর্যালোচনা করে সময় খন্ডের এক স্বাধীনতার কালকে পটভূমি করা হয়েছে দেশভাগ মুখরিত বিভাগ নির্ধারিত হয়ে ওঠেনি, স্বাধীনতার যুগে আর্থসামাজিক বিষয়ে গল্পে তিনি তার গল্পে স্বাধীনতার ভারতবর্ষের তথা ভারতের প্রেক্ষাপটে ষাটের দশকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের অস্বস্তি আমাদের ভেতরেও সঞ্চারিত হয়। এখানেই তো সার্থক গল্পকারের কৃতিত্ব। পূর্বদেশ দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত। যেমন -

> “মিথিলেশকে ভালো লাগে এই কারনে যে তিনি শুধু আমাদের অন্ধকার দিক দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন না। ...এমন ওজনদার এবং ঝকঝকে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আসামের ছোট গল্পে কম দেখা যায়।”[১২]

স্বাধীনতার কালি বিশেষত্ব ৮০-৯০ এর দশকে ভারতজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ধর্মের নামে ভাঙ্গার নামে ভাষার নামে চলেছে অবমাননা যদিও পরাগ সমাজের সৌভাগ্যের বাতাবরণ শান্তির দিকে অশান্তি সৃষ্টিকারী শেয়ালের আগমন অজগরির মত পালানো প্রতিটি ব্যঞ্জনায় ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিপ্লববাদী মনস্ক চেতনায়। আসামের নাগরিকতা যাচাইয়ের নামে হয়রানি ছিন্নমূল সমাজকে আতঙ্কিত করে রেখেছে তাদের নাগরিক ভিক্ষার উপর তিনি আলোকপাত করেছেন তাদের ভারতীয় নাগরিত্বের প্রতি তিনি গল্পের চর্চা করেছেন ছিন্নপুল মানুষের জীবন নিয়ে চর্চা করেছেন। সমাজের মানবিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতি তিনি তীব্রভাবে সোচ্চার হয়েছেন। সমাজের শত্রুকে চিহ্নিত করেছেন বুনো কুকুর, অজগর, শেয়াল রূপে। তার ধারণা এর পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে বিগত হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি সংগ্রামের শোক শোষিত শ্রেণী মানুষদের চাওয়া পাওয়া। উপত্যকার গল্পকার হিসেবে মিথিলেশ ভট্টাচার্য অবিস্মরণীয় একথা বলাই যায়।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, শিব, পূর্ব দেশ-দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃ. ২
২. ভট্টাচার্য, মিথিলেশ, শ্রেষ্ঠ গল্প, চিন্তা প্রকাশনী, কোলকাতা ২০২২ চিন্তা গল্প সিরিজ ১০ ভুমিকা।
৩. তদেব, পৃ. ১৯
৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫. তদেব, পৃ. ৩৫
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৭
৮. তদেব, পৃ. ৯৬
৯. তদেব, পৃ. ৯৮
১০. তদেব, পৃ. ৯৯
১১. তদেব, পৃ. ১৭৯
১২. ভট্টাচার্য, শিব, পূর্ব দেশ-দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃ. ৫

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

রায়, সব্যসাচী, অভিবাসন, নাগরিকতা ও আসাম, প্রাক উপনিবেশ কাল থেকে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর; ২০২২ খ্রিঃ
দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত, সম্পাদনা প্রসূন বর্মন, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২৩ খ্রিঃ
দাঙ্গাবিরোধী গল্প, সম্পাদনা কমলেশ সেন, ন্যাশনেল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭
শিকড়ের খোঁজে-প্রেক্ষিত বরাক-সুরমা, সম্পাদনা বিমলাংশু রায় ফাউন্ডেশন, শিলচর, ২০২১ খ্রিঃ
চট্টোপাধ্যায়, ডবানীপ্রসাদ, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, আনন্দ; কলকাতা, ২০১৩ খ্রিঃ

ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার, উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য, ১ম খন্ড, সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি, ২০০২ খ্রিঃ
কৈরী, সনৎকুমার, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পূজা পাবলিকেশন, শিলচর, ২০১৩ খ্রিঃ

সহায়ক পত্রিকা :
প্রবাহ; বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ২ : সম্পাদনা আশিষরঞ্জন নাথ, লালা, হাইলাকান্দি, ২০২২ খ্রিঃ
গল্পের উত্তরপূর্ব যাপনকথা, ৮ম সংখ্যা, সম্পাদক কান্তারভূষণ নন্দী, ২০২১ খ্রিঃ
সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়; অসমের সাম্প্রতিক বাংলা গল্প : অশান্ত সময়ের দলিল; আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদ; Access date-11/10/23; Time-00:49 লিংক-
http://www.bangabidya.org/wp-content/uploads/2015/02/14-Bangabidya.pdf
দে, নন্দন, মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, Journal Of Emerging Technology And Innovative Research; ISSN 2349 5162, Vol-9; Issue-4, April : 2022, Access Date 11/10/23, Time 1: 13 লিংক https://www.jetir.org/papers/JETIR220406
চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ, ভাষা ও বুনোটের যুগলবন্দিতে বিন্যস্ত গল্প সংকলন মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'শ্রেষ্ঠ গল্প. Bidyutkotha.blog.Access Date 4/09/23; Time-8:45PM লিংক -
https://bidyutkotha.blogspot.com/2022/08/blog-post_8.html?m=1

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 278 - 288
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ’র ছোটগল্প : ভাবনা ও প্রকাশের সাযুজ্য সন্ধান

মিজানুর রহমান
গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : persianmizan@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Tagore, Jamalzadeh, Short story, Culture, Norm, Construction, Narrative.

Abstract
The short stories of Tagore and Jamalzadeh are the best sources of short stories in Bengali and Persian languages. It is from their hands that this element has got its start and stability. They have made various experiments in the texture of the story and made its acceptance sky high among the readers. Short stories are called fiction because they are written on the words of ordinary people. Here the characters are speaking. The issues of the parliament and from the society are also discussed in the story. Tagore in his stories wrote about childishness, history, horror, love, memory, position of women, nature, science etc. Similarly, Jamalzadeh, the son of Persian civilization, brought out politics, language, society, religion and culture in his story. Their storytelling and artistry are almost close. However, Jamalzadeh has shown a lot of skill in writing political issues as stories. Both the stories are superior in terms of story language, composition, plotting, narrative construction etc. The well accepted aspects are presented in this article.

Discussion

ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ’র ছোটগল্প বাংলা ও ফারসি ভাষার ও সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। উভয়েই মেধা, মনন এবং কল্পনাকে এমনভাবে কাজে লাগিয়ে গল্প লিখেছেন যা পাঠকের কাছে এক অনন্য আবেদন নিয়ে বারংবার হাজির হয়। ছোটগল্পের জমিনে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে এক পোক্ত ভীত দিয়ে গেছেন। যার ফলে এমাধ্যমটি এখন সবার কাছে আদরণীয়। অলিগলি থেকে সংসদ ভবনের আলোচ্য বিষয় গল্প হয়ে ওঠে উভয়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে শিশুতোষ, ইতিহাস, ভৌতিক, প্রেম, স্মৃতি, নারীর অবস্থান, প্রকৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে আশ্রয় করে লিখেছেন। তেমনি পারস্যের সন্তান জামালযাদেহ তাঁর গল্পে রাজনীতি, ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি তুলে এনেছেন। প্রায় কাছাকাছি তাদের গল্পের ভাব, শিল্পগুণ এবং প্রকাশরীতি।

গবেষণা পদ্ধতি ও যৌক্তিকতা : এটি যেহেতু একটি তুলনামূলক বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য অন্বেষা পদ্ধতির গবেষণা সেহেতু উভয় গল্পকারের গল্পকে বিষয় ও শৈল্পিক মূল্যমানে পাশাপাশি রেখে সাযুজ্য বা ঐক্যের স্থানগুলির আলোচনা স্থান পাবে। বাংলাদেশে বা ভারতের বাংলা ভাষাভাষী গবেষকদের মধ্যে কেউই উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণা করেননি। ফলে এজনরায় গবেষণা প্রবন্ধটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গবেষকদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এখানে উভয়ের মূল গল্পগ্রন্থ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বোদ্ধা সমালোচকগণের মতামতকে টেনে আনা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ'র ছোটগল্প বাংলা ও ফারসি ভাষার ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁদের হাত ধরেই তো এ উপাদানটির প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব লাভ করেছে। তাঁরা গল্পের জমিনে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে পাঠকসমাজে এটির গ্রহণযোগ্যতাকে আকাশচুম্বী করে তুলেছেন। বিষয়বৈশিষ্ট্য, ভাবনার জগত এবং প্রকাশভঙ্গিতে তাঁদের গল্প অনন্য। সেই অনন্য দিকগুলি এপ্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেলজয়ী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, আঁকিয়ে, ভ্রমণগদ্য রচয়িতা, দার্শনিক, কণ্ঠশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (রহমান, ২০১২: ১৭) উপর্যুক্ত মাধ্যমগুলোতে ছোট-বড় প্রায় ২৩৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এত এত সৃজনসম্ভারের মধ্যেও তিনি বিশ্বকবি নামে সুখ্যাত। কেননা, তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যের অনুবাদ ঝড়হম ঙভভবৎরহমং এর জন্য তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল জয় করেন। (রফিক, ২০২০: ৩৮) তাই বলে ছোটগল্পকার বা ঔপন্যাসিক হিসেবে কিন্তু কম পরিচিত নন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প ভিখারিনী (১৮৭৭) লিখে বাংলা ছোটগল্পের জনক খ্যাতি লাভ করেন।(মাওলা, ২০১৯: ৫৭) আর তাঁর হাত ধরেই এ শাখাটি উৎকর্ষ লাভ করে। ১১৯টি ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভৌতিক, যৌতুক প্রথা, প্রেম-বিরহ, শৈশবের নানা দিক ইত্যাদি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। কাব্যিক আর ঔপন্যাসিক ধারার বাইরে এসে মানুষের জীবনকে ছোটগল্পের অবয়বে তুলে ধরাতে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার। গল্পগুচ্ছে যে গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন প্রথমে তাঁর ছোটগল্প (১৩০০ বঙ্গাব্দ), বিচিত্র গল্প (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ), কথা-চতুষ্টয় (১৩০১ বঙ্গাব্দ), গল্প-দশক (১৩০২ বঙ্গাব্দ), গল্প (১৩০৭ বঙ্গাব্দ), কর্মফল (১৩১০ বঙ্গাব্দ), আটটি গল্প (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ), গল্প চারটি (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ), গল্পসপ্তক (১৩২৩ বঙ্গাব্দ), পয়লা নম্বর (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), তিনসঙ্গী (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। (হায়দার, ২০১১: ১৪) আবার গল্পগুচ্ছের বাইরেও রয়েছে তাঁর বেশ কিছু গল্প। এগুলো রয়েছে তাঁর লিপিকা (১৯২২), সে (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) ও গল্পসল্প (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে। তিনি আশি বছর বয়সে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের একজন বহুমাত্রিক প্রোজ্জ্বল লিখিয়ে। লেখকের নিজ ভাষ্যমতে নেসফে জাহান বা অর্ধ-পৃথিবী খ্যাত সমৃদ্ধ নগরী ইস্ফাহানে ১৩ জানুয়ারি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (হাকিমি, ২০১৯: ১৮২) ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবারের এ সুসন্তান মাত্র বারো বছর ইরানে থেকে লেবানন, জার্মানি, ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ডে পাঠাধ্যয়ন শেষে জেনেভায় স্থায়ী হন। ২৩০টি গ্রন্থের গ্রন্থকার জামালযাদেহ ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণকাহিনি, গবেষণা, ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করেছেন। তিনি তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে নোবেলের জন্য মনোনয়ন তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন।(হাসেমি, ২০০৮: ১০) কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় তা বাস্তবে রূপলাভ করেনি। ইরানে 'সবথেকে পরিশ্রমী' লেখক হিসেবে পরিচিত জামালযাদেহ তাঁর প্রাচীন যুগের সাহিত্যের সাথে আধুনিক যুগের মেলবন্ধনের গদ্যসাহিত্যের একজন অত্যুজ্জ্বল লেখক। কিন্তু এসব অভিধা ছাড়িয়ে তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ফারসি শেকার আস্ত বা ফারসিই চিনি নামক গল্প লিখে ফারসি ছোটগল্পের জনক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর দ্বারাই এ রীতিটি পোক্ততা লাভ করে। মাত্র বারো বছরের ইরানের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে তিনি প্রায় সত্তরটি ছোটগল্প রচনা করে ইরানের সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ইত্যাদির সুনিপুণ বুনন করেছেন। তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম হচ্ছে, ইয়াকি বূদ ইয়াকি নাবূদ বা একদা একসময় (১৯২১) সার গুযাস্তে আমুয়ে আমুয়ে হোসাইল আলী বা হোসাইন আলী চাচার গল্প (১৯৪২), সার ভা তাহে ইয়েক কারবাস বা এক তাবুর কাপড়ের আগাগোড়া (১৯৫৫), তালখ ভা শীরীন

বা তেতো ও মিষ্টি (১৯৫৫), শাহকর বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম (১৯৫৮), গাইর আজ খোদা হিচ কেচ নাবূদ বা খোদা ছাড়া কেউ ছিল না(১৯৬১), অসেমান ভা রেসমান বা আকাশ ও দড়ি (১৯৬৪), কেচ্ছেহয়ে কুতা'হ বার'য়ে বাচ্চেহ'য়ে রিশদ'র বা দাঁড়িওয়ালা বাচ্চাদের জন্য ছোট্টগল্প (১৯৭৪) ইত্যাদি। প্রখ্যাত এ লেখক ১০৫ বছর বয়সে ৮ নভেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে জেনেভায় ইন্তেকাল করেন।(তাক্কিযাদে, ১৯৫৪: ২৫৮)

সবাই সমকাল শাসিত। সময়ের সন্তানও। আর লেখকদের বেলায়তো এটা সর্বাগ্রে। কেননা, তাকে টিকিয়ে রাখে বা বাঁচিয়ে রাখে তার লেখা। আর লেখায় পাঠক সমকালকে খুঁজে না পায়, নিজের ভাষা ও কথাকে খুঁজে না পায় তাহলে লেখককে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। যেমন পৃথিবীর আদিকাল থেকে অনেক লেখকই লিখে গেছেন। কিন্তু টিকে আছেন ক'জন? তারাই টিকেছেন যারা নিজ সময়কে ধারণ করে এমন কিছু বলেছেন বা বুনেছেন যা সবসময় প্রাসঙ্গিক। কেননা, লেখকগণ সবসময় প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী হন। এমনই প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ উভয় লেখকই। এখানে অবশ্যই সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ প্রাতিস্বিকতার পরিচয়ে ভাস্বর। কেননা, তাঁর লেখক সত্তাই জন্ম হয়েছে মাশরুতিয়াত বা সাংবিধানিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। বাবাকে হারিয়েছেন সমকালীন স্বৈরাচারীর হাতে। তাই তিনি জনগণের চাওয়াকে, জনমণের ভাষাকে রূপ দিয়েছেন তাঁর গল্পের প্লটে, আখ্যানে ও আবহে। ফারসি শেকার আস্ত'র ঘটনা এই ডামাডোল নিয়ে। আর সমকালীন রাজনীতিকদের চরিত্রকে তিনি সুক্ষ্মভাবে এঁকেছেন রাজুলে সিয়াসি (رجل سیاسی) নামক গল্পে। তিনি সেখানে দুজন ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদের কথোপকথনে লিখছেন -

> "বললেন, না, না, সততার সাথে এসবের কি সম্পর্ক? সততা মমানে ঘুষ ঘুষ গ্রহণ না করা। রাজনীতিক সেই যে ঘুষ নেয় না। বললাম ঘুষ দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? ওই মোল্লাদের এবং ধর্ম ব্যাখ্যাকারদেরকে যেমন দেয়? বললেন, হ্যাঁ আগের দিনে ফকির-ফোকরারা বুজুর্গদের, সম্ভ্রান্তদের, শেখ এবং মোল্লাদের ঘুষ দিতো। কিন্তু সংবিধান আন্দোলন যখন থেকে হল তখন থেকেই কাজটা উল্টা হয়ে গেছে। এখন অভিযাতরা, উজির-হাকিমরা অধীনস্থদের ঘুষ দেন। বললাম, তাইলে এটা তো ঘুষ হচ্ছে না এটা যাকাত-ছদকার মতো। এতে দোষ কী? বললেন, ছদকা তো দেয় আল্লাহর রাস্তায়। কিন্তু ঘুষ হলো আগেকার দিনে যেমন কেউ উচ্চপদ পেতে চাইলে শাহ এবং প্রধানমন্ত্রীর পেছনে হাজার তুমান, দুহাজার তুমান বিনিয়োগ করতো এবং তাদের কার্য সাধন হয়ে যেতো। এখন সে উদ্দেশ্যেই সেই রকমই হাজার দু'হাজার তুমানকে পাঁচ তুমান, দশ তুমান হিসেবে ভাগ ভাগ করে ছোট ব্যাগে ভরে ৩০-৪০জন রাজনৈতিক ব্যক্তির দরজায় পৌঁছে দিয়ে যেকোনো উচ্চপদে পৌঁছে যান তারা। এই যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দেখছেন এদের অধিকাংশের রাতদিনের কাজই হচ্ছে এই নিলাম।"[১]

আর দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সসময়কে তীক্ষ্ণভাবে অবলোকন ও উপলব্ধি করেছেন। সেগুলোর যে অভিঘাত তা তাঁর সৃজনে স্পষ্ট। বিশেষ করে ছোটগল্পের জমিনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের যে গল্পগুলো শেষপর্বে লিখেছেন তাতে যে অভিঘাত ও মোড় নিয়েছেন তিনি তা নিজেই এভাবে লিখছেন -

> "My stories of a later period I have got to necessary technique... I have different strata of my life and all my writings can be divided into so many periods. All of us have different incarations in this very life. We are born again and again in this very life."[২]

গল্পকার মানেই পাঠকের মনোরাজ্যকে জয়কারী। ক্রমাগত পাঠককে কথার জাদু, ঘনঘটার আকস্মিকতা আর আখ্যানে মাতিয়ে কল্পরাজ্যে ভাসিয়ে নিজের কব্জায় রাখা। এটি করতে গল্পকারকে হতে হয় অত্যন্ত সচেতন ও মেধাবী। নাহলে ক্লাইমেক্সে উপনীত হওয়ার আগেই পাঠকের মনে বিতৃষ্ণা জেগে পাঠের টেবিল থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। আর বিরক্তি ভাব নিয়ে পুস্তকখানা ছুড়ে দেবে টেবিল বা বিছানার নিচে। ধুলোমাখা হবে গল্পের ডালি। লেখকের আশায় পড়বে গুড়ে বালি। এরকম গুড়ে বালি কিন্তু ঘটেনি বিচক্ষণ ও মেধাবী গল্পকারদের বেলায়। অধিকন্তু পাঠক বারংবার পাঠে আগ্রহী হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাঠ শেষে ভেবেছে অসংখ্যবার। আমরা ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে যে ভূত-প্রেত ইত্যাদি শুনেছি তাতে মনের আঁধারে একটি ভয়ের কোণ নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি খারাপ জিনের আছরে চারপাশে অনেককেই নাস্তানাবুদ হতে দেখি। যার রেখাপাত মননে স্থায়ী। ফলে একাকী আঁধার রাতে বাঁশের ঝাড়ে বা বাগানে গা ছমছম করে ওঠে। মনে পড়ে যায় ভৌতিক গল্পের কোনো ক্লাইমেক্স। আরও ভয় বেড়ে যায়। এমনই আবহে পাঠককে ভীতিকর পরিস্থিতির সামনে ফেলতে জামালযাদেহ নৈপুণ্য দেখাতে সফল হয়েছেন। তিনি দোস্তিয়ে খলেহ খরসে (دوستی خاله خرسه) বা ভালুক খালার বন্ধুত্ব শীর্ষক গল্পে উত্তমপুরুষের বর্ণনায় লিখছেন -

> "আমি আর কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটুকুই শুধু জানি খানিকক্ষণ বাদেই গুলির শব্দ হল এবং খুব দ্রুত থেমে গেল। গুলির শব্দে আশেপাশের কুকুরগুলো অলক্ষুণে মর্মভেদী ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গাছের ডালে ঘুমিয়ে থাকা কাকগুলো হতভম্ব হয়ে ডানা ঝাপটে এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে গেল। আবারও কূপের ভেতরে পাথর পড়ে যাওয়ার শব্দের পরবর্তী নিস্তব্ধতার মতো ভয়ার্ত নিস্তব্ধতা ঘুমমাখা গ্রামটাকে গ্রাস করল।"[৩]

পক্ষান্তরে ঠাকুরমার ঝুলির (১৯০৬) ভূমিকা লেখা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন গল্পের ঈশ্বর। তিনিও পাঠক মানসকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন তাঁর লেখায়। পাঠককে হাসি, রম্য, বেদনা, রোমান্স ইত্যাদির পাশাপাশি ভৌতিক আবহে ভাসিয়েছিলেন। যেহেতু গল্প শোনার আগ্রহ আমাদের ঐতিহ্যের। আর ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রূপকথার গল্প। এরূপ রূপকথার আবহ তিনি দিয়েছেন ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে। এখানে গা ছমছম করা এক পরিবেশের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন -

> "অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জল, স্থল আকাশ সহসায় শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃংখলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভেতর দিয়া আর্ত চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।"[৪]

প্রেম শাশ্বত। পবিত্র। এপ্রেমের জন্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কেননা, তাঁর এবাদত বন্দেগীর জন্য অসংখ্য ফেরেশতাতো আছেই। কিন্তু তাদের সাথে মহান রবের প্রেম নেই। এই প্রেমের জন্যই আল্লাহ তায়ালা আদমকে (আ.) মাটি থেকে তৈরি করে নূরের তৈরি ফেরেশতার উপর সম্মান দিয়েছেন। প্রেম স্রষ্টা-সৃষ্টিতে। পিতা-পুত্রে। আত্মীয়-স্বজন-বান্ধবে। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাতে। আমাদের লিখিয়ে স্বজনগণ যেহেতু মানুষ তাই তাঁরা মানুষের জৈবিক, আত্মিক, সামাজিক ইত্যকার বিষয়কে কেন্দ্র করেই গল্প বুনেছেন, বুনছেন ও বুনবেন। মানুষ যখন স্রষ্টার প্রেমে পড়ে তখন সে হয়ে যায় উন্মাদ। আর কোনও প্রেমিক হৃদয়ে যদি নিটোল ষোড়শীর প্রেম উঁকি দেয় সেও হয়ে ওঠে উন্মাদ। তার কাছে জাত-পাত, কূল-বংশ কোনও কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। শিরিকে পাওয়ার জন্য যেমন ফরহাদ উন্মাদ থাকতেন তেমনি উন্মাদ হয়ে পড়ে মানবিক মন। সামাজিক সম্মান-মযার্দা একচুল পরিমাণও টলাতে পারে না। এমনই এক প্রেমিকের সাতকাহন গল্পের ফ্রেমে আবদ্ধ করে নিটোল রূপ দিয়েছেন সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ। মোল্লা কোরবান আলী এলাকার লোকের কাছে বেশ সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তি। অথচ সে হাজি সাহেবের মেয়ে ষোড়শী গওহর খানমকে প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ে যান। ঘটনাক্রমে চাঁদমুখখানি একনজর দেখেই নিজের উপর আর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রণ হারানো একজন প্রেমিকের যোগ্যতা। নইলে সে প্রেমিক নয়। এইরকম চরিত্র বুননে আন্তরিকতার কোনও কমতি রাখেননি ফারসি ছোটগল্পের জনক। তিনি প্রেমে বিভোর ও দিকভ্রান্ত মোল্লা কোরবান আলীর অবস্থা বর্ণনা করছেন -

> "আমি সামান্য ধাতস্থ হতেই নিজেকে হাজী সাহেবের বাড়ির ছাদের ওপর আবিষ্কার করলাম; একটা ভাঙ্গা টিনের চালার নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা পাইপের ফুটো দিয়ে অস্থিরভাবে সে বাড়ির ভিতর দেখিছি। একটা কক্ষের দরজার কাছে শাদা বিছানায় লজ্জায় গুটিশুটি মেরে বালিশ জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা

> এলোমেলো চুলের এক কুমারীর ওপর আমার চোখ আটকে গেল। আমি মৃদুস্বরে সেই কবিতার ছত্রটি বিড়বিড় করে আওড়াতে শুরু করলাম, যেটা কখনো কখনো মর্সিয়া অনুষ্ঠানে আগত বক্তিদের মনোযোগ বাড়ার জন্য বলতাম -
> 'নিশিদিন আমি তোমার আঁখি দেখি অবাক বিস্ময়ে
> তন্দ্রায় মগ্ন হয়েও জেগে রই তোর প্রেমের জ্বালা লয়ে।' ”[৫]

অনুরূপ প্রেমিক হৃদয়ের ছটফটানি ও অস্থিরতার নিপুণ রূপায়ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর একরাত্রি গল্পে। সুরবালার সে বাল্যপ্রেমিকের সাতকাহন -

> “এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতুহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।
> ততক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল-বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃদপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবিং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।
> বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি, যাহা করি, কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা বৃহৎ একটা বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।”[৬]

যদি উভয়ের ছোটগল্পের জগতে প্রবেশ করে শিল্পের নানাদিক অন্বেষণ করি তাহলে বিস্মিত হতে হয় পরিশ্রমী ও মেধাবী লেখকদ্বয়ের গল্পের বৈচিত্র্য দেখে। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাগরিক জীবনে বেড়ে ওঠা ভিন্ন চিন্তার ছোটগল্পের ভুবন। তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলো গ্রামীণ আবহ কেন্দ্রিক, আর তাতে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের হৃদয়রহস্য ও মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ঐকাত্ম্য। এ পর্বের গল্পে চরিত্রের বিকাশ ও পরিণামী ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে প্রকৃতি পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোস্টমাস্টার, সুভা, অতিথি প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ঠিক একইভাবে শহুরে লেখক জামালযাদেহ তারঁ গল্প ভুবনের প্রথম গল্প ফারসি শেকার আস্ত-এ শহুরে বিষয় আশয় নিয়ে গল্পবুনতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন পদ্মার পলিদ্বারা বিধৌত এলাকার জনগোষ্ঠীর থেকে নিজ গল্পের ভ্রূণ খুঁজে নিয়েছেন, তেমনি ইস্ফাহানের জায়ান্দে নামক নদীর আশেপাশের মানুষও বাঙময় হয়েছে জামালযাদেহ'র কথ্যরীতির ছোটগল্পে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের নিবিড়-আত্মিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক থেকে বিচ্ছেদজনিত জটিলতা গল্পগুচ্ছের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদ ঘটলে মানবজীবনে নেমে আসে আত্মিক মৃত্যু। ছুটি, সুভা, সমাপ্তি, অতিথি প্রভৃতি গল্প তার উজ্জ্বল উদাহরণ। দ্বিতীয় ভাগের গল্পগুলোতে তিনি শহরমুখী হয়েছেন। তাতে শহুরে বিষয় আশয় স্থান লাভ করেছে। রোমান্টিক আবহ ছেড়ে কঠিন বাস্তবের দিকে এগিয়ে যায় লেখার বৈতরণি। আর তৃতীয় ভাগের গল্পগুলোতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের নানা টানাপোড়েন আখ্যান লাভ করেছে। প্রথম দিককার ভাষা কিছুটা ঔপনিবেশিক মোড়কে আচ্ছন্ন। এরপর কাব্যিক সুষমা। চিত্রল, গীতল, উপমা আর বাক্যগঠনে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন।

পারস্য সভ্যতার উত্তরসূরি জামালযাদেহ'র প্রথম দিককার গল্পগুলোর ভাষা সহজ ও সাবলীল। তিনিই এ শাখাটি নিয়ে প্রথম নিরীক্ষা চালিয়েছেন। যার ফলে নানা চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে। তিনি মনে করতেন যে, সাহিত্য বিশেষ করে ছোটগল্প হচ্ছে 'জীবনের দর্পণ'। তাই তার যথার্থ উপলব্ধি নিয়ে জীবনের ভাষায় ছোটগল্পকে মূর্ত করে তুলেছেন। যার জন্য ইরানের কৃষ্টি-সভ্যতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং জনগণের মুখের ভাষা ব্যবহার করে সাহিত্যকে কাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার সফল প্রচেষ্টা চালান। আমরা তার গল্পের পরতে পরতে লোকজ শব্দাবলী বিশেষ করে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার দেখতে পাই। সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের নানাবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি কলমের আঁচড়ে তুলে এনেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষা সংরক্ষণে উভয়ই প্রশংসিত। তাদের ভাষা চেতনা ছিল উল্লেখ করার মতো। যেখানে যে ধরনের ভাষা, রীতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেরকম ভাষা বা ডিকশন ব্যবহার করে গল্পের ভাষাকে স্রোতস্বিনীর মতো রূপ দিয়েছেন। যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা গল্পে কাবুলীওয়ালা ও মিনির কথোপকথন থেকে জানতে পারি। পক্ষান্তরে জামালযাদেহ'র কেচ্ছেহয়ে কুত'হ বার'য়ে বাচ্চেহয়ে রিশদার'র গল্পগুলো দেখলে ভাষার এই সংরক্ষণ ও স্বতস্ফূর্ততা পরিলক্ষিত হয়।

হাস্যরস বা ব্যাঙ্গাত্মক পরিবেশ তৈরিতে উভয়েই ছিলেন সুনিপুণ কারিগর। জামালযাদেহ তাঁর রাজুলে সিয়াসি বা রাজনীতিক নামক গল্পটিতে একজন ব্যক্তি নিয়ে কী না ব্যাঙ্গাত্মক পরিবেশের তৈরি করেছেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যাপক নামক গল্পে যে হিউমার এঁকেছেন তা সত্যই শিল্পসফল ব্যাঙ্গাত্মক রচনা।

সবাই সময় শাসিত। হোক মানুষ, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, ধার্মিক বা সৃজনশীল ব্যক্তি। সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সময় শাসিত বা সময়েরই ফসল। প্রতাপশালী ব্রিটিশের সময়ে তিনি প্রস্ফুটিত হয়েছেন আপন ঔজ্জ্বল্যে। তবে স্বীয় সময়ে যে তাঁর সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার বিশেষ করে যৌতুক প্রথা ইত্যাদি সেগুলো তাঁকে তাড়িত করে হৈমন্তী'র মতো গল্প লিখে নিয়েছে। পক্ষান্তরে জামালযাদেহ শৈশবে তাঁর পিতাকে স্বৈরাচারী শাসকের হাতে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের যে মাশরুতিয়াত বা সাংবিধানিক আন্দোলন তাই শিল্প-সাহিত্যের সব শাখার বাঁক বদলে একমাত্র নেয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। কবিতা আধুনিক হয়েছে। ছোটগল্পের জন্মভূমি প্রস্তুত করেছে। উপন্যাসের বিষয়াঙ্গিকে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। নাটক পেয়েছে সঞ্জিবনী। আর তার ফসলই আমাদের জামালযাদেহ। তিনি তাঁর ক্ষরিত খুনকে ছোটগল্পের বাক্যে বাক্যে লেপ্টে দিয়েছেন। এগুলোকে আমরা উত্তরাধিকারও বলতে পারি। আল্লামা আলী আকবার দেহখোদাসহ (১৮৭৯-১৯৫৬) অন্যান্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফারসি ছোটগল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসের ভাষা, ব্যাপ্তি ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। আর আধুনিকতার জনক মাইকেল মধুসূদনও (১৮২৪-১৮৭৩) পূর্বসুরি। কেননা, তিনিই ইউরোপীয় ধারার কাব্যকলা আত্মস্থ করে বাংলা কবিতাকে আধুনিকতার কাতারে নিয়ে আসেন। এসবই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার রসদ।

দিন বা রাতের নানা সময়ের নান্দনিকতা একজন সৃজনশীল মানুষের মানসকে তাড়িত করে। সকালের স্নিগ্ধতা, পাখির কলকাকলি, শিশিরে স্নাত দূর্বাঘাসের ডগা, অরুণের প্রথম কর কতভাবে না উপস্থিত কাব্যে-গল্পে। ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত দুপুরের নিস্তব্ধতা, ছায়ায় বসে জিড়িয়ে নেয়া চাষি, দুম করে পুকুরের থির জলে দঙ্গল ছেলের লাফিয়ে পড়া যেন জীবন পায় শিল্পীর সৃজনে। গোধুলির মোহিত আভা, দিগন্তের লালিমাতে ডুবন্ত দিনমণি, পেটপুরে খেয়ে নীড়ে ফেরা পাখির দল, হাকিয়ে নেয়া গরু-মহিষের পাল, পাড়ার মসজিদে আজানের ধ্বনি কিংবা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শঙ্খ ধ্বনি আমরা বিমূর্ত হতে দেখি কলমের কালির রেখায়। নিষুতি রাতে ঝিঁঝির ডাক, দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের হাক, রুগ্নদের খুকখুক কাশি সব সবই গল্পের ভাব আর ভাষা দেয়। শহুরে সকালে নীরবতা, বেলা বাড়লেই ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়া, অফিসমুখী মানুষের ঢল, হকারের ডাক, গাড়িঘোড়ার শব্দ মাতিয়ে রাখে। সন্ধ্যায় ঘর ফিরতি মানুষের ক্লান্ত ঢল, উপচে পড়া যাত্রী নিয়ে যান-কল এগুলিও স্বমহিমায় স্থান পায় সাহিত্যে। এসব কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হয়ে সুক্ষ্মভাবে তাঁর গল্পের পরতে পরতে বুনে দিয়েছেন। গল্পগুচ্ছের প্রায় সব গল্পই বারোমাসের ছয় ঋতুর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনে ঋদ্ধ। সুভা গল্পে নিস্তব্ধ দুপুরের যে নান্দনিক উপস্থাপন দেখি তা যেমনি স্বতন্ত্র তেমনি বিরল। শীত প্রধান দেশের জামালযাদেহ তাঁর গল্পে চারটি ঋতুর ব্যতিক্রমী উপস্থাপন করেছেন। সাথে বরফে ঢেকে যাওয়া প্রকৃতির স্পষ্ট ভাষিক ক্যানভাস এঁকেছেন। এক্ষেত্রে উভয় কথাশিল্পীর শৈল্পিক সুর এক মোহনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ বাংলা ও ফারসি ভাষার ছোটগল্পের জনক, এ রীতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা করেছেন, চরিত্রগুলোকে জীবন্ত ও একান্ত পরিচিত করে তুলতে ভিনগ্রহের কাউকে নির্বাচিত না করে আমাদের আশেপাশের কোনো ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে আমাদের ভাষায়ই কথা বলিয়েছেন। সময়ের অভিঘাত, মোড় ইত্যাদিকে সঠিকভাবে রূপায়িত করেছেন। এগুলিই তাদের ছোটগল্পের মূল সুর। অবয়বেও প্রায় মিল পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের ছোটগল্পে শিল্পরূপ, নান্দনিকতা আর প্রকাশভঙ্গিতে যে সাযুজ্য যে ফুটে উঠেছে তা উপস্থাপিত হচ্ছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষা প্রকাশের মাধ্যম। ভাষাই মানুষকে আকৃষ্ট করে। নেয় গহীনে টেনে। লিখিয়ে মানস মানেই তাদের থাকবে এক অন্যরকম ভাষাশৈলী। ভাষার কারিগরি খাটিয়ে সামান্য বিষয়কে কিংবা লোকচক্ষু স্বভাবতই এড়িয়ে এমনকিছুকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলাই ভাষাচিত্রীগণের কাজ। রবীন্দ্রনাথ অনন্য উচ্চতার একজন ভাষাচিত্রী। তাঁর গদ্য আবেগশাসিত, হৃদয়তল-উৎসারিত এবং কবিতাপ্রবণ। গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রাতিস্বিকতা এই যে, আজীবন তিনি কবির মতো গদ্য লিখেছেন। আর এ-জন্যই অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঠাকুরের গদ্যকে আখ্যায়িত করেছেন "মহাকবির গদ্য" অভিধায়। পক্ষান্তরে ইরানের সবচেয়ে পরিশ্রমী লেখক ও গবেষক সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ এই ভাষারই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যই গল্প লেখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে চেয়েছেন ভিনদেশি ও ভিনভাষীগণ যেন ফারসি শিখতে পারেন। তাই গদ্যের আশ্রয়ে অলিগলির ভাষা, প্রবাদ বা মিথের ভাষাকে তিনি আগামীর জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন। ড. সাইয়েদ মোহাম্মদ রেজা হাসেমী এ সম্পর্কে বলেছেন, একজন ভাষাতত্ত্বের গবেষক হিসেবে আমি এই বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক মনে করছি যে, জামালযাদেহ 'ভাষা চেতনা'র (Language Conciousness) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতেন। ভাষা চেতনার বৈশিষ্ট্য মানে হচ্ছে ভাষা সম্পর্কে সঠিক অবহিতি এবং এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জাতীয় ঐক্যের কর্মী হওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা।(সবুর, ২০০৮: ০৮)

পাশাপাশি জামালযাদেহ তাঁর গল্পের জমিনে চাষকৃত ফসলরূপী শব্দগুলোর ব্যবহার ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মুন্সিয়ানার সাথে শব্দ ব্যবহার করে এক দারুণ আবহ ও চেতনা সৃষ্টি করায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অনুরূপ বাংলার কবি ও গদ্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম দিককার গল্পগুলোতে উভয় চেতনাকেই দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সুনিপুণ সে গদ্যের উদাহরণ হচ্ছে -

> "দেখিল জল খলখল ছলছল ছলছল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।" [খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন][৭]

উপমা বা উৎপ্রেক্ষার যে প্রতীতি আমাদের জ্ঞানে সংরক্ষিত তা শুধুই কাব্যিক। এর সাথে কোনোভাবেই যেন গদ্যের কোনও সম্পর্ক আমরা আবিষ্কার করতে পারি না। এটা আমাদের পাঠক হিসেবে দুর্বলতা। তাই বলে সাহিত্যকলার দারুণ উপাদান যা রচনাকে মনোহরা করে তা থেকে সম্পর্কচ্যুত নয়। কেউ যদি প্রধানত কবি হন তাহলে তাঁর গদ্যে এ অলংকারটি অত্যুজ্জ্বল করে মানকে। ফারসি ও বাংলাভাষার ছোটোগল্পের জনক জামালযাদেহ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ই এ অলংকারটি স্বীয় ছোটগল্পের পরিবেশ পরিস্ফুটনে ব্যবহার করেছেন। এটি তাদের গদ্যের আরেক ধরণের বৈশিষ্ট্য। শ্যামল বাংলাদেশের শ্যামলিমা যাকে আকৃষ্ট করে শহুরে মনকে গল্পের ক্যানভাসে উদ্বেলিত করেছিলো সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুভা গল্পে উপমাময় কথা বুনছেন এভাবে -

> "সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমেই সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।"[৮]

পক্ষান্তরে বিশ্বকবিতার লালন ও চারণভূমি ইরানের ভূমিপুত্র কাব্যকলায় হাত না পাকালেও কাব্যিক অলংকার উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। গদ্যের প্রসাদগুণ বৃদ্ধির জন্য জামালযাদেহও তাঁর গল্পের সংলাপ-আখ্যানে গদ্যকবির পরিচয় ফোটাতে উপমার ব্যবহার করেছেন। তবে সে উপমা নিজস্ব দেশীয় ভঙ্গির। درد دل ملا قربان علی গল্পে উন্মাদ প্রেমিকের ঘুমহীন ছটফটানি সে রাতের বর্ণনায় লিখছেন -

> "প্রতিবেশী সবাই ঘুমে ডুবে ছিল। কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। চারপাশ থৈথৈ জোসনায় ভরা। দেয়াল আর ছাদগুলো যেন রূপার তৈরি, একদম দুধের মতো শাদা দেখাচ্ছিল। দূর থেকে

> মসজিদে শাহর গম্বুজটাকে বড় একটা ডিমের মতো লাগছিল, মিনার দুটোকে লাগছিল দুটি আঙ্গুলের মতো, যেন সেই দুই আঙ্গুলের ফাঁকে ডিমটাকে ধরে রেখেছে।"[৯]

গল্পকারগণকে চরিত্র রূপায়নে হতে হয় দক্ষ শিল্পীর মতো। কিংবা স্বর্ণকারের মতো। ঝলকে দেখা ঘটনা, পলকে দেখা মানুষ, লহমায় ধারণ করা আবহের সম্মিলন করে অত্যন্ত মমতা দিয়ে বুনতে হয় গল্পের পাত্রপাত্রী বা কুশিলবদের। তাতে পাঠক নিজেকে বা তার পরিচিত কাউকে খুঁজে পান গল্পের চরিত্রে। চরিত্র হাসে, কাঁদে, বিদ্রোহ করে কিংবা প্রেমের যে মূর্তি হয় তাতে মানব মনে দাগ কেটে যায়। মুছে না যা তার থেকে ভালো কোনও চরিত্রের সাথে পরিচয় ঘটার আগ পর্যন্ত। ঐতিহ্যের লালনকারী ও ধারণকারী ইস্ফাহানের ভূমিপুত্র জামালযাদেহ ইরানের অভ্যন্তরীণ মানুষদের দিয়ে যে কথা বলে নিয়েছেন, যে আচরণ উপস্থাপন করে দিয়েছেন তাতে সে চরিত্রগুলো সত্যিই পাঠক মনে দাগ কেটে যায়। যেমন মোল্লা কোরবান আলী, ভালুক খালার বন্ধুত্ব গল্পের হাবিবুল্লাহ ও নিষ্ঠুর-লোভী কাজাক সৈন্য, ফারসিই চিনি গল্পের শায়খ, ভিলানুদ্দৌলা গল্পের নাম চরিত্র, যেমন ডেগচি তেমন বিট গল্পের হাম্মামখানার সেই মর্দনকারী আমাদের মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। এটা গল্পকারের সার্থকতা। অনুরূপ আমাদের বাংলার আলো-বাতাসের লালনকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৈমন্তি, ফটিক, সুভা, সুরবালা, কাবুলিওয়ালা ইত্যাদির যে পোট্রের্ট করেছেন তা পাথরে খোদাই করার মতো। স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলেও তারা অনায়াসেই এসকল চরিত্রের নাম বলতে পারেন। তার মানে চরিত্র রূপায়নে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরম মমতায় বুনতেন চরিত্রগুলো। যেমন সুভা গল্পে তিনি বলছেন -

> "সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল-এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।
> কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময় ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে তর্জমা করিতে হয় না-মন আপনি তাহার উপর ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত, কখনো মুদিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে মিলিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিকবিদিকে ঠিকরিয়া উঠে।"[১০]

অনুরূপ আমাদের একসময়কার প্রশাসনিক ভাষা ফারসির মিহ্রিখণ্ডের গল্পকার জামালযাদেহ তার কলমের কালিতে অঙ্কিত গল্পের চরিত্রগুলোর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছিলেন। ফারসি শেকার আস্ত বা ফারসিই চিনি গল্পে শায়খের টিপিক চরিত্র রুপায়নে মুন্সিয়ানা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সেই মুন্সিয়ানার নজরানা হচ্ছে -

> "কিন্তু এরই মধ্যে জেলখানার কোন এক কোন থেকে আসা একটা হুইসেল আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়ে তা বলা থেকে আমাকে বিরত করল। ওই কোনায় এমন একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল প্রথমে যাকে আমি ময়লার স্তূপে শিকারের অপেক্ষায় কুণ্ডুলী পাঠিয়ে বসে থাকা একটা শাদা বিড়াল মনে করেছিলাম। কিন্তু না দেখা গেল তিনি এক শায়খ, যিনি মাদ্রাসার অভ্যাস মতো বগলের নিচে দু'হাঁটু দিয়ে দু'পায়ের ওপর বসা আর আবা দিয়ে কান পর্যন্ত ঢাকা। আর চকচকে সাদা বিড়ালটা হচ্ছে তার পরিপাটি পাগড়ীটা তার কানের লতি পর্যন্ত ঝুলানো পাগড়ির প্রান্তটাই একটা বিড়ালের লেজের আকৃতি সৃষ্টি করেছিল। আর ওই হুইসেলটা আসলে ছিল তার ফিসফিস করে দরুদ পড়ার শব্দ।"[১১]

প্রকৃতি আমাদের চারণভূমি। এখানেই হেসেখেলে বেড়াই। এর ফল, জল, ফসলে বেঁচে থাকি। ছায়ানীড়ের আশ্রয়ে পাই প্রশান্তি। ঝরঝর বৃষ্টির মূর্ছনায় মেতে উঠি। কুয়াশায় চাদর মুড়িয়ে চলি। পূর্ণিমার সোমের সাথে কথা বলি। বিহানকালের স্বচ্ছ শিশির কণা, আমাদের করে তোলে আনমনা। নদীর কলতান কিংবা বসন্তে কুহুতান, ঝাঁক বেধে অতিথি পাখি কিংবা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খাবার দিয়ে হাঁসকে ডাকি। সন্ধ্যা পরের লালিমা রেখা, মধু মাসে রসালো ফলের দেখা, ভোররাতে ফোঁটা শিউলি ফুল, সফেদ কাশফুলে ছাপানো শরতের নদীর দুকূল। সবই আমাদেরকে আনন্দ দেয়। উদ্বেলিত করে। কষ্ট মুছে দিয়ে আনন্দে বাঁচতে শেখায়। আর লিখিয়ে যারা তাদেরকে খাতা কলম নিয়ে নান্দনিক অনেক কথা বুনতে বলে। সাহিত্যের প্রধানতম উপাদান হয়েছে এখন প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ। অথচ এই সাহিত্যের খোলস ছিল আগে রাজা-বাদশাহগণের স্তুতিতে ফেনিল। সেই ফেনিল থেকে জীবনঘনিষ্ঠ রূপে আজ রূপান্তরিত হয়েছে সাহিত্য। কথাসাহিত্য তো অলিগলির সাধারণ মানুষের বিষয়ে ঠাসা। ঠাসা আরও প্রকৃতি ও নিসর্গের দারুণ রসে।

জামালযাদেহ একজন জীবনঘনিষ্ঠ ও আধুনিক মানসিকতার গল্পলেখক। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই প্রকৃতি হেসে উঠেছে। নিসর্গের দারুণ উপস্থাপনা গল্পকে করেছো আরও প্রাণবন্ত। এমনই প্রাণবন্ত নৈসর্গিক বুনন পাই তাঁর দোস্তিয়ে খলে খরসেহ নামক গল্পে। তিনি ফারসাঙ্গের বরফ পড়া ও সেসময়কার আশপাশের বর্ণনায় লিখছেন -

> "বরফও থামছিল না; তার দানাগুলো অনবরত ভারী হচ্ছিল। প্রথমে মশার মতো, তারপর মাছির আকারের আর তারপরে ভিমরুলের চেয়ে বড় হচ্ছিল, আর লাখ লাখ শাদা প্রজাপতির আকৃতি সৃষ্টি করছিল, যেগুলো নির্জীব ও ভারী হয়ে উপরের প্রেম-ভালোবাসার বাগান থেকে মাটিতে বর্ষিত হচ্ছিল, আর মাটির ডাস্টবিনের প্রেমে জীবন উৎসর্গ করে তাকে শাদা জামা পরিয়ে দিচ্ছিল।"[১২]

পক্ষান্তরে বাংলার জল, বাংলার মাটির অকুণ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে প্রকৃতি প্রাণ পায়। নির্মলতা ও পেলবতায় গল্পের আবহ হয়ে ওঠে মনোহর। তেমনই আবহ নিয়ে মেঘ ও রৌদ্র গল্পের প্রস্তাবনা করছেন এভাবে -

> "পূর্বদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকাল ম্লান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।"[১৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, মহাদেশ একটি হলেও ভৌগলিক সীমারেখার জন্য প্রকৃতির অবস্থান ভিন্ন। তাই নৈসর্গিক রূপ ভিন্নতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উভয়ের ছোটগল্পের জমিনকে বহুবর্ণিল করেছে।

শিশুমন কাদামাটির মতো। আবার স্বচ্ছ জলের ঝর্ণার মতোও। কাদামাটি এজন্য যে এটিকে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে গড়িয়ে নেয়া যায়। আবার স্বচ্ছ জলের ঝর্ণার মতো এজন্য যে এখানে নেই কোনও পঙ্কিলতার ছাপ। এই নিষ্কলুষ মনে অল্পকিছুতেই খুশির ফোয়ারা ফোঁটানো যায়। যায় তাদেরকে কল্পনার ডানায় ভর করিয়ে পরিস্তানে ঘুরিয়ে আনা। তাদেরকে যদি পাঠের টেবিলে বসানো যায় তাহলে তারা নিবিষ্ট পাঠক হয়ে যেমনি আনন্দ পাবে তেমনি পাবে কৌতূহলী মনের স্ফুরণ। এ স্ফুরণের দ্বারাই তারা নিজের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার উপাদান পাবে। সাথে নিজেকে সৎ ও সাহসী করে গড়ে তুলবে। তাই তাদেরকে আদর ও যত্নে রাখতে হবে। তারা যেনো ভুলে বা রাগে বিপথে পা না বাড়ায়। এজন্যই সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আগলিয়ে রাখার দায়িত্বই আমাদের বড়দের উপর। এমনি বড়দের ও ছোটদের শিক্ষামূলক একটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, শিশুরা দুষ্টু। তাই তাদেরকে শাসনের জোড়ে শোধরাতে চাইলে হিতে বিপরীত ঘটবে। যেমন ইঁদুরের ভোজ গল্পে স্কুলের ছেলেরা নতুন পণ্ডিতের কাছে কিছুতেই পড়বেন না। অথচ সেই পণ্ডিতই তাদেরকে এমন নাটকীয় আচরণে আদর করলেন যে, তারা অচেনা অবস্থায় কালীকুমার তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তাদের স্কুলে কাজ নিতে জোরাজুরি করলো। গল্পটি রম্য হলেও শিশুদের শেখার উপযোগী ও নিটোল।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ও আবহে লালিত জামালযাদেহ তাঁর মাত্র বারো বছর কাটানো ইরানের অমোচনীয় স্মৃতিকে নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন সারাজীবন। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু ও ভাষা সব ইরানী। শিশুদের জন্য বিশেষ করে গল্পগ্রন্থ লিখেছেন তিনি। কেচ্চেহয়ি কুতাহ বারায়ে বাচ্চেহয়ি রিশদার শীর্ষক গল্পগ্রন্থে বারোটি শিশুতোষ ছোটগল্প

রচনা করে তিনি শিশুদের মনের কথা বুনেছেন। যেমন নান ও দানদান নামক গল্পে একজন শিক্ষকের মৃত্যুর কথা শৈশব-কৈশোরকালীন কোমল মনে কতটা দাগ কাটে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

উপসংহার : বাংলা ও ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠ পরিশ্রমী লেখক হিসেবে পরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ তাঁদের ছোটগল্পে প্রকৃতি, নিসর্গ, স্বাজাত্যবোধ, সমকালীন প্রেক্ষাপট, প্রেমিকের সাতকাহন, গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের রূপায়ণ, ভূগোল ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও উপজাতি ইত্যাদি বিষয় বা ভাব সুনিপুণ চিত্রকরের মতো এঁকেছেন। যেগুলো প্রায়ই কাছাকাছি। পাশাপাশি তাঁদের শব্দ ব্যবহার, উপমা-উৎপ্রেক্ষার বুনন, বর্ণনা রীতি, নির্মাণ কৌশল, চমৎকারিত্ব ইত্যাদি অনেকাংশেই মিলে যায়। উভয়ের প্রকাশ পদ্ধতিতে এনকটাই সাদৃশ্য আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে তাঁর ভাষার একধরনের মাধুর্য। আর বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে জামালযাদেহ অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন।

Reference:

১. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, রাজুলে সিয়াসি, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৬০

২. বিশী, প্রমথ নাথ, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প,* কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন্স, ১৩৬৪, পৃ. ৪৫

৩. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দোস্তিয়ে খালে খারসেহ, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৭২

৪. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৬৯

৫. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দারদে দেলে মোল্লা কোরবান আলী, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৭১

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৭৩

৭. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৬৮

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৭৩

৯. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দারদে দেলে মোল্লা কোরবান আলী, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৯২

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৯৭

১১. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, ফারসি শেকার আসত, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ০৫

১২. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দোস্তিয়ে খালে খারসেহ, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৮০

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৯৭

Bibliography:

জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী: রাজুলে সিয়াসি, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* (ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল)

বিশী, প্রমথ নাথ, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প,* কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন্স, ১৩৬৪

ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩

রফিক, আহমদ, *রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংস্কৃতি,* ঢাকা, অনিন্দ্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০২০

হাসেমী, ড. সাইয়েদ মোহাম্মদ রেজা, *একদা এক সময়,* ইরান, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮

রহমান, বদিউর, *রবীন্দ্র জীবনের আশি বছর,* ঢাকা: কথা প্রকাশ, একুশে বইমেলা, ২০১২

মাওলা, ড. আহমেদ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,* ঢাকা: ভাষা প্রকাশ, ২০১৯

হায়দার, মুহম্মদ, *রবীন্দ্রনাথ: তিনটি গল্প,* ঢাকা: মূর্ধণ্য, ডিসেম্বর, ২০২১

হাকিমি, ইসমাইল, আদাবিয়াতে মোআসেরে ইরান, তেহরান: আসাতির প্রেস, ২০১৯

শারহে হলে অশ্বায়ে জামালয়াদেহ ব খ্বলামে খোদ বে খ্বলামে সাইয়েদ হাসান তাক্বিযাদেহ, তাবরিজ: নাশরে দানেশকাদেয়ে আদাবিয়াতে তাবরিজ, ১৯৫৪

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 289 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 289 - 293
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হরিশংকর জলদাসের গল্প : নিম্নবর্গীয় নারীর সামাজিক অবস্থান

গোবিন্দ রায়
গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : gobindaroy914@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
নিম্নবর্গ, নিম্নবর্গ ও নারী, দইজ্যা বুইজ্যা, চিঠি, দুলারি এবং কয়েকজন, কুন্তীর বস্ত্রহরণ।

Abstract

আদিকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণীবিভাজিত। এই শ্রেণী বিভাজিত সমাজ আবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত। বিংশ শতাব্দীর আশি দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় জীবন নিয়ে সাহিত্যচর্চার জোয়ার আসে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক অর্থে নারীরাও নিম্নবর্গ। কেননা নারী পুরুষের দ্বারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিতা, নিপীড়িতা ও শোষিতা।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সাহিত্যেও নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন সংগ্রামের কথা বলা হলেও তা ছিল মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের খন্ড চিত্র মাত্র। নিম্নবর্গীয় জীবন তথা নিম্নবর্গ নারীদের কথা বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ভাবে উঠে আসতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এই সময় পর্বে একঝাঁক কথাসাহিত্যিক তাদের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবন চিত্র সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেন। এপার বাংলার পাশাপাশি ওপার বাংলার কথাসাহিত্যেও এই নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে। ওপার বাংলার জীবন দরদী শিল্পী হরিশংকর জলদাস নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবনের চরম ব্যার্থতা, বেদনা, হতাশা, আশা নিরাশার ছবিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ছোটগল্পে রূপদান করেছেন। এই নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য নারীদের জীবন সংগ্রামের পরিচয়টি গল্পকার হরিশংকর জলদাসের ছোটগল্পে কীভাবে সামাজিক ও আর্থিক প্রেক্ষিতে ফুটে উঠেছে তা এই আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Discussion

১৯৫৫ সালের ১২ অক্টোবর চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গার জেলে পল্লীতে হরিশংকর জলদাসের জন্ম। সামাজিক অপমানের জ্বালা মেটানোর জন্যই তিনি লিখতে বসেন। তাই তাঁর প্রতিটি লেখাতেই তাঁরই জীবন অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। জল ও জলমগ্ন নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষজন তাঁর কথাসাহিত্যের প্রিয় বিষয়। নিম্নবর্গীয় সমাজ থেকে উঠে আসা বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাকার হরিশংকর জলদাস তাঁর 'কৈবর্ত কথা' গ্রন্থে বলেছেন –

> "আমি পরবর্তী জন্মেও জেলের ঘরে জন্মাতে চাই। যে অর্ধশিক্ষিত জেলে-দম্পতি নিজের ঘরের টিন বিক্রি করে ছেলের পরীক্ষার ফি দেন, যে অশিক্ষিত দাদিমা ঝড়জলের গভীর রাতে নাতিকে হারিকেনের আলোয় কর্দমাক্ত পথ দেখাতে দেখাতে প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি থেকে কালো মাটির জেলে পল্লিতে নিয়ে আসেন, যে জেলে পল্লিতে সহোদররা অর্ধপথে নিজেদের পড়া থামিয়ে দিয়ে দাদার পড়ার সুযোগ করে দেয়, সেই সমাজে আমি বারবার জন্মাতে চাই। 'জলদাস' পদবির তিলকটি কপালে ধারণ করে ধন্য হতে চাই।"[১]

সমাজের এই অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষরাই তাঁর গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'Subaltern' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'নিম্নবর্গ' প্রথম ব্যবহার করেন রণজিৎ গুহ। এই নিম্নবর্গ দ্বারা বোঝানো হয়েছিল সেই সব মানুষ যারা সমাজের একেবারে প্রান্তিক, ব্রাত্য মানুষ হিসেবে বসবাস করছে এবং যারা আর্থিক দিক থেকেও খুবই দুর্বল, যারা নানা করণে, নানাভাবে উপেক্ষিত, শোষিত, বঞ্চিত; সেই সব মানুষের পরিচয় এখানে নিম্নবর্গীয়। এই শোষিত, বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষেরা বাংলা সাহিত্যে সুদূর চর্যাপদের সময় থেকে উঠে এসেছে। চর্যায় পাওয়া যায় –

> "নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ
> ছই ছই জাই সো ব্রাহ্মণ বাড়িআ।।"[২]

বাংলাদেশের অন্যতম কথাকার হরিশংকর জলদাসের লেখায় প্রান্তিয়বর্গের উপস্থিতি পাওয়া যায়। হরিশংকর অন্ত্যজ মানুষের চোখ দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করেন। তাদের পুরাণকথার ভেতর দিয়ে যে ইতিহাস তুলে আনেন, তা আধিপত্য বিস্তারকারী হেজিমনি শ্রেণীর নয় বরং শোষিত দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। নিম্নবর্গীয় কণ্ঠস্বরকে তুলে এনেছেন মূলস্রোতের মানুষের সাহিত্যে, যা নিচের দিক থেকে ইতিহাসকে দেখবার ইঙ্গিত বহন করে, ওপারের দিক থেকে নয়। আন্তেনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত কারাগারের নোটবুক বইটিতে নিম্নবর্গ সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেন। গ্রামশির মতে, নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর পক্ষে কলম ধরতে হবে বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু তাতে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর অন্তরের কথা কখনোই উঠে আসে না। নিম্নবর্গীয় মানুষের অন্তরের কথা জানতে হলে, নিম্নবর্গীয় লেখকের লেখা পড়তে হবে। আমাদের আলোচ্য হরিশংকর জলদাস তেমনই একজন নিম্নবর্গীয় শ্রেণিভুক্ত লেখক। হরিশংকর জলদাস নিজে একজন 'জলপুত্র' হওয়ার কারণে শৈশব থেকেই সামাজিক অপমানের শিকার হয়েছেন। তাই সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্যই 'জলপুত্র'-দের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কথাই লিখেছেন। তাঁর 'জলদাসীর গল্প' (২০১১) এর প্রতিটি গল্পই সেই কথা বলে।

জলদাসের 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে দেখা যায় ব্রাত্য সমাজের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের নিপীড়নের চিত্র। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন মার্শোদের দ্বারা জগমোহন জলদাসের ষোলো বছরের মেয়ে পারুবালা ধর্ষিত হয়। এছাড়া চলে নানা রকমের অত্যাচার। গল্পকারের বর্ণনায় উঠে আসে সেই চিত্র –

> "যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা খালি হাতে যায় না। মধুসূদনের ছাগলটা, মালতির হাঁস চারটি, বুড়ো হারানের বাপের প্রসবোন্মুখ গরুটি নিয়ে যায়। জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। শুধু মনে আগুন জ্বলে, রাগে-ক্ষোভে শরীর কাঁপে। সেই কাঁপুনি অতি কষ্টে জীর্ণ কাপড়ের তলায় ঢেকে রাখে তারা।"[৩]

এরকম নানাভাবে পতেঙ্গার এই জেলে পাড়ার মানুষরা পাকিস্তানি খান সেনা ও রাজাকারদের দ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়। 'সুবিমলবাবু' গল্পে দেখা যায় সমাজের উচ্চ বর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পে আমরা দেখি জাত্যাভিমানের অন্ধ অবিবাহিত সুবিমলবাবু নিম্নবর্ণের মানুষদের একদম সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি তাঁর বাবা হরিচরণ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ও কুলীন ব্রাহ্মণ। বাবার মতো তিনিও কৌলিন্যকে প্রাধান্য

দিতে গিয়ে নিজে বিবাহ করেননি এবং বোনেদেরও বিয়ে দেননি। কিন্তু মানুষ জৈবিক চাহিদাকে দমন করতে পারে না। তাই শরীরের কামনা ও চাহিদা মেটাতে শিক্ষিত অধ্যাপক বেছে নেন নিম্নবর্গের মালতী জলদাসকে –

> "সেদিন শুক্রবার। শুক্রবার কলেজে সাপ্তাহিক ছুটি। শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে শনিবারও কলেজ বন্ধ। ...বারান্দায় মাছ কুটছে মালতী। বিছানা থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। মাছ কুটতে কুটতে বুকের আঁচলটা সরে গেছে মালতীর। টুটাফাটা ব্লাউজ ভেদ করে ডান পাশের স্তনটি বেরিয়ে আসতে চাইছে তাঁর। বাম পাশের স্তনটি মালতীর বাঁ হাঁটুতে চাপা পড়ে আছে। সুবিমলবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখে মালতীর আড়াল-স্তনের সঙ্গে সুজলার খোলা স্তন একাকার হয়ে যাচ্ছে। ...কিছুক্ষণ পর আবার মালতীর কণ্ঠ, 'আপনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছার, আমি সামান্য জলদাসী'।"[৪]

মালতীকে যখন সে শোষণ করতে থাকে তখন তাঁর নিজের জাতের কথা ভুলে যায়। এই ভাবেই নারীরা বিশেষ করে নিম্নবর্গের নারীরা উচ্চবর্গের পুরুষদের লালসার শিকার হয়ে আসছে।

নারী শোষণের আর একটি গল্প 'চিঠি'। গল্পটি আগাগোড়া চিঠির ভঙ্গিতে লেখা, যা গল্পটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। এই গল্পে দেখা যায়, মুসলিম ঘরের এক মেয়েকে তাঁর বাবা শিক্ষিত করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। চাষ-বাস করে অক্লান্ত পরিশ্রমের অর্থ তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য খরচ করে। কিন্তু বাবার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। কারণ স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক হান্নান স্যারের কামনার শিকার হয় তাঁর মেয়ে। শেষ পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা শিকার করতে না পেরে মেয়েটি তাদের বাড়ির উঠানে আমগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর আগে মেয়ে তাঁর সমস্ত ঘটনা চিঠির মাধ্যমে তাঁর বাবাকে লিখে যায়। মেয়েটির চিঠিতে উঠে এসেছে তাঁর যন্ত্রণা ও ব্যথার কথা–

> "গোটাটা দিন নিজের সঙ্গে নিজে অনেক যুদ্ধ করেছি বাবা। ...এক সময় মন বলল, তোমার চলে যাওয়া ভালো। তুমি না গেলে তোমার বাবা, মা, ভাই– এদের লজ্জার সীমা থাকবে না। তোমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হবে। টানা-হ্যাঁচড়ার প্রতিযোগিতায় তোমার কমজোর বাবা একদিন না একদিন হেরে যাবে। তোমার জীবন আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তাই তোমার চলে যাওয়াই উচিত। আমি মনের কথা শুনলাম। আমি চলে গেলাম বাবা। তুমি আমার উপর রাগ কর না। মাকে বল, না কাঁদতে।"[৫]

আমাদের এই শিক্ষিত সমাজ মুখোশ পরে আছে। রাতের অন্ধকারে সেই মুখোশ খুলে গেলে তার ভয়ঙ্কর রূপটি বেরিয়ে আসে। আর আমাদেরই এই সমাজের অসহায় মানুষরা সেই লালসার শিকার হয়। বিশেষ করে নারীর ওপর অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বেড়েছে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যাও। জলদাসের এই 'চিঠি' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে ধর্ষিত এক নারীর আত্মকথা। সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো চেয়েছিল সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বাঁচতে। কিন্তু আমাদেরই এই শিক্ষিত সমাজ তা দেয়নি। তাই মা-বাবার লজ্জার কথা মাথায় রেখে সে বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। গল্পকার এই গল্পের মাধ্যমে শুধু আমাদের শিক্ষিত সমাজের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হিংস্র পশুর কথা বলেননি, সেই সঙ্গে একটি মেয়ের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা বেদনার কথাও সুন্দরভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

হরিশংকরের 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে দেখা যায় প্রান্তবর্গীয় এক নারীর অসহায়তার ছবি। গল্পে আমরা দেখি শ্যামল দত্ত নামে এক উচ্চবর্গীয় মানুষ দুলারিকে বিয়ে করে। দেড় বছর পরে দুলারি জানতে পারে, তাঁর স্বামী বিবাহিত এবং তাঁর দুটি সন্তান আছে। দুলারি তাঁর স্বামীর কাছে কারণ জানতে চাইলে শ্যামল জানায়–

> "এ-তো তোমার সৌভাগ্য। ...উদ্ধার তো করেছিই। জাইল্যার মাইয়ারে বিয়ে কইরা এই শ্যামল দত্ত তো তোমাকে জাতে তুলেছে।"[৬]

ক্ষোভে, দুঃখে অসহায় দুলারি শ্যামলের জাত তুলে বিদ্রুপ করে। তাঁকে চড় মেরে তাড়িয়ে দেয়। সে হয়ে পড়ে একাকী অসহায়। অতঃপর দুই সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কিন্তু সমাজের কাছে সে আবার লাঞ্ছিত হয়, ধর্ষিত হয়। একবার নয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 289 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বারংবার। ফলে দুলারি এক সময় সকল উচ্চবর্ণের প্রতি রাগ ঘৃণা দেখাতে থাকে। এভাবে এগল্পে উচ্চবর্গের দ্বারা প্রান্তবর্গীয় নিম্নবর্গের শোষণের দিকটি তুলে ধরেছেন।

'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' গল্পেও ব্রাত্য নারীর শোষণের দিকটি উঠে এসেছে। গল্পে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের ইচ্ছে মালোপাড়ার বহু পুরোনো শ্মশান ঘাটটিকে একটি বাগান বাড়ি বানানোর প্রাস্তাব আনা হয়। পরিবর্তে মালোদের জন্য একটি বাঁধানো শ্মশান ঘাট বেধে দেবে। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে বাধা দেয় কুন্তী। সে বলে–

> "পূর্ব পুরুষের শ্মশান আমাদের। আমাদের বাপ-দাদা, তাদের মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই শ্মশানের সঙ্গে। আপনি কি করে বলেন ওই শ্মশান ছেড়ে দিতে!"[৭]

কুন্তির এই প্রতিবাদ শুনে থতমত খেয়ে যায় আবুল কাশেম। সে কুন্তীকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কুন্তী সরাসরি জানিয়ে দেয় –

> "দরকার নাই আমাদের বাঁধানো শ্মশানের। পূর্ব পুরুষের শ্মশান আমাদের মাথায় থাক। এই শ্মশানের দিকে নজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাহেব।"[৮]

মালো পাড়ার সকলেই কুন্তীর কথায় সম্মতি জানায়। এর কিছুদিন পর ভোটের জন্য অজয় মন্ডলের বাড়ির উঠানে মিটিং বসে। সকল মালোকে একত্রে আবুল কাশেম তাঁর পার্টিকে ভোট দিতে বলাতে কুন্তী পুনরায় প্রতিবাদ করে–

> "আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি না। কাকে ভোট দেবে তা আমরাই ঠিক কইরবো। কাকে ভোট দেব, তা নির্ধারণ করার আপনি কে?"[৯]

এই প্রতিবাদের পরিণাম হয় মারাত্মক। সেদিন রাতেই অজয় মন্ডল মারা যায়। তাঁর মৃত দেহ নিয়ে কুন্তীসহ অনেক মালো শ্মশান ঘাটে এসে উপস্থিত হলে আবুল কাশেম তার দলবল নিয়ে হাজির হয় এবং শ্মশানে দাহ কার্য করতে নিষেধ করে। কিন্তু কুন্তী না শুনলে কাশেমের লোকজন মালোর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ফলে কুন্তী ছাড়া সবাই পালিয়ে বাঁচে। সেই সময় শহিদুল আর ফখরে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। একটানে কুন্তীর শরীর থেকে শাড়ী খুলে নেয়–

> "ফখরে কাছে গেলে কুন্তী দুরে সরে যেতে চাইল। কিন্তু বেশি দুর যেতে পারল না। শহিদুল এসে জুটল ফখরে আলমের সঙ্গে। শহিদুল একটানে কুন্তীর শাড়ি খুলে ফেলল। কুন্তীর পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। কুন্তীর নিতম্বে হাত দিল শহিদুল। এই সময় কোত্থেকে লাঠি হাতে দৌড়ে এল শান্তনু। ফখরে আলম এক বাড়িতে শুইয়ে দিল শান্তনুকে। শহিদুল ততক্ষণে কুন্তীর পেটিকোটের ফিতে ধরে টান দিয়েছে। গিঁট খুলে গেছে। পেটিকোট খুলে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। কুন্তী চোখ বন্ধ করল। তাঁর গলা চিড়ে বেরিয়ে এল, 'ভগবান রে...।"[১০]

এভাবে কুন্তী একাই লড়েছে উচ্চবর্গের মানুষদের বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ করতে জানে। সমাজকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে সে একাই থাকবে। জয় তাঁর একদিন হবেই।
হরিশংকরের বহু গল্প–উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষজনের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণ, হাহাকার ও লাঞ্ছনা উঠে এসেছে। এককথায় ব্রাত্য সমাজের আত্মকথন যেন তাঁর গল্পগুলি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "হাজার বছর ধরে প্রচলিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য মূলত আমি লেখালেখি করি।"[১১]

তাঁর সাহিত্যে প্রান্তবর্গের নর-নারী সম্পর্কে রয়েছে স্বতন্ত্র নীতিচেতনা। একদিকে যেমন আছে প্রেমানুভূতি বা ভালোবাসা, তেমনি আছে আদিম যৌন প্রবৃত্তির তাড়না; দাম্পত্য জীবনে আছে মিলন বিরহ ও ক্রুর বিচ্ছেদ। নর-নারীর আদিম বৃত্তি, দ্বন্দ্ব–বিবাদ–জিঘাংসা, প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষার বিচিত্র প্রকাশ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় প্রকাশ পেয়েছে জলদাসের গল্প উপন্যাসে। এপ্রসঙ্গে গল্পকার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন –

> “আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি বা যাদের নিয়ে লিখি, যে সম্প্রদায় বা যে অপাংক্তেয় মানুষদের নিয়ে লিখি, তাদের বিনোদনের প্রধান উপায় কিন্তু এই যৌনজীবন, যৌনতা।”[১২]

নিম্নবর্গের প্রতিবাদ প্রতিরোধ গুরুত্বসহ উপস্থাপন করছেন হরিশংকর। জীবন-জীবিকার তাগিদে আমৃত্যু কর্ম তৎপর এই নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে একপ্রকার নিবিড় ঐক্য পরিদৃষ্ট হয় তাদের টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষায়, আত্মপ্রকাশের অভীপ্সায়। নিম্নবর্গ শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত, এই হিসেবে তাদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত হয়। তারা সম্মিলিত হয়, তারা প্রতিবাদ–প্রতিরোধ করে। তারা একদিন জয়লাভ করবেই এই আশা রাখেন হরিশংকর জলদাস। এই বিশ্বাসের প্রতিফলন বহুস্বরে ধরা পড়ে তাঁর কালোত্তীর্ণ গল্পগুলিতে।

Reference:

১. জলদাস, হরিশংকর, ‘কৈবর্ত কথা, একটি বর্ণচোরা পরামর্শ’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৫৫
২. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’, ডি.এম লাইব্রেরি, কলকাতা, মার্চ ২০০৫, পৃ. ২০৮
৩. জলদাস হরিশংকর, ‘গল্পসমগ্র ১’, ‘দইজ্যা বুইজ্যা’, মাওলা ব্রাদার্স , ঢাকা , ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৬
৪. জলদাস, হরিশংকর, ‘গল্পসমগ্র ১’, ‘সুবিমলবাবু’ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৬-৩৭
৫. জলদাস, হরিশংকর, ‘গল্পসমগ্র ১’, ‘চিঠি’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৩৬
৬. জলদাস, হরিশংকর, ‘গল্পসমগ্র ১’, ‘দুলারি এবং কয়েকজন’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ , পৃ. ৯৩
৭. জলদাস, হরিশংকর, ‘গল্পসমগ্র ১’, ‘কুন্তীর বস্ত্রহরণ’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩০৭
৮. তদেব, পৃ. ৩০৮
৯. তদেব, পৃ. ৩০৮
১০. তদেব, পৃ. ৩১৩ – ৩১৪
১১. মুহাম্মদ মহি, ‘হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গ কথা’, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮২
১২. তদেব, পৃ. ৯০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 294 - 309
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি : প্রেক্ষিত রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প

অপূর্ব রায়
গবেষক
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় (আসানসোল)
Email ID : rapurba26@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Indigenous people, superstition, population, India, lifestyle, culture, exploitation, Munda, famine, crisis.

Abstract
Every tribal people have been trying to survive on their own since the beginning of human civilization. They consider agriculture as an integral part of their lives along with forest products collection and animal husbandry. They mainly contribute to the economic development of India through paddy production. Apart from paddy, they are seen to earn their living by producing other crops. But their plight in the agricultural economy is Nothing has changed. At the same time, the landlords were close to the state power. They have been oppressed repeatedly. Storyteller Rama pad Chowdhury tells the story of these oppressed indigenous peoples. He highlighted social culture in several of his stories. The story shows the story of tribal women becoming sex workers due to poverty and hardship. In addition, tribal people are seen to have traditional beliefs about ancient customs, superstitions. For example, they take people with family illnesses, dog bites, snake bites to a shaman or a poet to get rid of the poison. Again, an Englishman is seen coming forward to express his sympathy for their society or to save a woman from the clutches of the society's elite. At one time, all the people of a hard-working tribal village became beggars. Some Englishmen convert indigenous women to Christianity and marry them, or keep their indigenous religion intact and take women as wives. However, in most of his stories, Rama pad Chowdhury highlights the issue of women being molested and looked down upon by outside men, either in the story's explanation or in the narration.

Discussion

'আদিবাসী' অর্থে বোঝায় প্রথম ও প্রকৃত অধিবাসী। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, ধর্মবিশ্বাসে, রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানে, বিশ্বাস-সংস্কারে যারা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তারাই আদিবাসী। এঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনবিন্যাস পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানের এবং অকৃত্রিম সারল্যে, বাহুল্যবর্জিত অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে (common geogrophical area) জনজাতি সংস্কৃতির মানুষ বসতি নির্মাণ করেন এবং একই ভাষায় (a similar

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

language) ভাবের আদানপ্রদান করেন; এমনকি প্রতিদিনের সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অভ্যস্ত আচরণে (culture or beliefs and practices) জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কর্তৃক গৃহীত ১৬৯ নম্বর কনভেনশনের ১ নম্বর আর্টিকেলে 'আদিবাসী' বা 'আদিনৃগোষ্ঠী'র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

1. Tribal people independent countries (are those) whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections or the sections or the national community and those status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.
2. People in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabitated [sic] the country belongs, at the time of conquest of colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.[১]

আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ট্রাইব শব্দের নানারকম অর্থ পরিভাষা হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে।

এই পরিভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-'আরণ্যক', 'পাহাড়িয়া', 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'আদিমজাতি', 'খণ্ডজাতি', 'ভূমিপুত্র', 'গিরিজন', 'জনজাতি'। এই শব্দগুলির পাশে আরেকটি শব্দ গৃহীত হতে পারে, সেটি হলো 'প্রাকৃতজন'। লক্ষণীয় প্রতিটি পরিভাষার অন্তরালে রয়েছে গভীর আর্থ-সমাজ-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। সভ্যতা সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে যে মানুষগুলি অরণ্যচারী জীবন গ্রহণ করেছিল তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্যে 'আরণ্যক' শব্দটির ভিন্ন আর এক তাৎপর্য রয়েছে। এই মানুষগুলি অরণ্যনির্ভর জীবনযাপন করতেন। অরণ্য যাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তারাই চিহ্নিত হয়েছেন 'আরণ্যক' নামে। 'পাহাড়িয়া' শব্দটির মধ্যে রয়েছে অনুরূপ ব্যঞ্জনা। এই মানুষগুলি গিরিকন্দরে তাদের গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। খাদ্যান্বেষণে বেড়িয়ে তারা পশু শিকার করেছেন, ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তাই তারা 'পাহাড়িয়া'।

আদিম মানুষগুলি ভারতবর্ষের প্রকৃত মানুষ। এদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় এরাই হলেন ভারতবর্ষের আদি মানুষ; এই অর্থে এরা 'আদিবাসী'। ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা ক্রমাগত গভীর অরণ্য জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তারা মূল ভারতীয় সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করেছেন। উপ অর্থে মূলের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই তারা হলেন 'উপজাতি'। আর্যদের প্রবেশের পূর্বে প্রাগাধুনিক সেই সভ্যতার মানুষগুলি যেসব জীবন, জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির মূল শিকড়, তাই এঁরা 'আদিমজাতি' নামেই পরিচিত।

মানবসভ্যতার সমাজ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আদিম জাতিগোষ্ঠী মূলত মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ওরাওঁ, ভূমিজ, শবর, লোধা, খেড়িয়া, মালপাহাড়িয়া, ডোম, বাউরি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাসস্থান হয়ে উঠেছিল অরণ্য। এখানে গোষ্ঠীবদ্ধ বা দল বেঁধেই এদের অবস্থান। পরবর্তীকালে আর্য জাতিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে এরা অরণ্য কিংবা বন-জঙ্গলকে নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নেয়। প্রথমে এরা আর্য জাতি দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে খণ্ড খণ্ড জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আর এখান থেকেই এদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়। এই আদিম তথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা আজও অবহেলা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার যন্ত্রণা ভোগ করে আসছে। উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা অবহেলা বা তাচ্ছিল্য পাওয়ার জন্যই এরা আজও পিছিয়ে। এদের জন্য ঘোষিত সরকারি নানা সংরক্ষণ প্রথা কিংবা আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সর্বদা চাহিদার তুলনায় অপূর্ণ থেকে যায়। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কোনোরকম উন্নয়ন হতে দেখা যায় না। এ সম্পর্কে স্মরজিৎ জানা লিখেছেন -

> "...কিছু সম্পদ বিতরণের রাস্তায় যদি উন্নয়নের 'দেখা মিলত' তাহলে গত ৬০ বছরে আদিবাসীদের উন্নয়ন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি হওয়ার কথাও নয় বলে। যে জনগোষ্ঠীকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সুকৌশলে সমাজের সীমান্তে ঠেলে রাখা হয়েছে; সে জায়গার বদল না ঘটিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আসলে প্রশ্নটা উন্নয়নের মতাদর্শকে ঘিরে। সেখান থেকে শুরু করলে উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং রণকৌশল এক নতুন আঙ্গিকে দেখা বোঝা বা গড়ে তোলা যাবে। তাই যতক্ষণ না উন্নয়নের প্রক্রিয়া-প্রকরণ আদিবাসীদের সীমান্তে ঠেলে রাখার বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ঝুটি ধরে টান দিতে পারছে ততক্ষণ উন্নয়ন অধরাই থেকে যাবে।"[২]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের অরণ্যকূল জীবন যাপন হওয়ায় বেঁচে থাকতে প্রতিনিয়ত তাদের প্রকৃতির সঙ্গেও লড়াই করতে হতো। পূর্বপুরুষানুক্রমে প্রচলিত প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পরব এবং সংস্কার, কুসংস্কারের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল তাদের। একদিকে যেমন দুমুঠো খাদ্যের সংগ্রহের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হতো তেমনি ঝড়-বৃষ্টি দাবানল প্রভৃতির থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হতো। ফলস্বরূপ খাদ্য সংকটে শিশুদের দেখা দিত অপুষ্টি, নানান রোগ সেইসঙ্গে মহামারী। খাদ্য সংকটে একসময় তারা জীবিকার সন্ধানে কৃষিকাজ, সস্তা শ্রমিকের কুলি-কামিন, মজুর-মজুরিণী রূপে কর্মে লিপ্ত হতে থাকে। বিভিন্ন খনি অঞ্চলে বিশেষত কয়লাখনি ও চা-বাগানের কুলি-কামিনের শ্রমিক, ইট ভাটার শ্রমিক রূপে জীবিকার পথ খুঁজে নেয়। তাদের শ্রমদানে রেললাইন স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। অথচ দিনের পর দিন ঠিকাদার বা মালিকের তারা বঞ্চনার শিকার হয়েছে এরা। মজুরি না পেয়ে কিংবা কাজ হারিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। বিশেষ করে একমুঠো অন্নের জন্য খ্রিস্টান ধর্ম বা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে একাধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে। ফলে এই আদিবাসীদের বঞ্চনা, জীবন যন্ত্রণা যুগ যুগ ধরে একই ভাবে চলে এসেছে কিংবা এখনো চলছে। অথচ আদিবাসী এলাকার উন্নয়নের জন্য ভারতের সংবিধানের ৩৩৯ তম ধারাতে বলা হয়েছে যে -

> "ভারত সরকার তপসিলী এলাকা ও তপসিলী উপজাতিদের কল্যাণের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতি দশ বছর অন্তর একটি কমিশন নিয়োগ করে ঐ সমস্ত এলাকা ও উপজাতিদের উন্নয়ন ও শাসন সম্পর্কিত অবস্থার কথা প্রতিবেদন মারফত জানতে চাইবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাবলে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারেন, তপসিলী উপজাতি ও তপসিলী এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য।"[৩]

ভারত সরকার এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নানান সুযোগ সুবিধার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে পেরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। যদিও সেই সুযোগ সুবিধা সবটুকু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে না। ফলস্বরূপ বঞ্চিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের জীবন যন্ত্রণার প্রসঙ্গ কথা তুলে ধরতে কলম হাতে তুলে নিতে হয় সাহিত্যিকদের। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অনিল ঘড়াই, সুধীর করণ প্রমুখ সাহিত্যিকরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যন্ত্রণা যেভাবে কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ঠিক একইভাবে রমাপদ চৌধুরীর একাধিক গল্পে উঠে এসেছে নানা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যন্ত্রণার বাস্তবিক ইতিহাস।

স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্বার্থক লেখকরূপে পরিচিত হয়ে আছেন সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। একেবারে জনসামখ্যের প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসা ও কমকথা বলা মানুষটিকে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সেভাবে না চিনলেও কথাসাহিত্যে প্রিয় পাঠকরা তার সাহিত্যের সৃষ্টির নব নব ঐতিহ্যকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন সর্বাগ্রে। ভ্রমণপিপাসু রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য বিপুল পরিমাণ না হলেও তার রচিত মানুষ ও সমাজের বাস্তব জীবনের এক এক চরিত্রের মনের চোরাগলির পথ সহজেই পাঠকের মনে দাগ কাটিয়ে দিয়ে যায়। যে দাগ আমাদের জনসমাজে বসবাসকারী আমাদেরই বন্ধু স্বজনদের কলরবের চিহ্নিত দাগ। রমাপদ চৌধুরী ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। খড়্গপুরে তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই রমাপদ লেখা লেখি শুরু করলেও, বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথম ছোটগল্প রচনা করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে রমাপদচৌধুরী যেমন শিক্ষা ও সংস্কার পেয়েছিলেন তেমনি পেয়েছিলে শারীরিক গঠন, মেধা ও মনন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে রমাপদ তিন মাস ধরে মুরী, রাঁচি, রামগড়, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, আরগাড়া, রেলিগাড়ার কয়লাখনি, খালারির চুনের পাহাড় যেমন দেখলেন তেমনি আদিবাসী উপজাতি ফিরিঙ্গি যুবক-যুবতী প্রবাসী বাঙালিও মার্কিন সৈন্যদেরসম্পর্কে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন।

ভ্রমণপিপাসু রমাপদ চৌধুরী বেড়ানোর সূত্রে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ ইত্যাদি আদিবাসী জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে। খুব কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মুন্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের জনজীবনকে। তাদের প্রাত্যহিক জীবন, আচার-আচরণ, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রথা ইত্যাদি রূপ পেয়েছে তাঁর আদিবাসী জীবননির্ভর গল্পগুলিতে। কয়লাখনি অঞ্চল, দেহাতী মানুষ, কুলি-কামিন ইত্যাদির পাশাপাশি এই গল্পগুলিতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা দেশী খৃষ্টান চরিত্রেরও দেখা মেলে। গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা, কুৎসিত নৃশংসতা, নোংরামি, অভদ্রতা, ইতরতা, অশ্লীলতা, তন্ত্র-মন্ত্রে অন্ধবিশ্বাস ডাইনি বিশ্বাস এসব কিছুই আদিবাসী জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঠেলে দিয়েছে গভীর অন্ধকারে। আপাতসভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থানরত পিছিয়ে থাকা এই জনজীবনকে রমাপদ চৌধুরী তাঁর আদিবাসী জনজীবননির্ভর গল্পগুলিতে রূপ দিলেন নব কলেবরে। ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আদিবাসী সমাজের জীবন সংগ্রাম যেভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল স্রোতের ধারায় আবারো তার সার্থক প্রকাশ ঘটলো রমাপদ চৌধুরীর একাধিক গল্পে। তাঁর আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিমূলক গল্পগুলি আদিবাসী সমাজের জীবন ও সংকট বাস্তবিক চিত্র ফুটে উঠেছে কাহিনী ও চরিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল -

> ‘জলরঙ’ (১৯৫১), ‘দরবারী’ (১৯৫১), ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’ (১৯৫২), ‘বিবিকরজ’ (১৯৫২, রেডিওতে পড়া গল্প), ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ (১৯৫৩), ‘সতী ঠাকুরুনের চিতা’ (১৯৫৩, ১৩৬৪ সালে আপন প্রিয় গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত), ঝুমরা বিবির মেলা’ (১৯৫৩, শারদীয়া ‘আনন্দবাজার’), ‘নারীরত্ন’ (১৯৫৫), ‘মানুষ অমানুষের গল্প’ (১৯৫৯, শারদীয়া ‘দেশ’), ‘আহ্লাদী’ (১৯৬০), ‘মন্ত্র’ (১৯৬১, শারদীয়া ‘দেশ’) ‘ফিরে আসা’ (১৯৬৫), ‘ভারতবর্ষ’ (১৯৬৮), ‘শেষ সংলাপ’ (১৯৭৮), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রমাপদ চৌধুরীর ‘জলরঙ’ গল্পটি ছিল অনগ্রসর উপজাতিদের নিয়ে প্রথম গল্প। মুন্ডা আদিবাসীদের কোলিয়ারি জীবনকে কেন্দ্র করে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে লিখিত হয় গল্পটি। অরণ্য অধ্যুষিত পাহাড়, জল-জঙ্গলে ঘেরা কোলিয়ারি অঞ্চলকে রমাপদ খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আদিবাসী মুন্ডাদের কাছে কোলিয়ারী জীবনধারণের একমাত্র উপায়, আর কোলিয়ারীর মুনশী ওদের ভাগ্যবিধাতা। এদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত মানুষেরা তাদের যে কী পরিমাণ নির্যাতন করছে আলোচ্য গল্পে তা পরিস্ফুট হয়েছে। মূলত কোলিয়ারীতে কর্মরত আদিবাসী মুন্ডাদের অসহায়ত্বের দিকগুলি প্রতিফলিত হয়েছে ‘জলরঙ’ গল্পে।

গল্পের শুরুতেই দেখা যায় কোলিয়ারির চাকরি নিয়ে আদিবাসী গ্রামে উপস্থিত হয়েছে বাঙালি বাবু। কয়লা খনি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ জলে ডোবা এক নম্বর খাদটা দেখে কথকের মনে হয়েছে জলে ভর্তি হ্রদ। হরীতকীর বন আর খয়ের গাছের ঝোপ এড়িয়ে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে উ'চুনীচু অসমতল পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে প্রথমবার সে মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিকে দেখল। রূপমণিকে দেখে কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়লো তার।

খাদানে পৌঁছে মিশিরজীর থেকে কাজ বুঝে নিতেই জানা গেল পাঁচ নম্বর খাদানের কথা। হলেজের ট্রলি-লাইন ধরে মন্থর পায়ে খাদে নামার সময় চোখে পড়ল আঁকাবাঁকা বিরাট একটা ব্যর্থ দিঘি। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শুধু শাল-শালাই, আমলকী আর মহুয়ার বন। তারও ওপারে পুবে পশ্চিমে একটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের তরঙ্গ। আর সেই শান্ত নিঃশব্দ অরণ্যের মাঝে বেনিয়া সিন্ডিকেটের লুব্ধ কণ্ঠের চিৎকার ফুটে উঠছে হাজারো শাবল আর গাঁইতির কোলাহলে। যতই নিচে নাবা যায় ততই ধাপে ধাপে পৃথিবী যেন নেমে এসেছে নরকের অন্ধকারে। সেই নরকের সিড়ি শেষ হয়েছে কালো কয়লার অন্ধকারে। কোথাও মাটি, কোথাও বা পাথরের প্লটে কাজ চলছে। মালকাটারি রেজা-কুলিদের চেঁচামেচি ভেসে আসছে খাদের গভীর থেকে। কুলিরা গাঁইতির পর গাঁইতি ফেলছে, ছন্দে বাঁধা ধীর পায়ে চলেছে সারি বাঁধা রেজাদের দল। খাড়াই পথ বেয়ে

পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে তারা, মাথায় পাথর-বোঝাই ঝুড়ি, পুরুষদের বাঁকের দু পাশে দড়ির ঝোড়া। খাদের এক পাশে মাটি পাথর ফেলে ফেলে নতুন একটা পাহাড় গড়ে তুলছে তারা। আর এখানেই রীতিবিরুদ্ধ একটি খাড়াই পথ বেয়ে ঝুড়ি মাথায় ওপরে উঠতে-নাবতে দেখা গেল রূপণিকে। আর সেখানেই,

> "পাথরের গা থেকে জল পড়ছে চাঁয়ে চু'য়ে, আর একটা জায়গায় ছোট একটি গর্ত কেটে জল ধরে রেখেছে ওরা। রেজা কুলিরা মাঝে মাঝে তৃষ্ণা দূর করে আসছে সেই জলে। কালি-ঝুলি মাখা এই মেয়েটিকেও একটু আগে এক আঁজলা জল খেয়ে আসতে দেখেছি। ওর হাতের সেই ভঙ্গিমাটুকু ভালো লেগেছিলো, মনে হয়েছিলো এমন ভালো লাগার ছবি হয়তো বা আগেও দেখেছি।"[৪]

মিশিরজীর কথায় রূপমণি খাদের রানী। যাকে কেউ কখনো ভুলতে পারে না। এমনকি তার টোকেন দুশো সাঁইত্রিশ নম্বরটিও কেউ ভোলে না। খাদানে, শনিচারীর হাটে মাঝেমধ্যে দেখা হত রুপমণির সঙ্গে। এভাবেই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল তারা। হঠাৎ একদিন দুপুর বারোটার সময় দুটো ঝুড়ি আর একটা শাবল নিয়ে গোপী সিং এর ডেরায় পৌঁছে দিতে বলেছিলো রূপমণিকে। আদিবাসী মুন্ডা রমণীদের অসহায়ত্ব, ভীরুতা রূপমণির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ঠিকাদার গোপী সিংয়ের অসৎ উদ্দেশ্য টের পেয়ে তার কথা মতো রূপমণি গোপী সিংয়ের ডেরায় যায়নি বলে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছে। রূপমণির চাকতি নম্বর কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি সুধীনবাবু, উপাধ্যায়কে, গোপী সিং এর কথা বলেও কাজ না হওয়ায় বাঙালি বাবু রূপমণির ভালোবাসার মানুষ পরিয়াগককে কাজ বন্ধ রাখার পরিকল্পনা দেয় যতক্ষণ না রুপমণি কাজে যোগ দেয়। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। রূপমণিকে ধরা দিতে হয় গোপী সিং এর ডেরায়। গল্পের শেষে দেখা যায়, -

> "বিষণ্ণ হাসি হাসলো পরিয়াগ। গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।
> দুপুরের শিফ্টে দেখা হল রূপমণির সঙ্গে। নতুন শাড়ি পড়ে হেলেদুলে এসে দাঁড়ালো সামনে।
> বললাম শরম নেই তোর?
> লজ্জায় মাথা নিচু করলে রূপমণি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মুনশীর কত তাকত বাবু, ঠিকাদার মানজার সকলে ওর কথা শুনে। মুনশী চটলে খাবো কি বল্?"[৫]

একজন দয়ালু বাঙালী বাবুকে দুর্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য, পরিয়াগের জীবন রক্ষার জন্য রূপমণিকে গোপী সিংয়ের কাছে হার মানতে হয়েছে। নতুন শাড়ি পরে সে এখন গোপী সিং এর রক্ষিতা হয়ে থাকবে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে রেজাদের রাতের শিফটে কাজ করানো নিষেধ। কিন্তু কোলিয়ারীতে মুনশী থেকে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই সরকারী আইন মানলেও যে জন্য এই আইন বলবৎ হয়েছে, তার ইজ্জত রক্ষা হয় না। তাই প্রভাঙ্গের মুখে শোনা যায় "খাদে এখন রাত পাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো..."। এই বক্তব্যে সহজেই তথাকথিত ভদ্রবাবুদের চরিত্র স্পষ্ট হয়। আবার অন্যদিকে আদিবাসী মুন্ডা মেয়েদের চরম অসহায়ত্বের দিকটিও পরিস্ফুট হয়। এই মুন্ডা কোলিয়ারি শ্রমিক নিতান্ত পেটের দায়ে জীবন হাতে রেখে পাতালের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করে তুলে আনে 'কালো হীরে'। জীবিকার অনিশ্চয়তাই নয় এদের জীবনেরও নেই কোন নিশ্চয়তা। একটু অসতর্ক হলেই খাদানের ধসে কিংবা ডিনামাইটের বিস্ফোরণে যে-কোন সময় প্রাণ হারাতে হয় এদের। শুধু তাই নয়, খনি ম্যানেজার, অফিসবাবু, ঠিকাদার থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি মহাজন পর্যন্ত এই সমস্ত কুলি-কামিন, রেজা-মুজুরদের শোষণ করে, এদের মা-মেয়ে-বউদের দিয়ে নিজেদের ভোগ লালসা চরিতার্থ করে। আদিবাসী জনজীবনের দুঃখ, দুর্দশা, অসহায়ত্ব, ভীরুতা, দুর্বলতা 'জলরঙ' গল্পে উপস্থাপিত।

রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী' (১৩৫৮) গল্পটি আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক একটি জনপ্রিয় গল্প। গল্পটি সেই সময় বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। গল্পের শুরুতেই উঠে আসে লাপরার স্টেশন মাস্টার রজনীবাবুর কথা। বরকাকানার জংশন-স্টেশন তখন সদ্য সদ্য ত্রিবেণী হয়েছে। স্টেশন মাস্টার রজনীবাবুর অনুযোগের শেষ ছিলো না, মনে মনে গজরাতেন শুধু, শোনাবার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোক পেলে বলতেন, এমন স্টেশনই ভাগ্যে জুটলো যে দিনরাত কেবল সবুজ বাতিই দেখাতে হয় ট্রেনগুলোকে, সিগন্যাল নেমেই আছে। সারাদিনে একখানা আপ আর একখানা ডাউন ট্রেন থামে। লাপরায় তখন দিনে দু-চারটে যাত্রী নামতো, দু-চারটে প্যাসেঞ্জার টিকিট কাটতো। তাও থার্ড ক্লাসের। স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে মুণ্ডা অস্পৃশ্যদের একটা ছোট্ট ডিহি ছিল। একদিন সেকেন্ড ক্লাস কামরা থেকে লাপরা স্টেশনে হঠাৎ করে আগমন হয়েছিল জোনাথন ম্যাকক্লাস্কির, সাঁওতাল পল্লীর সবাই যার নামকরণ করেছিল 'পাগলা সাহেব'। সে রজনীবাবুকে বন্ধু সম্পর্কে আবদ্ধ করে সেখানকার পাথুরে জমিতে ফার্মিং ও আবাদ করার পরিকল্পনা জানায়। রজনী বাবু মনে মনে হাসেন আর ভাবেন দুদিন গেলেই বেচারা সমস্ত তলপিতলফা গুছিয়ে সেখান থেকে রওনা দেবে। কিন্তু জোনাথন মুন্ডাদের সঙ্গে মিশে নেটিভ হবার এবং সহজ সরল মুন্ডাদের নিয়ে বই লেখার স্বপ্ন নিয়ে পাহাড়ের গায়ে বিঘে কয়েক জমি নিয়ে বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি বানিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। পাগলা ম্যাকুসাহেব মুন্ডাদের সঙ্গে মহুয়া খেয়ে আপন করে নিয়েছিল তাদের, মুন্ডাদের মেয়ে শোনিয়াকে ভালবেসে ফেলে সে। দেখা যায়, -

> "শোনিয়াকে সত্যিই একদিন বিয়ে করে বসলো জোনাথন, একেবারে আরণ্যক মতে। মুণ্ডা সর্দার প্রথমটা একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিলো। কিল্লীর মিল নেই, নাম গোত্র দূরের কথা একেবারে ভিন দেশের ভিন জাতের লোক, তার সঙ্গে গিতিওড়ার কুমারী মেয়ে শোনিয়ার বিয়ে! কেন, জোয়ানদের গিতিওড়ায় যে আইবুড়ো ছেলেগুলো ঘুমের জন্যে ছটফট করে তাদের একজনকে কি বেছে নিতে পারলো না শোনিয়া? বনজঙ্গল সাফ করবার জন্যে যখন জারা জ্বালানো হয় তখন তো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পারতো মেয়েটা।"[৬]

জোনাথনের বিয়ের খবর পেয়ে তার পরিবারের মানুষজন একে একে লাপরার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এক সময়ের অজ সাঁওতালী গাঁয়ে সভ্যতার আলো প্রবেশ করল, লাপরায় গীর্জা হলো, মুন্ডাদের জন্য মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা হলো, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তৈরি হলো ধীরে ধীরে নানা প্রতিষ্ঠান, রেস্ট হাউস, দোকানপাট। লেখক সেখানকার আদিবাসী মুন্ডাদের জীবনযাপন, কুসংস্কার, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি এইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুন্ডাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। দেহাতী অঞ্চল লাপরা উপনগরী হয়ে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলোনীতে পরিণত হল। কিন্তু জোনাথনের 'মিশন' পূর্ণ হলো না। কারণ, জোনাথন মুন্ডাদের একজন হতে চাইলেও মুন্ডারাই উল্টে ক্রিস্টান হয়ে গেল। কারণ ক্যাসল, ব্রাউনরা সেখানে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন এবং একে একে 'অশিক্ষিত হিদেনদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে' সচেষ্ট হলেন। মুন্ডারা সভ্যতার নানা উপকরণের সংস্পর্শে এলেও তাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা জোনাথন ও সোনিয়ার পরিণয়। কিন্তু জোনাথন বাদে অন্য ইউরোপীয়রা মুন্ডাদের উন্নতি কামনা করে না, ফলে কলোনিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ, জোনাথনের পুত্র ম্যাক ইভা হাগিন্সের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। সমস্ত উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটে জোনাথন ও শোনিয়ার মৃত্যুতে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে সহজ সরল আদিবাসী মুন্ডাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলেও একশ্রেণীর সাহেবরা যে তাদের খ্রিস্টান মনে করে না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে ব্রাউনের বক্তব্যে "দি মুন্ডাজ, আর ক্রিশ্চানস্ ওনলি ইন নেম্।" শেষ পর্যন্ত রেভারেন্ড ব্রাউন আর আরো পাঁচশো বাসিন্দা পিটিশন পাঠিয়ে অনুমতি চায়, লাপরার নাম বদলে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ করা হোক। অনুমতি আসে। স্টেশনের বোর্ডে লাপরা নাম মুছে নতুন হরফ বসনো হয় ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। যা দেখে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে রাজীববাবুর।

> "মিস্টার ম্যাকক্লাস্কির জীবনের সবচেয়ে বড় ডিফিট এইটেই। তিনি নিজে লাপরার মানুষ হতে চেয়েছিলেন, মুণ্ডা হতে চেয়েছিলেন। অথচ শেষ পর্যন্ত লাপরাই বদলে গেল।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শান্তির দূত বহনকারীদের হিংস্রতার জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্ক যে কত তিক্ত হয় এবং জোনাথনের মতো সৎ মানবকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, আলোচ্য গল্পে সেই বিষয়টিকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার।

'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' (১৩৫৯) গল্পে উত্তমপুরুষ কথকের বর্ণনার দ্বারা সাঁওতাল সুরমণির পিতা লাটুয়া ওঝার ওঝা-বিদ্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। সাঁওতাল সমাজগোষ্ঠীর একসময়ের বিশ্বস্ত ও ঈশ্বরতুল্য ওঝার গল্প 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' (১৩৫৯, শারদীয়া আনন্দবাজার)। আদিবাসী সাঁওতালদের এককালীন অন্ধবিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে গল্পটিতে। মরিয়ম এর কথায় গল্পকথক জানতে পারে সেই তল্লাটে লাটুয়া ওঝার মত ওঝা আর একজনও নেই। মুর্দার বুকেও সে প্রাণ বসাতে পারে এমনকি সাপকে মন্ত্র দিয়ে এমন বশ করে যে চুমুক দিয়ে নিজের বিষ নিজেই টেনে নেয়। এমন অবস্থায় গল্পের কথক কুকুরের বিষ পা থেকে নামাতে লাটুয়া ওঝার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। একমাত্র আদিবাসী মুন্ডা, সাঁওতাল জাতির বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর লাটুয়ার বাড়িতে আসা।

বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ হে'টে ভুরকুন্ডার সারনা পার হয়ে লাটুয়া ওঝার বাড়ির সামনে পৌঁছায় গল্পকথকরা। কাদামাটির দেয়াল-দেওয়া এক টুকরো খাপরার চাল। অন্ধকূপের মতো ছোট একখানি নোংরা ঘর। পচাই মদ আর বাসী ভাতের গন্ধ। চাল থেকে দড়িতে বাঁধা অসংখ্য জিনিসপত্তর ঝুলছে বাদুড়ের মতো। হাঁড়ি, কুমড়ো, বাঁশের চোঙা, তামাক পাতা। ঘরের এক কোণে বসে অন্ধ লাটুয়া ওঝা। বাইশ-চব্বিশ বছরের ওঝার একটি ভরাযৌবনা যুবতী মেয়ে কথকের ঘা পর্যবেক্ষণ করে লাটুয়া ওঝাকে জানাতেই ওঝা ওষুধের সন্ধান দিল,

> "এক কোণে অসংখ্য ছোটবড় কৌটো, হাঁড়ি, মাটির সরা।
> তারই ভেতর থেকে সুরমণি একটা কোঁটো এগিয়ে দিলো লাটুয়াকে।
> "লাটুয়া বললে, ইটা জুডাং গাছের মূল। চন্দন আর ডুডাং ঘষে তিন দিন লাগাবি কত্তা। বিষ আখন বুকে উঠছে, জুডাং লাগালি মাটিতে ঝইরবে।
> শিকড়টা হাত বাড়িয়ে নিলাম। সুরমণি খানিকটা ঘষতে শুরু করলো। দেখিয়ে দেবে কি করে লাগাতে হয়।
> শিকড় ঘষার শব্দে লাটুয়া হেসে বললে, আমার মায়েটাও বড় ওঝা কত্তা, সব ঝাড়ফংক শিখ্যে লয়ছে।"[৮]

কথক লাটুয়া ওঝার কাছ থেকে শিকড় সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার শিকড় সংগ্রহ করতে গিয়ে কথকের সামনে লাটুয়া ওঝার মেয়ে সুরমণির দারিদ্র্যের স্বরূপটা সামনে এসে পড়ে এবং সুরমণি স্বীকার করে নেয় যে, তার পিতার মিথ্যা ঔষধ চালানে রোগের নিরাময় ঘটা সম্ভব নয়। এতদিন সে পিতার অগোচরে মিথ্যার জাল বুনে মানুষকে ঠকিয়ে টাকা অর্জন করেছে। তার পিতা লাটুয়া ওঝাও তা জানে না। পরিবারের অভাব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এই ধরনের মিথ্যার ওপর আশ্রয় নিতে হয়েছে সুরমণিকে। একমাত্র অর্থের অভাবে সুরমণির ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে বিবাহ আর হয় না। একসময় ডাইনী তাড়ানো, সাপের বিষ নামানো, কুকুরের কামড়ের বিষ নামানো ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সাঁওতালদের একমাত্র বিশ্বাসের স্থান ছিল লাটুয়া ওঝা ও তার ঔষধ। মানুষের যে-কোনো রোগের নিরাময়ের ঔষধ চালনা করে আরোগ্য লাভের দিশা দেখাত লাটুয়া ওঝা।

সব ছিল লাটুয়া ওঝার! সব রোগের ওষুধ জানতো সে। ডাইনী যুগিন তাড়াতে পারতো, সাপের বিষ ঝাড়তে পারতো। নাগবংশী পুজো দিয়ে সব শিখেছিলো লাটুয়া ওঝা। তারপর একদিন বুড়ো বয়সে জঙ্গলে মূল খোঁজার সময় কখন একটা ভালুক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরে তাকে। প্রান বে'চে গেলও কিন্তু ভালুকের থাবার ঘায়ে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল লাটুয়ার। তখন থেকে আর ঘরের বাইরে যায় না সে। গাছের মূলও শেষ হয়ে গেছে সেসব ওষুধপত্রও শেষ। সেসব গাছের নামও জানে না কেউ, চেনেও না। বুড়ো বাপ দুঃখ পাবে বলে আজেবাজে যা পেয়েছে ঘাস পাতা শিকড় নিয়ে এসে কৌটোগুলোয় সাজিয়ে রেখেছে সুরমণি। কিন্তু আগের মত আর রুগী হয় না, -

> "রুগী না এলেও রোজ বসে বসে গল্প করে লাটুয়া, কোন ওষুধে কি কাজ হয়, কোনটা কাকে দিয়েছিলো। আর ভাবে, ওর কাছে শুনে শুনে সুরমণিও বড় ওঝানী হয়ে উঠবে।
> কিন্তু লাটুয়া তো জানে না যে সে মূল শেষ হয়ে গেছে। জানে না, চোখ ফিরে পেয়ে গাছগুলো চিনিয়ে না দিলে সুরমণি কিছুই শিখতে পারবে না। তাই দিনের পর দিন শুধু গাপ শোনে সুরমণি। আর গল্প শুনতে শুনতে চোখ ঠেলে কান্না আসে ওর।
> তাই রুগীরাও কেউ আসে না আর, লাটুয়া ওঝার ওষুধে কাজ হয় না' বলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়।"[৯]

আসলে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে অশিক্ষিত আদিবাসীদেরও মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। তাই তারা লাটুয়া ওঝার কাছে ভিড় না করে ভিড় জমায় হাসপাতালে। আদিবাসীদের পরিবর্তনের এই চিত্রের পাশাপাশি লাটুয় ওঝার জীবনের ট্র্যাজেডিও ধরা পড়েছে। হিংস্র ভালুকের আক্রমণে অন্ধ হয়ে যাওয়া লাটুয়া বনজঙ্গল থেকে আর লতৌষধি খুঁজে আনতে পারে না, তাই সে আজ পরিণত হয়েছে ব্যর্থ ওঝায়। ফলে আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে তার। একজন সফল ওঝার জীবনের ভয়াবহ দিকের পাশাপাশি অশিক্ষিত সাঁওতালদের অন্ধবিশ্বাস ও তাদের মানসিক পরিবর্তনের চিত্রও তুলে ধরেছেন গল্পকার গল্পকার রমাপদ চৌধুরী।

'বিবিকরজ' (১৩৫৯) গল্পকথকের 'আমি'র জবানীতে লেখা ফুলের মত সতেজ, সবুজ, নবীন অনুপমার জীবনের ট্রাজেডি স্থান পেয়েছে। আদিবাসী কামিনদের কোলের শিশুদের জন্য খোলা বেবি- ক্রেশের দায়িত্ব নেবার জন্য কোলিয়ারিতে আগমন ঘটেছিল অনুপমার। বেঁচে থাকার জন্য, দু'বেলা খাবার জোগাড়ের আশায় শিশুদের নিয়েই কোলিয়ারীতে কাজ করতে যেতে হতো আদিবাসী রমণীদের। ক্লান্ত অসহায় সেই আদিবাসী রমণীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কথক জানিয়েছেন, -

> "হাজরির কাজ সেরে খাদে চক্র দিতে গিয়ে প্রায়ই দেখতাম, অসহায় চোখ-তাকানো ছেলেগুলোকে পিঠে জড়িয়ে রেজারা চলেছে ঝুড়ি মাথায়, খাড়াই পথ বেয়ে। আর বোঝার ভারে দু-পাশে চাপ দেওয়া স্প্রিং-এর মতো কুচকে গেছে তাদের সমর্থ শরীর। ওভারবার্ডেনের ওপর রোদ্দুর-ঝলসানো বালিতে ছে'ড়া চাটাইয়ে পড়ে পড়ে কখনো বা ছেলেগুলো কাঁদতো খিদেয়। দুটো কাঠিতে জড়ানো এক টুকরো নোংরা কাপড় নৌকোর পালের মতো সূর্য আড়াল করতো। কখনো হয়তো সে আড়াল সরে যেতো বাতাসে, কিংবা তাতানো-তাওয়া বালির ওপর গড়িয়ে পড়ে কেদে উঠতো। মুনশীর চোখ আর শরীরের ক্লান্তিকে ফাঁকি দিয়ে কামিন-মা কান্না থামাতো, খিদে মেটাতো শিশুর।"[১০]

কোলিয়ারী জগতের সেই গ্লানি মুছে নেবার জন্যই অনুপমা এসে পৌঁছেছিল তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামী ও শিশুকন্যা মুন্নুকে নিয়ে। অনুপমাকে ঘিরে আদিবাসীদের উৎসাহ দানা বেধেছিল। তাদের মনে হয়েছিল, এসেছে একজন, এসেছে সেই ঝরাপাতার অরণ্যে। শুধু সবুজের শোভা নিয়েই নয়, লাল পলাশের আগুন ছড়িয়ে এসেছে। বেবি-ক্রেচের সমস্ত কুলিকামিন আদিবাসী সন্তানদের দেখাশোনা করত অনুপমা। সঙ্গে থাকতো মেয়ে মুন্নু। বেশ কিছুদিন ভালো কাটলো। কিন্তু কয়েক দিনের পর নেমে আসে অনুপমার জীবনে ট্রাজেডি। কোলিয়ারির এলাকায় মাতব্বর জ্যোতির্ময়বাবু অর্থাৎ জে-পি-সাহেববের কুনজর পড়ে অনুপমার উপর। অনুপমা বুঝতে পারে জ্যোতির্ময়বাবু জেনানার ইজ্জতে হাত বাড়ায়। সে বেবি-ক্রেচে অনুপমার সঙ্গে দেখা করতে আসলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। জ্যোতির্ময় শ্রমিকদের বুঝিয়ে রটিয়ে দেয় অনুপমা সারাদিন মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর কুলিকামিনদের সন্তানরা পড়ে পড়ে কাঁদে নয়তো আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। বিবি-করজে শ্রমিকরা তাদের সন্তানদের রাখতে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের নির্দেশে প্যারালাইসিস স্বামীর কাছে দরজা বন্ধ করে মেয়েকে রেখে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু কয়েকদিন পর দরজার ফটো খুলে মুন্নু বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল জেলেরা জলে-ডোবানো এক নম্বর খাদে মুন্নুকে পাওয়া যায়। অনুপমা সেই ঝরাপাতার অরণ্য থেকে সব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সবুজের শোভা নিয়ে, সব ফাগুনের আগুন নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু কথকের স্মৃতিতে অনুপমার স্মৃতি বিরাজমান, -

> "আজও বেবি-ক্রেচের ধার দিয়ে যেতে যেতে অনুপমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি উৎকণ্ঠার চোখ, একমুখ ফুলঝুরির হাসি।
> আজও সারা মন অনুশোচনার দৃষ্টিতে খাঁজে বেড়ায় অনুপমাকে।
> হঠাৎ যদি আপনার কানের কাছে কেউ সে নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোনো দিন তাকে খুঁজে পান, কোনো দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোনো জনারণ্য শহরের অন্ধ গলিতে, যদি চিনতে পারেন তাকে, হাতে তার নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, ব্যর্থ বিষন্ন মুখে দু সারি মুক্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, বাঁ চোখের নীচে ছোট্ট একটি কালো তিল।"[১১]

অনুপমার জীবনে ট্র্যাজেডির পাশাপাশি কোলিয়ারীতে কর্মরত আদিবাসী কুলি- কামিনদের জীবনযাত্রা, পেশা ও তাদের সরলতা প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

'রেবেকা সোরেনের কবর' (১৩৬০) গল্পটিও কোলিয়ারী ও সাঁওতাল জনবসতির জীবনচর্যার কেন্দ্রভূমিতে গড়ে উঠেছে। কারানপুরা কয়লাখনি অঞ্চল এই গল্পের পটভূমি। খনিতে কাজ করা সাঁওতালদের ভিড়ে মাধো সোরেনের মেয়ে রূপমতীর রূপ চোখে পড়ার মতো। শুধু রূপ নয় তার-হাটাচলা, কথাবার্তা থেকে শুরু করে দৃষ্টি চাউনি সবকিছু পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হত। রূপমতী ভালোবাসে লালোয়া কুডুখকে। যদিও কারানপুরা কোলিয়ারী এজেন্ট ফার্ণহোয়াইটের বাউন্ডুলে ছেলে ম্যাকুসাহেবের মন কেড়ে নিয়েছে সাঁওতাল কামিন রূপমতী। ম্যাকুকে জড়িয়ে রূপমতির নামে পট্টির বুড়োবুড়ি বলাবলি করছিল। রূপমতীর নামে কুৎসার কানাঘুসা সাঁওতাল সমাজ মেনে নিতে পারেনি। কেননা সাঁওতালরা মনে করে-

> "সাহেব। ও হল আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধর্ম নাই ওদের, তাই সান্তালদের ধর্ম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা। যেমন করেছে ওই মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রেজিকে।"[১২]

রূপমতী লালুয়া কুডুখের থেকে ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে বেশি হাঁসি-খুশি থাকতো। অথচ রূপমতীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল লালুয়া কুডুখের সঙ্গে। তারা স্থির করেছিল দু'কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমান্ডির খাদানে, দু'জনে মিলে বাসা বাঁধবে। কিন্তু দাঙ্গার অন্ধকারে নিজেকে বাঁচাবার জন্য রূপমতী ম্যাকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্ধকারে থেকেছিল বলে পঞ্চায়েত তাকে 'বিটলা'র সাজা শোনায়, যার ফলে পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিস বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার, না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে তাকে। শুধু তাই নয় গ্রামের মেয়েরা কপাট বন্ধ করে থাকবে, পুরুষেরা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে ঘিরে ধরবে তাকে, আরেকদল আসবে তীর-ধনুক নিয়ে। অশ্লীল গান আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে তাকে উদ্দেশ্য করে, কেড়ে নেবে লজ্জা নিবারণের যৎসামান্য বস্ত্রখানিও। নিজের স্বজাতির রোষ থেকে বিবস্ত্র রূপমতীকে উদ্ধার করে ম্যাকুসাহেব নিজের বাংলোয় নিয়ে যায়। সাঁওতাল থেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে রূপমতী। অসহ্য ঘৃণা আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রূপমতী রেবেকা নাম নিয়ে ম্যাকুসাহেবের ঘরণী হয়। ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে বিয়ের পর রূপমতীর জীবনে সুদিন এসেছিল। গর্বিত রেবেকা সুখী রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখল। কিন্তু রূপমতীর ভাগ্যে এই সুখ সইল না বেশিদিন। দুর্নীতি প্রমাণে চাকরি হারাতে হল ফার্ণহোয়াইটকে। পিতার বিপন্নতার সাথে সাথে বেকার ছেলে ম্যাকু প্রমাদ গুনলেন। পিতার পরামর্শ মতো ম্যাকু পিতার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে চলে গেলেন সিলেভিয়ার সঙ্গে বিয়ের জন্য। সিলেভিয়াকে বিয়ে করে মিলবে রেলে চাকরি। রূপমতীকে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ম্যাকু চললেন পিতার সাথে। আর রূপমতী অর্ধাহারে, অনাহারে ম্যাকুর সন্তানকে কোলে নিয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন গুনল। ম্যাকু আর ফিরে এল না। এরপর প্রাক্তন প্রেমিক লালোয়ার দেওয়া বিয়ের প্রস্তাব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রূপমতী শুধু ফিরিয়ে দিল না, সই সোনামিরুর সহায়তায় খাদানে কামিনের কাজ করে নিজের ও সন্তানের খাওয়ার ব্যবস্থার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে জানায়, -

> "খাদানের কাম? চোখ কপালে তুললো রূপমতী। বললে, আমার না ম্যাকুসায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত খতম্ করতে চাস তুরা?"[১৩]

ক্ষুধার তাড়নায় রূপমতী দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকে। শেষপর্যন্ত না খেতে পেয়ে রূপমতী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তার আগেই মৃত্যু হয় তার শিশুসন্তানের। মৃত্যুর পর কোন রকমে খ্রিষ্টান নিয়ম মেনে রূপমতীকে কবরস্থ করে একটা সামান্য কাঠের ক্রুশ পুঁতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খ্রিষ্টান পল্লীর সবাই তাকে ভুলে গেল। ভুলতে পারলো না কেবল লালোয়া কুড়ুখ আর সই সোনামিরু। রূপমতীর বিয়োগ ব্যাথায় লালোয়ার মন আজও কাঁদে নক্সীকাঁথার রূপাই মিঞার মতো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লালোয়া রূপমতীর কবরের পাশে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যেত। দীর্ঘদিন লালোয়া কুড়ুখ ও সোনামিরুর রূপমতীর কবরের পাশে চুপচাপ বসে থাকা ও প্রদীপ জ্বালানোর দেখাদেখি একে একে সাঁওতাল পল্লীর সকলে এসে রূপমতীর কবরে প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করল। ক্রমশ শুরু হল মুরগি বলি, পৌষপর্বের নাচ -

> "ওঁরাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিল রূপমতীর কবর, আরসেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধল সাদা আর কালো খ্রিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খ্রিস্টানরাই জিতল শেষ অবধি। রূপমতি নয়, রেবেকা ফার্ণহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।"[১৪]

সাঁওতাল কন্যা রূপমতীর জীবনের ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে। বাংলা সাহিত্যের নব আস্বাদের গল্পটিতে গ্রীক ট্র্যাজেডিসুলভ নিয়তির ক্রীড়া রয়েছে। আলোচ্য গল্পটিতে রমাপদ মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী অসংস্কৃত সমাজের মানুষের তীব্র কুসংস্কারকে তুলে ধরেছেন।

'সতী ঠাকুরুনের চিতা' (১৩৬০) গল্পটি বাঁকুড়া রায়ের থানে যাত্রাসিদ্ধির প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্তকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। গল্পের প্রত্যক্ষ বিবরণের আড়ালে এক অদৃশ্য কালিতে লিখিত হয় সতীদাহ প্রথার কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য ডোমপল্লীর এক অশিক্ষিত পূজারীর প্রথম বিদ্রোহের প্রয়াস। জেলা বাঁকুড়া, মহকুমা বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ পুবে ময়নাপুর, কাঁসারী-দের গ্রাম। গ্রামের এদিকে একখানা ভাঙা পুরোনো বাড়ি, লোকের মুখে-দেওয়ানজীর কাছারি। আশেপাশে আরো কয়েক ঘর বামুন-কায়েতের বাস থাকলেও গাঁয়ের আর সবাই ছিল ডোম। একসময় ডোমপল্লীর নাম হয় পণ্ডিতপাড়া। ডোমপল্লীর ডোমদের যশাই সিদ্ধপুরুষ হয়ে বাঁকুড়া রায়ের উপাসক হয়েছে। তাকে পূজোর কাজে সহায়তা করতে ব্রাহ্মণকন্যা কল্যাণী যেতো ডোমেদের আখড়ায়। কল্যাণীর পিতা অকলঙ্ক বাঁড়জ্যে একদিন পন্ডিতের মন্দিরে মধ্যরাতে যাওয়া প্রসঙ্গে মেয়েকে ধমক দেয়, -

> "-পণ্ডিত? ক্ষিপ্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন অকলঙ্ক বাঁড়জ্যে। -শালা ডোম, ভেলকি দেখিয়ে পণ্ডিত হয়েছে। আমার অনুমতি না নিয়ে আর কোনো দিন যাবে না তোমরা, এই বলে দিলাম শেষবারের মতো।
> -যাবো না আর। মৃদু উত্তর এলো।
> কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভুলতে সময় লাগলো না কল্যাণীর। তা না হলে সারা গাঁয়ে এত কানাঘুষো চললো কেন, ডোমপল্লীতে হাসির হলোড় উঠলো কেন কল্যাণীর নামে!
> সকলেই প্রথম প্রথম লক্ষ করতো, সকালে পুজোয় বসতে দেরি হয়ে যেতো যশাই পণ্ডিতের। কোষাকুষি ধুয়ে ফুল বেলপাতা নেড়ে সময় কাটাতো কেবল। তারপর একসময় স্নান সেরে এলোচুলে এসে হাজির হতো কল্যাণী। সমস্ত শরীরে যৌবনের পুষ্প ফুটিয়ে, মুখে মুক্তোর হাসি দুলিয়ে। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিতো।"[১৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে মেয়েকে ধমক দিয়ে কাজ না হওয়ায় মেয়ের ডোমের আখড়ায় যাবার পথ বন্ধ করার জন্য রাতারাতি বিয়ে দিলেন আশি বছরের এক কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু হলে সহমৃতা হবার জন্য কল্যাণীকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। পাশাপাশি জোড়া চিতা সাজানো হয়ে গিয়েছে। এক পাশে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। হাত আর পা শক্ত করে বাঁধা তার। মুখের স্বর রুদ্ধ করে আছে কাপড়ের বাঁধন। সতী হবে কল্যাণী। তখনো একদৃষ্টে যশাই পণ্ডিতের আখড়ার দিকে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। ওখানে একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে আকাশে। যশাই পন্ডিত ছুটে এলেন, কল্যাণীর স্বামীকে জীবিত করবেন তিনি। কিন্তু সারারাত চেষ্টা করেও মন্ত্রের বলে কল্যাণীর স্বামীকে জীবিত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তার ইষ্ট দেবতা বাঁকুড়া রায়ের নিষ্ফলতা অনুভব করে নিরুদ্দেশ হলেন যশাই। বহুদিন পরে যশাই পুনরায় ফিরে এসে দিঘির জলে সমস্ত মূর্তিকে ফেলে দিয়ে বল, -

> "এবার মন্ত্র পড়বো আমি, তোমাদের মধ্যে যে প্রকৃত জাগ্রত ঠাকুর, সে আমার হাতে উঠে এসো।
> এই বলে জলে হাত পেতে মন্ত্রপাঠ শুরু করলো যশাই।
> মুহূর্ত কয়েক পরেই সকলে দেখলে একটি মূর্তি ঠেকেছে যশাই পণ্ডিতের হাতে। মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো। এ যে যাত্রাসিদ্ধি, যাত্রাসিদ্ধির ঠাকুর! আমার বাঁকুড়া রায় কোথায়?
> আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হলো। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হাতের কাছে উঠে এলো না।
> ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যশাই। বাঁকুড়া রায় তা হলে মিথ্যা? বাঁকুড়া রায় জাগ্রত নয়? এতদিন তা হলে মিথ্যার পুজো করে এসেছে সে?
> তন্নতন্ন করে খুঁজে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তিটা দিঘি থেকে তুলে আনলে যশাই। তারপর লাঠির ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ করলে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তি। ইষ্ট দেবতা পরীক্ষিত যাত্রাসিদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করল এবং যাত্রাসিদ্ধির থানে ব্রাহ্মণদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল।"[১৬]

তার আদেশ যে বামুন নিজের জ্যান্ত মেয়েকে জীবন্ত পোড়াতে পারে সে জাত যেন এ মন্ডপে না ঢোকে। যশাই এর বিশ্বাস পরজনমে কল্যাণী আবার এখানে ফিরে আসবে। জনশ্রুতি, প্রচলিত আখ্যান, লোকাচার, কুসংস্কার, ধর্মভীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে গল্পটি লিখিত।

'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পটিতে আদিবাসী সমাজের অন্ধবিশ্বাসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সোনাডি গ্রামের তুড়ুক সাঁওতালরা ডাইনি প্রথায় বিশ্বাসী। গাঁয়ের আদিবাসীরা বিশ্বাস করে ঝুমরা বিবি ও তার মেয়ে আসমিনা ডাইন। ডাইনি সন্দেহে তাদের মারধোর করে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা। তারা মনে করে, -

> "নির্মল সিং নয়, আঠারো-বিশ বছরের একটি পর্ণযৌবনা সাঁওতালী মেয়ে। কেউ যেন গলা টিপে মেরেছে তাকে।
>
> গাঁয়ের লোক বললে, ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনা। মায়ের মতো মেয়েও ছিলো ডাইন। নির্মল সিংকে বশ করেছিলো মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিলো, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের করে খেয়ে নিয়েছে, তাই নির্মল সিং বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না।"[১৭]

এই অন্ধবিশ্বাসের পাশাপাশি আরেক ধরনের অন্ধবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে। ডাকাত বুধন কিস্কুর পিতা মিঞা মাঝির অন্ধবিশ্বাস পুত্রের খুনের দায়ে ফাঁসী হলে পিতার কলিজা পুত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে এবং বুধন ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সৎ মানুষ হয়ে উঠবে। বুধন ডাকাতি ছেড়ে চাষবাসে মনোযোগী হবে পিতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলে মিঞা মাঝি মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অন্য একটা মৃতদেহ পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়ে বুধনের মৃতদেহ বলে দাবি করে। পুত্রের হত্যার দায় স্বীকার করে তাকে 'লটকে' (ফাঁসি) দিতে বলে। কিন্তু ফাঁসির বদলে চার বছর সাজা হলে জেল থেকে বেরিয়ে সে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। গল্পের সমাপ্তিতে দেখা যায়, ঝুমরা বিবি, বুড়ো মিক্স মাঝি সবাই ডাকাত বুধন কিস্কুকে ভুলে গেলেও সোনাডির তুড়ুক চাষীরা ভুলেনি। তাই, -

> "সোনাডির তুড়ডুক চাষীরা ভোলেনি সে ঘটনা। এখনো শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়-ঝুমরা -ঝুমরা বিবির মেলা। মেয়েপুরুষ দিনরাত নাচে গায়, দোকানীদের সারি বসে-মিঠাই, 'মান্ডী', রঙিন কাচের জলচুড়ি। ভিড় ভেঙে পড়ে মোরগ-লড়াইয়ের দিনে। চারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা আর মিঞামাঝির নামে। এলা বোঙার পুজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা অন্যটার মিঞামাঝি-তারপর দুজনেরই পায়ে ছুরি বেধে ছেড়ে দেয়।
> যে বছর 'ডাইন' মরে, আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের। আর যেবারে 'মিঞামাঝি' রগটার চোট লাগে, সেবারে এলা বোঙার পুজো চলে সাত দিন ধরে।"[১৮]

প্রচলিত আখ্যান, স্থান-কাল, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে রমাপদ গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেন। আদিবাসী সমাজে লোক-উৎসবের অন্যতম একটি ঐতিহ্য হল মোরগ লড়াই। যে-কোনো মেলা-পরবকে কেন্দ্র করে মোরগ-লড়াই আয়োজন করে আদিবাসী সমাজের মানুষেরা। এই উৎসব থেকে বিশাল আনন্দ অনুভব করে তারা। রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে মোরগ-লড়াইয়ের দৃশ্য তুলে ধরেছেন।

'নারীরত্ন' (১৩৬২) গল্পটি একরামপুর জঙ্গলের থানা-হাকিম সুধীরবাবুর মুখে শোনা গল্প কথকের লেখনীতে বর্ণিত হয়েছে। গল্পে অবৈধ প্রেমিক ধুলনকে বাঁচাতে আদিবাসী ময়না কিস্কু তার স্বামী ভুখন কিছুকে খুন করে। অথচ ময়নার অনুরোধে ধুলন যখন মৃতদেহ সোনা তুলসী নদীর জলে ফেলতে রাজি না হয়, তখন নিজেকে বাঁচাতে ময়না কৌশলে দরজা বন্ধ করে ধুলনকেই মিথ্যে খুনের অপরাধে ফাঁসিয়ে দেয়। নিজেকে বাঁচাতে ধুলন ঘরের চাল ছেদ করে পালালেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। খুনের দায়ে ধুলনের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু দিন পরে ময়নার মেয়ে, মায়ের নিষ্ঠুরতায় ও ডাইনি সন্দেহের ভয়ে আসল সত্য দারোগা সুধীরবাবুকে খুলে বলে। সুধীরবাবু অনুমান করেন ধুলন হয়তো সত্যি সত্যি ময়নাকে ভালোবাসতো। সেই ভালোবাসার নারীই যখন তাকে মিথ্যা অপরাধে ফাঁসাতে চাইলো তখন অভিমানি প্রেমিক মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করলো।

> "যাকে সত্যিই ভালোবাসি, সে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, তখন মৃত্যু কামনা করাই তো স্বাভাবিক।"[১৯]

এই গল্পের ময়না আত্মসুখসর্বস্ব ভোগী নারী। জীবনকে অপরিসীম মমতায় ভালোবেসেছে বলেই আপন অপরাধের দোষ প্রেমিকের উপর চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। আত্মসুখসর্বস্ব ভোগী মানুষ আপন স্বার্থে যে কতখানি নীচে নেমে যেতে পারে এই গল্প তারই প্রমাণ।

'মানুষ অমানুষের গল্প' (১৩৬৬) এর শুরুতেই "হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর মার, হা-লা-লা-লা বান্দর মার" চিৎকার করতে করতে বাঁদর মারার দল গ্রামে ঢোকে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় বাঁদরমারাদের দল। গ্রামবাসীদের আখের ক্ষেত, জমির ফসল, সব্জির ক্ষেত নষ্ট করে যে বাঁদরগুলো সেই বাঁদরগুলোকে মারার জন্য টাকা আর গামছার চুক্তি হয় গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে। আলোচ্য গল্পে পশুদের মানুষের সমগোত্রীয় করে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

কিছু দিন ধরেই বাঁদরদের উৎপাত নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিলো শাঁখাভাঙার লোকেদের মধ্যে। পথে মোড়ল দেড় বিঘে জমিতে বেগুনের চারা বসিয়েছিলো। যখন বেশ একটু ডাগর হয়েছিলো চারাগুলো তখন একদিন দেখলে সব ছত্রাকার করে দিয়ে গেছে। শাক-সবজি করতে দেবে না, লাউ- কুমড়ো হতে দেবে না, আখের ক্ষেতে ঢুকে মটমট করে ভেঙে দিয়ে যায় সব। শুধু কি তাই, কারো উঠন থেকে কাপড় নিয়ে পালায়, বারান্দায় বড়ি শুকোতে দিলে ঘে'টে দিয়ে যায়, গাড়ুটা-হাঁড়িটা এর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে অন্যের বাড়িতে ফেলে দেবে। পথে মেয়ে-বউ দেখলেই তাড়া করে। ছোট ছেলেপিলে সামনে গেলেই দাঁত-মুখ খি'চিয়ে তেড়ে যায়। গ্রামের সবাই যখন অতিষ্ঠ মোড়ল জানায় বাঁদর-মারাই আনতে হবে। কিন্তু তাতে সায় ছিল না অকলঙ্ক ভট্টাচার্যের। শেষ পর্যন্ত নগদ সাত টাকা ও দুজোড়া গামছার বিনিময়ে আদিবাসী বাঁদর মারার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দল গ্রামে উপস্থিত হয়। বকুল গাছের তলায় ধরানো আগুনে স্বীকার করা ইঁদুর ও খট্টাশ গুজে দেয় আহারের জন্য। লারী, টিকালী আর রচ্চনরা সাতটা লোক নিয়ে একটা দল। ভোর হতেই ওরা এসে ঢুকলো গাঁয়ের মধ্যে। চারপাশ থেকে তাড়া খেয়ে মাঠের গাছ থেকে লাফাতে লাফাতে বাঁদর- গুলো এসে জোটে গাঁয়ের মধ্যে। তাড়া খেয়ে আম গাছে লুকিয়ে থাকা একটি বানর ও শাবককে ধরে ফেলে টিকালী আর রচ্চন। বাঁদরের অসহায় অবস্থা দেখে অকলঙ্ক ভট্টচায এগিয়ে এসে, চাটুজ্যে আর পথে মোড়লের উদ্দেশে বললেন, -

> "আহা, অমন করে হত্যা কোরো না ওদের। বানর নয় হে ওরা, মানুষ। অভিশপ্ত মানুষ ওরা। দেখছো না, মানুষের মতো কেমন বুকে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটিকে।"[২০]

কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ধাড়ীটা ছুটে এসে বসল তার সামনে, ঠিক মানুষের মত দুটি হাত জোড় করে দুটি করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। কিচকিচ করে কি যেন বলতে চাইল বাঁদরটা। কিন্তু তার আগেই বাঁদরমারাদের একটা তীর এসে লাগল ধাড়ীটার বুকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেই ছটফট করতে শুরু করলো বাঁদরটা। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল অকলঙ্ক ভট্টাচার্যের পায়ের তলার মাটি। দু'চোখ বেয়ে জল নামল তার। নিজের শিশুকে বাঁচাবার জন্য গল্পে বাঁদরের মায়ের আকুলতা যে কোনো মানব মায়ের তার শিশুর জন্য আকুলতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পারিশ্রমিক হিসাবে পাওনাগণ্ডা আদায় করে নিয়ে বাঁদর মারার দল নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এখানে টিকালী চরিত্র দর্পণের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রিদে আর টিকালীর যৌন সম্পর্কের যে ছবি লেখক আভাসে ইঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন তাতে নারী-পুরুষের আদিম সম্পর্ক চিত্রায়িত হয়েছে।

আদিবাসী বাঁদর মারা দলের পেশা, জীবনযাপন, হিংসা, যৌনতা ইত্যাদির পাশাপাশি পশুদের উপর মানুষের অত্যাচার ও সমবেদনার একটা মর্মস্পর্শী ও হৃদয় আকুল করা ছবি গল্পে প্রকাশিত। যুগসচেতন লেখক তাঁর শিল্পপ্রতিভার দ্বারা এক অনবদ্য গল্প বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

'মন্ত্র' (১৩৬৮) গল্পে পাহাড়ী, সাঁওতাল শ্রেণির অশিক্ষিত মানুষের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন রমাপদ চৌধুরী। গল্পে লালচাঁদ ওঝার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের প্রতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের অন্ধবিশ্বাস এতে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামে জনশ্রুতি লালচাঁদ রোজা বিষধর সাপের বিষ ঝেড়ে নামিয়ে মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে। কিন্তু জনশ্রুতি, অপার বিশ্বাস বিফলে গেল যখন লালচাঁদের জড়িবুটি, তন্ত্র, মন্ত্র, নিমের ডালের ঝাড়ন কোন কিছুই গল্প কথকের সাপে কাটা দিদিমাকে বাঁচাতে পারলো না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যুক্তি দিয়ে তর্ক বিচার না করে শুধু পরম্পরাজনিত একটা অন্ধবিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। নদী-নালা-ঝোঁপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই বাংলাদেশে সাপের আনাগোনা বেশি। কিন্তু সব সাপই বিষধর নয়। মেশিন কোন এক সাপের কামড় দেওয়া রোগীকে কোন একদিন লালচাঁদ বাঁচিয়ে দিয়েছিল তার মন্ত্রের বলে। কিন্তু কথকের দিদিমাকে যথার্থই বিষধর সাপে কাটল, তখন ওঝার তন্ত্র-মন্ত্র কোনো কাজ দিল না। রোগীকে বাঁচাতে না পেরে হতাশ হয়ে লালচাঁদ ফিরে গেলেও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি আজন্ম বিশ্বাসে তার এতোটুকু আঘাত পড়েনি। কান্ত বেদের মেয়ে পার্বতীও বৃদ্ধ লালচাঁদের তন্ত্র-মন্ত্রে এতই বিশ্বাসী যে তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পার্বতী অন্যান্য মানুষেরা লালচাঁদের তন্ত্র-মন্ত্রের উপর যত আস্থাই রাখুক না কেন, খোদ লালচাঁদের বিশ্বাসই যেন শেষ অবধি ফাটল ধরেছিল। আজন্মলালিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষকে যে কতটা নিরুপায় করে তুলতে পারে, তাই প্রমাণিত হয় গল্পের শেষে লালচাঁদ রোজার আচরণে। নিজের স্ত্রী পার্বতীকে সাপে কামড়ালে হাসপাতালে যাবার পরিবর্তে বিষহরির প্রতি স্থির বিশ্বাসের কথাই সে বলে। ঠাকুর-দেবতার প্রতি অন্ধভক্তি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মানুষের জীবনে যে কি ভয়াবহ পরিণতি ঘনিয়ে আনে, 'মন্ত্র' গল্পটির শেষ সংলাপে কথকের উক্তিতে লাল চাঁদের বক্তব্য, -

> "অনেক তো মেরেছিস টাকা রোজগারের জন্যে, বউটাকে অন্তত বাঁচা।
> শুনে হাসলো লালচাঁদ। তারপর ঝোলা থেকে জড়িবুটি শিকড়বাকড় বের করতে করতে বললে, মা বিষহরীর মন্তর কখনও মিছা হয় গো বাপ, লাগবন্দী বিষ লামানোর মন্তর কখনও মিছা হয়।

বলে বিষপাথরে একটা শিকড় ঘষতে শুরু করলো।”[২১]

‘ফিরে আসা’ (১৩৭২) গল্পটিতে রমাপদ চৌধুরী আদিবাসী মানুষের জীবিকা রূপে কৃষিনির্ভরতা এবং বনভূমি-নির্ভরতা জীবনকে দেখিয়েছেন। গল্প কথকের বাচনভঙ্গিতে শুঁড়গি পাহাড়ের কানিয়ালুকা গ্রামের আদিবাসী মানুষের কৃষিকাজ ও পশুপালন-নির্ভর জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে ফিরে আসা গল্পটিতে। গল্পকথক তাঁর তিনবন্ধুসহ, ছোট্টু প্রধান ও ভাটিখানার মেনুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে গেস্ট হাউস থেকে আদিবাসী কানিয়ালুকা গ্রাম পরিদর্শনে বের হয়। তখনই তাঁদের রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমিতে আদিবাসীদের ফসল ফলানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। এই অবস্থায় তাঁরা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার আদিবাসীদের পালিত একটি ছাগল ছানাকে গাড়ির তলায় চাপা দেন। বরেন বলে ওঠে ওটা কেবল ছাগল, অন্য কিছুই নয়। দ্রুত তারা সেই স্থান ত্যাগ করে কিন্তু বারবার মনে হতে থাকে সড়কি টাঙি নিয়ে তেড়ে আসছে। বেশ খানিকটা এসে একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম দেখে তবেই আশ্বস্ত হলো তারা, -

> “একটা জঙ্গল-চৌকি ঘিরে কয়েকটা মাটির ঘর। লম্ফ হাতে একটা সাঁওতাল মেয়ে একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে গেল।
> সুনন্দ একটা চিমটি কাটলো।
> মৈনুদ্দিন চুপচাপ বসে ছিলো, বললো, বাঁয়ের রাস্তা নদীর দিকে গেছে।
> অবিনাশের হয়তো থামার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু থামতে পারলো না। শুধু বললো, ধুৎ, মিছিমিছি আসা।”[২২]

সন্ধের সময় গ্রামের মানুষ তামার খনিতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আসে। গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে মৃত ছাগলটাকে রাস্তার ওপর রেখে পথ অবরোধের মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এই আদিবাসী গ্রামের একই রাস্তা দিয়ে গল্পকথকসহ পাঁচ যাত্রী গাড়িতে করে ফেরার সময় তাদের বিক্ষোভের সামনে পড়ে। তাঁরা ছাগলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দশ টাকা গ্রামের মোড়লের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে আদিবাসী মানুষেরা টাকা নেওয়ার পর মানবিকতার পরিচয় স্বরূপ ছাগলটা গল্পকথকদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানালে তা কিন্তু তাঁরা গ্রহণ করে না। বরং কথকরা আদিবাসীদেরকেই উপহার স্বরূপ ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে গল্পকথকসহ তাঁর তিন বন্ধু আদিবাসী মানুষের মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পেয়ে অবাক হন। এভাবেই পরম্পরা আদিবাসী মানুষেরা নিজেদের শান্ত, নিরীহ ও সৎ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছে দিকু কিংবা বহিরাগত মানুষের কাছে। এমনকি পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই ছোট মিঞার পাঠানো ভেট পেয়ে তারা অবাক হয়েছে।

‘ভারতবর্ষ’ (১৩৭৫) রমাপদ চৌধুরীর একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। একটি জনজাতি, এ গল্পে প্রোটাগনিস্ট তাকেই ‘ভারতবর্ষ’ বলেছেন। মাহাতোগাঁয়ের কালো কালো মানুষগুলো কীভাবে ভিখারি হয়ে গেল তার বর্ণনা রয়েছে গল্পে। গল্পের শুরুতেই জানা যায় যেখানে, -

> “স্টেশন ছিল না, ট্রেন থামত না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিল। তা থেকে আমরাও বলতাম ‘আন্ডা হল্ট’।
> আন্ডা মানে ডিম। আন্ডা হল্টের কাছ ঘে’ষে দুটো বে’টেখাটো পাহাড়ী টিলার পায়ের নীচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিলো, গ্রামে-ঘরে মুর্গি চরে বেড়াতো। দূরে, অনেক দূরে ভরকুণ্ডার শনিচারী হাটে সেই মুর্গি কিংবা মুর্গির ডিম বেচতেও যেতো মাহাতোরা।”[২৩]

এই আন্ডা হল্ট নিয়ে রমাপদ চৌধুরীর গল্প ‘ভারতবর্ষ’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে এবং কখনও কখনও শুধু আমেরিকান সৈনিকদের নিয়ে মাঝে মাঝে ট্রেন যেত মাহাতোদের গ্রামের পাশ দিয়ে। লাইনের দু’পাশে কাঁটাতারের বেড়া। ভোরবেলা সেই ট্রেন হল্টে থামলে ব্রেকফাস্ট হিসেবে সৈনিকদের দেওয়া হ’ত সেদ্ধ ডিম। রাশি রাশি ডিমের পরিত্যক্ত খোসা জমত লাইনের পাশে কাঁটাতারের ওপর মাহাতোদের গ্রামের পাশে। সেই থেকে নাম হ’ল আন্ডা হল্ট।

গল্পের বাঁক বদল ঘটল যেদিন দেখা গেল মাহাতো গ্রামের এক নেংটিপরা ছেলে কোন সাহসে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের ডিম রুটি কফি খাওয়া দেখছে। এখানে লক্ষ্য করা গেল একদিকে লেখক নির্জন এক হল্ট স্টেশনের আবহ নির্মাণ করেছেন। একদিকে রেললাইন, লালশালু উড়িয়ে ট্রলির চলে যাওয়া, ঠিকাদার, বেহারি কুক, সার্ভার কুলি, মার্কিন সৈনিকদের দল এসবের প্রয়োগে নির্মিত হয় ধাতব, স্বাভাবিক মনুষ্যস্পর্শরহিত নির্জন যান্ত্রিক এক আবহ। তার বিপরীতে ক্রমে রেললাইনের পাশে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে জমা হতে থাকে মাহাতো গ্রামের মানুষজন। ওদের নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে দূর থেকে দেখা এই ট্রেনের আসা যাওয়া, মার্কিন সৈন্যদের ডিম রুটি খাওয়া, এসবই ছিল নতুন এক দৃশ্য। প্রথমে শুধু কৌতূহল ভরেই ওরা দেখত এই আশ্চর্য দৃশ্য। আর কিছু নয়, কোনও প্রত্যাশা নয়, কোনও লোভ ছিল না ওদের চোখে। এই আশ্চর্য চলমানতা দেখবে বলেই সহজ সরল মানুষগুলো এসে দাঁড়াত কাঁটাতারের বেড়ার পাশে।

একদিন এক সৈনিক তার হিপ পকেট থেকে চকচকে একটা আধুলি বার করে ছুঁড়ে দিয়েছিল কাঁটাতারের ওপারে। সবাই অবাক হয়ে সৈনিক ও আধুলিটির দিকে তাকিয়ে রইল। কাঙালের মত খাবার বা বকশিসের লোভে মাহাতোগাঁয়ের মানুষ এসে সেখানে দাঁড়াত না। শুধু কৌতূহল ছিল ওদের চোখে। ট্রেন এলেই ছুটে দেখতে আসত। ওদের ছিল খেতির কাজ, পরিশ্রমের ফসল তুলত ওরা। ওদের ছিল মুরগির লড়াই, গলায় লালসুতোয় ঝোলানো দস্তার তাবিজ, পুঁতির মালা। ছিল ধামসা মাদল, মহুয়া বন, আদিম সঙ্গীত। সাহেব বকশিস দিয়েছে শুনে ওরা উল্লসিত হয়নি। নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। লেখকের মতে পয়সাটি ছুঁড়ে দেওয়া ছিল ওদের কাছে বিস্ময়, একটা ধাক্কা, হয়তো অপমানও। সহজ সরল যে বিশ্বাস নিয়ে ওদের জীবনযাপন, সেখানে এই লোভের হাতছানি, বকশিস বড় বেমানান। বিস্মিত হয়েছিল ওরা। তারপর একদিন একমুঠো আনি, দোয়ানি ছুঁড়ে দিয়েছিল এক সৈনিক মাহাতোগ্রামের মানুষদের দিকে। দু'টো বাচ্চা ঝাঁপিয়ে পড়ল পয়সা কুড়োতে। মাহাতোবুড়ো খবর্দার চিৎকার করে সাবধান করেছিল। বাচ্চাদু'টো শোনেনি, যতটা পেরেছে পয়সা কুড়িয়ে নিয়েছে। মাহাতোবুড়ো কী সব বলে যাচ্ছিল আর হাসছিল মাহাতোগ্রামের সবাই। পালটে গেল ধরম-করম, বিশ্বাস, রীতরেওয়াজ। ভেঙে গেল তাদের ব্রতকথা, মঙ্গলকাব্য, লক্ষ্মীর আলপনা। তাদের দিকে নেমে আসে রঙিন ছবি।

এভাবে কখনও আমেরিকান সৈন্য-বোঝাই ট্রেন, কখনও ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াত। কাঁটাতারের ওপাশে মাহাতোগ্রামের সমস্ত লোক এসে দাঁড়াত হাত বাড়িয়ে। একদিন কথক দেখলেন 'সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতোবুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে — সাব বকশিস, সাব বকশিস।' উন্মাদের মত, ভিক্ষুকের মত। গল্পের শেষে দেখা গেল যেদিন মাহাতোবুড়োও ভিখারি হয়ে গেল, সেদিন আর ট্রেন থামল না। আর কোনও দিনই থামেনি। মাটি আর অরণ্যের সহজ মানুষগুলোকে ভিখারি বানিয়ে ট্রেন চলে গিয়েছিল। চিরকাল এই ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়। যারা বিক্রি হতে চায় না, যাদের শিরদাঁড়া শক্ত, যেভাবে হোক, তাদের ভিখারি বানিয়ে দাও। জগৎজুড়ে ভোগবাসনার রঙিন সুখের স্বপ্ন দেখাও। সব কেনা যায়। তারপর কেনা হয়ে গেলে আমরা আর ট্রেন চালাব না। সবাইকে ভিখারি না বানালে আমাদের রাজ্যপাট চলবে কেমন করে। পয়সা তোমাকে তুলতেই হবে। মানুষকে ভিখারি বানানোর এ এক আশ্চর্য গল্প। গল্পের শেষবাক্যে মর্মন্তুদ আত্মযন্ত্রণাজাত বেদনাকেই বাঙ্ময় করে তুলেছে -

> "ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিখারি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব-সব ভিখারি হয়ে গেল'।"[২৪]

অরণ্য ও খনিজ অধ্যুষিত ঝাড়খন্ডের রাঁচি, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ এবং ছত্তিশগড়ের বিলাশপুর সন্নিহিত অঞ্চলে জীবনে অনেকটা সময় কাটিয়ে আসা রমাপদ চৌধুরীর গল্পে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে ঐ সমস্ত অঞ্চলের মানুষজনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। শুধুমাত্র আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক বা অনগ্রসর উপজাতিদের নিয়ে রমাপদ চৌধুরী গল্প লেখেননি। তাঁর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্যে ভরা। অবশ্য একাধিক বিষয় নিয়ে তিনি গল্প রচনা করলেও তাঁর গল্পের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী অসহায় মানুষগুলির কথা। আদিবাসীদের কৃষিকাজ স্বল্পমজুরির বিনিময়ে শ্রমদান, লৌকিক দেব-দেবীর উপর আস্থা রাখা, ঝাড়ফুঁক ওঝা বিদ্যায় বিশ্বাসী, ডাইনি বিদ্যার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ধর্মান্তরের মাধ্যমে আধুনিক জীবনকে বরণ, আদিবাসী কেন্দ্রিক নানা কুসংস্কারের শাস্তি স্বরূপ বিতাড়িত হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি রমাপদ চৌধুরী তুলেছেন নিখুঁতভাবেই। উল্লেখিত

গল্পগুলি ছাড়াও রমাপদ চৌধুরীর আদিবাসী কেন্দ্রিক আরো কিছু গল্প থেকেই যায় যা মূলত অসহায় মাটির কাছে থাকা মানুষগুলির জীবন যন্ত্রণা, সমাজ সংস্কৃতির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

Reference:

১. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, 'বাংলাদেশের নাটক আদি-নৃগোষ্ঠীকথা', সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত "উলুখাগড়া" সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, বর্ষা ১৪১৩, পৃ. ২২১
২. জানা, স্মরজিৎ, 'সমাজ-সমস্যার সাত সতেরো', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দুর্বার প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২০-২১
৩. 'দেশ', ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ৬৩
৪. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২২৩
৫. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২২৬
৬. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১৯৬
৭. চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২০৩
৮. তদেব, পৃ. ২৪০
৯. তদেব, পৃ. ২৪৩
১০. তদেব, পৃ. ২৩৪
১১. তদেব, পৃ. ২৩৮
১২. তদেব, পৃ. ২৭৯
১৩. তদেব, পৃ. ২৮২
১৪. তদেব, পৃ. ২৮৪
১৫. তদেব, পৃ. ২৯৪
১৬. তদেব, পৃ. ২৯৮
১৭. তদেব, পৃ. ৩০০
১৮. তদেব, পৃ. ৩০৫
১৯. তদেব, পৃ. ৩২৪
২০. তদেব, পৃ. ৩৯৩
২১. তদেব, পৃ. ৪৬৩
২২. তদেব, পৃ. ৫২৩
২৩. তদেব, পৃ. ৫৭৩
২৪. তদেব, পৃ. ৫৭৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 310 - 315
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জনজীবন : প্রসঙ্গে জীবনানন্দ

উৎকলিকা সাহু
সহকারী অধ্যাপক
বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজ
Email ID : utkalika.sahoo86@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Partition, communal riots, Jalpaihati, Jibanananda Das

Abstract
Partition is a very important issue. During the partition of India in 1947, many people came to India from East Bengal due to communal riots. Here they came as refugees. But their refugee life became very difficult. Many people died of hunger and disease. The novel "Jalpaihati" written by Jibanananda Das was written during this time.Through the characters of the novel he also mixed elements of his own life. Bengal was then due to Hindu Muslim communal riots,Unsettled. The central character of the novel, Nishith, comes to Calcutta in search of a teaching job. Here, the complex economic and social aspects of the period are described through various characters.

Discussion

স্বাধীনতা প্রত্যেক মানবজীবনের অতিকাঙ্খিত বিষয়। ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর বুকে স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেতন জনগণ প্রতিবাদী হয়ে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্তির স্বাদ পায়। কিন্তু স্বাধীনতার একদিকে যেমন অনাবিল আনন্দ প্রকাশ পায়, অপর দিকে দুঃখ যন্ত্রনা ও স্বজন হারানোর বিষাদের সুরও পরিলক্ষিত হয়। সাতচল্লিশের ভারত বিভাজনের ফলে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুহারা মানুষদের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতকে টুকরো টুকরো করে খন্ডীকরন করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি হল পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)। পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল বাংলার একটি বৃহৎ অংশ। চল্লিশের দশকের সেই ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন বাংলার ইতিহাস ও অবয়ব সম্পর্কে। প্রাচীনকালে যে ভারতের মানচিত্র ছিল তা কালের নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং বাংলা বা বঙ্গের আকার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক চিত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। দেশভাগের আগের ও পরের বাংলার মানচিত্র আমূল পরিবর্তিত।

বাংলার ভৌগোলিক পরিসর উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এর পশ্চিম দিকে গঙ্গা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। আবার ব্রহ্মপুত্র নদ, পদ্মা ও গঙ্গার উচ্চতর প্রদেশ হতে মাটি এসে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে নতুন বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। ষোড়শ শতকে পদ্মার পরিবর্তিত প্রবাহ পথ সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়[১]। প্রাচীন যুগে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো নাম না থাকায় অঞ্চল ভিত্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন বঙ্গ, পুন্ড্রবর্দ্ধন, রাঢ়, গৌড়। মধ্যযুগ থেকে মূলত মুসলিম শাসনকালে এই অঞ্চলগুলি একসাথে বাংলা বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হতে থাকে[২]। প্রাচীন বাংলাদেশ প্রায় ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলি ছিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বতন্ত্র। তবুও শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর হওয়ার পর অধুনা পশ্চিমবঙ্গ মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে উৎকল পর্যন্ত একটি ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল। শশাঙ্কের আমলে জনপদগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি পাল-দেব যুগ পর্যন্ত চলেছিল[৩]। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলিম বৈষম্যের কারনে বাংলায় পৃথক দুটি সম্প্রদায় পৃথক ভাবে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা বাংলায় বানিজ্য বিস্তার করেছিল এই যুগে। চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রামে বানিজ্য কুঠী ছিল তাঁদের। পরবর্তী কালে ইংরেজরা শুজাকে বছরে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বানিজ্য করার অধিকার দিয়েছিল[৪]। পলাশীর যুদ্ধের পরে ফলাফলস্বরূপ প্রায় দুইশত বৎসর বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন বানিজ্যের বেশধারী ইংরেজদের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে শাসকের রাজদন্ড হাতে বাংলা তথা ভারতের শাসকে রূপান্তরিত হল। এরপর বাংলা পরাধীনতার অন্তরালে চলে যায়।

সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ও দেশভাগ আকস্মিকভাবে ঘটেনি। ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়টি ঔপনিবেশিক সরকার সহজে মেনে নেয়নি। এই প্রসঙ্গে সাতচল্লিশের ভারত বিভাজনের পূর্বের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারতে বণিকের রূপে এসে ইংরেজরা সাধারন মানুষকে শোষন করছিল। বিভিন্নভাবে জমিদার, কৃষকসহ প্রজাদের ওপর তাদের অত্যাচার সীমাহীন হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মহাবিদ্রোহের সময়কালের পর থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভারতের শিক্ষিত যুবসমাজ ও সমাজ সংস্কারকরা তাদের দেশমাতাকে ব্রিটিশদের স্বৈরাচারী শাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেছিল। এই কারনে ১৮৭০ সালে পুণা সার্বজনিক সভা, ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৮৪ তে মাদ্রাজ মহাজন সভা, ১৮৮৫ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের মতো বিভিন্ন সর্বভারতীয় গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। ১৮৮৫ তে ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সরকারের শিকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ সোচ্চার হতে শুরু করেছিল। ১৮৭০ ও ৮০ র দশকে পূর্ববঙ্গে চড়া মাত্রায় জমিদারী দাবির ফলে রায়তরা প্রতিবাদ করতে থাকে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া, রাজশাহীর মতো পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে এই ধরনের আন্দোলন হচ্ছিল। সুতরাং আর্থিক ভাবে শোষনের এই ধারাবাহিকতা বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের অসন্তোষের কারন হয়ে উঠেছিল। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ইতিহাসের মোড় বদলাতে শুরু করেছিল।

বলা বাহুল্য ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে ঊপনিবেশিক সরকার কিছু সাংবিধানিক সংস্কার চালু করেছিলেন। যেমন ১৯৪২ সালের ক্রিপস মিশন, ১৯৪৫ সালের ওয়াভেল পরিকল্পনা, ১৯৪৬ সালের সংবিধান সভা এবং পরিশেষে ১৯৪৭ সালের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা। এইসব সাংবিধানিক পরিকল্পনা গুলির অন্তিম পরিনতি হল দেশভাগ ও স্বাধীনতা। তবে ভারত বিভাজন এই প্রথমবার পরিকল্পনা হয়েছিল, তা নয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমেই প্রথম বিভাজন নীতি শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই বঙ্গ বিভাজন ১৯১১তে রদ করা গেলেও ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজন রদ করা সম্ভব হয়নি। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতের গর্ভনর জেনারেল ও ভাইসরয় হিসাবে আসেন লর্ড কার্জন। তিনি কনজারভেটিভ পার্টির রাজনীতিবিদ। ভারতে এসে প্রশাসনিক সুখ্যাতির সাথে সাথে অনেক কুখ্যাতিও পেয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন প্রশাসনের দক্ষতা ও শাসিতের সন্তোষ দুটিই তাঁর চোখে সমান[৫]। বঙ্গভঙ্গের সাথে সাথেই ভারতে জাতীয়তাবাদের এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল।

ভারত স্বাধীন হয়েছিল দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। বহু রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরে দেশ স্বাধীন হল বটে, কিন্তু টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিল ভারত উপমহাদেশকে। সাতচল্লিশে ভারত বিভাজন হয়ে পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হল। আবার এই পুর্ব পাকিস্তান পরিবর্তিত হল মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা বাংলাদেশ নামে গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ হিসাবে। সুতরাং এই ভাঙ্গা গড়ার খেলার মাঝে সাহিত্যিকদের মনজগৎ হয়েছিল আঘাত প্রাপ্ত। সদ্য পাওয়া স্বাধীনতা মানুষকে শান্তি দিলেও রাতারাতি বাস্তুচ্যুত হলে দেশত্যাগী জীবনের যুদ্ধ সাহিত্যিকদেরও ভাবতে বাধ্য করেছিল। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দপর্ন স্বরূপ, তাই দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হওয়া উদ্বাস্তু সমস্যা, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, বেকারত্ব, আর্থিক সংকট প্রভৃতি বিষয়গুলি সাহিত্যেও তার স্থান করে নিয়েছিল। সাহিত্যিকরা এইসব অনাচার অব্যবস্থাগুলি

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একদিকে যেমন তাঁদের সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্ত করেছেন, তেমনি অপর দিকে এটাও বলা যেতে পারে সাহিত্যিকরা প্রতিবাদ স্বরূপ সমসাময়িক ঘটনাবলী তাঁদের রচনায় উল্লেখ করেছেন। ভারতের দুই প্রান্ত দেশভাগ জনিত কারনে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব প্রান্ত তথা বাংলায় সেই আঘাতের ক্ষত সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারত ভাগ হওয়ার পর বাংলার যে বিভাজন তা ইতিহাসের দৃষ্টান্তমূলক একটি বিষয়। বাংলাকে ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। ভাষা, জীবিকা, জনজাতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রবল ধাক্কা বলা চলে এই বিভাজনকে। তার পরে পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির সময়েও মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই যে পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরী হয়েছিল, এর অভিঘাত পরিবর্তিত হয়ে তৎকালীন ভারতের অন্তর্গত বাংলা বা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গকে স্পর্শ করেছিল। কারন সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে একাত্তরের সময়সীমার মধ্যে বহু মানুষ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতের অন্তর্গত বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। ভারতভুক্ত বাংলা থেকে যত না মানুষ তখন পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশী পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ ভারতভুক্ত বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এইসব বাস্তুহারা দেশত্যাগী মানুষরা উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রনা ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা চোখের সামনে দেশকে ভিনদেশে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। সেইসব মানুষদের মধ্যে বহু বিদগ্ধ সাহিত্যিকরাও ছিলেন। তাই তাঁদের রচনার মধ্যে ভিটে মাটি হারা দুঃখ কষ্ঠের বিষয়টি উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ভারত অন্তর্গত বাংলা অর্থাৎ অধুনা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা সেইসব সাহিত্যিকদের বিশেষ করে কথাসাহিত্যের রচনাগুলি দেশভাগ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হল এই সাহিত্য। কথাসাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অর্ন্তভুক্ত। তাই এপার বাংলার কথাসাহিত্যিকদের নিয়েই আলোচ্য বিষয় আবর্তিত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল ভারতের ইতিহাসে পটপরিবর্তনের সময়। তাই বাংলা কথা সাহিত্যের মধ্যেও এই সময়ের বিভিন্ন দিকগুলি উঠে এসেছে। এপার বাংলার কথাসাহিত্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল- জীবনানন্দ দাসের জলপাইহাটি (১৯৪৮), বাসমতীর উপাখ্যান (১৯৪৮), অমরেন্দ্র ঘোষের ভাঙছে শুধূ ভাঙছে (১৯৫০), মন্থন (১৯৫৪), ঠিকানা বদল (১৯৫৭), বনফুলের পঞ্চপর্ব (১৯৫৪), ত্রিবর্ন (১৯৬৩), অমিয়ভূষন মজুমদারের গড় শ্রীখন্ড (১৯৫৭), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দূরভাষিনী (১৯৫২), উপনগর (১৯৬৩), মহানগর (১৯৫৩), প্রবোধকুমার সান্যালের হাসুবানু (১৯৫২), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্বজনীন (১৯৫২), অমিয়ভূষন মজুমদারের নির্বাস (১৯৫৯), প্রতিভা বসুর সমুদ্র হৃদয় (১৯৫৯), রমেশচন্দ্র সেনের পূর্ব থেকে পশ্চিমে (১৯৫৬), নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাল্মীকি (১৯৫৮), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাশ্বেতা (১৯৬০), যোগভ্রষ্ট (১৯৬০), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩), সমরেশ বসুর সুচাঁদের স্বদের যাত্রা (১৯৬৯), সওদাগর (১৯৭১), খন্ডিতা (১৯৮৭), সুনীল গঙ্গোঁপাধ্যায়ের, অর্জুন (১৯৭১), পূর্ব পশ্চিম (১৯৮৯), প্রফুল্ল রায়ের কেয়াপাতার নৌকা (১৯৭০), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠপাখির খোঁজে (১৯৭১), গৌরকিশোর ঘোষের জলপড়ে পাতা নড়ে (১৯৭৮), প্রেম নেই (১৯৮১), জ্যোর্তিময়ী দেবীর এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা (১৯৬৭), হাসান আজিজুল হকের আগুন পাখি (২০০৬), আখতার জামান হুলিয়ায়ের খোয়ানামা (১৯৯৬) সহ অসংখ্য উপন্যাস বিদ্যমান। ছোটগল্পও নেহাত কম নেই। দেশভাগ কেন্দ্রিক ছোট গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নবেন্দু ঘোষের উলুখড়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খতিয়ান, রমেশচন্দ্র সেনের পথের কাঁটা, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভারতবর্ষ, দেবেশ রায়ের উদ্বাস্তু, জ্যোর্তিময়ী দেবীর সেই ছেলেটা, নরেন্দ্র নাথ মিত্রের জৈব সহ আরো ছোটগল্প বাংলা দেশভাগ কথাসাহিত্যে তাদের ছাপ ফেলে গেছে।

চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত শুধুমাত্র দেশভাগই হয়নি, দেশভাগের সাথে অসংখ্য সমস্যাগুলিও তখন সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা, পুর্নবাসন, খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম আন্দোলন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি উক্ত দশকগুলিতে ঘটনা বহুল হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা সর্বাপেক্ষা জটিল। চল্লিশের দশকের মধ্যকালীন সময়ে ধর্মীয় অসন্তোষ প্রকট হয়ে উঠেছিল। নোয়াখালির দাঙ্গার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা দেশত্যাগী হতে শুরু করেছিল। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালীর দাঙ্গার পর থেকেই মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা কলকাতা তথা ভারতের বিভিন্ন অংশে চলে আসতে থাকে। মূলত এই পর্যায়টি ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলেছিল। ঐ সময় উদ্বাস্তু আগমন অনেকটাই ক্ষীন হয়ে এসেছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চে প্রায় ১০ লক্ষ উদ্বাস্তু চলে এসেছিল এবং জুন মানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১১ লক্ষ। এদের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ ছিল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বাকী সাড়ে পাঁচলক্ষ ছিল গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর

মানুষ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৫০ সালে হিন্দু সংখ্যালঘুদের আগমন বাড়তে থাকে। বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা হিন্দুদের উপরে অত্যাচার ও নিপীড়ন বাড়াতে থাকে। তখন প্রায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে নিরুপায় মানুষরা ভারতে চলে আসে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। ১৯৬০-৬১ সালে উদ্বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। পাবনা (১৯৬২) ও রাজশাহি (১৯৬৪) ও ঢাকা (১৯৬৫) তে ব্যাপকভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়। যার ফলে ভয়ে প্রান ও ধর্ম রক্ষা করতে প্রচুর হিন্দু পূর্ববঙ্গীয়রা বাঁচার তাগিদে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছিল[৬]। হিন্দুদের ঘর পুড়িয়ে ফেলা হোত, ফলে তারা গৃহহীন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ অনুভব করেছিল।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশক ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সাক্ষী বলা যেতে পারে। ভারত ভাগকে কেন্দ্র করে চারপাশে তখন বিহ্বল অবস্থা। নোয়াখালী ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষকে ভয়ভীত করে তুলেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ায় একদিকে যেমন আনন্দ ও উচ্ছাস প্রকাশ পাচ্ছিল, তেমনি অপরদিকে দেশত্যাগী বাস্তুহারা, স্বজন ছাড়ার যন্ত্রনাও ফুটে উঠছিল। এই বাস্তবতা কথাসাহিত্যিকদের লেখনীর মধ্যেও স্থান পেয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে উপন্যাস দুটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল জীবনানন্দ দাশের জলপাইহাটি ও বাসমতীর উপাখ্যান। উপন্যাস দুটির রচনাকাল ১৯৪৮ সাল। দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা উক্ত উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। বিভাজনের পরে পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের প্রতিছবি তাতে ফুটে উঠেছে। দুটি উপন্যাসে যেমন দেখা গেছে তেমনি দেশবিভাজনের ফলে যে অনাগত স্থিতিহীন জীবনের ভাঙন এসেছিল তার বিবরন পাওয়া যায়।

জীবনানন্দের লেখা উপন্যাসগুলি তাঁর বেঁচে থাকাকালীন প্রকাশিত হয়নি। তদুপরি তাঁর বেশীরভাগ উপন্যাসই অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। তবে 'জলপাইহাটি' ও 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাস দুটি সম্পূর্ণ লেখা। ১৯৪৮ সালে লেখা তাঁর জলপাইহাটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশীথ সেন। পেশায় একজন অধ্যাপক। পূর্ববাংলার জলপাইহাটিতে বেসরকারি কলেজের ইংরেজী পড়াতেন। কিন্তু আর্থিকভাবে পরিস্থিতির তাড়নায় তিনি অসুস্থ স্ত্রীকে প্রতিবেশীদের দায়িত্বে রেখে কলকাতায় চলে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় সম্মানজনক একটি জীবিকা পাওয়া। নিশীথের স্ত্রী সুমনা রক্তাল্পতায় ভুগছিল। কলকাতায় তিনি তাঁর বন্ধু জিতেন দাশগুপ্তের গৃহে ওঠেন। তিনি ভেবেছিলেন কলকাতা শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার কারনে এখানে হয়ত কোন কলেজ ইউনির্ভার্সিটির ব্যক্তিদের সাহায্যে কলকাতার কোন উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরী পাবেন। কিন্তু কলকাতায় এসে তাকে প্রতি পদে লড়াই করতে হয়। অন্যদিকে তার একটি কন্যার খোঁজ নেই। হারিয়ে গেছে না পালিয়ে গেছে সেই খার নেই। আর এক কন্যা যক্ষা রোগে আক্রান্ত। কাঁচড়াপাড়া টি.বি হসপিটালে ভর্তি। নিশীথের বাইস বছর বয়সী ছেলে বি.এ পাশ করে সঙ্গ দোষে জীবন সম্পর্কে দিকভ্রষ্ট। নিশীথের স্ত্রীয়ের রক্তাল্পতায় প্রতিবেশী নরেন মিত্তির রক্ত দিচ্ছে। ছেলে হারীত জলপাইহাটিতে রাজনীতি করে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে হারীত কংগ্রেস ছেড়ে সোশ্যালিষ্ট পাটিতেও যোগ দেয়। ওদিকে নিশীথ কলকাতায় এসে চাকরীর সুরাহা না পেয়ে পুনরায় জলপাইহাটিতে ফিরে যায়। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু মোটামুটি এটাই। কিন্তু এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে দেশভাগজনিত বিভিন্ন বিষয়ের শাখা প্রশাখা বিন্যস্ত হয়েছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশীথের মতোই উপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ নিজের অঞ্চল বরিশাল ত্যাগ করে কলকাতার ভাড়া বাড়িতে চলে এসেছিলেন। তিনিও কলকাতায় এসে অর্থের অভাব, বেকারত্ব, স্থানসংকুলানে জর্জরিত ছিলেন। ১৯৪৬ – এ জীবনানন্দ বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জীবনানন্দের মতো আরো অনেক অধ্যাপক দেশ ত্যাগ করেছিলেন। বলাবাহুল্য এঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু। জীবনানন্দও কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায় এবং বেকারত্বের জীবনে পর্দাপন করেছিলেন[৭]। আলোচ্য উপন্যাসটি তাই জীবনানন্দের সেই কঠোর দিনগুলিতে লেখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সমগ্র বিশ্ব দেখেছিল। সেই বিভীষিকা কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সারাবিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলিও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। পারমানবিক শক্তি প্রয়োগের খেলা শুরু হয়েছিল। ভয়ংকর হত্যালীলার সেই আঁচ থেকে রক্ষা পায়নি উপমহাদেশও। বলাবাহুল্য এই যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তাঁর উপন্যাসে প্রভাব ফেলেছিল। যে সময় এই উপন্যাসটি রচিত সেই সময়ে যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ বিভাজন, উদ্বাস্তু সমস্যার দশক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় পর্বের অধিকাংশ উপন্যাসেই সেই অভিঘাতের চিহ্ন দেখা যায়[৮]। কলকাতাতে এসেও যে অধ্যাপনার চাকরীতে বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি সেটাও উপন্যাসে তিনি ব্যক্ত করেছেন –

> "আজকাল পাকিস্তানের হিন্দু ছেলেরা দল বেঁধে কলকাতায় পালিয়ে এসে জয়নাথের বড় সুবিধে করে দিয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অধ্যাপকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব ইচ্ছে জয়নাথের, কিন্তু পথ পাচ্ছেনা এবং হাজার হাজার ছেলে বাড়ছে, পুরোন কলেজ বাড়িতে আঁটছে না কোথাও আর...।"[৯]

আবার উপন্যাসের এটাও বলা হয়ে কিভাবে পূর্ব বাংলা থেকে মানুষ এসে কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়।

> "পূর্ব বাংলার কলেজগুলো ফতুর হয়ে পশ্চিমবাংলার কলেজগুলোকে ছেলেতে ছেলেতে ফাঁপিয়ে তুলল...।"[১০]

উপন্যাসের অন্য একটি চরিত্র কুলদা প্রসাদের বাড়ী ভাড়া নিয়েও উপন্যাসিক বাংলা ভাগের প্রসঙ্গ এনেছেন। আসলে ভারত ও পাকিস্থান দুটি রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু অখন্ড বাংলা ভাগ মেনে নেওয়া কষ্ট কর ছিল। দেশভাগ না হলে কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু জনগনের ভিড় হতোনা এই দেশে। বাড়ী ভাড়া প্রসঙ্গে কুলদা জানায় –

> "চারশো, সাড়ে চারশো, পেতে পারতুম, কুমড়ো কেটে দুফালি হবার মুখে তোবা তোবা করে তুলে দিলে–" নিশীথ জিজ্ঞাসা করে "কুমড়ো কেটে দুফালি হওয়া কাকে বলে কুলদা?"

ললিতা ঘরের ভেতর থেকেই বলে ওঠে - "এক ফালি হল পশ্চিমবাংলা, আর এক ফালি পাকিস্তান ...।"[১১]

দেশভাগের সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্পর্ক বিশেষভাবে যুক্ত। রাতারাতি বিভাজনের ফলে হিন্দু ও মুসলিমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভারত ও পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু ধর্মীয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। জলপাইহাটি উপন্যাসে এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ভীষন ভাবেই সুস্পষ্ট। যেমন নিশীথের বন্ধু রবিশঙ্কর মুসলিমদের –

> "...মুশকিলে পড়েছিলুম ওয়েষ্ট পাঞ্জাবে। তখনো দাঙ্গা চলছে সেখানে। ...দু'জন মুসলমান এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলে – আমি যতই বলি যে আমি বাঙালি মুসলমান, আমার নাম লালন ফকির, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, তখন একটি কথা মনে পড়ে গেল – একসাথে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাসি পেল। বললুম আমি সারকামসিশন মানে সুন্নৎ করেছি, সেটা দেখালে বিশ্বাস হবে তো? কিছুটা নরম হল বটে কিন্তু তবুও দেখতে চাইল ...যদি অগ্রভাগ কাটা না থাকে আমার মাথা কাটবে।"[১২]

পরবর্তীকালে উপন্যাসে জানা গেল মাদ্রাজে দশ বছর আগে অবিনাশ লিঙ্গ তাকে ফাইমসিস অপারেশন করেছিল যে কারনে পাঞ্জাবে সে রক্ষা পেয়েছিল মৃত্যুর হাত থেকে, কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়। রামশঙ্কর দিল্লীতে গিয়ে হিন্দুদের রোষানলে পড়েছিল। যে নিশীথকে বলে – ''ট্রেনে দিল্লীতে অবিশ্রাম হিন্দুদের মধ্যেই চলতে ফিরতে হত আমার, কিন্তু নিজেকে মোটেই নিরাপদ মনে করতে পারতুম না, অবিনাশলিঙ্গের মুন্ডপাত করতে করতে দুর্গা বলে ঝুলে পড়তুম রোজ'।

> - কেন? হিন্দুদের ভিতর ঘুরে ফিরে কী ভয়?'
> - দুটো মাস আমার জান খেয়ে নিয়েছে হিন্দুরা।
> - 'হিন্দুরা? হিন্দুর বাচ্ছাকে?
> - কিন্তু অবিনাশলিঙ্গের কারসাজির ফলে আমার হিন্দু অভিজ্ঞান তো পাচার হয়ে গেছে"[১৩]।

হিন্দু মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মানদন্ড হয়ে উঠেছিল একজন ব্যক্তির অসুস্থতার শল্য চিকিৎসার ওপরে। শারীরিকভাবে যদি ধর্মীয় চিহ্ন না থাকে তবে বিপরীত পক্ষের মানুষটি হয়ে উঠত অযাচিত ভাবে শত্রু। শেষে দিল্লীতে মাদ্রাজী পাগড়ী পড়ে, কপালে ত্রিশূল কেটে তার হিন্দুত্বের পরিচয় বহন করত।[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবনানন্দের সাহিত্যে প্রকৃতি, একাকিত্ব, সময়, জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে যেমন আলোচনা হতে দেখা গেছে তেমনি দেশভাগজনিত দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে। অস্তিত্বের সংকটই যেনো বার বার উন্মোচন হয়েছে তাঁর লেখায়। জীবনের সেই যন্ত্রনার স্তরগুলির বিন্যাস ঘটেছে সাহিত্যের মধ্যে। জলপাইহাটি উপন্যাসেও সেই স্তরটির প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। সামাজিক অবক্ষয় আর্থিক অনটনে ক্লান্ত মানুষ, শিক্ষিত উচ্চাকাঙ্খী মানুষের যন্ত্রনা, দাঙ্গা ক্লিষ্ট বৈরীতা প্রভৃতি আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া থেকে সবেমাত্র তখন বিশ্ব রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ছিল সুদূর প্রসারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ভারতবর্ষকেও স্পর্শ করেছিল। সেই বিপর্যয়জনক অবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ সাধারন মানুষের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই জীবনানন্দের উপন্যাসে সেই আখ্যান ব্যক্ত হয়েছিল। মানবজীবনের চরম হতাশা ও বিপর্যয়ের মর্মভেদী বিবরণ রচনার দিক থেকে তিনি একজন স্বার্থক ঔপন্যাসিক বলা অত্যুক্তি হবেনা। দেশভাগ সাহিত্যে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের ভূমিকা তাই অপরিসীম।

Reference:

১. মজুমদার, শ্রী রমেশচন্দ্র, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', প্রথমখন্ড, দিব্যপ্রকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১ পৃ. ২৪
২. তদেব, পৃ. ২২
৩. রায়, নীহাররঞ্জন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ১২৪
৪. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খন্ড, দিব্য প্রকাশক, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৬০
৫. সরকার, সুমিত, 'আধুনিক ভারত', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮৫
৬. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, 'প্রান্তিকমানব', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৮-১৯
৭. সেন, অরুন, জীবনানন্দ দাশ জীবনী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ১৯৯৪ খ্রিঃ, জীবনানন্দ সংখ্যা, পৃ. ৪০৬, সিনহা, হেনা, 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ : ভগ্ননীড়ের বেদনা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৯
৮. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ও অর্ন্তবাস্তবতা : জীবনানন্দের উপন্যাস, জীবনানন্দ, গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, 'সাহিত্যলোক', কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৯৮, সিনহা, হেনা, 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ' ভগ্ননীড়ের বেদনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০
৯. দাশ, জীবনানন্দ, 'জলপাইহাটি', www.amarboi.com, পৃ. ৪৬২
১০. তদেব, পৃ. ৪৬৬
১১. তদেব, পৃ. ৪৫৮
১২. তদেব, পৃ. ৪৩৭, ৪৩৮
১৩. তদেব, পৃ. ৪৩৮
১৪. তদেব, পৃ. ৪৩৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 316 - 327
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নিম্নবর্গীয় জীবন, সুন্দরবন ও বাংলা উপন্যাস : সাহিত্যের এক উজানযাত্রা

ড. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ
Email ID : skrezwanulislam@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Sundarbans, Subalterns, folk cultures, rituals and deities, Baule (Wood-cutters), Moule (Honey-collectors), Jele (Fisher man), Novel, Upstream Journey.

Abstract
Antonio Gramsci first coined the term 'Subaltern' in order to address economic disparity. However, the terminology 'Nimno borgo' (synonymous as 'Subaltern') clearly indicates the disparity in class, caste, language and culture. In the era of globalization, 'Nimno borgo' are those who are "marginalized and oppressed people(s) specifically struggling against hegemonic globalization" (Sousa Santos). Cultural imperialism and subalternism are antagonistic with each other as the latter is "a space of difference" (Spivak). However, the subalterns as 'minority groups' play a crucial role to re-define the 'self' of the 'majority group' as Homi K. Bhaba asserts, "Subaltern groups as oppressed minority groups whose presence was crucial to the self-definition of the majority groups". This paper has explored the life of those 'Nimno borgo' in the Sundarbans.

The Sundarbans, comprising 19 blocks with 54 inhabited islands and an area of 9630 km^2, is home to a diverse population in India. This population includes communities from Medinipur; tribal groups from Bihar, Manbhum, and Singhbhum; refugees from East Bengal (now Bangladesh) and the marginalized lower-caste Poundra and Muslim communities. The religious harmony, cultural exchanges and diversity of thought of these four groups have transformed the Sundarbans into a unique field of mixed culture. These four groups are known as 'Nimno Borgo' and their life stories have started to reflect in literature from the 20th century onwards. The lives and struggles, bitterness, beliefs, folk cultures and rituals, and blend of the mundane and the supernatural among the marginalized people residing under the dominion of deities like Bonbibi, Shah Jongoli, Narayani, and Dakshin Ray revealed a new dimension of the subaltern perspectives in Sundarbans-centered novels, beginning in the 1950s with Manoj Basu's novel Jal Jangal (1951) that shows the emergence of the marginalized people of the delta - bauley (wood-cutters), mouley (honey-collectors), bahardar, saidar, crab-catchers and fishermen. Subsequently, writers like Shibshankar Mitra in Sundarbone Arjan Sardar (1955), Bonbibi (1966) and Bede Baule (1985), Baren Ganguly in Bonbibir

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Upakhyan and Bagda; Shyamal Gangopadhyay in Kuberer Bishoy Ashoy, Shachin Das in Ondho Nodir Upakhyan and Nun Dariya; Tapan Bandopadhyay in Nodi Mati Aranya (three volumes), and Jhareswar Chattopadhyay in Rampadar Ashon-Byason; Char Purnima and Samudra Duyar followed this tradition. Authors like Sunil Gangopadhyay in Jal Jangoler Kabya; Amar Mitra in Dhonpoti'r Chor, Sadhan Chattopadhyay in Gohin Gang and Joltimir; and Amitav Ghosh in The Hungry Tide have also touched upon the Sundarbans through their literary brushes. In the twenty-first century, local writers of the Sundarbans like Soharab Hossain, Utpalendu Mondal, Niranjan Mondal, Bibhu Nageshwar, and Adam Safi have woven the lives of marginalized fishermen, bauley and mouley from the Sundarbans into literature. Through vivid portrayals of such representatives of a simple life centered around water and forests, Bengali novels have found a distinct new direction that marks the beginning of an upstream journey.

Discussion

১

ব্যক্তিমানস ও সমাজমানস কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য-কামিতার কবলে পড়ে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক আধিপত্য যেমন যুগবৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি সাংস্কৃতিক জীবনেও এই আধিপত্যকামিতা সমাজ-মানসে প্রবিষ্ট হয়েছে। আধিপত্যের কবলে পড়া দলিত সম্প্রদায় - যারা জীবনের সার্বিক দিক থেকে বঞ্চিত, তাদেরকেই নিম্নবর্গ বা 'Subaltern' অভিধায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক বিভাজনের নিরিখে ইতালীয় সমাজতন্ত্রী Antonio Gramsi (১৮৯১ - ১৯৩৭) সর্বপ্রথম 'Subaltern' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নিম্নবর্গীয় অত্যাচারিত সম্প্রদায়, যারা মূলত শ্রেণি বৈষম্যের শিকার, তারাই 'Subaltern'। Sousa Santos-এর মতে, Subaltern-রা "...marginalized and oppressed people (s) specifically struggling against globalization."[১]

'নিম্নবর্গ'- এই শব্দটির মধ্যে যেমন শ্রেণিগত, জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বিভাজনের নিরিখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি Subaltern Studies দলিত ও দলনকারীর সম্পর্ককেও ব্যাখ্যা করে। Gyan Prakash যথার্থই বলেছেন –

> "The term 'Subaltern'... refers to subordination in terms of class, caste, gender, language and culture and was use to signify the centrality of dominant/ dominated relationships in history."[২]

কিন্তু এহো বাহ্য। 'Subaltern' - এর বহুমাত্রিক ও বহুকৌণিক দর্শন উঠে আসে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথায় –

> "...Subaltern is not Just a classy word for 'oppressed', for (the) others, for some body who's not getting a piece of pie... in postcolonial term, everything that has limited or no access to the cultural imperialism is subaltern - a space of difference ... The working class is oppressed. It is not Subaltern..."[৩]

তাঁর কথায় শুধু শ্রমজীবীরাই 'Subaltern' নয়, সাংস্কৃতিক সম্রাজ্যে যাদের প্রবেশাধিকার নেই, তারাই 'Subaltern'। Homi K. Bhaba 'Subaltern' - এর আলোচনায় সামাজিক শক্তির সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। তাঁর মতে 'Subaltern' রা শুধু নিপীড়িত সংখ্যালঘু নয়, তাদের উপস্থিতি সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা উচ্চবর্গীয়দের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

> "...Subaltern groups as oppressed minority groups whose presence was crucial to the Self-definition of the majority groups."[8]

দেশীয় চিন্তাবিদরা 'Subaltern' এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা উপরের কথাগুলির যোগফল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –

> "পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাব-অলটার্ন শ্রেণি' হল শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরণের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাব-অলটার্ন' শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত 'হেগেমনিক' শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিমালিক, 'বুর্জোয়াসি'। শ্রমিক শ্রেণি/ বুর্জোয়া শ্রেণি, এই বিশেষ অর্থে 'সাব অলটার্ন'।"[৫]

তবে এই 'Subaltern' চর্চা নিমগ্ন থাকে মূলত জনগণের সাংস্কৃতিক - রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও ইতিহাসবেত্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা নিয়ে। যেখানে –

> "Accusing colonialist, nationalist and Marxist interpretations of robbing the common people of their agency, it announced a new approach to restore history to the Subordinate."[৬]

অধুনা প্রান্তিক জীবনে দেখা যাচ্ছে, সমাজের অভিজাত বা এলিট সম্প্রদায়ের বিশ্বাস - অভ্যাস - আচার - আচরণজাত সংস্কৃতি (অভিজাত সংস্কৃতি) নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরা ক্রমশ সাঙ্গীকৃত করছে। ফলত এই দ্বিবিধ সংস্কৃতির ঘাত অভিঘাতে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নিম্নবর্গ অধ্যুষিত সামাজিক বিন্যাসে। এই নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিই ক্রমশ প্রান্তিক সংস্কৃতির রূপ লাভ করেছে।[৭] এই প্রান্তিক সংস্কৃতিই তথা নিম্নবর্গীয় লোকায়ত জীবন - বিন্যাস, আচার - আচরণ, বিশ্বাস - সংস্কার, ভাষা উপন্যাসে উঠে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসসমূহ এই প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় যাপন ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক কথন। বাংলা উপন্যাসে এ এক স্বতন্ত্র অনুশীলন।

আমরা জানি, ১৯টি ব্লকের সমন্বয়ে গঠিত, ৫৪টি বসবাস যুক্ত দ্বীপ, ৯৬৩০ বর্গকিমি আয়তন বিশিষ্ট ভারতীয় সুন্দরবনে চতুর্বিধ জনগোষ্ঠীর বসবাস। মেদিনীপুর থেকে আগত জনগোষ্ঠী, বিহার মানভূম সিংভূম থেকে আগত আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী ও এখানকার নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক পৌন্ড ও মুসলিম সম্প্রদায় - এই চতুর্বিধ জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণ, ধর্মীয় সমন্বয় ও সাংস্কৃতিক আদান - প্রদান ও বিবিধ ভাবধারার সমন্বয়ে সুন্দরবন আজ মিশ্র সংস্কৃতির এক নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এক ব্যতিক্রমী লোকায়ত ভাবধারায় চালিত হয় এখানকার মানুষ। সুন্দরবনে সকাল শুরু হয় বনবিবির বন্দনায়, রাত নেমে আসে জাঙ্গুলিক দেবদেবীর সান্ধ্যসঙ্গীতে - এমনটা তাদের বিশ্বাস। তার মাঝে বেঁচে থাকার জন্য কতই না কসরত। জল-জঙ্গল-নদী-খাড়ি, হাতানি-ভরানি-দোয়ানিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের তাগিদে জীবন বাজি রাখা। জীবন সংগ্রাম। এ এক ব্যতিক্রমী যাপন। এহেন যাপনকথার বিন্যাস উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র অভিমুখের সূচনা করেছে, যাকে বাংলা উপন্যাসের উজান যাত্রা বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আলোচনা সেই দিকেই অগ্রসর হবে।

২

হ্যাঁ, জল-জঙ্গল, মাটি-কাদা, নোনা হাওয়া ও দরিয়ার কূলে জীবনসংগ্রাম করে বেঁচে থাকা লোকায়ত জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক বিন্যাস সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বনবিবি, শাহজঙ্গলী, নারায়ণী, দক্ষিণরায়ের রাজত্বে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের বাঁচা - মরা, অম্লতা - তিক্ততা, বিশ্বাস - অবিশ্বাস, আচার - আচরণ, লৌকিকতা - অলৌকিকতা - সবমিলিয়ে এক লোকায়ত জীবন-বীক্ষার নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে। যদিও চল্লিশের দশকে, নাগরিক জীবনের চেনা অলিন্দ থেকে বেরিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মানদীর মাঝি - ১৯৩৬) আমাদের দেখালেন আঞ্চলিকতার এক বৈভব - কেবল ভাবনায় নয়; চরিত্র নির্মাণে, ভাষায় - স্বতন্ত্র জীবনের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্বেষণে। তার আগে অবশ্য কল্লোল যুগের উপন্যাসকাররা রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে এসে 'অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতার' মুখোমুখি হয়েছিলেন। নেমে এসেছিলেন 'নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।'[৮] পরবর্তীতে আমরা দেখলাম, প্রান্তিক জীবনের অলিন্দে যে একান্ত জীবনস্রোত নিহিত, তাকেই আবিষ্কার করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা।

তবে পঞ্চাশের দশক থেকেই সুন্দরবন উঠে আসছে সাহিত্যে, মূলত মনোজ বসুর 'জল জঙ্গল' (১৯৫১) উপন্যাসের হাত ধরে। আমরা দেখলাম, একটা আস্ত বদ্বীপে যাপনকারী নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষ – বাউলে-মউলে জেলে-বহরদার-সাইদার – কাঁকড়া মারারা উঠে আসছে উপন্যাসে। পরবর্তীতে শিবশঙ্কর মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়রা এই ধারাপথকে সাঙ্গীকৃত করে এগিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিংবা অমিতাভ ঘোষ সাহিত্যের তুলিকায় সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছেন। একুশ শতকে ভূমিপুত্র কথাকার সোহারাব হোসেন, উৎপলেন্দু মণ্ডল, নিরঞ্জন মণ্ডল,বিভু নাগেশ্বর,আদম সফিরা সুন্দরবনের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জেলে-মৌলে-বাউলে-মাছমারাদের যাপনচিত্রকে সাহিত্যে অঙ্গীভূত করেছেন। করছেন ও। এসবের সুচারু চিত্রণে বাংলা উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র অভিমুখ সূচিত হয়েছে।

নাগরিক বন্ধ্যা জীবনের আবেষ্টনী পেরিয়ে সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে ধরা পড়েছে ধূসর জাঙ্গুলিক এক লোকায়ত জীবন। কিন্তু কেমন সে জীবন? হ্যাঁ, এখানকার লোকায়ত জনসমাজ জীবন জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। সেই ব্যতিক্রমী পেশাভিত্তিক জীবনাচার উপন্যাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা এবার সেই নিম্নবর্গীয় লোকসমাজের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হব।

১. বাওয়ালি/ বাউলে : 'বাউলে' শব্দেরই অপভ্রংশ 'বাওয়ালি'। ঝাড় – ফুঁক – তন্ত্র - মন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তিই বাওয়ালি বা বাউলে অর্থাৎ গুনিন। আসলে জঙ্গলে হিংস্র বন্য জীবজন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে অরণ্যজীবী মানুষ একজন গুনিনকে সঙ্গে রাখতেন, যারা 'বাউলে' নামে পরিচিত। বর্তমানে কাঠ কাটানিয়াদেরও বাউলে বলা হয়েছে। মনে করি, এক্ষেত্রে শব্দের অর্থগত অবনমন ঘটেছে।

২. মৌলে : সুন্দরবনের একশ্রেণির মানুষ জঙ্গলের মধু ভেঙে জীবিকা নির্বাহ করে। সুন্দরবনের গহন জঙ্গলে মউ - চাক ভেঙে মধু অন্বেষণকারীই হল মৌলে।

৩. জেলে – মাছমারা : সুন্দরবনের খাড়ি – ভরানি – দোয়ানি – খাল – বিল - নদী নালা থেকে মৎস্য আহরণকারীই জেলে। তবে কিছু মানুষ চরে চরে ঘুরে শুঁটকি মাছ ধরে, শুকায়। তারপর সেগুলো লাট করে ডাঙায় পাঠায়। জেলে - জেলেনি - প্রত্যেকেই এই কাজে অংশ নেয়। এদের একত্রে মাছমারা বলা হচ্ছে।

৪. মালঙ্গী : সুন্দরবনে লবণ প্রস্তুত কারকদের 'মালঙ্গী' বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে এরা সুন্দরবনে বসবাস করে আসছে। এখনও সুন্দরবনে নদীর তীরে লবণ তৈরির মৃৎভাণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। লবণ তৈরির এই পাত্রকে বলা হয় 'মোলাঙ্গা'। 'মোলাঙ্গা' দ্বারা লবণ প্রস্তুতকারকগণ তাই 'মালঙ্গী' নামে পরিচিত।

৫. পশু - শিকারি : বাঘ – হরিণ - বানর শিকারের নেশা সুন্দরবনবাসীকে পেয়ে বসেছে। নেশার বশবর্তী হয়ে, কখনো বা গুপ্ত পথে ব্যাঘ্র হরিণ মেরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের তাগিদেই এই শিকার প্রবৃত্তি।

> "প্রকৃত ব্যাঘ্র শিকারীরা বনের আবহাওয়ায় বনমানুষ হইয়া যায়। ব্যাঘ্রের হাতে তাহারা জীবন বিসর্জন দেয়, আবার বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় ব্যাঘ্রকে পরাজিত করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। বন শিকারীর জীবন-মরণের ক্রীড়াস্থল।"[৯]

অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার ত্রি-সঞ্চয়েই শিকারিরা হরিণ শিকার সম্পন্ন করে। আবার দরিদ্র মানুষরা অর্থ উপার্জনের তাগিদেই বানরও শিকার করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. হাঙর ও কুমির শিকারি : জলজ জন্তুর মধ্যে হাঙর ভীষণ ভয়ঙ্কর। চট্টগ্রামের মৎস্যজীবীরা চাকমা ও মগ জাতীয় মানুষরা সুন্দরবন সংলগ্ন নদী, সমুদ্র থেকে হাঙর শিকার করে। খাদ্য হিসাবে তা ভক্ষণ ও করে।[১০] সুন্দরবনের মানুষরা 'চবক' নামক এক প্রকার লৌহনির্মিত সূচাগ্র অস্ত্র দ্বারা কুমির শিকার করে।[১১] কুমিরের চামড়া অর্থ সম্পদ আহরণে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

৭. সর্প ও তারকেল (গোসাপ) শিকারি : সাপুড়িয়া সমাজ সুন্দরবনের গহন জঙ্গল থেকে বিষধর সর্প শিকার করে অন্যত্র বিক্রি করে। এছাড়া, ফাঁসি জাল ও হাতের কেরামতিতে তারকেল বা গো-সাপ শিকার করে। অর্থ সম্পদ আহরণের এ এক অভিনব পন্থা।

৮. কাগজি : সুন্দরবনে এক সময় 'গেউয়া' কাঠ দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করা হত। এই কাজে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি 'কাগজি' নামে পরিচিত।[১২] বর্তমানে এ পেশা বিলুপ্ত। তারা এখন কৃষিকাজে জীবিকা নির্বাহ করছে।

৯. সানা : নদ-নদী পরিবেষ্টিত সুন্দরবনের বাঁধ ও ভেড়ি রক্ষাণাবেক্ষণের ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন গ্রাম্য মাতব্বর নিযুক্ত করা হত। এরা 'সানা' নামে পরিচিত।[১৩]

১০. বেলদার : সুন্দরবনের মৎস চাষের ভেড়ি কিংবা বাঁধের ঘোগ (ফাটল) মেরামতকারীদের বলা হয় বেলদার।

১১. কৃষক : সুন্দরবন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিজীবী। জমিদার, জোতদার, মহাজনদের সঙ্গে তাদের সংঘাত সমাজ বিন্যাসে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে। জমির মালিকানায় তাদের অংশীদারিত্ব কম। ফলে কৃষককূল বর্গা প্রথায় জমি চাষ করতে বাধ্য হয়। সংসার নির্বাহে, তিন চারগুণ মুনাফার চুক্তিতে ধান কর্জ নিতে বাধ্য হয়। এই প্রথাকে 'বাড়ী ধান' বা 'ধান্য বাড়ী' বলে।[১৪] তবে জমিদারি উচ্ছেদের ফলে বর্তমানে এহেন জর্জরিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কোথাও কোথাও অন্তঃস্রোতের মতো এই বিষবাষ্প কাজ করে চলেছে।আজও।

১২. বহরদার ও দেয়াসি : সুন্দরবনের হিংস্র বন্য জীবজন্তুদের হাত থেকে বাউলে, মউলেদের রক্ষা করার সার্বিক দায়িত্ব নেয় বহরদার ও দেয়াসি। এরা তান্ত্রিক সাধক পুরুষ। তারা হস্তে ধারণ করে মন্ত্রপূত জাদুদণ্ড - আশাবাড়ি ও ছাটাবাড়ি। বহরদাররা দেয়াসিদের তুলনায় নিজেদের উচ্চমার্গের বলে মনে করে। বহরদাররা যে কোন মূল্যে, এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সার্বিক দলকে রক্ষা করে। বাঘরূপী ছাওয়াল পীরের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে (অবশ্যই মন্ত্র বানে) গোটা দলকে বিপন্মুক্ত রাখে। পক্ষান্তরে দেয়াসিরা উচ্চমানের কাঠ পাবার আশায় দলের কোন এক সভ্যকে বাঘের মুখে তুলে দেয়। হয়ত তাই তাদের নাম দেয়াসি এমনটা মনে করেন বহরদাররা।[১৫] ফলত তাদের মধ্যে অন্তবিরোধ প্রবল।

১৩. সাইদার : মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নির্দেশক সাইদার। এক একটা নৌকায় ১০/১২ জন জেলেদের সঙ্গে একজন সাইদার থাকে। বহরদারদের মতো তারাও সাধকপুরুষ। মন্ত্র বলে বন্যজীবজন্তুদের হাত থেকে কিম্বা সামুদ্রিক বিপদ থেকে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে রক্ষা করাই তাদের কাজ।

সুন্দরবনের এই সকল নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবনাচারণ উপন্যাসের কায়া গঠন করেছে। এই সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ের বাংলা উপন্যাসে একটি নতুন অভিমুখ সূচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, তা বিশ শতকের মাঝামাঝিতে এসে।

৩

স্বাধীনোত্তর বাংলা উপন্যাসে বলিষ্ঠভাবে লোকায়ত পৌরুষ তথা নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক গ্রামীণ জাঙ্গুলিক যুথবদ্ধ জীবন, এক কথায় প্রান্তিক সুন্দরবনের জীবনচর্যা, জীবনবীক্ষা, সংস্কার – আচার - আচরণ, আধিভৌতিক ও আধিবৈদিক বিশ্বাসের কাহিনি রসসম্পৃক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে মনোজ বসুর রচনায়। তাঁর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১) ও 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) বাদা অঞ্চলেরই জীবন চিত্রণ। বনবিবির অপার করুণা, কিংবা দৈহিক প্রবৃত্তির এক জটিল আবর্ত অথবা নয়া আবাদ পত্তনের জন্য মানুষের বিরামহীন সংগ্রাম - এসবেরই বাস্তবিক বিশ্লেষণ মনোজ বসুকে কালোত্তীর্ণ করেছে। এ কথা সত্যি–

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কল্লোল যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছিল ইট – কাঠ – লোহা - লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছিল বনে – বাদায় – খালে - বিলে। পতিত আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় কল্লোল দেখেছে মানুষের ট্রাজেডি। প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা।"[১৬]

'জলজঙ্গল' - এর কেতুচরণরা বাদাবনের ব্যাঘ্রতুল্য তেজস্বিতায় বলিয়ান। আর মধুসুদন সমবায়িক সমাজ গঠনের রূপকার, মানিকের হোসেন মিঞার উত্তরসূরি। 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের জগন্নাথ, বলাই, রাধেশ্যাম - যারা অর্ধসভ্য, অর্ধমানবের তকমাধারী (তথাকথিত সভ্যদের চোখে), তারাই সুন্দরবনের বসতি স্থাপনের, সভ্যতা নির্মাণের কারিগর। পেয়েছি মন্ত্রধারী চরিত্র - মহেশ বাউলেকে। তাঁদের বাঁচা - মরা, লৌকিকতা, অলৌকিকতা ও সভ্যতার জন্মদানে হাড়হিম করা জীবনালেখ্য রচনা করলেন মনোজ বসু। সেখানে প্রত্যক্ষ হয় বসতি স্থাপনের কঠোর সংগ্রাম, মাছমারাদের জীবনসংগ্রাম, আলা নির্মাণ, ভেড়ি দখলের লড়াই, বেলদার – সিল - দানো ঝুটো - দাঁড় পোঁতা - সুন্দরবনীয় কর্মপন্থা, শেষমেষ সভ্যযন্ত্রণার বিষবাষ্পে বসতি উচ্ছেদে নির্মম যন্ত্রণা। সভ্য সমাজের করাল থাবায় বাদাবনের অর্ধসভ্য মানুষরা ক্রমশ বিতাড়িত হয়ে কালাপানির মুখোমুখি হয়। তথাপি মরে না। বন কেটে আবারও বসত বানায়। বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এভাবেই জীবনের প্রতিষ্ঠা দেন মনোজ। সুন্দরবনের জল জঙ্গল জীবন প্রান্তিক সোঁদাভেজা কাদামাটির বাস্তবতাকে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছেন মনোজ বসু।

শিবশঙ্কর মিত্রও সুন্দরবনের 'Core Zone' - এর বাস্তবতার দিশারি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র - আর্জান, কলিম, অনিল, লায়লারা লড়াই করে বনের সঙ্গে, জন্তুর সঙ্গে, এমনকি জোতদার, মহাজনদের সঙ্গেও। আর্জান, ফতেমা (সুন্দরবনে আর্জান সর্দার, ১৯৫৬), কলিম, লায়লা (বনবিবি), ১৯৬৬), অনিল, সবুর, মন্মথ (বেদে বাউলে, ১৯৮৫)-দের জীবনসংগ্রামের বহুরৈখিক নির্মাণ সুন্দরবনের Core Zone - এর প্রেক্ষিতে, ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় নি। আর্জানের বাঘ শিকারের রুদ্ধশ্বাস বাস্তব কাহিনীর পাশাপাশি শিবশঙ্কর মিত্র দেখাচ্ছেন অনিলের 'বেদে' থেকে 'বাউলে' উন্নীত হওয়ার সংগ্রাম। সঙ্গে আক্রাম বাওয়ালির আধিদৈবীক লোকমানস। এহেন নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জাঙ্গুলিক চরিত্রগুলির বাস্তব অস্তিত্ব লেখক স্বীকার করেছেন -

> "এই আয়োজনে যেসব ঘটনা ও ছবি তুলে ধরা হয়েছে তার একটিও অবাস্তব বা অলীক নয়। ঘটনাগুলি যেমন সত্য, তাদের নামগুলিও হারাতে চাইনি। অবিকল আছে। ... এরা সবাই দুর্ধর্ষ বনের সম্মুখে বাঙালির বীরত্ব ও মহত্ত্বের প্রতিভূ।"[১৭]

এদের কান্না হাসির কোলাজের সঙ্গে শিবশঙ্কর মিত্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ বিদ্যমান ছিল। তার উপন্যাসে জঙ্গলের ভয়াবহ বাস্তবতার পাশাপাশি দুর্ধর্ষ বাঘ শিকারিদের রুদ্ধশ্বাস জীবন বলিষ্ঠ ভাবেই প্রকাশিত। আক্ষেপের বিষয় এমন একজন ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিতই থেকে গেছেন।

নাগরিক জীবনের খিস্তি খেউড় ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় জল ও জঙ্গলজীবী মানুষের হৃদয়ার্তি ও জীবনসংগ্রামের ধ্বস্তাধ্বস্তি চিত্র উপন্যাসে অঙ্গীভূত করেন। গোসাবার শম্ভু নগরে শিক্ষকতার সূত্রেই জেনেছেন জল ও জঙ্গলের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক সূচিত হয়েছে যাদের - সেই অনাড়ম্বর ধূসর জীবনসম্পৃক্ত মানুষের কাহিনি। মনোজ বসুর মতো বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ও নাগরিক চৌহদ্দি অতিক্রম করে বাংলা উপন্যাসে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছিলেন প্রান্তিক হেজে পুড়ে স্নাত হওয়া নির্মেদ জীবনের মাঝে। তাই তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বাদাবনের গর্ভে, মাটির রন্ধ্রে, নদীর খরস্রোতায়, জঙ্গলের বৃত্তে। সেই প্রসারিত দৃষ্টির অত্যুজ্জ্বল বর্ণন 'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' (১৯৭৯), 'বাগদা' (১৯৮৯) - প্রভৃতি উপন্যাসে ধরা পড়েছে। বনবিবি ও বাঘের রাজ্যে সওয়ার হওয়া মানুষদের আবিষ্কারের গল্প হয়ে ওঠে তার উপন্যাস। 'বনবিবির উপাখ্যান' - এ জঙ্গল কেটে আবাদ পত্তনের পাশাপাশি আছে দৈবনির্ভর মানুষের বিশ্বাস – সংস্কার – আচার - আচরণের বহুমাত্রিক চিত্রণ। বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ মানুষের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় রজনী, ঈশান, মকবুল গৌরীদের। এককথায়, আবাদ পত্তনে প্রান্তিক মানুষের অস্তিবিদারক সংগ্রামের আলেখ্য 'বনবিবির উপাখ্যান'।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাধক, শামান, গুনিনদের অন্ধবিশ্বাস, তন্ত্রমন্ত্র, জঙ্গলাচারের প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হয়েছে 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' উপন্যাসে। আবার মাছমারাদের কঠোর জীবনসংগ্রামের সুনিপুণ চিত্রণ 'বাগদা', যেখানে কায়েমি স্বার্থের প্রতীক রূপে হাজির হয় প্রসন্নবাবু, অক্ষয়বাবুরা। সব মিলিয়ে বরেনের লেখনীতে সুন্দরবনের লোকায়ত পৌরুষের বলিষ্ঠ প্রকাশ। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের অম্লমধুর দিন যাপনের গ্লানি বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নব-নিরীক্ষার উৎসমুখ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) উপন্যাসে গ্রামজ লোকজ জীবনবীক্ষার সুনিপুণ চিত্র প্রতিফলিত। কুবের আধুনিক শূন্য রিক্ত 'Hollow men' - এর প্রতিভূ। কুবের যেন লেখকেরই এক সত্তা, যে যন্ত্র জীবনের ঘূর্ণাবর্তে দিশেহারা হয়ে ক্রমশ ছুটে চলেছে মাটির কাছাকাছি। উপন্যাসটি 'বিষয়' 'বিষ' -এ পর্যবসিত হওয়ার এক ইতিহাস। সবকিছু পাওয়ার নেশায় সর্বস্বান্ত হওয়া এক মানুষকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন প্রান্ত সুন্দরবনের গ্রামজ জীবনবীক্ষার সমান্তরাল করে। স্বপ্ন বিকিকিনির সওদাগর কুবের প্রান্ত সুন্দরবনের কদমপুর ছাড়িয়ে গহন সুন্দরবনের মেদনমল্লদুর্গ নিকটস্থ 'চড়াবিদ্যা'য় আবাদ পত্তনের মরিয়া প্রয়াস চালায়। ঔপন্যাসিক চরভূমির জীবনচর্যার নয়া উন্মোচন করেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলজঙ্গলের কাব্য' (১৯৮০) উপন্যাসে মাধব ওঝা কিংবা মনোরঞ্জনের পাঁচালির মধ্যে জড়িয়ে আছে সুন্দরবনের সংগ্রামমুখর হাভাতে মানুষের বেঁচে থাকার করুণ আবহগীতি। সেই সঙ্গে পরিমল মাষ্টার ও সুলেখা দিদিমণির কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমবায়িক সমাজদর্শনও প্রতিফলিত।তুষার কাঞ্জিলাল ও বীণা কাঞ্জিলালের আদর্শে জারিত পরিমল ও সুলেখার চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক সাম্যচেতনার প্রকাশ ঘটান। সুন্দরবনের সংগ্রামঋদ্ধ মানুষের জীবনালেখ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাধব ওঝা, মনোরঞ্জন, বাসনা, ডলিদের চরিত্রে। সুনীলও দেখালেন ওঝা বা গুনিন চরিত্রের উপন্যাসে উর্ধায়নের পাঠকৃতি। সুন্দরবনের এ এক স্বতন্ত্র জীবন, কান্নাহাসির কোলাজ।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৮০) উপন্যাসে সুন্দরবনে গজিয়ে ওঠা মালো সমাজের বেআব্রু জীবন, তাদের বাঁচার লড়াই, হিংসা-বিদ্বেষ, শোষক-শাসিতের সম্পর্কের জটিলতা, কো- অপারেটিভের সঙ্গে মহাজন - খটিদারদের সংঘাত, ভাইয়ে ভাইয়ে বৈষয়িক বিবাদ - ইত্যাকার সামাজিক বিন্যাসের সুনিপুণ চিত্র ফুঠে উঠেছে। স্বল্পায়তন বিশিষ্ট এই উপন্যাসে এক বৃহৎ ভাবনার সন্নিবেশ দেখা গেছে। ডা. ভূপতি বর্মণ ও শ্রীপদরা সমবায়িক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। সুন্দরবনের মানুষদের আর্থিক সুরক্ষায় এগিয়ে আসে কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় খটিদার আবদুল ও মহাজন ঈশ্বর মণ্ডলের মতো স্বার্থান্বেষী মানুষ। ফলত এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত চরমে ওঠে। এরই পাশাপাশি উঠে এসেছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ও সংস্কারগত সংঘাতের বহুমুখী চিত্র। সুন্দরবনের আস্ত জীবন, লৌকিক ও পারলৌকিক বিশ্বাস - সংস্কারের (বাঘের মুখে চলে যাওয়া মৃত মানুষের আত্মার শান্তি কামনায় 'কুশপুতুল' পোড়ানো) অকথিত কথন স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। বেতনা তীরবর্তী নিম্নবর্গীয় মাছমারা মালো সমাজের জীবনসংগ্রাম ও জীবনজিজ্ঞাসার বহুরৈখিক বয়ান সাধনকে লিখতে হয়েছে সামুদায়িক ও সাম্যচেতনায় জারিত হয়েই।

'সুন্দরবন কেন্দ্রিক কথাকার' - এর তকমাধারী ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে মোড় ফেরানো একটি নাম। সুন্দরবনের দ্বীপ বা চরকে নিয়ে প্রথাগত ভাবনার বদল ঘটালেন তিনি। চরজীবনের ব্যতিক্রমী আখ্যান আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, তারই উদ্গাতা ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সুন্দরবনের অজস্র দ্বীপ বা চর কীভাবে জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার উৎস ভূমি হয়ে ওঠে, তারই নির্মল আলেখ্য 'রামপদর অশন ব্যসন' (১৯৯৩)। 'রামপদর অশন-ব্যসন' দিয়েই বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতটি বদলে গেল সুন্দরবনের ট্যাংরার চরে রামের খড় ব্যবসার সূত্র ধরে। 'এক চরে বসবাস, আর এক চরে রোজগার' সুন্দরবনবাসীদের কাছে নিত্য সত্য হয়ে দাঁড়ায়। রাম, উত্তরা, উলুপী, আন্ধারী, কান্ত প্রত্যেকেরই জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে চরের গন্ধ। উত্তরা-আন্ধারীরা যেমন লবণ তৈরি (মালঙ্গি) করে, তেমনি উলুপী কান্তরা চরে ঘাস কাটে। চরই হয়ে ওঠে চরবাসীদের বাঁচার অবলম্বন। চর – জমি – খড় - মোষ এক অজানা অচেনা লোকায়ত বৃত্তে নতুন জীবন - চরজীবন - বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। বাংলা সাহিত্যে মোড় ফেরানো একটি উপন্যাসও বটে।

শীতের শুটকির সিজনে (মাত্র চার মাস) সুন্দরবনের চরভূমিতে বসবাসকারী সাবাড়ে, মাছমারা খটিদারদের বিধ্বস্ত ও সংগ্রামী জীবনের অনবদ্য রূপায়ণ 'চরপূর্ণিমা' (১৯৯৫) ও 'সমুদ্রদুয়ার' (২০১০)। সুন্দরবনের বকখালির অদূরে

'কালিস্থান' নামক চরটিই 'চরপূর্ণিমা' উপন্যাসে 'বালিস্থানের চর' নামে উঠে এসেছে। শুটকি মাছের সিজনে সেই চর কলোনির চেহারা পায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে নারী পুরুষরা আসে রোজগারের আশায়। সঙ্গে চাল – ডাল – জাল – হোগলা – বাখারি - বিছানাপত্র। চরের বুক ফুঁড়ে অস্থায়ী জীবিকার ছাউনি গড়ে তোলে। ট্রলার ভর্তি লালপাতি, ভোলা, নিহেড়ে, মরা কামট, হাঙর ফিরলে শুকনো চর জীবিকার রসে সিক্ত হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ করে তারা চর আঁকড়ে পড়ে থাকে। এই একই ভাবনার বহুমাত্রিক রূপায়ণ আবারও দেখা গেছে 'সমুদ্র দুয়ার' (২০১০) উপন্যাসে। 'সমুদ্র দুয়ার' - এ 'নতুন দ্বীপ' - এ মেছো কলোনির পত্তন এবং পঞ্চান্নটি পরিবারের সমন্বয়ে এক সামুদয়িক সমাজ গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক - যেখানে শ্রমের সঙ্গে বাঁচা মরা ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। 'ভুবনতলা' থেকে সাত আট মাইল দূরে সমুদ্রে উত্থিত একটি দ্বীপ উপন্যাসে 'নতুন দ্বীপ' নামে পরিচিত। বাস্তবিকই এটি জম্বুদ্বীপের নিকটস্থ। মিতামাণ্ডিই হয়ে ওঠে সেই চরের ধাত্রী। ঔপন্যাসিক ভুগোলের ব্যাপ্তি তথা দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সাংস্কৃতিক চলমানতাকে প্রকাশ করেন।

সুন্দরবনে 'নতুন দ্বীপ' কিংবা 'বালিস্থানের চর' - এর মতো অসংখ্য দ্বীপ জেগে ওঠে। সমুদ্র দুয়ারে গজিয়ে ওঠা চরে নিরন্ন, নিরাশ্রয় মানুষরা ছুটে আসে। চরকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজ, নতুন এক সভ্যতার জন্ম হয়। কিন্তু তথাকথিত সভ্য মানুষের করাল থাবায় কিংবা প্রশাসনিক আগ্রাসনে বাস্তু উচ্ছেদ হতে হয়। কখনো বিতাড়িতের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা জেগে ওঠে (চর পূর্ণিমা), কখনো বা পরাজয়কে মেনে নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে। নির্বাসিত এই মানবাত্মার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এবং বিতাড়নের যন্ত্রণা ঝড়েশ্বরের উপন্যাসে নতুন প্রত্যয় নিয়ে উঠে এসেছে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'চরপূর্ণিমা'র ধারাপথের নতুন সংযোজন অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭)। ধনপতির চরের ছ'মাসের (কার্তিক - চৈত্র) এক আজব পৃথিবীর সন্ধান দিলেন ঔপন্যাসিক। শুটকি মাছের সিজনে ছ'মাসের অস্থায়ী সংসার, অস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের ব্যতিক্রমী কথন ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুললেন। সেই সঙ্গে ইতিহাসের বোধ আর ভূগোলের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে জীবন - জীবিকা ও আর্থ সামাজিক সম্পর্কের বহুরৈখিক চলন ও খোলস বদলানোর বয়ান রচনা করলেন অমর মিত্র। ধনপতির চরে উপার্জনের জন্য পার্শ্ববর্তী ঘোড়াদল ক্যানিং থেকে চরপুরুষ ও চরনারীরা আসে। বর্হিজগৎ থেকে ব্যবসায়ীরা আসে। মীনা বাজারের পত্তন হয়। কিন্তু অচিরেই নেমে আসে 'গরমেন'ই আগ্রাসন। চর দখলের সঙ্গে নারী দখলের লড়াই। নারী যেন ভোগ্যবস্তু ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতার এই স্পষ্ট চেহারার বিরুদ্ধাচারণ করে নারী তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে তাদের একমাত্র উপার্জিত চরভূমি যা কিনা সরকারি পয়স্থ ভূমিও বটে - এই জিগির তুলে তা দখল করতে চায় প্রশাসন। এরই বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে একুশ শতকের নারী শক্তি - কুন্তি, বাতাসি, যমুনারা।

'চর' নামান্তরে ভূমি বা জমি রক্ষার্থে কুন্তিদের এই সংগ্রাম দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বৈশ্বিক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনজাতির জমি বা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে এই নারীসংগ্রাম, যা একুশ শতকের অস্থিবিদারক এক জ্বলজ্যান্ত বাস্তব সমস্যা। 'ধনপতির চর' উপন্যাসের আবেদন তাই বহুমাত্রিক। ড. তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন-

> "সমাজতান্ত্রিক আদর্শে জারিত অমর মিত্র সমাজ-রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালন গরমেন কর্তৃক ধর্ষিতাদের ভূগোল নিরপেক্ষ অস্তিত্বের বৃত্তান্ত রচনা করেন।"[১৮]

প্রাচীনত্বের মোড়কে (ধনপতি, পেদরু) নবীন পৃথিবী তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসন এখানে স্পষ্ট। সুন্দরবনে নতুন গজিয়ে ওঠো এক চর, যা জেলে-জেলেনিদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন তাকেই রাষ্ট্র করতলগত করতে চায় চরবাসীদের উচ্ছেদ করে। আর তারই বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নারীশক্তির জাগরণ - জাদুবাস্তবতার মোড়কেই অমর মিত্র বয়ন করলেন 'ধনপতির চর'। স্বভাবতই 'ধনপতির চর' বহুবাচনিক উপন্যাসের একটি মাইলষ্টোন।

চরকে নিয়ে গজিয়ে ওঠা নতুন কলোনি, অস্থায়ী সংসার ঝড়েশ্বর ও অমর মিত্রের চিন্তার এই মৌলিকত্ব বাংলা উপন্যাসে নতুন দিশার হদিস দেয়। যদিও হোসেন মিঞার 'ময়নাদ্বীপ' আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু 'ময়নাদ্বীপ'

আসলে 'Utopia' - কল্পরাজ্য। কিন্তু আধুনিক কথাকাররা সেই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও একুশ শতকীয় চিন্তাচেতনায় তা আর অবাস্তব থাকে না - বাস্তবাধিক বাস্তব হয়ে ওঠে। বাংলা উপন্যাসের বদল বৃত্তান্ত রচিত হয়ে যায় এই অতিবাস্তব চর আখ্যানে।

বিশ্বখ্যাত ইঙ্গ-ভারতীয় কথাশিল্পী অমিতাভ ঘোষ শিল্পের দায়বদ্ধতা মেনে ঢুকে পড়লেন সুন্দরবনের স্রোততরঙ্গে, দ্বীপের নতুন সমাজ বিন্যাসের অলিন্দে। সুন্দরবনের হাজা-পোড়া-এগজিমাময় মানুষের অস্তিত্বরক্ষার বিরামহীন পথ চলার কাহিনি রচনা করলেন 'দি হাংরি টাইড' (২০০৪) উপন্যাসে। গ্রামজ - লোকজ ও ইতিহাসজ জীবনবীক্ষার এক অসাধারণ নিদর্শন 'দি হাংরি টাইড'। কাহিনির যাত্রাপথ সুদীর্ঘ - সুদূর আমেরিকা থেকে সুন্দরবনের গোসাবার 'লুসিবাড়ি'। আমেরিকা থেকে আগত গবেষক পিয়ালী রয় (গবেষণার বিষয় - গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন) ওরফে পিয়ার সুন্দরবনে আগমন এবং কানাই ও ফকিরের সঙ্গে তারই জীবনবৃত্তের সমান্তরাল করে সুন্দরবনের ভয়াল ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ও তার নান্দনিক দিকের উন্মেষ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বর্তমানের সুন্দরবন আর অনতি অতীতের মরিচঝাঁপি - এই দুয়ের বিন্যাসে গড়ে ওঠা চরিত্র সমূহ নির্মল, নীলিমা, হরেন, কুসুম, কানাই, ফকির, পিয়া- এক নিটোল অবয়ব পেয়ে যায় ইতিহাস সম্পৃক্ত হয়ে। নির্মলের ডায়েরি আর মরিচঝাঁপি হামলায় বেঁচে থাকা এক প্রাণ ফকিরই সুন্দরবনের অতীত ও বর্তমানের সংযোগ রক্ষাকারী। সুন্দরবনের নিম্নবর্গীয় কুসুম, হরেন, ফকিরদের যন্ত্রণাবিদ্ধ কাহিনি উঠে এসেছে মরিচঝাঁপির সমান্তরাল করে। সঙ্গে বনবিবির পালাগান ও। 'হাংরি টাইড' - এ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দিয়ে আস্ত সুন্দরবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিকরণকে চিহ্নিত করেছেন ঔপন্যাসিক। সেই সঙ্গে প্রগতিশীল সমাজবাদী, ভাববাদী আদর্শের (নির্মলের) সঙ্গে বাস্তববাদী আদর্শের (নীলিমার) সংঘাত- এই উপন্যাসের নতুন ভূমি তৈরি করেছে।

সোহারাব হোসেনের 'গাঙবাঘিনি' (২০১১) উপন্যাসে সুন্দরবনের 'Core Zone' এর বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। ধঞ্চি, বিজিয়াড়া, কলস ক্যাম্প, বনি ক্যাম্প, ছোট চামটে, বড় চামটে, ডাঙাডুলি - ইত্যাকার দ্বীপের বাস্তব চিত্র ও দ্বীপে পদচারণাকারী কাঠকাটা বাউলে মউলেদের সংগ্রামী জীবনের অনবদ্য প্রকাশ 'গাঙবাঘিনি'। একদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা, অন্যদিকে নিঃসঙ্গ হৃদয়ের আর্তি উপন্যাসের মৌল চরিত্র অধরকে ক্ষতবিক্ষত করে। সেই ক্ষতের জ্বালা নিবারণের একমাত্র দাওয়াই কাজলা। অথচ কাজলা জ্যান্ত বনবিবির তক্কা এঁটে আধোবৃত্তের পিঞ্জারা তৈরি করে। এটাই উন্মাদপ্রায় অধরের ট্রাজেডি। সেই ট্রাজেডির পরতে পরতে উঠে এসেছে বাউলে, কাঠকাটানিয়া-মাছমারা বনচারী মানুষের দেশজ, লোকজ বিশ্বাস, আচার প্রথা, লৌকিকতা, অলৌকিকতা, বনবিবি, দক্ষিণরায়, কপিলমুনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ - ইত্যাকার প্রসঙ্গ, যা 'গাঙবাঘিনি'কে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। পেয়েছি মন্ত্রিশক্তিতে বলীয়ান হানিফ সাঁইদারের মতো চরিত্র। সীমান্ত অতিক্রমকারী বাঘের প্রতীকে অধরের ছিন্নমূল হবার বৃত্তান্ত ও দেশভাগের যন্ত্রণা এবং সেই সাথে বাঘিনির শরীরের 'আতপ' গন্ধে বাঘের বর্ডার অতিক্রমন যেন কাজলার প্রতি অধরের হৃদয়বত্তার তীব্র আকর্ষণকেই সুচিত করে - যা ঔপন্যাসিকের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। সোহারাব হোসেনের 'গাঙবাঘিনি' তাই দেশ-কাল ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে যায়।

'প্রবহমান ধারায় প্রাণোচ্ছল' যে জীবন,সে তো আপন ছন্দে বয়ে চলে সমূহ ঝঞ্ঝা-বাত্যা অতিক্রম করে। কখনো কখনো যন্ত্রণার ফেনিল হাওয়া মেদমজ্জা ভেদ করে হিমশীতলতা দান করে। তবুও বাঁচার আকাঙ্খাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় মানুষ। তখন দেখা যায় 'কোজাগরী পূর্ণতা' - এ হেন বৃত্তান্ত নবীন ঔপন্যাসিক উৎপলেন্দু মণ্ডলের হৃদয় স্পর্শ করে যায়। তাঁর লেখনীতে বেরিয়ে আসে সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবনের নিদারুণ যন্ত্রণা জল ও অরণ্যজীবী মানুষের বারোমাসের ক্রন্দন ধ্বনি। তিনটি ছোট ছোট নভেলেটে - কুসুমকথা, আঠারো ভাঁটির মা ও নোনাভূঁই - এ ফুটিয়ে তোলেন সুন্দরবনের লোকায়ত জনগোষ্ঠীর জীবনকাব্য 'জলজঙ্গলের বারমাস্যা' (২০০২)। তাঁর উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনযন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত। প্রান্তিক জীবন যেন পদ্মপাতায় জল, ভালবাসা দূর বিসর্পিল নদীর মতো কূল ভাঙে। বিদ্যা, মাতলা, ঠাকুরনের জল আলগোছে ভাসিয়ে দেয় বর্ণময় জীবন। সেই জীবন শুরু যায় খুব দ্রুত, ফুরিয়ে যায় আরো দ্রুত। সেই দ্রুত শুরু হওয়া ও ফুরিয়ে যাওয়া জীবনের নির্মল আলেখ্য 'গৌড়দহ' (২০১১)। ক্যানিং, বাসন্তি, কুলতলি, মেরিগঞ্জ, গোসাবা, সোনাখালি, গোলাবাড়ির দহবৃত্তে গড়ে ওঠা প্রান্তিক মানুষের আকাঁড়া অভিজ্ঞতা ও জীবনসংগ্রামের সকরুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'গৌড়দহ' উপন্যাসে। এক ভণ্ড সাধু গৌরের জীবনযন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত

হয়েছে উপন্যাসে। এ হেন জীবনযন্ত্রণার আর এক প্রস্ত বিন্যাস আবারও দেখা গেছে 'সেতু' (২০১২) উপন্যাসে। বাসন্তির সেতু পার্শ্ববর্তী জনপদের আলেখ্য এই উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে কিছুটা ফারাক লক্ষ্য করা গেলেও প্রান্তিক জনপদের জীবন বিন্যাসের বহুমাত্রিক প্রয়াস - অবশ্যই প্রশংসনীয়।

নিরঞ্জন মণ্ডলের (১৯৫৫) লেখনী সুন্দরবনের কোর জোনকে ধারণ করেই অগ্রসরমান। তার লেখা এক অনাস্বাদিত মাধুর্য বহন করে আনে পাঠকের মনে। জঙ্গলের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা মানুষজন – বাউলে - মউলে কাঁকড়ামারি - মিনমারি, প্রান্তিক জল ও জঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংগ্রামী মানুষজন নিরঞ্জনের লেখনীর জারক রস। চোখে দেখা বাস্তব জীবনের সঙ্গে লোকায়ত অধিচেতনার দ্বিবিধ মিশ্রণই তাঁর সাহিত্য রচনার মৌল চাবিকাঠি। 'বাদাবনের পদাবলী' (২০১৯), 'উজান ভাটির কথকতা' (২০২০), সম্প্রতি প্রকাশিত 'ঠাকুর ঠাকুর ডয়রা কলা' (২০২১), 'বাদাবনে কমলে কামিনী' (কিশোর আখ্যান - ২০২১) - ইত্যাকার রচনার আখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাদাবনের নোনা হাওয়ার ঝাপট, কুমির - কামোট, বাউলে-মউলেদের রুদ্ধশ্বাস জীবনের আকাড়া অভিজ্ঞতা। সেই সঙ্গে তন্ত্র – মন্ত্র – ক্রিয়া - আচার - সব একাকার হয়ে যায় তার লেখনীতে। এভাবেই জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তিনি।

সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবনের নানান অনুষঙ্গ, জীবন-জীবিকার সংগ্রাম অথবা সংগ্রামহীনতা, মন্ত্রশক্তির উজ্জীবন, বেঁচে থাকার দুর্দম প্রয়াস - সবই আমরা দেখি তার বাদাবনের পদাবলীতে –

> "সুন্দরবনের জলজীবী বনজীবী, দলিত খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের জীবন - জীবিকা লৌকিক দেবদেবী - এসব নিয়েই জড়িয়ে থাকা যে বিস্তীর্ণ লোকসংস্কৃতি, তা নিয়েই বই। জলে জঙ্গলে হিংস্র পশু, আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার জীবনসংগ্রাম। আর সেই জীবন সংগ্রাম, তার নিজের চলা দিয়ে তৈরি হয় লোকসংস্কৃতি। তাই মুখে মুখে তৈরি হয়ে যায় 'জ্বালান', 'খিলান', 'চালান' মন্ত্র'।"[১৯] (এই সময়, ৩০. ০৬. ২০১৯)

এসব নিয়েই রচিত নিরঞ্জনের 'বাদাবনের পদাবলী' এক ব্যতিক্রমী মননের সন্ধান দেয়।

'উজান ভাটির কথকতা' (২০২০) উপন্যাসে লেখক সুন্দরবনের কোর জোনের পরতগুলো একে একে উন্মোচিত করেছেন। মাছমারা, মিনমারা, কাঁকড়ামারা, বাউলে-মউলদের জীবন সংগ্রামের মর্মন্তুদ বয়ান নির্মোহ দৃষ্টিতেই নির্মাণ করেন নিরঞ্জন। সুন্দরবনের লোকায়ত সংস্কৃতির এক ফল্গুস্রোত - আখ্যানকে সিক্ত করে নিবিড় ভাবে। সেই সাথে কেবল জঙ্গলের বাঘ নয়, ডাঙার বাঘ তথা আড়তদার খটিদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও চিত্রায়িত করেন। তার নারান, শুকো বাউলে-ইত্যাকার চরিত্ররা কালের চক্রে হারাবার নয়। যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতায় একটা লেখনী শেষাবধি শিল্প হয়ে ওঠে, সেই প্রসারতা আমরা অবলীলায় দেখতে পাই 'উজান ভাটির কথকতা'য়। হ্যাঁ, সাহিত্যের এক নতুন ধারাপথের উত্তরণ ঘটছে নিরঞ্জনের লেখনীতে। বাংলা উপন্যাসের নতুন প্রত্যয়ের জন্ম দেওয়ার সমুহ সম্ভাবনা আছে নিরঞ্জন মণ্ডলের।

হ্যাঁ, সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক ধূসর বাস্তব জীবনকে এভাবেই চিনিয়ে দেয় আমাদের। ঔপন্যাসিকরা তাই এক অর্থে স্তালিনের ভাষায় - 'Engineer of human souls' - মানবতার কারিগর। সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাকাররা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অমোঘ প্রকাশে মানবের সমুহ বিকাশকে পরিপুষ্টি সাধন করেছেন। গোর্কির মতে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা পৃথিবীর পুনর্গঠনকারী জনগণের বাস্তবতা। সেক্ষেত্রে লেখকের দায়িত্ব হবে - গোর্কির ভাষায় –

> "...to participate directly in the construction of a new life, in the process of changing the world."[২০]

নতুন জীবন-অন্বেষালব্ধ চেতনায় জারিত সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাকাররাও সমাজতান্ত্রিক মানবতার দিশারি – মায়াকভস্কি যাকে বলেছেন, "পরিপূর্ণমানবতা।"[২১]

8

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সবমিলিয়ে সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস জীবন - অন্বেষার স্বতন্ত্র দর্পণ বিশেষ, যেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অচেনা, অজানা অভিধেয় মানুষের জীবনসংগ্রামের তিতিবিরক্ত জ্বালা ও জীবনযন্ত্রণার আর্তনাদ। আমরা জানতে পারলাম, 'বাউলে' বৃত্তিধারী প্রান্তিক মানুষগুলোর বেঁচে থাকার লড়াই, 'মউলে' সম্প্রদায়ের মধু-অন্বেষণের কারকিত, পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াই-এর আদিম হিংস্রতা, কখনো বা সহাবস্থান। জানলাম, কাঠ কাটানিয়াদের খট - খট শব্দের মাতনে বনভূমি বিদীর্ণ হবার এক রুদ্ধশ্বাস আবহ। সেইসঙ্গে 'বহরদার' 'সাইদার'দের তন্ত্রমন্ত্রের উচ্চারণে হিংস্র জীবজন্তু অধ্যুষিত বনভূমি স্তব্ধ হবার ইতিবৃত্তও। জেলে চিত্রণ আগেই পেয়েছি, কিন্তু সাবাড়ে, খটিদার, মেছুনী, মাছমারাদের শীতের শুটকির সিজনে নতুন গজিয়ে ওঠা চরভূমিতে বিজয়োল্লাস - বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার পাশাপাশি চরভূমির বাস্তবতার এক শৈল্পিক রূপায়ণ, বাংলা উপন্যাসে নতুন দিশার হদিস দেয়। চরভূমিতে গজিয়ে ওঠা নতুন বসতিতে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের থাবা ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতা এবং তা প্রতিহত করতে চরবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন (চরপুর্ণিমা, ধনপতির চর) - এই অভিনব ভাবনা, জীবনসংগ্রাম ও জীবনযন্ত্রণা বাংলা সাহিত্যে আর কোথায়?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদা আক্ষেপের সুরে প্রশ্ন তুলেছিলেন –

> "ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী – মজুর – মাঝি – মল্লা – হাড়ি - বাগদীদের রুক্ষ কণ্ঠের সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা- যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে, মানুষের জগতে স্থান পায় না?"[২২]

অন্ত্যজ শ্রেণির নিম্নবর্গীয় (Subaltern) জীবনকথন নামান্তরে 'বিরাট মানবতা' সাহিত্যে উপেক্ষিত ছিল বলেই মানিক একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। মানিক কথিত এই 'বিরাট মানবতা'র শৈল্পিক প্রকাশেই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটেছে। সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাকাররা এই 'বিরাট মানবতা' তথা নিম্নবর্গীয় লোকায়ত পৌরুষের সন্ধান করেছেন। করছেনও অহরহ। মনোজ বসু, শিবশঙ্কর মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস, অমর মিত্র, সোহারাব হোসেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু মণ্ডল, নিরঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ ঔপন্যাসিক সাহিত্যে 'বিরাট মানবতা'র প্রকাশ সাধনে উপন্যাস শিল্পে স্বতন্ত্র অভিমুখের সূচনা করেছেন। উপন্যাসকাররা নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক বিমর্ষ জীবন, জীবনের ওঠা-পড়া ও লোকায়ত পৌরুষের বলিষ্ঠ আখ্যান রচনা করলেন, যেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সুন্দরবনের বৃহৎ আঞ্চলিকতার (Local Colour) বহুরৈখিক বিন্যাস। এর মধ্যেই নিহিত আছে উত্তর আধুনিক (Post modern) উপন্যাসের বীজ। বাংলা সাহিত্যের এ এক নতুন ট্রেন্ড, স্বতন্ত্র অভিমুখ।

হ্যাঁ, গহন সুন্দরবন ও তার তীরবর্তী সমতল ভূখণ্ডে বসবাসকারী নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষজন তাদের লোকায়ত পৌরুষ নিয়ে বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এতকাল সাহিত্যের পাতার অপাংক্তেয় ছিল, সেই সব নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরাই উপন্যাসের মৌল চরিত্র হিসাবে প্রতিপাদ্য হল - অনেকটা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের ঊর্ধায়নের মতো। সুন্দরবনের লোকায়ত জনগোষ্ঠীর সংক্ষুব্ধ হৃদয়াত্মাকে উপন্যাসে অঙ্গীভূত করে ক্ষত প্রলেপের একটা চেষ্টা যেন। অতঃপর বাংলা উপন্যাসে নায়ক চরিত্রের মর্যাদা পেল বাউলে, মৌলে, জেলে, জেলেনি, মাছমারা, মেছুনি, বহরদার, সাঁইদার, ওঝা, গুনিন তথা জল ও জঙ্গলকেন্দ্রিক অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিভূ নিম্নবর্গীয় কোনো ব্যক্তিমানুষ - এটাই বাংলা সাহিত্যের পরম প্রাপ্তি। বাংলা কথাসাহিত্যে এ এক উজান যাত্রার সূত্রপাত, বলতেই হয়।

Reference:

১. Santos, De Sousa, Towards a New Legal Common Sense, 2nd ed. Lexis Nexis Butterworths, London, 2002. www.google.com

২. Prakash, Gyan, Subaltern Studies as Post Colonial Criticism, The University of Chicago Press, 1994, Source

৩. The American Historical Review, Vol. 99, No. 5 (dec, 1994), P. 1477. (www.google.com) de Kock, leon, 'Interview with Gayatri Chakraverty Spivak, New National Writers Conference in South Africa, 1992, Review of International English Literature. www.google.com

8. K Bhaba, Homi, 'Unsatisfied notes on Vernacular Cosmopolitanism', Text and Nations: Cross-Disciplinary Essays on Cultural and National Identities, Ed, Laura Garcia - Moreno and Pater C. Pfeiffer, Columbia, SC Camden house, 1996. (www.google.com)

৫. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহার্স', নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ২ – ৩

৬. Prakash, Gyan, Subaltern Studies as Post-Colonial Criticism, The University of Chicago Press, 1994. P. 1477. (www.google.com)

৭. ইসলাম, আমিনুল, নিম্নবর্গীয়দের জীবন ও বাংলা উপন্যাস, বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর, সম্পাদনা বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১১২

৮. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য, কল্লোল যুগ, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪১৬, পৃ. ৩০৮

৯. এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৯৭

১০. তদেব, ঐ, প. ১৯৮

১১. তদেব ঐ, পৃ. ১৯৮

১২. তদেব ঐ, পৃ. ২০৭

১৩. তদেব ঐ, পৃ. ২০৮

১৪. তদেব ঐ, প. ২০৬

১৫. ইসলাম, শেখ রেজওয়ানুল, 'সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন : শিকড় সন্ধান', সমকালের জিয়নকাঠি, জুন ২০১০, সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, পৃ. ৩১৭

১৬. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য, কল্লোল যুগ, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪১৬, পৃ. ১৭৯

১৭. মিত্র, শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৫, মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩০৪

১৯. দৈনিক এই সময় পত্রিকা, ৩০/ ০৬/ ২০১৯

২০. Gorky, Maxim, Soviet literature, Soviet Writers Congress, 1934, Lawrence and Wishart, London, 1977

২১. সরকার, সংলাপ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বাস্তবতার এক অন্য উদ্ভাস, পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, সম্পাদনা. নবেন্দু সেন, রত্নাবলী, ২০০৯, পৃ. ১৯২

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, সাহিত্য করার আগে, লেখকের কথা, নিউ এজ, পৃ. ১৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 328 - 336
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারী ও প্রকৃতির আত্মিক সম্পর্ক : ‘রূপকথা ফিরে আসে’

ড. বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
অধ্যক্ষ, বিলাসীপাড়া মহাবিদ্যালয়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সরকারি আর্দশ মহাবিদ্যালয়, বিলাসীপাড়া
Email ID : dr.biswasprincipal@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Natural Environment, Built Environment, Eco-Text, Green House, Ecofeminist, C.F.C, C.M.C.

Abstract
A unique Bengali novel with the concept of environmental consciousness by the author Tapan Banerjee ‘Rupkatha Phere Aase’ (2008) is analysed here. The background of the novel is a village called Apanpur, an hour's journey by rail from Calcutta, which was given the name ‘Bankella’ by a village historian. It is well known by that name. Ranima made this village, two kilometers away from Jhau Palash station, full of natural beauty by planting numerous trees of different species. Throughout the year that village was filled with the shade of flowers. The current heirs of the old royal family want to bring modern civilization to the village. Ranima had planted a Shisham tree in the middle of the village entrance. For that tree, no motorized vehicles other than bicycles and rickshaws could enter the village. The village surrounded by numerous trees had the wonderful fragrance of pure air. The current heir to the dynasty cut down the Shisham tree in the middle of the road to drive his hobby car into the 'bankella'. In Bankella village there was an unwritten prohibition of Ranima against cutting trees, which was believed by all the people of the village. But the people of Rajbari broke that rule and cut the first tree in Bankella. It was Ranima who forbade everyone not to cut any tree. She had heard in the prophecy that if the tree is cut down, disaster will come closer to ‘Bankella’. The narrative of the novel begins with the cutting of the Shisham (Dalbergia Sissoo) tree and ends with destruction.

Discussion

এক

কথাশিল্পী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশ-ভাবনা সম্বলিত একটি অনন্য উপন্যাস ‘রূপকথা ফিরে আসে’ (২০০৮)। উপন্যাসটির ভূমিকায় ঔপন্যাসিক বলেছেন –

> “প্রকৃতির সঙ্গে কোনও মানুষ বন্ধুত্ব করে, কেউ বা শত্রুতা। সমাজের এই দু’ধরণের মানুষের মধ্যে টানাপোড়েন নিয়ে এই উপন্যাস”[১]

উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা থেকে রেলপথে ঘন্টাখানেকের পথ আপনপুর নামের একটি গ্রাম, যাকে গ্রামের ইতিহাসের এক রানিমা দিয়েছিলেন ‘বনকেল্লা’ নাম। সেই নামেই তার পরিচিত। ঝাউ পলাশ স্টেশন থেকে দু'কিলোমিটার দূরের এই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রামকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন রানিমা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য বৃক্ষ রোপন করে। সারা বছর সে গ্রাম ফুলে ফলে ছায়ায় ভরে থাকতো। পুরানো রাজপরিবারে বর্তমান উত্তরাধিকারীরা সেই গ্রামে আধুনিক সভ্যতাকে নিয়ে আসতে চায়। রানিমা গ্রামের প্রবেশ পথের মাঝখানে পুঁতে ছিলেন একটি শিশু গাছ। সেই গাছটির জন্য সাইকেল এবং রিক্সা ছাড়া অন্য কোনও মোটর চালিত যানবাহন গ্রামে প্রবেশ করতে পারতো না। অসংখ্য গাছে ঘেরা সে গ্রামে ছিল নির্মল বাতাসের অপূর্ব সুগন্ধ। রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী তার শখের গাড়িটিকে 'বনকেল্লা'য় প্রবেশ করানোর জন্য রাস্তার মাঝখানের শিশু গাছটিকে কেটে ফেলে। গাছ কাটার প্রতি বনকেল্লা গ্রামে ছিল রানিমা-এর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা, যে নিষেধাজ্ঞাকে বিশ্বাস করতো গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ। কিন্তু রাজবাড়ির মানুষেরাই সে নিয়ম ভেঙে বনকেল্লায় প্রথম গাছ কাটল। রানিমা-ই সবাইকে বারণ করেছিলেন তার পোঁতা গাছ না কাটতে। তিনি নাকি দৈববাণীতে শুনে ছিলেন গাছ কাটলে বনকেল্লায় ঘনিয়ে আসবে সর্বনাশা। উপন্যাসটির আখ্যান শুরু হয়েছে শিশু গাছটির কর্তনের মধ্য দিয়ে আর শেষ হয়েছে সর্বনাশে।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় ১৯৪৭ সালে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] দেশভাগের অব্যবহিত পরেই উত্তর চব্বিশ পরগণার ইছামতি নদীর কিনারে বসবাস ও লেখাপড়া শুরু করেন। ষাটের দশকে কলেজে পড়তে চলে আসেন কলকাতায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সরকারি প্রশাসনিক চাকুরির সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বহু বছর কাটিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার-ই প্রতিফলন ঘটেছে তার বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ব্যাভিচারিণী' সাড়া জায়গায়। তারপর 'রাজ্যপালের অসুখ', 'মুখ্যমন্ত্রী উপহার', 'ইঁদুর' প্রভৃতি গল্প পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রশাসনিক চাকুরি সূত্রে দীর্ঘকাল সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে সেখানকার ইতিহাস ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের বীজ দানা বাঁধে। সুন্দরবনের একশ বছরের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের জন্য লেখক ২০০২ সালে পেয়েছেন রাজ্য সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার'। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাসের সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'শঙ্খসমুদ্র', 'শঙ্খচিলের ডানা', 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', 'পিঞ্জরের টিয়া', 'ঘাতক', 'অভিশপ্ত অরণ্যে', 'শিকড়ের খোঁজে মানুষ', 'টাঁড় বাংলা উপাখ্যান', 'টাঁড় বাংলার রূপাখ্যান', 'টাঁড় বাংলার রীতিকথা', 'জঙ্গলের রাজা', 'আশ্বিনের বিল', 'চাঁদমারি', 'কোটি কোটি বছরের পাড়ি', 'জীবনের সাত রং', 'রেস কোর্সে রোমি', 'দ্বৈরথ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩] 'মহুলবনীর সেরেঞ্চ' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়নের পর কাহিনিকার হিসেবে ঔপন্যাসিক পেয়েছেন বি.এফ.জে.এ. পুরস্কার (২০০৫)। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে তিনি পেয়েছেন 'সাহিত্য সেতু' পুরস্কার (১৯৯৩), 'সোপান' পুরস্কার (১৯৯৫), 'অমৃতলোক' পুরস্কার (১৯৯৭), 'সাংস্কৃতিক খবর' সম্মান (২০০১), 'মঞ্জুষ দাসগুপ্ত স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৩), 'পাঞ্চজন্য' পুরস্কার (২০০৩), 'প্রতিমা মিত্র স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৫), 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর' পুরস্কার (২০০৫), 'কৃত্তিবাস সাহিত্য' পুরস্কার (২০০৫), 'নিত্যানন্দ স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৫), 'শৈলজানন্দ স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৫), 'রূপসী বাংলা' পুরস্কার, 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কার, 'চোখ সাহিত্য' পুরস্কার (২০০৯), শিলচরের 'দ্বিরালাপ স্মারক' পুরস্কার (২০১০), 'তারাশঙ্কর' পুরস্কার (২০১১)। কিশোর সাহিত্য রচনার জন্য 'দীনেশচন্দ্র স্মৃতি' পুরস্কার (২০১১)।[৪] এছাড়া তিনি বাংলাদেশের নানা প্রতিষ্ঠানের কবি সম্মেলনে ও আলোচনা সভায় যোগদান করেন। একবার সাহিত্য আকাদেমির আমন্ত্রণে ভারতীয় লেখক হিসাবে চিনের আন্তর্জাতিক বইমেলায় দুটি বক্তৃতা দেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম, খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত তাঁকেও গভীর ভাবে নাড়া দিচ্ছে সাম্প্রতিক কালের প্রধানতম সমস্যা পরিবেশ-বিপর্যয়-এর ভাবনা। তাই তাঁর কলমে উঠে আসছে পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্য। তাঁর 'রূপকথা ফিরে আসে' উপন্যাসটি সেই গভীরতর ভাবনার এক সংবেদনশীল 'ইকো-টেকস্ট'।[৫]

দুই

কবিতার দুটি ছত্র দিয়ে শুরু হয়েছে 'রূপকথা ফিরে আসে' উপন্যাসের আখ্যান। দুটি লাইনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করে দিয়েছেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনাকে—

"সবুজ সবুজ ছায়ায় ঘেরা বনকেল্লা গ্রাম
এখন তো আর সে-গ্রাম নেই এখন বিশ্বগ্রাম।"[৬]

আপনপুর নামক একটি অখ্যাত গ্রামকে বনকেল্লায় রূপান্তরিত করেছিলেন রানিমা। গ্রামটির বাস্তব অস্তিত্ব অজ্ঞাত। গ্রামটিকে নিজের মত করে সাজিয়ে ছিলেন তিনি। বাঁশ-ঝাড় থেকে শুরু করে শাল, শিশু, অর্জুন, মেহগেনি, দেবদারু, সেগুন, জারুল, ইত্যাদ সমস্ত শ্রেণির গাছ যেমন তিনি রোপন করেছিলেন তেমনি সমস্ত ঋতুর অসংখ্য ফুলগাছ রোপন করে বনকেল্লাকে স্বার্থকনামা করে তুলেছিলেন। বনকেল্লার রাজা পদ্মরাজ ছিলেন বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। তিনি তার পিতা শঙ্খরাজের নামে একটি গড় নির্মাণ করেছিলেন যা সময়ের ব্যবধানে ভুলুণ্ঠিত হয়ে শুধু ঢিবি হয়ে রয়ে গেছে। বনকেল্লার ইতিহাস প্রসঙ্গে উপন্যাসে জানানো হয়েছে—

> "বনকেল্লার যিনি রচয়িতা রচয়িত্রী রাজবাড়ির সেই রাজা-রানিরা আর নেই, শুধু পড়ে আছে বিশাল রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ। রাজা গড়েছিলেন তাঁর রাজত্ব, আর রানিমা পরম মমতায় গড়েছিলেন বনকেল্লা গ্রাম। স্টেশন থেকে নেমে যে-ভাঙা-ইটের রাস্তাটি রওনা দিয়েছে বনকেল্লার উদ্দেশে তার দুপাশে শুধু গাছ আর গাছ। বিশাল গ্রামের ক্যানভাসে সবুজের এক মহোৎসব। আর ঋতুতে ঋতুতে সেই সবুজ ফুঁড়ে নানা রঙের নানা রকমের ফুলের উদ্ভাস। লাল ফুলই সংখ্যায় বেশি কেন না রানিমার পছন্দের তালিকায় লাল ফুলের ছিল অগ্রাধিকার।"[৭]

রানিমা-এর সাজিয়ে তোলা এই গ্রামে তিনি মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন গাছ না কাটার, তাই বনকেল্লায় কেউ গাছ কাটে না। রানিমা বলেছিলেন যে দৈববাণীতে তিনি শুনেছেন রাস্তার দুপাশে পোঁতা এই গাছগুলির কোন একটির নিচে সঞ্চিত আছে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস। কোন্ গ্যাস তা জানা নেই, কিন্তু সেই বিশেষ গাছটি যদি কেউ কেটে ফেলে তবে গাছের নিচের গ্যাস বেরিয়ে পড়বে বনকেল্লার বাতাসে। সেই গ্যাস মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করলে শুরু হবে প্রবল শ্বাসকষ্ট। তা ছাড়া, কেউ যদি একটি গাছও কখনো কাটে তাহলে রাস্তার উপরের ছাউনি যাবে ফুটো হয়ে। দেখা যাবে নীলের বদলে কালো আকাশে। সেই আকাশ ফুটো হয়ে নেমে আসবে কালো বৃষ্টির ধারা। সেই বৃষ্টির ধারা লাভার মত উত্তপ্ত ও প্রাণ-সংহারী।

এই দৈববাণীকে উপেক্ষা করার প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন স্বয়ং রাজা পদ্মরাজ। রাজার খুব ইচ্ছে হয়েছিল রাজবাড়ির নাচঘরে তিনি নিয়ে আসবেন একজন সুন্দরী বাঈজিকে, আর সে আসবে আট ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। কিন্তু বনকেল্লার পথ এতটাই সংকীর্ণ যে আটঘোড়ার গাড়ি সেখানে ঢুকতেই পারবে না। তাই রাজা হুকুম দিয়েছিলেন বনকেল্লার পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী গাছগুলিকে কেটে উড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু তার হুকুমে একটি গাছ কাটা শুরু হতেই ঘটল অঘটন। সবাই দেখলো রানিমার দেহ ভাসছে বিশাল কৃষ্ণশায়রের জলে। বনকেল্লার পুরানো ইতিহাসে গাছকাটার সেটাই প্রথম এবং শেষ ঘটনা। কৃষ্ণশায়রের বুকে রানিমার মৃত শরীর ভেসে উঠেছিল বলে সেই বিশাল দিঘির নাম হয়ে যায় 'রানিদহ' বা 'রানিশায়র'। বনকেল্লার সামগ্রিক অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে রানিমা। গ্রামবাসীদের অনেকেই ভাবেন রানিমার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় সমস্ত বনকেল্লা জুড়ে। তাই বনকেল্লার বিস্তৃত ভূমিতে রানিমা একটি 'মিথ', একটি বহুশ্রুত রূপকথা।

এই বনকেল্লা গ্রামের-ই ছেলে কৃষ্ণাভ। সে উচ্চ শিক্ষিত চাকুরিজীবী কিন্তু কবিতা লেখা তার মূল প্রবণতা। সে মনে প্রাণে কবি। বনকেল্লার বাসিন্দা বটেশ্বর ও রাজলক্ষ্মীর একমাত্র ছেলে কৃষ্ণাভ হঠাৎ বিয়ে করে নিয়ে আসে টালিগঞ্জের রিজেন্ট-পার্কবাসী এক বড়লোকের কন্যা রচনাকে। রচনা নিজেও শিল্পী। সে ছবি আঁকে। বনকেল্লার একটি বড় প্লটের মধ্যে অবস্থিত এল প্যাটার্নের একটি ছোট্ট একতলা বাড়িতে শুরু হয় কবি কৃষ্ণাভ ও শিল্পী রচনার সংসার। রচনা সংবেদনশীল প্রকৃতিপ্রেমিক। তার আর্টিস্ট সত্ত্বার গভীরে প্রকৃতির প্রতি এক অনাবিল মমতা বাস করে। অন্যদিকে কবি কৃষ্ণাভ চেষ্টা করত তার বনকেল্লা গ্রামটিকে কবিতায় 'জ্যান্ত' করে তুলে এনে শহরের মানুষের কাছে উপহার দিতে। যে দিন তারা বিয়ে করে প্রথম বনকেল্লা গ্রামে প্রবেশ করে সেদিন-ই বনকেল্লা গ্রামে দ্বিতীয়বার প্রথম গাছ কাটা হল। পথের মাঝখানে যে শিশুগাছটি গ্রামের মধ্যে মোটর গাড়ি প্রবেশের পথ দীর্ঘকাল ধরে অবরোধ করে রেখেছিল মেজ তরফের রাজবংশধর চম্পকরাজ তার ছোট মোটর গাড়ি রাজভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক লাগিয়ে শিশু গাছটিকে কেটে ফেলে।

রচনা অত্যন্ত সুন্দরী। সে যেদিন কৃষ্ণাভদের বাড়িতে প্রথম বধূ হিসেবে প্রবেশ করে সে দিন-ই গাঁয়ের মহিলাদের দু-একজন কৃষ্ণাভর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছিল —

> "ও মাগো বৌয়ের কী রূপ! এক্কেরে আমাদের রানির পারা! ... রানি না রানি। বনকেল্লার রানি আবার ফিরে এসেছে গো!"[৮]

গ্রামের মানুষেরা সবাই যে রানিমাকে দেখেছে এমন নয়, অথচ মুখে মুখে রচনা রানিমা-এর প্রতিরূপ বলে প্রচারিত হয়ে যায়। যে শিশু গাছটি কেটে ফেলা হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে গ্রামে গুঞ্জন ওঠে। রানিমা চাননি যে তাঁর স্বপ্ন দিয়ে গড়া বনকেল্লা ডিজেল পেট্রোলের ধোঁয়ায় কলুষিত হয়ে যাক। তাই পুঁতে দিয়েছিলেন ওই গাছটিকে যা কালক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়। বনকেল্লা গ্রামেই বাস করেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাকে এলাকার লোকেরা বলে 'গাছবুড়ো'। গাছের সঙ্গে তাঁর আছে আত্মিক সম্পর্ক। শিশু গাছটির অকালপ্রয়াণ সে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারে না। নিজের মত করে সে বৃদ্ধ প্রবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সে রীতিমত পুরোহিত দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে অকালপ্রয়াত শিশু গাছটির শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করে গাছটির গুঁড়ির পাশে তাঁবু খাটিয়ে। রচনা গাছবুড়োর প্রতি সহমর্মী হয়ে ওঠে। তার দুঃখ লাঘব করতে সে ওই এক-ই জায়গায় একটি নতুন শিশু গাছের চারা রোপনের ব্যবস্থা করে রীতিমত অনুষ্ঠান করে, আর সেই কাজটি করান গাছবুড়োর হাত দিয়েই। রচনা নিজেও কিছুদিন সেই গাছটির পরিচর্যা করে। গাছটির বৃদ্ধি শুরু হলে রচনা পরিচর্যার প্রয়োজন কমে গেছে বলে সে দিকটায় আর তেমন যায়নি। কিছুদিন পর কারা যেন সেই শিশু চারাটিকেও উৎপাটিত করে দেয়। গাছবুড়ো সেই শিশুগাছের ঘেরাটোপের মাঝখানে ঢুকে অস্বাভাবিক বাক্যবন্ধে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে।

রচনা কৃষ্ণাভ-র বাড়িতে দৈনন্দিন গৃহকর্মের পরও যথেষ্ট সময় পায়। সকাল ৮টা নাগাদ কৃষ্ণাভ বেরিয়ে যায় কলকাতায় অফিস করতে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে যায়। রচনা একা একা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মানুষের সঙ্গে তার তেমন সখ্যতা নেই। সে গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, গাছের সঙ্গে কথা বলে। পাড়ার লোকেরা যেমন তাকে রানিমা বলে ভাবে তেমনি কেউ কেউ ভাবে তাকে ভুতে ধরেছে। রচনা অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের রদ বদলকে। প্রত্যেকটা ঋতুকে সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আর ঋতুর বিবর্তনকে সে ধরে রাখে তার ক্যানভাসে। দুপুরবেলা যখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে ট্রাঙ্ক খুলে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে বসে ঘরের দরজা বন্ধ করে। কেউ জানতে পারে না তার এই নীরব ছবি আঁকা। কৃষ্ণাভ-র কবিতা নিয়ে নানা কথা হলেও রচনার ছবি নিয়ে কোন কথা হয় না। এক ছুটির দিনে বনকেল্লার পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখতে রচনা বায়না করে কৃষ্ণাভকে সাথে নিয়ে যায়। প্রাসাদে পৌঁছে রচনার মধ্যে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা জেগে ওঠে। তার মনে হয় দীর্ঘকাল সে এই প্রাসাদে বসবাস করেছে। এমনকি প্রাসাদের কোন্ ঘরে কি আছে সেটাও সে কৃষ্ণাভকে বলতে থাকে। কৃষ্ণাভকে সে টেনে নিয়ে যায় ছাদের উপরে একটি অর্ধনগ্ন নর্তকী মূর্তি দেখাতে। সেই মূর্তির মাথায় যে একটা আঘাতের চিহ্ন আছে সেটাও কৃষ্ণাভকে দেখিয়ে দেয়, এমনকি সে আঘাত যে রানিমা-ই করেছিলেন সেটাও বলে কৃষ্ণাভকে। তারপর দোতালায় নেমে সে নাচ ঘরে ঢুকতে চায় এবং সেই ঘরে যে আরো একটি নগ্ন নারী মূর্তি আছে তাও সে কৃষ্ণাভকে জানায়। কৃষ্ণাভ ভয় পেয়ে যায়। প্রশ্ন করে বসে, রচনা জাতিস্মর কিনা।

গ্রামের লোকেরা রচনাকে রানিমার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে অনেক আগেই। কৃষ্ণাভর মনেও সে ধরনের একটা বিশ্বাস জেগে ওঠে কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। রচনা দিন দিন প্রকৃতি পাগল হয়ে ওঠে, যেমনটি ছিলেন রানিমা। শরৎ এল। কাশ ফুলের প্রকাশ রচনার মধ্যে আনে মত্ততা। বনকেল্লা থেকে দূরে রাজবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম যেখানে থাকে সেই অঞ্চলের নাম 'রাজভূমি'। রাজভূমিতেই দুর্গা পূজা হয়। রচনা অনেকটা জোর করেই পূজার আগে কৃষ্ণাভকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিমা নির্মাণ দেখতে যায়। রাজভূমির রাজপারিবারের মহিলারাও রচনার চেহারার মধ্যে দেখতে পায় রানিমাকে। রচনার নিজেরও কখনো কখনো সন্দেহ হয় তার অস্তিত্ব নিয়ে। এর মধ্যেই বনকেল্লায় সভ্যতার আগ্রাসন শুরু হয়। ছোট তরফের বিশ্বরাজবাবু রাজভূমির নিকটে কারখানা নির্মাণের জন্য কাজ শুরু করলে মেজতরফের চম্পক রাজবাবুর মধ্যেও কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকট হয়ে পড়ে। রাজভূমিতে ভারি যন্ত্রপাতি ও কারখানা স্থাপন করতে গেলে চাই পথ। তাই প্রয়োজন হয় বনকেল্লার পথের দু-ধারের গাছ কেটে রাস্তার সম্প্রসারণ ঘটানোর। যাতে বড় বড় ট্রাক সে পথে চলতে পারে। ব্যাপক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হারে বৃক্ষ নিধন শুরু হয়ে যায়। রচনা মর্মে মর্মে মরে যেতে থাকে, যেন তার জীবনের সব আলো নিভে গেছে, মুছে গেছে সব রং। সে লক্ষ্য করে কৃষ্ণাভ হারিয়ে ফেলছে তার কবিত্ব। এই হৃত-সর্বস্ব ভগ্ন হৃদয় নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে না, যেমন বাঁচতে পারেননি বনকেল্লার রানিমা। তাই একদিন রাতে কাউকে না জানিয়ে সে চলে যায় সেই ভগ্ন রাজপ্রাসাদের জীর্ণ নাচঘরে। যেখানে একদিন রানিমা তার বিপথগামী স্বামী পদ্মরাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কোন পেশাদার নর্তকীর চেয়েও উদ্দাম অশ্লীল ভঙ্গিতে রাতভর নেচেছিলেন এবং শরীর ছাড়াও নারীর যে নিজস্ব সত্ত্বা আছে সেই সত্ত্বার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যা করেছিলেন রানি দিঘিতে ডুবে। রচনাও তার আত্মার যন্ত্রণায় সেই নাচ ঘরে গিয়ে রানিমার মতই নাচতে থাকে। তারপর এসে নেমে যায় পদ্মে ভরা রানিশায়রের গহীন জলে। পরদিন কৃষ্ণাভ খবর পায় লাল শাড়ী পরা রচনার মৃত শরীর ভেসে উঠেছে রানিশায়রের জলে যেমন এক দিন সেভাবেই ভেসে উঠেছিল রানিমার প্রাণহীন শরীর। রূপকথার এই পুনরাবৃত্তিতেই উপন্যাসের আখ্যানের সমাপ্তি।

তিন

‘রূপকথা ফিরে আসে’ উপন্যাসের এই কাহিনিকে যেমন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যাদু-বাস্তবতার তত্ত্বগত[৯] দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তেমনি নব্য ইতিহাসবাদের ভাবনাকে যুক্ত করেও অগ্রসর হওয়া যায় আলোচনায়। পরিবেশকেন্দ্রিক পাঠের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই উপন্যাস এক অনন্য উপকরণ, আর বিশেষ ভাবে ‘ইকো-ফেমিনিস্ট’[১০] বা পরমা প্রকৃতিবাদী তত্ত্বের নিরিখেও উপন্যাসটি বিচার্য হতে পারে। আমাদের আলোচনা ক্ষেত্র যেহেতু পরিবেশকেন্দ্রিক সেহেতু আমরা পরিবেশকেন্দ্রিক পাঠের দৃষ্টিতেই[১১] প্রকৃতিও মানুষের পারস্পরিক আন্তর্সম্পর্ক-এর দিকটিকেই প্রাধান্য দেব। ঋতু পরিবর্তন শুধুমাত্র গাছপালা কিংবা প্রাকৃতিক উপকরণের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে না, মানুষের মন ও জীবনেও যে ঋতুর গভীরতর প্রভাব আছে রচনা তার উপলব্ধি দিয়েই কর্ম ব্যস্ততায় বিস্মৃতপ্রায় আধুনিক মানুষকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সেই ঋতু পরিবর্তনকে অনুভব করতে হলে চাই এক শৃঙ্খলাময় সুব্যবস্থিত প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে থাকবে বৃক্ষ থেকে ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা, ফুল-ফল, গুল্ম, জলজ উদ্ভিদ, জলাশয়, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, জীব-জন্তু থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর একটি সুসংবদ্ধ ‘ইকো-সিস্টেম’। সেই ‘ইকো-সিস্টেম’কে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন বনকেল্লার রানিমা। বনকেল্লার প্রাকৃতিক পরিবেশকে আধুনিক পরিভাষায় ‘Built Environment’[১২] বলে ধরে নিলেও দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনহীন সুসংহত অবস্থার জন্য সেটা প্রাকৃতিক পরিবেশের (Natural Environment)[১৩] রূপ লাভ করেছে। ফলে বনকেল্লার পরিবেশকে কৃত্রিম বলে ভেবে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং রুক্ষ অঞ্চলে এরকম রানিমার মত গভীর নিষ্ঠার সাহায্যেই যে ছায়া-নিবিড় সুশীতল বাস উপযোগী দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা যায় তার-ই দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বনকেল্লার উপর থেকে গাছের সেই ছায়া-নিবিড় আচ্ছাদন সরিয়ে নিলে অন্যান্য গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির কীট-পতঙ্গ যে হারিয়ে যাবে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের এই হনন ঘটলে ঋতু পরিবর্তনের যে সুস্পষ্ট চিত্র বনকেল্লায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতো তার হদিশ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। চিত্রশিল্পী রচনা রঙের খেলার কারিগর। ঋতু পরিবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র রঙ পরিবর্তনের খেলা চলে দিনের পর দিন, সেই খেলার সচেতন পর্যবেক্ষক শিল্পী রচনা। সে দেখতে পায় শুধু ঋতু পরিবর্তন-ই নয়, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুলেরা, গাছেরা তাদের রঙ বদলায়। ভোরের আলো আঁধার, সকালের প্রথম সূর্যালোক, দুপুরের দাবদাহ, বিকেলের পড়ন্ত রোদ, সন্ধ্যার রক্তিম আভায় ফুটে ওঠে গাছ ও ফুলের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তিগুলোকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত মন এবং বোধ সাধারণত সবার থাকে না। যে দু-এক জনের থাকে; লোকের চোখে তাদের পরিচয় পাগল, অর্দ্ধোন্মাদ বা ভূতগ্রস্ত মানুষ। উপন্যাসে অন্তত দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রকৃতি প্রেমের এই ভূতগ্রস্ততাকে আমরা খুঁজে পাই। একজন চিত্রশিল্পী রচনা আর অন্যজন গাছবুড়ো, যে আসলে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। একজন প্রকৃতিকে দেখেন রঙ-এ, রসে, রূপে, রেখায়, আর অন্যজন দেখেন বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে-গাছের সঙ্গে গাছের, ফুলের সঙ্গে ফুলের সংযোগ ঘটিয়ে উদ্ভিদ ও জীবজগৎ-এর পারস্পরিক আন্তর্সম্পর্কের সূত্র ধরে। উপন্যাসের নায়ক কৃষ্ণাভ সে কবি আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। তার কবির দৃষ্টি এবং অনুভূতি প্রবণ মন থাকলেও ভাবনা ও বাস্তবতার মধ্যে সে ভারসাম্য বজায় রাখতে জানে। ফলে রচনা বনকেল্লার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশের উপরে সভ্যতার আগ্রাসনে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চূড়ান্তভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভেঙে পড়লেও কৃষ্ণাভর মনে তেমন গভীরতর কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। বরং আর সাত-পাঁচ জন অন্তঃসারশূন্য আধুনিক মানুষের মতই বিশ্বাস করে যন্ত্র-সভ্যতার অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আর, ডিজেল পেট্রোলের ধোঁয়া ওড়ানো ভারি যানবাহন, আকাশচুম্বী কারখানার চিমনি কিংবা অট্টালিকা সেই তথাকথিত সভ্যতার-ই প্রতীক। রচনা কৃষ্ণাভকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছিল তার মধ্যেকার ভাবুক কবি সত্ত্বার জন্য। ক্ষণিকের জন্য হলেও কৃষ্ণাভকে তার অসাধারণ বলে মনে হত। বিয়ের পর থেকে ধীরে ধীরে কৃষ্ণাভ তার সেই অসাধারণত্ব থেকে অবস্থান পরিবর্তন করতে করতে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের অতিসাধারণ পর্যায়ে নেমে যায়। ভুলে যায় প্রতিবাদ প্রতিরোধের ভাষা। গাছ কাটার দুর্বিসহ যন্ত্রণায়, বিপন্নবোধের তাড়নায় রচনা যখন কৃষ্ণাভর সম্মুখীন হয়েছে তখন কৃষ্ণাভর দিক থেকে কোন প্রবোধ বা সহযোগ সে পায়নি। বরং তাকে শুনতে হয়েছে বুদ্ধিজীবীর 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' শ্রেণির অনুভূতিহীন ভাষণ। রচনা মর্মাহত হয়েছে।

বৃক্ষচ্ছেদনের বিরুদ্ধে রচনা নিজের মত করে প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছে। বনকেল্লার গাছ-পালা কেটে যখন শূন্য করে ফেলা হচ্ছে, লুঠ করে নেওয়া হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডার তখন রাজভূমির দুর্গা মন্দিরের দেওয়ালে সে গোপনে লাগিয়ে দেয় তার নিজের হাতে আঁকা বনকেল্লার প্রাকৃতিক ঋতুচক্রের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ক্যানভাস যে ক্যানভাস বাস্তবে আর কোনও দিন দেখতে পাবে না বনকেল্লার মানুষেরা। কারণ প্রবলের কুঠার আঘাতে হারিয়ে গেছে সেই প্রকৃতি। মানুষ দল বেঁধে গিয়ে দুর্গা মণ্ডপের দেওয়ালে টাঙানো সেই বিচিত্র ছবিগুলিকে দেখে, বিমোহিত হয়, কেউবা নীরবে চোখের জল ফেলে কিন্তু রাজশক্তির এই প্রবল প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারে না। প্রবলের আগ্রাসনকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেওয়াও অপমৃত্যুরই নামান্তর। যারা নীরবে সেই অপমৃত্যুকে মেনে নেয় রচনা তাদের মধ্যেকার কেউ নয়। শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা যে আত্মার অপমান রচনার সংবেদনশীল মন তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে। যে মর্যাদাবোধের জন্য রানিমা একদিন বেছে নিয়েছিলেন আত্মহননের পথ, সেই এক-ই শ্রেণির বোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রাণবন্ত রচনা নিষ্প্রাণ মানুষদের জগৎ থেকে নীরবে প্রস্থান করাকেই সম্মানজনক বলে মনে করেছে। কৃষ্ণাভর মধ্যে যখন স্বজ্ঞান ফিরে এসেছে ততক্ষণে রচনার দেহ ভেসে উঠেছে রানিশায়রের জলে। আর তারপর, রচনার সেই টিনের সিন্দুক যেটাকে খোলা হল উপস্থিত গ্রামবাসীদের সবার সামনে। দেখা গেল তাতে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে বনকেল্লার বিভিন্ন স্থানের ও সময়ের বিচিত্র রঙ-এ রেখার আঁকা অসংখ্য ক্যানভাস। যে প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে বনকেল্লায় সেই প্রকৃতি ছবি হয়ে জেগে আছে রচনার ক্যানভাসে। এমন কি বাদ যায়নি সেই ভগ্ন প্রসাদ, নাচঘর-নিজের কল্পনা ও বাস্তব নক্সার জ্ঞান মিশিয়ে তার জাতিস্মর সত্ত্বার জাগরণ ঘটিয়ে বিশাল ক্যানভাসে এঁকে দিয়েছে রাজপ্রসাদের এক অনুপম ছবি। যে প্রাসাদ দেখেছিল বনকেল্লার পুরানো বাসিন্দারা। বিশ্বায়নের আগ্রাসনে হারিয়ে গেছে বাস্তবের বনকেল্লা। আর নিজের জীবন দিয়ে, শিল্পীর সত্ত্বা দিয়ে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বনকেল্লাকে অমর করে বাঁচিয়ে রেখেছে রচনার ক্যানভাস। উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদের শুরুতে রচনার স্বপ্নকে স্বীকৃতি দিতে ঔপন্যাসিক দুটি ছত্রে তুলে ধরেছেন নতুন বিশ্বভাবনার অভিব্যক্তি –

"একজন ছবি এঁকে গিয়েছে নীরবে
বলে গেছে বিশ্বগ্রাম বনকেল্লা হবে।"[১৪]

'রূপকথা ফিরে আসে' উপন্যাসে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনন্য সংযোজন গাছবুড়ো চরিত্র। বিয়ে হয়ে গ্রামে প্রবেশের পথে গাছবুড়োর সঙ্গে পরিচয় হয় রচনার। গাছবুড়ো নামটি তার ভারি অদ্ভুত বলে মনে হয়। মানুষটাকে নিয়ে রচনার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। সে জেনে যায় গাছবুড়ো গ্রাফাটিং-এ অত্যন্ত দক্ষ মানুষ। রাজবাড়িক মেজ তরফ যখন মোটর গাড়ির জন্য শিশু গাছটিকে কেটে ফেলে তখন গাছবুড়ো পাগলের মত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরেছে। আর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ক্রমাগত উচ্চারণে 'জাহান্নম। জাহান্নম। সব জাহান্নমে। ... ছিয়েফসি, ছিয়েমসি!" গাছকাটার পর থেকেই গাছবুড়ো বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ পায়।

বসন্তকাল একদিকে বনকেল্লার গাছগুলি ফুলে-ফুলে ভরে উঠছে আর অপরদিকে চলছে রাজশক্তির বৃক্ষচ্ছেদন। গাছবুড়ো দিন-দিন আশা হারিয়ে ফেলছে। উন্মাদপ্রায় অবস্থায় ছুটে বেড়ায় গোটা এলাকা জুড়ে আর জানিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যায় আশঙ্কার কথা। সে হারিয়ে ফেলে তার জীবনী শক্তি। রচনা যেখানটায় শিশুচারা পুঁতেছিল তার বাঁশের বেড়ার ঘেরার ভিতরে ঢুকে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে গাছবুড়ো আর বিড় বিড় করে বলতে থাকে —

> "ওরা সবুজ বাড়ি বানাচ্ছে। ইস, কী দুর্ভোগ মানুষের! ... ছিয়েফসি, ছিয়েমসি।"[১৫]

এভাবে ওই ঘেরাটোপের ভেতর থেকেই গাছবুড়ো কৃষ্ণাভকে জানায় তার শেষ ইচ্ছা —

> "— দ্যাখ, আমি যদি মরে যাই, আমাকে দাহ করিসনে। এখানে যেমন আছি, তেমনি থাকব। দেখবি, আমি ঠিক আর একটা শিশু হয়ে জন্মাব এখানে।"[১৬]

গাছবুড়ো চোখবোজে। তার শরীর ক্রমশ নিথর হয়ে যায়। কৃষ্ণাভর চোখে জল এসে যায়। গাছবুড়োর মৃত্যুর পর রচনা এবং কৃষ্ণাভ দু'জনেই যায় তার কুটীরে। রচনার গাছবুড়োকে অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে বেদনায় স্তব্ধ ও নিথর হয়ে পড়ে। তার ঘরের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো ছিল অসংখ্য বই আর টেবিলে অনেক ডায়েরি। সেই ডায়েরির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অজস্র লেখা—

> "গাছ বুড়ো কী পাগল, ডায়েরিতে লিখে গেছে কী সব অদ্ভুত স্বর্গ থেকে নেমে আসে সিঁড়ি নয়, রথ নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত।"[১৭]

কৃষ্ণাভ গাছবুড়োর লেখা ডায়েরিগুলো পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়, শিউরে উঠতে থাকে তার সমস্ত শরীর। ডায়েরির পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে পৃথিবীর এক ভয়ঙ্কর পরিণতির গল্প। কৃষ্ণাভ ভালো করে জানলো গাছবুড়ো কেন সবসময় সতর্ক করতে চেয়েছিল, 'তার বিজ্ঞানচর্চিত জীবন দিয়ে গোটা বনকেল্লা আর রাজভূমির মানুষকে।'[১৮] টেবিলের খাতার স্তূপ থেকে কৃষ্ণাভ খুঁজে পায় গাছবুড়ো কথিত 'সবুজ বাড়ি'[১৯]-র রহস্য এই সবুজ বাড়ি আসলে গ্রিণ হাউসের বিষয়। শীতের দেশে চারা গাছকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে বড় করে তুলতে তৈরী করা হয় এক ধরনের কাঁচের ঘর। সে ঘরে সূর্যের আলো সহজেই প্রবেশ করতে পারে। উত্তপ্ত হয়ে উঠে মাটি। সেই উত্তাপ কাঁচের ঘেরাটোপ পেরিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই ঘরকেই পরিভাষায় বলা হয় 'গ্রিণ হাউস'। এই ঘরের বৈশিষ্ট্য যে পরিমাণ বিকীর্ণ তাপ এই ঘরে প্রবেশ করে সেই উত্তাপ আর সেখানে থেকে বের হতে পারে না। গাছবুড়ো লিখেছেন—

> "আমরা বসবাস করি যে পৃথিবীতে তাও খুব দ্রুত পরিণত হতে চলেছে একটি বিশাল গ্রিণ হাউসে। ভুপৃষ্ঠের দশ কিলোমিটারের উপর প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটির নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই অঞ্চলে সারা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে ওজোন গ্যাসের স্তর। ওজোনের অনুতে থাকে তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু।"[২০]

এর পরের ডায়েরিতে গাছবুড়ো লিখেছে অতিবেগুনি রশ্মির কথা। ওজোন স্তর এই রশ্মিকে কীভাবে শোষণ করে নেয়, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে শুরু করে বিকিরণের নানা সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং ওজোন স্তর কীভাবে অতিবেগুণি রশ্মির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে তার তাত্ত্বিক আলোচনা। ওজোনস্তরের ধ্বংস নিয়ে নানা তথ্যের সংগ্রহ। গাছবুড়ো বারবার 'ছিয়েফসি বা ছিয়েমসি' বলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত। ডায়েরিতে এর অর্থ এবং পরিবেশের ওপরে এর প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। সি. এফ. সি বা ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন, সি. এম. সি. বা ক্লোরো ফ্লুরো মিথেন গ্যাসের প্রয়োজন হয় ফ্রিজ, এ.সি., নানা ধরনের প্লাস্টিকের বাক্স, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ও রঙ তৈরি করতে। এই C. F. C এবং C. M. C. ওজোন স্তরের ক্ষতির প্রধানতম কারণ।

একটি ডায়েরিতে আছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ও বাতাসে এর পরিমান বৃদ্ধির তথ্য। প্রাকৃতিক চক্র যে এই কার্বন-ড্রাই-অক্সাইডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এবং বায়ুমণ্ডলে এর বৃদ্ধিই যে গোটা পৃথিবীকে একটি গ্রিণ হাউস বানিয়ে ফেলছে তার অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ ও পৃথিবীর উষ্ণায়ণ সম্পর্কিত নানা তথ্য। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন যে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তার ভয়ঙ্কর সব পরিণাম লেখা আছে ডায়েরিতে।

একটি ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন, অ্যাসিড বৃষ্টির রহস্য। সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড কীভাবে মেঘের জলকণায় মিশে গিয়ে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং তথ্য জানিয়েছে গাছবুড়ো। বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক চরম সংকটময়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তুলে ধরেছে সে। বাহ্যত উন্মাদ প্রায় গাছবুড়ো কতবড় বিজ্ঞানসেবক এতদিন কেউ জানত না। প্রকৃতির প্রতি তার নিগূঢ় পর্যবেক্ষণকে তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন তার ডায়েরির পাতায় পাতায়। যেমন করে রচনা বনকেল্লাকে এঁকে রেখে গিয়েছে তার অসংখ্য ক্যানভাসে রূপে রং-এ রেখায়। ঔপন্যাসিক গাছবুড়ো চরিত্রটি নির্মাণের মধ্য দিয়েই তাঁর পরিবেশ বীক্ষাকে প্রকাশ করেছেন এক সুনিপুণ কৌশলে।

চার

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রূপকথা ফিরে আসে’ উপন্যাসটির রচনা কৌশল অভিনব। উপন্যাসের নায়িকা রচনা প্রত্যক্ষভাবে একজন কিন্তু পরোক্ষভাবে দুজন। আবার এই দু’জন রচনাও রানিমা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন সত্ত্বা। একজন বনকেল্লাকে গড়ে তুলেছিল নিজের হাতে গাছ রোপণ করে। সেই সাজানো বনকেল্লার একটি গৃহে বধূ হয়ে এসেছে রচনা। একটি গাছের মৃত্যুর প্রতিবাদে আত্মহত্যা করেছিল রানিমা। আর সমগ্র বনকেল্লার বৃক্ষরাজিকে উজাড় হতে দেখে চরম অসহায়তায় আত্মহত্যা করেছে শিল্পী রচনা। রানিমার পদক্ষেপে অন্তত সেই সময়ের জন্য বনকেল্লার প্রকৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। রচনার সময়ে সভ্যতার আগ্রাসন থেকে বনকেল্লাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে। তাই ছবিতে সে তুলে রেখেছে হারিয়ে যাওয়া বনকেল্লার সৌন্দর্যকে। তাই দুই প্রজন্মের দুটো সত্ত্বা এমন একাকার হয়ে মিশে আছে যে তাদের পৃথক করা যায় না।

অপরদিকে, সাধারণ দৃষ্টিতে বনকেল্লার রাজা পদ্মরাজ থেকে শুরু করে রাজ পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের চম্পকরাজ এবং বিশ্বরাজদেরকে খলনায়ক বলে মনে হয়। কৃষ্ণাভ সাধারণ চোখে নায়ক। অথচ নিবিড় নিরীক্ষণে সেও যে, খলনায়কেরই ভূমিকায় অবতীর্ণ পাঠককে ঔপন্যাসিক সেটা বুঝতেই দেন না। উপন্যাসের শুরুতে কৃষ্ণাভ যতক্ষণ কবি ততক্ষণ তার ভূমিকা নায়কোচিত। কিন্তু রচনাকে বিয়ে করে সংসার গড়ে তোলার পর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আপোস করতে করতে সে হয়ে ওঠে একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। যে কবিতা একসময় ছিল কৃষ্ণাভর সামগ্রিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ সেই কবিতা দিনে দিনে হয়ে পড়ে ব্যবহারিক জীবনে তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশ। উপন্যাস জুড়ে রচনার মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে আগে লেখা কবিতার অসংখ্য পংক্তি অথচ কৃষ্ণাভর বিবাহ পরবর্তী সময়ের কবিতা রচনার কণ্ঠে প্রায় অনুচ্চারিত। কৃষ্ণাভ যতই আধুনিক সভ্যতার অগ্রগমনের পক্ষ নিয়ে রচনাকে বোঝাতে থাকে ততই যেন রচনার কাছ থেকে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে।

বনকেল্লা উজাড় হয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণাভ বসেছে কবিতা লিখতে কিন্তু আসছে না কোনো পঙ্ক্তি। যেন হারিয়ে গেছে তার কলম থেকে সমস্ত শব্দ। রচনা লক্ষ করে কৃষ্ণাভর হতাশা, বিরক্তি আর যন্ত্রণা। তারপর পাগলের মত খিলখিল করে হেসে উঠে বলে —

> “তুমি আর কবিতা লিখতে পারবে না।”[২১]

কৃষ্ণাভ জানতে চায় রচনা কেন তাকে এভাবে বলছে। তখন রচনা যা বলে তার মধ্যে ফুটে ওঠে উপন্যাসের দর্শন—

> “অ্যাজ দি সিভিলাইজেশন আডভান্সেস, পোয়েট্রি ডিক্লাইনস।”[২২]

কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে রচনা কৃষ্ণাভকে বুঝিয়ে দেয় পরিবেশ ধ্বংস করে সাম্প্রতিক উন্নয়নের নামে যা চলছে তার প্রতি মানসিক পক্ষপাত দেখিয়ে কৃষ্ণাভ আসলে নিজেকেই ধ্বংস করেছে। তার ভেতর থেকে হারিয়ে গেছে প্রেমিকের সত্ত্বাটি। যে টিকে আছে সে একজন আধুনিক বস্তুপ্রেমী মানুষ মাত্র। আর এই বস্তুপ্রেমী বা Materialist আর যাই হোক কবি হতে পারে না, প্রেমিক হতে পারে না। রচনা এমন প্রেমহীন কৃষ্ণাভর কাছে একটি শরীরী অস্তিত্ব বা মেটেরিয়াল হয়ে গেছে, এটা রচনার মত প্রেমময়, প্রাণময় মানবীর কাছে চরম অপমানের। তাই সে রূপকথার রানিমার মতই রানি সায়রের গভীর জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণময় অস্তিত্বের মর্যাদাকে রক্ষা করেছে।

তাই ‘ইকোফেমিনিস্ট’ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই উপন্যাসটি অনন্য স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। নারী এবং প্রকৃতির পরম্পরাগত আত্মিক সম্পর্কের চিত্রায়ণ এই উপন্যাসে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ঘটেছে। ঔপন্যাসিক তার অপূর্ব নির্মাণ কৌশল প্রদর্শন করেছেন ঔপন্যাসটিকে রসোত্তীর্ণ করে তোলার জন্য।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, রূপকথা ফিরে আসে, প্রথম প্রকাশ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৯

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, দ্বৈরথ, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ব্লার্গ অংশ

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য (১ম খণ্ড) প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ব্লার্গ অংশ

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, দ্বৈরথ, পৃ. ব্লার্গ অংশ

৫. Garred, Greg, Ecocriticism : The New Critical Idiom, First Ed., Rutledge, USA, 2012, P. 5

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, রূপকথা ফিরে আসে, পৃ. ১১

৭. তদেব, পৃ. ৫১

৮. তদেব, পৃ. ৩৪

৯. Zamora, Lois Parkinson & Faris, Wendy B. (Edited), Magical Realism: Theory, History Community, 1st Ed., Duke University Press, London, 1995, P. 15

১০. রায় চৌধুরী, সমীর, ইকোফেমিনিজম : পরমা প্রকৃতিবাদ নারীবাদী তত্ত্বের বহুকৌণিক আলোচনা সংকলন, দ্বিতীয় সং, আবিষ্কার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৬২ - ১৬৪

১১. বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ, পরিবেশকেন্দ্রিক পাঠ ও বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, দে পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৪২

১২. পাল, গৌতম, পরিবেশ ও দূষণ পরিবেশ বিজ্ঞান, তৃতীয় সং, পুনর্মুদ্রণ, দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭

১৩. তদেব, পৃ. ১৮

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, রূপকথা ফিরে আসে, পৃ. ১৩৮

১৫. তদেব, পৃ. ১৩৮

১৬. তদেব, পৃ. ১৫০

১৭. তদেব, পৃ. ১৫০

১৮. তদেব, পৃ. ১৫০

১৯. ভুক্ত, অনিন্দ্য, পরিবেশ অভিধান, ১ম প্রকাশ, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২২০

২০. তদেব, পৃ. ১৫১

২১. তদেব, পৃ. ১৫৫

২২. তদেব, পৃ. ১৫৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 337 - 343
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 337 - 343
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আনসারউদ্দিনের ‘জন-মুনিষ’ উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা

ড. সোমা দেব
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, বিলাসীপাড়া মহাবিদ্যালয়
Email ID : somadeb017@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Rural Society, Flash Floods, Economic Development, Muslim community, Marginalized People.

Abstract
In his novel ‘Jan-Munish’, Ansaruddin has presented a complete picture of the daily life of Jan-Munish, the lowest level of the rural agrarian society of pre-Green revolutionary period. The novel was published in 2018 in paperback by Abhiyan Publishers. This Ninety five page novel is divided into ten chapters. The background of the novel is Manjilpur village. Manjilpur village is located in the lowlands beyond Gadakhali Dam on the bank of Jalangi. A long embankment runs along Manjilpur to Adamponta. This dam protects Manjilpur village from flash floods.

But like Ansaruddin's other novels, the teenage love does not have happy conclusion. On the last day of Aminuddin's jute harvest, the Gadakhali dam suddenly broke. The team leader of Jan-Munish Gajudafather along with Bahar and his entire team disappeared in the dammed water stream and were never found. This immortality is the destiny of Migrant Agricultural lebour of that era people. Just as disability, disease and old age block people's way of earning, those who are able-bodied also have to face various calamities and die prematurely. The hunger and death of marginalized people in the society in the era of globalization of the 21st century is the same in the village life which is potrait in this novel of Ansaruddin. As a result, the novel Jan Munish is valuable as a unique expression of the social- reality and life reality of marginal peasant society.

Discussion

গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজের সর্ব নিম্নস্তর জন-মুনিষদের দৈনন্দিন যাপনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আনসারউদ্দিন[১] তুলে ধরেছেন তাঁর ‘জন-মুনিষ’ উপন্যাসে। উপন্যাসটি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অভিযান পাবলিশার্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পঁচানব্বই পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বাংলার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাক্-সবুজ বিপ্লব যুগের প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থায় নিয়োজিত অতি দরিদ্র মুসলমান খেত-মজুরদের জীবন সংগ্রাম ও সমাজ-বাস্তবতার এক নিখুঁত চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন এই ক্ষুদ্রায়তনিক উপন্যাস পরিসরে।

‘সমাজ-বাস্তবতা’ এই শব্দবন্ধে ‘সমাজ’ এবং ‘বাস্তবতা’ দু’টি পৃথক ধারণা সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। ‘বাস্তব’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ— যা প্রকৃত, যথার্থ বা সত্ত্বাযুক্ত বাস্তব জগৎ। অন্যদিকে, ইন্দ্রিয়গোচর এবং সত্য অর্থাৎ ‘True’ বা ‘Real’

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 337 - 343
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থেও ব্যবহৃত হয় 'বাস্তব'[২] শব্দটি। আর বাস্তববাদী-এর সাধারণ অর্থ ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ-ই একমাত্র সত্য - এই মত বা আদর্শ।

'সমাজ' শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, নিবিড় পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে মানুষ যখন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে অভিহিত করা যায়।[৩] সমাজকে যেমন একটি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত প্রবাহমান ধারা (Social Process)[৪] হিসেবে দেখা হয়। তেমনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা (Social System)[৫] হিসেবেও গণ্য করা হয়। মানুষের এই সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণ, শ্রেণি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, জীবিকা, সংস্কৃতি, নগর-গ্রাম আর্থিক অবস্থান ইত্যাদি অসংখ্য ভিন্নতার ভিত্তিতে একটি ভৌগোলিক এলাকায় একাধিক ক্ষুদ্রায়তনিক সমাজ গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্র-ই যে প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্রায়তনিক সমাজের সমষ্টি সে সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন অনেক সমাজতাত্ত্বিক।[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে বাস্তববাদী এবং সাহিত্যের বাস্তবতার তাৎপর্য এক নয়। সাহিত্যের বাস্তবতা মুখ্যত উপাদান বা উপকরণের বাস্তবতা কিন্তু দর্শনের বাস্তবতা একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং বৌদ্ধিক আন্দোলনের নাম বা পরিভাষা। যদিও বাস্তববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখেই সাহিত্যের বাস্তবতা অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে।

উপন্যাসের পটভূমি মঞ্জিলপুর গ্রাম। জলঙ্গির তীরে গদাখালির বাঁধের ওপারের নিম্নভূমিতে অবস্থান মঞ্জিলপুর গ্রামের। মঞ্জিলপুরের গা বরাবর আদমপোঁতা পর্যন্ত চলে গেছে লম্বা বাঁধ। এই বাঁধ মঞ্জিলপুর গ্রামকে বান বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। গদাখালির বাঁধ ভাঙলে মঞ্জিলপুরের বাঁশের মাথার ওপর দিয়ে বন্যার জল বয়ে যায়। তাই —

> "গদাখালির বাঁধের উপর মঞ্জিলপুরের মানুষের জান পোঁতা থাকে।"[৭]

মঞ্জিলপুর গ্রামের পাশেই আছে একটা বিশাল অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। এক সময়ে জলঙ্গীর মূল প্রবাহ ছিল ওই হ্রদ। সেই বড় জলাশয়টা ঘিরে গড়ে উঠেছে জেলেদের পাড়া। এই জলাশয়ের স্থানীয় নাম রূপোর বিল। সারা বৎসর এই বিলে হাজার প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

গদাখালির বাঁধের অবস্থা বড়ই নড়বড়ে। বাঁধের ওপরে বাঁশের মাথায় কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে আদাপিরের দোয়া দরুদের বাণী। লোকবিশ্বাস আদাপির গদাখালির বাঁধকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করবেন। মঞ্জিলপুর গ্রামের মধ্যে বিঘে দেড়েক জমিতে আদাপিরের মাজার। বৎসরের অন্য সময় মনে না পড়লেও বর্ষাকালে আদাপিরের মাহাত্ম্য বেড়ে যায়। তার মাজারের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। জলঙ্গী যত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে মাজারে লোক সমাগম ততই বেড়ে যায়। মঞ্জিলপুরের মানুষের সমস্ত চাওয়া পাওয়া এই মাজার ঘিরেই আবর্তিত হয়। মঞ্জিলপুর গ্রামের ইমান তাবারকতুল্লা মসজিদের পাশাপাশি এই আদাপিরের মাজারও রক্ষণাবেক্ষণ করে। গ্রামের নানা বিষয়ে মতামত ও দিশা পরামর্শ তাবারকতুল্লাই দিয়ে থাকে। পির সাহেবের প্রকৃত নাম ছিল ওয়াদাপির। লোকমুখে হয়ে গেছে আদাপির। তার কাছে বর্ষাকালে মঞ্জিলপুরের মানুষের একটাই আর্জি যাতে গদাখালির বাঁধ না ভাঙে।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে ভাদ্র মাসে। জলঙ্গি তখন টুইটুম্বর। গদাখালির বাঁধ এই ভাঙে কি সেই ভাঙে। মঞ্জিলপুরের বড় চাষী আমিনুদ্দিন। মাঠে তার অনেক জমিতে আউশ ধান পেকে উঠেছে। পাট ও আছে বিঘে দশেক। তার মনে শঙ্কা যদি গদাখালির বাঁধ ভাঙে তবে সব হারাবে। মঞ্জিলপুরের প্রায় সবাই যেহেতু কমবেশি পরিমাণে জমির মালিক তাই সকলেই নিজের নিজের জমির ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত। স্থানীয় স্তরে মুনিষ খাটার মানুষ প্রায় নেই। তাই পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলের বা ডাঙালির থেকে ডেকে আনা হয়েছে মুনিষ খাটার লোকজনদের। আমড়াদহ, হাজিপুর, পেটান্তিপুর, জোয়ানপুর, ভোলাডাঙা, কুমিরডাঙা ইত্যাদি অনুর্বর অঞ্চলের কৃষি মজুরেরা বর্ষাকালে মুনিষ খাটাতে হাজির হয় মঞ্জিলপুরে।

মঞ্জিলপুরের বড় চাষীর বাড়িতে কাজ করতে এসেছে পেটান্তিপুরের গাজু দফাদার এবং তার দলবল। গাজু দফাদার এই মুনিষ খাটা মানুষদের সর্দার এবং উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। পেটান্তিপুরের দরিদ্র কৃষি শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় কাজের অনুসন্ধান করা এবং জনমজুরদের সাথে নিয়ে কাজ সমাধান করা তার পেশা। পেটান্তিপুরের মুনিষ খাটা মানুষেরা গাজু দফাদারের সিদ্ধান্ত যতটা সম্ভব মেনে চলে। সাময়িক মতবিরোধ কখনো কখনো তৈরি হলেও গাজু দফাদারের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 337 - 343
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমকক্ষ বিচক্ষণ গ্রামে আর কেউ নেই। আমিনুদ্দিন ভাদ্রমাসে অনেকটা পথ অতিক্রম করে গাজু দফাদারের কাছে এসেছে তার জমির ফসল কেটে তোলার আর্জি নিয়ে। গাজু দফাদার মুনিষদের বাড়ির লোকের খাওয়ার জন্য চাল ডাল অগ্রিম নিয়ে সদলবলে উপস্থিত হয়েছে আমিনুদ্দিনের গ্রামে। অনেকেটা দূরের পথ এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসা যাবে না বলে পেটান্তিপুরের অনেক মানুষই যেতে রাজি ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে যখন তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত চাল ডাল আমিনুদ্দিন পাঠিয়ে দিল তখন পুরো দলটাই তৈরি হয়ে গেল মঞ্জিলপুর যেতে।

গাজু দফাদারের দলের সবচেয়ে কর্মঠো মুনিষ ছিল ন্যাটাপটলা। ন্যাটাপটলা হঠাৎ করে মারা যায়। তার স্ত্রী পরি বেওয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে চরম বিপদে পড়ে। পরি বেওয়াকে গাজুদফাদার প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। মঞ্জিলপুরে যাওয়ার আগের দিন তার বড় ছেলে কিশোর বয়সি বাহারআলি কে নিয়ে পরি বেওয়া উপস্থিত হয় গাজু দফাদারের দরবারে। বাহার চৌধুরীদের ভেড়া চরাতো। চৌধুরীরা ভেড়ার পাল বেচে দিল বাহার কর্মহীন হয়ে পড়ে। বিপন্ন পরি বেওয়া তাই শরণাপন্ন হয়েছে গাজু দফারের এবং আর্জি জানিয়েছেন বাহারকে তার দলে নেওয়ার। পরি বেওয়ার অনুরোধে —

> "ছেলে মানুষ না হোক ভাল মুনিষ হলেই হবে।"[৮]

গ্রামীণ সমাজের একজন হতদরিদ্র মায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে সমাজ-বাস্তবতার একটি অত্যন্ত নির্মম দৃষ্টান্ত উঠে আসে। প্রসঙ্গক্রমে গাজুদফাদারের বক্তব্যে উঠে আসে এক ধর্মীয় ব্যাখ্যা —

> "যে ছেলে ভেড়া চরায় সে ছেলে না হয় মানুষ না হয় মুনিষ। তার চেয়ে ছাগল চরানো অনেক ভাল। দীনের নবি একসময় ছাগল চরিয়েছেন। ছাগল চরাতে চরাতে নবি হয়েছেন। তাই ভেড়ার থেকে ছাগলের মান্যতা অনেক বেশি।"[৯]

শেষ পর্যন্ত বাহারকে সাথে নেয় গাজু দফাদার। এই বাচ্চা ছেলেকে সাথে নেওয়ায় দলের অন্যরা যখন দ্বিমত প্রকাশ করেছিল তখন গাজুর বক্তব্য —

> "আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাপহারা ছেলেটা যদি মানুষ হয়, মুনিষ হয় সেটা কম নয় হে।"[১০]

গাজু দফাদারের এই কথা গুলির মধ্যে তার অভিভাবকত্বের বোধ প্রবল হয়ে ধরা পড়ে। এতগুলো বুভুক্ষু মানুষের দায়িত্ব সে যেন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে।

পেটান্তিপুরের এই দরিদ্র কৃষি শ্রমিকদের একটি বিপরীত চেহারা দেখতে পাওয়া যায় মঞ্জিলপুরে। সেখানকার জমি উর্বরা, ফলে অভাব নেই কারো। মঞ্জিলপুরের যে আমিনুদ্দিনের বাড়িতে তারা কাজ করতে যায় তার দুই স্ত্রী নাগিনা আর ছাকিনা এই জন মুনিষদের আগমনে বিপন্ন হয়ে পড়ে। পেটান্তিপুরের মুনিষদের দুই বেলার খাওয়ার জোগাড় করতে গিয়ে তাদের নাজেহাল হতে হয়। ধান সেদ্ধ করে শুকিয়ে ঢেঁকিতে চাল বানিয়ে তারপর পনেরো জন মানুষের ক্ষুধার্ত পেটকে শান্ত করতে দিশেহারা হয়ে পড়ে তারা। অমিনুদ্দিন সমৃদ্ধ কৃষক। তার কোন কিছুর অভাব নেই। অন্যদিকে, পেটান্তিপুরের জমি অনুর্বর বলে সেখানে ঘরে ঘরে অভাব।

তবুও সমৃদ্ধ মঞ্জিলপুরেও বছিরণ বুড়ির মত অসহায় নিঃস্ব বিধবারা বাস করে। তার একটি মাত্র খাসি ছাগল ছিল। সেই ছাগলের সঙ্গে তার সম্পর্ক আবেগের। সেই ছাগলকেই শেয়ালে খেয়ে নেয় আর দেহের অবশিষ্ট অংশ ফেলে রেখে যায় আমিনুদ্দিনের ধানের জমিতে। একমাত্র ছাগলের মৃত্যুতে বছিরণের যে কান্নাকাটি তা সন্তান হারানোর যন্ত্রণাকেও হার মানায়। শেষে আমিনুদ্দিন তাকে একটা বাচ্চা খাসি ছাগল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বছিরন খুশি হয়ে বাড়ি চলে যায়। নিঃসহায় বিধবার একটা অবলা প্রাণীর অবলম্বনকে আকড়ে ধরে বেঁচে থাকার যে প্রবণতার কথা উপন্যাসিক বিবৃত করেন তার মধ্যে মনস্তাত্বিক বাস্তবতা এবং সমাজ-বাস্তবতার একটি গভীরতর দিক উন্মোচিত হয়। কিশোর বাহারআলিকে কাজের জন্য নিয়ে আসায় আমিনুদ্দিন তার চেহারা দেখে আপত্তি করলে গাজু দফাদার তার মনিবকে বলেছে —

> "জানবা আমাদের মতো মুনিষখাটার ছেলে মায়ের গভ্ভে থেকে মুনিষ হয়েই বেরুয়।"[১১]

গাজু দফাদারের দল কাজে ফাঁকি দেয় কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমিনুদ্দিন ধান খেতে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা লক্ষ করে গাজুর বক্তব্য —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 337 - 343
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমরা যখন কোনো খেতে কাজে লাগি তখন খেত আর গেরস্তের থাকে না। গেরস্তের খেত খোলা নিজের হয়ে যায়।"[১২]

কাজের প্রতি এই দায়িত্ববোধ গাজু দফাদারকে আলদা করে চিনিয়ে দেয়।

মঞ্জিলপুরের ছোট গৃহস্থ আরসাদ! আরসাদের আখ্যানকে আনসারউদ্দিন উপন্যাসে টেনে এনেছেন মুসলিম সমাজ মানসিকতার একটা বৈপরীত্যের চেহারাকে উন্মোচন করার জন্য। আরসাদ সরল সাদা মানুষ। ইসলামের প্রতি গভীর আস্থা থাকা সত্ত্বেও যুক্তিবোধের জন্য কখনো কখনো বেফাঁস কথা বলে দেয়। ফলে ইমাম তাবারকতুল্লার কাছে মাঝে মাঝেই গালি খায় সে। আরসাদের পর পর তিনটি মেয়ে জন্মেছে তাই একটি ছেলের জন্য তার হাপিত্যেশ। পিরের দরগায় সে সবচেয়ে বেশি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে একটি পুত্র লাভের আশায়। আরসাদের এই পুত্র কামনার বাড়াবাড়ি দেখে আমিনুদ্দিন তাকে বলেছে —

> "জানবি পয়গম্বর হজরত মহম্মদেরও ছেলে নেই। সবই মেয়ে। মেয়ের বাবা আল্লাতলার নেকদৃষ্টি পায়।"[১৩]

মুসলমান সমাজে সাধারণ ভাবে মেয়েদের যে সামাজিক অবস্থান এবং মেয়ে সম্পর্কিত সমাজ মানসিকতা তার প্রতি ধর্মীয় যুক্তির আড়ালে একটি প্রতিবাদী ও সংস্কারমুখী মন প্রকাশিত হয় এই বক্তব্যে। আরসাদের পাঁচ পাঁচটি মেয়ে জন্মানোর পর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু তিন মাস বয়সেই সেই পুত্রের মৃত্যু হয়। গ্রামজীবনের মানুষের আশা এবং হতাশা কিভাবে একেকজন ব্যাক্তিকে জীবন সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত করে দেয় তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে আরসাদ চরিত্রে। পেটান্তিপুরের খেটে খাওয়া মানুষের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে তারা ডাঙালির মানুষ এবং বন্যায় কখনো বিপন্ন হয় না। সাঁতার না জানলেও সমস্যার কিছু নেই। জলের অভাবে ডাঙালির জমি অনুর্বর। ভয়ঙ্কর ক্ষুধা তাদের নিত্যদিনের সহচর। তবু আব্দুল বলে—

> "দরকার নেই নদী-নালা, খাল-বিলের। আমরা ডাঙা দেশের মানুষ। খাই না খাই শুকনো ডাঙায় থাকি। বান আসলে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় ভেসে বেড়াব?"[১৪]

তবু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গদাখালির বাঁধ ভাঙার প্রবল সম্ভাবনার মধ্যে তাদেরকে নাবালে কাজ করতে আসতে হয়। লেখকের বর্ণনায়—

> "পেটান্তিপুরের এক জণ্ডর ক্ষুধার্ত মুনিষ যেমনভাবে ভাতের ভারার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে অমনভাবে কোনো ইমানদার মানুষ ইদের চাঁদ দেখার জন্য তাকিয়ে থাকে না।"[১৫]

গাজু দফাদার এবং তার দলবল আমিনুদ্দিনের আউশ ধানের ক্ষেতে দুপুরবেলার ভাত খাওয়ার সময় যে কথাগুলো বলে তাতে গ্রামীণ সমাজের বাস্তব জীবনবোধ এবং হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের দিকটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। দফাদারের দলের একজন সদস্য খাওয়ার মুখে তোলার আগে গাজুকে জিজ্ঞেস করে —

> "ও গাজু ভাই, বিছমিল্লা বলে খাব?"[১৬]

গাজুদফাদারের মাথা গরম হয়ে ওঠে। তার কথায় —

> "তোদের মুখে লাথি মারি হারামির বাচ্চা। গেরস্তের খাবি, তাতে আবার বিছমিল্লা বলার কী আছে? জানিস, বিছমিল্লা বলে খেলে অল্প ভাতে পেট ভরে যায়।"[১৭]

ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে নজে ও ফজে অনুযোগ করে দফাদারকে বলে খাওয়ার আগে বিছমিল্লা বলাটা মোছলমানদের চিরাচরিত নিয়ম। গাজু এই কথায় আরও তেতে ওঠে। সে স্পষ্ট করে জানায় —

> "মুনিষখাটা মুনিষখাটা। মুনিষখাটার আর হেঁদু মোছলমান কী। পেট ঠেসে খাওয়ার জন্যিই দেশ গাঁ পেরিয়ে এখানে মুনিষে আসা। বিছমিল্লা বলে খেলে গেরস্তের ভাত বাঁচবে, আমাদের কী লাভ তাতে? জানবি বিছমিল্লা বলবি ঘরের ভাতে, পরের ভাতে নয়।"[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 337 - 343
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাজুর দু'একটি বক্তব্যে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনবোধ কর্মবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক মনন প্রকাশিত হয়ে যায়। যে শ্রেণি সচেতনতা এবং শ্রেণি বিভেদের বোধ এখানে উঠে আসে তা মার্ক্সীয় সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের তত্ত্ব থেকে উৎসারিত নয়। গাজুর প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা নিসৃত জীবনবোধই এই বক্তব্যের আধার।

নাবালের কাজ শেষে মজুরির হিসাব মিলিয়ে গাজুর দল পেটান্তিপুরে ফিরে যায়। পেটান্তিপুরের ভয়ঙ্কর অভাব আর কর্মহীনতার মধ্যেও প্রতিদিন পালা করে এই অভাবী মানুষগুলোকে কাজ খুঁজে দেয় গাজু। পেটান্তিপুরে সমৃদ্ধ চাষীর সংখ্যা খুবই কম। চাষ আবাদও জলের অভাবে তেমন ভালো হয় না। অপরদিকে মুনিষ খাটা লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে, প্রতিদিন সবার কাজ জোটে না। কিন্তু সবাই সকালবেলায় গাজু দফারের উঠোনে হাজির হয় কাজের আশায়। বাস্তব পরিস্থিতি এবং পরিবারের ক্ষুধার্ত পেটের সংখ্যা বিবেচনা করে গাজু একদিন একেকজনকে কাজ দেয়। গাজু নিজেও এই শ্রেণির-ই একজন। যেদিন কাজ নেই সেদিন তাকেও অনাহারে কাটাতে হয়। নিজে অনাহারে থেকেও অন্যের প্রয়োজন পুরণে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে মুনিষ নির্বাচন করে সে। তার অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং দায়িত্ববোধ একজন যথার্থ জননেতার পরিচয় বহন করে।

উপন্যাসে ক্ষুধা কাতরতার এক বিবর্ণ চেহারা অঙ্কিত হয়েছে পরিবেওয়া ও তার ছেলে বাহারআলির আখ্যানকে কেন্দ্র করে। পরি ন্যাটাপটলার বিধবা স্ত্রী। মাঠের কচু-ঘেচু, শাক লতা পাতা কুড়িয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার এক কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত সে। পেটান্তিপুরের বড় চাষীরা তাদের জমির মটর, ছোলা ও অন্যান্য ফসল গবাদি পশু ও মানুষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দুরমুশ মিয়া নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে 'মাঠ রাখাল' হিসেবে। নিরুপায় পরি একদিন মাঠে শাক তুলতে গেলে দুরমুশ মিয়া তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে গাঁয়ের তেমাথায় নিয়ে আসে। এবার গাঁয়ের মনিব শ্রেণির মানুষেরা দুরমুশকে ওই কাজের জন্য তিরস্কার করলে সে জানায় 'মাঠ রাখাল' হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করছে মাত্র। ফলে, মনিবেরা পরি বেওয়াকেই বকাঝকা করতে শুরু করে—

> "ঘরের বউ মাঠে যাও কেন বাপু? যদি কোনো অঘটন ঘটে কী করে সমাজে মুখ দেখাতে? কার কাছে বিচার চাইতে? বেহায়া কোথাকার?"[১৯]

মনিবদের এরকম কথায় উৎসাহিত হয়ে দুরমুশ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে—

> "শোনো মোড়ল, অঘটন আমি ঘটাতে পারতাম। ঘটাইনি।"[২০]

গ্রাম্য সমাজে অসহায় নিঃস্ব বিধবার এই প্রকাশ্য লাঞ্ছনা ও অপমান গ্রামীণ সমাজ-বাস্তবতার একটি ভিন্নতর অভিমুখ চিহ্নিত করে দেয়। যদিও বাহার আলি বড় হয়ে সেই ছোলা ক্ষেতেই মুনিষ হিসেবে কাজ করতে গেছে এবং মনিব তার কর্ম দক্ষতায় খুশি হয়ে 'হুড়াপোড়া' খাওয়ার জন্য একআটি ছোলা উপহার দিয়েছে। সন্ধেবেলা পরের বাড়ি থেকে পাটকাঠিতে আগুন এনে উঠোনে সবাই মিলে ছোলার ডাল গুলিকে পোড়ানো এবং পোড়া শেষে আগুন নিভে গেলে অন্ধকারে হাতরে হাতরে ছোলার ছিম খুলে মুখে দেওয়া এই হুড়াপোড়ার রীতি। অন্ধকারে বিধবা পরি ছোলা খুঁজতে খুঁজতে তার ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকের পারস্পরিক হাতের স্পর্শ পায়। এই স্পর্শের মধ্যে দিয়ে মানবীয় সম্পর্কের এক আবেগময় পরিসর গড়ে ওঠে। পরির চোখে জল আসে, তার মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ে। প্রেতলোকে যাওয়া স্বামীকে হুড়াপোড়ার ছোলা খাওয়ানোর জন্য ছেলে বাহার আলিকে পরামর্শ দেয় কয়েকটি ছোলার দানা দুপায়ের ফাঁকা দিয়ে পেছন দিকে ছুঁড়ে দিতে। তাদের গ্রামীণ বিশ্বাস এই পদ্ধতিতে প্রেত বা শয়তানকে খাবার দিতে হয়।

মঞ্জিলপুরে আমিনুদ্দিনের বাড়িতে একবার দক্ষতার সঙ্গে কাজ সমাধা করে আসার পর প্রতি বর্ষায় গাজু দফাদারদের দলের কাজ সেখানে পাকা হয়ে যায়। বাহার আলি যখন দক্ষ মুনিষ তখন গাজু দফাদারের সঙ্গে পুনর্বার মঞ্জিলপুরে যায়। সেবারে আরসাদের বড় মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আমিনুদ্দিনের তেরো বিঘা জমির ধান তারা তিনদিনে কেটে ঘরে তুলে দেয়। একমাত্র শিশু পুত্রের অকাল মৃত্যুতে আরসাদ যখন বিপন্ন তখন গাজুর দলবল বিনা পারিশ্রমিকে একদিন আরসাদের জমির ধান কেটে তার বাড়িতে তুলে দিয়ে আসে। এরপর আরসাদের বড় মেয়ে আর বাহার আলির সম্পর্ক আরও গভীর হয়। কিন্তু আনসারউদ্দিনের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এখানেও এই কিশোর প্রেম পরিণতি পায় না। আমিনুদ্দিনের পাট কাটার শেষতম দিনে হঠাৎ সশব্দে গদাখালির বাঁধ ভেঙে যায়। বাহার সহ গাজুদফাদার

এবং তার পুরো দলবল বাঁধভাঙা জলস্রোত কোথায় হারিয়ে যায় আর তার সন্ধান মেলে না। এই অপমৃত্যুই মুনিষখাটা মানুষের নিয়তি। কর্মহীনতা ব্যাধি জরা বৈকল্য বার্ধক্য যেমন মুনিষখাটা মানুষের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দেয়, তেমনি যারা কর্মক্ষম তাদেরকেও নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়। সমাজের প্রান্তিক মানুষের ক্ষুধা এবং অপমৃত্যু একুশ শতকের বিশ্বায়নের যুগেও একই ভাবে গ্রাম জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সঞ্চারিত হয়ে আছে আনসারউদ্দিনের এই উপন্যাসে তারই বাস্তবতাকে তুলে ধরা। ফলে জনমুনিষ উপন্যাসটি প্রান্তিক কৃষক সমাজের সমাজ ও জীবন বাস্তবতার এক অনন্য প্রকাশ হিসেবে মূল্যবান।

আধুনিক যন্ত্রনির্ভর কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা প্রচলনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে গ্রামীণ কৃষি নির্ভর জীবনের এক ডকুমেন্টারি চিত্র এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। পরিযায়ী কৃষি-শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার সমস্যা অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বিবৃত ও বিধৃত হয়েছে এখানে। বাংলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। কৃষিজীবী মানুষের অনুপাতে জমির পরিমাণ খুব কম। সাধারণভাবে বাংলাকে সুজলা-সুফলা বলা হলেও সমগ্র বাংলার মাঠ ঘাটের জমির গুণগত মান এবং উর্বরা শক্তি সমান নয়। কিন্তু উর্বর-অনুর্বর সর্বত্রই কৃষিজীবী মানুষের বসবাস রয়েছে। প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন ক্ষেত মজুরেরা নিজেদের এলাকায় বছরের কিছুটা সময় কাজ পেলেও সারা বছর এক জায়গায় তাদের কাজ জোটে না। তাই অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকেরা দল বেঁধে দূরের সমৃদ্ধ গ্রামগুলিতে যায় চাষের জমিতে কাজ করতে। এটা খুব স্বাভাবিক একটা গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাপনায় পরিযায়ী শ্রমিক যারা জীবিকার সন্ধানে ঘরে পরিবার রেখে বাইরে যায় দু'পয়সা রোজগারের আশায় তাদের যাপন অভিজ্ঞতা সব সময় সুখকর হয় না। এই উপন্যাসে গাজু সর্দারের দলের লোকেদের পরিণতি হয়েছে নির্মম। তারা যখন ভিন গাঁয়ের নাবাল জমিতে কাজ করছিল ভরা ভাদ্রে তখন হঠাৎ গদাখালির বাঁধ ভেঙে বাঁশ সমান উঁচু জলের স্রোত এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ডাঙালির মানুষ বেশির ভাগই সাঁতার জানে না। তাদের লাশ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কাহিনি শুধু গাজু সর্দার ও তার দলেরই নয়, দেশের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের অভিজ্ঞতার কাহিনি এটাই। উন্নয়ন, বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক ঢক্কা-নিনাদ যথেষ্ট পরিমাণে হলেও স্থানীয় স্তরে কর্মের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রচেষ্টা বা নীতি প্রণয়ন কেউই করেনি আজও।

আনসারউদ্দিনের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও নায়ক বাহার আলি সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হওয়ার এই চরিত্রে কল্পনা-প্রবণতা, সুকুমার মনোবৃত্তি, বয়সোচিত চপলতার সংসারের কঠিন দায়ভারে একেবারে সংযত। তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়িকারাও প্রায় কিশোরী, তাদের প্রেম পূর্ণতা পায় না নানা পরিস্থিতিগত কারণে। কথাসাহিত্যিক আনসারউদ্দিন স্বয়ং তাঁর গল্প উপন্যাস-এর নায়িকাদের প্রসঙ্গে গৌতম সাহাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন –

> "আমি মূলত গ্রাম সমাজের একেবারে নিম্নবিত্তের মানুষকে আশ্রয় করে সাহিত্য নির্মাণ করার চেষ্টা করি। এই শ্রেণির নারীদের তেমন শারীরিক সৌন্দর্য নেই বা শারীরিক সৌন্দর্যের বেসাতি করি না আমি। যা করলে পাঠককে কিছুটা টেনে রাখা যায়। আমার সাহিত্যে নারীরা রূপচর্চার দিক থেকে ভীষণ পিছিয়ে। সে কারণে বইয়ের প্রচ্ছদে তাদের শরীরের বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের মাথার চুল কাঠবেড়ালির বাসার মতোই শ্রীহীন। মাথায় উকুন। মুখে মেচেতার দাগ। ফাটা পা। শীতকালে এই ফাটল আরো চওড়া হয়। সেই ফাটলে চোখ রাখি। তা দেখে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার ছবি আঁকি।"[২১]

আনসারউদ্দিনের কথাসাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপটিকে চিনে নিতে এই মন্তব্যের পর আর আলোচনা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন।

Reference:

১. আনসারউদ্দিন, হেঁশেল জীবন, প্রথম প্রকাশ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ব্লার্ব অংশ।
(আনসারউদ্দিনের জন্ম ১৯৫৯ সালে, নদিয়া জেলার শালিগ্রামে। বাবা আশিরুদ্দিন মণ্ডল, মা মহিলা খাতুন বিবি। ১৯৮০-তে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে স্নাতক। পেশায় প্রান্তিক কৃষক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বারোর বেশি। পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি সোমেন চন্দ পুরস্কার, অন্নদাশংকর রায় স্মারক পুরস্কার, গল্পমেলা পুরস্কার, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন ও

গবেষণাকেন্দ্র পুরস্কার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইলাচন্দ পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা। আনসারউদ্দিনের শখ বই পড়া, নেশা সংবাদপত্র পাঠ ও খবর শোনা। বর্তমানে থাকেন নদিয়ার ধুবুলিয়ায়।)

২. চক্রবর্তী, শুভাশিস (সম্পাদক), অহর্নিশ পত্রিকা, অক্টোবর, ২০১৮, পৃ. ৩

৩. ইসলাম, আজাহার, সাহিত্যে বাস্তবতা, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২১

৪. Abrams, M.H., & Harpham, Geoffrey Galt, A Glossary of Literary Terms, Tenth Edition, Cengage Learning, Delhi, 2012, P. 334

৫. Buchanan, Ian, Oxford Dictionary of Critical Theory, First Published, Oxford University, Press, New York, 2010, PP. 439 - 441

৬. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৬

৭. আনসারউদ্দিন, জন-মুনিষ, প্রথম প্রকাশ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৮

৮. তদেব, পৃ. ২৯

৯. তদেব, পৃ. ৩০

১০. তদেব, পৃ. ৩৩

১১. তদেব, পৃ. ৪৬

১২. তদেব, পৃ. ৪৭

১৩. তদেব, পৃ. ৫৩

১৪. ভদেব, পৃ. ৫৫

১৫. তদেব, পৃ. ৫৪

১৬. তদেব, পৃ. ৫৭

১৭. তদেব, পৃ. ৫৮

১৮. তদেব, পৃ. ৫৮

১৯. তদেব, পৃ. ৭২

২০. তদেব, পৃ. ৭২

২১. সাহা, গৌতম, আনসারউদ্দিন অনন্য সন্ধান, প্রথম প্রকাশ, নান্দনিক, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৫৬

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 344 - 352
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘কালিন্দী’ ও ‘প্রথম প্রবাহ’ : সত্যবতীর নবনির্মাণ

ড. ইন্দ্রাণী হাজরা
সহকারী অধ্যাপক
কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ
মেজিয়া, বাঁকুড়া
Email ID : indranihazra86@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Mahabharata, Satyavati, Kalindi, Pratham Prabaha, Reconstruction

Abstract

The topic of our discussion in this article is how the character of Satyavati from the Mahabharata is re-constructed in the novels ‘Kalindi’ (2016) by Bani Basu and ‘Pratham Prabaha’ (2017) by Sourav Mukhopadhyay. Following the original story of Satyavati's life in the adi parva of the Mahabharata, both authors have presented the character from a new perspective in their novels and have shown uniqueness in the construction of the story.

Satyavati is placed at the heart of the story in both books. The mystery of her birth, the history of her transformation from Matsyagandha to Yojanagandha, the long story of her transformation from a bride to a paternal grandmother, and above all, the chemistry of her relationship with Vishma -- in this journey Satyavati has been recreated by the authors.

The magnificently beautiful lady Satyavati was raised in a Dhivara family. The wise sage Parashara was attracted by her beauty and she became mother of Vedvyas, the great creator of the Mahabharata. Then she became a part of the empire Hastinapur as the wife of the old king Shantanu. Was such a beautiful young lady truly happy with the old king? Was she really proud to play the role of the mother of Vishma? Both of the writers probe here deeper to carve a new analysis out of this part. They narrate the relationship of Vishma and Satyavati from a different perspective altogether. Through her passionate love, failure, pain, revenge, diplomacy and immense intelligence Satyavati became a distinctive female character from the historical era in these novels.

Discussion

রামায়ণ এবং মহাভারত – এই দুটি মহাকাব্য সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ ও আবেগ আজও কালের গতির মতোই নিয়ত বহমান। বিশেষত মহাভারতের জটিল ও বহুবিচিত্র বিন্যাস, ঘটনা সংস্থান, অসংখ্য সমান্তরাল কাহিনির সমাবেশ, আয়তনের বিশালতা ও অভিনবত্ব যুগে যুগে লেখক সমালোচকদের এর গভীরে অবগাহনে প্রবৃত্ত করেছে। ভারতের প্রায় সকল প্রাদেশিক ভাষায় মহাভারত অনূদিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় নিরবধি রসগ্রহণ করেছে এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে। বাংলা ভাষাতেও একাধিকবার মহাভারত অনূদিত হয়েছে। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কাব্য রচনার জোয়ার এলে রামায়ণ, ভাগবত পুরাণের মতো মহাভারতেরও একাধিক অনুবাদ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম সম্পূর্ণ মহাভারত গদ্যে প্রকাশ করেন (১৮৫৮-১৮৬১)।

মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।’ এই ইতিহাস তথা মহাকাব্যের মহিমা বাঙালি সসম্ভ্রম বিস্ময়ে অনুভব করেছে। পাশাপাশি এর অন্তরে লুক্কায়িত অমিত সম্ভাবনার খনি থেকে বহুমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে আপন কল্পনাশক্তির নৈপুণ্যে গড়ে তুলেছে অসামান্য সব অলংকার। নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে কাহিনির গভীরে লুকিয়ে থাকা কাহিনিকে। নিজের যুগ-পরিস্থিতির আলোকে প্রাচীন ঘটনা চরিত্র নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে তার সামনে। তখনই নির্মিত হয়েছে কাহিনি বা চরিত্রের ভিন্নতর পাঠ। সেই ভিন্ন পাঠ কাব্য-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের আধারে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের দরবারে। তার মধ্যে কিছু কালের দরবারে আদৃত হয়েছে আর কিছু নিপতিত হয়েছে তার করাল গর্ভে।

রাজশেখর বসু তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় বলেছেন, -

> “মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দু-তিন হাজার বৎসর ধরে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যনাটকাদির উপাদান যুগিয়েছে।”[১]

বাংলা সাহিত্যেও মধ্য যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই ধারা অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পরশুরাম, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুবোধ ঘোষ, প্রতিভা বসু, সমরেশ বসু, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, বাণী বসু এবং অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত দুটি উপন্যাসে মহাভারতের সত্যবতী চরিত্রটি কীভাবে ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, তাই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বাণী বসুর ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। তার আগের বছর শারদীয়া বর্তমান পূজাসংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। আর সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রথম প্রবাহ’ উপন্যাসটি শারদীয় দেশ পূজাসংখ্যায় প্রকাশের পর ২০১৭ জানুয়ারিতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দুটি উপন্যাসই মহাভারতের আদি পর্বের কাহিনি অবলম্বনে রচিত।

আদি পর্বের কাহিনিতে সত্যবতীর জীবনবৃত্তান্তে দেখা যায়, উপরিচর বসুর ঔরসে সত্যবতীর জন্ম, ধীবরগৃহে প্রতিপালন, যমুনাবক্ষে পরাশর ঋষির সঙ্গ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্মকথা। তারপর এসেছে শান্তনু-গঙ্গা-দেবব্রত বৃত্তান্ত, বৃদ্ধ রাজা শান্তনুর সত্যবতীকে বিবাহের জন্য আকুল হয়ে ওঠা ও পিতার মনস্কামনা চরিতার্থতায় ভীষ্মের কঠিন শপথের কাহিনি। রানি হয়ে সত্যবতীর হস্তিনাপুরে আগমন, চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্যের জন্ম, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্যের সিংহাসন লাভ, ভীষ্মের কাশীরাজকন্যাদের স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করে আনা এবং অম্বিকা-অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহের ঘটনা বর্ণিত এরপরের অংশে। তারপর ক্ষয়রোগে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু, সত্যবতীর কানীন পুত্র বেদব্যাসের দ্বারা নিয়োগ পদ্ধতিতে দুই বধূর গর্ভাধান ও ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্ম – মহাকাব্যের এই মূল কাঠামোকে দুটি উপন্যাসেই অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

কিন্তু মূল কাঠামোকে বজায় রেখেও দুই ঔপন্যাসিকই কাহিনি নির্মাণে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। দুটি গ্রন্থেই কাহিনির মূলে স্থাপন করা হয়েছে সত্যবতীকে। তাঁর জন্মরহস্য, মৎস্যগন্ধা থেকে যোজনগন্ধা হওয়ার ইতিহাস, রাজপরিবারে বধূ থেকে রাজমাতা হয়ে পিতামহী হয়ে ওঠার সুদীর্ঘ কাহিনি, সর্বোপরি ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রসায়ন – এই পথ পরিক্রমায় সত্যবতীকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন দুই লেখক। সেখানে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন এক ভিন্ন সত্যবতীকে। ধীবর বংশে প্রতিপালিতা সত্যবতী ছিলেন এমনই অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী, যাঁর সৌন্দর্য ছিল জিতেন্দ্রিয় ঋষি পরাশরের সংযমকে টলিয়ে দেওয়ার মতো। সেই সত্যবতী প্রায় তাঁর সমবয়সী তরুণের পিতা, বৃদ্ধ রাজা শান্তনুর স্ত্রী হয়ে রাজপরিবারে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে কি প্রকৃতই কৃতার্থবোধ করেছিলেন! নাকি স্বাধীনচেতা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই অরণ্যকুমারীর অন্তরে ছিল অন্য কোনও অপ্রাপ্তির বেদনা, কোনও ব্যর্থতার বোধ! ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধুই কি মাতা-পুত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল! নাকি তাঁর মধ্যে সকলের অগোচরে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল অন্য কোনও বিশেষ অনুভূতির স্রোত - 'কালিন্দী' ও 'প্রথম প্রবাহ'কে অবলম্বন করে এই ভিন্ন সত্যবতীর পরিচয় নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

সেই প্রসঙ্গে আলোচনায় আসবে সত্যবতী কেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রেরা। দুটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে মূল মহাভারতের সঙ্গে তাদের কাহিনিগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের নতুন পাঠ নির্মাণে লেখকদের মৌলিকতা কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা এই আলোচনায় উঠে আসবে। তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে বিনির্মাণবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, ভাষার মধ্যে চিন্তার কিছু কিছু পরিসর সব সময় অধরা রয়ে যায়, লেখার অন্তরালে থাকে আর এক লেখা, পাঠের অন্তরালে থাকে আর এক পাঠ।

> "বিনির্মাণবাদ যেহেতু কোনো ধরনের অভিভাবকত্ব মেনে নেয় না, অন্বিষ্ট পাঠকৃতিকে তা স্বচ্ছন্দে ভাঙতে পারে। আসলে নিরন্তর অন্তর্ঘাতের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তার সজীবতা ও অভিনবত্বকে। অন্যভাবে বলা যায়, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তা প্রতিমুহূর্তে আবাহন করে নির্মাণকে। ফলে পাঠকৃতির মধ্যে অলক্ষ্যে জেগে থাকে আরও অনেক পাঠকৃতির সম্ভাবনা।"[২]

মহাভারতের নির্মিত সত্যবতীর কাহিনি লেখকদের হাতে কীভাবে নবনির্মিত হচ্ছে এবং এই ভিন্ন পাঠ নির্মাণ পাঠকদের কাছে কোনও নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে কি না তা আমাদের অন্বিষ্ট।

মূল মহাভারতের কাহিনি উপন্যাসে কোথায় কীভাবে অনুসৃত হচ্ছে আর কোথায় তাকে অতিক্রম করে এক নতুন জগতের সন্ধানে রত হচ্ছে, তা আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধে প্রধানত রাজশেখর বসু কৃত মূল মহাভারতের সারানুবাদকে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে আলোচনায় আসবে সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত। মৃগয়ারত চেদিরাজ উপরিচর বসু নিজের মহিষীকে স্মরণ করে স্খলিত হওয়া বীর্য শ্যেনপক্ষীর সাহায্যে রানির কাছে পাঠান, সেটি ঘটনাক্রমে যমুনা নদীতে পড়ে গেলে নদীতে থাকা মৎসীরূপী শাপভ্রষ্ট অপ্সরা অদ্রিকা তা ধারণ করে গর্ভবতী হয় এবং সত্যবতীর জন্ম হয়। জন্মের পর রাজা তাকে ধীবরদের কাছেই দিয়ে দেন।

মূল মহাভারত অনুযায়ী 'প্রথম প্রবাহ' উপন্যাসে সত্যবতীর পিতা-মাতা উপরিচর-অদ্রিকা বর্ণিত হলেও 'কালিন্দী' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন দাস রাজার স্ত্রী-র সঙ্গে রাজা উপরিচরের অবৈধ মিলনের ফল হল সত্যবতী। হয়তো মৎসী গর্ভে মনুষ্য সন্তানের জন্মকে এইভাবে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন লেখক। ধীবর পল্লির কোনও রমণীর শারীরিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে সুদর্শন কোনও রাজার পক্ষে তাকে সন্তান দানের বিষয়টি হয়তো সেই সময় একেবারে অমূলক ছিল না। আর দাসরাজা যেভাবে পরপর শর্ত দিয়ে দেবব্রতের কাছ থেকে আদায় করে নেন দুটি প্রতিশ্রুতি, তার পিছনে বাণী বসু তাঁর পৌরুষত্বের নিষ্ফল আক্রোশকে দেখিয়েছেন। আগাগোড়া 'কালিন্দী' উপন্যাসে দাসরাজার আচরণে এই ঈর্ষার প্রকাশ লক্ষিত হয়, -

> "দাসরাজা মনে মনে এঁচে রেখেছে, কোনও এক রাজপুরুষ যেমনি তার বংশে পুঁতে দিয়ে গেছে নিজের বীজ, সে-ও তেমনি পুঁতবে রাজপুরুষদের বংশে। ঝাড়েবংশে উচ্ছন্নে যাক সব।"[৩]

সত্যবতীর জন্ম সংক্রান্ত অলৌকিকতাকে একইভাবে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার জন্য 'প্রথম প্রবাহ'-তেও রানি গিরিকার সঙ্গে মিলনে উৎসুক রাজার সামনে গহীন অরণ্যে সশরীরে উপস্থিত করে মিলন ঘটানো হয়েছে অপ্সরা অদ্রিকার। কাহিনিকারেরা নিজ নিজ দক্ষতা অনুসারে মৌলিকতার নিদর্শন রেখেছেন এই অংশে।

এরপর আসে সত্যবতী-পরাশর প্রসঙ্গ। মূল কাহিনিতে দেখি সত্যবতী পরাশর ঋষির কাছ থেকে যোজনগন্ধা হওয়ার এবং সন্তান জন্মের পরেও কৌমার্য অটুট থাকার বর লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয়েও দুটি উপন্যাসেই বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'কালিন্দী'-তে দেখা যায় পরাশর সঙ্গ করার আগে সত্যবতীর গায়ের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য ওষধি জাতীয় কোনও মাটি গায়ে মেখে স্নান করে আসতে বলেন, আর 'প্রথম প্রবাহ'-তে দশমাস তপোবনে থাকাকালীন নিয়মিত

ভেষজ ওষুধ লেপনের ফলে সত্যবতীর গায়ে স্থায়ী সুগন্ধ তৈরির কথা বলা হয়েছে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতে এই সুগন্ধ আসলে সত্যবতীর ধীবরপল্লির সংস্কার কাটিয়ে মহামুনি পরাশরের সংস্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার লাভের ইঙ্গিত,

> "তাঁর সুনামের সৌগন্ধ, তাঁর রূপের সৌগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই সত্যবতী গন্ধবতী, সত্যবতী যোজনগন্ধা।"[৪]

মূল কাহিনিতে সত্যবতীর চরিত্রের প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ঋজু ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত থাকলেও তাঁর প্রেমিকা সত্তার পরিচয় সেভাবে দেখানো হয়নি। কিন্তু আলোচ্য দুই উপন্যাসে সত্যবতী চরিত্রের ভিন্ন পাঠ নির্মিত হয়েছে প্রধানত এই প্রেমিকা সত্তার পরিস্ফুটনকে কেন্দ্র করে। সে প্রেম তাঁর গর্ভজাত তিন পুত্রের জন্মদাতাদের প্রতি নয়, তা হস্তিনাপুরের যুবরাজ মহাবীর গঙ্গাপুত্র দেবব্রতের প্রতি এক সুন্দরী ষোড়শী তরুণীর বয়সোচিত অনুরাগ। ধীবরপল্লিতে প্রতিপালিতা হলেও যাঁর শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে এক রাজ পরিবারের রক্ত। প্রতিভা বসু 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থে বলেন, যে সত্যবতীর জন্য দেবব্রতের জীবনে সমস্ত সুখের পথ বন্ধ হয়ে গেল, পরবর্তীকালে সেই দেবব্রত কী করে নতমস্তকে সত্যবতীর সব আদেশ পালন করলেন ভাবলে বিস্ময় জাগে।

> "তবে কি যে মোহিনী মায়ায় মহারাজা শান্তনু আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই মোহিনী মায়ায় সত্যবতী তাঁর পুত্র দেবব্রতকেও বন্দী করেছিলেন? ...জানতে ইচ্ছে হয় সত্যবতী বিষয়ে দেবব্রতর অন্তরে কী চেতনা কাজ করতো। কেন তিনি তাঁর জীবন যৌবন ক্ষমতা এই হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে নিঃশেষ করলেন?"[৫]

অর্থাৎ সত্যবতী ও ভীষ্মের মধ্যে অন্যরকম এক সম্পর্কের সম্ভাবনা আগেও ভাবিত করেছে সমালোচকদের। আর সেই সম্ভাবনার সূত্রটুকু থেকে এই সম্পর্কের এই ভিন্ন বয়ান নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিকরা।

তবে 'কালিন্দী'-তে এই প্রণয় উভয় তরফে দেখানো হলেও 'প্রথম প্রবাহ' - তে তা একপাক্ষিক। নৌকা বাইতে বাইতে যমুনা তীরবর্তী অরণ্যে দেবব্রতের সঙ্গে কালিন্দীর সাক্ষাৎ ও ভালোলাগার সূচনা। এমনিতে সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হলেও ভালোলাগার পুরুষটির সামনে সত্যবতীর নারীসুলভ লজ্জা সহজ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সে ভীষ্মের চোখেও অনুরূপ মুগ্ধতা প্রত্যক্ষ করে সুখী হয়েছে।

অন্যদিকে 'প্রথম প্রবাহ'-তে স্বয়মাগতা হয়ে দেবব্রতকে প্রেম নিবেদনে স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা ভুলে লজ্জারুণ হয়ে পড়েছে। প্রিয়কে জয় করার দুর্দম বাসনায় সে গঙ্গাপুত্রের প্রশ্নের উত্তরে তীক্ষ্ণ যুক্তিতে উত্তর দিয়েছে। তাঁর গর্ভধারিণীর প্রকৃত পরিচয় স্বর্গের গণিকা শুনে যুবরাজ চমকিত হলে সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের মহান বংশের উদ্ভব মেনকা নন্দিনী শকুন্তলার পুণ্যগর্ভ থেকেই। দাসরাজার বংশপরিচয় নিয়ে ভীষ্মের তীর্যক মন্তব্যে অন্তরে আহত হয়েছে, তবু পাল্টা কটূ বাক্য প্রয়োগ করেনি। কিন্তু যখনই কাশীরাজকন্যা অম্বার প্রতি দেবব্রতের প্রণয় বন্ধনের কথা শুনেছে, কাঙ্ক্ষিত পুরুষের মুখে অন্য নারীর প্রশস্তি তাঁকে বিবর্ণ করে তুলেছে। তাঁর সুতীব্র প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছে। প্রতিশোধস্পৃহায় অহরহ তাড়িত যে সত্যবতী উপন্যাসে এরপরে অঙ্কিত হয়েছে, তাঁর সমস্ত কার্যক্রমের ব্যাখ্যা লুকিয়ে থাকে তাঁর এই প্রেমিকা সত্তার দহনে। উপন্যাসে দেখা যায় দেবব্রতকে লাভ করার জন্য কুমারী দেহের শুদ্ধতাকে তুচ্ছ করে সে পরাশরের সঙ্গে শর্তাধীন মিলনে রাজি হয়। গাত্রগন্ধ দূরীভূত করে দেবব্রতের পিতার মাধ্যমে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ সুগম করে সে পরাশরের সাহায্যে। হতচকিত দাসরাজা বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে তরুণী কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর পুত্রদের রাজসিংহাসন লাভের শর্ত আরোপ করলেও সত্যব্রতকে আজীবন ব্রহ্মচর্যের শপথ সত্যবতীর জন্যই নিতে হয় দুটি উপন্যাসেই।

তবে 'কালিন্দী'-তে পূর্বরাগের আবেশে আচ্ছন্ন কালী যেহেতু যুবরাজের তাঁর প্রতি মুগ্ধতার সংবাদ জানতেন, তিনি আশা করেছিলেন এই অসম্ভব শর্ত রাখলে হয়তো যুবরাজ পিতার বিবাহ প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়াবেন। অন্য কাহিনিতে সরাসরি প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় জর্জরিত সত্যবতী লেলিহান ক্রোধে 'সর্পিণীর মতো হিসহিসে গলায় বলল, -

> "পুত্রলাভের সম্ভাবনা বিনষ্ট করতে হবে। বিবাহ করা চলবে না।"[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে না পাওয়ার বেদনা প্রশমিত করতে চেয়েছেন তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে। এইভাবে প্রতিশোধের বিষে প্রিয়তম পুরুষকে ছিন্নভিন্ন করে আত্মঘাতী যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হয়ে নতুন পথচলার সূচনা হয় হস্তিনাপুরের রাজমহিষীর।

এই পর্বে দুটি উপন্যাসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য চোখে পড়ে। 'প্রথম প্রবাহ'-তে সত্যবতী বিবাহের পর যেন অধিক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ভীষ্মের অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে তখন প্রেমের পরিবর্তে সংগ্রামী মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভীষ্মের সুউচ্চ বংশগৌরবের অহমিকা ভেঙে রাজবংশে দাসরক্ত প্রবাহিত করাই যেন তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কারণ তিনি জানতেন ভীষ্ম অন্য নারীতে মুগ্ধ।

অন্যদিকে 'কালিন্দী'-তে যেহেতু সত্যবতী জানেন সত্যব্রত একদিন তাঁকে ভালোবেসেছিলেন, সেই সত্যটুকুকে অবলম্বন করে উচ্ছল প্রগলভা লাস্যময়ী রমণীর মতো অন্তঃপুরে ভীষ্মকে আকর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি। ভেঙে দিতে চান তাঁর গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ। যদিও তাঁর সেই উচ্ছলতার অন্তরালে শুষ্ক কান্নাটুকু গোপন থাকে না। দুঃসাহসী প্রেমিকা অকপটে পুত্র কামনা করেন প্রেমাস্পদের কাছে, -

> "আমি তোমাকে চেয়েছিলুম। আর তুমি আমাকে চেয়েছিলে। এটা তো ভোরের আলোর মতো সত্য ছিল আমাদের কাছে। ... আজ চুপ করবার দিন নয় কুমার। আজ আমি বলবই। ...তোমার কথাও রইল। আমার কথাও থাক। আজ আমাকে একটি পুত্র দিয়ে যেতেই হবে।"[৭]

ভীষ্ম নীতি আদর্শের কথা বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে অসহ্য ক্রোধে সে বলে ওঠে, -

> "একজন স্বাধীন অরণ্যকুমারীর সাধ, আশা সব চূর্ণ করে বৃদ্ধ শকুনের হাতে নিজের প্রেমিকাকে তুলে দেওয়া কোথাকার নীতি? কোন আদর্শ?"[৮]

যে নারী একদিন সুতীব্র ভালোবেসে প্রিয় পুরুষকে নিয়ে স্বপ্নের সংসার কল্পনায় বিভোর হয়েছিল তার ব্যর্থ প্রেমের এই নিদারুণ হাহাকার তাকে একজন রক্ত মাংসের সজীব মানবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে। এখানেই কাহিনিকারদের সার্থকতা।

বিনায়কের জবানিতে সত্যবতী চরিত্রের বিশ্লেষণে লেখকের দরদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়, -

> "একে পাপীয়সী বলে দিতে পারলে তো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তা পারা যাচ্ছে না। অন্তরের প্রত্যন্তে কোথাও এই নারীর জন্য সুপ্ত বেদনাও অনুভব করছি। বিচিত্র এক ঈর্ষাকাতর প্রেম সত্যবতীর। যাকে স্বয়ং অর্জন করতে পারলেন না, তাকে অন্য নারীর বাহুডোরে আবদ্ধ হতেও দেবেন না। বহিরঙ্গে যা প্রতিশোধলিপ্সা ও নীচ উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে হয়, তার গভীরে রয়েছে বঞ্চিত প্রেমের হাহাকার।"[৯]

এ যেন স্রষ্টার হাতেই সৃষ্টির অনবদ্য বিশ্লেষণ। 'কালিন্দী' - তে পুত্রের অধঃপতন দেখে রাজবংশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশায় অসুস্থ সত্যবতী যে ভীষ্মের রাজকন্যা হরণ করতে যাওয়ার অন্য অর্থ করলেন, তার পিছনেও তাঁর সেই সদাশঙ্কিত প্রেমিকা মনটিই কাজ করছিল বলে মনে হয়। সত্যিটা জানার পর তিনি ভাবেন রাজমাতা সত্যবতী ভীষ্মকে সম্পূর্ণ চেনেন ও ভরসা করেন কিন্তু "কালিন্দী এখনও চেনেনি। সে এখনও বেপথুমতী তরুণী এক। মৃগীর মতো চকিতনয়না। সব সময়ই তার হারাই হারাই ভাব। অথচ আশ্চর্য! কী হারাবে? কোনও দিনই তো কিছু পায়নি সে।"[১০] আজীবন প্রেমিকের অনতিদূরে থেকেও এই অপ্রাপ্তির বেদনাই যেন কালিন্দীর নিয়তির পরিহাস।

ভীষ্মের প্রতি সত্যবতীর ব্যর্থ প্রেম যেভাবে প্রবল প্রতিশোধে পরিণত হয়েছে সেই দুর্দম প্রতিশোধলিপ্সা তাঁর চরিত্রে কীভাবে অন্য একটি মাত্রা সংযোগ করেছে তা এই অংশে আলোচ্য। এখানেও দুই উপন্যাসে কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। 'কালিন্দী'-তে সত্যবতীকে একবারই নিষ্ঠুর প্রতিশোধে জ্বলে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি বিবাহের দ্বিতীয় শর্ত দিয়ে দেবব্রতকে ব্রহ্মচর্যের শপথ নিতে বাধ্য করেন। আর কখনও সেভাবে তাঁকে প্রতিহিংসুরূপে দেখা যায় না। এখানে দাসরাজার প্রতিশোধকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। কালীকে তিনি তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন কালীর

অজ্ঞাতসারে। এখানে কালিন্দীকে দেখে মনে হয়, প্রথম যৌবনে ভীষ্মের মুগ্ধ চাহনির স্তুতিটুকু তাঁর জীবনব্যাপী দহনজ্বালায় কিঞ্চিৎ প্রশান্তির স্পর্শ এনে দিতে হয়তো বা সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু 'প্রথম প্রবাহ'-এর নায়িকার কাছে এমন কোনও সম্বল না থাকায় প্রতিশোধের আগুনে রাজবংশ ধ্বংসের খেলায় মেতে নিজেও তিনি পুড়ে ছারখার হয়েছেন। কামান্ধ শান্তনুর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে যেমন তিনি সুকৌশলে ভীষ্মের ব্রহ্মচর্য শপথের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের উপর তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছেন, তেমনি নিপুণতায় পুত্র উৎপাদনের জন্য গোপনে রাজবৈদ্যের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

এতখানি প্রচেষ্টার পরেও জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ পুত্রোৎপাদনে অক্ষম জেনে হতাশ হলেও হার মানছেন না। গুপ্ত ঘাতক দ্বারা ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করাচ্ছেন কনিষ্ঠ পুত্রকে যথাসময়ে সিংহাসনে বসিয়ে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সিংহাসন সুরক্ষিত করতে। এ সংবাদ গোপন রাখতে রাজবৈদ্যকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করাচ্ছেন। অর্থাৎ নারীত্বের আহত অহং দিয়ে যে যুদ্ধের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই যুদ্ধে মাতৃত্ব পরাভূত হচ্ছে প্রেমিকার প্রতিশোধস্পৃহার কাছে। সত্যবতী তাঁর প্রেমিকা সত্তার পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পাখির চোখ বানিয়ে নিয়েছিলেন রাজসিংহাসনকে। সমস্ত নীতি আদর্শের ঊর্ধ্বে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ভীষ্ম এবং তাঁর উচ্চ বংশগৌরবকে ধুলিসাৎ করা। তাঁর বিশুদ্ধ আর্য বংশের বিস্তার রুদ্ধ করে দেওয়া। এই কার্যে সফল হতে এতখানি মরিয়া হয়ে উঠছেন যে, পুত্রকে হত্যা করাতেও তিনি পিছপা হচ্ছেন না।

যে কূটনীতি অবলম্বন করে তিনি পরাশরের সাহায্যে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছিলেন, সেই কূটনীতির বশেই ভীষ্মের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন তিনি। সুচতুরভাবে ভীষ্মের পূর্বপ্রেমিকা কাশীরাজকন্যা অম্বাকেও হরণ করিয়ে এনে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ সংঘটনের আদেশ দান করেছেন। প্রস্তরীভূত ভীষ্মের প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ঠুর কুটিল হেসে মন্তব্য করেছেন, -

> "ভুলে যেও না মহান ভীষ্ম তুমি একজন শপথবদ্ধ চিরব্রহ্মচারী। এখনও কাশীনৃপতির জ্যেষ্ঠা দুহিতার প্রতি তুমি উদাসীন হতে পারনি দেখছি। ধিক! এ তো ব্রহ্মচর্য যাপনের উপযুক্ত মনোভাব নয়। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়র কাছে বিশ্বের সব রমণীই সমান বিবিক্তির যোগ্য, তাই না?"[১১]

'প্রথম প্রবাহ' উপন্যাসটি পড়লে বারেবারে উপলব্ধি করা যায় প্রত্যাখ্যানের জ্বালা তাঁর সকল কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর যখন অমাত্যবর্গ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী আনার জন্য ভীষ্মকে সিংহাসনে আরোহন অথবা ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার পরামর্শ দেন, তখনও স্তব্ধ নির্বাক সত্যবতী নড়ে বসেছেন। সভামধ্যে সসংকোচে নিজের কুমারী গর্ভের কথা জানিয়ে ভীষ্মের পরিবর্তে নিজের কানীন পুত্র ব্যাসকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। মূল মহাভারতে দেখি সত্যবতী স্বয়ং ভীষ্মকে পূর্বে উল্লিখিত অনুরোধ দুটি করেছেন এবং ভীষ্ম রাজি না হলে তখন তাঁর কাছে ব্যাসের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছেন 'প্রথম প্রবাহ' উপন্যাসের নায়িকা। এখানে লেখক সেই সত্যবতীর ছবি অঙ্কন করেছেন যিনি ভীষ্মকে একসময় ভালোবেসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। তাই দেখি, অভাবনীয় কৌশলে নিজের লক্ষ্যে অবিচল সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাধ্যমে কৌরব বংশে নিজের বংশ পরম্পরা সার্থক করার প্রতিজ্ঞাকে অটুট রাখতে সমর্থ হলেন।

আসলে প্রতিশোধ চরিতার্থতা বলে একে আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও এর নিগূঢ় কারণটুকু স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে সত্যবতীর ভাবনায়, -

> "হৃদয়ের মধ্যে একটি কীট যেন দংশন শুরু করেছে। দুই বিধবা পুত্রবধূর পূর্ণযৌবনা শরীর দু'টি অকস্মাৎ ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে। ...সত্যবতী অস্থির হয়ে ওঠেন। ভীষ্মকে অন্য নারীর বাহুডোরে তিনি কল্পচক্ষেও দেখতে পারবেন না। ...সহ্য হচ্ছে না সত্যবতীর। ভাবনাটি পর্যন্ত সহ্য হচ্ছে না। অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে ছটফট করতে থাকে।"[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রেমাস্পদের প্রতি মনুষ্যস্বভাবজাত অধিকারবোধই যে এই আচরণের মূল কারণ হিসেবে এখানে নির্দেশিত হয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই উপন্যাস অবলম্বনে সত্যবতীর চরিত্রের প্রতিহিংসার স্বরূপ আলোচনার শেষে একথা অনুভূত হয়, প্রতিশোধস্পৃহায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আপন লক্ষ্যে তাঁকে ধাবমান মনে হলেও, কোথাও কোথাও এই প্রতিহিংসার অন্তরালে জ্বলতে থাকা ব্যর্থ প্রণয়ের উত্তাপ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

রাজপরিচালনায় সত্যবতীর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় মূল কাহিনিতে পাওয়া গেলেও তাঁর দৃপ্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও দুর্দম অপরাজেয় মনোভাব তাঁকে ভিন্নরূপে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। স্বাধীন অরণ্যচারী ধীবর পালিতা থেকে 'হস্তিনার সম্মানিতা রাজমাতা, দীর্ঘকালের সিংহাসনার্ধ-ভাগিনী, মহারাজ শান্তনুর মহিমময়ী রাজ্ঞী, রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী সত্যবতী' একের পর এক কূটকৌশলের জাল বিস্তার করেও যখন অসফল হচ্ছেন তখন তাঁর নিষ্কম্প কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, -

> "যার সঙ্গে আমি দ্যূতক্রীয়ায় নেমেছি, হে বৈদ্য, তার নাম নিয়তি! পণ রয়েছে আমার সর্বস্ব। এখন হয় পরিপূর্ণ বিজয়, নচেৎ চূড়ান্ত পতন – এ দুইয়ের মধ্যে আর কোনও তৃতীয় বিকল্প নেই।"[১৩]

ভাগ্যের পথকে বারবার ভিন্নপথে চালনার চেষ্টা করেছেন তিনি। খাদের মুখ থেকেও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বারবার। নিশ্চিত পরাভবকে আবার বিজয়ে রূপান্তরিত করেছেন। বহু চেষ্টা করেছেন কৌরব বংশের ধারাকে আপন শক্তিতে প্রবাহিত করার। তবু পরিপূর্ণ সাফল্য কোনওদিন তাঁর করতলগত হয়নি। তবু তাঁর অসীম অনমনীয় মনোবল ও প্রচণ্ড একমুখীতা নিয়ে তিনি ভাগ্যের সঙ্গে পাশাখেলায় ঘুঁটি সাজিয়ে গেছেন। লেখকের বর্ণনায় পাই, -

> "সারা জীবনই বিরূপ অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চলল সত্যবতীর। অন্য যে-কেউ হলে হতোদ্যম হয়ে ভেঙে পড়ত কবেই। যোজনগন্ধার রক্তে সে প্রবৃত্তি নেই। পরাজয়কে ঘৃণা করেন তিনি। প্রতিটি আঘাত তিনি ভাগ্যকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। নিজে যত রক্তাক্ত হয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বীকেও সমপরিমাণ বিদ্ধ করতে ছাড়েননি। যখনই চলার পথ রুদ্ধ হয়েছে, তিনি সেই বাধা চূর্ণ করে অথবা বিকল্প পথ স্বহস্তে কর্তন করে এগিয়েছেন। থেমে যাওয়ার কথা ভাবেননি কখনও।"[১৪]

এই সাহসিকতা চরিত্রটিকে মূল মহাকাব্য থেকে স্বতন্ত্র চেতনায় রঞ্জিত করেছে।

স্বাতন্ত্র্যের চেতনা, আত্মমর্যাদার এই বোধ থেকেই হয়তো সে পালকপিতার কাছে প্রশ্ন তুলেছিল রাজার সন্তান হয়ে তার ভাই রাজপরিবারে মানুষ হওয়ার সুযোগ পেলেও সে একা কেন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'ইতিহাসের বাঁক বদল' বা 'সমাজ বিপ্লব' – যে নারীর হাতে সূচিত করা হয়েছে, তাঁকে এইভাবে স্বয়মপ্রভা করে গড়ে তোলাই হয়তো ছিল তাঁর নির্মাতাদের লক্ষ্য। তাই কমবেশি দুটি উপন্যাসেই লেখকদের বর্ণনায় প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী এই রমণীর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে সেই নতুন আলোয় তাঁকে নতুন করে চিনতে বাধ্য করেছে পাঠককে।

আলোচনার শেষ পর্বে এসে আমরা উপন্যাস দুটিতে উপস্থাপিত দীর্ঘ জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত রিক্ত অসহায় এক নারীর আলোচনা করব। আপাত দৃষ্টিতে যাঁকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে হলেও জন্মাবধি যাঁর সারাটা জীবন জুড়ে রয়েছে শুধু অপ্রাপ্তি ও শূন্যতার হাহাকার। ভাগ্যের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে প্রবল তেজ দেখালেও একসময় তাঁকে হার মানতে হয়েছে। 'কালিন্দী' - তে তিনি ভীষ্মের হাতে বিচিত্রবীর্যকে সমর্পণ করার পরেই যেন খানিকটা নতি স্বীকার করে নিয়েছেন মনে হলেও 'প্রথম প্রবাহ' - তে তাঁর লড়াই আরও দীর্ঘ।

শত চেষ্টাতেও যখন আবার তাঁর চালে ভুল হল, হস্তিনার শক্ত সমর্থ সুস্থ উত্তরাধিকারীর আশায় দ্বিতীয়বার ব্যাসকে আহ্বান করলেও নিয়তির পরিহাসে বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তানটি যখন জন্ম নিল দাসীর গর্ভে, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন।

> "সত্যবতীর পরাজয় আজ সম্পূর্ণ হল। মেঝেতে লুটিয়ে তিনি মাথা খুঁড়তে লাগলেন। আজ তিনি নিঃস্ব, পরাভূত, পন্থহীন।"[১৫]

এই অসহায় রমণীর যন্ত্রণায় সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছেন তাঁর কানীন পুত্র ব্যাসদেব, তিনি মাকে শুনিয়েছেন ভবিতব্যের অলঙ্ঘনীয় শক্তির কথা। ক্ষুদ্র মানবীশক্তি দিয়ে যথাসাধ্য প্রযত্ন নিলেও অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম যে মানুষের অসাধ্য, কালের নির্দেশের কাছে যে সে অসহায় – সেকথা বুঝিয়েছেন তাঁকে।

এই অসহায়তা থেকে গর্বিতা নারী হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারীর কামনায় শেষপর্যন্ত নতজানু ভিক্ষায় ভেঙে পড়ছে প্রেমিকের কাছে। এইভাবে নির্দোষ গঙ্গাপুত্রের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন সত্যবতী। হস্তিনাপুরকে রক্ষা করার জন্য আকুল প্রার্থনায় ভীষ্মের সন্তানের মা হতে চাইছেন,

> "সারাজীবন আমি নিজেরই রচনা করা শ্মশানভূমিতে প্রেতিনীর মতো শবদেহ ঘেঁটেছি। দেবব্রত, একবার আমাকে প্রাণের স্বাদ দাও। একটি রাত অন্তত বেঁচে দেখি বাঁচার স্বাদ কেমন!"[১৬]

যখন সত্যবতী এইভাবে গঙ্গাপুত্রের কাছে হাত পাতছেন, তখন হস্তিনাপুরের কল্যাণকামী রাজমাতার পাশাপাশি প্রেমিকার হাহাকারও গোপন থাকছে না। কিন্তু তাঁর সুতীব্র আলিঙ্গনের প্রত্যুত্তরে যখন দেবব্রতের হৃদয় থেকে বর্ষব্যাপী দহন জননীর সুশীতল স্পর্শের আশায় অশ্রুধারা রূপে নির্গত হয়, তখন নব চেতনায় সত্যবতীর উত্তরণ ঘটে গাঙ্গায়নির আকাঙ্ক্ষিত সেই মাতৃসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে। যে ভীষ্মের মুখে মা ডাক সত্যবতীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিত তাঁর মা ডাকেই অকৃত্রিম স্বতোৎসারিত মাতৃস্নেহে সিক্ত হয় তাঁর বুক, হারানো সন্তানদের সঙ্গে ভীষ্মকে একই আসনে বসাতে সমর্থ হন রাজমাতা। প্রেমিকা সত্যবতীর এই মাতৃসত্তায় উত্তরণে মূল কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির আশ্চর্য সমাপতন তৈরি হয়। অসীম প্রযত্নে যৌথ সন্তানের মতো ভবিষ্যতের হস্তিনা নগরীকে রক্ষা ও লালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন দুজনে।

তাই দুটি উপন্যাসে সত্যবতীর ভিন্ন রূপে উপস্থাপনের আলোচনার পরিণতিতে এসে আমাদের মনে হয়, দুটিতেই প্রেমিকা রূপে সত্যবতীকে নতুন ভাবে নির্মাণে ঔপন্যাসিকরা সফল। মূল কাহিনি থেকে অনেকখানি সরে এসে এক অসামান্য সুন্দরী বুদ্ধিমতী নারী চরিত্রের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বকে তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাকাব্যের পাতায় আবদ্ধ না থেকে এখানে সত্যবতী হয়ে উঠেছেন প্রেমের জন্য আকুল এক মনস্বিনী আধুনিক নারী, যাঁর সময়কাল স্থিত মহাকাব্যের যুগে। ব্যর্থ প্রেমের যে জ্বালা বুকে নিয়ে তাঁর পথ চলার সূচনা হচ্ছে সেই জ্বালা একসময় প্রশমিত হচ্ছে প্রশান্তিতে। প্রেমিকা নারীর উদগ্র কামনা নির্বাপিত হচ্ছে মাতৃস্নেহের বারিধারায়। পাঠকের চেতনার সমুদ্রে আলোড়ন তুলে লাস্যময়ী কালিন্দী মিশে যাচ্ছে মহাকাব্যের পরিচিত বৃত্তে, ভীষ্মের উন্মত্ত একনিষ্ঠ প্রেমিকা সমাপতিত হচ্ছে হস্তিনাপুরের রাজমাতায়।

Reference:

১. বসু, রাজশেখর (অনুবাদ), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, এম সে সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, ভূমিকা।
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১০৬
৩. বসু, বাণী, কালিন্দী, দে'জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৪
৪. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১১০
৫. বসু, প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ২৬
৬. মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, 'প্রথম প্রবাহ', শারদীয় দেশ ১৪২৩, কলকাতা, পৃ. ৪৪০
৭. বসু, বাণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৮. তদেব, পৃ. ৭০
৯. মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০
১০. বসু, বাণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১১. মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০
১২. তদেব, পৃ. ৪৬০
১৩. তদেব, পৃ. ৪৪৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. তদেব, পৃ. ৪৬৬
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭৪
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮০

Bibliography:

বসু বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা–৭৩, এপ্রিল, ১৯৭৪
ভট্টাচার্য ধীরেশচন্দ্র, মহাভারতের নারী, আনন্দ, কলকাতা, ২০২২
ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২৯
ভট্টাচার্য সুখময়, মহাভারতের চরিতাবলী, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১২, আষাঢ়, ১৩৬৪
ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮
সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০২৩

পত্র-পত্রিকা

গোস্বামী উজ্জ্বল (সম্পা.), লেখা দিয়ে রেখাপাত: বাণী বসু সম্মাননা সংখ্যা, নৈহাটি, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ক্রম নং ১১, সেপ্টেম্বর ২০২০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 353 - 364
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখন ‘জলের ভুবন’ : হারিয়ে যাওয়া শৈশবযাপন ও একটি শহরচরিত্র

পর্ণা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা
Email ID : parna.bengali@tripurauniv.ac.in

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Memoir, Lost Childhood, City Character, Nostalgic, Historical Significance, Migration, Reminiscence, universal, timeless.

Abstract
Enakshi Roy's 'Joler Bhuvan' (2016) is such a memoir that is not only about her own childhood experiences, but also of various experiences of many people related to their childhood life which is nostalgic. It is reminded of the various materials left behind by many people related to their childhood life in the seventies and eighties, which are now a thing of the past. The sincere relationships of childhood, games, observance of vows, free-roaming in the bosom of nature, the tradition of fairs, the craze of puppet dancing, telegrams, postcards, inland letter cards, the khaki-coloured clothes of the postman, the coal engine of the railway car, the well-welder, the curd seller, floating paper boats in the rainwater, the wedding of dolls, etc. are being lost in the 21st century. Many of the joys of childhood life have been lost to today's generation. Therefore, the various elements of that lost childhood described in the memoir have special historical significance. It is also about being a living character of a city and being intimately involved with life. That city is Jalpaiguri in North Bengal. The history of the naming of Jalpaiguri district, the horror of floods, the nature of the Karala River, the Dharla River, the Rukruka River, the discovery of the Toto caste by Enakshi Roy's grandfather Jatindranath Roy, the sweetness of the language of Jalpaiguri city under the influence of the Rajbangshi language, the tradition and antiquity of the Jalpesh fair, the contribution of Nawab Hossain Mosharraf to Jalpaiguri, the words of Thakur Panchanan Barma, some historical facts of Jalpaiguri centered on Netaji-Gandhiji, historical information about the change of the route of the Darjeeling Mail, information about the city's traditional shops, schools and colleges - all these things are presented in the memoir in connection with life

experiences. Finally, the pain of being uprooted due to Enakshi Roy's migration from Jalpaiguri to Kolkata is added. There is talk of alleviating that pain through reminiscence. The style of the memoir captures a touch of poetry. The significance of the memoir, "The Water World," lies in its transcendence of the personal to become universal and timeless.

Discussion

প্রত্যেকের শৈশব জীবনের আধারে বয়ে যায় কোনো সময়বৃত্ত। অতীতের সেই সময়ের সৌধ গড়ে ওঠে আগামীর ফিরে দেখায়। লিঙ্গভেদে, জাতিভেদে, স্থানভেদে, যুগভেদে ধ্রুবসত্য স্মৃতিচারণা। তবে, স্মৃতির প্রকাশ বহুমুখী। স্মৃতির লিখন মাধ্যমে প্রকাশ যখন হয়ে ওঠে সর্বজনীন ও সর্বকালীন, তখন তা মর্যাদা পায় সাহিত্যের। এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবন' (২০১৬) এমনই এক আত্মজীবনী, যার শব্দের বুননে আছে শৈশবের অনুভূতির প্রখরতা আর আস্ত এক শহরের স্বভাব-চরিত্র-ইতিহাস। উত্তরবঙ্গের বুকে করলা নদীর কোল জুড়ে সেই শহরের নাম জলপাইগুড়ি। এণাক্ষী রায়ের অনুভূতিতে তাঁর শৈশবের আকর এই শহর —

> "খেলাধুলো, শিক্ষা, ঐতিহ্যের শহর জলপাইগুড়ি। সৌন্দর্যের শহর, শান্তির শহর। মন্থর ধোঁয়াহীন ধুলোহীন জীবন। মন্থর গা-এলানো নদী, শুয়ে থাকা চা-বাগান, রুপোলি বালির চর। পাখির শহর সবুজের শহর, আমার ভালোবাসার জলপাইগুড়ি।"[১]

শৈশব আর শহরের যখন রঙমিলান্তি হয়, পৃথক করা যায়না যখন একের থেকে অপরকে, তখন জীবন্ত শৈশবের সঙ্গে শহরও হয়ে ওঠে এক ব্যক্তিচরিত্র। এণাক্ষী রায় তাঁর শৈশবযাপনে শহরকে জারিত করেছেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাঁর পঞ্চাশোর্ধ জীবনের নানাবেলার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় শৈশববেলার প্রতি। তাই তাঁর স্মৃতিলিখনে জলপাইগুড়ির বৃত্তে শৈশব থেকে কিশোরী বয়সে পদার্পণের কথার বাইরে নেই পরবর্তী জীবনের কোনো উল্লেখ। নদী, গাছ, জঙ্গল, পশু-পাখি — প্রকৃতির অনাবিল আনন্দ দিয়ে ঘেরা জলপাইগুড়ি থেকে শিকড় উৎপাটিত হয়ে যায় যখন, এসে পড়তে হয় যখন কংক্রিটের জঙ্গলে, তখন স্মৃতিরোমন্থনে অতীতকে আঁকড়ে ধরে শান্তির নীড় অন্বেষণ ব্যতীত উপায়ন্তর থাকে না স্পর্শকাতর মানবমনের।

'জলের ভুবন'কে আপাতভাবে ব্যক্তি এণাক্ষী রায়ের শৈশবজীবনের টুকরো কথা মনে হলেও, এর মধ্যে মুক্তোর মতো গোপনে সযত্নে রাখা হাজার মনের অনুভূতি। মেদুর শহরের শিকড় উপড়ে নগরমুখী হতে বাধ্য হওয়া হাজার সত্তার বোবাকান্না। সময়স্রোতে হারিয়ে গেছে বা হারানোর পথে শৈশবের কত শত খেলা, আবেগ, মুহূর্তের বেহিসাবি আনন্দ। এণাক্ষী রায়ের জন্ম সত্তরের দশকে। একুশ শতকে পৌঁছে যখন ফিরে তাকালেন শৈশবে, তখন শৈশবের বহু যাপন হয়ে গেছে ইতিহাস। সঙ্গে একটা শহর বদলেছে তার রূপ। শহর জলপাইগুড়িকে শুধু আত্মস্থই করেছেন, তাই নয়। জলপাইগুড়ির সুপ্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানে তথ্যপূর্ণ ছবি তুলে ধরেছেন ব্যক্তিক অনুভূতির বুননে। এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে'র সেই বহুকৌণিক ক্ষেত্র লিখনটিকে করে তুলেছে যুগ ও যুগান্তরের সাম্পান।

একুশ শতকের শৈশবে যা কিছু ফসিল : মধ্যবিত্তের জীবনের মান বিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে একুশ শতকের মতো জৌলুষপূর্ণ ছিল না। সাদামাটা সরলবৃত্তে আবর্তিত হত তখন মধ্যবিত্তজীবন, সঙ্গে তার শৈশবজীবন। অথচ অনাড়ম্বর শৈশবে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা। সম্পর্কের সমীকরণেও ছিল তখন সেই নির্ভেজাল অন্তরের টান। তাই তুতো ভাই-বোনেরাও সহোদর সম্পর্কের থেকে কিছু কম অনুভূতির ছিল না। এণাক্ষী রায়ের জীবনে তেমন পারিবারিক-পাড়াতুতো সবাইকে নিয়ে ছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, চড়ুইভাতির অবাধ বিচরণ। শব্দে কান পাতা, শব্দ নিয়ে খেলা, শব্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যন্ত্রসভ্যতার যুগে হারিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১-এ জন্ম নেওয়া এণাক্ষী শৈশবে শব্দতরঙ্গে নিজস্ব অনুভূতিগুলোকে লীন করে দিতেন। সেকথা শিশুবেলার ঝুলি থেকে —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ফুল ফোটার শব্দ আমি পেতাম, প্রজাপতিরা ঘাপটি মেরে বসে থাকত লঙ্কাজবা গাছের তলায়, শুকনো পাতায়। আমি সামনে গেলেই একসঙ্গে উড়ে যেত। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি সেই শব্দ। ফুলে ফুলে ফড়িং ঘুরত। ওদের পাখার ফরফর শব্দ শুনতাম। চাঁদের আলোয় একটা শীতল শব্দ থাকে। মনখারাপের রাতে কান্না হয়ে গলে—পড়ার শব্দের মতো। আমি জানি, চিনি শব্দগুলোকে। শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের শব্দের মতো হু-হু বিষন্নতার শব্দ আমি খুঁজে থাকি।"[২]

জীবনানন্দীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুধাবন ছোট থেকেই সহজাত ছিল স্পর্শকাতর মনের অধিকারিণী এণাক্ষীর। পরিবেশ-প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের খেলায় আজ আর মশগুল নয় শিশুরা। তবে, এণাক্ষী রায়ের শিশুকালে ছিল ফুল ফোটার বিস্ময়। বিকেল চারটেয় লিলিফুল ফোটা প্রত্যক্ষ করা ছিল সহজমনের আবিষ্কারবিশেষ। এছাড়াও বিকেল থেকে প্রকৃতির বুকে খেলে বেড়ানোর সময়সীমা চিহ্নিত হত শঙ্খধ্বনির সূত্রে। শঙ্খের শব্দে শিশুমনে সন্ধ্যা নামার অনুভূতি এখন অনেকাংশে অতীত।

প্রকৃতির বুকে শৈশববেলায় নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কল্পনা করা যে আসলে দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক বেড়াজালকে অস্বীকার করা, তা হিসাব করার মতো জটিলতা ছিলনা তখন। প্রাপ্তবয়স্ক এণাক্ষী রায় সেকথা জীবনের বহুপদে অনুধাবন করেছেন। বাস্তবটা বুঝেছেন যে, প্রকৃতির ছন্দে মেতে ওঠা ফুল-পাখির জীবনে সমাজের অঙ্গুলিহেলন নেই।

> "ফুল-পাখি-ফড়িয়ের দলে মিশেছি বলে, আমি তো আর ওদের মতো স্বাধীন নই। আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সমাজ।"[৩]

শিশু বয়সে জ্ঞানীয় অনুষদগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়না বলে, কার্য-কারণ সূত্র অমেলবন্ধনেও কিছু ভয়ার্ত বিষয় তাকে ঘিরে রাখে। এক্ষেত্রে অভিভাবকেরা অনেকসময় শাসনের সুবিধার্থে বা শিশুকে পরিস্থিতিবিশেষে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে নানান ভীতিউদ্রেককারী কল্পকাহিনী বা কখনও সচেতনতাধর্মী চিত্রকল্প শোনান যুগপরম্পরায়। যেমন— নিশির ডাক, ছেলেধরার ভয়, হায়নার ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি। একুশ শতকে কংক্রিটের যুগে এই জাতীয় ভয়ের প্রবণতা কমে আসছে শিশুমহলে। এখন বোধের প্রথম স্তর থেকেই শিশুদের ঘিরে আছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। তাই ভয়ের চরিত্রগুলোও বদলে যাচ্ছে। এণাক্ষী রায় তাঁর স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে' তাঁর শৈশবকালীন সেই ভয়ের অনুভূতিগুলোর কথা লিখেছেন। সেখানে আছে 'কানা হুলো ধরার ভয়', 'নিশির ডাক', 'ছেলেধরার ভয়', 'হায়নার ভয়', 'ভূতের ভয়', 'বাঘের ভয়'। অনেক শিশুর মতই এণাক্ষী রায়ের 'বাবা' সম্বোধনের পরিবর্তে ছিল সমার্থক নিভাষা। সেটি 'বাবান'। তাই তাঁর বাবানের কাছে ভয়ের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা আর গল্পের অন্তিম পরিণতিতে একই নীতিকথা শোনা ছিল তাঁর আকর্ষণের বিশেষ ক্ষেত্র।

> "বাবান ঘুমানোর সময় গল্প বলতেন রোজ। ভূতের, বাঘের। সব গল্পের নায়ক বাবান নিজে। ভূত কেমন করে বাবানের কাছে মাছ চেয়েছিল। কেমন করেই-বা বাবানের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হল। বাঘবাবাজি কেমন বাবানকে না-খেয়ে ছেড়ে দিল ভালোমানুষ বলে। সব গল্পের শেষে থাকত ভালোমানুষদের কোথাও কোনও ভয় নেই।"[৪]

সত্তর-আশির দশকে ছিল মেলা, যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচের উন্মাদনা। নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় ক্ষণিকের আনন্দ-অভিমান। মেলা মানেই রকমারি পসার আর নাগরদোলার আকর্ষণ। এণাক্ষী রায়ও সেইসব অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও জলপাইগুড়িতে নির্জন দুপুরে তাঁর মায়ের সঙ্গে রিকশায় ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে ছিল রিকশার 'ক্যাঁচকোঁচ' শব্দের মাদকতা। গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন মোটরচালিত রিক্সার দাপটে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে রিকশার 'ক্যাঁচকোঁচ' আর 'নির্জন দুপুরে'র মতো আরও অনেক ছোটখাটো ভালোলাগার আস্বাদ। শহুরে প্রতিযোগিতা এখন মুছে দিচ্ছে ছোট ছোট অনুভূতির বিশুদ্ধ আনন্দ। যদিও ঐতিহ্যের সঙ্গে অগ্রগতিকে তাল মেলাতে বিসর্জন দিতে হয় অতীতের কিছু উপাদান। এটাই বাস্তব। তাই আক্ষেপ আর স্মৃতিচারণার মধ্যেই জীবন্ত থাকে নির্ভেজাল আনন্দানুভূতি। শৈশব জীবনে আনন্দের উপকরণ কম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। ছিলনা টেলিভিশন, টেলিফোন। খবর আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামের সঙ্গে ছিল দুঃসংবাদ পাওয়ার অজানা আশঙ্কা। সঙ্গে ছিল পোস্টকার্ড। আর ছিল হালকা নীল রঙের ইনল্যান্ড লেটার কার্ড। নব্বই দশকের শেষ বা বিশ শতকের শুরুতেও ছিল পত্র-বিনিময়। কিন্তু একুশ শতকে প্রয়োজন বা বাণিজ্য ব্যতীত মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য চিঠি নয়, আছে হরেক বৈদ্যুতিন মাধ্যম। তাই জীবন থেকে ডাকপিওন হারিয়ে যাচ্ছে। ফিকে হয়ে যাচ্ছে খাকি পোশাক পরিহিত ডাকহরকরার ডাক।

রেলগাড়ির ইঞ্জিন ছিল কয়লার। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় মামাবাড়ি আসার পথে শিশু এণাক্ষীর চোখে ছিল এই কয়লার ইঞ্জিনের বিস্ময়। তাঁর সেই রেলযাত্রার অভিজ্ঞতাসূত্রে উঠে এসেছে একটা সময়ের রেলযাত্রার টুকরো ইতিহাস।

> "কু-ঝিক্-ঝিক্ কু...উ...উ...। কয়লার ইঞ্জিনটা খুব হাঁফাত। হলদিবাড়ি থেকে এইটুকু রাস্তা। জলপাইগুড়ি আসতেই ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দে শ্বাস ফেলত যেন। বাবা সঙ্গে থাকলে দেখাত, কেমন করে জল খায় ট্রেন।... প্রত্যেকের সঙ্গে থাকত সুটকেস আর হোল্ডল। হোল্ডলের মধ্যে বিছানা-বালিশ সব। সেকেন্ড ক্লাস কোচে তখন থাকত একটা কাঠের লেডিস ক্যুপ। দরজা ভেতর থেকে বন্ধের ব্যবস্থা সমেত।"[৫]

জীবনের বিস্ময়গুলোতে অভিভূত হয়ে থমকে দাঁড়ানো দেখে গতানুগতিক মানুষজন সেই থমকে দাঁড়ানো মানুষকে 'বোকা' বলে চিহ্নিত করে। এমন অভিজ্ঞতা এণাক্ষী রায়ের নিজস্ব জীবনে ঘটেছে। জীবনের বিস্ময় অনুধাবন করার মতো স্পর্শকাতর সবাই হয়না। স্পর্শকাতর এই মন-মনন গড়ে ওঠে শৈশবের বিকাশের স্তরে। কখনও অনুঘটকের মতো ক্রিয়া করে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, কখনওবা পূর্বপ্রজন্মের অনুপ্রেরণা। এণাক্ষীর জীবনে সত্য ছিল এই দুই মাধ্যমই। প্রথমত জলপাইগুড়ির মতো আন্তরিক শহর, দ্বিতীয়ত তাঁর বড়পিসির প্রভাব; যিনি বাড়িতে গাছ কাটলে অন্তরের বেদনায় কাতর হয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিতেন। তাইতো, ঠাকুরের প্রসাদ বাতাসার মধ্যে থাকা কালো পিঁপড়ে অনিচ্ছাকৃত খেয়ে ফেলায়, শিশু এণাক্ষীর মনে জেগে ওঠে পিঁপড়ে হননের আক্ষেপ আর মনখারাপের কাঞ্চনজঙ্ঘা।

কুয়োর ব্যবহার কমে এসেছে এখন। তখন কুয়োর সঙ্গে ছিল শিশু এণাক্ষীর মনে রূপকথার কল্পনা। যেমন, মনে মনে ভাবতেন, করলা নদীর সঙ্গে বুঝি যোগ আছে তাঁদের বাড়ির কুয়োর। সঙ্গে মানুষের ছিল কুয়ো-ঝালাইয়ের পেশা। শীতের শেষে 'কুয়ো-ঝালাই-ই-ই-ই' ডাকে পাড়ায় ডাক পড়ত বাড়ি-বাড়ি। এণাক্ষী রায়ের ছিল প্রকৃতির আনাচে-কানাচে প্রেম। সযত্নে তাঁর পোষা মাছ ছিল কুয়োয়। কমলা রঙের মাছটি জলের পোকা খেত। প্রত্যেকবার কুয়ো ঝালাইয়ের সময় তাই সচেতন করে দিতেন, মাছের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। এভাবেই আগলে রাখতেন শৈশবের নির্ভেজাল ভালোবাসাগুলো। ছিল তখন দইওয়ালা, টিকাওয়ালার নিত্য আসা-যাওয়া। কালো কালো বাতাসার মতো কয়লার টিকা ফুলের মতো সাজিয়ে আনতেন টিকাওয়ালা। হুঁকো বা ধুনোর জন্য নেওয়া হত এই টিকা। আবার মাথায় ঝুড়ি নিয়ে বিক্রি হত হুকোর তামাক। পাড়ায় পাড়ায় হাঁক-ডাক 'দই চাই-ই-ই দো-ও-ও-ই-ই-ই।' এণাক্ষী রায়ের একান্নবর্তী পরিবারে একত্রে ছিল দই কেনার চল। নিছক কৌতূহলে সবাই ভিড় জমাত। তখন মানুষের হাতে সময় ছিল। ইঁদুর-দৌড়ে দৌড়তনা তখন সবাই। তাই একজনের দই কেনা ঘিরে থাকত অনেক কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। নেওয়া হত মাত্র চার আনা বা আট আনার দই। তবু গ্রাহকের ছিল অনেক শর্ত। যেমন, জল না কাটা হাঁড়ি থেকে চাপধরা দই চাই। আবার তারপর দইতে জল কেটে যাওয়া হাঁড়ি থেকে জল ফাউ চাই। দইওয়ালাও শর্তগুলি মেনে নিতেন বিনা বাক্যব্যয়ে। এমনই ছিল তখন ক্রেতা-বিক্রেতা সুসম্পর্ক।

বর্ষা-বৃষ্টি আর মেঘলা দিন মানেই ছিল পাড়াময় খিচুড়ির সুবাস। ছোটদের কাগজের নৌকা ভাসানোর পালা। এণাক্ষী রায়েরও ভালো লাগত নৌকা ভাসাতে। খাতার পাতা, খবরের কাগজের নৌকা ভাসালেও খোঁজ করতেন ক্যালেন্ডারের। কারণ ক্যালেন্ডারের মোমপালিশ পাতা জলে সহজে ভেজেনা, টেকসই হয় কাগজের নৌকা। কিন্তু এই ক্যালেন্ডার দিয়ে নৌকা বানানোয় ছিল ছোটদের প্রতি বড়দের ট্যাবু। কারণ, তৎকালীন অধিকাংশ ক্যালেন্ডারে ছিল দেব-দেবীর ছবি। তাই সেগুলি পুরনো হলেও ছেঁড়া বারণ। পরবর্তীতে কোনোটা আবার বাড়িতে চুমকি দিয়ে বাঁধানো হত। তাই নৌকা বানানোর উদ্দেশ্যে গাছপালা-ফুল-পাখি আঁকা ক্যালেন্ডারের খোঁজে থাকতেন শিশু এণাক্ষী। তাঁর কাগজের নৌকা ভাসানোর অভিজ্ঞতা লিখনের মধ্যে আছে তৎকালীন শত শিশুর আবেগ আর উন্মাদনা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কাঁচা ড্রেনগুলোর মধ্যে দিয়ে তখন জল যায় সাঁইসাঁই করে। এত পরিষ্কার তখন, যে, তলার বালি পর্যন্ত দেখা যায়। নৌকাগুলো ছোট। কালভার্টের তলায় ঢুকে গেলে উদগ্রীব হয়ে থাকি আমরা। কারটা আবার আটকিয়ে যায়। কালভার্টের তলা থেকে সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে এলে সমস্বরে চিৎকার ওঠে 'বারাইছে, বারাইছে-এ-এ।'"[৬]

তখন মেয়েদের চুল ভালো হওয়ার আশ্বাস দিয়ে স্কুলে পড়াকালীন তুলনায় বেশ বড় বয়স অবধি ন্যাড়া করার প্রবণতা ছিল। এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখনেও আছে তাঁর এবং বাড়ির বোনেদের একসঙ্গে 'ন্যাড়ামুণ্ডি' হওয়ার অভিজ্ঞতা। বন্ধু-বান্ধবদের পুতুলের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। এই পুতুলের বিয়েকে কেন্দ্র করে অভিভাবকেরা রান্নার আয়োজন করতেন। এণাক্ষী রায় সেকথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও ভাই-বোনেদের মধ্যে ছিল বাঁশ কেটে ফুলদানি তৈরির প্রতিযোগিতা, কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী শিশুদের মধ্যে ছিল প্রত্যেকের বাড়ির সামনে পাহাড় তৈরির প্রতিযোগিতা। তখন ছিল বায়োস্কোপ ওয়ালাকে ঘিরে পাড়ায় কচিকাঁচা থেকে শুরু করে বড়দের জমায়েত। সময়ের স্রোতে বায়োস্কোপের বিষয় বদলাতে দেখেছেন। আর এখন তো বায়োস্কোপওয়ালা নিশ্চিহ্ন। ছোট ছোট বাক্স মাথায় নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে আগমন জানান দিত বায়োস্কোপওয়ালা। এণাক্ষী রায় সেই বায়োস্কোপ দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন –

> "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখ বাবুয়া, তাজমহল দেখ বাবুয়া।... মাত্র পঁচিশ পয়সা দিলে, ফুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখাত। কিছু ছবি সরে যেত পর পর। আস্তে আস্তে এইসব বায়োস্কোপের ছবিও পালটে যাচ্ছিল। তাজমহলের বদলে হেমামালিনী, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন। মাঠের মধ্যে পর্দা টাঙিয়ে সরকারি প্রচারমূলক ছবি দেখাত। আমরা বলতাম পাব্লিসিটি এসেছে। যে কোনও চলমান ছবিতেই ছিল বিপুল উত্তেজনা।"[৭]

জলপাইগুড়ির শৈশবে এণাক্ষী উল্লেখ করেছেন নানান ব্রতপালন ও পুজো-পার্বনকে কেন্দ্র করে উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের সমবেত আনন্দের কথা। যেমন আছে, কাসুন্দিপুজো, বড়িপুজোর মতো আকর্ষনীয় ব্রত। বাড়িতে ছিল কাঠের বড় হামানদিস্তা, যাকে বলা হত 'ছামগান'। সেই ছামগানে অক্ষয় তৃতীয়ার সকালে কাসুন্দি প্রস্তুত করা হত। প্রথা ছিল প্রথমে সরষে, গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা ও আরো বারো রকমের মশলা, এর সঙ্গে একটি কাঁচা আম পোঁটলা বাঁধার। তারপর সেই পোঁটলাটি বাড়ির বড় বউ মাথায় নিয়ে কুয়োপাড়ে বসতেন। অন্যান্য এয়োগণ বালতি করে তাঁর মাথায় জল ঢালতেন। সেই মশলাধোয়া জলে স্নান করে ছামগানে মশলা কোটা হত। শুধুমাত্র বাড়ির সদস্যরাই নন, পাড়া - প্রতিবেশী, পরিচিত - পরিজন এয়ো সবাই এসে যোগ দিতেন এই কাসুন্দিপুজোয়। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি সহযোগে সবার একত্রিত যোগদান শিশুদের কাছে ছিল অপার আনন্দের ক্ষেত্র। এছাড়াও যে শিশুরা পুতুলের বিয়ে দিতে অভ্যস্ত, তারা যখন দেখে বড়ির বিয়ে। সেই বিষয়টিও তাদের কাছে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ। এণাক্ষী রায় তাঁর বাড়ির সেই বড়িপুজোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কলাইয়ের ডাল অর্থাৎ বিউলির ডাল ভিজিয়ে তা বাটা হত। দুটি বড় প্রতীকী বড়ি তৈরি করা হত। সেই দুটি বড়ির একটি বর, একটি কনে। ধান-দুব্বোর মুকুট-সিঁদুর পরিয়ে তাদের বিয়ে দেওয়া হত। শিশুদের চোখে তখন কনে বড়ি লাজুক মানব কনের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। এরপর রৌদ্রে শুকনো করতে দেওয়া হত বড়ি। মাঝে থাকত এই বর-কনে বড়ি। এই দুই বড়িকে ঘিরে থাকত বাকি ছোট বড়ি। ছোট বড়িগুলি দেওয়ার অনুমতি পেত বাড়ির ছোটরা। শুকনো না হওয়া অবধি ছোটদের খেলা ছিল বড়িগুলি সযত্নে পাহারা দেওয়া। ছোটদের আকর্ষণ ছিল বর-কনে বড়ি। এণাক্ষী রায় লিখেছেন, দেখতে দেখতে চোখের সামনে বর-কনে বড়ি পুরানো হয়ে যেত। তারপর শিশুমহলের উত্তেজনা ছিল রান্নার মধ্যে বর-কনে বড়ির অন্বেষণ। বড়ির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে সারাবছর বড়ি খাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যেতনা। 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষে' এই বড়ির বিয়েকে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, 'বিয়ে' বিষয়টির সঙ্গে 'উর্বরা শক্তি'র সম্পর্কের প্রতীক ছোট বড়িগুলি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে –

> "বাংলার লোকায়ত জীবনে বড়ির বিয়ে এক আকর্ষণীয় ঘটনা। ...প্রথম দুটি বড়ি যেন মা-বাবা। লক্ষণীয় এরাই প্রথম বড়ি। পরবর্তীকালের বড়িগুলি যেন এদেরই সন্তান-সন্ততি। 'বিবাহ' নামক সমাজ স্বীকৃত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তাদের উর্বরাশক্তির স্বীকৃতি মিলেছে। এ প্রসঙ্গে সাদৃশ্যমূলক যাদু-বিশ্বাসের দিকটিও উপেক্ষিত নয়। যেন, বর-বউর সম্মিলিত উর্বরশক্তির ফলেই পরবর্তীকালের শত শত বড়ি-সন্তানের আবির্ভাব।"[৮]

এণাক্ষী রায় তাঁর বাড়িতে বড়ির বিয়ের সময়কাল উল্লেখ না করলেও, এই বড়ির বিয়ের সময়কাল নিয়ে 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' উল্লেখ করেছে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষ। বড়ির বিয়ে লোকসমাজের সুপ্রাচীন প্রথা। বর্তমানে আচার-অনুষ্ঠানে বদল এসেছে। মানুষের মধ্যে বড়ি বাড়িতে তৈরি করে খাওয়ার প্রবণতা কমে এসেছে সময়ের অভাবে। এখন শহুরে জীবনে এসেছে প্যাকেটজাত বড়ি। তবুও সংখ্যায় অপ্রতুল হলেও এখনও গ্রামাঞ্চলের কোনো কোনো বাড়িতে প্রচলিত রয়েছে বড়ির বিয়ে।

কেবলমাত্র এণাক্ষী রায় তাঁর ব্যক্তিগত শৈশব অভিজ্ঞতা বর্ণনে নিজের জীবনের সীমায়িত ক্ষেত্রই তুলে ধরলেননা। এই শৈশবের ছবি বহু মানব-মানবীর শৈশবের প্রতিফলন। সময়ের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের শৈশব জীবনই বিগত হয়। কিন্তু এই শৈশবকথাগুলি তো প্রজন্ম থেকেই অনেকাংশে বিগত হয়ে একুশ শতকের শিশুদের চোখে ফসিল-সমান। তাই স্মৃতিলিখনে সেই ইতিহাস জীবন্ত করে রাখার প্রয়াসে 'জলের ভুবন' অনন্যতার দাবিদার।

ইতিহাস ও জলপাইগুড়ির জলছবি : ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলা; যার উত্তরে ভুটান এবং দক্ষিণে কোচবিহার ও বাংলাদেশের পঞ্চগড়। এই জলপাইগুড়ি জেলায় এণাক্ষী রায়ের জন্ম থেকে স্কুল জীবন। এই জেলার নামকরণ বিষয়ে এণাক্ষী রায় নানাবিধ মত উপস্থাপন করেছেন তাঁর স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে'। যেমন, অত্যন্ত প্রচলিত কথা— জলপাই গাছ থেকে আগত 'জলপাইগুড়ি' নাম। কিন্তু এখানে বনাঞ্চলে কোথাও জলপাইগাছের অবশেষ নেই বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। আরও একটি নামকরণ বিষয়ক মতবাদ হল — সম্পূর্ণ অঞ্চলের নাম আগে জল্পেশ্বর ছিল, জল্পেশ্বরের অপভ্রংশ হল 'জলপাইগুড়ি'। এণাক্ষীর মতে, যুক্তিযুক্ত মতবাদ হল, রাজা জল্পেশ্বরের রাজধানী ছিল এই জলপাইগুড়ি জেলা অঞ্চল। জল্পেশ্বরের মন্দিরটি এই রাজার নির্মিত। মন্দিরের নাম থেকে জনপদের নাম অথবা বিপরীতে জনপদ থেকে মন্দিরের নাম 'জলপাইগুড়ি' হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করেন তিনি। আরও একটি সূত্রের কথা লিখেছেন এণাক্ষী। ভুটানী শব্দ 'যে-লে-রি-গো-পে'-এর অর্থ যেখানে গরম কাপড় পাওয়া যায়। একসময় জলপাইগুড়ি ছিল কেনাকাটার কেন্দ্রস্থল। তাই এই ভূটানী শব্দ থেকেও 'জলপাইগুড়ি' নামের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গত।

জলপাইগুড়ি শহরের সঙ্গে বন্যা সম্পর্কিত। ১৯৬৮ সালের লক্ষ্মীপুজোর সময়ে ভয়াবহ বন্যা ঐতিহাসিক। সেই বন্যার দুঃস্বপ্ন বয়ে বেড়াত তার পরবর্তী বহু বছর শহরের মানুষজন। ১৯৭১-এ জন্ম এণাক্ষী রায়ের। ছোট থেকে তাই বন্যার আতঙ্ক শুনতে শুনতেই বড় হয়েছেন তিনি। তিনি লিখেছেন, জলপাইগুড়ি শহরে একটা সময় শহরবাসীর জন্মের সালের সূত্রে অবধারিতভাবে চলে আসত বন্যা। যেমন, জিজ্ঞাসা করা হত, বন্যার আগে জন্ম নাকি বন্যার পরে জন্ম। শৈশবের এণাক্ষী কল্পনায় চাক্ষুষ করতেন জলপাইগুড়ির বন্যা। নেহাতই তাঁর সরল মন কোনো ক্ষতির প্রত্যাশা না করে পুনরায় বন্যা প্রার্থনা করত, শুধু সেই ছবিগুলো মিলিয়ে দেখার ছেলেমানুষিতে।

> "বন্যার বছর! ওহ্ কী করে বাঁচলেন! কী খাইসিলেন ওই কয়দিন? ...এইসব কথাবার্তা তখনও অবধি চলে আসছিল। সেই বন্যা আমার দেখা হয়নি। সেইসময় হওয়া চাল লুটপাটের গল্প শুনেছি। মানুষ ভেসে যাওয়ার গল্প শুনেছি। ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যুর কথা শুনেছি। কেউ জানত না, আমি তখনও মনে মনে আর একটি বন্যা চাই, কল্পনার ছবিগুলো মিলিয়ে নেওয়া জন্য।"[৯]

আটষট্টির বন্যার পর তিস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে চলেছিল জলপাইগুড়ি শহরের সমতল থেকেও। তাই পরে বেশি বৃষ্টি হলেও মানুষের মনে বিগত সেই বছরের ত্রাস জাঁকিয়ে বসত। 'উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে নদীর প্রভাব' প্রবন্ধে অচিন্ত্য বিশ্বাসও উল্লেখ করেছেন সেই বন্যার ভয়াবহতার ছবি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পদ্মার মতো তিস্তাও 'সর্বনাশা' রূপে পরিচিত। বিশেষত ১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর স্মৃতিতে নিয়ে মানুষ একথা মনে রাখবে। তার সর্বনাশী ও আসুরিক শক্তি জনমনে ভয়ের সঞ্চার করেছে কালে কালে। এখনও বৃষ্টির দাপটে, নদীর নাব্যতা কমে জলধারায় পরিপূর্ণ তিস্তাকে দেখলে মানুষ ভয়ংকর স্মৃতির পটে আঁকা ছবি, কিংবা ভয়ংকর বন্যার চিত্রের কথা মনে করে আর শিউরে ওঠে।"[১০]

বন্যার আতঙ্ক নিয়েও তিস্তাকে ভালোবাসে জলশহরের মানুষ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার বিপন্নতার কথায় চিন্তিত হয়ে ওঠে সবাই। তিস্তার গতিপথে পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্র উঁচু হয়ে গেছে নদীখাত। তাই বিপদসীমার উপর তিস্তার জল। তিস্তায় বন্যারোধে বাঁধ নির্মাণ নদীর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে। তাইতো নদী থেকে শহর নিচু হয়ে পড়েছে। তিস্তার শাখানদী করলায় জল উপচে পড়ে। সেই নিয়েই আঁকা হয়ে আছে এণাক্ষী রায়ের মননে জলশহরের জলছবি, যা তিনি স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে' শব্দে-শব্দে এঁকেছেন।

এণাক্ষীর লেখায় আছে করলার পাশাপাশি ধরলানদীর কথা। আছে ধরলানদীর গতিপথ পর্যবেক্ষণের কথা। স্কুলফিরতি কিশোরী দেখত, ওপারে ফার্মেসি কলেজ, হাসপাতালের মর্গ ; যার পাশ থেকে ধরলা নদী ফার্মেসি কলেজকে পাশ কাটিয়ে কেমন ছন্দে চলেছে। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে আছে ধরলানদীর ইতিহাস।

ধরলা নদীর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে 'লোককথার' উল্লেখ করেছেন ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত' গ্রন্থে। বোড়ো-ধিমালদের বিশ্বাস দেবী তিস্তার স্বামীর নাম ধরলা; আদিবাসীদের দু-একটি গানে ধরলাকে দেবী তিস্তার স্বামীরূপে উল্লেখ করা আছে।

"কালিয়াগঞ্জের কালা সুতা
তাক দিয়া গাঁথি নো মালা
ওই লা চলনের বাজে-ধরলো
গে পাড়ে গালি,
হইগে তিস্তা বুড়ি হাউসালী।"

কারো কারো মতে ধরলা নদীরই অন্য নাম 'তোরসা'। এই 'সা' এর প্রয়োগেও বোড়ো কাছারি ভাষার লক্ষণ।[১১]

এছাড়াও এণাক্ষীর স্মৃতিলিখনে আছে জলপাইগুড়ির 'রুকরুকা' নদীর কথা। ছোট নদী রুকরুকার কথা অনেকেরই কাছে অজ্ঞাত বলে আক্ষেপ করেছেন লেখিকা। রুকরুকাকে কখনও 'শীর্ণ স্রোতস্বিনী', কখনও 'রোগা নদী' বলে উল্লেখ করে নিজের সঙ্গে সমীকৃত করেছেন। ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা নদীটিকে ভালোবাসেন এণাক্ষী। 'শহরের ভুলে-যাওয়া মেয়ে', 'ছোট্ট সরু সেতু', 'সামান্য জল' নিয়ে বয়ে যাওয়া রুকরুকার অস্তিত্ব বারংবার তাঁর নিজেরই প্রতিচ্ছবি বহন করে বলে অনুভব করেছেন। লিখেছেন অন্তরের সেই সংযোগের কথা।

এণাক্ষী রায়ের ঠাকুরদা যতীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন তৎকালীন সরকারি ফেরি ইনস্পেক্টর, উদাসীন মানুষ। এমনই উদাসীনভাবে একদিন লাঠিয়াল পাচককে সঙ্গে নিয়ে দূর-দূরান্তে হেঁটে হেঁটে হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েক ঘর ব্যতিক্রমী প্রজাতি 'টোটো'। উত্তরবঙ্গে পরিচিত 'রাজবংশী', 'কোচ', 'রাভা' প্রজাতি। কিন্তু টোটো তখন ব্রাত্য। প্রবল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে 'টোটো'রা। এই 'টোটো'দের প্রত্যক্ষ করে তিনি সেইসব তথ্য নিজের দপ্তরে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জমা করেন এবং ঈষৎ বাঁকা বড় বড় অক্ষরে বিস্তারিত লিখে রাখেন টোটো জাতির জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ। সেই তথ্য তুলে দেন প্রিয় বন্ধু চারচন্দ্র সান্যালকে। ইতিহাসের পাতায় টোটো জাতির সরকারি স্বীকৃতিলাভ প্রসঙ্গে প্রিয় বন্ধুর নামোল্লেখ থাকলেও ইতিহাসে উল্লিখিত হয়নি তাঁর ঠাকুরদা যতীন্দ্রনাথ রায়ের নাম। তিনি জীবনের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি ছিলেন বলে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোনোদিন উদ্যোগী হননি। কিন্তু এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখনের তথ্যে নতুন করে গড়ে উঠল টোটোজাতিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে ও তাঁদের দুর্দশা নিরসনে যতীন্দ্রনাথ রায়ের কৃতিত্বের ইতিহাস। ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসে চারুচন্দ্র সান্যালের জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির ক্ষেত্র। যেমন, 'Rajbansis of North Bengal', 'The Limbus' এবং সর্বোপরি টোটোজাতির কথা আছে যে গ্রন্থে, সেটি 'The Meches and the Totals of North Bengal'.

জলপাইগুড়ির ভাষার মিষ্টত্ব প্রসঙ্গে রাজবংশী ভাষার সংমিশ্রণের তথ্য উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। লিখেছেন—

> "আমাদের জলপাইগুলির তাবৎ মানুষের ভাষায় রাজবংশী ভাষার সুন্দর একটি মিশেল আছে। করতেছি, আসতেছি, যাবা খাবা, ভারি মিষ্টি সে ভাষা।"[১২]

কাজের সন্ধানে নগরমুখী বাহে, রাজবংশীদের কথা লিখেছেন স্মৃতিকথায়। শহরে আসার পর তাঁদের পুরুষেরা রিকসা চালানো বা কামলার কাজে যোগদান করত। স্ত্রীলোকদের ছিল শহরে এসে বাসনমাজা, রান্নার কাজে নিযুক্ত হওয়া। গ্রামের চাষির ছেলে বাধ্য হয়ে শহরে রিকসা চালায়। শহরে অনেক সময় ভূলুণ্ঠিত হয় তাঁদের সম্মান; জাগে অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু রোজগারের আশায় হাল ছাড়েননা তাঁরা। কামলা করতে আসা মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত। তাই অনেকসময় পয়সার চেয়েও কাজের শেষে পেট ভরে ভাতের প্রত্যাশা থাকত তাঁদের।

> "আমাদের জলের জীবন, তিস্তার রুপোলি মিহি বালি, বাঁধের ওপরে লুকানো চোরকাঁটা, দোলনাপুল, দূরের আলোকোজ্জ্বল তিস্তা ব্রিজ, টাউন ক্লাবের মাঠ, আমাদের ভালোবাসা, ইতিহাসের গন্ধ লেগে থাকা দেবী চৌধুরানি মন্দির, আর জল্পেশের মেলা। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে করলা নদী।"[১৩]

জল্পেশের মেলা জলপাইগুড়ির গর্ব। এণাক্ষী রায় জল্পেশের মেলাকে অভিহিত করেছেন তাঁর সম্পূর্ণ জীবনে দেখা সবচেয়ে বড় গ্রাম্য মেলা রূপে। শিবের অপর নাম জল্পেশ্বর। জল্পেশ্বরের জল্পেশ মন্দিরটি জলাপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে কিছু দূরে জরদা নদীর তীরে অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো এক শিবরাত্রির দিন থেকে এই মেলার সূচনা। পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রাচীন মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম জল্পেশ মেলা। জলপাইগুড়ির রাইকতপাড়ার রাজবাড়ির সুবিখ্যাত মনসাপূজার মেলার কথাও উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। আঞ্চলিক এই বৃহৎ মেলা বসত রাজবাড়ি সংলগ্ন বিখ্যাত দিঘির পাশে। এই প্রসঙ্গে আছে রাজবাড়ির সিংহদুয়ারের বিশেষত্ব। এই সিংহদুয়ার এক অসাধারণ স্থাপত্য, যা এশিয়ার মধ্যেও অন্যতম। বিশেষত্ব হল, এটি কোনোপ্রকার কংক্রিট বা লোহালক্কর ব্যতীত কেবলমাত্র চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি স্থাপত্যশৈলী।

স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে, জলপাইগুড়ির মুক্তাভবন থেকে প্রতিদিন সকাল ন'টার সাইরেনের কথা। সারা শহর জুড়ে শোনা যায় সেই সাইরেন। নস্টালজিয়ার সঙ্গে আছে নবাব হোসেন মুশারফের বাড়ি অর্থাৎ নবাবাবাড়ি বা প্রাসাদের কথা; যা পরবর্তীতে হয়েছে জলপাইগুড়ি কোর্ট এবং হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। নবাব হোসেন মুশারফ পেশায় ছিলেন একজন আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ। ফয়জন্নেসা বেগমকে বিবাহ করার সূত্রে নবাব হোসেন মুশারফ উনিশ শতকের শেষ থেকে জলপাইগুড়িতে বসবাস শুরু করেন। ইতালি আর জার্মানি থেকে শিল্পী এনে তৈরি করেন তাঁর প্রাসাদোপম বসতবাড়ি। তিনি যেহেতু পেশায় আইনজ্ঞ ছিলেন, তাই আইনজ্ঞ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা বার কাউন্সিলে। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের তৎকালীন রাজা প্রসন্নদেব রাইকতের পাকিস্তান থেকে ঋণ করা টাকা মকুব করতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে আবেদন করে মঞ্জুর করান। জলপাইগুড়িকে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নবাব হোসেন মুশারফের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যতটা চর্চার প্রয়োজন, তেমনটা হয়নি বলে উল্লেখ করে আক্ষেপ করেছেন এণাক্ষী রায় তাঁর স্মৃতিলিখনে। নবাব হোসেন মুশারফের নামে জলপাইগুড়ি শহরের বুকে কোনো সৌধ বা স্থাপত্য বা রাস্তার নাম হওয়া একান্ত কাম্য বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নামেও হয় মেলা। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা উনিশ শতকের শেষে তৎকালীন এম. এ., বি. এল. পাশ করে সুশিক্ষিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করার জন্য রায়সাহেব উপাধি অর্জন করেছিলেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রাজবংশী সম্প্রদায়কে তথাকথিত উচ্চজাতের সমকক্ষ করার চেষ্টা ও তফশিলি তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নেন তিনি। রাজবংশী ভাষা নিয়ে গর্ব করতে শেখান পঞ্চানন বর্মা। রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চাতেও বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে উত্তরবঙ্গে তাঁর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় — 'কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।'

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে আরও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রভূমি তৈরি হয়েছিল। যেমন, 'কংগ্রেসপাড়ার মাঠ' নামে খ্যাত মাঠটি থেকে প্রথম 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সময় ১৯৩৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগ দিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে। তৎকালীন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে নেমেছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে। সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন। সেই স্মৃতিবিজরিত মাঠের সূত্রে পাশের গলির পাড়ার নাম হয় এরপর থেকে 'কংগ্রেসপাড়া'। আবার গান্ধিজি যখন জলপাইগুড়ি আসেন, তিনি ফণীন্দ্রদেব স্কুলের মাঠে ভাষণ দিয়েছিলেন। উল্লিখিত হয়েছে, অন্যান্য স্কুল-কলেজের নাম। যেমন, সোনাউল্লা হাই স্কুল, জেলা স্কুল, সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুল, গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, কদমতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দেশবন্ধু স্কুল, হোলি চাইল্ড, আনন্দচন্দ্র কলেজ, প্রসন্নদেব রাইকতের নামে একটিমাত্র মেয়েদের কলেজ অর্থাৎ পি.ডি. মহিলা কলেজ।

একুশ শতকে জলপাইগুড়ির বা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার সংযোগে বহু রেলের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সত্তর-আশির দশকে তৎকালীন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ছাড়া বড় ভরসা ছিল দার্জিলিং মেইল। এই দার্জিলিং মেইলের পথ-পরিবর্তের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসও আছে এণাক্ষী রায়ের এই স্মৃতিলিখনে। তিনি যে তথ্য তুলে ধরেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০ সালের পূর্বে এই ট্রেন কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি মাত্র কয়েকটা বড় স্টেশনে থেমে নয় ঘণ্টায় পৌঁছাত। তখন দার্জিলিং মেলের গতিপথ ছিল অর্বিভক্ত নদিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কুষ্টিয়ার কাছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দিয়ে তখন পদ্মা পেরোতে হত। ইঞ্জিন বদলানোর জন্য ট্রেন পার্বতীপুর স্টেশনে থামত অনেকক্ষণ। কিন্তু ১৯৫০ সালে ঘটেছিল ট্রেনে এক নারকীয় হত্যালীলা। সেকথার বীভৎসতা লিখেছেন এণাক্ষী —

> "৫০ সালে দার্জিলিং মেইল সান্তাহার স্টেশন ছাড়ার পর, ট্রেন থামিয়ে ভয়াবহ এক নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালানো হয় তৎকালীন পাকিস্তানের ভূখণ্ডে। শিয়ালদা থেকে জলপাইগুড়িগামী দার্জিলিং মেইলে সেদিন রক্তগঙ্গায় ভাসছিল গাদা গাদা লাশ। তারপরই ফারাক্কায় থেমে ফেরি পার হয়ে কলকাতায় আসার ব্যবস্থা চালু হল, যতদিন না ফারাক্কা ব্রিজ তৈরি শেষ হল।"[১৪]

এরপর ফারাক্কা ব্রিজ হওয়ার পর দার্জিলিং মেইলের যাত্রাপথ একটানা উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও যাত্রা অব্যাহত।

তৎকালীন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘিরে শহরে ছিল প্রবল উত্তেজনা। নিজের বাড়ির কেউ পরীক্ষা না দিলেও পাড়া-প্রতিবেশী বা দূর সম্পর্কের পরিচিতজনদের জন্যও ছিল আগ্রহ। তখন ছিলনা এমন বৈদ্যুতিন মাধ্যম। ফলাফল জানার একমাত্র মাধ্যম গেজেট। জলপাইগুড়ি শহরের জমজমাট কদমতলার মোড়ে তখন গেজেট নিয়ে ছেলেরা বসত। রোল নম্বর বলে রেজাল্ট জানতে হত। অর্থমূল্য নির্ধারিত হত প্রাপ্ত ডিভিশনের উপর ভিত্তি করে। যেমন, ফার্স্ট ডিভিশন ফল করলে দশ টাকা, সেকেণ্ড ডিভিশনে পাঁচ টাকা, থার্ড ডিভিশনে দুই টাকা, অকৃতকার্য হলে তার জন্য বিনা পয়সা।

শহরটাই ছিল আন্তরিকতার মোড়কে ঘেরা। সেখানে, পাড়ার দুর্গাপূজাকে মানুষ তাঁদের নিজের বাড়ির পুজো মনে করে হাতে হাত মিলিয়ে পুজোর কাজ সামলাতেন। মানুষে-মানুষে আন্তরিক টান এতটাই ছিল যে, স্টেশনে ট্রেনে তুলতে আসত একজন যাত্রীর জন্য একাধিক পরিচিত ও পরিজন। অবলা প্রাণীকে আঘাত করার মতো বিকৃত মানসিকতা তৈরি হয়নি তখন। এণাক্ষী যেমন অসুস্থ বা পথ হারানো শিশু সারমেয়-মার্জার নজরে পড়লে তৎক্ষণাৎ বাড়িতে এনে আশ্রয় দিতেন। তেমনই আছে বিড়াল দধিমুখীর কথা।

কোনো জেলা বা শহরে বিখ্যাত কোনো কোনো দোকান ঐতিহ্য বহন করে। এণাক্ষীর স্মৃতিলিখনে তেমনি উঠে এসেছে জলপাইগুড়ি বেলাকোবার 'পোড়াবাড়ির চমচম', বাহ্যিক ভাঙাচোরা অথচ সুবিখ্যাত ঢাকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের 'কালাকাঁদ', সোসাইটির 'চপ-কাটলেট', রূপশ্রী হলের বিপরীতের 'গন্ধেশ্বরীর মিষ্টি', 'কবিরাজ যজ্ঞেশ্বরের দোকানের' বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম ও স্মৃতি। সারা শহরে প্রসিদ্ধ ছিল তখন 'দাদুর ভাজা' নামক চানাচুরওয়ালার বিশেষ সাজ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো চেহারা দেখে দেশ-কাল আর শৈশবের সহজ বুদ্ধি মিশে যেত অনায়াসে। এণাক্ষী রায়ের ভাষায় —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ঝুমঝুম শব্দ করে হেঁটে হেঁটে আসতেন দাদু। হাতে ধরা সাইকেলের সঙ্গে আটকানো টিনের বড় কৌটো। তার ওপর বাংলায় লেখা 'দাদুর ভাজা'। ...দাদুর পরনে থাকত সার্টিনের গেরুয়া পাজামা আর শার্ট। ওই কাপড়েরই নেতাজীটুপি। কায়দা করে একটু ত্যারছা করে পরা। কোমরে বন্ধনী। ফর্সা ধবধবে দাদুকে দেখতে ছিল অবিকল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ...আমরা জানতাম নেতাজির অন্তর্ধানের খবর। আমরা এও জানতাম নেতাজিই ছদ্মবেশ ধারণ করে দাদুর ভাজা বিক্রি করছে। চারদিকে যখন নেতাজি ফিরে আসবে ফিরে আসবে রব, আমরা নিশ্চিত নেতাজিকে আমরা চিনি, আর এত বুদ্ধিমান বড়রা কিছু বুঝতে পারেন না।"[১৫]

ছোটবেলায় এমন কত কল্পনাকে সত্যি ভেবে অপার আনন্দ জাগত মানুষের মনে। প্রাপ্তবয়সে এসে সেগুলি এখন আমোদের রসদ। তেমনই কদমতলার মোড়ে রোজ বিকালে জমায়েত হওয়া কাবুলিওয়ালাদের দেখে 'মিনির গল্প' মনে পড়ত এণাক্ষীর। কিন্তু 'কী, খোকি?' বলে কেউ ডাকত না। হাসত শুধু তারা ছোট মেয়ের অবাক চাহনি দেখে।

জলপাইগুড়ি শহরের চরিত্রই ছিল আত্মীয়ের মতো। তাই ১৯৬৮ ও তার আগে ১৯৫০ এর বন্যার ভয়াবহতা জেনেও জলশহরের প্রতি শহরবাসীর ছিল অমোঘ টান। তাই তিস্তা-ধরলা-রুকরুকা নিয়ে জলপাইগুড়ি এণাক্ষী রায়ের জীবনেও আশ্রয়দাত্রীস্বরূপা।

শিকড়ের সন্ধানে মন অবিচল :

> "রক্তের ভেতরে সেঁধিয়ে যাওয়া এ প্রকৃতি এই শহরের কুয়াশা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, শিশির, মাটি সব মিশে যায়। একাকার এক সত্তা। এর থেকে উপড়ে নিলে আমার আর কোনও জীবনই নেই। কোনওদিন এ মাটি থেকে তাকে উপড়ে নিলে রুকরুকার মতো শুকিয়ে যাব আমি।"[১৬]

এই শিকড় উপড়ে প্রাণহীন হওয়ার আশঙ্কা সত্যি হল একদিন এণাক্ষী রায়ের জীবনে। সেই সময়ে স্বেচ্ছায় কলকাতায় যেতে চেয়েছিলেন তিনি, সেই সময় বাবা-মা সঙ্গে নেননি। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর যেই সময়ে শিকড়ের টানে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন জলপাইগুড়ি শহরটাকে, সেই সময় তাকে ছিন্ন হতে বাধ্য করা হল। পরিবার-পরিজন ছাড়াও যাদের জন্য তৈরি হল মনখারাপের দীর্ঘ তালিকা, তা থেকে তাঁর প্রবল সংবেদনশীল মননের ঠিকানার আভাস মেলে। যেমন - ঠাকুমা, বড়মা ছাড়াও তাঁর মনখারাপ প্রতিদিন খেলা-ফেরত হাত-পা ধোওয়া জলের কলটার জন্য, দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠটার জন্যে, টবের মধ্যে চোখের সামনে বেড়ে ওঠা জামরুল গাছটার জন্য, কুয়োর জলের জন্য, কাঠালগাছের পাতায় পাতায় বিচ্ছেদের বিষন্নতা অনুভব করেন। বিষন্নতা অনুভব করেন সাদা গোলাপ গাছের চেহারায়। বহু মাইল দূরে পড়ে থাকবে করলা-ধরলা-রুকরুকা। বসন্ত এসে কড়া নেড়েছিল মনের দরজায়। এক জোড়া চোখ অপেক্ষায় থাকবে কথা দিয়েছিল তিস্তার বাঁধে। প্রথম বা শেষ কোনোবারের সাক্ষাৎই হওয়ার সুযোগ হল না। শহর-ভালোলাগা-ভালোবাসা-প্রেম সব অতীতের স্মৃতি হয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করবে মনের গভীরে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন বড় হয়ে আবারও ফিরে আসবেন জলপাইগুড়িতে, শিকড়ের টানে। যে নদীগুলি পড়ে থাকবে, পড়ে থাকবে সবুজ গালিচা, রেললাইনে ঝরে পড়া পুটুশ ফুলগুলি, মাথার উপর মশার ঝাঁকের পরিচিত শব্দ আর চারিপাশে চেনা মুখের ভিড়—সব ছেড়ে চলে যাওয়াকে এণাক্ষী রায়ের মনে হয়েছে মায়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে সন্তানকে কেড়ে নেওয়ার মত বেদনাতুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওপার বাংলা থেকে যখন দেশভাগের সময় এপার বাংলায় দশ বছরের অতীত শৈশব ফেলে এসেছিলেন সুনন্দা সিকদার, তাঁরও ছিল ওপারের দিঘপাইতের প্রতি গভীর আবেগাশ্রু। কলম ধরেছিলেন ছিন্নমূল শিকড়ের সন্ধানে —

> "যাঁরা মনের গতিবিধি নিয়ে কাজ করেন, তাঁরাই বলতে পারবেন, আমি কেন শৈশবের দশটা বছর এমন যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছি এত কাল।"[১৭]

সুনন্দা সিকদারও ওপারে ফেলে আসা নদীগুলিকে স্বপ্নে চাক্ষুষ করেন। ঠিক যেমন এণাক্ষীও অনুভব করেন। 'দয়াময়ীর কথা' স্মৃতিলিখনে সুনন্দা সিকদার —

> "স্বপ্নে দেখি ছিড়াজাঙ্গাইল পুল শুয়ে আছে ঝিনই নদীর উপর। বড় খেয়ালি ঝিনই নদী; কখনও শান্ত, কখনও অতি দুরন্ত।[১৮]

অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'র লেখক দেবেশ রায়, সাহিত্যের আনাচে-কানাচে যাঁর উত্তরবঙ্গ, তিনিও প্রথম জীবনে ছিলেন জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ির পাহাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা প্রসঙ্গে এণাক্ষী রায় উল্লেখ করেছেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের কথা। দেবেশ রায়েরও জীবনের প্রথম পাঠগ্রহণ ছিল পাহাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি যখন জলপাইগুড়ির শিকড় ছিঁড়ে কলকাতায় পাড়ি দিলেন, তখন বিচ্ছিন্নতা তাঁকে বিষন্ন না করার কারণ উল্লেখ করেছেন —

> "...জলপাইগুড়িতে তো আমাদের বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন; বন্ধুবান্ধব সবাই থেকে গেলেন। আমার পক্ষে সাবেকি বাঙালির সেই কলকাতা আর 'দেশের বাড়ি'র ঘটনাটাই সত্য হয়ে উঠল।"[১৯]

কিন্তু এণাক্ষী রায়ের জীবনে ছিল প্রত্যহ যাপনের সঙ্গে জড়িত জলপাইগুড়ির গভীরকথা। অমোঘ আকর্ষণ ছিল তাঁর জন্মশহরের প্রতি। তাই দেশের বাড়ি হিসাবে শুধু আনুষ্ঠানিক সাক্ষাত প্রাণোচ্ছ্বল দিনযাপনের বিকল্প হয়ে উঠবে না কখনই।

> "ট্রেনের গতি তীব্র হতে দেখলাম দূরে সরে যাচ্ছে আমার শহরের প্রান্ত। আমার সমস্ত শৈশব, কৈশোর, দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট, কিতকিত খেলার ঘুঁটি, এক্কাদোক্কার ঘরকেনা, তিস্তা বাঁধের কদম, কিংসাহেবের ঘাট। ...মনখারাপের কথাগুলো বোঝে না পৃথিবী। হয়তো পৃথিবীরই এত বিষাদ যে সে আর শুনতে চায় না এসব কথা। মনখারাপের কথা চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে এগোই। কলকাতার বিষাক্ত ধুলোবালির দিকে, ধোঁয়াময় বাতাসের দিকে, অস্পষ্ট আকাশের দিকে, আমার এই একাকী যাত্রা...।"[২০]

শৈশব, শহর, সময়-কাল-ইতিহাস আর ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে এণাক্ষী রায় জন্ম দিলেন স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে'র। যে জলের ভুবনের শিশু ও কিশোরী এণাক্ষী চাইতেন করলার স্রোতে ছুটে চলা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া কচুরিপানাকে জিতিয়ে দিতে। ঝিঁঝির একটানা ডাক যাঁর কাছে একঘেয়ে নয়, বরং মোহাবিষ্টের মতো অনুভূত হত, পাখির বৈচিত্র্যপূর্ণ ডাকে যাঁর চমক লাগত, প্রজাপতি-পিঁপড়ে-ফড়িং নিরীক্ষণ ছিল যাঁর খেলা, সেই মানুষটিকে কংক্রিটের জঙ্গলে এনে রোপণ করার চেষ্টা মানসিক অপমৃত্যুর সমতুল্য। তাই মনের মধ্যে গড়ে তোলেন জলের ভুবনের বলয়। সেই বলয়ে সুরক্ষিত রাখেন স্মৃতির কাঞ্চনজঙ্ঘা। সযত্নে লালন করেন স্মৃতি, ধুলো জমতে দেননা, নগরকেন্দ্রিক জীবনচর্যা গ্রাস করতে পারেনা জলশহরের ছবি। লেখিকার ব্যক্তিজীবনে রূপকথার স্বপ্ন দিয়ে সুরক্ষিত ফেলে আসা শৈশব আর শহর। কলমের আঁচড়ে যেন শুধু লিখে যাওয়া নয়, বড় ক্যানভাসে মুহূর্তে এঁকে ফেললেন আস্ত এক অন্য পৃথিবী। শৈলীবিচারে শব্দের বুননে আছে কাব্যিকতার স্পর্শ। শব্দগুলো যেন অনাবিল আনন্দে রূপকথার রঙিন মাছেদের মতো বিচরণ করছে এই স্মৃতিলিখনের ভুবনে। এণাক্ষী রায়ের ভাসানো সেই কাগজের নৌকা তরতরিয়ে বয়ে চলেছে স্মৃতির পসরা সাজিয়ে এই 'জলের ভুবনে'।

Reference:

১. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭৬
২. তদেব, পৃ. ১৪
৩. তদেব, পৃ. ২৭
৪. তদেব, পৃ. ৩৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. তদেব, পৃ. ৩৯
৬. তদেব, পৃ. ১০৯
৭. তদেব, পৃ. ৮৯
৮. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (সম্পা.), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স (প্রকাশন বিভাগ), কলকাতা, মার্চ ২০১২, পৃ. ৩২৭
৯. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১০৮-১০৯
১০. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৩৯
১১. তদেব, পৃ. ১৪২
১২. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২
১৩. তদেব, পৃ. ৩৫
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৯
১৫. তদেব, পৃ. ৫৭ - ৫৮
১৬. তদেব, পৃ. ১২৭
১৭. সিকদার, সুনন্দা, দয়াময়ীর কথা, একাদশ প্রকাশ, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৪২
১৮. তদেব, পৃ. ৪৪
১৯. রায়, দেবেশ, গল্পসমগ্র ৪ (ভূমিকা), প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ৯
২০. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২

Bibliography:

আকরগ্রন্থ :

রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ :

চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (সম্পা.), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স (প্রকাশন বিভাগ), কলকাতা, মার্চ ২০১২

বিশ্বাস, অচিন্ত্য, লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

রায়, দেবেশ, গল্পসমগ্র ৪, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৪

সিকদার, সুনন্দা, দয়াময়ীর কথা, একাদশ প্রকাশ, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 365 - 373
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

দীপক চন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' উপন্যাসে মহাভারতের প্রতিহিংসা ও রাজনীতির পুনর্নির্মাণ : একটি পর্যালোচনা

দীপা মাজি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : dipamaji7@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Humiliation, Neglect, Violence, Anger, Vengeance, Rivalry, Diplomacy, Family Politics, Revenge

Abstract
Krishna Dvaipayana (Vyasadeva) is the author of the Mahabharata and an important character in the Mahabharata. He is not a king, nor is he a Kshatriya. He is the son of Parashara Muni and Satyavati. He was a learned scholar. Deepak Chandra's novel 'Kurukshetra Dvaipayana' shows him as a politician and a person who is obsessed with revenge. Revenge paved the way for politics in the Mahabharata. This revenge was born in the mind of Vyasadeva, the creator of the Mahabharata. How the desire for revenge led to the great war of Kurukshetra. That has been newly embodied in Deepak Chandra's novel Kurukshetra Dvaipayana. The neglect of the lower castes by the upper castes pained Vyasadeva's mind. He could not accept the disrespect and neglect done by his father to his mother. Similarly, he could never forget the humiliation and humiliation done by Ambika, the wife of Vichitravirya. He took revenge on Ambika's son Dhritarashtra. Vyasadeva's revenge ended with the death of Duryodhana. In the Mahabharata, Vyasadeva represented the non-Aryans and the lower castes. The war in the Mahabharata was actually the result of his revenge on the Aryans. For this, he followed the path of diplomacy. That is why he is seen favoring the Pandavas in the Mahabharata. Along with this, the rivalry between Bhishma and Dwaipayana is highlighted. Neither of them is a king. However, both of them were present in politics. One outside, the other inside. Their fight was going on behind everyone's eyes. They were jealous of each other. They made many different plans to maintain their honor and existence in the family. Their rivalry, anger, jealousy, and cunning political activities are described in this novel. The novelist has presented a different side of the politics of the Mahabharata to the reader through his own perspective.

Discussion

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনায় পরিবর্তন ঘটে, তার প্রভাব পড়ে সমাজে, সংস্কৃতিতে এবং সাহিত্যে। পরিবর্তনশীল সমাজে সময়ের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রচলিত পুরাণ কাহিনিগুলির বিনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ ঘটে চলেছে। পুরাণ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বা মহাকাব্যকে কখনও চরিত্রগত দিক থেকে, আবার কখনও বা ঘটনার দিক থেকে মূল কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বারবার পুনর্গঠন করা হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যিকেরা মূল কাহিনিকে অপরিবর্তিত রেখে সমকালের ভাবনা, নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা মহাকাব্যকে নতুনরূপে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা মহাকাব্যের পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ভাবনার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবনা মেলবন্ধন এবং আধুনিক রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ভারতীয় সাহিত্যের দুই যুগান্তকারী মহাকাব্য – 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। মহাভারত প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান ভাণ্ডার, তার সঙ্গে এই মহাকাব্য লোকশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। এই মহাকাব্যে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। তেমনই প্রকাশ পেয়েছে মানবমনের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। মহাভারত ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে যতটা প্রাসঙ্গিক, ততটাই রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসাবে। প্রাচীন ভারতের রাজনীতির আকর গ্রন্থ বললেও ভুল হবে না। সেই সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বার্থে বিবাহ দেওয়ার প্রচলন ছিল, এই মহাকাব্যে তার অনেকগুলি উদাহারণ পাওয়া যায়। মহাভারতের রাজনীতি প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি তাঁর 'মহাভারত নীতি অনীতি ও দুর্নীতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "মহাভারতের মধ্যে বহু জায়গাতেই রাজনীতির উপদেশ আছে, যেটাকে আমরা শাস্ত্রীয় রাজনীতি বা অর্থশাস্ত্র বলতে রাজি আছি, কিন্তু মহাভারতে জীবনটা যেভাবে চলছে, সেখানে শতসহস্র সামাজিক তথা পারিবারিক টানাপোড়ন চলে, কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকারে আছেন বলেই সেইসব পরিবার এবং তাঁদের সামাজিক পরিবেশটাও রাজনৈতিক হয়ে ওঠে, অথচ রাজনীতির চরিত্র মহাভারতের শাস্ত্রীয় রাজনীতির থেকে এক্কেবারেই আলাদা।"[১]

নীতি-দুর্নীতি, দ্বেষ-বিদ্বেষ, ক্ষোভ, বিদ্রোহ, হিংসা-প্রতিহিংসা এই সকল বৈশিষ্ট্যই সেই রাজনীতিতে বিদ্যমান। আমি এই প্রবন্ধে মহাভারতের প্রতিহিংসার কথায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। 'প্রতিহিংসা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অনিষ্টকারীর ক্ষতিসাধনের প্রবৃত্তি' বা 'প্রতিশোধ'। অনেকেই এই মহাকাব্যকে হিংসার রাজনীতি বলেছেন। মহাভারতে শুধু হিংসার কথা উল্লেখ থাকলে কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। হিংসার পরে রয়েছে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা। এই প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে এক থেকে একাধিক ব্যক্তির হৃদয়ে। গ্রাস করেছে সুপুরুষ, দেবতা, মুনি, ঋষির জীবনকেও। মহাভারত যে প্রতিহিংসার কথা নিহিত আছে তা আর্য-অনার্যের ও উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের। এই সম্পর্কে প্রতিভা বসু 'মহাভারতের মহারণ্যে' প্রবন্ধের 'প্রাক্ কথন' অংশে লিখেছেন –

> "...মহাভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটে বিধৃত এক অনস্বীকার্য কালো-সাদার দ্বন্দ্ব। সংঘাত বৈধ-অবৈধের, আর্য-অনার্যের। লক্ষণীয়, যে ভারতবর্ষে আজও জাতিভেদ প্রবল, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ গাত্রবর্ণে প্রতিফলিত, সেখানে ক্ষত্রিয়-কুলের এই কাহিনীতে কৃষ্ণবর্ণের আধিপত্য সর্বত্র, অবৈধ অনার্য এবং মিশ্ররক্তের জয়জয়কার, শুদ্ধ শোণিতের চূড়ান্ত পতন ও বিলুপ্তি।"[২]

'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' উপন্যাসের রচয়িতা দীপক চন্দ্র। ঔপন্যাসিকের জন্ম ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ (ইং ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৮)। তিনি পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাস রচনার প্রতি ঝোঁক না রেখে পৌরাণিক ঔপন্যাসিক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজ সচেতনতা, বাস্তবিক চিন্তা, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের মূল্যবোধ। তিনি তাঁর সব রচনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিল রেখে কাহিনির পুনর্নিমাণ করেছেন। তাঁর বই- এর সংখ্যা প্রায় ৭০। সম্পাদিত গ্রন্থ ৫টি। তারমধ্যে মহাভারত আশ্রয়ী উপন্যাসগুলি হল – ১. 'দ্রৌপদী চিরন্তনী', ২. 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন', ৩. 'এবং অশ্বত্থামা', ৪. 'মহাভারতে শকুনি', ৫. 'দ্বৈপায়নে দুর্যোধন', ৬. 'পিতামহ ভীষ্ম' ৭. 'তোমারী নাম কর্ণ', ৮. 'সাম্রাজ্ঞী কুন্তী', ৯. 'গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রে গান্ধারী, ১০. 'দ্রৌপদী চিরন্তনী' ইত্যাদি। আলোচ্য উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসে ব্যাস চরিত্রের ভিন্নতর রূপ আমরা দেখতে পাই। এখানে তিনি অলৌকিকতাকে বর্জন করেছেন এবং মানুষের বিচলিত হৃদয়ের একেবারে অন্তঃস্থলের গতিপ্রকৃতির সন্ধান করেছেন। মহাভারতের ব্যাস চরিত্র অবলম্বনে ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শাহজাদ ফিরদাউস রচিত উপন্যাসের নাম 'ব্যাস'। এখানে মনুষ্যত্বের অন্বেষণ করা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়েছে। এছাড়া নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীর 'মহাভারতে ছয় প্রবীণ', সুখময় ভট্টাচার্যের 'মহাভারতের চরিতাবলী' ইত্যাদি প্রবন্ধে ব্যাস চরিত্র সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেব, তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামেও সুপরিচিত। তিনি যেমন এই মহাকাব্যের স্রষ্টা, তেমন এই মহাকাব্যের গুরুত্বপুর্ণ এক চরিত্র। উপচিরবসু ও অদ্রিকার কন্যা সত্যবতী। কিন্তু সত্যবতী দাসরাজ নামে এক ধীবরের গৃহে পালিত হন। তাঁর রূপে মোহিত হন ঋষি পরাশর। পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের। যমুনার দ্বীপে জন্মগ্রহন করেছিলেন বলে ব্যাসদেবের আরেক নাম দ্বৈপায়ন। অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে তিনি মহাভারতে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করছেন। মহাভারতের আদিপর্বে তাঁর শিষ্য বৈশাম্পায়ণ ব্যাসের জন্মের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু মহাভারত রচনা করে গেছেন তা নয়, তিনি নিজে বেদের ভাগ করেছিলেন। প্রথমে বেদের চারটি ভাগ ছিল না। ভাগ ছিল একটাই। পরে বেদকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজানো হয়।

রাজশেখর বসু 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ' গ্রন্থে ভূমিকায় ব্যাসদেব প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "ইনি মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু সুপুরুষ মোটেই নন।"[৩]

ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্রও এই চরিত্রটিকে সুপুরুষ বলে চিহ্নিত না করলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপিত করে বলেছেন –

> "ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, ঐতিহাসিকও বটে। ইতিহাস রচনায় তিনি নিরপেক্ষ নন, পাণ্ডবের পক্ষে।"[৪]

ব্যাসদেব কুরুবংশের রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তিনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়ও নন। সত্যবতীর কুমারী বয়সের সন্তান। অথচ কুরুবংশের রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন - এঁদের সকলের রাজ্যাভিষেকে তাঁর পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ লক্ষ করি। কুরুবংশের বিভিন্ন সময় সংকটের কালে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ কেন নিয়েছিলেন তার কারণও অতিসংক্ষিপ্তভবে বলেছেন –

> "নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় ব্যথা তাঁর লুকানো ছিল। আলোচ্য উপন্যাসে আমি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের জীবনে সেই অনুদ্ঘাটিত দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ও বঞ্চনাকে আবিষ্কার করেছি।"[৫]

এই উপন্যাসে তিনি পুরাণের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কাহিনির পুনর্গঠন করেছেন। অপমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা রাজনীতির পথকে সুপ্রশস্ত এবং সুদৃঢ় করে তুলেছে। এখানে দ্বৈপায়নের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ভীষ্ম। দ্বৈপায়নের কুরুবংশের সমগ্রকুলের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ ছিল, সেই বংশের জন্মদাতা তিনিই। তা সত্ত্বেও তিনি রাজকর্ম থেকে ব্রাত্য। ভীষ্ম যেভাবে রাজকর্মে লিপ্ত থাকতেন সেটা তিনি পারতেন না বলে ক্ষোভ ও হিংসা দুই-ই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। তেমনই ভীষ্মও ব্যাসদেবের হস্তিনাপুরে অবাধ আনাগোনাকে অপছন্দ করতেন। ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের বিরোধ, বিদ্বেষও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত এগিয়েছিল। দীপক চন্দ্র এই উপন্যাসের দৃষ্টিকোণে উল্লেখ করেছেন –

> "...কেবল দ্বন্দ্বের পরিবেশটা ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। গোটা মহাভারত কাহিনি এই দুই ভাই-এর বিরোধ ও বিদ্বেষের ফল। শ্রীকৃষ্ণ রাজনৈতিক ঘটনার রাশ ধরেছিল আর ব্যাসদেব তার ভেতরটা জীর্ণ করার ইন্ধন জুগিয়েছিল।"[৬]

ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং বিরোধ এই যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে জ্ঞাতিদ্বন্দ্বের কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেই দ্বন্দ্বের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা। তাঁরা কেও-ই রাজা নন। দ্বৈপায়নের ব্যক্তিগত হিংসা, ক্ষোভ, অপমান অবহেলা মহাভারতে

রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই কথা স্পষ্টভাবে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে দীপকচন্দ্রের এই উপন্যাসে।

ব্যাসদেব ছিলেন ঋষি। তাই তাঁর একটা অনুতাপ ছিল, যে তিনি লৌকিক হৃদয়চর্চা করতে পারবেন না। তিনি সাংসারিক জীবন ও আত্মীয় পরিজনদের প্রতি কোনোরকম আন্তরিকতাও অনুভব করতেন না। তবুও তাঁর হৃদয়কে এক অস্থিরতা গ্রাস করেছিল –

> "ভিতরে ভিতরে এ কোন অস্থিরতা সে টের পাচ্ছিল? এ অনুভূতি কীসের? ব্যথা নয়। বেদনা নয়, জ্বালা নয় একটা কীসের ভার যেন হৃদপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল।"[৭]

তখন তাঁর মনে বাল্যস্মৃতির কথা জাগ্রত হয়। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত তিনি। শৈশবে তিনি জননীর সান্নিধ্য পেলেও তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে গেছে। তিনি সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে শুধু জননীকেই চেয়েছেন। তাঁর পিতার কথা স্মরণ করলে মনে জেগে উঠেছে বিষন্নতা। পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ ছিল না। ব্যাসদেব জানতেন মনু মহারাজের কথা। মনু মহারাজ বলেছিলেন যে, যে ব্রাহ্মণ একবার শূদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবে তার প্রায়শ্চিত্ত করেও কোন লাভ হবে না। ব্যাসদেবের জন্মকালে সেই প্রায়শ্চিত্তের ভয়ানক অপরাধ ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর পিতা পরাশর মহামনি বলে স্বয়ং আপন তেজে দীপ্যমান ছিলেন। পিতার সেই বিপুল প্রতাপকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করতেন। যখন তাঁর ১২ বছর বয়স, তখন তাঁকে মানুষ করার জন্য পরাশর মুনি সত্যবতীর কাছ থেকে জোরপূর্বক বদরিকা আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত বারো বছর বয়সে। তখন থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুপ্ত বেদনা মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের আগে এই প্রতিহিংসা দেখা দিয়েছিল দাসরাজের মধ্যে। তিনি ছিলেন অনার্য। আর্যরা অনার্যদের কাছে চিরকাল অবহেলিত। তাই পুরুবংশের রাজা শান্তনু যখন দাসরাজের কাছে সত্যবতীকে বিবাহের অনুমতি চায়, তখন দাসরাজের মনের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল –

> "যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞার নেশায় আর্যরা অনার্যদের চিরকাল অবহেলা করে, তাদের সুখ-দুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকায় না, সেই ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হবে না – কে বলবে?"[৮]

দাসরাজ তাঁর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ দিতে রাজি হয়েছিলেন একটি শর্তে যে শুধুমাত্র সত্যবতী সন্তানেরাই কুরুবংশের উত্তরাধিকারী হবে ও সাম্রাজ্য লাভ করবে। শান্তনু তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র দেবব্রত (ভীষ্ম)-এর সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। দেবব্রত দাসরাজের শর্ত মেনে নিয়ে তাঁর সম্মুখে যুবরাজের উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন। তখন অনার্য দাসরাজের মনে এক প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে –

> "দাসরাজের মুখে হাসি চোখে কপটতা। তাঁর শরীরের মধ্যে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট এক প্রতিশোধস্পৃহা বার বার শিহরিত হয়ে গেল।"[৯]

তাই তিনি কপটতার ছলে দেবব্রতকে আজীবন অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন। শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্য। তাঁর মৃত্যুর পর কুরুবংশকূল রক্ষার্থে সত্যবতী তাঁর কানীন পুত্র ব্যসদেবকে ডেকে পাঠান। তিনি সত্যবতীর অনুরোধে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে শারীরিক ভাবে মিলিত হতে রাজি হন। মিলনের সময় অম্বিকা তাঁকে চরম অপমান করেন। তখন ব্যাসের মনে এক অদম্য প্রতিহিংসার জন্ম নেয় -

> "আর্য-অনার্য ঘৃণার কূট সন্দেহ যখন সত্যি হয়ে উঠল, দ্বৈপায়নের অন্ত্রে সত্যিকারের বিজাতীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রবল প্রতিহিংসা পুঞ্জিভূত হল।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্রোধ, বিদ্বেষ তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তিনপুরুষ ধরে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের অপমান, অবহেলা করে এসেছে। এই শ্বেতাঙ্গদের কাছে অপমানের শিকার হয়েছেন তাঁর মাতামহী অদ্রিকা, মাতা সত্যবতী এবং তিনি নিজেই – এইসব কথায় তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল –

> "তিন পুরুষ ধরে একটি বংশধারা শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা, অবহেলা, অনাদর, লাঞ্ছনা, অপমানের শিকার হচ্ছে কেন? তবে কি, মানুষের অমঙ্গল কামনা অভিশাপের রূপ ধরে তাকে দিয়ে সেই শোধটায় তুলতে চায়?"[১১]

দ্বৈপায়নের ঔরসে অম্বিকা, অম্বালিকা ও দাসীপুত্রের গর্ভে তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় – ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুর। তবে দ্বৈপায়নের বিদুরের প্রতি সর্বাধিক স্নেহ ছিল। সেটা ভীষ্ম অনুমান করতে পেরেছিলেন। গঙ্গা ও শান্তনুপুত্র ভীষ্মের রাজনীতি জ্ঞান ছিল প্রখর। তাই তিনি সকলের কাছে সম্মানীয়। তিনি প্রজাপালক, রণনীতিতেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। রাজপুত্রদের মধ্যে কে সিংহাসনে বসবে এই বিষয়ে ভীষ্ম দ্বৈপায়নের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তিনি নৃপতি হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কারণ ধৃতরাষ্ট্র শান্ত, স্থির প্রকৃতির, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাঁর কূট রাজনীতি জ্ঞানও তীক্ষ্ণ। শুধু তিনি জন্মান্ধ ছিলেন এটাই তাঁর ব্যর্থতা বলে মনে করেছিলেন ভীষ্ম। তাঁর কাছে ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি হিসাবে যোগ্য। কিন্তু দ্বৈপায়নের তা মনে হয়নি। তাঁর মনে হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্র দাম্ভিক, অহংকারী ও ঈর্ষাপরায়ণ। তাঁর মধ্যে আর্যত্বের অহংকার ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের স্বভাব তাঁর মা অম্বিকার মতই হয়েছে। দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরের সিংহাসনের জন্য কার নাম উল্লেখ না করে নৃপতি নির্বাচনের কতগুলি সাধারণ নিয়মের কথা বলেন -

> "রাজনীতিতে নৃপতি নির্বাচনের পথ সবরকম এক হয় না। নৃপতির অভিষেকের সময় অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে। রাজনীতির রহস্যময় খেলায় রাজার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা একটা মস্ত সম্বল। সুতরাং, নৃপতি নির্বাচনের সময় মানুষের চিত্ত প্লাবিত করার আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বও পরিমাপ করে দেখতে হয়।"[১২]

তিনি ব্রহ্মচারী হলেও তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানও তীব্র - তার যথেষ্ট পরিমাণ পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। এখানে তিনি নিজেকে নির্বিরোধী, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন বলেই কূট রাজনীতির পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি ছদ্মবেশে ধারণ করেছিলেন সন্নাসীর সাজ এবং ঘৃণার মুখোশ। দ্বৈপায়নের সমর্থনেই যে পান্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছিলেন, সেটা ভীষ্ম বুঝতে পেরেছিলেন। মহাভারতে সেভাবে প্রকাশ না পেলেও এই উপন্যাসে একে অপরের প্রতি রেষারেষি খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ভীষ্মও যে চুপ করে বসেছিলেন তা নয়। তিনিও রাজসভায় নিজের স্থানটিকে বজায় রাখার জন্য পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যান। ধৃতরাষ্ট্রের রাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়নি দেখে ভীষ্ম তাঁর বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। সেইসময় গান্ধার যুবরাজ শকুনি হস্তিনাপুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আসেন। শকুনির কূট রাজনীতিতে তিনি মুগ্ধ হন। তিনি গান্ধার রাজ্যের সংকটের সুযোগ নেন। তিনি শকুনিকে রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রস্তাব জানান। শকুনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হন। ঔপন্যাসিক শকুনির এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন –

> "রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে ভীষ্ম তাকে এক অদ্ভুত রাজনীতির প্যাঁচে ফেলল। এখন গান্ধার রাজ্যের গৌরব, মর্যাদা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে প্রিয় ভগিনী গান্ধারীকে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠলগ্ন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ তার সামনে ছিল না।"[১৩]

ভীষ্ম গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের গোপনে বিয়ে দিয়ে দ্বৈপায়নের ভেতর অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে তুললেন। তিনি এখানেই গৃহবিবাদের রাজনীতির সূত্রপাত করলেন। এই বিবাহের মধ্য দিয়ে ভীষ্ম সমাজের সামনে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন - যা মানুষের কাছে স্মরণীয় এবং বিস্ময়ের।

১. সুদূর গান্ধার থেকে রাজকন্যা হস্তিনাপুরে স্বয়ং এসেছিলেন অন্ধ রাজপুত্রকে (যিনি রাজাও নন) বিয়ের উদ্দেশ্যে।
২. পতিব্রতা নারীর আদর্শের কথা।
৩. ধৃতরাষ্ট্রের সৌভাগ্য, যিনি পেয়েছিলেন একজন কূটনীতিবিদ শ্যালক। যে তাঁর পক্ষে সবসময় থাকবে।

ভীষ্মের পারিবারিক রাজনীতিতে সূক্ষ্ম পদক্ষেপ গুলোকে খুবই বিশদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই উপন্যাসে। ভীষ্মের ঘরে ও বাইরের রাজনীতিতে অবাধ কর্তৃত্বকে মেনে নিতে পারেননি দ্বৈপায়ন। তাঁর ভাবনায় ভীষ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনিই –

> "পাণ্ডুকে সামনে রেখে ভীষ্ম তার দিকেই তির তাক করেছে। ভীষ্ম নেপথ্যে থেকে তার কাজ করার জন্যে ধুরন্ধর শকুনিকে রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়েছে। মুখে না বললেও ভীষ্মের মূল লড়াইটা কার্যত তাঁর সঙ্গে। পাণ্ডু উপলক্ষ্য। লক্ষ্য সে।"[১৪]

এভাবে সবার আড়ালে ভীষ্মের সঙ্গে দ্বৈপায়নের গোপনে সংঘাত চলতে থাকে। সেই সংঘাতে বিপর্যস্ত হয় পাণ্ডুর জীবন। তাকে সিংহাসন ত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে হয়। ভীষ্ম শুধু একা রাজনৈতিক খেলা খেলেনি, দ্বৈপায়নও এই খেলায় অংশগ্রহন করেছিলেন। সেই খেলার তিনিই সংগঠক আর পরিচালক। তাঁর মনের মধ্যে সুপ্ত প্রতিহিংসা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই হস্তিনাপুরের ভেতর ও বাইরে এই কূট রাজনীতির খেলা শুরু করতে তিনি অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি বিদুরকে কুরুবংশের বিরূদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে সিংহাসনের প্রলোভন দেখিয়েছেন। তিনি বিদুরের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলেছেন এবং সতর্ক করে জানিয়েছেন –

> "তোমার ধমনিতে বিশুদ্ধ অনার্য রক্ত, তুমি কৃষ্ণবর্ণ – চির অনাদৃত। অনার্যদের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ বন্ধের রাজনৈতিক টোপ হলে তুমি। তোমার জনরঞ্জনী শক্তিকে ওরা প্রজারোষের বর্মরূপে ব্যবহার করবে।"[১৫]

ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকার গর্ভজ সন্তান। অম্বিকার অপমান দ্বৈপায়নকে সবথেকে বেশি কষ্ট দিয়েছিল। দ্বৈপায়ন ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করতে না পারলেও তাঁর মনে দুশ্চিন্তা, ভয়কে তীব্র করে তুলেছিলেন তিনি। কুন্তীর পুত্রলাভের সংবাদ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মনের ভেতর এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডুপুত্ররা ও পাণ্ডু স্ত্রী কুন্তী আশ্রয়ের জন্য হস্তিনাপুরে আসতে চায়। পাণ্ডুপুত্ররা সকলেই ছিল দেবতাদের সন্তান। হস্তিনাপুরে তাঁদের আগমন নিয়ে রাজ অভ্যন্তরে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। ধৃতরাষ্ট্র এবিষয়ে ভীষ্মের কাছে পরামর্শ চান। ভীষ্ম একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। ভারতীয় মহাকাব্যে তাঁর রাজনীতিবিদ আমরা খুব কমই দেখতে পাই। দীপক চন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' উপন্যাসে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভীষ্ম চরিত্রের কথা ও কার্যকলাপের মধ্যে এক দক্ষ রাজনীতিবিদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে –

> "রাজনীতিতে কৌশলটাই মুখ্য। জয়ের জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হয়।"[১৬]

পাণ্ডবেরা রাজপরিবারে এলে পাণ্ডব এবং ধার্তরাষ্টের সঙ্গে বিরোধের সূচনা হয়। পাণ্ডব এবং ধার্তরাষ্ট্রদের চরিত্রের মধ্যে স্বভাব ও প্রকৃতিগত অমিল ছিল। হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই মূলত তাঁদের লড়াই। মহাভারতে শকুনি বা কৃষ্ণ ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের মধ্যে লড়াই-এ ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কিন্তু নেপথ্যে কূট রাজনীতি পরিচালনা করে গেছেন ব্যাসদেব, সেকথা মহাভারতে অপ্রকাশিত। সেটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে।

দুর্যোধন ও শকুনির পরিকল্পনায় বারনাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেটি ব্যর্থ হয়ে যায়। পাণ্ডবরা যে জীবিত সেকথা ব্যাসদেব জানতেন। মহাভারতের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীর 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ' প্রবন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য –

> "ব্যাস বুঝিয়ে ছিলেন - তিনি কেবলমাত্র পিতামহের নিম্নগামী নিয়ে স্নেহধারায় সিক্ত হয়ে এখানে আসেননি, পান্ডবদের যেভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে, যেভাবে অন্যায় অধর্মের পথে কুট কৌশলে তাদের নিগৃহীত করা হয়েছে, তাতে তিনি খুশি হননি। খুব বাস্তব কারণেই তা আর স্নেহ-পক্ষপাত বর্ষিত হয়েছে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> পাণ্ডবদের ওপর এবং এতে আশ্চর্য কিছু নেই, কেননা আত্মীয় পরিজনেরা এভাবেই বঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষপাতি হয়ে পড়েন।"[১৭]

কিন্তু ঔপন্যাসিক উপন্যাসের এখানে ব্যাস-এর কূটনীতিতে স্পষ্ট করার জন্য পাঠকের মনের মধ্যে সংশয় এনে দিয়েছেন। তার জন্য ব্যবহার করেছেন কতগুলি জিজ্ঞাসা(?) চিহ্ন –

> "ভস্মস্তুপের ভেতর থেকে পাঁচটি পুরুষের ও একটি রমণীর দেহ পাওয়া গেছে। তবুও ব্যাসদেব কেমন করে জানল তারা জীবিত আছে? কি করে তাদের গোপন অবস্থান টের পেল? গহন অরণ্যে আদিবাসীর ছদ্মবেশে বাস করছে এ সংবাদ তো কারো জানার কথা নয়।"[১৮]

পাণ্ডবরা জতুগৃহে ছ'মাস কাটিয়েছিল, বনে বনে ঘুরেছিল আরো কয়েক মাস। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডপুত্রদের সিংহাসন এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্যকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দ্রোণাচার্য ও পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মধ্যে শত্রুতা ছিল - এই কথা যেমন ধৃতরাষ্ট্র জানতেন, তেমনি বাসদেবও জানতেন। তাই ব্যাসদেব নিজের রাজনৈতিক কৌশলকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। রাজনীতিতে যেমন শত্রুও তৈরি হয়, তেমন প্রয়োজনে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হয় - একথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। এরপর পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের জন্য দ্রুপদকে দিয়ে রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের শুরু করেন। এরজন্য তিনি দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণাকে কাজে লাগিয়েছেন। কৃষ্ণার ভুবনমোহিনী রূপ হয়ে উঠেছে ব্যাসদেবের রাজনৈতিক মূলধন। দ্রোপদীর স্বয়ংবর সভা একটি রাজনৈতিক মঞ্চের রূপ পেয়েছিল। তিন বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রনেতা জরাসন্ধ, কৃষ্ণ এবং দেবলোকের ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা, ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষিরা, ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের রাজারা পাঞ্চাল রাজ্যে এসেছিলেন। সেখানে ভারতবর্ষের দলগত রাজনীতির চেহারার ছবি পাওয়া যায়। এই স্বয়ংস্বর সভা দেখে ব্যাসদেব মনে মনে পর্যালোচনা করেছিলেন –

> "অম্বিকা ভীষ্মের আর্যবিদ্বেষের বহ্নিতে সারা ভারতবর্ষের আর্যসন্তানদের আহুতি দেওয়ার মহান সংকল্পের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি যেন এই স্বয়ম্বর সভায় রূপ পাচ্ছে।"[১৯]

বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের বাইরে নতুন রাজ্য স্থাপন করার জন্য দিয়েছিল যমুনা তীরে এক বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল (খান্ডববন)। যা পরবর্তীকালে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে পরিচিত। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের রাজপথে অধিষ্ঠিত করে ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ অম্বিকার পুত্রের ওপর অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ও রাজনীতিতে নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত মনোভাব দেখে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই দেশ ও কুলের মান-গৌরব রক্ষার্থে, গণতন্ত্রের আদর্শকে বিখ্যাত করে তোলার উদ্দেশ্যে অর্জুনকে ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে পাঠান। এখানে ব্যাসদেব ভালো রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেন। প্রয়োজনে রাজনীতিতে উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয়, তিনিও তাই করলেন। অর্জুনকে ছল করে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। অর্জুন আর্যাবর্তের বাইরে গিয়ে অনার্যদের মধ্যে পান্ডব রাজনীতিকে ব্যবহার করলেন। তাঁর গৌরব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনার্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রীতি ও স্থাপন করলেন। যাদবের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রীর সম্পর্ক মজবুত করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের বোন সুভদ্রার সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

জরাসন্ধের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের বিনয় ,শ্রদ্ধা এবং চতুরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ব্যাসদেব। যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অর্ঘ্য দিতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণকে। কিন্ত সকলের সামনে সেকথা বলা অনুচিত ভেবে ভীষ্মের পরামর্শ নিয়েছিলেন। ব্যাসদেব চেয়েছিলেন আসন্ন কুরু-পান্ডবদের যুদ্ধে ভীষ্মকে জড়িয়ে রাখতে। মহাভারতে ভীষ্মের বয়ানকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রায় সকলেই। যেমন ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, শকুনি, বিদুর, দ্রোণাচার্য, পাণ্ডুপুত্ররা এমনকি কৃষ্ণও। কারণ তিনি মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং সত্যব্রত। যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন পিতামহ ভীষ্মের কৃষ্ণের প্রতি এক অনুরাগ ছিল। সুতরাং কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাবে। এখানে প্রকাশিত যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক দুরাভিসন্ধি। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সত্যিকারে কৃষ্ণই বিভেদ বিদ্বেষের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে এক মুক্ত মহান ভারতবর্ষ গঠন করতে এগিয়ে এসেছে। মানুষে মানুষে ও রাজ্যে রাজ্যে প্রীতি, মৈত্রী, সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা এবং সহাবস্থানের উপর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্বন্ধ স্থাপনের যে উদ্যোগ কৃষ্ণ একা একা করে চলেছে তাকে মনেপ্রাণে স্বাগত জানানোর জন্যে উন্মুখ হয়েছিল ভীষ্মের প্রাণ মন।"[২০]

ভীষ্মও চেয়েছিলেন এই বিদ্বেষের এবার সমাপ্তি হোক। কূট রাজনীতির খেলায় জড়িয়ে তিনি ক্লান্তি অনুভব করছিলেন।

মহাভারতে প্রতিহিংসা কারণেই দুর্যোধন ও পাণ্ডবদের মধ্যে একাধিকবার দ্বন্দ্ব হয়। শকুনি যেমন তাঁর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভাই-ভাই এ বিরোধের সৃষ্টি করে। ঠিক তেমন ব্যাসদেব নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এত রাজনৈতিক পরিকল্পনা করেন। তাই দুর্যোধনের মৃত্যুতে তাঁর ভেতর কোনরকম অনুশোচনা দেখা যায়নি –

> "এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধের স্রষ্টা সে নিজে। অম্বালিকার ঘৃণা, প্রত্যাখ্যান, অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল দ্বৈপায়ন। দুর্যোধনের মৃত্যুতে সেই প্রতিজ্ঞাপূরণ হল। পাণ্ডবেরা শত্রুহীন হল। আর্যাবর্ত বীরশূণ্য হল। রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা শেষ হল।"[২১]

মহাভারতে উল্লেখ্য সিংহাসনকে কেন্দ্র করে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হয়, তাতে ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা প্রকাশিত। শকুনি ও কৃষ্ণ উভয়ই রাজনীতিতে কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' উপন্যাসে মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে দ্বৈপায়নের প্রতি অবহেলা, অসম্মান। যা তার মনে বিদ্বেষ ও হিংসার বীজ হিসাবে রোপিত হয়। তিনপুরুষ ধরে চলে আসা আর্যরা অনার্যদের প্রতি যে অশ্রদ্ধা, অপমান ও অবহেলা করে এসেছিল, তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকেও বেছে নিতে হয়েছিল কূট রাজনীতির পথকে। যা শেষপর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। এছাড়াও দ্বৈপায়ন ও ভীষ্মের মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম, জটিল রাজনীতির খেলা চলছিল। মহাভারতে সেই প্রতিহিংসা ও রাজনীতির প্রসঙ্গকেও ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র এই উপন্যাসে পাঠকের সামনে নতুনরূপে উন্মোচন করেছেন। এই উপন্যাসে মহাভারতের রাজনীতির এক ভিন্ন দিকের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

Reference:

১. ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০1৪, পৃ. ২২৭
২. বসু, প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৪৮, পৃ. ১৫
৩. বসু, রাজশেখর, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৯
৪. চন্দ্র, দীপক, কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২৩, পৃ. ৫
৫. তদেব, পৃ. ৫
৬. তদেব, পৃ. ৭
৭. তদেব, পৃ. ৯
৮. তদেব, পৃ. ৪০
৯. তদেব, পৃ. ৪৪
১০. তদেব, পৃ. ৬৪
১১. তদেব, পৃ. ৬৪
১২. তদেব, পৃ. ৮২
১৩. তদেব, পৃ. ৯০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. তদেব, পৃ. ৯৩
১৫. তদেব, পৃ. ১০৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৭
১৭. ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারতের ছয় প্রবীণ, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৩১
১৮. চন্দ্র, দীপক, ‘কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১৪৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৯
২০. তদেব, পৃ. ১৭৬
২১. তদেব, পৃ. ১৯২

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :
চন্দ্র, দীপক, ‘কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৩

সহায়ক গ্রন্থ :
দাস, কাশীরাম, কাশীদাসী মহাভারত (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৮
দাস, কাশীরাম, কাশীদাসী মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২
বসু, প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৪৮
বসু, রাজশেখর, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২৭
ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪
ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারতের ছয় প্রবীণ, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 374 - 380
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারীচেতনাবাদের আলোকে নারীর কলমে নারীদের অবস্থান : প্রেক্ষিত বিশশতকের শেষ দশকের 'দহন' উপন্যাস

ড. মথুর গুপ্ত
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, কবি নজরুল কলেজ
মুরারই, বীরভূম
Email ID : mathurg02@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
The position, women, narrative, feminist, consciousness, century.

Abstract

Currently, women are neglected, oppressed, deprived, and exploited in the social sphere. However, of course, feminism does not mean the suffering of women, the humiliation of women, the list of their oppression, and the way out of this situation is 'feminism'. However, not only women are aware of women's rights, several men have also spoken out in this movement. However, women definitely need more awareness. After enduring neglect for a long time, women are able to respond to some extent. However, it goes without saying that this protest movement may have been formed since the beginning of patriarchy, but it could never be organized or it was not known by any specific name. Because when a person's back is completely against the wall, he makes a last effort to push away the opposition coming from the front, and this is where 'feminism' may begin. Just as women are opposing oppression against him, similarly, the level of oppression against women has changed over the ages through the evolution of men. In the era of Ramayana, Sita had to undergo the ordeal of fire to dispel her husband's suspicions. Even today, women have to undergo the ordeal of fire, both at home and outside.

In the context of feminist narrative theory discussion, it is worth mentioning that narrative theory is not limited to the discussion of written narratives only. Narrative theory is mainly built on the basis of organizational discussion. The study of narrative theory is mainly interdisciplinary and multidisciplinary. Various literary and non-literary subjects, as well as discussions about the narratology of various narratives and discussions about what has not become a narrative have become part of narrative theory. Cinema, theater, drama, poetry, stories, advertisements, history, narrative is generally not seen in these, but it is worth mentioning that narrative is very present in all subjects. However, it is quite difficult to analyze feminist narrative exactly in this frame. However, it is not impossible. This type of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

definition has seen the predominance of the past tense. Therefore, in the context of feminist narrative, in the analysis of this definition, it can be said that gender inequality has been created since ancient times and its origin was mainly in the post-Aryan era. Because in the pre-Aryan era, our society was matriarchal. After the arrival of the Aryans, a terrible change occurred in the entire system, the invasion of patriarchy began. Women have not been able to free themselves from this invasion and colonialism even today. This characteristic is reflected in the narrative. Therefore, feminist consciousness is no longer limited to a single literary theory. It has become part of the Interdisciplinary Approach.

Discussion

আখ্যানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য —

> "এক বা একাধিক কথকের দ্বারা এক বা একাধিক আখ্যান গ্রাহকের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক বাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনার পুনঃকথন হল আখ্যান।"[১]

নারীচেতনাবাদী আখ্যানের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আখ্যানত্ব এবং আখ্যান মাধ্যম। আখ্যানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনের দ্বিস্তরিকতা। আখ্যানে মূলত সময়গত সংগঠন দু'ধরনের হয় – ক. Story time, খ. discourse time. যে সময় কাহিনির মূল ঘটনাগুলি ঘটে আর একটা যে সময় আখ্যান পাঠক আখ্যান পাঠ করেন। সুতরাং নারীচেতনাবাদী আখ্যান প্রেক্ষিত বহু প্রাচীন। বিশশতকে সাহিত্য সমালোচনায় একটি অন্যতম ধারা হল আখানতত্ত্ব। যদিও সুপ্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ আখ্যানের বিভিন্ন আলোচনা করেছিলেন কিন্তু সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে আখ্যানের আত্মপ্রকাশ বিশশতকে এসেই।

নারী চেতনাবাদের সূচনা পাশ্চাত্যে, ক্রমে এর বিস্তার ঘটে সারা বিশ্বে, কোথাও কম, কোথাও বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে সমান অধিকারের দাবিতে শুরু হয় নারীচেতনাবাদী আন্দোলন। শুরু হয় মাতৃত্ব রক্ষার দাবিতে বিশেষ কিছু ছুটি এবং সমপরিমাণ বেতন, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান বেতনের দাবি। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির দাবিতে আইনি পদক্ষেপ। এমনকী নারীরা পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রেও মুক্তির উপায় জানতে চান। বলাবাহুল্য, এগুলোর বেশকিছু সমাধান হলেও পরোক্ষে নারী আজও অবরুদ্ধ। শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতিতে নারী সমান অধিকার পেয়েছে। মাতৃত্বকালীন বিশেষ ছুটি পেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে সমান বেতনভোগী হয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বিশাখা গাইডলাইনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারের কৌশল প্রতিদিন পাল্টে পাল্টে গেছে। এমনকী ডিম্বানু সংরক্ষণকে কেন্দ্র করেও পুরুষ নারীর সামনে লোভনীয় টোপ তুলে ধরেছেন।

> "পিতৃতন্ত্রের অনুশাসনে শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা নারীর স্বকীয় সত্ত্বা-স্বরূপ-ভাষা-ইতিহাস নির্মাণের আপ্রাণ প্রয়াস।"[২]

আগে ছিল সতীদাহপ্রথা এখন হয়েছে গণধর্ষণ, যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর 'দহন' উপন্যাসে। 'দহন' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঝিনুক আর রমিতা। মেট্রো স্টেশনের সামনে সুন্দরী রমিতার সঙ্গে হয়ে যাওয়া শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে সকলে যখন নীরব দর্শক তখন একমাত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শ্রবণা সরকার ওরফে ঝিনুক। ঝিনুক অত্যাচারিত না হয়েও রমিতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতেও ঝিনুককে অজস্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকী রমিতার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে হয়ে যাওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকুও করতে পারেনি। রমিতাকে তার স্বামী হয়তো প্রত্যাখ্যান করেননি ঠিকই, কিন্তু তাকে কোনো আইনের সাহায্যও নিতে দেয়নি, কারণ চৌধুরী বংশের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সেই বংশের পুত্রবধূর। আর তূনীরের বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্লীলতাহানির মতো নোংরা কেস তার Future Carrer-কে নষ্ট করতে পারে তাই সে চায় ঝিনুক যাতে এ সব

কেসে না জড়ায়। বলাবাহুল্য এখানে তূনীর ও পলাশ যথাক্রমে ঝিনুকের boyfriend আর রমিতার husband দু'জনেই তাদের হবু স্ত্রী বা স্ত্রীকে ভালোবাসেন কিন্তু নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নেহাত-ই গৌণ। এরা সকলেই চান শুধুমাত্র আধিপত্য।

কিন্তু মানুষ প্রজাতির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান। শুধু সমান নয়, একে অপরের পরিপূরক। বিশ্বসংসারে নারী পুরুষ ছাড়া অক্ষম আবার পুরুষ ও নারী ছাড়া অক্ষম। নারী ও পুরুষ উভয় ছাড়া সৃষ্টি থমকে যাবে। তাই সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারী ও পুরুষের সহাবস্থান আবশ্যিক। কিন্তু নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও সমাজ নারী ও পুরুষকে স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণ করেছেন। এখানেই মনে পড়ে যায় সিমন দ্য বোভোয়ার সেই যুগান্তকারী মতটি কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে। নারী শারীরিক দিক থেকে যতটা নিজস্ব নির্মাণ তার থেকে অনেক বেশি নির্মাণ সমাজের দ্বারা। তাই বারবার ঝিনুককে শুনতে হয়েছে -

> "আফটার অল তুমি মেয়ে' কিংবা 'লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, চাকরি করতে দেওয়া হয়েছে তাতেই কি তুমি পুরুষ সমাজের সমান হয়ে গেলে নাকি?"[৩]

সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আর পিতৃতন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষালিত নারী মগজ কখনোই নারীকে পুরুষের সমান দেখতে পারেনি। এখানেই ঔপনিবেশিক পুরুষ নারীকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যে পুরুষ এতদিন ধরে ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে তারা ক্ষমতার আস্ফালন করবে এটা স্বাভাবিক। আরো, তারা এই ক্ষমতার হস্তান্তর মোটেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে না। তেমনি ক্ষমতাহীন থাকতে থাকতে নারীর মজ্জাগত হয়ে গেছে অক্ষমতা, তারা ক্ষমতা পেলেও আজ আর ক্ষমতা ভোগ করতেও পারছেন না।

এভাবেই নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসে নারীর সমস্যাপটের বিবর্তন লক্ষণীয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসের ঝিনুক, রমিতা এবং মৃণালিনীর চরিত্র বহন করে চলেছেন বিবর্তনীয় লৈঙ্গিক সমস্যাকে। এই প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই বিভিন্নভাবে পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে বন্দী তার প্রতিফলন 'দহন' উপন্যাস। ঝিনুক অবিবাহিত হলেও এমনকী অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে তার boyfriend তূণীরকে কোনোভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। রমিতা তো বিবাহিত সমাজ-সংসার-সংস্কারের বেড়াজালে ভীষণভাবে আবদ্ধ আর মৃণালিনী অভিজ্ঞ বটবৃক্ষ। নারী এখানেই পিতৃতন্ত্রের দ্বারা উপনিবেশীকৃত। কিন্তু কেউই তার কাছের পুরুষটিকে অতিক্রম করতে পারেননি। নারী আভিজাত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরের প্রতিফলন ঘটেছে 'দহন' এর বয়ানে।

এখানে রমিতা বা ঝিনুকের মানসিকতা নিয়ে পলাশ বা তূণীর কেউই তেমন চিন্তিত নয়। তূণীর ঝিনুককে ভালোবাসলেও তার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত। আর পলাশ চৌধুরী তার পরিবারের সোশ্যাল স্ট্যাটাস রক্ষার্থে সদাব্যস্ত। অভিজ্ঞ মৃণালিনী কিন্তু সংসারে এই অলিখিত বিধি নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই ঝিনুকের দুঃখের কথা যেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তেমন বুঝেছিলেন রমিতার কষ্টের কথাও। কিন্তু তবুও তিনি ঝিনুককে ভালো থাকতে অনুরোধ করেছিলেন কারণ 'personal is political' সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কই রাজনৈতিক। সমস্ত সম্পর্কই একটা স্তরে গিয়ে বিনিময়ের জায়গায় থমকে যায়। সেটা শুধুমাত্র পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। নারী নারী এমনকী পুরুষ নারী সমস্ত সম্পর্কই রাজনৈতিক। সুতরাং নারী ও পুরুষের মধ্যেযে বিনিময় আসবে এটা খুব স্বাভাবিক। এই ব্যাপক আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে অসম্ভব। কিন্তু সেই প্রেক্ষিতে অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে যে কোনো পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বিনিময়ের মধ্যে আবদ্ধ সেটা বাবা-মা, মা-ছেলে, প্রেমিক-প্রেমিকা সর্বস্তরেই হয়। আর সর্বোপরি নারী কখনোই পুরুষের আধিপত্যবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, তাই সমালোচকের মতে 'women are last colony'। সুতরাং আমরা যতই স্বাধীন হই না কেন নারী কখনোই পিতৃতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কারণ অবশেষে তূণীর আর ঝিনুকের মিলন হয়েছে। রমিতাও চৌধুরী পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে থেকে গেছে, জয় হয়েছে পুরুষের আগ্রাসনের। "বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূত্রে এবং অভীষ্টের ভিন্নতার জন্য আখ্যানতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা জটিল তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে। যেমন নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব (Feminist Narratology) স্বাভাবিক আখ্যানতত্ত্ব (Natural Narratology) সমাজ আখ্যানতত্ত্ব

(Social Narratolgy) মনো আখ্যানতত্ত্ব (Psycho Narratology) ইত্যাদি। এইভাবে আখ্যানতত্ত্ব তত্ত্ববিশ্বের বিস্তীর্ণ পরিসরে পরিকীর্ণ হয়েছে। এই ভাবে 'Structuralist or classical narratology evolved into post classical narratology."[8]

'দহন' উপন্যাসটি আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে যতটা না বিচার্য তার থেকে অনেক বেশি প্রধান হয়ে উঠেছে নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষিতে। এখানে নারীর আত্মসংকটের বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন ঔপন্যাসিক। এই আধুনিক আখ্যান হিসাবে 'দহন' উপন্যাস, আখ্যানতত্ত্বকেও অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে। বিশ শতকের একটি অন্যতম সাহিত্যধারা আখ্যানতত্ত্ব। আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতেই হয়, গাছের মূলটা হল 'আখ্যান' আর আমার গবেষণা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক উপন্যাস, সেটি হল গাছটির ডালপালা। গবেষণা সন্দর্ভ আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে যখন উপন্যাসের আলোচনা সুতরাং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসটি আখ্যান কি তা নয় এটা বিচার এর চেষ্টা করেছি। 'দহন' উপন্যাসে গল্পের একটা সুন্দর নিটোলতা আছে, আছে চরিত্রগুলির অসাধারণ নির্মাণ, চরিত্রের মধ্যে আছে দ্বান্দ্বিকতা। কিন্তু সব কিছু থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসে আখ্যান ভাবনা যেন ঠিক তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে উপন্যাসে আখ্যান অনুপস্থিত এটা বলা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমস্ত রচনাতেই আখ্যান বর্তমান। আখ্যানের বৈশিষ্ট্য বর্তমান কিনা সেটা সন্দেহের। সমগ্র 'দহন' উপন্যাস জুড়ে নারীচেতনাবাদী আখ্যানের একটি ব্যাপক বিস্তার লক্ষণীয়। বিশশতকের ৯০-র দশকে লিঙ্গ সমস্যা সমগ্র বিশ্বে একটি অন্যতম বড়ো সমস্যা 'দহন'উপন্যাসে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এবং নারীচেতনাবাদের সম্মিলিত প্রভাবে 'দহন' হয়ে উঠেছে এক নারীবাদী আখ্যানের দলিল।

> "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত সংস্কার বা অগ্রাধিকার যেহেতু আমূল বদলে যায়, লেখার ধরণ ও অভিমুখ রূপান্তরিত হয়। বলায়, লেখায় বা কিছু বিজ্ঞাপিত বা দ্যোতিত হয়, তাতে ছোট্ট বীজের মধ্যে প্রচ্ছন মহীরূহের সম্ভাবনার মতো, লুকিয়ে থাকে আখ্যান বীজ। এই বীজ সম্বোধকের প্রকাশ ক্ষমতা ও সম্বোধিতের গ্রহণ সামর্থ্যের ভিত্তিতে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে বনস্পতির সংরূপ ও চরিত্র অর্জন করে নেয়।"[৫]

এভাবেই দহনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মহীরূহের সম্ভাবনার মতো লুকিয়ে থাকে নারীবাদী আখ্যান। ঔপন্যাসিক সময়কে কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই বর্তমান বিশ্বে নারীচেতনাবাদী আখ্যানের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এটা খুব স্বাভাবিক, বর্তমান সময়কে ধরে রাখার ক্ষেত্রে নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে যে অসম্ভব আর্তি উঠে এসেছে তাকে হয়তো নারীবাদী আখ্যান বললে ভুল হবে না। তবে, সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে সম্পূর্ণ নারীবাদী বললে ভুল হবে তবে voiceless Section of the Indian Society-র প্রধান ধারক যে নারী। সেই নারী জীবনের অসংখ্য দুঃখ বেদনার কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। নারীকে ভিন্ন শ্রেণি বা বিভিন্ন জীবনের বাঁকে দাঁড় করিয়েও নারী শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন। তাই, সুচিত্রা দেবী সংসার অভিজ্ঞতায়পূর্ণ প্রবীণ মৃণালিনী সমাজ সংসারে কঠোর নিয়মে বন্দী রমিতা আর অবিবাহিতা শিক্ষিত ঝিনুক এদের সকলের দ্বারা নারী জাতির ভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করালেও এরা কিন্তু সেই চিরকাল-ই সমাজ সংসারে বঞ্চিতা। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার কেন যে বিধাতা দেননি? তার সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। তবে, সম্ভাব্য কিছু ধারণা তৈরি করলেও নারী আপন ক্ষমতা বলে বলীয়ান হবার কৌশল রপ্ত করতে এখনো অক্ষম। তবে, পুরুষ কখনোই স্বেচ্ছায় তাদের অধিকার ছেড়ে না দিলেও, নারীর অধিকার সম্বন্ধে সূচনা অল্প পুরুষ মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। বর্তমানে নারী সে কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি।

সুতরাং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসে যে নারীবাদী আখ্যানের ব্যাপক বিস্তার আছে তা লক্ষণীয়। আখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আখ্যান বিভিন্ন মাধ্যমে থাকতে পারে। এগুলির মধ্যে মৌখিক ও লিখিত মাধ্যম অন্যতম, লিখিত মাধ্যম গদ্য ও পদ্য উভয়েই হতে পারে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাস গদ্যে লিখিত নারীবাদী আখ্যান। উপন্যাসের মূল নির্যাস থুড়ি আখ্যান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তা হল দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত নারীদের কথা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নারী আজও পিতৃতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তবে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, শেষরক্ষা যদিও হয়নি, তবে নারী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। নারী পুরুষ কেউই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়,

উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। নারী ও পুরুষের সহাবস্থান ছাড়া সমাজের সকল সৃষ্টি-ই থেমে যাবে। তাই হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। নারী ও পুরুষের সহাবস্থান ছাড়া সমাজের সকল সৃষ্টি-ই থেমে যাবে। তাই হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের উভয় উভয়ের প্রতি সাহচর্য একান্ত কাম্য। স্ত্রী এবং পুরুষ ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত হলেও এরা উভয়েই মানব জাতি, সুতরাং মানবতার ধর্মে নারী পুরুষ সকলেই সমান। কিন্তু এটাই বিস্ময়ের নারীর স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্ব কিছুই সমাজে স্থিত হয়নি। নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়া মানেই নারীর সত্তাকে পুরুষের পরিপূরক সত্তা হিসাবে কল্পনা করা অর্থাৎ কন্যা জায়া জননী ছাড়া নারীর কোনো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। অথচ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে নারী মানুষ। স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট এক মানুষ। অথচ সমাজ পুরোপুরি তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে পুরুষ তার পরিপূরক চরিত্র হিসাবে নারীর নির্মাণ করে চলেছেন। সামগ্রিকভাবে নারীসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হল নারীচেতনাবাদ।

'দহন' উপন্যাসে ঝিনুক তাদের এই চেতনা সমন্বিত ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সমাজ নারীকে কোনোভাবেই এগিয়ে আসতে সাহায্য করেনি। কারণ তাকে পশ্চাতে টেনেছে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ রমিতা চৌধুরী। আর এই সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও চুপচাপ অভিজ্ঞতার ভাবে জর্জরিত মৃণালিনী। এতদিন ধরে ক্ষমতা ভোগ করতে করতে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা এত সহজে ক্ষমতার হস্তান্তর মেনে নিতে পারে না। আর আজ সেজন্যই নারীর অধিকার নারীর দাবি, সবটাই নারীর ওপর দায়ভার অনেক বেশি। উপনিবেশোত্তর যুগে এসে বোধ হয় আমরা উপন্যাস প্রকরণটির সঙ্গে ভীষণ পরিচিত হয়ে পড়েছি কিন্তু পূর্বে আমাদের নিজস্ব প্রকরণ-ই ছিল আখ্যান। এই উপনিবেশোত্তর প্রেক্ষিতে আবার নারীচেতনাবাদকে নিয়ে লেখা উপন্যাস সবটাই পাশ্চাত্যে বা উপনিবেশবাদকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে, বলাবাহুল্য, 'দহন' উপন্যাসে, উপন্যাস, আখ্যানের থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে নারীচেতনাবাদী দলিলীকরণ, -

"যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার সুসময়।"[৬]

এই উপন্যাসের মধ্যে যে সত্য প্রধান হয়ে উঠে আসে তাই হল উপন্যাসের আখ্যান অর্থাৎ নারীর পাওয়া এবং না পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠেছে 'দহন' উপন্যাসে এটাই খানিকটা আখ্যান রূপে নির্মিত হয়েছে। নারীর প্রতি যত অবিচার অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিরোধ আন্দোলন ও তেমন ভাবেই হয়েছে। যতই মনে করা হোক না কেন শুধুই অত্যাচার হয়েছে তা কিন্তু নয়, অত্যাচারের বহুমাত্রিকতার সাথে সাথে প্রতিরোধ ঘটেছে খুব সামান্যভাবে। কিন্তু এর মাঝের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের ইতিহাস কিন্তু পিতৃতন্ত্রে জানা নয়, জানার কথাও নয়। আবার নারীই ভাবে তার সমস্ত শক্তি গৃহ চৌহদ্দির মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু এই শক্তিবৃদ্ধির পিছনেও পুরুষের হাত। নারী এটাও বুঝতে অক্ষম এই মিথ্যা প্রতিপত্তিও পুরুষ প্রদত্ত। কারণ পুরুষ জানে এই ক্ষমতার আড়ালে নারীর ওপরই আরোপ করা হয় সমস্ত দায়িত্বের বোঝা। সুচিত্রা ভট্টাচার্য হয়ত এই বিষয়টা ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। সমাজের সকল নীতি-নিয়ম, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব যখন নারীর তখন বিপথগামী পুরুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাও নারীর দায়িত্ব। পরোক্ষে তাদের বক্তব্য পুরুষের বিপথগামীর পিছনেও নাকি নারীর ই হাত থাকে। তাই কৌশলে নিজের দায়িত্ব এড়াতেই পুরুষের এই প্রক্রিয়া। আর নারীকে বাঁধা হয় সতীত্ব, বংশমর্যাদা, জননী ইত্যাদির নিগড়ে। কিন্তু পুরুষকে পরিমাপের জন্য এ ধরনের কোনো মাপকাটি তৈরি হয়নি।

তবে, বলাবাহুল্য, নারীবাদ মানে সম্পূর্ণ রূপে পুরুষ বিদ্বেষী তা কিন্তু নয়। নারীবাদ মানে নারীর অস্তিত্ব নারীর অধিকার দাবি বিষয়ে, সচেতন করে তোলার প্রয়াস। শিক্ষা রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারী খানিকটা স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃত অর্থে নারী স্বাধীন হয়নি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর হলেও, সামাজিক নির্মাণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ভীষণভাবে ভিন্ন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে থাকে পিতৃতন্ত্রের কদর্য চেহারা। বা পুরুষতন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত নারী মগজে ধরাই পড়ে না। নারীবাদের মূল বিষয় হল ঠিক এই জায়গাগুলি তুলে ধরা। অর্থাৎ নারীর জীবনচর্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের মধ্যে থেকে নারীর জীবনচর্যার সাম্যবাদী ধারণা প্রতিষ্ঠাই নারীচেতনাবাদের মূল লক্ষ। সুচিত্রা ভট্টাচার্য একজন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারী তার লেখায় নারীর জীবন যেমন ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কোনো পুরুষের লেখনিতে কিন্তু তা হয়নি। কারণ পুরুষের 'চোখে নারী যেমন, নারীর নিজস্ব লেখনিতে নারী কিন্তু তেমন নয়।

সাহিত্য জগতে মেয়েদের আবির্ভাব উনিশ শতকে ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীতে এর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষণীয়। তবে উনিশ শতকে রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবীর জীবনে সংসারে সমস্যা যেভাবে ঘনীভূত হয়েছিল বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর যুগসমস্যা একেবারে পাল্টে পাল্টে গেছে। সামাজিক নির্মাণ অনুযায়ী নারীর চরিত্রের যদি পরিবর্তন ঘটে বা পুরুষ নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে চলে যায় তখন সকলেই নারীর প্রতি বক্র চোখে তাকাতে থাকে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাস নাগরিকতার আবহে নারীসত্তার বিভিন্ন সংকটের কথা তুলে ধরেছেন যেখানে যুগচিহ্ন ভীষণভাবে বর্তমান। এই উপন্যাসে আখ্যান নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এটা শুধুমাত্র আখ্যানের পরিবর্তে অনেক বেশি নারীবাদী আখ্যান হয়ে উঠেছে। তাই 'দহন' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমগ্র নারী জাতির সংকটের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বের জেরেই নারী ও পুরুষ সমান ক্ষমতাশালী Biological দিক থেকে মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষ ভিন্ন দেহের অধিকারী হলেও তারা মানুষ কিন্তু এই মানব নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজ বারংবার নারীকে পিছিয়ে দিয়েছে। শিক্ষা রুচি সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বাইরে মেয়েদের সমস্যাপটের পরিবর্তন ঘটেছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' তারই এক দলিল ঝিনুক, রমিতা, মৃণালিনী এই তিন নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বর্তমান কালের জীবনচর্যা যেভাবে পালন করেছেন তারই বিস্তৃত বিবরণ 'দহন'।

নারীসত্তার নানা বিভঙ্গ এবং সংকটের মূলে আছে সমাজ ও পরিবার। কারণ পুরুষ ও নারী যতটা biologically different তার থেকে অনেক বেশি different সামাজিক প্রেক্ষিতে। পুরুষ ও নারীর প্রতি সমাজের যে অচল ও অনড় বিভাজন তাও এই উপন্যাসে স্পষ্ট। যদিও নারী বর্তমানে অন্দর মহলের অধীশ্বরী নন। তাঁর ক্ষমতা গৃহে বাইরে সর্বত্র সমান। তবুও নারী আজও শুধুমাত্র পুরুষের ভোগ্য পণ্য। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে স্বামী নামক পুরুষ পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও সুন্দরী ঝকঝকে রমিতা বেশ কিছু যুবকের দ্বারা 'মলেস্টেড' হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে রমিতা বা তার স্বামী পলাশের পরিবর্তে এগিয়ে আসে ঝিনুক। ঝিনুক সমস্ত আইনী পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু তার পরেও এই সত্যের প্রতিবাদের স্বরূপ তার কপালে জোটে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা। এমনকী তার boyfriend তূণীর-ও সরাসরি ঝিনুকের এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। যা ঝিনুক স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। অবশেষে চৌধুরী পরিবারের বউ রমিতা তাঁর স্বামী পলাশ এমনকী তূণীরের কাছেও ঝিনুক পুরোপুরি হেরে যান। হাজার চেষ্টা করেও ঝিনুক শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কারণ সে একটা মেয়ে এবং সে অপর একটি মেয়ের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছে। সামাজিক নির্মাণের দ্বারা নারী মানুষ নর ঊন মানব বা অসম্পূর্ণ পুরুষ তাই তাদের সম্মান, স্বতন্ত্রসত্তা কিছুই নেই। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার ফলে ঝিনুকের মধ্যে সৃষ্টি হয় যে ব্যক্তিগত সংকট তার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট বর্তমানে সুন্দরী, শিক্ষিতা স্মার্ট, নারীও বিভিন্নভাবে পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে বন্দী। নারী শিক্ষিত হোক, সুন্দরী হোক, রাজনৈতিক হোক সবটাই পুরুষের নিমিত্তার্থে। নারী শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী নারীর কাছে অন্দরমহলের দখলদারিত্ব যেন দাস্যতারই প্রতীক। আর এই দাসীবৃত্তির অপর ছবি হল 'দহন' উপন্যাস। প্রত্যক্ষ ভাবে এই দাসখতে নাম লিখিয়েছে রমিতা ও ঝিনুক।

সমাজ বাস্তবতার দিকটিকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সমাজ বাস্তবের এই কঠিন দিকটিই হল 'আখ্যান' বলা ভালো নারীবাদী আখ্যান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, -

> "একজন লেখক ঔপন্যাসিক বিবরণ লেখার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন নিজে না জেনেই। তিনি আসলে তখন বহু মানুষের এমন বহুস্বর খুঁজে বেড়ান যে বহুস্বরের মধ্যে তাঁর নিজের স্বরটাও মিশে যায়। বিবরণকার কোনো জায়গায় তারই কথা বলে প্রায় কোনো কথা বলেন না অথচ বিবরণকারের নিজের স্বর ছাড়া অন্য সব স্বরই সেখানে অর্থহীন। অন্য বহুস্বর ছাড়া তাঁর সেই নির্দিষ্ট স্বরটা চিনে নেওয়া যায় না, কিন্তু লেখকের নিজস্ব স্বর ছাড়াই স্বর সেই অন্য স্বরগুলি হয়ে যায় অপ্রাসঙ্গিক। এই যে বহুস্বর আর লেখকের স্বরের দ্বৈততা তা থেকেই তৈরি হয় উপন্যাসের আততি।"[৭]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর এর মূলটাই হল আখ্যান।

Reference:

১. দত্ত, সম্রাট, 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৫
২. দাশগুপ্ত, প্রদীপণ, 'মানবী চেতনার বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, অমৃতলোক, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩০
৩. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'দহন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮৮
৪. দত্ত, সম্রাট, 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৮
৫. দাস, বেলা, ও বিশ্বতোষ চৌধুরী, 'বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ', রত্নাবলী, ২০১১, পৃ. ৩
৬. রায়, দেবেশ, 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১৩
৭. রায়, দেবেশ, 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ৩৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 381 - 389
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হুমায়ূন আহমেদের ‘মিসির আলি’ সিরিজের উপন্যাসে মনোচিকিৎসা : একটি মণঃসমীক্ষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. প্রসেনজিৎ দাস
স্নাতক শিক্ষক
পালাটানা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা
Email ID : yusufjit426@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Fiction, Humayun Ahmed, Sigmund Freud, Treatment, Psychoanalysis, Psychotherapy, Hypnotize, Delusion, Reality.

Abstract
Psychoanalysis and psychology have significantly influenced the world of thought and medical science. In 1896, Austrian neurologist Sigmund Freud first introduced the concept of ‘Psychoanalysis’. This therapeutic method of Sigmund Freud has become one of the most important treatment methods in the modern world. Humayun Ahmed, one of the most popular fiction writers in Bangladesh and Bengali literature, has consciously highlighted the aspect of psychoanalysis in his various novels. Humayun Ahmed's best novel series is ‘Misir Ali’. The protagonist of this novel series, Misir Ali, is a psychology professor and psychoanalyst. Although he does not practice psychotherapy as a profession, he does it out of his own liking. And so, people come to Misir Ali with various problems. The first novel in the ‘Misir Ali’ series is ‘Devi’. In this novel, Humayun Ahmed has very consciously shaped the subject of psychoanalysis. The method of psychoanalysis of psychologist Sigmund Freud was primarily conversational. He would talk to the patient and point out the cause of the disease. He observed that in many cases, the disease was cured by bringing the cause to the forefront. Again, in many cases, he would hypnotize the patient and remove the symptoms of the disease from the patient's mind. In the novel ‘Devi’, Misir Ali seems to have followed the path indicated by Sigmund Freud in Ranu's treatment method. Humayun Ahmed's second novel in the ‘Misir Ali’ series is ‘Nishithini’. The subject of psychoanalysis has also come up in this novel. The subject of psychoanalysis has also come up in Humayun Ahmed's novel ‘Misir Ali. Kothay?’ In the novel, it is seen that when Tariqul Islam suddenly becomes overwhelmed by a fear of dogs, Misir Ali treats him using the hypnotic method. Humayun Ahmed has presented Misir Ali as an experienced psychoanalyst. However, the steps of treatment that the novelist has described here are completely fictional and dramatic.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

মনোচিকিৎসা ও মনঃসমীক্ষণ আধুনিক বিশ্বের চিন্তা চেতনা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের জগতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড প্রথম 'মনঃসমীক্ষণ' (Psychoanalysis) এর ধারণাটি উপস্থাপন করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি অবদমিত বাসনাকে উন্মোচন এবং অস্বীকৃত অপ্রকাশিত আবেগকে প্রকাশের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল কথোপকথনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ। রোগী ও সমীক্ষকের কথোপকথনের মাধ্যমে এই চিকিৎসা পদ্ধতি অগ্রসর হত। রোগ সনাক্তকরণের উপাদান ছিল প্রধানত ভাষিক। ফ্রয়েডের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রোগীর উক্তির বা উচ্চারিত ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্যের অসচেতন দিকগুলির উৎসের প্রতি। এর মাধ্যমে বোঝা যায় - স্বপ্ন, শব্দচালাচালি এবং কথার ভুলের জন্য যেসব কৌশল কাজ করে তা কয়েকটি মানসিক এবং ভাষিক পদ্ধতির সাদৃশ্যসূচক। এইভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি এগিয়ে যায়।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এই চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম চিকিৎসা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সময়ে সময়ে তার ব্যবহারিক পদ্ধতিতে নানা সংযোজন ও পরিবর্তন এসেছে।

আধুনিক কালে মানুষের জীবন-যাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক মন্দাগ্নিও বাড়ছে। তার ফলস্বরূপ দেখা দিচ্ছে নানা মানসিক রোগ-যন্ত্রণা। মানুষের জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরতে গিয়ে আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকেরাও মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয় তাঁদের রচনায় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ফলত আধুনিক উপন্যাসে উঠে এসেছে মানুষের মনের নানা রাগ-যন্ত্রণা ও তার চিকিৎসার কথা।

বাংলাদেশের তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের মনোচিকিৎসার দিকটি সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। হুমায়ূন আহমেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সিরিজ 'মিসির আসি'। এই উপন্যাস সিরিজের নায়ক মিসির আলি একজন সাইকোলজির অধ্যাপক এবং মনোচিকিৎসক। যদিও মনোচিকিৎসার কাজটি তিনি পেশা হিসাবে নয় তার ভালোলাগা থেকে করে থাকেন। আর তাই মানুষ নানা সমস্যা নিয়ে মিসির আলির কাছে উপস্থিত হন। মিসির আলির চিকিৎসার উপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

'মিসির আলি' সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'দেবী'। এই উপন্যাসে মনোচিকিৎসার বিষয়টি হুমায়ূন আহমেদ খুব সচেতনভাবে রূপ দিয়েছেন। মিসির আলি ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির অধ্যাপক। মনোচিকিৎসক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তবে এই কাজের জন্য "আমি ফিস নেই না। এই কাজটি আমি শখের খাতিরে করি।"[১]

'দেবী' উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী অনীশ ও রানু। রানু মাঝে মধ্যেই কিন্তু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং ভয়ে আঁতকে উঠে। আবার ভয় কেটে গেলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। কখনো কখনো আবার ঘুমের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত হেসে উঠে। তাই অনীশ স্থির করল রানুকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবে। এই প্রসঙ্গেই মনোচিকিৎসার বিষয়টি উপন্যাসে উঠে এসেছে।

অনীশ অফিসের এক সহকর্মীর কাছ থেকে মিসির আলির নাম শুনেছে। অনীশ অনেক খুঁজাখুঁজি করে মিসির আলির বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মিসির আলিকে রানুর বিষয়টি জানান। তবে মিসির আলি অনীশকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় –

"শুনুন, আমি কিন্তু ডাক্তার না।"[২]

তিনি মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক। আর সেই সুবাদে তিনি শখ হিসাবে মনোচিকিৎসার কাজটি করে থাকেন।

অনীশ রানুকে মিসির আলির কাছে নিয়ে যান। মিসির আলি আন্তরিক ভঙ্গীতে রানুর সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রথমেই তাকে চারটি কার্ড দেখিয়ে তার মধ্যে কী ডিজাইন রয়েছে তা অনুমান করে বলতে বলেন এবং রানু অনুমানের মাধ্যমে প্রতিটি কার্ডের ডিজাইন সঠিক বলেছেন। এর মধ্যে দিয়ে মিসির আলি রানুর ESP (এক্সট্রা সেন্সরি পারসেপশন) ক্ষমতা পরীক্ষা করেন। এরপর মিসির আলি রানুর কাছে তার প্রথম ভয় পাওয়ার ঘটনা শুনতে চাইলেন।

রানুর বয়স যখন এগারো বারো বছর তখন মধুপুরে চাচাতো বোন অনুফার বিয়েতে গিয়েছিল। গায়ে হলুদের দিন রঙ খেলা হয়। তারপর সকল মেয়েরা মিলে নদীতে স্নান করতে যায়। হঠাৎ রানু অনুভব করে কেউ যেন তার পা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জড়িয়ে ধরে আছে। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠে। পরে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে শুনতে পায় একটা মড়া মানুষ তার পায়ে আটকে গিয়েছিল। সেই থেকে রানু ভয় পায়। তারপর থেকে সে যখন একা থাকে মনে হয় কেউ যেন তাকে ডাকছে।

মিসির আলি একজন অভিজ্ঞ মনোসমীক্ষক। প্রতিটি কেইস স্টাডি তিনি আলাদা খাতায় তুলে রাখেন। রানুর কেইস স্টাডির খাতার প্রথম পাতায় লেখা 'একটি মানসিক রোগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ'। দ্বিতীয় পাতায় রয়েছে রানু সম্পর্কিত নানা তথ্য-নাম বয়স ইত্যাদি। তৃতীয় পাতায় তিনি তাঁর মনোবিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। সেখানে প্রথমেই মনোচিকিৎসার একটি পরিভাষা 'অডিটরি হেলুসিনেশন'-এর উল্লেখ রয়েছে। মিসির আলির মতে মেয়েটির অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে। সে যখন একা থাকে শুনতে পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে; অর্থাৎ মেয়েটির হেলুসিনেশন হচ্ছে জলের ঘটনাটি উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন তিনি প্রস্তুত করেছেন, এবং নিজেই তার উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করছেন -

প্রথমত : মৃত মানুষ জলে ভাসে, জলের নীচে ডুবে থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : মৃত মানুষটির বয়স কত? পোস্টমর্টাম হয়েছে কিনা?

তৃতীয়ত : প্রথম অসুস্থতার সময় ঘুমের মধ্যে কিছু বলেছে কিনা? বললে কী?

এই ঘটনাটির প্রেক্ষিতে মিসির আলি কিছু মন্তব্য উল্লেখ করেছেন -

ক) জলের ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

খ) প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হবে।

এইভাবে মিসির আলি ধাপে ধাপে রানুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার চিকিৎসার পথে এগিয়ে গেছেন।

মিসির আলি রানুর বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য মধুপুরে রানুর কাকার বাড়িতে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি নদীতে স্নানের ঘটনাটি শুনতে চাইলেন। ঘটনাটি মোটামুটি একই রকম ছিল। মিসির আলি অনুফার সঙ্গেও কথা বলেছেন। অনুফার মতে রানু এক অদ্ভুত মেয়ে, সে মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে। মিসির আলির ব্যাখ্যায়, কিছু কিছু মানুষেরই ই. এস. পি ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় তিনি নিজেও রানুর ই. এস. পি পরীক্ষা করেছেন। যদিও ই. এস. পি সাইকোলজির বিষয় নয়; এটি প্যারাসাইকোলজির পরিভাষা। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ই. এস. পি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। 'জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজি'র তৃতীয় অধ্যায় ই. এস. পি এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোচিকিৎসার পদ্ধতি ছিল মূলত ভাষিক। তিনি রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে রোগের কারণটি নির্দেশ করতেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন রোগের কারণটি সামনে নিয়ে আসলে অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্মূল হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে সম্মোহিত করে রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করতেন।

'দেবী' উপন্যাসে মিসির আলি যেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের নির্দেশিত পথেই রানুর চিকিৎসা পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেছেন।

রানুর সঙ্গে কথা বলে মিসির আলি জানতে পেরেছেন যে, রানু প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন একজন উলঙ্গ মানুষ রানুর পাজামা খোলার চেষ্টা করছে, মিসির আলি এই স্বপ্নের একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন; সেটি এই রকম যে, ছেলেবেলায় একজন বুড়ো মানুষ রানুকে ভুলিয়ে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে জোর করে তার পাজামা খুলে ফেলল। রানুর অসুখের শুরু হয়েছে সেখান থেকেই। তার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে রইল। স্নান করার সময় মড়া মানুষটি পায়ে লাগায় ঐ ঘটনাটি মনে পড়ে যায়।

মিসির আলি ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য রানুদের বাড়ি যান। সেখানে গিয়ে শুনতে পান রানুদের বাড়ির কাছে একটি পুরোনো মন্দির ছিল। স্থানটি নির্জন। সে প্রায়ই দেবী মূর্তি দেখতে সেখানে যেত। জালাউদ্দিন নামে একজন লোক রানুকে নির্জনে পেয়ে অসভ্যতা করার চেষ্টা করেছিল। মিসির আলি জালালউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। সে জানায় যে, দেবী মূর্তি হঠাৎ রানুর শরীরে এসে মিলিয়ে যায়। তা দেখে সে ভয়ে পালিয়ে গেছে।

এই বিষয়ে মিসির আলির ব্যাখ্যা-জালালউদ্দিনের মনে পাপবোধ ছিল। তাছাড়া মন্দিরটি ছিল তার কাছে নানা ভয়ভীতির কারণ তা থেকেই জালালউদ্দিনের হেলুসিনেশন হয়েছে।

অনীশ মিসির আলির বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে নানা সমস্যা নিয়ে। রাতে রানু নূপুরের শব্দ শুনতে পায় এবং সেই সঙ্গে ফলের ঘ্রাণও পায়। ইদানীং অনীশও তা অনুভব করে। তবে প্রথমে রানু নূপুরের শব্দ শুনে এবং ফুলের ঘ্রাণ পায়, তারপর অনীশও গায়।

মিসির আলির ব্যাখ্যায় এটি হল ইনডিউসড অডিটরি হেলুসিনেশন। অনীশ রানুকে খুব ভালোবাসে। রানুর অসুস্থতায় অনীশের মন দুর্বল হয়ে আছে। রানু যখন বলে সে নূপুরের শব্দ শুনতে পায় তখন স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসায় অনীশের কাছেও হেলুসিনেশন হয়। তাই সেও নূপুরের শব্দ শুনতে পায়। এটি সম্পূর্ণ মনোজগতের বিষয়।

একদিন রাতে অনীশ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখলো রানুর অস্থিরতা বেড়েছে। সে ডাক্তার ডাকতে চাইলে রানু তাকে রাবণ করে। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অসুস্থতা বাড়ে। একসময় আশীস ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে গেলে এবং ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল। রানুকে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ মনোচিকিৎসার যে আখ্যানটি তুলে ধরেছেন তা এখানেই ছেদ পড়ল।

উপন্যাসে দেখা যায় মিসির আলি একজন অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসকের মতোই প্রথমে রানুর সমস্যাটি শুনেছেন, তারপর এর পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ প্রস্তুত করেছেন এবং প্রয়োজন মত নানা স্থানে ঘুরে রানুর দেওয়া তথ্যগুলি যাচাই করেছেন। কিন্তু ঔসন্যাসিক ছোটগল্পের মতই অতৃপ্তি রেখে রানুর যবনিকা পত্তন করেছেন। রানুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার চিকিৎসা মনোবৈজ্ঞানিক মতেই এগোচ্ছিল। হয়তো হুমায়ূন আহমেদের পক্ষে এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তাই রানুকে তিনি কলমের আঁচড়ে মেড়ে ফেলেছেন। মূলত, হুমায়ূন আহমেদ রসায়নের ছাত্র, মনোবিজ্ঞানের ছাত্র নন। তবে সাইকোলজি ও প্যারাসাইকোলজি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। উপন্যাসে মনোচিকিৎসাটি যতদূর চালিয়ে নিয়ে গেছেন তাও প্রশংসার দাবি রাখে।

হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলি সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিশিথিনী'। এই উপন্যাসেও মনোচিকিৎসার বিষয়টি উঠে এসেছে। এই উপন্যাসেও মিসির আলি চরিত্রের পূর্বাপর সাযুজ্য রক্ষা করা হয়েছে। এই উপন্যাসেও তাকে মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও মনোচিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যায়।

যদিও মনোচিকিৎসা মিসির আলির পেশা নয়, তবুও তিনি এই কাজটি অধিক গুরুত্বের সঙ্গে করে থাকেন। এই কাজটি তাঁর কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এরজন্য তিনি সুইডেনে মনোবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ –

> "আমি একজন রোগীর মনোবিশ্লেষণ করছি। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।"[৩]

সেই কনফারেন্সে পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসবেন জেনেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন শুধুমাত্র একজনের চিকিৎসার জন্য। এর মধ্য দিয়ে চিকিৎসার প্রতি মিসির আলির নিষ্ঠা প্রকাশ পায়।

মিসির আলি ফিরোজ নামের একজন একুশ বর্ষীয় যুবকের চিকিৎসায় রত। ফিরোজ বিশাল বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান। সে শহরেই বড় হয়েছে। কখনো গ্রাম দেখেনি, তাই গ্রাম দেখতে সহপাঠী বন্ধু আজমলের সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়ি মোহনগঞ্জে যায়। আজমলের বাড়িটি সেকেলে জমিদারি বাড়ি। যদিও বর্তমানে বাড়িটি ছাড়া তাদের আর কিছু নেই। আজমলের বাড়িতে শুধু তার মা ও বোন রয়েছে। আজমলের বোন নাজনীন পঙ্গু, কিন্তু অলৌকিক সুন্দরী। নাজনীন তার পঙ্গুত্বের জন্য কারো সামনে যায় না। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই নাজনীন ফিরোজের সামনে পরে যায় এবং দ্রুততার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে হঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ফিরোজ তাকে তাড়াতাড়ি টেনে তুলে কিন্তু হাত ছাড়তে ভুলে যায়, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অবশেষে নাজনীনের ধমক খেয়ে সে হাত ছাড়ে। অসহ্য এক ব্যথায় তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি, সকালে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায়। সে উন্মাদের মত চিৎকার করতে থাকে। চোখের দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে যায়। একসময় মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে থাকে। তারপর গ্রামের লোকেরা তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। এরপর থেকেই ফিরোজ উন্মাদ হয়ে যায়।

ফিরোজের বাবা চিকিৎসার জন্য ফিরোজকে মিসির আলির কাছে নিয়ে আসেন। মিসির আলির চিকিৎসায় সে কিছুটা সুস্থ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই চিকিৎসায় ফিরোজের মা। সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তিনি মনে করেন-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"চিকিৎসা যে করছেন, সে তা ডাক্তার না... ভদ্রলোক একজন মাস্টার উনি কী চিকিৎসা করবেন।"[৪]

কিন্তু ফিরোজের বাবা ওসমান সাহেবের ধারণা-

"কেউ যদি কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন।"[৫]

এই কথাটির মধ্য দিয়ে মিসির আলির চিকিৎসার উপর ওসমান সাহেবের ভরসা ও বিশ্বাসের দিকটি ফুটে উঠেছে। মিসির আলিও ফিরোজের চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখছেন না। একদিন তিনি ঘরে ফিরে দেখলেন ফিরোজ একটি লোহার রড হাতে নিয়ে বসে আছে। তার চোখ লাল হয়ে আছে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু শান্তভাবেই তার সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝলেন এই অবস্থায় তাকে শান্ত রাখার একটিই উপায়, তাকে যে কোনভাবে ঘুম পাড়ানো। তিনি কড়া ঘুমের ঔষধ লিব্রিয়াম খাইয়ে দিলেন। ড্রাইভার এসে ফিরোজকে বাড়ি নিয়ে গেল। তিনি রাত্রিবেলা তাকে বাড়িতে তালাবন্ধ করে রাখার পরামর্শ দিলেন এবং ফিরোজের ঘরে একটি টেপরেকর্ড চালু করে রাখতে বললেন।

মিসির আলি ফিরোজের বাড়ি থেকে পাঠানো টেপগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন। একটি অংশ তিনি বারবার শুনে দেখলেন সেখানে দুজনের কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে - একটি ফিরোজের আর অন্যটি অপরিচিত। মিসির আলি অনেক চিন্তা করে বের করলেন যে, যেহেতু ফিরোজকে একা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে সুতরাং দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটিও ফিরোজেরই। এটি আসলে ফিরোজের দ্বিতীয় সত্ত্বা।

ফিরোজ কালো পেন্ট পরে একটি লোহার রড হাতে নিয়ে পুরান পল্টন এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সে প্রথমে একটি কুকুরকে মেরেছে। একজন পতিতাকে পিটিয়ে আধমরা করেছে, একটি রাস্তার বালককে মেরে ফেলেছে। তাকে ধরার জন্য সর্বক্ষণের পুলিশ পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ধরতে পারছে না।

ফিরোজের অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে মিসির আলি মোহনগঞ্জ আজমলদের বাড়িতে গেলেন।

ফিরোজ যে সকল জায়গায় গিয়েছিল তা মিসির আলি ঘুরে দেখলেন। ফিরোজের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে সকলের ইন্টারভিউ নিলেন, কিন্তু কোন ক্লু খুঁজে পেলেন না। নাজনীনের কাছে সবকিছু শুনেছেন। নাজনীন মিসির আলিকে একটি বন্ধ ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে তাদের পূর্বপুরুষ জমিদারদের ওয়েল পেন্টিং রয়েছে। সেখানে একটি ছবিতে একজন লোক কালো পেন্ট পরে খালি গায়ে ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, হাতে লোহার রড। তিনি তাদের বংশেরই একজন জমিদার, যিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী। একদিন বাড়ি ফেরার সময় গ্রামের লোকেরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং পিটিয়ে মেরে ফেলে। ছবিটি দেখে মিসির আলির ধোঁয়াশা অনেকটাই কেটে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন ফিরোজ এই লোকটির হেলোসিনেশন-ই দেখে। এই লোকটিই তার দ্বিতীয় সত্ত্বা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর ফিরোজের অসুস্থতার বিষয়ে মিসির আলি একটি হাইপোথিসিস তৈরি করেছেন -

প্রথমত : একটি অসম্ভব রূপবতী মেয়েকে সে দেখে। কিন্তু মেয়েটি পঙ্গু।

দ্বিতীয়ত : মেয়েটি তাকে হাত ধরে থাকার জন্য তীব্র ভাষায় আঘাত করেছে।

তৃতীয়ত : খালি গায়ে লোকটির ছবি দেখেছে এবং তার মর্মান্তিক মৃত্যুর গল্প শুনেছে।

চতুর্থত : রাতে জ্বরের ঘোরে বারবার লোকটির কথা মনে হয়েছে।

পঞ্চমত : নির্জন নদী তীরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরোজের হেলুসিনেশান হয়েছে।

মিসির আলি লাইব্রেরীতে গিয়ে ড. মিস ম্যাকার্থির 'ইল্যুশন এন্ড হেলুসিনেশন' বইটিতে খুঁজে দেখেছেন ফিরোজের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কেইস স্টাডি রয়েছে কিনা। এছাড়া স্টিভেনশনের 'সম মনোবলিক প্যাটার্ন' বইটিও মিসির আলি পড়ে দেখলেন, তিনিও তাঁর কেইস স্টাডি নিয়ে একটি বই লিখতে চান। তবে তার আগে তিনি ফিরোজের সমস্যাটি সমাধান করতে চান।

মিসির আলি ফিরোজের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। এখন ফিরোজকে নিয়ে সামনাসামনি বসার পালা। এখানে হিপ্রোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। হিপ্লোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তাকে সম্মোহিত করে তার মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করে দিতে পারলেই ফিরোজ আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু এমন সময় ফিরোজ লোহার রড নিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মিসির আলির বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং মিসির আলিকে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলে। আর তখনই দেবীর অলৌকিক স্পর্শে তার চৈতন্য ফিরে আসে এবং সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

হুমায়ূন আহমেদ ‘নিশিথিনী’ উপন্যাসে মনোচিকিৎসার যে প্লটটি নির্মাণ করেছেন তাকে ‘তীরে এসে তরী ডোবানোর’ মতই উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে এসে দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছে ইতি টেনেছেন। উপন্যাসে মনোচিকিৎসার যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও ফিরোজকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করে তুলেছেন এটা তাঁর একটা ব্যর্থতা।

মনোচিকিৎসকরা রোগীর মানসিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রথমে রোগের লক্ষণটি নির্ণয় করেন এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তবে তাঁরা যে সর্বক্ষেত্রেই রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি নির্মূল করতে পারেন তা নয়। শুধু মনোচিকিৎসা নয় কোন চিকিৎসা পদ্ধতিতেই সর্বক্ষেত্রে রোগ নির্মূল সম্ভব নয়। হুমায়ূন আহমেদের ‘মিসির আলি’ সিরিজের উপন্যাসের মিসির আলিও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি একজন অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি রোগের লক্ষণ নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়েছেন। আর সেই সকল রোগীর কেইস হিস্ট্রি তিনি লিখে রাখতেন তাঁর ‘UNSOLVED’ ডায়েরিতে। এমনই আটটি অমীমাংসিত চিকিৎসার গল্প নিয়ে লিখিত হয়েছে ‘মিসির আলি UNSOLVED’ উপন্যাসটি।

যে সকল রোগীর চিকিৎসা তিনি শেষ করতে পারেননি, সেই সকল কেইস হিস্ট্রি তিনি অবসর সময়ে নিয়ে বসেন এবং পুনরায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রোগের সঠিক লক্ষণটি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

‘মিসির আলি UNSOLVED’ উপন্যাসের ‘বাবার সিন্ধুক’ শীর্ষক অংশে দেখা যায় মিসির আলির বাবা মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি সবসময় মনে করতেন চারদিকে তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি মৃত্যু ভয়ে তটস্থ ছিলেন। রাত্রে অন্ধকারকে তিনি খুবই ভয় পেতেন। কোন কারণে বাতি নিভে গেলে তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন এবং কাঁপতে থাকেন। সাইকোলজির ভাষায় এই অসুখের নাম পেরানোয়া। এই অসুখে আক্রান্ত হলে রোগী চূড়ান্তভাবে মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পরে। মিসির আলির বাবার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল এবং এই অবস্থায় একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় তিনি মারা যান।

হুমায়ূন আহমেদের ‘মিসির আলি। আপনি কোথায়?’ উপন্যাসেও মনোচিকিৎসার বিষয়টি উঠে এসেছে। উপন্যাসে দেখা যায় তরিকুল ইসলাম আকস্মিকভাবে কুকুর ভীতিতে কাবু হয়ে গেলে মিসির আলি হিপ্লোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তার চিকিৎসা করেছেন –

> “মিসির আলির হাতে পকেট ঘড়ির চেইন। চেইনের মাথায় ঘড়ি। তিনি ঘড়িটা পেন্ডুলামের মতো সামান্য দুলাচ্ছেন। তাদের বাঁ দিকে খাটের উপর আয়না বসে আছে। আয়নার চোখে তীব্র কৌতূহল। আয়নার পাশেই তার মা। ঘোমটা টেনে তিনি নিজেকে আড়াল করেছেন। মহিলা কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তিনি এক হাতে মেয়েকে শক্ত করে ধরে আছেন।
> মিসির আলি বললেন, হেডমাস্টার সাহেব!
> জ্বি।
> আপনি সারারাত ঘুমান নি এখন আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।
> জ্বি।
> আপনি কল্পনা করুন নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন। জায়গাটা ফাঁকা। গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। জায়গাটা কি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন।
> তরিকুল ইসলাম চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বললে, দেখতে পাচ্ছি।
> জায়গাটা কেমন একটু বলুন তো?
> সুন্দর। খুব সুন্দর। ফুলের বাগান আছে।
> ঠান্ডা বাতাস কি বইছে?
> জ্বি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন না?
পাচ্ছি।
একটা পুরানো কাঠের বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন?
হুঁ।
দোতলা বাড়ি না?
জ্বি।
খুঁজে দেখুন দোতালায় উঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বের করুন।
আচ্ছা।
সিড়ি খুঁজে বের করে আমাকে বলুন। সিঁড়ি পেয়েছেন?
পেয়েছি।

এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করুন। এক একটা ধাপ উঠবেন আর আপনার চোখ গাঢ় হতে থাকবে। সপ্তম ধাপে উঠে গভীর ঘুমে আপনি তলিয়ে যাবেন। উঠতে শুরু করুন। প্রথম ধাপ উঠেছেন?
জ্বি উঠেছি।
দ্বিতীয় ধাপ?
হুঁ।
ঘুম পাচ্ছে?
হুঁ।
তৃতীয়।
হুঁ।
আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আপনার পা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে চতুর্থ ধাপ। উঠেছেন?
হুঁ।
চতুর্থ, পঞ্চম এখন সপ্তম ধাপ উঠবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি পা দিয়েছেন সপ্তম ধাপে।
তরিকুল ইসলাম বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসেছে। আয়না আপলক তাকিয়ে আছে।
মিসির আলি বললেন, তরিকুল ইসলাম সাহেব।
জ্বি।
ঘুমাচ্ছেন?
জ্বি।
আপনার কেমন লাগছে?
ভালো।

আমি দু'বার হাত তালি দেব। তালির শব্দে আপনার ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙার পর আপনি কুকুর ভয় পাবেন না। কুকুর ভীতি আপনার পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি দু'বার হাত তালি দিলেন। তরিকুল ইসলাম চোখ মেললেন। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। আয়না বলল, বাবা কুকুরের ভয়টা কি গেছে?
তরিকুল ইসলাম বললেন, কুকুরের কিসের ভয়?”[৬]

এইভাবে হিপ্নোটিক সাজেশনের মধ্য দিয়ে মিসির আলি তরিকুল ইসলামের কুকুর ভীতি দূর করেছেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মানসিক রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করা সম্ভব। তবে লেখক বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে -

> "এই বইয়ে লেখা হিপ্নোটিক সাজেশনের পদ্ধতিটি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। Trance state-এ চলে যাওয়া কাউকে ভুল সাজেশন দেওয়া ঠিক না। এতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।"[৭]

'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসের মূল রহস্যটি ঘনিয়ে উঠেছে মিসির আলির ছাত্র ফারুকের স্ত্রী আয়নাকে নিয়ে। ফারুকের স্ত্রী আয়না মাঝে মাঝে আয়নার ভেতরে ঢুকে যায় এই রহস্যের সন্ধানে ফারুক তার প্রিয় অধ্যাপক মিসির আলির সাহায্য প্রার্থনা করেছে। মিসির আলির প্রতি ফারুকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অগাধ বিশ্বাস। মিসির আলির মনোবিশ্লেষণ তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে আসছে ছাত্র জীবন থেকে। তাই নিজের জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হতে প্রিয় শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছে। ফারুকের বিশ্বাস একমাত্র তিনিই পারেন তার স্ত্রীর রহস্যের সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে।

ফারুকের স্ত্রী আয়না আয়নার ভিতরে ঢুকে যাওয়ার অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, এই রহস্যের সমাধানে মিসির আলি প্রথমে তিনটি হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছেন। প্রথমত: তিনি মেনে নিয়েছেন যে আয়নার ভিতরে ঢুকার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তার রয়েছে। তা মেনে নেওয়ার ভিত্তি হল আয়নার স্বীকারোক্তি এবং ফারুকের বক্তব্য, কিন্তু বিজ্ঞান এই হাপপোথিসিসকে গ্রহণ করবে না। কারণ, আয়না একখন্ড কাঁচের টুকরো যার পেছনে প্রলেপ লাগানো থাকে। এর ভেতরে মানুষের ঢুকা সম্ভব নয়। মিসির আলি নিজে তা মেনে নিলেও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে তা অগ্রাহ্য করবে। তার পরেও এই হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর কারন হল ভুলের ভেতর দিয়ে অনেক সময় শুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যায়।

মিসির আলির দ্বিতীয় হাইপোথিসিস হল, আয়নার ভেতরে কেউ কখনো ঢুকেনি, সুতরাং সেও ঢুকতে পারে না। তবে এক রিয়েলিটি (reality) থেকে অন্য রিয়েলিটিতে (reality) যেতে আয়না লাগে না। মানুষ বিছানায় ঘুমিয়েও রিয়েলিটি পরিবর্তন করতে পারে। আয়না মেয়েটির ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত হাইপোথিসিস।

মিসির আলির তৃতীয় হাইপোথিসিস অনুযায়ী সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই আয়নার স্বামী ফারুকের কল্পনা। ফারুক সাইকোলজির ছাত্র। সুতরাং ডিলিউসন (Delusion) এর বিষয়টি সে জানে। তার স্ত্রী আয়না তাকে ডিলিউসন (Delusion) এ সাহায্য করেছে। তাছাড়া ফারুকের স্ত্রীর নামও আয়না এবং আয়নার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ফারুক ডিলিউসন (Delusion) এর জগতে চলে গেছে।

মূল সিদ্ধান্তে পৌছানোর পূর্বে মিসির আলি ফারুক এবং আয়নাকে হিপ্নোটিক সাজেশনের মাধ্যমে তাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে চান। একজন অভিজ্ঞ মনোসমীক্ষকের ন্যায় মিসির আলি তাদের হিপ্নোটিক সাজেশন দিয়েছেন।

হুমায়ূন আহমেদ মিসির আলিকে একজন অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসকের ভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন। হিপ্নোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের চিকিৎসা সুদীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তবে এখানে চিকিৎসার যে ধাপগুলি ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক ও অতিনাটকীয়।

Reference:

১. আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২০
২. তদেব, পৃ. ১৭
৩. তদেব, পৃ. ১১৪
৪. তদেব, পৃ. ১২২
৫. তদেব, পৃ. ১২২

৬. আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-২,* অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১
৭. তদেব, পৃ. ৫৩

Bibliography:

আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২
আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-২*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩
আহমেদ, হুমায়ূন, *আমিই মিসির আলি,* অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪
চট্টোপাধ্যায়, সুবীর, *মনোরোগ ও মনোচিকিৎসা,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪
পাঠক, রিংকু, *সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং ও তার প্রয়োগ,* নায়েক এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা, ২০১৪
মিত্র, মাধবেন্দ্র, মিশ্র, পুষ্পা, (অনু), *সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪
বসু, অরূপরতন, (অনু), *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা: স্বপ্ন,* দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৯৭
ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু শেখর, *সাইকোথেরাপি এবং কাউন্সিলিং,* এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০১৭

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 390 - 399
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে' : নর-নারীর জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপ অন্বেষণ

শিরিন আক্তার
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ
ও
গবেষক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : shirin.akterju43@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Humayun Ahmed, Life and works, Fiction, Quest of Question, Stylistics, Dipiction, Men and women, Post Liberation war, Middle class.

Abstract

Humayun Ahmed (1948-2012) is one of the greatest Bengali fiction writer in the era of 20th century. Not only fiction writer but also he is known as Bangladeshi filmmaker, composer and playwright, songwriter, scholar and academic. Humayun Ahmed made his debut on fiction era by appearing the famous novel- Nandito Noroke (1972). He picked up the Bangladeshi civil middleclass society on his plot of this novel. This article will emphacise on how his colossal writing makes reader understand the circumstance through the age. He imitates the life of men and women in the civil society in his point of view. The major concern of this article is to give importance to bring out the quest of life of men and women in his novel named Nandito Noroke. After liberation war (1971) we found him as a powerful fiction writer who potrayed the pulse of middle-class family based on the real scenario of hope, desire, expections. Humayun Ahmed's novel especially early aged writings are very lively, dynamic and meaningful. His conscious depiction of thought gives the fiction a new era. This writing will provide a clear concept about the nature of character's quest of questions and their expectation and reality. The complexity of life is described wonderfully through his protagonist of the novel. The point of view of indivisual mind, soliloquy and psychoanalysis took an important place in characterisation. So, stylistics will also be a part of this article. This paper has been designed through the lens of literary and cultural approach including critical analysis.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

জননন্দিত কথার যাদুকর হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮ - ২০১২) প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারায় ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন রূপায়ণে নিঃসন্দেহে এটি একটি স্বতন্ত্র সংযোজন। ব্যক্তিগত বোধ, সামাজিক অবস্থান, শ্রেণি বৈষম্য, প্রতিবেশ বর্ণনা এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে পাশাপাশি রেখেই উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন লেখক হুমায়ূন আহমেদ। তাই প্রতিটি চরিত্রের জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপ অন্বেষণে তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোনো শিল্পই দেশকাল বিশ্লিষ্ট নয়। কারণ দেশকালের আলো-বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় প্রাণরস আহরণ করেই শিল্পমানস হয়ে ওঠে লালিত ও বর্ধিত। মানস গঠনে ঐতিহ্য ও পরিবেশ পালন করে এক কার্যকর ভূমিকা।[১] নিম্ন মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবন অঙ্কনের পাশাপাশি লেখক তাদের দৈনন্দিন সম্পর্কগুলোর ওপর সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোর প্রতি একই সাথে সচেতন ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন যা নিঃসন্দেহে লেখকের দূরদর্শী ভাবনার প্রতিফলন বলা যায়। হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে অবশ্য এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার মানস গঠন। এক্ষেত্রে একটু পেছনের প্রেক্ষাপট আলোচনা আবশ্যক -

১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পতনের পর শাসন ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। একই বছর বাংলা - বিহারে দেওয়ানী প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের এই ক্ষমতার পথ যেন এগিয়ে যায় এক ধাপ। এরপর ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা প্রবর্তনের ফলে বাংলায় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে ১৮০০ সালে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা, ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ', ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের 'নব শিক্ষানীতি' ইত্যাদি নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি সমাজে গড়ে ওঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ইংরেজদের শাসন ও শোষণনীতির প্রভাবে শিল্প-সাহিত্য, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিকভাবে বাঙালি জনমানসে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে যেভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে পুঁজিবাদী সভ্যতার মাধ্যমে সামন্তবাদকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান - ভারত-বাংলাদেশে তা হয়নি।[২] ব্রিটিশদের হাত ধরে অখন্ড বাংলায় জন্মলাভ করেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক কাঠামো। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে, তৎকালীন ঔপনিবেশিক স্বার্থে মেকলের কেরানি ব্যবস্থায় 'বাবু' নামক বৃত্তিকে আশ্রয় করে এবং 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার মাধ্যমে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' এর সময় জমিতে যে ভোগদখল সত্য বলে ঘোষিত হয় সেই ভূমিস্বত্বের উপর আশ্রয় করেই বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম দাঁড়িয়ে ওঠে। পরে সরকারি চাকুরিও হয় তার দ্বিতীয় আশ্রয়।[৩]

অর্থাৎ উপরিউক্ত মন্তব্য দুটিকে পর্যালোচনা করলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা লাভ করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক রুচি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা হল মধ্যবিত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দুই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই এদের করতে হয় জীবিকা নির্বাহ।[৪]

এছাড়াও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ঘটে গেছে দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তরের মতো দুর্বিষহ ঘটনা। ফলে সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে জীবনের এসব কথকতা। এর মধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী শিল্প-সাহিত্যে মার্ক্স ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। ফলে বাঙালি মানস গঠনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা দোলাচালের সাথে পরিলক্ষিত হয় পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্বসহ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। একদিকে উপরিউক্ত প্রেক্ষিতগুলো যেভাবে সাহিত্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবেগ-বিহ্বল মানসিকতাও অঙ্কিত হয়েছে শিল্প-সাহিত্যে। হুমায়ূন আহমেদের মানসপটেও এসকল প্রেক্ষিতগুলো নিয়মের অবধারিত প্রবহমানতায় সঞ্চারিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। *নন্দিত নরকের* মধ্যে তাই আমরা প্রত্যক্ষ করি মধ্যবিত্ত জীবনের নানামুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আবেগ-বিহ্বলতা সংগ্রাম, স্নেহ-ভালোবাসা, পারিবারিক পরিবেশ ও বন্ধনের এক সাবলীল বয়ান।

শুধু উপন্যাসের বিষয় বা প্লট নির্মাণে চমৎকারিত্ব নয়, চরিত্র নির্মাণে পরিণত মনোভাব, নামকরণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা, ভাষিক উপস্থাপনের পাঠকপ্রিয় সারল্য, বিদেশি শব্দের আরামদায়ক উপস্থিতি, উপমার যথাযথ প্রয়োগ,

লোকবিশ্বাসের যুৎসই ব্যবহার ও সর্বোপরি লেখকের ন্যারেটিভ স্টাইল সব মিলিয়ে নর-নারীর জীবন জিজ্ঞাসার যে বাস্তবধর্মী আখ্যান রচিত হয়-তার স্বরূপ বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে'র কাহিনি বর্ণনায় চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্ব-সংকট, ভাষার বর্ণনায় সারল্য, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের দুটে আলাদা আলাদা চিত্র এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রাবেয়ার জীবনে সমাজের প্রভাব এবং তার পরিণতিসহ শেষে মন্টু কর্তৃক মাস্টার কাকাকে খুন, খুনের কারণ না বলা এবং সবশেষে মন্টুর ফাঁসির আদেশ-এই সবকিছুই যেন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু হয়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। এরপর রাবেয়ার জীবনের ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় খোকার পরিবারটির এলোমেলো হয়ে যাওয়া, একটা পরিবারের সকল সদস্যদের সীমাহীন ও অনিশ্চিত ক্লেদাক্ত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া যেন শত শত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। মানসিকভাবে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন রাবেয়া যেন কিছুতেই সমাজের অন্য দশজন মানুষের জীবনের মতো স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করতে পারে না। রাবেয়াকে ঘিরে গল্পের কথক চরিত্র খোকার বয়ানে যেন উপন্যাসের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

লেখক এখানে ঘটনার কার্যকারণ বলতে যেয়ে খোকার মুখ দিয়ে বর্তমান থেকে অতীতে বিচরণ করে আবার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে নির্মোহ বাস্তবতার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে তাই কখনো কখনো হঠাৎ চেতনা-প্রবাহরীতির বয়ানের মতোই পাঠকের প্রাণে দোলা দিয়ে যায় -

> "আমরা বহু কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছি। আমাদের ছেলে মানুষি কোনো বাধ কোন বাসনা আমার বাবা-মা মেটাতে পারেন নি। আজ আমি সমস্ত বেদনার সমস্ত দুঃখে শান্তির প্রলেপ জুড়াব। আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছি শক্তিমান দৈত্যটা হাতের মুঠোয়।"[৫]

উপরিউক্ত মন্তব্যটি থেকে খোকা তথা রাবেয়ার পারিবারিক-সামাজিক-আর্থিক সংকটের সাথে সাথে মধ্যবিত্তীয় স্বপ্ন-সাধ-আশার এক মেলবন্ধন চিহ্নিত হয়েছে। খোকা যেন কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাকে নীরব দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে এবং স্বীয় আবেগকে পরিশীলিতভাবে প্রকাশ করে। শীলুর জন্য তার হৃদয়ের অনুরণন যেন হৃদয়েই ঝর্ণাধারা হয়ে প্রবাহিত হয়। সে প্রবাহ কখনোই নদীর প্রবাহমানতা হয়ে সমুদ্রের সাক্ষাৎ লাভ করে না। হৃদয়ের গভীরে শীলুকে নিয়ে মনে মনে ভালোবাসার জাল বুনে চললেও বাস্তব জগতে তার পূণর্তা প্রাপ্তির সাক্ষাত লাভ করতে দেখা যায় না। খোকার ভাবনা -

> "কবে আসবে শীলু যাকে আমি 'করুণা' বলে নিজের মনেই ডাকি। করুণা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে বাগানে, নিজের খেয়ালে গান উঠবে আচমকা। আমাদের বাসার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ভাববে, রুনু, রুনু বাসায় আছ? এর জন্য আমি অপেক্ষা করেছিলাম। ভালোবাসা সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। কিন্তু আমি বুকের ভেতর গোপন ভালোবাসা পুষেছি।"[৬]

নিজের ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে খোকা যেমন নির্মোহ তেমনি রাবেয়ার করুণ মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার নিয়ন্ত্রণহীন আবেগ পরিলক্ষিত হয় না। এমনকী মধ্যবিত্ত ক্লেদাক্ত জীবনের মা-বাবার একান্ত মুহূর্তের কথা বুঝতে পেরেও তার আবেগ সংযমহীন হয়ে ওঠে না।খোকার বর্ণনায় -

> "মাঝ রাতে বাবা যখন 'শানু শানু এই শাহানা' বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে ওঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত কথা ও আমার জানা। মা বলেন, আহ কর কী? ছি! বাবা ফিসফিস করে কী বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন, আমি দু'হাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি।"[৭]

মা-বাবা ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি রয়েছে তার তীব্র ভালোবাসা। বড় বোন রাবেয়া, ছোট বোন রুনু ও ছোটভাই মন্টুর প্রতি রয়েছে প্রচন্ড স্নেহ-ভালোবাসা। মা-বাবাসহ বাবার বন্ধু মাস্টার কাকার প্রতি রয়েছে তার সীমহীন

শ্রদ্ধাবোধ। আর্থিক হিসেব কষে চলা নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে পড়ালেখা শেষে একটা ভালো বেতনের চাকরির প্রত্যাশায় যেন তার ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন আবর্তিত হতে চায়। রুনুকে নিয়ে তার স্বপ্ন -

> "আমি রুনুকে অনেক বড় করব। রুনু ডাক্তার হবে বড় হলে। স্টেথোস্কোপ গলায়, কালো ব্যাগ হাতে মেয়ে ডাক্তারদের বড় সুন্দর দেখায়। রুনু অঙ্ক ভালো পারে না। আমি তাকে নিজের পড়া বন্ধ রেখে অ্যালজেবরা বোঝাই। ডাক্তারি পড়তে অবশ্যি অঙ্ক লাগে না।"[৮]

আদরের ছোটবোন রুনুকে নিয়ে তার স্বপ্ন যেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকের স্বার্থহীন চাওয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে।সেই সাথে বড় ভাই হিসেবে তার দায়িত্ব সচেতনতাও পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। ছোটভাই মন্টু তার মায়ের পেটের ভাই না হলেও তার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা খোকার হৃদয়ের উদারতাকেই চিহ্নিত করে -

> "মন্টু হয়তো আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। বড় চাপা ছেলে, বুঝবার উপায় নেই তবে শ্রদ্ধা করত ঠিকই। না শ্রদ্ধা নয়, ভালোবাসা বলা যেতে পারে। ...প্রবল ভালোবাসা না থাকলে সন্ধাবেলা বসে কেউ প্রতীক্ষা করে না কখন বড় ভাই এসে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবে।"[৯]

ভাই-বোনদের প্রতি যেমন খোকাকে স্নেহশীল পাই তেমনি পরিবারের সবার প্রতিও পাওয়া যায় দায়িত্বশীল আচরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত। সৎ মা হলেও বড় মার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না -

> "বড় মা আমাদের অতি শ্রদ্ধার মানুষ। রাবেয়া আর আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারিনি। যখন বয়স হয়েছে, তাঁর কোলে এসেছে মন্টু। আমি আর রাবেয়া দক্ষিণের ঘরে নির্বাসিত হয়েছি, তখনো তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, খোকা, আজ তুই শুবি আমার সাথে। আগে আমার সঙ্গে ঘুমুবার জন্য এত হৈচৈ করতিস, এখন যে বড় চুপচাপ?"[১০]

আবার, বাবার বন্ধু শফিক সাহেবের প্রতিও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয় -

> "মাস্টার কাকাকে খুব ভালে লাগে আমার। অদ্ভুত মানুষ। বয়সে বাবার সমান। বিয়ে-টিয়ে করেননি। দুই যুগের বেশি আমাদের সঙ্গে আছেন। কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বাইরের কেউ যদিও তা বুঝতে পারে না। বাইরের কেন, আমি নিজেই অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে বাবার আপন ভাই বলেই ভেবেছি।"[১১]

উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খোকার আত্মকথন ও তার উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাশের বাড়ির ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে শীলুর প্রতি তার আবেগ ও আবেগ প্রকাশের সীমাবদ্ধতা যেন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর দুই মেরুতে বসবাস করা দুইটি পরিবারের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্য তুলে আনার সাথে সাথে চিন্তা-চেতনা ও রুচির পার্থক্যকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ভালোবাসা প্রকাশে যেমন সংযমী খোকা তেমনি পরিবেশ-পরিস্থিতির সাপেক্ষে তার প্রতিক্রিয়ায় নির্লিপ্ততাও পরিলক্ষিত হয়। তবুও খোকা প্রতিনিয়ত স্বপ্ন বুনে চলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে নিয়ে ভালো থাকার -

> "আমি সমস্ত কিছু বুঝতে চাই। আমি সবাইকে ভালোবাসি। যে সংসার বাবা গড়ে তুলেছেন সেখানে আমার যা ভূমিকা আমি তারচে' অনেক বেশি করতে চাই। যদি কোনো জটিলতা এসেই থাকে তবে সে জটিলতা থেকে আমি দূরে থাকতে চাই না। আমি চাই সবাই সুখী হোক রুনু শীলুর মতো একটা ময়না এনে পুষুক যেটি সময়ে-অসময়ে মানুষের মতো সুকের শিস দিয়ে উঠবে।"[১২]

খোকার এই ভালো থাকার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার একটা ভালো চাকরি। যেখানে চিরকাল বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে আমরা কেন্দ্রিভূত হতে দেখি। খোকার চাওয়া-পাওয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। একটা সময় খোকার স্বপ্ন পূরণের সেই সোনার কাঠি-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভালো চাকরি ঠিকই হয় কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস আর পুলক যে কেন উদযাপন করতে পারে না পাঠক ঠিকই তা বুঝতে পারেন। নতুন দিনের প্রত্যাশায় প্রহর গুণতে থাকা খোকা চরিত্রটি যেন আবহমান বাঙালি সমাজের চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল যুবকের চিরচেনা রূপটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাইশ বছরের স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ে রাবেয়া। রাবেয়া আর খোকার বয়সের পার্থক্য এক বছর হলেও তাদের চিন্তার জগতের পার্থক্য রয়েছে। তাকে ঘিরেই এগিয়ে যায় মূল কাহিনি। তার কাছে জীবন ও জগতের সংজ্ঞা অন্য দশজনের মতো নয়। অত্যন্ত সরল চিন্তার অধিকারী রাবেয়ার মধ্যে জগতের কুটিলতা নেই। জগতের কুটিলতা তার মধ্যে না থাকলেও কুটিলতা ও জঞ্জাল তাকে আক্রান্ত করে এবং ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে যা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি -

> "রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা কটিই বারবার বলছিল। রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখছিলাম তার ফর্সা কান লাল হয়ে উঠছে।"[১৩]

ঠিক কী কথা লেখক তা প্রকাশ না করলেও পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না যে কথাগুলো নিশ্চয়ই শোভনীয় নয় যা খোকার ভাষ্যে আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় -

> "ছি! রাবেয়া, এসব বলতে আছে? ছিঃ। এগুলো বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস। ...সে আমার কথা মন দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ ধরে বালেশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিল। আমার কথায় তার ভবাবান্তর হলো না। পুতুল তৈরি বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পা নাচাতে নাচাতে সেই নোংড়া কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বলল।"[১৪]

ভালো-মন্দের পাথর্ক্য রাবেয়ার বোধগম্য নয়। আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ সবল হলেও বয়সের সাথে সাথে বুদ্ধির বিকাশ রাবেয়ার ঘটেনি। ফলে পরিবেশ সর্ম্পকে তার আন্দাজ নেই বললেই চলে। পাশের বাড়ির হারুন মনে মনে রাবেয়াকে পছন্দ করে কিন্তু হারুনের মা পছন্দ করে না এবং হারুনের মায়ের মনোভাব যেন সমাজের অন্যান্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিনিধিত্ব করে। কোনরূপ সহানুভূতি নয় বরং হারুনের মায়ের চোখে -

> "হারুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করতে চায়। আপনার মেয়েকে পাঠাবেন না ওখানে। কী করে সে ছেলের মন ভুলিয়েছে। মাথার ঠিক নেই একটা মেয়ে। ছি!"[১৫]

হারুনের মায়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে আর্থিক প্রতিপত্তির অহমবোধ। এই অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন তিনি। হারুনের মায়ের মতো শত শত অবিবেচক স্বার্থপর চরিত্র যেন আমাদেরই চারপাশে বিরাজমান। যারা মনে মনে নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে ষোল আনাই বুঝতে পারে আর অন্যের সন্তানের প্রতি সামান্য সহমর্মিতাটুকু প্রদর্শন করার মতো মানবিকতাটুকুও লালন করে না। এর বিপরীত চিত্রও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় হারুনের বোন ও পরবর্তীতে হারুনের স্ত্রী নাহারের সাথে রাবেয়ার সুসম্পর্ক দেখা যায়। স্বল্প আয়ের সংসারে রাবেয়ার চিন্তায় যেন পরিবারের অন্য সদস্যরাও চিন্তামগ্ন হয়ে ওঠে। মায়ের চোখের নিচে কালি জমে, বাবার মাথার ভিতরের দুঃসহ যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং বাবার মুখে উচ্চারিত হয়ে যায়-'বিষ খাইয়ে মেরে ফেল মেয়েকে'। আর্থিক অসঙ্গতি আর জীবনের অসহায়ত্ব এমনভাবে পীড়িত করেছে যে বাবার মুখ দিয়ে এমন যন্ত্রণাকাতর সংলাপ তৈরি হয়েছে। ঘটনার পারম্পার্যে এক সময় অন্য একজনের সাথে রাবেয়ার বিয়ে ঠিক হলেও তার বিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যেতে দেখা যায় -

> "মাস্টার কাকা একটা ফরসা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন, বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনার জন্য। পাঁচটায় তাদের আসার কথা, ছ'টা পর্যন্ত কেউ এলো না। জানা গেল কেউ আসবে না। একটি পাগল মেয়ে গছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র তারা কী করে যেন জেনেছে।"[১৬]

এ ঘটনার কিছুদিন আগেই চৈত্র মাসের দারুণ এক উষ্ণ দুপুরে রাবেয়া হারিয়ে গিয়েছিল। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাস্টার কাকা তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এরপরের ঘটনা অত্যন্ত ভয়াবহ সেই সাথে হৃদয় বিদারকও। এই ঘটনার কিছুদিন পর রাবেয়ার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার লক্ষণ ধরা পড়ে মায়ের চোখে। লোক লজ্জায় এবং জানাজানি হবার আশঙ্কায় সম্পূর্ন অগোচরে রাবেয়ার এবোরশন করানো হয় এবং প্রচন্ড রক্তপাতের ফলে রাবেয়ার মৃত্যু হয়। রাবেয়া যেন এই পৃথিবীরূপী নরক থেকে অনন্তের পথে এগিয়ে গেল। কথক খোকার ভাষ্যে -

> "রক্তে মেজে ভেসে যাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এবোরশন নাকি? কাকে দিয়ে কী করালেন? নাকি নিজে নিজেই কিছু খাইয়ে দিয়েছেন?"[১৭]

একটু একটু করে যেন মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে রাবেয়া -

> "বেলা নটায় চুপচাপ মরে গেল রাবেয়া। তখন চারদিকে শীতল ভোরের কী ঝকঝকে আলো।"[১৮]

পরিবার ও তথাকথিত সমাজ থেকে যেন মুক্ত মিলল রাবেয়া নামক নিষ্পাপ ফুলের। মৃত্যুর আগে রাবেয়া হারিয়ে যাওয়া পোষা কুকুর পলা-কে খুঁজেছে। বারবার বুক খালি হবার কথা বলেছে। মৃত্যুর মতো এমন নির্মম ঘটনাকে খোকার ভাষ্যে লেখক হুমায়ূন আহমেদ এত নির্লিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন এটি একটি নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। অথচ রাবেয়ার মৃত্যুর সাথে সাথে যেন পাঠকের হৃদয়াবেগ মিলে এক শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করে।

রাবেয়ার এই করুণ মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি রাবেয়ার ছোট ভাই মন্টু। মন্টু রাবেয়ার মায়ের পেটের ভাই না। তার বাবার প্রথম স্ত্রীর সন্তান। মায়ের পেটের ভাই না হলেও রাবেয়ার প্রতি মন্টুর ভালোবাসার কমতি ছিল না -

> "বারোটার দিকে ফির এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু দিনেদুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালাফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা মাছকাটা বটি দিয়ে।"[১৯]

স্বল্প কথা বলা মন্টু যে মাস্টার কাকাকে খুন করবে তা কেউ কোনদিন ভাবেনি। অথচ মন্টু কর্তৃক মাস্টার কাকাকে খুন করার মধ্য দিয়েই যেন রাবেয়ার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণ ও তার করুণ পরিণতির মূল কারিগর হিসেবে মাস্টার কাকা ওরফে শরীফ আকন্দের মূল চরিত্র উন্মোচিত হয়। হারুনের স্ত্রী নাহার ভাবির সাথে মন্টুর কথোপকথনে যা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

> "রাবেয়ার মৃত্যুর কারণটাতো আপনি জানেন ভাবি। মাস্টার কাকাই হয়তো দায়ী ছিলেন, মন্টু জেনেছিল। অবশ্যি মন্টু বলেনি কিছুই।"[২০]

তবে একটি বিষয় খুব খেয়াল করা যায়, মাস্টার কাকাকে মন্টু খুন করলেও খুনের কারণটা মন্টু কাউকে জানায়নি, এমন কী মাস্টার কাকাকে অশ্রদ্ধা করেও কোনো বাক্য বলেনি। চাপা স্বভাবের এই মন্টু যেন বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিটাকে ঠিক চিনে নিয়েছিল এবং তাকেও অশ্রদ্ধা করতে চায়নি। বরং মন্টু তার অপার সম্ভাবনাময় জীবনকে খুনের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের ট্র্যাজিক হিরোর মতো হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায় -

> "একটি সম্ভাবনাময় জীবন ছিল মন্টুর। সে সাপ মারতে দ্বিধা করে না, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেও কশুর করে না; রাগে উন্মত্ত হয়ে রাবেয়ার মৃত্যুর নেপথ্য কারণ মাস্টার কাকাকেও খুনও করে। শুধু দারোগা-পুলিসের কাছেই নয়, আদালতে বিচারকের সামনে সে যদি সত্যটাকে প্রকাশ করতো তবে হয়তো তার ফাঁসির হুকুম নাও হতে পাররত। কিন্তু তা সে করেনি, মন্টুর শরীরে যত শক্তিই থাক তা বলে সে সমাজ-সত্যটাকে অস্বীকার করেনি। সমাজের কাছে এ পরিবারের সম্মানকে, সামাজিক প্রতিষ্টাকে ম্লান হতে দিতে পারে না। আত্মসম্মানহীন যে জীবন তা তার কাম্য নয়, তাই সে আদালতে দাঁড়িয়েও সামাজিক সত্যটাকে মেনে নেয়।"[২১]

আমরা যদি মাস্টার কাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই আপাত দৃষ্টিতে একজন সাদাসিধে অকৃতদার স্কুল মাস্টারকে যার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি রয়েছে অগাধ জ্ঞান ও আগ্রহ। কিন্তু এই মাস্টার কাকা আসলে পুরো উপন্যাসের সবথেকে রহস্যময় চরিত্র। বাবার কলেজ জীবনের বন্ধু যে কলেজ ছেড়েছিল অনিলা চৌধুরীর প্রতি দুর্বলতা এবং তার সঙ্গে নাম জড়িয়ে অন্য ছাত্ররা 'শকুন মামা ও শকুনি মামী' নাম দিয়ে পদ্য লিখে প্রচার করেছিল বলে। অনিলা চৌধুরীর প্রতি প্রবল প্রেমানুভূতি থাকলেও সে সম্পর্ক পূর্ণতা পায়নি। বন্ধুর পরিবারের সবার সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক থাকলেও মাস্টার তার অতৃপ্ত লিবিডো বা যৌন চেতনার দ্বারা এমনভাবে তাড়িত যে রাবেয়া নামক একটা নিষ্পাপ ফুলকে অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মাস্টারকে খুনের দায়ে মন্টুর ফাঁসি হয়। খোকার ভালো চাকরি হলেও তা যেন পরিবারের কেউই আনন্দে উদযাপন করতে পারে না। একটা গোটা পরিবারের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্খা যেন নিমিষেই নষ্ট হয়ে যায় দুর্ঘটনার। আমাদের চারপাশেও এমন মুখোশধারী লিবিডো তাড়িত ধর্ষকাম পুরুষ চরিত্র দুর্লভ নয়।

মাস্টার কাকা তথা শরীফ আকন্দ কতৃক ধর্ষিত হয় রাবেয়া। বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতার শিকার তরুণী রাবেয়াকে যে তার কন্যাসম; তাকে মাস্টার কাকা নিজের কামনার দ্বারা তাড়িত হয়ে ধর্ষণ করবে এটা কেউ ভাবতেই পারেনি। তার মনোজগতের প্রকৃতি যেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব (১৯০০-১৯৩০) সুপ্তযৌন অবস্থার (লেটেন্সি স্টেজ) কথা মনে করিয়ে দেয়। মনোবিজ্ঞানের সাইকোডাইনামিক রূপটিও পরিলক্ষিত হয় - যেখানে মাস্টার কাকার সচেতন মন অচেতন আচরণের দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়। অকৃতদার মাস্টার কাকা তার অবদমিত যৌন বাসনা নিবৃত্তির জন্য অবুঝ ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার রাবেয়ার ইহ জীবনকে নরক যন্ত্রণার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। সবার চোখের সামনে ভালো মানুষের যে খোলশ পরিধান করে ছিলেন মাস্টার কাকা, খোকার প্রতিক্রিয়া যেন তার সে রহস্যময় মুখোশটি উন্মোচন করে দিয়েছে। মানুষের মনের অবচেতন স্তরের কামনা-বাসনা কতটা ভয়ানক হতে পারে তার বাস্তব চিত্র দেখা যায় মাস্টার কাকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মন্টু কতৃক মাস্টার কাকাকে খুন তাই পাঠকের চিত্তে মাস্টার কাকা কর্তৃক ঘৃন্য অপরাধের শাস্তি হিসেবেই বিবেচিত হয় যার দরুণ মাস্টার কাকার জন্য পাঠকের মনে কোন অনুকম্পা তৈরি হওয়ার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু মন্টুর কথা স্মরণে আসতেই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মতো পাঠকের হৃদয় যেন দুঃখবোধে সমানভাবে আক্রান্ত হয়। মন্টুর বাবার ভাষ্যে -

> "মন্টুর জন্য বুকটা কাঁদে রে। তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠল।"[২২]

মন্টুর বাবার হৃদয়ের এই করুণ চিৎকার যেন পাঠককে অশ্রুসজল করে তোলে; বেদনায় মথিত হয় পাঠকের অন্তকরণ। মাস্টার কাকার কর্মফলে শুধু তার শাস্তিই হয়নি সাথে সাথে মন্টুর ফাঁসির আদেশ এবং এর সাথে সাথে তার গোটা পরিবারের উপর নেমে এসেছে বিষাদের কালো ছায়া। জ্যোতিসশাস্ত্র জেনে গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে মিল রেখে অন্যদের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারলেও নিজের পরিণতি সম্পর্কে কোন ধারণাই মাস্টার কাকার ছিল না। মন্টুর জন্ম নিয়ে মাস্টার কাকার ভবিষ্যৎ বাণী ছিল নিম্নরূপ-

> "মন্টু, যার জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির হোরায় বুধের দ্রোক্কাণে। কাকা বলেছিলেন এ ছেলে হবে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।"[২৩]

হয়তো মন্টু সাহসী ছিল বলেই পরিবারের মর্যাদার কাছে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ফাঁসির দড়ি নিজের গলায় তুলে নিয়েছিল। জীবনকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেবার মতো এমন অসীম সাহস সবার থাকে না। মন্টুর ছিল বলেই উপন্যাসের ক্ষুদ্র ব্যাপ্তির মধ্যেও যেন মন্টুকে ট্রাজিক হিরো বলে ভাবা যায়।

উপন্যাসটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শফিক-শাহানা দম্পতি। ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখ-দুঃখের সংসার তাদের। প্রথম জীবনে শফিক সাহেব বেসরকারি স্কুলের মাসটার ছিলেন পরে ফার্মের অ্যাকাউন্ট্যান্ট হন। অর্থ না থাকলেও আত্ম অহমিকা ছিল যার প্রবল। কথক খোকার বর্ণনায় দেখা যায় তার স্বরূপ -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাবা পেঙ্গুইন পাখির কলমদানি দেখে খুব রাগ করলেন। বাবার পয়সা ছিল না বলেই হয়তো অহংঙ্কার ছিল।শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হতো না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন, অন্যের সুখ সে কারণে সহজভাবে নেওয়ার মানসিকতা ছিল না।"[২৪]

শফিক সাহেবের মানসের একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় খোকার উক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। আত্ম অহমবোধের জায়গাকে ঠিক রাখতে গিয়ে সমাজের ভয়ে যারা হৃদয়ের পুত্তলিকা প্রথমা কন্যাকে অগোচরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কেবল যে রাবেয়ার জীবন বিপন্ন হয়েছে তা নয় রাবেয়ার জঠরে বেড়ে ওঠা প্রাণকে পৃথিবীর আলো দেখারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। রাবেয়ার নির্বুদ্ধি সম্পন্ন কর্মকান্ডে বিরক্ত হয়ে কখনো বা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চিন্তা করেন। তাড়াহুড়ো করে অন্তঃসত্ত্বা রাবেয়াকে বিয়ে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হন - ফলশ্রুতিতে গর্ভপাতের মতো জঘন্য কাজও করে ফেলেন তারা। ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলেও দুটি প্রাণকে যেন একসাথে শেষ করে দেওয়ার দায় কিছুতেই শফিক-শাহানা দম্পতি এড়িয়ে যেতে পারেন না। আবার এক সন্তান-রাবেয়াকে হারিয়ে ফেলার পর আরেক সন্তান মন্টুর ফাঁসির আদেশে পিত হৃদয়ের করুণ আর্তি যেন পাঠকের চিত্তকে গভীর মর্মবেদনায় আচ্ছন্ন করে তোলে। উপন্যাসে এর প্রতিফলন দেখা যায় -

> "ক্রস একজামিনেসনের শুরুতেই বাবা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তিনি শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। সবাই তাকাল তাঁর দিকে। আদালতে মৃদু গুঞ্জন সরব হয়ে উঠল।"[২৫]

স্বল্প কথা বললেও এবং উপন্যাসে বাবা চরিত্রের ব্যপ্তি কম পরিসরে হলেও সন্তানের প্রতি গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ পায় উক্ত মন্তব্যে। লেখকের বর্ণনা ভঙ্গির চমৎকারিত্বে যেন পিতৃহৃদয়ের চিরাচরিত রূপটি পরিলক্ষিত হয়। এখানেই যেন পাঠকগণ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

ছোটবোন রুনুও যেন উপন্যাসটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কিশোরী রুনু যেন লক্ষ্মী মেয়ে। বয়স অল্প হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ধারণা রাখে সে। কবিতা লেখে, ছবিও আঁকে। খোকার ট্রাঙ্কের এক কোণায় তার কবিতা লেখার খাতার খোঁজ পাওয়া যায়। বারোটি কবিতাও খোকা দেখতে পায় সেখানে। মাকে নিয়ে, পোষা কুকুর পলাকে নিয়ে, মন্টুর সাপ মারা নিয়েও সে কবিতা লিখেছে -

> "মন্টু ভাইতো মারলেন মস্ত বড় সাপ
> চার হাত লম্বা সেটি কী তার প্রভাব।"[২৬]

রুনুর এহেন সৃজনশীলতা যেন একটি কিশোরী বালিকার চমৎকার বেড়ে ওঠা ও পেলব হৃদয়ের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও রয়েছে তার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এমনকি পাশের বাড়ির শীলু-নাহার ভাবির সাথেও রয়েছে তার সুসম্পর্ক। পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে কোমল হৃদয়ে কষ্ট পেলেও পরিবারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে দেখা যায় তাকে।

প্রতিবেশি হারুনের মধ্যে রাবেয়া প্রতি দুর্বলতা ও ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়।ভালোবাসা থাকলেও মায়ের শঠ আচরণের কোন প্রতিবাদ করতে তাকে করতে দেখা যায় না। বরং তাকে নির্লিপ্তভাবে খালাতো বোনকে বিয়ে করে ফেলতে দেখা যায় -

> "হারুন ভাইয়ের বিয়ে হল নাহার ভাবির সঙ্গে। তাঁর খালাতো বোন, হোম ইকোনোমিক্সে বিএ পড়তেন। হারুন ভাই জার্মানি চলে গেলেন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি নিতে। আগেই সব ঠিক হয়েছিল। নাহার ভাবি সমস্তই জেনেছিলেন। বিয়ের সাতদিন না পেরোতেই তিনি আমাদের বাসায় এসে সবার সঙ্গে গল্প করলেন।"[২৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তবে নাহার ভাবির আন্তরিকতা দেখে হারুনের প্রতি অভিযোগটি যেন ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। তাদের পরিবারের শীলু ও নাহার ভাবি যেন একবোরেই তাদের মায়ের মতো না। মিষ্টভাষী, সদালপী নাহার ভাবির রয়েছে রাবেয়ার সাথে স্নেহশীল সম্পর্ক। শীলু ও যথেষ্ট সদালপী কিন্তু খোকা তাকে মনে মনে ভালোবসলেও, খোকার প্রতি তার অনুরাগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একদিন তারা বাড়ি (শান্তি কটেজ) ছেড়ে অন্যখানে চয়ে যায় এবং তাদের সম্পর্কে আর বেশিকিছু জানা যায় না।

উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে মন্টুর খোঁজে একটি মেয়েকে আসতে দেখা যায়- নাম ইয়াসমীন। যে মন্টুর সাথেই পড়ে। মন্টু ও ইয়াসমীনের হৃদয়ের লেনা - দেনা হয়েছিল কী না তা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও মন্টুর ও তার পরিবারের প্রতি ইয়াসমীনের গভীর মমত্ববোধ যেন তার ভেতরকার মানবিক রূপটাই প্রকাশ করে।

এভাবেই মধ্যবিত্ত বাঙালি-বাংলাদেশি নর-নারীর ভেতরকার চিন্তা-মননশীলতা আবেগ-অনুরাগ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকট যেন চমৎকার ও সাবলীল ভাষায় তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৭২ সালে নন্দিত নরকে প্রকাশিত হলেও এটি মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে লেখা হয়েছিল। এর নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। আহমদ শরীফের মতে -

> "মাসিক 'মুখপত্রে'র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম 'নন্দিত নরকে' দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবনদৃষ্টি, একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচিছল। লেখক তো বটেই, তাঁর নামটিও ছিল আমার সম্পুর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলাম ঐ নামের মোহেই।"[২৮]

সত্যিই উপন্যাসটির নামকরণে যেন আলাদা একটা ব্যঞ্জনার উপস্থিতি পাওয়া যায়। নন্দিত মানে সুন্দর কিংবা আনন্দিত এবং ধর্মীয় বিধান মতে নরক মানে মৃত্যুর পর পাপীদের শাস্তি লাভের স্থান অর্থাৎ নিকৃষ্টতম স্থান। ফুলে-ফলে সুশোভিত এই সুন্দর পৃথিবী যেন কারো কারো কাছে নরকে পরিণত হয়েছে এই উপন্যাসে। রাবেয়া, খোকা, মন্টুসহ পরিবারের সকলের জীবনই যেন এই নারকীয় যন্ত্রণায় বিদ্ধ। সেদিক থেকে বিপরীতার্থে ব্যবহৃত উপন্যাসের এমন নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা যেন বিষয়বস্তুর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

সরল ও সাবলীল ভাষ্যে কাহিনি প্রকাশ করতে যেয়ে কখনো কখনো প্রতীক রূপকেরও ব্যবহার করেছেন। আরো ব্যবহার করেছেন ঝরঝরে ইংরেজি শব্দের - ইনসমনিয়া (Insomnia), আউটিং (Outing), রাইফেল (Rifles), এবনরমালিটি (Abnormality), সাইকোলজি (Psychology), এবরশান (Abortion), ইনক্রিমেন্ট (Increment), এনেস্থেশিয়া (Anesthesia), হাইড্রোলজির (Hydrology) মতো অসংখ্য ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন যা উপন্যাসের ভাষাকে দূষণীয় না করে বরং পাঠকের চেনা জানা জগতের সাথে একেবারে মিলিয়ে দিয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের নন্দিত নরকে উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গও অত্যন্ত চমৎকারভাবে উঠে এসছে। নিচের বক্তব্যগুলি লক্ষ্য করলে তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

'কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গলের চিহ্ন' (পৃ. ১৮)
'কাকা বললো দেখেছিস কত তারা?
খুব যখন তারা ওঠে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় শুনেছি!' (পৃ. ২৫)
'আমি জেনেছি মীন রাশিতে আমার জন্ম। মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়।' (পৃ. ২৮)

উক্ত সংলাপগুলোর মধ্য দিয়ে জনমানুষের মনে প্রোথিত হয়ে থাকা চিরায়ত লোকবিশ্বাসকে ঔপন্যাসিক খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পরিবারকে যাপিত জীবনের কেন্দ্র হিসেবে আবিষ্কার ও প্রাত্যহিকতার অনুল্লেখ্য আলেখ্যে জীবনকে বিম্বিত করার যে শক্তি কথাশিল্পী হুমায়ূনের প্রধান গুণ, তার পূর্ণ প্রকাশ দেখি এ উপন্যাসে।[২৯]

কাহিনি বর্ণনায় এবং উপন্যাসের নর-নারীর মানস রূপায়ণে হুমায়ূন আহমেদ সিদ্ধহস্ত এর সাথে যুক্ত হয়েছে ঝরঝরে ভাষিক উপস্থাপন। ছোট ছোট বাক্যের বুননে জীবনের খুঁটিনাটি সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-আবেগ, মান-অভিমান, আনন্দ-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষাদের আলেখ্য হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। চরিত্রসমূহের ভেতরকার ও বাহিরের জগৎ চিত্রণে, উপমা-রূপকের প্রাসঙ্গিকতায় লোকবিশ্বাসের বুনন যেন উপন্যাসটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে যেখানে মূল আখ্যানের ভিতর নর-নারীর জীবন জিজ্ঞাসার বাস্তব চিত্রটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে হুমায়ূন আহমেদ তুলে এনেছেন। তিনি তাঁর *নন্দিত নরকে* যে প্রেক্ষাপট ও চরিত্রের মানসপট উপস্থাপন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র সংযোজন। এ উপন্যাসের মাধ্যমে যেন হুমায়ূন আহমেদ এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন।

Reference:

১. হোসেন, সৈয়দ আকরম, ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ’, ১ম সং-১৯৮৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৭
২. চৌধুরি, সিরাজুল ইসলাম, ‘লিঙ্কনের নোটবুক’, ১ম সং- ১৯৯৪, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, পৃ. ৯৬
৩. হালদার, গোপাল, ‘বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা’, ৪র্থ, সং ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, অরুণা প্রকশনি, কলকাতা, পৃ. ২২
৪. ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া, ‘বাঙলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ’, বাংলা একাডেমি-১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৪
৫. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং, ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫১
৬. তদেব, পৃ. ২২
৭. তদেব, পৃ. ১২
৮. তদেব, পৃ. ১৬
৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. তদেব, পৃ. ৬১
১১. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২৬
১২. তদেব, পৃ. ২৬
১৩. তদেব, পৃ. ৯
১৪. তদেব, পৃ. ৯
১৫. তদেব, পৃ. ৩৩
১৬. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৪৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫৪
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬
১৯. তদেব, পৃ. ৫৭
২০. তদেব, পৃ. ৬৯
২১. মিরবর, কল্যাণ, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস (১৯৭১-১৯৮৭)’, ১ম সং-২০২০, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫, পৃ. ৩৫৫
২২. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭০
২৩. তদেব, পৃ. ৭০
২৪. তদেব, পৃ. ৭০
২৫. তদেব, পৃ. ৬৭
২৬. তদেব, পৃ. ৩৮
২৭. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩৭
২৮. তদেব, পৃ. মুখবন্ধ
২৯. আজম, মোহাম্মদ, ‘হুমায়ূন আহমেদ : পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য’, ১ম সং - ২০২০, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৬৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 400 - 410
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ষাটের দশকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে নগরায়ণবাদের প্রভাব

ড. শান্তনু প্রধান
Email ID : pradhansantanu89@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Urban Culture, Urbanism, Civilization, Behavioural response, Density, Way of Life.

Abstract
In urban life, the specific customs and practices of people come to the fore through culture. Urbanism highlights the entirety of that culture and other specialities (money, family, business, education, employment). Through this urbanism, the quality of life, manners and behaviour of a city can be highlighted. And since the novel talks about individuals, the manners, customs, mentality, cultural scope and environment of the people living in the city or town come to the fore. However, here, the city or town life is described as the life of Kolkata. The nature of the impact of urbanization on the Bengali novels centred on Kolkata Post- independence has been highlighted. Although the characteristics of urbanization were observed in the novels of this period, its prevalence increased further after independence. But the picture of anxiety that we observe in families coming from the village to the city and returning due to various political, social and economic reasons in the past is also no less important.

Discussion

এক

নগর জীবনে মানুষের সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি, জীবনচর্চার কথা উঠে আসে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। সেই সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিশেষত্বের (অর্থ, পরিবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান) সমগ্রতাকে তুলে ধরে নগরায়ণবাদ। এই নগরায়ণবাদের মাধ্যমে কোন শহরের জীবন-যাত্রার মান, আচার-আচরণের কথা তুলে ধরা যায়। আর উপন্যাস যেহেতু ব্যক্তি মানুষের কথা বলে, সেহেতু শহরে বা নগরে বসবাসকারী মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, মন-মানসিকতা, সংস্কৃতি এবং তার ব্যাপ্তি ও পরিমণ্ডলের কথা উঠে আসে। তবে এখানে নগর বা শহর জীবন বলতে কলকাতা শহর জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিশেষত ষাটের দশকে কলকাতা শহরকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে নগরায়ণবাদের প্রভাব কতটা পড়েছে তার স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। এই সময় পর্বের উপন্যাসে নগরায়ণবাদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের পালাবদলে নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে পারিবারিক টানাপোড়েন, গ্রাম থেকে শহরে আসা আবার পুনরায় ফিরে যাওয়ার যে চিত্র আমরা লক্ষ করি তার গুরুত্বও কম নয়। তবে এই আলোচনার পূর্বে 'নগরায়ণবাদ' সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নগরায়ণ এবং নগরায়ণবাদের সম্পর্ক : সমস্ত বিশ্বব্যাপী নগরের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে ব্যাপক হারে নগরের বৃদ্ধি এবং নগরায়ণ দু'টি এক কথা নয়। বিশ্বের বৃহৎ নগর সাংহাই, বম্বে এবং কায়েরোকে এখনো গ্রামীণ সমাজের আওতায় ফেলা যায়। শুধুমাত্র একটি বৃহৎ নগরকেই Urbanization বা নগরায়ণের আওতায় নেওয়া যায় না। সাধারণ অর্থে Urbanization বা নগরায়ণ হল লোকজনের নগরে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া (The process of people moving to Cities)।[১] Urbanization প্রত্যয়টির দ্বারা সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তনকেও নির্দেশ করে। আর এটাই জনসংখ্যাকে কেন্দ্রীভূত করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামীণ বসতি ভেঙে নগর বসতিতে রূপান্তরিত হয়। জনতাত্ত্বিক দিক থেকে নগরায়ণ হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একে কাঠামো ও কার্যক্রমের রদবদল বলা চলে। জনতাত্ত্বিকভাবে (Demographically) নগরায়ণ দু'টি উপাদানকে[২] সংযুক্ত করে -

১. চিন্তনের স্থিরতা, গুণন বৃদ্ধি;

২. ব্যক্তির কেন্দ্রীভূত করণের আকার বৃদ্ধিকরণ।

অন্যদিকে, Urbanism বা নগরায়ণবাদ হল নগরায়ণের পরিণতি বা ফসল। যার সঙ্গে জনগণের মূল্যবোধ, প্রথা ও আচার-আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদি জড়িত। অর্থাৎ নগরায়ণবাদ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের আচরণগত প্রক্রিয়া (behavioural respons)। ধারণাগত ভাবে নগর-মানসিকতা, নগর জীবনের সমাজ - মনবৈজ্ঞানিক দিক (Socio - Psychological)। নগর ব্যক্তিত্বের আকার এবং আচরণগত অর্থে নগরায়ণবাদ একটি জীবন ব্যবস্থা (Way of life)। তা শহুরে জীবন ব্যবস্থা (City of life), নগরের সামাজিক পরিবেশ এবং শহরের জীবনের ধরনকে গুরুত্ব দেয়।

নগরায়ণ ও নগর-মানসিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল প্রত্যয় বা অভিধা। নগরায়ণ ছাড়া যেমন নগর-মানসিকতার উপস্থিতি অসম্ভব আবার নগর - মানসিকতা ছাড়া নগরায়ণের প্রক্রিয়া প্রায় অচল। নগর - মানসিকতাই নগরায়ণের স্বাভাবিক গতিকে ত্বরান্বিত করে থাকে। এ দু'টি প্রত্যয় আবার গভীর সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। নিম্নের আলোচনায় এ দু'টি প্রত্যয়ের কয়েকটা সম্পর্ক উপস্থাপন করা যেতে পারে—

ক. উপাদানগত : নগরায়ণ নগরের আকার, সীমা, সংখ্যা বা পরিমাণকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ নগরায়ণ পরিমাণগত উপাদান। অপরপক্ষে, নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতা হলো গুণগত উপাদান।

খ. অবস্থানগত : নগরায়ণ বলতে নগরের বাহ্যিক দিককে বোঝায়। নগরের রাস্তাঘাট, অট্টালিকা, স্থাপত্যের শিল্প নিদর্শন, অফিস-আদালত, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হচ্ছে নগরায়ণের দিকে। অপরপক্ষে, নগর-মানসিকতা বলতে নগরবাসীর মন-মানসিকতা বা তাদের জীবন দর্শনকে ইঙ্গিত করে।

গ. জীবনপ্রণালীগত : এই মন-মানসিকতা নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। আধুনিক নগর সমাজে বসবাস করার ফলে নগর জীবনযাত্রা প্রণালীর এমন একটি রূপরেখা গড়ে উঠে বা নগরবাসীকে পৃথক সত্তা প্রদান করে। প্রকৃত নগর-মানসিকতা নগর সভ্যতার ইতিবাচক একদিক। চলন-বলনে, আচার-আচরণে, কাজে-কর্মে, চিন্তায়-ধ্যাণে নগরবাসীর মনে এমন স্টাইল সৃষ্টি হয় যাকে নগর-মানসিকতা বলা হয়।

ঘ. সংস্কৃতিগত : নগরায়ণ যেন বস্তুগত সংস্কৃতিক বিকাশ আর নগর-মানসিকতা যেন অবস্তুগত সংস্কৃতির দিক। প্রথমটি সভ্যতা (Civilization) এবং দ্বিতীয়টি সংস্কৃতি (Culture)। প্রথমটি মূর্ত এবং দ্বিতীয়টি বিমূর্ত এক জীবনযাত্রা প্রণালী।

ঙ. প্রেক্ষাপটগত : নগরায়ণ ছাড়া নগর-মানসিকতা সম্ভব নয়। আবার নগর মানসিকতাহীন নগরকে প্রভৃতপক্ষে নগর সভ্যতা বা নগর সমাজ বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। এই কারণেই বলা যায়, নগরায়ণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেলেও নগর-মানসিকতা মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পায়। এটা ঠিক অগবার্গের সাংস্কৃতিক ব্যবধান বা Cultural lag তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কেননা, নগর হলো বস্তুগত সংস্কৃতির দিক যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় আর নগর-মানসিকতা অবস্তুগত বা মন-মানসিকতার দিক যা মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পায়। ফলে, Lag-এর সৃষ্টি হয়। উন্নয়নকামী অনেক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেশই নগরায়ণ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় নগর-মানসিকতা আছে পিছিয়ে। তদুপরি অনেকেই আকস্মিক অর্থ-বিত্তের সুবাদে নগরে বসবাস শুরু করে বটে তবে তাদের মধ্যে প্রাক্-নগর জীবনের বৈশিষ্ট্য এতই প্রাধান্য পায় যে, নগর সভ্যতার ফল ভোগ করেও নগর-মানসিকতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন বা এতে অনেক সময় নেয়।

চ. প্রভাবগত : এটা একেবারে অসম্ভব নয় যে, কিছু নগরবাসীর তুলনায় গ্রামবাসী কিছু ব্যক্তির মধ্যে নগর-মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে। গ্রামীণ শিক্ষিত মানুষ দূরদর্শন, পত্র-পত্রিকা, তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদি গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নগর-মানসিকতা অর্জন করতে পারে। আবার শহরে কিছু অধিবাসীদের মধ্যে গ্রামীণ মানসিকতা প্রধান্য পেতে পারে এবং নগর-মানসিকতার অভাবও দেখা দিতে পারে।[৩]

নগরায়ণবাদ (Urbanism) :

ক. সংজ্ঞা : নগরায়ণের চলমান প্রক্রিয়ার ফসল হল গ্রাম সমাজের সদস্যদেরকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ, রুচিবোধ পরিবর্তন সাধন করা, যাতে গ্রামে সমাজের সদস্যরা নগরের জীবন ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে পারে। নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন এ উপলব্ধি থেকে ১৯৩৮ সালে Louis wirth, 'urbanism' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন 'Urbanism as a way of life.' সাধারণভাবে বলা যায় যে, নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতা হল এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা গ্রাম ও শহরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকে নির্দেশ করে। বিশেষভাবে বলা যায় যে, বৃহৎ নিবিড় বা সামাজিকভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের স্থায়ী বসবাস হিসাবে। তিনি বলেন —

> "নগরায়ণ-এর এসব উপাদান, আকার, ঘনত্ব এবং বিভিন্নতা হচ্ছে স্বাধীন চলক যা একটি আলাদা জীবন পন্থা সৃষ্টি করে থাকে তাকে নগরায়ণবাদ বলা হয়।"[৪]

নগরতত্ত্ববিদ Hogyt উল্লেখ করেছেন যে—

> "নগরের সদস্য হিসেবে একজন মানুষ যে সমস্ত আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রুচিবোধ, অভ্যাস শিখে থাকে এবং নগরের সদস্য হিসেবে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে সে সবের সমন্বিত রূপই হল নগর-মানসিকতা।"[৫]

চন্দ্র শেখর ভদ্র বলেন —

> "Urbanism is a style of life."[৬]

শ্রী নিবাস উল্লেখ করেছেন যে —

> "নগর-মনিসিকতা হলো নগরজীবন যাপন প্রণালির এমন একটি রূপরেখা যা নগরবাসীকে পৃথক সত্তা প্রদান করে এবং যার প্রভাব নগরবাসীদের উপর পড়ে থাকে।"[৭]

এডওয়ার্ড সাঈদ উল্লেখ করেছেন যে—

> "নগর-মানসিকতা হলো নগর সংস্কৃতির ও সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ যা মানুষ নগরে বসবাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে থাকে।"[৮]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতা হল নগরায়ণ প্রক্রিয়ার এমন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষ নগরের সদস্য হিসেবে বসবাস করতে গিয়ে নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় এবং নিজেকে গ্রাম সমাজের সদস্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানী Robert Bierstedt তাঁর 'The Social Order' (1957) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন —

> "It is best, perhaps, of follow Begal, who refers to urbanization as a process and urbanism as a condition... urbanism is the condition that results forms this process."[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবশ্য যারা নগরে বাস করছে তারা পুরোনো সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে নতুন সম্পর্ক গড়ছে নিত্যনিয়ত। মানুষকে না চিনেও মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তবে এই নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতাকে উইলিয়াম বেসকন সমর্থন করেছেন। নগরায়ণবাদকে গুণগত সম্পূরক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। গ্রাম ও নগরের নানাবিদ্‌রূপের বর্ণনা করার জন্য। এ সম্পর্কে Kamal Saroop Srivastava 'Urban Sociology' গ্রন্থে পাঁচটি[১০] ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন —

(Urbanism) নগরায়ণবাদ
1. Informal Urbamism (লৌকিকতা বর্জিত নগরায়ণবাদ)
2. New Urbanism (নব্য নগরায়ণবাদ)
3. Self-sufficient Urbanism (স্বয়ং সম্পূর্ণ নগরায়ণবাদ)
4. Sustainable Urbansim (সুস্থায়ী নগরায়ণবাদ)
5. Centralized or ecentralized Urbanism (কেন্দ্রিভূত/অকেন্দ্রীয় নগরায়ণবাদ)

খ. বিশেষত্ব : লুইস ওয়ার্থ তাঁর প্রবন্ধে নগরায়ণবাদের কয়েকটি বিশেষত্ব বা গুরুত্বের[১১] কথা বলেছেন। যথা —

১. সমকালীন শহর সভ্যতা (The City And Contemporary Civilization)
২. নগরের সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা (A Sociological Defination of the City)
৩. নগরায়ণবাদ তত্ত্ব (A Theory of Urbanism)
৪. জনসংখ্যার আয়তনগত সমষ্টি (Size of the Population Aggregate)
৫. জনঘনত্ব (Density)
৬. বর্ণসঙ্করতা (Heterogeneity)
৭. নগরায়ণবাদের বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত প্রেক্ষিত (Urbanism in Ecological Perspective)
৮. সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে নগরায়ণবাদ (Urbanism as a form of Social Organization)
৯. শহুরে ব্যক্তিত্ব এবং যৌথ আচরণ (Urban Personality and Collective Behavior)

এই কয়েকটি বিশেষত্বের মাধ্যমে নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতার স্বরূপ জানা যায়।

লুইস ওয়ার্থ তাঁর তত্ত্বে বলেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব (Density) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং বর্ণসঙ্করতা (Heterogeneity) দেখা দেয়। Herbent Gens-এই মতের সমর্থন করেন না। তিনি ১৯৬৮ সালে একটি প্রবন্ধে শহরের কেন্দ্রীয় সামাজিক পরিকাঠামোর উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সম্পূর্ণভাবে কোনো শহরের উপর বর্ণসঙ্করতাকে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা যায় না। তিনি মনে করেন যে, পরিবার বা প্রধান সম্পর্কগুলোর পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ প্রতিবেশীদের সম্পর্ক কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। ১৯৮৪ সালে Clause S. Fischer (ক্লড. এস. ফিসার) নগরায়ণবাদের তত্ত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, সংখ্যার ঘনত্ব, বর্ণসঙ্করতা, অস্কার লুইস এবং হাবার্ট গেনস-এর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র। ফিসার মনে করেন যে, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং আয়তন থেকে উপসংস্কৃতির জন্ম হয়। সংক্ষেপে বলা চলে ওয়ার্থের বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত এবং নিয়তিবাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, গেনসের জনমিতিক (Demographic) এবং রচনামূলক ও ফিসারের তত্ত্ব উপসংস্কৃতিমূলক বিষয়ের সন্ধান দেয়।[১২]

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের সমগ্র জীবনবোধ ও মানসিকতা দাঁড়িয়েছিল অস্পষ্ট বিদ্রোহের সুর এবং দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি জনিত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের ওপরে। কলকাতা এবং সন্নিকটবর্তী মফঃস্বলকে অবলম্বন করে তখন জীবনের দু'টি ধারা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১৩] ভাষায় —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এক. কলকাতাকেন্দ্রিক দেওয়ান মুৎসুদ্দি প্রভৃতি বর্ণমর্যাদাচ্যুত নব্য বড়লোক শ্রেণি-তাদের সমস্ত বাবুয়ানি-বিলাস-ব্যভিচারাদির চিত্র;

দুই. অন্যদিকে, ছিল দুর্বল এবং প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন পুঁথি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিদ্যাব্রতী সমাজ। যা হুতোমের বিবরণে, 'নববাবুবিলাস'-এ এবং বঙ্কিমের 'লোকরহস্য'-এ এর প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা গেছে। তবে কলকাতা শহরের গুরুত্ব ছিল নানামুখী। একদিকে, সামাজিক বিভিন্ন অভিঘাত এবং অন্যদিকে, জীবন-জীবিকার সন্ধানে নানা জায়গার মানুষ এই শহরে এসে ভিড় করতে থাকে। যখন থেকে গ্রামের মানুষেরা এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল আর তখন থেকেই তাদের মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ লাগল। গ্রামীণ সংস্কৃতি ছেড়ে তারাও নাগরিক সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল। শিখতে শুরু করল নাগরিক আদপ-কায়দা। এতদিনের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণাকে যে জলাঞ্জলি দিতে শুরু করল এর চিত্রও আমরা পাই। সবাই যে নাগরিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল এমনটাও নয়, আবার অনেকে নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে গ্রামেও ফিরে গিয়েছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনকালে কলকাতা নগর স্থাপন এবং নগরায়ণের মাধ্যমে তার প্রবৃদ্ধি এবং নানান রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে কলকাতার জনজীবন ব্যহত হয়। উনিশ ও বিশ শতকে কখনো বিধবা-বিবাহ বা বাল্যবিবাহের মতো সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, কখনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বা বঙ্গভঙ্গ, কখনো প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোলাচলতা, কখনো মন্বন্তর, কখনো দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো ঘটনায় শহর কলকাতায় নেমে আসে নানা অবক্ষয় ও বিপর্যয়। তবুও এই নগরের প্রতি মানুষের চিরন্তন আস্থা জাগ্রত। এই শহর ও শহরকেন্দ্রিক মানুষের মন ও মানসিকতার চিত্র স্বাধীনতা-পরবর্তী বিশেষত ষাটের দশকের নানা ঔপন্যাসিকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে কলকাতাকেন্দ্রিক রচনা সৃষ্টি ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিকদের দু'টি বিশেষত্ব গড়ে উঠেছে—

প্রথমত : সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে শহর কলকাতার জীবন দর্শন।

দ্বিতীয়ত : বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতের আধারে পূর্বের শহর কলকাতার জীবন দর্শন।

মানব জীবনের এই জীবন্ত দলিল নগরায়নবাদের প্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিকের কলমে কতটা সার্থক রূপায়িত হয়েছে, তা এবার আলোচনা করা যেতে পারে —

উপন্যাসে শহর কলকাতা : দেশভাগ-পরবর্তী নগর জীবনের নানান টানাপোড়েন, ক্যাম্পে থাকা মানুষের দুর্বিসহ চিত্রের পাশাপাশি নারীদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের সুনিপুণ চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নাগরিক জীবনের আচার-আচারণ, নারীদের স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা, বস্তি জীবনের মানুষের মন-মানসিকতার চিত্র উপন্যাসে যে বারে বারে প্রতিফলিত হয়েছে তা তাঁর উপন্যাসগুলি আলোচনা করলেই বোঝা সম্ভব—

ক. বে-আইনী জনতা (১৩৫৮/ ১৯৫১)

অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর অনেক উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের সমাজ-বাস্তবতার রূপটি পরিবেশন করলেও দেশভাগ সমকালীন উদ্বাস্তু নগর জীবনের বাস্তব দলিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'বে-আইনি জনতা' উপন্যাসের মধ্যে। তিনি নিজেও ব্যক্তি জীবনে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে চলে এসেছিলেন। তাই জীবনের সেই ভগ্নবেদনা এবং কলকাতা শহরে এসে তার যে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন তার-ই মরমি পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করলেন এই উপন্যাসে। শহরের কেন্দ্রে উচ্চবিত্ত মানুষের বসবাসের চিত্রের সঙ্গে জনঘনত্বের তারতম্যের কারণে যারা শহরের মধ্যে আশ্রয় পেল না তারা বাধ্য হল শহরের প্রান্তীয় অঞ্চল অর্থাৎ বস্তি জীবনে আশ্রয় গড়তে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনেক উপন্যাসেই আমরা এই নগরজীবনকেন্দ্রিক বস্তি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং শহুরে মন-মানসিকতার কথা চিত্রিত হতেও দেখেছি। তবে নগর জীবনে এসেও ছিন্নমূল মানুষের সুদিনের বদলে যে দুর্দিন নেমে এসেছে তার কথাই এখানে যেন মর্মমুখী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক আমিরণকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষের টানাপোড়েন লক্ষ করা গেছে। আমিরণ এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে। খুব অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয়েছিল এক অবস্থাসম্পন্ন বাড়িতে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পর বাড়িতে নতুন সতীন এলে তার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। বাধ্য হয় সে ঘর ছাড়তে। তার পর থেকে আমিরণ নিজে কালোবাজারে চাল বিক্রি করে ছেলে গৌর-নিতাইসহ কাঙাল নন্দীকে দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নন্দী মারা গেলে তাকে সৎকারের অর্থও সংগ্রহ সে করতে পারেনি।[১৪] একের পর এক পরিবেশ-পরিস্থিতি আমিরণের জীবনকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। এই আমিরণ চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এর পাশাপাশি সর্বহারা কুলসম, কুট্টি, সাখিনা, যুঁই-র মতো মানুষের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ যারা আমিরণের চারপাশে বৃত্তের আকারে রয়েছে তাদেরও জীবনে লক্ষ করা গেছে একটি অতীত জীবনের বাতাবরণ। যেখানে তারা সমাজের অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্তদের বা ক্ষমতাবানদের হাতে বারে বারে পর্যুদস্ত হয়েছে। অবশেষে গ্রামের জীবন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অভাব-অনটনের তাড়নায় শহরে এসে নাম লিখিয়েছে বেআইনি জনতার ভিড়ে। তারপর শুরু হয় নগর জীবনের আর এক জটিল অধ্যায়। এখানেও নানা ধরনের আর্থিক ক্ষমতাবান মানুষরা পুনরায় এদেরকে অত্যাচার ও শাসন-শোষণ করতে চাইলে এরা সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে। নগরের এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষের স্বার্থপরতার পাশাপাশি নগর দারিদ্র্য এবং মন-মানসিকতা ও নাগরিক বস্তি জীবনের যে মর্মাহত জীবন চিত্র ফুটে উঠে তার মূল্য সত্যিই অপরিসীম। এই উপন্যাসের সমালোচনায় 'সত্যযুগ' পত্রিকার ১৪শে চৈত্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে বলা হয়েছে —

> "শহর কলকাতার বস্তি জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস। কিন্তু এটা তথাকথিত বস্তি সাহিত্য নয়, বা গল্পের বকলাস কোন থিয়োরীও প্রচার এখানে লেখক করেননি। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার অক্টোপাশে আটকে পড়া একদল সর্বহারা নরনারী শিশুর জীবন সংগ্রাম-নতুন জীবনে উত্তরণের আশাবাদী বলিষ্ঠ সংগ্রাম-ই এই উপন্যাসের মূলকথা।"[১৫]

খ. মন্থন (১৯৫৪)

'বে-আইনী জনতা' উপন্যাসের মতো অমরেন্দ্র ঘোষের 'মন্থন' উপন্যাসেও কলকাতা শহরকেন্দ্রিক উদ্বাস্তু জীবনচর্চা ও জীবন সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব এসে পড়েছে শহরের কারখানাগুলিতে। এরকমই এক ছোটসাহেবের কারখানার শ্রমিকরা নিজের প্রাপ্ত অধিকারের অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি ও বোনাসের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। প্রধান চরিত্র মন্মথ সরল সাধারণ মানুষ হয়েও সকল শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি তার সমবেদনা জেগেছে। এই মন্মথ দেখেছে সমাজে আর্থিক ক্ষমতার বলে কীভাবে ছোটবাবুর মতো মানুষরা মল্লিকা, সন্ধ্যা ও মৃদুলার মতো সর্বহারা নারীদেরকে নিজের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। নারীরা ক্রমশ যে পণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে তার কথাও কলকাতা শহর জীবনের প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে। উপন্যাসে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই মন্মথ এই স্বাধীনতাকে 'ধাপ্পাবাজি' বলে আখ্যা দিয়েছে। অবশেষে এই অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করতে না পেরে ছোটবাবুর বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ সম্মিলিত হয়ে প্রতিবাদ মিছিলে করেছে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক নগর জীবনে শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্ত অধিকারের কথা বলতে গিয়ে সংগ্রামের পথেই যে তাদের আশা পূরণ হবে সেই বক্তব্যকেই এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গ. ঠিকানা বদল (১৯৫৭)

অমরেন্দ্র ঘোষের শহর জীবনের প্রেক্ষাপটে এবং উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তের জীবন-সংকটের কথা উঠে এসেছে 'ঠিকানা বদল' উপন্যাসটিতে। ঔপন্যাসিক তাঁর নিজের উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতাকে অহল্যা চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। ঔপন্যাসিক যেমন অসহায় অবস্থায় সপরিবার নিয়ে এদেশের ব্যারাকে হাজির হয়েছিলেন তেমনি উপন্যাসে অহল্যাও দুর্বিসহ অবস্থায় হাজির হয়েছে ব্যারাকে। যদিও সে কিছুদিন পূর্বে তার পঙ্গু স্বামীকে ছেড়ে এই শহর কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছে। এই ব্যারাকে যারা স্থান পেয়েছে তারা কোনো না কোনো ভাবে পূর্বের ঠিকানা বা আশ্রয়কে হারিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। এখন আর অহল্যাকে কালীঘাটের অস্বস্তিকর পরিবেশে আর থাকতে হয় না। এখানে এসে সে ফুলদির সহায়তায় তার ভাইপো সত্যবন্ধুর শুশ্রূষাকারিণী হিসেবে কাজ পেয়েছে। আর এই শুশ্রূষাকে কেন্দ্র করে অহল্যা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং সত্যবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে।[১৬] ফুলদি সব কিছু জেনেও কিছু করতে পারে না। অহল্যার সঙ্গী পটলও সব সময় অহল্যাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। এমনকি তার সাধ্য মত আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়। পটল নিজে বারবণিতা হলেও অহল্যাকে এই কাজে না নামিয়ে অন্য কাজ জোগাড় করে দেয়। এই উপন্যাসে যেমন নগরের জনঘনত্বের চিত্র লক্ষণীয় তেমনি উদ্বাস্তু মানুষের মন-মানসিকতা, কর্ম-প্রতিযোগিতা, নারীর স্বনির্ভরতা চিত্রটিও বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সবশেষে দেখা গেছে, অহল্যার স্বামী সুস্থ হয়ে কলকাতা শহরে এসে অহল্যাকে খুঁজে বের করে এবং নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। এইভাবে দেশভাগের করাল ছায়া এই সকল উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনে কীভাবে বিপর্যয় ঢেকে এনেছিল এবং কলকাতা শহরে এসে তারা টিকে থাকার জন্য যে সকল পথ অবলম্বন করেছিল তার-ই বাস্তবময় চিত্র যেন ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন অমরেন্দ্র ঘোষ এই উপন্যাসে। তিনটি উপন্যাস সম্পর্কে তারক সরকার বলেছেন—

> “রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ হয়েছে; কিন্তু সেই বিভাগোত্তর সময়ে দেশত্যাগী মানুষের সার্বিক দুর্ভাগ্যের কাহিনি রচনা করেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ তার তিনটি উপন্যাসে।”[১৭]

মহানগরী (১৯৫১) এবং কানাগলির কাহিনী (১৯৫৫)

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কলকাতার কানাগলির কথকতা তুলে ধরতে দুই ঔপন্যাসিক, সুশীল রঞ্জন জানা এবং অচ্যুৎ গোস্বামী সক্ষম হয়েছেন ‘মহানগরী’ ও ‘কানাগলির কাহিনী’ উপন্যাসদ্বয়ের মাধ্যমে। ‘মহানগরী’ উপন্যাসটি ১৩৫৫ সালে বৈশাখ মাসে ‘অগ্রণী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ১৯৫১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১৮] উপন্যাসটিতে গ্রাম ও শহরের রৈখিক ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র লক্ষ করা গেছে। এর প্রথম পর্বের নামকরণ করা হয়েছে ‘কানা-গলি’। ট্রেনের মধ্যে অবৈধ সন্তান কোলে দিয়ে ভিক্ষা করা মেয়েটির যৌবনতা যেন ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক সুধীরের গন্তব্য এই শহরের কানাগালি। ঔপন্যাসিক এই কানাগলির মধ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত একদল মানুষের জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব ও টানাপোড়েনকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। এই গলির মধ্যে লুকিয়ে আছে নগর জীবনের অন্তগূঢ় রহস্য ও মর্মান্তিক বেদনা। সুধীন এই কানাগলিতে বসবাসকারী অনেকের জীবনের ভাঙা-গড়াকে প্রত্যক্ষ করেছে। দারিদ্র্যের জন্য জয়ন্তীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক বারে বারেই নতুন করে মোড় নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইংরেজ সৈনিকরা তাদের চাহিদা মিটিয়েছে এই কানাগলিতে এসে। অন্যদিকে, কলকাতার নাইট ক্লাব চৌধুরী রেস্তোরার মধ্যে তৎকালীন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পানশালী মানুষদের অন্ধকারময় জগতের ছবির পাশাপাশি পানশালায় উপস্থিত জনি, চৌধুরী, হরিশ দত্ত, সুধীর, পাছাভারি গোল মেয়ে প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন রূপের চিত্র ও মানসিকতা লক্ষ করা গেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের চরম সঙ্কট কেরানি হরেনের সাংসারিক টানাপোড়েন, জয়ন্তী, পারুল ও মাধুরির প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম, বাসুদেবের দিন বদলের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এই কাহিনি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর এই কানাগলির জীবন্ত কাহিনির নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুধীর। সময় পরিবর্তিত হলেও শুধু পরিবর্তন হয়নি এই কানাগলিটার। যা উপন্যাসের শেষে সুধীরের কথায় স্পষ্ট —

> “দুনিয়া জুড়ে কত পরিবর্তন এসেছে- পরিবর্তন হয়নি শুধু দীর্ঘ এই কানা- গলিটার। তবু অন্ধকার সরু এই পথটা দিয়েই এসেছে তার জীবনে স্বপ্নের তরঙ্গ, কত দিনের পর দিন! সব কি ব্যর্থ হয়ে গেছে? মন বলে তার না, কিছুই সে ব্যর্থ হতে দেবে না। অবিশ্বাসী লোক একটার তুচ্ছ সেই পুরানো হিসেব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন হিসেব মেলাবে সে আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে সংগ্রাম দিয়ে।”[১৯]

অন্যদিকে, অচ্যুত গোস্বামীর ‘কানাগলির কাহিনী’ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একদল বাস্তুহারা মানুষের নিপীড়নের কাহিনি নগর কলকাতার আলেখ্যে রচিত হয়েছে। রায় বাহাদুর নামে পরিচিত এক জমিদারের বাগান বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে দীপঙ্কর, কালীনাথ, সুধীন, মনোরম, কল্যাণ, ধরনী, পটল, অটল সকলের পরিবার একটি করে ঘর নিয়ে কোনো রকমে মাথা গুঁজে দিন অতিবাহিত করছে। কিছুদিন পর বাড়ির মালিক সেই বাড়ি খালি করানোর জন্য প্রশাসনকে নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সকল মানুষদের পরিস্থিতি দেখলে আমাদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পটির কথা স্মরণে আসে। সেখানেও উদ্বাস্তু মানুষেরা এই আশ্রয়কে কেন্দ্র করে নানান জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এই উপন্যাসে বাড়ির মালিককে খুশি করার জন্য প্রতিটি পরিবার কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে অল্প কিছুর টাকার বিনিময়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মালিকের সঙ্গে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও মালিক তাতে রাজি হয় না। তাই কোনোকিছু উপায় না থাকায় উদ্বাস্তু মানুষেরা পুনরায় এই শহর জীবনে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। রায় বাহাদুরের বাড়ির দোতলায় আশ্রয় নিয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসা ভদ্র পরিবারগুলি। আর নিচের তলায় বসবাস করত ধোপারা। এই ধোপাদের মধ্যে লক্ষ্মণ অন্য মানসিকতার মানুষ ছিল। এরা ঢাকায় থাকাকালীন এদের প্রতিবেশীদের নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করত। এখানে এসেও রায়বাহাদুরের বাড়িতে একই সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে। নিম্নবিত্ত এই পরিবারগুলি নিজেদের অন্নের জোগাড় তাড়াতাড়ি করতে পারলেও উপরের মানুষগুলো জীবন ও জীবিকার সমস্যায় ভুগেছে। তাই পাকিস্তানের কংগ্রেস নেতা কল্যাণ সেনের স্থায়ী কোনো রোজগার সে দেশেও ছিল না, এ দেশে এসেও নেই। কল্যাণবাবু একটি কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা করলে তা কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তাই সরকারি সাহায্যে 'কলিয়ারি' করার চেষ্টা করে। সেই ঋণ মঞ্জুর হলেও ঠিকানা বদলের কারণে সেই টাকা আর সে পায়নি। তাই কল্যাণবাবুর স্ত্রী মনোরমার শেলাই করা উপার্জনের টাকা দিয়ে বহু কষ্টে দিন অতিবাহিত করে। আবার অটল এই দেশে এসে স্বল্প মূলধনে কাপড় ফেরির কাজ করে। পরে সরকার থেকে কিছু সাহায্য পেলে কাপড় দোকান করে এবং বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে সংসার চালায়। এরকমই এক নারী সুধা যে মেট্রিকুলেশন পাশ করেছে, তার স্বামী ধরণী অসুস্থ হলে ভাসুরের দেওয়া তিরিশ টাকায় তাদের সংসার চলে। এই নারী মনোরমার মতো স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ, উদ্বাস্তু ঋণ, অন্যান্য ঋণের জন্য বহু ছোটাছুটি করেও যখন কোনো কাজ জোগাড় করতে পারেনি তখন নিজেই স্বল্পকালের জন্য দেহ ব্যবসায় নেমেছে।[২০] সে এই কাজে উপার্জিত টাকাকে ভাসুদের দেওয়া তিরিশ টাকার চেয়ে নায্য বলে মনে করেছে। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে সমিতিতে সেলাইয়ের কাজ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেছে। এই উদ্বাস্তু মানুষেরা নিজেদের এই পরিস্থিতির জন্য কোনো অংশেই দায়ী নয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে এই দেশ ধর্মীয়ভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। ফলত, এদেশে আগত ছিন্নমূল বাস্তহারা মানুষেরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিভিন্ন অত্যাচার অবিচারকে মানতে তারাই বাধ্য হয়েছিল। সরকার তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেলও সঠিক সময়ে তা কার্যকরী না হওয়ায় অকালে বহু মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এইরকম এক মর্মভেদী জীবন বীক্ষা নগর দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করলেন অচ্যুত গোস্বামী। তাই বলতেই হয়, এই কালপর্বের প্রেক্ষাপটে নগর জীবনের বাস্তুহারা মানুষদের সমগ্রতাকে দুই ঔপন্যাসিক দু'ভাবে শিল্পের আঙিনায় নির্মাণ করেছেন।

তৃতীয় ভুবন (১৯৫৭)

স্বাধীনতা-পরবর্তী কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মন-মানসিকতা এবং শহুরে সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। নগর জীবনের বর্ণসংকরতা, সম্পর্কের শিথিলতা এবং নগর দরিদ্রের কথা তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক 'তৃতীয় ভুবন'[২১] উপন্যাসটিকে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে জয়তীর মাধ্যমে তিনটি ভুবনের কথা আমরা জানতে পারি—

ক. জয়তীর ব্যক্তিজীবন;
খ. জয়তীয় কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত;
গ. জয়তীয় প্রেম সাধনা।

এই ত্রিমুখী সমন্বয়ে এবং শহর পরিবেশের গড়ে উঠেছে 'তৃতীয় ভুবন'। এই উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে 'নতুন সাহিত্য' শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'তৃতীয় ভুবন' মূলত জয়তীর মনের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্বের সংঘাত। এই সংঘাত তার এসেছে শহরের শিক্ষার প্রভাব, যুক্তি-তর্ক মানসিকতা এবং নারীত্বের জাগরণ থেকে। জয়তীর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যেন নগর সমাজের বিশেষ দিককে তুলে ধরা চেষ্টা করেছেন। জয়তী প্রাচীন মূল্যবোধ, সংস্কার, ধর্মের গোঁড়ামিকে অতিক্রম করে একটি সর্বজনীন সম্প্রীতির আদর্শকে গড়তে চেয়েছে। জয়তী স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী। পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগেই তাকে নিতে হয়েছে বাড়ির দায়িত্ব। তাই সে সকালে একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করে এবং দুপুরে কলেজে যায়। কলেজে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গেও সে যুক্ত। আর একটি বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে বিরাজমান। একজন মুসলমান ছেলে আসাদকে সে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা শুধুমাত্র একটা সম্পর্ক নয়, সমস্ত গোঁড়ামিকে দূর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে, ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার আশা। এই আশা সে রাখতে পেরেছে শহর জীবনে বসবাসের কারণে। শহর জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের প্রভাব অনেকটাই কম লক্ষ করা যায়। জয়তীর বাড়ির পরিবেশ পরিস্থিতিও ঠিক নেই। কারণ ৪৬-এর দাঙ্গায় তার দাদা মারা গেছে এবং তার দিদি তপতী নিচু জাতের ছেলে রমেনকে বিবাহ করায় বাড়ির সকলে তাকে খারাপ ভেবেছে। একটি ঘটনা পারিবারিক পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছে—

> "জীবনে নতুন অবস্থা এসেছে। সেই অবস্থার প্রভাব মনে পড়েছে সেই প্রভাব চৈতন্যকে কিছু নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই নতুন অবস্থা আর পরিবেশ দিদির জীবনে নতুন পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করতে পারে। কারণ জীবন প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বাড়ে। কিন্তু যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে সে এই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে, তা তো বদলায়নি। জয়তী জানে, বদলাতে পারে না।"[২২]

জয়তী সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ে কাজের সূত্রে কর্মজীবনের পরিমণ্ডল এবং বিভিন্ন সহকর্মীদের ঈর্ষা, কলহ, প্রতিযোগিতা তার মনে নতুন করে ভাবনার জন্ম দিয়েছে।[২৩] এমনকি স্কুলে জাতিগত বিদ্বেষের কথা উঠলে, জয়তী তার প্রতিবাদ করেছে। সে জানে না আসদের প্রতি হৃদয়ের টানেই হয়তো তার এই সম্প্রীতি ভাবনা। এর পাশাপাশি নগর প্রবৃদ্ধির বিষয়টিকেও ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। তাইতো চিড়িয়ামোড়ের দিকে শহর বৃদ্ধির কথা উঠে আসে। শুধুমাত্র জাতীয় স্কুলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেনি সে তার মায়ের বিরুদ্ধেও বীতশ্রদ্ধ হয়েছে —

> "যে মা আচার, সংস্কার আর অন্ধতার বেড়াজালে নিজেকে বন্দী রেখে মুহূর্তে জয়তীর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন, সেই মা তার সংসারের অভাব মেটাবার জন্যই বিবেকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভালবাসা আর ভাল লাগার সম্মানবোধের বিরুদ্ধে জয়তীর পক্ষে কিছু বলার নেই। চুপ করে হেসে ব্যাপারটা সয়ে যেতে হবে। কারণ জীবনে টিকে থাকার জন্য অনেক অপমানই সহ্য করতে হয়।"[২৪]

এইভাবে জয়তীর পরিবারে সম্পর্কের শিথিলতা লক্ষ করা গেছে। তবে মায়ের মতো জয়তী সংস্কারে আবদ্ধ হতে পারেনি বরং সে সমস্ত বন্ধনের বেড়াজালকে মুক্ত করে মানবতার জয়গান গেয়েছে। দু'টি অনিবার্য ঘটনা তাকে জীবনের কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছে। সে স্কুলে শিক্ষকতাকালীন পেয়েছে শর্বরীর মতো রাজনীতি করা মেয়েকে। আবার, কলেজে মায়াদি ও প্রকাশদার মতো রাজনীতি করা ব্যক্তিত্বরা তার জীবনে নারীত্বের উন্মেষ ঘটিয়েছে। শহর জীবনে প্রত্যেকে নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে একে একে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। চরিত্রের মধ্যে তাই এসেছে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব। এই একাকিত্ব জীবনে জয়তী পূর্ণতা পেতে চেয়েছে আসাদকে নিয়ে। আজ তার সমগ্র ভালোবাসার স্বপ্ন আসাদকে ঘিরে। উপন্যাসের শেষে জয়তী তার জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে এবং নিজেকে সমর্পিত করতে ছুটে গেছে শহর পরিবেশে আসাদের কাছে। কারণ —

> "সে বুঝেছে মানুষ কেন বাঁচে। জয়তীকে কেন বাঁচতে হবে। জীবনের সহস্র তুচ্ছতা বা অসঙ্গতির মধ্যেও মানুষ কী নিয়ে বাঁচে, জয়তীকে কীসের জন্য বাঁচতে হবে। আহ্ নিশ্চয়তা কত বড় আশীর্বাদ। নিজেকে ভালবাসি, একথা স্বীকার করতে আর লজ্জা নেই। অন্যকে ভালবাসতে পারার জোরও বেড়েছে, বাড়ছে।"[২৫]

চায়না টাউন (১৯৫৮)

বিমল মিত্র কিংবা শংকরের উপন্যাসে কলকাতার চিনা বাজারের কথা উঠে এলেও ১৯৪৮-১৯৫৬ সালের চিনা বাজারের আর্থিক প্রেক্ষিত এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কথা তুলে ধরলেন বারীন্দ্রনাথ দাস তাঁর 'চায়না টাউন' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। যেখানে শহর কলকাতা প্রাচীন ইতিহাসকে পেছনে ফেলে অগ্রগতি হয়েছে নতুন নগর পরিকল্পনা আধুনিক কলকাতার পুনর্গঠনের পাশাপাশি চিনাদের সংস্কৃতি ও জীবন-যাপনের বিশেষ রীতির কথা উঠে এসেছে। যদি এই চিনারা কালের প্রবাহে তাদের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়েছে। এককালে যারা এদেশে চোরাকারবার ও বোম্বাইয়ে ব্যবসা করতে এসেছিল, তারা জীবনের জটিল ঘূর্ণিতে[২৬] আবর্তিত হয়ে সেখানকার ব্যবসা গুটিয়ে দিয়ে চলে এসেছে এই শহর কলকাতায়। এখানে এসে এই সকল চিনা মানুষরা বসবাসের দরুণ এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নিয়েছে। ফলত, তাদের পূর্বগত

সংস্কৃতি এবং শহুরে সংস্কৃতির একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে। দিলীপের মধ্যে দিয়ে ছলচাতুরী মানসিকতা, বন্ধুমণ্ডলীর যাযাবর জীবন দর্শন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন এবং নেশাগ্রস্ত হওয়ার চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, রঞ্জনকে নিতান্তই নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে পরিবেশন করেছেন। আর এই রঞ্জনকে উপলক্ষ্য করে দিলীপ, যোগীন্দ্র সিংহ, জয়প্রকাশ ত্রিবেদীর দেশ-বিদেশের জটিল মনস্তত্ত্বের কাহিনি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে, বাংলাদেশে চিনা-উপনিবেশের কথকতা। জোনীর সঙ্গে দিলীপ অভদ্র আচরণ করায় জোনী তার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। এমনকি যে প্রাচীন পন্থী ওয়াং এককালে নির্মম ও কঠোর মনের ব্যক্তি ছিল সেও আজ বার্ধক্যের পূর্ব জীবনে সমস্ত রকম কঠোরতাকে ভুলে গিয়ে এই শহর জীবনের আদব-কায়দা, রীতি-নীতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। তাই বর্তমানে সে আর ছেলে-মেয়েদের ওপর স্বেচ্ছাচারিতা চালায় না বরং ক্ষমা সুন্দর প্রশ্রয়ের চোখে দেখে। আসলে ঔপন্যাসিক শহর কলকাতার নগরায়ণবাদকে তুলে ধরতে ইতিহাস ও বর্তমানের কালপর্বে চিনাদের জীবনাচরণ ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার বোধকেই[২৭] যেন গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন।

এইভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় এবং সংস্কৃতি পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে নগর জীবনের মানুষের জীবনচর্চার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতকে তুলে ধরেছেন ষাটের দশকে বিভিন্ন ঔপন্যাসিক নগরায়ণবাদের প্রেক্ষিতে। তাই নগরায়ণবাদ সমাজতত্ত্বের বিষয় হয়েও বাংলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে নান্দনিক ও শিল্পিত রূপ লাভ করেছে।

Reference:

১. Pandey, R.K., *Urban Sociology Planning Administration and Management*, First Edition, Sarup & Sons, New Delhi, 2006, p. 7
২. আসাদুজ্জামান, আলহাজ্ব মোঃ, *নগর সমাজবিজ্ঞান*, প্রথম প্রকাশ, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩-১৪, পৃ. ২৪৮
৩. Pandey, R.K., ibid, p. 7 – 8
৪. Wirth, Louis, *Urbanism as a Way of Life*, (The American Journal of Sociology, vol. 44, no. 1), America, 1st July, 1938, p. 8
৫. আসাদুজ্জামান, আলহাজ্ব মোঃ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮
৬. তদেব, পৃ. ২৪৮
৭. তদেব, পৃ. ২৪৮
৮. তদেব, পৃ. ২৪৮
৯. মাহমুদ, জাহিদ, আবুল, হাসিম হাজারী, জুলফিকার, হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬
১০. Srivastava, Kamal Saroop, *Urban Sociology*, First Published, ABSA Publishers, New Delhi, 2010, p. 4
১১. Wirth, Louis, *Urbanism as a way of life*, ibid, pp. 1-2
১২. Singh, Sheobahal, *Sociology of Development*, First Published, Rawat publication, New Delhi, 2010, pp. 156-157
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পঞ্চম সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ-৪১
১৪. হাজরা, প্রতাপ রঞ্জন, *অমরেন্দ্র ঘোষ জীবন ও সাহিত্য সাধনা*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩৬
১৫. সত্যযুগ, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৫৮ (দ্র: হাজরা, প্রতাপরঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
১৬. সিনহা, হেনা, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ভগ্ননীড়ের বেদনা*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০০
১৭. সরকার, তারক, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ*, প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৮. জানা, সুশীল, *সুশীল জানা উপন্যাস সমগ্র*, (সম্পাদকমণ্ডলী – পল্লব সেনগুপ্ত ও অন্যান্য), প্রথম প্রকাশ, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১১, পৃ. মুখবন্ধ অংশ

১৯. তদেব, পৃ. ৭২

২০. সিনহা, ড. হেনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *দীপেন্দ্রনাথ নির্ভয় নাবিক* (উপন্যাস সমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়), প্রথম প্রকাশ, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১১

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, উপন্যাস সমগ্র, (সম্পাদনা – অনিশ্চয় চক্রবর্তী), প্রথম প্রকাশ, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৯

২৩. মোদক, ড. রীতা, *কথা প্রগতি দীপেন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৪৩

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

২৫. তদেব, পৃ. ১৫২

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পুনর্মুদ্রণ, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১২-১৩, পৃ. ৪১৯

২৭. তদেব, পৃ. ৪২০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 411 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 411 - 415
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা উপন্যাসে নগরজীবনে পারিবারিক কাঠামো : প্রসঙ্গ সত্তর দশক

জয়দেব ব্যানার্জী
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : joydevbanerjee15@gmail.com

***Received Date** 20. 12. 2024*
***Selection Date** 01. 02. 2025*

Keyword

Abstract

Discussion

সভ্যতা বিকাশের সূচনাপর্ব থেকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদায় মানুষ জোটবদ্ধ হয়। একক মানুষ আপন নিরাপত্তার জন্য তৈরি করে দল, যা পরবর্তীকালে গোষ্ঠীজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পরিবারের আকার ধারণ করে। সমাজের মৌলিক কাঠামো রূপে এই পরিবার সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সুনির্দিষ্ট একটি পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্তি বিধান করা ছিল মানুষের অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান পরিচয়। এই অস্তিত্বের স্বরূপ বা মূল কাঠামোটি নির্মিত হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে – যারা আন্তঃসম্পর্কে পারস্পারিক ভাবে জড়িত। জৈবিকতার ভিত্তিতে একজন বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে যে পরিবার গঠন করে, তাতে যুক্ত হয়ে যায় আরো অনেক সদস্য। যুগে যুগে এই কাঠামোর স্বরূপ বদলেছে, কিন্তু মূল বিষয়টি অক্ষত রেয় গেছে।

সুবৃহৎ ভারতবর্ষে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়রা সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত থেকে জীবনযাপন করে। ধ্রুপদী ভারতীয় চিন্তাধারায় পারিবারিক কাঠামো বলতে যৌথ বা বর্ধিত পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিবারের সদস্যদের একত্রীভবনকে বোঝায়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পারিবারিক কাঠামোর এই বলয় অতি সুপরিচিত এবং প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, সংস্কৃতি, সামাজিক ও মানসিক আচরণ, বংশবৃদ্ধি, যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক স্থিতি সহ আরো বহুবিষয় পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে যুক্ত থাকে। যদিও এই কাঠামোর গতিশীলতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসে ভারতবর্ষের প্রচলিত কাঠামোর বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামীণ এলাকার বর্ধিত পরিবারগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আবার বহু পরিবার সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিউক্লিয়ার বা পারমানবিক পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। শহুরে এলাকায় এই জাতীয় পরিবারের আধিক্য এই একবিংশ শতাব্দীতে যেন কিছুটা অনিবার্য। বর্ধিত পরিবার ও ছোট পরিবারের বৈষম্য ক্রমশ সদস্যদের মানসিক সংগঠনকে প্রভাবিত করে। বিবাহ ও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, নগরায়ণ, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধি, আর্থিক প্রয়োজনীয়তা, প্রযুক্তির উন্নতি সহ একাধিক কারণ এর মূলে রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এই আলোচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

অঙ্গ হিসেবে নগরায়ণ (Urbanization) শব্দটির উল্লেখ করেছেন। সাধারণত বিভিন্ন কারণে গ্রামীণ এলাকা ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগরায়ণ বলে। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে শহরে পদার্পণ কিম্বা শহরাঞ্চলের এলাকা বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক বিষয়। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে নগরায়ণের এই প্রক্রিয়াটি সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। গ্রামগুলির শহরে পরিণত হওয়ার ইতিহাস আজ যেন কোন রূপকথার গল্প নয়। সমালোচক তাঁর একটি লেখায় জানিয়েছেন -

> "অর্থাৎ কৃষিপ্রধান যে ভারতবর্ষ মূলত গ্রামে বাস করে সাতের দশক থেকে সেই গ্রামের চেনা চেহারাটা বদলে গেল। শহুরে বিনোদনের উপকরণ বিদ্যুতায়নের দৌলতে গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ে একদিকে যেমন তার সারল্যকে কৃত্রিমতার মুখোশ পরিয়ে দিল, অন্যদিকে মৃত্তিকালগ্ন সংস্কৃতিকেও আর অবিমিশ্র থাকতে দিল না। 'ছায়া সুনিবিড়' গ্রামগুলি হয়তো সেভাবে কোনদিনই 'শান্তির নীড়' ছিল না। এখন আরো নেই, শহর এখন বাড়তে বাড়তে গ্রামের সীমানা ছুঁয়ে ফেলেছে..."[১]

জাতীয় আদমশুমারির তথ্য আমাদের জানিয়েছে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শহরাঞ্চলের কলেবর। পশ্চিমবঙ্গে এই বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের থেকেও কিছুটা বেশি। বলা বাহুল্য, এই ক্রম-প্রসারণ শহরে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়িত। জীবন ও জীবিকার তাগিদে মানুষ শহরে এসে ভিড় করছে, পরিবার পরিকল্পনা করছে। নগরভূমিতেই গড়ে উঠছে বিচিত্ররূপী পারিবারিক কাঠামো। বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকরা নগরজীবনের এই পরিবারগুলির উপর সচেতন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরোপ করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক আঁচড়ে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের ক্যানভাসে। স্বাধীনতা উত্তর সত্তর দশক পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এক বিশেষ ক্রান্তিকাল। নগরভূমিতে এই সময় দেখা দিয়েছিল একধরনের সার্বিক অস্থিরতা, যা নগরের পরিবার এবং তার কাঠামোকে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে সমকালে রচিত তিনটি উপন্যাস নির্বাচন করে আমরা সমগ্র বিষয়টিকে বুঝে নিতে সচেষ্ট হতে পারি। এই তিনটে উপন্যাস হল – ১. তপোবিজয় ঘোষের লেখা 'সামনে লড়াই' (১৯৭১), ২. মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), এবং ৩. মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'ন হন্যতে' (১৯৭৪)।

সামনে লড়াই উপন্যাসটি রাজনীতির ক্যানভাসে রচিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমকালীন উত্তাল পরিস্থিতি এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমিকে আরো সুদৃঢ় করেছে। আমরা জানি, স্বাধীনতা উত্তর ষাট-সত্তর দশকের বাংলা এক প্রবল অনিশ্চয়তার প্রহর গুনছিল। সমালোচক সেলিম বক্স মণ্ডল এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন –

> "আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নানা বৈপরীত্যময় ঘটনারাজীর সমাবেশে ষাট-সত্তরের দশক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ রক্তপাতহীন দ্বিধা বিভক্ত স্বাধীনতার স্বাদ অনেকের কাছে 'ঝুটা' মনে হল। 'উদ্বাস্তু' জনজোয়ারে বাংলা টালমাটাল। খাদ্যসঙ্কট তীব্র। এরই পাশাপাশি ছিল নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ দিয়ে যে ষাটের দশকের সূচনা হয়েছিল, সেই দশকেই এগিয়ে গিয়ে দেখল দ্বিধা ত্রিধা বিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, দেখল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন।"[২]

যুগ ও জীবনের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে উপন্যাসের আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উপন্যাসিক। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ত্রিদিবশঙ্করের জমিদারী অত্যাচারের বিভীষিকায় প্রজাদের জীবন তছনছ করে দিয়েছিল। তারই সুযোগ্য পুত্র মণিশঙ্কর। পিতার জমিদারিতে পরপর দুটি গুলিতে দুজন নিরীহ কৃষককে গুলি করে যার উত্থান ঘটে। তবে, পিতার মতো তিনি গ্রামীণ ভূমিতে আটকে থাকেননি। বদলে যাওয়া যুগ পরিস্থিতিকে ধরতে পেরেছিলেন বলেই গ্রামের জমিদারী ছেড়ে শহরে বসত স্থাপন করেন, ফ্লাওয়ার মিল ও ফ্যাক্টরি চালু করেন। রাজনীতির ময়দানে পা রেখে অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। শাসনক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। জীবননীতির প্রতিটি পাঠ একজন ব্যক্তিমানুষ তার পরিবার থেকেই গ্রহণ করেন। মণিশঙ্করের পুত্র জয়শঙ্করের পরিবার বলতে শুধু তার পিতা। পিতার প্রতি রয়েছে তার অসম্ভব শ্রদ্ধা-ভক্তি। পিতার মতো তিনিও এই কায়েমি শাসন ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান।

পিতা পুত্রের এই শোষণের ইতিহাস মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয় নায়ক তমালের হাত দিয়ে। বিপ্লবী নেতা রূপে তমাল এদের স্বৈরাচারী মুখোশ খুলে দিতে তৎপর হয়। ফলে অনিবার্য ভাবে তার উপর নেমে আসে মৃত্যুর আঘাত। উপন্যাসে তমালের পারিবারিক ছবির ইতিহাস দীর্ঘ করেননি লেখক। জগতবল্লভের স্মৃতিকথায় জানা যায়, তেভাগা আন্দোলনের সময় জমিদারের লাঠিয়ালদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হয় তমালের বাবা মা। অনাথ তমাল আর তার ভাই আশ্রয় পায় জগতবল্লভের কাছে। জন্ম না দিলেও পালক পিতা হিসেবে জগতবল্লভ তাদের সন্তানসম লালন - পালন করেছেন।

উপন্যাসটির আখ্যানে অলকেশের পারিবারিক কাঠামোর ওপর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবার রূপে অলকেশের পরিবারকে এখানে দেখানো হয়েছে। অলকেশের বাবা সরকারি অফিসের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। স্ত্রী-পুত্র এবং কন্যা নন্দিতাকে নিয়ে তার কষ্টের সংসার। সরকারি অনুগ্রহে পালিত এই মানুষটি নির্ঝঞ্ঝাট, ভীতু চরিত্রের। একজন সচেতন বাবা হিসেবে তিনি স্বপ্ন দেখেন ছেলেকে মানুষ করার, কন্যাকে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করার। কিন্তু এই ভাড়াবাড়ির পারিবারিক কাঠামোতে অশান্তির কালো মেঘ নামিয়ে আনে সত্তরের রাজনীতি। তমালের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে অলকেশ ও নন্দিতা রাজনীতির বৃত্তে জড়িয়ে পড়েছে। বাবার সঙ্গে শুরু হয়েছে তাদের মতভেদ। আতঙ্কিত বাবা অলকেশকে বুঝিয়েছেন -

> "একবার পুলিশের খাতায় নাম ধরে গেলে তোর এত লেখাপড়ার দাম কি থাকবে? আমার এত কষ্ট, এত টাকাপয়সা সব জলে ফেলা।"[৩]

নাগরিক সমাজে মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়েছে এই পরিবার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'শুধু কেরানী' গল্পের মতোই নগরজীবনের মধ্যবিত্ত পারিবারিক সংকটকে নির্মম বাস্তবতা দিতে পেরেছেন লেখক।

পারিবারিক কাঠামোর এই বিপর্যয়ের ইতিহাস আমরা মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসেও আবিষ্কার করতে পারি। স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। সমাজ ও জীবনের নানান ক্ষেত্র, রাজনৈতিক সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি, জনজাতি-উপজাতি-আদিবাসীদের লড়াই ও গৌরবগাথা, মানবিক মূল্যবোধ, নারীভুবনের চিত্র অঙ্কনে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের প্রভাব থেকে বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিকরা রক্ষা পাননি। নানা বৈচিত্র্যে তাঁরা কলমের ভাষায় এই আন্দোলনকে পাঠক দরবারে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্বর্ণ মিত্র, অসীম রায়, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈবাল মিত্র, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখদের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীও এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় জানিয়েছিলেন -

> "আমি দীর্ঘদিনের পেশাদারি লেখক, বাজার চলতি পত্র-পত্রিকাই আমার লেখার জায়গা। সত্তরের আন্দোলন নিয়ে যদি লিখে থাকি, তা লেখা আমার পক্ষে ছিল (যা লেখা আজও আমার কাছে আছে) লেখক হিসাবে আমার প্রাথমিক কর্তব্য। এইটুকু না করলে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী হয়ে থাকতে হত।"[৪]

তাঁর লেখা 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসটির আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে সুজাতার চারবেলার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকথা দিয়ে। সুজাতার পুত্র ব্রতী পুলিশের গুলিতে নিহত এক হাজার চুরাশিতম লাশ। পুত্রহারা যন্ত্রণায় কাতর সুজাতার চেতনা প্রবাহের অলিন্দে এরপরে ধরা পড়ে তাঁর নিজস্ব পরিবারের আসল রূপ। স্বামী দিব্যনাথ চ্যাটার্জি নাগরিক বিত্তবান, অর্থলোলুপ আর একই সঙ্গে চরিত্রভ্রষ্ট। পুত্রের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতে চান না বলেই মৃত্যুর পরে পুলিশের সঙ্গে রফা করেন, সুজাতাকে না জানিয়ে পুত্রের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর দিন বাড়িতে ছোট মেয়ের আংটিবদলের অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, ছেলেমেয়েদের অত্যাধুনিক করতে চেয়ে উচ্ছন্নে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করেন। সুজাতা এই অভিজাত পরিবারে সবসময় নিজেকে অসহায়, নিপীড়িত আর বিপন্ন বলে মনে করেছে। ব্রতী ছিল এই সবকিছুর থেকে আলাদা। বিত্তবান পিতার ছেলে হয়ে সে অধপাতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 411 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না গিয়ে বিপ্লবের পথে হেঁটেছে। পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে সে শ্রেণিশত্রুদের কাছে আত্মহননের বিপ্লব নিয়ে গেছে। ব্রতীর এই পারিবারিক কাঠামো থেকে সরে যাওয়ার সংকটটি সুজাতা উপলব্ধি করতে পেরেছে -

> "ব্রতী যদি জ্যোতির মতো প্রচুর মদ খেত, নীপার বরের মতো মাতলামি করত, ব্রতীর বাবা যেমন সেদিনও এক টাইপিস্ট মেয়েকে নিয়ে ঢলাঢলি করেছে, তাই করত, ঝানু জোচ্চর হত টোনি কাপাডিয়ার মত, দুশ্চরিত্র হত ওর দিদি নীপার মত, যে এক পিসতুত দেওরের সঙ্গে প্রায় বসবাস করে; তাহলে ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না।"[৫]

নাগরিক অভিজাত জীবনে পারিবারিক কাঠামোর এই ইতিহাস আসলে পরিবারের সদস্যদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৮৯) রচিত 'ন হন্যতে' উপন্যাসেও আমরা বিষয়টি লক্ষ করেছি।

আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে রচিত এই উপন্যাসে লেখিকা অমৃতার পরিবারকে তুলে ধরেছেন। সেই উপন্যাসের নায়িকা। নিজের বেয়াল্লিশ বছরের সুখি দাম্পত্য জীবনে ঝড় নিয়ে এসেছে মিরচা ইউক্লিডের স্মৃতি। অমৃতার স্মৃতি বেদনায় উপন্যাসটি যেন পাঠককে চুম্বকের মতো টেনে রাখে আখ্যানে। অমৃতার বাবার নাম সুরেন্দ্রনাথ। কলকাতার ভবানীপুরের এই নামকরা পণ্ডিত নিজের পরিবারের সর্বেসর্বা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজে যেমন – আধুনিক, পরিবারের বাকি সদস্যদের কাছেও সেটাই আশা রাখেন। সেই ভাবেই পরিবারের প্রতিপালন করেন। নিজের বাড়িতে আধুনিক শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর কোনো বাধা নেই। পাড়া প্রতিবেশীদের ফিসফাস উপেক্ষা করেই স্ত্রীকে ফরাসি শেখান, মেয়েকে রোমানিয়ার অধিবাসী মিরচার সঙ্গে একসঙ্গে সময় কাটাতে বলেন। সমগ্র বিষয়টাকে তিনি বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিতে পরিচালনা করেন। নাগরিক সমাজের তথাকথিত 'এলিট' ক্লাসের অন্তর্গত হয়েই তাঁর পারিবারিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান সুরেন্দ্রনাথ। তিনি বলেন –

> "ভারতে এখন সর্বত্র রেভলিউশন হচ্ছে। পিকেটিং আর কাঁদুনে গ্যাসেই কি একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু? এই যে তুমি আমাদের বাড়িতে আছ, এটাই তো একটা রেভলিউশন – আমার বাবার বাড়িতে কি থাকতে পারতে? তাহলে আমার স্ত্রী তোমার সামনে মুখ ঢেকে বেরোত, আর এই অমৃতা, ছেলেদের কলেজে গিয়ে কবিতা পড়ে, কখনো হতে পারত? তোমার বাসন আলাদা হত, তুমি ছুঁয়ে দিলে ভাত ফেলা হত – সে এক ব্যাপার।"[৬]

এই পরিবারে বিপর্যয়ের সূচনা মিরচা ও অমৃতার গোপন সম্পর্ক জানাজানি হওয়ার পরে। অমৃতার মা বিদেশি ছেলেকে মেনে নিতে পারেননি। বাবা সংস্কারবশত সমগ্র বিষয়টির ক্ষতিকারক দিক বিবেচনা করে মিরচাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অমৃতা গভীর দুঃখে পরিবারের মানুষগুলো থেকে মানসিক দূরত্ব তৈরি করেছে। আমরা আরো দেখতে পাই, কাকা-কাকিমার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারের যে ঐতিহ্য চলে আসছিল এতদিন, তাও ভেঙ্গে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। পারিবারিক কাঠামোর সাদা খাতায় পড়েছে বিচ্ছিন্নতার কালো কালি।

উপন্যাসের চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ওঠা এই নাগরিক চরিত্রগুলিকে নগরের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন লেখকরা। যে নগরে তারা মরণপণ সংগ্রাম করে, বেঁচে থাকার আশ্রয় গড়ে তোলে, তার কথা ও কাহিনিকে উপন্যাসের মধ্যে জীবন্ত করতে চেয়েছেন তারা। আসলে নাগরিক জীবন কোথায় যেন এই বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়েই তৈরি। পরিবারের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে চরিত্রদের যে মানসিক আচরণ সম্ভব ছিল, তা যেন বড়ই অমিল এখানে। শহুরে জীবনে বসবাসের ফলে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ থাকছে, নৈকট্য আসছে না। নিজের রক্তের সম্পর্কেও ঘটে চলেছে দূরত্বের জারণ-বিজারণ। নাগরিক জীবনের এই পাল্টে যাওয়া পারিবারিক কাঠামোর ইতিহাসকে বাংলা ভাষার কথাকারেরা বাঙময় করে তুলেছেন নানান উপন্যাসে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 411 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. পাল, শ্রাবণী, *পরিবর্তনশীল গ্রামসমাজ ও বাংলা উপন্যাস,* কালের বিবর্তনে দুই বাংলার উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭, সম্পাদনা, সুব্রতকুমার পাল, প্রকাশক, শ্রী ভারতী প্রেস, ৮১/৩ এ রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা – ৭০০০৪৭

২. মণ্ডল, সেলিম বক্স, *ষাট-সত্তরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি,* এবং প্রান্তিক, সম্পাদনা, আশিস রায়, ৮ম বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা, ৩১ মে ২০২১, প্রকাশক, আশিস রায়, সারদাপল্লী, কলকাতা - ৭০০০১২

৩. ঘোষ, তপোবিজয়, *সামনে লড়াই,* নবজাতক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, প্রকাশক, মজাহারুল ইসলাম, এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা - ১২ পৃ. ১০১

৪. দেবী, মহাশ্বেতা, *সত্তরের দশক ও তারপরে,* সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড), ৩য় মুদ্রণ, ২০১০, সম্পাদনা, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ, ২য় নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ৪৮-৪৯

৫. দেবী, মহাশ্বেতা, *হাজার চুরাশির মা,* চতুর্বিংশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০২২, করুণা প্রকাশনী, প্রকাশক, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ৩০

৬. দেবী, মৈত্রেয়ী, *ন হন্যতে,* প্রাইমা পাবলিকেশন, ঊনত্রিংশ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০২১, প্রকাশক, উপমা সেনগুপ্তা, সুকান্ত দাশগুপ্ত, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৭, পৃ. ৩০

Bibliography:

দে, নাড়ুগোপাল ও মুখার্জি, সোনালি (সম্পাদিত), *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্য,* অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০২৪, প্রকাশক, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা - ৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে,* পুস্তক বিপণী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, প্রকাশক, অনুপকুমার মাহিন্দার, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯

চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় উপন্যাসে কলকাতা : সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ (১৮৫৭-১৯৭১),* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, প্রজাতন্ত্র দিবস, জানুয়ারি, ২০০৮, প্রকাশক, দেবাশিস ভট্টাচার্য, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০০৯

গুহ, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *নগরোন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়,* সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০১৯, প্রকাশক, অর্চনা দাস ও সুব্রত দাস, ১২/এ, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা – ৭০০০০৬

মুখোপাধ্যায়, সুবিকাশ, *নগরায়ন প্রক্রিয়ার উপাদান ও পরিমাপ-সূচক একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ,* বাংলার শহর : ঔপনিবেশিক পর্ব, সম্পাদনা - শেখর ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী, আশাদীপ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২০, প্রকাশক, অনিরুদ্ধ মণ্ডল, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯

K, SIDDHARTHA & S. BANERJEE. *CITIES, URBANISATION & URBAN SYSTEMS (SETTLEMENT GEOGRAPHY).* KITAB MAHAL. NEW EDITION, 2016. 22-A, SAROJINI NAIDU MARG, ALLAHABAD – 211001. ISBN, 978-81-225-0817-8

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 416 - 426
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে নদী-ভাঙনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

ড. শুভেন্দু মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
Email ID : shubhendumondal90@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
River bank erosion, River Migration, Socio-economic impact, River management, River traditions, 'Char' lifestyle.

Abstract
The relationship of rivers with humans is eternal. Since the era of ancientcivilization, people have been worshipping riversas gods. They settledalong its banks and earned a living for themselves. Sometimes the river appeared as a blessing, and at times it flooded both the banks and destroyed villages. An amazing combinationof life running with the flow of the river. If we look at the history of Bengali novels, just as we find river-centric novels, we also come across the socio-economicalimpact of river erosion as the context of many novels. Although the interrelationship between rivers and people is observed in the novels of Bankim Chandra, Rabindranath or Kazi Abdul Odud, the story oferosion and braid bar-centric people have come up in the novels of Amarendra Ghosh, Narayan Gangopadhyay, Amiyabhusen Majumdar, Abdul Jabbar, SadhanChattopadhyay and Abul Bashar.

Discussion

নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আবেদন চিরকালীন। প্রাচীন সভ্যতার যুগ থেকে মানুষ নদীকে দেবতার জ্ঞানে পুজো করেছে এবং তারই তীরে বসতি স্থাপন করে জীবিকা অর্জন করেছে। নদী কখনো মানুষের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। আবার কখনো দু'কূল ভাসিয়ে গ্রামের পর গ্রাম মানুষকে উজার করে দিয়েছে। বহতা নদীর সঙ্গে চলমান জীবনের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে যেমন নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের সন্ধান মেলে, তেমনি অনেক উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় নদী-ভাঙনের আর্থ-সামাজিক রূপটি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিংবা কাজী আব্দুল ওদুদের উপন্যাসে নদী ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের চিত্র পরিলক্ষিত হলেও নদী-ভাঙন ও চরকেন্দ্রিক মানুষের কথা উঠে এসেছে অমরেন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, আব্দুল জব্বার, সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং আবুল বাশারের উপন্যাসে। এই সকল ঔপন্যাসিকের কলমে স্বাধীনতা-পরবর্তী নদী-ভাঙন এলাকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কথাকতা আলোচনার পূর্বে নদী-ভাঙন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নদী-ভাঙন : বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে নদী-ভাঙন একটি অন্যতম প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে পরিচিত। নদী-ভাঙন বলতে নদীর জল-প্রবাহের ফলে নদীর তীর বা পাড়ের ভাঙনকে বোঝায়। এই ভাঙনে নদীর তীরবর্তী বাড়িঘর, কৃষিভূমি, বাজার-হাট, রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বনভূমি প্রভৃতিকে নদীগর্ভে বিলীন করে দেয়। জলচক্রের প্রভাবে পর্বতের গায়ে বরফ জমে সেই বরফ গলা জল পর্বতের গা থেকে নেমে আসে। সেই নামা অংশ জল থেকেই নদীর সৃষ্টি। নদীর এই জল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। সাধারণত সমুদ্রের কাছাকাছি অর্থাৎ নিম্নগতি অংশে নদীর জল তীব্র গতিতে ছুটে চলে। এছাড়াও ভরা বর্ষার মরশুমে উজানে তীব্র বৃষ্টিপাত হলে নদীর জল বেড়ে যায়। তখন নদীর স্রোতও যায় বেড়ে। নদীর এই তীব্র স্রোত ভাটার দিকে চলার পাশাপাশি নদীর পাড়ে আঘাত করতে থাকে। জলের এই ক্রমাগত তীব্র আঘাতে নদী তীরবর্তী ভূভাগ ক্ষয় হতে থাকে। এক সময় মাটি ক্ষয় হতে হতে যখন উপরের মাটির ভার সহ্য করতে পারে না। তখন উপরের অক্ষয় মাটিসহ নদী পাড়ের বিশাল অংশ নদীর গর্ভের মধ্যে ভেঙে পড়ে। এসব কারণেই ভাঙন এলাকায় নদীর জল হয় গলিত মাটিপূর্ণ, ঘোলা। সাধারণত নদী, তার জলের গতিপথে কোনো বাধা পেলে তাতে তীব্র আঘাত করে। নদী গতিপথ বদলাবার সময় যেদিকে গতি বদলায়, সেদিকের পাড় বরাবর তীব্রগতিতে আঘাত করতে থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে উপকূলবর্তী এলাকা পলিগঠিত হওয়ায়, নরম পলিমাটির স্তর সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে। এইভাবে নদী একদিকের পাড় ভাঙতে থাকলেও অপরদিক থেকে গতি বদলে নেয় বলে অপর দিকে গলিত পলিমাটি নিয়ে জমা করতে থাকে। তাই নদী-ভাঙনের মাধ্যমে নদীর এক পাড় ভাঙে আর এক পাড় গড়ে।[১] আবার নদী কোথাও চরের সৃষ্টি করতে থাকে। তবে এই ভাঙন (erosion) সম্পর্কে আভিধানিক কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। 'The American Haritage Dictionary'-তে 'Erosion' সম্পর্কে বলা হয়েছে —

> "The gradual wearing away of land surface materials, especially rocks, sediments, and soils by the action of water, wind, or a glacier. Usually erosion also involves the transfer of eroded material from one place to another, as from the top of a mountain to an adjacent valley, or from the upstream portion of a river to the downstream portion."[২]

অর্থাৎ, জল, বায়ু বা হিমবাহের কর্ম দ্বারা ক্রমবর্ধমান ভূমিপৃষ্ঠ উপাদান, বিশেষ করে পাথর, পলল এবং মৃত্তিকাকে দূরে পরিবেশন করে। সাধারণত ভাঙনের ফলে ভাঙন উপকরণটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়, যেমনটি একটি পর্বতের উপর থেকে একটি সন্নিহিত উপত্যকায় বা নদী থেকে প্রবাহিত অংশ থেকে প্রান্তবর্তী অংশে অবস্থিতি লাভ করে।

আবার, 'Illustrated Dictionary of Architecture'-তে 'Erosion' সম্পর্কে বলা হয়েছে —

> "The wearing away of the land surface by rain or irrigation water, wind, ice, or other natural of anthopogenic agents that abrade, detech, and remove geologic parent material or soil from one point on the Earth's surface and deposit it elsewhere, including such processes as gravitational crcep and so-called tillage erosion."[৩]

সাধারণত ভাবে ভারী বর্ষার মৌসুমে নদীতে অতিরিক্ত জল প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয় নদী-ভাঙন। অনেকে মনে করেন, জলের আঘাতে নদীর তীরবর্তী কৃষিজমি বা ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়াকে নদী-ভাঙন বলা যায়।[৪] আবার এ সম্পর্কে জানা যায় —

> "River bank erosion is the deterioration of the banks of a river or stream. It occurs when the top soil that enclosed a river or stream washes away. River bank erosion is a natural occurrence that allows rivers to flow on a proper course. However when accelerated because of un natural causes, the water system is

> susceptible to a disproportionate sediment supply, strem channel instability and habitat loss, according to the EPA."[৫]

অর্থাৎ, নদী বা খালের পাড়ের অবনমন যখন ঘটে তখন তাকে নদী-ভাঙন বলা যায়। এটি ঘটে যখন নদীর তীরের উপরের স্তরের মাটি জলস্রোতে ক্ষয় হয়ে যায়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। যা নদীকে নিজ খাতে বয়ে যাওয়ার সহায়তা করে। তবে EPA (Environmental Protection Agency) - এর মতে যখন এই প্রক্রিয়াটি অতি প্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক কারণবশত ত্বরান্বিত হয় তখন জলপ্রবাহিকার সুষমতাহীন অধক্ষেপণ (চর) নদী বা খালের গতিপথের স্থায়ীত্ব অভাব এবং জনজীবনের ক্ষতির প্রবণতা দেখা যায়, তখন তাকে আমরা নদী-ভাঙন বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার নদনদী' গ্রন্থে বিশেষজ্ঞদের মত তুলে নদী-ভাঙন সম্পর্কে বলেছেন —

> "উৎস থেকে শুরু করে মোহনা পর্যন্ত এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠনের ওপর নির্ভর করে নদীর প্রবাহপথ। এই প্রবাহপথের শেষ পর্যায়ে সমতল অঞ্চলে নদীস্রোত বিভিন্ন খাতে বয়ে যায় নানা কারণে। এই পর্যায়ে নদীস্রোতের পরিবর্তন মোহনা অঞ্চলে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক কারণেই প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে, নদীস্রোতের সঙ্গে বয়ে আসা প্রচুর ভাসমান বালি ও পলিকণা বদ্বীপ গঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন, এই বালি ও পলিকণার জন্ম নদীর অববাহিকা এলাকায় অবিরাম ভূমিক্ষয় থেকে। নদীখাতের ঢাল ও নদীর ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করেই পলিকণা নদীখাত বা নদীতীরে জমতে শুরু করে। তবে নদী খরস্রোতা হলে পলিকণা নদীর খাতে জমতে পারে না, নদীস্রোতে ভেসে চলে যায়। তাই নদীস্রোত মন্থর হলে নদীখাতে চড়া পড়ে বদ্বীপ গঠনের পথে এক ধাপ এগিয়ে যায়। তখন নদীর স্রোতধারা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে নদীপথ সর্পিল হয়ে ওঠে। নদীর পাড় ভাঙার অন্যতম বা মূল কারণ হল নদীপ্রবাহের এই সর্পিল গতি।"[৬]

পশ্চিমবঙ্গের নদী-ভাঙনের সর্বগ্রাসী প্রভাব লক্ষ করা যায়, গঙ্গা-পদ্মা নদীতে। বর্তমান সময়ে দেখা গেছে, গঙ্গা নদী সবসময়ই প্রবাহিত হয়েছে সর্পিল গতিতে। দু'টি জায়গায় গঙ্গার গভীর নদীখাত অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। সেই দু'টি স্থান- রাজমহল ও ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে ১.৬ কি.মি.[৭] ওপরের একটি এলাকায়। এই দু'টি স্থানের কথা বাদ দিলে ১৯২২ সাল থেকে আজ অবধি ফরাক্কা ব্যারেজের উপর নদী অববাহিকার ভাঙন ঘটছে বাম পাড় ঘেঁষে। কিন্তু এই নদী পাড় ভাঙন ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে অর্থাৎ নদীর উজানের দিকে ঘটছে। ব্যারেজ অতিক্রম করার পর গঙ্গা-পদ্মা নদী প্রবাহ ডান পাড় ঘেঁষে বয়ে চলেছে। সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই গঙ্গার ব্যারেজের নিচের দিকে ভাঙন ঘটাচ্ছে ডান পাড়ে। ধূলিয়ান এবং নয়নসুখ এলাকার ভাঙন ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হওয়ার আগে থেকেই লক্ষ করা যায়। এই ভাঙনের ফলে বারহাওয়া ও নিমতিতা স্টেশনের[৮] যোগাযোগকারী রেল লাইনটিকে সরাতে হয়। অন্যদিকে, ১৯৭২-এর পরে ব্যারেজ পার হয়ে গঙ্গা-পদ্মা দু'টি ধারায় প্রবাহিত হত। এর মধ্যে বামদিকের ধারা দিয়ে অনেক বেশি জল প্রবাহিত হত। সেই ধারাটি বালি বা পলিতে মজে যাওয়ার ফলে এখন সমস্ত জল ডান দিক দিয়েই প্রবাহিত হয়। এই নদী-ভাঙনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এইরকম-

১. নদী-ভাঙন একটি সময়ে অর্থাৎ ভরা বর্ষাকালে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে হয়ে থাকে।

২. নদী-ভাঙন যে এলাকায় হয় সেখানে এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের ব্যাঘাত ঘটে।

৩. নদী-ভাঙনে যেমন এক পাড়ের মানুষদের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তেমনি অন্য পাড়ে নতুন করে চরের উদ্ভব দেখা দিতে পারে।

৪. নদী-ভাঙনের ফলে মানুষেরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির কথা না ভেবে অন্য সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে।

৫. নদী-ভাঙন কবলিত মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্তরা এক নিমেষে নিঃস্ব বা ভিখারিতে পরিণত হতে পারে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. নদী-ভাঙনের ফলে সরকার পরিকল্পিত বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় না।

৭. নদী-ভাঙনে প্রতিবছর বিভিন্ন বাঁধ, ব্যারেজ, সড়ক ও রেলপথের বহুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে।

৮. নদী-ভাঙনের ফলে রাজ্যের কিংবা দেশের সীমানা অনেক সময় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। যেমন - ভারত-বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড আন্তর্জাতিক-রাজ্য সীমানা।

এই নদী-ভাঙনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাধীনতা-পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে কীভাবে রূপলাভ করেছে তা এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে—

উপন্যাসে নদী-ভাঙন :

চরকাশেম (১৯৪৯)

অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' উপন্যাসটি ১৯৪৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি সপরিবারে চলে আসেন কলকতায় পূর্ববঙ্গ থেকে। এখানে এসে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেন। উপন্যাসটি ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে Flash back রীতির অনুসরণ করেছেন। মেছো হাসেমের ছেলে কাশেমের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যায়। সেই সময় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কাশেমকে আড়াই টাকার বিনিময়ে বন্ধক থাকতে হয়। সে বড় হয়ে সেই টাকা দিয়ে সেখান থেকে মুক্তি পায় এবং পদ্মার বুকে মাছ ধরা ও জনমজুর খেটে টাকা রোজগার করে। তার স্বপ্ন ছিল যে একদিন পদ্মার বুকে নিরানব্বইকানির চর জাগবে। যার মালিক হবে কাশেম। সত্যি সত্যি পদ্মার বুকে একদিন চর জাগল।[৯] এই চর উপন্যাসে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে থাকেনি, তা পরিণত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতীক। এই চর কাশেমের নাম অনুসারে পরিচিত হয় চরকাশেম নামে। প্রলয়ঙ্করী পদ্মার খামখেয়ালী রূপে নিরানব্বইকানির চর জলের তলায় তলিয়ে যায়। পরে এই চর জেগে ওঠায় কাশেমের ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। ঔপন্যাসিক বর্ষার উন্মত্ত পদ্মার ভাঙন ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন —

> ক. "নদী আর নদী। এপার ওপার দেখা যায় না- শুধু মাঝে মাঝে ঝকমক করে উঠছে ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে ভেঙে পড়ছে খাড়ি-পাড়ে এসে। ধ্বসে পড়ছে পাড়। ভাসিয়ে নিচ্ছে গাছপালা। তবু লোকে ভালবাসে নদী-ভালবাসে ঢেউ।"[১০]
>
> খ. "দেখতে দেখতে নদী আরও ভয়াল হয়ে ওঠে বিঘার পর বিঘা পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়তে থাকে জমি ক্ষেত বাগবাগিচা সমেত। বড় বড় নারকেল সুপারি গাছ থৈ পায় না কূলের কাছে।... চির পরিচিতার একি প্রলয়ংকরী মূর্তি? স্নেহ নেই, মায়া নেই, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষুধা। লাবণ্য নেই, কেবলই উলংগ নৃশংস বর্বরতা গাঙ গোঙাচ্ছে- ভাঙছে নিষ্করুণভাবে ক্ষুধার্ত নাগিনী গিলে খাচ্ছে সবকিছু। মানুষ পালাচ্ছে বাড়ি ঘর ছেড়ে।"[১১]

উপন্যাসের পটভূমিতে শুধু পূর্ববঙ্গের চাষীদের জীবন চিত্রই পরিলক্ষিত হয়নি, কাহিনিবৃত্তে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, চরকাশেমের মানুষদেরকে অস্থির করে তুলেছে। উপন্যাসের মধ্যে চরকেন্দ্রিক জীবনে দুর্বিসহ যন্ত্রণা নেমে এসেছে আর্থিক দুরাবস্থায় —

> "আবার সর্বনাশা হাঁ মেলে আসে দুর্দিন। ওরা খাটতে খাটতে শুকিয়ে যায় তবু অভাবের গহ্বর পূর্ণ করতে পারে না। আয় যা করে তাতে কিছুতেই ব্যয় কুলায় না। চিন্তা-ভাবনায় ওরা হাবুডুবু খায় এক একবার ওরা নির্দিষ্ট দিনে ক্ষেপ থেকে চরকাশেমে ফেরে না। উপোস চলে ঘরে ঘরে। ছেলেমেয়েরা যদিও বা কিছু খায়, পেটেপিঠে ফোঁড়া যায় বয়স্কদের। ... চরের বাসিন্দারা সবাই ভেঙে পড়ে। স্ত্রীলোক বৃদ্ধ যুবা শিশু কেউ বাদ যায় না।"[১২]

এই দুরাবস্থার কারণে এই গোষ্ঠী জীবনের মানুষেরা মহাজনদের কবলে পড়ে একে একে ঘর বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে রাস্তার ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। সেই স্বপ্নের চরে শুধু পড়ে থাকে কাশেম, ফুলমন, আঞ্জু এবং রসময়। এরপরেও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাশেমের জীবনে অভাব অনটন এলেও সে এই চর ছেড়ে যায় না। অবশেষে জীবন হালদারের প্রচেষ্টায় ফিরে পায় বেঁচে ওঠার রসদ। গড়ে তোলে জমিদার, জোতদার ও ব্যাপারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোবল। এখানে নদী-ভাঙনের কবলে চর জীবনকেন্দ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের পাশাপাশি সমাজের উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত মৎসজীবীদের প্রতিবাদের চিত্রও পরিলক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসটি সামাজিক পালাবদল সম্পর্কে প্রতাপরঞ্জন হাজরা বলেছেন —

> "পূর্ব বাংলার বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলের চরের কাহিনি হলেও তা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে এসে সমস্ত সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। কেন-না কাশেমের স্বপ্ন আর তার ব্যক্তিগত স্বপ্ন হয়ে থাকেনি। ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত মানুষের আশার, শান্তিকামী মানুষের কামনার স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে।"[১৩]

মহানন্দা (১৯৫১)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' উপন্যাসটি দু'টি ভাগে (প্রথম-১৫টি, দ্বিতীয়-১০টি অধ্যায়ে) বিন্যস্ত। লেখক জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের মানুষ হলেও অধ্যাপনাসূত্রে উত্তরবঙ্গের জন-জীবন ও নদী মহানন্দার সঙ্গে পরিচিত হন। উপন্যাসটিতে তিনি কাল ও সময়ের নিগূঢ় পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী মন্ত্রে[১৪] দীক্ষিত যুবকের মধ্য দিয়ে মহানন্দার খামখেয়ালিপনা ও তার সঙ্গে জীবন সত্যের নান্দনিক, রোমান্টিক ও বস্তুনিষ্ঠ দিকের তনিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের নদী মহানন্দার ব্যাপক ভূমিকা না থাকলেও নায়ক নীতীশের জীবনে এর গুরুত্ব কম ছিল না। কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, বৈষ্ণব সংস্কৃতি এবং সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র ঔপন্যাসিকের জীবন বোধের স্পর্শে নবরূপ লাভ করেছে।[১৫] উপন্যাসের কেন্দ্র ভূমিতে নদী মহানন্দার অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে নায়ক নীতীশের জীবন ও কর্মধারার যোগসূত্র রচিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে মহানন্দার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন —

> "মরে যাচ্ছে মহানন্দা, শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। উত্তর বাংলার শ্যামল মাটির শ্রেষ্ঠ প্রাণপ্রবাহিনীর সর্বাঙ্গে নেমেছে অপঘাতের ছায়া। এদিকে ওদিকে যে দু'চারটে স্টিমার সার্ভিস ছিল, আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে আসছে, নদীতে জল নেই। বর্ষায় আর শরতের কয়েকটা মাস ছাড়া মরা নদী মহানন্দার দিকে তাকালে কষ্ট হয়। বিশাল বালু শয্যার মাঝখানে এদিকে ওদিকে তির তির করে দু'একটা জলের রেখা বয়ে যায়, কোনোটায় স্রোত চলে, কোনোটায় চলে না।"[১৬]

কিন্তু বর্ষার মহানন্দার খামখেয়ালিপনার চিত্রটা একটু আলাদা —

> "বর্ষায় - তির তিরে নীলজলে নামে ঘোলা জলের পাহাড়ি বান। শ্যাওলার স্তর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, হারিয়ে যায় বনঝাউয়ের দল, মোটা মোটা গম্বুজগুলোকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে নদীর ভৈরব গর্জন চলতি ট্রেনের যাত্রীরা ভয়ার্ত চোখে তাকায় নীচের জলের উন্মত্ত আক্রোশের দিকে-যদি ব্রীজটাকে ভাঙে হঠাৎ?"[১৭]

বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত নায়ক নীতীশ যৌবনের শুরুতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যোদপুর গ্রামে নিজের অতিপ্রিয় নদী মহানন্দা ও স্ত্রী মাল্লিকাকে ছেড়ে চলে যেতে হয়, খুন ও ডাকাতির অপরাধে জেলে বারো বছরের জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসে সে দেখেছে শুধু নদীর চিত্রের পট-পরিবর্তন হয় নি, পরিবর্তন হয়েছে সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতির। কালের অমোঘ পরিবর্তনের প্রভাব মল্লিকার জীবন বোধের ধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করেছে —

> "শান্ত মহানন্দা গর্জে উঠল- ঘোলা জলের অর্ঘ্য ঢেলে দিতে লাগল কালিন্দী, ফুল্লরা, পুনর্ভবা, নিমাসরাই স্তম্ভের নীচে নদী কুপিতা ধূমাবতীর মূর্তি। চরের বনঝাউগুলোর চিহ্ন রইল না।"[১৮]

নদী-ভাঙনের মতো মল্লিকার সংসারেও ভাঙন দেখা দিল। দীর্ঘ বারো বছর পর নীতীশ যোধপুর গ্রামে ফিরে এসে মহানন্দার অন্য রূপ পরিদর্শন করেছে। এক সময় হিমালয়ের বরফ গলা জলে পুষ্ট কুশী নদীর জলে মহানন্দার বুকে দেখা দিত ভাঙন। পরবর্তীতে এই নদী দিক পরিবর্তন করায় মহানন্দার সেই ভয়ঙ্করী রূপ আর নেই —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “বর্ষার জল থিতিয়ে আসছে এর মধ্যেই, জলের তলা থেকে ভুতুড়ে মাথাগুলো আকাশে তুলে ধরতে চাচ্ছে ডুবন্ত ঝোপঝাড়ের দল। এত স্বল্প স্থায়ী এখন মহানন্দার বাণ এত অল্পদিনেই এমন করে তার জল নেমে যায়। আর এক মাসের মধ্যেই তা হলে আবার জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে বালির চড়ার ওপর পঙ্কিল পলিমাটির আস্তরণ রেখে চলে যাবে বন্যার জল, ক্ষণ যৌবনের অস্থায়ী উন্মত্ততার গ্লানির স্বাক্ষর মহানন্দার বুকে ছড়িয়ে থাকবে কিছুদিন।”[১৯]

নীতিশ এই মজে যাওয়া মহানন্দার সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পায় কোথাও। সে কলকাতায় চলে গেলেও দুর্বার আকর্ষণে ফিরে আসে যোধপুরে। সে বিশ্বাস করে এই চর পড়া মহানন্দার গর্ভে একদিন না একদিন নব যৌবনের জোয়ার আসবে। এ উপন্যাসেও নদী-ভাঙনের ফলে নদী ক্রমশ মজে যাওয়ার ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা গেছে।

গড় শ্রীখণ্ড (১৯৫৭)

পদ্মা নদী ও নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন গাঁথা রচনা করেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি ১৩৬০ বঙ্গাব্দে ‘পূর্বাশা’ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির ৩৮টি পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক তিন ধরণের মানুষের কথকতা গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন—

প্রথমত : সান্দার গোষ্ঠী;
দ্বিতীয়ত : মাঝি ও কৃষক গোষ্ঠী;
তৃতীয়ত : সান্যাল মশাইয়ের জমিদারী পরিবার।

প্রথম গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোনো জীবন-ধারণের রীতি না থাকায় এরা নদী তীরবর্তীতে চালের চোরাচালান এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী চাষাবাদ করে জীবন অতিবাহিত করে। এর মধ্যে রয়েছে রামচন্দ্র মুঙলা, এরফান, চৈতন্য সাহা, ছিদাম প্রমুখরা। এদের জীবন বিভিন্ন সময়ে নদীর অতল গহনে তলিয়ে যায়। এরা অপেক্ষা করে নতুন জীবন গড়তে। তাই নদী চর জাগালে এদের মুখে হাসি ফোটে। লেখক এই তিন শ্রেণির মানুষের জীবন-ধারণ, পেশাগত অবস্থান এবং আর্থিক ভিত্তিকে ভিন্ন আঙ্গিকে চিত্রিত করলেও পদ্মার খামখেয়ালিপনা, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, পুনর্বাসন সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত সমস্যা এদেরকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। উপন্যাসটিতে নদী-ভাঙনের যে বিশেষত্বগুলি লক্ষ করা যায় তা ঠিক এইরকম —

ক. নদীশাসন ও নদী পরম্পরা;
খ. চর সৃষ্টি, চর বিলীন হওয়া এবং চর দখলের রাজনীতি;
গ. নদীগত উদ্বাস্তু (River Migration) সমস্যা।

উপন্যাসে পদ্মা নদী মূল চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। পদ্মার ভয়াল হিংস্রতা যেমন গ্রামের পর গ্রামকে গ্রাস করে তেমনি ভয়ংকর ধ্বংসের মধ্যে গড়ে তোলে নরম পলিমাটির চর। যে মানুষগুলির জীবন পদ্মার করাল গ্রাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারা কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠী নতুন করে জীবনের ভিত্তি রচনা করে সেই চরে। তাই পদ্মার জীবনে যেমন এগিয়ে যাওয়ার দ্বান্দ্বিকতার ইতিহাস আছে তেমনি রয়েছে মানব জীবনের জটিল দ্বন্দ্বময় প্রতিভাস। এই পদ্মার গ্রাসে সুরোতুন ও মাধাই-এর প্রেমের বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে। কারণ তাদের পরস্পরের কাছে আসার মধ্যে যে সংকোচ ছিল তা তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।[২০] অনেকদিনের সামাজিক সংস্কারকে ভেঙে নতুনের দিকে ধাবিত হতে না পারার কারণেই তাদের এই প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটেছে। উপন্যাসের সূচনায় ব্রিজ বাঁধা পদ্মার সঙ্গে ঔপন্যাসিক সুরোতুনের বা সুমিতরি বদ্ধ অবস্থার অভিন্ন তাৎপর্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন—

> “বাঙাল নদী পদ্মা এখানে বন্ধনে পড়েছে, ‘বিরিজ’ বলে লোকভাষায়।... ব্রিজটা অত্যন্ত উঁচু, তার ধরাছোঁয়া পাওয়ার জন্য গ্রামের জমি থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মও উঁচু। এত উঁচু যে বড়ো-বড়ো তালগাছগুলিও পায়ের নিচে থাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে।”[২১]

তেমনি শেষে পদ্মা যেমন বাঁধ ভেঙে সবকিছুকে প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তেমনি সুরোতুন তার যাবতীয় সংকোচ, সংস্কার, দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি লেখকের আশা যে নবীন পলি মাটির চর পদ্মার বুকে জেগেছে তাতে যারা জন্ম নেবে তারা সমাজের কুসংস্কার, শ্রেণিচেতনার দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় গোড়ামির সমস্ত দেওয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নবতর সমাজ ব্যবস্থার নতুন সেতু নির্মাণ করবে।

ইলিশমারির চর (১৯৬২)

সুন্দরবন অঞ্চলে চরজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যে আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' এক অনন্য সংযোজন। উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে আব্দুল আজিজ আল আলম সম্পাদিত 'জাগরণ' পত্রিকায়[২২] প্রকাশিত হয়। আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' উপন্যাসের ১৯টি পরিচ্ছেদে গঙ্গা-ভাঙনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই ইলিশমারির চরের বাসিন্দা হন জেলেরা। গঙ্গা তাদের একমাত্র ভরসা। বর্ষার মরশুমে গঙ্গাতেই তারা মাছ ধরে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তারা বিধ্বংসী গঙ্গায় নামে মাছ ধরতে। তারা প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেদের বাঁচার লড়াই চালিয়ে যায়। এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জয়নদ্দি, হরেন, কানাই শরিক হয়েছে।

গঙ্গার নিম্নগতি এবং সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চলে গড়ে ওঠা একটি চর-ই ইলিশমারির চর। এই চরে বসবাস করে মাছমরা জেলে, মাঝি, মহাজনসহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। জব্বার নিজে ২৪-পরগণায় জন্মগ্রহণ করার কারণে নিজস্ব ব্যক্তি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সকল চর অঞ্চলের অধিবাসীদের কথকতা তুলে ধরেছেন। মানিক, অদ্বৈত কিংবা সমরেশের থেকে তিনি যে স্বতন্ত্র তার আভাস রয়েছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসে কয়েকটি বিশেষত্ব নিম্নরূপ:

ক. চর জীবনকেন্দ্রিক জীবনচর্চা;

খ. মহাজনদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ও রাজনীতি;

গ. জেলেদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

হুগলি নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জেলেদের অবাধ বিচরণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ইলিশের মরশুম ফুরালে যেমন জেলেরা অর্থহীন হয়ে পড়ে, অভাব-অনটনে দিন কাটায় তেমনি এই উপন্যাসের জেলেরা ইলিশের মরশুম ফুরালে গহন সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ইলিশের মরশুমে মহাজন তারিণী মাঝি ও তরব-দি মাঝির মতো মহাজনদের কাছে ভগের নৌকায় কাজ করে। যা মাছ পায় আড়াইটা ভাগ মহাজনদের দিতে হয়। ইলিশের মরশুমে এই জেলে পাড়ার বুড়ো এবং বউয়েরা বাদে সবাই গাঙে চলে যায়। পাড়ার বুড়ো ও বউরা তাদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকে। অন্যদিকে, বর্ষায় নদীও এই চরকে আস্তে আস্তে গ্রাস করতে থাকে—

> ক. "ওদিকের বিরাট একটা অংশ জুড়ে বুক-শিউরে-ওঠা ধস নামছে প্রতি বছরে বছরে, ইলিশমারির চরের বুকে এগিয়ে চলেছে ধান-জমিকে গ্রাস করতে করতে।"[২৩]
>
> খ. "পোর্ট কমিসনের হাজার শক্ত বাঁধুনীকেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। এই ভাঙা চরের মাঝখানে আছে পাঁচটি খেজুরগাছ-ঘেরা সবুজ ঘাসওয়ালা একখণ্ড জমি।"[২৪]

বর্ষাকালে জেলেদের এই ভাঙনের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। কারণ জেলেরা মহাজনের কৃপাধন্য। অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবিত্ত জেলেরা তাদের টাকা শোধ দিতে না পারলে সেই টাকার শোধ নেয় ঘরের যুবতী মেয়ে ও বউয়ের শরীরের বিনিময়ে। এইভাবে কানাইয়ের যুবতী মেয়ে মালতীকে তরব-দি মহাজন শারীরিক অত্যাচার করে।[২৫] আবার হরেনের বউ সিন্ধু তরব-দিকে নিজের শরীর সঁপে দিতে চায় না। তাই অন্তঃসত্ত্বা সিন্ধুকে খুন হতে হয়। আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে চর অঞ্চলের মানুষদেরকে কতটা নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হয় তার-ই বয়ান যেন তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। বড় জেলেদের পাশাপাশি খুচরো মেছোনিদের কথাও এখানে উঠে এসেছে। মহাজনের নৌকায় জয়নদ্দি, হরেন ও কানাই কাজ করে। মহাজনের কাছ থেকে মাছ যা ভাগ পায় জয়নদ্দি তিনটি সমান ভাগ করে। আবার, কখনো পাওনা থেকে হরেন, কানাই বঞ্চিত হলে মহাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছে। মানিকের পদ্মায় যেমন বেশি মাছ উঠলে জেলেদের মনে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করা যায় তেমনি এখানে জেলেরা চায় বেশি মাছ। কারণ, এখানে তারা মাছ বেশি পেলে তাদের হাতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটু বেশি টাকা রোজগার হয়। জেলে জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে যেমন প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, মহাজনদের শোষণ-অত্যাচার থেকে জেলেরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু এই উপন্যাসের শেষে দেখা গেছে, জয়নদ্দি নিজে জমি ও নৌকার মালিক হয়েছে। তার দুটো নৌকায় পাঁচজন জেলে কাজ করে। অর্থনৈতিকভাবে এই নিম্নবিত্ত মানুষেরা নিজেদের প্রচেষ্টায় সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, মহাজনদের বাধ্য করেছে তাদের দাবি মানতে। অন্যদিকে, রতনের প্রচেষ্টায় একটি স্কুলও স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে চরের মানুষেরা পেয়েছে শিক্ষার আলো।[২৬] ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বাস্তব রূপায়ণে ধীবর সমাজের এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে।

গহিন গাঙ (১৯৮০)

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি ১৯৭৯ সালে 'প্রান্তিক' শারদীয়া সংখ্যায় এবং ১৯৮০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের ৬টি পরিচ্ছেদে বেতনা নদীর ধারে মালোপাড়ার মাছমারাদের জীবন-যাপনের সুখ-দুঃখের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই বেতনা নদী বর্ষা এলেই ফুলে ফেঁপে ওঠে। রায়মঙ্গলের থেকে নিজেকে আলাদা করতে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বিদ্যামান। তাই এই নদী মালোদের জন্য নিয়ে আসে চিংড়ি, ভেটকি থেকে শুরু করে নোনা জলের হাজারো মাছ। মালোদের ইতিহাস অর্থনৈতিক সংকটের ইতিহাস। সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নেওয়ার ফলে নিম্নবিত্ত মালোরা সোনার গাঙের সোনার ফসল ঘরে তুলতে পারে না। সবটুকুই দিয়ে আসতে হয় সুদখোর মহাজনদের। এই মালোপাড়ার অপর একটি নাম আছে - 'বিধবা পল্লী'। উপন্যাসটির কাহিনি বিধবা পল্লী থেকে শুরু করে বেতনা, সোনার গাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, কচুখালি, বিদ্যার জঙ্গল, বাসন্তী, রাঙাবেলিয়া, ক্যানিংসহ অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মালোদের কাছে নৌকা ও জাল দুটোই জীবনের চলমানতার প্রতীক। সোনার গাঙে মালোরা দুটো প্রজাতিতে বিভক্ত। একটি 'মালো' অন্যটি 'নিকিরি'। মালোরা জাল ও নৌকা নিয়ে গাহিন গাঙে মাছ ধরতে যায় বলে নিজেদেরকে নিকিদের থেকে উন্নত বলে মনে করে। আর নিকিরা কাদা বা পাঁক থেকে মাছ খুঁজে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সপরিবারে উপস্থিত হয় বিডিও অফিসে, রিলিফের জন্য। মালোপাড়ার প্রধান দ্বন্দ্বটা মালোদের সঙ্গে মালোদের নয়, মালোদের সঙ্গে জোতদারদের। একদিকে ননীবালা, ললিত, দয়াল খুড়ো, হারান, মধ্য এবং ললিতের ছেলে শ্রীপদ ও লগা। অন্যদিকে, আব্দুল, ইশ্বর মণ্ডল ও পাঁচু ভট্টাচার্যের মতো মানুষদের সঙ্গে মূল সংগ্রাম। মালোরা যখন ক্যানিং-এর মহাজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখন তার নেতৃত্ব দিয়েছিল ললিত বর্মণ। কারণ ভূপতি ডাক্তার কো-অপারেটিভ ফিসিং-এর একটি ব্যবস্থাপনায় এই মালোদের উপকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু লঞ্চের মালিক ও ঘাটিদাররা মিলে এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পরিকল্পনাটি সফল হতে দেয়নি। তাই মালো সমাজ অন্ধকারে পড়ে থাকে। এই ষড়যন্ত্রে মালোরা আত্মসমর্পণ করে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত জোতদারদের কাছে। তারা আত্মসমর্পণ করলেও 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', এবং 'গঙ্গা' উপন্যাসে মালোদের মতো তাদের অবস্থা হয়নি। অর্থাৎ এখানে মালোদেরও সমাজে উত্তরণ লক্ষ করা গেছে। ছোট গাঙে মাছ পাওয়া না গেলে তাদের আর্থিক সংকট আরো অধিক হয়ে ওঠে। ললিতকে বাঘে নিয়ে যাওয়ার পর তার ছেলে শ্রীপদ মালো সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী কুশপুতুল না পুড়িয়ে বাবার তিন বছর আগে ধার নেওয়া পঞ্চাশ টাকা সুদে আসলে দু'শো পঁয়তাল্লিশ টাকা শোধ করে এবং নিজের ছেলে যাতে ঋণগ্রস্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখে। এখানে নদী শুধু গহিন হয় না, নদীমাতৃক জীবনের হাঁ মুখটিই গহীন হয়।[২৭] সময় সময়ে নদী ভয়াল, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শেষে বেতনা নদীর ভয়ংকর ঘূর্ণিতে মেতেছে—

> "বাপ! বাপরে! আসিস নি সর্বনাশীর কাছে। জলস্তম্ভ ভেঙে ভেঙে পড়ে, ঢেউ কমে আসে, পদর চোখের সামনে বেতনা জল ঠেলে নিয়ে যায় সাগরে।"[২৮]

শ্রীপদকে জীবন দ্বন্দ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে পরাজয়ের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হয়। তাই সে স্থান, কাল, বাস্তবতার নিরিখে জীবনের টানে এবং বাঁচার তাগিদে ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিবাদের আগুনকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে চলমানতাকেই বেছে নিয়েছে। আর নৌকা, জাল ও সোনার গাঙ হয়ে উঠেছে এই চলমানতার প্রতীক।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জল মাটি আগুনের উপাখ্যান (১৯৯৬)

আশির দশকে ভৈরব নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত নিয়ে যিনি উপন্যাস রচনা করলেন, তিনি অবশ্যই আবুল বাশার। বাশার দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে, সেখানকার মানুষদের জীবন-যাপন ও জীবিকা নির্ভরের দিকটিকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসে লোকায়ত জীবন, ইসলামীয় মিথ, হিন্দু পুরাণ এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের সংমিশ্রণ[২৯] ঘটিয়েছেন নিপুণ ভাবে। 'জল মাটি আগুনের উপাখ্যান' উপন্যাসটি ৮টি পরিচ্ছেদে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভৈরব নদী ভাঙনের প্রেক্ষাপটে রচিত। ভাঙনের ফলে, ভৈরব নদী পাড়ের মাটিকে কেন্দ্র করে চাষি ও কুমোর সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের অবকাশ লক্ষ করা গেছে —

> "ওরা জানে না। নাম মদন ভাবে। ওরা যেন কিছুই জানে না। নদীকে যেন কখনও প্ররোচিত করে না পাড় ভাঙতে! এই গুহায় জল কি ঢোকে না বর্ষাপ্লাবনে! গুহা করে বলে তো চুঁটঅলা জমি ভেঙে পড়ে জলের ধাক্কায়, জলের ফিসফিসামি শোননি? ষড়যন্ত্র জান না?"[৩০]

এখানে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন নদী পাড় থেকে মাটি কাটলে আইনসম্মত ভাবে কারোর কিছুই কররা থাকে না। কোনো চাষির জমি থেকে মাটি কাটলে সেটা অপারাধ হয়। তাই নদীর ধারে যে চাষির জমি, সে শুধু মহাক্রোধে কুমোরকে গালিগালাজ দিয়ে শান্ত হয়। এখানে নদী-ভাঙন একশ্রেণির (চাষি) মানুষের কাছে দুঃখের কারণ হলেও অন্য শ্রেণি অর্থাৎ কুমোরের কাছে সেটা আনন্দের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। নদী-ভাঙনে চাষিরা জমি হারিয়ে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, স্বাভাবিক নিয়মেই নদী ঐ মাটিকে নিয়ে অন্য পাড়ে চরে পরিণত করেছে। তাতে মাটি পাওয়ার সুবিধা হয়েছে কুমোরদের।

সেই মাটিকে কাজে লাগিয়ে মৃৎ পাত্র নির্মাণ করে তারা আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করেছে। নদীর যেই পাড় বরাবর মানুষের বসতি থাকে সেই পাড়ে নদী শাসনের চিত্রটাও বেশি লক্ষ করা যায়। তাই সেই পাড় দুর্যোগপূর্ণ দিনে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে—

> ক. "ওপারে ভাঙন নেই। নদী পলি ফেলে চরের সঙ্গে সমতল রেখায় সমান হতে চাইছে; পাড়ের ভাঙন শুধু এপারে। এপারে বসতি, এপারেই ভাঙন।"[৩১]
>
> খ. "বর্ষার ভাঙতে ভাঙতে থেকে পড়া সুবৃহৎ কাঁধালে ফাট ধরে নদীর পথের সীমানা ছাড়িয়ে কখন অজ্ঞাত নাম মদনের জমির একটি বড় অংশ অবধি সেই ভাঙন-ফাট প্রসারিত হয়েছে। রবিশস্যের ঝুনো ফসল ঝাড়ে সেই ফাট ছিল ঢাকা, চেন এই ফাটের উপর দিয়ে টেনে বেড়াল মদন, একটু আগে।"[৩২]
>
> গ. "তখন সেই চাঙড় গিয়ে নদীর জলে মোষের মতন ভোঁস করে ঝাঁপ দিল। মনে হল, মাটিও প্রাণী। সবই অবাক ব্যথায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করল নাম মদন। মাটিতে সে একফোঁটা হাতও লাগাল না। স্পর্শ করতে ইচ্ছে হল না তার। এই রকম রোদের তাতে পোড়া, শুকনো মাটি আশ্চর্য করে ধসে গেল। চৈত্রে এমন ভাঙন বিশ্বাস করতে চায় না মন।"[৩৩]

শুধু যে নদী বর্ষাকালে পাড় ভাঙন ঘটায় এমনটি নয়, বর্ষার পরবর্তী সময়ে জলস্তর নিচে নেমে গেলে সেই ভাঙন অব্যাহত থাকে—

> "বর্ষা-বন্যার জল নামতে শুরু করলে ভাঙন লাগে কাঁধালে। অবশ্য জলভরা নদীতেও পাড় ভাঙার কাজ চলে। তবে জল নামার সময়ই দাপানি বেড়ে যায়। বর্ষা শেষ হয়েছিল। পাড় ভাঙছে। মৃন্ময়ী পাড় ভাঙা দেখছিল। মিতের জমির উপর নদীর চোট এবার সবচেয়ে বেশি। কী একটা অদ্ভুত আক্রোশ। কখনও কখনও নদী বিশেষ একটা জমিকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে।"[৩৪]

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জল-মাটি-আগুনের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে চিত্রিত করেছেন। তার সঙ্গে এই নদী পার্শ্ববর্তী মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মৃন্ময়ীকে ঘিরে চাষি মদন ও কুম্ভকার মদনের প্রেম ও দ্বন্দ্বময় চিত্র এবং ভৈরবের প্রতিহিংসার আগুন এই জনজীবনকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। তাই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষে বলেছেন —

> "মিলনে সম্পূর্ণতা নয়, অভিশাপের সঙ্গে পাপের সম্পূর্ণতাই জল মাটি আগুনের উপ্যাখ্যান।"[৩৫]

নদী-ভাঙন ভূগোলের বিষয় হলেও সেই বিষয়টিকে নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ঔপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। নদী-ভাঙন তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের আধারে জনজীবনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের যে চিত্র আমরা লক্ষ করি তা এক বিশেষ সময়ের কালপর্বে মানব জীবনের বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. https://bn.m.wikipedia.org, Date-02.12.2024
২. *The American Haritage Dictionary*, Second Edition, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, USA, 2014 [দ্র: www.the free dictionary.com. Date-02.12.2024]
৩. Burden, Ernest, *Illustrated Dictionary of Architecture*, Third Edition, McGraw Hill, New York, 2012 [দ্র: www.thefreedictionary.com, Date-02.12.2024]
৪. আসাদুজ্জামান, ইসলাম, জহুরুল, আখতার লুবানা, রহমান, ওহিদুর, রহমান, হাবিবুর, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রথম প্রকাশ, কবির পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ২০১১-২০১২, পৃ. ৩২৪
৫. www.referance.com, Date-02.12.2024
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, *বাংলার নদনদী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৯১
৭. তদেব, পৃ. ১৯৩
৮. তদেব, পৃ. ১৯৩
৯. হাজরা, প্রতাপরঞ্জন, *অমরেন্দ্র ঘোষ জীবন ও সাহিত্য সাধনা*, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০৪
১০. ঘোষ, অমরেন্দ্র, *চরকাশেম*, পুনর্মুদ্রণ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫
১১. তদেব, পৃ. ৫৫
১২. তদেব, পৃ. ১২১
১৩. হাজরা, প্রতাপরঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
১৪. রায়, অলোক, *বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা প্রাপ্তি*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৪৩
১৫. মজুমদার, ড. সমরেশ, *গল্প-উপন্যাসের অন্তর্জীবন*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৮২
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) (মহানন্দা)*, পঞ্চম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ১৩৫
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৮
১৯. তদেব, পৃ. ১৪৭
২০. সামন্ত, ড. প্রভাস চন্দ্র, *নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬৩
২১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *গড় শ্রীখণ্ড, দ্বিতীয়* সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৯
২২. দাশ, শচীন, *ইলিশমারির চর: সুন্দরবনের জেলে জীবনের এক নতুন আখ্যান*, [*সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক - নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল], ২০১১, পৃ. ৮৩
২৩. জব্বার, আব্দুল, *ইলিশমারির চর, দ্বিতীয়* সংস্করণ, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫
২৪. তদেব, পৃ. ৫
২৫. মাল, ড. সুদেব, *জেলে-জীবন ও বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, ঘোষ অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮৭

২৬. সরকার, ড. তারক, *ইলিশমারির চর: জীবনের নবদিগন্ত*, [*বনানী (আব্দুল জব্বার সংখ্যা)*, সম্পাদক - অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল], ২০০৯, পৃ. ১১৪

২৭. মণ্ডল, অলোক, *সুন্দরবনের নিসর্গ, সমাজ ও মানুষের এক জীবন চিত্রশালা–গহীন গাঙ*, [*সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন, কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা*, (সম্পাদক- নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল)], ২০১১, পৃ. ১৮৫

২৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, *গহিন গাঙ*, প্রকাশ, ভাবনা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬১

২৯. দত্ত, সমীরণ, *আবুল বাশারের উপন্যাসে মুসলিম জীবনের অন্তঃস্বর*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫৫

৩০. বাশার, আবুল, *জল মাটি আগুনের উপাখ্যান*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২১

৩১. তদেব, পৃ. ২৩

৩২. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭

৩৩. তদেব, পৃ. ৩৭

৩৪. তদেব, পৃ. ১০১

৩৫. তদেব, পৃ. ১৬৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 427 - 434
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লীলা মজুমদারের উপন্যাস : শিশুমনের সার্বিক কথন

পরিতোষ পাল
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : paritoshpaulnbu20@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Leela Majumdar, Bengali Children's Literature, Child Psychology, Moral Values in Literature, Character Development, Nature and Animals in Stories, Fantasy and Ghost Tales,

Abstract
Children's literature plays a vital role in shaping a child's mental framework, alongside their environment, family, and education. In the Indian context, traditional forms like folklore, epics, and moral tales gradually transitioned into structured publications catering to children's evolving needs. Despite efforts by notable literary figures and magazines, like Sandesh, spearheaded by Upendrakishore Ray Chowdhury, Rabindranath Tagore, and Sukumar Ray, many early publications failed to balance entertainment, education, and engagement.

Leela Majumdar redefined children's literature in Bengali by addressing their dynamic needs at different life stages. She crafted stories that combined adventure, humor, curiosity, and life lessons without enforcing moral dictums. Her characters, like Ganasha, Ghontan, Gupe, and Panu, reflected everyday flaws and learned from their mistakes, resonating deeply with young readers. Majumdar's storytelling emphasized human values such as kindness, gratitude, and empathy, all while acknowledging the socio-political upheavals of her time—British rule, independence struggles, Partition, and post-war realities.

Her thematic diversity spanned science, fantasy, ghosts, and nature. Unlike others, her portrayal of animals and nature was rooted in realism, fostering an emotional connection and ecological awareness among children. Her unique approach extended to language and presentation, using simple, modern words and short sentences to make Bengali literature accessible and enjoyable for children.

Drawing inspiration from her familial legacy, time at Santiniketan, and personal experiences, Majumdar enriched her works with authenticity and emotional depth. This essay examines her contributions across six chapters: her literary inheritance, understanding of child psychology, integration of science, animal and nature themes, innovative ghost stories, and distinctive narrative techniques. Majumdar's oeuvre remains a cornerstone of Bengali children's literature, blending education, entertainment, and ethical growth seamlessly.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

লীলা মজুমদার যখন সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করেন তখন বিশ শতক। শিশুসাহিত্য ইতিমধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত। 'সখা' 'সখা ও সাথী' 'বালক' 'মুকুল' 'সন্দেশ' ইত্যাদি পত্রিকা শিশু সাহিত্যকে নতুন দিশায় পরিচালিত করে ফেলেছে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার বুঝেছিলেন শিশুদের চাহিদায় শিশুসাহিত্য রচনা করার প্রয়োজনীয়তা। সেই আবহে সরাসরি বড়ো না হলেও তার আঁচ সবসময় পেয়েছিলেন। আর নিজের পরিবারের সেই সদস্যদের পেয়েছেন পূর্বসুরি, উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা হিসেবে। পাশাপাশি ছোট থেকেই নিজে ছিলেন অসম্ভব যুক্তিবাদী, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন। শিলং পাহাড়ে কাটিয়েছেন ছেলেবেলা; প্রকৃতি ও সেখানের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কাছ থেকে দেখেছিলেন, আত্মস্থ করেছিলেন। নানারকম মানসিকতার, সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেশার ফলে মানবচরিত্রের নানাদিক তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছিল। নিজের লেখার জগৎকে এই দেখার শোনার জগৎ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন; নিজেই তা স্বীকার করেন —

> "ছোটবেলা থেকে আমার জীবনের আকাশে বাতাসে যেসব পাতার মর্মর, ছোট ছেলের কলহাস্য, স্নেহের কণ্ঠ শুনেছি তাঁরাই আমার মনের বনের গানের পাখি। সবুজ গাছের ডালটি পুঁততে পারিনি, বসার একটু জায়গা পায়নি তারা। বুঝতে পারি, জন্মক্ষণে পরিপূর্ণ ভাবে জন্মায়নি আমি। তার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পড়েছি, যা ভেবেছি, যা দিয়েছি, যা পেয়েছি আর যা পাবার নয়, যাকে শুধু স্বপ্ন দেখেছি, সব মিলিয়ে তিলে তিলে কণা-কণা করে আমি তৈরি হয়েছি। তাদের কাছে আমার ঋণই আমার পরম গৌরব।"[১]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন 'মনের পুঁজি'র কথা বলতেন, সেই মনের পুঁজি জমিয়ে গড়ে উঠেছে লীলা মজুমদারের শিশুসাহিত্য। তাই তারা জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে পাঠকের কাছে।

শিলং পাহাড়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে পড়াশোনা করার সুবাদে নানদের ত্যাগ শিশু লীলাকে মুগ্ধ করত। ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ ও স্কুলের নানদের শিক্ষা এবং তার সাথে সবুজ প্রকৃতির মুক্ত হাওয়া দুইই তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁর ভিত গড়ে উঠতে। কখনই কোনও ধর্মই তাঁকে আকৃষ্ট করেনি— ভগবানের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, যিশুর ছবির সাথে বাস্তবে দেখা পরিচিত জনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে গিয়ে চারপাশের মানুষজন-প্রকৃতিকে প্রাণ ভরে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সর্বোপরি বাড়ির বড়দের থেকে কখনই বাধা পাননি এইসব কাজে, বরং উৎসাহ পেয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে অথবে পরোক্ষভাবে। তাঁর সেই বেড়ে ওঠার সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বস্ত করেছিল। মিশনারি স্কুলে সেই যুদ্ধের হাওয়া এসে লেগেছিল —

> "মেমরা, অর্থাৎ আমাদের ফিরিঙ্গি সহপাঠিনীরা বুনবে সায়েব সোলজারদের জন্য, স্কুল থেকে তাদের খাকি উল দেওয়া হল। মাদার হায়াসিস্থ নিজে ফরাসি মেয়ে, তিনি আমাদের সেলাই শেখাতেন, এমন চমৎকার সেলাইয়ের হাত কম দেখেছি। তিনি বলতেন, 'তোমরা ইন্ডিয়ান সোলজারদের জন্য বুনবে। বাড়ি থেকে উল কিনে নিয়ে এসো'। '...যামিনীদাকে খাকি উলের নমুনা দেওয়া সত্ত্বেও, গাঢ় লাল উল এনে দিল। এবং বললে আনতে অস্বীকার করল। ভয়ে ভয়ে মাদার হায়াসিংকে উল দেখালাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। সব রং-ই সমান গরম'। তাই বোনা হল, সাদা কালো মেমের মেয়েরা বুনল সায়েবদের জন্য থাকি গলাবন্ধ আর আমরা বুনলাম আমাদের দেশভাইদের জন্য লাল, নীল, হলদে, সবুজ, যার যেমন ইচ্ছে, কিংবা যামিনীদাদের যেমন ইচ্ছে। এই ব্যাপারে অনেকদিন পর্যন্ত মনে একটা খটকা থেকে গেছিল। বলেছি তো যা দেখা যায়, শোনা যায়, ভাবা যায়, সব মিশে একেকটা মানুষ তৈরি হয়। তবু যুদ্ধটা দূরেই থেকে গেল। দূরেই থেকে গেল, যতদিন না মিস লেভেন্স এসে আমাদের সেলাইয়ের ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। এই মানুষটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। বয়স হয়তো বছর কুড়ি, অদ্ভুত ফ্যাকাশে রং ফিকে সোনালি চুল, তাতে এতটুকু জেন্না নেই, পালকের মতো পাতলা শরীর,

> চোখ দেখে মনে হত সর্বদা জলে ভরে আছে। ক্লাসের বেকুফ মেয়েগুলো বলল, "বেলজিয়াম থেকে এসেছে। জর্মানরা ওর চোখের সামনে ওর বাপ ভাইদের মেরে ফেলেছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিছু নেই ওর। রেড ক্রসের লোকরা ওকে পাঠিয়েছে। ওর কাপড়চোপড়গুলো পর্যন্ত অন্য লোকে দয়া করে কিনে দিয়েছে।
> আমরা শুনে স্তম্ভিত! ওই মানুষটিকে মেয়েগুলো এমনি জ্বালাত যে কতবার সে কেঁদে ক্লাস ছেড়ে চলে গেছিল। শেষে একদিন শুনলাম সে চলে গেছে।"[২]

পরে কিছুটা বড়ো হওয়ার পরে দেশে তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, সাথে পাল্লা দিয়ে চলছিল মানুষের ভণ্ড দেশপ্রেম। ছেলেবেলার এক ঘটনা 'পাকদণ্ডী'তে লিখেছেন তিনি, সাথে তাঁর মায়ের ভাবনাচিন্তার ব্যপ্তি —

> "আসলে আমাদের দেশভক্ত বন্ধুবান্ধবরা ওই উপাধির কথা জানতে পারেনি। তাইতে আমরা বেঁচে গেছিলাম। কিন্তু বাবা কেন সরকারি চাকরি ছাড়ছেন না, তাই নিয়ে গঞ্জনা দিতে ছাড়ত না। মা-র কাছে একবার কথাটা পাড়লে, মা সোজাসুজি বললেন, 'এ তো কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কাজ নয়। তা ছাড়া বাবা কাজ ছাড়লে কি তোরা আর তোদের দেশপ্রেমিক বন্ধুরা আমাদের সংসার চালাবি?' এমন অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর হয় না বলে রণেভঙ্গ দিতে হল।

তখন কেউ বিদেশি কাপড় পরত না। শহরের নানা জায়গায় যে যার দামি দামি বিদেশি কাপড়চোপড় এনে স্তূপাকার করে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। মা একবার বলেছিলেন, শীতে কাঁপছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গরিব মানুষ। পুড়িয়ে না ফেলে ওই গরম জামাগুলো ওদের দিয়ে দিলে হত না?' আমরা তখন জোর গলায় বলেছিলাম, 'না, মা, হত না। দেশপ্রেমের জন্য সব্বাইকে কষ্ট করতে হবে। এখন ভাবি মা মন্দ কথা বলেননি।"[৩]

আবার যখন বাবার সাথে স্বাধীনতার হুজুগে ছোটদের বিদেশি স্কুলে ঢুকতে দেওয়ার বাধা দেওয়া প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হত, তখন তিনি বলতেন—

> "শত্রুর নিন্দা করে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওভাবে যুদ্ধে জয় হয় না। প্রবল শত্রুর চেয়ে প্রবলতর হতে হয়; মুখে বক্তৃতা করলেই হল না, কাজেও দেখাতে হবে। ব্রিটিশদের অনেক গুণ, সেগুলোকে আয়ত্ত না করলে কিছু হবে না, শুধু জোর করে ছেলেদের স্কুলে ঢোকা বন্ধ করে দেশের কোন মঙ্গল হবে না, সাহদসী হওয়া চাই, জোরালো হওয়া চাই।"[৪]

এই সব বাহ্যিক ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন গড়ে তুলতে পরোক্ষ প্রভাব ফেলে, লীলার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। আর যারা এই সময়তা নিজেরা পেরোয়নি, কেবল উপন্যাস শুনেছে কিংবা বইয়ের পাতায় পড়েছেন তাদের অর্থাৎ তাঁর খুদে পাঠকদের মনে এই ঘটনাগুলির প্রভাব চিরস্থায়ী করতে ও তার প্রকৃতস্বরূপ বোঝাতে সাহিত্যে বারেবারে এইসব ঘটনার প্রেক্ষিত নিয়ে এসেছেন। তবে ইতিহাস হিসেবে নয়, সেই সময়ের অন্ধকার দিক মানুষকে কীভাবে যন্ত্রণা দিয়েছিল, তার দিকে আলোকপাত করেছেন। আসলে তিনি জানতেন, দুই বিশ্বযুদ্ধ, নিজের দেশের স্বাধীনতার লড়াই, পরিবর্তিত সময়-সমাজে আদর্শ-মূল্যবোধ ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে—

> "আমরা যেসব গুণকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম, এখন দেখি সেসব গুণ অচল।"[৫]

চেষ্টা করেছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই মূল্যবোধ শিশুদের মধ্যে ধরে রাখতে। আর এই সমস্ত কিছু দিয়ে শিশুমনকে যত্ন দিয়ে গড়ে তাকে সুন্দর করে লালন করার স্বপ্নেই তাঁর শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ।

লীলা মজুমদারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্রে পরিবারের যে আদি পুরুষের নাম পাওয়া যায়, তিনি রামকান্ত মজুমদার, যিনি ছিলেন নানা ভাষার পণ্ডিত। লীলার প্রপিতামহ লোকনাথ-ও ছিলেন সেই সময়ের প্রধান তিন ভাষা আরবি-ফারসি-সংস্কৃতে পারদর্শী। ভাষার প্রতি ভালোবাসা সেইখান থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল, বলাই বাহুল্য। তাঁর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পিতামহ শ্যামসুন্দর মুন্সীকে পরিবারের প্রথম সাহিত্যিক বলা যেতে পারে। লীলা মজুমদার যাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁরাও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে লীলা মজুমদারের মানস গঠনের কাণ্ডারি। সারদারঞ্জনের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ দান, তাঁর অসম্ভব চারিত্রিক দৃঢ়তা যেমন লীলার মধ্যে রয়েছে, তেমনই তাঁর চরিত্রদেরও এইসব গুণে ভরিয়ে তুলেন তিনি। ছোটোজ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন লীলার ছবি আঁকার প্রবণতাকে উৎসাহিত করতেন; পাশাপাশি তাঁর প্রাচ্য–পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদের সহজ সরল প্রাঞ্জল অকৃত্রিম ভাষা লীলার ভাষা শিক্ষার সহায়ক। বাবা প্রমদারঞ্জন জরিপের কাজে নানা দুর্গম স্থানে বেড়িয়েছেন আজীবন, ফিরে এসে তাঁর সেই অভিজ্ঞতার উপন্যাস শোনাতেন। লীলা মজুমদারের পশু-পাখির প্রতি ভালোবাসা, হিংস্রতার বদলে তাদের অসহায়তা, তাদের ভয়, তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বোধ সেখান থেকেই গড়ে উঠেছে; একইসাথে উপন্যাস শুনেছেন কীভাবে প্রবল বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করতে হয়— লীলা সেই ভাবনা আত্মস্থ করেছেন এবং উপন্যাসের চরিত্রদের মাধ্যমে তাকে তাঁর শিশু পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করার প্রয়াস করে গেছেন। আর উপেন্দ্রকিশোরের কাছে তো সমগ্র শিশুসাহিত্য আজীবন ঋণী, সেখানে লীলা মজুমদারের ঋণ থাকবেই তা স্বাভাবিক। লীলা মজুমদার পাকদন্ডীতে বলেছিলেন, -

> "তাঁর পুরোনো লেখা পড়তে গিয়ে কত সময় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দেখেছি যে ভাষাকে আমি নিতান্ত আমার নিজের মৌলিক ভাষা বলে অনেকদিন ভেবে এসেছি, তাও জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া।"[৬]

তাঁর শিশুসাহিত্যের জন্য ভাবনা, কেবল উপন্যাস লিখে দায় না সেরে শিশুমনের উপযোগী করে তার উপস্থাপন, প্রকাশের পরিকল্পনাকে লীলা মজুমদার পরিবর্তিত সময়ের কথা মনে রেখে তাকে বিবর্তিত করে তাঁর উপন্যাসের ভুবন সাজিয়েছেন। বড়দা সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকার হাত ধরেই তাঁর সাহিত্যের হাতেখড়ি। বড়দার উদ্ভট ভাবনা, নির্মল হাস্যরসকে আরও বুদ্ধিদীপ্ত করে উপস্থাপন করেছেন লীলা। স্বীকার করেছেন নানকুদার অর্থাৎ সুবিমলের অনবরত সকলকে নিয়ে বা যে কোন ঘটনা নিয়ে উপন্যাস বলে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই তিনি উপন্যাস বলা শুরু করেছিলেন। সাথে ছিল মা সুরমাদেবীর তাঁদের মানুষ করার জন্য খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি। এইভাবে সমগ্র পরিবার তাঁকে লীলা মজুমদার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

এই বিপুল পারিবারিক সহযোগীতা ও উত্তরাধিকার এবং তাঁর সাথে যুক্ত আধুনিক মানস লীলা মজুমদারের শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য রচনায় সাহায্য করেছিল। ফ্রয়েড, এরিকসন, আর্নল্ড গেসেল, বনফেনব্রেনারে, গিলফোর্ড, পিঁয়াজে, ভয়টোগস্কি, টরেন্স, রুশো ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিকদের শিশুমন বিষয়ক আলোচনায় দেখা গেছে শিশুদের সংবেদনশীল মন, কৌতুহলী মন, সৃজনশীল মন, কল্পনাপ্রবণ মন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, চিন্তন ক্ষমতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। গবেষণায় দেখা যায় শিশুসাহিত্য শিশুর চরিত্র, চিন্তন, ভাষাশিক্ষা, সৃজনশীলতাকে গড়ে তুলতে ও পরিবর্তনে সাহায্য করে। এই ভাবনাকে লীলা মজুমদার মান্যতা দিয়েছেন আজীবন। 'কেন ছোটদের জন্য লিখি' বলতে গিয়ে তিনি বলেন—

> "ছোটরা পড়ে মজা পাবার জন্য। মজা না পেলে হাজার ভালো বই হলেও পড়ে না। যা পড়ে তাই দিয়ে ওদের মন তৈরি হয়, পরে কাজে লাগে।"[৭]

এই সমস্ত শিক্ষা, নিজের ভাবনা-চিন্তা দিয়ে তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন তাঁর শিশুতোষ উপন্যাসগুলিকে। তাঁদের মনের উপযোগী করে সেখানে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রিয় ও উপকারী নানা বিষয়— পশুদের হিংস্র-জান্তব ভয়ের বিষয়ের বদলে তাদের অসহায়তা, তাদের সংরক্ষণের প্রতি যত্নশীল হওয়ার উপন্যাস; সাধারণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এসে শিশুদের মতো করে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন; কখনও জীবনের জটিলতাকেও শিশুদের সামনে তুলে ধরেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন তাদেরই মত করে; উপস্থাপন কৌশলে এনেছেন তাদের শিক্ষণীয়, উৎসাহিত ও মনোযোগী করার উপাদান; শিশুদের দিয়ে করিয়েছেন দুঃসাহসিক অভিযান; তাদের সংবেদনশীল মনকে যত্ন সহকারে পালন করেছেন কাহিনিতে; উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে নিয়ে এসেছেন তাদেরই মতো কিছু দুষ্টু স্কুলে পড়া ছেলেদের ও তাদের আশেপাশে দেখা বড়দের,

যাদের সাথে তারা নিজেদের একাত্ম করতে পারে; উপদেশমূলক উপন্যাসকে পরিহার করা হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের হাত দিয়েই, লীলা সেখানে নিয়ে আসেন এক অভিনবত্ব, যেখানে তিনি তাঁর খুদে পাঠকদের সামনে খারাপ-ভালো দুই দিকই তুলে ধরেন সাথে সেই কাজের পরিণাম, স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের মন ভাল কাজের পরিণাম দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়; প্রকৃতির শিক্ষা যা শিশুদের জন্য অপরিহার্য, তাঁকে নানাভাবে উপন্যাসের মধ্যে নিয়ে আসেন তিনি; জীবন যে কেবল সুখের চাদরে মোড়া নয়, দুঃখ যে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই শিক্ষা ছোটদের জানিয়ে দিয়ে যান নানাভাবে; শিশুমনে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার ও তাকে উৎসাহিত করার প্রয়াস তাঁর উপন্যাসের অন্যতম মূলধন; আবার একইভাবে তাদের অত্যন্ত পছন্দের বিষয় ভূতকেও বারেবারে উপন্যাসের চরিত্র করেন তিনি— শিশুমনের গঠনের সব দিকেই সমান দৃষ্টি দেন বলেই এখনও একবিংশ শতকের প্রতিযোগিতা বিধ্বস্ত গ্যাজেট সর্বস্ব সময়ে দাঁড়িয়েও লীলা মজুমদারকে অস্বীকার করতে পারে না শিশুরা, এমনকি তাদের অভিভাবকেরাও।

লীলা মজুমদার বারবার বলেন, -

> “বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস আমি চেষ্টা করি না। ফ্যান্টাসি লিখি। প্রকাশকরা বলেন কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস। কথাটা অদ্ভুত। ...ছোটো ছোটো পাঠক, যাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে প্রায় কোনো জ্ঞানই নেই, তাদের যদি এমন সব উপন্যাস শোনানো যায় যা পড়লে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু আসলে তা নয়— তাহলে ওই কচি পাঠকদের কপালে ভবিষ্যতে দুঃখ থাকতে পারে। তার চেয়ে সোজাসুজি আমি বলি ‘আজগুবি রচনাসমগ্র উপন্যাস’। ফ্যান্টাসি। তার মধ্যে যেটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্য পুরে দেই সেগুলি বাস্তব সত্যি। কিন্তু তাদের সম্ভাব্য পরিণামগুলি সত্য আজগুবি ব্যাপার। তার সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ নেই, যে উপন্যাস পড়বে সে একথা বুঝবে।”[৮]

তাই তাঁর গল্পে বিজ্ঞান আসে উপন্যাসের অনুষঙ্গে। সেখানে ভিনগ্রহী প্রাণী, রোবট নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা, আকাশযান, স্পেস স্টেশন, মহাকাশ বিজ্ঞান, চন্দ্রযাত্রা, বিজ্ঞানের নানারকম বৈচিত্র্যময় আবিষ্কার, আবিষ্কারের নেশা— সব কিছুই আছে, কিন্তু তার সাথে সত্য-মিথ্যা সকলই জুড়ে থাকে। কল্পনার অংশগুলি এতটাই কাল্পনিক যে পাঠকের পক্ষে তাকে সত্যি বলে মনে করার কোন উপায়ই থাকে না। আবার কিছু কিছু কল্পনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যাকে বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। কিন্তু একইসাথে এই তথ্য পাঠককে জানাতে ভোলেন না যেখানে বিজ্ঞানের আবিষ্কার তার আবিষ্কারকের ওপরেই কর্তৃত্ব করতে চায়। একইসাথে গল্পে মাঝে মধ্যেই নিয়ে আসেন বিজ্ঞানের নানা অনুষঙ্গ, যেখানে প্রকৃতি বিজ্ঞান থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান কিছুই বাদ পড়ে না।

প্রকৃতির মধ্যে শৈশব কাটিয়েছেন লীলা মজুমদার। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ তাঁকে আবৃত করে রেখেছিল জীবনের গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে, যাকে জীবনের সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করা হয়, সেই পর্যায়ে। শিলং ছেড়ে কলকাতায় আসার সময় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, -

> “সমস্ত বনভূমি আমাদের হাত-পা ধরে টেনেছিল।”[৯]

প্রতির সাথে এই একাত্মতা তাঁর জীবনের সেরা মূলধন। যেখানে গেছেন সেখানের প্রকৃতি, পশু পাখি সকলই তাঁকে আকৃষ্ট করত। ছোট থেকেই পশু-পাখিকে ঘৃণা নয়, ভালোবাসতে শিখেছিলেন। বুঝেছিলেন তাদের অসহায়তা, সংরক্ষণের প্রয়জনীয়তা। তাই তাঁর চরিত্ররাও তাদের প্রতি যত্নশীল; তারা ডানা ভাঙা পাখি, ঝড়ের রাতে দুর্দশাগ্রস্ত রাস্তার কুকুর, বিড়াল সকলের জন্যই কষ্ট পায়, তাদের সাহায্য করে। আবার হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের হিংস্রতা যে তাদের জীবনধারনের ও আত্মরক্ষার জন্য সেই কাহিনির পাশাপাশি তাদের মমত্ববোধ, তাদের জীবনযাপন নিয়ে নানা কৌতুকরসের কাহিনিও লিখে যান। তিনি স্বীকার করেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমি শুধু যেখানে যা ভালো জিনিস দেখি— শিশিরের উপর সূর্যের ঝিকিমিকি, নীল আকাশের বকের সারি, ছোটোছেলের গালের টোল, বাতাসের মুখে শুকনো পাতার ঘূর্ণি, উনুনের আঁচে দাবানল, সব জমা করি। যত শব্দ শুনি টিনের চালে শব্দ পড়া, গাছের পাতায় পাতায় বাতাস বওয়া, মাথার ওপর বুনো হাঁসের আঁক-আঁক শব্দ, বালির পাড়ে ঢেউ ভাঙা, ...যেখানে যত সুগন্ধ আমার নাকে এসেছে, লম্বা লম্বা কাহিনিসুদ্ধ আমার মনে জমা আছে। ...সারাজীবন ধরে তারা আমাকে রাজ্যেশ্বরী করে রেখেছে। এখন যদি তাদের বিলিয়ে না দিই, তাহলে তাদের রাখব কোথায়?"[১০]

সারা জীবনের প্রকৃতির দান তিনি বিলিয়ে গেছেন খুদে পাঠকদের মধ্যে কখনও কীটপতঙ্গ বিষয়ে নানা জানা-অজানা তথ্যের মাধ্যমে; কখনও বাঘ-ভালুক-হাতিদের নানা ছোটোবড়ো কাহিনি দিয়ে; কখনও প্রকৃতির অপার রূপ বর্ণনা করে। ছোটোদের মনে পশু ও প্রকৃতিকে এইভাবেই স্থায়ী করে রেখেছেন।

ভূতের উপন্যাস, যা শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়, তাই আবার তাদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারের গা ছমছমে পরিবেশে ভূতের ভয়ঙ্করতা শিশুমনে অন্ধকার ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভাললাগার সাথে ভয়ের এই বৈপরীত্য কাটাতে চেয়েছেন লীলা মজুমদার। তাই তাঁর উপন্যাসের ভূত কখনই ভীতিপ্রদ নয়, বরং তারাই ভয় পায় মানুষকে। তারা মনুষ্যজীবনের কৃতকর্ম, ভালো-মন্দ কাজের দায়ভার বহন করে চলে ভূত জীবনেও। ভূত হলেও তারা কর্তব্যে অবিচল। তারা সকলেই ভালো ভূত তো অবশ্যই, উপকারি-ও। এই ভুতেদের কার্যকলাপ সাধারন মানুষের মতোই— তাদের কেউ কেউ যৌথ পরিবারের সদস্য ছিল মনুষ্যজীবনে, ভূত হয়েও সেই যৌথ জীবনযাপন করার তাগিদ তাদের মধ্যে; কেউ মানুষের জীবনে যা যা কর্তব্য করত ভূত হয়েও সেই কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করছে; কেউ কেউ জীবনে যা পূরণ করতে পারেনি ভূত হয়ে সেইসব মনস্কামনা পূরণ করছে। গল্পে ভূতের প্রসঙ্গ এসেছে একেবারে স্বাভাবিকভাবেই। সেখানেও কোনও আলাদা আবহ তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করেন নি লীলা মজুমদার। আবার ভূতের আস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিশ্চিত, তাই তাঁর ভূতেরা যেন মানব জীবনেরই অঙ্গ হয়ে ধরা দেয়। এই বোধ যখনই ছোটদের মনে তৈরি হয়ে যায়, তখনই ভূতের ভয়ে তারা তটস্থ হয়ে থাকে না। উপরন্তু সেই ভূতেরা তাদের মানবিকতার, ঋণ পরিশোধের, নৈতিকতার, পরোপকারের, যূথবদ্ধতার পাঠ দিয়ে যায়। আর এখানেই লীলা মজুমদারের ভূতের উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে অনন্যতা।

সর্বোপরি শিশু সাহিত্যের বিশেষ উপস্থাপন ভঙ্গির যে দায়িত্ব শিশুসাহিত্যিকের ওপরে থাকে, তাই তাঁদের পাঠকমনে গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম নির্ণায়ক। লীলা মজুমদার যেন জন্মেই ছিলেন শিশুসাহিত্যের জন্য। আজীবন তিনি উপস্থাপন ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। বলা যেতেই পারে যে তা তাঁদের পারিবারিক উত্তরাধিকার; কিন্তু সেখানে তিনি বজায় রেখেছেন তাঁর স্বাতন্ত্র। সুনিল গঙ্গপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "রায়চৌধুরী পরিবারের অন্য লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে লীলা মজুমদারের একটি বড়ো তফাত আছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক আধুনিক, শব্দ ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন।
> তাঁর লেখাগুলির মধ্যে সংলাপ এমনই জীবন্ত ও স্বাভাবিক যে মনে হয়, সারাজীবন ধরে তিনি পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গেই মিশেছেন। ...দিন দুপুরে পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এ তো আমাদেরই উপন্যাস, উনি জানলেন কী করে? কোনও রচনা সম্পর্কে পাঠকদের এতখানি আপন আপন বোধ খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।"[১১]

ছোটদের কৌতূহলী অথচ চঞ্চল মন, প্রখর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে তিনি উৎসাহ দেন। আর তাই তাঁর উপন্যাসের পড়তে পড়তে আসে চমক। উপন্যাসকে তিনি এমনভাবে সাজান যে উপন্যাস পড়া নয়, তা হয়ে ওঠে শিশুদের প্রিয় উপন্যাস শোনা। উপন্যাসের বিষয় থেকে চরিত্র নির্বাচন— সবক্ষেত্রেই তিনি শিশুমনের প্রেক্ষিতে বিচার করেন। তাই শব্দচয়ন, বাক্যের বিন্যাস, ভাষার রকমভেদ সমস্ত কিছুই একেবেরে নিখুঁত হয়ে ধরা দেয় তাঁর রচনায়। গভীর তত্ত্ব কথা, জীবনের কঠিন সত্য, গোপন দুঃখ কোনকিছুই বাদ যায় না তাঁর গল্পে। কিন্তু কখনই তা শিশুদের বোধগম্যতার বাইরে যায় না। তাঁদের ভাষায় তাঁদের বোঝার মতো অনুষঙ্গ তৈরি করে তিনি শিশুদের এমন অনেক সত্যের মুখোমুখি অনায়াসে দাঁড়

করান, যা বাড়ির আপনজনেরাও এড়িয়ে যেতে চান, অথচ তা জানা দরকার। শব্দ চয়নে তিনি কোন সীমাবদ্ধতা মানেননা। বাক্য গঠন একেবারে তাদের মুখের কথা। সেখানে অনেক সময়ই উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব থেকে যায়। তবু তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি এততাই সাবলীল যে মনে হয় সেই পরিস্থিতিতে সেই কথাগুলো বাদ দিলে হয়তো পরিস্থিতিটি সঠিক ভাবে ব্যখ্যা করা যাবে না। আর তাই লীলা মজুমদারকে অস্বীকার করার কোন জায়গা থাকে না কারোর পক্ষেই।

গবেষণার শেষে আমরা দেখি, লীলা মজুমদার যেন শিশুদের স্বপ্ন, তাদের মানস গঠনের কারিগর হয়ে ধরা দিয়েছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই সমস্ত কিছুকে পেরিয়ে এসে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভবিষ্যতের জন্য শিশুমনকে যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্রমপরিবর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তাদের একটি নির্দিষ্ট আদর্শ, মূল্যবোধ তৈরি হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে ক্রমশ। পাশাপাশি প্রথম বিশ্বের অনুকরণ, মাল্টিমিডিয়া, গ্যাজেট শিশুর শৈশবকে যেমন ব্যহত করছে, তেমনই তাদের করে তুলছে গৃহবন্দী আত্মকেন্দ্রিক। এর সাথে পাল্লা দিয়ে চলা শিশুদের শিশুমনকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ তাঁর সাহিত্যের প্রধান প্রয়াস। দ্রুত সময়-সমাজের পট পরিবর্তনে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শৈশব, তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তাঁর দূরদর্শিতা তাঁকে এও বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, আগত পৃথিবী তাদের জন্য আরও বিষময় হতে চলেছে। আর তাই তিনি নিজেকে অভিযোজিত করেছেন বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্যও। উপন্যাসের বিষয় থেকে চরিত্র, উপস্থাপন ভঙ্গি থেকে ভাষা, বিজ্ঞান থেকে ভূত, প্রকৃতি ধ্বংসের দিনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি প্রেমের শিক্ষা— লীলা মজুমদার এখনও সমান আধুনিক, সমান প্রাসঙ্গিক। বদলে যাওয়া পরিবেশের বদলে যাওয়া শৈশব, অতি-সচেতন অভিভাবক এখনও লীলা মজুমদারকে বর্জন করতে পারেনি, আগামী ভবিষ্যতেও পারবে না। লীলা মজুমদার শিশুমনের গঠনের, লালনের অন্যতম কাণ্ডারি হয়ে তাঁর স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবেন বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৫ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১৯৭ - ১৯৮

২. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ২৪৪

৩. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৩২২ - ৩২৩

৪. মুখোপাধ্যায়, সোমা, লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৫ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১৪৪

৫. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৪৫৮

৬. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ২৪৮

৭. রায়, প্রসাদরঞ্জন, সম্পা. অনন্য অন্য লীলা মজুমদার, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৯, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৩১৯

৮. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৫২৩

৯. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ২৭১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৪৬৭

১১. রায়, প্রসাদরঞ্জন, সম্পা. অনন্য অন্য লীলা মজুমদার, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৯, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৪৮৯ - ৪৯০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 445
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 435 - 445
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

জাদুবাস্তবতা ও রবিশংকর বলের উপন্যাস চতুষ্টয়

দিব্যেন্দু সরকার
গবেষক
বিশ্বভারতী
Email ID : punoscho40@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Magic realism, Ravishankar Bal, Hallucinetory event, Hetetroglossia, Cross-culturalism, Postcolonialism, Dozakhnama, Kissa Bolen Seherzade,

Abstract
One of the genres of modern fiction is the magical narrative. This genre is most developed by several Latin American authors. As a critic Ravaishankar has also discussed magic realism in the context of Marquez's writings. We will discuss how magic realism is used in Rabishankar's fiction. The extent to which Rabishankar's work is influenced by the ideas of magic realism from Franz Roah to Alegeo Carpenter to Marquez is a matter of concern.

Hallucinetory scenes and events, one of the elements of magic realism, are clearly used in Ravishankar's works such as 'Dozakhnama', 'Aynajiban', 'Zaro Hour', 'Kissa bolen Sheherzade' etc. Elements of the magical world and hars reality of the world are spontaneously combined in these works. Other elements of magic realism such as 'heteroglossia', 'cross-culturalism', 'postcolonialism' etc, can be noted in Rabishankar's work. Through all this, he wanted ro break the conventional European style of writing stories. Following the style of kissa, dastan in creating stories, he made the reader a passenger to an endless story.

Discussion

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের গল্পে জাদুবাস্তবতার ব্যবহার প্রসঙ্গে রবিশংকর বল 'বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "বাস্তবতা সেই বিমানপোত, যেখানে দৌড়তে দৌড়তে শুরু হয় উড়াল। এই বাস্তবতা যেমন দৈনন্দিনের বেঁচে থাকার, তেমনই তাঁর স্বদেশেরও, শুধু কলম্বিয়া নয়, গোটা দক্ষিণ আমেরিকা ওরফে আমেরিকার। সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে একের-পর-এক সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্রের নির্মম, রক্তাক্ত বাস্তবতার ভিতরে দাঁড়িয়ে মার্কেসের গল্পের উড়াল। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-ই হোক কিংবা আমার অন্য যে কোনো বইই হোক, আমার লেখার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির যাত্রাভূমি নিখাদ বাস্তব থেকে, আমি শুধু একটা আতসকাচ দিই, যাতে পাঠক বাস্তবকে ভালভাবে বুঝে নিতে পারে।...' "[১]

রবিশংকর নিজেও কি তাঁর বেশকিছু রচনার মধ্য দিয়ে পাঠককে একটা আতসকাচ দেন না? তার মধ্য দিয়ে আমরাও কি দেখতে পাই না দৈনন্দিন বেঁচে থাকার বাস্তবতাকে, তাঁর কালের দেশজ আর আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপোড়েনকে? রবিশংকরের অধিকাংশ লেখার যাত্রাও বাস্তবের রক্তাক্ত ভূমি থেকে। তাহলে কি রবিশংকরের লেখাতেও প্রযুক্ত হয়েছে জাদুবাস্তবতা?

কাকে বলে জাদুবাস্তবতা? জাদু দুনিয়ার কিছু উপাদান আর নির্মম বাস্তব জগৎ গাঁটছড়া বেঁধে থাকে যেখানে সেখানেই নির্মিত হয় জাদুবাস্তবতা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মান সমালোচক Franz Roh শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। সাহিত্য নয়, জার্মান চিত্রকলার জগতে প্রথম এই আন্দোলনটির সূত্রপাত। Roh জানিয়েছিলেন –

> "with the word 'magic', as opposed to 'mystic', I wished to indicate that the mystery does not descend to the represented world, but rather hides and palpitates behind it."[২]

বোঝাই যাচ্ছে জাদু দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য নয়, জাদুবাস্তবতায় প্রাধান্য পায় বাস্তব পৃথিবীর জীবনধারা।

সাহিত্য জগতে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ নানাজনের হাত ধরে। জার্মান সাহিত্যে ফ্রান্‌জ্‌ কাফ্‌কার লেখায় দেখা যায় জাদুবাস্তবতার ব্যবহার। আবার লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে অ্যালেজো কার্পেন্টার (Alejo Carpentier), মার্কেজ (Marquez) প্রমুখের রচনায় লক্ষ করা যায় জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদে বা ইতালীয় লেখক ইতালো কালভিনোর রচনাতেও দেখা যায় জাদুবাস্তব কথনরীতির ব্যবহার। লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ জার্মান শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় একটু পরে – বিংশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কার্পেন্টার লিখছেন 'On the Marvelous Real in America' প্রবন্ধখানি। প্রবন্ধে তিনি লিখছেন –

> "I will say that my first inkling of the marvelous real [lo real maravilloso] came to me when, near the end of 1943, I was lucky enough to visit Henri Christopher`s kingdom – such poetic ruins."[৩]

এই প্রবন্ধেই তিনি আরও লিখেছেন –

> "The marvelous real is found at every stage in the lives of men who inscribed dates in the history of the continent and who left the names that we still cary: from those who searched for the fountain of eternal youth and the golden city of Manoa to certain early rebels or modern heroes of mythological fame from our wars of independence, such as Colonel Juana de Azurduy."[৪]

লাতিন আমেরিকার মানুষদের বেঁচে থাকার, বাঁচার লড়াইয়ে রূঢ় সত্য থেকে উঠে এসেছে জাদুবাস্তবতা। আর লাতিন আমেরিকায় জাদু বাস্তব সাহিত্য সর্বাধিক বিকশিত হয় গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের হাতে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান 'One Hundred Years of Solitude' গ্রন্থটির জন্য। এই নোবেল পুরস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠানে মার্কেস বলেন–

> "On a day like today, my master William Faulkner said, 'I decline to accept the end of man'. I would fall unworthy of sanding in this place that was his, if I were not fully aware that the colossal tragedy he refused to recognize thirty two years ago is now, for the first time since the beginning of humanity, nothing more than a simple scientific possibility. Faced with this awesome reality that must have seemed a mare utopia through all of human time, we, the inventors of tales, who will believe anything, fell entitled to believe that it is not yet too late to engage in the creation of the opposite utopia. A new and sweeping utopia of life, where no one will be able to decide for others how they die, where love will prove true and happiness be possible, and where the races condemned to one hundred years of solitude will have, at last and forever, a second opportunity on earth."[৫]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় জাদু বাস্তবতা। আর মার্কেজের বক্তব্য অনুসারে জাদু বাস্তব কথনের মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরবেন – ‘A new sweeping utopia of life’ - কে। যেখানে ভালোবাসা সত্য প্রমাণিত হবে, জীবনে প্রশান্তি সম্ভবপর।

জাদুবাস্তব সাহিত্যের স্বরূপ ঠিক কেমন হবে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ‘Magical Realism’ গ্রন্থের ভূমিকায় Lois Parkinson Zamora এবং Wendy B. Faris সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন –

> “Magical realist texts are Subversive : Their in-betweenness, their all-at-onceness encourages resistance to monologic political and cultural structures, a feature that has made the mode particularly useful to writers in postcolonial and, increasingly, to women. Hallucinatory scenes and events, fantastic/ phantasmagoric characters are used in several of the magical realist work discussed here to indicate recent political and cultural perversions.”[৬]

অর্থাৎ জাদুবাস্তববাদ উত্তর উপনিবেশিক রচনাকারদের কাছে খুবই উপযোগী এক রচনারীতি। জাদু বাস্তববাদি রচনা ধ্বংসাত্মক। তা একঘেয়ে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। এই ধরনের রচনায় ভ্রমাত্মক ঘটনা এবং দৃশ্য (Hallucinatory scenes and events) যেমন থাকে, তেমনই থাকে রূপকথার বা মিথিক্যাল দুনিয়ার চরিত্রদের অথবা ‘phantasmagoric’ চরিত্রের উপস্থিতি। এই চরিত্রগুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখক জাদু বাস্তববাদি রচনায় বর্তমানের তথা বাস্তবের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করবেন। শব্দটির বাংলা করা যেতে পারে – স্বপ্নের ভিতর বা মোহাবিষ্ট চোখে দেখা ছায়ামূর্তি বা কল্পিত মূর্তির ধারাপ্রবাহ। আবার জাদু বাস্তবতা কী এই প্রসঙ্গে Maggie Ann Bowers তাঁর ‘Magic(al) Realism’ গ্রন্থে লিখেছেন –

> “When referring to magical realism as a narrative mode, it is essential to consider the relationship of ‘magical’ to ‘realism’ as it is understood in literary terms.”[৭]

‘Magic’ আর ‘Realism’-এর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন –

> “Conjuring ‘magic’ is brought about by tricks that give the illusion that something extraordinary has happened, whereas in magic(al) realism it is assumed that something extraordinary really has happened.”[৮]

সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে উপন্যাসে জাদুবাস্তব কথনের মধ্য দিয়ে লেখক এমন এক বাস্তব নির্মাণ করেন, যে বাস্তবের মধ্যে থাকা জাদু উপাদান গুলোকেও বাস্তবের অঙ্গীভূত বলে মনে হয়। জাদু উপাদানগুলো এখানে তার জাদু ধর্ম নিয়ে হাজির হয় না। হারায় নিজেদের জাদুগুণ (quality)। আর বাস্তব জীবনেই কোনো না কোনো ভাবে হয়ে যায় ইচ্ছে-পূরণ।

এখন দেখার বিষয় রবিশংকর বলের কথাসাহিত্যে আদৌ কি জাদু বাস্তবতা প্রযুক্ত হয়েছে? এই মুহূর্তে রবিশংকর বলের সর্বাধিক চর্চিত এবং পাঠক মহলে পরিচিত উপন্যাস ‘দোজখ্‌নামা’। উপন্যাসের কাহিনির কথক একাধিক। কাহিনির শুরুতে লেখকই কথক। পরে কখনও ঐতিহাসিক মির্জা গালিব, কখনও আবার ঐতিহাসিক সদত হসন মন্টো[৯] হয়েছেন কাহিনি-কথক। উপন্যাসের কাহিনি-কথক তথা লেখক-কথক শুরুতেই পাঠককুলকে জানান তাঁর জীবনে ব্যাখ্যাতীত কিছু ঘটনা কখনও সখনও এসে হানা দিয়েছে। বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে থাকা সেইসব ঘটনা বাস্তব যুক্তি-বুদ্ধির অতীত। বিষয়টি পাঠককুলের বোধগম্যতার প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন –

> “একদিন রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে আপনি যদি এমন কাউকে দেখে ফেলেন, যাকে চিত্রে বা স্বপ্নে দেখা যায়, হয়তো একটি মুহূর্তের জন্য মুখোমুখিও দেখা হয়ে যেতে পারে, তবে কী মনে হবে আপনার? মনে হবে না, এক আশ্চর্য দরজা খুলে গেছে আপনার সামনে?”[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 445
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে রবিশংকর কি 'Hallucinatory scenes and events' প্রতি ইঙ্গিত করতে চাইছেন না? যদিও রবিশংকর এইসব ঘটনাসমূহ আর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে শুধু বর্তমানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক pervertions কে তুলে ধরেন নি। ভারতবর্ষের প্রায় একশ বছরের এক ঐতিহাসিক সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক pervertionকে তুলে ধরেছেন তিনি। মার্কেজও কিন্তু তাঁর জাদুবাস্তব লেখা 'One Hundred Years of Solitude'- এ তুলে ধরেছেন একশ বছরের নিঃসঙ্গতার আখ্যান। যদিও মার্কেজের আখ্যান আর রবিশংকরের আখ্যান আলাদা সময়ের, আলাদা বিষয়ের কথা বলে।

'দোজখনামা'য় রবিশংকর তথা লেখক-কথক প্রথমেই যে 'Hallucinatory' ঘটনার কথা বলেন তা হল – একবার লখনউতে গিয়েছিলেন লেখক-কথক তবায়েফদের নিয়ে লেখার খোঁজে। তাদের নিয়ে নানা মানুষের মুখে(যেমন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী পরভিন তালহার প্রমুখ) গল্প শুনতে শুনতে তিনি গিয়ে পৌঁছান ফরিদ মিঞার কাছে। সদত হসন মন্টোর লেখা এক বিচিত্র দাস্তানের পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে তুলে দেন ফরিদ মিঞা। মির্জা গালিবকে নিয়ে লেখা এই উপন্যসটি ফরিদ মিঞা পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। বাবা কোথা থেকে পেয়েছেন তার সন্ধান জানা নেই কারো। ফরিদ মিঞা দাস্তানটি ছাপার জন্য অনুরোধ করেন লেখক-কথককে। লেখাটি নিয়ে লেখক-কথকের বক্তব্য –

> "মির্জা গালিবকে নিয়ে লেখা মান্টোর অপ্রকাশিত উপন্যাস, আসল কি নকল আমরা কেউই জানি না, আমার সঙ্গে এই শহরে এসে পৌঁছল। উর্দু জানি না, তাই এমনি এমনি মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপিটা দেখি। সত্যিই মান্টোর লেখা, না অন্য কারোর? তারপর একদিন মনে হল, আমরা সবাই যদি কারোর দেখা স্বপ্ন হই, তা হলে স্বপ্নের গালিবকে নিয়ে একজন স্বপ্নের মান্টো উপন্যাস লিখতেই পারেন। এখানে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে?"[১১]

অনেকটা বঙ্কিমি ঢঙে পাঠককে শাসন করে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইলেন লেখক। উর্দু শিখতে এবং মন্টোর লেখা উপন্যাসটি অনুবাদের কারণে লেখক-কথক গিয়ে পৌঁছান তবসুমের কাছে। কাজ করতে করতে তিনি উপলব্ধি করেন –

> "তবসুমের বলা মান্টোর উপন্যাসের অনুবাদ লিখতে লিখতে আমি একসময় বুঝে যাই, মির্জা গালিবকে নিয়ে আমি কখনও উপন্যাস লিখতে পারবো না। এরপর আপনারা যা পড়বেন, তা মির্জা গালিবকে নিয়ে মান্টোর উপন্যাসের অনুবাদ। মাঝে মাঝে আমি ও তবসুম ফিরে আসতেও পারি।"[১২]

অবাস্তব একটি ঘটনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন লেখক-কথক। কেননা গালিবকে নিয়ে উপন্যাস বা দাস্তান কোনোদিনই লেখেন নি মন্টো। এরপরের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে প্রধান দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে – মির্জা গালিব আর সদত হসন মন্টোকে ঘিরে। উপন্যাসে আরও আশ্চর্য ঘটনা হল নিজের মৃত্যুর দিনে মন্টো তাঁর রচনা শুরু করেছেন। ভূমিকা লিখে তার নিচে যে তারিখটি মন্টো দিয়েছেন, তা ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৫৫। ওই দিনই মারা যান মন্টো। মৃত্যুর পর দোজখ্ তথা নরকের বাসিন্দা হয়ে মন্টো কথা চালিয়েছেন আর এক দোজখের বাসিন্দা মির্জা গালিবের সঙ্গে। যাঁর মৃত্যুদিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৯। বাস্তবে কোনোদিন দেখা না হওয়া, ভিন্নকালে বাঁচা দুটো মানুষ মৃত্যুর পর কবরে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছেন পরস্পরের। সারা উপন্যাস জুড়ে নিজের সময়ের তথা দুটি ভিন্ন সময়ের যন্ত্রণা তাঁরা তুলে ধরেছেন পারস্পরিক কথোপকথনে। তাই তো একটা অধ্যায়ে যদি থাকে গালিব সাহেবের সময়ের অস্থিরতা, তাহলে ঠিক তার পরবর্তী অধ্যায়ে থাকে মন্টো সাহেবের সময়কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিক্ষোভ। একে 'Hallucinatory event' ছাড়া আর কী বা বলা যেতে পারে! আর গালিব বা মন্টো প্রমুখ চরিত্রগুলিও তো 'phantasmagoric' বলা যায়।

সারা উপন্যাস জুড়ে এমনই অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাকে, জাদু দুনিয়ার উপাদানকে বাস্তবের ভূমিতে স্থাপন করে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন লেখক। মার্কেজের জাদুবাস্তব গল্প 'A Very Old Man with Enormous Wings' - এও দেখা যায় বাস্তবের প্রেক্ষাপটে হরেক জাদু উপাদানের ব্যবহার। তাই তো সেখানে দেবদূত নেমে আসে বাস্তবের ক্লেদাক্ত

দুনিয়ায়। থাকে না তার কোনো দৈবী তথা জাদু ক্ষমতা। একটি মেয়েও বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হয় মাকড়শায়। কিন্তু এইসবের মধ্য দিয়ে লেখক জাদু দুনিয়ার বর্ণনা দেন নি। বরং এলিসেন্দা, পেলাইওর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের বাস্তব লড়াইয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। রবিশংকরও 'দোজখ্‌নামা'য় দোজখ্ তথা নরকের বাসিন্দাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁদের সময়কালের বাস্তবকে। মির্জা গালিবের সময়কাল ১৭৯৭ থেকে ১৮৬৯। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সভাকবি তিনি। হতমান মুঘল সলতনতের ক্ষয় তথা বিনাশ তখন শেষ সীমায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত করে ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি। ফলত তখন গালিবের সমস্ত রকম ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। অসহনীয় আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে শেষের দিনগুলি কাটে তাঁর। চোখের সামনে তিনি দেখেন সময়ের বদল। যে পরিবেশে, সংস্কৃতিতে তিনি বেঁচেছেন তাকে পুরো বদলে যেতে দেখেন তিনি। দেখেন ব্রিটিশ বেনিয়াদের কাছে কোনো মূল্য নেই তাঁর শিল্পীমনের, সৃজনের, কাব্যের। অনেক অনুনয় করেও ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনো ভাতা বা অনুদান কিছুই পান না তিনি। জীবনের এই যন্ত্রণাদগ্ধ দিনগুলির কথাই গালিব মন্টোকে বলেছেন মৃতুর পর কবরে শুয়ে। দোজখের আগুনে গালিব তো মৃত্যুর পর পোড়েন নি, পুড়েছেন আগেই। পুড়েছেন রাজনৈতিক, সামজিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের বাস্তব সময়কালে, বাস্তবের মাটিতে। যে বাস্তবে বেঁচেছেন গালিব সেটাই জ্বলন্ত দোজখ্। মন্টোর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। তাঁকেও বাঁচতে হয়েছিল দেশভাগ আর আর্থিক টানাপোড়েনের জ্বলন্ত দোজখে। 'সদত হসন মন্টো : রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থের ভুমিকায় রবিশংকর লিখছেন –

> "দেশভাগ তিনি মেনে নিতে পারেননি, ফলে বম্বে থেকে লাহোরে পৌঁছে অনেকদিন মন্টো এক বিকারের মধ্যে থাকেন। নিজেই সেসব দিনের কথা লিখেছেন, 'তিন মাস আমি কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, একটা পর্দার ওপর একই সময়ে অনেকগুলো ছবি দেখানো হচ্ছে। সব জড়িয়ে গেছে- কখনও বম্বের নানা বাজার আর রাস্তাঘাট, কখনও করাচির ছোট, দ্রুতগামী ট্রাম, আর খচ্চরে টানা দুলকি চালের গাড়ি, কখনও বা লাহোরের রেস্তোরাঁর হৈ-হট্টগোল। বুঝতে পারছিলাম না, আমি কোথায় আছি। সারাদিন চিন্তায় ডুবে আমি চেয়ারে বসে থাকতাম।"[১৩]

আর 'The Pity of Partition' গ্রন্থে Ayesha Jalal লেখেছেন –

> "An exploration of Manto's life and literature provides the historian with a novel way to address the complex relationship between the event and the processes of partition. Hailed as a keen observer of the moment of partition, Manto was equally, if not more power powerfully, an astute narrator of its continuing aftershocks."[১৪]

আর 'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসে কবরে শুয়ে মন্টো গল্প করতে করতে গালিবকে বলেছিলেন –

> "দেশভাগ আমাদের জীবনে হত্যার বীভৎস উৎসব হয়ে উঠেছিল, মির্জাসাব। শুধু তো মানুষ মানুষকে হত্যা করেনি, হত্যা করেছে পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালবাসা, নির্ভরতাকে। ...দাঙ্গার আগুন এভাবেই আমাদের সব অনুভূতিকে পুড়িয়ে আঙরা বানিয়ে দিচ্ছিল।"[১৫]

'আয়নাজীবন' উপন্যাসখানি 'দোজখ্‌নামা'-র দোসর বলা যেতে পারে। উপন্যাসের 'নিবেদন' অংশে রবিশংকর লিখেছেন –

> " 'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসের চরিত্ররা ছিল নরকের বাসিন্দা। দীর্ঘ এক দহনকাল পেরিয়ে গেছে তারা। আর এই 'আয়নাজীবন' উপন্যাসে আমরা ফিরে এলাম শুশ্রূষাময় জলের কাছে।"[১৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 445
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখানেও একটি 'Hallucinetary' ঘটনার মাধ্যমে লেখক উপস্থাপিত করেছেন সুফি সাধক জালালুদ্দিন রুমির বাস্তব জীবনের হাজারো কিস্‌সা। এই উপন্যাসের কথক ইবন বতুতা। তিনিই লিখেছেন জালালুদ্দিন রুমির কিস্‌সা। কাহিনির শুরুতেই কথক ইবন বতুতা জানাচ্ছেন –

> "আপনারা আমার এই কিতাব আগে পড়েন নি। আমার তিরিশ বছরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কেউ কেউ পড়ে থাকতে পারেন।"[১৭]

মহাকালের পাঠককুলের না পড়া এই কিতাবের বিষয়বস্তু কী? শেখ ইবন বতুতা জানাচ্ছেন –

> "গোপন যে কিতাব আমি আজ আপনাদের সামনে পড়তে চলেছি, মওলানাই তার প্রধান চরিত্র।"[১৮]

রুমিই এখানে মওলানা। আক্ষরিক অর্থেই এমন কোনো গ্রন্থ কোনোদিন লেখেননি ইবন বতুতা। রুমির কিস্‌সা শুরুর আগে দরবেশরা চারটি সন্ধ্যা জুড়ে যে গল্প ইবন বতুতাকে শোনান তাও তো জাদুবাস্তব দুনিয়ার। তাই তো গল্পকথক দরবেশ প্রথম জীবনে যখন সওদাগর ছিলেন তখন পাঁচিল থেকে ঝোলানো একটি সিন্দুকে সুন্দরী এক মেয়েকে পেয়েছিলেন আরব্য রজনীর গল্পের মেয়ে পাওয়ার মতো। ফরিউদ্দিন আতরের কাছে যে কিস্‌সা শুনতেন কিশোর রুমি তাও জাদুবাস্তব দুনিয়ার গল্প। তাই আতরের সেই কিস্‌সায় মুর্শিদ হোদহোদ পাখির সঙ্গে উড়ে যায় অনেক অনেক পাখি তাদের সুলতানের খোঁজে। সুলতান হল সিমুর্গ পাখি। তারা অর্থাৎ পাখিরা অনেক অনেক বছর ধরে উড়ে চলল। মাত্র তিরিশটি পাখি এক সময় গিয়ে পৌঁছয় কাফ পাহাড়ে জাঁহাপনা সিমুর্গের প্রাসাদে। পৌঁছে দেখে তারা মুখোমুখি হয়েছে নিজেদের আত্মার। সিমুর্গ মানেই হল তিরিশটি পাখি। আসলে দুঃখের পথে, বেদনার পথে হেঁটে, আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই পৌঁছানো যায় আল্লাহর কাছে। এক সুফি কিস্‌সাকে (মিথ?) এভাবেই উপন্যাসে ব্যবহার করলেন রবিশংকর। আর তার সঙ্গে বলে চললেন রুমির বাস্তব জীবনের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক টানাপোড়েনকে। তাই তো ইবন বতুতার জবানীতে এখানে বর্ণিত হয় বলখ্ থেকে ছিন্নমূল হয়ে নিশাপুর, বাগদাদ, কোনিয়া, দামাস্কাস, আনাতোলিয়া প্রভৃতি স্থানে রুমির কখনও পিতা বাহাউদ্দিনের সঙ্গে কখনও বা একলার খণ্ড-জীবন-যাপনের বৃত্তান্ত। বাগদাদ শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় রুমিরা জানতে পারেন মোঙ্গলদের আক্রমণে ইসলামি সংস্কৃতির পীঠস্থান, 'ইসলামের গম্বুজ' বলে পরিচিত বলখ্ পরিণত হয়েছে শ্মশানে। বারো হাজার মসজিদ ধ্বংস করেছে তারা। পুড়িয়েছে কোরানের চোদ্দ হাজার বই, মাদ্রাসার ছাত্র আর শিক্ষক মিলিয়ে পনেরো হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। শেখ বাহাউদ্দিন বলখের পতনের পর জালালুদ্দিন রুমিকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন –

> "দুনিয়ায় আর কোথাও আশ্রয় মিলবে না। আমরা উদ্বাস্তু হয়ে গেলাম, জালাল।"[১৯]

একই ধারার উপন্যাস 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে'। রবিশংকরের স্ত্রী সীমা বল জানাচ্ছেন এই গ্রন্থটি লেখার জন্য রবিশংকর প্রায় দুই লক্ষ টাকার বই কিনে ফেলেছিলেন।[২০] এটি রবিশংকরের শেষ উপন্যাস, অসম্পূর্ণও। যদিও উপন্যাসের শুরুতে, 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে' – একটি বেদনার সিরিজ" নামক প্রাক-কথনে লেখকের স্ত্রী সীমা বল জানিয়েছেন –

> "লেখা হটাৎ (যদৃষ্টং) করে থেমে গেলেও 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে'কে অসমাপ্ত উপন্যাস বলে দেগে দেওয়া যায় না। এমনিতেও সে তো কোনদিন গোল কাহিনি রচনা করেনি।"[২১]

এই উপন্যাসের কাহিনিও 'Hallucinetary event' ছাড়া আর কিছু নয়। আরব্য রজনীর সহস্রাধিক গল্প বলা শেহ্‌রজাদে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। আরব্য রজনীর কিস্‌সার জাদু দুনিয়া থেকে তিনি এসে হাজির হন ঐতিহাসিক সময়ে, বাস্তব জগতে। তাই তো উপন্যাসের শুরুতে সোফি অ্যান্ডারসনের উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি আঁকা কোনো নারীর ছবি দেখেন তিনি। দেখে মন খারাপ হয় তার। Sophie Gengembre Anderson কিন্তু একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মানো ব্রিটিশ মহিলা চিত্রশিল্পী তিনি। দেহত্যাগ করেন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। মূলত তিনি 'Victorian painter'। তাঁর আঁকা চিত্রগুলি বেশিরভাগই নারী, শিশু, গ্রাম্য জীবন নিয়ে। আবার কখনও শেহ্‌রজাদে সুলতান শাহ্‌রিয়ারকে একটা বইয়ের ছবির একটি পৃষ্ঠা দেখিয়ে যে কিস্‌সা শোনান, তা সিরিয়ার উদ্বাস্তুদের মৃতদেহের আখ্যান। জাদু দুনিয়ার চরিত্রগুলিকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 445
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এইভাবেই রবিশংকর এনে ফেলেছেন রূঢ় বাস্তবে। এক সময় শেহ্‌রজাদে আর তাঁর বিবিজান এসে হাজির হন বর্তমান সময়ের ভারতবর্ষের কোলকাতার রাজাবাজারে। বর্তমান সময়ে প্রাচীন ভারতবর্ষকে খোঁজার চেষ্টা করেন তাঁরা। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব সময় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁদের চেতনায়, তাঁদের কিস্‌সা কথনে। পৌরাণিক ভারত, ঐতিহাসিক ভারত, বর্তমান ভারত সমান্তরালে চলে তাদের কিস্‌সায়। 'মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ', মনুর 'ধর্মশাস্ত্র'-র বৃত্তাকার সময় চেতনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিবিজান শেহ্‌রজাদে স্বামী সুলতান শাহ্‌রিয়ারকে বলেন কলিযুগে দেশভাগ ভারতবর্ষের ভবিতব্য –

> "কলিযুগেই ভারতবর্ষ ভেঙে প্রথমে দুটুকরো হয়ে যায়, মালিক : ভারত ও পাকিস্তান। তারপর পাকিস্তান থেকে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এই দেশ আরও কত টুকরো হবে, ভেঙে যাবে, আমরা জানি না।"[২২]

জাদু বাস্তবতার তত্ত্ব অনুসারে একে 'Hybridity' বলা যেতে পারে। আন্তর্জাল সূত্র 'Wikipedia'-তে 'Hybridity' প্রসঙ্গে Danial, A. Lee-র বক্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধার করে বলা হয়েছে –

> "Magical realism plot lines characteristically employ hybrid multiple planes of reality that take place in 'inharmonious arenas of such opposites as urban and rural, and Western and indigenous."[২৩]

ঠিক একই রকমভাবে সিন্দবাদ হয়ে ওঠে উপন্যাসের একটি চরিত্র। আরব্য রজনীর মিথিক্যাল দুনিয়া থেকে সে চলে এসেছে একবিংশ শতকের বাস্তবের কোলকাতায়। মার্কেজের গল্পেও দেবদূত এসে পৌঁছেছিল লাতিন আমেরিকার দারিদ্র্যময় জীবনের রূঢ় বাস্তবে। তাই তো রঘুপতি তাকে পাকড়াও করে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনার বাসনা প্রকাশ করলে মৃত্তিকা বলে –

> "সে তো বলে, গল্প জানে না। গল্প শোনাই তার কাজ। সে নাকি গরিব সিন্দবাদ। কুলির কাজ করে। বড়লোক, নাবিক সিন্দবাদ তাকে গল্প শোনায়। ভাল ভাল খাবার, মদ খাবে, আরাম করবে বলে সে ধনী সিন্দবাদের গল্প শুনতে যায়। নাবিক সিন্দবাদও তাকে ছাড়তে চায় না।"[২৪]

এই রকম বহুবিধ কিস্‌সার মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেছেন বর্তমান ও ঐতিহাসিক ভারত তথা বিশ্বের নানাবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক রূঢ় চিত্রকে। সেই কারণে উপন্যাসে সিরিয়া-লেবাননের উদ্বাস্তুদের কথা যেমন আসে, তেমনই আসে স্বাধীনতার সময় ভারতের বাঁটোয়ারার কারণে গান্ধীজির অন্তর্বেদনার চিত্র। এই বিষয় সম্পর্কে রঘুপতির মন্তব্য –

> "এই ঘটনার কোনো নাটকীয় গল্প তৈরি করা যায় না। তাহলেই ভেঙে পড়বে এই উপমহাদেশের বাস্তবতা – স্বাধীনতা, দেশভাগ – আর মানুষ গান্ধীজির বাস্তবতা। ধারাবাহিক, চমকদার গল্প নয়, তুমি একে খণ্ড বৈচিত্রের মহিমা দাও।"[২৫]

এই রচনাতেও শেহ্‌রজাদে, শাহ্‌রিয়ার, সিন্দবাদ প্রমুখ চরিত্রগুলি 'phantasmagoric'.

আবার 'জিরো আওয়ার' নভেল্লাতে কবি অমলকান্তি বন্দ্যঘাটীর যে আখ্যান বর্ণনা করেছেন কবি সেখানেও লক্ষ করা যায় বেশকিছু 'Hallucinatory' ঘটনা। তাই তো তার জীবনে আসে কখনো নবারুণ ভট্টাচার্যের সাহিত্য দুনিয়ার পুরন্দর ভাট, কখনও বা অ্যালেবার কামু। কখনও আবার জীবনানন্দের মাল্যবানের সঙ্গে কথোপকথন চলে গ্রীক পুরাণের ইউলিসিসের। কিন্তু এইসবের মধ্য দিয়ে রবিশংকর আসলে বর্ণনা করেছেন বর্তমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্যার কথা। আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের স্পষ্ট চিত্র লেখক তুলে ধরেন উপন্যাসে –

> "১৯৮৫ - তে রোম ও ভিয়েনা এয়ারপোর্টে লিবিয়ার প্ররোচনায় যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল, আমেরিকার মতে তা সন্ত্রাসবাদ। অন্যদিকে ১৯৮৬ - তে লিবিয়াতে যে শাস্তিমূলক হানাদারি আমেরিকা চালিয়েছিল, কর্নেল মুয়াম্মর গদ্দাফি তাকেই সন্ত্রাসবাদ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে রোম ও ভিয়েনা এয়ারপোর্টে আক্রমণ এক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, স্বাধীনতার লড়াই।"[২৬]

তাহলে কোনটা সন্ত্রাসবাদ? পশ্চিমের দেশগুলির সংজ্ঞায় যা সন্ত্রাসবাদ তা সিরিয়া, লিবিয়া, ইরানসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছে স্বাধীনতার লড়াই। তাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দিয়ে রবিশংকর লিখেছেন –

> "আমাদের কাছে সন্ত্রাসবাদীর সংজ্ঞা একটাই : নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সে যে কাউকে মারতে পারে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ-অক্ষম কেউই তার নিশানার বাইরে নেই।"[২৭]

সব মিলিয়ে নভেলাটিতে লেখক এইভাবেই নির্মাণ করেছেন জাদুবাস্তব দুনিয়া।

জাদুবাস্তবতা আসলে এক বিশেষ প্রকারের কথনরীতি। যে কথনরীতি সম্পর্কে Maggie Ann Bowers জানিয়েছেন –

> "The characteristic of magical realism which makes it such a frequently adopted narrative mode is its inherent transgressive and subversive qualities. It is this feature that has led many postcolonial, feminist and cross-cultural writers to embrace it as a means of expressing their ideas."[২৮]

তাই তো জাদুবাস্তব রচনায় লক্ষ করা যায় 'heteroglossia', 'cross-culturalism', 'postmodernism', এবং 'postcolonialism' বিষয়গুলি। রবিশংকরের উক্ত চারখানি উপন্যাসের কথনরীতিতে প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। 'দোজখ্‌নামা', 'আয়নাজীবন', 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে' উপন্যাস তিনটিতে রবিশংকর সরাসরি প্রচলিত গল্প বলার তথা ইউরোপীয় গল্প বলার রীতি থেকে সরে এসেছেন। মধ্য-এশীয় কিস্‌সা, দাস্তান বলার ধরণকে অনুসরণ করেছেন তিনি। যে কথনের ধরণে আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত নিটোল গল্প তৈরি হয় না কোনদিন। কথা যেন এখানে ফুরায় না। গল্পের ভিতরে গল্পের এক অনিঃশেষ যাত্রা চলতে থাকে। আমাদের দেশীয় কথকতার ধরণও অনেক দূর পর্যন্ত এই রকম। 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি রচনায় এই রীতি লক্ষণীয়। 'মহাভারতে'ও তো আছে কথকতার রীতি। এই প্রসঙ্গে রবিশংকরের কিছু কথা উদ্ধৃতিযোগ্য –

> "নতুন কথা বলে সাহেবরা, যারা সবসময় আমাদের চমকে দিতে চায়। আমরা জানি, একটি কথাকে ঘিরে সাতকাহন বাড়ে শুধু। এর বেশি কিছু নয়। একটি আদিকাহিনি। সাপটি তার লেজ থেকে নিজেকেই খাচ্ছে আর এই খাওয়া কখনও শেষ হয় না। সব গল্প এই আদিকাহিনিকে ঘিরে নানারকম বুনন আর কী।
>
> ছোটবেলায় দিদিমার কাছে শুয়ে অনেক গল্প শুনতাম। আমার বেশ মনে আছে, একটি গল্প – হয়তো তা লেবুসুন্দরীর – এক একদিন এক একরম ভাবে বদলে যেত, আমি না ঘুমনো পর্যন্ত একই গল্পে নানা ঘটনা জুড়ে দিত দিদিমা। অর্থাৎ লেবুসুন্দরীরই নানারকম গল্প। আসলে পুরোটাই একটা নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া। আপনি যেখানে থামলেন, গ্লপ সেখানেই শেষ; আবার চলতে শুরু করলে গল্প শুরু হয়।"[২৯]

কথনের ক্ষেত্রে এই বিশেষ রীতির ব্যবহারকে 'postcolonialism' ছাড়া আর কী বা বলা যেতে পারে! আর 'জিরো আওয়ার' উপন্যাসে তো কামুর সঙ্গে অমলকান্তির আচরণে, কথোপকথনে সরাসরি 'কলোনিয়ালিজম'-এর বিরুদ্ধতা করেছেন লেখক। রাতের অন্ধকারে অমলকান্তি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিতে বৃষ্টি দেখতে দেখতে আর ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 445
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হঠাৎ কামুর ভূতকে দেখতে পায়। অমলকান্তি ভূত কামুকে দেখে দুই হাত জড়ো করে প্রণাম করতে করতে উঠে দাঁড়ায়। কামু বসতে বললেও অমলকান্তি বসে না। তাতে কামুর প্রতিক্রিয়া –

> "এখনও কলোনিয়ালিজম ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না? সাদা চামড়া দেখলেই উঠে দাঁড়ান?"[৩০]

উত্তরে অমলকান্তি বলে – 'সরি স্যর'। এবারও কামুর প্রতিক্রিয়া –

> "আবার কলোনিয়াল হ্যাং ওভার! ওপারে – বুঝলেন – বাংলাভাষার চারজন লেখকের সঙ্গে মারতে খুব ভাল লাগে।"[৩১]

সেই চারজন হলেন জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। কী আশ্চর্য ম্যাজিক রিয়ালিস্ট ভাবনা রবিশংকরের!

আর 'heteroglossia' সম্পর্কে 'merriam-webster'-এ বলা হয়েছে –

> "a diversity of voices, styles of discourse, or point of view in a literary work and especially a novel."[৩২]

'দোজখ্‌নামা'য় স্বরের বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনই আছে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য। মির্জা গালিব, মন্টো আর উপন্যাসের উত্তম পুরুষ কথক এই তিনজনের স্বরই স্পষ্ট বৈচিত্র্যে এখানে বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যও উপন্যাসে স্পষ্ট। গালিব যে কালের ভারত-দর্শনের কথা বলে, মন্টো বলে অন্যকালের ভারত-দর্শনের কথা। উত্তম পুরুষ কথক আবার ভিন্নকালের ভারতকে তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। আবার সময়ের সরলরৈখিক ক্রমও এখানে অনুসরণ করেন নি লেখক। ভিন্ন ভিন্ন সময় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে। তাইতো মির্জা গালিবের কুকুর মহাভারতের কুকুরের মতো ধর্মরাজ হয়ে গালিবকে শোনাতে পারে অনেক পরের কবি শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা'। জাদুবাস্তব কথনে এসবই সম্ভব।

'আয়নাজীবন', 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে', বা 'জিরো আওয়ার'-এও লক্ষ করা যায় একাধিক কথকের স্বরের বৈচিত্র্য, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য। 'আয়নাজীবন'-এ ইবন বতুতাই একমাত্র কথক নন। চারজন দরবেশও হয়েছেন এখানে এক এক রাতের কিস্‌সার কথক। আর 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে' তে কিস্‌সার কথক একাধারে শেহ্‌রজাদে, শাহরিয়ার, সিন্দবাদ, রঘুপতি প্রমুখ। কালানুক্রমিক সময় চেতনা এখানেও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 'জিরো আওয়ার'-এও একই ধরণ লক্ষ করা যায়। এখানে অমলকান্তি, কামু, পুরন্দর ভাট, মাল্যবান, ইউলিসিস প্রমুখ চলে আসে একই সময়ের বৃত্তে। দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য নিয়ে প্রত্যেকেই স্বরবৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে এখানে।

এবার আসা যাক 'Cross-Culture'-এর প্রসঙ্গে। সাহিত্যে 'Cross-Culture'-এর প্রয়োগ বলতে বোঝায় একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে একাধিক সংস্কৃতির উপস্থাপনা। আফগানি-আমেরিকান লেখক খালেদ হোসেইনির 'Kite Runner' উপন্যাসে, সালমান রুশদের 'Fury' প্রমুখের উপন্যাসে বিষয়টির যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায় বলে তাত্ত্বিকদের অভিমত। খালেদ হোসেইনির উপন্যাসে লক্ষ করা যায় দুই ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি থেকে আসা মানুষের হৃদয়স্পর্শী বন্ধুত্বের গল্প। দোজখ্‌-এ দেখা হয়ে হৃদয় উজার করে গল্প করা গালিব আর মন্টোও ভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানুষ। 'জিরো আওয়ার' উপন্যাসে কথোপকথনরত অমলকান্তি-কাফকা, মাল্যবান-ইউলিসিস ভিন্ন সংস্কৃতির কথাই তুলে ধরেছে পাঠকের সামনে। অন্যদিকে 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে'তে আরব্য রজনীর শেহ্‌রজাদে-শাহ্‌রিয়ার আর বাস্তবের রঘুপতি ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক বাহক। তাছাড়াও হিন্দু আর ইসলাম উভয় সংস্কৃতির কথাই আছে এখানে। সিন্দবাদ যেমন এখানে আছে তেমনই আছে শ্বেতকেতু, আরুনি। আরও আছে বর্তমান পৃথিবীর হিংস্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা।

এই সমস্তকিছু নিয়েই তো নির্মিত হয় পোস্টমর্ডানিস্ট সাহিত্য। পোস্টমর্ডান সাহিত্যের কথনের অন্যতম লক্ষণগুলি হল – আকস্মিকতা, সচেতনভাবে যুক্তি ভাঙা, আপাত অর্থহীনতা, ইতিহাসের সময়ের ক্রম রক্ষা না করা, বিনির্মাণ, কাহিনিতে ধারাবাহিকতার অভাব, উদ্দেশ্যহীনতার দিকে কাহিনির যাত্রা, উপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হওয়া তথা কলোনিয়াল হ্যাংওভার কাটিয়ে ওঠা ইত্যাদি। আর রবিশংকর এইসবকিছু নিয়েই নির্মাণ করে চলেন অনিঃশেষ গল্প। যে গল্পের কথনে মিশে আছে

দেশীয় কথকতার ধরণ, মিশে আছে মধ্য এশীয় কিস্‌সা কথনের ধরণ। তাই নিটোল গল্প রবিশংকরের অধিকাংশ উপন্যাসে খুঁজে পাবেন না পাঠক। জাদুবাস্তব কথনে ছোটো ছোটো কিস্‌সার মধ্য দিয়ে রবিশংকর আসলে পাঠককে হাত ধরে নিয়ে যান – না ফুরানো গল্পের দিকে…।

Reference:

১. বল, রবিশংকর, গদ্য সংগ্রহ ১, বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৭২

২. Roh Franz, Magic Realism : Post-Expressionism, Magical Realism, Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris, Duke University Press, Fourth printing, 2003, p. 15

৩. Carpenter Alejo, On the Marvelous Real in America, Magical Realism, Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris, Duke University Press, Fourth printing; 2003, p. 84

৪. Carpenter, Alejo, On the Marvelous Real in America, Magical Realism, Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris, Duke University Press, Fourth printing, 2003, p. 87

৫. Gabriel Garcia Marquez – Nobel Lecture. - www.nobelprize.org

৬. Magical, Realism, Introduction : Daiquiri Birds and Flaubertian Parrot (ie)s, Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris, Duke University Press, Fourth printing, 2003, p. 6

৭. Bowers Maggie Ann, Magi (al) Realism, Routledge, London and New York, First Indian Reprint 2007, P. 21

৮. Ibid, P. 21

৯. রবিশংকর 'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসে 'মান্টো' শব্দটি ব্যবহার করলেও পরে মন্টোর অনূদিত রচনাসংগ্রহের ভূমিকায় তিনি 'মন্টো' শব্দটি ব্যবহার করেন। হিন্দি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলিতেও 'মন্টো' বানান তথা শব্দটি গৃহীত হয়েছে। উর্দুতেও উচ্চারণ 'মন্টো'। তাই 'মন্টো' বনানটাই এখানে গ্রহণ করা হল। অন্যদিকে রামকুমার মুখোপাধ্যায় 'দোজখ্‌নামা'র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'দেশকালের সন্ধানে দুটি চরিত্র'-এ (গদ্য সংগ্রহ, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩০২) 'মান্টু' বানানটি লিখেছেন। তাঁর মতে কাশ্মীরি 'মিন্ট' শব্দ থেকে 'মান্টু' শব্দটি আগত। 'মিন্ট' শব্দের অর্থ 'বাটখারা'।

১০. বল, রবিশংকর, দোজখনামা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৯

১১. তদেব, পৃ. ১৪

১২. তদেব, পৃ. ১৮

১৩. বল রবিশংকর সম্পাদিত, সদত হসন মন্টো : রচনা সংগ্রহ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৯, পৃ. ৮

১৪. Jalal Ayesha, The Pity of Partition; Princeton University Press; Princeton and Oxford, 2013, P. 148

১৫. বল, রবিশংকর, দোজখনামা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৩৪৭

১৬. বল, রবিশংকর, আয়নাজীবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ৭

১৭. তদেব, পৃ. ১১

১৮. তদেব, পৃ. ১১

১৯. তদেব, পৃ. ৮৩

২০. বল, রবিশংকর, কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে, দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৯

২১. বল, রবিশংকর, কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে, দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১৫

২২. তদেব, পৃ. ৩১

২৩. wikipedia.org (Magic Realism)

২৪. তদেব, পৃ. ৬৭

২৫. তদেব, পৃ. ৭১

২৬. বল, রবিশংকর, জিরো আওয়ার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৩

২৭. তদেব, পৃ. ২৪

২৮. Bowers Maggie Ann, Magi (al) Realism; Routledge, London and New York, First Indian Reprint 2007; P. 65-66

২৯. বল, রবিশংকর, গদ্যসংগ্রহ ১, প্লট ভাঙো, গল্প লেখো, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৯৮

৩০. বল, রবিশংকর, জিরো আওয়ার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৪

৩১. তদেব, পৃ. ৩৪

৩২. www.merriam-webstar.com

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 446 - 451
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আবুল বাশারের 'সঈদা বাঈ' (১৯৮৯) : নবাবিয়ানা, রাজনৈতিক সংকট এবং বাইজিদের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান

ড. জিনিয়া পারভীন
Email ID : jiniaparveen1988@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Nawabiana, Baiji system, Vote-centered politics, Patriarchy, Muslim women's rights.

Abstract
Abul Bashar's 'Sayida Bai' is written about the background of the life of the people of Kashdiara village in Murshidabad and various political parties. Abul Bashar has depicted the luxurious life of Bengal Nabab in his narrative. Baiji system is one of the part and parcel of their luxury and the Baijis' life was safed and blessed. The people of the area want to keep it up Nawabiana. But changing time and political chaos disrupted their lives. So, the life of Baiji is disoriented today. The vote-centered politics and corruption also is disturbing the common people. Bashar talked about Baiji system, Political ideologies in his Novel. He wanted to focus on women's dreams, hopes and aspirations. Bashar documented the degradation of Nawabiana, Life of Baiji and domestic politics etc. in his Novel. Basically, he focused on muslim society and its Patriarchy, the crisis of Muslim women's rights and this is relevant today.

Discussion

মুর্শিদাবাদ জেলার কাশদিয়াড়া গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পটভূমিকায় রচিত আবুল বাশারের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস হল 'সঈদা বাঈ'। উপন্যাসটির আখ্যানের প্রতিবেদনে রয়েছে কাশদিয়াড়া গ্রামের মুখ্য মুখ সঈদা। সঈদা ও তাঁর স্বামী ফেরুর বর্তমান জীবন, সঈদার বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরজা রয়েছে উপন্যাসের নিউক্লিয়াসে। ভোটের হিংসাত্মক রাজনীতিতে একজন শ্রেণিচ্যুত বাইজির কীভাবে স্বপ্নপ্রয়াণ ঘটেছে তা-ই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। এরই পাশাপাশি তিনি অবক্ষয়িত নবাবিয়ানা, মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থান, তাঁদের কৃষ্টি-কালচার, ভাষাসমস্যা ইত্যাদিকেও উপন্যাসের ন্যারেটিভে তুলে ধরেছেন।

গ্রামের কল্পিত নাম কাশদিয়াড়া, এই গ্রাম থেকেই আখ্যানের শুরু। এই গ্রামের প্রতিটি পুরুষ নিজেদের নবাব ভাবে। নবাব নেই, নবাবিয়ানার সমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু এখানকার প্রতিটি পুরুষের নবাবি মন আজও ছুটি পায়নি। তাই বাংলা ভাষা ব্যবহারের চেয়ে উর্দু বা উর্দু মেশানো বাংলা ভাষা ব্যবহারের দিকেই তাদের ঝোঁক প্রবল। পেশা সকলের টাঙ্গা চালানো। নেতা ভাটু বাবুর টাঙ্গায় সকলে ভাড়ায় খাটে। মহরমের লাঠি খেলা, ব্যারা উৎসবে বাজি পোড়ানো এগুলো যেমন উৎসব তেমনই ভোট তাদের কাছে একরকম উৎসব। কাশদিয়াড়ার ভোট কোনো নেতার শুধু শুধু মেলে না। ভোট নিতে হলে ভোটের দিন সকালে টাঙ্গা পাঠাতে হয়। সকালবেলায় সেজে-গুজে টাঙ্গায় চেপে সেই দলকে ভোট দিয়ে আসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাশদিয়াড়ার মানুষ। ভাটু বাবু এই গ্রামের নেতা এবং সকলে তাকেই ভোট দেয়। সকলের জন্য টাঙ্গা ব্যবস্থা করেন তিনি, আর তার ভোট জোগাড় করে দেয় ফেরু ও তাঁর বউ সঙ্গীদা।

পিংকু কলেজের ছাত্র এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের সদস্য। হুগলি জেলা থেকে কাশদিয়াড়ায় এসেছে দলের নির্বাচনের কাজে। এই গ্রামে এসে সঙ্গীদার সাথে পিংকুর ধীরে ধীরে ভাব হয়েছে। গ্রাম এবং সঙ্গীদার পূর্বজীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছে পিংকু। সঙ্গীদার উপর তাঁর স্বামী ফেরুর অত্যাচার দেখেছে সে। সঙ্গীদা বাঁজা বলেই তাঁকে একা আলাদা ঘরে থেকে বিড়ি বেঁধে রোজগার করে খেতে হয়। ফেরুর অন্য বউ এবং বাচ্চা ফেরুর সাথে ফেরুর রোজগারে খেতে পায়। কিন্তু অত্যাচারের শিকার শুধু সঙ্গীদা। ফেরু সঙ্গীদার ঘরে বন্ধু এনে তারি খেয়ে মাতলামো করে এবং তার প্রতিবাদ করায় শাস্তিস্বরূপ সঙ্গীদার মুখে তারির গেলাস ধরে ফেরু। শুধু তাই নয়, ফেরুর প্রথম বউ সালেহার ছেলে খেলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গেলে সঙ্গীদা তাকে বাঁচানো সত্ত্বেও শুনতে হয়েছে গালাগালি। ফেরু সঙ্গীদার গালে চড় কষে দিয়েছে। সালেহা সঙ্গীদাকে বাঁজা, বান্দি, ডাইনি ইত্যাদি বলেছে। বাঁজা মেয়েতে সালেহার ছেলেকে ছোঁয়ায় তার ছেলের নাকি ক্ষতি হতে পারে। বর্তমান সময়ে এসেও বাঁজা নারীকে এভাবে দোষারোপে বিদ্ধ করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর এই দহনজ্বালা দেখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা বলেন –

> "সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট ভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের; এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের। আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য করো।"[১]

পিংকু সঙ্গীদাকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সঙ্গীদাকে পিংকুর দিদি সম্বোধন করে ডাকায় প্রথম সঙ্গীদা সম্মানবোধ করেছে। পিংকুর প্রতি আলাদা স্নেহ তৈরি হয়েছে সঙ্গীদার মনে। এর আগে অন্য কোনো পুরুষ তাঁকে এভাবে সম্মান দিয়ে কথা বলেনি। পরবর্তীতে ভাটু বাবুর পরিবর্তে পিংকুর হয়ে ভোট প্রচার করেছে সঙ্গীদা। সঙ্গীদা প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিজদায় মাটি ছুঁইয়ে কসম করিয়ে নিয়েছে তারা যেন পিংকুকে ভোট দেয়। তাই ভোটের আগে সকলকে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে গিয়েছে। কিন্তু ভাটু বাবুর টাকা কেউ নেয়নি। তাই ভোটের আগের রাতে ভাটু বাবুর নেতৃত্বে ফেরু আর তার দলবল কাশদিয়াড়ার প্রতিটা বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। পিংকুকে উলঙ্গ করে ফেলে দিয়ে এসেছে মাঠে। এই আগুন থেকে রেহাই পায়নি ফেরুর পোষা ঘোড়া ও স্ত্রী সঙ্গীদাও। সঙ্গীদার নতুন জীবনের স্বপ্ন স্বামীর লাগানো আগুনে দেহের সাথে পুড়ে লীন হয়ে গেছে। তবু কাশদিয়াড়ায় ভোট হয়েছে। পরদিন সকালে ভাটু বাবুর দেওয়া নতুন শাড়ি পড়ে টাঙ্গায় চড়ে মেয়েরা ভোট দিতে গিয়েছে। এইসব দেখে পিংকুর মনে হয়েছে ভারতবর্ষ যেন এভাবেই রোজ পুড়ছে। কিন্তু তাদের থেমে থাকলে চলবে না। চোখের জলকে আগুনে পরিণত করে তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আবুল বাশার জীবনকে দেখেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে। নিজে একজন বামপন্থী নেতা হওয়ায় তাঁর উপন্যাসে বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। বর্তমান উপন্যাসে তিনি হতদরিদ্র টাঙ্গাচালক নেতা নবাবের মুর্শিদাবাদী কাহিনি তুলে ধরেছেন। সেই সাথে এক শ্রেণিচ্যুত বাইজির স্বপ্নপ্রয়াণ দেখেছে পাঠক। জীবনের গতিপথে সাধারণ নারীর থেকে বাইজির স্থান যে স্বতন্ত্র তা তিনি দেখিয়েছেন। আবুল বাশার উপন্যাসে নবাবি পরবর্তী সেই সময়কে তুলে ধরেছেন যেখানে নবাবি আমল শেষ হয়ে গেলেও মানুষের নবাবি মন ছুটি পায়নি। যেখানে রাজত্ব নেই কিন্তু রাজনীতি আছে। প্রতিটা দল নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনে আগ্রহী। নীতি, আদর্শ সেখানে নেই। আর ঠকার বিনিময়ে ভোট কেনা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে লেখক বামপন্থী দলের নীতি, আদর্শকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার অপশাসনের কাছে হার মেনেছে নীতি, আদর্শ সবকিছুই। নয়ের দশকের প্রাক্‌মুহূর্তে লেখা এই উপন্যাসে যার কয়েকশো বছর আগেই নবাবি শাসনের বিনাশ হয়েছে, কিন্তু আজও যে নবাবিয়ানার ছিটেফোঁটা মানুষগুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে তা লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। জীবনের দাবিকে তারা পেশা করতে চায়নি নবাবিয়ানার মাধ্যমে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে না হলেও মানসিক দিক দিয়ে এই নবাবি মনটাকে ধরে রেখেছে কাশদিয়াড়ার মানুষ। ভোটকে কেন্দ্র করে এই সত্তা বেশি করে প্রস্ফুটিত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভোট সেইসব মানুষের কাছে উৎসব। নবাবের ব্যারা উৎসবের যে ঐতিহ্য, তার এক ভাজ করতে হাফ ছাড়তে হয়, তাই ভোটই এখন প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছে। ভোট হয় টাঙ্গার বিনিময়ে,

> "টাঙ্গা ভেজদো, ভোট হো যায়েগা। ওরৎ বিনা টাঙ্গাকে যায়েগি কৈসে। টাঙ্গা লেকর আইয়ে, ঈমানদারিসে কাম হো যায়গা, ভোট মিল যায়েগা।"[২]

শুধু টাঙ্গা চড়ে ভোট দেয়ার মধ্যে নবাবিয়ানা নয়, কথাবার্তায় নবাবিয়ানার প্রকাশ দেখা যায় তাদের মধ্যে। তাই উর্দু মেশানো ভাঙা ভাষায় কথা বলে।

নীতি-আদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচনের কাজে কাশদিয়াড়ায় এসেছে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের সদস্য পিংকু। তার কর্মক্ষেত্র এই কাশদিয়াড়া গ্রামে তাকে প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেতে হয়েছে। মানুষের কাছে তার বক্তব্য স্থাপনের অভিজ্ঞতাহীনতা এবং ভাষা বোধগম্য না হওয়ায় বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে মানুষের সঙ্গে তার সংযোগ। গ্রামের নারীদের উপহাস উপেক্ষা করে পথচলার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বাধা টপকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ়সংকল্প তার। পুরাতন রাজনৈতিক দল যে নীতি গঠন করেছে এই অশিক্ষিত মানুষগুলোর মধ্যে তার বেড়াজাল ভাঙা খুব সহজ নয়। আর সেই নীতির পথে পথচলার আদর্শ বামপন্থী দলের নেই। আর চাইলেও সেই পথে হাঁটতে পারবে না তারা। কারণ এই দলটির কর্মী-নেতা-সংগঠন-আদর্শ সবকিছু থাকলেও অর্থ নেই। অর্থব্যতীত তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার একমাত্র উপায় জনসংযোগ। কিন্তু ভাষার বোধগম্যহীনতা প্রধান অন্তরায়। ধীরে ধীরে গ্রামকে উপলব্ধি করেছে, জেনেছে গ্রামের মানুষকে, জেনেছে সঙ্গীদাকে। দেখেছে ফেরুর সঙ্গীদার প্রতি অমানবিক অত্যাচার। বাঁজা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিরূপ মনোভাব ও মাতলামোর দৌরাত্ম্য মুখ বুজে সইতে হয়েছে। যে জীবন কোনও নারী কামনা করে না সেই বাঁজা জীবনের জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানিয়েছে,

> "শুকরিয়া খোদা কী, মেহেরবানী আল্লাহ কীনাইতো ফেরু নবাবের জারজ বাচ্চা পয়দা হয়ে সারা ঘর আমার হাবিয়া দোজখ হয়ে যেত।"[৩]

বর্তমান বিড়িওয়ালি সঙ্গীদার জীবন শুরু যাত্রাদলে নাচের মধ্য দিয়ে। মা রৌশন বাঈয়ের তালিমে বাচ্চা বয়সেই নাচ শিখে উপার্জনের পথে নেমে যেতে হয়। তাদের জীবনে এখনও নবাবি আত্মাবাবাজির নেশাভরা উৎসব নিরন্তর চলছে। প্রতিনিয়ত ঘর বাঁধার পাগলামি তাদের তাড়া করে চলেছে, কিন্তু ঘর পাওয়া হয়নি। অন্যদিকে যাত্রাদলের গীতিকার লুকমান মির্জা নবাবিয়ানা অন্তরে না রেখে বাঙালি হয়ে উঠেছে। তার গলায় ছিল রাবীন্দ্রিক স্বরের আর্তিময় প্লাবন, যার স্বাদে নিজে ভিজে গেলেও তা সঙ্গীদার কাছে চাপা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। নবাবি মনকে সিন্দুকে বন্দি রেখে লুকমান মির্জা নিজেকে শুধু লুকমান করে তুলেছে। তার এই নবাবিয়ানার নামকরণ করেছিল 'মুতা নবাব'। এই লুকমান দীর্ঘ পঁচিশ বছরের জীবনে অর্জিত চোখের জলে বেড়ে ওঠা আমিত্ব দান করেছে রবীন্দ্রনাথকে,

> "চোখের জলই অর্জন করেছি ঠাকুর। আমায় কে নেবে? তুমিই নাও।"[৪]

নবাব পুত্রের এ হেন রাবীন্দ্রিক প্রেম দেখে জ্বলে উঠত বাইজি রৌশন বাঈ। লুকমান বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিল তামাম মুতা নবাবি সন্তানদের। বিদ্যাসাগরী বর্ণবোধের আদর্শে গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্কুল স্থাপনের মধ্য দিয়ে করেছিল তার প্রয়াণ ঘটেছে নবাব আহম্মদজানের প্রতিরোধে। বাইজিদের কঠিন জীবনসংগ্রাম দেখিয়েছেন বাশার তাঁর উপন্যাসে। তাঁদের জীবন বেঁধে দেওয়া জীবন, যার অধিকার দাবি করে মালিক থেকে কর্মচারী। এই জীবনসত্য মেনে নিয়ে রৌশন বাঈ বলেছে,

> "বাইজির ভোগ নবাবে। পয়লা নবাবকে দিয়ে শুদ্ধ করিয়ে তারপর এই দেহ কুকুর বিড়ালকেও দেওয়া যায়। তাতে কোনো পাপ থাকে না।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লুকমানের রাবীন্দ্রিকতায় অসন্তুষ্ট হলেও কোথাও সঙ্গদার মনে প্রেমিকাসত্তা তৈরি করেছিল লুকমানের জন্য। রাতের অন্ধকারে শরীরের রাশ লুকমানের হাতে ছেড়ে দিলেও যৌনসঙ্গী করেনি তাকে। তবু এই বাহ্যিক মিলনের সাক্ষী হয়ে গিয়েছিল অমর। তার মালিকানার জোরে দাবি করেছে সঙ্গদার দেহ। সেই দাবিত্ব আরও জোরালো করতে লুকমান সঙ্গদার মিলনকাহিনি রৌশনকে শুনিয়েছে অমর। মেয়ের দেহকে নষ্ট করার যে খেলায় রৌশন মেতেছে তা দেখে আঁতকে ওঠে পাঠক। মেয়েকে একা ঘরে রেখে অমরকে ডেকেছে বাড়িতে। ভাঙা বাংলায় একটি চিঠি লিখে গিয়েছে,

> "এই বাড়ি, আমার মেয়ে আর রাত্রিটা তোমায় দিয়ে গেলাম।"[৬]

উৎসর্জিত দেহকে অমরের হাত থেকে রক্ষা করার সর্বত চেষ্টা করেছে সঙ্গদা। সে বলেছে,

> "সদকাহুঁ ম্যায়। সব কুছ ম্যায়নে দে দিয়া উসিকে পাঁও পর, নবাব মুঝে লে লিয়া, দাখিল কিয়া দিল পর।"[৭]

সেই রাতেই মাতাল হয়ে ভোগ করতে চেয়েছে সঙ্গদাকে। তবু নিজের দেহকে বাঁচিয়ে বেরিয়ে এসেছে সঙ্গদা। সারারাত্রি রাস্তায় রাস্তায় খুঁজেছে তাঁর নবাবকে। ফিরে এসে অমরকে আর পায়নি ঠিকই, কিন্তু অমরের কঠিন দহনজ্বালার বীভৎস নিশানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে সঙ্গদা। ভোর রাতে ফিরে আসা লুকমানকে অভিমানের তীব্র বাণে বিদ্ধ করেছে সঙ্গদা-

> ১. "তাবৎ রাতে এ-দেহে গোলাপ ফুটেছে। কাঁটায় ছিড়েছে হৃদয়। আমি অপেক্ষা করেছি। তুমি এলেনা। তুমি বড় পাপী গো। আমায় এভাবে ঠকালে কেন নবাবজাদা?"[৮]
>
> ২. "তোমায় আমি ক্ষমা করব না। যে হরিণী আপন মাংসে বৈরী নিজেরই। কেমন করে নিজেকে শহরের পথে পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল। রক্ষা করে ফিরল। এর বুঝি দাম নেই?"[৯]

জীবনের দগ্ধ অভিযোগ, নিঃসহায় কান্না আর অস্থির দিশেহারা ভাবাবেগ সঙ্গদার মতো বাইজিদের চালিত করে। সঙ্গদা তাই ভাবেনি ফেরুকে ঠিক কতটা বিশ্বাস করা যেতে পারে। রাতের অন্ধকারে তাই ফেরুর টাঙ্গাই চেপে মতিঝিলে চলে গিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে একাকী নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছে ফেরু। শিশির ভেজা ঘাসে জোর করে নামিয়ে এনেছে সঙ্গদাকে। সঙ্গদার প্রথম যৌনসঙ্গী হয়ে উঠেছে ফেরু। সঙ্গদা বুঝেছিল এই দেহে নারীর সতীত্ব বলে কিছু নেই। অমরও তার কামনা চরিতার্থ করেছে সঙ্গদাকে ভোগ করে। গর্ভে তার সন্তান দিয়েছে। সেই ভ্রূণকে নিষ্কাশন করতে গিয়ে চিরতরে মাতৃত্বের ক্ষমতাকে হারিয়েছে। তারপরই সে ফেরুর ঘরনি হয়েছে। আসলে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারীর জীবন কণ্টকময়। তাঁদের বেঁচে থাকাটাই ভয়ানক কষ্টের। সমালোচক যথার্থই বলেছেন -

> "তাহাদিগের শৈশবাবস্থার অনাদর, বৈধব্যের দারুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থার যন্ত্রণা এবং বার্দ্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের জীবিত কাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিগের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়।"[১০]

অথচ নারীই ভ্রান্ত পথিকের ধ্রুব নক্ষত্ররূপিণী। স্নেহ, কোমলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের অধিকারিণী হওয়ায় প্রকৃত মানব গঠনে নারীই প্রধান সহায়। এই কারণে কাজী নজরুল ইসলাম 'নারী' কবিতায় বলেছেন -

> "কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী/প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী!"[১১]

ফেরুর কাছে সঙ্গদা আর বাইজি নয়। সে মুতা, সে বাঁজা, সে বেশ্যা, সে পাপী। সঙ্গদা ফেরুর সন্তানকে ছোঁয়ায় মরে যাবে এমন গ্রামীণ কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে ফেরু সঙ্গদার প্রতি অত্যাচারের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া, এরকম আরও দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সাথে বামপন্থী সমাজদরদি মনোভাবাপন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। বিনা স্বার্থে রাহেদাকে সুস্থ করে তুলেছে যেখানে সে কোনও ভোট পাবে না জেনেও। আবার ফেরুর পিংকুর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার

ঘটনাও দেখেছে মানুষ। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত উপন্যাসে একটা বৃহত্তর জায়গা জুড়ে আছে। পাঁচটি রাজনৈতিক দল থাকলেও সবার ক্ষমতা সক্রিয় নয়। এর মধ্যে দুটি দল ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াইয়ে নেমে ভোট বৈতরণী পার করতে চেয়েছে আর হতদরিদ্র বামপন্থী দল নীতি-আদর্শ ও কৌশলী রাজনীতি অবলম্বন করেছে। বিরোধীদল বিপরীত শক্তিকে পরাস্ত করার কৌশল তৈরি করেছে। কেউ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে, কেউ মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোট প্রচার করেছে। বামপন্থী দলের নেতা নীতি-আদর্শকে সামনে রেখে বলেছেন -

> "আমাদের তত্ত্বে আছে জনগণকে শেখাও, তাদের কাছে শেখো। আমরা সবচেয়ে বেশি করে শিখব মানুষের চোখের জলের কাছে। ফ্রম দ্য টিয়ার্স অব সঙ্গদা বাই।"[১২]

স্বভাবতই বোঝা যায় সঙ্গদাকে আর তাঁর চোখের জলকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল তারা।

ভোটের ভয়ানক রাজনীতির শিকার হয়েছে গ্রামবাসী এবং সঙ্গদা। যে নতুন জীবনের স্বপ্ন পিংকুর কথায় দেখেছিল সঙ্গদা সেই স্বপ্নের কবর হয়েছে স্বামীর হাতে প্রকারান্তরে রাজনীতির হাতে। এক হতদরিদ্র দলের হয়ে সঙ্গদা ভোট জোগাড় করেছে। এখান থেকেই স্ত্রীর প্রতি তীব্র রাগ তৈরি হয়েছে ফেরুর। ভোটের আগের রাতে ভয়ানক দৃশ্যের সাক্ষী থাকে গ্রামবাসী। প্রতিটা বাড়ি পুড়েছে কাশদিয়াড়ার। কিন্তু মন পোড়েনি। সঙ্গদার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু কাশদিয়াড়ার ভোটের উৎসব বন্ধ হয়নি। গৃহহীন মানুষগুলোই নবাবিয়ানা বজায় রেখে টাঙ্গা চড়ে ভোট দিয়ে এসেছে। ফেরু বুঝেছে রাজনীতির কবলে পড়ে তার ঘর পুড়েছে, তার মন পুড়েছে। রাজনীতির এই কবলে পড়ে অজস্র সঙ্গদা এইভাবে শেষ হয়ে যাবে।

তারাশঙ্কর যেমন তাঁর উপন্যাসের আখ্যানে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তেমনই আবুল বাশার তাঁর 'সঙ্গদা বাঈ' উপন্যাসের আখ্যানে অবক্ষয়িত নবাবিয়ানাকে চিত্রিত করেছেন। ঔপন্যাসিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন -

> "নবাবি কালচারটাই ওই উপন্যাসে উঠে এসেছে। ওখানে যে নায়ককে দেখা যায় পার্টির হয়ে কাজ করতে, সেটা আমি নিজেই। আমারই একটা আত্মপ্রক্ষেপ আছে ওই উপন্যাসের মধ্যে। আমার ভাবনাটাকেই ওভাবে দেখিয়েছি। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ওখানে যে দুর্নীতির কথা আছে, সেটাও সত্য।"[১৩]

সেই নবাবিয়ানায় বিলাসিতার প্রধান অঙ্গ ছিল বাইজিপ্রথা। যেখানে বাইজিদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। এখানকার জনগণ নবাবিয়ানাকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু যুগের পটপরিবর্তনে, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে এবং কায়েমি স্বার্থের অপঘাতে সবকিছু আজ ছন্নছাড়া। সঙ্গদা বাঈদের জীবনও আজ দিশেহারা। একবিংশ শতাব্দীর ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্রিয়াকর্ম, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের আশ্রয় ইত্যাদির সূচনাপর্ব ছিল নয়ের দশক। সেই অবক্ষয়কেও লেখক তুলে ধরেছেন। অন্য রাজনীতির মতাদর্শের কথা বললেও সেগুলির নাম করেননি তিনি। কিন্তু বাম রাজনীতির প্রতি লেখকের পক্ষপাত যে প্রখর ছিল তা উপন্যাসের আখ্যানে অত্যন্ত প্রকট। সবচেয়ে বড় কথা, পুরুষতন্ত্রের বেড়াজালে, রাজনৈতিক কূটকৌশলে ও ব্যক্তির স্বার্থপরতার বাহুবলে কেমন করে শেষ হয়ে গেছে নারীর বাঁচার স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা তা আখ্যানের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আবুল বাশারের 'সঙ্গদা বাঈ' অবক্ষয়িত নবাবিয়ানা, মুসলিম সমাজের ভোটকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কূটকৌশলে দলাদলি-খুন-রাহাজানি, মুসলিম নারীর স্বাধিকারের সংকট তথা বাইজিদের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস ইত্যাদির দলিল।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পঞ্চভূত,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩০৪, পৃ. ৪৪
২. বাশার, আবুল, *সঙ্গদা বাঈ,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯, পৃ. ১১৫
৩. তদেব, পৃ. ১১৯

৪. তদেব, পৃ. ১৩৪
৫. তদেব, পৃ. ১৪৩
৬. তদেব, পৃ. ১৪৪
৭. তদেব, পৃ. ১৪৪-৪৫
৮. তদেব, পৃ. ১৪৭
৯. তদেব, পৃ. ১৫৭
১০. রায়, ভারতী (সম্পা.) *নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা,* আনন্দ, ২০০২, পৃ. ৬৬
১১. ইসলাম, নজরুল, *নারী, সঞ্চিতা,* ডি. এম লাইব্রেরি, ১৯২৮, পৃ. ৭৯
১২. বাশার, আবুল, *সঙ্গীদা বাঈ,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯, পৃ. ১৩১
১৩. আমি আধুনিক নারীবাদী লেখক : আবুল বাশার (সাক্ষাৎকার), সুখপাঠ, অক্টোবর ২০২১, পৃ. ৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 452 - 459
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কামনার কালীদহ ও তারাশঙ্করের কয়েকটি উপন্যাস

ড. প্রীতম চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক
শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ
Email ID : pritam22uc@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Tarasankar, Novel, Love, Society, Sexuality, Marginalized people.

Abstract
Tarashankar Bandyopadhyay is a bright star in the post-Rabindra-Sharat Bengali literature in the first half of the 20th century. His name is pronounced along with Bibhutibhushan and Manik. Although Tarashankar is ahead of both of them in terms of composition. However, his longer life than the other two writers can also be identified in this context. Tarashankar is mainly referred to as the commentator of 'Rarhbangla'. He himself was a representative of the evolving feudal society. But he saw all classes of people from landlords to crowd, rich to poor; He understood their life, society, love, relationship, nature and instinct with his heart. The people of Rangamati in Birbhum, Tarashankar's paradise, Came to life in his pen. Tarashankar's literature is a candid picture of marginalized life, Norit is world of hypocrisy of the rich affluent society. Their anger - violence-hatred is as obvious as the expression of sexuality is clear, undisguised. All these become vivid and lively or alive in his work. From Novel 'Ganadevata' Durga, the prostitute, to Padma the housewife--there is an expression of desire in all; Someone is clear in someone's signal-consonant-form. Drunken Aniruddha leaves an unhappy childless marriage and seeks release through sex. Although Chiru Pal wants to be a gentleman, his children bear the mark of his unbridled sexuality. In the novel 'Kobi', Basanta, she too had become accustomed to the indulgent life. She sought to be freed by sheltering Nitai Kabial, but was not saved in the end. Basanta's libertine life had a tragic end in death. In 'Hansuli Banker Upaktha', the Kahar-Kanyas of Banshbadi village leave the house because of desire. They left their sick husband and remarried a man. Due to physical dissatisfaction, Kaloshashi stalks her pre-marriage lover Banwari. Seeing the example of the dead lover, the old Banwari brought the young girl Subasi at home, but could not keep her to herself. In fact, not the house, not the family, not the children, -- girls easily leave the house and run to the new guy. And men's polygamy adultery is in their holes--Banwari, from Param to Karali, no one is satisfied from one woman, mens' instinct of polygamy and adultery has switched from genaration after genaration. In the novel 'Naginikanyar Kahini', the author has highlighted two forms of passion centered on Shabala Pingala. Men who are the head of the Vedic community, how they turn women into

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

objects of lust is highlighted here. In the novel 'Radha', along with the dialectics of Vaishnava theory, the image of the decadent society of the 18th century has emerged. Although it is not very long, the boy of Vaishnava descent is supposed to run wildly after dark barbarian girls. It is in the context of these few novels that the subject of sexuality has been discussed in the works of Tarashankar.

Discussion

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

> "নরনারীর জীবধর্মে প্রেমের দৈহিক সম্পর্কটাই বিশেষভাবে তার কাছে বাস্তব বলে মনে হয়েছিল। তাই তারাশঙ্করের সাহিত্যে নরনারী জীবনধর্ম প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনধর্মের রূপ নিয়েছে। তারাশঙ্কর মনে করতেন সৌন্দর্যবোধ নয়, নীতির অনুশাসন নয়, ব্যবহারিক জীবনটাই জীবনের ছন্দ, জীবনের প্রত্যক্ষতা জীবনের রসতীর্থে বিচিত্র রসলীলায় তার উপলব্ধি— ভালো মন্দের উর্ধ্বে মানুষ মহৎ হলেও প্রবৃত্তি তার জীবন প্রতিপালনের বিশেষ ধর্ম। একে উপেক্ষা করে জীবনের গতি প্রবাহিত হয় না। কারণ প্রবৃত্তির কাছে মানুষের সমস্ত প্রেয়বোধ বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, এই লাইফ ফোর্সকে তিনি সত্য বলে জানতেন তার অভিজ্ঞতা লব্ধ বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে। সুতরাং যুক্তিতর্ক, নীতি, স্নেহ, প্রেম, মমতা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক সংস্কার কোন কিছুই অপরিহার্য নয় তার প্রেমধর্মে। তারাশঙ্করের প্রেম ধর্মের মূল সত্য হল আদিম প্রবৃত্তির তাড়না।"[১]

তবে প্রেমের সৃজন শুধু নয়, প্রেমের ধ্বংসেও তো প্রবৃত্তি ভূমিকা নেয়, তারাশঙ্করের সাহিত্যে সে ছবি বিরল নয়। সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়ে নিজ সমাজের 'সম্ভোগ-প্রবৃত্তি' ও 'মোহ-মাৎসর্যে'র পাশাপাশি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের জনমানস, তাদের জীবনযাপন, সংস্কার এবং প্রেম ও প্রবৃত্তিকে। অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "রাঢ় বাংলার খর-মৃত্তিকাজাত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা— বেদে-কাহার ঝুমুর নাচিয়েরা— তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস তাদের জৈব আসক্তির অনুষঙ্গী জীবনাচরণের আশ্চর্য আদিম মত্ততাকে উন্মোচিত করেছে। প্রেম ও বাসনা, আদিমতা ও লালসার তাড়নায় বিপন্ন কিন্তু অমোঘ এক জীবনবাস্তবতা শিহরিত করেছে পাঠককে।"[২]

তাদের 'লোভ-লালসা কামনা ও স্নেহ'— সবকিছুই 'খররৌদ্রের রৌদ্ররসে' অভিষিক্ত। তাই বেদেনী রাধিকা, সাপুড়ে খোঁড়া শেখ এমন সজীব হয়ে ধরা দেয় তারাশঙ্করের কথাভুবনে। আসলে তারাশঙ্কর আসক্তির দাবদাহ দেখালেও তারই মধ্যে রয়ে যায় আদিম সারল্য। সেই ছবিও ফুটে উঠেছে তার কথা-পরিসরের উপন্যাসমগুলে।

বেশ কিছু ছোটগল্প এবং 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'প্রেম ও প্রয়োজন' কিংবা 'আগুন'-এর মতো উপন্যাস বা রবীন্দ্র-প্রশংসিত 'রাইকমল', এসবের পরে 'জীবননাট্যে'র শুরু হিসেবে লেখক নিজেই চিহ্নিত করেছেন সজনীকান্ত দাশ কর্তৃক 'ধাত্রীদেবতা'র প্রকাশ বা 'প্রবাসী'তে 'কালিন্দী'র ধারাবাহিক ছাপা হওয়াকে; এরপরই প্রকাশ পেয়েছে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' (১৯৪২)। 'গণদেবতা'য় পল্লী বাংলার বিবর্তনের ছবি আঁকতে গিয়ে ধরা পড়েছে অদম্য কামনার তীব্র রূপ। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিরু পাল, যৌনব্যাধিতে তার দাঁতেরই শুধু অকাল-পতন ঘটেনি, একের পর এক মৃত অথবা অসুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়ে চলে তার স্ত্রী। পল্লীসমাজের বিবর্তনের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে সামন্ততন্ত্রের অবসান ও ধনতন্ত্রের উত্থানে এই 'হঠাৎ নবাব' হয়ে ওঠা মানুষগুলোর যৌন-জীবন তো এমন বাঁধ ভাঙ্গাই ছিল। মনে পড়বে, 'যোগাযোগে'র মধুসূদনকে, কুমুদিনীর অর্ঘ্য সে পেতে ব্যর্থ হয়ে লালসা চরিতার্থ করেছিল বিধবা শ্যামাসুন্দরীকে দিয়ে। আর 'গণদেবতা'য়

ছিরু পাল তো দুর্গার সঙ্গে শুধু 'ফষ্টিনষ্টি' করেই ক্ষান্ত হয়নি, পাতু বায়েন বোনের এই কাজে প্রতিবাদ জানালে, ছিরু পাল 'একগাছা দড়ির বাড়িতে' পাতুর পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। আবার একসময় 'বহুভোগ্যা' দুর্গার গৌরদেহ আর উচ্ছ্বসিত যৌবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ছিরু কামনা করেছে অনিরুদ্ধ কর্মকারের 'দীর্ঘাঙ্গী সবল দেহা' পত্নী পদ্মকে। পদ্ম দেখেছে লোকটির হাসির মধ্যে 'অন্য একটা ক্রূর প্রবৃত্তির প্রেরণা অথবা তাড়নাও ছিল'। যদিও দিনের আলো আর পদ্মর দা'য়ের ভয়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি সে। তবে 'অন্তরের নগ্ন কামনার প্রগাঢ় আসক্তি' সহজে সরাতেও পারেনি। তারাচরণ আর দাশজী যখন পদ্ম কে নিয়ে আলোচনা করে তা ভালো লাগে না ছিরুর— 'ওই দীর্ঘাঙ্গি মেয়েটির প্রতি তাহার আসক্তি প্রচণ্ড— কামনা প্রগাঢ়, যে আসক্তি ও যে কামনাতে মানুষ মানুষকে, পুরুষ নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্ত ভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায়, এক জনশূন্য লোকে— সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মতো; অন্ধকার গুহার নিস্তব্ধতম আবিষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিনীর মতো— শতপাশের বন্ধনের মধ্যে।' এই সাপের অনুষঙ্গে যে অবচেতন যৌন আকাঙ্ক্ষা মিশে থাকে তা ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বেও আছে। অন্যদিকে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বপ্রিয় মৃধা লিখেছেন—

> "প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারে সর্প ও নাগ একার্থবাচক ছিল না। 'নাগ' বলতে বোঝাত গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ এই শ্রেণীর কোন উপজাতিকে, আর 'সর্প' বলতে বোঝাত বিশেষ প্রাণীটিকে। অনুমান করা যায় সাপের ক্রূরতা বিশেষ কোন জাতির মধ্যে অনুরূপ লক্ষণ থাকায় দীর্ঘ অপব্যবহারের ফলে দুটি একার্থবাচক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়, যা পরবর্তীকালে নাগ ও সর্প উভয় অর্থেই বিশেষ প্রাণীটিকে বোঝাতে থাকে। সর্প পূজা বা সেই সূত্রে যে সব দেবদেবীর পূজা জড়িত হয়ে আছে, যেখানে আছে ভীতিজনিত কোন বিষয়। কিন্তু সেইসঙ্গে সাপের উর্বরতাবাদ বা fetility cult এর একটি সম্পর্ক আছে একথাও মনে রাখতে হবে। কারণ দেখা যায় অপুত্রক বা বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান কামনায় অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে মাটির বা পাথরের তৈরি নাগমূর্তি প্রদক্ষিণ করে প্রার্থনা করে থাকেন।"[৩]

'নারী ও নাগিনী'র জোবেদার মত পদ্মও নিঃসন্তান, সেও গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে 'মস্ত বড় একটা কালো কেউটে' তাকে জড়িয়ে ধরছে। পদ্মের অবচেতন অনুভূতিতেও হয়তো মিশে গেছে ছিরুর কামতাড়িত দৃষ্টির বিষ। আর সেই বিষের ক্ষয় যতীন আর উচ্চিংড়ের 'মা-মণি' ডাকে।

অন্যদিকে দুর্গা— সে স্বৈরিণী। তার রূপও তার মায়ের ব্যভিচারের ফসল। তার বৌদি অর্থাৎ পাতুর বউ, সেও গর্ভে ধারণ করেছে হরেন ঘোষালের অবৈধ সন্তান। দুর্গার পারিবারিক প্রেক্ষাপট এমনই। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গেলে শাশুড়ি তাকে নামাতে চেয়েছিল দেহব্যবসায়। বাপের বাড়ি পালিয়ে এলেও ব্যভিচার থেকে মুক্তি পায়নি; হাতে ধরে মেয়েকে অন্ধকারের পথে এগিয়ে দিয়েছে তার নিজের মা— 'তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে।' সেই পথে শুধু গ্রামের ছিরু নয়, শিবকালিপুরের বাইরেও তার দেহব্যবসা ছড়িয়েছে। এমনকি যে পাতু বোনের দেহ ব্যবসার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছিরুর মার খেয়েছিল, সেও বৃত্তি-সংকটে পড়ে রাতের অন্ধকারে বোনকে পৌঁছে দিয়েছে অন্য পুরুষের ঘরে। আসলে তাদের সমাজে নেই 'আদর্শের সংস্কার', আর দুর্গার 'উৎশৃঙ্খলতা সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে! সে দুরন্ত স্বেচ্ছাচারিণী; উর্ধ্বে বা অধঃলোকের কোন সীমাকেই তাহার দ্বিধা নেই।' কিন্তু কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গেই দুর্গার অনুভূতিশীল, সজীব, পরোপকারী মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের হিত সাধনে তার প্রচেষ্টা আন্তরিক। দুর্গার বিলুদিদির বর দেবু পন্ডিত জেলে বসে তা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছে। এই দেবুর প্রতিও দুর্গার ভালোলাগা ছিল। সেখানে কিন্তু কামনার আগুন নেই আছে মহৎ মানুষের প্রতি আন্তরিক ভক্তি। আর 'তেজী লোক' অনিরুদ্ধর প্রতি আছে দেহজ আকর্ষণ— 'সবচেয়ে ভালো লাগে কামারের চেহারাখানি। লম্বা মানুষটি। দেহখানিও যেন পাথর কাটিয়া গড়া, প্রকাণ্ড লোহার হাতুড়িটা লইয়া সে যখন অবলীলাক্রমে লোহার উপর আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকে তখন ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে; কিন্তু একটি আঘাতও বেঠিক পড়ে না।' এর মধ্যে যৌনতার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। আর সত্যিই এরপর দুর্গার সঙ্গে অনিরুদ্ধর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। পদ্মর প্রতি দুর্গার অকপট সহানুভূতি থাকলেও দুর্গার ঘরে অনিরুদ্ধর যাতায়াত ও মদ্যপানে উভয়ের কাম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবৃত্তির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে— একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার অসুস্থ স্ত্রী, সন্তানহীন দাম্পত্য জীবন নিয়ে অনিরুদ্ধর যে মানসিক অশান্তি, নিজের স্বাধীন বৃত্তি নিয়ে গ্রামজীবনে সংকট, সেখান থেকে মুক্তির পেতেই এই কামনা-কালিদহে ডুব দিয়েছিল সে। অন্য মুক্তির পথ অবশ্য খুঁজে পেয়েছিল বটে, তবে সে আরও পরে।

কবি উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে নিতাই কবিয়ালের জীবনকে দেখা; তার জীবনদর্শনের পরিণতি —

'হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?'

কিন্তু 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে' থেকে ওই ভাবনায় পৌঁছতে তার জীবনে এসেছে দুই নারী। প্রথমজন নামহীনা ঠাকুরঝি, বন্ধু রাজনের শ্যালিকা— 'মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহ ভঙ্গিতে ভুঁই চাঁপার সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটি, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটাসুতোর খাটো কাপড়। মোটাসুতোর খাটো কাপড়খানির আটোসাটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল দেহখানের স্বাভাবিক খাঁজগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি পোড়ামাটির পুতুলের মতো দেখায়... সে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে।' নিতাই কবিয়ালের গান শুনে তার দেহের বসন 'অসম্বৃত' হলেও সে শালীন। কবিয়াল এর প্রতি তার প্রেম কামনা-মদির নয়। কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি রাজনের চোখে আলকাতরা হলেও নিতাই এর চোখে সুন্দর। প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গে মেয়েটির প্রতি মূর্তি ধরা পড়ে কবির চোখে। রাজনের মুখরা স্ত্রী 'রাক্ষসী' ভগ্নিপতির প্রশংসা করলেও রাজনের বক্তব্য থেকে জানা যায় - 'ঠাকুরঝির শাশুড়িটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয়।' নিতাইয়ের ঘরে বসন্তের উপস্থিতি দেখে মানসিক স্থিতি হারিয়েছিল সে — পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঝগড়া করে মূর্চ্ছা যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত কালী মায়ের ভরণে উঠে দেবাংশীর ঝাঁটার মার খেয়ে নিতাই কবিয়াল এর নাম বলেছিল ঠাকুরঝি। নিতাইয়ের প্রতি প্রেম আর শ্বশুড়বাড়ির অত্যাচার — মৃত্যুই তাকে মুক্তি দিয়েছিল দুটি ক্ষেত্র থেকে।

এরই বিপরীতে বসন্তের অবস্থান, সে রূপসী। ঝুমুরদলে নাচলেও আসলে তো দেহপজীবিনী। একার্থে সে 'নিম্ন শ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা', অশ্লীল নাচগানের সঙ্গে 'রাত্রির আড়াল দিয়া মেয়েদের দেহব্যবসাও চলে।' রাজবংশী ডোমযুবক নিতাই 'খুনির দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙ্গাড়ের পৌত্র, সিঁধেল চোরের পুত্র' — যার কালো রঙ আর দেহের গঠনে বংশের ছাপ স্পষ্ট হলেও স্বভাবে সে কবি; 'আস্তাকুড়ের এঁটো পাতা' হয়েও যে স্বর্গে যেতে চায়। সেও ওই রূপোপজীবিনীদের দলেরই গায়ক হয়েছে। বসন্তের সঙ্গে বেঁধেছে গাঁটছড়া। নিতাই কে ভালবাসলেও প্রতি সন্ধ্যায় ভিন্ন পুরুষকে নিয়ে দোরে আগল তোলে বসন্ত। কখনো বসন্তের 'সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে' প্রদর্শিত শরীর দেখে লজ্জিত হয়ে ওঠে নিতাই। ললিতা-নির্মলা বা সব মেয়েদেরই আচার-আচরণে, পোশাকে-আশাকে ছড়িয়ে থাকে যৌন আবেদন— 'মেয়েদের গায়ে গিলটির গয়না, কানঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশনের বডিস, রঙিন কাপড়। কেশ বিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপ্রকৃষ্ট ভঙ্গী। ঠোঁটে-গালে লাল রঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নোর প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লাল রঙের ছোপ।' 'আগুনের শীষ' - এর মতো জ্বলছে তাদের শরীর। আবার দেশি মদ খেয়ে সম্ভোগের পর এরাই তো পড়ে থাকে গাছের তলায় তৃণশয্যায়— 'কেশের রাস বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর, মুখের কাছে কতগুলো মাছি ভনভন করিয়া উড়িতেছে।' এই যৌন জীবনকে 'আলোর বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা' বলেই চিহ্নিত করেছেন লেখক— 'মাটির তলায় সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে।'

এই ঝুমুরের দলে নাচ-গান থাকলেও গভীর সাধনার অবকাশ নেই। শুধু মত্ততায় ডুবে যাওয়াতেই আশ্রয় করে আছে 'জীবনের সকল মর্যাদা'। তাই বাইরে প্রায়-যাযাবর শ্রেণির মেয়েগুলি তো 'নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী' মাত্র— 'তাহাদের দেহ ও রূপের অহংকারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ ও রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগই করে, চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মত ফেলিয়া দিয়া যায়।' এই ব্যবসায় উপার্জনের দু'ভাগ দেহোপজীবিনীর, একভাগ প্রৌঢ়া মাসীর। 'উৎশৃঙ্খল বর্বর, বীরবংশীয় সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি' ধরে মত্ত নিতাই যখন বসন্তের দিকে এগোয়ে 'নিতায়ের মুখ চুমায় চুমায়' ভরিয়ে দেয় বসন্ত। কারণ 'পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি' পেতে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাদের— 'পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায়

হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে।' তার ওপর 'কাসরোগ' আড়ালে রেখে চলতে হয় বসন্তকে; কাশির সঙ্গে ওঠে রক্ত, জ্বর আসে প্রায়ই; বুঝতে অসুবিধা হয় না, ক্ষয়রোগে সে জর্জরিতা। 'উলঙ্গবাহার' শাড়ির আড়ালে 'নগ্ননৃত্য' করলেও জীবন তাদের দীর্ঘ নয়। দূর্বা ঘাসের রসে সেই কঠিন রোগ সারে না। তবু সন্ধের পর অশ্লীল কথোপকথনে বসন্ত-ললিতারা নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেয়। বিষাক্ত জীবন থেকে মুক্তি চাইলেও সব পথ তাদের রুদ্ধ।

'বহুভোগের নেশা'ও কিন্তু ছাড়া সহজ নয়। তাই 'সুরুচি সম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে' খদ্দের হিসেবে পেয়ে ফেরাতে পারে না নিতাই-প্রিয়া বসন্ত। সম্ভোগের পর সে আবার অপরাধিনীর মত কেঁদেওছে। এরই মাঝে যৌন রোগে আক্রান্ত হয় বসন্ত। মাসি তিনদিনে সুস্থ হবার আশ্বাস দিলেও দুর্বল মেয়েটির রোগভোগ দীর্ঘকালীন। দেহ জোড়া 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট'— সোনার অঙ্গ হয়েছে কালিবর্ণ। এভাবেই তো – 'ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধূলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।' শুধু বসন্ত নয়, পূর্বে নির্মলা তিনবার ও ললিতা দুবার এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। কারোর 'ভালোবাসার জন' তখন ত্যাগ করে, আবার কেউ 'রোগের সুযোগে তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া পলাইয়া' যায়। নিতাই অবশ্য নিঃস্বার্থ সেবাই করেছিল বসন্তের। মাস পেরিয়ে বসন্ত সুস্থ হলেও সেই 'ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি, তাহার বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে বসন্তের অনুপম দেহ বর্ণের উজ্জ্বলতা লাবণ্য সবকিছু নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।' কঙ্কালসার দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে দুর্গন্ধ। না, নিতাই কবিয়ালের প্রেম 'শরতের মেঘ' বা 'হেমন্তের শীতের বাতাসের' মতো চলে যায়নি, শেষ পর্যন্ত থেকেছে। বসন্তের জন্য কলকাতার দোকানে চিঠি পাঠিয়েছে 'সালসা' ওষুধের জন্য। অবশেষে কাটোয়ায় গঙ্গা তীরে দেহ রেখেছে বসন্ত। এই দেহোপজিবিনীর মনেও যে স্বামী পুত্র সংসারের আকাঙ্ক্ষা ছিল তা প্রকাশ করে গিয়েছিল।

মনে রাখতে হবে এই কামনায় ভরা যৌনতার আতিশয্যময় পরিবেশ আর দেহোপজীবিনী নারীর সংস্পর্শ নিতাইকেও ক্ষণিকের জন্য অন্য মানুষ করে দিয়েছিল। গলায় মদ ঢেলে যখন সে খেউড় গাইতে ওঠে তার রক্তে মস্তিষ্কে জেগে ওঠে 'জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ'— 'সমাজের আবর্জনার স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়ে উঠে রক্তবীজের মতো। ভাষায়-ভাবে-ভঙ্গিতে অশ্লীল কদর্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধেনা।' পড়াশোনা ও কবিয়ালির চর্চা করে নিজের মূলের যে 'আবর্জনা স্তূপ'কে ভুলতে চেয়েছিল তা যেন ফিরে আসে। মত্ততায় ভোগ করে বসন্তকেও— 'সবল বাহুর দোলায় বসন্ত কে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। বসন্ত নির্জীবের মতো ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি।' এগুলো বসন্তের কাছে 'বহু প্রত্যাশার দিন'। আর এটা ঔপন্যাসিকের বাস্তববোধও বটে।

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় কাহার কুলের নরনারীর মনে 'অঙ' ধরে। সেই জৈবিকতার প্রকাশও বেশ স্পষ্ট। বলা বাহুল্য জীবনের সাধারণ গতির সঙ্গেই যেন প্রেম-পরকীয়া আর জৈবিকতা মিশে আছে। উপন্যাসের শুরুতেই আছে সাপের অনুষঙ্গ। সেই সাপ মরেছে করালীর হাতে। আর রুগ্ন হাঁপানি রোগে আক্রান্ত স্বামী নয়নকে ছেড়ে পাখি উঠেছে তারই ঘরে। চন্দনপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে করালী। গ্রামের অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র সে। কিন্তু পাখির এই প্রেম আর প্রেমের জন্য স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের কাছে যাওয়া কাহারপাড়ায় নতুন নয়। করালীর বিধবা মা-ও তো বাবুর বাড়ির মজুর খাটতে গিয়ে পয়সার লোভে ছেলেকে ছেড়ে গিয়েছিল। সে-জন্যই কাহারপাড়ার নারী আর ভরা কোপাইকে তারাশঙ্কর মিলিয়ে-মিশিয়ে দিয়েছেন — 'কাহারদের এক একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পাড়াপড়শিকে শাপ-শাপান্ত করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইটপাটকেল পাথর, দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিনই ভরা নদী অকস্মাৎ ভেসে ওঠে।'

কুলে কালি দিয়েছিল কালো বউও — বিয়ের আগে বনওয়ারীর সঙ্গে তার 'রঙ ছুঁই ছুঁই' হয়েছিল। তারপর পরম কাহারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর স্বামী ভিন জাতের মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং বদ সঙ্গে গিয়ে ডাকাতি শুরু করে। সেই অবকাশে 'কালো বউ মনের আক্রোশে চন্দনপুরে রোজ খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।' ধরা পড়ে পরমের যখন দ্বীপান্তর হয়, বাবুর বাড়ি চাপরাশি সিংজীর 'অনুগৃহীতা' হয়েছিল কালোশশী। আবার পরম গ্রামে ফিরলে

সে তার দুর্নাম আর কলঙ্ক নিয়ে গ্রামে ফিরেছে। নিজের অসুখী দাম্পত্যের কারণেই হয়তো মাতব্বর বনওয়ারির প্রতি তার আকর্ষণ গেছে আরো বেড়ে। কালোশশী পরমের নামে বহু অভিযোগ জানিয়েছে বনওয়ারীর কাছে, স্বামী স্ত্রীর নিশিযাপনের শীতল মুহূর্তের কথা স্বীকার করেছে। আর পাড়ায় যখন পাখি করালীকে নিয়ে মাতন লেগেছে, মাটির তলায় সাপেরা 'ছ'মেসে দম নিয়ে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে', পুরো বোতল পাকি মদ খেয়ে বেহারা পাড়ার মাতব্বর কামনার চোখে দেখেছে আটপৌরে-মাতব্বরের বউ কালোশশীকে— 'কালোবৌয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা যায় না।' আবার এক মাতন উৎসবে দুই নরনারী মুখোমুখি হল; তার আগেই পরমের সঙ্গে লড়াই হয়েছে বনওয়ারীর। 'মনোরমা' কালোবউ ধুয়ে মুছে দিয়েছে বনওয়ারীর 'ক্ষত এবং আঘাতের যন্ত্রণা'। কোপাইয়ের জলে নেমেছে পুরুষ নারী বসেছে পা ছড়িয়ে বালিতে— 'কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন খিলখিল হেসে ঢলে গড়িয়ে পড়েছে'— তারপরই পরমের উপস্থিতি এবং গোখুরো সাপের কামড়ে পলায়নপরা কালোবউয়ের মৃত্যু। অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— 'ধর্মশাস্ত্র পুরাণ ও লৌকিক ঐতিহ্যে সাপ বরাবর অশুভ শক্তি, গোপন কামনা-বাসনা ইত্যাদির প্রতীক রূপে উল্লেখিত হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে কালনাগিনী, নাগকন্যা, যাদু-সাপ ,নাগচক্র প্রভৃতির মোটিফ ও চিত্রগল্প বহুবার বহুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়'।[৪] কালোবউয়ের অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা যা প্রকাশ পেয়েছিল বনওয়ারীকে কেন্দ্র করে, সাপের কামড়েই যেন তার সমাপ্তি।

কিন্তু 'বনওয়ারীর ঘরে ঢুকেছে কালসাপিনী, সুবাসী কালসাপিনী', — কালোবউয়ের বিধবা বোনঝিকে গোপালীবালার বর্তমানে বিয়ে করেছে বনওয়ারী। কালোশশীকে ভোগের বাসনা তখনও মেটেনি তার। বনওয়ারীর ভালোমানুষ প্রথম পত্নী বোঝে 'কালোশশীর বুনঝি, কালোশশীর মতন দেখতে শুনতে বলে' স্বামী সাঙা করেছে সুবাসীকে। নতুন বউয়ের আলতা লেগে থাকে মাতব্বরের শরীরে। মুখ টিপে হাসে পাড়ার লোক। কিন্তু সুবাসী 'যুবতী মেয়ে, শক্ত শরীর', তাই বনওয়ারী নয় সে আকৃষ্ট হয় করালীর প্রতি। বনওয়ারী সামলে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় — নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্বে নবীনের জয় তো যুগসত্য। তাই করালীর ছাতিম ফুল ঠাঁই পায় সুবাসীর মাথায়। পাখিকেও করালি স্পষ্ট বলে— 'পোষ মাসে একটা ইঁদুর দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পোষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশি হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।' পাখি ঘর করেনি। করালির কপালে কাটারির আঘাতে 'চিরস্থায়ী দাগ' এঁকে দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। আর সুবাসী অসুস্থ স্বামী বনওয়ারীকে ফেলে 'নিষ্ঠুর হৃদয়হীন' করালীর ঘরে উঠেছে। প্রশ্ন ওঠে করালীই কি 'শুধু গায়ের জোরে, রক্তের তেজে আর রোজগারের গরমে ধর্মকে পায়ে মাড়িয়ে গেল'! বনওয়ারীও কি যায়নি? মত্ত আবেগে সে-ও এগিয়েছিল কালোশশীর দিকে। আর সুবাসীও তো কালোবউয়েরই উত্তরসূরি— তারা 'যাবেই— এই নিয়ম'। আসলে 'গোপালীবালার মধ্যে কোপাইয়ের ঢেউ নাই, মনে সে দোলা লাগাতে পারে না, সে হল নীলের বাঁধের জল, না আছে সাড়া, না আছে ধরা। চুপচাপ ঠান্ডা শীতল। বুক ডুবিয়ে থাকলে নড়বে না, জড়িয়ে ঘিরে নিথর হয়ে থাকবে...'। কাহার সর্দার তো এমন শান্ত নারী নিয়ে নিয়ে নেশা জামাতে পারেনি। তাই কালোশশী থেকে সুবাসীতে যাত্রা; এর ফল হয়তো ইতিবাচক নয়, কিন্তু সেই সমাজের অনুসারী বটে।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে সাঁতালি গ্রামের প্রেক্ষাপটে বিষবেদে সম্প্রদায়ের যাপনে উঠে এসেছে দলপতি শিরবেদের সঙ্গে 'বেদেজাতির ধর্মবোধের প্রতীক নাগিনীকন্যা'র সংঘাত। এই সংঘাতের দুটি ছবি ধরা আছে উপন্যাসে। প্রথম পর্বে মহাদেব ও সবলার দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় পর্বে ধনঞ্জয় ও পিঙলা। ছ'মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় বেদেকন্যার; আর পাঁচ বছরের আগে সাপের কামড়ে স্বামীর মৃত্যু হলে সেই মেয়ে হয় নাগিনী কন্যা — 'একজন শিরবেদের আমলে দু-তিনজন নাগিনীকন্যার আসন পার হয়ে যায়।' কিন্তু 'বিষহরি দেবীর কাছে উৎসর্গীকৃত আজীবন কুমারীত্বের ব্রতধারিণী' মেয়েগুলি তো নিষ্কাম হতে পারে না। স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা ফুটে ওঠে তাদের দেহে-মনে। অথচ 'ব্যভিচারের অপরাধ' তাদের স্পর্শ করলে 'গোটা বেদে সমাজের মুখে কালি পড়বে'। অন্যদিকে 'বেদের কন্যের লাজ নাই, শরম নাই, বেদের কন্যের ধর্ম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই, বেদের কন্যে বেদেনী অবিশ্বাসিনী।' মনে পড়বে তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পের রাধিকাকে, কেবল শরীরী চাহিদায় এক পুরুষ থেকে যে ছুটে গিয়েছিল অন্য পুরুষের কাছে; ভালোবাসা

নয় এক উত্তপ্ত যৌনজীবনও চেয়েছিল ভীষণভাবে। নাগিনীকন্যা শবলার মনেও এসেছিল 'বয়সের নেশা', কামের চেয়ে গভীর ছিল প্রেম— সেই জোয়ান বেদের প্রতি। ছেলেটির প্রেমেও ছিল একাগ্রতা। শবলা মানসিক-দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের চক্রান্তে রাজগোখরোর কামড়ে প্রাণ গেছে জোয়ান বেদেটির। শবলার শরীর মনে তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। তাই 'কচি ধন্বন্তরী' শিবরামের কাছে 'মাতৃকুক্ষীতে সদ্যসমাগত সন্তান-হত্যার ভেষজ চেয়েছে সে'। কারণ তার চোখেও নামে অবাধ্য স্বপ্ন। আসলে 'বেদের মেয়ে মায়াবিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে সর্বনাশী, বেদের মেয়ে পোড়ারমুখী।' কারণ সে 'সমাজে অবাধ উদ্দাম জীবনলীলা', তারই প্রভাবে এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কামনা জেগেছিল শবলার মনে; শরীরী পিপাসায় দেহে ধরেছিল জ্বালা— 'বুকে আমার সাতটা চিতার আগুন, সর্ব অঙ্গে আমার মরণ জরের তপ'। 'জলচারিণী সরীসৃপ' - এর মতো শিরবেদে মহাদেবের কাছে গিয়ে তার 'কলিজার উপর' বিধে দিল বিষাক্ত কাঁটা। জলে ঝাঁপ দিল শবলা। চল্লিশোর্ধ প্রেয়সী দধিমুখীর বদলে তরুণী শবলা— মহাদেবের কামনাও কি প্রজ্জ্বলিত হয়নি! শবলার যুক্তি— 'শিব নিজে ধরমভেরষ্ট হয়্যা কুচনীপাড়ায় ঘুরে আপন কন্যের রূপে মোহিত হয়।' তাদের 'জৈবিক জীবনের' স্বেচ্ছাচারের আদলে নিজেদের আরাধ্য দেবতাকেও সাজিয়েছে তারা; আর 'ওদের পূজা নিতেই দেবতাটি অম্লান মুখে গ্রহণ করেছে উৎশৃঙ্খলতার অপরাধ, ধরেছেন বর্বর নেশাপরায়ণের রূপ...'। তবে শবলা মুসলমান বেদের সঙ্গে ঘর বাঁধতে গিয়েও সফল হয়নি। মাতৃত্বে ব্যর্থতা হয়েছে অন্তরায়। 'পোড়াকপালী বেদের বেটি', খর চলন-বলন-চাউনি তাদের মাতৃমূর্তি নয়, দিয়েছে এক অভিশপ্ত জীবন। পিপাসার উজানে ভাসলেও 'সর্বনাশীরা ফিরেছে— ধর্ম বিসর্জন দিয়ে। কিছুদিন পরই অঙ্গে দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ। তখন ওই সন্তানকে নষ্ট করতে গিয়ে নিজে মরেছে। কেউ পালাতে চেয়েছে। কেউ পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েও রক্ষা পায়নি তারা। রক্ষা পায় না। হয় মরেছে বেদে সমাজের মন্ত্রপূত বাণের আঘাতে— নয়তো নাগিনীধর্মের অমোঘ নির্দেশে প্রসবের পরই নখ দিয়ে টুঁটি টিপে সন্তানকে হত্যা করেছে। ডিম ফুটে সন্তান বের হবামাত্র নাগিনী সন্তান খায়— নাগিনীকন্যাকেও সেই ধর্ম পালন করতেই হবে।'

হতভাগিনী শবলা পতি পুত্র ঘর না পেলেও প্রাণে বেঁচেছিল, প্রতিবাদিনী হয়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কিন্তু পরবর্তী নাগিনীকন্যা পিঙলা বাঁচেনি। মহাদেবের পরবর্তী শিরবেদে গঙ্গারামের 'অন্তরের অন্তস্থলে স্বেচ্ছাচারের কামনা কুটিল পথে আত্মপ্রকাশ' করেছিল। সে পাপী ভ্রষ্ট ব্যভিচারী— 'জটিল তার চরিত্র, কুটিল তার প্রকৃতি। সে ডোমন করেত। বেদে পাড়ায় সে অবাধে চালিয়ে চলেছে তার পাপ।' নাগিনীকন্যা পিঙলার উপর পড়েছিল তার কুদৃষ্টি, তাকে আয়ত্ত করতে গঙ্গারামের জটিল পন্থা— 'কন্যাটির মনে সে বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছিল, তার অঙ্গে চাঁপার গন্ধ ওঠে। কল্পনা করেছিল, এই বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত উদভ্রান্ত হয়ে পিঙলা একদিন রাতে বের হবে, নয়তো পালাতে চাইবে। পালালে এসে তাকে নিয়ে পালাত। মুরশিদাবাদে সে যেত ওষুধের উপকরণ আনতে। সেখান থেকে সে এনেছিল চম্পকগন্ধ, নিত্য মধ্যরাতে সে এসে পিঙলার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সেই গন্ধের আরক ছিটিয়ে দিত।' এর পিছনে ছিল শিরবেদের 'মহাপাপের বাসনা'। এই গন্ধের সঙ্গে পিঙলা মিশিয়ে ফেলে মিলন ঋতুতে সাপিনীর অঙ্গের সুবাসকে। মনে পড়বে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্প—

> "পায়ের কাদা ধুইয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা? ... খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘনঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল। ...খোঁড়া বলিল, বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।"[৫]

আর বিষবেদেদের বিশ্বাস— 'সাঁতালি নাগিনীকন্যের ওই হইল সব্বনাশের হেতু, পরানের ঘরের আগুন। সে আগুন ঘরে লাগলে ঘরের সাথে নিজে পুড়্যা ছারখার হয়্যা যায়। নাগিনীকন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস ফুটলে— হয় কন্যে আত্মঘাতী হয়, লয়তো কুলে কালি দিয়্যা বেদেকুলে পাপ চাপায়ে অকূলে ভাসে।' আর সেই উন্মাদরোগে আক্রান্ত পিঙলা, মিথ্যা অপরাধবোধে 'মেয়েটির কষ্টের যে অন্ত নাই, মস্তিষ্ক থেকে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত অহরহ এই যন্ত্রণায় নিপীড়িত হচ্ছে।' নাগু ঠাকুর— শবলার অনুরোধে যে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, গঙ্গারাম যাকে বন্দি করেছিল। পিঙলা মানুষটিকে মুক্তি দিলেও থেকে গিয়েছিল

নাগু ঠাকুরের 'মহানাগের ঝাঁপি'। সেই শঙ্খচূড়ের ছোবল নিজের বুকে নিয়ে 'বিশীর্ণা তপস্বিনী' পিঙলা নিজের জীবন যন্ত্রণা জুড়িয়েছে আর 'নিষ্কাম ব্রতে' ঢাকা পড়া অতৃপ্ত কামনা আর জীবন বাসনা থেকে মুক্তি পেয়েছে বিধবা বেদেনীরা।

'রাধা' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে স্বকীয়া ও পরকীয়া— বৈষ্ণব ধর্মের এই দুই তত্ত্বের সংঘাত। এক দিকে প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ার রাধামাধব, অন্যদিকে মাধবানন্দের কংসারী কৃষ্ণ। মাধবানন্দ কৃষ্ণভজনা করতে চেয়েছেন রাধাকে বাদ দিয়ে, জয়পুরের স্বকীয় মতে। তিনি 'সারা দেশে পরকীয়া এবং কিশোরী ভজনের পরিণতি'র নেতিবাচক ছবি দেখেছিলেন নিজের পরিবারে। দুই স্ত্রী বর্তমানেও মাধবানন্দের ভোগী জমিদার পিতার 'সুয়োরানী' ছিল এক যবনী-রক্ষিতা। শরিকদের আপত্তিতে তিনি 'গুরু ডেকে তিলক ফোঁটা কেটে মালা পরে নিজে বৈষ্ণব হলেন— সঙ্গে সঙ্গে ওই যবনীটিকে ভেক দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন।' মাধবানন্দ দেখেছিলেন মায়ের যন্ত্রণা, আর সেখান থেকেই তিনি পরকীয়া সাধনার প্রতি ছিলেন বিরূপ। মনে রাখতে হবে উপন্যাসের পটভূমি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্ব, তখন বাংলার সমাজে ফুটে উঠেছে 'সর্বনাশের সংকেত'— 'জীবনে পচে ধরেছে। একটু অবহিত হলেই তার গন্ধে অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে।' বাজারের পাশে 'সাধারণ নটী-কসবিরা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে গুপ্ত প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়ে চলে যায়।' অন্যদিকে বৈরাগী-বোষ্টম, ন্যাড়ানেড়ি সম্প্রদায় সেখানেও তো ব্যভিচারের শেষ নেই; প্রেমদাস বাবাজির 'বড় আখড়ার অধিকারিণী' হয়েও কৃষ্ণদাসী 'বৈষ্ণব নটী' — বৈষ্ণবীর সাজে প্রভুর সেবা করে, দেবতার বিগ্রহের সামনে বসে কাঁদে; আবার সে-ই 'সেজেগুজে গায়ে গন্ধ মেখে ডুলি চড়ে দাস-সরকারের কুঞ্জে যায় নটীর মত গান গাইতে। শুধু দাস-সরকার হলেও কথা ছিল না, আরো দু চারজন জমিদার-জোতদারের বাড়ি যায়...।' লেখকের কথায়— 'দুটো জীবন তার যেন দুটো আলাদা ঘরের মত। দুই ঘরের মধ্যে কোন যোগ নেই। অথবা দুটো পাত্রে সে তরল পদার্থের মতো আলাদা আকার ধারণ করে।' আর রাধারমন সরকারের ছেলে অক্রূর ওরফে 'ক্রূর সরকার', তার রূপ তো ভয়ংকর '...সে ধর্ম মানে না; সে বৈষ্ণব বংশের ছেলে হয়েও দুর্দান্ত মাতাল, নারী দেহের প্রতি তার প্রচন্ড প্রলোভন এবং রুচিও বিচিত্র; তার রুচিতে সে নিকষ কালো বন্য বর্বর-জাতীয়া মেয়েদের পিছনে উন্মত্ত লালসায় ছোটে।' তার বিলাসকুঞ্জে 'নিত্য-নতুন শবর জাতীয় যুবতী'দের নিয়ে আসে অনুচরবর্গ। তারই আবার 'ব্যতিক্রমের মতো ভালো লেগেছে মোহিনীকে'— কৃষ্ণদাসীর মেয়ে গোবিন্দমোহিনী। 'শ্বাপদের মতো হিংস্র' বীভৎস অক্রূরের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও রাধারমণের সাধন কুঞ্জে 'ভজন কুঠুরি'র ডাক অস্বীকার করা দুঃসাহস দেখাতে পারেনা কৃষ্ণদাসী। আর মোহিনী মুগ্ধ মাধবানন্দে। বয়সজনিত মুগ্ধতায় কাম থাকলেও প্রেমের আলোকিত উদ্ভাসন সেখানে অনুপস্থিত ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারই মধ্যে স্বকীয়া সাধক মাধবানন্দ দেখেছেন আরাধিকা রাধার রূপ। বহু সংকট সংঘাত এবং প্রতিকূলতা পেরিয়ে 'ক্লেদজ কুসুম' নয় আলোর অমল কমল'-এর মতো 'অমলিন অবারিত সত্য' হয়ে মোহিনী ধরা দিয়েছে মাধবানন্দের চোখে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় কাহার রমণীরা' (প্রবন্ধ), নিমাই দাস, অনিল রায় (সম্পা), 'প্রসঙ্গ হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ১১৫

২. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, 'নারী ও নাগিনী : বাসনার বিষম ত্রিভুজ' (প্রবন্ধ), ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা), 'যুগলবন্দী কথাকার, তারাশঙ্কর মানিক', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, পরিবর্জিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ৪৬

৩. মৃধা, বিশ্বপ্রিয়, 'নারী ও নাগিনী— প্রেমবৃত্তে জীবনায়ণ' (প্রবন্ধ), উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা), 'গল্পচর্চা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৮, পৃ. ১১৩৫ - ১১৩৬

৪. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, 'নারী ও নাগিনী : বাসনার বিষম ত্রিভুজ' (প্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫. ভট্টাচার্য, জগদীশ, (সম্পা), 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৬৫, পৃ. ৭২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 460 - 466
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অনিল ঘড়াই-এর ‘প্লাবন’ : গণজীবনের বিপর্যয়

আজিমুদ্দিন মণ্ডল
গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suraj.jarur@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Bourgeois, Political polarization, Femininity, Personal politics, Post – Independence era, Exploitation.

Abstract
Anil Gharai's 'Plaban' is written about the Disaster of public life, The deceit of the bourgeois minded, degradation of their values, corrupt mentality, political polarization, women's femininity, their social status and deprivation-exploitation. As we know, the Tristar Panchayat system was introduced in West Bengal in 1973 for the purpose of rural development. Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad. The responsibility of managing the Gram Panchayat rests with the Pradhan and Upa-Pradhan. They are the ones who control the fate of the people of the village. So, after achieving the goal all these heartbreakers do not sit idly by. Then a kind of aggressive attitude is born in their mind. People's happiness and peace is destroyed by the violence and brutality of these so-called people's leaders with an aggressive attitude. Storyteller Anil Gharai has brought before us through the story of Chaitir's family how endangered the people of Palli are in the trap of personal politics in the post-independence era[5] where there is no ideology. In the novel, a tone of awakening of the village people who are suffering from the exploitation[6]-persecution-torture of Pradhan is also heard.

Discussion

ভারতীয় উপমহাদেশের দলিত-আদিবাসী-অন্ত্যজ জনজীবনের কথাকার হলেন অনিল ঘড়াই। যুগ যুগ ধরে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল শোষণের যজ্ঞে শামিল থাকার কারণে যাঁদের মাথার উপর ছাঁদ নেই, যাঁদের পায়ের তলায় মাটি নেই, সেইসব শোষিত মানুষেরই কথাকার হলেন তিনি। দেশের নব্বইজন যেখানে বাস করে সেই পল্লি-বাংলায় কবির ঘর; যে পল্লি-বাংলার মানুষ মামলা-মোকদ্দমা, বাদানুবাদ এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে না। মনে অনেক আগ্রহ নিয়ে তিনি তাঁদের আঙিনায় ছুটে গেছেন এবং তাঁদের বহু সুখ-দুঃখের-দৈন্যের কাহিনি শুনেছেন। দূর থেকে দেখা পল্লবগ্রাহিতা নয়; জীবনের মূল্যে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞান-কান্না, ঘাম-রক্তে রঞ্জিত অনুভূতি-উপলব্ধিই তাঁর লেখনীর চালিকাশক্তি। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যজগতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে একদিকে যেমন দেখতে পাব পল্লি-বাংলার সরল-বিশ্বাসপরায়ণ মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, কৃষ্টি-কালচার অন্যদিকে তেমনই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের ব্যক্তিসর্বস্ব রাজনীতি যেখানে আদর্শের বালাই নেই সেই ব্যক্তিসর্বস্ব রাজনীতির যূপকাষ্ঠে পল্লিবাসীরা কতটা বিপন্ন সেই হৃদয়বিদারক চিত্রও সমানভাবে আমাদের গোচরীভূত হয়। নিজের লেখালেখি জগতের কথা বলতে গিয়ে কথাকার জানান -

> "দারিদ্রের মধ্যে যারা বেড়ে ওঠে তাদের গায়ে কষ্টের শ্যাওলা জমা থাকে। শ্যাওলাহীন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। বিলাসিতার ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠিনি বলেই হয়তো আমার মনটা এখনও তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই, তথাকথিত সফিস্টিকেটেড মানুষ যাদের বলা হয় তাদের নিয়ে এখনও লিখতে পারিনি, এটা আমার অক্ষমতা। আর এই অক্ষমতাকে সম্বল করে আমার চরিত্ররা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে, আমাকে সাহস প্রদান করে।"[১]

অর্থাৎ সাবল্টার্ন তথা প্রান্তিকের বহুস্তরীয় স্বরকে ভাষা দিয়েছেন অখ্যাত, শোষিত শ্রেণির কথাকার অনিল ঘড়াই। 'প্লাবন' সেই ধারারই বলিষ্ঠ উপন্যাস।

আমরা জানি, 'গ্রামন্নোয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবাংলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় প্রধান ও উপপ্রধানের উপর।'[২] মূলত গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই প্রধান ও উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে গ্রামের হর্তাকর্তা হয়ে বসে। তাদের হাতেই থাকে গ্রাম শাসনের ভার। গ্রামের মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা তারাই। কাজেই লক্ষ্য পূরণের পর অর্থাৎ পদপ্রাপ্তির পর এই সমস্ত হর্তাকর্তারা কিন্তু হাতগুটিয়ে বসে থাকে না। তখন তাদের মনের ভেতরে জন্ম নেয় একধরনের আগ্রাসি মনোভাব। এই আগ্রাসি মনোভাবাপন্ন মানুষেরই হিংস্রতায়-নৃশংসতায় নষ্ট হয়ে যায় মানুষের সুখশান্তি। তাদের ক্ষমতার আগুনে পল্লিবাসীর ছন্দময় জীবনের সব কিছুই হয়ে যায় ছারখার। আমাদের আলোচ্য 'প্লাবন' উপন্যাসের প্রতিবেদনেও মূলত এইসব ক্ষমতাবান গ্রামপ্রধানের হিংস্রতায়-নৃশংসতায়, ক্ষমতার মদমত্ততায় কীভাবে একটি পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তা তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরটিকেও তুলে ধরতে ভোলেননি এই জনদরদি কথাকার।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষ এক সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই ভারত নামক রাষ্ট্র বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষাভাষী মানুষের সমবায়ে গঠিত এক বৈচিত্র্যময় ভারত। সংহতি, একতা, ঐক্যবদ্ধতা ভারত রাষ্ট্রের মূল মন্ত্র। কিন্তু কর্তৃত্ববাদীদের দাম্ভিকতা, হৃদয়হীনতার জন্য এই পরম্পরা থেকে ভারত আজ বিছিন্ন। বৈষম্য এইটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, শোষকের বাড়ি তেতলা আর শোষিতের ঘরে চাল নেই। এই ভারতের মাটিতেই একশ্রেণির মানুষ বসবাস করে যাঁদের দিন শুরু হয় বেঁচে থাকার উপযোগী খাদ্যসংস্থানের স্বপ্ন দিয়ে। উপন্যাস শুরু হয়েছে এমন এক ব্রাত্য পরিবারের কথা দিয়ে। মনসার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে সংসার। বড় ছেলে দুলে সংসারের কোনও দায়িত্ব পালন করতে অপারগ। মেজো ছেলে হেলেও বিয়ের পর বউ নিয়ে আলাদা থাকে। তাই বাধ্য হয়ে পিতার মৃত্যুর পর মনসার সঙ্গে সংসারের হাল ধরতে হয় ছোটো ছেলে কেলেকে। পিতার ফেলে যাওয়া কামারশালাটাই তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ক্ষুধা আর ক্ষুধার বিরুদ্ধে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা যে সকলেই শ্রমজীবী, বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা কায়িক শ্রমই যে তাঁদের জীবিকার মুখ্য মূলধন এই বিষয়টিকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মনসার একমাত্র মেয়ে চৈতিও সংসারের ভাঙা হাল ধরতে দিদিমণির বাসায় কাজ করতে যায়। মাস গেলে ঝি-গিরির দরুন ত্রিশ টাকা সে মায়ের হাতে তুলে দিতে পারে। এই চৈতিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীর জীবন যে এখনও কণ্টকময় তার প্রমাণ চৈতির জীবনকাহিনি। গ্রাম হোক কিংবা শহর এখনও যে নারীর স্বাধীনভাবে চলাফেরার পরিবেশ তৈরি হয়নি, নারীবিদ্বেষী পুরুষ এখনও যে নারীকে একমাত্র কাম নিবারণের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে, নারীর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা শব্দটি যে এখনও বাক্সবন্দি তার প্রমাণ চৈতির জীবনকাহিনি। এই চৈতি বোবা। অভাব ওকে কাজের মেয়েতে পরিণত করলেও তাঁর মধ্যে রূপের বাহার আছে। আর তাঁর এই বিমল সৌন্দর্যই তাঁর জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে গ্রামপ্রধানের ছেলে মাকুন্দ তাঁকে ভোগ করতে চায়। কেননা তার ধারণা যাঁরা ছোটোলোক তাঁদের সসম্মানে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। ক্ষমতাবানরা যেভাবে তাঁদের চলতে বলবে তাঁদের সেভাবেই চলতে হবে। আর এখান থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত সমাজের দ্বন্দ্ব। কিন্তু চৈতির মানসম্মান যথেষ্ট। হররোজ-হরবেলা তাঁকে কেউ কুচোখ দিয়ে দেখবে তেমন নীচ মানসিকতাকে সহ্য করার মানসিকতা চৈতির নেই। সে একবেলা না খেয়ে থাকবে, তবুও নিজের মানসম্মান বিকিয়ে দেবে না কারও কাছে এমন দৃঢ়চেতা নারী

সে। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের সতর্ক পাহারাদারিকে উপেক্ষা করে চৈতির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা। তাঁকে একসময় হার মানতে হয়।

কামারশালা কেন্দ্রিক জীবিকার মধ্যে শরীরের সব পরিশ্রম দিয়ে শুধু দু-বেলা দু-মুঠো ভাতের সংস্থান হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু টাকা জমিয়ে রাখার মতো পেশা নয় এটা। আর তাইতো আমরা দেখি, চৈতির মা মনসা একসময় প্রচণ্ড জ্বর, কাশি আর বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো অসুস্থ মনসাকে সদরে নিয়ে গিয়ে ফটো তোলার জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন সেটাও কেলের হাতে থাকে না। পানতা ভাত আর সজনে শাকের ভাজি খেয়ে যাঁদের বছরের অধিকাংশ দিন কাটে তাঁরা কীভাবে এক রোগীকে সুপথ্য তুলে দেবে! তবুও তাঁরা মাকে সুস্থ করে তোলার জন্য গুগলির ঝোল আর ভাতের ব্যবস্থা করার কথা ভাবে। সেইমতো চৈতি যায় গুগলি তুলতে পুকুরে-

> "গুগলি তোলা মহা ঝক্কির কাজ। মাজা লেগে যায় তবু কোঁচড় ভরে না।"[৩]

ঠিক এই সময় লম্পট মাকুন্দ তাঁদের অভাবের সুযোগ নিয়ে চৈতির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এটা ছিল তার ছল। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী চৈতি মাকুন্দর সেই কু-মতলবের আঁচ পেয়ে তার দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দেয়। সঙ্গে-

> "মাকুন্দ হয়ত ভেবেছিল চৈতি টাকাগুলো ছোঁ মেরে নেবে। কিন্তু তার ধারণা ভুল। ছোঁ মেরে টাকাগুলো নিল না চৈতি, এগিয়ে এসে থুঃ করে ছুঁড়ে দিল থুতু। হাওয়ায় সেই থুতু উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল মাকুন্দর মুখে।"[৪]

বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী মাকুন্দ চৈতির এহেন আচরণ মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তাই সে মনে মনে ছক কষে কীভাবে চৈতিকে বাগে আনা যায়। এদিকে কেলে কোনোভাবেই অভাবের পুকুর থেকে পরিবারকে তুলে আনতে পারে না। আসলে ভারতীয় রাজনীতির মেরুকরণের শিকার তাঁরা। সৌধের বাসিন্দাদের অখণ্ড সুবিধাভোগকে যেনতেন-প্রকারেণ ভাবে বজায় রাখাই ভারতীয় রাজনীতির মূল পরিচায়ক হওয়ায় যাঁরা শ্রমিক-কুলি-কামিন তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও রাষ্ট্রীয়নীতি না এক্ষেত্রে আমাদের চোখে পড়ে না এবং -

> "এই স্থিতাবস্থা বজায় রেখেই পশ্চিমবাংলার সমাজ টিকে আছে। একদিকে দরিদ্র পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলি বিপুল সংখ্যায় সুবিধা বঞ্চিত, অন্যদিকে খুবই ছোট একটি অংশের প্লাজা, শপিং মল, টেকনোলজি পার্ক, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ, যাবতীয় জাগতিক বৈভবগুলির উপর অবিচল অধিকারটি সুনিশ্চিত রাখা। সরকার যেমন এই অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি বিরোধী রাজনীতির যে প্রধান ধারা সেটিও এদেরই প্রতিনিধি।"[৫]

আর এই সুযোগকেই কাজে লাগায় মাকুন্দ। সে কেলেকে একশো টাকা ধার দিয়ে তাঁর মন জয় করে ফেলে। কেলে মাকুন্দর মতলবের কথা জানতে না পারলেও চৈতির তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

এদিকে মনসা সুস্থ হয়ে উঠলে একঘেয়েমি জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনার জন্য চৈতিকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। মনসা ভেবেছিল হয়তো রামায়ণ-মহাভারতের বীরত্বমূলক কোনো অংশের অভিনয় হবে। কিন্তু এ যে উলটো রামায়ণ! পর্দায় অশ্লীল দেহভঙ্গি করে নেচে চলে চৈতির বয়েসী একটা মেয়ে, তা দেখে লজ্জায় চোখ নামিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকে মনসা। একসময় মনসা মেয়ে চৈতিকে সেখানে রেখে এসে একা একা বাড়ি ফিরে আসে। এদিকে শো শেষ হতে রাত্রি প্রায় গভীর হয়ে যায়। এই নিশিরাত্রের অন্ধকার ভেদ করে মা-হীন চৈতিকে একা একা বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে হয়। চৈতি পাকুড়তলার ঢালু পথ বেয়ে যখন যাচ্ছিল তখনই তাঁর সামনে এসে হাজির হয় মাকুন্দ। চৈতির আর বুঝতে বাকি থাকে না চাঁদের আলো আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে আগুন হয়ে পুড়িয়ে দেবে এবং দেয়ও। মাকুন্দ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় বাঁধের নীচে। সেখানেই চলে তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "চন্দ্রালোকে সবুজ প্রকৃতির বুকে পর্যায়ক্রমে ধর্ষিতা হল সে। জ্ঞান হারাবার আগে সে দেখল তার নগ্ন দুই জাং ভিজিয়ে রক্তের ঢল নামছে মাটিতে।"[৬]

মাকুন্দ তাঁর সতীত্বের পাপড়িগুলো নষ্ট করে দেয়। শুধু মাকুন্দ নয়, মাকুন্দর অপর দুই লম্পট বন্ধু পরিমল এবং মাধবও। বিকৃতকাম দুরাত্মারা যে এভাবেই শত শত নারীর জীবনকে অনাদিকাল ধরে নরকে পরিণত করে চলেছে তার একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই। শঙ্খ ঘোষ একদা তাঁর 'আমরা মেয়েরা' কবিতায় ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীশোষণের এই চিত্র দেখে বলেন যে, -

> "লিখে যাই জলের অক্ষরে/আমার মেয়েরা আজও অবশ ভিক্ষার হাতে পড়ে আছে সব ঘরে ঘরে।"[৭]

এভাবেই যুগে যুগে নারী আধিপত্যবাদী প্রতাপবর্গের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। নারীমাংসলোলুপ পুরুষ আজও ব্যাধের ভূমিকায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সমস্ত পরিসর ও অবকাশ রুদ্ধ।

এক সহায়-সম্বলহীন পরিবারের নারী চৈতি সমাজরক্ষকদের হাতে বাঁধের ধারে নিজের সতীত্ব হারিয়েও ন্যায়বিচার পায় না। আসলে জোর যার মুলুক তার। মাকুন্দর পিতা একজন গ্রামপ্রধান। সে ক্ষমতালোভী-অর্থলোভী-পদলোভী একজন নেতা। চরিত্রটির পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় সমালোচক যা বলেছেন তাতে আমাদের বুঝে নিতে সমস্যা হয় না যে, তিনি একজন রাজনীতির ছত্রছায়ায় পুষ্ট স্বার্থগৃধ্নু, পরপীড়ক, বিবেকহীন, মনুষ্যত্ববিবর্জিত এক নেতা -

> "আমাদের দেশের ভোটের রাজনীতিতে বা ক্যারিয়ারিস্টিক রাজনীতিতে নব্বই ভাগ নেতা যাদেরকে আমরা জনপ্রতিনিধি বলি তাদের চরিত্রের ঠিক নেই। আশিভাগ জেলফেরত বা কোথাও না কোথাও মামলা ঝুলছে। এ দেশে ভোট নেওয়া হয় মানুষকে বোকা বানিয়ে বা ভয় দেখিয়ে। সে দেশের উন্নতি কোথা থেকে হবে? মুরলীধরবাবুও এই ধরনের একজন বিত্তবান নেতা। যিনি তার বিত্তের পাহাড়টাকে বাড়িয়েই যাচ্ছেন।"[৮]

এহেন মানুষকে থানার ছোটোবাবু পর্যন্ত সমীহ করে চলে। অবশ্য মুরলিধরবাবুকে সমীহ করার পেছনে আরও নানান কারণ আছে। মাকুন্দর পিতা মুরলিধরবাবুর বিশাল পুকুরে হুইল নিয়ে মাছ ধরতে যায় থানার ছোটোবাবু। শুধু মাছ নয়, আরও অনেক কিছু পান তিনি। তাই থানার ছোটোবাবু ন্যায়ের পক্ষ না নিয়ে অন্যায়ের সাথে হাত মেলায়। অর্থের কাছে মাথানত করে মানুষের ন্যায়-বিবেকবোধ-মূল্যবোধ। তাইতো আমরা দেখি, কেলে দারোগার সামনেই হাত নেড়ে নেড়ে প্রতিবাদ জানালে তাঁর সেই প্রতিবাদ মুখ তুবড়ে পড়ে। সমাজের এই অধঃপতিত চিত্র দেখে মনসা সেখান থেকে পালিয়ে আসার জন্য ছেলেকে বলে -

> "এই সোনার দেশ এখন ছাই হয়ে গিয়েছে, এদেশে বুক ফাটলেও তোর মুখে কেউ একফোঁটা জল দেবে না!"[৯]

একদিকে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা অন্যদিকে বোনের বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত অবস্থা কেলেকে গভীর মানসিক আঘাত দেয়। তাই আবার কেলে সুবিচারের জন্য দারস্থ হয় সমাজের মাথাওয়ালদের কাছে। একমাত্র বোনকে সে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসিয়ে গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের দোরে-দোরে ঘোরে। সবাই মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও কিন্তু কাজের কাজ কেউ করে না। বোবা বোনকে ন্যায়বিচার না দিতে পেরে বিশাল ব্যর্থতার পাহাড় জমে যায় কেলের বুকের ভেতর। সেই ব্যর্থতাই একসময় তাঁকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে -

> "যদি পাগলা কামারের রক্ত তার গায়ে থাকে তাহলে এই চরম অপমানের বদলা নেবে সে। বোনের ইজ্জত যে বাঁধের ধারে মিশিয়ে দিয়েছে তাকে সে ছেড়ে কথা বলবে না। যে কোন শর্তে বদলা নেবে সে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোমরে ধারালো হেঁসো গুঁজে কেলে দোকানপাট ভুলে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় বাঁধের উপর অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে -

> "প্রতিহিংসার গোঁ কেলেকে স্থির থাকতে দেয় না কোন সময়। মাথার ভেতরটা সব সময় ভার হয়ে আছে তার।"[১১]

অসম লড়াইয়ে ভয়-ভীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে কেলে অপেক্ষায় থাকে আক্রমণের। একসময় সুযোগ পেয়েও যায়। মাকুন্দ তার সঙ্গীদের নিয়ে আম-কাঁঠালের বনমধ্যে অবস্থিত পথ ধরে বাড়ি ফেরার পথে অগ্রসর হলে কেলে তাক করে অস্ত্রটা ছুঁড়ে দেয়। মাকুন্দ তা দেখতে পেয়ে চকিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। হেঁসোটা গিঁথে যায় আমগাছে। ওরা তিনজন, সে একা। তাই কেলের হার হয়। তিন ব্যাটারির টর্চের আঘাতে কেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে গভীর জঙ্গলে। বোনের ধর্ষণকারীকে শাস্তি দিয়ে গিয়ে নিজেই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে হাজির হয়। মাথায় বাইশটা সেলাই নিয়ে সে কোনোরকমে প্রাণে বাঁচে। জ্ঞান ফেরার পর হাসপাতালেই কেলে তাঁর এই অবস্থার জন্য যে দায়ী সেই মাকুন্দর কথা আকারে-ইঙ্গিতে জানায়। চৈতির ধর্ষিত হবার ঘটনাও সে জোর গলায় বলে। কিন্তু বিচার পায় না। কেননা থানা-পুলিশ একশ্রেণির মানুষের কুক্ষিগত। যাবতীয় ক্ষমতাও একশ্রেণির মানুষের হস্তগত। তারা এভাবেই বিরুদ্ধ স্বরকে দমিয়ে রাখে। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ তাদের হৃদয়কুঞ্জে স্থান পায় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন -

> "...আমাদের শাসন কাঠামোকে যতই গণতান্ত্রিক বলে দাবি করা হোক না কেন, অন্যের কথা শোনার ঐতিহ্যকে পুষ্ট করার বদলে দুর্বল করা হয়েছে। বাঙালি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্ষুদ্র এক উন্নাসিক গোষ্ঠী, যেটি ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে নিজেকে তথাকথিত আলোকায়নের সঙ্গে যুক্ত করেছে। সেই সুবাদে সে যাবৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতার উপর একাধিকার স্থাপন করেছে।"[১২]

শুধু চৈতির পরিবারই নয়, ক্ষমতার অলিন্দে বসবাসকারী ক্ষুদ্র এক উন্নাসিক গোষ্ঠীর কাছে বাংলার পঁচাশি শতাংশ জনসাধারণের ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরার কোনও মূল্য নেই; তাঁদের প্রাণের কোনও মূল্য নেই।

পাকা একমাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় কেলে। কিন্তু সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে সে আর ফিরে আসতে পারে না। অন্যদিকে কিন্তু যারা মনসার পরিবারের এহেন দুরবস্থার জন্য দায়ী তারা দিব্যি মাথা উঁচু করে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের বুড়ো বটতলায় তাদের আড্ডা। গ্রামসমাজ ধিক্কারে জাগ্রত হলেও এতে মাকুন্দ বা মুরলিধরবাবুর কোনও কিছু যায় আসে না। কিন্তু মনসার পরিবারের অনেক কিছু যায় আসে। কেননা কেলে ছিল মনসার পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস। তিনমাসের উপর হল সে দোকান খোলে না। তাঁর যে একটা কামারশালা আছে এটা সে বেমালুম ভুলেই যায়। ফলে মনসার ঘাড়ে সব দায়িত্ব এসে পড়ে। মনসা ছিল ঘরের বউ, এখন হয়েছে চাকরানি। পরের দোরে দোরে গিয়ে এঁটো বাসন না ধুলে তাঁর হাঁড়ি চড়ে না -

> "দিন চলে যায়, কিন্তু পেট চলে না তার। তিন বাড়িতে এখন বাসন মাজে মনসা।"[১৩]

আমাদের সমাজে দুই ধরনের মানুষ বাস করে। একশ্রেণির মানুষ টাকা এবং পদের লোভে ভুলে যায় মানবিকতা, তারা মানুষের ক্ষতি করে দিব্যি মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামপ্রধান মুরলিধরবাবু ও তার ছেলে মাকুন্দ তার উদাহরণ। আর একশ্রেণির মানুষ সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে। তাঁরা সর্বশক্তিমান শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মনে মনে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রজত সেই দলের। গ্রামের কেউ যখন এক সহায়-সম্বলহীন পরিবারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না তখন এই রজত এগিয়ে আসে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। শুধু তাই নয় -

> "এক মাস ছুটিতে এসে রজত এবার অনেক বেশি সময় ঘরের বাইরে কাটাচ্ছে। গ্রামের অতি সাধারণ-দরিদ্র মানুষগুলোর সঙ্গে তার ওঠা-বসা।"[১৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রজত তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের দরিদ্রপল্লিতে গিয়ে তাঁদের দুঃখ-বেদনার কথা শুনে। তাঁদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়-অবিচারের কথা শোনে। সব কিছু শুনে রজতের দল শোষকশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে -

> "এই কালো কালো লেখাগুলো থানার দারোগাকে ভয় পাইয়ে দেবে।"[১৫]

এঁরা সবাই ছিল সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের সপক্ষে। এঁরা সমাজসংস্কারক। রাইচরণ সিদ্ধা যথার্থই বলেছেন -

> "তোমাদের অত্যাচারে আজ আমরা মরিয়া
> তাই দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে -
> প্রতিবাদের আগুন।"[১৬]

এই প্রতিবাদের আগুন যে শোষকশ্রেণির ঘুম উড়িয়ে দেবে তা তো বলাই বাহুল্য। রজতের দলের কর্মকাণ্ড আমাদের জানিয়ে দেয় যে, একমাত্র বঞ্চিত কণ্ঠের প্রতিবাদই সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র। সকল প্রতিবাদী কণ্ঠই চেতনার দ্বারা জাগৃত হয়। মানুষ মানুষের প্রতি চিরায়ত বঞ্চনার বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে স্লোগান দেয়। রজতের দলের প্রতিবাদ ঠিক এমনই। মনসার পরিবারের উপর হওয়া অবিচারের কথা শুনে তাঁরা অপেক্ষা করে বুকে একরাশ প্রতিবাদের আগুন নিয়ে।

রজতের দলের কর্মকাণ্ড প্রশাসন ভালো চোখে দেখে না। শুরু হয় ধরপাকড়। ফলে পুলিশের জুলুমে রজতকে সাময়িকভাবে গ্রাম ছাড়তে হয়। গ্রাম ছাড়লেও সে আবার সন্ন্যাসীর রূপ ধরে গ্রামে ফিরে আসে চৈতির সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। প্রথম লক্ষ্য তাঁর মাকুন্দ। প্রথম গুলিটাতেই সে মাকুন্দর বুক ঝাঁঝরা করে দিতে চায়, তারপর অন্য ভাবনা। সুযোগ পেয়েও যায়। গ্রামের পুব পাড়ায় বাঁধ ভেঙে গেলে মাকুন্দ তার দলকে নিয়ে সেখানে যায় লোকদেখানোর জন্য যে, তারা মানুষের দুঃখে সমব্যথী -

> "আজকাল শো না করলে মানুষের মন পাওয়া যায় না। আর মানুষের মন না পেলে ভোটের নৌকো ডাঙায় তোলা যায় না।"[১৭]

কিন্তু এই শো-ই তার জীবননাট্যের শেষ শো হয়ে যায়। মাকুন্দ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বাঁশঝাড়ের কাছে মদ খেত গেলে রজত নিমেষে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর ফায়ার। গুলির আঘাতে কাদাভর্তি বাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ে মাকুন্দ। মাকুন্দর সঙ্গে পরিমলকেও সে গুলি করে খুন করে। থানার ওসি থেকে শুরু করে মুরলিধরবাবুও হিসাব মেলাতে পারে এটা কার কাজ। এ যেন শোষক শ্রেণির বা বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত সমাজের সশস্ত্র প্রতিবাদ। আজ ক্রমশ কোটি কোটি নিম্নবর্গ ও অসাম্মনিত মানুষের মধ্যে এই বিপ্লবী বিদ্রোহ-ই শ্রেণিসংঘাতের মোড় নিচ্ছে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শোষণের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে যশস্বী হয়ে আছে। পল্লিবাসী দরিদ্র জনগণের স্বাধীনতা যে এখনও একশ্রেণির ঔদ্ধত্য মানুষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখেছে আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিবেদনেও আমরা তার ছায়াচিত্র লক্ষ করি। নিম্নবর্ণের মানুষ কীভাবে যুগের পর যুগ ধরে সমাজপতিদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছে, বিপন্ন হয়েছে, পদানত হয়েছে তারই আলেখ্য নির্মাণ করেছেন অনিল ঘড়াই তাঁর আলোচ্য উপন্যাসে। সেসঙ্গে তিনি তাঁদের জাগরণের দিকটিকেও তুলে ধরতে ভোলেননি। পল্লিবাসীরা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে একমাত্র সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমেই-এই সত্যকে সুকৌশলে উপন্যাসের ন্যারেটিভে গেঁথে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই। আর এভাবেই তিনি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত এই দুই সমাজের দ্বান্দ্বিক বাস্তবতাকে আলোচ্য উপন্যাসের ন্যারেটিভে তুলে ধরেছেন।

Reference:

১. মাঝি, সুনীল ও ভবেশ বসু (সম্পা.), অনিল ঘড়াই পরিক্রমা, তূর্য, ২০১৫, পৃ. ৪২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২.https://prd.wb.gov.in/services/resources/Patrikas/mm_638181921066367215.pdf,Accesson 19.12.2024
at 06.49 PM
৩. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ২৫
৪. তদেব, পৃ. ২৬
৫. রাণা, কুমার, শিক্ষা ও রাজনীতি, আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ২৬
৬. তদেব, পৃ. ৩৩
৭. ঘোষ, শঙ্খ, আমরা মেয়েরা, কবিতা সংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৯৭, পৃ. ১৭২
৮. জানা, সুস্নাত, ভবেশ বসু, শঙ্খশুভ্র পাত্র ও সুনীল মাঝি (সম্পা.), পাতা ওড়ার দিন : একটি ব্যক্তিগত আলোচনা (সত্যজিৎ ঘোষ), শাশ্বত ছিন্নপত্র : অনিল ঘড়াই সংখ্যা, মেদিনীপুর, ২০০৪, পৃ. ১৫২
৯. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ৩৪
১০. তদেব, পৃ. ৩৮
১১. তদেব, পৃ. ৩৯
১২. রাণা, কুমার, প্রান্ত ও কেন্দ্র, আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৯৫
১৩. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ৪৬
১৪. তদেব, পৃ. ১৯
১৫. তদেব, পৃ. ২৩
১৬. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, দলিত সাহিত্যের দিগ্‌বলয়, একুশ শতক, ১৯৯২, পৃ. ৪৫
১৭. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ৬০

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 467 - 475
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস : প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা ও হাঁসুলি বাঁকের উপকথা

রাহুল সেখ
সহকারী অধ্যাপক
রানী ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস্ কলেজ
Email ID : sahiulzamal@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rural Society, Social Conflicts, Changes, Transformation, Novel, Ganadevta, Hansuli Banker Upakatha, Socio-Economic and History

Abstract
History is currently conducting research on various subjects while becoming 'objective' and 'fact-based'. According to the writings of the British and the words of Marx, Indian society was stuck. They could not notice any changes in Indian society. Society or human history cannot stand still in one place. The history of rural Bengal society was not written in that way, so it did not come up in the history of conflicts and changes in rural society. To understand the changes in rural society, we need to know about the small time and personal time of human society. Tarashankar Banerjee is the kind of writer who was able to understand rural society directly and deeply. He easily mixed with the people of rural Bengal society and collected oral stories to write history-based society-centric literature. Writing the history of the form and transformation of society is a favourite subject of Tarashankar's literature. The field in which the history of the form and transformation of society is studied, studied, and widely observed is feudal society. The background of Ganadevat is vast - although it is based on a homogeneous society, the living internal conflict of the ancient Indian caste-based and economically stratified social classes in the process of shaping and transforming society has acquired dimensional scope as it is included in the novel Ganadevat-Panchagram. On the one hand, the seeds of transformation that arose within society due to socio-economic influences, on the other hand, the fruits of the newly introduced civic culture, the widespread influence of the politics of nationalism and its programs, have created a tremor in the basic values of feudal and rural society everywhere - Ganadevat-Panchagram is its artistic history. In the novel Ganadevat-Panchagram, Tarashankar, not being an economist, witnesses the role of money as a driving force in the transformation of a society that has changed under the dictates of the religion of the time. In the first part of the novel, starting from Ganadevat, published in a contemporary newspaper called Chandimandap, to the end of Panchagram, we observe the inevitable influence of the religion of the time on the process of transformation of society. Although the Hansuli Banker Upakatha is set in the world of primitive fables of a particular regional

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

community, how has the influence of the new era implemented the theory and truth of social change in the fable-based life of that community? Tarashankar Banerjee's experience of time and society and his experience of political consciousness and enlightenment can be called a new horizon in the field of writing social history. The novel "Ganadevata and Hansuli Banker Upakatha " has achieved a new dimension in the artistic expression of the end of feudal society, the rise of capitalist society, and social conflicts. From a literary point of view, the novels 'Ganadevata and Hansuli Banker Upakatha' can be called invaluable references to time and social life, which are written based on a deep analysis of the basic structure of society, the position of classes in rural society, their behaviour, and their way of life.

Discussion

ইতিহাস মানব সভ্যতার বিভিন্ন সামাজিক ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ' এবং 'তথ্যনিষ্ঠ হতে গিয়ে ইতিহাস বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমীক্ষা চালাচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস ধরতে গেলে মানুষের রচনার বিভিন্ন দিকের উপর চর্চা করা প্রয়োজন। মার্কস ১৮৫৩ সালে 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' নামক প্রবন্ধে এশিয়াটিক মোড ধারণা তৈরী করে প্রাচ্যসমাজ তথা ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন হাজার হাজার বছর ধরে একই জায়গায় থেমে রয়েছে এবং এই গতিহীনতার বীজ গ্রাম-সমাজের বিশিষ্ট গড়নের মধ্যেই নিহিত। সমাজের অভ্যন্তরে এমন কোনও শক্তি নেই সেখানে যা এই অনড়তা কাটিয়ে দেশকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে ঐতিহাসিক বিবর্তনের রাজপথে।[১] বাংলার গ্রাম সমাজ সমন্ধে জানার ইতিহাস ব্রিটিশদের হাত ধরে তৈরি হলেও ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য তা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। ব্রিটিশরা সাধারণত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা বা মুনাফা লাভের জন্য গ্রামগুলিতে নিবিড় সমীক্ষা চালিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় 'মর্ডান ভিলেজ লাইফ ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধে বাংলার গ্রামীন জীবন, অর্থনীতি, সমাজের গঠন, শ্রেণী ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে গঠিত লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।[২] কর্নেল জেমস বাড ফিয়ার লেখা 'দি এরিয়ান ভিলেজ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলন' ১৮৮০) গ্রন্থে উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার ভূমিব্যবস্থা এবং গ্রাম সমাজের অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রিটিশদের লেখা ও মার্কসের কথা অনুসারে ভারতীয় সমাজ ছিল বদ্ধ। তারা ভারতীয় সমাজের কোন পরিবর্তন লক্ষ করতে পারেননি। সমাজ বা মানব ইতিহাস এক জায়গায় স্তব্ধভাবে অবস্থান করতে পারে না। গ্রামীন বাংলার সমাজের ইতিহাস সেভাবে রচনা হয়নি বলেই গ্রামীণ সমাজের দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের ইতিহাসে উঠে আসেনি। অশীন দাশগুপ্তের ইতিহাস ও সাহিত্য প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায় ইতিহাস মানব সমাজের ছোটো সময় ও ব্যক্তিগত সময় নিয়ে সেভাবে মাথা ঘামায় না। ইতিহাসের কারবার শুধু মানব সমাজের বড় সময়কে নিয়ে। গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন বুঝতে গেলে আমাদেরকে মানব সমাজের ছোটো সময় ও ব্যক্তিগত সময় সম্বন্ধে জানতে হবে। অশীন দাশগুপ্ত বলেছেন মানব সমাজের ছোট সময় ও ব্যক্তিগত সময়ের কারবারি হলেন সাহিত্যিকরা।[৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলেন সেই ধরনের সাহিত্যিক যিনি গ্রামীন সমাজকে প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিশেষভাবে রাঢ় বাংলার সমাজের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে ও মৌখিক কথা সংগ্রহ করে ইতিহাস ভিত্তিক সমাজকেন্দ্রীক সাহিত্য রচনা করেছেন। পল টমসন তাঁর 'ভয়েস অফ দি পাস্ট' দেখান কিভাবে গ্রাম ও শহরের নীচতলায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে মুখের কথার মাধ্যমে তথ্যর ভিত্তিতে সমাজের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।[৪] সাহিত্যের মাধ্যমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামীন সমাজের দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন।

১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই অবিভক্ত বাংলার বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করলে একটা বিশেষ অঞ্চলের সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশাল জনগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা যায়। তিনি ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটোগল্প-সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ-সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, একটি কাব্যগ্রন্থ এবং একটি প্রহসন রচনা করেন।[৫] রাঢ় বাংলায় বেড়ে ওঠা লেখক ইতিহাসের উপলব্ধি নিয়ে নৃ-তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যেমে রাঢ় বাংলার প্রতিটি মানুষকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খুব কাছে থেকে দেখছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য যাঁর চিহ্নিত হয়ে আছে আঞ্চলিকতার ভাষ্যকার হিসেবে সেই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি? হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বা গণদেবতা এই নিয়ে সমালোচক মহলে দ্বিধা থাকতে পারে। বস্তুত দুটি রচনার প্রেক্ষণবিন্দু সামান্য পৃথক। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় আছে সেই সামাজিক মানুষের কথা-যারা সভ্যতার পিলসুজ; আর গণদেবতা-য় এই মানুষও আছে আবার যারা সভ্যতার রথের চাটায় পিষ্ট হয় না, টেনে নিয়ে যায় রথটি তাদের কিংবা যে দেবতার জয় ঘোষণা মন্দ্রিত হয় আধুনিকতার নান্দীপাঠে সেই জনতা নিবিড় সম্মিলিত প্রজাপুঞ্জের কাহিনীও আছে।[৬] গণদেবতা অংশের গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৯ (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) আর পঞ্চগ্রাম অংশের গ্রন্থকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ মাঘ ১৩৫০ (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গাব্দে। দুইখানি উপন্যাসের বর্তমানে একত্রিত রূপ হচ্ছে 'গণদেবতা'।[৭] ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (জুন-জুলাই ১৯৪৭) গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা মুদ্রিত হয়। ভারতের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে উপন্যাস দুটি রচনা করা হয়েছে। সেই দিক থেকে বিচার স্বাধীনতার আগে বাংলা তথা রাঢ় বাংলার সমাজ চিত্র উপন্যাস দুটিতে উঠে এসেছে। প্রাথমিকভাবে গণদেবতা দেবু ঘোষ হয়ত সদগোপ সমাজের প্রতিনিধি কিন্তু তার নেতৃত্বে ধরে আছে সমগ্র সমাজ শরীরকেই। বিপর্যস্ত গ্রামীণ সামন্ত সমাজব্যবস্থার পটভূমি এবং সামাজিক রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে নিমগ্ন হয়ে অবশেষে উপনীত হয়েছে বিশেষ রাজনীতি-পরিস্রুত এক সদর্থক জীবনার্থে। কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখারিয়া - এই পঞ্চগ্রামের মানব সম্পদের পুনর্গঠন আর গ্রামদেশ জেগে ওঠার মহৎ কাহিনী আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমান্তরাল।[৮] অন্যদিকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কাহিনী তাদের নিয়ে যারা সংসার যাত্রায় ব্রাত্য মন্ত্রহীন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা কেবল তারাশঙ্কর সাহিত্য নয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন বাঁকের সন্ধান দেয়। এর কারণ নিহিত রয়েছে এক সুগভীর কালচেতনা।

সমাজের রূপ এবং রূপান্তরের ইতিহাস রচনা করা তারাশঙ্কর-সাহিত্যের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। যে সমাজের রূপ ও রূপান্তরের ইতিহাস অধ্যয়ন-অনুধ্যান-পর্যবেক্ষণ প্রশস্ত ক্ষেত্র সেটি হল সামন্ত সমাজ। গণদেবতার পটভূমি বিশাল-অভিন্ন সমাজ অবলম্বিত হলেও সমাজের রূপ ও রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় বর্ণ ভিত্তিক ও অর্থনৈতিকভাবে বহুস্তরীভূত সামাজিক শ্রেণীর প্রাণবন্ত অন্তঃসংঘাত গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে সংযোজিত হওয়ার এটি লাভ করেছে মাত্রাগত ব্যাপকতা। একদিকে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাবে সমাজের অভ্যন্তরে উদগত রূপান্তরের বীজ, অন্যদিকে নবসূচিত নাগরিক সংস্কৃতির ফসল জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ও তার কর্মসূচির সর্বত্রবিস্তারী অভিঘাত সমন্বিত হয়ে সামন্ত গ্রামীণ সর্বত্র-সমাজের ভিত্তিমূল্যে যে কম্পন সৃষ্টি করেছে-তারই শিল্পিত ইতিহাস গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম। তারাশঙ্কর এর গণদেবতায় পৌরাণিক দেবতা নেই, আছে অনিরুদ্ধ,পাতু, শ্রীহরি, দুর্গা, দেবু, পদ্ম। এরা দেবতা নয় মানুষ। আত্মকেন্দ্রিক একক মানুষ নয় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সামাজিক মানুষ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজতান্ত্রিক নন কিন্তু সমাজের অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক। এজন্যেই বোধ করি আলোচ্য উপন্যাসের সমাজদ্বন্দ্বের সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান দুই উৎস অর্থনীতি ও রাজনৈতিক যোগ্য তাৎপর্যসহ উপস্থাপিত হয়েছে। চন্ডীমণ্ডপ নির্ভর দৃঢ়বদ্ধ গ্রামীণ সামন্তসংস্কৃতির অনিবার্য ভাঙনের সংকেত দিয়েই গণদেবতা উপন্যাস - অংশের সূচনা। চন্ডীমণ্ডপ দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে কর্মকার অনিরুদ্ধ ছুতার গিরীশের এই বিদ্রোহ নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনের মর্মমূলকে প্রকম্পিত করেছে। কারণ সামান্যই কিন্তু এই কথাটা বলতেও বিস্মৃত হননি যে সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। বস্তুতই হাজার বছরের সামন্ত শাসন কাঠামোয় এ এক বিরাট বিশৃঙ্খলা বা সম্ভাব্য বিপর্যয়ের সংকেত। তারাশঙ্কর মহাকাব্যোচিত বিশাল ক্যানভাসে সামন্তসমাজের অবক্ষয় এবং নতুন জীবনবেদের শিল্পীত কাহিনি যে সৃজন করিবেন উপন্যাসের সূচনাতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখেছেন। অর্থনৈতিক সংকটে পতিত অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ ব্যক্তি অস্তিত্বের মানবীয় প্রান্তিক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জন্মগত বৃত্তি পরিত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নয়। পেশাগত স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই প্রেরণার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান নিবিড়ভাবে সংলগ্ন। সমাজের সাধারণ পেশাজীবী মানুষ অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ত বলেই বিদ্রোহে সোচ্চার হতে চেয়েছে। অনিরুদ্ধ ও গিরীশ এইসব পীড়িত মানুষেরই প্রতিনিধি। এই অর্থে তাদের প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। সমাজ যে দ্রুত বদলাবে, অধিকারবোধ জাগ্রত মানুষ যে তার ন্যায্য প্রাপ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত হবে-এর ইঙ্গিত উল্লেখিত ঘটনায়। সমাজের মাত্রা সম্প্রসারিত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হচ্ছে, ক্রমশ গুণগত পরিবর্তনের হাওয়া এসে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে সমাজে, অর্থনীতির আধিপত্য অজন্ম-লালিত সংস্কার বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বিপর্যয়ের প্রান্তদেশে।[৯]

গণদেবতার এর আসল সিদ্ধি এর বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভরতা। তারাশঙ্কর দাবি করেছেন যাহার কথা কথকতা করিয়েছি - তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়; বিশ্লেষণে মতান্তর ঘটতে পারে। রাঢ়বাংলা তথা বীরভূমের গ্রামসমাজ তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের গ্রাম জীবনের চিরকালীন সত্যসিন্ধুকেই উপহার দিয়েছেন তারাশঙ্কর। অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রকে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন –

> "শুধু ময়ূরাক্ষী চরের এই দেবু-স্বর্ণের সংসারেরই ছবি নয় ওটা। আমি সারা দেশের সম্বন্ধে ঐ কল্যাণের কথা, - ওই শ্রীর কথাই ভেবেছি।"[১০]

অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে গোটা সমাজ অবয়ব পেয়েছে।[১১] তারাশঙ্করের তত্ত্বভাবনা বাস্তবকে স্পর্শ করে থাকলেও সামান্য অতিক্রম করেই গেছে-ফলে গণদেবতা পঞ্চগ্রামের শেষপর্যন্ত আদর্শ সাহিত্য রয়ে গেছে শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় যাকে উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে সামান্য দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন। তার ভাষায় – অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক উপন্যাসিক নহেন; তিনি গ্রাম্য জীবনের চারণ কবি'।[১২] গণদেবতার পটভূমি বিশাল হওয়ার ফলে গ্রামীণ জীবনের সব মানুষ স্থান পেয়েছে। আর চন্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে তা নানামুখী ও বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিক ব্যবস্থায় উঠে আসে জমিদারি ব্যবস্থার অবক্ষয়, গ্রাম সমাজে ছিরু পালের মত অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান সেথা আভিজাত্য নয় - সদ্য লব্ধ অর্থশক্তির অহঙ্কারে সংস্কারহীন শ্রেণী, গ্রাম্য জীবনের সংরক্ষিত শক্তির বিশ শতকীয় অভিব্যক্তি–সেখানে গ্রামের প্রতিষ্ঠান ফিরে পাক মর্যাদা, অতীত গ্রামীণ গৌরব ঐতিহ্যময় স্মরণ রেখে সমাজের বন্ধন উপরিতলের নয়, একবারে আন্তরিক আর আছে সমাজের প্রান্তজন বা নিম্নবর্গের মানুষ তারাশঙ্কর তাদের একত্রে নাম দিয়েছেন গান্ধিজির ভাষা অনুসারে হরিজন। পঞ্চগ্রামে সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তারাশঙ্কর। সব মিলিয়ে এক বর্ণাঢ্য মানবসমাজ ধারা।[১৩]

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে কালধর্মের অনুশাসনে পরিবর্তমান সমাজের রূপায়ণে অর্থনীতিবিদ না হয়ে চালিকাশক্তি অর্থের ভূমিকাকে যোগ্য তাৎপর্যে প্রত্যক্ষ করছে তারাশঙ্কর। উপন্যাসের প্রথমাংশে, সমসাময়িক পত্রে যা চণ্ডীমণ্ডপ নামে মুদ্রিত হয়েছিল - সেই গণদেবতা থেকে শুরু করে পঞ্চগ্রাম এর শেষ অবধি আমরা লক্ষ্য করি সমাজের রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় কালধর্মের অনিবার্য প্রভাব। অনিরুদ্ধ ও গিরীশের বিদ্রোহের অর্থনৈতিক নিপীড়ন-নিষ্পেশণ আর ছিরুপালের আস্ফালন নবলব্ধ ধাতব মুদ্রার কৌলিন্যশক্তির অহংকার জাত। এখানে উভয় আচরণেরই নিয়মক অর্থ। এর জন্যই পীড়ত ও নিপীড়িক উভয় পক্ষের কাছে অচলায়তন সমাজধর্ম ও সংহতির প্রতিভূ দ্বারিক চৌধুরীর আপোশ প্রস্তাব অবাঞ্চিত। নতুন অর্থনীতির হাওয়া সব কিছুকেই পরিবর্তিত করে দিতে উন্মুখ। চণ্ডীমণ্ডপ ঝাঁট দিতে এসে রাঙাদিদির খেদোক্তি প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য-কেত্তেরলে, পাঁচালী, কত হত ভাই! তোরা আর কী দেখছি বল? সে রামও নেই। সে অযুধ্যেও নেই। চণ্ডীমণ্ডপে নিকুবার জন্য তখন মাইনে করার লোক ছিল, দিনরাত তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করত। সিঁদুর পড়লে তোলা যেত। সময়ের প্রবাহমানতায় প্রবীণ শাসনভিত্তি আর আজ অটুট নেই। অর্থনীতির পালাবদলের শ্রেণী সমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে উজ্জীবিত করে চলেছে, মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছে শ্রেণী সচেতনতা। চণ্ডীমণ্ডপ এর মীমাংস বা সিদ্ধান্ত আজ আর বাধ্যতামূলক নয়। গণদেবতায় চণ্ডীমণ্ডপ নিয়ন্ত্রিত জীবনের কাহিনী নয়, ঐ জীবনপ্যাটার্নের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি প্রয়াসী নবজীবনের কথকতা। আর সমগ্র উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংঘাতের সূত্র ধরে পরিবর্তনশীল কালের কাহিনী রচনা করেছেন। গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম তাই প্রথমার্ধে বিংশশতাব্দীর বাংলাদেশের 'যুগ পরিচায়ক উপন্যাস' ঔপন্যাসিকের সমাজবোধ ইতিহাসের ছন্দজ্ঞান এর সমন্বয়ে একটা দেশে একটা জাতির মোড় ফেরার এক আশ্চর্য আলেখ্য।[১৪] ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন তারাশঙ্কর নৈপুণ্যের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের অন্তর্নিহিত ও বহুস্তর দ্বন্দ্ব (শুধু শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, জাতপাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিততে, ইংরেজি শিক্ষিত ও সংস্কৃত পন্ডিতে; কৃষি ও কারু শিল্পনির্ভর মানুষ ও শহরের শিল্পনির্ভর মানুষে) উদঘাটন করেছেন। তিনি এও বলেছেন গণদেবতা

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে কংগ্রেসের রাজনীতির সাংগঠনিক কর্মসূচি এবং তার সঙ্গে বহুস্তররীভূত সামাজিক শক্তিসমূহের সংঘর্ষের কথা স্বীকৃত হয়েছে। সামাজিক জীবনের সঙ্গে রাজনৈতিক-জীবন পরস্পরিত হয়ে ত্বরান্বিত করেছে যুগাবসানকে। গণদেবতায় সমাজ মূল ও সমাজ মানসে পরিবর্তনের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল পঞ্চগ্রামে তা অঙ্কুরিত বর্ধিত হয়েছে। এই পর্যায়ে লক্ষ্য করি কৃষিজীবী রূপান্তরিত হচ্ছে শ্রমদাসে, সামন্তধনগৌরব আত্মসাৎ করে নিচ্ছে নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায় পূজা-পার্বণ গীত পাঁচালীর মধুময় গ্রামীণ সংস্কৃত অভ্যন্তরে এসে লেগেছে নবযুগের অভিঘাত। এই নতুন যুগের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রে এবং সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে অর্জন করেছে স্বতঃস্ফূর্ততা।[১৫]

গণদেবতা পঞ্চগ্রাম প্রথমার্ধে বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের যুগ পরিচায়ক উপন্যাস। সমাজে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহের প্রভাব প্রতিক্রিয়া কিভাবে সক্রিয় উপাদান রূপে কার্যকর হয় আলোচ্য উপন্যাস তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে সমাজ ও রাজনীতির অন্বয় সাধনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলাদেশের যুগান্তর পর্বকে ইতিহাসনিষ্ঠ শিল্পের গৈরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রিটিশ উপনিবেশে বণিকতন্ত্রের অভ্যুদয়ে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক সচলতা অন্যদিকে তেমনি নবজাগ্রতা রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং সেই মূল্যবোধের সাংগঠনিক কর্মসূচি জীবনমূলে সঞ্চার করেছিল গতিশীলতা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় যখন সচল ও জীবন্ময় তখন সামাজিক বহুস্তরীভূত শ্রেণীসমূহের অন্তঃসংঘাত সেই প্রক্রিয়াকে করেছে অধিকতর বেগবান ও পরিণতিমুখী। এই পর্যায়ে সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির স্রোতোপ্রবাহ পরস্পরিক হওয়ায় সামাজিক সংক্রান্তি-পর্ব আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।[১৬] ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী গণদেবতা পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের ঐতিহাসিক মূল্য ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট তো বলেছেন যে বহুস্তরীভূত সামাজিক শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপন্যাসখানিতে উদঘাটিত হয়েছে এবং এই সংঘাতের পটভূমি উপন্যাসের নায়ক দেবু মাস্টার কংগ্রেসের রাজনীতির পক্ষে জনমত গঠনে তৎপর প্রদর্শন করেছে এবং অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অহিংসা-গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করে বিশিষ্ট জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে।[১৭] চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রিত গোষ্ঠীজীবন এবং গোষ্ঠীজীবনের বিলয় উগ্র ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রের উদ্ভব, শহরকেন্দ্রিক নতুন সামাজিক ইনস্টিটিউটের institution এর আবির্ভাব এগ্রিকালচার ইকোনমিকের (agricultural economy) পরবর্তী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি (industrial economy) এর প্রাধান্য বিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী জীবনের যুগান্তরের ইতিহাস ধরা পড়েছে তারাশঙ্করের গণদেবতাই পরিকল্পনা। সে বিচারে গণদেবতা এবং পঞ্চগ্রাম এককালের বাঙালির সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনীতি ইতিহাসের ভাষ্য।[১৮] সময় ও সমাজ বিন্যাসে উপন্যাসিক কালের যোগসূত্র সামঞ্জস্য চেতনার পরিচয় স্থানে স্থানে লক্ষ্য করি। চণ্ডীমণ্ডপের মজলিস যে কোন ক্রমে ভেঙ্গে গেছে এবং তা স্থানান্তরিত হয়েছে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির বৈঠকখানায়। বৈঠকখানায় অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ পার্টির ভাষণ, প্রজাস্বত্ব আইন, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হচ্ছে। রাজনীতি সমকালীন গ্রামীণ জীবন পটভূমিকাকে বদল করছে।

পঞ্চগ্রামের সমাজ জীবনে রাজনীতির অভিঘাত অন্তর্বয়ন করেছেন তারাশঙ্কর। যেকালের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের শিল্পসজনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সে-কালের এক পরম সমাজসত্য। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারা গ্রামীণ জীবনের মানুষের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমাজ পটভূমি রচনা হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মানসের মাত্রা সম্প্রসারিত হয়েছে তার পরিচয় প্রজা সমিতি ও কংগ্রেস কমিটি গঠনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সামাজিক অসাম্য ও উৎপীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে প্রজা সমিতির নেতা দেবু গ্রাম সমাজের সমস্যা মেটানোর জন্য দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছে। খাজনা বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে দেবু ঘোষের নেতৃত্বে পঞ্চগ্রামের দরিদ্র হিন্দু মুসলমান চাষী সম্প্রদায় সংঘটিত হয়ে প্রজা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। দেবুর পাশে এসে দাঁড়াল কুসুমপুরের আদর্শবাদী মুসলমান যুবক-মুক্তবের মৌলভী ইরসাদ।[১৯] সামাজিক দায়িত্ববোধ নিরাসক্ত নিশ্চেষ্ট জীবনানুভব থেকে ফিরিয়ে আনল দেবুকে। গণদেবতা পঞ্চগ্রামের সমকালীন সমাজ রাজনীতির পটভূমিতে একটি ভূখণ্ডের মানুষের বিকাশের গতিধারা অঙ্কন করার পরিকল্পনা করেছেন ঔপন্যাসিক। স্থবির সমাজের অচঞ্চল মানুষের মধ্যে শক্তি ও গতি সঞ্চারিত হোক। তারা ভারতকে ক্রমশ নব মহাভারতে রূপান্তরিত করুক - এই ছিল তার প্রত্যাশা। তাই লেখক উল্লেখ করেছেন –

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "যেদিন আসবে, সেদিন পঞ্চগ্রামের জীবনে আবার জোয়ার আসিবে; সে আবার ফুলিয়া ফাঁপিয়ে গর্জমান হইয়া উঠিবে। শুধু পঞ্চগ্রাম নয়, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম হইতে নবগ্রাম, নবগ্রাম হইতে বিংশতি গ্রাম,পঞ্চবিংশতি গ্রাম, শত গ্রাম, সহস্র গ্রাম গ্রামের জীবনের কলরব উঠবে।"[২০]

উপকথায় বিশেষ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর প্রত্নপ্রতিম উপকথার জগতে বিচরণ করলেও ঐ-বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপকথা নির্ভর জীবনে নতুন কালের অভিঘাত কিভাবে সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব ও সত্যকে বাস্তবায়িত করেছে - সমাজ, রাজনীতি, নৃবিজ্ঞানের সমন্বিত পর্যবেক্ষণ তা উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে উপকথায় বাঁকের সমাজ গতির অনিবার্য পরিণতি লাভ করেছে সার্থক শিল্পী-প্রমূর্তি।[২১] উপকথায় রয়েছে সমান্তরাল দুটি কাহিনীস্রোত। একটি বাঁশবাদি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কোপাই নদীর বিখ্যাত হাঁসুলী বাঁকের কাহার সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষের জীবনবিশ্বাস বাহিত উপকথা এবং তাদের উপকথা নিয়ন্ত্রিত জীবনকাহিনী। অন্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়ায় দূরাগত অভিঘাতে কাহারকুলের জীবন সংহতির অনিবার্য ভাঙন কৃষিনির্ভর জীবনের ক্রম অবসান এবং বাঁশবন ঘেরা উপকথা হাঁসুলী বাঁকের বিরল প্রান্তরে পরিণত হয়েছে কথকতা। বিশেষত ঔপন্যাসিকের সমাজজ্ঞান, ইতিহাস চেতনা ও রাজনৈতিক বোধির বিজ্ঞাননিষ্ঠ পরিচর্যায়, কাহিনির এই দ্বি-স্তর অবলীলায় হয়েছে পরস্পরিত। উপকথায় বহুবর্ণিত জীবনের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে প্রত্যক্ষ দেখাতে চেয়েছেন হাঁসুলী বাকের গোষ্ঠীজীবনের বিনাশের ইতিহাস অর্থাৎ মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং পরিণতিতে কাহার সম্প্রদায়ের স্বগ্রাম থেকে উন্মুলিত হওয়ার প্রসঙ্গ। যুদ্ধের দামামাই নগদ অর্থ উপার্জনের প্রলোভনে আকৃষ্ট করে কাহারদেরকে দিনমজুরের পরিণত করেছে, যুদ্ধের রসদ যোগানোর অনিবার্যতায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে বাঁশবাদির বাঁশবন। ফলত স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে কাহারকুল; বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজের অজগরতুল্য জঠরের আকর্ষণে বাস্তহারা-সংস্কৃতিহারা কৃষক কাহার রূপান্তরিত হয়েছে যন্ত্রকালের শ্রমদাসে। কৃষির উপর যন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস সামাজিক রূপান্তরিত ইতিহাসসংলগ্ন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর সমাজ ইতিহাসকেই সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির এক ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিশেষ একটি অঞ্চলের প্রত্নকাহিনী – শাসিত সম্প্রদায়ের জীবনকথার প্রতীকায়িত করেছেন।[২২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গড়ে পশ্চাদপদ অবতলবর্তী সামাজিক গোষ্ঠীগুলির আত্মমর্যাদার আন্দোলনের সূত্রে হাঁসুলীবাকের নান্দনিক পটভূমি সনাক্ত করা যায় - কাহারদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে রয়েছে শ্রেণী ভেদ কোশকেঁধে আর আটপৌরে - এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কাহার সম্প্রদায়। বর্তমানে তাদের পেশাগত জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পার্শ্ববর্তী জাঙ্গাল গ্রামে কাহারপল্লীর মাতব্বর কোশকেঁধে বনওয়ারী ঘোষদের জমি ভাগে চাষ করে। ঘোষরা এখন আর ভূমিনির্ভর আয়ের ওপর একান্ত মুখাপেক্ষী নয়। পাশ্ববর্তী চন্দনপুরেও ঘটেছে পরিবর্তন। চন্দনপুরের রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কল, নগদ অর্থের আর্কষণে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে শ্রমিকে। সামাজিক রূপান্তরের পটভূমিকাতেই সুচাঁদের কথিত উপকথার অবতারণা।[২৩] বনওয়ারী আর করালি দুজনেই কাহার সমাজের দুই প্রবণতার প্রতীক। বনওয়ারীর তুলনায় করালী অনেকটাই যেন জাতি ভেদাত্মক সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে; যদিও স্বসমাজের যথাযোগ্য নেতৃত্ব বনওয়ারীর আয়ত্ত্বে থেকে গেছে, কারণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে অতি ধীরে ধীরে। বনওয়ারীর আকাঙ্ক্ষাও সমাজ বদলের, কিন্তু ততটাই বদল তাঁর অভিপ্রেত যতটা হলে সমাজের মূল ভিত্তিতে অটুট থাকে। গোষ্ঠীজীবনের উপকথায় অবিমিশ্র বাস্তব সন্ধান করা অর্থহীন হলেও আধুনিক কথাকোবিদের পুণ্যমূল্যায়িত উপকথার অঙ্গসংগঠনে গথিত উপমা-রূপক চিত্রকল্প, আচার-আচরণ প্রবাদ-বিশ্বাস এবং বিশেষভাবে প্রত্নপ্রতিমা সমূহে প্রতিফলিত হয় ঐ-জনগোষ্ঠীর আবহমান জীবনসত্য। বিমিশ্র বাস্তবতার জগতেও প্রচ্ছন্ন থাকে বিজ্ঞানবিমুখ ও দৈব বিশ্বাসী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের নিগূঢ় ইতিহাস।[২৪] উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে এতে অভিব্যক্ত হয়েছে সমাজ ও নৃ-বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু ঔপন্যাসিকের বিজ্ঞানঋদ্ধ এক সমাজচেতনা। তাই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবন-অবলম্বনে রচিত সমাজ গতিচেতনার এক অসামান্য উপন্যাস।

কর্ম-সংস্কৃতির ধারক হলেও বর্তমান কাহার সম্প্রদায় যে সমাজ কাঠামোর আধীন-তা কালান্তর পর্বের সামন্ত সমাজেরই অংশ। হাঁসলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসের দুটি সীমা - প্রথম রেলপথ আর দ্বিতীয় হাঁসুলির মত বাঁক নেওয়া

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোপাই নদী। আধুনিকতা আর অতীতমুখী ধারাবাহিকতা, বাস্তব আর আদর্শ, আলো আর অন্ধকার - বিচিত্র দ্বান্দ্বিকতায় এই দুই পথের ইশারায় উপন্যাসের মানুষগুলি হয়েছে দিশেহারা। লোকউৎসব, বিশেষ অনুষ্ঠান করে কর্তাবাবার পূজা সংগঠন-কর্তার আশ্রিত চন্দ্রবোড়া সাপকে হত্যা করার অপরাধে কলুসমোচন, আনন্দ উৎসব, ব্রতগীতি ছড়াভাষ্যে উপকথার এক পরিমণ্ডল - যেন ফেলে দেওয়া কোন জীবনের টুকরো, যেন হারিয়ে যাওয়া কোন কালখন্ড, সব যেন উপুড় করেছেন তারাশঙ্কর। উপন্যাস শেষ হওয়ার সময় সহসা একটি বিনিময়ের সংবাদ পায়। তখন কর্তাবাবার গাছটি পড়ে গেছে। বনোয়ারী ভূপতিত, পরম পলাতক, পাগল আর নসুবালা গান গায় জংশন স্টেশনে। করালি আবার হাঁসুলী বাঁকে ফিরে আসতে চায়। হাঁসুলী বাঁকে করালি ফিরেছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে। বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে, নতুন হাঁসুলীবাঁক। এটি অনেকটা সমাজ সত্যের দিক বা সমাজতত্ত্বের সত্য। বস্তুত করালি শিল্পশ্রমিক হতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তরঙ্গ সাময়িক। সুতরাং করালীর গ্রামে ফেরা খুব অবাস্তব নয়। ইতিহাসের গঙ্গায় করালিদের চেষ্টায় উপকথার কোপাইকে মেলানো কতটা সম্ভব হয়েছে তা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক বির্তকিত দিক। কাহার জীবন ভূমিকেন্দ্রিক হয়ে সমাজগতি ইতিহাসের বড় নদী বা মূলধারায় সমর্পিত হয়েছে। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকারবাহী প্রত্ন প্রতিমাতুল্য কাহারদের জীবনবেদ এর বিপর্যয়, তাদের স্বসমাজের জন্য আত্মঘাতী স্বরূপ হলেও, সামাজিক রূপান্তরের সর্বমানবিক সদর্থকতায় এটি ইতিহাসের অনিবার্য উত্তরণ। তবে বনওয়ারী ও করলি সংঘর্ষে টানটান কাহার সমাজের গোষ্ঠী (clan) ভেঙে জাতি (caste) আর জাতি ভেঙ্গে ব্যক্তি (Individual) বা শ্রেণী (Class) হবার ইতিহাসের নিরিখে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস সন্দেহ নেই।[২৫] এখানকার ইতিহাসবোধ-নিম্নবর্গ সমাজের বাস্তব চিত্র নতুবা নবতরঙ্গ ইদানিং ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির ও রাজনীতির বাস্তব দিক। তারাশঙ্কর মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছে বলেই এমনটি পেরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় ও সমাজ অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতিবোধ ও বোধির অভিজ্ঞান সমাজ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত বলা যেতে পারে। সামন্ত সমাজের অবসান ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব সামাজিক দ্বন্দ্বের শিল্পভাসে গণদেবতা ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ভারতের জাতীয়তাবাদের রাজনীতির ক্রমপ্রসারতায় বাংলার সমাজ জীবনে ঐ দ্বন্দ্বের তীব্রতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং সামন্ত অবশেষে থাকা সত্ত্বেও নবোদ্ভূত ধনতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আঞ্চলিক ইতিহাস ও সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসের বড় সময় ও সাহিত্যের ছোট ও ব্যক্তিগত সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বা ইতিহাস ও সাহিত্যকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে ছেন। এক্ষেত্রে প্রথিতযশা সাহিত্য সমালোচক বিনয় ঘোষের কথা প্রাসঙ্গিক, তা হল —

> "যে যুগে মানুষের আত্মবিশ্বাস আকাশস্পর্শী হচ্ছে, স্বজাতি বোধের চেয়ে অহমবোধ হচ্ছে প্রখরতর মানুষ হতে চাচ্ছে বিশ্বকর্মা। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত জোলা'র বাস্তবতা যোগ করলেও একা বালজাকের বাস্তবতাকে ছাড়াতে পারবেনা। একথা এঙ্গেলস বলেছিলেন। তেমনি তারাশঙ্কর সম্বন্ধে বলা যায়, মজুর কৃষকদরদী শত সাহিত্যিকের বাস্তবতা একা তারাশঙ্করের এই বাস্তবতার সমতুল্য হবে না। হতে পারে তিনি ভাষার স্টাইলের জাদুকর নন, তার চেয়ে সূক্ষ্মতর কারুশিল্পী আরও অনেক থাকতে পারেন, আছেনও কিন্তু তার মত এ যুগের বাংলার গ্রাম সমাজের একনিষ্ঠ জীবনশিল্পী সমকালে আর কেউ আছেন কিনা জানি না।"[২৬]

যদিও তার সাহিত্যকে বিভিন্ন ব্যক্তিরা সমালোচনা করছেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ভবানী সেন মার্কসবাদী পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা'শীর্ষক প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করে লেখেন –

> "তারাশঙ্করবাবু তাঁর সাহিত্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সূক্ষ্মভাবে গান্ধীপন্থী ব্যক্তিত্ববাদেরই মহিমা কীর্তন করেছেন, ইতিহাসের অগ্রগতি এবং ধনতন্ত্রের শোষণ এবং অবিচার সম্বন্ধে তাঁর সাহিত্য যে চেতনা আছে তা একটি মাত্র মধ্যমণিকে কেন্দ্র করে সাজানো, সেই মধ্যমণিটি হচ্ছে মহাত্মার মতো পুরুষ-শ্রেষ্ঠের সৃজনী

> প্রতিভা এবং অগণিত অসহায় জনগণের করুন আর্তনাদ। ইতিহাসের অবাস্তব দৃষ্টি তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্যকে অবাস্তব ভাববাদী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে।”[২৭]

যাইহোক সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ না হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের দৃষ্টিতে সমাজের ভিত্তিকাঠামোতে গ্রাম্য সমাজে শ্রেণীর অবস্থান, আচার আচরণ, তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি গণদেবতা ও হাঁসুলী বাকের উপকথা উপন্যাসগুলো সময় ও সমাজ জীবনের অমূল্য সন্দর্ভ বলা যেতে পারে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, ইতিহাসের উত্তরাধিকার আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১০২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৩. দাশগুপ্ত, অশীন, প্রবন্ধ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫১
৪. দাশগুপ্ত, সত্যজিৎ, সম্পা. মুখের কথা র ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯
৫. https://greatwestbengal.com/tarasankar-bandyopadhyay-biography
৬. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি, রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩৬
৭. চৌধুরী, ভীমদেব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি, কথা প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ২৯৮
৮. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৯. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১০. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১২. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, উক্ত, পৃ. ৫৫৯
১৩. ড. সৌমিত্র শ্রীমান ও অন্যান্য, সম্পাদিত ইতিকথা, আনন্দ ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী : ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন চর্চা, একদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০২৩, পৃ. ৪০
১৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২
১৫. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-৭৮
১৬. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৭. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
১৮. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
১৯. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৪
২০. ভীমদেব, প্রাগুক্ত,পৃ. ২১০
২১. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০
২২. ভীমদেব, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৭১
২৩. ভীমদেব, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৭৯
২৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
২৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২৬. ঘোষ, বিনয়, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ : শনিবারের চিঠি, তারাশঙ্কর সংখ্যা, পৃ. ২৫৬
২৭. দাশ, ধনঞ্জয়, সম্পা., মার্কসবাদী সাহিত্যে-বিতর্ক, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১০-১১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সম্পাদক: শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৭৯ (১৯৭২)

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সম্পাদক: শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৮০ (১৯৭৪)

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 476 - 484
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ : একটি আলোকিত উদ্ভাসন

ড. তুষার পটুয়া
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : patua.tushar@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Tarashankar, unique life consciousness, The struggle, the Dom community, lower castes, Birbhum, Bangladesh, folk culture, Kabigan of Bangladesh, Jhumur Gan, reflection, The Philosophical aspects.

Abstract
Tarasankar was quite different from ‘kallol’, ‘kali-kalom’ ‘Uttara’s new ways. He reached and left much of their own previous. So he enters the new model of mdern literature. Then we want to find out the perfect platform which is closely connected with the author. By virtue of being a person from a remote village in Birbhum, he met people from various social and social classes. With their eagerness to talk, he wanted to hear new words in literature. The novel 'Kabi' written about Nitai Kabial of the Dom community belonging to the Lokayat community of Bangladesh is written in this episode. When recalling this village-centric novel, the word 'poet' comes to mind. Hunger and thirst in real flesh-and-blood body are mingling with his desires. Life goes on in its own way. He started writing with strong self-confidence.

In fact, several characters and events of this novel are directly experienced by the author. In the words of the author, it is known that Raja, Basan, Thakurjhi and even Dwijapada of this novel have become Viprapada. So the discourse of the novel is overshadowed by many real life experiences. Not only in this novel but all his village-centered novels have emerged as a mirror of that direct experience. Tarshankar Bandyapadhyay in this novel did not use poetry only for entertainment; There is a particular tendency at work. These poems enrich the narrative of the novel. Songs became particularly significant in the construction of archetypes in the narrative. The song that comes to mind in the beginning is ‘Kabigan’. From the mid-eighteenth century to the mid-nineteenth century, all the entertaining lyrical literature prevalent in urban and rural Bangladesh is commonly known as Kabigan. On the one hand the super familiar character of reality took place, on the other a philosophical understanding through poetry and a search for the larger world through the spirit of music—this was the project presented by Tarashankar.

Discussion

ভূমিকা : সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ হওয়ার সুবাদে রাঢ়ের বিভিন্ন অপরিত্যাজ্য ব্রাত্য ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ তৈরি হয়। জন্ম সূত্রেই এই পরিপূর্ণতার নির্মিত হয়েছিল। অপরিমার্জিত এই সম্প্রদায়ের কথা বলতে গিয়েই তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন অনাড়ম্বর ভাবে। অপরাজেয় কথাশিল্পী তারাশঙ্কর সৃষ্ট সাহিত্যের দিকে তাকালেই সহজে চিনে নেওয়া যায় কোন বিশেষ অঞ্চলের চিত্র সেখানে আছন্ন হয়ে আছে! সাহিত্যমন্দিরে যখন তিনি নানানভাবে প্রবেশের পথ অন্বেষণ করে চলেছেন ঠিক তখনই হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন এক সোনার কাঠি। অকস্মাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প (পোনাঘাট পেরিয়ে) ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি'র গল্প (জোহান-এর বিহা) পাঠে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানতে পারি এইভাবে –

> "ইচ্ছে হল এমনই গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা— তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হারছে।"[১]

বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি লিখতে শুরু করেন। প্রাথমিক ভাবে এই ধারায় রচিত হয় 'চৈতালী-ঘূর্ণি' (১৯৩১), 'রাইকমল' (১৯৩৪), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'কবি' (১৯৪১), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি। বাংলাদেশের লোকায়ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ডোম সম্প্রদায়ের নিতাই কবিয়ালকে নিয়ে রচিত হয় 'কবি' উপন্যাস।

তারাশঙ্কর তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস লেখার পূর্বে গল্পাকারে সেই রচনার খসড়া নির্মাণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; শুরুর দিকে 'রাইকমল' ও 'মালাচন্দন' দুটি পৃথক গল্পের একত্র ও বর্দ্ধিত গ্রন্থরূপ 'রাইকমল' উপন্যাস। 'শ্মশানের পথে' গল্পটি পরে পূর্ণরূপ পেয়েছে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসে এবং 'কবি' উপন্যাসটি তাঁর 'কবি' নামক গল্পের পুনর্লিখিত ও বর্দ্ধিতরূপ। 'কবি'-র গল্পে, অর্থাৎ গল্পাকারে প্রকাশিত আখ্যানে বর্তমানের ঝুমুর দলের বা বসন্তের কোনো উল্লেখ ছিল না, পরে উপন্যাসাকারে সেই প্রসঙ্গটি সংযুক্ত হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের থেকে পাওয়া তথ্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তারাশঙ্কর এই ঝুমুর গানের নানান তথ্য জোগাড় করে ঝুমুর দলের আখ্যান রচনা করেছেন। সেখানে ঠাকুরঝির পরিণতি পৃথক, অর্থাৎ ঠাকুরঝি সেখানে রাজা তথা জামাইবাবুকে বিয়ে করেছে। উপন্যাসে ঠাকুরঝি উন্মাদিনী হয়ে মৃত্যু দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ঠাকুরঝি বসন্ত আর গান এই তিনের উপস্থিতিতে উপন্যাস হয়ে উঠেছে দ্বন্দ্বমুখর।

উপন্যাসের কাহিনি : আলোচনার শুরুতেই উপন্যাসের কাহিনিটি জেনে নিলে সুবিধে হয়। শুরুতেই আছে, নিতাই কবিয়ালের জন্ম যে বংশে সেই বংশটি হিন্দু সমাজের পতিত শ্রেণীর কুখ্যাত ডোম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও নিতাই কিন্তু তার কবিগানের জন্যে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল—সকলে বিস্মিত হয়, মনে করে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'। নিতাইয়ের বাবা ছিল সিঁধেল চোর, পিতামহ ছিলেন ঠ্যাঙাড়ে অর্থাৎ ঊর্দ্ধতন পুরুষের ইতিহাসে যেখানে এত রক্তাক্ত কাহিনি মিশে আছে সেখানে নিতাইয়ের মত মানুষের কবিগানে নিমগ্ন থাকাটা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। উপন্যাসে বলা হয়েছে,'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; দীর্ঘ সবল কঠিনপেশী দেহ...।' তবুও সে ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগপূর্বক কবিগানকেই বেছে নেয়।

এই অট্টহাস গ্রামের মাঘী পূর্ণিমায় দেবী চামুণ্ডার পূজা উপলক্ষ্যে যে মেলা হয় সেই মেলায় কবিগানের আসর বসার কথা ছিল। গায়ক ছিলেন দুই বিখ্যাত কবিয়াল নোটনদাস ও মহাদেব পাল। নোটনদাস শেষপর্যন্ত উপস্থিত না হওয়ায় কবিগান করার ভার পরে নিতাইয়ের উপর। সেই আসরেই ঠাকুরঝি (নিতাইয়ের বন্ধুস্থানীয় স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজালালের বা রাজনের শ্যালিকা) নিতাইকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পেরে ভীষণভাবে গর্বিত বোধ করে। মানুষটিকে নাম বিকৃত করে লোকে ডাকতো তারা এখন নিতাইচরণ বলে। পালাশেষে 'নিতে'—'নেতা'—'নিতো'—'নেতাই'— থেকে একনিমেষে নিতাইচরণ হয়ে উঠেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিতাই স্টেশনের বন্ধু পয়েন্টস্‌ম্যান রাজার কাছে কুলিগিরি করে কিছু উপার্জন করে দিন চালায়, চুরি সে করে না, মিথ্যে কথা বলে না। স্টেশনে থাকলে বারোটার ট্রেন চলে গেলে নিতাই লাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুরঝির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগে কারণ দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গতিতে স্বর্ণবিন্দুর মতো বিশেষ ভঙ্গিতে প্রত্যহ এক পোয়া করে দুধের যোগান দিয়ে যায় সে। ঠাকুরঝি পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে। ধীরে ধীরে নিতাই বিখ্যাত হয়ে ওঠে তার আপনক্ষেত্রে। বিশেষ করে চণ্ডীমায়ের মেলাতে কবিগানের পালার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দুরলিপ্ত শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়ে নিতাই ফিরে আসে দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। মামার হাতে অপদস্ত হওয়ার পরও নিতাইয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার। একসময় সে ঠিক করে কুলিগিরি আর সে করবে না, তার পদমর্যদায় আঘাত লাগতে পারে। একদিন বিপ্রপদের কথায় মর্মাহত হয়ে মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে। দস্যু রত্নাকরের কাহিনি তার মনে আসে ভীষণভাবে। এই কাহিনি তাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। সে নিজেই দুইলাইন মুখে মুখে রচনা করে বন্ধু রাজনকে বলে –

“সংসারে যে সহ্য করে সেই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম্ম কোন ধর্ম্ম নয়।।”

নিজের জাতের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধির মর্ম বুঝবে না বলে নিতাই বিয়ে করেনি। রাজনের মুখে ঠাকুরঝির সম্পর্কে ‘আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের ক’রে হাসছে দেখ! লজ্জা নাই তোর?’ — এই বাক্য শুনে ঠাকুরঝি মনে মনে খুব কষ্ট পায়। নিতাই বিষয়টি খেয়াল করে। নিতাই মনে মনে চিন্তা করে এবং বন্ধুকে বলে এইভাবে কথা বলা ঠিক হল না। সে মনে করে, ‘আলকাতরার মত রঙ’ কথাটি বলা উচিত হয়নি। ‘ছি, ওই কথাই কি বলে? কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তা ছাড়া কালো কি মন্দ! কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, চুল কালো — আহা-হা! আহা-হা! বড় সুন্দর বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে! হায়, হায়, হায়!’

“কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?” মহাদেব কবিয়ালের দোয়ারকি করার সুবাদে পাঁচদিন পর গান সেরে নিতাই ফিরলে তার সাজ বদলে যায়, তার পায়ে ক্যাম্বিশের একজোড়া নতুন জুতো, গায়ে ময়লা কাপড়-জামার উপর ধপধপে সাদা নতুন একখানা উড়ানি চাদর। চাদরখানা শিরোপা দিয়েছেন বাবুরা এই কথা বললেও প্রকৃত কথা গোপন করে। আসলে জুতো এবং চাদর উভয়ই নিতাই নিজের পয়সা খরচ করেই কিনেছে। এইখানে লুকিয়ে থাকে নিতাইয়ের লড়াই। চারপাশটা কেমন ফিকে মনে হয়; নিতাই যখন স্টেশনে নেমে দেখে তার জন্যে অবজ্ঞার নমুনা সর্বত্র ছড়ানো আছে। শুধু খাতির যেটুকু সে পায় তা ঠাকুরঝির কাছেই। সে ঠাকুরঝিকে কেমিকেলের সূতা-হার উপহার দিয়েছে। ঠাকুরঝিকে সে ভালোবাসতে শুরু করে এইভাবে ধীরে ধীরে।

নিতাই পরদিন রাজার কাছে কৌশলে ঠাকুরঝির স্বামীর বৃত্তান্ত জেনে নেয়। নিতাই সুবোধ মন সেই অপরাধপ্রবণতার দিক থেকে সরে আসে। ঠাকুরঝিকে এবার সে একটু পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে গ্রামে উপস্থিত হয় ঝুমুরদল ও তার মেয়েরা। সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে উদ্ভব যাদের তাদের সঙ্গে নিতাইয়ের ভাব জমল। বসন্ত নামের একজনকে নিতাই মন দিয়ে বসলো। পালাগানের মধ্যে দিয়েই তাদের সখ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঝুমুরদলের আসরে ঠাকুরঝিকে দেখে নিতাই গান ভুলে গেল। ঠাকুরঝিকে অবহেলা করলেও ঠাকুরঝি তাকে অবজ্ঞা করেনি। বসনের ঘরে তার পরিচর্যায় নিতাই যখন ছিল তখন জানালার বাইরে ঠাকুরঝিকে দেখে নিতাই স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকেই ঠাকুরঝির অস্বাভাবিক আচরণে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়ে ওঠে। রাজার মুখে এই কথা শুনেই অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। নিতাই বন্ধু রাজনের সামনে স্বীকার করে বসে। নিতাই সকলের কাছে ধরা পড়ে যায়। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে চায় এমন সময় বসনের দলের সেই বেহালাদার এসে উপস্থিত হয়। নিতাই চলে যাওয়ায় ঠিক বলে মনে করে। নিতাই চলে যায় ভিন্ন ঠিকানার খোঁজে।

আলিপুরের মেলায়, রাসপূর্ণিমায় আলিপুরের মেলা বেশ বিখ্যাত মেলা হয়। আলিপুর থেকে কান্দারা, কান্দারা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে আর কোনো ঠিক নেই। সেখানে গিয়ে উত্তেজনায় নিতাইয়ের মন

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিপূর্ণ — সে আজ সত্যি কবিয়াল হিসেবে আসরে নামবে আর বসন নাচবে। পাশে বসে নিতাই বসনকে যত দেখে ততই অবাক হয়ে যায়! নিতাইয়ের পালিয়ে যাবার কথাও সে অনুমান করে নিতে পারে এক নিমেষে। বসন মারা যায় নিতাইয়ের কোলে মাথা রেখে। এই মৃত্যুর পরে ঝুমুরদল যখন দেশের পথ ধরে নিতাই তখন কাশী গেল। মাসখানেক কাশীতে কাটিয়ে আপন দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ফিরে রাজনের মুখ থেকে শুনতে পায় ঠাকুরঝি শেষটাই পাগল হয়ে মরেছে। নিতাই এবার কেঁদে গলা ছেড়ে গাইলো —

‘এই খেদ আমার মনে —
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবন!
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?’

চরিত্রায়ণ : হেনরি জেম্স, তাঁর ‘Art of Fiction’ বইতে বলেছেন - ‘What is character but the determination of incident, what is incident but the illustration of character.’ চরিত্রায়ণের এই আলোচনায় তারাশঙ্করের গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসের কয়েকটি দিক বা অভিমুখ আমরা খুঁজে পাই। ‘আমার কালের কথা’-য় তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃত আকারে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে জানা যায়, অভিজাত মানুষের মনে অনভিজাত ও নিম্নবর্ণের মানুষ সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা, তাতে লেখকের স্পর্শকাতর মন ছিল আহত ও বিক্ষুব্ধ। বস্তুত এই উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্র ও ঘটনা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। দেশসেবার কাজে ও গ্রামে বসবাসের সূত্রে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ হয়েছে তারাশঙ্কর পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনে তাদের কথা কোথাও স্বনামে কোথাও স্বরূপে উপস্থিত করেছেন। লেখকের কথায় জানা যায়, -

> “মাঠে মাঠে ঘুরি। রেলের লাইন ধরে নদীর ধার। ...এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, নজরে পড়ে— গাছতলায় বসে কী গাছের উপর চেপে কেউ গান ধরে দিয়েছে। সেইখানেই একদিন দেখেছিলাম আমার কবির নায়ককে। গাছগুলিকে মুগ্ধ রসিক শ্রোতা ধরে নিয়ে সে বাঁ হাত গালে দিয়ে— ডান হাতখানি নেড়ে নেড়ে আপনমনেই কবিগান শোনাচ্ছিল। ...বসনের সঙ্গে দেখা হত, কুসুমের সঙ্গে দেখা হত, আজও বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে দেখা হয়, তারা পথেই ঘটি নামিয়ে প্রণাম করে প্রশ্ন করে— কবে এলেন...।”[২]

এই মানুষগুলির সঙ্গে অজান্তেই তাঁর একটি সরল নিষ্কণ্টক সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বেলার দিকে তারা যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাথায় দুধের স্বর্ণাভ কলস নিয়ে যাতায়াত করে তখন মনে হয় একটি চলন্ত স্বর্ণবিন্দু যেন দূর থেকে কাছে বা কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। উপন্যাসে যে প্রতিমাকল্প ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের রাজা, বসন, ঠাকুঝি এমনকি দ্বিজপদ উপন্যাসে হয়েছে যিনি বিপ্রপদ—তাদের বিস্তৃতকথা আমরা শুনতে পায়। এমন কথা তিনি নিজেও বলেছেন —

> “আমার কবি উপন্যাসের বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই...নিতাই বাউড়ি, সতীশ ডোম এরা এসে মাটিতে উপু হয়ে বসে গল্প করে গল্প শোনে।”[৩]

মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোর সূত্রেই ‘কবি’র নায়কের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলেছেন একদিন তারা-মায়ের ডাঙায় গাছতলায় বসে আছেন সেখানে হঠাৎ কানে এসে পৌঁছায় কবিগানের সুর...এখানে এইভাবেই আবিষ্কার করেছিলেন কবির নায়ককে। এই নিতাই সম্পর্কে আরও আনেক কথা আছে তাঁর আভিজ্ঞতায়, ‘কবি গল্পটির আরম্ভ নিতাইকে নিয়ে। নিতাই চরিত্রটি

একটি সত্যিকারের মানুষের ছায়া নিয়ে তৈরি। আমাদের গ্রামের সতীশ ডোম ছিল এই ধরনের পাগলাটে কবিযশঃপ্রার্থী মানুষ।' সুতরাং উপন্যাসের ডিসকোর্সে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের ছায়া পড়েছে। শুধু এই উপন্যাসেই নয় তাঁর সমস্ত গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি যেন সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দর্পণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসে প্রান্তিক জনজাতি- ডোম, বাগ্‌দি, বাউরি, কাহার, বেদে, সাঁওতাল প্রভৃতি শ্রেণির অসংখ্য মানুষ স্থান পেয়েছে। হীনকুলে জন্ম হওয়ার কারণে 'কবি' (১৯৪১) উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল যে কারণে আহত হয়, ঠিক একই কারণে 'সন্দীপন পাঠশালা'-র (১৯৪৫) সীতারামও ভুক্তভোগী। নিতাইয়ের মতো তারও 'হয়ে ওঠা'র লড়াইতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সেই বর্ণসংযোগ সূত্রটি। নীচকুলে জন্ম হওয়ায় যে কারণে নিতাই কবিয়াল 'কবি' (১৯৪১) উপন্যাসে বারবার লাঞ্ছিত হয়। শিল্পী যে সকল জাতপাতের উর্ধ্বে সে কথা বিপ্রপদের মতো মানুষেরা জানে না। নিতাই জন্মগত সূত্রেই নীচকুলের, তাই তার সম্পর্কে বলা হয় 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'। প্রকৃতপক্ষে ডোম বলতে যা বোঝায় নিতাইয়ের বংশ তা নয়; তারা বাংলাদেশের বিখ্যাত লাঠিয়াল; 'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙারের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র— নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিনপেশী, দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত।' এতৎসত্ত্বেও নিতাই কিন্তু নিজেকে শিল্পী সমাজের একজন বলে মনে করে; এমনকি উচ্চ ও অভিজাত রুচির সঙ্গে সে জীবনযাপন করতে চায়। যদিও তার মেনে চলা আদর্শ সর্বত্র রক্ষিত হয় না,কবিগানের আসরে তীব্র আক্রমণের প্রতিবাদ আসরে তাই বারবার প্রকাশ হয়ে যায় জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অশ্লীলতার আদিরূপ। নিতাইয়ের এই হয়ে ওঠার একটি ইতিহাস উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তার আসক্তি অন্যরূপ। তার মামাতো মাসতুতো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করে বলে 'পণ্ডিতমশাই'। নিতাই বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করে মুখে দেয়...। এই ধরনের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ স্বীকার করে সে এগিয়ে চলে একলা পথিকের মতো। নিতাই পদধূলি নিতে গেলে বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে তাকে আশীর্বাদ করে,'ভব কপি, মহাকপি দগ্ধানন সলাঙ্গুল। নিতাইও ভদ্রসমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়লে ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই 'ল'-কারকে 'ন'-কার করে উচ্চারণ করে। 'লোহা'কে বলে 'নোয়া', 'লুচি'কে বলে 'নুচি', 'লঙ্কা'—'নঙ্কা', 'লোক'—'নোক' হয়ে ওঠে তার কথোপকথনে। এই পর্বান্তর সমাজের স্বীকৃত একটি পর্যায়কে নির্দিষ্ট করে দেয় এইভাবেই। এইভাবে বর্ণগত কারণে বিশ শতকের প্রথমার্ধের রাঢ়দেশের নিম্নবর্গের মানুষগুলিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা থেকে তৈরি হয়ে যায় চরিত্রায়ণের এক রকমের প্যাটার্ন।

নারী চরিত্র চিত্রণে তারাশঙ্কর ছিলেন বিশেষভাবে তৎপর। ঝুমুর দলের মেয়েরা কিংবা বসনের কথাপ্রসঙ্গে লেখক এই উপন্যাসে উল্লেখ করেন ঝুমুর দলের মেয়েরা আসে 'সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে।' যৌবনকালে এই মেয়েদের মূল্য থাকলেও মৃত্যুর পর তাদের কেমন অবস্থা হয়, তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বসনের মৃত্যুর মাধ্যমে। শবদাহকালে সাহায্য করার ব্যাপারে এগিয়ে আসে কিন্তু মেয়েরাই। পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করে না 'এ ক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া' ওঠে। নারী ও পুরুষের বা পুরুষতন্ত্রের তফাত, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ প্রভৃতি সূত্র দেখিয়ে লেখক যেন গ্রাম্য কৌমজীবনের ভেতরে স্থিত সেই ভেদাভেদগুলিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

মৃত্যুচেতনা ও দার্শনিক উপলব্ধি - ঝুমুরদলের মেয়ে বসনের মৃত্যুর পর মাসী তার দেহ থেকে নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনী শেষ সম্বলটুকু অর্থাৎ 'কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাকছাবি, হাতে দুই গাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তের গলায় ছিল একছড়া হালকা বিছাহার' খুলে নেয়। ললিতা ও নির্মলা এই দেখে তাদের ভবিষ্যতের দিনটি যেন সম্মুখে দেখতে পায়। দীর্ঘ পরিশ্রমক্লান্ত নিতাই ভাবতে শুরু করে, 'মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়। ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্ম বিচার করেন, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসনের সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায়? তাহা সে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল। কারণ বসন যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে যাবে। মরণ অদ্ভুত!' বসন যেদিন মারা যায় সেদিন দলে মধ্যে বসনের স্থান কে দখল করবে সেই নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। দলে যে বসন নামের কেউ ছিল তার একদিনের ব্যবধানে সমস্ত কিছু মুছে যায়। নির্জন গঙ্গার পারে একাকি নিতাই অনুভব করে মৃত্যুর বিচিত্র কথা। এতকাল পাড়া ঘরে অনেক মৃত্যু দেখেছে খুব সামনে থেকে কিন্তু বসনের ক্ষেত্রে তার নিজের কোলের উপর এক মানুষকে মরতে দেখে এই প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায় সে। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে মৃত্যুর অতল রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা।

জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যাকে দার্শনিকেরা বলেন জীবনদর্শন, সাধারণ মানুষ যাকে বলে জীবনদৃষ্টি—এই দেখাটা সকলেরই থাকে। কিন্তু যাঁরা গভীরভাবে ভাবতে পারেন, তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে পারেন; তাঁদের দেখবার ভঙ্গিটা আমাদের থেকে কিছুটা হলেও পৃথক তা সহজেই বোঝা যায়। কবি উপন্যাসে দেহোপজীবিনী রূপোপজীবনী নারী বসনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর আমাদের এক কঠিন সত্যের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বসন্তকে সে নতুন সাজে নতুন রূপে দেখতে পায়। এই মুহূর্তে নিতাইয়ের মনে গানের কয়েকটি কলি ভেসে আসে—

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালোবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—"

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?' এই গান যেদিন নিতাইয়ের মনে এসেছে এবং বসনকে শুনিয়েছে সেইদিন থেকেই বসনের মনে বাসা বাঁধে মৃত্যুর কড়াল গ্রাসের ভীতি।

'এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?'

এই গান শুনেই বসনের মনে হয়েছে, জীবনে যা পাওয়া যায় না— মরণে কি তাই মেলে? 'জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তাই মরণে?'

নিতাইয়ের আরও প্রশ্ন 'মেটে? তাই মেটে? বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে- সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ জীবনে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে— পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের ও জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয়া ওঠে ওপারে— সে জগতে? ওঠে ওঠে?

'এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনে কান্না যত— হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়? জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?'

গানগুলি সম্পর্কে মোহিতলাল বলেছিলেন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"এই গানগুলিই কবি-র প্রাণশক্তি।"[৪]

তারাশঙ্কর বলেছেন, 'আমি সে সময় নিতাইয়ের মতোই ভাবতে পেরেছিলাম। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।' — এই লাইনের সঙ্গে আমি অনেক লাইন বেঁধেছি। 'কালো চোখের তারায় তবে আলো এমন হাসে ক্যানে?' 'কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা কাঁদে ক্যানে?' এই গানের মধ্যে দিয়েই একটি দার্শনিক উপলব্ধির জগতে আমরা খুব সহজেই পৌঁছে যেতে পারি— যেখানে মৃত্যুভাবনা, জীবনভাবনা, যাপনের বহুবিধ মাত্রা, এমনকি দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জীবন অভিজ্ঞতার চিত্র পরিস্ফুট হয়ে যায়।

কবি উপন্যাসে কবিগান ও ঝুমুর - প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য 'কবি'র কথা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "কবি'র আখ্যানে ঝুমুর দলের কাঠামো হয়ে ওঠে তারাশঙ্করের দেখনো রাঢ়ের কৌমকাঠামোর অনুরূপ। হয়তো বা অণুবিশ্ব।"[৫]

সুতরাং তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে কবিগান শুধু অবসর বিনোদনের জন্যে প্রযুক্ত করেননি; সেখানে কাজ করেছে এক বিশেষ প্রবণতা। উপন্যাসের আখ্যানের বয়ানকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে এই কবিগানগুলি। আখ্যানে প্রত্নপ্রতিমার নির্মাণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে উক্ত গানগুলি। শুরুতেই যে গানের কথা আসে তা হল কবিগান। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে নগর ও গ্রামবাংলায় যে সমস্ত মনোরঞ্জনকারী গীতিসাহিত্যের প্রচলন হয় তা সাধারণভাবে কবিগান নামে পরিচিত। এই কবিগান বাঙালির এক সময়ে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী ছিল। এসম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন আনন্দচন্দ্র মিশ্র, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ। অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় 'কবিগান' একটি স্থান করে নিয়েছিল। তবে এর উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। নিছক 'আনন্দের উত্তেজনা'-র যোগান দিতে গিয়ে কবিগানের মধ্যে নানা রকমের আবিলতা প্রবেশ করেছিল। অনেকেই স্থূল রসিকতা ও অশ্লীলতাকে প্রশয় দিতেন বলে কবিগান অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছিল। ফলে কবিগানের শ্রোতারা উচ্চস্তরের বিষয়ের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেতে শুরু করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাইকে এমন একজন কবিওয়ালা হিসেবে উপস্থিত করেছেন। নিতাইয়ের জন্ম যেকুলেই হোক না কেন কবিত্ব তার রক্তে মিশে গিয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে। আসলে কবিগানের মধ্যে দিয়ে লেখক এই অবহেলিত সম্প্রদায়ের অবদমিত স্বরকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বাবুদের মধ্যে একজন বলে, 'কি অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A Poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই!' ভুতনাথ বলে, '—লে রে বেটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবশ্যা হোক। কাক—কাকই সই!' নিতাইয়ের খারাপ লেগেছিল ভীষণ যখন তাকে 'গ-য়ে গরূ, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া' বলে অপমান করতে শুরু করে তখন। সে এবার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে [লেখক এখানে অঙ্গি ভঙ্গি গুলির ব্যাখ্যা করেছেন বিস্তৃত] জবাব দিতে শুরু করলে সকলেই হতবাক হয়ে যায়। নিতাই কবিয়ালের নিজেকে মেলে ধরার এই পরমক্ষণটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি মহাদেবের দোয়ার নানান শ্লীল-অশ্লীল গালি-গালাজে নিতাইকে বিপর্যস্ত (আস্তাকুড়ের এঁটোপাতা— স্বগ্‌গে যাবার আশা— গো!/ ফরাৎ করে উড়ল পাতা— স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!) করতে চাইলেও নিতাই কিন্তু খুব 'শান্তভাবে ছড়া কেটে উত্তর দেয় এইভাবে —

'ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য।।
তোমার হয়েছে ভীমরতি—আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব— কোনই ভয় করি না মনে।।'

এইভাবে নিতাই কবিয়ালের কবিগান প্রতিবাদের ধরালো আস্ত্র হয়ে ওঠে ও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় সে বিখ্যাত হয়ে ওঠে এই গানকে কেন্দ্র করেই।

ঝুমুর - ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যভারত, গুজরাটের সীমান্ত পর্যন্ত যে আদিবাসীরা বাস করতো তাদের মধ্যে এই সংগীত প্রচলিত ছিল একসময়। এককালে আদিবাসীদের মধ্যেই এই গান সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। তবে ভৌগোলিক সুবিধার কারণে সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জেলার আদিবাসীদের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিল বেশি। এগুলি ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি। এদের মধ্যে বৈষ্ণব পদবলীর অনুরূপ ভণিতা বা কবির নাম পাওয়া যায়। লোকসংগীত হবার কারণেই একটি অঞ্চলের লৌকিক রসচেতনার উপর ভিত্তি করেই এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। কবিগান যে বিষয়বস্তু নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, বাংলাদেশে ঝুমুরগানের যাত্রা শুরু একইভাবে। তবে কবিগান শুধুমাত্র একটি বিশেষ ব্যবসায়ী কবিওয়ালার গানে সীমাবদ্ধ ছিল বলে লোকসংগীতের পর্যায়ভূক্ত হতে পারেনি; কিন্তু ঝুমুর গান নিরক্ষর সমাজের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে লোকসঙ্গীতের স্তরে নেমে এসেছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাঁওতালি ঝুমুর গানের লৌকিক প্রেম যে কীভাবে বাংলাদেশের সীমায় প্রবেশ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে স্বর্গীয়তা লাভ করেছে সে কথা বলা মুশকিল।[৬]

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, কবিগান ও ঝুমুর দলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের যে গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে তা অসাধারণ। একদা প্রচলিত গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির উপর ভর করে নিতায়ের যে হয়ে ওঠার কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। এখানে নিতাইয়ের কবিসত্তা ফুটে উঠেছে বা তার হয়ে ওঠার লড়াইতে প্রধান মাধ্যম হয়েছে বাংলাদেশে একদা প্রচলিত 'কবিগান'। শুধু কবিগান নয়, ঝুমুর দলে যোগ দিয়ে 'খেমটা'-র কথাও জানা যায় 'খেউর কবির দলের অপরিহার্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউর না জানিকে [জানিলে] এ দলে গাওনা অধিকারই হয় না। মাসী বলে— কত বড় বড় মুনি-ঋষি কামশাস্ত্রে হার মানিয়া—শেষ তাহাদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। তাহা হইলে খেউর ছোট জিনিস কিসে?' এমনকি নিতাই 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' (পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া) রচনা করলে ঝুমুর দলের সকলেই অবাক হয়ে ভাবে 'পরিচিত কবিয়ালেরা কবিগান করে, ছড়া কাটে, দুই-চারিটা গানও লেখে, কিন্তু এমন ভাবে ধর্মকথা লইয়া কেহ পাঁচালী রচনা করে না।' এছাড়া বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের নাম যেমন—দাশুরায়ের পাঁচালী, টপ্পা'র কথা জানা যায়, 'টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাল লাগে।' 'কবি' উপন্যাসের আখ্যানে তারাশঙ্কর বিভিন্ন লোক-উপাদানগুলিকে শুধু বহিরঙ্গের আভরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন— এ'কথা মনে করলে ভুল হবে। বরং লোক উপাদান ও লোক-প্রতিমার প্রযুক্তিতে লেখকের পর্যবেক্ষণের আগ্রহটিকে প্রসঙ্গক্রমে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই উপন্যাসের কবিতা বা গান অংশ সমগ্র গদ্য আখ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'ভালবেসে মিটিল না আশ—কুলাল না এ জীবন।/ হায় জীবন এত ছোট কেনে? এ ভুবনে?' গানটি বার বার ফিরে এসেছে। বসনের স্বল্প জীবনের বা তার সঙ্গে নিতাইয়ের স্বল্প সান্নিদ্ধে এই প্রশ্ন আমাদের ও ভাবিত করে। আখ্যানে সৃষ্ট গানগুলি তখন আর শুধু গান বা কবিতা থাকে না; হয়ে ওঠে বৃন্দাবন সমতুল আন্য কোনো ভুবন। খুব সচেতন মনের সৃষ্টি এই নিভৃত দেশ। সেখানে ঠাকুরঝির মতো চরিত্রের বর্ণনায় থাকে 'বেতসলতাসুলভ একটা নমনীয়তা'র কথা, দেহের বর্ণনায় আসে 'ভুঁইচাপার সবুজ ডাঁটা' 'কচিকলাপাতা'র মতো নমনীয় ও মনোরম তুলনা। ঠাকুরঝির সমান্তরালে কল্পনা আসে 'ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল! ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া ওঠে।' পদাবলির রাধা-কৃষ্ণের প্রেম পরকীয়া। এখানেও যেন তার ইঙ্গিত আছে। তাই নিতাইয়ের উপলব্ধি 'চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?' বসনের সঙ্গে রাধার নৈকট্য দেখানো হয় ভীষণ কৌশলে। তাই তো বসনের মুখে গান 'তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,/ জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।' কৃষ্ণকথায় যে কদম গাছের কথা থাকে এখানেও তেমনি থাকে রেললাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিতাইয়ের উপলব্ধি : 'আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।/ তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে।' এই চির সত্যকথাই তো বহন করে চলেছে পদাবলির আখ্যানবিশ্ব। প্রত্নপ্রতিমার ধারক বাহক সাধারণ মানুষের মন যেখানে নিতাই-ঠাকুরঝি-বসন চরিত্রের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের প্রতীকে এক নবপ্রতিমা নির্মিত হয়। 'কবি' উপন্যাস সেই প্রত্ন-প্রতিমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসের একদিকে বাস্তবের অতিপরিচিত চরিত্র স্থান করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়েছে, অন্যদিকে কবিগানের মধ্যে দিয়ে এক দার্শনিক উপলব্ধি ও গানের চেতনালোকের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ জগতের সন্ধান— এই ছিল তারাশঙ্করের উপস্থাপিত প্রকল্প।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ১৬

২. ঐ, পৃ. ২৩

৩. ঐ, পৃ. ২০১

৪. ঐ, পৃ. ২০৭

[তারাশঙ্কর আরও যুক্ত করেছেন— ‘কবি-র গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়। ওগুলি সবই আমি রচনা করেছি। কীভাবে করেছি বলতে পারি না। ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।’]

৫. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন, তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১, পৃ. ১৬

৬. রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়াও নানান পৌরাণিক প্রসঙ্গ ঝুমুরগানের বিষয় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বিষয় অনুসারে নামকরণ হয়ে থাকে। অধিকাংশ ঝুমুরগানের সঙ্গে নৃত্য যুক্ত থাকে। ‘কবি’ উপন্যাসে তারাশঙ্কর সে দলটির কথা বলেছেন তাদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঝুমুরগানের মধ্যে ক্রমশ নানান বৈচিত্র উপস্থিত হয়েছে। ধীরে ধীরে মেলায় পালাগানের আকারে উপস্থাপন শুরু হয় উনিশ শতকের শুরু দিক থেকে। তখন থেকেই দেহোপজীবিনী মেয়েদের নিজেকে প্রদর্শনের একটি বড় উপায় হয়ে দাঁড়ায়। নাচনী ও রসিক দু’জনে মিলে নৃত্যসহযোগে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে গান গেয়ে দর্শকদের ও খরিদ্দারদের মনোরঞ্জন করে। তারাশঙ্কর কবি উপন্যাসে এমনই একটি দলের বর্ণনা দিয়েছেন বিস্তৃত।

Bibliography:

গুপ্ত ক্ষেত্র, তারাশঙ্কর অনুসন্ধান ৯৮, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮

ঘোষ বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, কলকাতা, অরুণা, ১৪০৬

চক্রবর্তী নিরঞ্জন, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলকাতা-৭, ১৮৮০ শকাব্দ

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (৬ষ্ঠ), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪০৮

বসু নিতাই, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, কলকাতা, দে’জ, ১৯৯৮

ভট্টাচার্য প্রদ্যুম্ন, তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১

ভট্টাচার্য জগদীশ, ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর, কলকাতা, ভারবি, ২০০৮

মজুমদার অভিজিৎ, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, দে’জ, ২০০৭

মল্লিক সমরেন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, প্রতিভাস, ২০০৭

রায় অলোক, কালান্তরের কথাকার তারাশঙ্কর, কলকাতা, অক্ষর, ২০০৯

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 485 - 493
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রফুল্ল রায়ের ‘মাটি আর নেই’ : অধিকার অর্জনের সন্ধানে এক অন্তহীন যাত্রা

ড. পারমিতা আচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, শ্রীভূমি, আসাম
Email ID : mumun7777@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Landlord, uprooted, struggle for life, land construction, settlement construction, farming, landless again, uncertain life.

Abstract

Economic inequality has divided the society in many ways. This division created the capitalist class on the one hand and the toiling masses on the other. In the context of a capitalist society, when the thinking becomes capitalist, the life of the marginalised class is plunged into uncertainty. The right of crops and green soil belongs only to humans. But the hegemonic claws of capitalist society axed all habitable space. As a result, the lower classes of the society have to lose land again and again. They move from place to place like nomads. Plains, jungles, dense forests – everywhere they plow in search of land. By clearing the forest, clearing the weeds, they create habitable land in return of inhuman labour. From the firm fist of the forest, the wet juicy soil is brought out. As a result of their combined efforts, golden crops emerged on that fertile land. But then suddenly someone appeared with the ownership of that land. And again, they are landless and move from place to place. Hoping for a piece of land. They live through such uncertainty and struggle throughout their lives. They have no identity, no land, no soil. Novelist Prafulla Roy brings out this cruel form of society through the life struggle of Kubera Saidar, Moti, Gagan, Bilas, Kunj, Gupi, Nishi, Bhatuni's. In this article we will discuss his novel "Mati Aar Nei" from this point of view.

Discussion

> "উপন্যাস যেমন চেতনার দিগন্ত-বিস্তার – তেমনি একই সঙ্গে নিজেকে চিনে নেওয়ার শিল্পও বটে।"[১]

সমালোচকের এই ভাষ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় আমাদের। কেননা জীবন সুবিশাল, সেই জীবন প্রবাহের স্রোতস্বিনী ধারাকে ধারণ করে গড়ে ওঠে উপন্যাসের বিস্তৃত কলেবর। লেখক ও পাঠকের দ্বিবাচনিক গ্রন্থনায় ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হতে থাকে সমাজ, সময় ও ব্যক্তির উচ্চারিত/ নিরুচ্চারিত ভাববিশ্ব। পাঠকৃতির গভীরে অবগাহন করতে করতে আমরা অর্জন করি সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি, যার মধ্য দিয়ে সমস্ত পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের বলয়কে কেটে নবরূপে প্রত্যক্ষ করি আপন সত্তাকে।

অন্যদিকে আমাদের চেতনাও সমৃদ্ধ হতে থাকে এই সমাজের পাঁকে পাঁকে জড়ানো মুখ ও মুখোশের পার্থক্যকে অনুধাবন করে। বহুধা বিভক্ত এই সমাজ আপন সুবিধা ও স্বার্থের জন্যে নিরন্তর সৃষ্টি করে যায় সত্য বিভ্রম। আধুনিক সমাজে যেখানে জীবনচর্যা এমনিতেই নানান কূটাভাসে জটিল, সেখানে এই সত্যভ্রমের কুহকতায় ভাবাদর্শও বদলে যায় বারে বারে। ফলত প্রাধান্য পেতে থাকে সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আধিপত্যবাদী প্রতাপের ঊর্ণাজাল, সর্বত্র। বিত্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ভিত্তিক নানান বিভাজনকে আশ্রয় করে বিস্তারিত হয় প্রতাপের করাল থাবা। অবধারিতভাবেই মেরুকরণ ঘটে যায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে। একদিকে জৌলুসপূর্ণ বিত্তবান আধিপত্যশ্রেণী, আর অন্যদিকে দারিদ্রপীড়িত প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজন। বেঁচে থাকার অবিরত সংগ্রামে এরা বিধ্বস্ত। তবুও আমৃত্যু রেহাই নেই প্রতাপের শৃঙ্খল থেকে।

ঔপন্যাসিক হলেন প্রজ্ঞাবান ত্রিকালদর্শী। যুগ যুগ ধরে সমাজের পরতে পরতে বিছিয়ে থাকা প্রতাপের বহুরূপী শৃঙ্খল তাঁর সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আর তাই ঔপন্যাসিক আকরণ হয়ে ওঠে তাঁর অন্যতম হাতিয়ার, যার মধ্য দিয়ে তিনি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে তুলে ধরেন সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে প্রতাপের বহু বিচিত্র রূপ। মানবতাবিরোধী সময় ও প্রেক্ষিতকে সাহিত্যিক দর্পণের মতো তুলে ধরেন আমাদের সামনে সত্য উন্মোচনের তাগিদে। সমালোচকের ভাষ্য অনুযায়ী,

> "ঔপনিবেশিক নির্মিতি এঁরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে প্রান্তিকায়িত সত্তাকে নানা প্রকরণে, আখ্যানের বিবিধ বিন্যাসে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন।"[২]

এভাবেই প্রতাপের সমস্ত জটিল গ্রন্থনাকে অস্বীকার করে চলতে থাকে সত্য উন্মোচনের প্রক্রিয়া এবং চেতনার বিনির্মাণ। আখ্যান বয়নের মধ্য দিয়ে তিনি একে একে উদ্ঘাটিত করতে থাকেন প্রতাপের সমস্ত কৃৎকৌশলকে। এভাবেই আমরা ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়ের কথাবিশ্বে প্রত্যক্ষ করি আধিপত্যবাদীগোষ্ঠী নির্মিত নানান অচলায়তনের স্বরূপকে এবং তার বিপরীতে সেই অসাড়তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দিয়ে প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চিরকালীন মানবিক অধিকার ও অনুভূতিকে।

ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় ১৯৩৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। '৪৭ এর দেশভাগের পর সপরিবারে তাঁকে চলে আসতে হয় কলকাতায়। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত ঘটে পঞ্চাশের দশক থেকে। স্বভাবতই তাঁর কথাবিশ্বে উঠে আসে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ও সমাজের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট। এই সময়ের মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি এবং তার প্রভাবে বদলে যাওয়া ব্যক্তিজীবন তাঁর উপন্যাসের মূল অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে।

এই সময়পর্বে কিছুটা আলোকপাত করলে দেখব, দীর্ঘ সময়ের ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে যখন আমাদের দেশ মুক্ত হয়, তখন স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে এলেও তা প্রকৃত অর্থে কোনো আলোর বার্তা বহন করে আনে না সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর জীবনে। পরাধীনতার হাত থেকে স্বাধীনতার অর্থ আসলে সমাজের সর্বস্তরে সবধরণের একনায়কতন্ত্রের অবসান এবং জনগণের সার্বিক উত্থান। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়ায় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে রাজধ্বজার হাতবদল ঘটে শুধুমাত্র। দীর্ঘকালের ঔপনিবেশীকৃত মন স্বাধীনতা অর্জন করলেও বুঝতে পারে না এর প্রকৃত তাৎপর্যকে। অথবা এর স্বরূপকে। ফলত ঔপনিবেশিক শাসকদের বিদায়ের পর তৎকালীন সমাজের অভিজাতবর্গ ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথারীতি অব্যাহত থাকে আধিপত্যবাদী কাঠামো পূর্বের মতোই। নিম্নবর্গীয় দরিদ্র আপামর জনসাধারণের জীবনে শাসনতন্ত্রের জোয়াল বিন্দুমাত্রও সরে যায় না। শুধু শাসকের ও পীড়নের রূপবদল হয় মাত্র। তাই এবার পরিবর্তিত সময় ও পরিবর্তিত সমাজের প্রেক্ষিতে শুরু হয় আরও এক স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার নবতর সংগ্রাম। সামাজিক পরিস্থিতি হয়ে উঠল বহুমাত্রিক, যেখানে চেতনা অর্জন করে জীবনের অন্য মানে। এবার সংগ্রাম কোনো বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ – নিজেরই দেশের ক্ষমতা লোভী, আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই।

ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী সময় ও সমাজের পটভূমিতে প্রতাপের এই জটিল সমীকরণ এবং প্রান্তিকায়িতবর্গের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন বড় গভীরভাবে, যা সরাসরি উঠে আসে তাঁর একের পর এক উপন্যাসে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস যেমন, 'ভাতের গন্ধ' (১৯৮১, করুণা প্রকাশনী), 'আকাশের নীচে মানুষ' (১৯৮১, দে'জ পাবলিশিং), 'মানুষের যুদ্ধ' (১৯৮৩), 'ধর্মান্তর' (১৯৮৪, দে'জ পাবলিশিং), 'দায়বদ্ধ' (১৯৮৬, দে'জ পাবলিশিং), 'শান্তিপর্ব' (১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং), 'প্রস্তুতিপর্ব' (১৯৯০, করুণা প্রকাশনী), 'জনগন' (১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স) 'রথযাত্রা' (১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৯৯, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির), 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৯১,দে'জ পাবলিশিং) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক বিরাট পটভূমির মানুষের প্রতাপ-লাঞ্ছিত জীবনের সংগ্রামশীল বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর রচিত অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্য দিয়েও তিনি দরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনসংগ্রামের কাহিনিকে নিরন্তর ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কথাবিশ্বের জগতে। উল্লিখিত উপন্যাস-গল্পসম্ভার, উত্তর-বিহারের প্রান্তিকায়িত মানুষদের জীবনযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও আমরা জানি ক্ষমতার ঊর্ণাজাল কখনই স্থানবিশেষে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। তার সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তৃত হয় সর্বত্র। ভিন্ন ভিন্ন রূপে। তাঁর 'মাটি আর নেই' উপন্যাসটিতেও আমরা ক্ষমতায়নের সেই আগ্রাসী রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করি। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে।

এর আখ্যানভাগ পর্যালোচনা করলে দেখব, বঙ্গোপসাগরের অরণ্যসঙ্কুল উপকূলভূমিতে, 'বাঙলা দেশের দক্ষিণ সীমান্ত' অঞ্চলে একদল যাযাবর মানুষের আগমন ঘটে। যেহেতু ততদিনে দেশবিভাজন ঘটে গেছে, তাই ঔপন্যাসিক কথিত 'বাঙলা দেশ' বলতে আমরা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে বুঝতে পারি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে এরা আসে বাসযোগ্য ভূমির অন্বেষণে। কুবের সাঁইদার এদের মুরুব্বি। তাঁর উপর ভরসা করে মোতি, গগন, বিলাস, কুঞ্জ, গুপী এবং অন্যান্যরা নিজেদের পরিবার সমেত এসে উপস্থিত হয় এই উপকূল সংলগ্ন ভূমিতে। গহীন অরণ্য কঠোর শ্রমে পরিষ্কার করে তারা একে বাসযোগ্য করে তোলে। এরা সবাই তথাকথিত সমাজের বর্ণ বর্গ বিভাজিত দৃষ্টিকোণ থেকে নিচুজাতির (মালো, কাহার, বাউরী, বাগদী) দরিদ্র মানুষ। এরা 'নির্ভূম'। চিরকাল এরা ভূমির সন্ধানে নানান স্থান ভ্রমন করেছে, পতিত জমিকে আবাদ করেছে, বন কেটে বসত গড়েছে। কিন্তু এই শ্রমসাধ্য নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন তারা মাত্র সেই ভূমিতে বাস করতে শুরু করেছে, প্রতিবার জমিদার বা জমিমালিকের লোক এসে উপস্থিত হয়েছে 'টাঙি-বল্লম হাতে'। 'এদের বসত ভেঙে উৎখাত করে দিয়েছে' এবং এরা পুনরায় ভূমিহীন হয়ে 'নতুন মাটির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে'। এই-ই তাদের জীবন। এভাবেই তারা এখানেও আসে। পুনর্নির্মাণ করে বসতভূমি। তাদের সংগ্রামই তাদের জীবনালেখ্য।

আসলে ধনতান্ত্রিক সমাজের জাঁকজমকপূর্ণ অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেই আপন অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে উপনিবেশোত্তর চেতনা সমৃদ্ধ প্রতিবেদন। যেখানে দৈনন্দিন জীবনের সুসজ্জিত আলোকসজ্জাই আমাদের নজর কাড়ে বেশি এবং সত্যের বদলে উৎপন্ন করে সত্যভ্রম; আমাদের মনে হয় জীবন বুঝি বা এরকমই আলোকের রোশনাই - আমরা শুধু ব্যর্থই হই না, বিস্মৃতও হই জীবনের যথার্থ স্বরূপ সন্ধানে। মগ্ন হই বিলাসী জীবনের মাদকতায়। তাই প্রদীপের নিচেই জমাট বাঁধে যে গাঢ় অন্ধকার, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বড় সহজে। আচ্ছন্নতার সেই ঘোর কাটাতে তখন সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ঔপন্যাসিক আকরণের অন্তহীন পরিসরে বহুকৌণিক বিন্যাসে প্রতিফলিত হতে থাকে যখন জীবন, সময়, সমাজ ও ব্যক্তি; আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকে এই তথাকথিত চাকচিক্যপূর্ণ সমাজের অন্ধবিন্দুগুলি। ক্ষমতালোভী শাসকের নির্মম আগ্রাসনের শিকার হয়ে বিভাজন, বিভেদ, বৈষম্য, পরিসরহীনতা সমস্তই কিভাবে চোরাস্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ে সমাজের খাঁজে খাঁজে, তা আমাদের সচকিত মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রতাপের এই আগ্রাসনের সম্মুখে বারে বারে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় ব্যক্তিজীবনের তথা গোষ্ঠীজীবনেরও। এভাবেই গুপী-কুবের'রা বারে বারে মুখোমুখি হয় এই সত্যের যে 'মাটি আর নেই'। মাটি হারানোর যন্ত্রণা তাদের জীবনকে স্থির হতে দেয় না কিছুতেই। অনবরত স্থানান্তরিত হতে হতে একসময় অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা লক্ষ্য করে, - "এই পর্যন্তই মাটির সীমানা। মাটি ফুরলো তো শুরু হল জল। যতদূর তাকান যায়—কালো নোনা অফুরন্ত জল, অশান্ত গর্জন আর পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ। এর নাম সমুদ্র।..." (পৃ. ৯)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমরা দেখি, আখ্যান পরিসর নির্মাণ হয় যেখানে তা বঙ্গোপসাগরের জটিল অরণ্যসঙ্কুল উপকূল। লোকসমাজের দৃষ্টির বাইরে, জানার বাইরে উপকূল সংলগ্ন এই গহন অরণ্যভূমি। এ ভূমি বাসযোগ্য তো নয়ই, বরং প্রকৃতির রূপ এখানে অনেকটাই ভয়াল। 'শঙ্খিনী সাপ...ডোরাকাটা বাঘ...কুমীরের পাল' এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। একটা নদী উত্তর থেকে দক্ষিণের এই সমুদ্রে এসে মিশেছে। আর সেই "নদীর পার ধরে ধরে একদল মানুষ একদিন এখানে এসে হানা দিল।" (পৃ. ৯) এরা কারা? 'তারা আধা যাযাবর, আধা গৃহী।' কিছু ভূমিহীন মানুষ।

'গৃহী' মানুষ যখন বাধ্য হয় 'যাযাবরে'র মতো জীবন যাপনে এবং পরিণত হয় 'আধা যাযাবর, আধা গৃহী'তে, তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না কোন সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসে 'ওরা'। গৃহী মানুষের জীবন যাপন স্থিতিশীল হয়। 'আধা গৃহী' শব্দবন্ধের মধ্যেই রয়েছে সেই গৃহকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ইঙ্গিত। কিন্তু সেই 'গৃহ' স্থায়ী হয় না যখন, তখন পুনর্বার গৃহের সন্ধানে যাত্রা শুরু করতে হয় তাদের, যা তাদেরকে নিয়ে যায় এক 'যাযাবর' জীবন যাপনের অভিমুখে। কিন্তু কেন স্থায়ী হয় না তাদের ঘর? আখ্যানের কেন্দ্রিয় চরিত্র গুপীর বয়ান থেকে ঝলসে উঠে জীবন সংগ্রামের তপ্ত অভিজ্ঞতা, "...এই পিরথিমীতে আমাদের জমিন লেই, ঘরবসত লেই, নিজের কইতে কিছু লেই। ...যেখেনেই আমরা ডেরা বাঁধি, জমিন হাসিল করি, ফসল ফলাই, ভাঙা মাটি চোরস করি, বন কেটে বসত বানাই, সেখেন ঠেঙেই জমিনদার আর ভেড়িবাবুদের লোকেরা আমাদের তাড়ায়। ...তাড়া আর খেদানি খেতে খেতে পিরথিমীর শেষ মাথায় এই সমুদ্দুরের মুখে এসে পড়েচি। এখনও নিজেদের জমিন হল নি।" (পৃ. ১৩) পাঠকৃতির সূচনাতেই এভাবে ঔপন্যাসিক বয়ানে স্পষ্ট ভাষায় ফুটে ওঠে প্রতাপের গহীন গভীর কূটচালের আঁকাড়া বাস্তব রূপ।

জমিমালিকদের জমির প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি যে কত শত মানুষের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে, তার সাক্ষী ইতিহাস বহন করে চলেছে চিরকাল। 'দুই বিঘা জমি'র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপেন যেন কাল থেকে কালান্তরে সেই সমস্ত নির্যাতিত নিপীড়িত উৎখাত ভূমিহীন মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে আজও দেশময় ঘুরে বেড়ায়। তাঁর সময়কাল থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেও আশির দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত আলোচ্য উপন্যাসে সেই সামাজিক সত্য যে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয় নি এরই প্রমাণ মেলে গুপীর বক্তব্য থেকে। স্বাধীন ভারতে জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হয়ে গেলেও জমির উপর থেকে জমিমালিকদের বজ্রমুষ্ঠি তখনও শিথিল হতে চায় নি। বরং নামে বেনামে জমির দখলদারি অব্যাহত থাকে। যার অনিবার্য প্রভাব এসে পড়ে প্রান্তিকায়িত দরিদ্র মানুষদের জীবনে। স্বাধীনতার ফলস্বরূপ স্বাধীন জীবনযাপন করা তাদের ভাগ্যে আর ঘটলই না। হয় তাদের থাকতে হল কোন না কোন জমিমালিকের অধীন হয়ে অথবা সম্পূর্ণ নির্ভূম হয়ে। এছাড়া রয়েছে বর্ণগত জাতিগত বিভাজন। সমাজের যেখানে উচ্চবর্ণের বিত্তবান মানুষদের অবস্থান, সেখানে বাউরী, বাগদী বা কাহার সম্প্রদায়ের মানুষদের উপস্থিতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সমাজের মূল স্রোত থেকে বহু দূরে এদের অবস্থান। কুবের, গুপী, বিলাস'রা আসলে সেইসমস্ত বঞ্চিত মানুষদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

পাঠকৃতির নিবিড় পাঠে এরপর আমরা দেখি, এবার শুরু হয় সেই আরণ্যক ভূমিকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য গুপীদের প্রাণপণ চেষ্টা। যা তাদের জন্য প্রায় স্বাভাবিক কাজ। জীবনকে তারা যেভাবে পেয়েছে সেখানে স্থিরতা যেন কোথাও নেই। তাই এই অনিশ্চয়তায় তারা ঘাবড়ায় না। বরং সেরকম ঘন মনুষ্যবিহীন অরণ্যভূমি দেখলে তারা প্রস্তুত হয় সে স্থানকে বাসযোগ্য করে তুলতে এবং সেই কাজ তারা সম্পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। তাদের এই নিঃশব্দ অমানুষিক কর্মক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলছেন, - "কত জায়গা যে এরা আবাদ করেছে, কত পতিত নিষ্ফলা মাটিকে যে এরা সুফলা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বন কেটে জমি হাসিল করে পৃথিবীর সীমানাকে বাড়াতে বাড়াতে তারা চলেছে।" (পৃ. ১৫-১৬)

এই সমুদ্র উপকূলে এসেও তারা বসত নির্মাণে, বলা ভালো পুনর্নির্মাণে প্রস্তুত হয়। জঙ্গল সাফ করে সেখানে 'বাঁশের বেড়া আর গোলপাতার চাল মাথায় নিয়ে' ছোট ছোট ঘর ওঠে। 'মিঠে মাটিতে লাঙল' পড়ে। আর 'সমুদ্রের খাড়িতে মাছ মেরে' শুরু হয় জীবিকার্জনের প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গড়ে ওঠে 'নয়াবসত'। এতদিন জনমানবশূন্য এই ভূমির ছিল না কোন পরিচয়। আজ এই ভূমির মতোই কিছু পরিচয়হীন মানুষ এর নামকরণ করে এবং পরম মমতায় নোনা জলের পারের এই মিঠে মাটিকে ফসল উৎপাদনের যোগ্য বানিয়ে তোলে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নয়াবসতের বাসিন্দাদের মূল পেশা মাছ বিক্রি। নোনা জলের মিঠে মাছ ধরে ওরা সারারাত সমুদ্রের খাড়িতে। সকাল হতে না হতেই পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে গিয়ে পাতিবুনিয়ার হাটে সেই মাছ বিক্রি করতে হয় রোজগারের জন্য। এই প্রচন্ড শ্রমের মধ্যে বিশ্রামের কোনো ফুরসত নেই। ফুরসত নেই নিজের জীবন ও অস্তিত্বের কথা ভেবে দেখবারও। টিকে থাকার কঠিন সংগ্রাম তাদের অনবরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের মৌলিক অধিকার থেকে এরা চিরকাল বঞ্চিত। এমনকি সরকারের কোন খাতায়ও অন্তর্ভুক্ত নেই এদের নাম। সাদামাটা অথচ সংগ্রামী জীবন তাদের। জন্মসূত্রে তারা 'কেউ বাউরী, কেউ বাগদী, কেউ মালো, কেউ কাহার' (পৃ. ১৬)। সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন - অন্ত্যজ প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজন। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে এসেছে তারা। জন্মগত বৃত্তি তাদের একসময় যা ছিল, তা এখন আর নেই। বারে বারে ছিন্নমূল হতে হয়েছে তাদের। অনবরত স্থানচ্যুত হতে হতে পেশাবদলও ঘটে গেছে বেঁচে থাকার তাগিদে। আজ তারা সব কিছু হারিয়ে শুধুই 'কৃষাণ আর মাছমারা' (পৃ. ১৬)।

তথাকথিত ভদ্রসমাজের বাইরে এদের জীবন অগণিত প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ হলেও আমরা আখ্যানে দেখতে পাই তারা এই নয়াবসতে গড়ে তুলেছে একটি ছোট্ট জনপদ। কুবের সাঁইদার, মোতি, গগন, বিলাস, কুঞ্জ, গুপী, নিশি, ভামিনী প্রভৃতিরা দরিদ্র যাযাবর জীবনের নানা পর্ব অতিক্রম করতে করতে আজ এখানকার বাসিন্দা। কুবের সাঁইদার এদের মুরুব্বি। সারাদিন খাটুনির পর তারা সবাই সন্ধ্যায় এসে কুবেরের ঘরের সামনে 'আসর' বসায়। কোনদিন গান হয়, নতুন আবাদ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়, মাছের ব্যবসা নিয়ে কথাবার্তা হয়। কুবের তাদের আগলে রেখেছে সবসময়। তাদের ভালোমন্দের ভার কুবেরের উপর। মানুষ তো আসলে সামাজিক জীব। প্রতাপ শৃঙ্খলিত জীবনে যতই পিছিয়ে পড়ে গিয়ে সে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক না কেন, শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এসেও সে বার বার উঠে দাঁড়ায়। সংঘবদ্ধ হয়। শ্রান্তি, ক্লান্তি ভুলে গিয়ে প্রাণ ভরে গ্রহন করে প্রকৃতি মায়ের আলোকসুধা। কবির শাশ্বত উচ্চারণ যেন ধ্বনিত হয়, -

"আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে।"[৩]

কুবের সাঁইদারের কথায় সেই আশার স্পর্শ সামান্য ফুটে ওঠে যখন সকলকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, - "দু বচ্ছরের ভেতর কেউ তো আমাদের তাড়াতে এল নি। মনে হচ্চে, এ জায়গাটার মালিক লেই।" (পৃ. ১৭) আসলে তারা যেখানেই বসত গড়েছে এতদিন, সেখান থেকেই উৎখাত হয়েছে। কুবেরের বক্তব্য থেকে জানতে পারি, "হেই সুখচরে, পাতিবুনেতে, মাতলায় – কুথাও পুরো বচ্ছর কাটাতে পারিনি। ...খালি ঘুরেই মরচি। এট্টুস মাটির খোঁজে পিরথিমীর এক মাথা ঠেঙে খেদানি খেতে খেতে আর এক মাথায় এসে পড়েচি।" (পৃ. ১৮) সেই তুলনায় আজ অনেকটা সময়কাল অর্থাৎ দু'বছর এক জায়গায় স্থিতীশীল হওয়া তাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার বৈকি! আবেগে কুবেরের চোখ ভরে আসে। সেই আবেগ চারিয়ে যায় বাকি সবার মধ্যেও। ওদের মধ্যে বিশ্বাস জাগে, এই জমি তাদেরই।

সবার ভেতরের কর্মোদ্যম যেন ভিন্ন মাত্রা পায়। আপন জমিকে আরো চৌরস করতে হবে, যত্ন করতে হবে। পায়ের নিচের এই এক টুকরো উর্বর কালো মাটিকে তারা আরো সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে তুলবে। সবাই মিলে পরামর্শ করে সমুদ্রের নোনা জল থেকে ধানক্ষেত বাঁচানোর জন্য ক্ষেত বরাবর মাটি চাপা দেওয়ার কথা ভাবে। যাতে পরবর্তী 'দু-দশ বছরের ভেতর' মাটি নষ্ট হয়ে না যায়। আমরা দেখি "মেয়ে-মরদ, জোয়ান-বুড়ো, বাচ্চা-কাচ্চা—নয়াবসতের কেউ আর ঘরে রইল না। কোদাল আর ঝোড়া নিয়ে মুরুব্বির পিছু পিছু খাড়ির দিকে ছুটল।" (পৃ. ২৮) তারা ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার কথা ভাবে। জীবনে এই প্রথমবার স্থিরতা প্রাপ্তির আনন্দে আনন্দিত হয়।

এরপর কাহিনির গতি আমরা অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে যেতে দেখি। নয়াবসতকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সমাজ। সে সমাজ কালে কালে নিজস্ব গতি লাভ করে। পাতিবুনিয়ায় গুপীদের মাছের কারবার চলতে থাকে। ভাঁটুনী বুড়ির আগমন ঘটে। পরবর্তীতে আসে গেঁওখালির বানভাসি কিছু মানুষ। দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে আখ্যান এগিয়ে চলে। এছাড়া নয়াবসতের লৌকিক জীবনচিত্রকে অনেকটা প্রাণবন্ত করে তুলেছে উপন্যাসে বর্ণিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকগানগুলো। এরই মধ্যে বেশ কিছুটা অংশজুড়ে আমরা দেখতে পাই গুপী, নিশি ও ভামিনীর সম্পর্কের টানাপোড়েন। এ পর্বে কাহিনি কিছুটা বিলম্বিত হয়ে উঠেছে যেন।

যাই হোক, এরপরই আখ্যান পরিসরে আগমন ঘটে একটি নতুন চরিত্রের, যার নাম ভূষণ। ভূষণ সেই লোক যে এদের কাছে জমির মালিকদের সম্পর্কে খবর এনে দেয়। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বোঝার জন্য ঔপন্যাসিকের ভাষ্য অনুসরণ করতে পারি আমরা, "পৃথিবীর কোন মাটিই বেওয়ারিশ নয়। ফলে যতবার তারা বসত করেছে, ততবারই একজন করে মালিক বেরিয়ে পড়েছে। আর সেই মালিকদের খবর প্রথম যার মারফত পাওয়া গেছে, সে ভূষণ! ...সে খবর দেবার ক'দিন পরেই মালিকের লোক টাঙি-বল্লম নিয়ে হানা দিয়েছে।" (পৃ. ৯৭)

তাই ভূষণের উপস্থিতি তাদের জন্য চিন্তাজনক। যদিও ভূষণ আখ্যানে জমিমালিকদের প্রতিনিধিত্ব করে না কোনোভাবেই। সে আসলে একজন সামান্য দোকানদার। পাতিবুনিয়ার হাটে তার দীর্ঘ বিশ বছর পুরোনো মুদির দোকান। কিন্তু দোকানঘর জীর্ণ, শ্রীহীন। ব্যবসায় তার মন নেই। তার নেশা তথ্য সংগ্রহে। কোন জমিদার কোথায় নতুন জমি কিনল, কোন ভেড়িবাবু কোথায় জমি ইজারা নিল এসব আশেপাশের সমস্ত তথ্য সে সংগ্রহ করে রাখে। আর সময়মতো কুবের/কুবের'দের মতো এ অঞ্চলের অন্যান্য হতদরিদ্র মানুষদের সে খবর দিতে থাকে, যাতে কেউ হঠাৎ কোনো বিপদে না পড়ে। সে আসলে সবার ভালো চায়।

কুবেরদের জন্যেও ভূষণ মনেপ্রাণে মঙ্গলকামনাই করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে প্রতিবার জমি হারানোর শঙ্কা সে-ই বয়ে নিয়ে আসে তাদের জীবনে। আখ্যানের শেষভাগে দেখতে পাই আবারো ভূষণ এসেছে তাদের কাছে বঙ্কিমকে সঙ্গে নিয়ে, যে আসলে 'মেদিনীপুরের ভেড়িবাবুদের' গোমস্তা। সেই বঙ্কিম কুবেরকে জানায়, "তুমরা যেখেনে গাঁ বসিয়েচ, মেদিনীপুরের ভেড়িবাবুরা ও জায়গাটার মালিক। ...ভেড়িবাবুদের ইচ্চে, সমুদ্দুরের মুখে মাছের ভেরি বসাবে, বুঝলে। ...আসচে মাসের ভেতর ওখেন ঠেঙে তুমাদের উটে যেতে হবে। ...আসচে মাসে ভেড়িবাবুরা জমিনের দখল লিতে যাবে।" (পৃ. ১৪১) অর্থাৎ পুনর্বার উচ্ছেদ ঘটবে তাদের এই জমি থেকেও। লক্ষণীয় যে, ওদের এখানে বসত গড়ে তোলার প্রায় দু'বছর হতে চলেছে (কুবেরের বক্তব্য থেকে যা আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি), এর আগে এই অঞ্চল ছিল গহীন জঙ্গল। কারোরই অধিকৃত অঞ্চল ছিল না তা। কুবের-গুপীরা আপন চেষ্টায় এই ঘন অরণ্যকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আজ যখন এই অরণ্যভূমি শস্যদায়িনী হয়ে উঠল, ঠিক তখনই এর জমিমালিক এসে উদয় হলেন। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে আসলে এই মালিকানা-দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা শুধুই আধিপত্যবাদী সমাজের ক্ষমতালোভী মানসিকতার কূটচাল। এই গহীন অরণ্য যখন বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল তখন এর কেউ দাবীদার ছিল না। আজ তা বাসযোগ্য স্থান, তাই অবধারিত ভাবেই এখন এর মূল্য নির্ধারিত হবে। হিসেবি সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত হয়ে যাবে এই 'জমি'। অসহায় আর্তনাদে কুবের চেঁচিয়ে উঠে, "সমুদ্দুরের মুখের মাটিটুকুনেরও মালিক আচে!" (পৃ. ১৪১) -- আছে বটে। এটাই তো এই সমাজের প্রতাপ শৃঙ্খলের স্বরূপ। স্বাধীনতার তিন দশকের চেয়েও বেশি সময় পরে রচিত (১৯৮৪ সাল) এই ঔপন্যাসিক প্রেক্ষাপটে যে সামাজিক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তা সরাসরি অঙ্গুলিসঙ্কেত করে আসলে স্বাধীনতারও বহু যুগ পূর্ব হতে নিরঙ্কুশভাবে চলে আসা ক্ষমতায়নের আগ্রাসী শাসন কাঠামোর দিকে। সমালোচকের ভাষ্যের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয় আধিপত্যবাদী মনস্তত্ত্ব, -

> "ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকেরা একদিন বিদায় নেয়। কিন্তু আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো এত সহজে ভেঙে পড়ে না।"[৪]

এর রূপবদল হয়, হাতবদল হয় মাত্র। আমাদের মনে পড়ে যায় গ্রামশি-র প্রতাপের তত্ত্বসূত্র, -

> "...the directedness of power in power relations attempts to maintain the balance of power."[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফলত নিম্নবর্গীয় জনজীবনে অব্যাহত থাকে সংগ্রামের ধারা। আর তাই গহীন অরণ্য যখন কুবের'দের অমানুষিক পরিশ্রমে বাসযোগ্য-কর্ষণযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হয়, শাসকদলের তথা জমিমালিকদের অবধারিত আগমন ঘটে।

জীবনের দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসেও কুবের হার মানে নি কখনও, নিরুৎসাহ হয়নি। কিন্তু আজ সে যেন কিছুটা ভেঙে পড়ে। আবারও ভূমিহারা হয়ে পড়ার আশঙ্কা তাকে দিশাহারা করে তোলে। যে মাটির খোঁজে এরা গোটা জীবন ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে, প্রবল অনিশ্চয়তা ও বিপদের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করেছে, সেই মাটির সন্ধান কি তারা আজও পাবে না – তা হতে পারে না! তাই সাময়িকভাবে বিপন্ন বোধ করলেও সেই সময়টুকু কাটিয়েই কুবের আবার দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়ায়। নয়াবসতের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্য করে বলে, "এখেন ঠেঙে কুত্থাও যাব নি। সারা জীবন কুকুরের মতন ঢের খেদানি সয়েচি। বার বার বসত গড়ে বার বার ফেলে গেচি। কিন্তুক আর পারব নি, কিচুতেই লয়। তাতে যা হবার হবে –" (পৃ. ১৪৩)

আমরা জানি ক্ষমতায়নের মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধের সার্বিক অবলুপ্তি এবং ক্ষমতার সর্বগ্রাসী বিস্তার। শাসক মন পরোয়া করে না শাসিতবর্গের জীবনসংগ্রামের, ন্যায্য অধিকারের। জাতি বর্ণ বিত্ত বিভাজিত সমাজে তাদের রাজধ্বজা শাশ্বত করে রাখতে চায় চিরকাল। কিন্তু সময় ও জীবন পরিবর্তনশীল। আর তাই আধিপত্যবাদী সমাজ নির্মিত শোষণের অচলায়তনের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে সমাজের অন্তেবাসীশ্রেণীর কণ্ঠে এভাবেই জেগে ওঠে শাশ্বত প্রতিরোধী উচ্চারণ। কুবের'দের কাছে হারাবার মতন কিছুই আর নেই। গোটা জীবন তারা শুধু দিয়েই গেছে, তাদের শ্রম, তাদের শক্তি। বিনিময়ে পায় নি কিছুই। একদিকে জমিমালিকদের ক্ষমতালোভী আগ্রাসী থাবা, অন্যদিকে সমুদ্র উপকূলের প্রকৃতির ঝড়োন্মত্ত করাল রূপ। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজ তারা আর চলে যাবে না। বরং মুখোমুখি দাঁড়াবে, জমিমালিকদের। কুবেরের কণ্ঠ দিয়ে সেই প্রতিবাদের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সকলের মধ্যে।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, কুবেরের সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের উল্টোদিকে বসে থাকা মানুষগুলো তখন 'ভীত, চকিত, বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন' (পৃ. ১৪৪)। কেননা প্রতাপের কুৎসিত রূপ তাদের চেতনায় বড় স্পষ্ট। একদিকে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে এই সমাজে তাদের নিরালম্ব অবস্থানের স্বরূপকে। অন্যদিকে, আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আধিপত্যবাদীশ্রেণী যে শৃঙ্খল বিস্তার করে ব্রাত্যজনদের জীবনে, তা শুধুমাত্র তাদের জীবনকেই নয়, চিন্তা ও মননকেও অনেকটাই স্থবির করে দেয়। সুদীর্ঘকালের শৃঙ্খলিত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাবার ফলে ভুলে যায় প্রতিবাদের সমস্ত ভাষাও। ফলত ভয় ও উদ্বিগ্নতায় তাদের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তখন প্রতাপের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সগর্জন উচ্চারণও তাদের প্রজন্ম লালিত ভীতির নিগড়কে সহজে ভাঙতে পারে না। ফলে গোটা পরিস্থিতিটাই বেশ জটিল হয়ে উঠে। স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে তৈরি হয় দুস্তর ব্যবধান। আখ্যানে আমরা দেখি, কুবের তাদের একমাত্র ভরসাস্থল। তার হাত ধরেই তারা প্রতিবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তবুও আজ আবার জমিমালিকদের অবাঞ্ছিত আগমন সংবাদ তাদের জীবনে ভীতি ও অনিশ্চয়তার ঝড়কে যেন ডেকে এনেছে। আখ্যানে বর্ণিত উপকূলের দিকে ধেয়ে আসা ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় যেন এরই ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কুবের কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না এই 'নয়াবসত'কে। না ঝড়ের কারণে, না জমিমালিকদের কারণে। তাদের জাতি, বর্ণ ও দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনে 'নয়াবসত' স্থিরতার প্রতীক। তাই নয়াবসতকে রক্ষা করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি, ঝড় আসার আগের মুহূর্তে কুবের গুপীকে দায়িত্ব দেয় যতজনকে পারা যায় তার ঘরে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেওয়ার জন্য, কেননা এই বসতে একমাত্র কুবেরের ঘরটাই শক্ত টিনের তৈরি। কিন্তু গুপী, যে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী, "...যেন সমুদ্র মুখের এই সামান্য মাটিটুকুর প্রতীক" (পৃ. ১৪৮), - নিশির সঙ্গে নয়াবসত ছেড়ে গোপনে চলে যায় প্রেমের টানে, নতুন জীবনের খোঁজে।

তার এই চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে কুবেরের জন্য এবং নয়াবসতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুবেরের গভীর ইচ্ছা ছিল, নিজের মেয়ে ভামিনীর সঙ্গে গুপীর বিয়ে দেওয়া। ভামিনীও গুপীকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু গুপীকে কখনও এই বিয়ের জন্য প্রস্তুত দেখা যায় না। নিশির প্রতি তার অন্তরের টান তাকে ভামিনী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। যখন কুবের গুপীর মনের কথা বুঝতে পারে তখন কিছুটা জোর করেই সে গুপীর সঙ্গে ভামিনীর বিয়ের কথা

সামাজিকভাবে পাকা করে নেয়। যা গুপীর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে আমাদের মনে হয় যেন এই বিন্দুতে এসে কুবের ও গুপী দুজনেরই মনোদশার প্রায় মিল রয়েছে। দুজনেই স্বাধীন স্থিতিশীল জীবনের প্রত্যাশী। কুবের চায়, নিজের জন্য ও তার এই ছোট্ট জনপদের জন্য ভেড়িবাবু বা জমিদার বর্জিত একটুকরো স্বাধীন জমি, যেটা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের মাটি হবে। আর গুপীও চায় 'নিজেদের জমিন', তার সেই চাওয়ায় সঙ্গে যুক্ত হয় নিশির স্বাধীন জীবনের আকাঙ্খা। কুবের প্রস্তুত হয় শাসক নির্মিত বেড়াজালকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে। আর গুপী তার জীবনের আশেপাশে গড়ে উঠতে থাকা কুবের তথা এই সমাজের বেড়াজালকে ডিঙিয়ে বেরিয়ে যায় নিশির প্রবল টানে। আসলে মানবমন স্বভাবতই স্বাধীনতার পিয়াসী। যে কোনো শৃঙ্খলই, হোক তা শাসকের অথবা সমাজের, তাকে চিরকাল আবদ্ধ রাখতে পারে না। প্রতিবাদ আসলে মানবমনের চিরন্তন সুর। হোক তা সোচ্চার, অথবা নিরুচ্চার। প্রতিবাদের ধ্বনিই মানবসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তাকে ভুলতে দেয় না আপন স্বাতন্ত্রবোধকে। গুপী মনে মনে নিশির সেই আকর্ষণেরই অপেক্ষা করছিল হয়তো। কুবেরকে সে সমীহ করে। নয়াবসতের প্রতিও সে দায়িত্বশীল। কিন্তু মনের ইচ্ছার বিপরীতে গিয়ে ভামিনীকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিশির আহ্বানে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে নয়াবসত ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কুবেরের প্রতি এ যেন তার নীরব প্রতিবাদ।

কিন্তু ঔপন্যাসিক প্রদত্ত উপরোক্ত উপমা এক্ষেত্রে কুবের তথা নয়াবসতের জন্য বিপদ সংকেত বয়ে নিয়ে আসে যেন। প্রতাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনযাপন, বঞ্চনা লাঞ্ছনার পরিবর্তে স্বনির্ভরশীল জীবন কাটানোর স্বপ্ন সমাজের এই প্রান্তিকায়িত বর্গের মানুষদের যেন পূর্ণ হতে গিয়েও আর হয়ে ওঠে না। আখ্যান বয়নের শেষভাগ তাই যেন অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে গুপীকে এই উপকূল সংলগ্ন মাটির সঙ্গে তুলনা করায়, যে 'মাটি' হয়তো বা আবারও হারিয়ে যেতে পারে! যার উপর শ্যেনদৃষ্টি এসে পড়েছে ভেড়িবাবুদের। বসত খালি করে সমুদ্রের মুখে মাছের ভেরি বসাতে চায় তারা।

গুপী-নিশি চলে যায়। নয়াবসতের অন্যান্য বাসিন্দারা ভীত। শুধুমাত্র দমে যায় না কুবের। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে কিছু অসহায় নিরীহ মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে নয়াবসতের মুরুব্বি কুবের সকলের ধন-প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকে যেন কোনো সুবিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো। কুবের'দের প্রান্তিকায়িত ব্রাত্য জীবনে অধিকার অর্জনের মুহূর্তেই হারানোর আশঙ্কা যেমন ঘনিয়ে আসে, ঠিক তেমনি হারাতে হারাতেই পুনর্বার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ে সজ্ঘবদ্ধ হয় 'ওরা'। এই সংগ্রামপূর্ণ পথ চলা চলতেই থাকে। আর এভাবেই পাঠকৃতির সূচনাপর্ব আর সমাপ্তি মুহূর্ত একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে যায়। 'মাটি' তথা স্বাধীন স্থিতিশীল জীবনের খোঁজ তাদের শেষ হয় না আর। তাই এই বৃত্তান্তেরও আর অন্ত হয় না। অধিকার অর্জনের পথে প্রতাপের আগ্রাসী থাবা আর তার বিপরীতে প্রতিরোধের দৃঢ় প্রত্যাঘাত যেন এক ক্রমচলমান ধারা হয়ে ওঠে।

Reference:

১. নাথ, প্রিয়কান্ত, 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ২৩

২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর - ১ প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ – ২০০২ পৃ. ১৪১

৩. দাশ, জীবনানন্দ, 'আবহমান' কবিতা, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, পৃ. ৫৬

৪. প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, তদেব, পৃ. ১২৬

৫. Antonio Gramnsci (Beyond Marxism and Postmodernism), Renate Holub, Routledge, London, First Published- 1992, P. 200

Bibliography:

নাথ প্রিয়কান্ত, 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা–৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-১ প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০২

দাশ জীবনানন্দ, ‘আবহমান’ কবিতা, ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ভারবি, কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪

Antonio Gramnsci (Beyond Marxism and Postmodernism), Renate Holub, Routledge, London, First Published, 1992

বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা, ‘স্বাধীনতা–উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা–৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘সময় সমাজ সাহিত্য’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা–৯, প্রথম প্রকাশ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রকাশ, ‘এই সমাজ এই সময়’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 494 - 499
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের অগ্নীশ্বর : পেশাগত সংরূপে মধ্যবিত্তের প্রচ্ছন্ন প্রতিনির্মাণ

অনন্যা আচার্য্য
স্যাক্ট (বিভাগ - ১)
বাংলা বিভাগ, কালনা কলেজ
Email ID : ananya9062@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
capitalism, middle class, post-colonial, feudal, Balaichand Mukhopadhyay. Banophool, Agnishwar.

Abstract
With the rise of capitalism, the middle class gradually emerged with certain characteristics. Along with this, the struggle for independence, the post-colonial lifestyle and the disintegrating feudal system are also associated with Bengali life. Life becomes increasingly complex and humanity becomes artificial. An important fiction writer of this period is Balaichand Mukhopadhyay, who we know as Banophool. An important novel written by him is Agniswar. By profession, we can identify Dr. Agnishwar as a representative of the middle class and we can say that he belongs to a certain class but has ignored all the characteristics of the middle class. At the same time all the rules of capitalism could not affect him much. He is strongly opposed to self-promotion. He transcended the characteristics of the age and created a unique way of life. At the same time, professional identity has formed the main basis of the novel. An aspect of the economic position is also presented in the novel. All in all, the novel Agnishwar is memorable in the world of Bengali fiction for several reasons. This study attempts to find out those reasons.

Discussion

১

বিশ শতকীয় সাহিত্য ও জীবন বহুলাংশেই উনিশ শতকের জিজ্ঞাসা ও চিন্তা-ভাবনাকে অতিক্রম করে গেছে। পুঁজিবাদের বাড়বাড়ন্ত একইসাথে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং উভয় মূল্যবোধের সংঘাত বাংলা সাহিত্যের আখ্যানভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। একইসাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই পর্বে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে কিছু শ্রেণি চরিত্রের অবস্থান।

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকেই উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার পরিসরখানি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ। একই সাথে ঔপন্যাসিকদের সামাজিক অবস্থান বা সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু উপন্যাসের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বা খুব সূক্ষ্মভাবে বলা যায় চরিত্রের পেশাগত পরিচিতি বা পেশাভিত্তিক পরিচিতির অবস্থান বেশ খানিকটা অস্পষ্ট। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দিকের বেশ খানিকটা সময়ের উপন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা চরিত্রের পেশাগত বিষয়ে অস্পষ্ট চিন্তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। এই সময়পর্বে আমরা যে সকল উপন্যাসের চরিত্রগুলি দেখি তারা প্রায় সকলেই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ বা শেষদিকের অবক্ষয়িত প্রতিনিধি বা শেষ প্রজন্মের চিহ্নকে বহন করে চলেছে। পেশাভিত্তিক পরিচিতির এই অস্পষ্টতা থেকেই তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কিত অস্বচ্ছ ধারণা।

মার্কসের প্রভাব ও সমাজতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার বদল বাংলা কথাসাহিত্যের গঠনমূলক পরিবর্তনকে সাধিত করেছে। বিশ শতকের দুই-এর দশক থেকে স্বাধীনতা ও তার পরবর্তী কিছু সময় রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি সমাজে অথবা সাহিত্যে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি বা হওয়াটা সম্ভবও ছিল না। রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমাজ বিন্যাসের ও একইসাথে জীবনাদর্শের বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে এই রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠার ছাপগুলি ধীরে ধীরে উঠে এসেছে। এই সময়পর্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল। বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসটি আমাদের আলোচ্য। উপন্যাসটি বেশ কয়েকটি কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অগ্নীশ্বর। পেশায় ডাক্তার। উপন্যাসে অর্থনৈতিক অবস্থানের দিকটিও ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে। উপন্যাসের চরিত্রে পেশাগত পরিচিতির উল্লেখ উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের পরিপন্থী। যে সময়পর্বে এই উপন্যাসটি রচনা করা হয়েছে সেই সময়কে খুব সূক্ষ্মভাবে অন্বেষণ করে বলা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের সাথে সাথে এই পেশাকেন্দ্রিক আইডেন্টিটিগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিকের পরিচয়বাহী।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠার সাথে সাথে পেশার মূল্য গড়ে ওঠার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং ডাক্তার নামক একটি শ্রেণিচরিত্র গড়ে ওঠার কাঠামো এই পর্বে ক্রমশ স্পষ্টতর হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসার এবং রাষ্ট্রস্বীকৃত পেশা হিসেবে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গুরুত্ব বেড়েছে সমাজে ও সাহিত্যে। ডাক্তার অগ্নীশ্বর রাষ্ট্রস্বীকৃত এমনই এক শ্রেণি চরিত্রের প্রতিনিধি। ব্যক্তিচরিত্র ও শ্রেণি চরিত্রের এই তুলুমূল্য অবস্থানের পথে যে সমস্ত কথাসাহিত্যিকের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে বনফুল উল্লেখযোগ্য। এই অর্থনৈতিক ও পরিবর্তিত মানসিক উত্থান বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অগ্নীশ্বর-এর পাশাপাশি উপন্যাসে ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত চরিত্রটিও বনফুল খুব সচেতনভাবে চিহ্নিত করেছেন। যোগেশ রক্ষিত-এর বক্তব্য তাই আত্ম-জাহিরের মাধ্যম এবং আমিত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ। এই চরিত্রটি পুঁজিবাদের প্রবল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিকায়িত করেছে। তাই তার সাথে কথোপকথনে অগ্নীশ্বর-এর দম বন্ধ হয়ে আসে। প্রবল আমিত্বের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত একজন মানুষ হলেন অগ্নীশ্বর। ডাক্তার অগ্নীশ্বর জানেন বাক্যব্যয়ের সীমানা ঠিক কতদূর। একজন খাঁটি ডাক্তার হিসেবে অগ্নীশ্বর-এর ভূমিকার কথা সমগ্র উপন্যাস ধরে বিবৃত হয়ে আছে। কিন্তু চিকিৎসা একটি জীবিকা। জীবিকাকে অতিক্রম করেও চিকিৎসা পেশাটির সাথে যে মানবিক জিজ্ঞাসার আদর্শটি পরিপন্থী হয়ে আছে তার যথাযথ ব্যবহার বনফুল এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। পেশাগত অবস্থানের সাথে সাথেই শ্রেণিধর্মের বিপরীতে ব্যক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্য অগ্নীশ্বরকে করে তুলেছে অন্যান্যদের থেকে আলাদা।

সমাজ পরিবর্তন ও সমাজের মানুষের পরিবর্তন প্রতিটি কালেই সত্য। কিন্তু এ সকলকে অতিক্রম করে যে মূল মানবিক চিন্তার পরিকাঠামোকে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে গেঁথে দিয়েছেন তা সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। রাষ্ট্র যখন ব্যক্তিচরিত্র থেকে শ্রেণি চরিত্রের যাত্রাপথ ঠিক করে দেয় তখন উভয়ের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বে ব্যক্তিধর্মের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ অথবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থগুলি হয়ে ওঠে চূড়ান্ত।

২

বিশ শতকে সামাজিক কাঠামোর সাথে সাথেই মানসিক কাঠামোর ছকটি বেশ খানিক পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী কেননা –

> "যে মন নিয়ে যোব চার্নক সূতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কলকাতা মহানগরের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মন হল পাশ্চাত্য বণিকের সজাগ ব্যবসায়ীর মন। নিরাপদ বাণিজ্যে আর্থিক মুনাফার হিসেব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ছাড়া কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মনে সেদিন আর কোনো মানবিক সুচিন্তা উদ্ভাসিত হয়নি। জন্মকালের এই মনই কলকাতা শহরের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে পরিপুষ্ট ও পাকাপোক্ত হয়েছে।”[১]

নিরাপদ জীবন ও আত্মসর্বস্ব জীবনের লোভ মানুষকে ক্রমাগত করে তুলেছে সুযোগসন্ধানী অথবা একমুখী। এক সীমাবদ্ধ চিন্তা ও চেতনায় বরাবর আবদ্ধ মানুষের জীবন। আবদ্ধ এই চেতনার পরিবর্তে মানবিক সুচিন্তা সমৃদ্ধ মানুষের প্রয়োজন একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। প্রতিটি সময়ের একটি নিজস্ব দাবি থাকে। যেমন পুঁজিবাদের উত্থান মানুষের মধ্যে একপ্রকার চেতনাকে বরাবর প্রতিষ্ঠা দিয়ে এসেছে। সেই চেতনার মূল ভিত্তি আত্মকেন্দ্রিকতা ও জীবনযাপনের একপ্রকার নিরাপত্তা। বনফুল ডাক্তার অগ্নীশ্বরের মুখ দিয়ে তাই বলাচ্ছেন –

> “মানবসভ্যতা যেমন কৃষিসভ্যতা ও যাযাবর সভ্যতায় ভাগ হইয়া দুইটি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙালী সমাজও যেন অনেকটা তাই। একদল চাকরিবিলাসী শান্তশিষ্ট সুবিধাবাদী কেরানীর দল। গৃহিণীর গহনা গড়াইয়া, বংশ বৃদ্ধি, বড় সাহেবের মন রাখিয়া, দোল-দুর্গোৎসব, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া জীবনের অপরাহ্নে পরচর্চা, পরলোক-চর্চা, দলাদলি, ঘোঁট প্রভৃতিতে মত্ত থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা-ইহাই মোটামুটি তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু এই বাঙালীর ঘরেই আবার এমন একদল ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গৃহের বন্ধন, গৃহস্থালীর মায়া যাহাদের বাঁধিতে পারে নাই, আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যাহারা যুগে যুগে গৃহত্যাগ করিয়াছে।”[২]

অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আর সাথে সুখী গৃহকোণ - এই হয়ে উঠেছে মানুষের জীবনের ভবিতব্য। সেই দাবীকে সম্মান দিয়েই বনফুল তাঁর ‘অগ্নীশ্বর’ উপন্যাসে এমন এক চরিত্রের অবতারণা ঘটিয়েছেন যে চরিত্র সমকালীন স্বার্থপরতাকে কড়াভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের আদর্শ বৈশিষ্ট্যের একটি প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরেছেন।

শাসকের বিরুদ্ধাচরণ একই সাথে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ একজন চরিত্র ডাক্তার অগ্নীশ্বর। চিঠিতে ‘প্লীজ’ শব্দের উল্লেখ না থাকায় মিস্টার স্কটের চিঠিকে তিনি নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। স্কটের আসন্ন প্রসবা স্ত্রী-কে দেখতে যান না, পরিবর্তে অন্য একজন ডাক্তারকে পাঠান। নেটিভ ডাক্তারের এহেন আচরণ ইংরেজকেও অবাক করে। শাসকের মন জুগিয়ে চলার অভ্যেস তাঁর নেই। আত্মপ্রত্যয় যাঁর দৃঢ় তিনিই তো পদের চিন্তা না করে অবলীলায় দুঁদে শাসকের বিপরীতে যেতে পারেন। আই-জি মিস্টার স্কটকে তাই জানান –

> “অগ্নি খাঁটি ইস্পাতের তৈরি শানিত তরবারি। উহাকে যদি ঠিক মতো ব্যবহার করিতে পার অনেক উপকার পাইবে। বোকার মতো নাড়াচাড়া করিলে কিন্তু রক্তারক্তি হইবার সম্ভাবনা।”[৩]

বিশ শতকের বাঙালি জীবনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠছিল আত্মসুখ। এই সময়পর্বে দাঁড়িয়ে ডাক্তার অগ্নীশ্বর এক বিরুদ্ধ চিন্তার নিদর্শন। জীবিকা কেন্দ্রিক সৎ উপকারের চিন্তাই আত্মসুখের মাধ্যম হিসাবে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

> “অগ্নীশ্বরের ওই এক ধরণ ছিল, তিনি যখন কাহারও উপকার করিতেন তখন কাহাকেও সেটা জানিতে দিতেন না। এমন কি উপকৃতকে পর্যন্ত নয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুবিমল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল তিনি কেন এমন করেন।”[৪]

অগ্নীশ্বর এর প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন –

> “ওরে বাপরে, এরকম না করলে রক্ষে ছিল আমার। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়নি, যদি কারও উপকারটি করেছ, অমনি সে শত্রু হয়ে গেছে তোমার। মেরেই ফেললে ও লোকটাকে শেষ পর্যন্ত।”[৫]

এই সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা বেশ স্পষ্ট –

> "এমনিই তো দু'বেলা খাচ্ছি-পরছি, মোটামুটি সুখে আছি, এতেই তো অগণিত শত্রুসৃষ্টি হয়েছে, তার উপর তাদের পিঠে যদি উপকারের চাবুক পড়ে তাহলে তো ক্ষেপে যাবে তারা, দেশছাড়া করবে আমাকে। ...অথচ উপকার না করেও পারিনা, ওটা একটা রোগ বিশেষ,"[৬]

প্রায় সকল বিষয়েই স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ডাক্তার অগ্নীশ্বরকে কোন অধ্যাপকই ভুলে যায়নি। ডাক্তারি শুধুমাত্র জীবিকা নয়। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের কাছে ডাক্তারিও একটা আর্ট। মানবিক জিজ্ঞাসার আধুনিক চিন্তা-চেতনাও একই সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। বাংলাদেশের ফোকলা দাঁতে তিনি এক পেশাগত সৌন্দর্যের বাতাবরণ অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন শুধুমাত্র তার জীবনচিন্তা ও প্রতিদিনের কার্যকলাপকে একত্রিত করার মাধ্যমে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের মধ্যে যে একপ্রকার নিশ্চিন্ত যাপনের ছাপ ও প্রস্তুতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। সেই অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ডাক্তার অগ্নীশ্বর পুঁজিবাদের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যকেই হাতে ধরে নস্যাৎ করে এক বিপরীত জীবনচেতনার সুরকে প্রতিকায়িত করেছেন। বিশ শতকের চারের দশক থেকেই মানুষের জীবন ও চলাচলে এক ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের প্রতিযোগিতা দারুণভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য অচিরেই মানুষের মধ্যেকার প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়েছে –

> "অটোমোবিলিটি বা আত্মগতির যুগ এবং আত্মগতি যান্ত্রিক গতি। এই গতির কোনো লক্ষ্য নেই কোনো উদ্দেশ্য নেই কোনো সীমানা নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই- আছে শুধু ছককাটা শানবাঁধানো পথের উপর দিয়ে টাকা ও মুনাফার ধাক্কায় অন্ধবেগে চলার গতি। কেবল গতি আর গতি।"[৭]

মরাল কোডের অতি বিশুদ্ধতার ভানকে ধিক্কার জানিয়েই অগ্নীশ্বরের জীবন বয়ে চলেছে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন – "পৃথিবীতে আইনের চেয়ে মানুষ বড়। সেই বৃহত্তে পৌঁছবার জন্যে আইন ভাঙাটাই মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব"[৮] সামাজিক মানুষের অসঙ্গতি ও বোধের সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই বনফুলের আকুতিই এই উপন্যাসের প্রাণ।

> "মর্ডানিস্টদের সব চেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য - তারা মানবাধিকারে বিশ্বাস করে। ...সমস্ত মানুষই এক এবং একটা ঐক্যবদ্ধ একক।"[৯]

সত্য-অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি এবং সত্যনিষ্ঠা অগ্নীশ্বরের প্রধান গুণ অথবা সত্যপথে সুন্দরের লক্ষ্যে পৌঁছানো। সত্যের যে আদর্শটি তাঁর নিজের কাছে ছিল, তা অন্যদের চেয়ে আলাদা। আইনের সত্য নয়, ধর্মের সত্য নয়, শাস্ত্রের সত্য নয়, তাঁর নিজের সত্য এবং সে সত্যের প্রধান গুণই হল সুন্দর। বনফুল এই সৎ চিন্তার আবরণটুকু খুবই যত্নের সাথে ডাক্তারের পেশার সাথে সম্পৃপ্ত করতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা এবং রাষ্ট্রের তথা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সৎ চিন্তা ও আদর্শের ছবি তুলে ধরেছেন।

বিশ শতকের চারের দশক থেকেই সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি পর্যুদস্ত হয়েছে।

> "চিরায়ত নীতিবোধ মূল্যবোধ মানবিকতাবোধ এমন সজোরে ধাক্কা খেয়েছে, বিশেষ করে ভাবপ্রবণ তরুণমনে, যে তাঁকে গতানুগতিক 'পরিবর্তন' বা Social Change না বলে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর বলা যায়।"[১০]

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনবিন্যাস ক্রমশ পুঁজি মানসিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই যুগ বৈশিষ্ট্যের সাথে সঠিকভাবে খাপ খাইয়ে চলার মানসিকতা ডাক্তার অগ্নীশ্বরের মধ্যে কখনো পরিলক্ষিতই

হয়নি। অন্যকে খোঁচা দিয়ে কথা বলা যেমন মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য তেমনি অন্যের প্রতি সুচিন্তিত সহানুভূতি বরাবরই ডাক্তার অগ্নীশ্বরের চরিত্রে বর্তমান। রূঢ় ব্যবহারের আড়ালে একপ্রকার হৃদ্যতার আলাপ তাই খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিন্তু খুব সহজে সেই হৃদ্যতার খোঁজ সকলে পায় না। সহানুভূতি সম্মান এগুলো পারস্পরিক প্রক্রিয়া। দুর্বলতার পরিবর্তে দৃঢ় মানসিক বিন্যাসের মানুষ ডাক্তার অগ্নীশ্বরের পছন্দ। এই কারণেই হিউম্যান উইকনেস (human weakness) কে ক্ষমা করার মানুষ তিনি নন।

উপন্যাসের কথক জানিয়েছেন যে এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তিনি বহু কিছুর পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছেন কিন্তু জীবনে একটিমাত্র ছবির পরিবর্তন দেখেননি। সে ছবির নাম ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় –

> "আমার জীবনে কয়েকবারই তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে আসিয়াছেন ও চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিবারই তাঁহাকে একরকম দেখিয়াছি। তরবারির মতো তীক্ষ্ণ, অগ্নির মতো উজ্জ্বল, অন্তরের অন্তস্থলে কিন্তু স্নেহ-করুণার ফল্গু বহমান। বজ্রের মতো কঠোর অথচ কুসুমের মতো মৃদু এক তাঁহাকেই দেখিয়াছি।"[১১]

কথকের ভাষায় তিনি সারাজীবন যেন একটা আলেয়াকে অনুসরণ করে চলেছেন। সে আলেয়াটা কখনও ডাক্তারি, কখনও সাহিত্য, কখনও নাস্তিকতা, কখনও শাস্ত্রবিচার, কখনও দেশভক্তি, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা। অথচ অগ্নীশ্বরের মূল খোঁজ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। কথকের ভাষায় –

> "মাঝে মাঝে ভাবিয়াছি, এই আলেয়ার মধ্যে তিনি কি পাইতে চাহিয়াছিলেন। সত্য? আনন্দ? জনপ্রিয়তা? অর্থ? আমার মনে হয়, ইহার একটাও তিনি চাহেন নাই। জনপ্রিয়তা তো তাঁহার দু'চক্ষের বিষ ছিল।"[১২]

তবে ডাক্তার অগ্নীশ্বরের মূল চাওয়ার মধ্যে কি মধ্যবিত্তীয় রোমান্টিসিজম-এর বীজখানি সুপ্ত অবস্থায় ছিল? অথবা তাঁর আপামর জীবনের চলাচল যাকে 'নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা' বলে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন সেটি কি এই মধ্যবিত্তীয় রোমান্টিসিজিমেরই পরিপন্থী? কেননা কথকের বয়ানেই আমরা পাই –

> "ধন মান ধর্ম মোক্ষ এসব কিছুই তিনি চাহেন নাই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন - সেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যাহা সামাজিক মানুষের পক্ষে দুর্লভ।"[১৩]

অথবা অগ্নীশ্বরের নিজস্ব বক্তব্য –

> "আমি একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। রবি ঠাকুরের ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াত, আমি সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি স্বাধীনতা।"[১৪]

Reference:

১. ঘোষ, বিনয়, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৯
২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, অগ্নীশ্বর, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪ - ৪৫
৩. ঐ, পৃ. ১৩
৪. ঐ, পৃ. ১৭
৫. ঐ, পৃ. ১৮
৬. ঐ, পৃ. ১৮
৭. ঘোষ, বিনয়, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৯
৮. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, অগ্নীশ্বর, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৭

৯. মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র, পোস্টমডার্নিজম, কলকাতা, ধ্যানবিন্দু, এপ্রিল ২০২০ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৭

১০. ঘোষ, বিনয়, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ২১৬

১১. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, অগ্নীশ্বর, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭

১২. ঐ, পৃ. ২৭

১৩. ঐ, পৃ. ৪৩

১৪. ঐ, পৃ. ৩৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 500 - 507
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘বটতলা’ : সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ ও নারীর অবস্থান

মৌমিতা হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : moumita.bengali.ku@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Society, Social life, Social Issues, Archaic Mindset, Realistic Novel, Cyber Abuse, Women Empowerment,

Abstract

A novel centred on realistic societal narratives is a literary work that draws upon real-life events, social issues, and various dimensions of human life. Such novels often reflect the struggles and lived experiences of individuals, groups, or entire social classes. These works, particularly those addressing the artificial moral values of society, expose its prevailing hypocrisy, unexpected behaviours, and double standards. Through them, the underlying realities of society, often hidden behind a facade of pretentious values, are brought to light.

Society is fundamentally structured around men and women, but it predominantly functions within a patriarchal framework. In such a setting, a woman's virtues and flaws are often judged from a male perspective. Despite significant advancements in civilization and the improvement of modern lifestyles, has the position of women truly transformed? When a woman becomes a victim of crimes such as murder, rape, harassment, blackmail, false rumors, or character assassination, society frequently blames the victim, subjecting her to further humiliation and injustice. In Bengali literature, the portrayal of women has always held great significance. Many stories and novels provide profound examples of women’s awakening and empowerment, emphasizing their strength and resilience.

Sukanta Gangopadhyay’s novel Bototola is a powerful work that transcends medieval social thinking and portrays a woman’s struggle to live with dignity. Sukanta Gangopadhyay, a well-known and highly regarded figure in modern Bengali literature, skill-fully captures the destructive impact of cybercrime on a woman’s life. In Bototola, he depicts how the malicious acts of cybercriminals can poison a young woman’s life within moments. Yet, as a compassionate and insightful storyteller, he does not stop there. Gangopadhyay also charts a path of recovery and redemption for the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

protagonist, showing her unwavering determination to reclaim her life and dignity.

The novel serves as a testament to the resilience and courage required to confront societal prejudices and injustices. The protagonist's battle to hold her head high and fight for her rightful place in society is emblematic of a broader struggle faced by countless women. This fight is not hers alone but is shared by every woman striving to live with respect and self-worth. Through Bototola, Gangopadhyay not only narrates a compelling story but also delivers a powerful message about the need for societal change, the recognition of women's rights, and the universal demand for justice and equality. This narrative resonates deeply, reminding us of the collective responsibility to support and empower women in their journey toward a fairer and more inclusive society.

Discussion

ভূমিকা -

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?"[১]

সমাজ ও নারী একে অপরের পরিপূরক। সমাজের বিকাশে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারী সমাজে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে আসছে - মা, স্ত্রী, কন্যা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে। প্রাচীন সমাজে নারী ছিল গৃহকেন্দ্রিক, তবে কৃষি, শিল্প ও গৃহস্থালির কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সীমিত হলেও প্রভাবশালী ছিল। আধুনিক সমাজে নারীর ভূমিকা বহুমাত্রিক। তারা শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়ন করেছে এবং বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে নারী রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমানভাবে কাজ করছে। তবুও, সমাজে নারীর সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ এখনও চ্যালেঞ্জ। নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব সমাজের প্রধান সমস্যা। তাছাড়া, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই নারীর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে।

সাহিত্য : সমাজ : নারী – সমাজে পুরুষদের আধিপত্য সর্বদা গভীরভাবে প্রবাহিত এবং বাংলা সাহিত্যে নারীর উপস্থাপনা প্রায়শই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন। কবিতা, উপন্যাস এবং গল্পে পুরুষ লেখকরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীদের চিত্রিত করেছেন। বিশ্বসাহিত্যে ও একই দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে নারীদের নির্দিষ্ট এক আদলে নির্মাণ করা হয়। অধিকাংশ কাহিনীতে নারীকে 'ভালো' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে - যারা সুন্দরী, সতী, কিছুটা বুদ্ধিমতী এবং ত্যাগী। অন্যদিকে, 'মন্দ' নারীরা হয়ে ওঠেন - চালাক, স্বার্থপর বা চরিত্রহীন। বাংলা সাহিত্যের প্রধান কিছু সাহিত্যিকদের উপন্যাস ও গল্পে নারীর চরিত্র নির্মাণ কেমন হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারীদের মূলত সতীত্ব ও আদর্শ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বিবাহিত নারীরা সতী হিসেবে চিত্রিত, যেমন - মৃণালিনী, মনোরমা, সূর্যমুখী, রজনী, এবং লবঙ্গলতা। বিধবা নারীদের তিনি ব্রহ্মচারিণী হিসেবে তুলে ধরেছেন, যেমন কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নারীর সতীত্ব ছিল অপরিহার্য গুণ, যা ছাড়া কোনো নারীকেই আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সতীত্বহীন চরিত্রগুলোকে মেনে নিতে পারেননি। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী, যারা সমাজের বিধিনিষেধ অমান্য করে প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের চরিত্র ধূসর হয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত তাদের মৃত্যু ঘটে। রোহিণী, একজন অপূর্ব সুন্দরী বিধবা, যিনি বিবাহিত গোবিন্দলালকে ভালোবাসতেন এবং তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, সেই চরিত্রটি সৃষ্টির পর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রোহিণীর মৃত্যু নিয়ে পাঠকদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সমালোচকরা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদী মনোভাবের কারণে শিল্পী হিসেবে তিনি পরাজিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দিকে নারীদের ঐতিহ্যবাহী চিত্রণ করলেও, পরবর্তীতে তিনি স্বাধীন ও সাহসী নারী চরিত্র নির্মাণে সিদ্ধহস্ত হন। তাঁর পূর্বসূরিরা যেমন বিধবা নারীদের অসহায় এবং দুর্ভাগী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন দৃষ্টিতে নারীদের উপস্থাপন করেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী চরিত্র একজন স্বাধীনচেতা বিধবা নারীর প্রতীক, 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে হেমনলিনী চরিত্রটি একই ধরনের স্বাধীনতা ও সাহসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাস — 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ' এর সুচরিতা, বিমলা, দামিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলো সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ও স্বাধীনচেতা নারীর প্রতীক হিসেবে হাজির হয়েছে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের লাবণ্য আধুনিক, আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাধীনচেতা চরিত্র, যা তার সময়ের নারী চরিত্রের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের নারী চরিত্রগুলোও তৎকালীন সমাজের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ও স্বাধীন। সমালোচকরা মনে করেন, ঠাকুরবাড়ির আধুনিক, স্বাধীনচেতা নারীদের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শক্তিশালী নারী চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নারীর মুক্তির এক শক্তিশালী বার্তা প্রদান করেছে এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীরা যেভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে, তা স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রগুলো কুসংস্কার, অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজে আধুনিকতার আলো জ্বালিয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল, 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী, 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী, এবং 'শাস্তি'র চন্দরা — এই চরিত্রগুলো নারীর স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবদান রেখেছে।

বর্তমান সমাজে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান, তাই সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর না করলে সম্ভব নয়। সাহিত্য সমাজের এক প্রতিচ্ছবি, যা যুগে যুগে সমাজের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবর্তন প্রতিফলিত করেছে। সাহিত্যই নারীদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থান থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, এবং এই প্রভাব বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকেই দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে, চর্যাপদে, স্বাধীন পেশাজীবী নারীদের উল্লেখ রয়েছে, যেমন: তাঁতি, ডোমনি, গণিকা, ইত্যাদি, যারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পারদর্শী ছিলেন। চর্যাপদে নারীর পেশাগত স্বাধীনতা এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাঙালি সমাজের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

মধ্যযুগের সাহিত্যেও নারীর অবদান অনস্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা চরিত্রের মাধ্যমে নারীর নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে, যা কখনো আধ্যাত্মিক, কখনো নাগরিক, আবার কখনো লৌকিক রূপে চিত্রিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে, অর্থাৎ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলে নারীরা প্রতিবাদী চরিত্রে আবির্ভূত হয়েছে এবং তাদের নিজস্ব অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার প্রতিবাদী মনোভাব এবং তার সমাজের দেওয়া অসম্মান মেনে না নেওয়ার দৃঢ়তা স্পষ্ট। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীকে প্রেমিকা, স্বাধীনচেতা এবং প্রতিবাদী চরিত্রে দেখানো হয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র নারীরা তাদের প্রেমের স্বাধীনতা উপভোগ করেছে এবং সমাজের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করে প্রেমের জয়গান গেয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে নারীর মনোজগতের নানা অনুভূতি, আবেগ ও বাসনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা নারীর মুক্তির চেতনা এবং নারীবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন।

বিংশ শতাব্দীতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নারীর সমান অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কণ্ঠ তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যকর্মে নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করেছেন এবং নারীর আত্মসম্মান রক্ষায় বুদ্ধির চর্চা এবং শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় (যেমন 'সবলা') নাটকে ('চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা') নারীর বিদ্রোহী সত্তা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে নারীর আত্মস্বীকৃতি, স্বাধীনতা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি বিদ্রোহের স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি নারী চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা পাশ্চাত্য নারীবাদী চিন্তার প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে নারীর স্বাধীনতা, অধিকার এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি বিদ্রোহের কথা গভীর শিল্পিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী নারী চরিত্রের সন্ধান করতে গেলে আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতীর উল্লেখ না করলেই নয়। সত্যবতী বুদ্ধি, যুক্তিবাদ, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তার ভালোবাসা আবর্তিত হয় স্বামী নবকুমার, দুই ছেলে ও এক মেয়ে সুবর্ণলতাকে ঘিরে। এই মায়াবী নারীই প্রতিবাদী হয়ে সংসার ত্যাগ করেন যখন তিনি জানতে পারেন তাকে না জানিয়েই তার আট বছরের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

সমরেশ মজুমদারের 'গর্ভধারিনী'র জয়িতা বিপ্লবী ও বুদ্ধিমতি নারী, তার অস্তিত্বে মিশে আছে সমাজ বদলানোর নেশা। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন সে পাহাড়িদের মাঝে মিশে গিয়ে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী পুরুষটিকে ভালোবাসে। সে পুরুষের সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করে। গ্রামের পাহাড়ি মানুষগুলো তার কাছে ভণিতাহীন, অকৃত্রিম ও স্বচ্ছ। ধনী পরিবারের শহুরে ও শিক্ষিত মেয়ে হয়েও জয়িতা প্রান্তিক মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের তাগিদে হয়ে ওঠে তাদেরই একজন।

সেলিনা হোসেনে 'মোহিনীর বিয়ে' উপন্যাসে মোহিনীর করুণ আখ্যান রচনা করেছেন। পতিতাপল্লী থেকে উঠে আসা তরুণীর পুরো নাম মোহিনী মহুয়া মঞ্জুর। তার বাবা রমজান আলী প্রেমিকা নাসিমাকে পতিতালয় বিক্রি করে দেয়। নাসিমার ঘরে জন্ম নেয়া ছেলে সন্তানকে ঘরে তোলে নিজের ছেলে হিসেবে। আর রমজানের বৈধ সন্তান মোহিনীকে দিয়ে যায় নাসিমার কাছে পতিতাপল্লীতে। মোহিনীর জীবনের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি তৈরি হয় যখন তার বিয়ে ঠিক হয়। ভদ্রপল্লীতে মোহিনীর জায়গা হয় না, তার বিয়ের স্বাদ অপূর্ণই থাকে।

বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় এমনই অজস্র উদাহরণ ছরিয়ে রয়েছে। তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা', বানী বসুর 'মৈত্রেয় জাতক', সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন', উপন্যাসগুলি একদিকে যেমন নারী সশক্তিকরণের জয়গান গায় তেমনি সমাজের ঠুনকো মেকি মূল্যবোধের মুখোশটিকেও চিনতে শেখায়।

সুকান্তর 'বটতলা' - সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিকতম বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নাম। তার লেখা গল্প উপন্যাস পাঠক মহলে বহুল চর্চিত ও সমাদৃত। 'বটতলা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় দেশ, ১৪২৩ এ। পরে 'বটতলা' উপন্যাসটি ২০১৭ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বটতলা শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে প্রাচীনতার অনুষঙ্গ। প্রায় একশ বছর আগে, স্বাধীনতার পূর্বের গ্রামগুলির জনবিন্যাস সম্পর্কে জানতে গেলে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটি করে বটতলা বা চন্ডীমন্দির ছিল। প্রাচীন জনশ্রুতি আবর্তিত হয় এই সকল বটতলাগুলিকে ঘিরে। গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে এই বটতলা।

একইসাথে, বটতলা পিছিয়ে পড়ার প্রতীক। বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যাবস্থা ও প্রাচীন ধ্যানধারণায় পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বটতলার স্থবির মানসিকতা আজও সভ্যতাকে একশ বছর পিছিয়ে দিতে সক্ষম। ঠিক এই কারনেই হয়তো সমাজের নানা স্তরে অপরাধ সংঘটিত হলে যদি তার সাথে কোন একটি মেয়ে বা দুর্বল প্রকৃতির কোন মানুষের যোগ থেকে থাকে আমরা অনায়াসেই সেই মেয়েটিকে বা দুর্বল প্রকৃতির ছা পোষা মানুষটিকে দাগিয়ে দিই। বটতলার এই সংস্কৃতি আজন্মকাল বহমান। যার বলি হয়েছিল 'আনন্দমঠের' প্রফুল্ল, 'চোখের বালির' বিনোদিনী।

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বটতলা' উপন্যাসের পর্ণাও এর ব্যতিক্রম নয়। ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করতে বাজি চৌধুরী যেভাবে দশ মিনিটের একটি নিষিদ্ধ ভিডিও ছড়িয়ে এক নিমেষে পর্ণার জীবন বিষময় করে তোলে, তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে আমাদের মানসিকতায় আজও ধীরে ধীরে বয়ে চলা মধ্যযুগীয় অপসংস্কারের জন্য।

"দশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও ফুটেজ তার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছে।"[২]

পর্ণার আত্মত্যাগ, পরিবার পরিজনদের মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ করে দেবার মরিয়া প্রয়াস, তার এতকালের সুশীল লক্ষ্মীমন্ত ব্যবহার, সেবাযত্ন, বিশ্বাস ভরসা চোখের পলকে মিথ্যে হয়ে যায় একটি ভিডিও ফুটেজে। পর্ণার স্বামী সংসার তো বটেই, তার আজন্ম পরিচিত বাবা মা ভাই বোনেরাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আমরা যতই আধুনিকতার বড়াই করি না কেন, মনে মনে আজও আমরা সেই বটতলায় পড়ে, যেখানে একটি মেয়েকে বিচার করা হয় তার পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও আচরনের উপর। তাই, নীলার্কর আমেরিকার ইউনিভার্সিটির সহপাঠী তৃষা যতই উচ্চশিক্ষিত হোক, তার সম্পর্কে তনয়ার পর্যবেক্ষণ, -

> "সব ক'টা ফোটোতেই তোমার গা ঘেষে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। মুখে কি হাসি! ওর প্রোফাইল খুলে ফেললাম। দেখলাম মেয়েটা মদ, সিগারেট সবই খায়। হট ড্রেস পরে। ফোটোতে সেক্সি পোজ দেয়। দেখতেও তো দারুণ। তাই একটু ভয় হচ্ছিল।"[৩]

অভিজিতের বন্ধু খোকন এখনও অবিবাহিত। মেয়েদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ও অভিমত কিছুটা এরকম, -

> "জীবনে এতো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি। কোনও মেয়েকে আর বিশ্বাস হয় না।"[৪]

প্রাক্‌বিবাহ যৌনতার উপলব্ধি অভিজিতেরও ছিল। হোটেলের ব্যাবসায় নেমে বোর্ডারদের আবদার মতো কলগার্লের যোগান দিতে হয়েছে তাকে। একাধিকবার শারীরিক অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

> "ঘটনাটা হওয়ার পর প্রতিবার বিষাদে ভরে গিয়েছে মন। ব্যাপারটা আদ্যন্ত জান্তব। মেয়েটার সঙ্গে কোনও মানসিক সংযোগ হত না। সমুদ্রস্নানের পর শরীরে নুন লেগে থাকার অনুভূতি হত। ওরকমই নুন লেগে আছে পর্ণার গায়ে।"[৫]

উপন্যাস হোক বা বাস্তব জীবন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই শালীনতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু একজন পুরুষ ঠিক কি চাই? নর ও নারীর এই মনস্তাত্ত্বিক সমীকরণ বড়ই জটিল। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশী ডাক্তার বলে, -

> "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই, কুসুম।"[৬]

শুধুই কি শরীর? বিয়ের পর থেকে পর্ণা অভিজিতের মধ্যে যে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল তা শরীরী আকর্ষণের উর্ধ্বে। কিন্তু ঘটনার পর অভিজিৎ যেভাবে নিজেকে পর্ণার থেকে সরিয়ে নিয়েছিল তা থেকে পর্ণার শারীরিক ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলাই যেন মূল উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়। যুক্তি বুদ্ধি বিবেকধারা দিয়েও পর্ণার শরীর সম্পর্কে যে অপবিত্রতার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে তা ধোওয়া সম্ভব নয়। আবার সব সমস্যার মূল কারণ বাজি চৌধুরীকে গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়ানোর প্ল্যানও করে।

সমাজ-সংসার-স্বামী-পরিবার সবখানে মান সম্মান খুইয়ে পর্ণা একবার শেষ চেষ্টা করে। যে বাজি চৌধুরী তার হেনস্থার কারণ, যার থেকে এতকাল পালিয়ে বেড়িয়েছে, ভয়ে কুঁকড়ে থেকেছে তাকে একসময় নিজে থেকেই ফোন করে পর্ণা। দেখা করে স্কুলবাড়ির মাঠের কাছে আর অতর্কিতে হাতের লুকিয়ে রাখা নোড়াটা সজোরে মারে বাজির মাথায়। বাজি খুন হয়, খুনি পর্ণা। ভয়কে জয় করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিজের প্রতি হওয়া হেনস্থার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে পর্ণা জয়ী হয়।

চরিত্র - 'বটতলা'র প্রধান চরিত্রেরা হল – পর্ণা, অভিজিৎ ও নীলার্ক। পর্ণা চ্যাটার্জী পরিবারের বৌ, যার সম্মান ও সম্ভ্রম কালিমালিপ্ত হয়েছে একটি দশ সেকেন্ডের ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হওয়ায়। পর্ণা এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে যার জন্ম বেড়ে ওঠা শেওড়াফুলির কাছে একটি ক্ষুদ্র মফস্বলে। কলকাতার আধুনিকতার ছোঁয়াচ মুক্ত তার মন। পরিবারের দারিদ্র অনটন সঙ্গী হলেও সততা নৈতিকতাকে আশ্রয় করেই তাদের জীবনযাপন। পরিবারের বিপদের দিনে অর্থ সংগ্রহের জন্য পর্ণা বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ ছবিতে শুটিং এর প্রস্তাব গ্রহণ করে। অর্থের অভাব মিটলে এই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়েও নেয়। কিন্তু এর ভয়াবহ পরিনতি নেমে আসে তার বিবাহিত জীবনে।

> "ও বাড়ির বউকে নিয়ে জোর ফিসফিসানি চলছে পাড়ায়, বেপাড়ায়, বাজারে। এলাকার অনেকের মোবাইলেই নাকি বউটার গা-খোলা ফোটো আছে।"[৭]

সমাজ সংসার ও স্বামীর থেকে সম্পূর্ণ ব্রাত্য হয়েও ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে জিতে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে এনেছে তার জীবনকে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিজিৎ দেউলপুরের চ্যাটার্জী পরিবারের বড়ো ছেলে। তার পিতা সমর চ্যাটার্জীকে এলাকার প্রত্যেকে সমীহ করে। প্রথমে হোটেলের ব্যাবসায় ও পরে লরির ব্যাবসায় অর্থনষ্ট করে বর্তমানে কলকাতার একটি কোম্পানিতে কর্মরত। আজও অভিজিৎ তার হারিয়ে যাওয়া লরিটিকে কলকাতার রাস্তায় খোঁজে। মনে মনে স্বপ্নবোনে একদিন তার বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে ৪০৭ নম্বরের লরি। অভিজিতের বন্ধু খোকন সর্বদা একজন আদর্শ বন্ধুর মতোই তাকে আশ্রয় ও আশ্বাস দিয়েছে, -

> "জীবনের ফেলিয়োরগুলো যদি ভুলতে না পারিস, কোনও দিন এগোতে পারবি না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আসে, আমিও খানকয়েক বিজনেসে লস দিয়েছি। সবাই দেয়, কেউ কম, কেউ বা বেশী।"[৮]

সুখী দাম্পত্য জীবনের মধ্যে হঠাত করেই ছন্দপতন ঘটে একটি নিষিদ্ধ ভাইরাল ভিডিওতে নিজের স্ত্রীকে দেখা যাওয়ায়। বৈবাহিক জীবনের মূল স্তম্ভ বিশ্বাসে ফাটল ধরে। রাগ বিরক্তি ও ঘৃণা মিশ্রিত মানসিক অবস্থার মধ্যে স্ত্রীকে সবরকমভাবে এড়িয়ে চলায় শ্রেয় বলে মনে হয়।

নীলার্ক এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য চরিত্র। নীলার্ক চ্যাটার্জী পরিবারের মেজছেলে, পরিবারের গর্ব। দীর্ঘ সময় যাবত আমেরিকায় প্রবাসী, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের জন্য। নীলার্ক উদারমনস্ক, স্বাধীনচেতা, তেমনি সমাজ সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত। দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার পরেও বাংলা ভাষা ও বাঙালী ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র ভোলেনি।

> "বাইশ বছর বাংলায় কাটিয়েছি। মাত্র পাঁচ-ছ'বছরে ভাষাটা ভুলতে শুরু করব!"[৯]

দেশে ফিরে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সায়েন্স ক্লাব, সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপায়নে ব্রতী হয়। তনয়ার অপরিণত বয়সের প্রেম প্রস্তাবকেও নির্দ্বিধায় সে গ্রহণ করতে পেরেছ। বহু বছর বিদেশে থেকে, দীর্ঘ অদর্শনের পরেও সে তনয়ার প্রতি ভালোবাসায় সৎ থেকেছে। যখন সকলে ভাইরাল ভিডিওর কারণে পর্ণাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, একমাত্র নীলার্কই পর্ণার পাশে দাঁড়িয়েছে। পর্ণা ও অভিজিতকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে। পর্ণা যাতে পরিবারের মধ্যে আগের মতো মিলেমিশে থাকতে পারে তার জন্য পারিবারিক সম্মিলনেরও আয়োজন করে নীলার্ক।

'বটতলা' উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র যা নজরকাড়ে সে হল আদলা। পর্ণা একসময় বলেছিল, -

> "তুমি তো আর পুরো পাগল নয়, আধপাগলা। তাই তো তোমার নাম আদলা।"[১০]

এই আদলা কিন্তু মোটেও পাগল নয়। বরং এই চরিত্রটি অনেক বেশী দূরদর্শী ও সংবেদনশীল। অনেকটা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের দিলদার চরিত্রের মতো। আদলার দূরদৃষ্টি পর্ণাকে ঠিক চিনেছিল তাই কোনদিনই লোকের ছড়ানো কুৎসায় সে কান দেয়নি।

> "যে পরের জন্য এত ভাবে, সে কখনও খারাপ হতে পারে?"[১১]

পর্ণার উপর আচমকা বাইক আরোহীদের হামলার কালে আদলাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। পর্ণাকে সমাজ ও পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আদলাই খুনের অস্ত্র পাথরের নোড়াটা মহাদেবতলার অজস্র পাথরের মধ্যে লুকিয়ে দিয়েছিল, যা একসময় মিশে যায় ভগবানের চিহ্নস্বরূপ রাখা পাথরের ভিড়ে।

চলচ্চিত্রায়ন : 'বটতলা' থেকে 'উত্তরণ' - সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'বটতলা' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হইচইয়ের নতুন ওয়েব সিরিজ 'উত্তরণ', মুক্তি পেয়েছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২২। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই সিরিজে রয়েছে সাতটি এপিসোড, যেখানে অভিনয় করেছেন মধুমিতা সরকার, রাজদীপ গুপ্ত, শাওন চক্রবর্তী ও স্বস্তিকা দত্ত। যদিও সিরিজটি শুরুর দিকে আশার সঞ্চার করে, তবে উপন্যাস-পাঠকদের জন্য এটি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন পর্ণা, যাঁর বিবাহোত্তর সুখী জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় নেমে আসে। এক অজ্ঞাত উৎস থেকে একটি আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে তছনছ করে দেয়। সংসার ভেঙে যাওয়ার

পাশাপাশি স্বামীও তাঁর পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হন। এই সংকটময় মুহূর্তে একমাত্র তাঁর দেওর নীলার্কই ঘটনাটির গভীরে গিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে। পর্ণার এই লড়াই ক্রমশ সাইবার অপরাধ ও প্রযুক্তিগত চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক কঠিন যুদ্ধে পরিণত হয়।

উত্তরণের কাহিনী বটতলা কেন্দ্রিক হলেও এর অনেক অমিল খুব সহজেই চোখে পড়ার মতো। উপন্যাসে বর্ণিত দৃশ্যকল্পকে ওয়েব সিরিজে ঠিক তেমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। উপন্যাসের পর্ণা সাধারণ গৃহবধূ, 'উত্তরণে'র পর্ণা স্কুল শিক্ষিকা। পরিবর্তন এসেছে পর্ণার স্বামী অভিজিতের পেশাতেও। পরিচালক উপন্যাসের প্লট গ্রহণ করলেও কাহিনীতে নানা পরিবর্তন এনেছেন।

আকাশ মিশ্র'র মতে, -

> "পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সাহসী একটি বিষয়কে পর্দায় তুলে ধরার জন্য প্রশংসার যোগ্য হলেও, মূল উপন্যাসের সূক্ষ্মতা ও চরিত্রের গভীরতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে যা একটি শক্তিশালী থ্রিলার হতে পারত, তা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা এবং মেলোড্রামার ভারে দুর্বল হয়ে পড়ে। গল্পের উপর আরও গভীর মনোযোগ দেওয়া হলে এটি একটি অনন্যসাধারণ সিরিজ হয়ে উঠতে পারত।"[১২]

উপসংহার - সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার একটি উক্তি চর্চার বিষয় হয়েছে।

> "Don't look for a virgin as wife, get a woman with good manners. Virginity ends in one night but manners last forever."[১৩]

স্ত্রী মানেই শান্ত নম্র বিনয়ী, সন্তান ধারণ ও পরিবার পালনই যার প্রধান কাজ এই মধ্যযুগীয় ধারণা এখন অতীত। বটতলা থেকে উত্তরণের সময় এসেছে। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'বটতলা' একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকর্ম, যা মধ্যযুগীয় সমাজচিন্তার গণ্ডি পেরিয়ে একজন নারীর সম্মান বজায় রেখে টিকে থাকার সংগ্রামের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক হিসেবে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাইবার অপরাধের মারাত্মক প্রভাব একজন নারীর জীবনে কীভাবে আঘাত হানে, তা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'বটতলা'-য় তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে সাইবার অপরাধীদের মরণ কামড় মুহূর্তের মধ্যেই এক তরুণীর জীবনকে বিষময় করে তুলতে পারে। তবে, একজন সংবেদনশীল ও অন্তর্দৃষ্টি-সমৃদ্ধ কথাশিল্পী হিসেবে তিনি এই ধ্বংসাত্মক ঘটনার বর্ণনাতেই থেমে যাননি। উপন্যাসে তিনি নায়িকার পুনরুদ্ধার ও মুক্তির পথও নির্মাণ করেছেন, যেখানে তার অটুট মানসিক শক্তি এবং হারানো জীবন ও সম্মান পুনর্গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টা স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়েছে।

উপন্যাসটি সামাজিক পক্ষপাতদুষ্টতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত। নায়িকার এই সংগ্রাম তার ব্যক্তিগত সম্মান ও সমাজে নিজস্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বহুমাত্রিক এক বৃহত্তর আন্দোলনের প্রতীক, যা প্রতিটি সেই নারীর কণ্ঠস্বর বহন করে, যারা সম্মান, আত্মমর্যাদা এবং মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায়। 'বটতলা'র মাধ্যমে গঙ্গোপাধ্যায় কেবল একটি হৃদয়স্পর্শী কাহিনির সূচনা করেননি, বরং তিনি একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন — সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর, নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং ন্যায়বিচার ও সমতার সার্বজনীন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির আহ্বান। এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বার্তা গভীরভাবে অনুরণিত হয়, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নারীদের সমর্থন এবং ক্ষমতায়নের পথে আমরা সকলেই এক অভিন্ন দায়িত্বে আবদ্ধ। এর মাধ্যমেই একটি আরও ন্যায়সঙ্গত, মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের নির্মাণ সম্ভব।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মহুয়া', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬৩, পৃ. ৬৩

২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'বটতলা', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃ. ৩১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. তদেব, পৃ. ৪২

৪. তদেব, পৃ. ৮৭

৫. তদেব, পৃ. ১৪০

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’, সুন্দর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৩৫

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘বটতলা’, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃ. ২৫

৮. তদেব, পৃ. ৮৭

৯. তদেব, পৃ. ১০১

১০. তদেব, পৃ. ১৪২

১১. তদেব, পৃ. ২৬

১২. মিশ্র, আকাশ, ‘সাইবার ক্রাইমের গল্পে মধুমিতার দুর্বল অভিনয়! কেমন হল ‘উত্তরণ’?’, সংবাদ প্রতিদিন, January 27, 2022 7:52 pm

১৩. The viral India, facebook.com, 19.12.2024, Thursday, 07:17 am

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 508 - 513
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সমর দেবের ‘লোহিতপারের উপকথা’ প্রসঙ্গ : আধিপত্যবাদ ও অস্তিত্বের সংকট

দীপ্তি সাহা
অতিথি অধ্যাপক
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি
Email ID : dipti.saha00@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
struggle, supremacy, settlement, migrate, refugee, exploit, Bangladeshi.

Abstract
A custom has become very influential in human society over a long period of time. The rule is encroachment by force. The struggle for supremacy begins from here. According to this rule the powerful people inflict in human torture on common people. The writer Samar deb has written the novel about the chaotic life story of the Working-class people and their efforts to overcome it. Depicting the plight of the very common people sheltered by the suddenly rising the bed of rivers, their regular struggle in flood prone areas and struggle of supremacy with the indigenous people over the settlement of low caste destitute people who migrated to the riparian areas, being a minority in a different environment, they have to face various deceptions and neglect due to lack of proper identity cards. Attempts to classify the Bengalis of Assam as Bangladeshis, the ups and downs of their lives, their refugee problems are the main subjects of this novels. Due to the lack of fixed place for settlement, river grazing has finally become the only hope of these exploited people. The fate of homeless people has been shrouded in impenetrable darkness due to over-activity of powerful rich people. The struggling and sensitive life stories of the oppressed people are highlighted in this article.

Discussion

বহু ইতিহাস বহু জীবন কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্রাহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী গুয়াহাটি শহর। ব্রাহ্মপুত্রেরই আরেক নাম লোহিত। পুরো অসম জুড়ে এই নদী বিস্তৃত এবং তারই পার ঘিরে গড়ে উঠেছিল নানা জীবন। মায়ের আঁচলের ন্যায় সভ্যতাকে যুগ যুগ ধরে এই নদী লালন করে চলছে, অথচ এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পাপ, অকর্তব্য।

> “যা কিছু গর্হিত তার প্রতি মানুষের অমোঘ আকর্ষণ। এই আকর্ষণ থেকে জন্মাচ্ছে লোভ। লোভ থেকেই কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য। নাহলে জন্মদাত্রী, স্তন্য দায়িনীকে কেউ হত্যা করতে পারে? পাপ, ঘৃণ্য পাপ। যা করা অনুচিত, সে কাজই পাপ।”[১]

এই পাপের ফলস্বরূপ দেখা যায় কিছু অমানবিকতার রূপ। এর পরই সৃষ্টি হয় সাধারন কিছু মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করার পালা। উল্লেখিত উপন্যাসটিতে গুয়াহাটি শহরের পাণ্ডু অঞ্চল এলাকার এক বস্তির কিছু সাধারণ মানুষের নানান সমস্যা তাদের জীবনকাহিনীর দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে। এই বস্তির মানুষগুলোর জীবনকথা বলতে গিয়ে এখানে দেখা যাচ্ছে সেই সমাজে প্রচলিত সুবিধাবাদী লোকেদের রাজনীতি, অর্থের লোভে এবং ক্ষমতার ভয়ে অন্ধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নিম্নবর্গের মানুষগুলোর উপর অমানবিক অত্যাচার, প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে তাদের বেঁচে থাকার লড়াই, তাদের অবৈধ সম্পর্ক উঠে এসেছে। খুব সাধারন মানুষগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলো প্রতিমুহূর্তে কীভাবে সংগ্রামমুখর হয়ে উঠেছে সেটাই এই নিবন্ধের প্রধান বিষয়।

আলোচ্য উপন্যাসের প্রায় সকলেই নিম্নবিত্তের মানুষ। সুবল পরেশ ঠিকাদারের কাছে কিছুদিন মিস্ত্রিগিরি করে, কোনো স্থায়ী কাজ তাদের নেই। সাধু, ধীরু, শনিয়া, রমেশ, গোপাল, দিলিপ রিকশা চালায়, মদনা চোলাই মদ ও চাট বিক্রি করে, চায়নার বাবা সব্জি বিক্রেতা, ইসমাইলের সিকিউরিটির কাজ করে। পরিবারের দুর্দশার জন্য সুবলের বউ ঠোঙ্গা বানায়, খুব কষ্টে তাদের দিন চলে। তাদের জীবিকার একরকম ব্যবস্থা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু থাকার জায়গার অভাব। বিশাল ধরিত্রীর বুকে তাদের এক কোনা জায়গা নেই। দেশ থেকে দেশান্তর হয়েও যে জায়গাটুকু নিয়ে তারা বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, সেই জায়গাটুকুতে সুবিধাবাদী লোকদের। এখান থেকেই শুরু হয় তাদের সংঘর্ষ। ফলে তাদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাদের নির্দিষ্ট কোনো কাজের ঠিকানা নেই, খেটেখুটে কোনোরকম যা রোজগার হয় তার থেকে মালিককে কিস্তির অংশ দিতে হয়। সারাদিনের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের বিনিময়ে সঠিক পারিশ্রমিক পায় না। সুবিধাবাদী লোকগুলো তাদের স্বার্থে গরীব মানুষগুলোর সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। পেটের দায়ে সমাজের ঘৃণ্যতম কাজগুলো করতে তারা বাধ্য হয়। এত কিছু সহ্য করার পর যখন উদ্বাস্তুর মত উটকো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তখন তাদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। এদের দৈনন্দিন জীবনকাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দেশভাগ ও উদ্বাস্ত সমস্যার মতো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশ বিভাজনের আগে এবং পরে যারা অসমে প্রবেশ করেছে তাদের অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনকাহিনী নিয়ে একটা সংকট উৎপন্ন হয়েছে,

> “কনে যামু, আমাগো তো যাওনের জায়গা নাই।”[২]

তাদের হাহাকার, আস্থাহীনতা এই কথাটির মধ্যে বোঝা যায়। এই মানুষগুলোর আগে অনেক জমিজমা ছিল, গরু বলদ, চাষের জমি ছিল কিন্তু কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার কখনো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদের সেইসব ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করে। সব জায়গায় জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি। উপন্যাসের সবচেয়ে বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চরিত্র পরান বলে –

> “দ্যাশের বাড়িতেও কামড়াকামড়ি আছিল। সাতচল্লিশের কামড়াকামড়ি শুধু না। তারও আগে, অনেক আগেও ছিল জমি নিয়া কাড়াকাড়ি। তাই ইতিউতি জমির খোঁজে ছড়িয়ে পড়া। আসাম দ্যাশে জমিই জমিই।”[৩]

এই ভেবে তারা আসামের দিকে চলে আসে। কিন্তু আসামে এসেও যে তাদের জমি নিয়ে মারামারি, বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ ইত্যাদি হবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। অসমের সঙ্গেই যেহেতু বাংলাদেশ ভৌগলিক ভাবে যুক্ত ছিল তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে।

> “ব্রিটিশের শাসন কালেই যে রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল (১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ), সেই ‘অসম প্রদেশ’-এ শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অঙ্গীভূত ছিল।”[৪]

এছাড়া চাষ আবাদের জন্য, আহোম রাজাদের কর্মচারি নিয়োগে বরাক ও ব্রাহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষাভাষীদের প্রবজন করা হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে তারা যে এই দেশেরই মানুষ, পরে দেশ বিভাগ হয়। দেশের মানুষ একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতেই পারে কিন্তু এই বিভাজনের সুযোগ নিয়ে এই উপন্যাসে উল্লেখিত পরেশের মত কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ রাজনীতিকে হাতিয়ার বানিয়ে নিজেদের মুনাফা লুটে নেওয়ার কথা ভাবে। সে তার ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রচুর টাকা অর্জনের স্বার্থে বস্তির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকদের সরিয়ে সেখানে ফ্ল্যাট বানিয়ে বিক্রি করতে চায়। টাকার লোভের বশবর্তী হয়ে সে বস্তির লোকেদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালায়।

বহুদিন পুরনো এই ঘটনার রেশ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে মানুষকে প্রমান দিতে হচ্ছে তারা আদৌ বাংলাদেশি না ভারতীয়। বস্তির অনেকেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের অনেক আগেই এসেছিল। তাদের বাপ ঠাকুরদার দলিলও আছে, যখন এসেছিল তখন তো দেশ একটাই ছিল।

> "থলুয়া মানুহর মাটি বাড়ি কাড়ি লইছে ধনী মানুহ।"[৫]

প্রথমে বাংলাদেশি বলে বস্তির লোকেদের উচ্ছেদের চেষ্টা করে, তাতে সে সঠিকভাবে সফলতা পায়না। এরপর বস্তিতে আগুন লাগিয়ে বস্তির মানুষদের উচ্ছেদ করার কথা ভাবে। দেশভাগের আগে যারা আসছে তারা নাহয় একি দেশের বলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এসেছে। কিন্তু যারা দেশভাগের পরে এসেছে, তারা বহু বৎসর দেশে থাকার পরও সঠিকভাবে নাগরিকত্ব পায়নি, বা তারা এই ভাগাভাগির বিষয়টাকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বিচার করতে যায়নি। যে যখন যেখানে খুশি হয়েছে, সুযোগ সুবিধা হয়েছে থেকেছে। প্রকৃত প্রমান পত্র লাগবে বলে সেইভাবে জোড় দিয়ে ভাবেনি তাই উপন্যাসের এক চরিত্র ধিরুর উক্তির মাধ্যমে তা স্পষ্ট বোঝা যায় সে বলে –

> "আমার বাবা দ্যাশ ভাগ হওনের পর আইছিল। অন্তত পঞ্চাশ পাঁচপান্ন বছর হইব। আমাগো জন্ম তো এই দ্যাশেই। বরপেটায় আসিলাম, নওগাঁয়ে আসিলাম। বানে সব ভাইস্যা গেল গতিকেই না আমাগো ব্যাকটিরে লইয়া বাবা এইহানে আইসে। তাও ধরো গিয়া বিশ বচ্ছর হইব। কী অশান্তি কও দেখি।"[৬]

একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ গরীবদের উপর অত্যাচার করে চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে তারা এখানে এসেছিল, কিন্তু এখানে এসেও তারা শান্তি পেল না। কিছু ক্ষমতালোভী দুষ্ট মানুষ তাদের বাংলাদেশি বলে মিথ্যা আরোপ চাপিয়ে দিল এবং এই অস্ত্রটাকেই তারা প্রয়োগ করে সমস্ত দেশি বিদেশি নির্বিশেষে সকল সাধারণের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল।

একদিকে ক্ষমতালোভী লোকেদের উৎপাতে এই রকম উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্যদিকে অসমে এসে যারা নিশ্চিন্তে থাকতে চেয়েছিল তাদের কাছে দেখা দিল নতুন এক সংকট। অসমে একসময় অসমীয়া ভাষা রক্ষার স্বার্থে ও ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য উচ্চবর্ণের অসমীয়া সমাজ অন্য সব ভাষাকে পেছনে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। গণআন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থেই প্রথমে বাংলাভাষী পরে বাংলাদেশি বিতাড়নের ঝোঁক তুলেছিল। তাছাড়া ১৯২১ সালে লাইন সিস্টেম চালু হওয়ায় এই আন্দোলনের একটা আইনসম্মত কারন ছিল। কিন্তু এতবছর পর যে কারনে বস্তির লোকজনদের তাড়িয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হলো তা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। অনেকে অবশ্য চর এলাকা থেকে এসেছে, তাদের জমির দলিল নেই, চরের জমির দলিল থাকার কথাও না, চর কখনো জেগে উঠে, আবার জল বাড়লে ভেসে যায়। অনেকের অবশ্য রেশন কার্ড, বিলো পোভারটি লাইন কার্ড আছে, তবে তাদের খুব জোড়াল প্রমাণ নেই। রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে।

> "...বছরের পর বছর ধরে অবৈধ বিদেশি প্রব্রজনের ধুয়ো তুলে ফয়দা লুটছে কিছু রাজনৈতিক দল, কিছু ক্ষমতাবান আর ক্ষমতালোভী মানুষ।"[৭]

পদে পদে তাদের অপমান অসম্মান করা হচ্ছে বাংলাদেশি বলে। ভিন্ন পরিবেশে সংখ্যা লঘু হওয়ায় তাদের এমনিতেই জনবল কম, তার মধ্যে সঠিক পরিচয়পত্রের অভাবে তারা সব দিক থেকে প্রতারিত হয়েছে। দেশান্তর হওয়ায় নিম্নবর্গীয় এই নিঃস্ব মানুষগুলোর বসতি নিয়ে, তাদের অস্তিত্ব নিয়ে সর্বদা প্রশ্ন উঠছে। আধিপত্যবাদে তারা চাপা পড়ে যাচ্ছে। প্রাপ্য পাওনাটুকু তাদের জোটে না। ছয় টাকার রিকশা ভারার জায়গা এক টাকা ভারা দিয়ে ধনীরা গরিবদের ঠকায়, প্রতিবাদ করলে বলে –

> "অই বাংলাদেশি। ক্যালা, দাঁত ভাঙি দিম। ললে লবি, নহলে এটা পয়সাও নিদিও।"[৮]

অসমের অসমীয়াই শুধু নয়, ধনী শ্রেনির বাঙালিও একইরকম ভাবে ব্যবহার করে বলে –

"দিমু না। কী করবি শালা? ঘর জ্বালায়া দেব। ক্যালা, বাংলাদেশির পুত। বেশি বাইরা গেছস। শুয়োর।"[৯]

ধিরু ভাবে কেন সবাই তাদের বাংলাদেশি বলে আখ্যা দেয়। আসলে আদিবসতি অসমীয়ারা ভেবেছে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা তাদের আধিপত্য অসমেও বিস্তার করতে চলেছে। ফলে তারা বাঙালি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে। সেসময় শোনা যায় আইএমডিটি উঠে যাবে, পাণ্ডুর ঘরে ঘরে বিদেশি নোটিস দেওয়া হচ্ছে, এটা উঠে গেলে তাদের দলকে বর্ডারে ছেড়ে দেওয়া হবে, নলবাড়িতে ট্রাইবুনালে হাজির হয়ে প্রমাণ দিতে হবে। অস্তিত্বের এই সংকট তাদের একেবারে ভেতর থেকে ভেঙে দিয়েছে। পরচয়হীন হয়ে বেঁচে থাকার এই পরিণতি যে তাদের পক্ষে কতটা কষ্টকর শুধু তারাই বোঝে। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে নিজেদের বাড়িঘর হারানোর একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। দেশভাগের ফল যে মানুষের কতটা সর্বনাশ করেছে তা ভাবা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ও বরাক উপত্যকায় যারা চলে গেছে, তাদের একরকম ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের দুর্গতির শেষ নেই।

এই অমানবিক অত্যাচারই শুধু নয়, অস্তিত্বের সংকট ও আধিপত্যবাদ তাদের ব্যক্তিগত জীবনগুলোকেও বহুভাবে প্রভাবিত করে। আলোচ্য উপন্যাসে এরকম বহু চরিত্র রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। খুব সাধারন মানুষ যারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে নিজেদের কোনোরকম আয় - উন্নতি করতে পারছে না তারা একদিকে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করছে অন্যদিকে নিজেদের জীবনকে সুরক্ষিত করার জন্য নীতিগত দিক সব ভুলে বৈধ অবৈধ নির্বিশেষে সম্পর্ক গড়ে এগিয়ে চলছে। অভাব, দারিদ্র্যতা যে কত বড় অভিশাপ তা উপন্যাসে উল্লেখিত চায়নার জীবন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শুধুমাত্র দুশো টাকার জন্য চায়নার স্বামী কিপা তাকে এক পাঞ্জাবি ড্রাইভারের কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন সে গর্ভবতী থাকায় সে তাকে আর ভোগ করার সুযোগ পায় না। দুটো বাচ্চার কথা ভেবে এক স্কুলমাস্টার শইকিয়ার বড় ছেলের সঙ্গে চায়না শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এরপর যখন তার ছোট ছেলেটা হয় তখন লোকটা বিয়ে করে নেয় অন্য মেয়েকে, কিছুদিন তাদের সম্পর্ক বজায় থাকলেও বেশি দিন আর সম্ভব হয় না। তবুও লোকটা নিজের মাকে বলে ঘরের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল, মাঝে মধ্যে দশ বিশ টাকাও দিত, কিন্তু এভাবে আর কতদিন। এভাবে চারটি পেট পালা তার সম্ভব ছিল না বলে চায়না তার তিন সন্তানসহ বাপের বাড়িতে চলে আসে। অল্পবয়সী একটা মেয়ে যার বান্ধবীরা হয়তো এখনও উচু ক্লাসে পড়ছে, আর সে পরিস্থিতির শিকারে প্রথমে ভিখিরি ও পরে বেশ্যাতে পরিণত হয়েছে। তার মা পুঁটি এমনি নিজের অভাবের সংসার নিয়ে জর্জরিত, তার মধ্যে আরও চারটি পেট এসে জুটেছে, নিজের জন্য রাখা বাসি ভাত চায়নার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে লঙ্কা দিয়ে মেখে দিয়ে দেয়, তারা তাই খুব তৃপ্তি সহকারে খায়। চায়না এই অভাবের জন্য সরষের মিলে কাজ করে, সরষের দাম বেড়ে যাওয়ায় মিলের ম্যনেজার অনেককে ছাটাই করে দিতে চায়। চায়না তিন সন্তানের দোহাই দিয়ে কাজটা বজায় রাখতে চাইলে ম্যনেজার এর পরিবর্তে তার শরীর ভোগ করতে চায়। তাকে কাজে বহাল রাখার আস্থা দিলেও শেষে ভোগ করে তাকেও কাজের থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। চায়নার নিজের শরীর বিক্রি করে পেটের দায়ে, বেঁচে থাকার তাগিদে ও টাকার প্রয়োজনে। চায়নার সঙ্গে মিলে কাজ করে হিদয়ের মা, সে প্রায়ই বলে –

"প্যাটের লাইগ্যাই তো। ভগবানে প্যাট দিছে গতিকে ক্ষুদা। প্যাট দিছে গতিকেই পয়দা।"[১০]

পেটের দায়ে মানুষ চরম নিকৃষ্ট কাজ করতেও বিরত হয়না। সমস্ত অন্যায়, অবিচার গালিগালাচ সব মেনে নিতে হয়। রমেন যখন নিজের সম্পর্কে মহেশের কাছে বেজন্মা গালি শুনে মদনের দোকানে এসে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলে তখন মদন নিজের মদের ব্যবসার খাতিরে সবটা মানিয়ে নিয়ে বলে -

"'বুঝলা না, ব্যবসা করা আর ব্যাশ্যা হয়া একই। সগগলেই আমার খরিদ্দার। কেউ আমার পর না। তার রাগ করলে চলে না। পেটের দায় গো।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধিরুকে রিকশা ভারা কম দেওয়ায় পুলিশের উপস্থিতিতে যে ঝামেলার সৃষ্টি হয় তখন লোকটি নানারকম বাজে গালিগালাচ করে ছয় টাকার পরিবর্তে পাঁচ টাকা দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় এরকম গালিগালাচ খেয়েও সব হজম করতে হয়। ধিরু নিজেকে সান্তনা দিয়ে বলে –

> "গরীব মানুষ। 'আমগো উপায় কী? পরিস্থিতি না বুঝে মুখ খুললে বিপদেও পড়তে হয়। কিল চরও জোটে।' আর তখনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে – 'আর চালাইমু না রিকশা। সব শালা খানকির বাচ্চা।'"[১২]

শুধু এই পর্যন্তই, পরদিন সকালেই সে আবার রিকশা নিয়ে বেড়িয়ে পরে কারন মালিককে কিস্তির বিশ টাকা রোজ দিতে হয়। আর এই অসহায়তার সুযোগ নেয় পরেশের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন স্বার্থপর ধনী মানুষ। শনিয়ার মত বস্তির এক নিরীহ ছেলেকে চুরির অপবাদে পুলিশকে দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধম মার দেওয়ায়। এই অমানবিক প্রহারের ফলে ছেলেটি পরে মারা যায়। বস্তির লোক আপসোস করে বলে –

> "হ্যায় মইরা বাঁইচা গ্যাছে। আমাগো তো মরণ নাই। মাইনষের লাথি ঝ্যাঁটা খাইয়া বাঁইচা রইছি।"[১৩]

বস্তির সকলের মধ্যে একটা ভীতি সৃষ্টি হয়েছে যে প্রথমে শনিয়াকে পরিকল্পনা করে মারা হয়েছে, এরপর হয়তো অন্য কাউকে মারবে, নয়ত বাংলাদেশি বলে ধরে নিয়ে যাবে, আর এখন শোনা যাচ্ছে বস্তিতে আগুন লাগিয়ে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে। প্রতিমুহূর্তে তাদের হাজার সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। হরেন মাস্টার তাদের সচেতন করে দেয়, তারাও এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। অসমীয়া রিকশাওয়ালা দিলীপ হরেনকে সাবধান করে বলে –

> "মাস্টার চাবো দেই, আপোনার বিপদ হবো পারে, মোরও।"[১৪]

থলুয়া মানুষ হয়েও সে কিন্তু তার সমপর্যায়ের মানুষের ভালো চায়। পরানের ছেলে সুবল মাফিয়া পরেশের নির্দেশ অনুযায়ী রাত্রে বস্তিতে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করে। সুবল নিজেও এই বস্তির লোক হয়ে পরেশের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয় কারন তা নাহলে তার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষে সেও পরেশের কাজ প্রত্যাখ্যান করে। সে বুঝতে পারে বস্তির মানুষগুলো তার নিজের মানুষ, তাদের সঙ্গে সে বেইমানি করতে পারেনা। বস্তির ঘোর শত্রুর দয়ায় বেঁচে থাকার গ্লানিবোধ তাকে খারাপ কাজের সঙ্গী হতে বাধা দেয়।

> "অনেক ভাবছি। বস্তির সগ্গলের লগেই থাকুম। কাম কইরাই তো খাওন লাগব, কাম কইরাই খামু। হেই খানকির পুতের কাম করুম না।"[১৫]

যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে একসময় তারা ফিরে দাঁড়ায়, প্রতিবাদী সুর তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। এত সংঘর্ষের পরও এই মানুষগুলো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছে। প্রতিপদে অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রতারিত হয়েও নতুন ভাবে বেঁচে থাকার আশা করেছে। এক সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় প্রাণের বীজ বপন করে গেছে। সুখে থাকার তাগিদ তাদের বৈধ অবৈধ নির্বিশেষে সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার রসদ যুগিয়েছে, লড়াই করার শক্তি দিয়েছে। ধিরুর বউ শ্যাফালিরমা হওয়ার সাধ ধীরু পূর্ণ করতে না পারায় সে ইসমাইলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। এরপর সে জীবনকে নতুন রূপে দেখতে চায়, যেখানে কারও আধিপত্যের বিস্তার থাকবে না, যেখানে তারা স্বাধীন ও মুক্তভাবে থাকতে পারবে, যেখানে তাদের অস্তিত্বকে বিরাট ভাবে মান্যতা দেওয়া হবে সেই আশার বাঁধ তৈরি করে সে ইসমাইলের সঙ্গে সদ্য জাগরিত নদীর চরে গিয়ে নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করে। এই আধিপত্যবাদের আশায় শ্যফালি একদিকে জীবনের নতুন পথের আশ্রয় নেয়। ইসমাইল ও আরেকভাবে নিজের অস্তিত্বকে প্রমান করতে চায়। অর্থসম্পন্ন মানুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অসফল ছেলে হিসেবে নিজের বাড়ি থেকে বিতারিত হয়ে এবার সে নিজের রাজত্ব গড়ে তুলতে চেষ্টা চালায়। আধিপত্যবাদের নেশা মানুষকে কীভাবে আমূল পরিবর্তন করে দেয় তা ইসমাইলকে দেখলে বোঝা যায়।

এই আশা এক নেশার মতো কাজ করে যার ফলে বস্তির অনেকে এর কবলে পড়ে। মদন তার একমাত্র মেয়ে টিকুর মৃত্যুর পর আবার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে তার স্ত্রী জবার শরীরে প্রাণের বীজ বপন করে। চায়নাও সর্দারের খুনী দাস

সরকারের সঙ্গে পুনরায় নতুন করে বাঁচার চেষ্টা চালায়। বস্তির মানুষের কষ্টে একসময় ভেঙ্গে পরা হরেন মাস্টার সঙ্গীতার দেহের উষ্ণতায় আবার সতেজ হয়। এরা প্রত্যেকে নিজেদের অস্তিত্বকে এক স্বাভাবিকরূপ দেওয়ার জন্য কেউ সমাজের সঙ্গে, কেউ নিজ বিবেকের সঙ্গে সংগ্রাম করে। পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিনিয়ত লড়াই করে।

প্রতিদিনের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এদের মধ্যে কয়েকজন অন্য ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। বস্তির এই হাহাকার, জীবনের এই অনিশ্চয়তা আর মেনে নেওয়া যায়না। ইসমাইল হয়ে উঠে এই ভিন্ন পথের কাণ্ডারি। ব্রহ্মপুত্রে জেগে ওঠা চরে সে বসতি স্থাপন করতে চায়। সেখানে বিশাল ভূখণ্ড মাইল মাইল তার বিস্তার। চারপাশে উত্তাল জলের সর্বনাশী স্রোত আর মাঝখানে চাষবাস, হাটবাজার, মানুষজন, গরুছাগল, হাঁসমুরগী নিয়ে বসবাস হয়তো মদনের কাছে অবিশ্বাস্য ছিল কিন্তু ইসমাইলের বিশ্বাস পোড়ো জমিতে চাষবাস করে বসবাসের যোগ্য করে তোলা সম্ভব। মদন তাই পরের দিকে ইসমাইলের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে চরে চলে যেতে রাজি হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের পরিণতির সঙ্গে এই উপন্যাসের পরিণতির অনেকটা মিল পাওয়া যায়। সব বাঁধা বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে সমাজবর্জিত মানুষগুলো নতুন আশায় ঘর বাধতে চায়। তারা জানে হয়তো যেকোনো মুহূর্তে তাদের চরের বসতি নদীর নীচে চলে যেতে পারে। প্রায়ই বস্তির কিছু ঘরের একেবারে দোরগোড়ায় জল এসে উপস্থিত হয়। সুবলের বাড়ি থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। এখানেও হয়তো তাদের নানান সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হতে পারে, তবে আধিপত্যের প্রকোপ থেকে তারা বেঁচে যাবে। স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। জলে তাদের ঘর ভেসে গেলেও তাদের আপত্তি নেই তথাপি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে নিজেদের অস্তিত্ব খোয়াতে তারা রাজি নয়। এই সত্তা-সংকট তাদের অদম্য সাহসী করে গড়ে তুলেছে। এই সাহসে সাহসী হয়ে এক শুভ আকজ্ঝায় জীবনের অনির্দিষ্ট যাত্রা পথে তারা এগিয়ে গেছে।

Reference:

১. দেব, সমর, 'লোহিতপারের উপকথা', প্রথম সংস্করণ ২০১০, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি - ৫, পৃ. ২০
২. দেব, সমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
৩. ঐ, পৃ. ২১৫
৪. সেনগুপ্ত, ড. জ্যোতির্ময়, 'আখ্যানের সন্ধানে ব্রাহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস', PRAG CONSILIENCE/ vol.4, no.1/ August 2019, পৃ. ১১৮
৫. দেব, সমর, 'লোহিতপারের উপকথা', প্রথম সংস্করণ ২০১০, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি - ৫, পৃ. ৭৩
৬. ঐ, পৃ. ১৭
৭. ঐ, পৃ. ১৪২
৮. ঐ, পৃ. ১৮
৯. ঐ, পৃ. ১৯
১০. ঐ, পৃ. ১৩৫
১১. ঐ, পৃ. ১০৮
১২. ঐ, পৃ. ১৮
১৩. ঐ, পৃ. ১৫৬
১৪. ঐ, পৃ. ১৮৮
১৫. ঐ, পৃ. ২১৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 514 - 524
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শহীদুল জহিরের ‘মুখের দিকে দেখি’ : জাদু বাস্তবের অন্বেষণ

দেবদীপ দাস
গবেষক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ
Email ID : debodeep.das1993@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Magic Realism, Classification, Sahidul Jahir, Mukher Dike dekhi, Bangladesher Maquez.

Abstract
What is ‘Magic Realism’? What is the source of ‘Magic Realism’? Who did first use this term? Is there any manifesto of it? What is ‘Baroque’ asthetics? Classification of ‘Baroque’. Similarities between ‘Baroque’ and ‘Magic Realism’. Why did ‘Magic Realism’ boom in 20th Century, just after of first world war? I have searched and analysed so many of question of like these in this article. I also discussed difference between fairy tales and magic realism, the difference between absurd and magic realism. J. A. Cuddon gave some characteristics of magical realism in the book named ‘Dictionary of Literary Terms and Literary Theory’. I tried to give example of this characteristics. There is a novel of renowned novelist Sahidul Jahir named ‘Mukher Dike dekhi’. At first i have discussed the story of this novel in brief, then started to analyse it with a magnifying glass. He is not only tell a story with a fuzzy vision but also describes it with a hazy outline. The style of story-telling is very much unpredictable. In this area he is a unique guy in whole Bengali literature. No one like him ever come in whole era of Bengali literature. Why I am telling this? Anybody can get his answer after reading my analytical approach. He is very much deserved the praise, that is ‘Bangladesher Maquez’ or ‘Marquez of Bengladesh’, from my aspects it is not only for Bangladesh but also for ‘Bengali Literature’

Discussion

ফখরুল আলম লেদু মামুনের বাড়িতে গিয়ে মামুনকে সেখানে পায় না। লেদু মামুনের মাকে মামুনের বাড়িতে না থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে। অন্যান্য রীতির বা সরল কথনধর্মীতার উপন্যাস হলে জোবেদা রহমান সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দিতেন; অর্থাৎ তিনি যদি জানতেন মামুন কোথায় গেছে এবং তিনি যদি সে বিষয়ে প্রকাশেচ্ছু হতেন তাহলে সেটা সরাসরি জানিয়ে দিতেন এবং তার যদি ওই প্রশ্নের উত্তর না জানা থাকে বা তিনি প্রকাশেচ্ছু না হন তাহলে তার উত্তর দিতেন না

অথবা এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু শহীদুল তাঁর আখ্যানে কুহকময় ভাষায় পাঠককে স্বচ্ছন্দ হতে দেন না। তিনি এই পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে -

> "মামুনের মা হয়তো জানে সে কই গেছে, অথবা হয়তো সে জানে না, সে হয়তো বলে, জানি না কই যায়, অথবা হয়তো বলে, অয়তো গেছে কাঠের ভুসি আননের লাইগা।"[১]

এই কথনধর্মীতা 'মুখের দিকে দেখি' সমগ্র উপন্যাস জুড়েই আছে। তার ফলে পাঠক নিশ্চিন্তে যে কোন একটি নির্দিষ্ট পাঠে স্থির থাকতে পারে না। পাঠক সাবধানি হলে তবেই এই দোলাচলতার মাঝখানে মূল কাহিনিদের চিহ্নিত করতে পারবে। শহিদুল সর্বদা তাঁর গদ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে একটু ররহস্যাবৃত ভাষা কাঠামো ব্যবহার করেছেন। গল্প হোক বা উপন্যাস 'অথবা', 'হয়তো', 'বা', 'কিংবা' – ইত্যাদি শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের দ্বারা কতকগুলো সম্ভাব্য বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে সেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বা সেগুলোকে বাতিল করে কাহিনিকে বা আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আহমদ মোস্তফা কামালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন —

> "এইসব অপশন দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে রাখা। জিনিসটাকে যদি আপনি ছবি মনে করেন তাহলে বলব, ছবির আউটলাইনটাকে একদম ক্লিয়ার না করা, ফটোগ্রাফিক না করা, একটু ফাজি রাখা। অর্থাৎ ছবিটাকে আমি একটু ঝাপসা রাখতে চাই।"[২]

ফ্রাঞ্জ রো ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে র্মানিতে ভ্যানগগের একটি চিত্র প্রদর্শনী দেখে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। সেই চিত্রে আপাত বাস্তবের অন্তরালে জীবন রহস্যকে ধরবার প্রয়াস ছিল। 'জাদু বাস্তব' কী তা এক কথায় বলা শক্ত। কোন লেখক হয়তো জাদু বাস্তবের কোন এক প্রবণতা ব্যবহার করলেন প্লটের বিশেষ প্রয়োজনে কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা অন্য প্লটে জাদু বাস্তব হিসাবে গ্রহণ নাও হতে পারে —

> "…that was to remain a hallmark of magical realism although the elements within the equation would not remain constant and the relationship between those Elements would also change."[৩]

এই প্রয়োগগত ভিন্নতা 'জাদু বাস্তব' নামক শিল্প আন্দোলনের বোধকে জটিল করে তুলেছে। 'জাদু বাস্তব' এই আখ্যাটিতে আছে দুটি বিপরীত শব্দের সমাবেশ — 'জাদু' ও 'বাস্তব'। বিপ্রতীপ এই দুটি বিষয়ের পাশাপাশি সহাবস্থান 'জাদু বাস্তব' আখ্যাটিকে প্রতর্কিত এবং একই সঙ্গে আলোচনার পরিসরকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

'জাদু বাস্তবতা' বিষয়টা কী, তা জানবার আগে Magic Realism নামটির বা আখ্যাটির পূর্ব ইতিহাসটা জেনে নেওয়ার প্রয়াস করি।

জার্মান শব্দ 'Magicher Realismus' থেকে এই শব্দটির উৎস। তারপর স্পেনীয় ভাষায় 'Realismo Magico' এবং তারও পরে ইংরেজি 'Magic Realism' শব্দটি শিল্প আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। অন্যমতে 'Lo real maravilloso' থেকে অনূদিত হয়ে গড়ে ওঠে ইংরেজি শব্দ 'Marvellous Realismo' এবং 'Marvellous Reality'. পরে স্পেনীয় 'Realismo Magico' থেকে গড়ে ওঠে ইংরেজি 'Magical Realism' শব্দটি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালে জার্মানিতে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, হিটলার ও অন্যান্য বাম-ডানপন্থী দলগুলির মধ্যে তীব্র লড়াই, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিপ্লবী কার্যকলাপে তৈরি হয়েছে জাতীয় সংকট, জোট সরকার এই অরাজকতা দমনে ব্যর্থ; এই পরিস্থিতিতে শিল্পীরা সুভদ্র বস্তুগত বিচার ও প্রকাশবাদী মানবিকতা এবং যুক্তিবিচারে আস্থা না রাখতে পেরে দ্বিধান্বিত, শঙ্কিত। ফ্রাঞ্জ রো এই সময় উল্লিখিত চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যে পরা বাস্তববাদী চিত্র তথা শিল্পের থেকে ভিন্ন তা প্রকাশ করতে গিয়ে 'Magic Realism' বা 'জাদু বাস্তব' শব্দটি ব্যবহার করেন। অবশ্য Lois Parkinson Zamora তাঁর 'Swords and Silver Rings : Magical Objects in the work of Jorge Luis Borges And Gabriel Garcia Marquez' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন রো-এর পূর্বে দার্শনিক নোভালিস ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধিজীবী সমাজে 'Magical

Realist' শব্দটির পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিক হেনরিখ উলফিনও ফ্রাঞ্জ রো-র পূর্বে এই দুটি শব্দের সহাবস্থানের কথা জানিয়েছিলেন। ১৯১৫ - ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ, এই সময়ে ফ্রাঞ্জ রো ও হেনরিক উলফিন একসঙ্গে মিউনিখে পড়াশোনা করেছিলেন। Zamora তাঁর প্রবন্ধে জানাচ্ছেন —

> "According to Wolffin, the play of contradictions is inherent in Baroque aesthetics, whether in the tension between nature and artifice, sensuality and spirit, absence and abundance, surface and depth or, I am tempted to add, magic and real."[8]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বারোক' শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে তিনি দুটি উৎসের কথা বলেছেন —

ক. পর্তুগিজ 'বাররোকা'
খ. লাতিন 'ভেরুরভা'

পর্তুগিশ 'বার্‌রোকা' শব্দের অর্থ মুক্তোর প্রোজ্জ্বল ও বহুদ্যুতি বিচ্ছুরণ। অন্যদিকে লাতিন 'ভেরুরভা' শব্দের অর্থ কোন উৎরাইয়ের শিখর থেকে নেমে আসা ঢাল। 'বারোক' রচনারীতির বৈশিষ্ট্যগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক —

১. মূল রচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে থাকে উৎপ্রেক্ষা ও রূপক।
২. সময়ের গতি নিয়ে জট পাকানোর এক আজব খেলা সমগ্র লেখা জুড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
৩. কাহিনির মধ্যে থাকে নাটকীয় পরিস্থিতি ঘোরপ্যাঁচ এবং এক অন্তর্লীন বিশ্ববীক্ষা।
৪. শ্লেষ, পরিহাস ও উপমায় পরিপুষ্ট হয় কাহিনি।
৫. কল্পনার বিস্তার আর বাস্তবের মিশেলে কাহিনি হয়ে ওঠে আপাদমস্তক রহস্যময়।
৬. সময়ের সমস্ত আপাত বিরোধী সম্ভাবনা বারবার উঠে আসে লেখার মধ্যে।
৭. চরিত্রগুলির অনুভূতির তাড়নায় কাহিনী হয়ে ওঠে অনন্যসুন্দর।
৮. সবশেষে সমস্ত চরিত্র, নাটকীয়তা, সময়, পরিহাস এক স্থানে এসে মিলে যায়, পাঠকের মনে এনে দেয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।
৯. সুন্দর আর কদর্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা, ধর্মবোধের উৎসার ও যৌনতার প্রকোপ, তাৎক্ষণিক ও শাশ্বত সারাক্ষণ হানা দিতে থাকে লেখার মধ্যে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করেছেন আস্তুরিয়াস ও কার্পেন্তিয়ারের লেখায়।

চিত্রশিল্পের পর সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৪০-এর দশকে - এমনটা অভিমত জে.এ. কোডনের। জর্জ সাইকো ১৯৫২ সালে প্রকাশিত 'Die Wirkhichiet hat Doppelten Boden. Gendanken Zum Magischer Realismus' - গ্রন্থে Magic Realism - এর প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ইউরোপের পরিধির বাইরে লাতির আমেরিকার সাহিত্যে জাদু বাস্তবের চর্চা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতে থাকে। আর্তুরো উসলার পিয়েত্রি ভেনেজুয়েলার লেখক এবং আলহো কার্পেন্তিয়ার কিউবার সাহিত্যিক। লাতিনা আমেরিকায় জাদু বাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে এই দুই সাহিত্যিককে অগ্রণী হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার লুই বোর্হেসকেও একই সম্মানে অনেকে সম্মানিত করে থাকেন। জাদু বাস্তবধর্মী উপন্যাসের ধারায় আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি কলম্বিয়ান লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, আর্জেন্টিনার জুলিও কোর্তজার, ইতালির ইতালিও কেলভিনো, ব্রিটেনের জন ফাউলেস, জার্মানির গুন্টার গ্রাস, জাপানের হারুকি মোরাকামি, আমেরিকার টনি মরিসন, চিলির ইসাবেল আলেন্দে, ব্রিটিশ কিন্তু ভারতীয় বংশোদ্ভূত সালমান রুশদি প্রমুখ।

আমরা জাদু বাস্তবের তিনটি ইংরেজি আখ্যা লক্ষ্য করেছি — 'Magic Realism', 'Magical Realism' এবং 'Marvellous Realism', Maggie Ann Bowers - এই তিনটি বিষয়কে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'Magic

(AL) Realism' গ্রন্থে। এই তিনটি বিষয়কে আলোচনার মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। 'Marvellous Realism'-এর বিষয়ে বলতে গিয়ে ম্যাগি বলেছেন -

> "The distinguishing feature of 'marvellous Realism', for instance is that its fiction brings together the seemingly opposed perspectives of a pragmatic, practical and tangible approach to reality and an acceptance of magic and superstition…"[৫]

'মারভেলাস রিয়ালিজম' এর ক্ষেত্রে প্লটের বিষয়বস্তুতে থাকবে অতিপ্রাকৃত জাদুবিদ্যা, অন্ধবিশ্বাস; বাস্তবের সাথেই এরা অবস্থান করবে। অর্থাৎ আপাত বিরোধী দুটো বিষয় একত্রে অবস্থান করবে এখানে। অন্যদিকে 'Magical Realism' হল—

> "Magical realism which of all the terms has had the most critical consideration, relies most of all upon the matter of-fact, realistic tone of its narration when presenting magical happenings. For this reason it is often considered to be related to, or even a version of literary realism."[৬]

'ম্যাজিকাল রিয়ালিজম' নির্ভর করবে একান্তভাবে বাস্তবিক ঘটনাবলীর ওপর। এখানে বিস্ময়কর বা ঐন্দ্রজালিক ঘটনার উপস্থাপনাও হবে বাস্তবের পরিকাঠামোয়, বিস্ময়ের আশ্রয় নেওয়াটা এক্ষেত্র একটা স্বতন্ত্র শরীরকে অনুসরণ করা। বিস্ময় বা ইন্দ্রজাল হলো একটি আবরণ যার মধ্যে নিহিত থাকবে প্রকৃত বাস্তব। এই বাস্তব অনেকক্ষেত্রে রাজনীতিকে অনুসরণ করে। আবার 'Magic Realism' - এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে তিনি Magic শব্দটিকে কেন্দ্রে রেখে উক্ত দুটি বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন —

> "magic refers to the mystery of life (aspects of magic realism) : in marvelous and magical realism 'magic' refers to any extraordinary occurance and particularly to anything spiritual or unaccountable by rational science."[৭]

Magical Realism, Marvellous Realism এবং Magic Realism - এর তুলনামূলক এই আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপর নির্ভর করে জাদু বাস্তব, বাস্তবতার বিপরীত পিঠে তার অবস্থান নয়। ভৌতিক কাণ্ড, মানুষের উড়ে যাওয়া, ভালোবাসার স্পর্শ পেলে ফুলদানির রঙ বদলে যাওয়া, অতিলৌকিক দৃশ্যাবলী, রহস্যঘন পরিবেশ ইত্যাদি উপাদান জাদু বাস্তবধর্মী লেখকদের বাস্তবকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাসমূহের এক নান্দনিক রূপ। বহু পাঠকই রূপকথাধর্মী বা ফ্যান্টাসিমুখ্য সাহিত্যের সাথে 'জাদু বাস্তব'ধর্মী রচনার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। Joan mellen বেশ জোরের সাথেই বলেছেন যে ফ্যান্টাসি জাতীয় লেখা ও জাদু বাস্তবীয় লেখা পৃথক বিষয়, তারা স্বতন্ত্র। ফ্যান্টাসি জাতীয় লেখায় কল্পনার রাজ্যে পাঠক অবাধে বিস্তার করে ঠিকই, কিন্তু সেই কল্পনার রাজ্য জাদু বাস্তবের জগতের সঙ্গে এক হতে পারে না। জাদু বাস্তব অনেক বেশি পরিমাণে বিভিন্ন ধারার, বিভিন্ন আঙ্গিকে ভাবনার অবকাশ দেয়, সুযোগ করে দেয়। জাদু বাস্তবের লেখনীর অভিমুখ একটি নয়, তা বহুমুখী, বহুরৈখিক। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বিচার করা ঠিক হবে না। তবে এ কথা সত্য যে জাদু বাস্তবধর্মী লেখার মধ্যে ফ্যান্টাসির জগৎ স্থান পেতে পারে। Stephen M. Hart সম্পাদিত 'A Companion to Magical Realism' গ্রন্থের 'Part II : History, Nightmare, Fantasy' অধ্যায়ের Introduction - এ এই বিষয়টিই অন্বেষণ করেছেন —

> "does the fantasy in a magical-realist novel indicate the hallucinations of an artist who is in the process of retreating from the world around him?"[৮]

এই বহুমুখী ধারা জাদু বাস্তব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং দেবে, তা নিয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। অ্যাবসার্ডিটির সঙ্গেও জাদু বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলা যায় না। অ্যাবসার্ড নাটকে বা উপন্যাসে একটা সঙ্ঘবদ্ধ কাহিনি পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা স্যামুয়েল বেকেটের 'Waiting for Godot' - নাটকটিকে পেশ করতে পারি। আপাতভাবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটা যুক্তি বোধের অভাব এই ধরনের নাটকগুলিতে দেখা যায়, নিটোল কাহিনি প্রায় থাকেই না, নাটকের আঙ্গিক, তার সংরূপটাই এখানে মুখ্য। 'Waiting for Godot' - তে নির্দিষ্ট কোন কাহিনি নেই। মার্টিন এসলিন তাঁর 'Theatre of the Absurd' - গ্রন্থের 'Samuel Beckett : The Search for the Self ' প্রবন্ধে এই নাটক সম্বন্ধে লিখেছেন —

> " 'Waiting for Godot' does not tell a story, it explores a static situation. Nothing happens, nobody comes, nobody goes."[৯]

জাদু বাস্তবধর্মী সাহিত্যে কিন্তু ঘটমান বিষয়ে যুক্তিবোধের অভাব প্রায় দেখা যায় না। তার চেয়েও বড় কথা জাদু বাস্তবধর্মী সাহিত্যে একটি কাহিনি থাকে। তার মধ্যে একাধিক কাহিনির সূত্রগুলো জট পাকানো অবস্থায় থাকতে পারে, কিন্তু একটি কাহিনি পূর্বাপর বর্তমান থাকে।

কোন লেখনীর মধ্যে শুধুমাত্র জাদু থাকলেই তাকে জাদু বাস্তব লেখনীর আওতাভুক্ত করা যায় না। সেই জাদু বা মায়াজাল বা কুহক কোন অর্ন্তলীন জীবনবীক্ষার কথা বলছে কিনা তাও লক্ষ্যণীয়। জে.এ.কোডন, জন মেলেন, লুইস লিয়েল, ম্যাগি, স্টিফেন এম. হার্ট, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আলোচিত বিশেষত্ব, আমাদের মতে জাদু বাস্তবকে অনেকটাই চিহ্নিত করতে পেরেছে। তর্ক-বিতর্কের সুস্থ পরিবেশ 'জাদু বাস্তবতা' - কে আরো রহস্যমণ্ডিত করবে, আরো পরিণত হবে 'জাদু বাস্তবতা'র জগৎ, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জে. এ. কোডন 'Dictionary of literary terms and literary theory' গ্রন্থে জাদু বাস্তবের কিছু বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন, সেই বৈশিষ্টগুলির উদাহরণসহ বঙ্গানুবাদ করার চেষ্টা করা যাক —

১. বাস্তব, রূপকথা, উদ্ভটের মিশ্রণ বা সহাবস্থান। যেমন - গার্সিয়া মার্কেজের 'বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো' গল্পে একটি গ্রামের সাদামাটা জীবনে হঠাৎ একজন ডানাওয়ালা বৃদ্ধ এসে পড়লে সাধারণ গ্রাম্য জীবনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

২. চকিতে সময়ের পরিবর্তন হবে - এমন নৈপুণ্য। যেমন - শহীদুল জহিরের 'কাঁটা' গল্পে ভূতের গলির বাসিন্দারা প্রত্যেক দশকে একবার করে একটি নির্দিষ্ট হিন্দু দম্পতিকে খুন হতে দেখে। প্রত্যেকবার খুনের কারণ বদলায় কিন্তু প্রত্যেকবারই খুনের আদলটা এক থাকে। তখন তাদের মনে হয় তারা সময়ের একটি আবর্তে পড়ে গেছে এবং ঘটনাগুলো এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে পাঠককে সময় সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকতে হয়।

৩. কাহিনীর বিভিন্ন অংশ একত্র পাকানো থাকবে অর্থাৎ গোলকধাঁধাময় প্লট। যেমন - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'শত বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসে অনেকগুলি প্রজন্মের কাহিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে একটির সঙ্গে আরেকটির সূত্র পৃথক করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৪. স্বপ্নের সঙ্গে রূপকথা ও মিথের ব্যবহারও চলে আসবে। যেমন-আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস 'খোয়াবনামা'য় মুনসির শ্লোকে শ্লোকে লোকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বেড়ায় চেরাগ আলি। এই মুনসি মৃত, কিন্তু গ্রামের সবাই জানে কাৎলাহার বিল শাসন করে মুনসি বয়তুল্লা শাহ।

৫. প্রকাশবাদী বর্ণনা ও সুররিয়ালিস্টিক বা পরাবাস্তববাদী ধারণা স্থান পাবে। যেমন- মার্কেজের 'আলো, সে তো জলের মত' গল্পের দুই চরিত্র তোতো ও হোয়েলের আচরণকে পরা বাস্তববাদের কোঠায় রাখা যায়।

৬. রহস্যময় বা মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্য। যেমন - 'কর্নেলকে কেউ লেখে না' গল্পে সর্বদা একটা রহস্যঘন পরিবেশে যেন সৃষ্টি হয়ে আছে। উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র গল্পকে দেখলে লেখকের এই মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়।

৭. সহসা বা অতর্কিত চমকের আগমন। যেমন - 'কর্নেলকে কেউ লেখে না' গল্পে সর্বদা যেন একটা রহস্যঘন পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে আছে। উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র গল্পকে দেখলে লেখকের এই মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়।

৮. ব্যাখ্যাতীত ও আতঙ্কময় উপস্থিতি। যেমন - শহীদুল জহিরের 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসে একাধিক অতিলৌকিক বর্ণনা ব্যাখ্যাতীত ও আতঙ্কময় পরিবেশ রচনা করে।

উপন্যাসে ফিরে আসা যাক। 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মাওলা ব্রাদার্স' থেকে। এই উপন্যাসটি শহীদুল জহিরের জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। উপন্যাসটিকে লেখক কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের আবর্তে সম্ভবত বেঁধে ফেলতে চাননি। এখানে 'সম্ভবত' বলবার নির্দিষ্ট যুক্তি আছে। লেখক এক সময় থেকে অন্য সময় বলয়ে প্রবেশ করবার মুহূর্তগুলোকে ধূসর করে রেখেছেন। একই সময়ে একটি চরিত্র দুটি পৃথক জায়গায় পৃথক আচরণ করছে। আধুনিক বিজ্ঞানে 'প্যারালাল ইউনিভার্স' বা 'সমান্তরাল বিশ্ব' বিষয়ে যে গবেষণা চলছে তার সঙ্গে পাঠককে তিনি পরিচয় করাচ্ছেন। ইথান সিজেল তাঁর প্রবন্ধে জানাচ্ছেন -

> "you have likely imagined it before: another Universe out there, just like this one, where all the random events and chances that brought about our reality exactly as it is played out just the same."[১০]

উপন্যাসটিতে অনেক চরিত্র, তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু তাদের ক্রিয়ার গতি নির্দিষ্ট একটি অভিমুখে নয়, তাদের প্রত্যেকের স্বাধীন নিজস্ব একটা গল্প আছে, হতে পারে এই গল্পগুলো উপন্যাসের নির্দিষ্ট স্থানে এসে পরস্পর মিলিত হচ্ছে এবং তারা আবার আলাদাও হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গল্পগুলো প্রত্যেকে স্বাধীন থেকে যাচ্ছে। উপন্যাস শেষে লেখক এই চরিত্রগুলোর পরিণতির দায় যেন নিতে চাননি, সমগ্র উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মননকে ব্যস্ত রেখে উপন্যাসের শেষে এসে কাহিনির লাগাম পাঠকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এর ফলে প্রত্যেক পাঠকের কল্পনার জগতে, মননের জগতে একটা নিজস্ব পরিসর তৈরি হয় নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে কাহিনির পরিণতিকে নির্মাণ করবার।

উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ভূতের গলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে ভূতের গলির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, চরিত্রটি ভূতের গলির বাসিন্দা হোক বা না হোক ভূতের গলি তার জীবনের বিবিধ ঘটনার মধ্যে হঠাৎ করেই প্রবিষ্ট হয়ে যায়। লেখক নিজে এই ভূতের গলির বাসিন্দা ছিলেন। দু'চোখ মেলে এই স্থানের মানুষজন, জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, চাহিদা ইত্যাদি লক্ষ্য করেছেন আবাল্য। উপন্যাসে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই ভূতের গলির জীবন যাত্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন কুহক।

উপন্যাসের গাত্র আপাতভাবে খুবই জটিল, দুরূহ। একটা কাহিনির সাথে অন্য কাহিনিকে এমন ভাবে মেশানো হয়েছে যে আপাতভাবে মনে হবে কাহিনি দুটি অসংলগ্ন, তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট যোগসূত্র নেই, ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র নিজের মর্জি বশত দুটি ঘটনার মধ্যে জোর করে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে পড়লে এবং কাহিনী সূত্রগুলোকে পৃথক করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে তাদের যোগসূত্রটা নিবিড়, অসংলগ্ন নয়। পাঠকের কল্পনাকে নিয়ে লেখক এখানেও খেলা করবেন, উপন্যাসে বর্ণিত কোন বিষয়েই পাঠককে কোন একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতে দেবেন না। একটা ঘোর লাগানো কথনভঙ্গিতে সমগ্র উপন্যাস এগিয়ে যাবে এবং শেষপর্যন্ত পাঠক এই আবেশ থেকে মুক্তি পাবে না। কাহিনির গোলকধাঁধার মধ্যে পাক খেতে খেতে পাঠক লক্ষ্য করবে খ্রিস্টান মিশনারির গল্প, ক্যাথলিকের সঙ্গে প্রোটেস্টানের প্রেমের গল্প, মুক্তিযুদ্ধের কথা, খৈমনের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার গল্প, বাঁদরের দুধ খেয়ে বড় হয়ে ওঠা চান মিঞার জীবনযুদ্ধে হেরে সমাজ বিরোধী হয়ে যাওয়ার গল্প; সঙ্গে এও লক্ষণীয় মিসেস জোবেদা রহমানের পুত্র মামুন কিভাবে একই সময়ে দুই পৃথক জায়গায় যথাক্রমে মাহমুদ বা মামুন এবং খরকোস বা কুতুবউদ্দিন আইবেক হয়ে উঠছে, তাদের জীবনও দুটো পৃথক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; সব মিলিয়ে এ এক আশ্চর্য উপাখ্যান।

উপন্যাস শুরু হচ্ছে লেখকের বক্তব্য এবং কিছু ঋণ স্বীকার দিয়ে। সেখানে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন ‘মুখের দিকে দেখি’ উপন্যাসের বিষয়ে তিনি নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা দেবেন না। উপন্যাসের অন্দরে প্রবেশ করলে প্রথমেই যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে সে হলো চান মিঞা। মামুন বা মাহমুদের মা মিসেস জোবেদা রহমান মামুনের বন্ধু ফখরুল আলম লেদুকে বলে চান মিঞা বান্দরের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমেই যখন একটাই চরিত্রকে বিভিন্ন নামে ডাকা হচ্ছে এবং প্রথমেই এমন একটা উদ্ভট তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে তখনই পাঠককে সাবধানি হয়ে যেতে হয়।

মামুনের বাড়িতে গিয়ে লেদু যখন মামুনের খোঁজ করে তখন মামুন ‘দি নিউ চন্দ্রঘোনা স মিল অ্যান্ড টিম্বার ডিপোট’-এ যায় কাঠের ভুসি আনতে এবং কাঠের ভুসির গর্তে পড়ে ভুসির তলায় চাপা পড়ে যায়। সেদিন রাতে মিলের কুলিরা আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর চারটে ট্রাকে কাঠের ভুসির সঙ্গে মামুনকেও চাপিয়ে দেয় এবং মামুন সাতকানিয়ায় পৌঁছে যায়।

কুলিরা কি কাঠের ভুসি তোলার সময় বুঝতে পারিনি পারেনি যে কাঠের ভুসির সঙ্গে তারা মানুষকেও ট্রাকে তুলছে। এর এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক, একইসঙ্গে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণকে তুলে ধরেছেন –

ক. ‘ব্যাপারটা এভাবে ঘটে : এই চালাক বা বোকা কুলিরা ভুসি তোলার সময় অবশ্যই তাকে পায়, সে হয়তো অজ্ঞান হয়া ভুসির স্তূপের মধ্যে পড়ে ছিল, তখন তারা তাকে আবিষ্কার করে, কিন্তু কারখানার ভিতরে অন্ধকার থাকায়, কারণ তারা আলো জ্বেলে কাজ করতে পারছিল না, তারা টুকরির ভিতরে অজ্ঞান মামুনকে গোল করে ভরে একটা ট্রাকের মধ্যে ছুটে ফেলে দেয়।’

খ. ‘তাদের একবার মনে হয়, এটা হয়তো কাঠের টুকরো, এরকম ভাবা কিছু কঠিন না, তারা কুলির পোলা কুলি, তারা তাই ভাবে যে, কাঠের ভুসির ভিতরে যা পাওয়া যায় তা কাঠই, হয়তো দামি, কদম কিংবা ছাতিম, তথাপি হয়তো কাঠই।’

গ. ‘অথবা তারা হয়তো এই রকম ভাবে না, তারা হয়তো অতো বোকা ছিল না, হাত দিয়া ভুসি তুলতে যায়া তারা যখন সেখানে মামুনুল হাইকে পায়, অন্ধকার হলেও তারা বুঝতে পারে যে এইটা একটা মানুষ।’

ঘ. ‘তাদের মনে হয় যে, এটা হয়তো লাশ এবং তখন তারা তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, তারা একটা কথাও না বলে মামুনকে টুকরিতে তুলে নেয়া যায়া ট্রাকের ভিতর ফেলায়।’

ঙ. ‘‘তাদের মনে হয় যে এই বিষয় নিয়া এখন কথা বললে তারাই পুলিশের ঝামেলায় পড়বে, পুলিশ ওদেরকে এক হাজার একটা কথা জিগ্যাস করবে, হয়তো লাথি-গুঁতাও মারবে, তার চেয়ে মালিকের ভুসির ভিতরে পাওয়া মাল মালিকের ভাইয়ের ট্রাকের সঙ্গে চলে যাওয়া ভালো!’’[১১]

পাঠককে যখন লেখক পাঠ নির্মাণের এতগুলো বিকল্প দেন এবং এই ‘কাউন্টার লিনিয়ার ন্যারেটিভ’ সমগ্র উপন্যাস জুড়েই বর্তমান থাকে তখন পাঠককে মনোযোগী হতে হয় বৈকি।

এরপর মামুনের আখ্যানকে খানিক বিরতি দিয়ে শুরু হয় খৈমন বেগমে এবং ময়না মিঞার গল্প। এদের কাহিনিটিও রহস্যময়। ময়না মিঞা এবং খৈমন বেগমের ছেলে চান মিঞা। চান মিঞার বেড়ে ওঠার আখ্যান যেমন অদ্ভুত তেমনি খৈমন এবং ময়নার বিবাহ কাহিনিও অদ্ভুত। খৈমন চেয়েছিল তার স্বামী হবে পিয়ন বা হেড অফিসের দারোয়ান, তার জন্য তার বাবা-দাদা নিশ্চয় এরকম পাত্র খুঁজে এনে দেবে। কিন্তু ঘটনাসমূহের আকস্মিকতায় একদিন ভূতের গলির বাসিন্দারা দেখে ময়না মিঞার পেছনে পাড়ার একদল ছেলে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। এই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করে খৈমন, তাদের বিবাহ হয়, তাদের সন্তান চান মিঞার জন্ম হয়। তখন সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে। চান মিঞার জন্মের সময় খৈমনের বাবা এবং ময়না মিঞা নিখোঁজ হয়ে যায়, হয়তো পাকিস্তানি মিলিটারির গুলিতে মারা যায়। রাজাকার আব্দুল গনি খৈমনদের বাড়িতে এসে তার ভাই রফিজুলের কথা জিজ্ঞাসা করে, খৈমন তখন অন্ত:সত্ত্বা, রাজাকারদের সন্দেহ রফিজুল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পাকিস্তানি মিলিটারির বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছে। খৈমন বিভিন্ন ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে রাজাকারদের ঠেকিয়ে রাখে, কারণ সে জানে তারা যদি জেনে যায় তার ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা তাহলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাদের সবাইকেই মেরে দেবে। কিন্তু খৈমনের একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে এবং রাজাকার আব্দুল গনিকে জানিয়ে দেয় তারা স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থক। আব্দুল গনি জানিয়ে যায় যেদিন তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সেদিনটিই খৈমনের জীবনের অন্তিম দিন। তাই চান মিঞা ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলেও নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা প্রমাণ করার জন্য খৈমন নিজের পেটে কাপড়ের পুঁটলি জড়িয়ে থাকে। ফলত পরবর্তীকালে চানমিঞার নাম হয়ে যায় 'পোঁটলার পোলা'। খৈমনের মা জরিমন মারা গেলে চান মিঞাকে নিয়ে তার নতুন জীবন শুরু হয়। ভূতের গলির বাঁদররা চান মিঞার পরম বন্ধু হয়ে ওঠে। বাচ্চা চানকে ঘরে রেখে খৈমন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে কোন কাজে বের হলে ঘরে এসে দেখে বাঁদরেরা ঘরের ভেতর ঢুকে তার সঙ্গে খেলা করছে, এমনকি একটা মাদি বাঁদর চান মিঞাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। এই খবর পাড়ায় ছড়িয়ে গেলে চান মিঞার নতুন নামকরণ হয় 'মাঙ্কি বয়' -

> "খৈমন হয়তো চান মিঞাকে মাইর লাগানোর হুমকি দেয়, বলে, ঘরের ভিতর বন্দর লইয়া ফালাফালি করলে মাইরা তোরে ফাটামু, কিন্তু বান্দররাই চানমিঞার বড় বন্ধু হয়া খাড়ায়, মাইরা ফাটানোর কথা বলায় বুড়া হুলাটা এসে খৈমনকে ভেংচি দিয়া ভয় দেখায়; তিন-চাইর-পাঁচ প্রজন্মের পঞ্চাশটা বান্দর তার খেলার সাথী হয়ে পড়ে এবং এই সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে।"[১২]

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে চান মিঞাকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ায়। চান মিঞা পড়াশোনায় ভাল ফলাফল করে, কিন্তু এই সময় যখন তার শারীরিক সক্ষমতার ডাক্তারি পরীক্ষা হয় তখন ভাগ্যের ফেরে সে জানতে পারেনা সে একজন বর্ণান্ধ, এই ঘটনায় তার জীবনে নেমেসিস হয়ে দেখা দেয়। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বাচ্চাদের কাছে সে অপমানিত - অপদস্থ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং পরবর্তীকালে ঢাকার বিখ্যাত গাড়ি চোর হয়ে ওঠে। তাদের ক্লাস টিচারের মেয়ে জুলি গাড়ি চোর চান মিঞার প্রেমে পড়ে এবং চান মিঞা তার জন্য একটি চেস্টিটি বেল্ট বানিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে জুলি যাতে কারো সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতে না পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। অবশ্য এই বুদ্ধি তাকে জুলিই দিয়েছিল। জুলি এই ধারণাটি পেয়েছিল গাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেজের 'ডেথ কনস্ট্যান্ট বিয়ন্ড লাভ' গল্পটা পড়ে। শহীদুল জহির গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের কথাসাহিত্যের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, জুলির এই আচরণ তারই সাক্ষ্য বহন করে। জুলি ও চান মিঞার সূত্র ধরে একটি বিশেষ 'নিষেধ' - এর মাধ্যমে মিসেস ক্লার্কের বংশে প্রবেশ করতে হয়। জুলিকে তার মা মিসেস ক্লার্ক নিষেধ করেছিলেন কোন পুরুষ যদি তাকে কখনো কলা খেতে দেয়, তা যেন সে কখনো না খায়। জুলি তার মায়ের এই নিষেধ মানেনি, মোট দুবার সে নিষেধ অগ্রাহ্য করে করে চান মিঞার দেওয়া কলা খেয়েছে। ফলত তাদের বংশে পূর্বে যা ঘটেছিল কাকতালীয়ভাবে একই রকম ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

মিসেস ক্লার্কের পূর্বপুরুষ ছিল বাঙালি খ্রিস্টান, ঠাকুরদার নাম মিহির কান্তি দাস, তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন। মিহিরকান্তি দাসের দুই মেয়ে, লাবণ্যপ্রভা ও বিদ্যুন্মালা। মিহিরকান্তির স্থানীয় ক্যাথলিক ফাদার চার্লস ডিসুজার সঙ্গে আলাপ হয়, তারপর ডিসুজা প্রায়ই তাদের বাড়ি আসতে থাকে। সে ছোট বোন বিদ্যুন্মালার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতো, আবার লাবণ্যপ্রভা আকর্ষণ অনুভব করতো ফাদার চার্লস ডিসুজার প্রতি। এভাবে তাদের এক ত্রিকোণ প্রেম গড়ে ওঠে। এরই মধ্যে একদিন চার্লস ডিসুজা লাবণ্যপ্রভাকে বঞ্চিত করে বিদ্যুন্মালাকে একটা কলা খেতে দেয়। এই ঘটনায় লাবণ্যপ্রভা ক্ষুন্ন হয় এবং সে চার্লস ডিসুজার আরো কাছে আসবার জন্য বাড়ির অমতে ক্যাথলিক হয়ে যায়। কিন্তু চার্লস ডি সুজা বিদ্যুন্মালার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে যায় এবং সাহেবি পোশাক ছেড়ে বাঙালির ধুতি পড়তে শুরু করে। তাদের বিবাহ হয় এবং লাবণ্যপ্রভা আজীবন 'নান' বা সন্ন্যাসিনী থেকে যায়। তাই মিসেস ক্লার্ক তার মেয়ে জুলিকে কলা সম্বন্ধীয় ওই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিল, কাকতালীয় ভাবে জুলির জীবনও একই ঘটনা ঘটে। চান মিঞার লাল বর্ণ শনাক্ত করতে পারত না, তাই মামুনের ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়, তার জীবনের পরিণতি খুন সুখের হয় না।

অন্যদিকে মামুন বা মামুনুল বা মাহমুদ নামের যে ছেলেটি কাঠের ভুসি আনতে গিয়ে সাতকানিয়ায় পাচার হয়ে যায় সে সেখানে গিয়ে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর আদুরে মেয়ে আসমানতারার খরকোস হয়ে ওঠে। তার জন্য খাঁচা বানানো হয়, সে সেই খাঁচার ভেতরে বিনা প্রতিবাদে শুয়ে থাকে, খাঁচা থেকে বেরলে তার গলায় যে দড়ি লাগানো থাকে তার লাগাম

থেকে আসমানতারার হাতে। অন্যদিকে মামুন তার মা জোবেদা বেগমের কাছে ফিরে আসে কাঠের ভুসি নিয়ে। কাঠমিলের শ্রমিকেরা যারা মামুনকে সাতকানিয়ার ট্রাকে তুলে দিয়েছিল তারা এই ঘটনায় তাজ্জব হয়ে যায়, ধন্দে পড়ে যায় পাঠকও। মামুনের মায়ের কাছে দুজন শ্রমিক এসে জানায় যে মামুনকে তারা তাদের ঘরে স্থান দিয়েছে সে আসলে মামুন নয়, সে সাতকানিয়ায় পাচার হয়ে গেছে। জোবেদা বেগম এইরকম সাঙ্ঘাতিক বার্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং মামুনের ভাইকে পাঠিয়ে দেয় মামুনকে খুঁজতে। তার ভাই তাকে খেলার মাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে আসে। তখন জোবেদা বেগম মামুনকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে তার জন্ম দাগ পরীক্ষা করে এবং কাঠকলের সেই দুই শ্রমিককে ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দেয়।

সাতকানিয়ায় গিয়ে মামুন একদিন খাঁচায় থাকতে অস্বীকার করে, তার হিংস্র আচরণে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর পরিবারের লোকেরা তাকে খাঁচার বাইরে বের করে আনে এবং বাড়ির বাইরে দারোয়ানের ঘরে তার স্থান হয়। এতদিন খাঁচায় থাকার ফলে তার মানসিক বিকাশ হয়নি কিন্তু শারীরিক বিকাশ হয়ে গিয়েছিল, তাই যৌন লালসা সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেই দারোয়ানের ওপর তার যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে ফেলে। তারপর তার নাম হয়ে যায় কুতুবউদ্দিন আইবক। আব্দুল ওদুদ চৌধুরী মামুনের হিংস্র আচরণকে তার অবৈধ ব্যবসার পুঁজি করে ফেলে। আব্দুল ওদুদ একজন কুখ্যাত স্মাগলার। তার বেতনভুক কর্মচারীরা একটা বোটের সাহায্যে জলপথে স্মাগলিং করত। মামুন সেই বোটের আরেকজন কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়। অবদমিত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করবার জন্য বোটের মধ্যে বাজারের মেয়ে তুলে আনলে পুরানো কর্মচারীদের সাথে মামুনের বচসা হয় এবং তারা মামুনকে মাঝসমুদ্রে খুন করবার পরিকল্পনা করে। মামুন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলে। ফলত মামুনই তাদের খুন করে এবং বোটের মালিককে জানিয়ে দেয় কোস্টগার্ডের হাতে তারা মারা গেছে। মামুনের হাত ধরে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে, সে আরো তিনটে বোট কেনে এবং সবচেয়ে বড় বোটের সারেঙ করে দেয় মামুনকে। আব্দুল ওদুদ চৌধুরীদের ঘরেও মামুনের কদর বাড়ে। খাঁচা থেকে বের হওয়ার মামুনকে আসমানতারা কখনো দেখেনি। মামুন কৈশোরপ্রাপ্ত আসমানতারার প্রতি আকৃষ্ট হয়, আসমানতারারও মামুনের প্রতি মুগ্ধতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মামুন আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ার জন্য একটা ষড়যন্ত্র রচনা করে। বাড়ির সকলকে ‘খোদার দান’ বোটে করে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোস্টগার্ডের ওপর গুলি চালায়, কোস্টগার্ড পাল্টা গুলি চালালে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর সমগ্র পরিবারসহ 'খোদার দান' জলে ডুবে যায়, কৌশলে বেঁচে যায় মামুন। যেহেতু সে আসমানতারাকে ভালোবেসেছিল তাই আসমানতারার কোন ক্ষতি করে না, সে আবার আসমানতারার কাছেই ফিরে আসে। এরপর সে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর সমস্ত বৈধ ও অবৈধ ব্যবসায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে, বকলমে মালিক থাকে আসমানতারা। সে সময় একদিন মামুনের মনে পড়ে তার মায়ের কথা, জোবেদা বেগমের কথা। সে ভূতের গলিতে জোবেদা বেগমের কাছে উপস্থিত হলে জোবেদা বেগমের জীবনে সবচেয়ে সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। সে এই নতুন মামুনকে বোঝায় যে তার পুত্র মামুন কখনোই তার কাছ থেকে খোয়া যায়নি, সে সর্বদা তার মায়ের কাছেই থেকেছে, আগন্তুক মামুনের বা কুতুবউদ্দিন আইবকের নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। মামুন তার দামী গাড়ি ভূতের গলির মুখে দাঁড় করালে বাঁদররা অপকর্ম করে তার নোংরা করে দেয়, মামুন এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সহকারি আবু জাফরকে বলে বন্দুক এ. কে. ৪৭ নিয়ে আসতে। আবু জাফরের সঙ্গে আসমানতারাও আসতে চায়। ঢাকার কাছে তাদের গাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, আবু জাফর পালিয়ে যায় কিন্তু আসমানতারা গ্রেফতার হয়। র‍্যাব আসমানতারাকে গ্রেফতার করলে সে সব কথা বলে দেয় এবং তার প্রিয় ‘খরকোস’এর কাছে যেতে চায়। র‍্যাব মামুনকে ধরতে চাইলে মামুন জানিয়ে দেয় তাকে ধরলে আসমানতারাকে ছেড়ে দিতে হবে। হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে র‍্যাব দেখে মামুন সেখানে নেই। মামুন তখন বাঁদরদের ও তাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী চান মিঞাকে শায়েস্তা করাবার জন্য ফাঁদ পেতেছে। সে গাড়ি চোর চান মিঞার গাড়ির মত আরেকটা গাড়ি তার বাড়ির সামনে রেখে দেয় যাতে চান মিঞা আর তার বাঁদর বন্ধুরা একসাথে ভুল করে ওই গাড়িতে চাপে এবং র‍্যাব তাকে মামুন ভেবে ‘খতম’ করে দেয়। চান মিঞা মামুনের পাতা ফাঁদে পা দেয়। আর মামুন বা মামুনুল হাই বা কুতুবউদ্দিন আইবক বা খরকোস তখন –

> “খাঁচার ভিতরে খরকোস দুই হাত মাথার দুই পাশে দিয়া চোখ বন্ধ করে রাখে, মনে হয় মায়ের জরায়ুতে থাকা ভ্রূণের মতো আরেকটা জন্মের জন্য সে নিজেকে গোল করে আনে— খাঁচা তার মা হয়।”[১৩]

উপন্যাসের কাহিনি এখানে শেষ। তারপর লেখক ফ্রেঞ্চ ভাষায় দুটি পংক্তি লিখেছেন –

"pour ellesi je lui vois encore"[১৪]

ইংরেজিতে এর তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'for her/ if i still see her' অর্থাৎ 'যতক্ষণ আমি তোমাকে দেখছি, আমি তোমারই।'

উপন্যাসের নাম 'মুখের দিকে দেখি', স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কার মুখ, কে দেখে? অনেকগুলি পরিণতির সম্ভাবনা রেখে উপন্যাস শেষ করে লেখক এই প্রশ্ন পাঠক মনে রেখে গেছেন। একই চরিত্রের যেখানে দু'রকম পরিণতি হতে পারে, সেখানে সম্ভাব্য সকল রকম ঘটনা ঘটাই সম্ভব। যতগুলো চরিত্র এই উপন্যাসে আছে প্রত্যেকেই তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একসময় আকৃষ্ট হয়েছে অর্থাৎ বলা যেতে পারে একাধিক নরনারীর প্রেম বা প্রেম বহির্ভূত সম্পর্কের উপন্যাস 'মুখের দিকে দেখি'। লেদু, মামুন জুলিকে ভালোবেসেছিল কিন্তু জুলি হঠাৎ করেই চান মিঞার সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং 'ডেথ কনস্ট্যান্ট বিয়ন্ড লাভ' গল্পের মত সে এমন ব্যবস্থা করে যাতে জুলি কখনো তার অনুমতি ব্যতিরেকে শারীরিক সম্পর্কে না লিপ্ত হতে পারে। তাদের পূর্বপুরুষ চার্লস ডি সুজা যখন বিদ্যুন্মালার সঙ্গে বিবাহ করে তখন সে লাবণ্যপ্রভার মুখের দিকে দেখেনি, সেখানেই ছিল সার্থক প্রেম, যা পরবর্তীকালে চার্লস ডি সুজা বুঝেছিল। খৈমন ময়না মিঞাকে বিয়ে করেছিল ভালো না বেসেই, ময়না মিঞা শুধুমাত্র সামান্য অর্থের লোভে খৈমনকে বিবাহ করে। আর আসমানতারা মামুনকে ভালোবাসতো, কিন্তু সে ভালবাসা ছিল একটি পোষ্যের প্রতি ভালোবাসা বা স্নেহ। মামুন তার দুটি বিশ্বেই কোথাও ভালোবাসা খুঁজে পায়নি, সে সারা জীবন তার অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধাকে বয়ে নিয়ে গেছে।

সমগ্র উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে নর-নারীর ভালোবাসার চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে না, পরিবর্তে উঠে আসে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি যৌন লালসা, সেখানে শরীরটাই প্রধান, মুখের সৌন্দর্য, লাবণ্য সেখানে গৌণ। উপন্যাস শেষের পংক্তি দুটো ঠিক তার বিপ্রতীপে অবস্থান করছে, জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ একজনকে দেখার আকুতি ঝরে পড়ছে পংক্তি দুটোতে, উপন্যাসের কোন চরিত্রের মধ্যেই যা দেখা যায়নি। লেখক এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন কুহকময়তার পরাকাষ্ঠায় উন্নীত হয়ে। একই সঙ্গে উপন্যাসের পরিণতির সমস্ত সম্ভাবনা পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এত বিচিত্র সব ঘটনার সমাবেশ, উদ্ভট ঘটনার সমাহার, সমান্তরাল বিশ্বের অবতারণা, মনস্তত্ত্বের বিচিত্র প্রয়োগ, সময়ের চকিত পরিবর্তন, কথনধর্মীতা ও ঘটনার পারম্পর্যে কুহকের প্রাচুর্য উপন্যাসটিকে 'জাদু বাস্তবতা'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে। একই সঙ্গে শহীদুল জহিরের শিল্পীবোধের নান্দনিক রূপ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপন্যাস পাঠ শেষে শহীদুল জহিরকে কেন 'বাংলাদেশের মার্কেজ' বলা হয়, এ সম্বন্ধে পাঠকয়ের সমস্ত কৌতুহলের নিরসন হয়।

Reference:

১. শহীদুল জহির, 'শহীদুল জহির উপন্যাস সমগ্র', প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৯৫

২. আহমাদ মোস্তফা কামাল, শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার: 'আমার তো মনে হয় জীবনের ব্যর্থতাগুলোও এক ধরনের ঐশ্বর্য', 'শহীদুল জহির সমগ্র', প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯৫৩

৩. Stephen M. Hart, Stephen M. Hart and Wen-chin Ouyang (edited by), 'Magical Realism : Style and Substance', 'A COMPANION TO MAGICAL REALISM', First Published, Tamesis, Woodbridge, Uk, 2005, P. 3

৪. Lois Parkinso Zamora, Stephen M. Hart and Wen-chin Ouyang (edited by), 'Swords and Silver Rings : Magical Objects in the work of Jorge Luis Borges And Gabriel Garcia Marquez', 'A COMPANION TO MAGICAL REALISM', First Published, Tamesis, Woodbridge, Uk, 2005, P. 29

৫. Maggi Ann Bowers, 'Magic (AL) Realism', 1st ed., Routledge, USA and Canada, 2004, P.3

৬. তদেব, পৃ. ৪

৭. তদেব, পৃ. ১৯

৮. Stephen M. Hart, Stephen M.Hart and WIN-chin Ouyang (edited by), 'Introduction PartII: History, Nightmare, Fantasy', 'A COMPANION TO MAGICAL REALISM', First Published, Tamesis, UK, 2005, P. 101

৯. Martin Esslin, 'Theatre of the Absurd', First Publication, Anchor Books, USA, 1961, P. 12

১০. Ethan Siegel, 'We might live in a multiverse', https://www.space.com

১১. শহীদুল জহির, 'শহীদুল জহির উপন্যাস সমগ্র', প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৯৮-১৯৯

১২. তদেব, পৃ. ২৪২

১৩. তদেব, পৃ. ৩২৪

১৪. তদেব, পৃ. ৩২৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 525 - 532
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 525 - 532
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হরিশংকর জলদাসের 'মৎস্যগন্ধা' উপন্যাস : একটি উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর দ্বন্দ্ব

খুকুমণি বাগ
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কোস্টাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ
ও
ড. শান্তনু দলাই
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ
Email ID : drsantanudalai81@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Harishankar Jaldas, Jalaputra, Matsyagandha.

Abstract
Harishankar Jaldas in his novel 'Jalaputra' (2008) has shown the aspect of fishermen's profession. In this novel, we get a description of what disaster the fishermen have to face when they catch fish in the sea like the Bay of Bengal, then when the fishermen bring the fish and take it in a dishonest businessman, the exploitation of moneylenders goes on indiscriminately. This professional humiliation and exploitation of fishermen is the subject of this novel. The author's of 'Matsyagandha' describes also the social status of fishermen. The history of how the fishermen were abused and deprived on the basis of caste in the caste society is recorded in this novel. The novel 'Matsyagandha' by Harishankar Jaldas was first published in February 2020 from Bangladesh.

Discussion

'মৎস্যগন্ধা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হরিশংকর জলদাস গ্রহণ করেছেন মহাভারত থেকে। কৈবর্ত কন্যা মৎস্যগন্ধার রাজমহিষী হয়ে ওঠার আখ্যান হল মৎস্যগন্ধা উপন্যাস। এই মৎস্যগন্ধাকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র করে হরিশংকর জলদাস একটি তর্ক খাড়া করেছেন এই উপন্যাসে। সেই তর্কটি হল সমাজের জাত পাতের ঊর্ধ্বে বাস করা ব্রাহ্মণ জাতির সঙ্গে সমাজের একেবারে নিচু শ্রেণীতে বসবাসকারী জেলা নারীর তর্ক। আর সেই তর্কে লেখক এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, শাস্ত্র লেখে যারা তারা নিজেদের সুবিধামতো নিয়ম তৈরি করে। সেই সঙ্গে লেখক এও দেখান সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণ সমাজের এই

নিয়মকে জেলে সমাজের মানুষ আর মানবেন না। তারা প্রশ্ন করবেন। এই উপন্যাসে ঋষি পরাশর মুনিকে নিরন্তর প্রশ্ন করে গেছেন মৎস্যগন্ধা।

জেলেদেরকে সমাজের একেবারে নিচু শ্রেণীতে নামিয়ে দিল কারা? কিভাবে জেলেরা সমাজে এত ঘৃণিত জীবে পরিণত হলেন তার একটা উত্তর হরিশংকর জলদাস তাঁর বর্ণবৈষম্যের শেকড়-বাকড় বইতে দিয়েছেন। উক্তিটি দীর্ঘ কিন্তু এই দীর্ঘ উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন –

> "আর্যরা ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করলে দুটি জনজাতির মুখোমুখি হয়। এই জনগোষ্ঠীর ভাষা আলাদা সংস্কৃতি অন্যরকম। এদের দেহ গড়নও আর্যদের থেকে ভিন্ন। আর্যরা এই জনজাতির একটি নাম দেয় নিষাদ। দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীর নাম দেয় দাস বা দস্যু। এই দাস বা দস্যুরা ছিল দ্রাবিড়ভাষী। ...দ্রাবিড়রা ছিল উন্নত এক জনগোষ্ঠী। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার মত নগর সভ্যতার পত্তন আর বিস্তৃতিতে ছিল দ্রাবিড়দের বিশেষ অবদান। ভারতে প্রবেশ করে এই আর্যরা দ্রাবিড়দের বাধার সম্মুখীন হয়। উভয় জনজাতি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষে আর্যরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। নির্বিচারে দ্রাবিড়দের হত্যা করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপুল ক্ষতিসাধন করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার মানুষেরা দমে থাকেনি। কয়েকশো বছর ধরে আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। এই সময় আর্যরা ভারতের পূর্বতন অধিবাসীদের ঘৃণা করতে শুরু করে এবং শত্রুরূপে গণ্য করতে আরম্ভ করে। এই ঘৃণা আর হিংসাটা এতটাই গাঢ় হয়ে যায় যে দ্রাবিড়দের আর্যরা গোলাম এবং অপহরণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। দ্রাবিড়রা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করে সুযোগ বুঝে আর্যদের আক্রমণ করতো এবং তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। বশ্যতা স্বীকার না করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত বলে আর্যরা দ্রাবিড়দের কলঙ্কিত করবার জন্য উৎপীড়ক, লুণ্ঠক, ডাকাত - এসব নামে অভিহিত করত। ভারতের সিন্ধু উপত্যকা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পরাজিত করে আর্যরা যাদের বন্দী করতে পারতো তাদের নির্বিচারে হত্যা করত। কিন্তু পরে যখন আর্যদের মধ্যে গোলাম বা ভৃত্যের প্রয়োজন বেড়ে গেল তখন বন্দীদের হত্যা না করে তাদের গোলাম বা চাকরে পরিণত করত। পুরুষবন্দীরা গোলামী করে বেঁচে থাকার সুযোগ পেত। কিন্তু নারীদের ভাগ্য সেরকম ছিল না। কারণ তাদের যে শরীর আছে, সে শরীরে যে যৌবন আছে, আছে সুষমা। আর আছে আর্যদের দেহ ক্ষুধা মেটানোর ললিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই আর্যদের গোলামী করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহ চাহিদাও বন্দী নারীদের মিটাতে হতো। হতে হতো রক্ষিতা বা উপপত্নী। আর্যরা সামষ্টিকভাবে যাদের দাস বা দস্যু নামে চিহ্নিত করেছিল তাদের মধ্যে নানা জনগোষ্ঠী ছিল। সেই জনজাতির একটির নাম শূদ্র। এই শূদ্র জনগোষ্ঠী আর্যদের বিরুদ্ধে সবচাইতে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ওদের দ্বারাই সবচাইতে বেশি ক্ষতি হয়েছিল আর্যদের। তাই শূদ্রদের বিরুদ্ধে আর্যদের ছিল বিপুল ঘৃণা আর উত্তুঙ্গ ক্রোধ। পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন হলো। শূদ্ররা হীনবল হয়ে পড়ল। আর্যদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিল এই জনগোষ্ঠী। পরাজয় স্বীকার করলেও শূদ্রদের ওপর ক্রোধ কমেনি আর্যদের। আর্যরা তাদের শাস্ত্রে, অনুশাসনে, আচরণে শূদ্রদের অবনমিত করল। চিহ্নিত করল বর্ণেতর জনজাতি হিসেবে। একদা ভারতবর্ষে শূদ্র নামের যে প্রবল এবং প্রাচীন জনগোষ্ঠীটি ছিল আর্যদের শাস্ত্রে-স্মৃতিতে সেই জনজাতি হয়ে গেল ভৃত্য বা গোলামের সমর্থক। আর্য ব্রাহ্মণরা তাদের, মানে শূদ্রদের চিহ্নিত করল চতুর্থ বর্ণ রূপে। পূর্বেই আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি বর্ণ ছিল। শূদ্র বর্ণ দিয়ে প্রচলিত হয়েছিল চতুর্থ বর্ণটি।"[১]

এই নমঃশূদ্রদের অন্তর্গত একটি জাতিগোষ্ঠীর নাম হল জেলে। আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করার ফলে যাদের কপালে জুটে ছিল অবাধ অপমান আর লাঞ্ছনা। তাই লেখক বলেন –

> "যেহেতু আমি অনার্য সম্প্রদায়ের মানে শূদ্র বংশের, স্বভাবতই একটা ক্ষোভ তো আমার মধ্যে সর্বদা জাগরুক।"[২]

কিন্তু হরিশংকর জলদাস একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জেলে জীবন নিয়ে লিখতে বসেই তার উপন্যাসের মধ্যে এনেছেন প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ। এক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন –

> "আমার কথাসাহিত্যের মধ্যে শেষ কথা হল বর্ণ বিভাজনের নির্যাতনের যে বিষয় সেটা ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। নদী উপকূলের মানুষের জীবনে হোক বা একটা ঘরে একটা গৃহকর্মীর জীবনে হোক বা সেখানে বর্ণবৈষম্য বললে সেখানে আমি ধর্মের যে বর্ণবৈষম্য সেটাকে বোঝাচ্ছি না, অর্থনৈতিক বৈষম্যটাকেও বোঝাচ্ছি। ...নির্যাতনের প্রতিবাদ করাই আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য।"[৩]

'মৎস্যগন্ধা' উপন্যাস তেমনি এক নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ। যে নির্যাতন ঘটে গিয়েছিল মহাভারতের কালে। এক কৈবর্তকন্যা মৎস্যগন্ধার উপর ব্রাহ্মণবাদীদের অন্যতম হোতা ঋষি পরাশরের নির্যাতন। প্রাচীনকালের কোন জেলেকন্যার সম্মানহানির উদাহরণকে সামনে রেখে হরিশংকর জলদাস সমস্ত জেলে কন্যার ওপর (বা বলা ভালো সমগ্র নমঃশূদ্র কন্যার ওপর) জোর খাটিয়ে দেহ দখলের যে ইতিবৃত্তকে ব্রাহ্মণরা নিজেদের অধিকার বলে প্রতিপন্ন করে আসছিলেন ব্রাহ্মণবাদিতার সেই অন্ধকার দিককে লেখক তুলে ধরেন একবিংশ শতকের আলোতে, করে চলেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ। এক ঘরোয়া আলাপচারিতায় তিনি বলেন –

> "মনুসংহিতার মধ্যে মনু বলেছেন যে তুমি জেলে মানে জেলে থাকবে। পেশা পরিবর্তন করতে পারবে না। তুমি মুচি মানে মুচি থাকবে। এবং সেখানে অনেকগুলো বেদনাদায়ক নির্দেশন আছে। একজন ব্রাহ্মণ ইচ্ছে করলে চার সম্প্রদায়ের নারীর সাথে উপগত হতে পারে। বৈশ্য শূদ্রদের মেয়েকে যখন ইচ্ছা কেড়ে নিয়ে আসতে পারে। এগুলোর বিচার হয়। কেমন বিচার হয় - এক পয়সা দুই পয়সা দিয়ে বিচার থেকে রেহাই পাবে। তার কোন শাস্তি হবে না। ...উল্টোদিকে কোন বৈশ্য বা শূদ্র ব্রাহ্মণ নারীর হাত ধরে তবে তার হাত কেটে দেওয়ার বিধান আছে, দেখলে চক্ষু উৎপাটন করার কথা আছে। তাহলে দেখো সমাজ ব্যবস্থাটা কত বৈষম্য পরায়ণ।"[৪]

'মৎস্যগন্ধা' উপন্যাস শুরু হয়েছে মৎস্যগন্ধার জন্ম বৃত্তান্ত দিয়ে। মৎস্যগন্ধা যমুনা নদীতে যাত্রী পারাপার করে। কারণ তার পালকপিতা সিন্ধুচরণের অনেক বয়স, তিনি আর নৌকা চালনা করতে পারেন না। তার জাল নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে ছিঁড়ে খুড়ে গেছে। ফলত অর্থ উপার্জনের আর কোন পথ নেই সিন্ধুচরণের সামনে। তিনি সবকিছু হারিয়েছেন। তাই মৎস্যগন্ধা বাধ্য হয়ে নৌকার দাঁড় তুলে নিয়েছেন হাতে। এই জায়গা থেকে মৎস্যগন্ধার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে নৌকার মাঝি। মৎস্যগন্ধা একদিন যাত্রীর আশায় যমুনার কিনারে নৌকা ভাসিয়ে রেখে অপেক্ষা করছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবে এমন সময় পরাশর মুনি যাত্রী হিসেবে মৎস্যগন্ধার নৌকায় ওঠেন। আর এই পরাশর মুনিকে এই মৎস্যগন্ধা তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়ে চলেছেন।

স্বর্গ অপ্সরা অদ্রিকা ছিলেন প্রজাপতি কচ্ছপ এবং দক্ষ কন্যার সন্তান। দীর্ঘদিন ধরে যমুনার পাড়ে একজন মুনি অমর হওয়ার আশায় তপস্যা করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অদ্রিকাকে নির্দেশ দিলেন ওই মুনির ধ্যান ভাঙাতে। প্রয়োজনে অদ্রীকা যেন তার রূপ যৌবনের ব্যবহার করতে না ভোলেন একথাও দেবরাজ ইন্দ্র বলে দিলেন। অদ্রিকা তাই যোগাসনে বসে থাকা মুনির ঊরুতে নিজের শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলেন। তাতে মুনির অমর হওয়ার তপস্যা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি অদ্রিকাকে মৎসী তে রূপান্তরিত হয়ে যমুনার জলে কলিযুগ পর্যন্ত বাস করার অভিশাপ দিলেন। অভিশাপ মুক্তির উপায়ও বলে দিলেন। তিনি বললেন মৎসী রূপী অবস্থায় দুটি মানব সন্তান প্রসব করলে তবেই মৎস্য রূপ থেকে অদ্রিকার মুক্তি ঘটবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 525 - 532
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চেদিরাজ্যের রাজা উপরিচর বসু স্বর্গবাসী পিতৃপুরুষের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় তিনি যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এই যজ্ঞ করার আগেই রাজাকে মৃগয়ায় যেতে হয়। উপরিচর বসু মৃগয়ার জন্য অরণ্যে গিয়ে কামাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তার স্খলিত শুক্র রানী গিরিকার কাছে পাঠানোর আয়োজন করেন। একটি বটপত্রে স্খলিত শুক্রকে দিয়ে তিনি পক্ষি নামক এক কুশলী বাজপাখিকে নির্দেশ দেন যে এই শুক্র যেন সে রানী গিরিকার কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সেই শুক্র রানী গিরিকার কাছ অব্দি পৌঁছাতে পারেনি। পথেই আরেক বাজপাখির আক্রমণে পক্ষির মৃত্যু হলে বটপত্রে থাকার শুক্র যমুনার জলে পড়ে যায় এবং সেই শুক্র খেয়ে ফেলে অদ্রিকা। এরপরই অদ্রিকা গর্ভধারণ করে। এবং সন্তান প্রসবের প্রাক মুহুর্তেই সে সিন্ধু চরণের জালে ধরা পড়ে। তার পেট কেটে দুটি মানব সন্তান পায় সিন্ধুচরণ। একটি পুত্র সন্তান এবং একটি কন্যা সন্তান। পুত্র সন্তানটিকে রাজা উপরিচর বসু নিয়ে যান। আর কন্যা সন্তানটি হল মৎস্যগন্ধা, সে রয়ে যায় সিন্ধুচরণের কাছে। সে যৌবনবতী এখন। রাজার ঔরসে তার জন্ম হলেও যেহেতু সে মাছের পেটে জন্মেছে এবং নিঃসন্তানা জেলেনি ভবানী তাকে মানুষ করেছে ফলত সে জেলে ঘরের সন্তান।

যমুনা নদীতে সন্ধ্যাকালে ঋষি পরাশর জেলেকন্যা মৎস্যগন্ধার সমগ্র জন্ম বৃত্তান্ত শোনার পর মৎস্যগন্ধাকে যে প্রস্তাবটি দেন সেটি ছিল এরকম –

“আমার প্রথম রিপু প্রবল হয়েছে বাসবি। আমার বাসনা পূরণ করো তুমি।”[৫]

এটা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে মৎস্যগন্ধার কাছে ঋষি পরাশরের অনুরোধ। তারপর মৎস্যগন্ধার বারংবার প্রত্যাখ্যানে এই অনুরোধ বলপ্রযোগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই অনুরোধ এবং বল প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময়টাতেই লেখক হরিশংকর জলদাস ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণবাদীতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন। মনুসংহিতার নিবিড় পাঠক হিসেবে লেখক খুব স্পষ্টভাবে জেনেছিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যেকোন বর্ণের নারীতেই উপগত হতে পারে এবং তা শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমেই পারে। দীর্ঘদিন ধরে এহেন নির্যাতন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নারীরা ভোগ করে আসছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে লেখকের প্রশ্ন মৎস্যগন্ধার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন –

> “ঋষির এ কী প্রস্তাব? নগ্ন। লাজ লজ্জা হীন! সে কি ক্রীড়নীয়? এরকম যাচ্ছেতাই প্রস্তাব সে নারী বলেই কি দিতে পারলেন ক্রান্তদর্শী এই ঋষি? এরকম প্রস্তাব কি নারীত্বের অপমান নয়? সে প্রান্ত সমাজের মেয়ে বলেই কি মুনি এরকম ঘৃণ্য প্রস্তাব করতে দ্বিধা করলেন না? ধীবর কন্যা বলেই তার কি কোন দাম নেই? সতীত্ব কুমারীত্ব বলে কি তার কিছুই থাকতে নেই?”[৬]

লেখক হরিশংকর জলদাস অবশ্যই এই প্রশ্নগুলির প্রত্যক্ষ কোন উত্তর পাঠকুলকে দেন না। কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নগুলির সার্বিক একটা উত্তর তিনি বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড় বইতে দিয়েছেন। যেহেতু মনু ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণবাদীতার যাবতীয় সুযোগ নিয়ে তিনি নিয়মাবলী তৈরি করেছেন। ফলত ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি এই সুযোগ ছেড়েই দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণেরা সব শ্রেণীর নারীকে ভোগ করার অধিকার রাখে এবং তার কোন বিচার হবে না। নিম্নবর্ণের নারীকে ভোগ করতে পারে কিন্তু তাকে তো মর্যাদা দেওয়া যায় না। তাই মৎস্যগন্ধা বোঝে –

> “এই মুনি তো তাকে চিরসঙ্গিনী করে নিয়ে যাবে না। রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে হেলায় ফেলে চলে যাবেন। মুনি পরাশরের কাছে সে ক্ষণিক উত্তেজনার ব্যবহার্য বস্তু ছাড়া তো বাড়তি কিছুই নয়!”[৭]

ঋষি পরাশর তার প্রথম রিপু কামনার ক্ষণিক উত্তেজনাকে, সার্বিক দেহসম্ভোগের উদ্দেশ্যকে নির্মলতা দান করতে চান। কারণ যেহেতু ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ থেকে সৃষ্ট ফলত তার সকল কার্যই পবিত্র। তাই রমণী সম্ভোগের কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে তিনি পুত্র কামনার্থে মৎস্যগন্ধাকে রমণ করতে চান। কারণ মানুষকে যুগ থেকে যুগান্তরে নিয়ে যায় পুত্র। পরাশরের এই যুক্তি হাস্যকর। কেননা মানুষকে কেবলমাত্র পুত্রই যুগ থেকে যুগান্তরে নিয়ে যায় না। মানুষকে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে তার কর্ম। মানুষ তার যাবতীয় কু-ইচ্ছাকে আত্মপক্ষে আনার জন্য এমনই হাস্যকর বেদরদি যুক্তি

খাড়া করেন। প্রতিপক্ষ মৎস্যগন্ধার কাছে নিজেকে বিবেকবান হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য পরাশর মুনি তার লালসাকে পুত্র লাভের অভিধায় ভূষিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু মৎস্যগন্ধার কাছে সেই বিবেকবান প্রস্তাব তার নিজের জীবনের বেদনাময় ইতিহাসকে বয়ে আনে –

> "আবার সেই পুত্র বাসনা! সেই পুত্র মর্যাদা! আহ মৎস! আহ রাজা উপরিচর বসু! পুত্র বাসনার কারণেই তো আমি পরিতক্ত! যমুনা ঘাটের পারানি।"[৮]

অদ্রিকা নামক মৎসীর গর্ভে যে দুটি মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে পুত্র সন্তানটি ছিল গৌরবর্ণ এবং কন্যাটি ছিল ঘন কৃষ্ণবর্ণ। রাজা উপরিচর বসু দাশরাজা সিন্ধুচরণের উঠানে দাঁড়িয়ে পুত্র সন্তানটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন ফলতো তার অবর্তমানে তার সিংহাসনের রাজা করার জন্য তার একজন পুত্র সন্তানের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তিনি পুত্র সন্তানকে নিয়ে চলে যান, মৎস্যগন্ধার কোন প্রসঙ্গই তোলেন নি। আর এই মুহূর্তে মৎস্যগন্ধার যৌবন উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে একজন ঋষি তাকে যে কামনা করছেন তারও কারণ পুত্র সন্তান লাভের বাসনায়। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা শাস্ত্রের সমূহ আদেশকে সত্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। নারী পুত্র সন্তানের জন্মদানের জন্যই কেবল ব্যবহৃত। তাতে তার সম্মতি থাক বা নাই থাক।

মৎস্যগন্ধাকে সমস্ত আশীর্বাদ এবং অভিশাপে ভোলাতে না পেরে পরাশর মুনি মৎস্যগন্ধার ওপর বল প্রয়োগ করতে চাইলেন। মৎস্যগন্ধা তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন –

> "আমি নিম্ন বর্ণের সামান্য এক নারী। আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা সমাজে নমস্য। একজন দাশনারীর হাত ধরা আপনার শোভা পাচ্ছে না।"[৯]

এ কথার উত্তরে ঋষি পরাশর যে উত্তরটি দিলেন সেটিই আসলে সর্বজনগ্রাহ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত কথা –

> "কামনার কাছে উঁচু-নিচু বলে কিছু নেই। আমার কাছে তুমি রূপময়ী। বাসনার হোম তুমি। সাগররা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী যুবতী বলে মনে হচ্ছে তোমায়। তাই তোমাকে কামনা করছি।"[১০]

মনুসংহিতার মধ্যে ঋষি মনু যদি এই কথাটিই বলে যেতেন যে মানুষের প্রথম রিপু জাতপাতের ঊর্ধ্বে। তাহলে তাকে একবিংশ শতকের মানুষ কিছুটা হলেও মানবিক বোধসম্পন্ন বলে মনে করতে পারতো। কিন্তু তা না করে ব্রাহ্মণ যেহেতু ঈশ্বরের মুখ থেকে সৃষ্ট বর্ণ তাই কেবল তারাই চতুর্বর্ণের যে কোন নারীতে উপগত হতে পারে এ কথা বলার মধ্য দিয়ে সমাজের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা কায়েম করার পথ তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে খুলে দিলেন। কিন্তু সত্যি কথা হল এই ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখসৃষ্ট জাতি বলে নয় কামনার বশবর্তী হয়ে যদি তারা যে কোন বর্ণে নারীতে উপগত হয় তাহলে তাদের যাতে শাস্তির ব্যবস্থা তেমন করে সমাজে তৈরি না হয়। ফলত যত অন্যায় অবিচার তারা চালিয়ে যাক সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ হবার কারণে তাদের অন্যায় আচরণের বিচার করতে কেউ সাহস না পায়।

পরাশর মুনির কামনায় মৎস্যগন্ধা নিজেকে ধরা দিতে না চাইলে পরাশর মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন। সেটি হল শাস্ত্র শ্লোক। কারণ নিম্ন বর্ণের সমাজের মানুষের কাছে শাস্ত্র আদেশ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত কথার মত। শাস্ত্র আদেশ লঙ্ঘন করলে তাদের নরকগামী হতে হবে। এই শাস্ত্র ভয় দেখিয়ে পরাশর মৎস্যগন্ধাকে কুক্ষিগত করতে চাইলেন –

> "তুমি ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের কথা বললে। শাস্ত্রে আছে - ব্রাহ্মণ যে কোন বর্ণের নারীতে উপগত হতে পারে।"[১১]

এই শাস্ত্র তো সুযোগ সন্ধানী স্বার্থবাদী ব্রাহ্মণরাই তৈরি করেছেন। নিজেদের জন্য তারা সমস্ত সুযোগই বরাদ্দ রাখবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই মৎস্যগন্ধাকে যেহেতু ঔপন্যাসিক একবিংশ শতকের আঙিনায় তৈরি করেছেন ফলে তার সংলাপ প্রশ্নময় -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 525 - 532
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ব্রাহ্মণেতর অন্য কোন বর্ণের পুরুষ কি ব্রাহ্মণীতে উপগত হতে পারে?"[১২]

ঋষি পরাশর বলেন –

> "চোখ বড় বড় করে মৎস্যগন্ধার দিকে তাকালেন ঋষি। বিব্রত গলায় বললেন, 'তা কি করে হয়!' নিজেকে আত্মস্থ করলেন। বললেন 'শাস্ত্রে তো সে বিধান নেই'!"[১৩]

মৎস্যগন্ধা বলেন –

> "বিধান থাকবে কি করে? ওই বিধান তো নিম্নবর্ণের মানুষেরা তৈরি করেনি। শাস্ত্র তো বানিয়েছেন আপনারা, আপনাদের মতো বামুনেরা।"[১৪]

পরাশর বলেন –

> "শান্ত হও, নিজেকে সংযত করো মৎস্যগন্ধা। রাগের মাথায় কি বলছ - বুঝতে পারছ না তুমি। জানতে অথবা অজান্তে তুমি ব্রাহ্মণ সমাজকে অপমান করছ।"[১৫]

মৎস্যগন্ধা বলেন –

> "সত্য কথা বলতে গেলে যদি আপনাদের গায়ে লাগে, শাস্ত্র নির্মাতাদের বিরোধিতা করা হয়, তাহলে আমি নিরুপায়। আপনাদের তৈরি শাস্ত্র প্রথা কি অমানবিক নয়, এই ভারতবর্ষের বৃহৎ একদল মানুষকে পায়ের তলায় পিষ্ট করার বিধি-বিধান কি আপনারা তৈরি করে যাননি? আপনাদের চোখে সমতা বলে কিছু নেই। ...রোষকষায়িত চোখে বলল, নগরের বাইরে ঠেলে রেখেছেন তথাকথিত নিচু জাতের মানুষদের। বলছেন, তারা অস্পৃশ্য। কিন্তু দেহ তাড়নায় তাদেরই কুঁড়েতে গিয়ে উঁকি মারেন আপনারা।"[১৬]

হরিশংকর জলদাস তার মৎস্যগন্ধা উপন্যাসে মৎস্যগন্ধা নামক এক জেলে কন্যাকে দিয়ে পরাশর ঋষি নামক এক ব্রাহ্মণের কাছে এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা তৈরি করিয়েছেন। খুবই সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সেই প্রশ্নমালা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর তিনি তার বাকি উপন্যাসে এই তর্ককে আর উপস্থাপন করবেন না। এই উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এই তর্কের সমাপ্তি ঘটেছে। এরপর মৎস্যগন্ধা যোজনগন্ধা নামে, সত্যবতী নামে পরিচিত হবেন। বেদব্যাসকে জন্ম দেওয়ার জন্য তিনি এবং তার পরিবার সকলে মিলে একটি সমবেত লড়াইয়ে সামিল হবেন। বেদব্যাসের চার বছর বয়সে পরাশর মুনি এসে বেদব্যাসকে নিয়ে যাবেন। এরপর রাজা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ, হস্তিনাপুরের সিংহাসনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া তারপর সেখান থেকে অবসর নিয়ে বেদব্যাস এর সঙ্গে তার আশ্রমে চলে যাওয়া।

লক্ষণীয় বিষয় হল দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মৎস্যগন্ধার শেষ কথাটি –

> "এই ভারতবর্ষের বৃহৎ একদল মানুষকে পায়ের তলায় পিষ্ট করার বিধি-বিধান কি আপনারা তৈরি করে যাননি?"[১৭]

এই কথাটি আর মৎস্যগন্ধার সংলাপ হয়ে থাকেনি। মহাভারতের কালকে ছাড়িয়ে এ কথা হয়ে ওঠে জীবনে অনার্য হওয়ার কারণে দীর্ঘ অসম্মান লাভ করা কথা সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের কথা। কারণ এই 'যাননি' শব্দটি। যদি এটি মহাভারতের কালের কথা হয় তাহলে বর্ণবাদীতার সমগ্র প্রক্রিয়াটি তখনো জারি রয়েছে। লেখক যখনই 'যাননি' ব্যবহার করেন তাতে বোঝা যায় যে লেখক স্বীকার করে নিয়েছেন যে বর্ণবাদিতার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। এখানে এই 'যাননি' শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক সরাসরি ঢুকে পড়েন এই তর্কের মধ্যে। তখন এই তর্ক কেবলমাত্র পরাশর মুনি এবং মৎস্যগন্ধার থাকেনা তা হয়ে ওঠে সমগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা সম্পন্ন সমাজের সঙ্গে লেখক হরিশংকর জলদাসের তর্ক। যে লাঞ্ছনাময় জীবন তিনি এবং তার সমগ্র পূর্বপুরুষেরা সহ্য করেছেন সেই সমগ্র নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ এই 'যাননি' শব্দের ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে। শিক্ষিত সমাজে এখনো তিনি 'জাইল্যার পোলা'[১৮] বলে নিন্দিত হন বলে তিনি এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 525 - 532
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তর্ককে জারি রাখেন, স্টেটমেন্ট দেন। মহাভারতের কাল নিয়ে মৎস্যগন্ধা উপন্যাস লিখতে বসে তিনি স্বয়ং মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাসকেও প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেন এবং তাঁর 'বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়' বইতেই তিনি পাঠককে জানিয়েছেন–

> "তিনি (ব্যাসদেব) ব্রাহ্মণ সন্তান যেমন শূদ্রাণী পুত্রও তেমনি। তার বাবা ঋষি পরাশর, মা মৎস্যগন্ধা। মৎস্যগন্ধা রাজার বীর্যে উৎপন্ন হলেও জেলের ঘরে মানুষ হয়েছেন। জেলে পরিবারে লালিত-পালিত এই কন্যাটির গায়ের রং ছিল আব্রাহ্মণ বা অক্ষত্রিয় সুলভ। তার গায়ের রং ছিল কালো, নমঃশূদ্র জেলেদের মত। জোর জবরদস্তির সন্তান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের গায়ের রংও ছিল আলকাতরার মত কালো। ...মাতৃ পরিচয়টা যদি ভারতবর্ষে পিতৃপরিচয় চেয়ে মূল্যবান হয়, তাহলে ব্যাসদেবের প্রকৃত পরিচয় তিনি এক অনার্যকন্যা মৎস্যগন্ধার সন্তান। এই জেলে কন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতী হয়ে শেষ পর্যন্ত হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের প্রধান রাণী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ব্যাসদেবের ঔরস জাত সন্তানদের দ্বারা কুরু আর পাণ্ডব রাজবংশকে আচ্ছাদিত করিয়েছেন। অথচ ব্যাসদেব নিজের শূদ্রাণী পুত্র হয়েও ব্রাহ্মণ্যবাদীতার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছেন।"[১৯]

উপরিউক্ত মৎস্যগন্ধার সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে মৎস্যগন্ধার দেহকে জবরদখল করে পরাশরন মুনি তাকে একপ্রকার ধর্ষণ করেছেন। এই ধর্ষণ পর্বের পরে তিনি মৎস্যগন্ধাকে দুটি আশীর্বাদ করেন - প্রথম, মৎস্যগন্ধার শরীর থেকে মাছের গন্ধ চলে গিয়ে শরীর পুষ্প গন্ধযুক্ত হবে। যোজন পথ দূর পর্যন্ত তার শরীরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। দ্বিতীয় আশীর্বাদটি হল, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মৎস্যগন্ধা সত্যবতী নামে খ্যাত হবেন এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত এক রাজার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

এই দুটি আশীর্বাদই বিশ্লেষণ যোগ্য। কেননা এই দুটি প্রয়োজন মৎস্যগন্ধা অনুভব করেছেন কতটুকু। এই উপন্যাসের মধ্যে তো সেই অনুভব আমরা দেখি না। তাহলে মৎস্যগন্ধার শরীর থেকে মাছের গন্ধ চলে যাওয়ার ফলে মহারাজা শান্তনু তার দেহের গন্ধে আকুল হয়ে তাকে বিয়ে করতে ছুটে এসেছিলেন, তাও আবার শেষ বয়সে। অনেক বাধা পার করে সেই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু তার বিনিময়ে মৎস্যগন্ধার মত সামান্য নারী কি পেয়েছিল। একজন সাধারণ নারীর যা যা স্বপ্ন থাকে তা কিছুই তিনি পাননি। পুত্র পেয়েছিলেন দুজন একজন অহংকারী আর একজন কামান্ধ। দুজনেই অল্প বয়সে মারা যান। কুরু বংশের সিংহাসনের জন্য তিনি বেদব্যাসের কাছে পুত্র ভিক্ষা করে পুত্র পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তারাও দৈহিক দিক থেকে অক্ষম এবং দুর্বল ছিল। রাজাকে বিয়ে করে রাজরানী হয়ে মৎস্যগন্ধা সমগ্র জীবন জুড়ে বরং অশান্তি লাভ করেছেন। ফলত একজন ঋষির ধর্ষণের বিনিময়ে পাওয়া দুটি আশীর্বাদ নিয়ে মহাভারত কার আপ্লুত হতে পারেন কিন্তু লেখক হরিশংকর জলদাস কোনভাবেই আপ্লুত নন। তাই তিনি উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ জুড়ে এই তর্কের অবতারণা করেন।

Reference:

১. বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড় হরিশংকর জলদাস, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৮-৩০

২. হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা, মহি মোহাম্মদ, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬১

৩. ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখের নেওয়া ঘরোয়া সাক্ষাতকার।

৪. ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখের নেওয়া ঘরোয়া সাক্ষাতকার।

৫. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬০

৬. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬১

৭. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬১

৮. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৩

৯. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 525 - 532
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১১. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১২. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১৩. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১৪. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭, ৬৮
১৫. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১৬. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৮
১৭. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৩
১৮. আমার কর্ণফুলী, হরিশংকর জলদাস, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি' ২০২০, পৃ. ৯৪
১৯. বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড় হরিশংকর জলদাস, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৬

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :
হরিশংকর জলদাস, 'মৎস্যগন্ধা', কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০২০

সহায়ক গ্রন্থ :
হরিশংকর জলদাস, 'বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়', কথাপ্রকাশ, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২
হরিশংকর জলদাস, 'আমার কর্ণফুলী', বাতিঘর, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৯
মহি মোহাম্মদ, 'হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা', অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
টুম্পা মন্ডল, 'বাংলা সাহিত্য ও ধীবর সংস্কৃতি'।
হরিশংকর জলদাস, 'বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০
হামিদা বেগম, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সমুদ্র উপকূলবর্তী জীবন ও জনপথ', আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
ড. চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা মণ্ডল, 'বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত', একুশ শতক, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি, বইমেলা, ২০০৩

পত্র-পত্রিকা :
মহি মুহাম্মদ, কালি ও কলম পত্রিকা, 'উপন্যাসের সমুদ্র সংগ্রামী কৈবর্ত জীবন', ঢাকা, বাংলাদেশ ১২০৯
ইবন সাজ্জাদ, দৈনিক আজাদীর, 'উপেক্ষিত বঙ্গোপসাগরের আহাজারি'।
পলাশ মজুমদার, সম্প্রীতি পত্রিকা, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উপন্যাস', বাংলাদেশ, জুন সংখ্যা ২০১৪
দেশ পত্রিকা, অমর্ত্য সেন, 'ভারতের শ্রেণীবিভাগের তাৎপর্য', ১৮ই জানুয়ারি সংখ্যা ২০০৩

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 533 - 539
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সমর দেবের ‘লোহিত পারের উপকথা’ উপন্যাস : জীবন যন্ত্রণার আখ্যান

ড. চাঁদমালা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : khatun.chandmala@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Samar Dev, Novel, Assam, Exploitation, Deprivation, Pain, Struggle

Abstract
Northeast India is known as the state of seven sisters. This north-east India is also known as the third world. Various castes and tribes live in this world. However, the number of Bengalis is comparatively more in the states of Assam and Tripura. Amidst various unrest and hatred, Bengalis have kept their language and literature alive through writing. Literary practice in Assam is mainly concentrated in two valleys, the Barak Valley and the Brahmaputra Valley. Although the context of Bengali literary practice in these two valleys is similar in many respects, it is different in several respects. The Bengalis of the Brahmaputra Valley are mainly identified as ‘external expatriates’. Since the Bengalis of this valley have to coexist with the Assamese, their level of crisis is of a different nature. In short, the Bengalis here have to struggle constantly. Partition is a great story of danger in the life of Bengalis. Even after independence came through partition, the Bengali heart was also divided. Before the wounds or pain of that partition could heal, the blow of foreign expulsion doubled that pain. And the victims of that violence were the helpless common people. Political and ethnic problems are the main subject of most of the literature of the Brahmaputra Valley. Samar Deb is one of the poets of the Brahmaputra Valley of Assam. One of his notable novels is ‘Lohit Parer Upokatha’ (2010). The toiling common people living on the banks of the Brahmaputra River, despite living in Assam for a long time, have to endure the pain and struggle to survive of not being able to become citizens of Assam. In short, the story of the precarious life of the people of the slums along the Brahmaputra is the subject of the novel ‘Lohit Parer Upokatha’.

Discussion

উত্তর-পূর্ব ভারত তথা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম কথাকার সমর দেব। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘লোহিত পারের উপকথা’ (২০১০)। আলোচ্য উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মূলত প্রান্তীয় পাণ্ডুর ব্রহ্মপুত্র ঘেষা একটি বস্তি। বস্তিবাসী মানুষের

জীবন চিত্র এই উপন্যাসের বিষয় বস্তু। এই বস্তি কারোর নিজের বসতবাটি নয়। আসলে এই বস্তির সকলেই উদ্‌বাস্তু। কেউ দেশভাগের বলি, কেউ বা নগরায়ণের বলি হয়ে পূর্বতন ভিটে থেকে উচ্ছেদিত। আবার কারোর বাড়ি ব্রহ্মপুত্রের জলে তলিয়ে গেছে। কেউ বা পালিয়ে এসে বস্তির এক কোণে আশ্রয়ের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে। বস্তির সমস্ত মানুষই শেকড়হীন। বিচিত্র শ্রেণির মানুষের একমাত্র ও শেষ আশ্রয় স্থল এই বস্তি। সংকট, যন্ত্রণা ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ভাগ্যতাড়িত, ইতিহাস লাঞ্ছিত এবং রাজনীতি পীড়িত অসহায় মানুষগুলি জীবন স্রোতে টিকে থাকতে চায়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পাশাপাশি ধর্মীয়ভিত্তিতে দেশ ভাগও হয়েছিল। তার ফলে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়— হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ছিন্নমূল হয়ে আসা সংখ্যালঘু মানুষেরা নিজের বরাদ্দ দেশে এসেও পায়ের নিচে মাটি ও মাথার উপরে ছাদ পায় না। প্রতিনিয়ত তাদের টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হয়। 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে ব্রহ্মপুত্র ঘেষা বস্তিতে বাস করে ছিন্নমূল হয়ে আসা পরানের পরিবার। দেশভাগের আগে পরানের সমস্ত কিছু ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর উদ্‌বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষ তথা আসামে আসার পর তার আর কিছুই নেই। সেই আক্ষেপ তার উক্তির মধ্যে স্পষ্ট—

> "আমাগো ঘর আছিল, জমি আছিল, লাঙ্গল আছিল, বলদ আছিল। সব আছিল। আইজ আমাগো কিছুই নাই। ব্যাবাকটা কে খাইল, কন বাবু গো!"[১]

আবার দেশভাগ হয়েছে ধর্মীয় ভিত্তিতে। নিজের বরাদ্দ দেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার পরেও পরানের মতো হাজারো মানুষ এ দেশের নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি। যে দেশে তারা জন্ম গ্রহণ করেছে ও বেড়ে উঠেছে, সেই দেশ তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর বরাদ্দ দেশে কেউ তাদেরকে বলে বিদেশি, কেউ বা বলে শরণার্থী। সেই যন্ত্রণা থেকে পরান বলে—

> "যাওনের তো আর জাগা নাই। হেই পারে মাইরা কাইটা নাথি দিয়া খেদাইল। এই পারেও দ্যাখতাছি জেবনের এতটা কাল কাটাইয়াও দ্যাশের মানুষ হইতে পারলাম না। বাবু গো, আমাগো দ্যাশ তাইলে কুনটা?"[২]

ব্রহ্মপুত্র ঘেষা বস্তির মানুষেরা অসহায় ও নিরীহ। সামান্য উপার্জিত অর্থে তাদের দিন কাটে। অথচ বস্তির এই অসহায় ও দরিদ্র মানুষেরা রাজনীতি ও মুনাফাকামী অপশক্তির সাঁড়াশি আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে। তারা বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করতে বস্তির ঘরে ঘরে তারা নোটিশ পাঠায়। বস্তির ঘরে ঘরে 'লুটিশ' এসে পড়ায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বস্তিবাসীদের মধ্যে। সেই নোটিশের মূল বক্তব্য হল — আইয়েমডিটে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে তাদের নাগরিকত্ব। প্রমাণ করতে হবে তারা বাংলাদেশি নয়। ধীরু মনে করে কেবল মুসলমানরাই বাংলাদেশি। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙে। ধীরু রিকশা চালক। তার রিকশা থেকে নেমে যাওয়া লোকটি যখন চোখ পাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে —

> "অই বাংলাদেশি। ক্যালা, দাঁত ভাঙি দিব। ল'লে লবি, না হলে এটা পয়সাও নিদিও।"[৩]

আবার ধীরুর মতো সাধনকে রিকশার প্যাসেঞ্জার লোকটা বলে—

> "দিমু না। কি করবি শালা? ঘর জ্বালাইয়া দেব। ক্যালা বাংলাদেশির পুত। বেশি বাইরা গেছস। শুয়োর। ...হালার ভাড়াই দিমু না। যাহ্‌ কী করবি কর গিয়া। তর কুন বাপরে ডাইক্যা আনবি আন গিয়া।"[৪]

বস্তিবাসীর মনে এক অজানা ভয় সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। কে জানে কখন এসে পুলিশ হানা দেবে। সেই ভয়ে বস্তিবাসীর অনেকেই যৎসামান্য সামগ্রী যেমন বিছানাপত্র, হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি আছে তা গুছিয়ে রাখে। তবে হরেন মাস্টার অবশ্য তাদের আশ্বাস দিয়ে জানায়—

> "তোমাদের তো গতবারের ভোটের সময় নাম ছিল।"[৫]

গতবছর তাদের অনেকের ভোটার লিস্টে নাম থাকলেও প্রমাণ হিসেবে যদি জমির দলিল দেখতে চায়, তাহলে তা আবার অনেকের নেই। কেননা, এই বস্তির বেশিরভাগ লোকজনই চর থেকে আসা। শীতকালে চর মাথাচাড়া দেয় এবং বর্ষাকালে ভেসে যায়। ফের নতুন জায়গায় চর মাথা তুলে দাঁড়ায়। চরের জমির দলিল তাদের কাছে নেই। সুতরাং এক অজানা ভয় তাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। আর এই ভয় থেকেই ধীরু ইসমাইলকে এই নোটিশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে—

> "আমাগো বিদেশি কইলেই শুনুম নাকি। হেরা কওনের কেডা? আমরার নানার বাপজান হেই পাড়ের মানুষ আছিলা, সাচা কথা। কিন্তুক, নানা আমরার বাপজান, আমরা ব্যাবাকটি ভাই-বুন সব এই পারে হয়ছি। লুটিস দিলেই হইব? দ্যাশটা মগের মুল্লুক নাকি।"[৬]

ইসমাইলের কথার প্রত্যুত্তরে ধীরুও বলে—

> "আমার বাবা দ্যাশ ভাগ হওনের পর আইছিল। অন্তত পঞ্চাশ পাঁচপান্ন বছর হইব। আমাগো জন্ম তো এই দ্যাশেই। বরপেটায় আছিলাম, নগাঁওয়ে আছিলাম। বানে সব ভাইস্যা গেল গতিকেই না আমাগো ব্যাকটিরে লইয়া বাবা এই হানে আইছে। তাও ধরো গিয়া বিশ বচ্ছর হইব। কী অশান্তি কও দেখি।"[৭]

ইসমাইল ধীরুকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে—

> "ভাইবো না অত কিছুই হইব না। গেল হপ্তাই আমি নামাজে গেছিলাম। তয়, কথাটা মোল্লারে কইলাম। হ্যায় কি কয়, জানো? কয় ...ভুট আইছে তো। সব ঠিক হইয়া যাইব। দ্যাহো দিহি, বাইছা বাইছা বস্তির ব্যাবাকটিরে লুটিশ দিছে। হালা খানকির বাচ্চা।"[৮]

আবার হরিপদ ইসমাইলকে অভয় দিয়ে বলে—

> "কিছুই হইব না। বচ্ছর বচ্ছর এই গুলান চলতাছে। বিদেশটারেই হালার দেখলাম না, আর আমাগো ব্যাকটিরেই বানাইছে বিদেশি।"[৯]

আসলে কোনো এক অজানা ভয় থেকে তারা যে এদেশের নাগরিক তার যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছে একে অপরের কাছে।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় যারা দীর্ঘদিন ধরে যারা এই বস্তিতে বাস করছে তাদের নামে সরকার নোটিশ পাঠিয়েছে। তারা দেশি না বিদেশি তার প্রমাণ দিতে। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা অর্থের বিনিময়ে সমস্ত প্রমাণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজ তৈরি করে নিয়েছে। 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসের তেমনি একটি চরিত্র হল নরেশ। নরেশ লোককে টাকা দিয়ে নিজের জায়গা ধরে রাখার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। হরিপদর বক্তব্যের মধ্যে তা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে—

> "নরাশ্যা তো ট্যাহা দিয়াই খালাস হইল। অরে নোটিশ দেয় নাই।"[১০]

নরেশ নিজের জায়গা পাকা করতে এই এলাকার কমিশনের ফাইফরমাশও খাটে। কমিশনের মাধ্যমে সে পুলিশকে ম্যানেজ করেছে। বস্তির সকলেই জানে এই গিট্টির দালালি করা চতুর লোক নরেশই হল একমাত্র বিদেশি। ইসমাইল তাই বলে—

> "শুন, হেইডাই আসল বিদেশি। গতিকে আগেই সব কাগজপত্র বানায়া নিছে। দ্যাশের মানুষের আর কাগজে কী দরকার?" [১১]

আবার মুনাফাধারী স্বার্থপর মানুষের অত্যাচারে এই বস্তিবাসী মানুষের জীবন নাভিশ্বাস হয়ে উঠে। এই উপন্যাসে মুনাফাধারী মানুষ পরেশ নেওগ। সে ঠিকাদারের কাজ করে। পরেশ নেওগ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো কাজ করতে পিছুপা হয় না। একসময় হাসপাতালের কাছে একটি বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করে সেখানে দালান বা অট্টালিকা তৈরি করে মোটা পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে। এখন তার চোখ পড়েছে এই আধাবস্তি মানুষদের প্রতি। পরেশ নেওগের এই অভিসন্ধির কথা বস্তিবাসীর মুখে মুখে ঘোরে। সকলে ভয়ে আতঙ্কে থাকে। কারণ তারা সকলেই জানে পরেশ ঠিকাদার যা চায় তা করে দেখায়। পরেশ ঠিকাদার অর্থের লোভ দেখিয়ে প্রশাসনের লোককে হাত করেছে। সেই লোভে থানার বড়বাবুও পা বাড়িয়েছে। সরকারের এই নোটিশ দেওয়াকে পরেশের চাল বলে বস্তিবাসী মনে করে। বস্তিবাসী যদি প্রমাণ দেখাতে না পারে তাহলে বিদেশি বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং পরেশ ঠিকাদার সেই সুযোগে সেখানে সহজেই প্রাসাদ গড়ে তুলতে পারবে। বস্তিবাসীর অনেকে মনে করে শনিয়াকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পিছনে পরেশ নেওগার হাত রয়েছে। আসলে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়। সে কথা বস্তির মানুষজন যে বুঝতে পেরেছে তা সাধনের বক্তব্যে স্পষ্ট—

> "আমরার ব্যাকটিরে মাইরা খেদাইব নাকি? মনে ত কয় শনিয়ারে সেই কারণেই মারছে। বুঝলা না, আমাগো ডরাইয়া দিবার চায়।"[১২]

বস্তির সকলেই বিশ্বাস করে শনিয়া কখনো পরেশের কিছু করার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারে না। শুধু শনিয়ায় নয়, বস্তিবাসীর কেউই তা করতে পারবে না। হরেন মাস্টার বস্তিবাসী না হলেও বস্তিমানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। হরেন মাস্টার দিলীপকে বলে—

> "তুমি ঠিকই বলেছ। শনিয়া চুরি করতে পারে না। যে পরিশ্রম করে বেঁচে থাকে সে চুরি ডাকাতি করে না।"[১৩]

বস্তি উচ্ছেদ করার জন্য শনিয়াকে চুরির অপবাদ দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া পরেশের চাল হতে পারে বলে মনে করে দিলীপ। দিলীপ হরেন মাস্টারকে বলে—

> "...আসলতে কি জানেনে মাস্টার— বস্তির মানুহক খেদিব বিচারিছে। যেনে তেনে ইয়ার মানুহক খেদিব। ইয়াত ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং বনাই বেচিব পরেশে।"[১৪]

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে দেখা যায় রাজনৈতিক চাপ ও মুনাফাকারী ফন্দিবাজ মানুষের চাপে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলির জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তারা সব কিছু না বুঝলেও অনেক কিছু তারা জানে এবং বোঝে। কিন্তু এই অসহায় মানুষগুলি নীরবে সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে থাকে। বস্তির নিরক্ষর, সহজ-সরল মানুষগুলি স্বার্থপর বা স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। সেই সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে।

সমর দেবের 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে বস্তিবাসী মানুষের সমাজ-জীবনের আলেখ্য ধরা পড়েছে। এই বস্তির সকলেই ছিন্নমূল হয়ে আসা। নিত্য অভাবে এই বস্তি মানুষের জীবন অতিবাহিত। তাদের একবেলা খাবার জুটলেও আরেক বেলা না খেয়ে প্রায় প্রতিটি বস্তির মানুষকে দিন কাটাতে হয়। দৈনন্দিন অভাবের মধ্যেও বস্তির প্রতিটি পরিবার একে অপরের পাশে থাকে। সমাজের কিছু মুনাফাকামী, স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থের জন্য এই বস্তির মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে লক্ষ করলে দেখা যায় যে পরেশ নেওগা নামে একজন ঠিকাদার কেবল নিজের স্বার্থে এই বস্তি তথা বস্তির মানুষকে উচ্ছেদ করে বিরাট বিল্ডিং তৈরি করতে চায়। তারা তাদের মুনাফা লাভের জন্য যে কোনো কাজ করতে পারে। আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করতে পারে। কারণ এই পরেশই লোক দিয়ে হাসপাতালের কাছে বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উচ্ছেদ ঘটায় এবং পরে সেখানে বিরাট ফ্লাট নির্মাণ করেছে। এই আশঙ্কা বস্তির প্রতিটি মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলে। বস্তির শনিয়াকে পুলিশ পরেশের জিনিসপত্র চুরির দায়ে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু শনিয়া যে চুরি করেনি বস্তির প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করে। আসলে তাদের মধ্যে একটা ভয়ের আতঙ্ক তৈরি করতে চেয়েছিল। সাধু ও মদনের কথপোকথনের তা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে—

> "আমরার ব্যকটিরে মাইরা খেদাইব নাকি? মনে তো কয় শনিয়ারে সেই কারণেই মারছে। বুঝলা না, আমাগো ওবাইয়া দিবার চায়। আমরার অ্যাওগুলান মানুষরে কুত্তার লাগান খেদাইব। যামু কই।"[১৫]

আমরা জানি তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির কাজ। পরেশের মতো পয়সাওয়ালা লোকের পাশে প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনীতির বড়ো বড়ো লোকেরা রয়েছে। কিন্তু এই নিম্নশ্রেণির অসহায় মানুষদের পাশে তারা থাকে না বলেই সমাজের স্বার্থপর ও সুযোগ সন্ধানী মানুষেরা সহজেই এই অভাব পীড়িত মানুষদের উপর শাসন ও শোষণ চালায়।

কথাকার সমর দেব রচিত 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনে সংকট ও যন্ত্রণার পাশাপাশি প্রেমের দিকটিও উঠে এসেছে। প্রেমের বিচিত্রতা উপন্যাসে ধরা পড়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রেম শরীরী অনুষঙ্গে ধরা দিয়েছে। প্রেম আদিম ভোগ বাসনা তাড়িত। ব্রাত্য, পরাজিত মানুষগুলি বার বার যৌনতার কাছে সপে দিয়েছে। যৌনতা যেন এক বাঁচার রসদ। আবার যৌনতা পেরিয়ে হঠাৎই জাগ্রত প্রেম পাঠককে চমকে দিয়েছে। মাতৃত্বের অভিলাষা থেকে যৌন সম্পর্ক যেমন ধরা দিয়েছে তেমনি কামাসক্ত নারী প্রেমের মধ্যেই খুঁজে নিয়েছে বাঁচার আশ্রয়।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে সুবল ও মালতির মেয়ে লক্ষ্মী। পল্টু লক্ষ্মী একে অপরকে ভালোবাসে ও কাছে পেতে চায়। কিন্তু একসময় লক্ষ্মী পল্টুর কাছে ধরা দিতে গিয়েও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ চায়নার জীবনের পরিণতি

তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই বস্তির মেয়ে চায়না। চায়না ভালোবেসে কৃপার সঙ্গে কম বয়সে পালিয়ে ছিল। কিন্তু চায়নার স্বামী অর্থের লোভে তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তারপর একাধিক পুরুষের আগমন ঘটে চায়নার জীবনে। শেষপর্যন্ত তিনটে সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে এই বস্তিতে মা-এর কাছে এসে ওঠে। এখানে এসে তেলের কলে কাজ করার সময় ম্যানেজার চায়নাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোগ করে। শেষপর্যন্ত তাকে বিয়ে না করে কাজ থেকে ছাটাই করে দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যে নানা ভাবে নানা দিক থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত তা লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখি রঙমিস্ত্রি রমেন শিবুর বোন নন্দাকে ভালোবাসে। কিন্তু শিবু তাদের এই সম্পর্ককে মেনে নিতে পারে না। কারণ শিবু রমেনকে সেভাবে জানে বা চেনে না। এইরকম অপরিচিত মানুষের হাতে শিবু তার বাপ মা মরা বোনকে তুলে দিতে চায় না। তাছাড়া একসময় নন্দা কমলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়। নন্দা তাকে বিয়ের কথা বলতেই হাওয়া হয়ে যায়। শিবু তার কোনো খোঁজ পায়নি। বোনকে বাঁচাতে শিবু তার সঞ্চয়ের টাকা খরচ করেছিল। তাই কমলের দ্বারা ব্যবহৃত ও প্রত্যাখ্যাত নন্দা রমেনের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে সিঁদুরের নিশ্চয়তা দাবি করে। নন্দা পুরোপুরি রমেনের কাছে ধরা না দিয়ে পালিয়ে আসে। নন্দার এই ব্যবহারে রমেন আঘাত পাই। তাই অভিমানে আত্মহননের পথ বেছে নেয় রমেন।

আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হরেন। যার পেশা শিক্ষকতা। এই বস্তিবাসী মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী। তবে হরেন মাস্টারের সঙ্গে সংগীতার প্রেম অন্য রকম হতে পারতো। কারণ তারা দুজনেই শিক্ষিত। সংগীতার বাবার অনুরোধে পড়া দেখিয়ে দেওয়ার সূত্রেই সংগীতার সঙ্গে হরেনের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা। রূপ মুগ্ধতা, হৃদয়াবেগ নিয়েই হরেন ও সংগীতার কাহিনির সূত্রপাত। প্রথম থেকেই সংগীতা তার শরীর দিয়ে হরেনকে লাভ করতে চেয়েছে। আবার ধীরুর বউ শেফালি। সে বন্ধা। ইসমাইলের সঙ্গে সে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। নিজের 'বাজা' পরিচয় ঘোচাতে একদিন ইসমাইলকে শেফালি আহ্বান করে। এরপর মাতৃত্বের অহং এ বিকশিত হতে থাকে শেফালি। শেষপর্যন্ত শেফালি বস্তিবাসের অনিশ্চয়তা জীবন ছেড়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় আর ইসমাইলের প্রতি অপ্রতিরোধ্য টানে ধীরুকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসের বস্তিবাসী সমস্ত মানুষই প্রায় শ্রমজীবী। উপার্জনের অনিশ্চয়তা তাদের জীবনের অঙ্গ। আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সুবল। বৃদ্ধ বাবা পরান, বউ মালতি ও চার ছেলে মেয়ে নিয়ে তার সংসার। সুবল কাজ করে সংসার চালায়, আর তার স্ত্রী মালতি বাড়িতে ঠোঙা বানিয়ে যৎসামান্য উপার্জন করে সংসারটাকে মসৃণ ভাবে চলতে সহায়তা করে। ধীরু রিক্‌শা চালায়, বউ শেফালি ও মাকে নিয়ে তার সংসার। ধীরুর মতো সাধুও রিক্‌শা চালিয়ে জীবন নির্বাহ করে থাকে। শিবু কলের মিস্ত্রি, সে তার বোন নন্দাকে নিয়ে থাকে। নন্দা রঙের মিস্ত্রি রমেনকে ভালোবাসলেও তার প্রাক্তন প্রেমিক কমল তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে তাকে সে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারেনি। মদন মদ বিক্রি করে সংসার চালায়। স্ত্রী জবা ও মেয়ে কুটিকে নিয়ে তার জীবন। মদ বিক্রি করে তার ভালো উপার্জন হয়। কিন্তু সে যে পথে অর্থ উপার্জন করে তার জন্য প্রশাসনকে খুশি রাখতে মাঝে মাঝে অর্থ দিতে হয়। দরিদ্র মানুষের উপর এ এক শোষণ প্রক্রিয়া। আবার কিষান মণ্ডলের মেয়ে চায়না তার তিন-তিনটে সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে। চায়না পরিবার তথা সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিতে তেল কলে কাজ করে। তেল কলের ম্যানেজার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ব্যবহার ও ভোগ করেছে। শেষপর্যন্ত ম্যানেজার চায়নাকে তার কর্ম থেকে ছাঁটাই করে দেয়। এইভাবে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা নানা ভাবে শোষিত হয়।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে হরেন মাস্টার বস্তিবাসী না হলেও এই বস্তিবাসী মানুষদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীক ভাবে জড়িয়ে গেছে। হরেন মাস্টার পাণ্ডুর রেল কোয়ার্টারে ভাড়া থাকে। বস্তিবাসী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আশা-নিরাশার সঙ্গী। বস্তিবাসী মানুষেরা তাদের শলা পরামর্শের জন্য তাকে (হরেন মাস্টার) ডাকে। আবার কখনো হরেন মাস্টার নিজেই তাদের কাছে যায়। একসময় এই বস্তিবাসী মানুষেরা হরেন মাস্টারের নেতৃত্বেই শনিয়ার মৃত্যুর জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

আলোচ্য উপন্যাসে ব্রহ্মপুত্র ঘেষা বস্তিবাসী মানুষের জীবন নানা বিশ্বাস-সংস্কারে ঘেরা। ওঝার প্রতি এই সমস্ত মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। তাই তারা অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। আলোচ্য

উপন্যাসে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ওঝার প্রতি বিশ্বাস রেখে মদ বিক্রেতা মদন তার একমাত্র মেয়ে কুটিকে নিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওঝা সম্পর্কে রমেন মদনকে বলেছে—

> "শুনছি ভালো ওঝা। একবার লইয়া যাও। কওন তো যায় না। মেডিকেলে সারাতে পারে নাই এমুন কতো মাইনসেরে হ্যায় ভালো করছে। সগগলেই কয়। দেরি কইর না। পাললে, কাইলি লইয়া যাও না।"[১৬]

রমেনের কাছ থেকে হরিশ ওঝার কথা জেনে মদন তার স্ত্রীকে বললে সে বলে—

> "তাহলে কাইলই চল না গো। আমি তো ভালো কিছু বুঝতাছি না। মাইয়া তো শুকায়, খালি শুকায়।"[১৭]

শেষপর্যন্ত মদন তার মেয়েকে নিয়ে যায়। মেয়েকে ভালো করার জন্য একান্ন টাকা দক্ষিণাও দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আবার মদন এও বলেছে যে তার মেয়ে যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে পরে হরিশ ওঝাকে একশো টাকা দেবে। এমনকি ঠাকুরের কাছে পাঁঠাবলিও দেবে। আসলে সকল জন্মদাতা তার প্রাণের সম্পদকে বাঁচানোর জন্য সব কিছু করতে পারে। কিন্তু ওঝার কাছ থেকে আসার পর তার মেয়ে কুটির অবনতি ঘটে এবং পরের দিনই সে সকলকে ফাঁকি দিয়ে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেয়।

আবার তারা বিশ্বাস করে কাকের কা কা ডাক কু-বার্তা বহন করে আনে। কোনো কাক যদি কা কা করে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়, তাহলে তাদের মনে ভয়ের আশঙ্কা জাগে। তাদের বিশ্বাস কাকের এই ডাক মানুষের মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনে। তেমনি উপন্যাসে দেখা যায় কুটির মৃত্যুর আগে এক দল কাক কা কা করে ডেকে উড়ে চলে যায়। আবার ইষ্টি কুটুম পাখির ডাক আনন্দের বার্তা বাহক বলে তারা বিশ্বাস করে। চায়না যখন দীর্ঘ কয়েক বছর পর তার মায়ের বাড়িতে ফিরে আসে, তখন তার মায়ের মনে হয়েছে সকাল থেকে ইষ্টি কুটুম পাখিটা ডাকছিল। তারা রাত্রে সাপ দেখলে সাপ না বলে দড়ি বলে। কারণ, তাদের বিশ্বাস যদি সাপ বলা হয় তাহলে হয়তো কোনো ক্ষতি হতে পারে। আবার গর্ভবতী মহিলাকে সন্ধ্যা বেলায় একা বাড়িতে রাখার নিয়ম নেই। তাই শেফালির স্বামী ধীরু নিজেই কামাখ্যা বাড়ি থেকে একটু প্রসাদি ফুল নিয়ে এসে তার বালিশে গুঁজে রাখে। এই ধরনের নানা বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে গাঁথা তাদের জীবনের যাপন কথা।

কথাকার সমর দেব তাঁর 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে ব্রহ্মপুত্র ঘেষা প্রান্তিক, ব্রাত্য মানুষের জীবনের বহুমুখী সমস্যার দিককে তুলে ধরেছেন। জীবন তো কখনো থেমে থাকে না। এগিয়ে চলার নামই জীবন। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় অনেকেই এই বস্তি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে নতুন ভাবে বাঁচার পথ খোঁজে।

Reference:

১. দেব, সমর, 'লোহিত পারের উপকথা', ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, আসাম, প্রথম সংস্করণ, ২০১০, তদেব, পৃ. ১২
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ১৮
৪. তদেব, পৃ. ১৯
৫. তদেব, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ১৭
৮. তদেব, পৃ. ১৭
৯. তদেব, পৃ. ৪৫
১০. তদেব, পৃ. ৪৫
১১. তদেব, পৃ. ৪৫
১২. তদেব, পৃ. ১১১
১৩. তদেব, পৃ. ১০৩

১৪. তদেব, পৃ. ১০৩
১৫. তদেব, পৃ. ১১১
১৬. তদেব, পৃ. ১০৯
১৭. তদেব, পৃ. ১০৮

Bibliography:

চৌধুরী, সুজিত, ‘বরাক উপত্যকার বাঙালী : অস্তিত্ব ও অবয়বের সংকট’, আসাম, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০২
দেব, সমর, ‘লোহিত পারের উপকথা’, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, আসাম, প্রথম সংস্করণ, ২০১০
নাইনথ কলাম (১৬), উত্তর-পূর্বের বাংলা কথাসাহিত্য, গুয়াহাটি, আসাম, নভেম্বর, ২০২০
পাণ্ডা, অগ্নিমিত্রা, ‘উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্যচর্চা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ২০১৭
ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার, ‘নির্বাচিত সাহিত্য’, তৃতীয় খণ্ড (উপন্যাস ও গল্প ২), সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দী, আসাম, প্রথম প্রকাশ ১ জুলাই ২০০৫

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 540 - 551
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লোকায়ত ভাবনায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' : উপন্যাস বনাম চলচ্চিত্র

গৌরব সরকার
গবেষক, বিশ্বভারতী
Email ID : sgourab35@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Folk culture, Malo community, Advaita Mallabarman's, Titas Ekti Nadir Naam, Ritwik Ghatak, Malo culture, Novel versus film

Abstract

The Titas River, originating from and merging back into the Meghna River, is a culturally and historically significant river in Bangladesh. Flowing through Brahmanbaria in Bangladesh and Tripura in India, the Titas River served as the central theme of Advaita Mallabarman's renowned novel 'Titas Ekti Nadir Naam', which depicts the lives of the Malo community. Their livelihood, festivals, music, and folk beliefs form the core of the novel. Based on this literary work, Ritwik Ghatak created a film of the same name.

The Malo community depends on fishing in the Titas River for their sustenance. They observe various traditional customs and beliefs, such as rituals after childbirth, writing fortunes with Chitragupta's ink, and offering special foods for the deceased. Their vibrant festivals include playing with colors and music during Dol Purnima. Music is an integral part of their lives, reflected in genres like Murshidi, Sari, and Baromasi songs, which express their joys, sorrows, and cultural identity.

The Malo community's lifestyle is rich in diversity, including unique dietary habits and proverbs reflecting societal realities and humor. The Titas River symbolizes more than just a river; it represents the life, history, and cultural identity of a community.

This essay delves into how Ritwik Ghatak's film portrays the life of the Malo community as depicted in the novel. It examines which aspects the director excluded, which he added, and provides reasons for these creative choices.

Discussion

তিতাস মাঝারি মাপের নদী। মেঘনা থেকে এর উৎপত্তি মেঘনাতেই সমাপ্তি। এ নদীর কোন বড় ইতিহাস নেই। তবে লেখকের কথায় –

> "পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহে, ভাইয়ের প্রেম, বউ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সেই ইতিহাস হয়তো কেউ জানে না। তবু সে ইতিহাস সত্য।"[১]

তিতাস বাংলাদেশ-ভারতের সীমানা সংশ্লিষ্ট একটি নদী। নদীটির উৎপত্তি ভারতের রাজ্য ত্রিপুরায়। ভারতে বাংলা ভাষায় হাওড়া নদী এবং স্থানীয় কোকবোরোক ভাষায় সাঈদ্রা নদীনামে এটি পরিচিত। বাংলাদেশে এটিই তিতাস নদী। নদীটি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার কাছাকাছি থেকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলা দিয়ে নদীটি প্রবেশ করে শাহবাজপুর টাউন অঞ্চলের সীমানা ঘেঁষে এটি আরো দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে ভৈরব-আশুগঞ্জের সীমানা ঘেঁষে মেঘনা নদীর সাথে মিশে গেছে। তিতাসের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮ কিলোমিটার। কোন কোন উপকথায় বলা হয়েছে যে, তিতাস নদী মেঘনার কন্যা বা মেয়ে।

এই তিতাসকে কেন্দ্র করেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। লেখকের মৃত্যুর পরে যেটি প্রকাশিত হয়। এটিকে কেন্দ্র করে মৌলিক-সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক একটি ছবি তৈরি করেন। ২৭ জুলাই ১৯৭৩ সালে ছবিটি মুক্তি পায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামেই। প্রযোজক ছিলেন হাবিবুর রহমান খান। নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক বলেন —

> "তিতাস পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) এ রকম লেখার দেখা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো - সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়।"[২]

উপন্যাসটি মালো সম্প্রদায়ের জীবনকথা। ররুণ কুমার চক্রবর্তীর ভাষায় 'মালোদের জীবন পাঁচালী'। লেখক যা ফুঁটিয়ে তুলেছেন আপন জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে। সেই মালোদের জীবন-যাপনের যে ছবি, তাকে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।

জীবিকা : নদীতে যখন জল থাকে তখন মালোরা তিতাস নদীতেই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। যখন জল কমে যায় তখন এরা নৌকা নিয়ে বিদেশ পাড়ি দেয়, কোন মালিকের আন্ডারে মাছ ধরে রুজি রোজকার করতে। মেয়েরা শণসুতা দিয়ে মিহি ও মোটা দুরকম সুতো কাটে। সেই সুতো জেলেরা কিনে নিয়ে নিজেরাই জাল বোনে। মোটামুটি এই তাদের মূল জীবিকা।

বিশ্বাস-সংস্কার : যে সমস্ত লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের বশবর্তী মালোরা তার মধ্যে আছে - এদের রীতিতে শ্বশুরের নাম মুখে না আনা। সেই জন্য মালোপাড়ার এক নারীর শ্বশুরের নাম পাণ্ডব ছিল বলে পান কে সে বলে বট পাতা।

> "ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়।"[৩]

মোলোদের সন্তান প্রসবের সময় এই রীতি প্রচলন। কালোর মার ঘরের মেজ বৌয়ের সন্তান হওয়া প্রসঙ্গে এই রীতির কথা এসেছে। সন্তান ছয় দিনের হলে ঘরে দোয়াত কলম রেখে দেওয়ার নিয়ম। তাদের বিশ্বাস এই রাতে চিত্রগুপ্ত এসে দোয়াত থেকে কালি নিয়ে ওই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখবে তার ভাগ্যলিপি। অষ্টম দিনে হয় আটকলাই। তের দিন পর্যন্ত অশৌচ থাকে। অশৌচ কাটানোর দিন নাপিত এসে সকলের চুল-দাড়ি কামিয়ে দেন, এবং পুরোহীত দিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে অশৌচ কাটানো হয়।

অনন্তর মা মারা যাবার পরে তাদের রীতি অনুসারে আচার-অনুষ্টান সেরেছে অনন্ত। আলোচাল আর কলা দিয়ে মালসায় জাউ রেঁধে সাত খানা ডোঙা বানিয়া তাতে জাউ আর কলা দিয়ে তুলসী তলায় সারি সারি সাজানো হয়। অনন্ত শুনেছে তার মা কাকের রূপ ধরে এসে ঐ জাউ কলা খেয়ে যাবে।

আলীর নাম স্মরণ সাদির নৌকা খোলে বাইচের দিন, এটাই এদের সংস্কার। আবার বনমালী কাদিরের বাড়ি এলে কাদির মুসলিম এবং বনমালী হিন্দু হওয়াতে সে বনমালীকে অন্য খাবার না দিয়ে দুধ ও চিড়ে খেতে দেয়। ইত্যাদি এসব আরো বিশ্বাস ও সংস্কারে মালোদের জীবন ঘেরা।

উৎসব : চৈত্রমাসে মাঝামাঝিতে শুকদেবপুরে দোল পূর্ণিমা। দোলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হোলি খেলে গান-বাজনা করে, রঙ খেলা ও খাওয়াদওয়া করে। করতাল ও রামকরতাল, ঘুঙরা বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ায় এই দিনে।

সংগীত : মাঘমণ্ডল ব্রত উপলক্ষ্যে মালো পাড়ায় উৎসব, সেই উৎসবকে কেন্দ্রকরেই গান গায় নারীরা 'সখি ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো, কই কালাচাঁদ আইলো'। গানটির জন্মইতিহাস তাদের জানা নেই। ৭ বছর আগে বাসন্তী যখন গর্ভে তখনও তারা এই গান গেয়েই ব্রত উদ্‌যাপন করতো।

শুকদেবপুর যাবার সময় নৌকা যখন তিতাস ছেড়ে ভৈরব বন্দর পার করে কুলঘেষে চলছিল, সে সময় কিশোর গেয়ে ওঠে -

"উত্তরের জমিনেরেসোনা-বন্ধু হাল চষে
লাঙ্গলে বাজিয়া ওঠে খুরা।
দক্ষিণা মলয়ার বায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়
কার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া।"[৪]

দোল উপলক্ষ্যে গান। খলা ও শুকদেবপুরে নর-নারীরা মিলিত হয়ে দুদলে বিভক্ত হয়ে গান ধরলেন। একদল কৃষ্ণের দল অন্যদল রাধার দল -
রাধার দল ভদ্রভাবে গান তুলল -

'কৃষ্ণের দল সুর চড়াল
সুখ বসন্তকালে ডেকোনারে
অরে কোকিল বলি তুমারে।
বিরহিনী বিনে কান্ত হৃদাগ্নি হয় জ্বলন্ত,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে হয়নারে শান্ত।
সে-যে ত্যজে' অলি কুসুম-কলি রইল কি ভুলে।।

'বসন্তকালে এলরে মদন-
ঘরে রয় না আমার মন।।
বিদেশে যাহার পতি,
সেই নারীর কিবা গতি,
কতকাল থাকিবে নারী বুকে দিয়া বসন।।

'রাধার দল তখনও ধৈর্য ঠিক রেখে গাইল—
বনে বনে পুষ্প ফুটে,
মধুর লোভে অলি জুটে,
কতই কথা মনে মনে উঠে সই-
ব্যথা কার বা কাছে কই ।।
দারুণ বসন্তকাল গো,
নানা বৃক্ষে মেলে ডাল গো,
প্রবাস করে চিরকাল সে এল কই-

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বসিয়া তরুর শাখে কুহু খুহু কোকিল ডাকে,
আরে সখিরে এ-এ-এ-

'কৃষ্ণের দল আবার অসভ্য হয়ে উঠল –

"আজু শুন ব্রজনারী
রাজোকুমারী, তোমার যৌবনে করব আইন-জারি
হস্তে ধরে নিয়ে যাব
হৃদকমলে বসাইব – রঙ্গিনী আয় লো-
হস্তে ধরে নিয়ে যাব, হৃদকমলে বসাইব।
বসন তুলিয়া মারব ঐ লাল-পিচোকারী-"[৫]

শুকদেবপুর থেকে কিশোরদের ফেরার পথে ভৈরব বন্দরে নৌকা থাকানো হয়। সেখানে সকলে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের ঘুমিয়ে পড়ার কথা। সে সময় নৌকাতে নৌকাতে গান শুরু হয়। 'বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের এই নদী-বিহারীদের কতকগুলি নিজস্ব সম্পদ আছে। অমনিতেই তারা শুইয়া পড়ে না।' শুরু করে গান – নৌকা থেকে ভেসে আসে মুর্শিদা গান -

"এলাহী দরিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নায় ডুবল ভেলা। ..."[৬]

কালোর মার মেজ বউমার ছেলের অশৌচ কাটার দিন পুরনারীরা গান করেন –

"দেখ রাণী ভাগ্যমান, রাণীর কোলেতে নাচে দয়াল ভগবান। নাচরে নাচরে গোপাল খাইয়া ক্ষীর ননী, নাচিলে বানাইয়া দিব হস্তের পাচনি। একবার নাচ দুইবার নাচ তিনবার নাচ দেখি, নাচিলে গড়াইয়া দিব হস্তের মোহন বাঁশি।"[৭]

ময়না আঁস্তাকুড়ের পাশের ছিট্‌কি গাছের জঙ্গলে পাখি তাক করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে সে গুণ গুণ করে গান ধরে 'টিয়া পাললা, শালিক পাললাম, আর পাললাম ময়না রে। সোনামুখী দোয়েল পাললাম, আমার কথা কয় না রে।'

মালো পাড়াতে বসন্তের আগমনে ঢোলক বাজিয়ে তারা দোলের দিন গান গেয়ে বেড়ায় – 'বসন্ত তুই এলিরে, ওরে আমার লাল ত এলো না।'

নয়নতারার স্বামী একটি গান গেয়েছে – 'ও চাঁদ গৌর মাথার শঙ্খ-শাড়ি, ও চাঁদ গৌর আমার সিঁথির সিন্দুর চুল-বান্ধা দড়ি, আমি গৌর-প্রেমের ভাও জানি না ধীরে ধীরে পাও ফেলি।'

একটি বারোমাসি গান গেয়েছে একজন 'হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্থে বুনে বীজ। আনগো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ।। বিষ খাইয়া মইরা যামু কাবে বাপ মায়। আর ত না দিবে বিয়া পরবাসির ঠাঁই। ...' গানটা তীরে দাঁড়িয়ে রমু শুনেছিল।

নৌকা খেলার জন্য সাদির মিয়া চার জন ছুতোর মিস্ত্রিকে নিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন গেয়ে ওঠে – 'ছোট লোকের খানা-পিনা রে বিহানে বৈকালে বড় লোকের খানাপিনা রাত নিশা কালে রে – হায় কান্দে, কান্দেরে দেওয়ান কটু মিয়ার মযায়।' ওদের মধ্যেই যে বড় ছুতোর মিস্ত্রি ছিল সেও গান ধরেছে 'হস্তেতে লইয়া লাঠি, কান্ধেতে ফেলিয়া সাটি, যায়ে বুরুজ দীঘল পরবাসে।'

নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা দেখতে আশা বিভিন্ন নৌকা থেকে বিভিন্ন রকম গান তারা গাইছিল, গানগুলোকে নীচে তুলে ধরা হল -

- ✓ "আকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুর করে নাও, জিত্যা আইলাম রে নাওয়ের গলুই পাইলাম না।'
- ✓ "তারে ডাক দে, দলানের বাইর হইয়া গেল, অ দিদি, প্রা-ণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে।। ...'
- ✓ গদ্যভাবের গান – 'চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে, দারোগা জিজ্ঞাসে, আরে চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে।"
- ✓ সারি গান – 'জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উথলে গো, যাইস না যমুনার জলে। ...'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ✓ সারি গান, বিপ্রলব্ধা রাধা - 'আম গাছে আম নাই ইটা কেনে মারো, তোমায় আমায় দেখা নাই আঁখি কেনে ঠারো। ...'
- ✓ "ও তোরে দেখি নাই রে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে। ...'
- ✓ 'সামনে কলার বাগ, পুব-দুয়রী ঘর। রাইতে যাইও বন্ধু, প্রাণের নাগর।'
- ✓ 'ঝিয়ারীর মাথায় লম্বা কেশ, খোঁপা বান্ধে নানান বেশ, খোঁপার উপর গুঞ্জরে ভোমরা।...'

বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে গিয়ে পূর্বে অনন্তকে মারার অপরাধে উদয়তারা এবং তার সঙ্গীরা বাসন্তীকে প্রচণ্ড মারধর করলে বাসন্তীদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা না দেখেই বাড়ি ফিরে আসে। ফেরবার পথে অন্য একটি নৌকা বাইচ দেখতে যাচ্ছিল সেই নৌকা থেকে একটি গান গাওয়া হয়, গানটি সারি গান - 'সকলের সকলই আছে আমার নাইগো কেউ। আমার অন্তরে গরজি উঠে সমুদ্দুরের ঢেউ। নদীর কিনারে গেলাম পার হইবার আশে। নাও আছে কান্ডারী নাই শুধু ডিঙ্গা ভাসে।'

মালো পাড়ায় পুরাতন ও নতুন সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বিভেদ। দুদলে বিভক্ত হয়। একদল রায় দেয় যাত্রাগানের দিকে অন্যদল তাদের পুরানো রীতি অনুসারে গেয়ে চলে গান, এরা মোহনের দল, মোহন তাদের প্রতিনিধি। ওরা যখন যাত্রাগান করছে এরা তখন এদের সাজানো অনুষ্ঠান সুচীতে গেয়ে চলেছে গান। প্রথমে বিচ্ছেদের গান দিয়ে শুরু শেষ হয় সহচরী গান দিয়ে -

- ✓ 'ভ্রমর কইয়ো গিয়া, কালিয়ার বিচ্ছেদে রাধার অংগ যায় জ্বলিয়া। না খায় অন্ন না লয় পানি, না বান্ধে মাথার কেশ, তুই শ্যামের বিহনে রাধার পাগলিনীর বেশ।'
- ✓ 'জীবন জুড়াব যেয়ে কার কাছে, দয়াল কৃষ্ণ বিনে বন্ধু ভবে কে আছে।'
- ✓ 'এহি বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণে ঝুরিয়াছে দুনয়ানে। পশুপক্ষী সবে কান্দিছে নীরবে হায় হায় কৃষ্ণ বলে।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের গানের প্রকার বদলে চলেছে। পরিবেশকে মাথায় রেখে।

- ✓ 'কালো কালো কোকিল কালো, কালো ব্রজের হরি। খঞ্জনি পক্ষীর বুক কালো, চিত্ত ধরিতে না পারি। শুতিলে না আসে নিদ্রা বসিলে ঝুরে আঁখি। (আমি) শিথান বালিশ পইথা বালিশ বুকে তুইল্যা রাখি।'
- ✓ 'মাটির উপরে বৃক্ষের বসতি, তার উপরে ডাল, তার উপরে বহুলার বাসা, আমি জীবন ছাড়া থাকিব কত কাল। নদীর ঐ পারে কানাইয়ার বসতি, রাধিকা কেমনে জানে।'
- ✓ হরিবংশ গান। কেন গান হরিবংশ হল তা তারা জানে না তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের এই গান শিখিয়েছিল, তাই তারা গেয়ে চলে-

  'না ওরে বন্ধু বন্ধু, কি আর বন্ধু রে,
  তুই শ্যামে রাধারে কিরিলি কলঙ্কিনী।
  মথুরার হাটে ফুরাইল বিকিকিনি'।

তাদের অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে সহচরী গান দিয়ে – 'সহচরী, উপায় বল কী করি'।

এভাবে মালোদের জীবনের পরতে পরতে যে সঙ্গীতের ছোঁয়া রয়েছে, সেই প্রাণের সঙ্গীতকে অদ্বৈতবাবু নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন।

খাদ্য-খাবার : নিত্যদিনের খাবারের মধ্যে রয়েছে ভাত। বিয়েবাড়িতে দেওয়া হয় মুঠো মুঠো বাতাসা। ছোলা ভাজা, মটর ভাজা, কমলা, মাছের ডিম এসব খাবার প্রসঙ্গ। এছাড়া কদমা, নানান ধরণের পিঠে, চিড়ে, গরুর দুধ ইত্যাদি।

প্রবাদ-প্রবচন : লোকায়ত মানুষ অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের নিত্য দিনের জীবন যাপনে প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করে থাকেন প্রতিনিয়ত। মালোরাও তার ব্যতিক্রম নয়। 'জিভে কামড় শিরে হাত, কেমনে আইল জগন্নাথ?' - সুবলের বউ। অনন্তের মাকে। তাকে নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে, সবেরই উত্তর সে 'জানি না' দেওয়াতেই এই ব্যাঙ্গাত্মক প্রবাদ তার উদ্দেশ্যে বলা হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'কাকের মুখে সিন্দুইরা-আম'-এক মহিলা অনন্তর মাকে বলেছে শ্যামসুন্দর ব্যাপারীকে উদ্দেশ্য করে। শ্যমসুন্দর ব্যাপারী উত্তর মুলুক থেকে এক সুন্দর বউ নিয়ে আসলে তার সম্পর্কে তিনি এই প্রবাদটি বলেন। শ্যামসুন্দরকে কাকের সঙ্গে এবং সুন্দরী বউটিকে সিন্দুইরা আমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চতুর্থবার বিয়ে করা শ্যামসুন্দর যে বালিকা বৌয়ের উপযুক্ত নয়, প্রবাদটি তারই ইঙ্গিত দেয়।

বাসন্তী অনন্তর মাকে রামকেশবের বাড়িতে পিঠে বানাতে যাবার কথা বললে, অনন্তর মা যেতে রাজি হয় না, তখন বাসন্তী একটি প্রবাদ বলে – মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ায় আর গরুর কুটুম লেহনে-পুছনে'। অর্থাৎ গরুকে দেখভাল করলেই গরুর আপন জন হওয়া যায় কিন্তু মানুষের আত্মীয়তা বাড়ে যাওয়া আসার মধ্যে দিয়ে।

বাসন্তী পাগল কিশোরের আচরণে বিরক্ত হয়ে একটি প্রবাদ বলেছে 'পরের পাগল হাততালি, আপনা পাগল বাইন্ধা রাখি'। পরের বাড়ির পাগল দেখে হাততালি দিলেও নিজের বাড়ির পাগলকে সামলে রাখতে হয়।

অনন্ত মাতৃহীন শুনে অনন্তবালা একটি প্রবাদ বলেছে 'মা নাই যার ছাড় কপাল তার'। পরক্ষণেই যখন শুনেছে অনন্তর মাসি আছে তখন পুণরায় একটি আউড়িয়েছে সে -

'তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী,
ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা।'

এছাড়া আরো যারা প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে, তাদের মধ্যে কাদির মিয়ার 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ', কাদির আরেকটি বলেছে 'মা মরলে তালই, ভাই বনের পশু', মনসাপুজোর দিনে আয়োজিত এক অভিনব বিবাহতে যোগ দিতে আসা উদয়তারার সমবয়সী এক নারী বলেছে 'কাজের ভাসসি নাই, খাওনের গোসাই', রশিদ – 'হাতে-বৈঠা-ঘাটে-নাও অবস্থা', ঘাটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি – 'যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ?'-ইত্যাদি প্রবাদ গুলো উপন্যাসকে সজীবতা দান করেছে।

মন্ত্র-তুকতাক-ঝাড়ফুঁক : অনন্তর মাকে দেখেতে এসে মালোপাড়ার মহিলারা যে খোস গল্প শুরু করেছিল, সেখানে তাদের গল্পে মন্ত্রের কথা উঠে এসেছে। একজন মহিলা বলেছে – তার শ্বশুর তুরি খেলা জানত। উঠানের দু দিকে দুই ওস্তাত দাঁড়াত। একজন মন্ত পড়ে সাপ চালান দিত, আরেকজন ময়ূর চালিয়ে সেই সাপ সংহার করত। সেই মন্ত্র না জানা থাকলে মরণ। সেইজন আবার ফিরতি আগুন চালান দিত, অন্য একজন মত্র মেঘ নামিয়ে আগুন নিভাতো। প্রথম খেলা হয়েছিল গায়ের আর এক উস্তাদের সঙ্গে। বাদ্যানী সরষার মধ্যে মন্ত্র পড়ে উস্তাদের পরাণ টিপে ধরল – বাদ্যানী সরষাবান্ধা গিরের মধ্যে টেপে দেয়, আর উস্তাদের নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ে। উস্তাদ এর পালটা মন্ত্র না জানত না। তখন ঐ মহিলার শ্বশুর বাদ্যানীরে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে সরষা-বন্ধন খুলে উস্তাদরে বাঁচিয়েছিল। বাদ্যিনী রেগে গিয়ে ভীমরুল বাণ মারলে তার শ্বশুর ধুলাবৃষ্টি বাণে সব ভীমরুলরে কানা করে দিয়েছিল। তারপর উলটে তিনি বাণ এমন এক বাণ মারেন যাতে বাদ্যানীর পিন্ধনের শাড়ি কেবল উপরের দিকে উঠতে থাকে। দুই হাত দিয়ে যতই শাড়ি টেনে রাখতে চায় ততই শাড়ি উপরে ওঠে। তখন বাদ্যানী এক দৌড়ে তার নৌকার ভিতর গিয়ে তার লজ্জা বাঁচিয়েছিল।

নক্সা, চিত্র বা আল্পনা : মাঘমণ্ডলের ব্রত উপলক্ষ্যে বাসন্তীর মা তাদের উঠানে আলপনা দেবে, 'উঠানজোড়া আলিপনা আকমু; অ বাবা কিশোর, বাবা সুবল, তোমরা একটা ঘোড়া, আর কয়টা পক্ষী আইক্যা দেও।' বাল্যশিক্ষার বই দেখে তারা উঠানের মাঝ খানে তা আঁকতে লেগে যায়। তাদের নিপুণ হাতের টানে সেজে ওঠে বাসন্তীদের উঠান।

সাদিব মিয়ার নৌকায় তিন জন কারিগর দিন রাত পরিশ্রম করে নৌকায় তুলি বুলিয়া রঙ দিয়ে লতা, পাতা, সাপ, ময়ূর ও একজোড়া পালোয়ান এঁকেছিল।

দুটি প্রকান্ড মাটির গামলা বিচিত্র রঙে সাজিয়ে হাত দুটোকে বৈঠার মত ব্যবহার করে দুটি লোক ওগুলোকে নিয়ে ভেসে চলেছে নদীতে। ইত্যাদি এসব নক্সা, চিত্র ও আলপনার প্রসঙ্গ আছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোক রসিকতা : অনন্তর মাকে দেখেতে এসে মালোপাড়ার মহিলারা খোস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতাও চালাতে থাকে। যেমন একজন নারী বলছে, তার ননদের শাশুড়ি বাড়িতে জামাই আসলে জামাই ঠকানো তার চাই-ই। সে - 'পান খাও রসিক জমাই, কথা কও ঠারে, পানের জন্ম অইল কোন অবতারে। যদি না কইতে পারো পানের জন্ম কথা, ছগল হইয়া খাও শাওড়াগাছের পাতা।' যদিও জামাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কোন কালেই। সুতরাং পান না খেয়েই তাকে থাকতে হয়।

লোক ভাষা : মালোদের কিছু নিজস্ব ভাষাভাণ্ডার রয়েছে। সেগুলোর কিছু কিছু তুলে দেওয়া হল -

- ✓ পরস্তাব - জীবনের পূর্বের কোন অতিরঞ্জিত ঘটনাকে তারা পরস্তাব বলে।
- ✓ আলন্তি – কালীপুজো উপলক্ষে, উত্তরসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিন, যে খাবারের আয়োজন করা হয় তার নাম আলান্তি।
- ✓ মান্‌তি – 'মানে' শব্দটিকে তারা মাতি বলে।
- ✓ শিলোক – শ্লোককে এরা শিলোক বলছে।
- ✓ জোকার – উলুধ্বনিকে দেওয়াকে তারা জোকার বলে।
- ✓ জালাবিয়া - মনসা পুজোর দিন একধরণের অভিনব বিবাহের রীতি নাম জালাবিয়া। যে বিয়ে উদয়তারাদের গাঁয়ে হয়েছিল।
- ✓ কালা আখর – বইয়ের পাতার অক্ষরগুলোকে তারা কালা আখর বলেছে। ইত্যাদি।

লোকচিকিৎসা : গোষ্ঠীবদ্ধ লৌকিক মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বড় নিবিড়। প্রকৃতি তাদের বাঁচা-মরা সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েই তারা নানা রকম রোগ-প্রতিরোধ করে থাকে। যেমন অনন্তর মা পাগলের জন্যে ঘুরে ঘুরে এক কবিরাজের কাছ থেকে গাছগাছড়ার ওষুধ এনেছে। গরমজলে গা ধুইয়ে সে ওষুধ গায়ে প্রলেপ করে দিতে হত। এতে তার অসুখ দূর হবে।

অনন্তের মা মূর্ছা গেলে তেল-জল এবং পাখার বাতাস করে ঘরোয়া টোটকাতে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা হয়।

বাসন্তীকে উদয়তারারা মারার পর বাসন্তী বাড়ি ফিরে এলে বাসন্তীর মা হলুদ বাটা লাগিয়ে দেয় ব্যাথা জায়গাগুলোতে। ইত্যাদি উপায়ে মালোরা তাদের চিকিৎসা চালায়।

ব্রত-পার্বন : মাঘ মাসের শেষে মালোপাড়াতে উৎসবের ধুম পড়ে, মাঘমণ্ডলের ব্রতকে অবলম্বন করে। কুমারী মেয়েদের ব্রত এটি। বাল্য বয়সেই মালোদের মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায়। তবু এ ব্রতের উৎসাহ এখানে খুব। মাঘ মাসের ত্রিশ দিন তারা তিতাসের ঘাটে প্রাতঃস্নান করে বাড়ি ফিরে ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়ে সিঁড়িপূজা করে মন্ত্রপাঠ করে,

'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।'

চারা কলাগাছের এক হাত পরিমাণে লম্বা করে কাটা ফালি বাঁশের সরু সলাতে বিঁধে ভিত করে সেই ভিতের উপর গড়ে তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি-ঘর। ব্রত শেষে ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারি মাথা করে তিতাসের জলে ভাসাবে, সঙ্গে ঢোল-কাঁসি বাজবে, নারীরা গান গাইবে। এভাবেই ব্রত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে।

এছাড়া পৌষ মাসের শেষ পৌষ সংক্রান্তি বা আলন্তির কথা আছে। যেখানে কিশোরের বাবা গ্রামের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে বলে ঠিক করেছে। বাসন্তী, অনন্তের মা এবং আরো কয়েকজন মিলে সেখানে সারারাত জেগে পিঠে বানিয়েছে।

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছড়া : বলরামের বোন উদয়তারা ছোটবেলায় হাতে কাচের চুড়ি পরে হাততালি দিয়ে একটি ছড়া বলেছিল। সেটি এখন তার মনে পড়ছে - 'রামের হাতে ধেনু, লক্ষণের হাতে ছিলা, যেইখানের ধেনু সেইখানে গিয়া মিলা।' বিশ্বাস ছিল যে এই মন্ত্র পড়লে আকাশের রামধনু মিলিয়ে যাবে।

একদিন প্রচণ্ড ঝড় উঠলে উদয়তারা ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চিৎকার করে ছড়া বলে চলে। বিশ্বাস তাদের এর ফলে ঝড় থেমে যাবে। ছড়াগুলো হল -

'দোহাই রামের দোহাই লক্ষ্মণের, দোহাই বান রাজার;
দোহাই তিরিশ কোটি দেবতার'

ঝড় না থামলে আরো একটি ছড়া কাটে -

'এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুঁইসনা ছুঁইসনা'।

আবারও না থামলে –

'যা বেটা যা, পাহাড়ে যা, পর্বতে যা, বড় বড় বিরিক্ষের সনে যুদ্ধ কইরা যা'।

ছাদিরের ছেলে রমু জলের উপরে দুটো হাত তুলে তালি বাজিয়ে একটা ছড়া কেটেছে –

'দম্ব দম্ব তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পুবে যাই'।

উদয়তারা তিতাসের নদীর নতুন জলে স্নান করতে করতে পুলকিত হয়ে ছড়া কেটে ওঠে –

'জিলাপির পেচে-পেচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠান্ডা লাগে জল ছাড়া।'

ধাঁধা : বনমালীর সাথে অনন্ত আর উদয়তারা যখন নৌকায় করে যাচ্ছিল তখন অনন্তকে মনযোগ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে উদয়তারা অনন্তকে একটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে -

'সু-ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই : সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই।' উত্তর যদিও অনন্ত দিতে পারে নি। পরে সে নিজেই এর উত্তর বলে দেয়, 'আসমানের তারা'।

নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমান তারা তিন বোন পিঠে বানাতে বসে রাত জাগার জন্য তারা ধাঁধা ধরে -

- ✓ হিজল গাছে বিজল ধরে, সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে।-উদয়তারা জিজ্ঞাসা করে।-এর উত্তর দিয়েছিল আসমানতারা- 'হাট'।
- ✓ 'পানির তলে বিন্দাজী গাছ, ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে।'- উদয়তারা। এর উত্তর দিয়েছে বড় বোন 'কুয়াসা'
- ✓ 'আদা চাক্‌চাক্ দুধের বর্ণ এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম' – উদয়তারা, উত্তর - 'টাকা',

বাদ্যযন্ত্র : গোপীযন্ত্র, জয়ঢাক, কাশী, ঘন্ট, ঢোলক, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে।

লোকদ্রব্য-বস্তু : মালোদের ব্যবহৃত কিছু কুছু জিনিসপত্র, তুলে ধরা হল –

- ✓ মুগরাচণ্ডীর ফুল। বাঁশিরাম মোড়লের গ্রামে গিয়ে এই ফুলটি দেখেছিল।
- ✓ ডিঙি নৌকার বসার জন্য বাঁশের মাচন।
- ✓ নৌকাতে মালসায় আগুণ ধরিয়ে রাখা।
- ✓ টাকু, সুতো কাটার যন্ত্র। ভালো নাম টেকো।
- ✓ দুমুখো উনুন যেখানে তারা ধান সিদ্দ করে।
- ✓ জলটুঙ্গি-জলের উপর মাছ ধরার জন্যে বাঁধা হয়।
- ✓ রাতে ঘরে মাটির গাছাতে কেরোসিনের আলো জ্বালা হয়।
- ✓ চাটাই – খেজুর পাতা বুনে বসার আসন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ✓ বাঁশের ধনুকা আর মাটির গুলি নিয়ে পাখি মারার প্রসঙ্গ।
- ✓ কুশ আসন - পুজোয় ব্যবহৃত একধরণের আসন।
- ✓ সালুকাপড় – পুঁথি মুড়িয়ে রাখার জন্য।
- ✓ মুগুর – বড় কাঠ বা শক্ত কোন কিছুর দন্ড, যা দিয়ে কোন কিছু পোঁতা হয়ে থাকে। হাতুড়ির যে কাজ তাই এর কাজ, তবে এটি বড় সংস্করণ।
- ✓ এছাড়া আছে সেঁউতি, মন্দিরা, দা, কাঁথা, শিতলপাটি ইত্যাদির কথা।

লোকক্রীড়া : মহরমে লাঠি খেলার প্রসঙ্গ রয়েছে। ছেলেরা খেলত গোল্লাছুট আর মেয়েরা পুতুলের ঘরকন্নার খেলা। তুরি খেলা, যেটি অনন্তের মাকে দেখতে আসা মহিলাদের মধ্যে এক মহিলার শ্বশুর জানত বলে সেই মহিলা গল্প করেছে। এছাড়া নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতার উল্লেখ আছে।

উপন্যাসে শেষে দেখা গেছে মালোদের জীবনাচারণের পুরাতন রীতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব বেধেছে। কেউ আকড়ে থেকেছে পুরাতনকে নিয়ে কেউবা ছুটেছে নতুনের দিকে। ঠিক যেন পুরাতন নবীনের দ্বন্দ্ব, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মত। এখানেও কালের নিয়মে জয়ী হয় অবশ্যা নতুন প্রথাই। তবুও লেখক যেন সেই পুরাতন সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করেছেন বেশি। টান তার সেদিকেই। সেই টান ছিল বলেই তাদের জীবনকে এত কাছ থেকে এঁকেছেন, নিপুণ তুলিতে।

উপরের বিষয়গুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, জীবনচর্যা এবং মানসচর্যা। দৈনন্দিন কাজে যেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, জীবনচর্যা। অন্যদিক তাদের মানস চর্যার দিক, যেখানে গান-বাজনা, নাচ, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির ব্যবহার। দুটি দিককেই উপন্যাসিক বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে এই ব্যবহারগুলোর প্রয়োগ তিনি উপন্যাসে করেছেন।

উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রেও মালো সম্প্রদায়ের জীবনযাপন, তাদের সংস্কৃতি ও লোকায়ত ঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন। চলচ্চিত্রটিতে তিতাস নদী মালো সম্প্রদায়ের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদী তাদের জীবিকার উৎস, তাদের সংস্কৃতির অংশ এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। নদীতে মাছ ধরা, নৌকা চালানো, নদীর তীরে জীবনযাপন করা - এসব মালোদের জীবনের অঙ্গ। ঘটক নদীকে শুধু একটি ভৌগোলিক উপাদান হিসেবেই দেখেননি, বরং তিনি নদীকে মালো সম্প্রদায়ের আত্মার প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখেছেন।

লোকসংগীত ও লোকনৃত্য : চলচ্চিত্রে মালোদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের বিস্তৃত ব্যবহার করা হয়েছে। নৌকা চালানোর সময়, উৎসবের সময়, দুঃখের সময় - সব সময়ই মালোরা গান গায় এবং নৃত্য করে। এই গান ও নৃত্যগুলি তাদের জীবনের আনন্দ, দুঃখ, ভালোবাসা, বিচ্ছেদ সব কিছুই প্রকাশ করে। ঘটক এই লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে মালোদের জীবনের সৌন্দর্য এবং তাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধি তুলে ধরেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই পরিচালক যে উপন্যাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এমন নয়, বেশ কিছু জিনিস তিনি ব্যক্তিগত সংযোজন করেছেন। বিশেষ করে সংগীত প্রয়োগের দিক থেকে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিশোর এবং অনন্তের মায়ের মালা বদলের সময় গান, বিবাহের গান বেজেছে ব্যকগ্রাউন্ডে –

> দৃশ্য – ৭
> মিড লং শট-এ মোড়ল বারান্দায় বসে হুক্কা খাচ্ছে। সামনে উঠানে দাঁড়ানো লোকটি আর কিশোর। একটু দূরে কয়েকজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বেঁজে ওঠে –
> লীলাবালি লীলাবালি
> বড় যুবতী সই গো

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কি দিয়া সাজাইমু তোরে।[৮]

গানটি চলচ্চিত্রে আরো দুই এক বার ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিবাহের পূর্বে দোলপূর্ণিমার মেলা বসেছে এমন উপস্থাপনা আছে চলচ্চিত্রে। সেখানে তিলকচাঁদ, কিশোর এবং সুবোল মেলা দেখতে গেছে। সেখানে মেয়ের নাচ করছে। নৃত্যরত নারীদের মধ্যে একজন ছিল অনন্তের মা।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি: মালো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা, উৎসব - সবকিছুই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে। যেমন – দোল পূর্ণিমার পুজো, অনন্তের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কালীপুজো ইত্যাদির ব্যবহার আছে। ঘটক তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করেছেন এবং তাদের জীবনের উপর এর প্রভাব তুলে ধরেছেন।

সামাজিক জীবন ও রীতিনীতি: মালো সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন এবং তাদের রীতিনীতি চলচ্চিত্রে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিবাহ, মৃত্যু, উৎসব - এসব অনুষ্ঠানে মালোরা কীভাবে আচরণ করে, কীভাবে পোশাক পরে, কীভাবে খাবার খায় - সবকিছুই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে। ঘটক এই মাধ্যমে মালো সম্প্রদায়ের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন।

ব্রত এবং পার্বণ : মাঘমণ্ডলের ব্রত, পৌষ সংক্রান্তিতে আলন্তী – যেখানে বাসন্তী, অনন্তের মা'রা মিলে সারা রাত জেগে পিঠে বানিয়েছে।

উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের তুলনা প্রসঙ্গে প্রথমে আমাদের লোকসংস্কৃতির বিভাজনটাকে বুঝতে হবে। তাহলে এই পার্থক্যকে সহজেই অনুমান করা যাবে। লোকসংস্কৃতির পরিসর বৃহৎ, কোন বিভাজনেই তাকে সম্পূর্ণ ধরা যাবে এমন দাবী করা সম্ভব নয়। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বরুণ কুমার চক্রবর্তী চরিত্র ও গঠন অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করেছেন – বস্তু-নির্ভর লোকসংস্কৃতি (পোশাক-পরিচ্ছদ, কুটির-শিল্প, লোক-ভাস্কর্য, চিত্র ইত্যাদি) এবং অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি (লোকসাহিত্য)। বস্তু এবং অবস্তুভেদে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলোকে নিম্নোক্তভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে -

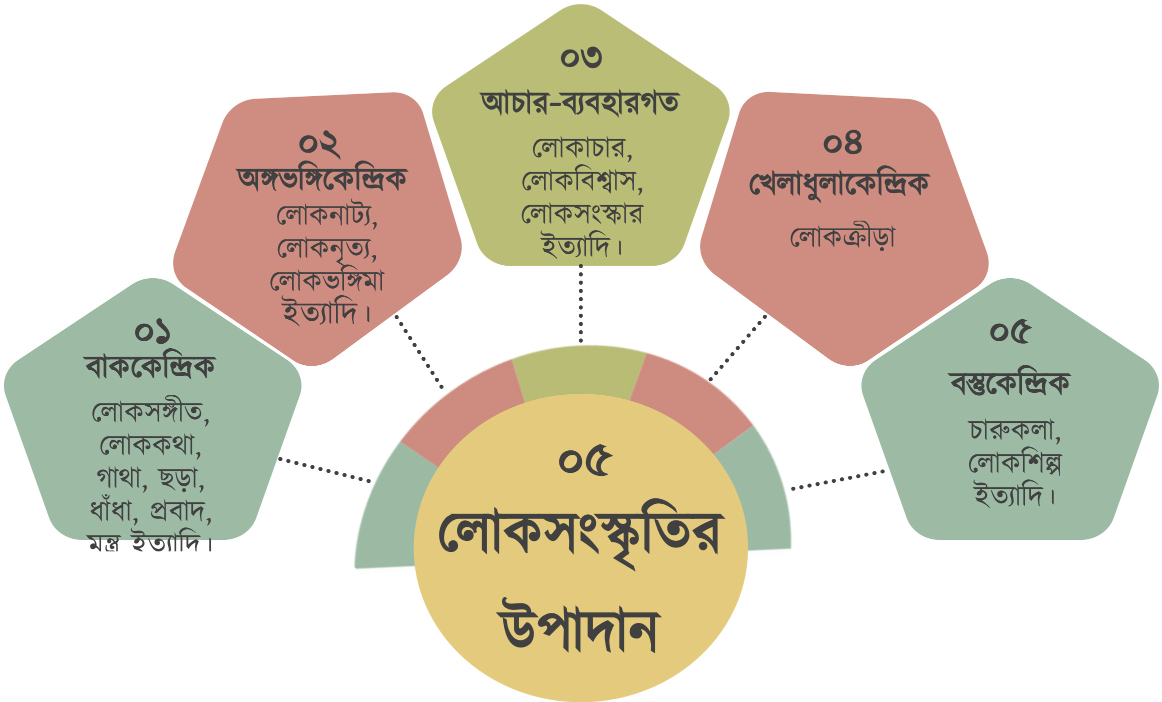
উপন্যাসে লেখক বিস্তৃতপরিসরে মালো সমাজের সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক মালোদের সমস্ত দিকের প্রতিফলন ঘটাতে পারেন নি। মালোদের সঙ্গীত, লোককথা, তাদের ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সিনেমাতে স্কিপ করে গেছেন। তবে বস্তুকেন্দ্রিক দিক গুলো তাঁর চলচ্চিত্রে বিস্তৃতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অ-বস্তুকেন্দ্রিক দিকগুলো বিস্তৃতপরিসরে তুলে ধরতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ হল সময়। এমন নয় যে তিনি লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল নয়, বরং বাংলা ভাষায় এখনো পর্যন্ত যত পরিচালক জন্মছেন তাদের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি সবচেয়ে বেশি আস্থা রেখেছেন ঋত্বিকই। সেকথা সত্যজিৎ রায়ও স্বীকার করেছেন –

> "ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালী পরিচালক ছিল, বাঙালী শিল্পী ছিল - আমার থেকেও অনেক বেশী বাঙালী। আমার কাছে সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।"[৯]

সীমিত সময়ের গণ্ডিতে 'তিতাসে'র মত মহাকাব্যসম উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ সহসসাধ্য নয়। কাজেই এত বড় উপন্যাসের কিছু অংশ বাদ যাবে তা স্বাভাবিকই। তাইতো উপরে আলোচিত সমগ্র দিকের প্রকাশ হয়তো চলচ্চিত্রে নেই কিন্তু সমস্ত দিকের প্রতিফলন উপলব্ধি করা যায়। এইখানেই ঋত্বিকের শিল্পীত্ব। সমালোচক সাজেদুল আউয়াল এই চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে তাই যথার্থই বলেছেন –

> "এ-চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র নির্মিতির নিজস্ব ধারা ধরা পড়ে প্রকটভাবে। এর বিষয়বস্তু এপিকধর্মী। একটি সম্প্রদায়ের বিশেষত তিতাস-পারের জেলে সম্প্রদায় 'মালো'দের, সর্বোপরি একটি নদীর অভিযাত্রার বয়ান এই চলচ্চিত্র। মালোদের জীবনযাত্রা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের অসহনীয় বাস্তবতা, দারিদ্র্য, লৌকিক উৎসব, জন্ম-কৈশোর-পেশা-বিবাহ-সন্তান উৎপাদন-মৃত্যু এবং একই সমান্তরালে তিতাস নদীর বাঁচা-মরা সবকিছুকেই ঋত্বিক শরীরময় ও মন্ময় করে তুলেছেন এই চলচ্চিত্রে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue



Reference:

১. মল্লবর্মন, অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ, আশ্বিন, ১৩৫৬, পৃ. ১৯

২. দৈনিক প্রথম আলো, ছুটির দিনে, তিতাস একটি নদীর নাম, মুদ্রিত সংস্করণ, ৭ জানুয়ারি, ২০১২

৩. মল্লবর্মন, অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ, আশ্বিন, ১৩৫৬, পৃ. ১৬০

৪. তদেব, পৃ. ৪১

৫. তদেব, পৃ. ৭৫

৬. তদেব, পৃ. ৯৫

৭. তদেব, পৃ. ১৬১

৮. রাশেদ, পার্থিব, ও মনিস রফিক (সম্পা:), 'ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম চিত্রনাট্য', দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২০, পৃ. ২৪

৯. রায়, সত্যজিৎ, 'ঋত্বিক', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), 'সেই ঋত্বিক', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিভাস, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৪০

১০. আউয়াল, সাজেদুল, 'চলচ্চিত্রকলা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১০, পৃ. ২০২

Bibliography:

অদ্বৈত মল্লবর্মণ, 'রচনাসমগ্র', সম্পাদনা – অচিন্ত্য বিশ্বাস, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দেজ, ফেব্রুয়ারী, ২০১১, ২. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃত কোষ', সম্পাদিত, তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারি ২০১৬

বরুণ কুমার চক্রবর্তী, 'বিচিত্র ভাবনার গদ্য', কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারি ২০১৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পার্থিব রাশেদ ও মনিস রফিক (সম্পা:), ‘ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম চিত্রনাট্য’, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২০

সত্যজিৎ রায়, ‘ঋত্বিক’, সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), ‘সেই ঋত্বিক’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিভাস, ডিসেম্বর ১৯৮৫

সাজেদুল আউয়াল, ‘চলচ্চিত্রকলা’, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 552 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 552 - 560
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিকের উপন্যাসে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যা এবং সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শেলী সাহা
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী
Email ID : saha.shally@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Novelists, Manik Bandyopadhyay, Literary Criticisms, Complexity, themes, metaphors, strange imaginations, Critic, Srikumar Bandyopadhyay.

Abstract
Manik Bandyopadhyay is one of the most prominent novelists in Bengali literature. The subject matter of his novels is broad, offering a unique flavor through his presentation style, storytelling techniques, and the way he highlights the personal problems of his characters. The complexity of the issues he presents and the depth of understanding required to grasp them are significant challenges, yet he navigates these effectively.

Critic Srikumar Bandyopadhyay discusses nine of Manik Bandyopadhyay's novels in the eighteenth chapter of his book, 'Bangasahityer Upanyaser Dhara', titled 'Jibone Sanketikata O Uadvot Samasyar Aarop'. In his analysis, the critic emphasizes that various life problems emerge through the themes, metaphors, and the unusual imaginations of the characters in these novels. Furthermore, he highlights aspects such as the novelist's artistic qualities, the novelty and weaknesses of the subject matter, and other significant elements of Bandyopadhyay's work.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কাহিনির বৈচিত্র্যমুখীনতা, উপস্থাপন রীতি, ভঙ্গি, চরিত্রের মনের উদ্ভট কল্পনা ও জটিলতা এবং মানব মনের একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সমস্যাকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে আমরা তাঁর রচনার মধ্যে একটা ভিন্নস্বাদ অনুভব করি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তিনি প্রায় ৩৯টি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ' শিরোনামে চারটি পরিচ্ছেদ জুড়ে মানিক বন্দ্যোপাধায়ের নয়টি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনাকে সমালোচক মহাশয় চারটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। প্রথমাংশে 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৪), 'পুতুলনাচের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 552 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইতিকথা' (১৯৩৬)। দ্বিতীয়াংশে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'জননী' (১৯৩৫), 'অহিংসা' (১৯৪১), 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৩৮)। তৃতীয়াংশে 'সহরতলী' (১৯৪১) এবং চতুর্থাংশে 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) ও 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩) স্থান পেয়েছে।

সাহিত্য হল সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিফলন। সেই সমস্যা সাহিত্যের আঙিনায় প্রতিফলিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার উপস্থাপন, কাহিনি, চরিত্র ও মানব মনের জটিল সমস্যাকে অনুধাবন করা সহজ বিষয় নয়, সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সিদ্ধ হস্ত এবং সমালোক মহাশয় তাঁর আলোচনায় এই বিষয়গুলিকে পর্যালোচনা করেছেন। সমালোচকের চিন্তা ও মননশক্তি যেভাবে উপন্যাসের বিষয়, চরিত্রগুলিকে উত্থাপন করেছেন, তাতেই তাঁর বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। উপন্যাসগুলির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, রূপক-সাংকেতিকতা ও চরিত্রের নানাবিধ উদ্ভট কল্পনার মধ্য দিয়ে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে এসেছে তা সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে ঔপন্যাসিকের শৈল্পিকগুণ, বিষয়ের অভিনবত্ব ও দুর্বলতা ইত্যাদি দিকগুলিও প্রাধ্যান্য পেয়েছে।

১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যা আরোপ'-এর কথা বলেছেন। তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাস দুটির পর্যালোচনা করেছেন এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে। প্রথমে আসা যাক 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে। উক্ত উপন্যাসটিতে তিনটি ভাগ রয়েছে। এই তিনটি ভাগের কথা উল্লেখ করে সমালোচক মহাশয় চরিত্রগুলির মধ্যে যে অস্থিরতা দেখানো হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। 'দিবারাত্রির কাব্য' আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকে বলেছেন—

> "দিবারাত্রির কাব্য' একটি বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক-কাহিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।... তথাপি এই সাংকেতিকতার অর্ধভাস্বর আবেষ্টন সত্ত্বেও মানুষগুলিকে রক্ত-মাংসের জীব-হিসাবেই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।"[১]

'দিনের কবিতা' অংশে হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক হেরম্বকে সুপ্রিয়া ভালোবাসে। কিন্তু অভিভাবকের চাপে পড়ে সুপ্রিয়া তার প্রিয় মানুষকে বাদ দিয়ে দারোগা অশোকের অর্ধাঙ্গিনী হয়েছে। তাদের এই দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। বিবাহের পাঁচ বছর পর সুপ্রিয়া সংসার ত্যাগ করে পুরানো প্রেমিক হেরম্বের হাত ধরার ঘোষণা করে। কিন্তু হেরম্ব তার প্রেমিকার প্রেমের ডাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি বরং বিষয়টিকে ছয় মাসের জন্য অতিকষ্টে তুলে রেখেছে। দ্বিতীয়াংশ 'রাতের কবিতা'য় রয়েছে হেরম্ব ও আনন্দের কথা। এবং সেই সাথে স্থান পেয়েছে অনাথ ও মালতীর ব্যর্থ প্রেম, মালতীর মনোবিকৃতির কথা। আনন্দ চরিত্রের সৌন্দর্যের বিকাশের সাথে হেরম্বের কাছে তার আত্মসমর্পণকে উভয়ের ভালোবাসার 'অগ্রগতির স্তর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগ 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এ হেরম্বের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে বাতাস জুগিয়েছে সুপ্রিয়ার আগমন। একদিকে আনন্দ অন্যদিকে সুপ্রিয়া দুজনের মধ্যে 'রূপক-প্রতিভাস' সুস্পষ্ট হয়েছে। সুপ্রিয়ার মধ্যে সংসার রচনার প্রয়াস ও আনন্দের সাংসার বিমুখতা এই দুই নারী দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সাথে হেরম্ব নিজেকে মানিয়ে নিতে অক্ষম হয়েছে। আনন্দের আত্মহত্যা ও অশোকের সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা মানব মনের রহস্যের অন্য একটি দিককে চিহ্নিত করে।

সমালোচক মহাশয়ের মতে উক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলির আত্মবিশ্লেষণ, জীবনের সাংকেতিকতা ও পাশবিকতার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা 'চমকপ্রদ'। এবং আধুনিক যুগে উপন্যাসের গঠন ও বিষয় নিয়ে যে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে তার অন্যতম প্রচেষ্টার ফসল হল এই উপন্যাস। বিশেষ করে হেরম্ব, আনন্দ, সুপ্রিয়া ও অশোকের জটিল সম্পর্কজাল নিয়ে ঔপন্যাসিকের যে 'রূপক-বিলাস' ভাবনা, চরিত্রগুলির মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আকাঙ্ক্ষার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "লেখকের এই রূপক-বিলাস যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা নহে। যেমন কোনো কোনো স্থূলবস্তুকে হঠাৎ আলোকের দিকে ফিরাইলে তাহার ভিতরটা স্বচ্ছ ও রঙিন বলিয়া মনে হয়, তেমনি এই কয়েকটি নর-নারীর জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে একটা অতর্কিত সংকেতলোকের দ্যুতি ঝলসিয়া উঠে। তাহাদের

> সমস্যা-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত গভীর মানবপ্রকৃতিরহস্যমূলক মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া প্রতিনিধিত্বের দিকটাই অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[২]

'পুতুলনাচের ইতিকথা'-তেও সমালোচকের মতে 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর মতো অসংলগ্নতা বিদ্যমান, তথাপি এখানে বাস্তবতার মাত্রা বেশি। উপন্যাসের বিষয় গাউদিয়া গ্রামের সাধারণ সমাজ জীবনের কাহিনি। কিন্তু এই সাধারণ কাহিনি অপরিচিত হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের বিশেষ মনোভাবের দ্বারা। তাই সমালোচক বলেছেন –

> "এই অপরিচয় সাংকেতিকতার বা রূপকের জন্য নহে; লেখকের মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মনোভাব আছে তাহাই এই আপেক্ষিক অপরিচয়ের হেতু।"[৩]

উপন্যাসের নায়ক শশীর জীবনের সমস্যাগুলি প্রাবন্ধিকের কাছে অনেকটা অসংলগ্ন। নায়কের প্রধান সমস্যা প্রতিবেশীর স্ত্রী কুসুমের তার প্রতি দুর্বোধ্য আকর্ষণ। শশী কুসুমের অনুচ্চারিত আকর্ষণ নিয়ে দীর্ঘসময় খেলা করেছে ঠিকই, কিন্তু প্রেমের আবেদনে ধরা দেয়নি। পরবর্তী সময়ে শশী যখন কুসুমের আকর্ষণ বেদনা অনুভব করে তখন নিজের অবহেলার কারণেই কুসুমকে পায়নি। শশীর এই অবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক মহাশয় বলেছেন —

> "এই অভিজ্ঞতায় শশীর মনোরাজ্যে কী পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই। সংসারে ঔদাসীন্য ও গ্রামত্যাগের ইচ্ছা— ইহারা হতাশ প্রেমের এত সাধারণ প্রতিক্রিয়া যে শশীর বিশেষত্ব তাহাতে কিছুমাত্র সূচিত হয় নাই।"[৪]

সমালোচকের মতে শশীর সংসারে ঔদাসীন্য ও গাউদিয়া ত্যাগ করার যে ইচ্ছা তা অতি সাধারণ। উপন্যাসের প্রারম্ভে নায়ক চরিত্রের দুটি দিকের উল্লেখ ছিল, কিন্তু সেই দুটি দিকের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সূচিত হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উক্ত উপন্যাসের দুইটি খণ্ডাংশ আসাধারণত্বের জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি হল বিন্দুর বিবাহিত জীবনের অস্বাভাবিক ভয়াবহ চিত্র। বিন্দুর স্বামী তাকে অনিচ্ছায় বিয়ে করে পূর্ণ অর্ধাঙ্গিনীর মর্যাদা না দিয়ে রক্ষিতার মতো দূরে রেখে সেই স্বভাবের অনুশীলন করিয়েছে। ফলে মদের নেশা তাকে গ্রাস করে। মদের নেশার জন্য তার নৈতিক অনুশাসন বা বদনামের ভয় নেই। স্বামীর প্রভাবে একজন গৃহিণীর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন পাঠকের মনকে ভয়াবহ সম্ভবনায় বিচলিত করে তুলবে। বিন্দুর শেষ পরিণতির চিত্রও উপন্যাসে অনুপস্থিত। আরেকটি হল কুমুদ ও মতির 'পূর্বরাগ ও দাম্পত্যজীবন' কাহিনি। কুমুদ চরিত্রের অস্থিরতা ও অধঃপতনকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "বিবাহিত জীবনে এরূপ Bohemianism বা উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরত্বের চিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর নাই।"[৫]

একদিকে বিন্দুর স্বামী যেমন তার চরিত্রে অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। অপরদিকে কুমুদের প্রণয় অস্থিরতা ও শৃঙ্খলার অভাবের প্রভাব মতির চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত উপন্যাসের তিনটি খণ্ডাংশের কথা উল্লেখ করে চরিত্রগুলির সমস্যার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। একই সাথে তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশী, কুসুম, বিন্দু ও তার স্বামী, কুমুদ ও মতি চরিত্রের জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপের দিকটিকে পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুটি বিখ্যাত উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত—

> "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সহিত আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় মিলে।"[৬]

বলাবাহুল্য অসংলগ্ন অবাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে থাকলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সর্বাধিক জনপ্রিয়' উপন্যাস। এই জনপ্রিয়তার দুটি কারণ হল— পদ্মানদী মাঝির বিষয়ের অভিনবত্ব ও কথ্য ভাষার সরস ব্যবহার। একই সাথে উক্ত উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সম্পর্কে বলেছেন—

> "কিন্তু উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিঁখুত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব-প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ।"[৭]

তিনি মানিকের সৃষ্ট অসামান্য চরিত্র কুবের ও কপিলার অবৈধ প্রেমের দহনজ্বালার চিত্রকে তুলে ধরেছেন। সেই সাথে আরও বলেছেন কীভাবে কুবের নিজেকে শান্ত রেখেছে। তার চরিত্রে কোথাও হৃদয়ের অতৃপ্তির কাব্যসুলভ আতিশয্য নেই। অপর দিকে কপিলা সমালোচকের দৃষ্টিতে—

> "কপিলার আদিম, অসংস্কৃত মনোবৃত্তির মধ্যে ছলনাময়ী নারী-প্রকৃতির সনাতন রহস্য বাসা বাঁধিয়াছে। সে দীর্ঘকাল কুবেরের সম্মুখে মোহজাল বিস্তার করিয়া ও ছদ্ম ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া শেষ পর্যন্ত এক দুর্বোধ্য, অনিবার্য আকর্ষণে সেই ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে— সংগতিসম্পন্ন স্বামিগৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া এক বিপৎসংকুল, অনিশ্চিত অভিসারযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"[৮]

এছাড়াও এসেছে মেজবাবুর কথা। তাকে আভিজাত্য শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে দেখানো হলে 'যবনিকার অন্তরালে' রয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কুবেরের মেয়ে গোপীকে বিয়ের ব্যাপারে কুবেরের ঘর ধবংস হাওয়ার ঘটনা সমালোচকের কাছে—

> "এ যেন ছেলেদের জন্য ট্রয়-নগরী-ধ্বংসের এক গ্রাম্য সংস্করণ, মহাকাব্যের ঝুমুরগানে পরিণতি।"[৯]

সমালোচকের মতে পদ্মানদী এক রহস্যের ইঙ্গিতবাহী। ঔপন্যাসিকের অভিনব সৃষ্ট চরিত্র হোসেন মিয়া। সে এই পল্লীবাসীর কাছে 'বিধাতা-পুরুষ'। আর তার দ্বীপটিকে 'বেহেস্ত-জাহান্নামের অদ্ভুত সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত উপন্যাসের সমাজ চিত্র, হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ সমস্ত মিলে 'এক আশ্চর্য সুসংগতি ও নিখুঁত সম্পূর্ণতা' সাহিত্যের পাঠককে মুগ্ধ করে তুলবে এই উক্তির মধ্য দিয়ে আলোচনার শেষ করেছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **'জননী'** উপন্যাসটিকে সুলিখিত বলে মন্তব্য করেছেন। এই উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন –

> "এই উপন্যাসে কোনো আদর্শবাদের আতিশয্য নাই–মাতৃত্বকে দেবীত্বের পর্যায়ে পৌঁছাইবার কোনো কাব্যসুলভ, কৃত্রিম চেষ্টা নাই, জননী ও গৃহিণী সংসার-বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু; প্রেয়সী ইহার প্রত্যন্তপ্রদেশের একটা বিচিত্র ক্ষণস্থায়ী বর্ণপ্রলেপ। কাজেই বাস্তব-জীবনে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই প্রিয়া হইতে জননীর বিকাশ খুব স্বাভাবিক পরিণতি।"[১০]

শ্যামা এই উপন্যাসের মূল চরিত্র। শ্যামা চরিত্রের বিশ্লেষণ সমালোচনার মূল আকর্ষণ। শ্যামার যৌবন থেকে প্রৌঢ় জীবনের সাংসারিক ঘটনাবহুল কাহিনি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তার স্বামী খেয়ালি মানসিকতার, সেই সাথে দুর্বল চিত্ত ও দায়িত্ববোধহীন। তার ফলে শ্যামার যৌবন বয়সে প্রণয়ের ঘোর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তার চরিত্রে গৃহিণীত্বই অধিক পরিমানে সুপরিস্ফুটিত। শ্যামার দুই সন্তান প্রসবের মধ্যদিয়ে জননীর অনভূতি ও দায়িত্বের যে চিত্র উক্ত উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সমালোচক তাকে 'চমৎকার বিশ্লেষণ' বলেছেন। শ্যামার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন শ্যামার প্রণয় ও সংসার পরিচলনার বিষয়ে স্বামীর সাথে অসহযোগ ও প্রবল বিরোধ। শ্যামার প্রৌঢ় জীবনে যেমন পুত্রবধূর যৌবনের বিকাশ তার কাছে ঈর্ষার বিষয়, তেমনি সে কন্যার দাম্পত্যজীবন সুখময় না হাওয়ার আশঙ্কায় কন্যার প্রতি অসংবরণীয় ক্রোধে জ্বলে উঠে। একই সাথে তিনি উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র মন্দা, বিধানকেও চিত্রিত করেছেন। আলোচনার অন্তিম অংশে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে তার শেষ পরিণতি হিসাবে বলেছেন—

> "শ্যামার প্রথম সন্তানের আবির্ভাবের সঙ্গে যে গ্রন্থের আরম্ভ, তাহার পুত্রবধুর প্রথম প্রসবের সহিত তাহার শেষ— এই ঘটনা যেন সংসাররাজ্যের রাজ্ঞী-পরিবর্তনের ঘোষণ।"[১১]

'জননী' উপন্যাসে সমালোচক কোনো জীবন সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার দিক তুলে ধরেন নি। এছাড়াও উপন্যাসের গঠন, কাহিনি ও চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে দুর্বলতার আরোপের কথাও আলোচিত হয়নি। ঔপন্যাসিক জননী চরিত্রের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাকে চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

'অহিংসা' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত দুটি উপন্যাস অমিশ্রিত অসাফল্যের উদাহরণ বলেছেন সমালোচক। এই দুটি উপন্যাস তিনি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ঘটনার বর্ণনা বা চরিত্র বিশ্লেষণ তেমনভাবে কিছু নেই। 'অহিংসা' উপন্যাসে আশ্রমের ধর্মান্ধতা, ভণ্ডামি ও যৌন লালসার চিত্রকে উদ্ভট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপন্যাসের ত্রুটি হিসেব তিনি বলেছেন কাহিনিতে ঔপন্যাসিকের কোনো স্থির লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হয়নি। কোথাও কোথাও রয়েছে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী প্রচেষ্টা। এবং সেই সাথে ঔপন্যাসিকের নিজের উক্তি উপন্যাসের পরিবেশকে আরও জটিল করে তুলেছে। উপন্যাসের যে বিভিন্ন চরিত্র রয়েছে মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী প্রভৃতি তারা ঠিক বোধ্যগমতার স্তরে আসতে পারেনি। চরিত্রগুলি এক অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় যেন এক কঠিন পরিস্থিতির রচনা করেছে। আর দ্বিতীয় উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত অতি সামান্য এবং উক্ত দুটি উপন্যাসের কাহিনিকে সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ভট কল্পনা বলে উল্লেখ করেছেন—

> "'অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যহীনতার চিহ্ন আরও সুপরিস্ফুট। এই দুইখানি উপন্যাসে গ্রন্থকারের উদ্ভট কল্পনা-প্রবণতা বাস্তবনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া এক সংগতিহীন ধূম্রলোক রচনা করিয়াছে।"[১২]

৩

'সহরতলী' উপন্যাস সহরতলীর লোকেদের জীবন কাহিনির আখ্যান। উক্ত উপন্যাসের আলোচনার মূলে রয়েছে শ্রমিকদের কথা। সেই সাথে তাদের প্রতিনিধি যশোদা ও মিলের মালিক সত্যপ্রিয়র কর্ম ও সংসার জীবনের সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উপন্যাসের দুই পর্বেই সমালোচকের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে এই দুটি মুখ্য চরিত্রের বিবরণ। আর তাদের বাস্তবিক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রমিকদের নানা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তিনি যশোদা ও সত্যপ্রিয়কে উক্ত উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর শ্রমিকদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত তাদের জীবন খণ্ডিত ও বিকৃত হলেও এদের জীবন খাঁটি ও অকৃত্রিম। সেই সাথে এসেছে সুধীর, নন্দ এবং উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় অজিত ও সুব্রতার কথা। সুধীর শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি এবং যশোদার ভাড়াটে। সমালোচক জানিয়েছেন সুধীর চরিত্রটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এবং তার চরিত্রের ক্রুর ঈর্ষা, বাড়ীওয়ালি যশোদার কাছে প্রণয় নিবেদন ও খুঁত ধরার মানসিকতা চরিত্রটিকে অন্যমাত্রা প্রদান করে।

সমালোচক বলেছেন, এই শ্রমিক সমাজ ভদ্র সমাজের সংস্পর্শের বাইরে নয়। জীবিকার্জনের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র এক। এখানে স্বার্থের সাথে আদর্শের সংঘাত হতে দেখা যায়। এই সংঘর্ষ সত্যপ্রিয় ও মিলের মজুরদের ধর্মঘটের। আর যশোদা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে আরম্ভ করে শ্রমিকদের স্বার্থে ধর্মঘটে প্ররোচনা দিয়ে মিলের মালিক সত্যপ্রিয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত উপন্যাসে যশোদা ও সত্যপ্রিয় এই দুটি চরিত্র একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরিপূরক। যশোদার চরিত্রের কথা বলতে সমালোচক বলেছেন—

> "যশোদার পরিকল্পনার অনন্যসাধারণত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। এমন বলিষ্ঠ, আত্মনীর্ভরশীল, দৃপ্ত-আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন, ভাবপ্রবণতাহীন, অথচ রূঢ় ব্যবহারের অন্তরালে মায়া-মমতায় কোমল, সেবানিপুণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্ত্রীলোক সংসারে, বা সাহিত্যে সুলভ নহে।"[১৩]

যশোদার সমস্ত কার্যকলাপ নীতি দ্বারা নিয়ন্তিত। সে সব ধরণের রমণীসুলভ আচরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। শ্রমিকদের প্রতি তার আছে একদিকে কঠোর শাসন, অন্যদিকে কোমল সস্নেহ ক্ষমার প্রশ্রয়। সমালোচকের মতে এই দুই বিপরীতমুখী বিকাশ যশোদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অপর দিকে যশোদার ভাই নন্দের কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা, চাকুরিজীবী হওয়ার আকাঙ্খার প্রকাশ ও নন্দের চরিত্রের মেরুদণ্ডহীন দুর্বলতা ইত্যাদির কথা এসেছে। একই সাথে এসেছে ধনঞ্জয়ের কথা। তার ও যশোদার পারস্পরিক সম্বন্ধ রহস্যঘনীভূত হয়ে আছে। দ্বিতীয় পর্বে যশোদা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব বদ্ধমূল ধারণা কোনো কোনো স্থলে শিথিল হয়েছে। আবার অজিত ও সুব্রতার সংস্পর্শে এসে সে ভদ্র পরিবারের সন্ধান পেয়েছে। যার ফলে তার ব্যবহারে চাল চলনে পরিবর্তন এসে গেছে। তার কাজ মজুরদের সার্বিক উন্নতির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 552 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিন্তা থেকে প্রসার লাভ করেছে ভদ্র পরিবারের সঙ্গীতচর্চার ব্যবস্থা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বে যশোদার প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়েই সে নতুন জীবনযাত্রার সূচনা করবে।

সমালোচক বলেছেন সত্যপ্রিয় চরিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য সৃষ্টি। কৌশলময়, দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যপ্রিয় চরিত্রটি মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি এবং এই শ্রেণির সমস্ত গুণ বর্তমান। সত্যপ্রিয়ের কূটনৈতিক চালে যশোদা পরাজয় হয়েছে। শুধু তাই নয়, সত্যপ্রিয়ের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে শ্রমিকদের বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়ে ফেলে যশোদা। উপন্যাসে দ্বিতীয় পর্বেও সত্যপ্রিয়ের নির্মমতা পারিবারিক জীবনে প্রসারিত হয়েছে। সত্যপ্রিয় মিলের শ্রমিক ও ঘরের জামাতা উভয়ের জন্য একই শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেছে। সমালোচক বলেছেন সত্যপ্রিয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে 'সংকীর্ণ যান্ত্রিকতার' প্রকাশ ঘটেছে। উক্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> 'সহরতলী' উপন্যাসে লেখক বিষয়নির্বাচন ও চরিত্র পরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণত উপন্যাসে যে স্তরের নর-নারীর জীবনসমস্যা বর্ণিত হয়, এখানে তদপেক্ষা নিম্ন স্তরের কথাই আলোচিত হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রাণহীন, নিস্তেজ, একঘেয়ে জীবন-কাহিনীতে যে সরস নূতনত্বের অভাব, তাহা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে অপেক্ষাকৃত সুপ্রচুর। ...ইহাদের সমস্ত স্থূল, ইতর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রাণশক্তির সতেজ স্ফূর্তি প্রচুর ধারায় প্রবাহিত। 'সহরতলী'তে এই নূতন বিষয়ের অভিনব স্বাদবৈচিত্র্য একটা প্রধান আকর্ষণের হেতু।"[১৪]

৪

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে লেখক যৌনব্যাপার সম্পর্কিত উদ্ভট মনোবিকারের ছবি এঁকেছেন। সমালোচকের মতে যৌনতত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটির উৎকর্ষ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই উপন্যাসের নায়ক রাজকুমারের মধ্যে যৌন-কল্পনার অবাধ ব্যপ্তি দেখা যায়। মূল চারটি নারী চরিত্র রিণী, মালতী, সরসী ও কালীকে নিয়ে নায়ক যৌন-কল্পনা বিলাসের এক নিজস্ব জগত গড়ে তুলেছেন। উদ্ভট খেয়ালের বশবর্তী হয়ে রাজকুমার মেয়েদের নগ্ন দেহ দর্শন করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্বাহের ইঙ্গিত অনুসন্ধানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ওঠে। সমালোচক বলেছেন, নায়কের 'যৌন আকর্ষণ অসাধারণ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী'। উক্ত উপন্যাসের চারজন মেয়েই রাজকুমারকে মনে মনে কল্পনা করে। নারীর নগ্ন দেহ দর্শনে তার যে এক্সপেরিমেন্ট থিওরি রিণী তা প্রত্যাখান করে। এবং এই প্রস্তাব মালতীর কাছে ব্যক্ত করার অবসর হয়ে ওঠে না। একমাত্র সরসী রাজকুমারকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই সরসী স্বেচ্ছায় দর্শন দিয়েছে। যাকে সমালোচক বলেছেন—

> "সরসীর নগ্ন দেহে সে নিজ অদ্ভুত কল্পনা যাচাই করিবার সুযোগ পাইয়া এত উৎফুল্ল হইয়াছে যে, বোধ হয় নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া এতটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।"[১৫]

সমালোচকের মতে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের বিশ্লেষণ গভীরতা ঔপন্যাসিকের ফ্রয়েডের অনুমান সিদ্ধান্তের স্তর অবধি সীমাবদ্ধ। নায়ক চরিত্রটিকে 'রূপক বা ব্যক্তি' যে হিসাবে ধরা হোক, বাস্তব জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন ও অনুদ্ঘাটিত দিক থেকে যবনিকা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। একই সাথে লেখকের শিল্পচাতুর্যের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যায় না। উপন্যাসের বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকের উক্তি—

> "এই উপন্যাসে যৌন কল্পনার অবাধ ব্যাপ্তি ও বিচরণের, ইহার সূক্ষ্মতম, অনির্দেশ্যতম খেয়াল-পরিতৃপ্তির, উপযোগী প্রতিবেশ আশ্চর্য কলাকৌশলের সহিত রচিত হইয়াছে। এই প্রতিবেশে সমাজ-জীবনের সমস্ত নৈতিক অনুশাসন ও নিয়ম-সংযম, ইহার ভাবী ও স্থায়ী উপাদান ও মনোবৃত্তিসমূহ— এক কথায় ইহার মধ্যে ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে—সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া এক লঘু স্বপ্নাবেশমন্থর, স্বপ্রতিষ্ঠ ও আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে সৃষ্টি করা হইয়াছ।"[১৬]

'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসের মূল চরিত্র তারক। সে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক। কিন্তু দলের রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। তার কাছে পার্টির জীবনাদর্শ ও জীবনযাত্রা প্রণালী অনেকাংশেই দুর্বোধ্য ও খাপছাড়া বলে মনে হয়েছে।

তার দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক দলগত মতবাদের প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়নি। সমালোচকের মতে তারক একজন সাধারণ, আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিকের বিচারবুদ্ধির অনুসরণকারী। তারকের যেটুকু ব্যক্তিগত পরিচয় তুলে ধরেছেন, তাতে চাকরিতে তার অনিচ্ছা, চাকরি না করার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করেছে। আর তারকের এই পরিচয় খুবই সাধারণ। সীতানাথ ও মনোজিনীর কাহিনি উপন্যাসের মূল অংশের তুলনায় 'উজ্জ্বলবর্ণে ও মানব-প্রকৃতির রহস্যজড়িত' বলে উল্লেখ করেছেন। সমালোচক অতি সংক্ষেপে উক্ত উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মনোভাব থেকে ঔপন্যাসিক সম্ভবনা ও ত্রুটি কথা তুলে ধরেছেন—

> "ঔপন্যাসিক ভারকেন্দ্র একটু দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কোনো অনিদির্ষ্টনামা রাজনৈতিক দলের মতবাদ ও কর্ম্মপদ্ধতি আলোচনা তারকের চরিত্রের ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত করার ইচ্ছা হয়তো লেখকের ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যত পূর্ণ হয় নাই।...সুতরাং উপন্যাসের প্রধান বিষয় হইতেছে, এই রাজনৈতিক দলের চিন্তা ও কর্মধারার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা। ইহার মধ্যে যতটা তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় আছে, ততটা ঔপন্যাসিক রসসৃষ্টির নাই।...গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে যে অংশে ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা ও উৎকর্ষ আছে তাহা মনোজিনীর সহিত সীতানাথের সম্পর্ক ও প্রসঙ্গক্রমে যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে দলের বিশেষ মতবাদ ও আদর্শ বিষয়ক।"[১৭]

৫

'সমালোচনা' জীবনের ক্ষেত্রে হোক বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য নিয়ে যখন সমালোচনা করা হয়, তখন তার রচিত সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য থেকে দুর্বলতার দিকগুলি পাঠকের কাছে প্রতিফলিত হয়। সমালোচনা সাহিত্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট নাম। তার সমালোচনা বাংলা সাহিত্যকে পুরিপুষ্ট করেছে। তিনি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিশ্লেষণ করেছেন। এবং নাম দিয়েছেন— 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ'। মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলো রূপক-সংকেত ও কল্পনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এক নতুন দিকের সূচনা ঘটিয়েছেন। তাকেই সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলেন সমালোচক মহাশয় তাঁর সমালোচনায়। তিনি ঔপন্যাসিকের রচনায় দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরলেন— বিষয়ের নানামুখী বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা।

বহু বাংলা উপন্যাসের বিষয় ছিল পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, রোমান্স ও মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের মনের ও জীবনের সমস্যার রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের যৌন-কল্পনা, উদ্ভট চিন্তা বা মনের খণ্ডাংশ সাহিত্যের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ব্যক্তি প্রাধান্য দেখা যায় যেমন— হেরম্ব, হোসেন মিয়া, শ্যামা, যশোদা, রাজকুমার। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-ভালোবাসা, জীবনের খণ্ডাংশ, মনোবিকার, উদ্ভট চিন্তা, অবাধ যৌন- কল্পনা ও যৌনচেতনা তাঁর উপন্যাসের প্রধান সুর। সমালোচক মহাশয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উক্ত বিষয়গুলোকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের রাজকুমার। একদিকে উদ্ভট কল্পনা অন্যদিকে সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রাণকেন্দ্র। এখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসগুলি বিচার করে ঔপন্যাসিকের মৌলিক অবদানের বিষয় সম্পর্কে বলেছেন—

> "এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার সুর ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, জীবন আলোচনার স্বকীয় রীতিটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে উদ্ভট কল্পনাবিলাস ও সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা তাঁহার 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় লক্ষ্যগোচর হয়, সেই উভয় বিশেষত্বই হয় মিশ্রিত না হয় এককভাবে তাঁহার সমস্ত রচনাতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উপন্যাসের আসরে এই নূতন সুরপ্রবর্তনাই তাঁহার মৌলিকতার নিদর্শন।"[১৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, নয়টি উপন্যাসে যেখানে বিষয়ের বৈচিত্র্য, মৌলিকতা, উদ্ভট সমস্যা, উদ্ভট কল্পনার চিত্র দেখা দিয়েছে সমালোচক মহাশয় তা তুলে ধরেছেন। তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য'-এ রূপকের কথা উল্লেখ করেছেন। হেরম্ব, মালতী, আনন্দের আলোচনা এলেও 'অশোক' চরিত্রটি যেন কোথাও অবহেলিত হয়ে থেকে গেছে। একই সমস্যা দেখা যায় 'পুতুল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 552 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাচের ইতিকথা'র ক্ষেত্রেও। শশীর আলোচনার অপূর্ণতা অনুভব হয়। সেই সাথে তিনি বললেন লেখকের 'একটা বিশিষ্ট মনোভাব আছে'। কিন্তু সেই মনোভাব শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হল না। 'পদ্মান্দীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনায় কুবেরের স্ত্রী মালার ভূমিকা অনুপস্থিত। অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হতে দেখা গেল 'অহিংসা' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' উপন্যাস দুটি। দুটি উপন্যাসে উদ্ভট কল্পনার কথা বললেন ঠিকই কিন্তু তাঁর আলোচনায় উদ্ভট-কল্পনার চিত্র তেমনভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু সমস্যার কথা উল্লেখ করে গেছেন। এখানে যেন আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়।

তা সত্ত্বেও, সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপায়ের 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ' শিরোনামে আলোচনাটি পাঠককে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য, রসাস্বাদ, বিচার বিশ্লেষণ, ঘটনা ও চরিত্রগুলির সাথে পরিচিত হতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এবং সমালোচনা সাহিত্যের সার্থকতা এখানেই।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬-১৭, পৃ. ২৭৯
২. তদেব, পৃ. ২৭৯
৩. তদেব, পৃ. ২৮০
৪. তদেব, পৃ. ২৮০
৫. তদেব, পৃ. ২৮০
৬. তদেব, পৃ. ২৭৯
৭. তদেব, পৃ. ২৮০
৮. তদেব, পৃ. ২৮১
৯. তদেব, পৃ. ২৮১
১০. তদেব, পৃ. ২৮১
১১. তদেব, পৃ. ২৮২
১২. তদেব, পৃ. ২৮২
১৩. তদেব, পৃ. ২৮৩
১৪. তদেব, পৃ. ২৮২
১৫. তদেব, পৃ. ২৮৫
১৬. তদেব, পৃ. ২৮৪
১৭. তদেব, পৃ. ২৮৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৮০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬-২০১৭

সহায়ক গ্রন্থ :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দিবারাত্রি কাব্য', ডি.এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৪৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পুতুল নাচের ইতিকথা', প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৬৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পদ্মানদীর মাঝি’, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘জননী’, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘অহিংসা’, লেখাপড়া, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’, ক্যাতায়নী বুক স্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘চতুষ্কোণ’, বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪২

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 561 - 567
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শাঁওলী মিত্রের নাট্যচেতনায় দ্রৌপদীর নবমূল্যায়ণ : প্রসঙ্গ নাথবতী অনাথবৎ

সাবানা মোল্লা
Email ID : mollasabana661@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Shaoli Mitra, Drama, Nathavati Anathavat, Reconstruction, Mahabharata, contemporary times and society.

Abstract
Shaoli Mitra – A Bold and Unique Thinker, Playwriter, and Actress. Shaoli Mitra's famous play, Nathavati Anathavat (1983), is a poignant depiction of Draupadi's suffering, inspired by the Mahabharata. However, through the exquisite weaving of dramatic elements, the playwright transforms the story into a contemporary narrative of women's struggles. The entire play unfolds as a storyteller narrates the tale to the audience through various expressions and techniques.

Shaoli Mitra draws specifically from Draupadi's story and the social conditions of that time, choosing to focus on the position of women from beginning to end. The primary theme of the play revolves around the social plight and helplessness of women, with Draupadi as the central character. Through Nathavati Anathavat, Shaoli Mitra raises her voice against the injustices endured by Draupadis across ages. Her Draupadi becomes a representative of the politically and socially oppressed women of the present era.

The cruel societal norms devastate Draupadi's life. Despite having husbands, she suffers the pain of abandonment and the betrayal of trust. The playwright vividly portrays this anguish. The play sheds light on the cowardice, greed, lust, and exploitation of men, exemplified by the Pandavas' decision to gamble Draupadi away to protect their empire. Draupadi's desires, agency, and even her womanhood were of little significance to them, except for Bhima, who at least tried to shield her from humiliation and suffering.

When Yudhishthira gambled Draupadi away during the dice game, Bhima was the only one to rise in protest against his brother. Yet, neither Draupadi nor the playwright places faith in the idea that brave husbands will protect oppressed women like her. Consequently, Draupadi calls for war to rid society of the sins and atrocities perpetrated by individuals like Dushasana and Duryodhana. Through the extraordinary vision of a woman from the Mahabharata, Shaoli Mitra seeks to critique contemporary times and society. This article attempts to explore that perspective.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানকে অবলম্বন করে একালের অনেক সাহিত্যিক তাঁদের কালজয়ী সৃষ্টি পাঠককে উপহার দিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাঁওলী মিত্র। তিনি ১৯৮৩ সালে ‘পঞ্চম বৈদিক’ নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন, যে নাট্যদলের পথচলা শুরু তাঁরই লেখা নাটক ‘নাথবতী অনাথবৎ’ দিয়ে। তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরবদের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে দ্রৌপদীকে চিত্রিত করেছেন। বর্তমান সময়ের অত্যাচারিত, নির্যাতিত, পীড়িত নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেছেন তাঁকে। মহাভারতের আখ্যানভাগ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে তিনি কোনও মৌলিক নাটক রচনা করেননি, বরং বলা যায় মহাভারতের পুনর্নির্মাণ করেছেন। কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ - বহু সাহিত্যিক রামায়ণ মহাভারত থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে নানান সাহিত্য রচনা করলেও তাদের কোনটিকেই মৌলিক রচনা বলা যাবে না। শাঁওলী মিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা সেই ধারা লক্ষ করি। নাটকটি লিখিত ও অভিনীত হয়েছে কথকতার ভঙ্গিতে। মুখে মুখে গল্প বলার রীতিকে বলা হয় কথকতা। একটা সময় বাঙালি জীবনে কথকতার প্রচলন ছিল। যার মুখে গল্পটি পরিবেশিত হয় তিনি কথক এবং তার বলা গল্পটি কথকতা। পুরাণের কাহিনি ব্যাখ্যাসহ কথকতার আসরে পরিবেশিত হত। কথকঠাকুর উঁচু বেদীর উপরে বসে গল্প শোনাতেন। শাঁওলী মিত্র সেই রীতিকে ব্যবহার করে এক নতুন নাট্য-আঙ্গিকে রচনা করলেন তাঁর এই নাটক। পুরো নাটকের সূত্রধর হলেন এই কথক ঠাকুরণ। এই নাটকে কথক ঠাকুরণ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শাঁওলী মিত্র স্বয়ং। কথক ঠাকুরণ শুধু মহাভারতের কাহিনিটুকুই বলে ক্ষান্ত হচ্ছেননা, পাশাপাশি তাঁর ভাবনা, মতামত, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ দিয়ে নিজের উপস্থিতি সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শাঁওলীর একক অভিনয় দক্ষতা ও সাবলীল বাচনভঙ্গি এ নাটকটিকে নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। এই কাহিনির পুনর্নির্মানে যাঁদের গ্রন্থগুলি লেখিকাকে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ও শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, কাশীরাম দাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও গোরক্ষপুরী প্রকাশনার মহাভারতকার। এই গ্রন্থটির নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন যে, দ্রৌপদী চরিত্রটিকে পুনর্নির্মাণ করতে তাঁকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছেন মহাভারত-বিদুষী ইরাবতী কার্বের *যুগান্ত* গ্রন্থটি। আরো যাঁদের কথা তিনি বলেছেন তাঁরা হলেন কবি বুদ্ধদেব বসু, নাটক ক্ষেত্রের প্রাতঃস্মরণীয় নট ও লেখক মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নাট্যকার ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ। এ নাটকে তিনি সহজেই কাশীরাম দাসকে কাশীদাদা ও ইরাবতী কার্বেকে ইরাবতীদিদি বলে সম্বোধন করেছেন। মানব চরিত্রের বিচিত্র চিত্রশালা মহাভারত। এর স্রষ্টা বেদব্যাস যে চরিত্রগুলির মাধ্যমে পুরো ঘটনা বলেছিলেন বা যে সমাজের কথা তুলে ধরেছিলেন, বর্তমান সময়ে সমাজ, মানুষের মনস্তত্ত্ব কোনভাবেই সে গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। যার ফলে আধুনিক কালের পাঠককেও এই কাহিনিগুলি যথেষ্ট মনোযোগী ও কৌতূহলী করে তোলে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে ঘিরে নানা রকমের ঘটনা ঘটে চলেছে তার অভ্যন্তরীণ চরিত্রদের যদি মহাভারতের দৃশ্যপটে ফেলা যায় তাহলে দেখব, মহাকাব্যের এক একটি চরিত্রে তারা ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। দ্রৌপদীও তেমনি এক চরিত্র। মহাকাব্যের তিনি অগ্নিকন্যা। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর পা পৃথিবীর মাটিতে পড়েছে সেই মুহূর্তে তিনি হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর কন্যা। মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল বিশেষ এক কারণের পরিপ্রেক্ষিতে, অলৌকিক উপায়ে। পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা পৃষতের পুত্র হলেন দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ। বাল্যকালে ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সম্পর্কর গভীরতা যখন তুঙ্গে সেই সময় রাজপুত্র দরিদ্র বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন, যদি তিনি কোনোদিন রাজা হন তাহলে রাজ্যের অর্ধাংশ তাঁকে দেবেন। রাজা হওয়ার পর দ্রুপদ বাল্যবন্ধুকে রাজ্যের ভাগ তো দিলেনই না, উপরন্তু তাঁকে চূড়ান্তভাবে অপমান করেলেন। পরবর্তীকালে দ্রোণাচার্য সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাঁর শিষ্যদের সাহায্যে দ্রুপদ রাজাকে বন্দী করেন ও অপমান করেন। সেই সময় দ্রুপদ রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। লাঞ্ছিত দ্রুপদ পুত্র লাভের জন্য যাজ ও উপযাজ নামক দুইজন সন্ন্যাসীর কাছে পুত্র যজ্ঞের প্রার্থনা করেন। যাজ দ্রুপদ রাজার প্রার্থনা স্বীকার করে পুত্র যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞ থেকে প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পরে দ্রৌপদীর তথা কৃষ্ণার আবির্ভাব হয়। মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে –

“পুত্র কন্যা দুইজন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবানী হৈল।।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ কন্যার জন্ম হৈল ভার নিবারণে।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধনে||
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এই কন্যা হৈতে।
এ পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে||"[১]

নারী কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অযোনিসম্ভূতা কৃষ্ণার আবির্ভাবের কারণ হল ক্ষত্রিয় বংশকে ধ্বংস করা। এ বিষয়টি এখানে বলার কারণ এই যে দৈব প্রভাবে আবির্ভূত হলেও শাঁওলী মিত্র তাঁকে উপস্থাপন করেছেন রক্ত মাংসে গড়া নারী হিসেবেই।

নাটকটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দ্রৌপদীর জন্ম বৃত্তান্ত, স্বয়ংবর সভা ও কুরুসভাতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আখ্যান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বনবাস যাপন ও পাঞ্চালীর প্রতি ভীমের অগাধ ভালবাসার কথা। কাহিনির প্রথমে দ্রুপদ রাজা তাঁর কন্যার যোগ্য পাত্র সন্ধানের জন্য স্বয়ংস্বর সভার আয়োজন করেছেন। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন ইতিপূর্বে বারণাবতের ঘটনার পর পঞ্চপাণ্ডব যদি জীবিত থাকেন তাহলে এই স্বয়ংস্বর সভায় নিশ্চয়ই আসবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ রাজারা স্বয়ংস্বর সভায় উপস্থিত হয়েছেন। দ্রৌপদীকে পত্নী হিসেবে পাওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে এসেছেন ছেলে, মামার সঙ্গে ভাগ্নে, দাদার সঙ্গে ভাই, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু। দ্রৌপদীকে পাওয়ার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে থাকে, যেকোনো মূল্যে দ্রৌপদীকে পেতেই হবে। তাঁর অসামান্য রূপ দেখে রাজারা সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রাজাদের সেই কামনা, লালসা ও দ্রৌপদীর কাছে পৌঁছানোর যে চেষ্টা, তা হাসির উদ্রেক করে। কোনও রাজাই লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না। অবশেষে ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ব্রাহ্মণ যুবক উঠে দাঁড়ালো। তাঁর রূপ দেখে দ্রৌপদী তো মোহিত হয়ে গেলেন। অর্জুনের রূপ দেখে দ্রৌপদীর যে অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনা নাটককার করেছেন এইভাবে -

> "এতক্ষন বাদে এই কৃষ্ণবর্ণ যুবকটিকে দেখে তার মনে হল - এক সত্যিকারের পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে সভা আলো করে।"[২]

এরপর অর্জুন লক্ষ্যভেদ সম্পূর্ণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কথামতো দ্রৌপদী অর্জুনের গলায় মালা দেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করার পর দ্রৌপদীর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এমন সময় ক্ষত্রিয়রা মানতে চায় না যে সামান্য এক ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীর স্বামী হবে। নাট্যকার এইখানে চমৎকার এক উদাহরণ দিয়ে বলেছেন রামায়ণের কাল থেকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। এইখানে তিনি সংযোজন করেছেন বর্তমান সময়ে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক সংকটের মতো জ্বলন্ত বিষয়টিকে। এখানে মহাকাব্যের সঙ্গে বর্তমান সময়ের চলমানতা এক হয়ে যায়। অর্জুন ও ভীম দুজনে মিলে সে যুদ্ধে সবাইকে পরাজিত করে। সদ্য নির্বাচিত স্বামীকে দেখে দ্রৌপদী মুগ্ধ হয়ে যান। এরপর অর্জুন দ্রৌপদীর হাত ধরে বেরিয়ে যায়। তাঁর স্বামী গরীব জেনেও রাজকন্যা পাঞ্চালীর একটুও গ্লানিবোধ হল না, দুঃখবোধও হল না। অর্জুনকে দেখে সে পরম নিশ্চিন্তে, পরম বিশ্বাসে এক ভালোবাসার ঘোরের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে, কোন বিচার বিবেচনা না করে তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে। এরপর অর্জুনের সঙ্গে গিয়ে হাজির হয় কুন্তীর কাছে। কুন্তীর বক্তব্য নাট্যকার চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন -

> "জননী-দ্রৌপদী বড় অভাগা বাবু মশাইরা। শ্বশুর বাড়ি আসতেই শাশুড়ি বললেন, সম্পত্তি পাঁচজনকে ভাগ করে নিতে! বললেন 'যা এনেছ, পাঁচজনে মিলে ভোগ কর বাবা!"[৩]

এখানে 'সম্পত্তি' শব্দটি ব্যবহার করে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন নারী কোন ভোগ্যবস্তু নয়, পাশাপাশি তিনি এক নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। এখানে যে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল সে বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কুন্তী জানেন সংসারে প্রধানত দ্বন্দ্বের শুরু হয় সম্পত্তি ও নারীকে কেন্দ্র করে। সুতরাং তিনি যদি জানতেন দ্রৌপদীকে তাঁর কোনো এক ছেলে বিবাহ করেছেন তাহলে ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল থাকবে না। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে দ্রৌপদী অসামান্য সুন্দরী। জ্যোৎস্নার মত তাঁর রূপ, সূর্যের আলোর মতো তাঁর মুখের আভা। সূর্যের আলো পড়লে

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পদ্মের পাপড়িগুলো যেমন একটু একটু করে মেলে ধরে তেমনি দ্রৌপদীর যৌবন নারীত্বের অপূর্ব সম্ভার মেলে ধরেছে। কুন্তী নারীমন দিয়ে বুঝতে পারলেন যে সে পুরুষের কামনার ধন। তাঁকে দেখে নারীরাও তীব্র জ্বালায় জ্বলে। তাঁর রূপের আগুনে মুনী ঋষিরাও ছাই হয়ে যাবে। কুন্তী সম্পর্কে ইরাবতী কার্বে তাঁর 'যুগান্ত' গ্রন্থে বলেছেন -

> "Finally through her (kunti) wisdom and stratagem of Vyasa the dilemma was resolved so that Draupadi became the wife of all five, and her marriage to all five thus destroyed any possible seed of dissension."[8]

কুন্তীর এই নির্দেশের মধ্যে ছিল জটিল রহস্য। তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজনীতির ছায়া লক্ষ করা যায়। প্রজ্ঞাবতী কুন্তী তাঁর পুত্রদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার বাসনা পূর্ণ করার জন্য 'টার্গেট' করলেন দ্রৌপদীকে। পাঁচজন স্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাপে দ্রৌপদীকে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে দ্রৌপদীকে বিনা বাক্যে মেনে নিতে হয় সবকিছু।

শাঁওলী মিত্র চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন, কীভাবে দ্রৌপদীর বিবাহের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কুরু ও কৌরব বংশের ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে ছিল। নাট্যকার দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জুয়াড়ী মনকে আবিষ্কার করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পাশাখেলার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হস্তিনাপুর এলেন। এখানে কথক ঠাকুরণ বলেছেন ঋকবেদেও বলা হয়েছে 'দ্যূতক্রীড়া অপেক্ষা কৃষি কার্য করা অনেক ভালো'। তবুও তো সেই সভায় দ্যূতক্রীড়ারই আয়োজন করা হয়েছিল। আসলে নীতিকথা, আদর্শ এসব মানুষ কখনো শোনেনা, প্রাচীনকালেও শোনেনি আজও শোনে না। না হলে এরকম জুয়া খেলার আসর পৃথিবী জুড়ে বসতো কি? কিন্তু আমাদের দুঃখের জায়গা হল যুধিষ্ঠির। ধর্মের পুত্র বলে যিনি পরিচিত তাঁর কেন মতিভ্রম হল! তিনি একের পর এক দানে পরাজিত হতে থাকলেন। সমস্ত ধন-সম্পত্তি হারানোর পর, তিনি ক্রমে ক্রমে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম সবাইকে বাজি রাখলেন এবং পরাজিত হলেন। তাঁর ভাইয়েরা কেউ কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। সবকিছু হারানোর পর যুধিষ্ঠির পণ রাখলেন দ্রৌপদীকে। এই দানেও তিনি পরাস্ত হলেন। এরপর কুরুসভায় শুরু হয় তীব্র উল্লাস। প্রতিকামীকে পাঠানো হয় দ্রৌপদীকে ডাকার জন্য। দ্রৌপদী জ্বলে ওঠেন ক্ষোভে এবং জিজ্ঞাসা করেন কোন সাহসে এক পুরুষ তাঁর কক্ষে হাজির হয়েছেন, বিনা অনুমতিতে। প্রতিকামী বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, রাজার আদেশে এসেছি আপনাকে সভাস্থলে নিয়ে যেতে। যুধিষ্ঠির আপনাকে বাজি রেখে পরাজিত হয়েছেন পাশা খেলায়। দ্রৌপদী হতবাক হয়ে প্রশ্ন করেন আমাকে হারানোর আগে তিনি কি নিজেকে হারিয়েছিলেন? প্রতিকামী উত্তর দেন, হ্যাঁ। দ্রৌপদী বলেন তিনি প্রথমে নিজেকে হেরেছেন, সুতরাং তিনি আমার স্বামী নন। ফলে আমাকে পণ রাখার কোনো অধিকার তাঁর নেই।

> "প্রতিকামী, তুমি সভায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস, ধর্মরাজ কি নিজেকে পণ রাখার পূর্বে আমাকে পণ রেখেছিলেন? না পরে? যদি পরে হয় তার আগেই তিনি আমার ওপর অধিকার হারিয়েছেন। সেই অনুসারে আমি সভায় যেতে বাধ্য নই।"[৫]

এই প্রতিবাদী উক্তি দ্রৌপদীর প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দেয়। জ্ঞান না থাকলে ঐ পরিস্থিতিতে ওরকম প্রশ্ন উত্থাপন তিনি করতে পারতেন না। বিবাহিত স্ত্রী তাঁর কাছে পরিণত হয়েছে অস্থাবর ভৌম সম্পত্তিতে - যাঁর সম্মতি ব্যতিরেকেই পাশা খেলায় পণ রাখা যেতে পারে। দ্রৌপদীর অনুরোধ, অনুনয় সত্ত্বেও দুঃশাসন তাঁর কথা শোনেনি। দুঃশাসন তাঁর কেশাকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে সভার মাঝখানে। দ্রৌপদী তাঁর পাঁচ স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় তাঁরা? সভার একপাশে আনত দৃষ্টিতে বসে আছেন যে পাঁচজন তাদের দেখে মনে হচ্ছে না তাঁরা পুরুষ! এরপর শুরু হয় সেই নারকীয় কাণ্ড। দুঃশাসন দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টানতে শুরু করলো আর দুর্যোধন তার উরু উন্মুক্ত করে অপেক্ষা করতে লাগলো বিবস্ত্র দ্রৌপদীকে কোলে টানার! কুরু রাজসভা যেন গণিকালয় হয়ে উঠল। এই অপমান, অসম্মান দ্রৌপদীর নারী-সত্তাকে নিমিষে শেষ করে দেয়। এরপর শুরু হয় সেই জঘন্যতম বস্ত্রহরণ পর্ব। সর্বসমক্ষে তাঁর সম্ভ্রম বিনাশের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল দুঃসাসনের লোলুপ হাত। তাঁকে উৎসাহিত করতে লাগলো দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাঁর দ্বারা অপমানিত কর্ণের প্রবল উৎসাহ ও

কৌরবদের সম্মতি। দ্রৌপদী কাঁদতে কাঁদতে সভায় উপস্থিত গুরুজনদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন আপনাদের কি বিবেক বলে কিছু নেই, আমি কুরুকুলের বধু, আমাকে এইভাবে সভার মধ্যে অপমানিত হতে হচ্ছে তা দেখেও কেউ দেখছে না, কেউ প্রতিবাদ করছে না, কোনো নিন্দে করছে না! একমাত্র ভীম এ সময় ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ওঠেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন আপনি আমাদের চার ভাইকে পণ রেখেছেন এবং হেরেছেন তাতে আমরা কোনও কথা বলিনি, কারণ আপনি আমাদের প্রভু। কিন্তু পাঞ্চালী কেন এই অপমানে অপমানিত হবে। এই অপমানের যোগ্য সে নয়। আমি আপনার হাত দগ্ধ করব। অর্জুনের মধ্যস্থতায় ভীম শান্ত হন। ভীম ছাড়া আরো দু'জন মানুষ এই জঘন্য অপরাধের প্রতিবাদ করেছিলেন তার একজন হলেন বিদুর। যিনি ক্ষত্রিয় পুত্র নন, দাসীপুত্র বলে কোনোদিন রাজা হওয়ার যোগ্য হননি, সেই বিদুর সবার সামনে প্রতিবাদ করে উঠলেন। আরেকজন হলেন দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ। ওই বালক বিকর্ণ বলেন দ্যুতক্রীড়া তো রাজাদের খেলা, সে খেলা কী করে এইরকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে! এই যে দ্রৌপদী, তাঁকে পণ রাখা হয়েছে, তিনি তো কেবল যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী নন, আরো চারজন ভাইয়ের স্ত্রী, কই তাঁদের অনুমতিক্রমে তো তাঁকে পণ রাখা হয়নি? দ্রৌপদী কোনো ভাবেই বিজিত হতে পারেন না। মহাভারতের এই জঘন্যতম দৃশ্য নিশ্চিত রূপে সেই সভাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। আর সেই অভাগিনী দ্রৌপদী এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে সবার কাছে কাকুতি, মিনতি করেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কেউ তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি। কেবলই তাঁর ক্রন্দনে শুষ্ক মৃত্তিকা সিক্ত হয়েছিল। নাট্যকার সেকালের নারীর উপরে অত্যাচারের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান সময়ের নারীর লাঞ্ছনাকে একসূত্রে বাঁধেন। নাট্যকার তাই বলেন - যে, পৃথিবীতে এরকম এক একটা কাল আসে যখন গুণীজনেরা সব চুপ করে থাকে আর যে অত্যাচারিত হয় সে অত্যাচারিত হয়েই যায়। সভায় উপস্থিত গুণীজনেরা বাক্যহারা হয়ে যান। তাঁরা কেউ কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে বিজিত পঞ্চপাণ্ডব, তাঁরাও চুপ করে বসে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মারাঠি কবি ইরাবতী কার্বে বলেছেন পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদী অনাথ।

> "Two words keep recurring in reference to Draupadi – Nathhavati Anathavat, (having husbands, but like a widow). She was the wife of five but bereft the daughter of a rich house but like an orphan, she had brave allies but she was alone. This was the pity of her situation. Every time she was dishonored, her husband and father-in-laws stood watching in silence."[৭]

মহাভারতে আছে, অন্তর্যামী কৃষ্ণ অলৌকিক উপায়ে অনন্ত বস্ত্র যুগিয়ে রক্ষা করেছিলেন দ্রৌপদীকে। কিন্তু নাট্যকার শাঁওলী মিত্র নাটকে অন্য এক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কৌরবদের এই অত্যাচারে মনে হয় ন্যায়নীতির ভীত নড়ে উঠেছিল। হস্তিনাপুরের রাজসভায় এক অদ্ভুত অন্ধকার নেমে আসে ক্ষুধার্ত শকুনের কালো ডানার মতো। সভার চারিদিক থেকে কী সব ডাক ভেসে আসতে থাকে, শিয়াল কুকুরের ডাক অমঙ্গলের ডাক। এসব অমঙ্গলের ছায়া দেখে ধৃতরাষ্ট্র ভয় পান এবং এর পাশাপাশি নাট্যকার এখানে আরো একটি বিষয় যোগ করেছেন, প্রজা বিদ্রোহ। ধৃতরাষ্ট্র নানারকম রাজনৈতিক লাভ ক্ষতির হিসাব-নিকাশের পর সিংহাসন থেকে উঠে এসে দ্রৌপদীকে বর দিয়ে একে একে সব কিছু ফিরিয়ে দিলেন। সর্বস্ব ফিরে পেলেও তিনি কি ভুলতে পেরেছিলেন তাঁর অপমানের কথা? অবশেষে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী সর্বহারা হয়ে তেরো বছরের জন্য বনবাসে চলে যান।

এরপর নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে আমরা দেখি জুড়ির দল ও সমবেত মেয়েরা গান গাইছে, সেই গানের মূল বিষয় হল দ্রৌপদীর একাকিত্ব, দারিদ্র্য, এবং সুখ-স্বস্তি-শান্তিহীন নিস্তরঙ্গ জীবন। দ্রৌপদী চেয়েছিলেন একবার অন্তত ধর্মযুদ্ধ হোক। কে পাপী, আর কে পাপী নয়, তা প্রমাণ হয়ে যাক। অন্তত একবার পাপের পরাজয় হোক। কিন্তু দ্রৌপদীর মনের মতো করে সবকিছু হল না। তিনি দেখলেন সবাই চাইছে সন্ধি করতে। যুধিষ্ঠিরও মাত্র পাঁচটি গ্রাম দাবি করেছেন। সবাই দ্রৌপদীর অপমানের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু দ্রৌপদী ব্যথিত হন যখন তিনি দেখেন তাঁর সখা কৃষ্ণও সন্ধির পক্ষে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনেরা মাত্র পাঁচটি গ্রাম দিতেও রাজি হলেন না। ফলে পাণ্ডবদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণা হল। দ্রৌপদী ভেবেছিলেন এবার হয়তো তাঁর প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিচার হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পাঞ্চালীর মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, তা কথক ব্যক্ত করেছেন এইভাবে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ধর্মযুদ্ধ তো হল না! এরা তো সব অন্যায় যুদ্ধ করলে! – দু'পক্ষেই! কৌরবরা না হয় করবেই। কিন্তু পাণ্ডবরা? পাণ্ডবরা অন্যায় যুদ্ধ করলে! আর তা আবার কৃষ্ণের পরামর্শে! যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যে বলতে হল! ভীম, অর্জুন ওরা সব অন্যায় যুদ্ধ করলে। কই, ধর্মযুদ্ধ তো হল না।"

নাটকের এই পর্যায়ে দ্রৌপদীর এই বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠক-দর্শক হতবাক হয়ে যায়। তাঁর মহত্ত্ব, চিন্তাভাবনা, সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্ন কোথাও যেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও পরাজিত করে। মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকে কেন্দ্র করেও নানা প্রশ্ন থেকে যায়! এই পাপ কেবলমাত্র নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করে না, পাশাপাশি নীতিবোধের সীমা নিয়েও আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। ধর্ম কি? ধর্ম বলে কি কিছু আছে? এ প্রশ্ন মহাভারতের সমস্ত জ্ঞানী গুণী মানুষের কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কৌরব সভায় তাঁর বস্ত্রহরণের চেষ্টা, তাকে কেন্দ্র করে অন্যদের মধ্যে যে লালসা, সেই বিষয়টি এমন এক পাপের আখ্যান তৈরি করেছে যাতে সেই সভাতে উপস্থিত সমস্ত পুরুষের বিরুদ্ধে আঙ্গুল ওঠে।

বনবাসে যাওয়ার সময় পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গী হলেন একমাত্র দ্রৌপদী। তাঁদের অন্যান্য স্ত্রী যেমন সুভদ্রা, দেবিকা, বিজয়া কাউকেই বনবাসে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গী হতে হয় নি। নাট্যকার মনে করেন অর্জুনের কাছে দ্রৌপদী 'তুরুপের তাস'। তাঁর প্রতি অর্জুনের কোনো ভালবাসা, আবেগ কিছুই ছিল না, বরং সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের বেশি ভালবাসা ছিল। নাট্যকার শাঁওলী মিত্র এই নাটকে ভীম চরিত্রটিকে নতুন মাত্রায় সংযোজন করেছেন। পাঞ্চালীর প্রতি ভীমের ভালোবাসার এক অমূল্য চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। একমাত্র ভীম যুধিষ্ঠিরের নীতি, জ্ঞানহীন অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের হাত পুড়িয়ে দিতেও উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দুঃশাসন ও দুর্যোধনকে শেষ করে দিতে। পরে সেই ভীমই দুঃশাসনের উরু ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আর যে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে নগ্ন করার চেষ্টা করেছিল ভীম সে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করেছিলেন। ভীমই ঝুঁকি নিয়ে স্বর্ণপদ্ম তুলে এনে দিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে। জটাসুর, জয়দ্রথ, কীচক - সবাইকে শাস্তি দিয়েছিলেন তিনি। অথচ দ্রৌপদী কোনোদিন ভীমের প্রতি তাঁর ভালবাসা অনুভব করেননি। তিনি ভালোবেসেছিলেন অর্জুনকে, তাই তিনি তাঁর মনের মণিকোঠায় বসাতে পারেননি ভীমকে। দ্রৌপদীর সমস্ত যন্ত্রণা ও বেদনা অনুভব করেছেন একমাত্র ভীম। তাঁর প্রত্যেকটি অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন ভীম। মহাপ্রস্থানের পথে বন্য হিংস্র প্রাণী ও জন্তুর ভয়ে দ্রৌপদী যখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, যখন নরকের কালো ছায়া গ্রাস করেছে, তখন দ্রৌপদীর কাছে এসে তাঁকে আশা, ভরসা ও সাহস যুগিয়েছেন একমাত্র ভীম। বারবার অসহায় দ্রৌপদীকে ভরসা যুগিয়েছেন তিনি। জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রৌপদী কেবলমাত্র ভীমকে তাঁর পাশে পেয়েছেন। জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অনাথ দ্রৌপদীর নাথ হয়ে উঠেছে ভীম।

পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটা মুহূর্ত দ্রৌপদীকে অপমানিত হতে হয়েছে। মহাভারতের দ্রৌপদীর এই জীবন যন্ত্রণার দলিল হয়ে উঠেছে যেন এই নাটক। তাঁর জীবন যন্ত্রণার কথা বলতে বলতে বর্তমান সময়ের নারীদের যন্ত্রণার কথাও পরতে পরতে বুনে দেন নাট্যকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন নারীদের সংকট। দ্রৌপদীর মতো অত্যাচারিত বধূদের যুগে যুগে রক্ষা করবেন তাদের বীর স্বামীরা – এই আস্থা ও ভরসা শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদী বা নাট্যকার কেউই রাখতে পারেননি। সেদিনের দ্রৌপদী দুঃশাসন - দুর্যোধনদের সমস্ত পাপ ও অন্যায় থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য ধর্মযুদ্ধ চেয়েছিলেন, তার ফল হল কুরুক্ষেত্র। আর আজকের দ্রৌপদীদের হয়ে লড়বার মতো মানুষের বড়ো অভাব। আজ আর কোনো কৃষ্ণ এগিয়ে আসেন না তাঁর কৃষ্ণার পাশে। মহাভারতের অলোকসামান্যা এক নারীর চোখ দিয়ে বর্তমান সময় ও সমাজকে এ নাটকে দেখতে চেয়েছেন শাঁওলী মিত্র। দ্রৌপদী শেষপর্যন্ত তাঁর সখা কৃষ্ণের কাছে তাঁর স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। দ্রৌপদী বুঝেছিলেন তাঁর জীবনের এই অসহায় পরিস্থিতির জন্য দায়ী তাঁর স্বামীরা। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং অপমান নিশ্চিত জেনেও তাঁকে কৌরবদের হাতে তুলে দিয়েছেন। স্বামী হয়েও তিনি তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেনি। দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ দ্রৌপদীকে একজন অ-নাথ নারীতে পরিণত করেছে। বিশ পেরিয়ে একুশ শতকে এসেও নারীরা আজও প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হয়ে চলেছে তাদের স্বামী ও সাংসারিক পরিমণ্ডলে। তারই এক অমোঘ চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার এই নাটকে পৌরাণিক-গুণ্ঠনের আড়ালে। বর্তমান সময়েও আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার

জন্য দ্রৌপদীর মতো অসংখ্য নারীকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, শোষিত হতে হচ্ছে। আমরা আজও সেই অবস্থান থেকে বেরোতে পারছি না। পুরনোর মোড়কে সমকালকে হাজির করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, সুকৌশলে তাকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার এ নাটকে; আর এখানেই আজও এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা।

Reference:

১. শীল, বেণীমাধব, (সম্পাদিত), *কাশীদাসী মহাভারত*, কলকাতা, অক্ষয় লাইব্রেরী, পৃ. ১৬৩

২. মিত্র, শাঁওলী, *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৪২৯, পৃ. ৩১

৩. ঐ, পৃ. ৩৫

৪. Irawati Karb, *Yuganta*, Orient Black Swan Pvt.Ltd; 2nd edition (19 july 2006), P. 85

৫. মিত্র, শাঁওলী, *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৪২৯, পৃ. ৪৩

৬. Irawati Karbe, *Yuganta*, Orient Black Swan Pvt. Ltd; 2nd edition (19 july 2006), p. 91

৭. মিত্র, শাঁওলী, *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৪২৯, পৃ. ৬৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 568 - 574
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মনোজ মিত্রের নাটক ‘তক্ষক’ : মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনীর একটি বিনির্মাণ

প্রশান্ত কুম্ভকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়
Email ID : kumbhakarprasanta@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Porikshit, Mahabharata, Sringi, Curse, Takshak, Life, Fear of death, Joy, Sorrow.

Abstract
Manoj Mitra is well-known to everyone as a unique dramatist of recent times. He was also an accomplished actor, director and playwright. Manoj Mitra was associated with Bengali theater and film world for a long time. He has given us successful drama one after another. ‘Takshak’ is one of the successful and popular drama among them. It is a one act play based on the Parikshit story of Mahabharata. Though the story of the drama is taken from Mahabharata, the dramatist has skillfully adapted and presented it to suit the modern era. The conflict between life and death of a modern man is portrayed in this drama, and the way it is portrayed is simply amazing. At the end of the drama, death surrendered to life and victory song of life is announced. In real life, we lose the taste of life and it becomes boring for some sad event. But in this play the playwright has shown us through the character of Parikshit, that the life of seven days is as expansive as crossing seven seas. So, ignoring the fear of death and moving in natural rhythm is the name of life. We have to live every moment by fighting death, beating death, defeating death. This is the message conveyed in the play, which is not present in Parikshit story of Mahabharata. It is very sad to say that Manoj Mitra is no more with us. So, discussing his one act play ‘Takshak’ is actually just a small attempt to pay tribute to him.

Discussion

মহাকবিরা সময়ে সময়ে এমন কিছু গ্রন্থ সৃষ্টি করে যান, যেগুলিকে মহাকালের পক্ষেও বিদায় জানানো সম্ভব হয় না। সেগুলি অবিনশ্বর ও অবিনাশীরূপে কালে কালে সামাজিক মানুষের পথ চলার পাথেয় হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল মানুষকেও সেগুলি রীতিমতো ভাবায়। সেই ভাবনা থেকেই একটি তত্ত্ব, দর্শন উঠে আসে এবং তার লিখিত রূপায়নে জন্ম নেয় আরেকটি নূতনতর নির্মাণের। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত তেমনই উচ্চস্তরের মহাগ্রন্থ যেগুলি কালস্রোতে আজও অমলিন। এইসব গ্রন্থের কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতি, জীবনদর্শন, চিরন্তন সত্যতা আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখনি ধারণে বাধ্য করায়। তবে আধুনিক যুগ হল বিজ্ঞানচেতনা, যুক্তিবিচার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির যুগ। তাই এই যুগে বসে রামায়ণ,

মহাভারত বা পুরাণ উপনিষদের ভক্তিভাব তথা ধর্মীয় সত্ত্বাকে সেইভাবে ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ সাহিত্যিকদের শিক্ষা, রুচি, সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা, জীবনকে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ভাবে পর্যালোচনা করার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের রচিত সাহিত্যে এসে পড়ে। ফলে দেব-দেবী, মুনিঋষির কাহিনীর অন্তরালে বর্তমান যুগসমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় প্রকট হয়ে ওঠে।

নাট্যকার মনোজ মিত্রের এমনই কয়েকটি নাটক হল অশ্বত্থামা (১৯৬৩), তক্ষক (১৯৬৭), যা নেই ভারতে (২০০৭) প্রভৃতি। এইসব নাটকে তিনি পুরাণকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। কারণ নাটকগুলির ভাব বা সত্ত্বা পুরোপুরি বাস্তব। আমাদের আলোচ্য নাটকটি হল তক্ষক। এটি মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি একাঙ্ক নাটক। কিন্তু নাট্যকার মহাভারতের কাহিনীকে সুকৌশলে পরিবর্তিত করে তাকে আধুনিক মানুষের জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে পরিণত করেছেন এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যু হার মেনেছে জীবনোচ্ছ্বাসের কাছে। নাটকটি বিশ্লেষণের আগে আমরা একবার মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনীটি সংক্ষেপে দেখে নিতে পারি।

মহাভারতে আদিপর্বের অন্তর্গত ৪০, ৪১, ৪২ ও ৪৩তম অধ্যায়ে পরীক্ষিতের কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে।[১] অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর পর পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হন। তিনি প্রপিতামহ পাণ্ডুর মতোই অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, যুদ্ধবিশারদ এবং মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদিন একটি হরিণকে শরবিদ্ধ করে তার পিছু নিতে নিতে তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অত্যধিক পরিশ্রম ও পিপাসায় অধির হয়ে একটি গোচারণ ভূমিতে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক তপস্বীকে দেখলেন যিনি স্তন্যপায়ী গোবৎসের মুখনিসৃত ফেনা পান করে জীবনধারণ করছেন।[২] রাজা পরীক্ষিৎ সেই মুনির কাছে শরবিদ্ধ হরিণ সম্পর্কে বারংবার জানতে চাইলেন। কিন্তু মুনি মৌনব্রতাবলম্বী থাকায় কোন উত্তর দিলেন না। তখন রাজা রাগে অন্ধ হয়ে ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে একটি মৃত সাপকে মুনির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

ঐ মুনির নাম শমীক। রাজা তা জানতেন না। শমীক মুনির শৃঙ্গী নামে এক তরুণ পুত্র ছিল। তিনি খুব রাগী ছিলেন। ব্রহ্মার উপাসনা করে তিনি আশ্রমে ফিরছিলেন। তাঁর এক বন্ধু কৃশ শমীকমুনির এই অপমানের কথা তাঁকে গিয়ে পথিমধ্যে জানালেন। শৃঙ্গী রাগে জ্বলতে লাগলেন এবং রাজাকে অভিশাপ দিলেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে বিষধর তক্ষক সেই পাপাত্মাকে যমালয়ে প্রেরণ করবে। আশ্রমে ফিরে এসে তিনি পিতাকে সমস্ত কথা জানালেন। শমীকমুনি পুত্রের এই অভিশাপের কথা শুনে দুঃখিত হলেন এবং পুত্রকে ভৎসনা করলেন। রাজা হয়তো জানতেন না যে শমীকমুনি মৌনব্রতাবলম্বী। তাই না হয় একটা কুকর্ম করে ফেলেছেন। কিন্তু তাই বলে না বুঝে রাজাকে অভিসম্পাত করা শৃঙ্গীর একেবারে উচিত হয়নি। শৃঙ্গীর পক্ষেও আর অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি সত্যবাদী এবং বাকসিদ্ধ। তখন মহর্ষি শমীক গৌরমুখ নামে এক শিষ্যকে দিয়ে এই দুঃসম্বাদ পরীক্ষিতের কাছে পাঠালেন। সব শুনে এবং নিজের দুষ্কর্ম স্মরণ করে রাজা বিষন্ন ও অনুতপ্ত হলেন। এরপর মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ করে রাজা একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এবং সেখানে নানাবিধ ঔষধ, বহু চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করলেন। বিষবিদ্যা বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ এই সংবাদ শুনে ধনসম্পদের আশায় রাজাকে বাঁচাতে এলে তক্ষক তাঁকে বাধা দিলেন এবং তাঁকে অভিলষিত অর্থের অধিক প্রদানে সম্মত হলেন। কাশ্যপ ধ্যানে জানতে পারলেন যে, রাজার আয়ু শেষ হয়েছে। তাই তিনি তক্ষকের কাছে কাঙ্ক্ষিত ধনসম্পদ নিয়ে প্রস্থান করলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছে শুনে তক্ষক সমস্ত নাগেদের ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে পুষ্প, কুশ, জল, ফল প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ে আশীর্বাদ ছলে রাজার কাছে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং নিজে কীটরূপে একটি সুস্বাদু ফলের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেন। দৈবক্রমে রাজা ঐ ফলটি খেতে গেলেন। তখন কীটরূপী তক্ষক নিজদেহ ধারণ করে রাজাকে দংশন করলেন। পরীক্ষিতের মৃত্যু হল। এই হল মহাভারতে পরীক্ষিৎ রাজার কাহিনী। এরপর আমরা মনোজ মিত্রের ‘তক্ষক’ নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

নাটকের একেবারে প্রথমেই দেখা যায়, পরীক্ষিৎ একটি বাণবিদ্ধ হরিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। পরীক্ষিতের একান্ত ইচ্ছা ছিল হরিণশিশুটিকে জীবন্ত ধরার।[৩] কিন্তু মূল মহাভারতে জীবন্ত মৃগশিশু ধরার মানসিকতা পরীক্ষিতের ছিল না। কারণ মহাভারতে উল্লেখ আছে যে পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হলে কোন হরিণেই জীবিতাবস্থায়

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পালাতে পারে না, কিন্তু এই হরিণটি যে বাণবিদ্ধ হয়েও পালাতে সক্ষম হয়েছে, তা কেবল তার অচিরাৎ স্বর্গলাভের কারণে -

"ন হি তেন মৃগো বিদ্ধো জীবংচ্ছতি বৈ বনে।
পূর্বরূপং তু তত্তূর্ণং তস্যাসীৎ স্বর্গতিং প্রতি।।"[৪]

যাইহোক, 'তক্ষক' নাটকে পরীক্ষিতের সঙ্গী ছিল তন্ত্রিপাল। সে একাধারে রাজার সারথী এবং বন্ধু। মহাভারতে এরূপ কোন তন্ত্রিপাল নেই। তন্ত্রিপাল নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা প্রসূত। হরিণশিশুটিকে অনুসরণ করতে করতে পরীক্ষিৎ গভীর অরণ্যের এমন এক স্থানে পৌছেছেন যা তাঁকে অভিভূত করেছে- 'শান্ত নিস্তব্ধ সমাধিস্থ'। এরপরেই সারথি তন্ত্রিপালের আবির্ভাব হয়েছে। অন্ধকার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তন্ত্রিপাল রীতিমতো শঙ্কিত –

"কিছুই ঠাহর করতে পারছি না! মহারাজ, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি!"[৫]

তার মনে হয়েছে কোন অজানা বিপদ হয়তো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই পরীক্ষিতকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষিৎ হরিণটির সন্ধান করতে চেয়েছেন। পথ হারানোর আনন্দে তিনি আরো দূরে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। এদিকে তন্ত্রিপাল ভয়ানক পিপাসার্ত। চোখমুখ তার পিপাসায় নীলবর্ণ হয়ে উঠেছে। পরীক্ষিৎ তার জন্য জল আনতে চাইলে তন্ত্রিপাল তা মেনে নিতে পারেনি। কারণ সে একজন সামান্য প্রজা মাত্র। তার জন্য মহারাজ স্বয়ং জল এনে দেবেন-এটা হতে পারে না। এর প্রত্যুত্তরে রাজা পরীক্ষিৎ যে কথা বলেন তা দর্শক ও পাঠককে অভিভূত করে –

"প্রজার সেবা যদি নাই করতে পারে, তবে সে কিসের রাজা – কার রাজা... কেনই বা রাজা!"[৬]

যাইহোক, তন্ত্রিপালকে জেগে থাকার পরামর্শ দিয়ে ঘুমন্ত বৃক্ষপুরীতে প্রবেশ করে তিনি জল নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে এরকম কোন ঘটনা নেই। সেখানে আছে -

"পরিশ্রান্তঃ পিপাসার্ত আসসাদ মুনিং বনে।
...ময়া বিদ্ধো মৃগো নষ্টঃ কচ্চিত্তং দৃষ্ট বানসি।।"[৭]

অর্থাৎ, মৃগের অনুসরণ করতে করতে পরীক্ষিৎ পরিশ্রান্ত ও পিপাসায় কাতর হয়ে এক মৌনব্রতাবলম্বী মুনির কাছে গিয়ে বাণবিদ্ধ হরিণশিশু সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে পরীক্ষিৎ জলের সন্ধানে ইতস্থত ঘুরতে ঘুরতে তপস্যারত এক মুনির কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। তপস্যারত কঙ্কালসার মুনিকে দেখে তিনি বিস্মিত হন –

"...জীবিত না মৃত! (সতর্ক হয়ে ঋষির শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করে) হ্যাঁ আছেন, বেঁচে আছেন। উঃ এত ধীরে... এত একা... এত সূক্ষ্মভাবে কেউ বাঁচে... বাঁচতে পারে!"[৮]

ধ্যানরত মুনির সামনে নতজানু হয়ে বসে পরীক্ষিৎ নিজের বিপন্ন অবস্থা জানালেন এবং তৃষ্ণার জলের সন্ধান চাইলেন। কিন্তু মুনি মৌনব্রতাবলম্বী থাকায় কোন উত্তরই দিলেন না। পরীক্ষিতের গলার আওয়াজ ক্রমশ বর্ধিত হল। পাশের কোন এক স্থান থেকে শৃঙ্গী রাজাকে ভৎসনা করলেন এবং রাজা জল চাইলে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু পরীক্ষিতের এক্ষুনি জল চাই। কারণ সারথি তন্ত্রিপাল পিপাসায় মূর্ছিতপ্রায়। তার জন্য জল তাঁকে সংগ্রহ করতেই হবে। তাই ধ্যানস্থ মুনির কাছে তিনি আবারও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সন্ধান চাইলেন। কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ এবং উন্মত্ত হয়ে একটি মরা, পচা সাপকে ধ্যানরত মুনির গলায় দেবার জন্য উদ্যত হলেন। এমন সময় শৃঙ্গী এসে তাঁর পিতা ও নিজের পরিচয় দিয়ে রাজাকে যথেষ্ট ভৎসনা করলেন। রাজাও শৃঙ্গীর সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন এবং ধনুকের ডগা দিয়ে মৃত সাপটিকে ঋষির গলায় জড়িয়ে দিলেন। সাথে সাথে শৃঙ্গীর অভিশাপ নেমে এল –

"ধ্বংস হবি...ধ্বংস হবি তুই! অনাচারী রাজা...মরবি...মরবি তুই...আজ থেকে সাত দিনের দিন তক্ষকের কামড়ে মরবি...।"[৯]

ধ্যানমগ্ন ঋষির শরীর কেঁপে উঠল। চোখ উন্মুক্ত হল। পুত্রের এই অভিশাপে তিনি দুঃখিত হলেন। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষটির মৃত্যু কামনা করে শৃঙ্গী ভালো করেনি। কারণ ঋষির কাজ শুধু পুণ্য অর্জন নয়, পুণ্যকে রক্ষা করতে হয়। এরপর শৃঙ্গীর তাঁর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় জর্জরিত হলেন। চিৎকার করে পরীক্ষিতকে ডাকলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"থামাও ...ঘোড়া থামাও...ফিরে এসো রাজা...তৃষ্ণা মিটিয়ে যাও...।"[১০]

ব্রহ্মশাপ তো ফিরিয়ে নেওয়ার নয়। কিন্তু রাজা যেন তৃষ্ণায় না মারা যান- শৃঙ্গী এই আবেদন রাখেন পিতার কাছে। রাজার পথে যেন একটি মায়া সরোবর সৃষ্টি হয় এবং রাজা জল পান করে যেন তৃপ্ত হন। মহর্ষি শমীক তাই করলেন।

এখন লক্ষ্য করার বিষয় এটা যে, নাট্যকার মনোজ মিত্র মহাভারতের কাহিনীকে অনুসরণ করেন নি, উপরন্তু পরীক্ষিৎ-শৃঙ্গী ও শৃঙ্গী-শমীকের যে কথোপকথন উপস্থাপন করেছেন তাতে নাটকটি আরো জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পরীক্ষিৎ ও শৃঙ্গীর কথোপকথন নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। মহাভারতে এই কথোপকথন নেই। মহাভারতে শমীকমুনির এই দুর্দশার বর্ণনাটি শৃঙ্গীর এক বন্ধু কৃশ শৃঙ্গীকে জানিয়েছে এবং শৃঙ্গী এই কথা শুনেই পরীক্ষিতকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছেন। মহাভারতে আছে -

"রাজ্ঞা পরিক্ষিতা তাত মৃগয়াং পরিধাবতা।
অবসক্তঃ পিতুস্তেহদ্য মৃতঃ স্কন্ধে ভুজঙ্গমঃ।।"[১১]

অর্থাৎ, মৃগয়াবিহারী পরীক্ষিৎ এই তপোবনে মৃগয়া করতে এসেছিলেন, তিনি তোমার পিতার স্কন্ধে মরা সাপ সমর্পণ করে গিয়েছেন। আরেকটি বিষয় হল এই যে মহাভারতে পরীক্ষিৎ শমীকমুনির কাছে জলের সন্ধান চাননি, মৃগের সন্ধান চেয়েছিলেন। মুনির কোন উত্তর না পেয়ে রাজা রেগে যান এবং একটি মরাপচা সাপকে মুনির গলার ঝুলিয়ে দেন। কৃশের কাছে এই তথ্য পেয়ে শৃঙ্গী রাজাকে অভিশাপ দেন -

"যোহসৌ বৃদ্ধস্য তাতস্য তথা কৃচ্ছগতস্য হ। স্কন্ধে মৃতং সমাস্রাক্ষীৎপন্নগং রাজকিল্বিষী।।
তং পাপমতি সংক্রুদ্ধস্তক্ষকঃ পন্নগেশ্বর। আশীবিষস্তিগ্ন তেজা মদ্বাক্য বলচোদিতঃ।।
সপ্তরাত্রাদিতো নেতা যমস্য সদনং পতি। দ্বিজানামবমন্তারং কুরূণাময়শস্করম।।"[১২]

অর্থাৎ, যে নৃপাধম আমার মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত দিয়েছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ম বিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যমসদনে প্রেরণ করবে।[১৩] কিন্তু 'তক্ষক' নাটকে নাট্যকার কি অপূর্ব কৌশলে পরীক্ষিৎ ও শৃঙ্গীর কথোপকথনটি সৃজন করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেল না -

"শৃঙ্গী ।। ব্যঙ্গ...ব্যঙ্গ করো রাজা...এত দম্ভ! এতই স্পর্ধা! ধরাকে সরা জ্ঞান করো! দেখবে...দেখবে তুমি রাজা, দেখবে সাধকের শক্তি!
পরীক্ষিৎ ।। দেখাও...দেখাও তাপস বালক, শুধু মুখে আস্ফালন না করে সাধ্য থাকে বাধা দাও! দেখি তোমার তপস্যার ক্ষমতা!...
শৃঙ্গী ।। মরবি...মরবি তুই...আজ থেকে সাত দিনের দিন তক্ষকের কামড়ে মরবি...
পরীক্ষিৎ ।। (হা হা করে হেসে উঠে) ধন্য হলাম...প্রীত হলাম...কৃতার্ত হলাম বালক...
শৃঙ্গী ।। তক্ষক! বিষধর তক্ষক! কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না...
পরীক্ষিৎ ।। (সক্রোধে) তোর তক্ষক আমার পা অবধি পৌঁছতে পারবে?
শৃঙ্গী ।। ব্রহ্মতালুতে দংশন করবে...
পরীক্ষিৎ ।। ওরে, সে কি একটা তক্ষকের কর্ম!
শৃঙ্গী ।। একটা তক্ষক...সহস্র মুখ...সহস্র ফনা ধরে সহস্রবার তোকে দংশন করবে...সহস্রবার...
পরীক্ষিৎ ।। তা সহস্রমুখ হলেও লেজ তো তার একটাই থাকবে! তাতেই হবে...কি করে তোর তক্ষককে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
দেখাতে হয়...সে আমার জানা আছে..."[১৪]

শুধু তাই নয়, এরপর আমরা দেখব যে, শৃঙ্গীর শাপপ্রভাবে পিপাসায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষিৎ কিভাবে একফোঁটা জলও মুখে দিতে পারছেন না। এই ঘটনা মহাভারতে নেই। এগুলি নাট্যকারের অপূর্ব সঙ্গতি ও দক্ষতার ফল। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রবেশ করেছেন। তিনি জঙ্গলময় পরীক্ষিতকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দেখাও হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরিণ সম্পর্কে মন্ত্রীর কৌতূহল থাকলেও পরীক্ষিতের পক্ষে এখন সবকিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ তিনি ভয়ানক পিপাসার্ত। এখন শিবিরে ফেরা প্রয়োজন। কিন্তু মন্ত্রী জানিয়েছেন যে তিনিও পথ হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিকআছে তাহলে আগে জলের সন্ধান করা হোক। কারণ পথ রাজা তৈরী করে নিতে পারবেন, কিন্তু সর্বাগ্রে তৃষ্ণা মেটাতে হবে। চিন্তিত মন্ত্রী মাথা তুলতেই অদূরে একটি পূর্ণ সরোবর দেখতে পান। আমরা জানি ঐ সরোবরটি মহর্ষি শমীক তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করেছেন। যাইহোক, পূর্ণ সরোবর দেখে পরীক্ষিৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন –

> "এতো সরোবর নয় মন্ত্রীমশাই, সবুজ লতাপাতার ঘোমটায় যেন এক শান্ত কোমল কিশোরী আমারই জন্য অপেক্ষা করছে...বহু যুগ যুগান্ত ধরে...তার শ্যামল সঘন আঁখিপল্লব আমারই মুখের পানে আকুল হয়ে চেয়ে আছে।"[১৫]

কিন্তু যেমনি তিনি ঐ সরোবরে জল পান করতে গেছেন তখনি কোমল মসৃণ তৃণদলকে সর্পভ্রমে আর্তনাদ করে উঠেছেন। মন্ত্রী বারংবার তাঁকে বোঝালেও শৃঙ্গীর শাপপ্রভাবে তৃণদলকে তিনি তক্ষক রূপেই দেখতে পাচ্ছেন। বাতাসে দীর্ঘ ঘাসের ডগাগুলির জলে নুয়ে পড়াকে তাঁর তক্ষকের বিষাক্ত ছোবল বলেই মনে হয়েছে। তিনি ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছেন।

চতুর্থ দৃশ্যে আবার ঋষি অর্থাৎ শমীক ও শৃঙ্গীর কথোপকথন শুরু হয়েছে। রাজার জল খাওয়া হল না দেখে শৃঙ্গী অনুশোচনায় কাতর হয়ে উঠেছেন। শমীক তাঁর পুত্রকে ব্রহ্মশাপ ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। কিন্তু শৃঙ্গী জানিয়েছেন তা সম্ভব নয়। তার থেকে কিছু একটা ব্যবস্থা করা হোক। অন্ততঃ সর্পাঘাতে মৃত্যুর আগে পরীক্ষিৎ জল পান করুক। তাই শৃঙ্গী এবার পিতার কাছে একটা মায়াঝর্ণা সৃজনের আবেদন জানালেন এবং ঐ ঝর্ণা যেন রাজার পায়ের সামনে দিয়ে বয়ে যায়। মহর্ষির ইচ্ছায় তাই হল। পঞ্চম দৃশ্যে পায়ের সামনে ঝর্ণা দেখে রাজা প্রাণ গিরে পেলেন –

> "ওরে মূর্খ পাপিষ্ঠ দুরাচার! কোথায় ছিলি! জানিস না আমি তৃষ্ণার্ত! দাঁড়া! তোকে আমি শোষণ করব...নিঃশেষ করব...ধরিত্রীর বুক থেকে মুছে দেব তোর ধারাটি!"[১৬]

কিন্তু জল পান করতে গিয়ে ঝর্নাকে তাঁর মনে হয়েছে বাসুকি নাগ। যেন ছত্র মেলে ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে। মন্ত্রী জোর করে তরবারি দিয়ে হত্যার ভয় দেখিয়ে জলপান করাতে চাইলে তিনি মন্ত্রীকে ভুল বুঝেছেন। ব্রহ্মশাপে তিনি বিকারগ্রস্ত। পরীক্ষিতের মনে হয়েছে যে, মন্ত্রী রাজ্যের লোভে তাঁর সাথে চক্রান্ত করেছেন। তাই পরীক্ষিৎ এবারও জল পান করলেন না। উন্মাদের মতো ছুটে পালিয়ে গেলেন।

এরপর তন্ত্রিপালের সাথে রাজার দেখা হয়েছে। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তন্ত্রিপালকে একটি দিব্য রসালো ফল দিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষিতকে না খাইয়ে সে কিভাবে খাবে? পরীক্ষিৎ আনন্দে ফলটিকে দুভাগ করলেন দুজনে খাবেন বলে। কিন্তু ফলের টুকরোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দৃষ্টি পাল্টে যায়। এটা বিষফল নয় তো! এখানেও তিনি ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন –

> "প্রজারা সব জানে...শুধু রাজারা প্রজাদের মনের কথা জানতে পারে না। এই যে আমার মুকুট...সহস্র মণিমুক্তা খচিত-এর প্রত্যেকটির ওপর সহস্র লোভী চক্ষু বিঁধে আছে। রাজার শিরে সহস্র ফণা সে তো শুধু নাগনাগিনী তোলে না...তোলে সহস্র লোভী প্রজা..."।[১৭]

বিধাতা প্রদত্ত ফলটি মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নষ্ট করে দেন। তারপর তাঁর চেতনা ফেরে। তাঁর মনে হয়েছে, হয়তো ফলটি বিষাক্ত ছিল না, হয়তো তন্ত্রিপাল ও মন্ত্রী তাঁকে মারতে চান নি, হয়তো ঝর্নার ধারা ও সরোবরের সাপ সবই ভুল ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। মন্ত্রীকে জানালেন যে, শৃঙ্গীর দ্বারা তিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত। আজ থেকে সাত দিনে তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। তাই সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র তিনি তক্ষকের বিষাক্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছেন। এরপর তন্ত্রিপাল রাজাকে এক ভিন্ন দর্শনের সন্ধান দিয়েছেন। শুধু কি পরীক্ষিতকে? তন্ত্রিপালের এই দর্শন হাজার হাজার মৃত্যুগামী মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। একটু তুলে ধরা হল -

"তন্ত্রিপাল ।। ভয়! মৃত্যুভয়ে উন্মাদ হয়েছেন আপনি! (ক্রমশ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে) ব্রহ্মশাপ সত্য হ'লে মৃত্যু সে তো আসবে সপ্তম দিনে! তার ভয়ে আজই কেন মরবেন মহারাজ?

পরীক্ষিৎ ।। তন্ত্রিপাল!

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তন্ত্রিপাল ।। (গোঙাতে গোঙাতে) মৃত্যু...সে তো জীবনের পরিণতি! (থেমে) সেই তো মূর্খ, যে সেই পরিণতিকে মানে না – আবার সেই তো কাপুরুষ যে তার ভয়ে ভীত হয়! (থেমে) মহারাজ আপনি বীর, আপনি জ্ঞানী...ভেবে দেখুন, সপ্তম দিন কতো দূরে...

পরীক্ষিৎ ।। সপ্তম দিন...কতো দূরে...

তন্ত্রিপাল ।। অনেক দূরে! জীবনের একটা দিন একটা সমুদ্র! মৃত্যু তবে আজ হতে সপ্ত সমুদ্র দূরে! আজই কেন মরবেন...কেন হার মানবেন! এখনো তো সাতটা দিন। ....বাঁচুন...বাঁচুন... মহারাজ সাত দিনের প্রতি মুহূর্তে বাঁচুন... (তন্ত্রিপালের জ্ঞান লুপ্ত হয়)

পরীক্ষিৎ ।। তন্ত্রিপাল! তন্ত্রিপাল... (তন্ত্রিপালের মুখ নত হয়) ...

তন্ত্রিপাল ।। মরার আগে মরবেন না মহারাজ... সাতদিন অনেক সময়...অনেক...”।[১৮]

সত্যি কথা বলতে কি – নাট্যকারের এই অনুভূতি, প্রজ্ঞা ও দর্শনের কাছে আমদের মাথা নত হয়ে যায়। মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়। এই দর্শন কিন্তু মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনীতে নেই। তাই তো ‘তক্ষক’ নাট্যকার মনোজ মিত্রের একটি নতুন সৃষ্টি। মহাভারতে পরীক্ষিতকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি মাত্র স্তম্ভের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে। নানাবিধ ঔষধ, চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে। ৪২ তম অধ্যায়ের ২৯ ও ৩০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে -

“সংমন্ত্র্য মন্ত্রীভিশ্চৈব স তথা মন্ত্রতত্ত্ববিৎ।
প্রাসাদং কারয়ামাস একস্তম্ভং সুরক্ষিতম্।।
রক্ষাং চ বিদধে তত্র ভিষজশ্চৌষধানি চ।
ব্রাহ্মণান্মন্ত্রসিদ্ধাংশ্চ সর্বোত বৈ ন্যযোজয়ৎ।।”[১৯]

এমনকি মহর্ষি কাশ্যপ পরীক্ষিতকে রক্ষা করার জন্য এলে পথিমধ্যে তক্ষক তাঁকে আগলে ধরেন এবং বোঝান যে, পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে, তাঁকে বাঁচানো সম্ভব নয়। ফলে সাত দিনের দিনে তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছে। নাটকে পরীক্ষিতের মৃত্যু নেই। শেষ দৃশ্যে দেখতে পাচ্ছি যে, মহর্ষি শমীক পরীক্ষিতকে বাঁচাতে চাইলেও শৃঙ্গীই বারবার মৃত্যু হয়ে তাঁর সামনে প্রতিভাত হয়েছেন। এখানে পিতাপুত্র যথাক্রমে জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। শৃঙ্গী নিজেই বলেছেন –

“আমি সেই তক্ষক! (হা হা করে হাসে) তুমি জীবন...তুমি স্থিতি! আমি তক্ষক...আমি মরণ! মহাপ্রলয়![২০]

কিন্তু শেষপর্যন্ত শৃঙ্গী অবিচল থাকতে পারেন নি। পরীক্ষিতের সামনে গিয়ে তাঁর দু'হাত ধরে বলেছেন - ‘ব্রহ্মশাপ আমি তুলে নেবো পরীক্ষিৎ’। সেই অভিশাপ বর্তাবে তাঁর নিজেরই উপর। রাজা বেঁচে থাকবেন, তিনি মরবেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ মৃত্যুকে জয় করে নিয়েছেন। আজ আর মরতে তিনি ভয় পান না। শৃঙ্গীকে তাই বলেছেন –

“মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা যায় না...প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আঘাত করে তাকে পরাজিত করে তবেই না জীবনকে ভোগ করা যায়...এতো আজ তোমার কল্যাণেই শিখেছি শৃঙ্গী...”।[২১]

তাই সপ্তদিনের দিন যেন সহস্র ফণায়, ভয়ংকর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে মৃত্যু তাঁকে দেখা দেয়। বাকসিদ্ধ বালকের বাণী সত্য হোক এই তিনি চান। অবশেষে শৃঙ্গী পরীক্ষিতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ঋষি বলেছেন, পরীক্ষিতের পায়ের কাছে মৃত্যু আজ ক্ষমা চাইছে, মৃত্যু হার মেনেছে তাঁর কাছে। তাই পরীক্ষিতের কাছে মৃত্যু ভয় বা লজ্জা কিছুই নয়। সপ্তম দিনে তিনি মরবেন। কিন্তু দিন সপ্তম সমুদ্র দূরে। তার আগে ছয় দিন তিনি বাঁচবেন এবং বিরাট হয়ে বাঁচবেন।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মনোজ মিত্র ‘তক্ষক’ নাটকের পটভূমিটি মহাভারত থেকে সংগ্রহ করলেও সর্বত্রই তাঁর মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। নতুন চরিত্র নির্মাণে, সংলাপ সৃজনে, জীবনদর্শনে এ নাটক এক নতুন সৃষ্টি। মহাভারতের পরীক্ষিৎ-কাহিনীকে তিনি জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে পরিণত করেছেন এবং জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন। এই নাটক আমাদের

ভাবায়, বিস্মিত করে এবং বেঁচে থাকার মনোবলকে দৃঢ় করে। মহাভারতের এই কাহিনী এক নতুন রূপে, নতুন ভাবে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। তাইতো 'তক্ষক' নাটক পরীক্ষিৎ-কাহিনীর এক বিনির্মাণ হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৬, পৃ. ৫৩-৫৭
২. তদেব, পৃ. ৫৩
৩. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪১৯
৪. https//sanskritdocuments.org>mbhk
৫. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪২০
৬. তদেব, পৃ. ৪২০
৭. https//sanskritdocuments.org>mbhk
৮. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪২২
৯. তদেব, পৃ. ৪২৪
১০. তদেব, পৃ. ৪২৫
১১. https//sanskritdocuments.org>mbhk
১২. তদেব
১৩. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৬, পৃ. ৫৪
১৪. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪২৪
১৫. তদেব, পৃ. ৪২৮
১৬. তদেব, পৃ. ৪৩১
১৭. তদেব, পৃ. ৪৩৩
১৮. তদেব, পৃ. ৪৩৫
১৯. https//sanskritdocuments.org>mbhk
২০. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪৩৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 575 - 585
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রূপকের অন্তরালে তৎকালীন ভারতবর্ষের বাস্তব চিত্র : মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’

ড. মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপক
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা
Email ID : mousumipal1971@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Mythology, British imperialism, Tyranny, Social reform, Political struggle, Civil disobedience movement, Rule, Exploitation, Allegorical play,

Abstract

Playwright Manmatha Roy wrote the play 'Karagar' based on the story of the Srimadbhagavatam. After taking away the scepter and crown from the hands of the Yadavas' king, Surasena, the chieftain Ugrasena became the king of Mathura. From then on, the oppression of Ugrasena's son Kangsa and his followers began on the conquered Yadava's. When Kangsa himself ascended the throne of Mathura after imprisoning his father Ugrasena, the level of oppression by him and his followers increased. At the fervent prayers of the humiliated Yadava's, the savior, Lord Krishna, was born in the prison of the miscreants. He was born to destroy the Arati, to establish religion in a world flooded with irreligiousness, to destroy the demon Kangsa and establish peace on earth.

When the play ‘Karagar’ was written, Mahatma Gandhi had broken the salt law and spread the freedom movement across the country to gain complete freedom. Starting from Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, many leaders of the country, were imprisoned. Sometime before that, there was a social reform movement in North Bengal. Therefore, the playwright Manmatha Roy, who was aware of life and the world, did not directly attack the British power, but wrote the play ‘Karagar’ by combining the mythological story of the slaughter of Kangsa with the idea of saving kidnapped women and other welfare ideals.

Karagar' is a metaphorical play. In this play, the playwright talks about national social reform and political struggle under the guise of mythological words. In the play, the tyrant Bhojpati Kangsa represents the imperialist tyrannical British royal power. The Yadavas defeated by the Bhojapati Ugrasena and his son Kangsa are actually the Indians defeated by the british. The servants of the British government, who are devotees and supporters of British imperialism, appear in the play as the slave Yadavs, such as Vidurath, who are greedy for the feet of the conquering lord. In the play, the tyranny of the Bhojaraja Kangsa is actually the tyranny of the Indian subjects by the imperialist British rulers. Their rule is nothing but exploitation in the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

name of rule. Through the abduction of some inhuman Yadav youths, such as the Yadav young woman Chandana, by the inhuman followers of Kangsa, the playwright wants to present a sad picture of the abduction and rape of Indian women by some drunken English servants or miscreants before the audience.

The reason for the playwright Manmath Roy to adopt this metaphorical disguise in the play 'Karagar' is to avoid royal anger. In subjugated India, speaking against the powerful royal power is tantamount to treason. The patriotic playwright knows this very well. A mythological environment has been created in the play 'Karagar'. The playwright talks about national social reform and political struggle under the guise of mythological words. Kangsa's prison is a symbol of the British's crushing machine, the prison in India. The playwright has used the form of Kangsa's prison to highlight the real problems of India at that time.

Discussion

নাট্যকার মন্মথ রায় শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনীকে অবলম্বন করে 'কারাগার' নাটক রচনা করেন। যাদবদের রাজা শূরসেনের হাত থেকে রাজদণ্ড ও রাজমুকুট কেড়ে নিয়ে ভোজপতি উগ্রসেন হলেন মথুরার রাজা। সেই থেকে বিজিত যাদবদের উপর আরম্ভ হল উগ্রসেনের পুত্র কংস ও তার অনুচরদের অত্যাচার। পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে যখন কংস নিজে মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তার এবং তার অনুচরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। লাঞ্ছিত যাদবগণের আকুল প্রার্থনায় পরিত্রাতা ভগবান দুর্বৃত্তের কারাগারে জন্ম নিলেন। জন্ম নিলেন অরাতি নিধনের জন্য, অধর্মপ্লাবিত পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপনের জন্য, দানব কংসকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য। এটিই 'কারাগার' নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

'কারাগার' নাটকে নাট্যকার পৌরাণিক কথার আবরণে জাতীয় সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাই বলেছেন। সেটাই নাটকের রূপক অর্থ। নাটকে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে অত্যাচারী ভোজপতি কংস। ভোজপতি উগ্রসেন ও তার পুত্র কংসের কাছে পরাজিত যাদবগণ আসলে ইংরেজের কাছে পরাজিত ভারতবাসীগণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত ও সমর্থক দাসভাবাপন্ন ইংরেজ সরকারের কর্মচারীরা নাটকে বিজেতা প্রভুর পদলোভী বিদূরথ প্রভৃতি ক্রীতদাস যাদব হয়ে দেখা দিয়েছে। নাটকে ভোজরাজ কংসের অত্যাচার আসলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ভারতীয় প্রজাদের উপর অত্যাচার। তাদের শাসন শাসনের নামে শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচক বলেছেন –

> "মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটিতে পৌরাণিক বাতাবরণে ইংরেজ শাসকের দমন পীড়ণের ছবি আঁকা হয়েছে।"[১]

কংসের অনুচর অমানুষ কয়েকজন যাদব তরুণদের যাদব তরুণী চন্দনা প্রভৃতি নারীনিগ্রহের মাধ্যমে নাট্যকার কয়েকজন মদ্যপ ইংরেজ কর্মচারী বা দুর্বৃত্তের দ্বারা ভারতীয় নারীহরণ ও ধর্ষণের গ্লানিকর চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন দর্শকদের সামনে।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক যখন রচিত হয়, তখন মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সারাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী ও জহরলাল নেহেরু থেকে আরম্ভ করে দেশের ছোট বড় বহু নেতা কারাগারে বন্দী। তার কিছু আগে উত্তরবঙ্গে সমাজসংস্কার আন্দোলন হয়েছে। কাজেই জীবন ও জগত সচেতন নাট্যকার মন্মথ রায় সরাসরি ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ না করে পৌরাণিক কংস বধ কাহিনীর সঙ্গে অপহৃত নারীউদ্ধার প্রভৃতি জনকল্যাণকর আদর্শ মিলিয়ে 'কারাগার' নাটক লিখেছেন।

'কারাগার' নাটকে কংসের শালগ্রাম পূজা নিষেধ করা, নিজের পূজা প্রবর্তনের মাধ্যমে সাকার মূর্তিপূজা বিরোধী রাজশক্তি প্রশ্রয়পুষ্ট কয়েকজন খৃষ্টভক্ত পাদ্রীর দ্বারা হিন্দুদের সাকার পূজার নিন্দা, বিরুদ্ধাচরণ, দেবমূর্তিভঙ্গ, খ্রীস্টপূজা প্রবর্তন, ভারতীয়দের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ এবং দেবভক্তির স্থানে ব্যাপক মদ্যপানাসক্তি শেখানোর চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উঠেছে। ইংরেজ শাসকের দ্বারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে নিক্ষেপ করার চিত্রকে নাট্যকার মন্মথ রায় পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে অর্থাৎ কংসের বিরোধী দেবকী, বসুদেব, কঙ্কা, কঙ্কণ প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী যাদব পুরুষ রমণীদের কারাগারে নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন নাটকে।

পরাজিত যাদবদের অস্ত্রধারণে অনধিকারের মাধ্যমে ইংরেজ আমলে সব ভারতবাসীদের সৈন্যদলে ভর্তি না করার চিত্রটি ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের চিত্রটি নাটকে যাদবদের অস্ত্র ত্যাগ করে কংসের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর কংসের কারাগার মূলত ভারতে ইংরেজদের কারাগার ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচক লিখেছেন -

> "অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করে নাট্যকার মন্মথ রায়কে তাদের জন্য একটি নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করে। তখন দেশ জুড়ে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন। সমকালীন দেশ কালের এই উন্মাদনাময় ঘটনার প্রভাব পড়েছিল মন্মথের উপর। 'কারাগার' নাটকের পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে নাট্যকার তাই তুলে ধরেছেন সমকালের ছবি।"[২]

'কারাগার' নাটকে নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই রূপকের ছদ্মবেশ নেওয়ার কারণ রাজরোষ এড়িয়ে চলা। পরাধীন ভারতে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা রাজদ্রোহিতার নামান্তর। স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার তা ভালোভাবেই জানেন। তাই তিনি পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য শক্তিসঞ্চারে সচেষ্ট ছিলেন। 'কারাগার' নাটকে এক পৌরাণিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। পৌরাণিক কথার আবরণে জাতীয় সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাই বলেছেন নাট্যকার। কংসের কারাগার ভারতে ব্রিটিশদের পেষণযন্ত্র কারাগারের প্রতীক। তাই কংসের কারাগারের রূপকে নাট্যকার তৎকালীন ভারতবর্ষের বাস্তব সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন।

'কারাগার' নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা লবণ আইনভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলন এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত উত্তরবঙ্গে সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ। ভারতের স্বাধীনতা লাভ জাতির লক্ষ্য। এজন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ১২ই মার্চ ১৯৩০ সালে সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে যাত্রা করে ২৪ দিনে ৩৮৪ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পশ্চিমে সমুদ্রতীরে ডান্ডি নামক স্থানে পৌঁছে লবণ আইন ভেঙ্গে সত্যাগ্রহ করেন। ১৯৩০ সালের ৫ই মে তিনি বন্দি হন। প্রতিবাদে সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছোট বড় বহু নেতা মহাত্মাজীর সঙ্গে জেলে যান। এই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে তার সঙ্গে সমাজ সংস্কারের আদর্শ মিশিয়ে নাট্যকার ১২ই আগস্ট থেকে ২৫শে আগস্ট ১৯৩০ মাত্র ১৪ দিনে 'কারাগার' নাটক রচনা করেন।

নাট্যকার সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আক্রমণ না করে পৌরাণিক কৃষ্ণের জন্ম ও অত্যাচারী কংসবধ কাহিনী রূপকে সেই অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। যেহেতু রূপকের দুটি রূপই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'কারাগার' নাটকে দুটি কাহিনী সমান মর্যাদা লাভ করেছে। একদিকে আছে কংসের অত্যাচার, যাদবদের অত্যাচারিত হওয়া এবং এর প্রতিবিধানের জন্য কংসের জন্ম। যিনি দুষ্টের দমন সৃষ্টির পালনের জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। এটি রূপকের স্পষ্টার্থ। এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে আরেকটি কাহিনী যা অত্যন্ত বাস্তব। এটি পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। এর মধ্যে আছে ব্রিটিশদের অত্যাচার, ভারতবাসীদের অত্যাচারিত হওয়া এবং এর সমাধানের জন্য মহাত্মাজী প্রভৃতি নেতার আবির্ভাব। যারা পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। রূপকে যেহেতু রহস্যের সমাধান সম্ভব, তাই 'কারাগার' এ সেটি হয়েছিল। মন্মথ রায় সরাসরি ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ না করলেও কারাগারের অভিপ্রায় তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই ইংরেজ সরকার দ্বারা সেটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সে হিসেবে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানমূলক নাটকের পাশাপাশি এটিকে রূপক নাটকেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রথাসিদ্ধ পথে জনমানসে ধর্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকের নাম পৌরাণিক নাটক। এরূপ নাটকে দ্বন্দ্ব, জটিল মনস্তত্ত্ব ও বাস্তব জীবন সমস্যার চিত্রণের চেয়ে সুনীতি, দুর্নীতি, পাপ, পুণ্যফল ও ঐশ্বর্য

মহিমার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বর্ণনা করে দর্শকচিত্তে ভক্তিভাব উদ্রেক করাই নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য। বাস্তব জীবনের জটিল সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় এই জাতীয় নাটকে তেমন থাকে না। এদিক থেকে বিচার করলে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটককে প্রকৃত পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। বরং পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানমূলক নাটক বলাই শ্রেয়।

'কারাগার' নাটকে একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। এই কাহিনীতে আছে কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। দানব দ্রমিলের ঔরসে মানবী মাতার গর্ভে তার জন্ম হয়। কংস পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হন। শেষে তাকে কারারুদ্ধ করেন। কংস তার প্রিয়তমা বোনের বিয়ের পর তার স্বামী বসুদেবসহ যখন রথে করে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই দৈববাণী হল –

"ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন!"[৩]

দৈববাণী শুনে কংস তার বোনকে খড়গাঘাতে হত্যা করতে উদ্যত হলে বসুদেব তার উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জন্ম হওয়া মাত্র দেবকীর সন্তানকে কংসের হাতে তুলে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তাতে কংস শান্ত হন। নাটকে আছে বসুদেব কংসের নিকট এই অঙ্গীকার গোপনে করেন। এই সম্পর্কে দেবকী কিছু জানতেন না।

কংস দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে। বসুদেব জন্মমাত্র শিশুকে কংসের হাতে তুলে দেন। কংস তাকে বধ করে। কারাগারে কীর্তিমানসহ সাতটি শিশুকে হত্যা করে কংস এবং গুপ্তচর দ্বারা রাজ্যের সব শিশুকেও বধ করে সে। বসুদেব অষ্টম সন্তান কৃষ্ণকে ব্রজে নন্দালয়ে রেখে যশোদার কন্যাকে নিয়ে এসে কংসকে বধ করতে দিয়েছে। কংস তাকে বধ করার জন্য মাটিতে ছুঁড়ে মারতেই তিনি অষ্টভূজা হয়ে আকাশে উঠে ভবিষ্যৎবাণী করেন–

"তোমাকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"[৪]

গীতা থেকে ভগবানের আবির্ভাবসূচক শ্লোক উদ্ধৃতও করেছেন নাটকে নাট্যকার মন্মথ রায় -

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"[৫]

কৃষ্ণের জন্মবর্ণনায়ও নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। নিরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি। ঝড়, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রনাদ হচ্ছে। এর মধ্যেই কৃষ্ণের জন্ম। বসুদেব সদ্যোজাত শিশু কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে চলেছেন নন্দালয়ে। বাসুকি নাগ ফণা বিস্তার করে ছত্র ধরেছে কৃষ্ণের উপর। এভাবে 'কারাগার' নাটকে পৌরাণিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে নাট্যকারের মূল লক্ষ্য নষ্ট হয়নি। পৌরাণিক কথার আবরণে জাতীয় সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাই তিনি বলেছেন। নাট্যকার এখানে ভাগবতাদি বৈষ্ণব পুরাণ থেকে বিভিন্ন চরিত্রগুলি নিয়েছেন। যেমন– কংস, উগ্রসেন, দেবকী, বসুদেব, যোগমায়া, ধরিত্রী, বিদূরথ, অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত, কীর্তিমান ও দ্রমিল।

এই নাটক যখন রচিত হয় পরাধীন ভারতবর্ষে তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। আইন অমান্য করে দেশের কোটি কোটি লোক বিদেশী রাজের কারাবরণ করছে। কারাগারে স্থান সংকলনের অভাব দেখা দিল। বিদেশি রাজের কারাগার স্বদেশী প্রেমিকদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো। পরাধীন জাতির পুঞ্জীভূত বেদনা এবং ক্ষোভে জন্ম লাভ করল নতুন শক্তি। আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠল। তৎকালীন এই অবস্থার বাস্তব রূপায়ণ 'কারাগার' নাটকে ঘটেছিল বলে এই নাটকটি জাতির মর্ম স্পর্শ করেছিল। 'কারাগার'এর জনপ্রিয়তায় বিদেশি শক্তির ভিত তলে গিয়েছিল। সেজন্য রাজরোষে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। কারাগার নাটকটির নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল –

> "কারাগার একখানি পৌরাণিক নাটক, দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা কংসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন? অথবা দ্বাপর যুগের কারাগারের সঙ্গে এই কলিযুগের 'কারাগারে'র সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠেছেন উঠিয়াছেন?"[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাট্যকার সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচারের রূপ তুলে ধরার জন্য অত্যাচারী ভোজপতি কংসের রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। ইংরেজের কাছে পরাজিত ভারতবর্ষের চিত্র উপস্থাপিত করার জন্য নাট্যকার ভোজপতি উগ্রসেন ও তার পুত্র কংসের কাছে পরাজিত যাদবগণের চিত্র এঁকেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত ও সমর্থক দাসভাবাপন্ন ইংরেজ সরকারের কর্মচারীদের শ্লেষ ও বিদ্রূপ জানাতে তিনি বিজেতা প্রভুর পদলোভী বিদূরথ প্রভৃতি ক্রীতদাস যাদবদের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ভোজরাজ কংসের অত্যাচারের মাধ্যমে নাট্যকার পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ভারতীয় প্রজাদের উপর অত্যাচার ও শাসনের নামে শোষণের চিত্র এঁকেছেন।

চন্দনা, কঙ্কা, অঞ্জনা প্রভৃতি নারীচরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী রমণীদের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। সেজন্য কংসের প্রাসাদে বন্দী থেকেও চন্দনা শুদ্ধশীলা ও স্বাধীন। কোনো কিছুকে সে তোয়াক্কা করে না, ভয় করে না। সে বন্দী থেকেও কারোর অধীন নয়। কংসের দাস সেনাপতি বিদূরথের পত্নী অঞ্জনাও স্বাধীনতাকামী। শিশুপুত্র রঞ্জনের মৃত্যুর বেদনাকে এই নারী নীরবে সহ্য করেছে। নিজ পুত্রের মৃতদেহ কোলে করে সে প্রাণত্যাগ করেছে। তবু স্বাধীনতার বিনিময়ে সে দাসত্ববরণ করেনি। স্বাধীনতা তার কাছে প্রাণের চেয়েও বড়।

নাটকের স্বাধীনতাকামী আরেকটি নারীচরিত্র কঙ্কা বুঝতে পেরেছে যে পরাধীনতার ফলেই যাদব বিদূরথ মনুষ্যত্ব হারিয়ে কংসদাস হয়েছে। কঙ্কার ভাবী স্বামী বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই নারী তার দাম্পত্য সুখ বিসর্জন দিয়েছে। ঘাতকরা তাকে কারাগারে জল খেতে দেয়নি, তার আঙ্গুল কেটে নিয়েছে। তবু সে দাসত্ব বরণ করেনি। নিজেই নিজের আঙ্গুল স্বেচ্ছায় কেটে দিয়ে বলেছে, দেশের মুক্তির জন্য স্বামীকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত সে। স্বামী কঙ্কণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে সে শৃংখলমুক্তির গান গেয়েছে -

“আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ বরাবর।
পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল, তালে তালে তারি আমরা গাই।”[৭]

এই বীরাঙ্গনার চিত্রটি স্বদেশী আন্দোলনের নারী বিপ্লবীদের প্রতিচ্ছবি।

দেশপ্রেমী নাট্যকার জানেন, আমাদের সমাজজীবনের ভিত্তি নারী। তাই তিনি তাঁর নাটকে বিশেষত ‘কারাগার’ নাটকে স্বদেশপ্রেমী নারী চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে জনজাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। নারী যে জনজাগরণ ঘটাতে পারে একথা দেবকীও বলেছেন –

> “আমি মা। ...নিদ্রিত সন্তানকে জাগ্রত করতে মা যেমন জানে আর কেউ জানে না। সশস্ত্র যখন সশস্ত্রের উপর অত্যাচার করে ভগবান তখন জাগেন না; ভগবান জাগেন তখন, যখন সশস্ত্র নিরস্ত্রের উপর অত্যাচার করে।”[৮]

এভাবে দেশপ্রেমী নারীচরিত্র সৃষ্টি করে স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার জনজাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন।

নাটকে বসুদেবের দ্বারা আত্মশক্তিতে রাজমুকুট উদ্ধার করার যে বাসনা এর মাধ্যমেও পরাধীন জাতির ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা এনে দেবার বাসনা ব্যক্ত করা হয়েছে। কংসের শিশুহত্যার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকের দ্বারা দেশপ্রেমিক যুবকযুবতীদের হত্যার দৃশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কংসবিরোধী দেবকী, বসুদেব, কঙ্কা, কঙ্কণ প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী যাদব পুরুষ-রমণীদের কারাগারে বন্দী করার মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকের দ্বারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে নিক্ষেপ করার কথাই নাট্যকার বলতে চেয়েছেন। যাদবদের অস্ত্রত্যাগ করে কংসের বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের কথাই বলা হয়েছে। কংসের কারাগার যে ব্রিটিশদের কারাগারের প্রতীক একথা নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ রাজরোষের ভয়ে স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার মন্মথ রায় পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের চিত্রই তাঁর ‘কারাগার’ নাটকে তুলে ধরেছেন। সমালোচক বলেছেন –

> “পুরাণের ছদ্ম আবরণে রচিত ‘কারাগার’ নাটকটিতে স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছিল বলেই ‘কারাগার’ নাটকটির উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ এসে পড়ে।”[৯]

নাট্যকার সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আক্রমণ না করে পৌরাণিক কৃষ্ণজন্ম ও অত্যাচারী কংস বধ কাহিনীর সঙ্গে অপহৃতা নারীউদ্ধার প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক জনহিতকর আদর্শ মিশিয়ে 'কারাগার' নাটক রচনা করেন। নাটকে সমাজ সংস্কার ও রাজনীতির দুটি ধারা মিশে নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। এই নাটকে দেখানো হয়েছে দুটি কারাগার - একটি পাষাণ ঘর অপরটি লৌহ কারাগার। পাষাণ ঘরের আলোবাতাসহীন পরিবেশে কংসবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদব তরুণ কঙ্কণের পত্নী কঙ্কা, কঙ্কণের মা অঞ্জনা এবং তার শিশুপুত্র রঞ্জনের ক্ষুধা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করতে হয়। কংসের চরদের অস্ত্রাঘাতে কঙ্কণের মৃত্যু কারাগারের সামনেই হয়। এই পাষাণঘরেই যাদবদের উপাস্য নারায়ণমূর্তি বন্দী ছিল।

লৌহ কারাগারে বন্দী ছিলেন দেবকী ও বসুদেব। এখানেই তাদের শিশু পুত্রদের একে একে হত্যা করে অত্যাচারী কংস। কৃষ্ণের জন্মও এই লৌহ কারাগারেই। কারাবন্দীদের দুঃসহ বেদনায় সাড়া দিয়েই বিপদবরণ নারায়ণ জন্ম নেন কারাগারে দুষ্টের দমন ও সৃষ্টের পালনের জন্য। দুর্বৃত্ত কংসচরগণের দ্বারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কংসের ভোগের জন্য অপহৃতা শুদ্ধশীলা চন্দনা নিজ দিব্য মনোবলে সতীধর্ম রক্ষা করে কংসের প্রাসাদে ও প্রমোদবনে বন্দী জীবনের মর্মবেদনা অনুভব করেছে। কাজেই কংসের প্রাসাদ ও প্রমোদবন ধর্মপ্রাণা চন্দনার কাছে কারাগার স্বরূপ। যে সমাজে নারী ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা, তা দেখেও পুরুষেরা বিশেষত সমাজপতিরা নিষ্ক্রিয়, নির্মম, উদাসীন, নারীর অসম্মান দূর করতে অসমর্থ সে অধঃপতিত সমাজও কারাগার স্বরূপ। তাই অমানুষদের সমাজরূপ কারাগার ভাঙ্গার জন্য চন্দনা আগুন লাগিয়েছিল যাদবপল্লীতে। আর কংসের পিতা উগ্রসেন, কংস ও তার অনুচরদের অত্যাচারের নিন্দা করার বলে স্বগৃহে বন্দী।

'কারাগার' নাটকে কেবল যাদবেরা বন্দী নয়, বন্দী তাদের উপাস্য নারায়ণ মূর্তিও। তাই কারাগার পবিত্র তীর্থ - ভূস্বর্গ। এই কারাগারের মহিমা কীর্তন করে দেবকী বলেছেন –

> "কারাগারে আজ দেশের যত ধর্মাত্মা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা - কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন - কারাগার আজ পুণ্যতীর্থ, কারাগার আজ স্বর্গ।"[১০]

'কারাগার' নাটকে মূল কাহিনীও কারাগারকে ঘিরে সংগঠিত হয়েছে। ব্রিটিশদের কারাগারকে সামনে রেখে নাট্যকার তাঁর নাটকের কারাগারের কথা বলেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বইছিল। নিজ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য দলে দলে তরুণ-তরুণীরা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। ব্রিটিশদের বিরোধিতা করে ব্রিটিশদের তৈরি কারাগারকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে লাগলো স্বদেশী আন্দোলনকারীরা। দেশের এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে মন্মথ রায় রূপকের আশ্রয়ের রচনা করলেন তাঁর 'কারাগার' নাটক। এখানে কংস ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক আর আন্দোলনকারীদের প্রতীক হিসেবে এসেছে চন্দনা, কঙ্কণ, কঙ্কা, অঞ্জনা, দেবকী, বসুদেব ইত্যাদি চরিত্র। স্বাধীনতাকামী যাদব পুরুষদের কারাগারে বন্দি করার দৃশ্যের মাধ্যমে আসলে ইংরেজ শাসকের দ্বারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে প্রেরণের চিত্রই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। নাট্যকার কংসের কারাগার বলতে ভারতে ইংরেজদের কারাগারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিশেষত ইংরেজদের কারাগারের দৃশ্য পাঠক দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল এবং নাট্যকার কংসের কারাগারের রূপকে এই উদ্দেশ্য লাভে সিদ্ধ হয়েছেন ও কারাগারের পটভূমিকাতেই সমস্ত নাটকের কাহিনী, চরিত্র, ট্র্যাজেডি আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে।

কংস শুধু মূল মহাভারতেই নয়, এই 'কারাগার' নাটকে একটি বিশিষ্ট ভিলেন চরিত্র হয়ে উঠেছে। কংস ভোজপতি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। মানবী মাতার গর্ভে দ্রমিলের ঔরসে তার জন্ম। তাই কংস চরিত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ দানবিক ও মানবিক ভাবের সমাবেশ ঘটেছে। দানব কংস নাস্তিক, দেবদ্বেষী, কাম-ক্রোধে আসক্ত, মদ্যপ ও হিংস্র এবং অত্যন্ত নির্দয়, জিঘাংসু। সে দয়া, ধর্ম, জ্ঞানহীন।

কংস আত্মভোগের জন্য বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে রাজা হয়েছে। ভগিনী ও ভগিনীপতি বসুদেবকে সানুচর লৌহ কারাগারে বন্দী করে জিঘাংসা চরিতার্থ করেছে। এমনকি দেবদ্বেষী হয়ে দেবমূর্তিকে পাষাণঘরে আবদ্ধ করেছে। তার কামনা লালসা তৃপ্তির জন্য নিষ্পাপ অবলা চন্দনাকে হরণ করে এনে নিজ নীচবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। সে এতই নিষ্ঠুর যে শিশুহত্যা করতেও তার দ্বিধা নেই। চন্দনার সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে কংস নিজের পরিচয় সম্পর্কে নিজেই বলেছে –

"শুনেছ আমি শয়তান, আমি দানব, আমি রাক্ষস - আরো কত কি। এও হয়তো শুনেছ - আমি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, আমি মাতার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাথরের উপর আছড়ে মেরেছি, আমি মানুষের তাজা রক্ত পান করি...।"[১১]

আবার মানবী মায়ের সন্তান হিসেবে কংসের বক্তব্য মানবিক হয়েও নাটকে দেখা দেয় –

"যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালোবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে।"[১২]

চন্দনা সম্পর্কে কংসের এই উক্তি তার মানবিকতারই পরিচয় জানান দেয়।

শক্তিস্বরূপিণী চন্দনা চরিত্রের দিব্যভাবে, যখন তার দানবতার স্থানে মানবতা জাগতে থাকে, তখন দেখা যায় তার আত্মদ্বন্দ্বের চরম বিক্ষোভ। সে চন্দনার দেবপূজার আয়োজন করে, চন্দনার আরতি দেখে তাকে নারায়ণ পূজা করতে বলে। চন্দনার চরিত্রের প্রভাবে কংসের চরিত্রে আসে পরিবর্তন –

"আমি আজ ধন্য! আমি আজ ধন্য! আজ আমি জয়ী - পরমজয়ী। দেবতাকে পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমি লাভ করেছি।"[১৩]

কংস তাই রাতে নিদ্রার ঘোরে দেবকীর বুকে নারায়ণের ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে আর্তনাদ করে জেগে উঠে ছোটাছুটি করে। আবার স্বপ্ন দেখে অন্ধকার কারাগারে বন্দিদের জল ও খাদ্যাভাবে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। শিশু রঞ্জনের মৃত্যুর শোচনীয় দৃশ্য দেখে কংস আতঙ্কিত হয়। ক্ষুৎপিপাসায় বন্দিদের উচ্চ আর্তনাদ শুনে আতঙ্কে জেগে উঠে। তার মনুষ্যত্ব জেগে উঠেছে। তাই সে এই নির্মম নির্যাতনের জন্য নিজেকেই দায়ী করে ক্ষোভে, দুঃখে, মর্মবেদনায় ও লজ্জায় জর্জরিত হয়। কংস রঞ্জনের মৃতদেহ আঁকড়ে তার মা অঞ্জনাকে পড়ে থাকতে স্বপ্নে দেখে। এই মর্মন্তুদ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে কংস। এভাবে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়। নাটকে কংসের এই আত্মদ্বন্দ্বের চিত্রটি করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

নিজের জন্মরহস্য সম্পর্কে কংসের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই –

"আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র...দানব দ্রমিলের ঔরসজাত পুত্র। মানবী মাতার গর্ভে দানবের ঔরসে আমার জন্ম-মানব-দেহধারী হলেও আমি দানব।"[১৪]

কংস যে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর সে সম্পর্কে সে নিজেও জানে। সে তার দানবসত্তা দিয়ে দৈববাণীকে ব্যর্থ করতে চায়, দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করতে চায় –

"আমি অতিমানব অথবা দানব। যে দুঃস্বপ্ন মানুষকে বিধ্বস্ত করে, আমি সেই দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করি - ঐখানেই আমার আনন্দ এবং ঐখানেই আমার উল্লাস।"[১৫]

মানুষকে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে পৈশাচিক উল্লাস কংসের। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিতা উগ্রসেনের পূজিত শালগ্রাম শিলা হাতে নিয়ে ভাঙতে চেয়েও ভয়ে ভাঙতে পারে না কংস। শেষে তা ফিরিয়ে দেয় পিতাকে। এখানেই দানবতার উপর মানবতার ক্ষণিক জয় ঘোষিত হয়।

অত্যাচার যত বাড়ে কংসের দুর্বলতাও তত বাড়ে। কিন্তু কংস ধরা দিতে চায় না –

"আমার আত্মবিশ্বাস পর্বতের মতোই অটল।"[১৬]

কংস নিজেকে নিষ্ঠুর নির্মম দানব বলে ভাবতে পারে। কিন্তু সে তার মধ্য থেকে যে ধীরে ধীরে দেববিদ্বেষ লোপ পাচ্ছে কিংবা তার দানবসত্তা লুপ্ত হয়ে তার মধ্যে মানব সত্তা প্রকটিত হচ্ছে একথা ভাবতে পারে না। কংস নিজেকে নির্মম দানব বা অতিমানব বলে পরিচয় দিতে পিছপা নয়। কিন্তু তার অত্যাচারী রূপের মধ্যে যে ধীরে ধীরে দুর্বলতা প্রবেশ করছে একথা সে মানতে রাজি নয় –

"আমি দুর্বল, মিথ্যা কথা, মুহূর্তের তরেও আমি এতটুকু দুর্বল নই! আমি নির্মম - আমি নিষ্ঠুর - আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই, আমি দুর্নিবার শয়তান।"[১৭]

কিন্তু কংস চরিত্রে চন্দনা চরিত্রের প্রভাবে ঘটে গেছে আমুল পরিবর্তন। তাই রাতের অন্ধকারে গোপনে চোরের মত চুপিচুপি এসে বোন দেবকীর পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায় কংস। নাটকের শেষাংশে আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত ও বিধ্বস্ত কংস।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই সে কারাগারে এসে বসুদেবকে বলে কারাগারের দ্বার খুলে দিতে। যেন কেউ না দেখে তার অনুশোচনা, তার মর্মবেদনা। বসুদেব একে অভিনয় মনে করলে কংসের উক্তি আমাদের মর্মকে বিদ্ধ করে –

> "অভিনয় নয়! অভিনয় নয়! বিশ্বাস কর বসুদেব - আমি ঘুমুতেও পারিনে। চোখ বুজলেই দেখি তোমার সাত-সাত পুত্রের ছিন্নশিরের উচ্ছ্বসিত রক্তধারা আমার চোখে মুখে সর্বাঙ্গে ছিটকে এসে পড়ছে।"[১৮]

কংস যদিও তা সহ্য করতে পারে, কিন্তু সহ্য করতে পারে না যখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শোকাতুরা বিষাদের প্রতিমূর্তি তার আদরিণী বোন দেবকীর মুখখানি। কংসের আরো অসহ্য মনে হয় যখন সে দেখে এত অত্যাচারের পরও দেবকী শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলে, কংসের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় না, কংসকে অভিশাপ দেয় না।

'কারাগার' নাটকের মূল বক্তব্যকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। এক, অত্যাচারী ভোজরাজত্বের অবসান ও হস্তচ্যুত যাদব রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দুই, কংসের দানবতা ও দেববিদ্বেষের মানবতা ও দেববিশ্বাসে পরিণতি। তিন, অপহৃতা নারীর লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য সমাজের মধ্যে চেতনা সঞ্চার। এই তিনটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণশক্তি বসুদেব চরিত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। তাই 'কারাগার' নাটকের নায়ক বসুদেব। সমালোচকের ভাষায় –

> "কারাগার কাহিনীর যে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ - অত্যাচারী রাজা কংস ও বসুদেবের নেতৃত্বে পরিচালিত যদু বংশের মানুষগুলির মধ্যে ফুটে উঠে সমকালীন ভারতবর্ষের অত্যাচারী শাসক ইংরেজ ও পরাধীন ভারতের প্রজাদের ছবি। পুরাণের কংস কারাগার কারাগার নাটকে রূপান্তরিত হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারত কারাগারে। বসুদেব সংগ্রামী মুক্তিকামী জনতার নায়ক হয়ে যান।"[১৯]

উগ্রসেন কংসের অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে বসুদেবকেই তার পিতা শূরসেনের অপহৃত রাজমুকুট ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বসুদেব তা নেননি। স্বাধীনতা অপরের কাছ থেকে দান হিসেবে নিলে তাতে কোন পৌরুষ নেই। তাই তিনি ঐ রাজমুকুট শক্তিবলে অর্জন করবেন। এজন্যই তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন –

> "আমরা শক্তিসাধনা করছি...সেই শক্তি...যা এই অত্যাচার উৎপীড়ন দমন করতে পারে...যা আমাদের হৃত-সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওই রাজদণ্ড ঐ রাজদন্ড ঐ রাজমুকুট অর্জন করব...ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়।"[২০]

এই বীরবাণী যথার্থ নায়কের উক্তি। এই উগ্রসেনের রাজমুকুট কংসদাস সেনাপতি বিদূরথকে দিয়ে তিনি বলেছেন –

> "যাও - গিয়ে সেই শয়তানকে বল, যদুকুলের এই হৃত রাজদণ্ড, এই হৃত মথুরারাজ্য যদুসন্তান দান গ্রহণে নয়, স্বকীয় সাধনায় পুনরুদ্ধার করবে।"[২১]

এই শক্তি সাধনা বসুদেবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। তাই বসুদেব 'কারাগার' নাটকের নায়ক।

কংসের অত্যাচার দমন করার ক্ষমতা, চরিত্রবল ও লোকবল একমাত্র বসুদেবেরই ছিল। অত্যাচারিত যাদবগণ ও ভোজপতি উগ্রসেন বসুদেবের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন তাদের উপর অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য। বসুদেব সাহায্য করেছিলেনও। তিনি দাস ভাবাপন্ন যাদবদের তিরস্কার করে বলেছিলেন, কংস যখন নারায়ণ পূজা বন্ধ করে রাজার পূজা প্রবর্তন করে, তখন ক্রীতদাস যাদবরাই তা মেনে নিয়েছিল। তারাই ছিল কংসের সৈন্য, গুপ্তচর, অনুচর, সহায়, সম্পদ। তাদের দাসত্বের ও তাদের ওপর কংসের অত্যাচারের কারণও তারাই, তাদের দাসমনোবৃত্তি। বসুদেবের উক্তিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় –

> "এখন এ ক্রন্দন বৃথা। যেদিন উগ্রসেন পিতার হাত হতে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিল সেদিন তোমরা কথাটি কওনি, বরং ঘরভেদী বিভীষণের মতো তোমরাই হয়েছিলে তার সহায়, তার সৈন্য।"[২২]

তাই যাদবরা যখন বসুদেবের নিকট করুণ প্রার্থনা জানায় স্বজাতিকে রক্ষা করার জন্য, তখন বসুদেব প্রকৃত নেতার মত যাদবগণকে স্বাধীনতা লাভের জন্য দুঃখবরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছেন –

> "যে অত্যাচার সহ্য করে, মৃত্যু তাকে ঘৃণা করে, মৃত্যু তাকে পদাঘাত করে পরশ দেয় - মৃত্যু যন্ত্রণা দেয় কিন্তু আলিঙ্গন দিয়ে মুক্তি দেয় না - শান্তি দেয় না।"[২৩]

তিনি নিজেদের মুক্তি সাধনের জন্য নিজেদেরই উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এটাই প্রকৃত নেতার যোগ্য কাজ।

কঙ্কা যখন তার স্বামী কঙ্কণের কংসের সেনানায়কের শিরস্ত্রাণ পুড়িয়ে তাকে কংসবিরোধী স্বাধীনতাকামী যাদব সৈনিকে পরিণত করেছে, তখন বসুদেব তাকে প্রথম স্বাগত জানিয়ে বলেছেন –

"ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরে এল।"[২৪]

কঙ্কণ ও কঙ্কার বিবাহিত জীবনকে তিনি আশীর্বাদ দিয়েছেন। কারণ, তারা বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, কংস বিরোধী। কংসের সেনাপতি বিদূরথ যখন কংসের আদেশে নারায়ণ পূজোর স্থানে রাজার পূজা প্রবর্তন ঘোষণা করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রথমে বসুদেবই কংসের আদেশ অমান্য করতে বদ্ধপরিকর। স্বধর্ম রক্ষার জন্য এই নির্ভীক সিদ্ধান্ত নায়কোচিত। তিনি বিপথগামী যাদব সন্তান কংসের সেনাপতি বিদূরথকে যাদবাধম এবং কংসকে শয়তান সম্বোধন করে ধিক্কার দিয়েছেন তাদের সম্বিত ফেরানোর জন্য। এটা তার উন্নত চরিত্রবলের লক্ষণ।

কয়েকজন যাদব যখন যাদবকন্যা চন্দনাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কংসের প্রাসাদে নেবার জন্য চেষ্টা করেছে, তখন অসহায় চন্দনার আর্তনাদ শুনে একমাত্র তিনিই চন্দনার রক্ষার্থে তার পাশে এসে দুর্বৃত্তদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন –

> "ওরে ভীরু, ওরে কাপুরুষ, ওরে লুপ্ত মনুষ্যত্বের পিশাচ-প্রেত, জননীর নারীধর্ম বিনিময়েও রক্ষা করবি ঐ ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ? ওরে তোরা মর, তোরা মর, তোরা মর।"[২৫]

তিনি চন্দনাকে প্রাসাদে যেতে বারণ করেছেন বারবার। এটা তার নারীর প্রতি সম্মানবোধ ও চারিত্রিক পবিত্রতার দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই। এটি নায়কের অপরিহার্য গুণ। আবার বসুদেব চরিত্রহীন যাদবদের মরতে বললেও তাদের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। কারণ, তিনি জানেন তাদের গর্হিত শোচনীয় পরিণাম বিষয়ে তারা অজ্ঞ। তাই তিনি বলেছেন–

> "ভগবান! ভগবান! ওরা জানে না ওরা কি করছে। ক্ষমা করো...ক্ষমা করো - আমাদের এই মোহান্ধ ভাইদের ক্ষমা করো।"[২৬]

ক্ষমা মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বসুদেব তা জানতেন। অধঃপতিত যাদবদের প্রতি তার সহানুভূতি প্রবল। তাই তিনি তাদের ভাই বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের চরিত্র পরিবর্তন করতে চেয়েছেন।

বসুদেব বিচক্ষণ পতি। তিনি পুত্রসন্তান কংসের হাতে দেবেন বলে অঙ্গীকার করে পত্নী দেবকীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন কংসের অস্ত্রাঘাত থেকে। এটা তার পত্নীপ্রেম, ধর্মবোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শন। সত্যরক্ষার্থে তিনি কংসদাস বিদূরথের হাতে পুত্র কীর্তিমানকে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু পুত্রের জন্য তার স্নেহের কমতি ছিল না কোথাও। সন্তান বৎসল পিতা-মাতা স্বচক্ষে পুত্রের মৃত্যু দেখতে চান না। তাই বসুদেব একই সঙ্গে নিজেদের জন্যও মৃত্যু কামনা করেছেন। বসুদেব জ্ঞানী ও সত্য দ্রষ্টা। তিনি জানতেন নৃশংসতার জন্য কংসের পরিণাম ভয়াবহ। তাই তিনি বলেছেন –

> "অত্যাচারীর অত্যাচার যদি সত্য হয় অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সত্য।"[২৭]

এতে বসুদেবের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুত্রশোকে বিদূরথ পাগলের মত হলেও বসুদেব নির্বিকার। এখানে বসুদেবের অপত্য স্নেহ ও দেশপ্রেমের দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই সন্তান বাৎসল্যকে দেশপ্রেমের বেদীতলে বিসর্জন দিয়ে দেখালেন সন্তান বাৎসল্যের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়। এতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাও বসুদেবের মুখে ফুটে উঠেছে। নিজের সন্তানকে অত্যাচারীর হাতে তুলে দিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই প্রমাণ করলেন একের সুখের চেয়ে বহুজনের সুখ বড়। কৃষ্ণের জন্মে যে বসুদেব-দেবকীর তপস্যা সার্থক হয়েছে সেকথা কংসকে জানাতে কংস কৃষ্ণের আবির্ভাবকে স্বীকার করল এবং কৃষ্ণকে একবার দেখতে চাইল। অত্যাচার বন্ধ হলে অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে ভেদ লুপ্ত হয়। কারণ স্বাধীনতা আনে সাম্য ও মৈত্রী। এটি মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকের ফলশ্রুতি যা বসুদেবের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। তাই তিনি নাটকের যথার্থ নায়ক চরিত্র বা কেন্দ্রীয় চরিত্র।

নাটকের শেষে বসুদেব কৃষ্ণকে জানালো তাদের তপস্যা সার্থক। কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। কংস প্রতিবাদ করে বলে সেই তাকে এনেছে, তারা তাঁকে আনতে পারেনি। বসুদেব এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে কংসের উক্তি –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কত যুগ যুগ ধরেই কত কোটি কোটি লোক কত পূজা করেছে - কত তপস্যা করেছে - তাতে তো স্বর্গের আসন এক তিলও টলেনি - চোখ বুঁজে পড়ে থেকে সে শুধু পূজাই নিয়েছে...আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাঁকে জর্জরিত করে তাঁর স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্যেই তাঁকে টেনে এনেছি।"[২৮]

কৃষ্ণের আবির্ভাবকে স্বীকার করে কংস তাকে একটিবার দেখতে চায়। এভাবে নাটকে নানা দুঃখ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নাস্তিক অসুর কংস আস্তিক মানব কংসে পরিণত। নাটকের মূল বক্তব্য অশুভের উপর শুভের জয়। নাটকীয় এই কলাকৃতির মাধ্যমে কংস চরিত্রের পরিবর্তনে নাট্যকারের জীবনজিজ্ঞাসার সমাপ্তি ঘটেছে এই নাটকে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ, 'কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার', পৃ. ৪০
২. ভট্টাচার্য, ড. তারকনাথ, 'বাংলা নাটক : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', পৃ. ৭৬
৩. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ৩৫
৪. তদেব, পৃ. ৭৯
৫. তদেব, পৃ. ৫৯
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ, 'কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার', পৃ. ৪১
৭. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ৬৫
৮. তদেব, পৃ. ২২
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ, 'কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার', পৃ. ৩৯
১০. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ৭৮-৭৯
১১. তদেব, পৃ. ২৭
১২. তদেব, পৃ. ২৮
১৩. তদেব, পৃ. ৪৩
১৪. তদেব, পৃ. ৫৬
১৫. তদেব, পৃ. ৪৫
১৬. তদেব, পৃ. ৫৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫৬
১৮. তদেব, পৃ. ৭৮
১৯. ভট্টাচার্য ড. তারকনাথ, 'বাংলা নাটক : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', পৃ. ৭৬-৭৭
২০. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ১৭
২১. তদেব, পৃ. ১৮
২২. তদেব, পৃ. ১৬
২৩. তদেব, পৃ. ১৬
২৪. তদেব, পৃ. ২১
২৫. তদেব, পৃ. ৩৯
২৬. তদেব, পৃ. ৩৮
২৭. তদেব, পৃ. ৪৮
২৮. তদেব, পৃ. ৭৯

Bibliography:

মন্মথ, রায়, 'কারাগার', সম্পাদনা – ড অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রন্থতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, কলকাতা–৭৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আশুতোষ, ভট্টাচার্য, ‘বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস’, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা -১২, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭১

পবিত্র, সরকার, ‘নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ’ (অখন্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম অখন্ড সংস্করণ, ২০০৮

ড. শেখর, সমাদ্দার, ‘বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাস’, প্রয়াগ প্রকাশনী, কোলকাতা-৪৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

দেবব্রত, বিশ্বাস, (সম্পাদনা), ‘বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা’, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

তরুণ, মুখোপাধ্যায়, ‘নাটক, কাব্যনাটকঃ নিজস্ব দর্পণে’, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২

ড. রবীন্দ্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার’, গণমন প্রকাশন, কলকাতা–৫০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫

ড. তারকনাথ, ভট্টাচার্য, ‘বাংলা নাটক : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ’, (উৎস থেকে বিংশ শতাব্দী), বাংলা সাহিত্য একাডেমি, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 586 - 595
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরাণ ও আধুনিকতার মেলবন্ধন : বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক

মনীষা পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID : monishapal870@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Buddhadeb Bose, poetic drama, Topossi Torongini, Kalsondhya, Anamni Angana, Prothom Parttha, Songkranti,

Abstract
Buddhadeb Bose is a groundbreaking name in Bengali drama literature. He enriched Bengali literature by composing plays in different styles. Mahabharata-centered poetic dramas written almost at the end of his life are one of the signs of his theatrical talent. In these poetic dramas based on Indian mythology, the playwright has adapted the mythology to his own liking. He has mixed with that story the modern people's thinking. In the dramas, he took refuge in his own imagination by taking mythological stories. Above all, his artistic genius has made the dramas, though ancient, suitable for the modern mind.

Discussion

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকে যিনি সব থেকে বেশি আপন ও সমৃদ্ধ করেছেন তিনি হলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তবে তাঁর লেখনী বাংলা সাহিত্যকে শুধু কবিতা উপহার দিয়েছে এমন নয়; নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ ও শিশুসাহিত্য রচনায়, বলা যায় সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। নাটকের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছোটবেলা থেকেই। ছেলেবেলায় নোয়াখালীতে থাকাকালীন তাঁর মাতামহ তাঁকে শেক্সপিয়ার, বার্নাড শ প্রমুখের নাটক সম্পর্কে অবহিত করাতেন, পরিচিত করাতেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য প্রতিভাধর নাট্যকারের নাটক সম্পর্কে। এই নাট্যচর্চা বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে নাট্যপ্রেমকে জাগিয়ে তুলেছিল। নোয়াখালী টাউনহলের স্থানীয় যুবকদের সৌখিন নাট্যাভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করত। ছাত্রাবস্থা থেকে এই নাটক দেখা ও অভিনয় তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সেই সময়ের পক্ষে অতি আধুনিক দুটি একাঙ্কিকা লিখেছিলেন। একাঙ্কিকা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অভিনীত হয়েছিল। তিনি যখন ঢাকা থেকে কলকাতা আসেন তখন তাঁর একমাত্র অভিপ্রায় ছিল 'নাট্যকার' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু-সাহিত্য রচনাও করেছিলেন। নাটক, কবিতা বাদে তাঁর সে সমস্ত রচনাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

বুদ্ধদেব বসু নাটক রচনার পাশাপাশি সমগ্র জীবন ধরে নাটকের ফর্ম নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। ফলস্বরূপ তাঁর লেখনী আমাদের উপহার দিয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকের নাটকধর্মী রচনা। ১৯৩৩ সালে আমরা তাঁর নাটককে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এক নতুন আঙ্গিকে পাই। তিনি সে রচনার নাম দিয়েছিলেন 'নাট্যোপন্যাস'। এটি সম্পূর্ণরূপে নাটকের ফর্মে লেখা সংলাপ সর্বস্ব একটি উপন্যাস। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' ছোটগল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'লোকটা' নামক রচনাটি নাটকের ফর্মে লেখা একটি ছোটগল্প। রীতিমতো অভিনয়যোগ্য এই গল্পনাট্যটি তাঁর নাটকের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরেকটি সুখপাঠ্য উপহার। চল্লিশের দশকে উপহার দিয়েছিলেন দুটি গদ্যনাটক, একটি মৌলিক 'কাঠঠোকরা' অপরটি তাঁর 'কালো হাওয়া' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটক 'মায়া মালঞ্চ'। এরপর তিনি নাট্য রচনায় দীর্ঘদিন বিরতি দিয়ে পুনরায় ষাটের দশকে ফিরে আসেন 'পাতা ঝরে যায়' এবং 'বাবু ও বিবি' নামক দুটি একাঙ্ক নিয়ে। এই দুটি একাঙ্কই পূর্বের রচনা 'লোকটা'র আঙ্গিকে রচিত, অর্থাৎ এ দুটিও গল্পনাট্য। পরবর্তীতে তিনি এই রচনা দুটিকে যুক্ত করেছিলেন আনন্দ থেকে প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পের সংকলন 'তুমি কেমন আছো' গ্রন্থে। এই সময়ে তিনি যাদবপুর ও আমেরিকায় অধ্যাপনার কাজ সমাপ্ত করে পুনরায় নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। পাঠককে উপহার দেন বেশ কয়েকটি অসাধারণ নাটক। নাটক রচনার নিত্য নতুন আঙ্গিক নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি এই সময় তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁর মহৎ গ্রন্থ 'মহাভারতের কথা' লেখার। স্বভাবত তখন লেখকের মন জুড়ে ছিল মহাভারত। তাই এই সময় নাটকের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য সম্পাদনের প্রয়াসে ও লেখকের কবি-নাট্যকার সত্তার মিলনে যে কয়েকটি অসাধারণ কাব্যনাট্য বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হল অবসম্ভাবীভাবে তাদের বিষয়ভাবনায় মহাভারত স্থান করে নিল। মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীর নতুন ভাষ্যে তিনি পরপর পাঁচটি কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন, যথা - 'তপস্বী তরঙ্গিনী' (১৯৬৭), 'কালসন্ধ্যা' (১৯৬৯), 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০), 'প্রথম পার্থ' (১৯৭০) এবং 'সংক্রান্তি' (১৯৭৩)। কাব্যগুণের সঙ্গে নাট্যগুণের অনবদ্য মিলন ঘটেছে এই কাব্যনাট্যগুলিতে। নাটকগুলি যেমন মঞ্চ-সফল তেমন এর শ্রবণ-সুখকর ভাষা একান্ত পাঠে বা শ্রবণে ততটাই রোমাঞ্চকর অনুভূতিদায়ক। তাঁর এই শ্রুতিসুখকর কাব্যনাট্যগুলি দিয়েই বর্তমানে বহুল প্রচলিত শ্রুতিনাট্য ধারাটির সূত্রপাত হয়। নতুন ধারায় রচিত এই মৌলিক কাব্যনাট্যগুলিতে নাট্যকার গদ্যের সজীব ও শাণিত ভাষা, নাটকীয় উপাদান ও অসামান্য কাব্যময়তার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন সুদক্ষভাবে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক আবহে আধুনিক সমস্যাকে, আধুনিক ভাবনাকে উপস্থাপিত করতে মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র বাদে সার্থকতা পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। পুরাণের কাহিনীর মধ্যে যে সমকালীন আভাস পাওয়া যেতে পারে তার প্রমাণ এই কাব্যনাটকগুলি। পৌরাণিক উপাখ্যানে সমকালবর্তী ভাবনাকে স্থাপন করে রচিত এই নাটকগুলিতে নাট্যকার শুধু পুরাণের আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছেন তাই-ই নয়, তাঁর দক্ষতায় এখানে পুরাণ যেন নবজন্ম লাভ করেছে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'তে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান, 'কালসন্ধ্যা'তে মহাভারতের মৌষল পর্ব, 'অনাম্নী অঙ্গনা'তে বিদুরের দাসীমাতার কথা, 'প্রথম পার্থ'তে পরাক্রমী বীর কর্ণের কথা এবং মহাভারতের যুদ্ধের শেষ দিন স্থান পেয়েছে 'সংক্রান্তি' নাটকে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য এই সমস্ত পৌরাণিক অনুষঙ্গে মানবতাকে, আধুনিক সময়কে খোঁজা। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচিত এই পৌরাণিক নাটকগুলিতে যেহেতু পুরাণের আবহে সমকালীন ভাবনা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই সময়ের ঘটনাগুলোকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন তার ফলস্বরূপ পৌরাণিক চরিত্রদের সামান্য রদবদল ঘটেছে। আধুনিক দৃষ্টিতে পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে দেখার ফলে, বলা যায় তাদেরকে দেবত্বের ঘেরাটোপ মুক্ত করার ফলে তাদের দোষ-গুণ সমন্বিত মানব রূপ পাঠক ও দর্শকের চোখে ধরা পড়েছে। তাঁর কলমে পৌরাণিক চরিত্ররা দেবত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পুরাণের পাতার ঘটনা ও চরিত্রের অলৌকিকতার রহস্যমুক্তি ঘটেছে আধুনিক মনের উপযোগী যুক্তির উপস্থাপনে।

> "এই কাব্যনাটকগুলোতে মহাভারতের স্বর যেমন ধ্বনিত হয়েছে তেমনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাদীর্ণ বোধ।"[১]

রামায়ণ ও মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনি আমরা কম-বেশি সবাই জানি। নাট্যকার সেই ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের এক মর্মস্পর্শী নতুন রূপ দিলেন তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে। চার অঙ্কে সম্পূর্ণ এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সালে। পুরাণ-কেন্দ্রিক পাঁচটি কাব্যনাট্যের মধ্যে এই নাটকটি প্রথম রচনা। শুধু রচনাকাল হিসেবে প্রথম তাই নয় রচনাগুণেও এই নাটকটি শ্রেষ্ঠত্বের স্থান অধিকার করেছে। এই নাটকটির রচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন –

> "সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবেমাত্র উত্তর তিরিশ।"[২]

নাটকটির রচনাকালের আরও তিরিশ বছর পূর্বে নাট্যকারের মনে এই নাটকটির ভাবনা জন্মেছিল। তিরিশ বছর ধরে জীবনের নানান অভিজ্ঞতা সেই ভাবনার সঙ্গে জুড়েছে। প্রসূত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা নাটকটির ভাবনার সঙ্গে তাঁর জীবনবোধ মিশ্রিত হয়ে ১৯৬৬ সালে এক অনবদ্য সৃষ্টি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পৌরাণিক আবহে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গ জাগরণকে নাট্যকার এই নাটকে জানতে চেয়েছিলেন।

নাটকটিকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কিছু কিছু টুকরো টুকরো সংলাপ ছাড়া পুরো নাটকটাই গদ্যে রচিত। এমনকি অন্যান্য নাটকগুলির মত এই নাটকটি প্রকাশের সময় তার মলাটে 'কাব্যনাট্য' বিশেষণটি ছাপা হয়নি, তার বদলে সেখানে লেখা হয়েছে 'চার অঙ্কের নাটক', তা সত্ত্বেও এটিকে কাব্যনাট্য হিসেবে ধরা হয়। গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিলে মূল নাটকটি কবিতারই বিষয়। তার ভাব, ভাষা, ভঙ্গী সবই কাব্যনাট্যের অনুকূল। নাটকটির গদ্যে রচিত স্থানেও কবিতার সুরমূর্ছনার অভাব ঘটে না। সর্বোপরি নাট্যকার নিজেই ছিলেন নাটকটিকে কাব্যনাট্য বলার পক্ষে। তিনি নিজে এই নাটকটিকে 'কাব্যজাতীয় রচনা বলে ধরে' নিতে চেয়েছেন। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটি রচনার পিছনে এলিয়টের 'Murder in the Cathedral' রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল। এলিয়টের অনুসরণেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে কোরাস ব্যবহার করেন। এলিয়টের মতোই পটভূমি ও সংলাপকে আকুতিময় প্রবলতায় নিয়ে গিয়ে, প্রতীক, শব্দস্পন্দ চরিত্রানুগ ভাষার সংলাপ রচনা করে তিনি নাটকীয়তা তৈরির চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর শৈলী নির্বাচনে ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্বিষ্ট অনুশীলনও সাহায্য করেছিল।

ঋষ্যশৃঙ্গর কাহিনী আমরা রামায়ণের বালকাণ্ডে পাই। রামায়ণের বালকাণ্ডে 'অঙ্গরাজের ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন বৃত্তান্ত' আছে। আবার মহাভারতেও আমরা আরেকটু বিস্তৃতভাবে এই কাহিনীর অবতারণা দেখতে পাই। নাট্যকারের কথা অনুযায়ী তিনি 'সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান' পড়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহর মহাভারত থেকে। নাট্যকার কাহিনী নিয়েছেন পুরাণ থেকে, পুরাণের কাহিনীকে নাট্যকার নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়েছেন, সেই কাহিনীতে সঞ্চার করেছেন 'আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ব বেদনা'। এই নতুনত্ব আদান করতে গিয়ে পৌরাণিক গল্পকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। মূল কাহিনীতে ছিল দীর্ঘ তপস্যায় শ্রান্ত বিভান্ডক হ্রদে স্নানরত অবস্থায় ঊর্বশীকে জলে রেতঃপাত করেন, জল সহ সেই রেতঃ পান করে এক হরিণী গর্ভিণী হয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করে। নাট্যকার ওখানে অলৌকিক কোনো ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে চাননি যার ফলে শ্রান্ত মুনির কামোন্মাদনা জাগাতে উর্বশীর ভূমিকা থাকলেও গর্ভধারণের জন্য হরিণীর বদলে আনা হয়েছে কিরাত রমণীকে। কামোন্মত্ত মুনি এক কিরাতরমণীর সঙ্গলাভ করে পুত্ররূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রাপ্ত করেন এবং সেই স্থান ও উক্ত রমণীকে পরিত্যাগ করে পুত্রকে নিয়ে পুনরায় সাধনার পথে ব্রতী হন। পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা হরিণীর গর্ভজাত হওয়ায় ঋষ্যশৃঙ্গ-র মাথায় একটি শিং দেখতে পাই। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকের চরিত্রদের দোষে-গুণে সমৃদ্ধ মানবরূপে অঙ্কণ করেছেন। ফলে তিনি 'মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন' নায়কটির মাথায় শিং লাগাননি। মূল পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে ব্রাহ্মণরা তাঁকে ত্যাগ করেন ও ক্রোধপরবশ হয়ে ইন্দ্রদেব তাঁর রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করেন। অনাবৃষ্টির ফলে সমগ্র রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নাট্যকার নাটকে অনাবৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন লোমপাদের বীর্যহীনতাকে। এখানে নাট্যকার ভূমি ও নারীগর্ভের উর্বরতাকে একই প্রকৃতি চক্রের অন্তর্গত করতে চেয়ে এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ঋষ্যশৃঙ্গর মূল কাহিনীতে তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল একদল বারাঙ্গনা। কোনো একক মেয়ের কথা সেখানে নেই। নাট্যকার এখানে আজন্ম নারীসঙ্গহীন এক ঋষিকে বারাঙ্গনাদের দিয়ে অপহরণ করে আনার কোনো সরল কাহিনী রচনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করেননি, এখানে তিনি সেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে অঙ্কন করেছেন এক পৃথক রমণীকে। দুজন দুজনের প্রতি কামনার হাত ধরে পৌঁছে গেছে সাধনার উচ্চসীমায়।

ঋষ্যশৃঙ্গর এই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘পতিতা’ নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবি সেখানে বারাঙ্গনা দলের মধ্যে একজন রমণীকে পৃথক করে, প্রধান করে চিত্রিত করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গর অপাপবিদ্ধ সরলতা তার মনকে গ্লানিতে ভরিয়ে দিয়েছে। তার কাজের জন্য তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দান করা হয়েছিল তা সে ফিরিয়ে দিয়েছে রাজমন্ত্রীকে। বুদ্ধদেব ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’তে এই একই ধরণের কাহিনী ব্যবহার করেছেন। সেই হিসেবে বলা চলে তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’ কবিতার কাছে ঋণী। কিন্তু নাট্যকারের ভাবজগৎ তার থেকে আলাদা। ‘পতিতা’ কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গর আদিম সারল্য বারাঙ্গনাকে মুগ্ধ করেছিল, ঋষ্যশৃঙ্গর কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল। কবিতায় উনিশ শতকীয় রোমান্টিকতার আস্বাদ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু শুধু সেখানেই থেমে থাকেননি।

ঋষ্যশৃঙ্গ তপোবনের আশ্রমে পিতা বিভান্ডকের সঙ্গে একান্তে জীবন কাটাচ্ছিলেন। পিতা এবং বন্য পশু-পাখি ব্যাতীত কোনো প্রাণী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি ছিলেন সমাজ, জীবন ও প্রকৃতির চক্র থেকে অনেক দূরে। আদিম মানুষের মত প্রকৃতিতে নিমজ্জিত, প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে বেঁচে থাকা মানুষ। তাঁর ছোট্ট গন্ডীতে অবস্থিত সবকিছুই তাঁর আত্মীয়। কিন্তু সভ্যতার পক্ষে এই অজ্ঞতা ক্ষতিকর। তাই তাঁকে নিষ্পাপ স্বর্গোদ্যানে ছুঁতে হল জ্ঞান বৃক্ষের ফল, কৌতূহল আর লোভের ফলে তাকে আসতে হল নগরে। ঋষ্যশৃঙ্গকে শহরে আনা হল তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়, রাজ্যের মানুষের প্রয়োজনে। যাতে অনাবৃষ্টি বন্ধ হয়ে বর্ষণের শুরু হয়, সভ্যতার চাকা সচল থাকে। আর সেই অপহরণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তরঙ্গিণী ও তার সখীদের। নানারকম ছলাকলায় ঋষ্যশৃঙ্গর মনে কামনার উদ্রেক ঘটিয়ে, তাঁকে প্রলুব্ধ করে তরঙ্গিণী তাকে নিয়ে আসে নগরে। অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে এনে, তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন বন্ধ করে, তাঁর সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ দিলে অঙ্গরাজ্য আবার আগের মতো সুজলা সুফলা হবে বলে দৈববাণী হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যে আসলে তাঁর সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ দেওয়া হয়, তাঁদের এক পুত্রসন্তানও হয়। তাঁদের বিবাহের পর লোমপাদের রাজ্য পুনরায় সুফলা হয়ে ওঠে। রাজকুমারী শান্তা ও মন্ত্রীপুত্র অংশুমান দুজন দুজনকে ভালোবেসে বরণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিবাহের ফলে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। অন্যদিকে ঋষ্যশৃঙ্গ সংসার, রাজ্য সবকিছুর মাঝেও খুঁজে বেড়ান তাঁর জীবনে নারী ও কামনা সম্পর্কিত ধারণা প্রদানকারী সেই নারীকে। আর তরঙ্গিণীও গভীর মর্মাহত হয়ে তার কাজ ছেড়ে নিজেকে বন্দী করে রাখে গৃহমধ্যে। তপস্বীর সরলতায়, তাঁর মুগ্ধতায় বিহ্বল হয়ে তরঙ্গিণী তাকেই মন সঁপেছে। নাটকের অন্তিমে দেখা যায় ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য ও শান্তাকে তুলে দিয়েছেন অংশুমানের হাতে, তরঙ্গিণীকে সাধনার পথে ব্রতী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন এক বৃহতের উদ্দেশ্যে। সাধারণত যাকে ‘কাম’ বলে নিন্দে করা হয় তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। পুরাণে তরঙ্গিনীর কোনো নাম ছিল, তার পরিচয় ছিল জনৈক বেশ্যাকন্যা। নাট্যকার এখানে তাঁকে স্বতন্ত্রতা দান করেছেন। নাট্যকার তার নাম দিলেন, অবয়ব দিলেন, তার মধ্যে জন্ম দিলেন প্রেমিক সত্তাকে। সমস্ত বৈষয়িক বাসনাকে ত্যাগ করে ঋষ্যশৃঙ্গের নির্দিষ্ট সাধন পথে চলতে পারার মত উচ্চস্তরে নিয়ে গেলেন বারাঙ্গনার মনকে। পৌরাণিক শুষ্ক কঠোর তপস্বীরূপের খোলস থেকে ঋষ্যশৃঙ্গের কোমল মানব হৃদয়কে নাট্যকার এই নাটকে বের করে এনেছেন। সংযোজন করেছেন মানসিক টানা-পোড়েন। মহাভারতের কাহিনী শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র জন্মের পর পুনরায় ঋষ্যশৃঙ্গের সাধনার উদ্দেশ্যে বনে গমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নাট্যকার এখানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর মানসিক দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে নাটকটিকে আধুনিক মনের উপযোগী করে তুলেছেন।

নাট্যকারের পরবর্তী কাব্যনাটক ‘কালসন্ধ্যা’ মহাভারতের মৌষল পর্বের অন্তর্গত যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ভূমিকায় নাট্যকার কুরুক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট স্মরণ করেছেন –

> “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন - ‘তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে-আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।' কৃষ্ণ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেবী, আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই-ই উক্ত হ'ল'।"[৩]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে শত পুত্রের বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত গান্ধারীর এই অভিশাপ তথা ভবিষ্যৎবাণী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর পূর্ণ হয়। 'কালসন্ধ্যা' নাটকে যাদববংশ ও দ্বারকাপুরীর শেষ সময় স্থান পেয়েছে। বলা-বাহুল্য নাটকের কাহিনীর ইঙ্গিত যদুবংশ ও দ্বারকার ধ্বংস পেরিয়ে বহু দূরে প্রসারিত। নাটকটির চির পরিচিত এই কাহিনীর অন্তরালে নিহিত আছে মানব সভ্যতার আদি সত্য। এর আবেদন চিরকালীন মানব-ইতিহাসের। ক্রান্তদর্শী কৃষ্ণ গান্ধারীর অভিশাপকে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন কালচক্রে আবর্তিত মানুষ কীর্তি স্থাপন করে, নির্দিষ্ট কালসীমার অন্তে মহাকালের সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। যদুবংশ-ধ্বংস, কৃষ্ণের জীবনলীলা সংবরণ, অর্জুনের অভাবনীয় পরাভব কাহিনীর মধ্যে দিয়ে মহাকালের এই বৈনাশিক রূপটি কাব্যনাট্যকার ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। নাট্যকার তাঁর আদি, চিরন্তন মিথ-আশ্রয়ী জীবনসত্যের উপলব্ধির জন্যই 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাটকে যদুবংশ ধ্বংসের নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে অর্জুন-কাহিনীকে যুক্ত করেছেন। মহাকালের কালচক্রের একটি সন্ধিক্ষণের প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের দুর্জ্ঞেয় জীবনে নিয়তির সংকেতময়তা যুক্ত করে একে বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছেন নাট্যকার।

নাটকটিতে দুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে আমরা গ্রিক নাটকের 'Prologue' এর মত একটি পূর্বরঙ্গ দৃশ্য দেখতে পায়। এখানে দুই বৃদ্ধের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের রূপটি আভাসিত। এই দুই বৃদ্ধ যেন গ্রিক নাটকের কোরাস চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তথা নাটকের শেষে দেখি গ্রীক নাটকের 'Epilogue'-এর মত উত্তরকথন দৃশ্য। যেখানে 'বয়সের অতীত' ব্যাসদেব অর্জুনকে জীবনের পাঠ শিখিয়েছেন এবং 'কালসন্ধ্যা'র স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ স্বাধীন বা সর্বশক্তিমান নয়, সে কালচক্র এবং নিয়তির অধীন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রান্তদর্শী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ হয়েও যদুবংশকে রক্ষা করতে পারেননি। যাদবরা পরস্পরের সংহারে লিপ্ত হয়েছিল, ব্যধের তীরে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসান হয়েছিল, দ্বারকাপুরীও সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। কালচক্রে-পিষ্ট অর্জুন তাঁর কুরুক্ষেত্র জয়ের পরাভব হারিয়ে সামান্য দস্যুদের হাত থেকে যাদব নারীদের রক্ষা করার জন্য গাণ্ডীব উত্তোলনে অক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এই বৃত্তান্তটির সামগ্রিক এবং মিথিক প্রকরণধর্মী বিন্যাস ঘটিয়ে সমকালীন সন্ধিযুগের ক্ষয় ও পতনের মর্মটিকে রচনায় প্রথিত করে দিয়েছেন। প্রবল কীর্তি, অলৌকিক শক্তিও কালের নির্ধারিত নিয়মের অধীন এই সত্যই এখানেই ফুটে উঠেছে।

মহাভারতের কাহিনীর কিছু কিছু অলৌকিকতা নাট্যকার এখানে পরিহার করেছেন। তার পরিবর্তে ফুটিয়ে তুলেছেন যুক্তিনির্ভর কার্য-কারণ সম্বন্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কে দুই যাদব নারী সত্যভামা ও সুভদ্রার কথোপকথনে যাদবদের প্রতি উৎকণ্ঠার পাশাপাশি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে নাট্যকার যাদবদের অমিতাচারের চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের ক্লেদাক্ত লালসা, উচ্ছৃঙ্খলতা, উন্মত্ত পাশবিকতা, রক্তাপ্লুত বীভৎসতা এসব দৃশ্যে কদর্য ও ভয়াবহ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাদের কাছে জীবনের সার মন্ত্র হল 'মাধ্বী ও শিশ্ন'। ভোগ-বাসনা, কাম-লালসায় ডুবে তারা অতীত গৌরবকে অমর্যাদা করেছে। ফলে প্রতিবাদী প্রজার প্রতিশোধ বাসনা উচ্চস্বরে ধ্বনিত হয়েছে। এ যেন বিংশ শতাব্দীর হানাহানিপূর্ণ অস্থির সময়ের চিত্র। নাট্যকার এখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ব্যক্তিক স্খলনকে একসূত্রে গেঁথে সার্বিক অবক্ষয়ের পূর্বাভাসকে দ্যোতিত করেছেন। এই অবক্ষয় থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় যে কৃষ্ণ তিনি সর্ব-দ্রষ্টা ও সর্ব-নিয়ন্তা হয়েও নির্বিকার, নিস্পৃহ। কারণ তিনি যেমন স্রষ্টা তেমন সৃষ্টি রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। তাই মহান কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় তাঁর সৃষ্টি যখন যাবতীয় বিনাশ কার্যে প্রবৃত্ত, তখন তাদের বিনাশ সাধন করে কৃষ্ণ সৃষ্টির মহা-নিয়মের ভারসাম্য রক্ষা করলেন। তাঁর মতে -

"জেনো, এই ধ্বংস-এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এল বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।"

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা অর্জুনকে পাই। দ্বারকার নারী, বৃদ্ধ আর শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকায় আসা অর্জুনের চেহারায় আমরা বয়সের ছাপ দেখতে পাই। শুধু অর্জুন নয় এখানে কৃষ্ণও বয়স্ক এবং কিঞ্চিৎ স্থূল অবয়বের। উভয়েরই চালচলনে বিরোচিত দর্প প্রকাশিত হলেও দৈহিক শক্তির অবক্ষয় হয়েছে তা বুঝতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কষ্ট হয়না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহাপরাক্রমশালী যুবক অর্জুন বয়স্ক হয়েছেন। অর্জুনের মুখে পৌঢ়ত্বের চিহ্ন, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। নাট্যকার এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও দেব-আশীর্বাদধন্য দুই পুরুষের বাহ্যিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন অসামান্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কালচক্রের অন্তর্গত, তাঁদের বিনাশ বা শক্তি-ক্ষয় অবসম্ভাবী। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানের পর দস্যুদের হাত থেকে অর্জুন যাদব নারীদের রক্ষা করতে পারলেন না। কৃষ্ণের দীপ্তিতে দীপ্তমান অর্জুন স্তিমিত বল হয়ে এসেছেন কৃষ্ণের প্রস্থানে। অর্থাৎ কালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নাট্যকার এখানে অর্জুন চরিত্রে দুর্জ্ঞেয় নিয়তিবাদের সঙ্গে আধুনিক আমিত্ববোধ ও মানসিক-দ্বন্দ্বকে সুদক্ষভাবে জুড়ে দিয়েছেন। মহাভারতের অর্জুন দস্যুদের সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রামে তাঁর অক্ষয়তূণের দ্রুত ক্ষয় দেখে 'দৈব দুর্বিবাক' ভেবে প্রতিনিবৃত্ত হন, কিন্তু 'কালসন্ধ্যা'র নিয়তিপীড়িত অর্জুন আমিত্ববোধে আক্রান্ত হয়ে উপলব্ধি করেন -

"অন্তহীন মহাশূন্যে
আমি যেন মজ্জমান-শরীরসর্বস্ব জড়!
শ্রুতি নেই শ্রবণে, দ্যাখে না চক্ষু, ত্বকে আর নেই স্পর্শবোধ,
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে না-
নির্বাপিত নষ্টবল, নিঃশেষ অর্জুন,"

অতীত গৌরব হারিয়ে অর্জুনের হাহাকার বেঁচে থেকে মৃত্যুর তুল্য অভিজ্ঞতালাভের যন্ত্রণায় রক্তাক্ত। বুদ্ধদেব খুব সহজেই জীবন্মৃতের এই যন্ত্রণা ও শূন্যতাবোধের চরম অসহায়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই অসহায়ত্ব, এই আত্ম-বোধ ও দ্বন্দ্ব অর্জুনকে পুরাণের গণ্ডী পার করে আধুনিক মানুষ করে তুলেছে।

যাদব-বংশ ও দ্বারকানগরীর ধ্বংস, অর্জুনের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে কালের বিবর্তনের রূপ ব্যঞ্জিত। যুগসন্ধিক্ষণে যখন কালসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন অবক্ষয়িত সমাজে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি খসে পড়ে। তখন নতুন সূর্যের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। কালসন্ধ্যা অমোঘ, অনিবার্য ও জাগতিক নিয়মের অঙ্গ। একটা কালের সমাপ্তিতেই থাকে নতুন কালের সূচনা।

পরের কাব্যনাট্যটির বিষয়ও মহাভারত। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র বিদুরের জন্মকথাকে আশ্রয় করে বুদ্ধদেব বসু রচনা করেছেন 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০) নামক কাব্যনাট্যটি। নাটকটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর নিঃসন্তান দুই রানীর গর্ভে সন্তান প্রদানের জন্য নিয়োগ করা হয় মহর্ষি বেদব্যাসকে। সেই সময়ই বেদব্যাসের নিয়োগে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর সঙ্গে এক দাসীর গর্ভে জন্ম হয় বিদুরের। অম্বিকা ও অম্বালিকার পাশাপাশি মহর্ষি বেদব্যাসের সন্তান প্রাপ্ত করেছিল অন্তঃপুরের অনাম্নী এক দাসী। সেই অখ্যাত অনাম্নী দাসীকেই নাট্যকার 'অনাম্নী অঙ্গনা'তে প্রধান ভূমিকায় এনেছেন। নাটকটির কোনো দৃশ্য ভাগ নেই, তবে কাহিনীর উপর নজর রাখলে নাটকটিকে চারটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে অঙ্গনা ও তার দুই সখীর কথোপকথন আছে, সেখান থেকে জানা যায় অঙ্গনার গোপন প্রণয়ের কথা, সংসার বাসনার কথা। দ্বিতীয় অংশে রানী অম্বিকার সঙ্গে রাজমাতা সত্যবতীর কথোপকথন, এই অংশে আমরা জানতে পারি দুই রানীর গর্ভজাত সন্তান ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ তাই সিংহাসনের প্রয়োজনে অম্বিকাকে আরেকবার ব্যাসদেবের ঔরসে গর্ভবতী হওয়ার আদেশ নিয়ে আসেন সত্যবতী। পরের দুটি অংশে অম্বিকা ও অঙ্গনার কথোপকথন আছে। একটিতে অঙ্গনাকে বেদব্যাসের অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্য অম্বিকার প্রস্তাব, প্রলুব্ধ করা ও অবশেষে অঙ্গনার সম্মতি প্রদান এবং অন্যটিতে ব্যাসদেবের সান্নিধ্যে পরিবর্তিত অঙ্গনার অনুভূতির প্রকাশ।

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকে নাট্যকার সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন অনাম্নী অঙ্গনাকে। মহাভারতে বিদুরের দাসী মাতা উপেক্ষিতা। মহৎ কর্মে রত মহাভারতকার তার নামটা উল্লেখ করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। বুদ্ধদেবও এই দাসীমাতার মহত্তম-ব্যপ্তিকে সীমিত গন্ডীতে বাঁধতে চাননি তাই তিনিও তাঁর প্রধানা এই নায়িকা চরিত্রের নামকরণ করেননি। নাটকে সে অনাম্নী অঙ্গনা। তবে নারীত্ব বিকাশের অপূর্ব সৌন্দর্য-লাবণ্যে, নিজের অনুভূতির সার্থক প্রকাশে মহাভারতের উপেক্ষিতা নাটকে সম্মানিতা। অঙ্গনার বিপরীতে নাট্যকার স্থাপন করেছেন অম্বিকাকে। রানী

হয়েও তাঁর মন কতটা আত্মচিন্তায় বিভোর, নিজের প্রয়োজনে কিভাবে তিনি অন্যের জীবনকে বাজি রাখতে পারেন নাটকে তা দেখা যায়। রানীর যে মহান হৃদয় প্রজাদের রক্ষা করে, সহায় হয় 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় রানী অম্বিকার মধ্যে আমরা তা পাই না। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষেরা কিভাবে নিম্নস্তরের মানুষদের সর্বান্তকরণে শোষণ করে তার চিত্র নাট্যকার এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। পৌরাণিক আবহাওয়া, পৌরাণিক চরিত্র, পৌরাণিক ঘটনা হয়েও এ নাটক আধুনিক সমাজের চিত্রকে পরিস্ফুট করেছে।

নাটকের প্রথম অংশে জানা যায় অঙ্গনা মন দিয়েছে এক তন্তুবায় যুবককে। তার সঙ্গে সংসারের স্বপ্ন দেখেছে। সে যুবকও রানী অম্বিকার থেকে অঙ্গনাকে মুক্ত করার জন্য দাসীপণ জোগাড় করেছে। কিন্তু রানী অম্বিকা কোন মতেই তার দাসী অঙ্গনাকে মুক্তি দিতে চান-না। প্রকারান্তরে তিনি প্রস্তাব করেন পরিণীতা হয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এলে স্বামীকেও রাজভৃত্য করে নেবেন। অঙ্গনা নিজে যে পরাধীনতার শিকল পরেছে স্বামীকে সে বাঁধনে বাঁধতে দিতে চায় না। আর নিজেও স্বপ্ন দেখে একটা নিজের ঘরের, নিজের কাজের। কিন্তু সে জানে তার এ স্বপ্ন পূরণ হবে না। কারণ সে 'উত্তম দাসী, তাই অর্ধেকমাত্র নারী'। নারীত্বের পূর্ণতার স্বাদ দাসীদের ভাগ্যে পাওয়া হয়ে ওঠে না। তার মত আরও অনেক অবলা নারী আছে এই রাজপুরীতে, যারা এমনই দুর্ভাগ্যপীড়িতা। তাদের কোন অধিকারই নেই নিজের জীবন নিজের মত করে কাটানোর। তাদের প্রভুদের প্রয়োজনে তারা নিজের জীবনকে আহুতি দিতে বাধ্য। এবং প্রভুরাও তাদেরকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করেন। তাই যখন মাতা সত্যবতী অম্বিকাকে ব্যাসদেবের অঙ্কশায়িনী হওয়ার আদেশ নিয়ে আসেন অম্বিকা তখন যেন-তেন-প্রকারেণ সেই কক্ষে অঙ্গনাকে পাঠান। অঙ্গনার প্রেম ও সংসারের আকাঙ্ক্ষা অম্বিকা জানতেন। তাই নিজে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য অঙ্গনার সেই দুর্বলতারই সাহায্য নিয়েছেন। তাকে তার কাঙ্খিত মুক্তি, প্রণয়, সংসারের লোভে প্রলুব্ধ করে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছেন। কুমারী, 'প্রিয়দর্শিনী', 'সংহত যৌবনা' দাসী অঙ্গনাকে পাঠাতে চেয়েছেন ব্যাসদেবের সান্নিধ্যে। কিন্তু অঙ্গনা সাধারণ মানুষ। সে জানে যে নিয়ম-নীতির অবমাননা রাজা-রাজড়া, মুনি-ঋষিদের চলে তা তাদের মত 'ব্রহ্মার অধমাঙ্গ' থেকে জন্ম নেওয়া জাতি-কুলের চলে না। তাই সে রানীর আদেশ মানতে গিয়ে নিজের সংস্কার-চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ভীত হয়েছে। তার কৌমার্য ও সতীত্বের সংস্কার, তন্তুবায় যুবকের প্রথম প্রণয় প্রকাশের সুখানুভূতি ও প্রভুর আদেশ পালনের দ্বন্দ্বে সে দ্বিধাগ্রস্ত। বুদ্ধদেব বসু অপূর্ব কবিত্ব ও অসাধারণ নাটকীয়তায় অঙ্গনার অন্তর্দ্বন্দ্বকে এই অংশে তুলে ধরেছেন। ছলনাময়ী অম্বিকা তার মানসিক দোলাচলতার সুযোগ নিয়ে এই কাজকে 'দেবতার নির্দেশ', 'সৌভাগ্যের আহ্বান!' বলেছেন। মোহাবিষ্ট অঙ্গনাকে নিয়ে সুচতুর অম্বিকা সতর্ক থেকেছেন, যাতে শেষ মুহূর্তের ভীরুতা তার মন বদলে দিতে না পারে। নিজের হাতে দাসীকে রানী সাজিয়ে নিজের কর্তব্য পালনে পাঠিয়েছেন অম্বিকা।

অম্বিকার দোলাচলতা ঋষি মিলনের পর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। ঋষির মহনীয়তা উপলব্ধি করে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে ঋদ্ধ হয়েছে অঙ্গনা, আত্মমগ্নভাবে ঋষির গুণগান করেছে। অম্বিকার ভয়ংকরদর্শন ভীষণ পুরুষ অঙ্গনার সমর্পিত হৃদয়ে গভীর অরণ্যের মতো মনে হয়েছে। সেই প্রথম ও শেষ মিলন অঙ্গনার হৃদয়ে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। আসন্ন পুত্রপ্রাপ্তির আশায় অঙ্গনা তার নিজস্ব আকাঙ্খা বিসর্জন দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। অঙ্গনা গুণযুক্ত পুত্র পাওয়ার সম্ভাবনায়, তাকে যোগ্য করে তোলার আকাঙ্খায়, সর্বপরি একরাত্রির মিলন তার হৃদয়কে যে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করেছিল তার জন্য রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি।

ভরত বংশের কাহিনীর এই বিশেষ অংশকে গ্রহণ করলেও নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু এখানে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেছেন। অম্বিকা সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন আর অঙ্গনা প্রতিভূ হয়েছে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের। পৌরাণিক সময়ই হোক আর অত্যাধুনিক যুগই হোক উঁচুস্তরের মানুষেরা সর্বদা নিম্নস্তরের মানুষদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। অন্তঃপুরের দাস, দাসীরা নিতান্ত জড়বস্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হত পৌরাণিক যুগে। তাদের নিজস্ব জীবন, আশা, আকাঙ্খার মূল্য দেওয়া হত না। কোনো দাসী স্বাধীন সংসার করতে চায়লে তার পাণিপ্রার্থীকে রানীর হাতে তুলে দিতে হত 'দাসীপণ'। আর সে পণ দিতে না পারলে ত্যাগ করতে হত তাকে পাওয়ার স্বপ্ন। নাটকে আমরা দেখেছি দাসী অঙ্গনার সঙ্গে অম্বিকার এই একই ব্যবহার। অম্বিকা চতুরতার সঙ্গে অঙ্গনাকে রাজি করিয়েছে তাঁর বিকল্প হওয়ার জন্য। অঙ্গনার সংস্কার, আকাঙ্ক্ষা, প্রণয় সব জানার পরও তাকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে মোহাবিষ্ট করেছে। নিজে

সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দাসীর জীবনের আকাঙ্খাকে বলি দিয়েছে। নাট্যকার অম্বিকার মাধ্যমে সমাজের উঁচু স্তরের স্বার্থান্ধ মানুষদের ছবি এঁকেছেন, আর এখানেই এই নাটক পৌরাণিকতার গণ্ডী পেরিয়ে আধুনিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।

'কালসন্ধ্যা' নাটকে নাট্যকার মহাভারতের যে যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের চিত্র দেখিয়েছেন, 'প্রথম পার্থ' (১৯৬৯) নাটকে আমরা সেই যুদ্ধের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পাই। 'প্রথম পার্থ' নাটকটি ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অনাম্নী অঙ্গনা'র মতো এই নাটকেও কোনো দৃশ্য বিভাগ নেই। এখানেও আমরা বিষয়বস্তু অনুসারে নাটকটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। নাটকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনায় কৌরব পক্ষে যোগদানে ইচ্ছুক কর্ণের কাছে পর্যায়ক্রমে কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ এসেছেন। তাঁদের সবার চাওয়া কর্ণ যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ না দেন। মূল মহাভারত থেকে নাট্যকার এখানে অনেকটা সরে এসেছেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে যান। কৃষ্ণর মাধ্যমে কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্রকে যুদ্ধে প্রণোদিত করার জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে পাঠান। কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বের হন তিনি রথে সঙ্গী হিসেবে কর্ণকে নিয়ে যান। সেই যাত্রাপথেই তিনি কর্ণকে তাঁর আসল পরিচয় প্রদান করেন, এবং এও জানান যে কুন্তীর বাসনা কর্ণ যুদ্ধে যোগ না দেন। কৃষ্ণের কথা শুনে কর্ণ কৃষ্ণকে জানান কুন্তী অমঙ্গল আশঙ্কায় শিশু অবস্থায় তাঁকে ত্যাগ করেছেন, রাধা ও অধিরথ তাঁকে পুত্র স্নেহে পালন করেছেন। দুর্যোধনের আশ্রয়ে তিনি রাজ্যভোগ করছেন এবং তাঁর ভরসায় দুর্যোধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তিনি দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারবেন না, তা ধর্মবিরুদ্ধ। তিনি তাঁর কর্তব্যবোধ বা পূর্ব পরিচয় ত্যাগ করতে পারবেন না। ফলে কুন্তীর কথা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর জ্ঞাতিবধের সম্ভাবনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কুন্তী কর্ণের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর শঙ্কা প্রকাশ করে কর্ণকে নিরস্ত হতে বলেন। কর্ণের জন্মদাতা পিতাও তাকে কুন্তীর আকাঙ্খা পূর্ণ করতে অনুরোধ করেছেন। কর্ণ একথা মেনে নেননি, কুন্তীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। মহাভারতে কৃষ্ণ ও কুন্তীর সঙ্গে কর্ণের সাক্ষাতের এবং যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকার প্রস্তাব দেওয়ার প্রসঙ্গ থাকলেও দৌপদীর সঙ্গে কর্ণের সাক্ষাতের কথা মহাভারতে নেই। দ্রোপদী ও কর্ণের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ নাট্যকারের নিজস্ব সংযোজন।

যুদ্ধের প্রক্কালে প্রথম ও পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণের কাছে উদ্বেলিত হৃদয়ে কুন্তী এসেছেন তাঁর মাতৃত্বের দাবী নিয়ে। মহাভারতের এই অংশকে রচনার আধার হিসেবে রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছিলেন তাঁর 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ। 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ'-এ অবশ্য কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথনে প্রাধান্য পেয়েছে মাতৃস্নেহ ও ধর্মবোধের টানাপোড়েন। অন্যদিকে বুদ্ধদেবের এই 'প্রথম পার্থ' নাটকে কুন্তী, দ্রোপদী বা কৃষ্ণের আগমন শুধু ব্যক্তিগত স্নেহ, ভালোবাসা বা প্রীতির মধ্যে আটকে থাকেনি, তাঁদের উদ্দেশ্য আরো গূঢ় রূপে দেখা দিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য কর্ণের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পেলেও তাঁরা দুই বৃদ্ধের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। এই নাটকে নাট্যকার কর্ণকে স্থিতধী, প্রাজ্ঞ, প্রতিভাবান আধুনিক মানুষরূপে অঙ্কণ করেছেন।

মহাভারতের কর্ণ যোগ্যতার শীর্ষ স্পর্শ করেও নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেননি। সমাজের ক্ষমতার আসনে বসে থাকা মহাপুরুষরা বারবার তাঁর যোগ্যতার উপর স্থান দিয়েছেন বংশ পরিচয়কে। তাঁর ক্ষমতা খাটো করা হয়েছে তাঁর জন্ম-পরিচয় দিয়ে। একজন যোদ্ধা হওয়ার সব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তিনি বারবার অপমানিত হয়েছেন, অবহেলিত হয়েছেন। জন্ম সূত্রে তিনি কুন্তীর প্রথম সন্তান, সেই অর্থে যে সম্মান পাণ্ডবরা পেয়েছেন তা তাঁরও প্রাপ্য ছিল। কিন্তু কর্ণের জন্মের পরই লোকলজ্জায় কুন্তী তাঁর কুমারী অবস্থার এই পুত্রকে বিসর্জন দেন। পরবর্তীতে কর্ণের বেড়ে ওঠা সুত অধিরথের গৃহে। তাঁর পরিচয় সুতপুত্র। ফলে তিনি অস্ত্রশিক্ষা বা চর্চার অধিকারী নন। নিজের অদম্য আকাঙ্খায় যদিওবা অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন তবুও পদে পদে অপমান তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। ঘটনাক্রমে দুর্যোধনের সহায়তা-লাভ এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিজেরই ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও অর্জুনের অস্ত্রে প্রাণত্যাগ কর্ণের জীবনলিপি। মহাভারতের এই মহান ব্যক্তিত্ব 'প্রথম পার্থ' নাটকের নায়ক। তাঁর জীবন ও চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে নাট্যকার এখানে কর্ণকে আরও বর্ণময় করে তুলেছেন। কুন্তীর প্রতি অন্তরের টান, দ্রৌপদীর থেকে পাওয়া প্রত্যাখানের বেদনা, দুর্যোধনের বন্ধুত্ব রক্ষা, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের আকাঙ্খার পাশাপাশি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহ এখানে কর্ণকে পূর্ণতা দান করেছে। এই যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যোগ্য বীরের মত কর্ণ যুদ্ধের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে। কৃষ্ণ যখন তাঁকে তাঁর শেষ-মুহূর্তের সঙ্গে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিচয় করিয়েছেন, কর্ণ তখন জেনেছেন অর্জনের হাতে তাঁর পরাভব সম্ভব নয়, তাঁর পরাজয়ের জন্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করতে হবে ছলনার। কৃষ্ণ যখন তাঁর দার্শনিক প্রতীতি কর্ণের কাছে ব্যক্ত করেন তখন কর্ণের একটাই চাওয়া থাকে- 'তবে আশীর্বাদ করো, আর যেন ফিরে না আসি।' কর্ণের এই সান্ত্বনাহীনতা এই বিষাদের মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হয় আধুনিক মানুষের অসহায় আর্তনাদ।

মহাভারতের কাহিনীকে আধার করে বুদ্ধদেব বসু রচিত শেষ মৌলিক কাব্যনাট্য 'সংক্রান্তি', রচনাকাল ১৯৭০ সাল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে, দুর্যোধনবধের পটভূমিকায় ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মনস্তত্ব এখানে পরিস্ফুট। গত সতেরোদিনের যুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর পিতৃহৃদয় শোকে কাতর হয়েছে অনুক্ষণ। সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন, পুত্রের প্রতি আঘাতের কথা শুনতে শুনতে ক্ষভে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রর অন্ধ পুত্রস্নেহ, পুত্রদের প্রতি গান্ধারীর যুগপৎ ঘৃণা ও অপরিমেয় স্নেহের অপূর্ব মেলবন্ধন এই কাব্যনাট্যটি।

ধর্মপ্রাণা গান্ধারী জানতেন তাঁর অর্ধমাচারী পুত্র অন্যায় ও হীন কর্মে লিপ্ত থেকে মানসিক অর্থে অনেক আগেই মৃত, আজ তাঁর শারীরিক মৃত্যু হল। তাই তিনি ধর্মের জয় দিয়েছেন। কিন্তু অর্ধমাচারী পুত্রকে ঘৃণা করার পাশাপাশি তাঁর মাতৃহৃদয়ের শোক প্রকাশ পেয়েছে দুর্যোধনের মৃত্যুতে। পরম স্নেহে গান্ধারী আহ্বান জানান - "বাছা, ফিরে আয়। ফিরে আয় শিশু হয়ে আমার কোলে-", করুণ প্রার্থনা করেন ধৃতরাষ্ট্রর কাছে 'যদি পারো, আরো একটি পুত্র দাও আমাকে'। নাটকের শুরুতে ধর্মের জয় কণ্ঠে নিয়ে গান্ধারীর আগমন ঘটলেও নাট্যকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে রক্তমাংসের মাতৃরূপেই এঁকেছেন। অন্যায় আচরণের জন্য যে পুত্রকে মা সুতীব্র ঘৃণা করেছেন সেই পুত্রের মৃত্যু সহ্য করা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। জীবনধর্মের বশবর্তী হয়ে গান্ধারী পুত্রের মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে পড়লেও তিনি ঘটনার অমোঘতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি জানেন, প্রতিটি জীবের জন্মের লগ্নেই থাকে মৃত্যুর পরোয়ানা, তবুও 'জীবিতেরা সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে অস্থির।' মৃত্যু মানে জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, যাবতীয় কোলাহল থেকে মুক্তি। তিনি জানেন জীবনের ধারাবাহিকতায় জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই, আছে এক মুহূর্তে মিলিয়ে যাওয়া। তিনি জন্ম-মৃত্যুর সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই অন্তিম শয়নে শায়িত পুত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন - 'পুত্র, তুমি অনেক যুদ্ধ করেছ, এখন নিদ্রা যাও, অনেক অশান্তির পর শান্তি হোক তোমার।' ন্যায় হোক বা অন্যায়, দুর্যোধনের পুরো জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই কেটেছে। বেঁচে থাকার জন্য, রাজা হওয়ার জন্য দুর্যোধন অনেক সংগ্রাম করেছেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমস্ত ভাই-বন্ধুর জীবনলীলা সমাপ্তির মত হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের সাক্ষীও হতে হয়েছে তাঁকে। জীবন সংগ্রাম, যুদ্ধের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি তাঁর দূর হয়েছে এই শান্তিময় মৃত্যুতে। এই মৃত্যুই আনে মানুষের ইতিহাসে ক্রান্তিকাল। নাট্যকার দুর্যোধনের মৃত্যুতে অনুভব করেছেন মানুষের ইতিহাসের সংক্রান্তি। জীবন কাম্য হলেও তার অন্তে মৃত্যু অবসম্ভাবী। কখনো কখনো এই মৃত্যু বেঁচে থাকার চেয়ে বেশি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। জীবনের দ্বন্দ্ব, ব্যর্থ সংগ্রামের যন্ত্রণা থেকে মৃত্যুর শান্তি যেন বুদ্ধদেবের নাটকের পাত্র-পাত্রীদের উজ্জ্বল উদ্ধার।

'মহাভারতের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু বলেছেন –

> "মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানব জীবনের মধ্যে প্রবহমান।"[৪]

মানবজীবনের মূলেই হচ্ছে সংগ্রাম, তাই বুদ্ধদেবের কৃষ্ণ বলেন 'দ্বন্দ্ব ছাড়া জীবন গতিহীন'। জীবন-যাপনের জন্য প্রতিটি মানুষকে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হতে হবে। জয় বা পরাজয় দুই-ই তুল্য-মূল্য। এক-একটি যুদ্ধের পর কালসন্ধ্যা আর সংক্রান্তি অবসম্ভাবী। এটিই কালের প্রবহমানতা। মানব ইতিহাসের এই মহাকাব্য মহাভারত এভাবে আবহমান কাল ধরে গৃহীত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই মহাভারতকে দেখেছেন। পৌরাণিক চরিত্রাবলীর জীবনালেখ্য, দ্বন্দ্ববেদনা আধুনিক মানসিকতায় পরিপুষ্টি লাভ করে তাঁর কাব্যনাটকের অন্বিষ্ট বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে। সব মিলিয়ে কাব্যনাটকগুলি জগৎ ও জীবনের এমন এক বোধের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে যা সম্পূর্ণ আধুনিক। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাই

নিছক বর্তমান থেকে দূরবর্তী, অতীত যুগের মানুষরূপে দেখলে ভুল হবে, অন্তর্গত পরিচয়ে তারা সমকালীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরকালীন হওয়ার আবেদন রাখে।

Reference:

১. সরকার, রাজীব, বহুমাত্রিক বুদ্ধদেব বসু : বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে, কথাপ্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫২
২. দে, অপূর্ব (সম্পা.), তপস্বী ও তরঙ্গিনী পুরাণের নবভাষ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, পৃ. ২৫
৩. বসু, বুদ্ধদেব, কালসন্ধ্যা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভূমিকা
৪. বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 596 - 607
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নাট্যতাত্ত্বিক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'টিকটিকি' নাট্য : অপ্রত্যাশিত প্রবীণ-নবীনের অনবদ্য যুগলবন্দি

চাঁদ কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক
বালুরঘাট বি.এড. কলেজ
Email ID : chandkumarw.b@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Psychoanalysis, Detective, Recidivist, Devotion, Fictional, Mystery, Movement, Partition, Self-imagined, Ornament, Crime, Camouflage, Excitement, Perception,

Abstract
The evolution or development of Bengali drama has been seen by theatre enthusiasts from the general public to theatre intellectuals. As much as social, political and historical dramas have been seen, Rajshekhar Bose, Sharadindu or Satyajit Ray have not been brought to the theatre arena. In this regard, the long-standing desire of the theatre enthusiasts has been fulfilled by the recent famous mystery and detective drama 'Tiktiki' by the 'Swapnasandhani' theatre group. Playwright Soumitra Chatterjee has made a Bengali adaptation of the much-loved 'Sleuth' play by foreign playwright Anthony Shaffer in the play 'Tiktiki'. In the world of theatre in the 20th century, veteran playwright Soumitra Chatterjee has been working tirelessly with indomitable dedication and enthusiasm in the pursuit of theatre. He has inspired his creative power in writing original and translated plays and both full-length and one-act plays. The play was first published in Bahurupi Patrika, issue 52, September 1979, and secondly in Vibhav Patrika. Satya Sindhu and his wife Rekha found a companion of thirty-five years to shake off the boredom of their failed married life. The man was Bimal Nandi, new resident of the area. Bimal Nandi's father's name was Jagannath Kangsavanik. His father moved to Kolkata during the partition. His original home was at Faridpur. Even though Satyasindhu was immersed in his own world, the love story between Rekha and Bimal finally reached into his ears. One day, in Rekha's absence, Satya invites Bimal Nandi to his house. Two people of different ages, different classes, different tastes and different mindsets stand face to face in a room of that large house decorated in various ways. Bimal Nandi and Rekha love each other, but Bimal's financial condition was not as prosperous as Satyasindhu's. Satyasindhu prefers to stay in his own imaginary world, afraid to come out into the real world outside. Therefore, he deals with his wife's illicit love and lover in the style of a fictional detective story. Bimal has fallen in love with a very expensive woman and he has no money. In this case, according to Satyasindhu's logic, if he wants to have a married life, he has only one way

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

out, which is to steal those jewels. Bimal completely believes Satyasindhu this time. Satya Sindhu have asked Bimal to play this game in such a way that the government inspector comes and spends his time on this matter, and you will have to do the work in such a way. The black dog will come only after you have stolen; it is called a detective. The language of the underworld, 'tiktiki' is what you call it. Bimal, the lover, joins in this game and gets a kick out of it at first, then uses his 'Gurumara' knowledge to trick Satya Sindhu (Soumitra Chatterjee). Needless to say, Satya Sindhu plays the game like a seasoned player. And Kaushik Sen, who plays Bimal, keeps pace with him. This pairing of the old and the new is enjoyable and educational for the young. As a smart, intelligent comedy, 'Tiktiki' certainly comes off well. But even in that, the production gets a little deeper because it touches on some contemporary issues, problems or relationships. For example, the problem of marital relations or illicit love, the class gap enters into it and complicates it, a sharp joke about police corruption or the fantasy world of detective literature. The comedy at the beginning of the second act is also particularly interesting, especially Bimal's extraordinary disguise, Balaram is at least fifty years old. He wears glasses, has unkempt hair, and a mustache. He wears a police uniform. The director, actor, and makeup designer Sri Das is also a partner in the achievement. At one point, it is almost proven that Satyasindhu has murdered Bimal. The police officer says that he will arrest Satyasindhu for murder. Then Bimal Nandi comes out from behind the makeup of the officer disguise. He wants to take revenge for the extreme humiliation and shame of defeat that Bimal suffered when he came close to death in the first act. Bimal takes that revenge at the end of the play; the play becomes new in another episode. The game starts again. The three-time game ends in today's social emptiness. How he takes it creates a terrible beauty in the play. In this play, Satyasindhu Chowdhury is a rich, aristocratic man. And Bimal is a poor son of a refugee family. Bimal loves Satyasindhu's wife Rekha. He wants to marry her. So, Satya wants to compose a play within the play to punish Bimal. In this way, two men endanger each other by taking control of the same woman, become cruel, ruthless, brutal towards each other, and even become each other's murderers. This play is a report on how jealousy, rivalry, and the attitude of competing with each other make people desperate and endangered, how they push each other towards humiliation and disrespect. The play is not just a spy story, but it is very much like that. Playwright and director Soumitra Chatterjee has beautifully presented the imagination and feelings of the subconscious in the analysis of the psyche of people.

Discussion

প্রবাদ প্রতিম নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের ১৯৪৪-এ রচনা 'নবান্ন' নাটক। ওই বছরেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্যর যুগ্ম নির্দেশনায় এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটকটি মূলত বিষয় ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এরপর ১৯৪৮-এ 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রযোজনায় ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই সময় থেকে বাংলা নাটকের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের যে ধারা নাট্যামোদী আমদর্শক থেকে শুরু করে নাট্য বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত দেখেছেন তাতে সামাজিক, রাজনীতি ও ইতিহাস উপজীব্য নাটক যতটা দেখা গেছে সেভাবে রাজশেখর বসু, শরদিন্দু নতুবা সত্যজিৎ রায়কে নাটকের অঙ্গনে নিয়ে আসা হয়নি। এ বিষয়ে নাট্যামোদী দর্শকের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে 'স্বপ্নসন্ধানী' নাট্যদলের সাম্প্রতিক সময়ের বিখ্যাত রহস্যানুসন্ধানী তথা গোয়েন্দাধর্মীর নাটক 'টিকটিকি'। জনপ্রিয় অভিনেতা কৌশিক সেনের 'স্বপ্নসন্ধানী' নাট্যদলের প্রযোজনায় 'আঁখিপল্লব', 'যদুবংশ'-এরপর 'টিকটিকি' তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা।

এই নাটকটি কেবল গুপ্তচর কাহিনি নয় অথচ অনেকটা সেইরকম। জন মানুষের মনোবিশ্লেণে অবচেতনের কল্পনা ও অনুভূতিকে বাস্তবে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার ও নির্দেশক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। স্বয়ং নাটককার সৌমিত্রবাবু ‘বিভাব’ পত্রিকায় লিখেছেন, -

> “বহুরূপী পত্রিকায় আদি নাট্যরূপটি অনেক আগেই ছাপা হয়েছিল। এখন প্রযোজনায় সময়ের খুঁটিনাটি পরিমার্জনায় যে রূপটি ছাপা হচ্ছে সেটি প্রথমটির সাথে মিলিয়ে দেখলে নাট্যশিক্ষার্থীর কোনো উপকার হলেও হতে পারে এমন বিশ্বাসেই সম্পাদকের অনুরোধে আমি এই পুনর্মুদ্রণে সম্মত হয়েছে।”[১]

এ নাটকটি নাট্যরচনা প্রসঙ্গে অশোকবাবু লিখেছেন, -

> “‘টিকটিকি’ মৌলিক নাটক নয়। এই নাটকের প্রেরণার উৎস অ্যান্থনি শ্যাফার রচিত ‘স্লুথ’ নাটকটি। পরিচালক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় উৎসটিকে স্বীকার করেছেন- এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অ্যান্থনি শ্যাফার রচিত ‘স্লুথ’ কলকাতায় বহুবার প্রদর্শিত হয়েছে। কখনও কখনও নাটকের আকারে, কখনো বা চলচ্চিত্রের আদলে। সত্তর দশকের শেষভাগে, সিগাল এম্পায়রের তত্ত্বাবধানে নাটকটি মঞ্চ হয়েছিল, অবশ্যই মূল ইংরেজিতে।...”[২]

জনপ্রিয় নাটককার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘টিকটিকি’ নাটকটি ‘স্বপ্নসন্ধানী’ নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনার জন্য ‘শিরোমণি’ পুরস্কার পেয়েছে প্রায় সকলেরই জানা। নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, নানা মঞ্চে। ফলত এ নাটকের শিল্প অভিপ্রায় আরও বিশদভাবে জানবার জন্যে ‘টিকটিকি’ নাটকের প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা, নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কুশলী অভিনেতা কৌশিক সেন, এই দুই শিল্পীর মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শিলাদিত্যবাবু, সৌমিত্র বাবুকে প্রশ্ন করেছেন- রূপান্তরের কারণ ও ধরন কী? তিনি জানাচ্ছেন, -

> “যে নাটক অ্যাডপ্ট করতে ইচ্ছে করে, সেটা অ্যাডপ্টেবল কিনা আমাদের সিচুয়েশনে, আমাদের দেশের সঙ্গে তাকে কতটা বদলে সেটাকে নূতন করে ক্রিয়েট করতে পারব, তাকে কতটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেশীয় বলে মনে হবে, সেটা দেখি। এরপর আদর্শগতভাবে বা জীবনদৃষ্টির দিক থেকে আমি যেসব ব্যাপার বিশ্বাস করি, সে-সব ব্যাপারের পরিপন্থী কিনা নাটকটা তা দেখতে হবে এবং সদর্থক দিক থেকে সেরকম কি কি আছে সেটা দেখি। সেখানে স্বভাবতই নাটকটা ওরিজিনালি হয়তো অন্যরকম ছিল, আমি সেটাকে পাল্টেছি। এই নাটকটা একটা ডিটেকটিভ থ্রিলার। কিন্তু আমি সে সাংঘাতিক ডিটেকটিভ থ্রিলারের ভক্ত নই, তবে সাহিত্যের জ্যঁর হিসেবে আমি একে বাদ দিতে পারিনা। ডিটেকটিভ থ্রিলার পড়তে আমার অনেক সময় ভালো লাগে, বিশেষ করে অবসর সময়ে এবং কিছু ডিটেকটিভ থ্রিলার আমি বারেবারে ফিরে ফিরে পড়ি, যেমন রেমন্ড শেন্ডলার এবং বলাই বাহুল্য কোনান ডয়েল।... যেমন আমার দারুণ প্রিয় আরেক ধরনের থ্রিলার, শিকার কাহিনি, জিম করবেট, আমি জীবনে কতবার পড়িছি তার ঠিক নেই।... সত্যসিন্ধু কিন্তু সত্যিকারের খুনী নয়। হি ইজ নট এ মার্ডারার, বাট হি ইজ এ টির‍্যান্ট। এমনই সেই টির‍্যানি, ইট বর্ডারস অন ক্রিমিন্যালিটি। এরকম চরিত্র আমরা আমাদের আশেপাশে সবসময় দেখতে পাই। এমন অনেক স্বামী আছে যারা তার স্ত্রীর ওপর এমন মানসিক অত্যাচার করে যেগুলোকে অপরাধপ্রবণই বলা যায়। অনেক বাবা ছেলের ওপর এরকম অত্যাচার করে। অনেক শাশুড়ি তার পুত্রবধূর ওপর এরকম অত্যাচার করে। সুতরাং এটা জীবনে আছে। মানুষ মানুষকে ছোট করে, মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষকে দুঃখ দেয়। মূলত সেইজন্যই এগুলো আমাকে অ্যাপিল করে, না হলে শুধুমাত্র থ্রিলারের প্যাঁচগুলোর জন্যে এ নাটক আমি করতাম না। ...”[৩]

নাটককার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিদেশি নাট্যকার অ্যান্থনি শ্যাফার-এর বহুজন প্রিয় ‘স্লুথ’ নাটকের বঙ্গীয় রূপান্তর ঘটিয়েছেন ‘টিকটিকি’ নাটকে। তিনি এটি ডিটেকটিভ অবলম্বনে বাংলা রূপান্তর করেন। বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সৌমিত্রবাবু ইতিমধ্যে বার্ল্ট ব্রেখট, ক্লিফোর্ড, ওডেটস, আলবেয়ার কামু, এরলজন, ইভান সার্জেইভিচ তুর্গেনেভ জ্যঁ আনুই, হেনরিক ইবসেন, মার্কিন নাট্যকার লিলিয়ান হেলম্যান, মাইকেল ডাইন্স, জন মিলিংটন সিনজে প্রমুখ বিদেশি নাট্যকারদের নাটক নিয়ে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার লিখেছেন, -

> "এই বছরের এপ্রিল মাসে 'নাট্য সংহতি' নামক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং নাট্যকর্মীদের একটা সংস্থা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। বাংলা থিয়েটারের দুইশো বছর উদযাপন উপলক্ষে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের বর্তমানকালের এক কৃতী পরিচালককে সম্মান ও স্বীকৃতি জানানোর দায়িত্ববোধ থেকেই এই সম্মাননা। লক্ষ্য করার বিষয়, তার অনতিকাল পরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটি কনিষ্ঠ নাট্যদলের প্রযোজনায় পরিচালক, নাট্যকার এবং অভিনেতা রূপে আবির্ভূত হলেন গ্রুপ থিয়েটারের পীঠস্থান আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। নাট্যজগতের কিছু নিষ্ঠাপরায়ণ কুলীন ব্রাহ্মণ এইরকম ছোঁয়াছুঁয়িতে কিছুটা রুষ্ট এবং 'জাত গেল', 'জাত গেল' রবও তুলেছেন। গায়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' ছাপ আছে বলে অনেকে যেখানে পাতি বাংলা সিনেমা-কাহিনি সুলভ নাটক লিখে বা নির্বাচন করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন, এমনকি নাট্যসৃজনের ন্যূনতম যোগ্যতা বা ক্ষমতা না-থাকা সত্ত্বেও নাট্যব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন থিয়েটার জগতে, সেখানে সৌমিত্রবাবুকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান জানাতে কার্পণ্য বা কুণ্ঠা এক ধরনের সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা বা ভণিতা নয় কি? ...একমাত্র এই মানুষটি নির্বোধ, পাগল, জীর্ণ, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কিছুটা বুদ্ধির চর্চা, শিল্পের চর্চা ধারাবাহিকভাবে করে আসছেন। তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে শিশির ভাদুড়ি, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাই তাঁর নাটক নির্বাচন থেকে প্রযোজনায় খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ কিংবা 'লিটল থিয়েটার'-এর শৃঙ্খলা আমাদের বহুবারই মুগ্ধ করেছেন। অপর পক্ষে তিনিও গ্রুপ থিয়েটারের ইনটার‍্যাকশনে যদি কোনো ভালো ফল ফলে থাকে, তার নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।"[৪]

বিংশ শতাব্দীর নাট্যজগতের নাট্যাভিনয়, নাট্যপ্রযোজনায়, প্রবীণ নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমী, অদম্য নিষ্ঠা ও উদ্যম নিয়ে নাট্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি মৌলিক ও অনুবাদক এবং পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক উভয় প্রকার নাটক রচনাতেই তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর লিখিত, সঙ্গীত, মঞ্চ ভাবনা ও নির্দেশিত জনপ্রিয় নাটক 'টিকটিকি'। নাটকটি প্রথম প্রকাশ বহুরূপী পত্রিকায় বাহান্ন সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-এ, দ্বিতীয়বার বিভব পত্রিকায়। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ বইমেলা, ১৯৯৭-এ, আজকাল পাবলিশার্সে। নাটকটির গ্রন্থারম্ভে 'লেখকের নিবেদন', -

> "দুই দশক আগে অভিনেতৃ সংঘের জন্য উৎপল দত্ত 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' নাটকের প্রয়োগের দায়িত্ব নেন। সে নাটকে প্রায় চল্লিশজনের ওপরে অভিনেতা অভিনেত্রীর দরকার হত। ফলে তা বেশি দিন অভিনয় করা সম্ভব হল না। তখন সংঘের সম্পাদক হিসেবে আমি উৎপলদাকে অনুরোধ করি একটি খুব কম ভূমিকালিপির নাটক অভিনেতৃ সংঘের জন্য তৈরি করতে। নানা আলোচনার পরে তিনি Anthony Shaffer এর Sleuth নাটক করতে পরামর্শ দেন। এই নাটকে মাত্র দু'জন অভিনেতা। এই নাটকের একটি চিত্ররূপও হয়েছিল যাতে মাইকেল কেন ও লরেন্স অলিভিয়ের অভিনয় করেছিলেন। সেই দুটি ভূমিকায় যথাক্রমে আমি ও উৎপলদা অভিনয় করব। নির্দেশনার দায়িত্ব নেবেন উৎপলদা। তবে তিনি একটি শর্ত দেন যে এর বন্দিকরণের দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে। সেই প্রয়োজন থেকেই 'টিকটিকি'র রচনা হয়েছিল। কিন্তু সংঘ থেকে শেষপর্যন্ত 'টিকটিকি'র অভিনয় করা সম্ভব হয়নি। ...ইতিমধ্যে টিকটিকি চলচ্চিত্রায়িত করার কথাও ভাবা হয়েছিল। তাতে উত্তমকুমার ও আমি অভিনয় করব এমন প্রস্তাব ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও বাস্তবায়িত হয়নি। তারপর দু'দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। যথাযোগ্য অভিনেতা নির্বাচনের সমস্যা থাকার জন্যেই 'টিকটিকি' প্রযোজনা করা যায়নি। এতদিন পরে যখন 'স্বপ্নসন্ধানী' গোষ্ঠী থেকে এই নাটক প্রযোজনা করা গেল তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে বয়স্ক চরিত্রে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> চলে আসতে হল এবং অল্পবয়সের চরিত্রের জন্যে নির্বাচন করতে হল স্বপ্নসন্ধানীর তরুণ অভিনেতা কৌশিক সেনকে।...”[৫]

এ নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ২৮ মে ১৯৯৫-এ, স্বপ্নসন্ধানী নাট্যদলের প্রযোজনায় ও নট নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ ভাবনা, সঙ্গীত, নির্দেশনায় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এ মঞ্চস্থ হয়। স্বপ্নসন্ধানী নাট্য সংস্থার জন্ম ২৯ মে ১৯৯২-এ। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করেন অভিনেতা কৌশিক সেন। স্বপ্নসন্ধানীতে একমাত্র ‘টিকটিকি’ ব্যতীত রেখে সমস্ত নাটকের নির্দেশনা করেন কুশলী অভিনেতা কৌশিক সেন। নাটকটিতে সত্যসিন্ধু চৌধুরীর ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিমল নন্দীর চরিত্রে কৌশিক সেন। এঁরা অত্যন্ত চমৎকার কুশলতার সঙ্গে অভিনয় করে আমদর্শক ও সমাজের জ্ঞানীগুণী বিদ্বৎমণ্ডলীদের বহু ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন। ব্যারাকপুরের রিভারসাইড রোডের একটি পুরোনো ইংরেজ আমলের বিশাল বাড়ির মালিক সত্যসিন্ধু চৌধুরী। বাড়িটি উঁচু সিলিং, বড় দরজা-জানালা, একটি পুরোনো ধরনের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। তার ল্যান্ডিং-এর কাছে জানালা-বাইরে বাগান। মধ্যবয়স্ক অভিজাত চেহারা। পোশাকে, আশাকে ‘পাক্কাসাহাব’ ভাবের পরিচয় আছে। এই মানুষটির সময় কাটে গোয়েন্দা কাহিনি লিখে ও পড়ে। এছাড়াও রয়েছে বাড়ি ভর্তি নানান খেলার সরঞ্জাম, যা খেলতে লাগে তুখোড় বুদ্ধি একদিকে গোয়েন্দা কাহিনির কাল্পনিক আবরণী, অন্যদিকে নানান যুক্তি ও বুদ্ধির খেলা সত্যসিন্ধুকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করে দেয় জীবনের মূল স্রোত থেকে-এমন কি তাঁর কমবয়সী সুন্দরী স্ত্রী রেখার থেকেও। নাটকটি রহস্য কাহিনি নয়। তবে রহস্য এখানে পুরোপুরিই রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গল্প। এই দুটো মাত্র চরিত্রের এক অসাধারণ নাট্যবিন্যাস। নাটকের প্রথমেই সত্যসিন্ধু, ইন্সপেক্টর ভরদ্বাজের উদ্দেশ্যে বলেন, -

> “...ভয়ংকর খুনি ডা. সোম গ্রেফতার হইয়াছে। যে জিমনাশিয়াম রহস্য লইয়া সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেন্ট উথালপাথাল হইতেছিল গতকাল রাত্রে তাহার অবসান হইয়াছে। রোহিতাশ্ব সেনের কৃতিত্বেই অপরাধীকে ধরা সম্ভব হইয়াছে। আজ সকালে মূল্যবান গ্রন্থরাজিশোভিত রোহিতাশ্বের লাইব্রেরি ঘরের বহুমূল্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলে রোহিতাশ্বের সম্মুখে বসিয়া নির্বাক বিস্ময়ে রহস্যভেদের আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন। রোহিতাশ্ব থামিতেই বলিলেন ‘হুম’। রোহিতাশ্ব ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়া পায়ের নিকট শায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন জার্মান শেপার্ড বাঘাকে একটু আদর করিতে লাগিল। বাঘা লাঙ্গুল আন্দোলনে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিল। ভরদ্বাজের হুম শুনিয়া একবার বুঝি কান খাড়া করিল। ভরদ্বাজ বলিলেন- ‘সবই তো বুঝলাম রোহিতাশ্ববাবু- কিন্তু বডি পাওয়া গেল জিমনেশিয়ামের ছাদে- অথচ সিঁড়ির তালা সেদিন সন্ধে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ খোলেনি। কোনও দেওয়ালের ধারেকাছে কোনও পায়ের দাগ পাওয়া যায়নি। এ রহস্যটার তো কিছুতেই মর্মোদ্ধার করতে পারছি না।’ গোয়েন্দা রোহিতাশ্বের গৌরবর্ণ সৌম্যমুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে বলিতে লাগিল - ‘পুলিশই যদি এ রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে পারত মিস্টার ভরদ্বাজ, রোহিতাশ্বের কাছে কি তা হলে আপনারা আসতেন?... ডা. সোম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একজন দুর্ধর্ষ অ্যাথলিট ছিলেন। পোল ভল্টে একসময় তাঁর রেকর্ড ছিল। তিরিশ বছরে তাঁর চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও পোল ভল্টের দক্ষতা এতটুকু হ্রাস পায়নি। তাই বন্ধুকে গলা টিপে খুন করে তাঁর দেহ পিঠের ওপর নিয়ে ওই জিমনাশিয়ামেরই একটি পোল ভল্টের লগি বের করে নিয়ে দেহসুদ্ধ এক লাফে ছাদে উঠে গিয়ে মৃতদেহ ছাদে ফেলে আসতে তাঁর কোনও অসুবিধেই হয়নি। এবং নামার সময় আবার সেই লগি দিয়ে বিশ-তিরিশ হাত দূরে লাফিয়ে পড়াতে দেওয়ালের ধারেকাছে তাঁর পায়ের কোনও দাগই পড়েনি। এই হল রহস্যের আসল মর্মোদ্ধার, বুঝলেন মি. ভরদ্বাজ?”[৬]

সত্যসিন্ধুও তার স্ত্রী রেখা তাঁদের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের অবসাদ ঝেড়ে ফেলতে রেখা খুঁজে পায় এক পঁয়ত্রিশ বছরের সঙ্গী। ওই অঞ্চলের এক নতুন বাসিন্দা বিমল নন্দী। সে ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করে, তার তিনটে অ্যামব্যাসাডার

গাড়ি আছে। এখন থাকেন গ্যারেজ-এ আসলে সেটা একটা পুরনো বাংলোর কম্পাউন্ড। বাংলোটা সাবলেট করে দিয়েছে, একটা ঘর খালি করে সেইখানেই থাকেন। পুরোনো বাড়িটা একজন সাহেবের, ঘরের ভেতরে সিলিং খুব উঁচু উঁচু ছিল। বিমল নন্দীর বাবার নাম জগন্নাথ কংসবণিক। সে দেশভাগের সময় বাবা কলকাতায় চলে আসেন। তার আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুর। পিতার পদবী সম্পর্কে সত্যসিন্ধু ও বিমলের সংলাপে উঠে আসে, -

> "সত্য : তা হলে তুমি নন্দী কী করে হলে?
> বিমল : আমরা আসলে কাঁসারি। বাবা কিন্তু স্যাকরার কাজ করতেন। কলকাতায় আসার পরে বাবা কিছুই করতে না পেরে শেষে বিষ্ণুপুরে গিয়ে একটা ছোট্ট দোকান দিয়ে বসেন। সেইখানেই একজন মুন্সেফের বাড়িতে বাবা কাজ করতেন, তাঁকে ধরে আমাকে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলে ভরতি করে দেন। তার আগে বিষ্ণুপুরে একটা স্কুলে আমি ভরতি হয়েছিলাম- সেখানে আমার ক্লাসের ছেলেরা আমায়- ডালের মধ্যে খেসারি, মানুষের মধ্যে কাঁসারি- এই বলে ভীষণ খেপাত। আমার খুব লজ্জা করত। সৈনিক স্কুলে যাওয়ার আগে বাবাকে বললাম- 'বাবা আমার পদবিটা বদল করে দাও।' বাবা বললেন- ওরে, জন্ম জন্ম ধইরাই তো আমরা কাঁসারি। এইখানে যেমন কংসবণিকেরা কেউ দে, কেউ দত্ত, কেউবা নন্দী বইলা পরিচয় দেয়, আমগো পালঙে তো তেমন নয়। তা এই দ্যাশেই যখন থাকতি হইব তখন এই দ্যাশের মতোই না হয় তর নাম বিমল চন্দ্র নন্দী হউক আইজ থেইকা।"[৭]

সত্যসিন্ধুর নিজস্ব জগতে ডুবে থাকলেও কানে শেষ পর্যন্ত রেখা-বিমলের প্রেমোপাখ্যান এসে পৌঁছয়। একদিন রেখার অনুপস্থিতিতে সত্য তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাই বিমল নন্দীকে। বিচিত্র সাজে সজ্জিত ওই বিশাল বাড়ির একটি ঘরে মুখোমুখি দাঁড়ায় দুটি ভিন্ন বয়সের ভিন্ন শ্রেণির ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন মানসিকতার দুটি মানুষ। বিমল নন্দী ও রেখা একে অপরকে ভালোবাসে, কিন্তু বিমলের আর্থিক অবস্থা সত্যসিন্ধুর মতো স্বচ্ছল নই। তাই সত্যর স্ত্রী রেখা যেভাবে জীবনযাপন, ভোগ-বিলাসে কাটিয়েছে সেভাবে বিমল রেখাকে খুশিতে রাখতে পারবে কিনা- তাদের কথোপকথনে পাই, -

> "সত্য : দেখো ভাই বিমল - লেট আস হ্যাভ নো মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং। রেখাকে তোমার বিয়ে করাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তোমরা দুটিতে জোড় বাঁধলে আমার থেকে সুখী আর কেউ হবে না। কিন্তু জোড়টা একটা একদম কলমের জোড় হওয়া চাই- পাকাপোক্ত জোড়। আমি রেখার হাত থেকে জন্মের মতো রেহাই পেতে চাই- নন্দী ট্রান্সপোর্টের গাড়িতে দু'-এক সপ্তাহের বাইরে যাওয়া নয়। নানা- তুমি আমার কথাটা শোনো।... তোমায় বলছি শোনো- কোনও কারণে- কারণ বলতে ধরো এক মাস ওর হাত-খরচের ক্যাশ শর্ট পড়ল- কিংবা বেড়াতে যেতে চাইলে কুলু মানালি, না নিয়ে গিয়ে তুমি ওকে মধুপুর নিয়ে গেলে- এই রকম কোনও কারণে ও যদি তোমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ে তা হলে দেখবে ও হুট করে তোমাকে ছেড়ে আমার গলায় এসে ঝুলে পড়বে। এবং স্ত্রী হিসেবে সে যত অপরাধই করে থাক না কেন আমি তো আর তখন তাকে ফেলতে পারব না!
> বিমল : ওরকম নদের নিমাই-এর মতো কথা বলবেন না তো- মেরেছিস কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না? কুলু মানালি কাশ্মীর আমি তাকে বেড়াতে নিয়ে যাব না। কিন্তু সেজন্য আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।...
> বিমল : ...এই যে এত চট করে তুমি ব্যবসা দাঁড় করাতে চেষ্টা করছ এটা জেনেও কি রেখা তার চালচলন কিছুমাত্র পাল্টবার চেষ্টা করেছে? এই গত তিন মাসের স্বর্গসুখের জন্যে সে নিজের কোন সুখটা ছেড়েছে বলতে পারো? নো, নো, আই অ্যাম নট জোকিং- গত তিন মাসে তোমার কত টাকা জলে গেছে বলো তো? ১৫ হাজার ২০ হাজার ২৫ হাজার? আর সেই ফরিদপুরে তোমার বাবা- তাঁকে কতদিন টাকা পাঠাতে পারোনি? অ্যাঁ? শেষ কবে টাকা পাঠিয়েছিলে? নিশ্চয়ই রেখার সঙ্গে আলাপের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> আগে? এই বার বুঝতে পারছ কেন এত কথা ভাবছি? তোমায় বলে দিচ্ছি, ও তোমার সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দেবে।...
> বিমল : হ্যাঁ, টাকাপয়সা নিয়ে আমাদের প্রায়ই কথা হয়। আমি বলেছি আমরা বড্ড বেশি খরচা করছি।...
> সত্য : অ্যাই। এখন এই ছোট প্রবলেমটা সল্ভ করার জন্যেই আজ তোমাকে আমি এখানে ডেকেছিলুম। এবং এই জায়গাতেই লেখকদের ভাষায় রহস্য ঘনীভূত হয়ে চলেছে।... বসো বসো- তোমায় কয়েকটা কথা বলি। একদা এই কলকাতা শহর যাদের জমিদারি ছিল, সেই সাবর্ণ চৌধুরী বংশের এক সন্তান সত্যসিন্ধু চৌধুরী, জমিদারি বিলোপ আইন, ইনকাম ট্যাক্স, ওয়েলথ ট্যাক্স, এস্টেট ডিউটি, ডেথ ডিউটি প্রভৃতির কল্যাণে হৃতবৈভব হইয়া আসিতেছিলেন। সর্বস্বান্ত হইবার আগে তাঁহার অ্যাটর্নি ও অ্যাকাউন্ট্যান্টদের পরামর্শে তিনি তাঁহার কাঁচা টাকার বেশ বড় একটা অংশ সুবর্ণ ও হীরক ইত্যাদি মহামূল্য প্রস্তরের অলংকারে পরিণত করেন। তাঁর স্ত্রী স্বভাবতই এতে পুলকিত হন।
> বিমল : আপনি কি তাকে এগুলো উপহার দিয়েছিলেন?
> সত্য : কস্মিন কালেও না। এগুলো আমার- এবং আমি ভেবেছিলুম ও এগুলো পরলে তো কোনও ক্ষতি নেই- পরুক না। ও পরত এবং ওর হেফাজতেই ওগুলো থাকে। আফটার অল পুরোটাই তো ইনশিয়োর করা।
> বিমল : রহস্য ঘনীভূত হয়ে আসছে বলতে কী বোঝাতে চাইছিলেন এইবার বুঝতে পারছি। ডিটেকটিভ গল্পে ইনশিয়োরেন্সের কথা এলেই রহস্য ঘনীভূত হয়।
> সত্য : যাক। আমার কতাটা যে সোজাসুজি ধরতে পারলে এতেই আমি খুশি। আমি চাই তুমি ওই গয়নাগুলো চুরি করো। আজই করতে পারো - রেখা নেই বাড়িতে - প্রশস্ত সময়।”[৮]

সত্যসিন্ধু তার স্বকল্পিত জগতেই থাকতে পছন্দ করে, বাইরেকার বাস্তব জগতে বেরিয়ে আসতে ভয় পায়। তাই স্ত্রী-র অবৈধ প্রেম এবং প্রেমিকের সঙ্গে সে মোকাবিলা করে অলীক গোয়েন্দা গল্পের কায়দায়। একেবারে সত্যিকারের ক্রাইম যদি না দিতে পারতাম তা হলে রোহিতাশ্ব সেন। আমার ডিটেকটিভ। রোহিতাশ্বের সৌম্য গৌরবর্ণ চেহারা ও তার বর্ণনা তো লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখস্থ। তাহার নাশারন্ধ্র যেন রহস্যের গন্ধ পায়। সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যে স্থানের রহস্যের কিনারা করতে পারে না রোহিতাশ্ব সেখানে অনায়াসে অপরাধীকে ধরিয়ে দেয়। বিমল একটি অত্যন্ত খরুচে মহিলার প্রেমে পড়েছে - আর তার কাছে টাকা নেই। এক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন পাততে হলে সত্যসিন্ধুর যুক্তি অনুযায়ী তার কাছে একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হল ওই গয়নাগুলো চুরি করার কথা বলেন। বিমল, সত্যসিন্ধুর কথা এইবার পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেয়। বিমল ও সত্যসিন্ধুর কথোপকথনে উঠে এসেছে, -

> “বিমল : দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কাছে হয়তো খেলা খেলা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আপনি খেলা করছেন এটা বুঝতে পারছেন?
> সত্য : তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা আমি করছি না। আমি শুধু তোমার জীবন এবং আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানের মধ্যে একটু রোমান্স সঞ্চার করতে চাইছি।”[৯]

সত্যসিন্ধু, বিমলকে এই খেলা এমনভাবে খেলতে বলেছেন যাতে সরকারি ইন্সপেক্টর এসে এই ব্যাপারটা মাথা খরচ করে সেইভাবে তোমাকে কাজটা করতে হবে। তোমার চুরি করার পরই আসবে কালাকুত্তাটি; একে বলে ডিটেকটিভ। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভাষা, তোমাদের ভাসায় ‘টিকটিকি’। তাই চুরি করা কৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে পিলিশ সত্যিকারের চুরি ভাবে। সত্যসিন্ধু বলেন প্রথমে বিমল তোমাকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে, বাগানের কাঁচা মাটিতে তোমার পায়ের ছাপ পড়লে চলবে না, টিপিক্যাল চোরের পোশাক পড়তে হবে। যাতে শহরতলির ধনীগৃহে কাবুলি ডাকাতের গরাদ ভাঙিয়া চাঞ্চল্যকর ডাকাতি; শহরে উত্তেজনা ও ভীতির সঞ্চার, পুলিশ হতচকিত হয়। বিমল আলমারি খুলে একটা বড়

গয়নার বাক্স পায়। বাক্সটা খুলে দেখে ভিতরে বহুমূল্য গয়না-মণিমুক্ত। বিমল মুগ্ধ, হাতে নিয়ে দেখতে থাকে। আলোর ঠিকরে সেগুলো ঝলমল করে ওঠে। বিমল চিন্তা করতে করতে, -

> "...বেচারা বাবা- চিনির বলদের মতো সারাটা জীবন ঠুকঠুক করে গয়না তৈরি করে গেল- অথচ এসবের মালিক হবার যে কী মানে তা কোনওদিন বুঝতে পারল না। অন্ধকার ঘুপচি ঘরে ঘাড় গুঁজে বেঁকে দুমড়ে বসে একটা জন্তুর মতো কাজ করছে- দিন নেই রাত নেই, টিকলি টায়রা কানপাশা রতনচূড় করতে করতে চোখের জ্যোতি ঘোলাটে হয়ে আসছে। কেন? না, আমাকে ইস্কুল-কলেজে পড়াবে- নিজে পড়তে পায়নি- আমাকে লেখাপড়া শেখানোটা তার কর্তব্য- তার যেন একটা ঋণ। আমার কাছে ঋণ, যে দেশে এসেছি সেই নতুন দেশের কাছে তার ঋণ! ছেলেকে এ দেশের মতো করবে। বেচারা!"[১০]

এ নাটক প্রসঙ্গে স্বয়ং অভিনেতা কৌশিক সেন লিখেছেন, -

> "টিকটিকি নাটকে বিমল নন্দী চরিত্রটি করতে করতে একটা পর্যায়ে আমার সেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। একটা দীর্ঘ সংলাপ বলার সময়, আমি বুঝতে পারছিলাম মহড়া চলাকালীন, আমি নিজেকেই প্রকাশ করে ফেলছি, বিমল নন্দী-কে নয়। একটা গয়না ভর্তি বাক্স খোলার পর যখন মধ্যবিত্ত, ছোটখাটো ব্যবসায়ী বিমল নন্দীর চোখ ঝলসে যায়, তার মনে পড়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা তার স্বর্ণকার বাপের কথা। অন্যের চুড়ি, হার, কানের দুল গড়তে-গড়তে যার পিঠ বেঁকে গিয়েছে, চোখের জ্যোতি ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে, সেই গরীব পিতার কথা- যে, খুব কষ্টে তার ছেলেকে মানুষ করেছে। এমন আবেগপূর্ণ সংলাপ বলার সময় আমি তো স্তানিস্লাভস্কি বর্ণিত 'emotional memory'-র তত্ত্বকে বদহজম করে খুব চোখের জলটল ফেলছি, কিন্তু বুঝতে পারছি- হচ্ছে না, চরিত্রটা বলছে না, কৌশিক বলছে কথাগুলো। সৌমিত্রবাবু বোঝালেন কোথায় ভুলটা হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে আমার জীবনের প্রথম অভিনয় শিক্ষক, আমার বাবা শ্যামল সেন প্রয়াত হন। ১৯৯৫ সালে 'টিকটিকি' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার বছরে ওই জায়গাটায় অভিনয় করতে গিয়ে আমার খালি বাবার মুখটা মনে পড়ছে, চোখে জল আসছে। কিন্তু 'বিমল নন্দী' আর 'কৌশিক সেন' তো এক ব্যক্তি নয়। তাদের ইমোশনাল জার্নিও আলাদা। সুবিধা হচ্ছে বলে ব্যক্তিগত 'ইমোশন' চরিত্রের উপর প্রয়োগ করা যে ভুল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে শেখালেন।"[১১]

ব্যাপারটা যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তাই বিমল একটা পাজ্যস্ট্যাণ্ড উল্টে রাখে ছোট টেবিল সোফার গায়ে হেলান দিয়ে দেয়। সত্যসিন্ধু একটা টেবিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, একটা ড্রয়ারের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে, বুককেস থেকে বই ফেলে দেয়। এরপর সত্যসিন্ধু বিমলকে কোনও অবকাশ না দিয়েই ধরে ফেলে ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয়- আর জিনিসপত্তর পড়তে থাকে। বিমল এই অদ্ভুত পোশাকে খুব বেকায়দায় পড়ে যায়। এ তো সেটল্ড ম্যাচ বিমল ঘাবড়াচ্ছ কেন? এবার তুমি আমাকে অচৈতন্য করে ফেল। কারণ পুলিশ এলে তো আমাকে মাথায় একটা সত্যিকারের আঘাত দেখাতে হবে। একটা কাজ করতে পারো আমার, হাতপা বেঁধে কাপড় মুখে গুঁজে ফেলে রেখে যেতে পারো- সকালে ঝি কাজ করতে এসে আমায় সেই অবস্থায় আবিষ্কার করবে বা তুমি আমাকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখাতে পারো- আজকাল common criminal-দের কাছে অনেক সময়ই ফায়ার আর্মস থাকে। বলতে বলতে সত্যসিন্ধু বিমলের মাথার দিকে তাক করে। সত্য সহসা পিস্তল তুলে গুলি করল। একটা জিনিস ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বিমল চমকে তাকায় এবং সভয়ে বুঝতে পারে গুলিটা তার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে। সত্য হঠাৎ ভাব পরিবর্তন করেন আর বিমল নার্ভাস ভাবে হাসে। বিমল ও সত্যসিন্ধুর কথোপকথনে উঠে আসে, -

> "...বিমল : তার মানে এই আপনার স্ত্রীর গয়না চুরি করানোর ব্যাপারটা নেহাতই একটা...
> সত্য : নিশ্চয়ই। আমি যে আজ তোমাকে এখানে ডেকে এনেছিলাম তার কারণটা হল তোমার নিজের যে অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে সে অবস্থাটা যাতে তুমি নিজেই তৈরি করে দিতে পারো। বাড়ি ভেঙে ঢোকা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ছদ্মবেশ ধারণ, তোমার পকেটের সোনাদানা- গৃহস্বামীর অতর্কিত প্রবেশ ধস্তাধস্তিতে পিস্তলের গুলি ছুটে যাওয়া এবং সব শেষে একটি অব্যর্থ গুলিতে তোমার মৃত্যু। আমি এমনকী এই সাহসের জন্যে একটা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারি। পরিকল্পনাটার ভেতরে কোথাও কোনও ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি?
> বিমল : [মরিয়া হয়ে] রেখা! পুলিশ আমার সঙ্গে রেখার যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা জানতে পারবেই।...
> সত্য : ...সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার এদেশে আইনত স্বীকৃত এবং একটি অপরাধীর জীবনের চেয়ে সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে আইন অনেক বেশি তৎপর। এমনকী রেখাও ভাববে যে তুমি আসলে একটি ফেরেপবাজ যুবক, তার গয়নাগুলোর দিকে চোখ রেখে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছিলে- একটা ছিঁচকে চোর, বিয়ে নয়, চুরির মতলব নিয়ে তুমি তার সঙ্গে মিশছিলে। অতএব মি. নন্দী, তোমার ভবলীলা সমাপ্ত।”[১২]

এটা ডিটেকটিভ গল্প নয় মিস্টার চৌধুরী দয়া করে একটু সুস্থ মাথায় ভবুন, এটা বাস্তব জীবন। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আপনি সত্যি সত্যি খুন করার কথা বলেছেন - এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন? সত্যসিন্ধু গলফ ব্যাগ থেকে ওটা বের করতে থাকে। বিমল ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে যায়। সত্য বিমলের পিঠে পিস্তল ধরতেই চমকে কেঁপে ওঠে ভয়ে। বিমল কাঁপা হাতে মুখোশটা পড়ে নেয়। সত্য পিস্তলটা বিমলের মাথায় ধরে সে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। সত্যসিন্ধু আসতে করে ট্রিগারটা টেনে দেয়। বিমল সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ে যায়। সত্যসিন্ধু যেন নিজের কৃতিত্বে খুশি হয়েছে। মুখে তার হাসি ফুটে ওঠে।

প্রেমিক বিমল এই খেলায় শামিল হয়ে প্রথমটায় নাকানি-চুবানি খায়, তারপর গুরুমারা বিদ্যার প্রয়োগে কাত করে সত্যসিন্ধুকে। বলা বাহুল্য সত্যসিন্ধু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) পাকা খেলোয়াড়ের মতোই খেলাটা খেলেন আগাগোড়া। আর তার সঙ্গে সামনে তাল দিয়ে যান বিমলরূপী কৌশিক সেন। প্রবীণ-নবীনের এই যুগলবন্দি উপভোগ্য, তরুণদের কাছে শিক্ষণীয়ও বটে। একটি স্মার্ট, বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি হিসাবে ‘টিকটিকি’ অবশ্যই ভালোভাবে উতরে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও সমসময়ের কিছু বিষয়, সমস্যা বা সম্পর্ককে স্পর্শ করে যায় বলে প্রযোজনাটি খানিকটা গভীরতর মাত্রা পায়। যেমন- দাম্পত্য সম্পর্ক বা অবৈধ প্রেমের সমস্যা, তার মধ্যে শ্রেণিগত ব্যবধান ঢুকে পড়ে তাকে জটিল করে তোলে, পুলিশের দুর্নীতি কিংবা গোয়েন্দা- সাহিত্যের কল্পনাজগৎকে নিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ ঠাট্টা। একতলার সেটটি পরিচালক সাজিয়েছেন চমৎকার, বিশেষ করে নানান আসবাব এবং খেলনার সংস্থাপন, নাবিক-পুতুলটির নড়াচড়া-হাঁটা। বিমল আর সত্যসিন্ধুর সাজানো লড়াই বিমলের ক্লাউনের পোশাক পরা ঘরময় শাড়ি-কাপড় বা কাগজ ছড়িয়ে দেওয়া- ধীরে ধীরে যতই পরিণতির দিকে এগোয়, ততই কৌতুক থেকে আতঙ্ক বা আকাঙ্ক্ষায় ভরে ওঠে দর্শকমন। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেও কৌতুক বিশেষ করে বিমলের অসাধারণ ছদ্মবেশ, বলরামের বছর পঞ্চাশেক অন্তত বয়স। চোখে চশমা কাঁচাপাকা চুল, গোঁফ। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা। যার কৃতিত্বের অংশীদার পরিচালক, অভিনেতা এবং রূপসজ্জা পরিকল্পক শ্রী দাস। ইন্সপেক্টর বলরাম গুপ্ত কবিরাজ ও সত্যসিন্ধুর সংলাপে উঠে আসে, -

> “বলরাম : অ। আচ্ছা মি. চৌধুরী, মি. নন্দী যখন এইখান থেইকা গ্যালেন গিয়া তখন কি তিনি কিছু কইছিলেন?
> সত্য : না। ও তো হতবাক। [হাসতে থাকে] একটা কথা নেই মুখে- প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।
> বল : মি. চৌধুরী, জানি না ক্যান আপনার এইটারে তামাশা মনে হইত্যাছে- আমরা কিন্তু ঘটনাটি ঠিক তামাশা বইলা নাও ভাবতে পারি।
> সত্য : আচ্ছা, আপনি ব্যাপারটা আমার দিক থেকে ভেবে দেখছেন না কেন বলুন তো? এক হিসেবে বিমল তো সত্যিই একটা চোর- সে আমার বউ চুরি করেছে-
> বল : সে লেইগা আপনি তার উপরে এই অমানুষিক অত্যাচার করলেন?
> সত্য : [ফেটে পড়ে] আপনি কি বুঝতে পারেননি ওটা ছিল একটা খেলা?

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বল : খেলা?...
সত্য : দেখুন ইন্সপেকটর- আমি আমার জীবনে এমন সব জটিল বুদ্ধির খেলা খেলেছি যে খেলা খেলতে ডাকলে সত্যেন বোস, আইনস্টাইন গর্ববোধ করতেন। Games of construction, Games of destruction, Games of hazard, Games of callidity. Deductive logic, inductive logic, semantics, color association, Mathematics, hypnosis থেকে আরম্ভ করে ম্যাজিক ভানুমতীর খেলা অবধি আমি বহু খেলা খেলেছি। এর মধ্যে দিয়ে মনের যে প্রসারতা- আত্মার যে উপলব্ধি আমি অর্জন করেছি তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারেন না।"[১৩]

সত্যসিন্ধুর বাড়ির সিঁড়িটা বলরাম খুঁটিয়ে দেখতে পাই রক্ত, রক্তটা শুকিয়ে গেছে, রক্ত কার্পেটটা কেউ ঘষছিল স্যার, এখন ভিজা রয়েছে। বাগানের মধ্যে মাটিটা স্তূপ করে রাখা আছে আপনি বলেননি স্যার। আলমারির ভেতর থেকে বিমলের শার্ট বের করে, শার্টের পকেট থেকে একটা চিঠি বিমল নন্দীর নামে, চিঠিটার লেখাগুলো তো আপনার স্যার। সত্যসিন্ধু একেবারে ঘাবড়ে ভেঙে পড়েছে প্রায়। আমাকে বিশ্বাস করুণ জামাকাপড়গুলো ওখানে কীভাবে এল সত্যি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুণ মি. নন্দী (চিৎকার করে) সুস্থ দেহে হেঁটে ও এখান থেকে জ্যান্ত ফিরে গেছে। তাঁদের কথোপকথনে পাই, -

"বল : আমি দুঃখিত সার- কিন্তু আপনেরে না লইলে চলব না। বাইরে একগো পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করত্যাছে।
সত্য : [জোরে চিৎকার] বাইরে লক্ষটা পুলিশের গাড়ি থাক, আমি যাব না।
বল : দ্যাখেন, অযথা ট্রাবল কইরা কুন লাভ আছে কি? দয়া কইরা আমাগো কামটা ডিফিকাল্ট কইরা দিয়েন না সার।"[১৪]

একসময় প্রায় প্রমাণ করে ফেলে যে সত্যসিন্ধু বিমলকে খুন করেছে। পুলিশ অফিসার খুনের দায়ে সত্যসিন্ধুকে গ্রেপ্তার করবে বলেন। তারপরেই অফিসার ছদ্মবেশের মেকআপ-এর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিমল নন্দী। বিমল প্রথম অঙ্কে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায় তার যে চরম অপমান ও হারের লজ্জা তার প্রতিশোধ নিতে চায়। সেই প্রতিশোধ বিমল নিচ্ছে নাটকের শেষে, নাটক আর এক পর্বে নতুন হয়ে ওঠে। আবার খেলা শুরু হয়। তিনবারের খেলা শেষ হয় আজকের সামাজিক রিক্ততায়। কীভাবে নিচ্ছে সেইটাই নাটকের মধ্যে ভয়াভহ এক চমৎকারিত তৈরি করে দিয়েছে। তাদের কথাবার্তায় উঠে আসে, -

"সত্য : কী শয়তান তুমি!
বিমল : বিলক্ষণ।
সত্য : উফ্ - কী ধড়িবাজ বদমায়েশ তুমি।
বিমল : ধন্যবাদ।
সত্য : ধন্যবাদ! পাজি ছুঁচো কোথাকার।
বিমল : তা তো বটেই।
সত্য : জোচ্চোর, ভণ্ড। বুজরুক।
বিমল : তাই নাকি?
সত্য : তাই বলে ভেবো না তোমার খেলাটা আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি না- দারুণ হয়েছে- ব্রিলিয়ান্ট-
বিমল : থ্যাংক ইউ।
সত্য : হ্যাভ এ ড্রিংক, মাই ডিয়ার ফেলো।
বিমল : আগে এগুলো একটু তুলি। সর্বাঙ্গে মেক-আপ আর স্পিরিট গাম লেগে রয়েছে - বাথরুমটা?..."[১৫]

শেষপর্যন্ত অবশ্য সত্যসিন্ধু, বিমলকে গুলি করে খুন করে। আর তাদের সংলাপে উঠে এসেছে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সত্য : আমার অভিরুচি আমি তোমাকে গুলি করে মারব। তুমি আমার বাড়িতে ঢুকে আমার বউকে বের করে নিয়ে যাবার পারমিশন চাইবে- আমার পুরুষত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করবে - মিউজিয়ামের জগৎ নিয়ে লেকচার দেবে - রোহিতাশ্বকে ঠাট্টা করবে- আর আমি কিছু বলব না? ওয়েল, এবারের গুলিগুলো কিন্তু রিয়েল বুলেট।
> বিমল : আমি বাড়ি যাচ্ছি। [বিমল চলে যেতে যায়- সত্যসিন্ধু গুলি করে। বিমল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে পড়ে যায়। সত্যসিন্ধু তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা তুলে ধরে বলতে থাকে।]
> সত্য : মিথ্যেবাদী! তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ। শুনতে পাচ্ছ- তুমি একটা বোকা খেলোয়াড়- বোকার মতো এক খেলা পরপর তিনবার খেলতে নেই- [বাইরের দরজায় বেল বেজে ওঠে।]
> কণ্ঠস্বর : আমরা থানা থেকে আসছি- দরজাটা একটু খুলুন-
> বিমল : খেলাটায় আমারই জিত হল।"[১৬]

'টিকটিকি' নাটকটি ১৯৯৫-এ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য এশিয়ান পেইন্টস্ শিরোমণি পুরস্কার পাই। ওই বছরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি দেয় নাট্য নির্দেশক কৌশিক সেনকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যতাত্ত্বিক বিভাস চক্রবর্তী লিখেছেন, -

> "সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সত্যসিন্ধু) পাকা খেলোয়াড়ের মতোই খেলাটা খেললেন আগাগোড়া। আর তাঁর সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে যান বিমলরূপী কৌশিক সেন। প্রবীণ-নবীনের এই যুগলবন্দী উপভোগ্য, তরুণদের কাছে শিক্ষণীয়ও বটে। একটি স্মার্ট বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি হিসাবে 'টিকটিকি' অবশ্যই ভালোভাবে উতরে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও সমসময়ের কিছু বিষয়, সমস্যা বা সম্পর্ককে স্পর্শ করে যায় বলে প্রযোজনাটি খানিকটা গভীরতর মাত্রা পায়।"[১৭]

নট নাট্যকার স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন যে, -

> "আমি এখনও বিশ্বাস করি যে টিকটিকি আদতে পাবলিক থিয়েটার নাটক - কমার্শিয়াল থিয়েটার- entertainment at a very high level কিন্তু সবরকম লোকই ওতে entertainment হয়েছে।"[১৮]

বঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক পবিত্র সরকার লিখেছেন, -

> "...কিন্তু নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে সতর্ক, সচকিত, স্তম্ভিত ও আলোড়িত করে রাখে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়। নির্দ্বিধায় বলি, এতটা প্রত্যাশা নিয়ে যায়নি। সৌমিত্র বড় অভিনেতা জানি, কিন্তু অনুভব ও অভিব্যক্তির এমন বিস্তার ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রে তাঁকে কখনও দেখিনি বলেই তাঁর সামর্থ্য যে কোথায় পৌঁছাতে পারে সে শিক্ষার জন্য এই নাটক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। তাঁর কণ্ঠস্বরের অনায়াস ওঠানামা, কৌতুক, উচ্ছ্বাস, ভয়, গাম্ভীর্যের দ্রুত চঞ্চল আলোছায়া, অনুপস্থিত নানা চরিত্রের বিচিত্র অভিনয়, আতঙ্কে মুখেচোখের ভাঁজে হঠাৎ বার্ধক্য নেমে আসা- দর্শকদের জন্য অন্তহীন স্বাদুতা পরিবেশন করতে থাকে। তখন মনে হয়, এত উপকরণপূর্ণ মঞ্চের (নির্মাণ- মনু দত্ত) দরকারই ছিল না।..."[১৯]

বিশ্ববিখ্যাত খ্যাতনামা অভিনেতা, নির্দেশক ও নাট্যকার সৌমিত্রবাবু অ্যান্থনি শ্যাফারের 'স্লুথ' নাটকটি অবলম্বনে লিখেছেন 'টিকটিকি'। এ নাটকে সত্যসিন্ধু চৌধুরী একজন ধনী, অভিজাত পুরুষ। আর বিমল একটি উদ্বাস্তু পরিবারের গরীব ছেলে। সত্যসিন্ধুর স্ত্রী রেখাকে ভালোবাসে বিমল। তাকে সে বিয়ে করতে চায়। তাই বিমলকে শায়েস্তা করতে নাটকের ভিতর এক নাটক রচনা করতে চায় সত্য। এইভাবে একই নারীর ওপর দখল নিয়ে দুজন পুরুষ একে অপরকে বিপন্ন করে তোলে, একে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর, নির্মম, নৃশংস হয়ে ওঠে, একে অপরের হত্যাকারী পর্যন্ত হয়ে ওঠে। ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরস্পরের

ওপর টেক্কা দেওয়ার মনোভাব মানুষকে কতটা মরিয়া ও বিপন্ন করে তোলে, পরস্পরকে কী কীভাবে অপমান ও অসম্মানের দিকে ঠেলে দেয়, তারই প্রতিবেদন এই নাটক।

নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে আদ্যন্ত পেশাদার থিয়েটারের অভিনেতা হিসাবেই অভিনয় করে আসা মানুষটিই শেষ পর্বে যখন গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসছেন, সেখানেও তিনি সমান নিষ্ঠাবান, সিরিয়াস এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাবলীল। তাঁর 'টিকটিকি' প্রযোজনায় সমালোচনা করতে গিয়ে বিভাসবাবু এ বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন, -

> "পেশাদার ও গ্রুপ থিয়েটারের ইন্টার-অ্যাকশনে যদি কোনো ভালো ফল হয়ে থাকে, তার নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।"[২০]

Reference:

১. চক্রবর্তী অভিজিৎ, 'এমন প্রযোজনা আরও হোক', প্রতিবেশ সাহিত্য, আগস্ট ১৯৯৬, কলকাতা।
২. বিশ্বনাথন অশোক, 'প্রকৃত নাট্যের প্রত্যাবর্তন', দেশ পত্রিকা, ১২ আগস্ট ১৯৯৫, কলকাতা।
৩. সেন শিলাদিত্য, 'টিকটিকিঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৌশিক সেনের সঙ্গে কথাবার্তা', প্রতিবেশ সাহিত্য, আগস্ট ১৯৯৬, কলকাতা।
৪. চক্রবর্তী বিভাস (প্রধান সম্পাদক), 'শঙ্খ ঘোষ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে', অন্য প্রকাশনা, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০২১, কলকাতা, পৃ. ১৮৯ - ৯০
৫. চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫৪৯ - ৫০
৬. তদেব, পৃ. ২০৭ - ০৮
৭. তদেব, পৃ. ২১২
৮. তদেব, পৃ. ২১৮ - ২০
৯. তদেব, পৃ. ২২৭
১০. তদেব, পৃ. ২৩৫ - ৩৬
১১. সেন কৌশিক, 'মাটির প্রদীপের শিখা', সংবাদ প্রতিদিন, ২২ নভেম্বর ২০২০, কলকাতা।
১২. চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২৪১
১৩. তদেব, পৃ. ২৫৪ - ৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ২৬১
১৫. তদেব, পৃ. ২৬৩
১৬. তদেব, পৃ. ২৮১ - ৮২
১৭. আজকাল পত্রিকা, ১৯ জুলাই ১৯৯৫/ চট্টোপাধ্যায় অলক ও চক্রবর্তী মানস (যুগ্ম সম্পাদক), 'সৌমিত্র', প্রতিভাস পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা।
১৮. চট্টোপাধ্যায় অলক ও চক্রবর্তী মানস (যুগ্ম সম্পাদক), 'সৌমিত্র', প্রতিভাস পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা।
১৯. সরকার পবিত্র, 'স্তম্ভিত করে রাখে অভিনয়', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫, কলকাতা।
২০. চক্রবর্তী বিভাস, 'প্রবীণ নবীনের যুগলবন্দীঃ টিকটিকি' (থিয়েটার যা দেখা তা নিয়ে লেখা), প্রতিভাস পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 615
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 608 - 615
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সুন্দরবনের রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রসেনজিৎ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : prsenjitd.beng.rs@jadavpuruniversity.in

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Sundarbans, Speech Community, Morphology, Phonology, Diglossia, Bi-lingualism, Code-mixing, Language death.

Abstract
The Sundarbans, a unique cultural and ecological region, exhibits a rich linguistic diversity. Among the various linguistic group, four primary language communities dominate the region. They are the Poundra kshatriyas and other lower caste, the spoken language of Mahishya and Kaibarta community from south-west frontier Bengal, the language of tribes and the spoken language of Muslim community. Notably, the language of Poundra kshatriyas and other lower castes is the most widespread and prominent spoken language in the region, influencing the linguistic landscape of the Sundarbans. The focus of the paper is primarily to understand the spoken language of the Raidighi region, located in the Mathurapur-II block, a part of the Sundarbans. It should be noted that the language here is not different from the linguistic tendency of the Sundarbans. The central objective of the paper is to map the linguistic features of the region, emphasizing both the morphological and phonological characteristics of the dialects spoken in this area. This would help in illustrating how local variations interact with the larger dialectal patterns of Sundarbans. In addition to the structural aspects of the language, the paper also explores socio-linguistics perspective, particularly language contact and language extinction. The paper will discuss how language contact has shaped the evolution of the spoken dialects and highlight the risk of language extinction as younger generations may shift to more dominant regional languages, leading to a gradual loss of indigenous dialects.

Discussion

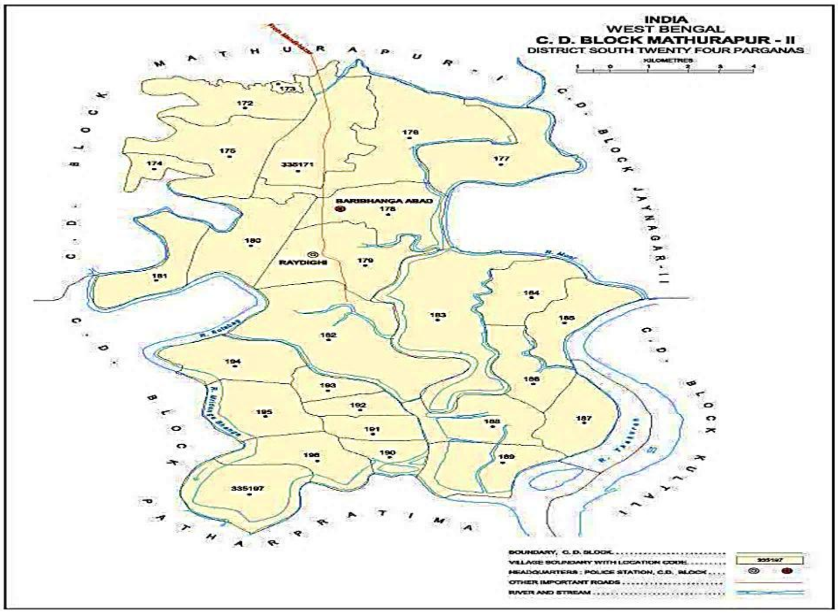
ভূমিকা : ভাষা হল মানুষের সংজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম। এই ভাষা সামাজিক মানুষের সৃষ্টি। ভাষা যেহেতু সামাজিক মাধ্যম সেহেতু সমাজের রীতি, সংস্কার, সংস্কৃতির মতো ভাষাও বৈচিত্র্যময় ও নিত্য পরিবর্তনশীল। এই ক্ষেত্রসমীক্ষার এলাকা

হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর-II নম্বর ব্লকের রায়দিঘি অঞ্চলটিকে। এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য তপশিলি জাতির মানুষ। এই অঞ্চলে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। এছাড়া ছোটোনাগপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা জীবিকার তাড়নায় এই অঞ্চলে এসে আবাদ পত্তনের কাজে সামিল হন। এদের মধ্যে ভূমিজ, বেদিয়া, মুণ্ডা, লোধা, মাহাতো, ওঁরাও, খাসি ও সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠীই প্রধান। মেদিনীপুর, দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবঙ্গ এবং উড়িষ্যা থেকেও এসেছেন বহু মানুষ। এদের মধ্যে মাহিষ্য ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মানুষই প্রধান। বাংলাদেশ থেকে এবং উত্তরের প্রান্তিক জেলাগুলি থেকে এই অঞ্চলে আসেন নানা শ্রেণির নানা বর্ণের দরিদ্র মানুষ। এই অঞ্চলটিতে একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ রয়েছেন। এই অঞ্চলটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষের শিক্ষা, অর্থ ও সামাজিক অবস্থানের নিরিখে বেশিরভাগই প্রান্তিক শ্রেণির।

সুন্দরবন অঞ্চলে অতীতে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার মানুষেরা এখানে স্থায়ী বসবাসের ফলে এবং পেশাগত সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের ফলে কয়েকটি বাক সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। এই বাক সম্প্রদায় গুলির মধ্যে অঞ্চলটিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য তপশিলি জাতির মানুষের আধিক্যের কারণে তাদের কথ্যভাষাটিই প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছে এবং ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষমতা ও সংহতির[১] সূত্রে পার্শ্ববর্তী বাকসম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলেছে। এই গবেষণা নিবন্ধের মূল বিষয় রায়দিঘী অঞ্চলের প্রধান কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করে ও পাশাপাশি অঞ্চলটিতে অন্যান্য বাক সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা সংযোগের ফলে যে ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তা তুলে ধরা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের রায়দিঘীর কথ্যভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের একটি ভাষা মানচিত্র নির্মাণ ও সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে অঞ্চলটির ভাষা বৈচিত্র্যের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি : আমার এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য মথুরাপুর-II নম্বর ব্লকের রায়দিঘি অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্য ও বাক সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলা। উদ্দেশ্যকে সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই কাজের জন্য আমাদের বেছে নিতে হয়েছে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র অনুসন্ধান পদ্ধতি। সমীক্ষার প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র নির্বাচন করার পর পর সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের কাছ থেকে তাদের কথ্যভাষা সংগ্রহ করা হয়। রায়দিঘির বিভিন্ন পাড়ার মানুষদের মুখ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শব্দগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। ঐ যন্ত্রে বয়স্ক মানুষদের মুখ থেকে তাদের জীবনের নানা কথা এবং লোককথা বা উপকথা জাতীয় গল্প ধরে নিয়ে তার থেকে ভাষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞান ও সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের প্রথাগত পদ্ধতি।

ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থান : গ্রাম – নগেন্দ্রপুর আদিবাসী পাড়া,
দমকল ২নং চ্যাটার্জিপাড়া, মান্নাপাড়া, রায়দিঘি, কঙ্কনদিঘি।
থানা – রায়দিঘি
ব্লক – মথুরাপুর-II
মহাকুমা – ডায়মন্ড হারবার
জেলা – দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ



মানচিত্র : সুন্দরবনের মথুরাপুর-II নম্বর ব্লকের মানচিত্র[2]

তথ্য বিশ্লেষণ :

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : কোনো আঞ্চলিক কথ্যভাষার চরিত্রলক্ষণ অন্বেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ও পদের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা জরুরি। ধ্বনির চেহারা আর অবস্থান বৈচিত্র্যই আঞ্চলিক কথ্যভাষাকে আদর্শ বা মান্যভাষার থেকে পৃথক করে তোলে। মান্য চলিত বাংলা ভাষার সঙ্গে রায়দিঘি অঞ্চলের ভাষার প্রভেদগুলি দুটি ভাষার শব্দ পাশাপাশি রেখে (>) এই চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হল।

১। 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হয়ে যায়, এই অঞ্চলের ভাষায়।

যেমন - বন>বোন (ব্+অ+ন্ > ব্+ও+ন্)

নদী > নোদী (ন্+অ+দ্+ঈ > ন্+ও+দ্+ঈ)

কলকাতা > কোলকাতা (ক্+অ+ল্+ক্+আ+ত্+আ > ক্+ও+ল্+ক্+আ+ত্+আ)

২। আধুনিক বাংলায় বা মান্য বাংলায় অপিনিহিতি লুপ্ত হলেও, আলোচ্য অঞ্চলে ভাষার মধ্যে অপিনিহিতি রক্ষিত আছে। আলোচ্য অঞ্চলের অনেক বাসিন্দাই পূর্ববঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে আগত, কাজেই ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার রীতি তারা এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি।

যেমন - এখানে যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে কিঞ্চিৎ '-ই' কারের প্রবণতা লক্ষণীয়।

বন্যা > বইন্না,

নায্য > নাইয্য।

'-ই' কারের অপিনিহিতি। কাল > কাইল, রাত > রাইত।

৩। সমীক্ষিত অঞ্চলে অপিনিহিতি এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অভিশ্রুতির আগমন ঘটে।

যেমন - কইর‍্যা > করে।

৪। উচ্চারণের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে বর্ণ বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট শব্দে অবস্থিত বর্ণের পরস্পর স্থান পরিবর্তনে যে বর্ণ বিপর্যয় ঘটে যায়। উচ্চারণের সময় একে অপরের স্থান দখল করে। আবার অনেকসময় দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

যেমন - ভেটকি > ভেকটি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 615
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রিক্‌সা > রিসকা
ডালনা > ডানলা

৫। কখনো কখনো উচ্চারণের সময় ‘ও’ কার ‘অ’ কার হয়ে যায়।
উদাহরণ - হোলি > হলি

৬। সমীক্ষিত অঞ্চলে যুক্তবর্ণের প্রবণতা বলতে গেলে খুবই কম, বলার সময় তার যুক্তস্বরটি ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে।
উদাহরণ - যন্ত্র > যন্‌তর্‌
গ্রুপ > গুরুপ্‌
ক্লাস > কেলাস

৭। এই আঞ্চলিক ভাষায় দুটি কাছাকাছি ব্যঞ্জনধ্বনি বা সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম একটি ধ্বনিতে পরিণত হয়।
যেমন - স্নান > চান

৮। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পৃথক স্বরধনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রুপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। এই আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রেও স্বরসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে।
যেমন - চেয়ার > চিয়ার
বিঘা > বিঘে
গোছাতে > গুছোতে

৯। ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ দেখা যায়।
যেমন - নিমন্ত্রণ > নিমন্‌তন
চারদিন > চাদিন
বৃহস্পতিবার > বেহস্পতিবার

১০। শব্দের প্রথমে স্বরধনির উচ্চারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আদিস্বরাগম লক্ষ্য করা যায়।
যেমন - স্কুল > ইস্কুল

১১। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি যোগ করে দেয়। অর্থাৎ বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি লক্ষ্য করা যায়।
উদাহরণ - ক্লাস > কেলাস
গ্রুপ > গুরুপ
প্রথম শব্দে ‘এ’ স্বরধ্বনি পরবর্তী শব্দে ‘উ’ স্বরধনির আগম ঘটেছে। অর্থাৎ বিপ্রকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

১২। বিয়ে > ব্যা এখানে স্বরসংকোচ ‘ই’, ‘এ’, ‘য়’ শ্রুতি।

১৩। স্বরধনির লোপ দেখা যায়।
উদাহরণ - ঠাকুমা > ঠাক্‌মা

১৪। ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ দেখা যায়।
উদাহরণ - চারদিন > চাদ্দিন

১৫। ‘য়’ এর উচ্চারণ কখনো কখনো ‘ই’ এর মতো হয়ে যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 615
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উদাহরণ - রায়দিঘি > রাইদিঘি

খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : রায়দিঘি অঞ্চলের ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন নামপদ, ধাতু, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক বিভক্তি, অনুসর্গ, উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস, শব্দদ্বৈত প্রভৃতি ভাষায় যে রূপলোক সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, সুন্দরবনের এই অঞ্চলটির ভাষার রূপের জগৎ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ।

১। বিশেষ্য : এই অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ্যপদগুলি মান্য চলিত বাংলার মতোই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য প্রধানত ধ্বনিগত, শব্দের উচ্চারণগত।

উদাহরণ - জটাবরদানগর, ঘন্টো, এককুড়ি, একলোক, গাইকা, নাইকা, কচ্ছম, কালোহরিণ, পাঁচচল্লিশ, কুত্রিশ প্রভৃতি।

২। বিশেষণ : বাক্যে ব্যবহৃত অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, ধর্ম, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করে যে পদ তার নাম বিশেষণ। বিশেষণরূপী নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই রয়েছে এই অঞ্চলের ভাষার নিজস্বতা।

উদাহরণ - ইশকুলির মাস্টার (অবস্থা বা গুণবাচক বিশেষণ), বাঁশের চোঙা (উপাদান-বাচক বিশেষণ), এট্টুসকানি (পরিমাণবাচক), কুড়িডা ছাগল (সংখ্যাবাচক)।

৩। সর্বনাম : মান্য চলিতের সঙ্গে রূপগত পার্থক্যের বিচারে রায়দিঘী অঞ্চলের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামের বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বিশিষ্টতা উত্তমপুরুষ সর্বনাম, মধ্যমপুরুষ সর্বনাম এবং নির্দেশক সর্বনামের একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই বিদ্যমান।

ক) উত্তমপুরুষ সর্বনাম :

একবচন - আমি, আমারে, আঁই, মোর

বহুবচন - আমরা, মোর, আমাগো, আঙ্গা

খ) মধ্যমপুরুষ সর্বনাম :

একবচন - তুই, তুমি, আপনি, তোর, তোমার, আপনার, তোমারে, আপনারে, তোরে।

বহুবচন - তোমাদের, আপনাদের, তোগো, তোমাগো, তোমানকি

গ) সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম :

একবচন - সে, তার, তেনার, এনার, উনি, তারির

বহুবচন - তারা, তেনার, ওনাগো

ঘ) নিকট নির্দেশক সর্বনাম :

একবচন - এডা, এইটে, এটি

বহুবচন - এগুলো, এগুলি, এগুনো

ঙ) দূর নির্দেশক সর্বনাম :

একবচন - ওডা, সেডা

বহুবচন - ওগুনো, সেগুনো

৪। অব্যয় : রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষার ব্যবহৃত অব্যয়গুলির প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ - আর (সংযোজক অব্যয়)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 615
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নয়তো > নয়তে (বিয়োজক অব্যয়)

না হয় > নায় (বিয়োজক অব্যয়)

তার জন্য (কারণাত্মক অব্যয়)

৫। কারক ও বিভক্তি : মান্য চলিত বাংলা ভাষার কোনও কারকের নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষাতেও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বিবিধ নাম শব্দের সঙ্গে এই বিভক্তিগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা নিজস্বতা, নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য রয়েছে।

ক) কতৃকারকে বিভক্তিরূপে শূন্য, র, এর, ইর, গো, গা, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ - নাভিতে জোঁক ঝুলে থাকত।

খ) কর্মকারকে একবচনে বিভক্তি শূন্য, কে, রে, র প্রভৃতি যুক্ত হয়।

উদাহরণ - নোন(কে) আনোনি কেন?

গ) করণকারকে এ, র, শূন্য, য় বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

উদাহরণ - এ জালে মাছ ধরা হয়।

নৌকায় নদী পার হই।

ঘ) অধিকরণ কারকে শূণ্য, এ, ই, কেরে, য়, তে বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

উদাহরণ - কালকেরে আসিব।

নোদীতে কাঁকড়া ধরতে যাই।

৬। ক্রিয়া :

ক) সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত বাক্যের শেষে বসে। কোথাও কোথাও উহ্য থাকে।

খ) সমাপিকা যৌগিক ক্রিয়ার এমন তদ্ভব চেহারা লক্ষ করা যায় যে, সে ধরনের বিবর্তন মান্য চলিত বাংলাতে এখনো হয়নি। যেমন - গিয়েছিল>গেলো, করেছিল>করলো।

গ) মান্য চলিত বাংলায় ব্যবহৃত ইয়া>এ অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া এই অঞ্চলের ভাষায় কিছু ক্ষেত্রে এ অন্তক থাকলেও শব্দটির রূপের ঈষৎ বদল ঘটে। যেমন - খেয়ে>খায়ে, গেয়ে>গায়ে ইত্যাদি।

ঘ) ইলে > লে অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার লি অন্তক হয়। যেমন- পেলে > পালি, করলে>কাল্লি, ডাকলে>ডাক্লি, বললে>বল্লি।

ঙ) ভবিষ্যৎ কালে মধ্যমপুরুষে ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন - শুনবো>শুনবু।

চ) সাধারণ বর্তমান কালে উত্তমপুরুষে কর্ ধাতু এর সঙ্গে 'ই' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা-করি।

ছ) সাধারণ বর্তমান কালে মধ্যমপুরুষে কর্ ধাতু এর সঙ্গে 'ও', এন, ইস বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা - করো, করেন, করিস।

জ) সাধারণ বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে কর্ ধাতু এর সঙ্গে 'এ', 'এন', বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা- করে, করেন।

ঝ) ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে মধ্যমপুরুষে পড়্ ধাতু বিভক্তি যুক্ত হয়ে হয় পড়তি লাগবি।

৭। বচন : রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্য ভাষার বাচনরীতি মান্য চলিত বাংলার মতোই। তবে বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সঙ্গে বচন নির্দেশক প্রত্যয় বা বিভক্তি গুলির তদ্ভব ও বিকার গ্রস্ত রূপ এখানকার ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণকে প্রকাশ করে।

একবচনের রূপ গঠনের ক্ষেত্রে পদের পূর্বে বা পরে বচন নির্দেশক টি, টা, খানা, খানি প্রভৃতি শব্দ প্রত্যয় এর বদলে ডা, এট্টু, ওট্টুন, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যেমন- লোকডা, ইট্টুসখানি।

গুলি বা গুলো বিভক্তিটি এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় 'গুনো' রূপে ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন পদ গঠন করে। যেমন- লোকগুনো, মাছগুনো।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 615
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮। শব্দ বা শব্দখণ্ডের দ্বৈত ভূমিকা : একই শব্দ বা শব্দখণ্ডকে কখনো উপসর্গ, কখনো বা প্রত্যয় রূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল হলেও এই অঞ্চলের ভাষায় এরকম প্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে। যেমন - ভদ্দিন/ দিনভর, ভরজনম/ জনমভর।

গ. সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

গ. অ. দ্বিবাচন : এই অঞ্চলের লোকেরা বাড়িতে ও আশেপাশের লোকেদের সাথে কথা বলার সময় তারা আঞ্চলিক বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। তবে স্কুলে পড়াশোনা, শহর থেকে কোনো লোক এলে তার সঙ্গে বা বাইরে গেলে এখানের লোকেরা মান্য বাংলা ভাষাতে কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মান্য ভাষা উচ্চ কোড হিসাবে ও আঞ্চলিক বাংলা ভাষা তারা বাড়িতে ও নিজেদের গ্রামে নিম্নকোড হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। মেদিনীপুর থেকে আগত এবং চব্বিশের লোকজনের মধ্যে কথাবার্তার সময় তারা তাদের আঞ্চলিক কথ্যভাষায় কথা বললেও শহরে এলে বা বাইরের লোক বা বিদ্যালয় বা কোনো অফিসারের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা মান্য চলিত বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকেন। পরস্পর দুটি ভাষার সহাবস্থানের ফলে মান্য চলিত ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে ক্ষমতা ও সংহতিও লক্ষ করা যায়।

গ. আ. দ্বিভাষিকতা : দ্বিভাষিকতা অর্থ একের অধিক ভাষার ব্যবহার। ফিশম্যান দ্বিভাষিকতাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা- স্থিতিশীল ও অস্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা।[৩] রায়দিঘি অঞ্চলের নগেন্দ্রপুর গ্রামের বেশ কিছু পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জনজাতির মানুষ। তারা তাদের নিজ গোষ্ঠীর মানুষের ক্ষেত্রে কথা বলার সময় নিজস্ব ভাষা 'সাদরি' বা 'বানোয়া' ভাষাতেও কথা বললেও ওই অঞ্চলের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে তারা বাংলায় কথা বলেন। এছাড়া নগেন্দ্রপুর গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসি পাড়ার লোকেরাও বাংলা ভাষার পাশাপাশি সাতনা, সাদরি বা বানোয়া ভাষা কেউ কেউ জেনে থাকেন। সাদরি ভাষা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ততোটা জনপ্রিয় ভাষা নয়। এটি প্রধানত ছোটনাগপুর মালভূমি এবং তার আশেপাশে বসবাসকারী অনার্য জনগোষ্ঠীর ভাষা, যা বিকশিত হয়েছে 'সেতু ভাষা' বা 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসাবে। মূলত এখানের সমস্ত জনজাতির মানুষেরা ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে সুন্দরবন অঞ্চলে আসার সাথে সাথে নিয়ে এসেছে তাদের নিজস্ব ভাষা সাদরিকে। এছাড়া মান্নাপাড়ার লোকেরা মূলত দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে এসেছেন ফলে সেই সমস্ত পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা ওড়িয়া ভাষার পাশাপাশি রায়দিঘী অঞ্চলের কথ্যভাষার ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ এখানে দ্বিভাষিকতা বর্তমান। এই অঞ্চলে ও বিস্তীর্ন সুন্দরবন অঞ্চলে সাদরি ভাষা কেবল আদিবাসী পরিবারের কেউ কেউ কথা বলে থাকেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার প্রাধান্য থাকায় সেই ভাষাটি প্রধানত ব্যবহৃত হয়। ফলে এই অঞ্চলে অস্থিতিশীল দ্বিভাষীকতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিভাষিকতা এর উদাহরণ হিসাবে মঙ্গলা মুন্ডার সাদরি ভাষা ও বাংলা ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলা থেকে খুব সহজেই লক্ষ করা যায়। তিনি সাদরি ভাষায় বলেন, 'কালে জাতিন, কালে আতিন' এটি মূলত তাদের জনগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তার সঙ্গে বলেন কিন্তু অন্য গ্রামের লোক সঙ্গে তিনি তা বলেননি, তিনি বলেন - 'কাল যাচ্ছি, কাল আসব'। আবার কাজল মুন্ডার থেকেও পাই- 'কাজল মুন্ডা হেকে আমার নাম। আমার ছুয়া একটা'। অর্থাৎ, 'আমার নাম কাজল মুন্ডা। আমার একটা ছেলে'।

গ. ই. কোড মিশ্রণ : নগেন্দ্রপুর অঞ্চলের ক্ষেত্রসমীক্ষার তিনটি পাড়ার প্রত্যেকের ভাষার মধ্যে কোড মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মূলত তাদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে ইংরাজি বেশকিছু শব্দ যেগুলির বাংলা প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও তারা ইংরাজি শব্দ গুলি ব্যবহার করেন। যেমন- দমকল ২ নম্বর চ্যাটার্জি পাড়ার ভানুমতি নস্করের কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, "আমাদের কাঠ-খড়ের আগুনে রান্না করে practice হয়ে গেছে"। আবার, "আমরা খালি বাংলা বুঝি, others কথা যদি বলেন তবে আমরা বুঝতে পারিনা"। আবার আদিবাসী পাড়ার ক্ষেত্রেও কোড মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিজয় মুন্ডার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন - "বাড়িতে আমরা পাঁচজন family"। কৃষ্ণা মুন্ডা বলেন, "love marriage করে বিয়ে করেছি"। মান্নাপাড়ার ক্ষেত্রেও কোডমিশ্রণ দেখা যায়। নীলিমা হাজরা বলেন, "আমাদের হাজরা family"। বাক্যগুলিতে 'practice', 'others', 'family', 'love marriage' এই ইংরাজি শব্দগুলির আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 615
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ. ঈ. ভাষামৃত্যু : নগেন্দ্রপুর অঞ্চলের আদিবাসী পাড়ায় কেবল মাত্র বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যেই বানোয়া বা সাদরি ভাষার ব্যবহার থাকলেও তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এখন অনেকটাই অজানা। তথ্য সংগ্রহের সময় তারা নিজেরাই বলেন এখন তাদের জনগোষ্ঠীর এই ছোটো গ্রামটিকে এখন কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলতে পারেনা। সঠিক অনুশীলন পরবর্তী প্রজন্মের লোকেদের মধ্যে না হওয়াই এর মূল কারণ। তাদের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলে এই ভাষাটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে বানোয়া বা সাদরি ভাষাটি এই অঞ্চলে ভাষামৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

উপসংহার : এখানে রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের কথ্যভাষার একটি ধারনা তৈরি করা যাচ্ছে। এছাড়া সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের ভাষা গোষ্ঠীর পারস্পারিক সহাবস্থানের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

Reference:

১. নাথ, মৃণাল. ভাষা ও সমাজ. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯. পৃ. ৪৪-৪৮

২. https://www.sundarbanaffairswb.in/home/page/mathurapur_ii. time-7.30pm, 13/12/24

৩. Fishman, J.A. The Sociology of Language. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publication, 1972. P. 45-58

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 616 - 621
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলায় মুসলিম সমাজে মাতৃভাষা প্রসারে ফুরফুরার পীর মাওলানা শাহ সুফী মহম্মদ আবুবকরের ভূমিকা

ড. সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : hossaindrskjahangir@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Influential Sufi, Muslim Society, Religious Reforms, Social Reform, Educational Reform, Mother tongue Bengali

Abstract
Abu Bakar (1846 - 1939) was an influential Sufi and Pir of Bengal in Eastern India. He was born at Furfura in West Bengal. Around him, a reform movement was developed in the Muslim society in different parts of Bengal and Assam at that time. As a result of his movement, religious reform, social reform, educational reform etc. took place in the Muslim society. He tried to use the mother tongue Bengali as the medium for all reforms in Bengal. In the Muslim society where Arabic-Persian-Urdu was given importance, being a member of the Ulema class, he did not consider Bengali English and Hindi as foreign languages. He struggled for the practice and spread of Bengali language in the field of education, religious field, social, cultural, magazine, newspaper writing, political awareness, book writing etc. He even made effective efforts to spread this language in Khankas, Mosques and Maktabs. In this article, the role of Abu Bakar in the practice of Bengali language is tried to be explained with analysis.

Discussion

ভূমিকা : আবুবকর কে ছিলেন? প্রথমেই সেই পরিচয় প্রদান করা যেতে পারে, কেন না তিনি কে ছিলেন পাঠকবৃন্দ হয়তো তা নাও জানতে পারেন; কারণ তাঁর অবদান নিয়ে গবেষণা ইদানিং বেশি হলেও পূর্বে তা পর্যাপ্ত ছিল না। ফলত সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজে তাঁর কিছুটা পরিচিতি থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক সমাজে তাঁর ততোটা পরিচয় গড়ে ওঠে নি। আবুবকর ছিলেন হুগলি জেলার ফুরফুরা শরীফের প্রধান পীর অর্থাৎ তিনি একজন ইসলাম ধর্মের ধর্মগুরু ও সুফী ছিলেন (১৮৪৬ - ১৯৩৯)।[১] কিন্তু এটি হল তাঁর প্রাথমিক পরিচয় এর বাইরেও তাঁর আরো এক পরিচয় আছে, যাঁরা তাঁর অবদান নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন, তাঁরা হয়তো জানেন। আবুবকর ছিলেন অবিভক্ত বাংলা - আসামের সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন বাঙালি সমাজে বিশেষ করে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কারগুলি দূর করে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, মুসলিম সমাজ ও ধর্মেও নানা কুসংস্কার ও অনাচার সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। মুসলিম সমাজের এই কুসংস্কারগুলি দূর করতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যাঁরা আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ফুরফুরার পীর সুফী আবুবকর। অর্থাৎ একজন ধর্মগুরু হলেও তিনি ছিলেন আসলে পুর্ব ভারতের মুসলিম সমাজের একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। তাঁকে কেন্দ্র করে বিংশ শতকের শেষ ও একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ও পূর্ব ভারতে একটি আন্দোলনের মতো গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন আবুবকর এবং তার অসংখ্য মুরিদগণ যাঁরা হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের দ্বারা এই আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল।[২] এই আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। আবুবকর এই সমস্ত সংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন সত্য কিন্তু সবার আগে তিনি যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন তা হল ভাষার বিষয়টিকে।[৩] তিনি বাংলাভাষকে ব্যবহার করে বা এই ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ধর্ম - সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার ঘটিয়েছিলেন।

পটভূমি : আবুবকরের পূর্বে ও আবুবকরের সময়ে অবিভক্ত বাংলা ও আসামে মুসলিম সমাজে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।[৪] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাসা, খানকা, মসজিদ প্রভৃতি। সেখানে যে শিক্ষা প্রদান করা হত তা ছিল আরবী ফারসী কোরআন হাদিস প্রভৃতি ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন ওস্তাদ ও মৌলবী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা প্রদান করা হত সেখানে ভাষা হিসাবে আরবী ফারসী উর্দু ব্যবহার করা হত।[৫] কোরানের আরবী সূরাগুলি যখন শিক্ষার্থীদের শেখানো হত তখন শুধুমাত্র সেই আরবি সূরার পংক্তিগুলিকে আরবী ভাষায় ছাত্রদের মুখস্ত করিয়ে দেয়া হত, বঙ্গানুবাদের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হত না। এর পিছনে কিছু কারণ ছিল, যেমন মনে করা হত যে, যেহেতু মুসলিমদের ধর্মীয় ভাষা হল আরবী ও উর্দু তাই এই ভাষাতেই শিক্ষা লাভ করলে পূন্য সঞ্চয় বেশি হবে অথবা এমনও হতে পারে যে, যেহেতু গুরু পরম্পরায় ওস্তাদ বা মৌলবী শ্রেণীগণ আরবী উর্দু ফারসী শিখে এসেছে তাই তারাও হয়তো বঙ্গানুবাদে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করতে পারেনি, ফলে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যেত। তবে এখানে একটি কথা যে, কারণ অনুসন্ধানে আমার বিশ্লেষণ হয়তো যথার্থ নাও হতে পারে, কিন্তু এই বিষয়টি যথার্থই ছিল যে, মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যথেষ্টই উপেক্ষিত ছিল। তখন যেহেতু শুধুমাত্র ধর্ম শিক্ষা ছিল প্রধান, বিজ্ঞান দর্শনের বিষয় ছিল নগণ্য তাই বাংলা ভাষার সাহায্যে সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝানোর প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পায়নি। বিষয়টি একজন সমাজ সচেতন সংস্কারক হিসেবে আবুবকরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

পর্যালোচনা : আবুবকর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন দ্বিতীয় বার হজ্জব্রত সম্পন্ন করে আসার পর।[৬] সম্ভবত তীর্থক্ষেত্র আরবে কয়েকজন ওয়াহাবী ও ফরাজি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, হতে পারে পীর সাহেব তাঁদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। তাছাড়া বাল্য জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন ও ধর্ম বিষয়ে তিনি প্রভূত জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলেন। যেহেতু ধর্ম বিষয়ে প্রবল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন ফলে তার প্রভাবে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, কুসংস্কারগুলি মুসলিম সমাজ ও ধর্ম জীবনের কতটা ক্ষতিসাধন করছে। তাই এগুলির উৎপাটনে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। প্রথমেই তিনি আরবী - ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভের জন্য ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগকে স্বীকার করে আরবী ও ফারসীর দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু কয়েক বছর পরে মুসলিম সমাজের বৈষয়িক উন্নয়ন ও অন্যান্য জ্ঞান লাভের স্বার্থে অপর ভাষাগুলির গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে সমর্থ্য হলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ওল্ড স্কিম অর্থাৎ পুরানো ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নতুন প্রতিষ্ঠান নিউ স্কিম মাদ্রাসা স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিলেন।[৭]

নিউ স্কিম মাদ্রাসায় আরবী - ফারসী ও উর্দু ভাষার পাশাপাশি বাংলা ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়। আবুবকর বাংলা ও আসামের বহু স্থানে যেমন ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন তেমনি কিছু নিউ স্কিম মাদ্রাসাও স্থাপন করলেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরবী ফারসী উর্দু ও ইংরেজি ভাষাগুলি শিক্ষাদান ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য মাধ্যম হিসেবে বাংলা মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর তিনি জোর দিলেন। এখন প্রশ্ন হল আবুবকর কেন নিউ স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করলেন? কেন তিনি পুরোপুরি ইংলিশ মিডিয়াম বা বাংলা মিডিয়াম কোন মডেল স্কুল গড়ে তুললেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না? এই প্রশ্নের জবাবে দেখা যায় যে তিনি এ বিষয়ে একটি বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে যেহেতু একটু ধর্মভাবাপন্ন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেহেতু তিনি পুরোপুরি আরবী ফারসী শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। যদি তিনি পুরোপুরি বাংলা মিডিয়ামের কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন তাহলে সেখানে আরবী শিক্ষা উপেক্ষিত হতে পারতো, তাই আবুবকর সমাজের দাবি ও প্রয়োজনকে মেনে নিয়ে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যেখানে আরবী ফারসী শিক্ষাদান বহাল থাকবে এবং পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বিষয় - গনিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়।[৮] এই সমস্ত বিষয়গুলির শিক্ষা যেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রদান করে তা হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায় - তবেই এই শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থবহ হবে বলে তিনি মনে করেন অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিখুন, বাংলা শিখুন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলি শিখুন। পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়গুলোও শিক্ষা লাভ করুন। ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠন করতেও তিনি চেয়েছি।

আবুবকর, তাঁর মুরিদ ও তাঁর কিছু প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। সেগুলিতে আরবী-উর্দু-ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হত। এগুলির কিছু এখানে উল্লেখ করা যায়, যেমন পূর্ব বাংলার রংপুর, বগুড়া, বরিশালের শর্ষিনা, চট্টগ্রাম, বরিশালের সৈয়দপুর, চরপদ্দার, মির্জাবালু, তেলিয়াখালি, চরকাওয়ার মেহেরগঞ্জ, বগুড়ার বড় মেহার, দিনাজপুরের চন্দনবাড়ি বড়গাঁও, রংপুরের মাঠের বাজার, তবকপুর, কান্দিরহাট, নোয়াখালীর মীর আহম্মদপুর, পাঁচবেড়িয়া, ফেনী, পাবনার তারাবেড়িয়া, উলট, হাদোল, শিবরব, পুষ্পপাড়া, ধূলাউড়ি ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মাদ্রাসা সমূহ। নদীয়ার আমবেড়িয়া, হুগলির পাঁচলা, কলকাতার এনায়েত নগর প্রভৃতি স্থানে বহু মাদ্রাসার স্থাপিত হয়েছিল আবুবকরের এর উদ্যোগে।[৯] ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফুরফুরাতে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় একটি বাংলা মাধ্যমের আবাসিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও আবুবকর মেঘালয়ের গারোহিল জেলার তুরা থানার মহেন্দ্রগঞ্জ গ্রামে একটি শিশু শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।

আবুবকর ধর্মগুরু ও সংস্কারক ছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি যেমন বহু মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল প্রতিষ্ঠাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তেমনি আধ্যাত্মিকতা চর্চার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। যেমন দায়েরা শরীফ (১৯২১), কাদিমী খানকাহ, দরবার শরীফ বা তালিমগাহ্ ইত্যাদি।[১০] আবুবকর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে আধ্যাত্মিক বিদ্যা চর্চা মুরিদ বা শিষ্য ও অতিথী দিগকে প্রদান করতেন। এখানে যে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করা হত সেগুলি হল তাসাউফ শিক্ষা, তাওয়াজুহ প্রদান, মোরাকাবা, মোসাহাদা, ইবাদত, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া তরিকার অনুশীলন ইত্যাদি।[১১] এই সমস্ত শিক্ষার বিষয়গুলি ছিল মূলত ধর্মীয় এবং এগুলির ভাষা ছিল আরবী ফারসী উর্দু ইত্যাদি। এগুলি যখন তিনি শিশুদের শিক্ষা দিতেন তখন তিনি বাংলা ভাষায় তরজমা বা ব্যাখ্যা করে তা বুঝিয়ে দিতেন। শুধুমাত্র আরবী-ফারসীতে সূরা বা শ্লোকগুলিকে মুখস্ত করিয়ে তিনি দায়িত্ব সেরে দিতেন না, শিক্ষা বা ধর্মীয় অনুশীলন যাতে অর্থবহ ও কার্যকরী ভাবে গড়ে ওঠে, তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানকে অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক বিদ্যা চর্চার কেন্দ্রগুলিতে দেশ-বিদেশের নানা শিক্ষার্থীরা বিদ্যা চর্চা গ্রহণ করতে আসতেন। এই বিদ্যা চর্চা প্রদানের প্রধান কেন্দ্রটি ছিল ফুরফুরা। এখানে যেমন ব্রম্ভদেশের মানুষ আসতেন, আসামের মানুষ আসতেন, বাংলাদেশের মানুষ আসতেন, তেমনি বহু স্থানীয় শিক্ষার্থীরাও এখানে যোগদান করে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতেন।[১২] আবুবকরের কাছে ধর্ম শিক্ষা লাভ করে বহু মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন। এমন কিছু ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করা যায়, যেমন মেদিনীপুরের সুফি আব্দুল মাবুদ, পূর্ব বাংলার সুফি তাজাম্মুল সিদ্দিকী হোসেন, বাংলার মাওলানা নিসারুদ্দিন আহম্মদ, বসিরহাটের রুহুল আমিন, যশোরের সুফি সদরুদ্দিন আহম্মদ, কুমিল্লার পীর হাতেম সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার ডঃ শহিদুল্লাহ প্রমূখ।[১৩] আবুবকর মনে করতেন যে এই সমস্ত বিদ্যার্থীগণ হলেন তাঁর রুহানি বা আত্মার সন্তান। তাই তিনি তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শিক্ষা প্রদান করতেন। আবুবকর তাঁর ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন যে, তারাও যেন তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের যে জাহেরি বা পার্থিব এবং বাতেনি বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করবেন তা যেন অত্যন্ত সহজবোধ্য হয় এবং মাতৃভাষার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাধ্যমে বোধগম্য করে শিক্ষা দান করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলার জন্য বাংলা ভাষা, আসামের জন্য অসমীয়া এবং ব্রম্ভ দেশের জন্য তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের কথা তিনি বলেছিলেন, তবেই সেই শিক্ষা স্থায়ী হবে বলে তিনি মনে করেন।

আবুবকর তার শিক্ষা জীবন সমাপনের পর বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ধর্মীয় বক্তব্য পরিবেশন করতেন। এর দ্বারা তিনি ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ যা তাদের সততার পথে, ন্যায় পরায়নতার পথে নিয়ে আসতে পারে, মুসলিম জনগণ সত্যবাদীতার পথে আসতে পারে, হালাল অর্থাৎ বৈধ উপার্জনে মনোনিবেশ করতে পারে - তার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তিনি এই সমস্ত ওয়াজ বা ধর্মীয় বক্তব্যের প্রথম দিকে আরবী ফারসী উর্দু ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করলেও বক্তব্যের মধ্যম অংশ থেকে শেষপর্যন্ত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে, জনগণকে নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি এত ভালো হাদিস কোরানের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করতে পারতেন যে তার জলসা বা সভাগুলিতে হাজার হাজার মানুষ তা শ্রবন করে, শিক্ষা লাভ করার জন্য অংশগ্রহণ করতে আসতেন।[১৪] আবুবকর তার শিষ্যদের খুবই বিনয়ের সঙ্গে এই উপদেশ দিতেন যে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না তা আমল অর্থাৎ শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাত্রা গড়ে তুলতে হবে অর্থাৎ তিনি প্রয়োগের বিষয়টির উপর জোর দিয়ে ছিলেন। এই বিষয় টিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ খুঁজে পাননি। আবুবকরের মুরিদ ও শিষ্যগণ যারা আবুবকরের সংস্পর্শে আসেন তারাও যখন গ্রামাঞ্চলে ধর্মীয় ও নৈতিক বক্তব্য পেশ করতে যেতেন তখন তারা সুরা বা শ্লোক তেলাওয়াত আরবি ভাষাতে উপস্থাপন করলেও বাংলা ভাষায় তা অনুবাদ করে গ্রামবাসীদের তা বুঝিয়ে বলে দিতেন। কেননা এ ব্যাপারে আবুবকরের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে বক্তব্য শ্রোতাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল বক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ফলাফল : আবুবকরের পূর্বে আলেম বা ধর্মগুরু শ্রেণী ধর্মীয় কাজে জনগণের কাছে যে বক্তব্য পেশ করতেন সেখানে তারা বেশিরভাগ সময়ে আরবী ও উর্দু ভাষা ব্যবহার করতেন। কেননা তাঁরা মনে করতেন যে, যেহেতু কোরান ও হাদিসের ব্যবহৃত ভাষা আরবী, তাই এই ভাষার কদর অনেক বেশি। অন্যদিকে ইংরেজি বাংলা ইত্যাদি ভাষাকে বিধর্মীদের ভাষা হিসেবে গণ্য করা হত। আবুবকর এর তীব্র বিরোধিতা করেন, তিনি বলেন যে সৃষ্টিকর্তার কোন নিজস্ব ভাষা নেই। যেহেতু সমস্ত মানুষই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তাই সমস্ত মানুষের ভাষায় তিনি অবগত আছেন। তাই সমস্ত ভাষাতেই ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। আবুবকরের পূর্বে মসজিদগুলিতে জুম্মার দিন শুক্রবার যে খুতবা পেশ করা হতো তা আরবীতে পেশ করা হত। সুফি আবুবকর বললেন যে খুতবা আরবীতে পেশ করা হোক এতে কোন অসুবিধা নেই, এটি ইসলামের নিয়ম কিন্তু তার পূর্বে দশ-পনেরো মিনিট ওই বক্তব্য বাংলা ভাষায় শ্রোতা মন্ডলীকে বুঝিয়ে দিতে হবে না হলে তারা এই বক্তব্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।[১৫] আবুবকরের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার মত একটি দিক দিয়ে বাংলা ভাষার চর্চা বা প্রসার ঘটাতে চান নি, যেখানে যেদিক দিয়ে সুযোগ পেয়েছেন সেই দিকে দিয়েই বাংলা ভাষার ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে বাংলা মাতৃভাষার মাধ্যমে একমাত্র কার্যকরী স্থায়ী ও ফলপ্রশুভাবে শিক্ষার আদান-প্রদান সম্ভব। আর এই শিক্ষা গ্রহণ শুধুমাত্র বিদ্যালয়, মাদ্রাসা নয়, আধ্যাত্মিকচর্চা, ওয়াজ নসিয়ত, সংবাদপত্র পাঠ সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যদিয়েই সম্ভব বলে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। এই জন্য তিনি বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে যখন পরিভ্রমণ করেছেন তখন তিনি পুস্তক নিয়ে গেছেন ও জনগণকে পুস্তক পাঠের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। ওয়াজের মহফিলগুলিতে পুস্তক বিতরণ করেছেন। ইসালে সওয়াবে পুস্তকের দোকান স্থাপনকে সমর্থন করেছেন।

আবুবকর জানতেন যে হেদায়েত বা স্থায়ীভাবে সততার পথে জনগণকে নিয়ে আসতে হলে গ্রন্থ একটি অন্যতম মাধ্যম। বেশকিছু গ্রন্থ তিনি নিজে রচনা করেন, আবার তাঁর শিষ্য মন্ডলীদের সাহায্যেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। আবুবকর নিয়মিত মুরিদ বা শিষ্যদের উৎসাহ দিতেন গ্রন্থ রচনা করার জন্য। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আছে মিলাদে মোস্তফা, মাযহাব মীমাংসা, আখেরি জোহর, ইসলাম ও সংগীত, খিলাফত-সংগীত ইত্যাদি।[১৬] এই সমস্ত গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল, যদিও এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথাপি এই বিষয়গুলিকে বাংলা ভাষায় জনগণের বোধগম্য করে রচনা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবুবকরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা

ভাষায় বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে এই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইসলাম প্রচারক (১৮৯৭), সুধাকর (১৮৮৯), মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫), সুলতান (১৯০২), নবনূর (১৯০৩), ইসলাম দর্শন (১৯২০), রওশানে হেদায়াত (১৯২৪) ইত্যাদি। পূর্ব ভারতের বাংলাতে আঞ্জুমানে ইত্তেকাফ ইসলাম (১৯১২), বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯), বঙ্গীয় ইসলাম মিশন (১৯০৪), আঞ্জুমানে উলামায়ে বাংলা (১৯১৩), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১), নুরুল ইমান জামাত (১৮৯৯), প্রভৃতি মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৭] এই সমস্ত মিশনের সঙ্গে পীর সুফি আবুবকরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগ ছিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলির সমস্ত কার্যবিবরণী বাংলা ভাষায় লিখিত হত। আবুবকর আরবী ফারসীতে অত্যন্ত দক্ষ হওয়া সত্বেও এই সমস্ত কার্যবিবরনীর শুরুতে অথবা উপরি উল্লেখিত পত্রিকাগুলির সূচনা অংশে প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বাংলাতেই মুদ্রিত করতেন। যেমন তিনি এভাবে লিখতেন - বিসমিল্লা হির রহমানের রহিম অর্থাৎ পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি - সুতরাং বাংলা ভাষা ব্যবহারে আবুবকরের আন্তরিক ভূমিকা ছিল।

উপসংহার : ফুরফুরার পীর আবুবকর নারী শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ফুরফুরায় গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে গিয়েছিলেন যেটি, পরবর্তীকালে তাঁর উত্তর-সূরিদের প্রচেষ্টায় আরো বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। তিনি শিশু-শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য মাওলানা রুহুল আমিনকে দিয়ে তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। এই গ্রন্থগুলি রচনার ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিক পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এগুলি হল বালকনূর ও বালিকানুর।[১৮] এগুলি শিশুদের কিভাবে সহজ ভাষায় শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝে পড়াতে হবে তার বর্ণনা আছে। বলাবাহুল্য যে, এই গ্রন্থ দুটি বাংলা ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যে, আবুবকর তো এই বাংলাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি বাংলা ভাষাতে কথা বলবেন অথবা বাংলা ভাষাতে শিক্ষা প্রদান করবেন এবং বাংলা ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক, এতে কৃতিত্বের কি আছে? আপাত বিচারে কোনো কৃতিত্ব নেই বলেই মনে হয়, কিন্তু পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে আবুবকর একজন আলেম শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। সাধারণভাবে উলেমা শ্রেণী আরবী ও ফারসী ছাড়া ইংরেজি ও বাংলা ভাষাকে বিধর্মীদের ভাষা বলে গণ্য করতেন, ফলত:ই তাঁরা অধিকাংশই বক্তব্য প্রদর্শন বা গ্রন্থ রচনার মধ্যে ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করেন। আবুবকর কিন্তু এই গণ্ডি থেকে বের হতে পেরেছিলেন। তিনি যাবতীয় ভাষাকে বৈধ বলে মনে করতেন এবং বাংলা ইংরেজি সব ধরনের ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন।[১৯] তাছাড়া আবুবকর নিজে আরবী ফারসী ভাষাতে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি জনগণের বোধগম্যতার স্বার্থে সহজ সরল বাংলা ভাষা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে বাংলা ভাষা ছিল প্রধান ভাষা। বাঙালী হিন্দু সমাজে বাংলা ভাষা যতটা যত্নের সঙ্গে ব্যবহৃত হত, বাঙালী মুসলমান সমাজে কিন্তু তা হত না। ধর্মীয় কাজে তো আরবী-উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ধর্মীয় শিক্ষাগার গুলিতেও একই অবস্থা ছিল। এমনকি মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষ যে কথ্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন তাতে অনেক আরবী উর্দু হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণ ছিল। সুতরাং ইসলামীক ভাষার প্রতি পূর্ব ভারতের মুসলিম সমাজ কিছুটা গুরুত্ব দিতেন বলেই মুসলিম সমাজে কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে এই সংমিশ্রণ এসেছিল। আবুবকর মুসলিম সমাজে ভাষার ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষার প্রতি এই প্রীতির ভাবটিকে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সফল হননি ঠিকই, কিন্তু ফুরফুরার প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে ধর্মীয় কাজে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতি চর্চায় এবং কথ্য ভাষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, একাধিক ক্ষেত্র সমীক্ষায় তা উঠে এসেছে। আবুবকর এর আরেকটি উদ্যোগ এখানে উল্লেখ্য, তা হল আকায়েদ ইসলাম গ্রন্থে আরবী ও উর্দু ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে ছিল এবং এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়ে ছিল। আবুবকর এর তীব্র বিরোধিতা করেন। মুরিদ ফজলুল হক আকায়েদ ইসলামের প্রতিবাদ করে আফতাবে হেদায়েত ফিরদ্দে মহতাবে জালাল গ্রন্থ রচনা করে আরবী ফারসীর বিরোধিতা করেন এবং বাংলা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বহাল রাখেন।[২০] সুতরাং একজন একজন সুফী, ধর্মগুরু ও উলেমা শ্রেণীর মানুষ হয়েও আবুবকর বাংলা মাতৃভাষা চর্চা ও প্রসারের জন্য যে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 616 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. মাবুদ, আব্দুল. ছোয়া নেহে ওমরি গাউছে সামদানী আবুবকর সিদ্দিকী, কলকাত, সিরাজী প্রেস, ১৩৪১, পৃ. ৫
২. সাক্ষাৎকার, সেখ বাসারত হোসেন, অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী, ২০/১০/২০০৭
৩. বাহাউদ্দিন, সৈয়দ, বাংলার শ্রেষ্ঠ উলেমাদের জীবন ও কর্ম একশ বছরের ইতিহাস(১৯০১-২০০২), ফুরফুরা, দি কম্পিউটার পয়েন্ট, ২০০৯, পৃ. ৭
৪. বেঙ্গল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, রিপোর্ট অন পাবলিক ইনসট্রাকশান, ১৮৮৫-৮৬, পৃ. ১ - ২
৫. জেনারেল ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ব্রাঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, প্রসিডিংস, ১৮৫৩, নং ৯৯
৬. সাত্তার, আব্দুস, মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকি (রহমতুউল্লাহ আলাইহে) পীর কেবলার জীবনচরিত, ঢাকা, প্রেস বাংলা, ১৯৩৯, পৃ. ৬৬
৭. আমিন, রুহুল, হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, বসিরহাট, মাজেদিয়া প্রেস, ১৯৩৯, পৃ. ৩৩
৮. তদেব, পৃ. ৩৩
৯. ইসলাম দর্শন, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, ১৩২৭, পৌষ, পৃ. ৪৩২
১০. রহমানী, মোবারক আলী, ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, প্রিন্টেক্স ইন্ডিয়া, ১৯৮৪, পৃ. ৬১
১১. আমীন, রুহুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
১২. সাত্তার, আব্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
১৩. রহমানী, মোবারক আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৪. বারি, আবদুল, ফুরফুরার ইসালে সওয়াব দর্শন, নোয়াখালী, সুজাপুর ইসলামীয়া লাইব্রেরী, ১৯২৪, পৃ. ১১
১৫. আমীন, রুহুল, বঙ্গানুবাদ খোৎবা, ৪৭নং রিপনস্ট্রিট, হানাফি প্রেস, ১৯২৭, পৃ. ৫০ - ৬০
১৬. সিদ্দিকী, বাকীবাল্লাহ, পীর সাহেবের জীবন চরিত্র, পাবনা, হেরা পাবলিকেশন, ১৯৭৩, পৃ. ১২
১৭. বাহাউদ্দিন, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১৮. রহমানী, মোবারক আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৯. আমিন, রুহুল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২
২০. বাহাউদ্দীন, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 622 - 631
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রাঢ় বাংলার ধর্মপূজা : একটি ব্যতিক্রমী পুজো পূর্ব বর্ধমান জেলার রায় রামচন্দ্রপুর গ্রাম

রুদ্রনীল চোংদার
স্যাক্ট, গুসকরা মহাবিদ্যালয়
Email ID : rudranil@gushkaramahavidyalaya.ac.in

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Rarh Bengal, composite culture, Dharmamangal Kavya, Bhakta or Bhakte, Akshay Tritiya, Buddha Purnima, Charak Puja, Baneshwar Puja.

Abstract
'Rarh' refers to two Bardhamans, two Medinipurs, Bankura, Purulia, Birbhum, Murshidabad, Hooghly and Howrah districts. In most if not every village in the region, the ancient deity is Dharma Thakura. He is known by different names in different places. Dharam Puja gained so much popularity in Bengal that several Dharmamangal Kavyas were written in Bengal during the Middle Ages. Mayura Bhatta was the first poet of Dharmamangal Kavya. Dharam Thakura is said to be part of various gods. This deity is a combination of Arya and non-Arya deities and this 'composite culture' is well observed in Rarh Bengal. But Dharma Thakura is the symbol of niranjan or emptiness and the vehicle of this Dharmaraja is horse. One such example of Dharam Puja is the Kotra Puja of Rai Ramchandrapur village under Bhatar Thana in Purba Bardhaman district. The specialty of this puja is Dhunoseba, anointment by water, bringing of bhandral and above all, 9 goats are sacrificed at once. Like the Dharam Puja of other villages, there is a legend about the origin of Dharam Puja in this village. Since there is no real material about the origin of Puja, we mainly have memory studies and folklore has to be relied upon. 8 Brahmin families served the Kotra puja in Rai Ramchandrapur and the main devotees were Adhikari (Brahmin) families. The cobbler caste – called Deyashi – are heavily involved in the rituals while the launderer (Dhopa) and Muslim community are absent from this puja. People from different regions participate in this puja and the authentic spirit of the village ceremony is maintained. A small fair is also held in this village. Most of the income of the whole year is spent by every villager to organize this event. Every family play a role in organizing the festival and there is no fault in hospitality or entertainment among them. Dharma Thakura and the Puja Pratha of Rai Ramchandrapur village centering on him is the subject of this article.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের যে সাহিত্য সম্ভার রচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যটি আবর্তিত হয়েছে রাঢ়ের গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। রাঢ় বাংলার প্রাচীন একটি জনপদ। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত, মহাভাষ্য, পুরান, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যে রাড়ের নামটি পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষায় লাল বা রাল শব্দের সংস্কৃত রূপ হল 'রাঢ়', সাঁওতালি ভাষায় 'রাঢ়' এবং কোলে ভাষায় 'রৌড়' শব্দ দুটির অর্থ পাথুরে বা পাথুরে শক্ত মাটি। ভাষাতত্ত্ব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে রাঢ় অঞ্চল হল - উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিনে মেদিনীপুর পূর্বে কলকাতা হাওড়া থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়ার সাঁওতাল পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত।[১]

ধর্ম ঠাকুর হল রাঢ়ের প্রাচীন দেবতা, প্রান্ত জনের দেবতা। রাঢ়র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় এই ধর্ম ঠাকুর দেবতা। আমিরার বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত বর্ধমান জেলার নানান স্থানে তিনি নানান নামে পরিচিত। কোথাও তিনি ধর্মরাজ, কোথাও তিনি বুড়োরাজ, কোথাও তিনি দক্ষিণ রায় প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভারতের জনসাধারণের গঠনগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নেগ্রিটো, নডিক, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলয়েড, মেডিটেরিয়ান, ব্রাকিসেফাল প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্টি। একারণেই ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' (a land of diversity and an ethnological museum) বলেছেন। ভারতের নেগ্রিটো জাতির পর ইন্দো-চীন থেকে ভারতে আসে অস্ট্রিকরা। এই অস্ট্রিক জাতির বিভিন্ন শাখা ভারতবর্ষে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর অস্ট্রিকরা নেগ্রিটো জাতির সাথে মিশে গেলে ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থায় কোল, ভিল, মুন্ডা ইত্যাদি জাতির উদ্ভব হয়।[২] অস্ট্রিকরাই হল কৃষিকাজ প্রণালীর উদগাতা। বলা যায় নব্য প্রস্তর যুগেই অস্ট্রিক জাতির জীবনধারা বিকাশ লাভ করেছিল। ঠিক রা আত্মার অস্তিত্বের বিশ্বাসী ছিল একারণেই তারা যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিল। অস্ট্রিকদের পর ভারতে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছিল। দ্রাবিড়রা অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতি হওয়ায় অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিশে মিশ্র সংস্কৃতি অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল।[৩] সংস্কৃতিটি অনার্য হলেও তাদের পরিকল্পনা বা চিন্তা ভাবনা কখনোই নিম্নমানের ছিল না। মেহেরগড় ও হরপ্পা সভ্যতায় আমরা সেসব উন্নত জীবন প্রণালীর নিদর্শন দেখতে পাই।

ভারত ভূমিতে আর্যদের প্রবেশ ঘটে। আর্যদের আদি বাসস্থান সংক্রান্ত বিতর্ক থাকলেও অধ্যাপক ব্যান্ডেলস্টাইনের মতামতটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তার মতে, ইউরাল পর্বতের দক্ষিণের কিরঘিজের স্তেপ বা তৃণভূমি অঞ্চলে আর্যরা আদিতে বসবাস করত। এই স্থান হতে আর্যদের একটি শাখা পশ্চিমে চলে আসে। পরে এই শাখা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ ইরানে অপর ভাব ভারতে প্রবেশ করে। এভাবে আবার নর্ডিক, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্যগোষ্ঠীর সমন্বয়ে মিশ্র সংস্কৃতি বা 'Composite Culture'-র পুনরাবির্ভাব ঘটে। বাংলাতে অনার্যদের প্রভাব বেশি থাকায় আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। অনেক পরবর্তীতে প্রায় মধ্যযুগের শুরুর দিকে বাংলায় তুর্কিদের আগমনের ফলে যথারীতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের কাছাকাছি চলে আসায় বর্ণসংযোগ ঘটে।[৪] উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর তুই দেবদেবীর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আর এই সূত্রেই বাংলায় 'মঙ্গলকাব্য' বিকশিত হয়েছিল। তাই বলাবাহুল্য ধর্ম ঠাকুর বা ধর্ম পূজা আদিবাসী সমাজ থেকে উৎপত্তি হয়ে সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৫]

সমগ্র রাঢ় বাংলায় কোন না কোন স্থানে ধর্ম ঠাকুর বা রাঢ়র প্রাণের ঠাকুর পুজিত হয়ে আসছে ধর্ম পূজা সাধারণত বৈশাখ/ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।আবার পূর্ব বর্ধমানের বেশিরভাগ গ্রামগুলিতে মিটিং-এর মাধ্যমে জুর দিনক্ষণ স্থির হয়। কেননা পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাথে একই দিনে যাতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে পুজো বিঘ্নিত হতে না পারে এবং প্রতিবেশী গ্রামগুলি একে অপরের অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হতে পারে তার জন্য। তবে অনেক গ্রামেই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনেই ধর্ম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যাইহোক বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যে কোন না কোন গ্রামে ধর্ম পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ধর্ম ঠাকুরের সাথে কচ্ছপ/ কূর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব স্থানে ধরম ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেইসব স্থানের মন্দিরগুলিতে কূর্মমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। 'ধর্মপূজা বিধান' কূর্মকে ধর্ম ঠাকুরের বাহনরূপে দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন ধর্ম ঠাকুর গোড়ায় কূর্মদেবতা ছিলেন না তবে তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূজোয় কূর্ম দেবতার পূজা এসে মিশেছে। শুধু কূর্ম দেবতাই নয়, সূর্য দেবতা এবং জল দেবতার সাথেও ধর্ম ঠাকুরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৬] 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'র প্রথম কবি হলেন ময়ূর ভট্ট। আ. ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে/ সাধারণ অব্দে রূপরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রচনা করেছিলেন। পর ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে/ সাধারণ অব্দে রামদাস আদক 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'টি লেখেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে/ সাধারণ অব্দে ঘনারাম চক্রবর্তী রচিত 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'। এই কাব্যে সমকালীন সমাজের চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

অনেকে ধর্ম ঠাকুরকে সূর্য দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। কূর্ম সূর্য দেবতার প্রতীক। ধর্ম ঠাকুর শূন্য মূর্তি সূর্যকেও বলা হয় শূন্য মূর্তি। ধর্ম ঠাকুরের কৃপালাভ করলে অন্ধত্ব, কুষ্ঠরোগ দূরীভূত হয় তেমনি সূর্য উপাসনা করলে অনুরূপ ফল লাভ করা যায়। বেশ কিছু অঞ্চলে সমীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে শালগ্রাম শিলাকে ধর্ম ঠাকুর রূপে পূজা করা হচ্ছে। শালগ্রাম শিলাকে সাধারণত আমরা নারায়ণ রূপেই পূজা করে থাকি। এইরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায় ধর্ম ঠাকুরের সাথে নারায়ণ তথা বিষ্ণুর সম্পর্ক বিদ্যমান।[৭] ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংযোগ রয়েছে শিব ঠাকুরের/ মহাদেবের। শিবের গাজন আর ধর্মরাজের গাজনের বৈশিষ্ট্য একই ধরনের, পার্থক্য শুধু সময়ের। শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে আর ধর্মরাজের গাজন শুরু হয় নতুন বছরে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন থেকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম ঠাকুরের গাজনে শিব ঠাকুরকে আহ্বান করা হয়। আসলে একটা সময় শৈব ধর্ম ও শক্তি সাধনা রাঢ় বাংলায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে সাধনার সংমিশ্রণ ঘটে এবং ধর্ম পূজায় শিব ঠাকুরের নেশাশিক্ত রূপটি শুধুই প্রকাশ পেয়েছে।

আবার অনেকে ধর্ম ঠাকুরকে যমরাজের সাথে অভিন্ন বলে মনে করে থাকেন। যেহেতু ধর্মরাজ ও যমরাজ দুটোতেই নামের শেষে 'রাজ' শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তীতে 'রাজ' নামের পরিবর্তে 'রায়' শব্দটি যুক্ত হয়েছে এবং ধর্মরাজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিত হয়ে আসছেন। যেমন - ধরম রায়, চাঁদ রায়, কালুরায়, মেঘ রায় শ্যামরায়, দক্ষিণ রায়, উত্তর রায়, কটারায় প্রভৃতি। আবার ধর্ম ঠাকুরের সাথে দেবী মনসা, দেবী চণ্ডী প্রভৃতি লোকদেবীর সাথে ইসলাম ধর্মেরও সংস্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। কারণ ইসলাম ধর্মের মতই ধর্ম ঠাকুর হলেন নিরাকার বা নিরঞ্জন অর্থাৎ শুন্যতার প্রতীক। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের প্রভাব নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের স্পর্শ করেছিল। কালের অমোঘ নিয়মে মুসলিমরা ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান প্রভৃতি ঈশ্বর-কারক শব্দগুলি বর্জন করলেও 'নিরঞ্জন' শব্দটি বর্জন করেনি। ড. সুকুমার সেনও ধর্ম ঠাকুরের পায়ে বুটপরা 'অশ্বারোহী মূর্তি'কে মুসলিম সৈনিকের সাথেই অভিন্ন বলেই মনে করেছেন।

প্রত্যেকটি হিন্দু দেবদেবীর কিছু না কিছু বাহন থেকেই থাকে। 'বাহন' অর্থাৎ যিনি বহন করে নিয়ে চলেন। ধর্ম ঠাকুরের সেরূপ বাহনই হলো ঘোড়া ও হাতি, যদিও ঘোড়ার প্রচলনই বেশি। কারণ সাধারণ মানুষেরা ধর্ম ঠাকুরকে মাটির তৈরি ঘোড়া মানত করেই থাকে। বলা যায়, রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের বাহন সাদা ঘোড়া এবং সাদা ফুল (টগর, বেলি, জুঁই, শ্বেতপদ্ম ইত্যাদি) তাঁর প্রিয়। ধর্ম ঠাকুরের প্রতীক হল পাদুকা বা খড়ম। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, সাদা যোদ্ধা ঘোড়া অর্থাৎ আরবি ঘোড়া মুসলমান সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করত আর খড়ম বা পাদুকা হল হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীকী চিহ্ন। আবার ধর্ম ঠাকুরের সাথে হিন্দু দেবদেবীরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ধর্ম ঠাকুর হল রাঢ় অঞ্চলের এক সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দু সমাজে প্রধানত বাগদী, বাউরী, হাড়ি, ডোম, মুচি প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের মানুষের প্রধান দেবতা বলে বিবেচিত হলেও বর্তমানে উচ্চ বর্ণের মধ্যেও ধর্ম পূজা প্রবেশ করেছে।

রায় রামচন্দ্রপুর গ্রাম : পূর্ব বর্ধমান জেলার রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামটি কাটোয়া মহকুমার ভাতার থানার অন্তর্গত। গ্রামটির নামের উৎপত্তি নিয়ে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা হল ৩২২১ এবং ৪৫১.৮৯ হেক্টর। গ্রামটির লোকসভা কেন্দ্র হল বর্ধমান-দুর্গাপুর এবং বিধানসভা কেন্দ্র হল ভাতার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভাতার থানার মোট ১০৭টি গ্রামের যে নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে অন্যতম হল রায় রামচন্দ্রপুর গ্রাম, পিন কোড ৭১৩১২৮। গ্রামটি আসলে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামটিতে জমিদার বাড়ি নীলকুঠিসহ বেশ কিছু পুরাতন শিবমন্দির রয়েছে যা মধ্যযুগের বলে মনে করা হয়। গ্রামের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই রয়েছে ব্রাহ্মণ পরিবার এছাড়াও রয়েছে কায়স্থ, আগুড়ি, গোয়ালা, সদগোপ এবং নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়। গ্রামটি বর্ধমান শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার ও গুসকরা রেলস্টেশন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গুসকরা রেলস্টেশন থেকে পূর্ব দিকে টোটো বা বাসযোগে এই গ্রামে আসা যায়। রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামটি আসলে আমার পৈতৃক ভিটা। কিন্তু বর্তমানে কাজের সূত্রে এই গ্রামে আর থাকা হয় না। তা সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকেই ধর্ম পুজো দেখতে আমরা অভ্যস্থ। এখানকার ধর্মরায় ঠাকুর কটরায়/ কটারায় নামে পরিচিত। পুজোর বিষয়ে বেশ কিছু উৎস পাওয়া গেলেও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কথোপকথনের এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ গ্রাম্য ঐতিহ্য বা অনুষ্ঠানের বিষয়টি আমাদের স্মৃতিচর্চা ও জনশ্রুতির উপরে নির্ভর করতেই হয়।

ভাতার থানার এই রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের দখিন (দক্ষিণ) দুয়ারী ঘরে ধর্মরাজ ঠাকুরের অবস্থান। এখানে চারটি কূর্মাকৃতি শিলা মূর্তি অবস্থিত ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে কটা রায়, ময়না রায়, মেঘ রায় এবং পোড়া ধরম রায়। প্রধান ধর্ম ঠাকুর হলেন কটা রায়/ কটরায়। কটারায়ের আগের মূর্তিটি ছিল গোলাকার কিন্তু সেটা ১৯৮০র দশকে চুরি হয়ে যায়। প্রতিবছর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ঢাক বাজনার সাথে রাত্রে বেলায় দক্ষিণ দুয়ার থেকে মূল কটরায় মন্দিরে মূর্তিটিকে নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অর্থাৎ মূল কটরায় পূজোর দিন পর্যন্ত নিত্য ভোগ নিবেদন করা হয় টানা ১২ দিন ধরে। ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয় আতপ চাল, মন্ডা, ফল, কদমা, বাতাসা ইত্যাদি। সন্ধ্যা আরতির সময় সন্ধ্যায় শীতল হিসেবে নিবেদন করা হয় দুধ, সুজি, লুচি ইত্যাদি। তবে প্রত্যেহ একই রকম ভোগ থাকেনা।

কথিত আছে বহুকাল পূর্বে এই গ্রামের মুচিপাড়ায় এক বেলতলায় ছেলেরা মাটি করতে গিয়ে প্রবালের মত প্রস্তর খন্ড দেখতে পায়। ছেলেরা একটি মিষ্টির দোকানে ওই সুন্দর পাথরটির পরিবর্তে মিষ্টান্ন দাবি করে। দোকানের ময়রা ওই পাথরের ওজন মত মিষ্টি দেওয়ার জন্য দাড়িপাল্লায় পাথরটি চড়ায় এবং দাঁড়িতে ওই পাথরের ওজন এত বেশি ছিল যে প্রচুর মিষ্টান্ন চড়িয়েও ময়রা দোকানী তার সমান ওজন করতে ব্যর্থ হন। যখন কোনোভাবেই সক্ষম হল না তখন সেই দোকানী ভিত হয়ে গ্রাম প্রধানদের কাছে বিষয়টি ব্যক্ত করে। গ্রামের বরিষ্ঠ ও প্রধান ব্যক্তিরা এই ঘটনায় অবাক হয়ে যান এবং সেখানেই তারা ধর্ণা দেন।[৮] সেই ভোর রাতে প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখেন যে বিগ্রহের মধ্যে অশ্বরূঢ় এক দেবমূর্তি বহির্গত হয়ে তাদেরকে বলছেন অভিনব বলিদানে তাঁকে যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকেই নাকি এখানে অভিনব বলিদান প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্রামের ধর্ম পূজা তথা কটরায় পূজার অভিনব বৈশিষ্ট্যটি হল একসাথে একচোটে নয়টি পাঁঠা বলিদান। যা আর অন্য কোন গ্রামে সচরাচর দেখা যায় না। যাইহোক এবারে মূল পুজোয় আসা যাক।

নতুন বছরের পহেলা বৈশাখের পর থেকেই অনুষ্ঠানের দামামা বেজে ওঠে। অমাবস্যার দু'দিন পরে অক্ষয় তৃতীয়া পড়ে। এর ঠিক ১২ দিন পর হয় বুদ্ধ পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমার একাদশী থেকে শুরু হয়ে যায় কটরায় উৎসব। একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও বুদ্ধ পূর্ণিমা এই পাঁচ দিন ধরে উৎসবের মরশুম চলে। বাবা কটারায়ের সেবাইত হলেন রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের আটটি ব্রাহ্মণ পরিবার যথা - মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, রায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। আর প্রধান ভক্ত হল অধিকারী পরিবার (ব্রাহ্মণ)। অধিকারী পরিবারের পূর্বপুরুষ ছিলেন গোলক অধিকারী মূলত তাঁর পরিবারের নির্দেশই পুজো সম্পন্ন হয়। বর্তমানে অধিকারী পরিবারের সদস্যেরা হলেন - দেবপ্রসাদ অধিকারী, ভবানীপ্রসাদ অধিকারী, জয়ন্ত অধিকারী, শ্রীমন্ত অধিকারী। আর বাবা কটরায়ের প্রধান দেয়াশী হল মুচি সম্প্রদায়। এদের পদবী হল দাস। বর্তমানে প্রধান দেয়াশী হলেন মঙ্গলা দাস। তিনি মূল ভাড়ালটি মুচিপাড়া থেকে বাবা কটারায়ের মূল মন্দিরে নিয়ে আসেন। একাদশী তিথি থেকেই ঢাক বাজতে থাকে। ভক্তেরা সাদা উতরি (সাদা কাপড় পরনে ও গলায়) পড়ে এবং সেই উতরি খোলা হয় কটরায় পূজোর দিন অর্থাৎ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মহাসমারোহে গোটা গ্রামের ঢাক বাজিয়ে দক্ষিণ দুয়ার থেকে কটারায় মূর্তি থেকে মূল মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। ঐদিন থেকে ভোক্তিসহ যিনি বলিদান করেন তিনিও মোট ১২ দিন ধরে হবিষ্যি/ হবিষ্যান্ন করেন। একাদশী তিথি থেকে পুজো শুরু হয়ে যায়। ত্রয়োদশী তিথিতে হয় ধূনোসেবা। এই দিনটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ঐদিন ভক্তরা মন্দির থেকে বানেশ্বর নিয়ে আসেন। বর্তমানে বানেশ্বর লিঙ্গটি না থাকায় একটি ঢেঁকির মতো কাঠের একটি অংশ থাকে। এই কাঠের ওপরে ত্রিশূলের মত গোটা অংশ জুড়ে ফলা থাকে, তার মধ্যে ফুল ফল ইত্যাদি আটকানো থাকে। এই প্রতীকী বানেশ্বরকে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে গ্রামের অন্যান্য মূল মন্দিরগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সন্ধ্যায় তাকে স্নান করানো হয় এবং স্নান সেরে ভক্তরা ধুনো সেবার আয়োজন করে। এখানে তিনটি বাঁশ ব্যবহার করা হয়। দুটি বাঁশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশাপাশি লম্বালম্বি পুঁতে দেয়া হয় এবং আরেকটি বাঁশ ওই দুটি বাঁশের মাথায় দড়ি দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। এরপর ভক্তেরা সেই দড়ি দিয়ে বাঁধা বাঁশের উপর পা ঝুলিয়ে মাথা নিচে করে উল্টোদিকে ঝুলতে থাকে। নিচে জ্বলতে থাকে আগুন এবং সেখানে মাঝে মাঝে ধূনো ছিটানো হয় ফলে আগুনের শিখা আরো বেড়ে যায়। একজন ভক্তে যতক্ষণ পর্যন্ত আঁচ নিতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঝুলতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় 'ধূনোসেবা' নামে পরিচিত। ভক্তেরা যখন ঝোলেন তখন তার পার্টিল আটকানো থাকে পাটের দড়ি দিয়ে, যাতে তিনি নিচে পড়ে না যান। এই প্রক্রিয়াটি রাত আটটা থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত চলতে থাকে।

ধূনো সেবার পরের দিন অর্থাৎ চতুর্দশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় মুক্তস্নান। ঐদিন সন্ধ্যেবেলায় বাবা কটারায়কে মূল মন্দির থেকে বের করে নিয়ে এসে কাঠের ঘোড়ার পীঠে চাপানো হয় গোটা গ্রাম ঘোরার উদ্দেশ্যে। কাঠের ঘোড়াটিকে গরুর গাড়ির পীঠে চাপিয়ে গ্রামের মানুষজন তাকে দড়ি দিয়ে টানতে থাকে। সারারাত ধরে এই প্রক্রিয়া চলে। কাঠের ঘোড়ার পীঠে বসানো থাকে সিংহাসন যেখানে বাবা কটারায়ের অধিষ্ঠান, সেখানে সিংহাসনটিকে ধরে থাকেন বাবা কটরায়ের বর্তমানের প্রধান পুরোহিত উত্তম মজুমদার। গোটা গ্রামবাসী এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং উপস্থিত থাকে ৮টি ব্রাহ্মণ বাড়ির সবাইত আর মূল ভক্ত স্বর্গীয় গোলক অধিকারী পরিবারের বংশধরেরা। দেবপ্রসাদ অধিকারী ও ভবানীপ্রসাদ অধিকারীর নির্দেশে রাত্রি আটটার সময় সেই গরুর গাড়িটি বের করা হয় আর সারারাত ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশেষে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে ভোর রাতে গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বড় পুকুরে বাবা কটরায়কে স্নান করানো হয়। ঐদিন প্রায় গোটা গ্রামবাসী জেগে থাকে এবং আনন্দে মেতে ওঠে।[৯] এরপর ভোর বেলায় বাবা কটরায়কে মূল মন্দিরে নিয়ে আসা হয়, বাবা কটরায়কে সাত পাক ঘুরিয়ে মূল মন্দিরের গর্ভ গৃহে প্রবেশ করানো হয়। ভক্তেরা ঠিক সূর্য টার আগে আকন্দের মালা পড়ে ফল, জল খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে নেন। সূর্য উঠলে আর তারা আর কিছু আহার করেন না। এই ভক্তদের মধ্যে আবার কতগুলি ভাগ আছে, যেমন বড় ভক্ত, বড় ভাঁড়াল (যিনি ভাঁড়াল নিয়ে আসেন) এবং সাধারণ ভক্ত (নতুন ভক্ত যারা ওই ১২ দিন নিয়ম নিষ্ঠা পালন করে তবে নিয়মিত নয়)।

চতুর্দশীতে মুক্তস্নানের পরদিনই পড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমা অর্থাৎ সেদিনই অনুষ্ঠিত হয় মূল পূজাটি। ঐদিন সকাল থেকেই গ্রামের মানুষেরা বাবা কটারায়ের উদ্দেশ্যে পুজো দিতে থাকে, পুজো চলতে থাকে দুপুর বেলা পর্যন্ত। এর মধ্যে যিনি বড় ভাঁড়াল তিনি ভাঁড়াল আনতে যান মুচিপাড়া থেকে। গ্রামের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী মনোজ দাসের পূর্ব পুরুষরা এই ধারা বজায় রেখেছে। বড় ভাঁড়ালটি তাঁর বাড়ি থেকে মঙ্গলা দাস নিয়ে আসেন এবং সেটিকে ওখান থেকে এনে মূল কটারায়ের মন্দিরের সামনে এনে রাখা হয়। দুপুর থেকেই ওই ভাঁড়ালের মধ্যে কিছু চাল বিনা আগুনে ফুটতে থাকে। এটি একটি অভিনব দৃশ্য, এর পিছনে হয়তো কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামের মানুষ দীর্ঘকাল এই বিশ্বাস বহণ করেই চলে আসছে। বিকাল চারটে নাগাদ বাবা কটারায়ের উদ্দেশ্যে হোম শুরু হয় এবং সেই হোমেই বাবা কটরায়ের উদ্দেশ্যে পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। প্রথমে পরে একটি পাঁঠা তারপর পরে নটি পাঁঠা। এই নটি পাঁঠাকে একসঙ্গে ক্রম অনুসারে সাজিয়ে এক চোটে একসাথে বলিদান করা হয়। এরপর পাঁচটি, তিনটি করে পাঁঠা বলিদান চলতেই থাকে। এই বছর নয়টি পাঠা বলিদান করেছিলেন গ্রামেরই পুরোহিত বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ১২ দিন ধরে হবিষ্যন্ন করেন এবং ৯টি বলিদান করার পরই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বলিদান হওয়ার আগে মূল ভক্ত ভবানীপ্রসাদ অধিকারী তিনি বলি করবেন তার গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দেন অধিকারী বাবুর নির্দেশেই বলিদান সম্পন্ন হয়। এই বলিদান হয় বিকেল ৫টায়। এরপর প্রাচীন রীতি ও প্রথা অনুযায়ী হোমের ফোটা/ তিলক প্রত্যেক সেবাইত ও তার পরিবারদের পড়িয়ে দেন প্রধান পুরোহিত শ্রী উত্তম মজুমদার। বলিদানের পর ভক্তেরা সেবাইতদের বাড়িতে ফল জল গ্রহণ করে এবং সেদিনের মতো বাবা কটরায়ের পুজো সমাপ্ত হয়।

বুদ্ধপূর্ণিমার পরের দিন বাবা কটরায়কে মূল মন্দির থেকে আবার কাঠের ঘোড়ায় বের করে নিয়ে আসা হয় বেলা দশটা নাগাদ। সেখান থেকে গ্রামের বাইরে (পাশের গ্রাম নূতা) পোড়া ধর্ম তলায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং এখানে ধর্মমঙ্গল কাব্যের নবখণ্ড থেকে পাঁচালী গাওয়া হয় -

"ধর্ম জয় জয় পূর্বের ভানু পশ্চিম উদয় বল ভাই জয়, জয়, জয়।"[১০]

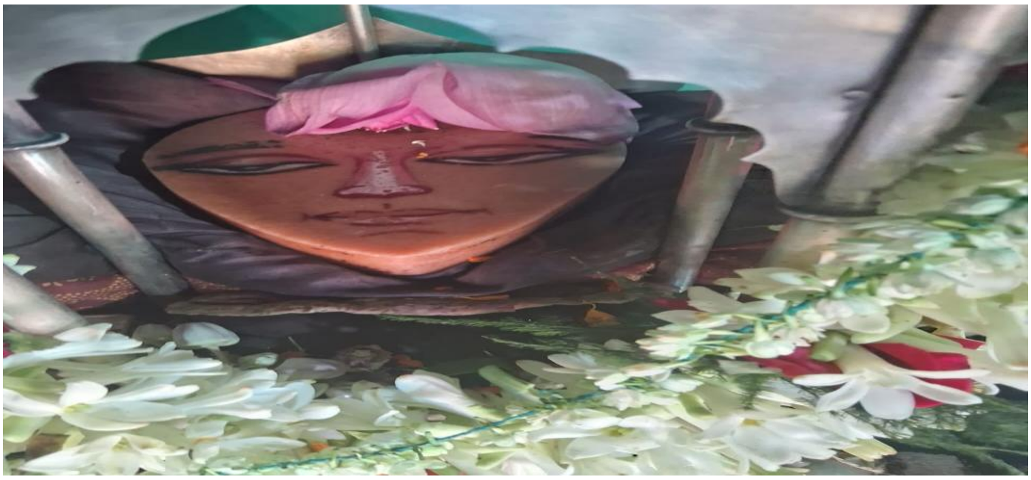
OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এরপর সেখান থেকে বার বাবা কটরায়কে নিয়ে আসা হয় গ্রামের মূল ভক্ত অধিকারী বাড়িতে। পুরাতন কটরায়ের মন্দিরটি ছিল সেটি এখনো অধিকারই বাড়ির সীমানার মধ্যেই রয়েছে। বর্তমানে তা ভগ্নপ্রায়। যাইহোক সেখানে দিনের বেলাতেই পূজাও আরতি অনুষ্ঠিত হয়। তারপরে অধিকারী বাড়ির নয়টি শিব মন্দিরে বাবা কটরায়কে ঘোরানো হয়। তারপর আবার প্রাচীন প্রথা মেনে আবার কটরায় মূর্তিটিকে গ্রামের মূল মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আবার বাবা কটরায়কে সাত পাক ঘুরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। মূল মন্দিরে প্রবেশ করার পর ২১ সের মনুই ভোগ (পরমান্ন) ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয় এবং সেই ভোগ ভক্ত ও সেবাইতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরপর সন্ধ্যা আরতির মধ্য দিয়ে পুজোর সমাপ্ত হয়।

কটরায়পুজোতে ছোট্ট একটি মেলা বসে। লোকসমাগম ও বাড়িতে অতিথি আসা নিয়ে সংখ্যাটা নেহাতই কম হয়না। প্রতিটি বাড়ির যার যেটুকু সামর্থ্য ততটুকুই আয়োজন করতে সচেষ্ট হয়। আপ্যায়ন ও আমন্ত্রণে তাদের কোন ত্রুটি থাকে না। যাইহোক এই রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের মূল উৎসব হল ধর্ম পূজা তথা বাবা কটরায়ের পূজা। বাবা কটারায় হলেন উচ্চশ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর সমন্বয়ের প্রতীক। যেহেতু মুচিরা প্রথম কটারায়ের মূর্তিটির সন্ধান পায় তাঁরা পূজায় প্রধান দেয়াশি। বাবা কটরায়ের আবির্ভাব দিবস হল পয়লা মাঘ। যেহেতু মুচি সম্প্রদায় কটরায়ের প্রথম সন্ধান পেয়েছিল। ঐ ১লা মাঘ আবার কটনায় মন্দিরে মুচি সম্প্রদায় ঢাক বাজিয়ে পুজোর আয়োজন করে এবং বলিদানও হয়। এরপরে পুজো শেষে মূর্তিকে আবার দক্ষিণ দুয়ারে রেখে আসা হয়। আবার যথারীতি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পূনরায় মূর্তি থেকে মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। এভাবেই প্রতি বছরের ন্যায় পুজো প্রক্রিয়া চলতে থাকে।



মন্দিরে বাবা কটারায়



রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের কটারায় মূর্তি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue



মুক্তস্নানের দিন এই কাঠের ঘোড়ার পীঠে চাপিয়ে বাবা কটরায়কে গ্রাম ঘোরানো হয়।



ধূনোসেবা ত্রয়োদশী তিথিতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue



বলিদানের দৃশ্য, এখানে ৯টি ছাগলকে পরপর সাজানো হয়েছে।



বানেশ্বর পূজা – পাদটীকা

১। রাঢ় বঙ্গ : ভাষাবিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে 'রাঢ়' শব্দটির উৎস প্রোটো-অস্ট্রো এশিয়াটিক 'রাঢ় বা 'রাঢ়ো' শব্দ দুটি থেকে, যার অর্থ লাল মাটির দেশ বা ল্যাটারাইট মৃত্তিকার দেশ। যাইহোক রাঢ় বাংলার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি হল সম্পূর্ন বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার মধ্যভাগ, বাঁকুড়া জেলার পূর্ব ও দঃ পূর্ব ভাগ ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলার পশ্চিমভাগ রাঢ়ের অন্তর্গত। এছাড়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অংশ বিশেষ এবং হুগলি ও হাওড়া জেলার সামান্য অংশ রাঢ়ের অন্তর্গত।

২। Composite Culture : আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার প্রাচীন মানুষ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ। পণ্ডিতদের মতে, এদের ভাষার নাম ছিল 'অস্ট্রিক'। জাতি হিসেবে এদের বলা হত নিষাদ। এরপর বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায় দ্রাবিড় জাতি। আর্যরা এদেশে আসার পূর্বে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বাঙালির জনপ্রকৃতিতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে। এটাই Composite Culture নামে পরিচিত। বহু বছর বিচিত্র আদান-প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙালির সংস্কৃতি হয়েছে মিশ্র সংস্কৃতি।

৩। ধর্মমঙ্গল কাব্য : বাংলা সাহিত্যে যে মঙ্গলকাব্যের সম্ভার রয়েছে সেখানে প্রধান মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং অন্নদামঙ্গল কাব্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট। এছাড়াও খেলারাম চক্রবর্তী, মানিকরাম, রূপরাম, চক্রবর্তী, শ্যাম পন্ডিত, সীতারাম দাস, রাজারাম দাস, দ্বিজ প্রভুরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্য ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের উৎসব কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের উৎসব। তিনিই হলেন রাঢ়ের প্রাচীন দেবতা।

৪। ভক্ত বা ভক্তে : ভক্তে হল 'ভক্ত' শব্দের মূল শব্দের অর্থ। গভীর ধর্মীয় অনুভূতি এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পন করেন। রাঢ় বঙ্গে চড়ক ও গাজন উৎসবে একধরণের ভক্ত দেখা যায়, যারা হাতে একটি বেতের লাঠি নিয়ে উৎসবের দিনগুলিতে গোটা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের মানুষ তাদের হাতে মার খাওয়ার জন্য এগিয়ে যায়। ভক্তেরা পুজোর দিন গুলোতে শুধু ফল জল খেয়ে উপবাস করে। ধর্ম পুজোগুলিতে ভক্তদের বড় একটি ভূমিকা থাকে, তাদের ছাড়া এই পুজো সম্পূর্ণ হয় না। সাধারণত নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকেই ভক্তে হওয়ার রীতি প্রচলিত হয়ে আছে।

৫। অক্ষয় তৃতীয়া : সংস্কৃত ভাষায়, 'অক্ষয়' (अक्षय) শব্দটি 'অবিনশ্বর, ক্ষয় নাই যাহার, সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্য', 'ত্রিত্য' এবং তৃতীয়া অর্থ 'চাঁদের তৃতীয় দিন'। হিন্দু পঞ্জিকায় বসন্তের বৈশাখ মাসের 'তৃতীয় চন্দ্র দিন' এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। এটি হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি। এই শুভদিনে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্ম নিয়েছিলেন, এ জন্য এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালন করা হয়। বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

৬। বুদ্ধপূর্ণিমা : বুদ্ধ পূর্ণিমা মূলত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৈশাখ/ জ্যৈষ্ঠ মাসের এই পূর্ণিমা দিবসে মহামানব বুদ্ধের জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে দিনটি 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। হিন্দুদের বিশ্বাস আছে যে এই দিনে ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধ রূপে তার নবম অবতার হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে বুদ্ধের মতো পরম অহিংস মহাপুরুষের জন্ম দিবসে রাঢ় বঙ্গে এই ধরণের অনুষ্ঠান কেন পালিত হয়? তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। আসলে বাংলা ছিল অনার্যদের কেন্দ্রস্থল সেখানে আর্যিকরণ ঘটেছিল দেরিতে। তাই সেখানে অহিংস প্রভাব খুব একটা পড়েনি। বাংলায় আর্য অনার্য সংস্কৃতির কম্পোজিট কালচার গড়ে উঠেছিল, আর সেই সংস্কৃতিরই একটি উদাহরণ হল ধর্ম ঠাকুর পূজা।

৭। চড়ক পূজা : চড়ক পুজো হল গ্রামবাংলার লোক সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পুজো পালিত হয়। নতুন বছরের প্রথম ২-৩ দিন ধরে চলে চড়ক উৎসব। জানুন গ্রাম বাংলার এই বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের মাহাত্ম্য। শোনা যায় দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত উপাসক বাণ রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মহাদেবের থেকে অমরত্ব পাওয়ার জন্য বাণ রাজা নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে মহাদেবকে তুষ্ট করেন এবং ভক্তিমূলক নাচ গান করে। শোনা যায় সেই সময় থেকে এই চড়কের পুজোর শুরু। লোককথা অনুসারে ১৪৮৫ সালে রাজা সুন্দরানন্দ ঠাকুর এই পুজোর প্রচলন করেন বলে অনেকে মনে করে। সেই সময় থেকে শৈব সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষজন এই উৎসব পালন করে আসছেন।

৮। বানেশ্বর পূজা : পৌরাণিক লোকশ্রুতি অনুযায়ী, বাণ নামক এক অসুর তপস্যার মাধ্যমে মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেব তাঁকে বর দিতে চাইলে বাণ বলেন, রোজ রোজ শিবলিঙ্গ নির্মাণ করতে তাঁকে বেশ কষ্ট করতে হয়। তাই দেবাদিদেব স্বয়ং-ই যদি উত্তম লক্ষণযুক্ত শিবলিঙ্গ দেন। তখন শিব ১৪ কোটি উত্তম লক্ষণযুক্ত শিবলিঙ্গ বাণাসুরকে দেন।

বাণাসুরের আরাধ্য বলে এই লিঙ্গগুলি বাণলিঙ্গ বা বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ নামে পরিচিত। এই শিবলিঙ্গগুলি প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট। রাঢ় বাংলার বেশিরভাগ গ্রামেই মূলত চড়কের দিন বানেশ্বর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য, 'রাঢ় বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি', কলকাতা, নন্দিতা পাবলিশার্স, ২০২৩ পৃ. ৪১-৬৬
২. চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর, গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম ভাগ, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ৩৫-৩৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, 'সাংস্কৃতিকী' (অখন্ড সংস্করণ) কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯ পৃ. ৩৬৯-৩৭৬
৪. সেন, দীনেশচন্দ্র, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ১৯৪০, অনলাইন সংস্করণ।
৫. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি', তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৪ পৃ. ৩০-৫৫
৬. মুখোপাধ্যায়, সুজয়, 'ধর্ম ঠাকুরের স্বরূপ সন্ধান ও নিরঞ্জন (ধর্ম) পূজা পদ্ধতি', কলকাতা, বার্ণিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ২৩-২৫
৭. দাঁ, সুধীর চন্দ্র, 'বর্ধমান পরিক্রমা', কলকাতা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, পৃ. ৩১২
৮. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, 'বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি', দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, ২০০০, পৃ. ৫৭৯-৫৮০
৯. মিত্র, ড. অমলেন্দু, 'রাঢ়র সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর', কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৭২, পৃ. ২০৫
১০. মিত্র, ড. অমলেন্দু, 'রাঢ়র সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর', কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৭২, পৃ. ২০৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 632 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 632 - 634
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুলিয়ার লোকবিশ্বাসের ধারায় ‘ধর্ম ঠাকুরের ব্রত’

সাবিনা খাতুন
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
বাংলা বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী কলেজ, পুরুলিয়া
Email ID : sabinakhatunprl@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword

Abstract

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলা ‘পুরুলিয়া’। জেলার লোকায়ত সমাজ জীবনে সারাবছরেই কোনো না কোনো উৎসব-পার্বণ লেগেই আছে। উৎসব-পার্বণ মানেই আচার-অনুষ্ঠানের পর্ব। দীর্ঘকাল ধরে পুরুলিয়া জেলার লোকজীবনে সামাজিক ও ধর্মীয় নানান আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। এখানকার নর-নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। লোকাচার বিধি মেনেই নর-নারীরা উৎসব-পার্বণগুলি পালন করে থাকেন। জেলার উৎসব-পার্বণের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে এখানকার ‘ব্রত’গুলি। ব্রত হল কোন কিছু কামনার উদ্দেশ্যে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকে বলা হয় ব্রত।

> “মানুষের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত অর্থাৎ কোনও কিছুর উদ্দেশ্যে নারীসমাজ আন্তরিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তা-ই হল ব্রত।”[১]

এখানকার লোকসমাজে ভাদু ব্রত, টুসু ব্রত, করম-জাওয়া ব্রত, লক্ষ্মীর ব্রত, শিবের ব্রত র মত অজস্র ব্রত প্রচলিত। সমস্ত ব্রতের মূলে রয়েছে কামনা। এই কামনা স্বামী-পুত্র-ভ্রাতার মঙ্গল কামনা, রোগব্যাধি নিরাময়ের কামনা, সুস্বাস্থ্যের কামনা, শস্য ও ধন সম্পদ বৃদ্ধির কামনা, পুত্র সন্তান লাভের কামনা ও বৃষ্টির কামনা – অর্থাৎ মানব জীবনের সার্বিক মঙ্গলকামনা করা হয় এই সমস্ত ব্রতগুলিতে।

ব্রতগুলি মূলত নারীকেন্দ্রিক। জেলার অধিকাংশ ব্রত নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেমন - মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, ভাদু ব্রত, টুসু ব্রত, করম-জাওয়া ব্রত, লক্ষ্মীর ব্রত, তুলসী ব্রত প্রভৃতি। বাঙালি নারী চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও স্বামী-সন্তান ও সাংসারিক মঙ্গলকামনা করে থাকেন ব্রতের মধ্যে দিয়ে। পুরুষেরা সুস্বাস্থ্যের কামনায়, রোগব্যাধি দূরীকরণে অনেক সময় ব্রত পালন করে থাকেন। কখনো একক ভাবে আবার কখনো নারীদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্রত করে থাকেন। জেলায় নারী-পুরুষ যৌথ ব্রতের সংখ্যাও কম নয়। যেমন - শিবের ব্রত, মনসার ব্রত, গাজন ব্রত, ধর্মের ব্রত, শীতলার ব্রত প্রভৃতি। ব্রতগুলি উদ্ভবের পেছনে রয়েছে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। জেলার নর-নারীরা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার বশতই ব্রতগুলি পালন করেন। পুরুলিয়া জেলার ‘ধর্মঠাকুরের ব্রত’ তেমনই এক ব্রত। পুরুলিয়া জেলার লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের পূজা আসলে সূর্যের পূজা। সূর্যের অপর নাম বলা হয় ধর্মরাজ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরকে সূর্যদেব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 632 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের মন্দির বা থান থাকলেও কোথাও তার নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। প্রতিটি মন্দিরে একখণ্ড পাথর যা ধর্মশিলা নামে পরিচিত সেটাকেই ধর্মঠাকুর বলা হয়।

"ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। তাহার পরিবর্তে এক খণ্ড স্বাভাবিক পস্তরই এই নামে পুজিত হয়।"[২]

কেবল পুরুলিয়া জেলায় নয় সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের মাহাত্মের কথা পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ-পরগনা অর্থাৎ সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। প্রতিটি জেলায় ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে ব্রত-উৎসব পালিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - বীরভূম জেলার ধর্মঠাকুরের কথা। বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের মালাকার পাড়ায় অবস্থিত ধর্মঠাকুর। এখানে আষাঢ় মাসে বা শ্রাবণ পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। বীরভূম জেলায় ধর্মের ভক্তরা আগুন নিয়ে, কাঁটা নিয়ে খেলা করে। আবার বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে আষাঢ় পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। ধর্মপূজা উপলক্ষে এখানে গাজন হয়। যা ধর্মের গাজন নামে পরিচিত।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্মের কথা মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই ব্রতের উল্লেখ রয়েছে –

"প্রবেশ করিলে পূর্ণ পঞ্চম বৎসরে।
বার বর্ণ সকলে ধর্মের ব্রত করে।।"[৩]

পুরুলিয়া জেলায় পাড়া, দুরমট, ছড়রা, বিলতোড়া, মানবাজার, নেতুরিয়া, রঘুনাথপুর প্রভৃতি এলাকায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। জেলার অধিকাংশ স্থানেই ধর্মঠাকুরের পূজা হয় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। যেমন - দুরমট ও পাড়ায় বৈশাখ মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার সময় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পাড়ায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয় বৈশাখ মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। ব্রতিনীরা পূজার আগের দিন বার করেন। পূজার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করে থাকেন। কেউ কেউ আবার দণ্ডী দেয়। সন্ধ্যায় পূজার পর কিছু খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। মন্দিরের পাশেই আছে এক বটগাছ। ভক্তরা এই গাছে সুতো বেঁধে মানত রাখেন। ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে এখানে মেলা হয়। মেলা চলে সাতদিন ধরে। মেলায় জেলা ও জেলার বাইরের হাজার হাজার লোকজনের সমাগম ঘটে। এখানে নারী ব্রতিনীর সংখ্যা বেশি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মঠাকুরের পূজা ও মেলা দেখতে আসেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে রঘুনাথপুরের আড়রা গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। এখানে মূল পূজা হয় তিন দিনের। প্রথম দিন ভক্তারা ক্ষৌরকর্ম করেন। সেদিন বার করেন। দ্বিতীয় দিন উপোস করতে হয়। সেদিন মূল পূজা হয়। পূজাতে পদ্মফুল ও একধরনের কাগজের ফুল দেওয়া হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্তারা অঙ্গে শলাকা বিদ্ধ করেন এবং নৃত্য করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তৃতীয় দিন হয় চড়ক ঘোরা। নারী-পুরুষ উভয়েই ধর্মঠাকুরের ব্রত পালন করেন। কেউ কেউ দণ্ডী দেয়। কেউ আবার মশাল নৃত্য করেন। এখানেও ধর্মঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের ভিড় দেখা যায়। পাশাপাশি গ্রামগুলি থেকেও লোকজনের আগমন ঘটে।

শ্রাবণ মাসে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। যেমন - ছড়রার ধর্মঠাকুরের পূজা। শ্রাবণ মাসে রাখী পূর্ণিমার দিন এখানে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্মঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষ উভয়েই ব্রত পালন করেন। সারাদিন উপবাস দিয়ে সন্ধ্যার সময় ধর্মের থানে মানত রেখে দণ্ডী কাটে। পুরুষেরা ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক গান করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। সাধারণত জেলার ডোম ও বাউরি সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা ধর্মঠাকুরের পূজার দায়িত্বে থাকেন। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও এই পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। পূজায় ধর্মঠাকুরকে ঘি, গুড়, আতপচাল, কলা, বাতাসা, সিঁদুর নিবেদন করা হয়। পুরুলিয়া জেলার ছড়রা গ্রামের পোদ্দার পাড়ায় ধর্মঠাকুরের মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরে পাথরের অনেকগুলি বিগ্রহ আছে। একসময় এখানে অনেক বিগ্রহ ছিল। পরবর্তীকালে কিছু চুরি হয়ে গেছে। আর কিছু জেলার

রামকৃষ্ণমিশনের সংগ্রহশালায় আছে। গ্রামের মন্দিরে ধর্ম ঠাকুরকে (ধর্মশিলা) কাঠের সিংহাসনে বসানো আছে। মন্দিরে আরও অনেকগুলি মূর্তি আছে। সেগুলিও কাঠের সিংহাসনে বসানো। বেশ কিছুগুলি ভগ্নমূর্তি আছে। ধর্ম মন্দিরের পাশে আছে ভগ্ন সূর্য মন্দির ও জৈন মন্দির। প্রতিবছর রাখীপূর্ণিমার দিন এখানে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। ব্রতিনীরা পাশের পুকুরে স্নান সেরে দণ্ডী দেয় ধর্ম মন্দির পর্যন্ত। এখানকার ধর্মরাজ ঠাকুর খুবই জাগ্রত বলে এলাকাবাসীর বিশ্বাস। ধর্মপূজা উপলক্ষে এখানে একদিনের মেলা হয়। মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও সুদূর ধানবাদ, চাষ, চন্দনকিয়ারী, হাজারীবাগ থেকে ভক্তরা আসেন এই মেলায়। ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে এই মেলা হয় বলে এই মেলা ধর্মরাজের মেলা নামে পরিচিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুরুলিয়া জেলার নানান প্রান্তে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যের কথা রয়েছে। ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন। নারী-পুরুষ উভয়েই ব্রত পালন করেন। কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে ব্রতিনীরা ব্রত পালন করেন। নারীরা স্বামী-সন্তানের মঙ্গলকামনায় এবং পুত্র সন্তানের কামনায় ধর্মঠাকুরের ব্রত করেন। এছাড়া বিভিন্ন চর্মরোগ যেমন - কুষ্ঠ, হাম, পক্স প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে এই ব্রত পালন করা হয়। নারী-পুরুষ উভয়েই মানত করেন। মানত পূরণ হলে ধর্মঠাকুরের কাছে পূজা দেন এবং পাঁঠা বলি দেন।

আজও পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবছর ধূমধাম ভাবে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পূজা উপলক্ষে মেলা ও পার্বণে ভক্তরা মেতে উঠেন। নারী-পুরুষ উভয়েই ভক্তিভরে ধর্মঠাকুরের পূজা করেন, ব্রত পালন করেন। এলাকার জনমানসে বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ব্রত করলে যে কোনো ধরণের চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পুত্র সন্তান লাভ হয়। আজও সেই বিশ্বাস বশতই জেলার বিভিন্ন গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়ে চলেছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নর-নারীরা এখনো ধর্মঠাকুরকে বিশ্বাস করে চলেছে। ব্রতিনীদের কামনা পূরণ হওয়ার কারণে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

Reference:

১. বসাক, শীলা, 'বাংলার ব্রতপার্বণ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,' এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫ পৃ. ৫০৫
৩. গাঙ্গুলি, মাণিকরাম, 'ধর্মমঙ্গল', কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ২৬৪

Bibliography:

ক্ষিতীশচন্দ্র দেওঘরিয়া (৭০), ২রা শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার, ছড়রা, পুরুলিয়া।
কৈলাস মালাকার (৬৪), ২রা শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার, ছড়রা, পুরুলিয়া।
তরুণদেব, ভট্টাচার্য, 'পুরুলিয়া', ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬
ড. দয়াময় মণ্ডল, ও প্রদীপ কুমার ঘোষ, 'মানভূমের সংস্কৃতি', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, নভেম্বর, ২০২২
বিনয়, ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১য় খণ্ড), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৯
শিবশঙ্কর, সিং, 'পুরুলিয়ার লোকমেলা', নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিসট্রিবিউটরস্, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০২১
ড. সুভাষ, রায়, 'পুরুলিয়ার মন্দির-স্থাপত্য', রাঢ় প্রকাশন, বীরভূম, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০২৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 635 - 645
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা প্রবাদের গঠনপ্রকৃতি

শ্যামসুন্দর প্রধান
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাগর মহাবিদ্যালয়, হরিণবাড়ি, সাগর
Email ID : shyampradhan73@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Proverb, Construal, Functionality, Padaprakaran, Dual Contrast, Psychoanalysis, Chaturanga Construal, Neutral-Sympathetic.

Abstract
The premises of folk culture have always been wide-ranging – from past to present to future, from village to city, from uneducated to educated societies, from oral to written traditions. Discussions about its science were at first whimsical and in which the role of the collector rather than the expert was predominant; Later that discussion turned into an in-depth analysis of scholarly society. The discussion of folk culture morphology or structuralism is a product of this expanded vision. Although linguists have developed the concept of structuralism in the scope of sociolinguistics, this method has been applied and discussed in the field of folk culture by Propp, Strauss, Dundis, Maranda couple, Milner, Goodwin and Wenzel, Peter Sistel and others. One of the main forms of non-material folk culture is that proverbs, though short-lived, incorporate the essence of long-lived experiences in folk society. Since it depends on unwritten and spoken sentences, its stylistic analysis should be in the form of 'sentences'. If you don't know its exact form, judging its structure may be incomplete or wrong. Therefore, it is necessary to judge the form or structure of the proverb to understand the people's experience, integrated social-psyche awareness, utility of daily folk usage, literary beauty and sense of humor etc. Western folklorists have analyzed the structure-nature or structure of proverbs in various ways. The order and measure of people can be identified from the structure-size-type-semantic features of proverbs. As a result proverbs are not composed randomly; It is based on scientific reasoning. This will be discussed in detail in the main article.

Discussion

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন্ [Charles Robert Darwin (1809-82)] ‘The Origin of Species’ (১৮৫৯) গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী-মানুষের জন্ম হয়েছে। এই মতবাদের ফলে ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি (বাইবেলে বর্ণিত) সম্পর্কিত অলৌকিক তত্ত্বই শুধু খণ্ডিত হয় নি, সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। গঠনশৈলীতেও এর প্রভাব পড়েছিল। ‘গঠনশৈলীবাদ’ বা ‘গঠনাত্মক সমালোচনা’ (Structuralism) যে রূপে এখন পরিচিত বা প্রচলিত হোক না কেন, আমরা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তা পেয়েছি পাশ্চাত্য লোকসংস্কৃতিবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের থেকে। কিন্তু এর বীজ ছিল খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর ভারতীয় কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থে পরিব্যক্ত 'বক্রোক্তিবাদ'-এ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের পর থেকে লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় যে নতুন নতুন পদ্ধতি চালু হতে থাকে, তা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। তবে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিল। লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় যে সমস্ত তত্ত্বের প্রচলন ঘটেছে তার মধ্যে গঠনতত্ত্ব বা গঠনকাঠামো বিশ্লেষণ মতবাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ লোকসাহিত্য কেন যে কোনো সাহিত্য-সংরূপের যথার্থ স্বরূপ না জানলে তার গঠনশৈলী বিচার অসম্পূর্ণ কিংবা ভ্রান্তও হতে পারে।

অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান প্রকরণ হল প্রবাদ। এটি আবার লৌকিক 'বাক্শিল্প' বা 'Verbal Art' -এর উপধারার অন্তর্গত। এটি অলিখিত (Unwritten) ও কথ্য বাক্যনির্ভর (Based on Colloquial Sentences), তাই প্রবাদের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করতে গেলে 'বাক্যবন্ধ' (Sentence Structure) রূপেই একে বিচার করতে হবে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে প্রবাদ কী ধরনের বাক্যবন্ধ? স্পেনদেশীয় প্রবাদে বলা হয়েছে, "A Proverb is a short sentence, based on long experience"[১], অর্থাৎ প্রবাদ হল এমন একটি ছোট বাক্য, যার মধ্যে সংহত হয়ে আছে লোকসমাজে দীর্ঘচালিত অভিজ্ঞতার নির্যাস। এর দেহাবয়ব ছোটো হলেও অর্থের দিক থেকে এটি অসামান্য। সরল ও সংক্ষিপ্ত অথচ রসময় ব্যঞ্জনার জন্য লোকসমাজে প্রবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় সম্পদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রবাদ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'The wit of one, the wisdom of many'।[২] কিন্তু এই বুদ্ধিদীপ্ত অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ সংক্ষিপ্ত প্রবাদ বাক্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বাক্যের মতো 'Absolute Truth' বা 'Universal Truth' কিংবা চূড়ান্ত ধ্রুব সত্য বাক্য নয়। প্রবাদের সত্য 'আপেক্ষিক সত্য বা Relative Truth'। প্রবাদ-বাক্যে প্রকাশিত লোক অভিজ্ঞতা, সংহত সমাজ মানসের শেণিচেতনা, দৈনন্দিন লোকব্যবহারের উপযোগিতা, সাহিত্যসৌন্দর্য ও রসবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বুঝতে এর Form বা গঠন বা রূপের বিচার প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ প্রবাদের গঠন-প্রকৃতি বা গঠনরীতি বা গঠনশৈলীগত নানা তত্ত্বে এর রূপবন্ধ বিচার করেছেন।

মানবসমাজ যেমন জনসমাজ ও শ্রেণিগত বিন্যাসের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তেমনি মানুষের বাক্যবিন্যাসও বর্ণ বিন্যাসের নিয়মের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে। আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্‌গণ লোকসাহিত্যের উপকরণের গঠনরীতি বিশ্লেষণে তৎপর। নৃতত্ত্ববিদ লেভি স্ট্রাউস, সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্ডিনাণ্ড ডি. সোসুর, ফ্রাঞ্জ বোয়েজ, এডওয়ার্ড সাপির, নোয়াম চম্‌স্কি, ভ্লাদিমির জ্যাকলো ভিচ প্রপ্, থমসন এ. সিভিয়ক, মারান্দা দম্পতি, এলান ডাণ্ডিস, রিচার্ড প্রিয়েভ, এডমণ্ড লীচ, জর্জেস, মিলনার প্রমুখরা 'স্ট্রাকচারাল ফোকলোর', 'ভাষা : লোকসাহিত্যের রূপতত্ত্ব ও গঠনতত্ত্ব' নিয়ে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

গঠনরীতির প্রয়োগগত দিকটি আলোচনার আগে গঠনরীতির মৌলিক উপকরণগুলি নিয়ে দু' একটি কথা বলা যাক্। ল্যাতিন 'Structure' শব্দের অর্থ হল সজ্জা, সংগঠন, স্তূপ [The Components of a language (as phonomes and Morphemes) and the way in which they are related-compare phonomics, Morphonomics, Morphology, Syntax.]। ভাষাতত্ত্বে এর অর্থ একটু ব্যাপক। কারণ ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ভাষার মৌলিক কণাগুলির তাৎপর্য খুব বেশি। যেমন – ধ্বনি এবং রূপরেণুগুলির ঘন সুনিয়ন্ত্রিত সন্নিবেশে শব্দ, বাক্য ও ভাষা গড়ে উঠেছে। ফার্ডিনাণ্ড ডি. সোসুর, নোয়াম চম্‌স্কি প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিতে Structuralism-এর ধারণার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটলেও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ এবং এ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছেন রাশিয়ান বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ভ্লাদিমির জ্যাকলো ভিচ প্রপ্। তবে তাঁর আলোচনা মূলত রাশিয়ান রূপকথার গঠনরীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৮৫৮ সালের আগে রূপতত্ত্ব (Morphology) আলোচনার সূত্রে প্রপ্ লোককথার গঠনরীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন।

যে কোনো প্রকারের কাঠামো বিশ্লেষণে প্রথমে আলোচ্য বিষয়ের কার্যকরী এককগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে, যাতে ওই এককগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিষয়ের গঠনটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায়। এই কারণেই আঙ্গিকসংস্থানবাদী বা গঠনতত্ত্ববাদীগণ প্রত্যেকেই লোককথার স্ব-স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী নানা প্রকার একক নির্বাচন করেছেন। একটি বাক্যের কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া যেমন সমগ্র বাক্যটিকে নিয়ন্ত্রণ বা চালিত করে, তেমনি ফোকলোরের উপাদানগুলির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(পক্ষ ও ক্রিয়াশীলতা) মধ্যে ক্রিয়াশীলতা বা Function কাহিনিকে গতি দান করে। মূলত প্রপ্ ফর্মালিস্টদের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে ফোকলোরের গঠনকাঠামো বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং বিষয়টিকে প্রথম বিশ্ববাসীর সামনে এনেছিলেন। তাছাড়া তিনি দেখিয়েছেন কাহিনি পরিভ্রমণের সময় অনেকক্ষেত্রে বিষয়ের হেরফের ঘটে, পরিবর্তন হয় কিন্তু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ পরিবর্তনীয় শক্তিকে বলেছেন Variables এবং অপরিবর্তনীয় শক্তিকে বলেছেন Constants। আবার এও তিনি বলেছেন কাহিনিতে ক্রিয়াশীলতাগুলি পরপর সাজানো থাকে, কেননা কাহিনির বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্রিয়াশীলতার স্থান দৃঢ়। আবার কাহিনির এই অগ্রগতি কখনো উর্দ্ধগামী অথবা নিম্নগামী হতে পারে। প্রপ্ কাহিনির কাঠামগত বিশ্লেষণে ৩১টি (ঙ - প্রাথমিক অবস্থা, ছ, ঞ, ড, ঐ, ফ, ন, জ, আ, অ, ব, চ, ঢ, এ, ভ, গ, হ, য, ই, অঅ, অঅভ, পর, রস, ও, ল, ম, স, শ, ঘ, ট, উ, ঊ) ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।[৩] তবে প্রতিটি কাহিনিতে সবগুলি ক্রিয়াশীলতা বা Function নাও থাকতে পারে। আবার প্রতিটি মূল Function বা ক্রিয়াশীলতা একাধিক উপবিভাগে বিভক্ত। এক্ষেত্রে প্রপ্-এর এই তত্ত্বকে বলা হয় Syntagmatic Model বা বাক্য ক্রমানুযায়ী মডেল বা ক্রিয়াশীলতার ফর্মুলা। এগুলি সবই লোককথাকে ঘিরে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য প্রপ্ প্রদত্ত এই মোডেলটি লোককথার কাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ মেলভিল জাকব প্রপ্ এই মডেল সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে প্রপ্-এর কাজের মূল্য খুবই সামান্য। আর এক লোকসংস্কৃতিবিদ্ তাঁর 'The Socio Psychological analysis of Folktales' (1963) গ্রন্থে প্রপ্-এর দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক সমালোচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রপ্-এর তত্ত্বের দুর্বলতার দিকটি তুলে ধরে বলেছেন, এটি লোককথা ছাড়া লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রযোজ্য নয়। ফিশারের সমসাময়িক সময়ে প্রপ-এর সমালোচনায় যিনি সবচেয়ে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তিনি হলেন আর্চার টেলার। পরবর্তীকালে প্রপ-এর তত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচক হলেন ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ্ ক্লড লেভি স্ট্রাউস। তিনি প্রপ্-এর বুদ্ধিমত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েও পদে পদে তাঁর তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন এবং নিজে এ বিষয়ে এক যুগান্তকারী তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। অবশ্য বহু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও একথা বলা যায় ভ্লাদিমির প্রপ-ই লোককথার সর্বজনীন কাঠামো সম্বন্ধে একটি ধারণা দেন তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে।

প্রবাদে প্রপ্-এর এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করা যায় সঠিক ও সুষ্ঠভাবে। প্রবাদ খুব সংক্ষিপ্ত বাক্য বা বাক্যাংশ হলেও অনেক প্রবাদের পেছনে গল্প আছে। তবে প্রবাদে প্রয়োগের সময় সেই গল্পটি যদি জানা থাকে তবে এই পদ্ধতির প্রয়োগটি বুঝতে সহায়ক হবে। এই পদ্ধতিগুলি বেশি সক্রিয় থেকেছে কাহিনি নির্ভর গল্পে। 'খ'য়ে বন্ধন' প্রবাদে গল্পটি হল- একটি ছোটো ছেলে ঘরে খুঁটির কাছে বসেছিল। তার ঠাকুরমা একটি পাত্র নিয়ে তার কাছে এসে বলল, 'খই খাবি ত হাত পাত।' লোলুপ ছেলেটি দু'হাত এক করে বিস্তৃত করল। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে খুঁটির দু'পাশ দিয়ে তার হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরমা তার হাতে খই ঢেলে দেওয়ার পর সে মুখের কাছে হাত নিয়ে আসতে গিয়ে নিজের বিপদ বুঝতে পারল। হাত খুললে খই'গুলি মাটিতে পড়ে যাবে, আর হাত না খুললে সে মুখে খই দিতে পারছে না, খুঁটিতে হাত আটকে যাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে 'খ'য়ে বন্ধন' অর্থাৎ অগ্র পশ্চাৎ সকল দিকেই অসুবিধায় পড়া।

প্রপ্-এর রীতি (একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতা) অনুসারে কাহিনিটিকে সাজালে এভাবে দাঁড়ায় -

১। ঙ. ছ^{৪}. ঞ^{২}. ঢ^{২}.
২। অ^{৫}. ব^{১}. এ^{১০}. অঅ^{২}.
৩। ম^{১}. ট^{৪}. রস^{৭}.

অর্থাৎ সমগ্র কাহিনিটি হল-

ঙ. ছ^{৪}. ঞ^{২}. ঢ^{২}.↑ অ^{৫}. ব^{১}. এ^{১০}. অঅ^{২}. ↓ ম^{১}. ট^{৪}. রস^{৭}.

ঙ - প্রাথমিক অবস্থা
ছ^{৪} - উপস্থিতি
ঞ^{২} - উপদেশ
ঢ^{২} - দাতা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ
এরপর কাহিনি মোড় নিয়েছে- ↑
অ^{৫} - অভাব বোধ
ব^{১} - নায়ককে (শিশু) সরাসরি প্রেরণ
এ^{১০} - বিনিময়ে সম্মতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অত্র[২] - হস্তগত করা
এরপর আবার কাহিনি পরিবর্তন- ↓
ম[১] - খাদ্য দ্বারা পরীক্ষা
ট[৪] - যুক্তিগ্রাহ্য এবং কৌতুকময় আকৃতি
রস[৭] - লোভ থেকে বিরত থাকা

প্রপ্-এর তত্ত্বের সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ ক্লড লেভি স্ট্রাউস। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Structural Study of Myth' প্রবন্ধে তিনি নৃবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে লোককথার অন্তর্গত Myth বা লোকপুরাণকথা বিশ্লেষণের একটি গঠনবাদী বা রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। পরে চার খণ্ডে রচিত 'Mythologigues' গ্রন্থাবলীতে তিনি এটির আরও বিশদ আলোচনা করেন। তিনি তাঁর কাঠামোগত বিশ্লেষণে প্রত্যেকটি মোটিফের বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতিকে বলা হয় পদপ্রকরণজাত বিশ্লেষণ বা Paradigmatic Analysis। Paradigm বা পরিকল্প এবং Sintagma বা ক্রমান্বয়কে যথাক্রমে উলম্ব (Vertical) ও আনুভূমিক (Horizontal) রূপে সাজিয়ে এদের মধ্যে Myth বা লোকপুরাণের Mythem বা লোকপুরাণকথা রেণুগুলির চরিত্র ও ক্রিয়াশীলতা বোঝা যাবে। তবে স্ট্রাউস মনে করেন Myth-কে বুঝতে গেলে Mythem গুলিকে উলম্ব সারিতে সাজানো দরকার এবং এই এককগুলিকে বাম দিক থেকে ডান দিকে পড়া দরকার। এজন্য স্ট্রাউসের পদ্ধতিকে Syntagmatic Model অনুসারীও বলা হয়। আবার মিথেম (Mythem) কে লোকপুরাণ কথার ক্ষুদ্র এককও বলা হয়। একটি প্রবাদকে উলম্ব বা Vertical ও আনুভূমিক বা Horizontal বা আনুভূমিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় –

কুলীনের বউ তরুনী
চোখের জলে বিনুনি
মতান্তরে সতীন নিল চিরুনী
সাগর জলে স্বামীর পা
মতান্তরে আছাড় খায় চিতায় যা
মতান্তরে ও ছুঁড়ী তুই চিতায় যা।

Horizontal (আনুভূমিক) –

এই প্রবাদটি Horizontal বা আনুভূমিক ভাবে পড়লে তো অর্থ পাওয়া যায় কিন্তু Vertically বা উলম্ব ভাবে পড়লে যে বাক্য এবং অর্থগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল।

ক – কুলীনের চোখের সামনে সতীন সাগর তীরে আছাড় খায়।
খ – বউকে চিতায় চড়ানোর আগে শুদ্ধ হবার জন্য স্নান করানোর রীতি ছিল এবং জলে দাঁড়িয়ে তুলসীপাতা বা বেলপাতা খেতে হত।
গ – স্বামীর চিতার জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখায় তরুনীর বিনুনি/ চিরুনি জ্বলে যায়।
ঘ – পা যা। অর্থাৎ পা বেঁধে চিতায় যা।

ক্লড লেভিস্ট্রাউস 'The Structural Anthropology' গ্রন্থে Myth বা পুরাণের গঠনরীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চরিত্র ও ঘটনার বৈপরিত্য এবং রূপ ও বস্তর দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর এই তত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন চরিত্রের দ্বৈত সত্ত্বার ওপর। মানবচরিত্রে যেমন পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশায় দ্বন্দ্ব চলছে, তেমনি মানব সমাজের কাঠামোতেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। লেভি স্ট্রাউস এর নাম দিয়েছেন Bianary Opposition বা দ্বৈত বৈপরীত্বের সম্বন্ধ। প্রপ্ এটিকে দু'ভাবে দেখেছিলেন – 'Synchronic' এবং 'diachronic'। মূলত ফরাসী ভাষাবিদ এফ. ডি. সোসুর(F. De. Saussure) এই শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছিলেন ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে। 'মাছ আর অতিথি দু'দিন পরেই বিষ' প্রবাদে দ্বৈত বৈপরীত্যের ব্যাপারটি কীভাবে রয়েছে তা দেখা যাক – এখানে মাছ আর অতিথি দু'টি বিষয়কে সমগোত্রীয় বলা হয়েছে। বাঙালী গৃহস্থ ঘরে মাছ আর অতিথির আদর দু'দিনের জন্য। অনাহূত অতিথি আসার পর দু'দিন ভদ্রতার খাতিরে মানিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিতে হয়। কিন্তু তৃতীয় দিন তাকে বিদায় দিতে পারলে গৃহস্থের স্বস্তি। তেমনি টাটকা মাছ প্রথমদিন উপাদেয়, দ্বিতীয় দিনেও টক, ঝাল চলতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিনে স্বাস্থ্যের খাতিরে বাসি মাছ ভক্ষণ না করাই ভালো। এখানে দু'টি বস্তু প্রথমে গ্রহণ করে পরে পরিবর্জন করা হয়েছে। দু'টি বস্তু দু'টি বিপরীত ধর্মে রয়েছে। লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় এখানে Bianary Opposition বা দ্বৈত বৈপরীত্যের উপাদান লক্ষ্য করা যায়।

মূলত স্ট্রাউসের মূল বক্তব্য ছিল – মিথের সম্পূর্ণ ও যথাযথ অর্থ উদ্ধার করার জন্য এর মোটিফ বা অভিপ্রায়গুলিকে পৃথক করে এদের Motifeme বা অভিপ্রায়রেণুগুলিকে খুঁজে বের করা এবং তাদের Function বা ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে অর্থবোধক ভাবে সাজানো। কারণ মিথের সামগ্রিক অর্থ বিচ্ছিন্ন নয়, মিথের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তা সমন্বিত হয়ে থাকে। এরপর এদের বিপরীতমুখী বক্তব্য ও ক্রিয়াশীলতাকে সাজালে একনজরে সামগ্রিক তাৎপর্যে পৌঁছানো যাবে। লেভি স্ট্রাউসের বীজগাণিতিক সূত্রটি হল– $fx(a) : fy(b) :: fx(b) : fa^{-1}(y)$

যেখানে fx হল Function বা ক্রিয়াশীলতা, fy হল প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত কর্মশীলতা, এর অবস্থা b-এর সঙ্গে যুক্ত। a হল প্রথম পক্ষ, b হল মধ্যস্থকারী।

প্রবাদের গঠনশৈলী বিশ্লেষণে 'Mytheme' (লোকপুরাণ কথারেণু)-এর মতো 'Motifeme' (অভিপ্রায় রেণু) এবং 'Function' (ক্রিয়াশীলতা)-এর উপাদানটুকু থাকে কিনা দেখা যেতে পারে। যেমন –

'পরের সোনা দিয়ো না কানে।
প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা-টানে।।'

এই প্রবাদের অভিপ্রায়গুলি কী কী হতে পারে? ধরা যাক্ - (১) সোনা নামক দ্রব্য উজ্জ্বল, মনোহারী, সৌন্দর্য; (২) ওই ধাতুর বহুমূল্যতা; (৩) সৌন্দর্যপ্রিয় নারীজাতির স্বর্ণালঙ্কারের লোভ; (৪) সোনার কর্ণভূষণ কানে দুলিয়ে নিজের সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা; (৫) নিজের ওই স্বর্ণালঙ্কার না থাকলে পরের কাছ থেকে (দ্বিতীয় অথবা অপর নারী) যে ভাবেই হোক তা বাগানের অপচেষ্টা এবং তা হাতানো; (৬) উভয় নারীর অবশ্যম্ভাবী বিবাদ সংঘাত; (৭) পরিণামে প্রথমা নারীর প্রাণ সংশয়; (৮) কোনো বুদ্ধিমতী তৃতীয় নারী প্রথমা নারীকে আত্মরক্ষার জন্য সাবধানবানী শোনায় এবং দ্বন্দ্বরোধের চেষ্টা করে।

স্ট্রাউসের পূর্বোল্লিখিত বীজগাণিতিক সূত্র অনুসারে এখানে fx অর্থাৎ Function বা ক্রিয়াশীলতা হল সোনার কর্ণাভরণ নিয়ে দুই নারীর দ্বন্দ্ব। এখানে অর্থাৎ প্রথম পক্ষ হল পরের সোনা হাতানো প্রথম নারী, আর b অর্থাৎ মধ্যস্থকারী হল তৃতীয় নারী, যে এই দ্বন্দ্ব নিবারণ চায়। আর fy অর্থাৎ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত ক্রিয়াশিলতাই হল – দ্বিতীয়া নারী প্রথমা নারীর কানে হ্যাঁচকা টান মেরে নিজের সোনার গয়না উদ্ধারের চেষ্টা।

অঙ্গসংস্থানবাদের আলোচনা বিশেষভাবে কোন ধারার প্রবর্তন না করলেও সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্বের বৃদ্ধি ও বিকাশে সবিশেষ অবদান রেখেছেন আমেরিকান প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যালান ডাণ্ডিস। তিনি Wolfgang Mieder-এর সঙ্গে নিজের সম্পাদনায় রচিত 'The Wisdom of many' গ্রন্থে 'On the structure of the Proverb' প্রবন্ধে প্রবাদের গঠনশৈলী বিচার করেছেন। প্রবাদ বিচার পদ্ধতিতে এ্যালান ডাণ্ডিস প্রবাদের 'Propositional Descritive Element' বা আরোপিত বর্ণনামূলক উপাদানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন – (১) Topic(T), (২) Comment(C)। বাংলায় এদের যথাক্রমে বলা হয় – (১) বিষয় ও (২) উক্ত বিষয়ের মন্তব্য। তিনি 'On the Structure of the Proverb' প্রবন্ধে স্পষ্ট বলেছেন –

"The basic unit of proverbs seems to me to be a topic – comment construction."[8]

অর্থাৎ অর্থগত 'বিষয় মন্তব্য' গঠনই প্রবাদের মূল কাজ। কয়েকটি প্রবাদে এই বিষয়(Topic/T) ও মন্তব্য(Comment/C) গত গঠন উপাদান কীভাবে রয়েছে দেখা যাক। 'ঘরে নেই অন্ন,/ তার নাম দাতাকর্ণ' প্রবাদ বাক্যের প্রথম অংশের বিষয় (T) হল 'ঘরে নেই অন্ন'। অর্থাৎ নিরন্ন উপবাসী অক্ষম ব্যক্তির গৃহ-সংসার। আর এই বিষয় সম্পর্কে বাক্যের দ্বিতীয় অংশের মন্তব্য (C) হল 'তার নাম দাতা কর্ণ'। অর্থাৎ আর্থিক অনটন ও অক্ষমতা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তির দানবীয় কর্ণ নামে পরিচিত হবার দুরাকাঙ্ক্ষাকে ব্যঙ্গ পরিহাস।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ্যালান ডাণ্ডিস মূলত রাশিয়ান অঙ্গসংস্থানবিদ ভ্লাদিমির জ্যাকলো ভিচ প্রপ্-এর ধারনা অনুসারি ছিলেন। ভাষার ক্ষুদ্রতম কার্যকরী একক Morpheme-এর ধারনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রপ্ বর্ণিত Function-কে Motifeme নামে চিহ্নিত করেছেন। প্রপ্ ৩১টি ক্রিয়াশীলতার কথা বললেও বেশিরভাগ কাহিনিতে সবগুলি ক্রিয়াশীলতা থাকে না।[৫] তিনি স্বীকার করেছেন এই ক্রিয়াশীলতা আরও বিচিত্র হতে পারে। তাছাড়া তিনি লোককথা বিচার পদ্ধতিতে 'Lack' বা 'অভাব' এবং 'Lack Liquidated' বা 'অভাব বিমোচন'-এই দুটি Motifeme বা অভিপ্রায় রেণুর কথা বলেছেন। ডাণ্ডিস বলেছেন 'One Structural type of American Indian Folktale Consists of just two motifemes – Lack (L) and Lack Liquidated (LL)'।[৬] প্রবাদ বাক্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদে কোনো অভাবী ব্যক্তির পারিবারিক বা সামাজিক বা ব্যক্তিগত দায় থেকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার 'অভাব'(Lack/L), দানশীল ধনী গৌরী সেন সেই টাকা দেওয়ায় 'অভাব মোচন' (Lack Liquidated/LL)। কিংবা 'একলা ঘরের গিন্নি হবে,/চাবিগাছি ঝুলিয়ে নাইতে যাব' প্রবাদে অভাব বোধ হল একান্নবর্তী পরিবার (Lack/L), নারী সেই পরিবারের বউ হবে কিনা সে নিজে জানে না। আর অভাব পূরণ হল, সে একলা ঘরের বউ হবে (Lack Liquidated/LL)। বাস্তবে কী ঘটবে তা জানা নেই, তবে ইচ্ছা পূরণের তাগিদে সে অভাব পূরণ করতে চেয়েছে।

ইউরোপ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের চিন্তা জগতে যিনি একই সঙ্গে স্বতন্ত্রবিদ্যা ও আধুনিক স্তরে উন্নীত করেছিলেন, তিনি হলেন স্যার সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। তাঁর 'মনঃসমীক্ষণের নব মুখবন্ধ' এবং 'মনঃসমীক্ষণের প্রস্তাবনা' গ্রন্থ দু'টিতে তিনি মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী মানব মনের তিনটি স্তর – সজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞান-এর নির্দেশ করেছেন এবং 'Super Ego' বা অধিশাস্তার প্রভাবে সজ্ঞান মনের অবদমনের ফলও দেখিয়েছেন। তাঁর 'Totem and Taboo' গ্রন্থে তিনি লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের ব্যাখ্যাকালে এই 'Repression' বা অবদমনের প্রতিক্রিয়াও বর্ণনা করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে আরও বলেছেন, 'Symbol' বা 'প্রতীক' এবং 'Dramatization' বা নাট্যীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা 'Folklore' বা 'লোকশ্রুতির নানা বিষয়কে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।[৭] এই পদ্ধতিটি 'শাশুড়ি ম'ল সকালে, খেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে কাঁদব আমি বিকেলে' প্রবাদ বাক্যে বিচার করে দেখা যেতে পারে। এই প্রবাদে একজন দজ্জাল শাশুড়ির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একজন গৃহবধূর ক্ষোভ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত আনন্দের তির্যক বহিঃপ্রকাশ। এখানে শাশুড়ি 'Dominant Class' বা নিয়ন্ত্রক শ্রেণির প্রতিনিধি; আর বধূটি 'Subjugated Class' বা নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির প্রতিভূ। শাশুড়ির মৃত্যু বধূটির জীবনে মুক্তির বার্তা এনে দিয়েছে। তাই এ মৃত্যুতে বধূর কোনো দুঃখ বা শোক হয়নি। এখন সে নিয়ন্ত্রণমুক্ত। লোকলজ্জায় গভীর শোকের ভাব দেখিয়ে সকাল গড়িয়ে বিকেল এলে 'মায়া-কান্না' কাঁদবে। শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিত বধূটির প্রবল ক্ষোভ 'Repression' অবদমিত হয়ে রয়েছে তার 'Secondary Unconscious' অর্থাৎ গৌণ নির্জ্ঞান বা অসংজ্ঞান মনে। অর্থাৎ তার অবদমিত ক্ষোভ অসংজ্ঞান মনের প্রতীক শব্দবন্ধে(কাঁদব আমি বিকেলে) ক্ষোভের প্রকাশ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই ক্ষোভ মুখোমুখি স্পষ্ট আকারে প্রকাশের সুযোগ নেই। তাই সেই ক্ষোভ 'Dramatization' বা নাট্যায়িত হয়ে 'Symbolic Expression' বা প্রতীক প্রকাশ লাভ করেছে 'কাঁদব আমি বিকেলে' সুপ্ত প্রতিবাদী বাক্যাংশে।

এ্যালান ডাণ্ডিস যেমন প্রপ্‌কে অনুসরণ করে প্রপ্-এর তত্ত্বকে বিকশিত ও বিবর্ধিত করেছেন তেমনি লেভি স্ট্রাউসের তত্ত্বের উপর বিস্তৃত আলোচনা ও পরিমার্জনা করেছেন মারান্দা দম্পতি (ইলি কঙ্গাস মারান্দা ও পিয়েরে মারান্দা)। ১৯৭১ সালে তাঁদের সুবিখ্যাত 'স্ট্রাকচারাল মডেলস্ ইন্ ফোকলোর অ্যাণ্ড ট্রান্সফরমেশানাল' ('Structural Models in Folklore and transformational essays') গ্রন্থে গঠনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করার সময় তিনি প্রবাদের গঠনতত্ত্বেরও ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে মারান্দা দম্পতি গঠন (Structure)-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, -

> "গঠন হল অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভিত্তি, যার দ্বারা সাংগঠনিক উপকরণ সমূহ একটি অখণ্ড সত্তায় গ্রথিত হয়। গঠনরীতির বিশ্লেষণ তাই কোনও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কণিকাগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা ও আবিষ্কার।"[৮]

এই আনবিক উপকরণগুলিকে এক বা Unit ধরা হয়েছে। এটি কখনো ধ্বন্যাত্মক(+) বা ইতিবাচক এবং ঋণাত্মক(-) বা নেতিবাচক হয়। স্ট্রাউসের fx (a) : fy (b) :: fx (b) : f^{a-1} (y) সূত্রটিকে সরল করে মারান্দা দম্পতি প্রকাশ করেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

QS : QR :: FS : FR, যেখানে QS = Quasi Soluation (আপাত সমাধান), QR = Quasi Result (আপাত ফল), FS = Final Soluation (শেষ সমাধান), FR = Final Result (শেষ সমাধান)। আপাত দৃষ্টিতে মারান্দা দম্পতি স্ট্রাউসের পদ্ধতির বিস্তৃততর ব্যাখ্যা korechen। 'নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি, পরের বেলায় চিম্‌টিকাটি' প্রবাদ বাক্যটিকে মারান্দা দম্পতিদের কার্য-কারণ সম্পর্কিত সূত্রে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মারান্দা দম্পতিদের দেওয়া ফর্মুলা বা সূত্রটি হল- QS : QR :: FS : FR

QS = Quasi Soluation(আপাত সমাধান) = একজনের স্বার্থপরতা
QR = Quasi Result(আপাত ফল) = অন্যের অসহায়তা
FS = Final Soluation(শেষ সমাধান) = আঁটিশুঁটি
FR = Final Result(শেষ ফল) = চিম্‌টিকাটি

উপরের উল্লিখিত ফর্মুলা থেকে এই সিদ্ধান্তে আশা যায় যে, স্বার্থপরতা স্বার্থপরতার জন্ম দেয়। সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে স্বার্থপরতা বর্জন করা উচিত, তাহলেই সুস্থ জীবনবোধ গড়ে উঠবে। আর রয়েছে সাবধানতা। এই স্বার্থপরতা ও অহংবোধ যদি সমাজে বিস্তৃত হয়, পাশাপাশি বসবাসকারী মানুষজন যদি অন্যকে ভালোবাসতে না পারে, যদি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়, যদি শুধু নিজের কথাই ভাবে – তবে সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনবে। এই ধরনের কদর্য সম্পর্ক রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এগুলিকে জয় করাই মনুষ্যত্ব বা সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার পূর্ব শর্ত।

পাশ্চাত্য লোকসংস্কৃতিবিদ জি. বি. মিলনার (G. B. Milner) প্রবাদের গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিটি প্রবাদের চারটি অঙ্গ বা 'চতুরঙ্গ' গঠনরীতি'র (quadripartite structure) কথা বলেছেন।[৯] এদের নাম দিয়েছেন 'প্রবাদানু'। অর্থ ও গুণগত দিক থেকে দুটি অনু মিলে একটি অঙ্গ গঠন করে। অবশ্য কোনো কোনো প্রবাদে দু'টির বেশি অঙ্গও লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রতিটি প্রবাদবাক্যে প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ মুখ্য বা প্রধান ও গৌণ দু'টি প্রধান অঙ্গ থাকে। মুখ্য বা প্রধান অঙ্গের প্রথমটি 'সূচনার্থ' (opening half), দ্বিতীয়টি 'পূরণার্থ' (second half)। আবার এ্যালান ডাণ্ডিস ও রবার্ট জর্জেস প্রবাদকে গঠনরীতির দিক থেকে দু'টি ভাগে ভাগ করে দু'টি অর্ধকে বলেছেন – বিষয় (Topic/T) ও মন্তব্য (Comment/C)। মিলনার এই দুই অর্ধের 'সংকলন' (যোগ = +) এবং 'ব্যবকলন' (বিয়োগ = -) চিহ্ন দিয়ে এদের অস্ত্যর্থক ও নাস্ত্যর্থক মূল্যমাণ নির্ধারণ করেছেন। তাই মিলনারের প্রবাদ বিচারের পদ্ধতিকে 'চতুরঙ্গ গঠণরীতি বিচার' বলা হয়। মিলনার প্রবাদবাক্যের সূচনার্ধকে আবার বলেছেন শীর্ষ বা মাথা (head) এবং পুরণার্ধকে বলেছেন পুচ্ছ বা লেজ (tail)। বাংলায় একে 'আদি' ও 'অন্ত' নামকরণ করা যেতে পারে। তিনি উভয়কে আবার 'যোগ' (plus), 'বিয়োগ' (minus) মূল্য দিয়েছেন। এই 'যোগ-বিয়োগ' মূল্য সম্বলিত 'আদি-অন্ত' বিভাজন পদ্ধতিকে 'চতুরঙ্গ গঠনরীতি' বলা হয়েছে। তিনি প্রবাদের আদি ও অন্ত অংশের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ মূল্যের 'গাণিতিক সমাবেশ রীতি'তে (arithmetical) চারটি [(i) +H +T, (ii) +H –T, (iii) –H +T, (iv) –H -T] এবং 'গাণিতিক বিন্যাস রীতি'তে (permutical) ষোলটি উপবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে, আদি-অন্তের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ মূল্য বিচার করে প্রবাদের 'হ্যাঁ-বোধক' (positive) ও 'না-বোধক' (negative) অর্থ পাওয়া যায়।[১০] মিলনারের প্রদত্ত রীতির ছকটি হল-

শ্রেণি (group)	**আদি (head)**	**অন্ত (tail)**
ক	হ্যাঁ-বোধক[+]	হ্যাঁ-বোধক[+]
খ	হ্যাঁ-বোধক[+]	না-বোধক[-]
গ	না-বোধক[-]	হ্যাঁ-বোধক[+]
ঘ	না-বোধক[-]	না-বোধক[-]

উদাহরণ - ১। গাছে কাঁঠাল/গোঁফে তেল।	আদি +, অন্ত +
২। সুখে থাকতে/ভূতে কিলোয়।	আদি +, অন্ত –
৩। কাটা ঘায়ে/নুনের ছিটা	আদি -, অন্ত +

৪। অল্প শোকে কাতর/অধিক শোকে পাথর   আদি - অন্ত -

আবার প্রবাদের মূল্যমান নির্ণয়ে তিনি বলেছেন, দু'টি অর্ধেরই মান ধনাত্মক বা অস্ত্যর্থক(Positive = +) এবং ঋণাত্মক বা নাস্ত্যর্থক(Negative = -) দুটোই হতে পারে। এবারে প্রবাদের মূল্যমান বিচারের ক্ষেত্রে মিলনারের বীজগাণিতিক সূত্রটি হল- $P = \pm H + \pm T$

যেখানে, P= Proverb বা প্রবাদ বাক্য, H হল ওই বাক্যের Head বা মাথা বা শীর্ষ বা সূচনার্ধ এবং T হল ওই বাক্যের Tail বা লেজ বা পুচ্ছ বা পূরণার্ধ। দু'টি অংশই কখনো ধ্বন্যাত্মক (+) অথবা ঋণাত্মক (-) হতে পারে। বিষয়গত বিন্যাসে প্রথমাংশ 'এ$_১$', দ্বিতীয়াংশ 'এ$_২$'। তাহলে তাত্ত্বিক দিক থেকে গঠনরীতির মডেলটি হল এই রকম – ± মা : ± লে :: এ$_১$: এ$_২$

যেমন – 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' প্রবাদটির ক্ষেত্রে মিলনারের তত্ত্বটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।–

অধিক সন্ন্যাসীতে	গাজন নষ্ট
এ১	এ২

এখানে, Proverb (P) = প্রবাদ বাক্য 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'; Head বা শীর্ষ অংশ হল 'অধিক সন্ন্যাসীতে'। চৈত্র সংক্রান্তির দিবসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত সন্ন্যাসীর সমাগম ইতিবাচক, অতএব এর মূল্যমান ধ্বন্যাত্মক(+)। এর Tail বা পুচ্ছ অংশ হল 'গাজন নষ্ট'। বহু গাজন উৎসবে বিশৃঙ্খলা ঘটলে তা নষ্ট বা পণ্ড হতে পারে। অতএব এর মূল্যমান ঋণাত্মক(-)।

কিন্তু ডাণ্ডিস এই সূত্রে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন ধ্বন্যাত্মক অনুধাবনের জন্য এই মডেলকে আরও বিস্তৃত করা যেতে পারে। যেমন –

± মা ± লে → বর্ণনাত্মক রেণু ← এ$_১$ এ$_২$

এই মডেলটিকে মিলনারের প্রণালী অনুসারে আরও বিশদ করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ মডেলটি হল –

± মা + ± লে – প্র [(লে$_১$ + বি$_১$ + লে$_২$ + বি$_২$) – প্র/ (এ$_১$ এ$_২$ এক্স + ওয়াই)]

[প্র= প্রবাদ, বি= বর্ণানাত্মক বিষয় {প্রথম + দ্বিতীয়(বি$_১$বি$_২$)}, এ$_১$= বিষয়, এ$_২$= মন্তব্য, এক্স + ওয়াই= দুই বা ততোধিক ব্যক্তি]

প্রত্যেক প্রবাদের এককে ষড়ঙ্গ বিভাগ পাওয়া যায়-

মন্ত্রের সাধন	কিংবা শরীর পতন
এ১	এ২

এই প্রবাদে কর্তা অনুপস্থিত। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি বা সমাজ এর কর্তা। সমাজ যত এগিয়েছে ততই চিন্তার ক্ষেত্রে এসেছে প্রজ্ঞা। দীর্ঘ বর্ণনাকে দিনের পর দিন বাস্তব প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কর্তা হারিয়ে গেছে। শুধু 'উদ্দেশ্য', 'বিধেয়', 'ক্রিয়া' অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। অবশেষে একটি বর্ণনাত্মক বাকবিন্যাসের কণিকাগুলি কালের সীমা ছাড়িয়ে একটি অমর প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাই প্রবাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ।

মিলনারের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এ্যালান ডাণ্ডিস অর্থের দিক থেকে প্রবাদকে 'Opositional' ও 'Non-opositional' এই দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন।[১১] ড. ওয়াকিল আহমেদ[১২] ও ড. সনৎ কুমার মিত্র[১৩] বাংলায় এদের নামকরণ করে বলেছেন 'সপক্ষ' ও 'নিরপেক্ষ' প্রবাদ। যে প্রবাদে একটি মাত্র বর্ণনাধর্মী উপাদান থাকে, তাকে বলে 'নিরপেক্ষ প্রবাদ' (Non-opositional Proverb)। যেমন, 'এক মাঘে শিত যায় না', 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট', 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' ইত্যাদি এই শ্রেণির প্রবাদ। যে প্রবাদে একাধিক বর্ণনাধর্মী উপাদান থাকে তাকে বলে 'সপক্ষ প্রবাদ' (Opositional Proverb)। যেমন, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', 'কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই', 'খাবি জেনে, বসবি টেনে/বাপে টাকা দিলেও নিবি গুণে' ইত্যাদি এই শ্রেণির প্রবাদ। এ-ধরনের প্রবাদের পক্ষদ্বয় হ্যাঁ-বোধক, না-বোধকও, পরস্পর বিরোধী ('গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'), পরস্পর সম্পূরক ('পেটে খেলে পিঠে সয়'), সমতুল্য ('ধারে কাটে না, ভারে কাটে')

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হতে পারে। আঙ্কিক নিয়মে উভয় পক্ষের সম্পর্ককে ≠ রূপে দেখানো যায়, যার পক্ষদ্বয় সমধর্মী (ক=খ) হতে পারে, আবার অসমধর্মীও (ক/খ) হতে পারে। এ্যালান ডাণ্ডিস বিরোধমূলক প্রবাদের আদি-অন্ত পক্ষবিন্যাসের ত্রিবিধ নীতির[১৪] কথা বলেছেন - (১) পরস্পর বিরোধমূলক বা antithetical contradictive ('গাছের গোড়া কেটে আগায় জল'), (২) অভাবজনিত বিরোধমূলক বা privational contradictive ('নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল'), (৩) কারণজনিত বিরোধমূলক বা casual contradictive ('নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা')। সবশেষে বলা যায় মিলনারের বিশ্লেষণটি বাক্যভিত্তিক (syntactic) আর এ্যালান ডাণ্ডিসের বিশ্লেষণটি শব্দার্থভিত্তিক (semantic)। প্রথমটি প্রবাদের উপর-কাঠামোর (surface structure) এবং দ্বিতীয়টি প্রবাদের অন্ত-কাঠামোর (deep structure) পরিচয় তুলে ধরে।

প্রাবাদের আঙ্গিক গঠনের বিচার বিশ্লেষণ চিন্তা ও যুক্তির ভিত্তিতেও করা যায়। প্রবাদ বুদ্ধি প্রসূত; বুদ্ধি যুক্তির পথে এগোয়। প্রবাদে লোকসমাজের প্রচলিত বুদ্ধি ও যুক্তির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদকারের মনের জগতে যে-সব ক্রিয়া কাজ করে, পি. ডি. গুডউইন ও জে. ডবলিউ. ওয়েনজেল সেগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে সেগুলিকে তুলে ধরা যেতে পারে।

১। **চিহ্ন (sign) :** প্রবাদের আঙ্গিক নির্মাণে বিশেষ চিহ্ন প্রভাবিত করে। যেমন- 'শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়' প্রবাদে 'গোঁফ' চিহ্নরূপে কাজ করেছে। অনুরূপভাবে 'চেনা বামুনের পৈতা লাগে না', 'তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না', 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে' প্রভৃতি প্রবাদে 'পৈতা', 'তিলক' ও 'হাঁচি' চিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে।

২। **সংখ্যা (number) :** বাংলা প্রবাদে সংখ্যার গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। প্রবাদে 'এক' থেকে শুরু করে 'লক্ষ' পর্যন্ত সংখ্যা উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন - 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা', 'মরা হাতি লাখ টাকা দাম', 'দশচক্রে ভগবান ভূত', 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা' প্রভৃতি প্রবাদে সংখ্যার চিন্তা ও যুক্তি উভয়েই কাজ করেছে।

৩। **কার্য-কারণ (cause and effect) :** প্রবাদে যুক্তিপ্রবণ লোকমনের ছাপ দেখা যায়। যেমন- 'ফেল কড়ি মাখ তেল, 'পেটে খেলে পিঠে সয়' প্রভৃতি প্রবাদ কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত।

৪। **সমতুলতা (parallel) :** প্রবাদে দু'টি প্রসঙ্গের তুল্যমূল্য সম্পর্ক কিংবা গুরুত্বের দিকটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম', 'পুরুষের ভালোবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা' প্রভৃতি প্রবাদে দুটি বাক্যের তুল্যমূল্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

৫। **সাদৃশ্য (analogy) :** প্রবাদে সাদৃশ্য চেতনা বা সমমাপের দু'টি বিষয়কে একসূত্রে বাঁধা থাকতে দেখা যায়। যেমন- 'কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী', 'তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি থাকি পাতায় পাতায়', 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়' প্রভৃতি প্রবাদগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৬। **সাধারণীকরণ (generalization) :** বিশেষ অবস্থা থেকে নির্বিশেষে গেলে সাধারণীকরণ করা হয়। যেমন- 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ', 'মল্লার দৌড় মসজিদ তক', 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়' প্রভৃতি প্রবাদে সাধারণীকরণের চেতনা লক্ষ্য করা যায়।

৭। **শ্রেণিকরণ (classification)** : 'সব শিয়ালের এক রা', 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' প্রভৃতি প্রবাদগুলি শ্রেণিকরণ বা শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ।

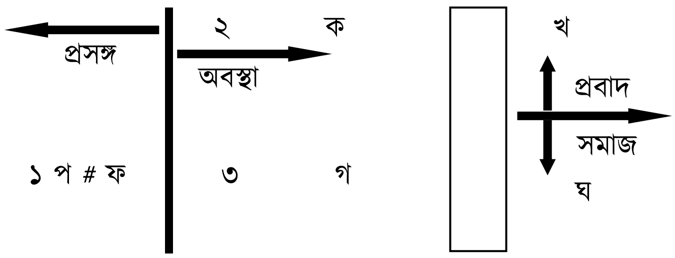
৮। **কর্তৃত্ব (authority) :** কোনো কিছুর উপর প্রভাব খাটালে বা প্রভুত্ব আরোপ করলে কর্তৃত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়। যেমন- 'সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না', 'মিঠা কথায় চিড়া ভিজে না' প্রভৃতি প্রবাদে কর্তৃত্বের চেতনাটি লক্ষ্য করা যায়।

৯। **প্রেরণা (motivation) :** লোক অভিজ্ঞতাজাত প্রবাদ অনেক সময় প্রেরণাজাতও হয়ে থাকে। যেমন- 'পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা', 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ', 'নাকে সরিষা তেল দিয়ে ঘুমানো' প্রভৃতি প্রবাদগুলি প্রেরণাজাত।

১০। **সম্বন্ধযুক্ত জোড়-শব্দ (pairs) :** topic ও comment পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত জোড়-শব্দ-এর অবস্থান নিয়ে কখন সাদৃশ্য, কখন বিরোধিতা সৃষ্টি করে। 'একের লাঠি দশের বোঝা' প্রবাদটিতে 'এক' ও 'দশ' জোড়-শব্দ। প্রথমটি সাদৃশ্যবাচক, দ্বিতীয়টি বিরোধমূলক। 'লাঠি' ও 'বোঝা' শব্দদ্বয় বিপরীত অর্থ বহন করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবাদ প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হয়। প্রবাদকার বা প্রবাদ বক্তা প্রবাদ বলেন, উপস্থিত শ্রোতা তা শোনে কিংবা পাঠক পাঠ করে। পিটার সিস্টেল (Piter Sietel) বলেন, যে সামাজিক প্রসঙ্গে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়, সেই প্রেক্ষাপটে এর অর্থ স্পষ্ট হয়। তিনি বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রবাদ চর্চার প্রসঙ্গ ধরে প্রবাদ ও সমাজ অবস্থার একটি কাঠামোগত মডেলের কথা বলেছেন।[১৫] রেখাচিত্রের সাহায্যে নির্দেশিত মডেলটি হল-



তিনটি অংশে বিভক্ত করে এই রেখাচিত্রটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রবাদের একটি অর্থ আছে এবং তার একটি সামাজিক ব্যাখ্যাও আছে। এই ধারণা থেকে রেখাচিত্রটি নির্মিত হয়েছে। পিটার সিস্টেল একে একটি গাণিতিক ছকে[১৬] রূপ দিয়েছেন- ক : খ :: গ : ঘ। 'প' ও 'ফ' যথাক্রমে বক্তা ও শ্রোতা। 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' প্রবাদে 'দুষ্ট গরু' [ক] এবং 'শূন্য গোয়াল' [খ] – এই দু'টি প্রবাদের অংশ বা প্রবাদ-অবস্থা (proverb situation)। এর সমান্তরালে 'মন্দ লোক' [গ] এবং 'সমাজে অবাঞ্ছিত [ঘ] হল সমাজ-অবস্থা (social situation)। অনুরূপ 'যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভাল' প্রবাদে 'গরুর দুধ' [ক] এবং 'গরুর লাথি' [খ] এই দু'টি প্রবাদের অংশ বা প্রবাদ-অবস্থা। এর সামাজিক অবস্থা হল 'উৎপাদনক্ষম শ্রমিক' [গ] ও 'শ্রমিক সমস্যা'[ঘ]। এটিকেও ক : খ :: গ : ঘ গাণিতিক ছকে দেখানো সম্ভব। এই প্রবাদগুলি পিটার সিস্টেলের ছক অনুসারে গঠিত।

প্রবাদের গঠনরীতি বা গঠনশৈলী বিচারের প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলি ছাড়া আরও কিছু বিচার পদ্ধতি রয়েছে, যাদের মধ্য দিয়ে প্রবাদের গঠনশৈলী বিচার করা সম্ভব। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল -

১। আর্চার টেলার (Archer Taylor)-এর 'গুণগত বা স্বধর্মগত বিচার (Attributal Analysis)

২। প্রবাদের কথান্তর বিচার পদ্ধতি

৩। আলঙ্কারিক ও সাহিত্য শৈলীগত বিচার

৪। লিঙ্গ বৈষম্যের নিরিখে প্রবাদ-বিচার পদ্ধতি, ইত্যাদি

বাংলা প্রবাদের গঠনরীতি বা গঠনশৈলীর এত বিচিত্র দিক আছে, যা সামান্য বিবরণে বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। তবে আলোচনার নিরিখে প্রমাণ হিসেবে কিছু প্রবাদের গঠনরীতি বিশ্লেষণ করে 'দুধের স্বাদ ঘোলে' মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। আশা করি পরবর্তীকালে কোনো ধীমান গবেষক এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানে ব্রতী হবেন।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড, আলোচনা), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা - ১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ৫৬৯

২. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত), প্রবাদ প্রসঙ্গ, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০১০, পৃ. ৩২৮

৩. ইসলাম, মযহারুল, ফোকলোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, লোকলৌকিক প্রকাশনী; কলকাতা- ৪৭, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮২, পৃ. ১৪ – ৫২

8. Dundes, Alan, 'On the structure of the proverb', The Wisdom of Many, edited by Wolfgang Mieder and Alan Dundes, New York, 1981; p. 63 (footnote)

৫. পোদ্দার, সুস্মিতা, লোকসংস্কৃতি (ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০১, পৃ. ২১২

৬. Dundes, Alan, 'Structuralism and Folklore' (1978) in Essays in Folkloristics, Folk Institute; Meerot, Ved Prakas Vatuk, P. 74

৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), প্রবাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৪৭ - ৪৮

৮. চৌধুরি, দুলাল, প্রবাদকোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ১৯

৯. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), প্রবাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৪২

১০. Dundes, Alan, 'On the structure of the proverb', পৃ. ৪৯ - ৫০

১১. ওই, পৃ. ৫১ - ৫২

১২. আহমেদ, ওয়াকিল, বাংলা লোকসাহিত্য : প্রবাদ-প্রবচন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ২৩

১৩. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদক), 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৬০ জেমস্ লঙ্ সরণি, বেহালা, কলিকাতা – ৩৪, ৭ম বর্ষা, ১ম সংখ্যা, ১৪০১, পৃ. পাঁচ

১৪. ওই, পৃ. পাঁচ-ছয়

১৫. Sietel, Peter, Proverbs : A Social use of Metaphor, The Wisdom of Many, p. 125 - 127

১৬. ওই, পৃ. ১২৫-১২৭

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

সাহা, মঞ্জু, বাংলা প্রবাদের বিষয়বস্তু ও গঠনশৈলী; পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা- ৯; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০২৩

প্রধান, শ্যামসুন্দর, কিংবদন্তী : উৎস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ; প্রতিভাস; ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড; কলকাতা- ২; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১

ঘোষ, রীতা, বাংলা লোককথার রূপতত্ত্ব; পুস্তক বিপণি; প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা, ১৪১০

Permyakov, G.L. From Proverb to Folk-Tale, Moscow; 1979

Propp, V.J, Theory and History of Folklore; USA; Manchester University Press; 1984

Propp, V., Morphology of Folktale (2nd Edition); University of Texas Press, Austin & London; 1968

Levi-Strauss, Clude, Structural Anthropology (Vol.- 2); Penguin Book; England; 1963

Maranda, P. & Maranda E.K., Structural Models in Folklore and Transformational Essays; Netherland Mouton; The Hague; Paris; 1971

Priebe, Richard, The horses o speech: A structural Analysis of the Proverb; Folklore Annual; University Folklore Association; The University of texas; Austin; 1971

পত্রিকা :

প্রমা (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা); ১৯৮১; প্রবন্ধ- বাংলা প্রবাদের রূপ – পবিত্র সরকার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 646 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 646 - 651
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নটরাজ শিব ও নাটুয়া নাচ

সুশান্ত কুমার মাহাতো
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ, পুরুলিয়া
E-mail : sushantamahato2@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Nat, Nataraj, Shiva, Nritya, Tandava, Natua.

Abstract
SHIVA-On the one hand he is the God of Gods and Nataraj. Again in secular tradition he is the father and God of agriculture. Just like on the one side agriculture began through his hand, he also the inventor of dance. We found his love for dancing in different puranas. We saw various types of pictures of dancing Shiva in the wall of temple. Stone idols of Nataraj were found in Harappa.

Basically, his dances are of two types. The first one is Tandava dance and the second is Mangala dance. Though we are more familiar with the first one. There is not only destruction in this Tandava of Nataraj Shiva, but is a combination of creation - stability - destruction.

Natua is a very ancient folk dance in western border region of Bengal. It is believed that Shiva has a role as the creator of the dance. Many people think that Natua was born from Tandava dance of Shiva in Daksha Yajna. However, most of the artists and researchers are of the opinion that this dance was created by Nandi and Bhringi during Shiva's marriage journey and it was on the instructions of Shiva himself. Many also said that Lord Shiva created Natua dance at the request of Devraj Indra by watching the dance of a small bird named Kshama. I have tried to show how Shiva's attachment is connected with this dance.

Discussion

প্রাক-আর্য যুগের দেবতা শিব একাধারে কৃষি ও নৃত্য এই দুইয়ের উদ্ভাবন করেন বলে কথিত। প্রচলিত বিভিন্ন গল্পে, পুরাণে, মন্দিরের গায়ে আঁকা ছবিতে শিবের নটরাজ মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত নৃত্যের সূচনা হয়েছিল শিবের হাত ধরেই এই বিষয়ে প্রায় সব গবেষক সহমত পোষণ করেন। জনৈক নৃত্যবিদ বলেছেন -

> "নৃত্যের দেবতা নটরাজ। শিবের তাণ্ডবনৃত্য থেকেই প্রকৃত নৃত্যের সূচনা। নটরাজ মূর্তিকল্পনা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বিভিন্ন রূপকের মধ্যদিয়েই শিল্পকলারও একটা আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টি করার যে প্রবণতা প্রাচীনকালে ছিল তারই সার্থক প্রকাশ দেখা যায় সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের ছন্দে নটরাজ মূর্তির উদাত্ত পরিকল্পনায়।"[১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 646 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরপ্পাতে নটরাজ শিবের সদৃশ একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। পাথরের তৈরি এই মূর্তির বর্ণনা দিয়ে গবেষক জানিয়েছেন-

> "There are two remarkable statuettes found at Harappa, - and the other of dark gray slate, the figure of a male dancer, standing on his right leg, with the left leg raised high, the ancestors of Siva-Nataraja."[২]

বিভিন্ন পুরাণ তথা অন্যান্য গ্রন্থেও শিবের নৃত্যের কথা জানা যায়। দক্ষযজ্ঞে শিব নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগ করার খবর শুনে উন্মত্ত শিব যে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, সেকথা সবারই জানা। মধ্যযুগে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে শিবনৃত্যের ছবি ধরা পড়েছে –

> "পদ্মারে লইয়া কাঁখে নাচে শিব ঘন পাকে,
> "জগত মোহন শিবের নাচ।
> সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ।।"[৩]

শিবনৃত্যের দুটি ধারার কথা জানা যায়। প্রথমটি হল তাণ্ডব – দক্ষযজ্ঞের সময় সতী হারিয়ে শিব যে প্রলয় নাচন নেচেছিলেন সেই তাণ্ডব ধ্বংসের প্রতীক। দ্বিতীয়টি হল, শিবের সৌম্যসুন্দর মঙ্গলনৃত্য যা আনন্দের পরিচায়ক। 'সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিবের মঙ্গলনৃত্যের বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে —

> "ব্রহ্মা তালধর, শ্রীহরি পটহবাদ্য করিতেছেন, স্বয়ং ভারতী বীণাবাদনরতা; রবি ও শশী বংশী আলাপনে নিরত; সিদ্ধ, অপ্সরা ও কিন্নরগণ শ্রুতিধর; নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি মাদল বাজাইতেছেন ও নারদ গান করিতেছেন; এরূপ অবস্থায় মঙ্গলময় বিগ্রহ শম্ভু নৃত্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই মাঙ্গল্যনৃত্যেই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ ইহা অনুমান করা কিছু অসঙ্গত হইবে না।"[৪]

অন্যদিকে বিশাখ দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থে নটরাজ শিবের যে নৃত্যরূপটির পরিচয় পাই, সেটি হল 'দুঃখনৃত্য'। এই গ্রন্থের 'নান্দী'র দ্বিতীয় শ্লোকে শিবের এই দুঃখনৃত্য বর্ণনায় বলা হয়েছে –

> "পাছে তাহার পাদন্যাসে পৃথিবীর অবনতি হয়, পাছে তাহার বাহুক্ষেপে সকল লোক পীড়িত হয়, পাছে তার অনলকণাবর্ষী দৃষ্টিপাতে নিখিল দৃশ্যবস্তু ভস্মীভূত হয়, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত সংকোচের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন।"[৫]

শিবের তাণ্ডবনৃত্য শুধু ধ্বংসই নয়, একাধারে তা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীক। ধ্বংসের পর নতুনভাবে বিশ্বজগৎ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়েই শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য। সমালোচক বলেছেন –

> "Tandavan, which summed up the threefold processes of creation, preservation and destruction."[৬]

শিবের নৃত্যকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাত্ত্বিক, সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বলেছেন—

> "নটরাজের নৃত্য সৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণত নটরাজ মূর্তি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণদিকে উপরের হাতে ডমরু অনাহত শব্দের প্রতীক, অখণ্ড মহাকালের বুকে তা যেন ছন্দ বা তাল লয় রক্ষা করে চলেছে। ডমরুর শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ পঞ্চভূতের যোগসূত্র জড়িত। বিশ্ববৈচিত্রের উপাদান পঞ্চভূত। শব্দও তাই। নটরাজের বামদিকের উপরের হাতে 'অর্ধমুদ্রা', তাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ধ্বংসের পরিচায়ক।

> দক্ষিণদিকে নিচেকার হাতে 'অভয়মুদ্রা' শান্তি ও সান্ত্বনার উদ্বোধক। বামদিকের নিচেকার হাত উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত এবং তা চরণের দিকে নমিত, তাতে আছে 'গজহস্তমুদ্রা' এবং তা বিঘ্ননাশক গণপতি যা বিনায়ককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ হাত সর্ববিঘ্ননাশের প্রতীক। পদতলে 'অপস্ মার' পুরুষ বা অসুর ত্রিপুর অজ্ঞানরূপ সংসারচক্রের পরিচায়ক। নটরাজ বামনকে পদদলিত করেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মুক্তি ও শান্তির আলোকদান করেছেন। বামন পদ্মপীঠের উপর শায়িত। নৃত্যে শিবের পাঁচটি শক্তি বা পঞ্চক্রিয়া বিকশিত : সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। - নটরাজ শিবের হাতে মুদ্রা বা হস্তকরণগুলি, নৃত্যে ভাব ও রসের প্রকাশক। নটরাজের চারিদিকে প্রভামণ্ডল বা অগ্নিশিখার চক্র বিশ্বের ও বিশ্ববাসীগণের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের শিরে জটাজাল নৃত্যের তালে তালে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। ছটার বাঁধনে গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে অর্ধচন্দ্র বা অগ্নি জ্ঞানের এবং শিরে সর্প প্রকৃতি বা প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের দক্ষিণ কর্ণে মনুষ্যদেহের এবং বাম কর্ণে নারীদেহের ভূষণ। শিল্পী হ্যাভেল এটিকে বলেছেন পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত রূপ।"[৭]

শিল্পী, গবেষক, সমালোচক হ্যাভেল শিবনৃত্য তাণ্ডবের ব্যাখ্যার সাথে সাথে একটি পৌরাণিক গল্পের কথাও জানিয়েছেন। তাণ্ডব নৃত্যের দুটি ভাবের কথা বলেছেন – প্রথমত, প্রকৃতির বাইরে জড়বস্তুর বিলাস আর দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্ম জগতের লীলা। নটরাজের নৃত্য প্রসঙ্গে তিনি এই গল্পটির কথা বলেছেন —

> "একদিন শিব যোগীবেশে অরণ্যে ঋষিদের কাছে গিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন ও ঋষিদের হারিয়ে দিলেন। ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা শিবকে আক্রমণ করার জন্য যজ্ঞাগ্নিতে ভয়ঙ্কর মূর্তি এক ব্যাঘ্র সৃষ্টি করলেন। শিব কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে ব্যাঘ্রের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে নিজের গায়ে পরিধান করলেন। ঋষিরা বিষধর সর্প সৃষ্টি করলেন। কিন্তু শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নৃত্য করতে লাগলেন। তখন ঋষিদের যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকটাকার এক বামনরূপ অসুর বহির্গত হয়ে শিবকে আক্রমণ করল। শিব অসুরকে পদভারে দলিত করে তার পৃষ্ঠদেশ ভেঙে দিলেন। শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য স্বর্গলোকের দেবতা ঋষিরা প্রত্যক্ষ করলেন। এই নৃত্যের দৃশ্যই এলিফেন্টার গুহায় চাক্ষুষভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।"[৮]

এভাবে, দেখা যায়, শিবের হাত ধরেই যে প্রকৃত নৃত্যের সূচনা এবিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হয়েছেন। এবার আমরা দেখব যে, 'নাটুয়া' নাচ প্রসঙ্গে শিবের অনুষঙ্গ কিভাবে জড়িয়ে আছে। নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে যে সমস্ত মতামতগুলো জানা যায়, সেগুলির মধ্যে এই নাচ সৃষ্টিতে নটরাজ শিবের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উঠে আসে।

নাটুয়া নাচের উদ্ভবের পিছনে নটরাজ শিবের ভূমিকার কথা কেন বারবার উঠে আসে, সেকথা জানার আগে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিবের অনুষঙ্গ কিভাবে জড়িয়ে আছে সেটা জানা দরকার। নাটুয়া অধ্যুষিত এলাকার জনজীবনে শিব মূলতঃ অনার্য কৃষি দেবতা হিসেবে পূজিত। এখানে তাঁর পরিচয় 'বুঢ়াবাবা' ('আদি পিতা') আর পার্বতীর পরিচয় 'মহামাঈ' ('আদি মাতা') হিসাবে। কৃষিজীবী গ্রামীন মানুষের কাছে শিব কৃষিকার্যের সূচনাকারী দেবতা হিসেবে পরিচিত। এখানের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই শিবের মন্দির তথা 'মড়প' (মণ্ডপ) লক্ষ্যণীয়। পাতালেশ্বর, বুদ্ধেশ্বর, মানিকেশ্বর, জলেশ্বর, দুধেশ্বর, বাণেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, আকড়েশ্বর, এক্তেশ্বর প্রমুখ নামে তিনি পরিচিত। চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে জৈষ্ঠ্য মাসের ১৩ তারিখ 'রহিন' পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গ্রামে শিবের গাজন খুব জমজমাট ভাবে পালিত হয়। এছাড়াও পুরো শ্রাবণ মাস জুড়ে (বিশেষত প্রতি সোমবার) 'বাবা'র মাথায় জল ঢালতে মানুষের দীর্ঘ পদযাত্রা ও বিশেষ বিশেষ মন্দিরে মানুষের দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়। ভক্তদের বিশ্বাস এই যে, এর ফলে 'বাবা' তুষ্ট হয়ে সবার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন ও বর্ষাকালে ভালো বৃষ্টি দেবেন, যা এই অঞ্চলের কৃষিকাজের একমাত্র সম্বল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 646 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলা যায়, যেখানে শিবের প্রতি মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস এমন অচল অটল, সেখানে উদ্ভুত বিভিন্ন লোকনৃত্যের পিছনে শিবের ভূমিকা রয়েইছে এই বিশ্বাস মানুষের মনে থাকবেই। শিবের আরেক পরিচয় 'নটরাজ' সেই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে।

এবার নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে শিবের ভূমিকা সম্পর্কে শিল্পী গবেষকদের মন্তব্যগুলি দেখে নেওয়া যাক। গবেষক অধ্যাপক মাননীয় শিবশঙ্কর সিং মহাশয় বলেছেন –

> “পারম্পর্যটি মাথায় রেখে আজকের প্রবীণ থেকে নবীন নাটুয়া শিল্পী এবং লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন ও মতামত দেন, নটরাজ শিবের তাণ্ডবধর্মী নৃত্যধারা থেকে নাটুয়ার সৃষ্টি তাদের যুক্তি 'নট' অর্থাৎ নটরাজ শিবের তাণ্ডবধর্মী নৃত্যধারা থেকে নাটুয়ার উৎপত্তি।”[৯]

প্রবাদ প্রতিম নাটুয়া শিল্পী স্বর্গীয় হাড়িরাম কালিন্দী মহাশয়ের বক্তব্য –

> “নাটুয়া নাচের উৎপত্তির মূলে রয়েছে, নটরাজ শিব। তবে শিবের সাথে তাঁর ঘরণী পার্বতী নাটুয়া সৃষ্টিতে সমান সৃজনশীল ছিলেন। - নাটুয়ার, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং হর-পার্বতী।”[১০]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছো নাটুয়া শিল্পী জগন্নাথ কালিন্দী কালিন্দীর অভিমত হল, - দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও সতী সেখানে যাবার জেদ করেন। শিব প্রথমে যেতে বারণ করলেও পরে তাঁর দুই অনুচর নন্দী ভৃঙ্গীকে সাথে দিয়ে সতীকে দক্ষালয়ে পাঠিয়ে দেন। সেখানে শিবনিন্দা শুনে সতী প্রাণত্যাগ করেন। নন্দী ভৃঙ্গীর মুখে এই খবর শুনে শিব ক্রোধে ফেটে পড়েন। তৎক্ষনাৎ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে সতীর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। তাঁর নৃত্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কেঁপে ওঠে। সৃষ্টি বিনাশের উপক্রম হয়। তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে ফেলেন, যেগুলি একান্ন পীঠ নামে পরিচিত। এইভাবে শিবের কাঁধ থেকে সতীর দেহ পড়ে গেলে শিব শান্ত হন। শিবের এই তাণ্ডব নৃত্য থেকেই নাটুয়া নাচের সৃষ্টি হয়।

প্রয়াত লোক গবেষক মাননীয় যুধিষ্ঠির মাজী মহাশয়ও নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> “সাধারণভাবে নট এবং নাটুয়ার অর্থ প্রায় একই ধরনের। নট বলতে যেমন নর্তক বা অভিনেতাকে বোঝায়, ঠিক তেমনি নাটুয়া বলতেও নর্তক বা অভিনেতাকে বোঝায়। সমাজ জীবনে নট নৃত্য এসেছে শিবনৃত্য থেকে। - নৃত্য কলার ইতিহাসে নটরাজ হলেন নৃত্যের দেবতা।ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের সমতুল্য। নৃত্যকলার ইতিহাসে নটরাজের ধারনা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে।
>
> ‘নট নৃত্য পুরুষ নৃত্য। একে তাণ্ডব নৃত্যও বলা যায়। সতীর দেহত্যাগের পর সতীর মৃতদেহ নিয়ে শিব এই নাচ নেচেছিলেন। তাঁর উদ্দাম নৃত্যে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। বিষ্ণু দেবতা সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন করে শিবনৃত্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন’।
>
> ‘শিবনৃত্যের এই ভাবধারা হতেই লোকজীবনে জন্ম লাভ করে নট নৃত্যের। পুরুলিয়া অঞ্চলে নট নৃত্য নাটা নাচ বা লাটা নাচ রূপে আজও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।”[১১]

প্রবীণ শিল্পী বিপদতারণ কালিন্দীর বক্তব্য হল —

নাটুয়া নাচের উৎপত্তি দক্ষযজ্ঞের অনেক পরে হয়েছে। পুরানো নাচগুলি দেখে দেখে দেবতাদের মনে একঘেয়েমি এসে যায়। তখন তাঁরা নতুন নাচ দেখার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানান। ইন্দ্র স্বর্গের সবাইকে নতুন নাচ দেখাতে বলেন, কিন্তু কেউ তা পারেন না।শেষে ইন্দ্র নটরাজ শিবকে অনুরোধ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধ শিব না করতে পারেন না, তিনি ‘নাটুয়া’ নামে নতুন নাচ সৃষ্টি করে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাদের দেখান।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 646 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নটরাজ শিব কিভাবে এই নতুন নাচ 'নাটুয়া' সৃষ্টি করলেন, সেই গল্প জানিয়েছেন বর্ষীয়ান নাটুয়া শিল্পী মাননীয় রাসু কালিন্দী মহাশয় — ইন্দ্রের কাছে নতুন নাচ দেখানোর অনুরোধে শিব চিন্তিত হন। তাঁর প্রাত্যহিক কাজকর্ম এলোমেলো যায়, কোনো কাজে ঠিকমতো মন বসাতে পারেন না। শিবের এই অবস্থা দেখে পার্বতীও চিন্তায় পড়েন। শিবকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিব জানান, ইন্দ্র তাঁকে নতুন নাচ দেখাতে বলেছেন। কিন্তু তিনি কোন নাচ দেখাবেন তা ঠিক করতে পারছেন না, তাঁর জানা সব নাচই তো দেখানো হয়ে গেছে। কাছ থেকে এই কথা শুনে পার্বতীও চিন্তায় পড়ে যান। কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন সকালে শিব স্নান সেরে ত নির্জন শ্মশানে ধ্যানে বসেন ও নতুন নাচের কথা ভাবতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ধ্যানে বসা শিবের চোখ খুলে যায়। মেলে তিনি দেখতে পান 'ক্ষমা' নামের ছোট এক পাখিকে। পাখিটি নিজের মনে নাচ করছিল। পাখির নাচ দেখে শিব চিন্তা করলেন তিনিও যদি পাখিটির মতো করে নৃত্য করেন তবে সেটা একটা নতুন কিছু হতে পারে। তখন তিনি শ্মশানের ছাই সারা শরীরে মেখে শ্মশানে পড়ে থাকা কাপড়ের পাড় নিজের দুহাতে পাখির ডানার মতো করে বেঁধে 'ক্ষমা' পাখিকে দেখে দেখে নাচতে শুরু করেন।

ওদিকে শিবের ফিরতে দেরি হওয়ায় পার্বতী শিবের সন্ধানে বেরিয়ে এসে দেখেন শিবের এই নতুন নৃত্যানুশীলন। একসময় 'ক্ষমা' পাখি উড়ে গেলে শিবের নাচও থেমে যায়। পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করেন এ কোন নাচ? শিব জানান এ নাচ তিনি আগে নাচেননি, 'ক্ষমা' পাখিকে দেখেই শিখেছেন। পার্বতী এই নাচ দেখিয়েই দেবতাদের আনন্দ দান করতে বলেন। তখন শিব এই নাচ দেবতাদের দেখান।এই নাচ দেখে দেবতারা খুবই খুশি হন। শিবের এই নাচেই হল নাটুয়া নাচ।

নাটুয়া নাচের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে বিষয়টির কথা বেশিরভাগ শিল্পী গবেষক বলেছেন, সেটি হল শিবের বিবাহযাত্রার কথা। শিবের বিবাহযাত্রার সময়ই যে নাটুয়া নাচের সৃষ্টি এ বিষয়ে শিল্পী শলাবৎ মাহাত বলেছেন—

> "শিব যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যগণ যথা নন্দী, ভৃঙ্গী প্রমুখ গায়ে ছাই মেখে হাতে টেনা, মাথায় ফেটি বেঁধে তাতে পালক গুঁজে যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশন করেছিল, সেটি হল নাটুয়া নাচের আদিরূপ।"[১২]

এবার আমরা শিবের বিবাহযাত্রার সময় কিভাবে নাটুয়া নাচের সৃষ্টি হল, নাটুয়া নাচের বাদ্যযন্ত্র ঢাকের জন্মই বা কিভাবে, সেই ঢাক বাজানোর জন্য কালিন্দীদের সৃষ্টি কিভাবে হল এই বিষয়গুলি সংক্ষেপে জেনে নেব।

শিল্পী অভিমন্যু কালিন্দী কাছ থেকে জানিয়েছেন, শিবের বিবাহযাত্রার সময় খুব ঝড়বৃষ্টি হয়। তারপর ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝি পোকার ডাক ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে বিচিত্র কলতানের সৃষ্টি করে। সঙ্গে ছিল শিবের অনুচর ভুত প্রেত পিশাচের বিচিত্র ধরনের অঙ্গভঙ্গি ও কলরব। এমতাবস্থায় বরযাত্রীদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিলে নন্দী ভৃঙ্গী শিবের কাছে এই বিশৃঙ্খলার খবর পৌঁছান। শিব নন্দী ভৃঙ্গীকে নাচ গানের ব্যবস্থা করতে বলেন। নন্দী ভৃঙ্গী জানায় নাচ গানের জন্য আগে বাজনার ব্যবস্থা দরকার, তাদের কাছে তো বাদ্যযন্ত্র নেই। শিব তখন নন্দী ভৃঙ্গীকে ঢাক তৈরির নির্দেশ দেন। ঢাক তৈরির কথা শিব বললেন। সেই ঢাক তৈরি হবে কী দিয়ে তা শিবই জানিয়ে দিলেন—

সান্তালি পর্বতে থাকা দুটো গামার কাঠের গোড়া ও ডগা ফেলে দিয়ে মাঝখানের অংশ নিয়ে ঢাক তৈরি করা হবে। সান্তালি পর্বতে থাকা গামার গাছ দুটি কোনো সাধারণ গাছ নয়। তারা আসলে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষী জয় ও বিজয়। লক্ষ্মীর অভিশাপে তারা গাছ হয়েছিল। সেই গাছ দিয়ে ঢাক তৈরি করতে হবে।

শিবের নির্দেশমতো কা সান্তালি পর্বত থেকে গামার গাছ কেটে আনা হল। ছুতোর সেই কাঠ দিয়ে দুটি ঢাক তৈরি করল তাদের নাম হল জয় ও বিজয়। তৈরি করার পর সেই ঢাকদুটি তুলে দেওয়া হল নন্দী ভৃঙ্গীর হাতে। ঢাক তৈরির কাহিনী নিয়ে নাটুয়া নাচের সময় যে গানটি গাওয়া হয় সেটি হল এইরকম –

"ঢাক কোথায় পালি বায়েন?
খাড়ি কোথায় পালি?

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 646 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাঠি কোথায় পালি?
সাঁতালি পর্বতে ছিল গামারের গাছ
সেই গাছকে কাঠি ল্যয়ে ছিল কামার ভায়ার বাড়ি
কামার ভায়াই তুলে দিল সুতার ভায়ার বাড়ি।
সুতার ভায়াই তুলে দিল পাটভকতার হাতে
পাটভকতা তুলে দিল কালিন্দীদের হাতে...।।"[১৩]

ঢাক তো তৈরি হল, এবার সেটা বাজাবে কে বা কারা! শিল্পী অভিমন্যু কালিন্দীর কাছ থেকে জানা যায় -

শিব নিজের দুই হাতের ময়লা থেকে সৃষ্টি করলেন দুই ভাই — সাদইলা (মতান্তরে ছাদইলা) ও বাদইলা কালিন্দী তথা ডোমেদের দুই আদি আদি পুরুষ। বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়েছে, বাদ্যযন্ত্রীও প্রস্তুত, কিন্তু নাচবে কে! শিবের নির্দেশেই নন্দী ভৃঙ্গী তৈরি হল নাচার জন্য। শ্মশানের ছাই সারা গায়ে মেখে, দু হাতে বাঁধল শ্মশানে পড়ে থাকা কাপড়ের রঙীন ফালি। মাথায় মোরগের পালক, হাতে ঢাল ও ফরি নিয়ে ঢাকের বাজনার তালে তালে শুরু হল দুই ভাইয়ের নাচ। জন্ম নিল নতুন এক নাচ 'নাটুয়া'।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, ভারতের নৃত্যকলা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ৭ই মার্চ, ১৯৫৯, পৃ. ৩৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড: গীত ও নৃত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, পৃ. ৭০৯
৪. চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৯. সিং, শিবশঙ্কর, পুরুলিয়ার নাটুয়া, নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটরস, প্রথম প্রকাশ ১৪ই এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ২২
১০. প্রাগুক্ত
১১. মাজী, যুধিষ্ঠির, পুরুলিয়ার নট ও নাটুয়া নৃত্য, সুভাষ রায় (সম্পা.), মানভূমের লোকনৃত্য (১ম খণ্ড), অনৃজু ২০০৩, পৃ. ৮০
১২. সিং, শিবশঙ্কর, প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

সাক্ষাৎকার :

রাসু কালিন্দী, বয়স ৭৫ বছর, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, তারিখ - ২৯.১০.২০২৩
বিপদতারণ কালিন্দী, বয়স ৪৫ বছর, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, তারিখ - ২৯.১০.২০২৩
জগদীশ কালিন্দী, বয়স ৪৪ বছর, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, তারিখ - ২৯.১০.২০২৩
অভিমন্যু কালিন্দী, বয়স ৬০ বছর, কদমপুর, আড়শা, পুরুলিয়া, তারিখ - ০২.০৬.২০২৪
জগন্নাথ কালিন্দী, বয়স ৩৪ বছর, পাঁড়দ্দা, বলরামপুর, পুরুলিয়া, তারিখ - ০৭.০৭.২০২৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 652 - 661
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার প্রতিবাদী লোকোধর্ম : প্রসঙ্গ বলাহাড়ি সম্প্রদায়

ড. প্রদীপ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কৃষ্ণনাথ কলেজ
Email ID : pmhis@msduniv.ac.in

Received Date _20. 12. 2024_
Selection Date _01. 02. 2025_

Keyword
Balahari, protests, opposing, culture, Bankura, Purulia, Murshidabad, Balaram.

Abstract
The middle of the 18th century saw several folk religions to have heaved in sight to a larger extent in different parts of Bengal, and many of them amongst themselves displayed strong flavour of protests or disagreements that arose primarily depending on religious principles in multiple ways. Nihar Ranjan Ray, in his report presented to the National Congress Session in 1975, called attention to, with enough and perceivable pellucidity, these protestant characters he observed in the folk religions of that time. An ideal example of such a folk religion, that distinctively marked it out to be a protestant one, is Balahari, or Balarami, or Balaram Bhaja religious community. This religious sect was given its congregated formation by the Hari community in the region of Meherpur, located in the district of undivided Nadia, under the leadership of Balaram Hari. Later on, present day Nischintapur of Nadia district turned out to be one of the biggest centers of this religious sect. Bankura, Purulia, and Murshidabad as well gradually came under a massive influence of this religious community and their evidently distinctive religious perspectives. Around 1780, Balaram Hari took his holy birth, and he took his last breath around 1850. The Hari community and their distinctive religious perspectives established their erect heads, that patently displayed its religious sway in different geographical locations, fundamentally through opposing Vaishnavism and specifically Brahmin religious culture. That is why, in their religious culture one can easily trace their force of oppositions in several ways, specifically with respect to religious rituals, principles and practices of worship. The Hari community does not allow and accept the use of Dip, Dhup, Dhuna, Tulsi and Tilak and even Gangaajal while maintaining any religious creed and custom. And this essentially unique and rudimentarily unmixed religious perspective provides the Hari community with a separate recognition.

Discussion

অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং উচ্চ বর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে নদিয়া জেলায় যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তার ফলশ্রুতিতেই জন্ম নিয়েছিল একাধিক গৌণধর্মের। এই সময়ে নবদ্বীপ সন্নিহিত এলাকা সহ অবিভক্ত নদিয়া জেলার মহকুমা মেহেরপুরে

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানবতাবাদের চর্চা শুরু হয়। সমাজের উপরিতলার মানুষ তথা সমাজপতিদের শোষণের মাত্রা ছাড়িয়েছিল। নিচু তলার হাড়ি, ধোপা, মালো, ডোম, বাগদি, কৈবর্ত, বেদে, বুনো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল অস্পৃশ্য। তাদের সাধারণ ধর্মাচরণের অধিকার পর্যন্ত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মেহেরপুরে আবির্ভূত হন বলরাম হাড়ি নামে এক অন্ত্যজ শ্রেণির ধর্মীয় নেতা। বলরাম প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায় বলরামী, বলরামভজা, বলাহাড়ি মত, বলরামচন্দ্রের ধর্ম, হাড়িরাম, সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

অক্ষয়কুমার দত্ত বলরামী সম্প্রদায়কে 'চৈতন্য সম্প্রদায়-এর শাখা'[১], বিশ্বকোষ গ্রন্থের দ্বাদশ ভাগে 'তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শাখা'[২] বলে অভিহিত করা হলেও তাদের ধারণা ঠিক নয়। কারণ বলরাম ছিলেন ঘোরতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী। তাঁর এই বিরোধিতার সুর পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে –

> "একদিন বালরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাহাদের ন্যায় অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া নদী কূলে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলাই, তুই ও কি করিতেছিস? সে উত্তর করিল, আমি শাকের খেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, এখেনে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর দিল, আপনারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদীর কূলে জলসেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন?"[৩]

বলরাম এবং হাড়িদের সম্পর্কে জানার উপাদানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হল, বলরাম এবং তার অনুগামীদের সকলেই ছিলেন অস্পৃশ্য সম্প্রদাভুক্ত। তাই সমাজের শিক্ষিত উচ্চবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এ সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, -

> "অন্ত্যজ বর্গের মধ্যে প্রচারিত এই সম্প্রদায় সম্পর্কে ছাপার অক্ষরে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৮৬২ সালে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৬-শে ফাল্গুন ১২৬৯ সংখ্যায়।"[৪]

১৮৭০ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' থেকে বলরামিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মেহেরপুর নিবাসী লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় 'সেকালের স্মৃতি' তে বলরাম সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান। ১৮৭২ সালে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মেহেরপুরে যান এবং বলরামের স্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তিনি লিখিছেন,-

"I met her in the year 1872."[৫]

তিনি এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন হিন্দু কাস্ট অ্যান্ড সেক্ট নামক গ্রন্থে। তবে এই বিবরণগুলি থেকে বলরাম এবং হাড়িদের সম্পর্কে খুব সামান্যই তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী ১৯৭১ সালে মেহেরপুরে যান এবং হাড়িদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন।

সাময়িক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৬ শে ফাল্গুন, ১২৬৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যার (১৮৬২) প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'প্রায় ৫/৬ বৎসর হইল, বলরাম হাড়ি মানবলীলা সম্বরণ করিয়েছে।'[৬] অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছেন, "১২৫৭ সালের ৩০ এ অগ্রহায়ণে অনুমান ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।"[৭] আবার দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'বাঙলা ১১৯০ বা ১১৯১ সালে বলরাম জন্মগ্রহণ করেন।'[৮] এই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৭৮০ সালের আশেপাশে বলরাম জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫০ সালের আশেপাশে তাঁর মৃত্যু হয়।

বলরাম মেহেরপুরের মালোপাড়ার অস্পৃশ্য হাড়ি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি এবং মাতার নাম গৌরমণি। হাড়ির ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে শৈশবেই তাঁর মনে ধর্মভাব অঙ্কুরিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি যৌবনকালে মল্লিক জমিদারদের গৃহ-বিগ্রহ আনন্দ বিহারীর দেবয়াতনের রক্ষী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই চাকরি পেয়ে বলরাম আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বিগ্রহের বাসগৃহে প্রবেশ করতে না পারলেও দূরে থেকে ভক্তিভরে আনন্দবিহারীর পূজার্চনা করতেন। আনন্দ বিহারীর দেহের স্বর্ণালঙ্কার, রত্ন-মুকুট ও পায়ের সোনার নূপুর ছিল; বলরামের প্রতি এই সব অলঙ্কার রক্ষার ভার অর্পিত হয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাগ্যের এমনই পরিহাস, বিশে ডাকাতের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে প্রভুকে রক্ষা করেও পরে সেই প্রভুর লাঞ্ছনা ও পীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না বলরাম হাড়ি। 'হঠাৎ এক রাতে মল্লিকদের গৃহদেবতার সমস্ত অলঙ্কার গেল চুরি হয়। সন্দেহ পড়ল বলরামের ওপর। তাকে গাছে বেঁধে চলল প্রচণ্ড প্রহার। শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো তাকে। এই ঘটনায় বৈরাগ্য এসে গেল বলরামের মনে। ছিঃ এত নীচু মানুষের মন? নীচু জাতি বলে বড়লোকদের এত ঘেন্না? সহসা তার মধ্যে জন্ম নিল এক প্রতিবাদী মানুষ। এই অসহায় জীবন, সমাজের এই অন্যায়, বিশ্বাসের এই স্খলন তাকে তলিয়ে দিল। বলরাম হাড়ি অপমানে লাঞ্ছনায় ম্রিয়মাণ হয়ে মেহেরপুর ত্যাগ করেন, চলে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে। কোথায় যান - কেউ জানে না। বেশ কয়েক বছর পর তিনি অনেক শিষ্য-সাগরেদ সঙ্গে নিয়ে আবার মেহেরপুরে ফিরে আসেন। কিন্তু তখন তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা আমূল বদলে যাওয়া অন্য মানুষ। কেশে-বেশে, চেহারায়-পোশাকে কত না পরিবর্তন। শিষ্য-ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভৈরব তীরে আশ্রয় গড়ে নিয়ে নবলব্ধ ধর্মমতের চর্চা করতে থাকেন।

ততদিনে মল্লিক বাড়ির অলঙ্কার চুরির কিনারা হয়েছে। প্রকৃত চোর ধরা পড়েছে। ফলে অনুতপ্ত জমিদার পদ্মলোচন মল্লিক বলরাম হাড়ির সাধন ভজনের জন্য ভৈরবতীরে জমি দেন। আশ্রম তৈরিতে আর্থিক সহযোগিতা পর্যন্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে একদিন তাঁরই কারণে মেহেরপুর থেকে বলরামের উৎখাত হয়, আবার সাধক রূপে প্রত্যাগমনের পর এই মেহেরপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠার নেপথ্যেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। অথচ এই বলরামের প্রতিষ্ঠা উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই। দীর্ঘকালের ব্রাহ্মণ্য শাসন ও শোষণে পর্যদুস্ত কৈবর্ত, বেদে, বাগদি, নমঃশূদ্ররা দলে দলে এসে বলরামকে পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করে। হাড়ি, ডোম, মুচি, বাগদির পাশাপাশি নিম্নবিত্তের মুসলমানরা পর্যন্ত তার শিষ্যত্ব বরণ করে।[৯] এই কাহিনী কতটা সত্যি তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কারণ এই বিষয়ে সমকালীন কোন উপাদান পাওয়া যায় না। তবে একাথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মল্লিক বাড়ির চুরি যাওয়ার ঘটনা বলরামের জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয়। মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয় তার মালোপাড়ার আশ্রমে। বলরামে মৃত্যুর পর হাড়ি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নেন তাঁর স্ত্রী ব্রহ্ম মালোনী। বলরামে মৃত্যুর পর হাড়ি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নেন তাঁর স্ত্রী ব্রহ্ম মালোনী। এই ব্রহ্ম মালোনী কে ছিলেন - বলরামের বৈধ পত্নী, সাধন সঙ্গিনী, না সেবিকা, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে যোগেন্দ্রনাথের বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্রহ্ম মালোনী ছিলেন বলরামের স্ত্রী। তিনি বলরামের মৃত্যুর পর মালোপাড়ায় যান এবং ব্রহ্ম মালোনী-এর সাথে কথা বলেন।[১০]

বলরামের মহিমা ধীরে ধীরে প্রচারিত হতে থাকে এবং হাড়ি সম্প্রদায়ের সদস্য বাড়তে থাকে। মেহেরপুরের গণ্ডি পেড়িয়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, রাজশাহী, কুষ্ঠিয়া চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বলরামের মতাদর্শ ছড়িয়ে পরে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সম্প্রদায়ের ভক্ত সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার। উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, -

> "After wandering about for some years, he set himself up as a religious teacher, and attracted round him more than twenty thousand disciples."[১১]

পশ্চিমবঙ্গে বলরামিদের প্রধান তিনটি সাধন ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমটি নদিয়া জেলার তেহট্ট ব্লকের নিশ্চিন্তপুর, দ্বিতীয়টি পুরুলিয়ার আদ্রার নিকটবর্তী দৈকিয়ারী গ্রাম এবং তৃতীয়টি বাঁকুড়ার ঝাটিপাহাড়ীর কাছে শালুনি গ্রাম।

তবে ১৯৪৭ সালের পর এদের সংখ্যা কমতে থাকে। 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মেহেরপুর' থেকে জানা যায়-

> "বৃন্দাবন হালদার (বলরামিদের অন্যতম নেতা)-এর মৃত্যুর পর (১৯৮৫) বাংলাদেশে বলরামীদের পাওয়া যায় না। কুষ্ঠিয়ার বারোখাদায় সত্তর ঘর বলরামি আছে, যারা বংশপরম্পরায় এই লোকধর্মটিকে ধরে রেখেছে। চুয়াডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের রামসেবক বিশ্বাস, কুষ্টিয়ার জুগিয়ার রঞ্জিতকুমার দাস, বারোখোদার অনন্ত দাস, বলাই দাস হলেন কয়েকজন হাড়িদের অন্যতম সদস্য।"[১২]

হাড়ি সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র হল বর্তমান নদিয়া জেলার নিশ্চিন্তপুর। মেহেরপুর থেকে কিভাবে নিশ্চিন্তপুরে এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর লেখায়। তিনি লিখেছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “আসলে আগেকার দিনে নদীয়া যখন ভাগ হয়নি তাখন মেহেরপুর ছিল একটা মাহকুমা শহর। আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে কেনা বেচা বা মামলা মকদ্দমার কাজে মেহেরপুরে আসত মানুষ। এই রকম কোন কাজে নিশ্চিন্তপুরের তনু মণ্ডল সেখানে এসেছিলেন একবার। নেহাতই দৈব ঘটনায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বলরামের। বলরামের বাকপটুতা, ঐশীক্ষমতা আর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তনু তাঁর শিষ্যত্ব নেয়। এই তনু থেকেই নিশ্চিন্তপুরে বলরাম-ভজনার শুরু। আস্তে আস্তে ওই গাঁয়ের মৎস্যজীবী নমঃশূদ্ররা বলরামভজা হয়ে ওঠে। তনুর অনুরোধে মেহেরপুর থেকে হাঁটাপথে বলরাম নিশ্চিন্তপুরে আসেন বেশ কয়েকবার। সেখানে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন মহীন্দর, রামচন্দ্র দাস, জলধর, সদানন্দ, শ্রীমন্ত, আর রাজু ফকির। মেয়েদের মধ্যে দীক্ষা নেয় নটু, দক্ষ আর জগো। দেখতে দেখতে ধরমপুর, সাহেবনগর, আরশীগঞ্জ, নাটনা, ধা’পাড়া, হাউলিয়া, গরিবপুর, পলাশীপাড়ায় ছড়িয়ে পরে বলা হাড়ি মত।”[১৩]

বলরামের মৃত্যুর পর মেহেরপুরে সংগঠন পরিচালনার নেতৃত্ব দেন ব্রহ্ম মালী আর নিশ্চিন্তপুরের তনু মণ্ডল। নিশ্চিন্তপুরের ভক্তদের কাছে বলরম হাড়িরাম নামে পরিচিত। তনু মণ্ডল এর নেতৃত্বেই নিশ্চিন্তপুরে বলরামিদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁর নেতৃত্বেই বেলতলায় প্রতিষ্ঠিত হয় হাড়িরামের আশ্রম। একটি গানে তনুর মাহাত্মকে এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে -

“ত্রেতাযুগে ছিল হনু
মেহেরাজে নাম তনু।।
পেয়ে রামের পদরেণু
চারযুগে সঙ্গে ফেরে।।”[১৪]

এখানে তনুকে রামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাড়িরাম এখানে মাঝে মধ্যেই আসতেন। আর উৎসবের সময় মেহেরপুর থেকেও প্রচুর ভক্ত এখানে আসতেন। হাড়িরাম নিশ্চিন্তপুরে যাদের প্রত্যক্ষভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের না, জাতি এবং বাসস্থানের পরিচয় এই রকম -

“দীনু। জাতে মুচি। চাঁদবিল গ্রাম।
রামচন্দ্র। নমঃশূদ্র। নিশ্চিন্তপুর
ধনঞ্জয়। জাতপরিচয় অজ্ঞাত। বীরভূম।
রাজু ফকির। মুসলমান। গোপীনাথপুর।
নীলু। যুগী। বাসস্থান অজ্ঞাত।
সদানন্দ। হাড়ি। পঞ্চকোট।
শ্রীমন্ত। মাহিষ্য। নিশ্চিন্তপুর।
দক্ষ, জগ, নটু। নারীশিষ্যা। ভিক্ষোপজীবিনী।
বলাই গেঁড়ো। মাহিষ্য। সাহেবনগর।”[১৫]

এই নিশ্চিন্তপুরে হাড়িদের সম্পর্কে জানার উপায়ের বিশেষ অভাব রয়েছে। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীই প্রথম এই অঞ্চলের হাড়িদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। ১৯৭০ এর দশকে তিনি এই অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান এবং বলরামীদের অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ১৯৭২ সালে যখন সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় নিশ্চিন্তপুরে পৌঁছন তখন হাড়িরামী শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পূর্ণদাস হালদার এবং বিপ্র দাস। তিনি সেই সময় লক্ষ্য করেন বিপ্র দাসের প্রখর বৈষ্ণব বিরোধিতা। সাহেব নগরের বৈষ্ণব আখড়ায় একবার বিপ্র দাসকে প্রসাদ গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করেন হাড়িরামের নিষেধ বাণী -

“না করিব অন্য দেবের নিন্দন বন্দন।
না করিব অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ।
মৎস্য মাংস না খাইব তিল না মাখিব গায়ে।

নারীসঙ্গ না করিব আপন ইচ্ছায়।"[১৬]

মোহান্ত যখন জানতে চাইলেন সেবা গ্রহণ না করার কারণ, তখন বিপ্র দাস যুক্তিসম্মত ভাবে উত্তর দেন –

> "সেবা তো নেবো কিন্তু দেব কে? মোহান্ত বললেন, কেন? সেবা দাও পরম আত্মাকে। উত্তরে তিনি বলেন, মোহান্তজী এই ভোগ তো আপনারা পরমাত্মাকে উৎসর্গ করা, তা আমি সেই উচ্ছিষ্ট বস্তু কেন আমার পরমাত্মাকে সেবা দেব বলুনতো?"[১৭]

বলরাম যেমনভাবে বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করতেন, ঠিক একই সুর পাওয়া গেল বিপ্র দাসের গলায়।

হাড়ি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধিতা করে। তাই তাদের আঁচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতিনীতি ও সাধন পদ্ধতির মধ্যে এই বিরোধিতার রূপটি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়ের শিষ্যরা বলরামকে রামচন্দ্রের অবতার বলে মনে করতেন। দোলের সময় বলরাম নিজে দোলমঞ্চে আরোহণ করে বসতেন আর শিষ্যরা আবির ও ফুল দিয়ে তাঁর পূজা করত। বলরামের জন্ম নিয়ে অবতারের কাহিনী প্রচলিত হয়েছে সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ বিষয়ে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন- দেবত্বগুন আরোপ করা হয়ে থাকে এমন অনেক ধর্মগুরুর মত বলরাম সম্বন্ধেও সৃষ্টি হয়েছে অনেক কাহিনী, যার ফলে তাঁর জন্মবৃত্তান্তেও খানিকটা অলৌকিকতত্ত্ব আরোপিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর পিতার বিবাহের সময় গনৎকাররা ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, যে এই বিবাহের ফলে যে পুত্র জন্মাবে সেই হবে বংশের শেষ সন্তান। এরপর স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা হন তখন সে ব্যাপারটা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন। একদিন বিকেলে একটি শিশু মাথা ভর্তি চুল ও দাড়ি নিয়ে খরের চাল থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং আশ্চর্যজনকভাবে স্ত্রীলোকটি দেখেন যে তাঁর গর্ভ শূন্য হয়ে গেছে। তিনি সেই শিশুটিকে জড়িয়ে চুপিসারে জঙ্গলে পরিত্যাগ করে আসেন। কিন্তু পাশের গ্রামে ছিল তাঁর এক ভগিনী। বলরাম তাকে স্বপ্নে দেখা দেন। পরের দিন সকালে শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে আসে। এরপর পালিতা মাতা কাজ পায় এক জমিদাদের বাড়িতে এবং বলরাম বড় হলেও তাকেও নিয়োগ করা হয় জমিদারের গরু চরানোর কাজে। জন্মটি অলৌকিক এবং কাহিনীটির মিল রয়েছে রাখাল বালক কৃষ্ণের সঙ্গে।[১৮]

হাড়িরামের তত্ত্ব অনুযায়ী এই পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর শরীর 'ক্ষয়' করে। তিনি মানব দেহের হাড়ের সৃষ্টি করেছেন তাই তাঁর নাম হাড়ি। হাড়ি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা পূর্ণ হালদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হারিরামের কল্পিত যুগতত্ত্ব, -

> "আদি যুগে কিছুই ছিল না। অনাদি যুগে সৃষ্টি হয় গাছ পালা। দিব্যযুগে কোনো নারী ছিল না। তখন হাড়িরাম তাঁর হাই থেকে করলেন হৈমবতী সৃষ্টি। হৈমবতী আদ্যাশক্তি। তাঁর থেকে হলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। তাই হাড়িরামের নিগূঢ় তত্ত্ব যারা তাড়া বুঝেন কী করে? সত্য ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারযুগ তো অনেক পরে- যে চার যুগে চার অবতার। হাড়িরাম তারও একযুগ আগের দিব্যযুগের মানুষ। তাঁর হৈমবতী, হৈমবতীর সৃষ্টি বিষ্ণু। কাজেই বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার রামচন্দ্র আসলে হাড়িরামেরই অবতার।"[১৯]

এর উল্লেখ পাওয়া যায় হাড়িরামি তত্ত্বের গানে -

"দিব্যযুগে যিনি হাড়ি
সত্যযুগে বলিহারি
ত্রেতাযুগে দর্পহারি
দ্বাপর যুগে ভৃগুরাম
কলিযুগে সেই হাড়িরাম
প্রকাশ করলেন তাঁর নিজ নাম।"[২০]

অর্থাৎ হাড়িরামের তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি হলেন আদি পুরুষ, সবকিছুর স্রষ্টা। মালোপাড়ার শৈলেন হালদার জানিয়েছেন, মানব দেহ চার বীজে গঠিত। এই চার বীজ হল - হাড়, হাড্ডি, মনি (শুক্র) এবং মগজ। দীনুর একটি গানে পাওয়া যায় হাড়িরামী তত্ত্বের কথা। তিনি লিখেছেন -

"কারিগরের কী খোদাগিরি
গড়াচ্ছেন ঘর বরাবরি
ঘরের গড়নদারের বলিহারি
কিবা কারিকুরি চারিধার।।
ঘরের ফেলে জোবাকাঠি
চার চিজের চার খুঁটি
গড়লেন পরিপাটি
কী চমৎকার।।
ভেবে দিনু বলে, আমি
না চিনিলাম ঘরামি
ত্রিজগতের স্বামী রাম গড়নদার।।[২১]

হাড়িরামকে শিষ্যরা মাতা-পিতা এবং জগতপতি বলে মান্য করেন। তারা বিশ্বাস করে যে, মাতার চার বীজ, বাবার চার এবং হাড়িরামের দশ বীজ নিয়ে মানব দেহ গঠিত। মানদেহে মাতৃবস্তু হল - ত্বক, মাংস, রক্ত, কেশ এবং পিতৃবস্তু হল - অস্তি, মজ্জা, শুক্র ও স্নায়ু। মাতৃবস্তু, পিতৃবস্তু এবং জগতপতির দেওয়া দশ উপাদান মিলে হয় আঠারো মোকাম। আর এই আঠারো মোকাম জুড়ে যার অধিষ্ঠান তিনি হলেন হাড়িরাম। আবার হাড়িরামের আর একটি গানে আছে -

"কারিগরের করা দিব্য মলিন করা,
দেহের ভিতর আছে ৩৬০ খান তারে জো।।
কারিগরের দেখো এমনি গো করা মাফে চৌদ্দ পোয়া,
আছে ৫২ বাজার, ৫৩ গলি, কয়জন দেয় পাহারা।।
দেহের ভিতর ছয় জন রিপু গো তার
কয়জন ঘুমায় মন, কয়জন জাগে গো তারা।।"[২২]

বলরামীরা বৈষ্ণবদের মত পরকিয়ায় বা গুরুবাদে বিশ্বাস করেনা। বৈষ্ণব বলতে সহজিয়া বৈষ্ণব এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের নানা অধঃপতিত শাখাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এমন কি হাড়িরামের শিষ্যরা গৌরাঙ্গকে নিচু করে আত্মতুষ্টি লাভ করে থাকেন। এর কারণ হিসেবে অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, - "...উনিশ শতকের গোড়ায় গ্রামসমাজে ব্রাহ্মণের চেয়ে লৌকিক বৈষ্ণবরা ছিলেন তাঁদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের অবাধ সংখ্যা গরিষ্ঠতা সাধারণ দুর্বল ভক্তিমোহিত মানুষকে তীব্রভাবে টেনে নিচ্ছিলেন তাঁদের ধর্ম। সে প্রবল তরঙ্গ রোধ করার মত ক্ষমতা সংখ্যালঘু ও অচ্ছুত হাড়িরামের ধর্মমতের ছিল না। তাই তারা বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁর লিখেছিলেন বেশ কিছু ব্যঙ্গাত্মক ছড়া। সহজিয়া বৈষ্ণবদের অপ্রতিহত জয়যাত্রাকে ঠেকাতে তারা গৌরাঙ্গ পূজকদের প্রতিরোধ তৈরি করেন নতুন নতুন শ্লোক। যেমন -

"নিত্যচৈতন্য পুরুষ হাড়িরাম উদয় মেহেরপুর।
জানতে পারে তারই নিকট নইলে বহুদূর।।
বৈষ্ণবের জন্য কাঁদে নিতাই আর গৌর।
আবার ঐ বৈষ্ণব গোঁসাই ঠাকুরের ঠাকুর।।"[২৩]

সদাচারী জীবনযাপন, পরকীয়া বর্জন এবং গুরুবাদহীনতা তাদের এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে না। দৈনন্দিন জীবনে তারা যে মন্ত্র পাঠ করে তা পুরোপুরি বাংলা ভাষায়। তার একটি উদাহরণ হল, বাইরে যাওয়ার সময় তারা যে মন্ত্রপাঠ করে তা হল -

"বলরাম চন্দ্র হাড়ি গোঁসাই
হাড় হাড্ডি মনি মগজ
তারক ব্রহ্ম রামনারায়ণ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জগৎ পতি পিতা
হায়াত–মউতের কর্তা
তুমি আমার রক্ষাকর্তা।"[২৪]

প্রথাগত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বা রীতিনীতি বলরামিদের মধ্যে নেই। এদের কোন ধর্ম গ্রন্থ নেই। তাঁর মূর্তি পূজা করে না। এরা প্রতিদিন বলরামের উদ্দশ্যে যে নৈবেদ্য দেয় তাতে থাকে, চাল, ডাল, গুড়, এবং নাড়ু। হাড়িরা দ্বীপ, ধূপ, তুলসী, তিলক, গঙ্গাজলের প্রভৃতি প্রচলিত মানে না। বলরামী শিষ্য ফণী বিশ্বাস জানিয়েছেন, -

> "হিন্দুদের মত গঙ্গার পবিত্রতা মানি না। পূণ্য মনে করে স্নান করি না। গঙ্গাজল আমরা হাড়িরামের সেবা পূজা স্নানেও দেই না। ...আমাদের কাছে গঙ্গা স্নান আর পাঁচটা প্রাকৃতিক জিনিসের মত।"[২৫]

বলরামীরা পায়ে হাত দিয়ে কাউকে প্রণামও করে না। এর উত্তর রয়েছে শ্লোকে -

"দেহ আমার শ্মশানের সমান
গুরু এসে মন্ত্র দিল
করলে ফুলের বাগান।"[২৬]

তাদের বিশ্বাস ভক্তহীনদের দেহ শ্মশান এর সমান। তাই তাদের পায়ে হাত দিলে হাড়িরামীদের তেজ সহ্য নাও করতে পারে। তাই তারা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না।

বলরামীদের সব আশ্রম বা আখড়া বেলতলাতেই হয়ে থাকে। তারা বেলকে 'শ্রীফল' বলে। বেল হল আদ্যাশক্তির স্তনের প্রতীক আর বেলতলায় থাকা মানে আদ্যাশক্তির স্নেহ ছায়ায় থাকা। হাড়িরামের মতে জাতি দুটি - পুরুষ আর নারী। তাই বেলগাছকে জড়িয়ে দেওয়া হয় একটি ধুতি আর একটি শাড়ি। এদের সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ গোপনীয়তা ঘেরা নয়, এমন নয় যে এদের ক্রিয়াকর্ম মূলত সমাজ জীবনের বাইরে সাধন করা যাবে। বরং এদের সাধনার ধরণটি হল দৈনন্দিন সমাজ জীবনে দেহকে সংযত করা। এখানেও দেহ একটি সামগ্রী, যা তাঁর মালিক, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সঙ্গে কাজে লাগাতে পারেন অথবা লাম্পট্যের মাধ্যমে অপব্যয় বা ধ্বংস করতে পারে।

বলরামিদের সাধনার চারটি স্তর দেখা যায় - 'খাসতন', 'নিত্যন', 'এয়োতন' এবং 'বোধিতন'। এই চারটি স্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সুধীর চক্রবর্তীর লেখায়। তিনি লিখেছেন হাড়িরামিদের ধর্মসাধনার সবচেয়ে উঁচু স্থান খাসতনের। পৃথিবীর আলো, হাওয়া, আকাশ, আগুন, জল সবকিছুই ঈশ্বরের খাসতালুকের প্রজা। এরা কাউকে খাজনা দেয়না। অর্থাৎ এদের অস্তিত্বের বিনিময়ে কোন রকম মূল্য দিতে হয় না। হাড়িরাম এঁদের কাছে ছিলেন খাসতনের সাধক। খাসতনের একেবারে উল্টো ধর্ম বোধিতন। যেখানে অজ্ঞানতা ও অসহয়াতার জন্য কেবল মূল্য দিতে হয় অকারণ বিন্দুপাতে, অতিপ্রয়োনীতায় ও বন্ধনে। হাড়িরামের ধর্ম, গৃহী ধর্ম কিন্তু যে গৃহী অন্ধভাবে রোজ দেহ সঙ্গম করে এবং অকারণ বীর্য ক্ষয় করে সেই বদ্ধ হয় বোধিতনে। এই সম্প্রদায়ে তাই বোধিতনের বন্ধন থেকে সব ভক্ত মুক্তির আকুল প্রার্থনা করে। এই বন্ধন থেকে মুক্তি স্তরই হল এয়োতন। গৃহী হাড়িরামি যে- ধর্ম পালন করেন তাকে বলে এয়োতন। এটি আসলে এক রকম জন্ম নিয়ন্ত্রণের কৌশল। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে জানে না। তাই 'এয়োতন' ধর্মে বলা হয়েছে দেহ- সঙ্গম করতে হবে কেবল সন্তান কামনায়। বৃথা সঙ্গম ও অকারণ বীর্যক্ষয় মহাপাপ। হাড়িরামের অনুগামীরা বিশ্বাস করে -

"সন্ধ্যাবেলা সঙ্গম করলে সন্তান হয় চোর বা গুন্ডা।
রাত বারোটার আগে সঙ্গম করলে সন্তান হয় ডাকাত
বা দস্যু। রাত বারোটা থেকে ভোরের মধ্যে সঙ্গম
থেকে জন্ম নেয় সর্বলক্ষণযুক্ত দেবাগুণানবতি।"[২৭]

এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হাড়িরামি সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকনেতা বা 'সরকার' চারুপদ মণ্ডলের কাছে, -

> "হাড়িরাম ঐ নির্দেশ আসলে গরীব মূর্খ্য গাঁয়ের মানুষদের সাবধান করা বই আর কি? গ্রামদেশে জানেন তো, সন্ধ্যারাতেই নেমে আসে রাত্তির। মেয়ে পুরুষ তখন কি করবে? শুয়ে পড়ে। জানেন তো গ্রামে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটা কথা খুব চলিত আছে যে 'কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই'। এখানে শোওয়া মানেই দেহের মিলন। আপনাদের শহুরে জীবন আসছে নানা রঙ্গরস সিনেমা সার্কাস খাওয়া-দাওয়া হোটেল রেস্টুরেন্ট। গ্রামে ও সব কই? সারাদিন মাঠে, খামারে ভুতের মত খাতে, গরীব মানুষ সব, ঘরে বেশিক্ষণ লণ্ঠন জ্বালাবার কেরোসিন পর্যন্ত থাকে না। তাছাড়া নানা দলাদলি। কী দারকার? যে যার মত শুয়ে পড়ে। কিন্তু রাত তো লম্বা। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী। দেহধর্ম একটা আছে তো? তাই কেবলি সঙ্গম আর বীর্যক্ষয়। তার থেকে অনবরত সন্তান জন্ম। হাড়িরামের সময় তো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ওঠেনি। উনি তাই কৌশলে একটা আইন চাপিয়ে গেছেন। বুদ্ধিমান বাচক মানুষ ছিলেন তো! কে আর চায় বলুন যে তার সন্তান হোক চোর ডাকাত।"[২৮]

এয়োতন সাধক যখন সফলতা পাবেন অর্থাৎ অভিপ্রেত সন্তান লাভ ঘটবে একটি বা দুটি, তখন তাঁর সাধন মার্গ হবে নিত্যন। চিরতরে দেহের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে নিত্যপুরুষ হাড়িরামের ধ্যান জ্ঞানে মগ্ন থাকা নির্জন বনে বা নদীর তীরে বা বেলতলায়, এই হল নিত্যনের লক্ষণ। এই নত্যিন লাভই হল মুক্তি। এইভাবে হাড়িরাম শিখিয়েছেন কিভাবে সংসারের মধ্যে থেকে সাধনার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়। একটি শাখার ভক্তরা বলরামের মৃত্যুর পর একটি ছোট ঘর তৈরি করে রেখেছেন এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। আর অন্য শাখার ভক্তরা বলরামের এইরকম আজ্ঞা নেই বলে তাঁরা কোনরূপ অনুষ্ঠান করে না। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী তাঁর অনুসন্ধানে এই বিভাজনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বলরামও এই ধরণের কোন বিধান দেননি। তিনি ছিলেন ব্রাত্যজনের পথপ্রদর্শক। তাঁর সংস্পর্শে এসেই মুক্তি পেয়েছেন অসংখ্য দরিদ্র, অস্পৃশ্য, সর্বহারা শ্রেণির মানুষ।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী যখন অনুসন্ধান করেন এই সম্প্রদায় এর অস্তিত্বের সঙ্কট লক্ষ্য করেছেন। তিনি হাড়িরামের শিষ্যদের যে তালিকা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এখন আর কেউ জীবিত নেই। আর নতুন প্রজন্মের কেউ হাড়ি সম্প্রদায়ে ভূক্ত হওয়ার প্রবণতা নেই। নিশ্চিন্তপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বলাহাড়ি সম্প্রদায় এর একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন প্রশ্ন হল এই রকম একটি সম্প্রদায় যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষ মাথা উঁচু করে ধর্মাচারণের অধিকার লাভ করেছিল তারা আজ কেন বিলুপ্ত? নিশ্চিন্তপুরে টিকে আছে শুধু হাড়িরামের খড়ম, মৃত বেলগাছ আর নতুন আশ্রম, সেখানে হাড়িরামের কোন শিষ্য এর দেখা মেলে না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন।

দেশবিভাগ হাড়ি সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। দেশভাগের ফলে হাড়িদের প্রধান কেন্দ্র নিশ্চিন্তপুর চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র থাকে ভারতের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবে এই বিভাজনের ফলে নিশ্চিন্তপুরের হাড়ি সম্প্রদায় অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া পরিসংখ্যানে দেখা যায় ধারাবাহিক ভাবে এই জেলায় হাড়িদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। একটি তালিকা দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক -

সাল	হাড়িদের সংখ্যা
১৮৭২	৪,১১৩ জন
১৮৮১	৬,৪১৫ জন
১৮৯১	....
১৯০১	৫,০৬৯ জন
১৯১১	৪,০৩৫ জন
১৯২১	৩,৭২৯ জন
১৯৩১	৩,২৮০ জন
১৯৪১	২,২৬০ জন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৫১	১,৮৪৯ জন

(Mitra, A, The Tribes and Castes of West Bengal, West Bengal Press, Alipur, 1953, p-101)

অষ্টাদশ শতকে ভারতে জাতি, রাষ্ট্রের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। সমাজ নানা জাতি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করতেন সমাজে কিছু উচ্চ শ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তি। নিচুতলার মানুষের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বলরাম নিচু শ্রেণির মানুষকে বাঁচার পথ দেখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতে জাতি রাষ্ট্রের ধরণা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে এবং সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা কমে আসে। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে সমাজে সকলের সমান অধিকারের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্ম পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর এই কারণে সমাজের গৌণধর্মগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে আর প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীতা কমে এসেছিল।

যে কোনো ধর্ম প্রসারের জন্য প্রয়োজন হয় শাসক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রচার। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ে কোন উচ্চ শ্রেনির মানুষ নেই। কোনো প্রভাবশালী বা শাসক এই ধর্ম গ্রহণ বা সমর্থন করেনি। বরং সমাজের উচ্চশ্রেণি, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল বিরোধিতা করেছেন।

> "Aristocratic Brahmanism can only punish them by keeping them excluded from the pale of humanity."[২৯]

এই প্রবল বিরোধিতা বলাহাড়িদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এছাড়া নিশ্চিন্তপুরের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন চোখে পরার মত। কৃষির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়েছে। সে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। কিন্তু বলাহাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সমাজের উচ্চশ্রেণির কাছে সে অবহেলিতও। তাই নতুন প্রজন্ম বলরামকে ভক্তি করলে এই ধর্ম আর নতুন করে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক না। আর হাড়িরামের কোন সন্তান ছিল না। তাই বংশ পরম্পরায় এই মত ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কর্তাভজা বা সাহেবধনী সম্প্রদায় আজও টিকে থাকার একটি কারণ হল তাদের বংশের উত্তরাধিকারীদের উপস্থিতি। এই উত্তরাধিকারদের কেন্দ্র করে মানুষ আজও মানুষ সমবেত হয়। বর্তমানে বলরাম তাই টিকে আছেন নিশ্চিন্তপুরের মানুষের মনে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস হাড়িরাম এখনও তাদের রক্ষা করছেন। তাঁর মহিমা লোকমুখে প্রচলিত। আর হাড়িরাম এই ভাবেই সকলের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন।

Reference:

১. দত্ত, অক্ষয়কুমার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), বিনয় ঘোষ (সম্পা), পাঠভবন, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৭
২. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), বিশ্বকোষ(দ্বাদশ খণ্ড), বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ৬২২
৩. দত্ত, অক্ষয়কুমার, বিনয় ঘোষ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৪. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৫. ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ, হিন্দু কাস্ট অ্যান্ড সেক্টস, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা, ১৮৯৬, পৃ. ৪৯৩
৬. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৭. দত্ত, অক্ষয়কুমার, বিনয় ঘোষ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৮. রায়, দীনেন্দ্রকুমার, সেকালের স্মৃতি, নাভানা, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ২২
৯. তদেব, পৃ. পৃ. ২৩-২৪
১০. ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩
১১. তদেব, পৃ. ৪৯৩
১২. খান, মো. আলতাফ হোসেন, শামসুজ্জামান, আমিনুর রহমান সুলতান, (সম্পাদনায়), বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মেহেরপুর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৩৫
১৩. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

১৪. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৫. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৬. তদেব, পৃ. ৬১

১৭. তদেব, পৃ. ৬৯

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পাদনা), জাতি, বর্ণ ও সমাজ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিস, দিল্লি, ১৯৯৮, পৃ. পৃ. ৮৮-৮৯

১৯. চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০১

২০. খান, শামসুজ্জামান ও হোসেন মো. আলতাফ (সম্পাদনায়), বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মেহেরপুর, আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৬৫।

২১. তদেব, পৃ. ২৩৫

২২. আয়ম, তোজাম্মেল, মেহেরপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, গতিধারা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৯

২৩. খান, শামসুজ্জামান ও হোসেন, মো. আলতাফ (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

২৪. চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. পৃ. ১০৩-০৪

২৫. তদেব, পৃ. ১৪৬

২৬. সরকার, সোমব্রোত, কর্তাভজা, দেহবাদ, লোকতন্ত্র, অণেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৮৪

২৭. চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১২৮

২৮. তদেব, পৃ. ১০১

২৯. ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ, হিন্দু কাস্ট অ্যান্ড সেক্টস, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা, ১৮৯৬, পৃ. ৪৮৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 662 - 674
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

চট্টগ্রামের লোকগানের ধারা : স্বরূপ-সন্ধান

হাসনাইন ইস্তেফাজ
প্রভাষক, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : hasnainpavel3@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Chittagong folk songs, Sampan, Karnaphuli, Maizbhandari songs, Kavi songs, Pala songs, Hati Kheda songs,

Abstract
Folk songs in every region of Bangladesh are spontaneous creations of the local mindset of that area. Like other branches of folk creation, the folk songs of Chittagong are born from the local life of this region and are an evolving cultural element shaped by the flow of time.In the folk songs of this region, alongside the collective characteristics of the rural lifestyle, there are various exceptional tendencies for several reasons.Here ,in addition to classical music and kirtan,many diverse streams of music can be observed. In fact, the rich and diverse tradition of folk music has been practiced in this region for nearly one and a half centuries.Therefore , the folk songs of this region are considered a rich tradition of bengali folk music. The present article attempts to present a cronological intruduction to the diverse streams of folk music prevalent in Chittagong.

Discussion

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের লোকগানই সেই অঞ্চলের লোকমানসের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। লোকসৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতোই চট্টগ্রামের লোকগানও এ অঞ্চলের লৌকিক জীবন প্রসূত এবং তা সময়ের স্রোতে বিবর্তিত একটি সাংস্কৃতিক উপাদান। এ অঞ্চলের লোকগানে লোকায়ত জীবনধারার সামূহিক বৈশিষ্ট্যসহ কিছু ব্যতিক্রমী প্রবণতা যুক্ত নানা কারণে। এখানে শাস্ত্রীয় সংগীত ও কীর্তনের পাশাপাশি লোকগানের বহুবিধ ধারা পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত, এখানে লোকগানের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য চর্চিত হয়ে আসছে প্রায় দেড়শত শতাব্দী জুড়ে। তাই এ অঞ্চলের লোকগানকে বাংলা লোকগানের একটি সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে চট্টগ্রামের প্রচলিত লোকগানের বিচিত্রধারার পর্যায়ক্রমিক পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

হাজার বছরের পথ পেরিয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি স্বরূপতায় সমৃদ্ধ বিশ্বের মানচিত্রে চট্টগ্রাম একটি প্রাচীনতম জনপদ। চট্টগ্রামের সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পর্যালোচনা করলে মনে হবে যে, জ্ঞানচর্চা ও ধর্মচর্চাই চট্টগ্রামের বিশেষত্ব। কিন্তু, এই জ্ঞানচর্চা ও ধর্মচর্চার একটি বিস্তৃত জায়গা জুড়ে আছে সংগীত। চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর হওয়ায় অতীতে বিদেশী বণিকদের যাতায়াত ছিল। ভিনদেশী বণিক শাসকদের অপ্রত্যাশিত দখল শাসন ও শোষণ, নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ প্রমুখের আবির্ভাব এখানকার সংস্কৃতিকে সংগীতময় করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক।

বর্তমান বিশ্বে সংগীত বলতে শিষ্ট সংগীতকে প্রধান্য দিলেও সেই শিষ্ট সংগীতের উৎসমূল লোকগান। লোকগান হলো সেই গান যা মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় নিরক্ষর গ্রামবাসীর কণ্ঠে গীত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। বাংলা লোকগানে চট্টগ্রামের বিরাট এক ঐতিহ্য রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের কবি-সাহিত্যিকদের অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। এমনকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ ছিল কতগুলো গান মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, বৈষ্ণবপদাবলী, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানসহ মধ্যযুগের সকল সাহিত্যকর্মই ছিল রাগতাল সমভিব্যবহারে গেয়। কাব্যগানের উৎকর্ষের পরম্পরায় এখানে আধুনিককালের লোকাঙ্গিক গানের বিচিত্র সম্ভার সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

লোকগানের বিভিন্ন ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানষের মুখের ভাষায়। মূলত স্থানীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক জীবনধারা, সাগর-নদী বিধৌত জীবনধারা, পাহাড়বেষ্টিত বন্ধুর জীবনপ্রণালী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে চট্টগ্রামের লোকগানের ধারা। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান নদী কিংবা সাগরের অবারিত স্রোতধারার মত, যেখানে ফল্গুধারার মতো এসে মিশেছে স্থানীয় লোকগানের ধারার

পালাগান, বারোমাসি গান, হঅঁলা গান, বিয়ের গান, ফুলপাঠ গান, হালদাফাডা গান, সাম্পানিয়া গীতি, মারফতি গান, মাইজভাণ্ডারী গান, গাইনের পালা বা গাজির গান, কবিগান নামক বিভিন্ন স্রোত। চট্টগ্রামের এসকল গানকে অনেকেই আঞ্চলিক গানও বলে থাকেন। ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমি থেকে কল্যাণী ঘোষ সম্পাদিত ‘চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান’ নামক একটি গানের সংকলন প্রকাশিত হলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান সারাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। সংকলনটিতে ত্রিশজন গীতিকারের ৩৮১টি গান স্থান পেয়েছে। গানগুলোকে ২০টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের খ্যাতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে যাঁদের নাম চিরস্মরণীয় তাঁরা হলেন -অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, অজিত বরণ শর্মা, এম. এন. আখতার, আবদুল গফুর হালী, আস্কর আলী পন্ডিত, অমলেন্দু বিশ্বাস, ফণী বড়ুয়া, কবিয়াল ইয়াকুব আলী, মলয় ঘোষ দস্তিদার, মোহনলাল দাশ, মোহাম্মদ নাসির, শিমুল শীল, বুলবুল আক্তার, জাহাঙ্গীর আলম, মৃদুল কুমার দে, সুমন চৌধুরী বিকু, শেলী দে, বাবুল আচার্য, প্রতিমা ঘোষ, এস্তফা, অজিফা খানম প্রমুখ। এঁদের অনেকেই কণ্ঠশিল্পী, সুরকার কেউ আবার গীতিকার হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় শিল্পী জুটি শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব - শেফালী ঘোষ। শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব - শেফালী জুটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানকে নিয়ে গেছেন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে। পরবর্তীতে সনজিত আচার্য ও কল্যাণী ঘোষ তাঁদের পরবর্তী জুটি হিসেবে আঞ্চলিক গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন মানুষের কাছে। চট্টগ্রামের কিছু জনপ্রিয় আঞ্চলিক গান –

১. বাইন দুয়ারদি ন'আইসো তুঁই নিশিরও কালে/ মা বাপরে লাগাই দিবো মাইনষে দেখিলে, ২. কইলজার ভিতর গাঁথি রাইখুম তোঁয়ারে, ৩. কর্ণফুলীরে সাক্ষী রাখিলাম তোরে, ৪. মনে তো মানে না, দিলে তো বুঝে না, ৫. মালকা বানুর দেশে রে, ৬. একদিন বুঝিবা জ্যাডা একদিন বুঝিবা, ৭. কী জ্বালা দি গেলা মো রে, ৮. আইচ কাইল আই আইলে এ্যান কা গরর, ৯. নাতিন বরই খা, বরই খা হাতত লইয়া নুন, ১০. মানা গজ্জীলাম তোরে পিরিত ন গরিস, ১১. হেড মাস্টারে তোঁয়ারে তোঁয়ার। জনপ্রিয় এ গানগুলোতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রেম-বিরহ, নর-নারীর সম্পর্ক, সামাজিক নানা অসঙ্গতি, নানা এলাকার লোকসংস্কৃতি, এখানকার নিজস্ব লোকাচার ওঠে এসেছে। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গানগুলোর উপজীব্য শুধু প্রেম, বিরহ ও স্থানীয় জীবনচিত্রই নয়; দেশপ্রেমও রয়েছে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এরকম কয়েকটি দেশপ্রেমমূলক গান হল –
‘বাংলাদেশের মুখ হইয়ে যে চাঁটিয়া বন্দর’, ‘লাল সবুজ এ পতাকা আন্নি আঁরা যুদ্ধ গরি’, ‘মার ভাষার লাই পরাণ দিয়ে রফিক, সালাম, বরকত’, ‘পরাণ ভরি শোকর গরি আঁরার চাটগাঁত বসত বাস’, ‘বার আউলিয়া ছিটকাই দিইয়ে রহমতের সুবাস’, ‘কতো দেশ ঘুরিলাম কতো কিছু দেখিলাম চাটগাঁর মতন এন সুন্দরইয়্যা ন দেখিলাম আঁই’ সহ বেশ কিছু গান।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রাম নদীবিধৌত পলিমাটির অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত। মোহনার নদী কর্ণফুলী চট্টগ্রামের প্রাণ বলেই বিবেচিত। চট্টগ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা, প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার যেন নিত্যসঙ্গী কর্ণফুলি। কর্ণফুলি নদী চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। শুধু তাই নয়, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এ অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলনের হাজারো স্মৃতি জড়িয়ে আছে কর্ণফুলি, শঙ্খ এবং কক্সবাজারের মাতামুহরী ও বাঁক-খালী নদীকে ঘিরে।"[১]

তাইতো মলয় ঘোষ দস্তিদার কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি বিষয়ক ইতিহাসকে অনুষঙ্গ করে লেখেন অসাধারণ একগান। দৃষ্টান্ত স্বরুপ নিম্নোক্ত গানটিতে কর্ণফুলি নদীর ইতিহাস দেখতে পাই -

"ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত
লুসাই পাহাড়তুন নামিয়ারে
যার গই কর্ণফুলি।...
পাহাড়ি কন সুন্দর মাইয়া
ঢেউর পানিত যাই
সেয়ান করি উডি দেখের
কানের দুল তার নাই
যেইদিন কানের ফুল হাজাইয়ে
হেইদিনত্তুন নাম কর্ণফুলি।"[২]

লোকগানে বিরহী নারীদের হৃদয়াকুতির প্রকাশ লক্ষযোগ্য। সনজিত আচার্যের একটি গানে নদী কর্ণফুলিকে নিয়ে নারী হৃদয়ের আত্মগত ভাবনা, বিরহ ও যাতনার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে -

"ওরে কর্ণফুলিরে সাক্ষী রাখিলাম তোরে
অভাগিনীর দুঃখের কথা-করি বন্ধুরে।
যত তরুলতা-
কার কাছে বুঝাইয়ুম
আঁর মনেরি কথা-
যদি ন পাই বন্ধুরে
আর হুনাইয়ম কারে
...
ইশারা দি ডাইকতো বন্ধু
আঁরে গোপনে
কানে কানে মনর কথা
কইতাম দুইজনে
যাইতাম ঘরের বাইরে
ও তাঁর বাঁশির সুরে॥"[৩]

কর্ণফুলির রূপসুষমায় মুগ্ধ হয়ে অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী কর্ণফুলির ঢেউ, কর্ণফুলির বুকে ভাসমান সাম্পান, নৌকা নিয়ে লিখেছে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী গান। এ গানের মাধ্যমে এখানকার মানুষের সংগ্রামী মনোভাব ও অসাম্প্রাদায়িক চেতনারই প্রকাশ দেখতে পাই -

"চাডগাঁইয়া নওজোয়ান আঁরা
হিন্দু মুসলমান
দৈর্গার কূলত বসত গরি
ঠেগাই ঝড় তুয়ান।
এই দইরগার কূলত বসতগরি
আঁরা বেয়াগুন মিলি রে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঢেউয়ের আঘাত নাচি নাচি
নাও সাম্পান লই খেলি রে
ডর কি আঁরা সিনা দি তাই
ঠেগাই ঝড় তুয়ান।”[৪]

চট্টগ্রামের লোকগানের অন্যতম অনুষঙ্গ ‘সাম্পান’। সত্তরের দশকে বিখ্যাত গীতিকার মোহনলাল দাশের রচিত ‘ওরে সাম্পান ওয়ালা’ গানটি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। “সাম্পান মাঝি নিয়ে জনপ্রিয় গানগুলোর বেশিরভাগ লিখেছেন মোহাম্মদ নাসির, অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, মোহন লাল দাশ, কবিয়াল ইয়কুব আলী, এম এন আখতার, আবদুল গফুর হালী, সঞ্জিত আচার্য, সৈয়দ মহিউদ্দিনের মতো সংগীতজ্ঞরা। শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, সঞ্জিত আচার্য, কান্ত নন্দী, বুলবুল আক্তারসহ নাম না জানা অনেক শিল্পী সাম্পান মাঝির গান গেয়েছেন।“[৫] সাম্পানওয়ালার সাথে এ অঞ্চলের নারীর প্রেমানুভূতি ও নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক সত্যিই অবাক করার মতো। বাবরি চুলের সাম্পানওয়ালার অদম্য সাহস, প্রকৃতির সাথে লড়াইয়ের অফুরান শক্তি আসলেই নারী হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে -

“ও রে সাম্পানওয়ালা-
তুই আমারে করলি দেওয়ানা,
সাম্পানওয়ালার বাবরি চুল
হারি নিল জাতের কুল
সে বিনা মোর পরান বাঁচে না।
কুতুবদিয়া বন্ধুর বাড়ি
বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে নারি
বন্ধু বিনা ঘুম তো আসে না।
বাহার মারি যার গই সাম্পান
ক্ষেণে ভাটি ক্ষেণে উজান
ঝড় তুফানে পরওয়া করে না।”[৬]

বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সঞ্জিত আচার্যের সাম্পান মাঝির গানটি প্রসঙ্গ ক্রমে মনে পড়ে যায়। প্রিয় মানুষের খোঁজে সাম্পান মাঝি যেন কাঙাল হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে আজকে এ-ঘাট তো কালকে ও-ঘাট –

“বাঁশখালী মইশখালী
পাল উড়াইয়া দিলে,
সাম্পান গুরগুরাই টানে
আয় তোরা হন্ হন্ যাবি
কর্ণফুলীর মাঝি আঁই
নিইয়ম ভাটি-উজানে,”[৭]

কবিয়াল এয়াকুব আলী সাম্পান মাঝির বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের শিল্পী শেফালী ঘোষের গাওয়া সেই গানে প্রেম-বিরহের প্রসঙ্গ যেমন ওঠে এসেছে, তেমনি সাম্পান মাঝিদের জীবনের করুণ কথাও জানতে পারা যায় -

“পালে কী রং লাগাইল রে মাঝি
সাম্পানে কী রং লাগাইল
শঙ্খ খালর সাম্পানওয়ালা আঁরে
পাগল বানাইল।”[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাম্পান এখানকার মানুষের যাপিত জীবনের নিত্যসঙ্গী বলেই সাম্পানমাঝি নিয়ে গান ও নাটক লেখা হয়েছে অসংখ্য। তাছাড়া কক্সবাজার এলাকার মাতামুহুরী ও বাঁকখালী নদীর মাঝি নিয়েও লেখা হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী অনেক গান। এই অঞ্চলের বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার এম এ রশিদ কাওয়াল, আহমেদ কবির আজাদ ও সিরাজুল ইসলাম আজাদের গানগুলো বেশ জনপ্রিয়। আহমেদ কবিরের একটি গান -

“কক্সবাজার দইজ্যার চর
তার উয়রদি পার
দইজ্যার কূলত সাম্পান চলে
হত গম গম লার।
বাঁকখালীর মাঝি অভাই সোনাদিয়া বাসা
মুখখান হালা গইরজ্য কিল্লাই
হনে দিলে তাশারে
ওরে বাঁকখালী মাঝি রে।”[৯]

চট্টগ্রামের লোকগানের ধারায় ঐতিহ্যবাহীআধ্যাত্মিক গান হল মাইজভাণ্ডারী গান। মাইজভাণ্ডারী গান বাংলার লোকসংগীতে এক ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। ৭০ ও ৮০-এর দশক ছিল চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডারী গানের স্বর্ণযুগ।

মাইজভাণ্ডারী গানের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারেরও অধিক। যে সকল ভক্ত-কবি মাইজভান্ডারী গান রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন – আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, বজলুল করিম মন্দাকিনী, আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী, রমেশ শীল, মনমোহন দত্ত, আব্দুল গফুর হালী, মহিউদ্দীন ভাণ্ডারী প্রমুখ। তবে লোকগানের এ ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন মাওলানা আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী, কবিয়াল রমেশ শীল ও আবদুল গফুর হালী। কবিয়াল রমেশ শীল প্রায় তিন শতাধিক মাইজভাণ্ডারী গান রচনা করেন। তাঁর একটি মাইজভাণ্ডারী গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে যা মানুষের মুখে মুখে আজও ফেরে -

“চল রে মন ত্বরাই যাই, বিলম্বের আর সময় নাই
গাউলছুল আজম মাইজভাণ্ডারী স্কুল খুলেছে।
আবাল বৃদ্ধ নরনারী, করে সবে হুরাহুরি
নাম করে রেজিষ্টারী ভর্তি হইতেছে।
সেই স্কুলের এমনি ধারা, বিচার নাই জোয়ান বুড়া
ছিনায় ছিনায় লিখা পড়া শিক্ষা দিতেছে।
মাষ্টার ও মাহিনা ছাড়া, এলমে লদুনী পড়া
কাগজ কালি দোয়াত কলম কি দরকার আছে?”[১০]

হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতে খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) তাঁর চিশতীয়া তরিকায় সামা’কে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এক বৈপ্লবিক সংস্কৃতির রূপান্তর সাধিত হয় এই ভারতবর্ষে। মাইজভাণ্ডারী গানের উদ্ভবপর্বের গানগুলো সাধন সংগীত হিসেবে সামা মাহফিলে গীত হত, যা ভক্তদের আধ্যাত্মিক জিকির হিসেবে গণ্য হত। মাওলানা হাদীর উদ্ভব-পর্বের একটি গান -

“দমে দমে জপরে মন-লা এলাহা ইল্লাল্লা,
ঘটে ঘটে আছে জারি লা এলাহা-ইল্লাল্লা।
ঘাটের সারেঙ্গী বিছে প্রেম রতনের তার লাগাইছে,
মাওলাজির নাম জপে লা এলাহা ইল্লাল্লা।
সপ্তরঙ্গী টপি বিছে রুহধন কামিনী নাচে,
প্রেমেতে বিভোর জপ লা ইলাহা ইল্লাল্লা।”[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে আঠারো শতকের দিকে কবিগানের আবির্ভাব হয়। যাঁরা কবিগান রচনা করতেন তাঁদেরকে কবিওয়ালা/ কবিয়াল বলা হয়। কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হলেও কবিগান মৌলিক এবং অলিখিত লোকাঙ্গিক গানের ধারা। কবিগানের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবিগানের প্রাচীনতম কবি ছিলেন কবি গোঁজলা গুঁই। এছাড়া ভোলাময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, নিধু বাবু ও দাশরথি রায় কবিয়াল হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। চট্টগ্রামে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিগানের চর্চা ব্যাপক লক্ষ করা যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রগতিশীল বাম পন্থীদের উদ্যোগে চট্টগ্রামেই প্রথম কবিয়ালদের সংগঠিত করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবিয়াল গঙ্গাচরণ জলদাস, সুবল ভট্ট, নবীন ঠাকুর, আজগর আলী, মোহন বাঁশি ও হরকুমার শীল চট্টগ্রামে কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কবিগানে আধুনিক চিন্তা ও জাতীয়তাবোধের সম্মিলন ঘটানোর জন্য ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রমেশ শীলকে সভাপতি ও ফণী বড়ুয়াকে সম্পাদক করে ‘চট্টগ্রাম কবি সমিতি’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। চট্টগ্রামে কবিয়াল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম রমেশ শীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমাজবাদী মানুষ কবিয়াল রমেশি শীল গাইলেন -

“দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখানে লোক জাগিল না কেনে।
দিন মজুর ঘরজা যারা, গত সন মরেছে তারা
ঘরের ছানি দিব কেমনে,
মরে গিয়েও যারা আছে তারাও মরতে বসেছে
অনাহার আর রোগের পীড়নে।
দুইবেলা কেহ খায়না, কেহ কারো পানে চায় না
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুর গনে।”[১২]

চট্টগ্রামে কবিগানে রমেশ শীলের পরেই যাঁর নাম অনিবার্যভাবে ওঠে আসে মণীন্দ্র দাসের নাম। সরকার মণীন্দ্র দাস ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ওপর রচনা করেন ‘১৯৪৩ সনের কবিতা’ নামক কবিগানের একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ নিম্নরূপ-

“১৯৪৩ সনে খাদ্য সঙ্কট হইল
চট্টগ্রামে নরনারী দুই লক্ষ মইলা।
অন্নবিনা পাইয়া কষ্ট অনেকে হয় জাতি ভ্রষ্ট
সতীর সতীত্ব নষ্ট পেটের দায়ে হইল।
মা ছেলে লইয়া কোলে রাস্তায় নিয়ে দিল ফেলে
নিজে মরে ডুবি জলে প্রাণের মায়া গেল।”[১৩]

পালাগান বলতে কাহিনীমূলক লোকগীতিকে বোঝায়। পালাগান প্রধানত পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানভাগ নিয়ে রচিত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পৌরাণিক পালাগান: মান, মাথুর, নৌকাবিলাস, কালীয়দম, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি। চন্দ্রাবতী, মহুয়া, মলুয়া, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, দস্যু কেরামের পালা, ভেলুয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আখ্যানমূলক পালাগান। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালাগানেরও আঙ্গিক এবং বিষয়গত পরিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক ও দেব-দেবীর কাহিনীর পরিবর্তে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা নিয়েও পালাগান রচিত হয়েছে। চট্টগ্রামের সাহিত্যিক আশুতোষ চৌধুরী ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ৭৬টি পালাগান সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ৯টি পালা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ নামের পালা সংকলনে স্থান পায়।

পালাগনের পদকর্তাকে বলা হয় পদকর্তা বা অধিকারী। পালাগানে একজন মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন। তিনি দোহারদের সহযোগে গান পরিবেশন করেন। চট্টগ্রামের পালাগানের গায়কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - সেকান্দার বাইন, অলিয়র রহমান, অজু পাগল, ওমর বৈদ্য, হায়দার আলী, বেলায়েত আলী প্রমুখ। চট্টগ্রামে লোকপ্রিয় অনেক পালা-কাহিনী

প্রচলিত ছিল। 'ভেলুয়া-আমির সওদাগর', 'কমল সওদাগর', 'মলকা-মনু', 'কাফনচোরা ডাকু মনসুর', 'নসর মালুম ও আমিনা সুন্দরী', 'নুরুন্নেহা ও কবরের কথা' ইত্যাদি এখানকার বিশিষ্ট পালা। 'নেজাম ডাকাতের পালা' আশুতোষ চৌধুরী লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর খুব সম্ভবত প্রথম সংগ্রহ। পালাটি তিনি বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত অল্লাগ্রাম নিবাসী সদর আলী গায়েনের নিকট হতে সংগ্রহ করেন। এটি রচিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক নেজাম ডাকাতকে উপজীব্য করে। পালাটির অংশ বিশেষ -

"ফকির কহিল তুমি কর এক কাম,
ঘরে তোমার মা জননী স্তিরী পুত্র আছে।
এই টাকা লইয়া তুমি যাও তারার কাছে,
রুজি করিয়াছ টাকা অনেক মানুষ কাড়ি।"[১৪]

'হঁঅলা গান' চট্টগ্রামের লোকগানের একটি প্রাচীন ধারা। চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে বিয়ে-শাদি, খৎনা, মেয়েদের কর্ণছেদন উপলক্ষে মহিলারা নেচে নেচে একক বা দলবদ্ধভাবে এ গান পরিবেশন করে। তারাই এ গানের রচয়িতা, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাৎক্ষণিক মুখে মুখে এ গান পরিবেশন করে। হঁঅলা সংগীতে নারী মনের ভাবাবেগজাত কামনা-বাসনা প্রকাশ পায়। চট্টগ্রামের লোকগানে 'পরীবানুর হঁঅলা', 'মলকা-মনুর হঁঅলা' নামে দু'টি বিখ্যাত হঁঅলা প্রচলিত আছে। পরীবানুর হঁঅলা -

"সাইগরে ডুবালি পরীরে,
হায়! হায় দুখে মরিরে,
বার বাংলার বাদশা সুজা রাজ্যের শেষ নাই
বাপের দিন্যা তক্তের লাগি করিল লড়াই
মার পেডর ভাইরে হৈল কাল পরানের বৈরীরে।
...
নসিবের লেখা কভু না যায় খণ্ডন
চাডিগাঁ ছাড়িতে বাদশা করিল মনন,
দক্ষিণ মিক্যা আইল তারা হাতির পিটে চড়িরে,
সাইগরে ডুবালি পরীরে।"[১৫]

'রঙ্গুম রঙ্গিলা' চট্টগ্রামের লোকগানের একটি স্বতন্ত্র ধারা। মায়ানমারের বর্তমান রাজধানী ইয়াঙ্গুনকে চট্টগ্রামের মানুষ 'রঙ্গুম', 'রেঙ্গুন' বলতো। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানে রেঙ্গুনের প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে ওঠে এসেছে। চট্টগ্রামের লোকজন জীবিকার অন্বেষণে গিয়ে রেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থানে চাকরি করতো। বর্মী মেয়েদের একধরনের আকর্ষণীয় নাচ 'পোনার নাচে'র প্রেমে পড়ে কেউ সেখানে বিয়ে করে ফেলত। ভুলে যেত মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানকে। রেঙ্গুন প্রবাসী পতির বিরহে চট্টগ্রামের নববধূদের বিরহ-গাঁথা লোক মুখে মুখে গীত হত -

"রঙ্গুম রঙ্গিলারে...
রঙ্গুম রঙ্গিলার সনে
মজি হইল মন,
এই মতে 'দেবানা' হইয়া
রইল কতজন।
রঙ্গুম রঙ্গিলারে।"[১৬]

এ ধারার গানের মধ্যে আবদুল গফুর হালীর 'ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাওরে' গানটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই একটি গানেই তৎকালীন সামাজিক চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠেছে। আবদুল গফুর হালীর দাদা সলিম উদ্দিন রেঙ্গুন গিয়ে আর ফিরে আসেননি। দাদির বিরহী হৃদয়ের জীবন-বাস্তবতার নিরিখে এই গানটি রচনা করেন -

"ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাওরে
কনে খাইব রেঙ্গুনের কামাই রে,
ও শ্যাম শ্যাম রে
রেঙ্গুনের রেশমি শাড়ি
ন পিন্দিয়োম মুই অবলা নারী রে।
ও শ্যাম রে
ঘরত আছে শীতল পাটি
সুখে রাইখ্যম টাঙায়া মশারি রে।
ও শ্যাম শ্যাম রে
এক মাসের লাই রেঙ্গুন যাইবা-
আর কোনদিন ফিরি ন আইবা রে।
ও শ্যাম শ্যাম রে
রেঙ্গুন যাইব নৌকার চড়ি
ফিরি আইসতে আইসতে
আঁই যাইয়ম গই মরি রে।"[১৭]

'হাতি খেদা' গান চট্টগ্রামের ব্যতিক্রমধর্মী লোকগান। পাহাড় জঙ্গলবেষ্টিত চট্টগ্রামে যখন অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধান পাকতে শুরু করে তখন বন্যহাতি লোকালয়ে ঢুকে কৃষকের ফসল, ঘর-বাড়ি নষ্ট করে। হাতি খেদা গানে লোককবিদের দক্ষতা অবাক করার মত। হাতির চরিত্র, আবাসস্থল, চেহারা গতিবিধির যে শৈল্পিক এবং হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা তাঁদের গানে রয়েছে তা লোককবি হিসেবে তাঁদেরই দক্ষতারই পরিচায়ক -

"শুন আচানক কাণ্ড হাতির চরিত্র
এত বড়ো জানোয়ার নাই পৃথিবীতে।
হাতির ঠ্যাং দেখিতে যেমন গুদামের থম
মুড়ার পথত লাগৎ পাইলে হাতি মাইনসের যম।
ডঅর ডঅর কান যেমন দুইয়ান কুলা।
দাতাল হাতির দাঁত দুউয়া মাঘ মাইস্যা মুলা।
ডেঁকির সমান ছোড়তা তার মাথা সদাই হেট
ছোড ছোড চোখ হাতির ডোলর মতন পেট।
কে বুঝিতে পারে ভাইরে হোদার কেরামত॥"[১৮]

'গরু দাগান্যা'র গান হল চট্টগ্রামের লোকগানের আরেক স্বতন্ত্র ধারা। রোগাক্রান্ত গরুর চিকিৎসার জন্য একসময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরুর ডাক্তাররা উপস্থিত হতেন। চট্টগ্রামের ভাষায় এদেরকে 'গরু দাগান্যা' বলা হয়। এমনই একজন গরু দাগান্যা আনোয়ারা উপজেলার সোনাইয়া গোয়াইল্যা। তাঁর একটি গান -

"লাগ লাগ লাগ,
তোরে দাগাইলাম জট করি,
তোর রোগ যাইব চট করি।
সোনাইয়া গোয়াইল্যার দাগ,
বন্দে বন্দে লাগ॥"[১৯]

চট্টগ্রামের লোকায়ত জীবনে খরা বা অনাবৃষ্টির ফলে 'বৃষ্টি ডাকার গানে'র উদ্ভব হয় কৃষিভিত্তিক জনপদে। দলবদ্ধ হয়ে ঘরে-ঘরে গিয়ে চাউল তুলতো, আর এই গান সম্মিলিতভাবে গাইতো। বৃষ্টি ডাকার গানের নমুনা -

"আয়রে মেঘনী
ঠেং দুই দুই ফেলা পানি,
কেলা তুলে এক আঁড়ু পানি।
কচুতলে এক গলা পানি
বিবি ফাতেমা খোঁজে পানি
আল্লা তুই দেরে পানি।"[২০]

আবার অতিবৃষ্টি হলে কৃষকেরা রোদের প্রার্থনা করে 'রোদ ডাকার গান' নামে এক ধরনের গানের উদ্ভব করেন। তা নিম্নরূপ-

"রৈতারে রৈধানি, চাঁদার মারে পুতনী,
চাঁদার উর বৈলফুল
ছির ছিরিয়া রৈত উঠ্॥"[২১]

লোকাঙ্গিক সুরে গীত হওয়া 'ঘুম পাড়ানি' ও 'ছেলে ভুলানো' ছড়া চট্টগ্রামের লোকগানকে ভিন্নতা দান করেছে। ঘুম পাড়ানি ও ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির কেন্দ্রে রয়েছে শিশু। ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ঘুম পাড়ানি ছড়া শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। সেকালে সন্তানেরা ঘুমাতে চাইত না বলে মায়েরা সুরে সুরে এসব ছড়া কাটত। বৃহত্তম অর্থে ঘুম পাড়ানি ছড়াগুলি ছেলে ভুলানো ছড়ার অন্তর্গত হলেও শিশুদের ভোজন, শয়ন, বিশ্রাম, কান্না ইত্যাদি নানা কিছু ছেলে ভুলানো ছড়ার অন্তর্গত। একটি ছেলে ভুলানো ছড়ার অংশবিশেষ নিম্নরূপ -

"ঘুম যারে দুধের বাছা
ঘুম যারে তুই
ঘুমরতন উড়িলে বাছা
লই বেরাইয়ম মুই।
সোনার দিয়ম ঢুলইন কোঁডা
রূপার দিয়ম দড়ি
ঢুলইনের বাইর কাইর দি
ঝর পড়েরলে ফোযা ফোডা
বাইরে ভিজের লাই –
দুধের বাছা ঘুম যাদ্দে
সোনার ঢুলইন পাই।"[২২]

বর্তমান সময়ে নানা অসঙ্গতিগুলোকে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়কে ব্যতিক্রম ও রসপূর্ণ ভাষায় যে গানে তুলে ধরা হয় চট্টগ্রামের লোকগানে 'উল্টা বাউলের গান' বলে। এরকম একটি গান -

"আসিল কলির গীত
শুনো ভাই উলটা গীত
উলটা বাবুলের গীত হুনো॥
ওরে জোন পহরগ্যা ধান পুয়াত দি
পাতিলাৎ দিছে বাড়া।
বিলাইরে মাছ কুডাৎ দি
বউয়ে বেড়ায় পাড়া রে॥
উলটা বাবুলের এমন ধারা।"[২৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চট্টগ্রামের পল্লি অঞ্চল বন-অরণ্যে সমৃদ্ধ। বনে গাছ কাটা ও চিরানোর জন্য শ্রমিকরা একধরনের শক্তিসঞ্চারী গান গায়, যা 'শ্রমিকদের গান' নামে পরিচিত। শ্রমিকদের গানের নমুনা -

"হে'রে হেঁইয়া
আরও জোরে -হেঁইয়া
আড়াইত্যা বাড়া -হেঁইয়া
কল্লা তোল -হেঁইয়া
আল্লারে আল্লা -হেঁইয়া
আল্লা-রাসুল -হেঁইয়া
জিন্দাগাজী -হেঁইয়া
হযরত আলী -হেইয়া।"[২৪]

চট্টগ্রামের জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার সময়, মাছ ধরে আসার সময়, নদীর পাড়ে জাল বুননের সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের প্রাণে একধরনের গান জাগে। জেলেদের মুখে এই গান 'জেলেদের গান' নামে পরিচিত। নদীর জলে-সাগরের বুকে-ঢেউয়ের তালে তালে তারা এগান করে। জেলেদের মুখে গীত হওয়া একটি গান নিম্নরূপ -

"পুষমাইস্যা শীতের কাল
হাচুঁরি বাইলাম ঢেঁইয়া জাল,
জালে বাজিল ইছা, বাইলা
কোড়াল আর বোয়াল।
কাঁইচার মুখ ডুবারে
এণ্ডে আছে মাছের ঘর
হরাহরি পরিগেল
ছিড়ি যারগোই জাল,
কুতুবদিয়ার উত্তর কোনত
তাইল্যা ফাইস্যা জাগদি থাকে
লড়া পাইলে এ-ক্কাই বারে
ফলর উর ফাল।"[২৫]

ভাটিয়ালি গানকে উত্তর চট্টগ্রামের লোকেরা 'হালদাফাডা গান' বলে। হালদা নদীতে মাঝিরা দাঁড় বেয়ে যাওয়ার সময় এগান গেয়ে থাকে। হালদাফাডা গান একেবারে চট্টগ্রামের নিজস্ব সম্পদ যেখানে সামাজিক পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে -

"মরা বাঘে খওক বন্ধুরে হুয়ানা আলৎ ডুবক
নরম নরম জহিৎ কদু বন্ধে ফুডি মরুক
বন্ধে ভাইরাল রে
নাক ফুল দিয়া কইলা বন্ধু রূপে যে অতুল
বাত্তি জ্বালাই চাইলাম হায় রে বরই গাছের ফুল
বন্ধে ভাইরাল রে"[২৬]

'ফুলপাঠ গান' চট্টগ্রামের ডোম ও জেলেদের নিজস্ব সৃষ্টি। ফুলপাঠ গানের মূল আকর্ষণ হল নাচ আর গান। হিন্দুদের মধ্যে কারও সন্তান-সন্ততি না হলে, তার কোলজুড়ে সন্তান আসার জন্য এ-গান মানত করা হত। এ গানের অংশবিশেষ -

"এক মাসের কালে যাদু গোপনে রাখিল,
দুই মাসের কালে যাদু রক্ত গোলা গোলা,
তিন মাসের কালে যাদু তিন উদর অঙ্গুরী,

চারি মাসের কালে যাদু হাড়ে মাংস জোড়া,
পাঁচ মাসের কালে যাদু পঞ্চফুল ফুটিল,
ছয় মাসের কালে যাদু উলটে পুলটে,
সাত মাসের কালে যাদু সাত করইয়া খায়,
অষ্ট মাসের কালে যাদু মোকাম হয়,
নয় মাসের কালে যাদু নব দন্ডতিথি,
দশ মাসের কালে যাদু উদরে বসতি,
দশ মাস দশ দিন যেদিন পূর্ণ হইল,
উঃহু মাঁহু করি যাদু কাঁদিতে লাগিল।"[২৭]

সারিগানকে চট্টগ্রামের লোকেরা হাইল্যা সাইর বলে। চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় হাইল্যা সাইরকে পাইন্যা সাইর বলে আখ্যায়িত করে। আবার কোথাও কোথাও কৃষকের গান বলতে শুনা যায়। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে ধানের চারা রোপণের সময় দলবদ্ধ হয়ে এ গান পরিবেশন করে। দু'দলে বিভক্ত হয়ে এগান পরিবেশন হয় বলে দল দুটোতে একজন করে মূল গায়ক বা কবিয়াল থাকে। দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাদের গানের সুরে ওঠে এসেছে এভাবে -

"ওরে পশ্চিম সিপাই
তেরজুরি মারি যারগই রঙ বাত্তি জ্বালাই॥
সাথে লইয়া হাতি, ঘোড়া, কামান, বন্দুক যত
সোনা চান্দি টেঁয়া পয়সা লইয়ে শত শত॥
বিটিশের ফাইজলামি হই গেইয়ে শেষ
পাড়া পড়শী মনে গরের স্বাধীন অইয়ে দেশ॥"[২৮]

মাইজভাণ্ডারী গানের উদ্ভবের আগে চট্টগ্রামের মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা বৈষ্ণব পালার ঢঙে অসংখ্য মারফতি গান রচনা করেন। মারফতি গানের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির স্তুতি ও রহস্য প্রকাশ করা হয়। এ ধারায় মারফতি গানের উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হলেন আনোয়ারা থাকার ওষখাইন গ্রামের সাধক কবি আলী রজা ওরফে কানু ফকির। তিনি তিনশোর অধিক মারফতি গান রচনা করেন -

"আলো ভবের মাঝে রে
কানুর মন মজিলরে
চল কানু এবে দেশে যাই॥
কোথায় আছিলা মন, কোথায় তোমার সিংহাসন
কোথায় থাকি দিলা দরশন
দরশন দিয়ারে, কোথায় ছাপাই রইলা রে, অ সাধু ভাই
অকূল দরিয়ার মাঝে ভাসাইলা রে॥"[২৯]

'গাজির গান' চট্টগ্রামের মানুষের লোকবিশ্বাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ছিল। তাদের বিশ্বাস গাজি এক গায়েবি পীর। ধর্মযুদ্ধে যারা লড়াই করে বীরত্ব দেখায় তারা গাজি, তাই গাজির গান বীরত্বব্যঞ্জক গান। এতে লড়াইয়ের বর্ণনা, শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণিত। গাজির গানে গাজির কীর্তিগাথা, পরাজিত হিন্দুর ইসলাম গ্রহণ, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু মেয়ের বিয়ে কিংবা ডাকাতের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী বা নানা উপকথা প্রভৃতি বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামের মানুষের কাছে গাজির গান এলাকাভেদে গাইনের তামাশা, গাইনের পালা নামে সুপরিচিত ছিল। চট্টগ্রামের প্রচলিত একটি গাজির গানের কিছু অংশ নিম্নরূপ-

"সারাদিন যে যুদ্ধ হইল মগ-মুসলমানে
বেলার শেষে কালো মেঘ উড়ে হাইড়া কোনে॥

ধীরে ধীরে সেই মেঘ আসমান ছাইল।
ঝাপটাইয়া তুফান এক উত্তর থনে আইল॥
বেবান সাগরে তখন হৈল বিষম হাল।
চাইর দিকতুন ডাক পৈল সামাল সামাল।
উপরে উঠিছে ঢেউ আকাশ বরাবর
নীচের দিকে পড়ে যেন পাতালের ভিতর॥"[৩০]

উল্লিখিত ধারাগুলো ছাড়াও চট্টগ্রামের আরো কিছু ধারার প্রবহমানতা ছিল। চট্টগ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে 'কীর্তন' নামে এক ধরনের ধর্মীয় গানের প্রচলন যেমন ছিল ঠিক তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল কাওয়ালি, গজল, হামদ্ নাত্, মুর্শিদি ইত্যাদি। এধরনের গানগুলো 'ভক্তিগীতি', 'ভাবের গান', 'আধ্যাত্মিক গান' নামে পরিচিত ছিল। নব্বই দশকের সূচনালগ্নে মাজার কেন্দ্রিক 'মোহছেন আউলিয়ার গানে'র ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া চট্টগ্রামের মাজারগুলো ভিক্ষুকদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব মাজারগুলোতে তারা এককভাবে বা দলবেঁধে গান গেয়ে ভিক্ষা করে যা 'ভিক্ষুকের গান' কিংবা 'ফকিরের গান' নামে পরিচিত।

Reference:

১. সাদী, মোহাম্মদ শেখ, চট্টগ্রামের লোকগান লোককবি: ভাবসাধনার বৈচিত্র্য-সন্ধান, নন্দন বইঘর, চট্টগ্রাম, ২০২০, পৃ. ২৮
২. ঘোষ, কল্যাণী, (সংকলন ও সম্পাদনা), চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৮
৩. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৭৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৫. সাদী, মোহাম্মদ শেখ, চট্টগ্রামের লোকগান লোককবি: ভাবসাধনার বৈচিত্র্য-সন্ধান, নন্দন বইঘর, চট্টগ্রাম, ২০২০, পৃ. ২৮
৬. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৬৯
৭. হায়দার, নাসির উদ্দিন (সম্পাদিত), আবদুল গফুর হালী'র চাটগাঁইয়া নাটক সমগ্র, সুফী মিজান ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, ২০১৫, পৃ. ৮৮
৮. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৬৩
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
১০. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৩২৯
১১. জাহাঙ্গীর, ড. সেলিম (সম্পাদিত), রমেশ শীল: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র, আলোকধারা বুকস, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৩৩২
১২. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৩৬৯
১৩. আরেফিন, শামসুল, বাংলাদেশের লোককবি ও লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড), বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০০৭, পৃ. ২৬
১৪. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৫৫
১৫. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৯৩
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
১৭. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৫৭-৫৮
১৮. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ২২৯
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
২৬. আলম, ওহীদুল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৫
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২৮. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৩৯০
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 675 - 680
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আব্বাসউদ্দীনের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী সঙ্গীত তথা গজল-চর্চা

ড. মিনাল আলি মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়
Email ID : minal87011@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Dimension, Islamic Song, Unique, lyricist, expression etc.

Abstract
Music is the expression of human heart. But music heart is song. The song has expressed the happiness, sorrow and joy of people in the world. Many songwriters and singer do having created variety dimension of song. The name of Nazrul Islam has to mention in the discussion of the song in Bengal. He is one of the lyricists in Bengali song. Classical song, Shyama Sangeet, patriotic and Islamic songs his own a unique creation of the traditional song in Bengal. Actually, Nazrul was humanity poet and writer. He did establishment of human harmony in religious structure. His self-glory by experimenting with themes like leto songs, Arabic-Persian and mythical. He has come in contact with many talented people; Abbas Uddin Ahmed is one of them. As Abbas Uddin got the opportunity to record music by Nazrul's hand, Nazrul Islam devoted himself to the practice of Islamic music at his request. Due to the combined efforts of the two, Islamic music and Gazal's are still heard in Muslim festivals, events and entertainment.

Discussion

বাংলা ক্লাসিক সংগীতচর্চায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। নজরুল ইসলাম সহজাত প্রতিভা ও হৃদয়ের আকুতি থেকেই গুলবাগিচায় বুলবুল সৃষ্টি করেছেন — 'নজরুলগীতি' বিশ্ব। বিভিন্ন রাগ-বিষয় ও দেশি-বিদেশী সুর সমাহারে তাঁর গীতিবিশ্ব রকমারি পাপড়ির মতোই সুন্দর। হৃদয়-প্রেমে, স্বদেশভূমির মহিমা কীর্তনে, মায়ের মহিমা অনুধাবনে শ্যামা পূজায়, আর জাহেলিয়াত যুগের অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী নবী হজরত মহম্মদের আত্মত্যাগের স্বরূপকে স্মরণ করে— বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির অপার বিস্ময়কে তুলে ধরেছেন তাঁর গীতিমালায়। প্রসঙ্গত শ্রী নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন—'সঙ্গীতে তিনি দেশপ্রেম, যৌনচেতনা, প্রেম, ভক্তি, নিসর্গ প্রীতি, নারীর মর্যাদায় বিশ্বাস, গণমুক্তির প্রতি আস্থা প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে বাণীর মাধুর্যের উপর অতিরিক্ত একটি গুণ আরোপিত হয়েছে— সুর-সৌন্দর্য।'[১] এমনি এক বিরল সৃষ্টিশীল প্রতিভা নজরুল ইসলাম। বটবৃক্ষের মতো একদল তরুণ-তরুণীকে গীতিকার হয়ে ওঠার রশদ যুগিয়েছিলেন তিনি। আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, মোহিনী চৌধুরী,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আঙুরবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবী প্রমুখ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সবার কাছে তিনি কাজী সাহের থেকে হয়ে ওঠেন 'কাজীদা'। শত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে আব্বাস উদ্দিনের অনুরোধ কিংবা এক প্রকার পীড়াপীড়িতে নজরুল ইসলামের ইসলামী গানের চর্চা ও জনপ্রিয়তা অর্জন।

বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও ভাওয়াইয়া গানের সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমেদ (১৯০১-১৯৫৯)। বয়সের দিক থেকে তিনি নজরুলের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম বলরামপুরে অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা জাফর আলি আহমেদ পেশায় উকিল। পিতার ইচ্ছা ছিল আব্বাস পড়াশুনা করে ব্যারিস্টার হবেন। কিন্তু গান ও যাত্রা-অভিনয়ের প্রতি আব্বাসের ছিল গভীর ঝোঁক। সহজাত প্রতিভার মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিতা অভিযোগের সুরে বলেছিলেন—'ছেলে হয়ত ভবিষ্যতে গাইয়ে হবে।'[২] পড়াশুনার সঙ্গেই চলছিল তাঁর গানের চর্চা। ফাঁকা পরিবেশ পেলেই আব্বাস উদার কণ্ঠে গান গাইতেন। কোচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ বর্তমানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে বি. এ. পড়ার সময়ে কোচবিহারের সুনীল রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া প্রমুখ ভাওয়াইয়া শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কলেজে পড়ার সময় মিলাদ্ উপলক্ষ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই অনুষ্ঠানে গানের সূত্রধরেই আব্বাসের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়। আব্বাসউদ্দীন লিখেছেন —

> "কুচবিহার কলেজের ছাত্র আমি, স্কুল-কলেজ মিলে প্রতি বৎসর মিলাদ্ করতাম। সেই মিলাদ্ মহফিলে কবিকে আমন্ত্রণ-করি। সেই থেকে পরিচয়ের সূত্রপাত। তিনি আমার গান শুনে আমাকে উৎসাহ দিলেন, বললেন, 'সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ, কলকাতায় চলো, তোমার গান রেকর্ড করা হবে।"[৩]

এই অল্প পরিচয়ে আব্বাস হয়ে উঠেন নজরুল অনুরাগী। একবার শুনেছেন নজরুল দার্জিলিং আসছে গান করতে। তিনিও অনুষ্ঠানের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হন। ভরা অনুষ্ঠানে কবি নজরুল আব্বাসকে মঞ্চে ডাকেন এবং উপস্থিত দর্শকদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন —

> "এক নতুন শিল্পীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি— শ্রীমান আব্বাসউদ্দীন।"[৪]

মঞ্চে আব্বাস নজরুলের ও নেপালি গান করেছেন। নজরুলের আহ্বানে আব্বাস কলকাতায় যান বন্ধু জীতেন মৈত্রের বিয়ে উপলক্ষ্যে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে অধ্যাপক বিমলদাস গুপ্তের সহযোগিতায় ১৯৩০ সালে আব্বাসের প্রথম গান রেকর্ড হয়। প্রথম গানের রেকর্ড প্রসঙ্গে আব্বাসউদ্দীন বলেছেন —

> "বিমলদা, রেকর্ডে আমার গান দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন? বললেন, 'গাও দেখি একখানা গান।' আমি গাইলাম কাজীদার 'কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল করবে লোপাট।"[৫]

গান শুনে তিনি মুগ্ধ হন। আমার ঠিকানায় চিঠি পাঠাবেন বলে কথা দেন। তার সাতদিন পরেই আব্বাস উদ্দিন চিঠি পান। প্রথম রেকর্ডে তিনি দুটি গান করার সুযোগ পান। প্রথমটি হল — 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়া' এই গানটির সুর দিয়েছিলেন শৈলেন রায় ও আব্বাসউদ্দীন নিজেই। দ্বিতীয় হল— 'কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো।' গানটির সুর দিয়েছিলেন ধীরেন দাস। গান রেকর্ড ও কলকাতায় থাকার সুবাদে নজরুলের সঙ্গে আব্বাসের সখ্যতা আরও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কাজী নজরুল ইসলাম কাব্য-সাহিত্যে সঙ্গে গানের ক্ষেত্রেও পরাধীনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করেছেন। সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার কথা বলেছেন। তবুও 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) কাব্যের 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী' ও 'মোহররম' ইত্যাদি কবিতা দেখে তাঁকে অনেকে 'মুসলমান কবি', 'হাবিলদার কবি' ও 'খিলাফতের' কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। অপরদিকে শ্যামাসঙ্গীত রচনার জন্য নজরুল মুসলিমদের কাছে হয়েছেন চক্ষুশূল। কিন্তু তিনি কোনো কথাই কানে তোলেন নি, শুধু জারী রেখেছেন নিজ সাধনা-সংগ্রাম। মাত্র কুড়ি-বাইশ বছরের সাহিত্য সাধনায় অসংখ্য গান রচনা করেছেন। গবেষকদের গবেষণা মতে তাঁর গানের সংখ্যা ৩১৩৯টি, অনেকের মতে আরও বেশি। নজরুল কীর্তন, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, মুর্শিদী, বাউল, রামপ্রসাদী, ঠুংরী, গজল, ধ্রুপদী, তোড়ী, জৈনপুরী,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভৈরবী, আশাবরী, পিলু, খাম্বাজ, বেহালা, ছায়ানট, ভূপালি প্রভৃতি লোকগীতি, দেশি-বিদেশী বহু রাগরাগিণীর সুরে তিনি গান লিখেছেন। প্রথাগত ভাবে কোনো গুরুর কাছে তাঁর গান শেখার সৌভাগ্য না হলেও 'লেটোদল' হয়ে উঠেছে তাঁর গান চর্চার প্রথম ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে আজাহার উদ্দিনখান বলেছেন –

> "তাঁর সময় যে 'লেটোদল' ছিল তাঁদেরই সাহায্যে তাঁর গান সাধনা শুরু হয়েছিল— তাঁদের দলে থেকেই গান ও যন্ত্র ও সংগীত দক্ষতা লাভ করেন, গীত, রচনার হাতে খড়ি হয় তাঁদের দলে ভিড়েই।"[৬]

এছাড়াই তিনি বিভিন্ন সময়ে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খান, ওস্তাদ দবিরখান, ওস্তাদ কাদের বক্স, সতীত কাঞ্জিলাল, মঞ্জুসাহেব, মাস্তান গামা, সুরেশচন্দ্র চক্রব্রতী ও আব্দুস সালাম প্রমুখ সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এবং নিজ সাধনায় তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আজাহার উদ্দীনখান নজরুলগীতিকে চারটি ভাগেভাগ করেছেন— ক) দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, খ) গজল বা প্রেমসঙ্গীত, গ) শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান, ঘ) হাসির গান। নজরুল স্বদেশপ্রেমী। বিপ্লবী। পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। তিনি জনমানসে বিপ্লবী উদ্দীপনা জাগাতে সময় সচেতন গান রচনা করেছেন। যেমন— 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার', 'জাগো নারী বহ্নি শিখা', 'আজি রক্ত নিশাভোরে একি শুনি ওরে', ইত্যাদি গান আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতিস্পর্ধী করে তোলে। উর্দু গজলের অনুকরণে বাংলায় গজল সঙ্গীতের প্রচলন উনিশ শতক থেকে শুরু হলেও নজরুলের হাত ধরে আসে নতুন সুর-ঢঙ ও রঙ। দেশীয় খেয়ালি ঠুংরি টপ্পার সঙ্গে বিদেশী পারসীয় গজলের রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে নজরুল গজল - প্রেমসঙ্গীতকে বাঙালি ঘরানায় উপস্থাপন করেছেন। যেমন— 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল', 'দাঁড়ায়ে দুয়ারে কে তুমি ভিখারিণী', 'মুসাফির মোছরে আঁখি জল', 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়', ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত প্রেমের গান। তাঁর ব্যতিক্রমী সংগীতচর্চা হল শ্যামাসঙ্গীত। এই শ্রেণির কিছু গানে ভাব-ভক্তির সঙ্গে বাস্তব জীবন সমস্যার যেমন উঠে এসেছে তেমনি কিছু গান আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হয়েছে। যেমন— 'বলরে জবা বল—কোন্ সাধনায় পেলি তুই শ্যাম মায়ের চরণ তল,' 'কালো মায়ের পায়ের তলায়, খেলছি এ বিশ্ব লয়ে,' 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী', ইত্যাদি। শ্যামসঙ্গীত রচনায় নজরুল যতটাই উৎসাহী ছিলেন ইসলামী গানের ক্ষেত্রে ততটাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। এমন সময়ে আব্বাসউদ্দীন আহমেদ নজরুলকে ইসলামী সংগীত রচনার জন্য অনুরোধ করেন। তারপর থেকে শুরু হয় নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত রচনা। এই প্রসঙ্গে আব্বাসউদ্দীন বলেছেন –

> "একদিন কাজিদাকে বললাম, 'কাজিদা, একটা কথা মনে হয়। এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গান, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রী হয়। এই ধরনের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? ...আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার গান।"[৭]

প্রস্তাবটি নজরুলের মনে ধরে এবং তিনি রাজি হয়ে যান।

নজরুল রাজি হলেও ইসলামী রেকর্ডে কিছু সমস্যা ছিল। কারণ গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে ব্যবসাহিক লাভ-ক্ষতির হিসেব আগে। শ্যামাসঙ্গীত রেকর্ড করে তাঁরা যে পরিমাণ লাভ করেছিলেন ব্যবসাহিক স্বার্থে হঠাৎ করে ইসলামী গান রেকর্ডে ছিল তাঁদের আপত্তি। তাই ইসলামী গান রচনার আগে নজরুল আব্বাসউদ্দীনকে গ্রামোফোন কোম্পানির ম্যানেজার ভগবতীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন। দীর্ঘ ছয়মাস ভগবতীবাবু আব্বাসের প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আব্বাস ছিলেন নাছোড়বান্দা। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল ঘরে ভগবতীবাবুকে খোশমেজাজে দেখে আব্বাস সুযোগটাকে কাজে লাগান। বলেছিলেন –

> "যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি। সেই যে বলেছিলাম ইসলামী গান দেবার কথা, আচ্ছা, একটা এক্সপেরিমেন্টই করুণ না, যদি বিক্রী না হয় আর নেবেন না, ক্ষতি কি?"[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেদিন ভগবতীবাবু রাজী না হয়ে পারেননি। আব্বাসকে বলেছিলেন —

"নেহাতই নাছোড়বান্দা আপনি, আচ্ছা আচ্ছা করা যাবে।"[৯]

দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পুরণের পূর্বাভাস পেয়ে আব্বাস ছুটে যান কাজীদার কাছে। কাজীদা তখন ইন্দুবালা দেবীকে গান শেখাচ্ছেন। ভগবতীবাবু ইসলামী গান রেকর্ডে রাজি হয়েছে শুনে তাঁকে ছুটি দেন। আব্বাস কাজীদার জন্য এক ঠোংগা পান ও চা ব্যবস্থা করেন। তার আধঘণ্টার মধ্যে দরজা বন্ধ করে নজরুল ইসলাম লিখে ফেলেন— 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।' গানটি। পরের দিন লেখেন— 'ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।' গান দুটি লেখার চারদিন পরে রেকর্ড হয়। গান দুটি পুরোপুরি মুখস্থ না হওয়ায় রেকর্ডের সময় নজরুল ইসলাম হারমোনিয়ামের উপর রেখে পাণ্ডুলিপিটি ধরেন আর সুমধুর কণ্ঠে গান করেন আব্বাসউদ্দীন। রেকর্ডের দু'মাস পরেই ছিল ঈদ। বাঙালি মুসলমান সমাজ নিজ ধর্ম, নবী, রোজা কেন্দ্রিক গান পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেন। এবং গান দুটিকে কেন্দ্র করে একটা উন্মাদনা শুরু হয়, মুসলমান বাঙালির কণ্ঠ থেকে গুন গুন করে গানের সুর ভেসে আসে। প্রায় দুই হাজারেরও বেশি রেকর্ড বিক্রী হয়েছিল। ঈদের ছুটিতে গ্রামে গঞ্জে গানটি শুনতে আব্বাসউদ্দীন উৎফুল্ল ও আনন্দ অনুভব করেছিলেন। ইসলামী গানের সফল প্রচারে নজরুলও খুশি হন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে নজরুল আব্বাসকে বলেছিলেন— "আব্বাস, তোমার গান কী যে হিট হয়েছে।"[১০] আব্বাসউদ্দীন আহমদ ৩৭টি ইসলামী গান গেয়েছেন।

প্রথম গান দুটি সাফল্যের মুখ দেখায়; ইসলামী গান রচনায় নজরুলের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ইসলামের নবী, নামাজ-রোজা, জাকাত, মক্কা-মদিনা, ইজরাইল, ফাতেহা-দোয়াজদাহাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন।

আল্লাহ্ ও নবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) নিয়ে লিখেছেন —

১. 'আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।
ফলবে ফসল বেচ্‌ব এবার কেয়ামতের হাটে।।...'[১১]
২. 'মোহম্মদ মোর নয়ন-মণি মোহম্মদ নাম জপমালা।
ঐ নামে মিটাই পিয়াস ও নাম কওসারের পিয়ালা।।
মোহম্মদ নাম শিরে ধরি,
মোহম্মদ নাম গলে পরি,
ঐ নামেরি রওশনিতে আঁধার এ মন রয় উজালা।।...'[১২]
৪. 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহম্মদ এলো রে দুনিয়ায়,
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।...[১৩]

ঈদ নিয়ে লিখেছেন —

১. 'ঈদের খুশির তুফানে আজ ভাসলো দো জাহান
এই তুফানে ডুবু ডুবু জমিন ও আসমান।।
ঈদের চাঁদের পানসি ছেড়ে বেহেশ্‌ত হতে
কে পাঠালো এত খুশি দুখের জগতে
শোন ঈদ্‌গাহ হতে ভেসে আসে তাহারি আজান।।...'[১৪]
২. 'এলো রমজানেরই চাঁদ এবার দুনিয়াদারী ভোল
সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোল্।।
এই একমাস রোজা রেখে
পরহেজ থাক গুনাহ্ থেকে
কিয়ামতের নিয়ামত তোর ঝুলি ভরে তোল্।। ...'[১৫]

হজ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন –

১. 'চল্ রে কাবার, জিয়ারতে, চল্ নবীজীর দেশ।
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পর্ রে হাজির বেশ।।
আওকাতে তোর থাকে যদি—আরফাতের ময়দান,
চল্ আরফাতের ময়দান,
এক জামাত হয় যেখানে ভাই নিখিল মুসলমান। ...'[১৬]

মদিনা ও মুসলমান সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন –

'ত্রাণ কর মওলা মদিনার—
উন্মত্ত তোমার গুনাহগার কাঁদে।
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ায়
পড়েছে আবার গোনাহের ফাঁদে।'[১৭]

জাকাত সম্পর্কে কবি লিখেছেন –

'দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দিল্ খুলবে পরে ওরে আগে খুলুক হাত।।
দেখ্ পাক্ কোরান শোন্ নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান। ...'[১৮]

মা ফতেমা ও তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হোসেন সম্পর্কে কবি লিখেছেন –

'ওগো মা— ফতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দিনের শেষে বাতি নিভিয়া যায় মাগো, বুঝি আঁধার হ'ল মদিনা-পুরী।।
কোথায় শেরে খোদা, জুলফিকার কোথা,
কবর ফেঁড়ে এসো কারবালা যথা—
তোমার আওলাদ বিরান হ'ল আজি, নিখিল শোকে মরে ঝুরি।।...'[১৯]

প্রায় একশ বছর পরেও নজরুলের ইসলামী গান সমান ভাবে জনপ্রিয়। ইসলামী গানগুলি বাঙালি মুসলমান সমাজের কাছে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে একাত্ম। গানগুলি রচনায় নজরুলের কৃতিত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অপরদিকে আব্বাস উদ্দিন অনুরোধ বা আবেদনের মাধ্যমে সেদিন নজরুলকে ইসলামী গান রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সে কথাও স্বীকার করতে হয়। গীতিকার ও সুরকার নজরুলের ইসলাম সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও গান রচনার দক্ষতা এবং আব্বাসের সুললিত কণ্ঠস্বর বাংলা গানের ধারায় নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে। শ্যামাসঙ্গীতে হিন্দু সমাজ এবং ইসলামী গান-গজলে মুসলমান সমাজ নিজ ধর্মীয় মহিমাকে উপলব্ধি, প্রতিবেশী সম্প্রদায়কে জানা-বোঝার সুযোগ পায়। ইসলামী গান সূত্র ধরে ফার্সি, উর্দু, তুর্কি ও আরবীয় রাগ-রাগিনীর সঙ্গে পরিচিত হয় সঙ্গীতশিল্পী মহল। আঞ্চলিকতার সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সুর-স্বর ও ভাবের ঢেউ লাগে বাঙালি সঙ্গীত জগতে এবং ভেসে ওঠে নতুন সুরের ডঙ্কা।

Reference:

১. চৌধুরী, নারায়ণ, 'নজরুলের গান', বিশ্বনাথ দে (সম্পা.) 'নজরুল স্মৃতি', সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯৭
২. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ২৪
৩. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'কাজীদার কথা', বিশ্বনাথ দে (সম্পা.) 'নজরুল স্মৃতি', সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০১
৪. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬৪
৬. উদ্দীনখান, আজাহার, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১১৬
৭. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭২
৮. তদেব, পৃ. ৭৩
৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. তদেব, পৃ. ৭৪
১১. কাজী, কল্যাণী, (সম্পা.) 'কাজী নজরুলের গান', সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬৪
১২. তদেব, পৃ. ১৬২
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৭
১৪. তদেব, পৃ. ১২২
১৫. তদেব, পৃ. ৭৪
১৬. তদেব, পৃ. ১২৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৬
১৮. তদেব, পৃ. ১৭১
১৯. তদেব, পৃ. ১৯২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 681 - 688
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লোকসংস্কৃতি ও শ্রেণি-চেতনা

ড. আজাজুল আলি খান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল
Email ID : ajajulaliajajul91@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Folklore, Class-Consciousness, Culture, Class, Historical Dialectic, Religion, Sociology, Social Science, Arunkumar Roy, Marxism, Lokayata.

Abstract
The word 'folk' in folklore has a special meaning. The 'folk' of folklore consists of the common people or more precisely the people of a cohesive society. Folklore cherishes group traditions; But not stagnant. Changes in production systems and social relations affect folk culture. But folk culture has a distinct historical character – which sets it apart from other cultural streams. Folk culture has a universal character – presenting to us a universal pattern of origin, evolution and overall creation of human society. Hence folk culture is called 'folk science'. Civilization is built on the foundation of folk society. The same applies to classic literature. Where is the lump in our folklore studies? It has become necessary to find an answer as to why a collective and spontaneous culture like folklore has gone astray in a tangle of extreme nationalism, religious bigotry, devotion and spirituality without instilling a sense of 'We the people'. I would like to present here a proposal by eminent folklorist Arunkumar Roy on the manner in which folk culture should be practiced. Arunkumar Roy proposed the practice of folk culture in the light of Marxian dialectic and historical materialist consciousness. Beyond religion, gotra, caste, he wants to judge folklore from the point of view of 'class'. So, he goes back to that primitive human society in the judgment of folklore -- to find the link between the present and the future.

Discussion

লোকসংস্কৃতির ‘লোক’ শব্দটি বিশেষ অর্থবাহী। একটি সংহত সমাজের সাধারণ মানুষ বা আরও স্পষ্ট করে বললে লোকায়ত মানুষকে নিয়ে গঠিত লোকসংস্কৃতির ‘লোক’। লোকায়ত অর্থাৎ ‘লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ’ – যা সাধারণ লোকের দর্শন। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এই দর্শন লোকসমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে তার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। লোকসংস্কৃতি গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যলালিত; কিন্তু স্থবির নয়। উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক চরিত্র আছে – যা তাকে অন্যান্য সাংস্কৃতিক জঁর থেকে আলাদা করে দেয়। আজকাল হরেক কিসিমের সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকে গুলিয়ে ফেলার একটা বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ করছি। 'পপুলার কালচার' বা 'মাস কালচার' এবং আরও অন্যান্য পুঁজিবাদী ও বাজার সর্বস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকেও এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে – বিভিন্ন তত্ত্ব খাড়া করে (বিশেষ করে উত্তর-আধুনিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-গঠনবাদ, বিনির্মাণবাদ ইত্যাদি তত্ত্ব) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গবেষণাও করছেন এই বিষয়ে![১] এর বিপজ্জনক ফল হল এতে লোকসংস্কৃতির বিশেষ ঐতিহাসিক চরিত্রটি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। আর লোকসংস্কৃতির 'সংস্কৃতি' শব্দটি সম্পর্কে বলতে চাই, আজও অনেকেই মনে করেন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত যে 'সংস্কৃতি' তা আসলে অনভিজাত, স্থূল, প্রাকৃত অর্থাৎ নীচুদরের গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট সংস্কৃতি! দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালচার' বলতে বুঝতেন শিল্পসাহিত্য, ভব্যতা, ভদ্রতা, চিত্তোৎকর্ষ, refinement ইত্যাদি। বিশিষ্ট গবেষক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন -

> "একান্ত জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য যে স্থূল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম ও তার ফলশ্রুতি তাকে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] culture বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্যই 'কৃষ্টি' শব্দে তাঁর বিরাগ, 'সংস্কৃতি' শব্দে অনুরাগ।"[২]

অথচ কালচার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে আমরা দেখতে পাবো এর মধ্য দিয়ে 'ভূমি চাষ করা যেমন বুঝায়, তেমনি বুঝায় বীজের সংস্কারসাধন, তেমনি বুঝায় মানুষের জীবনভূমির চাষ, আত্মোন্নতিসাধন, শিল্প-সাহিত্যাদির চর্চা, refinement ইত্যাদি সমস্তই।'[৩] আমাদের মনে পড়ে যাবে কবি রামপ্রসাদের সেই অমর লাইন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ জানো না। এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা'। ফলে কৃষিক্ষেত্র বলুন আর মানবজমিনই বলুন দুটোকেই আবাদ করতে হয়, আর তাতেই ফসল ফলে। দুটোই সংস্কৃতির অঙ্গ। মানবসমাজের কাছে দুই-ই সমান মূল্যবান। তাই লোকসংস্কৃতি আর তথাকথিত অভিজাত সংস্কৃতির মধ্যে দেওয়াল তুলে বিভাজন তৈরি করা মানে মানবসমাজের সামগ্রিক বিকাশ ও সৃষ্টিকে খণ্ডিত করা। সাংস্কৃতিক 'আভিজাত্য' আসলে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী মানুষের তৈরি করা অবধারণা – যা মানবজীবনের অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তাকে খণ্ডিত করে।

প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই। লোকসংস্কৃতি একটি সংহত সমাজের সামগ্রিক বা লোকসমাজের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যলালিত সৃষ্টি। একথা সত্য। কিন্তু লোকসংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন চরিত্র আছে – যা মানব-সমাজের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও সামগ্রিক সৃষ্টির একটি সর্বজনীন পদ্ধতিকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে। এইজন্য লোকসংস্কৃতিকে 'লোকবিজ্ঞান' বলা হয়। লোকসংস্কৃতি চর্চার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র গড়ে উঠেছে। আদিম সমাজের মাতৃকাতন্ত্র, উর্বরাতন্ত্র, জাদুবিশ্বাস, টোটেম ও ট্যাবু, দেবদেবীতত্ত্ব, লোককাহিনির বিভিন্ন মোটিফ ও ইনডেক্স জনিত ধারণা লোকসংস্কৃতি বিচার ও বিশ্লেষণের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিতে সমর্থ হয়েছে। ফলে লোকসংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞান-চর্চার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। বলাবাহুল্য উর্বরাতন্ত্র, মাতৃকাতন্ত্র, জাদুবিশ্বাস জনিত লোকাচার বা লোকবিশ্বাস কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোষ্ঠীর সমাজ-বাস্তবতাকেই তুলে ধরে না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানব সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের বাংলায় প্রচলিত অনেক ব্রতকথার সঙ্গে আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকায় প্রচলিত ব্রতকথার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। লোকায়ত দেব-দেবীর উদ্ভবের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এমনকি লোকসাহিত্যের কিছু সাধারণ মোটিফ সারা পৃথিবীর লোকসাহিত্যে 'common'। এটা কাকতালীয় কোনো ঘটনা না, এর পেছনে লোকবিজ্ঞানের একটি বিশ্বজনীন সত্য আছে – যা দেশ-কালের ভৌগোলিক গণ্ডিকে ছাপিয়ে যায়। মানবসমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন অভিমুখকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। লোকসংস্কৃতি তাই বিশ্বজনীন সংস্কৃতি।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৭৫ সালে দিল্লিতে সাহিত্য একাডেমি আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয় ছিল 'দক্ষিণ এশিয়ায় রামায়ণের ঐতিহ্য'। এই আলোচনাচক্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। বিষয় ছিল : 'The Ramayana : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus'.[৪] এই নিবন্ধে সুনীতিকুমারের একটি অন্যতম প্রতিপাদ্য ছিল,

> "রামায়ণ কোনোভাবেই একশৈলজ (monolithic) নয়। বহুকাল ধরে প্রচলিত বেশকিছু লোককথার কাহিনীরেণুর অন্তর্গত বিভিন্ন অভিপ্রায়কে (motif) এর মধ্যে কালপ্রভাবে মিশ্রিত হতে দেখা গেছে। এই মিশ্রণেরই রূপান্বিত পরিণতি হল রামায়ণ।"[৫]

এমনকি সুনীতিকুমার রামায়ণ মহাকাব্যে ইলিয়াদ মহাকাব্যের অনেক মিল দেখিয়েছিলেন উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ। আসলে মিথ-লিজেণ্ড-টেল (myth-legend-tell)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র গোষ্ঠীগত প্রকল্পনা দিয়ে বা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বা কোনো 'কৌম' কেন্দ্রিক সংস্কার দিয়ে লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত জগতকে সর্বদা ধরা যায় না। কিন্তু ইদানিং এইরকম একটি অন্ধ জাতীয়তাবাদী প্রবণতা লোকসংস্কৃতি-চর্চায় লক্ষ করছি। একটি গোষ্ঠীর বা কৌমের সমাজ-বাস্তবতাকে বিচার করা হচ্ছে মানবসমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে তাকে আলাদা করে। ফলে গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করার নামে অমর্ত্য সেন যাকে বলেছেন 'সভ্যতার ঘেরাটোপ'-এ তাকে আটকে ফেলা হচ্ছে।[৬] আর সভ্যতার এই বন্দিদশা-ই 'অপর'-এর ধারণা তৈরি করে 'হিংসা', 'ঘৃণা' আর 'বিদ্বেষ'– এর জন্ম দেয়। লোকসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পাঠ-পদ্ধতি আর তার বিশ্বজনীনতা মানুষকে সংকীর্ণ পরিচিতি-সত্তার বাইরে বের করে একটি বৃহত্তর মানবসমাজের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। আজকে সারা পৃথিবীতে যেভাবে অন্ধ ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে মনে হয় লোকসংস্কৃতিকে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা যে প্রকল্পিত জাত্যাভিমানে প্রতিবেশীকে শত্রু বানিয়ে লড়াই করতে উদ্যত হচ্ছে মানুষ, লোকসংস্কৃতির চর্চা সেই উগ্র ধর্মীয় সংকীর্ণতার শেকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য মানবসমাজে একটি প্রগতিশীল ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। সারা পৃথিবীর লোকসাহিত্য থেকে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেখানে লোকসাহিত্য বর্ণবাদী সমাজ-ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের বৈষম্য বা সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে আমাদের গ্রামবাংলার লোককবিদের রচিত পল্লীগীতিকাগুলি – যেখানে ধর্মবিযুক্ত প্রেমকে বড়ো করে তুলে ধরা হয়েছে। 'শ্যামরায়ের পালা', 'আঁধারবধূর পালা' প্রভৃতিতে নায়িকারা প্রেমের জন্য সমাজ-সংস্কার সবকিছু ত্যাগ করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে সামন্তবাদী বা দরবারী সাহিত্যে উলটো ছবি আমরা দেখি – সেখানে পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা নায়িকারা! এই পল্লীগীতিকার নায়িকাদের সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন -

> "সে বুঝিয়াছে প্রেম জিনিসটা খাঁটি সোনা, তাহার কাছে পুরোহিতের মন্ত্র, সামাজিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে সেই প্রেমের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এজন্য তাহারা অসতী, পরপুরুষকে ভালোবাসিয়া এমন সকল কার্য করিয়াছে, এমন নির্ভিকভাবে তাহাদের নায়িকাদের অনুগমন করিয়াছে, যে তাহারা সীতা-সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের 'মূলীভূত সমস্যা' ও তার 'সমাধান'-এর জন্য লোকসমাজের অন্তর্নিহিত 'সাধনা'র মধ্যে ভারতবর্ষের 'বিরাট সত্য'-কে উপলব্ধি করেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন–এর 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লোকসমাজের অন্তর্নিহিত সাধনা সম্পর্কে বলেছেন -

> "বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতর হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবনের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তারা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।"[৮]

আবার লোকদেবদেবীর মধ্যে একটি সমন্বয়বাদী ধারাও আমরা লক্ষ করি। একই দেবদেবীর দুটি সমন্বয়ধর্মী ভিন্ন রূপ – যেমন মুসলমানের কাছে যিনি বনবিবি, তিনিই হিন্দুর কাছে বনদেবী, তেমনি শীতলা দেবী-ওলা বিবি, দক্ষিণ রায়-বড় খাঁ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাজী, কালুগাজী-কালুরায় প্রভৃতি। আর এই সমন্বয়ধর্মী লোকদেবতার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সত্যনারায়ণ-সত্যপীর। এই জনপ্রিয় লোকদেবতা নিজের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে –

> "হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।/ যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল।।"[৯]

লোকসমাজের ভিত্তিমূলের ওপরেই নাগরিক-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ক্লাসিক বা চিরায়ত সাহিত্যর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। হোমার বা শেক্সপিয়র বলুন কিংবা কালিদাস বা বাল্মিকী বলুন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকরা বৃহত্তর লোকসমাজের সমবেত চিন্তন-মনন ও প্রয়াস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বৃহত্তর লোকসমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে গ্রহণ করে প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক নিজ দেশ-কালের প্রেক্ষিতে সেগুলির নতুন রূপ দান করেছেন। চিরায়ত সাহিত্য লোকসাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অচ্ছিন্ন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লোকসমাজের সমবেত প্রয়াস (Collectivity)-কে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই লোকসাহিত্যর মতোই চিরায়ত সাহিত্যের আবেদন এবং স্বীকৃতি সর্বজনীন (Unanimity)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, সাহিত্যের ধারক-বাহক ও সমালোচকগণ অনেকসময় এই সত্যটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক আহমদ শরীফের কথা। যিনি একদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে বাঙালি জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সংকরায়ণ ইত্যাদির ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আরোপ করেন অন্যদিকে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত চূড়ান্ত রকমের অবৈজ্ঞানিক। তাঁর মতে,

> "প্রাকৃত বা লোক (Folk) সংস্কার, আচার-আচরণ কিংবা সাহিত্য-শিল্প উঁচুমানের ও পরিমার্জিত হয় না।"[১০]

শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে একটি সাক্ষাৎকারে যখন তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয় যে, একদা তিনি লোকসংস্কৃতিকে 'অক্ষমের সাহিত্য' বলে মনে করতেন, এখনও তাই মনে করেন কিনা। এই প্রশ্নের জবাবেও তিনি আমাদের অবাক করে দিয়ে বলেন,

> "আমি লোকসংস্কৃতিকে আমাদের অজ্ঞতার, অসামর্থ্যের, অশিক্ষার সাক্ষ্য ও নিদর্শন হিসেবে গণ্য করি।"[১১]

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে কতখানি অজ্ঞতা, অবজ্ঞা, ইতিহাস বোধের অভাব এবং তথাকথিত আভিজাতিক অহংকার থাকলে একজন খ্যাতনামা গবেষকের কলম এবং মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোতে পারে তা ভাবলেই স্তম্ভিত হতে হয়! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লোকসাহিত্যের এই অবমূল্যায়ন থেকে বিরত ছিলেন না। মঙ্গলকাব্যের লোক দেব-দেবী নিয়ে তাঁর অস্বস্তির কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। সে প্রসঙ্গ এখানে বাদ দিচ্ছি। যে প্রসঙ্গটা আনতে চাইছি তা হলো, আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ বেশকিছু লোকছড়া ও গান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিগানের মধ্যে 'উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলংকারের বাহুল্য' লক্ষ করে এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে ভবিষ্যতে কবিগানে 'ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা' পাবে।[১২] বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনায় লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত সমাজবাস্তবতার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে রুচি, রসতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বর বিচার। লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও চিরায়ত সাহিত্য, লৌকিক সমাজ ও নাগরিক সমাজের যাবতীয় মূল্যায়ন যেন বাঁধা পড়ছে কতকগুলি যান্ত্রিক শব্দবন্ধে, পরস্পর বিরোধী প্যারাডাইমে, সাংস্কৃতিক মেরুকরণে – সি. পি. স্নো-র বিখ্যাত 'দ্য টু কালচারস্'[১৩] থিয়োরি-র সংস্কৃতির দ্বিখণ্ডনে, অভিজাত-অনভিজাতে, মার্জিত-স্থূলে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, ভদ্র-অভদ্রে, সভ্য-অসভ্যের আপেক্ষিক মানদণ্ডে!

আর অন্যদিকে আছে রাষ্ট্রানুমোদিত অর্থানুকুল্যে লোকসংস্কৃতিকে সাংস্কৃতিক ফসিল (Fossil) বানিয়ে তার বিপণন ও বানিজ্যিকরণ। রাষ্ট্র সেখানে লোকসংস্কৃতিকে প্রয়োজন মাফিক কেটে ছেঁটে, সভ্য ও মার্জিত করে, সুযোগ বুঝে কখনও জাতীয়তাবাদের, কখনও বা ধর্মের রঙে রাঙিয়ে তাকে খোলা বাজারে – গ্লোবালাইজেশনের হাটে বিক্রি করে। বাজার যত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্বজনীন মানে গ্লোবাল হচ্ছে লোকসংস্কৃতি ততই ধর্মের, জাতের, বর্ণের, কৌমের, গোত্রের ছোটো ছোটো খুপরিতে ঢুকে আধুনিক নাগরিকের ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধন করছে। অথচ লোকসংস্কৃতি বরাবরই শাসকের সংস্কৃতি থেকে পৃথক ছিল। শাসক লোকায়তর যূথবদ্ধতাকে, যৌথ প্রয়াসকে বরাবরই ভয় পেয়েছে। শাসক শ্রেণি তার কায়েমি স্বার্থ-কে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, শোষণ যন্ত্রকে চিরস্থায়ী রাখার জন্য সমবেত প্রয়াসকে ভেঙে দিতে চেয়েছে, অনেকাংশে সফলও হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি। লোকসংস্কৃতি রাষ্ট্রবিরোধী, সাম্যবাদী, যূথচারী, পুঁজিবিরোধী, কর্পোরেট বিরোধী, জাতীয়তাবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতপাত বিরোধী। হ্যাঁ, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী। তাই রাষ্ট্র লোকসংস্কৃতির বিকাশে ভয় পায়। তাই তাকে বিকৃত করতে, বিপথে চালিত করতে, বিপণনে মুড়ে ফেলতে সে এত উৎসাহী। তাই পুঁজিবাদ লোকসংস্কৃতিকে শুধু কিনে নিতে আগ্রহী তাই নয়, পুঁজিবাদ সংস্কৃতি 'উৎপাদন' করে 'মাস কালচার'-কে পঙ্গু করে দিতেও চায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে বিখ্যাত মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক থিওডোর ডাব্লিউ. অ্যাডোর্ণো-র 'দ্য কালচার ইন্ডাস্ট্রি' বইটির কথা।[১৪] এই গ্রন্থে অ্যাডোর্ণো দেখিয়েছেন 'মাস কালচার' বা 'জনগণেশ সংস্কৃতি'[১৫] বলতে সাধারণত যা বোঝানো বা দেখানো হয় তার অনেকাংশই আসলে সংহত বা সমষ্টিগত জনসমাজ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে উঠে আসা কোনো 'সংস্কৃতি' নয়। বরং ব্যাপারটা ঠিক এর উলটো। শাসক বা পুঁজিবাদ তার 'সংস্কৃতি কারখানা'-য় পরিকল্পনামাফিক সাংস্কৃতিক পণ্য বা মূল্যবোধ 'উৎপাদন' করে জনগণেশের উপর ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়। পাবলিক খায় বলে যা উৎপাদন করা হয় তা আসলে পরিকল্পনামাফিক পাবলিককে খাওয়ানো হয়। আসলে এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'-তে উৎপন্ন মূল্যবোধ বা পণ্য দিয়ে শাসকশ্রেণি জনগণেশকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আন্তোনিও গ্রামশিও আমাদের সচেতন করেছিলেন যে রাষ্ট্র কীভাবে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেওয়ার জন্য নিত্য-নতুন ফন্দির জাল বোনে। 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'-র ভূমিকাও তাই -

> "সংস্কৃতি কারখানা ধনতান্ত্রিক মতাদর্শগত আধিপত্যের পুনরুৎপাদন করে, শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিচেতনার বিকাশকে প্রতিহত করে, শাসকশ্রেণির পক্ষে সামাজিক সম্মতি ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বানিয়ে তোলে। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির রাজনীতিকরণ ঘটিয়ে অথবা সমস্ত প্রতিবাদী শক্তিকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চুপ করিয়ে দিয়ে সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজকে ধ্বংস করে। সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনা, কাঠামো 'কারণ' ও উপরিকাঠামো তার 'ফলাফল' এই যান্ত্রিক বস্তুবাদী ও অর্থনীতিক নিয়তিবাদী ভাবনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে, সংস্কৃতির ওপর ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের, সংস্কৃতির পণ্যায়নের, সংস্কৃতির সূত্রে চৈতন্যের রিইফিকেশনের (অর্থাৎ মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া যে সমস্ত পণ্য সামাজিকভাবে উৎপাদিত হয়) ও পুঁজির শাসনকে মতাদর্শগতভাবে মেনে নেওয়ার – সামাজিক প্রক্রিয়াকে গভীর বিশ্লেষণে সাহায্য করে।"[১৬]

রাষ্ট্রের কাছে 'লোকসংস্কৃতি' হল 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'-র অতি লাভজনক একটি পণ্য। এতে শ্যাম আর কূল দুই-ই রক্ষিত হয়। পুঁজিবাদ লোকায়ত সংস্কৃতির যূথবদ্ধতাকে ভেঙে দিয়ে জাত-ধর্ম-বর্ণ-কৌম প্রভৃতির প্রকল্পিত জাতীয়তাবাদী আত্মাভিমানের রঙিন চাদরে মুড়ে তাকে বাজারজাত করে তোলে। বলাবাহুল্য, পুঁজিবাদের পালে হাওয়া লাগিয়েছে আমাদের দেশে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে উদ্ভূত বেশ কিছু জ্ঞানতত্ত্ব। বিশেষ করে উত্তর আধুনিকতাবাদ, উত্তর উপনিবেশবাদ, ইকো-নারীবাদ, স্বদেশী বিজ্ঞানবাদ, বিকল্প বিজ্ঞানবাদ, এথনোসায়েন্স ইত্যাদি নামধারী বেশকিছু তত্ত্ব – যারা দাবি করেছিল উপনিবেশবাদের প্রভাবে ভারতীয়দের মগজে যে তথাকথিত 'আধুনিক' ও 'প্রগতিবাদী' চিন্তা গজগজ করছে তা আসলে পাশ্চাত্যের ক্ষমতায়নের প্রতীক, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে না পারলে ভারতীয়দের মুক্তি নেই।[১৭] কিন্তু বাস্তবে ফল হল বিপরীত। স্বদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নামে জাতপাত-ধর্ম-অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, যুক্তিবাদ বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠলো। লোকসংস্কৃতি হয়ে উঠলো এই উত্তর আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব চর্চা ও প্রয়োগের একটি বড়ো ক্ষেত্র। লোকাল নলেজ বা লোক মন-কে জানা বা বোঝার জন্য সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হল 'এনলাইটনমেন্ট', 'যুক্তিবাদ', 'আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি' এমন দাবি তারা করলেন। এই অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেন যা বলেছেন তা প্রনিধানযোগ্য -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "অনুচ্চবর্গের মানুষদের ঘোর বাস্তব দুর্দশাগুলি অতীত কাল থেকে শুরু করে আজকের দিনেও সমানে চলছে। এগুলোর ওপর জোর না দিয়ে কেবল তাদের প্রতি, ইতিহাসে তাদের ভূমিকার প্রতি, মুগ্ধতা দেখালে কিন্তু ওই বঞ্চনার অবসান ঘটানোর কাজকে মোটেই সাহায্য করা হয় না। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে 'আধুনিকতাবাদ'কে বর্জন করার অছিলায় কোনো পদ্ধতিচয়ন যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বকে খাটো করে দেখে, তবে তার ফল ভালো হতে পারে না। ...ভারতের বয়ঃপ্রাপ্ত জনসমষ্টির অর্ধেক (এবং বয়ঃপ্রাপ্তা নারীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) এখনও নিরক্ষর। দু-একটি বিশেষ অঞ্চল বাদ দিলে শিক্ষা আর বিজ্ঞানকে ভারতের নাগরিকদের ব্যাপক অংশের মধ্যে নিয়ে যাবার তেমন কোনো সনিষ্ঠ প্রয়াস চোখে পড়ে না। এই ভয়াবহ ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের গুরুত্বকে খাটো করার অর্থ হল অসাম্য আর অবিচারের বিরুদ্ধে নয়, সপক্ষে কাজ করা।"[১৮]

তাহলে আমাদের লোকসংস্কৃতি চর্চায় গলদ ঠিক কোনখানে? কেন লোকসংস্কৃতির মতো সামূহিক ও স্বতস্ফূর্ত একটি সংস্কৃতি 'We the people' - এর বোধ না জাগিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামী, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার কুজ্ঝটিকায় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তার উত্তর খোঁজা জরুরি হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মধ্যে লোকসংস্কৃতির সীমানা, স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিয়ে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ছিল। সেই সমস্যা আজও বিদ্যমান। নৃবিজ্ঞান, জাতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ শাখা লোকসংস্কৃতি চর্চারও একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র প্রয়োজন। কোন পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতি চর্চা করা উচিত সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ অরুণকুমার রায় -এর একটি প্রস্তাবনাকে এখানে হাজির করতে চাই। অরুণকুমার রায় মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী চেতনার আলোকে লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রস্তাব রেখেছেন। লোকসংস্কৃতি কেন যথার্থ বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারছে না তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন –

> "এই সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে শ্রমপ্রক্রিয়ার অবদান বুঝবার অক্ষমতা ও অস্বীকৃতির মধ্যে। মানব সমাজের যে কোনো উপসৌধ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে, যে শ্রমপ্রক্রিয়া চতুষ্পদী মানুষকে মেরুদণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিপদী হতে সহায়তা করেছিল তাই মানবসমাজের সকল উপসৌধও রচনা করেছে এবং আজও করছে।"[১৯]

ধর্ম, গোত্র, জাতপাতের ঊর্ধে অরুণকুমার লোকসংস্কৃতি-তে বিচার করতে চান 'শ্রেণি'-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাই লোকসংস্কৃতির বিচারে তিনি পেছন ফিরে যান সেই আদিম মানব সমাজে - বর্তমান ও আগামীর যোগসূত্র সন্ধানে। তাঁর ভাষা উদ্ধার করেই বলছি –

> "মানবসমাজের এই প্রাথমিক দিনগুলিতে চিন্তা ও ভাষার সাযুজ্যে এবং সমবেত কর্মপ্রয়াসে যে উপসৌধগুলি রচিত হয়েছে তারই উপাদানসমূহ এবং প্রবহমান প্রক্রিয়া বৃহৎ জনসমষ্টির পরবর্তী জীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে, তাকে যৌথজীবনে যৌথসৃষ্টিতে উদবুদ্ধ করেছে এবং কঠিন রক্তক্ষয়ী সামাজিক জীবনযাত্রায় বল সঞ্চার করেছে। এই উপসৌধগুলির চিহ্ন আমাদের যুগে এসেও বিলীন হয়নি। আজও এরা রূপকথা, উপকথা, গীতকথা, বীরগাথা, পুরাণ ইত্যাদির মাঝে নীলকান্ত মণির ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।"[২০]

অরুণকুমার মনে করেন লোকসংস্কৃতি স্থবির নয়, প্রবহমান (ever-flowing & ever-creating)। কেবলমাত্র গ্রামীন সমাজেই লোকসংস্কৃতি বিস্তৃত তা নয়, নগরে বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা-চেতনায়, এমনকি নাগরিক সভ্যতার 'শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির' মধ্যেও লোকসংস্কৃতি বর্তমান। লোকসংস্কৃতির বহিরাবরণে যে ধর্মীয় গন্ধ বা অশ্লীল অভিব্যক্তি তা এর অন্তর্সত্তা নয়, এটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের কলুষমাত্র।[২১] তাই অরুণকুমার রায় মনে করেন লোকসংস্কৃতিকে 'শ্রেণি'-র ভিত্তিতে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে –

> "এই সজীব ও প্রবহমান সাংস্কৃতিক উপাদান ইতিমধ্যেই তার প্রভাব বিস্তৃত করে মূল শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন ও নগর-সভ্যতায় লালিত-পালিত নিরালম্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও জয় করে ভবিষ্যৎ সর্বজনগ্রাহ্য সংস্কৃতি গড়ার কাজে সামিল হয়েছে। আদিম গুহাবাস ও শিকারি জীবন থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত সর্ব অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে সমবেত সৃজন প্রয়াসে একদিন যে সর্বজনগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ে উঠবে, তাই হবে লোকায়নের শিখরবিন্দু।"[২২]

Reference:

১. এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধায়। দ্রষ্টব্য : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি – সংশ্লিষ্ট কিছু তত্ত্বগত সমস্যা, চার্বাক সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক, সম্পাদক- সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৭৪-৭৮

২. রায়, নীহাররঞ্জন, কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ১৯৮২, পৃ. ৮

৩. তদেব, পৃ. ২২

৪. উক্ত নিবন্ধটির বৃহৎ আকারে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছে ছিলো সুনীতিকুমার চট্টোপাধায়ের। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি কাজটি সম্পূর্ণ করার আগেই মারা যান। গ্রন্থটির খসড়া পরবর্তীতে সুকুমার সেন -এর প্রস্তাবনা এবং অনিল কুমার কাঞ্জিলাল -এর দীর্ঘ ভূমিকা সমেত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য : Suniti Kumar Chatterji, The Ramayana : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus A Resume, Prajna, Calcutta, 29 May 1978

৫. সেনগুপ্ত, পল্লব, রামকথার লৌকিক-অলৌকিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা উৎসের সন্ধানে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৯০

৬. সেন, অমর্ত্য, পরিচিতি ও হিংসা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৪১-৫৮

৭. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯৮

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, বঙ্গীয় কলাকেন্দ্র, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই

৯. খান, আজাজুল আলি, সমন্বয়বাদী লোকদেবতা সত্যনারায়ণ-সত্যপীর : একটি মূল্যায়ন, অতনু শাশমল সম্পাদিত, পশুপতি শাশমল স্মারকগ্রন্থ -এর অন্তর্ভুক্ত, দোসর পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩১৩

১০. শরীফ, আহমদ, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৫

১১. শরীফ, আহমদ, জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৮

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃ. ৮৫

১৩. Snow, C. P., The Two Cultures and the Scientific Revolution, The Rede Lecture 1959, Martino Publishing, USA, 2013

১৪. Adorno, Theodor W., The Culture Industry Selected Essays on Mass Culture, Routledge, New York, 1991

১৫. মাস কালচার এর বাংলা অনুবাদ 'জনগণেশ সংস্কৃতি' আশীষ লাহিড়ী কৃত। দ্রষ্টব্য আশীষ লাহিড়ী, কলে-ছাঁটা সংস্কৃতি এবং থিওডোর অ্যাডোর্ণো, শারদীয় প্রতিদিন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ২৪০

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ, থিওডোর অ্যাডোর্ণো ফ্যাসিবাদের মনস্তত্ত্ব ও সংস্কৃতি কারখানার সমালোচনা, নন্দন, কলকাতা, ৪সেপ্টেম্বর – ৪অক্টোবর ২০২৪, পৃ. ১২৬-১২৭

১৭. বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আশীষ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও মতাদর্শ, অবভাস, কলকাতা, জুলাই ২০১১, পৃ. ৪২ - ৫৫; Meera Nanda, Prophets Facing Backward Postmodernism, Science, and Hindu Nationalism, Permanent Black, Delhi, 2011

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৮. সেন, অমর্ত্য, ভারতের অতীত-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, অনুবাদ-আশীষ লাহিড়ী, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, জুন ২০১৮, পৃ. ৩০-৩১

১৯. রায়, অরুণকুমার, লোকায়নচর্চার ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৭

২০. তদেব, পৃ. ১৯

২১. তদেব, পৃ. ২২

২২. তদেব, পৃ. ২০-২১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 689 - 699
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সাঁওতাল সমাজজীবনে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বাবলু সরেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
অতিথি শিক্ষক
সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম
Email ID : bablusaren24@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Santals imagine, Folk Culture, Santal society, nature since.

Abstract
At present, many people think that folk belief and folk reform is a deep-rooted concept which is mainly illiterate people, little learned and so Called of the rural society fellow which is a bad reform or misconception prevalent. Actually it is not. This belief or Samskar is held by almost everyone in the society. From the earliest times, the Santal people have experience various auspicious and inauspicious events and witnessed the cause of all events, it a cause-and-effect relationship or a coincidence. Because they believed that nothing happens without a reason. There is a specific reason behind all events. What we in modern times call cause-and-effect relationship, the Santal of the primitive age considered that cause-and-effect relationships as more coincidence. And that is the reason for the birth of faith and reform in the Santal society. In early times the Santal people used to hunt animals for food. Their senses are always alert to hunt for prey and to protect themselves. As a result, various forms of nature and various signs of animals and birds are experienced repeatedly and come to be regarded as special causes. For example birds charming or suddenly stop, various kind of smell, direction of blowing wind etc, which is the bright prospect of food, which is the possibility of stormy weather and which is the re-emergence of the spring season, lightning the sky, meteor falls and earthquake etc. after witnessing the signal of Santals may have failed in the hunt or been attacked by enemies or a member of the group may have died, they considered it as casually link between them. Although there is no Casual link between them yet primitive Santals imagine a cause and effect relationship between them. Primitive Santals believed that human life was controlled by a spirit residing in the human body. And all things happen in this mundane world due to some gods or goddesses or some special forces of the world. Storms, floods, earthquake lightning sunrise sunset meteos lunar eclipses, solar eclipses, tides, volcanoes all have a special energy action. Hence the primitive Santals believe that all creations of nature are a reservoir of energy by doing

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

rivers- channels, mountains, planets, star's are all a reservoir of energy. So the Santals have been worshiping nature since the dawn of time. The source of reformation is also found in various religious precepts, disciplines and practices of Santal society. We don't look for its source or ignore it as an unwanted phenomenon. But from the world's oldest text, the Rikvedawe find the roots of many reforms. Which still exists in the society today. For example – brother and sister marriage is prohibited in the society, It is unlucky to call an owl, One should not call someone from behind, One has to spit on the chest before going outside at night, people die if Karaj (Male Fox) is called at night etc.

Discussion

বর্তমানে সময়ে অনেকেই মনে করেন যে, লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কার এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা যা প্রধানত গ্রাম্য সমাজের নিরক্ষর মানুষ, অল্প শিক্ষিত ও তথাকথিত সভ্য সমাজে প্রচলিত এক কু-সংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা বিশেষ। আসলে তা কিন্তু নয়। শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত প্রায় সকলের মধ্যেই এই বিশ্বাস বা সংস্কার দানা বেঁধে অল্প বিস্তর থেকেই গেছে। আদিকাল থেকেই মানুষ নানা রকম শুভ ও অশুভ ঘটনার সম্মুখিন হয়েছে এবং সব ঘটনার একটা করে কারণ প্রত্যক্ষ করেছে। সেটা কার্য-কারণ সম্পর্কই হোক বা কোন কাকতালীয় ঘটনাই হোক। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করত যে, কোনো কিছু ঘটনা অকারণে ঘটে না। সব ঘটনার পেছনেই একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে। আধুনিক যুগে আমরা যেটা কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে অভিহিত করে থাকি, আদিম যুগের মানুষরা সেই কার্য-কারণ সম্পর্ককেই কাকতালীয় ঘটনার সঙ্গে নিছক অবান্তর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিল। আর এই কারণ বশবর্তী থেকেই বিশ্বাস আর সংস্কারের জন্ম।

আদিকালে সাঁওতালরা খাদ্যাবৃত্তির জন্য পশু শিকার করত। শিকারের সন্ধানে আর নিজেদের আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের ইন্দ্রিয় সদা জাগ্রত থাকত। ফলে প্রকৃতির নানা রূপ এবং পশুপাখির নানান সংকেতগুলি বারাংবার অভিজ্ঞতা হওয়ায় সেগুলিকে বিশেষ কারণ হিসাবে গণ্য করতে থাকে। যেমন - 'পাখির কলরব বা হটাৎ করে পাখির স্তব্ধ হওয়া, নানা রকমের সুগন্ধ, দূর্গন্ধ, প্রবাহমান বাতাসের দিক নির্ণয় ইত্যাদি নানাবিধ সংকেতের সঙ্গে আদিম মানুষ পরিচয় লাভ করে। কোনটি খাদ্য প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভবনা, কোনটি ঝড় হাওয়ার সম্ভবনা, আবার কোনটি বসন্ত ঋতুর পুর্নরাবির্ভাব, আকাশে বিদ্যুতের চমকানি, উল্কা পতন, ভূমিকম্প ইত্যাদি সংকেতগুলি প্রত্যক্ষ করার পর আদিম মানুষেরা হয়ত শিকারে ব্যর্থ হল বা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হল বা গোষ্ঠীর কোনো সদস্য মারা গেল। যদিও এদের মধ্যে কার্য-কারণের কোন যোগসূত্রই নেই। তবুও তারা এর মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ককে কল্পনা করে নেয়। এইরূপ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ এই অবান্তর সংকেতগুলি থেকেই সংস্কার এবং বিশ্বাসের উদ্ভব। পরবর্তীকালে মানুষ যতই সভ্য ও উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে ততই এই কল্পিত সংকেত বা কারণগুলি বিভিন্ন পরিনামের সঙ্গে যোগাযোগের পথকে আরও সুস্পষ্ট ও প্রশস্ত করে দিয়েছে।

সাঁওতালরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের দেহে অবস্থিত কোনো এক আত্মার দ্বারা। এই জাগতিক বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা ঘটে কোনো দেব-দেবী বা জাগতিক কোনো বিশেষ শক্তির কারণে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ চমকানি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, উল্কাপাত, জোয়ার-ভাটা, আগ্নেয়গিরি এই সমস্ত কিছুতেই রয়েছে বিশেষ কোনো শক্তির ক্রিয়া। এঁরা প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিকেই শক্তির এক একটি আধার বলে বিশ্বাস করে। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র এই সবই শক্তির এক একটি আধার। তাই সাঁওতালরা এখনো প্রকৃতির পূজা করে। প্রকৃতির উপাদানেই এঁদের আরাধ্য দেব-দেবী।

আমাদের সংহত সমাজের নানান ধর্মীয় নির্দেশ এবং আচার-আচরণের মধ্যেও সংস্কার সৃষ্টির উৎস রয়েছে। আমরা তার উৎস সন্ধান করি না বা অবাঞ্চিত ঘটনা বলে এড়িয়ে যাই। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদে আমরা বহু সংখ্যক সংস্কার বা সংস্কারের মূলের সন্ধান পাই। যেমন, ঋকবেদের ১/১০৫/৩ সায়নভাষ্য মন্ত্রে বলা হয়েছে যে,- 'পুত্র সন্তান না থাকলে স্বর্গচ্যুত হয়।' 'সমাজে ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ'- ঋক সংহিতার ১০/১০/সূক্ত। 'পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়' - ঋকসংহিতা - ১০ম মন্ডল। ১৬৫ সূক্ত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল – 'Folk Belief' ও 'Superstition'। লোকবিশ্বাস শব্দটি সোজাসুজি ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়ে 'Folk Belief' হয়েছে আর লোকসংস্কারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে 'Superstition' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। যার বাংলা আভিধানিক অর্থ হল কু-সংস্কার। লোকসংস্কার আর কু-সংস্কার কিন্তু এক জিনিস নয়। অর্থের দিক থেকেও এই দুটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা ও বিপরীত। তাই অনেকেই এই 'Superstition' শব্দটিকে লোকসংস্কারের যথার্থ প্রতিশব্দ হিসাবে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, 'লোকসংস্কারের ভাল-মন্দ দুটি দিকেই আছে। কিন্তু 'Superstition' বলতে বিশেষ ভাবে সংস্কারের মন্দ দিকটিকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

American Dictionary-তে 'Superstition' এর যে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে তা হল –

> "A Belief that is not based on reason or scientific thinking and that explains the causes for events in ways that are connected to magic."[১]

অনুরূপ ভাবে, Cambridge Dictionary-তে এই 'Superstition' এর আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে যে, -

> "Superstition means – belief that is not based on human reason or scientific knowledge but is connected with old ideas about magic etc."[২]

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী এই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, -

> "লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার দুই-ই এক। আভিধানিক অর্থের বিচারে অবশ্য দুইই এক - বিশ্বাস এবং সংস্কার উভয়েরই অর্থ হল প্রত্যয়। গুণগত বিচারে (Qualitatively) উভয়ই এক হলেও বলা যায় পরিমাণগত ভাবে (Quantitatively) কিছু পার্থক্য দুইয়ের মধ্যে রয়ে গেছে। সংহত এক জনসমষ্ঠি যে বিশেষ বিশেষ আচার আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভবোধ জড়িত, তাই হল লোক-বিশ্বাস। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে। কিন্তু লোক-সংস্কার হল সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্ঠি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে। লোক-সংস্কারের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।"[৩]

কার্ভেথ রীড লোক-বিশ্বাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, -

> "The attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgement as true or matters fact actions and events as about to have certain results. It is a series and respectful attitude; for matter of fact compels us to adjust our behavior to it, whether we have power to after it or not."[৪]

> "... to define as 'superstition' may belief or practice that is not recommended or enjoyed by any of the great organized religious such as Christianity, Judaism, Islam and Buddhism."[৫]

> "... a superstition is something which is 'left over' from the past and which continues to prevail without being understood."[৬]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রকারভেদ –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের নির্দিষ্ট শ্রেণীকরণ করা খুব মুশকিল। কেননা, আমাদের সমাজে সব বিষয় সংক্রান্তের ওপরেই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার প্রচলিত। আর এই বিষয় সংক্রান্তের উপর নির্ভর করে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে কয়েকটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি। যেমন – ১. বৃষ্টি সংক্রান্ত, ২. প্রতিকার সংক্রান্ত, ৩. গর্ভবতী নারী বা প্রসূতি নারীর পালনীয় সংস্কার সংক্রান্ত, ৪. সংখ্যা সংক্রান্ত, ৫. জন্ম সংক্রান্ত, ৬. বিবাহ সংক্রান্ত, ৭. মৃত্যু সংক্রান্ত, ৮. রঙ সংক্রান্ত, ৯. যাত্রা সংক্রান্ত, ১০. হাঁচি সংক্রান্ত, ১১. কাক সংক্রান্ত, ১২. লোহা সংক্রান্ত, ১৩. কৃষি সংক্রান্ত, ১৪. সু-লক্ষণ ও কু-লক্ষণ সংক্রান্ত ১৫. ভাল-মন্দ সংক্রান্ত, ১৬. নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত, ১৭. দিন সংক্রান্ত ইত্যাদি। Phillippa Waring তাঁর ‘A Dictionary of Omens & Superstitions’ গ্রন্থে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে তিনটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।

> “1. The Idea that if a certain action is taken bad luck will result.
> 2. The performing of a specified ritual which will bring about desired results.
> 3. The reading of omens by which a definite event, good or bad will occur.”[৭]

ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্তী তাঁর ‘লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার’ গ্রন্থে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন – “নিয়ন্ত্রণীয় ও অনিয়ন্ত্রণীয়”[৮]

সাঁওতালদের সমাজ জীবনেও লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। অন্য সমাজের ন্যায় সাঁওতাল সমাজেও একই রমকের লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার রয়েছে। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

১. বৃষ্টি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজে বৃষ্টি সংক্রান্ত নানান বিশ্বাস ও সংস্কার রয়েছে। অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সমাজে বৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্কারগুলির আবির্ভাব। বর্তমানে বিজ্ঞান অগ্রগতির যুগে যেসব এলাকায় এখনও বিজ্ঞানের আলো এসে পৌঁছায়নি বা আংশিক ভাবে পৌঁছালেও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সেই সব এলাকায় এই সংস্কার অধিক লক্ষ্য করা যায়। যেমন - দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে সাঁওতাল সমাজের অবিবাহিত মেয়েরা গ্রামের লাংড়ে আখড়া (যেখানে সাঁওতালদের নাচ গানের আসর বসে) গোবর দিয়ে ছোঁচ্ দেয়। অর্থাৎ সকালে স্নান করে নতুন কাপড় বা পরিষ্কার শাড়ি পরে লাংড়ে আখড়া ছোঁচ্ দেয়। ছোঁচ্ শুকে গেলে বা বিকালের দিক করে লাংড়ে নাচ গানের আসর শুরু হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস এই সংস্কার পালনের পর অর্থাৎ লাংড়ে নাচ গানের আসর শুরু হলে স্বর্গ থেকে দেব-দেবী নেমে এসে আসরে সামিল হন। আখড়ায় মানুষ আর দেব-দেবীর সম্মিলিত নাচে আখড়ার ধূলা আকাশের দিকে উঠলে কিংবা ধামসা মাদলের আওয়াজ বা কম্পন স্বর্গে পৌঁছালে বৃষ্টি নেমে আসে।

অতিবৃষ্টি বন্ধ করা করার জন্য সাঁওতাল সমাজে অজস্র লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার প্রচলিত আছে। অতিবৃষ্টি বন্ধ করার জন্য যদি কোনো পুরুষ মানুষ উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে নাকি বৃষ্টি থামবে বলে মানুষের বিশ্বাস। আবার, বৃষ্টি বন্ধ করতে আগুনে পাথর পোড়ানো হয়। এতেও নাকি বৃষ্টি থামবে বলে মানুষের বিশ্বাস। কিছু কিছু এলাকায় অতিবৃষ্টি বন্ধ করার জন্য যদি কোনো পুরুষ মানুষ জ্বলন্ত কাঠ বা কয়লা অন্যের ছাদে ছুঁড়ে মারে, তাহলেও নাকি অতিবৃষ্টি বন্ধ হয় বলে মানুষ বিশ্বাস করে। অতিবৃষ্টির মধ্যে জ্বলন্ত কাঠ বা মশাল আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলেও নাকি বৃষ্টি বন্ধ হয়। অতিবৃষ্টিতে এক নিশ্বাসে একটি কাঠি বা লাঠি মাটিতে পুঁতে দিলে বৃষ্টি বন্ধ হয় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন।

২. প্রতিকার সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতিতে প্রতিকার সংক্রান্ত বা উপশম সংক্রান্ত নানা রকমের লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার প্রচলিত। যা সাঁওতালরা কারণে বা অকারণে গ্রহণ করে সংস্কৃতিবদ্ধ করেছেন। যেমন – কাউকে বাম হাত দিয়ে মারতে নেই। বাম হাতে মারলে নাকি রোগা হয়ে যায়। তাই এর প্রতিকার স্বরূপ বাম হাত মাটিতে ঠুকতে হয় তাহলে সব দোষ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কেটে যায়। রাত্রে কোথাও বেরানোর আগে বুকে থুতু দিতে হয়। তাতে অপদেবতা বা ভূত-প্রেতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস। অজ্ঞাত বা অসাবধানতার কারণে যদি দুজনের মাথা ঠোকাঠুকি লাগে তাহলে পুনরায় আবার ঠোকাঠুকি করতে হয়, না হলে মাথায় শিং গজায়। রাতের বেলায় বাইরে কোথাও খাবার নিয়ে গেলে খাবার এঁটো করতে হয় কিংবা এক টুকরো অঙ্গার রাখতে হয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘাড় ব্যথা হলে পরের দিন ওই বালিশ রোদে দিতে হয়। খেতে বসা অবস্থায় মুখ থেকে খাবার পড়ে গেলে, পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খেতে হয়। না হলে শত্রু বৃদ্ধির আশংকা বাড়ে। খাবার খেতে খেতে হাঁচি হলে অমঙ্গল হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে রাতে খাবার খাওয়ার পর হাতে, পায়ে, মুখে ও পেটে সরিষার তেল মেখে ঘুমাতে হয়। আত্মীয় স্বজনকে (সিরম) ঝাঁটা দিতে হলে বেড়ার ভিতর থেকে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। রাত্রে কারাজ (পুরুষ শেয়াল) ডাকলে মানুষ মারা যায় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে।

৩. গর্ভবতী নারী বা প্রসূতি নারীর পালনীয় সংক্রান্ত সংস্কার :

বর্তমান সাঁওতাল সমাজে গর্ভবতী নারী বা প্রসূতি নারীর অজস্র পালনীয় লোকসংস্কার রয়েছে। গর্ভবতী অবস্থায় নারীদের নানা রকমের নিষেধাজ্ঞা এবং ভাবী সন্তানের মঙ্গল সাধনে নানা বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। বিশেষ করে খাদ্যগ্রহণ, যাতায়াত, বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শন কিংবা প্রসাধনের ব্যাপারে বিশেষ বিধি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যেমন- সন্ধ্যার পর গর্ভবতী নারীদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। কারণ, বাড়ির বাইরে বেরালে তাঁর উপর ভূত-প্রেত বা কোনো অপদেবতার কু-নজর লাগতে পারে এবং ভাবী সন্তানের চরম ক্ষতি হতে পারে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। আবার, পোয়াতি অবস্থায় নৌকায় নদী পেরোতে নেই। এই অবস্থায় নদী পেরোলে নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। গর্ভবতী অবস্থায় মুরগি বা হাঁসের পায়ের চামড়া ছাড়াতে নেই। ছাড়ালে ভাবী সন্তানের হাতে-পায়ের চামড়াও হাঁস মুরগির পায়ের চামড়ার ন্যায় হয়। পোয়াতি অবস্থায় নদীতে বা খালে মাছ ধরতে যেতে নেই। গেলে ভাবী সন্তানের অমঙ্গল হয়। গর্ভবতী নারীর কাপড়-চোপড় বেলা থাকতেই তুলে নিতে হয়। না নিলে অপদেবতার কু-নজর লেগে ভাবী সন্তানের ক্ষতি হতে পারে বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন।

সাঁওতাল সমাজে নারী গর্ভবতী হলে পুরুষসঙ্গীকেও কিছু কিছু সংস্কার মেনে চলতে হয়। যেমন - স্ত্রীর অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় পুরুষের শিকারে যাওয়া নিষেধ বা কোনো প্রকার জীব হত্যা করা নিষেধ। মাছ, মুরগি, বা অন্য কোনো প্রাণীর মাথার মাংস খাওয়া যাবে না বা ডিম ফাটানো যাবে না। স্ত্রীর গর্ভবতী অবস্থায় কোনো কাঠ কাটা যাবে না। এতে সন্তানের ঘোর অমঙ্গল হতে পারে বলে সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস।

৪. সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কারও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে, সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কার বোধ হয় তেমন কিছুই না। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল থেকে চলে আসা সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কার সাঁওতাল সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বিশেষ করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে শুভ বা অশুভ ব্যাপারটা অনেক সময় সংখ্যার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন - বিশেষ কিছু সংখ্যা বিশেষ বিশেষ কাজে শুভ বা অশুভ করার ক্ষমতা রাখে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। তাই সংস্কার বিশ্বাসী মানুষ যখন কোনো শুভ কাজ শুরু করেন তখন অশুভ কোনো সংখ্যার বা ক্ষতিকারক কোনো সংখ্যার যাতে কোনো যোগ না থাকে সে বিষয়ে খুব সচেষ্ট থাকেন। যেমন - পূজা-পাষান করার সময় সাঁওতালরা জাহের থান (পূজা স্থল)-কে তিন পাক সুতো দিয়ে ঘেরে এবং তিন পাক জল দিতেই পূজা পাঠ শেষ করেন। কিংবা, কোনো অনুষ্ঠানে নেমন্তন করার সময় যে আমন্ত্রন বা গিরা (সাঁওতালদের আমন্ত্রন পত্র) পাঠানো হয় সেখানে কম করে তিনটা গিঁট দেওয়া সুতো পাঠাতে হয়। এছাড়া মানুষের মৃতদেহ তিন জনে বহন করতে নেই। তিন বলদে লাঙ্গল জুড়তে নেই। কাউকে তিনটি জিনিস দিতে নেই। তিন ডাকে সাড়া দিতে নেই ইত্যাদি। এই সংখ্যা সংস্কারগুলো শুধু সাঁওতাল সমাজে নয় প্রায় সব সমাজেই কমবেশি প্রচলিত হয়ে আসছে।

৫. জন্ম সংক্রান্ত সংস্কার :

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানব জীবনে সংস্কারের শুরু হয় মানুষের জন্মলগ্ন থেকে। জন্ম সংক্রান্ত সংস্কার সাঁওতাল সমাজে এর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নবাগত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক মুহূর্ত থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত এই জন্ম সংক্রান্ত সংস্কার পালন করা হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে গর্ভবতী মহিলাকে যে ঘরে রাখা হয়, সেই ঘরের বাইরে দরজার দুপাশে গোবর (গোলাকৃতি করে) রাখা হয়। এই সংস্কার পালন করলে বাইরের কোনো অশুভ আত্মা ঘরে প্রবেশ করতে পারে না আর সন্তান জন্মগ্রহণেও কোনরকম বাধা-বিপত্তি আসে না বলে বিশ্বাস। অনুরূপভাবে, ঘরের ভিতর দিকে দরজার দুপাশে দু-মুঠো ধান রাখা হয় লক্ষী দেবীর নামে। যাতে সংসারে নবাগত শিশুকে লক্ষীদেবী স্বাগত জানাতে পারে। শিশু ভূমিষ্ঠ হলে সাঁওতালরা থালা-বাটি বাজায় এই সংস্কারটি সাঁওতাল সমাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, নবাগত শিশুর নাড়ি কাটা হয় তিরের ফলা দিয়ে। শিশুর ছাটয়ার বা নামকরণ না হলে সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয় না। শিশুর উপরের পাটিতে আগে দাঁত বেরালে কিংবা দু-পাটিতে একসাথে দাঁত বেরালে কিংবা জোড়া মাসে দাঁত বেরোলে তা শিশুর পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়। শিশুর নাভির নারীর কাটা অংশ পড়ে গেলে তিন দিন বা পাঁচ দিনের মাথায় ঘরের দরজার মাঝখানে পুঁতে দেওয়া হয়। ছুঁচ দিয়ে গর্ত করে পুঁতা হয়। মাটির উপরের দিকে পুঁতলে তাড়াতাড়ি দাঁত বেরায় আবার মাটির নিচের দিকে পুঁতলে দেরিতে দাঁত বেরায় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে।

৬. বিবাহ সংক্রান্ত সংস্কার :

মানুষের জীবনে বিবাহ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আরও গুরুত্ব দিতে গিয়ে সাঁওতাল সমাজে বিবাহকে নানান রকম সংস্কারে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সাঁওতাল সমাজে বিবাহ সংক্রান্ত বহু সংস্কার বর্তমান। যেমন – সমগোত্রে বিবাহ করতে নেই। সমগোত্রে বিবাহ করলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না বা ভাবী সন্তানগুলো পঙ্গু হওয়ার সম্ভবনা থাকে। অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের গোধূলি লগ্নে বিয়ে করতে নেই। বিয়ে করলে অমঙ্গল হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। পোষ বা চৈত্র মাসে বিয়ে দিতে নেই। কারণ, এই মাসে বিয়ের শুভ যোগ নেই বলে মানুষের বিশ্বাস। কনেকে কালো রঙের উপহার দিতে নেই। এতে ঘোর অমঙ্গল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় না। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিনটি মাস মল মাস। তাই এই মাসে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। জন্ম বারে বিবাহ করতে নেই। বিবাহের সময় কনের মাকে উপবাসে থাকতে হয়। শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢাললে শিবের মত বর হয় কিংবা বৈশাখ মাসের ভোরবেলায় নীলকণ্ঠ পাখী দেখলেও নাকি শিবের মত বর হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। ছাঁতনা তলায় বর-কনের শুভদৃষ্টি সময় কোনো ঋতুবতী নারী থাকতে নেই। এতে নবদম্পতির সাংসারিক জীবন সুখের হয় না। বাড়িতে কোনো পরিচিত ব্যক্তি এলে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য তাঁকে বসতে দেওয়া হয়। বসতে না দিলে বাড়ির মেয়েদের বিয়ে হবে না বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস।

৭. মৃত্যু সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজ জীবনে প্রধান তিনটি ঘটনার মধ্যে এই মৃত্যু সংক্রান্ত সংস্কার হল অন্যতম। অপর দুটি ঘটনা হল- জন্ম এবং বিবাহ। এই তিনটি ঘটনার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু হল অনিবার্য ঘটনা। প্রাণী মাত্রেই জন্ম নেয় আর জন্ম নিলে মৃত্যু অনিবার্য একটা ঘটনা। আর এই মৃত্যু নিয়ে সাঁওতাল সমাজে নানা রকমের সংস্কার বর্তমান। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে উনি তাঁর আসা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করবেন। অর্থাৎ আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। বাড়িতে কারোর মৃত্যু হলে মাছ, মাংস, দুধ, মাখন, পেঁয়াজ বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রিক থাকলে সব বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। নাহলে ওই মৃত ব্যক্তির আত্মা এসব খাবারে প্রবেশ করে আর এই খাবার খেলে মানুষের শরীর খারাপ করে বলে বিশ্বাস। শেষকৃত্য না হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহকে একা ফেলে রাখতে নেই। কাউকে না কাউকে মৃতদেহ ছুঁইয়ে রাখতে হয়। মৃতদেহ সৎকারের পর শ্মশান যাত্রীদের আগুনের তাপ নিতে হয়, লোহা স্পর্শ করতে হয়, মুখে তেতো জাতীয় কিছু দিতে হয় এবং শেষে মিষ্টি মুখ করে ঘরে ঢুকতে হয়। যাতে মৃত ব্যক্তি শ্মশানযাত্রীদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এছাড়াও মৃতদেহ চিতাতে তোলার পর কাঠের ছিলকায় একটা মুরগি বাচ্ছাকে মাথা ফুঁড়ে এপার-ওপার করে চিতায় দিয়ে দেওয়া হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস এতে মৃত ব্যক্তির স্বর্গ যাত্রা সুগম

ও সুখের হয়। যদি কোনো ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় মদ বা হাঁড়িয়া পান করে থাকতেন এবং তাঁর মৃতদেহ যদি না পুড়ে বা পুড়তে দেরি করে তাহলে তাঁর চিতায় মদ ঢেলে দিয়ে হয়। কারণ, মদ হাঁড়িয়ায় আসক্ত ব্যক্তির অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তাই তাঁর মৃতদেহ পুড়তে চাই না বা পুড়তে দেরি হয়। ছাটয়ার বা নামকরণ করার আগে কোনো শিশুর মৃত্যু ঘটলে তাকে কবর দেওয়া হয়। করব দেওয়ার সময় মৃতদেহের উপর বিভিন্ন ধরণের কাঁটা দেওয়া হয়। তারপরে মাটি ছাপা দিয়ে দেওয়া হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস ওই মৃতশিশু ভবিষ্যতে ভূত বা প্রেত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই কবর থেকে যাতে না বেরাতে পারে সেক্ষেত্রে এই সংস্কার প্রচলিত। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা কথায় যায় সেই বিষয়ে আমাদের কোনো সুনিশ্চিত ধারণা নেই। অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় মানুষের পক্ষে মৃত্যুর পরবর্তী কালের ব্যাপারে জানা বা ধারণা পাওয়া অসম্ভব। তবুও পরলোকে যাতে মানুষের আত্মা সুখে শান্তিতে থাকে সেই প্রয়াসেই আমরা করে এসেছি। আমরা মৃতব্যক্তির মঙ্গিলার্থে বা আত্মা শান্তির কামনায় যা করি, আমাদের মৃত্যুর পরেও ওই একই সংস্কারই করা হবে আমাদের আত্মার হিতার্থে।

৮. রঙ সংক্রান্ত সংস্কার :

সমাজে প্রচলিত অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় রং সংক্রান্ত সংস্কারও সমাজে একটা জায়গা করে নিয়েছে। মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, মানব মনে বিভিন্ন রং বিভিন্ন প্রকার প্রভাব ফেলে যা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ বিশেষ রং মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই রং নিয়েও সাঁওতাল সমাজে অজস্র সংস্কার বর্তমান। যেমন- সাঁওতাল সমাজে কালো রংকে অশুভ শক্তির আধার হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই কোনো শুভ কাজ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কালো রঙের কোনো ছোঁয়া থাকে না। আবার, শ্রাদ্ধের সময় যে নিমন্ত্রণ বা গিরা পাঠানো হয় সেখানে মরা কালো চাল এবং এক টুকরো কয়লা দেওয়া হয়। সাঁওতাল সমাজে কালো বিড়াল খুব অশুভ। কোনো শুভ কাজে বা কোথাও যাওয়ার সময় কালো বিড়াল চোখে পড়লে বা রাস্তা কাটলে যাত্রা ব্যর্থ হয় এবং এটা খুব অশুভ ও বিপদের সংকেত বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন। সাঁওতালদের শুভ রং হল হলুদ। তাই সমাজের সবকটি শুভ কাজে, বিশেষ করে বিবাহের সময় হলুদ রঙের পোষাক ছাড়া বিবাহ হয় না। এছাড়া জন্ম ও মৃত্যু সংস্কারে হলুদের বিশেষ ব্যবহার রয়েছে। সমাজের নানান অনুষ্ঠানে গ্রামের পঞ্চজনকে হলুদ রঙের পাগড়ি দেওয়া হয়। অর্থাৎ গ্রামের পঞ্চজনকে চিহ্নিত করার সংকেত স্বরূপ মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ি দেওয়া হয়। সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে সাঁওতাল নারী পুরুষ উভয়ে চিরাচরিত হলুদ রঙের পোষাক পরে থাকেন। সাঁওতাল সমাজে সাদা রঙের প্রভাবও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নানা পূজা-পার্বণে সাঁওতালরা সাদা রঙের পোষাকেই পরে থাকেন। সবুজ রংকে সংগ্রাম বা একতার প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়। তাই বিভিন্ন আন্দোলনে সবুজ রঙের ফিতা বা উত্তরীয় কিংবা হলুদ-সবুজ পতাকা ব্যবহার করেন।

৯. যাত্রা সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজে যাত্রা সংক্রান্ত নানান সংস্কার ও নিষেধাজ্ঞা চোখে পড়ার মতো। যেমন – বাড়ি থেকে তিনজন মানুষ একসঙ্গে যাত্রা করত নেই। সাঁওতালদের বিশ্বাস এতে যাত্রা শুভ হয় না। কোনো শুভ কাজে যাওয়ায় সময় রাস্তায় হোঁচট খেলেও নাকি যাত্রা বিফল হয় বলে বিশ্বাস। যাত্রা শুরুর সময় কোনো কিছুতে আঘাত লাগলে সেই যাত্রায় বাধা পড়তে পারে। কিংবা বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস। যাত্রাকালে বিড়ালের কান্না শুনলে, যাত্রা বাতিল করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিংবা যাত্রাপথে বিড়াল রাস্তা কাটলে যাত্রা বিঘ্নিত হয় বলে বিশ্বাস। তাই তিন-পা পিছিয়ে আবার যাত্রা শুরু করতে হয়। আবার, যাত্রাপথে যদি কালো রঙের বিড়াল রাস্তা অতিক্রম করে তাহলে সেক্ষেত্রে যাত্রা খুব শুভ হয় বলে ইঙ্গিত বহন করে। যাত্রাপথে বিড়াল রাস্তা অতিক্রম করার পর যদি কোনো সাদা বা কালো কুকুর পুনরায় রাস্তা অতিক্রম করে তাহলে তা শুভ বলে ধরে নেওয়া হয়। নবদম্পতির নৌকা যাত্রা নিষিদ্ধ। যাত্রাপথে মাথার উপর দিয়ে কাক উড়ে গেলে, তাহলে বুঝতে হবে যে বিপদের সময় ঘুনিয়ে আসছে। যাত্রা কালে হাঁচি হলে তা অশুভের ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া হয়। যাত্রাপথে গোসাপ দেখা মোটেও শুভ নয়। শেয়াল কিংবা সাপ রাস্তা কাটলে তা খুব অশুভ এবং দূর্ভাগ্যজনক বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন।

আবার, কোনো শুভ কাজে যাওয়ার সময় মৃতদেহ দর্শন বা চিতার আগুন দেখা খুব শুভ বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া সাদা মরা গরু দেখাও নাকি খুব শুভ। যাত্রা শুরু করার সময় কিংবা যাত্রাপথে বউ কথা কও পাখির ডাক শুনলে যাত্রা শুভ হয় বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস।

১০. হাঁচি সংক্রান্ত সংস্কার :

হাঁচি সংক্রান্ত সংস্কারও সমাজে বিশেষ গুরুত্বঅপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। আমরা জানি যে, কোনো রোগ জীবানু বা কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ যদি নাক দিয়ে শরীরের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে নাকের স্নায়ুগুলো জোর করে তাকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করে, ফলে হাঁচি হয়। কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি অচল। এই হাঁচি সংক্রান্ত সংস্কার শুধু সাঁওতাল সমাজেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচলিত। এই হাঁচি সংস্কান্ত সংস্কার কখনও বাধা স্বরূপ আবার কখনও সমর্থন স্বরূপ গণ্য করা হয়। যেমন – বাড়ি থেকে কোথাও বেরানোর মুহূর্তে যদি কেউ হেঁচে ফেলে, তাহলে সেই ব্যক্তির যাত্রা সফল হবে না। কারণ, মানুষের বিশ্বাস করেন যে, যাত্রা করার মুহূর্তে হাঁচি দেওয়া মানে যাত্রায় বাধা পড়ার সম্ভবনা। তাই কিছু সময় অপেক্ষা করে গন্তব্যের দিকে রওনা দিতে হয়। খাওয়ার সময় হাঁচি হলে তা মোটেও ভালো নয়। সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন যে, এতে লক্ষ্মীদেবীর রাগ হয়। তাই খাওয়ার সময় হাঁচি হলে মাথায় জল ছিটিয়ে পুনরায় খেতে শুরু করতে হয়। আবার, কোনো বিষয়ে কথা বলার সময় যদি কেউ হাঁচে তাহলে সেকথা যথার্থই সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, একবার হাঁচি দেওয়া মানে ভগবানের আশীর্বাদ ধন্য হওয়া। দু'বার হাঁচি দেওয়া মানে দোষী সাব্যস্থ হওয়া আর তিনবার হাঁচি দেওয়া মানে শরীর অসুস্থ হওয়ার সম্ভবনা প্রবণ। আবার, যদি কেউ হাঁচার চেষ্ঠা করেও হাঁচি না হলে, তাহলে এক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, কেউ একজন ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসে কিন্তু সাহস করে তাঁর ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারছে না।

১১. পাখি সংক্রান্ত সংস্কার :

আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কারগুলির মধ্যে পাখি সংক্রান্ত সংস্কারও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কাক, কোকিল, পেঁচা, শকুন আর ময়ূর এই বিশেষ কয়েকটি পাখি নিয়ে সমাজে সংস্কারের আধিক্য দেখা যায়। বিশেষ করে কাককে কখনও সু-নজরে দেখা হয় না। কারণ, পাখিদের মধ্যে কাককে খুব কুৎসিত দেখতে হয় এবং তার কণ্ঠস্বরও কর্কশ। কাককে সু-নজরে দেখা হয় না কারণ, কাক কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় সবসময় অশুভের ইঙ্গিত বাহক রূপে ধরা হয়। রাত্রেবেলায় কাক ডাকলে ঘোর অমঙ্গল হয়। কাকের বিষ্ঠা মাথায় পড়লে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভবনা থাকে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। কিন্তু কোকিলের ডাককে বেশ শুভ বলেই গন্য করা হয়। কোকিল ডাকলে বিয়ের সম্বন্ধ আসে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। পেঁচার ডাককে অশুভ বলে ধরা হয়। শকুনকে সাধারণত লোকালয়ে দেখা যায় না। কখনও কখনও ভাগাড়ে মরা গরু-মোষ ফেললে শকুনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অসময়ে লোকালয়ে এসে শকুন যদি ডাকে, তাহলে মহামারী এবং দুর্ভিক্ষার ইঙ্গিত বহন করে বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন। ময়ূরের ডাককে খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস রূপে বিবেচিত করা হয়। এছাড়া বেনে বউ পাখি ও কোকিল পাখির ডাককে সাঁওতালরা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দুই পাখি ডাককে শুভ সংবাদের আগাম বার্তা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১২. লোহা সংক্রান্ত সংস্কার :

পৃথিবীর সমস্থ দেশে সমস্থ জাতিই লোহাকে অশুভ শক্তির বিনাশক হিসাবে গণ্য করেন। আমাদের দেশেও বিভিন্ন সংস্কারের সঙ্গে লোহার প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজ জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যথা - জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংস্কারের সঙ্গে লোহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন – সদ্য প্রসূতি নারী একুশ দিনের মধ্যে বাড়ির বাইরে গেলে সঙ্গে কাস্তে রাখার নিধান রয়েছে। সাঁওতাল সমাজে সদ্য প্রসূতি শিশুকে যে খাটে শোয়ানো হয় সেই খাটের মাথার দিকে একটা তীর (যে তীর দিয়ে নবজাত শিশুর নাভী কাটা হয়েছে) উলম্ব ভাবে রেখে দেওয়া হয়। এই সংস্কারটি দাক্ষিনাত্যের সংস্কারের সাথে সুসম্পর্ক যুক্ত।

> "দাক্ষিনাত্যে সদ্য প্রসূতি যে, তার বিছানার প্রতি কোণে পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়। যে অস্ত্র দিয়ে নবজাতকের নাভঈকাটা হয়। সেই অস্ত্রটিই অশুভ আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে জননীর বালিশের তলায় স্থাপন করা হয়। কুম্ভেরা অস্ত্রটিকে এগারো দিনের জন্য স্থাপন করে রাখে। পাঞ্চালেরা রাখে পাঁচ দিনের জন্যে, আর কোরবেরা রাখে তিনদিনের জন্যে। সারস্বত ব্রাহ্মণপত্নী সন্তান প্রসবের পর দশদিন পর্যন্ত নাড়ী ছেদনকারী অস্ত্রটি নিজের কাছে রাখে।"[৯]

এতে নবাগত শিশু সমস্থ অশুভ এবং কু-নজর থেকে রক্ষা পায় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন। ডাইনি বা অপদেবতা হাত থেকে নবাগত শিশুকে রক্ষা করার জন্য শিশু হাতে পায়ে লোহা বা অষ্টধাতুর বালা পরানো হয়। ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় লৌহনির্মিত কাজল লতা রাখার সংস্কার আছে। মানুষের বিশ্বাস এটি বিভিন্ন রকম অশুভের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

বিবাহের সময় ভাবী বর-কনের হাতে লোহার জাঁতি ও কাজল লতা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এঁরা ধারণ করে থাকেন।

মৃতদেহ সৎকার করার পর শ্মশানযাত্রীদের আগুনের তাপ নিয়ে, লোহা স্পর্শ করতে হয়। এতে নাকি মৃত ব্যক্তি শ্মশানযাত্রীদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না বলে মানুষের বিশ্বাস। পরে মুখে তেতো জাতীয় কিছু দিতে হয় এবং মিষ্টি মুখ করে ঘরে ঢুকতে হয়। পরিবারে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে পরিবারের সবাই অশৌচ হয়। ঐ মৃত ব্যক্তির অশৌচ কাজ বা শেষকৃত্যের কাজ যিনি করেন তাঁর গলায় একটি লোহার চাবি ঝোলানো হয়। মানুষের বিশ্বাস এতে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঐ মানুষটির কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

এছাড়া বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য লৌহ জাতীয় কোনো জিনিসকে গরম করে জলে ডোবাতে হয়। আর সেই জল তৎক্ষণাৎ খেয়ে নিতে হয়। বাতের ব্যথা থেকে রক্ষা পেতে লোহার আংটি ব্যবহার করা হয়। অশুভ শক্তির হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকে ঘোড়ার ক্ষুর বাড়ির সদর দরজায় লাগিয়ে রাখে। কিছু কিছু এলাকায় অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় বা সন্তান প্রসবের করার সময় কোনো নারীর মৃত্যু ঘটলে তাঁর শেষকৃত্য যেখানে সম্পন্ন হয় তার চারিপাশে পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়। যাতে মৃতা নারীর আত্মা বাইরে বেরাতে না পারে। সাঁওতাল সমাজে এই সংস্কারটি একটু আলাদা। এক্ষেত্রে শেষকৃত্য করার আগেই মৃতা নারীর পায়ে কাঁটা ফোঁটানো হয়। যাতে মৃতার আত্মা কাউকে ভয় বা তাড়া করতে না পারে।

১৩. কৃষি সংক্রান্ত সংস্কার :

অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় কৃষি সংক্রান্ত সংস্কারও সমাজে বিশেষ একটা জায়গা করে নিয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশি কৃষি কাজ হয়ে থাকে। এই কৃষিকে কেন্দ্র করে দেশে নানান সংস্কার প্রচলিত। যা আমাদের দেশে তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত কৃষি সংক্রান্ত সংস্কারগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সংস্কার এখানে তুলে ধরা হল। অমাবস্যা বা বৌদ্ধ পূর্ণিমায় জমি হাল দেওয়া নিষিদ্ধ। যার গায়ে বেশি ফোঁড়া হয়, তাঁর নাকি প্রচুর শস্য হয় বলে বিশ্বাস। কুমড়া, লাউ, আলু, পটল ইত্যাদির জমিতে একটি মাটির হাঁড়িতে চুনের দাগ (বিজোড় সংখ্যায়) লাগিয়ে উল্টো করে রাখা হয় বা একটা খুঁটি পুঁতে তার উপর রাখা হয়। মানুষের বিশ্বাস এতে নাকি কারোর নজর লাগে না। নিজের জমিতে বীজ ফেলার আগে অন্য কাউকে দিতে নেই। মেঝেতে ধান ফেলে রাখলে সেই ধানের চারা হয় না। সরষে বোনার সময় হাত ভেজাতে নেই। বাসি কাপড়ে পানের বরজে ঢুকতে নেই। ডাক সংক্রান্তিতে ভালো ফলনের উদ্দেশ্যে ডাক দেওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন অর্থাৎ পয়লা মাঘ যেকোনো জমিতে হাল দেওয়া সাঁওতাল সমাজে বাধ্যতামূলক। কম করে তিন পাক হাল ঘোরাতে হয়। অথবা জমির তিন কোণে কোদালে তিন কোপ দিয়ে আসতে হয়। ধান কেটে ফেলার পর ওই ধানের চারাতে যদি আবার ধান হয়, তাহলে তা খেতে নেই। খেলে মানুষের আয়ু কমার সম্ভবনা আছে বলে মানুষের বিশ্বাস। এই ধরনের অজস্র কৃষি সংক্রান্ত সংস্কার আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত।

১৪. সু-লক্ষণ ও কু-লক্ষণ সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা দেখে সু-লক্ষণ ও কু-লক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। আর সেই মোতাবেক সমাজে নানা সংস্কারও প্রচলিত। যেমন - মেয়েদের হাঁটুর নিচে চুল থাকা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। তিন

সন্তানের পর যদি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে সে খুব সু-লক্ষণা হবে। সর্পের মিলন দর্শন সৌভাগ্যের সূচক। মেয়েদের বাম দিকে এবং ছেলেদের ডানদিকে সাপ দেখা সু-লক্ষণ সূচক। ছেলেদের জোড়া ভুরু সু-লক্ষণ-এর ইঙ্গিত। শকুনের কান্না মড়কের পূর্বাভাস জানান দেয়। বিড়ালের কান্নাকে রোগের সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। চিলের কান্না মৎস্যাভাবের সূচক বলে মানুষের বিশ্বাস। দাঁড় কাকের ডাক শোকের সূচক হিসাবে ধরা হয়। পেঁচার ডাক অর্থহীনতার সূচক। উঠোনে ঝাঁটা পড়ে থাকা খারাপ। সিঁদুর পড়ে যাওয়া অশুভের লক্ষণ। সোনা কুড়িয়ে পাওয়া খারাপ। নারীর বুকে লোমের আবির্ভাব কু-লক্ষণ। সকাল বিকাল জোড়া শালিক দেখা শুভ। দিনের বেলায় আকাশে তারা দেখা অশুভ। গোসাপ দেখলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। স্বপ্নে মৃত্যু দেখা ভালো। রাত্রিবেলায় লক্ষ্মী পেঁচা বা সাদা পেঁচা দেখা মঙ্গলজনক দেওয়াল থেকে ছবি পড়ে গেলে অমঙ্গল হয়। রাত্রে কাক ডাকলে অমঙ্গলের সূচক। মাথার উপর কাকপড়লে খুব অশুভ হয়। আম বেশি হলে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা গাছে বেশি তেঁতুল হলে ধানের ফলন ভালো হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। ছেলেদের দাঁত বাঁকা থাকলে ভাগ্যবান হয়। যেসব মেয়েদের কপাল চওড়া তারা খুব ভাগ্যবতী হয় হাতে পায়ে পাঁচটার কম বা বেশি আঙ্গুল থাকলে তা অলক্ষন হয় কপালে তিল থাকলে তা মোটেও সুলক্ষণ নয়, মেয়েদের দাঁত আঁকা হলে সেটা সুলক্ষণের নয়। পুরুষের বাম চোখ আর মেয়েদের ডান চোখ নাচলে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু পুরুষের ডান চোখ নাচলে ভালো কিছু লাভের আশঙ্কা থাকে সাঁওতালদের বিশ্বাস।

১৫. ভালো-মন্দ সংক্রান্ত সংস্কার :

মানুষ সর্বদাই নিজের ভালো-মন্দের সম্পর্কে সজাগ। কিন্তু ভালো চাইলেই তো আর ভালো থাকা যায় না। তাই যতটা সম্ভব ভালো থাকা যায় মানুষ সেটাই সারা জীবন অন্বেষণ করে গেছেন। মানুষের জানার কৌতুহল সীমাহীন আগ্রহ থেকে নানা রকম সংস্কারের জন্ম নেয়। সাঁওতালদের সমাজ জীবনে ভালো-মন্দ সংক্রান্ত সংস্কারগুলি হল - রাত্রে বেলায় চুল কাটতে নেই বা চুল আচড়াতে নেই। এটা অত্যন্ত খারাপ দিক বলে গণ্য করা হয়। রাত্রে নখ কাটা ভালো নয়। শিশুর নখ কাটতে নেই। শিশুর বয়স একবছর না হওয়া পর্যন্ত নখ কাটা যাবে না। কাটলে শিশুটি ভবিষ্যতে চোর ডাকাত হবে বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে। ঝাঁটায় পা দিতে নেই। রাত্রে বেলায় শিশ বাজাতে নাই। কেননা, শিশ বাজালে ডাইনি বিদ্যা শিখে যায় বলে সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার চলার সময় ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ। মোরগ লড়াই করতে যাওয়ার সময় খালি হাড়ি বা কলসি চোখে পড়লে তা মোটেও ভালো নয়। যদি কোন শিশু জন্মের সময় দাঁত নিয়ে জন্মায় তবে তার সারাটা জীবন খুব অশান্তির হয় বলে বিশ্বাস।

১৬. নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সংস্কার :

মানুষ সমাজ জীবনে নিজেকে ভালো রাখার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নিজের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু এই চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে জীবনে নানা রকমের বাধা নিষেধাজ্ঞা পালন করতে হয়। সাঁওতাল সমাজে পালনীয় নিষেধাজ্ঞাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিষেধাজ্ঞাগুলি হল - সকালে বাসি মুখে মিথ্যে কথা বলতে নেই। ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই। বালিশে বসতে নেই। বসলে পেছনে ফোঁড়া হয় বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। দরজার চৌকাঠে বসতে নেই। বসলে ঘোর অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। বটি সোজা করে রাখতে নেই। রাখলে নাকি মনের আশা আকাঙ্ক্ষা সব কাটা হয়। খেতে বসে গান গাইতে নেই। খেতে খেতে গান গাইলে লক্ষ্মী দেবী রাগ করেন এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে টাকা বার করতে নেই। কোন মানুষকে ডিঙিয়ে যেতে ন। ডিঙ্গালে বেঁটে হওয়ার সম্ভবনা থাকে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। রাত্রে বেলায় হাতিকে 'হাতি' বলতে নেই। বললে হাতির আবির্ভাব ঘটে। তাই রাত্রে বেলায় হাতিকে 'ঠাকুর' বলতে হয়। বৃহস্পতিবার নখ কাটতে নেই। কেননা বৃহস্পতিবার হল লক্ষ্মীবার এই দিনে নখ কাটলে অমঙ্গল নিশ্চিত বলে ধরা হয়।

প্রাচীন কাল থেকে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার মনুষ্য সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং বর্তমান পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সমাজ ব্যবস্থাতেও লোকে না বুঝেই মেনে চলে আসছেন। এই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার যে শুধু গ্রাম্য সমাজের নিরক্ষর মানুষের মধ্যে প্রচলিত তা নয়, অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন তথাকথিত শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও বহুল

প্রচলিত। শুধু সাঁওতাল সমাজ ব্যবস্থায় নয় বিশ্বের সমস্থ সমাজ ব্যবস্থায় এই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার সমানভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে।

Reference:

১. Source - https://superstition.americandictionary.org

২. Source - https://dictionary.cambridge.org

৩. বিশ্বাস, ডঃ বরুন কুমার, 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার', পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৬, পৃ. ২৪

৪. Read, Carveth, 'The Origin of Man and of His Superstition', London : Cambridge University Press, 1920, P. 6

৫. Krappe, Alexander H., 'The Science of Folklore'. New York : Barnes & Noble INC, 1929, P. 204

৬. Lings, Martin. 'Ancient Beliefs and modern superstition'. London : Perennial Books, 1965, P. 26

৭. Waring, Phillippa. 'A Dictionary of Omens & Superstitions'. Britain : Chartwekk Books, 1986, P. ৪

৮. বিশ্বাস, ডঃ বরুন কুমার, 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার'পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৯. বিশ্বাস, ডঃ বরুন কুমার, 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 700 - 705
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 700 - 705
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মুর্শিদাবাদ জেলার এক বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি : মুসলিম বিবাহ গীতি

নূরজাহান বেগম
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : begamnurjahan224@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Muslim wedding songs, Biye Gaouni, Nowsha, Jhumur, Iburo vat, Bibi, Demand.

Abstract

An ancient tradition of the Murhidabad district is the Muslim wedding songs. Since time immemorial, Muslim wedding songs have been enriching the folklore and folk culture of this district as well as entire Bengal. The main feature of the Muslim wedding songs in Murshidabad is a special type of folk music conducted and sung by the rural Muslim women of the villages. The singing programme continues for 6-7 consecutive days from 'Gaye Halud to Iburo Bhat'. Once, Muslim wedding songs were the main means of expression of the minds of rural Muslim women folk. Muslim women use to perform different types of songs for spending their leisure time and for entertainment on the occasion of marriages. Rural illiterate Muslim women of the Murshidabad district generally play a one-sided role in promoting and spreading the practice of Muslim wedding songs. Even the listeners of these songs are women. On this occasion, the entry of the men folk of the house are strictly forbidden. Muslim wedding songs are not only melodious, but also reflect the laughter, tears, sorrows, pains and joy that happen in our daily lives. Once, Muslim wedding songs were literally meant the wedding ceremonies and the songs about the bride and the groom. But nowadays Muslim wedding songs are not only limited to wedding related talks and accompaniments, rather this culture of Muslim wedding songs has also been constantly changing over time and according to geographical locations. In keeping with the wedding ceremony, the style of Muslim wedding songs has also changed in different places of the Murshidabad district. Muslim wedding songs of this district are actually one of the mirrors of society and culture. These songs highlight the various sporadic incidents that happen in daily human life. The happiness, sorrow, pain and suffering, social customs, various types of diseases, marital life of girls, social status of women, child marriage and ill effects of child marriage, widowhood, problem of old husband, polygamy of men, extramarital affairs, domestic violence against women, the negative impact of not getting polio vaccination in rural areas, the ill effects

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 700 - 705
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

of not receiving proper education are skillfully and beautifully portrayed through the Muslim wedding songs.

Discussion

ভূমিকা : ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি উৎসব পালিত হয় বহরমপুরের উৎসব মঞ্চে। মুর্শিদাবাদ জেলার জীবন্তী গ্রামের আনন্দ মণ্ডল ও এক্রাম সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদ জেলার মহিলাদের গাওয়া বিবাহ গীতকে অন্তঃপুর থেকে তুলে নিয়ে এসে আপামর বাঙালির কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আনন্দ মণ্ডল ও এক্রামের নেতৃত্বে একদল কম বয়সী মুসলিম মহিলাদের দল সর্বপ্রথম মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় এমন গান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পালিত লোকসংস্কৃতির উৎসব মঞ্চে গেয়ে শোনায়।[১] নিতান্তই গৃহবধূদের কাছে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ভরা মঞ্চে গান গাওয়ার পথটা মোটেও সহজ ছিল না। মুর্শিদাবাদ জেলার গোঁড়া রক্ষণশীল মৌলবি তন্ত্র ও মোড়ল গোষ্ঠীর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেই অন্তঃপুরের মহিলারা সর্বপ্রথম মঞ্চে গান গেয়েছিল।

বিষয়বস্তু : মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত গাওয়ার প্রচলন বহু প্রাচীন। তবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই সংস্কৃতির পরিবর্তনও হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। উনিশ শতকের পূর্বে গ্রামের মুসলিম মহিলারা নেহাতই শখের বশে বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত গাইত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই গানগুলি বাড়ির মহিলারা বংশ পরম্পরায় শুনে শুনে মনে রাখত। তবে এর স্রষ্টা কোনো পুরুষ নয়। পরবর্তীকালে সামান্য লেখা পড়া জানা মহিলারা নেহাতই কৌতূহল বশত বিয়ের গান গুলি খাতায় লিখে রাখতে থাকে। বর্তমান প্রজন্মের কিছু গবেষক এই গানগুলি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে।

উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিয়ে বাড়িতে গান করার জন্য বেশ কিছু মহিলা দল ছিল যারা 'বিয়ে গাউনি' নামে পরিচিত। বিবর্তনের ধারায় যা ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার চুঁয়া (হরিহরপাড়া ব্লক), ভরতপুর মিয়ে পাড়া (ভরতপুর ব্লক), জীবন্তি, জলঙ্গি প্রভৃতি গ্রামে কিছু সংখ্যক বিয়ে গাউনি দল এখনও টিকে আছে। 'বিয়ে গাউনি'রা বিয়েবাড়িতে খাওয়া দাওয়া বা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে গান গেয়ে থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার দীঘল গ্রামের বাসিন্দা বছর সাতচল্লিশের হারানি বিবি নিজের স্বামীর অত্যাচারে ঘর ছাড়ে। কিছু সময় পরে তার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা হারানি বিবির ঘুম কেড়ে নেয়। সারারাত জেগে থাকতে থাকতে হারানি বিবির মাথায় নানান ধরণের ভাবনার উদ্রেক হয়। এই কথা বা ভাবনা গুলিই হারানি বিবি সুর করে গুনগুন করে গাইতে থাকে। যা এক অন্য ধরণের গানের রূপ দেয়।[২] প্রথমে সখ করে হারানি বিবি বিনা পারিশ্রমিকে তার কষ্ট ও ভাবনা গুলিকে ঢোল বাজিয়ে গানের আকারে প্রকাশ করত। তার গানের সুর গান গাওয়ার ধরণ দেখে অনেকেই তাকে বিয়েবাড়িতে গান করার জন্য বায়না দিতে থাকে। যা হারানি বিবির ভবিষ্যৎ বদলে দেয়। হারানি পরিচিত হয় 'বিয়েগাউনি হিসেবে'। মুর্শিদাবাদ জেলার গজনিপুর গ্রামের হারানি বিবির গাওয়া বেশিরভাগ গানই যন্ত্রনাময় ও বাস্তব সম্মত। যেমন, বিয়া করো কন্যা খোঁজ খবর লইয়া/ খারাব হাতে পড়লেরে কন্যা/ চোখের জলের বইবেরে বন্যা।[৩] হারানি বিবির এই গানের মধ্য দিয়ে খোঁজ খবর না নিয়ে অপাত্রে বিয়ে হলে তার পরিনাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তার ইঙ্গিত দেয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার এক একটি এলাকায় এক এক ধরণের বিবাহ রীতির প্রচলন। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার বিবাহ গীতও এক এক জায়গায় এক এক রকম। স্থান বিশেষে গানের ভাষা, সুর ও পরিবেশনার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেখানে মুর্শিদাবাদ জেলার বেশিরভাগ জায়গায় বিয়ের দিন গীত গাওয়া হয় না, সেখানে বাংলাদেশ লাগোয়া লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চলে বিয়ের দিনে বর আসার আগে থেকে বর আসা পর্যন্ত বিয়ের গান গাওয়াটাই চিরাচরিত ঐতিহ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য জায়গায় সাধারণত বিয়ের প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত বাদ্য সহকারে বিয়ের গান গাওয়া হয়।

বর বা কনের গায়ে হলুদ (অর্থাৎ হলুদ মাখানো) ঠেকানোর সময় মহিলারা দল বেঁধে সুর করে গেয়ে ওঠে আজ কন্যার গায়ে হলুদ কাল কন্যার বি (ছেলের বিয়ে হলে বলা হয় নওশা বা ছেলি)/ বাপের বাড়ি ছেড়ে কন্যা যাবে নতুন বাড়ি (ছেলে হলে বলা হয় মায়ের লেগিন আনবি ছেলি নতুন ঝি)। এই কথার মধ্য দিয়ে বিয়ের পর মেয়েদের বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার চিরাচরিত প্রথাকে মনে করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ছেলের বৌ মানেই শ্বশুর বাড়ির বিনা পয়সার কাজের লোক, এই প্রচলিত ধারণাকেই প্রকাশ করা হয় গানের মাধ্যমে।[৪] বিয়ের একদিন আগে মাথায় তেল ঢালা (মাথায় তেল ঢালার অর্থ হল বিয়ের একদিন আগে, আবার কোথাও বিয়ের আগের দিন দুপুর বা সন্ধ্যে বেলা পাত্রপাত্রীকে একটি ছোট্ট জলচৌকির উপর বসিয়ে তার মাথায় তেল ঢেলে দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সেই তেল বর বা কণের মাথা থেকে মুছে নিয়ে যদি কোন অবিবাহিত যুবক যুবতী নিজের মাথায় মাখে তাহলে তার তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। তেল ঢালা অনুষ্ঠানে তাই সধবাদের পাশাপাশি গ্রামের যুবক যুবতীদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়)। তেল ঢালার সময় সাত জন সধবা মহিলা ও চার জন অবিবাহিত যুবতী বর বা কণের চারিদিকে গোল করে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে মহিলা দল সুর করে গায়, তেল ঢালো হে সই রাজকন্যার মাথাতে/ সেই তেলের গন্ধে দেমান্দ (বর) হবে গো মাতোয়ারা/ তেল ঢালো হে সই রাজকন্যার মাথাতে/ মাথা করো ঠাণ্ডা/ ঠাণ্ডা মাথাতে কন্যা করবে সবার মন জয় গো। (ছেলের বিয়ে হলে গানের কথাগুলি একটু পাল্টে যায়। যেমন, তেল ঢালো হে সই নওশার মাথাতে/ সেই তেলের গন্ধে বিবি (বউ) হবে গো মাতোয়ারা/ তেল ঢালো হে সই নওশার মাথাতে/ মাথা করো ঠাণ্ডা/ ঠাণ্ডা মাথাতে নওশা করবে শালির মন জয় গো)।[৫] এই বিবাহ গীতের মাধ্যমে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ভাসিত হয়। সেটি হল বিয়ের আগে বর বা কণে উভয়ের মনেই নতুন জীবন নিয়ে চিন্তার উদ্রেক হয়। মাথায় তেল দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়। তাই বিয়ের আগে তেল ঢালা অনুষ্ঠানটি করা হয়। ঝুমুর খেলা (বিয়ের আগের দিন বর বা কনেকে ছোট চৌকি বা জলচৌকিতে বসিয়ে তা মাঝখানে রাখা হয় এবং বর বা কনেকে ঘিরে বিজোড় সংখ্যার সধবা মহিলারা মাথায় ডালা নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে নিজের কণ্ঠে গান গেয়ে)। ঝুমুর খেলার সময় গাওয়া হয় আজ ঝুমুর খেলবরে সই (এই অনুষ্ঠানটি আগেকার দিনের যৌথ পরিবারকে নির্দেশ করে)। ক্ষীর খাওয়া (চাল, চিনি ও দুধ সহযোগে রান্না), থুবড়ো খাওয়া বা থাল খাওয়া (আইবুড়ো ভাত) আলমতলায় (বিয়ের মণ্ডপ) যাওয়া, জলভরা, বর আসা, কন্যা বিদায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মেয়েরা গান গেয়ে থাকে। মুসলিম বাবাহগীতি মানে যে শুধুই মজা ও হৈ হুল্লোড় তা নয়। এই গীতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মেয়েদের সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, বৈবাহিক জীবন, মেয়েদের সামাজিক অবস্থান, তাদের বৈধব্য জীবন, স্বামী ও শাশুড়ির অত্যাচার, পরকীয়া, বহুবিবাহ প্রভৃতিও নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।[৬]

মুর্শিদাবাদ জেলার চুঁয়া পাঠান পাড়ার বিবাহ রীতি একটু ভিন্ন। বিয়ের তিনদিন আগে ছেলে বা মেয়ের গায়ে হলুদ দেওয়ার আগে বাসর সাজানো হয়। বাসর সাজানোর অর্থ হল ছেলে বা মেয়েকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে খেজুর পাতার তৈরি একটি রঙিন পাটি নিয়ে চার জন মহিলা বর বা কনের চারপাশে ৭ বার ঘোরে। তারপর মা প্রথম মেয়ে বা ছেলের কপালে হলুদ ঠেকায়। মায়ের হলুদ ঠেকানোর সাথে সাথে মহিলারা সুর করে গেয়ে ওঠে, হলুদ বাঁটো হে রাঙা বৌ/ দামাদকে মাখাবো/ দামাদকে হলুদ মাখাতে ৫০০ টাকা লিব। এই গানের মাধ্যমে ছেলেকে হলুদ মাখিয়ে খুশি করে ছেলের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার প্রথাকে বোঝানো হয়। মেয়েকে হলুদ মাখানোর সময় গাওয়া হয়, হলুদ বাঁটো হে সই/ আমি মাখব রে আজ/ আমি নিব রে সই এমন দেমান্দ/ হেক্কে মাজা (পাতলা কোমর), লম্বা কুঁচা/ মুঠেই ধরবে রে মাজা/ হলুদ বাঁটো হে সই/ আমি মাখব রে আজ। এই গানের মাধ্যমে মেয়ের বিয়ের জন্য সুদর্শন পাত্র কামনা করা হয়েছে। পাত্রের রূপের বর্ণনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে পাতলা কোমর, লম্বা চোখ। পাতলা কোমর ঠিক এতটাই পাতলা যা হাতের মুঠোয় ধরা যাবে। অর্থাৎ রূপ শুধু মেয়েদের দেখা হয় তা নয়, ছেলেদেরও দেখা হয়।[৭]

চুঁয়া গ্রামের খাঁ সম্প্রদায়ের ফকিরদের বিয়েতে সিঁদুর দান এবং শুভদৃষ্টিও হয়। যা অন্যান্য মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দু ধর্মের ন্যায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী খাঁ দের বিবাহ অনুষ্ঠানে বর নব বধূকে প্রথমে সিন্দুর পরিয়ে দেয়। মেয়েরা স্বামীর মঙ্গল কামনা এবং আয়ু বৃদ্ধির জন্য সিঁদুর পরে। কিন্তু বর্তমানে ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীলতার জন্য এই নিয়মের অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। এখন শুধুমাত্র বিয়ের দিন নব বধূ সিঁদুর পরে। তারপর সামাজিক অশান্তির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 700 - 705
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভয়ে সিঁদুর পরাকে এড়িয়ে চলে। খাঁ সম্প্রদায়ের ফকিরদের শুভদৃষ্টি হিন্দু ধর্মের থেকে একটু আলাদা। হিন্দু ধর্মে যেখানে পানপাতা দিয়ে মেয়েরা মুখ ঢেকে রাখে এবং পানপাতা সরিয়ে সরাসরি বর-বৌ উভয়েই উভয়কে দেখে। কিন্তু চুঁয়ার ইসলাম ধর্মাবলম্বী খাঁ সম্প্রদায়ের ফকিরদের বিয়েতে শুভদৃষ্টি হয় আয়নার মাধ্যমে। একটি আয়না বর এবং কনের মাঝখানে রাখা হয় এবং সেই আয়নাতে বর বৌ উভয়ে উভয়ের মুখ দেখে।[৮]

বিয়ে বাড়িতে গান করতে গিয়ে যখন বিয়ে গাউনিদের দীর্ঘক্ষণ জল এবং খাবার খেতে দেয় না বা ভালো করে তরি তরকারি দেয় না এবং খাতির যত্ন করে না তখন ব্যাঙ্গ করে বিয়ে গাউনিরা গেয়ে ওঠে আফুলে অ্যাঁওলা/ কোন ঠ্যাঁটা বাড়ির বিহারে/ ভাতেরই ছড়াছড়ি তাও ভাতের পাশে নাই তরকারি/ আফুলে অ্যাঁওলা/ কোন ঠ্যাঁটা বাড়ির বিহারে।[৯]

বিবাহ গীতের মাধ্যমে পণপ্রথা ও পাত্রের দোষ ত্রুটিকেও বোঝানো হয়। যেমন 'দিবনা দিবনা বেটি মাতাল জামাইকে/ জনম যাবেরে বেটির মদের বোতল যুগাইতে'।[১০] এই গানের মাধ্যমে মেয়েকে সৎ পাত্রের সাথে বিবাহ দেওয়া এবং মদ্যপ পাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। মাগো মা সইতে পারি না আর ঐ সতীনের বাহার/ আমি থাকি গলা পেতে সতীনের গলায় সীতা হার/ মাগো মা সইতে পারি না আর ঐ সতীনের বাহার/ আমি থাকি খালি কাঁখে সতীনের ছেলের গলে পুস্প হার।[১১] এই গীতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের পুরুষদের বহুবিবাহ এবং একটি পত্নীর প্রতি দুর্বলতা এবং তাতে অন্য পত্নীদের অসহায়ত্ব ও দুঃখ যন্ত্রণাকেই তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে এই বিবাহ গীতের মাধ্যমে একদিকে নিঃসন্তান রমণীর যন্ত্রণা এবং অপরদিকে সন্তানের জন্ম দিতে পারায় অপর বধুর আদর ও আতিশয্য ফুটে উঠেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বাল্যবিবাহ বহুল প্রচলিত। তাই মুর্শিদাবাদ জেলায় কম বয়সী বা নাবালিকার সঙ্গে মাঝবয়সী বা বৃদ্ধের বিবাহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যপার। বিয়ে গাউনিরা তাই বাল্য বিবাহ নিয়েও নানা রকম গান বেঁধেছে। তার মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি গান হল 'ও মা টি মা দেখ আমার বুড়ু বাঁচে কিনা/ আমার বুড়ু খেতে চেয়েছে পুঁই।/ পুঁই টুঁই খেয়ে বুড়ু করে সাঁই সুঁই'।[১২] এই গানের মধ্য দিয়ে কম বয়সী মহিলার বয়স্ক স্বামী নিয়ে সংসার ও বিড়ম্বনার চিত্র ফুটে উঠেছে। অল্পবয়সী মেয়ের বুড়ো বরকে দেখে ভয় পাওয়া নিয়ে বিয়ে গাউনিরা গান বেঁধেছে 'মাগো মা বুড়াকে দেখে লাগে ডর/ বুড়ার গলায় নাই কোন স্বর/ বুড়া শুধু করে ঘড়ঘড়।[১৩] এই গানের মাধ্যমে নাবালিকা বধূর সঙ্গে অশীতিপর বৃদ্ধের বিবাহ এবং তাকে নিয়ে নাবালিকার সংসার করার যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধ বয়সে ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠাণ্ডা লাগলে গলার স্বর পাল্টে যায় এবং অনেক সময় গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে এক ধরণের শব্দ বের হয়। এই শব্দের সঙ্গে নাবালিকার পরিচয় না থাকা এবং তাতে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যপার।

'শাশুড়ি আমার যেমুন তেমুন মা/ স্বামী গলার মালা/ দেওর আমার যেমুন তেমুন মা/ স্বামী মাথার তাজ'।[১৪] এই গানের মাধ্যমে গ্রামীণ বধূর তার স্বামীকে প্রাধান্য দেওয়া এবং শাশুড়ি ও দেবরকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা ফুটে উঠেছে। 'বারো বছরে বিয়ে হলে/ হবে নানা যন্ত্রণা।/ মেয়ের অনুমতি ছাড়া মুসলিম বিয়ে হবে না'।[১৫] এই গানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল এবং বিবাহে মেয়েদের মতামতের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। ভরতপুর মিরে পাড়ার ৭৫ বছরের বৃদ্ধা ওলেমা বেওয়া, সাবেরা বিবি, তকিরা বিবি, তৈয়বা বিবি, হানিফা বিবি, কালোজিরে বিবি, অঞ্জুরা বিবি প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে একটি গানের দল তৈরি করেছে। এদের গানে বৈধব্য যন্ত্রণা, বাল্যবিবাহ, পুলিশ কেশ, শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার, সামাজিক নিপীড়ন প্রভৃতি ভীষণভাবে ফুটে ওঠে। 'তুমি সুহাগন নারী/ স্বামী আছে বেঁচে, তাই তুমি রাজরানী/ স্বামী মরলে গো কালকে, তুমি হবে ভিখারিনী'।[১৬] এই গানের মাধ্যমে বিধবা হওয়ার পর সমাজে মেয়েদের অবস্থা এক নিমেষেই কিভাবে বদলে যায় তা তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ গৃহবধূদের স্বামী মারা যাওয়ার সাথে সাথেই তাদের জীবন থেকে সমস্ত চাওয়া পাওয়া, মান সম্মান সব হারিয়ে যায়। এই ঘটনাকেই রাতারাতি রাজরানী থেকে ভিখারিনী হয়ে যাওয়া বুঝিয়েছে। অনাদি কাল থেকে বৈধব্য জীবনের দুর্দশা যেন স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই বিদ্যমান।

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ মেয়েদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হল বিড়ি বাঁধা। বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করার পর অবসর সময়ে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মহিলারা দল বেঁধে বিড়ি বাঁধতে বসে। স্বভাবতই মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের মহিলারা অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার পরিশ্রমী মহিলাদের নিয়ে বিয়ে গাউনিরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 700 - 705
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গান বেঁধেছে, ভাত দেয় না ভাতারে/ ভাত দেয় গতরে/ দ্যামাক দেখাস না ভাতার/ খাব না তর ভাত/ যেইরো খাটাব গতর, সেইরো পাব ভাত। এই কথার মধ্য দিয়ে পরিশ্রমী মহিলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে। সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও যখন স্বামী অহংকার দেখায় তখন গ্রামের খেটে খাওয়া মহিলারা নির্দ্বিধায় বলতে পারে তোমার অহংকার সহ্য করব না, আমি পরিশ্রম করতে পারি এবং পরিশ্রম করেই খাই এবং নিজের টা নিজেই করে নিতে পারব।[১৭] বিড়ি বাঁধতে জানা মহিলাদের নিয়ে বিয়ে গাউনিরা গায়, বাঁধতে জানি বিড়ির পাক/ খাব না আমি ভাতারের ভাত। এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল মেয়েদের আত্মমর্যাদার কথা ফুটে উঠেছে। বিড়ি বাঁধতে জানা মহিলারা সারা মাসে যা রোজগার করে তা কোনমতে তাদের নুন ভাতের জোগান হয়ে যাবে।[১৮] এই কথা মাথায় রেখে বিয়ে গাউনিরা বিড়ি শ্রমিকদের স্বামীর অত্যাচার সহ্য না করে নিজের মত চলার নিদান দিয়েছে।

বিয়ে গাউনিরা বিয়ে বাড়িতে বিভিন্ন মজার সম্পর্ক যেমন বেয়াই, বেয়ান, দেওর, নন্দাই এদের নিয়েও বিভিন্ন গান করে থাকে। চুঁয়ার বিয়ে বাড়িতে শোনা নন্দাইকে নিয়ে বাঁধা এমন একটি গান হল, আষাঢ় মাসের রথের মেলায়/ যাব নন্দু সাঁঝের বেলায়/ ঐ আমার নেশাতে ঢুলু ঢুলু আঁখিরে/ আমার নন্দু দিয়েছেরে পাগলা কার দোকানের মদ/ সেই দোকানের মদ খেয়ে আমি ঢুলে ঢুলে পরি।[১৯] এই গানের মাধ্যমে নন্দাই এর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা ও মজার সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। দেওরকে নিয়ে মজা করে গাওয়া একটি গান হল, ভাদুর মাসের ভেদরে বানে/ লা ভেসেছে নবাবের গাঙে/ ঐ আমি লায়ে চেপে/ বেরা ভাসা দেখবরে পাগলা দেওরের সাথে।[২০] মুর্শিদাবাদ জেলা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। তাই এখানে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার তীরবর্তী বেশিরভাগ গ্রামেই বন্যা হয় ভাদ্র আশ্বিন মাসে। ইতাহাস সমৃদ্ধ মুর্শিদাবাদ জেলার চিরাচরিত একটি ঐতিহ্য হল বেরা ভাসানো। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীতে বেরা ভাসান অনুষ্ঠান হয়। এই গানের মাধ্যমে ভেদরে বান বলতে ভাদ্র মাসের বন্যাকে বোঝানো হয়েছে। লা অর্থাৎ নৌকা। নৌকায় করে দেওরের সঙ্গে বেরা ভাসান বা মেলাতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিয়ে বাড়ির গীত মানে শুধুই যে ছেলে বা মেয়েদের বিভিন্ন অনুভূতি, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতি নীতি তা নয়। চুঁয়া পাঠান পাড়ার সায়রা বানু তার চোখে দেখা বিভিন্ন ঘটনা এবং নিজের কানে শোনা কিছু কথাকে গানের রূপ দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিয়ে বাড়িতে ঢোল বাজিয়ে বা তালি সহযোগে পরিবেশন করে থাকে। রুকনপুরের এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত মুদি দোকানি সুরেন মণ্ডল অতিরিক্ত মদের নেশায় আজ সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারি। সায়রা বানু সুরেন বাবুকে নিয়ে গান বেঁধেছে, আগে ডাকত সুরেন বাবু/ এখন দাকে সুরনা রে/ মদের দৌলতে গেল মুদিখানা/ সুরেন শুন শুনরে বাড়ি, গাড়ি, টাকা, পয়সা সবকিছু তোর ছিল/ মদের দৌলতে সবই হল খুন।[২১]

উপসংহার : যেসমস্ত বাড়িতে মেয়েরা নিজেরাই গান করে সেখানে এই দলগুলি অপ্রয়োজনীয়। সাধারণত বাড়ির ভেতর বাড়ির ও প্রতিবেশী মহিলারাই বিয়ের গান গেয়ে থাকে। ঢোল বাজিয়ে আবার কোথাও তেলের টিন বাজিয়ে গীত করার পাশাপাশি কোথাও কোথাও মহিলারা তাল ও সুর মিলিয়ে নৃত্য পরিবেশনও করে। ঢোলগুলিও মহিলারাই বাজিয়ে থাকে। তবে এই সমস্ত মহিলাদের প্রথাগত প্রশিক্ষণ কখনই ছিল না, আর আজও নেই। সবটাই তাদের নিজস্ব তালজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত এই গানের অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষরা নিতান্তই ব্রাত্য। তাই এই গানের অনুষ্ঠানে মেয়েরা একটি নিজস্ব পরিসর পায়। যেখানে তারা খোলামেলা ভাবে গান, নাচ ও কাপ (অভিনয়) প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজের নিজের পারদর্শিতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ করতে পারে। মেয়েদের এই পারদর্শিতা শুধুমাত্র অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ। অন্তঃপুরের ভেতরে গাওয়া গান লোকাচারের অংশ হিসেবে বাইরের জগতে শুধুমাত্র একটি শিল্পধারা হিসেবে প্রকাশ করতে চাওয়ায় আছে পুরুষতন্ত্রের বাধা।

মুসলিম হাদিস অনুযায়ী বিবাহ আসরে গান বাজনা করা নিষিদ্ধ। তাই শরীয়তপন্থীরা বিয়ের আসরে গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তথাপি বর্ধমান জেলা লাগোয়া সালার, ভরতপুর প্রভৃতি জায়গা সহ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকাতে এখনও বিবাহ গীত কিছুটা হলেও চলছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও পরিবর্তনশীল। বর্তমানে হিন্দি গানের সুর ও তালের দাপটে ফিকে হয়ে পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম ঘরানার বিয়ের গানের শিল্পীরা। আধুনিক প্রজন্মের কাছে তাই ক্রমাগত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে মুসলিম বিয়ের গান। আধুনিকতার জোয়ারে বিলুপ্তির পথে হাঁটতে শুরু করেছে মুর্শিদাবাদের

একটি উল্লেখযোগ্য লোকসংস্কৃতি। উৎসব মঞ্চে এই শিল্পীদের কিছুটা কদর থাকলেও পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে এবং সমাজে ভীষণভাবে অবহেলিত।[২২] কিছু গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মুসলিম মহিলারা এই বিবাহ গীতকে বর্তমানে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। তার প্রধান কারণ হল পারিশ্রমিক। বিয়ে গাউনিরা যে পরিমাণ অর্থ বিয়ের গান করে রোজগার করে তার পরিমাণ অতি সামান্য। সেই সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে হাত খরচ চালানো গেলেও সংসার চালানো সম্ভব নয়। সংসার চালাতে গেলে বিয়ে গাউনিদের অবশ্যই বিকল্প অর্থ সংস্থানের পথ দরকার। বিড়ি বেঁধে বা চুল ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ মহিলারা বরং বিয়ে গাউনিদের থেকে বেশি অর্থ রোজগার করতে পারে। উপরন্তু বিয়ে গাউনিরা সামাজিক মর্যাদাটুকুও পায়না।[২৩] তাই অধুনা মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ঐতিহ্য মুসলিম বিয়ের গান ক্রমাগত হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে আশার কথা এই যে, এই বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমানে এদের গান রেকর্ড করে রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ইউটিউবার ও ক্যাসেট কোম্পানিগুলির মধ্যে। যার ফলে হয়ত দেখা যাবে অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে গাউনি হিসেবে কোন পেশা বা দল না থাকলেও গানের অস্তিত্বগুলি স্বমহিমায় টিকে থাকবে যতদিন তার গ্রহণ যোগ্যতা থাকবে।

Reference:

১. মালিনী ভট্টাচার্য ও সোমা মুখোপাধ্যায়, *মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গান*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১
২. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
৩. সাক্ষাৎকার : হারানি বিবি, গজনিপুর গ্রাম, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৪. সাক্ষাৎকার : রোকেয়া বিবি, চুঁয়া পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৫. সাক্ষাৎকার : রুবিনা বিবি, চুঁয়া পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৬. ক্ষেত্রসমীক্ষা - মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বিয়ে বাড়ি
৭. সাক্ষাৎকার : সায়রাবানু, চুঁয়া পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৮. ক্ষেত্রসমিক্ষা : চুঁয়া, নতুন পাড়া ,বিয়ে বাড়ি , ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৯. সাক্ষাৎকার : রায় বিবি, চুঁয়া, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
১০. সাক্ষাৎকার : তামান্না খাতুন, সালার, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১১. সাক্ষাৎকার : আকলিমা বিবি, রতনপুর, ব্লক বেলডাঙ্গা ১, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ০৭.০৩.২০১৯
১২. সাক্ষাৎকার : ওলেমা বিবি, ভরতপুর ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৩. সাক্ষাৎকার : নাড়ু বিবি, মালিহাটি তালিবপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১২.০৯.২০২২
১৪. সাক্ষাৎকার : চুমকি খাতুন, ভরতপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৫. সাক্ষাৎকার : ওলেমা বিবি, ভরতপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৬. সাক্ষাৎকার : ওলেমা বিবি, ভরতপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৭. সাক্ষাৎকার : আসেরা বিবি, চুঁয়া, নতুন পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
১৮. সাক্ষাৎকার : ফিরোজা বিবি, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
১৯. সাক্ষাৎকার : রেজা বিবি, চুঁয়া, নতুন পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
২০. সাক্ষাৎকার : জরিনা বিবি, চুঁয়া, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
২১. সাক্ষাৎকার : সায়রাবানু, চুঁয়া, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা ব্লক, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
২২. তদেব
২৩. তদেব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 706 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 706 - 714
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাউল সাধনার প্রেক্ষিতে লোকচিকিৎসা : ঐতিহ্য, দর্শন ও প্রাসঙ্গিকতা

নিরঞ্জন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : niranjanju9@gamil.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Folk Medicine, Baul, Spiritual Practice, Tradition, Philosophy, Baul Song, Yoga, Guru-Shishya, Disease Relief, Habits, Health.

Abstract
Baul practice is a unique and profound theoretical and cultural tradition of Bengal. It is not merely a spiritual journey but also a distinctive approach to improving physical, mental, and social well-being. The philosophy and practices of the Bauls inherently incorporate elements of folk medicine, primarily guided by natural and spiritual knowledge. In Baul philosophy, the body is regarded as a vessel for attaining Brahmatattva (the ultimate truth of the divine). Bauls believe that spiritual enlightenment is unattainable without a healthy body. Based on this belief, they utilize various herbal plants and natural elements to treat ailments. Their methods of folk medicine include specific rituals, music and meditation, which play a significant role in enhancing the mental health of individuals. The philosophy of Baul practice emphasizes maintaining harmony between the individual and the collective. It holds that the fusion of natural energy and consciousness within the human body is the true source of health and happiness. Although Baul folk medicine does not rely on modern medical equipment or pharmaceuticals, it has the potential to bridge the knowledge of ancient traditions with modern healthcare practices. Thus, Baul folk medicine is not merely a traditional element but a vital healthcare system for marginalized communities. It can be considered a complementary approach to modern medical science. Through this practice, we observe a profound philosophy of respect for nature and the pursuit of self-purification.

Discussion

বাউল সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে সাধনা করে থাকে তা মূলত গুরুমুখীবিদ্যা অর্থাৎ একজন সমাজের সাধারণ মানুষ প্রথমে গুরুর কাছে আশ্রয় নেয়, তারপর ধীরে ধীরে গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করে, একজন প্রকৃত বাউল সাধক হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হয়। এই পথ বেশ দীর্ঘ। গুরু সবসময়ই লক্ষ্য রাখে তার শিষ্য সঠিকভাবে সবকিছু শিখতে পারছে কিনা? তাই গুরু মাঝে মাঝে শিষ্যকে বোঝার জন্য পরীক্ষা করে থাকে। বাউল সাধকেরা সবসময়ই তাদের গানের মাধ্যমে সাধারণ

সমাজের কাছে নিজেদের কথা, চিন্তা ভাবনাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। আবার কখনও কখনও সাধনার গূঢ় তথ্য বা কোনো পদ্ধতি সম্পর্কে গানের মাধ্যমে শিষ্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। কারণ এই কঠিন ও জটিল বিষয়গুলিকে নানা সঙ্কেত এর মধ্য দিয়ে গানের মধ্যে ধরা থাকে। যা চর্যাপদে বিভিন্ন গানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে দেহকে নীরোগ রাখার জন্য বাউল সাধকরা ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির নানান দিক তাদের গানের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই মাংস খায় না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির বহু পূর্ব থেকেই এরা জানে যে পাকস্থলীর সুস্থতাই দেহকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখতে পারে। এ বিষয়ে গার্ভারের মত হল, জীবনযাপন অভ্যাসগুলোর জ্ঞান আমার এবং আমার রোগীদের চিকিৎসায় বিশাল উপকার করে। এই যোগীরা তাদের পরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছে যে, এক সময়ে শুধুমাত্র এক নাসিকা পথ কাজ করে এবং কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়া এটি প্রায় এক ঘণ্টা পরপর পরিবর্তিত হয়। এক নাসিকা পথ যান্ত্রিকভাবে পরিবর্তন করতে হলে শুধু পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে হয়, পাঁজরের নীচে এবং বগলের নীচে একটি বালিশ রাখতে হয় এবং কয়েক মিনিটের জন্য নাসার মিউকাস নীচের দিকে যেতে দিতে হয়, যার ফলে উপরের নাসিকা পথ খুলে যায়। তারা দেখেছে যে ডান নাসিকা পথ খোলা থাকলে বাম মস্তিষ্ক প্রধান হয় এবং উল্টোটাও সত্য। সুতরাং, কোন নাসিকা পথ খোলা তা নিয়ন্ত্রণ করে, মস্তিষ্কের হেমিস্ফিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গার্ভার নাসিকা পথ নিয়ন্ত্রণ করাকে তাঁর জীবনের জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন। খাওয়ার আনন্দ (ডান নাসিকা), মলত্যাগ (ডান), স্নান (ডান), যৌন ক্রিয়া (পুরুষের জন্য ডান এবং মহিলাদের জন্য বাম), পান করা (বাম), এবং মূত্রত্যাগ (বাম) নাসিকা পথ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। নাসিকা পথ এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপের সাথে সঠিক সমন্বয় শক্তি সংরক্ষণ করে এবং এই কাজগুলোকে আরও সহজ এবং আনন্দদায়ক করে তুলতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ বাউল সম্প্রদায়ের মানুষই নিরামিষাশী খাদ্য গ্রহন করে। কারণ তারা মনে করে, পাকস্থলীই অগ্নির উৎস। তাই পাকস্থলীকে সুস্থ রাখতে নিরামিষ খাদ্য গ্রহন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে গার্ভার বলেছেন –

> "Japannese investigators have recently found the hallucinogenic chemical, dimethyltryptamine (DMT) in the urine of schizophrenics. Their evidence suggests that this abnormal chemical collects in genetically susceptible individuals after large amounts of tryptamine (parent amino acid to DMT) is produced by bacteria in the colon where the individual is constipated and the bacteria cannot be eliminated."[১]

অর্থাৎ জাপানি গবেষকরা সম্প্রতি স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মূত্রে হ্যালুসিনোজেনিক রাসায়নিক ডাইমেথাইলট্রিপটামিন (DMT) খুঁজে পেয়েছেন। তাদের প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে এই অস্বাভাবিক রাসায়নিকটি জেনেটিকভাবে সংবেদনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে জমা হয়, যখন বৃহৎ পরিমাণে ট্রিপটামিন (DMT-এর মূল অ্যামিনো অ্যাসিড) কোলনে উৎপন্ন হয় এবং ব্যক্তি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, যার ফলে ব্যাকটেরিয়া দূর করা যায় না।

আধুনিক চিকিৎসায় ডাক্তারবাবুরা মানুষকে বেশি বেশি জল খাবার পরামর্শ দেন। বেশি জল খেলে শরীর সুস্থ থাকবে এবং শরীরে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ খুব সহজেই শরীর থেকে নির্গত হতে পারবে। বহু বছর আগে থেকে বাউল সম্প্রদায়ের সাধকরা জলের ব্যবহার করে শরীরকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায় সে বিষয়ে সচেতন ছিলো। তাদের মতে নাক দিয়ে জল গ্রহণ করে, যদি সেই জল মুখ দিয়ে বের করা হয় ও এই প্রক্রিয়া বার বার করলে মানুষ শ্লেমামুক্ত হবে। এছাড়াও যদি মুখ দিয়ে জল গ্রহণ করে, তা যদি ধীরে ধীরে নাকের মাধ্যমে নিঃসরণ করা যায়, তাহলে শরীর লাবণ্যময় হয়ে উঠবে, জড়তা দূর হবে এবং অতি সহজে বার্ধক্য জনিত সমস্যা হবে না। এছাড়াও কফ জনিত সমস্যা থেকেও মানুষ নিজেকে সুস্থ রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে হরিশ জোহারী র ধান্বান্তারি গ্রন্থ থেকে জানা যায় –

> "Knowledge and practice of the principles of breath science enables one to control his state of consciousness and prevent disease states."[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 706 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ শ্বাস বিজ্ঞানের নীতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং অনুশীলন একজনকে তার চেতনার অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রোগের অবস্থা প্রতিরোধ করতে সক্ষম করে।

বাউল সাধনায় লোকচিকিৎসার নানা প্রসঙ্গ : বাউলদের পঞ্চরস সাধনা একটি বিশেষ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে তারা নিজের দেহকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সুস্থ রাখতে সক্ষম হয়। তারা মনে করে প্রাকৃতিক ভাবে আমরা যা কিছু পেয়েছি তা সব কিছুই মূল্যবান সম্পদ। সাধারণ সমাজের কাছে যা কিছু অপবিত্র বা নোংরা বলে পরিচিত তারা সেই সব কিছুকেই দেহ শোধন করার কাজে ব্যবহার করে। তাই তারা মনে করে ‘আপনি আছরি ধর্ম পরেরে শেখায়’ তাই তাদের সাধনার কাজ মূলত নিজেদের উপরে পরীক্ষা করা। সেই সাধনায় যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তাহলে সেই সুফল বা সুচিকিৎসা সাধারণ মানুষকে তারা মানব কল্যাণ অর্থে যুগ যুগ ধরে দান করে।

বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া বাউল সাধনা একধরনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ। বহু শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। বাউলদের মতে জীবনের আসল অর্থ খুঁজে পাওয়া এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করার জন্য পঞ্চরসের সাধনা অপরিহার্য। এই পঞ্চরস হল মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য ও দুগ্ধ। যদিও এই বিষয়গুলি সাধারণত তুচ্ছ বা অশুচি হিসেবে সমাজে প্রচলিত রয়েছে বাউল দর্শনে এইগুলির গভীর তাৎপর্য রয়েছে। বাউলেরা বিশ্বাস করে যে আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য শরীরই প্রধান মাধ্যম। তাদের মতে দেহ একটি মন্দির এবং এই মন্দিরের প্রতিটি উপাদানই পবিত্র। তাই দেহের নির্গত পদার্থগুলিও সাধনার অংশ হতে পারে। এই পঞ্চরসকে কেন্দ্র করে তাদের সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বাউল সাধনায় মল-মূত্রের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সাধারণ সমাজে মল ও মূত্রকে সাধারণ ভাবেই ঘৃণার চোখে দেখা হয়। কিন্তু বাউলেরা মনে করে এই পদার্থগুলোর মধ্যেও জীবনের মূল সত্য লুকিয়ে রয়েছে। বাউলদের মতে মল ও মূত্র দেহের বর্জ্য হলেও এরা দেহের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ফল এবং এদের সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করার উপায় জানা থাকলে দেহের নানান ধরনের রোগ ব্যাধিকে সম্পূর্ণ রূপে দূর করা সম্ভব হয়। নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা নিরাময়ের জন্য যেভাবে মূত্রের ব্যবহার করা হয়, আগেকার দিনে মায়েরা বাচ্চাদের পেটের সমস্যা দূর করার জন্য তারই মূত্র খাওয়াতো, প্রাচীনকালের মুনি-ঋষি বা যোগী সাধকরা মূত্র পানের মাধ্যমে নানান শারীরিক সমস্যার সমাধান করতো বলে জানা যায়। আগেকার দিনে যেকোনো বয়সের মানুষও পেটের ব্যাথায় প্রস্রাব পান করতো। মাথা ব্যাথা দূর করার জন্য মাটির সঙ্গে প্রস্রাব মিশিয়ে তা লাগানো হত। এছাড়াও চোখ, কান, দাঁত, ত্বকের সমস্যার ক্ষেত্রে মূত্রের উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করলে তা নিরাময় হয়। ক্যান্সার,বহুমূত্র এবং যক্ষা রোগীদের ক্ষেত্রেও মূত্রের প্রচলন ছিল। বাউল সম্প্রদায়ের সাধকদের মাধ্যমে জানা যায় মুখ নিঃসৃত থুতু ব্যবহারের মাধ্যমে চর্ম রোগের বিভিন্ন সমস্যা দূর করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে শরীরের কোনো স্থানে যদি ফোড়ার সৃষ্টি হয় সেখানে আঙুলের সাহায্যে থুতু লাগালে তা আর বৃদ্ধি পাবে না ও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। জ্বর হলে বাউল সাধকেরা শরীরে মূত্র লেপন করে।

রজঃকে বাউল সাধকেরা সাধনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পবিত্র বস্তু বলে মনে করে। নারীর শরীরের এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি তাদের কাছে সৃষ্টির প্রতীক। রজঃকে কেন্দ্র করে বাউল সাধনায় নারী শক্তির আরাধনা করা হয়। তাদের মতে নারীর এই রজঃ পাত্র হল শক্তির উৎস, যা নব জীবনের মূল উৎস। রজঃ পানের মাধ্যমে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা যায়। তাই কেউ যদি নিয়মিত রজঃ পান করে তাহলে দীর্ঘদিন নিরোগ থাকা যায়। বীর্যকে বাউলরা জীবনী শক্তির প্রতীক হিসেবে মনে করে। বীর্য দেহের অন্যতম প্রধান উপাদান। এটি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। বাউল সাধনায় বীর্য সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করা যায়। বাউলরা বিশ্বাস করে বীর্য সংরক্ষণ করে এই শক্তিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বীর্য পানের ফলে দেহের বহু রোগ দূর হয় এবং দেহ লাবণ্যময় থাকে, বীর্য পানের ফলে সহজে বীর্য স্খলন হয় না। দুগ্ধ বা দুধ বাউলদের সাধনারই অঙ্গ। এটি সৃষ্টি ও জীবনের প্রতীক বলে তারা মনে করে। তারা মনে করেন দুধ হল সেই পবিত্র তরল যা দেহ ও মনকে পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে। দুগ্ধ পানের মাধ্যমে শরীরে পুষ্টি সম্পন্ন হয়। জানা যায় বহু বাউল সাধক মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 706 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে পান করে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বাউলদের বহু আখড়ায় যারা যক্ষা রোগে আক্রান্ত হতো তারা নিয়মিত মাতৃ দুগ্ধ পান করে সুস্থ থেকেছে।

বাউলদের মতে পঞ্চরসের সম্মেলন দেহ ও মনের শুদ্ধিকরণের এক মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা সাধনার দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ করে জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। বাউল সাধকরা মনে করে দেহের প্রতিটি অংশ এবং প্রতিটি ক্রিয়া আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে। সাধনায় দেহ ও মনকে একীভূত করার মাধ্যমে চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করা সম্ভব বলে সাধকরা মনে করে। বাউল সাধনায় পঞ্চরসের ব্যবহার শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমাজে প্রচলিত চিন্তা ধারার বিপরীত প্রতিবাদও বটে। বাউলরা প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেরাই নিজেদের আধ্যাত্মিক মুক্তির অনুসন্ধান করে থাকে। তারা মনে করে সমাজে প্রচলিত রীতি নীতি ও বিধি নিষেধ মানবতার আসল চেহারা দেখার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। বাউল সাধনায় পঞ্চরসের ব্যবহার একটি গভীর আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন। এই ধরনের সাধনা প্রমান করে যে জীবনের আসল সত্য খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের দেহের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি ক্রিয়ার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা ও বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতিকে এবং নিজেকে জানতে হবে। পঞ্চরসের মাধ্যমে বাউল সাধকেরা দেহ ও মনের মিলনের মাধ্যমে জীবনের মূল সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এই সাধনার মাধ্যমে তারা উন্নত সমাজ সভ্যতার সাথে যে প্রকৃতির দূরত্ব বেড়েই চলেছে তা খানিকটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছে।

পঞ্চরসের ন্যায় বাউল সমাজে চারিচন্দ্র একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। মল, মূত্র, রজঃ ও বীর্যের মিশ্রণকে সাধারণভাবে চারিচন্দ্র বলা হয়। এই চারিচন্দ্রের মিশ্রণকে তারা ‘প্রেম ভাজা’ নামে অভিহিত করে থাকে। বাউল সাধকরা বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই তাদের মধ্যে একধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থারও প্রচলন রয়েছে। এই চারিচন্দ্রের মিশ্রণে তৈরি প্রেম ভাজা ব্যবহার করে দেহের চর্ম রোগসহ অন্যান্য নানান রোগের ঔষধ তৈরি করতে সক্ষম। বাউলদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে তন্ত্র সাধনাও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে দেবী প্রসাদের লেখা থেকে জানা যায় –

> “As a matter of fact, it is in field of alchemy that the contribution of the Tantrikas to Indian science was most notable.”[৩]

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এটি রসায়নের একটি ক্ষেত্র এবং ভারতীয় বিজ্ঞানে তান্ত্রিকদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তাছাড়াও P. C. Roy - এর লেখা গ্রন্থ ‘History of Hindu Chemistry’ থেকে জানা যায় –

> “Indian Alchemy very largely derives it s colour and flavour from it (Tantrism). There is a curious mixture of alchemical processes on the one hand, and grotesque and obscene and sometimes rites on the other.”[৪]

অর্থাৎ ভারতীয় রসায়ন অনেকাংশে এটির রং এবং গন্ধ। এটি (তন্ত্রবাদ) থেকে পেয়েছে, একদিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এক কৌতূহলী মিশ্রণ, অন্যদিকে অদ্ভুত এবং অশ্লীল আচার দেখা যায়। চারিচন্দ্র হল বাউল গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। যা বাউলদের দেহতত্ত্ব সাধনার অংশ। চারিচন্দ্রের যে চারটি উপাদানের কথা আগে আলোচনা করেছি প্রতীকী ভাষায় এই চারিচন্দ্র-র বাউল গানে উল্লেখ পাওয়া যায়। লালন ফকিরের রচিত একটি গান আমরা এখানে উল্লেখ করছি, –

“চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।
তার দুটি চন্দ্র প্রকাশ হয় তাই জানে অনেক জন।।
যে জানে সেই চন্দ্রভেদকথা বলবো কী তার ভক্তির ক্ষমতা
যে চাঁদ ধরে পাই চাঁদের অন্বেষণ সে চাঁদ কেউ পায় না গুণে ।।
এক চন্দ্রে চার চন্দ্র মিশে রয় ক্ষণেক ক্ষণেক বিভিন্ন রূপ হয়
ও সে মণিকোঠার খবর পেলে সকল খবর সেই জানে।।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 706 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধরতে পারে মূল চন্দ্র কোনজন গরল চন্দ্রের করো নিরূপণ
সিরাজ শাঁই কয় দেখরে লালন আছে বিষামৃত মিলনে।।"[৫]

এই গানে লালন উল্লেখ করেছে যে দেহের ভিতরে চারটি চন্দ্র রয়েছে এবং তাদের ভেদ করতে জানলে সাধক তার ভক্তির ক্ষমতার প্রসার ঘটাতে পারবে। এই চারিচন্দ্রের ধারণাটি বাউল সাধকদের অনন্য সাধনা ও বাউল তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা তাদেরকে অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায় থেকে পৃথক করতে পারে। এই সাধনার মাধ্যমে বাউল সাধকরা দেহের ভেতরের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান করে এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাউল সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গভীর আধ্যাত্মিকতা ও সহজিয়া পথ। বাউলরা মূলত ভক্তি সাধনায় বিশ্বাসী তবে তাদের সাধনার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় তন্ত্র ও যোগ সাধনার মিশ্রণ দেখা যায়। তন্ত্র সাধনা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তন্ত্র মূলত শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের উপায়। বাউল সাধনায় তন্ত্র সাধনার প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাউল সাধকগণ বিশ্বাস করে যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারলে আত্মার মুক্তি সম্ভব। তন্ত্র সাধনায় বিভিন্ন মন্ত্র ও মুদ্রার মাধ্যমে শক্তিকে জাগ্রত করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বাউল সাধকেরা তন্ত্র সাধনার মধ্যে যোগ সাধনার মিশ্রণ ঘটিয়েছে। তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করে। বাউলরা বিশ্বাস করে যে শরীর হল প্রকৃত মন্দির, এই মন্দিরে ঈশ্বরের আসন রয়েছে। তাই ঈশ্বরের যথাযথ যত্ন ও উন্নতি তাদের অন্যতম লক্ষ্য। যোগ সাধনা হল শারীরিক ও মানসিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে আত্মার উন্নতির পদ্ধতি। বাউলগণ বিভিন্ন যোগ সাধনার পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। তাদের সাধনার ক্ষেত্রে প্রায়ই হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগের উদাহরণ পাওয়া যায়। বাউলদের মতে যোগ সাধনার মাধ্যমে শরীর ও মনের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় যা আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বাউলরা তাদের গানের মাধ্যমে যোগ সাধনার বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে থাকে। গানের গভীরতা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতিফলন যা একজন সাধকের জন্য বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে। একটি গানের দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা তা বোঝার চেষ্টা করবো —

"যদি ভবপারে যাবি মন ভক্তিযোগে অনুরাগে কর গুরুপূজার আয়োজন।।
লহ সন্ধি অজপারে করে বন্দি পূজ চরণ।।
ধরি যাতায়াতের বর্ত্ম সাধনে হও প্রবর্ত, পূর্বদ্বারে সাধন, অন্যত্র না কর গমন।
গুরুপূজায় আছে নানা দ্রব্যের প্রয়োজন।।
প্রাণায়ম পাদ্য দিয়ে, রতি রূপ অর্ঘ্য লয়ে দাও দম লাগায়ে প্রেম তুলসী ভক্তি চন্দন।।
শ্বেত পীত নীল লোহিত পদ্ম আছে দেবী দহে সর্বশাস্ত্রেতে কহে, মায়ার অতীত,
সে ফুল তুলিবারে বায়ু ভরে কর নদীতে গমন।।
চন্দ্র সূর্যের যোগ কর যতনে, আগম নিগম সন্ধানে পূর্বদ্বারে বসি কর গুরু চরণ আরাধন।।
রাজকৃষ্ণ বলে শোন রে সতীশ শান্তি পাবি, গুরু পূজলে বাধ্য ত্রিভুবন।।"[৬]

এই গানে পরম আনন্দ লাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন। এই গুরু ধরে সাধককে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে প্রাণায়াম, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পর্কে এখানে ছত্রে ছত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঈশ্বর লাভের জন্য শুধু ভক্তি সাধনা একমাত্র পথ নয়। এর জন্য দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ রূপে গুরুর নির্দেশ অনুসারে প্রস্তুত করতে হয়। বাংলা প্রাচীন সমাজের একটি আধ্যাত্মিক চর্চার অঙ্গ ছিল যোগব্যাম ও প্রাণায়াম। বাউল সাধকরা গান, নাচ ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালনের পাশাপাশি শরীর চর্চা এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণের সাধনাও করেছে। তাই বাউলের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় 'বায়ু' শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাণায়াম অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহ ও মনের সংযোগ স্থাপন করার পদ্ধতি। এই বিষয়টি বাউল সাধকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণায়াম শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। সেখানে 'প্রাণ' অর্থাৎ জীবন শক্তি এবং 'আয়াম' অর্থ নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং প্রাণায়াম হল জীবন শক্তির নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম মূলত শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও চেতনার সাথে সংযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়া।

বাউল সাধকরা বিশ্বাস করে যে মানবদেহ হল একটি পূর্ণাঙ্গ জগৎ যার মধ্যেই সকল শক্তির উৎস বিদ্যমান। এই শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আত্মার মুক্তি সম্ভব। প্রাণায়ম সাধককে তার দেহ ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে এবং সাধককে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে সাধনার পথ প্রশস্ত করে। বাউলরা বিশ্বাস করে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা দেহের ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়, যা তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। বাউল সাধকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাণায়ামের চর্চা করে। মূল প্রাণায়াম পদ্ধতি হল যেখানে নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া হয়। এটি দেহের অভ্যন্তরীণ দূষিত বায়ু এবং অন্যান্য পদার্থগুলিকে নালির মাধ্যমে রেচন ক্রিয়ার দ্বারা বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। সাধকরা এক নাক দিয়ে বায়ু গ্রহণ করে এবং সেই বায়ু বিপরীত নাকের সাহায্যে ধীরে ধীরে বাইরে বের করে দেয়, একই ভাবে যে নাক দিয়ে বায়ু বর্জন করা হচ্ছিল সেই নাক দিয়ে গ্রহণ করা হয় এবং যে নাক দিয়ে গ্রহণ করা হচ্ছিল সেই নাক দিয়ে বর্জন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যদি বাম নাক দিয়ে বায়ু গ্রহণ করা হয় তাহলে ডান নাক দিয়ে তা বর্জন করতে হবে। এভাবে কিছুক্ষণ করার পরে পুনরায় ডান নাক দিয়ে বায়ু গ্রহণ করে তা বাম নাক দিয়ে বর্জন করতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেহ যেমন সুস্থ থাকে, তেমনি মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও আরও নানান পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত রেখে দীর্ঘদিন দেহকে সুস্থ রাখা যায়।

বাউল সাধনায় প্রাণায়াম শুধুমাত্র শারীরিক চর্চা নয়। এটি একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথও বটে। বাউল সাধকরা বিশ্বাস করে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চেতনার উচ্চ স্তরে পৌঁছোতে সক্ষম হয়। নিয়মিত প্রাণায়াম চর্চা করলে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। মানসিক দিক থেকে বিচার করলে প্রাণায়াম চর্চার ফলে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ কমায়, মন প্রশান্ত হয় এবং মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বাউল সাধনায় সঙ্গীতের চর্চা অপরিহার্য। তাই বাউল গান হল সাধকদের আত্মার অভিব্যক্তি। প্রাণায়ামের সাহায্যে বাউল সাধকরা সুরেলা ও মধুর কণ্ঠস্বর বজায় রাখতে সক্ষম হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা দীর্ঘদিন সঙ্গীত পরিবেশনের শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাউল সাধকেরা সমাজ থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে বসবাস করে। তাদের জীবন দর্শন ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতির জন্য তারা নানান ধরনের আধ্যাত্মিক সাধনা, শরীর চর্চা ও সঙ্গীত চর্চা করে থাকে। বাউল সাধকরা সাধারণত এক জায়গায় বসবাস করে না। তারা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে ভালবাসে এবং পথেই তারা তাদের সাধনার পথের অনুসন্ধান করে। বাউলদের মূল সাধনা হল অন্তর জগতের অনুসন্ধান করা। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বর মানব হৃদয়ে বসবাস করে এবং তাকে উপলব্ধি করার জন্য বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে অন্তরের পবিত্রতা ও গভীর সত্যের উপলব্ধি করাই গুরুত্বপূর্ণ। বাউল সাধনায় যোগ ব্যায়ামের বা শারীরিক কসরতের ভূমিকা অপরিসীম। শরীর চর্চার মাধ্যমে তারা নিজের দেহকে সাধনার উপযুক্ত করে তোলে। তাই পথে ঘাটে বিভিন্ন মঞ্চের অনুষ্ঠানে বাউলদের নেচে নেচে গান গাইতে দেখা যায়। তারা শরীর চর্চার মাধ্যমে দেহ মন্দিরের পুজা করে থাকে। এইভাবে তারা নিজ দেহ মন্দিরকে সুস্থ তথা পবিত্র রাখতে সচেষ্ট হয়। এভাবে তারা যেমন দীর্ঘদিন নীরোগ থাকে, তেমনি মানবতার সাধনাকে দীর্ঘদিন যাবত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাউল সাধনায় অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাধনার ধাপগুলি হল – ইয়ম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি।

বাউলদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া মূলত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্তরের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। বাউল সাধনায় 'রসায়ন' শব্দটি শুধু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত নয়। বরং এটি একধরনের আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার প্রতীক। বাউলরা বিশ্বাস করে যে মানব শরীর একটি ক্ষুদ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান যা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মোচন করতে পারে। বাউল সাধনায় দেহতত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করে যে মানব দেহে রয়েছে সাতটি প্রধান চক্র বা শক্তি কেন্দ্র যা সাধনার মাধ্যমে সক্রিয় করা যায়। এই চক্রগুলো সক্রিয় হলে সাধক আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে। বাউলরা শরীরের ভিতরে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান যেমন রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরকে শুদ্ধ করে এবং সাধনার মাধ্যমে এই উপাদানগুলোকে পরিশোধিত করে। আধুনিক রসায়নের সাথে বাউল সাধনার রসায়ন অনেকাংশে আলাদা হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। বাউলরা বিশ্বাস করে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 706 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একধরনের অ্যালকেমিক রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে যা সাধকের আধ্যাত্মিক উত্থান নিশ্চিত করে। বাউল সাধনায় বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ও প্রস্তুতির ব্যবহার করা হয় যা একধরনের রসায়ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মধু, দুধ, ঘি, বিভিন্ন ভেষজ উপাদান ইত্যাদি বাউলরা তাদের সাধনায় ব্যবহার করে। এই উপকরণগুলো শরীরকে শুদ্ধ করার পাশাপাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ায়। বাউল গানগুলোতে একটি গভীর আধ্যাত্মিক রসায়ন রয়েছে। এই গানগুলো সাধকের মন ও আত্মাকে একত্রিত করে। যা সাধনার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাউল গানের প্রতিটি ছন্দে ও শব্দে রয়েছে একধরনের আধ্যাত্মিক শক্তি যা সাধককে তার অভ্যন্তরীণ জগতে প্রবেশ করতে সহায়তা করে। বাউল সাধনায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হল শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের সম্পূর্ণতা অর্জন। সাধকরা বিশ্বাস করে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল দোষ ও অপবিত্রতা দূর হয় এবং সাধক আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়।

বাউল গানে লোকচিকিৎসার প্রসঙ্গ : বাউল সাধকরাও রক্ত মাংসেরই মানুষ। সাধারণ মানুষের মতো তাদেরও নানান সময় নানান ধরনের অসুখ তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে তারা রোগ মুক্তির জন্য মূলত লোকচিকিৎসার আশ্রয় নিয়ে থাকে। আমরা বেশ কিছু বাউল গানে এই প্রসঙ্গ খুঁজে পাই। এর পরবর্তী আলোচনায় সেই সকল গানকে উদ্ধৃত করে আমরা বাউল গানে লোকচিকিৎসার প্রসঙ্গকে খোঁজার চেষ্টা করব —

“রোগের জ্বালায় কোথায় পালাই বাঁচি কিসে
সর্দিকাশি দিবানিশি অস্থির হই ঘায়ের বিষে।।
১. যক্ষ্মাকাশি ক্ষয়কাশি উৎকাশি খোসপাচড়া গরমিপড়া এজমা বাগী
পৃষ্ঠে ঘা পচে উড়া ফোটরস গাড় আর কানগলা কুড়ে আতুর
করে ঝোলে অন্ধ কানা ঝলসা নুলা হাঁপ হলে হাঁপায় বসে।।
২. কোকবাই দড়াবাই শুচিবাই আর চুলচুলে সোত পণ্ডব ছুলি
মেভিমেহ, ধাতমেহ গনোরিয়া স্বপ্নদোষ ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া
আর টাইফয়েড নিয়া মারা পড়ে যায় শেষে।।
৩. চওল ফুলা চোখ ওঠা বাতাস ঠেকা আর পিলে, ঢাকি কলসে
ম্যালেরিয়া মল সব জরগিলে, পেলেট আর পেটেতে বিষ ওলটকম্বল
আর পাছায় হারিস চোকরা ফাটা দাঁতেতে কলেরা এল দেশে।।”[৭]

মানব সমাজে নানান ধরনের অসুস্থতা দেখা যায়। এই গানে বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সেই সমস্ত রোগের মুক্তির সম্ভাব্য ঔষধি সম্পর্কেও আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গানটিতে বেশ কিছু রোগের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন – সর্দিকাশি, ঘা, যক্ষ্মাকাশি, ক্ষয়কাশি, উৎকাশি, খোসপাচড়া, গরমিপড়া, এজমা বাগী, হাঁপানি, কোকবাই, দড়াবাই, শুচিবাই, ছুলি, মেভিমেহ, ধাতমেহ, গনোরিয়া, স্বপ্নদোষ, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, চওল ফুলা, চোখ ওঠা, বাতাস ঠেকা, পিলে, ম্যালেরিয়া, পেটেতে বিষ, হারিস, কলেরা ইত্যাদি। এই গানে বিভিন্ন রোগের ভেষজ ঔষধি হিসেবে ওলটকম্বল পাতার উল্লেখ করা হয়েছে। ওলটকম্বল পাতা যার বোটানিক্যাল নাম ব্রায়োফিলাম পিনাটাম (Bryophyllum Pinnatum) একটি সুপরিচিত ঔষধি উদ্ভিদ। এই গাছটি দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষত ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ এবং নেপালে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। প্রচুর ঔষধি গুণাবলির জন্য এটি হাজার বছর ধরে আয়ুর্বেদিক এবং প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যবহার হয়ে আসছে। এই প্রবন্ধে আমরা ওলটকম্বল পাতার ঔষধি গুণাবলি ও রোগমুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ওলটকম্বল পাতায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের ফ্রি র‍্যাডিক্যালদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ফ্রি র‍্যাডিক্যালরা শরীরের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যার ফলে বার্ধক্য এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হতে পারে। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এই ক্ষতিকারক উপাদানগুলিকে নিরপেক্ষ করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এই পাতায় প্রদাহ বিরোধী উপাদান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 706 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রয়েছে যা শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এই পাতা ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রদাহজনিত রোগ যেমন আথ্রাইটিস এবং বাতের চিকিৎসা করা হয়। ওলটকম্বল পাতা ব্যাথা উপশমকারী গুণাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ। এতে উপস্থিত উপাদানগুলো ব্যাথা এবং অস্বস্তি কমাতে কার্যকর। বিশেষ করে মাথা ব্যাথা, দাঁতের ব্যাথা এবং পিঠের ব্যাথার ক্ষেত্রে এই পাতা প্রয়োগ করে তাৎক্ষনিক আরাম পাওয়া যায়। ওলটকম্বল পাতায় অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে। যা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বিরুদ্ধে কার্যকর। এটি ত্বকের সংক্রমণ এবং অন্যান্য মাইক্রোবিয়াল সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে। এই পাতার রস হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং পেটের সমস্যা যেমন অ্যাসিডিটি, গ্যাস এবং বদ হজমের ক্ষেত্রে কার্যকর। এটি হজম প্রণালীকে সুস্থ রাখতে সহায়ক এবং খাদ্যের সঠিক পরিপাক নিশ্চিত করে। ওলটকম্বল পাতা কিডনির পাথর নিরাময়ে বিশেষ ভাবে কার্যকর। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এই পাতার রস কিডনির পাথর গলাতে ব্যবহৃত হয়। নিয়মিত এই পাতার রস পান করলে কিডনির পাথর ছোটো হয়ে যায় এবং মূত্রের সাথে বের হয়ে যায়। ওলটকম্বল পাতা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রনে সহায়ক। নিয়মিত এই পাতার রস গ্রহণ করলে ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা যায়। উচ্চরক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে ওলটকম্বল পাতা একটি প্রাকৃতিক ঔষধ হিসেবে কাজ করে। এই পাতার রস নিয়মিত সেবনে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে। ওলটকম্বল পাতার রস ক্ষত এবং পোড়ার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এই পাতার রস দ্রুত ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে এবং ত্বকের পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। পোড়া স্থানে এই পাতার রস লাগালে তাৎক্ষনিক আরাম পাওয়া যায়। ওলটকম্বল পাতায় আয়রন উপস্থিত থাকায় এটি অ্যানিমিয়া চিকিৎসায় সহায়ক। নিয়মিত এই পাতার রস সেবনে শরীরের আয়রনের ঘাটতি পূরণ হয় এবং রক্ত শূন্যতা দূর হয়। ওলটকম্বল পাতা শ্বাস কষ্টের সমস্যা নিরাময়ে কার্যকর। এই পাতার রস ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যাজমার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটি শ্বাস প্রণালীকে প্রশমিত করে এবং শ্বাস কষ্ট কমাতে সাহায্য করে। ওলটকম্বল পাতা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু সাধারণ পদ্ধতি হল –

১. তাজা ওলটকম্বল পাতা সংগ্রহ করে তা ভালোভাবে ধুয়ে রস তৈরি করা যায়। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এই রস এক থেকে দু’চামচ করে সেবন করা উচিত।
২. ওলটকম্বল পাতা পিষে পেস্ট তৈরি করা যায়। এই পেস্ট ক্ষত স্থানে বা প্রদাহিত স্থানে লাগিয়ে তা ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখা যায়।
৩. ওলটকম্বল পাতা দিয়ে চা তৈরি করে পান করা যায়, এটি হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বি ভিন্ন পেটের সমস্যা নিরাময়ে সহায়ক।
৪. তাজা ওলটকম্বল পাতা সরাসরি চিবিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এটি মুখের ক্ষত এবং দাঁতের ব্যাথা নিরাময়ে কার্যকর।

যদিও ওলটকম্বল পাতা একটি প্রাকৃতিক ঔষধ, তবে এর ব্যবহারেও কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের এই পাতা সেবন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ওলটকম্বল পাতা একটি অত্যন্ত কার্যকর ঔষধি উদ্ভিদ যা বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে সহায়ক। এর প্রাকৃতিক গুণাবলী এবং বহুবিধ ব্যবহার একে আয়ুর্বেদিক এবং প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থায় অপরিহার্য করে তুলেছে। সঠিক পদ্ধতিতে এবং সঠিক পরিমাণে এর ব্যবহার করলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। তবে যেকোনো প্রাকৃতিক ঔষধ ব্যবহারের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

Reference:

১. মিঞা, ড. মো. আবদুল করিম, (সম্পাদিত), *বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন* (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৮০
২. ঐ, পৃ. ২৮১
৩. ঐ, পৃ. ২৮৪

৪. ঐ, পৃ. ২৮৪
৫. মাননান, আবদেল, (সম্পাদিত), *অখণ্ড লালনসঙ্গীত,* পরিবর্ধিত ও সংশোধিত চতুর্থ সুলভ সংস্করণ, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ৩৮০
৬. ঝা, শক্তিনাথ, (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাউল-ফকির পদাবলি* (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, মনফকিরা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৫৪
৭. ঝা, শক্তিনাথ, (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাউল-ফকির পদাবলি* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মনফকিরা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৯৫

Bibliography:

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪ (বঙ্গাব্দ)

অনুপম হীরা মণ্ডল, *ফকির লালন সাঁই ভাব-সাধনা,* ঢাকা, অবসর, ফেব্রুয়ারি, ২০১২

আদিত্য মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বজয়ী বাউল,* কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৬

আনসার উল হোক, *সব লোকে কয় লালন কী জাত,* কলকাতা, নান্দনিক, ২০১৪

আবদেল মাননান, *লালনদর্শন,* ঢাকা: রোদেলা, ২০২১

আবদেল মাননান(সম্পা.), *অখণ্ড লালন সঙ্গীত,* ঢাকা : রোদেলা, ১৪২২ (বঙ্গাব্দ)

আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই,* তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা: গাঙচিল, আগস্ট ২০১৮

আবীর মুখোপাধ্যায় (সংকলক), *আরশিনগর বাউল ফকির উৎসবের পত্রিকা বিশেষ সংকলন,* শান্তিনিকেতন: বইওয়ালা বুক ক্যাফে, ২০১৯

আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফিসাহিত্য,* ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৩

আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব,* ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার, জানুয়ারি, ২০২২

ওয়াকিল আহমেদ, *লালন গীতি সমগ্র,* ঢাকা: বইপত্র, ২০১৬

ওয়াকিল আহমেদ, *বাউল গানের ধারা,* ঢাকা: গতিধারা, ২০২৩

কার্তিক উদাস, *নাটোরের বাউল-ফকির,* ঢাকা: সমাচার, ২০১৮

ড. মো. আবদুল করিম মিঞা (সম্পাদিত), *বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন* (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মো. নুরুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *নেত্রকোণার বাউলা গান,* প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: জয়তী, এপ্রিল ২০২১

শক্তিনাথ ঝা (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাউল-ফকির পদাবলি* (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা: মনফকিরা, নভেম্বর ২০১৩

শক্তিনাথ ঝা (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাউল-ফকির পদাবলি* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: মনফকিরা, জানুয়ারি ২০১২

সুধীর চক্রবর্তী, *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: লালমাটি, ১৫ মাঘ ১৪১৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 715 - 722
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লোকসাহিত্যে নারীর অন্তঃকথা

অন্বেষা দাস
প্রাক্তন ছাত্রী
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anwesha92.das24@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Folklore, Women, Domestic, Creative, Express, Hope, Desire, Dignity.

Abstract
Folklore is a collage of the lived realities of ordinary people, providing valuable insights into the social position of women. In the earliest stages of human civilisation, women held a significant status in society. They actively participated alongside men in the struggle for survival and were industrious contributors. However, with the progression of civilisation, women's autonomy and societal roles began to diminish, while male dominance steadily increased. Over time, the belief took root that women were incapable of participating in physically demanding activities. Consequently, men consolidated their authority, relegating women to subordinate roles confined within the domestic sphere. This confinement created an intense yearning within women to express their unspoken anguish. Much of Bengali folklore, predominantly oral in nature, was composed by women. Their oral literature naturally reflects their lived experiences, encompassing their struggles, sorrows, unfulfilled desires, and aspirations. Through their inherent creativity, women have crafted fairy tales, composed ritualistic bratakatha, soothing lullabies, and folk songs tied to various customs. Regardless of the themes, these works invariably carry the imprint of women's personal experiences and inner reflections. Women's repressed hopes and dreams found fulfilment through the female characters in their tales, where the heroines, despite enduring hardship and oppression—often at the hands of co-wives in a patriarchal society—reclaimed their dignity and fortune by the story's end. Such narrative twists reveal the latent desires of women's hearts. Similarly, the ritualistic rhymes of women's vows (bratakatha) serve as reflections of their direct lived experiences. These verses express the hopes, aspirations, and contemplations of both unmarried and married women, capturing their achievements and disappointments. Across various branches of folklore, rural Bengali women have vividly and spontaneously articulated their life's struggles, emotional turmoil, and suppressed sighs with masterful skill. Over time, as patriarchal oppression intensified, women—confined within the domestic sphere—grew vengeful, became aware of their individuality, and began to recognise the language of their subjugation. This awareness

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

compelled them to portray their deprivations and grievances in the mirror of folklore, giving voice to their marginalised existence.

Discussion

লোকসাহিত্য লোকায়ত জীবনের কোলাজ। লোকজীবনের বিচিত্র বর্ণের প্রতিচ্ছবি লোকসাহিত্যে ধরা পড়েছে। লোকসাহিত্যের এই বিপুল সৃজনীর মধ্যে নারীর সামাজিক অবস্থান চিত্ররূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা জানি, আদিমযুগে বন্য জীবনযাপনে নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় ছিল। সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কম ছিল। সেই সময় মূলত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে শিকারের প্রয়োজনে জনসংখ্যার বৃদ্ধি একান্ত অভীষ্ট ছিল। একমাত্র নারীরাই সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম বলেই সেই সময় সমাজে নারীদের প্রাধান্য ছিল। শুধু তাই নয় নারীরা পুরুষদের সাথে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইতেও সামিল হত, তারাও যথেষ্ট কর্মঠ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমেই নারীজাতির ব্যক্তি স্বাধীনতা, তাদের অবস্থান সীমিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজন হতে থাকে শিকারের। আর শিকারের প্রয়োজনের সাথে সাথেই পুরুষের প্রাধান্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হতে থাকে যে নারীরা অধিক দৈহিক পরিশ্রমের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সমর্থ নয়। ফলে ক্রমেই সমাজে পুরুষেরা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিচিতি নিস্পৃহ হতে থাকে। সমাজের গভীরে পুরুষতন্ত্রের শিকড় এমনভাবে প্রোথিত হয়, যার পরিণামে ধীরে ধীরে পুরুষতন্ত্রের মানসিকতায় একধরণের কর্তৃত্ব সুলভ অহংকার বিরাজ করতে থাকে। সেই দম্ভেই তারা নারীজাতিকে তাদের হাতের ক্রীড়নক বলে ভাবতে শুরু করে।

পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মতো ভারত তথা বাংলাতেও নারীরা কমবেশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় কোনঠাসা। নারীদের অবস্থান হতে থাকে গৃহের অভ্যন্তর। সেই অন্তঃপুরের পরিসরে নারীজাতির হৃদয়ের নানা টানাপোড়েনগুলি, দীর্ঘদিনের লালিত বঞ্চনাগুলি যেন প্রসববেদনা অনুভব করতে থাকে। হৃদয়-অন্তঃস্থলে সঞ্চিত হাহাকারগুলি প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। বাংলার লোকসাহিত্যের অধিকাংশই মৌখিক সাহিত্য এবং তার বেশিরভাগই মেয়েদের দ্বারা রচিত। তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-বেদনা, অপ্রাপ্তি, পরম প্রার্থিত বিষয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দ্বারা রচিত মৌখিক সাহিত্যে উঠে এসেছে। মেয়েরা তাদের অর্ন্তনিহিত সৃজনী প্রতিভায় রূপকথা সৃষ্টি করেছে, মুখে মুখে ব্রতকথা রচনা করেছে, ছেলেভুলানো ছড়া গেঁথেছে শব্দের পিঠে শব্দ জুড়ে কিংবা বিভিন্ন লোকাচারমূলক গান বেঁধেছে, যেমন— বিবাহের গান, প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত, হৃদয়-উত্তাপ উৎসারিত বিরহের গীত কিংবা নিছক বিনোদনমূলক সঙ্গীত। বিষয় যাই হোক না কেন, তাতে নারীজাতির ব্যক্তিমনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিজস্ব উপলব্ধি ভাষারূপ পেয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা পুষ্ট সত্যটি যখন একটি সৃজনী মন কর্তৃক রসসমৃদ্ধ হয়ে নিজের ভাষায় প্রকাশ পায় এবং সমাজে আর পাঁচজনের কাছে চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, তখন সেই বাক্যটি জনসমক্ষে গৃহীত হয়ে সাহিত্যের রূপ লাভ করে। এইভাবে উদ্ভাবিত হবার পর বাক্যগুলি শ্রুতি-পরম্পরায় সমাজের অন্তঃস্থলে অগ্রসর হয়, বিকাশিত হয় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই মৌখিক সাহিত্যগুলি আস্বাদিত হতে থাকে।

লোকসাহিত্যের একটা বিশেষ পরিসর জুড়ে রয়েছে রূপকথার গল্পগুলি। মুখে মুখে প্রচলিত এই গল্পগুলির বেশিরভাগই আবর্তিত হয় নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে। নারীজাতির অন্তরের সুপ্ত অপূর্ণ ঈপ্সাগুলি রূপকথার গল্পের নারী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে যেন পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করে। নারীকেন্দ্রিক রূপকথার গল্পগুলিতে কখনো দেখা যায় যে মা তার সতিনদের কাছে নির্যাতিত হয় এবং গল্পের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় মা তার ভাগ্যগুণে সন্তানদের সাহায্যে তার হৃতসম্মান ফিরে পায়। পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন ছিল ফলে সতিন কর্তৃক নির্যাতন, লাঞ্ছনা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই পল্লীবাংলার লোকসমাজের মেয়েরা রূপকথার কল্পজগৎ রচনা করলেন, যাতে দেখালেন যে সতিনের সমস্ত বিরূপতা সত্ত্বেও তিনি গল্পের পরিশেষে তার হৃতসম্মান ও সৌভাগ্য ফিরে পেলেন— গল্পকথার এহেন মোচড় নারীর অন্তরের সুপ্ত বাসনারই পরিচায়ক। আবার নারীকেন্দ্রিক রূপকথার গল্পগুলির মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় যে ছোটরানী দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়। বাঙালি সমাজে একান্নবর্তী পরিবারে সাধারণত দেখা যায় যে শাশুড়ি, ননদ, কিংবা জায়েরা সংসারে

অধিক কর্তৃত্ব ফলাতে চায় এবং বাড়ির ছোটবউ সংসারে কোনঠাসাভাবে অবস্থান করে। উল্লিখিত রূপকথার কাহিনির বড়রানীরা মূলত বাস্তব জীবনের শাশুড়ি, জা, ননদ এদেরই প্রতিরূপ, কোথাও গিয়ে এদের দ্বারা গৃহের ছোটবউ-এর উপর শাসন, তত্ত্বাবধানমূলক মনোভাব, ঈর্ষা, বিরূপতা যেন রূপকথার গল্পের বড়রানীর ছোটরানীর ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতার সাথে মিলে মিশে গেছে। আবার কোনো কোনো রূপকথার গল্পের বুননে নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়টিও গেঁথে আছে।

এবার আসা যাক প্রবাদ-প্রসঙ্গে। নারীর দৃষ্টিতে তার পারিপার্শ্বিকতার যে চিত্র ধরা পড়ে, বা এমনভাবে বলা যায় যে, সমাজ নারীর ওপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, যেভাবে নারীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে তার অবস্থান চিহ্নিত করে দেয়, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব চিত্রই বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে নারী প্রবাদের মধ্যে তুলে ধরেছে। ফলে অনিবার্যভাবেই সমাজের কঠোর সত্য, চরম বাস্তবতা প্রবাদে উঠে এসেছে।

আমাদের দেশে আজও নারীর তুলনায় পুরুষের গুরুত্বকে সর্বপ্রথমে গ্রাহ্য করা হয় এবং পুরুষের শিক্ষাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যদিও বর্তমানে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেকটাই কমে এসেছে। মানসিকতার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে এবং শিক্ষাদীক্ষায় নারীরা এগিয়ে চলেছে পুরুষের পাশাপাশি। কিন্তু যে সমাজ পটভূমিকায় প্রবাদগুলি রচিত সেই সমাজের প্রাচীন মানসিকতার ছাপ প্রবাদগুলিতে স্পষ্ট। সেসময় সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য এতটাই প্রবল ছিল যে নারীশিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হত এবং নারীর অবস্থান চিহ্নিত করে দেওয়া হত হেঁশেলে—

"ছেলে শিখবে লেখাপড়া/ মেয়ে শিখুক রান্নারান্না।
মেয়ে যত পাশ দেবে/ মাথায় চড়ে তত বসবে।
'লেখাপড়া যে মেয়ে করে/ তাকে নিয়ে দুর্ভোগ সংসারে।"

সমাজ বাস্তবতার এক শোচনীয় রূপ উল্লিখিত প্রবাদগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমাজে লৈঙ্গিক বৈষম্য তো ছিলই এমনকি কন্যা সন্তানের জন্মও যে অনভিপ্রেত ছিল, তার প্রমাণও মেলে—

"পুত্র সব সম্পদ / কন্যা সব আপদ।
ছেলে হলো হীরের টুকরো / মেয়ে হলো খুদকুঁড়ো।
ছেলে বিয়োলে স্বর্গবাস / মেয়ে বিয়োলে নরকবাস।
মেয়ে হলে মুখ ঘোরায় / ছেলে হলে শাঁখ বাজায়।"[১]

দৃষ্টান্তগুলিতে যেভাবে পুরুষের প্রবল আবশ্যকতা এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা মূলত সমাজ মানসিকতার সংকীর্ণতাকেই তুলে ধরেছে। প্রবাদগুলির মধ্যে স্বাধীনচিন্তার অভাব সুস্পষ্ট। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাম্ভিকতাই এই প্রবাদগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। সেকালের সামাজিক পটভূমিতে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর জন্মদাত্রী মায়ের যে কীরূপ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, এই প্রবাদগুলোই তার প্রামাণ।

লোকজ সাহিত্য যেহেতু সমাজজীবনের দর্পণ, তাই স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজের নির্মম আচার-আচরণ, অন্ধ কুসংস্কারের চাপে পিষ্ট নারীর অসহায়তার এক জ্বলন্তচিত্র প্রবাদের মাধ্যমে প্রকট হয়ে উঠেছে—

"কার আগুনে কেবা পোড়ে আমি জাতে কলু
মা আমার কি পুণ্যবতী বলছে দে উলু।"[২]

প্রবাদটিতে সতীদাহের প্রসঙ্গ রয়েছে। আমরা জানি, সতীদাহ একটি হিন্দুধর্মীয় প্রথা যেখানে স্বামীর শবদাহের সঙ্গে তার বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করা হত। কিছু ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, কোনো নারীকে বলপূর্বক জোর করে তুলে এনে অন্যের স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হত। উল্লিখিত প্রবাদটিতে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাতে কলু এমন এক গৃহবধূকে অন্যের স্বামীর চিতায় তোলা হলে সে তার জাত পরিচয় দিয়ে এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে চায় কেননা সতীদাহ প্রথা প্রাচীন যুগে শুধুমাত্র রাজপরিবারে বা অভিজাত সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল। কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেইস্থানে উপস্থিত সমাজের জনৈক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি সেই নারীকে ওই মৃত ব্যক্তির চিতায় সহমরণে বাধ্য করতে তাকে জানায় আগুনে ঝাঁপ দিলে সে পুণ্যবতী হবে এবং উলুধ্বনি তুলতে নির্দেশ দেয়। তৎকালীন সময়ে এইরূপ সম্পূর্ণ অমানবিক নির্মম প্রথার বলি হতো অসহায় স্ত্রীজাতি।

পণপ্রথা আমাদের সমাজে দীর্ঘকালের এক করাল অভিসম্পাত। এর মূলে রয়েছে সমাজের সংকীর্ণ মনোভাব। সকল পিতা-মাতারই প্রত্যাশা থাকে তাদের কন্যা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে। কিন্তু পাত্রপক্ষ যখন বিবাহের তাৎপর্যের তুলনায় যৌতুকের দাবিকে অধিক প্রাধান্য দেন, তখনই ঘটে বিপর্যয়। পাত্রপক্ষের বিপুল দাবিদাওয়া পূরণ করতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা-মাতাকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়, এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর রয়েছে। সর্বোপরি সেই অসহায় কন্যার জীবনে নেমে আসে দুঃসহ যন্ত্রনা। প্রতিশ্রুতি মতো যৌতুক না মেলায় শ্বশুরবাড়িতে তাকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়। মেয়েটির নতুন জীবনে প্রবেশ করার সমূহ প্রস্তুতি, আনন্দ এক লহমায় তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। পরিণয়ের মতো মধুর বন্ধন কোথাও যেন দেনা-পাওনার অঙ্কের মাপজোকে তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। একদিকে পাত্রপক্ষের অর্থলোভ ও হৃদয়হীনতার চিত্র অন্যদিকে পরিবারের অসহায়তা, বিড়ম্বনা কন্যাকে ব্যথিত করে তোলে। হৃদয়হীন পাত্রপক্ষের নির্লজ্জ দাবি পূরণ করতে গিয়ে পাত্রীপক্ষের কীরূপ শোচনীয় পরিণতি হয়, নিম্নলিখিত প্রবাদ দুটিতে সেই দৃষ্টান্ত প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

১. "কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ বসে আছে, পাঁচশো টাকার আশে।
২. কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে।"[৩]

সমাজে অধিক বয়সেও পুরুষের বিবাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের মূল্য সচরাচর দেওয়া হত না। এ প্রসঙ্গে একটি মেয়েলি ছড়ার উল্লেখ করা যায়—

"তালগাছ কাটুম রসিক বাটুম্ গৌরী এল ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কী।"[৪]

উক্ত ছড়াটি মেয়েদের জীবনে নিয়তির করুণ পরিহাসেরই ইঙ্গিত বহন করে। সেইসঙ্গে পুরুষের বহুবিবাহ যে সমাজিক নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, নিম্মলিখিত প্রবাদগুলি তার সাক্ষ্য দেয়—

১. "এককালে ঠেকেছে তিন কাল গিয়ে।
তবু আবার করবে বিয়ে।
২. পচা মরিচের দর যেমন, দু'বার বিয়ের দশা তেমন।
৩. ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।"[৫]

বর্ষীয়ান স্বামী ও সতিনের সাথে সংসারধর্ম করতে গিয়ে নারীদের বিবাহ পরবর্তী জীবন যে অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তা বলাই বাহুল্য। তাদের প্রতিনিয়ত সইতে হয় সতিনের বিড়ম্বনা। স্বামীর প্রতি অধিকারবোধ থেকেই স্বামীর প্রণয়ের অংশীদার সতিনের প্রতি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, তিক্ততা জন্মায় এবং একে অপরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সতিনের প্রতি বিদ্বেষের কথা টুসু গানেও প্রকট হয়ে উঠেছে—

১. "পিঁয়াজ কেটে রসুন লাগাব, তোদের বাবুগিরি ঘোচাব
আইল সতীন মারবি নাকি, তোর মার খেয়ে ঘর যাব।
পিঁয়াজ কেটে রসুন লাগাব।।"[৬]
২. "ও তুই খাইস্ না বনের শালপাতে,
মরণ আছে সতীনের হাতে।
এক সরপে, দুই সরপে তিন সরপে লোক চলে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

টুসু আমার মধ্যে চলে বিন্ বাতাসে গা দোলে।।”[৬]

এ প্রসঙ্গে সেঁজুতি ব্রতের দুটি ছড়া উল্লেখ করবো—

১. “অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আলতা পরি।।
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটা।।
অভ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।।”[৭]
২. “হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতিনের মাথা।
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি!
সতিন মাগি টেরি।
পাখি, পাখি, পাখি!
সতিন মাগি মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি।
বঁটি বঁটি, বঁটি!
সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।”[৮]

মেয়েলি ব্রতের ছড়াগুলি মূলত নারীমনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমূহের প্রতিচ্ছবি। সেঁজুতি ব্রতের উক্ত ছড়া দুটিতে নারীমনের অসহ যন্ত্রণা, সতিনের প্রতি প্রবল প্রতিহিংসা গোপন থাকে না।

সেকালে বিধবাদের এমনকি যারা শৈশবে অথবা কৈশোরে বিধবা হয়েছে তাদেরও বৈরাগ্য ও কঠোর ত্যাগস্বীকার করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হত। সমাজে বিধবা, প্রধানত বাল্যবিধবাদের অসীম দুরবস্থা ছিল। নিম্নলিখিত প্রবাদগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়—

১. “বিধবার একাদশী করলে আর ভাল কি,
না করলেই নিন্দা।
২. সধবা কপালে সিঁদুর পরে,
বিধবার কপাল চড়চড় করে।”[৯]

এবার আসা যাক অন্য একটি প্রসঙ্গে— কুমারী ও সধবা নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ধ্যানধারণাগুলি মেয়েলি ব্রতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। নারীমনের সহজাত আকাঙ্ক্ষাগুলি, কামনাগুলি যা তারা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না, ব্রতের আচার পালনের মধ্য দিয়ে তা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখ করবো—

“এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
ভাদুলি-ঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলি তিন কুলে সুখ।”[১০]

সংসার জীবনের যাবতীয় দুঃখ-বেদনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দেবী ভাদুলির কাছে এ যেন স্ত্রীজাতির চিরন্তন প্রার্থনা।

বিবাহের পর স্বজনদের ছেড়ে নববধূ যখন একটি নতুন পরিবারে পদার্পণ করে তখন সে তার নবপরিবারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে সহানুভূতি, স্নেহ ও ভালোবাসা। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামীর গৃহে পা দিয়েই তাকে সহ্য করতে হয় লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বিদ্রুপ, নির্যাতন। যার মূলে প্রধানত যিনি সক্রিয় থাকেন তিনি হলেন শাশুড়ি। শাশুড়ি যেমন একদিকে কারো মা, তেমনি তিনিই আবার শাশুড়ি। কিন্তু মা হিসেবে তিনি যতখানি উদার, স্নেহবৎসল, শাশুড়ি হিসেবে ঠিক তার উল্টো, বধূর প্রতি তিনি বিরূপ, বধূকে তিনি শাসনে রাখেন, বধূর সামান্যতম ত্রুটিও তার কাছে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মূলত কার্যকরী হয় শাশুড়ির কর্তৃত্বমূলক মনোভাব। তার নিজের হাতে গড়ে তোলা সংসারে অপর একজন নারীর আধিপত্যকে তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন না। বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই তিনি নানা কারণে পুত্রবধূকে তাচ্ছিল্য করে মনে মনে অপার সন্তুষ্টি লাভ করেন। নিঃসঙ্গ গৃহবধূকে হতে হয় প্রবল মানসিক নির্যাতনের শিকার। শাশুড়ির নিকট সে শুধুমাত্র একটু স্নেহের আশ্রয় প্রার্থনা করে, একটি ছড়ায় তার পরিচয় মেলে—

"রাগ করো না শাশুড়ি গো, আমি তোমার মেয়ে।
তুমি যদি তাড়াও তবে দাঁড়াই কোথায় যেয়ে।।"[১১]

এ প্রসঙ্গে একটি চটকা গানের উল্লেখ করা যায়—

"আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর ভাশুর করে গোঁসা।
নিদয় হেন স্বামী আস্যা ধরল চুলের খোঁপা।
আমার শাশুড়ি আছে ননদী আছে আছে ভাইগ্‌না বউ
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল আউগাইল না কেউ।"[১২]

গানটিতে বধূর প্রতি তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নিপীড়নের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। গানটি অসহায় গৃহবধূর জীবনযন্ত্রণার এক নিদারুণ অভিব্যক্তি।

হৃদয়হীনা শাশুড়ি পুত্রবধূর প্রতি কিছুটা তত্ত্বাবধানমূলক মনোভাব পোষণ করেন। শাশুড়ির আদেশ বধূর কাছে অবশ্য পালনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কেননা কর্তব্যে গাফিলতির ফল হতে পারে তাচ্ছিল্য, বিদ্রুপ এবং নির্যাতন। সেই কারণেই শ্বশুরগৃহে শাশুড়ি, ননদের উপস্থিতি তাকে পদে পদে আশঙ্কিত করে তোলে। তার চারপাশে শ্বাসরোধকারী আবহের সৃষ্টি হয়। তাই গৃহে শাশুড়ি, ননদের অনুপস্থিতিতে বধূ সাময়িক সময়ের জন্য হলেও স্বস্তির নিশ্বাস নেয় এবং তার মনে স্বাধীনতার আস্বাদ জেগে ওঠে—

"শাউড় নাই ননদ নাই, কারে করমু ডর।
আগে বাড়মু ভিজ্যা ভাত, পাছে মুছমু ঘর।।"[১৩]

শ্বশুরগৃহে বধূর স্নেহবিহীন জীবন কোনোভাবে অতিবাহিত হতে থাকে। যন্ত্রণাদীর্ণ মুহূর্তগুলিতে বিগত জীবনের সুখস্মৃতিগুলি মনে পড়ে যায়। পরিবারের অসীম স্নেহে লালিত কন্যা স্বজনদের সান্নিধ্য লাভে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে ভাইয়ের আগমনে বধূর প্রাণ আনন্দে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে—

" 'ওপারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম্,
ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙ্গা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।।'
'এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।।'
'হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হলো দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।।"[১৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 715 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উক্ত ছড়াটিতে ভাইয়ের সাথে কথোপকথনে বোনের বেদনাসিক্ত অন্তরের যন্ত্রণা, বঞ্চনার হাহাকার ব্যক্ত হয়েছে। ছড়াটির মধ্য দিয়ে পল্লীবাংলার গৃহবধূর বিষন্ন ম্লান মুখ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। একটি টুসু গানেও অনুরূপ অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়—

“এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে,
মাগো, আমার মন কেমন করে।
পরের মা কি বেদন জানে অন্তরে জ্বালায়ে মারে।”[১৫]

উৎসবের দিনগুলোতে বালিকাবধূর প্রিয়জনদের মুখগুলো, তাদের প্রত্যেকের সাথে নানান সুখস্মৃতিগুলি বারবার মনে পড়ে যায়। তাদের জন্য তার মন কেমন করে। পৌষ পার্বণের দিনেও তাকে স্নেহহীন পরিবেশে ‘পরের ঘরে’ দিনযাপন করতে হয়। মনে মনে মায়ের কাছে তনয়ার অনুযোগ এখানে প্রকাশিত।

পিতৃগৃহে গিয়ে বধূ আর শ্বশুরালয়ে ফিরে আসতে চায় না, তার কারণ হল পুনরায় শাশুড়ি কর্তৃক শারিরীক ও মানসিক নিপীড়নের আশঙ্কা —

“ই চালে পুঁই উ চালে পুঁই পুঁইয়ের খাব মেচুরি,
আর যাবনা শ্বশুরবাড়ী ধইরে মারে শাশুড়ি।”[১৬]

উক্ত টুসু গানটি নারী হৃদয়ের দহন জ্বালার অকপট স্বীকারোক্তি।

কন্যার বিবাহ দেবার পর কন্যার পিতা-মাতা সর্বদা এই উৎকণ্ঠায় থাকে নতুন সংসারে গিয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় তনয়া সুখে আছে তো। কন্যা মাতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনকালে মাতা তার সঙ্গে কিছু আহার্য সামগ্রী প্রেরণ করেন শ্বশুরগৃহের লোকেদের প্রসন্ন করতে কারণ তিনি জানেন, তাদের প্রসন্নতার উপরই নির্ভর করে আছে তাদের কন্যার বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য —

“উড়কি ধানের মুড়কি দিল শাশুড়ী ভুলাতে।”[১৭]

জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রেই গৃহে স্ত্রীকে রেখে স্বামী বিদেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। প্রিয়তমা স্ত্রীর অশ্রুসজল চোখ দুটি বারংবার মনে পড়লেও অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের কাঠোর জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হয়। প্রিয়তমা পত্নী বিচ্ছেদজনিত বেদনায় অধীর হয়ে স্বামী গৃহে শীঘ্রই ফিরে আসবে এই আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে। নারী হৃদয়ের সেই বেদনার প্রতিফলন ঘটেছে এই বর্ণনামূলক প্রেমসঙ্গীতে—

“নাথ, আমায় ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।
বৈশাখে বসন্ত জ্বালা, ছেড়ে গেল চিকন কালা,
আমরা নারী হই অবলা
কেমন করে রইব ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।”[১৮]

নারী হৃদয়ের আন্তরিক অভিব্যক্তিই উক্ত বর্ণনামূলক সঙ্গীতটির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এভাবেই পল্লীবাংলার মেয়েরা তাদের জীবনের অযুত সমস্যাগুলি, তাদের জীবনযন্ত্রণা, আবেগ, দীর্ঘশ্বাসগুলি নির্দ্বিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুনিপুণ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে। তাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তিগুলি শাশ্বত আবেদন সৃষ্টি করেছে। আর এর মধ্য দিয়েই নারীর সেই ভদ্র, নম্র, লজ্জাশীল, অনুগত ইমেজটি চূর্ণবিচূর্ণ হতে চায়। তাদের রচিত সাহিত্যে তারা নিজ ব্যক্তিত্বের তেজ ও দীপ্তিতে ভাস্বর, অনেক বেশি দৃঢ় ও নির্ভয়া। যে মেয়েরা পূজার্চনায়, ব্রত পালনে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে চালের গুড়োর পিটুলি সহযোগে বিচিত্র নকশার আলপনা আঁকতে পারে, বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন রাঁধতে পারে, বিচিত্র ফোঁড়ের সাহায্যে কাঁথায় সুন্দর নকশা কাটতে পারে, সুমিষ্ট গলায় গান গাইতে পারে, তাদের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভা থাকবে, তারা যে ব্যক্ত করার কৌশল জানবে, সৃজনী দক্ষতায়

হৃদয়ের অব্যক্ত বঞ্চনাগুলিকে ব্যক্ত করে সেগুলিকে হৃদয়ের গহন থেকে মুক্ত করে দেবে সুনির্মল আকাশে, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই প্রত্যাশিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোনঠাসা হতে হতে একসময় অন্তঃপুরের পরিসরে নারীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, নিজেদের অসম্মানের ভাষা বুঝতে শিখেছে। আর তাই নারীর নিজস্ব স্বর, তাদের জীবনের বঞ্চনাগুলি তারা তুলে ধরেছে লোকসাহিত্যের আয়নাতে। হৃদয়ের খেদগুলোকে প্রকাশ করে তারা লাভ করেছে অপার পরিতৃপ্তি— যা তাদের পরম প্রাপ্তি।

Reference:

১. দৈনিক আজাদী পত্রিকা, বাংলার লোকসাহিত্যে নারী-পুরুষ বৈষম্য— মাধব দীপ, শনিবার, ২৭ জানুয়ারি ২০১৮
২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন ও কৃষ্ণগোপাল রায় (সম্পাদনা), সাহিত্য-প্রবন্ধ : প্রবন্ধ-সাহিত্য, বাংলা প্রবাদ : বাঙালি জীবন, বিপ্লব চক্রবর্তী, কলকাতা-০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, দোলযাত্রা ২০০৯, পৃ. ৩০৯
৩. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৬৫
৪. বিশ্বাস, সুফল, লোকমনন : লোকসাহিত্য, কলকাতা-০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ২০১৪, পৃ. ১৫৯
৫. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৫৬
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ৯৯
৭. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড : আলোচনা), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ১৯১
৮. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, কলকাতা-১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুণর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, পৃ. ৪৭
৯. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ), কলকাতা-৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৬১
১০. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, কলকাতা-১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুণর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, পৃ. ৭
১১. মজুমদার, মানস, লোকসাহিত্য-পাঠ, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৫৩
১২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউজ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ২৮২
১৩. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯, পৃ. ৩১১
১৪. তদেব, পৃ. ৩১৪
১৫. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ১০৩
১৬. তদেব, পৃ. ১০৬
১৭. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯, পৃ. ৩১২
১৮. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য), কলকাতা-০৯, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ৫৪৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 723 - 729
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নমঃশূদ্র সমাজ : প্রসঙ্গ কয়েকটি পূজা ও ব্রত

ড. কৃষ্ণ কান্ত রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, ধুবড়ী, আসাম
Email ID : krishna04021972@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Partition, mother tongue, vow, Sankranti, childlessness, fertility, palmistry, mental desire, horoscope.

Abstract
In 1947 and 1971, the displaced people from East Bengal come to this side with countless fear, doubts, and conflicts, driven by the need to survive, they had nothing in hand, no roof behind the roots of their lives and once again rooted themselves of resh. They settled down creating new homes, despite all this, they did not want to lose their past. Their innate vibrancy reminded alive. They rebuilt homes, sowed crops, and started an rituals, prayers, folk dance, folk songs and customs, they enriched the realm of folk culture. The rituals and vows that ware once the pride of Society culture now seem to have lost their influence. The relentless grip of globalization has fragmented the vast splendor of folk culture. It's no longer easy to hear the prayers, vows, and songs as before. However, this is not the final word for folk culture dose not die, it only transforms. Folk culture teaches unity, harmony, and connection. It's the teaches spirit of brotherhood.

Discussion

১৯৪৭ এর দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ওপার বাংলা থেকে এসেছিল এপার বাংলায় ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষ ও পূর্বপাকিস্তান সৃষ্টি হলেও কোথাও যেন একটা চাপা দ্বন্দ্বের স্রোত চোরাবালির মত বয়ে চলছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের মধ্যদিয়ে। দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রত্যাখান হল। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষাকে বাংলা দেশের বাঙালী তাকে সজোরে প্রত্যাখান করে আপন মাতৃভাষা গৌরবের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হল। ধর্মের চেয়ে ভাষা অনেক বড়ো। ১৯৫২ তে যেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত হল ১৯৭১ এ সেখানে জন্ম হল বাংলাদেশের। এরপর শুরু হল আরো বিপর্যয়। ওপার বাংলা থেকে পিঁপড়ের শারীর মত মানুষ ছুটে আসে এদেশে। যেখানে অগণিত মানুষের কান্নার চোখের জল বয়ে যায় পদ্মা গঙ্গার জলের স্রোতে। তারি বহিঃপ্রকাশ পায় কবির কলমে –

“এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়ি বারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশাল কেউবা ঢাকায়।” (জলদাও/ বিষ্ণু দে)

ছিন্নমূল মানুষ বাঁচার তাগিদে আশ্রয় নেয় ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। রনবীর সমাদ্দার সম্পাদিত প্রবন্ধ গ্রন্থের 'Reflection on Partition in the east' এর মোহন্ত মন্ডল এমনি এক চরিত্র। এই সব নিম্নবরগীয় নম:শুদ্র জেলে চাষিরাও থাকতে পারেনি নিজেদের দেশে, নিজেদের ভিটায়। আত্মিক সংকট থেকে উত্তরণ ও বাঁচার তাগিদে কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানা পেশায় নিযুক্ত হলেন। তথ্যনুযায়ী ১৯৯১ সালে উপার্জনশীল নমশূদ্রদের ৭৮ শতাংশই নির্ভরশীল ছিল কৃষিকাজের উপর। গবেষণা প্রবন্ধে এই বিষয় আলোচনা কর হয়েছে মূলত সাধারন প্রান্তিক মানুষের অবস্থান কোন রেখায় অবস্থান করেছে এ বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। তাছাড়া অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তাই নমশূদ্র সমাজের প্রত্যেকটি লোকায়ত অনুষ্ঠান, পূজা, গান, বিশ্বাস, সংস্কার সবেতেই কৃষিভাবনা জড়িয়ে আছে।

লোকায়ত ঐতিহ্যে নমঃশূদ্র সমাজ : দেশ ভাগের রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে অসহায় মানুষগুলো সুখ দুঃখের আতুর ঘরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায় অহরহ। দুঃখের সাতকাহন ভরা সংসারের অভাব তাড়নার জটিল আবহের মধ্যেও বিকিয়ে দেয়নি লোক ঐতিহ্যকে। অহরহ জীবন যাতনার মধ্যেও তারা পালন করে চলছিল লোক দেবদেবীর পুজা ও গান। তারই ঐতিহ্য বহন করে গ্রাম গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে চলছে সূর্য পুজার গান, কাচ নাচ, বুড়ি পুজা, বাস্তু পুজা, মাদার ঠাকুর পুজা, ক্ষেত্র ব্রত, সুমতি ব্রত, গাসসি ব্রত, মচ্ছব, বাইদ্য বাইদ্যনীর গান আরো কতকিছু।

বত্তি বা বাস্তুপুজা : বাস্তু বা বত্তি পুজা মূলত ধরিত্রী মায়ের পুজা। পুজা অনুষ্ঠিত হয় পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন। পুজার সময় ভোর বেলা। মূলত নারীরাই এই পুজায় অংশগ্রহণ করে। বাড়ীর গৃহকর্ত্রী পুজার দিন উপোস থেকে মাটি দিয়ে বাস্তু ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করে। মূর্তি তৈরির আগে উঠনের মাঝখানে সিঁদুর দিয়ে পাঁচটি ফোটা দিতেই হয়। সাধারনত চালের গুড়ো দিয়েই মূর্তি তৈরি করে। মূর্তি তৈরি হলে প্রসাদ হিসাবে দেওয়া হয় তিল, কদমা ও বেলপাতা। এই পুজার দিন কেউ মাটিতে হলকর্ষণ বা মাটিতে আঘাত করতে পারবে না। তাদের বিশ্বাস ঐদিন এরূপ কাজ করলে ধরিত্রী মাতাকে আঘাত করা হয়। রাজবংশী সমাজেও এরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। তারাও আমাতি বা অম্বুবাচীর সময় এক সপ্তাহ ধরে মাটি বা ধরিত্রী মাতাকে আঘাত করেনা। কারন এই সময় ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। তবে সময়ের হেরফের আছে। সে যাই হোক না কেন এই পুজায় আছে কামনার সুর। বাড়ীর গৃহিণী কামনা করে যে তাদের পরিবারের সবাই যেন খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারে। ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রহীন এই পুজা আসলে অনার্য পুজারি সংস্করণ বলে মনে করা যেতে পারে।

নাটাই পুজা : পুজার সময়কাল অগ্রাহায়ন মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতটি মেয়েরাই মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রতটি যে একবার শুরু করবে মাসের চারটি রোববারের করতেই হবে। তবে প্রথম দুটি রোববার ও শেষ রোববার করতেই, হবে। মাঝের রোববার বাদ যাবে। ব্রতের জন্য প্রয়োজন – ১৪টি ভেন্না পাতা, একুশটি দূর্বা ঘাস, একুশটি ধান, একটি ঘট, চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি পিঠে, একটি কাটা পুকুর। ব্রতটির সময়কাল সন্ধ্যা বেলা। যে ব্রতী হবে সে সারাদিন উপোষ থাকবে। বাড়ির উঠনে পুকুর কেটে ঘট বসায়। কাটা পুকুরের বা দিকের ডালায় থাকে ৭টি ভেন্না পাত ও চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি লবন ছাড়া ও লবন যুক্ত পিঠে আর ডান দিকের ডালায় থাকবে অনুরূপ প্রসাদ। এর শুরু হবে পুজা। পুজায় ব্রত কারিনী ব্রত কাহিনি বা হাস্তর বলার সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি ও পুকুরে জল ঢেলে দেবে। এই ব্রত পালন করলে নি:সন্তান সন্তান পায় ও হারানো জিনিষ সহজেই পাওয়া যায়। ব্রতের মূল প্রসাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি রীতি মানা জরুরী। পুজা স্থানের বা দিকের ডালা পুজা শেষে উলু দিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়েই তা আবার বাইরে কোন অন্ধকার স্থানে নিয়ে ঝাঁকি দিয়ে পুনরায় আগের স্থানে এনে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। লোক বিশ্বাসনুযায়ী লবন যুক্ত পিঠা পেলে তার সমস্ত মনস্কামনা পুরন হবে আর যদি লবন ছাড়া কেউ পায় তাহলে তার কামনা অপূর্ণই থেকে যাবে। এই লোকানুষ্ঠান মূলত উর্ব্বরতাকেন্দ্রীক। নাটাই ব্রতের সঙ্গে ত্রিপুরার কল্কিনারায়ন ব্রতের বেশ মিল পাওয়া যায়। যে কারনে উভয় ব্রতের শেষ উক্তি একি। ব্রত শেষে বলা হয় –

"হারাইল ধন ঘরে লয়
যার যার মনের বাসনা পূর্ন হয়।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষেত্তর পুজা : অঘ্রায়ন মাসের দুটো নাটাই ব্রত পুজার পর মঙ্গলবার অথবা শনিবার ক্ষেত্তর পুজা করে। পুজা পুরোপুরি নারীকেন্দ্রিক। পুজার আগের দিন ঘরের সবাই নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। দেবীর কোন মূর্তি নেই। এই ক্ষেত্তর দেবীকে মূলত মা লক্ষ্মীদেবীর একটি রূপ বলে মনে করেন। এই পুজা যারা করবে তার সাত বাড়ি মাগন করে চাল সংগ্রহ করবে। এই চালের গুড়ো দিয়ে নাটাই ঠাকুরের মতন প্রতিকৃতি তৈরি করে। পুজার উপকরণ - বিচা কলা, খই,মোয়া, মুড়ি, বুট ভাজা, বিভিন্ন রকমের ডাল ভাজা, ফুল, দূর্বা, তুলসী, সাতটি বেগুন পাতা, সাতটি কুল পাতা, কলার পাত ইত্যাদি। কলার পাতায় প্রসাদ সাজিয়ে গোয়াল ঘরে রাখা হয় এবং এই প্রসাদ রাখালেরা গ্রহন করে। কুল ও বেগুন পাতার প্রসাদ প্রত্যেক ঘরের চালে সবজি ও অন্যান্য খেতে ছিটিয়ে দেয় চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি ক্ষেত্তর ঠাকুরকে বাড়ির ছোট ছেলেরা চেটে চেটে খাবে। লোক বিশ্বাস - ক্ষেত্তর ঠাকুরে চালের গুড়ো খেলে ছোট বাচ্ছারা বিছানায় প্রস্রাব করে না। ক্ষেত্তর পুজা আসলে ফসল বৃদ্ধি কামনা মূলক পুজা।

সুমতি পুজা : সুমতি পুজা যে কোন সময়, যে কোন মাসে করা যায়। পুজার দিন সোম ও শুক্রবার হতেই হবে। সূর্য ওঠার আগেই পুজা শেষ করতেই হবে। একটি লম্বা পাথরকে দেবী হিসাবে কল্পনা করে। পুজার আগে পাথুরে দেবীকে সর্ষের তেল দিয়ে স্নান ও পাঁচটি সিঁদুরের ফোটা দিতেই হবে। পুজার উপকরন - সাতটি পান, প্রত্যেক পানে সুপারি বাতাসা, খয়ের, জর্দা, ঘট, আমের পল্লব, ফলমূল ও ভোগ প্রসাদ। ফুল বেলপাতা হাতে নিয়ে যখন পুজা করা হয় তখন বলতে হয়–

"এই বত্তের এই কথা, ঘটে দেয় বেলপাতা
হারানো ধন পাওয়া যায়, মনস্কামনা পূর্ন হয়।"[২]

সুমতি দেবীর কাছে সকলে ফুল, বেলপাতা নিয়ে মনস্কামনা করে। এমনিকি বাড়ির অসুস্থ মানুষের জন্যও দেবীর কাছে প্রার্থনা করে। তথ্যদাতা মায়ারানী সরকার বলেন যে কোন বাড়িতে বিয়ের পর সুমতি পুজা করাতেই হয়। দেবীর কাছে যার মানত থাকবে সে সুমতি ঠাকুর ও ঘট মাথায় করে ঠাকুর ঘরে যাবে এবং বাড়ির সকলে উলু ধ্বনি দেবে। এই পুজায় সুমতি ও কুমতির কাহিনি বলা হয়। ব্যক্তি মনস্কামনার সঙ্গে পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করে ব্রতীরা। এই পুজার সঙ্গে সাইটোল বিষহরি দেবীর একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

সূর্য পুজা : সারা পৃথিবী জুড়েই সূর্য পুজার প্রচলন আছে। আদিম সভ্যতায় মানুষ জল, হাওয়া, সূর্য কিরন, বন্যা ইত্যাদি বিপদ থেকে রক্ষা পেতে তাদের দেব দেবী হিসাবে কল্পনা করেছে। প্রাচীন ভারত বর্ষে মুনিরা তপস্যা করেছেন সূর্যের কাছে। এমনকি মহাভারতের সূর্যের ঐরসে জন্ম কর্নের।

কিন্তু লোক মননে সূর্যের পুজা ভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যদিয়ে প্রতিভাস হয়। বিশেষ করে নম:সূদ্র সমাজে সূর্য পুজা ও ব্রত পালন একেবারেই আলাদা। মাঘ মাসের সরস্বতী পুজার দিন থেকে মাঘী পূর্নমার দিন পর্যন্ত সূর্য পুজা চলে। পুজার দিন হতে হবে রবিবার অথবা বৃহস্পতিবার।

সূর্য পূজার আগের দিন উত্তর দক্ষিণ উঠনে মাটি দিয়ে সূরা দেবের বেদী তৈরি করে। পুজা সম্পূর্ণরূপে নারীদের। যারা পূজা দেন তাদের বত্তি বলা হয়। যে নারী প্রথম সূর্য পুজা করবে, সে সকালবেলা স্নান করে ভিজে কাপড়ে প্রদীপ হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকবে। বত্তির চারদিকে সিঁদুর দিয়ে গন্ডি কুন্ডলী কাটা থাকবে। পূর্বে যে বত্তি ছিল সেই একমাত্র একটি পয়সা হাতে নিয়ে কুণ্ডলী কাটবে। গন্ডির ভেতরে থাকা বত্তিকে সূর্যদেবকে কথা দিতে হবে যে পরের বছর সে পুজা করবে। সূর্য পুজা করা হয় সকল ও বিকাল দুটি পর্যায়ে। সকাল বেলার পূজার উপকরণ হিসাবে থাকে – দুটি ঘট, প্রত্যেক বত্তির জন্য আলাদা আলাদা ঘট, প্রদীপ, কলা, পান, সুপারি, আমের পল্লব, গামছা, ধুপতি ইত্যাদি। বিকেল বেলার সূর্য পূজার আগে মাটির বেদীটিকে গাদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সকাল বেলায় পূজার বত্তিরা পূর্ব দিকে মুখ করে থাকে আর বিকেল বেলার পূজায় থাকবে পশ্চিম দিকে মুখ করে। আসলে সূর্যের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজারী বত্তিদেরও দিক পরিবর্তন হয়। সূর্য পূজা গানের কয়েকটি পর্যায় আছে। পর্যায়গুলি হল –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এক. জাগানো গান
দুই. বন্দনা গান
তিন. রূপ বর্ননার গান
চার. রাখাল বেশের গান
পাঁচ. সন্ধ্যা আরতির গান।

প্রথম তিনটি পর্যায়ের গান সকাল বেলার গান, পরের দুটি পর্যায়ের গান বিকেল বিকেল বেলার গান।

এক. জাগানো গান : সূর্য সারাদিনের ঝর ঝাপটা নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে সে ক্লান্ত। তাই সারারাত সে থাকে নিদ্রামগ্ন ।কেননা কাল আবার সকাল বেলায় উদয় হতেই হবে। তাই বত্তিরা গানের মাধ্যমে সূর্যদেবকে জাগিয়ে তুলে এক বিশেষ সুর লয়ের মাধ্যমে।

গান :

“ওঠ ওঠ সূর্য ঠাকুর নিশানা ভাঙ্গিয়া
তোমার জন্য দাঁড়ায়ে আছি ঘিয়ের প্রদীপ লইয়া
একশ বত্তি চাইয়া রইয়াছে ভিজা বসন পরে
একশ বত্তি চাইয়া রইয়াছে ঘট হাতে লইয়া।”[৩]

পূজার সমস্ত উপকরণ দিয়ে সূর্যদেবকে নিয়ে গান হবে।

দুই. বন্দনা গান : সূর্যদেবকে কেন্দ্র করে দশদিক বন্দনা করে গানের মধ্যদিয়ে।

গান :

“বন্দি আমি রাম লক্ষন (বন্দি অর্থে বন্দনা)
বন্দি সীতার চরন, জয় জানকী
প্রথমে বন্দনা করি মাতা পিতার চরন (জয় জানকী)
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাশ পর্বত
তাহার মধ্যে বসত করে ভোলা মহেশ্বর।”[৪]

গানের মধ্যদিয়ে দশদিক বন্দনা করে সূর্যদেবকে মাঝখানে স্থান দিতে হয়।

তিন. ঠাকুরের রূপ বর্ননার গান :

গান :

“জলধর গোবিন্দ চরন।
দেখলাম কদম তলায় গৌর সখী
কি রূপ দেখে আসলাম
কৃষ্ণর মাথায় রৌদ্রে গলে
বাতাস পাইলে ঝলকে গো সখী ঝলকে।”[৫]

গানে সূর্যকে কৃষ্ণ রূপের আকারে ধরে কৃষ্ণর সমস্ত দিকের রূপ বর্ননা করে। আসলে বৈষ্ণব আন্দোলন তথা চৈতন্যদেবের প্রভাব ব্যপক ভাবে সারা ফেলেছিল সারা বাংলায়। যার ফলে সূর্যকে কৃষ্ণ রূপেই তাদের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। তাই গানের মধ্যদিয়ে কৃষ্ণর পরশ পাওয়ার জন্য নানা প্রকরনে কৃষ্ণকে সাজিয়ে তোলে -

গান :

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"চলো গো সখী আমরা কৃষ্ণর উদ্দেশে যাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।
বিনা জলে চন্দ ঘষি কৃষ্ণরে সাজাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।
বিনা তেলে কাজল পেরে কৃষ্ণরে সাজাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।
বিনি সুতার মালা গেঁথে কৃষ্ণরে সাজাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।"[৬]

চার. রাখাল বেশের গান : বিকেল বেলায় যখন সূর্য পূজা অনুষ্ঠিত হবে তখন প্রত্যেক বত্তি আতপ ধানের খই নিজের কোচে নেবে। সূর্য ঠাকুরের চারপাশে একবার প্রশিক্ষণ করে এক মুঠো খই নিজের ঘটের সামনে এসে পশ্চিম দিক মুখ করে ছিটিয়ে দেবে। এভাবে কমপক্ষে সাতবার সূর্য ঠাকুরকে কেন্দ্র করে প্রশিক্ষণ করবে আর খই ছিটিয়ে দেবে। বিকেলের গানে সূর্য ঠাকুরকে রাখাল রূপ ধরে বত্তিরা গান গেয়ে থাকে –

'ঘট আনোলো সখী পূজা করবো
ঠাকুর এসে রাখাল বেশে দাঁড়াল।

এভাবেই বত্তিরা পূজার যাবতীয় উপকরণ (ফল, বাতাসা, নাড়ু, খৈ, দুধ, সিঁদুর) গানের ভাষায় তুলে ধরে।

পাঁচ. সন্ধ্যা আরতির গান : বিকেলের পূজা শেষ। প্রত্যেক বত্তি প্রদীপ হাতে নিয়ে সাতবার এগিয়ে যাবে আবার সাতবার পিছিয়ে আসবে। এই সমস্বরে উলুধ্বনি দেয়। এই সময়েই গাওয়া হয় সন্ধ্যা আরতির গান। দুই তিন ধারায় সন্ধ্যা আরতির গান গাওয়া হয়। কিন্তু এখানে একটি ধারার গান উল্লেখ করা হল -

গান :

"আরতি করে ব্রজ মায়া
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।
কৃষ্ণ গুন গাইয়ারে
মঙ্গল আরতি ঢাকো বাজে, ঢোলো বাজে
বাজে করতাল কাসি।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে
বাজে মিলন বানীরে।
মঙ্গল আরতি —
ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, নাচে শিব শঙ্কর
মহামুনি নারদ নাচে, বীনায় দিয়া সুররে।
মঙ্গল আরতি —
চন্দ্র নাচে, সূর্য নাচে, নাচে গ্রহ তারা
পাতালে বাসকী নাচে হইয়া দিশা হারারে।"[৭]

পূজা শেষ হলে প্রত্যেক বত্তি ঘট, প্রদীপ, ধূপ নিজের নিজের ঘরে রেখে দেবে।

মচ্ছব : নমশূদ্র সমাজের একটি আনন্দ মুখর অনুষ্ঠান মচ্ছব। 'মচ্ছব' কথাটির অর্থ মহোৎসব। মহোৎসব - মতসব - মচ্ছব। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগের থেকেই এক আনন্দ মুখর পরিবেশ তৈরি হয়। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গ্রামীন কৃষকেরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভগবানের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করে এবং গ্রামের সমস্ত কৃষক পরিবার এতে অংশ গ্রহণ করে। প্রসাদ হিসাবে থাকে – ভাত, শাক, শাক, লাবড়া, রসা, সবজি, চাটনি পায়েস ও বিভিন্ন প্রকারের ডাল।

ধান ঘরে তোলা শেষ। কাজের অবসর। কাজেই আনন্দ আর ধরেনা। সাধারন কৃষক সমাজ নিজের মনে মনে গেঁথে নেয় ছড়া, গান। এই মচ্ছব পর্বটির মধ্যে যে ছড়া ধর্মী গান পরিবেশন করে থাকে, তাকে বলা হয় 'প্রেমধ্বনি'। এই ছড়া ধর্মী গানে কখনো উঠে আসে পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ভাবনা আবার কখনো উঠে আসে পৌরানিকতা। পৌরানিকতা বিষয়ক প্রেমধ্বনি গান –

“কি করগো নন্দরানী যশোধা রোহিনী — হ্যাঁ
কালিন্দীর তীরে বগা খাইছে নীলমণি —হ্যাঁ
আইলিয়া মাথার কেশ পাগলিনী প্রায় — হ্যাঁ
কালিন্দীর তীরে নিরখিয়া চায় — হ্যাঁ
মায়ের কান্দনে কানাই শ্রবনে ওশিল — হ্যাঁ
বাশীতে ছলনা করে বগাকে বধিল — হ্যাঁ।”[৮]

সামাজিক - প্রাকৃতিক বিষয় নিয়েও পংক্তি ভোজের আসরে প্রেমধ্বনির গান গায়। যে গানগুলিতে সামাজের নানা প্রসঙ্গ যেমন ধরা পরে তেমনি প্রকৃতির বহুবিধ প্রকাশও উঠে আসে। আসলে সাধারন মানুষ সকলের সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

গান :

“ওরে ও ভ্রমরা কত খাও মধু কমলা — হ্যাঁ
অল্প অল্প করে খাও — হ্যাঁ
বন্ধনে পড়িবা তুমি — হ্যাঁ
শীঘ্র চলিয়া যাইও — হ্যাঁ
শুদ্ধ নারীর সঙ্গ ধরে — হ্যাঁ
সারা নিশি মধু খেয়ে — হ্যাঁ।”[৯]

লোক পূজায় সমাজ চিত্র : লোক মননে সুদীর্ঘকাল ধরে লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকব্রত, লোকধর্ম, লোকপূজা প্রভৃতি লোক ঐতিহ্যের যে প্রবাহ ধারা তাঁদের নিজস্ব তাগিদে সৃষ্টি হয়ে যুগযুগ ধরে বয়ে চলেছে তাকেই আমরা বলি লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির প্রধান উপাদান লোকসমাজ। গবেষনা প্রবন্ধে লোকসমাজের লোক দেবদেবীর পূজা, রীতি নীতি, পূজা উপলক্ষে গান, আলপনা সবিতে লোক বিশ্বাসের ছড়াছড়ি। এই বিশ্বাসের উপর ভর করে যে পূজা, ব্রতাচার গড়ে উঠেছে তাতে লোক মানসের আর্থ সামাজিক চিত্র ধরা পরে। পূজা ব্রতাচারে ব্যবহৃত বিভিন্ন আলপনার চিত্র (চন্দ্র, সূর্য, তারা, পৃথিবী, ঘট, প্রদীপ, পুকুর), কুমারী, সধবা, নারী পুরুষদের মুখে বলা ছড়া, হাস্তর, গান গাওয়ার মধ্যদিয়ে আদিম যুগের আর্থ সামাজিক স্তরের উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত। প্রত্যেকটি পূজাব্রতের মূল উৎস উর্বরতাভিত্তিক জাদুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। সন্তান, পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি, শস্য কামনার মিলিত রূপ এই পূজাব্রত। সূর্য পূজা গানের মধ্যে যে সামাজিকতা, সমাজ বাস্তবতা লক্ষ্য করার মতো তা হল মিথের ব্যবহার। গানের পৌরানিক চরিত্রগুলো (রাম, লক্ষন, সীতা, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ) যেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। গায়কী ‘কালো জলে কৃষ্ণকে’ কাছে পেতে চেয়েছেন রাধার মতো। পারমার্থিক ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ এই পৌরানিক চরিত্রের উপস্থাপন।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের পূজা ব্রত, রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যথা –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথমত : আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের পূজার অন্যতম বিশেষত্ব আলপনা। আলপনার বহুমাত্রিক নকশা চিত্র নারীমনের নান্দনিক সৌন্দর্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ। একসময় নারীদের কাছে বাইরের জগৎ ছিল অচেনা অজানা। মনের কোনে লালিত বহুদিনের বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় আলপনার মধ্যদিয়ে।

দ্বিতীয়ত : মূলত নারীরাই সংস্কৃতির ধারক বাহক। গবেষনা প্রবন্ধের যে কটি পূজাব্রত আলোচিত হয়েছে যেখানে নারীরাই প্রধান। একমাত্র মচ্ছব ছাড়া। তবে সেখানেও নারীরা উপস্থিত। কারন প্রসাদের রান্না থেকে আয়োজন সবই নারীর হাত দিয়ে হয়েছে। আসলে নারীরা সর্বমঙ্গলাময়ী। আপন সুখকে বিসর্জন দিয়ে সন্তান, স্বামীর সুখ আনন্দ কামনায় ব্যস্ত থাকেন। আর একারনেই পূজা ও ব্রত পালন।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে আলোচিত পূজা, ব্রতগুলি একসময় নম:শূদ্র সমাজের প্রতিটি বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত। যাকে কেন্দ্র করে সারা গ্রাম থাকত উৎসব মুখর। কিন্তু বিশ্বায়নের চাপে ও তাপে বর্তমানে পূজাগুলির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে বাসন্তী সরকার, শেফালী সরকারদের চোখে মুখে করুন হতাশার বানীই শোনা গেছে। তবে কোথায় কোথায় টিমটিম বেঁচে আছে।

Reference:

১. বাসনা সরকার (60), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম+পো : প্রমোদনগর, থানা : ফালাকাটা, জেলা : আলিপুরদুয়ার, তাং - ৭.৭.২০১০
২. ঐ
৩. ঐ
৪. শেফালী সরকার (৫৫), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম + পো : প্রমোদনগর, থানা : ফালাকাটা, জেলা : আলিপুরদুয়ার, তাং - ১৫.৭.২০১১
৫. বাসন্তী সরকার (৬০), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম + পো : ঝাড়শালবাড়ী, থানা : ধুপগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি
৬. ঐ
৭. সরস্বতী সরকার (61), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম + পো : শালবাড়ী, থানা : ধুপগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি, তাং - ২৫.৭.২০১১
৮. মায়া মন্ডল (55), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম : গাদং, পো : ঝাড়শালবাড়ী, থানা : ধুপগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি, তাং - ১৫.৯.২০১১
৯. হরমোহন সরকার (58), গ্রাম + পো : প্রমোদনগর, থানা : ফালাকাটা, জেলা : আলিপুরদুয়ার, তাং - ১০.১২.২০১২

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), দেশ বিভাগ ও বাংলা উপন্যাস।
শেখর বন্দোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), জাতি, বর্ন, ও বাঙালী সমাজ।
অরবিন্দ কর (সম্পা), কিরাত ভূমি (শারদীয়া সংখ্যা)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 730 - 739
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে অপরাধী চরিত্রের গঠন

গার্গী বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : gargi.bethune@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Structure-Construction-Activities of Criminal Character-Making process of Criminal Character.

Abstract
The oppression of the British increased in colonial period. After that, people's lives become uncertain and that's why people, mainly men, and women was getting cruel and ferocious. Gradually, the level of crime increased. Numbers of robber and Thagi gradually increased in our society. In this situation, the police system was activated in Bengal.

On that time, young generation of Bengal, maximum young men employed as a policeman. Their job was mobile. After joining the post of Daroga, the young men took part in important role to reduce the level of crime. Later, their own life's experiences became detective stories and novels for the readers. Bangalee got their history of crime.

At the later time, there was imitation of foreign detective literature was noticed in our own crime fiction. But after that, some prime detective literature was written by Bengali authors.

Not all stories or novels have criminal characters. For the sake of the plot, author creates the criminal characters in a particular design or pattern. This is the main discussion topic for the paper.

Discussion

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির উত্থান প্রসঙ্গ আসলে, স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনির কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অপরাধ এবং অপরাধীর ধারণা পেতে অসুবিধা হয় না, মানবসভ্যতার আদিকাল থেকেই অপরাধের ধারনা কম-বেশি বর্তমান। দেশীয় কাহিনিতেও অপরাধ প্রবণতা, অপরাধ সনাক্তকারীদের পরিচয়ও মেলে। কিন্তু প্রথাগতভাবে গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধ-অপরাধী প্রসঙ্গ এবং আরও সূক্ষ্মভাবে বলা চলে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধ এবং অপরাধ সম্পর্কিত অপরাধীর ধারণা অনেক পরে এসেছে। বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির শাখাটি-ই অনেক পরে বিস্তার লাভ করেছে। আর, এইখানেই বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনির ওপর বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা কাহিনি অল্প-বিস্তর ঋণী। এখানে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি সচেতন হয়ে বলা যায়, দীর্ঘ দু'শ বছর ব্রিটিশ অধীনে ভারতবর্ষ ছিল, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রভাব যে সেখানে বর্তমান, তা বলাই বাহুল্য।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টির জগতেও শিল্প-সাহিত্যেও ব্যাপক রদ-বদল ঘটেছিল। একদিকে যেমন রিয়্যালিস্ট নভেলের চাহিদা বাড়ছিল, তেমনি অন্যদিকে রোম্যান্টিক নভেলের প্রতি একদলের আকর্ষণও

তৈরি হচ্ছিল। এই রোম্যান্টিক নভেলের ধারা-ই ক্রমে বিবর্তিত হয়ে, তার একটি শাখা ডার্ক- রোম্যান্টিসিজমের পথ নেয়। এই ডার্ক-রোম্যান্টিসিজমের ধারা পরবর্তীতে বিবর্তিত হয়ে তার একটি শাখা গোয়েন্দা কাহিনির দিকে মোড় নেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তারই প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যে এসে পড়ে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একদিনে গোয়েন্দা কাহিনি বিস্তৃতি লাভ করেনি। বাংলায় ঔপনিবেশিক রাজত্বকালে ব্রিটিশদের অত্যাচারের রূপ ভয়াবহ আকার ধারন করে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমে অনিশ্চিত আকার নেয়। স্বাভাবিকভাবেই, অপরাধের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ নিতে থাকে। মানুষ-ই মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হতে শুরু করে। সমাজে দস্যু, জলদস্যু, ঠগীর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই অরাজক পরিস্থিতির সামাল দিতে বাংলায় পুলিশি ব্যবস্থা কঠোর পদক্ষেপ নেয়। বাংলায় পুলিশি ব্যবস্থার রূপ সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করলে, পরিস্থিতিকে আরো সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে, এই পুলিশি কার্যে অনেক বাঙালি তরুণ নিযুক্ত হয়। তারা তাদের কর্মসূত্রে প্রাপ্ত অপরাধ কাহিনির অভিজ্ঞতা একত্রে সংগ্রহ করে অপরাধ কাহিনির একটি ধারার প্রচলন করেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, অপরাধ কাহিনির মূল দুটি দিক বর্তমান। একটি হল, অপরাধের ঘটনা, অন্যটি হল অপরাধ অন্বেষণের ঘটনা। প্রথম কাজে ভূমিকা নেয় একজন অপরাধী। দ্বিতীয় কাজটি অপরাধীর হাতে থাকে না। তার দায়িত্ব পড়ে দারোগা, পুলিশ অথবা গোয়েন্দার হাতে। অনেক সময় প্রাইভেট ডিটেকটিভ বা বলা চলে, শখের গোয়েন্দা নিজে থেকে কেসটি সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম ঘটনাতে তাৎক্ষণিক কাজের মাত্রা থাকে অনেক বেশি। পরেরটিতে পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাওয়ার ভূমিকা থাকে অনেক বেশি। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে যে কাহিনিগুলি পুলিশি কাহিনি আকারে লেখা হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হল, বরকতউল্লা বা বাঁকাউল্লা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বসুর কাহিনিগুলি।

এরপর অপরাধের কাহিনিতে গোয়েন্দার ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক-তৃতীয় দশকের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির প্রাচুর্য বাড়তে থাকে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে যেমন পুলিশি কাহিনির আধিক্য দেখা যায়, বিশ শতকের শুরুর দিকে বিদেশী গোয়েন্দা সাহিত্যের অনুবাদের একটি প্রচলিত ধারা সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। দীনেন্দ্রকুমার রায়, পাঁচকড়ি দে-র রচনায় অনুবাদের প্রবণতা চোখে পড়ে। এরপর বাংলায় স্বতন্ত্র গোয়েন্দা কাহিনি লেখার সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে, সেই লেখাতেও কয়েকটি চরিত্রে বিদেশী চরিত্রদের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি কিছু নিজস্ব ঢং-এ পরিবেশিত হতে থাকে। মূলত বিশ শতকের গোড়ার দিকে যেসব লেখকরা গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন, তারা নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেন। এই বিশেষত্ব গুলি অনুসরণ করার ফলে কিছু ক্ষেত্রে তা পাঠকের কাছে একঘেয়েও হয়ে ওঠে। অনেক কাহিনিই উদ্দেশ্যমূলক ভাবে লেখা হয়েছে কিশোরদের উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের গোয়েন্দা কাহিনিতে মহিলা চরিত্রদের পাঠকের সামনে বিশেষভাবে আনা হয়নি। সুখকর কিশোরপাঠ্য রচনার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দাদের জীবনও একরৈখিক রাখা হয়েছে। কাহিনিতে প্রেম-যৌনতা প্রায় নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অবিবাহিত রয়ে গেছে পাঠকের কাছে। যদিও এতে গোয়েন্দা কাহিনির স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হয়নি, উপরন্তু, একটি ধারার জন্ম দিয়েছে। বরং, ত্রিশূল গোয়েন্দার ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

অপরাধী প্রসঙ্গে বলা যায়, যেহেতু পুলিশি কাহিনি অথবা অনুবাদ কাহিনির পর কিশোরপাঠ্য হিসেবেই গোয়েন্দা কাহিনির বিকাশ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, তাই কাহিনিতে গোয়েন্দার ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। গোয়েন্দাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেক লেখকই গোয়েন্দা চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অপরাধের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসেছে তবে, অপরাধীর চরিত্র অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিতও থেকেছে। কখনো কখনো অপরাধীর বর্ণনা উল্লেখ থাকলেও, নামের উল্লেখ নেই, অথবা নামোল্লেখটুকু থাকলেও তাদের মনস্তত্ত্বের পরিচয় অনেক লেখকই অগ্রাহ্য করে গেছেন। গোয়েন্দা কাহিনির বয়ানে অনেক অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনিরও জন্ম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মামাবাবু, বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদা অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবুর কাহিনিগুলির প্রসঙ্গের কথা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গোয়েন্দা কাহিনির গঠন : বাংলা সাহিত্যে প্রথমে পুলিশি কাহিনির রূপে যেহেতু অপরাধ কাহিনি বা গোয়েন্দা কাহিনির আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে, ফলে প্রথম দিকে তার রচনার গতি নিজস্ব ধারায় বর্ণিত হতে থাকে। এই পুলিশি কাহিনির অধিকাংশ ঘটনায় লেখকেরা যেহেতু স্বীকার করে নিয়েছেন, যে, কাহিনিগুলির অধিকাংশই সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত, ফলে ঘটনার বর্ণনায় সেখানে অধিক। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে, উদ্দেশ্যমূলক হয়ে অথবা সমৃদ্ধ গুণসম্পন্ন হয়ে সেইসকল কাহিনি রচিত হয়নি। বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে গোয়েন্দা কাহিনির একটি নিজস্ব নির্মাণ রূপ ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের ধারায় সংযুক্ত হয়। মূলত বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে যেসব কাহিনি অনুবাদ হতে থাকে বাংলায়, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু ঘটনা ভৌগোলিক কারণে অথবা জলবায়ুর পার্থক্যে স্বতন্ত্র রূপ নিলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনুকরণের মাত্রাও চোখে পড়ে। গোয়েন্দা কাহিনির মধ্যে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, গোয়েন্দার সহকারী বন্ধু অথবা সাগরেদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। এটির উল্লেখ শার্লক হোমসের কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাহিনিতে যেমন, জয়ন্ত সঙ্গে মানিক, বিমল সঙ্গে কুমার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কাহিনিতে গোয়েন্দা হুকাকাশির সঙ্গে রণজিত, ব্যোমকেশ সঙ্গে অজিতেশ, ফেলুদা সঙ্গে তপসে অথবা জটায়ুর ভূমিকা উল্লেখ করা যায়।

তবে, শুধুমাত্র অনুকরণই নয়, স্বতন্ত্র ধারণার উপস্থিতিও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে, ত্রিশূল ডিটেকটিভের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রিশূল ডিটেকটিভ সম্পর্কে প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন,-

> “ত্রিশূল ডিটেকটিভ হল গোয়েন্দার সঙ্গে সহকারী ওয়াটসন ছাড়াও আরও এক সঙ্গী। হেমেন্দ্রকুমারের ক্ষেত্রে জয়ন্তর সঙ্গে মানিক ছাড়া সুন্দরবাবু। কিংবা হেমন্তর সঙ্গে রবীন ছাড়া সতীশবাবু।”[১]

এই ত্রিশূল ডিটেকটিভের বিষয়টি চিহ্নিত করে পাঠককে সচেতন করার পেছনে অধ্যাপক সেনেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

সময়কালের প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির ধরনেও কিছু পার্থক্য এসেছে। উল্লেখ করে বলা যায়, অস্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মূলত পুলিশি গোয়েন্দা কাহিনিতে পুলিশের চরিত্র অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রূপে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। পুলিশের বা দারোগার ভূমিকা সেখানে অত্যন্ত সক্রিয় রূপে দেখানো হয়। পরবর্তীতে, ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে প্রাইভেট ডিটেকটিভের ভূমিকা বাড়তে থাকে। পুলিশ সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহকারী ভূমিকা পালন করে। কাহিনিগুলিতে গোয়েন্দা চরিত্র প্রধান হয়ে পড়ে। পুলিশের চরিত্র অপ্রধান হয়ে পড়ে। তবে, বিংশ শতকের সত্তর দশক পরবর্তী সময়ে পুলিশ ডিটেকটিভের ভূমিকায় সক্রিয় ভাবে গুরুত্ব পালন করে, এমন ঘটনার উদাহরণও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে মেলে।

বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের গোয়েন্দা কাহিনি অপেক্ষা তিরিশ-পঞ্চাশ বছর পরবর্তী গোয়েন্দা কাহিনির রসদ অপেক্ষাকৃত ভাবে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের তিরিশের দশকে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে বৈজ্ঞানিক ল্যাবের প্রসঙ্গ উঠে আসছে। অপরাধীরা বিভিন্ন দ্রব্যে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল বা রাসায়নিক জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করে। সেই কারণে গোয়েন্দাকেও হতে হয়, অনেক বেশি আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক ল্যাবের কাজে দক্ষ। তদন্তের জন্যও তাকে হতে হয় সমস্ত প্রকারে অনুসন্ধানী। অর্থাৎ, শুধুমাত্র অপরাধী অনুসন্ধান বা কেসগুলি তদন্তভিত্তিকই হয়ে পড়ছে না, অপরাধী ধরার বা অপরাধ সনাক্ত করার মাত্রাও রদবদল হচ্ছে— সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনিতে। যা সময় ক্রমে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম হচ্ছে। অপরাধী সন্ধান করার পদ্ধতিও অনেকবেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মত হয়ে উঠছে। ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাণ : বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্মাণও করা হয়। কম-বেশি প্রায় সকল গোয়েন্দা কাহিনিতেই এই নির্মাণের রূপটি চোখে পড়ে। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি প্রসঙ্গত, কাহিনির একটি *উত্থান পর্ব, বিকাশ পর্ব* এবং *পরিণতি পর্ব* (বক্রাক্ষর আমাদের) চিহ্নিত করা যেতে পারে। কাহিনির প্লটের ভিত্তিতে উত্থান-বিকাশ-পরিণতিকে বিচার করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ক্রাইম কাহিনীর মধ্যে অন্য দিক দিয়ে দেখলে তিনটি স্তর আছে। যেমন আছে মানুষের বেলায়- ভ্রূণ অবস্থা, শিশুকাল ও সামর্থ্য।"[২]

কোনো সুসংলগ্ন কাহিনিকে যথাযথ শিল্পের মর্যাদারূপ পেতে হলে তাকে সুষম, পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। সেই সুষম, সংবদ্ধ, সমগ্র রূপের মধ্যে একটি আদি, মধ্য এবং অন্তিম— এই তিনরূপের বিন্যাস থাকা প্রয়োজন। গোয়েন্দা কাহিনি এর ব্যতিক্রম নয়। বরং এই বিন্যাস অনেক বেশি স্পষ্ট।

গোয়েন্দা কাহিনির অন্যতম আকর্ষণ অপরাধীকে সনাক্ত করা। পাঠক অপরাধীকে অন্বেষণের কারণেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। যে লেখক যত সুষম, সংঘবদ্ধ পদ্ধতিতে পাঠকের কাছে অপরাধীর পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম হন, সেই কাহিনি তত বেশি চমকপ্রদ হয়। একইসঙ্গে বলা প্রয়োজন, সংঘবদ্ধ হতে গেলে একটি দৃঢ় পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়। কাহিনি গঠনের আদি-মধ্য-অন্ত্যরূপ নির্মাণ সেই পরিকল্পনারই অংশ। গোয়েন্দা কাহিনি সংক্ষেপে কী? তা বলতে গিয়ে W.H. Auden বলেছেন, -

> "The basic formula is this: a murder occurs; many are suspected; all but one suspect, who is the murderer, are eliminated; the murderer is arrested or dies."[৩]

কাহিনির শুরুতেই অপরাধীকে সনাক্ত করেন না লেখক। অপরাধীকে পাঠকের সামনে আনতে কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নেন তিনি। এই পদ্ধতিগুলি-ই ক্রমে পর্বগুলির মধ্য দিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখ করা হল।

আদি বা উত্থান পর্ব : কাহিনির প্লটেই আদি বা উত্থান পর্বে ঘটনাস্থলের অপরাধের সঙ্গে পাঠককূলের পরিচয় ঘটে। অপরাধের ধরন বিবৃত হওয়ার পরেই পাঠকের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গোয়েন্দার পরিচয় ঘটে। সেই হল কাহিনির মূল নায়ক চরিত্র। তাকে নায়ক করে গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য চরিত্রের (বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি, সাগরেদ বা পুলিশ) আবির্ভাব ঘটে। যারা গোয়েন্দার নির্দেশ অনুসারে কাজ করে এবং অপরাধী সনাক্তকরণের কাজে সহায়তা করে। মূলত কি অপরাধ ঘটেছে, কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে অপরাধ করেছে অপরাধী তারই সংক্ষেপিত একটি বর্ণনা এই অংশে করা হয়ে থাকে।

মধ্য বা বিকাশ পর্ব : গোয়েন্দা চরিত্র পাঠকের কাছে প্রকাশ হওয়ার পর গোয়েন্দা অপরাধী সনাক্তকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সে এক নিরীক্ষা-ই বটে। গোয়েন্দা কখনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ল্যাবের বিভিন্ন কেমিক্যাল দ্বারা পরীক্ষা করে, ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো উপকরণের সাহায্যে অপরাধী কে হতে পারে, তা বিবিধ উপায়ে একপ্রকার পর্যবেক্ষণ করে, মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার সাহায্যে অনুমান করেন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক সত্য জেনে ফেলেন। প্রয়োজনে, জনসংযোগ মাধ্যমকেও ব্যাপক ভাবে তিনি কাজে লাগান। অর্থাৎ, অপরাধীকে চিহ্নিত করতে অথবা চিহ্নিত অপরাধীর কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে দূত হিসেবে কখনো কখনো কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন অথবা, নিজে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরাধীর ঠিকানা জানতে বা তার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হন। কিন্তু, সর্বসমক্ষে সাক্ষী রেখে গোপন তথ্য প্রকাশ সময় এটি নয়। গোয়েন্দা তথা লেখক এটি পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ, অপরাধী সনাক্তকরণের সম্পূর্ণ যে পদ্ধতি তা এই অংশে বিবৃত থাকে।

অন্তিম বা পরিণতি পর্ব : গোয়েন্দা কাহিনির এই অংশে সমস্ত পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষা শেষে অপরাধী দলকে বা মূল অপরাধীকে পাঠকের কাছে চিহ্নিত করেন। প্রয়োজনে তার শাস্তির দায়িত্ব নিজে নেন, অবশ্যই তা অপরাধের মাত্রার ওপর নির্ভর করে অথবা তাকে কখনো কখনো পালিয়ে যেতেও সাহায্য করেন, বা পালিয়ে যেতে বাধা দেন না। কখনো তিনি ভারতীয় বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম মেনে পুলিশের হাতে ছেড়ে দেন। সংশোধনাগারে সেই অপরাধী বা অপরাধীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। কখনো অপরাধীর অপরাধটুকুকে চিহ্নিত করেন শুধুমাত্র গোয়েন্দা। কখনো তা সংশোধনের দায়িত্ব নেন তিনি। অপরাধীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তার কর্তব্য নয়। প্রশাসনিক কাজের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত, এককথায় বলা চলে পাঠকের কাছে রহস্য উন্মোচন করা গোয়েন্দার মূল কাজ। যেমন— তিনি কাহিনির অন্তিম বা পরিণতি পর্বে করে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তিপ্রদানের জন্য পুলিশি সাহায্য নেন। অপরাধের মাত্রা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কখনো তার হেরফেরও ঘটে। কখনো কখনো কাহিনিতে অপরাধীর আত্মহত্যা ঘটলে এক ট্র্যাজিক পরিণতিতে কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

অন্তিম বা পরিণতি পর্ব পরবর্তী অংশ--- গোয়েন্দার প্রাথমিক কাজ রহস্য উন্মোচনের পরে পরিসমাপ্ত হলেও, পাঠকের কাছে তার অথবা লেখকের কিছু দায়বদ্ধতা অবশিষ্ট থেকে যায়। অপরাধের ধরন, অপরাধী সনাক্ত করার পদ্ধতি এবং অপরাধী চিহ্নিত হওয়ার পর, পাঠকের প্রাথমিক কৌতুহল নিবৃত্তি হয় বটে, তবে সম্পূর্ণ নয়। এই কৌতুহলকে সম্পূর্ণ করতেই এই অংশটির গুরুত্ব থাকে। পরিণতি পরবর্তী অংশে অপরাধীর অপরাধ করার সম্পূর্ণ পদ্ধতির বিবরণ এবং অপরাধ করার কারণ উল্লেখ থাকে। যদিও, এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, সব লেখক সব কাহিনিতে ব্যাখ্যা দেন না। অথবা সব গোয়েন্দা অপরাধীর অপরাধ করার প্রবণতা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা বোধও করেন না। কিন্তু, এই বিবরণ থেকেই অপরাধের প্রবণতা তথা অপরাধীর মনস্তত্ত্ব পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। গোয়েন্দা কাহিনিও এইখানেই সার্থক হয়ে ওঠে। পাঠকের মন জয় করে।

ব্যতিক্রম হিসাবে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু কাহিনিতে আলাদা করে অপরাধের সন্ধান অনেকক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, সেইসব কাহিনিতে রহস্যের সমাধান করা-ই গোয়েন্দার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, পরিণতি পরবর্তী অংশ সেইসব কাহিনিতে উহ্য থাকে।

গোয়েন্দা কাহিনিতে অপরাধী চরিত্র গঠন : গোয়েন্দা কাহিনির ভিত্তি-ই হল গোয়েন্দা বা নায়ক চরিত্র এবং অপরাধী বা খলনায়ক চরিত্র। একটি কাহিনিতে এরা পরিপূরক সম্পর্কে অবস্থান করে। একজন ছাড়া আর একজন প্রায় অসম্ভব। কখনো কখনো অপরাধীর অবদান উহ্য হলেও দুজনেরই প্রসঙ্গ-ই কাহিনিতে তাৎপর্যপূর্ণ। একজন অন্যজনের পরিপূরক। ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা সাহিত্যের মূল উপজীব্য হল একটা রহস্য বা অপরাধ। এর পর আসে তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ। খুঁজে বের করা হয় অপরাধের স্থান (কোনো কোনো ক্ষেত্রে), কাল (সময়), উপায়, উদ্দেশ্য এবং অবশেষে অপরাধীর (পাত্র) শনাক্তকরণের মাধ্যমে এর পরিণতি পায়।[৪]

গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাণ পদ্ধতির একটি ছককে যেমন নির্দেশ করা যায়, তেমনই একথাও বলা যায়, কাহিনিতে প্রথমেই পাঠকের সঙ্গে সচরাচর অপরাধীর পরিচয় হয় না। রহস্যের সমাধান শেষে অপরাধীকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন গোয়েন্দা স্বয়ং।

অপরাধীকে পাঠকের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে লেখককে তথা গোয়েন্দাকেও পাঠকের কাছে কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন করতে হয়। যদিও বা কিছু ক্ষেত্রে অপরাধীর চিহ্নিত প্রক্রিয়াটুকু কাহিনির সূচনাতে পাওয়া যায়, তবু, তার চরিত্র, মনোভাব আরো নিঁখুত বর্ণনা কাহিনির শেষেই বিশ্লেষিত হয়। মূলত অপরাধী চরিত্র গঠনের ওপরও কাহিনির পরিপূর্ণতা, বুননের দক্ষতা নির্ভর করে। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির যে প্যাটার্ন বা ধাঁচ তা অনেকাংশে পাশ্চাত্য গোয়েন্দা কাহিনি থেকে অনুকরণ তা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য। সেই ধাঁচ সম্পর্কে বলা যায়, অপরাধীকে পাঠকের সামনে পরিবেশন করারও যথেষ্ট ধাপ অনুসরণ করেন লেখক। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, -

> "The first part of the structure identified by Salgado is the *exposition* of events leading up to the situation requiring vengeance, in revenge tragedy, or investigation, in the crime novel. The second part of the structure is *anticipation* as the revenger plans his revenge, or the detective investigates the crime. The third step is the *confrontation* between revenger and victim, followed by the *partial execution* of the revenger's plan, or, as is often the case with the detective's investigation in the crime novel, the villain's temporary thwarting of it. The final part is the completion of the act of vengeance, or, in the case of crime fiction, the detective's final success in bringing the villain to justice (Salgado 1969: 17)."[৫]

অপরাধী চরিত্র গঠনের পদ্ধতিটিকে সাধারণ ভাবে চারটি ধাপ পেরিয়ে কাহিনিতে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তা হল, অপরাধীর কর্ম, অপরাধীর অপরাধের ধরন বা পদ্ধতি, গোয়েন্দাকে অপরাধীর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা, অপরাধীর সর্বসমক্ষে চিহ্নিত হওয়া, গোয়েন্দা বা পুলিশের কাছে অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশেষে সকলের সামনে অথবা নিতান্ত তার কাছের কিছু স্বজন – বন্ধু - বান্ধবদের কাছে অপরাধীর অপরাধের কারণ প্রকাশ করে পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ হয়। যারা অধীর আগ্রহে রহস্যের কিনারার সমাধানের আশায় ছিল, তাদের কাছে অপরাধী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দা দায় মুক্ত হন। লেখক তার লেখনীকে আরো ঋদ্ধ করে পাঠকের কাছে। একথাও, প্রসঙ্গত, উল্লেখ রাখা প্রয়োজন যে, সব গোয়েন্দা কাহিনিতে অপরাধী থাকে না। অপরাধের শুধুমাত্র উল্লেখ থাকে সেখানে। আবার অপরাধীর পরিচয় থাকলেও, সেখানে তার চরিত্র, অপরাধ করার কারন উহ্য থাকে। তবে, বাহুল্যবর্জিত, অপরাধীর মনস্তত্ত্ব কাহিনিকে সম্পৃক্তই করে।

- গোয়েন্দা কাহিনির সূত্রপাতে থাকে অপকর্ম। সেই অপকর্মের কর্মকর্তা আসলে কে, তা নিয়ে রহস্য ক্রমে জটিল হতে শুরু করে। এই রহস্যের জটাজাল ছাড়িয়ে প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করা-ই হল গোয়েন্দার মূল উদ্দেশ্য। রহস্য গল্পের প্রথমেই এই অংশটিকে লেখক প্রতিস্থাপন করেন। সেই প্রথম পাঠকের বিস্ময় এবং কৌতুহলের স্থল। কি অপরাধ ঘটেছে, তা পাঠককে জানিয়ে গোয়েন্দা তদন্ত শুরুর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান।
- গোয়েন্দা তদন্তেকর্মে নেমে প্রথমেই যে বিষয়টি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন, তা হল--- অপরাধ কার্য কিভাবে করা হয়েছে? তা চুরি-ডাকাতি হোক বা খুন! অপরাধীর কাজের ধরন দেখে সম্ভাব্য অপরাধীদের একপ্রকার তালিকা তিনি প্রাথমিক ভাবে তৈরি করেন। তারপর সেই সম্ভাব্য তালিকা থেকে তার অভিজ্ঞতা, অনুমান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে পদ্ধতিটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। অপরাধী কোন পদ্ধতিতে, কোন অস্ত্র ব্যবহার করে, কিভাবে কাজটি করেছেন, তা এই অংশে বিবৃত থাকে।

  এছাড়া, এখানে কার ক্ষতি হয়েছে, বা কে খুন হয়েছেন, কি ক্ষতি হয়েছে, অথবা কিভাবে, কেমন অবস্থায় ব্যক্তি খুন হয়েছেন তার বিবরণ থাকে, এই অংশে। একইসঙ্গে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হলেন, বা আততায়ীর হাতে মারা গেলেন, তার সামাজিক প্রতিপত্তি সম্পর্কেও পাঠককে এই অংশে লেখক সচেতন করেন।
- গোয়েন্দা এই বিবরণ শুনে অথবা নিজে সরাসরি উপলব্ধি করে, তদন্তের কাজ শুরু করেন। ঘটনা ঘটার সময় কে কোন অবস্থানে ছিল, তার একটি প্রাথমিক মৌখিক বিবরণ তিনি সকলের থেকে জেনে নেন। কোনো অপরাধী পলাতক হলে, অথবা পারিবারিক ঘেরাটোপে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে গোয়েন্দা তাকে ধরতে প্রমাণের সংগ্রহ করতে থাকেন। পাঠককে অপরাধী সম্পর্কে দ্বিধান্বিত করার জন্য গোয়েন্দা তথা লেখকের অবদান যথেষ্ট।

  গোয়েন্দার সঙ্গে অপরাধীর এই অংশে সরাসরি কথোপকথন সম্ভব। অপরাধীর গোয়েন্দাকে বিভ্রান্ত করার, ফাঁকি দেওয়ার অনবরত চেষ্টা থাকে। কখনো কখনো মারনাস্ত্র সহ যুদ্ধও সম্ভব। বিভিন্ন রকম কৌশল পদ্ধতি অবলম্বন করে কখনো তীব্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বাকযুদ্ধে অপরাধীকে পরাস্ত করে সনাক্ত করে।
- সমস্ত তথ্য প্রমাণ সহ গোয়েন্দা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা প্রায় সকল ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সভার আয়োজন করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই ঘটনাস্থলে অপরাধীও উপস্থিত থাকে। যদিও সে তখনো জানে না, গোয়েন্দার তীব্র বুদ্ধি তাকে ধরে ফেলেছে। গোয়েন্দা তার আভাসমাত্রও অপরাধীর কাছে বুঝতে দেয় না। গোয়েন্দা ঘটনার আনুমানিক সত্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কাছে কাহিনির আকারে বিবৃত করার চেষ্টা করে। সেই কাহিনি বিবৃতির মধ্য দিয়েই গোয়েন্দা অনবরত অপরাধীর দেহাবয়ব নজরবন্দী করতে থাকে। তার মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেন। কাহিনি শুনতে শুনতে অপরাধী উত্তেজিত হয়ে পড়লে গোয়েন্দা সর্বসমক্ষে অপরাধীকে সনধরা ক্ত করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- অপরাধী সর্বসমক্ষে চিহ্নিত হলে, গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ভারতীয় সংবিধান মেনে তাকে হস্তার্পণ করে। কখনো কখনো অপরাধী অবশ্য পালিয়ে যায়, ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধীর অপরাধ বুঝে সে কখনো পালিয়ে গেলেও গোয়েন্দা তাকে বাধা দেয় না। কখনও কখনও অপরাধী গোয়েন্দাকে ফাঁকি দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে। কাহিনিতে এমন পরিস্থিতি সেক্ষেত্রে এক ট্র্যাজিক কাহিনিতে পরিণত হয়।
- এরপরের যে অংশটি তা গোয়েন্দা কাহিনির তথা অপরাধীর চারিত্রিক গুণাবলী বুঝতে চেষ্টা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। অপরাধী কেন, কোন পরিস্থিতিতে অপরাধ করল? নাকি করতে বাধ্য হল, তার আনুমানিক

  সত্যকাহিনি বা সম্পূর্ণ সত্য কাহিনি উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী বা পাঠকের উদ্দেশ্যে বলে। এই অংশেই অপরাধীর অপরাধ করার আগে বা অপরাধ করার সময় মনোভাব কেমন ছিল? তার শারীরিক কোনো ত্রুটির কারণেই তার এই অপরাধ মনস্কতা কিনা, তা এই অংশেই পাঠককে তিনি বিস্তৃত ভাবে জানান।

প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা কাহিনির গঠন অথবা কাহিনিতে অপরাধীকে উপস্থাপন করার নির্মাণ কম-বেশি এমনই পরিলক্ষিত হয়। তবে, সময়ের প্রেক্ষিতে এবং স্বতন্ত্র লেখক সত্তার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নির্মাণের রদবদল হয়।

অপরাধী চরিত্র নির্মাণ ও পদ্ধতিকে সাধারণ এবং স্থূলভাবে কয়েকটি দশকের বিশ্লেষণে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরা যেতে পারে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী চরিত্র লেখকের লেখনীতে কেমন আকারে পরিবেশিত হয়েছে তা দশকের বিশ্লেষণে ধারনা পাওয়া যেতে পারে –

সময়কালের বিচারে অপরাধীর এই বিভাজনকে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি পর্বে বিভাজন করা হল —

ক. প্রথম পর্ব (ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক) (১৮৯০ - ১৯২০)
খ. দ্বিতীয় পর্ব (বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়) (১৯২০ - ১৯৫০)
গ. তৃতীয় পর্ব (স্বাধীনতা পরবর্তী সময়- সত্তরের দশক)
ঘ. চতুর্থ পর্ব (সত্তরের দশক থেকে বিশ্ব-উষ্ণায়ন পূর্ববর্তী অবস্থা)

ক. প্রথম পর্ব (ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক) : ঊনবিংশ শতকে ঠগীর অত্যাচারের বাড়বাড়ন্তের পর থেকে কাহিনি আকারে সেইসব ঘটনা লিখিত ভাবে আবদ্ধ হতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ইংরেজিতে কিছু পুলিশি কাহিনির উল্লেখ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে, বাংলা ভাষাতেও, গিরিশচন্দ্র বসুর লেখাতে পুলিশ কাহিনি পাওয়া যায়, তবে, অধ্যাপক সুকুমার সেন ১৮৫৫ সালে যে বইটির ইংরেজি পুলিশ কাহিনির উল্লেখ করেছেন, তারই বাংলা সংস্করণের সম্পাদিত রূপটি ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে প্রকাশ পায় বলে, অধ্যাপক সেন অনুমান করেন। সেই অনুযায়ী, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে অপরাধমূলক কাহিনি গুলির তথা অপরাধী চরিত্রের নির্মাণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই কাহিনি গুলিতে পরিকল্পনা করে প্লট সুসজ্জিত ভাবে নির্মিত হয়নি, বিবরণ আকারে সত্য ঘটনা, অপরাধের ঘটনা, অপরাধীর বর্ণনা বলা আছে মাত্র। 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' এর ক্ষেত্রে যেমন ঘটনা-ই বিবৃত আছে। সাহিত্য গুণের লক্ষ্মণের আধিক্য এখানে নেই বললেই চলে। এরপরে অপরাধ কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়, গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগা কাহিনী', প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর'-এর কাহিনিগুলিতে। এখানে লেখকের নির্মাণের পরিকল্পনার কিছু পরিচয় মেলে। লেখক ভয়ংকর, বীভৎস অপরাধমূলক কাহিনি পরিকল্পনা করেই পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন। লেখনীতে সেই পরিকল্পনার চেহারার পরিচয় মেলে। কাহিনি শেষে অপরাধীর যথাযথ, সূক্ষ্ম, স্পষ্ট মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পর্বের কাহিনিগুলিতে তখনও গোয়েন্দার ভূমিকা সক্রিয় হয়নি। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি রচনার প্রবণতাও অধিক হয়ে ওঠেনি। ইংরেজ সরকারের অধীনে কর্মরত দারোগারা কর্মসূত্রে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে একত্র করে অপরাধমূলক কাহিনিগুলিকে সংঘবদ্ধ করেছেন। তাদেরই অভিজ্ঞতা থেকে কাহিনিগুলি সংগ্রহ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করেছেন। অধিকাংশ কাহিনিই সত্য, চরিত্রেরা সত্য। কাহিনির বিবরণের ঘনঘটা সেখানে নেই, জটিলতা নেই। বর্ণনা বেশ সরল।

অপরাধের মাত্রা কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ, আবার কিছু ক্ষেত্রে বীভৎসও বটে। ঠগী, জলদস্যুদের প্রসঙ্গ এই সময়ের কাহিনিতে উঠে এসেছে। ঠগীদের ভয়ঙ্কর, নৃশংস কার্যকলাপের ঘটনা 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'এর কাহিনিতে, নীল চাষে অত্যাচারী জমিদারদের কৃষকদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনা, সেই সংক্রান্ত অপরাধের কথা গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগা কাহিনী'তে উঠে এসেছে।

এই সময়ের অপরাধীদের প্রসঙ্গ পরিকল্পনামূলক বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে লেখক তুলে ধরেননি, কখনও কাহিনির মধ্য অংশ, কখনো শেষাংশে কাহিনির স্বার্থে প্রসঙ্গত উল্লেখ হয়েছে, অপরাধীদের নাম অথবা বর্ণনা বা মনস্তত্ত্ব, অপরাধের কারণ প্রভৃতি। তবে, রহস্যের জটাজাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাহিনির পরিণতি অংশেই পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় পর্ব (বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়) (১৯২০ - ১৯৫০) : বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক থেকে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে লেখনীতে রদ-পরিবর্তন হল অথবা রদবদল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার তাগিদও অনুভব করল লেখকগোষ্ঠী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভৌগোলিক দূরত্ব বাড়ল, জানার ব্যাপ্তি বিস্তৃত হল। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি বৃদ্ধি পেল দেশীয় লেখকদের। তার ফলে তাদের মধ্যে অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। বিদেশীয় ভাষায় গোয়েন্দা কাহিনি গুলি বাংলা ভাষায়, এ দেশীয় জল-হাওয়ায়, ভৌগোলিক অবস্থানে এই দেশের লেখকের হাতে অনুবাদ এবং বাঙালির উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদের ফলে স্বতন্ত্র রূপের কিছুটা অভাব এই সময়ের বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে দেখা যায়। বিদেশীয় ভাষার ফরম্যাট বা গঠন অনুকরণ করার একপ্রকার বৈশিষ্ট্য এই সময়ের কাহিনিতে চোখে পড়ে, যথেষ্টভাবে। যদিও, সকল কাহিনি সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়, কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রও বটে।

গোয়েন্দার সাগরেদ, সাহায্যকারী পোষ্য, ত্রিশূল গোয়েন্দার অবদান, বৈজ্ঞানিক ল্যাবের ব্যবহার, নানাবিধ কেমিক্যাল ব্যবহার করে অপরাধীর অপরাধ করার প্রবণতাও এই সময়কালের কাহিনিতে লক্ষ্য করা যায়।

কাহিনির নির্মাণপদ্ধতি সম্পর্কে এবারে আলোচনা করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতার কাহিনির পর, অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ এবং তার পরবর্তীতে নিজস্ব কাহিনি গঠন করার তাগিদ এই সময় বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা অনুভব করে। অভিজ্ঞতার কাহিনি এই পর্বে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, অনুবাদের একটি ধারা যেহেতু লক্ষ করা যায়, ফলে নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যেও সামগ্রিক গঠনে অনুকরণের একটি দিক প্রকাশ পায়। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকের রচনায়, গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টিতে শার্লক হোমসের ছায়া চোখে পড়ে।

তবে, কিছু কিছু মৌলিক গোয়েন্দা কাহিনি তথা কাহিনির আদলও এই সময় সৃষ্টি হয়। অ্যাডভেঞ্চার মূলক কাহিনি, কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি লেখার আধিক্য এই সময় পর্বে বাড়তে থাকে। বাঙালি অভিনব কিছু সৃষ্টির স্বাদ উপভোগ করে। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অথবা অনুবাদ বা অনুকরণ নয়, নতুন কাহিনি বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করে। বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন শাখা দিক বিস্তৃত করতে থাকে। যদিও যে বা যে সকল লেখকেরা এই সময় গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেন, অপরাধ কাহিনি অথবা অপরাধী মনস্তত্ত্ব হিসাবে তারা উপরিউক্ত অর্থাৎ, প্রথমে অপরাধ কি ঘটেছে তার প্রাথমিক বর্ণনা থাকে, তারপর গোয়েন্দার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে, গোয়েন্দা তার তীর্যক বুদ্ধি, কূট কৌশল বুদ্ধি দ্বারা কখনও পুলিশের সাহায্যে বা বন্ধুর সাহায্যে অপরাধী সনাক্ত করেন। রহস্য উদঘাটনের পর্ব সমাপ্ত হলে গোয়েন্দা আয়োজন সহকারে, কখনও বিশেষ সভা আয়োজন করে পরিচিত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের কাছে তার রহস্য সমাধানের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করে অপরাধীকে উপস্থিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে তথা পাঠকের কাছে পরিচয় করান।

আয়োজন করে অপরাধীর অপরাধ করার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব সহ কাহিনি আকারে রচনা এই পর্বে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে মৌলিক বা নিজস্ব কাহিনি নিয়ে যে সকল রচনা হয়েছে, তার রচনাকৌশল প্রায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে কম-বেশি নির্মিত হয়েছে। তবে, রচনার গুণের ক্ষেত্রে বলা যায় সাহিত্য রস-সমৃদ্ধ গুণান্বিত কাহিনি গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গড়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। গোয়েন্দা কাহিনিকে বড়দের মনোভাবে, আত্মীকরণে রূপ দিয়েছেন হেমেন্দ্র কুমার রায়। তাঁর বেশ কিছু রচনায় মনস্তত্ত্বের বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এরপরে স্পষ্টতই স্বীকার করে নিতে হয়, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিকে বড়দের জন্য সুখকর পাঠের মাত্রা প্রদান করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রচনায় গোয়েন্দা কাহিনি কিশোরদের জন্যই যথোপযুক্ত ছিল, যদিও ব্যোমকেশের কাহিনি গুই এই তকমার ব্যতিক্রম। একটি সুষ্ঠ নির্মাণ এবং সমৃদ্ধ রসাশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য শুধুমাত্র নয়, বাংলা সামগ্রিক সাহিত্যকেও ঋদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, ব্যোমকেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাহিনিগুলি-ই স্বাধীনতা পরবর্তী কাহিনিগুলির তুলনায় বেশি সমৃদ্ধ।

গ. তৃতীয় পর্ব (স্বাধীনতা পরবর্তী সময়-সত্তরের দশক) : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্বের কাহিনিকে পর্ব হিসাবে বিশেষ ভাবে পৃথক করা চলে না। সাহিত্য মাত্রই আসলে সমাজের এক বহমান রূপ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার রদবদল চলে মাত্র। তবু, প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবণতা অনুযায়ী সামান্য হেরফেরের ধরনে পার্থক্য ঘটে। দেশ তথা বাংলা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ার পর বাঙালির সমগ্র চিন্তাভাবনা, সমাজে ব্যাপক এক পরিবর্তন ঘটে। সাহিত্যে তার রূপ প্রতিফলিত হবে, এও বলাই বাহুল্য।

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে কৃষ্ণার মতো চরিত্রেরা এসেছে। মহিলা গোয়েন্দার মুখে মেয়েদের জন্য প্রতিবাদের ভাষা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক বার্তা অনেক বেশি করে পাঠকের সামনে এসেছে। আলাদা করে গঠনভঙ্গীতে যে রদবদল হয়েছে, এমনটা বলা যায় না। বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। কাহিনিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আনুসাঙ্গিক চরিত্রেরা যুক্ত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে কাহিনি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক দীর্ঘ হয়েছে। যদিও তা লেখক বা কাহিনির প্রেক্ষিতে নির্ভর করে ঠিকই; তবু, কাহিনির নির্মাণকে দুর্বল করে তোলে।

একইসঙ্গে, অপরাধী চরিত্রটিও যেহেতু কাহিনির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়, ফলে অপরাধী চরিত্রের গঠনও কাহিনির বুননের সঙ্গে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কাহিনিতে অপরাধ এসেছে ঠিকই, কিন্তু, অপরাধ ব্যতিরেকে আরো কয়েকটি বিষয় কাহিনির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে কাহিনির নির্মাণ শুধুমাত্র অপরাধ কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বেশ কিছু কাহিনিতে, কাহিনির গতি যথেষ্ট ধীর হয়ে পড়েছে। পাঠকের আগ্রহ সেক্ষেত্রে কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

ঘ. চতুর্থ পর্ব (সত্তরের দশক থেকে বিশ্ব-উষ্ণায়ন পূর্ববর্তী অবস্থা) : সমাজে কোনো বিপ্লবের ফল, গুণসম্পন্ন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক বিপ্লব আনে। ভাবনায়-বিষয়ে-কাহিনিতে রদবদল হলেও, নির্মাণে যে বিশেষ পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়, এমন বলা যায় না। সত্তর দশক পরবর্তী সময়ে বাংলার সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি বড় উত্তাল। ক্রমে জটিল হচ্ছে সময় এবং পরিস্থিতি। ফলে, মানুষের মন-মানসিকতাও হয়ে উঠছে জটিল। কখনো কখনো বিকৃত থেকে বিকৃততর। কাহিনির বিষয়ও ক্রমে আরো জটিল হচ্ছে। কাহিনিতে আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী ব্যক্তির মধ্যে অনেক সময়ই গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফলত, গোয়েন্দা কাহিনি শুধুমাত্র কিশোর কাহিনি নয়, বড়োদের পাঠেরও অনুকূল হয়ে উঠছে। এছাড়া, অপহরণের মাত্রা পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে কাহিনিতেও বাড়ছে। বিষয়ের দিক থেকে নানান মাত্রা আরো যুক্ত হলেও নির্মাণে খুব বিশেষ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না, একথা বলা যায়।

তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ, একবিংশ শতকের প্রথমার্ধ্বে নির্মাণ রীতিতেও নানারকম পরীক্ষা-নীরীক্ষা করার চেষ্টা করছেন সাম্প্রতিক কালের লেখকেরা। আখ্যানের নির্মাণ রীতির ভাঙা-গড়া চলছে। একটি কাহিনি চলমান অবস্থায়, সেখানে আরো একটি বা দুই তিনটি কাহিনির ধারা সমান্তরালে বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। এই দুটি তিনটি কাহিনির মধ্যে সূক্ষ্ম মিল কোথাও থেকে যাচ্ছে। যা কাহিনির শেষে লেখক তিনটি প্রবাহকে একত্রিত করেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে গঠনেও অভিনবত্ব এসেছে।

ফলত সব মিলিয়ে শুধুমাত্র বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুতেই পরিবর্তন এসেছে, এমন নয়। গোয়েন্দা কাহিনির নির্মাণের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এসেছে, নতুন নতুন চিন্তার বিকাশের ছাপ পাওয়া গেছে।

এছাড়া শুধু গোয়েন্দা কাহিনি নয়, অপরাধী চরিত্রের নির্মাণের ক্ষেত্রেও রদবদল হয়েছে। অপরাধীকে কিভাবে পাঠ্যে উপস্থাপন করা হবে, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও যেমন হয়েছে, তেমন রদবদলও হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর ধরনও বদলেছে স্বাভাবিকভাবে। একইসঙ্গে, অপরাধীর চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে।

পুলিশি কাহিনি-দারোগা কাহিনির ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রে অপরাধী চরিত্রের এমন কিছু প্রসঙ্গত উল্লেখ রয়েছে, যারা বাস্তবিক চরিত্র। পরবর্তীতে, কাহিনিগুলিতে কাল্পনিক চরিত্ররা উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে, সময়ের তুলনা করলে বলা যায়, কাল্পনিক অপরাধী চরিত্রগুলি ধীরে ধীরে বাস্তবসম্মত উপায়ে অনেক বেশি পরিণত হয়েছে।

সবমিলিয়ে বলা যায়, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির বিষয়বস্তু, গোয়েন্দার গাম্ভীর্য, অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ল্যাবের ব্যবহার, অপরাধী ধরার কৌশল, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায়, অপরাধের ধরনে, কৌশলে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই গোয়েন্দা কাহিনির নির্মাণেও, অপরাধী চরিত্রকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও, অপরাধী চরিত্রের গঠনেও পরিবর্তন ঘটেছে।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ, *সাহিত্যের গোয়েন্দা,* কলকাতা: পরশপাথর প্রকাশন, পৌষ ১৪১৯, পৃ. ১৬৩

২. সেন, সুকুমার, *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০১৫, পৃ. ১১

৩. Auden, W.H. 'The Guilty Vicarage', *Detective Fiction: A Collection of Critical Essys*, 1980, p. 15

৪. বসু, প্রলয়, *গোয়েন্দা রহস্যের সন্ধানে,* কলকাতা: খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা পুস্তকমালা ২০২০, পৃ. ২৬

৫. Scaggs, John, *Crime Fiction*, Oxon: Routledge, 2005, p. 11 - 12

Bibliography:

কুন্ডু তন্ময়, *একটি গোয়েন্দা কাহিনি একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পাঠ,* কলকাতা, তবুও প্রয়াস, সেপ্টেম্বর ২০২২

গোস্বামী পরিমল, *ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা (অনু),* কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৯

ঘোষাল পঞ্চানন, *অপরাধ বিজ্ঞান,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ, *গোয়েন্দাচরিত,* কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০১৭

দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ, *রহস্যগল্পের নায়কেরা,* কোলকাতা, আত্মজা পাবলিশার্স, ২০১৯

দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ, *সাহিত্যের গোয়েন্দা,* কলকাতা, পরশপাথর প্রকাশন, পৌষ ১৮১৯

প্রলয় বসু, *গোয়েন্দা রহস্যের সন্ধানে,* কলকাতা, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা পুস্তকমালা ২০২০

মল্লিক ভক্তিপ্রসাদ, *অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩

রোহিণী ধর্মপাল, *অপরাধ ও অপরাধীর পুরোনতুন কাহিনী,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কল্পতরু দিবস, ২০২০

সেন সুকুমার, *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০১৫

ইংরেজি গ্রন্থ :

Auden, W.H. 'The Guilty Vicarage', *Detective Fiction: A Collection of Critical Essys*, 1980

David Canter, *Criminal Psychology*, Great Britain: Hodder Education, 2008

Scaggs John, *Crime Fiction*, New York: Routledge, 2005

Schoop Robert F., *Automatism Insanity And The Psychology of Criminal Responsibility*, USA: Cambridge University Press, 1991

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 740 - 746
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

গোয়েন্দা গার্গী : বাংলা সাহিত্যের এক প্রতিভাবান নারী গোয়েন্দা

সাহেব কুমার দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : 9547sahebkumardas@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Gargi, Bengali, Female, Detective, criminal, Mystery, Solve, Murder,

Abstract
In the nineties, Tapan Banerjee created his fictional female detective Gargi. Gargi's full name is Gargi Mukherjee. She is a student of the Department of Mathematics at Calcutta University and a mystery solver by passion. Her favourite subjects are country, time and time. She loves to read history and sociology. After enrolling in mathematics, she initially thought of becoming a mathematics professor or teacher. Later, she changed her mind. Before coming to detective work, she was a freelance journalist. She made her first appearance in a detective novel called 'Ershar Sabuj Chokh'. Detective Gargi has sometimes investigated murders, sometimes recovered valuable documents from old history. She has had to travel to different places to do her detective work. Her husband Sayan has helped her a lot in this regard. She has solved one mystery after another while managing the family. Detective Gargi has an outstanding skill in solving mysteries. Gargi solves all the mysteries with her sharp intellect and infallible guessing power. When society slowly starts getting entangled in a web of mysteries, Gargi sometimes gets involved on his own, sometimes gets hired to solve the mystery. Sometimes, the mystery is created by looking at Gargi. Gargi's curiosity is very wide. He goes out of his own field in search of many more information, theories and arguments. Sometimes literature, sometimes politics, sometimes economics, political science or philosophical theories are among his hobbies. On the one hand, he handles important positions in the family, office and 'Paradise' company, and on the other hand, he identifies the criminal through his hard observation and analysis. Gargi never has to take the help of a gun or a pistol to catch the criminal. He finds the criminal only through observation, speculation, analysis and unparalleled intelligence. He never takes payment from anyone for this. He is not a private detective. Gargi considers helping a person in danger to be his supreme religion. It has always been Gargi's nature to delve deeply into a subject and analyse it thoroughly.

Discussion

রহস্যের প্রতি কৌতূহল কম বেশি সকলেরই। আর এই রহস্য দেখা যায় গোয়েন্দা গল্প বা উপন্যাসে। সমাজের কিছু বিষয়লুব্ধ ও স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য সমাজ অশান্ত হয়ে পড়লে ডাক পড়ে গোয়েন্দার। গোয়েন্দার কাজ হল গোপনে অনুসন্ধান করে অপরাধীকে খুঁজে বের করা। গোয়েন্দার কথা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোনও কোর্ট প্যান্ট অথবা ধুতি পাঞ্জাবি পরা পুরুষ। যার মুখে থাকবে চুরুট অথবা সিগারেট। কিন্তু নারীরাও যে গোয়েন্দাগিরি করতে পারে আশ্চর্যজনকভাবে এটা অনেকেই মানতে পারে না। তাদের কাছে নারী গোয়েন্দা 'সোনার পাথর বাটি'-র মতো। আজকের এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সব কিছুতে নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। স্বামীর আচরণে সন্দেহ হলে, সে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে এইসব ব্যাপারে নজর রাখতে ওস্তাদ নারীরা। পাশাপাশি কোনও স্বামী তার মাইনের কিছু টাকা সরিয়ে রাখলে স্ত্রী সেটা চোখের পলকে বের করে ফেলতে পারে। আর গোয়েন্দাগিরিতে নারীরা পিছিয়ে থাকবে তা আবার হয় নাকি! গোয়েন্দাগিরিতে নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। তেমনই এক নারী গোয়েন্দা গার্গী।

নয়ের দশকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেন তাঁর কল্পিত নারী গোয়েন্দা গার্গীকে। গার্গীর পুরো নাম গার্গী মুখার্জী। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের ছাত্রী এবং সখের রহস্যভেদী। তার প্রিয় বিষয় দেশ, কাল ও সময়। পড়তে ভালোবাসে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান। গণিতে ভর্তি হওয়ার পর সে প্রথমে ভেবেছিল গণিতের অধ্যাপিকা বা শিক্ষিকা হবে। পরে সে নিজের মত বদলায়। গোয়েন্দাগিরিতে আসার আগে সে ছিল একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' নামের গোয়েন্দা উপন্যাসে তার প্রথম অবির্ভাব হয়। গোয়েন্দাগিরিতে তার আগমন বন্ধু সায়নকে বাঁচাতে এবং তার স্ত্রী ঐন্দ্রিলার হত্যা রহস্যের সত্য উন্মোচন করতে। গার্গীর ভূমিকা দিতে গিয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, -

> "বিদুষী গার্গী বরাবরই ভারি ঠাণ্ডা স্বভাবের, যে কোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে যেতে পারে দ্রুত, যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তার শাণিত বুদ্ধি দিয়ে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতায় গার্গী মুখার্জি তার ঝকঝকে, শাণিত চাউনি দিয়েই বুঝিয়ে দিত, সে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র।"[১]

গার্গীর কৌতূহলের পরিসর বড্ড বড়ো। সে তার নিজস্ব বিষয়ের বাইরের হুটহাট বেরিয়ে পড়ে আরও বহুবিধ তথ্য, তত্ত্ব ও তর্কের তালাশে। কখনও সাহিত্য, কখনও রাজনীতি, কখনও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনও বা দর্শনের তত্ত্ব তালাশ তার অন্যতম হবি। সে একদিকে যেমন সংসার, অফিস 'প্যারাডাইস' কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলায় তেমনই তার কঠিন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অপরাধীকে চিহ্নিত করে। অপরাধী ধরতে গার্গীকে কখনও বন্দুক বা পিস্তলের সাহায্য নিতে হয়নি। শুধু পর্যবেক্ষণ, অনুমান, বিশ্লেষণ, অতুলনীয় বুদ্ধির দ্বারা সে অপরাধীকে খুঁজে বের করে। এর জন্য সে কখনও কারোর কাছে পারিশ্রমিক নেয় না। সে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়। কোনও মানুষ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করাকে গার্গী পরম ধর্ম বলে বলে মনে করে। কোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে তাকে তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করা গার্গীর বরাবরের স্বভাব। ঐন্দ্রিলা হত্যাকাণ্ডের ঘটনার উৎস খুঁজতে গিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছে গার্গী। খুঁজেছে খুনের মোটিভ। শেষ পর্যন্ত তার বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে খুঁজে বের করেছে আসল অপরাধীকে।

কলকাতার পথে পথে সন্ধানী চোখ নিয়ে ঘোরাফেরা করা গার্গীর প্রিয় বিলাস। একে ঠিক বোহেমিয়ান বলা যাবে না। আসলে এসবের মধ্যে গার্গী খুঁজে পায় এক অ্যাডভেঞ্চার। যা তার অনুসন্ধিৎসু মনকে তৃপ্তি দেয়। সে ভীষণ স্পষ্ট বক্তা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সে কাউকে রেয়াত করে না। কর্তব্যবোধ ও সময়ানুবার্তিতা গার্গীর পছন্দের। সে যে কোনও ব্যাপারেই ভীষণ সিরিয়াস। সকাল সাড়ে আটটা বা নটার পর মিনিট পঁয়তাল্লিশেক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তন্নতন্ন করে চোখ বোলানো গার্গীর রোজনামচার একটি বিশেষ আইটেম। সংবাদপত্রের কালো অক্ষরগুলো গোগ্রাসে গেলার পরই তার নিজেকে অজ্ঞ থেকে বিজ্ঞ মনে হয়। সারা বিশ্বে কোথায় কী ঘটছে সেগুলো জানার পাশাপাশি কখনও কখনও সংবাদপত্রে খুঁজে পায় খুন, ডাকাতি, অপহরণের মতো খবর। আর রহস্যের গন্ধ পেলে গার্গী নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এমনই একটি রহস্যের সন্ধান পায় 'বহে বিষ বাতাস' উপন্যাসে। সংবাদপত্র দেখে খবর পায় কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে বেশ রহস্যজনকভাবে খুন হয় সে বাড়ির রানিমা। সন্দেহ করা হয় এক ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিককে। যে ছবিও আঁকে এবং লেখে বাম হাতে। রানিমা খুনের পর থেকে সেই লোকটির

আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পালাবার সময় ফেলে গিয়েছিল সর্বক্ষণের ব্যবহার করা লেখার প্যাড ও কলম। এরপরেই কলকাতায় ঘটে যায় শিহরণ হত্যাকাণ্ড। গার্গী তদন্তে নেমে বাম হাতের লেখা, প্যাড ও কলম থেকে রানিমা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের যোগ খুঁজে বের করে সেই অপরাধীকে।

গার্গীর পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই তার অনুমান ক্ষমতাও। যা থেকে কোনও অপরাধীর নিস্তার নেই। তা অপরাধী যে স্তরেই থাকুক না কেন। 'হলুদ খামের রহস্য' উপন্যাসে গার্গী উদ্ধার করে বিনীতা রায়ের মার্ডার কেস। অপরাধী সত্যব্রত রায় বিনীতার স্বামী। যে পেশায় একজন পুলিশ অফিসার। অপরাধ ঢাকার জন্য সে নিজের ঘরেই রেখে যায় একটি হলুদ খামের চিঠি। কিন্তু বুদ্ধিমতী গার্গী বুঝে ফেলে সত্যব্রতের কারসাজি। সে সত্যব্রত রায়ের ঘরের চাবি, জুতো ও ব্যাগের ক্লু দেখে ধরে ফেলে তার অপরাধ। তার মতো একজন লোভী, লম্পট, নিষ্ঠুর মানুষকে শাস্তি দেয় গার্গী এবং তুলে দেয় পুলিশের হাতে।

'ধূসর মৃত্যুর মুখ' উপন্যাসে গার্গী তদন্ত করে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের মার্ডার কেস। পুলিশের অনুমান ডাক্তারকে নায়িকা বর্ণনা সেনগুপ্ত হত্যা করেছে। কিন্তু গার্গীর অনুসন্ধিৎসু মন পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যালের কথাকে সহজে মেনে নেয়নি। তাই সে শুরু করে গোয়েন্দাগিরি। যার জন্য তাকে পড়তে হয় ভয়ংকর বিপদের সামনেও। কিন্তু গার্গী ভয় পাওয়ার মেয়ে নয়। তাকে থামানো সহজ নয়। জীবনের বিপদ থাকলেও সে সত্য তুলে ধরবেই। এরপর যা যা চোখে দেখেছে এবং লোকের সঙ্গে কথা বলেছে সমস্ত ঘটনা সে মনে মনে বিশ্লেষণ করে। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ডাক্তার সুস্নাত তালুকদারের মৃতদেহের পাশে পাওয়া যায় একটি সোনালী ফ্রেমের চশমা। সেই একই ধরনের চশমা পরে সিনেমুভি টিমের সদস্য রানাজি সান্যাল। তাই প্রথম সন্দেহ তার দিকেই যায় গার্গীর। কিন্তু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে গার্গী জানতে পারে রানাজির চশমার পাওয়ার মাইনাস। কিন্তু ঘটনাস্থলে যে চশমাটা পাওয়া গিয়েছিল সেটি প্লাস পাওয়ারের। সুতরাং রানাজি সান্যাল হত্যাকারী নয়। হত্যাকারী অন্য কেউ।

এরপরই গার্গী কয়েকদিন ধরে লক্ষ করে সিনেমুভির পরচালক ঋষভ মুখার্জির চালচলন। সে পুলিশ দেখলেই যেভাবে রিঅ্যাক্ট করছিল তা দেখে সন্দেহ হয় গার্গীর। কিন্তু সন্দেহ হলেই তো হবে না তার জন্য দরকার উপযুক্ত প্রমাণের। তাই গার্গী লেগে পড়ে প্রমাণ জোগাড় করতে। গার্গী জানতে পারে ঋষভ মুখার্জি ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকার একটা চশমার দোকান 'গ্রিন অপটিকস'-এ চোখ দেখিয়ে সদ্য নিয়েছিল চশমাটা। প্লাস পাওয়ার হওয়ায় সবসময় দরকার হয় না। চশমায় অনভ্যস্ত হওয়ায় হাতে ছিল চশমাটা। খুন করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ভুল করে সুস্নাত তালুকদারের ঘরে সেটা ফেলে চলে যায়। যেহেতু আগে চশমা পরত না বলে কেউ ভাবেনি ওটা ঋষভ মুখার্জির চশমা হতে পারে। এখানে ঋষভ মুখার্জির খুনের মোটিভ টাকা। ডাক্তারের সঙ্গে ঋষভের সম্পর্ক ভালো থাকার জন্য তার ছবিতে প্রডিউস করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। সেই রাগ থেকে খুন।

এছাড়াও গার্গী লক্ষ করেছিল, ঋষভের হাতে কোনও রেখাই নেই। এরকম সাদা, ধবধবে, রেখাহীন করতল। ঋষভকে গার্গী জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, কলেজে পড়তে ল্যাবরেটরিতে কী একটা অ্যাসিড টেস্টটিউবে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে টেস্টটিউবটি ভেঙে সেই অ্যাসিডে মাখামাখি হয়ে আধপোড়া হয়ে গিয়েছিল তার দুটো করতল। পরে ক্ষত সেরে গিয়ে করতল স্বাভাবিক হয়ে গেলেও করতলের রেখাগুলো আর ফুটে ওঠেনি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দুটো খুনের কোনটাতেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত গার্গীর এই তদন্তের ফলশ্রুতি সকলের সামনে পটাসিয়াম সায়ানেট খেয়ে খুনি ঋষভ মুখার্জির আত্মহত্যা।

গার্গী গান ভালোবাসে। ভালো গায়কের নতুন কোনও অ্যালবাম বেরুলে কখনও কখনও সিডি-র স্টলে গিয়ে কিনে নিয়ে আসে সে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চালিয়ে দেয় সিডি প্লেয়ার। গান সম্পর্কে তেমন ভালো জ্ঞান না থাকলেও গানকে উপভোগ করে গার্গী। সেই গান নিয়েই একটি রহস্যের উন্মোচন করে গার্গী 'একটি ইমন সন্ধ্যা' রহস্য উপন্যাসে। উপসনা মুখোপাধ্যায় নামে একজন উঠতি গায়কের গান চুরি করে প্রকাশ করে শহরের বিখ্যাত গায়ক অরিজিৎ রায়গুপ্ত। কিন্তু এটা জানার পর তদন্ত শুরু করে। যেমন কর্ম তেমন ফল— এই নীতিতেই বিশ্বাস করে গার্গী। অরিজিৎ রায়গুপ্ত যেমন উপাসনার গান চুরি করে তা নিজের নামে শহরের বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের সামনে প্রকাশ করেছে তেমনই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার চুরির কথা ফাঁস করার জন্য গার্গী অপেক্ষা করতে থাকে উপাসনার অ্যালবাম প্রকাশের দিনটির জন্য। এরপরই গার্গী একে একে তার অকাট্য যুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে তুলে ধরে। গার্গীর প্রথম প্রমাণ, অরিজিৎ রায়গুপ্ত গানের কথাকার অনুত্তম বারিকের গান লেখার ক্ষেত্রে কপি পেস্টের প্রসঙ্গ। প্রমাণ হিসেবে পেশ করে তার সঙ্গে কথা বলা গার্গীর সহায়ক সোনালিচাঁপার কথোপকথন-এর রেকর্ড। গার্গীর ইঙ্গিতে একটি ক্যাসেট বাজতে শুরু হয় হলের মধ্যে। যেখানে অনুত্তম বারিক সোনালিচাঁপাকে বলছে কীভাবে সে নানা কবিতার বই ঘেঁটে কবিতার এক-একটি পঙক্তি কাঁচি দিয়ে কেটে তৈরি করে একটি গান। দ্বিতীয় প্রমাণ হিসেবে গার্গী দেখায় উপাসনার একটি ডায়েরি। যেখানে উপাসনা নিয়মিত গান লেখে। এই অ্যালবামের গানগুলোও সে দীর্ঘদিন ধরে লিখেছে। গার্গী তার বিচক্ষণতার সাহায্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের বোঝাতে সক্ষম হয় অ্যালবামের গানগুলি কার লেখা, সুরই বা কে দিয়েছে। বিখ্যাত গায়ক হলে সেও যে অন্যায় কাজ করতে পারে এটা গার্গী সকলের সামনে তুলে ধরে। সেই সঙ্গে রক্ষা করে নতুন প্রতিভা উপাসনার সংগীত জীবনের ক্যারিয়ার।

'কফিন রঙের রুমাল' উপন্যাসে গার্গী অসাধারণ বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও মেধা দিয়ে উদ্ধার করে কফিন রঙের রুমালের আসল রহস্য। গার্গী উন্মোচন করে ড্রাইভাররূপী মকবুলের আসল পরিচয়। সেই আসলে বিবেক দ্বিবেদী। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হয়নি। সে এতদিন অভিনয় করে যাচ্ছিল। আর এই অভিনয়ের জন্য দরকার ছিল একটা লাশের। তাই সে তার ড্রাইভারকে হত্যা করে। তার পোশাক পরিয়ে মৃতদেহ পুড়িয়ে তাকে সাজানো হয়। তার এই অভিনয়ে সাহায্য করে যাচ্ছিল স্ত্রী তিতিক্ষা। বিবেকের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কের কাছে লোন নিয়ে, ধার করে এবং শ্বশুরের কাছে মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে তিতিক্ষাকে নিয়ে বিদেশ পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি তিতিক্ষার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায়। এটা গার্গী বুঝতে পারে তিতিক্ষার ঘরে থাকা পাসপোর্ট দেখে। মকবুলের রূপ ধারণ করে তিতিক্ষার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে থাকে বিবেক। কিন্তু তিতিক্ষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ শ্রবণকুমার, নীলার্ণব ও শেষাদ্রি তিতিক্ষার শরীরের লোভে কাছে আসার চেষ্টা করলে বিবেক তাদেরকে হত্যা করে। কারণ কোনও পুরুষই চায় না তার স্ত্রীর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাক। গার্গী হাতে কোনও অস্ত্র না নিয়েও, শুধুমাত্র মগজাস্ত্র ব্যবহার ও ঘটনা বিশ্লেষণ করে উন্মোচন করে শহরে ঘটে যাওয়া তিনটি হত্যা রহস্যের এবং অপরাধীকে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। পুলিশবাহিনী যা করতে পারে না, গার্গী সেটাই একা হাতে করে দেখায়।

গার্গী কোনও পেশাদার গোয়েন্দা নয়। কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে অনেক সময় নিজের অজান্তেই। কখনও তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় অঘটন। তখন তাকে নেমে পড়তেই হয় রহস্যের সমাধানে। এরই মধ্যে কলকাতার বুকে ঘটে যায় আরও এক হত্যাকাণ্ড। যা নিয়ে কলকাতা পুলিশের দিশেহারা অবস্থা। পুলিশ সুপার দেবাদ্রি সান্যালের এই তরুণীর বুদ্ধিমত্তার প্রতি এতই আস্থা যে কোনও ঝামেলা বুঝলেই গার্গীকে ফোন করে তার সঙ্গে পরামর্শ নেয়। কখনও আলোচনা করে বহুক্ষণ ধরে। মাঝে মধ্যে চলেও আসে তার অফিস চেম্বারে। এক কাপ কফির সঙ্গে বুদ্ধিও পান করতে থাকে হাসি-হাসি মুখে। আজও তাই ডাক পড়ে গোয়েন্দা গার্গীর। আর গোয়েন্দা গার্গীও –

"কোথাও কোনও সামান্য ক্লু পেলেও ঝাঁপিয়ে পড়বে তৎক্ষণাৎ।"[২]

চিনা ভাষায় লেখা অর্ধেক প্রেসক্রিপশন ও ভিজিটিং কার্ড থেকে গার্গী 'চিনা ডাক্তারের হত্যা রহস্য' উপন্যাসে উন্মোচন করে ডাঃ চ্যান চিউ-এর হত্যাকারীকে। গার্গী উদ্ধার করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কিছুটা প্রফেশনাল জেলাসি থেকে। কিছুটা ডাঃ মাও তুনের রগচটা চরিত্রের কারণে। ডাঃ চ্যান চিউ কলকাতায় এসে চেম্বার খুলে বসায় ডাঃ মাও তুনের পসার একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে ডাঃ চ্যান চিউয়ের ওপর মনে মনে খুব রাগ ছিল তার। মাঝে মাঝে এসে বসে থাকত ডাঃ চ্যান চিউয়ের কাছে। বলা যায় সময় নষ্ট করতে। ফলে ডঃ চ্যান চিউ একদম পছন্দ করত না মাও তুনকে। এমনিতেই মাও তুনের খুব রুক্ষ মেজাজ। তার উপর চলে যেতে বলায় সে খুব চটে যেত। হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে মাও তুনকে আসতেই হয় তার দাঁত ফুলে যাওয়ার কারণে। নিজে দাঁতের ডাক্তার হলেও নিজের দাঁত তো আর নিজে তুলতে পারে না। বাধ্য হয়ে এসেছিল চ্যান চিউয়ের কাছে। প্রথম দিকে চ্যান চিউ তার দাঁত তুলতে না চাইলেও পরে তুলে দেয়। চ্যান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিউয়ের টেবিলে ছিল ছোট্ট হাতুড়ি যেটা দাঁত তুলতে ডেন্টিস্টদের কাজে লাগে। সেটা দিয়ে অপমানের জ্বালা জুড়োতে সজোরে মারে চ্যান চিউয়ের মাথায়। চ্যান চিউ টেবিলেই লুটিয়ে পড়ে। প্রেসক্রিপশনটা উড়ে যায় ফ্যানের হাওয়ায়। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টটিভ সমুদ্রশেখরের ভিজিটিং কার্ডটাও। সেগুলো মাও তুনের নজরে পড়ে না। হাতুড়িতে হাতের ছাপ ছিল, ফলে সেটা আর ওখানে রাখতে চাননি। সোজা নিয়ে এসে রাখে নিজের টেবিলে। ভেবেছিল হাতুড়ির ব্যাপারটা কারও নজরে পড়বে না।

ভিজিটিং কার্ড-এর সূত্র ধরে ডাক পড়ে সমুদ্রশেখরের। সমুদ্রশেখরে যেহেতু চিনা ভাষা অল্প অল্প পড়তে পারে তাই গার্গী তার কাছ থেকে পড়ে উদ্ধার করে অর্ধেক লেখা প্রেসক্রিপশনের। আর এই প্রেসক্রিপশন ছিল মাও তুনের। এরপর চ্যান চিউয়ের মাথায় আঘাতের ধরন দেখে গার্গী খুঁজেছিল কী দিয়ে আঘাত করেছে খুনি। চ্যান চিউয়ের চেম্বারে একটাও হাতুড়ি না দেখে গার্গী অনুমান করে নিশ্চয়ই নিজের অপরাধ ঢাকতে সেটা নিয়ে এসে রেখেছে নিজের টেবিলে। সেই হাতুড়ি গার্গী খুঁজে পায় মাও তুনের চেম্বারে। তার চেম্বারে গার্গী দেখতে পায় দুটো হাতুড়ি। তার বুঝতে বাকি থাকে না এই হত্যাকাণ্ড মাও তুনেরই করা।

'ক্যাপসুল রহস্য'-উপন্যাসে গোয়েন্দা গার্গী সরাসরি ঘটনার তদন্ত না করেও শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে জট খুলেছে রহস্যের। উপন্যাসে দেখা যায় গ্যাংটকে ঘুরতে গিয়ে গার্গীর সঙ্গে পরিচয় হয় এক সদ্য বিবাহিত দম্পতি তানিশা ও ঋতুরাজের সঙ্গে। কিন্তু এসে থেকেই গার্গী লক্ষ করে তানিশার একটা টেনশনপূর্ণ অভিব্যক্তি। কথা বলে গার্গী জানতে পারে তানিশার বাবা পৃথ্বীরাজবাবু কাজ করে 'স্টান্ডফোর্ড' নামের একটি মালটি-ন্যাশনাল মেডিসিন কোম্পানিতে। কয়েকদিন ধরে তার পাগলের মতো অবস্থা। সে নাকি টাইম মেসিনে চড়ে যাত্রা শুরু করেছে। ছুটছে প্রবল গতিতে। সে যাত্রাটাও ভারি অদ্ভুত। খুব দ্রুত তার বয়স কমে যাচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় দু-তিন বছর করে। তার চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা পাগলের মতো। কাউকেই চিনতে পারছে না। অফিসে গিয়ে অফিসেরই কর্মী বিমলেন্দুবাবুকে হত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল। এসবের কারণ হিসেবে অনুমান করা হয়েছে পৃথ্বীরাজবাবুর কোম্পানিতে স্ট্রেস কমানোর একধরনের মেরুন রঙের ক্যাপসুল তৈরি হয়েছে। সেই ক্যাপসুল খেয়েই নাকি এই অবস্থা হয়েছে তার।

এই নিয়ে গার্গীর মনে নানান রহস্যের তৈরি হয়। গোয়েন্দাসুলভ মন গার্গীর। তার মগজে একবার কৌতূহল প্রবেশ করলে সারাক্ষণ সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করে। বুঝতে চেষ্টা করে এই রহস্যের গতিপ্রকৃতি। যতক্ষণ না সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ গার্গীর মন ছটফট করতে থাকে। কিন্তু গ্যাংটকে বসে কলকাতার সমস্যা সমাধান করা খুবই মুশকিল। ইতিমধ্যে তানিশার সঙ্গে কথা বলে গার্গী জানতে পারে 'স্ট্যান্ডফোর্ড' মেডিসিন কোম্পানির বেলেঘাটার স্টোরে বিমলেন্দু চক্রবর্তীর খুনের কথা। সে একজন অ্যাস্টিস্টান্ট স্টোর কিপার ছিল। সেই খুনের দায় পড়ে তানিশার বাবা পৃথ্বীরাজবাবুর উপর। শেষ পর্যন্ত গার্গী কলকাতায় এসে পৃথ্বীরাজবাবু এবং স্ট্যান্ডফোর্ড কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রঞ্জন দত্তের সঙ্গে কথা বলে উন্মোচন করে আসল রহস্যের। পৃথ্বীরাজবাবু আর্থিক তছরূপ না করেও তার অনুপস্থির সুযোগ নিয়েছিল বিমলেন্দু সেন। সেই থেকে বাঁচার জন্যই পাগলের অভিনয় করছিল সে। আর সেই অভিনয় সহজেই ধরা পড়ে যায় বুদ্ধিমতী গার্গীর কাছে।

'গোয়ায় গার্গী' রহস্য উপন্যাসে গার্গী গোয়াতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ডায়েরি থেকে উদ্ধার করে মেরিনেত্তির মতো ইন্টারন্যাশনাল কালপ্রিটের। করেছিল 'সে ক্যাথেড্রাল চার্চ' ও 'ব্যাসিলিকা অফ বম জেরাস'—এই দুটি চার্চের হামলার ছক। যেটা গোয়ার পুলিশ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তাই করে দেখায় গার্গী। সেই সঙ্গে গার্গী প্রকাশ করে সেই ইন্টারন্যাশনাল কালপ্রিটের ছবি। অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে গার্গী গোয়ার পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেয় দুই গোয়ানিজকে। যার জন্য গোয়ার পুলিশকে বলতে হয়েছে, -

> "ম্যাডাম, আপনার জন্যেই একটা ন্যাশনাল অ্যাসেট সেভ করা সম্ভব হল আজ! আপনি যদি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে একবার থানায় আসেন তো সবাই আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। সবাই খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছেন আপনার আশ্চর্য অনুমানশক্তি আর খবর সংগ্রহের বুদ্ধিমত্তা উপলব্ধি করে।"[৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সবুজ কোমরবন্ধনী রহস্য' উপন্যাসে গার্গী কয়েকটি ছবি দেখে চিহ্নিত করেছে রুম্পা সারখেল-এর হত্যাকারী নেহা শর্মাকে। রুম্পার মৃতদেহ দেখার পর গার্গীর নির্দেশে সোনালিচাঁপা খুব গোপনে মৃতদেহসহ দুই বান্ধবী নেহা শর্মা ও তিন্নি দেশাই-এর ছবি তুলে নেয় তার মোবাইল-ক্যামেরায়। ছবিতে প্রিন্সেপ ঘাটে রুম্পার ডেডবডির পাশে দুটো জিনিস পড়ে থাকতে দেখা যায়। একটি ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্যটি একটি সবুজ বেল্ট। গার্গী ফেসবুক ঘেঁটে বের করে ওই তিন বান্ধবীর একটি ছবি যারা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে বসে আছে হাসি-হাসি মুখে। সেই ছবিতে দেখা যায় ওই সবুজ বেল্টটি পরে আছে নেহা শর্মা। সেটি দেখেই গার্গী বুঝতে পারে এই হত্যাকাণ্ড নেহা শর্মারই করা। এই খুনের মোটিভ হিসেবে গার্গী আবিষ্কার করে ট্রায়াঙ্গুলার লাভ। গোয়েন্দা গার্গীর তদন্তের ধরন দেখে পুলিশকেও বলতে হয়, -

"আপনি যেভাবে কেস সলভ করেন তাতে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।"[৪]

গার্গী বিজ্ঞানের ছাত্রী। তার গোয়েন্দাগিরিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার লক্ষ করার মতো। 'সোনালী সুতার ফাঁস' উপন্যাসে দেখা যায় এক স্বামীজি বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে লোককে ভাঁউতা দিয়ে আসছিল। তাই গার্গী স্বামীজির সঙ্গে লড়াই করেছে অত্যন্ত বুদ্ধি দিয়ে। গার্গী জানে, স্বামীজি ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে কাত করে। তাই মঠে গিয়ে গার্গী প্রথম থেকেই ঠিক করেছিল স্বামীজির অস্ত্রেই তাকে ঘায়েল করতে হবে। স্বামীজি ঘরের মধ্যে গার্গীকে একা পেয়ে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল তার ম্যাজিক দেখিয়ে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বেরিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে বেরিয়াম সালফেটের প্রেসিপিটেট দেখিয়ে দুধ তৈরি করেছিল। গার্গীকে এতো সহজে বোকা বানানো সম্ভব না। তাই সেও ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশনের সঙ্গে পটাশিয়াম থায়োসায়নিন মিশিয়ে লাল টকটকে ডালিমের রস তৈরি করে স্বামীজিকে ফ্ল্যাট করে দেয়। এ ম্যাজিকটা স্বামীজি জানত না। ফলে এটা দেখার পর স্বামীজি একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। তার ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই তাকে কাগজের ফুলে ক্লোরোফর্ম মাখিয়ে শুঁকতে দিয়ে গার্গী বলে, শুঁকলেই কাগজের ফুল হয়ে উঠবে সত্যিকারের ফুল। স্বামীজি গার্গীর ফাঁদে পা-দিয়েই জ্ঞান হারায়। সেই সুযোগে গার্গীর পুলিশ ডেকে মঠের স্বামীজিসহ সকলকে লকাপে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেই সঙ্গে গার্গীর উদ্ধার করতে আসা টিটোকে তার বাবা মায়ের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

গোয়েন্দা গার্গী তার অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, সূক্ষ্ম কল্পনাপ্রবণ মন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে একের পর এক রহস্যের উন্মোচন করে গেছে। 'পিঙ্কি হত্যারহস্য' উপন্যাসে অপরাধী বিল্ব যখন 'ম্যাকবেথ'-এর অনুকরণে পিঙ্কিকে হত্যা করে। গোয়েন্দা গার্গী সাহিত্য প্রীতির কারণে ধরে ফেলে অপরাধীকে। গোয়েন্দা গার্গী কখনও খুনের তদন্ত করেছে, কখনও বা উদ্ধার করেছে পুরানো ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। তার গোয়েন্দাগিরি করার জন্য তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। এই ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে গেছে তার স্বামী সায়ন। সংসার সামলে একের পর এক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে গেছে। গোয়েন্দা গার্গীর আছে রহস্য সমাধানে অসামান্য দক্ষতা। গার্গী সকল রহস্যের জট সমাধান করে নিজের ধারালো বুদ্ধি আর অব্যর্থ অনুমান শক্তি দিয়ে। সমাজ যখন রহস্যের জালে ধীরে ধীরে আবৃত্ত হতে শুরু করে তখন গার্গী কখনও নিজে থেকেই লেগে যায়, রহস্যের সমাধান করতে আবার কখনওবা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। আবার কখনও কখনও এমন হয়েছে গার্গীকে দেখেই রহস্য আপনা আপনিই তৈরি হয়েছে।

গোয়েন্দা সাহিত্যে তরুণী গোয়েন্দা গার্গীর আবির্ভাব এক সাড়া-জাগানো ঘটনা। নয়ের দশকের মাঝামাঝি 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' দিয়ে শুরু হয়েছিল গার্গীর যাত্রা। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে বহু তদন্তের কাজ সুনিপুণভাবে সমাধা করে গার্গী এখন এ শহরের এক প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধানকারী। কলকাতা শহর ছাড়িয়ে এখন দূর রাজ্যে ভ্রমণের সময়েও সে রহস্যের সন্ধান পেলে শামিল হয় তদন্তে ও তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান সম্মোহিত করে রাখে সব শ্রেণির পাঠককে। এককালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভদের সুনাম ছিল বিশ্বজোড়া। প্রায় অর্ধশতক রহস্যের সমাধান করার পর গার্গীর সুনামও কিন্তু ক্রমবর্ধমান। এতদিন শহর কলকাতার মধ্যে বিস্তৃত ছিল তার গতিবিধি, কিন্তু ইদানীং রাজ্যের বাইরে গিয়েও সে জড়িয়ে পড়ছে নানা রোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে, ফলে কাহিনির প্রেক্ষাপটও হয়ে উঠেছে আরও বর্ণাঢ্য, আরও বৈচিত্র্যময়।

গোয়েন্দা গার্গীর অন্যতম আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে ভূগোল, ইতিহাসসহ নানা বিষয় সম্পর্কে তার অসামান্য জ্ঞান। গোয়েন্দা গার্গীর রহস্য উপন্যাসে যে সকল স্থান এসেছে সেগুলোর ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিছুই সুন্দরভাবে ফুটে উটেছে রহস্য সমাধানের পাশাপাশি। যে কারণে গোয়েন্দা গার্গী তার পাঠকদের কাছে শুধুমাত্র গল্পের চরিত্র নয়, বরং বাস্তবের মানুষ হিসেবে হাজির হয়েছেন। গোয়েন্দা গার্গী পাঠক মহলে কতটা জনপ্রিয় লাভ করেছে তা বোঝা যায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেই। গোয়েন্দা গার্গীর সাফল্য নিয়ে তিনি লিখেছেন, -

> "রবিবার পার হতেই সম্পাদকীয় দপ্তরে আসতে শুরু করেছিল পাঠকদের প্রশংসাসূচক চিঠি। তেত্রিশ সপ্তাহ পরে যখন উপন্যাসটি শেষ হয়েছিল, তরুণী গোয়েন্দা গার্গী জয় করে নিয়েছিল পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়। এক তরুণ-দম্পতি খবরের কাগজের কাটিংগুলি নিয়ে চলে এসেছিল আমার বাড়িতে। বলেছিল, তারা উপন্যাসটা দূরদর্শনে সিরিয়াল করতে চায়, আর সেই তরুণী প্রতি সপ্তাহের কিস্তি পড়ে গার্গীর সংলাপগুলি মুখস্থ করে ফেলেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্যাডো অভিনয় করছে রোজ, কারণ সে-ই অভিনয় করবে গার্গীর ভূমিকায়।"[৫]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) নভেম্বর ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩০৮
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) নভেম্বর ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৪৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (অষ্টম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫৩
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) নভেম্বর ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ভূমিকা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 747 - 754
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 747 - 754
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘কল্পবিশ্ব’ ওয়েব ম্যাগাজিন এবং বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান চর্চার নতুন পরিসর ও প্রকাশরীতি

দীপান্বিতা কাঁড়ার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kanrardipanwita@bhu.ac.in
ও
ড. সাম্পান চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
21st century, Digital Reading, Bengali science fiction, progress of science fiction, web-magazine.

Abstract

When the period is twenty-first century, changes can be seen in all aspects of language-composition-style of communicating literature whereas the relationship between literature, society and contemporary time is has always been eternal. Now a days, the reader can get the scope to invest in literature reading instantly on his digital devices without having to wait in the book market in search of books or magazines. One suitable example could be of this system is the recent 'webzine'; That is, 'web magazine'. Reading through new technology with apps like Kindle, Google Play Book etc. has become easy. It can be said that electronic voice is one of the contemporary literature publishing mediums. People's opportunity to read is in the blink of an eye, and this has contributed in part to the advancement of science in the modern era. To know the influence of science in literature, the genre of science-fiction has served the thread of Bengali literature from late 19th century.

‘Kalpabiswa' magazine has played a special role in the practice of Bengali science fiction literature in the form of webzine. As a result, this year the representative of 'Kalpabiswa' got the first invitation from India at the 'World Science Fiction Convention' (81st).

In the discussion, an attempt has been made to shed light on the development and expansion of Bengali science fiction literature as well as the mainstream of literature and at the same time the use of new technology in Bengali literature as a new direction in literary practice through this particular webzine.

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 747 - 754
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

সভ্যতার ভবিষ্যৎ সদা পরিবর্তনশীল, সময়ের সঙ্গে চলে যুগের বদল। বিজ্ঞানের উন্নয়ন এনেছে প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার যুগ। আজ যা অধরা বা কল্পনার পর্যায়ে রইল, কাল তা হতে পারে আবিষ্কারের স্বাক্ষর — এই ভাবেই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে। পরিবর্তন ঘটেছে সমাজের সর্বস্তরে— সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশের মাধ্যমে, বিজ্ঞান-চিকিৎসা ক্ষেত্রে আবিষ্কারের মাধ্যমে, মানব প্রজাতির চিন্তা-ভাবনার রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবর্তিত হচ্ছে শতাব্দীর ইতিহাস। সেই আদিম প্রস্তরযুগ থেকে রূপান্তরিত হতে হতে আজকের একুশ শতক টেকনোলজির যুগ, আবিষ্কারের যুগ; অন্যভাবে বলা যায় যন্ত্রের যুগ। মানুষ এখন আবিষ্কারগুলির ব্যবহার করতে শিখেছে নিজের প্রাত্যহিক জীবনকর্মে। আবার অতিরিক্ত যন্ত্র নির্ভরতার ফলে যন্ত্রের বিকলতায় মানুষকে সম্মুখীন হতে হয় যন্ত্রের যন্ত্রণায়। তবুও ভালো-মন্দ মিলেমিশে এককথায় একুশ শতক নব আলোর দিশা।

এই আলোকবার্তা এসেছে সাহিত্যের বিষয়ের পাশাপাশি সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীতেও। কাগজের পাতা উল্টে পড়ার বিকল্প রূপে মানুষ পেয়েছে সফ্ট বা কপি পি.ডি.এফ। যা সহজেই পাঠক পেয়ে যাচ্ছে নিজের মুঠোফোনে, ট্যাব, ল্যাপটপে; নিজের সুযোগ-সুবিধা মতন। তবে বই পাড়ায় বইয়ের সন্ধান, হাতে হার্ডকপির পৃষ্ঠার সুবাস, বই সাজানো ঘরের নিজস্ব ছোট্ট গ্রন্থাগার অবশ্যই আলাদাই আমেজ সৃষ্টি করে বইপোকাদের কাছে। তবে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে এমন অনেক পাঠক থাকেন যাদের সেই সুযোগ হয় না কিন্তু তারা সাহিত্যচর্চায় ভীষণ আগ্রহী। তাই তাদের জন্যে নব প্রযুক্তির উপস্থাপন রীতি হিসেবে অন্তর্জাল খুব উপযোগী মাধ্যম। এছাড়া এমন অনেক অনলাইন জার্নাল আছে যারা অন্তর্জালেই তাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করে; যার ফলে সহজেই আমরা তা ঘরে বসে পড়ে ফেলতে পারি। শুধু তাই নয় সম্প্রতি করোনা মহামারীকালে আমরা বুঝেছি অনলাইন ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিল; তাই বর্তমানকালে সকল পাঠকদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম। এই ব্যবস্থার অন্যতম উদাহরণ সাম্প্রতিককালের 'ওয়েবজিন'; অর্থাৎ, 'ওয়েব ম্যাগাজিন'। আবার Kindle, Google Play Book ইত্যাদি দ্বারা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে এই বইপড়া। কেম্ব্রিজ ডিকশানারি-তে 'Webzine' এর অর্থ 'a magazine that is published on the internet and not on paper,' আবার 'ওয়েব ম্যাগাজিন' এর সংজ্ঞায় আমরা পাই —

> "A web magazine is a linear, finite edition of a magazine, just like the app edition. Readers can turn the pages and progress through the magazine the same as they would an app or print magazine. Unlike an app edition, it's accessed on the Internet through a web browser, meaning it's accessible on any device and any platform, without restrictions. And unlike print magazines, it also delivers access to a library of all past articles, instantly available with just a click."[১]

অর্থাৎ, 'ওয়েব ম্যাগাজিন' হল - প্রিন্টের পরিবর্তে ইন্টারনেটে প্রকাশিত সাহিত্য প্রকার; এতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস, নিবন্ধ, ছবি ইত্যাদি কম্পিউটার, ট্যাব বা মোবাইল ডিভাইসে পড়ার ও দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় এই 'ওয়েব ম্যাগাজিন'-এর সংখ্যা কম হলেও কয়েকটি সক্রিয় 'ওয়েবজিন' প্রচলিত। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ওয়েব ম্যাগাজিন হল- 'জয়ঢাক', 'কল্পবিশ্ব' ও 'ম্যাজিক ল্যাম্প'। যারা বিশ্বের দরবারে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের নানা রঙের ডালি সাজিয়ে উপহার দেয়। আলোচনার সুবিধার্থে ও নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যে কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েব ম্যাগাজিন 'কল্পবিশ্ব' সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচিত করা হল।

'কল্পবিশ্ব' বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম ওয়েব ম্যাগাজিন। যার উদ্ভব কয়েকজন কল্পবিজ্ঞান প্রেমীদের হাতে; একুশ শতকের দুইয়ের দশকে ২০১৬ সালে। সাহিত্যের মূলধারার পাশাপাশি আরেকটি স্বল্প চর্চিত ধারা ছিল কল্পবিজ্ঞান। এই কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম পত্রিকা ছিল 'আশ্চর্য!' এরপর 'বিস্ময়', 'ফ্যানট্যাসটিক' পত্রিকা প্রকাশিত হলেও প্রথম দুটি পত্রিকা স্বল্প কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। তবে কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখি প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্যের বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে। সাহিত্যের এই অবহেলিত স্বল্প চর্চিত ধারাটিকে বিশ্বের দরবারে বহুল চর্চিত ধারায় রূপান্তর করায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 747 - 754
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

‘কল্পবিশ্ব’র অবদান অনস্বীকার্য। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে তাদের নব প্রয়াস কল্পবিজ্ঞান শাখার শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে এবং একই সাথে পরিচিত জগতের পরিসর বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই ই-পত্রিকার মূল আলোচনার বিষয় হবে কল্পবিজ্ঞান, অলৌকিক ও ফ্যান্টাসি। ‘কল্পবিশ্ব’-এর প্রথম সংখ্যাতে ‘সম্পাদকীয় কলমে’ তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠকদের জানিয়েছিলেন, –

> “প্রতিষ্ঠিত লেখকদের আরও বেশি এই জঁর এর লেখা লিখতে অনুরোধের পাশাপাশি কল্পবিশ্বের মাধ্যমে আমরা নতুন ইচ্ছুক লেখকদেরও এই পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল প্রত্যেক সংখ্যায় বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের ক্লাসিক কিছু লেখা অনুবাদের মাধ্যমে বাংলার পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। এছাড়াও নিয়মিত থাকবে দেশ-বিদেশের কালজয়ী কিছু লেখকের জীবন ও রচনা পরিচিতি। এই তিনটি বিষয় নিয়ে নিয়মিত চর্চা করে আমরা চাইছি পালে যদি কিঞ্চিৎ বাতাস লাগানো যায়। যদি সামান্য ও জোয়ারও আসে এই অবহেলিত কল্পনার সমুদ্রে।”[২]

আর তাদের কল্পনার সমুদ্রে বিপুল জোয়ার আসে বর্তমান বছরেই কারণ তারা আহ্বান পায় ‘২০২৩ চেংডু ওয়ার্লডকনে’। অর্থাৎ, ৮১তম কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক ‘ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স’ - এ, যা অনুষ্ঠিত হয় চীনে। প্রথম কোনো ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স - এ বাংলা কল্পবিজ্ঞান এবং তার ইতিহাসকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হল। এই পত্রিকায় বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত হয় নতুন ও পরিচিত লেখকদের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা (গ্রন্থ, চলচ্চিত্র), বিশেষ আর্কষণ (এখানে থাকে বিভিন্ন কালজয়ী লেখকদের সাক্ষাৎকার), কবিতা, লিমেরিক, ক্যুইজ ইত্যাদি বিভাগ। এছাড়া থাকে কিছু বিশেষ থিমের উপর আকর্ষনীয় ‘বিশেষ সংখ্যা’।

‘কল্পবিশ্বে’র প্রথম সংখ্যায় ব্ল্যাকহোল বিষয়ক একটি রচনা রয়েছে। লেখক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের ‘হরেনবাবু ও ব্ল্যাকহোল’। আমাদের অনেকের এমন অনেক স্বপ্ন থাকে বা আশা থাকে বড় হয়ে কন একটি কাম্য স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌছনোর কিন্তু বাস্তবে অন্য কিছু হলে মনে হয় সেটা হলে বেশি ভালো হত। এমনই হয়েছিল স্কুলশিক্ষক হরেন বাবুর সঙ্গে। তাঁর স্বপ্ন ছিল ইংরেজিতে এম.এ পড়ে আই.এ.এস পরীক্ষায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবার, এতে তাঁর জীবন সুখময় হতে পারতো। আচমকাই তার এই ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয়েছে সমান্তরাল দুনিয়া বা Parallel world-এর আর্টিস্ট হরেন শাসমল ও তার যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রটি হল মিনি ব্ল্যাকহোল। আমরা ব্ল্যাকহোল প্রসঙ্গ আগেও পেয়েছি বিশিষ্ট কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক লেখকদের রচনায়। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সিরিজের গল্পে ‘কালো ফুটো সাদা ফুটো’, ‘ফুটো’ নামক জ্যোর্তিবিদ্যা বিষয়ক গল্পগুলিতে। যেখানে বিভিন্ন ডাইমেনশন ও ভিন্নগ্রহের কল্পনা করা হয়েছিল। তবে আলোচ্য গল্পের লেখক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য তুলে ধরেছেন পৃথিবীর মতন অনেক পৃথিবীর কথা, একই চেহারায় বিভিন্ন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষের কথা এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হবার অদ্ভুত খুদে যন্ত্র, যার কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষক হরেনবাবু নিজের একঘেয়েমি জীবন থেকে বেরিয়ে ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছিল ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের। আর্টিস্ট হরেনবাবুর উপহার দেওয়া যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি ছিল কিছুটা এই রকম–

> “ছবিটা পষ্টাপষ্টি যেই মনের মধ্যে দেখতে পাওয়া, অমনি বাক্সের ভিতর থেকে একটা গুণগুণ আওয়াজ উঠল। বাক্স জানান দিচ্ছে সে রেডি। এবারে রওনা হলেই হয়। হরেন বাবু এইবার নীচু হয়ে তার মুখের ঢাকনাটা খুলে দিলেন। ভেতরে মটরদানার সাইজের কালো কুচকুচে একখানা বল ভাসছে - এক মুহূর্তের জন্য শুধু হরেনবাবু দেখতে পেয়েছিলেন সেটাকে, তারপর একটা ভয়ানক হ্যাঁচকা টানে তিনি ফিতের মতন সরু হয়ে সেঁধিয়ে গেলেন বলটার ভিতর।
>
> ছোট্ট ব্ল্যাকহোলটা তাঁকে গোটাগুটি টেনে নিয়ে, বাক্সের গায়ে আঁটা মিনিকমপুটারে ধরে রাখা হরেনবাবুর ইচ্ছাটা যে সমান্তরাল পৃথিবীতে সত্যি হয়েছে সেইখানে ছুঁড়ে ফেলল এক নিমেষের মধ্যে–”[৩]

তবে সমান্তরাল পৃথিবীতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে শিক্ষক হরেনবাবুর ভ্রান্তি দূর হয়, কোন পেশাই আরামের নয়, সেখানে রয়েছে অনেক ধরনের কর্মসমস্যা তাই 'পুনর্মূষিক ভব' হয়ে শিক্ষক জীবনে পুরনো পৃথিবীতে তিনি ফিরে আসেন এবং সেই মিনি ব্ল্যাকহোল যন্ত্রটিকে পুকুরে বিসর্জন দেন। একই সাথে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহাকাশের দূত', অদ্রীশ বর্ধনের 'প্রমোদ কন্যা' প্রমুখ প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি সৌগত বসু'র 'দেবযন্ত্র', সন্তু বাগ, প্রমুখ নবীনদের লেখালিখি।

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় 'কল্পবিশ্বে'র উপস্থাপন ছিল কিছু সোভিয়েত আমলের রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন কাহিনির সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করা। সংখ্যাটি ছিল 'রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন' বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ তেমন ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তন ঘটায় চিন্তাভাবনার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বলশেভিক বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ - এইসবের মধ্যে দিয়ে উত্থান ঘটে নতুন রাষ্ট্রের। কির বুলিচেভ, আনাতলি দনেপ্রভ, আইগির রশোকোভতস্কি, ভ্যালেন্টিনা জুরাভ্লিয়োভা, আলেক্সান্দর বেলিয়ায়েভ, গেন্নাদি গোর প্রমুখ রাশিয়ান লেখকদের রচনার অনুবাদ এই সংখ্যায় পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, সাহিত্যে অনুবাদের ধারাকেও 'কল্পবিশ্ব' চলমান রেখেছে।

তার মধ্যে য়ুরি গ্লাজকভ - এর 'শান্ত গ্রহ' রচনাটি হল 'The Mirror Planet'-এর ভাবানুবাদ। যেখানে দেখি, অদ্ভুত সুন্দর ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রহের উপর ক্ষমতার লাভের প্রয়াস অন্য প্রান্তের অবস্থানকারী এক গ্রহের। তারা বারে বারেই শান্ত গ্রহে আক্রমণ করে এবং অসফল হয়। আধুনিক সমরাস্ত্র প্রেসক্রুজার, লেজার কামান, নিয়ন্ত্রণযোগ্য মিসাইল, ট্যাঙ্ক, এয়ার ক্র্যাফট ইত্যাদি যন্ত্র নিয়েও যুদ্ধের শেষে পড়ে থাকে যন্ত্রাংশের টুকরো ও আক্রমণকারীদের দেহাবশেষ। আক্রমণকারী কাউন্সিলের আলোচনায় কর্নেল ক্রুক শান্ত গ্রহ আক্রমণ করার পদ্ধতি ও পরিকল্পনা জানান। শান্ত গ্রহটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে কাহিনিতে যেমন তাদের তরফ থেকে কোন যুদ্ধযান আক্রমণকারী গ্রহে আসেনি, বরং আক্রমণকারী গ্রহের সমপরিমাণ ফেরত আসে শান্ত গ্রহ থেকে। ক্রুকের পরিকল্পনা মতন এবার শান্ত গ্রহে আগে অবতরণ করা হবে, তারপর আক্রমণ করা হবে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এবারেও তিনটি ট্যাঙ্ক আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হল এবং ক্রুক নিজে আক্রমণ করার সময় দেখলো—

> "কিন্তু শত্রুপক্ষের অবয়বটাও ওর মতোই ভাবছিল নিশ্চিত। প্রায় ছায়ার মতোই ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। সময় নষ্ট না করে ট্রিগারে চাপ দিলেন জেনারেল ক্রুক। পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলিটা চালানোর সময় দেখতে পেলেন শত্রুপক্ষের মুখ। তার নিজেরই মুখ...কাদা রক্ত ঘামে মাখামাখি সোনালী চুলওয়ালা মাথা...বিস্ফারিত চোখে যুগপৎ ঘৃণা ও ভয়ের ছাপ...বুকের বোতাম খোলা ওভার কোট...সে কোটের বুকের কাছে লাগানো আছে এক বিশেষ চকচকে তারা।"[৪]

অর্থাৎ, বিপরীত দিকে যে আক্রমণকারী সে তারই প্রতিমূর্তি। আসলে এই শান্ত গ্রহ হল অন্য প্রান্তে অবস্থানরত আক্রমণকারী গ্রহের Mirror Planet। আমরা আয়নায় যেমন প্রতিচ্ছবি দেখি কিন্তু সেটা হয় উল্টো তেমন ভাবে লেখক দেখিয়েছেন এই যুদ্ধবাজ গ্রহের শান্তচিত্র। একই সাথে সমাজের আগ্রাসী নীতি, সমাজের ক্ষমতা লোভের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত করেছেন লেখক এই কাহিনিতে। এছাড়া আলেকজন্দ্র কুপিনের অভিবাদন কাহিনিটি প্রাক্ বিপ্লব যুগের ভবিষ্যতের কল্পনার রাজ্যের দৃশ্যপটের বাস্তব মূল্যায়ন।

'কল্পবিশ্বে'র 'কঙ্কাবতী কল্পবিজ্ঞান লেখেননি' (চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সংখ্যার বিষয় নারীদের কলমে কল্পবিজ্ঞান, যার মধ্যে দিয়ে জানা যায় কল্পবিজ্ঞান ধারায় মেয়েদের সংখ্যা কম হলেও ছিল না তা নয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বেগম রোকেয়ার 'সুলতানাজ ড্রিম' ইংরেজিতে হলেও প্রথম বঙ্গনারীর রচনা। যিনি তৎকালীন সময়ে স্বপ্নে হলেও এমন এক পৃথিবীর কল্পনা করেছিলেন যেখানে সমাজের কর্ত্রী নারী। এরপর আমরা পেয়েছি লীলা মজুমদার, বাণী বসু, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মের কিছু তরুণী লেখককে। বর্তমানকালে যশোধরা রায়চৌধুরী, অনুষ্টুপ শেঠ, কৃষ্ণা বসাক প্রমুখ বঙ্গনারীর কলমে কল্পবিজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। কল্পবিশ্বের অবদানে আমরা পাচ্ছি নতুনদের পাশাপাশি পুরানো স্বনামধন্য লেখিকাদের চিরস্মরণীয় রচনাগুলি, যেগুলি হয়তো অনেকেরই অজানা। আবার পড়তে চাইলেও যা সহজপ্রাপ্য নয় কারণ পুরনো অনেক বই আজ আর রিপ্রিন্ট হয়না। 'কল্পবিশ্ব' ওয়েজিন এই

হারিয়ে যাওয়া লেখাগুলি সহজেই পৌঁছে দেয় আমাদের কাছে, নতুন লেখকদের পাশাপাশি ফিরিয়ে দেয় প্রবীণ লেখকদের পুরাতন রচনাকে ফিরে দেখার সুযোগ। এই বিশেষ সংখ্যায় আমরা পেয়েছি বাণী বসুর কলমে এক অন্য ধরনের রচনা- 'কাঁটাচুয়া'। কাহিনির শুরু থেকে রহস্যময় মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা শুরু হয় একটি-দুটি বিকল্প হত্যার ঘটনা থেকে; পরে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে মৃত ব্যক্তির সারা দেহে কিছু রহস্যময় একই মাপের ছিদ্র লক্ষ করা যায় এবং রক্তক্ষরণে তাদের মৃত্যু হয়। তবে কাহিনিতে একটি লক্ষ করার বিষয় প্রতিটি মৃত ব্যক্তি পুরুষ এবং কোন আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আসলে এখানেই লুকিয়ে রয়েছে রহস্যের মূল জট। এই গল্প হল নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের বিরুদ্ধে তাদের যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ শলাকাবিদ্ধতার ঘটনা। এবং মিউটেশনের মোড়কে নারীর রুখে দাঁড়ানোর প্রতিবাদ। লেখিকার অসাধারণ বর্ণনায় ফুটে ওঠে সেই অসহনীয় অত্যাচারের মুহূর্তে নারীর প্রতিটি লোমকূপ যেন ধারালো শলাকায় পরিণত হয়েছে। কাহিনিতে রিপোর্টার নন্দনা যখন কানাই মাঝির বউ কিংবা মাধ্যমিক পড়ুয়া রুণার কাছে রিপোর্ট সংগ্রহে আসে তখন শজারুর কাঁটারূপ অদৃশ্য হত্যাকারীর রহস্য উদ্ধার করতে কিছুতেই পারছিল না। কিন্তু স্বয়ং তার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটলে সে সহজে হিসেবে মেলাতে পারে। নন্দনা যখন তার দূর সম্পর্কীয় দাদা অবিনাশের শিকার হয়েছে, সেই অংশে লেখিকার বর্ণনা লক্ষণীয় —

> "ক্রমশ শোক সন্ধ্যার অন্ধকার আরো দম বন্ধ করা, ক্রমশ এক বুনো জান্তব গন্ধে ভরে যায় ঘর। প্রবল বমি পেতে থাকে নন্দনার। তার বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পাচ্ছে। সামনে দুলছে কুয়াশার পর্দা ভেদ করে কিছু দেখা যায় না। প্রত্যেকটি লোমকূপ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে চকচকে মসৃণ তীক্ষ্ণ দৃঢ় শলাকা।"[৫]

নারীর কলমে কল্পবিজ্ঞানের এক অসাধারণ কাহিনি 'কাঁটাচুয়া' গল্পটি। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নিবিড় সংযোগ কল্পনা করা হয় সর্বদাই। প্রকৃতির প্রদত্ত উপহাররূপে এই কাঁটা নারীর প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে এই গল্পে। নন্দনার পিনকুশন, রুনার কাঁটা কম্পাস কিংবা কানাই মাঝির বউয়ের চুলের কাঁটা হয়তো রহস্যময় কাহিনির শজারুর কাঁটা।

অন্যদিকে, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ধারায় বেশ কিছু রচনা লিখেছিলেন ঘনাদার পিসতুতো ভাইকে কেন্দ্র করে। এই ভদ্রলোকের শ্রোতা ছিল চারজন। 'আইসবার্গ' কাহিনিতে সামান্য আইসক্রিম থেকে ঘনাদার পিসতুতো ভাই পৌঁছে যায় আইসবার্গ বিষয়ক ভাবনায়। অত্যন্ত কৌশলে লেখিকা পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিকগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন— বনভূমি ধ্বংস করে নগরায়ণ, পেট্রোল-জ্বালানি ব্যবহারে মাত্রারিক্ত দূষণ, গ্রীন হাউস এফেক্ট প্রভৃতি বিষয়গুলি ঘনাদার পিসতুতো ভাই কাহিনিতে বলেছে। যেখানে কল্পনায় লেখিকা দেখিয়েছেন মেরু অঞ্চলের বরফ গলে কলকাতার রাস্তায় নৌকো ভেসে চলার ঘটনা। একই সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারি পদক্ষেপ, কিয়াটো সম্মেলন, জি-এইট প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়গুলি কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে।

এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে লীলা মজুমদারের 'ফর্মুলা ১৬' গল্পটি। যেখানে দেখি বৈজ্ঞানিক চর্চায় গবেষণারত ধনকাকা প্রাণীবিদ্যায় যুগান্তর পরিবর্তনকারী বিশেষ ফর্মুলার সন্ধান পায়। তার গুরুদেবের ফর্মুলা ১৬-এর সামান্য ব্যবহারে ঘটে চমৎকার সব ঘটনা। এতে অমরত্ব লাভ করা যায়, বুদ্ধিমান হওয়া যায়, আবার অতিরিক্ত ব্যবহারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত এই আবিষ্কারের সূত্রও নষ্ট হয় এবং ঔষধের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে অমূল্য আবিষ্কার স্বপ্ন হয়েই থাকে। ঘনাদা ও শঙ্কুর মতন সমস্ত আবিষ্কারের প্রমাণ লোপাট হয় কাহিনির পরিসমাপ্তিতে।

কল্পবিশ্বের 'হাস্যরসাত্মক কল্পবিজ্ঞান' সংখ্যায় (অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) স্থান পেয়েছে হাস্য রসের কাহিনি। সাহিত্যে হাস্য এমন এক বিষয় যেখানে সহজ-সরল, প্রাণবন্ত হাসি থাকে আবার কখনো ব্যঙ্গের ছলে ঈঙ্গিতময় বিষয়ও লুকোনো থাকে। হাস্যরসের বিশেষ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে পূর্বে 'রামধনু' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসুশীল চন্দ্র মিত্রের 'বৈজ্ঞানিক বর-যাত্রী সম্বর্ধনা', পরশুরামের 'গামানুষ জাতির কথা', ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'ফুটোস্কোপ' ইত্যাদি রচনা। আবার স্থান পেয়েছে নবীন লেখকদের হাসির রচনা। হাসির মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় যে কোন বিষয়ে ভীষণ জটিল মন্তব্য সহজে বলে দেওয়া যায় যেমন যন্ত্রের যন্ত্রণা কেমন হতে পারে তা হাস্যরসের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই 'বৈজ্ঞানিক বর-যাত্রী সম্বর্ধনা' রচনায়। বিজ্ঞানপ্রেমী হিমাচলবাবু তার মেয়ের বিয়েতে সবকিছুতেই যান্ত্রিকতার প্রয়োগ করেছিলেন। সব সুন্দরও ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যন্ত্রের বিকলতায় তাকে পর্যুদস্ত হতে হয় সকলের সামনে। বিষয়টি দুঃখের হলেও লেখক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 747 - 754
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাস্য উপভোগ করার উপাদানে ভরপুর করে উপস্থাপন করেছিলেন কাহিনিটিকে। মানুষ যন্ত্রের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে লাগলে যন্ত্রের বিকলতায় কি করবে? আমাদের সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় এই কাহিনিটি।

অন্যদিকে নবীন লেখক এস. সি. মন্ডল মজার কল্পবিজ্ঞান রূপে রচনা করেছিলেন 'হরিপদবাবু ও ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসী' রচনাটি। যেখানে হরিপদবাবুর দেখা মেলে ম্যাক্রোকসমগ্রহের অধিবাসী ইনকংরুয়াশ ওরফে কং-এর সাথে। অফিস, বউ, দোকান সব জায়গা থেকে হতাশা-বিরক্তি-বিদ্বেষ পেয়ে হরিপদবাবু ময়দানের মাঠে যখন বিশ্রামরত ছিলেন তখন UFO করে ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা কং- তার কাছে সাহায্যের অনুরোধ করে। কং-যে গ্রহের বাসিন্দা তারা অনেক উন্নত। তাদের সব কিছুরই ভার নিয়েছে কৃষ্টি, অর্থাৎ সুপার হাইটেক কোয়ান্টাম কম্পিউটার। যার জন্য তাদের জীবনে চিন্তা-ভাবনা-প্রশ্ন কিছুই নেই। তবে দীর্ঘকাল এরকম থাকার পর কৃষ্টি জানিয়েছে তাদের উন্নতি থেমে গেছে। তাই তারা এসেছে পৃথিবী গ্রহের হরিপদবাবুর কাছে; কিছু দার্শনিক তথ্য দিয়ে তিনি যদি তাদের সহায়তা করেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হলে ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসীরা অমর। জেনেটিক রিজেনারেশন প্রক্রিয়ায় তারা ত্রিশ বছর অন্তর পুরনো শরীরকে নতুন করে নেয়। তবে কাহিনিতে মজার বিষয়টি ঘটে যখন হরিপদবাবু কং-কে উপায় বলে দেয় এবং কং তার যন্ত্রে রেকর্ড করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নোট করে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি উপভোগ্য হবে —

> "হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হতে হলে, বোধের জন্ম হতে হলে জীবনে প্রেম থাকতে হয়, প্রেমে ব্যর্থতা থাকতে হয়। ব্যর্থতাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। নিজের ব্যর্থতার সময়ে, হৃদয় ভাঙ্গার সময়ে, মানুষ নিজেকে নিয়ে চারপাশ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখে। এই পৃথিবীর এক মহান দার্শনিক বলে গেছেন 'হৃদয়ে ফাটল না থাকলে সেখানে আলো প্রবেশ করবে কিভাবে?' তাই হৃদয়ে আলো প্রবেশের জন্য হৃদয় ফাটল থাকতে হয়। কথায় আছে মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝেনা।..."[৬]

অন্যদিকে এর অর্থ কং-এর কাছে যা দাঁড়ালো সেটা এমন —

> "৪। সকল মানুষের হৃদপিন্ডে অপারেশনের মাধ্যমে ফাটল তৈরি করতে হবে।
> ৫। মানুষের দাঁত ভেঙে দিতে হবেই, তবেই দাঁতের মর্ম বুঝবে।"[৭]

অর্থাৎ, হাস্যচ্ছলে বোঝাই যাচ্ছে কং-দের চিন্তাশক্তি, ভাবনার পর্যায় লোপ পেয়েছে। যন্ত্রের উপর নির্ভর থেকে থেকে নিজের বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত রসিক হরিপদবাবু তার সমস্ত দার্শনিক পরামর্শ বাদ দিয়ে কৃষ্টিকে বলে শুধু তাদের গ্রহে বিয়ের প্রচলন শুরু করতে, তবেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কল্পবিজ্ঞানের উপাদানের মধ্যে হাস্যরসের ব্যবহার কাহিনিটিকে আরো অনেকাংশেই উপভোগ্য করেছে।

হাস্যরস ও কল্পবিজ্ঞানের মিশেলে এই সংখ্যায় আরেকটি রচনা উল্লেখ করব - সন্দীপ চৌধুরীর 'ইচ্ছেপূরণ', যেখানে দেখি মৃত্যু পথযাত্রী অমলবাবুর শেষ ইচ্ছা পরের জন্মে পূরণ হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর। গল্পে দেখা যায়, আলিশা গবেষণায় এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল যার সাহায্যে মানুষের শেষ ইচ্ছা পরের জন্মে পূরণ হবে। আলিশার রিসার্চ অনুযায়ী মৃত্যুর পর আত্মাকে অনুসরণ করা যায় এভাবে এক যন্ত্রে —

> "তার পরের জন্ম কোথায় হবে সেটা প্রবালিটির ওপর নির্ভর করে। সেই আত্মার উপর ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে তার গতিবিধির খোঁজ পাওয়া সম্ভব। কোয়ান্টাম এন্ট্যাংগেল্ডমেন্টের সিদ্ধান্ত ব্যবহার করে এই ট্যাগ করা হয়। অর্থাৎ, যে মানুষ আজকে মারা গেল, সে মৃত্যুর পর কবে, কোথায় জন্মাল তার আত্মার সঙ্গে এন্ট্যাগেল্ড কণা ট্র্যাক করলেই পাওয়া যাবে।"[৮]

অমলবাবু আলিশার এই চুক্তির এক ক্লায়েন্ট। মৃত্যুর শেষ কিছু মুহূর্ত আগে অমলবাবু বিভিন্ন ইচ্ছা প্রকাশ করে - উন্নত দেশে জন্মাবে, অবস্থাপন্ন পরিবার হবে, আগের জন্মের স্মৃতি যদি মনে থাকে তবে তা উপভোগ করবে, আলিশার সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ বলবে। ঘটে ও তাই। তার নতুন জন্মে আগের সব কথা মনে থাকে এবং আলিশার দেখা মেলে কিন্তু তিনি ধন্যবাদ জানানোর বদলে আলিশার উপর রেগে যান। কারণ উচ্চবিত্তশালী দেশগুলিতে জন্ম না হয়ে তার ভারতের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয়। এছাড়া সাতাত্তর বছর বয়সের সব স্মৃতি নিয়ে বাচ্চার জীবন আমাদের কাছে হাসির

খোরাক হলেও, কাহিনির চরিত্র অমলবাবুর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠে। কিন্তু ট্যাব দেখে আলিশা মনে করিয়ে দেয় তার শেষ ইচ্ছা এই দুটিই ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত অমলবাবু মুক্তি পেয়েছে তার নবীন জীবন থেকে পুরানো স্মৃতি মুছে ফেলার ফলে।

ওয়েব ম্যাগাজিন রূপে 'কল্পবিশ্ব'- এরকম ভাবেই উপহার দিয়ে চলেছে বিভিন্ন স্বাদের কাহিনি, প্রবন্ধ, সমালোচনামূলক লেখা-লিখি, দেশ-বিদেশের খবরা খবর। উপরিক্ত সংখ্যাগুলি বাদেও 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন দ্বি-শতবর্ষ সংখ্যা' (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা), 'ক্লাই-ফাই বা ক্লাইমেট ফিকশন সংখ্যা' (তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), 'ডিটেকটিভ সায়েন্স ফিকশন সংখ্যা' (চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), 'স্তানিসোয়াভ লেম শতবার্ষিকী সংখ্যা' (সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা), 'রে ব্র্যাডবেরি সংখ্যা' (সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) ইত্যাদি আরো কত রঙিন সংখ্যা উপহার পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে। জানতে পারি, বিদেশে সায়েন্স ফিকশনের চর্চার ধারা। তাদের বিভিন্ন সংখ্যায় লেখালিখির পাশাপাশি আলোচিত হয় বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন ('সাই-ফাই') সিনেমা বা সিরিজের রিভিউ। যেমন - 'Her', 'Moon', 'Frankenstein', 'Close Encounters of the Third Kind', 'Son of Flubber', 'Metropolis', 'Terminator' ইত্যাদি। আবার আছে সত্যজিৎ রায়, অনীশ দেব, স্কার্লোস সুচলওস্কি, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কল্পবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের বিশেষ সাক্ষাৎকার। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তির ব্যবহারে 'কল্পবিশ্ব' খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে তাদের মুঠোফোনে। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির সুফল রূপে বর্তমানকালে ই-জার্নাল বা ওয়েব ম্যাগাজিন এক প্রচলিত গণমাধ্যম। আর কল্পবিজ্ঞানের অতীত ঐতিহ্যের পাশাপাশি একই সাথে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা প্রেরণ করে এই বিশেষ ওয়েব ম্যাগাজিনটি।

কাগজ বাদ দিয়ে স্ক্রীন, মুদ্রিত প্রকাশনা বাদ দিয়ে নেট দুনিয়ায় সাহিত্যপাঠ এবং বিষয়ের উদ্ভাবনী কৌশলে 'কল্পবিশ্ব'-র মত ওয়েব ম্যাগাজিনরা অতএব বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের বেশি যাত্রাপথের ইতিহাসের নতুন আনন্দগান।

Reference:

১. https://www.mequoda.com/articles/digital-magazine-publishing/clarification-web-magazine/ Retrieved on 26.12.2023, 10:26pm

২. সম্পাদকীয়, কল্পবিশ্ব, প্রথম সংখ্যা, ২০১৬ https://www.kalpabiswa.in/article/%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a7%80%e0%a7%9f/ Retrieved on 26.12.2023, 10:30pm

৩. দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, 'হরেনবাবু ও ব্ল্যাকহোল', কল্পবিশ্ব, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৬ https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B2/ Retrieved on 26.12.2023, 10:50pm

৪. য়ুরি গ্লাজকভ, অনুদিত-প্রতিম দাস, 'শান্তগ্রহ', কল্পবিশ্ব, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৭ https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9/ Retrieved on 27.12.2023, 08:40pm

৫. বাণী বসু, 'কাঁটাচুয়া', কল্পবিশ্ব, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৯ https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE/ Retrieved on 28.12.2023, 08:30am

৬. এস.সি.মন্ডল, 'হরিপদবাবু ও ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসী', কল্পবিশ্ব, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩ https://www.kalpabiswa.in/article/y8n1a10/ Retrieved on 30.12.2023, 09:26am

৭. এস.সি.মন্ডল, 'হরিপদবাবু ও ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসী', কল্পবিশ্ব, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩ https://www.kalpabiswa.in/article/y8n1a10/ Retrieved on 30.12.2023, 09:26am

৮. সন্দীপ চৌধুরী, ‘ইচ্ছেপূরণ’, কল্পবিশ্ব, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩
https://www.kalpabiswa.in/article/y8n1a11/ Retrieved on 31.12.2023, 10:39am

Bibliography:

সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ, ‘কল্পবিজ্ঞান প্রবন্ধসংগ্রহ’, কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০২৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 755 - 762
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘কল্লোল’ ও ত্রৈমাসিক ‘পরিচয়’ : একটি তুলনামূলক আলোচনা

মইজুদ্দিন মোল্লা
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
Email ID : mmoijuddinmolla@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
age of disturbance, Ivan Sergeevich Turge nev, Knut Hamsun, Rabindranath Tagore, Buddhadev Basu, Premendra Mitra,

Abstract
'Parichoy' was born when 'Kallol' was seven years old. Although 'Kallol' only had a life span of seven years, 'Kallol' stopped at the very beginning of 'Parichoy's' journey, but even then 'Prichoy' had to fight. It had to fight not with 'Kallol'; with the 'Kallol era'. This is a source of pride for 'Prichoy', and a victory for 'Parichoy'. In building their era of friendship, in their changing mentality, that is, in the land of faith. This article discusses 'Kallol' and 'Parichoy' newspapers in a comparative manner. In particular, the subject of this article is to outline how the mentality of both magazine shaped each other's course.

Discussion

> “সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তির আভাস দেওয়া হয়, তাহলে দুঃখ-দারিদ্ররূপ যে কোনো অবস্থার বর্ণনাতেই সাহিত্যসৃষ্টি হবে না। তবে যদি দারিদ্য কিংবা অন্য কোনো রিপুর তাড়নায় মানুষ কী রকম ব্যবহার করে দেখানোই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ব্যক্তির কোনো ধার না রাখলেও চলে।”[১]

মানে, আংশিক নয়, চরিত্রকে হতে হবে সম্পূর্ণ। কোনো ব্যক্তিই যেহেতু একটিমাত্র ঘটনার সাক্ষী নয়, তার অনিকেত জীবনে বহু ঘটনার সম্মিলিত উপহাস কতটা নির্মাণের কাজ করেছে তার হিসেব না থাকলে ঠিক ‘concrete’ উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। কেননা, -

> “সত্যকার নভেলের গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিৎ নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে।”[২]

আর থাকবে বলেই পরিচয়ের লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি কল্লোলের পীত ব্যথা হতে পারে। ‘কল্লোলের’ অপ্রশান্তির জল-কলরোলের শেষ ঘাট ‘পরিচয়ের’ শান্ত অবকাশ এই কথাটি যেমন ‘পরিচয়’ বুঝে গিয়েছিল তেমনি বুঝে গিয়েছিল ‘কল্লোল’ নিজেও। একদিকে ব্যর্থতার ঊষর পদচিহ্ন অন্যদিকে আশার বিস্তীর্ণ চোখ, একদিকে বিরুদ্ধতার গদ্য, আর একদিকে ভাববিলাসের নিমীলিত অতলতা এই দ্বিবিধ টান ‘কল্লোল’কে যেমন দিয়েছিল আবেগসর্বস্ব ‘কল্লোল যুগের’ শিরোপা, তেমনি ‘পরিচয়’কে দিয়েছিল বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের পরিচয়। এবং যেহেতু “কল্লোলের সাধনাই ছিল নবীনতার,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে, এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি,"[৩] 'নুট হামসুনের সঙ্গে গোর্কি'কে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা, তাই জীবনাশ্রিত বাস্তবতা ও বোহেমীয় রোমান্টিকতা থেকে সরে গিয়ে 'সবুজ পত্র' যে মননঋদ্ধ স্বচ্ছদৃষ্টির পালা এনেছিল ঘটাতে হবে তারই অনুবর্তন এই ভাবনায় ভাবতে 'পরিচয়'এর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কেননা, বিদ্রোহ জীবনে ও সাহিত্যে দুই ক্ষেত্রেই সত্য, কিন্তু মৈত্রীভাবের পরিচয়ই পারে সমস্ত অবজ্ঞাকে তুচ্ছ করে দিতে। তাই 'রবীন্দ্র-উত্তর' যুগ প্রবর্তনের চেষ্টায় নয়, রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে হাঁটা। কালব্যপ্তিতে না হোক, গভীরতায় দূরবিস্তারী হবে। উদ্দেশ্য হবে, 'প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর বহাইয়া দেওয়া'। আর এজন্যই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যেখানে লিখেছিলেন, -

> "কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[৪]

সেখানে 'পরিচয়'এর প্রথম সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন, "ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাহাদের উপর - বাংলা ভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসব সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ"। কল্লোলের সঙ্গে পরিচয়ের মনান্তর এখানেই, কল্লোলের তরুণ জীবনে অনিশ্চয়তার পটভূমি আর পরিচয়ে তিরিশ উত্তীর্ণ প্রবীণের মৌন গভীর প্রশান্তি। তাদের মধ্যে দূরত্ব কেবল দশকের নয়, তারা বিমুখ অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্যে। যদিও কল্লোলের সমাপ্তিতেই পরিচয়ের সূচনা।

ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখবো কল্লোলের জন্ম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক (১৯২৩-৩০) আর 'পরিচয়' তার ত্রৈমাসিক সংখ্যার প্রথম জন্ম দিচ্ছে তৃতীয় দশকের প্রথম সিঁড়ি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। শেষ হচ্ছে ১৯৩৬-তে গিয়ে। তাদের দুটিরই জন্মকাল 'age of disturbance' - এ, একটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল আর একটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষ্য। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই মার্ক্সবাদ, ফ্রয়েডবাদ, লরেন্সের সেক্স ও ইডিপাস তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে লেডি চ্যাটার্লির সংস্কারমুক্তির টান 'কল্লোল'কে যতটা টান মেরেছিল ততটা 'পরিচয়'কে নয়; কেননা, পরিচয়ের আর কিছু থাক বা না থাক, ক্লুট হামসুনের ক্ষুধা ছিল না। দীনেশরঞ্জনের অনুজা নিরুপমা দেবী তাই জানাচ্ছেন, -

> "না খেতে পাওয়া একদল ছোকরা সাহিত্যিক কল্লোলকে ঘিরে থাকতো। সকলেই প্রায় ছাত্র। কারও এক পয়সা উপার্জন নেই। অনেকেই অভুক্ত আসতেন।"[৫]

আর পরিচয়ের আড্ডার কথা বলতে গিয়ে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ লিখছেন, -

> "তারপর চা - সঙ্গে যথারীতি অতি পরিপাটি জলযোগ।"[৬]

কল্লোলের অফিস ছিল মধ্যকলকাতায় দশের দুই পটুয়াটোলা লেনে সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাসের মধ্যম ভাইয়ের ভাড়াবাড়ির বৈঠকখানায়। ত্রৈমাসিক পরিচয়ের অফিস ছিল উত্তর কলকাতায় একশ' উনচল্লিশ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে - হাতিবাগানে বিখ্যাত দত্তভবনে - অ্যাটার্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সুসজ্জিত বৈঠকখানায়। গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন, সুনীতিদেবী, মনীন্দ্রলাল বসু, সতীপ্রসাদ সেন, সুধীরকুমার চৌধুরীর সমন্বিত আয়োজনে প্রকাশিত হল কল্লোলের প্রথম সংখ্যা (সময় ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ১লা বৈশাখ)। মূলধন দাঁড়ালো সাড়ে তিন টাকা আর তারুণ্যের বিপুল আত্মবিশ্বাস। ছাপা হল মানিকতলার প্রেস থেকে। প্রথম তিন বছর ডিমাই সাইজের পনেরো ফর্মা, চতুর্থ বছর (বৈশাখ, ১৩৩৩) থেকে ডবল ক্রাউনে। মূল্য নির্ধারিত হল প্রথমে চার আনা, পরে পাঁচ আনা। ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা। যাত্রা শুরু গল্প-মাসিক হিসেবে। তারপর কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ আর ব্যঙ্গচিত্র। রঙিন ছবি না ছাপার সংকল্পেও ঘটে মতান্তর, মুদ্রিত হয় ১৩৩১ থেকে ১৩৩৬ এর শেষ সংখ্যা পর্যন্ত।

'কল্লোল'-এর এই অনাড়ম্বর বিদ্রোহ 'পরিচয়'-এ ছিল না। অক্সফোর্ড ফেরত সুরাবর্দি, কিরণ মুখোপাধ্যায়ের মতো অপূর্ব চন্দ, হীরেন মুখোপাধ্যায়, তুলসী গোঁসাই, সুশোভন সরকার, হুমায়ুন কবীর প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকের চালচুলোহীন দারিদ্র্য থেকে যোজন যোজন দূরত্বে বাস। গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ফ্রান্স থেকে কীর্তিমান হয়ে ফিরেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তরুণ বয়সেই নামকরা বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চারুচন্দ্র দত্ত অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান আর সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ধনী অ্যাটার্নী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমেরিকা ভ্রমণান্তে ফিরেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃতি অধ্যাপক, নানাবিদ্যায় পারঙ্গম। আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হামফ্রে হাউস, স্টেটম্যান-এর সহ-সম্পাদক ম্যালকম ম্যাগাবিজ, মজিদ রহিম আই সি এস, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত। পরিচয়ের জন্মকথা বলতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথের অনুজ হরীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

> "নানা কারণে সুধীন্দ্রনাথ স্থির করলেন যে একটি পত্রিকা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করবেন। তাঁর কনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তখন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শহীদ সুরাবর্দি প্রভৃতি সকলেই খুব উৎসাহী ছিলেন। মনস্থির করে তিনি আমাকে জানালেন যে, আয়োজন ঠিক হয়েছে, তুমি কিছু টাকা জোগাড় করে দাও। আমরাও তখন সাহিত্যমণ্ডলে বাস করছি। সবিশেষ উৎসাহিত বোধ করলুম। তাছাড়া দাদা বলছেন। অন্যচিন্তা না করে নিজের কাছে যা ছিল তা থেকে আড়াই শো টাকা দিলুম। পঞ্চাশ গ্রাহক করে অগ্রিম দু'শো টাকা বড়দাকে দিলুম। বাবার কাছে চাইতে উনিও দুশো টাকা বড়দাকে দিলেন। এমনি করে সাড়ে ছ'শো টাকা যোগাড় হল। বড়দার কাছেও কিছু টাকা ছিল। সব মিলিয়ে আশা হল যে ভদ্রভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে।... পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ১৫৪। দাম প্রতি সংখ্যা ১ বার্ষিক ৪|। ত্রৈমাসিক পত্ররূপে বাংলা ১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' প্রকাশিত হল।"[৭]

পরিচয়ের আড্ডার উদ্দেশ্য ছিল কাজ; 'রচনা নির্বাচন', 'রচনা সংগ্রহের ব্যবস্থা' আর 'বিবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ'। বুদ্ধির বিস্ময়ে হৃদয়কে সঞ্চয় করা। তাদের আপ্যায়ন বৈভবের সীমানা ছুঁয়ে। আর কল্লোলের আড্ডা ছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কথ্যভাষার সমতুল সাংবাদিক সুলভ ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর কখনো জটিল দুরূহ বিষয় উপস্থাপনে। একদিকে দীনেশরঞ্জনের উত্তপ্ত বন্ধুত্বের সান্নিধ্য, অন্যদিকে গোকুলচন্দ্রের নিরাসক্ত - আত্মলীন ভাবুকতার স্পর্শ এই দুই এর মধ্যে নিজেদের টুর্গেনিভ চরিত্রকে চুপটি করে বসিয়ে রাখা।

'কল্লোল'-এর সামনে ছিল 'বঙ্গদর্শন', 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'সবুজ পত্র'-এর নিপুন সাজানো বিদ্রোহ, ছিল 'প্রবাসী', 'অর্চনা', 'ভারতবর্ষ', 'নারায়ণ', 'বিজলী', 'বঙ্গবাসী', 'আত্মশক্তি', 'ধুককেতু'র মতো কতগুলো পত্রিকার নব্যরুচির সবুজ হাওয়া, সাহসিক দৃষ্টির দিশাসন্ধান। 'সবুজ পত্রে'র ধর্ম জানাতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী যেমন লিখলেন, -

> "পাতা কখনো তার কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো। তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরতা করবেই। কেবলমাত্র ভক্তির শান্তজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সবুজ পত্র এই যৌবনের অর্চনা করবে, এই আশাতেই এই সাহিত্যপত্রের প্রবর্তনা।"[৮]

তেমনটা কল্লোল করলেন না। এখানেই তাদের প্রথম বিদ্রোহ। তাদের সংকল্প ধরা পড়লো কবিতায়, প্রচ্ছদের নির্জন সমারোহে। সঙ্গত সম্মান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা 'কল্লোল'-এ দীনেশরঞ্জন দাস লিখলেন, -

> "আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন,
> অজানা জানার নয়নের বারি
> নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
> পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরি আমি নিশিদিন।
> ... ...
> আশা আছে তবু যদি কোনদিন শতশত যুগ পরে
> বধির শিলার ফেটে যায় বুক
> গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
> জলকল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাত্রির সংঘর্ষ আর বিচ্ছিন্ন দুঃখের বিস্তৃত গতি এটুকুই কল্লোলের সম্মান। নিবিড় স্বর্গ পাওয়ার প্রত্যাশা আছে কিন্তু প্রাপ্তি নেই, এই বেদনাই তাদের অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকেও করে দিয়েছে 'অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ'। বুদ্ধদেব বসু তাই লিখছেন, -

> "যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ,"[৯]

কেননা, রবীন্দ্ররচনার বিষয়বস্তু বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্যও নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে; এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভরে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন। বস্তুত, কোনো কৃত্রিমতা নয়, সহজকে 'সহজ' করে লেখাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এবং যেহেতু সমাপ্তি বলে কিছু নেই তাই অতৃপ্তিও নেই, "আনন্দদ্ধের খল্পবিমণি ভূতানী আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"। ঔপনিষদিক এই শান্তি আর মিস্টিসিজমের সুখ রবীন্দ্রে নিমজ্জিত কবিদের তৃপ্তি দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রপারে দাঁড়ানো কবিদের শান্তি দেয়নি। কারণ তারা ন্যাচারিলজমের যাত্রায় প্রত্যক্ষ করছেন আধ্যাত্মিকতার উল্টোদিক। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই কল্লোলের বিশ্বাসভূমি তৈরিই হয়েছিল এই শ্রদ্ধা নিবিড় দূরত্বকে নিয়ে-

> "অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্ত এলাকায়।"[১০]

স্থির গন্তব্য নেই, স্থির সংকল্প নেই, যাযাবরীয় জীবনে ঠোঁটকাঁপা আর্ত প্রতিবাদ। তাই প্রথম মলাটে সমুদ্রতীরে বসে আছে এক নিঃসঙ্গ যুবক - দূরে উত্তাল তরঙ্গমালা। দ্বিতীয় মলাটে সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়ছে তীরবর্তী মন্দিরে। তৃতীয়তে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপরে তাণ্ডব নৃত্যরত নটরাজ শিব। চতুর্থতে শুভ্র ফেনায়িত বিশাল সমুদ্র - এপারে দুটি তাল গাছ, ওপার নীলদিগন্তে বিলীন। আর পঞ্চমে সাগরের একটি ঊর্মি, উপরে লেখা 'কল্লোল'। বিচ্ছিন্ন কল্পনাবিলাসী যুবকের আত্ম-অতিক্রমণের আর্তি এই প্রথম ছবিটি, দ্বিতীয়টি যা প্রাচীন, যা অচল, যা স্থিতিশীল তারই বিরুদ্ধ-বিদ্রোহের, তৃতীয়টি ভাঙণের, সংগ্রাম আহ্ববানের, চতুর্থটি কবিতা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার আর পঞ্চমটি বন্ধনহারা তারুণ্যের অপ্রতিহত গতির। তাদের সুখ এখানেই তারা নিজের কথা শোনেন, তাদের দুঃখ এখানেই তারা কেবলই নিজেরই কথা শোনেন।

'পরিচয়'-এর এই কথা শোনা 'কল্লোল'-এর মতো নয়, তাদের বেঁচে থাকা স্বর্ণিল প্রাণনায়, চিন্তার সূক্ষ্মতায়। প্রকাশের চারুতা কিংবা মত প্রকাশের নির্দ্বিধ সাহসিকতায় হাঁটতে হাঁটতে যুক্তির মূর্তায়ন। কেননা, পরিচয়ের অঙ্কুর কল্লোলের ফোর আর্টস ক্লাবে নয়, পরিচয়ের অঙ্কুর 'সোভিয়েত অ্যাঁদো-ল্যাঁতাঁ'য়, সোসাইটি ইন্দো-লাটিনে। গিরিজাপতি, নীরেন্দ্রনাথ রায় দাঁড়ালেন মুখ্য হয়ে। ফলত, স্বাভাবিভাবেই সুধীন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় উঠে এল ফরাসি ভাষা-সাহিত্য-শিল্পকলা-চর্চা। আধুনিক ও প্রাচীন ভাবগঙ্গায় মানস-নিমজ্জন আর দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি-প্রবাহ। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদনায় তাই সুধীন্দ্রনাথ কৈফিয়তের শব্দসজ্জায় লিখলেন, - 'এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ ভাষা সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত ও পরিশীলন সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণচিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ'। অথবা, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মুলভাষার অনুকরণে আলোচনা করিয়া কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে"। মানে, নির্বাসনের দীর্ঘশ্বাস নয়, পরিচয় বুঝেছিল জগতের বন্ধন সমাজবদ্ধ মানুষকে জগৎ অস্তিত্বের মাধ্যমে স্ব-অস্তিত্বকে খুঁজে নিতে দেয় না এ কথা সত্য। যদিও আত্ম-স্বাধীনতা সে পথ প্রশস্ত করতে পারে কিন্তু তাতে জগৎ অস্তিত্বের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য। বাস্তব জগৎ ও স্ব-অস্তিত্বকে অতিক্রম করে অস্তিত্বের স্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। নয় বলেই জীবন হতাশায় বিড়ম্বিত। আর বিড়ম্বিত বলেই চাই সম্বন্ধযুক্ত অস্তিত্বের প্রণয়ী সম্মান।

'কল্লোল' প্রকাশের কয়েক বছর আগে ও পরে বাংলার নব প্রজন্ম দু'জন নায়ককে পেয়েছিল। প্রথমজন শ্রীকান্ত শর্মা ('শ্রীকান্ত', ১৯১৭-৩৩) আর দ্বিতীয়জন অমিত রায় ('শেষের কবিতা', ১৯২৯)। একজন হত - আশ, উদ্দেশ্যহীন, অকালপৌঢ়, অন্যজন সিনিক, বিশ্বাসরিক্ত, কর্মহীন, স্টাইলসর্বস্ব বাচাল। গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক', দীনেশরঞ্জন দাশের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'দীপক', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', 'বিবাহের চেয়ে বড়', 'কাকজ্যোৎস্না', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া', 'ধূসর গোধূলী', 'যে দিন ফুটল কমল' প্রভৃতি উপন্যাসের চরিত্ররা যে তাদেরই জ্ঞাতি তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, কল্লোল অমূলতরু নয়, বিচ্ছিন্নস্রোতও নয় কল্লোলের জোয়ার।

> "বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করতে হলে একথা বলতেই হবে যে কল্লোল থেকে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার এলেও, তার পূর্বাভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব রূপে যখন প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তখনই কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম এবং কথাসাহিত্যে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নতুন পথ খোঁজার প্রয়াসে কলম ধরেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে দেখি তারই পরবর্তী সেকসান।"[১১]

পরিচয়ের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। তাদের চরিত্র নির্মাণের চেয়ে দৃষ্টি পড়েছিল বেশি প্রবন্ধের বস্তুনিষ্ঠতায়। বুঝেছিল, অনুজ পত্রিকা 'প্রবাসী' আর 'বিচিত্রা'র কৌলীন্য না থাকলেও সংগ্রহের বৈদগ্ধ্য ছিল; প্রবাসীর অনুশ্চার্য শরৎচন্দ্র আর ভারতবর্ষের অনুপস্থিত রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে 'সবুজ পত্র', 'ভারতী' এমনকি কল্লোলের সদ্যোজাত লেখককে একই ছত্রে মিলিয়েছিল যে পত্রিকা, সেই 'বিচিত্রা'র সম্মিলিত সংলাপ তাদেরকেও আওড়াতে হবে। কেননা, বিদ্রোহের উল্লাস নিয়ে আর যাই হোক সাহিত্য হয় না, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে রুচি, বিচারবুদ্ধি আর চিন্তার শৃঙ্খলা। পরিচয়কে তাই নতুন পথ খুঁজতে হয়নি, কল্লোল নতুন পথ তৈরি করে বুঝিয়ে দিয়েছিল পরিচয়কে হাঁটতে হবে চেনাপথেই আবার নতুন করে। আর এখানেই ঘটেছিল ব্যাধি; লেখকরা যতটা না শিল্পী হয়ে থাকলেন, তার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ালেন ব্যাখ্যাতার ভূমিকায়।

কল্লোলের সাত বছরের আয়ু প্রবন্ধের চেয়ে গল্প কবিতা উপন্যাসেই সেজেছে বেশি। প্রথম বর্ষ প্রবন্ধ ছাড়াই। দ্বিতীয় বর্ষ মাত্র তিনটি। তৃতীয় বর্ষ থেকে বছরে গড়ে সতেরোটি। সঙ্গে কিছু গাথা, কথিকা, নাটিকা, স্মৃতিতর্পণ, সাহিত্যতত্ত্ব ও অনুবাদ। পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী কবিতা ৩০৭টি, গল্প ৩৫২, উপন্যাস ১১, প্রবন্ধ ৯০ আর অন্যান্য ৯টি। মোট ৭৭২। প্রথমবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াই। পরবর্তী বছরগুলিতে ছাপা হয় আটটি কবিতা ও একটি চিঠি। আশ্চর্য মিল এখানেই পরিচয়েও প্রথম সংখ্যার সূচিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর যুক্তকরণ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চিঠি পাওয়ার পর, "আমার চিন্তামেঘ এখন রিক্তবর্ষণ নইলে তোমাদের পূত হাওয়ার টানে আসরে নামতুম"। রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ বছরে বাইশ। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' উপন্যাসের সমালোচনা, শেলির কবিতার অনুবাদ। এরপর একে একে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত', 'আধুনিক কাব্য', 'ছন্দ বিতর্ক', 'নব ছন্দ', 'চিহ্ন বিভ্রাট', 'কালান্তর', 'সাহিত্যের মাত্রা', 'রিয়ালিস্ট' আর দশটি সংখ্যায় 'কবিতাগুচ্ছ'। রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসে পাওয়ার বিজয়ী উল্লাসে হিরণকুমার সান্যাল লিখছেন,
-

> "পরিচয়ের আসরে তাঁকে নিমন্ত্রণ করার মতন সাহস আমাদের হয়নি, কিন্তু গিরিজাবাবু, ধূর্জটিবাবু (কলকাতায় থাকলে) সুধীন ও আমি কবির সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ করেছি, ও হাত না পেতেই পরিচয়-এর জন্য রচনা উপহার পেয়েছি।"[১২]

কিন্তু কল্লোল যে স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত ঝড় তুলেছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল মৈত্রী মনান্তরে। কবিতা লিখলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শিরোনাম দিলেন 'অহংকার';

"সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো।
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।"

যদিও রবীন্দ্রবিরোধিতার সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীর তুলেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মত কয়েকজন যাঁদের অভিযোগে মিশে ছিল অশ্লীলতা, অস্পষ্টতা ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবাস্তবতার যুক্তি। ‘কল্লোল’ প্রথম সমর-উত্তর গোষ্ঠী। প্রবীনদের বিরোধিতার মূলে ছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে সংশয়, তাঁদের লক্ষ্য ছিল তাঁর কাব্য-উপন্যাসে দোষত্রুটির সন্ধান। নবীনদের বিরোধিতা ছিল আরো গভীরে- দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ, জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের প্রশ্নেই আপত্তি। তাঁর সৌন্দর্যবোধ, আস্তিক্যবোধ, কল্যাণ-পরিণামী জীবনাদর্শ, সুষমা ও সামঞ্জস্যের বিশ্বাস অপাঙ্ক্তেও। বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, -

> “তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হল তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।”[১৩]

যদিও কল্লোলের এই ধারণা ভাঙতে বেশি দেরি হয়নি।

> “সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ - তখনকার সাহিত্যে শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ।”[১৪]

এই সংকল্প নিয়ে ‘কল্লোল’ প্রকাশিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঔদ্ধত্য ও চাপল্যকে ক্ষমা করেছিলেন। আশীর্বাদ দিয়ে কবিতা পাঠিয়েছিলেন কল্লোলের তৃতীয় বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় -

“যেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত
আমার পরাণ হিব্র কিংশুকের রোমাঞ্চলাঞ্ছিত
সেদিন আমার মুক্তি, সেই দিন হে চির-বাঞ্ছিত
তোমার লীলায় মোর লীলা
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতবঙ্গে তালে তালে মিলা।”

কিন্তু দুঃখের বিষয় নতুন রাস্তায় এসে পরিচিত মুখ দেখার এই আবেগটাকে কল্লোল সেদিন বুঝতে পারেনি। বুঝতে পেরেছিল প্রায় একযুগ পরে ‘শেষের কবিতা’ পাঠের নির্জনতায়। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিল ‘সাহিত্যধর্ম’, ‘সাহিত্যে নবত্ব’ কিংবা ‘সাহিত্যের পথে’র মত কতগুলো প্রবন্ধ যেখানে আধুনিকতা ও কল্লোলকে ধরা যায় দুটি শব্দবন্ধে- ‘লালসার অসংযম’ ও ‘দারিদ্র্যের আস্ফালন-’। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য কোনো অংশেই ভুল হয়নি। গোকুলচন্দ্র নাগের ‘পথিক’ যতটা বুদ্ধিমার্জিত চেতনার নিকষে সদসৎ ও সুন্দর-কুৎসিতের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করেছে ঠিক ততটাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘বেদে’ দেখিয়েছে জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্যপিষ্ট, বিক্ষোভক্ষুব্ধ মিথুনাসক্তির প্রাবল্য। হামসুন, হ্যাভলক এলিসের চরিত্র যেন। যেন ফীলডিং-এর ‘টমজোনস’ উপন্যাসের টম জোন্স এই কাঞ্চন কৈশোর। প্রবোধকুমার সান্যালের ‘যাযাবর’ হোক বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পাঁক’, শৈলজানন্দের ‘ষোলোআনা’ হোক বা জগদীশ গুপ্তের ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ প্রত্যেকটিতেই যৌবনের প্রাণোদ্দীপনা, সজীবতা ও তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য। প্রত্যেকটির সঙ্গেই ফ্লবেয়ার, জোলা, ইবসেন, গোগল, চেখভ, ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক, জোহান বোয়ার, জাসিন্তো বেনাভান্তের হৃদ্যতার যোগ। বুদ্ধদেব বসুর ‘সাড়া’, ‘যেদিন ফুটলো কমল’, ‘একদা তুমি প্রিয়ে’, ‘ধূসর গোধূলী’, ‘বাসর ঘর’ও এদের থেকে সরে নেই; হতে পারে প্রেমই সেখানে মুখ্য, কিন্তু প্রেমের বিলাস, লীলামাধুর্য, স্বপ্নসৌরভ, নিবিড় রহস্যমেদুরতা কল্লোলেরই ঘোষিত গৌরব। গল্পের ক্ষেত্রেও খাটে একই বিশেষণ। তাদের চরিত্র মণীশ ঘটকের চরিত্রের মতোই সমাজের ‘তলানি’, ‘কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমার। তাদের এই বিকৃত জীবনের কারখানা বহুদূরবর্তী কোনো অঞ্চল নয়, কলকাতা শহরেরই বুকের উপর থমকে থাকা ‘পটলডাঙা’। কবিতার ভাষায়,

“মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত হতভাগাদের ভীড়;
মাল ব’য়ে ব’য়ে ঘাল হ’ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়"। (বেনামী বন্দর, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

গঠনের দিক থেকে কল্লোলের ছিল পাঁচটি ফিচার- নির্বাচিত লেখার জন্য 'সংগ্রহ', পুস্তক-পত্রিকা বা নাট্য আলোচনার জন্য 'আলোচনা', সটীক দেশ বিদেশের সংবাদের জন্য 'সমাচার', মুদ্রিত রচনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'পরিচয় লিপি' আর চিত্রধর্মী বর্ণনা বা অলঙ্করণের জন্য 'ছবি'। দু বছরের এই পাঁচটি ফিচারকে তৃতীয় বর্ষে পুরে দেওয়া হল একটি নতুন বিভাগে, তার নাম 'ডাকঘর'। ষষ্ঠ বর্ষে আবার 'ডাকঘর'-এর বদলে আনা হল 'প্রবাহ' আর 'কাহিনী'। 'প্রবাহ'-এ থাকতো 'ডাকঘর'-এর বিপুল ভার, আর 'কাহিনী'তে থাকতো দেশ বিদেশের সাহিত্যচিন্তা, সাহিত্যিক পরিচয়।

ত্রৈমাসিক পরিচয়ও ফিচারের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু তার পাঁচ বছরের আয়ুতে (১৯৩১-৩৬) যেটির ভার সবচেয়ে বেশি বাড়িয়েছিল সেটি প্রবন্ধ। যদিও কবিতার সংখ্যা প্রবন্ধের চেয়ে ১২টি বেশিই ছিল তবুও ৯৫টি প্রবন্ধের যে গাম্ভীর্য পরিচয় দেখিয়েছিল তাতে চল্লিশের দশকের বাংলা সাহিত্য পেয়েছিল প্রার্থিত জীবনীশক্তি। বাংলা ছন্দ থেকে শুরু করে কাব্যে আধুনিকতা, কাব্যরীতি, কাব্যতত্ত্ব, মার্ক্সবাদ কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। বাদ পড়েনি রুশ বিপ্লব, বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা। আধুনিক অর্থনীতি, সংখ্যাশাস্ত্রের মতো কান্টের বিজ্ঞানবাদ, সিলভ্যা লেভির প্রাচ্যবাদ, কিংবা হোয়াইটহেডের দর্শন সমস্ত কিছুই জায়গা করে নিয়েছিল অকপটে। লিখতেন, সুধীন্দ্রনাথ (ঐতিহ্য ও টি. এস এলিয়ট), রবীন্দ্রনাথ, সুশোভন সরকার (রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা, রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত, সোস্যালিজমের মূলসূত্র, মাঞ্চুকুয়ো, জার্মানির দুরবস্থা, আন্তর্জাতিক সংকট, ফ্রাশিসমো প্রভৃতি), প্রিয়রঞ্জন সেন (বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া), গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (সমষ্টি-বিজ্ঞান ও বসুর সমষ্টিগণিত), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (বিবাহ বিধি), প্রবোধচন্দ্র বাগচী (স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, মিলভ্যাঁ লেভি), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ইতিহাস), আবু সয়ীদ আয়ুব (বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি, সুন্দর ও বাস্তব, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন, সৌন্দর্যের মূল্য কি স্বাশ্রয়ী), বটকৃষ্ণ ঘোষ (ভাব ও ভাষা, শব্দ ও অর্থ), হুমায়ুন কবীর (ইমানুয়েল কান্ট, কান্ট ও বিজ্ঞানবাদ)-এর মতো অভিজ্ঞতার নিয়মী বিন্যাসে দক্ষ কয়েকজন প্রাবন্ধিক যাঁদের উপজীব্যই ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভারতীয় দর্শন। যেখানেই যুক্তির ফাটল দেখেছেন সেখানেই টেনেছেন বিদ্রোহ। বিদ্রোহ তাঁদের সবচেয়ে বেশি গ্রন্থসমালোচনায়।

ফলত, স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্রতিভ এই অস্তিত্বের গাঢ় জাগরণে থেকে কবিতা বিভাগে অন্নদাশঙ্কর রায় যে সাহজিক স্বস্তির প্রত্যয় নিয়ে লিখেছিলেন "আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি এতক্ষণে হল উদ্দামতার ক্ষান্তি" (সমাপ্তি) সেই মৌন গভীর শান্তির চত্বরে বুদ্ধদেব বসু কল্লোল থেকে হেলেনের 'বুকের সোনার বাটি'র খোঁজে এলে যেভাবে প্রত্যাখ্যাত হন তাতে তিনি বুঝেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, হুমায়ুন কবীর, অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ যেখানে স্থির হয়ে বসে আছেন সেখানে না থাকাই ভালো। কেননা, পরিচয়ের এই মনন-পরিমণ্ডলে দেহকামনার দহনজ্বালা আর যাই হোক বড্ড বেমানান। 'কল্লোল'-এর উদ্দাম কলরোলের শান্তিও পরিচয়ের মতোই রবীন্দ্রকাব্য-শান্তিতীর্থে আত্মসমর্পণে।

বস্তুত, সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের যে পরিচয় ছিল তা তর্কবুদ্ধি ও যুক্তির উপর ভর করেই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, -

> "পরিচয়ের স্টাণ্ডার্ড আমাদের সম্মিলিত স্টাণ্ডার্ড, কিন্তু তার মধ্যে সুধীনের সবচেয়ে উঁচু ও যুক্তিসাপেক্ষ ছিল বলেই সেই সম্মিলিত স্টান্ডার্ড ছিল উর্ধ্বমুখী।"[১৫]

একটি সুতোয় সকলকে বেঁধে রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর। কল্লোলের সঙ্গে পরিচয়ের সুতো-ছেঁড়ার সম্পর্ক এখানেও ছিল। পরিচয়ের জন্ম ও লালন যেখানে সম্পাদকের হাতেই অর্পিত ছিল, সেখানে কল্লোলের বেড়ে ওঠা ছিল প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের হাতে নয়, তার লেখকদেরই নির্বন্ধগুণে।

> "দীনেশরঞ্জন বের করেছিলেন গল্পের পত্রিকা, যার সিকি সচিত্র বিজ্ঞাপন দেখা যেতো কিন্তু তার রূপান্তর ঘটলো গোকুলচন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমারের সংযোগে, তারপর নবযুবক লেখকেরাই 'কল্লোল'কে দখল করে নিলো, দীনেশরঞ্জন স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। সেই অভ্যর্থনার উষ্ণতায় তাঁর কৃতিত্ব, বন্ধুতার প্রতিভায় তাঁর গৌরব।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কল্লোলের জয় এখানেই। হাতফেরির এই বিনীত সমর্পণ ত্রৈমাসিক পরিচয়ে ছিল না কখনো। যদিও কল্লোলের আন্দোলনটা এসেছিল বাইরে থেকে, মার্ক্সবাদ থেকে অস্তিবাদের সীমান্তে এসে শেষাবধি সনাতনী শিবিরে নিশ্বাস ফেলতে হয়েছিল, তবুও তার টান যেহেতু দেশজ অনুরাগের, তার সাহিত্যও তাই দেশীয় হৃদ্যতার, বেঁচে থাকার আয়ু তার দীর্ঘকালের। সাড়ে তিন টাকার মুঠো নিয়ে হাঁটার যে গন্তব্য তার নাম 'কল্লোল' পত্রিকা নয়, কল্লোলযুগ' এটাই তার আত্মলীন পরিচয়ের ব্যাপ্ত অহংকার। অথচ কল্লোলের নৌকা ভীড়েছিল যে পরিচয়ের ঘাটে সেই পরিচয়ের পরিচিতি দাঁড়িয়েছিল বৈদেশিক চিন্তার আলোচনার প্রাচুর্য ও দক্ষতায়। তাঁদের আগ্রহ যতটা বিশ্বমনস্ক হবার, ততটা দেশজ হবার দিকে নয়। আর নয় বলেই তাঁরা ছিলেন স্বদেশে ছিন্নমূল। স্বদেশের চিত্তভূমি থেকে একঘরে। যতটা না সাহিত্যিক তার চেয়ে অধিক আইডিয়ার ব্যবসায়ী; এখানেই তাঁদের নিজেদের প্রতি নিজেদের প্রতারণা।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যে তিনিখানি ভাল বই, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১, দে'জ পাবলিসার্স, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৭, পৃ. ২৫০

২. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্তঃশীলা, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৩৪

৩. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোলযুগ, ডি.এম লাইব্রেরি, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ১০৪

৪. রায়, এস. এন. (সম্পাদিত), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ২৮০

৫. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, দে' জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ৭০

৬. সান্যাল, হিরণকুমার, পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৩১

৭. দত্ত, হরীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়-এর প্রকাশ, উত্তরসূরী, নববর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সবুজপত্র, কল্লোল : রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রচর্চা, ১৯৬১, পৃ. ৭২

৯. দে, সুধাংশুশেখর, (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, দে' জ পাবলিশিং, প্রথম দে' জ সংস্করণ, মাঘ ১৩৬৩, পৃ. ৮২

১০. সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, কল্লোলযুগ, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ৮৩

১১. সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের কাল, উত্তরসূরী, নববর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৬৯, পৃ. ৪৫

১২. সান্যাল, হিরণকুমার, পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, ঈদ ১৯৭৮, পৃ. ১১

১৩. দে, সুধাংশুশেখর, (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, মাঘ ১৩৬৩, পৃ. ৮৩

১৪. সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, কল্লোলযুগ, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ১০৬

১৫. সান্যাল, হিরণকুমার, পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, পরিশিষ্ট অংশ।

১৬. বসু, বুদ্ধদেব, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, সাহিত্যপত্র, ১৯৫৭, পৃ. ৩৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 763 - 771
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের ভ্রমণ সাহিত্যে বাঙালি নারীর স্বদেশ চেতনা : প্রসঙ্গে ‘ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা’

ড. সান্ত্বনা দেওঘরিয়া
Email ID : santanabzr@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Renaissance, abroad, impact, consciousness, travelling atrocities, oriental, travel - literature, emerged, patriotism.

Abstract
The 19th century was the period of Renaissance. It had brought about a great impact on Bengali literature and society under the influence of Western education. Rammohan Roy, Vidyasagar and others were the forerunners of this change. Renaissance spirit awakened a new consciousness in the minds of the Bengalee sin the 19th century. Travelling to abroad in the 19th century was an adventure. At that time, many obstacles had to be overcome to travel abroad. When Ram Mohan Roy, Dwarakanth Thakur went to England, the society was steeped in superstition. Ignoring many obstacles, they had to go abroad. Later many had to endure different social atrocities for going abroad. They used to be motivated by patriotism by travelling abroad. The Bengalees love to travel. Travelling from one end of the country to the other, they try to get to know the way of life of those places in detail. They brought from abroad the oriental way of life and sympathy for the oppressed countries. Travel - literature began to be published as a result of these travelling in the 19th century. Here, the contribution of women as well as men were in no way less. For women's education, women's progress, Krishna Bhavini Das had contributed much. She also made attempts to educate girls, standing by them. She went to England with her husband Devendranath Das, leaving her only child daughter Tilottama. There in 1885, she published ‘Englande Banga Mahila’ under the pseudonym ‘Banga Mahila’. Feelings for homeland of a 19th century Bengalee woman is revealed in the book. In this book, she praised the English people for the liberation and improvement of her country. The discussion about the good and bad of the English nation, customs and policies of it, brought up the sorrows and sufferings of our own country. A deep love for the country has emerged in this book. The book has total twenty chapters. Each chapter has feelings and deep respect for the country. The patriotism of the Bengalee women in the 19th century is really commendable in this book.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

উনিশ শতক হল নবজাগরণের কাল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় নবজাগরণের যে আলো ফুটে উঠেছিল তারই ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যের উত্তরণ ঘটেছিল। তবে যে শুধু সাহিত্যে এমনটা নয়, সমাজেও ব্যাপক পালাবদল ঘটেছিল। এই পালাবদলের প্রধান কাণ্ডারি ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ – ১৮৩৩ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ – ১৮৯১ খ্রি.), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ – ১৮৯৪ খ্রি.), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০৩ খ্রি.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১ – ১৯৪১ খ্রি.) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গ। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষে যখন অরাজকতা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন সেই অরাজকতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এই মহান ব্যক্তিত্বেরা। স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমাজকে নবচেতনার আলোকে উজ্জীবিত করেছিলেন তাঁরা। যার ফলে সমাজের পালাবদল ঘটে। সমাজ, সাহিত্য এক নতুন পথে চালিত হতে থাকে। যার অন্যতম পরিণতি হল দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও ভ্রমণসাহিত্য।

উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে বাঙালির মননে, চিন্তনে এক নবচেতনা জাগ্রত হয়, বাঙালি নবচেতনার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। উনিশ শতকে বিলেত ভ্রমণ করার অর্থই হল এক দুঃসাহসিক কাজ। তখন বিলেত ভ্রমণ করতে গেলে বহু বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করতে হত। ঠিক যেমন রামমোহন রায় (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ – ১৮৩৩ খ্রি.) এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪ – ১৮৪৬ খ্রি.) যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন বাঙালির সমাজজীবনে ছিল কুসংস্কারে নিমজ্জিত। তাকে উপেক্ষা করেই তারা বিলেতে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যারা গিয়েছিলেন তাঁদেরকেও বহু সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। কখনও সমাজ তাঁদের ত্যাজ্য করেছিল কখনও বা পরিবার। এরপর উন্নত ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা অর্জন, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই উনিশ শতকের বাঙালিরা ছুটেছিলেন বিলেতে। সমাজের নানা কুসংস্কার, সমস্ত বাধা পের করেই তাঁদের যেতে হত বিলেতে। যাত্রাপথ ও গন্তব্যস্থলও খুব একটা সুবিধার ছিল না। সাধারণত পদব্রজে, নৌকায়, ঘোড়ার পিঠে গোরুর গাড়ি করে তারা কোনমতে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ করতে পারতেন। এরপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশরা ট্রেন, বাষ্পচালিত স্টিমার, জাহাজ, ট্রাম ইত্যাদির দ্বারা যাতায়াতের পথ, বিশ্রামস্থল এবং দর্শনীয় স্থানগুলির উন্নতি সাধন করে। যার ফলে বাঙালির মধ্যে ভ্রমণের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলে। বাঙালিরা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে কুসংস্কারমুক্ত হয়।

দেশে - বিদেশে ভ্রমণ করে তাঁরা দেশাত্মবোধে আপ্লুত হন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে গিয়ে সেখানকার জীবনধারাকে নিবিড়ভাবে জানার চেষ্টা করে ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি। আর বিদেশ থেকে বহন করে এনেছিলেন পাশ্চাত্য জীবনবোধ এবং পরাধীন দেশের জন্য সহমর্মিতা। উনিশ শতকে বাঙালির এই ভ্রমণের পরিণামে প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক ভ্রমণসাহিত্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১ – ১৯০৫ খ্রি.) 'আত্মজীবনী', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪ – ১৮৮৯ খ্রি.) 'পালামৌ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ – ১৯৪১ খ্রি.) 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী', দুর্গাচরণ রায়ের (১৮৪৭ – ১৮৯৭ খ্রি.) 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রভৃতি ভ্রমণসাহিত্য রচিত হতে থাকে উনিশ শতকে। এই সাহিত্যগুলির মধ্যে আমরা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ভারতের ভ্রমণ চিত্রটি দেখতে পাই। আর সমাজের এই পালাবদলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানও কোন অংশেই কম ছিল না। তবে উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে যে পরিবর্তন তা বঙ্গনারীদের জন্যই। কারণ –

> "উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারীজাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা। প্রায় সব সংস্কারকই নারীর বেদনায় বেদনাদ্র এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা ও নারীর বন্ধন - মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এ সময় বাংলার চিন্তানায়করা নারীকল্যানেই যেন তাঁদের সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। যার প্রকাশ সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ আইনে, কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে।"[১]

পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সাহিত্যরচনায় ছিলেন সমান পারদর্শী।

সমাজের দ্বিতীয় স্তরে ছিল নারীদের অবস্থান। শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত বঞ্চিত ছিল এই দ্বিতীয় স্তরের নারীরা। অন্তঃপুরের রংমহালের মধ্যেই যাদের জীবন ছিল আবদ্ধ। তারপর ব্রিটিশরা যখন ভারতকে অধিকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করল তখন ভারতীয় নারীদের মর্যাদা দাঁড়াল পরাধীন দেশের পরাধীন শ্রেণির। স্বাধীন ভারতেও তারা দ্বিতীয় স্তরের আর ব্রিটিশ ভারতেও তাই। তবে এই ব্রিটিশ রাজত্বেই কিন্তু বাংলার নারীরা নারীমুক্তির ও নারীপ্রগতির স্পন্দন অনুভব করতে থাকেন। সতীদাহ প্রথা রোধ (১৮২৯ খ্রি.), বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬ খ্রি.), বাল্যবিবাহ রোধের চেষ্টা (১৮৯১ খ্রি.) ইত্যাদির দ্বারা নারীর অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটতে দেখা গেল। উনিশ শতকে লক্ষ করা গেল স্বদেশীয় ভাবনা। যেখানে যুক্তিবাদ, স্বদেশপ্রেম বিষয়গুলি প্রধান হয়ে উঠেছে। গদ্য ভাষায় সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় —

> "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রি পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।"[২]

শিক্ষা, সমাজ সবদিক থেকেই এক নতুন চেতনা প্রকাশ পেতে থাকল।

দেখা গেল স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন, নানান স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ঘরোয়া শিক্ষা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ইত্যাদির প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেল। যার ফলে নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। এরপর তারা সেই অন্তঃপুরের রংমহাল থেকে দেশ ও সমাজের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুধু যে শিক্ষার ক্ষেত্রেই তা কিন্তু নয়, নারীমুক্তি ও প্রগতির আলোকে আলোচিত হল উনিশ শতকের বাঙালি নারীসমাজ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীর কলমে যেমন অন্তঃপুরের নারীদের দুঃখ, কষ্টের কথা ফুটে উঠল "তেমনি নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁরা চিন্তা করেছেন, কিভাবে অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা যায় তার জন্য কেউ কেউ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা অসহায় মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সময়ে তাঁদের লেখনি গর্জে উঠেছে।"[৩] যার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪ - ১৯১৯ খ্রি.)।

উনিশ শতকে নারীমুক্তির, নারীপ্রগতির যে দিকগুলি বাংলায় প্রস্ফুটিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল তাদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং ভ্রমণের ফলে তাঁদের ভ্রমণসাহিত্য রচনা। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা 'পথে নারী বিবর্জিতা' এই প্রবাদবাক্যটি তৈরি করে নারীদের অন্তঃপুরে রাখার কৌশল বানিয়েছিলেন। তবে সব পুরুষের মধ্যেই যে এরকম মানসিকতা ছিল একথা বলা যায়না, এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। যাইহোক নারীদের ভ্রমণের জগত ছিল খুবই সীমিত। পিত্রালয়ের বাড়ি বা আত্মীয়ের বাড়ি, পবিত্রতিথিতে গঙ্গাস্নান, মন্দির দর্শন ইত্যাদি ভ্রমণেই বেশি করে লক্ষ করা যেত। নারীর তীর্থস্থান গমনও খুব একটা সহজ ছিল না। পরিবারের কুসংস্কার, নারীর অর্থবল নেই, শরীরের শক্তিতেও তারা ক্ষয়প্রাপ্ত, নারীর তীর্থযাত্রার পথকে সুগম করতে পারেনি। তবে সুযোগ পেলে তারা যেতেন তারকেশ্বর, গঙ্গাসাগর, দেওঘর, কাশী, মথুরা, পুরী এইসমস্ত জায়গা। এই ভ্রমণ পরিধি বাঙালি নারীর ভ্রমণের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় - একথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু উনিশ শতকের শিক্ষার স্পর্শে ঘটল সামাজিক রূপান্তর।

তীর্থযাত্রা বাদ দিয়ে নারীরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই চলেছিলেন দেশ - বিদেশ ভ্রমণে। অবশ্য এক্ষেত্রে নারীকে সাহায্য করতেন পরিবারের প্রগতিশীল পুরুষ সদস্যরা। উনিশ শতকের নারীরা সমাজকে অবজ্ঞা করে, সমাজের লাল চোখকে উপেক্ষা করে ইউরোপে, ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা ভ্রমণ করেছিলেন। উনিশ শতকেই আমরা দেখি অরু দত্ত (১৮৫৪ - ১৮৭৪ খ্রি.) ও তরু দত্ত (১৮৫৬ - ১৮৭৭ খ্রি.) এই দুই বোন তাদের বাবার উৎসাহে বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করে এসেছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯২৫ খ্রি.), তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ১৮৭৬ খ্রি.) কে বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত সমাজসেবিকা হয়েছিলেন। এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২ - ১৯২৩খ্রি.) এর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও (১৮৫০ - ১৯৪১ খ্রি.) শিশুদের নিয়ে একা বিলেতে পাড়ি দিয়েছেন জাহাজে করে। সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কারকে ভাঙতে চেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলেত যাওয়া নিয়েও বহু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ঠাকুরবাড়ি পরিবারের ভেতরে ও

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাইরেও। তবে একথা ঠিক যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলেত ভ্রমণ পরবর্তী বিলেতগামিনীদের পথ অনেকটাই প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

উনিশ শতকের যে সমস্ত নারীরা বিলেতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪ - ১৯১৯ খ্রি.), কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১ – ১৯২৩ খ্রি.), অবলা বসু (১৮৬৪/ ৬৫ - ১৯৫১ খ্রি.) প্রমুখ। উনিশ শতকের এই বাঙালি নারীরা ছিলেন সামাজিক উন্নতির প্রতীক। তাঁদের দেখানো পথেই পরবর্তীকালে বহু বাঙালি নারী খুব সহজেই বিলেত ভ্রমণ করেছেন। উনিশ শতকের বাঙালি নারীর ভ্রমণ সাহিত্যে যেভাবে দেশপ্রেম বা স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'। ইংলণ্ড নিয়ে এধরনের ভ্রমণকথা কোন বঙ্গনারীই রচনা করেননি এর আগে। ন'বছর বয়সে বৌবাজারের প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১২৬৩ – ১৩১৫ ব.) দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একমাত্র শিশুকন্যা তিলোত্তমাকে রেখে তিনি স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ডে যান। সেখানে ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির মধ্যে বহু বিতর্কিত মন্তব্য থাকায় ব্রিটিশ সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির মধ্যে উনিশ শতকের এক বাঙালি নারীর স্বদেশ চেতনা খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তবে যে শুধু স্বদেশের প্রতি অনুরাগ সেটাই নয় –

> "তিনি বুদ্ধিমতী ও যুক্তিবাদী ছিলেন। বুঝেছিলেন দেশকে স্বাধীন ও উন্নত করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ দেশগঠনের শিক্ষা। সেক্ষেত্রে ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছিলেন তিনি।"[৪]

তাই এই গ্রন্থটির মধ্যে তিনি ইংরেজ জাতির ভালোমন্দ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন।

কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থে উনিশ শতকের এক নারীর যে স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ভ্রমণ হল মানুষের দৈনন্দিন একঘেয়েমির থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়, মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা শিক্ষা ও আনন্দের সমন্বয়ে সুন্দর। তা আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন উপলব্ধির জগত সৃষ্টি করে, নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধানও দেয়, স্বদেশ চেতনাও তার মধ্যে একটি। কারণ ভ্রমণ সাহিত্য শুধুমাত্র সাল বা তারিখ থাকবে তা নয় সেখানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা অবগত হব-

> "কেবল কোনো অজানা-অচেনা স্থানের বর্ণনা ও মানুষজনের টুকরো ছবি এবং সর্বোপরি সাল - তারিখের দড়াদড়ি থাকলেই তো আর 'ভ্রমণসাহিত্য' হয় না।"[৫]

তাই ভ্রমণ সাহিত্যে আমরা পাই চিত্তবিনোদন, সহৃদয় মানসিকতার সঙ্গে বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি, সমাজের সাথে সাথে দেশ, রাষ্ট্র সম্পর্কেও টুকরো টুকরো ছবি যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সত্য ও সুন্দরকে। যা আমরা খুঁজে পাই কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থের মধ্যে।

কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' তে মোট কুড়িটি অধ্যায় রয়েছে, যেখানে প্রতিটা অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে দেশের প্রতি একটা টান, দেশের প্রতি একটা সুগভীর ভালোবাসা। দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ দেশগঠনের শিক্ষা। তাই তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছেন। ইংরেজ জাতির বীরত্ব, মূল্যবোধ, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি লেখিকা সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। কারন —

> "এই জাতির সাহস, বীরত্ব, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ, নিয়মানুবর্তিতা, পারিবারিক মূল্যবোধ সবই ভারতীয় নারী-পুরুষের কাছে শিক্ষণীয় বলে কৃষ্ণভাবিনীর মনে হয়েছে।"[৬]

তিনি ইংরেজদের গুনগুলিকে তাঁর রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন যার মূল কারণই ছিল ভারতীয়দের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা। লেখিকা নিজেই বলেছেন যে এই বইতে তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি বা নিজের গৌরবের কথাকে প্রকাশ করতে চাননি। তিনি বহু নতুন বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেগুলিকে সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন। সেখানে হয়ত সমাস, সন্ধি বা উপন্যাস, নাটকের বীরত্বপূর্ণ আখ্যায়িকা নেই কিন্তু সেখানে

আছে প্রতিটা মানুষের নিজের কথা। পরাধীনতার গ্লানিতে মানুষ যখন জর্জরিত, যখন অসহায়, নিঃসহায়, স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার প্রভেদ কতখানি তা আমরা এই গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই –

> "কেবল স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবেন।"[৭]

পরাধীনতার গ্লানিতে ভারতবাসী যখন জর্জরিত তখন যেমন উচ্চারিত হয় –

> "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
> দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?"[৮]

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেক ভারতীয় যুবক ইংলণ্ড সম্পর্কে জানবার জন্য ভীষণভাবে উদগ্রীব। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমরা বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় জানতে পারি।

কৃষ্ণভাবিনী ছিলেন গৃহবন্দী এক নারী যেখানে পৃথিবীর কোনো বিষয় সম্পর্কে তিনি জানতেন না। তবে সামান্য বিষয়কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে তিনি পারতেন না। দেশের ব্যাপারে জানার জন্য তিনি 'লালায়িত' হতেন কিন্তু বিলেতের কথা শুনলেই তাঁর মন নেচে উঠত, -

> "বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার নতুন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূরণ হয় না, সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতাম।"[৯]

তাই তিনি সমাজকে উপেক্ষা করেই, আত্মীয়দের নিষেধকে অগ্রাহ্য করে, ছ'বছরের কন্যা তিলোত্তমাকে শ্বশুরের কাছে রেখে স্বামীর সঙ্গে বিলেতে আসেন তিনি। ইংলণ্ডকে জানবার ইচ্ছা কমবেশি সকলেরেই আছে। সেই ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত দেবার জন্যই তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন –

> "বোধহয় ইংলণ্ডের জানিবার নিমিত্ত আমার মতো আপনাদের মধ্যে অনেকের মনে কৌতূহল জন্মে, সেই ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার বাসনায় আমি এই 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'কে আপনাদের করে অর্পণ করিলাম।"[১০]

এই গ্রন্থখানি এক ঐতিহাসিক দলিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয় –

> "ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভাবিনী দাসের ঐতিহাসিক বিলাত ভ্রমণকাহিনি এবং প্রথম ভারত ভ্রমণকারী লেখিকা হিসেবে প্রসন্নময়ীর পুস্তক প্রকাশ বাঙালির সাহিত্য ও ভ্রমণ ইতিহাসে সামান্য হলেও দাগ কেটেছিল।"[১১]

ইংলণ্ড যাওয়ার পথে লেখিকার দেশের জন্য একটা কষ্ট অনুভব করেন। কলের গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ, বহু সংখ্যক মানুষ থাকলেও –

> "কিন্তু আমার মতো কি কাহারও মনে এত কষ্ট হইতেছে? বোধ হয় না।"[১২]

কেউ যাচ্ছেন বিদেশে আবার কেউ বা ফিরে আসছেন দেশে তাই তাদের হয়ত সেভাবে কষ্ট হচ্ছে না কিন্তু "আমার মতো কি কেহ স্বদেশ ছাড়িয়া অনেক দিনের জন্য বিদেশে যাইতেছে? বোধহয় না; তবে আমার এ কষ্টের সহিত আজ অন্য কাহারও কষ্টের তুলনা হয় না।"[১৩] এখানেই আমরা লক্ষ্য করছি জন্মভূমির প্রতি লেখিকার একটা গভীর টান, একটা গভীর ভালোবাসা। যত পথ অগ্রসর হয় ততই তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। ভারতের মহিলারা যে স্বাধীনতা সুখ থেকে বঞ্চিত তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন—

> "মনে বড়ো আহ্লাদ হইল, আবার দুঃখও হইল, আহ্লাদ-আমি স্বাধীন, দুঃখ-ভারতমহিলারা এ স্বাধীনতা সুখ জানেন না।"[১৪]

চারিদিকের মনোরম পরিবেশ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে লেখিকার স্বদেশের জন্য ব্যাকুলতাও, যা গ্রন্থটির মধ্যে স্বদেশ চেতনার এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে একেবারে কলকাতা থেকে শুরু করে ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থ মুম্বাই এবং আরব সাগরের তীরবর্তী মুম্বাই থেকে এশিয়া ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর ঘুরে ইতালির ভেনিস পর্যন্ত দীর্ঘ পথের নিখুঁত বিবরণ এখানে দিয়েছেন লেখিক। ভেনিস থেকে রেলপথে ও সমুদ্রপথে লণ্ডনে পৌঁছানোর গল্পও এখানে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। লণ্ডনে তাঁরা তিন বছর ছিলেন সে কথাও ব্যক্ত করেছেন লেখিকা।

ইংলণ্ডে বসবাসের সময় সেখানে লেখিকার যে স্বদেশপ্রেমের কথা আমরা জানতে পারি তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। জব্বলপুরে তিন জাতির মানুষ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যথা একজন বাঙালি, একজন মারহ্রাট্টি, একদল পশ্চিমবাসী লোক, এরা একদেশের হলেও ভাষা, চেহারা, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা। এদের মধ্যে মারহ্রাট্টিদের অর্থাৎ শিবাজীর স্বজাতীয়দের ভীষণভাবে প্রশংসা করেছেন কারণ শিবাজী ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমী। এই জন্য এই বীরপুরুষকে তিনি সম্মান করেছেন, তাঁর বীরত্বকে প্রশংসা করেছেন। জব্বলপুরের অতি সুন্দর পার্বত্য এলাকাও মধ্যেও লেখিকার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে "আমার দেশীয় পরাধীনা ভগিনীদের কথা মনে পড়িয়া দুঃখ হইল; তাঁহারা যদি এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পান তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার মত তাঁহাদেরও আনন্দ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা এ সকল সুখে বঞ্চিত।"[১৫] লেখিকার প্রতিটা মুহূর্ত দেশের কথা মনে পড়েছে, মনে পড়েছে উপেক্ষিতা বঙ্গনারীদের। কারণ উনিশ শতকের বঙ্গনারীরা সহজে বাইরে বের হতে পারতেন না এমনকি তাদের পড়াশোনাও করতে হত অন্তঃপুরের মধ্যেই -

> "উনিশ শতকে অন্তঃপুর নারীরা নিজের হৃদয়ের অন্দরমহলের কথাকে সম্বল করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের পড়াশোনা অন্তঃপুরের মধ্যেই।"[১৬]

এই অন্তঃপুরের নারীদের জন্য তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছে বারংবার। সেই উপেক্ষিত মন নিয়েই তিনি পাড়ি দিয়েছেন বিলেতে। তিনি স্বদেশের বুকে স্বাধীনতা দেখতে চেয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন দেশকে উন্নত করতেই হবে, তাই নিজ দেশের জন্য ব্যথিত হয়েছে লেখিকার মন —

> "আজি প্রিয় দেশ! স্বদেশরতন!
> ত্যজিনু তোমারে বহুদিন তরে,
> ভেবনা জননি! অভাগী কন্যারে,
> কোন উপকারে এলনা যখন।"[১৭]

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি যে যখন লেখিকারা ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চললেন তখন এক চাপা কষ্টের অনুভব –

> "যে ভারতবর্ষে জন্মাইয়াছি, ও এতদিন রহিয়াছি, যাহাকে অন্তরের সহিত ভালোবাসি, যাহার হীনবস্থা দেখিয়া কোনো উপকার করিতে পারি না বলিয়া আত্মাকে ধিক্কার দি, আজ সেই প্রিয়স্থান ছাড়িয়া জানি না কতদিনের জন্য চলিলাম।"[১৮]

তিনি মনকে শক্ত করে ভারতবর্ষের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এই অধ্যায়ে যেমন একদিকে স্বদেশের প্রতি একটা কষ্ট, বেদনা অনুভব দেখতে পাচ্ছি তেমনই মুম্বাই থেকে ভেনিস যাত্রার যে বিবরণ তা ভীষণই রোমাঞ্চকর এবং সৌন্দর্যময়। আকাশের তারা ও নক্ষত্র দেখে লেখিকার বক্তব্য—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ভাবিলাম ইহারাই কি আমাদের সেই ভারতবর্ষের তার? ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এত দূরে আসিয়াছি, এখানেও কি আবার সেই সকল তারা দেখিতে পাইব?"[১৯]

কলকাতার ছাদের উপরে আকাশে যে নক্ষত্র দেখতেন সেই পরিচিত নক্ষত্রদের দেখে লেখিকার মন আহ্লাদিত হয়ে উঠেছে।

ইংলণ্ডে পৌঁছে সেখানকার আদব কায়দা, খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছুই ইংরেজি ধরনে চলতে থাকে। এখানে তিনি আমাদের দেশের দুরাবস্থার অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন যার মধ্যে অন্যতম হল —

> "আমাদের দেশীয় লোকদের উপহাসই আমাদের দেশের উন্নতিপথের কণ্টক হইয়াছে।"[২০]

হয়ত এই বিষয়টি প্রথমদিকে সব দেশেই কমবেশি রয়েছে কিন্তু –

> "আমাদের দেশে সে অবলম্বিত বিষয় ভালো হইলেও লোকে তাহা হইতে বিমুখ হয়, আর এ সব দেশে তাহার আদর করে।"[২১]

এই কারণেই হয়ত বিদেশ এত উন্নত। অনেকেই বলেন যে যারা ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে যায়, তারা স্বদেশের নিন্দা ও ঘৃণা করেন কিন্তু লেখিকা একথা মানতে নারাজ, কেননা —

> "ইহা কতদূর সত্য তাহা জানি না, কিন্তু আশা করি এমন কেহই নাই যে মাতৃভূমিকে ঘৃণা করিবে।"[২২]

লেখিকার এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তাঁর স্বদেশ প্রীতি ছিল হৃদয় থেকে। বিদেশের নতুন দেশ, নতুন শহর, নতুন গাছ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে একটা আনন্দ থাকলেও আমাদের ভারতবর্ষেরও একটা নিজস্ব রূপ আছে, সেখানে প্রকৃতির যে অপরূপ শোভা তা আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। লেখিকার মতে —

> "আমাদের দেশের হিমালয় পর্বতের নিকট গেলে যেমন অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সেরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখিতে পাইবে না।"[২৩]

শুধু তাই নয়, পাশাপাশি রাজবাটী, অট্টালিকা, তাজমহল এসবের সাথে কোন কিছুরই তুলনা করা চলে না।

ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন সেখানের মানুষ, শিক্ষিতরা কতটা অর্থলোলুপ, তাদের কাছে টাকার এতই কদর যে-

> "কেহ যতই জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান হউন না, লোকে তাঁহাকে ফেলিয়া একজন অপদার্থ বড়োমানুষের অধিক সমাদর করিবে।"[২৪]

কিন্তু আমাদের দেশে একজন দরিদ্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কেবল টাকাতেই ইংরেজদের এত অহংকার। তবে তিনি ইংরেজদের খারাপ দিকগুলির পাশাপাশি ভালো দিকগুলিও আলোচনা করেছেন। তাদের পড়াশোনা, পরিশ্রম, তেজ প্রভৃতির গুনেই তারা আজ উত্তম আর আমরা "ভারতবর্ষীয়েরা নিজদোষে ইংরেজদের অধীন হইয়া আছি, এবং আমাদের অক্ষমতা বশতই বিদেশীয়েরা স্বার্থপর ভাবে ভারতের উপর রাজত্ব করিতেছে।"[২৫]

আমাদের দেশে পুরুষরা বাইরের প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারলেও নারীরা সেই অধিকারে সম্পূর্ণ বঞ্চিত অথচ ইংরেজ রমণীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান লণ্ডনের উদ্যানে, জলে সর্বত্রই। ইংলণ্ডের লোকেরা ভ্রমণ প্রিয়, তারা অর্থ সঞ্চয় করে পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায় কারণ তারা জানেন যে ভ্রমণ মানবজীবনের ক্ষেত্রে কতটা উপকারী। আমাদের ভারতে যেমন ধনীর দুলালরা অলস প্রকৃতির হয় ইংরেজরা ঠিক তেমন নয় তারা ছোটবেলা থেকেই শেখে স্বনির্ভর হতে। ইংরেজ জাতির বিরূপতার পাশাপাশি তিনি তাদের প্রশংসাও করেছেন। এখানের নারীরা বিলাসী, ছলনাময়ী হলেও তারা কিন্তু যথার্থ নারিশক্তি রূপে প্রকটিত। তাদের মধ্যে আছে শিক্ষা, স্বাধীনভাবে স্কুল, কলেজে যাওয়ার অধিকার। তবে কি শুধু পুঁথিগত শিক্ষায়? না। এর পাশাপাশি "ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা মনের সহিত শরীরেরও বিলক্ষণ যত্ন লয়।"[২৬] তাদের

বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনেও আছে অবাধ স্বাধীনতা। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা অনেক উন্নত এইভাবে যদি এদেশেও মানুষদের শিক্ষিত করা যায় তাহলেই উন্নতিও সম্ভব।

ইংলণ্ডের সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি আমরা 'ইংলণ্ডের বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে পাই। তিনি ইংলণ্ডের গৌরব দেখে ভারতীয়দের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় পুরুষরা হীনবল তার সাথে তারা স্ত্রীদের রেখেছে অন্ধকারে, অন্তঃপুরে। এই প্রসঙ্গে লেখিকার বক্তব্য —

> "স্ত্রীলোক ও পুরুষের সভা, স্ত্রীলোক ও পুরুষের এক সঙ্গে খেলা, প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকদের শ্রেণিবদ্ধ হইয়া স্কুলে যাওয়া — এই সকল দেখিতে অধিক ভালবাসি..."[২৭]

তিনি ইংলণ্ডের সব থেকে ভালবাসেন নারী-পুরুষের এই সহাবস্থানটি। লেখিকা অনুভব করেছেন ভারতের নবজাগরণ প্রয়োজন। শুধু 'স্বাধীন হইব', 'স্বাধীন হইব' বলে মিথ্যা উত্তেজনা দিয়ে হবে না দেখতে হবে আমরা স্বাধীনতার উপযোগী কিনা, স্বাধীনতাকে আমরা বজায় রাখতে পারব কিনা। তাই গ্রন্থটির শেষে লেখিকা আশা-আকাঙ্ক্ষার-বেদনার সার্বিক রূপরেখা দিয়েছেন।

কুসংস্কারগ্রস্ত ভারতীয় সমাজকে ধিক্কার জানিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী। তিনি যখন ইংলণ্ডে এসেছিলেন তখন তাঁর শ্বশুরমশায় তাঁর একমাত্র কন্যা তিলোত্তমার অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন কিন্তু যখন তিনি এদেশে ফিরে আসেন, যখন দেখেন মেয়ে দাম্পত্য জীবনে অসুখী তখন তিনি মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন, -

> "অনিত্য সংসারে স্বামী-পুত্র কেবা কার, সবই যে দুদিনের খেলা। নারী কেবল দাসত্ব করবার জন্যই পৃথিবীতে আসেনি, পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে তার ক্রীড়াসঙ্গিনী হবার জন্যেও নয়, মেয়েরা বেঁচে থাকে নিজের জন্যেও।"[২৮]

কিন্তু তিনি মেয়েকে বোঝাতে পারেননি, অকালে শেষ হয়ে যায় মেয়ের জীবন। যেরকম ঘটনা আমরা দেখতে পাই আশাপূর্ণা দেবীর (১৯০৯ – ১৯৯৫ খ্রি.) 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতীর জীবনেও।

তিনি সারাজীবন নিজেকে দেশ ও সমাজের সেবায় নিযুক্ত রেখেছিলেন। নারিপ্রগতির কর্মকাণ্ড দিয়ে এর সূত্রপাত করেছিলেন। নারীদের জন্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, ঘুরে ছিলেন কলকাতার পথে পথে। সব দিক থেকে নারীদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন উনিশ শতকের এই বঙ্গমহিলা। তখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোনও বাঙালি মহিলার দ্বারা রচিত এমন বিস্তৃত ভ্রমণ কাহিনি আর প্রকাশিত হয়নি। আর উনিশ শতকের ভ্রমণসাহিত্যে কৃষ্ণভাবিনী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' তে যেভাবে স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

Reference:

১. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ৯৯
২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯০৪, পৃ. ৬৩
৩. দে, নাড়ুগোপাল, উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বঙ্কিম জন্মজয়ন্তী, ২০১০, পৃ. ২৪৮
৪. মুখোপাধ্যায়, সোনালি, পরাধীন ভারতে পরাধীন নারী, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ২৭
৫. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৯৫, পৃ. ৪০০
৬. মুখোপাধ্যায়, সোনালি, তদেব, পৃ. ২৮
৭. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা, বিজিত ঘোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ১১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১০-২০১১, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩২৪

৯. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তদেব, পৃ. ১১

১০. তদেব, পৃ. ১১

১১. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা, তৃতীয় পর্ব, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ১২

১২. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তদেব, পৃ. ১৩

১৩. তদেব, পৃ. ১৩

১৪. তদেব, পৃ. ১৩-১৪

১৫. তদেব, পৃ. ১৬

১৬. দে, নাড়ুগোপাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধ (সম্পাদনা), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, পৃ. ৩১

১৭. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তদেব, পৃ. ১৯

১৮. তদেব, পৃ. ২২

১৯. তদেব, পৃ. ২৬

২০. তদেব, পৃ. ৪০

২১. তদেব, পৃ. ৪০

২২. তদেব, পৃ. ৪১

২৩. তদেব, পৃ. ৪২

২৪. তদেব, পৃ. ৫৩

২৫. তদেব, পৃ. ৫৭

২৬. তদেব, পৃ. ৬৯

২৭. তদেব, পৃ. ১৪৫

২৮. দেব, চিত্রা, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০০৫, পৃ. ৬৮

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 772 - 787
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত রবীন্দ্র সাহিত্যে নিন্দাসূচক শব্দ ও অপভাষার প্রয়োগ

ড. মধুমিতা আচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত)
রাঘবপুর ক্যাম্পাস
Email ID : macharya1973@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath Tagore, literature, slangs, bad words, humor, ethics, charac ter, reality.

Abstract
Rabindranath Tagore is not only a famous author but a great part of our culture and heritage. In his literature there are also the use of slangs but these are used not for criticism, nor for cheap popularity but for the sake of providing authenticity to the characters. The slangs are only used in the dialogues of the characters.

Rabindranath Tagore was born in an educated liberal family of the nineteenth century. He believed in good values, but still a lot of slangs have been used in the short stories and novels. In drama, especially in the humorous short dramas, there are plenty of slangs which have been used for creating a ridiculous situation. The characters and the situations provide the laughter element in a drama. The duty of a good creator is to establish the character and the events in a believable manner. No doubt, Rabindranath has successfully created believable characters and situations in his writings.

Rabindranath wrote many devotional songs, poems and essays. He is the founder of Bramhacharya Bidyalay in Santiniketan, which was converted into Bishwavarati Bishwabidayalay. In the Shantiniketan Ashram he was called Gurudeva. But we are also able to gather a long list of slangs in his literature. This was not a controversy, but it's a great way to ascertain the versatility of our beloved poet, who so realistically included the smallest detail.

Rabindranath went to East Bengal for the maintenance purpose of his father's zamindari. In East Bengal he saw the rural people, who are fond of using slangs in their day to day life. So when Rabindranath created stories in the background of East Bengal, he used the slangs to make it more real. With the use of these words the life of the lower strata of the society was established as truly as possible.

In the era of Rabindra nath Tagore he was also criticized by the people in a bad way. Especially some literary magazines intentionally insulted

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Rabindranath. Sometimes this was happened as they had different views but often out of pure jealousy. But Rabindranath never answered rudely, nor did he use slangs for answering. He was a very soft-spoken person, who always respected his family, its culture and the heritage of our society. In this essay, we are going to look at the slangs which were used by Tagore in his writings, and also the deep purpose to use the same.

Discussion

বাঙালির মননের উৎকর্ষ নির্ধারিত হয় রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির কাছে শুধু একজন কবি, একজন চিন্তাবিদ, একজন সংগঠক নন; তিনি বাঙালির চরিত্রের উদ্বোধক। রবীন্দ্র সাহিত্য বাঙালির কাছে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় বাঁচার রসদ। বাঙালি বলতে চায় রবীন্দ্রনাথের মতো করে, বাঙালি ভাবতে চায় রবীন্দ্রনাথের মতো করে। বাঙালির মন আর মানসিকতা, চিন্তা আর চেতনা সবই পরিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারায়।

জীবন থাকলে সেখানে রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, নিন্দা ইত্যাদি থাকবেই, আর তারই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে মুখের ভাষায় চলে আসে নিন্দাসূচক শব্দ, অপভাষা, গালাগালি। চরিত্রের সজীবতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপাদনের জন্যই বিশেষ কোন চরিত্রের মুখে কখনও কখনও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিন্দাসূচক শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

চরিত্রের অবস্থানগত কারণে, বাস্তবতার প্রয়োজনে সাহিত্যে অনেক সময়ই অপভাষার প্রয়োগ দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের মধ্যেও তেমনিই বাস্তব ভিত্তির উপর চরিত্রকে দাঁড় করাতে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মুখে অপভাষার বা নিন্দাসূচক ভাষার ব্যবহার করেছেন। এতে চরিত্র যে শুধুমাত্র বাস্তব সম্মত হয়েছে তাই নয়, লেখকের সমাজদৃষ্টির সূক্ষ্মতাও তেমনিই পরিস্ফুট হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই 'রবীন্দ্র সাহিত্যে অপভাষার প্রয়োগ' বললে আমরা বাঙালিরা নড়ে চড়ে বসি! সে কী! রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে অপভাষা? তাও আবার হয় না কি? হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যেও অপভাষার প্রয়োগ আছে; আর পূর্ববর্তী প্রশ্নের তৈরি হওয়া থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সেই অপভাষার ব্যবহার এতখানি সার্থক, প্রাঞ্জল ও চরিত্রানুগ হয়েছে, যে সেই ব্যবহার সম্পর্কে আমরা আদৌ সচেতন থাকি না; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রযুক্ত অপভাষার প্রয়োগ এতটাই চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে যে তা আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *ঘরে-বাইরে*[১] উপন্যাসে নারীর প্রথম বাইরে আসাকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনই দেখিয়েছেন ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্ব, ঘরের চার দেওয়ালের বাঁধন ছিঁড়ে যখন দেশের কাজের নামে সন্দীপের পানে ধেয়ে চলেছে বিমলা তখন তার মেজো জা সাধ্য মত বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কখনও ননকু দারোয়ানকে দুই মহলের মাঝে বসিয়ে বিমলার পাহারার ব্যবস্থা করেন, কখনও থাকো ও ক্ষেমা নামের দাসীদের টিপে দিয়ে মিথ্যে ঝগড়া লাগিয়ে তাদের একজনকে পাঠিয়ে দেন বার মহলে বিচার চাইতে, ফলে বিমলাকে অন্দরে ফিরতেই হয়। ফিরে বিমলা জানতে চায় –

> "মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন?"
> "তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে দূর করে দেব।"[২]

এই যে ঝাঁটাপেটা করার প্রসঙ্গ এটি কর্ম বিষয়ক নিন্দাসূচক প্রয়োগ। এখানে কেউ অপভাষার প্রয়োগ করেছে, তাকে শাসন করতে যে কাজ করা হবে বলা হল তাও শালীন নয়। আর মেয়ে অর্থে 'মাগী' শব্দের প্রয়োগ তো সেযুগে নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। 'শাস্তি'[৩] গল্পে রামলোচন চক্রবর্তী রাধার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সন্ধ্যার সময় কুরিদের বাড়িতে এসে বলেছিলেন 'মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে'[৪] বোঝা যায় সেযুগে নারী অর্থে 'মাগী' শব্দের প্রয়োগ স্বাভাবিক ছিল নারী, পুরুষ উভয়ের মুখেই।

গালি হল একধরনের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা মূলত কটূক্তি বা নিন্দাসূচক কথা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তিকে নিন্দা করা, অপমান করা বা অভিসম্পাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে গালি ব্যবহৃত হয়। যখন পরস্পরের মধ্যে গালি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিনিময় হয় তখন তাকে গালিগালাজ বলে। অপভাষা বলতে আমরা মূলত ইতর, অভদ্র ভাষা বুঝে থাকি।অন্যদিকে নিন্দা প্রকাশ করা হয় যে শব্দের দ্বারা তাকে নিন্দাসূচক শব্দ বলে।

সাধারণত দেখা যায় ছেলেদের মুখের ভাষায় অনায়াসেই চলে আসে অপভাষা ও নিন্দাসূচক শব্দ, বিচার করলে দেখা যাবে এগুলি অপেক্ষাকৃত 'হার্ড বা স্ট্রং' অপভাষা; কিন্তু সমাজ ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করা ব্যক্তি মাত্রেই জানেন মেয়েদের মুখের ভাষাতেও অনায়াসেই প্রযুক্ত হয় অপভাষা, এবং তাঁরা যে অপভাষার প্রয়োগ করছেন সে সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন থাকেন না। 'আঁটকুড়ের বেটা', 'আবাগীর বেটি', 'ভাতারখাকি', 'হারামজাদী' প্রভৃতি শব্দ অতি অনায়াসেই উচ্চারিত হত আমাদের ঠিক দুই প্রজন্ম আগের নারীদের মুখে জীবনের দৈনন্দিনতায়। সেই যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বঞ্চিত নারীদের জগৎ ছিল সংকীর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মাত্র পুরুষের মুখাপেক্ষী জীবনে স্বার্থে ঘা লাগলেই তারা মুখে তুলে নিতেন নিন্দাসূচক শব্দ ও অপভাষা। বর্তমান প্রজন্মের নারী ও পুরুষের মুখের অপভাষা অনেক ক্ষেত্রেই কাছাকাছি চলে এসেছে, শিক্ষায়, কর্মে, রুচিতে মিলের কারণে ভাষা ব্যবহারের দুস্তর ব্যবধানও ক্রমে কমে আসছে সেকথা অনস্বীকার্য।

যুগ বদলায় পুরনো যুগ নতুন যুগেকে সহ্য করতে পারে না, নতুন যুগ পুরাতনকে স্বীকার করতে চায় না; তখন কলহ, সংঘাত বাধে, এই সময় যে নিন্দাসূচক শব্দ প্রযুক্ত হয় তা মূলত সময়কে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের *ব্যঙ্গকৌতুকের* 'গুরুবাক্য'[৫] নাটকে পাই খগেন্দ্র জটায়ুর মৃত্যু অস্ত্রের আঘাতে হয়েছে বলায় গুরু শিরোমণিমশাই বলেন, "আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতোই উত্তর হয়েছে।"[৬] এখানে 'কালেজের ছেলে' নিন্দার্থে প্রযুক্ত। এই নিন্দা যুগ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'সমাপ্তি'[৭] গল্পে মেয়েদের শাশুড়ির কাছে শাসিত হওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে, অপূর্বর মা মৃন্ময়ীকে বলেছেন –

> "দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের একেবারে শেষে যখন চন্দ্রনাথ বাবু এসে জানান হরিশ কুন্ডুর কাছারি লুট হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা ক্ষেপে উঠে মেয়েদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার করছে তখন নিখিলেশ বেরিয়ে যেতে চায় তাদের রক্ষা করতে এবং বিমলার বাধাও সে মানেনা। নিখিলেশ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে মেজ রানী অত্যন্ত চটে উঠে বিমলাকে গাল দিয়ে বলেন - "রাক্ষুসী, সর্বনাশী। নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি?"[৯] নিজ স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের মুখের ভাষা যে সৌজন্যের আবরণ মানে না এখানেই আমরা তার প্রমাণ পাই।

অপভাষা প্রয়োগের অনেক ধরন থাকতে পারে, যেমন বন্ধুর প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, এর আবার দুটি ধরন – আদর বা প্রশ্রয় মিশ্রিত এবং রাগ বা দ্বেষ মিশ্রিত; শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, লিঙ্গ ভেদে প্রচলিত অপভাষা, ভিন্ন জাতির প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, ভিন্ন ধর্মের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা।এই সবেরই উদাহরণ আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। বন্ধু বা বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের মধ্যে প্রচলিত অপভাষার ব্যবহার দেখি *চিরকুমার সভা*[১০] নাটকে। জামাইবাবু অক্ষয় তাঁর অন্য শালীদের বিয়ের জন্য তাঁর শাশুড়িমা ক্ষেপে উঠেছেন শুনে বিধবা শ্যালীকে অন্য শালীর প্রসঙ্গে বলেন, "ওকে ঐজন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই?"[১১] বোঝা যায়, বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের প্রতি প্রযুক্ত এই অপভাষার প্রয়োগে মিশে আছে অনেকখানি আদর ও প্রশ্রয়। আবার দুই বন্ধুর মধ্যে যখন মতবিরোধ হয় তখন সেখানেও অনেক ক্ষেত্রেই অপভাষা বা নিন্দাসূচক শব্দ প্রযুক্ত হতে আমরা দেখি। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা*[১২] উপন্যাসে যখন বিনয় ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী সুচরিতাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করছে এবং তাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং সেখান থেকে সুচরিতাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসছে, তখন তা দেখে গোরা ক্রোধান্বিত হয়েছে এবং মনে মনে বিনয়কে বলেছে, "মূঢ়! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়! এত সত্বর! এত সহজে!"[১৩] এখানে 'মূঢ়' শব্দে কিন্তু গোরার সেই মুহূর্তের প্রচণ্ড রাগ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ যখন নিজের স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় তখন বন্ধুও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, বাপ বেটাতেও ঝগড়া লাগে। রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি সমর্পণ[১৪] গল্পে এর উদাহরণ আছে, যজ্ঞনাথের অতিরিক্ত কৃপণতার কারণে যখন জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে উঠেছে তখন বাপ যজ্ঞনাথের সঙ্গে ছেলে বৃন্দাবনের মতান্তর ঘটে - "এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে

লাগিল।"[১৫] যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনের কথা না শোনায় "বৃন্দাবন প্রথমে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।"[১৬] এরপরই বৃন্দাবন পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা মানতে পারেন না যজ্ঞনাথ। 'বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড বলিলেন, "বেটা অকৃতজ্ঞ, তোকে ছোট বেলা থেকে খাওয়াইতে পরাইতে যে খরচ হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার চেষ্টা নাই, আবার তেজ দেখো না!"[১৭] এইভাবে পিতাপুত্রের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, যজ্ঞনাথ বললেন বৃন্দাবনকে ধন দেওয়া গোরক্তপাতের সঙ্গে গণ্য হবে, বৃন্দাবনও বলে গেল যজ্ঞনাথের ধন নিলে তা মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক হবে।

ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষার প্রয়োগ দেখি *চিরকুমার সভা*[১৮] নাটকে এবং 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'[১৯] গল্পে। নাটকের প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সেখানে শালীকে 'বর্বরে' সম্বোধনে ছিল প্রশ্রয়। ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষায় তীব্র আঘাত করার প্রবণতাও থাকে, যেমনটা পাই রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ*[২০] উপন্যাসে, সেখানে বিধবা ভাই-বৌ শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লে, এবং পরে কলহ করলে মধুসূদন তাকে বলেছে, "দূর হয়ে যা বজ্জাত, আমার বাড়ি থেকে।"[২১] 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'[২২] গল্পে পাই, "অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল - নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, "রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর"- যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।"[২৩]

ভিন্ন জাতির প্রতি প্রযুক্ত অপভাষার উদাহরণ পাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও *য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরিতে*।[২৪] 'দুই বিঘা জমি'[২৫] কবিতায় পাই – "ঝুঁটি বাঁধা উড়ে, সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।"[২৬] বাঙালির মুখে, 'উড়ে', 'খোট্টা', 'মেড়ো' প্রভৃতি শব্দ নিন্দাসূচক অর্থেই প্রযুক্ত হয়। প্রাদেশিকতার কারণে নিজেদের 'স্যুপিরিয়র' মনে করার জন্যই বাঙালি এই সব শব্দ ব্যবহার করে। আবার 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স'ও যে তাদের মধ্যে কম নেই, তা ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে*[২৭], সেখানে তিনি একটি ইঙ্গ বঙ্গ জাতীয় সংগীতের নমুনা দিয়েছেন -

"মা, এবার মলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব।
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে ডার্কি বলে মুখ ফেরাব।"[২৮]

বোঝাই যায় ইঙ্গ-বঙ্গদের মুখের স্বজাতির নিন্দা বোঝাতেই তিনি এই জাতিবাচক 'নেটিভ', 'ব্ল্যাকি' প্রভৃতি নিন্দাসূচক শব্দ তুলে এনেছেন।

ভিন্ন ধর্মের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষার উদাহরণ 'বিধর্মী', 'ম্লেচ্ছ', 'কাফের' ইত্যাদি শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাশা'[২৯] গল্পের যবন কন্যা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পালনকারিণীর কাহিনীতে এই 'ম্লেচ্ছ', 'বিধর্মী' দুই শব্দই পেয়েছি। বদ্রাউনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা, সিপাহি বিদ্রোহ দমনের প্রচণ্ড সময়ে তার ভাইয়ের পরিচ্ছদ পরিধান করে ছদ্মবেশে কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসে, কারণ তার জবানীতে পাই – "বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল।"[৩০] সারা রাত খুঁজে তার প্রণয়ী ও ইষ্ট কেশরলালকে সে আবিষ্কার করে যমুনাপুলিনে, নবাবকন্যা তাকে মৃত বলেই মনে করেছিল, কিন্তু নবাব কন্যার ভক্তিনম্র প্রণামের স্পর্শে চেতনা ফিরে পেয়ে কেশরলাল জল চায়, নবাব কন্যা আপন বস্ত্র ভিজিয়ে জল এনে তাকে সুস্থ করলে কেশরলাল পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, ও নবাবপুত্রীর পরিচয় পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলে, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি।'[৩১] এই গল্পের শেষে নবাবকন্যা দীর্ঘ সাধনায় যখন নিজেকে ব্রাহ্মণত্বে উত্তীর্ণ বলে মনে করেছে তখন সে ভুটিয়া, লেপচাদের হিন্দুত্বহীনতা সম্পর্কে বলেছে, -

> "এ হিন্দুর দেশ নহে- ভুটিয়া লেপ্‌চাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহারব্যবহারে আচারবিচার নাই, ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র।"[৩২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবশেষে জীবনের দীর্ঘ আটত্রিশ বছর পার করে নবাবকন্যা কেশরলালের দেখা পায় ভুটিয়া বস্তিতে। এতদিন এই নবাবকন্যা যাকে ধর্ম বলে জেনেছে, তা একটা নিতান্ত অভ্যাস বা সংস্কার মাত্র জেনে আজ তার কাছে 'বিধর্মী', 'ম্লেচ্ছ' এই সব কোন নিন্দাবাচক শব্দেরই আর কোন অর্থ নেই।

রবীন্দ্র সাহিত্যে অপভাষা ও নিন্দাসূচক শব্দের প্রয়োগের উদাহরণ পাচ্ছি কবিতায়, যেমন 'পুরাতন ভৃত্য'[৩৩] কবিতায় দেখি-

"ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।
যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।"[৩৪]

এখানে চেহারা নিয়ে খোঁটার সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম 'নির্বোধ', 'চোর' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট'[৩৫] গল্পেও আমরা 'নির্বোধ' শব্দটি পেয়েছি। রাজধর তাঁদের অস্ত্র শিক্ষক ইশা খাঁ-কে নিষেধ করে তার নাম ধরে ডাকতে, ইশা খাঁ এতে রেগে যান এবং মেজো রাজপুত্র ইন্দ্রকুমারও রাজধরকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তখন রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"(মুকুট) [৩৬]

'দুই বিঘা জমি'[৩৭] কবিতায় পাই -

"ধিক ধিক ওরে শত ধিক তোরে
নিলাজ কুলটা ভূমি
যখন যাহার তখনই তাহার এই কি জননী তুমি?"[৩৮]

'নিলাজ' অর্থ নির্লজ্জ আর 'কুলটা' শব্দে আমরা কুলত্যাগকারিণী, ভ্রষ্টা রমণীকে বুঝি। কেবলমাত্র 'কুলটা' নয় বড়লোকের সেবাদাসীতে পরিণত হওয়ায় উপেন এখানে জন্মভিটেকে 'রাক্ষসী' বলতেও পিছপা হয় নি। জন্মভিটের প্রতি তার সবচেয়ে বড় আফশোস - 'ছিলে দেবী হলে দাসী।'[৩৯] আসলে জন্ম ভিটের আঁচলহারা হয়ে উপেন তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে। সে পথে পথে বিবাগী হয়ে ঘুরছে, অথচ তার জন্মভূমি মা, বড়লোকদের আদরে বিলাসী বেশ ধরেছে এ তার পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। কিছু পূর্বে সে যে বঙ্গভূমিকে দেখেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"[৪০] এই কথাই 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম'[৪১] মন্ত্রে উল্লেখ করে জন্মভূমিকে বন্দনা জানিয়েছে, নিজস্ব ভূমিখণ্ডটুকুর বিলাসী বেশ দেখে, তা আর তখন তার মনে নেই। এরপরই দেখি জন্মভিটের আমগাছের আম কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য সে 'চোর' অপবাদে ধৃত হচ্ছে লাঠি গাছ হাতে করা 'উড়ে' মালীর হাতে। মালীর মুখে বিবরণ শুনে রাজা রেগে যান,

"শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন "মারিয়া করিব খুন!
বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।"[৪২]

এরপর উপেন নিজের জবানীতে জানিয়েছে, -

"আমি কহিলাম শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"[৪৩]

এরপরই উপেন আঁখি জলে ভেসে ভাবতে বাধ্য হয়েছে –

"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গিন্নি'[৪৫] গল্পে শিবনাথ পণ্ডিতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা ছাত্র মনস্তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি, শিবনাথ পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁর প্রতি বর্ষিত ছাত্রের বিশেষণও যোগ্যই হয়েছে বলতে হবে! শিবনাথ পণ্ডিত "মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের

রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালিমূর্তি কি ধরা পড়ে না।"[৪৬] সেই জন্য ছাত্রদের প্রীতি প্রাপ্তি ঘটে নি শিবনাথের ভাগ্যে।

> "যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।"[৪৭]

ছাত্রদের বাপান্ত করলে ছাত্ররা যম ছাড়া মাস্টারমশাইকে আর কী-ই বা ভাবতে পারে?
'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'[৪৮] গল্পে আমরা নিন্দাসূচক শব্দ ও অপভাষার প্রয়োগ পেয়েছি বেশ বেশি পরিমাণে –

> "যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই- এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই।"[৪৯]

রামকানাইয়ের দাদার মৃত্যুর পর দাদার গিন্নির কান্নাকে বিষয় বঞ্চিতরা বলেছে – 'মায়াকান্না'[৫০]। ছেলে নবদ্বীপ তার জ্যাঠার বিষয় পায় নি।

"উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল- বলিল, 'মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়।' তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন।"[৫১] মৃত জ্যাঠামশাই সম্পর্কে নবদ্বীপের মনে কোন অনুভূতির জন্ম হয় না - "নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে।"[৫২] জীবিত কালে সম্পর্ক যেমনই থাকুক না কেন, মৃত মানুষ সম্পর্কে নবদ্বীপের ভাবনা যে যথোচিত নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবদ্বীপের মা এরপর নবদ্বীপের বাপকে নিয়ে পড়েন –

> "তুমিও সময়কালে ঐ কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্ পোড়ামুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে-- আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে।"[৫৩]

এরপর নবদ্বীপ তার বাবা যাতে সব ভণ্ডুল করতে না পারেন তাই তাঁকে বাড়ি ছাড়া করতে বলে,

> "অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।"[৫৪]

নবদ্বীপের মার মৃত্যুর পর তার বাবা যে কোনও হাড়জ্বালানী ডাকিনী কিংবা 'পোড়ারমুখী ডাইনী'[৫৫] - কে এনে হাজির করবে, সে বিষয়ে নবদ্বীপের মা নিশ্চিত ছিলেন। বাবা কাশী গেলে, নবদ্বীপ জাল উইল তৈরি করে। নবদ্বীপের বাপ ফিরে এসে সব জেনে প্রতিবাদ করলে, "গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, 'কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"[৫৬] তিনি আরও যোগ করলেন, "কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়!"[৫৭] অবশেষে অন্ন-জল ত্যাগ করেও বোঝাতে না পেরে রামকানাই শেষ পর্যন্ত আদালতে তার সদ্য বিধবা বৌদির পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং তাতে নবদ্বীপের পক্ষের সকলে মনে করে - "এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।"[৫৮] শেষে পুত্রের নাম উচ্চারণ করতে করতে "এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ"[৫৯] পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এখানে আমরা 'চক্ষুখাদিকা', 'ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী', 'অষ্টকুষ্ঠীরপুত্রী' ইত্যাদি তৎসম অপভাষার প্রয়োগ পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে, বলা বাহুল্য বাঙালির মুখের

ভাষায় ইংরেজ শাসনকালে এই গালিগুলির কথ্যরূপই ব্যবহৃত হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম শুচিতার আদর্শবোধের জায়গা থেকে, পারিবারিক রুচিশীলতার কারণে, সর্বোপরি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের গুরুদেব হিসেবে ও নিজস্ব নৈতিক মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার জন্য ঐ অমার্জিত, অপরিশীলিত ভাষাকে তৎসমে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'[৬০] গল্পে এই প্রয়োগ এক আলাদা শ্লেষাত্মক হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর প্রসঙ্গে 'অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে'[৬১] রাখতে অপূর্বর মা রাজি হচ্ছেন না। 'হাড়জ্বালানে' না বলে এই অস্থিদাহকারী বলাও এক প্রকার সাধু প্রয়োগ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রাহক, ছেলেভুলানো ছড়ার তখনও কিন্তু তিনি এই কাজ করেছেন, 'ভাতারখাকি' শব্দটিকে তিনি 'স্বামীখাকি' শব্দে বদলে দিয়েছেন -

"বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুড়া ধরে।
সেই যে বোন গালি দিয়েছেন স্বামীখাকি বলে।"[৬২]

এখানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মুখের ভাষাকে ছড়া সংগ্রহের কালে বদলে দেওয়ায় তাত্ত্বিক গবেষকদের বিচারে রবীন্দ্রনাথ সমালোচিতও হয়েছেন, কারণ 'স্বামীখাকি' ও 'ভাতারখাকি' একই অর্থ বহন করলেও তা মূলগতভাবে শ্রেণিচরিত্রের এক বদল ঘটিয়ে ফেলে অনায়াসেই। তবুও রবীন্দ্রনাথ পারেন না, নিজস্ব অবস্থান থেকেই পারেন না, যেমনটি পেয়েছেন তেমনটিই ছেপে দিতে, কোথাও তাঁর রুচিতে বাঁধে, মর্যাদায় বাঁধে।

চিরকুমার সভা[৬৩] য় দেখি অক্ষয় তার শালীরা বই পড়ছে এতে সন্তুষ্ট নয়, সে বলছে, "ঐ তো! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে-"[৬৪] 'কানা' কথাটি অবশ্যই অশিষ্ট প্রয়োগ। কানাকে কানা খোড়াকে খোঁড়া বলা যেমন অন্যায় তেমনি কোন বৃদ্ধকে 'বুঢ়া' নামে ডাকা অবশ্যই নিন্দা সূচক প্রয়োগ, কিন্তু কথার ধরনে যদি আদর মেশানো থাকে তাহলে তা আর নিন্দাসূচক থাকে না, একথাই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর 'দালিয়া'[৬৫] ছোট গল্পে। বৃদ্ধ ধীবরের গৃহে পালিত আমিনা ধীবরকে 'বুঢ়া' নামেই ডাকতো। "বুঢ়া আজ আমার দিদি আসিয়াছেন। তাই আজ ছুটি।"[৬৬] অথবা "ভাবনা নাই বুঢ়া আজ আমি তাহার (দালিয়ার) কাছ হইতে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।"[৬৭] এখানে এই 'বুঢ়া' সম্বোধন নিন্দাসূচক হলেও আমরা বুঝতে পারি আমিনার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন স্নেহ এবং ভালোবাসা তাতে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। "না, তুমি অতি বর্বর। শাহজাদির সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নহ। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।"[৬৮] শুধু এখানেই শেষ নয়,আমিনা তার দিদি জুলিখাকে বলে, "দিদি রাগ করিস না ভাই। এখানকার মানুষগুলো এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।"[৬৯] কিন্তু তার কথার ধরন থেকে জুলেখার বুঝতে বাকি থাকে না এই 'হাড় জ্বালাতন' সে বড় আনন্দে ও আদরে সহ্য করছে। 'সমাপ্তি'[৭০] গল্পে পাই, "পাগলি মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত"[৭১] – 'পাগলি' নিন্দাসূচক শব্দ হলেও এখানে প্রশ্রয় মিশ্রিত ছিল।

একইভাবে 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে বলা যায়। যখন মা বা বাবা সন্তানকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলেন তখন তার মধ্যে অনেকখানি স্নেহ ও প্রশ্রয় মিশে থাকে। আবার কখনো এই 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দই নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শব্দ এখানে বড় কথা নয়, কোন্ ধ্বনিতে তা উচ্চারিত হচ্ছে সেটিই বড় কথা। মা বা বাবার মুখে সন্তান সম্পর্কে যখন 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দের প্রয়োগ পাই, তার মধ্যে মিশে থাকে কখনও আদর, কখনও প্রশ্রয় আবার কখনও অভিমান। মানুষ নিজের সম্পর্কে যখন ঐ একই শব্দ প্রয়োগ করে তখন তার অর্থ কতখানিই না বদলে যায়! 'লক্ষ্মী-ছাড়া'র অর্থ লক্ষ্মী যাকে ত্যাগ করেছেন এমন; দুষ্ট, পাজী, দুর্ভাগা। রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা'[৭২] হাস্যকৌতুকে হারানচন্দ্রের বাবা হারাকে বলেন, "লক্ষ্মীছাড়া, তোর কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না?"[৭৩] হাস্যকৌতুকের 'ছাত্রের পরীক্ষা'[৭৪]-য় মাস্টার হারানচন্দ্র ছাত্র মধুসূদনকে বলেন, "লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে!"[৭৫] এখানে পরের ছেলেকে প্রহারের যে ঐকান্তিক আগ্রহ মাস্টারের মধ্যে প্রকাশিত, তা নিশ্চয়ই হারার বাপের কাছ থেকে আশা করা যায় না। অন্য দিকে 'দুই বিঘা জমি'[৭৬] কবিতায় যখন জমিদারবাবু উপেনকে তার শেষ সম্বল দুই বিঘা জমির ভিটে মাটি ছেড়ে দিতে বলেন, তখন উপেন বলে, "দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনই লক্ষ্মীছাড়া?" (৭৭) এখানে উপেনের সব হারানোর আশঙ্কা ও হতাশা নিবিড় বেদনায় প্রকাশিত। এই দুই প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়, নিন্দাসূচক শব্দ প্রয়োগের অর্থ সব সময় এক নয়; কেবল

মাত্র শব্দটি নয়, তাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি অর্থের বদল ঘটায়, এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলার ধরন, কথার সুর, স্বরের ওঠা নামা। তেমনিই 'হতভাগ্য', 'হতভাগা' শব্দে বুঝি মন্দভাগ্য, দুর্ভাগা। 'রোগীর চিকিৎসা'[৭৮] হাস্যকৌতুকে হাঁস চুরি করা হারু সম্পর্কে যখন বলা হয়, "সব বোঝা গেছে। হতভাগাকে জব্দ করতে হবে।"[৭৯] তখন সেই দুষ্ট বালকের চিকিৎসার প্রয়োজন যেমন সুস্পষ্ট *চিরকুমার সভা* নাটকে কিন্তু 'হতভাগ্য' শব্দ সেই অনুভূতি আনছে না। অক্ষয় যখন তার স্ত্রীকে বলে, "যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।"[৮০] এখানে 'হতভাগ্য' শব্দে কিন্তু সৌভাগ্যবান রূপেই নিজেকে সূচিত করতে চাইছে অক্ষয়, আর সংসারকে সে যতই 'গোষ্ঠ' বলুক আসলে স্ত্রীর প্রেমরজ্জু তার কাছে চরম অভীপ্সিত তা বুঝতে পাঠকের বাকি থাকে না। *চিরকুমার সভা* [৮১] - তে শ্লেষাত্মক কথা অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যরস সৃজন করেছে। অক্ষয় শালীদের বিয়ের কথা শুনে বলে, "ওরে বাস রে। একেবারে বিয়ের এপিডেমিক। প্লেগের মতো।"[৮২] বড় শ্যালিকা ছোট দুই বোনের বিয়ের খবর আনলে বলে, "বল কী। শুভকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্‌বাহবন্ধন!"[৮৩] বিয়েকে 'উদ্‌বাহবন্ধন' বলা, গৃহকে 'গোষ্ঠ' বলা, কিংবা বিয়ে প্রসঙ্গে 'এপিডেমিক' শব্দের প্রয়োগ নিশ্চয়ই শিষ্ট প্রয়োগ নয়, নিন্দাসূচক প্রয়োগ; কিন্তু বলার মজার ধরনটিই এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। *চিরকুমার সভা* [৮৪] -তেই দেখি বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের পরস্পর সম্ভাসনে নিন্দাসূচক শব্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। অক্ষয় রসিককে ডাকে "ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড।"[৮৫] রসিক ফিরে উত্তর করে, "কেন হে মত্তমন্থর কুঞ্জকুঞ্জর পুঞ্জঅঞ্জনবর্ণ।"[৮৬] কালো এবং মোটা বলে হাতির সঙ্গে তুলনা নিশ্চয়ই শিষ্টতা নয়! রসিকের প্রতি অতঃপর অক্ষয়ের জিজ্ঞাসা, "তুমি আমার শ্যালী-পুষ্পবনে দাবানল আনতে চাও?"[৮৭] 'কাবুলিওয়ালা'[৮৮] গল্পে রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত 'হামি সসুরকে মারবে।'[৮৯]

শ্বশুরের প্রতি মারবে শব্দের প্রয়োগ অবশ্যই শিষ্ট প্রয়োগ নয়, কিন্তু নাবালিকা মিনি ও তার কাছে বাঙলা ভাষার শিক্ষা নবিস কাবুলিওয়ালার মুখে এই কথা শুনে মনে হতেই পারে, 'অমৃত বালভাসিতং'[৯০]। আসলে কাবুলিওয়ালা বয়সে বড় হলেও মিনির সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারার কারণে আমরা যেন তাকে বালখিল্য রূপেই বিচার করি।

'রামকানাইয়ে নির্বুদ্ধিতা'[৯১] গল্পে যেমন আমরা 'গৃহ-পোষ্য' কথাটিকে নিন্দাসূচক হিসেবে পেয়েছি একইভাবে 'মধ্যবর্তিনী' (৯২) গল্পে আমরা দেখি 'পোষা পুরুষ' কথাটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিবারণের বড় বউ হরসুন্দরীর ভাবনা হিসেবে সেখানে বলা হয়েছে –

> "বুঝিল, নববধূ পূর্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, 'দিদির সিন্দুক ভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পারি না।"[৯৩]

এই গল্পেই শৈলবালার মৃত্যুর পর হঠাৎ তার স্বামী নিবারণ আবিষ্কার করে-

> "এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিঃশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু।"[৯৪]

এখানে 'উদ্বন্ধনরজ্জু' এই নিন্দাসূচক শব্দ প্রযুক্ত হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে নয়, সম্পর্কের গভীরতার অভাব প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ পর্বের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গল্প 'শাস্তি'[৯৫]। এই গল্পের অবিস্মরণীয় চরিত্র রামলোচন চক্রবর্তীর মুখে আমরা অপভাষার প্রয়োগ লক্ষ করি। প্রথমে ছিদামকে, তার বৌকে বাঁচানোর পরামর্শ দিলেও তিনি হাকিমের সামনে বলেন, "খবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না- এতবড়ো মহাপাপ আর নাই।"[৯৬] ইসলাম ধর্মের বিধানমতে নিষিদ্ধ বা অবৈধ এমন বাচ্চাকে বোঝাতে 'হারামজাদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি গালিবিশেষ। 'শাস্তি'[৯৭] গল্পে রামলোচন চক্রবর্তী জজ সাহেবের সামনে প্রত্যক্ষত ছিদাম সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে 'হারামজাদা' শব্দ প্রয়োগ করেন। ছিদাম চরিত্রকে বর্ণগত ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে নিচু নজরে দেখেন বলেই চক্রবর্তীর এহেন উক্তি। নিজেকে ভালো প্রমাণ করার জন্য এবং জজসাহেবের সামনে পূর্বকৃত মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্ররোচনা দেওয়ার প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্যই যেন রামলোচন এত তৎপর হয়ে উঠে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চান নিজের মত করে, তখনই তিনি বলেন 'হারামজাদা' শব্দটি।

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'চতুরঙ্গ'[৯৮] উপন্যাসে আমরা 'পাজি', 'পাপিষ্ঠ', 'নচ্ছার', 'পাষণ্ড', 'পাগলা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পেয়েছি। শচীশের জ্যাঠামশাই ননির সর্বনাশ হওয়ার পর তার ভাই ননিকে নিতে এলে তাকে বলেন,

> "পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমার? ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই?"[৯৯]

এই উপন্যাসের অন্যত্র পাই, অভদ্র লোক শব্দের ব্যবহার। আবার ননীকে বিদায় করার পরামর্শ দিতে এলে দূরসম্পর্কের পিসিকে জগমোহন বলেন,

> "কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?"[১০০]

উপন্যাসে শ্রীবিলাস তার রক্ষণশীল মনোভঙ্গীর উন্মোচন প্রসঙ্গে বলেছে, "আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর - জাতি হিসেবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নর ঘাতকের চেয়ে, এমন-কি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।"[১০১] জগমোহন শচীশ ননিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসায় যেন নতুন করে মায়ের আদর পান, তাই বলেন,

> "তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।"[১০২]

'পাগলা' শব্দটি যদিও নিন্দাসূচক শব্দ তবু এখানে নিজের প্রতি পরম ভালোবাসায় শব্দটিকে উচ্চারিত হতে শুনি। এই জগমোহনই আবার তীব্র ভাবে রেগে ওঠেন যখন তাঁর ভাই তাঁর কাছে অন্যায় দাবি নিয়ে আসেন, বলেন, -

> "বটে! তুমি তোমার এঁটো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছো!"[১০৩]

শচীশের পিতা শচীশের কাছে জানতে চান তার কাজ কি "পাড়ার চামার গুলোর মুর্দফরাশির কাজ?"[১০৪] শচীশ সবিনয়ে ইতিবাচক উত্তর দিলে, তার পিতা ক্ষেপে উঠে বলেন, "'আজ্ঞা হাঁ' বৈকি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চৌদ্দপুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি! নচ্ছার! নাস্তিক!"[১০৫] খেয়াল করতে হবে, তথাকথিত ধার্মিকের কাছে 'নাস্তিক' গালাগালি বিশেষ।

মনে রাখতে হবে কথাসাহিত্য ও কবিতার চেয়ে হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকে রবীন্দ্রনাথ অপভাষা ও নিন্দাসূচক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বেশি, সেটা হাস্যরস সৃজনের জন্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যঙ্গকৌতুকের 'স্বর্গীয় প্রহসন'[১০৬] - এ যেহেতু স্বর্গের দেবতাদের আদি ও নব্য দুই ভিন্ন ধারা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এসেছে তাই সেখানে একই সঙ্গে পেয়েছি 'অয়ি কোপনে', 'অহো দুর্‌বৃত্তা নিয়তি!' থেকে শুরু করে 'মাইরি', 'মিনসে', 'আ মর মাগী' প্রভৃতি ভিন্ন প্রকারের অপভাষা। মনসা ইন্দ্রের সংস্কৃত জর্জরিত ভাষা বুঝতে না পেরে ঘেঁটুকে বলেছে, 'মিন্‌সে কী বকছে ভাই?'[১০৭] আবার ঘেঁটুকে ইন্দ্র সংস্কৃত সম্বোধনে ডাকলে ঘেঁটু চটে ওঠে,

> "ঘেঁটো কী! আমি কি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ তো দেখি নি গা! ঘেঁটো!"[১০৮]

অর্বাচীন কালের দেব দেবীদের স্বর্গে গিয়ে চ্যাং মাছ ধরার চেষ্টা কিংবা তেঁতুল দিয়ে পদ্মফুল রেঁধে খাওয়ার প্রসঙ্গ ফুরোতে না ফুরোতেই আবার 'চিত্তিরে হয়!'[১০৯] শীতলা চাঁদকে বলেন, "মাইরি! তুমি এত ছলও জান ভাই। আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যা হোক।"[১১০] স্বর্গের অন্দরমহলে অশ্লেষা আর মঘা নবাবপুত্রীর মতো বসে আছে দেখে শীতলা জ্বলে উঠে বলে, "বলি ও বড়োমানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না!"[১১১] দ্বন্দ্ব যে কেবল ঐতিহ্যবাহী দেবতাদের সঙ্গে নব্য গোষ্ঠীর তা নয়, দ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যেও, শীতলা তাই মনসা সম্পর্কে বলে, "মোলো মোলো! আমাদের মন্‌সে হিংসেয় ফেটে মোলো। আমি চাঁদের পাশে বসেছি, এ আর ওঁর গায় সইল না।"[১১২] 'মাগী'র কার্তিক-ঠাকুরটিকে নিয়ে 'নিলজ্জপনায়' শীতলা লজ্জায় মরে যায় আর-কি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ঐ তো চেহারা, ঐ নিয়ে এত ভঙ্গিও করে! মাগো, মাগো, মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর্ মাগী! চাঁদের সামনে দিয়ে অমন বেহায়ার মতো আনাগোনা করছিস কেন?"[১১৩]

ঘেঁটু আবার ইন্দ্রের সঙ্গে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক পাতানোর সূত্র ধরে বলেছে, "মাইরি দাদা, ঢের ঢের পুরুষ-মানুষ দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন স্ত্রৈণ আমি দেখি নি।"[১১৪]

ব্যঙ্গকৌতুকের 'হেঁয়ালি নাট্যে'[১১৫] Nonsense, Hypocrisy, Clever, Ignorance প্রভৃতি ইংরেজি নিন্দাসূচক শব্দ পেয়েছি; সেখানেই আবার পেলাম, "যারা কথায় কথায় তর্ক উঁচিয়ে খেঁকিয়ে আসে, তাদের একরকম সংকীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে বটে, কিন্তু তারা ভদ্র নয়।"[১১৬]

'একান্নবর্তী'[১১৭] হাস্যকৌতুকে একান্নবর্তী পরিবারে স্বার্থত্যাগের শিক্ষা নিয়ে বক্তৃতা করে আসার পর দিনই দৌলতের বাড়িতে প্রচুর আত্মীয়ের আগমন হয়, দৌলতের বিয়ে না হলেও নটবর নিজেকে তার শালা বলে দাবি করে। দৌলতের কান মলে সে বলে, "কী রে শালা! শুনলুম না কি শালার শোকে সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিস?"[১১৮] স্বাভাবিক ভাবেই দৌলত এর প্রতিবাদ করে, "কে হে তুমি বেল্লিক! ভদ্রলোকের কানে হাত দাও!"[১১৯] শেষ পর্যন্ত সে দাবি করে, সে তার দাদার শালা, এবং বলে, "ভদ্রলোক বসে আছেন, এঁর সামনে কে শালা আর কে শালা নয় তা নিয়ে তক্‌রার করা ভালো দেখায় না।"[১২০] এই নাটকেই জয়নারায়ণের খুড়তুতো ভাইয়ের দুই স্ত্রী এসে বিষম ঝগড়া লাগায়। প্রথমা পত্নী বলে, "পোড়ারমুখো তোমার মরণ হয় না!"[১২১] লোকের বাড়ি এসেই সে তার মুখের বাঁধন খুলে দেয়, "ও আবাগের বেটা ভূত!"[১২২] সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়া চিৎকার করে "মার্ ঝাঁটা, মার্ ঝাঁটা!"[১২৩] দৌলতের তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। বন্ধু কানাই তাকে তারই বক্তৃতার সুর ধরে বলে সহিষ্ণুতা শিক্ষার এত বড় ক্ষেত্র সে আর পাবে না। ইতিমধ্যেই প্রথম বৌটি চেঁচাতে শুরু করেছে তার স্বামীর প্রতি, "মিন্‌সে তুমি বুড়োবয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছ!"[১২৪] এতে দ্বিতীয়া পোঁ ধরে, "ওগো, এত লোকের এত স্বামী মরছে, যমরাজ কি তোমাকেই ভুলেছে!"[১২৫] বুক ধরফর্ করায় দৌলত এদের একটু ঠাণ্ডা হতে বলেছিল, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত ঘটে, দুই বৌ একসঙ্গে চেঁচাতে থাকে, "ঠাণ্ডা হব কিরে মিন্‌সে। তুই ঠাণ্ডা হ, তোর সাত পুরুষ ঠাণ্ডা হয়ে মরুক।"[১২৬]

চতুরঙ্গ[১২৭] ও *গোরা* [১২৮]- র মতো উপন্যাস বাদ দিলে, সেখানে চরিত্রের প্রয়োজনে নিন্দাসূচক শব্দ আনা হয়েছে, তাছাড়া সাধারণভাবে উপন্যাসে বা ছোটগল্পে পরের দিকে অপভাষা এবং নিন্দা সূচক শব্দের প্রয়োগ তেমনভাবে আসেনি। এমন প্রসঙ্গও আর তেমনভাবে আসেনি তাই ব্যবহারের দরকারও পড়েনি। শিলাইদহ পর্বে এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ বেশি পাওয়া যায়, এর পরবর্তী সময় শান্তিনিকেতন পর্বে কিন্তু তেমনভাবে কোন অপভাষার প্রয়োগ আমরা রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাসে পাচ্ছি না, কারণ তখন তিনি গুরুদেব এবং একই সঙ্গে বিশ্বকবি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি এসে গেছে, নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গেছে, তাই বিশ্বকবি, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন কোন শব্দের প্রয়োগ আর তেমনভাবে আমরা পাবো না তাঁর পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও অনুজ সাহিত্যিকরা স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক স্বচ্ছন্দ ছিলেন - এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করছেন তন্ময় ভট্টাচার্য তাঁর "স্ল্যাং - এর উদাহরণ রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যেই, বাদ যাননি বঙ্কিম-শরৎ, এমনকি বিবেকানন্দও'[১২৯] রচনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অপভাষার প্রয়োগ করেন নি, সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, যেমন 'বিচারক'[১৩০] গল্পে পাই "ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল;" (১৩১) কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এখানে কোন অপভাষার প্রয়োগ নেই। আবার যখন বিচারক ক্ষীরোদার ঝগড়া শুনছেন সেখানেও আশ্চর্য সংযমের প্রয়োগ দেখি, "মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনিই বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।"[১৩২] কিংবা *যোগাযোগ* [১৩৩] উপন্যাসে কুমুর বিবাহ প্রসঙ্গে, কুমুর সম্পর্কিত কাকা মধুসূদনদের সঙ্গে অবনিবনা হওয়ায় 'ভাষার প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্যন্ত এসে তবে থেমেছিল।'[১৩৪] সব আছে, কিন্তু অপভাষার প্রয়োগ এখানে নেই।

জীবনের উত্তর কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে আরো বেশি করে সচেতন। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কারোর মতের বিরোধিতা যখন করেছেন তখনও শব্দ প্রয়োগের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মৃদুতা বজায় রাখছেন। রবীন্দ্রনাথের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিঠিপত্র পড়লে এই প্রসঙ্গগুলি আমরা বুঝতে পারি। তাঁর লেখায় আলগা কথা প্রায় নেই বললেই চলে। ব্রাহ্মশুচিতা বোধ, পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, তিনি যে বৃত্তে বিরাজ করেছেন সেখানে স্থিত থেকে তাঁর পরবর্তী যুগের লেখায় নিম্নবর্গের চরিত্র তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটকে অনেক কম এসেছে - যাদের মুখে অপভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন পড়বে।শিলাইদহ পর্বের পর তাঁর রচনায় একেবারে নিম্নবর্গের চরিত্র অপেক্ষাকৃত কম। তাঁর শেষ পর্বে লেখা উপন্যাস শেষের কবিতা (১৩৫)-তে মধ্যবিত্ত মানুষের কথা এসেছে। তেমনভাবে নিম্নবর্গীয় জীবন কিন্তু সেখানে আর নেই। ব্রাহ্ম শুচিতার আদর্শ এবং রুচিশীলতা রবীন্দ্রনাথের উপর অবশ্যই কাজ করেছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের সীমানা কে বাড়াতে পেরেছিলেন, তাই চরিত্রের দাবিতে চরিত্রের মুখের ভাষা রূপেই নিন্দাসূচক শব্দগুলি এসেছে, নইলে চরিত্রগুলো জীবন্ত হতো না। তিনি যে নিজের সীমানাকে ভাঙলেন তা অবশ্যই চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে, চরিত্রের বাস্তবতার প্রয়োজনে। এই ভাষা উঠে না এলে চরিত্রগুলো জীবন্ত হতো না। মাটির কাছাকাছি থাকা চরিত্রদের আচার-আচরণ প্রকাশ করতে গেলে তাদের সংলাপে এই ধরনের অপভাষা ও নিন্দা সূচক শব্দের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই ধরনের শব্দ ব্যবহার না রাখলে তাদের রাগ, ক্রোধ, হতাশা, অসহায়তা ও বিক্ষোভ যেন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উঠে আসত না।

গালি বা অপভাষা প্রয়োগের প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের জীবন দিয়ে অনুভূত সত্য, কেন মানুষ গালি ব্যবহার করে, করে কী আনন্দ পায়, বা কীসের জ্বালা মেটে তা তিনি অনুভব করেছিলেন ছোট বয়সেই। নর্মাল স্কুল ছেড়ে বেঙ্গল একাডেমিতে ভর্তি হয়ে বুঝেছিলেন এখানকার ছাত্ররা দুর্বৃত্ত কিন্তু ঘৃণ্য নয়। তাদের মজা করার ধরন প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে[১৩৬] বলছেন, "তাহারা হাতের তেলোয় উল্টা করিয়া ass লিখিয়া, 'হেলো' বলিয়া যেন আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞাত উক্ত চতুষ্পদের নামক্ষরটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত।"[১৩৭] অনেক বয়সে পৌঁছে পঞ্চভূতের 'কৌতুক হাস্য'[১৩৮] প্রবন্ধে লিখেছেন, -

> "কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এই জন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন;"[১৩৯]

বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্রতর তার আনন্দ অনুভব ও রাগ-দ্বেষ প্রকাশের ধরন - উভয়তই মানুষ গালি প্রয়োগ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় হয়েছেন ঠাকুর বাড়ির মার্জিত রুচিশীল পরিবেশে। তাঁদের পরিবার তখনকার সময়ে কেবলমাত্র অর্থবান ও অভিজাত রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কালের থেকে এগিয়ে থাকা মন ও মানসিকতার কারণে এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রুচিশীল অবদানের জন্যই সে পরিবারের প্রকৃত পরিচয়। এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের ব্রাহ্ম মতাদর্শ তাঁদের জীবন যাপনে ও কথাবার্তায় ভীষণ ভাবে ছাপ রেখে গেছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ফলে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে সংযম তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষ করা যায়। সাহিত্য জগতে অনেক নিন্দাবাদ ও সমালোচনার শিকার হয়েও রবীন্দ্রনাথ কখনও তার উত্তরে রুচিহীন প্রতিক্রিয়া জানান নি। তাঁর প্রবন্ধেও আমরা অপভাষার প্রয়োগ দেখি না। কেবলমাত্র কথাসাহিত্যে ও নাটকে চরিত্রের বাস্তবতার প্রয়োজনেই তিনি অপভাষা ব্যবহার করেছেন, এবং এই প্রবন্ধে আমরা এটাই দেখাতে চাইলাম যে সে প্রয়োগ এতটাই চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে যে তা যেন আলাদা করে চোখে পড়ে না। রুচিশীল, সৃজনদক্ষ এই মানুষটি তাঁর আদর্শনিষ্ঠা ও পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষার জন্যই কখনও নিজের স্বার্থে নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করেন নি, কিন্তু যেখানে তিনি স্রষ্টা সেখানে চরিত্রের দাবি, বাস্তবতার দাবিই তাঁর কাছে মহত্তম, তাই সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তিনি অনায়াসেই চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন ইতর ভাষা, গালিগালি এবং তা তাঁর কথাসাহিত্য ও নাটককে বাস্তব ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

Reference:

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

২. তদেব, পৃ. ৪৫৫

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শাস্তি, *গল্পগচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

৪. তদেব, পৃ. ১৬৭

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গুরুবাক্য, *হাস্যকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

৬. তদেব, পৃ. ১৪৩

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমাপ্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

৮. তদেব, পৃ. ১৮০

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৫৪৯

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১১. তদেব, পৃ. ৬৯৯

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গোরা,* নবম খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩. তদেব, পৃ. ৮৭

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সম্পত্তি সমর্পণ, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

১৫. তদেব, পৃ. ৪৪

১৬. তদেব, পৃ. ৪৪

১৭. তদেব, পৃ. ৪৪

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *যোগাযোগ,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

২১. তদেব, পৃ. ৬৮৭

২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

২৩. তদেব, পৃ. ২৭

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র – ভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১২৮৬ – শ্রাবণ ১২৮৭

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

২৬. তদেব

২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র* – প্রথম খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ভাদ্র- ১৪২২

২৮. তদেব, পৃ. ৮১৪

২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুরাশা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

৩০. তদেব, পৃ. ৩২৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩১. তদেব, পৃ. ৩২৪
৩২. তদেব, পৃ. ৩২৭
৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুরাতন ভৃত্য, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৩৪. তদেব, পৃ. ৬৭৭
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মুকুট, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৩৬. তদেব, পৃ. ৯০৪
৩৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা,২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৩৮. তদেব, পৃ. ৬৭৯
৩৯. তদেব, পৃ. ৬৮০
৪০. শ্লোক-রামায়ণ
৪১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৪২. তদেব, পৃ. ৬৭৯
৪৩. তদেব, পৃ. ৬৮০
৪৪. তদেব, পৃ. ৬৮০
৪৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গিন্নি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৪৬. তদেব, পৃ. ২২
৪৭. তদেব, পৃ. ২২
৪৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৪৯. তদেব, পৃ. ২৫
৫০. তদেব, পৃ. ২৫
৫১. তদেব, পৃ. ২৫
৫২. তদেব, পৃ. ২৬
৫৩. তদেব, পৃ. ২৬
৫৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫৫ তদেব, পৃ. ২৬
৫৬. তদেব, পৃ. ২৭
৫৭. তদেব, পৃ. ২৭
৫৮. তদেব, পৃ. ২৮
৫৯. তদেব, পৃ. ২৮
৬০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৬১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমাপ্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৬২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেভুলানো ছড়া, *লোক সাহিত্য,* বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৬৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯২৬
৬৪. তদেব, পৃ. ৬৯৬
৬৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দালিয়া, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪

৬৬. তদেব, পৃ. ৫১
৬৭. তদেব, পৃ. ৫৪
৬৮. তদেব, পৃ. ৫৩
৬৯. তদেব, পৃ. ৫৩
৭০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমাপ্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৭১. তদেব, পৃ. ১৭৯
৭২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রোগের চিকিৎসা, *হাস্যকৌতুক*, ষষ্ঠ খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৭৩. তদেব, পৃ. ১০২
৭৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছাত্রের পরীক্ষা, *হাস্যকৌতুক*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৭৫. তদেব, পৃ. ৯৪
৭৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী*, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৭৭. তদেব, পৃ. ৬৭৯
৭৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রোগীর চিকিৎসা, *হাস্যকৌতুক*, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৭৯. তদেব, পৃ. ১০৩
৮০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা*, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৬৯৬
৮১. তদেব
৮২. তদেব, পৃ. ৬৯৭
৮৩. তদেব, পৃ. ৬৯৭
৮৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা*, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৮৫. তদেব, পৃ. ৭০০
৮৬. তদেব, পৃ. ৭০০
৮৭. তদেব, পৃ. ৭০০
৮৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কাবুলিওয়ালা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৮৯. তদেব, পৃ. ১১৮
৯০. সংস্কৃত শ্লোকাংশ
৯১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৯২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মধ্যবর্তিনী, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৯৩. তদেব, পৃ. ১৫৫
৯৪. তদেব, পৃ. ১৫৮
৯৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শাস্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৯৬. তদেব, পৃ. ১৭১
৯৭. তদেব।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চতুরঙ্গ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৯৯. তদেব, পৃ. ৩৬৪
১০০. তদেব, পৃ. ৩৬২
১০১. তদেব, পৃ. ৩৫৪
১০২. তদেব, পৃ. ৩৬১
১০৩. তদেব, পৃ. ৩৬৪
১০৪. তদেব, পৃ. ৩৬৭
১০৫. তদেব, পৃ. ৩৬৭
১০৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় প্রহসন, *ব্যঙ্গ কৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
১০৭. তদেব, পৃ. ১৬৪
১০৮. তদেব, পৃ. ১৬৫
১০৯. তদেব, পৃ. ১৬৫
১১০. তদেব, পৃ. ১৬৫
১১১. তদেব, পৃ. ১৬৫
১১২. তদেব, পৃ. ১৬৬
১১৩. তদেব, পৃ. ১৬৬
১১৪. তদেব, পৃ. ১৬৭
১১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, হেঁয়ালি নাট্য, *হাস্যকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15209
১১৬. তদেব, https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15209
১১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, একান্নবর্তী, *হাস্যকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
১১৮. তদেব, পৃ. ১২৫
১১৯. তদেব, পৃ. ১২৫
১২০. তদেব, পৃ. ১২৫
১২১. তদেব, পৃ. ১২৬
১২২. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৩. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৪. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৫. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৬. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চতুরঙ্গ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৬১
১২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গোরা,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮ ১২৯. https://www.prahar.in
August 23, 2021.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিচারক, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪

১৩১. তদেব, পৃ. ২৩২

১৩২. তদেব, পৃ. ২৩৮

১৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *যোগাযোগ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩৪. তদেব

১৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শেষের কবিতা,* নবম খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী, বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ, কলকাতা, মাঘ, ১৩৮২

১৩৭. তদেব, পৃ. ৪২

১৩৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কৌতুক হাস্য, *পঞ্চভূত,* রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩৯. তদেব, পৃ. ৬৮৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 788 - 793
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 788 - 793
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে ডাক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ

প্রিয়া দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : deyp942@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Dakghor, Runner, Meghdut, letter, Aronyok, Postmaster.

Abstract
The imagery of Sukanta Bhattacharya's poem 'Ranar' is now a thing of the past. Times have changed, society has evolved and modern technology has brought radical changes in postal services. Now a day's postal Service has been fast and versatile. It reflected on Bengali literature. The postal service was mostly improved in India during the British period in 1766 AD. The postal system introduced by the British was called India Post and Telegraph Department, later it has been renamed as India Post. The new system introduced by the Postal Department in 1854 AD is the basic structure of the present postal system in India. Although the postal system was actively introduced in India from the Sultanate period but we find the transmission of letter, messages by pigeons from the very ancient times in our folk and ancient literature. Not only pigeons but Indian postal system from ancient times is moving towards the highest peak of development today based on horse, palanquin, and vehicles etc. The life of the people involved in the work of this postal service which is spread in every corner of the Indian subcontinent. The hardships of life, duties, loyalty, pain, happiness, joy, dignity, etc., can be found in novels, short stories, poetry and drama.

Discussion

> "রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে – বাঁ হাতে লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে।"[১]

'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমলের চোখে ডাকহরকরাদের যে অবিরাম অন্তহীন পথ চলার প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, সেরকম ভাস্কর্য মূর্তি বর্তমানে প্রায় অনেক ডাকঘরের সামনে ঠাঁই নিয়েছে। তবে এখন ডাকহরকরাদের চিঠির থলি পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় না। তার পরিবর্তে তারা বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র, নিয়োগ পত্র, পুস্তক, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি নানান অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী পৌঁছে দেয় স্থানান্তরে। কারণ এখন কেউ আর চিঠি লেখে না। নববর্ষ, বিজয়ার প্রণাম, শুভেচ্ছা সবই মুঠোফোনে সারে। আর ব্যক্তিগত পত্রাদি লেখার থেকে মুঠোফোনে বাক্যালাপেই বেশি স্বচ্ছন্দ।

> "কত চিঠি লেখে লোকে - কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখে ও শোকে।"[২]

'রানার' কবিতার এই লাইনগুলি বর্তমানে ডাকঘরের লাল ছোট ছোট বাক্সগুলির অতীতস্মৃতিকে রোমন্থন করিয়ে দেয়। ডাকঘরের লাল ছোট ছোট বাক্সগুলির অতীত স্মৃতিকে রোমন্থন করিয়ে দেয়।

বাংলা 'ডাক' কথার অর্থ আহ্বান করা বা মনোযোগ আকর্ষণ করা। আর এই শব্দ থেকেই 'ডাক ব্যবস্থা, 'ডাকঘর', 'ডাকহরকরা' এবং 'ডাকমাশুল' প্রমুখ শব্দের উৎপত্তি। শেরসাহ (১৫৪০ - ৪৫) প্রথম ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচল ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সেসময় সরাইখানাগুলোকে ডাকচৌকি হিসাবে ব্যবহার করা হত। প্রাচীন ভারতেও সংবাদ আদানপ্রদানের পরিচয় মেলে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তাম্বুল সহযোগে কৃষ্ণের প্রেম বার্তা রাধার কাছে পৌঁছে দিয়ে বার্তাবাহকের ভূমিকা নিয়েছে বড়াই। অন্যদিকে ঋষি নারদ ঢেঁকিকে বাহন করে সুরাসুরের মধ্যে বার্তা বহন করেছেন। আবার মহাকবি কালিদাস মেঘকে দূত করে বিরহী যক্ষের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। সেসময়ে ডাক ব্যবস্থায় ডাকহরকরার পরিবর্তে রাজহংস, সাদা পায়রা, কিংবা দূতের মাধ্যমে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই পাল্টেছে। পরবর্তীতে ঘোড়া, উট, পালকি, মানুষ, যানবাহন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় ডাকব্যবস্থা তার দীর্ঘতম পথ অতিক্রম করেছে। এই সুবিশাল ডাক ব্যবস্থার সঙ্গে বিজড়িত মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রতিকূলতা, যন্ত্রণা, আনন্দ, মর্যাদাবোধ গভীরভাবে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে যার ফলস্বরূপ বাংলা উপন্যাস, গল্প, কবিতায়, নাটকে ডাক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। ডাক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের যে কুঠিবাড়িতে থাকতেন সেই কুঠিবাড়ির একতলাতেই একটি পোস্ট অফিস ছিল এবং সেখানকার পোস্টমাস্টারের সাথে কবির আলাপচারিতার কথা 'ছিন্নপত্রের' ৫৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন –

> "বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। ...আমি একে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম।"[৩]

এই পোস্টমাস্টারকে কেন্দ্র করেই তাঁর 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি আবর্তিত হয়েছে।

গল্পে দেখা যায় উলাপুর নামে একটি অজ পাড়াগাঁয়ে বিশেষ প্রয়োজনে নীলকুঠি সাহেবের উদ্যোগে একটি পোস্টঅফিস খোলা হয়। সেসময় পোষ্টমাস্টারের বেতন খুবই সামান্য এবং যে কোনো স্থানে বদলির ব্যবস্থা ছিল। আর ডাকঘরগুলির অবস্থা ছিল ভয়ানক রকমের। তৎকালীন গ্রামীণ ডাকঘরগুলির শোচনীয় অবস্থাকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে –

> "একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার অফিস; অদূরে একটা পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল বিশেষ করে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে এ হেন অজপাড়া গাঁয়ের পোস্টঅফিস সংলগ্ন পরিবেশ ভিন্ন অঞ্চলের পোস্টমাস্টারের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করত।"[৪]

এমনই পরিবেশে পোস্টমাষ্টারের সঙ্গী হয়ে ওঠে মাতৃহীনা অনাথ বালিকা রতন। গ্রামের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যখন পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন রতনই তাকে সেবা শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলে এবং বালিকার সাথে তার স্নেহের সম্পর্ক তৈরি হয়। ব্যাধির উপশম হওয়ার পরই উলাপুর গ্রামের পোস্টঅফিস থেকে বদলির জন্য আবেদন করে দরখাস্ত পাঠান কিন্তু কর্তৃপক্ষ বদলির আবেদন নামঞ্জুর করে দেন। শেষে পোষ্টমাস্টার তার কাজে জবাব দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনি ভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি গ্রামবাংলার ডাকব্যবস্থার একটি বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' (১৯১১) নাটকটি রূপক সাংকেতিক নাটকের ধারায় এক অন্যতম সংযোজন। এই নাটকে ডাকব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন ডাকঘর, ডাকহরকরা, চিঠি প্রভৃতিকে সাংকেতিক রূপে প্রতিকায়িত করা হয়েছে। প্রহরীদের সঙ্গে অমলের বাক্যালাপের মাধ্যমেই রাজা ও তার ডাকঘরের প্রসঙ্গ এসেছে। দইওয়ালার সঙ্গে অমলের

প্রতিসংলাপে সে দইওয়ালা হতে চেয়েছিল কিন্তু প্রহরীর সাথে আলাপে সে প্রহরী হতে না চেয়ে রাজার ডাকহরকরা হবার বাসনা প্রকাশ করেছে। অমল মনে করে –

> "ডাকহরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, গরিব নেই, বড়মানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিড়ি করে বেড়ানো- সে খুব জবর কাজ।"[৫]

অমলের কাছে ডাকহরকরাদের চিঠির বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ানোর কাজটি ভারী মজার মনে হয়েছে। সেকারণেই অমল রাজার ডাকহরকরা হয়ে বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। সমগ্র জগতটিই আসলে রাজার ডাকঘর। বিশ্বাত্মা তার আপন বার্তা এই ডাকঘরের মাধ্যমেই পৌঁছে দেন। আর সেই বার্তা বহন করে নিয়ে আসে ডাকহরকরা। অমলের সেই রাজার ডাকহরকরা হবার বাসনা। যখন পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের সময় আসে তখনই রাজার চিঠি আসে। নাটকেও অমল সারাদিন জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত রাজার চিঠির প্রত্যাশায়। মোড়ল পরিহাস করে একটি সাদা অক্ষরশূন্য কাগজ অমলের কাছে দিয়ে বলে এটি রাজার চিঠি। কিন্তু এই সাদা কাগজ ব্যঞ্জনা বহন করে নিয়ে আসে। এই চিঠির অর্থ বোঝে শুধু একজন - সে ঠাকুরদা। ঠাকুরদার কথায় –

> "হ্যাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।"[৬]

আসলে এ চিঠি সকলের জন্য বরাদ্দ - এ কথাটা নির্বোধ মোড়লের বোধগম্য হয় না। এই চিঠি যখন যার পাওয়ার ভাগ্য হবে তখনই রাজার ডাকহরকরা এসে দিয়ে যাবেন। নাটকে মুক্তি ও মৃত্যুর টানাপোড়নে মুক্তির চেয়ে মৃত্যুর উপস্থিতিই যে আমাদের জীবনে অপরিমেয় সত্য এটা বোঝাতেই ডাকঘর, ডাকহরকরা, ঘন্টা, চিঠি এই সাংকেতিক শব্দগুলি বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্প ছাড়াও আরো একটি 'পোস্টমাস্টার' গল্প রয়েছে। যেটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত। গল্পটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'মর্মবানী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডাকব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক অসাধু 'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। তৎকালীন গ্রাম্য ডাকঘরের চিত্র গল্পকার শুরুতেই খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন –

> "খড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোস্ট অফিসের ভিতরে, নড়বড়ে টেবিলের সামনে, হাতভাঙ্গা চেয়ারের উপর বেগুনে রংয়ের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কার্য করিতেছে, ওই ওখানকার পোস্টমাস্টার বা ডাকবাবু বিমল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।"[৭]

বিমল অন্যের চিঠি খুলে পড়ত। প্রেমের চিঠি, পরকীয়ার চিঠি, পড়াতেই তার বেশি আগ্রহ। শুধু এটুকুতেই শেষ নয়, খামের মধ্যে টাকা পেলে সেটাও আত্মসাৎ করতে তার দ্বিধা হত না। এরকমই একদিন একটি চিঠির মাধ্যমে জানতে পারে, এক বিধবা রমনী তার পুরুষের সাথে পালানোর পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু পোস্টমাস্টার তার অসাধু উদ্দেশ্যে সেই বিধবা রমণীকে নিয়ে পালানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। এর পুরস্কারস্বরূপ সে প্রচন্ড প্রহৃত হয়ে জ্ঞান হারায় এবং পরে নিজেকে পোস্ট অফিসের খোলা বারান্দায় আবিষ্কার করে। পোস্টমাস্টার তার এই পাপকর্মের ঘটনাকে পেশাগত উন্নতির কাজে লাগায়। এরপর পুলিশ তদরকিতে এলে সে বলে রাত্রে ডাকাত দল এসে তাকে প্রহার করে তহবিল থেকে ৫৪২ টাকা নিয়ে গেছে। অথচ পুরো টাকাটাই সে আত্মসাৎ করে। আর এই মিথ্যে ডাকাতির ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে বিমল নিজেকে ঊর্ধ্বতন পদে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি অনুভূতিপ্রধান কিন্তু প্রভাতকুমারের এই গল্পটিতে এমন একজন পোস্টমাস্টারের কথা উল্লিখিত হয়েছে যে ডাকব্যবস্থাকে হাতিয়ার করেছে তার স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 788 - 793
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিঠি, ডাকঘর এগুলি সমাজজীবনের সাথে যে কী ভীষণভাবে সম্পর্কযুক্ত তা 'আরন্যক' উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়। গল্পকথকের কাছে প্রথমে অরণ্য নির্বাসন তুল্য মনে হয়েছে সে কারণে বিস্তীর্ণ জনহীন প্রান্তরে সত্যচারণকে ডাকের জন্য অসীম প্রতীক্ষা করতে দেখা যায়। কথকের ভাষায় –

> "আজ আট - নয় মাস এখানে আসিবার ফলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই জনহীন বন-প্রান্তরে সূর্যাস্ত, নক্ষত্ররাজি, চাঁদের উদয়, জ্যোৎস্না ও বনের মধ্যে নীলগাইয়ের দৌড় দেখেতে দেখিতে বহির্জগতের সঙ্গে সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি - ডাকের চিঠি কয়খানির মধ্য দিয়া আবার তাহার সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হত।"[৮]

উপন্যাসে দেখা যায় উনিশ মাইল দূর থেকে ডাক আনতে হত। প্রতিদিন লোক পাঠিয়ে ডাক আনার ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব বলে সপ্তাহে দু'বার করে ডাকঘর থেকে চিঠি আনার ব্যবস্থা ছিল। ডাকের ব্যাগে শুধু চিঠির পত্রাদি থাকত না। ডাকের মাধ্যমে বিভিন্ন ম্যাগাজিন, নানা অত্যাবশ্যকীয় কাগজও পাঠানো হত। লবটুলিয়ার নির্জন অরণ্য প্রান্তরে ডাকব্যবস্থা যে কী ভীষণ প্রয়োজনীয় তার মূল্য সকলের কাছে বোধগম্য নাওবা হতে পারে কিন্তু সত্যচরণের কাছে তা অপরিসীম। শহরের কোলাহল, যান্ত্রিকতাকে নির্জন বন্য প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে ডাকব্যবস্থা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসের মাধ্যমে ডাক পরিষেবাকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার অন্যদিকে তাঁরই একটি অন্যতম গল্প 'অভিনন্দন সভা' যেখানে ডাক পিওনের কর্মজীবনকে তিনি পরম মমতায় তুলে ধরেছেন। অভিনন্দন সভা অর্থাৎ যে সভায় কোনো ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। গল্পে এক দরিদ্র ডাক পিওনকে বিদায় জানানো হচ্ছে। যা সমকালীন সমাজে কল্পনারও অতীত। ডাকঘরের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর গ্রামের তরুণ সংঘের ছেলেরা গৌর পিওনকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন এর আয়োজন করেছে। গৌরচন্দ্র হালদার ওরফে গৌর পিওন সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন –

> "গৌর পিওন আমাদের জীবনে সেই বহুদূরবর্তী নীহারিকার মতো অনড় ও অচল অবস্থায় এক ডাকঘরে, এক ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে পঁয়ত্রিশ - ছত্রিশ বছর ডাকহরকরার কাজ করে আসচে।"[৯]

গৌর পিওন কখনো হাটবার ভয়ে দূরবর্তী গ্রামের চিঠিপত্র ঝোপঝাড়ে ফেলে দিয়ে কর্তব্যের অবহেলা করত না। দৈনিক ৫-৬ ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে চিঠি পোঁছে দিত ক্লান্তিহীন ভাবে। পরবর্তীতে ডাক পিওনের কর্ম থেকে অবসরকালীন দিনগুলিতে সংসার চালাতে পরের বাড়িতে গরুর দুধ দোয়ানোর কাজ করত। গৌরের মতো ডাকপিওনই তো কর্তব্য পরায়ণ পিওন হিসেবে প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরও নতুন ছোকরা পিওনকে সব বাড়ি চিনিয়ে দেয় চিঠি বিলি করার সময়। অভিনন্দন সভায় গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কবিরাজ মশাই, প্রাইমারি স্কুলের পন্ডিতমশাই, স্কুলের শিক্ষক, চামড়ার খটিওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক, ডাক্তার, ষ্টেশন মাস্টার, বস্ত্র ব্যবসায়ী, পোস্টমাস্টার এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন। এই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অতিরঞ্জিত ও উদ্ভট বক্তৃতার মধ্যে থেকে একটি সত্যই উঠে এসেছিল - গৌর পিওন কর্তব্যনিষ্ঠ ডাককর্মী হিসেবে সম্মানীয়।

আমাদের সমাজ শ্রেণী বৈষম্যের ভরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন ডাকপিওনের জন্য আয়োজিত অভিনন্দন সভা আমাদের অভিভূত করে তোলে। গৌর পিওন সভার আয়োজনের ঘটা দেখে অভিভূত হয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে এবং সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে - 'বাবুরা - বাবুরা...' বলে বসে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, তার জন্য হরি ময়রার দোকানে রাজভোগ খাওয়ানোর আয়োজনে সে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলেছিল –

> "এমন দিনডা যে হবে তা ভাবিনি। ... কি খাওয়াডাই খাওয়ালেন, কি ভালো কথাই বললেন আমার সম্বন্ধে - বড্ড গুরুবল আমার।"[১০]

গৌর পিওনের মতো একনিষ্ঠ সমাজকর্মী যে তার কর্মজীবন পরিসমাপ্তিতে বিদায় অভিনন্দন পাওয়ার উপযুক্ত লেখক গ্রামের তরুণ সংঘের ছেলেদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বার্তা দিয়েছেন এবং ডাক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ডাক পিওনরাও যে ভবিষ্যতে সত্যিকারের মর্যাদা পাবে তারই বার্তা দিয়েছেন এই অসাধারণ গল্পটির মাধ্যমে।

শুধু গল্প বা উপন্যাসে নয় বাংলা কবিতাতেও ডাক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে এসেছে। এ প্রসঙ্গে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজি শব্দ 'Runner' যার আভিধানিক অর্থ যিনি দৌড়ান, এখানে ডাকহরকরা অর্থে রানার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়াকে পিছনে ফেলে নির্ঘুম রাতকে সাক্ষী রেখে মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেয়। সে নিজে পৃথিবীর বোঝা হয়ে থেকেছে, তার ক্লান্তির নিঃশ্বাস আকাশ ছুঁয়েছে, তার শরীরের ঘামে মাটি ভিজেছে, খুব স্বল্প মূল্যে নিজের জীবনের রাত্রিকে বিক্রি করেছে। কিন্তু তারা মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট আনন্দের নানা সংবাদের বোঝা কাঁধে নিয়ে দুর্বার গতিতে রাতের অন্ধকারে ছুটে চলে। তাদের এ বোঝাটা না দিন কবে শেষ হবে তারা জানে না। কখনো কি তাদের জীবনের সূর্য উঠবে -

"ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবু রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।"[১১]

কবিতার এই পংক্তিগুলি রানারদের জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত, বিষন্ন, হতদরিদ্র রানারদের কাছেই পৃথিবীটা কালো ধোঁয়াময়। প্রতিদিন টাকার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালেও সেই টাকা তারা ছুঁয়ে দেখতে পারে না। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কবিতার মাধ্যমে পত্রবাহক রানারদের বিবর্ণ জীবন কথাকে তুলে ধরেছেন।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিষয়ের ঐতিহ্য নিয়ে আবির্ভাব সতীনাথ ভাদুড়ীর। তাঁর 'দাম্পত্য সীমান্তে' গল্পটি প্রেম ও দাম্পত্য সম্পূর্ণমূলক ধারার হলেও এখানে ডাকব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের দেশ পত্রিকায়। পরবর্তীকালে 'জলভ্রমি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের আখ্যানে দেখা যায় - নিবারণ সরকারী চাকুরে। বিয়ের তিন বছর পরে সে অনেক চেষ্টা করে আজবপুর গ্রামের পোষ্ট অফিসে বদলি নিয়ে আসে। আজবপুর পোষ্ট অফিসটি এমনই এক অফিস যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পার্সেল বিলি না হয়ে ফেরত যায়। পোষ্টঅফিসটি –

"সত্যিই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে আসে; এখানকার পোস্ট অফিসে চিঠি ফেলতে আসে।"[১২]

পোষ্টমাষ্টার নিবারণের এরকমই স্থান পছন্দ। নিবারন উপরি উপার্জনের জন্য ডাক ব্যবস্থাকে অস্ত্র করে। কলকাতা থেকে যেসব ভুয়ো পার্সেল আসে সেগুলোর মধ্যে গাঁজা ভরে আবার সেলাই করে ফেরত পাঠায় স্ত্রী অসীমাকে দিয়ে। নিজের লোলুপতাকে চরিতার্থ করতে ডাকব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমকেও হাতিয়ার করতে পিছুপা হয় না।

বাংলা সাহিত্যে যেমন নিবারণের মতো অসাধু পোষ্ট মাস্টারের কথা আছে যারা ডাকব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থতার কাজে লাগিয়েছে। আবার অন্যদিকে রয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' গল্পটির দীনু চরিত্র। যে ডাকহরকরাদের প্রতিনিধি চরিত্র হয়ে উঠেছে। প্রথমে গল্প হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়। ডাকহরকরা দীনু পূর্বে ছিল ডোম। সেখান থেকে সে ডাকহরকরা হয়ে এক হাতে শক্ত করে ধরা বল্লম, অন্য হাতে হারিকেনের কম্পমান শিখার চিমনি নিয়ে ছুটে চলে সরকার বাহাদুরের ডাক নিয়ে। ডাকহরকরাদের জীবনের বর্ণনা লেখকের কথায় –

"ডাকহরকরা মৃত্যুতালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এই গতি তাহাকে বার বার সমানভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পথে এক দন্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 788 - 793
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> বিলম্ব ঘটিলে কি হইবে দিনু কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার ওপর পথে কোথাও ওভারসিয়ার হয়তো লুকাইয়া আছে, কোনো জঙ্গলের মধ্যে কিংবা কোনো গাছের ডালে বসিয়া ডাকহরকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।"[১৩]

সাত বছর ধরে সে সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠাভাবে সে দায়িত্ব পালন করে চলে। ঝড়জলের রাতে পথে ডাকাতের কবলে পড়লেও দীনু দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাকব্যাগটি আগলে রাখে এবং ডাকাতের আঘাতে অর্ধমৃত হলেও দ্বিধাহীনভাবে বলে তারই পুত্র নিতাই সেই ডাকাত। এমন দৃষ্টান্ত ডাক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদর্শ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দিনুর এই সত্যনিষ্ঠতা, আদর্শবাদ তার সংসার জীবনকে ট্র্যাজেডিতে ভরে তোলে। পোস্টঅফিসে দিনুকে সকলেই সম্মানিত করলেও পাড়াপ্রতিবেশীরা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে। দীনু তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য, লোভ সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে ডাক পরিষেবার আদর্শ ও কর্তব্যকে মূল্য দিয়েছে। সে কারণেই দীনুর মতো ডাকহরকরা সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে চিঠির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের হৃদয়ের বেদনাগুলি যেন ডাকবক্সে ফেলা বিচিত্র অনুভূতির রসায়ন। বর্তমানে চিঠির গুরুত্বহীনতা যদি কয়েকযুগ আগেও থাকতো তবে চিঠিকেন্দ্রিক সাহিত্য যেমন - ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি মহৎ সৃষ্টির রসাস্বাদন থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হতাম। এছাড়াও জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দেবীর রচিত 'দাদার চিঠি', কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দেওয়ালী', 'পত্র', 'ছাড়পত্র', 'চরমপত্র' প্রভৃতি কবিতাগুলি এবং সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার - শ্রী চরণেষুমাকে' প্রমুখ লেখা ডাকব্যবস্থার স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩৬৭
২. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, রানার, সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, কলিকাতা, পৃ. ৬৩
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, সুন্দর প্রকাশনী, ১৪২৪, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, কলকাতা, পৃ. ১৭
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬১
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬৯
৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬০, কলিকাতা, পৃ. ২৫১
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, গীতাঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৬
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস (সম্পাদিত), বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র, শুভম প্রকাশনা, ১ জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৭৯
১০. তদেব, পৃ. ২৮৫
১১. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, রানার, সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, কলিকাতা, পৃ. ৬৪
১২. ভাদুড়ী, সতীনাথ, শ্রেষ্ঠগল্প, করুণা প্রকাশণ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৫৮
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ডাকহরকরা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, পৃ. ৩২১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 794 - 801
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে পরিবার পরিজনের প্রভাব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছেলেবেলা’ — একটি আলোচনা

তাপস মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : tapasmandal2511@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath, Dwijendranath, Satyendranath, Hemandranath, Jyotirindranath, Kadambari Devi, Childhood, Relatives, Autobiography, Personality, Chelebela.

Abstract
The Creation makes the creator immortal. But in order to express one’s own story one needs to write an autobiography. Because through an autobiography writer/ author reveals himself/ herself to the readers. So that autobiography is the best way to know the writer/ author deeply and personally. Rabindranath Tagore wrote three autobiographies during his life-span. Those are ‘Jibansmriti’ (1912), ‘Chelebela’ (1940) and ‘Atmaparichoy’ (1943). Rabindranath Tagore wrote the book 'Chelebela' for boys at the request of Nityanandabinod Goswami, the professor of literature of Shantiniketan Vidyalaya. In this book Rabindranath Tagore recollected his childhood. But here he didn’t describe the continuous account of boy Ravi. Instead he reminisced the reasons why Ravi became Rabindranath Tagore. No man can grow alone. One grows up in family and Society. So that the role of environment, society, family and relatives are enormous in the formation of personality. And Rabindranath Tagore is not an exception. In the book ‘Chelebela’ Rabindranath Tagore focused on the history of the boy Ravi's growth in vitality. So as usual the description of farmer Calcutta, the rules and systems of Tagore’s family and relatives brought up in his reminiscence of childhood. In ‘Chelebela’ while Rabindranath Tagore talking about his family specially mentioned his four elder brothers’ — Dwijendranth Tagore, Satyendranath Tagore, Hemendranath Tagore and Jyotirindranath Tagore. However, the contribution of Kadambari Devi is not left out. Ravi’s childhood was spent on a small scale surrounded by servants. But that couldn’t clasp the boy Ravi. The vast experience and the independent thinking of the elders influenced the imaginative mind of boy Ravi little by little. Especially for the boy Ravi becoming Rabindranath Tagore, the education system of Hemendranath Tagore, the philosophy of Dwijendranath Tagore, the modern mentality of Satyendranath Tagore, the musical education and the sense of

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

realism of Jyotirindranath Tagore and the extraordinary personality of Kadambari Devi have been mentioned here.

Discussion

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।"[১]

তবু খ্যাতির বিড়ম্বনায় তাঁকেই বারবার রচনা করতে হয়েছিল আত্মচরিত; একটি নয় তিনটি — 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), এবং 'আত্মপরিচয়' (১৯৪৩)। 'আত্মপরিচয়' হল তথ্যের নির্যাস, যা একান্তভাবে মননশীল মানুষের পাঠের যোগ্য। 'জীবনস্মৃতি' বালক রবির রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার ব্যঞ্জনাময় কাহিনি আর 'ছেলেবেলা' ছেলেদের জন্য বালভাষিত গদ্যে লেখা 'কাহিনী নয় কাকলি'। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী অর্থাৎ গোঁসাইজির অনুরোধে ছেলেদের জন্য কিছু লেখার মানসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটি। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন — মনঃপ্রকৃতি যে বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠে — তারই বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থটিতে। তিনি জানতেন ছেলে মানুষের বৃদ্ধি আসলে তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি; বালক তাকেই হৃদয়ে গ্রহণ করে যা তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে। ছেলেবেলার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বালক রবির কৈশোরপ্রাপ্তির দিনগুলির স্মৃতি এখানে উপস্থিত। বালক রবির কথা বলতে গিয়ে লেখক সেকালের কলকাতা এবং ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের পাশাপাশি বালক রবিকে ঘিরে থাকা পরিবার পরিজনের প্রভাবের কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্র স্নেহধন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

> "রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স একুশ; মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ উনিশ বৎসরের যুবক, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত যাচ্ছেন; পরবর্তী সন্তান হেমেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তেরো। অন্য ভাইদের কথা বললাম না, কারণ এই চার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেবেলা'র স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর— এই চার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্মরণ করেছেন। তবে শুধুমাত্র এই চার সহোদরই নয়, রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে কবির নতুন বউঠান অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবীর প্রভাবের কথাও তুলে ধরেছেন অত্যন্ত মননঋদ্ধ ভঙ্গিমায়।

বালক রবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে ওঠার পিছনে নানা মানুষের ভূমিকা ছিল। তাঁর লেখাপড়ার প্রধান আয়োজক ছিলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলতেন —

> "আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন।"[৩]

রবির পড়াশোনার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তাঁর চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—

> "সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশোনার জাঁতাকল চলছেই ঘরঘর শব্দে। এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা।"[৪]

হেমেন্দ্রনাথ নিজের মতো করে রবিকে শিক্ষিত করার জন্য কুস্তি, অস্থিবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আশৈশব মানুষের স্নেহসঙ্গ বঞ্চিত বালক রবি নিয়মের জাঁতাকলে নিজেকে জুড়ে দিতে পারেননি। তবে বালক রবি যথার্থ উপকৃত হয়েছিলেন এক শিক্ষকের অভিনব শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায়। আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য বুঝেছিলেন লেখাপড়া শেখার প্রচলিত পথে এই বালক রবিকে চালিত করা যাবে না। তাই তিনি 'কুমারসম্ভব' মুখস্ত করিয়ে, 'ম্যাকবেথে'র তর্জমা করিয়ে অভিনব উপায়ে বালক রবির মনে সাহিত্যরস সঞ্চারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভৃত্যরাজক তন্ত্রে বন্দি বড় মানুষদের অদ্ভুত নিয়মের অন্তঃপুর থেকে সদা বিচ্ছিন্ন বালক রবির নিঃসঙ্গ

কল্পনাতুর জীবনে জ্যোতিদাদা আর নতুন বউঠান রস বর্ষণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই দুইজনের সংস্পর্শে বালক রবির জীবনে কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল 'বালক' কবিতার ছড়ার ছন্দে রবীন্দ্রনাথ তা লিপিবদ্ধ করেছেন —

"বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হ'ত তাঁর সাধা।
জুটেছি বউদিদির কাছে ইংরেজি-পাট ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লাল-পেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেন নানান উপদ্রবে।"[৫]

এই কয়েক পঙ্‌ক্তির মধ্যে জ্যোতিদাদা ও বউদিদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সম্পর্ক বন্ধনটি চমৎকারভাবে লোভ্য। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে জ্যোতিদাদার গুরুত্ব বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার ভাষায় বলেছেন —

> "আমার নির্জন বেদুয়িনি ছাদে শুরু হল আর-এক পালা— এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা।"[৬]

শুধু জ্যোতিদাদা নয়, বালক রবির নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর প্রাণশক্তির বিকাশে নতুন বউঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিদাদা উপস্থিত হয়েছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আগে যেখানে বড় ছোটর চলাচলের মধ্যে ছোট সাঁকোটা ছিল না সেখানে জ্যোতিদাদা বালকের আলাপকে অতুলনীয় সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোনোদিনই বালকের প্রলাপকে জ্যাঠামি বলে স্তব্ধ করে দিতে চাননি। তাঁরই আগ্রহে ছাদের ঘরে এসেছিল পিয়ানো। পিয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানো বাজিয়ে সুর তৈরি করতেন আর সেই সুরকে কথার বাঁধনে অক্ষয় করে রাখার দায়িত্ব ছিল বালক রবির ওপরে। বালক বলে জ্যোতিদাদা তাঁকে কখনও অগ্রাহ্য করেননি। বরং সেই প্রশ্রয়ে সুরের সঙ্গে কথা বসানোর কাজে ধীরে ধীরে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ভবিষ্যতের সেই রবীন্দ্রনাথ। যিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর সব কীর্তির মধ্যে স্থান পাবে তাঁর গান। শুধু পিয়ানো বাদনই নয় জ্যোতিদাদা সন্ধেবেলা স্নান সেরে পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে বউঠানের সযত্ন রচিত সুগন্ধ পুষ্পশোভিত ছাদের বাগানে বসে বেহালায় লাগাতেন ছড়ি; বালক রবিকে ধরতে হত চড়া সুরের গান। দাদা ভাইয়ের সেই যুগলবন্দি সুর সূর্য ডোবা আকাশে ছাদ থেকে ছাদে ছড়িয়ে পড়ত। আর একসময় আকাশের কালো পর্দা ছিঁড়ে উঁকি মারতে শুরু করত ঝকমকে তারার দল।

জ্যোতিদাদাই রবিকে ঘোড়া চড়তে শিখিয়েছিলেন। তিনি যখন শিলাইদহে যেতেন তখন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বন্দি বালক রবিকে মুক্তি দেবার জন্য নিয়ে যেতেন পদ্মা পাড়ের উন্মুক্ত প্রসারতার মাঝে। জ্যোতিদাদা শিলাইদহে বসবাসকালে রবির জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া; এবড়োখেবড়ো মাঠে পড়ি পড়ি করে রবি সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে আসতেন। তবে রবি যেদিন কলকাতাতে মেজাজি ঘোড়ার পিঠে চড়েছিলেন সেদিনের ঘোড়ার দৌড়টা মোটেও সুখাবহ হয়নি। পরিণামে ঘোড়া আর সওয়ারের চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার ছিল বাঘ শিকারের নেশা। তাই বাঘ শিকারে যাওয়ার সময় জ্যোতিদাদা সঙ্গী করতেন বালক রবিকে। এই শিকারে গিয়ে রবি শুনেছিলেন বাঘের ভীষণ গর্জন। সেই সঙ্গে আরও একবার দেখতে পেয়েছিলেন খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে এক দুরন্ত বাঘের ছুটন্ত গতি। বলা বাহুল্য এইসব অভিজ্ঞতা বালক রবির জীবনে সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বে রস সঞ্চার করেছিল।

বালক রবির জীবনে জ্যোতিদাদার প্রভাব আরও নানা দিক থেকে দেখা দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বালক রবির সব তর্কের জবাব যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে দিতেন। তিনি বুঝেছিলেন স্কুল পলাতক এই বালকের শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি। সেই জন্য তিনি জমিদারির কাজে শিলাইদহ গেলে বালক ভাইটিকেও সঙ্গে নিতেন। তখনকার দিনের বিচারে ঘটনাটা ছিল বেদস্তুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর বালক ভাইটির আকাশে বাতাসে চড়ে বেড়ানো মন আকাশ বাতাস থেকে পায় মনের খোরাক। এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কারণেই চিৎপুরের সরু গলির বাইরে শিলাইদহের আদি-অন্তহীন প্রসারতার মাঝখানে বালক রবিকে ছেড়ে দিতেন। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই কথা স্বীকারও করেছেন—

> "তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরো উপরের ক্লাসে উঠেছিল, আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।"[৭]

জ্যোতিদাদা শিলাইদহে বাসকালে বালক রবির জন্য বরাদ্দ করেছিলেন দোতলার এমন এক ঘর যার সামনে ছিল মস্ত একটা ছাদ আর লম্বালম্বা ঝাউয়ের সারি। এই বাড়িটি ছিল অতীতের নীলকুঠি। সেই মস্ত ছাদের বাতায়নের পাশে বসেই বালক রবি অতীতের দিনগুলিকে যেন কল্পনায় দেখতে পেতেন। অর্থাৎ জ্যোতিদাদার দেওয়া অবকাশেই বালক রবির মনের পাত্র কল্পনার সুধায় ভরে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। শিলাইদহের এই মনমুগ্ধকর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সুন্দর ভাষারূপ পেয়েছে—

> "একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন্ দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফলনের আমের বোল— ঝরেও গেছে।"[৮]

জ্যোতিদাদার আর একটা গুণ ছিল তিনি অপরের ইচ্ছাকে মান্য করতেন। একবার বালক রবির ইচ্ছা হয়েছিল ফুলের রস দিয়ে কবিতা লিখবেন। এ কথা শুনে জ্যোতিদাদা ছুতোর ডেকে ফুলের রস বের করে লেখার কালি প্রস্তুত করার সমস্ত বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু তার সত্বেও ওই কালি দিয়ে বালক রবির কবিতা লেখা হল না; তবুও তিনি কৌতূহলী বালকটির উদ্দেশ্যে কোনো ভর্ৎসনা বাক্য উচ্চারণ করেননি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত নাট্যকার। ঠাকুর বাড়ির চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদা কফি খেতে খেতে বালক রবিকে তাঁর নিজের লেখা নাটকের খসড়া পড়ে শোনাতেন। শুধু তাই নয় নাটকের অংশ বিশেষে কিছু কথা বা গান জুড়ে দেওয়ার দায়িত্বও দিতেন বালক রবিকে। জ্যোতিদাদার এই উদারতায় বালক রবির আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই বেড়েছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি দুই মহলে বিভক্ত ছিল। পুরুষেরা থাকতেন বাহির মহলে আর মেয়েরা থাকতেন অন্দরমহলে। অভিজাত বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদের কোঠায় ছেলেমানুষদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাই যেদিন বারোয়াঁ সুরে সানাই বেজেছিল, বাড়িতে এসেছিল কচি শামলা হাতের সোনার চুড়ি পরা বউ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী); সেদিন সেই মায়াবী দেশের নতুন মানুষদের কাছে ঘেঁষতে গিয়ে বালক রবিকে খেতে হয়েছিল ধমক। বিরস মুখে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল ছ্যাৎলা পড়া পুরনো ঘরের আড়ালে। তবে যেদিন নতুন বউঠান ছাদের লাগোয়া ঘরের কর্তৃত্ব পেলেন সেদিন পুরো ছাদটাই এল বালক রবির দখলে। শুধু তাই নয় নতুন বউঠানের পুতুলের বিয়ের আসরে প্রধান অতিথির আসন জুটত বালক রবির কপালে। রন্ধন নিপুনিকা এই নতুন বউঠান খাওয়াতেও ভালবাসতেন। তাঁর সখ মিটত স্কুল ফেরত রবির সানুরাগ উপস্থিতিতে। নতুন বউঠানের মেখে দেওয়া পান্তা ভাতের সঙ্গে লঙ্কার আভাস দেওয়া চিংড়ির চচ্চড়ি সেদিন বালক রবির জিভের স্বাদের সাথে সাথে মনের স্বাদও বদলে দিতে শুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী অর্থাৎ বালক রবির নতুন বউঠান আর দেবর রবি হয়ে উঠেছিলেন একে অপরের খেলার সাথী। নতুন বউঠানের সংস্পর্শে এসে এতদিনকার নিঃসঙ্গতা সরিয়ে বালক রবি স্নেহ-কৌতুকে, কপট বিবাদে মানব সম্পর্কের বিচিত্র ধারাকে আস্বাদন করতে থাকেন। নতুন বউঠানের স্নেহসঙ্গ বালক রবির জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, মাত্র কয়েকদিনের জন্য নতুন বউঠান অন্য কোথাও গেলে বালক রবি ভ্রাতৃবধূর কোনো একটা দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করে বলতেন —

> "তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে? আমি কি চৌকিদার!"[৯]

নতুন বউঠান বালক রবির অহেতুক চৌকিদারিত্বের গূঢ় কারণটি হৃদয়ঙ্গম করে রাগ দেখিয়ে বলতেন —

"তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।"[১০]

বালক রবির নতুন বউঠান ছিলেন অত্যন্ত গুণবতী। তিনি প্রয়োজনের বস্তুকেও সৌন্দর্যের আবরণে মুড়ে প্রয়োজনাতীত রস পরিবেশনে সক্ষম ছিলেন। তাঁরই আগ্রহে ঠাকুর বাড়ির ছাদে রচিত হয়েছিল উদ্যান। সেখানে ফুটত বেলফুল, জুঁইফুল, চামেলী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, দোলনচাঁপা। এই ছাদের বাগানে জ্যোৎস্না রাত্রে যখন গানের আসর বসত তখন সেই আসরে নতুন বউঠান রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন বেলফুলের গোড়েমালা; তা ঢাকা থাকত ফুলকাটা রুমালে। সঙ্গে থাকত বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে থাকত ছাঁচি পান। নতুন বউঠান তাঁর সযত্ন ছোঁয়ায় প্রাত্যহিকের বিবর্ণতাকে অনেকটাই ঢেকে দিতেন। দুপুরবেলা জ্যোতিদাদা কাছারিতে বসলে নতুন বউঠান সযত্নে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাজিয়ে দিতেন, সঙ্গে থাকত হাতে গড়া মিষ্টি আর তার উপরে ছড়ানো থাকত গোলাপের পাপড়ি; রুপোর গ্লাসে থাকত ডাবের জল অথবা ফলের রস। কখনও বা থাকত বরফে ঠাণ্ডা করা তালের শাঁস— সমস্ত জলখাবারটা মোরাদাবাদী খুঞ্চেতে সাজিয়ে ফুলকাটা রেশমের রুমালে ঢেকে পাঠিয়ে দিতেন বার মহলে। নতুন বউঠানের সযত্ন আতিথেয়তায় বালক রবি সেই বয়সে প্রত্যক্ষ করেছিলন কীভাবে সাধারণকে অসাধারণ করে তোলা যায়। মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যখন হাওয়া বদলের জন্য গঙ্গার ধারে বাগানে যেতেন তখন সঙ্গে নিতেন বালক রবি ও রবির নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীকে। গঙ্গার ধারের দোতলা বাড়িতে বসে রবি দেখেছিলেন গঙ্গার বুকে কালো মেঘের ঘনিয়ে তোলা ছায়া; উপরে কালো মেঘের রাশি নিচে গঙ্গায় ঢেউ উঠছে। সেদিনের এই অভিজ্ঞতাকে করুণ বিরহের রাগিনীতে ভরে নিতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রয় করেছিলেন বিদ্যাপতির একটি পদে—

"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"[১১]

পরে জ্যোতিদাদা বাসা বদল করেছিলেন মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা যেন রাজবাড়ি। রঙীন কাঁচের জানালা দেওয়া ঘর, মেঝে মার্বেলে মোড়া; গঙ্গা থেকে সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। সেই বারান্দায় চাঁদনী রাতে রবির মনে যেন ঘোর লাগত। মোরান সাহেবের বাগান বাড়ির বকুলতলায় প্রায়ই বসত চড়ুইভাতির আসর। নতুন বউঠান নানা ব্যঞ্জনের স্বাদ দিতেন বালক রবির রসনায়। রসনার পথেই বালক রবির হৃদয় সরস হয়ে উঠত। এই কারণেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ নববধূকে পরামর্শ দিতে ভুলতেন না —

"পাক প্রণালী'র মতে করো তুমি রন্ধন
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।"[১২]

আমরা একটু ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারব তুচ্ছ গল্পকথার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, নতুন বউঠানের সংস্পর্শে তাঁর শুধু মানব পিয়াসী মনের মরুতা দূর হয়নি। স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে, তাঁর চিত্তও পুলকিত হয়ে উঠেছিল। নতুন বউঠান বালক রবির সাহিত্য চর্চার সঙ্গী হতেন ঠিকই কিন্তু বালক রবির রচনাকে তিনি কখনোই প্রশংসায় ধন্য করতেন না। কাদম্বরী দেবীর কাছে বিহারীলাল চক্রবর্তী ছিলেন আদর্শ লেখক। বিহারীলালের তুলনায় বালক রবির সাহিত্য সৃষ্টিকে অকিঞ্চিৎকর বলে হয়তো বা এই বুদ্ধিমতী বধূটি প্রতিভাবান বালক দেবরের মধ্যে ঈর্ষা জাগ্রত করে সার্থকতর রচনার পরোক্ষ প্রেরণা যোগাতেন। সুতরাং পারিপার্শ্বিক সমস্ত দিক বিবেচনা করে একথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে না যে, রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে কবির নতুন বউঠান অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর প্রভাব ব্যতীত তিনি আদৌ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে উঠতেন কি না তা ভেবে দেখার বিষয়।

বালক রবির রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার পিছনে ঠাকুর বাড়ির যেসব মানুষের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অন্যতম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বভাবে ছিলেন খেয়ালী মানুষ। দর্শনের নানা গভীর তত্ত্ব নিয়ে তিনি সর্বদা মগ্ন থাকতেন। কাউকে ধরে বেঁধে তত্ত্বকথা শোনানোর জন্য তাঁর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। তাই তাঁর ফাঁদে সহজে কেউ পা রাখতে চাইতেন না। অথচ বালক রবি অনেক সময়ে এই ঋষিতুল্য মানুষটির সহিষ্ণু শ্রোতা ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় নিয়মিত ঝরে পড়ত আনন্দের নির্ঝর ধারা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'স্বপ্নপ্রয়াণ' পড়তে পড়তে তিনি উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়তেন। এই ঋষিতুল্য মানুষটির সদানন্দ জীবনবোধেই বালক রবির অস্তিত্বের মধ্যে আনন্দবোধের উৎসারণ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ জিজ্ঞাসা ও বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসা পূরণে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অনুভব করা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন সুদক্ষ সাঁতারু। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং উৎসাহে বালক রবি সাঁতারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। সাঁতার শিক্ষার সেই বর্ণনা রবীন্দ্র দৃষ্টিতে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে —

> "বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এ পার-ও পার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চারদিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না।"[১৩]

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবল ভাবে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বিষয়েই ছিলেন সেকালের মানসিকতার তুলনায় প্রগতিশীল। এই তরুণ সিভিলিয়ানটি সেকালের প্রচলিত রীতি এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বাড়ির বধূকে অর্থাৎ নিজের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে সেদিনকার মানুষদের হতভম্ব করে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ির চিরকালীন প্রথা ভাঙতে তাঁর বিন্দুমাত্র সাহসের অভাব হয়নি। আপাত দৃষ্টিতে রবীন্দ্র জীবনের সঙ্গে এই ঘটনা সম্পর্কহীন মনে হলেও বালক রবির মনে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ আমরা দেখেছি তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণাল পরিবারের অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। মৃণালের এই স্পর্ধিত কার্যক্রমের পিছনে ঠাকুর বাড়ির নতুন কালের বউ জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাব থাকা সম্ভব বলেই মনে করা যেতে পারে।

জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথ লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালক রবিকে সমাজ ও পরিবারের পক্ষে উপযোগী করে তোলবার জন্য ইংল্যান্ডে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে বিলাতি চালচলনের গোড়া পত্তনের জন্য আপন কর্মক্ষেত্রে আমেদাবাদে রবিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নতুন পরিবেশে প্রতি পদক্ষেপে অনভ্যস্ত সৌজন্য ও শিষ্টাচার কিশোর রবিকে প্রায়শই ক্লেশ দিত। ফলে কিশোর রবি অন্যপথে নিজের মুক্তি খুঁজে নিয়েছিলেন। জর্জসাহেব থাকতেন আমেদাবাদের সাহীবাগে বাদশাহী আমলের এক রাজবাড়িতে। সঙ্গীহীন অবস্থায় এখানে রবির দিন কাটত ক্লেশকর নিঃসঙ্গতায়। তাই নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে বালক রবি শাহীবাগের এই রাজপ্রাসাদের নিকট বিরাট শূন্য ঘরে আলোছায়ার রহস্যময় আল্পনা দেওয়া অলিন্দপথে ভূতগ্রস্থের মতো ঘুরে বেড়াতেন। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে ইতিহাসের চেহারা দেখবার সুযোগ রবির জীবনে আসেনি। কিন্তু শাহীবাগের এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে রবির মনে হত চলতি ইতিহাস যেন থেমে গেছে; শুধু—

> "দেখা যাচ্ছে তার পিছন ফেরা বড়ো ঘরোআনা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পোঁতা।"[১৪]

সেই নির্জন দুপুরে পুরনো ইতিহাসের হাড় বেড়করা কাঠামোর উপর কল্পনার মুখোশ আর মুকুট পরিয়ে নিয়েছিলেন বালক রবি। সেখানেই রোপন করা হয়েছিল 'ক্ষুদিত পাষাণ'-এর বীজ। আমরা বুঝতে পারি নিঃসঙ্গ বালক রবি আমেদাবাদের দিনগুলিতে ইতিহাস আর কল্পনার মিশেলে তৈরি এক রহস্যময় জগতের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলেন। ওই জগতের রস তাঁর সত্তার গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে ইতিহাস আর কল্পনার সহাবস্থান ঘটেছিল। তবে আমেদাবাদের দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ ধারণা ছিল রবির বিদেশ যাত্রার আগে দেশের মাটিতে বিদেশের রস সঞ্চার করতে পারে এমন ছেলে মেয়ের সঙ্গে রবিকে মিলিয়ে দিতে পারলে রবির মন হয়ে উঠবে সজীব। সেই মতো রবিকে চলে যেতে হয়েছিল বোম্বাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের বাড়িতে। আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা আন্না তড়খড় 'পড়াশোনা ওয়ালা মেয়ে'; বিদেশ থেকে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা। বালক রবি এই আন্না তড়খড়ের কাছেই ইংরেজিয়ানার মক্‌স করেন। এই ব্যবস্থায় রবির ইংরাজি শিক্ষার উন্নতি কতটা হয়েছিল তা

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়। তবে ততদিনে বালক রবির নতুন শিক্ষয়িত্রীটির কাছে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে বালক রবির কবিত্ব সত্তাটি। ফলত স্বাভাবিকভাবেই আন্না তড়খড় সুদর্শন এই বালক কবি রবির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বালক কবিও যে নতুন শিক্ষয়িত্রীর প্রতি একই আকর্ষণ অনুভব করতেন তা বলাই বাহুল্য। আন্না তড়খড় রবির কাছে তাঁর একটি নতুন নাম প্রার্থনা করলে বালক রবি শুধুমাত্র 'নলিনী' নামটি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; অসাধারণ কবিত্ব বলে ওই নামটি গেঁথে দিয়েছিলেন একটি সুন্দর কবিতায় —

"শুনো নলিনী, খোলো গো আঁখি —
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!
দেখো, তোমারি দুয়ার- 'পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি।।..."[১৫]

পুঁথিগত বিদ্যায় হার মানা এই সদ্য কিশোর কবি তাঁর নতুন শিক্ষয়িত্রীকে শুধুমাত্র নাম নয়, ভৈরবী সুরের গানও দান করেছিলেন। তরুণ কবির কণ্ঠস্বর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন —

"কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরনদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"[১৬]

এই নারীই প্রথম রবির গানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গাছে বসা পাখিকে চিনে নেবার আগে উড়ে গেলেও যেমন তার সুরের ঢাকনা খানা স্মৃতির উপর বিছিয়ে দিয়ে যায় তেমনি রবির জীবনে এই ক্ষণিকের অতিথি স্মৃতির বসনে বুনে দিয়েছিল ফুলকাটা কাজের পাড়। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবস্থাতেই এই স্বীকৃতি মিলেছিল বলেই রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রভাব প্রসঙ্গে আন্না তড়খড়ের কথা আপনা থেকেই চলে আসে।

'ছেলেবেলা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু বালক রবি আর রচয়িতা প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এ যেন পথ চলতি পথিকের ফিরে ফিরে দেখা আর নিজের চোখের আলোয় নিজেকে আবিষ্কার করা। জীবনের বহু ঘাট পেরিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ এক সফল কীর্তিমান মানুষের স্বীকৃতি পেয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ যেন স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আপন জীবনের অবসিত পর্বের মধ্য থেকে এই সফল মানুষটির প্রাণ শক্তির পথে পুষ্টিকর উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সহজ গল্পের ছলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর প্রকৃতি প্রেমের উৎসটি কোথায়? অথবা পারিবারিক আবহ থেকে সংগীত চর্চার রসদ কীভাবে মিলেছিল? — তারই বর্ণনা। তাঁর এই বর্ণনা থেকে এই আভাস বিচ্ছুরিত হয় যে, প্রিয়সঙ্গ বঞ্চিত হওয়ার দরুন নিঃসঙ্গতার সূত্রে বালক রবি হয়ে উঠেছিলেন অন্তর্মুখীন। আবার এই নিঃসঙ্গতা এবং অন্তর্মুখীনতা বালক রবিকে করে তুলেছিল কল্পনাপ্রবণ। ইঁট কাঠের স্কুলে অর্থাৎ দশটা চারটার আন্দামানে বাঁধা গতের শিক্ষা বালকটি পাননি বলে তাঁর মনের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়নি। বরং বলা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষদের স্নেহসিক্ত সঙ্গ ও প্রশ্রয় পেয়েছিলেন বলেই বালক রবির মনের দিগন্ত নিঃসন্দেহে বর্ধিত হয়েছিল। সুতরাং বালক রবির ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং ঘটনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঠিক তেমনি রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার পরিজনের প্রভাবও সুদূরপ্রসারী।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'উৎসর্গ', পুনর্মুদ্রণ: চৈত্র ১৩৯৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০১৭, পৃ. ৪৫

২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবনকথা', দ্বাদশ মুদ্রণ চৈত্র ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৫

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা', পুনর্মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, পৃ. ১৭

৪. তদেব, পৃ. ৩১

৫. তদেব, 'বালক কবিতা'

৬. তদেব, পৃ. ৪৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. তদেব, পৃ. ৫৪-৫৫
৮. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬
৯. তদেব, পৃ. ৪৯
১০. তদেব, পৃ. ৪৯
১১. তদেব, পৃ. ৬৩
১২. 'রবীন্দ্ররচনাবলী', ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ১৯৫৮, বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ১৩
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭
১৪. তদেব, পৃ. ৬৯
১৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবনকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 802 - 809
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত রবীন্দ্র গীতিনাট্যে সঙ্গীতের সমাবেশ

ড. মৌসুমী পাল
ফ্যাকাল্টি মেম্বার, বাংলা বিভাগ
ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
Email ID : paulmousami77@gmail.com
ও
ড. মহুয়া রায়
সহকারি অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
Email ID : mahuaagartala45@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Literature, Folk song, Ballad, Drama, Western music, History, Rabindra Sangeet.

Abstract

Rabindranath Tagore was a Bengali poet, writer, composer, philosopher, social reformer who wrote in many literary genres. He was the first poet who wrote successfully in all areas of literature. His poetry, Novel, songs, dance, drama has made the Bengali literature rich. Among Tagore's popular works the geetimalya or opera plays an important role in Bengali literature where Rabindra Sangeet has acquired a valuable place. Songs written by Tagore have added an immense beauty to the musical operas. Geetinatya rooted in India's history is a theatrical performance or musical play that emerged during the period of cultural fusion between Bengali and western traditions. Rabindranath Tagore exemplified Geeti Natya in his own writings, highlighting it's significance in the cultural landscape. Rabindra Sangeet is a wide range of songs that cover a variety of themes and are influenced by music from various styles around the world. Some songs have been taken from folk origin and some songs are being composed of folk tunes. Tagore's compositions include topics like humanism, structuralism, introspection, psychology, romance, yearning, nostalgia, reflection and modernism, offering melody for every season and every season and every aspect of Bengali life. During his travel to foreign Countries he came into contact with different musicians of west and south part of the world. As a result the western style has been incorporated into Rabindra Sangeet. Afrer returning home he has written the first Geetinatya Balmiki Pratibha and after that kaal mrigaya and mayar khela. In these operas he has played several songs which belong to the western origin. Apart from these Tagore has composed many songs from folk music. So

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

in this chapter our endeavour will be to focus on the songs that are sung in geetinatya.

Discussion

সাহিত্যের বৈচিত্রময় প্রকাশ বা অবিব্যক্তির মধ্যে নাটকের একটি বিশেষ রীতি ও ধর্ম আছে। তবে নাটকের পাশাপাশি কবিতার তথা সংগীতের যে একটি অনুভূতিময়- মনোরম জগৎ রয়েছে, সে কথা অনস্বীকার্য; আর সংগীতের এই আনন্দময় জগৎ প্রাধান্য পায় শুধুমাত্র কবি মনের ভাব-কল্পনা ও অনুভূতি। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে কহিনির বর্ণন ও পাত্র-পাত্রীর মনোবিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকের যে অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে; নাট্যকারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই স্বাধীনতা থাকে না। সংকীর্ণ পরিসারে অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিবেশে নাটকের মূল কাহিনি ও তত্ত্বকে দর্শকের সম্মুখের পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করা এক অন্যরকম উচ্চাঙ্গ মার্গের কলা। আসলে নাটকে কল্পনা বিলাসের কোনো স্থান থাকে না বলে এটি সাহিত্যের এক অন্য রকম বিশেষ ঘরাণা। আসলে নাটকের প্রাণই হল বস্তুধর্মী ও প্রত্যক্ষ ঘটনার প্রবাহ। আর সংগীত হল শাস্ত্রে বর্ণিত চৌষট্টি প্রকার কলা বা শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা। 'বৈদিক যুগে আর্য ঋষিগণ কর্তৃক সৃষ্ট চতুর্বেদের মধ্যে সাম বেদে সংগীত বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে'।[১] সঙ্গীত বলতে বোঝায় গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয় এবং গীত হল এক ধরেনের শ্রবণ যোগ্য কলা যা সুসংবদ্ধ শব্দ ও মধুর শুরের মাধুর্য্যে মানব চিত্তে বিনোদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। সংগীতের বেশ কিছু ধরন রয়েছে যেমন - শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, প্রভৃতি। বাংলা সঙ্গীত বাংলার প্রাচীন ধর্মীয়, ধর্মনিরপেক্ষ, দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব ও ইতিহাস নির্দেশ করে।

আমাদের ভারতীয় নাট্যের উদ্ভব ধর্মের আশ্রয়েই ঘটেছিল। ভরতের নাট্য শাস্ত্রেও নাটককে তাই বলা হয়েছে 'পঞ্চম বেদ'। বাংলার নাট্য সাহিত্যে ইউরোপীয় রোমান্টিক নাটক (বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক) অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। গিরিশ ঘোষ – দ্বিজেন্দ্রলাল – ক্ষীরোদপ্রসাদ – দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যের এই অতুলনীয় বিখ্যাত সব নাট্যকারগণ প্রত্যেকই এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বলতম জ্যেতিষ্কদের কিছুটা সমগোত্রীয় এবং সমকালীন হলেন বাঙালী কবি তথা ভারত এবং পুরো বিশ্বে সাহিত্যের অন্যতম বক্তিত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা শুধুমাত্র নাটক বা সাহিত্য জগৎকেই নয়, ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-সংগীত-নৃত্য-শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত দিকেই তাঁর অবদান আমাদের জীবনের আলোর দিশারী। তবে আলোচনার শুরুতেই বলে নেয়া আবশ্যক যে, রবীন্দ্র প্রতিভা বা রবীন্দ্রসাহিত্য মূলত সংগীত ধর্মী। স্বতন্দ্রধর্মী আত্মভাব মূলক গান বা গীতি কবিতাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র। বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন রকম সুরে সমৃদ্ধ অজস্র গীত শৈলী রয়েছে, যার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক উন্নত স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সঙ্গীতের এই প্রসিদ্ধ ধারাটির এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে, বাংলার এমন কোনো পরিবার নেই যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা বা গাওয়া হয় না। বাঙ্গালীরা মনে করে যে বাঙালি হৃদয়ে এমন কোনো আবেগ বা অনুভূতি নেই, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো সঙ্গীত রচনা করেননি। সাধারণত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাতটি পর্যায়ে বিভাজন করা হয়ে থাকে যথা- প্রেম পর্যায়, পূজা পর্যায়, প্রকৃতি পর্যায়, স্বদেশ পর্যায়, বিচিত্র পর্যায়, আনুষ্ঠানিক ও নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সব থেকে আকর্ষনীয় বিষয় হল যে, এই সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, কীর্তনাঙ্গ বাউল ও শ্যামাসঙ্গীতের প্রভাবের পাশাপাশি রয়েছে অভিজাত্য পূর্ণ বিদেশী সঙ্গীত বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব। আসলে সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে শৈশবকাল থেকেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে অর্থৎ তাঁর শৈশব কালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ধ্রুপদ গানের খুবই চর্চা ছিল। নানান উৎসব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সকল গান গাওয়া হতো তার অধিকাংশই ছিল ধ্রুপদ গান ও ধামার। শিশুরাও এই ধ্রুপদ গানের চর্চা করতো, এই জন্য ধ্রুপদাঙ্গের ব্রম্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহির্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় উপাসনা গৃহে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারায় ব্রম্মসঙ্গীত চালু হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অন্যান্য বাংলা গানেরই চর্চা হতো না বরং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই হিন্দুস্তানী সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি সমৃদ্ধ ভান্ডারের অনেক মনি-মুক্তাই সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটকের ছত্রে ছত্রে। রবীন্দ্রনাথের রচিত বিভিন্ন নাটকগুলিকে আমরা নিম্ন লিখিত ভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি। যথা -

ক. গীতি নাট্য – বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কাল মৃগায় (১৮৮২), মায়ায় খেলা (১৮৮৮)
খ. কাব্যনাট্য – প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৯০), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২)
গ. নাট্যকাব্য - বিদায় অভিশাপ (১৮৯২), গান্ধারীর আবেদন (১৯০০), সতী (১৯০০), নরকবাস (১৯০০), কর্ণকুন্তী সংবাদ (১৯০০), লক্ষীর পরীক্ষা (১৯০০)
ঘ. প্রহসন - গোড়ায় গন্দ (১৮৯২), বৈকুন্ঠের খাতা (১৮৯৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯৩৬)
ঙ. রূপক সাংকেতিক ও তত্ত্বমূলক নাটক : শারোদৎসব (১৯০৮), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফালগুণী (১৯১৬), মুক্তাধারা (১৯২২), রাজা (১৯১০), রক্তকরবী (১৯২৮)
চ. সামাজিক নাটক : শোধবোধ (১৯২৬), বাঁশরী (১৯৩৩)
ছ. নৃত্যনাট্য : নটীর পূজা (১৯২৬), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬, চন্ডালিকা (১৯৩৫), শ্যামা (১৯৩৯)

কবিগুরু শুধুমাত্র নাটকের কাহিনীর উপরই বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেননি, বরং গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্য গুলিতে নৃত্য ও গীতের সমন্বয় ঘটিয়ে এক উচ্চাঙ্গমাত্রার কলার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) রচনার পেছনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সঙ্গীতময় পরিবেশ, বিহারীলালের সারদামঙ্গল ও কবির ইয়ুরোপ ভ্রমনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকার পাশাপাশি স্বর্ণকুমারী দেবী ও জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গীতিনাটক 'বসন্ত উৎসব' (১৮৭৯) ও 'মানময়ী' (১৮৮০)-এর প্রভাবও অনস্বীকার্য।

> "রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে যেমন সুরের তেমনি ভাষা ও ছন্দের কত নূতন পরীক্ষা করিয়া কোথায় উর্ত্তীণ হইয়াছেন, সে বিষ্যে যথাকালে অনুসন্ধান ও অলোচনা হইবে আশাকার যায়।"[৩]

কবিগুরু নাটকের বিভিন্ন তত্ত্ব ভাবনা বা মূল বক্তব্যকে বিভিন্ন সঙ্গীতের আশ্রয়েই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তাঁর নাটকগুলিতে। নাটকের গভীর তত্ত্ব, আবেগ ও ভাবকে আরও প্রবল ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সঙ্গীতের। নাটকে সঙ্গীতের এহেন প্রয়োগ দর্শকের বা মানুষের মনে শিহরণ জাগাতে সক্ষম। মনের ভাবকে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে বলা হয় গান; আর এই গান যখন মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠে, তখনই সৃষ্টি হয়ে যায় নাটকের, অর্থাৎ সঙ্গীত নাটককে মনমুগ্ধকর করে তোলে। তবে রবীন্দনাথ ঠাকুরের এই তত্ত্বচিন্তা সমৃদ্ধ সঙ্গীত সমূহের সঠিক তাৎপর্য উপলদ্ধি করার জন্য রবীন্দ্রনাথের অন্তর মননের নিবিড় ভাবনা ও তাঁর আধ্যাত্মচেতনা উভয়ই উপলদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রায় ২৫০০ গানের মধ্যে আনুমানিক প্রায় ২৩৮ টি গান রচিত হয়েছে অন্য সুরকে অবলম্বন করে যা সাধারণ ভাঙ্গ গান নামে পরিচিত। সাধারণ অর্থে বলে যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল উৎস হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঠুমরি শৈলী, তবে কর্ণাটক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাংলা লোকসঙ্গীত, এমনকি ইংরেজী ব্যালাড ও স্কটিশ লোকগীতিও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে। নাটকে যখন সঙ্গীতের সমাবেশ ঘটে তখনই সৃষ্টি হয় গীতিনাট্যের। গীতিনাট্য সম্পূর্ণ ভাবেই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বিদেশী সুর অভ্যাস করে দেশে ফেরার পর কবিগুরু রচনা করেছিলেন গীতিনাট্য 'বাল্মিকি প্রতিভা' (১৮৮১)-র। বাল্মিকী প্রতিভার মূল আখ্যানভাগ কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিলেন; ইহার করুনরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনকেটা অংশ বাল্মীকি প্রিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়েছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"[৪]

'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) কবিগুরুর প্রথম গীতিনাট্য, যার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের জগতে গীতিনাট্যের সূত্রপাত হয়। এই নাটকের আখ্যানে মূল বাল্মিকী রামায়ণ নয়, বরং কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণের সূচনা অংশ থেকে কিছুটা কাহিনি নিয়ে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনার ও অনুভবের মাধুরী মিশ্রিত হয়েছে। এই নাটকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণে নতুন এক সংগীত ঘরাণার সৃষ্টি করে তোলেছেন। এই নতুন ধরনের নাটকের উপস্থাপনে পাত্র-পাত্রীর কোনো সংলাপ নেই; নাটক মঞ্চস্থ হয় শুধু মাত্র সুর ও ছন্দের মাধ্যমে আসলে সঙ্গীতই এর প্রাণ। দেশি ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। -

> "বাল্মীকী প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নুতন পরীক্ষা – অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি – প্রতিভা তাহা নহে – ইহা সুরে নাটিকা।"[৫]

'বাল্মিকী প্রতিভা' প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি উৎসাহিত হয়ে 'কাল মৃগয়া, (১৮৮২) নামক গীতিনাট্যের রচনা করেন। এই গীতিনাট্যের বিষয়ও ছিল রামায়নে বর্ণিত রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুবধ। এই গীতি নাট্যের আঙ্গিক গঠন করা হয়েছিল গানের সূত্র দিয়ে। বলাবাহুল্য যে, এই নাটকের প্রতিটি লাইনেই তিনি বিলাতি সুরকেও নিজস্ব ভঙ্গিতে ও মৌলিকতায় মিশিয়ে নাটকটিকে মাধুর্যপূর্ণ করে তোলেছেন এই নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলি হল - অন্ধ ঋষি, ঋষিকুমার, দশরথ, লীলা, বনদেবীগণ (৪ জন), বনদেবতা, শিকারীগণ (৩ জন) ও বিদূষক। এই গীতিনাট্যের সংগীত গুলির পার্যালোচনার পূর্বে এর কাহিনী অতি সংক্ষেপে জেনে নেওয়া আবশ্যক মনে হয়। নাটকটির শুরুতেই দেখা যায় অন্ধ ঋষি তাঁর পুত্রকে পিপাসা নিবারকের উদ্দেশ্যে জল নিয়ে আসার আজ্ঞা করেন। গভীর রাতের ভয়ানক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সত্যেও ঋষিকুমার পিপাসা নিবারণ হেতু সরযূ নদীতে যান জল সংগ্রহ করতে। এদিকে মহারাজ দশরথ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলে হরিণ শাবক ভেবে বাণে বিদ্ধ করেন ঋষিকুমারকে। অতঃপর মহারাজ পুত্রের মৃত দেহ নিয়ে অন্ধমুনির সন্মুখে আসলে গভীর বেদনায় জর্জরিত হয়ে তিনি দশরথকে পুত্রশোক অভিশাপ দেন। অবশ্য পরবর্তীতে দশরথের করুণ আকুতিতে অন্ধ ঋষি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। ছয়টি দৃশ্যে বর্ণিত 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে কিছু কালজয়ী জনপ্রিয় সংগীত রয়েছে যার সুর বিদেশী সংগীত থেকে গৃহিত হলেও এর আঙ্গিক কিন্তু মূল ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ। 'কালমৃগয়া'-র বর্ণিত বিষয়বস্তুকে নাট্যকার দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। আসলে ভাষা আর ভাবে যা প্রকাশ করা কঠিন হয়ে উঠে, তাই প্রকাশ করার সহজ মাধ্যম হল সঙ্গীত। সঙ্গীতে শব্দও ভাষার দ্বারা যেমন বক্তব্যের মূল তাৎপর্যকে তুলে ধরা যায়, তেমনি সঙ্গীতের সুরের মাধ্যমে ভাব ও ব্যাকুলতাকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা যায়। আসলে ভাষা ও সুরের সংযোজন ঘটিয়ে যে নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি করেছিলেন তা গীতিনাট্য নামে বিশ্ববিখ্যাত। গীতিনাট্য হল পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি খুবই জনপ্রিয় গীতি নির্ভর নাটক যার জন্ম ইতালিতে। পরবর্তী সময়ে ইতালী থেকে ছড়িয়ে পরে সমগ্র ইউরোপে। বাংলার গীতি নির্ভর নাটকগুলিই গীতিনাট্য, যা ইউরোপে অপেরা নামে পরিচিত।

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে ব্যবহৃত অনেক গানের সুর যেমন লোকসংগীত থেকে নেওয়া হয়েছে, তেমনি অনেক গানের মূল সুরের আধার ছিল বিদেশী বা পাশ্চাত্য সঙ্গীত। আসলে ইউরোপ থেকে ঘুরে এসেই তিনি এই গীতিনাট্য রচনায় ব্রতী হন বলেই এতে বিদেশী গানের সুরের আধিক্য; রয়েছে, যেমন 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', 'সখিলো ফুরালো ইত্যাদি বিভিন্ন গানের বিদেশী সুরই মূল আধাঁর। আসলে কবিগুরু তাঁর মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় বিদেশী বা পাশ্চাত্য সুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মেঝদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানু বাজিয়ে বিলাতী সুরের চর্চা করতেন এবং তাতে কথা বসাতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর বিলাত গিয়ে কবি ম্যূরের আইরিশ মেলডিজ এর গান লিখলেন অন্যান্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিলাতী সুরের সাহায্যে, যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি। এই নাটকগুলিতে সংযোজিত হয়েছে যে সঙ্গীতগুলির – সেগুলি সৃষ্টি হয়েছে আসলে বিদেশী সুরের আদলে। কবিগুরুর লেখা গানের মধ্যে – 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে', 'আমি চিনি গো চিনি', 'আনন্দলোক মঙ্গলালোক', 'প্রাণ ভরিয়ে', 'ক্লান্তি আমার', 'তোমার হল শুরু', 'ফুলে ফুলে'- প্রভৃতি আরও অনেক গান রয়েছে, যেগুলি রচিত হয়েছে বিদেশী বা পাশ্চাত্য সুরকে কেন্দ্র করেই। ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন বিভিন্ন বিদেশী সুরের দ্বারা। এই সব বিদেশী সুরের সাথে বিভিন্ন দেশীয় সুরের সংমিশ্রন ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যেগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভান্ডাকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। তাই এই সঙ্গীতগুলির অভ্যাসের মাধ্যমে একদিকে যেমন রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র ভাবনা ও মননের উপলব্ধি আসে, ঠিক তেমনি আবার আমরা দেশীয় সুরের পাশাপাশি বিদেশী সুর সম্পর্কে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য তৈরী হয়। তাছাড়া তাঁর রচিত বিভিন্ন গানে আমরা আধ্যত্মিকতার পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও আবেগগুলিকেও নিজেদের জীবন চর্চার সঙ্গে একান্ত করে নিতে পারি। 'কালমৃগয়া' ব্যবহৃত কয়েকটি গানের মূল সুর ও কথা এখানে তুলে ধরা হল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত	তাল	মূল বা উৎস সঙ্গি
১. ফুল ফুল চলে চলে	খেমটা	Ye banks and braes
২. সখিলো ফুরালো	একতাল	Rabin Adair
৩. মানা না মানিলি	ত্রিতাল	Go where glory wait Thee
৪. ও দেখবি রে ভাই	খেমটা	The viear of Bray

আসলে কবির যে গীতিধর্মী প্রতিভা, তা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার কাব্যে বা গানে। তবে নাটকে এই প্রতিভা একটু ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্রমপরিণতির ইতিহাস, কবি মানুষের এবং চেতনার জগতের ক্রমপরিণতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কবি মানস এক একটা স্তরে এক একটা বিশিষ্ট ভাবচক্রের মধ্যে অবস্থান করে। আবার তা অতিক্রম করার জন্য ভাবগন্ডীতে প্রবেশ করছে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিশেষ বিশেষ ভাবের অনুভূতি সেই সময়ের রচিত নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কাল মৃগায়' প্রভৃতি রচনা কালে কবি সদ্য বিলাত থেকে ফিরেছিলেন, নিজের জীবনের অভ্যস্ত গন্ডী, ঘরের নির্দিষ্ট আবহাওয়া ত্যাগ করে বিদেশে বহু গুনী জনদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দ্বারা মানুষে মানুষে সম্পর্কের স্বরূপের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করেছিলেন এবং নাটকে সেই অভিব্যক্তি ও অনুভূতির প্রতিফলন করেছিলেন বিভিন্ন গানের মাধ্যমে।

আসলে কোনো জাতির সংস্কৃতির ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড প্রকাশ ও নির্ভর করে সেই জাতির কবি ও সাহিত্যিকদের ওপর। একজন কবি মানব সভ্যতার আলো, তাঁদের সৃষ্টি মানুষকে জ্ঞান দেয়, আলো দেয় আর, দেয় আনন্দ। নাটক ও সঙ্গীত এই আনন্দ প্রদানের প্রধান মাধ্যম। আসলে নাট্যমূল্যের দিক থেকে বা সাহিত্য মূল্যের দিক থেকে 'বাল্মিকী প্রতিভা' বা 'কালমৃগয়া'-র আলাদা ভাবে কতটা মূল্য রয়েছে সেই তাকে না গিয়ে একটা কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, নাটকে সঙ্গীতের স্বার্থক প্রয়োগ বা মানব মনের অভিব্যক্তির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের মাধ্যম যে সঙ্গীত হতে পারে এবং অনায়াসেই সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শকদের সন্মুখে নাটকের মূল সুর বা আদর্শকে তুলে ধরা যেতে পারে, সেই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যগুলিতে। যার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে সাহিত্য জগতে, বিশেষত নাট্যজগতে। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছে –

> " 'বাল্মিকী প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিন্তু রচনা করি নাই। ঐ দু'টি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীত উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।"[৬]

তবে একথাও সত্য যে সময় যত এগিয়েছে, আঙ্গিকে – গীতিতে – রূপে – রসে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্য নাট্যগুলির আবেদন ও প্রকাশ ক্রমশ গভীরতর ও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। যার পরিপূর্ণ পর্যালোচনা মনে হয় এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

কারণ মানব হৃদয়ের অনুভূতির বিকাশ ও পরিবর্তনের পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যের আবেদন ও অর্থ যে কীভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে উঠে উঠেছে, তার পুর্ণাঙ্গ স্বরূপ এখনও উদঘাটিত হতে পারেনি।

'মায়ার খেলা' ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তার আর পুনর্মূদ্রণ হয়নি, বর্তমানে অচলিত সংগ্রহের প্রথমখন্ডই এর স্থান। 'জীবন স্মৃতি'তে কবিগুরু নিজেই বলেছেন – 'নলিনী' গদ্য নাট্যকেরই রূপান্তর এই গীতিনাট্য। এখানে রবীন্দ্রভাবনার ও প্রেমানুভূতির প্রকাশ প্রতিফলিত হয়েছে সুরে সুরে। এই নাটক রচনার সময় কবি 'মানসী' কাব্যের অনুভূতির জগতে বিচরণ করছিলেন। প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলদ্ধির জন্য ভোগবাসনার পরিত্যাগ কতটা প্রয়োজন, সে বিষয়ে কবির অনুভূতি 'মানসী' কাব্যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। 'আজি এ বসন্ত', 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম' – এই প্রতিটা গীতেই প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আসলে 'মায়ার খেলা' গীতি নাট্যেই যথাযথ ভাবে রবীন্দ্রসংগীতের জোয়ারে শ্রোতা বা দর্শকদের হৃদয় অনুভূতির প্লাবনে বয়ে গেছে। এই গীতিনাট্যের প্রায় প্রতিটি গানেই রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভা এবং সংগীত প্রতিভার স্বার্থক সমন্বয় ঘটেছে। 'মায়ার খেলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন –

> "'মায়ার খেলা' বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতি মুখ্য। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সুত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরন। বস্তুত মায়ার খেলার যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসে সমস্ত মন অভিসিক্ত হইয়া ছিল।"[৭]

'মায়া খেলা' গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়েছিল। তখনকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাও এই নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রসংশা কুড়িয়েছিলেন। ইউরোপীয় ও দেশীয় বিভিন্ন সুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি এই নাটকের সংগীত গুলির রচনা করেছিলেন। আমাদের দেশীয় বিভিন্ন রাগরাগিনীর গতানুগতি ও কৃত্রিম পরম্পরার বন্ধন থেকে তিনি সংগীতকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি সুর ও অনুভূতি নিয়ে নানান্ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এই গীতি নাট্যে। যেমন – আইনরিশ লোকসঙ্গীত 'Go Where Glory Waits Thee' - এর সুরকে অবলম্বন করে ত্রিতালের দ্বারা 'আহা আজি এ বসন্তে' গানটি রচনা করেছিলেন। এছাড়াও এই গীতিনাট্যে যে গান গানগুলি গাওয়া হয়েছে সেগুলি হল –

১. মোর জলে স্থলে কত
২. পথ হারা তুমি পথিক
৩. কাছে আছে দেখিতে
৪. জীবনে আজ কি প্রথম
৫. যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে
৬. আমার পরান যাহা চায়
৭. সখী সে গেলো কোথায়
৮. সখী, বহে গেল বেলা
৯. ওলো রেখে দে সখী, রেখেছে
১০. যেয়োনা, যেয়োনা, যেয়োনা ফিরে
১১. কে ডাকে আমি কভু ফুরে নানি চাই
১২. এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি
১৩. ওকে বলো সখী, বলো গানে
১৪. তারে দেখাতে পারিনে কেন
১৫. আপন, মন নিয়ে
১৬. ভালোবেসে যদি সুখ নাহি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. সুখে আছি সুখে আছি
১৮. ভালোবেসে দুখ সেও সুখ
১৯. দূরে দাঁড়ায়ে আছে
২০. ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও
২১. ওগো বোঝা গেলো না
২২. সখী সাধ করে যাহা দেবে
২৩. এ তো খেলা নয়, খেলা নয়
২৪. সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে
২৫. সখী প্রতিদিন হায়
২৬. সকলা হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যার
২৭. তুমি কে গো, সখীরে কেন
২৮. তবে সুখে থাকো সুখে থাকো
৩০. আমার নিখিল ভুবন
৩১. ভুল কোরো নাগো
৩২. ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙ্গেছে
৩৩. অলি বার বার ফিরে যার
৩৪. ডেকো না আমারে ডেকো না
৩৫. না বুঝে যারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে
৩৬. যে ছিল আমার স্বপ্নচারিণী
৩৭. হায় হত ভাগিনী
৩৮. এস এস বসন্ত ধরাতলে
৩৯. ওকি একা, ওকি একা
৪০. কোন্ সে ঝড়ের ভুল
৪১. ছি ছি, মরি লাজে
৪২. শুভ মিলনলাগনে বাজুক বাঁশি
৪৩. আর নহে, আর নহে
৪৪. ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে
৪৫. যাক ছিঁড়ে যাক ছিঁড়ে যাক
৪৬. আজ খেলা ভাঙার খেলা
৪৭. আহা আজি এ বসন্তে

উপরে উল্লিখিত গানগুলির মধ্যে প্রতিটি গানেই অমর, শান্তা, অশোক, প্রমদা, কুমার, মায়াকুমারীগন (৩ জন) প্রমদার সখীগন (৩ জন) কিছু পুরুষ চরিত্র ও স্ত্রী চরিত্র সমূহের – নিজ নিজ ভাবনা ও অনুভবগুলি খুব সুন্দর ভাবে গানের মাধ্যমে মঞ্চায়িত হয়েছিল।

আসলে গীতিনাট্যে সংলাপের স্থান নেয় সঙ্গীত। সঙ্গীত ছাড়া গীতি নাট্যে আলাদা ভবে কোনো কথা বলার জায়গা থাকে না। হৃদয়নুভূমি ও ভাবাবেগকে মঞ্চে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে গেলে সঙ্গীতের ক্ষমতা যে কতটুকু তা বিভিন্ন গীতিনাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখা করে এবং উপস্থাপন করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের তাল সম্পর্কে বক্তব্য ছিল –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 809
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"দ্রুত তাল হচ্ছে সুখের ভাব প্রকাশের অঙ্গ। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালেরও পরিবর্তন ঘটে।"[৮]

গীতিনাট্যগুলিকে মঞ্চেউপস্থাপনের অভিনয়ের সময় অভিনয়ের খুব বেশি সুযোগ থাকে না, কারণ গান ও নৃত্যের মাধ্যমেই এর উপস্থাপন করা বাঞ্চনীয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনার সময় উপনিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, রামপ্রসাদী, পাশ্চাত্য সুর প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই মঞ্চে তাঁর গভীর আত্মদর্শনের ভাব যখন অঙ্গভঙ্গিমায় প্রকাশ করার দায় শিল্পীর বা অভিনেতার উপরত্রসে পড়ে, তখন তা সত্যিই কলা-কুশলিদের কাছে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন নির্মল, সুন্দের, কোমল ও গভীর অনুভূতি ও দর্শনকে মঞ্চে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা – সে এক অন্য ধারার উৎকৃষ্ট শিল্প, একে শুধু মাত্র নৃত্য – বা অভিনয় বললে সঠিক হবে না, এই উচ্চাঙ্গ শিল্পকলাকে মঞ্চে উপস্থাপন করাকেই মনে হয় বলা যায় যথাযথ আত্মদর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ, 'শিক্ষার নাটক অ শিল্পকলা', রীতা পাবলিকেশন, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৩৫
২. গোস্বামী, কুমার প্রভাব, 'ভারতীয় সঙ্গীতের কথা' , আদিনাথ ব্রাদাস্‌, ২০০৫ কলকাতা, পৃ. ১৮০
৩. ভট্রাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা' ' ওরিয়েন্টার বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮১
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৭
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৮
৭. তদেব
৮. কুন্ডু, ডক্টর প্রণয়কুমার, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৫ কলকাতা, পৃ. ৫৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 810 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 810 - 817
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় ‘প্রগতি’ পত্রিকা

শেখ রফিজুল
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া
Email ID : rafijulrkmv01996@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Memoirs, Buddhadev Basu, Pragati Patrika, Jibanananda, Institutions.

Abstract
Buddhadev Basu himself became an 'institution', and the reason behind this 'institution' was editing the magazine. Although he had been involved in magazine editing since childhood, it was 'Pragati' magazine that gave him a different world in literature. This magazine became a field for his own literary practice as well as a place for young writers of that time. Buddhadev Basu found Jibanananda Das here. Buddhadev, fascinated by Jibanananda's poetry, waged a kind of war in 'Pragati' to establish him in the literary community. Buddhadev also discovered not only Jibanananda, but Vishnu Dey here. In a word, Pragati magazine is an important chapter in Buddhadev Basu's life. And he looks back on this chapter in the twilight of his life, and has retained it in his memoirs for future readers.

Discussion

‘মানুষটি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান’ – এই উক্তিটি আমরা যখন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে বলে থাকি তখন আমরা ওই ব্যক্তির সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়েই করি। ‘প্রতিষ্ঠান’ এমন এক সমবায়িকতা যেখানে একাধিক সমমনস্ক মানুষ একত্র হয়ে এমন কোনো কর্ম-প্রবাহের সম্পাদনা করেন যা অনেককে আকর্ষণ করে, সহায়তা করে, এমনকি অনেকের মনের ভেতর জাগিয়ে তোলে শক্তিকে। সেই কর্মপ্রয়াস এমন একটি প্রতিষ্ঠা অর্জন করে – যিনি বা যাঁরা সে কর্মপ্রয়াসের উৎস মুখ – তাঁর বা তাঁদের সময়ের পরও সেই কর্মের স্রোত ও সুফল-সমূহ সমৃদ্ধ করে অনেক মানুষকে। এই অর্থেই আমরা কোনো ব্যক্তিকে স্বয়ং প্রতিষ্ঠান বলে সম্মান জানাই। হয়তো সেই মানুষটি সেই অর্থে কোনো সঙ্ঘই গড়ে তোলেন নি। নিজের মনের মতো করে মননের চর্চা করে করে গেছেন কোনো বিষয়ে। কিন্তু বিষয়ের গভীরতা, মননের চর্চার বিস্তার এততাই যে, অনেকে তাঁর কাছে আসেন, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ পেয়ে উপকৃত হন; তাঁর আদর্শের ধারাকে সামনে রেখে নিজেরা কাজ করবার প্রেরণা পান। সমবায়ী প্রয়াসে গড়ে ওঠা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সব সময়েই খুব বড়ো মাপের না হতেও পারে, তা হতে পারে কোনো স্বল্পজীবী পত্রিকা - যা পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন দিক থেকে। অথবা কোনো আড্ডা - যেখান থেকে মনের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক মানুষ। সেই সময়ে সেই আড্ডার বা পত্রিকার গুরুত্ব খুব একটা বোঝা যায়নি কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিকথায় তার গুরুত্ব বোঝা যায়। এমনই এক ‘প্রতিষ্ঠান’ ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁর সাহিত্য সাধনা ও পত্রিকা সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 810 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে তরুণ বয়স থেকেই 'প্রতিষ্ঠান' হয়ে ওঠার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। যদিও শিশু বয়স থেকে মাতৃহীন ও পিতৃসঙ্গ -বঞ্চিত, তবুও মাতামহ ও মাতামহীর স্নেহানুশাসনে শিক্ষাজীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের রাজ্যে নিজে বিচরণ করতে ভালোবাসতেন এবং সেই মনরাজ্যে বিচরণের পরিধি তিনি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে একাগ্র মেধা-উজ্জ্বলতা এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারফলে তাঁর প্রতি বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী কিশোর তরুণরা আকর্ষিত হতেন। বুদ্ধদেব কিশোর বয়স থেকেই যখনই কোনো কাজ করার কথা ভেবেছেন, কাজে হাত দিয়েছেন তখন সংখ্যায় অল্প হলেও অনুগামী অনুরাগীরা তাঁর সঙ্গে থেকেছেন। বন্ধু, পত্নী, কন্যা, অনুরাগীদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, তাঁর মধ্যে মানুষকে আকর্ষণ করার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল। চারিদিকে থাকা মানুষদের কেন্দ্রে বিরাজ করতেন তিনি। এ কোনো সচেতন প্রয়াস নয়, এ আকর্ষণ জন্ম নিত তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি থেকে। যাঁরা পরবর্তীতে ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবেন তাঁদের মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের দ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। তাই তো ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ - এর বাড়িটি হয়ে উঠেছিল 'কবিতাভবন' নামের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সে তো অনেক পরের ঘটনা, ১৯৩৭ সালের। তারও অনেক আগে বুদ্ধদেব বসু যেখানেই থাকতেন সেই জায়গায় তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হত, মন-মনন-হৃদয় জুড়ে ঘণীভূত হত সাহিত্যপ্রেমের বাতাবরণ।

বুদ্ধদেব বসু যখন স্কুলের বালক ছিলেন তখন থেকেই লেখা ও পত্রিকার প্রেমে ছিলেন পাগল। বিভিন্ন পত্রিকা (যেমন, 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'সন্দেশ') নিয়ে মাতোয়ারা, তেমনি 'মৌচাক' নিয়েও আগ্রহের অন্ত ছিলো না। কিন্তু 'মৌচাকে' লেখা প্রকাশ করার জন্য বারবার লেখা পাঠাতে থাকলেও তা যখন সম্পাদকের নির্বাচনের তালিকায় ঠাঁই পায় না তখন সম্পাদককে 'পক্ষপাতদোষে দুষ্ট', বাইরের লোকের লেখা ছাপেন না, বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে চিঠি পাঠান। এই চিঠির তীব্র নিন্দা করে লেখা বেরোয় 'মৌচাকে'র পরের সংখ্যায়, যা বুদ্ধদেব বসুকে অনেকটা পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু 'আমার ছেলেবেলা'তে লিখছেন -

> "*মৌচাকের* পরের সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সেই চিঠির তীব্র নিন্দা বেরোলো, প্রায় আস্ত এক পৃষ্ঠা জুড়ে, পত্রলেখকের নামটি অবশ্য উহ্য রেখে। আমি মাথা পেতে নিলাম সেই শাস্তি, কাজটা খুব অন্যায় হয়েছিলো তা বুঝে নিতে আমার দেরি হল না। তেমনি আমি রইলাম *মৌচাকের* দ্বারা মুগ্ধ হয়ে - যতদিন না আমার যৌবনের শুরুতে, সেই শিশু-পত্রিকাটি আমার জীবন থেকে খসে পড়লো - কিছুকালের মতো।
>
> এই কাহিনীর একটি সুখের উপসংহার আছে। আমার সাহিত্যিক জীবনে যে-কটি মানুষকে আমি সত্যিকার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসেবে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সুধীনচন্দ্র সরকার - সেই সম্পাদকমশাই, যিনি আমার ছেলেবেলার অশিষ্টতাকে সুযোগ্যভাবে শাসন করেছিলেন। আমার কুড়ি বছর বয়স থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্বন্ধ অটুট ছিল।"[১]

এমনই মনের দুর্বার গতি ছিল লেখা প্রকাশ করার। তা যে কেবল ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, অনেক পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, এই লেখা প্রকাশ করার যে অন্যতম নির্ণায়ক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তা তিনি অনুভব করেন। তার জন্য তাঁর যে ব্যগ্রতা - যা তাঁর প্রতিষ্ঠান মনস্কতার পরিচয়ও বটে। পত্রিকাই সেই মঞ্চ - যা একজন সম্পাদক সম্পাদনা করলেও এবং লেখকেরা একা একা লিখলেও তা সকলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই স্কুলে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকার সম্পাদক রূপে থাকেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি তাঁর 'আমার ছেলেবেলা'তে লিখছেন -

> "ততদিনে আমি এক-ঝুড়ি-ভর্তি কবিতা আর গল্প-প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি; 'বিকাশ' অথবা 'পতাকা' নামে একটি হাতে লেখা মাসিকপত্রের আমি সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকার; ঢাকার শিশুপাঠ্য পত্রিকা *তোষিণী*তে আমার লেখা বেরিয়েছে, আর বর্জইস অক্ষরে কলকাতার *অর্চনায়*, এমনকি শ্বেত-পীত মলাটধারী সম্ভ্রান্ত চেহারার *নারায়ণে*ও।"[২]

আর 'ক্ষণিকা' নামের দুটি ক্ষণজন্মা পত্রিকা-প্রয়াসের পালা সাঙ্গ করে ১৯২৫-এ তিনি বার করলেন হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা। সঙ্গী ছিলেন টুনু অর্থাৎ পরবর্তীকালের কবি, অধ্যাপক, গবেষক অজিত দত্ত। সঙ্গে আরও ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য, প্রভু গুহঠাকুরতা, ভৃগু গুহঠাকুরতা, পরিমল রায় প্রমুখ। এই বন্ধুরা সবাই একই সময়ে আসেননি কিন্তু এক সময় এসেছিলেন, দিয়েছিলেন মানসিক সঙ্গ। তাই হাতে লেখা 'প্রগতি' ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে ছাপার অক্ষরে প্রস্ফুটিত হল। শুঁয়োপোকার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক প্রজাপতি। অল্পসময় জীবিতকাল বলে তা উপেক্ষণীয় নয়; এই অল্পসময়ে 'প্রগতি' অনেক দীর্ঘজীবী পত্রিকার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গিয়েছে। তাই তো 'প্রগতি' একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিভূমি রূপে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি পত্রিকা চালানোর জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সমমনস্ক-সম্পন্ন কয়েকজন মানুষের, যা সেই পত্রিকার উদ্দেশ্যকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। 'প্রগতি'র উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সাহিত্যচর্চা করা যেমন তেমনই আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের একটা জায়গা করে দেওয়া। 'প্রগতি' প্রথম থেকেই এই লক্ষ্য পূরণ করেছিল। মাসে একশো টাকা হলেই একটা পত্রিকা চালানো যায়, সেই অর্থ সংগ্রহ করতে সমমনস্ক বন্ধুদের অভাব হল না, যাঁরা মাসে দশ টাকা করে দিয়ে 'প্রগতি'র চলার পথ সুগম করে দিয়েছিল। প্রগতির আভির্ভাবের ক্ষণটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর *আমার যৌবন* স্মৃতিকথায় -

> "আর দ্বিতীয় বৃত্তিটি ঢাকা বোর্ড মাত্র সে-বছর থেকেই মঞ্জুর করেছিলেন। তা দৈব হোক আর যাই হোক, মাসিক কুড়ি টাকা মানে মাসিক কুড়ি টাকাই; - বন্ধুরা মিলে স্থির করা গেল, হস্তলিপি- পত্রিকা আর নয়, এবারে একটি মুদ্রাযন্ত্র নিঃসৃত দস্তরমাফিক মাসিকপত্র চাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেবার মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাসের কোনো এক দিনে আমার এবং টুনুর যৌথ সম্পাদনায় - এবং প্রধানত এই দু-জনেরই আর্থিক দায়িত্বে - *প্রগতি*র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। আকার ফুলস্ক্যাপ অষ্টমাংশ, হলদে মলাটে ঊর্ধ্বমুখ একটি নারীমুণ্ড আঁকা ... প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিল, মনে পড়ে বেশ একটু চাঞ্চল্যও তুলেছিলো। একদিকে এই পত্রিকা চালাবার উত্তেজনা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন জীবন - আমার দিনগুলি দুই ধারায় উচ্ছল বয়ে যাচ্ছে।"[৩]

এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দ্রুত একত্রিত হলেন তরুণ লেখক-গোষ্ঠী। *প্রগতি*র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বিজ্ঞাপনে যে লেখকরা ছিলেন সুশীলকুমার দে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জসীমুদ্দিন, বুদ্ধদেব বসু, মোহিললাল মজুমদার, যুবনাশ্ব, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দশগুপ্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, হেমচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। এই লেখক-গোষ্ঠীর তালিকা দেখে অনুমান করা যায় কত ঈর্ষণীয় ছিল *প্রগতি*র লেখক তালিকা। তারপর দু-বছরের কিছু বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকা। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (১৯২৯)।

একটি প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা বা আড্ডার সঙ্গে অনিবার্য ভাবেই একটি স্থানের নিবিড় সম্পর্ক থাকে। কোনো বাড়িতে, চা -এর দোকানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বা অনুরূপ কোনো স্থানে মিলিত হবার জায়গা থাকলে প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা বা আড্ডাটি বেশ জমাট হয়। 'প্রগতি' পত্রিকার জন্ম ও জায়মানতার তেমন এক স্থানের ভূমিকা ছিল। পুরানা পল্টনের টিনের ঘর এই সূত্রেই বিখ্যাত হয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসুর মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর মাতামহী স্বর্ণবালা তার ভাইয়ের সাহায্যে ঢাকার 'পুরানা পল্টন' এলাকায় একটি ইঁটের প্রাচীর দেওয়া টিনের ঘর তুললেন। তুলসীমঞ্চ, অপরাজিতা ও লজ্জাবতীলতা, বটগাছে পাখির ডাক, ফাঁকা মাঠ, খোলা আকাশ, দূরন্ত হাওয়া আর ধ্বনিবহুল উচ্ছৃঙ্খল অজস্র বর্ষার অপূর্ব মিশ্রণে বাড়িটি পরিপূর্ণ। এই বাড়িটি শুধু একটি বাড়ি নয়, একজন মননশীল, অনুভূতিপ্রবণ সাহিত্যিক তৈরিতে প্রভাব ছিল বিস্তর। বুদ্ধদেব বসু লিখছেন -

> "পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে আমি ছ-বছর কাটিয়েছি - সমস্ত কলেজ-জীবন, সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়, যৌবনের উন্মেষ থেকে বিকাশ। এ-সময়টা আত্মপ্রকাশের না-হলেও আত্মপ্রস্তুতির দিক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 810 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> থেকে জীবনের সবচেয়ে প্রধান অংশ। এ-সময়ের পরিণতিতেই মানুষের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ নির্দিষ্ট হয়। বন্ধুতা স্থাপন করবার, অন্তর্জীবনের বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করবার, রুচি ও অভ্যাস গঠন করবার এই সময়। ... শেষ পর্যন্ত আমরা যে-কয়টি বন্ধু একত্র হয়ে 'প্রগতি দল' বলে পরিচিত হলাম, তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই সেইরকম সময়েই আলাপের সূত্রপাত।"[৪]

আর এই বাড়িতেই 'প্রগতি'র পথ চলা শুরু হয়েছিল। অনেক বন্ধু, প্রচুর আড্ডা, বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে মতবিনিময়, মুগ্ধতা, বিতর্ক, সেই সঙ্গে নিজেদের সাহিত্যচর্চা।

> "তারপর রাত জেগে-জেগে সব কাজ করতে হতো; 'প্রগতি'র প্রুফ দেখা, 'প্রগতি'র পাতা ভরবার জন্য 'কপি' তৈরি করা, আরো নানারকম লেখা। এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করতাম না; একটা দিন কেটে যেতো এক মুহূর্তের মতো। দিনগুলো যেন গানের সুর, কোথাও একটু অসংগতি, একটু বৈষম্য নেই, আনন্দে একেবারে ভরপুর। বন্ধুদের ভালোবাসা, সাহিত্যে দুরন্ত উৎসাহ, নতুন সব জিনিশ লেখা, কল্পনার প্রসার, বিচিত্র বাসনার জাগরণ, জীবনের উপভোগে ক্লান্তিহীন আগ্রহ - যদি কখনো একটু অবসর পেতাম, বিস্মিত মন প্রশ্ন করতো : এ কি সত্যি ? এ কি সত্যি ? বছর দুই সময়ের মধ্যে আমার মন সৌন্দর্যে সাহসে দুরাশায় আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করলো। তারপর - তার পরের কথা বলে লাভ নেই; কী যেন হল, 'প্রগতি' উঠে গেলো, বন্ধুতার নিবিড় বন্ধন যেন শিথিল হয়ে এলো।"[৫]

আসলে 'প্রগতি' শুরুর সময় যে হৃদয়াবেগ ছিল বা সংসার সম্পর্কে যে উদাসীনতা ছিল তা পরবর্তী সময় বজায় রাখা অনেকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ একদিকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের চিন্তা অন্যদিকে আর্থিক অনটন তাঁদেরকে স্থিত হতে দেয়নি। যত সুন্দর মন নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসি না কেন সময়ের সাথে সাথে সংসারের ছাপ তাতে পড়বেই। এই পরিস্থিতির স্মৃতি বুদ্ধদেব তাঁর 'পুরানা পল্টন' প্রবন্ধে লিখেছেন -

> "শেষে কী হল একটু বলে রাখি। প্রথম সংখ্যা কাগজ বেরোবার কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের দশজনের মধ্যে বেশির ভাগ ঘটনাচক্রান্তে কে কোথায় ছিটকে পড়লো - পরে আর তাদের পাত্তা পাওয়া গেলো না। কেবল দু-জনের কাছ থেকে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত সাহায্য পেয়েছিলুম। কিন্তু মোটা খরচের ভারটা যে-দুজনের উপরে পড়লো, তাদের যৎসামান্য বিত্ত মাসিকপত্রের অগ্নিসংযোগে আশ্চর্য দ্রুতবেগে পুড়ে যেতে লাগলো। ('প্রগতি'র যা বার্ষিক আয়, তাতে ঠিক এক সংখ্যা কাগজ ছাপা হতে পারতো।) এমন অবস্থায় মাসিকপত্রের মতো প্রচণ্ড শখ মিটতেও বেশি দিন লাগে না, অকস্মাৎ মধ্যপথে 'প্রগতি'র গতি গেলো থেমে।"[৬]

'প্রগতি' পত্রিকা মাঝপথে থেমে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যে নিজের করণীয় কাজ অনেকটা সম্পন্ন করতে পেরেছিল। নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান রূপে দেখা দিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন 'প্রতিষ্ঠান' বলছি তার কিছু কারণ আছে। 'প্রগতি'র আগে প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল' (১৯২৩), 'শনিবারের চিঠি' (১৯২১), 'উত্তরা' (১৯২৫) এবং 'প্রগতি'র সঙ্গেই 'বিচিত্রা'। 'কল্লোল' ছাড়া আর প্রায় সব পত্রিকাগুলিতে নতুন লেখকদের আবির্ভাব ঘটলেও প্রথাসিদ্ধ পরম্পরাকে অস্বীকার করবার শৈল্পিক ঔদ্ধত্য ছিল না। সব ধরণের লেখাকেই স্থান দিতেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের সম্মানিত উপস্থিত ছিল অধিকাংশ পত্রিকায়। এমনকি 'কল্লোলে'ও রবীন্দ্রনাথ থাকতেন। অর্থাৎ আধুনিকেরা থাকতেন প্রথাসিদ্ধ সাহিত্য ধারণার সঙ্গে সহাবস্থানে। কিন্তু 'প্রগতি'র সম্পাদকের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্ত আধুনিকতার যে লক্ষণগুলো পাশ্চাত্য সাহিত্য দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে সেগুলোর সমর্থনে মত প্রকাশ করা। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' ছিল নবীন সাহিত্যের প্রসারক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'প্রগতি' পত্রিকার স্থান একটু স্বতন্ত্র। 'প্রগতি' নবীন সাহিত্যের প্রসারকই নয়, প্রচারকও। 'প্রগতি'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'মাসিকী'তে 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'মাসিকী' শীর্ষক ছাপা হত এবং লেখকের

নামের আদ্যক্ষর দিয়ে চিহ্নিত হত - 'প্রগতি' পত্রিকার নামটির তাৎপর্য ও নবীন সাহিত্যের লক্ষণগুলি বেশ স্পষ্ট করে বলা আছে। মাসিকীটি অ. স্বাক্ষরবাহী। লেখক অবশ্যই অজিতকুমার দত্ত। তবে বক্তব্য নিশ্চয়ই যৌথ ও সর্বসম্মত।

> "বাংলা সাহিত্যের এই নবীনভাবধারাকে ("আজকের দিনে বালাদেশে যে একটি বিশিষ্ট তরুণ সাহিত্য গড়ে উঠেছে এ-কথা অস্বীকার করবার আর উপায় নেই") আমরা তা'র সকল অপরাধ- সহ বরণ করে নিলাম।... সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার যত প্রয়োজন তেমন বুঝি আর কোথাও নয়। সেই স্বাধীনতার জন্যই এই বিদ্রোহ, সেই মনের কথা খুলে' বলবার অধিকারটুকুর জন্য। এই বিদ্রোহকে, সহস্রের নিষ্পেষণের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির মুক্তির এই প্রচেষ্টাকে আমরা গ্রহণ করেছি, তাই আমাদের মুখপত্রের নাম 'প্রগতি'।"[৭]

'কল্লোল' ও 'কালিকলমে' যে মনোভাব নিরুচ্চারিত অথচ প্রতিফলিত ছিল সেই মনোভাব 'প্রগতি' পত্রিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিষ্ঠভাবে অভিব্যক্ত। এই রচনায় নবীন সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও নবীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পত্রিকার ভূমিকা সবই বলে দেওয়া হল। এইটেই হলো প্রচারকের কাজ। পত্রিকা চালাতে গিয়ে কিছু প্রথাসিদ্ধ লেখা হয়তো নিতে হয়েছে তাঁকে কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল বা সচেতন প্রয়াস ছিল আধুনিক ভাবধারার লেখাকে প্রকাশ করা ও এই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

তাই বারবার তিনি 'প্রগতি'তে জোর দিয়ে রবীন্দ্র-অনুকরণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করতে থাকেন। তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে তিনি অসম্মান করেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে পরবর্তী সাহিত্যিকরা যাতে আটকে না পড়ে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল বুদ্ধদেবের। এ বিষয়ে 'প্রগতি' পত্রিকা সম্পর্কে তাঁর উক্তি -

> "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি একটি অতি আবশ্যক বোঝাপড়ার চেষ্টাও সেখানেই আমরা প্রথম করেছিলাম। বোঝাপড়া - মানে, এমন কোনো ব্যবস্থা, কিংবা বলা যাক আমাদের দিক থেকে প্রস্তুতি, যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমরা আটকে না থাকি চিরকাল, তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য করে তুলতে পারি। লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবীন্দ্র-বিদ্রোহ,..."[৮]

সমকালীন অন্যান্য পত্রিকাতেও নতুন ভাবধারার লেখা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র-অনুকরণে সাহিত্য রচনার বিপক্ষে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। 'কল্লোল' ও 'প্রগতি'র লক্ষ্যের তফাৎ হয়ত বিশেষ ছিলনা - কিন্তু 'কল্লোলে'র কণ্ঠস্বর এতটা উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিলনা। কল্লোল বা সমগোত্রীয় পত্রিকাগুলি নতুন ভাবধারার লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সাহিত্যকেও গ্রহণ করে চলতে থাকে। এরই পাশাপাশি, 'প্রগতি' জানত তারা কী করছে, কী করতে চায় বা কেন করবে। শুধুমাত্র কীভাবে করবে সেই রণনীতি বা ব্যূহসজ্জায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলনা তারা। আর তাই অভিমন্যুর মতো প্রবেশ করেছিল চক্রব্যূহে। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে উন্মুখরতার ফলে একদিকে যেমন শক্তিক্ষয় হয়েছিল তাঁদের, তেমনি অসহায়ভাবে তাঁরা আবিষ্কার করেছিল তাঁদের সুহৃদ্‌হীন সামাজিক স্থিতি। কিন্তু যৌবনের এই অমিতব্যয়ী তেজ থেকেই সমকালীনতার উত্তাপ পেয়েছিল 'প্রগতি'। এবং পেয়েছিল সাহিত্যেরই প্রয়োজনে, সাহিত্য রুচিরক্ষার উৎকণ্ঠা থেকেই। এমন উৎকণ্ঠার বিপরীত পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল যে অসুয়াকাতর, স্থূলপ্রকাশ, সৃজনদুঃস্থ কোন পত্রিকাগোষ্ঠীতে, তার থেকে তৃপ্তিকর বৈপরীত্যে নিজেদের স্থাপন ক'রে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোলে' প্রকাশিত কবিতা—

> "সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!"[৯]

এই কবিতাটির ভাবকে বুদ্ধদেব বসু যুক্তিতে, বিশ্লেষণে, তর্কে, বিভিন্ন লেখায় প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিল 'প্রগতি'র পৃষ্ঠায়।

'প্রগতি'তে 'মাসিকী' নামে একটি বিভাগ থাকতো। সেখানে বুদ্ধদেব বসু নিজের মতামত প্রকাশ করতেন। সেখানে লিখেছিল,

> "অধুনা বাংলা সাহিত্যে একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব movement শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেই নব-রসের আস্বাদ বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করবার ভার *প্রগতি* নিয়েছে।"[১০]

তিনি শুধু দায়িত্ব নেননি, সেই দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তার জন্য অনেকের সঙ্গে তর্কে যেতে হয়েছে, তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। জীবনানন্দের আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বারবার 'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দের কবিতা ছেপেছেন। তাঁর কবিতার নবীনত্ব, ভাষা, উপমা ব্যাখ্যা করে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন 'প্রগতি'র পাতায় -

> "জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়। ... তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট ক'রে ভালো কি মন্দ বলা যায় না- তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়। তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চ'লে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার ক'রেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ...
> এ-কথা ঠিক যে তিনি (জীবনানন্দ) পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিশেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে। ... জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধ'রে এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান; ... সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো। ... (সেইজন্যেই) আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে।"[১১]

তাছাড়া 'আমার যৌবন' স্মৃতিকথায়ও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই পত্রিকাতেই যে বুদ্ধদেব নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন ও নিজের সাহিত্যিক আদর্শ প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তা বারবার করে বিভিন্ন প্রবন্ধে ও স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন। 'প্রগতি' অন্যান্য পত্রিকা থেকে আলাদা তা তিনি 'আমার যৌবনে' প্রকাশ করেছেন-

> "*প্রগতির* প্রতি সংখ্যায় কয়েকটা পৃষ্ঠাজুড়ে থাকে সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ - *কল্লোলে* যে-জিনিসটি কখনো স্থান পায়নি, বা উল্লেখ্যভাবে স্থান পায়নি। এই বিভাগের জন্য অন্যদের লেখা দুষ্প্রাপ্য, আমিই লিখি মাসে-মাসে প্রায় পুরোটা - অনিচ্ছায় নয়, বরং সাগ্রহে ও উত্তেজিতভাবে। সাহিত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক, এদিকে সেই সময়টাও ছিলো বিশেষভাবে তর্কমুখর। অলিতে-গলিতে রব তুলছে আমাদের নিন্দুকেরা, দু-একটা সুশ্রাব্য কথাও আমাদের কানে আসছে মাঝে-মাঝে; ব্যাপারটা আমার মন্দ লাগছে না, আমার ছেলেমানুষি অহমিকায় ঈষৎ সুড়সুড়ি দিচ্ছে এই ভাবনাটা যে আমরা এতদূর মনোযোগের যোগ্য। আমি দুই হাতে ছড়িয়ে যাচ্ছি পাল্টা জবাব-শুধু শত্রুপক্ষের প্রতিবাদ হিসেবেই নয়, আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে বলেও। আমার প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় আমি নিষ্কুণ্ঠ; এক পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে ইতি-উতি তাকিয়ে পথ চলাও আমার স্বভাবে নেই। আমার সে-সব লেখায় দাপাদাপি একটু বেশি ছিলো, গদ্য ছিলো ইংরেজি বকুনি-মেশানো, নড়বড়ে; কিন্তু কাঁচা লেখাও কখনো কোনো কাজে লাগে না তা নয়, কোনো বিশেষ মুহূর্তে মুহূর্তের কথাও সবীজ হতে পারে, খুব উঁচু করে নতুনের নিশেন উড়িয়ে দেবারও প্রয়োজন ঘটে কখনো। প্রগতির জন্য এটুকু অন্তত দাবি করা যায় যে সেই দূর সময়ে, যখন 'গণ্ডার-কবি'কে নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির, অন্য কোথাও সমর্থনসূচক প্রয়াস ছিলো না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে, সোচ্চার ঘোষণায়।"[১২]

শুধু জীবনানন্দ নন সেই অজানা অখ্যাত বিষ্ণু দে-কেও তিনি প্রথম পান 'প্রগতি'র পাতাতে। সেখান থেকেই বিষ্ণু দে'র সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর সখ্য স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপালের সাহিত্যিক, মানসিক মিলনস্থল 'প্রগতি'। বুদ্ধদেব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন —

> "তখনও নাম-না-জানা উজ্জ্বল লেখকও আমাদের ভাগ্যে একজনকে আমরা পেয়েছিলাম : তিনি বিষ্ণু দে।
>
> বিষ্ণু দে প্রথম দু-একটি লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল রায়' বা অমনি কোনো ছদ্মনামে, তারপর স্বনামে পাঠালেন আড়াই পৃষ্ঠার একটি কবিতা ('ডলুটা যখন ন্যাকামি করে')-কথ্যভাষায় প্রবহমান মাত্রাবৃত্তে সুস্বাদু হালকা চালে হাসির ছটায় চমক-লাগানো। এর পরে 'ট্রিয়োলেট-গুচ্ছ', কিছু গদ্য রচনা-কোনো-এক সময় তাঁর দুটি গল্পও বেরিয়েছিলো, মনে পড়ে। কৌতুক এই, মিতাক্ষর 'বিষ্ণু দে' নামটিকেও অনেকে প্রথমে ছদ্মনাম বলে ধরে নিয়েছিলেন।"[১৩]

শুধু নতুন কবিদের নতুন ধরনের কবিতাই প্রকাশ ও প্রচার করেননি, নতুন স্বাদ ও শৈলির গল্প লেখার ও লিখিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু এই পত্রিকার পাতায়। সমকালীম পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঘটনা প্রবণ গল্পের পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে আত্মকথন ও প্রতীকী গল্পের বয়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমাজে মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, গন্তব্যহীন যাত্রা, অবিশ্বাস মানুষ ও দেবতাকে; এই অনিশ্চয়তার চেহারা ফুটে উঠছে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যে তেমনি 'প্রগতি'র পাতায়। 'শ্যামল রায়' ছদ্মনামে বিষ্ণু 'প্রগতি'র পাতায় এই ধরনের কিছু গল্প লিখেছিলেন। যদি 'প্রগতি' স্থায়ী হত তাহলে এই নতুন রীতি এখানে দৃঢ় হত। তার জন্য আমাদের তিন দশক অপেক্ষা করতে হত না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় বাঙালি সাহিত্যিকরা কেবল ইংরেজি সাহিত্য নির্ভর চর্চা তাঁরা করলেন না, তাঁদের দৃষ্টি পড়ল ইউরোপীয় অন্যান্য সাহিত্যের ওপর। এই আগ্রহের জাগরণ প্রমথ চৌধুরী ঘটালেও আলোচনা, অনুবাদের মধ্য দিয়ে 'কল্লোল'ই ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যকে এনে দিয়েছিল পাঠকের কাছাকাছি। আর বুদ্ধদেব বসু ইউরোপীয় সাহিত্যে অনুরাগী। তাই তিনি 'প্রগতি'র পাতায় ছাপতে লাগলেন অনূদিত কবিতা, গল্প। বিদেশি সাহিত্য নিয়ে লেখা হয়েছে প্রবন্ধ। রুশ কথাসাহিত্য ও জাপানের কবিতা অনুবাদ করে ছাপা হয়েছে।

'প্রগতি'র ভূমিকা এখনকার সময় থেকে দেখলে মনে হয় ক্রান্তিকরী। তরুণের এই অভিযান বাহ্যত ব্যাহত হ'ল অর্থের অভাবে, কিন্তু জুগুপ্সাপরায়ণ সাহিত্যব্যাপারীদের অরুচিকর কুৎসাপ্রচার হয়ত ভেতরে-ভেতরে ক্লান্ত ক'রে তুলেছিল সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং সম্পাদককেও। পত্রিকা বন্ধ করার দুঃখের মধ্যেও এই তৃপ্তির স্বাদটুকু র'য়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনে। কোন সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা, সাহিত্যের ইতিহাসে তার যে উজ্জ্বল উদাহরণগুলি আমাদের জানা আছে, নিতান্ত স্বল্পায়ু হলেও 'প্রগতি'কে তার অন্তর্ভূক্ত করা চলে। পত্রিকাটি যেমন বুদ্ধদেব বসু সৃষ্টি করেছেন তেমনি এই পত্রিকাই বুদ্ধদেব বসুকে সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধদেব বসু নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, নিজের সাহিত্য জীবনের পূর্ণ সূচনা ঘটিয়েছেন। নিজে যেমন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছেন তেমনি একদল তরুণকে এই পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু আত্মবিস্তৃতির রাস্তা করে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন যে, সম্পাদকের একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্য থাকে তা হল - নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য-সমাজে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সত্যিকারের প্রতিভা কারোর পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু আত্মবিস্তৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেলে তা শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই *প্রগতি*কে বাহন করে তাঁর উদ্দেশ্যের ঘোড়াকে ছুটিয়ে ছিলেন। মাত্র দু'বছর তিন মাসের আয়ুর মধ্যেই এই পত্রিকা নিজে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। যাকে ছাড়া বাংলা বিশ শতকের সাময়িক পত্রিকার আলোচনা অসম্ভব।

Reference:

১. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার ছেলেবেলা, আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, প. ৩৫

২. তদেব, পৃ. ৩৭

৩. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন, আত্মজৈবনিক,* বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৭৮

৪. *পুরানা পল্টন,* বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা - ২০, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯/ ফাল্গুন ১৪১৫, পৃ. ১৮৮-৮৯

৫. তদেব, পৃ. ১৯৩

৬. তদেব, পৃ. ১৯২

৭. প্রগতি, *মাসিকী,* ১৯২৭ (১৩৩৪), জ্যৈষ্ঠ

৮. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন, আত্মজৈবনিক,* বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৯১

৯. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম.সি. সরকার প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ৮৪

১০. *প্রগতি, মাসিকী,* জ্যৈষ্ঠ - ১৩৩৫

১১. *প্রগতি* - আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য

১২. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন, আত্মজৈবনিক,* বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৯০

১৩. তদেব, পৃ. ৯০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 818 - 823
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

দুঃখের জোয়ারে ভাসমান তিতাস পাড়ের মালোগোষ্ঠী

রিমা রায়

Email ID : roy rima.8536@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Malo group, Titus River, Fishermen, Floating, Culture, Livelihood, Social system, Crisis.

Abstract

If you go through history, it can be seen that most of the world's civilizations were developed in the areas along the sea and river banks. Similarly, the village of Gokarna was raised on the banks of titas river, about three miles from Brahmanberia in Comilla district of undivided Bengal in subjugated India. Writer Advaita Mallavarman was born in a very poor Malla family in that village. And the novel 'Titas Ak Nadir Naam', rich in narrative of the lower classes written by him, is established as an immortal achievement. There is no touch of civilized civility in the so-called civil life, no political manipulation, only the struggle for livelihood of the group-centered life of the lower classes of human society. The life terms of the neglected people of Bengal were written in the writer's pen, probably with the urge to express their unspeakable pain in public. River and life are united in his writing. The river has given food to the mouths of the people on its banks, has created the emotions of the mind, the colors of the eyes, and life is an epic of pain. Malos have an inseparable relationship with the river Titus. It is on the banks of the river Titus that the birth, youth, youth, old age and all the rituals of the Malo family unfold. How important the role of the river in their lives is throughout the novel. The survival of the Malos is completely dependent on the river. Most of the people of Titus Par live by fishing. They have to catch fish from the water at night. There Titus is calm or fearless, so many mothers and wives are not afraid even in the night of the storm and the sons and husbands are sent to the river. The wives think that the husband is in their arms, the mothers think that the sons are just resting their heads on the mother's chest and calmly making a net full of fish. This Titus is the only companion in the life of Malos and this companion is forever. Without Titus, they cannot function, it has a part in every work of life, its name is closely associated with it, its constant intermingling with the work of daily life. The path that started from the courtyard of the house of all the malos all went and joined the water of Titus. They are even so attached to this name that the Titus necklace hangs around their necks. But this much dependence may have led the lives of Malo people to danger. Fishing was the only profession of the Malos who survived by adopting Titus but with the passage of time this profession is no longer active due to the drying up of the river water. As the water in the river dried up, the Malora became immobile. A dire crisis has arisen in their lives, due to which the Malos are gradually

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

moving towards destruction. So dependence on one river and one occupation has become the norm for Malo clans. The Malos could not bring any change in their lives according to time; So with the past they also became extinct. It is true that the Malos could not grasp the present, but Titus's history tied their own past to it.

Discussion

"নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে; কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই। নদীরও বহার শেষ নাই।"[১]

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিতাসের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ সমগ্র বিষয়বস্তুকে যেন একটি লাইনের মাধ্যমে ধরে দিয়েছেন। কেননা এই তিতাসের সঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মালোগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম। তিতাস যেমন বয়ে চলেছে সেই বাহমনতাকে ঘিরেই বইছে মালোদের জীবনস্রোত। তাইতো তার বুকে থেকে গেছে অজস্র ঘটনা।মানব জীবনের বাস্তব রূপকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ সেই ঘটনাগুলিকেই বাস্তবায়িত করেছেন। শরতের মেঘগুলিতে জল না থাকলেও জল থাকে তিতাসের বুকে। তাইতো চির অবহেলিত মালোদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই নদী। শুধু মালোদের বললে ভুল হবে, কৃষকদের জীবনও পরোক্ষভাবে নির্ভর করেছে নদীর ওপরেই। তিতাসের তীরে যেখানে বালু মাটির চর জমে সেখানেই চাষ করেন চাষিরা। তেমনি চাষী সকরকন্দ ও জোবেদ আলী। নদী পাড়ের গ্রামগুলির মাঝখানে থাকে ধান জমি। চাষিরা ধান কাটা শেষ করে এদিকের ধান ওদিকে বয়ে নিয়ে যেতে তিতাসকেই কাজে লাগায়। আর মালোদের তো সমগ্রটাই নির্ভর করছে তিতাসের ওপর। উপন্যাসের শুরুতে 'প্রবাস খন্ডে' মাঘমন্ডলের ব্রত পালনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় মাঘ মাসের ত্রিশ দিন তিতাসের ঘাটে প্রাতস্নান করে ব্রত শেষে বানানো চৌয়ারিকে তিতাসের জলে বিসর্জন দিয়েই ব্রতের শেষ করতে হয়।

বেঁচে থাকার জন্য সমগ্র প্রাণী জগৎকেই নিজেদের আহার ব্যবস্থা করতে হয়। আর তার মধ্যে মানবজাতির তো কথাই নেই, তাদের সচ্ছল জীবন ধারণের জন্য থাকে বিভিন্ন ধরনের জীবিকা। তেমনি মালোদের প্রধান জীবিকা হল 'মাছ ধরা'। মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করেই নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় মালোরা। তাই হয়তো পাঠশালার পড়াশোনার জীবন থেকে এ জীবন তাদের বেশি ভালো লাগে। তাই লেখাপড়ায় হাতেখড়ি পড়ার আগেই পড়ে যায় নাওজালে হাতেখড়ি এবং একসময় পাকা জেলে বলে তাদের নামও হয়ে যায় সমাজে। তবে মালোর ছেলেদের কাছে এটা কোন দায়বদ্ধতা নয় বরং ভালোলাগা এবং ভালোবাসাও বলতে পারি। আর সেই ভালোবাসার স্রোতেই তাদের জীবন বহমান। 'জন্ম বিবাহ মৃত্যু' এই তিন নিয়েই মানব সংসার। এই তিনের সাহায্যেই প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। মালোরাও এই তিন ব্যাপারেই পয়সা খরচ করে, ধুমধাম করে উৎসব পালন করে। সমাজে এই মালোরা নিম্নবর্গীয় অবহেলিত জনজাতি। তাই উৎসব অনুষ্ঠানে সকলেই পয়সা খরচ করতে পারেনা। তবে যারা পারে তারা অত্যন্ত সমারোহের সাথেই খরচ করে থাকে। এক একটি শিশুর জন্মের উৎসব করে থাকে অত্যন্ত জাঁকজমক এর সাথে, অন্নপ্রাশন করে আরো জাঁকিয়ে। তবে তাদের জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিবাহের ব্যাপারে খরচই তাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়ে থাকে। বিবাহ করে সুখ, দেখেও আনন্দ।

তাছাড়াও তাদের প্রবাহমান জীবনে অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠান তো রয়েছেই। কালী পূজোতেই হয় তাদের সবচেয়ে বেশি সমারোহ। পূজোর এক মাস আগে থেকেই বিদেশ থেকে কারিগর এনে মূর্তি বানানো হয়। চারদিন ব্যাপী যাত্রা ও কবিগানের মধ্যে দিয়ে পূজোর সমাপ্তি ঘটানো হয়। এবং তারপরেই তাদের জীবনে আরেকটি অনুষ্ঠান গুরুত্ব পায় তা হল উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিনে পিঠে-পার্বণের অনুষ্ঠান, কালীপূজোর সময় গান-বাজনা আমোদ আহ্লাদে মালোরা অনেক টাকা খরচ করে, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার জন্য খরচ করে এই উত্তরায়ন-সংক্রান্তির দিনেই। তবে জীবন মানে শুধু হৈ-হুল্লোর নয় সেখানেও থাকবে নিরাশা-হতাশা-দুঃখ এর ওঠানামা। তাই মালোদের জীবনে সুখের জোয়ার যেভাবে আসে তেমনি ভাবে আসে দুঃখের বন্যা। আর তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় রামকেশবের ঘরে। রামকেশবের একমাত্র সম্বল ছিল তার

পুত্র কিশোর। কিশোর-ই ছিল রামকেশবের সেসব দিনের সম্বল যেসব দিনে রামকেশব বৃদ্ধ সহায়হীন। কিন্তু সেই কিশোর-ই জোয়ান বয়সে প্রবাস থেকে ফিরে আসে পাগলাবস্থায়। উল্টে রামকেশবের কাঁধেই দায়িত্ব এসে পড়ে ছেলেকে সামলাবার। একমাত্র সম্বল বা নির্ভরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে রাম কেশবের দুর্দশা আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তাই রামকেশবের বুক ভরা আক্ষেপের সুর আমাদের কানকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

> "হায়রে বিধাতা, হায়রে উপরোল্লা, একি করলে, কোন পাপে তুই আমারে এ শাস্তি দিলে। সাধ করেছিলাম জোয়ান পুতের কামাই খামু, তারে বিয়া শাদি করামু, বউ ঘরে আনুম, নাতি কোলে নেমু। হায়রে আমার কপাল।"[২]

উপন্যাসের শুরুতে লেখক মালো গোষ্ঠীকে একবার সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন কিশোর নামক যুবকের ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে দিয়ে। শুকদেবপুরে থাকা অবস্থায় কিশোর দেখেছিলেন, শুকদেবপুরের বাসিন্দাদের জাল যেমন আছে তেমনি হালও আছে। প্রত্যেক বাড়িতেই জালের এবং হালের সরঞ্জাম পাশাপাশি রয়েছে। একদিকে নদী মাছে ভরভর, আরেকদিকে মাঠ ফসলে হাসিহাসি থাকে। কোনদিন যদি কোন অদৃশ্য শয়তান এসে তাদের জালের গিঁটগুলি খুলে দেয়, নৌকার লোহার বাঁধগুলি আলগা করে ফেলে আর নদীর জল চুমুক দিয়ে শুশেও নেয় তাও এরা (শুকদেবপুরের বাসিন্দা) মরবে না। তাই গোকনঘাট গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে কিশোর এর ভাবনা এসেই যায় তিতাস পাড়ের মালোদের তো কারুর ক্ষেত খামার নেই। কিন্তু সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে গিয়ে, একজন মালোর ছেলে হয়ে বুকের মাঝে সে সাহস জোগাতে পারেনি লেখক। তাইতো কিশোর এর মুখে বসিয়ে দিয়েছেন –

> "আমাদের গাঁয়ের মালোদের কারো ক্ষেত খামার নেই। কিন্তু তিতাস আছে, তাকে শোষণ করিবে কে।"[৩]

সত্যিই এটা মালোদের ভাবনার থেকে অনেক দূরে যে, তিতাস কোনদিন শোষিত হবে। আর মালোদের জীবন যেখানে তিতাসকে ছাড়া অচল সেখানে কেনোই বা ভাববে তিতাসকে ছাড়া।

জন্মসূত্রই মালোরা জেনে এসেছে তিতাস এর সঙ্গে তাদের জীবনের বাঁধন এক সূত্রে গাঁথা। তার জন্য নদীর বিষয়ে একই রহস্য মালোদের বারবার শুনেও আনন্দ এবং শুনিয়েও আনন্দ। যতই সে রহস্য পূর্বশ্রুত হোক না কেন তাদের রোমাঞ্চে বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না রহস্যের পুনরায় উন্মোচনে। তারা যতই শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ুক না কেন নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেবার সময়ও তারা অনুভব করতে পারে তিতাসের জলের আসন-বসন। 'নয়া বসত' খন্ডে লেখক দেখিয়েছেন প্রথমবার নৌকাতে উঠে অনন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। বারংবার সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে 'বড়-গাঙ' দেখার স্বপ্নের মধ্যে। তবে মালোর ছেলে হিসাবে এটা যেন তার স্বভাবসিদ্ধ অধিকার। আর এই অধিকার এর জোরেই বোধহয় গোকনঘাটের মালোরা তাকে এবং তার মাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তবে শুধু অধিকারের জোরে বললে ভুল বলা হবে। কেননা তিতাস পাড়ের মালোদের ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি অসাধারন প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন। সেই বন্ধন এর কিছুটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে সুবলের বউ বাসন্তীর অনন্তের মায়ের প্রতি। দুজনেই সমবয়সী এবং অল্প বয়সে বিধবা তাই হয়ত সমবেদনার নিঃশ্বাস বাঁধ মানতে পারেনি। একজন অপরজনকে দেখিয়ে দেয় কাজের পথ, সেখানে জীবন খুব সচ্ছল না হোক সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা যায়। মালোদের মাছ ধরার জীবিকা যতদিন আছে নাও-জালের কাজ ততদিন থাকবে। তাইতো পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সক্ষম হয়ে যায় জাল বোনার কাজে।

কাজ যতই ভালো এবং ভালোবাসার হোক না কেন তাদেরকে থাকতে হয় কোন না কোন না কোন মালিকানার ভেতরে। যেমন মাটির মালিক থাকে জমিদার, যদিও জমিদাররা নিজেরা এসে কখনোই সে মাটিতে ঘরবাড়ি বাঁধেনা তবুও ঘুরে ফিরে তারাই মাটির মালিক হয়। আর শোষক-শোষিতদের টানাপোড়ান এর কথা তো আমাদের কারোরই অজানা নয়। তাইতো তিতাস এর সঙ্গে মালোদের জীবন এক সূত্রে বাঁধা থাকলেও তারা শোষিত শ্রেণী মাত্র, শোষণ করে অন্যকেউ। লেখকের ভাষায়–

> "তিতাসের মালিক জেলেরা। কাগজপত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা।"[৪]

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তবে সেই মাছে শুধুমাত্র মালোদের অধিকার আছে তাও নয়। রাজবাড়ীতে নির্দিষ্ট দিনে দশভার করে মাছ দিতে হয় মালোদের। তবে বর্তমানে প্রচলিত ভিন্ন ব্যবস্থা। মালোদের দশজন এর প্রধান মাতব্বর রামপ্রসাদ স্বয়ং সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এক সময় জগৎ বাবু এবং আনন্দ বাবু বাজার বসাত। আর সেই বাজারে মালোদেরকে পশরা সাজানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। মালোদের কাছে আসা এই অনুরোধ প্রেরিত হলো বড় মাতব্বর রামপ্রসাদের কাছে। রামপ্রসাদ আনন্দ বাবুর শর্তে (প্রত্যেককে ২৫ টাকা নগদ এবং একখানা করে ধূতি) রাজি হয়ে তাদেরকেই পান তামাক খাওয়ান। পরিনামস্বরুপ মালোরা মাছের ভার নিয়ে আনন্দবাবুর বাজারে পশরা সাজায়। কিন্তু সে ব্যবস্থায় আজ ঘুন ধরেছে। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার চিরপ্রসিদ্ধ তাইতো মধ্যসত্ত্বভোগী দালালের রক্ত চক্ষুকে মালোরা ফাঁকি দিতে পারেনি। মোড়ল-এর আশ্বাস পেয়ে একজন ভুক্তভোগী জানায় –

> "আনন্দবাজারে মাছ বিক্রেতাদের কাছে এখন জমিদারের লোকে মাশুল চাইতে শুরু করিয়াছে। মাছের ভার পিছু দুই আনা করিয়া মাশুল না দিলে বলিয়া দিয়াছে মালোদিগের বাজারে বসিতে দিবে না।"[৫]

জাতিভেদের তারতম্যও কিছুটা রয়েছে উপন্যাসে। তামসীর বাপের চরিত্র বিশ্লেষণে তার কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তামসীর বাপ কায়েতদের সাথে মেলামেশা করে ঠিকই কিন্তু তারও কোথাও গিয়ে অনুশোচনার জায়গা তৈরি হয়েছে। তার নিজেরও দশজনের সভায় বসে মনে হয়েছে পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। কায়েতরা যতই তার সাথে মেলামেশা করুক তারা মালোদের ঘরে নেয়না, মালোরা কোন জিনিস ছুলে সেই জিনিকে তারা অপবিত্র মনে করে। আর দশজনের সভায় তো তামসীর বাপকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় –

> "ভাবিয়া দেখো কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসন দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দেবে ভাঙা তক্তায়। তুমি রুপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকেখানা।"[৬]

দশজনের সভায় দয়ালচাঁদ এর এই সতর্কবার্তার মধ্যে দিয়ে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা শিক্ষিত নাই হতে পারে কিন্তু সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অসচেতন নয়। তাদের অগোচরে কিছুই নেই। তাইতো প্রতিবাদ না জানাতে পারলেও নিজেরা নিজেদেরকে সচেতন করতে জানে।

প্রবাহমান জীবনধারায় মৃত্যু যন্ত্রণা থাকবে না তা কখনোই সম্ভবপর নয়। তবে সেই বেদনাকে সময়ের সাথে ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। মালোরাও তেমনিভাবে এগিয়ে গেছে জীবনের পথে। মালোপাড়ায় সুবলের মৃত্যুটা বড়ই মর্মান্তিক। কালো বরণের বড় নৌকায় জিয়লের খেপ দিতে গিয়ে মেঘনা নদীতে তুফানের সম্মুখীন হয় তারা। তীরে নেমে তরী বাঁচাতে গিয়ে উৎসর্গ করতে হয় সদ্যবিবাহিত যুবক সুবলের প্রাণ। কিন্তু তাতে করে সুবলের স্ত্রী বাসন্তীর জীবন থেমে থাকেনি। তাকেও সময়ের সাথে সব দুঃখ কষ্ট বেদনা ভুলে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

> "চার-পাঁচ বছরে সে অনেক কিছু ভুলিয়াছে। স্বামীর জন্য তার আর কষ্ট হয় না। স্বামী বড় নিদারুণ মৃত্যু মরিয়াছে। এ কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।"[৭]

এছাড়াও রামকেশবের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন কিশোর পাগলাবস্থায় দিন কাটালেও তার মৃত্যুও ব্যাথিত করেছিল মালোদের। আর বিশেষভাবে ব্যাথিত করেছিল অনন্তের মাকে। যার পরিনামস্বরুপ চার দিন এর মাথায় অনন্তর মাকেও মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয়। তবুও মাকে ছাড়া বেঁচে থাকে অনন্ত, বেঁচে থাকতে হয় তাকে, তাও রীতিমতো লড়াই করেই। কারণ সমাজে পিতৃমাতৃহীন সন্তানের দুর্ভোগ-দুর্দশার তো শেষ হতে দেখা যায় না। তারপর একে একে আরো অনেক মৃত্যুই দেখা গেছে তিতাস পাড়ের মালোগোষ্ঠীদের মধ্যে। যা সমাজে অনেকটাই আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তবুও তারা থেমে থাকেনি, থেমে থাকেনি তাদের জীবন। একে অপরের প্রতি মায়া-মমতা ভালোবাসা তাদের চলার পথকে আরো বেশি সুগম করে তুলেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই সবকিছুর মধ্যে মালোদের সংস্কৃতিকে বাদ দিলে চলে না। কালীপুজো, পিঠে-পার্বণ এর ধূমধামের পাশাপাশি রয়েছে মনসা পূজার ধূমও। গোটা শ্রাবণমাসে রোজ রাত্রে গাওয়া হয় পদ্মপুরাণ গান। আর শ্রাবণ মাসের শেষের দিন ঘরে ঘরে আয়োজন করা হয় মনসা পূজার। অন্য পূজার চাইতে এই পূজোয় খরচ করে কম তবে আনন্দ হয় বেশি। ডুমুরের ফুলের মতো দুর্লভ মালোদের পুরোহিত। আর এই একজন পুরোহিত কে দশ বারো গায়ে ঘুরে পূজা করাতে হয় এই দিনে, তবুও এই দিনটির গুরুত্ব তাদের কাছে অনেক বেশি। আর এই বিশেষ দিনটিতে করা হয় জালাবিয়ার মত এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ধানের চারা বা জালাই হল এই বিয়ের প্রধান উপকরণ। এক মেয়ে বরের মত সোজা হয়ে চৌকিতে দাঁড়ায় আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার প্রদক্ষিণের মধ্যে দিয়ে এই এই জলাবিয়ার উৎসব পালন করে। তারপরে তাদের নৌকা-দৌড় (নাও-দৌড়ানি) প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই। এই প্রতিযোগিতা নিয়েও তাদের মধ্যে বেশ হুড়ুম-দুড়ুম লক্ষ্য করা যায়, তার বর্ণনা উপন্যাসটির অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে। তাই লেখক বলেছেন, রুপে রসে গন্ধে ভরপুর ছিল মালোদের এই সংস্কৃতি।

> "মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্টপূর্ণ।"[৮]

উপন্যাসের শেষপর্বে 'ভাসমান' শব্দটি উচ্চারণে আমাদের মনে এই অনুষঙ্গ আসে যে তিতাসের স্রোতে ভাসমান। তবে প্রকৃতপক্ষে এর অভিব্যঞ্জনা-বিনাশের স্রোতে ভাসমান; আর উপন্যাসের শেষের দিকে এই বিনাশের কারণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমেই, যেখানে বাসন্তী ও অনন্তের সম্পর্কের ভাঙন দেখিয়েছেন লেখক সেখান থেকেই যেন মালোসমাজের ভাঙনের ইঙ্গিত পাচ্ছি আমরা। লেখক এক জায়গায় বলেছেন –

> "মালোদের একতায় যেদিন ভাঙ্গন ধরিল, সেই দিন হইতে তাদের দুঃসময়ের শুরু। এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল ব্রজের মতো দৃঢ়, পাড়াতে তারা ছিল আঁটসাট সামাজিকতার সুদৃঢ় গাথুনির মধ্যে সংবদ্ধ। কেউ তাদের কিছু বলিতে সাহস করে নাই। পাড়ার ভিতরে যাত্রার দল ঢুকিয়া সেই ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিল।"[৯]

মালোদের সংস্কৃতিতে আঘাত হানে এই 'যাত্রাগান'। মালোসমাজের ভাঙনের পেছনে এই 'যাত্রাগান' এর ভূমিকা অনিবার্য। যাত্রা গানের কারনেই মালোর ছেলেরা কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। হুক্কা ছেড়ে সিগারেট ধরল। গুরুজনদের প্রতিও তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি রইল না। মালোরা ধীরে ধীরে আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলল। তাদের ব্যক্তিত্বও ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগলো। সামাজিক নীতির বন্ধনও ক্রমে ক্রমে শ্লথ হয়ে আলগা হয়ে গেল। সামান্য বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিল। ক্রমে প্রতিদিনের নিত্য বিষয়ে তীব্র প্রতিযোগিতায় তারা নেমে এলো। অথচ এই সব কিছু একসময় মালোদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

মালোদের সংস্কৃতি হারানোর পাশাপাশি রয়েছে নাগরিক জীবনের হাতছানি, অনন্ত তারই শিকার হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় –

> "একসময় যারা নদীর বুকেই জাল ফেলে দিন কাটিয়েছে, সংগ্রহ করেছে তাদের আহার। তারাই পরবর্তীকালে সে বৃত্তি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সামাজিক বিবর্তনের একটি ইশারা যেন তিতাসের গল্পে ঝিলকিয়ে উঠেছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের চেহারাটা ছিল পুরোপুরি আহার্য্য সংগ্রহভিত্তিক - যা তিতাস পড়ের মালোদের জীবনে প্রথম পর্যায়ে প্রতিফলিত। ক্রমশ তিতাসের জলে নির্ভরশীল মাছমারাদের জীবনের ধাঁচচটা গেল বদলে, শুরু হবে জীবন-যাপনের পালা আহার্য উৎপাদনে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় পৌঁছে দিয়েই ছুটি নিয়েছে অদ্বৈত।"[১০]

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 818 - 823
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিতাস পাড়ের মালোদের না রইলো রোজগারের প্রতি মন না রইল প্রবাসে যাওয়ার উদ্যোগ। এমনকি একসময় তাদের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান তিতাস এর খবরও রাখছে না তারা। রাধাচরণ মালোর তিতাসকে নিয়ে দেখা ভয়ংকর স্বপ্নের সম্মুখীন তারা হতে চায় না। চরটা ভাসমান হয়ে পড়লেও বাস্তবকে তারা হেঁয়ালি করতে থাকে। যার পরিনাম তাদের জীবন দিয়ে দিতে হয়। কেননা জল ছাড়া মাছেদের যেমন অবস্থা হয় তিতাসকে ছাড়া মালোদের অবস্থাও অনুরুপ। দীর্ঘকালের দলাদলির ফলে মালোরা একযোগে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তিতাসে যেখানে একান্তভাবে মালোদের অধিকার ছিল সেখানে তিতাসের উপরে ভাসমান চরে তারা অধিকার স্থাপন করতে পারল না। ফলে যারা অনেক জমির মালিক যাদের জোর বেশি তিতাসের বুকে তারাই আবার নতুন জমির মালিকানা পেল। তাই যে নদীকে কেন্দ্র করে মালোজীবনের বিস্তার-বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি, সেই নদী যদি হারিয়ে যায় শুকিয়ে যায় তাহলে এদের গোষ্ঠী জীবনের অস্তিত্বই বা টেকে কিভাবে। তাইতো উপন্যাস এর শেষে তিতাস নদীর পাশাপাশি মালোগোষ্ঠীকেও নিশ্চিহ্ন হতে দেখা গেছে।

Reference:

১. মল্লবর্মন, অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৪, মাইতি বুক হাউস, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ১৩
২. তদেব, পৃ. ৭২
৩. তদেব, পৃ. ৩৭
৪. তদেব, পৃ. ৮৩
৫. তদেব, পৃ. ৮৫
৬. তদেব, পৃ. ৮৬
৭. তদেব, পৃ. ১১৯
৮. তদেব, পৃ. ২৪১
৯. তদেব, পৃ. ২৩৮
১০. নস্কর, ড. সনৎ কুমার, সাহিত্য প্রবন্ধ, সেকালে একালে, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, সংযোজিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ২৮৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 824 - 831
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎ সাহিত্যের আলোকে শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা

মানস কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : manasdas725@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Social evils, condition of women, lower class, patriarchal society, caste discrimination, superstition

Abstract

'Literature can act as a mirror of society'. This is very much true about the writing of all great writers, Sarat Chandra chattopadhyay being one among them. The vast corpus of his writing- novels, short stories, essays- depicted superstition, social injustice and condition of women of his time. But behind all his writings was his silent intention to inform and educate his readers about evils of society as he saw it. Sarat Chandra Chattopadhyay was also a very socially conscious person and as a very popular writer, he did not write various stories, novels and essays only for the purpose of writing literature, but also from his firm belief that it was his moral duty for creating social consciousness against various social evils. He firmly believed that, one should try to remove various injustices and superstitions from society by writing against them. Sarat Chandra believed that the root of social evils and problems stem from socio-economic discrimination, the disturbing condition of lower caste and class, caste discrimination, the way women were treated in a patriarchal society, particularly in contemporary Hindu society. These social evils were so firmly rooted in the minds of people that it was impossible for people to get rid of these social evils and malpractices unless they were completely uprooted.

In the article under discussion, there will be an attempt to analyze how Sarat Chandra chattopadhyay, through his various novels, stories and articles, tried to form a public opinion among his readers by writing against various social evils and various social injustices. In short, the main aim of this research paper is to reveal how his social consciousness has been revealed through the Sarat Chandra's literature, that is, how much Sarat Chandra was a socially conscious person, in the light of the literature he created.

Discussion

ডক্টর অশীন দাশগুপ্ত বলেছেন, -

"সাহিত্য হল সমাজ-মানসের দর্পণ।"[১]

অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। কারণ সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন রূপকের আড়ালে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্রটিই তুলে ধরেন। আর একজন সাহিত্যিক যে সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করেন তা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর মানসিকতা ও মননশীলতার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষত উপন্যাস ও গল্পের মাধ্যমে সমাজের রূঢ় বাস্তব চিত্রটিই পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেন। আর এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনাগুলি ছিল মূলত রূঢ় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনার প্রতিবিম্বন। তিনি বাস্তব জীবন থেকে যা উপলব্ধি করেছেন তাই তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তিনি মানুষের জীবনের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী, তাদের ছোট্ট ছোট্ট অনুভূতির কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন বলেই তো তিনি ‘কথা সাহিত্যিক’।

শরৎচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সমাজসচেতন লেখক। তিনি মনে করতেন সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা আছে এবং সাহিত্যিক তাঁর এই সামাজিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারেনা। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মের নান্দনিক মূল্য যেমন অপরিসীম, তেমনই তার সামাজিক মূল্যও কোন অংশে কম নয়। বস্তুত সৃষ্টিশীল লেখকের কাজই হল জনসচেতনতার স্ফূরণ ঘটানো। একইভাবে শরৎচন্দ্রও তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বস্তুতপক্ষে সমাজের দারিদ্র-পীড়িত, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের বেদনা শরৎচন্দ্রের কলমে উন্মোচিত হয়েছে; তাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আকুতি তাঁর লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত 1933 সালে তাঁর 57তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক প্রতিভাষণে উল্লেখিত শরৎচন্দ্রের বক্তব্য থেকে তাঁর এই সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়। এখানে তিনি বলেন —

> “...সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, ...তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।”[২]

এমনকি সুভাষচন্দ্র বসুও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন —

> “সমাজে যাঁহারা বর্জিত ও উপদ্রুত তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা। নিজের জীবন তিনি দুঃখ দৈন্য ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।”[৩]

এছাড়া আমরা যদি শরৎ সাহিত্য পাঠ করি তাহলে দেখতে পাবো শরৎচন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে শ্রেণীবিভক্ত, কুসংস্কারে আবদ্ধ, স্ববিরোধিতায় পূর্ণ হিন্দুসমাজের যে বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ই সুনিপুণ দক্ষতার সাথে তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয় সমাজে যে বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা ছড়িয়ে আছে তা থেকে কি করে সমাজকে মুক্ত করা যায় সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি মনে করতেন, “আমাদের দেশের সমাজে জাত-পাতের সমস্যা, ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যা কত খারাপ এ সম্পর্কে শুধু দুটো বক্তৃতা দিয়ে এ জিনিসকে সমাজ থেকে দূর করা যাবে না। কারণ এটা সংস্কারের রূপে এমন করে মনোজগতে ঢুকে গেছে যে শুধুমাত্র দুটো বক্তৃতা বা ভালো কথা বলে এর হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।” সেই জন্য সংস্কার কী মারাত্মক তা তিনি নানান ভাবে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আমাদের অনেক দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোড়ামীকে কষাঘাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আমরা যতই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হই না কেন আমাদের মধ্যে মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনা ও সংস্কার দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধে ছিল। এমনকি বহু ক্ষেত্রে এখনো আমরা পুরোপুরি এর থেকে মুক্ত হতে পারিনি। বিশেষ করে ভারতীয় নারীকে এই সংস্কারের বাঁধনে সবচেয়ে বেশি বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শরৎচন্দ্র এই অতি সাধারণ কথাটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সতীত্ব রক্ষার দোঁহাই দিয়ে নারী জাতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখতে চায়, এর অন্যথা হলে তার কপালে জোটে অসীম লাঞ্ছনা। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে কুলটা, দুশ্চরিত্রা বা চরিত্রহীনা অপবাদ দিয়ে সমাজ বহির্ভূতও করা হত। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে হয় তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হত নতুবা পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে হত অথবা সবশেষে মৃত্যু ছাড়া কোনও গত্যন্তর থাকত না। শরৎচন্দ্রই প্রথম তাঁর *'চরিত্রহীন'* উপন্যাসে ভারতীয় নারী সমাজের এই দুর্বিষহ যন্ত্রনার চিত্র পাঠক বর্গের কাছে তুলে ধরেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাঁর সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে চায় না, জীবনে চরম দারিদ্রতা বা দুর্বিসহ শোষণ-যন্ত্রনার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য, অথবা পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির কারণে কোন উপায়ান্তর না দেখে বহু নারী গণিকা বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হয়। আর নারীর এই অবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের রসদ যে তিনি বাস্তব জীবন থেকে সঞ্চয় করেছিলেন, এমনকি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়ে তাঁকে দুর্নামের ভাগীদার হতে হয়েছিল তার বর্ণনা লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের এক চিঠি থেকে পাওয়া যায় —

> "আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ছয় সাত শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা! ...দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়। পয়সার জন্যে নয়, পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়।"[৪]

এছাড়া এই সতীত্বের সংস্কার কি মারাত্মক এবং তা কিভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়ে আছে তা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনার মাধ্যমে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনীকার শ্রী গোপালচন্দ্র রায় এর লেখা থেকে আমরা এই ঘটনার উল্লেখ পাই। শ্রী গোপালচন্দ্র লিখেছেন —

> "তখন শরৎচন্দ্র বালক, পাড়ায় এক বাল বিধবা ছিল, তাহাকে তিনি দিদি বলিতেন। মেয়েটি অত্যন্ত পরোপকারী ও শান্ত। সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিত। ছেলেমানুষীর ঝোঁকে শরৎচন্দ্র একদিন সন্ধ্যায় তাঁহার এই দিদিকে একটু ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের নিমগাছে উঠিয়াছিলেন। যেই তিনি নাকি সুরে দিঁ-দিঁ বলিয়া ডাকিয়াছেন, অমনি দেখিলেন একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি দিদির খাটের নিচে লুকাইয়া পড়িল।"[৫]

এই ঘটনা নিয়ে শরৎচন্দ্র পরে মেদিনীপুরে এক সভায় বলেছিলেন, "এই যে ব্যাপারটা দেখা গেল এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দিদির হয়তো সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তার নারীত্ব থাকবে না কেন? মানুষের রোগে শোকে সেবা করে, দীন দুঃখীকে দান করে যে মহত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার কি কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই? নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বালবিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে নাই পেরে থাকে তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না? এই জন্যই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব—দুটোকে আলাদা করে দেখেছি।"

একইভাবে *'শ্রীকান্ত'* উপন্যাসে শ্রীকান্ত যে নিরুদিদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তাতেও শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। শ্রীকান্তের মুখে শোনা যায় -

> "বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, গৃহস্থালির সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত স্নিগ্ধ শান্তস্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালোবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষ-স্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিমশয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায় লজ্জায়, নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাস-কাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহকাল ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোন স্মার্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।”[৬]

শরৎচন্দ্র তাঁর *‘সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি’* প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন –

> “... অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। ...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়। ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?”[৭]

বস্তুতপক্ষে সতীত্বকে তিনি নারীর ভালো-মন্দের মানদন্ড বলে মনে করেননি বলেই তাঁর সাহিত্যে সমাজ বহির্ভূতা ও পতিতা নারীদের জীবনও এত সম্মানের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে দু’একটি স্থানে পতিতা চরিত্র দেখা গেলেও সেগুলিকে সমাজের চোখে ঘৃণার পাত্রী করেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রই প্রথম সীমাহীন সহানুভূতির সাথে এই পতিতাদের চরিত্র আলোচনা করেছেন এবং নারীত্বের মাধুর্য ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শরৎচন্দ্র এক দিকে যেমন এই সমাজ-পরিত্যক্তা পতিতা মেয়েদের কলঙ্কিত জীবনের ইতিহাস, পতিতালয়ের বাস্তব জীবনধর্মী চিত্র, তাদের দুঃখ বেদনা ও প্রণয়ার্তির হৃদয়স্পর্শী বিবরণ গভীর সহানুভূতি ও মানবতাবোধ থেকে সযত্নে চিত্রিত করেছেন, তেমনি এই সমাজ পরিত্যক্তা পতিতাদের মধ্যেও যে মানবিক ও হৃদয়বৃত্তিগত গুণগুলি থাকতে পারে তা তিনি *‘দেবদাস’* ও *‘চরিত্রহীন’* উপন্যাসে চন্দ্রমুখী ও সাবিত্রী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এইভাবে তিনি আমাদের সমাজে পরিত্যক্তদের সমস্যাকে এক সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে পাঠককে সমাজ সচেতন করে তুলেছেন।

শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি শরৎচন্দ্র শ্রেণীবিভক্ত ও জাতিভেদ প্রথার অত্যাচারে জর্জরিত এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ঠ ভারতীয় সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের হৃদয় বিদারক যন্ত্রনার কথা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় উল্লেখ করে আপামর পাঠক সমাজের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ সামাজিক দিক থেকে না হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি নিজেই ছিলেন এই শ্রেণীর প্রতিভূ।[৮] কেননা জন্মের পর থেকেই শরৎচন্দ্রকে যে চরম দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে সেকথা তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট। তাঁর নিজের কথায় –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে-তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগদীর বাড়ীতে আহার করেছি ...তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ।"[৯]

এছাড়া লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে এও লিখেছেন যে —

> "বড় দরিদ্র ছিলাম, — ২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও, তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস করেই দিন কাটবে।"[১০]

অর্থাৎ শরৎচন্দ্রকে শৈশব থেকেই চরম আর্থিক দুরবস্থা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলেই হয়তো তাঁর রচনায় একদিকে যেমন গ্রাম বাংলার মানুষের প্রতি এত দরদ-সহমর্মিতা তেমন অপরদিকে তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুর রূপটি ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয় শরৎচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু-সমাজের দলাদলি, নীচতা-নিষ্ঠুরতা, জাতিভেদ প্রথার কুফল, সমাজপতিদের ধর্মের ও কুসংস্কারের নামে যথেচ্ছাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বেদনাময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাই পরবর্তীকালে শরৎ-সাহিত্যে প্রতিফলন এবং সমাজের সেই সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়েছিল। কেনো না সমাজদ্রোহ ছিল শরৎচন্দ্রের মজ্জাগত। এমনকি তিনি একজন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণ্য সমাজের নীচতা, আচার-বিচারের নামে তাদের ভন্ডামির বিরুদ্ধে শাণিত আঘাত হানতে পিছুপা হননি। এরজন্য ব্যক্তিগত জীবনেও লেখক শরৎচন্দ্রকে সমাজপতিদের নির্লজ্জ শোষণের শিকার হতে হয়েছিল এমনকি সমাজে তাঁকে 'একঘরে' করে দেওয়া হয়েছিল।[১১] আমরা এই ঘটনার উল্লেখ পাই শরৎচন্দ্রের বার্মা থেকে ফেরার পর হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকাকালীন তাঁর পুস্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্র থেকে। তিনি লিখেছিলেন—

> "...জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে' আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়...।"[১২]

সুতরাং শরৎচন্দ্র সমস্ত নিন্দা, গ্লানি বা নির্যাতনের ভয়কে উপেক্ষা করে নির্ভিক ভাবে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং সমাজের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। আর এক্ষেত্রে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে তিনি এমনভাবে চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেছেন যাতে তা মানুষের মনন জগতে ক্রিয়া করে ব্যথা-বেদনা সৃষ্টি ক'রে সমাজের কদর্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার চেতনাকে ক্রিয়াশীল করে। এইভাবে একজন প্রকৃত সাহিত্যসেবীর যা কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন তা-ই আজীবন করে গেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর *'শ্রীকান্ত'* ও *'পল্লীসমাজ'* উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের উপর উচ্চবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের নিরন্তর অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি তুলে ধরেছেন। গ্রামের জমিদার-গোমস্তা-সম্পদশালী মানুষেরা কিভাবে হতদরিদ্র মানুষদের সর্বস্ব গ্রাস করে তাদের নিঃস্ব করে ফেলে তার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন – "তাঁদের লোলুপদৃষ্টি প্রথমেই গিয়ে পড়ে তাদের কৃষি জমিতে। তারপর তাদের ভিটেমাটি টুকুও আত্মস্থ করতে তাদের বিবেকে আটকায় না। কখনো দেনার দায়ে, কখনো বা অন্য নানা কৌশলে তারা বাধ্য করে এই দরিদ্র মানুষদের জমি বিক্রি করতে।" এছাড়া *'শ্রীকান্ত'* উপন্যাসে উল্লেখিত গঙ্গামাটি গ্রামের অধিবাসীদের দূরবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন –

> "কেবলমাত্র চাঙ্গারি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সৎগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি তো ভাবিয়া পাইলাম না। ...পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোনো হিসাব কেহ কখনো রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে এক বিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনার কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।”[১৩]

শরৎচন্দ্রের *‘পল্লীসমাজ’* উপন্যাসেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ছত্রছায়ায় পুষ্ট গ্রাম্য জমিদার ও সমাজপতিরা কিভাবে সাধারণ মানুষের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালায় তা বর্ণিত হয়েছে। এই স্বার্থলোলুপ মানুষরা নিজেদের স্বার্থপুরণে এতটাই উন্মত্ত থাকে যে গ্রাম বাংলার অসহায় চাষী, জেলে, বাগদী, বাউরি, ডোমেদের কান্না তাদের মনে এতটুকু রেখাপাত করে না। তারা নির্বিচারে এই অসহায় মানুষগুলোর উপর অত্যাচার চালিয়ে যায়। তাইতো লেখক সমগ্র সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, “পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসংকোচে অত্যাচার করিবার সাহস ইহারা কোথায় পায় এবং কেমন করিয়া পায়, কেমন করিয়া দেশের আইনকে ইহারা কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। ...অর্থবল এবং কূটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যহতি দেয়, মৃত সমাজও তেমনি অন্যদিকে তাদের দুষ্কৃতির কোন দন্ডবিধান করে না।” উপরন্তু বহু শিক্ষিত ভারতবাসী এইসময় ইংরেজ শাসনকে সাদুবাদ জানিয়েছিলেন। তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চালু করা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র এর স্বরূপকে যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন— “দীঘি নেই, পুকুর নেই কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়... ম্যালেরিয়া, কলেরা হরেক রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে।” শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে শিল্পব্যবস্থার বিকাশের(?) ফলে সৃষ্ট শিল্প-শ্রমিকদের দুর্বিসহ জীবনযাত্রার কথাও তাঁর রচনার ধরা পড়েছে। তাঁর ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে বার্মামুলুকে ভারতবর্ষীয় কুলি লাইনের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রণালীর বস্তুনিষ্ট চিত্র আছে, ‘শেষপ্রশ্নে’ আছে আগ্রা শহরতলীতে চামড়া কারখানায় কর্মরত মুচিদের মজুর-বস্তির বর্নহীন জীবন প্রবাহ, ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে রেলওয়ের কন্সট্রাকশানে কর্মরত শ্রমিকদের রোগ-শোক ও দুঃখভরা জীবনের কাহিনীকে পাই, ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে পরিনতিতে গ্রামীণ অবহেলিত মানুষটিকে চটকলে কাজ খুঁজতে যেতে দেখা যায়।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভাবেই নয়, জাতিগত ভাবেও সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষরা কিভাবে শোষিত হয় তাও লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি গ্রামীন হিন্দুসমাজের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের রূপ — নিম্নবর্ণের মানুষের উপর সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের নির্মম শোষণ যন্ত্রণা। জাতিভেদ প্রথাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক অসাম্য, অত্যাচার ও অনাচার সমাজের বুকে কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তা শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং দেখিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজপতিরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ, অহংকার ও দম্ভের বেদীমূলে কি ভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষকে বলি দেয়, কত নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতায় প্রতিপক্ষকে বিশেষ করে নিম্নবর্গের লোকদের নানাধরনের সামাজিক শাস্তি বিধান করে গোঁড়া হিন্দু সমাজের তথাকথিত হিন্দুয়ানীকে কায়েম করতে চায়। একাধিক স্থানে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন — এই নিম্নবর্ণের মানুষদের সমাজে অস্পৃশ্য ক’রে রাখা হয়েছে—বিবাহ থেকে মৃত্যু সর্বক্ষেত্রে তারা অধিকার বঞ্চিত। সম্প্রতি Shrirama-ও তাঁর ‘Untouchability and Stratification in Indian Civilisation’ নামক প্রবন্ধে দলিতদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের ধারণাটি জড়িত বলে দেখিয়েছেন।[১৪] সেকারণে শরৎচন্দ্রের *‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘বামুনের মেয়ে’, ‘হরিলক্ষী’* প্রভৃতি গল্পে হিন্দু সমাজের অতি নিচু দুলে-বাগদি প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের বঞ্চনার চিত্রটিও পরিস্ফুটিত হয়েছে। একই সাথে এই গল্পের মধ্য দিয়ে যেমন নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নিম্নবর্গের অন্ত্যজ শ্রেণী সমাজে সমাজে নানাভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হলেও তারাই যে সভ্যতার মূল বাহক তা এখানে দেখানো হয়েছে। তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর ‘রাশিয়ার চিঠি’- তে এদের ‘সভ্যতার পিলসূচ’ বলেছেন।

বস্তুত পক্ষে শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। সমাজদ্রোহ ছিল তাঁর মজ্জাগত। আর তিনি অত্যন্ত সমাজ সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এমন সুচারু ভাবে সমাজের বাস্তব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিত্র তুলে ধরেছেন যা পড়ে পাঠকের মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন -

> "আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছি— এইখানেই আমার সাহিত্য রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; বর্তমান কালে কোন্‌ পরিবর্তন উপযোগী এবং কোনটার সময় আজও আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্তমনে বিদায় নিয়েছি...।"[১৫]

সুতরাং শরৎসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়— শরৎচন্দ্র একজন সাহিত্যিক হয়েও প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের ন্যায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও মানুষের দুঃসহ শোষণ যন্ত্রনা ও দুঃখ-কষ্টের দিকটি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, এমনকি তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদও জানিয়েছেন। যা বর্তমান কালেও শরৎ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতাকে আরও একবার প্রমাণ করে।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, অশীন. ইতিহাস ও সাহিত্য, কলকাতা - 9, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ২৭

২. কুমার, শ্রী মদনমোহন. (সম্পা.), শরৎচন্দ্র, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৫. 2-রা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (ইংরাজি ১৯৩৩ সাল) কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিভাষণ।

৩. বসু, সুভাষচন্দ্র. 'স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র', দে, বিশ্বনাথ. (সম্পা.) শরৎস্মৃতি, কলকাতা ৭৩, সাহিত্যম, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (১৯৭০ খ্রিঃ). পৃ. ৪৩

৪. 14-8-1919 তারিখে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি। দ্রষ্টব্য: রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৭৬

৫. রায়, শ্রী গোপালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা- 12, সাহিত্যসদন, ১৩৬৯, পৃ. ৪৪০

৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব), অষ্টম পরিচ্ছদ, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, শুভম প্রকাশন, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৪২২ - ৪২৩

৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩৭

৮. অধ্যাপক রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন - "...উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। ...ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেত মজুর, গরিব চাষী ও প্রায় গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তাছাড়াও এই সংজ্ঞায় শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষকেরাও..." অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কৃষক, শ্রমিক, শহুরে জনতা, আদিবাসী, নিম্নবর্ণের মানুষ এমনকি মহিলারাও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে বিদেশী শাসক, বণিক, পুঁজিপতি, দেশি অভিজাত, বুর্জোয়া ও উচ্চশ্রেণীর মানুষরা উচ্চবর্গের অন্তর্গত। সুতরাং নিম্নবর্গ কথাটি কেবলমাত্র বর্ণগত বা জাতিগত অর্থেই প্রযুক্ত নয়, পেশাগত, গুণগত এমনকি অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণী বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্রষ্টব্যঃ গুহ, রণজিৎ. 'নিম্নবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাসবিদ্যার দায়িত্ব', এক্ষণ ১৫-শ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ১৪-১৭

৯. রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৮

১০. কুমার, শ্রীমদনমোহন. (সম্পা.), শরৎচন্দ্র, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮

১১. রায়চৌধুরী, অনির্বাণ. শরৎসাহিত্যে আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, চারুপত্র প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৪

১২. রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১৬৫

১৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব), শরৎ রচনাবলী (১ম খণ্ড), কলকাতা, শুভম প্রকাশন, বইমেলা ২০১১. পৃ. ৫

১৪. গুপ্ত, আনন্দগোপাল, 'দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ', সেন, সুজিত. (সম্পা.) ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ভারতে দলিত আন্দোলন, গ্রন্থমিত্র, কোলকাতা, পৃ. ১৬৫

১৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'তরুণের বিদ্রোহ', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), শুভম প্রকাশন, কোলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৯৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 832 - 837
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 832 - 837
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ : জন-বুদ্ধিজীবী নজরুল

অমৃতা রায়
Email ID : amritaroy355@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Intellectual, Public intellectual, democratic system, intellect, society, democratic spirit, non-communal, harmony, fundamentalism.

Abstract
Nowadays Intellectual is a important notion. The role of this community in all aspects of society in a democratic state system is very important. But who is this group? What is their identity? There is no clear definition of who intellectuals are. There are differences of opinion among different theorists on precisely defining intellectuals. In a general sense, intellectuals are those who make a living by exploiting their intellect. But their scope of work is not limited to intellectual work alone, but extends beyond that. In a general sense, when we say intellectuals, we mean a special class of society such as writers, literary figures, teachers, lawyers, doctors, etc. Those who speak on behalf of the people of the society, raise questions against the authorities, talk about the progress of the people, talk about the progress of the society. Their intellect, consciousness, values, make the people aware of their thoughts, spread the word about the democratic spirit, and make them aware of their own duties. They do not confine themselves to the world of writing but instead engage themselves with ground reality and that is where they transform from an intellectual into a public intellectual.

Can we keep Kazi Nazrul Islam in the light of that identity? Is Nazrul just a rebel poet or a poet of harmony who dreamed of a non-communal nationhood, or can we see him as a public intellectual? This discussion aims to examine the extent to which Nazrul's role as a public intellectual is relevant to his statement on ‘Rajbandir Jabanbandi’. In the present world where fundamentalism has become a very important issue. The political situation is the victim of this fundamentalism. Standing at that moment and in the present world, how much of Nazrul's thoughts as a public intellectual, as expressed in 'Rajbandir Jabanbandi', are still acceptable and besides, how much role does a public intellectual play in the management of the state and in the formation of the state against the fundamentalism of the state, that is the subject of this article.

Discussion

বর্তমানে বিশ্বে ‘বুদ্ধিজীবী’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজের সর্বক্ষেত্রেই এই মহলের ভূমিকা অত্যন্ত। শুধু এখন বলে নয় রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সরাসরি বা নেপথ্যে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকা সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। খুব সাদামাটা ধারণায় বললে বুদ্ধিকে উপজীব্য করে যাঁরা জীবন নির্বাহ করেন তাঁরাই ‘বুদ্ধিজীবী’ নামক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 832 - 837
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। একটু বিশদে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয় বুদ্ধিকে উপজীব্য করে যাঁরা কতৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে প্রশ্ন তোলেন, জনমত গঠন করেন, তাঁদের সংগঠিত করেন, সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের লেখনী, সভা, বক্তৃতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় জনমতকে প্রভাবিত করতে। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণি এই সম্প্রদায় ভুক্ত বলে সাধারণত মনে করা হয়। সাহিত্যিক, লেখক, চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী ইত্যাদি পেশার সাথে যুক্ত মানুষজন এই সম্প্রদায়ের কান্ডারি বলে মনে করা হয়। বহুল প্রচলিত এই গোষ্ঠীর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ইন্ট্যাল্যাকচুয়াল'। এই ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে একটু পশ্চিমের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা দরকার।

'বুদ্ধিজীবী' ও 'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়' এর সঠিক উৎপত্তিক্ষণ নির্ণয় করা দূরহ। রথীন চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত 'বুদ্ধিজীবী চরিতনামা' গ্রন্থে বলছেন রাশিয়ায় ১৮৪০ - এর দশকে ফ্রিড্রিশ হেগেলের নানা উক্তি থেকে 'ইন্ট্যাল্যাকচুয়াল' শব্দের একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু মনেকরা হয় 'বুদ্ধিজীবী'র উৎপত্তি পোল্যান্ডের 'ইন্ট্যালেজিনেশিয়া' এর মাধ্যমেই। এই 'ইন্ট্যালেজিনেশিয়া' সম্পর্কে লাতিনে বলা হচ্ছে, -

> "Intelligentsia is a social class of people engaged in a complex mental labour aimed at guiding or critiquing, or other-wise playing a leadership role in shaping a society's culture and politics."[১]

উনিশ শতকে জার্মানি ও ফ্রান্সেও বুদ্ধিজীবী উন্মেষ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এবং পরবর্তীতে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কিত বিভিন্ন মহলে নানাবিধ তত্ত্ব পাওয়া যায়। সাধারণ অর্থে সমস্ত মতবাদ এক জায়গায় করে বলা যায় 'ইন্ট্যালেজিনেশিয়া' ও 'বুদ্ধিজীব'র উদ্ভব সম্পর্কিত বিশ্বের ইতিহাস মোটামুটি এই কথা বলে যে, মূলত শিক্ষায় ব্যাপক বিস্তার বা প্রসারের ফলেই এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। সেক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সেই উদ্ভবে একটি ধাক্কা মাত্র। কিন্তু তার আসল বীজ নিহিত সামাজিক শোষণ-পীড়নের মধ্যে। সেই সামাজিক শোষণ-পীড়নের ভিতকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে নাড়িয়ে দেওয়ার সূত্র থেকেই বুদ্ধিজীবীদের উৎসার। সামাজিক শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হয় নৈতিক মূল্যবোধ থেকে।

বুদ্ধিজীবী কারা? কী তাদের সঠিক ভূমিকা হওয়া উচিত? এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত মতামত পাওয়া যায় আন্তনিও গ্রামসির 'প্রিসন নোটবুকস' - এর 'ইন্টাল্যাকচুয়ালস অ্যান্ড এডুকেশন' অধ্যায়ে। গ্রামসির রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের উপর তার প্রতিফলনের মূল হল - অধস্তন গোষ্ঠীগুলি তাদের সাবঅলটার্ন অবস্থান অতিক্রম করতে পারে এবং আধিপত্য অর্জন করতে পারে। 'প্রিজন নোটবুকস' এ এই অধস্তন গোষ্ঠীর চেতনা ও আদর্শের রূপান্তরের ভূমিকা কী ভাবে? কী ভাবে তারা ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার আলোচনায় উঠে এসেছে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলের ভুমিকার কথা। সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীগুলিকে তাদের অধস্তন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে আধিপত্যবাদী হয়ে উঠতে এবং সমাজে অগ্রণী বা নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করার কল্পনা করেছিলেন। এবং এই বিষয় ঘটনোর জন্য তাদের অধীনস্ত গোষ্ঠীর একটি সীমিত অর্থনৈতিক কর্পোরেট চেতনার ঊর্ধ্বে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর যুক্তি ছিল বিপ্লবী তত্ত্ব আনতে হবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ছাড়া ইন্ট্যালেজেনেশিয়ার মাধ্যমে। যেখানে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অর্গানিক ইন্ট্যাল্যাকচুয়াল (জৈব বুদ্ধিজীবী) এর ধারণা।

সময়ের সাথে সাথে 'বুদ্ধিজীবী' সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। ধর্মজীবীরাও একসময় বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বিশ শতকে 'বুদ্ধিজীবী'র ব্যাখ্যা দাঁড়ায় –

> "a person who engages in critical study, thought and reflection about the reality of society, proposes solutions for the formative problem of society, and by such discourse in the public sphere gains authority from public opinion."[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 832 - 837
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই শতকের অন্যতম চিন্তাবিদ তথা বুদ্ধিজীবী এডয়ার্ড. ডাব্লিউ. বি. সাঈদ সেখানে তিনি প্রথমেই বলেই একজন বুদ্ধিজীবী তিনিই হবেন যিনি সমাজের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন, সমাজে যাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে। মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটান বা তাদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেন। সেক্ষেত্রে এমন মানুষকে তিনি বুদ্ধিজীবী বলতে নারাজ যে বা যাঁরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরে জ্ঞানের চর্চা করেন।

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত স্তরে শুধুমাত্র লেখালেখির জগতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননা তার পরিবর্তে নিজেকে ছড়িয়ে দেন জনগণের মধ্যে বা বলা যায় তাঁর লেখনীর ধার জনগণের মধ্যে মূল্যবোধ বা সচেতনতা তৈরি করে। যাঁরা প্রয়োজনে কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নে। তখন তিনি আর শুধুমাত্র একজন বুদ্ধিজীবী নন হয়ে ওঠেন 'public intellectual' যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বলা যায় 'জন-বুদ্ধিজীবী'।

'public intellectual' সম্পর্কে রোমিলা থাপার তাঁর 'Public Intellectual in India' গ্রন্থের 'To question or not to question? That is the question' প্রবন্ধে বলছেন -

> "Public intellectuals frequently concern themselves with issues related to human rights and to the functioning of society, such that it ensure the primacy of social justice."[৩]

অর্থাৎ একজন জন-বুদ্ধিজীবী অবশ্যই সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক ন্যায় বিচার, মানবিক অধিকার নিয়ে কথা বলেন। তাঁদের যুক্তি বোধ থেকে যুক্তিবাদী মনন থেকে জনসাধারণের জন্য কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। সেখানে অবশ্যই একজন জন-বুদ্ধিজীবী হবেন স্পষ্টবাদী নির্ভীক চেতনা সম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি আরও বলেন -

> "A public intellectual … take a position independent of those in power, enabling him or her to debatable ideas, irrespective of who propagates them. Reasoned critiques are often the essential starting point. The public intellectual has to see himself or herself as a person who is as close to being autonomous as is possible, and more than that, can be seen by others as such. … has to have at the same time a concern for what constitutes the rights of citizens, particularly on issues of social justice."[৪]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনস্বার্থে উন্নত পরিবর্তনমুখী, গতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য একজন জন-বুদ্ধিজীবী জনস্বার্থে কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। তাকে অবশ্যই একজন সমালোচক হতে হয়। প্রশ্ন করার ক্ষেত্র অবশ্যই শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়। তা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিকও। সর্বপ্রথম তিনি একজন জনগণের সদস্য। জনগণের দাবির থেকে বেশি তিনি নিজের চিন্তা চেতনাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের জন্য ভাবেন। পাশাপাশি একজন জন-বুদ্ধিজীবী হলেন তাঁরা যারা একটি 'পাবলিক ডোমেনে'-এর মধ্যে কাজ করেন। জনগণের স্বার্থে জনগণের হয়ে কথা বলেন। কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রূপান্তরমূলক পরিবর্তিত সমাজ গঠনে জন সচেতনতা তৈরি করেন। তিনি একজন সমালোচক। এবং অবশ্যই সমাজিক চিন্তাভাবনা পরিবর্তনে তাঁদের চিন্তাভাবনা কোনও সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করব বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধুই কি বিদ্রোহী কবি? বা বলাযায় অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখা কবি? নাকি তার পাশাপাশি বলাযায় তাঁর আরেক পরিচয় তিনি একজন জন-বুদ্ধিজীবীও? বর্তমান বিশ্বে মৌলবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সর্বসময়ই বিশেষ আকার ধারণ করে। সেই পরিস্থিতিতে একজন বুদ্ধিজীবী বা জন-বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রের জনমত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এই জটিল বাতাবরণে মানবধর্ম সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান পায়। নজরুলের সাহিত্য জগতের বিভিন্ন লেখার বিশ্লেষণের মধ্যে এই ধারণার প্রকাশ অবশ্যই হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে আমি তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'-কে সামনে রেখে একজন জন-বুদ্ধিজীবী নজরুলকে দেখার চেষ্টা করব। এবং একজন জন-বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর লেখা আজকের দিনে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বোঝার চেষ্টা করব।

১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর 'ধূমকেতু'র দুটি লেখা 'আনন্দময়ীর আগমনে' ও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং ২০ শে নভেম্বর তারিখে কুমিল্লা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে এই মামলা বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনে

আদালতে নজরুল যে বিবৃতি দেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে পরিচিত। ১৩২৯ সালের ১২ ই মাঘ তারিখের 'ধূমকেতু', ১৩২৯ মাঘের 'প্রবর্তক', ১৩২৯ ফাল্গুনের 'উপাসনা' ও 'সহচর' ফাল্গুন ১৩২৯ সাময়িক পত্রগুলিতে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী' -এর প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নজরুল শুরু করেছেন –

> "আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। এক ধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদন্ড; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। ...আমার পক্ষে সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য – জাগ্রত ভগবান।"[৫]

এই নির্ভিক সত্য কথনে। রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে ন্যায়দন্ডের প্রসঙ্গে। আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয়না তাঁর প্রতিবাদের ভঙ্গিমা। কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে তোলা প্রশ্নকে। যা একজন জন-বুদ্ধিজীবীর অন্যতম কাজ। তাঁর এই বক্তব্য প্রথমেই যেন উস্কে দিয়েছে জনগণের অন্তরাত্মাকে। যেখানে জনগণের রূপ ধারণ করে ভগবান তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। যেকোন রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো হওয়া উচিৎ সর্বসাধারণের জন্য। যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। যেখানে সবাই সমান। ধনী, গরীব, গাত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান আইন, সেখানে রাজার বিরুদ্ধে বা শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা সকলের সমান থাকা উচিত। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা সকলের না থাকলেও যাঁরা প্রশ্ন তোলেন তাঁরা ভাবান বা বলা যেতে পারে ভবাতে বাধ্য করেন জনসাধারণকে রাজ কর্তব্যের বিষয়ে, জনগণের সামাজিক ন্যায় বিচারের বিষয়ে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে একজন জন-বুদ্ধিজীবী খুব সচেতন ভাবে সেই কাজটি করেন। তাঁর গলার স্বর থাকে নির্ভীক, বলিষ্ঠ।

> "আমি কবি, অপ্রকাশক সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কতৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবনের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারের সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দন্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য-স্বরূপ।"[৬]

'রাজবন্দীর জবানবন্দী' রচিত হয় পরাধীন ভারতবর্ষে কিন্তু সেই সময় নজরুল যে ভাবে প্রশ্ন করে গেছেন তা আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষেও প্রয়োজনে রাজশক্তির বিরুদ্ধে যেকোন প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে যে চিন্তা শক্তির বা মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন তাতে অবশ্যই ইন্ধন জোগায়।

একজন জন-বুদ্ধিজীবী জনগণের সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে কথা বলেন। সেই ন্যায় বিচারের প্রশ্ন তুলেছিলেন বলেই নজরুল বন্দী হন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে রাজদন্ডে দণ্ডিত করা হয়। ধূমকেতুর ১২শ সংখ্যায়, ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপক ব্যঞ্জনা তাঁর রাজদণ্ডের কারণ। সেখানে যেমন তিনি বলেন -

> "আর কতকাল থাকবি বেটি, মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল।
> স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
> দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
> ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী ! ..."[৭]

সেই একই বাণী শোনা যায় তাঁর স্বীকারক্তিতেও যেখানে তিনি নির্ভীক ভাবে বলেছেন -

> "রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তার প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 832 - 837
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।"[৮]

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বাণী একই। সত্যের পক্ষ সমর্থন। জনগণের কণ্ঠস্বর, জনগণকে নিজ অধিকার, নিজ সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পর্কে সচেতন করা। একজন জন-বুদ্ধিজীবী কখনই গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাসকে আমল দেননা। তাঁর বক্তব্যের জন্য সমাজে তাঁর সামাজিক মর্যাদার হানি বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ভাবেন না। যা সত্য যা সর্বজনের কল্যাণের, নির্ভীক, বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাই বলে যান। তিনি বলছেন -

> "আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,- কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পোঁ ধরি নাই, - আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, - তার জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবনকে হীন করি নাই ... আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লোভের লোভে রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না।"[৯]

নজরুল তাঁর লেখনীর মধ্যদিয়ে মানবধর্মের প্রচারের কাজ করে গেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ জবানবন্দীর পরতে পরতে তীব্র প্রতিবাদ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। যে প্রতিবাদ মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায়। একজন জন-বুদ্ধিজীবী হিসাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে। প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে একজন জন-বুদ্ধিজীবীই জনগণের স্বার্থে তাদের নৈতিক, সামাজিক অধিকার নিয়ে মানবতার প্রশ্ন তোলেন। রাষ্ট্রের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ। আজও আমাদের বর্তমান সময় যখন সমগ্র বিশ্ব রাজনীতি মৌলবাদের শিকার সেখানে ঔপনিবেশিক সময়ে তাঁর এই লেখার মধ্যে যে মানবতার বাণী শাসকের রক্ত চক্ষুর বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন আজকের বর্তমান পরিস্থিতেও প্রাসঙ্গিক। যখন তিনি বলেন -

> "...এই যে বিচারাসন- এ কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে?" ...আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। ...হঠাৎ কখন এই হারাবাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।"[১০]

একজন প্রকৃত জন-বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর এমনই হবে যেখানে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে আরেক জনকে গর্জন করতে শেখাবেন। বলা যায় -

> "Perhaps this then is the real essence of a public intellectual someone who acts to create a public in which her role will become redundant and unnecessary."[১১]

Reference:

১. চক্রবর্তী, রথীন, সম্পা., *বুদ্ধিজীবী চরিতনামা,* নেতাজী রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা, পৃ. ১৩
২. চক্রবর্তী, রথীন, সম্পা., *বুদ্ধিজীবী চরিতনামা,* নেতাজী রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা, পৃ. ২৩
৩. Edited by Chandra Chari and Uma Iyengar, *The Public Intellectual In India,* Rupa Publications, 2015, New Delhi, p. 1

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 832 - 837
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

8. Edited by Chandra Chari and Uma Iyengar, *The Public Intellectual In India,* Rupa Publications, 2015, New Delhi, p. 79

৫. ইসলাম, নজরুল, ১৯৬৬, *নজরুল রচনাবলী* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ. ৪৩১

৬. তদেব

৭. ইসলাম, রফিকুল. (মাঘ ১৪১৮, প্রথম মুদ্রণ), *কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন সৃজন,* কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকাঃ বাংলাদেশ, পৃ. ৯৯

৮. ইসলাম, নজরুল, ১৯৬৬, *নজরুল রচনাবলী* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ. ৪৩২

৯. ইসলাম, নজরুল, ১৯৬৬, *নজরুল রচনাবলী* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ. ৪৩৩

১০. তদেব

১১. Edited by Chandra Chari and Uma Iyengar, *The Public Intellectual In India,* Rupa Publications, 2015, New Delhi, p. 61

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 838 - 844
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী নারীকণ্ঠ

অম্বিকা হালদার
এম. এ, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID : ambikahalder1994@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Patriarchal society, women protest, opposition to unjust oppression, Bravery, Strict social system, Scorned woman, Realistic woman, A disgraced woman.

Abstract
Feminism is an important issue in the age of globalization. In today society, women are much ahead that before. Women have transcended the patriarchal society to create a world of their own. This freedom or free environment situation for women did not develop easily. Mini great people co-operation, efforts and help is the reason behind it. Among various mission, woman have excellent in education and other fields. This great people are - Rabindranath Tagore, Raja RamMohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Michael Madhusudan Dutta, Sarat Chandra Chattopadhyay etc. The late 20th country saw the arrival of several women writers who change the mind state of women thought their writing power. Mentionable among them like-Ashapurna Devi, Suchitra Bhattacharya etc. Apart from this the power of writing of Rabindranath Tagore, also inspired women to emancipate themselves from patriarchal society and live independently. At once time. Women used to accept all the crimes with their mouths, did not protest any injustice, but later in the 20th country, it is seen that woman are protesting with a strong voice against injustice and wrong doing. We can see this in the character of Ashapurna Devi 'satyavati', Where women also do everything equal to man. Similary, in Suchitra Bhattacharya Novel 'Dahan ' the mentality of punishing criminals can be seen in the character who is not afraid of anything. On the other hand Rabindranath Thakur stories like 'Dena pawna', 'Haimanti','Stripatra' etc. also show the protest mentality of women. Through all these writing, the voice of women's protest has been heard, as if they are continuing their hardest struggle. The main purpose of my discussed research paper is to highlight how woman strengthened the voice of protest by ignoring this patriarchal society.

Discussion

প্রতিবাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল আপত্তি। সমাজে ঘটে যাওয়া নানা অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদ, নারীর উপর প্রতিনিয়ত অত্যাচারের প্রতিবাদ, বলতে গেলে সমস্ত প্রতিবাদের একটাই লক্ষ্য অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া। কোনো কিছুকে ভয় না পেয়ে জোরালো কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানানো। না কথাটাকে কঠোরভাবে না বলতে পারার মনোবল। বহু যুগ থেকেই সমাজে নারীদের প্রতি অত্যাচার হয়ে আসছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি, বর্তমান সমাজো তার ব্যতিক্রম নয়। আজও সমাজে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীরা নানাভাবে অপমান অপদস্ত এবং অত্যাচারিত হয়ে আসছে। এতকিছুর পরেও অনেক সময় কিছু সাহসী নারীদের প্রতিবাদের জোরালো কণ্ঠ আমরা শুনতে পারি। কিছু নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাদের সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আগের মত নারী আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভীত হয়ে থাকে না, এখন তারা জোরালো কণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে। বর্তমানে সমাজব্যবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখন নারীরা সকল ক্ষেত্রেই এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শুরুর দিকে আমাদের দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা পর্দার আড়ালে কঠোর নিয়ম নীতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সমাজের সকল নিয়ম পুরুষেরা নারী জাতিকে দমন করার জন্য প্রচলন করেছিল, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নারীরা যেন পুরুষের সমান হতে না পারে, নারীরা যাতে সকল সময়ই পুরুষজাতির পদপৃষ্ঠে থাকে। এই ছিল উনিশ শতকের আগের দিকে নারীদের সামাজিক অবস্থা। এরপর ১৯ শতকে মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সচিন্তা ও কর্ম নিষ্ঠায় নারী জাগতিক শুভ সূচনা হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় মেয়েরা আস্তে আস্তে প্রচলিত নিয়ম নীতির বেড়াজাল অতিক্রম করে শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে আসতে শুরু করল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের নিয়ম নীতির পর নারী জাতি যেন বাঁচার নতুন পথ খুঁজে পেল। তারপর থেকে নারীরা পথ চলার নতুন দিগন্তের অনুসন্ধান করতে লাগলো। শিক্ষার আঙিনায় আস্তে আস্তে নারী জাতির পদশব্দ শোনা যেতে থাকে। শুরুর দিকে নারীদের পথ চলাটা এতটা সোজা ছিল না। নানা অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নারী জাতি জীবনের পথে এগিয়ে যেতে থাকে তাদের আর পিছন ফিরে দেখবার প্রয়োজন হয়নি। বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও উপন্যাসিকদের লেখনীর মধ্যেও নারী প্রতিবাদের জোরালো ভাষার কণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও শোনা গেল নারীমুক্তির সুর। বিশ শতকের শেষে এক ঝাঁক মহিলা কবির আগমন ঘটলো যাদের লেখনীর ভাষায় নারী প্রতিবাদের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায় অত্যন্ত জোরালো ভাবে। তাঁরা হলেন - মল্লিকা সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমূখ। আজ আমরা তেমনি বাংলা সাহিত্যের কিছু প্রতিবাদী নারীদের জোরালো কণ্ঠের জোরালো ভাষা তুলে ধরবো। আমরা আজও বাংলা সাহিত্যের সেই সব প্রতিবাদী নারীদের প্রতিবাদের মনোবল এবং জোরালো কণ্ঠের কুর্নিশ জানাই।

“আমার কবিতা আলোর চাতক, অন্ধকারের মুনিয়া
কবিতা আমার ঘরের যুদ্ধ, যুদ্ধ শেষের কান্না
আমার কবিতা অসহায় যত পাগলি মেয়ের প্রলাপ
আমার কবিতা পোড়া ইরাকের ধ্বংসে রক্ত গোলাপ
আমার কবিতা ফুটপাত-শিশু, গর্ভে নিহত কন্যা
কবিতা আমার ঝড় দুর্যোগ মহামারি ধ্বংস বন্যা
আমার কবিতা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্ত
সেলাম সেলাম জিঙ - কাটা খান, ব্যাস, বাল্মিকী, দান্তে
আমার কবিতা আগুনের খোঁজে বেরিয়েছে কাঠ আনতে।”[১]

ঋগ্বেদ থেকে ২১ শতক পর্যন্ত আবহানকাল ধরে বয়ে চলা নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী বর্ণমালা গড়ে তুলেছে এই যুগের অগ্নিকন্যা মল্লিকা সেনগুপ্ত। তাঁর মধ্যে একটা প্রতিবাদী নারী সত্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা লেখনি সকল নারীর মনে শক্তি সঞ্চয় করে গেছে। বিশ শতকে পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে লেখনীকে প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া নারীদের প্রতি অন্যায়ের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ - ১৯৯৫) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সেই সময় ঘটে যাওয়া নারীদের প্রতি অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতি জোরালো প্রতিবাদকে লেখনীর ভাষা হিসেবে তুলে ধরেছেন। আশাপূর্ণা দেবী এই রকম একটি নারী প্রতিবাদ কেন্দ্রিক ট্রিলজি উপন্যাস যেটিকে কেবলমাত্র উপন্যাস বলা চলে না, সেটি তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি তা হল – ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’। উনিশ শতকের অনেকটা সময় জুড়েই আছে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের কাল পর্ব। তাঁর লেখা এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পিছুপা হয়নি সে হল সত্যবতী। এই সত্যবতী

চেয়েছে নারীর স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ। সত্যবতী মনে করতো মেয়েরা চাইলে সব করতে পারে পুরুষদের থেকে তারা কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই তবে কেন তাদের আলাদাভাবে দেখা হবে। কেন তাদের যেকোনো কাজ স্বাধীনভাবে করতে বাঁধা দেওয়া হবে। সত্যবতী গ্রামাঞ্চলে একটি একান্নবর্তী পরিবারে নানা আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় সত্যবতীর যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিবাদ করা দরকার ছোট থেকেই সে সব বিষয়গুলির প্রতিবাদ জোরালো কণ্ঠে এবং জোরালো ভাষায় করেছে। সত্যবতীর ছিপ দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারে দীনতারিনী এবং মোক্ষদার চোখ কপালে উঠেছে, যখন তারা শুনতে পায় সত্য টোপ পেলে মাছ ধরবে, তখন মোক্ষদা ছিট পিটিয়ে ওঠেন, এবং বলেন -

> "ছিপ ফেলে মাছ ধরবি তুই? খুব নয় বাপসোহাগী আছিস, তাই বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? মেয়ে মানুষ ছিপ ফেলে মাছ ধরবি?"[২]

এই কথাটি শুনে সত্য জোড়ালো প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে ওঠে -

> "আহা! ছোট ঠাকুরমার কি বাক্যির ছিরি! মেয়ে মানুষ মাছ ধরে না? রাঙা খুড়িমারা ধরে না? ও বাড়ির পিসিরা ধরে না?"[৩]

এইভাবে সত্যবতীর প্রচলিত রীতি-নীতি প্রতিবাদদের বাঁধা আনে।

আবার জটা দাদা যখন পান ফুরিয়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে তার বউকে লাথি মারে এবং বউ ভিমি খায়, পরে যখন আবার ভালো হয়ে যায় তখন জটা দাদার বউ দাদার সাথে হাঁসি মজা করছে দেখে সত্যবতী ক্ষুব্ধ হয়ে যায় এবং পুন্যি তার রাগের কারণ জানতে চাইলে সে বলে -

> "খ্যাংরা মারো অমন সোয়ামীর মুখে! যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গপ্প? গলায় দিতে দড়ি জোটে না? আবার আমায় কি বলছে জানিস, আমার সোয়ামী আমায় মেরেছে, তোমায় তো মারতে যায়নি ঠাকুর ঝি? এত গায়ে জ্বালা কেন যে ছড়া বেঁধে গালমন্দ করতে আস?"[৪]

পুরুষ মানুষ সে স্বামীই হোক, তাই বলে মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলা অন্যায় এটাও সত্যবতী মানতে পারেনি এবং সে প্রতিবাদ করে ওঠে। যে সময় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা বন্দী ছিল সেই সময় আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সত্যবতী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এক জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। যা সেই সময় এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অনেক মনোবল বৃদ্ধি করেছে। আশাপূর্ণা দেবীর এই উপন্যাসটির সত্যবতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-নীতির প্রতি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু ছোট গল্পেও নারীদের প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় যেমন – 'দেনা পাওনা', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র'। বিদ্যাসাগরের মতো নারী জাতির অগ্রগতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিও নারী জাতিকে গৃহকোণে বন্দী করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না তাঁর লিখনের মধ্যে দিয়ে নারী জাতি প্রবল মনোবল এবং নতুন ভাবে পথ চলার অগ্রগতি খুঁজে পান। তাঁর লেখনি থেকে নারী জাতির মনে এক অপার শক্তির অনুসন্ধানের সূত্র পেয়েছেন। সমাজে যখন অন্যায়, অবিচার, শাসন ,শোষণ দীর্ঘ সময়ের ধরে চলতে থাকে তখন একটা সময় পর কলুষমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য প্রতিবাদের প্রয়োজন হয়। নারী জাতির অগ্রগতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অস্বীকার করবার অবকাশ নেই। তিনি কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি, এবং নারী জাতির প্রতি অন্যায় অত্যাচারের ঘোরে বিরোধিতা ছিলেন, এটি তাঁর লেখনি শক্তির মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁর প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত গল্পগুলি আলোচনা করা হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' এই গল্পের অন্যতম নারী চরিত্র নিরুপমার মধ্যে প্রতিবাদী নারী কণ্ঠে ভাষা লক্ষ্য করা যায়। আজও আমাদের সমাজের কন্যা সন্তানের জন্ম অখুশির কারণ বলে মনে করা হয় এবং তার জন্য মায়েদেরই দায়ী করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে লেখক 'দেনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাওনা' গল্পে তার ব্যতিক্রমধর্মী চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গল্পে নিরুপমার জন্মের পর তার পরিবারের সকলের আনন্দিত হয়েছিল। বিশেষ করে পাঁচ ছেলের পর মেয়েকে পেয়ে রামসুন্দর ও তার স্ত্রী সবথেকে বেশি খুশি হয়। নিরুপমা বড় হওয়ার সাথে সাথে তার বাবা-মায়ের চিন্তা হয় তাকে সৎপাত্রে বিয়ের দেওয়ার জন্য। অনেক চেষ্টার পর রাম সুন্দর ঢের যৌতুকের বিনিময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিরুপমার বিয়ে দেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রায় বাহাদুরকে লোভী, শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে তুলে ধরেছেন। নিরুপমার বাবা-মা মেয়ের সুখ শান্তির কথা ভাবতে গিয়ে নিজেদের শেষ সম্বল ভিটে মাটিটুকু বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে চলেছে। লেখক নিরুপমাকে প্রতিবাদী করে তোলে শ্বশুরবাড়ি সকলের অত্যাচার, অপমান, লাঞ্ছনা অতিষ্ঠ হয়ে সে তার বাবা রামসুন্দরকে একদিন বলেন -

> "বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবেনা এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"[৫]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অর্থলোভী পুরুষেরা নিরুপমার মত মেয়েদের বুঝতে পারে না, এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আসলেই মেয়েদের বোঝার চেষ্টাও করা হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমাদের শুনিয়ে বলেছেন -

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই আমি কি কেবল একটা টাকার থলি... এই টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করোনা।"[৬]

এই টাকার জন্যই কন্যা পক্ষ সকল সময় বরপক্ষের কাছে অপমানিত হয়েই আসছে, আজও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই গল্পের নিরুপমার কথার মাধ্যমে সমাজের সকল নারী জাতিকে জাগ্রত করবার প্রচেষ্টা করেছেন যদিও প্রতিবাদের শেষে নিরুপমাকে ঝরা পাতার মতো ঝরে পরে পরপারে চলে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গল্প 'স্ত্রীর পত্র'। এই গল্পে মৃণাল ছিল শিক্ষিত এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একটি চরিত্র। দীর্ঘ ১৫ বছরের সম্পর্ক স্বামীর সঙ্গে ছিন্ন করে সে স্বামীকে শ্রীক্ষেত্রে থেকে একটি চিঠি পাঠিয়ে তার বক্তব্য পেশ করে। মিনাল সুন্দরী ছিল এবং সে গৃহকার্যে বন্দী থাকতো। গল্পে অন্য একটি চরিত্র বিন্দুকে নিয়ে মৃণালীর ভাবনার শেষ নেই সে বিন্দুকে খুব ভালোবাসতো তাকে সঠিক জায়গায় বিয়ে দেওয়ার মেয়ে হিসেবে তার আত্মমর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল মৃণালের ওপর। তাই মৃণালের কণ্ঠে শোনা যায় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী নিষ্পেষণের অপর আরেকটি গল্প 'হৈমন্তী'। গৌরীশংকর একজন সৎ আদর্শবান মানুষ তার একমাত্র মেয়ে হৈমন্তী। হৈমন্তী খোলা পরিবেশে মহৎ ব্যক্তিত্বের বাবার কাছে মানুষ হয়েছে। গৌরীশংকর নিজের কর্মব্যস্ততায় ভুলেই গেছে মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার বিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ সমাজের চোখেও তার বয়স বেড়ে গেছে। তাই বড় বয়সের মেয়ের বিয়ে হওয়া সেই সময় খুব চাপের ছিল। কিন্তু সেই সময় পুরুষের বয়স বাড়লেও সে একাধিক বিয়ে করতে পারতো। যদি কোন পাত্রপক্ষ বাবা জানতে পারত কন্যা পক্ষের বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো সেক্ষেত্রে আর তার বয়স বাড়লেও সমস্যার বিষয় ছিল না। গৌরীশংকরের আর্থিক অবস্থার কথা শুনে অপুর বাবা অপুর সাথে হৈমন্তীর বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর অবরুদ্ধ পরিবেশে হৈমন্তী নতুন জীবন শুরু হয়। কিছুদিন পর অপুর বাবা জানতে পারে গৌরীশংকরের অর্থের বিষয়ে যা কিছু শুনে ছিল তা সব গুজব। পরবর্তীকালে দেখা যায় আদর্শানুসারে বড় হয়ে ওঠা হৈমন্তী তার শ্বশুরবাড়ির ছলচাতুরি এবং মিথ্যে কথার প্রতিবাদ জোরালো কণ্ঠে করেছিল।

> "একে তো মেয়ে; তাতে কালো মেয়ে; কার ঘরে চলান, ওর কি দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলেই প্রাণ কেঁপে উঠে।"[৭]

বিন্দু হল আসলে মৃণালয়ের বড়জায়ের খুড়তুতো বোন সে অনাথ, অসহায় বলে মৃণালয়ের স্বামীর ঘরে তাকে ঠাই দেওয়া হয়। মৃণালের স্বামীর বাড়ি অন্যান্য সদস্যরা তাকে বোঝা বলে মনে করে এবং তাকে বোঝা মনে করে ঘর থেকে নামাতে চায়। তাই এক পাগলের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর পাগল স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এবং ভয়ে পুনরায় মিনারের কাছে চলে আসে। সকলে বিন্দুকে আবার পাগল স্বামীর কাছে জোর করে পাঠাতে চাইলে মৃণাল তথাকথিত প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের প্রতি জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়। মৃণাল সর্বশক্তি দিয়েও প্রতিবাদ করলেও শেষ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পর্যন্ত বিন্দুকে বাঁচাতে পারিনি। বিন্দু মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কোনো রাস্তা না পেয়ে শেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে নিজেকে শেষ করে দেয়। এরপর থেকে মৃণালো তার পরিবার সংসারের প্রতি দূরত্ব বাড়তে থাকে। স্বামীকে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে মৃণাল কঠোর ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলে,

> "আমি আর তোমাদের সেই ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।"[৮]

মৃণাল কিন্তু সকল কিছু সহ্য করে বিন্দুর মত আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেনি সে বরং আরো ভালো মতো নিজের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বামীকে পাঠানো চিঠিতে মৃণাল প্রতিবাদী সত্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা যায় সমাজে নারীরা বেঁচে থাকে ঠিকই কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই, সে কখনোই কারো কন্যা, কারো পত্নী, কারো মা, নারী নিজস্ব কোন আত্মপরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে কিন্তু মৃণাল সমস্ত গণ্ডি অতিক্রম করে নিজের আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজেই স্বামীর বাড়ি পরিত্যাগ করে সসম্মানে বাঁচবার পথে পারি দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই আমরা দেখি বিশ্বায়নের যুগে নারীরা কেবল অন্তরপুরীতে বন্দি নেই বহির্বিশ্বে পুরুষের সমতুল্য হয়ে কর্ম জগতে অংশগ্রহণ করেছে। নারীরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পর এবং ভোটাধিকার পাওয়ার সত্ত্বেও পুরুষের সমান স্বাধীনতা বা সাম্যের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না, তার কারণ কেবল রাজনৈতিক অধিকার পাওয়া নয়, পুরুষের সমযোগ্যতা পেতে তাদের চাই উন্নত মানের শিক্ষার অধিকার, কর্ম, অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার তবেই নারীরা পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারবে। নারীদের মধ্যে আত্ম সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদার বোধ বারিয়ে তুলতে হবে। আধুনিক নারী লেখিকারা তাদের দীপ্ত লেখনীর মধ্য দিয়ে সেই নবজাগ্রত নারী চেতনার দীপ্ত বাণীকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। এইসব লেখিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সুচিত্রা ভট্টাচার্য সমাজের এই অনিশ্চিত জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন যা তার কথাতেই স্পষ্ট -

> "আসলে কি জানো; এখনো আমাদের সমাজে মেয়েরা কোনঠাসা, তাদের প্রচুর কষ্ট আর অভিমান জমে রয়েছে আমি সেই সত্যটা কি কোন মোড়ক ছাড়া এই লেখায় তুলে ধরি।"[৯]

লেখিকার লেখনীর নারী সকল বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছে। এই রকম এক বিচিত্র বিশ্লেষণধর্মী নারীর জীবন তাঁর 'দহন' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। নারী প্রতিবাদী হতে চাইলেও সমাজের ভয়ে সে পদে পদে বাঁধা পেয়েছে এবং পিছিয়ে এসেছে, এই আত্ম জিজ্ঞাসা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার এক নতুন অধ্যায় 'দহন'। মেট্রো রেলের সামনে কয়েকজন ধনী পিতার পুত্র নিজের স্বামীর চোখের সামনে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেন। সবাইকে বল দেখেই যায় ভয় কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না, এর প্রতিবাদ করে এক অপরিচিতা দূর থেকে আশা ঝিনুক একটি সাধারন মেয়ে। রমিতা শশুর শাশুড়ির ভ্রান্ত মর্যাদা বোধ এবং বংশ গৌরব হারানোর ভয়ে কথাটা চাপা দিতে চায় ফলে মিথ্যে সাক্ষীর দেবার পরিণতি হিসেবে ঝিনুককে অপমানিত হতে হয়। এখনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানি অসম্মানের চোখে দেখা হয়। আজও দেখা যায় দোষীদের থেকে নির্দোষী নারীকে সমাজের চোখে বেশি অপমানিত হতে হয়, এবং এই অসম্মানজনক কাজটি নারীদের লজ্জা বলে মনে করা হয়। রমিতা শিক্ষিত হয়েও সমাজের এবং পরিবারের ভয়ে সমস্ত সত্য চেপে যায় প্রতিবাদ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে কেবল এক অসহায় নারীর শরীরের মতো পরে থাকে। তার মনের কথা তাকে মর্যাদা কেউ তাকে প্রদান করেনি। এই উপন্যাসে লেখিকা দেখান এক সমগ্র, এক সম্ভাবনা, এক স্বপ্ন ফলে, ২১ শতকে দহন জ্বালায় উপন্যাসে চরিত্র এক বিষাক্ত আগুনকে ছুঁয়েও প্রাণ আর প্রাণের কথায় ভেসে আসে সম্ভাব্য মীমাংসা প্রস্তাবের গ্রন্থনা –

> "একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস জমাট বাধল, রনিতার বুকে। জীবনটা যদি এইরকম হত, লেপে দেওয়া হতো কলঙ্ক শুকিয়ে যাওয়া পর চড়চড় করে টেনে তুলে নিত কোন নিপুন জাদুকর।"[১০]

২১ শতকে মেয়েরা নানাভাবে নিজেদের প্রমাণ করেছে, বিশ্বায়নের বাতাসে পাল্টে গেছে নারীর পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস এমন কি জীবনযাত্রাও। কিন্তু নারী এখনো সেই মর্যাদার শিক্ষায় পৌঁছাতে পারেনি। আজও সমাজের ভয়ে তাদের চুপ থাকতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয় অপরাধকে মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বড় হয়ে ওঠা এবং তারই প্রতিনিধি হিসেবে পলাশ তার বউ রমিতাকে হুংকারে শুনিয়েছে -

"দেখি কোন শ্রাবনা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে! দেখি, দেখি।"[১১]

রমিতা সমাজ, পরিবার, স্বামীর ভয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারিনি, কিন্তু তার হয়ে প্রতিবাদ করেছে শ্রাবনা সরকার। তাই -

"শ্রাবনা সরকার এখন রাতারাতি একটা নাম, একটা তারকা, একটা আদর্শ।"[১২]

'দহন' উপন্যাসে এই এক লড়াকু মেয়ে যে প্রতিবাদ করতে জানে, যে পুলিশ থানা, কোর্ট কাছারি, দৌড়ঝাঁপ করে নারীকে মানবী বিশ্বের সন্ধান দেওয়ার কাহিনী। শ্রাবণ সরকার ওরফে ঝিনুক ছাত্র অবস্থায় আর পাঁচটা মেয়ের মতোই শান্ত, ভীতু প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতিতে পরে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সমাজের পুরুষ যে প্রতিবাদের ভয়ে পিছিয়ে থাকতো ছেলে মানুষের ভূমিকা নিয়ে ঝিনুক অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। কেস থেকে ঝিনুককে সরে আসতে পলাশকে অফিসের বস শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, বিদেশে যাওয়ার লোভ দেখায়, কিন্তু ঝিনুক পলাশকে তা থেকে সরে আসতে বলে। ঝিনুক প্রচলিত নারীদের মতো হতে চায় না, অন্যায় সে মেনে নিতে চায় না। এই নারীবাদী ঝিনুক বুঝতে পারে আজও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভয় পেয়ে নারী জাতি কতটা পিছিয়ে আছে। ঝিনুকের মা সুজাতার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক এবং মধ্যযুগীয় নারী ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ঝিনুকের এই গুন্ডাদের সাথে লড়াইয়ের ঘটনা মা হিসেবে ভয়ে তার মন আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। তেমনি অন্যদিকে আবার মেয়ের সাহসিকতার জন্য কাগজে নাম ও ছবি ছাপা হওয়ায়,আত্মীয় বন্ধুর মুখে মেয়ের অভিনন্দন শুনে মা হিসেবে সুজাতা গর্ববোধ করে। সুজাতা চায় তার মেয়ে এইসব ঝামেলা থেকে সরে এসে আর পাঁচটা মেয়েদের মত সংসার ধর্ম করুক মাতৃ হৃদয় পরিপূর্ণ স্বার্থপরতা সুজাতাকে দোষে গুনে বাস্তব সময়ের জীবন্ত করে তুলেছে লেখিকা আমাদের সামনে। স্বাধীনচেতা মৃণালিনী শেষ আশ্রয় হিসেবে বৃদ্ধাশ্রমকে বেছে নিয়েছে। মৃণালিনী স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে বেঁচে থাকতে চায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে মৃণালিনী নির্বাক, প্রতিবাদ তীব্র খুব ঘৃণা প্রসন করে শ্বশুর বাড়ি থেকে বিয়েতে পন নেওয়ার জন্য এখনো অপমানিত বোধ করেন মৃণালিনী সব মিলিয়ে মৃণালিনীকে আধুনিক প্রতিবাদী নারীর প্রতিনিধি করে তুলেছে। ঝিনুকের স্কুলের শিক্ষিকা বন্ধুরাও শেষ পর্যন্ত দূরে সরে গেছে। পুলিশ, প্রভাবশালী গোষ্ঠী ঝিনুককে ভয় দেখায় তার প্রতিবাদী কণ্ঠ নিরব করে দিতে চায়। কিন্তু সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একা লড়াই চালিয়ে যায় ঝিনুক শেষে দেখা যায় ঝিনুক কেসটা হেরে যায়। কিন্তু পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের কাছে রেখে গেছে প্রতিবাদের বর্ণমালা। সেই বর্ণমালায় পাঠক প্রত্যাশিত নারী চেতনার অভিব্যক্তিকে পরখ করে নিতে পারে। আর আধুনিক নারীর দীপ্তি প্রতিবাদের উদাহরণ হিসেবে রেখে যায় এই 'দহন' উপন্যাস। বর্তমানেও আমরা নানা ক্ষেত্রে দেখতে পারি নারী-পুরুষের সমতুল্য সমস্ত কাজ করতে পারে তারপরেও কেন তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে পিছিয়ে থাকতে হবে। উনিশ শতকের দিকে নারী যদি গল্প বা কবিতা লিখতো শুনলেই পুরুষ সমাজ তাদের অপমানিত করে, পিছু পথে ঠেলে দিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত বলেছেন - 'নারকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যা ও বড় নয়।' বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মকথার লেখিকা রামসুন্দর দেবী সেই সময় নিজের ইচ্ছে এবং প্রচেষ্টায় প্রথমে পড়তে এবং ধীরে ধীরে লিখতেও শেখে। নারী হিসেবে সে স্বামী এত বড় সংসার পুত্র কন্যাদের দেখাশোনা করেও শিক্ষার আঙিনাকে উজ্জ্বল করে তোলে নারী হিসেবে সেই সময় নারীর আত্মমর্যাদার গৌরবকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে।সুদীর্ঘকাল থেকেই দেখা যায় নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে অবহেলিত, অপমানিত এবং লাঞ্ছনার পাত্রী। পুরুষের সমতুল্য যোগ্যতা লাভ করেও নারী আজও পিছিয়ে রয়েছে সমাজের চোখে। কিন্তু প্রতিবাদী নারীরা সমস্ত লাঞ্ছনার পরও অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছে। তাদের এই জোরালো কণ্ঠের প্রতিবাদের ভাষা আরও সমসময়ে কিংবা বর্তমান সময়ে নারী জাতির মনবল এবং সাহসিকতার যোগান দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখক এবং লেখিকাদের প্রতিবাদ নারী চরিত্রগুলো বাস্তব নারীদের প্রতিবাদ চেতনাকে যেন প্রতিনিয়ত বিকশিত করে গেছেন।নারী জাতি সকল সময়েই অন্যায়

অবিচারের বিরুদ্ধে এইরকম প্রতিবাদী হয়ে উঠুক। জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত জ্বলতে থাকুক নারী চরিত্র আর তাদের জ্বলন্ত আগুনের শিখায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাক অন্যায়কারী মানসিকতা, এবং আমাদের এই কঠোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। নারী জাতি যেন সকল সময় সবল থাকে সাহসী থাকে ভয় বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেন তাদের বোবা যন্ত্রে পরিণত করতে না পারে। নারী জাতি যেন সকল বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সমাজে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে এই আশাই আমরা রাখছি।

Reference:

১. মল্লিকা সেনগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১১

২. প্রথম প্রতিশ্রুতি, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭০০০৭৩, সাতাওরতম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৮, পৃ. ১৮

৩. তদেব পৃ. ১৮

৪. তদেব পৃ.৪৮

৫. দেনা পাওনা, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম প্রকাশনী, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৩

৬. তদেব পৃ. ২৩

৭. স্ত্রীর পত্র, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম প্রকাশনী, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬১০

৮. তদেব পৃ. ৬১০

৯. আগরওয়াল শশী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও তাঁর উপন্যাস গুলো পরিচিতি ও বিশ্লেষণ, কুনাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, জানুয়ারি ২০১৬, পত্রভারতী পৃষ্ঠা-১৯৮

১০. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ‘দহন’, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৯৬

১১. তদেব, পৃ. ৮৮

১২. তদেব, পৃ. ৩১

Bibliography:

সেনগুপ্ত মল্লিকা, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ২০১১, দেশ পাবলিশিং

আশাপূর্ণা দেবী,'প্রথম প্রতিশ্রুতি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সাতাওরতম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৮, কলকাতা ৭০০০৭৩

ভট্টাচার্যের সুচিত্রা, ‘দহন’, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স

রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 845 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 845 - 853
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’ : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিকল্প ইতিহাসের নির্মাণ

অনন্যা অধিকারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : ananya.adhikari.8937@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Bengali literature, Nineteenth Century, Historiography, Historical Consciousness, Memory, Speculative Fiction, Alternate History, Utopia, Narrative, Bhudeb Mukhopadhyay.

Abstract
In the second half of the Twentieth century, after the disastrous Second World War, a type of fiction became popular - Alternative history or Allohistory. It is a retrospection of history with an alternate narrative. Although the history of Alternate History fiction leads back to the Nineteenth century. Nineteenth-century Bengal was going through several massive changes- be it political, economic or social. As the century proceeded, the English-educated Bengalis emerged with a piece of new world knowledge. They got acquainted with European history, literature and culture. As they were trying to navigate their way, finding their existence in this ever-evolving new world, a world dealing with the Industrial Revolution followed by the Scientific Revolution, they realised we had a deficient historiography. The many years of memory, that we carried through stories were not documented as history. We got the idea of historical thinking and became conscious of History. The early Nineteenth-century Bengali literature reflects this historical consciousness. We see Alternative History fiction parallels Historical fiction. But allohistorical narratives are infrequent in Bengali literature. Bhudeb Mukhopadhyay wrote this rare story. If the Third Battle of Panipat were to conclude differently what would have happened? What would have happened if The Maratha Confederacy secured the triumph? How the socio-political history of India would appear? Could India also become a Household name in this fierce place called World Politics? Does it become a utopian narrative? Bhudeb Mukhopadhyay creates. With the Allohistorical narrative frame in mind, we excavate this literary piece- ‘Swapnalabdha Bharatbarsher Itihas’.

Discussion

বিকল্প ইতিহাসের ইতিহাস : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বসাহিত্যে অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি বা বিকল্প ইতিহাসের গল্প বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বেশিরভাগ গল্পের মূল কাহিনিতে ছিল এমন একটি ইতিহাসের কল্পনা যেখানে হয় ফ্যুয়েরার হিসেবে হিটলারের উত্থান আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে অথবা কল্পনা করা হয়েছে এমন এক পৃথিবীর, যেখানে হিটলারের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 845 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জন্মই হয়নি। এমন গল্পও আছে যেখানে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করছে অক্ষশক্তি, ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমীকরণ যাচ্ছে পালটে।

এই জাতীয় কাহিনিগুলিকে আমরা স্পেকুলেটিভ ফিকশনের অন্তর্গত করতে পারি। এই ধরণের কাহিনির সূত্রপাত খাতায় কলমে উনিশ শতকে দেখা যায়। বেশিরভাগ গবেষকদের মতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বেরোচ্ছে প্রথম বিকল্প ইতিহাসের উপন্যাস- Charles Renouvier-এর লেখা 'Uchronie'। তবে তারও আগে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এই বিষয়ে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের উপন্যাস লেখা হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন গবেষক Karen Hallekson -

> "The alternate history did not exist in Western literature until 1836. This year saw the first novel length alternate history, Louis-Napoleon Geoffroy-Chateau's Napoleon et la conquete du monde 1812-1832, histoire de la monarchie universelle, better known simply as Napoleon apocryphe. This text follows Napoleon as he crushes all opposition and becomes emperor of the known world, finally dying in 1832."[১]

তবে এই বিকল্প ইতিহাসের চিন্তার সূত্রপাত উনিশ শতকীয় নয়। এই ভাবনা বহুকালের, পাস্কাল অবধি ভেবেছিলেন ক্লিওপেট্রার নাক একটু কম টিকালো হলে ইতিহাস বদলে যেতে পারত।[২] কী হলে কী হতে পারত তা ইতিহাস তৈরির প্রাক্কালে লেখকরা প্রায়ই ভেবে থাকতেন, হেরোডটাসও এর ব্যতিক্রম নন -

> "As a genre of narrative representation, alternate history is an age-old phenomenon. Indeed, it traces its roots back to the origins of Western historiography itself. No less a figure than the Greek historian Herodotus speculated about the possible consequences of the Persians defeating the Greeks at Marathon in the year 490 B.C.E."[৩]

এই ধরণের স্পেকুলেশন কেবল মজা করার জন্য নয়, আবার আকাশ কুসুম কল্পনাও নয়। এই ধরনের চিন্তা ইতিহাস চেতনা তৈরির কাজে লেগেছে, অতীতকে পড়বার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও ইতিহাস নির্মাণের কাজে সাহায্য করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকরা, বিশেষত উনিশ শতকের ইতিহাস লেখকেরা এই স্পেকুলেশন বা অনুমাননির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন, এই ধরণের কাঠামোকে তারা একরকম নাকচ করে দিলেন -

> "Yet, with the rise of modern "scientific" historiography in the nineteenth century, allohistorical reasoning became stigmatized as empirically unverifiable and was banished to the realm of lighthearted cocktail party conversations and parlor games."[৪]

এরপর থেকে বিকল্প ইতিহাসকে আলাদা নজরে দেখা হতে থাকে, কেবল আজগুবি গল্প ছাড়া এর আর কোনো গুরুত্ব থাকেনা। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগে, যুক্তিবাদের আবহে 'স্পেকুলেটিভ' চিন্তাকে নাকচ করা হয়। অথচ এর এক শতকের মধ্যেই ঘটবে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিকল্প ইতিহাস শুধু মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তা নয়, বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে। এমনটা ঘটল কেন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ের নিয়মে যা পরিবর্তন ঘটানোর তা তো ঘটিয়ে ছিলই- রাজনৈতিক ক্ষমতার জটিল সমীকরণের পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এর একটা অংশ। তার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব, নৈতিকতার প্রতি মানুষ আস্থা হারালো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষকে চমকে দিয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার সমস্ত সীমা পার করে গেল। এই পরিবর্তন সমাজে, সাহিত্যে, দৃশ্যমাধ্যমে যে নামে ধরা আছে তা হল- 'পোস্টমর্ডানিজম'।[৫] নাৎসি জার্মানি, হলোকাস্ট ও পরমাণু বোমার দাপটে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে তৈরি হয়েছিল তাতে পুরোনো সমস্ত বাঁধাধরা নিয়মকে উপড়ে ফেলার মানসিক পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্যক্তিবিশেষ, অভিজাত চক্র থেকে বেরিয়ে জনগণের সংস্কৃতি বড় হয়ে ওঠে।[৬] এই সময়ের নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণাও একমাত্রিক, পরিণামবাদী অভিমুখ থেকে সরে আসে। যে 'ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স' নিজেকে বস্তুজগতের সর্বময় কর্তা মনে করত, আধুনিক পদার্থবিদ্যা তার সেই আসন টলিয়ে দিল। এইসব সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের ফলে বিকল্প ইতিহাসের পরিসর স্বীকৃত হতে থাকে -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 845 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "Beyond the influence of postmodernism, recent scientific trends have further promoted allohistorical thinking. Ever since the appearance of Einstein's theory of relativity and Heisenberg's uncertainty principle, modern science has been moving away from determinism and towards a belief in indeterminacy. The notion of "complexity Theory" or "chaos theory", which asserts that some universal laws are so complex that they appear to be chaotic or random in appearance, has lessened the appeal of deterministic explanations of history."[৭]

১৯৬০ পরবর্তী সময়ে এই বিকল্প ইতিহাসের কাহিনির বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করার অন্যতম কারণ তাই। এই ধারাটি যখন ইউরোপে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করছিল, তার সমকালে বাংলা সাহিত্যে বিকল্প ইতিহাসের কাহিনি নির্মাণ করেছিলেন এক বাঙালি, ভুদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি যখন এই কাহিনি লিখেছিলেন তখন বিকল্প ইতিহাস নিয়ে কোনো গবেষণার অবকাশ ছিল না। আজ যখন এই ধারাটি সাহিত্যে নিজের জায়গা তৈরি করেছে, একে ঘিরে নানা তত্ত্ব, ধারণা তৈরি হয়েছে, সেই গবেষণার ইতিহাসকে সামনে রেখে আমরা ভুদেব বাবুর এই নির্মাণকে ফিরে দেখব।

বাঙালির ইতিহাস চেতনার নির্মাণ : উনিশ শতকে বাঙালি প্রথম বুঝতে পারল তাদের কোনো ইতিহাস নেই। যা আছে তা কাহিনি অথবা রাজ-রাজড়াদের জীবনী। এর মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান ঠিকই আছে, কিন্তু তা ইতিহাস নয়। উপরিপর এই রচনাগুলি পক্ষপাতদুষ্টও বটে, কোনো এক রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি, কাজেই যা তথ্য রয়েছে তা যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে। ইতিহাস রচনার বিবিধ উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোনো ইতিহাস রচিত হয়নি। তার কারণ, উনিশ শতকের আগে আমাদের ইতিহাস বা ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ইতিহাস লেখা কেন প্রয়োজনীয় তা নিয়ে উনিশ শতকে ইউরোপে নানান আলোচনা হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কথাটি বলেছিলেন ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের সমকালে রাঙ্কে। তিনি বলেছিলেন 'ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, "আসলে কীরকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো"।[৮] আসল সত্যিটা সামনে আনতে ঐতিহাসিক বা ইতিহাস লেখককে তথ্য ঝাড়াই বাছাই করে নিজের মতো সাজিয়ে নিতে হয়। কারণ কোন তথ্য ইতিহাস তৈরির কাজে লাগবে তা শুধুমাত্র ইতিহাস লেখকই ঠিক করেন। এই যে আসলে কী হয়েছিল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা, তারপর সেই তথ্য দিয়ে সাজিয়ে তোলা ইতিহাস-এই ধারণা আমাদের ছিল না। এমন হওয়ার কারণ কী হতে পারে? বরুণ চক্রবর্তী তাঁর 'টডের রাজস্থান' বইতে বলছেন -

> "এর কারণ মুখ্যত দ্বিবিধ-প্রথমত যথার্থ ঐতিহাসিক চেতনার অভাব, দ্বিতীয়ত অধ্যাত্ম মানসিকতা। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি যে আমাদের গৌরব করার মত কিছুই নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে যা কিছু আমাদের দ্বারা সাধিত হয় তার মূলে আছে দৈবানুকম্পা। মানুষ নিমিত্ত মাত্র, দেবতার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানুষেরপক্ষে বড় বা ছোট কোন কাজই সমাধা করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন করে এসেছি। এমন কি সাহিত্য বলতেও দেব-বন্দনাকে দীর্ঘকাল ধরে বুঝিয়ে এসেছি। ইউরোপের মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের এখানে একটা মূল পার্থক্য রয়ে গেছে। ইউরোপীয়রা নিজেদের শক্তি ও দান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে যেখানে সচেতন, আমরা ভারতবর্ষের মানুষরা সেক্ষেত্রে এই আত্মসচেতনতা সম্পর্কে, নিজেদের কৃতিত্ব সম্পর্কে গৌরবান্বিত হওয়াকে অসমীচীন বলে মনে করে এসেছি।"[৯]

কিন্তু উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যখন বিশ্ব ইতিহাস পড়তে শুরু করল, যখন তারা ইংরেজদের ইতিহাস পড়ল, রোমানদের ইতিহাস পড়ল, গ্রীসের ইতিহাস পড়ল-তখন তারা পড়ল অস্তিত্ব সংকটে। অপরদিকে এই লিখিত ইতিহাস না থাকার সুযোগ পুরোপুরি নিতে থাকলেন ইংরেজ ঐতিহাসিকরা। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বলে বসলেন বাঙালির জীবনে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাক্রমই নেই যা ইতিহাস হতে পারে।[১০] ইংরেজদের হাত ধরেই প্রথম বাংলার ইতিহাস লেখা হল। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' এই কাজে হাত লাগিয়েছিল। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস স্টুয়ার্ট প্রথম বাংলার ইতিহাস লিখেছিলেন, 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল'। বলাই বাহুল্য, একে শাসক, তার উপর বিদেশি জাতি তাই তাদের লেখা

ইতিহাস মোটেই বাংলা বা বাঙালির সত্যের কাছাকাছি পৌঁছোয়নি। ধীরে ধীরে বাঙালি এই কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। একটি জাতির ইতিহাস থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বঙ্কিম আমাদের মনে করিয়ে দেন -

> "জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানেনা; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙালি।"[১১]

এই ইতিহাসচেতনা জেগে ওঠার ফলে বাঙালি নিজেদের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয় তা দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনি, গল্প, জীবনী আমাদের কাছে প্রচুর মজুত ছিলই, সেই তথ্য থেকে ইতিহাস আহরণের কাজ চলতে থাকে, অপরদিকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনেক নতুন তথ্য সামনে নিয়ে আসেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ইতিহাসের পাঠ্য বইও লেখা হচ্ছিল পুরোদমে, যেমন- 'আসাম বুরঞ্জী (১৮২৯), প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়-মার্শম্যান (১৮৩০), গ্রীসদেশের ইতিহাস-ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৩৩), ভারতবর্ষের ইতিহাস-গোপাললাল মিত্র (১৮৪০), বাঙ্গালার ইতিহাস-গোবিন্দচন্দ্র সেন (১৮৪০), বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৪৮), ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ, সারাবলি-নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১)'।[১২]

এই পর্বের ইতিহাস রচনা ও জাতির ইতিহাস নিয়ে যে সচেতনতা তৈরি হয়েছিল তার প্রভাব সদ্য লিখিত গদ্যসাহিত্যেও পড়েছিল। কাজেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবের কালে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাদুর্ভাবই লক্ষ্য করব। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন -

> "ক্রমপরিণতির দিক দিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। আমাদের বাস্তব-পর্যবেক্ষণশক্তি উপন্যাস-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনায়, অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিতে ছিলাম। উপন্যাস রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে অধিকসংখ্যায় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলি সত্য ও কল্পনার, সাধারণ ও অসাধারণের, এমন কি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ; বাস্তব জীবনের সহিত ইহাদের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ, অদৃশ্যপ্রায় ছিল।"[১৩]

একথা সত্য, ইতিহাস ও কল্পকাহিনির যে তফাৎ রয়েছে তা প্রায়ই উনিশ শতকের রচনায় তেমন স্পষ্ট নয়। কেরী 'ইতিহাসমালা' লিখেছিলেন, অথচ তাঁর গল্পগুলি মোটেই ইতিহাস নয়। 'তোতাকাহিনী' বা 'Persian Tales' - এর অনুবাদের নাম দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে 'তোতা ইতিহাস' এবং 'পারস্য ইতিহাস'।[১৪] উনিশ শতকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার সময় বাঙালি লেখকরা মূলত যে দুটি বই (টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' এবং কন্টারের 'Romance of History-India', Vol I & II) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন, সেগুলিকেও ঠিক ইতিহাস বলা যায় না। প্রাথমিক পর্বের লেখকদের লেখায় এই পার্থক্য বোঝা যেত না। পরবর্তী লেখকরা সচেতন ভাবে ইতিহাস এবং উপন্যাসের পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেও সবসময় তা বজায় থাকেনি। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা তার একটি কারণ বটে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন ভুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'।[১৫] এর মধ্যে রয়েছে দুটি কাহিনি - 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। ভুদেব মুখোপাধ্যায় মূলত প্রবন্ধকার হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাসের পাঠ্য বই রচনা করেছেন। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের তফাৎ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্তিক থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হত ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ১৩০২ বঙ্গাব্দে লেখক কর্তৃক উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১৬] আমাদের আলোচ্য এই রচনাটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, ইতিহাসও নয়। ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'- বাংলা সাহিত্যের বিরল বিকল্প ইতিহাসের কাহিনি।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' : বিকল্প ইতিহাস ও ইউটোপিয়ার ধারণা : বিকল্প ইতিহাস কবে থেকে লেখা হচ্ছে, বা কবে জনপ্রিয় হল তা নিয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। কিন্তু এই বিকল্প ইতিহাস লেখা কেন হচ্ছে? ইতিহাসের ঘটনাক্রম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 845 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বদলানোর কথা আমাদের মাথাতেই বা কেন আসে? তার কারণ অতীতে কী হয়েছিল তার উপর আমাদের বর্তমান নির্ভর করে, আর তাই -

> "when we speculate about what might have happened if certain events had or had not occurred in the past, we are really expressing our feelings about the present. We are either grateful that things worked out as they did, or we regret that they did not occur differently. The same concerns are involved in the broader realm of alternative history. Alternative history is inherently presentist."[১৭]

অর্থাৎ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকাচ্ছি, বোঝবার চেষ্টা করছি সেই অতীতকে- কোন ঘটনা বা ঘটনাগুলি আলাদা ঘটলে আমার বর্তমান, বাস্তব অন্যরকম হতে পারত। এর সঙ্গে শুকনো ঐতিহাসিক তথ্যের ততটা যোগাযোগ নেই যতটা আছে স্মৃতির। কারণ -

> "The general argument is That fictional visions of altered paths and the consequences they bear for the future are not an end in itself, but must be read as either affirmative or critical comments on the contemporary status quo. Here, the link between Alternative History and memory is especially evident, for, as Siobhan Kattago points out, "memories of the past perhaps tell us more about the present society than about the past. Because memory is a dynamic, fluid activity framed by social groups and located in symbolic places, the activity of remembering is guided by the needs of the present."[১৮]

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাহিনিতে উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাব। এই রচনায় মূলত যে ঐতিহাসিক ঘটনা বদলের উল্লেখ রয়েছে তা হল- পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মারাঠারা হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দের এই যুদ্ধে তাদের এই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মারাঠারা ভারতীয় শক্তি হিসেবে গুরুত্ব হারায়, রঘুনাথ রাওয়ের মত অপদার্থ শাসকের আবির্ভাব হয়। তাদের দুর্বলতা, অন্তর্কলহের সুযোগে ইংরেজরাও বাংলা ও কর্ণাটকে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সেদিন সেই যুদ্ধের ফলাফল যদি অন্যরকম হত? যদি আফগান নেতা আহম্মদ শাহের কাছে সেদিন মারাঠা বাহিনী হেরে না যেত? তাহলে যে ভুদেব মুখোপাধ্যায় উপনিবেশে বসে বিকল্প ইতিহাসের কাহিনি লিখছেন, সেই তিনি কী স্বাধীন ভারতবর্ষে বাস করতে পারতেন? সেই স্বাধীন দেশের ক্ষমতা থাকত মারাঠাদের হাতে?

কেমন হত সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষের চেহারা? সেই কথাই বেশ কিছু অধ্যায়ে তিনি কল্পনা করেছেন। মোট দশটি পরিচ্ছেদে রচনাটি বিভক্ত - 'পাণিপথের যুদ্ধ', 'সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্ত', 'মূল ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপকসভা', 'উন্নতির পথ মোচন', 'বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ', 'কাণ্যকুব্জের চতুষ্পাঠী', 'বারাণসীর বিদ্যালয়', 'বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিষয়ক', 'আতিথ্য উৎসবাদি-বিষয়ক' এবং 'আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা'।[১৯] প্রথম পরিচ্ছেদে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা সেনার কাছে আফগান নেতা আহম্মদ শাহ আবদালী পরাজিত হচ্ছেন। ফলে মারাঠা শক্তি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি হচ্ছে,ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে-তাদের বহুদিনের স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছেন না। তাদের নেতৃত্বে 'ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' নিচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারতের সকল নেতৃত্ব শিবজীর বংশধর রামচন্দ্রকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিচ্ছেন, তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসছেন। এরপরের সবকটি পরিচ্ছেদেই এই নতুন নেতৃত্ব কীভাবে দেশ চালনা করছেন সেই রীতি-নীতির বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছেন লেখক। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি, শিক্ষানীতি, বাণিজ্য নীতি, ঔপনিবেশিক নীতি কী হওয়া উচিত তার পরিচয় রয়েছে। নবম ও দশম অধ্যায়ে দেশবাসী কীভাবে নিজেদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বজায় রেখে নিজেদের উৎকর্ষতার চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাবেন তা নিয়ে আলোচনা আছে। দশম অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যটক ভারত ভ্রমণে এসে কী দেখেছেন তার কিছু ঝলক রয়েছে। বলাই বাহুল্য বেশিরভাগ পর্যটকই ইউরোপীয়। তারা প্রত্যেকেই ভারতের প্রশাসনিক, সামাজিক রীতিনীতির প্রভূত প্রশংসা করেছেন। যেমন, একজন রাশিয়ান পর্যটক লেখেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 845 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এককালে গ্রীকদিগের মধ্যে যেমন এথিনীয়েরা প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ অসাধারণ স্বত্বাধিকার বুঝিয়াছিল ভারতবর্ষীয় দিগের মধ্যেয় এক্ষণে সেইরূপ স্বত্বাধিকার প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্বে স্পার্টার লোকেরা সেরূপ স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুশীয়েরাও সেই-রূপ আছেন।"[২০]

এক জার্মান পর্যটক লেখেন –

> "ইউরোপ খন্ডের সর্ব্বত্র দেখিয়া এবং ইউরোপীয় ইতিবৃত্তের পর্যালোচনা করিয়া আমার সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থপরতা বৃত্তিই অধিকতর প্রবল। কিন্তু দেশের জন্ম বাতাসে গুণেই হউক, আর মিতাহার গুণেই হউক, আর পুরুষানুক্রমিক সুশিক্ষার প্রভাবেই হউক, ভারতবর্ষীয় দিগের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা তেমন প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।"[২১]

একজন মার্কিন পর্যটক লেখেন –

> "ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে নিতান্ত হতাশ হইতে হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় আমরা নিতান্ত অবিদ্য, অপবিত্র এবং অকর্ম্মণ্য লোক। ইহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ বুৎপন্ন।"[২২]

ইংল্যান্ডেরও একজন পর্যটক আছেন যিনি ভারতকে তেমন পছন্দ করেন না, তাও তিনি বলতে বাধ্য হন –

> "সত্য বটে, এখানকার নগরগুলি যেমন সমৃদ্ধিশালী তেমন আর কুত্রাপি নাই। পারীস, রোম, মেড্রিড, বর্লিন, প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর নগরগুলি এখানকার লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লাহোর, প্রভৃতির তুল্য নয় বটে।"[২৩]

'বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ' নামক পরিচ্ছেদে দেখা যায় ফ্রান্স দেশের সদ্য গড়ে ওঠা প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রণালী সম্পর্কে ভারতের সম্রাট অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে বসে কূটনৈতিক আলোচনা করছেন।[২৪] 'কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠী' ও 'বারাণসীর বিদ্যালয়' পরিচ্ছেদে দুটি আন্তর্জাতিক মানের চতুষ্পাঠীর বর্ণনা রয়েছে। কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠীতে কেবল সংস্কৃত ভাষা নয়, শেখানো হয় গ্রীক, লাতিন, আরবি।[২৫] বারাণসীর ত্রিপুরা ভৈরবী পল্লীর প্রধান চতুষ্পাঠীতে নব্য ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষাও পড়ানো হয় - 'ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয়, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী'।[২৬] সেখানে রয়েছে বিভিন্ন চলিত ভাষার বইয়ে সাজানো গ্রন্থাগার। এছাড়াও ওই চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ পশ্চিমে আরেকটি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পর্দার্থবিদ্যার চর্চা হয়।[২৭]

এই অধ্যায়গুলিতে তিনি যা বলেছেন তা খুব সুন্দর করে সাজানো। কিন্তু যে আদর্শ ভারতের তিনি নকশা এঁকেছেন তা সত্যি বা বাস্তব কোনোটাই নয়। যে দেশের কল্পনা তাঁর কলমে রয়েছে তা আদর্শ কল্পলোক। এই ধরণের কল্পলোকের ধারণাকে আমরা 'ইউটোপিয়া' নাম দিয়ে থাকি-

> "The term utopia designates the class of fictional writings that represent an ideal, nonexistent political and social way of Life. It derives from *Utopia* (1515-16), a book written in Latin by the Renaissance humanist Sir Thomas More, which describes a perfect commonwealth."[২৮]

ভুদেববাবুর রচনায় ঠিক এমনই একটি আদর্শ রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনের খোঁজ পাই, যার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে শ্রদ্ধা করে, তারা একে অপরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, ভারতের সকল প্রধান ব্যক্তি একত্রিত হয়ে গণতান্ত্রিক ভাবে রাজ্যশাসনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তারা সকলে মিলে ইংরেজকে (ক্লাইভকে) ভারতের ক্ষমতা দখল করতে দেয়নি, শালেমার বাগে ফাল্গুন মাসে একটি দরবারে সারা পৃথিবীর দেশগুলির প্রতিনিধিরা ভারতসম্রাটের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশের ও বৈদেশিক নীতি ঠিক করছে। এই সবই আকাশ কুসুম কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু এই কল্পনা তিনি কেন করছেন? তার কারণ বর্তমানে (অর্থাৎ উনিশ শতক, যে সময়ে এটি লেখা হচ্ছিল) যেভাবে শোষিত হয়ে, উপনিবেশের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 845 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাসিন্দা হয়ে, নিজের জীবন, জীবিকা সবকিছুর জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছিল আমাদের, তা কোনো মানুষেরই অভিপ্রেত নয়। সেই কারণেই লেখক ভাবছেন অতীতের কোন ঘটনা আলাদা ঘটলে আমরা উপনিবেশের বাসিন্দা হতাম না, ইংরেজদের হাতে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত না। ঠিক সেই কারণেই পাণিপথের যুদ্ধ ছাড়াও আরও কিছু ছোট ইতিহাস বদলের উল্লেখ আছে। যেমন, 'উন্নতির পথ মোচন' নামক পরিচ্ছেদে জানা যাচ্ছে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ 'আলীনগর' দখল করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাজীরাও তাদের সব জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছেন, তাদের কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করতে দেননি, এবং কেবলমাত্র ব্যাবসায়িক কাজ ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা তাদের থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে।[২৯] অর্থাৎ ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেছে। কিন্তু এই ধূর্ত ইংরেজকে যে আটকানো গেছে তার অন্যতম কারণ ভারতীয় নেতৃত্ববর্গের সংহতি ও রাজনৈতিক দক্ষতা- 'যদি সাম্রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল থাকিত, এবং আমার সহিত এত অধিক সুশিক্ষিত সৈন্য না থাকিত তবে সে কখনই ঐ সকল যুক্তি গ্রহণ করিত না। সে একটী বাঘের বাচ্চা'।[৩০] আবার 'বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিষয়ক' পরিচ্ছেদে ভারতের বিদেশি বাণিজ্যে রমরমার প্রসঙ্গ রয়েছে। ইংরেজদের তৈরি শিল্পদ্রব্যের উপর শুল্কের প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন, অবাধ বাণিজ্য রোধ করা হয়েছে। এদেশের কার্পাস সুতো দিয়ে এদেশের ব্যবসায়ীরা কাপড় বুনেছেন, তা নিজের দেশে বিক্রি করেছেন, নিজেদের অর্থনীতি সবল করেছেন। কোনো 'সম্পদের বহির্গমন' ঘটেনি। কিন্তু বাণিজ্যের ফলে একদল অধিক ক্ষমতা ভোগ করবেন বাকিরা করবেন না, এই সামাজিক অসাম্য 'স্বপ্নলব্ধ ভারত'-এর কাম্য নয়। ক্ষমতা আছে বলেই সর্বত্র উপনিবেশ স্থাপন তারা করবেন না, যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করবেন সেখানে জমির অধিকার ভোগ করবেন না। এছাড়াও- 'যে যে দেশে ধনস্পৃহা বশতঃ বাণিজ্য করিতে যাইবে, সেই দেশের ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিবে-আর যে দ্বীপাদিতে মনুষ্যের বসবাস নাই অথবা নিতান্ত অল্প মানুষের বাস সেই সেই দ্বীপ ভিন্ন অপর কোন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবে না'।[৩১] অর্থাৎ ঔপনিবেশিক জীবনের যে গ্লানি, দুঃখ তা বদলে ফেলার আশা থেকেই এই লেখাটি লেখা হচ্ছে। রচনাটির শেষে ভুদেববাবু সেকথা আমাদের জানান -

> "কাল পুরুষ, সূর্য ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়াসখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সখীর কষ্ট হতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দেবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সকল সময়ে পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হই। আমার নাম আশা"।[৩২]

শাসকদের, ক্ষমতাশালীদের ইতিহাস সাধারণ মানুষের ইতিহাস নয়। তবু বহুকাল ধরে শাসকদেরই পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ, বিগ্রহ সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একটি মাত্র যুদ্ধের ফলাফল বদলে গেলে আমাদের বাস্তব বদলে যেতে পারত। যে সভ্যতার লাশ আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি, তা বইতে হত না। প্রায় সমস্ত বিকল্প ইতিহাসের কাহিনিতে তাই আমরা বাস্তব নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা দেখতে পাই। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' - এও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটবে।

উনিশ শতক পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিপত্তি ক্রমশ কমতে থাকে। বিকল্প ইতিহাসের প্রসঙ্গ সেখানে আরও বিরল। কিন্তু অতীতকে ফিরে দেখবার ইচ্ছে কী বাঙালির এরপরে কখনও হয়নি? দেশভাগের পর আমরা কী কখনও ভাবিনি, এই ঘটনা না ঘটলে কী হতে পারত? কিন্তু সেসব কাহিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। উনিশ শতকে ভুদেববাবুকে অনেকে প্রফেট ভাবতেন।[৩৩] রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমান্তরালে তাঁর নাম উচ্চারিত হত। তাঁর লেখার প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে রয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক তাকে বাঙালি সেভাবে মনে রাখেনি। আজ আমরা গবেষণার পরিসরে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বসাহিত্যে আলোচিত এই অন্য ঘরানার কাহিনির উত্তরাধিকার বাংলা সাহিত্যেও আছে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সমকালেই তা তৈরি হচ্ছে। উনিশ শতকের বাঙালি অনেক অসাধ্য সাধন করেছিল, ভুদেব মুখোপাধ্যায় তারই একটি স্ফুলিঙ্গের নাম। তাঁর এই কীর্তির প্রতি আমাদের কুর্ণিশ রইল।

Reference:

১. Hallekson, Karen. 'Inventing the Past: A Brief Background of the Alternate History'. *The Alternate History: Refiguring Historical time.* Ohio, The Kent State University Press, 2001, p. 19

২. প্রাগুক্ত, p. 20

৩. D. Rosenfeld, Gavriel. 'Introduction'. *The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism*. New York, Cambridge University Press, 2005, p. 5

৪. প্রাগুক্ত, p. 5

৫. Abrams, M.H., and Harpham, Geoffrey Galt. *A Glossary of Literary Terms*. Eleventh Edition. Cengage Learning, p. 227-228

৬. প্রাগুক্ত, p. 228

৭. D. Rosenfeld, Gavriel. 'Introduction'. *The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism*. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 7

৮. কার, ই এইচ, 'ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্য', *কাকে বলে ইতিহাস?,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, পৃ. ৩

৯. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, "বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চা : টডের জীবনকথা ও 'রাজস্থান' গ্রন্থের গুরুত্ব", *টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), ঊনবিংশতি মুদ্রণ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৫

১২. দত্ত, বিজিতকুমার, 'বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ২৩

১৪. দত্ত, বিজিতকুমার, 'বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা : লি :, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ২২

১৬. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস,* হুগলি: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ

১৭. Rosenfeld, Gavriel. 'Why Do we Ask 'what if?' Reflections on The Functions of Alternate History'. *History and Theory*. Theme Issue 41, December 2002, p. 93

১৮. Schenkel, Guido. 'Alternate Histories: Memory, Counter Memory, Alternate Memory'. *Alternate History-Alternate Memory: Counterfactual Literature in The Context of German Normalization*. 2012, The University of British Columbia (Vancouver), PhD Dissertation, p. 8

১৯. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস,* হুগলি, বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ

২০. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬১

২১. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬১

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 845 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২২. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬৪

২৩. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬৩

২৪. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, 'পঞ্চম পরিচ্ছেদ: বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ', *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৬ - ৩৪৯

২৫. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫০

২৬. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫১

২৭. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫১

২৮. Abrams, M.H. and Harpham, Geoffrey Galt, *A Glossary of Literary Terms,* Eleventh Edition, Cengage Learning, p. 413

২৯. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৪ - ৩৪৫

৩০. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৫

৩১. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫৪-৫৫

৩২. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬৬

৩৩. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, 'ভুদেব মুখোপাধ্যায় : সংস্কারবাদী ও সংস্কারক', *ভুদেব-রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 854 - 861
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচীন গ্রাম আন্দুলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমাহার

অনামিকা চ্যাটার্জ্জী
পিএইচ.ডি.
হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্ট
টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি
Email ID : withdr.anamika@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Andul, Culture, Tradition, Lord Cornwallis, Pandit, Durga festival, Howrah District, Nityananda Mahaprabhu, Raj Poribar, Saraswati River.

Abstract
Andul is one of the oldest villages in Howrah district, a place that still bears the testimony of ancient history and tradition. Three hundred years ago, trade was carried out between various countries, places on the Saraswati River route through Saptagram Port. At that time, Andulgram was located in the middle of that trade route and a few noble landlord families started living in this area; the Roy Family (also known as Raj Parivar) followed by Mallick Family and Kundu Chowdury Family.

The importance of the Datta Chowdhury dynasty in the history of Andul is immense. During the time of Krishnananda, the fourth-generation male of this family, Nityananda Mahaprabhu. Once many Vaishnavas groups were meeting in the Kirtan Mandap in a religious gathering. It is said that the dance songs of Nityananda Mahaprabhu's Vaishnav group caused a dust of joy to rise on the ground of that place. This lead toward naming of the place as Anandodhuli. Later, this word got corrupted and became Andul, a name by which it known today.

The ancient Durga festival, which began during the reign of Krishnananda's grandson Ram Sharan Dutta Chowdhury, is still being celebrated in the same vein. Bhubaneswar Kar was the founder of the Kar dynasty. Later, the Andul dynasty emerged from this Kar dynasty, and the birth of two Pandits Vidyasagar and Mahendranath Bhattacharya further added to the greatness of this village. The name of Purushottam is known as the ancestor of the Kundu Chowdhury clan of this village, Mahiari, adjacent to Andul. This Kundu Chowdhury family established a hospital, thirty schools, and a library for the general public for the welfare of the village, which truly deserves praise.

During the Muslim rule, Andul was under the control of Muzaffarpura and Boro Pargana and was called as 'Muzaffara' at that time. During the rule of Lord Cornwallis, at the settlement of the revenue of Bengal, this place came under the Twenty-four Parganas, later during the delimitation of the Hooghly district, it came under the then Hooghly district, and later when the Howrah

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

district was established, the village of Andul was included in the Howrah district.

My aim in analyzing this issue is to present the history, culture and heritage of Andulgram to the future generations so that they can be informed about the various unknown historical places, culture and heritage of their state and they can take this heritage culture forward somewhere. In this way, the message of the history, culture and heritage of the villages of Bengal will gradually spread in Bengal and India.

Discussion

আন্দুলের ইতিহাসে জমিদার দত্ত চৌধুরী বংশের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্দুল গ্রামটিতে দত্ত চৌধুরী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তেখড়ি দত্ত যিনি দেবদাস নামে পরিচিত তাঁরই হাত ধরে।[১] তাঁর প্রপৌত্র কৃষ্ণানন্দ দত্ত ছিলেন কৃষ্ণ ভক্ত। তাঁর সময়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বহু বৈষ্ণব পরিবৃত হয়ে আন্দুল গ্রামে জমিদার কৃষ্ণানন্দের কীর্তন মন্ডপে আগমন করেন। কথিত আছে, সেই সময় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বৈষ্ণব দলের কীর্তনের সময়ে নৃত্য ও গীতের ফলে যে আনন্দধুলি উড়েছিল সেই থেকে এই জনপদের নাম হয় আনন্দধুলি। তার থেকে শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে জায়গাটির নাম হয় আন্দুল।[২] নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃষ্ণানন্দকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে তাঁকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি নবদ্বীপে গমন করে শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করেন ও তাঁর কৃপা লাভ করেন। এরপর কৃষ্ণানন্দ নিজ পুত্র কন্দর্পরামের হাতে সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর সহচর্যে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। পুরী ধামের 'চান্দুলমঠ' কৃষ্ণানন্দের কীর্তির সাক্ষ্য আজও বহন করছে। চৈতন্যচরিতামৃত ও মহাপ্রভু চরিত সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থে অনেক স্থানে কৃষ্ণানন্দ দত্তর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কৃষ্ণানন্দের তিন পৌত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামশরণ দত্ত চৌধুরী প্রথম আন্দুলে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে।[৩] তিন পৌত্রের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় মধ্যমপৌত্র গোবিন্দশরণ আন্দুল ত্যাগ করে 'বদর রসা' নামক চরে (অধুনা কলকাতার অন্তর্ভুক্ত) নিজ বাসস্থান স্থাপন করেন। সেই স্থান 'গোবিন্দপুর' নামে বিখ্যাত। ইনিই ছিলেন হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বাড়ির প্রথম পুরুষ।[৪] অল্প কালের মধ্যেই রামশরণ সর্বহারা হয়ে পড়েন এবং সেই শোকে দেহত্যাগ করেন। রামশরনের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশ্বর পৈত্রিক জমিদারির পুনরাধিকার করেন এবং কাশীশ্বর পুরাতন বাড়ি ত্যাগ করে নতুন করে বৃহৎ অট্টালিকা ও পূজার দালান নির্মাণ করেন। তিনি নিজ নামে ৺কাশীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করে কুলো প্রথা অনুযায়ী উক্ত দেবতারও সেবার জন্য 'শ্রীশ্রী কাশীশ্বর দেবত্তর' নামে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করে দেন।[৫] রামশরণ দত্ত চৌধুরী আন্দুলে দত্ত চৌধুরী বংশের যে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন তা আজ ৪৫৫ বৎসর ধরে চলে আসছে। এই দুর্গোৎসবে গ্রামের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এটি আন্দুলের এক বহমান ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। আন্দুলের মল্লিক পরিবার ছিল দত্ত চৌধুরী পরিবারের দৌহিত্র সম্পর্কিত।[৬] হুগলী জেলার মথুরাবাটী গ্রামে গৌতম গোত্রীয় মল্লিক পরিবার ছিল অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এঁদের 'মথুরাবাটীর মল্লিক' নামে সমাজে উল্লেখ করা হত। এই বংশের গৌরীশংকর মল্লিক মহাশয়কে আন্দুলের জমিদার কাশীশ্বর দত্ত চৌধুরী নিজ কন্যা দান করেন ও তৎসম্পর্কে যৌতুক স্বরূপ বিস্তীর্ণভূমি দান করে তাঁকে আন্দুলে স্থাপন করেন।[৭] ভদ্র-প্রতিবেশী ও গ্রামের সুন্দর পরিবেশ মল্লিক মহাশয়কে আকৃষ্ট করে। গৌরীশংকরই আন্দুলের মল্লিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কি সূত্রে মল্লিকরা জমিদারি ও প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও তবে 'মল্লিক' পদবী থেকে অনুমান করা যায় এই পরিবারের কোন পূর্বপুরুষ মুসলমান নবাব সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বংশেরই বিদ্যোৎসাহী, ধার্মিক, স্নেহ প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ মল্লিক। তিনি বহু পরিশ্রম ও খরচ করে আন্দুল গ্রামে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেটির নাম রাখা হয় 'Andul Higher Class English School।'[৮] তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অতি দক্ষতার সঙ্গে এটি পরিচালনা করতেন। তিনি এই কাজের দ্বারা নিজ গ্রামের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। আজ আন্দুলের ঘরে ঘরে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, পেশা ভিত্তিক যুবক দল দেখা যায় তার প্রধান ও মূল উৎস হল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যোগীন্দ্রনাথ মল্লিকের অনবদ্য কীর্তি 'ইংরাজী স্কুল'।[৯] এই বিদ্যালয়টি আজও বর্তমান। আজও প্রতিবছর দশই ফেব্রুয়ারি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগীন্দ্রনাথ মল্লিকের মূর্তিতে মাল্য দান করে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

কাশীশ্বর দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা ও আন্দুলের মল্লিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গৌরীশংকর মল্লিক তার ভগ্নিপতি ভুবনেশ্বর করকে আন্দুল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১০] কর বংশীয় রায় নিজ অবস্থার উন্নতি করেন ও অবস্থানুযায়ী 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। এই পরিবার থেকেই আন্দুলের রাজ বংশের উদ্ভব ঘটে। এই পরিবারের সুযোগ্য সন্তান রামচরণ রায়। তিনি ফার্সি ও আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ওকালতি পড়ে আইন ব্যবসাও করতেন। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হুগলি দপ্তরে উকিল পদে যোগ দেন। তিনি জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর দেওয়ানী করে অনেক প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান হন।[১১] সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বেসর্বা রবার্ট ক্লাইভ এর সুনজরে পড়েন তিনি এবং পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি দেওয়ানের সহকারী থেকে কোম্পানির দেওয়ান হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধে জয়ী হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পরাজিত সিরাজের প্রাসাদ থেকে লুণ্ঠিত হয় প্রায় ৮ কোটি টাকার মুদ্রা ও ধনরত্ন। সেই ধনরত্নের অধিকাংশ সরস্বতী নদীপথে নিয়ে আসেন রামচরণ রায়। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের হাতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমল পরিবর্তন ঘটে। ১৭৬৬, খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম রামচরণ রায়ের পুত্র রামলোচন রায়কে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।[১২]

রামলোচন রায়ের পুত্র রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ছিলেন মেধাবী, সামাজিক, কার্যদক্ষ ও উদ্যোগী পুরুষ।[১৩] কলকাতার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ও ধনীসমাজে রাজনারায়ণের খুব মেলামেশা ছিল। তিনি স্যার রাধাকান্ত দেবের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি সেই সময় গঠিত 'হিন্দু ধর্ম সভা'র যুগ্ম সভাপতি নির্বাচিত হন রাধাকান্ত দেবের সহিত।[১৪] আন্দুলে দত্ত চৌধুরী বাড়িতেও এই সভার অধিবেশন বসত এবং রাধাকান্ত দেবও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন।[১৫] আন্দুলের রাজপ্রাসাদ রাজা রাজনারায়ণের পরিকল্পনা ও তাঁর সময়েই এটি নির্মিত হয়। রাজপরিবারের সদস্যদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় এই রাজপ্রাসাদটি ডোরিক স্থাপত্যে নির্মিত। এই বিশাল প্রাসাদটি ৬০ ফুট উঁচু এবং ৫০ ফুট ৮টি থাম বিশিষ্ট, প্রাসাদের পূর্বদিকে পূজার দালান নির্মিত।[১৬]

এই রাজভবনটি বাংলার যেকোনো রাজভবনের সমকক্ষ ও অনেকের থেকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। এই রাজবাড়ীর প্রায় ১৩ ফুট চওড়া কাঠের সিঁড়ি এবং এই রাজবাড়ীর আকর্ষণ ছিল এই রাজবাড়ী নাচ ঘর। এই নাচ ঘরটি অবস্থিত ছিল রাজবাড়ির মাঝখানে তিনতলায়। বিশাল হলঘর যার মেঝে ছিল কাঠের তৈরি। নাচ ঘরে ৬৪ টি ঝাড়লণ্ঠন সে সময় দেখা যেত। দেওয়ালে টাঙানো ছিল রাজ পরিবারের পূর্বপুরুষদের oil painting এর ছবি। এই নাচ ঘরে লখনৌ, বেনারস থেকে আসতো বহু নামকরা বাইজি।[১৭] ঘুঙুরের তাল আর তবলার আওয়াজে নাচঘর জমজমাট হয়ে উঠতো। এখন আর নাচ ঘরের তেমন কোন অস্তিত্ব নেই। কালের গ্রাসে তা এখন ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে।

এই রাজবাড়ীর সম্মুখে ছিল মাঠ যার আয়তন ছিল চার বিঘা। সিংহ দুয়ারের পাশে ছিল দারোয়ানদের ঘর। তখন সরস্বতী নদীর দৈর্ঘ্য ছিল অনেক বেশি যা রাজবাড়ীর সিংহ দুয়ারের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হতো। রাজবাড়ির পেছনে ছিল বারো বিঘা জমি নিয়ে বিশাল ফলের বাগান যা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল।[১৮] রাজা রাজনারায়ণের সময় গৃহ বিগ্রহ অন্নপূর্ণা ঠাকুর বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল রাজবাড়ীর পশ্চিম দিকে। অন্নপূর্ণা ঠাকুর বাড়ির সিংহ দুয়ারের উপরে ছিল নহবতখানা। সেখানে রাজবংশের পূজা পার্বণ এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে নহবত বসত। সিংহ দুয়ার থেকে প্রবেশ করে বিশাল উঠান। উঠান পেরিয়ে শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দির। এই মন্দিরের অধিষ্ঠিতা দেবী অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি।[১৯] মন্দিরের দু'পাশে বারোটি শিবলিঙ্গের মন্দির রয়েছে। ৩০শে চৈত্র ১২৫১ সন শুক্রবার মহাবিষ্ণু সংক্রান্তির দিন শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা দেবী প্রতিষ্ঠা কার্যসম্পন্ন হয়। 'ভুকাশী' নামক ভবনে অষ্টধাতুময়ী শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা দেবী এবং শ্রী শ্রী নটশিব প্রতিষ্ঠা কার্য সুচারূপে সুসম্পন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে ১০ই বৈশাখ সোমবার ১২৫২ সন ইংরাজী ২১শে এপ্রিল ১৮৪৫ 'সমাচার চন্দ্রিমায়' প্রকাশিত হয়। তৎসময়ে আনন্দ সূচক বহু কামানের তোপধ্বনি দ্বারা ইহা প্রচারিত হয়। রাতে রাজবাড়িতে আলোকসজ্জা ও রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে নানাপ্রকার সুদৃশ্য আতশবাজি পোড়ানো হয়। তৎসময়ে ইংরাজি বাদ্যদাম হতে থাকে। ভূকাশীধামে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ অন্নপূর্ণা মন্দিরে সারা রাত্রি ব্যাপী শ্রীশ্রী কৃষ্ণলীলা যাত্রাভিনয় দ্বারা লোকরঞ্জন করা হয়। পরের দিন প্রাতঃকালে শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা মঙ্গলারতি শেষে রাজবাড়ীর কামানের তোপধ্বনি দ্বারা অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হয়।[২০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজবাড়ীর কামানটি এখনো অন্নপূর্ণা মন্দিরে রাখা আছে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত দুর্গাপূজা বসার সময়ে এবং বিজয়ার দিন কামানের তোপ পড়তো। অন্নপূর্ণার মন্দিরের পূজার জন্য পাশেই ছিল ফুলের বাগান। বাগানের পাশেই ছিল সান বাঁধানো পুকুর। পরবর্তীকালে যেটি 'গোলাপুকুর' নামে পরিচিত ছিল। বাহাদুর রাজনারায়ণের অন্যতম কীর্তি ছিল কোবলার বাগান, বাড়ি এবং সেই স্থানের স্থাপত্য ও নির্মাণ কৌশল ছিল অতি উচ্চমানের।[২১] রাজবাড়ী থেকে সুড়ঙ্গ পথে রানীরা স্নান করতে যেত কোবলার বাগান বাড়িতে। সেখানে বাগানের ভিতর ছিল একটি সান বাঁধানো জলাশয়। যার চার পাশে ছিল ফুলের বাগান, সান বাঁধানো ঘাটের উপরে বড়ো চাতাল যেখানে দুপাশে পাথর দিয়ে নির্মিত বসার জায়গা এবং মাথার উপর ছিল পাথর দিয়ে তৈরী ছাদ। বসার জায়গার দুপাশে স্তম্ভের উপর ছিল পরীর মূর্তি।[২২] তার পিছনে ছিল অপূর্ব কারুকার্যময় বাগানবাড়ি। বাহাদুর রাজা রাজনারায়ণের অপূর্ব কীর্তি ও সৌন্দর্যবোধের জন্য তিনি 'আন্দুলের শাহজাহান' নামে পরিচিত ছিলেন।[২৩] আন্দুল রাজবাড়ির দুর্গাপূজাও রাজবাড়ীর অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় গুলির মধ্যে একটি। আন্দুল রাজবাড়ির দুর্গোৎসব শুরু হয়েছিল ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামলোচন রায়ের হাত ধরে।[২৪] রাজবাড়ীর দুর্গা প্রতিমার একটি বিশেষত্ব হলো এখানে মা দুর্গার বাহন সিংহ নয়। এখানে নরসিংহ কে মা দুর্গার বাহন হিসেবে দেখা যায়। রাজ পরিবারের সূত্রে জানা যায় ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গোৎসবের বোধন বসেছিল প্রায় ২৪ দিন আগে।[২৫] সেই সময় কামানের তোপ দিয়ে বোধন বসেছিল। নবমীর দিন লর্ড ক্লাইভ রাজা রামলোচনের আমন্ত্রণে আন্দুল রাজবাড়িতে আসেন। তিনি এনেছিলেন একশত একটি পদ্ম। তিনি নগদ ১০০০০ টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন।[২৬] সেখানে সে সময়কার বিখ্যাত বাইজি গওহরজান সেই সময় নৃত্য গীত পরিবেশন করেন। প্রথম থেকে দুর্গোৎসবে দুর্গা প্রতিমার সামনে ২৪টি ছাগল ও দুটি মহিষ বলি হত।[২৭] প্রতিটি বলির সময় এই কামানের তোপধ্বনি হত। কিন্তু এই প্রথা বন্ধ হয়েছে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তবে রাজবাড়ীর দুর্গোৎসব আজও স্বমহিমায় চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কামানটি রাজা রামলোচন রায়কে দ্বিতীয় শাহ আলাম উপহার দিয়েছিলেন।[২৮] সেই কামানটি এখনো যত্ন সহকারে অন্নপূর্ণা মন্দিরে রাখা আছে। এই কামানটির বয়সও প্রায় ২৫৩ বছর।

রাজা রাজনারায়ণের দুই রানীর মধ্যে বড়ো রানীর দুই সন্তান ছিল। জেষ্ঠ সন্তান বিজয় কেশব এবং কনিষ্ঠ সন্তান বিজয় মাধব।[২৯] ছোট রানী ছিলেন নিঃসন্তান। বিজয় মাধব শিশু কালেই মারা যান। রাজা বিজয় কেশব ছিলেন অতি মহানুভব, বিষয়াসক্তি শূণ্য, দয়ালু ব্যক্তি। তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি রাজা রাজনারায়ণের দৌহিত্র প্রাণ কৃষ্ণ মিত্রকে আদালতের সাহায্যে দত্তক নেন।[৩০] সেই থেকে আজ পর্যন্ত দৌহিত্ররাই রাজ পরিবারের সদস্য।

আন্দুলের লাগোয়া গ্রাম মহিয়াড়ী। আন্দুল আর মহিয়াড়ী এতটা গায়ে গায়ে যে এই দুটি গ্রামকে কোনোভাবে আলাদা করা যায় না। এই গ্রামের কুণ্ডুচৌধুরী বংশের আদিপুরুষ হিসাবে পুরুষোত্তম-এর নাম জানা যায় কুণ্ডুচৌধুরী বংশের নবপ্রজন্মের কাছ থেকে।[৩১] তিনি সম্ভবত তমলুক থেকে মহিয়াড়ীতে আসেন। তবে মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরীদের জমিদার বাড়ি গড়ে তুলেছিলেন কুশদেব ১২২৩ বঙ্গাব্দের আশপাশে। তখন বাংলার অর্থনীতিতে সরস্বতী নদীর গভীর প্রভাব ছিল। আন্দুল মৌড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত হত সরস্বতী নদী। এই নদীর মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করেই এই কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারের উত্থান এবং শ্রীবৃদ্ধি।

কুণ্ডুচৌধুরী পরিবার গ্রাম কল্যাণের জন্য বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। এই পরিবারের এক সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কমলকৃষ্ণবাবু এলাকার মানুষের রোগনিরাময় এবং প্রসূতিদের জন্য স্থাপন করেন লক্ষ্মীকমল হাসপাতাল, তৈরি করেছিলেন নিজের বাগানবাড়িতে।[৩২] পরবর্তীকালে তিনি এই হাসপাতালটির বৃদ্ধির জন্য অনেক জমি দান করেছিলেন। যা সত্যি — আন্দুল ও মহিয়াড়ীর গর্বের বিষয়।

মহিয়াড়ীর কুণ্ডুচৌধুরী পরিবার স্থানীয় অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেন এবং এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ রাণীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বালিকা বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব আজও বর্তমান। আন্দুল ও মহিয়াড়ী অঞ্চলের

বহু কৃতী ছাত্রী বর্তমানে তারা সমাজের বহু উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিতা, তারা রাণীবালা বালিকা বিদ্যালয় থেকে তাদের সুকলের পাঠ নিয়েছেন। এটিও আন্দুল-মহিয়াড়ীর একটি কমন ঐতিহ্য।[৩৩]

মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরীদের অনবদ্য সৃষ্টি হল স্থানীয় জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা। তাঁরা এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করেন।

মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। তাঁরা স্থানীয় জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেন। সেগুলি আজও যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে।

কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারে সারা বছর ধরে চলত পূজা, উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠান। বাড়ি বাড়ি যেত নিমন্ত্রণ পত্র। শুধু ব্রাহ্মণরাই নন, নিমন্ত্রণ পেতেন এলাকার ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক এবং পোস্টমাস্টারও।

কুণ্ডুচৌধুরী পরিবার সূত্রে জানা যায়, এই পরিবারে দূর্গা পূজারও আগে বাসন্তী পূজার প্রচলন ছিল।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারের রাস ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব চলত প্রায় এক মাস ধরে। এই উৎসবে একটি রাস মেলার মাঠে ছোটো মেলা বসত এবং কলকাতা থেকে যাত্রা কোম্পানীরা আসত এবং তাদের যাত্রা পরিবেশন করত কুণ্ডুচৌধুরী বাড়ির উঠানে। আজও প্রতিবছর রাশপূর্ণিমায় আন্দুল মৌড়িতে রাসের মেলা বসে। এটিও আন্দুল-মহিয়াড়ীর একটি বহমান ঐতিহ্য।

আন্দুল গ্রামটিতে দু-জন শাস্ত্রজ্ঞ মহাজ্ঞানী পন্ডিতপ্রবর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন শ্রীভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর (ভট্টাচার্য) এবং শ্রী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি 'প্রেমিক মহারাজ' নামে পরিচিত। পন্ডিত রঘুনাথ তর্কবাগীশ আন্দুলে ভট্টাচার্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা।[৩৪] তিনি সংস্কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ মহাজ্ঞানী পন্ডিত ছিলেন। তার লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য বই হল 'তন্ত্রকুলশিরোমণি'।[৩৫] রঘুনাথ তর্কবাগীশ এর অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ শ্রী ভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, পন্ডিতপ্রবর ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বাংলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপের একটি তর্ক সভায় উপস্থিত হয়ে অসামান্য বিদ্যাপত্তা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। যার জন্য ওই ভৈরবী চরণের জন্মস্থান আন্দুলকে তৎকালীন সুধী সমাজ 'দক্ষিণ নবদ্বীপ' আখ্যা দিয়ে গৌরবান্বিত করেছিলেন। ভৈরবী চরণের তন্ত্র শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ছিল সুগভীর জ্ঞান।[৩৬]

তিনি আনুমানিক ১৭৬০ - ৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সূক্ষ্ম দেহে বারাণসী থেকে কষ্টিপাথরের মা সিদ্ধেশ্বরীকে আন্দুলে আনেন।[৩৭] ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জমিদার দত্ত চৌধুরীদের জায়গায় শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৮] এই শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতাই হলেন আন্দুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রঘুনাথ তর্কবাগীসের অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হলেন কবিরত্ন 'প্রেমিক মহারাজ' বা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।[৩৯] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দাদু রামরতন তর্কালঙ্কারের কাছে আন্দুলাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সাধক ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগরের তন্ত্র মতে দীক্ষা এবং পূর্ণাভিষেক হওয়ায় আন্দুলের চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য বাড়ি আন্দুল দক্ষিণ পাড়ার প্রেমিক মহারাজের বংশের (ভট্টাচার্য বাড়ী) শিষ্য বাড়িতে পরিণত হয়।[৪০] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক মহারাজ) তাঁর পিতা মাধব চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে প্রথম পাঠ গ্রহণ করার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।[৪১] এরপর মহেন্দ্রনাথ স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পন্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন এবং কিছুদিন অতি দক্ষতার সঙ্গে সেই কার্যসম্পন্ন করলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ সংসারী ছিলেন না। তাঁর অর্থ, যশ, পদমর্যাদা কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি তাঁর সহধর্মিনী ও পুত্রগণের হাতে সমস্ত অর্থ ও সংসারের দায়িত্ব অর্পণ করে কালী সাধনায় মগ্ন হন।[৪২] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে কুলাবধূত 'বশিষ্ঠানন্দ নাথ' নাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাধক কবি। তিনি সাধনার পথকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি কালীনাম রচনা করতেন এবং তার রচিত প্রতিটি কালী নামের শেষে নিজেকে প্রেমিক ভণিতায় প্রকাশ করতেন।[৪৩] তিনি ছিলেন আন্দুলের রাজা বিজয় কেশব রায় (যিনি তৎকালে তান্ত্রিক রাজা নামে খ্যাত ছিলেন) মহাশয় এর সভাকবি।[৪৪] ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আন্দুলের রাজবাড়িতে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগী কৃষ্ণধর মল্লিকের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি।[৪৫] প্রতিষ্ঠার দুই দশক পর্যন্ত একাধিক স্থানে কালী কীর্তন সমিতির আখড়া ছিল। তারপর বাংলার ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ইংরাজীর ১৯০০ সাল থেকে শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং সমিতির সভ্যগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রী শ্রী প্রেমিক মহারাজের বহিঃবাড়ি অর্থাৎ 'প্রেমিকভবনে' আন্দুল

কালী কীর্তন সমিতির আখড়া ঘর পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত হয়।[৪৬] সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার ১৪৩০ সাল (২০২৩) পর্যন্ত এখনও প্রেমিক ভবনে এই প্রসিদ্ধ কালী নাম ঘরেই কালী কীর্তন এর সাপ্তাহিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ঘরেরই সেই ঐতিহাসিক তক্তপোশের ওপরেই আজও আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি (প্রেমিক ভবন) এর পঞ্চম প্রজন্মের সভ্যগণ মহড়া অনুশীলন করেন। এই তক্তপোশের ওপরেই ১৯০১ সালে যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ করুণাময়ী শ্রীশ্রী সারদা দেবীর নির্দেশ মতো পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বার্ষিক সাধারণ জন্মোৎসবে কালী কীর্তন পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রণপত্র নিয়ে প্রেমিক মহারাজের কাছে এসেছিলেন।[৪৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সপ্তর্ষীর 'উজ্জ্বলতম নক্ষত্র' স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃকুলের কুলগুরু (স্বামীজীর পিতৃদের শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতৃ দেবী শ্রীমতি ভুবনেশ্বরী দেবীর) দীক্ষাগুরু ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তথা কবিরত্ন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক মহারাজ)।[৪৮] সেই সূত্রে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি স্বামীজির পিতা বিশ্বনাথ দত্তের প্রয়াণের কিছু পরে অর্থাৎ পারলৌকিক ক্রিয়ার পূর্বে স্বামীজি অসৌচ অবস্থায় কুলগুরু সাধক কবি শ্রী 'প্রেমিক মহারাজ'কে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন।[৪৯]

বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্ম উৎসবে (১৮৯৬-৯৮) আন্দুল কালীকীর্তন এর সংগীত পরিবেশিত হয়।[৫০] শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস আন্দুলের সাধক কবি প্রেমিক মহারাজের গান পরমাগ্রহে শ্রবণ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁর ভক্তের কণ্ঠে প্রেমিক রচিত গান -

"মেতেছে মন বারণ বিষয় বিষ বিপিণে
অবোধ বারণ বারণ মানে না মোহ বারুণী পানে।"

এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীম'দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ উনিশ খন্ড তৃতীয় পরিচ্ছদে।

আজও আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি (প্রেমিক ভবনের) পঞ্চম প্রজন্মের সভ্যগণ প্রতিবছর ৪ঠা ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী তিথিতে ধুমধাম এর সাথে কবিরত্ন প্রেমিক মহারাজের আবির্ভাব দিবস পালন করেন। যা আন্দুল প্রেমিক উৎসব নামে খ্যাত।

উপসংহার : হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল একটি প্রাচীনতম বর্ধিষ্ণু গ্রাম, যেটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য স্থাপত্যকে ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একসময় দক্ষিণের নবদ্বীপ যেমন জগৎ বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতপ্রবর রঘুনাথ তর্কবাগীস, শ্রী ভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর এবং 'কবিরত্ন' প্রেমিক মহারাজ প্রমূখ পূণ্যাত্মা সাধক ব্যক্তির জন্মস্থান তেমনি এই প্রাচীন গ্রাম আন্দুলেই হাওড়ার প্রাচীনতম দুর্গোৎসব এর প্রচলন হয়েছিল যা আজও স্বমহিমায় অব্যাহত রয়েছে। আন্দুলেই রাজা রাজনারায়ণের রাজত্বকালে গড়ে ওঠে ডোরিক স্থাপত্যে নির্মিত সুবিশাল রাজপ্রাসাদ যা আজও প্রাচীন ঐতিহ্য, স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। এই আন্দুলের মাটি স্পর্শ করেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ এবং লর্ড ক্লাইভ এর মতো ঐতিহাসিক চরিত্ররা।

আন্দুলের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গেলে আন্দুলের রাজবাড়ীর, দত্ত চৌধুরী বাড়ী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তা না হলে এগুলি একসময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

Reference:

১. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ১১
২. তদেব, পৃ. ১৬
৩. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ১৮
৪. ধর, কৃষ্ণ, কলকাতা তিন শতক, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১২
৫. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ২১

৬. তদেব, পৃ. ৭১
৭. চৌধুরী, কবিতা, নকসীকাটা স্মৃতির কাঁথা, দত্ত চৌধুরী পরিবারের অন্যতম একটি পারিবারিক বই, পৃ. ২০
৮. দত্ত, চৌধুরী, শ্রীঅতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৭৪
৯. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, ডঃ দেবিকা মিত্র (মল্লিক বংশের পুত্রবধূ)
১০. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৮৭
১১. তাদেব, পৃ. ৮৯
১২. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, সাথী মিত্র (রাজ পরিবারের পুত্রবধূ)।
১৩. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, অরুণাভ মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
১৪. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৯০
১৫. তাদেব, পৃ. ৯১
১৬. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশপরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১২
১৭. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী প্রণব কুমার মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
১৮. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রীমতি সাথী মিত্র (রাজ পরিবারের পুত্রবধূ)।
১৯. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী প্রাণ কুমার মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য।)।
২০. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশপরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৯৪
২১. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অরুণাভ মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
২২. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রীমতি সাথী মিত্র (রাজ পরিবারের পুত্রবধূ)।
২৩. দত্ত, চৌধুরী, শ্রীঅতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৯১
২৪. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশপরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২০
২৫. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী প্রাণ কুমার মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
২৬. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশ পরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৯
২৭. তদেব, পৃ. ৩৬
২৮. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৯১
২৯. তদেব, পৃ. ৯২
৩০. ১৯৫৫ সালের আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির ৭৫তম শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের ১১০তম জন্মোৎসবে এর যৌথ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তক, পৃ. ১০
৩১. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অমিতাভ কুন্ডু চৌধুরী (কুন্ডুচৌধুরী বংশের সদস্য)।
৩২. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অমিতাভ কুন্ডু চৌধুরী (কুন্ডুচৌধুরী বংশের সদস্য)।
৩৩. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অমিতাভ কুন্ডু চৌধুরী (কুন্ডুচৌধুরী বংশের সদস্য)।
৩৪. ১৯৫৫ সালের আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির ৭৫তম শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের ১১০তম জন্মোৎসবে এর যৌথ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তক, পৃ. ১০
৩৫. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৬. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অশোক ভট্টাচার্য (চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্য ও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার পুরোহিত)।

৩৭. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অজয় ভট্টাচার্য (চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্য ও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার পুরোহিত)।

৩৮. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অজয় ভট্টাচার্য (চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্য ও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার পুরোহিত)।

৩৯. আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, আন্দুল কালী কীর্তন ও বাউল গীতা বলি, পৃ. ১

৪০. তদেব, পৃ. ২

৪১. শ্রীশ্রীপ্রেমিক মহারাজের পঞ্চ ষষ্ঠাধিক শততম (১৬৫), আবির্ভাব তিথি উৎসব, (১২ই এপ্রিল, ২০০৯), স্মরণিকা পুস্তিকা, পৃ. ২০

৪২. তদেব, পৃ. ২৫

৪৩. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, কাজল ভট্টাচার্য (প্রেমিক বাড়ীর সদস্য)

৪৪. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, গৌতম চ্যাটার্জী (বর্তমান কালী কীর্তন সমিতির প্রধান সচিব)।

৪৫. ১৯৫৫ সালের আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির ৭৫তম শ্রী শ্রী প্রেমিক মহারাজের ১১০তম জন্মোৎসবে এর যৌথ জয়ন্তী
উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তক, পৃ. ২৬

৪৬. তদেব, পৃ. ২৮

৪৭. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, গোপাল ভট্টাচার্য (প্রেমিক ভবনের সদস্য)

৪৮. উদ্বোধন, ১২০ তম বর্ষ ১১৯ তম সংখ্যা কার্যালয় কলকাতা, পৃ. ৩৪

৪৯. তদেব, পৃ. ৪২

৫০. শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের পঞ্চ ষষ্ঠাধিক শততম (১৬৫), আবির্ভাব তিথি উৎসব, (১২ই এপ্রিল, ২০০৯), স্মরণিকা পুস্তিকা, পৃ. ৩০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 862 - 871
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ব্রহ্মবাদ প্রসঙ্গে উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের ধারণা : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

শেখ মোঃ মাকতুবুল ইসলাম
এম. ফিল (দর্শন)
Email ID : skmdmaktubul@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath, Brahmanism, Upanishad, Jivan Devata, Monism, Dualism, God, Reality, Brahman, Vedas.

Abstract
Rabindranath Tagore was familiar with the Upanishads from his childhood. The main theme of the Upanishads is Brahman. We find the concept of Brahmanism (Brahmabāda) in Rabindranath's thought which was influenced by the Upanishads. Sometimes Rabindranath explained Brahman as in the Upanishads and sometimes he also presented the concept of Brahman in a new way with his own thoughts. Like the Upanishads, Rabindranath searched for a hidden entity in Nature. Through a deep love relationship he found that the entity in his ownself is called 'Jivan Devata'. According to Tagore, the universal entity can be manifested in two stages: firsty the entity is the all-pervasive hidden governing power, the manifestation of the actions of it. Secondly, it is revealed through the love relationship with the individual, like the Jivan Devata of the souls. The Manifestation of the work of universal entity means to act for others by being humane towards the universe. From these Rabindranath developed the theory of Humanism. There is a difference between the thoughts of Rabindranath and the Upanishads on the Jivan Devata. We find the concept of Jivan devata in the thoughts of Rabindranath, where we cannot find that in the Upanishads. Rabindranath pays more importance to the path of devotion (bhakti Marg), where the Upanishads pays the path of knowledge (gyan Marg). We will also find more importance of dualism than monism in Rabindra Darshan. In this context Dualism he gave much importance to the mind in composing the external world. Like the Upanishads, Rabindranath believed that Nirguna Brahma created the world in order to get pleasure. In this way, we will try to present that Rabindranath's Brahmanism is not completely like that of the Upanishads and also not like the theories of Vedantic philosophers. In short, in our opinion we can assume Rabindranath's concept of Brahman as a distinct Brahmanism.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বৈদিক যুগ, উপনিষদীয় যুগ এবং বৌদ্ধ যুগ- এই তিনটি যুগকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবন অতিবাহিত হয়। সম্ভবত উপনিষদীয় যুগের প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল বেশি। পিতৃসূত্রে উপনিষদীয় বাণীর প্রতি কবির প্রাক-শৈশব থেকে পরিচয় শুরু হয়। পরবর্তীকালে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ ক'রে উপনিষদের বাণী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর মানসবৃত্তি শুধুমাত্র উপনিষদের দ্বারা গঠিত হয়নি। উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির প্রকৃতি প্রেম, মানুষের সান্নিধ্য, জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা ও বিচারবোধ। উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্ম। তাই উপনিষদকে ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মবিদ্যাও বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে গভীর যোগের মাধ্যমে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। প্রাথমিকভাবে যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, নিখিল ভুবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, সেই দেবতাকেই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বলেছেন। অবশ্য যতই তিনি তাঁর সাধন জীবন অতিক্রম করেছেন, ততই তাঁর ব্রহ্ম বিষয়ক চিন্তাভাবনা পরিপক্ক হয়েছে। কখনও ব্রহ্ম বিষয়ক উপনিষদের বাণীকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে উপনিষদের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আবার কখনও গভীর মননে নিজস্ব ব্যঞ্জনা ব্যবহার করে ব্রহ্ম বিষয়ক বাণীকে আপন চিন্তাভাবনার পথে ব্যাখ্যা করেছেন। এই নিবন্ধে আমরা মূলত রবীন্দ্র চিন্তায় (প্রবন্ধ, সঙ্গীত ও কবিতা) ব্রহ্মের স্বরূপ কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা নিয়েই আলোচনা করব। সেই সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়ে পর্যালোচনা করবো। সবশেষে আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করব যে, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে উপনিষদ ও বেদান্তের প্রভাব থাকলেও তাঁর ব্রহ্মবাদকে স্বতন্ত্র ব্রহ্মবাদ হিসেবে গণ্য করা যায়।

সমগ্র আলোচনাটি কয়েকটি পর্বে ভাগ বিন্যস্ত হবে। প্রথম পর্বে আমরা এটা দেখার চেষ্টা করব যে, রবীন্দ্রনাথ কিভাবে উপনিষদ ও ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে আমরা সংক্ষেপে ব্রহ্ম বিষয়ক উপনিষদের ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তৃতীয় পর্বের আলোচ্য বিষয় হবে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে (প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে এক লুক্কায়িত সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। দ্বিতীয় ধাপে এই মহাসত্তাকে জানতে চেয়েছেন এবং তৃতীয় ধাপে ভালোবাসা দিয়ে এই বিশ্বসত্তাকে নিজের করে পেতে চেয়েছেন। চতুর্থ ধাপে তিনি নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম নয় বরং ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে নিজের অন্তরে স্থাপন করে তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন - যা জীবনদেবতা নামে পরিচিত)। চতুর্থ পর্বে আমরা দেখব ব্রহ্ম বিষয়ে উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। উপসংহারে এটা বলার চেষ্টা করা হবে যে, ব্রহ্মবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এক স্বতন্ত্র ব্রহ্মভাবনা।

উপনিষদ ও ব্রহ্মবাদেরপ্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ : সংস্কৃত পণ্ডিত গৌরিনাথ শাস্ত্রীর মতে, শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা বিশ্বের মহান মহান চিন্তাবিদরা উপনিষদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধন জীবনের প্রথমেই উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রতি অলক্ষ্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করতে পারেনি। নিজস্ব চিন্তাভাবনার পথে চলতে চলতে তিনি বৈদিক পূর্বপুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন।'[১] ০উপলব্ধির পথে তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গে কখনো উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার কখনো তিনি উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদ থেকে সরে এসেছেন। তাঁর সাধন জীবনের চিন্তা উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে কেন্দ্রকরে শুরু হলেও পরবর্তীতে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাঁর চিন্তা প্রবাহ কিছুটা ভিন্ন দিকে ধাবিত হয়েছে। উপনিষদের প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। সাধনার অগ্রগতির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনায় কখনো দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের ভাবনাও উঠে এসেছে।

উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কয়েকটি কারণ আমরা আলোচনা করব। প্রথমত তিনি পিতৃসূত্রে ঈশ্বর বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একেশ্বরবাদের ভক্ত ছিলেন। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে বিগ্রহ পূজার রীতিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করতে পারেননি বলেই রাজা রামমোহন রায়ের মতো নিজস্ব 'ব্রহ্মধর্মে'র পরিকল্পনা করেন। অবশ্য উপনিষদীয় ভাবনা যেখানে মানুষকে ব্রহ্ম বলে কল্পনা হয়, এমন নীতি থেকে তিনি তার ব্রহ্মধর্মকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। এমন একটা আধ্যাত্মিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে পূজার্চনার ব্যবস্থা ছিল।

এভাবে তাঁর ঈশ্বর ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার লাভ করেছিল। তবে তিনি পৌরাণিক আনুষ্ঠানিক ধর্মনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাই তিনি বলেন –

> "উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাকপৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।"[২]

অবশ্য আমরা জানি তিনি কিছুদিন ব্রহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। আবার ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। অবশ্যই এখানে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল না, শুধু পারিবারিক সংস্কারের প্রভাব ছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘ যাত্রার পর তাঁর নিজস্ব মতিগতির দ্বারা চালিত হয়ে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে –

> "তাই সত্যের জীবন্ত রূপকে আড়াল করে চলার গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে আমি একদিন এই চার্চের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ছেদ টানলাম।"[৩]

পরবর্তীতে প্রকৃতির মধ্যে এক লুক্কায়িত মহাসত্তার উপস্থিতি আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। 'ব্রহ্ম সমাজের সার্থকতায়' তিনি বলেন –

> "ব্রহ্ম সাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মনুষত্বের কোন একটা চরম তাৎপর্য থাকে না।"[৪]

তাঁর ধর্মালোচনামূলক লেখাগুলোতে উপনিষদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে আমরা দেখেছি। সেখানে কোথাও উপনিষদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সের পরে উপনিষদ ও তপন ভিত্তিক আধ্যাত্ম সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন, তা নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতার মাধ্যমেও তুলে ধরেছেন। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের ভাষণে একরকম উপনিষদেরই ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন যেখানে উপনিষদের মূলতত্ত্ব; ব্রহ্ম তত্ত্বই তাঁর মূল আলোচ্য।

উপনিষদে ব্রহ্মের ধারণা : বেদের ব্রাহ্মণ অংশের উপাঙ্গ অরণ্যকে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ থেকে দার্শনিক চিন্তার দিকে সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যকের শেষ ভাগ হল উপনিষদ। 'উপনিষদ' শব্দের মুখ্য অর্থ হল ব্রহ্মবিদ্যা। স্পষ্টতই উপনিষদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম। উপনিষদে আত্মা, চৈতন্য ও ব্রহ্ম অভিন্ন। উপনিষদের ঋষিগণ বৈচিত্র্যময় জগতের মধ্যে দেখেছেন পাহাড়-পর্বত, মানুষ, পশু-পাখি সবকিছুই যেন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করে আছে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। এই সামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপনিষদের ঋষিরা বৈচিত্র্যময় জগতের মধ্যে এক মূলসত্তাকে তথা ব্রহ্মকে কল্পনা করেন। বিশ্বজগতের বিভিন্নতার মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, বিগত-অনাগত সমুদয় বস্তু ও ঘটনা যেন এক অদ্বয় সত্যের প্রকাশ। সেই সত্য কোন চেতনসত্তা। উপনিষদে এই অদ্বয় সত্যকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

'জন্মাদাস্যযতঃ' অর্থাৎ এই সবকিছুর জন্ম যা হতে হয়েছে, যাতে এই সবকিছুর স্থিতি এবং লয়, যিনি সব কিছুরই মূলাধার তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষদের বিভিন্ন বাণীতে এ কথা বারবার বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩/১৪/১) বলা হয়েছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"[৫] 'যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থেকেই সব আসে, আবার ব্রহ্মেই ফিরে যায়। সব কিছুই ব্রহ্মকেই আশ্রয় করে আছে। অতএব শান্তভাবে ব্রহ্মকে ধ্যান করা উচিত।' ব্রহ্মই যদি সবকিছু হয় এবং জগতের সব কিছুই যদি ব্রহ্ম থেকেই আসে তাহলে জগতের উপাদান কারণ হবে ব্রহ্ম। তাই ব্রহ্ম এবং সৃষ্টির সম্পর্ক অতি নিগূঢ়। উপমাপ প্রয়োগ করে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। মানুষের দ্বারা নির্মিত একটি মাটির পাত্রের উপাদান হল মাটি এবং পাত্রের প্রকাশ হল তার বিশেষ রূপ। এখানে মূল বিষয় হল উপাদান এবং গৌণ বিষয় হল তার রূপ। উপাদানের বিকার থেকে তার গৌণত্বের বা বিশেষ রূপের প্রকাশ পায়। তাকে আলাদা করে নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।[৬] তাই বিশ্বজগতের মূল তত্ত্ব হল ব্রহ্ম আর এই বৈচিত্র্যময় জগৎ হল ওই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপের প্রকটিত অবস্থা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রহ্ম সম্পর্কে উপনিষদে দ্বৈতভাব এবং অদ্বৈতভাব, এই দুটি ভাবেরই প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের উপর যখন বিষয় ও গুণ আরোপ করা যায় না, তখন ব্রহ্মকে দ্বৈতভাবহীন রূপে পাওয়া যায়।

> "এই অবস্থায় ব্রহ্ম একদিকে অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণহীন, চিন্তা ও শ্রবণের অগম্য, এবং অপরদিকে তা বহিঃপ্রজ্ঞ নয়, অন্তঃপ্রজ্ঞ নয়, অপ্রজ্ঞ নয়।"[৭]

ব্রহ্মের এই অদ্বৈতরূপ হল অমূর্তরূপ। অমূর্তরূপ হিসেবে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্মের এই গুণহীন নিঃসঙ্গ অবস্থা সৃষ্টির দিকে ধাবিত করে। এই নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য ব্রহ্ম সৃষ্টিতে বিবর্তিত হলেন। এ বিষয়ে ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে 'আগে একমাত্র আত্মাই ছিল, পরে তিনি ইচ্ছা করলেন বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করব।[৮] আবার ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে একটি সত্তা ছিলেন, কিন্তু পরে ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব, জন্মগ্রহণ করব। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন এবং সেই তেজ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করল।[৯] নির্বিকার, নির্গুণ ব্রহ্মের কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, আনন্দ আস্বাদনের জন্য। সেজন্য ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়। রস বা আনন্দের আকর্ষণেই এই সৃষ্টি ধারা প্রবাহিত হয়, যাতে আছে জন্ম-মৃত্যু ও তাদের জড়িয়ে নানান রসানুভূতি। এ কারণেই অখণ্ড দৃষ্টিতেই বিশ্বরূপ প্রকট রূপ বা ব্রহ্মের মূর্তরূপ।[১০] উপনিষদে এই ব্রহ্মকে আত্মা বলা হয়েছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে বহির্বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্ম আর ভিতরে এই আত্মাও ব্রহ্ম। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এই আত্মাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। 'সেই যিনি এই পুরুষে আবার সেই যিনি ঐ আদিত্যে - তিনি উভয়ই এক।'[১১] প্রায় সব ক্ষেত্রেই উপনিষদে ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভিন্ন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র ভাবনায় ব্রহ্মবাদ : শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি উপনিষদের বাণীর গভীর অর্থ অনুধাবন করতে না পারলেও তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার শুরুতে উপনিষদের বাণী গভীর শ্রদ্ধা্রসঙ্গে পাঠ করে অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। 'শান্তিনিকেতনে'র ভাষণমালার মধ্যে তিনি উপনিষদের বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত করে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'বিশ্ববোধ' শীর্ষক ভাষণটি বিশেষ লক্ষণীয়। আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর মানসবৃত্তির পরিপক্কতার ক্ষেত্রে একদিকে ছিল উপনিষদ এবং অন্যদিকে ছিল প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম, মানুষের সান্নিধ্য, জীবনের নতুন অভিজ্ঞতায়, যুক্তিবোধ প্রভৃতি মিলেমিশে ব্রহ্মভাবনার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা শামিল হয়। ব্রহ্ম বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কতগুলি ধাপে ধাপে এগিয়েছে। কখনো দেখবো উপনিষদের ব্রহ্ম বিষয়ক কোন বাণীকে বিস্তর ব্যাখ্যা করে তাতে নতুন ব্যঞ্জনা সংযোজিত করেছেন। আবার কোথাও দেখবো নিজের অনুভূতিকে খানিকটা উপনিষদের উপরে আরোপ করেছেন। এভাবে ব্রহ্ম বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের ভাবনা উপনিষদীয় ধারণার সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে।

ব্রহ্ম ভাবনার প্রাথমিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বৈদিক পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্যিকরা প্রকৃতির মধ্যে এক অস্ফুট সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রকৃতি বিষয়ক তাদের বর্ণনা পড়লে মনে হয় বর্ণনার পিছনে যেন প্রকৃতির সর্বত্র একটা দেবতার প্রতি (সত্য) বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সেই দেবতার সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা যোগসূত্র তৈরি করা। রবীন্দ্রনাথ ও অনুরূপভাবে প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেমে প্রকৃতির মধ্যেই এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতির ইঙ্গিত পেয়েছে এবং তাকে জানার জন্য আকুল হয়ে পড়েছেন। কবি নিজে তার প্রথম জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন –

> "আমার সেই অতীতের দিনগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় আমি যেন অজান্তে সেই সব বৈদিক পূর্বপুরুষদের দেওয়া পথ বেছে নিয়েছিলাম। আমার দেশের আকাশে যে একটি মহাসুদূরের আভাস আছে তার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।"[১২]

এখানে 'মহাসুদূর' শব্দের দ্বারা কবি প্রচ্ছন্ন সত্তার কথা বলছেন। তিনি আরো বলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "শরতের সকালে আকাশের কুয়াশা ঘন পর্দার ওপার থেকে নিঃশব্দ সূর্যের নয়নাভিরাম দৃশ্যে প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠতো। সেই এক অবর্ণনীয় আবিষ্টভাবের মধ্যে দিয়ে জগৎ প্রকৃতির সঙ্গে আমার মনের একটা নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।"[১৩]

মেটো রাস্তায়, নদীর তীরে, বনের পথে চলতে চলতে তিনি বার বার অনুভব করেছিলেন কোনো সত্তার যেন উপস্থিতি।

> "ভোরের বেলা জেগে ছিলেম দেখেছিলাম কারে/ সেদিন চলে যেতে যেতে চমক লাগে।/ মনে হল বোনের কোণে হাওয়াতে/ কার গন্ধ জাগে।"[১৪]

প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সেই প্রচ্ছন্ন সত্তাই যে ব্রহ্ম, সে কথা তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ২/১৭ সংখ্যক মন্ত্রের অনুরূপে নানা ভাবে বহুবার অনুবাদ করেছেন। 'ব্রহ্মসমাজের সার্থকতা' রচনায় তিনি বলেন –

> "যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।"[১৫]

তিনি মনে করেন এই আগুন, জল, জড়, জীব, অর্থাৎ পার্থিব সবকিছুইকেই আমরা আমাদের ব্যবহারের বস্তু বলে জানি। সেজন্য আমাদের মন শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিরিখেই তাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন -

> "আমাদের চৈতন্য সেখানে পরম চৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে বিশ্বব্যাপী চেতনার মধ্যে আহ্বান করছে।"[১৬]

বিশ্বব্যাপী এই চেতনাকে প্রাথমিকভাবে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তা এক উপলব্ধির বিষয়, কিন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সুক্ষ্ম থেকে স্থূল, পাহাড় থেকে পর্বত, নদী থেকে সমুদ্র, সমগ্র মহাবিশ্বে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এ প্রসঙ্গে রবিঠাকুর তার কবিতায় প্রকাশ করেছে –

> "এই তো তোমার অলোক ধেনু/ সূর্য তারা দলে দলে। কোথাও বসে বাজাও বেনু/ চরাও মহাগগন তলে।"[১৭]

এখানে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র এবং পৃথিবীর সবকিছুই কে বেণুর (বাঁশি) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বিশ্বচেতনাকে রাখাল ছেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাখাল ছেলেকে দেখা না গেলেও তার বাঁশির সুর অনুভব করা যায়, ঠিক তেমনি বিশ্বচেতনাকে দেখা না গেলেও সত্তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

বিশ্বব্যাপী এই চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ সব কিছুর নিয়ন্ত্রক রূপে কল্পনা করেছেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু সংযোগে বস্তুর উৎপত্তি আবার পরমাণু বিযুক্তিকরণে ধ্বংস, জীবন মৃত্যুর খেলা, প্রকৃতির একরূপতা নীতি, সবকিছুকে পরিচালনা করছেন এই প্রকৃতির মধ্যে লুকায়িত সত্তা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "চন্দ্র সূর্য এমনই ঠিক নিয়মে উঠছে অস্ত যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে, পাছে এক পলক ত্রুটি ঘটে ...এমনকি সেই মৃত্যু যার আনাগোনার কোন খবর নেই তাকেও জোড়হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয়।"[১৮]

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য; "আমার প্রার্থনা এই যে ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি কিন্তু তার সাধন সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জেরে সে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে।"[১৯] ভারতবর্ষের সাধনাভাণ্ডার, তার সত্যসম্বল হচ্ছে ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই সবকিছুইকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন... সেই বিধান শাশ্বতকালের। আজ এক রকম কাল এক রকম নয়...।"[২০]

এই বিধান কোনো দেশের কোনো রাজার বিধান নয় যে সেই রাজা পরিবর্তন হলে বিধানও পাল্টে যাবে। প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে সত্তার অনুভব করা যায় সেই সত্তার বিধান। সত্তা ওই বিধান দ্বারা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। এই বিশ্বজগত যেন তারই রচিত শিল্প। বিশ্বচৈতন্য অসীম মমতা ও অশেষ করুণার জন্য এই জগত থেকে দূরে থাকতে পারেন না। তাই জগতের মধ্যে দিয়ে তার প্রেম, তার আনন্দ প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, এই পৃথিবীর বিশাল অঙ্গ যেন তারই লীলা প্রাঙ্গণ। তাই সবকিছুই তার অমোঘ নিয়মে চলে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসত্তাকে জানতে চেয়েছেন। আসলে প্রথমেই আসে পরিচিত। পরিচিতি পর্বে জ্ঞান সম্পৃক্ত হলে এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করার পরই আসে তার প্রতি ভালবাসা। রবিঠাকুর মনে করেন শুধু জ্ঞানেই মুক্তি নেই। ভালবাসা থেকে আসে ভক্তি, আর ভক্তি থেকে তাকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন -

> "জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়, সর্বত্র নমস্কার করা। বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রস হচ্ছে ভক্তি।... সমস্ত ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা- জীবনের এমন পরিপূর্ণতা, জগতবাসের এমন সার্থকতা আর কি হতে পারে!"[২১]

রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্ম বিষয়ক শুধু জ্ঞানের কথা বলছেন না, ভক্তি ভরে জ্ঞানের কথা বলছেন। জ্ঞানের থেকে ভক্তিকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভক্তির দ্বারা নিজেকে বিশ্বসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করাকে রবীন্দ্রনাথ চরম সার্থকতা বলে গণ্য করছেন। তাঁর আরো বক্তব্য হল –

> "আমরা ব্রহ্ম সাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলাম - তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম। তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্যাপ্ত করে তুলতে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোম্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছিল।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনার তৃতীয় পর্বে তিনি বিশ্বসত্তাকে ভালোবাসার সম্পর্কে নিজের কাছে পেতে চেয়েছেন। আমরা দেখেছি তিনি প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বসত্তাকে আবিষ্কার করলেন। পরে তাঁর অনুভব হল এই সত্তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। অতঃপর বিশ্বসত্তাকে সম্পর্কে জানলেন, শুধু জানা নয় বরং বিশ্বসত্তার সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক স্থাপনেই জীবনের স্বার্থকতা বলে মনে করলেন। এখন আমরা দেখবো - তিনি এই সত্তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের কাছে পেতেও চাইছেন। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে - 'তাঁর এই পাবার আকুতিই তাঁকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল'। উপনিষদে বিশ্বসত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা রূপে তুলে ধরা হয়েছে। যার মূর্ত রূপ কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। এমন সত্তার প্রতি ভক্তিও আসতে পারে না। তাই তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদ থেকে সরে এসে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। মানুষ নৈর্ব্যক্তিক কোন কিছু কল্পনা করতে পারে না, রূপের আশ্রয় তাকে নিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে আরো বেশি রূপমনস্ক, তাঁর অরূপরতন ও রূপনারায়ণের কূলে শেষ পর্যন্ত জেগে উঠে সমাসীন থাকেন। তাই ব্রহ্মধর্ম নির্দেশিত হয়ে কবি ব্রহ্মসংগীতগুলো রচনা করলেও তার প্রেম দর্শন অনেকটা স্বাধীন ও আনন্দময়। ঈশ্বর হল প্রেম স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই জগত সংসার এই কর্মক্ষেত্র; এখানে জগতমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> জ্ঞান, জগতের সৌন্দর্য ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগতের সংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে।"[২৩]

এখানে রবীন্দ্রনাথ কর্ম, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং সৌন্দর্য ভোগকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুল্য মনে করছেন। এই ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে যে গুণটি বিশেষভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে তা হল প্রেম। প্রেমময় এই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন। এই প্রেম মুক্ত ও স্বাধীন বলে ঈশ্বরও স্বাধীন। প্রেমময় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলে আমাদের সকল ইচ্ছার পরিপূর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোন প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করেছেন। তিনিই প্রেম স্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন- সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ।"[২৪]

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে নিজের কাছে পাওয়ার জন্য কতগুলি সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। কিরূপ সম্পর্কে তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হলে ভাবের আদান-প্রদান, দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো হবে বা কিরূপ সম্পর্কে স্থাপন করলে একে অন্যের মধ্যে বিলীন হওয়া যাবে, তাই নিয়েই কবির ভাবনা। তাঁর মতে কোন সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনভাবে ঈশ্বরকে পেলে তিনি কেবল দর্শনের তত্ত্বের মতো আমাদের কাছে থাকবে, কোন আপন হবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

> "আমরাও যেসকল সম্বন্ধ দিয়া ঈশ্বরকে ধরবো তা একরকম নয়। আমরা তাকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি।... সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ।"[২৫]

পুত্র যত ছোট হোক বা পিতা যতই বড় হোক না কেন পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক অনেক গভীর থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ তার সাধনার পথে গভীর মননশীলতার সঙ্গে সাধনায় লব্ধ উপলব্ধির পরিণত রূপটি আবিষ্কার করেছিলেন। তখন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পিতারূপী ঈশ্বরের সঙ্গে গভীরভাবে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি সাম্যের ভিত্তিতে ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন। পিতা বড় পুত্র ছোট, একদিকে ভক্তি অন্যদিকে স্নেহ। তাই পিতা-পুত্রের সম্পর্কে সাম্য থাকতে পারে না। বরং বন্ধুর সম্পর্কে একে অন্যের মধ্যে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ গভীর প্রেমের সম্পর্কে নিজের মধ্যেই খুঁজে পেলেন ঈশ্বরকে যা 'জীবনদেবতা' নামে পরিচিত। 'আমার অন্তরে এমন কেউ আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সর্বকালীন মানব, সেই মানুষকে ব্যক্তিমানুষ নানা ভাবে ও নানা নামে পূজা করেছে এবং সেই সর্বজনীন মানব। সেই দেবতা।' এই জীবনদেবতা ব্যক্তি বিশেষের অন্তরে থেকে তার জীবনকে পরিচালিত করে। এই দেবতার ইচ্ছা অনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাই কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব নাট্যাভিনেতা ও নাটকের নির্দেশকের মতো। কিভাবে অভিনয় করতে হয় সেটা নির্দেশক যেমনভাবে শিখিয়ে দেয় অভিনেতা তেমনই অভিনয় করে। সেরকম জীবনদেবতাও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে দিয়ে তার ইচ্ছার পূরণ করেন। একেই রবীন্দ্রনাথ 'সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বসত্তা দুই পর্যায়ে প্রকাশ হতে পারে। এক পর্যায়ে তিনি সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নিয়ামক শক্তি, এটা যেন বিশ্বসত্তার কাজের প্রকাশ। এখানে বিশ্বসত্তা যেন বিশ্বদেবতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বসত্তা প্রকাশিত হয় ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, তার হৃদয়ের জীবনদেবতা রূপে। বিশ্বসত্তার কাজের প্রকাশ অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রতি মানবিক হয়ে পরের জন্য কর্ম করার ফলে আনন্দবোধ জাগরিত হয়। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিশ্বমানবতার তত্ত্ব গড়ে তোলেন।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কয়েকটি দিক : এই পর্বে আমরা ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিল ও অমিলের ক্ষেত্র বলার চেষ্টা করব। উপনিষদে দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ উভয় স্বীকার করা হয়েছে। কঠ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপনিষদে বিশ্বজগতকে সুবিশাল ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই বিশাল ক্ষেত্রকে পরিদর্শন করার জন্য মানুষের মন যেন ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব রথে চড়ে বিচরণ করছে। ভোক্তা এবং ভোগ্যবিষয়, এই দ্বৈতভাব না থাকলে বিশ্বরূপ কখনোই প্রকাশিত হতো না। মান্ডুক্য উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি অবস্থার কথা উল্লেখ আছে; অদ্বৈত অবস্থা এবং দ্বৈত অবস্থা। দ্বৈত অবস্থায় ভোক্তা এবং ভোগ্য এই দুটি ভাব থাকে। অদ্বৈত অবস্থায় ভোক্তা-ভোগ্য, এই ভাব থাকে না। ব্রহ্ম অদ্বৈতভাবে অবস্থান। আত্মা বা ব্রহ্মের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা হল দ্বৈতবস্থা এবং তুরীয় অবস্থায় ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন অদ্বৈতভাব থেকে দ্বৈতভাব গড়ে উঠেছে। তার এই অদ্বয়বোধ দ্বৈতবোধের পরিপন্থী নয়। কারণ দ্বৈতবোধের যাত্রা শুরু হয়েছে অদ্বয়বোধ থেকে। উপনিষদের মত রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেও দ্বৈতসত্তা খুঁজে পেয়েছেন; একটি আত্মা, আর অপরটি হল আত্মার সাহচর 'অহং'। যাকে আত্মার বাহ্যিক রূপ বলা যেতে পারে কারণ তা আত্মাকে অবলম্বন করে দেশ-কালে বারবার উদ্ভূত হয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতনে'র 'নদী ও কূল' শীর্ষক লেখায় বলেন –

"আমার আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মত যে নিয়ত লেগেই রয়েছে।"[২৬]

অন্যান্য দ্বৈতবাদীদের থেকে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদ এর পার্থক্য হল - রবীন্দ্রনাথ 'তুমি' ও 'আমি'র ধারণাকে অন্যান্য দ্বৈতবাদীগনের মত নিত্য ও স্থির বলেননি। তাঁর মতে আমির ধারণা কোন স্থির পরমসত্তার ধারণা নয়, 'আমি' বাস্তব জীবনের নতুন অভিজ্ঞতায় ক্রমশ সম্পৃক্ত হয়ে এক ব্যক্তি-সত্তার ধারণা লাভ করেছে। 'আমি' ও 'তুমি' মিলিয়ে নিত্যকালে সকল সত্য হয়ে উঠেছে। উপনিষদের দ্বৈতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদের আরেকটি পার্থক্য হল; উপনিষদে দুটি সত্তার কোন একটি সত্তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, দুটির ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বৈচিত্রময় প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষের মনকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। বিশ্বশিল্প রচনায় মানুষের মন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। এমনকি তাঁর মতে মন না থাকলে এই বৈচিত্রময় বিশ্বজগৎ রচিতই না।

যখনই দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ আসে তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে-কেন এই দ্বৈতসত্তা? কেন এই সৃষ্টি? আমরা আগেও দেখেছি বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত রূপের কল্পনা করা হয়েছে। ঐতিরেয় উপনিষদে দেখেছি বিভিন্ন লোক সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো নিজ ইচ্ছা। 'ইচ্ছার' কারণ আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা। আনন্দ আস্বাদনের জন্য তিনি সৃষ্টি প্রবাহে রূপান্তরিত হলেন। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা। এই আনন্দ আস্বাদনের জন্যে যিনি এক ছিলেন তিনি বহু দ্বারা বিচিত্র বিশ্বরূপে রূপান্তরিত হলেন। গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় তিনি বলেছেন 'জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন'। এক্ষেত্রে উপনিষদ ও রবীন্দ্র দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যতটুকু পার্থক্য আছে তা হলো প্রকাশভঙ্গির উপরে। উপনিষদে বিমূর্ত আকারে ভাষায় রূপ পেয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কোথাও খেলা, কোথাও নৃত্য, ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করে আনন্দতত্ত্ব ও সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সৃষ্টি যখনই হয়েছে তার ধ্বংস অনিবার্য। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপে অধিষ্ঠিত অবস্থায় সৃষ্টি প্রবাহ নেই তাই জন্ম-মৃত্যু নেই, সুখ-দুঃখ জীবন মরণের ঊর্ধ্বে। দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রহ্ম যখন বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ নিজের স্বার্থবোধ থেকে যখন মৃত্যুকে দেখে, তখন সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। উপনিষদে একে অবিদ্যা প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একে 'ছোট আমি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। তৃতীয় অবস্থা হল একাত্মবোধের দৃষ্টিভঙ্গি। সৃষ্টি যেহেতু অখণ্ড মহাসত্তার প্রকাশ তাই এখানে মৃত্যুতে মানুষ দুঃখ পায় না, সবকিছু যেন আনন্দময়। গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মৃত্যু মানুষকে পূর্ণতা দান করে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে উপনিষদের মতো একাত্মবোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে বিশ্বসত্তা বিশ্বরূপে প্রকাশ নিয়েছেন আনন্দের স্বাদ নেওয়ার জন্য, তাই পৃথিবীতে জন্ম-মৃত্যু উভয়েই জড়িয়ে রয়েছে আনন্দ। এখানে কোন দুঃখ নেই। মৃত্যু চেতনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের তেমন একটা পার্থক্য নেই।

রবীন্দ্রনাথ কাব্য, সাহিত্য, ও দর্শনের সুবিশাল বটবৃক্ষ স্বরূপ, যদিও তিনি নিজেকে দার্শনিক বলে পরিচয় দেননি। আমাদের মনে হয় উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনকালেই যদি পরিচয় না হত, তাও আমরা তাঁর লেখায় এমন অনেক

উপাদান পেতাম যা উপনিষদের বাণীর সঙ্গে নিগূঢ় মিল থাকত। কেননা কবির নিজের ধর্ম বিশ্বাস বাহ্যিক কোনো কিছুর প্রভাবে গড়ে ওঠেনি, কবির নিজের প্রসূত থেকেই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। উপনিষদের বাণীর সঙ্গে কবির প্রকৃতি প্রেম, বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলেমিশে ব্রহ্ম ভাবনা সম্পৃক্ত হয়েছে। সত্তার সন্ধানে উপনিষদের মধ্যে যেমন আমরা দেখেছি, বহির্বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত এক সত্তাকে আবিষ্কার করা এবং সেই সত্তাকে আমাদের ভিতরকার আত্মার সঙ্গে অভিন্ন উপলব্ধি করা। এখানে ব্রহ্মকে অবলম্বন করে আত্মা ও অনাত্মা যেন এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথও সেই পরম একের সঙ্গে যোগ হয়ে নিজের মধ্যে বিশ্বকে অনুভব করেছেন অথবা বিশ্বের মধ্যে নিজেকে অনুভব করেছেন। আমরা দেখেছি এরকম কয়েকটি ক্ষেত্রে উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদের মিল আছে। তবুও অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। যাকে উপনিষদ ও বিভিন্ন বৈদান্তিকদের মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মতবাদ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্ত্ব পুরোপুরি উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে মেলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব উপনিষদে সঙ্গে নেই। তবুও একথা আমরা বলতে পারি যে, জীবনদেবতাতত্ত্ব আসলে বিমুর্ত ব্রহ্মবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের ব্যক্তিরুপী ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের এক অভিনব পরিকল্পনা। তাছাড়া মানবতাবাদের প্রসঙ্গ যদি আমরা দেখি সেখানে দেখব, - 'সকল বস্তুই যে এক মহাসত্তার প্রকাশ' এই বোধই উপনিষদের মানবতাবাদী তত্ত্বের প্রেরণা। তাই উপনিষদের মানবতাবাদী তত্ত্ব এসেছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে অখন্ডতাবোধ ও ঐক্যবোধ থেকে। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ গড়ে উঠেছে উপনিষদের মতো অখণ্ডতাবোধ এবং 'ঈশ্বরকে নিজের জীবনে ভালোবাসার মাধ্যমে পাওয়া যাবে'- এই বোধ থেকে। ঈশ্বরকে পেতে গেলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও সমগ্র পৃথিবীর প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। আবার শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পুরোপুরি মিল নেই, কারণ শংকরাচার্য জগতের প্রকৃত সত্তা স্বীকার করেননি। তিনি জগতকে মায়ার দ্বারা সৃষ্ট বলেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মায়াবাদ স্বীকৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মতে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি অপূর্ব সুন্দর। আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তে এ সৃষ্টি কখনোই মায়া বা অবিদ্যা প্রসূত হতে পারে না। রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম তত্ত্বের সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ রামানুজ ব্রহ্মকে সত্য বলেছেন এবং জীব ও জড়কে বা চিৎ ও অচিৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলেছেন। ব্রহ্ম যেহেতু নিত্য তাই ব্রহ্মের অংশ হিসেবে চিৎ ও অচিৎ নিত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'আমি'কে নিত্য বা স্থির বলেননি। 'আমি' নানা রঙের জগতে, বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে নিত্যনতুন প্রবাহে পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার ধারণা লাভ করে। আবার বল্লভাচার্যের শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম চিন্তার পার্থক্য আছে। বল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দ গুণ তিরোহিত হলে ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন ব্রহ্ম জগতের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পান। মধ্যাচার্যের দ্বৈতবাদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচিন্তার পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি; মধ্যাচার্যের দ্বৈতবাদে জীব ও জগতকে ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য বলা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা বলেননি। তাই অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদকে উপনিষদ ও বৈদান্ত্রিকদের ব্রহ্মবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি 'ব্রহ্মবাদ' হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, *উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ.* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, 1959. পৃ. ৪৪ - ৪৫

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২. পৃ. ৮৬

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান.* বাংলা অনুবাদ, সেনগুপ্ত শংকর, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪. পৃ. ১০১

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ব্রহ্মসমাজের স্বার্থকতা', *শান্তিনিকেতনে.* দ্বিতীয় খন্ড. কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৭৫, পৃ. ১৪১

৫. লেকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *উপনিষদ : ছান্দোগ্য উপনিষদের শংকর ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা.* দ্বিতীয় ভাগ, শ্লোক সংখ্যা ৩/১৪১, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ১৩৫

৬. তদেব, শ্লোক সংখ্যা ৬/১/৪, পৃ. ২৪৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, 1959, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৮. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, 'ঐতরেয়োপনিষদ', *উপনিষদ গ্রন্থাবলী.* শ্লোক সংখ্যা, ২।। ১, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ৩৫১
৯. লেকেশ্বরানন্দ, স্বামী, ২০১২. প্রাগুক্ত, শ্লোক সংখ্যা ৬/২/৩, পৃ. ২৫২
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, 1959, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১১. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ', ১৯৬২, প্রাগুক্ত, শ্লোক সংখ্যা, ৩/১০/৪, পৃ. ৩৫২
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান,* ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
১৩. তদেব, পৃঃ, ৮৫
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, '*গীতিমাল্য*, ৫, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৬, পৃ. ৮
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ব্রহ্মসমাজের স্বার্থকতা', *শান্তিনিকেতনে,* ১৯৭৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
১৬. তদেব, পৃ. ১৪০
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতিমাল্য,* ১৯৪৬, প্রাগুক্ত, গীত সংখ্যা, ১০৩, পৃ. ১২৪
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্মযোগ', *শান্তিনিকেতন,* ১৯৭৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শিক্ষার মিলন,* কলকাতা, ১৩২৮, পৃ. ২২ https://archive.org/details/dli.ministry.26894
২০. তদেব, পৃ. ৫
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ব্রহ্মসমাজের স্বার্থকতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০ - ১৪১
২২. তদেব, পৃ. ১৪১
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *উপনিষদ ব্রহ্ম.* কলকাতা, আদি ব্রহ্মসমাহ যন্ত্রে, ১৩৮০, পৃ. ১৮ https://upload.wikimedia.org
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'প্রেম', *শান্তিনিকেতন.* প্রথম খন্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ২৬
২৫. তদেব, 'নমস্তেহস্তু', পৃ. ৩১৫
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নদী ও কূল', *শান্তিনিকেতন.* প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 872 - 882
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উপনিবেশিত বিশ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা : প্রসঙ্গ ‘সভ্যতার সংকট’

রাকিবুল হাসান
প্রভাষক, বাংলা
ডিপার্টমেন্ট অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস
বাংলাদেশ আর্মি ইউনির্ভাসিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
Email ID : rakibulhasanbangla440@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath Tagore, The Crisis of Civilization, Colonialism, Post-Colonialism, Imperialism, Cultural identity, Globalization.

Abstract

This research explores the contemporary relevance of Rabindranath Tagore's thoughts on the colonized world, particularly as articulated in his essay “The Crisis of Civilization” (Sabhyatar Sankat). Written during the later years of Tagore's life, the essay critiques the Western concept of civilization and its detrimental impact on India during the colonial period. Tagore argues that this notion has fueled the exploitation and oppression of colonized nations, urging Indians to reclaim their cultural heritage and reject the imposition of foreign values.

The study aims to analyze the themes within the essay, with a focus on its critique of imperialism and the lasting legacy of colonialism. It will investigate how Tagore's insights remain significant in today's post-colonial context, where many nations continue to grapple with the ramifications of their colonial histories. The research highlights Tagore's warning against blind imitation and unquestioning obedience while encouraging critical thought regarding dominant ideologies.

By contributing to the discourse on post-colonialism and decolonization, this study underscores the necessity for renewed critiques of Western values and institutions. Furthermore, it illustrates how Tagore's perspectives continue to resonate in contemporary discussions surrounding globalization, imperialism, and cultural identity.

Discussion

১

'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ - ১৯৪১) জীবনের শেষপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এটি পরে তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, তা দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনার অপূর্ব উদাহরণ, একই সাথে পাঠকেরও জীবন জিজ্ঞাসার পথনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রথম দিকে সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি এই মহিমার বোধ তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল ইংরেজি সাহিত্য ও ভাবুকদের নানান ভাবাদর্শ। এমনকি তিনি এও মনে করেছিলেন যে বিজিত জাতির স্বাধীনতাবিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কিন্তু পরে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি রসসম্ভোগের জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গ তিনি নিজেই জানাচ্ছেন সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। তথাকথিত সভ্যতাকে এভাবেই এই শাসকরা 'রিপুর প্রবর্তনায়' অনায়াসে লঙ্ঘন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, 'বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির' কী অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য। এভাবেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেই তাঁর আত্মচেতনার জাগরণ এবং পাঠকের নিদ্রাভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, একদা ইংরেজ জাতির প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তবে তিনি যে সেই আকর্ষণজাল ছিন্ন করেছেন এবং কেন করেছেন তারও কারণসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন। অন্ধ অনুসরণ, বিনা প্রতিবাদে শাসকের হাতে অবলীলায় শোষিত হওয়া যেকোনো জাতির পক্ষে লজ্জাজনক তাই যেন রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি আমাদের শিক্ষা দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, উপনিবেশিত দেশগুলো এখনো সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বের হতে পারেনি। আমাদের এই বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভ্যতার সংকট প্রবন্ধটি আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাঁর লেখায় আমরা কেবল নতুন রূপকল্পই চিত্রিত হতে দেখি না, বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বাদ আর সৌরভ, আশা আর আনন্দ, দুঃখ আর বেদনার শব্দপ্রতিমা যেন খুঁজে পাই প্রতিটি লেখায়। একজন বিশ্বের কবি হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশসহ পুরো বিশ্বকে নিয়েই তিনি ভেবেছেন। তাঁর এই ভাবনার প্রকাশ আমরা পাই জীবনের শেষ পর্যায়ের লেখায়। জীবনের শেষের দিকের প্রতিটি রচনায় তাঁর লেখকসত্তায় ভিন্ন মাত্রা তৈরী করে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম বলি হওয়া পৃথিবীর সর্বত্র সভ্যতার সংকটের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। যা তাঁর লেখক সত্তায় ভিন্ন আঙ্গিক তৈরী করে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের তুঙ্গ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধে তাঁর ভাবনার কথা জানান। কলকাতার নাগরিক জীবনের ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়, বিশেষত প্রবন্ধে উপনিবেশিত বাংলার বহুমাত্রিক রূপ শিল্পিতা পেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় মানবসম্পর্ক কীভাবে নষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্নতায় রূপ নিয়েছে, কীভাবে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন পুরো পৃথিবীকে তাঁদের ইচ্ছের গোলাম বানাচ্ছে তা রবীন্দ্রভাবনায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। বলা যায়, উপনিবেশের অধিবাসী হয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় বাংলার মানুষের আত্মিক ও জাগতিক মুক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধ তাঁর এই নতুন জীবনবাদ উচ্চারণের অভ্রান্ত সাক্ষী হয়ে আছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে, শতবর্ষের অধিককাল আগে ঔপনিবেশিক শাসনের যে-কদর্য রূপ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন, সে-সময় অধিকাংশ ভারতীয় ভাবুক-চিন্তাবিদ মোহগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন ছিল পাশ্চাত্য চিন্তাচর্চায়। জীবনের শুরুর দিকের রচনায় আমরা যেই রবীন্দ্রনাথকে পাই শেষ দিকের রচনায় আমরা পাই অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ উপনিবেশিত সমাজ কাঠামোর পটভূমিতে বেড়ে উঠেছেন। উপনিবেশিত সমাজে বসবাস করেও তিনি উত্তর উপনিবেশিক চিন্তা করতে পেরেছেন এক কালোত্তীর্ণ প্রতিভাবলে। অনেকে ইউরোপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগকে বড় করে দেখান। কিন্তু বিষয়টি এত সরলরৈখিক নয়। প্রথম জীবনে বিলেতি সভ্যতার প্রতি কিছু মোহমুগ্ধতা থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। তাঁর 'সভ্যতার সংকট' এর সবচেয়ে বড় দলিল। তিনি উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে অগ্রাহ্য করে প্রাচ্যের জ্ঞানতত্ত্বকে পশ্চিমের সামনে তুলে ধরেছেন। পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী ডিসকোর্সের পরিবর্তে উপস্থিত করেছেন প্রাচ্যের মানবিক ডিসকোর্স। আর এভাবেই তিনি গড়ে তুলেছেন উপনিবেশবাদবিরোধী মতাদর্শিক বৌদ্ধিক প্রতিরোধ। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক ছবি, একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিপ্রতীপে কোথায় আছে দ্রোহের উৎস তার সন্ধানও। উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের আলোয় কীভাবে ঘটবে মানুষের আত্মিক মুক্তি তারও অভ্রান্ত ইঙ্গিত আছে রবীন্দ্রনাথের এই লেখায়। এই প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট প্রবন্ধের পাঠ অনুসরণ করে ঔপনিবেশিত বিশ্বের সংকট ও ঔপনিবেশিত বিশ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার দিকটি উন্মোচন করার চেষ্টা করবো।

২

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই সাহিত্য-শিল্পকলা-রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে বিশেষ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব একটি বিশেষ মনোযোগের জায়গা দখল করে নেয়। এসব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং ধারণাগত অনুসন্ধিৎসা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা জানি, সতেরো-আঠারো বা উনিশ শতকে ইউরোপ সমুদ্রপথে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিল। তাদের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বাণিজ্য। মূলত, বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে ইউরোপ এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার শাসন ক্ষমতা দখল করেছে, লুণ্ঠন করেছে তাদের দেশ থেকে অধিকৃত সম্পদ, প্রচার করেছে খ্রিষ্টবাদ। একের পর এক সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে ইউরো-মানসিকতায় এক ধরনের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্ম দিয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল কালো-মানুষের ওপর সাদা-মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং এরই অনুষঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল সাদা-কালো প্রভু-দাসের অমোচনীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য (binary-opposition)। পাঠক, সভ্যতার সংকট প্রবন্ধ অনুসারে ইউরোপীয় উপনিবেশের ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী যে সংকট তৈরি হয়েছিল তা আমরা একটু পরই দেখবো।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পনেরো শতক থেকে সমুদ্রজয়ের মাধ্যমে অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করা শুরু করে। তাদের এই সাম্রাজ্য বিস্তার শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না তা ছিল তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানভাণ্ডার জয়ের অনন্ত অভিযাত্রা। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও ভূগোলজ্ঞানের মাধ্যমে ইউরোপ অন্যদের (native) দুর্বলতা ও সম্পদ সম্পর্কে যেমন অবহিত হয়েছিল, তেমনি ধারণা লাভ করেছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তথা শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে। বোধকরি এ-কারণেই কথাকোবিদ ফ্রানৎস্ কাফকা ইউরোপের সমুদ্রজয়কে আখ্যায়িত করেছিলেন জ্ঞানযন্ত্র বা knowledge machine অভিধায়। নবলব্ধ এই জ্ঞান দ্বারা ইউরোপ যে যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলো তা গভীরভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে, বিজিত দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয় সে যুগ্ম-বৈপরীত্য এবং বিজিত দেশের মানুষদেরও, তাদের দৃষ্টিতে যারা অপর (other), বাধ্য করায় সে যুগ্ম-বৈপরীত্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের কিছু নমুনা এরকম : শাসক-শাসিত, সাদা-কালো, সভ্য-অসভ্য, উন্নত-আদিম, গতিশীল-স্থবির, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, মানবিক-পাশব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জ্ঞানী-মূর্খ, চিকিৎসক-রোগী, কেন্দ্র-প্রান্ত ইত্যাদি। লেখাই বাহুল্য, এসব যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথমটি নির্দেশ করে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিকে আর দ্বিতীয়টি উপনিবেশিত পৃথিবীকে। ইউরোপ বোঝাতে চেয়েছিল, যা কিছু ভালো সুন্দর মানবিক এবং যৌক্তিক তার সবটাই ইউরোপের; উপনিবেশিত পৃথিবী কেবলই অসুন্দর ইতর মূর্খ অমানবিক আর প্রান্তিক। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত ভূখণ্ড ও মানবমণ্ডলী (natives) সম্পর্কে একটা পার্থক্যসূচক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে দিলো ইউরোপ। এই পার্থক্য সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক – সব দিকেই ক্রমে প্রভাব বিস্তার করল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকের এই মন্তব্য -

> "Colonialism could only exist at all by postulating that there existed a binary opposition into which the world is divided. The gradual establishment of an empire depended upon a stable hierarchical relationship is which the colonized existed as the other of the colonizing culture. Thus the idea of the savage could occur only if there was a concept

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

of the civilized to oppose it. In this way a geography of difference was constructed, in which differences were mapped (cartography) and laid out in a metaphorical landscape that represented not geographical fixity, but the fixity of power. Imperial Europe became defined as the 'centre' in a geography at least as metaphysical as physical. Everything that lay outside that centre was by definition at the margin of the periphery of culture, power and civilization."[১]

ঔপনিবেশিক শক্তি চায় কেন্দ্র-প্রান্তের এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের সম্পর্কটি দৃঢ়বদ্ধ ও অবিচল রাখতে। যুগ্ম-বৈপরীত্যসূচক সম্পর্কের অবিচলতার ওপরই নির্ভর করে উপনিবেশকের সাফল্য ও স্থায়িত্ব এবং বিজিত জনগোষ্ঠীকে হীনবল রাখার প্রত্যাশিত সফলতা। ফলে ইউরোপের সমুদ্রবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোতে কেবল বাণিজ্য-পণ্যই নয়, অধিকৃত ভূখণ্ডে চালান হতে থাকে আরো অনেক কিছু – ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, পোশাক, প্রশাসন, এমনকি মানবিক চিন্তন-প্রক্রিয়া পর্যন্ত, যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ ও তার অধিবাসীদের ওপর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও মানসিক আধিপত্য বিস্তার। ঔপনিবেশিক শক্তির অব্যাহত প্রচেষ্টায় উপনিবেশিতের মনে উপনিবেশী সংস্কৃতির প্রতি সৃষ্টি করে এক অমোঘ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একই সঙ্গে আপন ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতাবোধ। স্মরণ করা যাক ফানোর ভাষ্য -

"উপনিবেশবাদ শুধু জনগোষ্ঠীকে এর আয়ত্তে শৃঙ্খলিত করেই তৃপ্ত থাকে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মস্তিষ্কের বিকাশ ও ঘিলু অসার করে দেয়। কোনো এক বিকৃতবুদ্ধি যুক্তির মাধ্যমে লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ করা হয় এবং তাদের বিকৃত অবয়বহীন এবং ধ্বংস করা হয়।"[২]

এভাবে আধিপত্যবাদী দর্শন সাম্রাজ্য বিস্তারে ইউরোপীয়দের শক্তি জুগিয়েছে – পৃথিবীকে করেছে লুণ্ঠন। উনিশ-বিশ শতকে আধিপত্যবাদী এই শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড। একইভাবে ভারতবর্ষও বন্দি হয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক শক্তির এই সাংস্কৃতিক-জালে। উপনিবেশী শক্তির এই প্রচেষ্টা টমাস বেবিংটন মেকলের বিখ্যাত উক্তি থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। উপনিবেশিত 'অপর'দের 'সাদা মুখোশ' (white masks) পরানোর কৌশল হিসেবে মেকলে লিখেছেন -

"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."[৩]

– অর্থাৎ বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্য হিসেবে উপনিবেশী শক্তি সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এই পরিকল্পনারই প্রত্যক্ষ ফল উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উপনিবেশী শক্তির এই বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হয় থিয়োঙ্গোর ভাষ্যে -

"সমষ্টিগত প্রতিরোধীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র পরিচালনা করেছে, সেটা হলো সাংস্কৃতিক বোমা। এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হলো মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজেদের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেওয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়ো ভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা।"[৪]

৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্ব মানবিকতার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ সতত চলেছেন তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের সেই অমিয় বাণীই রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিরসত্য 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্রিক সঙ্কট প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা সভ্যতার সংকটে অকপটে স্বীকার করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি নিজের আত্ম সমালোচনার পাশাপাশি ইংরেজদের তৈরিকৃত বিশ্বব্যাপী যে সংকট প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল -

১. উপনিবেশিত রাষ্ট্রের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার।
২. সাম্রাজ্যবাদের নামে সন্ত্রাসবাদ, দমন, পীড়ন, শোষণ ও ঔপনিবেশবাদ।
৩. দুই বিশ্বযুদ্ধে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সংকট।
৪. ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে সৃষ্টি করছে ভেদ ও ধর্মবিদ্বেষ।
৫. ভারতের মতো দরিদ্র নিঃস্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মবিচ্ছেদ ও আত্মপরাভবের ঘটনা।
৬. ন্যাশনালিজম।

নিজেদের ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে ইংরেজরা প্রথমেই যে জায়গায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলো তাহলো উপনিবেশিত দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তার। বলা প্রাসঙ্গিক যে, এক্ষেত্রে তারা শতভাগ সফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার এই প্রবন্ধে বলেছেন, এমন একটা সময় ছিলো ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা, শেক্সপিয়রের নাটক, বায়রনের কবিতা, বার্কের বাগ্মিতা আর মেকলের ভাষা নিয়ে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রেখেছে। ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষার প্রতি এই টান রবীন্দ্রনাথের জীবনের শুরুর দিকে ছিলো খুবই প্রবল। ইংরেজদের এই প্রবণতার দিকে রবীন্দ্রনাথের ছিলো একনিষ্ঠ আস্থা ও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পারিবারিক প্রভাবের কথা যেটুকু বলা হয়েছে তা পাল্টাতে শুরু করে ১৮৯০ সালের শেষের দিকে জমিদারির কাজে পূর্ববঙ্গে চলে আসার পর। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাক রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য -

> "My banished soul sitting in the civilized isolation of the town-life cried within me for the enlargement of the horizon of its comprehension. I was like the town-away line of a verse, always in a state of suspense, while the other line, with which it rhymed and which could give it fullness, was smudged by the mist away in some undecipherable distance."[৫]

এই প্রবন্ধে তাকে বলতে শুনি, ইউরোপের জ্ঞান ও বিজ্ঞান একদিন সমস্ত মানব জাতিকে পথ দেখাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ডেকে এনেছে ধ্বংসের তাণ্ডব। নিজেদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে।

> "একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংল্যান্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংল্যান্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।"[৬]

কিন্তু ইংরেজ সম্পর্কে এই শ্রদ্ধার বোধ বর্তমান পরিস্থিতিতে আর বজায় রাখা সম্ভব নয় বলেই মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিগত কয়েক দশক জুড়ে ইংরেজরা পৃথিবীর উপর যে অমানবিক তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে তাতে তাদের অতীত গৌরব ধূলিসাৎ হয়েছে। জ্ঞানের অগ্রদূত হয়ে যারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, অচিরেই তাদের মধ্যে দেখা দিল বর্বরতার চূড়ান্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকাশ। মানবতার দূত হিসাবে যাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া, তারাই বিশ্বজুড়ে মত্ত হল মানবতা লঙ্ঘনের খেলায়। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছেন,

> "প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"[৭]

বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে ভাষাগত যে সংকট রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তা এই প্রবন্ধের পরতে পরতে যেন তিনি ব্যক্ত করেছেন। আমরা পাই এক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে। ইংরেজদের চাপিয়ে দেওয়া ভাষার এতই প্রভাব যে বর্তমানেও আমরা উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে তাদের ভাষার প্রভাব দেখতে পাই।

বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের প্রতি এই টান অনুভব করেছেন পারিবারিক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে, পাশাপাশি নিজের জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে। বিশেষ করে, যৌবনের শুরুর দিকে যখন ইংল্যান্ডে যান তখন সেখানে ব্রাইটের কণ্ঠে চিরকালের ইংরেজের বাণী শুনেছিলেন যা জাতিগত সীমা অতিক্রম করে তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ-অভিজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সবসময় এই ধারণা মনে লালন করেছেন যে, মানব-মনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিগুলো কখনো জাতিগত সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। মেকলের 'এডুকেশন মিনিট'- কে আমরা যেভাবেই মূল্যায়ন করি না কেন এবং তার ফল যেভাবেই ভোগ করি না কেন, খোদ মেকলে এর মাধ্যমে তো তা-ই চাইছিলেন। সে-সময় কিছু ইংরেজ অবশ্য আশঙ্কা করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলে ভারতীয়রা আত্মসচেতন হয়ে উঠবে এবং তারা সুযোগ বুঝে স্ব-শাসনও চাইবে— তখন এ-কথা শুনে জাতিগর্বী মেকলে বলেছিলেন – "whenever it comes, it will be the proudest day in the English History।"[৮] কার্যত তা-ই হয়েছিল।

পৃথিবী বিস্তৃত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ছিল শাসক হয়ে শোষকের ভূমিকায়। তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের নামে শোষণের চিত্র আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের বয়ানে *সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধে। উইল ডুরান্টের একটি বিখ্যাত বই *দি কেস ফর ইন্ডিয়া। এই বইটি ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের ভয়ংকর রূপ প্রকাশিত হতে দেখি।* উইল ডুরান্ট আমেরিকায় বসে যে-ভারতকে জেনেছিলেন, এখানে এসে অন্য এক ভারতকে দেখলেন, তাঁর দেখা ভারতের বিবরণই হল *দি কেস ফর ইন্ডিয়া*। অন্য কোনো দেশে তিনি ব্রিটিশদের দেখেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এখানে তিনি ভারতীয়দের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখেছেন। ইউরোপীয়রা যদিও বলেছিল কুসংস্কার আর জনসংখ্যার আধিক্যই এই মৃত্যুর কারণ, কিন্তু, তাঁর মতে, এর মূল কারণ ইতিহাসের নিষ্ঠুর জঘন্য শোষণ। উইল ডুরান্টের এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালে, নিউইয়র্ক থেকে; আর ১৯৩১ সালে দি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে - আলোচনা লেখেন তা পড়লে বোঝা যায় তিনি তখন আর কোনোভাবে এদেশে ব্রিটিশ-শাসন চাচ্ছেন না; তাই বলছেন - 'ব্রিটিশদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীন হবে, ভারত এই স্বপ্ন দেখলেও বিরক্ত হন এমন কিছু মার্কিন আমি দেখেছি। একদিন মানুষের যে অধিকার অর্জন করতে তারা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আমরাও যে সেই লড়াইয়ের কথা ভাবছি এটা তাদের অসহ্য ঠেকে।' ব্রিটিশদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি নিয়ে তখনই চিন্তা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তার একদশক পরে 'সভ্যতার সংকট'-এ দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরিণামদর্শীর ভূমিকায় কথা বলছেন -

> "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এ ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সাম্রাজ্য চান যেখানে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, রাজনৈতিক স্থিরতা, নীতিগত উন্নতি এবং জ্ঞান ও শিল্পচর্চা পাকাপোক্ত ভাবে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনানুযায়ী তার জীবনের শুরুর দিকে সভ্যতার সব উপাদানই তিনি দেখেছেন ইউরোপীয়দের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে তিনি ফরাসি মনীষী গিজোর বইয়ের আলোকে লিখেছেন, এশিয়া, প্রাচীন গ্রিস ও রোম সকল সভ্যতায়ই রয়েছে একধরনের একমুখী ও স্থায়ী ভাব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি বহুমুখী, বিচিত্র, জটিল ও বিক্ষুব্ধ। এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের মূলতত্ত্ব, লৌকিক, আধ্যাত্মিক, রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র প্রজাতন্ত্রসহ সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায় বিজড়িত, এরা যেন পরস্পর লড়াই করছে— এই যে এত বৈচিত্র্য, তার মধ্যেও রয়েছে এমন এক পারিবারিক সাদৃশ্য, তাতে তাকে ইউরোপীয় বলে চেনা যায়। এই সভ্যতার প্রতিই আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ। সংকীর্ণ ভূগোল-খণ্ড আর আচারের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং মনু-প্রবর্তিত যে— 'সদাচার' — রবীন্দ্রনাথের মতে যাকে আমরা 'সিভিলিজেশন' বলি — তার শীলিত রূপের সঙ্গে অথবা তার জায়গায় ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শকে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর ঠিক এজন্যই তাঁকে কঠিন দুঃখ পেতে হয়েছে, বিচ্ছেদ সইতে হয়েছে এবং তাঁর বিশ্বাসও ভঙ্গ হয়েছে। মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে তিনি নিজের ইংরেজ প্রীতির সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটি হয়ে উঠে তাঁর আত্মসমালোচনার দলিল। তিনি মনে করেন ইংরেজরা বিশ্ব এবং ভারতবর্ষকে যে সভ্যতা উপহার দিয়েছে তার মূলে রয়েছে শোষণ ও বঞ্চণার করুণ আর্তনাদ। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি একটি অনিশ্চিত আশাবাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে, তিনি বলেছিলেন -

> "আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, একদিন সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে ওই পূর্বদিগন্ত থেকেই।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্ব-রাজনীতি পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ তুলে এনেছেন বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সভ্যতাগর্বী ইংরেজ কি নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। চীনের অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) তেমনই এক আগ্রাসন। চীনে ইউরোপীয় দেশগুলির অবাধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিল। এ সময় চীনে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে আফিমের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ইংরেজ বণিকেরা চোরাপথে চীনে প্রচুর পরিমাণে আফিম সরবরাহ করতে থাকে এবং কালক্রমে তা চীনাদের নেশায় পরিণত হয়। আফিমের কুপ্রভাব থেকে দেশবাসীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্যান্টন বন্দরে ২০ হাজার পেটি আফিম বাজেয়াপ্ত করে (১৮৩৯) ধ্বংস করে চীনা সরকার। ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে চীনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। চীন তা অগ্রাহ্য করলে শুরু হয় প্রথম অহিফেন যুদ্ধ। শক্তিশালী ব্রিটিশরা সহজেই চীনকে পরাজিত করে। স্পেন থেকে শুরু করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে একই ভাবে ইংরেজেরা নিজেদের মানবতাবিরোধী কর্মধারাকে বজায় রেখেছে শক্তির মদমত্ততায়। অন্য দেশের সম্পদ লুঠ করে এনে নিজেরা হয়েছে সমৃদ্ধতর। ইংরেজকে অনুসরণ করে ফরাসী, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরাও নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষকে লুণ্ঠনের খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের সেই লোভের কারণে ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের অবক্ষয় দেখে মনে হয়েছিল এমন কালো সময় হয়তো আর পৃথিবীর বুকে কোনওদিন আসবে না। কিন্তু তা থেকেও ইংরেজ সহ ইউরোপের দেশগুলি কোনও শিক্ষা নেয়নি। শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন, -

> "এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের মতো দরিদ্র নিঃস্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মবিচ্ছেদ ও আত্মপরাভবের ঘটনা ঘটানোর পাশাপাশি সৃষ্টি করছে পারস্পরিক ভেদ, ধর্মবিদ্বেষ ও আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম দিকের যে ধারণা তা আমরা সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে গিয়ে ভিন্নতর রূপ দেখি। ইংরেজ-শাসনের কারণে অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা ও আরোগ্যের যে- শোকাবহ অভাব তৈরি হয়েছে তা আমাদের নিজস্ব সমাজ-শক্তির জোরেই হয়ত পূরণ করা সম্ভব, সে-কারণে এই অভাবের চেয়েও আমাদের মধ্যকার 'আত্মবিচ্ছেদ'-এর ঘটনাটিকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'অতি নৃশংস'। এই বিচ্ছেদ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার বিচ্ছেদ, যা নৃশংস, যার নেপথ্যে রয়েছে ভারত-শাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরের কোনো গোপন কেন্দ্রের ভূমিকা।

হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ বিষয়ে শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও নানা সময়ে, নানা সংকটে বিষয়টি নিয়ে তিনি ভেবেছেন তারও বহু আগে থেকেই। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী, কালিদাস নাগের এমন একটি প্রশ্নের জবাবে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ইউরোপ যেভাবে সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির মাধ্যমে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে, আমাদের হিন্দু-মুসলমানকেও সেভাবে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। ধর্মকে কবর বানিয়ে সমগ্র জাতিকে সেই 'ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে' উন্নতি হবে না, মিলবারও উপায় থাকবে না।

তারপর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লিখিত তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে দুই ধর্মমত এবং সমাজরীতির প্রভেদ ও বিরুদ্ধতার কথা স্বীকার করেও বলেছিলেন, এই সব সত্ত্বেও আমাদেরকে মিলতে হবে; এবং রাষ্ট্রিক অধিকার আদায় বিষয়ে দর-কষাকষি করে দুই সম্প্রদায়ের মন-কষাকষি বাড়িয়ে শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধন করা ঠিক নয়। তবে একথাও বলেছেন যে, স্বার্থের জন্য শেষ পর্যন্ত পলিটিক্সের তালি-দেওয়া মিলনকে সমর্থন করেন না। এর কারণ, যেখানে গাছের গোড়ায় বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে জল ঢেলে গাছকে চিরদিন সজীব রাখা যায় না, তাই একদম গোড়ায় গিয়ে আমাদের মিলতে হবে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব, এই বিষয়ে তখনো, ১৩৩৮ সালেও, সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে ভেবে দেখা হয়নি বলে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এক সময় খেলাফতকে সমর্থন করে গান্ধি যে মিলনের সেতু তৈরি করবেন বলে ভেবেছিলেন, সেই উদ্যোগকেও তার কাছে 'বাহ্য'-এর ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। এরপর কাজী আবদুল ওদুদের 'চিত্তবৃত্তির ঔদার্য'কে হিন্দু-মুসলমানের 'মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে' বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' শিরোনামে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লক্ষ করলে দেখব, রবীন্দ্রনাথ বা ওদুদ দুজনেই তখনো এই বিরোধের কারণ হিসেবে সরাসরি শাসকদেরকে দায়ী করেননি। এর কারণ হয়ত এই যে, এই দুজনেই মনে করতেন এ-বিরোধ ইংরেজদের আসার বহু আগে থেকেই চলে আসছে, আকবরও তা নিরসনের চেষ্টা করেছেন, আল-বিরুনিও তাঁর ভারত-বিবরণে এই বিরোধের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক জগদীশনারায়ণ সরকারও তা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে, এখানে, কালিদাস নাগকে লিখিত চিঠির শেষ অংশটির উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের মানসপ্রকৃতির অবরোধ ঘোচাতে না পারলে কোনোরকমের স্বাধীনতা পাব না -

> "হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই— কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানুষের মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।"[১২]

এই যুগ-পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তার জন্য সাধনার দরকার; কিন্তু কী সেই সাধনা? যেহেতু এই চিঠি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে লিখিত, এর আগে পূর্ববঙ্গের জমিদারি কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে শান্তিনিকেতনের কর্মময় জগতেও ঢুকে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, এর সঙ্গে তাঁর কথিত কল্পনাজগতের 'আসমানদারি'র অভিজ্ঞতা তো তার রয়েছেই, তাই বুঝতে বাকি থাকে না যে এই সাধনার ধরন কীরকম হতে পারে। তিনি সত্য ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির কথা বলেন, ব্রহ্মচর্যের কথাও বলেন, ধারণা করা যায় এই সবকিছুর সঙ্গে তাঁর সকল প্রকার অভিজ্ঞতার বিকিরণও যুক্ত হবে। কিন্তু তা তো এমনি এমনি হয় না, তার জন্য কোনো-না-কোনো প্রেরণা বা অভিঘাতের প্রয়োজন। একদিন ইংরেজরা এখানে এসেছিল বলে সেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রেরণার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বারবার ইউরোপের দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর বহুলপঠিত প্রবন্ধ 'কালান্তর'-এর কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে তিনি লিখেছিলেন - একসময় আমাদের স্থাবর মনে ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি এমনভাবে আঘাত করেছিল, যেমন দূর আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা পড়ে মাটির নিচে গিয়ে 'নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্র রূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সেই যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বের হয় হয়ে মানবেতিহাসের আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বোঝাই যায় রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করবেন, কারণ সজীব মন গ্রহণ না-করে পারে না। এই রবীন্দ্রনাথই 'সভ্যতার সংকট'-এ এসে বলছেন -

> "অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতো বড়ো নিকৃষ্ট বিকৃত রূপ কল্পনাই করতে পারিনি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম ঔদাসীন্য।"[১৩]

এখানে একবার 'ইংরেজ' আর বাকি তিনবারই রয়েছে 'সভ্য' শব্দের উল্লেখ; বোঝা যাচ্ছে এখন আর এই সভ্য ইংরেজদের প্রতি তার আগের মোহ নেই, একান্ত মনে নিবিষ্ট হওয়ার আগ্রহও নেই। তাঁর বেশকিছু লেখায় খেয়াল করলে দেখব মানুষের দারিদ্র্য প্রসঙ্গে শাসকদের কর্তব্য বিষয়ে কথা বলার চেয়ে আত্মজাগরণ আর সমাজ-শক্তির বিকাশ বিষয়ে বেশি জোর দিয়েছেন, এখন দেখা যায়, দারিদ্র্য আর হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ এই সংকটের জন্য সরাসরি শাসকদেরকেই দায়ী করছেন রবীন্দ্রনাথ। এই মত পরিবর্তনের কারণ 'সভ্যতার সংকট'ময় পরিস্থিতি, নাকি অন্য কিছু?

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনা আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাই। তিনি এই প্রবন্ধে ইংরেজদের উগ্রজাতীয়তাবাদ কীভাবে অবধারিতভাবে সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করেছে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। উনিশ শতকে ইংরেজরা যে ভাবে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা দখল করেছিল। শাসনের নামে শোষণ করে তারা তাদের অধিকৃত রাষ্ট্রকে তাদের দাস বানিয়ে রেখেছিল। বর্তমান সময় সেই ভাবে ক্ষমতা দখল না হলেও বিভিন্ন চুক্তি, ব্যবসা, অর্থনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করছে। আর এর ফলে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভারতবর্ষে শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে সভ্যতার সংকট যেন এখনো প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক শুধু তার ইতিহাস-বিশ্লেষণের কারণে নয়। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তা আজো নির্মমভাবে সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যদিও আর মহাসমর সংঘটিত হয়নি, তবু এমন সময় যায়নি যেখানে আমরা মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে সংঘাত দেখিনি। এশিয়া মহাদেশ তার মূল ঘটনাস্থল, তবে ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকাও তার থেকে বাদ যায়নি। বৃহৎ শক্তির লোভ মানুষের শান্তি ও সম্পদ হরণে ক্ষান্তিহীন। সভ্যতার দাবি আবার তাদেরই প্রবল। কোথাও সংঘর্ষ দেখা দিলে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে শক্তিমান দেশগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার তারাই যুদ্ধরত জাতিগুলোর কাছে মারণাস্ত্র বিক্রি করে সে-সংঘাতকে প্রলম্বিত করার ব্যবস্থা করছে। সভ্যজাতির ক্ষেত্রে এবং অপরের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের মাপকাঠি তাদের কাছে এখনো ভিন্ন। আমরা যখন যুদ্ধাপরাধের জন্যে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করি, তখন তারা আন্তর্জাতিক মানের কথা বলে বারবার। তারা যখন ওসামা বিন-লাদেনের গোপন আস্তানায় বলপূর্বক প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয় তখন আর কোনো মানের প্রশ্ন ওঠে না। সভ্যজাতির এই ভাবলেশহীন দ্বিচারণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯১৭ সালে *Nationalism* বইতে তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থপরতার কথা বলেছিলেন, এবং তার অনুকরণে জাপানের মতো প্রাচ্যদেশেও যে-অনাচার ঘটছিল, তার নিন্দাজ্ঞাপন করেছিলেন।

> "সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।"[১৪]

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সভ্যতার সংকটে শেষবারের মতো মানুষের প্রতি কৃত মানুষের অবিচার-অন্যায়ের একটা সূত্রবদ্ধ পরিচয় তুলে ধরলেন এবং মানুষের ওপরেই আস্থা রাখলেন সেই সংকট থেকে মুক্তিলাভের। এসব কথা অবিনাশী, এসব কথা কালোত্তীর্ণ। যা আজ একবিংশ শতকেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

৪

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ইংরেজরা যা করেছে সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারেননি রবীন্দ্রনাথ। অথচ এরই পাশাপাশি দেখেছেন জাপান, রাশিয়া, ইরান, এমনকি আফগানিস্তানে সর্বজনীন উৎকর্ষের সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের সমীক্ষণ হল, সভ্যতা গর্বিত কোনো ইউরোপীয় জাতি তাদের অভিভূত করতে পারেনি বলেই ওই দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই উৎকর্ষের পথে এগিয়ে আসা। এভাবেই ইউরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি তিনি হারিয়েছেন তাঁর বিশ্বাস জীবনান্তিকে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 'সভ্যতা' বলা যায় কি-না, জেগেছে সেই সংশয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় সূচনায় দাঁড়িয়ে কথিত সভ্যতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা বিচলিত হয়েছিলেন, এই লেখাটি পড়লেই তা বোঝা যাবে। এই প্রবন্ধের বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, সারাজীবন ধরে পর্বে-পর্বে রবীন্দ্রনাথ যা ভেবেছেন তা এই একটি লেখাতেই পেয়েছে সংহত গভীর নির্মোহ বাণীরূপ। পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রতি প্রবল আগ্রহ পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে গভীর অধ্যয়নে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জ্ঞানের প্রসারতার ফলে বিবেচনাশক্তি গভীরতর হওয়ায় সব কিছুরই শক্তি ও ত্রুটি বোঝা সম্ভবপর হয়েছিল তার। সেই সঙ্গে প্রাচ্য মূল্যবোধের প্রতি ক্রমবর্ধিত জ্ঞান ও শ্রদ্ধাও দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারত তথা এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন আত্মমুক্তির পরম সম্ভাবনা। বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা আমরা এই প্রবন্ধের পরতে পরতে লক্ষ্য করি। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত। একসময় মাছি মারা কেরানি তৈরী করার লক্ষ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। আজও এই শিক্ষাব্যবস্থা অপরিবর্তিত যা ইংরেজদের প্রতি দাসত্বের চিহ্ন বহন করে চলেছে। দীর্ঘদিন যাবত কারো অধীনে জীবনধারনের ফলে ব্যক্তি যেমন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে, উপনিবেশিক দেশগুলোও ঠিক সেভাবে হারিয়ে ফেলে সার্বভৌম অর্জনের স্পৃহা। আজও আমরা দেখতে পাই, নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি শেখার চাইতে তা ভুলে যেতেই বুঝি মানুষের আগ্রহ বেশি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারা আজকাল বড় কোন অর্জন মনে হয় আমাদের কাছে। যা ইংরেজ দাসত্বের পরিচয় বহন করে। ইউরোপ সৃষ্ট যুগ্ম-বৈপরিত্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধারণা, সাবেক উপনিবেশিক দেশের নাগরিক হিসেবে আজও তা আমরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধারণ করি। আমরা কালো-সাদা, ধনী-নির্ধন, সুন্দর-অসুন্দর ভেদে ব্যক্তি এমনকি সামাজিক পর্যায়েও ভেদাভেদ করে চলি। আমরা আজও ইউরোপ প্রবর্তিত পশ্চিমা সংস্কৃতির দাস। পশ্চিমাদের প্রবর্তিত সবকিছু আজও অনেকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। গুটিকয়েক যারা প্রাচ্য মনোভাবে আস্থাশীল তারা আজ একঘরে। এহেন অবস্থা চলতে থাকলে আমরা হারিয়ে ফেলবো আমাদের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ। যা আমাদের শিকড় ভুলিয়ে দিবে। এসব কিছু হারিয়ে ফেললে একটি জাতির আর কীইবা থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকটে যা ভেবেছেন সেই ভাবনা আমাদের আজ একবিংশ শতকেও নতুন করে ভাবায়।

Reference:

১. Bill Ashcroft et. al. (eds.), 1995. The Post-colonial Studies, London, p. 36-37

২. Fanon, Frantz, 2006. The Wretched of the Earth (জগতের লাঞ্ছিত : অনুবাদ – আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, ২০১৪), ঢাকা, পৃ. ২৮

৩. Woodrow, H., 1862. Macaulay's Minutes of Education in India, Calcutta, p. 115

৪. নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০১০, ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড (অনুবাদ : দুলাল আল মনসুর), ঢাকা, পৃ. ১৫

৫. Tagore, Rabindranath, The Religion of Man, The Hibbert Lecture for 1930

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সভ্যতার সংকট', রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬ পৃ. ৭৪১

৭. মেকলে, লর্ড, নির্বাচিত রচনা, আরশাদ আজিজ অনূদিত (অনুবাদকের ভূমিকা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৯

৮. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৪

৯. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৬

১০. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৬

১১. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৬

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'হিন্দুমুসলমান', কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৬২০

১৩. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪২

১৪. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 883 - 901
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মিথ, ইতিহাস ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আলোকে শ্মশান - শ্মশান সঙ্গীত ও সাহিত্য : অন্ত্যজ মানুষের জীবনদর্শন

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
শ্মশান, মনুসংহিতা, চণ্ডাল, শিব, এইচ. এইচ. রিসলে, শ্মশানসঙ্গীত, চর্যাপদ, মোক্ষ, অনাথ শব, সতীদাহ, রবীন্দ্রনাথ।

Abstract
'শিবপুরাণম' গ্রন্থে উল্লিখিত দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রিয়তম স্থান শ্মশানভূমি। শ্মশান মানুষের অন্তিম বাসস্থান। ভূত-প্রেত, শৃগাল-শকুন, মৃতের মস্তিষ্ক, হাড়-গোড়ে বড়ই দুর্গম এই স্থান। শিবপত্নী পার্বতীও স্বামীর মতই শ্মশানে-মশানে ফেরেন। শ্মশানের মধ্য দিয়েই মোক্ষ ও মুক্তি পিপাসু হিন্দু স্বর্গগমন করেন। সংসারের বন্ধন থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করেন। শ্মশান বন্ধুরা মৃত স্বজনের স্বর্গযাত্রার পথ সুগম করার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। গঙ্গাতীর শ্মশানভূমির উপযুক্ত স্থান। গঙ্গার স্পর্শে পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ চণ্ডাল সম্প্রদায়কে শ্মশান রক্ষার দায়িত্ব সমর্পণ করেছেন। মহর্ষি মনু অন্ত্যজ চণ্ডাল সম্প্রদায়কে মনুষ্যজাতির অধম বলে বর্ণনা করেছেন। নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে শ্মশানসঙ্গীতে। এমন সঙ্গীতে মানব জীবনের অসারতা প্রতিফলিত। কেমন আছেন শ্মশান চণ্ডালেরা? না তারা ভালো নেই। বাংলা সাহিত্যে শ্মশান বিচিত্র রূপে উপস্থাপিত। চর্যাপদের ৫০ সংখ্যক পদে শ্মশানের উল্লেখ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'চাণ্ডাল' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নদী তীরবর্তী শ্মশানভূমির উল্লেখ আছে। হিন্দুরা মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। হিন্দু বৈষ্ণবেরা মৃতদেহকে মাটিতে সমাধিস্থ করেন। রামায়ণ মহাভারতের কালে চিতায় মৃতদেহের দাহকার্য সম্পন্ন করা হত। মাদ্রী পাণ্ডুর সঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত চিতাতেই অনুমৃতা হয়েছিলেন। দেবীভাগবত পুরাণে উল্লিখিত আছে, ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীর মহাশ্মশানে চণ্ডালের কাজ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস অনাথ শব রূপেই পরিগণিত। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে শ্মশান চণ্ডাল হলেন বৈজু। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসে শ্মশানের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থে 'শ্মশান' নামের একটি সুদীর্ঘ কবিতা রয়েছে। মধুসূদন দত্ত তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'শ্মশান' কবিতায় পাঠককে বিষণ্ণতার সামসঙ্গীত উপহার দিয়েছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংস্কার, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি শ্মশানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শ্মশানসঙ্গীত হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গীয় মৃত ব্যক্তির আত্ম প্রতিরূপ। শ্মশান ও মৃত্যু সমার্থক। মৃত্যুর স্থির সমুদ্রে জীবনের অর্জিত গৌরবরাশি বৃথা হয়ে যায়। অর্থ-সম্পদ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই যায়। শ্মশানের চিতার আগুনে ইহজগতের দেনাপাওনা সব চুকে যায়। শ্মশান কেন্দ্রিক সঙ্গীত ও সাহিত্য ভারতীয় জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

Discussion

এক

“পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ পার্ব্বতি।
ইষ্টং শ্মশানমেবং মে তত্র তত্র রমাম্যহম্।।
ইমে চাত্র গণাধ্যক্ষা রমণীয়ায়তেক্ষণে।
রময়ন্তি রমন্তো মাং শ্মশানং তেন মে মতম্।।
স তস্মিন পশ্যমানস্তু গুণাংশ্চ গুণবর্ণিনি।
স্নেহং সদা চ কুরুতে শ্মশানেহহমিবানবে।।” [১]

অতএব শ্মশানই আমার প্রিয়তম স্থান। পুণ্যরমণীয় এবং সিদ্ধক্ষেত্র স্বরূপ শ্মশানভূমিই আমার অভীপ্সিত। সেখানে অবস্থান করলে আমি অত্যন্ত সুখী হই। শ্মশানভূমি আমার ঐশ্বর্য স্বরূপ। সুতরাং এই স্থানকে আমি হিতকর বিবেচনা করি। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ‘শিবপুরাণম্’ গ্রন্থে দেবাদিদেব মহেশ্বর তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে একথা বলেছেন।

শ্মশান মানুষের অন্তিম বাসস্থান। শবদাহের ধোঁয়ায় মানুষের চোখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। চিতার প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখায় দিগবিদিক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরাণকার লিখেছেন -

“লোকনিষ্ঠাগৃহে চৈব শবধূমারুণেক্ষখণে।
চিতাশতসহস্রেষু প্রজ্বলিতে চিতানলে।।”[২]

এই সেই শ্মশান, যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকেন মৃত ব্যক্তি। শ্মশানভূমি মৃত ব্যক্তির মাংসের গন্ধে পরিপূর্ণ থাকে। শ্মশান বড় ভয়ানক স্থান। ভূত প্রেতে পরিপূর্ণ। শৃগালের ভীষণ শব্দ। কাক ও পেচকে পরিব্যাপ্ত। নানাপ্রকার পাখি ও কুকুরের শব্দে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে শ্মশানভূমি। সর্বত্রই ভূতপ্রেতের অট্টহাস্য। শবের শরীরে পশুর দংশন ক্ষত চিহ্ন। শ্মশানের স্থানে স্থানে কুশ-কাশ প্রভৃতি দিয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয়। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র পতিত রয়েছে। শৃগালের ধ্বনি। কখনো কখনো চিতার আগুন দুরন্ত হয়ে ওঠে। কোথাও পড়ে রয়েছে মৃতদেহের অপবিত্র খাট, পীঠক (খোন্তা), কুলা প্রভৃতি। কোথাও মৃতের বস্ত্র, আভরণ। কোথাও মৃতের চুল, কোথাও মস্তিষ্কের কাপড়, কোথাও ছিন্ন শিরোভূষণ শোভা পাচ্ছে। বড় বীভৎস, বড় দুর্গম এই স্থান। পুরাণকার লিখেছেন, এই সকল স্থান বড় ভয়ঙ্কর রৌদ্র, অদ্ভুত ও বীভৎস রসের লীলাভূমি। দুর্গম ও দুর্ধর্ষ -

“রৌদ্রেরদ্ভুতবীভৎসৈর্ভয়দৈঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
দুরন্তকালপ্রতিমে দুর্ব্বিগাহ্যে দুরাসদে।।”[৩]

শ্মশানকে দেবাদিদেব আশ্রয়স্থল রূপে গ্রহণ করলেন কেন? শ্মশানের চিতাভস্মে মানুষ মুক্তি লাভ করে। দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ভূতিস্নানের (চিতাভস্ম) মত পুণ্য অর্জন আর কিছুতেই হয় না। আর এই ভূতিস্নানের কারণেই ভূত-প্রেত প্রভৃতি দেবাদিদেব মহেশ্বরের অনুচর হয়েছে। ভূতিস্নানের সুফল সম্পর্কে পুরাণে বলা হয়েছে, যেমন গঙ্গা সদৃশ তীর্থ নাই, বেদ সদৃশ শ্রুতি নাই, মৃত্যুর ন্যায় শাস্তা (শাসন, কর্তা, উপদেষ্টা) নাই, ঠিক তেমনি ভূতির মত তপস্যা নাই। ‘দেবীভাগবতম্’ – পুরাণে বলা হয়েছে, ভস্মধারণ করলে মানুষ শিবতুল্য হয় –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"বিভূতিধারণবিধিঃ স্মৃতিপ্রোক্তো ময়েরিতঃ।
যদীয়াচরণেনৈব শিবতুল্যো ন সংশয়ঃ।।"[৪]

এমনই শিবের প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে পার্বতী তাঁর অনুমতিক্রমে শরীরার্দ্ধস্বরূপা হলেন। আর শঙ্কর হলেন অর্দ্ধনারীশ্বর। 'কালিকাপুরাণ' – গ্রন্থে উল্লিখিত আছে -

"ততোহতিম হতা প্রেম্না শঙ্করস্যাথ পার্ব্বতী।
শরীরমর্দ্ধমহরত্তস্যৈবানুমতে সতী।।"[৫]

'কালিকাপুরাণম্' - গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম ও ভূতিযুক্ত। অপরাংশ চন্দনসিক্ত ও বস্ত্র শোভিত। এরূপ শরীরের অর্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণ, অপর অর্ধ সুদীর্ঘ পুরুষাকৃতি। শিবের অর্ধাঙ্গিনি পার্বতী স্বামীর মতই শ্মশানে – মশানে ফেরেন। সঙ্গে থাকেন পিশাচ-পিশাচী, ডাকিনী-যোগিনী। তান্ত্রিক সাধকেরা ডাকিনীর উপাসনা করেন। ভূত-প্রেতের অধিদেবতা হলেন শিব।

মোক্ষ ও মুক্তি পিপাসু হিন্দুরা জগতের অসারত্বের কথা বলেন। দেবীপদে তারা মুক্তির ঠিকানা খুঁজে নেন। মহাদেব স্বয়ং আত্মধ্যানের দ্বারা মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি মহাযোগী। তিনি ধ্যানে দর্শন করেন। ব্রহ্মই প্রধান সার। ধর্ম দ্বিতীয় সারস্বরূপ। আর সমস্ত কিছুই অসার। ধীমান ব্যক্তি সার পদার্থের স্বরূপ অবগত হয়ে নিত্যপদ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। 'কালিকাপুরাণম্' – গ্রন্থে পুরাণকার লিখেছেন –

"সারং তত্ত্বং পরমং নিষ্ফলং য –
ন্মুর্ত্ত্যা হীনং মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এষঃ।
সারোহন্যোহসৌ সারহীনং তদন্যজ্
জ্ঞাত্বৈবে থং যাতি নিত্যং মহাধীঃ।।"[৬]

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কর্মই প্রধান উপায়। যথার্থ আত্মজ্ঞানের অধিকারী হলে তবেই মানুষ পাপপুণ্য থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ না হলে মানুষ যোগ অবলম্বন করে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। 'শ্রীমদভগবদ্গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ সংখ্যক শ্লোকে সংসার ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে–

"নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"[৭]

শ্মশানে প্রিয়জনে আর শ্মশানবন্ধুরা মিলে তাদের এতদিনকার প্রিয় মানুষটিকে সহজে স্বর্গলোকে যাত্রার পথ সুগম করার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। দেশে দেশে, কালে কালে সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থার ভিন্নতা অনুসারে মৃত মানুষের সৎকারের বিধি ব্যবস্থায় পার্থক্য সূচিত হয়। হিন্দুরা মৃতদেহকে আগুনে দাহ করেন। হিন্দু বৈষ্ণবেরা 'সমাজ' (সমাধিস্থ) দেন। মিশরে ফারাওদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আজও জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছে। মুসলমানেরা মৃতদেহকে কবর দেন। একালে হিন্দু সমাজে শববাহক এবং সৎকার কার্যে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন, তাদের বলা হয় 'কাঁধকেট্যা'।

গঙ্গাতীরই শ্মশানভূমির উপযুক্ত স্থান। পুণ্যতোয়া গঙ্গার স্পর্শে মানুষ পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গগমন করেন। হিন্দুপুরাণের অনেক স্থান পবিত্র গঙ্গার মাহাত্ম্য কথায় পরিপূর্ণ। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে গঙ্গা স্বর্গ গমনের পবিত্র পথ। হিন্দুরা গঙ্গাতীরেই মৃত্যুকামনা করেন। 'দেবীভাগবতম্' পুরাণে উল্লিখিত আছে, যে কোন পাপ এমনকি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হলেও এমনকি গঙ্গা স্নানে বিনষ্ট হয় –

"কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ভারতে যৎ কৃতং নৃভিঃ।
গঙ্গায়া বাতস্পর্শেন নশ্যতীত শ্রুতৌ শ্রুতম্।।"[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত হয় না। সুতরাং গ্রাম গঞ্জের প্রান্তিক স্থানে শ্মশানের জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়। তবে প্রবাহিত গঙ্গাতীরের প্রায় সর্বত্রই রয়েছে শ্মশানভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ-এ অর্থাৎ 'নবম পরিচ্ছেদ' (প্রেতভূমে) শ্মশানের বর্ণনা আছে। সেই শ্মশান অবস্থিত রয়েছে গঙ্গাতীরের এক বৃহৎ সৈকতভূমিতে। শ্মশানভূমির মুখ গঙ্গা সম্মুখীন। মনুষ্য বর্জিত এমন নির্জন স্থানে শ্মশান ভীষণ অতিপ্রাকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। শ্মশান শবভুক পশুদের বিচরণ ক্ষেত্র। এখানে পশুদের কর্কশকণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়। শ্মশানের স্থানে স্থানে ভাঙা শ্মশান কলস, মৃতের খুলি অস্থি প্রভৃতি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকে। এই শ্মশানকে হিন্দুরা দেবভূমির তুল্য মনে করলেও, বাস্তবে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের পটভূমি গঙ্গাতীরবর্তী এক মহাশ্মশান। এই শ্মশানেই সংসার রচনা করেছিলেন মুমূর্ষু সীতারাম ও তরুণী যশোবতী। এই শ্মশানেই স্বর্গ-নরকের সাংসারিক আলোআঁধারি রূপ দেখেছিলেন চণ্ডাল বৈজুনাথ। বৈজুনাথ শ্মশান রক্ষক। এখানেই আছে পঞ্চমুণ্ডীর ঘাট। এ ঘাট বড় পুণ্যের ঘাট। সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকের অভিশপ্ত সতীদাহ প্রথার নির্মম চিত্র শিল্পবন্দি করতে গিয়ে কমলকুমার হিন্দুমিথের অবয়বে এমন আদর্শ শ্মশানের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসটি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এক সচেতন অঙ্গুলি নির্দেশ। কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের শেষ অংশে চণ্ডাল বৈজুনাথ ও যশোবতীর কথোপকথন প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> "চণ্ডাল ...আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছ?"
>
> "ভয় দেখাব কেনে, বউ দেখাই, সিন্দুর মাঙ্গি, এ শ্মশানে আর আমি পাব কোথাকে? এ শ্মশানে এক সিদ্ধ ছিল, মেয়েদের চুলের পৈতা ছিল, এক কঙ্কালকে 'ওগো ভৈরবী গিন্নী' বলে ডাকত যে হে..." যশোবতীর চর্ম্ম লোল, জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছিল। নরমুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অনাদি অনন্তকালের দৃশ্য দেখিয়াছিলেন।"[৯]

দুই

> "শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্
> বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।"[১০]

শূদ্র পুরুষের ঔরসে ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভজাত সন্তানকে চণ্ডাল বলা হয়। এইভাবে যে সব বর্ণসংকর জন্মগ্রহণ করেন, তার মধ্যে চণ্ডালেরাই হলেন মনুষ্য জাতির সবথেকে অধম। একথা লিখেছেন মহর্ষি মনু তাঁর 'মনুসংহিতা' গ্রন্থে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয় শূদ্র তো বটেই, রমণীকেও কখনোই সামাজিক মর্যাদার মান্যতা ফিরিয়ে দিতে চায়নি।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র চণ্ডালদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছেন গ্রামের বাইরে, বৃক্ষতলে (চৈত্যবৃক্ষে) বা শ্মশানে অথবা পাহাড়ের কাছে বা উপবনে।

> "চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষুপবনেষু চ।
> বসেয়ুরেতে বিজ্ঞানা বর্তয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ।।"[১১]

কুকুর এদের সঙ্গী। পরিত্যক্ত ভাঙা পাত্রে এরা খাদ্য গ্রহণ করেন। মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় এদের আচ্ছাদন। এদের জীবিকা মৃতদেহ সৎকার করা। বান্ধবশূন্য বা অনাথ শবকে চণ্ডালেরাই সৎকার করেন। মনু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

> "অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ।"[১২]

কি করেছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র? নারীর জন্য সতীদাহ। আর শূদ্র বা চণ্ডালের জন্য শ্মশানভূমি। প্রাচীনকাল থেকে শবদেহ সৎকার ও শ্মশান রক্ষক রূপে চিহ্নিত হয়ে রইলেন চণ্ডালেরা।

H.H. Risley (1851 – 1911) তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' (1891) গ্রন্থে লিখেছেন –

> "The Chandals of Bengal in variably call themselves Nama – Sudra, and with characteristic jealousy the higher divisions of the name Chandal to the lower, who in their turn pass it on to the DOM."[১৩]

প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী এবং শূদ্র – সমাজে এদের অবস্থানই ছিল সবথেকে খারাপ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রসারিত তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ হয়েছিল এরা। বৈদিক যুগেও দাস ব্যবস্থা ছিল। 'ঋগ্বেদ সংহিতা'য় তার সাক্ষ্য মেলে –'শতং দাসা অতি স্রজঃ'[১৪] – অর্থাৎ আমাকে একশত দাস প্রদান কর।

হিন্দুরা মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। 'ঈশ উপনিষদ' – এ প্রাচীন ভারতীয় ঋষি এ প্রমাণ রেখে গেছেন। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুরা মৃতদেহকে দাহ করার রীতিকে মান্যতা দিয়ে এসেছেন। 'ঈশ উপনিষদ' – এর ১৭ সংখ্যক মন্ত্রে উল্লিখিত আছে, আমার প্রাণবায়ু নিত্যকালস্থায়ী মহাবায়ুতে মিলিত হোক। তারপরে প্রাণহীন এই দেহ ভস্মে পরিণত হোক। বৈদিক যুগের ঋষির মৃত্যুকালীন এই প্রার্থনা গভীর দার্শনিক বোধের পরিচয় রেখে যায় –

"বায়ুরনিলমম্ তমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।"[১৫]

বৈষ্ণবেরা নানা আচারের মাধ্যম ভূমি খনন করে মৃতদেহ বসিয়ে মাটি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র ১০ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ৯ সংখ্যক ঋকে মৃতকে শ্মশানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবার উক্ত সূক্তের ১১ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে, মাতা যেমন আঁচল দিয়ে সন্তানকে আচ্ছাদন করেন, তেমনি পৃথিবী মৃতদেহকে আপন ভূমি দিয়ে ঘিরে রেখেছে –

"মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি।"[১৬]

সমাধিস্থ করার সময় অগ্নিকর্তা পৃথিবীমাতাকে প্রণাম করে মৃত ব্যক্তির জন্য তাঁর (দেবীর) কাছ থেকে সামান্য ভূমি চেয়ে নেন। বর্তমান বৈষ্ণবেরা যে মৃতদেহকে 'সমাজ' (সমাধিস্থ) করেন, তার প্রাচীন রূপ পাওয়া যাচ্ছে 'ঋগ্বেদ সংহিতা'য়। মহর্ষি মনু শূদ্রদের দাসরূপে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁর 'মনুসংহিতা'য় সাত প্রকার দাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দাসের উল্লেখ আছে। দাসদের দ্বারা শব বহনের উল্লেখও আছে। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রম্' গ্রন্থে লিখেছেন –

"প্রেতবিন্মূত্রোচ্ছিষ্টগ্রাহাণামাহিতস্য।"[১৭]

শব বহন, বিষ্ঠা, মূত্র ও উচ্ছিষ্ট অপসারণের কাজ নিম্নবর্গীয় শূদ্ররাই করতেন।

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের কালে মৃতদেহকে আগুনে দাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা দশরথের ক্ষেত্রে সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছিল। দশরথ পুত্র বিরহে দগ্ধ হয়েই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মীয়স্বজন ও মিত্রেরা বিবেচনা করেছিলেন, পুত্র বিরহজনিত মৃত্যুর কারণে দাহ করা উপযুক্ত হবে না। শেষ পর্যন্ত রাজা দশরথের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীর মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন –

"তৈলদ্রোণ্যাং শায়িতং তং সচিবৈস্ত নরাধিপম্

… … …

ঋতে তু পুত্রাদ্দহনং মহীপতে
নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ম্
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্
গতপ্রভা দ্যৌরিব ভাস্করং বিনা
ব্যপেতনক্ষত্রগণেব শর্ব্বরী।।"[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহাভারতে মাদ্রীর ‘সতী’ হওয়া এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর দাহকার্যের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মাদ্রীর শিবিকারোহণের, পরে ছত্র, চামর, বস্ত্র, পুষ্প প্রভৃতি সহযোগে সজ্জিত চিতায় পাণ্ডুর সঙ্গেই অনুমৃতা হয়েছিলেন তিনি। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে গঙ্গায় তর্পণ করেছিলেন ভীষ্ম বিদুর সহ আত্মীয় স্বজনেরা। মহাভারতকার লিখেছেন, পুরোহিতের অনুমতিক্রমে চিতা প্রদক্ষিণ করে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর শরীর দগ্ধ হয়ে গেল –

“যাজকৈরভ্যনুজ্ঞাতে প্রেতকর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতে।
ঘৃতাবসিক্তং রাজানং সহ মাদ্র্যা স্বলঙ্কৃতম্।।
তুঙ্গপদ্মকমিশ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধৈর্বিধিনা সমদাহয়ন্।।”[১৯]

ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল রাজের আজ্ঞাবাহী হয়েছিলেন। কাশীর মহাশ্মশানের দক্ষিণাংশ রক্ষার দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন। ‘দেবীভাগবতম্’ পুরাণগ্রন্থে সেই শ্মশানের বর্ণনা রয়েছে। হরিশ্চন্দ্র মৃতব্যক্তির বস্ত্র সংগ্রহ করতেন। শবের মালায় পরিপূর্ণ ছিল সে শ্মশান। অতি দুর্গন্ধময়। চিতার ধোঁয়ায় শ্মশানক্ষেত্র ভীষণ হয়ে উঠত। অসংখ্য শৃগাল-কুকুর-শকুনি প্রভৃতি পশুপাখি নিরন্তর দলে দলে শবমাংস ভক্ষণ করতেন। গলিত শবের পূতিগন্ধে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকত। শ্মশানের সর্বত্রই নরকঙ্কাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকত। স্থানে স্থানে অর্ধদগ্ধ শবমুণ্ড, বিকৃত দন্ত শ্মশানভূমির যত্রতত্র পড়ে। ভীষণ চিতাগ্নির চটচট ধ্বনি। শ্মশান ক্ষেত্রের চারধারে শত শত শৃগাল, ভূত-প্রেত, পিশাচ ও ডাকিনী এবং নিশাচরেরা দলে দলে বিকট শব্দ করে ঘোরে। শ্মশানের সর্বত্র ছোট ছোট কলস, শববস্ত্র, ছিন্ন শবের কেশ। এছাড়া নিশাচরদের ভোজনের আনন্দ। কিন্তু শ্মশানের এমন রূপই চরম নয়। হরিশ্চন্দ্র-শৈবার পুত্রের অপমৃত্যু হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর মতো তীব্রতর দুঃখ ও দহন পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। জীবন যখন এমন নশ্বর, তখন সত্যধর্ম অবলম্বনই শ্রেয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র শবের বস্ত্র পরিধান করে সেই দুর্গন্ধময় ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে যাত্রা করেছিলেন। ‘দেবীভাগবতম্’ পুরাণে উল্লিখিত আছে –

“কস্মিংশ্চিদথ কালে তু মৃতচৈলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ।।
চাণ্ডালেনানুশিষ্টস্তু মৃতচৈলাপহারিনা।
রাজা তেন সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্।।
পূর্য্যাস্তু দক্ষিণে দেশে বিদ্যমানং ভয়ানকম্।
শবমাল্যশমাকীর্ণং দুর্গন্ধবহুধূমকম্।।”[২০]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ গ্রন্থের ‘চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ’ –এর ৫০ সংখ্যক পদটিতে মানুষের মৃত্যুর পরে আগুনে দাহ করার রূপকে নির্বাণ প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে। শবরপাদ নির্বেদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়েছে। তিনি নির্বিকল্প অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর শবরত্বের অবসান ঘটে গেছে। ঐ দেখ, সেই শবর নির্বাণ লাভ করেছেন। পদকর্তা লিখেছেন –

“চারি বাসে গড়িলারেঁ দিআঁ চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরোডাহকত্রলা কান্দই সগুণশিআলী
মারিল ভবমত্তা রে দহ দিহে দিধলিবলী।”[২১]

ছত্রটির অভিধানগত অর্থ লৌকিক শ্মশান চিত্রের পটভূমিকে রূপায়িত করেছে। বাঁশের চাঁচড় দিয়ে মৃতদেহ রাখার চারপায়া খাট নির্মাণ করা হল। সেই খাটে শবদেহ শায়িত আছেন। এরপর দাহকর্ম সম্পন্ন করা হল। পদটির অভিপ্রায়গত অর্থ বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণতত্ত্বের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু পদটির লৌকিক তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয়। আজ থেকে হাজার এগারোশ বছর আগে, সেই প্রাচীন বাংলায় বাঙালিদের সৎকারের রীতিই ছিল মৃতদেহকে বাঁশের খাটিয়ায় করে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্মশানে নিয়ে যাওয়া। চিতায় একের পর এক কাঠ সাজিয়ে আশ্চর্য শিল্পিত রূপ দেওয়া হত। তারপর মৃতদেহকে চিতার উপর রেখে কাঠের সজ্জাসহ দাহ করা হয়। মাংসভুক শৃগাল শকুনি কাঁদতেন কেন? তাদের আহার্য বস্তু তাদের সামনেই আগুন গ্রাস করে নিচ্ছে। সুতরাং শৃগাল শকুনের কান্না স্বাভাবিক। শবরকে দাহ করার কথা পদকর্তা এখানে বলেন নি ঠিকই, কিন্তু শ্মশানের রূপকে নিভৃত নির্বাণ পথের সিঁড়ি রচনা করলেন পদকর্তা। জীবন-মৃত্যুর বাস্তবমুখী এই ছায়াপথ স্বর্গ পথের সিঁড়ি রচনা করল। স্বর্গ হিন্দুদের কাছে চির বসন্তের দেশ।

বাংলার বর্ণবিন্যাস ও জনতত্ত্ব অনুসারে চণ্ডালেরা ব্রাহ্মণেতর জাতি। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন – চণ্ডালেরাই সমাজের নিম্নতম স্তর –

"চণ্ডাল ও অন্ত্যজ এই দুই-ই সমার্থক।"[২২]

চর্যাপদে ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর, কাপালি প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় জাতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। চর্যার ১০ সংখ্যক পদে ডোম (ডোম্বি) রমণীর উল্লেখ করেছেন পদকর্তা কাহ্নুপাদ। এই রমণীকে ছুঁতে নেই, কারণ তিনি নিম্নবর্গীয়, অন্ত্যজ ও অচ্ছুত। এই নারীকে স্পর্শ করলেই ব্রাহ্মণ তথা সাধারণ মানুষও অপবিত্র হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধিরা অস্পৃশ্য ডোম সম্প্রদায়কে নগরের মধ্যে স্থান দেননি। সেকারণে নগরের বাইরে গ্রামের প্রান্তসীমায় কুঁড়েঘরে তিনি বসবাস করেন, তিনি চাঙাড়ি বিক্রি করেন। কাহ্নুপাদ এই নারীর জন্যই হাড়ের মালা পরেছেন। মহাসুখ লাভ করতে চেয়েছেন। পদকর্তা লিখেছেন –

"নগরবাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।"[২৩]

চর্যাপদে ডোম্বিনী নারীর মত 'মাতঙ্গি' অর্থাৎ চণ্ডালী রমণীর উল্লেখ আছে। ১৪ সংখ্যক চর্যার উল্লিখিত হয়েছে–

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।।
বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।।"[২৪]

নদীতে নৌকা চলাচলের ছবি। মাতঙ্গী ডোম্বীর নৌকায় নদী পারাপারের রূপকে যোগসাধনার মাধ্যমে ভবনদী উত্তীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য মেলে। চর্যার ১৯ সংখ্যক পদে বলা হয়েছে, কাহ্নপাদ নিম্নবর্গীয় ডোম্বিনীকে যৌতুকের জন্য বিবাহ করে নিজের জাতি বিসর্জন দিয়েছেন –

"কাহ্ন ডোম্বীবিবাহে চলিআ
ডোম্বী বিবাহিআ আহরিউ জাম
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।"[২৫]

'বৃহদ্ধর্ম্মপুরানম্' গ্রন্থে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক সময়কালীন বাংলাদেশের জাতি বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন পুরাণকার। নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে হীন জাতিরূপে পুরাণকার অন্ত্যজ বা অধম সংকর জাতির উল্লেখ করেছেন। ৩৬ টি জাতি প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত জাতিরূপে চিহ্নিত হত। এই শ্রেণীর নিম্নবর্গীয় জাতি হল চণ্ডাল। পুরাণকার চণ্ডাল জাতিকে সংকর - অধম জাতি বলে চিহ্নিত করেছেন –

"ধীবরাদপি শূদ্রায়াং মত্তজাতির্বভূব হ।
ইত্যাদি যেহন্ত্যজাঃ প্রোক্তা বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃতাঃ।।
তে চোক্তা মধ্যমা বিপ্র অধমাঃ সঙ্করান্তরম্।
সঙ্করান্তরসম্ভূতাঃ সচণ্ডালমনাদয়ঃ।।"[২৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে কবি কৃষ্ণকে 'চাণ্ডাল' বলে অভিহিত করেছেন। 'দানখণ্ড' - এ কবি লিখেছেন –

"চাণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে।"[২৭]

অনুরূপে 'বাণখণ্ড' - এ কৃষ্ণের কার্যাবলীকে চণ্ডালের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। সমকালের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রও চণ্ডালকে সামাজিক অস্পৃশ্যতা ও ভীতিকর জীব বলে দেগে দিয়েছিলেন –

"হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী।"[২৮]

সমগ্র প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ জুড়ে অধম সংকর চণ্ডাল তো বটেই, এককথায় সমগ্র নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রক ছিলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। এঁরাই ছিলেন শূদ্রদের 'হত্তা-কত্তা-বিধাতা'। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্মশানের মধ্যে সমাজবর্জিত ও সাধারণ মনুষ্যবর্জিত হয়ে, চিতার আগুনে পেষণে পেষণে হৃদয় ও মানবিক বোধগুলো যখন ছিঁড়ে খুঁড়ে পুড়ে যায়, তখন আর অবশিষ্ট কি থাকে? ক্রোধ, অবদমন এবং ঘৃণা। যা তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী পেয়ে এসেছে, তাই তারাও ফিরিয়ে দিয়েছে কখনো সখনো, সময়ে সময়ে সসম্মানে। সমাজ তাদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দিলে না। যুগসঞ্চিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পাপকে বহন করতে করতে চণ্ডাল সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিলেন ক্লান্ত, অসহায়। বেদের যুগে নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের আর্যরা কোন মর্যাদাই দিতেন না। চণ্ডালেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বংশপরম্পরায় ভারবহনকারী পশুর মতই জীবন ধারণ করেছেন। বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতাও এদের ছিল না। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র চণ্ডালের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্মম। মানবিকতা, আবেগ অনুভূতির সামান্যতম ব্যাকরণকেও এঁরা শাসন করেছে নির্মম চাবুক দিয়ে। বৈদিক পরবর্তী যুগে মহর্ষি মনুর সৃষ্ট পথই হয়ে ওঠে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পথ ও পাথেয়। রামায়ণের কালে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পেরিয়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের কোন কাজই স্বাধীনভাবে করার উপায় ছিল না। এমনকি দশরথ পুত্র মহাকবি বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়ক রাজা রামচন্দ্রেরও নয়। রামচন্দ্র যে শূদ্র নৃপতি শম্বুককে অযৌক্তিক, বিবেকবর্জিত ও বিবেচনাহীনভাবে হত্যা করেছিলেন তাও ছিল সমকালীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কুশলী পরামর্শ।

সন্তানসম্ভবা পত্নী সীতাদেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করার মধ্যেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র্যের সুবিস্তৃত প্রসারিত হস্তের দীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত রয়েছে। রামচন্দ্রের এসব কাজ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুমোদিত হলেও তাঁর চরিত্র গৌরব বৃদ্ধি করেনি। শূদ্রজাতি যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। ভারতবর্ষে দৃপ্ত আর্যসভ্যতা পদদলিত করে গেছে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য অনার্যদের। মহাভারতের যুগেও নিম্নবর্গীয় অনার্য অস্পৃশ্যদের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। একথা ঠিক, ভারতবর্ষীয় সমাজ কর্ণের প্রকৃত পরিচয় জানতেন না। তাঁকে সারথীর পুত্র বলেই জেনেছিলেন। তাই বীর্যবত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও ক্ষত্রিয় সমাজ তাঁকে একযোগে প্রতিহত করে সমাজ কাঠামোর বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। রাজ পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের তাঁর কোন অধিকার ছিলনা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তাড়িত কর্ণের নির্মম পরিণতি কে না জানে? এরপর সৃষ্টি হল পুরাণ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হল পুরাণ। মহর্ষি মনু নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য যে মৃতযুগের কারাগার তৈরি করেছিলেন, পুরাণকারেরা আচার আর সংস্কারের বেড়াজালে কয়েক শতাব্দী জুড়ে ভারতীয় সমাজকে উপহার দিয়েছে কঙ্কালের স্তূপ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে শূদ্র এবং নারী নিধনের তপস্যা করেছিল। মন্ত্রতন্ত্র এবং অলৌকিক আচারের সাধনায় ব্রাহ্মণ্য প্রতিনিধিরা নিজেদের দেবতার সমপর্যায়ে তুলে ধরেছেন। নারীর জন্য সতীদাহ আর চণ্ডালের জন্য দুর্গম বীভৎস শ্মশান ক্ষেত্র। এমন আবহ নির্মাণ ছিল সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগ জুড়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দান। হিন্দুশাস্ত্রে চণ্ডালকে স্পর্শ করা, চণ্ডাল স্পর্শদোষ জনিত জল পান, চণ্ডালের অন্নভোজন, চণ্ডালের নিকট থেকে ধন গ্রহণ, চণ্ডালী গমন প্রভৃতি কারণে সুনিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত বিধির পালনীয় উপদেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকারেরা। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'স্মৃতিচিন্তামণিঃ' নামের হিন্দু শাস্ত্রে এমনই অনেক শ্লোকে চণ্ডাল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের উল্লেখ করেছেন –

"যস্তু চাণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ।
স তু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ।।"[২৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না জেনে চণ্ডাল স্পর্শজনিত জল পানে প্রায়শ্চিত্ত হবে, কিন্তু জেনে পান করলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হবে। মধ্যযুগের সমাজপতিরা এইসব পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রকে আপনাদের দেবোত্তর সম্পত্তি বলেই মনে করতেন। আর এসব গ্রন্থগুলিকে লোকসমাজের মুখচ্ছদ হিসেবে তুলে ধরে সমস্ত সমাজদেহকে কলুষিত আচারে পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। মানবতা ঢাকা পড়েছিল পূতিগন্ধময় সামাজিক কুপ্রথার অন্তরালে। হিন্দুশাস্ত্রের মুক্তিমোক্ষের চাদরে ঢাকা পড়েছিল শতাব্দী লাঞ্ছিত নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের ক্রন্দন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠিন পেষণে চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় শূদ্ররা মানবেতর জীবন যাপন করেছিল। ভারতবর্ষে জাতি এবং বৃত্তিকে এক করে দেখা হয়েছে। নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায়ের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত। অস্পৃশ্য মানুষের বৃত্তিমুখরতা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমগ্র সমাজদেহকে পুষ্ট করলেও তা তাদের গৌরবান্বিত করেনি। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বহমান ঘৃণা তাদের মানুষ হিসাবে কোন মর্যাদাই দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।"[৩০]

এমন রবীন্দ্রকথিত 'আত্মপ্রসাদ' শূদ্রের মর্যাদাবোধ ফিরিয়ে দেয় নি। যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত হতে হতে, তাদের হৃদয়বৃত্তি শুকোতে শুকোতে, তারা যে নিষ্প্রাণ পাথরে পরিণত হচ্ছিল সে কথাতো অস্বীকার করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন শূদ্রত্বে শূদ্রের কোন অসন্তোষ নেই।

ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মের দেশ। তবুও মনে হয়, রবীন্দ্রকথিত শূদ্রত্বভার কোন সম্পদ নয়। একথা ঠিক, এমন সম্পদকে রক্ষা করার মধ্যেও কোন গৌরব নেই। প্রবন্ধটিতে শূদ্র সম্পর্কে রবীন্দ্র চিন্তন নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। তবুও রবীন্দ্রনাথের শূদ্র সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান মন্তব্য ধীমান পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি এড়াবে না।

> "ধর্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে। ...আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয় তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।"[৩১]

বাংলা সাহিত্যে অনাথ শবের সন্ধান দিয়েছেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দেবদাস' উপন্যাসে। দেবদাস মুখোপাধ্যায়। কুলীন জমিদার ব্রাহ্মণ। পার্বতীর শ্বশুরালয় হাতীপোতার জমিদার ভুবনবাবুর বাড়ির সম্মুখে দেবদাসের মৃতদেহ। দেবদাস হয়ে উঠেছেন অজ্ঞাত পরিচয় শব। কে দাহ করবে তাঁকে? কে ছোঁবে? কি তাঁর জাত? জাতিভেদ জর্জর পল্লিগ্রামের লোকসমাজে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র এই অনাথ শব দেবদাস সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বড় বেদনার –

> "ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও, পাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না, কাজেই চণ্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তার পর কোন শুষ্ক পুষ্করিণীর তটে অর্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল – কাক শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল-কুক্কুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ...বলিতে বলিতে পার্বতী ছুটিয়া নামিয়া পড়িল। মহেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ওমা, কোথা যাও? দেবদার কাছে। সে ত আর নেই-ডোমে নিয়ে গেছে।"[৩২]

তারপর পার্বতী মূর্ছিত হলেন। মূর্ছা ভঙ্গ হলে তিনি বললেন, রাত্রিতে এসেছিলেন। সমস্ত রাত। তারপর তিনি চুপ করে গেলেন। এরপর পার্বতী কেমন ছিলেন আমরা জানি না। তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় না। সামান্য কয়েক লাইনেই লেখক চণ্ডাল তথা ডোমেদের দ্বারা অনাথ শব সৎকারের ছোট চিত্রে উপন্যাসের কথাবস্তুকে অসামান্য করে তুললেন।

'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বৈজু শ্মশান চণ্ডাল। লেখকের কলমে বৈজু সময়ে সময়ে 'বৈজুনাথ' হয়ে উঠেছেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র অবশ্য উপন্যাসে এই শ্মশান চণ্ডালকে কখনো সম্মান সূচক সম্বোধন করেন নি। শ্মশানে শবদাহের সময় বৈজুর হাতে থাকে লাঠি। সমাজে বৈজু তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। নিজের সম্পর্কে সে বলেছে–

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আমি জাতচাঁড়াল গো, আমি তারাগুলা জলে দেখি আমার মাস শেয়াল শকুনে খায় না গো!"[৩৩]

শ্মশানে মড়া দেখে দেখে বৈজু অর্জন করেছিল একরাশ ক্লান্তি – জীবনের ক্লান্তি। চিতার আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে বৈজু বলেছে –

"মড়া দেখি দেখি আমি মাটি হইছি গো, আমি তো শব গো, বহুদিন মরে আছি হে।"[৩৪]

বৈজু নীচ কুলোদ্ভব। সে অস্পৃশ্য। শ্মশানে জ্যোতিষী তাকে অভিশাপ দিয়েছে –

"ফের বেটা হারামজাদা চাঁড়াল! বড় বাড় বেড়েছে তোর... খড়ম পেটা করে আমি তোর নাম ভুলিয়ে দেবো... ছোট জাত। ...পাষণ্ড, বেটা তুই কুকুর হয়ে জন্মাবি।"[৩৫]

শ্মশানে কখনো সখনো রমণীকে পুড়িয়ে মারা হয় অর্থাৎ সতীদাহ হয়, সতী স্বর্গে গমন করেন। পুণ্যবতী নারী। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধি জ্যোতিষী অনন্তহরি বৈজুর উদ্দেশ্যে বলেছেন –

"তুই শালা চাঁড়াল, বামুন কায়েতের সতী, এর ছায়া মাড়াবি না।"[৩৬]

চণ্ডাল বৈজুনাথ চিতা সাজানোয় পারদর্শী। চিতা সাজানো হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্গত। 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বৈজু চিতা সাজানোর শুরুতে জমিকে প্রণাম করেছেন। চিতার মাপ নিয়েছেন। হামাগুড়ি দিয়ে হাত মেপে মেপে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। খুঁটি বসিয়েছেন। হাওয়ার গতি নির্ণয় করেছেন। গঙ্গার দিক নির্ণয় করেছেন। চিতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিচার করেছেন। সমগ্র উপন্যাসে বৈজুনাথ ঘৃণিত ছোটজাত তকমা নিয়েই কাটিয়েছে। উপন্যাসে তার মুক্তি নেই। তার হাঁটা চলা সভ্য মানুষের মত হলেও তাকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হবে –

"বেটা তুই পাতকুড়নোর অধম ছোট জাত, ...হাঁটছিস আমাদের মত।"[৩৭]

বৈজুনাথ শ্মশান পরিচর্যাকারী। তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নির্দেশিত পথেই সে চলতে অভ্যস্ত। তবুও সে ভূত নয়, প্রেত নয়। এই শ্মশান চণ্ডালের মধ্য দিয়েই লেখক উপন্যাসে দুর্গন্ধ পীড়িত কদর্য সমাজভূমিতে মানবিকতার বিশুদ্ধ হাওয়া সঞ্চালিত করেছেন। শ্মশানের চণ্ডাল হওয়ার জন্য বৈজুনাথের কোনদিন কোন ভয়ডর ছিল না। ভয় কি সে কোনদিন জানে না। এই গঙ্গা তীরবর্তী মহাশ্মশানে সে একাকী। তার ভয় নেই। তার মনে হয় সে ভূত, প্রেত, চণ্ডাল কিংবা চিতা। গঙ্গার স্রোত তার সঙ্গে কথা বলে। উপন্যাসে এই চণ্ডাল বৈজু হয়ে ওঠে 'ডাকাত' নাম চিহ্নিত। শ্মশানে মৃতদেহকে সৎকারে সাহায্য করাই তার কাজ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তাকে কোথাও মর্যাদা দেয় নি। প্রায়ই তাদের সমবেত উচ্চারণ–

"হারামজাদা ... বেল্লিক ... শালা চাঁড়াল।" [৩৭.ক]

কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসটি যেন শ্মশানের অলৌকিক মৃতপ্রায় ব্যাধিভারে পীড়িত। উপন্যাসটি মধ্যযুগের। যা সেই পঙ্কিল যুগকে স্মরণ করায়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নির্দেশিত শ্মশানের সামগ্রিক রূপটি এখানে প্রতিফলিত। শ্মশানে চলমান হিন্দু মিথকে পূর্ণরূপে সাহিত্যলগ্ন করেছেন লেখক। উপন্যাসে রয়েছে শ্মশান, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, হিন্দু রীতি ও সংস্কার, মোক্ষ বা মুক্তি, কামনা, মৃত্যুকালীন গঙ্গাজল পান, নারায়ণ শিলা পূজা, গীতা পাঠ, শ্মশান কীর্তন, কীর্তনের দল, হরিনাম সংকীর্তন, হিন্দু জ্যোতিষী, ও জ্যোতিষ গণনা, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারী চিতা, দাহকর্ম, পিণ্ড দান, শ্মশান কলস প্রভৃতি। এছাড়া পুরাণ উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ, সতীদাহ, পঞ্চমুণ্ডীর ঘাট, প্রেতলোক, গঙ্গায় ডুবে মরণের অভিলাষ, হিন্দু অলৌকিকতা, কৌলীন্য প্রথা, মানব জীবনে মঙ্গল-রাহু-বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের প্রভাব, দুর্গা নাম জপ, শ্মশান সঙ্গীত, শ্মশান বাদ্য, মহাভারতের মাদ্রীর উল্লেখ, মহর্ষি মনু নির্দেশিত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, চিতা সাজানো, কন্যা সম্প্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, তর্পণ, সতী মাহাত্ম্য, দশমহাবিদ্যা, মহাভারতের মাদ্রী মাহাত্ম্য, ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা, শিব-দুর্গা, ভূত-প্রেত, জন্মান্তর, পুনর্জন্ম, শবযাত্রী, তুলসী গাছ, মনুসংহিতা, সপ্তর্ষি মণ্ডল, শ্মশানের অশরীরী রহস্য প্রভৃতির বাস্তব চিত্রকর কমলকুমার।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নির্দেশিত নিয়মের বেড়াজালে যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত, পদদলিত নিম্নবর্গীয় চণ্ডাল প্রতিনিধি বৈজুনাথের মুখে ভাষা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। মানুষের মৃতদেহ সৎকার করতে করতে জীবন মৃত্যু সম্পর্কে আত্মদর্শন লাভ করেছেন বৈজুনাথ। জীবন যন্ত্রণা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে তার বোধের উন্মেষ হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যেখানে অমানবিক, অপরিণত শ্মশান চণ্ডাল বৈজুর সেখানে ঘটে গেছে মানবিক উত্তরণ। শতশত শতাব্দীর পচনশীল সমাজদেহে যেখানে সংস্কারের নিশ্ছিদ্র সুবৃহৎ দেওয়াল তুলেছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, সেই দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে ঋতুরাজ বসন্ত ঋতুর মৃদুমন্দ হাওয়া প্রবেশ করেছিল শ্মশান চণ্ডাল বৈজুনাথের মত বিবেকী মানবিক সংবেদী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্মশান চণ্ডাল বৈজুনাথ বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী সৃষ্টি।

নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে শ্মশান সঙ্গীতে। এসব সঙ্গীতে মানব জীবনের অসারতা প্রতিফলিত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর মোক্ষ ও মুক্তির অভীপ্স ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে এখানে। সহজ কথায়, সরল সুরে নিম্নবর্গীয় লোকসমাজের কীর্তন শিল্পীরা (সঙ্গীত শিল্পী) হিন্দু দর্শনের সারতত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন সঙ্গীতে। ছোট ছোট উপলব্ধি, লৌকিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব চিত্রের মেল বন্ধনে চমৎকার নিরাসক্ত রূপ লাভ করেছে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন দর্শন। কোন গানে স্বল্পস্থায়ী মানবজীবনকে 'দোকানদারির' সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কোন গানে হাসি কান্নায় ভরা এই দু'দিনের ঘরে আত্মীয়জনের সাময়িক বিষণ্ণতা প্রতিফলিত। জীবন থেমে থাকে না। অনিবার্য মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে যায়। ছোটো ছোটো লোকজীবনে মৃত্যুর বিরাটত্বের সুর প্রতিফলিত। এ জীবন আমাদের ফেলে যেতে হবে। রেখে যেতে হবে সাধের ঘরবাড়ি। কিন্তু চিতার আগুনে সব পুড়ে যায়। বিষণ্ণ বেদনা শ্মশানভূমির ধূম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আকাশ-বাতাস ও মহাকাশকে ছুঁয়ে ফেলতে চায়।

শ্মশান সঙ্গীত জীবনকে পরিত্যাগ করে নয়। মানব জীবনের শৈশবের জল খেলা, যৌবনের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে ঘর-সংসার এভাবে একদিন বার্ধক্য আসে। দাঁত নড়ে। লাঠিতে (নড়িতে) ভর করে চলে জীবন। সমাজ সংসারের কাজ কমে যায়। বার্ধক্য মানুষকে জঞ্জালসম করে তোলে। অবশেষে একদিন আসে সেই সে দিন। যে দিন শ্মশান যাত্রার দিন। ঘর বাড়ি সংসার তুচ্ছ হয়ে যায়।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজন, ঘর-সংসার, জমি-বাড়ি, পুকুর-ঘাট, উঠোন বাগানের এই চেনা চৌহদ্দি জন্ম দেয় গভীর আসক্তির। লোকজীবনের পরিমণ্ডলে এই আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া দুরূহ। সংসার আসক্ত মানুষের এমন মুক্তি সত্য সত্যই কঠিন। সংসারের সীমানায় থেকে ইচ্ছে থাকলেও তা হয়ে ওঠে না। চিতার আগুনে পুড়ে পুড়ে মৃত্যু ধৌত মানুষ নতুন জন্ম নেয়। আসক্তির স্বাভাবিক অবসান ঘটে। তখন কোথায় পড়ে থাকে তার সাধের ঘর দুয়ার, টাকা-কড়ি, হাল-লাঙল জোয়াল। সংসারের জন্য জমি চষতে চষতে তার নিজের হৃদয়বৃত্তির জমিই অনুর্বর থেকে যায়। সাড়ে তিন হাত ভূমির ভেতরেই ইহ জগতের দেনা-পাওনা সবই চুকে যায়। গাছের জল শুকিয়ে যাওয়ার চিত্রকল্পে হই জীবনের নিরর্থকতা ফুটিয়ে তোলেন গায়ক কীর্তনীয়া। শ্মশান সঙ্গীত হয়ে ওঠে মৃত ব্যক্তির আত্ম-প্রতিরূপ। কোথায় পড়ে থাকে যশ-কীর্তি-খ্যাতি। গঙ্গা জল স্পর্শ করে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বর্গ পথের দরজা উন্মুক্ত করে দেন লোককবি –

"ঐ দোলা খাটে শ্মশান ঘাটে
এই সেদিন যাবে চলে হেলে দুলে
মরে গেলে এ মানুষ মরে গেলে
ঐ দোলা খাটে শ্মশান ঘাটে
পড়ে রবে জায়গা জমি টাকা কড়ি পয়সা দালান বাড়ি
মরে গেলে বলবে মড়া ডুব দেবে সবাই ছুঁলে
মরে গেলে এ মানুষ মরে গেলে
ঐ দোলা খাটে শ্মশান ঘাটে
যাবে চলে হেলে দুলে
নাগর দোল দিয়ে সেদিন সাজাবে তোরে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সোনার দেহ ঢেকে দেবে সাদা কাপড়ে
সেদিন বিধি মতে বংশধরে দেবে মুখেতে আগুন জ্বেলে
মরে গেলে মানুষ মরে গেলে
এই জন্মিলে মরিতে হবে বিজয় ধীবর বলে
একে একে যাবে সবাই
আপন দেশে চলে
বাজিবে করতাল আর খোল
বিদায় দেবে বল হরি বোলে।”[৩৮]

অপর একটি গানে রয়েছে শ্মশান যাত্রার ছবি। চারজনের কাঁধে ভর করে মৃত মানুষটি শ্মশানে যাচ্ছে। কেউ ঝাড়ে বাঁশ কাটছেন, কেউ বা দড়ি পাকাচ্ছেন। আর ব্যক্তিটি এ জীবনের সব দেনাপাওনা, লাভালাভ ও জীবনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন অজানা স্বর্গলোকের পথে। মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় লোককবি গেয়ে ওঠেন –

“কেহ কাটে ঝাড়ের বাঁশ
কেউ বা পাকায় দড়ি
চারজনাতে কান্ধে কইর‍্যা বলবে হরি হরি
রইলো রে তোর সাধের দোকানদারি (ঘরবাড়ি)
… … …
কত কষ্ট কইর‍্যারে মন
গইড়্যাছ ঘরবাড়ি
আগুনে পুড়িবে না মাথা
মারবে বাঁশের বাড়ি।
রইলো রে তোর সাধের দোকানদারি।।”[৩৯]

কোন গানে নশ্বর জীবনের প্রতি বীতরাগ ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর পরে লোকাচার পালনের মধ্যে প্রিয়জনকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আছে। আত্মীয় স্বজনের অবজ্ঞা জীবন পরবর্তী ধূসর মৃত্যুর মুখকে মেদুর, ছায়াময় ও করুণ রঙীন করে তোলে। লোককবি দেহকে মাটির দেহ বলেছেন। যে দেহ মাটিতেই বিলীন হবে। এই পবিত্র দেহ তুচ্ছার্থে হয়ে ওঠে ‘পচাদেহ’। এই দেহের যথার্থ কোন গৌরব নেই। মাটি দিয়ে কুমোর যেমন ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করেন তেমনি ঈশ্বর রক্ত মাংসের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জীবনের পরে মৃত্যুই হল মানুষের শেষ বিছানা। জ্বলন্ত চিতার সামনে লোককবি গেয়ে ওঠেন–

“ও তোর মাটির দেহ মাটি হবে
পুড়ে হবে ছাই
এ দেহ পচা দেহ গরব কিসের ভাই
হাড় মাটিতে কুমোর যেমন ঠাকুর গড়ে
রক্ত মাংসে দয়াল তেমন মানুষ গড়ে
শ্মশান হবে শেষ বিছানা রব ঘুমায়ে
খাঁচা পড়ে রবে পাখি যাবে পালিয়ে।”[৪০]

কোন গানে লোককবি বলেছেন, জীবনের অনেক সময় বৃথা অপব্যয় হয়েছে –

“ও মনো রে কার লাইগ্যা বান্ধ ঘর বাড়ি।”[৪১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুতরাং ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণ করে মুক্তি খোঁজেন কবি।

কোন গানে জীবনের অন্তিম সময়ে কৃষ্ণনাম শ্রবণের কথা আছে। মানুষ তাঁর অন্তিম শয্যার জন্য অপেক্ষা করেন। এই অন্তিম শয্যা হল সাড়ে তিন হাত ভূমির ভিতর নির্মিত ঘর। কবি বলেন –

"ও মন ময়না রে ...
এসেছো মন এই মাটিতে যেতে হবে এই মাটিতে
সাড়ে তিন হাত ভূমির ভিতর হবে যে তোর ঘর।।
... ...
ধান চাল টাকা কড়ি সবই কিছু রইবে কড়ি
শেষের দিনে এই হরিনাম হবে রে সম্বল
দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল।"[৪২]

কোন গানে কবি ইহজীবনের ব্যর্থতার কথা বলেছেন। সুতরাং পরকালের জন্য ভাববার কোন অবকাশ পান নি শ্মশানযাত্রী মানুষটি। বসত করার জন্য ঘর বানালেন, কিন্তু চাল ছাইতে পারলেন না। যে চাল কোন এক উপপ্লবে উড়ে গেছে। গাছ লাগালেন ফলের আশায়, কিন্তু জল সেচন করতে পারলেন না। গাছের ডাল শুকিয়ে ঝরে গেল। হাল লাঙল করে পরের জমি কর্ষণ করলেন, কিন্তু নিজের জমি বেহাল হয়ে গেল। এখন মৃত্যুর নদী পেরিয়ে ঈশ্বরের কৃপার উপর ভর করে ভবপারে পৌঁছানোর চেষ্টা ছাড়া উপায় কি? কবি লিখলেন –

"আশা কইর‍্যা গাছ লাগাইলাম ফল পাব বলে
জল দিতে পারলাম না আমি
শুকাইয়া গেল গাছের ডাল
গেল না আমার দুঃখের কপাল
হাল দিলাম লাঙল দিলাম জমি দিলাম চষে
পরের জমি চষতে চষতে নিজের জমি হয় বেহাল।"[৪৩]

অপর একটি গানে হরিনাম নিয়েই শ্মশান ঘাটে যেতে চান সংসারবদ্ধ মানুষটি। শ্মশানযাত্রী ব্যক্তিটির ঘর-বাড়ি আত্মীয় স্বজন সবই পড়ে থাকে। ইহজীবনে তো সংসারের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরেছেন। চিতার ধোঁয়ায় মান অভিমান সবই পুড়ে যায়। লোককবি লিখলেন –

"আমি হেলে দু'লে যাব শ্মশান ঘাটে
... ...
এই মান অভিমান পুড়বে সাথি
চিতার ধোঁয়াতে।"[৪৪]

এমন শেষের দিনে খোল করতাল সহযোগে হরিনামই কেবল সঙ্গী হবে। মৃত্যুর দিনে টাকা-পয়সা, গয়না গাঠি কিছুই সঙ্গে যায় না। দেহ যেদিন মাটি হবে, সেদিন সাড়ে তিন হাত জমির বেশি আর কিছুই দেবে না। মাটিতে শায়িত করার জন্য এইটুকু ভূমি মাত্র। লোককবি লিখলেন –

"সাড়ে তিন হাত জমির বেশি আর কিছুই দেবে না
সোনাদানা গয়না গাঠি একদিন হবে মাটি
একটুকরো কাপড়ও কেউ অঙ্গে দেবে না।"[৪৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবে মানুষ প্রথম সম্মানের সঙ্গে তাদের প্রিয়জনকে প্রথম সৎকার করেছে, আমরা জানি না। আদিম মানুষ বর্বর অবস্থা কাটিয়ে পরিশীলিত হয়েছে। যথার্থ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেছে সেই প্রাচীনকালে। মানুষ মানুষ হওয়ার সাধনা করেছে। কিন্তু সে সাধনা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। কবে যে মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হবে আমরা জানি না। মানুষের মানুষ হওয়ার অগ্রগমনের পথে কোন এক ধাপে আপনজনের মৃত্যুর পর মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে মানুষ সৎকার করেছে। পালন করেছে আচার ও রীতি-নীতি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এক এক জাতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকার করেছে। প্রাচীন মিশরে ফ্যারাওদের মমি বড় বিস্ময়। ফ্যারাওদের নির্মিত সমাধিস্তম্ভ 'পিরামিড' মানব সংস্কৃতির বিরাটত্বকে প্রকাশ করেছে। মুসলমান সম্প্রদায় মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে কবর দেন। পত্নী মমতাজের মৃত্যুতে সম্রাট সাজাহানের নির্মিত সমাধি মন্দির 'তাজমহল' আজও সমস্ত মানবজাতির সৌন্দর্যের বিস্ময়কর স্মারক। হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকার করা হয় শ্মশানে। এই শ্মশান হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র স্থান। হিন্দু জাতির বহু শতাব্দীর ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক ও আচার আচরণগত পরিশীলনের চিহ্নিত ছাপ থেকে গেছে শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের মধ্যে। হিন্দুর মিথ-মোক্ষ-মুক্তি-দেববাদ, জীবন-মৃত্যু কেন্দ্রিক দার্শনিকতা, শ্মশান রক্ষক ও সঞ্চালক, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, প্রথা ও আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, আত্মা ও পুনর্জন্ম, জীবনের গূঢ় রহস্য ও অসীমতা সবই যেন শ্মশানের কয়েক বর্গফুট ভূমির মধ্যে ক্রিয়াশীল। শ্মশান সঙ্গীত হিন্দু সংস্কৃতির নশ্বরতাবোধক মোক্ষ মুক্তির গান। মানব জীবনের চাওয়া-পাওয়া, লাভ-লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ সবই চিতার আগুনে লীন হয়ে যায়। চিতা বিশিষ্ট লোকশিল্প সৌন্দর্যের স্মারক।

এই শতাব্দীতে কেমন আছেন সেই শ্মশান চণ্ডালেরা? না - তারা ভাল নেই। অনেক নিম্নবর্গীয় জাতির বৃত্তি হারানোর মতো শ্মশান চণ্ডাল বা ডোমেরাও তাদের বৃত্তি হারিয়েছে। বৃত্তি হারানোর সময়ে তাদের সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিল না। না ছিল সঞ্চিত কিছু টাকা কড়ি, না ছিল এক প্রস্থ ভূমি, না ছিল জীবিকা অর্জনের জন্য সভ্য মানুষের মত বেঁচে থাকার সামান্য কিছু অর্জিত শিক্ষা দীক্ষা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আকাশ বাতাস জল স্থলের কণামাত্রও চণ্ডালদের জন্য রাখেন নি। তারা নিজেদের মধ্যে দখল ও বিলিবণ্টন করে নিয়েছে। হিন্দুর চিতা কাঠের স্থান নিয়েছে বৈদ্যুতিক চুল্লি। চণ্ডাল বা ডোমের স্থান নিয়েছে মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শি পরিজনেরা। সেই শৈল্পিক চিতা কিংবা আলো-আঁধারি রহস্যময় ভয়ঙ্কর ঐশী শক্তি সম্পন্ন শ্মশানের ধারণা আজ আর নেই। চণ্ডালেরা বৃত্তিচ্যুত হলেও সমাজ তাদের পরিপূরক বৃত্তির কোন ব্যবস্থা করেন নি। বরং এই নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নির্দেশিত শতাব্দী সঞ্চিত অস্পৃশ্যতার ভার বহন করে চলেছে আজও। কি করছে চণ্ডালেরা? এরা অনেকেই গ্রামে-গঞ্জে ভিক্ষাবৃত্তি করে। অনেকেই হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে কিংবা কলকাতার ফুটপাতে ফুটপাতে ভিক্ষাবৃত্তি করে। অনেকেই যক্ষারোগাক্রান্ত বা কুষ্ঠরোগী। অনেকে কলে কারখানায় বা ফুটপাতের ধারে ধারে নর্দমায় ময়লা পরিষ্কার করে অস্বাস্থ্যকর জীবন কাটায়। স্টেশন কিংবা খোলা আকাশের তলে শীতের রাতে এদের সংসার। কেউ কাগজের টুকরো কুড়োয়, কেউ পরিত্যক্ত মৃত মানুষের কম্বল জড়িয়ে শীত নিবারণ করে। এদের দেখার কেউ নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজে কোন সৎ মানুষ বলে কিছু হয় না। আর ধনতান্ত্রিক সমাজে সব মানুষের শ্মশান যাত্রা এবং স্বর্গযাত্রার চলন বলনও এক রকম হয় না। তবুও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত মানুষের জন্য একই রকম উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, আত্মা কখনো জন্মগ্রহণ করেন না অথবা মৃত হন না। কিংবা পুনরায় উৎপন্নও হন না। আত্মা জন্মশূন্য, শাশ্বত ও প্রাচীন। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা অবিনাশী –

> "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বান ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।"[৪৬]

জাত-জর্জরিত বাংলাদেশে 'ছোটজাত' দুলের মেয়ে অভাগীরও মৃত্যুর পরে স্বর্গ যাত্রার ইচ্ছে হয়। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সঙ্গতিসম্পন্ন ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে 'ধূমধামের শবযাত্রা' দেখতে ভিড় জমে যায়। গ্রামের গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। চন্দন কাঠের চিতা, (তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্প) ঘৃত-ধূপধুনো-মধুতে পরিপূর্ণ চিতা সংলগ্ন শ্মশানভূমি। প্রজ্বলিত চিতার নীলধোঁয়া রথের মত উর্দ্ধমুখী হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলে। মুখুজ্জ্যের মৃত পত্নীর সিঁথিতে সিঁদুর, পা দু'টি আলতায় রাঙানো। এ যেন মৃত ব্রাহ্মণ পত্নীর রথে চড়ে স্বর্গ যাত্রার ছবি। এ সংসারে অভাগীরা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেশি দিন বাঁচে না। মৃত্যুর পরে চিতা সাজানোর প্রয়োজনে তাঁর নিজের হাতে পোঁতা গাছটা জমিদার কাটতে দেয় নি। ব্রাহ্মণ জমিদার মৃতদেহকে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। ভট্টাচার্য মশায় বলেছেন –

> "তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? ...তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল। ...পোড়া খড়ের আঁটি হইতে স্বল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল।"[৪৭]

এই হল বাংলার নিম্নবর্গীয় দুলে-বাগদিদের মৃত্যুর পরে স্বর্গগমনের ছবি।

বাংলার শ্মশানগুলির বর্তমান অবস্থা কেমন? শ্মশান বা দেবতা স্থান সর্বসাধারণের সম্পত্তি। অত্যন্ত পবিত্র ভূমি। কিন্তু বর্তমান গবেষক দেখেছেন, দেবোত্তর স্থান, শ্মশান বা গ্রামীণ হাট-বাজারকে সেকালের জমিদার বা গ্রামের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মাতব্বরেরা সর্বসাধারণের অগোচরে নিজেদের নামে লিখে রেখেছেন। ফলে পরবর্তীকালে গ্রাম্য মোড়লদের উত্তরাধিকারীরা এসব সম্পদ কাগজের বলে নিজেরাই আত্মস্মাৎ করে নিচ্ছেন – এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শ্মশান সংলগ্ন ভূমিকে এরা কেটে কেটে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। এগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রাচীনকালের চণ্ডালরাজ আজ আর নেই। হিন্দুর পবিত্র শ্মশানভূমি বর্তমানে হয়ে উঠেছে মল, মূত্র ও আবর্জনা ফেলার স্থান। শ্মশান আজ জঙ্গল, আগাছা ও ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ। আজও ভারতীয় সমাজদেহ তালুবন্দি হয়ে রয়েছে সতীদাহ প্রথা প্রবর্তনকারী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উত্তর - পুরুষের কাছে।

শরৎ সাহিত্যের স্থানে স্থানে এসেছে শ্মশানের নানা চিত্র। লেখকের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে গঙ্গা নদীতে মাছ চুরি করতে গিয়ে ইন্দ্রের শ্মশান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র। নদীর ধারে প্রাচীন বট গাছের পাশে যে মহাশ্মশান, সেখানে কলেরা বা মহামারী আক্রান্ত মৃতদেহকে সকলে পোড়াতে পারে না। একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে চলে যায়। সেই শবকে শৃগালে কুকুরে ভক্ষণ করে। অবশিষ্ট অংশ পড়ে পড়ে পচতে থাকে। বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। পড়ে থাকে অনেক অকালমৃত শব। গভীর নিশীথেও শোনা যায় শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীৎকার। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ-তাড়ন শব্দ। গঙ্গার তটে ভেসে আসা গৌর বর্ণ হৃষ্টপুষ্ট বালক। সনাতন হিন্দু সন্তানের পরিচয়হীন মৃতদেহ স্পর্শ করা পাপ। এই দেশ বশিষ্ঠের দেশ। বংশগত সংস্কার, জন্মগত সংস্কার আর জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়। মৃত্যুকালে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল কিনা, কোন জাতি তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। অজাত-কুজাত ও অস্পৃশ্য মৃত দেহকে ছুঁতে নেই। উপন্যাসে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের সংলাপের মধ্যে ফুটে উঠেছে হিন্দু শ্মশানের ভয়াবহ চিত্র –

> "ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! ...কোনখানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই? ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত – সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চলে যায়, - আরে দূর! ভয় কি রে! ও শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করচে। ...শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে। ...হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস? ...তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! ...কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকে এখানে থাকতে হয়।"[৪৮]

হ্যাঁ-একথা ঠিকই, সকলে স্বর্গে যেতে পারে না। মৃত্যুর পরে কেউ কেউ স্বর্গে যায়। কারো কারো মৃতদেহ শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। অসম সমাজ ব্যবস্থার এই দেশে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিশেষত নিম্নবর্গীয়দের জন্য এমন ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছে। বামুন-কায়েতের কথা থাক, মাছ চুরি বিদ্যায় অভ্যস্ত ইন্দ্রনাথ তবু বুঝেছিল - মড়া মড়াই – মড়ার কোন জাত নেই। আর 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী হল – মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্রগুলি ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ সকল পরিত্যাগ করে অপর নতুন দেহ প্রাপ্ত হন -

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।"[৪৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনায় শ্মশানের উল্লেখ রয়েছে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে (৯ই মার্চ, ১৮৮০) লিখেছেন 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্পূর্ণ কাব্য এটি। কাব্যের রচনাকাল আরও চার বৎসর পূর্বের বলে মনে করা হচ্ছে। কাব্যের 'সপ্তম সর্গ' - এর সুদীর্ঘ কবিতাটির নাম 'শ্মশান'। কবির কবিতায় শ্মশানের ভীষণ রূপ প্রতিভাত। সেই নদী তীরবর্তী শ্মশান, যেন গম্ভীর প্রান্তর। শাখাপ্রশাখা হীন শুষ্ক বৃক্ষ সেখানে। পৃথিবীর ধ্বংসরাশি। প্রাণহীন শ্মশান যেন অন্ধকারে অস্থিভস্ম লুকিয়ে রেখেছে। মৃত মানব কঙ্কাল। ভূলুণ্ঠিত মৃতের দাঁত যেন পৃথিবীবাসীকে উপহাস করছে। শ্মশানের কোন স্থানে চিতা জ্বলছে। কোথাও ধূমরাশি। কোথাও শৃগাল শকুনের ক্রন্দন। সূর্যরশ্মি শুষ্ক ম্লান। তটিনী বিষণ্ণ গান শোনাচ্ছেন। কুমারী ঊষা, শ্মশান ভস্ম সেই পুরাতনী হিন্দু পুরাণকথাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, সতীদাহ প্রথা – কবিতায় টুকরো টুকরো ঘটনাকে আশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ–

"সেই সে বালিকা তোরে দেখিতাম বনে
চিতার অনলে আজ হবে তোর শেষ?
সুখের যৌবন হায় পোড়াবি আগুনে?
সুকুমার দেহ হবে ভস্ম-অবশেষে।"[৫০]

স্মৃতিচারী হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। তরুণীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর কিশোরী বেলায়। যেখানে সেই পাতার কুটির, সেখানে পত্রপল্লবের মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। সেই সে বালিকা ফুল গাছে জল ঢালেন। আলো ছায়ার লুকোচুরি দোলা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"ভস্মরাশিসমাকুল শ্মশান প্রদেশ!
মলিনা কমলা ছাড়া যেদিকে নেহারি
বিশাল শ্মশানে নাই সৌন্দর্যের লেশ,
জন প্রাণী নাই আর কমলারে ছাড়ি।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী' গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসে। কবির 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' অংশ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে 'যাত্রী'র প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বালিদ্বীপে অবস্থানকালে সেখানে মানুষের মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরিচয় পেয়েছেন। বলিতে কোন পরিবারে বয়স্ক গুরুজন থাকা সত্ত্বেও যদি কমবয়সী কোন সদস্যের মৃত্যু হয়, তবে তাঁর মৃতদেহ সৎকার করা হত না। বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ সংরক্ষিত করা হত। পরে অনেকগুলি দেহের একসঙ্গে দাহকর্ম সম্পন্ন করা হত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে, তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।"[৫২]

বালিতে শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য রথের মত বিশেষ যান প্রস্তুত করা হত। একে বলা হয় 'ওয়াদা'। এর গায়ে অঙ্কিত থাকত বড় গরুড়ের মুখ। এগুলি থাকত শিল্প সৌন্দর্যের নানা চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> "শবাধার বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখি যেমন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ।"[৫৩]

শ্মশানের সঙ্গে পুণ্যতোয়া গঙ্গার সম্পর্ক চিরকালই সুবিদিত। মৃত্যু – শ্মশানযাত্রা – মোক্ষ – মুক্তি হিন্দুর জীবনচর্যার অনিবার্য পরিণতি। হিন্দু গঙ্গাস্পর্শে ইহজগতের পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেন। শুধু তাই নয়, গঙ্গা ভারতীয় জাতি সত্তার সুবৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। জীবন মৃত্যুর এমন ওঠাপড়ায় শ্মশান আর গঙ্গানদী কখনো পৃথক নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে লিখেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। যে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্মতপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।"[৫৪]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'শ্মশান' – কবিতায় বিষণ্ণতার সামসঙ্গীত পাঠককে উপহার দিলেন। শ্মশান ও মৃত্যু কবির কবিতায় হয়ে উঠল সমার্থক। মৃত্যুর স্থির সমুদ্রে জীবনের অর্জিত গৌরবরাশি বৃথা হয়ে যায়। সব যায় – বিদ্যা-বুদ্ধি-বল-মান-অর্থ সবই নিয়ে যায়। কবি লিখলেন –

"অর্থের গৌরব বৃথা হেথা – এ সদনে –
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি।"[৫৫]

Reference:

১. বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, 'শিবপুরাণম', সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮০ - ৫৮১
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭
৩. তদেব
৪. বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, দেবী ভাগবতম্, সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৫৫
৫. বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কালিকাপুরাণম্, সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, কার্তিক ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০৬
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫
৭. ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪০ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৬, পৃ. ২২৫
৮. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন (সম্পা.), দেবীভাগবতম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৮৩৩
৯. মজুমদার, কমলকুমার, অন্তর্জলী যাত্রা, উপন্যাস সমগ্র কমলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭৪
১০. মহর্ষি মনু, মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ১২, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ১০১৩
১১. পূর্বোক্ত, দশম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা – ৫০, পৃ. ১০২৭
১২. তদেব, দশম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা – ৫৫, পৃ. ১০২৯
১৩. Risley, Herbert Hope, Tribes and Castes of Bengal, Vol. I., Printed at the Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, P. 184
১৪. দত্ত, রমেশ চন্দ্র (ভূমিকা), ঋগ্বেদ–সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত, ঋক্ সংখ্যা ৩, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৮০
১৫. সেন, অতুলচন্দ্র, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'উপনিষদ' (অখণ্ড সংস্করণ), ঈশ উপনিষদ, শ্লোক সংখ্যা – ১৭, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা , ১৯৯৪, পৃ. ২৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. দত্ত, রমেশ চন্দ্র (ভূমিকা),ঋগ্বেদ–সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১০ মণ্ডল, ১৮সূক্ত, ঋক সংখ্যা -১১, হরফ প্রকাশনী, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৬৩

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মানবেন্দু (সম্পা.), কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্, প্রথমখণ্ড, (৩.১৩.৩), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬৮৫

১৮. মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্, সম্পা. – শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেনীমাধব শীলস্ লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩০০, ৩০১

১৯. বেদব্যাস, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মহাভারতম্, আদিপর্ব-৩, সম্পা. শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৩, মাঘ, পৃ. ১৩৪৮

২০. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন (সম্পা.), দেবীভাগবতম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৬৭০ - ৬৭১

২১. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পা.), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১৬৮ - ১৬৯

২২. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২২৯

২৩. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পা.), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১০ সংখ্যক চর্যা, বঙ্গীয় – সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১৪১

২৪. পূর্বোক্ত, ১৪ সংখ্যক পদ, পৃ. ১৪৪

২৫. পূর্বোক্ত, ১৯ সংখ্যক চর্যা, পৃ. ১৪৮

২৬. বেদব্যাস, শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, সম্পা. - আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন, উত্তর খন্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৯৬, পৃ. ৩৪০

২৭. বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড, সম্পা. - বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয় – সাহিত্য –পরিষদ, কলকাতা, ভাদ্র, ১৪২২, পৃ. ২০

২৮. পূর্বোক্ত, বাণখন্ড, পৃ. ১১১

২৯. ভট্টাচার্য, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, স্মৃতি চিন্তামণিঃ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১৫৬

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শূদ্রধর্ম, কালান্তর, রবীন্দ্র– রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃ. ৬১২

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৩

৩২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, দেবদাস, শরৎ রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬ - ৬৭

৩৩. মজুমদার, কমলকুমার, অন্তর্জলী যাত্রা, কমলকুমার মজুমদার উপন্যাস সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০২২, পৃ. ৯

৩৪. তদেব

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৩৭. ক. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৩৮. ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত শ্মশান সঙ্গীত, তথ্য দাতা – মোহন সাঁতরা, গ্রাম – কমলপুর, পোস্ট – বাসুলিয়া, থানা – মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর, বয়স – ৬১, পেশা – কীর্তন, ৪৫ বৎসর ব্যাপী কীর্তন গানের সঙ্গে যুক্ত।

৩৯. তদেব

৪০. তদেব

৪১. তদেব

৪২. তদেব

৪৩. তদেব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪৪. তদেব
৪৫. তদেব
৪৬. ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১৬৪
৪৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, অভাগীর স্বর্গ, সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, (সম্পা.), উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৬
৪৮. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব), শরৎ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯৩ - ৩৯৬
৪৯. ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত (সম্পা.), শ্রীমদ্ ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২২ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১৭১
৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শ্মশান, বন-ফুল, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৯৭
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯
৫২. পূর্বোক্ত, যাত্রী, জাভা যাত্রীর পত্র, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৩০
৫৩. তদেব
৫৪. পূর্বোক্ত, বৃহত্তর ভারত, কালান্তর, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬১৫
৫৫. দত্ত, মধুসূদন, শ্মশান, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন ও দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পা. সব্যসাচী রায়, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 902 - 914
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাক-গান্ধীপর্বে দেশীয় সংবাদপত্রের লেখনীতে কারাগারের রাজনীতিকরন (১৯০৫ - ১৯১৫)

জয়দীপ সেন

Email ID : Joydeepsenhistory@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Politicization, rule of law, Newspaper, prison, Gandhi colonial prison,

Abstract
The concept of political prisoner was a contesting space between colonial government and nationalist. Colonial government basically tried to implemented hegemonic control over subjected people. Alien ruling power has intended to embedded hegemonic power through the concept of rule of law. The very people who violated the rule of law would be punished by imprisonment. Imprisonment became the means to implemented rule of law. Pervasive presence of rule of law has created a section of obedient indigenous people who for their interest wants to support colonial rule. These Section of people gradually realized the limitation of the concept of rule of law. These section from the time of swadesi movement conspicuously protested against the colonial government. Their protest not only confined within traditional protest but also extended to new from a mass mobilization. Newspaper has a pivotal role within the ambit of new form of mass mobilization. Newspaper gradually made conciliatory space with the mass. Colonial government also had took repressive measure against nationalist press. Native press played profound impact to made prison as a political space. Basically middle class prisoner wielded the violation of rule of as a form of protest. Middle class prisoner always used imprisonment to enhance the cause of nationalist movement. Native newspaper regularly published the report of middle class suffering within the prison. Suffering within the prison of nationalist became the concerning issue of national imagination. Colonial government also confronted with the dilemma of their reaction of the suffering of nationalist prisoner. Colonial administration also took some measure to differentiate the nationalist prisoner with the common prisoner. Due to this Bipin Chandra paul get good treatment within prison. But the case of Bipin Chandra paul is a exceptional issue. Generally political prisoner not get dignified treatment within the prisoner. The suffering of political prisoner extended throughout the society by native newspaper. suffering of the prisoner in Andaman jail also disseminated by native newspaper. It is well established believe that by the assiduity of the Gandhi colonial prison became the space of political protest.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

But if we notice the feature of swadeshi movement then it will easily understand the process of politicization of colonial prison outset before the gandhian era.

Discussion

ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় প্রতিরোধ, পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তর গন-আন্দোলন হিসাবে পরিচিত।[১] ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সাথে জাতীয় আন্দোলনের সর্দাই বিরোধিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।[২] এই বিরোধিতার চরিত্রের মধ্য দিয়েই জাতীয় আন্দোলন গন-মানসে আপন বৈধতাকে প্রতিপন্ন করতে চাইত। যে বৈধতা নির্মানের মূল ভিত্তি ছিল জনমানসের সাথে জাতীয় আন্দোলনের দাবির সংহতি সাধন।ঔপনিবেশিকতা বিরোধী দাবির স্বপক্ষে জনগনের মধ্যে সংহতি সাধনের মধ্য দিয়েই জাতীয় প্রতিরোধ গন-আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গন-আন্দোলনের সূচনার সাথে গান্ধীজিকে সম্পৃক্ত দেখবার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। গান্ধীজির পূর্বের জাতীয় প্রতিরোধের প্রতি একপ্রকার উপেক্ষাপূর্ন মানসিকতা প্রদর্শিত হয়। তবে গান্ধীজি সম্পূর্ন প্রেক্ষিতহীন পরিসরে গন-আন্দোলনের সূচনা করেন নি। গান্ধীজির পূর্বেও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধের ঐতিহ্য ছিল। যে প্রতিরোধী ঐতিহ্যের সাথে গান্ধী অনুসৃত রাজনৈতিক পন্থার সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীর পূর্বেও অহিংস পন্থাকে অনুসরণ করা হত জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে।[৩] স্বদেশী ও বয়কট নীতিও আন্দোলনের পদ্ধতি হিসাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে ব্যবহৃত হয়েছিল। অন্যান্য বিভিন্ন পন্থার ন্যায় কারাবাসকে রাজনৈতিক চরিত্র প্রদানের প্রবনতারও প্রাক্-গান্ধী ঐতিহ্য ছিল। কারাগারকে জাতীয় আন্দোলনের প্রতিবাদের অন্যক্ষেত্রে পরিনত করবার চেষ্টা স্বদেশী আমল থেকেই সূচিত হয়েছিল। কারাগারের রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক বন্দির ধারণা। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কারাবাসকে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সাথে সংযুক্ত করা হতে থাকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়কাল থেকে। কারাবাসের রাজনীতিকরনের ক্ষেত্রে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। জাতীয় কারনে কারাবাসকে বৃহত্তর গন-পরিসরের নিকট পৌছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। যুগান্তর, হিতবাদী, সন্ধ্যা ও নবশক্তির ন্যায় পত্রিকা জাতীয় কারনে কারাবাসের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করত। তার ফলে ব্যক্তিগত কারাবাস জনিত আত্মত্যাগের সাথে বৃহত্তর জাতীয় গন-মানস পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত। প্রাক্-গান্ধী পর্বে ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরণের ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে কারাগারের রাজনীতিকরন বিষয়ে আলোচনায় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশককে গুরুত্বপূর্ন পর্ব বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে গান্ধীজি সত্যাগ্রহীদের কারাবাসের আচরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই কারনে রাজনৈতিক কারাবাসের আলোচনা অসহযোগ আন্দোলনের সময় শুরু হয়ে থাকে। রাজনৈতিক কারাবাসের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেনির বন্দি হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেনির প্রচেষ্টার মধ্যদিয়েই কারাগারের রাজনীতিকরণ ঘটেছিল। জওহরলাল নেহেরু এই কারনে মনে করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেনির কারাগার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।[৪] জওহরলাল নেহেরুর এই মন্তব্যের সাথে অন্তত বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে সহমত হওয়া সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বহু পূর্বেই বৃহত্তর কারনের জন্য কারাবাস করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কারাবাসকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা গেলেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় নিয়মিত মধ্যবিত্ত শ্রেনির প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক কারনে কারাযাপন করেছিল। অরবিন্দ ঘোষ,বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেনির প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক কারনেই কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন। আসলে আসহযোগ আন্দোলনের পূর্বের রাজনৈতিক কারাবাস নিয়ে অস্পষ্টতা জওহরলাল নেহেরু থেকে ঐতিহাসিকদের একাংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে গান্ধীজির পূর্বেই কারাবাসের রাজনীতিকরনের প্রবনতা সূচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই। স্বদেশী আমলের সংবাদপত্রের তথ্য থেকেই অনুধাবন করা যায় কারাবাসের রাজনীতিকরন কিভাবে ঘটেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গন-সংযোগের একাধিক পন্থা অনুসৃত হয়েছিল। যে পন্থাগুলির মূল লক্ষ্য ছিক সাধারন মানুষের কল্পনাকে ঔপনিবেশিকরনের প্রভাব থেকে মুক্ত করা। মানুষের কল্পনার কাছে আবেদন তৈরিতে সংবাদপত্রের লেখনীর অন্যতম ভূমিকা ছিল। রাজনৈতিক কারাবাস সম্পর্কে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সচেতনতা বা সহানুভূতি তৈরি করেছিল দেশীয় সংবাদপত্রের লেখনী। লেখনীর মাধ্যমে কল্পনাগত সাযুজ্য যে জাতীয় চেতনার সংহতি সাধন করে। জাতীয় চেতনার সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক কারাগারের কি ভূমিকা ছিল তাই আমার আলোচনার বিষয়। ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরনের ক্ষেত্রে ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক বন্দির ধারনা দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কিভাবে প্রকাশ করত তা প্রাধান্য পাবে। ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরন নিয়ে ইতিহাসচর্চা হয়েছে তবে সেখানে গান্ধীজির আগমনের পরবর্তী সময়কাল প্রাধান্য পেয়েছে। আবার সেখানে আলোচনা পদ্ধতিতেও একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরনের প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেখানে ঔপনিবেশিক নীতির নিরিখে কারাগারের রাজনৈতিক বন্দিদের জীবনকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক নীতির নিরিখ ছাড়াও রাজনৈতিক কারাবাসকে বিবেচনা করবার ভিন্নতর পন্থা ছিল। সমকালীন দেশীয় সংবাদপত্রের লেখনী যে বিলল্প ভিন্নতর পন্থা হতে পারে। তাই ঔপনিবেশিক সংস্কার নীতির পরিবর্তে জাতীয় অবস্থান থেকে কারাগারের রাজনীতিকরণকে বিবেচনা করা হবে।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় যুগান্তর পত্রিকা।[৫] এই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। এই পত্রিকার নামকরন করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।[৬] শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর নামক সামাজিক উপন্যাসের নাম অনুযায়ী এই পত্রিকার নামকরন করা হয়েছিল। সশস্ত্র ও বৈপ্লবিক মানসিকতা প্রচার করাই ছিল যুগান্তর পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ২রা জুন ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রচনার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এই পত্রিকাকে ৭ই জুন সতর্ক করে দিয়েছিল।[৭] তবে এই সতর্কতাকে যুগান্তর পত্রিকা বিশেষ বিবেচনার মধ্যে আনেনি। প্রথম থেকেই এই পত্রিকা ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর সমালোচনা শুরু করেছিল তা ধারাবাহিক রেখেছিল। ১৬ই জুন ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে এই পত্রিকা ‘Dispelling of fear’ - নামে একটি রচনা প্রকাশ করে। এই রচনাটিতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে ‘লজ্জা’ বলে চিহ্নিত করা হয়।[৮] এই রচনাতে বলা হয় -

> “...it was a house without a foundation or a garland strung without a thread...”[৯]

দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র ভারতবাসীর মধ্যে মানসিক ভীতিবোধ থাকবার কারনে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য নিজের অস্তিত্ব ধারাবাহিক রাখতে পেরেছে। এই পত্রিকাতেই লেখা হয় ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা লাঠির ভাষা বোঝে তাই শক্তি প্রয়োগ করে তাদের তাড়াতে হবে।[১০] ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দৃষ্টিতে এই জাতীয় লেখা রাজদ্রোহমূলক রচনা বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই কারনে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুলাই যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১১] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব স্বীকার করে নেন।[১২] ২৪শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে 124A ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এই কারনে এক বছরের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। যুগান্তর ছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে প্রকাশিত হয় যেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধী বয়ান প্রকাশ করা। এই তালিকায় অন্যতম হল বন্দেমাতরম পত্রিকা। বন্দেমাতরম পত্রিকা ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ এই পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন। যুগান্তর পত্রিকার সাথে সখ্যতা থাকলেও বন্দেমাতরম সাধারন মানুষের পরিবর্তে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদের বক্তব্যের আবেদন তৈরি করতে চেয়েছিল।[১৩] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন ২৮শে জুন ‘Politics for Indian’ বলে একটি লেখা সহ যুগান্তরের বেশ কিছু লেখার অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যার জন্য আরবিন্দ ঘোষকে দায়ী করা হয়।[১৪] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমানাভাবে অবশ্য অরবিন্দ ঘোষকে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি দেওয়া হয়।[১৫] তবে ইতিমধ্যে বন্দেমাতরম মামলার সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। বিপিন চন্দ্র পাল এই মামলায় কোন প্রকার সহযোগীতা করতে রাজি ছিলেন না।[১৬] বিপিন চন্দ্র পালের এই নির্ভীক অবস্থান ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনে এক প্রকার সাহসিকতার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। আদালত অবমাননার জন্য ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বিপিন চন্দ্র পালের ছয়মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়েছিল।[১৭]

বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস সমকালীন জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাস্তি নিশ্চিত জেনেও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা তিনি করেন নি। বিপিন চন্দ্র পালের এই আচরন সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির সমার্থক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।[১৮] বিপিনচন্দ্র পাল সচেতন ভাবে শাস্তিকে মেনে নিয়ে নিয়েছিল। যার মাধ্যমে নৈতিকভাবে তিনি কারাবাসকে এক সচেতন প্রতিবাদের চরিত্র দিয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাসের শাস্তিকে কোনোভাবেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন যৌক্তিকতা প্রদান করতে পারে না বলে - স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল দৈনিক হিতবাদী পত্রিকা। এই শাস্তি সম্পর্কে দৈনিক হিতবাদীতে আরো লেখা হয় -

> "...The punishment which appears too severe to the public, certainly enhances the glory of the sufferer."[১৯]

বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস আসলে তার আচরন বা অপরাধের তুলনায় অনেক বেশী কঠোর শাস্তি ছিল-এই প্রতীতি গড়ে উঠেছিল। সেই কারনে বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস অপরাধ চরিত্রের পরিবর্তে, আক্রান্ত বিপিন চন্দ্র পালের আত্ম গৌরব বৃদ্ধির কারন হয়েছিল। সেই কারনে কারাবাস "...inflame the hearts of the public and increase their hatred to the official"[২০] -এর পরিস্থিতি তৈরি করে। সমকালীন সময়ে জাতীয় কারনে কারাবাসকে কেন্দ্র করে সাধারন মানুষের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রশাসন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন ছিল। তার কারন নরমপন্থীরা ইংরেজ শাসনের অনুগত ছিল। বিপিন চন্দ্র পাল সেই বিচারে চরমপন্থী গোষ্ঠীভুক্ত সদস্য। তার অযৌক্তিক কারাবাস সাধারন মানুষের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে মোহমুক্তির মানসিকতা তৈরি করেছিল। বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাসের সামাজিক প্রতিক্রিয়া এক প্রকার ইতিহাস তৈরি কারেছিল, যা কয়েক প্রজন্মের স্মৃতিতে স্থান পাবে বলে - সন্ধ্যা পত্রিকা মন্তব্য করেছিল।[২১] আদালতের সামনে নিশ্চিত কারাবাসের শাস্তির ভীতিকে উপেক্ষা করে যেভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিপিন চন্দ্র পাল স্থাপন করেছিল তার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে বিশেষ দেখা যায়নি। বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাসকে বৃহত্তর স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছিল সন্ধ্যা পত্রিকা। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পত্রিকায় বলা হয় –

> "...all swadeshi shops in calcutta were closed as a mark of respect for Babu B.C. pal who has been sent to jail."[২২]

কারাবাস জনিত ঔপনিবেশিক শাস্তিকে সরাসরি সংযুক্ত করা হয়েছিল বয়কট আন্দোলনের সাথে। কারাবাসের প্রতিবাদের সাথে মিশে গিয়েছিল সমকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক প্রতিবাদ। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস জনিত শাস্তির রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষের যথেষ্ট অসুবিধার কারন হয়। সেই কারনে কারাবাসের প্রতিবাদে সংগঠিত জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক কতৃপক্ষের তরফ থেকে।[২৩] বিপিন চন্দ্র পালের পূর্বেই বন্দেমাতরম পত্রিকার সাথে যুক্ত থাকবার কারনে অরবিন্দ ঘোষের কারাবাস হয়েছিল। প্রমানাভাবে তাঁর কারামুক্তি ঘটে। অরবিন্দ ঘোষের কারাবাস জনিত আত্মত্যাগকে প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা রচনা করেছিলেন।[২৪] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর উক্ত কবিতা নবশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়েছিল অরবিন্দ ঘোষের এই পর্বের কারাবাস ও কারামুক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়কট আন্দোলনের বিভিন্ন পন্থার সমালোচক ছিলেন, সেই তিনিই ঔপনিবেশিক আইনে অপরাধীর কারাবাস ও কারামুক্তির প্রশংসা করেছেন, যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ন।অন্যদিকে যা কারাবাসের রাজনীতিকরনের পথকে প্রশস্থ করছিল। জাতীয় মানসিকতায় রাজনৈতিক বন্দির ধারনা নির্মানের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ছিল। কারাবাসের রাজনীতিকরন পরিনত পর্যায়ে না পৌঁছালেও একপ্রকার সামাজিক মান্যতা তৈরি হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাসের ন্যায় তাঁর কারামুক্তিও বহুব্যাপ্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বিপিনচন্দ্র পালের কারামুক্তি ঘটেছিল।[২৬] কারামুক্তিও রাজনৈতিক উন্মাদনার জন্ম দিয়েছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামের মুখ্য সচিব পি. সি লাইন ঔপনিবেশিক ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানিয়েছিল –

> "The chief event of the fortnight has been the release of Babu Bepin Chandra pal, which took place on the 9th march."[২৭]

বিপিনচন্দ্র পালের মুক্তির দিন জনসভা ও পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আয়োজনের মুখ্য দায়িত্ব পালন করে ছাত্র সমাজ। বিপিনচন্দ্র পালের মুক্তি সম্পর্কে তমলুক নামক সংবাদপত্রে লেখা হয় মফসসলেও আনন্দের পরিবেশে তৈরি করেছিল এই মুক্তি।[২৮] রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাথে মিশে গিয়েছিল আনন্দের পরিবেশ। কারামুক্তির কারনে এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পালের কারামুক্তি উৎযাপনের গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট হল ছাত্র সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কার্যকরী অংশগ্রহন। বরিশালের ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২৫০ জন সহায়সম্বলহীন মানুষের মধ্যে চাল ও নুন প্রদান করেছিল বিপিন চন্দ্র পালের কারামুক্তি উৎযাপন করবার জন্য।[২৯] তারা এই কাজের জন্য অবশ্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভৎসিত হয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকেও যথেষ্ট ব্যতিক্রমী ছিল, তার কারন ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি রাজনৈতিক বন্দির ন্যায় আচরন করেছিল। তাঁকে দিয়ে কোনপ্রকার শ্রমসাধ্য কাজ কারাগারের অভ্যন্তরে করানো হয়নি।[৩০] সমকালীন সময়ে অন্য রাজনৈতিক বন্দিরা এই মর্যাদা পেতন না। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস সমকালীন রাজনীতিকে নতুন অভিমুখ দিয়েছিল। কারাবাস ও কারামুক্তি রাজনৈতিক চর্চায় যথেষ্ট প্রসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার কারনে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বছরের কারাদন্ড হয়েছিল।[৩১] এই কারাদন্ড যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। তার কারন রাজনৈতিক বন্দির ধারণা নির্মানের সাথে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার অনুকূল সম্পর্ক আছে। কারাবাসকে অপরাধ নয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে উপস্থাপন করতে চাইত রাজনৈতিক বন্দিরা। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। তার কারন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন ভারতমাতার সন্তান হওয়ার কারনে ঔপনিবেশিক আদালতের কাছে বিচার চাইবেন না।[৩২] তিনি জানতেন এর ফলে তাঁর কারাবাস হতে পারে তা সত্ত্বেও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আত্মপক্ষ সমর্থনে রাজি হননি। ঔপনিবেশিক শাস্তিকে এড়ানোর প্রচেষ্টা করেন নি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাসের ভীতিহীনতা সমকালীন জনমানসে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। জনগনের কাছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নির্ভীকতার সংবাদকে জাতীয় শৌর্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করবার ক্ষেত্রে সন্ধ্যা ও যুগান্তর সংবাদপত্র অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকা ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের নিশ্চিত শাস্তির প্রতি উপেক্ষাপূর্ন আচরনকে বৃহত্তর অনুপ্রেরনার দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছে। ২০শে জুলাই ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের সন্ধ্যা পত্রিকায় বলা হয় –

> "Bhupendra Nath will be imprisoned, but a hundred men like him will take his place."[৩৩]

২৪শে জুলাই ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের সাজা প্রাপ্তির দিন কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।[৩৪] যেখানে ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের অবস্থানকে সমর্থন করা হয়। কারাবাসের সমর্থনে এই জাতীয় সমাবেশ যথেষ্ট ব্যতিক্রমী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। যুগান্তর জনমানসকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে ব্রহ্ম বন্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যা পত্রিকার ছাপাখানা থেকে নিয়মিত যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করত।[৩৫] এর থেকে প্রমানিত হয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কারাগারে থাকলেও যুগান্তর পত্রিকার গনমানসে গ্রহনযোগ্যতা কোনরকম ক্ষুন্ন হয়নি। যুগান্তর পত্রিকার দপ্তরে তল্লাশি করবার সময় গ্রেপ্তারের ভীতি উপেক্ষা করে জনগন বাঁধার সৃষ্টি করে।[৩৬] ৭ই আগষ্ট ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে যুগান্তর দপ্তরে তল্লাশির সময় বেশ কয়েকজন বাঁধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দৃষ্টান্তগুলি প্রমান করে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাস সাধারন মানুষের কাছে রাজনৈতিক দায়িত্বের পরিনতি বলে বিবেচিত হয়েছিল। আমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয় –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"...He is not ordinary criminal but only a political offender and in England he would have been treated as a first-class misdemeanant."[৩৭]

অমৃতবাজার পত্রিকা নরমপন্থী মানসিকতা সম্পন্ন হয়েও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী লেখাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদমূলক লেখনী বলে মনে করেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের শাস্তিকে প্রয়োজনের তুলনায় কঠোর বলে ব্যাখ্যা করেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা। বন্দেমাতরম পত্রিকার মতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের আদালত কক্ষের আচরন ও কারাবাসের মধ্যদিয়ে মর্যাদাপূর্ন মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।[৩৮] বন্দেমাতরম পত্রিকার মতে শাসিত জনগনের স্বার্থে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অবস্থান নিয়েছেন সেই কারনে বিদেশী আইনে তাঁকে শাস্তি দিয়েছে।[৩৯] ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাসের শাস্তি প্রদানকারী আইনকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলে মনে করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের শাস্তি গ্রহনের সময় মুখে হাসি, ছিল যে হাসির মধ্যে বন্দেমাতরম পত্রিকা জাতীয় আশা দেখতে পেয়েছিল।[৪০] আরবিন্দ ঘোষ মনে করেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাজাভোগ কোন প্রকার অস্বাভাবিক নয়, তার কারন দেশ মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ন হলে বিদেশী আইন অনুযায়ী শাস্তিভোগ অনিবার্য।[৪১] এই জাতীয় শাস্তি বা কারাবাস আমাদের দুর্বল করবার পরিবর্তে মানসিক ভাবে দৃঢ় করবে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাস সমকালীন নারী সমাজকেও রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রানিত করেছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়ি সম্মিলিত হয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মাতাকে অভিনন্দন জানানো হয়।[৪২] কারাবাসকে এখানে শাস্তি হিসাবে দেখা হলে ভূপেনাথ দত্তের মাতাকে অভিনন্দন জানানো হত না। এই সমস্ত কারনে কারাবাসের সাথে অপরাধের সমানুপাতিক সম্পর্ক ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। কারাবাসকে প্রতিবাদ হিসাবে ভাববার কারনেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মাতাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আইন অমান্যকারীর মাতাকে অভিনন্দন জানানোর অর্থ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাজকে সমর্থন করা। এর মাধ্যমে আসলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান গুলি যে জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করছে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার আইনের বিবেচনায় যে ব্যক্তির কারাবাস হয়েছে তাঁর মাতাকে অভিন্দন জানিয়ে কাবাবাসকেই গৌরবান্বিত করা হয়। কারাবাসকে জাতীয় প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করে না দেখলে, এই জাতীয় মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। কারাবাস ও জাতীয় প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হওয়া রাজনৈতিক বন্দির ধারনা নির্মানের অন্যতম শর্ত। কারাবাস আভিনন্দিত হওয়ার ফলে কারাগার ও রাজনৈতিক বন্দির ধারনা সমাজমানসে তৈরি হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির বিবেচনায় অপরাধমূলক কারাবাস ক্রমশ সমাজের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক প্রতিবাদের পরিনাম হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৪৩] এই প্রত্রিকা প্রাথমিকভাবে পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করত। তবে চরমপন্থী রাজনীতি স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় সন্ধ্যা পত্রিকার ভাষা প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা শুরু করে। কারাবাস সংক্রান্ত সংবাদকে সাধারন মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত করবার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অরবিন্দ দত্ত বা বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাসের সংবাদ এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ পেত। সন্ধ্যা পত্রিকা চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী রাজনীতিকে সমর্থন করত। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল এই পত্রিকা জাতীয় প্রয়োজনে বোমা তৈরির পরামর্শ দিয়েছিল।[৪৪] প্রত্যক্ষ্যভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করবার কারনে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা পত্রিকার ম্যানেজার সারদা চরন সেন কে ১২৪ এ ধারাতে গ্রেপ্তার করা হয়।[৪৫] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সহ পত্রিকার মুদ্রক হরিচন্দ্র দাশকে।[৪৬] এই গ্রেপ্তার তুলনামূলকভাবে কম উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। গ্রেপ্তার শুধু নয় ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা থেকে গিয়েছিল বলে বিপিন চন্দ্র পাল মনে করেছেন। তবে সমকালীন বিভিন্ন সংবাদ পত্র জাতীয় কারনে স্বার্থত্যাগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে। অমৃতবাজার পত্রিকায় ১০ই সেপ্টেম্বর লেখা হয় – আত্মত্যাগ ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের উন্নতি করে।[৪৭] এই সময় ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পাল কারাগারে ছিলেন। তাই তাদের কারাবাসের সাথে অমৃতবাজারের লেখার পরোক্ষ সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে সন্ধ্যা পত্রিকা স্পষ্টভাবে সম্পাদকীয়তে লিখেছিল কারাবাস সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন কি সেই বিষয়টি। সেখানে লেখা হয় -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...When we are sent to jail we shall be chastened and washed clean of all impurities. The gates of prison have been thrown open and we must enter."[৪৮]

কারাবাসকে শুদ্ধতা ও পবিত্রতার পন্থা বলে অভিহিত করা হয়। কারাবাসের রাজনৈতিক অভিমুখ তৈরির ক্ষেত্রে এই লেখনী বা মানসিকতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন ছিল। কারাবাস সম্পর্কে ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায় মনে করেছিলেন, ইংরেজদের কারাগারে তাঁকে বন্দি রাখা সম্ভব নয়।[৪৯] তিনি দৃপ্ততার সাথে কারাবাসকে শাস্তি হিসাবে লঘু করে দিয়েছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে অক্টোবর সন্ধ্যা পত্রিকায় লেখা হয় -

> "...If the feringhi should dare to put me to the rack, I shall throw my body before his face as if it were torn slipper..."[৫০]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই মানসিকতা প্রমান করে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁকে কারাগারে বন্দি করবার ক্ষমতা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নেই। কারাগারের প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খল তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অবদমিত করতে পারবে না। প্রাতিষ্ঠানিক অবদমনের থেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর বন্দেমাতরম পত্রিকাতে ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায়ের তিরোধানকে গৌরবের বলে প্রচার করা হয়। সেখানে বলা হয় -

> "...he can very well triumph with prison handcuff …upadhyas decease fills the heart of the people with hope of liberty."[৫১]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুকে জাতির মুক্তি প্রাপ্তির সাথে সম্পৃক্ত করে দেখাতে চেয়েছিল বন্দেমাতরম পত্রিকা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কারাবাস সম্পর্কে বলেছিলেন ঔপনিবেশিক কারাগার তাঁকে আটক রাখতে পারবে না। কারাবাসের শাস্তি সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার কারনে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। কারাবাসের শাস্তি তাঁকে আর ভোগ করতে হয়নি। তাই তাঁর মৃত্যুকে ব্যক্তির পরলোকগমনের পরিবর্তে জাতির মুক্তি প্রাপ্তির আকাঙ্খার সাথে বন্দেমাতরম পত্রিকা যুক্ত করতে চেয়েছিল।

বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা ও যুগান্তর পত্রিকা ঔপনিবেশিক বিরোধিতার ভাষ্যকে নির্মান করতে চেয়েছিল লেখনী ও সংবাদ পরিবেশনের পন্থার মাধ্যমে। সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এই পত্রিকাগুলি ইংরেজদের ভাবমূর্তিকে অনৈতিক ও জাতীয় প্রয়োজনের পরিপন্থী হিসাবে সাধারন মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে চাইত। তবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর বিরোধিতার থেকেও এই পত্রিকাগুলি, জাতীয় প্রতিরোধকারীদের ত্যাগকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে সাধারন মানুষকে সংহত করবার চেষ্টা করত। জাতীয় প্রতিরোধকারীদের ত্যাগ আসলে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিবেচনায় ছিল অপরাধমূলক কার্য। জাতীয় প্রতিরোধের ভিন্ন ভিন্ন পরিসর ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল কারাবাস। লেখনীর ভাষার কারনে রাজনৈতিক কারাবাসকারীরা নিজেদেরকে সাধারন অপরাধী থেকে পৃথক করতে করতে পারে। ফলে সমাজ কল্পনাতেও তাঁরা সাধারন অপরাধী থেকে পৃথক হতে বলে বিবেচিত হতে থাকে। সেই কারনে বিপিন চন্দ্র পাল বা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাসের বিরুদ্ধে সাধারন মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করে কারাবাস হলে সেই বন্দিত্বকে পত্রিকাগুলি জাতীয় কারনে আত্মত্যাগ বলে উপস্থাপন করত। এই কারনে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে মে দেশীয় সংবাদপত্র গুলি সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয় –

> "There has been a lot of tall talk about martyrdom and dying for one country..."[৫২]

জাতীয় কারনে শহিদের আত্মত্যাগের প্রচারের ক্ষেত্রে আগ্রগন্য পত্রিকার পরিচয় নিয়ে বলা হয় -

> "The worst papers are the Bande Mataram, the Sandhya and the yugantar."[৫৩]

এই সকল পত্রিকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ঔপনিবেশিক আইনে দোষী সাব্যস্ত করে কারাবাসের সাজা প্রদান করা হয়েছিল। কারাবাসের মাধ্যমে এই পত্রিকা গুলির রাষ্ট্রদ্রোহী লেখাকে নিয়ন্ত্রন করতে চাইত ঔপনিবেশিক প্রশাসন। স্বদেশী আন্দোলনের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূর্বে ঔপনিবেশিক প্রশাসন দেশীয় সংবাদপত্রের এতটা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়নি। এই সমালোচনা ও সমালোচনা প্রতিরোধের শাস্তি হিসাবে কারাবাস, প্রতিস্পর্ধী জাতীয় মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিল। ঔপনিবেশিক আইনের কারাবাসকে শাস্তি হিসাবে অবশ্য দেখেত না এই সকল পত্রিকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। তারা নিজেদের শাস্তি প্রাপ্তির সামনে অবিচলিত থাকত।[৫৪] শাস্তি প্রাপ্তি নিশ্চিত জেনেও তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করত না। এই সকল কারাবাসের সংবাদ অন্যান্য চরমপন্থী পত্রিকা গুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। যে সংবাদের সাথে প্রতিবাদ ও সহানুভূতির আবেগ মিশে থাকত। কারন কারাবাসে সাথে সংশ্লিষ্ট সংবাদের মূল লক্ষ্য ছিল না নিছক সংবাদ পরিবেশন করা। কারাবাসকে জাতীয় স্বার্থে অবস্থান গ্রহনের পরিনাম হিসাবে উপস্থাপিত করা হত। এক্ষেত্রে পত্রিকাগুলির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কারাবাসকে ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আপরাধী চরিত্রকে নির্মানের প্রচেষ্টাকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শক্তিও এই প্রচেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তার প্রমান হিসাবে বলা যায় বিপিন চন্দ্র পালের সাথে কারাগারে সাধারন অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়নি। তবে কারাকক্ষে বিপিন চন্দ্র পালের প্রতি নমনীয় আচরনকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিবে বিবেচনা করতে হবে। তার কারন ঔপনিবেশিক কারাগারে সাধারন জাতীয় বন্দিদের প্রতি অত্যাচার মূলক আচরন করা হত। তার কারন বিপিনচন্দ্র পালের সমসাময়িক বাবু নীলমনি দাশ স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকবার কারনে কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি কারাগারে কি ধরনের ব্যবহার পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে সোনার ভারত পত্রিকায় লেখা ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই February লেখা হয় –

> "...Babu Nilmani das of tamluk, who had been sentenced to two months rigorous imprisonment in a Swadesi case, was very cruelly treated in jail. His body has become extremely thin and emaciated. In prison he was not only made to work hard during the illness, but was often subjected to severe physical chastisement. Marks of violence are still visible on his person."[৫৫]

বলাবাহুল্য এই সময়কালে কারাকক্ষে নীলমনী দাশের প্রতি যে আচরন করা হয়েছিল তাই ছিল স্বাভাবিক। নীলমনি দাশের কারামুক্তিকে জনসমাবেশের মাধ্যমে পালন করা হয়েছিল।[৫৬] ঔপনিবেশিক আইনের কারাবাস জাতীয় বিবেচনায় অভিন্দন যোগ্য কার্য বলে বিবেচিত হয়। ঔপনিবেশিক আইনে বিবেচিত অপরাধীদের কারামুক্তির 'জাতীয় উদযাপনের' সংবাদ বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা সংবাদপত্রগুলি সাধারন মানুষের মধ্যে গ্রহনযোগ্যতার ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছিল। ১৯০৭ সালের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানতে পারা যায় উক্ত বছরের জুলাই মাসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০০০ হাজার সন্ধ্যা প্রত্রিকা বিক্রি হয়।[৫৭] সন্ধ্যা পত্রিকা জাতীয় কারাবাসের সংবাদকে প্রকাশ করত নির্ভীকভাবে। সন্ধ্যা পত্রিকা এতটাই নির্ভীক ও একনিষ্ঠ ভাবে জাতীয় দায়িত্বপালন করত যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রেপ্তারের পর যুগান্তর পত্রিকা সন্ধ্যার ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হত। সন্ধ্যা পত্রিকা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিপিনচন্দ্র পালের গ্রেপ্তার ও কারাবাসের সংবাদকে জাতীয় প্রতিবাদ হিসাবে উপস্থাপন করত নিয়মিত। এহেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধ অবস্থান গ্রহনকারী পত্রিকার বিক্রি বৃদ্ধি প্রমান করে, এই জাতীয় প্রতিবাদের ভাষা সাধারন মানুষের মধ্যেও গ্রহনযোগ্যতা তৈরি করছিল। কারাবাসের সংবাদকে জাতীয় প্রতিবাদের ভাষাতে পরিনত করবার ফলে বন্দিত্বের রাজনৈতিক অভিমুখ তৈরি হচ্ছিল। কারাবাসের এই রাজনীতিকরনের ধারনা নির্মানের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ন।

ইন্দু ভূষন রায় আন্দামানের সেলুলার কারাগারে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮-২৯ এপ্রিল রাতে আত্মহত্যা করেছিল।[৫৮] যে হত্যার কারন হিসাবে ইন্দু ভূষন রায়কে মানসিক ভাবে অসুস্থ বলে চিহ্নিত করা হয়।[৫৯] ইন্দু ভূষন রায় অন্য কোন কারনে আত্মহত্যা করেছিল কিনা সেই বিষয় অনুসন্ধানের বিষয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে পরিলক্ষিত হয়নি। ইন্দু ভূষন রায়ের মানসিক অসুস্থতার বিষয়টিকে মূলত দুটি উদ্দেশ্যে কারা কতৃপক্ষ ব্যবহার করেছিল। প্রথমত মৃত্যু নিয়ে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করবার জন্য। আর মানসিক অসুস্থতাকে বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করে আসলে ইন্দু ভূষন রায়ের মৃত্যুর কোন রাজনৈতিক অভিমুখ যেন তৈরি না হতে পারে তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন।

ইন্দু ভূষন রায়ের মৃত্যু বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করবার পরিবর্তে ঔপনিবেশিক প্রশাসন সমস্ত দায় মৃত ব্যক্তির ওপর আরোপ করতে তৎপর ছিল। রাজনৈতিক বন্দিদের আন্দোলনের বৈধতাকে শুধু নয় একই সাথে তাদের মৃত্যুকেও ঔপনিবেশিক প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা থেকে বিরত থেকেছিল। জাতীয় আন্দোলনকারীদের কার্যকলাপ শুধু নয়, তাদের জীবনের প্রতিও ঔপনিবেশিক প্রশাসন কতটা উদাসীন ছিল তা এই মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে অনিচ্ছার মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়। এই উদাসীনতা আসলে প্রকৃত সত্যকে গোপন করবার প্রচেষ্টা। ইন্দু ভূসন রায়ের মৃত্যুর কারন অনুসন্ধানের জন্য যে সকল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরন নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নন্দ গোপাল। নন্দ গোপাল স্বরাজ্য পত্রিকায় রাজদ্রোহ মূলক রচনার জন্য দ্বীপান্তরের শাস্তি পেয়েছিলেন।[৬০] তিনি বলেন ইন্দু ভূষন রায় মূলত জেলের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেছিল। তেল কলে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে ইন্দু ভূষন রায়কে বাধ্য করা হয়। শাস্তির নামে যে অত্যাচার করা হোত তার থেকে মুক্তি পেতে ইন্দু ভূষন রায়ের মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে কালিয়ান বলে অপর এক রাজনৈতিক বন্দি আত্মহত্যা করেছিল। সে ক্ষেত্রেও কঠোর পরিশ্রমকেই নন্দ গোপাল আত্মহত্যার কারন হিসাবে উল্লেখ করে।[৬১] ঔপনিবেশিক প্রশাসন তাদের রিপোর্টে অবশ্য নন্দ গোপালের অভিযোগকে সম্পূর্নরূপে অস্বীকার করে। নন্দ গোপাল রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ার কারনে এই অভিযোগ করছে বলে উল্লেখ করা হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল লক্ষ্যছিল ইন্দু ভূষন রায়কে মানসিকভাবে অসুস্থ প্রমান করা সেই কারনে নন্দ গোপালের মতকে গুরুত্ব প্রদান করতে চায় নি।

ইন্দুভূষন রায়ের মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি দলিলে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে উল্লেখ করা হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কাঠামোর বিরোধিতা করছিল ইন্দুভূষন রায়। ইন্দুভূষন রায়ের ন্যায় বন্দিদের সম্পর্কে ডাকাত শব্দটিও ব্যবহার করা হোত। ডাকাতি বা রাষ্ট্রদ্রোহী শব্দ গুলির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামো প্রতিষ্ঠান বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধের চরিত্রকে অবৈধ প্রতিপন্ন করতে চাইত। তবে ইন্দুভূষন রায়ের মৃত্যুর কারনে রাজনৈতিক বন্দি সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি গন-পরিসরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৪ জুলাই ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দি শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল বেঙ্গলি প্রত্রিকা। বেঙ্গলি পত্রিকার সেই রিপোর্টে সাধারন বন্দিদের থেকে রাজনৈতিক বন্দিদের পৃথক করা হয়। লেখা হয় রাজনৈতিক বন্দি হল তাঁরা যারা তাদের মতামতের জন্য কারাবাস করছে।[৬২] ইন্দু ভূষন রায়ের সূত্রে আন্দামানের সমস্ত বন্দি যারা নিজেদের মতামতের জন্য কারাবাস করছে তাদেরকে রাজনৈতিক বন্দি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইন্দুভূষন রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে লেখা হয় –

> "The suicide of one of the political prisoner, named Indu Bhusan Roy throws lurid light upon the whole situation… and they are treated harshness."[৬৩]

আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আচরনকে স্পষ্টভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল। ইন্দু ভূষন রায়ের আইন অমান্যতাকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও বেঙ্গলি পত্রিকা সম্পূর্ন বিপরীত অবস্থান থেকে বিবেচনা করেছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে ইন্দু ভূষন রায় রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, অন্যদিকে বেঙ্গলি পত্রিকার বিবেচনায় তিনি রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। মতামতের কারনে সম্পাদিত আইন অমান্যতা অপরাধ নয়, তা রাজনৈতিক আচরন, এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল বেঙ্গলি পত্রিকায়। অবশ্য বেঙ্গলি পত্রিকার এই অবস্থানের মধ্যে আইন অমান্যতাকে প্রশয় প্রদানের ইঙ্গিত পেয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন। রাজনৈতিক বন্দি সম্পর্কে জাতীয় গনমানসের চিন্তা যাতে পরিবর্তিত হতে পারে সংবাদপত্র সেই প্রচেষ্টায় করছিল বলে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ধারণা হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে সংবাদপত্রের লেখনীর মাধ্যমে জাতীয় অবস্থানকে সমর্থন ও প্রতিরোধের দিকটি গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বাংলায় যে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ওপর ঔপনিবেশিক প্রশাসন সতর্ক লক্ষ্য রাখত তার মধ্যে অন্যতম হল যুগান্তর। এই পত্রিকায় রাষ্ট্রদ্রোহী রচনার জন্য অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্যের কারাবাস হয়েছিল। সংবাদ পত্রের লেখনীর মূল উদ্দেশ্য পাঠকের মানসিকতাকে প্রভাবিত করা। মানসিকতার পরিবর্তনের বিষয়টি ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে প্রভাবিত করেছিল। সেই কারনে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। লেখনীর মাধ্যমে জাতীয় আবেগের পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন প্রতিরোধ করতে চাইত। তাই বেঙ্গলি পত্রিকার মাধ্যমে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইন্দু ভূষন রায় সম্পর্কে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা সন্ত্রাসবাদী ভাবমূর্তির বিপরীত চরিত্র গড়ে উঠুক তা ঔপনিবেশিক প্রশাসন চায় নি।

কারাবাসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধের বিকাশের সাথে বৃহত্তর জাতীয় প্রতিরোধের সম্পর্ক আছে। কারাবাস ও কারাবাসের সময়কালের শাস্তি সম্পর্কে গন-পরিসরকে সচেতন করবার ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে সংবাদ-পত্রগুলির গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে গন-পরিসরের রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ জাতীয় রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তিত করতে থাকে। এই পরিবর্তনের কারনে ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বের সহযোগী সামাজিক স্তর ক্রমশ সমালোচকে পরিনত হচ্ছিল।[৬৪] সেই কারনে সংবাদপত্রের খবরের দ্বারা প্রভাবিত জাতীয় গনপরিসর ক্রমশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সমালোচনায় মুখর হচ্ছিল। সংবাদপত্রের লেখনীর মাধ্যমে কৃত্রিম সহানুভূতি তৈরি হত বলে ঔপনিবেশিক প্রশাসন মনে করে।[৬৫] সংবাদপত্রগুলি গন-পরিসরকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে চাইত। এই কারনে কারাবাস ও কারাগারের শাস্তি সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করত। ক্ষুদিরাম বসুর কারাবাস ও আদালতের বিচার পক্রিয়া সমকালীন অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। আদালতের সওয়াল জবাবের সময় ক্ষুদিরাম বসু কতটা নির্ভিক ছিল তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয় সংবাদপত্রের লেখনীতে।[৬৬] ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যর পরদিন অর্থাৎ ১২ই আগষ্ট ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকার শিরোনামে লেখা হয় - ক্ষুদিরামের অন্তিম/ প্রফুল্লচিত্তে স্মিতহাস্যে মৃত্যুবরন/ অনাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টি।[৬৭] অমৃতবাজার পত্রিকা বৈপ্লবিক পথের অনুসারী না হলেও ক্ষুদিরামের শহিদ হওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে বৈপ্লবিক সংবাদপত্র ক্ষুদিরামের মৃত্যু কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী কার্যক্রমের সম্প্রসারন ঘটিয়েছিল সেই সংক্রান্ত সংবাদ যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হত। বন্দেমাতরম পত্রিকা ৪ঠা নভেম্বর ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কানাই লাল দত্তের কার্যকলাপকে প্রশংসা করে প্রবন্ধ প্রকাশ করে।[৬৮] কানাইলাল দত্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেছিলেন।[৬৯] ঔপনিবেশি প্রশাসনের কাছে এই হত্যাকে অভূতপূর্ব ঘটনা বলে বিবেচিনা করে। কারাগারের মধ্যে ঘটা হত্যাকান্ডের সাথে গন-পরিসরকে পরিচিত করবার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল।

উপরিউক্তো আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই রাজনৈতিক কারাবাস কিভাবে জাতীয় কল্পনায় প্রতিফলিত হতে শুরু করে। জাতীয় কল্পনার সাথে কারাবাসকে সংযুক্ত করে কারাগারের রাজনীতিকরনের ক্ষেত্রে সমকালীন সংবাদপত্রের লেখনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। স্পষ্টভাবে উপলবদ্ধি করা যায় প্রাক গান্ধী পর্বেই কারাবাসের রাজনীতিকরন ঘটেছিল। কারাবাসের রাজনীতিকরনের এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতি ও সমাজ বাস্তবতার বেশ কয়েকটি দিক প্রতিফলিত হয়। কারাবাসের রাজনীতিকরণ ও রাজনৈতিক বন্দির ধারণা নির্মানের ক্ষেত্রে একদা অনুগত মধ্যবিত্ত শ্রেনিরই অগ্রনী ভূমিকা ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেনি অনুধাবন করেছিল ঔপনিবেশিক আইনের শাসনের অন্তরসার শূন্যতাকে। এই পর্বের কারাগারের রাজনীতিকরণের সাথে পরবর্তী, বিশেষত গনআন্দোলনের সময়কলের রাজনৈতিক কারা-ধারনার চরিত্রগত পার্থক্য আছে। গান্ধীজি গন-আন্দোলন পর্বে রাজনৈতিক কারাবন্দিদের বন্দি অবস্থার আচরনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। গান্ধিজি চেয়েছিলেন সত্যাগ্রহীরা বন্দি অবস্থায় কারাগারের নীতি ও নিয়ম অনুসরন করুক। সাধারন অবস্থায় তিনি বন্দিদের কারা-প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে রাজনৈতিক কারাবাসের সময়কালে প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকবার কোন নির্দেশ ছিল না। রাজনৈতিক কারা-প্রতিবাদ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। কারাগারে কেবলমাত্র সুবিধা বা সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ হয়নি। একই সাথে মর্যাদা প্রাপ্তির মানসিকতাও প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই কারাগারের অভ্যন্তরীন প্রতিবাদকে কেবলমাত্র বস্তুগত চাহিদার দৃষ্টি থেকে বিবেচনা করলে হবে না। কারাগারের অভ্যন্তরীন প্রতিবাদকে বৃহত্তর সমাজের সাথে সংযুক্ত করবার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রই অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। সামাজিক সমর্থন বা সহানুভূতি ছাড়া কারাগারের রাজনীতিকরন সম্ভব হত না। তাই বলা যায় ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরণের প্রবনতা গান্ধী পূর্ব পর্বেই শুরু হয়েছিল। অবশ্যই সেই ধারাকে সুদৃঢ় করেছিলেন গান্ধী। প্রাক-গান্ধী পর্বে কারাগারের রাজনীতিকরনকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের উল্লখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

Reference:

১. চন্দ বিপান, ইন্ডিয়া স্ট্রাগ্যাল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স ২০১৬, পেঙ্গুইন প্রকাশনী, পৃ. ১৪
২. চন্দ বিপান, দ্যা মেকিং অফ মর্ডান ইন্ডিয়া, ২০১২ ওরিয়েন্টাল ব্ল্যাক সোয়ান প্রকাশনী, পৃ. ৫
৩. হার্ডিম্যান ডেভিড, দ্যা নন ভায়োলেন্ট স্ট্রাগেল ফর ইন্ডিয়া, ২০১৮, পেঙ্গুইন প্রকাশনী, পৃ. ১০
৪. তদেব
৫. মুখোপাধ্যায়, উমা স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, স্বরসতী প্রেস, ১৯৬১, পৃ. ১৫৬
৬. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, নবভারত প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ২১
৭. তদেব, পৃ. ২২
৮. ক্যাম্বেল, জেমস, পলিটিক্যাল ট্রাবেল ইন ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী, ১৯১৭, পৃ. ৬৯
৯. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ২৫, তারিখ - ১৯০৭/০৬/২২, পৃ. ৫৭১
১০. তদেব, পৃ. ৫৭২
১১. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - ১৯০৮, মার্চ-১, পৃ. ২১
১২. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ২৫, তারিখ - ১৯০৭/০৭/২২, পৃ. ১৬
১৩. ক্যাম্বেল, জেমস, পলিটিক্যাল ট্রাবেল ইন ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী, ১৯১৭, পৃ. ৮৩
১৪. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৮, তারিখ - ১৯০৭/০৬/২৯, পৃ. ৬০৫
১৫. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – ১৯০৮, মার্চ – ১, পৃ. ৩৬
১৬. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৩৫
১৭. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৯, তারিখ - ১৯০৭/০৯/২৮, পৃ. ১০১২
১৮. তদেব, পৃ. ১০১৪
১৯. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৩৮
২০. তদেব, পৃ. ৯৩৫
২১. তদেব, পৃ. ৯৩৬
২২. তদেব, পৃ. ৯৫৩
২৩. ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বাংলা ও আসামের পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – বি – ১৯০৭, পৃ. ১৩
২৪. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা, ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৫০
২৫. তদেব, পৃ. ৯৫০
২৬. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - এ_১৯০৯_মার্চ_১, পৃ. ৪
২৭. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম পক্ষের বাংলা ও আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - এ-১৯০৮_১০৭, পৃ. ৪
২৮. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ১২, তারিখ - ১৯০৮/০৩/২১, পৃ. ৫৩৯
২৯. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম পক্ষের বাংলা ও আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - এ-১৯০৮_১০৭, পৃ. ৫
৩০. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ১৩, তারিখ - ১৯০৮/০৩/২৮, পৃ. ৫৭০
৩১. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - ১৯০৮/১, পৃ - ১১
৩২. ঘোষ, অরবিন্দ, বন্দেমাতরম, প্রকাশক, অরবিন্দ আশ্রম, ২০০২, পৃ. ৬১২
৩৩. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩০, তারিখ - ১৯০৭/০৭/২৭, পৃ. ৭১০

৩৪. ঘোষ, অরবিন্দ, বন্দেমাতরম, প্রকাশক, অরবিন্দ আশ্রম, ২০০২, পৃ. ৬১৩
৩৫. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ফাইলঃ ১৯০৮/১, পৃ. ১১
৩৬. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৩, তারিখ - ১৯০৭/০৮/১৭, পৃ. ৩৫৬
৩৭. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩০, তারিখ - ১৯০৭/০৭/২৭, পৃ. ৩০২
৩৮. তদেব, পৃ. ৩০৩
৩৯. তদেব, পৃ. ৩০৪
৪০. তদেব, পৃ. ৩০২
৪১. আরবিন্দ, অন ন্যাশানালিজম, অববিন্দ ট্রাস্ট, ২০১৭, পৃ. ২২৫
৪২. বাংলারদেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৩, তারিখ - ১৯০৭/০৮/১৭
৪৩. মুখোপাধ্যায়, হরিদাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, প্রকাশনী, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় (১৯৬১), পৃ. ১৭
৪৪. ক্যাম্বেল জেমস, পলিটিক্যাল ট্রাবেল ইন ইন্ডিয়া (১৯০৭ - ১৯১৭) ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী, ১৯১৭, পৃ. ৮১
৪৫. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরি, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক, ফাইল - ১৯০৮_১, পৃ. ১৫
৪৬. তদেব, পৃ. ১৬
৪৭. বাংলারদেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৮৭
৪৮. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৮, তারিখ - ১৯০৭/০৯/২১, পৃ. ৯৮৭
৪৯. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৯, তারিখ - ১৯০৭/১০/২, পৃ. ৩৮০
৫০. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৪৪, তারিখ - ১৯০৭/১১/০২, পৃ. ১১৯৭
৫১. তদেব, পৃ. ২৪৬
৫২. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের দেশীয় বাংলা ও আসামের দেশীয় পত্রিকা সম্পর্কিত রিপোর্ট, পৃ. ২
৫৩. তদেব, পৃ. ৪
৫৪. অরবিন্দ ঘোষ, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শাস্তিকে অত্যন্ত অবিচলিত ভাবে গ্রহন করেছে। তার ফলে শাস্তি সম্পর্কিত ভীতিবোধের বিপরীত মানসিকতা প্রদর্শন করেন। যা ঔপনিবেশিক শাস্তি ও কারাবাসের ভীতি তৈরির মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।
৫৫. দেশীয় ভাষায় স্বদেশী সংবাদপত্র সম্পর্কিত রিপোর্ট, সংখ্যা - ৭, তারিখ - ১৯০৮/০২/১৫, পৃ. ২৬৯
৫৬. তদেব, পৃ. ২৭০
৫৭. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের শাস্তি প্রস্তাব, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - বি_১৯০৭_৬৬, পৃ. ২
৫৮. কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার রিগার্ডিং দ্যা সুইসাইট অফ ইন্দুভূষন রায়, স্বরাষ্ট্র ও রাজনীতি বিভাগ, ফাইল - বি/১৯১২/৬১-৬৪, পৃ. ৬
৫৯. তদেব, পৃ. ২০
৬০. আর্টিক্যাল ইন দ্যা বেঙ্গলি রিগার্ডিং দ্যা সুইসাইড অফ ইন্দুভূষন রায়, রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - বি- ১৯১২/ ৬০, পৃ. ২০। প্রত্যক্ষ্যদর্শী নন্দগোপালের বিবরনীর ভাষায় - "...I think he (indubhusan) he must have committed suicide to escape from the troubles and torture of the jail"
৬১. তদেব, পৃ. ২২
৬২. আর্টিক্যাল ইন দ্যা বেঙ্গলি রিগার্ডিং দ্যা সুইসাইড অফ ইন্দুভূষন রায়, রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – বি - ১৯১২ / ৬০, পৃ. ৪০
৬৩. তদেব, পৃ. ৩৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬৪. ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সমর্থক মধ্যবিত্ত শ্রেনি মূলত এই সময় বিরোধীতে পরিনত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেনির সমালোচনার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল সংবাদপত্র। এই বিষয়টি সুমিত সরকার 'স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

৬৫. ফোর্টনাইট রিপোর্ট অন দ্যা পলিটিক্যাল সিচ্যুয়েশান ১৯০৮ (মার্চ), স্বরাষ্ট্র ও রাজনীতি, ফাইল - এ/১৯০৮/১০৭

৬৬. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৪, তারিখ - ১৯০৮/০৮/২২, পৃ. ১৫৪৯

৬৭. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ক্ষুদিরাম সংখ্যা, বর্ষ - ২৩, সংখ্যা – ২৫ ও ২৬, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ৬৬৪

৬৮. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৪৬, তারিখ - ১৯০৮/১১/১৪, পৃ. ১৮৭০

৬৯. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – এ - ১৯০৯ মার্চ - ১, পৃ. ১৯

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 915 - 923
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা : একটি তথ্যমূলক বিশ্লেষণ

মিহির মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ
Email ID : m.mihir0903@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Nationalism, Newspaper, British rule, Independence movement, Media, Social-media.

Abstract

Indian nationalism and the media is an important relationship that affects every level of society. The media illuminates various aspects of Indian nationalism and spreads nationalism within the society. The concept of media and nationalism is not new in India, it has deep roots in history and civilization. The history of newspapers or journalism in India dates back to ancient times. Evidence of this can be found by analyzing the history of India's oldest books - the Vedas, Puranas, Ramayana, Mahabharata, etc.

The modern concept of Indian media developed during the British rule and the media played a significant role in awakening the feeling of nationalism among the countrymen during the independence movement.

The rise of regional newspapers in India in the 19th century played a significant role in shaping public opinion, organizing political movements and propagating nationalism. As a result, the Indian National Congress was founded in December 1885, which was the first organized expression of Indian nationalism at the all-India level.

The media played a significant role in strengthening nationalism in post-independence India. Article 19 of the Indian Constitution provides for freedom of speech and expression, under which freedom of the press is enshrined. As the fourth pillar of Indian democracy, the media has been providing news independently on the internal peace and order or crisis of the country, war or friendly relations with any other country and the spread of nationalism.

Nowadays, since the rise of social media, the entire media system has changed. Today, social media has become the most powerful platform for shaping and organizing public opinion. Nowadays, nationalism has become the most controversial topic on social media. Additionally, nationalist sentiments are expressed through social media regarding the successes and

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

failures of various events organized within the country and in the field of Indian foreign policy.

Discussion

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যা সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে প্রভাব ফেলে। গণমাধ্যম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন দিকে আলোকিত করে এবং সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসারণ করে। গণমাধ্যম ও জাতীয়তাবাদের ধারণা ভারতে নতুন নয়, ইতিহাস ও সভ্যতার গভীরে এর শিকড় রয়েছে। সংবাদপত্র গণমাধ্যমগুলির মধ্যে শুধু প্রাচীনতমই নয়, এখনও পর্যন্ত বলিষ্ঠতম মাধ্যম রূপেই স্বীকৃত। সমাজে রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির বিস্তার ও প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব তাতে কিছু মাত্রায় ক্ষুন্ন হয়নি বরং ক্রমবর্ধমান।[১]

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থানের পর থেকে পুরো মিডিয়া ব্যবস্থা বদলে গেছে। আজ সোশ্যাল মিডিয়া জনমত গঠন ও সংগঠিত করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। আজকাল জাতীয়তাবাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও পরিষেবা প্রদান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রসারিত হয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীতে কাশ্মীরের পুলওমায় সেনা কনভয়ের উপর জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে এবং ভারতীয় বায়ু সেনার পাকিস্তানের বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, যা সারাদেশব্যাপী ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই জাতীয়তাবাদী আলোচনা অন্য মাত্রা অর্জন করে।

প্রাচীন ভারতে সংবাদপত্র : ভারতবর্ষে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতার ইতিহাস বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রথিত রয়েছে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময়কার কাজকে 'সাংবাদিকতা' বলে অভিহিত করা হতো না। ভারতে বৈদিক যুগের সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় চতুর্বেদের অন্যতম ঋগ্বেদে। এই ঋগ্বেদে 'সূত' ও 'পালাগল' এই দুই শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ আছে। 'সূত' হল পুরান কথক রাজ-সাংবাদিক এবং সারথি। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Royal Herald'। 'পালাগল' হল সংবাদ-বাহক বা 'Courier'। রামায়ণ এবং মহাভারত কেবল প্রাচীন মহাকাব্যই নয়, তৎকালীন সমাজের দর্পণ বলেও স্বীকৃত। এই মহাকাব্য দুটিতে সাংবাদিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা – নারদ, বাল্মিকী, সুগ্রীব, সঞ্জয়, বিদুর। মহাভারতের সংগঠিত কুরুক্ষেত্রের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় সঞ্জয়ের কাছ থেকে। আমার জতুগৃহে কুন্তিসহ পঞ্চপান্ডবকে পুড়িয়ে মারার গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্তটির সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন বিদুর। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে এই সমস্ত চরিত্র গুলিকে সাংবাদিক নামে চিহ্নিত করা না হলেও বর্তমান সময়ের সাংবাদিকের কাজের সঙ্গে তাদের কাজের কোন পার্থক্য ছিল না।[২]

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে সংবাদপত্রের প্রভাব : প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ভারতে ছাপাখানা ছিল না। মোঘল আমলে ভারতে হাতে লেখা সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। মোঘল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে 'চর' রাখতেন, এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করে কখনো মাসে একবার কখনো বা সপ্তাহে সপ্তাহে লিখে পাঠাতো। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হত। এই প্রথার অনুকরণে সেনাপতি, শাসনকর্তা এবং করদ-রাজারাও রাজ দরবারের ঘটনা, রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ, লেখক, ওয়াকেয়া-নবিস রাখতেন। এই সকল সংবাদ লিপির নাম ছিল 'আখবার'।[৩]

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ধনী ব্যবসায়ীরাও ব্যক্তিগত সংবাদ লেখক নিযুক্ত করতেন। সংবাদ লেখকরা বাণিজ্যিক ও অন্যান্য খবরসহ তথ্যপত্র প্রস্তুত করে মনিবের কাছে পাঠাতো। মুদ্রা যন্ত্রের সুবিধা না থাকার জন্য এইসব সরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্য ও সংবাদপত্র হাতেই লেখা হত। সংবাদের বৈচিত্র না থাকায় এগুলির প্রচার জনসাধারণের ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রিটিশ শাসনকালে সংবাদপত্র : ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জানুয়ারি ভারতের প্রথম মুদ্রিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা করেন জেমস অগস্টাস হিকি (James Augustus Hicky)। হিকির সাপ্তাহিক পত্র 'বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' (Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser) ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী হিকি ছিলেন পত্রিকাটির লেখক, সম্পাদক এবং প্রকাশক। পত্রিকাটি সপ্তাহে একবার শনিবার ছাপা হত এবং মূল্য ছিল এক টাকা। সংবাদ পত্রটি সরকারি দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং নাগরিক সমস্যা-সহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক সংবাদ প্রকাশ করা হত। কিন্তু হিকি অবগত হন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রতিযোগীরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র চালু করতে চায়, তখন তিনি শক্তিশালী কোম্পানি বিরোধী অবস্থান নেন। কোম্পানি এবং তার কর্মকর্তাদের ক্রমাগত সমালোচনার কারণে পত্রিকাটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজরে আসে ফলস্বরূপ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে পত্রিকাটি একাধিক মানহানির মামলাসহ আইনি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। মি: হিকি মানহানির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং গ্রেফতার করা হয়। প্রকাশের দুই বছর পর মার্চ মাসে ১৭৮২ সালে পত্রিকার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয় ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৫]

হিকির পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার দশ মাসের মধ্যেই ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'বেঙ্গল গেজেট' এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়া গেজেট'। মাদ্রাজ ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ ও বোম্বাই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্সর প্রথা চালু হয়, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ওঠে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মারকুইস অব ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য তিনি রেগুলেশন জারি করেন। সরকারি ভাবে আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্র দমনের সূত্রপাত ঘটে।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলির শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা পত্রিকা 'দিগদর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮) এবং 'সমাচার দর্পণ' (মে, ১৮১৮)। দিগদর্শন ছিল মাসিক পত্রিকা এবং সমাচার দর্পণ ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকা দুটির সম্পাদক হিসেবে জন মার্শম্যানের নাম থাকলেও সহ-সম্পাদক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই মে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গাল গেজেট' – প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র (বাংলা), প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। শুরু হল ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়। এই সময় থেকে সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই সময় থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর জেমস সিল্ক বাকিংহাম 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি সংবাদপত্রের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এই পত্রিকাটির মাধ্যমে সাংবাদিকতার একটি আদর্শ ফুটে ওঠে। রামমোহন রায় এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।[৬]

গবেষক কৃষ্ণ ধরের মতে, রামমোহন রায় ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর প্রথম দ্বিভাষিক পত্রিকা 'Brahmanical Magazine' ইংরেজিতে ও 'ব্রাহ্মণসেবধি' বাংলায় প্রকাশ করেন। পত্রিকা 'ব্রাহ্মণসেবধি' : ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ। তিনি ক্রমশ খ্রিস্টধর্মের যাজকদের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম বিষয়ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং ধর্ম সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি আন্দোলনে কলমই তাঁর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিভাষিক এই পত্রিকার মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[৭]

রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮২১ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'সংবাদ কৌমুদী' ও ১৮২২ সালে প্রকাশিত পার্শী সংবাদপত্র 'মিরাত-উল-আকবার' হল ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সংবাদপত্র। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যার বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা সংগঠিত হত। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় সাংবাদিকতার অগ্রগতিতে প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায়ের যৌথ উদ্যোগে ১৮৩০ সালে বাংলা ভাষায় 'বঙ্গদূত' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এরপর ১৮২৯ সালে ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, পরবর্তীকালে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন থেকে দৈনিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র আদর্শের উত্তরাধিকাররূপে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি। এই সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেশের সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা গভীরভাবে অন্বেষণ ও সমাধানের পথ খুঁজতে চেষ্টা করত। দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানোই ছিল এই পত্রিকার প্রধানতম উদ্দেশ্য।[৯]

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন রায়ের মালিকানায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মিলিটারি অডিটর জেনারেল - এ কর্মরত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামে প্রকাশিত (১৮৫৩) হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভারতের প্রথম জাতীয় পত্রিকার মর্যাদা অর্জন করে। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিস্তারিত সংবাদ ও মতামত নির্ভীকতার সঙ্গে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হতে থাকে। নীল বিদ্রোহের সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র বাংলা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১০]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে তখন শাসকগোষ্ঠী দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল না, কৃষক, কারিগর এবং সাধারণ মানুষও এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক বলে যাকে মনে করা হয়, সেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর তার বই 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ১৮৫৭' - এ আজিমুল্লাহ খান সম্বন্ধে লিখেছেন ১৮৫৭-র বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম ছিলেন আজিমুল্লাহ খান। স্বাধীনতা যুদ্ধর ভাবনাটা যাদের মাথায় প্রথম এসেছিল তাদের মধ্যে আজিমুল্লাহ অন্যতম। তিনি ইংরেজি, ফরাসি-সহ বেশ কয়েকটি বিদেশি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আজিমুল্লাহ প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুক্তিকামী ভারতীয়দের মুখপত্র স্বরূপ 'পায়ম-ই-আজাদী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। উর্দু, মারাঠি আর হিন্দিতে ছাপা হত পত্রিকাটি। তিনি ইউরোপ থেকে একটা ছাপার যন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন, সেই যন্ত্রেই ছাপা হত পত্রিকাটি। উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের গবেষক আসাদ ফয়সাল ফারুকি বলেন যে, ওই পত্রিকার মধ্যে দিয়েই বিদ্রোহের কথা, স্বাধীনতার কথা ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন আজিমুল্লাহ খান। তিনি স্বাধীনতার জন্য একই সঙ্গে মুসলমান, হিন্দু, শিখ – সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই বার বার তার পত্রিকার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহের যে মার্চিং সং, সেটিও তারই লেখা। যার শেষ দুটি লাইনে বোঝা যায় সব ধর্মের মানুষকে কীভাবে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন : "হিন্দু মুসলমান শিখ হামারা, ভাই ভাই প্যেয়ারা, ইয়েহ আজাদি কা ঝাণ্ডা, ইসে সালাম হামারা" ... অর্থাৎ "হিন্দু, মুসলমান শিখ সবাই ভাই-ভাই, এই স্বাধীনতার পতাকাকে আমাদের সালাম"। 'পায়ম-ই-আজাদী'-র আহ্বান সিপাহী বিদ্রোহে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তাই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর কোম্পানির ইংরেজ সৈন্যরা যার বাড়িতেই এই কাগজ পাওয়া গিয়েছিল তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। আজও ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে মহাবিদ্রোহের সমর্থক এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম।[১১]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক ১৮৫৮ সালে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের সমর্থন করেছিল এবং বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা করেছিল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নীলচাষীদের সমর্থনে কলম ধরেছিল।[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হেমেন্দ্র কুমার, শিশির কুমার ও মতিলাল ঘোষের যৌথ উদ্যোগে ১৮৬৮ সালে দ্বিভাষিক ইংরেজি ও বাংলা সাপ্তাহিক হিসেবে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রগুলির মধ্যে অন্যতম অমৃতবাজার পত্রিকা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচার করত।[১৩]

জন্মলগ্ন থেকে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র সোচ্চার হয়েছিল। ভারতীয় জনগণের স্বার্থরক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের দাবির প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবুও ইংরেজ-শাসকের বিরোধিতা করার জন্য, শক্তিশালী সুসংহত সর্বভারতীয় সংগঠনের অভাব তখনও ছিল। অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা ও ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় সংস্থা সংগঠিত করার প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে হিউম লিখেছিলেন : "নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ না হলে কিছুই হবে না। বিদেশীরা কিছুই তোমাদের দিতে পারে না। তবে তোমরা এগিয়ে এলে তারা তোমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিতে পারে"। তারই ভিত্তিতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীর কংগ্রেস সংগঠিত হয়।[১৪]

২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ সালে, ৭২ জন সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক এবং আইনজীবী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের জন্য গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ, বোম্বেতে সমবেত হন।[১৫]

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এর পর থেকেই দেশের প্রশাসনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে শুরু করে।[১৬]

ভারতীয় জনসাধারণের উচ্চতর পর্যায়ে জাতীয় সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৯ সালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা নানা ধরনের স্বদেশী সংবাদপত্র প্রসারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক 'কেশরী' এবং 'দি মারাঠা' (একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক) দুটি পত্রিকাই জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারণা উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯০৭ সালে সুরাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উদারপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে ভাগ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪ - ১৮) জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উদারপন্থি গোষ্ঠী ভারতীয় জনসাধারণের দাবি পূরণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল ও যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। তিলকের নেতৃত্বে অপর গোষ্ঠী অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনের জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ সংগঠিত করার পক্ষপাতী ছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের প্রথম ঢেউ দেখা যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল এই আন্দোলন তারই পরিণতি। মহাত্মা গান্ধী, সি. আর. দাশ, মতিলাল নেহেরুসহ কংগ্রেস ও খিলাফৎ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। আন্দোলনের ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসারিত হয়। ১৯১৯ সালে গান্ধীজি 'Young India' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তার রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচির মুখপত্র হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালের পর 'হরিজন' নামে একটি ইংরেজি হিন্দি এবং অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশ জনপ্রিয় ছিল। ১৯১৯ সালে পন্ডিত মতিলাল নেহেরু এলাহাবাদে 'Independent' (ইংরেজি দৈনিক) প্রকাশ করেন। এটি ছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতামত প্রচারের মুখপত্র। ১৯৩০ সালে এস. সদানন্দের সম্পাদনায় 'Press Journal' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি কংগ্রেসের স্বাধীনতা দাবি ও সংগ্রামের দৃঢ় সমর্থক ছিল। ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও বিস্তার হতে থাকল। সমস্ত প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্য শহরে দেশীয় ভাষায় এবং ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে সাময়িক পত্র, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।[১৭]

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে গণমাধ্যম : স্বাধীনতা উত্তর ভারতে গণমাধ্যম জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকারের তালিকার মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় জনগণের সংবাদ পাওয়ার অধিকার (Right to Information)।[১৮]

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। Harold Joseph Laski বলেছেন, "যা কিছু ঘটেছে, যা সংবাদ তার সবটা স্বাধীন ও অবিকৃতভাবে নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে হবে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে নাগরিকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তবেই গণতন্ত্র সফল হবে"। ভারতের সংবাদপত্রের ঐতিহ্য অতি উজ্জ্বল। ইংরেজ শাসনের আমলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাদের স্বাধীন ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পরেও ভারতের সাংবাদিকতা এই মহান ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছে। সবসময় সাংবাদিকরা শাসক দলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন এমন নয়। তবে গণতন্ত্রের প্রশ্নে মুখ্য ঘটনাগুলিতে তাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।[১৯]

১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং সংবাদপত্র গুলি ছাপার আগে সবকিছু সেন্সর করিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। এইসব প্রতিকূলতার মধ্যেও সংবাদপত্রের উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। ভারতের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যম দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বা সংকট, অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং জাতীয়তাবাদের প্রসারে স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে।

রেডিও : ১৯২৩ সালের জুন মাসে বোম্বে রেডিও ক্লাব দেশে প্রথম অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এর পাঁচ মাস পরে নভেম্বর, ১৯২৩ ক্যালকাটা রেডিও ক্লাব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯২৭ সালে ২৩ জুলাই ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্ট কোম্পানি (আইবিসি), বোম্বে স্টেশন ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন উদ্বোধন করেন। এপ্রিল ১৯৩০ সালে, শিল্প ও শ্রম বিভাগের অধীনে 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার পরিষেবা' পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের ৩০ আগস্ট, Lionel Fielden ভারতে প্রথম 'সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক' নিযুক্ত হন। পরের মাসে আকাশবাণী মহীশূর, একটি বেসরকারী রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়। জুন ৮, ১৯৩৬ সালে, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার পরিষেবা All India Radio (AIR) অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া রেডিওতে পরিণত হয়। ১লা আগস্ট, ১৯৩৭ কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। ১৯৩৭ সালে AIR যোগাযোগ বিভাগের অধীনে আসে এবং চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগের অধীনে আসে। ১৯৫৬ সালে জাতীয় সম্প্রচারকের জন্য 'আকাশবাণী' নামটি গৃহীত হয়েছিল। 'বিবিধ ভারতী' পরিষেবাটি ১৯৫৭ সালে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের প্রধান উপাদান হিসাবে চালু করা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে প্রথম টিভি স্টেশন AIR-এর অংশ হিসাবে শুরু হয়েছিল।

'Indian Agricultural Research Institute' Pusa, নয়াদিল্লিতে ১৯-২১শে মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃষি উন্নয়ন মেলা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী রাধা মোহন সিং-এর বার্তা, AIR এর মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী সম্প্রচার করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ভারত সরকার ২০১৬ সালের খরিফ মরসুম থেকে শুরু করেছিল। ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমস্ত AIR স্টেশনগুলিকে কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য এই প্রকল্প সম্পর্কে প্রচার এবং সচেতনতা প্রচার চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য, মহিলা ও শিশুদের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুষ্ঠানগুলি অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রচার হয়। এছাড়াও AIR বা আকাশবাণী জাতীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্প্রচার করে থাকে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণ। নয়াদিল্লি থেকে ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের সরাসরি সম্প্রচার। বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ। ১৫ই আগস্ট দিল্লির লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান এবং জাতির উদ্দেশে ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত উপযুক্ত কর্মসূচি।[২০]

টেলিভিশন : ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) বিশ্বে প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করার পর ১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রথম টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 915 - 923
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যান চলাচল, পথ চলার নিয়ম-কানুন, নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকারের মতো বিষয়ে সপ্তাহে দু'দিন এক ঘন্টা করে অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা হত। ১৯৭২ সালে ভারতে টেলিভিশনের প্রথম বড় আকারের সম্প্রসারণ করা হয়। এই সময় বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেলিভিশন কেন্দ্রটি খোলা হয়, এরপর শ্রীনগর এবং অমৃতসরে ১৯৭৩ সালে এবং কলকাতা, মাদ্রাজ এবং লক্ষ্ণৌ'তে ১৯৭৫ সালে টেলিভিশন কেন্দ্র খোলা হয়। এই সময় সাদাকালো ছবি টেলিভিশনে সম্প্রচার হত। ১৯৭৬ সাল নাগাদ ভারত সরকারের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে জাতীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক হিসাবে দূরদর্শনকে পৃথক বিভাগ হিসাবে গড়ে তোলে। মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য ও অখন্ডতা, যদিও সম্প্রচারের মধ্যে কিছু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর ফলে, টেলিভিশন সাধারণ মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর, ১৯৮২ সালে দেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ 'Insat-1A' দূরদর্শনের সমস্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেই প্রথম দূরদর্শন দিল্লি থেকে অন্য সমস্ত দূরদর্শন কেন্দ্রের জন্য জাতীয় অনুষ্ঠান শুরু করে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে দেশে এশিয়ান গেম্‌স - এর আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই গেম্‌স - এর সম্প্রচারের সময় থেকেই রঙিন ছবির সম্প্রচার শুরু হয়। এরপর ৮০-র দশক ছিল দূরদর্শনের বিখ্যাত টেলিভিশন সিরিয়াল 'হামলোগ' (১৯৮৪), 'বুনিয়াদ' (১৯৮৬ - ৮৭) এবং 'রামায়ণ' (১৯৮৭ - ৮৮) ও 'মহাভারত' (১৯৮৮ - ৮৯)-এর মতো পৌরাণিক নাটক দূরদর্শনে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ৯০-এর দশকের প্রথম দিকে উপগ্রহ টেলিভিশনের মাধ্যমে CNN -এর মতো বিদেশি অনুষ্ঠানের সম্প্রচার। এরপরেই Star-TV এবং তার আরও কিছু পরে G-TV এবং Sun-TV-র মতো দেশীয় চ্যানেলগুলি ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। এরপর ১৯৯০ - এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কেবল্‌ টেলিভিশন সম্প্রচার পারিবারিক বিনোদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দেয়।[২১]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম : বর্তমানে, Social media বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, এবং এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা মানুষের সাথে সংযোগ করতে এবং তথ্য ভাগ করতে ব্যবহার করা হয়। ভারতের সরকারি দপ্তর বা বিভাগগুলি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবিধা নিতে পারে। Ministry of Information and Broadcasting (MIB) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক সরকারী খবর এবং তথ্য সরবরাহ করতে, সরকারী অনুষ্ঠান এবং পরিষেবা প্রচার করতে এবং নাগরিকদের সাথে জড়িত থাকার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। নাগরিকদের ট্যাক্স এবং আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জনস্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য এবং পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং তাদের সরকারি কর্মসূচি এবং পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। বিভিন্ন সরকারী সংস্থাগুলি নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করতে, গ্রাহক সহায়তা প্রদান, প্রতিক্রিয়া পেতে, তথ্য ও পরিষেবা প্রদান এবং নাগরিক সচেতনতার প্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে।[২২]

গণযোগাযোগে উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তন গণমাধ্যমকে আরও শক্তিশালী করেছে। সাশ্রয়ী মূল্যের স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেটে সহজলভ্যতা মিডিয়াকে সেকেন্ডের মধ্যে তথ্য প্রচার করতে সাহায্য করেছে। ভারতে ২০১২ সাল থেকে রাজনীতির উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে, ভারতীয় নির্বাচনে প্রচার ও যোগাযোগের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের রাজনৈতিক খ্যাতি এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে বার্তা প্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে।[২৩]

2019 সালের 14 ফেব্রুয়ারি, বিস্ফোরক-বোঝাই গাড়ি চালিয়ে আসা আত্মঘাতী জঙ্গি কাশ্মীরের কাছে পুলওয়ামায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের একটি কনভয়ের উপর আক্রমণ চালায়, এই ঘটনায় 40 জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সারা দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। এই

হামলার পাল্টা জবাবে 26 ফেব্রুয়ারি ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের বালাকোটের জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি শিবিরে আঘাত হানে।[২৪]

ভারতীয় সেনা সূত্রের দাবি, ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ১২টি মিরাজ-২০০০ যুদ্ধবিমান পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের বালাকোটে ২০ - ২১ মিনিটের অভিযানে, মাত্র দেড় মিনিটে ১০০০ কেজি ওজনের বোমা ফেলেছে। তাতে মারা গিয়েছে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন জঙ্গি।[২৫] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহু পাক ব্যবহারকারীর পোস্ট থেকে জানা যায়, পাক সীমান্তে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান উড়তে দেখা গিয়েছে যা থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।[২৬] ভারতের গণমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে এবং ভারতীয় বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বার্তা বিনিময় ও আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে।

Reference:

১. পাল, তারাপদ, ভারতের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাস ১৭৮০ - ১৯৪৭ পৃ. ২৯
২. See পাল, ibid পৃ. ২২ - ২৩
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ, বাংলা সাময়িক পত্র প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, মাঘ ১৩৫৪
৪. দেশাই, এ আর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৩ পৃ. ১৯২
৫. চক্রবর্তী, রথীন, গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র পৃ. ২৩০
& hicky-s-bengal-gazette, NDTV, 13, may, 2024
https://www.ndtv.com/webstories/feature/hicky-s-bengal-gazette-india-s-first-newspaper-17329
৬. See পাল, ibid, পৃ. ৩৬
৭. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বিবিসি নিউজ বাংলা, ৮ মার্চ ২০২০,
https://www.bbc.com/bengali/news-50408248
৮. See দেশাই, ibid, পৃ. ১৯৩
৯. See পাল, ibid, পৃ. ১৩৯
১০. See পাল, ibid, পৃ. ১৪১ & See চক্রবর্তী, ibid, পৃ. ৬৮
১১. অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি নিউজ বাংলা, কলকাতা ২৭ মার্চ ২০২৪
https://www.bbc.com/bengali/articles/c8v3lmjpm1vo
& See চক্রবর্তী, ibid, পৃ. ৬৬
১২. See দেশাই, ibid, পৃ. ১৯৩
১৩. See দেশাই, ibid, পৃ. ১৯৪
১৪. See পাল, ibid পৃ. ১৮৪
১৫. Indian National Congress, history of Congress
https://inc.in/brief-history-of-congress
১৬. See পাল, ibid পৃ. ১৮৫
১৭. See দেশাই, ibid পৃ. ১৯৫
১৮. See চক্রবর্তী, ibid পৃ. ১৬০
১৯. See চক্রবর্তী, ibid পৃ. ১৮১
২০. All India Radio/Prasarbharati
https://prasarbharati.gov.in/all-india-radio-2/#1588508332867-217ff0f1-f4fe

২১. কাচোট, সঞ্জয়, Journey of the television revolution, PIB, 06 August, 2017
https://archive.pib.gov.in/independenceday2018/ifregcontent.aspx?relidd=169686&langcode=BEN
২২. Leveraging Social Media: Enhancing User Experience through Social Platforms for Government India Websites
https://guidelines.india.gov.in/activity/leveraging-social-media-enhancing-user-experience-through-social-platforms-for-government-india-websites/
২৩. Mir; Aijaz Ahmad, Rao; Dr A.Nageswara, The Use Of Social Media In Indian Elections: An Overview, Webology (ISSN: 1735-188X) Volume 19, Number 6, 2022
২৪. হুডা, ডি এস লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত), বর্ষপূর্তিতে ফিরে দেখা বালাকোট হামলার সাফল্য, E TV Bharat, 04 March 2020
https://www.etvbharat.com/bengali/west-bengal/bharat/bharat-news/review-on-balakot-air-strike/wb20200304110112393
২৫. Choudhury, Premangsu, দেড় মিনিটেই সব শেষ! পাকিস্তানে ঢুকে জইশের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় বায়ুসেনা, আনন্দবাজার পত্রিকা, 27 February 2019
https://www.anandabazar.com/india/indian-air-strike-india-s-air-strike-on-pakistan-1.959061
২৬. Basu, Maharsh, ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতীয় বায়ুসেনার, এই সময় পত্রিকা, 10 June 2024
https://eisamay.com/world/panic-grips-in-karachi-after-blackout-with-rumours-of-iaf-strike-in-pakistan/articleshow/76301099.cms

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 924 - 932
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক রানীর গৌরবগাথা – নানাঘাট প্রশস্তি

ভবেশ মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বঙ্কিম সর্দার কলেজ
Email ID : bssbjrp@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Nānāghāta praśasti, Andhrabhṛtya, Rājasūya, Aśbamēdha, Atirātra, Gabāyamana, Nayanika, Goutami.

Abstract
Nayanika was the first historical woman ruler in the history of ancient India. She was the wife of third Satavahana king Satakarni - I. After the death of her husband, Satakarni - I, she ruled as the guardian of her minor son. She was the first Indian woman to grace the currency of her realm alongside her consort that circulated throughout the land. She commissioned Nana-ghat inscription which is the oldest and most historically significant source for Satvahana kingdom. Her story serves as an eternal source of inspiration and reminds of the pivotal role played by woman in shaping the destiny of the Deccan civilizations. In Indian history many legendary women, like Rani Rudrama, Razia Sultana, Durgavati, Laksmi Bai, have gained immense popularity but we have heard little about Nayanika's era. Therefor it is necessary to find out the history of the queen Nayanika's realm.

Discussion

খ্রিস্টপূর্ব সময়কাল থেকে দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের কার্যকলাপের বহু পাথুরে সাক্ষ্য রয়েছে। যার অন্যতম দৃষ্টান্ত সাতবাহন লেখমালা। যেখানে রানী নাগনিকা/ নাগন্নিকার (সংস্কৃত নায়নিকা) নানাঘাট প্রশস্তি এবং রাণী গৌতমীর নাসিক প্রশস্তি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। নায়নিকা ছিলেন প্রথম ভারতীয় নারী শাসক। তিনি শিলালেখ উৎকীর্ণ করার যে দৃষ্টান্ত গড়েছিলেন পরবর্তীতে সেই ধারা অনুসরণ করতে দেখা যায় রানী গৌতমীকে। অবশ্য দুই রানীর লেখমালায় রয়েছে সাতবাহন শাসককুলের গৌরবগাথা। যেখান থেকে সাতবাহন শাসনব্যবস্থা এবং সাতবাহন শাসককুলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকের খোঁজ মেলে।

পুরাণে সাতবাহনদের 'অন্ধ্রভৃত্য' বলা হয়েছে যারা কাণ্ব বংশের পর ক্ষমতায় এসেছিল।[১] খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এই অন্ধ্র বা অন্ধ্রভৃত্যদের নেতৃস্থানীয় সিমুক (শ্রীমুখ/ পুরাণের শিশুক) দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২] এর অভিলেখগত এবং মুদ্রাগত সাক্ষ্য রয়েছে। অবশ্য সাতবাহনদের রাজত্বকাল এবং আদি বাসস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ ঠিক কোন সময় এই বংশ ক্ষমতায় এসেছিল, সে বিষয়ে পুরাণ এবং অভিলেখের সাক্ষ্যে বিরোধ রয়েছে। যেমন, বায়ুপুরাণে ১৭-১৯ জন অন্ধ্র রাজার নাম থাকলেও, এই বংশের ৩০ জন রাজা রাজত্ব করেন বলা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বায়ুপুরাণের সাক্ষ্য থেকে মনে করেন সাতবাহনরা ২৭২ বছর রাজত্ব করেছিল। কিন্তু মৎস্যপুরাণের তথ্যে রয়েছে সাতবাহনরা ৪১২-৪৬০ বছর রাজত্ব করেছিল।[৩] সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল গোদাবরী উপত্যকায় তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, উত্তর কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও সৌরাষ্ট্রের কিছু অংশ।

খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখে থাকা সাতকর্ণি ছিলেন সাতবাহন রাজা প্রথম সাতকর্ণি, যিনি সাতবাহন বংশের তৃতীয় শাসক।[৪] খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক নাগাদ তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন, অর্থাৎ অশোকের উত্তরকালের শাসক ছিলেন তিনি। প্রথম সাতকর্ণির নয় বছরের রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় রানী নায়নিকায় নানেঘাট/ নানাঘাট (আক্ষরিকভাবে নানে অর্থ 'মুদ্রা' এবং ঘাট অর্থ 'পাস) শিলালিপি থেকে।[৫] তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল প্রথম সাতকর্নীর মৃত্যুর পর তাঁদের নাবালক পুত্র দ্বিতীয় সাতকর্নী রাজা হলে নায়নিকাই সাতবাহন রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। যা ভারতের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গেছে। নায়নিকা নর্মদার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন করেছিলেন, ঐতিহ্যগতভাবে যা দক্ষিণপথ নামে পরিচিত। এই দক্ষিনী রানীর জন্ম কিন্তু শক্তিশালী অঙ্গিয় (অম্বিয়) পরিবারে যাদের মহারথী/ মহারঠি (সমস্ত যুদ্ধ এবং অস্ত্রের উপর যাদের দক্ষতা) বলা হত।

নানাঘাট লিপি যেমন সাতবাহন বংশের কথা জানায়, তেমন তা রানী নায়নিকার গৌরবগাথাও বটে। নায়নিকা ভারতের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি একটি রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর লেখে প্রমাণ করে তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং রাজ্য পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন। সাতকর্ণীর জীবদ্দশায় নায়নিকা সম্ভবত শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন, অন্যথায় স্বামীর মৃত্যুর পর অভিজ্ঞতা ছাড়া সাম্রাজ্যের একক দায়িত্ব পরিচালনা সম্ভব হত না। জুন্নারের কাছে সাতকর্ণি ও নায়নিকার নামাঙ্কিত একটি রৌপ্য মুদ্রাও পাওয়া গেছে। প্রাচীন ইতিহাসে প্রায় দেখাই যায় না যে রাজপরিবারের মহিলারা প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ করছেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন, মুদ্রায় নিজের নাম উল্লেখ করছেন। অথচ দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজত্বকালে এটি প্রথম দেখা গেল রাণী নায়নিকার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। অবশ্য, কেবল নায়নিকা নয়, মাতা গৌতমী বলশ্রীও পুত্রের প্রশস্তিসূচক লেখ উৎকীর্ণ করেছেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন। যা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অভিনব দৃষ্টান্ত। এখন প্রশ্ন হল সাতবাহন বংশের এসকল নারী শাসকের লেখ উৎকীর্ণ করার দরকার হল কেন? এমনকি সাতবাহন বংশের বেশ কয়েকজন রাজাও তাঁদের মায়েদের নাম নিজেদের আনুষ্ঠানিক নামের সাথে যোগ করেছিলেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ছিলেন এসবেরেই দৃষ্টান্ত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এসব করার দরকার হল কেন? বিষয়টি চর্চা সাপেক্ষ।

সমসাময়িক ভারতে বিবাহের একটি আদর্শ ছিল যে, নব-বিবাহিতা স্ত্রী তার পিতামাতাকে ছেড়ে চলে যাবে স্বামীর পরিবারে এবং স্বামীর পরিবারের অংশ হয়ে পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করবে। যথারীতি নিজের জন্ম-পরিবারের অংশ হিসাবে থাকা পরিচয়টি বদলে যাবে এবং তাঁর ছেলে মেয়েরা বাবার শেষ নাম (পদবী) ব্যবহার করবে। অথচ সাতবাহন রাজবংশে আমরা আলাদা কিছু দেখলাম, রাজার ছেলেরা তাদের পিতার নাম নয়, মায়ের নাম গ্রহণ করেছে। এর একটা নিশ্চিত কারণ তাদের মায়েরা ধনী ও শক্তিশালী পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং যুবরাজেরা পিতার কাছ থেকে নয়, মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য লাভ করতেন। আরেকটি কারণ সাতবাহন রাজপুত্ররা নিজেদেরকে উচ্চশ্রেণীর গোত্রের বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ মহিলাদের পুত্র হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছিলেন, যেমন - গৌতম গোত্র, এই নামের কিংবদন্তি ব্রাহ্মণ ঋষি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।[৬] অবশ্য এটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে সেকালে দাক্ষিণাত্যে উত্তরাধিকার কাজ করেছিল—কেবল পুরুষতান্ত্রিক নয়, মাতৃতান্ত্রিক হিসাবেও। রানী গৌতমীর থেকে এই পর্বটির শুরু। গৌতমীর পুত্র এসময় নিজেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী হিসাবে পরিচিতি দিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে গর্বিত ছিলেন বলেই বোধ হয়। সাতবাহনদের তিন আদিপুরুষের নামের সঙ্গে মাতৃনাম যুক্ত ছিল না, তাঁরা সিমুক, কৃষ্ণ এবং প্রথম সাতকর্নী বলেই উল্লেখিত। একারণে মনে হতে পারে সাতবাহন বংশে পরবর্তীকালে মাতৃতন্ত্র প্রচলিত হয়। এক্ষেত্রে রামশরণ শর্মা মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন দাক্ষিণাত্যে আগে থেকেই সাতবাহনদের মধ্যে মাতৃতন্ত্র চালু ছিল।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নে, নায়নিকা এবং গৌতমী কেন প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ করলেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন? তাঁরা যে কথাগুলো বলেছেন সে কথাগুলোর তাৎপর্যই বা কী? আধুনিক সরকারি বিজ্ঞাপনের মতো, এই রাজকীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাতবাহন মহিষীদের শিলালিপিগুলি ছিল প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্ম এবং আদর্শের মোড়কে প্রজাবর্গকে নিজেদের অনুকূলে রাখা বা মোহিত করার চতুর পন্থা। তাঁদের লেখের বক্তব্যের অর্থটা অনেকটা এরকম— দেখুন আমরা কতটা আদর্শ; আমরা কতটা রাজকীয় হওয়ার যোগ্য; আমাদের আদেশ কতটা মেনে চলার প্রয়োজন আছে ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে নতুন সাতবাহন শাসকেরা কেবলমাত্র সাতবাহন রাজপরিবার নয়, রাণীরা যে সমস্ত পরিবার থেকে এসেছেন তাদেরও জনপ্রিয় করার আপ্রান চেষ্টা করেছে প্রশস্তিসূচক প্রজ্ঞাপণগুলোর মাধ্যমে। রাজা ও উপ-রাজারা বিজয়ের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং জনগণকে কর দিতে বাধ্য করেছেন। আর রাণীরা এমন কাজ করলেন যাতে তাঁদের বিজয়ের প্রতি জনপ্রিয় সমর্থন নিশ্চিত থাকে। আরেকটি বিষয় হল দাক্ষিনাত্যের যে অংশে সাতবাহনরা নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন তা ছিল মিশ্র জনসংখ্যা ও জাতিসত্তার জায়গা। এমন নানা ধারার জাতিসত্তার শ্রদ্ধা ও অনুমোদন লাভের জন্য উদীয়মান সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্য থেকে এমন বিবৃতির প্রয়োজন ছিল।

নায়নিকার নানাঘাট লেখে থেকে জানা যাচ্ছে সাতকর্ণি এবং নয়নিকা রাজসূয় এবং অশ্বমেধ সহ প্রায় ২০টির অধিক যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল দুগ্ধ-গরু, হাতি, ঘোড়া, বংশযষ্টি, রৌপ্যকুম্ভী (রূপার জলপাত্র), রৌপ্যালংকার, সুবর্ণালংকার, কার্ষাপণ, গ্রাম, রথ, পোশাক ইত্যাদি। প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের দেওয়া হয়েছিল কার্ষাপণ মুদ্রা, পশুদের বড় দান ছাড়াও, শকট, পোশাক ইত্যাদি। লেখে থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে নায়নিকা নিজে যজ্ঞে উৎসর্গ করতেন, অথচ এই আচার সচরাচর নারীদের দ্বারা সম্পাদিত হত না। নায়নিকাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তিনি কার্যকরভাবে ছেলের অভিভাবক হিসেবে শাসন পরিচালনা করছিলেন বলেই। যাইহোক নায়নিকার নানাঘাট প্রশস্তি থেকে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস কিছুটা বোঝা যায়।

সাতবাহন শাসককূল যে বৈদিক ধর্মকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করতেন তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে নানাঘাট প্রশস্তিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে সাতবাহনরাজ প্রথম সাতকর্ণির পত্নী ও রাজমাতা নায়নিকা নানা বৈদিক যজ্ঞ করেছেন এবং বেদের নির্দেশ মতো সবকিছু সম্পন্ন করেছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে সেস্থানে সেসময় ব্রাহ্মণ্য সমাজ বলবৎ ছিল। অভিলেখের একেবারে শুরুতেই রানী নায়নিকা ধর্ম, ইন্দ্র, সংকর্ষণ, বাসুদেব, চন্দ্র-সূর্য ও চার লোকপাল যম-বরুণ-কুবের-বাসবের প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করেছেন (*'[সিধং]...নো ধংমস নমো ঈদস নমো সংকংসন-বাসুদেবানং চংদ-সূরানং [মহি]মা [ব]তানং চতুং নং চং লোকপালানং যম-বরুন-কুবের-বাসবানং নমো (।।*)*')।[৭] যা থেকে বৈদিক ধর্মের প্রতি তাঁদের আস্থা ও আনুত্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। নায়নিকার নিজের পরিচয় দেবার ক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে পুত্রবধূ রূপে, তারপর কন্যা রূপে, তারপর পত্নী এবং শেষে জননী রূপে (*'কুমারবরস [বেদি] সিরিস র [ঞো]...বীরস সূরস অ-প্রতিহত-চকস দখি [নপ*] ঠ-পতিনো*...[মা]...[বালা*]য মহারঠিনো অংগিয-কুল-বধনস সগর-গিরিবর-বল[যা]য পথবিয পথম বীরস বস য ব অলহ ষংতঠ?)... সলসু মহতো মহ...সিরিস...ভারিয়া(য*) দেবস পুতদস বরদস কামদস ধনদস [বেদি] সিরি-মাতু(য*) সতিনো সিরিমতস চ মাতু[য]সীম...*')।[৮] পরিচয় পর্বে শ্বশুরকুল, পিতৃকুল এবং পুত্রদের এই সাড়ম্বর উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নায়নিকা তাঁর সমুন্নত গৌরব ঘোষণা করতে চেয়েছেন। এখানেই রানী নায়নিকা থেমে যাননি, এরপর তিনি নিজস্ব চরিত্রগত গুণ উল্লেখ করেছেন; নাগবরদায়িনী, মাসোপবাসিনী অর্থাৎ একমাস ধরে উপবাস পালন করেন, গৃহে তপস্যার তুল্য কৃচ্ছ্রসাধন করেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, দীক্ষা, ব্রত ও যজ্ঞে নিপুণা ইত্যাদি (*'...[না] গবর-দযিনিয মাসোপবাসিনিয গহ-তাপসায চরিত-ব্রম্হচরিযায দিখ-ব্রত-যংঞ-সংডায যঞা হুতা ধূপন-সুগংধা য নিয...*')।[৯] এসকল কারণে নানাঘাট প্রশস্তিকে রানী নায়নিকার গৌরবগাথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

নানাঘাট লিপিতে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে যজ্ঞের পুরোহিতবর্গের পাশাপাশি প্রপর্ষক বা দর্শকাদিদেরও দান দেওয়া হয়েছে। এসব কী কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই করা হল? এখানে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল নানা ধরণের যজ্ঞের কথা রয়েছে; রাজসূয় ('**রাজ [সূযো যংঞো** *]...সকটং...ধংঞগিরি-তংস-পযুতং ১ সপটো ১ অসো ১ অস-রথো ১ গাবীনং ১০০।'), অশ্বমেধ ('**অসমেধো যংঞো** বিনিযো [যি*] ঠো দখিনাযো [দি]না অসো রূপালং[কা]রো ১ সুবংন...নি ১০ (+*)২ দখিনা দিনা কাহাপনা ১০০০০ (+*) ৪০০০ গামো ১ [হঠি]...[দখি]না দি [না]...গাবো...সকটং ধংঞগিরি-তস-পযুতং ১'), অতিরাত্র ('**সতরস...**১০ (+*)৭ অচ...ন...লয...পসপকো দি[নো]...[দখি] না দিনা সু...পীনি ১০(+*) ৩ অ(?)সো রূপ[আলং]কারো ১

দখিনা কাহাপ[না] ১০০০০...২....গাবো ২০০০০ [।*] **[ভগল]-দসরতো** যংও যি[ঠো] [দক্ষিনা] [দি]না [গাবো] ১০০০০। **গর্গতিরতো যঞো** যিঠো [দখিনা]...পসপকো পটা ৩০০।'), গবাযমন (**গবামযনং যঞো** যিঠো [দখিনা দিনা] গাবো ১০০০ (+*) ১০০।...গাবো ১০০০ (+*) ১০০(?) পসপকো কাহাপনা...পটা ১০০') ইত্যাদি।[১০] তখনকার দিনে রাজা বা শাসকেরা যজ্ঞ করবেন এটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় সাতবাহন রাজা কিংবা তাঁর পরিবারকে এতগুলো যজ্ঞ করতে হল কেন? আমরা জানি কোনও কাজ উদ্দেশ্য ব্যতীত হতে পারে না। অন্ততপক্ষে এটুকু বোঝা যাচ্ছে এখানে যে যজ্ঞগুলির নাম রয়েছে তার কোনওটি রাজক্ষমতার প্রকাশে, কোনওটি প্রজাকল্যানের অছিলায়, কোনওটি রাজপরিবারের শান্তি-সমৃদ্ধি কিংবা মোক্ষলাভের ভাবনায় করা হয়েছে। তখনকার দিনে এগুলোই ছিল শাসকের কাজকর্মের প্রচার কিংবা জাহিরের প্রধানতম পন্থা। নায়নিকার এই লেখে থেকে সাতবাহন শাসকের বৈদিক ধর্মে আস্থাশীল থাকার কথাই উঠে আসে। অবশ্য হতে পারে সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর রাজ্ঞী নায়নিকা অনেক বেশি ধর্মপ্রানা হয়ে পড়েছিলেন এবং এজন্য উপবাস কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন করতেন যার সদর্প উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে লেখেয়। অন্যদিকে গৌতমী বলশ্রীর নাসিক লিপিতে তপস্বী, সন্ন্যাসী ভিক্ষুদের দানের কথা রয়েছে। ভুমিদান করা হয়েছে বৌদ্ধ মঠকে (*'সেনাযে [বে]জযং[তি]যে বিজয়-স্বধাবারা [গো]বধনস বেনাকটক-স্বামি গোতমি-পুতো সিরি-সদকনি...পবজিতান তেকিরসিন বিতরাম'/পবজিতান ভিখুনং তেরণ্হুকানং দদ[ম]'*)।[১১] একারণে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে সাতবাহনরা সর্বদা হিন্দু ছিলেন। তাঁরা যেমন যজ্ঞ করেছিলেন, তেমন তাঁরা বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে এটুকু বলা যায়, অন্যান্য ভারতীয় রাজার মতো, ধর্ম ছিল সাতবাহন শাসককুলের কাছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের হাতিয়ার। নায়নিকার নানাঘাট শিলালিপির (*"নানাঘাট কেভ ইনস্ক্রিপশন অফ নাগনিকা")* মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ—

[সিদ্ধম্।।

ধর্মদেবকে নমস্কার, ইন্দ্রদেবকে নমস্কার, সংকর্ষণদেবকে নমস্কার[১২], বাসুদেবকে[১৩] নমস্কার, চন্দ্র-সূর্য ও চার লোকপাল[১৪] যম-বরুণ-কুবের-বাসবের প্রতি নমস্কার। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর দক্ষিণাপথপতির (সিমুক)[১৫] পুত্রবধূ, অঙ্গিক-কুল-বর্ধন[১৬] মহারথীর[১৭] কন্যা, সাগর-গিরি-সমেত পৃথিবীর প্রথম বীরের[১৮] পত্নী, পূর্তকর্মকারী[১৯] বরদায়ী কামদায়ী ধনদায়ী দেব কুমারবর বেদিশ্রীর[২০] জননী ও শক্তিশ্রীরও জননী (নাগন্নিকা)[২১]। তিনি নাগবরদায়িনী[২২], মাসোপবাসিনী[২৩], গৃহে তপস্যার তুল্য কৃচ্ছসাধনকারিনী, ব্রহ্মচর্য পালনকারিণী, দীক্ষা, ব্রত ও যজ্ঞে নিপুণা।[২৪] এই রাজ্ঞী ধূপ ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্যের আহুতি সমন্বিত বহু যজ্ঞে স্বামী সাতকর্ণির সঙ্গে আহুতি দিয়েছেন। (সেই সব যজ্ঞের) বর্ণনাও (প্রাকৃত বনো) দেওয়া হল। **অগ্ন্যাধেয়**[২৫] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১২টি গরু এবং ১টি ঘোড়া। **অনালম্ভনীয়**[২৬]/ অন্বারম্ভণীয় যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল দুগ্ধ-গরু... ১১০০/১৭০০ গরু, ১০টি হাতি, ১৮৬ বংশযষ্টি, ১৭টি রৌপ্যকুম্ভী (রূপার জলপাত্র)...**রিকা** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০০টি গরু, ১০০০টি ঘোড়া, প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের দেওয়া হয়েছিল ১২টি চমৎকার গ্রাম (গ্রামবর), দক্ষিণা ২৪,৪০০টি কার্ষাপণ, (উপহার) দর্শকদিগের ৬০০০টি কার্ষাপণ। **রাজসূয়**[২৭] যজ্ঞ...বিশাল ধান্যস্তপের (শস্যের পাহাড়) বহন ও মোচনের জন্য ১টি শকট (গরুর গাড়ি), ১টি সত্পট্ট, ১টি ঘোড়া, ১টি ঘোড়ার রথ, ১০০টি গাভী। দ্বিতীয় **অশ্বমেধ**[২৮] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১টি ঘোড়া, ১টি রৌপ্যালংকার, ১২টি সুবর্ণালংকার, ১৪০০০টি কার্ষাপণ, ১টি গ্রাম, ১টি হস্তী...? **যজ্ঞ** দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল গরু, বিশাল ধান্যস্তুপসহ (শস্যের পাহাড়) শকট (গরুর গাড়ি)। **বায** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১৭টি দুগ্ধগরু (ধেনু)...**সপ্তদশাতিরাত্র**[২৯] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১৭টি...?...প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের... ১৩টি...?...১টি ঘোড়া, ১টি রৌপ্যালংকার, ১০০০০টি কার্ষাপণ, ২০০০০টি গরু। **ভগাল দশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০০০টি গরু। **গর্গতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু, প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের কার্ষাপণ ও ৩০০টি পট্ট। **গবামযন**[৩০] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু, প্রপর্সক বা যজ্ঞ দর্শকাদিগের কার্ষাপণ ও ১০০টি পট্ট। **আপ্তোর্যাম**[৩১] যজ্ঞ...**গবামযন** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **অঙ্গিরসামযন** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **ত্রয়োদশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **শতাতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০?। (?) যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১১০০টি গরু। **আঙ্গিরসাতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল (?)গরু... ১০০২টি গরু। **ছন্দোমপবমানাতিরাত্র**[৩২] যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ১০০০টি গরু। **আঙ্গিরসাতিরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)।

...**রাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)।... **রাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)।...**(?)** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল **১০০০**টি গরু। ... (?) যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল (?) গরু। **অঙ্গিরসামযন**[৩৩] ষড়বর্ষ যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল **১০০০**টি গরু। ...(?) যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল **১০০০**টি গরু। **ত্রয়োদশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল(?)। **দশরাত্র** যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল **১০,০০০**টি গরু।... যজ্ঞ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল...দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল।

আরও একটি লেখ রয়েছে যেটি *"নায়নিকার নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্"* নামে দীনেশচন্দ্র সরকারের সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] যার মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গাক্ষরিত রূপ— *'রাযা সিমুক-সাতবাহ...নো সিরিমাতো...দেবি-নাযনিকায রনো...চ সিরি-সাতকনিনো...কুমারো ভা...য...মহারঠি ত্রনকযিরো...কুমরো হকুসিরি...কুমরো সাতবাহানো'*— এই লিপিতে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে সিমুক কিংবা সাতকর্ণী পরিবারের রাণী ছিলের নায়নিকা। যিনি ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক নারী শাসক, যিনি স্বগর্বে নিজের পুরো শাসনকাল অতিবাহিত করেছেন। পরবর্তী লেখেগুলিতে তাঁর প্রতি কারও বিরূপ মনোভাবের কথা পাওয়া যায় না। নায়নিকাকে সিংহাসন থেকে অপসারণ হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও নেই কোথাও। থাকলে নিশ্চিতরূপে পরবর্তীকালের গৌতমী বলশ্রীর প্রশস্তি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেত। তাই খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতকে তাঁর শাসনকাল[৩৫] কেবল সাতবাহন ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের এক গৌরবের অধ্যায় বলা চলে।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া,* ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯২৭, পৃ. ২৫৬ - ৭

২. মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রত্নস্থল নেভাসায় উৎখননের চতুর্থ সাংস্কৃতিক স্তরের একেবারে উপর দিকে বা শেষ পর্যায়ে পাওয়া মুদ্রায় সাতবাহন নামে রাজার নাম আছে। এই স্তর পুরাতাত্ত্বিক বিচারে প্রথম খ্রিস্টাব্দের আগের হতে পারে না। তার অর্থ সেখানে পাওয়া তৈজসাদি ও প্রত্নবস্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বা বড়জোর ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৈরি। তাই ঐ মুদ্রায় উল্লিখিত সাতবাহন ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক সাতবাহন বা কুমার সাতবাহন হওয়া সম্ভব। পুরাণে সিমুক এই বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা। সেক্ষেত্রে সব সাক্ষ্য বিচার করে এই বংশের উৎপত্তি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকেই ধরা যুক্তিযুক্ত। — শিণ্ডে, বসন্ত অ্যান্ড আদার্স, 'এ রিপোর্ট অন দ্য রিসেন্ট আর্কিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস্ অ্যাট জুনার, মহারাষ্ট্র (২০০৫-২০০২৭)', *বুলেটিন অফ দ্য ডেকান কলেজ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট,* ভলিয়্যুম ৬৬ - ৬৭, ২০০৬ - ২০০৭, পৃ. ১২২ - ৩২ ও ১৪৯

৩. সাতবাহনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল অর্থাৎ তাঁরা কোথা থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন তা নিয়েও বিতর্ক আছে। পুরাণের অন্ধ্র/ অন্ধ্রভৃত্য নাম থেকে অনেকেই মনে করেন এই রাজবংশের আদি বাসভূমি ছিল দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই বংশের শ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির আগে ঐ অঞ্চলে সাতবাহনদের উপস্থিতি প্রমাণ করা কঠিন। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে কর্ণাটকের বেলারি জেলায় লব্ধ অভিলেখে সাতবাহনী আহার (জেলা) শব্দ থাকায় সাতবাহনেরা কর্ণাটকের আদি বাসিন্দা ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার সাতবাহনদের প্রাচীনতম অভিলেখগুলি পাওয়া গেছে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিকে, নাসিক, নানেঘাট অঞ্চলে। পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যদের রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর/ পৈঠান মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলা, পৈঠানের টলেমির ভূগোলেও তার সমর্থন মেলে। নেভাসার প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত সাতবাহনদের নামাঙ্কিত মুদ্রাসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয় নেভাসা ও তার সংলগ্ন মধ্য-দাক্ষিণাত্য এলাকার ওপর আদি সাতবাহন শাসকদের অধিকার ছিল। — রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া,* তদেব, পৃ. ২৫৭ - ৬৩

৪. জয়সোয়াল, কে. পি. অ্যান্ড ব্যানার্জি, আর. ডি., 'দ্য হাতিগুম্ফা ইনস্ক্রিপশন অফ খারবেল', *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা,* ভলিয়্যুম ২০, নং ৭, পৃ. ৭৪ ও ৭৯

৫. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, 'নানাঘাট কেভ ইনস্ক্রিপশন অফ নাগনিকা (?)', *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* ভলিয়্যুম ১, নং ৮২, পৃ. ১৮৬-৯০। [নানেঘাট/ নানাঘাট গিরিপথের ওপরে একটি গুহাতে আদি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রাহ্মীলিপিতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে সাতবাহন রাজ্ঞী নাগনিকার অনুষ্ঠিত বিভিন্ন যজ্ঞের দক্ষিণা দানের বিজ্ঞপ্তি নানাঘাট শিলালিপি।]

নায়নিকার নানাঘাট গুহালিপির মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গাক্ষরিত রূপ –

১। [সিধং] ...নো ধংমস নমো ঈদস নমো সংকংসন-বাসুদেবানং চংদ-সূরানং [মহি] মা [ব] তানং চতুং নং চং লোকপালানং যম-বরুন-কুবের-বাসবানং নমো (।।*) কুমারবরস [বেদি] সিরিস র [ঞো],

২। ...বীরস সূরস অ-প্রতিহত-চকস দখি [নপ*] ঠ-পতিনো*...

৩। [মা]... [বালা*]য মহারঠিনো অংগিয-কুল-বধনস সগর-গিরিবর-বল[যা]য পথবিয পথম বীরস বস য ব অলহ ষংতঠ ?)... সলসু মহতো মহ...

৪। সিরিস... ভারিযা(য*) দেবস পুতদস বরদস কামদস ধনদস [বেদি] সিরি-মাতু(য*) সতিনো সিরিমতস চ মাতু[য]সীম...

৫। বরিয... [না]গবর-দযিনিয মাসোপবাসিনিয গহ-তাপসায চরিত-ব্রম্হচরিযায দিখ-ব্রত-যংঞ-সংডায যঞা হুতা ধূপন-সুগংধা য নিয...

৬। রাযস... [য*]ঞেহি যিঠং (।*) বনো। অগাধেয যংঞো দ[খি]না দিনা গাবো বারস ১০ (+*)২ অসো চ ১(।*) অনারভনিযো যংঞো দখিনা ধেনু...

৭। ...দক্ষিনাযো দিনা গাবো ১০০০ (+*) ১০০ হাথী ১০...

৮। ...স সসতরয [বা]সলঠি ২০০ (+*) ৮০(+*) ৯ কুভিযো রুপামযিযো ১০(+*)৭ ভি...

৯। ...রিকো যংঞো দখিনাযো দিনা গাবো ১০০০০(+*) ১০০০ অসা ১০০০ পস [পকো*]...

১০। ...১০ (+*) ২ গভবরো ১ দখিনা কাহাপনা ২০০০০ (০*) ৪০০০ (+*) ৪০০ পসপকো কাহাপনা ৬০০০। রাজ [সূযো যংঞো *]....সকটং

১১। ধংঞগিরি-তংস-পযুতং ১ সপটো ১ অসো ১ অস-রথো ১ গাবীনং ১০০ (।*) অসমেধো যংঞো বিনিযো [যি*]ঠো দখিনাযো [দি]না অসো রুপালং[কা]রো ১ সুবংন...নি ১০ (+*)২ দখিনা দিনা কাহাপনা ১০০০০ (+*) ৪০০০ গামো ১ [হঠি]... [দখি]না দি [না]

১২। গাবো...সকটং ধংঞগিরি-তস-পযুতং ১ (।*) বোযো যংঞো... ১০ (+*)৭ [ধেনু?]...বায...সতরস

১৩। ...১০ (+*)৭ অচ...ন...লয...পসপকো দি[নো]...[দখি] না দিনা সু...পীনি ১০(+*) ৩ অ(?)সো রুপ[আলং]কারো ১ দখিনা কাহাপ[না] ১০০০০...২

১৪। ...গাবো ২০০০০ [।*] [ভগল]-দসরতো যংও যি[ঠো] [দক্ষিনা] [দি]না [গাবো] ১০০০০। গর্গতিরতো যঞো যিঠো [দখিনা]...পসপকো পটা ৩০০। গবামযনং যংঞো যিঠো [দখিনা দিনা] গাবো ১০০০ (+*) ১০০।......গাবো ১০০০ (+*) ১০০(?) পসপকো কাহাপনা...পটা ১০০ (।*) অতুযামী যংঞো.....

১৫। ...[গ]বামযনং য[ঞো] দখিনা দিনা গাবো ১০০০ (+*) ১০০। অংগিরস[সা]মযনং যংঞো যিঠো [দ]খিনা গাবো ১০০০ (+*) ১০০। ত... [দখিনা দি] না গাবো ১০০০ (+*) ১০০। সতাতিরতং যংঞো... ১০০ (।*) [যং] ঞো দখিনা গ[গা] [বো] ১০০০ (+*) ১০০ (।*) অংগিরস [তি]রতো যংঞো যিঠো [দখি]না গা[বো]...(।*)...

১৬। ...[গা] বো ১০০০ (+*) ২ (।*)ছন্দোমপ[ব]মা [নতিরত] দখিনা গাবো ১০০০। অং[গি]র [সতির] তো যং[ঞো] [যি]ঠো দ[খিনা]... (।*) ...রতো যঠো যজ্ঞো দখিনা দিনা (।*) তো যংঞো যিঠো দখিনা...(।*)...যঞো যিঠো দখিনা দিনা গাবো ১০০০।

১৭। ...ন স সযং...দখিনা দিনা গাবো ত...[।*] [অং] গি [রসা] মযনং ছবস...[দখি]না দিনা গাব ১০০০...(।*) ... [দখিনা] দিনা গাবো ১০০০। তেরস... অ...(।*)

১৮। ...(।*) তেরসরতো স...ছ...[আ]গ-দখিনা দিনা গাবো...(।*)...দসরতো ম...[দি] না গাবো ১০০০০। উ... ১০০০০। দ...

১৯। ...[যং] ঞো দখিনা দি[না]...

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২০। ... [দ]খিনা দিনা...

নায়নিকার নানাঘাট শিলালিপির মূল প্রাকৃত অংশের সংস্কৃত রূপ —

--সিদ্ধম্।। [প্রজাপতয়ে] ধর্মায় নমঃ, ইন্দ্রায় নমঃ, সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাভ্যাং, চন্দ্রসুরাভ্যাং (সূর্যাভ্যাং) মহিমব্যাং, চতুর্জঃ চ লোকপালেভ্যঃ যম-বরুণ-কুবের-বাসবেভ্যঃ নমঃ।। কুমার-বরস্য বেদিশ্রিযঃ রাজ্ঞঃ...বীরস্য শূরস্য অপ্রতিহতচক্রস্য দক্ষিণাপথপতেঃ...[রাজ্ঞঃ শিমুকসাতবাহনস্য স্নুষযা]...বালযা (=কন্যযা) মহারথিনঃ অঙ্গিক-কুল-বর্দ্ধনস্য, সাগর-গিরিবর-বলযাযাঃ পৃথিব্যাঃ প্রথমবীরস্য...[শাতকর্ণি]-শ্রিযঃ ভার্যযা দেবস্য পুত্রদস্য বরদস্য কামদস্য ধনদস্য বেদিশ্রিযঃ-মাত্রা, শক্তে শ্রীমতঃ (=শক্তিশ্রিয়ঃ) চ মাত্রা...নাগবর-দাযিন্যা, মাসোপবাসিন্যা, গৃহ-তাপস্যা, চরিত-ব্রহ্মচর্যযা, দীর্ঘ-ব্রত-যজ্ঞ-শৌণ্ডযা যজ্ঞাঃ হুতাঃ ধূপন-সুগন্ধাঃ (=সুগন্ধ-দ্রব্যাহুত্যা সুগ-স্বীকৃতাঃ...রাজ [শ্রীশাতকর্ণিনা সহ] ...যজ্ঞৈঃ ইষ্টম্। [তেষাং] বর্ণঃ (=বর্ণনা= বিবরণম)-অগ্ন্যাধেযঃ যজ্ঞং, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ দ্বাদশ ১২, অশ্বঃ চ [একঃ] ১। অনালম্ভণীযঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা... ।... দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১৭০০, হস্তিনঃ ১০ বংশ-যষ্ট্যঃ ১৮৬, কুম্ভ্যঃ রৌপ্যময্যঃ ১৭...। ...রিকঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০০, অশ্বাঃ ১০০০, প্রসর্পকঃ (=যজ্ঞ-দর্শকাদি জনাঃ তেভ্যঃ দানম্)... [যজ্ঞঃ...দক্ষিণা দত্তা] ১২, গ্রামবরঃ ১২, দক্ষিণা কার্যাপণানি ৪৪০০, প্রসর্পকঃ কার্ষাপণানি ৬০০০। রাজসূযঃ যজ্ঞঃ...শকটং...ধান্যগিরি-তংস-প্রযুক্তং (বিশালধান্যস্তূপস্য বহন-মোচন-বিনিযুক্তং), সৎপট্টম্ ১, অশ্বঃ ১, অশ্বরথঃ ১, গবীনাং [শতং] ১০০। অশ্বমেধঃ যজ্ঞঃ দ্বিতীযঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা... অশ্বঃ [১], রৌপ্যালঙ্কারঃ ১, সুবর্ণা [লঙ্কারাঃ] ১২, দক্ষিণা দত্তা কার্ষাপণানি ১৪০০০, গ্রামঃ ১, হস্তী [১]...। ... [যজ্ঞঃ] দক্ষিণা দত্তা গাবঃ [৬০০০], শকটং ধান্যগিরিতংস-প্রযুক্তং ১... বাযঃ (?) যজ্ঞঃ [দক্ষিণা দত্তা]... ১৭...।... সপ্তদশা [তিরাত্রঃ যজ্ঞঃ দক্ষিণা দত্তা]...১৭... প্রসর্পকঃ দত্তঃ.......(যজ্ঞঃ) দক্ষিণা দত্তা...১২, অশ্বঃ [১], রৌপ্যালঙ্কারঃ ১, দক্ষিণা কার্যাপণানি ১০০০০... গাবঃ ২০০০০। ভগাল-দশরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০০। গর্গাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা... প্রসর্পকঃ পট্টানি ৩০০। গবামযনং যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০...। গাবঃ ১১০০, প্রসপকঃ কার্যাপণানি...পট্টানি ১০০। আপ্তোর্যামঃ যজ্ঞঃ...। গবামযনং যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০। অঙ্গিরসামযনং যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা গাবঃ ১১০০।... দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১১০০। শতাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ... ১০০...। ... যজ্ঞঃ, দক্ষিণা গাবঃ ১১০০। আঙ্গিরসাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা গাবঃ...। ... গাবঃ ১০০২। ছন্দোমপবমানাতিরাত্রঃ [যজ্ঞঃ], দক্ষিণা গাবঃ ১০০০। আঙ্গিরসাতিরাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা...। ...রাত্রঃ ইষ্টঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা...।... রাত্রঃ যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা...। ... যজ্ঞঃ ইষ্টঃ, দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০...। [যজ্ঞঃ ইষ্টঃ], দক্ষিণা দত্তা গাবঃ...। ... অঙ্গিরসামযনং ষড়বর্ষং... দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০। ... [যজ্ঞঃ], দক্ষিণা দত্তা গাবঃ ১০০০...। ...ত্রযোদশ [রাত্রঃ যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা]...। ত্রযোদশরাত্রঃ... অগ্র্যদক্ষিণা দত্তা গাবঃ...। ... দশরাত্রঃ... [দক্ষিণা] দত্তা গাবঃ ১০০০০. ...যজ্ঞঃ, দক্ষিণা দত্তা ...। ... দক্ষিণা দত্তা...।।

— সরকার, দীনেশ চন্দ্র, ‘নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্ অফ দ্য টাইম অফ সাতকর্নি-১’, *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন*, ভলিয়্যুম ১, নং ৮১, পৃ. ১৮৪ - ৮৫

নায়নিকার নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্-এর মূল প্রাকৃত অংশের বঙ্গাক্ষরিত রূপ—

‘রাযা সিমুক-সাতবাহ... নো সিরিমাতো...দেবি-নাযনিকায রনো...চ সিরি-সাতকনিনো...কুমারো ভা...য...মহারঠি ত্রনকযিরো...কুমরো হকুসিরি ...কুমরো সাতবাহানো’ — এই লিপি থেকে বোঝা যায় সিমুক কিংবা সাতকর্ণী পরিবারের রাণী ছিলের নাগনিকা/ নায়নিকা।

৬. শর্মা, আর. এস., 'সাতবাহন পলিটি', *প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস*, ভলিয়্যুম ২৮, ১৯৬৬, পৃ. ৮১ - ৯৩

৭. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, ‘নানাঘাট কেভ ইনস্ক্রিপশন অফ নাগনিকা(?)’, তদেব, পৃ. ১৮৬ - ১৮৭

৮. তদেব, পৃ. ১৮৭

৯. তদেব, পৃ. ১৮৭

১০. তদেব, পৃ. ১৮৭ - ৮

১১. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, ‘নাসিক কেভ ইনস্ক্রিপশনস্ অফ গৌতমিপুত্র সাতকর্ণি-১’,*সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন*, ভলিয়্যুম ১, নং ৮৩, পৃ. ১৯১ - ৪

১২. বৃষ্ণি বীরদের একজন বলরাম সংকর্ষণ বা প্লাউয়ার নামে পরিচিত। বৃষ্ণিবংশে জাত মানব হয়েও অসামান্য কীর্তির দ্বারা ক্রমে পূজ্য হয়েছেন।

১৩. বসুদেবের পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণকে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. লোকপালেদের মধ্যে যম দক্ষিণের, বরুণ পশ্চিমের, কুবের উত্তরের ও বাসব পূর্বের রক্ষাকর্তা।

১৫. দক্ষিণাপথপতি যে রাজাকে নাগন্নিকার শ্বশুররূপে জানা যাচ্ছে তিনি দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে সিমুক, সাতকর্ণির পিতা। কারো কারো মতে ইনি সিমুকের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী কৃষ্ণও (কন্ন) হয়ে থাকতে পারেন।

১৬. অঙ্গিককুলের/ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিকারী।

১৭. এরাই কি মারাঠি? বিষয়টি অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

১৮. এখানে স্পষ্টত প্রথম সাতকর্ণির কথাই উঠে আসে।

১৯ এর অন্য অর্থ হতে পারে হতে পারে পুত্রদায়ী।

২০.. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির মতে খন্দসিরি অর্থাৎ স্কন্দশ্রী।

২১. নাগন্নিকার পরিচয় দেবার ক্রমটি লক্ষণীয় প্রথমে পুত্রবধূ রূপে, তারপর কন্যা রূপে, তারপর পত্নী ও শেষে জননী রূপে।

২২. হাতির অপর নাম হল নাগ; সুতরাং শ্রেষ্ঠ হস্তী দানকারিণী হতে পারে যেহেতু এটি যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত।

২৩. অর্থাৎ যিনি একমাস ধরে উপবাস পালন করেন।

২৪. যিনি পুরো এক মাস উপবাস করেছিলেন, যিনি বাড়িতে একজন তপস্বীর মতো থাকতেন, যিনি পবিত্র ছিলেন, যিনি দীক্ষা অনুষ্ঠান, মানত এবং নৈবেদ্য, বলিদানের সাথে ভালভাবে পরিচিত। বোঝাই যাচ্ছে নাগনিকা নিজের এবং পরিবারের প্রশস্তি লিখেছেন।

২৫. এই অনুষ্ঠানে কাঠ বা পাথর ঘষে সৃষ্টি অগ্নিকে যজ্ঞকুণ্ডে মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা স্থাপন করা হয়। কেবল বিবাহিত গৃহস্থর (গৃহপতি) এই অগ্নি স্থাপনের অধিকার আছে। সপত্নীক গৃহস্থের যথাবিধি এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা কর্মই অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয় নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার সংকল্প রেখে এটা করা হয়। যেমন-আজীবন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান, দশপূর্ণমাস অনুষ্ঠান, সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদির সংকল্প। এই অনুষ্ঠান সফল হলে গৃহস্থ যাবতীয় শ্রৌত কর্মের অধিকার লাভ করেন।

২৬. দশপূর্ণমাসের শুরুতে (বসন্তে) বছরে একবার এই যজ্ঞ হয়। অমাবস্যার প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমার প্রতিপদ এবং পূর্ণিমার প্রতিপদ থেকে অমাবস্যার প্রতিপদ পর্যন্ত (মলমাস বাদ দিয়ে) প্রতিমাসে অনুষ্ঠেয়। এখানে পর পর তিনটি প্রধান যজ্ঞ করা হয়। আধানকর্মের শুরুতে একবার অনুষ্ঠেয় ইষ্টিই অন্বারম্ভণীয নামে পরিচিত। এই ইষ্টির দেবতারা হলেন সরস্বতী, সরস্বান্, অগ্নি ও ভগী।

২৭. রাজ্যে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ এটি যা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রমাণ। বহু ইষ্টিযজ্ঞ, দুটি পশুযজ্ঞ, সাতটি দর্বিহোম, ছটি সোমযজ্ঞের সমষ্টি এই রাজসূয়। একবছরের কিছু বেশি সময় চলে এই যজ্ঞ। ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদে এটি শুরু হয়।

২৮. কচ্ছত্র সার্বভৌম রাজা, যাঁর অধীনে সামন্ত রাজারা থাকেন, তাঁরাই এই যজ্ঞ করেন। শ্রৌতকর্মসমূহের মধ্যে এই যজ্ঞ প্রধান। এটি সোমযজ্ঞ এবং ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নাশ করে। বহু গ্রাম্য ও আরণ্য পশু এই যজ্ঞের অঙ্গ। যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান অশ্ব এবং তার শরীরের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাদেশ শ্বেতবর্ণ, ললাটে শকটাকার পুণ্ড্র। এর পিতামাতাকে একাধিকবার সোমরস পান করানো হয়েছে এবং এরও জন্মমাত্র জলপানের আগেই সোমরস পান করানো হয়েছে।

২৯. দশপূর্ণমাসের প্রকৃতি যজ্ঞের তিনটি রূপ হল—একাহ, সাহ্ন ও সত্র। সাহ্ন পর্যায়ে যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ হয় তার একটা হল অতিরাত্র। স্থান-কাল-পাত্রাদি ভেদে সপ্তদশাতিরাত্র, ভগালদশাতিরাত্র, গর্গাতিরাত্র, শতাতিরাত্র, আঙ্গিরসাতিরাত্র, ছন্দোমপবমানাতিরাত্র, ত্রয়োদশরাত্র ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি প্রতিপত্তি।

৩০. বছরের ১৩তম দিন থেকে সারাবছর অনুষ্ঠানের নাম গবাময়ন। একে সত্র বলা হয়। দিনভেদে এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নানারূপ হয়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 924 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩১. জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম।

৩২. ছন্দোম হল সামবেদসংহিতার ছন্দোমমন্ত্রপ্রতীকপাদের এক সংজ্ঞা। আর পবমান হল বারোটি স্তোত্রের একটি।

৩৩. এটি একপ্রকার অনুষ্ঠান যা অঙ্গিরস্ দেবতাদের উদ্দেশে করা হয়। ছ'দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান করা যায় বলে একে ষড়হযজ্ঞ বলা হয়। দুই থেকে বারো দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকে সাহ্ন বলা হয়। একদিনের অনুষ্ঠানকে অহীন বলা হয়।
—ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *যজ্ঞ-কথা,* প্রাচি পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪০২
—শাস্ত্রী, এ. চিন্নাস্বামী, *যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ,* সম্পাঃ. পি.এন. পট্টভিরামস্ত্রী, মতিলাল বানার্সিদাস পাবলিকেশন, দিল্লি, ১৯৯২

৩৪. সরকার, দীনেশ চন্দ্র, 'নানাঘাট কেভ ফিগার-লেভেল ইনস্ক্রিপশনস্ অফ দ্য টাইম অফ সাতকর্নি-১',*সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* ভলিয়ুম ১, নং ৮১, পৃ. ১৮৪-৮৫

৩৫. আলতেকার, এ এস, দ্য পজিশন অফ উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন, ফ্রম প্রিহিস্টোরিক টাইমস্ টু দ্য প্রেজেন্ট ডে, মতিলাল বানার্সিদাস, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ১৮৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 933 - 941
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শিকাগো ধর্মমহাসভা : নিঃস্ব সাধুর বিশ্বজয়

স্বাগত ব্যানার্জ্জী
Email ID : swagata2121@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Mystical impact of Sri Ramakrishna, Chicago Speech, The Cyclonic Hindu Monk Swamiji.

Abstract
The Cyclonic Hindu Monk Swamiji after passing away of Sri Ramkrishna paramhansa in August 1886, spent several years in intense spiritual practices. He gradually realised that he was not meant to live the life of an ordinary recluse, struggling for personal salvation. He was destined to work for divine mission entrusted to him before his master, Sri Ramakrishna. The master had told him before his passing away that he would have to do mother's work to teach mankind and to be like a banyan tree, giving shelter to the tired and weary travellers. It was under Ramakrishna's mystical impact that Vivekananda felt himself to be a capable apostle of Hindu Vedanta Philosophy. He set sail for America to take part in world Religion Congress to present the West the authentic Hindu view of life. His profound and eloquence speech held the audience spellbound and for the first time in the modern era the West heard from the lips of the young Hindu Yogi the truth of Hinduism of which they had been ignorant till then. Swamiji's view was lauded with great appreciation. Many people became his disciples, who later joined the Ramakrishna Mission. Man is the builder of his own destiny. So each human being with his own capacity can guide himself, and at the same time can play a key role in the society. In his deep lecture Swami Vivekananda explained to the world that God is the one big sea, and all religions are like rivers ultimately merging in the sea. Much of his speech on Hinduism is taken up with explaining the major teaching of Vedas. Vivekananda addressed the assembly on six different occasions in 1893 the Response to the Welcome on September 11, 'Why We Disagree' on September 13, 'Paper on Hinduism" on September 19, 'Religion Not the Crying Need of India' on September 20, 'Buddhism the Fulfilment of Hinduism' on September 26, and addressed the final session on September 27. For him every single Soul is divine. The aim is to channelize this divinity within by controlling nature's external and internal issues. He was a role model not only the people of his country but also to the whole world.

Discussion

পরাধীনতার নিরন্ধ অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মবিস্মৃত এই মহাজাতিকে প্রকৃত ভারত সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কে? কে এই শতধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে বৈদান্তিক সাম্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করে এক আদর্শ বেগবান সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার স্বদেশপ্রেমিক ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে? কে নবযুগের জীয়ন কাঠির স্পর্শে এই জীবন্মৃত জাতির অনড় দেহে সঞ্চারিত করলেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভূতপূর্ব প্রাণের স্পন্দন? কার উদাত্ত আহ্বানে আকুমারিক হিমাচল যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে জেগে উঠেছিল? পরাধীন, হৃতসর্বস্ব, আত্ম বিস্তৃত জাতি ফিরে পেল তার আত্মশক্তি ও লুপ্ত বিশ্বাস কার প্রচেষ্টায়? কে দিশাহারা জাতিকে এতদিনে খুঁজে দিলো তার প্রকৃত আত্মপরিচয় লাভ করার যথার্থ মুক্তি পথের সন্ধান? কার উদাত্ত বজ্র ঘোষণা জাতির নিস্তরঙ্গ জীবনে আনল দুর্বার যৌবন তরঙ্গ? তিনি হলেন অমৃত শক্তিধর নবজাগরণ মন্ত্রের উদ্যোক্তা বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। স্বামীজি পাশ্চাত্য জগতের সামনে আবির্ভূত হন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শিকাগো ধর্ম সভার মাধ্যমে তার এই আবির্ভাব যেমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি বর্ণময় ও নাটকীয়, স্বয়ং বিশ্ব নিয়ন্তার পরিকল্পনায় মানুষের মানব কৌতূহল নিবারনের জন্যই যেন এই ধর্মসভার আয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দী যেন এক গোত্রহীনকাল (An age without a name)। এই কালের মধ্যে ছিল না কোন থেমে যাওয়ার লক্ষণ। ছিল না কোনো বিশেষ চিন্তার প্রাধান্য। গত শতাব্দীর পৃথিবী যেন এগিয়ে চলেছিল এক বিচ্ছিন্নতা ও ঘূর্ণবাতের মধ্যে দিয়ে। আশা নিরাশা, বিশ্বাস আর সন্দেহ মানুষের মনকে করে তুলেছিল অস্থির ও বিচলিত, দার্শনিক চিন্তার সৌধগুলি যেন ক্রমাগত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে হোয়াইটহেড বলেছিলেন -

> "বিগত শতাব্দীগুলির তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দী সত্যিই এক অস্থিরতময় যুগ। তখন প্রতিটি মানুষেরই চেতনা ছিল দ্বিধা বিভক্ত। ধর্মতাত্ত্বিকবিদ ও দার্শনিকেরা সমস্যাকে ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছিলেন তারা মনে করতেন যে তাদের মতবাদই চরম সত্য; ফলে তাদের সকল প্রয়াসই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল।"[১]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গতানুগতিক খ্রিস্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য থাকার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আসে এক বিপর্যয়, যে বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ দুই পক্ষের মধ্যে মিলন ঘটানো হয়ে ওঠে কঠিন আর এই মিলনের চেষ্টায় হোয়াইটহেডের মতে সেই বিতর্কের সৃষ্টি করে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে বার্ট্রান্ড রাসেল তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন -

> "মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত ও অসহায়। তার নিজের ও সমগ্র মানবজাতির উপরে ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে এক নিশ্চিত অন্ধকার। ভালো মন্দ সম্পর্কে উদাসীন, ধ্বংসোদ্যত। সর্বগ্রাসী জড়পুঞ্জ অস্থির গতিতে এগিয়ে আসছে।নিজের প্রিয় জিনিসগুলি ক্রমশই চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে।আগামীকাল মানুষ কে নিজেই যেতে হবে অন্ধকারের রাজত্বে। চরম বিপর্যয় এখনো আসেনি। ভাগ্যের হাতে ক্রীতদাস হয়ে তাকে চলতে হবে, নিজের তৈরি মন্দির হবে তার উপাস্য, দৈব ঘটনায় হতবাক হয়ে কাটাতে হবে জীবন, অস্থির জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে নয়তো তার জ্ঞান ও অসহায় অবস্থা জরাজীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করবে, যে পৃথিবী অচেতন শক্তির ক্রিয়া হিসেবে তার নিজেরই সৃষ্টি।"[২]

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বক্তার সাহসিকতা ও মানব মনের অসহায় অবস্থার কথাই উচ্চারিত হয়েছে সবকিছুর উপরে ছিল মানুষের অবিশ্বাস, জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত, শাশ্বত সত্তার উপরে ছিল চরম সন্দেহ, সত্যকে আবিষ্কার করার ছিল অযৌক্তিক, এক কথায় বলা যায় তখন ধর্ম জীবন থেকে হয়েছিল বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত। এটাই ছিল সেই উপযুক্ত সময়, যে সময় ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, সেই সময় যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে যখন মানুষ তাকে ভুলে যাবে কিন্তু তাদের সমস্ত আর্তি ঈশ্বরের জন্য উন্মুখ হবে, তখনই তিনি আসবেন।

> "হে অর্জুন যখন ধর্মের পতন হবে আর অধর্মের উত্থান দেখা যায় আমি তখনই নিজেকে প্রকাশিত করি।"[৩]

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়টা ছিল বসন্ত ঋতু পাশ্চাত্যে যাওয়া নিয়ে স্বামীজি যখন ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত ঠিক সেই সময় পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ তাকে দেখা দিলেন এবং আদেশ দিলেন পাশ্চাত্যে যেতে তিনি তাকে বারবার বলতে থাকেন -

> ""আমার কাজের জন্য এসেছিস; তোকে যেতেই হবে। তোর জন্যই ওই সভার আয়োজন জানবি।"[৪]

পরমপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি তার ধর্ম মহাসভায় যোগদানের পিছনে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা দেখতে পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যে যাবার প্রাক্কালে স্বামীজি তার গুরু ভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাহাড়ে বলেছিলেন -

> "হরি ভাই ওই ধর্ম মহাসভা- টভা যা হতে চলেছে তা এর জন্যই (নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে), আমার মন তাই-ই বলছে দেখবে, শিগগিরই এটি ফলে যাবে।"[৫]

সকলের কাছে যিনি সাক্ষাৎ ভগবতী এবং পরম পুরুষ রামকৃষ্ণের আরেক রূপ সেই মা সারদা দেবীকে স্বামীজি চিঠি লিখলেন অনুমতি চেয়ে, শ্রী শ্রী মা সারদা তার চিঠির উত্তরে তাকে আশীর্বাদ পাঠালেন মায়ের আশীর্বাদ পাওয়ার সাথে সাথেই স্বামীজি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তার পাশ্চাত্য যাত্রা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ১৮৯৩ এর ৩১শে মে স্বামীজি পেনিসুলার নামক জাহাজ করে বোম্বে থেকে রওনা দিলেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে, যেতে যেতে জাহাজ বদল করে কানাডার ভাঙ্কুয়াড়ে পৌঁছালেন স্বামীজি ২৫ জুলাই তারিখে। তারপর রেলপথে করে ৩০শে জুলাই ১৮৯৩ পৌঁছালেন শিকাগো শহরে। ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগো শহরে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এই বিরাট প্রদর্শনীর প্রায় সবটাই সংঘটিত হয়েছিল চার্লস বনি সাহেবের মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনায়। বনিসাহেব ছিলেন একজন উকিল উদার ও পাণ্ডিত ব্যক্তি, তাই তিনি প্রদর্শনীর সাথে সাথে দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, অর্থনীতি আইন, নারী প্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং সবশেষে রাখেন ধর্মের সংযোজন, ধর্মের সংযোজন করার সাথে সাথেই বনি সাহেবকে সম্মুখীন হতে হল প্রবল বাদানুবাদের, ধর্ম এক না বহু? ধর্ম সত্য না মিথ্যা? একদল বললেন -

> "আসুক না অন্য ধর্মের লোক তারা সত্য কি জেনে যাক তাহলে তারা আর মিথ্যার পিছনে ছুটবে না।"[৬]

আর একদল বললেন -

> "যা মিথ্যা তাকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা এ আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুর অপমান।"[৭]

সবশেষে বনি সাহেবের জয় হল খ্রীষ্টান ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানোর লোভ কেউ সংবরণ করতে পারলেন না পাশ্চাত্য সভ্যতা যে চিন্তা বা মতবাদের সংঘর্ষে জর্জরিত হচ্ছিল তা হল বৈজ্ঞানিক ও ধর্মিয় দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত। চার্চের পাদ্রী ও পন্ডিতেরা বাইবেল ও অ্যারিস্টটলীয় লজিক এর সাহায্যে মানুষকে কেন্দ্র করে যে কোন ঘটনার উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বিশ্ব রহস্যকে জানার কোন তাগিদ তাদের ছিল না। গ্যালিলিও প্রথম দরজা খুলেছিলেন এই অচলায়তনের তাইতো এডুইন আর্থার বার্টের ভাষায় -

> "গ্যালিলিওর দর্শনে এই জগত হল কতগুলি বস্তুপুঞ্জ যা গাণিতিক সূত্রাবুলীর সাহায্যে চলে অর্থাৎ স্থান ও কালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান বস্তু পুঞ্জই হচ্ছে জগৎ।"[৮]

গ্যালিলিওর মতে ঈশ্বরই মূল কারণ তিনি বস্তুতে প্রথম গতি সঞ্চার করেছিলেন এবং তারপর থেকেই বস্তুগুলি নিজে নিজেই কাজ করে যাচ্ছে বার্টের উক্তি -

> "একটি প্রয়োজনীয় কর্তার হিসাবে ঈশ্বরের কাজ যেখানেই শেষ হল তিনি এক বিশাল যান্ত্রিক স্রষ্টা বলে পরিগণিত হলেন যার কাজ পরমাণুর প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।"[৯]

তর্কমূলক যৌতিকতা, ধর্মতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যাকে Deism বলা হয় সংক্ষেপে যা বলেছেন ভলতেয়ার -

> "মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে যা নৈতিক বলে মনে হয় তার মিলিত রূপই ধর্ম, বিচারমূলক ধর্ম।"[১০]

এক কথায় বলা যায় পাশ্চাত্যজগতের মূল সমস্যা ছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি এবং তাহা কাহার দ্বারা চালিত হচ্ছে সেটা ছিল তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু। তাই ব্যক্তি ঈশ্বরকে মেনে নিতে তৎকালীন মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আপস করে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতেই হয়েছিল। সনাতনী খ্রীষ্টধর্ম এই পথেই সমাধান খুঁজেছিল। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামীজি তিনি বলেছিলেন -

> "কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়া ভালো।"[১১]

শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের পথে বেশ কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় স্বামীজিকে, প্রথমত ধর্ম মহাসভার যোগ দেবার শেষ তারিখ পার হয়ে যায়, দ্বিতীয়ত তার কাছে কোনো পরিচয় পত্র ছিল না, তাই স্বামীজি ধর্ম মহাসভায় যোগ দেওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন কয়েকশো মাইল দূরে বষ্টনে। বষ্টনে গিয়ে পরিচয় হল হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে। স্বামীজীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন -

> "আপনার কাছে পরিচয় পত্র চাওয়ার অর্থ হচ্ছে সূর্য কে জিজ্ঞাসা করা তার কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা?"[১২]

অধ্যাপক রাইট এর প্রচেষ্টায় স্বামীজী একটি পরিচয় পত্র পেলেন এবং শিকাগো এসে পৌঁছালেন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সন্ধ্যায়। এই ধর্মসভা চলে ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ধর্ম মহাসভার প্রথম দিন ৫ মিনিটের জন্য বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান অনাহত এই হিন্দু ধর্ম প্রচারক। একসময় আরোহন করলেন বক্তৃতা মঞ্চে মুহূর্তের জন্য স্মরণ করলেন গুরুদেবকে তারপর শ্রোতাবর্গকে আত্মীয়তার উষ্ণ আবেগে সম্বোধন করলেন, মুহূর্তের উচ্ছ্বাসিত করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দিত হলেন হল প্রাচ্যের এই সন্ন্যাসী। তার প্রথম ভাষণটি ছিল খুব ছোট, তিনি বলেন -

> "আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি, বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সমুদ্রে এসে সব এক হয়ে যায়। তেমনি ভগবান আমাদের সকলের লক্ষ্য। আমাদের বিভিন্ন রুচি, তাই আমরা বিভিন্ন পথ দিয়ে চলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হে ভগবান তোমার কাছেই আমরা পৌঁছাব।"[১৩]

এ এমন একটা অসাধারণ কোন বক্তৃতা নয়, তবু শ্রোতারা এত উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলো কেন? লই বার্কের মতে এ শুধু আবেগ নয়, ভাবুকতা নয় এ কথাগুলির পিছনে ছিল এক বিস্তৃত সত্য যে সত্য আমাদের আত্মিক ঐক্য। স্বামীজীর কথাগুলি সেই ঐক্যবোধকে উজ্জীবিত করে দিয়েছিল। স্বামীজীর কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি যেন তার সমস্ত সাধনার তেজ ও বল অনুভব করলেন। লুই বার্ক বলেছিলেন - এই ঐক্যবোধ 'গোপনে অথচ অলঙ্ঘ্য শক্তিতে কাজ করবে।'[১৪]

যার ফলস্বরূপ সভ্যতার রূপ পাল্টে যাবে। মানুষকে মহৎ থেকে মহৎ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। সেই ব্যক্তি মহৎ হতে পারে, যার মধ্যে ক্ষমা প্রেম উদারতা থাকবে। তিনি বলতেন যিনি বলবান তিনি বল প্রয়োগ করুক গঠনের পথে, কল্যাণের পথে, পরার্থে, শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। প্রথম প্রথম সভাস্থল ছিল খ্রীষ্ট ধর্মের জয়গানে মুখরিত আর অন্যদিকে চলেছিল অন্যান্য ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা। সভার যারা আয়োজক ছিলেন তারাই এ বিষয়ে এগিয়ে এলেন। একদিন স্বামীজি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামীজীর প্রবন্ধ পাঠের পরে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ চরমে উঠল। তিনি যখন মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন তখন শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। স্বামীজি বললেন -

> "আমরা যারা প্রাচ্যদেশ থেকে এসেছি দিনের পর দিন এই উপদেশ শুনছি আমরা যেন তাড়াতাড়ি খ্রিস্টান হয়ে যাই, কারণ খ্রিস্টান জাতিরাই সবচেয়ে ধনী। সবচেয়ে ধনী ইংল্যান্ডবাসী। এই দেশটি পাঁচশো কোটি এশিয়াবাসীকে পদদলিত করে রেখেছে। অতীতের দিকে তাকালে দেখি ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছে স্পেন থেকে। স্পেন ধনী হয়েছে মেক্সিকোকে সর্বস্বান্ত করে এই রক্তমাংসের মানুষের গলা কেটে খ্রিস্টান ধর্ম ধ্বনি হয়েছে। এই উপায় অবলম্বন করে আমরা হিন্দুরা ধনী হতে চাই না।"[১৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথাগুলো স্বামীজি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অনেকবার তাকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। স্বামীজি এক সভায় শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন -

"আপনারা যারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দু একখানা পড়েছেন, হাত তুলুন।"[১৬]

মাত্র ৩-৪ জন হাত তুললেন স্বামীজি দুঃখ করে বললেন -

"আপনারা কিছু না জেনে কি করে একটা ধর্মকে আক্রমণ করেন।"[১৭]

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর প্রবন্ধ পাঠ শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠের মধ্যে দিয়ে সকল ধর্মের মূল সত্য সবার কাছে বোধগম্য হয়ে উঠেছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন স্বামীজি হিন্দু ধর্মকে নতুন রূপে নতুন ভাবে সাজিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। স্বামীজী কোন বিশেষ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাশ্চাত্য দেশে যাননি। নিবেদিতা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -

"আপনার জীবনের ব্রত কী?"[১৮]

তার উত্তরের স্বামীজি বলেন মানুষের মধ্যে যে যে সম্ভাবনা আছে তার বিকাশ ঘটানোই মানুষের একমাত্র ধর্ম। সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর থাকেন। মানুষের উচিত জীবনের প্রতি মুহূর্তে সেই দেবত্বকে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তার চেষ্টা করা। প্রত্যেকটি মানুষ অমৃতের সন্তান মানুষ পাপী নয়, মানুষ ভুল করে, কিন্তু চেষ্টা করুক ভুলকে সংশোধন করে নিতে। যে মানুষ আজ পাপী আগামী দিনে সেই পুণ্যাত্মা। সে তার নিজের ভাগ্য বিধাতা নিজেই। তাই সে ইচ্ছা করলেই অসাধ্য সাধন করতে পারে। স্বামীজি প্রচার করেন ভারতের উদারতম সত্য। তিনি বলেন সত্য কোন একটি ধর্মের সম্পদ নয় সব ধর্মের মধ্যেই সত্য বিরাজমান। সত্য প্রেম পবিত্রতা ক্ষমা উদারতা এই গুণগুলি সব ধর্মের মধ্যেই বিরাজমান। স্বামীজি বলতেন -

"সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।"[১৯]

তিনি এই সত্যকে প্রচার করেছিলেন, ভারত যে সত্যের উপাসক।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই সত্য ভারত, ভারতই এই সত্য। ভারতকে ভালবাসবো কেবল জন্মভূমি বলে নয়, ভারত পুণ্যভূমি, এই সত্যের প্রতীক।

স্বামীজি জাতিভেদ মানতেন না, সব জাতি ও সব ধর্মের মানুষ ছিল তার বন্ধু তার নিজের লোক। একবার এক নিগ্রো জাতির মানুষ তাকে ভুল করে নিগ্রো ভেবে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বুঝিয়ে দেননি যে তিনি নিগ্রো নন। একবার এক হোটেলে তাকে নিগ্রো ভেবে হোটেল মালিক থাকতে দেননি তবু তিনি নিজেকে পরিচয় দেননি যে তিনি নিগ্রো নন। তিনি বলতেন -

"কাউকে ছোট করে বড় হতে বিবেকানন্দ জন্মায়নি।"[২০]

তিনি সবসময় বলতেন তিনি যেমন শ্বেতকায়ের বন্ধু তেমনি কৃষ্ণকায় নিগ্রোদেরও বন্ধু।

শিকাগো ধর্ম মহাসভা সংঘটিত হয়েছিল ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। ধর্ম মহাসভার প্রথম দিনের বক্তৃতার পরেই তিনি গোটা আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তারপর তিনি ধর্ম মহাসভার মূল শাখা ছাড়াও আরো অনান্য বিজ্ঞান শাখায় বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন ১৯ সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম' সভায় বক্তৃতা, ২০শে সেপ্টেম্বর 'সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা' এবং ২৭ সেপ্টেম্বর বিদায়ী ভাষণ।

ধর্ম মহাসম্মেলনের ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে স্বামীজি কুয়োর ব্যাঙের গল্পের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের নিজেদের অহমিকাকে ভুল প্রমাণিত করলেন এবং প্রমাণিত করলেন ভারতবর্ষ কিন্তু পাশ্চাত্যের থেকে কোন দিকে কম নয়। স্বামীজি বুঝিয়েছিলেন ভারতের সমস্যা ধর্ম নয়, সমস্যা হল ভারতের অন্নের। স্বামীজীর প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছিল পাশ্চাত্য, এবং তারা অকপটে স্বীকার করেছিল যে ভারতের কাছে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শেখার আছে। স্বামীজী কোন ধর্মকেই ছোট করে দেখতেন না, তিনি বলতেন -

"খ্রীষ্টান আরো ভালো খ্রিস্টান হোক, হিন্দু আরো ভালো হিন্দু, মুসলমান আরো ভালো মুসলমান হোক।"[২১]

তাঁর এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খ্রিস্টান জগত তথা পাশ্চাত্য কখনোই পরিচিত ছিল না। স্বামীজীর সাথে পরিচয় এরপর পাশ্চাত্যের সংকীর্ণতা বা উন্নাসিকতা ধীরে ধীরে শিথিল হতে লাগলো। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার গুণে আমেরিকার লোক বলতে শুরু করল -

"আমরা এঁর দেশে মিশনারি পাঠাই? এঁদেরই উচিত আমাদের দেশে মিশনারি পাঠানো।"[২২]

বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন মারউইন-মেরী স্নেল তিনি লিখলেন -

"হিন্দুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন মহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। খ্রীষ্টান বা অখ্রীষ্টান যে কোন বক্তার চেয়ে শ্রোতারা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করত। যেখানেই তিনি যেতেন, লোকে তাকে ঘিরে থাকতো আর তাঁর প্রতিটি কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। যারা অত্যন্ত গোঁড়া খ্রিস্টান, তাঁরাও তাঁর সম্বন্ধে বলতেন যে, তিনি সত্যিই মানুষের মধ্যে রাজা। ... আমেরিকা ভারতবর্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাঁকে পাঠানোর জন্য এবং ভারতবর্ষের কাছে আমেরিকার প্রার্থনা: তাঁর মতো এই রকম মানুষ যেন সে আরো বেশি সংখ্যায় পাঠায়।"[২৩]

শিকাগো ধর্ম সভায় স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পর বেশ কিছু পাশ্চাত্যবাসীর মনে এক বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা নিজেদের অন্তর্দৃষ্টিকে আরো গভীরতা ও স্থায়িত্ব দিয়েছিল। বেশ কয়েক হাজার নারী পুরুষ তাঁর মহত্ব ও গভীরতা বুঝে নিজেদের জীবন উন্নত করেছিল। বেশ কিছু পাশ্চাত্য মনীষী যেমন উইলিয়াম জেমস্, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, ম্যাক্সমুলার, লিও টলস্টয়, এরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বামীজীর ভাবধারায়।

স্বামীজীর পাশ্চাত্য ভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল ছিল তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের উপর তার প্রভাব। ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকায় এতদিন যে গোঁড়া মনোভাব ছিল তা দূর হয়ে গিয়েছিল স্বামীজীর বক্তৃতায়। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা ও জীবন চর্চার গভীর সমস্যার যথার্থ সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বাণীর মধ্যে দিয়ে। স্বামীজী নিজ বানীর যে বীজ বপন করেছিলেন তা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছিল মানুষের জীবন ও পাশ্চাত্য জগতের সমগ্র চেতনার মধ্যে দিয়ে। বর্তমান যুগে প্রাচ্য ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি আমেরিকাবাসীর যে আগ্রহ, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তার মূলে আছে স্বামীজীর বক্তৃতার প্রভাব। এই প্রসঙ্গে কিপলিং বলেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কখনো মিলবে না। না মিললেও পরস্পর পরস্পরকে জানবে জানার পরে উভয় উভয়ের কাজ কিছু কিছু নেওয়া দেওয়া শুরু করবে। আর সে, দুই দেশের মধ্যেই শুভ হবে।

স্বামীজি চেয়েছিলেন প্রাচ্য বিশেষত ভারত পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিখুক। আর পাশ্চাত্য ভারত থেকে শিখুক ধর্ম। স্বামীজি ধর্ম মহাসম্মেলনের পরেও বেশ কিছুদিন আমেরিকায় থেকে যান। তিনি আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় দ্রুতগতিতে গিয়ে গিয়ে বক্তৃতা করতে থাকেন। খবরের কাগজে স্বামীজি 'The Cyclonic Hindu Monk' বলে প্রকাশিত হলেন। মানব জীবনের উচ্চতম আদর্শ হলো পূর্ণতা, এটাই ছিল স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু। তিনি বলতেন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ত্রুটি হল বাণিজ্য কেন্দ্রিক সভ্যতা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিষ্ঠুর যুদ্ধ প্রবণতা ও আত্মতুষ্টি।

স্বামীজি প্রত্যাবর্তনের সময় একজন আমেরিকাবাসী জাহাজঘাটে বিদায় দিতে এসে জিজ্ঞাসা করেন যে পাশ্চাত্যের এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকার পরেও ভারতে গিয়ে দরিদ্রের মধ্যে থাকতে কষ্ট হবে কি না? তার উত্তরের স্বামীজি বলেছিলেন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। আমি চিরদিন ভারতবর্ষকে খুব ভালোবাসি এখনো তাই। তোমরা বুঝতে পারছ না ভারতবর্ষ কী? তিনি আরোও বলেছিলেন তোমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ তোমারা জান না। এটা একটা আগ্নেয়গিরি যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে একটা প্রলয় কান্ড ঘটবে তোমাদের পাশ্চাত্য জগতে। স্বামীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল, শুরু হল ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন স্বামী বিবেকানন্দ এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কাউকে কোনদিন ছোট করে দেখতেন না কেউ কোনো ভুল করলে তিনি বলতেন -

"যা হয়েছে হয়েছে, এবার আরোও ভালো করো।"[২৪]

কোন ভারতবাসী ভারতের নিন্দা করলে তিনি বলতেন -

"তুমি ভারতের জন্য কি করেছ, যে তুমি সমালোচনা করছ?"[২৫]

তেমনি তিনি পাশ্চাত্যের নিন্দাও পছন্দ করতেন না তিনি বলতেন পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের অনেক কিছু শেখার আছে। পাশ্চাত্যে স্বামীজির শিক্ষাদানের পূর্ণ বা আংশিক আলোচনা সংক্ষেপে করা কঠিন। অদ্বৈতবেদান্তের যে ব্যাখ্যা তিনি জগতের কাছে তুলে ধরেছিলেন, পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তা নতুন আলো নিয়ে এসেছিল। ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ, সম্বন্ধীয় এমনকি যুক্তি, হৃদয়, আবেগ সম্পর্কে সকল সমস্যার সমাধান তারা খুঁজে পেল; ধর্ম ও বিজ্ঞানের জগৎ, যুক্তি ও বিশ্বাসের জগৎ, জড় ও ব্যক্তি ঈশ্বরের জগৎ, সবকিছুই চরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। কিন্তু এসব আপাত সত্য; স্বামীজি বলতেন -

> "আমাদিগকে আরো উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা করিতে হইবে। উহার দ্বারা যে সগুন ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। সগুন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এরূপ প্রমাণ করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম তাহাই একমাত্র ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত; সেই নির্গুণ সত্তাই সত্য, তিনি মানুষের আত্মা।"[২৬]

স্বামীজীর জীবনাদর্শে অদ্বৈত বেদান্তের সমাগম দেখা যায়। তিনি বলতেন যে গত তিনটি শতাব্দী পাশ্চাত্যের যে ধর্ম ও বিজ্ঞান সমস্যা, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্যা তার সবকিছুই অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি সত্যই বলেছিলেন যে বর্তমান জগতের কাছে অদ্বৈত দর্শন ও ধর্ম একান্ত প্রয়োজন।

> "যদি কেহ এই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈত বেদান্তই একমাত্র পন্থা।"[২৭]
>
> "... ইউরোপের মুক্তি এখন, এই যুক্তি মূলক ধর্ম-অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই, ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবেই পন্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ্য। যখনি ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে।"[২৮]

সম্ভবত এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন এবং এই মহান আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন পাশ্চাত্য জগতে।

স্বামীজির ধর্ম মহাসভার আত্মপ্রকাশ ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন -

> "বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য যাত্রা হল প্রথম লক্ষণ যে, ভারতবর্ষ জাগছে। জাগছে শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, জয় করবার জন্য। এই জয় অবশ্যই ভৌগোলিক জয় নয়। ভারতবর্ষ যদি পৃথিবীকে জয় করে তবে তা করবে ভাবাদর্শের দ্বারা, প্রেম, মৈত্রী ও উদারতার দ্বারা। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতায় তারই সূচনা হয়েছিল।"[২৯]

সবশেষে এ কথা বলা যায় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম মহাসভায় যোগদান একদিকে যেমন নতশির ভারতের দিকে বিশ্বের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি ভারতের সমাজকে নবজীবন ও নবযৌবনের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল।

Reference:

১. Whitehead, North Alfred, Science and the Modern World, The Macmillan Company, New York, 1925, P. 119

২. Russel, Bertrand, 'A Free Man's Worship', in Mysticism and Logic, Doubleday and Company, Inc., New York, 1957, P. 54

৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪/৭

৪. উদ্বোধন, ৭৫ বর্ষ পৃ. ৫২৯

৫. Spiritual Talks, Advaita Ashrama, Calcutta, 1955, p. 254

৬. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুবনায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস, ৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৫

৭. তদেব, পৃ. ৪৫

৮. Burtt, Arthur Edwing, The Metaphysical Foundation of Modern Physical Science, Doubleday Anchor Books, New York 1954, P. 33

৯. Ibid. P. 99

১০. Voltaie, Elements de la philosophic de Newton, Chap. 6

১১. স্বামীজির বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃ. ২৬৭

১২. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৪

১৩. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুবনায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস, ৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৭

১৪. তদেব, পৃ. ৪৭

১৫. তদেব, পৃ. ৪৮

১৬. তদেব, পৃ. ৪৮

১৭. তদেব, পৃ. ৪৮

১৮. তদেব, পৃ. ৪৮

১৯. তদেব, পৃ. ৪৮

২০. তদেব, পৃ. ৪৯

২১. তদেব, পৃ. ৪৯

২২. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৫

২৩. তদেব, পৃ. ৫

২৪. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুবনায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস,৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৫২

২৫. তদেব, পৃ. ৫২

২৬. স্বামীজির বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃ. ২৬৪-২৬৫

২৭. তদেব, পঞ্চম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, (১৩৮৩), পৃ. ৩০৯

২৮. তদেব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০৩

২৯. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৬

Bibliography

আচার্য, অধ্যাপক পি (রচয়িতা), উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা উজ্জ্বল দিগন্ত, বিচিন্তা ভবন, ৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ: এপ্রিল ১৪১৫

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুব নায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস, ৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রন, ২০০৭

ভদ্র, কালিদাস (সম্পাদিত), বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ (জীবনকথা ও গল্প সম্ভার), লতিকা প্রকাশনী, ১০/২, বি রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৮

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক: কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২

Bhattacharya, D.P., A Treasure Throve, Chandan Maity, New Light, 10/2B, Ramnath Majumdar Street, Kolkata- 700009, Revised Eight Edition -2014, Reprint - 2018

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 942 - 944
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 942 - 944
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যে মহামারি : সেকাল ও একাল

পৃথা সামন্ত
Email ID : samantapritha06@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
COVID-19, pandemic, literature, novel, short stories, essays, unemployment, isolation.

Abstract
A walk through the history tells us that nearly after every century there have been evidences of epidemics and pandemics across the world and how it affected the lives of people, health, economy, education and the overall social system. COVID-19 pandemic like other pandemics has been reflected through the literature also. This paper focuses on the effects of COVID-19 pandemic on literature. It will try to analyse the literature in the phase of COVID-19 with special references to the bengali short stories, drama and also try to compare with some other literary works on various pandemics. The major literary works are taken as examples are 'The Plague' by Albert Camus, 'Love in the time of Cholera' by Gabriel García Márquez, 'A journal of the Plague year' by Daniel Defoe, 'The Masque of the Red Death' by Edger Allan Poe.

There has been clear efforts in writings to bring out the misery caused by the pandemic and how it affected people and their livelihoods. Classic and contemporary writings not only provide an insight, but it also allows a fair portrait of the losses and people's efforts to move forward.

Discussion

সম্প্রতি সমগ্র বিশ্ব এক মহামারি থেকে ধীরে ধীরে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়কাল সমগ্র বিশ্বের কাছে যেন বিভীষিকাময়। ত্রাস হয়ে আবির্ভূত হল কোভিড-১৯। যদিও ২০১৯ সালের নভেম্বর মাস থেকেই চিন দেশের উহান শহরে তার প্রথম আবির্ভাব, তবুও ক্রমেই সেই সূক্ষ্ম ভাইরাস অনায়াসেই সদর্পে বিচরণ করতে শুরু করল বিশ্বের সকল প্রান্তে। অবরুদ্ধ জীবন, যেন স্তব্ধ সময়ের কাছে মানুষ তখন বড়ই অসহায়। এই ভাইরাস অতি সহজেই শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুস করে ক্ষতিগ্রস্ত, তারপর ক্রমেই শারীরিক বিবিধ জটিলতার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাণ সংশয় ঘটায়। চিকিৎসা, গবেষণার মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রতিষেধক অল্প কিছুদিনের মধ্যে এলেও করোনাকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা যায় নি। তবে যত সময় গেছে, অন্যান্য ভাইরাসের মতো এই ভাইরাসেরও প্রাবল্য কমেছে, ক্রমেই তা ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু করোনার প্রভাব শুধু মানব শরীরে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে সব দিক থেকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় সমাজ। করোনা মহামারির সময়কালও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যতটে করোনা মহামারির ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ফলে এই সময়কালীন মানব জীবনের জটিলতা, সর্বোপরি সামাজিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 942 - 944
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিত্র ধরা দিয়েছে বিভিন্নভাবে। এই সময়ের লেখা বেশ কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ সবই রচনার সময়কাল ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে। এই প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈরাশ্য, একাকীত্ব, বেকারত্ব, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার ভয়াল রূপ। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা, যার প্রভাব এখনও রয়ে গেছে। বহু মানুষের কর্মহীনতা, বেকারত্ব, পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা এই সময়ের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমীর গোস্বামীর ‘সব্জিওয়ালার ছেলে’ ছোটগল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অরূপের লকডাউনের শুরুতেই চাকরী চলে যায়। আর চাকরী পাওয়ার আশা না দেখে, চারজনের সংসারে একাকী রোজগেরে অরূপ কোনও উপায়ান্তর না পেয়ে স্থির করে সে সব্জি বিক্রি করে সংসার চালাবে। প্রবল টানাটানির সংসারে তার স্ত্রী ছন্দাও তাদের এই অবস্থাকে সামাজিক অবস্থানের পতন বলেই মনে করে। এরই মধ্যে তার বৃদ্ধা মা মারা গেলে ভারাক্রান্ত অরূপ স্ত্রী ছন্দাকে বলে ওঠে –

“জানো, মা-কে আর সব্জিওয়ালা ছেলেকে দেখে যেতে হল না।”[১]

এখানে ইগোকেই বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন অরূপের এই উক্তির মাধ্যমে। এই সময়ে শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে, দেখা দেয় বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সমস্যা। গুলরাজ রোশন রহমানের এই সময়ের একটি অন্যতম প্রবন্ধ ‘India's Covid crisis high cost of living, higher cost of dying, abd low cost of saving’ প্রবন্ধে ভারতবর্ষের করোনা মহামারির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন -

> “One of the most visible effects of the pandemic in India both it’s first and the second waves has been economic slowdown, ... but Alas, India is still way behind in satisfactorily managing the pandemic.”[২]

মহামারির এই সময়ের আর্থিক দুরাবস্থা নিয়ে বাংলাদেশেও বেশ কিছু ছোটগল্প রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মাহফুজ রিপনের লেখা ‘লাল মাস্কের আড়ালে’। করোনার সময়ে সামাজিক দূরত্ববিধি নিয়ে প্রশাসন থেকে সর্বত্রই কড়াকড়ি করা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল মাস্ক পরার অপরিহার্যতা। এক দরিদ্র দম্পতি তাদের শিশু সন্তানের জন্য নিউমোনিয়ার ওষুধ কিনতে বেরিয়ে তাদের বাধ্য হয়েই মাস্ক কিনতে হয়। দরিদ্র পরিবারের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের পরিবর্তে ত্রিশ টাকা দিয়ে মাস্ক কিনে ফেরা এখানে পরিস্থিতির কাছে দারিদ্র্যের নতি স্বীকারের মর্মন্তুদ চিত্র বর্ণিত।

করোনা মহামারি সমগ্র মানবসমাজেই সৃষ্টি করেছিল এক তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শেষ দৃশ্যের খসড়া’ সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়েই রচিত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মানব বিলাসবহুল বহুতলের ঊনচল্লিশ তলার বাসিন্দা। সে মানবীর থেকে প্রথম করোনা ভাইরাসের কথা জানতে পারে। মানবী জানায় –

“সারা পৃথিবী তছনছ করছে এই ভাইরাস, লক্ষ লক্ষ মানুষ এর মধ্যে মৃত্যুর কবলে।”[৩]

করোনার লকডাউনে তাঁর মনে মনে হয় –

“সারা পৃথিবীটা যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে।”[৪]

মানবের এই ধারণা সত্যিই তো অমূলক নয়, এই সূক্ষ্ম ভাইরাস এক লহমায় সবকিছুই পাল্টে দিয়েছিল। উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সকলকেই কমবেশী প্রভাবিত করেছিল। কেউ হারিয়েছেন স্বজন, কেউ চাকরী অথবা কেউ বঞ্চিত হয়েছেন মানসিক সুস্থতা থেকে। শুধু তাই নয়, অনলাইন শিক্ষা পরিষেবা থেকে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হওয়ার তারাও হারিয়েছে শিক্ষাজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। যাঁরা এতদিন ভাবতেন অর্থ থাকলেই, বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি থাকলেই হয়ত জীবনের যাবতীয় সুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক প্রশান্তিও অনুভব করা যায়। কিন্তু এই মহামারি মানবের মতো আমাদেরও দেখিয়েছে সামাজিক হয়ে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকলেই আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। মানবের মানবসভ্যতা সম্পর্কে এই উপলব্ধি যেন আমাদেরও পর্যবেক্ষণ। এই গল্পে লকডাউন, করোনা প্রতিরোধ ও নিরাময়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ, মানুষের সামগ্রিক

জীবনযাত্রা সবই সুন্দর বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত অপর এক মহামারি কেন্দ্রিক অ্যালবার্ট ক্যামুর 'The Plague' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানেও প্লেগের প্রকোপ এবং তার প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। ওয়ান শহরে প্লেগের প্রকোপ এবং ক্রমে তার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া, তীব্র জনরোষ, প্রশাসনের নিষ্ঠুর পদক্ষেপ প্রভৃতি নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় –

> "The local press, so lavish, of news about the rats, now had nothing to say. For rats died in the street; men in their homes. And newspaper are concerned only with street. Meanwhile, government and municipal officials were putting their heads together."[৫]

প্লেগ নিয়ে Daniel Defoe রচিত 'A journal of the Plague Year', Edger Allan Poe রচিত 'The Masque of the Red Death' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করোনা মহামারি থেকে কেবল মানসিক স্বাস্থ্যের বা আর্থিক বিপর্যয় নয়, বিভিন্ন কুসংস্কারেরও জন্ম হয়েছিল। সায়ন্তনী পূততুন্ডের লেখা 'কোভিড সমাচার বাই কমলি'-তে কমলি নাম্নী বিড়াল যেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বিড়ালকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। করোনা ভাইরাসের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কারবোধেরও জন্ম হয়েছিল। আনন্দ গোপাল গরাই-এর 'অদৃশ্য শত্রু নাটকে একদিকে এই সংস্কারবোধ অপরদিকে মানুষের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হওয়া প্রকাশ পেয়েছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহামারির আগমন ঘটেছে এবং তার প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যেও পড়েছে। যে দুটি ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী মহামারির সাক্ষী বিশ্ব থেকেছে তা হল কলেরা ও প্লেগ। এ প্রসঙ্গে দুটি কালজয়ী উপন্যাস গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'Love in the time of Cholera' এবং অ্যালবার্ট ক্যামুর 'The Plague'। সম্প্রতি যে মহামারি থেকে সম্প্রতি বিশ্ব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজী সাহিত্যেও পড়েছে। ইন্দো কানাডিয়ান সাহিত্যিক স্টিফেন গিলের 'Mask' গল্পে একজন কানাডিয়ান ভদ্রলোকের মাস্ক সম্পর্কে কৌতুহল নিয়ে গল্পের সূচনা, পরবর্তীতে তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধু আজিজের মাস্কের পরিবর্তে রুমালের মাধ্যমে ভাইরাস প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত দ্বারা গল্পের সমাপ্তি। কাহিনীর আবর্তনে গল্পে উঠে এসেছে বিভিন্ন বিষয়। যেমন, ভারত ও পাকিস্তানের ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনগত প্রসঙ্গ, করোনার সময়ে চিন ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ইত্যাদি। যে কোন মহামারির মত করোনার প্রভাবও সমাজ ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবেই পড়েছিল। অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবেই এই সময়ের রচিত সাহিত্যে সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

Reference:

১. গোস্বামী, সমীর, 'সব্জিওয়ালার ছেলে', আজকাল শারদ ১৪২৮, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২৬০

২. Rahman, Roshan Gulrez, 'India's Covid Crisis High Cost of living, Higher Cost of dying and low cost, CORONA PANDEMIC CRISIS AND POST COVID-19 SCENARIO Edited by NDR Chandra, AUTHOR'S PRESS, NEW DELHI, Page. 26

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'শেষ দৃশ্যের খসড়া' উশ্রী ২০২১, সুরসপ্তক, গিরিডি, পৃ. ৩৪

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'শেষ দৃশ্যের খসড়া' উশ্রী ২০২১, সুরসপ্তক, গিরিডি, পৃ. ৩৭

৫. Camus Albert, 'The Plague', Translated from the french by Stuart Gilbert, Delhi: Penguin Books, 2010

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 106
Website: https://tirj.org.in, Page No. 945 - 950
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 945 - 950
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অচর্চিত বাণী রায়

অধ্যাপক ড. আশীষ কুমার সাউ
বাংলা বিভাগ, এম. আর. এম. কলেজ
ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বারভাঙ্গা, বিহার
Email ID : asishksau88@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
অন্তঃসলীলা ফল্গু, প্রতিপত্তিশালী, শেরিফ, অধিকারসচেতন, ডাইরেক্ট মেথড।

Abstract
বাংলা ভাষা জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত বাংলার সাহিত্যাকাশে জন্ম নিয়েছেন বহু প্রতিভাধর সাহিত্যিক। সাহিত্যের এই দীর্ঘ যাত্রাপথের পথিক কেবলমাত্র পুরুষই নন, মহিলা সাহিত্যিকের লেখনিও এই যাত্রা পথকে ভাস্বর করেছে। এই রকম এক তেজস্বী মহিলা সাহিত্যিক ছিলেন বাণী রায়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে তাঁর বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টির ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতি মননধর্মিতা, স্বাধীন মুক্তপ্রেম ও প্রতিবাদী সত্তা সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা, অনুবাদমূলক রচনা প্রভৃতি নানাবিধ রচনাগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় নিহিত। তাঁর বহুমুখী, বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দানের প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভটিতে।

Discussion

বাংলা সাহিত্য-স্রোতের ধারায় বাণী রায়ের সাহিত্যকৃতি অন্তঃসলীলা ফল্গুর মতো প্রবহমান, যার রসধারা বাংলার অগণিত পাঠকের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছে। বাণী রায়ের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তাভাবনার মৌলিকতা, নির্মোহ দৃষ্টি এবং তথা অপরিমেয় সাহসিকতা তাঁর রচনাগুলিকে যে অভিনবত্ব দিয়েছিল তার স্বাদগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না তাঁর সময়কালের সকল রসজ্ঞ পাঠকের। ফলে বাণী রায়ের সমসাময়িক অনেক দুর্বল লেখক লেখিকা বাংলা সাহিত্যে তাঁর তুলনায় অধিক পরিচিতি লাভ করলেও এই লেখিকা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অপাংক্তেয়। তবে আজকের পাঠককুলের কাছে বাণী রায়ের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বাণী রায়ের জন্ম সাল নিয়ে মতভেদ আছে। একটি তারিখ হল ৫ নভেম্বর, ১৯১৮ আর অন্য মতে ৫ নভেম্বর, ১৯২০। বাণী রায়ের জন্ম সাল ১৯১৮, এই তথ্য মেলে ‘সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান’ গ্রন্থে। আর এক মতে বাণী রায়ের জন্ম সাল হল ১৯২০ এর প্রমাণ মেলে তাঁর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির ভূমিকার মধ্যে। আবার বাণী রায়ের ভাইপো ড. অনিরুদ্ধ রায়ের (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক) মতেও ১৯২০ সালটাই বাণী রায়ের প্রকৃত জন্মসাল। সম্ভবত এই কারণে, বাণী রায় নিজেই বলেছেন, -

> "আমার জন্মের সন, তারিখ, বার পর্যন্ত নিয়ে গোলমাল আছে। ইংরাজি ১৯১৯, ১৯২০, ১৯২১ এই তিনটির মধ্যে কোনো একটি হয়তো হতে পারে।"[১]

মোটামুটিভাবে বাণী রায়ের জন্মসাল ১৯২০ খ্রিঃ মেনে নিতে পারি। তাঁর জন্মস্থান উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার হাটুরিয়া অঞ্চলের পেঁচাখোলা গ্রামে। তাঁর পিতামহের নাম ছিল উমেশচন্দ্র রায় ও পিতার নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র রায়। তাঁর প্রপিতামহ শম্ভুনারায়ণ বা শম্ভুনাথ রায় ছিলেন পাবনা জেলায় প্রতিপত্তিশালী জমিদার। শোনা যায় তাঁর জমিদারির সময় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো, এমনি কঠোর বা রাশভারি জমিদার ছিলেন তিনি। বংশ পরম্পরায় সেই ঐতিহ্য লোপ পেতে থাকে এবং জমিদারিও ক্রমেই বিলীন হতে থাকে। বাণী রায়ের পিতা পূর্ণচন্দ্র রায় (এম.এ.বি.এল.) ছিলেন উত্তরবঙ্গের জমিদার। তবে তিনি জমিদার পরিচয়ের তুলনায় গ্রামের সবার কাছে অ্যাডভোকেট হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জমিদারি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং অ্যাডভোকেটের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি এই জীবিকায় নিযুক্ত ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ওকালতি ত্যাগ করে স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি 'হিন্দু মিউচুয়াল ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সারা জীবন খদ্দর পরেছেন, কখনো বিদেশি জিনিস ব্যবহার করেননি। তিনি যেন এই বাণীতে বিশ্বাসী ছিলেন - 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'। তিনি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে রাজেন্দ্র প্রসাদের সহপাঠীরূপে একঘরে বাস করেছেন। পূর্ণচন্দ্র রায় মনে প্রাণে স্বদেশি ছিলেন। উমেশচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন পূর্ণচন্দ্র রায়। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ বাণী রায়ের মা হলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক গিরিবালা দেবী। তিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছিলেন 'রায়বাড়ী' উপন্যাসটি রচনা করে। এছাড়া তাঁর আরো অনেক বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে, 'কুড়ানো মানিক', 'করবী-মল্লিকা', 'তৃণগুচ্ছ', 'হিন্দুর মেয়ে', 'দান প্রতিদান', 'রূপহীনা' প্রভৃতি স্মরণ করা যেতে পারে। পূর্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যম ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র রায় হাটুরিয়াতেই থেকে যান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র রায় কলকাতার শেরিফ ছিলেন। বাণী রায় ছিলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী। পূর্ণচন্দ্র ও গিরিবালা দেবীর দুই পুত্র ও এক কন্যা, যথাক্রমে সুশীল রায়, অনিল রায় ও বাণী রায়। বাণী রায়ের দুই দাদা উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদাসীন ছিলেন। বেহালার বিবেকানন্দ কলেজটি সুশীলকুমার রায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেই কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

প্রথম দিকে কলকাতায় এসে তাঁরা উত্তর কলকাতা অঞ্চলে ঠন্‌ঠনিয়া কালী বাড়ির কাছে বাসা বাড়িতে ছিলেন। পরবর্তীকালে (১৯৩০-৩১) নিজস্ব বিশাল বাসভবন 'বাণী মন্দির'-এ বসবাস করতে থাকেন। কথিত আছে, পিতা পূর্ণচন্দ্র তাঁর একমাত্র কন্যাকে খুব বেশি ভালবাসতেন, তাই কন্যার নামে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। বাণী রায়ের জীবনের বেশির ভাগ সময়টা কেটেছে ঐ বাড়িতে। ঐ বাড়িটির ঠিকনা ছিল ৭৩ নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। এই বাড়িতে ঘরের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশটি, গাড়িও ছিল একাধিক প্রায় তিন-চারটি। বাণী রায়ের জীবনের শেষ পর্বে (১৯৮৬) তাঁদের উত্তরপুরুষের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ ঘটায় বাণী দক্ষিণ কলকাতার ত্রিকোণ পার্কের সন্নিকটে একটি বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে উঠে আসেন এবং সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন।

বাংলাদেশের পাবনা অঞ্চলে বাণী রায়ের শৈশব কালের পাঁচ-ছয় বছর কেটেছিল। কলকাতায় থাকাকালীন তাঁরা মাঝে মাঝে পাবনায় গেছেন। পাবনা অঞ্চলে জমিদার বাড়ির মেয়ে হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতাপ ছিল সর্বত্র। শৈশব থেকেই তিনি অবাধে ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করার সব রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন। বাড়ির একমাত্র কন্যা সন্তান হওয়ায় সকলের আদরের ধন ছিলেন বাণী রায়। তাই জীবনে কখনো দুঃসাহসিক কাজ করতে পশ্চাৎপদ হতেন না তিনি। গ্রাম বাংলার ভাষায় তিনি ডাকাবুকো মেয়ে হিসাবে পরিচিত ছিলেন। যা তাঁর পরিণত বয়সের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। আর ছোটবেলায় পাবনা অঞ্চলে বসবাস করায় তাঁর সাহিত্যে পাবনা অঞ্চলের কাহিনি ও ভাষা স্থান পেয়েছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'একটি মেয়ে জন্ম নিলো' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির চিন্তা চেতনায় নবজাগরণের প্রভাব নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। যে সমস্ত কুপ্রথা মেয়েদের স্বাভাবিক গতি রোধ করে চার দেওয়ালের অন্ধকূপে বন্দী করে রেখেছিল, তার থেকে মুক্ত হল মেয়েরা। নতুনভাবে বাঁচার আশা দেখলো। লেখাপড়ার সুযোগ পেল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নারীর এই বিবর্তন পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলাদের আগমন ঘটেছে বটে কিন্তু বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মহিলা সাহিত্যিকগণও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 106
Website: https://tirj.org.in, Page No. 945 - 950
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীর চিরকালের কন্যা-জায়া-জননী রূপের বাইরে নারীমনের চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনার চিত্র অঙ্কনে সাহস বা সক্ষমতা দেখাননি। বাণী রায়ই সাহিত্যাকাশে ধুমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে সমাজের নীতি, প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে মেয়েদের স্বাধীন সত্তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। ফলে তাঁকে যথোচিত মূল্যও দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেনের একটি রচনা স্মরণযোগ্য–

> “দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল - পালের গরু হতে তিনি চাননি। তার জন্য যে কোনও মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। ...ঐ দুঃসাহসী কলমের যে পরিমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল, যে পরিমাণ সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করা উচিত ছিল, তা ঘটেনি। ...নারী জন্মের মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। আমাদের দেশ এখনো তেমন উদার হয়নি, তখন তো একেবারেই ছিল না।”[২]

বাণী রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যেমন স্বতন্ত্র ছিলেন তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। আর মহিলা হয়েও মহিলাজনোচিত লজ্জা, সংকোচ, ব্রীড়ার পরিবর্তে পুরুষের ন্যায় দীপ্ত, উন্নত ঋজুতা তাঁকে মহিলা সমাজ তো বটেই পুরুষ সমাজেও ব্রাত্য করে রেখেছিল। আর এরই প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও।

বাণী রায়ের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের দিকে আলোকপাত করলে তাঁর বহুব্যাপ্ত, বিচিত্র সাহিত্যপ্রতিভা আমাদের বিস্মিত করে। সাহিত্যের নানা বিভাগে ছিল তাঁর অবাধ পদচারণা। তিনি সব্যসাচীর মতো একদিকে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা, রম্যরচনা করেছেন আবার অন্যদিকে সাহিত্য-সমালোচনা, পত্রিকা-সম্পাদনা, শিশুসাহিত্য সৃষ্টি, বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

মাত্র সাত বছর বয়সে সাহিত্য-সাধনায় হাতেখড়ি বাণী রায়ের। এই সাধনা অব্যাহত ছিল তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছর আগে পর্যন্ত। তাঁর সাহিত্য রচনা আরম্ভ কবিতা দিয়ে। কবিতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ লক্ষিত হয় তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মাত্র এগারো বছর বয়সে ‘পুষ্পপাত্র’ পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। নানা পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার কাব্যমূল্য বিচার করে দেখলে হয়তো বা তার সবগুলিকে অতি উচ্চমানের কবিতা বলা যাবে না, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতিতে তাঁর কবিতাগুলি মর্মস্পর্শী হয়েছে অনেক সময়। বাণী রায়ের ‘জুপিটার’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য –

> “এই কবিতাগুলি বাঙালি পাঠককে কিছু নতুন আস্বাদ দেবে প্রধানতঃ দুই কারণে। কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে একটা ঋজু দৃঢ়তা আছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা পুরুষের নয়, নারীর। ...মুখের পর্দা ঘুচানো সহজ, মনের পর্দা তোলা কঠিন কাজ। নিজের অনুভূতি ও দৃষ্টির অবিকৃত প্রকাশ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কথা। কিন্তু সে সাহস কেবল শক্তিশালী লেখকদেরই থাকে। এই কবিতাগুলিতে লেখিকা সে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। চেষ্টাকৃত বিদ্রোহের উৎসাহে নয়, সহজ স্বাভাবিকতায়।”[৩]

‘জুপিটার’ বাণী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে বাণী রায় নিজের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কাব্যমাধ্যমে। বিদেশি সাহিত্যে সুপন্ডিত কবি তাঁর কাব্যে গ্রীক ও ইউরোপীয় সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন। তবে কবির অনুভূতির জাদুস্পর্শে বিদেশি সাহিত্য একেবারে বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। তার বিদেশিয়ানা হারিয়ে বিদেশি সাহিত্যকে দেশি পাত্রে পরিবেশন করেছেন কবি বাণী রায়। উপমা, রূপক, চিত্রকল্পের অপরূপ ব্যবহারে তাঁর কবিতাগুলি অসাধারণত্ব লাভ করেছে। ‘অরণ্যমর্মর’ কাব্যগ্রন্থে বাংলা সনেট সৃষ্টিতে বাণী রায়ের দক্ষতার পরিচয় মেলে। অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে গভীর আত্মিক বন্ধন, যে বন্ধন যান্ত্রিকতার কলুষ অনেকখানি আলগা করে দিয়ে মানুষকে অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত করছে, তাকে এই কাব্যগ্রন্থে রূপায়িত করেছেন কবি। বাণী রায়ের কবিতাগুলি প্রকাশের বিচিত্রতায়, আঙ্গিকের বিশিষ্টতায়, বিষয় বৈচিত্র্যে, অলঙ্কার-ভাষা-চিত্রকল্পের প্রয়োগে ও কবিহৃদয়ের একান্ত আন্তরিক অনুভূতির দীপ্ত প্রকাশে অনেক সময়েই অসাধারণ ও অনন্য।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাণী রায়ের অনায়াস গমন থাকলেও তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যের জন্য। বিশেষ করে বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রচনারীতিতে অভিনব ছোটগল্পগুলি বাণী রায়ের সাহিত্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর ছোটগল্পের প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 106
Website: https://tirj.org.in, Page No. 945 - 950
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের এমন একটি সহজ প্রত্যয় ছিল, যা অনায়াসেই চিনিয়ে দিয়েছিল যে তিনি কারো প্রতিধ্বনি নন–নজির মিলিয়ে অভ্যস্ত পথে পা টিপে টিপে সতর্কভাবে চলা তাঁর স্বভাব নয়। জীবনের অকুণ্ঠ সত্যভাষণ যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, নীতিকথা ও চিরাচরিত সংস্কার যেখানে সত্যকে বিভ্রান্ত করে, আদর্শের নামে যেখানে জীবনের পায়ে জড়তার শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া হয়, শ্রীমতী বাণী রায় তার সঙ্গে কোনদিন আপোষ করতে পারেননি। শুধু আপোষ করেননি বললেও সবটুকু বলা হবে না – তিনি তার শতসংস্কারে আবদ্ধ প্রাচীন দুর্গদ্বারে আঘাত হেনেছেন।"[৪]

বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের সামাজিক-অর্থনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপটে দ্রুত বদলে যাওয়া বাঙালি সমাজের চিত্র বাণী রায় তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে পরিবারের প্রয়োজনে মেয়েদের অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোকিত রাজপথে পা রাখা থেকে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূচনা তাকে লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। এই মেয়েরা সংসারে নিবেদিতপ্রাণা, আত্মবিলোপী নারীই শুধু নয়, এরা অধিকারসচেতন, ভোগবাসনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক মনোবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিসত্তা রূপে আত্মপ্রকাশিত। বাণী রায় শুধু মেয়েদের চরিত্রের মহানুভবতা, পরার্থপরতা, কর্মকুশলতা, স্নেহশীলতাকে উপস্থাপিত করেননি, পাশাপাশি তিনি ক্রূরতা, কঠোরতা, হিংসা, স্বার্থপরতা, নীচতাকেও তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী গ্রামের অর্থনৈতিক সংকট এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রবণতা এবং চাষ-আবাদের তুলনায় চাকুরী গ্রহণের প্রবণতাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন লেখিকা। তাঁর উপন্যাস 'সুন্দরী মঞ্জুলেখা', 'সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি' প্রভৃতিতে এই গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব তথা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রবণতা লক্ষণীয়।

সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাকে লেখিকা তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরে সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। মনোজগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে বাঙ্ময় রূপ দেওয়া তাঁর মূল লক্ষ্য হলেও তিনি সমাজ-বিমুখ ছিলেন না। তাই অর্থনৈতিক নানা সমস্যা যেমন জমিদারী প্রথার লোপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়া, কৃষিতে অসাফল্যের কারণে চাকুরী গ্রহণের প্রবণতা, বেকারত্ব, মধ্যবিত্ত সমাজের চরম অর্থনৈতিক অবক্ষয় তথা মানসিক অবক্ষয় সমস্ত কিছুকে বাণী রায় তাঁর কথাসাহিত্যে রূপদান করেছেন। আবার ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, হত্যা, রাহাজানি, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক, সমকামিতা, কুমারী মাতৃত্ব, চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলিকেও পাঠকের সামনে তুলে ধরে সমস্যা-সমাধানে প্রয়াসশীল হয়েছেন।

বাণী রায়ের পূর্ববর্তী ও সমকালীন মহিলা কথাসাহিত্যিকদের লেখনীতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই দেখা গেছে। মেয়েদের দুঃখ-যন্ত্রণা, হতাশা-অভিমান, কামনা-বাসনাকে সাহিত্যে রূপায়িত করলেও মেয়েদের প্রতি এঁরা পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। তাই নারী চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বল দিকগুলি এঁদের লেখনীতে তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু বাণী রায় এই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিলেন না। তিনি যেমন নারীচরিত্রের গুণগুলি প্রকাশ করেছেন তেমনি দোষগুলোকেও কখনো আবৃত করার চেষ্টা করেননি। এখানেই অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় তিনি স্বতন্ত্র।

উপন্যাস বা কবিতার তুলনায় ছোটগল্পে বাণী রায়ের অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বিচরণ। রোমান্টিক, কল্পনাপ্রবণ এই লেখিকার রূপের প্রতি সহজাত অনুরাগ তাঁর গল্পের নায়িকাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর গল্পের নায়িকারা বাংলা কথাসাহিত্যে একেবারে নতুন। তিনি কল্পনার তুলনায় বাস্তবকে বেশি জোর দিয়ে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ, কন্যা-জায়া-জননীর ভূমিকায় নারীমনের প্রত্যাশার পূরণ ও ঘাটতি, সমকামিতা, সাধারণ স্কুলশিক্ষয়িত্রীর জীবনের চরম লাঞ্ছনা, প্রৌঢ়া জীবনের একাকিত্বের যন্ত্রণা, বিধবা মহিলার আদিম প্রেম, বন্যপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষিতা-নারীর বন্য প্রেম, আধুনিক মননশীলতা চরম একাকিত্বের দোসর, বিদেশের মাটিতে প্রেমের স্বরূপ, অত্যাচারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচিত্রমুখী গল্পে নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার তাঁর কিছু কিছু গল্প নিতান্তই সাধারণ, পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, গরীব-বড়োলোক ভেদাভেদ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতা প্রভৃতিকে গল্পে রূপ দিয়েছেন লেখিকা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 106
Website: https://tirj.org.in, Page No. 945 - 950
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তিকে তাঁর গল্পে শিল্পসৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন লেখিকা। কোথাও আদিমপ্রেম, কোথাও চটুলতা, সম্ভোগের চিত্র, আবার কোথাও নিষ্কলুষ স্বর্গীয় শাশ্বত প্রেম তাঁর গল্পগুলিকে অসামান্যতা দান করেছে।

বাণী রায় গল্পের টেকনিক নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। টেকনিকের বৈচিত্র্য তাঁর গল্পগুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। গল্পরচনার ক্ষেত্রে 'ডাইরেক্ট মেথডের' তুলনায় তিনি আত্মজীবনীমূলক রীতি বেশি ব্যবহার করেছেন। আবার কোথাও দুটি রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বাণী রায়ের গল্পের ভাষার বৈশিষ্ট্য পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগে, অলঙ্কার-উপমা-চিত্রকল্পের প্রয়োগে, বিদেশি সাহিত্যের অনুসঙ্গ ব্যবহারে, বর্ণনাভঙ্গির মাধুর্যে তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নাট্যক্ষেত্রে বাণী রায়ের খুব বেশি আনাগোনা না থাকলেও তিনি প্রধানত তিনটি নাটক রচনা করেছেন। এবং এই কয়েকটি নাটকই তাঁর নাট্যরচনার কুশলতার পরিচয় বাহক। তিনি ট্রাজেডি নির্মাণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি বাণী রায়ের সুতীব্র অনুরাগের কারণে তিনি গ্রীক নাটক আত্মস্থ করেছিলেন। আর তার প্রভাবেই তিনি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর তিনটি নাটক তিনটি ভিন্ন বিষয়ের উপর আধারিত। পৌরাণিক কাহিনিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে উপাস্থাপন করার মুন্সিয়ানা যেমন তিনি দেখিয়েছেন তেমনি সমাজের বুকে অপাংক্তেয়, ভাগ্যের বিড়ম্বনার শিকার একটি মেয়ের জীবনের সব হারানোর মর্মস্পর্শী কাহিনিকেও তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন। আবার কালো মেয়ের বিয়েকে ঘিরে সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা তাকেও উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার বাণী রায়।

প্রাবন্ধিক বাণী রায় নিজের প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। যদিও বিষয় নির্ভর প্রবন্ধ তিনি খুব বেশি লেখননি, বেশিরভাগ প্রবন্ধই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, আর সেখানেও প্রাবন্ধিক বাণী রায় তাঁর নিজস্ব সাক্ষর রেখেছেন। তাঁর জীবনীমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ'-কে বাণী রায় নিজেই ফরমায়েসি রচনা বলেছেন। তাঁর নিজের কথায় –

> "Profiles জাতীয় রচনার প্রয়াস করেছি। ...Profile মানে পাশ থেকে মুখের সীমনা রেখা দেখা, সম্পূর্ণ দর্শন নয়। ...সাহিত্য বিচারে আমি সাহিত্যিককে জড়িত করে প্রোফাইলের প্রথায় নূতন আঙ্গিক বাংলায় আনবার চেষ্টা করেছি।"[৫]

ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে দেখা বিখ্যাত ব্যক্তিদের খ্যাতির আড়ালে থেকে যাওয়া ব্যক্তিমনের চরিত্র-চিত্রণের ছবি এঁকেছেন বাণী রায়, তাঁর রচিত জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, মোহিতলাল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সম্পর্কিত প্রবন্ধে। আবার কিছু প্রবন্ধ নির্মাণে তিনি তাঁর পান্ডিত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। বিদেশি সাহিত্যিকদের সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি একদিকে যেমন তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয়বাহী, তেমনি তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতারও পরিচয় বহন করে। 'মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা' নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থটি মধুসূদন দত্তকে যেমন নতুন করে চেনায় তেমনি বাণী রায়ের প্রাবন্ধিক সত্তাকেও উন্মোচিত করে।

ছোটোদের সঙ্গে বাণী রায়ের আত্মিক নিবিড়তা ছিল। তিনি শিশুদের সংস্পর্শে থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর বাড়ির কচি-কাঁচাদের কাছে তিনি ভীষণ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কিশোর উপন্যাসগুলি 'হাসিকান্নার দিন', 'সেই চেনা ছেলেটি' কিশোর মনের সারল্য, মায়া, মমতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। যা প্রমাণ করে বাণী রায় নিজের অন্তরেই একটা শিশুমনকে তাঁর পান্ডিত্য, জ্ঞান, বুদ্ধির অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

নানা বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে রচিত বাণী রায়ের রম্যরচনা 'চক্রবক্র' তাঁর সাহিত্য প্রতিভার আর এক দিককে উন্মোচিত করে। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি যে সমস্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন তাতে বাণী রায়ের কৌতুক প্রবণতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি হাল্কাচালে গম্ভীর বিষয় পরিবেশনের মুন্সিয়ানাও ধরা পড়েছে। 'কলেজ স্ট্রীট', 'পুরনো কলকাতা' প্রভৃতি রচনাগুলি পাঠককে নষ্টালজিক করে তোলে। আবার 'অথ বিবাহ ঘটিত', 'বিনে ভোজে নিমন্ত্রণ', 'অতিথি', 'চা-কফি-সুগার' প্রভৃতি রচনাগুলির সরসতা পাঠককে মুগ্ধ করে।

বিদগ্ধা বাণী রায় শুধু নিজে বিদেশি সাহিত্য অধ্যায়নই করেননি, তিনি বাংলায় সফল অনুবাদও করেছেন। অনুবাদক বাণী রায় বিদেশি সাহিত্যিকে আত্মস্থ করে বাংলায় তা অনুবাদ করেছেন এমনভাবে যে তা আর বিদেশি থাকেনি, সম্পূর্ণরূপে বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বাণী রায় বিশিষ্ট। কয়েকজন লেখক-লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ গল্প-উপন্যাস-কবিতা সংকলন করে সম্পাদনা করেছেন তিনি। বিশেষত তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মহিলা সাহিত্যিকদের রচনাসৌকর্য পাঠকের সামনে উপাস্থাপন। একেবারে স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে আরম্ভ করে তাঁর সমকালীন মহাশ্বেতা দেবী পর্যন্ত অনেকের রচনাকেই তিনি তাঁর গ্রন্থ সংকলনে স্থান দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাণী রায়কে হয়তো খুব সামান্য জায়গা দেওয়া হয়েছে, হয়তো তাঁর রচনাগুলি তাঁকে সুবিখ্যাত লেখকের পাশে জায়গা দেয়নি, তবুও তিনি নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ও বুদ্ধিমত্তায় একমেবাদ্বিতীয়ম ছিলেন। তাঁর চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা তাঁকে সবার মধ্য থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজের ক্ষমতায় সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছেন, কখনো কারো অনুকম্পার প্রত্যাশা করেননি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান এই অনন্য লেখিকা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের স্বাতন্ত্র্যে বাংলা সাহিত্যে নিজের পৃথক একটি স্থান অধিকার করেছেন। বাণী রায় ক্রমেই রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আরও বেশি করে আকর্ষণ করছেন এবং তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন নতুন করে করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। বাণী রায় যে নিজের যুগের অগ্রবর্তিনী সাহিত্যিক ছিলেন সে বিষয়ে আজ আর কোনো সংশয় নেই।

যাইহোক, বাণী রায় 'আমার সাহিত্য জীবন' নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ২৮ জুলাই, শুক্রবার, ১৯৬১ সালের 'বেতার জগৎ' - এ। যেটি কলকাতা আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছিল। সেখানে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন,-

> "আমার মনের মত রচনা আমি আজও লিখতে পারিনি। আমার সাহিত্য–সৃজনে আমি প্রীত নয়, আমি পূর্ণ নয়। মৃত্যুর পূর্বে যদি একটিও মনোমত সৃষ্টি রেখে যেতে পারি, আমি ধন্য হবো। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি সাহিত্যিক হয়েছি।"[৬]

যাইহোক, বাণী রায়ের শেষ জীবন সুখের ছিল না। শেষ জীবনের তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। আর পারিবারিক গোলযোগে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর সাধের 'বাণী মন্দির' ও বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। এর পর তিনি দক্ষিণ কলকাতায় ত্রিকোণ পার্কের কাছে একটি ফ্ল্যাটে চলে আসে এবং এখানেই আমৃত্যু কাটান। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬ অক্টোবর, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে, পূর্ণদাস রোডের উপর শ্রীকৃষ্ণ নাসিংহোম নামে একটি স্থানীয় নাসিং হোমে। তিনি কোনও গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না বলেই বোধহয় তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার সাহিত্যসমাজ নিস্তরঙ্গ ছিল। তবে 'নারীজগৎ' পত্রিকার তরফে অবশ্য একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়েছিল।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, অরুণা, 'বাণী রায় ও তাঁর সাহিত্য', নারী জগৎ পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃ. ১
২. দেবসেন, নবনীতা, 'বাণী পিসিমা', একান্তর পত্রিকা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃ. ৬২
৩. গুপ্ত, অতুলচন্দ্র, বাণী রায়ের রচনা প্রসঙ্গে, একান্তর, জানুয়ারী ২০০৩, পৃ. ৫৯
৪. রায়, রথীন্দ্রনাথ, ভূমিকা অংশ, প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ, কলকাতা, রামায়নী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫
৫. রায়, বাণী, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, ভূমিকা অংশ, কলকাতা, মুখার্জী বুক হাউস, ১৯৫৮
৬. রায়, বাণী, হাসিকান্নার দিন ও অন্যান্য গল্প, মুখবন্ধ, কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 951 - 958
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সহমরণ প্রথা ও নিবর্তক রামমোহন

ড. সুব্রত পাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়
Email ID : spaul.dta91@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Widow, Conservative, Argument, Superstition, Promoter, Preventor, Celibacy, Forbidden.

Abstract
In the first half of the nineteenth century, one of the most pervasive social maladies afflicting Bengali society was the practice of sati (ritual widow immolation). Following their husbands' deaths, widows often resorted to self-immolation to escape the future suffering of widowhood and protect themselves from the predatory gaze of men. This voluntary death elevated the widow to the status of a goddess, thereby solidifying the practice of sati as a cultural ideal in India. The practice assumed several forms, including sahamarana (self-immolation), anumaran (consensual death), and sahasamadhi (joint burial). However, not all widows voluntarily chose sati. In many cases, the practice was imposed upon them to relieve families of the perceived burden of the widow or to allow relatives to claim her property. Some were coerced through force or drugging. While many widows went willingly, it remains indisputable that the practice was profoundly inhumane. Yet, to the conservative Hindu society, it was often dismissed as a trivial matter. Against this backdrop of social crisis, Raja Rammohan Roy emerged in the early nineteenth century with a mission to eradicate the practice. In his efforts, he sought to shape public opinion and draw attention to the issue among both Indian reformers and the British administration through three meticulously argued essays: 'Sahamaran Bisay Prabarttak O Nibarttaker sambad' (1818), 'Sahamaran Bisaye Prabarttak O Nibarttaker Dbitiya sambad' (1819) and 'Sahamaran Bisay' (1829). To demonstrate the non-scriptural nature of sati, Rammohan Roy cited authoritative texts from Hindu scriptures, eliminating any scope for superstition or myth. Drawing from the Manusmriti, he argued that widow immolation or anumaran was neither obligatory nor central to Hindu dharma, emphasising the scriptural preference for brahmacharya (celibacy). He categorically denounced the forced immolation of widows as 'premeditated murder of women'. His advocacy sought to awaken compassion, kindness, and love in the hearts of conservative Hindus. However, despite his staunch opposition to sati, Rammohan Roy did not explicitly propose a method for its abolition. The arrival of Lord William Bentinck as Governor-General in 1828 marked a turning point. Deeply disturbed by the plight of women, Bentinck expressed keen interest in eradicating the barbaric practice of sati.

Ultimately, on December 4, 1829, he formally outlawed the practice through legislation. In conclusion, while the legislative abolition of sati was a significant milestone under Bentinck, the credit for galvanising public opinion, supporting the law's implementation, and ensuring its enforcement rightly belongs to Raja Rammohan Roy.

Discussion

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি সমাজ যে সামাজিক ব্যাধির দ্বারা সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছিল, তা সহমরণ প্রথা। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর জীবন বিসর্জনের মর্মান্তিক প্রথা প্রচলিত ছিল, যা সতীপ্রথা নামে পরিচিত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই সতীপ্রথার অসংখ্য নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', এমনকি বাৎসায়নের 'কামশাস্ত্রে'ও এর উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন এই সতীপ্রথার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মূল্যহীন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা ও পুরুষের কামুক দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সহমরণের পথেই আশ্রয় নিয়েছিল। বিধবা নারীর এই স্বেচ্ছামৃত্যু তাকে দেবীর আসনে বসাতো, ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে সতী সংস্কার প্রভাব বিস্তার করে। এই সতীপ্রথার আবার বিভিন্ন রূপ বর্তমান— মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় স্ত্রী যদি পুড়ে মারা যায় তবে তা সহমরণ, মৃত স্বামীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে ভিন্ন চিতায় পুড়ে মারা গেলে তা অনুমরণ, আবার মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবিত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করা হলে তাকে সহসমাধি বলা হয় (ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের যোগী সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল)। তবে এই সতীপ্রথা প্রাচীন যুগে শুধুমাত্র রাজপরিবারে বা অভিজাত সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা সমগ্র ভারতীয় সমাজে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। বাঙালি সমাজে সতীপ্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে ওঠে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায় এর নিদর্শন বিরল নয়। বিধবা মাত্রই সর্বদা স্বেচ্ছায় সহমরণে যেত তা নয়, বোঝা স্বরূপ বিধবা নারীর দায়ভাগ থেকে মুক্তির কারণে, এমনকি তার সম্পত্তির অংশ ভোগ করার জন্য নিকট আত্মীয়রা জোরপূর্বক বা মাদক দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা তাদের সতী হতে বাধ্য করত। এছাড়াও একদিকে নারীদের সতী হবার প্ররোচনা ও উৎসাহ দান করে ব্রাহ্মণেরা যেমন লাভবান হতেন অন্যদিকে তেমনি বৃদ্ধ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সতী হবার নির্দেশ ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা তাদের বাধ্য করত স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জন দিতে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হলেও একথা স্বীকার্য যে, এ প্রথা ছিল সম্পূর্ণরূপে অমানবিক। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চোখে এ ছিল নিছক ঠাট্টা-তামাশার বিষয়।

তবে সুদীর্ঘকাল ধরেই এই প্রথার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে অনুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে। মেধাতিথি, বাণভট্ট এমনকি শ্রীচৈতন্যদেবও এই সতীপ্রথাকে স্বীকার করতে পারেননি। মুঘল সম্রাটেরাই প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেব এই অমানবিক প্রথাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেও সার্থক হতে পারেননি। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষেও এই প্রথা পূর্ণ গৌরবে বর্তমান ছিল। স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—

> "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলাদেশে (বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়) সতীপ্রথা খুব বৃদ্ধি পায়।"[১]

ব্রিটিশ সরকার এই অমানুষিক প্রথাকে মেনে নিতে না পারলেও এর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনোরকম হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন, কারণ ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচার-আচরণে বাধা দিলে এদেশীয়রা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তবে খ্রিষ্টান মিশনারিগণ, উইলিয়ম কেরী ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছু কিছু সচেতন কর্মচারীরাও এই প্রথা বন্ধের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার নিজামত আদালতের অভিমতের ভিত্তিতে জানিয়েছিলেন, সহমরণ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত, তবে তা পালন করা সম্পূর্ণরূপে বিধবার ইচ্ছাধীন। বিধবাদের জোরপূর্বক বা মাদক প্রয়োগ করে সতী হতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাধ্য করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সরকারের এই আপোষমূলক বিধিনিষেধগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং সরকারি পর্যায়ে মান্যতার কারণে সহমরণ প্রথার গুরুত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড আমহার্স্ট প্রমুখ ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ এই প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়েও রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের আশঙ্কায় এই প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে পারেননি।

এইরকম সামাজিক সংকটময় পরিস্থিতিতে সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনের লক্ষ নিয়ে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভাব ঘটে রাজা রামমোহন রায়ের। তিনি ধর্মীয় সংস্কার ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বেড়া ভেঙে নতুন চিন্তা ও নতুন আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। রামমোহনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার মাধ্যম হিসেবে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ধারার সূত্রপাত করেন। এ প্রসঙ্গে ড. অধীর দে তাঁর 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন—

> "ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ও বাদানুবাদের মধ্য দিয়া রামমোহন আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের প্রথম বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছেন।"[২]

রামমোহন সহমরণ নামক সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা করে সমাজ সম্পর্কিত সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশীয় ব্যক্তিবর্গ ও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য শাণিত যুক্তি ও প্রমাণ সমন্বিত তিনখানি বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন— ১. 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), ২. 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) ও ৩. 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯)। সহমরণ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করার জন্য রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে যথোপযুক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে কুসংস্কার বা কল্পনার কোনো স্থান নেই। ড. অধীর দে মন্তব্য করেছেন—

> "স্ত্রী জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি, তাহাদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ এবং সর্বোপরি উদার মানবিক বোধের পরিচয় রামমোহনের সামাজিক সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।"[৩]

রামমোহন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'-এ (১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধে প্রকাশিত) প্রবর্তক ও নিবর্তক নামে দুটি প্রতিপক্ষ নির্মাণ করে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আপন বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। এখানে 'প্রবর্তক' হলেন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ সহমরণ প্রথার পক্ষপাতীরা। অপরপক্ষে 'নিবর্তক' হলেন সহমরণ প্রথার ঘোরতর বিরোধী অর্থাৎ স্বয়ং রামমোহন, যিনি সহমরণ প্রথার কবল থেকে নারী সমাজকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। রামমোহন নানা হিন্দুশাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সহমরণ বা অনুমরণ কোনো আবশ্যিক ব্যাপার নয়। প্রবর্তক বা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অঙ্গিরা, হারীত, বিষ্ণু, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি স্মৃতিসংহিতা থেকে বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, সহমরণ বা অনুমরণ শাস্ত্রসম্মত। এ প্রসঙ্গে প্রবর্তক অঙ্গিরার উক্তি তুলে ধরে বলেছেন—

> "স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহন করে সে অরুন্ধতী সে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়।"[৪]

এছাড়াও মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণের ফলে স্ত্রী মাতৃকুল, পিতৃকুল ও স্বামীকুল— এই তিন কুলকেই পবিত্র করে এবং স্বামীকে সমস্তরকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত করেন। আবার অনুমরণ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

> "অন্যদেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নান আচমনপূর্ব্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক।"[৫]

অন্যদিকে নিবর্তক অর্থাৎ রামমোহন বলেছেন যে, মনুর শাস্ত্র অর্থাৎ 'মনুসংহিতা'কেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত। 'মনুসংহিতা'য় বলা হয়েছে—

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না। আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্বক থাকিবেন।"[৬]

এতএব মনুর শাস্ত্রানুসারে রামমোহন বিধবাদের সহমরণ বা অনুমরণকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে ব্রহ্মচর্যকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বিধবাদের স্বামীদেহের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে শাস্ত্র উপেক্ষা করে বলপূর্বক চিতায় তুলে দেওয়াকে রামমোহন 'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা' বলেই উল্লেখ করেছেন। প্রবর্তকের যুক্তি, বিধবা নারী ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করলে ব্যভিচার হবার সম্ভাবনা থাকে বলেই মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারার পরম্পরা বা দেশাচার দীর্ঘদিন থেকেই চলে এসেছে। উত্তরে নিবর্তকরূপী রামমোহন জানিয়েছেন, কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ ব্যভিচার সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য ঈশ্বরভয়, শাস্ত্রভয় ও ধর্মভয়কে উপেক্ষা করে দেশাচার ও লোকনিন্দার ভয়ে অন্যায়ভাবে নারীহত্যা মহাপাপ এবং তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, স্বামী বর্তমান থাকাতেও অনেক স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়। রামমোহন বলেছেন, অন্যায়ভাবে স্ত্রীহত্যা করা এবং তাদের মরণকালীন কাতরতাতে প্রবর্তকের বিন্দুমাত্র দয়াবোধ জাগ্রত হয় না, যেমন—

> "শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"[৭]

শেষপর্যন্ত এই বিতর্কে প্রবর্তক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছেন এবং নিবর্তকের মতকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে রাজি হয়েছেন।

প্রবন্ধটি প্রচারিত হবার পর সহমরণ বিরোধী জনমত গড়ে ওঠার পাশাপাশি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন রাজা রামমোহন রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সহমরণের পক্ষে এবং রামমোহনের বিপক্ষে আক্রমণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সমাজের মূল অস্ত্র ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তরে কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' রচনা করেন। এখানে তিনি বলেছেন—

> "পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর এমন ধর্ম্ম নাই।"[৮]

এছাড়াও প্রবন্ধের সমাপ্তিতে লিখেছেন—

> "এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে যে মুণ্ডকশ্রুতি প্রভৃতি আছে তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়।"[৯]

যা তাঁর চূড়ান্ত রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

রামমোহন রায়ও কাশীনাথের 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'-এর একটি প্রত্যুত্তর রচনা করেন, যা 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' নামে ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "এই দ্বিতীয় পুস্তিকা অধিকতর ব্যাপক মানবিক মূল্যবোধ এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটিতে শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক প্রাধান্য পেয়েছিল, কিন্তু 'দ্বিতীয় সম্বাদে' শাস্ত্র বিচারের অতিরিক্ত আছে নারীর দুঃখবেদনার সহৃদয় উপলব্ধি।"[১০]

কাশীনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন সহমরণ স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম এবং তা দেশাচারসিদ্ধ। উত্তরে নিবর্তক অর্থাৎ রামমোহন বলেছেন—

> "স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচারবলেতে ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ এরূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবর্তক বিধবাদের বলপূর্বক দাহ করবার জন্য স্ত্রীলোকেদের চরিত্র সম্পর্কে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করেছেন—

> "স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মজ্ঞানশূন্যা হয়।"[১২]

প্রত্যুত্তরে রামমোহন যুক্তিসম্মতভাবে নারীজাতির বিরুদ্ধে এইসব মিথ্যা দোষারোপ খণ্ডন করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। নারীজাতি দৈহিক শক্তিতে দুর্বল বলে পুরুষেরা তাদের সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত করে রাখেন। প্রথমত, নারীজাতিকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে, এখানে রামমোহনের প্রশ্ন হল—

> "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?"[১৩]

বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হলে তারা যদি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলা যায় কিন্তু তাদের শিক্ষার তো কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। তাই নারী জাতিকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলা অযৌক্তিক। উপরন্তু বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতে লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাস পত্নী, যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী প্রমুখ নারীরা সর্বশাস্ত্রজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, নারীকে অস্থিরমতি বলেছেন সহমরণের পক্ষপাতীরা। এ প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছেন—

> "যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়।"[১৪]

তাই নারীরা অস্থিরমতি, এই যুক্তি ভিত্তিহীন। তৃতীয়ত, নারীকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীজাতি সরল বিশ্বাসী, পুরুষের মতো স্বার্থপর নয়। বিশ্বাসঘাতকতার দোষ নারী নয় পুরুষের চরিত্রে অধিক বর্তমান। সে বিষয়ে রামমোহনের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—

> "প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশ গুণ অধিক হইবেক।"[১৫]

চতুর্থত, নারীকে যে সানুরাগা বলা হয়েছে, তা নারী-পুরুষের বিবাহ ব্যবস্থার বৈষম্যের মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। কারণ একটি পুরুষের পাঁচ- দশটি স্ত্রী দেখা যেত কিন্তু নারীর একটিই স্বামী এবং সে স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী সমস্ত সুখ ত্যাগ করে সহমরণ বা ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করত। পঞ্চমত, নারী ধর্মভয়হীন, এ সিদ্ধান্ত অমূলক। কুলীন ব্রাহ্মণদের অসংখ্য পত্নীদের ধর্মভয় এবং স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বর্তমান ছিল বলেই তারা বিনা বাক্যব্যয়ে শত দুঃখ, অপমান ও যন্ত্রণা সহ্য করত। বিবাহের সময় ব্রাহ্মণেরা স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গ রূপে স্বীকার করলেও ব্যবহার করতেন পশুর মতো। রামমোহন জানিয়েছেন, স্বামীর থেকে নারীরা কোনো রকমের ভদ্র আচরণ আশা করতে পারত না অপরদিকে নারীরা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিষ্ঠা আজীবন রক্ষা করে চলতেন। তাই আমরা বলতে পারি, নারী প্রকৃতপক্ষেই ধর্মনিষ্ঠ।

প্রবন্ধের শেষে দেখা যায়, রামমোহন আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তরে দয়ামায়া, স্নেহ, প্রেম জাগ্রত করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর শেষ আবেদন হৃদয়ের কাছে—

> "দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১৬]

রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক সর্বশেষ প্রবন্ধটি 'দ্বিতীয় সম্বাদ'-এর দীর্ঘ দশ বছর পর 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯) নামে প্রকাশিত হয়। রামমোহন তাঁর প্রথম দুটি প্রবন্ধে সহমরণ প্রথার দুর্বলতা তুলে ধরে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধার মনোভাবে আঘাত করেন। ফলে বিরোধীরা তাঁকে তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করেন। এই রকমই সহমরণ প্রথার পক্ষপাতী দু'জন ব্যক্তি 'বিপ্রনামা' ও 'মুগ্ধবোধছাত্র' এই ছদ্মনামে রামমোহনকে তীব্র আক্রমণ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় দুটি পত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকাশ করেন। রামমোহন এই দুটি পত্রের উত্তরে রচনা করেন 'সহমরণ বিষয়' নামক প্রবন্ধটি। 'বিপ্রনামা' কাম্যকর্ম বিষয়ে গীতার বিধানকে অবলম্বন করে আটটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং সে বিষয়ে রামমোহনের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। রামমোহন বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিসম্মত উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন— ধর্মকে বাণিজ্য হিসেবে দেখা মূঢ়ের কাজ, ফল কামনা করে কর্ম করা নরাধমের লক্ষণ, ভগবান সকাম কর্মের নিন্দা করে নিষ্কাম কর্মকেই উত্তম কর্ম বলেছেন, পরমেশ্বরের আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই কামনা-বাসনা থেকে মনুষ্য সমাজের মুক্তি ঘটবে, কর্মফলে মানুষের কোনো অধিকার নেই। সহমরণের ফল স্বর্গলাভ, এই বিষয়ে রামমোহন বলেছেন—

> "স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুঃ সত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না।"[১৭]

এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন কাম্যকর্ম ও নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে গীতায় অসংখ্য শ্লোক রয়েছে, কিন্তু অল্পবুদ্ধি 'বিপ্রনামা' সেগুলির তাৎপর্য উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছেন।

'মুগ্ধবোধছাত্র' নামে অপর ছদ্মবেশী ব্যক্তিও গীতায় উল্লিখিত কাম্যকর্ম ও নিষ্কাম কর্ম বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে বলেছেন, ভগবান ও তাঁর অংশাবতার অর্জুন এবং তাঁর সমকালীন অনুগত ব্যক্তিরা যে সমস্ত কর্ম করেছেন সেই সমস্ত কর্মই কাম্যকর্ম এবং সেই অনুসারেই গীতার অর্থ করতে হবে। উত্তরে রামমোহন বলেছেন, 'মুগ্ধবোধছাত্রে'র এরূপ ব্যবস্থার ফলে সমস্ত ধর্ম লোপ পাবে—

> "কি আশ্চর্য্য মুগ্ধবোধছাত্র ও তাঁহারদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"[১৮]

আসলে প্রাচীন শাস্ত্রে এমন অনেক বিষয়ই আছে যা একালে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সহমরণের পক্ষপাতী নিষ্ঠুর ও ছলগ্রাহী 'মুগ্ধবোধছাত্র' বিধবাদের সহমরণকে শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধ ও উত্তম ধর্ম বলে মন্তব্য করেছেন। উত্তরে রামমোহন লিখেছেন, সহমরণরূপ কাম্যকর্মের নিন্দা ও নিষেধ গীতার অসংখ্য শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ বর্ণিত আছে বলে একালেও তার অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। প্রবন্ধের শেষে রামমোহন ব্যঙ্গ করে 'মুগ্ধবোধছাত্র' সম্বন্ধে বলেছেন—

> "শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্মত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত্ত হইলে এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে।"[১৯]

রামমোহন 'বিপ্রনামা' ও 'মুগ্ধবোধছাত্রে'র এই সমস্ত ভিত্তিহীন বক্তব্যের যুক্তি আশ্রয়ী ও শাস্ত্রসম্মত উত্তর দিয়েছেন, এর মূলে ছিল রক্ষণশীল সমাজের তীব্র বিরোধিতাকে নিরস্ত্র করবার প্রয়াস। তবে রামমোহন সহমরণ প্রথার ঘোরতর বিরোধী হলেও কীভাবে এই নিষ্ঠুর প্রথা নিবারিত হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন।

১৮২৮ সালে লর্ড আমহার্স্ট পদত্যাগ করলে এদেশে নতুন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। তিনি যথার্থই বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন, তাই নারীজাতির অসহায়তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে পারেননি। তিনি নির্মম সহমরণ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করার জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেছিলেন। রামমোহনের ঘোরতর সহমরণ বিরোধিতা ও বেন্টিঙ্ক-এর সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ করার প্রয়াস রামমোহন পন্থীদের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধকে সুতীব্র করে তুলেছিল। উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে রামমোহনের পরামর্শ আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন সহমরণ প্রথাকে দূর করতে চাইলেও সরকারিভাবে আইন করে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নানারকম বিধিনিষেধ জারি করে ও শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করে কোনোরকম আলোড়ন ছাড়াই এই প্রথাকে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সহমরণ প্রথাকে আইন করে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। সহমরণ প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হলে রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ১৮৩০ সালে বেন্টিঙ্ক-এর কাছে প্রতিবাদ স্বরূপ 'সতীদাহ আবেদন' অর্পণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে নানা আবেদন-নিবেদন ও অনুনয় করলেও বেন্টিঙ্ক নিজের সিদ্ধান্ত অটল ছিলেন। রামমোহন সহমরণ বিষয়ে

আইন প্রণয়নকে সমর্থন না করলেও একথা স্বীকার্য যে তিনিই প্রথম এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আসলে ব্রিটিশ শাসনে বিশ্বাসী রামমোহন মনে করেছিলেন, সহমরণ প্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ করা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু রক্ষণশীলরা যখন সহমরণ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারলেন না তখন রামমোহনই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানাতে এবং সহমরণ নিবারণ আইন যাতে বলবৎ থাকে সে বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু তাঁর ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন—

> “সুস্পষ্টভাবে এ-বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করার জন্য সহমরণ নিবারণের গৌরব রামমোহনের প্রাপ্য না হলেও, এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে সমাজকে নাড়া দেবার, আইন পাশ হলে প্রকাশ্যে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার ও এই আইন যাতে বলবৎ থাকে তার জন্য উদ্যোগী হবার গৌরব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।”[২০]

রামমোহনের হাত ধরেই যুক্তিমূলক বাংলা মৌলিক প্রবন্ধ-সাহিত্য ধারার শুভসূচনা হলেও তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যথার্থ সাহিত্যিক ও শিল্পগত দাবি পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। হৃদয়ের অনুভূতিকে উপেক্ষা করে যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি মূলত প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়কে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে কারণেই সহজাত রসপ্রেরণা ও শিল্পচেতনা তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রকাশ পায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’-এ আবেগের প্রাধান্য থাকলেও সাহিত্যরস যৎসামান্যই। তাই তাঁকে যথার্থ সাহিত্য-শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া যায় না। ড. অধীর দে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> “রামমোহনের রচনা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্য শিল্পীর পরিবর্তে তাঁহাকে প্রকৃত বির্তকমূলক প্রবন্ধ রচনার পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিহিত করা যায়।”[২১]

প্রবন্ধের ভাষা অনেকাংশেই স্বচ্ছন্দ নয়, এ বিষয়ে প্রবন্ধগুলির রচনাকালকে মাথায় রাখতে হবে তবেই আমরা ভাষা-সংক্রান্ত ত্রুটিগুলিকে অতি সহজেই উপেক্ষা করতে পারব।

Reference:

১. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলকাতা-০৯, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ১১৯
২. দে, অধীর, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা-০৭, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ২০
৩. তদেব, পৃ. ২৫
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা), রামমোহন গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮০, পৃ. ৩
৫. তদেব, পৃ. ৪
৬. তদেব, পৃ. ৫
৭. তদেব, পৃ. ১১-১২
৮. তদেব, পৃ. ১৫
৯. তদেব, পৃ. ২৪
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা-৭৩, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ১৪৮

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা), রামমোহন গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৬, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮০, পৃ. ৩৯

১২. তদেব, পৃ. ৪৪

১৩. তদেব, পৃ. ৪৫

১৪. তদেব, পৃ. ৪৫

১৫. তদেব, পৃ. ৪৬

১৬. তদেব, পৃ. ৪৭

১৭. তদেব, পৃ. ৫৩

১৮. তদেব, পৃ. ৫৬

১৯. তদেব, পৃ. ৫৮

২০. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলকাতা-০৯, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০০, পৃ.১২৯

২১. দে, অধীর, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা-০৭, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ২০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 959 - 970
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা গান : আধুনিকতা এবং তারপর

ড. সায়ক মুখার্জি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sayakmukherjee@tripurauniv.ac.in

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Bengali song, History, Modernity, Globalization, Post-Modern, Time.

Abstract
One of the most well-liked musical genres in India is Bengali music. Since the dawn of civilization, music has played a significant role in human existence. Since ancient times, Bengali songs have been an integral part of Bengali culture. The song made reference to modernity in the later 19th century. The protagonist is Rabindranath Tagore. Bengali songs have been influenced by the significant changes that have occurred both domestically and internationally, as well as the ways that historical and political events have impacted people's lives. Later, this song has transcended the current era and given rise to new commentary in the hands of different lyricists. The song's lyrics evolved together with the crisis of civil life.
It changed again because of globalization.
This fundamental study looks at how Bangla songs have evolved over time, h ow it represents modernity, and how they move from the mordenityto the post -modern era.

Discussion

বাঙালির শিল্পচর্চার অনন্য ফসল বাংলা গান। কয়েক শতকের পথ পেরিয়ে আজ আধুনিক বাংলা গান যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেই পটভূমিতে আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার এর আধুনিকতার অগ্রযাত্রার ইতিহাস। কেননা আজকের এই দ্রুত পরিবর্তমান সময়ে বাংলা গানের রূপ আর সমস্ত শিল্পের মতোই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আধুনিকতার নান্দনিক মূল্যবোধ বাংলা গানকে যেভাবে সাজিয়েছে, বর্তমানে সেই মূল্যবোধই নানান প্রশ্নের সম্মুখীন, তাই আমাদের ভাবা দরকার সেদিনের বাংলা গান কীভাবে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছিল আধুনিক। আর কেমনভাবেই তা ধারণ করেছিল সময় সময়কে।

আধুনিকতা বলতে আমরা উদারনৈতিক, মানববাদী, যুক্তিবাদ যে ধারণার কেন্দ্রে অবস্থিত সেই ভাবনাকেই বুঝতে চাইছি। এবং আমরা এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করে বাংলা আধুনিক গানের পথ চলার ইতিহাসকে একটু উল্টে-পাল্টে দেখব। উনিশ শতকের শেষাশেষি মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর হাত ধরেই বাংলা গানে লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা। মধ্যযুগের সংগীতের ধারায় লক্ষণীয় পরিবর্তনের অনুরণন শোনা যেতে শুরু করে উনিশ শতকের শুরু থেকেই। সে পরিবর্তনের কান্ডারী অবশ্যই নিধুবাবু—রামনধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)। তারপর কালী মীর্জা (১৭৫০-১৮২০), শ্রীধর কথক (১৮১৬-?)-এর হাত ধরে বাংলা গান নানান পথ অলিগলি অতিক্রম করে উনিশ শতকের

নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই হয়ে নতুন রূপ নিল। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ যার রূপকার। সংগীত নিয়ে যখন থেকে ভাবনা শুরু, সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর চারিপাশের বাংলা গানের যে চরিত্র তার মধ্যে যেমন নেই রুচি, নেই নান্দনিকতা, তেমনই নেই সমসময়। তিনি বুঝেছিলেন যে গান হবে সময়ের সাক্ষী, যেখানে থাকবে আধুনিক হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, সে গান সৃষ্টি করতে হবে তাঁকেই। তাই দেখি বাংলা গান রবীন্দ্রনাথের হাতে এক বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। কথা ও সুরের অনুপম সম্মিলনে সে গান বাঙালি হৃদয়ে তো বটেই, স্থান করে নেয় যেকোনও সংগীত রসিকের মননে। রবীন্দ্র সংগীত বাংলা গানের রাজপথ নির্মাণ করেছে এবং যেন উৎসমুখ খুলে দিয়েছে এক নির্ঝরিণীর। মূলত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাষাকেই সঙ্গী করে পরবর্তী গীতিকারেরা এলেন বিশ শতকের শুরুতেই— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। তাঁদের প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু গান রচনা নয়, তাতে সুর আরোপ করে তা পরিবেশনের মধ্যে দিয়েই বাংলা গান সমকালীন হয়ে উঠল এঁদের হাত ধরেই। তাতে কখনও কখনও ব্যক্তিগত প্রাণের প্রকাশ, কখনও বা ঈশ্বরের চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি, কখনও হাসি-হল্লা, রঙ্গ-রসিকতা, আর কখনও বিশ শতকের সময়ের স্বাক্ষর রূপে ধরা দিল দেশাত্মবোধ। জাতি গঠনের সেই সূচনালগ্নে বাংলা গান দেশপ্রেমের চারণভূমি হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে বাংলা গানকে সম্পূর্ণ নতুন পথ যিনি দেখালেন, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। কাজী নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে বাংলা গানের নতুন জোয়ার এল। শুধু সুরের বৈচিত্রই নয়, তাঁর গানের কথায় তিনি নিয়ে এলেন নতুন শব্দবন্ধের ব্যবহার। পাশ্চাত্য, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা বাংলা লোকজীবন থেকে সুর সংগ্রহ করে অথবা রাগ-রাগিনির সুরে যে নতুন গানের কাঠামো তিনি নির্মাণ করলেন, তাতে জুড়ে দিলেন সমকালীন জনরুচির সঙ্গে মানানসই ভাষা। আর তাই নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল আরেকটি সংগীত বলয়। এলেন এক ঝাঁক গীতিকার যাঁদের রচনায় সরাসরি নজরুলের প্রভাব খুব স্পষ্ট। সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৮৪), প্রণব রায় (১৯১১-১৯৭৫), মোহিনী চৌধুরী (১৯২০-১৯৮৭), শ্যামল গুপ্ত (১৯২২-২০১০) প্রমুখ এই সময়ের গীতিকারদের অন্যতম। তাঁদের গানের কেন্দ্রীয় বিষয় হল, ব্যক্তির হৃদয় আবেগ। প্রেম-বিরহের দোলায় দোলায়িত যে জীবন তাকেই তাঁরা ভাষা দিলেন তাঁদের গানে। কিন্তু সমকাল আরও বেশি কিছু দাবি করছিল। কেননা, ততদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক লক্ষণীয় বদল ঘটেছে। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করলে আমরা দেখি, স্বৈরাচার এই দশকে তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমশ গ্রাস করতে চেয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিকে। আবার এর পাশাপাশি মানুষের প্রতিবাদ, অপসহীন লড়াইয়ের সাক্ষী থেকেছে এই দশক। চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই এই পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। '৪২-এর 'ভারতছাড়ো আন্দোলন', '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ কিংবা আই. এন. এ-র সেনাদের বিচারকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতা আন্দোলন, ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগ— সব মিলিয়ে এই দশক ঘটনার ঘনঘটায় আর মানুষের প্রতিবাদে উত্তাল। কিন্তু বাংলা গান এই সময়ের কথা তেমনভাবে মূর্ত করতে পারছিল না। যদিও বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের মনে পড়ে যায় মোহিনী চৌধুরীর লেখা এই গানটি, -

"পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়,
খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।
...সবার মনের দীপালী জ্বালাতে যে দীপ আপনি জ্বলে,
কেন আর তারে ঢেকে রাখ বলো তোমার আঁচল তলে।
শোন না কি ওই আজ দিকে দিকে হায়,
কত বঁধু কাঁদে, কাঁদে কত অসহায়,
পথ ছেড়ে দাও, নয় সাথে চলো, মুছে নাও আঁখিরোল,
খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এমন আর্তি বাংলা গানে ইতস্তত শোনা গেলেও, মূল ধারায় তখনও একাধিপত্য করছে প্রেম। চাঁদ-ফুল-জোছনার গান তখনও বাংলা গানের জগত ঘিরে রেখেছে। নজরুল ইসলামের হাতেই যার বিস্তার। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি গানের ভিন্নতর আরেকটি দিক— দেশাত্মবোধক বাংলা গান। যদিও রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমরা দেশপ্রেমের গান পেয়েছি, তবু নজরুলের গানগুলি বিশ শতকের লড়াকু জনতার মনোভাবকে এক ভিন্নতর ভাষা দিয়েছিল। এবং এ কথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়, পরবর্তীকালে মানুষের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে যে গণসংগীত গড়ে উঠেছিল, কাজী নজরুলের দেশাত্মবোধক গানে তার প্রাক-প্রস্তুতির রূপটি আমরা পেয়ে যাই। তবু ত্রিশ-চল্লিশের দশকের ব্যাপক অংশের শ্রোতার কাছে যে আধুনিক বাংলা গান পরিবেশিত হচ্ছিল, রেডিও কিংবা রেকর্ডের মাধ্যমে তা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট ধরনকে অনুসরণ করেই চলেছিল যেখানে ছিল প্রেম-বিরহ-মৃত্যু নিয়ে নির্মিত কল্পলোক, মানব জীবনের একটা বিরাট অংশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কান্না-হাসির মধুর বাসর রচনার কল্পনা, এমনকী মৃত্যুর পরেও প্রেমের মধ্যে দিয়ে প্রিয় মিলনের বাসনাও শোনা গেছে।

ত্রিশ-চল্লিশের বাংলা গানের গতানুগতিক এই ধারায় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সলিল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫), যাঁর হাতে বাংলা গানের নব নির্মাণ হল। সুরেও যেমন, কথাতেও তেমনই। তাঁর আগমন বাংলা গানের জগতে এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু বিস্ময়কর নয়, যাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা গান আধুনিকতার সীমাকে অতিক্রম করে আরও নতুনতর এক পর্বে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তিনি সলিল চৌধুরী। আধুনিকতার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বাংলা গানের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে মূলত রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে তার ব্যাপ্তি আমরা পাই তাঁর বাণীতে। শুধু কথায় নয়, সুরের এক ইন্দ্রজাল যেন সলিলের সমগ্র সাংগীতিক প্রয়াসকে এক অন্য মহিমা দিয়েছে। তাঁর সাংগীতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছেন, সুযোগ পেয়েছেন বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি সুর শোনার আর সমৃদ্ধ হয়েছেন নানান গুণী মানুষের সঙ্গ করে। সব মিলিয়ে তাঁর সাংগীতিক যাত্রা জনতার প্রতিদিনকার জীবন থেকে শুরু হয়ে তাদেরই হাত ধরে পৌঁছে গেছে তাদের দৈনন্দিন লড়াইয়ের ভূমিতে। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সলিল চৌধুরীর যোগাযোগ তাঁর যৌবনে। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সহযোগিতায় তিনি গান লেখা শুরু করেন এবং গণনাট্য সংঘের সঙ্গে পরিচিত হন। এক্ষেত্রে নিত্যানন্দ চৌধুরী বা খেপুদার কথা বলেছেন তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে যাঁর বিশেষ যত্নে একটি একটি করে লড়াই আন্দোলনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে এবং সে প্রসঙ্গে গান রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। বিদ্যাধরী নদীর বন্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা বিরাট অংশের মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখরিত হয় তাঁর লেখার এই গণসংগীতটিতে, -

"দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে
কেমনে বলিব বন্ধু প্রাণের কথা তোরে।
ঘরেতে চাউল নাই পরনে পিরান নাই
অনাহারে দিবানিশি ভাসি নয়ন লোরে॥
দেশ ভেসেছে বিশ বছরের ধোঁকাবাজির ঘোরে
(আর) কাজের নামে শোষণকারী লোটে কু-কাজ ক'রে।
(তাই) নদীতে বাঁধন নাই, থেকেও না কাজ পাই
বিধির বিধান নয়কো এ ভাই বুঝবে কবে ওরে
কেমনে বলিব বন্ধু প্রাণের কথা তোরে॥
মানব না এ বিধান মানব না
অবহেলা অপমান সইব না
তোমাদের যতকিছু মারণ কাঠির ফল
ভুলব না কিছুতেই ভুলব না।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাঁচবোই বন্ধু একহাতে বাঁচব
দেশজোড়া ভাই বোন কন্যা
শোষকের সৃষ্টি-এ বন্যা।
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতিয়ার শানিয়ে
আনব নতুন দিন বাজবে প্রাণের বীণ
মিলিত মিছিলে হবে ধন্যা॥"[২]

গণনাট্য সংঘ এমন অনেক শিল্পী সাহিত্যিককে নিয়ে এসেছে মানুষের লড়াইয়ের পাশে, যাঁরা পরবর্তীকালে তাঁদের সারা জীবনের সেই সূচনাকে স্মরণ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭), নিবারণ পণ্ডিত (১৯১২-১৯৮৪), হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭), গুরুদাস পাল (১৯১৩-১৯৬৮), বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫), এবং অবশ্যই সলিল চৌধুরী। এই গণনাট্য সংঘের আদর্শ বা নীতি নির্ধারণকারি শক্তি ছিলেন বামপন্থীরা এ কথা ঠিক। কিন্তু শিল্পীদের যাঁরা অনুভূতি প্রবণ যাঁরা সমাজ সচেতন তাঁদের অনেকেই কিন্তু শেষ পর্যন্তই কিন্তু গণনাট্য সংঘের নিয়ন্ত্রণে থেকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রচারের জন্যই শিল্প করতে রাজি ছিলেন না। শুধু নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রচার নয়, তাঁদের আপত্তি ছিল নির্দিষ্ট ধরন এবং নির্দেশিকার বিরুদ্ধেও। এবং ঠিক সেই কারণে সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) এঁরা প্রত্যেকেই গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ আমরা বলছিলাম বাংলা গানের আধুনিকতার প্রসঙ্গে। এই গণনাট্য সংঘের গানগুলির দিকে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখব সেখানে মানুষের লড়াই আন্দোলন জয়-পরাজয় এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে বাংলা গানের যে ধারাটি চলছিল অর্থাৎ চাঁদ, চামেলী আর ফুল, তারার কাব্যের থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের লড়াই হয়ে উঠল গানের বিষয়। তবু এও আধুনিকতারই আরেকটি দিক, যেখানে মনে করা হয় একটি আদর্শ বা একটি নৈতিক মতবাদ আমাদের পৌঁছে দেবে বিজয়ের লক্ষ্যে বা আমাদের এগিয়ে দেবে প্রগতির পথে। ত্রিশ এবং চল্লিশের দশক গণসংগীতের মূর্ছনার কাল। যদিও রেডিও-টিভির অনুকূল্য পায়নি গণসংগীত। তবুও লড়াকু মানুষের মুখে মুখে সে গান ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের স্মরণে থাকবে ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট ১৯৪৬-কে কেন্দ্র করে সলিল চৌধুরীর সেই ইতিহাস হয়ে যাওয়া গান 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' কিংবা রংপুরের ছাত্র সম্মেলনের সময় তাঁরই লেখা 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে এই জনতা'। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সলিল চৌধুরীর কলম ডাক দিয়েছে সাধারণ হিন্দু মুসলমানকে 'ও আয়রে ও আয়রে, ও ভাইরে ও ভাইরে'। আবার তেভাগা আন্দোলনে তাঁর সহকর্মী বিনয় রায়ের গান 'অহল্যা মা' যেমন মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনই এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সলিলের লেখা গান 'হেই সামালো' গান আজও শ্রোতার মনকে উদ্দীপ্ত করে।

দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর পেরিয়ে ১৯৪৭-এ সালে স্বাধীনতা নিয়ে এলো দেশভাগ। দু-টুকরো হয়ে গেল ভারতবর্ষ। জন্ম নিল এক নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির। লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশান্তর আর নেতাদের চরম অপদার্থতা পরিস্থিতিকে আরো দুর্বহ করে তুলল। বাংলা গানের ভাষাতে তার ছাপ একেবারে যে নেই তা নয়। বরং বাঙালির গানে এ ঘটনার গভীরতর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এই সময় থেকেই আধুনিক সভ্যতার প্রতি যে আস্থা, তা ক্ষুন্ন হচ্ছিল সচেতন শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে। যে কারণে পঞ্চাশের দশকে নাগরিক বিষণ্ণতার ছবি পাই আমরা বেশ কিছু গানে। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগের মতো বড়ো বড়ো ঘটনা মানুষের ভেতর থেকে সভ্যতার প্রতি আস্থার ভিত যেন নাড়িয়ে দিচ্ছিল। নাগরিক প্রগতির মোহে মানুষের অনাস্থা এ সময়ে প্রতীয়মান হয় অমিয় দাশগুপ্তের লেখা এই গানটিতে, -

"নগর জীবন ছবির মত হয়তো
তবু, ভাবলেই চোখে বন্যা আসে নেমে,
এখানে হৃদয় বাঁধবে না কেউ শকুন্তলার প্রেমে।।"[৩]

বিলাসব্যসন আর পরিপূর্ণতায় ভরা যে জীবন সেখানে তখন হানা দিচ্ছে দুঃসময়, লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্বাস্তু জনগণের হাহাকার। নগরের পথে পথে তখন 'ফ্যান দাও' ফ্যান দাও' চিৎকার। সেখানে প্রেম তো বিলাসিতা। এ সময়ের গীতিকারদের লেখণিতে পাই সেই বিপন্নতার চিত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি, সলিল চৌধুরীর কাছে ধরা দেয় নতুন রূপে। যে কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ কবিকে মুগ্ধ করেছিল, তাকেই পঞ্চাশের দশকে সলিল চৌধুরী দেখলেন ময়নাপাড়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িত একটি মেয়ে হিসেবে।

"হয়তো তারে দেখেনি কেউ
কিম্বা দেখে ছিল,
ছিন্নশত আঁচল ঢেকে জীর্ণ দেহখানি
ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে
কি জানি কি ঝড়ে,
গেছে বুঝি ঝরে
জীবনের তরু থেকে—
...সেই মেয়ে।
দুটি শীর্ণ বাহু তুলে,
ওসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে;
অন্ন মেগে মেগে ফেরে প্রাসাদ পানে চেয়ে।
কে জানে হায় কোথায় বা ঘর
কি নাম কালো মেয়ের।"[৪]

বর্ষা বাঙালির বড়ো প্রিয়। কত গান, কত কবিতার অবিরাম সৃষ্টি হয়েছে এই ঋতুকে ঘিরে। কিন্তু জীর্ণ পথবাসী মানুষের জীবনে সেই বর্ষাই দেখা দেয় বিভীষিকা রূপে। অরুণ বসু (১৯৩৩-২০১৬), ভাস্কর বসু ছদ্মনামে যিনি বেশ কিছু স্মরণীয় বাংলা গান লিখেছেন, তাঁর একটি গানে দেখছি বর্ষার এক অন্যরূপ —

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান,
সেই বানের জলে ভাসলো পুকুর ভাসলো গোলার ধান।।
আকাশ ভেঙে নামল ধারা বর্ষা সর্বনাশা,
ভেসে গেল মাঝ দরিয়ায় আমার ভাঙা বাসা।
ফসল বোনা জমি গেল চাষার গেল ধান
হায় আগুন-নেভা উনুনে দিন হবে কি গুজরান?"[৫]

আধুনিকতার অন্যতম অবদান ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিগত প্রগতির ধারণা। সেই সমষ্টির চেতনাই মূর্ত হয়েছে গণসংগীতে কিংবা দেশাত্মবোধক গানে বা আধুনিক বাংলা গানের একটা বিরাট পর্যায়ে জুড়ে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী সময় থেকে সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ বাংলা গানের কথায় আরও স্পষ্ট হতে শুরু করে। যা সমষ্টির কাছে সত্য, তা ব্যক্তির সংকটকে তেমনভাবে প্রতীয়মান করছে না। বিপন্নতা বাড়ছে। পঞ্চাশের কবিদের কবিতায় সেই বিপন্নতার ছবি জীবনানন্দ যেমন বলেন, -

"সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?"[৬]

তখন বাংলা কবিতায় শুরু হয়ে গেছে নতুন যুগ। সেই সময় কবিতার রাজপথ শাসন করতেন যাঁরা, অর্থাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) — এঁরা খুঁজছেন কাব্য ভাষা। খুঁজে দেখছেন নতুন কিছু বলা যায় কিনা, কীভাবে বলা যায়। তাঁদের উপরে প্রভাব ফেলছেন পল রোবসন (১৮৯৮-১৯৭৬), হ্যারি বেলাফন্টে (১৯২৭-২০২৩) এবং অবশ্যই অ্যালেন গিন্সবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭)। আধুনিক কবিরা যত তাড়াতাড়ি নিজেদের ভাষাকে খুঁজে পেতে শুরু করলেন তত তাড়াতাড়ি আধুনিক বাংলা গান নিজের ভাষাকে ধরতে পারেনি। তার জন্য আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। যদিও পঞ্চাশের দশক থেকেই তার একটা সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। এই সময়ের অন্যতম গীতিকার ও সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত (১৯২৯-১৯৮২)-এর বেশ কিছু গান নিশ্চয়ই শ্রোতাদের স্মৃতিতে রয়েছে। শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৯৮৭)-এর কণ্ঠে একটি গানে দেশ গড়ার কথা আবার নতুন করে শোনা গেল।

“নীল আকাশের ওই কোলে
কান্না হাসির ঢেউ তুলে
...এ দেশ মোদের আয় গড়ি
আলোয় আকাশ আয় ভরি
প্রাণের বীণায় সুর ধরি সাধের সাধনায়।”[৭]

দেশ গড়ার কথা। তাঁর আরও একটি গানে সুবীর সেনের কণ্ঠে শুনি নতুন দিনের আহ্বান।

“ঐ উজ্জ্বল দিন, ডাকে স্বপ্ন রঙিন
ছুটে আয় রে লগন বয়ে যায় রে মিলন বিন,
ওই তো তুলেছে তান
শোনো ওই আহ্বান।”[৮]

ব্যক্তির এই সংকট বাংলা গানের কথায় আস্তে আস্তে জায়গা করে নিচ্ছে। আমরা দেখি ষাটের দশক আসতে আসতে অনেক বদল ঘটে যাচ্ছে বিশ্ব পরিস্থিতির। সেই পাল্টানোর সময়ে বাংলা গান নতুন মোড় নিচ্ছে। এই ষাটের দশকের গোটা বিশ্বের ইতিহাসকে একটু দেখে নেয়া যাক —

এ দশকের একেবারে শুরুতেই শোনা যাচ্ছে যুদ্ধের আওয়াজ, শোনা যাচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা। আর ঠিক সেই সময়ই প্রকাশিত হচ্ছে মিশেল ফুকো ১৯২৬-১৯৮৪)-র চিন্তাধারা। Madness and Civilization (১৯৬১), The Birth of the Clinic (১৯৬৩)-এর মতো বইগুলি আমাদের এতদিনকার ধারণাকে বদলে দিচ্ছে। তিনি বলছেন যে, আসলে মুক্তি বলে কিছু হয় না। একটি পরিস্থিতি থেকে আরেকটি পরিস্থিতিতে যাওয়াটাই হল সত্য। প্রতিটি পরিস্থিতিতেই থেকে যায় ক্ষমতা। আর, “Where there is power, there is resistance”[৯]। ষাটের দশকের প্রজন্ম এই বইগুলি পড়ছে। তার সঙ্গে তারা দেখছে ’৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙছে, ফ্রান্সের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল হয়ে উঠছে ছাত্র আন্দোলনে, ভিয়েতনাম লড়াই দিচ্ছে বিরাট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে। এই সময়েই ইউরোপ এবং এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টকে হত্যা করা হচ্ছে। আবার এই ষাটের দশকেই কমিউনিস্ট দেশগুলি আরেক কমিউনিস্ট দেশকে আক্রমণ করছে। ’৬৮-তে মার্টিন লুথার কিং মানবতার পূজারীকে হত্যা করা হচ্ছে। ঘটনা বহুল এই ষাটের দশক। এ দশকে যাঁরা কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে পা বাড়াচ্ছেন তাঁদেরই মধ্যে কয়েকজন নব্বইয়ের দশকে আমাদের যে গান শোনালেন তাঁদের গানে এ দশকের কথা শুনতে পাব এভাবে, -

“সঙ্গী ছিল আমার একটা গিটার ছেলেবেলায়
সঙ্গী একটা ইচ্ছে হলে হঠাৎ গান গেয়ে ফেলায়
...সঙ্গী ছিল ‘ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড’ খনা খনা গলায়
সঙ্গী উত্তাল সরবন বড়ো হবার পালায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঙ্গী হল সি.আর.পি.-র গুলির শব্দ রাত-দুপুরে
সঙ্গী নিষিদ্ধ বই লুকিয়ে রাখা আমার খাটের তলায়
সঙ্গী হল নাপাম বোমার ছবি সাদা কালো
সেই সঙ্গী নকশাল সঙ্গী যাকে পালিয়ে যেতে হল
বসন্তের মানে ছিল ঋতু হয়ে গেল মহামারী
সেই চুয়াত্তরের বসন্ততে পনেরো হাজার মরে গেল
সঙ্গী একটা ভয় আমার পাড়ায় দাঙ্গা লাগার পরে
সঙ্গী আটকে থাকা সেই ভয় নিয়ে বাড়ির ভেতরে।"[১০]

এই যে জীবনের কথা, এই প্রেক্ষিতগুলি ধীরে ধীরে সত্য হয়ে যাচ্ছে ষাটের দশক থেকে। যে দার্শনিক অবলোকনগুলির কথা বলা হল, তার পাশাপাশি আমরা সত্তরের দশকের গোড়াতেই পেয়ে যাচ্ছি গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭)-কে। গ্রামসির রচনাগুলি এই সময় ইংরেজিতে অনুদিত হওয়া শুরু করল। আর তিনি দেখালেন যে, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও তো 'সাবলটার্ন'-রা থাকে, শোষণ থাকে, হেজিমনি আর 'সাবলর্টান'-এর দ্বন্দ্ব থাকে। এই সত্তরের দশক থেকেই গুরুত্ব পাচ্ছে অনু ইতিহাস বা 'Micro History'। প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি মানুষের প্রেক্ষিত, প্রতিটি অবস্থা যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আর কোন বৈশ্বিক সত্য নেই, নেই কোনও বিশেষ মতবাদ, যেখানে এমন কিছু নেই যা আমাদের হাতে ধরে এগিয়ে দেবে, মুক্তির পথ নির্মাণ করে দেবে। তাই যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে এসময়ের আর একজন অসম্ভব প্রতিভাবান গীতিকার জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৭) লিখলেন এই গানটি —

"বন্ধু যদি আসো আগুন জ্বেলেই এসো
এখানে কিছু পোড়াতে হবে।
বন্ধু যদি আসো কিছু চৈত্র নিয়েই এসো
মিথ্যে ফাগুন ঝরাতে হবে।"[১১]

এই অস্থির মুহূর্তের কথাই বলে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মহীনের ঘোড়াগুলি।

"এই মুহূর্তে
তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে মন্বন্তর বাড়ে এই মুহূর্তে,
খরা আর বন্যা শিশুদের কান্না এই মুহূর্তে,
জীবনধারণে গ্লানি শুধু মিছে হয়রানি এই মুহূর্তে,
বুকের গভীর ক্ষত ছড়িয়ে ইতস্ততঃ এই মুহূর্তে।"[১২]

লক্ষ করবেন বারবার এই মুহূর্তে কথাটি আসছে। আসলে, সময়টাকে ধরতে চাইছেন গীতিকার। আবার এই গানেই বর্তমান সময়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অন্ততঃ কিছু একটা করার কথাও বলেন তিনি– 'এ বিশ্বরূপ দেখে চুপ করে থাকি যদি, আমি নেহাতই বেহায়া'। মহীনের ঘোড়াগুলির গৌতম চট্টোপাধ্যায়রা যে কথা বলতে চাইলেন তাঁদের গানে, সে গান আমাদের ষাটের দশকের কলকাতার কথা শুধু বলে না। বলে, গোটা বিশ্ব পরিস্থিতির কথা। প্রশ্ন তোলে করে প্রজন্মকে। খুঁজতে চায় অন্ধকারের থেকে মুক্তির উপায়, মুক্তির পথ। কিন্তু সেই ষাটের দশকের ধোঁয়াশায় মুক্তি তো অধরা। তবু, মহীনের ঘোড়াগুলি ডাক দিয়ে যায়।

"ওই দূরে ঝর্ণার পাড়ে
...ওগো আগুন মেয়ে তুমিও চল না সাথে আমার প্রিয় মন এসো অলস নীড় ফেলে
ওগো ফাগুন ছেলে নতুন পাতার দিনে ফিরে এসো এই গাঁয়ে দুখী দিন ফেলে

ওগো আগুন মেয়ে তুমিও চল না সাথে আমার প্রিয় মন এসো অলস নীড় ফেলে
ওগো ফাগুন ছেলে নতুন পাতার দিনে ফিরে এসো এই গাঁয়ে দুখী দিন ফেলে।"[১৩]

গৌতম চট্টোপাধ্যায়রা শুধু গানের কথাই নয়, গানের পরিবেশনেও একটা নতুন ভাষ্য রচনা করলেন। আমরা বলব আধুনিকতা থেকে উত্তরণের পথ তাঁরা নির্মাণ করলেন। বাংলা গানকে পৌঁছে দিলেন পরবর্তী স্তরে, যেখানে তাঁরা তাঁদের সহ-নাগরিকদের বিমূঢ়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন এইভাবে, -

"শুধু আজ নয় প্রতিদিন
সাত পাঁচ ভাবনা আর দুঃস্বপ্ন মেখে ঘুম ভাঙে আমার
তোমরা কেমন আছো?
তোমরা কি আমলকি গাছের ছায়ায় মোষের বিষণ্ণ ডাক শুনে
আনমনা হও আগেকার মতো?"[১৪]

এই যে মানবতার অসম্ভব অবক্ষয়ের সময়, সে সময় বাংলা গান কী করবে? কী করবেন বাংলা গীতিকাররা? তাঁরা তখন চাঁদ-তারা-পাখি নিয়ে মত্ত থাকতে পারেননি। মহীনের ঘোড়াগুলি যে দশকে গান-বাজনা করছে সেই সত্তরের দশক স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কাল। সমাজ বদলের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত অবস্থার ছবি তাই তাঁদের গানে।

"যে গেছে বনমাঝে চৈত্র বিকেলে
যে গেছে ছায়াপ্রাণ বনবীথিতলে,
যে গেছে ছায়াপ্রাণ বনবীথিতলে।

বন জানে অভিমানে গেছে সে অবহেলে
যে গেছে অশ্রুময়, বন-অন্তরালে
যে গেছে অশ্রুময়, বন-অন্তরালে।

আকাশে কেঁপেছে বাঁশিসুর
আঁচলে উড়েছে ময়ূর
চলে যাই, বলেছিলে চলে যাই
মহুল তরুর বাহু ছুঁয়ে
যে গেছে অশ্রুময়, বন-অন্তরালে

সে বুঝি শুয়ে আছে চৈত্রের হলুদ বিকেলে
সেখানে চূর্ণ ফুল ঝরে তার আঁচলে
সেখানে চূর্ণফুল ঝরে তার কাফনে।"[১৫]

এই যে স্বপ্ন, এটি বাংলা ভাষায়, বাংলা গানের একদম নতুন। এই স্বপ্ন যে প্রজন্মকে সৃষ্টি করল সেই প্রজন্মই পরবর্তীকালে নতুন রাজনীতির কথা নতুন ভাবে বলবার চেষ্টা করেছে। যার অন্যতম উদাহরণ আশির দশকের নগর ফিলোমেল নামক গানের দলটি। যাঁদের গানে পাই নাগরিক বিষণ্ণতার অন্য এক ছবি।

"পড়ন্ত আলোর ছটায় নেশা মন যেতে চায়
বিজনের চায়ের কেবিন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বসি গিয়ে জনা তিন, পায়াভাঙা উদাসীন
কয়েকটা চেয়ার টেবিল।

ধোঁয়া কালি রঙ চটা, একফালি দীর্ণতা
তবু যেন বিলাসিতা, রাজকীয় মত্ততা
গুঞ্জনে রাজ্যমুখর
আলোহীন চায়ের কেবিন।

কখনও বা দিন জুড়ে ব্যস্ত নগরে
ঝঞ্ঝাটে স্তব্ধ জীবন
পড়ে থাকে একা হায়, জনহীন দোকানে
বিষণ্ণ মালিক বিজন
বাকি প্রতি বিকেলে চামচে আওয়াজ তোলে
দেনাভারে শীর্ণ বিজন।

উষ্ণ চায়ের কাপে নেশাতুর রাত নামে
বয়ে চলে তরল জীবন
চলে এসো একদিন, দেখা হবে সেখানেই
বিজনের চায়ের কেবিন।”[১৬]

সত্তর পরবর্তী সময় ব্যক্তি মানুষের সংকট তীব্রতর হল। প্রাত্যহিক জীবনের স্বপ্নহীনতাকে আরও অমোঘ করে তুলল রাজনৈতিক বিপর্জয়। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল বিশ্বায়নের পদধ্বনি। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষ রূপান্তরিত হল পণ্যে। এ সময়েই আমরা শুনতে পেলাম একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠ।

“দেখছি শহর তলিয়ে যাচ্ছে
নোংরা আমায় ভয় দেখাচ্ছে
সগ্রি এঁটোর পাহাড় কলকাতা।”[১৭]

নব্বইয়ের দশকে কবীর সুমনের আবির্ভাব কিন্তু নিছকই আকস্মিক নয়। আমরা চমকে গিয়েছি হয়ত। কারণ আমরা তো বাংলা গানের ইতিহাস চর্চায় তেমন উৎসাহী নই। এ দশকেই যখন বিশ্বায়ন আমাদেরকে ঘিরে ধরছে, আমাদের পাল্টে দিচ্ছে ধীরে ধীরে তখন তিনি লক্ষ করছেন এই কলকাতার মধ্যেই, -

“নাভির নীচে শাড়ি ইটের নীচে ঘাস
সংস্কৃতির নীচে পড়ে
নব বধূর লাশ।

এই কলকাতা তাঁর কাছে তার যাবতীয় অসম্পূর্ণতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও সুমন বলেন, -

তিনশ বছর হাঁটলে তুমি
আমার গানের জন্মভূমি
গান ধরেছি তোমার নামে কলকাতা।”[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই কলকাতাতেই সত্তর দশকের প্রথমদিকের কোনও এক সকালে রেওয়াজ করে বাইরে এসে হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর বাড়ির পাশের নালায় ভেসে চলা ছুরিবিদ্ধ একটি লাশ। কবীর সুমনের হাতে বাংলা গানের আর এক পর্বান্তর—ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে তিনি যে সংগীত নির্মাণ করেন তাতে যেমন মূর্ত করে তোলেন তাঁর সময়ের সত্যকে তেমনই তাঁর উত্তর প্রজন্মের চিন্তায় বুনে দেন কিছু শাশ্বত স্বপ্ন। যেখানে একজন কবি শিল্পী তাঁর পরিস্থিতির বিপরীতে একক লড়াই লড়ে যান এবং সেই অসম লড়াইয়ে জয়ী হবার বিশ্বাস রাখেন। কবীর সুমনের গানের ভাষায় উত্তরাধুনিক প্রজন্মের ব্যক্তি মানুষের টুকরো টুকরো আশা উঁকি দিয়ে যায়। গানের কাছে তাঁর প্রত্যাশা, -

"গান তুমি হও গরম কালের সন্ধে বেলার হাওয়া
অনেক পুড়ে যাওয়ার পরে খানিক বেঁচে যাওয়া।
গান তুমি হও বিশ্রী গরম ভুলিয়ে দেয়া বৃষ্টি
সজীবতার ভরসা দেয়া সফল অনাসৃষ্টি।"[১৯]

একবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির নিজস্ব প্রেক্ষিতগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই গান তৈরি হবে। একথা কবীর সুমনের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। যেমন হয়নি তাঁর প্রজন্মেরই আর একজন গীতিকার, গায়ক অঞ্জন দত্তের। কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর গানগুলিতেও প্রধান হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ। ছোট্ট জানলায় ধরা দেয় গোটা পৃথিবী।

"সেই পৃথিবীতে বাঁচব বলেই যুদ্ধ করি রোজ।
একটুখানি বাঁচার জন্য হাজার আপোষ।
সেই পৃথিবীর নাম কলকাতা কি ভারত জানি না,
তুমি তোমার পৃথিবীর নামটা জানো কি?
তুমি বলবে আমার বেনিয়াপুঁকুর, তোমার বেহালা।
তুমি গন্ডি কেটে দেখিয়ে দেবে পশ্চিম বাংলা।
হয়ত কেরালার আকাশ আরেকটু বেশি নীল,
তবু সেটাও কি নয় আমার পৃথিবী?

আমার জানলা দিয়ে যায় না দেখা ইসলামবাদ।
শুধু দেখি আমি রোজ আমার পাশের বাড়ির ছাদ।
একটা হলদে শাড়ি শুকোচ্ছে আজ মোজার রংটা নীল,
আজ পৃথিবীটা বড্ডোই রঙিন।"[২০]

কলকাতার পড়ন্ত বিকেলে ফুটপাথের কলের জলে স্নানরত একটি কিশোর হয়ে ওঠে অঞ্জন দত্তের গানের বিষয়। এমন অনেক সাধারণ বা অতি সাধারণ ব্যক্তি, বিষয় তাঁর কাছে গুরুত্ব পায় যা থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁদের মতন শিল্পীরা আসলে খুঁজতে চান সত্যের ভিন্নতর ব্যাখ্যা। সাধারণভাবে মুরগি কথাটার সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে খাবারের প্রসঙ্গ। বহু মানুষের খাদ্য তালিকার অপরিহার্য একটি উপাদান এটি। কিন্তু দশ বছরের একটি শিশু যাকে এই সমাজ বাধ্য করেছে কোনও এক মাংসের দোকানে মুরগির পালক ছাড়াবার পেশা বেছে নিতে, তার কাছে 'আটতিরিশটা পাখি মানে ন টাকা পঞ্চাশ'। কেননা, 'চারটে মুরগি ছাড়লে একটা টাকার নোট'।[২১] কারও কাছে হয়ত লড়াই, প্রতিবাদ এই সমস্ত কিছুই চরম সত্য। কিন্তু অঞ্জন বলেন, -

"সুদিন আসবে বলে মোরা আগুন জ্বালাই,
আর হাজার হাজার মানুষ মরে যায়।"[২২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা গানের আধুনিকতার পরবর্তী পর্যায়টি এখনও বহমান। এই পর্বে গানের বাণী কীভাবে সময়ের সত্যকে উপস্থাপিত করবে তার নানান পরীক্ষা চলেছে। বহু গীতিকার তাঁদের মতো করে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন আজও। কিন্তু, চিরাচরিত আধুনিক ধারণাগুলি যখন একের পর এক ভেঙে পড়ে, যখন সত্য হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক, তখন অর্থাৎ উত্তরাধুনিক সময়ে বাংলা গানকে খুঁজে পেতেই হবে সমকালের বাণী। নির্মান করতে হবে এক ভিন্নতর ভাষ্য।

Reference:

১. পৃথিবী আমারে চায়। কথা – মোহিনী চৌধুরী, সুর – কমল দাশগুপ্ত
https://youtu.be/2rfV4HNsizE?si=7bFJDvDjspA2gYXi
২. চৌধুরী, সবিতা, অন্তরা চৌধুরী, রণবীর নিয়োগী (সং. ও সম্পা.), ‘সলিল চৌধুরী রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ৯০-৯১
৩. সেন, অরুণ, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ‘চার দশকের বাংলা গান’, কলকাতা, প্রকাশ ভারতী, মে ১৯৬০, পৃ. ১৮৯
৪. নন্দী, সুব্রত (সম্পা.), ‘গণসংগীত সংগ্রহ’, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১৫৩
৫. সেন, অরুণ, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭
৬. বোধ, জীবনানন্দ দাশ, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা, নাভানা, ১৯৫৪, পৃ. ২০
৭. সুধীন দাশগুপ্ত, নীল আকাশের ওই কোলে।
https://www.milansagar.com/kobi/sudhin_dasgupta/kobi-sudhindasgupta_kobita3.html
৮. সুবীর সেন, ওই উজ্জ্বল দিন। https://youtu.be/KqWOHLzPys0?si=wqVqMOhc2si42lR9
৯. Foucault, Michel, The History of Sexuality, Volume I: An Introduction, Tr. Robert Hurley, Pantheon Books, New York, P. 95
১০. অঞ্জন দত্ত, সঙ্গী। https://youtu.be/JQTEaqKJivM?si=Fe-j_y02s8GhbKAE
১১. জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বন্ধু যদি আসো। https://youtu.be/shxDuHeU3CA?si=iyu9yitre0tLtjxt
১২. গান - এই মূহুর্তে কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায়,
https://youtu.be/wQ6LkkoR46c?si=0UMFcKsZbRyitYQ6
১৩. ওই দূরে ঝর্ণার পাড়ে https://youtu.be/bgTAJBUyReE?si=fiovpYz_TqZk2NmN
১৪. শুধু আজ নয় প্রতিদিন https://youtu.be/a1Yf6t47VFo?si=o4uys0Ono9AYb4Qg
১৫. যে গেছে বনমাঝে চৈত্র বিকেলে https://youtu.be/XbBtIx6V8FI?si=oZElth7iD2ysjALH
১৬. বিজনের চায়ের কেবিন https://youtu.be/qAidGOqV2NM?si=HYQdA1ZsTo3Ilu6X
১৭. https://youtu.be/w-8UXaF4rjA?si=3A2duhlBRuY6ng1b
১৮. তিন শতকের শহর কবীর সুমন - https://youtu.be/oLUv_G7QZ_8?si=ozTGS4FHvQHNewAW
১৯. গান তুমি হও — কবীর সুমন https://youtu.be/gG2kyO1wTYg?si=G3JigAz-gKxXcKQ5
২০. আমার জানলা দিয়ে — অঞ্জন দত্ত https://youtu.be/FUIhZEI0ANo?si=SKx4UWidMNbwa0Oj
২১. আলিবাবা — অঞ্জন দত্ত https://youtu.be/1ijPgW_f2yk?si=E6odTx_F5W4OEEfa
২২. তুমি আসবে বলে — অঞ্জন দত্ত https://youtu.be/ROecNzXof6Q?si=7ODl-OoE89Qv9y9N

Bibliography:

অরুণ সেন, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ‘চার দশকের বাংলা গান’, কলকাতা, প্রকাশ ভারতী, মে ১৯৬০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সংগীতচিন্তা’, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯
রাজ্যেশ্বর মিত্র, ‘বাংলার গীতিকার’, কলকাতা, মিত্রালয়, ১৩৬৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সবিতা চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী, রণবীর নিয়োগী (সং. ও সম্পা.), 'সলিল চৌধুরী রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং

সুধীর চক্রবর্তী, 'গান হতে গানে', কলকাতা, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০০০

সুব্রত নন্দী (সম্পা.), 'গণসংগীত সংগ্রহ', কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 971 - 977
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ভিটগেনস্টাইনের দর্শনে 'জগত'

ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার
রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ও
রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক
দর্শন বিভাগ, মেমারি কলেজ, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : indrojyotikarmakar@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Possible World, Unique, Atomic Fact, Reality, Object.

Abstract
Wittgenstein is a famous philosopher of language. Philosophers of language believed that people talk about the world and worldly objects through the use of language, so the only way to know the structure of thought or experience related to the world and worldly objects is to know the structure of language. And the way to know this structure of language is to analyze language. Language analysis is possible only through the inherent logic of language. This logic of language is inherent in the nature of language. Therefore, to understand the logic of language, one must understand the nature of language. According to Wittgenstein, it is possible to describe the world only through language, so to understand language, one must understand the nature of the world. In this context, Wittgenstein explained the nature of the world in his book 'Tractetus: Logico Philosophicus'. 'World is the totality of facts, not of things.' - Based on this principle, an attempt will be made to have a complete discussion about the world in this series.

Discussion

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের সময়কালটি এবং বিংশ শতাব্দী সূচনার সময়কালটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সময় পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে দার্শনিক আলোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। কেন না, তৎকালীন কিছু দার্শনিক ভাষার কাঠামোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগতের কাঠামোকে অনুধাবনের চেষ্টায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, মানুষ ভাষার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই জগত এবং জাগতিক বস্তু সম্পর্কে কথা বলে থাকে, তাই জগত এবং জাগতিক বস্তু সম্পর্কিত চিন্তা বা অভিজ্ঞতার কাঠামোকে জানার একমাত্র উপায় ভাষার কাঠামোকে জানা। তাঁদের মতে, ভাষার কাঠামোকে জানার উপায় হল ভাষার বিশ্লেষণ। ভাষার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার কাঠামো এবং ভাষার কাঠামোর মধ্য দিয়ে জগতের কাঠামোকে অনুধাবন করা হয়ে থাকে। কারণ, জগতকে ব্যাখ্যা করার একমাত্র মাধ্যম হল ভাষা। এই

সময়কালের ভাষা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনাই ভাষা দর্শন নামে পরিচিত হয়েছে। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রেগে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ম্যুর ও রাসেলের হাত ধরেই এইরূপ দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে তাদের যথার্থ উত্তরসূরী রূপে ভিটগেনস্টাইনের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি ভাষা দর্শনে এক অন্যমাত্রা প্রদান করেন। তবে তিনি দর্শন শাস্ত্রকে কেবল একটি তত্ত্ব হিসাবে দেখেননি, তিনি তাঁর ট্রাকটেটাস নামক গ্রন্থে দাবি করেন যে, 'দর্শনশাস্ত্র কোন তত্ত্ব নয়, এটি এক প্রকার ক্রিয়া, আমাদের অস্বচ্ছ ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করার ক্রিয়া'।[১] ভাষাদর্শনের পদানুসরণ করেই তিনি দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, -

> "the method of formulating these problems rests on the misunderstanding of the logic of our language."[২]

এর থেকে এ কথা বলা যায় যে, ভাষার যুক্তিকে ভুল বোঝার থেকেই দার্শনিক সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভাষার যুক্তিকে বোঝার মধ্য দিয়েই দর্শনিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যেতে পারে। ভাষার এই যুক্তি নিহিত আছে ভাষার স্বরূপের মধ্যে। তাই ভাষার যুক্তিকে বুঝতে হলে ভাষার স্বরূপকে বুঝতে হবে। ভিটগেনস্টাইনের মতে, ভাষার মাধ্যমেই জগতের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। তার মতে, এই ভাষা ও জগতের মধ্যে একপ্রকার অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকায় ভাষার স্বরূপকে ধরতে হলে জগতের স্বরূপকেও বুঝতে হবে। তাই, জগত বলতে ভিটগেনস্টাইন ঠিক কি বুঝিয়েছেন — সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হবে।

ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে জগতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, -

> "World is the totality of facts, not of things."[৩]

তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তব জগতে বস্তু নেই, কেবল ব্যাপারই আছে। বস্তুত, বাস্তব জগতে ব্যাপার যেমন আছে, তেমনি বস্তুও আছে। তাই জগত সম্পর্কিত এই সূত্রের মূল অভিপ্রায় বুঝতে হবে এভাবে যে — জগতের (বাস্তব জগতের) যথোপযুক্ত বা অনুপম বর্ণনা দেওয়া সম্ভব ব্যাপারসমূহের সমন্বয়রূপে, বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপে নয়। এরূপ বক্তব্যের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা যায় —

ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে দুধরনের জগতের কথা উল্লেখ করেছেন – বাস্তব জগত (Actual or Real World) ও সম্ভাব্য জগত (Possible World)। যে জগতে আমরা অবস্থান করি অর্থাৎ যা আমাদের সম্মুখে বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই বাস্তব জগত। অপরদিকে, বাস্তব জগত অতিরিক্ত যে জগত, তাই সম্ভাব্য জগত। এরূপ দুটি জগতের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে ভিটগেনস্টাইনের জগতের বর্ণনা সম্পর্কিত ব্যাখ্যাকে বুঝতে হবে। তাঁর মতে, কোন একটি বিষয় সম্পর্কে যখন আমরা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করি, তখন সেই বর্ণনায় সঠিক হওয়ার দাবি থাকতে হবে অর্থাৎ বর্ণনাটিকে যথার্থ হতে হবে। তাঁর মতে, একটি বর্ণনা যথার্থ হবে তখনই, যখন তা 'একক' (unique) হবে। 'একক' এই অর্থে যে, যা উল্লেখের মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ বিষয়েরই বর্ণনা দেওয়া হয় এবং যার উল্লেখের দ্বারা অন্য কোন বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় না। এরূপ একক বর্ণনাকেই যথার্থ বর্ণনা বলা হয়। সহজ ভাষায়, কোন বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তা কেবল যদি যে বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ের প্রতিই প্রযোজ্য হয়, অন্য কোন ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সেই বর্ণনাকেই যথার্থ বর্ণনা বলা হয়। এই অর্থে জগতকে কেবল বস্তুসমূহের সমষ্টি বলা হলে বাস্তব জগতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে না। যেহেতু বাস্তব জগত যে বস্তুগুলি দ্বারা গঠিত, সেই একই বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত সম্ভাব্য আরও অনেক জগতের কল্পনা করা যায় তাই যে বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপে বাস্তব জগতের বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সেই একই বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপেই সম্ভাব্য জগতের বর্ণনাও করতে হয়। সেক্ষেত্রে বাস্তব জগতের বর্ণনাটি বাস্তব জগতকে ছাড়িয়ে সম্ভাব্য জগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি যে, কোন বর্ণনা তখনই যথার্থ হয় যখন সেই বর্ণনা এককভাবে কেবল একটি বিষয়েরই বর্ণনা করে থাকে। তাই জগতকে বস্তুসমূহের সমষ্টি বললে বাস্তব জগতের বর্ণনাকে যথার্থ বর্ণনা বলা যায় না। জগতের বর্ণনা প্রসঙ্গটি ছেড়েও যদি আমরা কেবল একটি সামান্য বাগানের বর্ণনা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হই তাহলেও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ধরা যাক, একটি ছোট

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাগানে দুটি আম গাছ, চারটি পেয়ারা গাছ, বারোটি ফুল গাছ, একটি জলের কল, একটি পাইপ, একটি প্রবেশদ্বার ও তিনটি দেওয়াল আছে। ওই বাগানটির বর্ণনারূপে কখনোই এই বর্ণণাটি যথোপযুক্ত নয়। কেননা, উক্তক্ষেত্রে বাগানে অবস্থিত বিষয়গুলির একটি তালিকা পাওয়া গেলেও বাগানে অবস্থিত বস্তুসমূহের কোন পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা জানতে পারি না। সুতরাং স্থানগতভাবে বস্তুগুলি বাগানে অবস্থিত, তা জানতে পারলেও জলের কলটি প্রবেশদ্বারের বাঁদিকে আছে না ডানদিকে আছে, পেয়ারা গাছগুলি সারিবদ্ধভাবে আছে নাকি জোড়ায় জোড়ায় আছে নাকি একটি একটি করে পৃথকভাবে আছে, ফুলগাছগুলির আমগাছগুলির সামনে আছে না পেছনে আছে ইত্যাদি পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা এক্ষেত্রে বলা হয়নি। অতএব বাগানটির বর্ণনা করতে হলে কেবল একটি বস্তুসমূহের তালিকা দিলেই হবে না, বস্তুসমূহের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা সম্মিলিতভাবে বলতে হবে; তবেই ওই বর্ণনাটি যথার্থ বর্ণনা রূপে চিহ্নিত হবে। কেননা, জগতে সম্ভাব্য এমন অনেক বাগানই থাকতে পারে, যেখানে ওই একই বস্তুর সমাহার থাকতে পারে; কিন্তু প্রতিটি বাগানে একই বস্তু সমাহার থাকলেও বস্তুর সম্বন্ধের বিন্যাস একই রকম হয় না। যার ফলে প্রতিটি বাগান পৃথক পৃথক যথার্থ বর্ণনা রূপে গৃহীত হবে। একইভাবে জগতের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। জগতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যদি কেবল একটি বৃহৎ বস্তুসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়, তাহলে তা বাস্তব জগতের যথার্থ বর্ণনা হবে না। কেননা, সম্ভাব্য এমন অনেক জগতই কল্পনা করা যেতে পারে; যে জগতে একই বস্তুসমূহের সমাহার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে জগতের বর্ণনাটিকে যথার্থ বর্ণনা বলা যাবে না। কিন্তু জগতের বস্তুসমূহের সম্বন্ধের সমন্বয় অর্থাৎ ব্যাপারের সমন্বয়কে জগতের বর্ণনারূপে ব্যাখ্যা করলে জগতের বর্ণনাটি 'একক' বর্ণনা হয়ে উঠবে অর্থাৎ যথার্থ বর্ণনা হয়ে উঠবে।

আরও একটি যুক্তির সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যায় এভাবে, কোন একটি বিষয়ে যে উপাদান বিদ্যমান থাকে, সেই উপাদানগুলির সমষ্টি হিসাবে সমগ্র বিষয়টি গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সমগ্রতা থেকে যেমন উপাদানকে পাওয়া যায়, তেমনি উপাদান থেকেও সমগ্রতা পাওয়া যাবে – এরূপ মনে করা হয়। কিন্তু জগতকে কেবল বস্তুগুলির সমষ্টি বলা হলে উপাদান থেকে সমগ্রতায় যাওয়া সম্ভব হতে পারে না। একমাত্র জগতকে ব্যাপারের সমন্বয় বলা হলে, তবেই উপাদান থেকে সমগ্রতাকে পাওয়া যাবে। বিষয়টিকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো যায় এভাবে, যদি কোন এক ব্যক্তি এক স্বর্ণকারকে একটি হীরের টুকরো এবং কিছু পরিমাণ সোনা দিয়ে তাঁর (ওই ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বর্ণকারকে সোনা দিল) মনের মতো একটি আংটি বানিয়ে দিতে বলে, কিন্তু আংটির বস্তু সমন্বয়ের কোনো আকার স্বর্ণকারকে বলে না দেওয়া হয়, তাহলে স্বর্ণকারের পক্ষে কখনোই ওই ব্যক্তির মনের মতো আংটি বানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু ব্যক্তি যদি স্বর্ণকারকে হীরের টুকরোটি আংটির কোথায় বসবে? কিভাবে সমন্বিত হবে? গোলাকারে না বর্গাকারে? সোনাটি হীরেটিকে আবৃত করে রাখবে নাকি উন্মোচিত অবস্থায় থাকবে? – এই সকল বিষয় অর্থাৎ সমন্বয়ের আকারগুলি যথাযথভাবে বলে দেয়, তাহলে স্বর্ণকারের পক্ষে ব্যক্তিটির মনের মতো আংটি বানানো সম্ভব হবে। অতএব উপাদান থেকে সমগ্রতায় যাওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন বস্তু সমন্বয়ের আকারটি উল্লেখ করে দেওয়া হবে। একইভাবে জগতের ক্ষেত্রেও জগতে অবস্থিত ব্যাপার বা বস্তু সমন্বয়ের ধরণ না জানা থাকলে জগতের যথার্থ সামগ্রতার ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না। তাই জগতকে বস্তুর সমষ্টি না বলে, ব্যাপারের সমন্বয় বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

জগত যেহেতু ব্যাপারের সমন্বয় সেহেতু ব্যাপার বলতে ভিটগেনস্টাইন কি বুঝিয়েছেন তা জানা প্রয়োজন। ব্যাপারের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ব্যাপার হল পরিস্থিতি বা আণবিক ব্যাপারের (Atomic fact) অস্তিত্ব।[৪] মূলত ভিটগেনস্টাইন বলেন, জগতের কম-বেশি অধিকাংশ ব্যাপারই যৌগিক ব্যাপার। এই সকল যৌগিক ব্যাপারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু ব্যাপারকে পাওয়া যায়, যে ব্যাপারগুলিকে আর বিশ্লেষণ করে কোন যৌগিক ব্যাপার পাওয়া যায় না; সেই সকল ব্যাপারকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়ে থাকে। আণবিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি বলেন, -

"An atomic fact is a combination of objects (entities, things)।"[৫]

আণবিক ব্যাপারের বিষয়টি *Tractatus* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রাসেল একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্তটি এরূপ - ধরা যাক, একটি ব্যাপার হল এই যে – ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন ভিনগেনস্টাইনের বন্ধু ও শিক্ষক। এই ব্যাপারটি থেকে আমরা আরও চারটি তথ্যে উপনীত হতে পারি। সেগুলি হল – ১) বার্ট্রান্ড রাসেল

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একজন দার্শনিক; ২) বার্ট্রান্ড রাসেল একজন ব্রিটিশ; ৩) বার্ট্রান্ড রাসেল ভিটগেনস্টাইনের বন্ধু এবং ৪) বার্ট্রান্ড রাসেল ভিটগেস্টাইনের শিক্ষক। প্রদত্ত ব্যাপারটির ন্যায় এই চারটিও ব্যাপার হলেও নিঃসৃত চারটি ব্যাপারের মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান – এগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যা পাই, যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল, দার্শনিক, ব্রিটিশ, ভিটগেনস্টাইন, বন্ধু, শিক্ষক, এদের কোনটিকেই ব্যাপার বলা চলে না। এগুলি হল সাধারণ বস্তু (Object) মাত্র। অর্থাৎ এই বস্তুদের সম্মিলিত যে ব্যাপার গঠিত হয় তাকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়। এর থেকে বলতেই হয় যে, প্রদত্ত ব্যাপার থেকে নিঃসৃত চারটি ব্যাপারই আণবিক ব্যাপার এবং প্রদত্ত ব্যাপারটি চারটি আণবিক ব্যাপারের সমষ্টিরূপ যৌগিক ব্যাপার। এই ব্যাখ্যা থেকে আণবিক ব্যাপারের দুটি পরিচয় পাওয়া যায় – প্রথমত, যে ব্যাপারের অংশ হিসাবে অন্য কোন ব্যাপার উপস্থিত থাকতে পারে না তাই তা আণবিক ব্যাপার।[৬] দ্বিতীয়ত, আণবিক ব্যাপার অন্য কোনো ব্যাপারের সমন্বয়ে গঠিত না হলেও বস্তুর দ্বারা গঠিত হয় অর্থাৎ আণবিক ব্যাপারের অংশ হল বিভিন্ন বস্তু।

এর থেকে একথা স্পষ্ট যে, বস্তুর সম্মেলনের দ্বারাই আণবিক ব্যাপার গঠিত হয়। বস্তুর এই সম্মেলনকে ভিটগেনস্টাইন শৃঙ্খলের জোড়ের সাথে তুলনা করেছেন। একটি শৃঙ্খলের বিভিন্ন অংশ যেমন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে শৃঙ্খলটি গঠন করে, তেমনি বিভিন্ন বস্তু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আণবিক ব্যাপারও সংগঠিত করে। তবে বস্তু নিজে অপরিবর্তনীয় হলেও কোন্ বস্তু অপর কোন্ বস্তুর সাথে মিলিত হবে তা নির্দিষ্ট নয়। এই অনির্দিষ্ট বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্মেলনের রূপকেই আণবিক ব্যাপারের আকার (Structure of atomic fact) বলা হয়। যেহেতু আণবিক ব্যাপারের সাথে সাধারণ ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে সেহেতু গঠনকারী আণবিক ব্যাপারের আকারের দ্বারা ব্যাপারের (যৌগিক) আকার নির্ধারিত হয়।[৭] তিনি এইরূপ আণবিক ব্যাপারগুলিকেই জগতের ভিত্তি রূপে (Building Block) গণ্য করেছেন। তাই তিনি জগত বলতে প্রকৃতপক্ষে আণবিক ব্যাপারের সমষ্টিকেই বুঝিয়েছেন।[৮]

ভিটগেনস্টাইন আণবিক ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, সেগুলি হল – অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন। এই অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারকে সদর্থক আণবিক ব্যাপার এবং অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারকে নঞর্থক আণবিক ব্যাপার বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাঁর মতানুসরণে বলা যায়, যে বস্তুগুলির সমন্বয়ের দ্বারা ব্যাপার গঠিত হয়, সেই বস্তুগুলির বাস্তব সমন্বয়কে বলা হয় অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপার এবং বস্তুর যে সমন্বয় বাস্তবে বাস্তবায়িত হতে পারে নি সেই সমন্বয়গুলিকে বলা হয় অনস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপার। এই দুই ব্যাপারের উল্লেখের মধ্য দিয়েই তিনি তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তত্ত্বের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "The existence and non-existence of atomic facts is reality."[৯]

অর্থাৎ তত্ত্ব হল অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র। তত্ত্বের এইরূপ সূত্রের জন্য জগতের সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাটি একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। কেননা, জগতের বর্ণনায় তিনি একথাও বলেন যে –

> "The totality of the existing atomic facts is the world."[১০]

অর্থাৎ জগত হল অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি। যা থেকে একথাই নিঃসৃত হয় যে, তত্ত্ব জগত অপেক্ষা ব্যাপক। কেননা, তত্ত্ব অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারের দ্বারা গঠিত হলেও জগত কেবলমাত্র অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারের দ্বারাই গঠিত। অতএব, এক্ষেত্রে তত্ত্বকে ব্যাপকতর বলতে হয়। কিন্তু আবার তিনি যখন জগত সম্পর্কে বলছেন যে – জগত হল তত্ত্বের সমষ্টি, তখন জগতকে তত্ত্বের তুলনায় ব্যাপকতর বিষয়রূপে দাবি করা হয়েছে। ফলে এই দুই জগত সম্পর্কিত সূত্রের মধ্যে এক আপাত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। কেননা, জগতকে তত্ত্বের সমষ্টি বললে জগতকে তত্ত্বের তুলনায় ব্যাপকতর বলতে হয়। আবার জগতকে কেবল অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি বললে তত্ত্বকে জগতের তুলনায় ব্যাপকতর বলতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তিনি *Tractatus* গ্রন্থের ২.০৪ সূত্রে তত্ত্বকে জগতের থেকে ব্যাপকতর বলে গণ্য করেছেন বলে মনে হয়েছে, আবার ওই একই গ্রন্থের ২.০৬৩ সূত্রে জগতকে তত্ত্বের তুলনায় ব্যাপকতর রূপে বর্ণনা করেছেন বলে মনে হয়েছে। ফলে একটি অসংগতি আছে বলে মনে হয়। তবে ভাষ্যকার জেমস গ্রিফিন এই অসংগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তা নিরসন করার উদ্দেশ্যে ট্রাকটেটাসের ২.০৫ সূত্রের, 'অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমগ্রই নির্ধারণ করে দেয় কোন আণবিক ব্যাপার অনস্তিত্বসম্পন্ন’[১১] উল্লেখ করেন, এবং ১.১২ সূত্রের, ‘ব্যাপারের সমগ্রই নির্ধারণ করে বস্তুত ঘটনা কি আর ঘটনা কি নয়’[১২] উল্লেখ করেন। গ্রিফিন বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন — ২.০৫ সূত্রটির অর্থ যদি স্পষ্ট করা হয় তাহলে বলতে হয় যে, অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার দেওয়া থাকলে অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার পাওয়া সম্ভব। আবার ১.১২ সূত্রের বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে, কোন্ বস্তু অপর কোন্ বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত, তা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা এটাও জানতে পারব যে, ঐ বস্তুর সঙ্গে কোন্ বস্তুর সম্বন্ধ নেই। অতএব, অস্তিত্বসম্পন্ন ও অস্তিত্বহীন আনবিক ব্যাপার পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র কোন কিছু নয়, একটি অপরটির পরিপূরক। তাই গ্রিফিন মনে করেন, যখন ভিটগেনস্টাইন তত্ত্বকে অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারের সমগ্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি এই দুই প্রকার আণবিক ব্যাপারের অবিচ্ছেদ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যা অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র, তা আসলে অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র যদি জগত হয়, তাহলে তত্ত্ব ও জগত পৃথক কিছু নয়, দুটিই সমমান। ফলে জগতকে তত্ত্বের সমগ্র হিসাবে বর্ণনা করা আর তত্ত্বকে অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র রূপে বর্ণনার মধ্যে কোন অসংগতি বা বিরোধ নেই। অতএব, জগত হল আণবিক ব্যাপারসমূহের সমষ্টি - একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

এই ব্যাপার বা আণবিক ব্যাপারের স্বরূপকে বুঝতে হলে এই ব্যাপারগুলি যাদের দ্বারা গঠিত তাদের সম্বন্ধে জানতে হয়। ভিটগেনস্টাইন আণবিক ব্যাপারকে ব্যাপার হিসেবে সরল বললেও তাদের গঠনকারী অংশ হিসাবে বস্তুর (Object) কথা উল্লেখ করেন। তিনি ‘বস্তু’ বলতে বুঝিয়েছেন সরল এমন বিষয় যার আর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এই বস্তুর দ্বারাই জগতের দ্রব্যত্ব গঠিত। এই বস্তুগুলি কেবলমাত্র সরল বা অযৌগই নয়, এরা বর্ণরহিত।[১৩] তবে এখানে তিনি ‘বর্ণ’ বলতে কেবল রূপের কথাই বোঝাতে চাননি। তাঁর মতে, ‘বর্ণ’ শব্দের অর্থ হল যে কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণ, যেমন আকৃতি, আয়তন ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বস্তু নিছক ব্যক্তিপদার্থ মাত্র, যার কোন জাগতিক ধর্ম নেই[১৪]। এখানে একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে, যদি বস্তুগুলি সরল, গুণরহিত হয়, তাহলে তাদের স্বরূপ কি করে বর্ণনা করা যাবে? এর সমাধানে ভিটগেনস্টাইনকে অনুসরণ করে বলতে হয়, -

> “It is essential to things that they should be possible constituents of atomic facts.”[১৫]

যদি এমন কোন বস্তু থাকে যা সম্পূর্ণভাবে নিজের অস্তিত্বের জন্য নিজের উপর নির্ভরশীল, তবে তা হবে সম্পূর্ণ আকস্মিক, বা আপতিক। কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানে আকস্মিকতার বা আপতিকতার কোন স্থান নেই। সুতরাং স্বয়ংনির্ভর বস্তু থাকতে পারে না, বস্তু মাত্রই কোন না কোন আণবিক ব্যাপারের অংশ হবে, অর্থাৎ কোন না কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে। কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার সম্ভবনারহিত বস্তু জগতে কল্পনা করা সম্ভব নয়।[১৬]

এর থেকে একথাই বলা যায় যে, একদিক থেকে দেখলে বস্তুকে নিরপেক্ষ বলতে হয়। কেননা, কোন এক বস্তু কোন্ পরিস্থিতির কোন্ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, যে কোন বস্তুই অন্য যে কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ কোন একটি বস্তুর সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতিতে অপরাপর যে কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা আছে। আবার আর একদিক থেকে দেখলে এই নিরপেক্ষতাই সাপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করে। কেননা, বস্তুর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই, অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের মাধ্যমেই তা অস্তিত্ববান হয়ে থাকে। অর্থাৎ বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের মাধ্যমে। একাধিক বস্তুর এই পারস্পরিক সম্বন্ধকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়। সুতরাং বস্তুর পরিচয় আণবিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়। এই বিবিধ আণবিক ব্যাপারের অংশীদার হওয়াই বস্তুর স্বরূপ।

এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ভিটগেনস্টাইন জগতের বিশ্লেষণটিকে যেভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল এরূপ – জগত যেহেতু ব্যাপারের সমষ্টি এবং এই জগতের বেশিরভাগ ব্যাপারই যৌগিক ব্যাপার, সেহেতু সেই বিশ্লেষণযোগ্য যৌগিক ব্যাপারগুলিকে ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করলে একটা পর্যায়ে এসে শেষ করতে হয়, যেখানে এমন কিছু ব্যাপার বর্তমান যে ব্যাপারগুলিকে আর বিশ্লেষণ করে কোন ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যায় না। এগুলিকেই বলা হয় আণবিক ব্যাপার, যা কেবল বস্তুর সমাহার রূপে আমাদের কাছে ধরা দেয়। অর্থাৎ বস্তুগুলি হল ব্যাপারের উপাদান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই ব্যাপারগুলি হল জগতের উপাদান। উপাদান এই অর্থে যে, ব্যাপার ব্যতীত জগতের যথার্থ বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। সাধারণদৃষ্টিতে বস্তুসমূহকে জগতের উপাদান বলে মনে হলেও বস্তুর সমাহাররূপ ব্যাপারই হল জগতের উপাদান। অতএব, ভিটগেনস্টাইনের ভাষায় — 'World is the totality of facts...'।

Reference:

১. 'Philosophy is not a theory but an activity'. Tractatus, 4.112, P. 44

২. Preface, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 23

৩. 1.1, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 25

৪. 'What is the case, the fact, is the existence of atomic fact'. Tractatus, 2, P. 25

৫. 2.01, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 25

৬. 'A fact which has no parts that are facts nis called by Mr. Wittgenstein a Sachverhalt. That is the same thing that he calls an atomic fact'. Tractatus, Introduction, B. Russell. P. 8

৭. 'The structure of a fact consists of the structures of atomic facts'. Tractatus 2.034, P. 28

৮. 'The sum total of reality is the world'. Tractatus 2.063, P. 28

৯. 2.06, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 28

১০. 2.04, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 8

১১. 'The totality of existing atomic facts also determines which atomic facts does not exist'. Tractatus 2.05, P. 28

১২. "For the totality of facts determines what is the case and also whatever is not the case." Tractatus 1.12, P. 25

১৩. 'Objects are colourless'. Tractatus 2.0232, P. 27

১৪. 'It is obvious that in the analysis of propositions we must come to elementary propositions, which consist of names in immediate combination'. Quoted by Passmore – Hundred Years of Philosophy. Penguin Books. 1984. P. 353

১৫. 2.011, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 25

১৬. '...there is no object that we can imagine excluded from the possibility of combining with other objects'. Tractatus. 2.0121, P. 25

Bibliography:

Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden

Wittgenstein, *Ludwig*, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trans by D.F. Pears & B.F. Mcguiness, Routledge & Kegan Paul Limited, 1961

Copi, Ivring M. & R. W. Beard (eds), *Essays on Wittgenstein's Tractatus*, Macmillan Publishing Co, Inc. New York, 1966

Hacker, P. M. S & G. P. Baker, *Wittgenstein: Understanding and Meaning*, Basil Blackwell, Oxford, 1980

Pitcher, George, *The Philosophy of Wittgenstein*, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1985

Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigation*, Trans by G. E. M. Anscombe, Blackwell, Oxford, 1963

Griffin, James., *Wittgenstein's Logical Atomism*, Oxford University Press, Oxford, 1964

Passmore, John, A Hundred Years of Philosophy, Gerald Duckworth & Co. Ltd, London, 1917

সরকার, প্রহ্লাদ কুমার ও সোমনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ভিটগেনস্টাইনের দর্শন, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সরকার, তুষারকান্তি ও শেফালী মৈত্র ও ইন্দ্রাণী সান্যাল (সম্পাদনা), হ্বিটগেনস্টাইন (জগৎ, ভাষা ও চিন্তন), এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, যাদবপুর, কলিকাতা, ১৯৯৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 978 - 990
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের বাংলা সুফি সাহিত্যে কোরান ব্যবহারের প্রবণতা : একটি পর্যবেক্ষণামূলক সমীক্ষা

গোলাম মইনুদ্দিন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : golam.moinuddin72@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
mysticism, Quran, reality, cosmology, Angel, soul, light, annihilation), absolute being.

Abstract
Sufis were also influenced by the Quran from the very beginning of original Sufism. In original Sufism, Sufis were influenced by the Quran in various aspects including creation theory, but its influence on Bengali Sufiism is very weak. The theories of the Quran have influenced Bengali Sufi literature in some cases directly, while in some cases they have not been directly influenced but have been mixed with Hindu-Buddhist traditions. In the book Surat Nama written by Haji Muhammad, the nature of God, his essence and qualities, the search for the Asila or Murshid, sending Adam as a representative, repentance, Fana-Baka, giving four books to the four prophets given by Allah, etc. In the book Talib Nama written by Sheikh Chand, Allah is mentioned as the conqueror of death, the words of four angels, the theory of evil, the creation of Adam, etc. In the Sirnama written by Sheikh Mansur, the influence of the Quran has been seen vertically in the areas of the creation of Adam, the release of the spirit, the mention of the four prophets, the mention of the saints, etc. Again, in some cases, the influence of the Quran can be seen horizontally. In this case, by mixing the thoughts of the Quran with the Hindu-Buddhist tradition, he has created a mixed tradition, such as the four spirits of the angels, the Marich, the four Mokam. In terms of practice, the influence of the Quran can be seen in the areas of prayer, fasting, Hajj, Zakat, Dhikr or remembrance of God, etc.

Discussion

সুফিবাদের উপর ইসলাম ধর্মের যথেষ্ঠ প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্মের প্রভাবের কথা বললে কোরানের কথা সর্বাগ্রেই বলা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ি কোরান আল্লাহর বাণী। আল্লাহর বাণী ফেরেশতা জিব্রাইল মারফত পয়গম্বর মোহাম্মদ কাছে পৌঁছাত। মোটামুটিভাবে ৬১০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোরান রচিত হয়। খলিফা উসমানের (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সময় গ্রন্থবদ্ধ আকারে রূপ লাভ করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুফি অতীন্দ্রিয় ভাবনায় কোরানকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই কিছু খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে সুফিবাদকে না দেখে সামগ্রিক দিক দিয়ে বিচার করাই সুফি দৃষ্টির পরিপন্থী।

> "সুফিরা কোরানের ভাবনাকে তাদের জীবনেরে সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন যে আপাত দৃষ্টিতে যা সুফি বিরোধী ব্যাখ্যা সেগুলিও অনেক সময় সুফি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে বাড়তি অক্সিজেন যুগিয়ে থাকে।"[১]

> "কোরানের যেকোন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সুফি দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই একীভূত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সুফিরা তাদের জীবনদর্শনের ভিত্তি কোরানকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলেছিল। কোরানের সঙ্গে সুফি সাহিত্যের ভাবনাটা এমন পর্যায়ে সমাহিত হয়েছিল যে সুফি সাহিত্যে কোরানের জন্য কোন বাড়তি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃতি করার প্রয়োজন হত না শুধুমাত্র শব্দ অথবা শব্দাবলী ব্যবহারেই কাজ সমাধা হত।"[২]

প্রথম দিকের সুফিরা কোরানের কিছু কিছু অনুচ্ছেদকে খুব গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব, শেষ বিচারের দিন, পয়গম্বর এবং সত্যের সাক্ষীর মুহূর্ত প্রভৃতি অনুচ্ছেদগুলিতে মানুষের সাথে আল্লাহর একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। কোরানের কিছু কিছু অনুচছেদে তওহিদ বা একত্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আবার কিছু জায়গায় প্রেমময় ঈশ্বরের করুণাঘন রূপ ফুটে উঠেছে। প্রেমের পাশাপাশি আবার চরম রুদ্র রূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকট হয়েছে। তত্ত্ব ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে অধ্যায়গুলি সুফিদের চিন্তা ও মননকে প্রভাবিত করেছে সেগুলি নিম্ন লিখিত ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে—

১। ঈশ্বরের স্বরূপ সংক্রান্ত : কোরানে ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্যগুলি হল— সর্বশক্তিমান রূপে— কোরানের শুরুতেই ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান প্রভু, 'কর্ম দিবসের মালিক'[৩], 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্ত তারই...।'[৪]

সর্বজ্ঞ রূপে—

> "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্ত তিনি অবগত, সর্বজ্ঞাতা, তার ইচ্ছা ব্যতীত তার অনন্ত জ্ঞান কেউ আয়ত্ত করে পারেনা।"[৫]

অতিবর্তী রূপে —

(ক) "দয়াময় আল্লাহ আরশে সমুন্নত।"[৬]

(খ) "নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক, যিনি আসমানকে এবং যমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে,অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হলেন।"[৭]

অন্তবর্তী রূপে—

(ক) "তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমার সাথে আছেন।"[৮]

(খ) "আমি তার ঘারের শাহরগ অপেক্ষাও নিকটর।"[৯]

(গ) "আমি তোমাদের নফসের সাথে মিশে আছি, কিন্তু তোমরা দেখছোনা।"[১০]

আল্লাহ একই সাথে অতিবর্তী ও অন্তবর্তী—

(ক) "তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশিত, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা।"[১১]

সর্বেশ্বরবাদ—

(ক) "অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর মুখ, কেননা আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী পূর্ণ জ্ঞানবান।"[১২]

মানবীয় রূপে—

(ক) "তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর প্রিয় হবে।"[১৩]

(খ) "সত্য এই যে, (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা ওদের হত্যা করনি বরং আল্লাহ ওদের হত্যা করেছেন। (আর হে নবি) তুমি যখন ধূলি নিক্ষেপ করেছিলে, তখন ধূলি তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।"[১৪]

(গ) "অতএব তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করিব।"[১৫]

২। কোরানে উল্লিখিত পয়গম্বরদের বিশেষত্ব : আল্লহ অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটি পয়গম্বরদের অনুগ্রহ করে বিশেষত্ব দান করেছেন।

> "তিনি মুসা ও হারুণকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী মানদণ্ড ফোরকান দান করেছিলেন।"[১৬]
> "তিনি ইব্রাহিমকে সত্যমিথ্যা বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলেন।"[১৭]
> "তিনি লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছেন।"[১৮]

৩। সৃষ্টিতত্ত্ব : ইসলামি ধর্মমত অনুযায়ী আদম হলেন প্রথম মানব এবং নবি। যিনি নিজ কৃত কর্মের ফলে চরম লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে দুর্বল ভাবে স্বর্গ রাজ্য থেকে পৃথিবীতে পতিত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ আদমকে খলিফা এবং নবি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। কোরানে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে যখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিরাজ্য পৃথিবীর জন্য প্রতিনিধি হিসাবে আদমকে সৃষ্টি করার বাসনা প্রকাশ করলেন। তখন সমস্ত ফেরেশতারা (দেবদূত) সমবেতভাবে আল্লাহকে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন আপনি যে সত্তাকে সৃষ্টি করছেন সে "সমগ্র পৃথিবীকে কলুষিত করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে।"[১৯] আল্লাহ এর উত্তরে বলেছিলেন— নিশ্চয় আমি যা জানি তুমি তা জাননা।"[২০] আদম সৃষ্টি সম্পর্কে কোরানে বলা হয়েছে যে তার অবয়ব মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল[২১] এবং তারপর এর মধ্যে রুহের সঞ্চার ঘটান।"[২২] এরপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন।" সমস্ত ফেরেশতাগণকে তিনি আদমকে সেজদা করতে আদেশ দিলেন, তখন একমাত্র ইবলিশ ব্যতীত সকলে সেজদা করলেন, সে অগ্রাহ্য করল এবং অহংকার করল।"[২৩]

৪। ঈশ্বর ও আদমের শপথপত্র : কোরানে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে সংগঠিত শপথের উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে কোরানে উল্লেখ আছে –

> "যখন তোমার প্রতিপালক বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম।"[২৪]

৫। মেরাজের ঘটনা : মেরাজ বলতে উর্ধ্বগমনকে বোঝান হয়। এই উর্ধ্বগমন নৈশ কালীন সময়ে ঘটেছিল। কোরানে মেরাজ সম্পর্কে উল্লেখ আছে—

> "তিনি পবিত্র যিনি তাঁর বান্দাকে এক রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম(নিকটবর্তী মসজিদ) হতে মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) যার চতুষ্পার্শ্বকে আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখবার জন্য, তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[২৫]

কোরানের উল্লেখিত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মেরাজ বলতে নৈশকালীন ভ্রমণকে বোঝান হয়েছে যাকে আরবিতে আসরা বলা হয়। এই ভ্রমণ হয়েছিল মসজিদুল হারাম অর্থাৎ কাবা থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত। এই ভ্রমণের সঙ্গেই হয়েছিল মেরাজ অর্থাৎ উর্ধ্বগমণ। উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নিদর্শন দেখাবার জন্য। কোরানের অপর এক স্থানে মেরাজে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা আছে—

> "যখন তিনি সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন এবং নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাঁদের মধ্যে দুধনুকের ব্যধান রইল অথবা তার চেয়েও কম।"[২৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬। রুহ : কোরানে কিছুটা দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট ভাবে দেহজ আত্মার কথা বলা হয়েছে। কোরানে একে নফস বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নফস অবিরত ভাবে খারাপ কর্মের দিকে চালিত করে। এ বিষয়ে কোরানে উল্লেখ আছে—

> "আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন, আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৭]

আবার কোরানে এই মন্দ কর্ম প্রবণ আত্মার সংশোধনের ফলে শান্ত ধর্মী আত্মায় পরিণত হওয়ার কথা আছে—

> "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও প্রিয়পাত্র হয়ে। অনন্তর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"[২৮]

কোরানে শ্বাসরূপী রুহের (আত্মার) আদমের (মানুষের) শরীরে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। যেটা ঈশ্বরের অন্যতম অংশ বলে উল্লেখ আছে—

> "যখন আমি (ঈশ্বর) তাকে (আদমকে) সুঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ(আত্মা) সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।"[২৯]

কোরানে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে এর উত্তরে বলা হয়েছে প্রভুর আদেশ—

> "তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল রুহ হল আমার প্রতিপালকের আদেশ।"[৩০]

সুফিবাদে উচ্চশ্রেণীর রুহ এবং নিম্নস্তরের রুহের মধ্যে লড়াই প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে।

৭। ঈশ্বরের বন্ধু : কোরানে আল্লাহ একটি শ্রেণীর দলকে বিশেষ অধিকার দিয়াছেন। যারা আল্লাহর বন্ধু বা ওলি নামে পরিচিত। কোরানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

> "মনে রেখো আল্লাহর বন্ধুদের না আছে কোনও ভয় না আছে কোনও চিন্তা।"[৩১]

ঈশ্বরকে স্মরণ করার কথা : কোরানে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বারে বারে বলা হয়েছে—

> "...আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রাখো, আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।"[৩২]

৮। তওবার (অনুশোচনা) কথা : আল্লাহ কোরানে তওবা(অনুশোচনা) সম্পর্কে বলেছেন—

> (ক) "আল্লাহ তখন তাদের তওবা কবুল করলেন। তারা যেন তাদের তওবায় অটল থাকে।"[৩২]
>
> (খ) "হে মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফল কাম হও।"[৩৩]

৯। সেজদা : সেজদা সম্পর্কে করানে বলা হয়েছে —

> "সেজদা করো আর আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও।"[৩৪]

১০। ফানা : ফানা হল নশ্বর চেতনা। কোরানেও নশ্বরতার প্রকাশ আছে —

> "মহাবিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে সবই নশ্বর অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা।"[৩৫]

১১। নূরতত্ত্ব : সাধারণ ভাবে নুর শব্দ দ্বারা আলো (Light) বা জ্যোতিকে বুঝায়। এখানে আলো বলতে অন্ধকারের বীপরিতে আলোকে প্রতীয়মান করে তুলেছে। সামগ্রিক ভাবে কোরানে নুরর বলতে আলো, চৈতন্য, দ্যুতি, আত্মা, জ্ঞান, কোরান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে। তাই কোরানে নুর বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কিছু তার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হল—

(ক) নুর শিক্ষা অর্থে ব্যবহৃত : কোরানের সামগ্রিক শিক্ষাকে নুর অর্থে কোরানে ব্যবহৃত হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়—

> "হে মানব জাতি! তোমাদের রবের (প্রভুর) কাছ থেকে তোমাদের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদক (convincing) প্রমাণ এসেছে এবং তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নুর অবতীর্ণ করেছি।"[৩৬]

(খ) অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞান অর্থে: কোরানের মধ্যে নুরকে জ্ঞান স্বরূপ বোঝাতে কিছু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

> "নিশ্চয় আল্লাহর কাছ থেকে নুর ও সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে এবং ওটা দ্বারা তিনি জুলমাত(অন্ধকার) থেকে নুরের (আলোর) দিকে নিয়ে যান এবং সেরাতুল মোস্তাকিমের (সহজ সরল পথ) দিকে পরিচালিত হন।"[৩৭]

(গ) অন্ধকারের বিপরীতে আলো অর্থে: কোরানের মধ্যে নুর অর্থে অন্ধকারের বীপরিতে আলো (Light) অর্থেও ব্যবহার হয়েছে—

> "প্রতিষ্ঠিত প্রশাংসা আল্লাহর যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং জুলমাত (অন্ধকার) ও নুরের (আলোর) উদ্ভব ঘটিয়েছেন।"[৩৮]

(ঘ) নূরকে রূপক প্রতীকে ব্যবহার: নূরকে সর্বত্রগামী চৈতন্যময় সত্তা হিসাবে তুলনা করে অবভাসিক জগতের কিছু প্রতীকে প্রতীকায়িত করেছেন—

> "আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর নুর (জ্যোতি), তাঁর নুরের রূপক হল - একটা কুলঙ্গী যাতে একটা প্রদীপ, প্রদীপটি একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় মোবারক বৃক্ষ জয়তুন দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যের নয়, অগ্নী এটাকে স্পর্শ না করলেও ওটা আলোকোজ্জ্বল, নুরের ওপর নুর, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার নুরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন, আল্লাহ মানুষের জন্য রূপক বর্ণনা করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা।"[৩৯]

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে নুরকে অবভাসিক জগতের কুলঙ্গী, প্রদীপ, কাঁচের আবরণ, জয়তুনের তেল, নুরের উপরে নুর প্রভৃতি প্রতীকে ব্যখ্যা করা হয়েছে। এর সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে।

১২। আল্লাহর সত্তা (জাত) : কোরানে আল্লাহর সত্তা প্রসঙ্গে সব চেয়ে সঠিক ভাবে যা উল্লিখিত হয়েছে তা হল—

> "মহাবিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে সবই নশ্বর অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা।"[৪০]

কাজেই আল্লাহর সত্তাকে এক এবং অবিভাজ্য যা সৃষ্টি এবং ধ্বংশের উর্ধ্বে।

১৩। নামও গুণের (আসমা ও সিফাত) কথা : কোরানে অনেক জায়গায় আল্লাহর নামের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদটি হল—

> "তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা সুন্দর সকল নাম সমূহ তারই।"[৪১]

এখানে নাম সমূহ বলতে আল্লাহর ৯৯টি গুণ সম্বলিত নামবলী। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল— সামিউন বাসির (সর্ব দ্রষ্টা), সামিউন আলিম (সর্ব জ্ঞাতা, সর্বশ্রোতা), হাইউন কাইউম (চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী), আলিমুন কাদির (সর্ব শক্তিমান), কাবিরুন বাসির (সম্যক পরজ্ঞাতা), হকিমুন খাবির (সর্ব জ্ঞাতা), ওইয়াসিউন আলিম (সর্ব ব্যাপী) ইত্যাদি।

১৩। অসিলা বা উপায়ের কথা : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য অসিলা তালাসের কথা কোরানে উল্লিখিত হয়েছে—

"হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য অসিলা তালাস কর।"[৪২]

উপরোক্ত ভাবনা গুলি নবম শতাব্দী থেকেই সুফি সাহিত্যেগুলিকে প্রভাবিত করে আসছে। কালক্রমে তা মধ্যযুগের বাংলা সুফি সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করেছে — তা আমাদের বিচার্য বিষয়।

যে কোন সাহিত্যের উপর অপর কোন শক্তিশালী সাহিত্যের প্রভাব বা কোন তত্ত্বের প্রভাব আলোচনা একটি সময় সাপেক্ষ পাণ্ডিত্যর বিষয় রূপে বিগত শতাব্দী থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রভাবের আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে— প্রথমটি হল উলম্ব (Vertical) পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি আনুভূমিক (Horizontal)। উলম্ব পদ্ধতিতে প্রভাবের অদর্শটি নির্ণয় করা হয় উত্তরাধিকার সুত্রে যে প্রভাব তাদের সৃষ্ট, চিন্তা, কর্মকে একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু আকার দান করে। এই পদ্ধতি উনিশ শোতকে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার উন্নয়ন ক্ষেত্রে ভাল প্রভাব রেখেছিল। এছাড়াও ধর্মীয় সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। যে কোন জমাকৃত প্রভাবের উন্মোচন এবং উত্তরাধিকারের খোঁজ প্রাপ্তি এই পদ্ধতির দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু সাহিত্য শূধুমাত্র উলম্ব দৃষ্টিকোনের দ্বারাই সীমাদ্ধ নয় এর বৃহত্তর অর্থ উন্মোচনের জন্য আনুভূমিক দৃষ্টিকোনের প্রয়জন হয়। এই পদ্ধতিতে মধ্যযুগের বাংলা সুফি সাহিত্যকে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলার সুফিরা মূলত তত্ত্ব ও অনুশিলনের জন্য কোরানকে ব্যবহার করেছিলেন। সুফিদের কোরানের যে তত্ত্বগুলি তাদের জীবন ও দর্শনের সাথে সাধনাকে প্রভাবিত করেছিল সে গুলি বার বার বাংলার সুফি সাহিত্যে ঘুরে ফিরে এসেছে এবং খুব সামান্য অংশই তারা কোরান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব আমরা হাজি মুহম্মদ বিরচিত *সুরত নামা,* শেখ চান্দ রচিত *তালিব নামা,* এবং শেখ মনসুর রচিত *সির্নামা* গ্রন্থে। এই প্রভাব গুলি নিম্ন লিখিতভাবে আমরা আলোচনা করতে পারি —

(ক) তত্ত্বগত দিক দিয়ে প্রভাব : এখানে দেখা হবে কোরানের আলোচিত তত্ত্বগুলি সরাসরি ভাবে অর্থাৎ উলম্ব ভাবে ব্যবহার এবং বাংলার লোকায়ত ভাবনার সাথে অভিযোজন করে কোরনের ভাবনার সঙ্গে মিশ্রিত ঐতিহ্যের উদ্ভবের দ্বারা। প্রথমে উলম্ব পদ্ধতি দ্বারা বা সরাসরি কোরানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

সপ্তদশ শতকের কবি হাজী মুহম্মদ রচিত *তালিব নামা* (আনুমানিক ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থের শুরুতেই আল্লাহর বন্দনায় আল্লাহকে মৃতুঞ্জয় রূপে উল্লেখ করেছেন—

"জনম নাহিক তান নাহিক মরণ
আখেরে তাহান পদে হইবা তরণ।"[৪৩]

কোরানে আল্লাহকে মৃত্যুঞ্জয় বা হাইউন কাইয়ুম বলে উল্লিখিত করা আছে। এছাড়াও কোরানের উল্লেখিত চার ফেরেশতার উল্লেখ আছে—

"আজ্রাইল ইস্রাফিল মিকাইল জিব্রিল
একনামে জান তান ফিরিস্তা কামিল।"[৪৪]

কোরানের উল্লিখিত আঠারো হাজার মাখলুকাত ও আর্শ কোর্শ লৌহ কালাম এর উল্লেখ—

"অষ্টাদশ হাজার যথ করিলুঁ বন্দন
আর্শ কোর্শ লোহ কালাম এতিন ভুবন।"[৪৫]

কোরানে উল্লিখিত কুন তত্ত্বের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়—

"কুন বুলি শব্দ প্রভু কহিলেক তবে
কাফ-নুউ দুই হরফ সৃজন হইল।
করিম আপনা নামে জাহের করিল।" [৪৬]

মাটি থেকে আদম তৈরির ক্ষেত্রেও কোরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

"সংসারে আদম পয়দা কৈলা নিরঞ্জন।
ক্ষিতি হোন্তে খাক আনি করিলা মথন
আপনার চারি চিজ দিলা নিরঞ্জন।"[৪৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শেখ মনসুর রচিত সির্নামা (আনুমানিক ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থে কোরনের উল্লিখিত মাটি থেকে আদম সৃষ্টির উপাখ্যান এবং কুন তত্ত্বের অনুরূপ প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায়—

"আদম আছিল মাটি হৈল পুষ্প বন
সে নুরে করিল সৃষ্টি পলক অন্তর
কাফে নু-এ দুই অক্ষর হইল সংসার।"[৪৮]

আদমের মধ্যে রুহ বা দম ফুৎকার কোরানের ন্যায় এখানেও উল্লেখ আছে—

"সঞ্চারিল দম যদি আদমের কাএ
আদম হইয়া নাম সুকর কহএ।"[৪৯]

কোরানের উল্লিখিত চার নবির উল্লেখ—

"ইদ্রিস পাইয়া দম স্বর্গে চলি গেলা
ইসা নবী দম পাই আকাশে
মুসা পয়গম্বর হৈল সিদ্ধুত
মীন উদর হোন্তে পাইল ইনুসে আমান
মুহম্মদে এ অক্ষর সপূর্ণ পাইল
নবী কুল হোন্তে শ্রেষ্ঠ ইমাম হইল।"[৫০]

কোরানের উল্লিখিত আউলিয়া বা বন্ধুর উল্লেখ—

"আউলিয়া সবের বাক্য রেসালা অন্তর
ফকিরি দরবেশি পাএ তাহারি ভিতর।"[৫১]

হাজী মুহম্মদ রচিত সুরতনামা বা নরজামাল গ্রন্থের প্রথমেই কোরানের অনুরূপ আল্লাহকে সৃষ্টি কর্তা রূপে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে—

"আউয়ালে আল্লার নাম আগাচ করলুঁ
দীল মুখে এক নাম স্বরূপে জানিলুঁ
আঠার হাজার আলম যাহার সৃজন
অহোনিশি আল্লা নাম করহ স্মরণ।"[৫২]

কোরানে আল্লাহর অনেক গুলি সিফাত গুণের নাম আছে এর মধ্যে মালিক বা সৃষ্টি কর্তা নাম অন্যতম। এখানে কোরানের অনুরূপ মালিক নামেও আল্লাহকে নামেও অভিহিত করা হয়েছে—

"মালেক তাহার নাম সৃজন যাহার
বিনি হস্তে সৃজিয়াছে সয়াল সংসার।"[৫৩]

কোরানের অনুরূপ রাজ্জাক বা অন্নদাতাও রূপে আল্লাহকে চিহ্নিত করা হয়েছে—

"রাজ্জাক তাহান নাম ভক্ষণ আনিয়া
সর্বজীবের ভক্ষ্য দেঅন্ত জানিয়া।"[৫৪]

কোরানের উল্লিখিত আল্লাহকে সামিউন বা শ্রোতা নামেও উল্লেখ করা হয়েছে—

"সামিউন নাম তান সকল দেঅন্ত
বিনি কর্ণ শব্দ যথ শুনে আদিঅন্ত।"[৫৫]

কোরানের মত আল্লাহকে বসির অর্থাৎ দ্রষ্টা রূপে সাক্ষি করা হয়েছে—

"বসির তাহান দেখন্ত সকল
বিনি চক্ষে দেখে সবার ভিতর।"[৫৬]

কোরানের উল্লিখিত আল্লাহকে জিকির বা স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে—

"আল্লা নাম স্মরণে সকল পাপ হরে
আল্লার দোস্ত নবী মোহাম্মদ পয়গম্বর
বহুল দরুদ হৈল যাহার উপর।"[৫৭]

কোরানের মত অসিলা তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়ের কথা—

"অছিলা যথা তথা যাও আরবার
তথাত পাইবা গিয়া আল্লাহর দিদার।"[৫৮]

কোরানের অনুরূপ আল্লাহ প্রদত্ত চার কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"তার মধ্যে এহি চারি কিতাব প্রধান
তওরাত ইঞ্জিল আর জব্বুর কোরান।"[৫৯]

কোরানের অনুরূপ আদমকে খলিফা রূপে উল্লেখ—

"প্রথমে আদম সফী আল্লার খলিফা
আখেরে পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা।"[৬০]

কোরানের উল্লিখিত তওবা অর্থাৎ অনুশোচনার কথা—

"ওই করিব আগে পাছে এবাদত
বিনি তওবাএ এবাদত তহে তত।
এবাদত কর হেন জানহে আপনে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিনি তওবাএ ফল নহে কদাচনে।”[৬১]

কোরানের অনুরূপ আল্লাহর সত্তা এবং গুণের কথা (জাত-সিফাত)—

“জাতে আর সিফাত আছিল এক কাএ
পশ্চাতে জাহের আপে হৈল ভাল ভাএ।
ডিম্বের ভিতর যেন পক্ষীর শরীর
তেন মতে ছিল শেষে হইল বাহির।”[৬২]

কোরানের উল্লিখিত ফোনা এবং বাকা তত্ত্বের উল্লেখ—

“ফানি মোকাম ছাড়ি বাকাতে গিয়া রহে।
বৈদেশির শ্রধা যেন যাইতে স্বদেশে
পরবাস ছাড়িয়া আপনা গৃহবাস।”[৬৩]

আনুভূমিক পদ্ধতি (Horizontal) : আনুভূমিক পদ্ধতিটি এখানে দুটি পর্যায়ে বিচার করা হবে। প্রথমত কোরানের ভাবনার সঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ ভাবনার মিশ্রণের দ্বারা সমন্বয় ঐতিহ্যের (syncretistic Tradition) দ্বারা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ভাষাগত গত দিক দিয়ে।

প্রথমত সমন্বয় বাদি ঐতিহ্যের দিক দিয়ে - এক্ষেত্রে সুফি সাহিত্যে অজস্র উদাহরণ দেখা যায়—

(১) চার ফেরেশতা : করানে চার ফেরেশতা হলেন জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল। জিব্রাইলের কাজ হল আল্লাহর বাণী নবিদের কাছে প্রেরণ করা। মিকাইলের কাজ বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদন করা। ইস্রাফিলের কাজ মহাপ্রলয় ঘোষণা করা। আজ্রাইলের কাজ প্রাণ হরণ করা। বাংলার সুফি সাহিত্যে এই মূল কোরানের ভাব রক্ষিত হয়নি। এখানে চার ফেরেশতাকে চার মোকামের প্রহরী রূপে কল্পিত হয়েছে। যা কোরান নয় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। বৌদ্ধতন্ত্রের চার চক্রের চার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লোচনা, মামকি, পাণ্ডুরা, তারা প্রভৃতির অনুরূপ। এখানে কোরানের ভাবনা ও বৌদ্ধ তন্ত্রের ভাবনার মিশ্রণে নির্মিত ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ করা যায় অজ্ঞাত নামা লেখক রচিত যোগ কলন্দর কাব্যে—

নাসুত মোকামের প্রহরী আজরাইল বলে উল্লেখ দ্বারা—

“নাসুত মোকাম জান এ তিন তিহরী
আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাত প্রহরী।”[৬৪]

এই ভাবে চার মোকামের চার ফেরশতার উল্লেখ আছে।

(২) মারিচ : যেমন বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে কোরানের নামের ঢাকনা দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে ফেরেশতার অনুষঙ্গে অনুরূপ ভাবে করনের ভাবনাকেও হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে মারিচ নাম দিয়ে। মারিচ রামায়নের মায়াবি রাক্ষস। মায়ার প্রহেলিকায় সে সাধারণ মানুষ সহ সাধুদেরও ভুলিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। এই ভাবেই সে রামায়নের সীতাকে মায়াবলে সোনার হরিণ দেখিয়ে ফান্দে ফেলেছিল। মারীচের এই মায়াবলে ফান্দে ফেলার অনুরূপ কর্মের সঙ্গে ইবলিশের সাদৃশ্য বেশি। ইবলিশ মানুষকে এই লোভনীয় মায়ায় ফেলে অপকর্মে লিপ্ত করে। ইবলিশের সঙ্গে মারিচের সাযুজ্য কল্পনা করে সুফি সাহিত্যে মারিচ আর ইবলিশ এক হয়েছে। *তালিব নামা* গ্রন্থে মারিচের জন্ম আগুন থেকে বলা হয়েছে—

“এথ শুনি করতার প্রসন্ন হইল
আতসের কাফির রগ নিকালি পেলিল।
সেইত কাফের অংশ মথন করিয়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মারিচেরে সৃজিলা প্রভু সেই অংশ দিয়া।"[৬৫]

মূল কোরানের ইবলিশের সৃষ্টি আগুন থেকে এবং আদমকে সেজদা না করার জন্য তাকে কাফের অর্থাৎ অস্বীকারকারী বলা হয়েছে ও শাস্তী স্বরূপ তাকে সেই স্থান থেকে নিকালে দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে আলিরাজার আগমের নুর মোহাম্মদ তত্ত্বের সাথে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তত্ত্বের সমন্বয়, মোকাম তত্ত্বের সাথে চার চক্রের সমন্বয় ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

দ্বিতীয়ত ভাষাগত নাম ব্যবহার করে –
এখানে মূলের সঙ্গে ভাবনাগত দিক দিয়ে কোন মিল নেই শূধুমাত্র ইসলামি নান ব্যবহার দ্বারা ইসলামি নামে উপবেশন ক যেমন মীর মুহম্মদ সফীর নুরনামা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এখানে কোরানে ব্যবহৃত কুর্সি, হাওজ ই কওসর, আব ই জমজম, হুর, নহস প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে তিনি বৌদ্ধ ঐতিহ্যক কী ভাবে প্রকাশ করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

(ক) ফেরেশতা বিষয়ে : কোরানে বলা হয়েছে ফেরেশতার জন্ম আল্লাহর নুর থেকে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে নুরনবির ঘর্ম থেকে। এখানে উল্লিখিত হয়েছে নুরনবির দক্ষিণ কর্ণের ঘর্ম থেকে আজরাইলে জন্ম, দক্ষিণ নাসা থেকে ইস্রাফিলের, ডাইন কোঠা থেকে মিকাইলের, জিহ্বা থেকে জিব্রাইলের। নুরনবির দুই নেত্রের ঘাম থেকে লোহ কলমের সৃষ্টি হয়—

"দুই নেত্রে ঘর্ম শ্রবিল যখন
লোহ কলম পয়দা হৈল তখন।"[৬৬]

কোরানে বলা হয়েছে আদমের জন্ম মাটি থেকে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে নুরনবির বুকের ঘাম থেকে—

"বুক হন্তে নিকালিল যথাযথ ঘর্ম
তাহাতে হইল জান আদমের জন্ম।"[৬৭]

কোরনের সৃষ্টি তত্ত্বে কোথাও ঘামের দারা সৃষ্টির উল্লেখ নেই। এখানে এই দিক দিয়ে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোরানের শব্দাবলী দিয়ে শুধুমাত্র নামগত প্রভাবটিই রক্ষিত হয়েছে।

(খ) অনুশীলনের দিক দিয়ে : অনুশীলনের দিক দিয়ে বাংলার সুফিরা কোরানের যে বিষয় গুলির প্রতি প্রভাবিত হয়েছিল সেগুলি হল নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি। হাজী মুহম্মদের *সুরতনামা* গ্রন্থে এবাদতের বিষয়ে শরিয়তের যে অনুশীলনের কাজ বলেছেন তার মধ্যে প্রথমেই এইকথা বলেছেন—

"শরীয়ত মঞ্জিলের কহি এহি কাজ
রোজা রাখিব আর করিব নামাজ।
বৎসরেত একমাস রোজা রাখিবেক
রমজান চান্দ যদি আইল পরতেক।
রাত্রিদিন পঞ্চ ওক্ত করিব নামাজ
রার চেষ্টা করা হ আখেরে দীনের ঠুনি এহি বড় কাজ।
হজ জারিব যদি সে আয়ু থাকে
মালের যাকাত দিব রূপাইয়া যে রাখে।"[৬৮]

এর সাথে সাথে মুখে কলেমা পড়ার কথাও উল্লেখ আছে। প্রথম যুগের সুফিরা বেশিরভাগ সময় কোরান আবৃত্তি করে পড়তেন কিন্তু এখানে কলেমার কথা বলা হয়েছে বেশ গুরুত্ব দিয়ে—

"কলেমা পড়িব মুখে হৃদে দড় জানি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এহি পঞ্চ কিছু যে বোলএ মুসলমানি।”[৬৯]

অনুরূপ ভাবে কলেমার কথা সির্নামা গ্রন্থেও উল্লেখ আছে—

“কলেমা জানিবা দড় প্রভুর নিশ্চএ
কলেমা অন্তরে গেলে নাহি পাপ ভএ।”[৭০]

জিকির বা ঈশ্বরকে স্মরণ : কাজী শেখ মনসুরের সির্নামা গ্রন্থে নামজ রোজার সঙ্গে মুখের জিকিরের দ্বারা নিরঞ্জনকে স্মরণ করার কাথা আছে—

“শরীয়ত আকলি না কৈল নবীবর
জিকির করিতে দিশি নিসি নিরন্তর।
অভ্যাস জিকির মুখে যাহার আছএ
প্রভুর সঙ্গতি সেই বসিয়া থাকএ।”[৭১]

ধ্যান : হাজী মুহম্মদ রচিত *সুরতনামা* গ্রন্থে দুনিয়ার সুখ সমৃদ্ধিকে ভুলে সাহেবের সাহেবের ধ্যানে ডুবে থাকার কথা বলা আছে—

“দুনিয়ার সুখ ভোগে মন নহে ভোলা
হামিসা সাহেব সনে কর ওলা মেলা।
হকেতে ডুবিয়া মন থাকে অনুক্ষণ
আপনারে আপনে হারাএ ততক্ষণ।”[৭২]

য়েছে। এক্ষেত্রে কিছু নাম এই ভাবে সাহেবের ধ্যানে ডুবে ডুবে থাকতে যখন আপন পর ভাব তিরোহিত হয় তখন সাহেবের দিদার সম্ভব হয়। তাই সুফি অনুশীলনে ধ্যানের গুরত্ব অপরিসীম।

পরিশেষে এই কথাই বলা যায় বাংলা সুফি সাহিত্য ছারাও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জুলেয়েখা, সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ, ওফাৎ-ই-রসুল ইত্যাদি কাব্যেও কোরানের কিছু কিছু অনুষঙ্গ চর্চা হয়েছিল এইভাবেই চর্চার হাতধরে আমীর উদ্দিন বসনিয়া দোভাষী তর্জমায় কোরানের সীমিত অংশ আমপাড়া উনিশ শতকেই পাই গিরিশচন্দ্রের হাতধরে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলার সুফি সাহিত্যে কোরানের ব্যবহার এত কম থাকার কারন হল মধ্যযুগের বাংলার সুফিদের সমাজে বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়নি। বাংলার নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশ তাদেরকে দেখেই ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের কথাকেই তারা মেনে নিত। অভিজাত শ্রেণীর ছিল উর্দু ফারসি তাই তাদের জন্য ফারসি ভাষায় কোরানের অনুবাদ অনেক ছিল। তারা মনে করত বাংলা ভাষায় কোরানের অনুবাদ জঘন্য গর্হিত কাজ। অন্যদিকে সুফিদের ধর্মের সঙ্গে খুব নিবিড় আত্মিক যোগ বাইরের দিকে ছিলো না। মূল মধ্যপ্রাচ্যের সুফিবাদ উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়িতে হয়। ফলে ইসলামের বৈধতা আদায়ের জন্য কোরনকে আত্মীকরণ করতে হয়। তছাড়া বাংলা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতীগত ব্যবধান প্রচুর ফলে যে ভাবে সে যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সুফিরা তাদের সাহিত্যে কোরানকে আত্মীকরণ করতে পেরেছিল বাংলার সুফিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই জন্যই বাংলার সুফিরা লোকায়তিক বেশি কোরানের তুলনায়।

Reference:

১. Sells Michaela, ‘Early Islamic Mysticism : Sufi, Miraj, Poetic and Theological Writings', Paulist Press, Mahwah, Published 1996, Page. 29
২. পূর্বোক্ত
৩. কোরান ১ : ৩
৪. কোরান ২ : ২৫৫

৫. কোরান: ২ : ২৫৫
৬. কোরান ২০ : ৫
৭. কোরান ১০ : ৩
৮. কোরান ৫৭ : ৪
৯. কোরান ৫০: ১৬
১০. কোরান ৫০ : ১৬
১১. কোরান ৫৭ : ২২
১২. কোরান ৫৭ : ৩
১৩. কোরান ৫ : ৫৪
১৪. কোরান ৮ : ১৭
১৫. কোরান ২ : ১৫২
১৬. কোরান ২১ : ৪৮
১৭. কোরান ২১ : ৫০
১৮. কোরান ২১ : ৭৪
১৯. কোরান ২ : ৩০
২০. কোরান, পূর্বোক্ত
২১. কোরান ৩৮ : ৭১
২২. কোরান ৩৮ : ৭২
২৩. কোরান ৩৮ : ৭৪
২৪. কোরান ৭ : ১৭২
২৫. কোরান ১৭ : ১
২৬. কোরান ৫৩-৭-৮-৯
২৭. কোরান ১২ : ৫৩
২৮. কোরান ৮৯ : ২৭-২৮
২৯. কোরান ১৫ : ২৯
৩০. কোরান ১৭ : ৮৫
৩১. কোরান ১০ : ২৬
৩২. কোরান ১৩ : ২৮
৩৩. কোরান ২৪ : ৩১
৩৪. কোরান ৯৬ : ১৯
৩৫. কোরান ৫৫ : ২৬
৩৬. কোরান ৪ : ১৭৪
৩৭. কোরান ৫ : ১৫-১৬
৩৮. কোরান ৬ : ১
৩৯. কোরান ২৪ : ৩৫
৪০. কোরান ৫৫ : ২৬
৪১. কোরান ৫৯ : ২৪
৪২. কোরান ৫ : ৩৫

৪৩. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৭৭
৪৪. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৭৭
৪৫. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৭৭
৪৬. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৮০
৪৭. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৮২
৪৮. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৬৯
৪৯. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৬৯
৫০. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৬৯
৫১. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৭০
৫২. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৩. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৪. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৫. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৬. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৭. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৮. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৯. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৫
৬০. আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 111
Website: https://tirj.org.in, Page No. 991 - 999
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 991 - 999
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার ইসলাম এবং 'পুরাণ-কোরাণ' সাহিত্য প্রকল্প

শ্রেয়সী মল্লিক
গবেষক
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mallickshreyasi123@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Pre-Colonial, Bengal, Loukik Islam, Puran, Koran, Literary Project.

Abstract
The remarkable spread of Islam in Bengal was not an isolated phenomenon. It was intricately linked to the region's history, culture, societal dynamics, and socio-economic conditions. In pre-colonial Bengal, an alternative form of Islam, known as Folk Islam, gained immense popularity as opposed to strict Shariatic Islam. This paper seeks to explore the significant role of Islamic Bengali literature in the proliferation of this popular form of Islam in Bengal.Through the present study, we aim to analyze a notable literary initiative undertaken by Muslim poets of Bengal, which contributed significantly to the local understanding and acceptance of Islam during the pre-colonial period. By delving into these literary creations, we hope to shed light on how this distinct and localized version of Islam, deeply embedded in the cultural and spiritual fabric of Bengal, evolved and flourished. This exploration not only highlights the syncretic traditions that shaped Bengal's Islamic identity but also underscores the vital influence of regional literary expressions in bridging religious, cultural, and social divides. The paper, therefore, attempts to provide a comprehensive perspective on the interplay between literature and religion in shaping the unique trajectory of Islam in pre-colonial Bengal.

Discussion

১

অষ্টম শতাব্দীতে মূলত ধনসম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সিন্ধু প্রদেশ প্রথম আরবদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে নেমে আসে তুর্কি ও তুর্কো আফগানদের আক্রমণ, যার পুরোধা ছিলেন গজনীর সুলতান মামুদ। তবে পূর্বতন আরব আক্রমণ থেকে এদের মূলগত পার্থক্য ছিল এই যে, অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও আরবরা বিজিত অঞ্চলে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির আধিপত্য আরোপ করতে চেয়েছিল এবং শাসিত অঞ্চলের কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজেদের যাপনের অঙ্গীভূত করেছিল। তুর্কিরা অন্তত প্রাথমিকভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনওরকম সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিসর গড়ে তুলতে

আগ্রহী হয়নি। কিন্তু এই প্রাথমিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ মিশ্রণের রূপ নিয়েছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত মুসলিম অধিগৃহীত বা উপনিবেশিত অন্যান্য দেশ ইসলাম সংস্কৃতির মূল ধারার মধ্যেই অঙ্গীভূত হয়ে গেলেও একমাত্র ভারতবর্ষেই মুসলিমরা যেমন নিজেদের সংস্কৃতি বিস্তার করেছে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে উপাদান গ্রহণও করেছে। এই পারস্পরিকতা বা সহিষ্ণুতা সুফি মতাদর্শের অনুকূল ছিল।[১] এই মিথষ্ক্রিয়াই এদেশকে ইসলামি সংস্কৃতির রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেয় নি, সমন্বিত সংস্কৃতির শাশ্বত ঐতিহ্য বজায় রাখার সুযোগ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত ভারতে ইসলামিভবন সংক্রান্ত প্রচলিত তত্ত্বগুলি সম্পর্কে রিচার্ড ইটনের বিশ্লেষণী আলোচনাটির দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রথমত অভিবাসন তত্ত্ব, যার মূল বক্তব্য হল ভারতীয় মুসলমানদের সিংহভাগ বহিরাগত মুসলমানদের বংশোদ্ভূত। ইটনের মতে এই তত্ত্বটি ইরাণ মালভূমি এবং আরব সাগরের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে যুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ভারতবর্ষের ব্যাপক ইসলামিভবন এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। দ্বিতীয় একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হল তরবারি তত্ত্ব। এক হাতে তলোয়ার এবং অন্য হাতে কোরাণ নিয়ে মুসলিম যোদ্ধারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, ক্রুসেডের আমল থেকেই ইউরোপীয়রা এ কথা প্রচার করে এসেছে এবং উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক আমলে প্রাচ্যবাদ বা Orientalism এই বক্তব্যকে আরও জোরালো করেছে। এই তত্ত্বানুসারে সেই সকল অঞ্চলেই ইসলামিভবন বেশি হওয়া উচিত ছিল যেখানে দীর্ঘকাল মুসলিম সাম্রাজ্য বজায় থেকেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেখানেই ইসলামিভবন বেশি দেখা গেছে, যেমন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব যা ছিল ইন্দো-মুসলিম শাসনের সীমানায়, যেখানে মুসলিম তলোয়ার ছিল সবচেয়ে দুর্বল। সমগ্র উপমহাদেশে মুসলিমদের রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের মাত্রা এবং ইসলামিকরণের মাত্রার মধ্যে একটি ব্যস্তানুপাতের সম্পর্ক রয়েছে। অখণ্ড বঙ্গের ক্ষেত্রেও এই সূত্রটি খাটে, ভারতের ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম জেলাগুলির মধ্যে মুহম্মদ শাসকদের সদর দফতর হিসাবে বিখ্যাত স্থানগুলির কোনটি নেই। ঢাকা প্রায় একশত বছর ধরে নবাবের বাসস্থান ছিল, তবে ফরিদপুর ব্যতীত আশেপাশের যেকোনো জেলার তুলনায় এতে মুসলমানদের সংখ্যা কম। মালদা এবং মুর্শিদাবাদে পুরোনো রাজধানী রয়েছে, যেগুলি প্রায় সাড়ে চার শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসনের কেন্দ্র ছিল, তবুও সেখানে মুসলমানরা দিনাজপুর, রাজশাহী এবং নদীয়ার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির তুলনায় জনসংখ্যার ন্যূন অনুপাত তৈরি করে। ইসলামিভবনের তৃতীয় শক্তিশালী তত্ত্বটিকে ইটন পৃষ্ঠপোষণা তত্ত্ব বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মুসলিম শাসকের দরবারে নিজেদের উচ্চ রাজপদ কায়েম রাখা, কর থেকে ত্রাণ লাভ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের স্যেকুলার সমাজ বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদমশুমারি অনুসারে, উত্তর ভারতের অনেক জমিদার পরিবার রাজস্ব পরিশোধ না করার জন্য কারাদণ্ড থেকে বাঁচতে বা পৈতৃক জমি রক্ষার জন্য নিজেদেরকে মুসলিম ঘোষণা করেছিলেন। তত্ত্বটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও ইটন বলেছেন এই তত্ত্বের একমাত্র সীমাবদ্ধতা হল এই যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রান্তে থাকা পাঞ্জাব বা বাংলার মতো অঞ্চলের বিপুল ধর্মান্তরণের যুক্তি এর দ্বারা বোঝা যায় না। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ তত্ত্বটি হল সামাজিক মুক্তি তত্ত্ব। নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধ, যারা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অত্যাচারে অস্তিত্বের ন্যূনতম মর্যাদাটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল, ইসলামের সামাজিক সাম্য বা মনুষ্যত্বের প্রতি বৃহত্তর শ্রদ্ধার জায়গাটি তাদের আকর্ষণ করে। ইটন আলোকপাত করেছেন, প্রাক-আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাদের ধর্মের সামাজিক সাম্যের আদর্শকে হিন্দু অসমতার বিপরীতে জোর দেননি, বরং হিন্দু বহুদেবতার বিপরীতে ইসলামিক একেশ্বরবাদের উপর জোর দেন। অর্থাৎ, এই দুটি সভ্যতার তুলনা করার জন্য তাদের রেফারেন্স ছিল ধর্মতাত্ত্বিক, সামাজিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম সামাজিক সমতাকে (ধর্মীয় সাম্যের বিপরীতে) উৎসাহিত করে এই ধারণাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সংস্কারকদের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকার থেকে এসেছে। তাছাড়া এমন প্রমাণও অলভ্য নয় যেখানে ইসলামিভবন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি বাংলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। বাংলায় ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে নগরায়ণ এবং নাগরিক অর্থনীতির বিন্যাসকে ইটন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন যা বাঙালি মুসলমানদের জাতি কাঠামোকেও একটা স্পষ্ট চেহারা দিয়েছিল। এই জাতিকাঠামোর মধ্যেও এক ধরনের হায়ারার্কি গড়ে উঠেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মান্তরণের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে জাতিব্যবস্থা অস্বীকার করে নয়, ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে তাঁদের জাতির সংযোগ বজায় রেখে। বৃহত্তর ভারতীয়

উপমহাদেশে ক্ষেত্রে ইসলামিভবনের প্রচলিত তত্ত্বগুলিকে পুনর্বিবেচনা করার পর ইটন তাঁর আলোচনাকে সীমায়িত করেছেন বঙ্গদেশে। এক মন্থর সামাজিক প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই বাংলায় এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল বলে ইটনের মত।[২]

বাংলার স্থানীয় ইসলামকে সমালোচক জগদীশ নারায়ণ সরকার 'লোকপ্রিয় ইসলাম' নামে চিনতে চেয়েছেন।[৩] মমতাজুর রহমানও তাঁর গবেষণায় মধ্যকালীন বঙ্গীয় মুসলমান জনজীবনে ইসলামের অনাড়ম্বর ও কঠোর সংযমী চরিত্র দেখতে পাননি।[৪] সমসাময়িক সাহিত্য পর্যবেক্ষণ করে তাঁর মনে হয়েছে ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন একধরনের লৌকিক ইসলামই তখন প্রচলিত ছিল। বস্তুত ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা ভাষায় ইসলামীয় ধর্মকাব্য রচনার কারণ বা কৈফিয়ত হিসেবে প্রায় প্রত্যেক বাঙালি মুসলমান কবি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁদের কৈফিয়ত থেকে জানা যায় বাংলা ভাষায় ইসলামীয় শাস্ত্রকর্মের নির্দেশ সম্বলিত রচনার অভাবে ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় অপরিচিত এক বাঙালি মুসলমান সমাজ সেসময় অস্তিত্বশীল ছিল। এই আদি বাঙালি মুসলিম লেখকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় আরবি-ফারসি ভাষায় অজ্ঞ বাঙালি মুসলিম জনসমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন স্বরূপ এক সমন্বয়ধর্মী ইসলামি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় যা উনিশ শতকে পাশ্চাত্য অভিঘাত জনিত বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে বিপর্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।[৫] সমালোচকদের পূর্বপাঠগুলিকে স্মরণে রেখে মিশ্র সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যের জায়গা থেকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব একটি সাহিত্যিক প্রকল্পকে যা বাংলার মানুষকে ধীরে ধীরে ইসলামের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

২

বলপূর্বক ধর্মান্তরণের মাধ্যমে মানুষকে হয়ত ধর্মীয় পরিচয়টা দেওয়া যায়, কিন্তু ধর্মীয় আবেগ নয়। ধর্ম মানুষের এক গূঢ় অন্তর্নিহিত প্রবণতা। ধর্মীয় আবেগ না থাকলে মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগের প্রান্তে এসে বাংলায় এত বিপুল ইসলামিক সংস্কৃতি তৈরি হতে পারত না। মধ্যযুগে কোরাণ ও হাদিস বাংলায় অনূদিত হয়নি, কারণ আলেমরা বাংলাকে পবিত্র ভাষা বলে মনে করতেন না। কোনও কোনও মসজিদে শরিয়ত নির্ভর মৌখিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল এবং মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালেও অনেক সময় কোরাণের আয়াত লেখা থাকত যা মসজিদের ক্যালিগ্রাফিক ডিজাইনকে প্রতিফলিত করত। কিন্তু প্রায়োগিক লিখিত চর্চার অভাবে এই ধর্মীয় শিক্ষা জনপরিসরে প্রসার লাভ করেনি। ফলত ইসলাম ধর্মের মূল ধারণাগুলিকে প্রচার করার জন্য এক বিকল্প পথের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগে ইসলামের যাবতীয় ধর্মতত্ত্ব ও কাহিনি রচিত হয়েছে বাংলায়। পুঁথির রচয়িতারা সমাজকে স্বীয় ধর্মে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসী হয়েছিলেন আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত ইসলামি শাস্ত্র গ্রন্থগুলির বাংলা তর্জমা করেন। তাঁদের মতে সমস্যা ছিল দ্বিবিধ। একদিকে বাঙালি সমাজের আরবি ও ফারসি ভাষায় অজ্ঞতা এবং অন্যদিকে ধর্মের পবিত্র বাণী 'ইতর' হিন্দু ভাষায় লেখার বিষয়ে গোঁড়া মুসলমানদের কঠোর বিরোধিতা। এই ধর্মীয় আপত্তির আড়ালে বঙ্গদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতরকার এক গভীর সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভেদ কাজ করেছিল। এই সম্প্রদায় বহিরাগত এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম - এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল এবং সাধারণভাবে আশরাফ ও আজলাফ নামে পরিচিত ছিল। শুদ্ধতা ও সামাজিক সম্মানের নিরিখে আশরাফ শ্রেণি ছিল মুসলিম সমাজে সম্মানের শিখরে। অনেকক্ষেত্রে উত্তরভারতের মুসলমান বঙ্গে উচ্চ সম্মানের অধিকার দাবি করেছে। আশরাফদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও দৃষ্টি ছিল পশ্চিমাভিমুখী। আশরাফদের সাংস্কৃতিক মানসের পবিত্রতার মানদণ্ডে ইস্লামীয় ধর্মচেতনার বাহক হিসেবে বাংলাভাষা ছিল নিতান্ত অযোগ্য।[৬] কিছু সুলতান ও আমীর বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সমর্থন পেয়েছে হিন্দু ধর্মসাহিত্য, ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র নয়।

আশরাফ ও আজলাফ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই ষোড়শ শতকে এক বাঙালি মুসলিম লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভব যাঁরা বাংলাভাষায় প্রথম ইসলামি সাহিত্য রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়ধর্মী বঙ্গীয় ইসলামের ঐতিহ্য-ধারাও সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় আবেগ প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। এই আবেগের বশবর্তী হয়েই কিছু মানুষ সাহিত্য শুনতে শুরু করেছেন এবং এভাবে গড়ে উঠেছে এক সাহিত্য সমাজ। অনুবাদ ও অনুকৃতির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 111
Website: https://tirj.org.in, Page No. 991 - 999
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাধ্যমে ইসলামের মূল তত্ত্বগুলি মধ্যযুগে বাংলায় প্রসার লাভ করেছে। এর বর্গভেদ আছে, কালিক ও আঞ্চলিক ভেদ রয়েছে এবং তা উদ্দিষ্ট শ্রোতার জ্ঞানসীমা ও সামাজিকতার উপর নির্ভর করেছে সবসময়ই। এই সাহিত্য সমাজ গড়ে তুলতে সুফিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। লেখকদের মধ্যে অনেকেই মরমিয়া-পন্থী পীর বা পীরের শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা সমস্যার চেয়েও এঁদের কাছে কঠিনতর সমস্যা ছিল বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের রূপ-কল্প, বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা। পালাপার্বণ, নাট্য, গীত, আখ্যান ও উপাখ্যানময় বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করার পক্ষে ইসলামের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর রূপ অনুকূল ছিল না। বাংলার লোকসমাজে ইসলামের গৌরব-প্রমাণ সূক্ষ্ম ও নীরস তাত্ত্বিক বিচারে নয়, ইসলামীয় আখ্যান ও উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার অতুলনীয় বীর্য ও মহত্ব প্রচারের মধ্যেই সম্ভবপর ছিল। একারণেই আরবি ফারসি গ্রন্থভুক্ত মুসলিম নায়ক-নায়িকাদের বঙ্গের লোকচেতনায় উপস্থাপন করার গভীর আবশ্যকতা ছিল। বাঙালি জনগণের পরিচিত ভাষায় ও রূপে ইসলামীয় ঐতিহ্যধারাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে লেখার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনমনে ইসলাম ধর্মের প্রতি আবেগ সঞ্চারের ক্ষেত্রে কবিরা এক বিশেষ সাহিত্যিক প্রকল্প অবলম্বন করেছিলেন। কাব্যগুলি ইসলাম ধর্ম বিষয়ক হলেও কাব্যের কাঠামো বা অবয়ব বাংলা আঞ্চলিক ও মার্গীয় রীতি অনুসারী। বাঙালি পাঠকের পরিচিত ধর্মীয় বলয়ের মধ্যেই অপরিচিত শব্দ এবং তত্ত্ব ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একটি তুল্য-মূল্য পদ্ধতিতে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চার প্রসার ঘটেছে যা ‘পুরাণ-কোরাণ’ সাহিত্য প্রকল্প নামে পরিচিত।

আমরা সিরাত ও প্রণয়োপাখ্যান-এই দুটি সাহিত্যবর্গ থেকে উদাহরণ নির্বাচন করে উক্ত ‘পুরাণ-কোরাণ’ প্রকল্পটি অনুধাবনের চেষ্টা করব। কাব্য থেকে আমরা মূলত দেখার চেষ্টা করব -

ক. ভাষার সংগঠন এবং বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক।

খ. ভাষা কোন সামাজিক অবস্থান থেকে উঠে আসছে, মার্গীয় না লোকজ।

গ. ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শ্রোতার চরিত্র বোঝা সম্ভব কি না।

ঘ. কাব্যে যে উপমা, রূপক অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে তা মূল আরবি বা ফার্সি কাব্যে থাকা সম্ভব কি না, যদি থাকে তবে বাংলা ভাষায় তা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা যদি উৎস কাব্যে না থাকে তবে নতুন উপমা, রূপকের ব্যবহার হল কেন।

৩

সিরাত হল ইসলামের পবিত্র চরিত্র, বিশেষত পয়গম্বরদের (মহম্মদ ও অন্যান্য নবী) জীবনী। এর দুটো অংশ – মহম্মদ পূর্ববর্তী সকল নবীদের জীবন কাহিনি এবং মহম্মদের জীবন কাহিনি। একটি সিরাত সম্পর্কে আলোচনা করে ‘পুরাণ-কোরাণ’ প্রকল্পটি দেখা যেতে পারে।

সৈয়দ সুলতানের ‘নবীবংশ’ : চট্টগ্রামের সুফি ভাবাপন্ন কবি সৈয়দ সুলতানের ‘নবীবংশ’ কাব্যটি ষোড়শ শতকের রচনা। চট্টগ্রামে দীর্ঘ মুসলিম উপনিবেশের ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলায় মুসলিম আক্রমণের আগে থেকেই এখানে সমুদ্রগামী বণিক-প্রচারক আরবরা ঘাঁটি করেছিল। পাপ হতে পারে এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও কবি দেবভাষা আরবিতে নিবদ্ধ কাহিনিকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন, কারণ তিনি জানেন বঙ্গদেশবাসী আরবি ভাষা বিষয়ে অজ্ঞ। কাব্য নাম থেকেই বোঝা যায় ইসলাম ধর্ম-প্রচারকের জীবন-চরিত ও কাফের দলন কাহিনিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে হরিবংশ-পাণ্ডববিজয়ের ছাঁচে। আল্লাকে কাব্যে ‘নিরঞ্জন’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে –

“আদমের বাক্য শুনি / নিরঞ্জনে কহে পুনি/ সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার।”[৭]

কবি জানেন বহু দেববাদ এবং ঈশ্বরের সাকার অস্তিত্বে বিশ্বাসী বাংলায় নির্গুণ, নিরাকার আল্লার তত্ত্ব প্রচার করা কঠিন। কাব্যে তাই ধর্ম-নিরঞ্জনের অনুষঙ্গে আল্লাকে ‘নিরঞ্জন’ বলা হচ্ছে, কারণ নিরঞ্জন শব্দটি নির্গুণ তত্ত্বের সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ। এমন শব্দ নির্বাচন করা হচ্ছে যা ইসলাম ধর্ম-তত্ত্বের সচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। তাছাড়া ‘নিরঞ্জন’ শব্দটির প্রয়োগ বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিকেও সজাগ করে। বৌদ্ধ ধর্মচর্চাকে কেন্দ্র করে ভারত ও ইরাণের মধ্যে একটা পরোক্ষ সংযোগ

তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধ পরিব্রাজক এবং তাত্ত্বিক Ngan she-kao এর অনুবাদকর্মের সূত্রে। তাঁর অনুবাদের বিষয় ছিল আগম এবং অনুবাদের ভাষা ছিল সম্ভবত ভারতীয় প্রাকৃত বা কোনও ইরাণীয় ভাষা। অন্যদিকে সম্রাট কনিষ্ক পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য ব্যাক্ট্রিয়া, তুর্কিস্তান - এসব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেক বৌদ্ধ লেখকের বিশ্লেষণে তিনি দ্বিতীয় অশোক। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে তাঁর এই অবদান বৌদ্ধধর্মকে ইরাণীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি দিতে অনেকটা সাহায্য করেছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পারস্যের পরিচয়ের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যই প্রমাণিত হচ্ছে।[৮]

ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য কবি হিন্দুর প্রধান দেবতাদের নৈতিক বিচ্যুতি এবং অপবিত্র স্পর্শে ধর্মগ্রন্থ কলুষিত হওয়ার কাহিনির অবতারণা করেছেন -

> "চারি মহাজন স্থানে পাইল চারি বেদ।/ সাম বেদ ব্রহ্মাত পাঠাইলা নৈরাকার।।/তবে যদি বিষ্ণুর হইল উৎপন।/ যজুর্বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।।/ তৃতীয় মহেশ যদি সৃজন হইল।/ ঋক বেদ তাহার স্থানে পাঠাইয়া দিল।।/ চতুর্থে যদি সে হরি হইলা সৃজন।/ অথর্ব বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।।"[৯]

এখানে কবি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই নামক্রম মেনেছেন। এরপর বলা হল পরম যোগী শিব সুরাপান করে আত্মজ্ঞান ও ব্রতচ্যুত হলেন এবং বিষ্ণুও কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। ইবলিস সেই সুযোগে বেদকে অপবিত্র করল এবং এভাবে ঐশ শাস্ত্র 'চতুর্বেদ' বাতিল হয়ে গেল সুতরাং ভারতীয়দের সত্যধর্মরূপে নির্বাচিত হতে পারে একমাত্র ইসলাম, বলা হল –

> "এ চারি বেদত সাক্ষি দিচ্ছে করতার।/ অবশ্য অবশ্য মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।।"[১০]

বহু দেববাদী সমাজে আল্লার ধারণা এমনভাবে দেওয়া হল যাতে মানুষ বহু দেববাদকে নস্যাৎ করে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। বহু দেববাদের একধরনের সমালোচনা উঠে এসেছে এই অংশে। এমনকি দেববাদের আকর গ্রন্থ বেদ দ্বারা মহম্মদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

সৈয়দ সুলতানের আলোচ্য কাব্যে বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব, ইসলামের মূল তাত্ত্বিক বিষয়গুলি এবং অন্যান্য নবীসহ মহম্মদের জীবন বর্ননায় যোগ তত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়; যেমন - আদিমানব আদমের দেহ পরিচয় –

> "অধঃ রেত শিবশক্তি লিঙ্গেতে বহিল/ নাভিদেশে পঞ্চবারি একত্র হইল।।"[১১]

লোক সাধারণের ধর্ম হিসেবেই সুফি ইসলামের মরমিয়া বিস্তার হয়ে উঠেছিল এবং এমতাবস্থায় খুবই স্বাভাবিক ছিল যোগ-তন্ত্র ভিত্তিক সুফির একটা দেশজ অবয়ব গঠন। ইসলাম ধর্মে কী কী করা উচিত অর্থাৎ ফারজ এবং কী কী করলে নরকে যেতে হতে পারে (যেমন - "নামাজ না পড়ে যেবা রোজা না রাখয়ে"[১২]), তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে কাব্যে। এই অংশ থেকে শ্রোতার চরিত্র বোঝা সম্ভব। তাঁদের কাছেই ইসলামি শাস্ত্র তত্ত্ব পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যারা যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম। এক্ষেত্রে আমাদের আঞ্চলিক ও সময়ের ভেদকে মাথায় রাখতে হবে। ষোড়শ শতকে চট্টগ্রাম এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। সেখানে জ্ঞানচর্চা অনেক বেশি সংগঠিত। তার মানে এই নয় যে সারা বাংলা জুড়ে তখন ইসলামি ফারজের কথা প্রচারিত হচ্ছে।

জায়েনউদ্দিনের 'রসুল বিজয়' কাব্য : এ কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একদল ঐতিহাসিকের মতে ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে, অন্য দলের মতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কাব্যটি রচিত হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে মহম্মদের যুদ্ধযাত্রাই এ কাব্যের উপজীব্য। এটি আরবি 'মাগাজী' জাতীয় যুদ্ধ কাব্য। এখানে ইরাকরাজ জয়কুমের সঙ্গে রসুলের লড়াই বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যে দেখা যায় অনুবাদ কীভাবে ভাষাসংস্কৃতি তৈরি করছে। বলা হচ্ছে মহম্মদ 'গাণ্ডীব' নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন। মহম্মদকে হিন্দু করে তোলা কখনোই কবির উদ্দেশ্য নয়। 'গাণ্ডীব' এখানে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধনুকের প্রতিশব্দ। শ্রোতাদের জন্য যুদ্ধের চেনা অস্ত্র প্রসঙ্গ ব্যবহার করছেন কবি। বোঝা যায় যে কবি মহাভারতের বাংলা

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 111
Website: https://tirj.org.in, Page No. 991 - 999
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত এবং জানেন যে তাঁর শ্রোতাদেরও এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা রয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অপেক্ষাও যে রসুলের ধর্মযুদ্ধ বেশি মহিমাব্যঞ্জক সেই বিষয়টি কৌশলে বর্ণনা করেছেন কবি –

> “যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার।/ গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর।।/ কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু।/ সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য।।”[১৩]

যুদ্ধদৃশ্যে দেখা যায় –

> “ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।/ বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।।”[১৪]

এই উপমা ইরাক-ইরাণের মরু আবহে উপযুক্ত হতে পারে না। কাব্যের ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশ সুনিশ্চিতভাবে বঙ্গীয়। চেনা ভাষা কাঠামোর মধ্যে ক্রমশ অচেনা তত্ত্ব পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সিরাতগুলিতে এভাবেই মহম্মদ কেন্দ্রিক আবেগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দৌলত উজীর বাহমাম খানের ‘লাইলী-মজনু’ কাব্য : ইসলামি প্রণয়োপাখ্যানের মধ্যে দৌলত উজীর বাহরাম খান রচিত ‘লাইলী-মজনু’ কাব্যটি আমাদের আলোচ্য। আহমদ শরীফের অনুমান অনুযায়ী ১৫৪৩-১৫৫৩ সালের মধ্যে এ কাব্যটি রচিত হয়েছিল। এ কাহিনি সুফিদের সৃষ্ট। ইরানই সুফি মতের বিকাশ ও প্রসার ক্ষেত্র। ফলত কাহিনির উদ্ভব হয় ইরানীয় ভাষাতেই। নিছক প্রেমকাব্য হিসেবে বাংলায় একে রচন ও পঠন বিষয়ে আলেমদের নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেদিক থেকে লাইলী-মজনুর লৌকিক প্রণয় কথা রচনা করে দৌলত উজীর দুঃসাহসিকতার গৌরব অর্জন করেছেন। ‘হামদ’ অংশে নিরাকার আল্লার ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘নাত’ অংশে রয়েছে সুফিমতের প্রেমজ সৃষ্টিতত্ত্ব –

> “আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন/ যার প্রেম রস হন্তে হইছে সৃজন।”[১৫]

কাব্যে আবু বকর, উমর, উসমান, আলীকে রসুলের ‘পরম চারি বন্ধু’ বলা হয়েছে, বোঝা যায় শিয়া-সুন্নি ভেদকে কবি প্রকট করতে চান না কাব্যে (এই চারজন খলিফা মহম্মদের বংশকে নয়, নির্বাচনকে সমর্থক করেছিলেন)। মরু আরবের কাহিনি হলেও এ কাব্যে আরবের আবহ অত্যন্ত কম। কেবল একবার শিবিরের কথা (লাইলী ‘শিবিরেত গমন করিলা মনোরঙ্গে’[১৬]) এবং যৌতুক স্বরূপ উট দান ও উটের পিঠে চেপে লাইলীর সামদেশে গমন - এটুকুই কেবল আরবি অনুষঙ্গ, আর সব বঙ্গদেশীয়। হিন্দু পুরাণের প্রতুল ব্যবহার রয়েছে কাব্যে। আরব দেশকে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। হিন্দু পুরাণ অনুসারে পুত্র পুত নামক নরক থেকে পিতাকে পরিত্রাণ করে। সেকারণে পিতার মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান একমাত্র পুত্রের দ্বারাই করণীয়। এই ধারণা আত্তীকরণ করেই কবি বলছেন, -

> “সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম।/ ধনপুত্র দুই যার সে বড় সুজন্ম।।”[১৭]

কএস তথা মজনুর বর্ণনা যেন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের রসিক নাগরিকের বর্ণনা –

> “কনক মুকুর জিনি ললাট সুন্দর।/কামের কামান জিনি ভুরু যুগ টান।”[১৮]

ব্যবহৃত অনুষঙ্গগুলি সবই বঙ্গদেশের কাব্য শাস্ত্রীয় ও কাব্য হৃদ্যতাসম্পন্ন। আরব বীরের বর্ণনা বলে মনেই হয় না। লাইলীর রূপ বর্ণনাতেও পৌরাণিক রূপসীদের তুলনা প্রসঙ্গ এসেছে –

> “ইন্দ্রাণী রোহিণী রতি/ অহল্যা দ্রৌপদী সতী/ নহে তার রূপের সমান।”[১৯]

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সুফির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংযোগ রচনা করেছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ। রাধা কৃষ্ণের ভক্তি কেন্দ্রিক সাহিত্য এবং সুফি সাহিত্য উভয়েরই মূল ভাবনায় রয়েছে অপ্রাপ্তির অতলান্ত বেদনা, সযত্নে পোষিত বিচ্ছেদ। সুফি সাধকরাও দেবতাকে প্রিয় হিসেবে দেখেছেন, তাঁকে খুঁজেছেন সারাজীবন ধরে। এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বোঝাতেই নর-নারীর

প্রেমের প্রতিতুলনা আনা হয়েছে। এই তত্ত্বই রূপকায়িত হয়েছে 'লাইলী মজনু' কাব্যে। মজনুর বিরহ দশা বর্ণনাকালে প্রেম সম্পর্কে কবি বলেন –

"ঘরে বড় জঞ্জাল বাহিরে গেলে দুখ/ পিরীতি করিলে জীবনে নাহি সুখ।"[২০]

এ যেন চণ্ডীদাসের রাধার আক্ষেপোক্তি –

"সইকে বলে পিরীতি ভালো/ হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া/ কাঁদিতে জীবন গেল।"[২১]

লাইলীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মজনুর অবস্থা বর্ণনায় কবি বলেছেন, -

"ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে না চিনে আপন।/ ক্ষেণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে পাড়ে লড়।/ ক্ষেণে খায় পাছার ভুমিতে গুরুতর।।"[২২]

মনে পড়ে যায় পূর্বরাগের রাধা বা প্রেমন্মোত্ত চৈতন্যদেবের ছবি। যোগ তত্ত্বে বিশ্বাসী কবির কাব্যের নায়ককেও যোগ সাধনায় রত দেখা যায় –

"তপোবনে তাপসী জপয়ে প্রভুনাম/ মায়াজাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।"[২৩]

ভারতীয় নাথপন্থী যোগীদের সাধনা ও দর্শনের সঙ্গে সুফি মতবাদের একটা সংমিশ্রণের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই। আলবেরুনী তাঁর বইতে ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সঙ্গে সুফি ভাবনার সাযুজ্যের উল্লেখ করেছেন।

কার্যত ভারতীয় পরিমণ্ডলে যে কোনও সাংস্কৃতিক অভিবর্তন (cultural synthesis) - এর ক্ষেত্রে যোগ, তন্ত্র এবং ভক্তি - এই তিনটি ধারার সংস্পর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, সুফির ক্ষেত্রেও তা সত্যি। পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ত্রিপদী পয়ার ছন্দে সুফি ধর্মের মূল তত্ত্ব পেশ করেছেন কবি চেনা ছাঁচের জনপ্রিয় প্রেমকাহিনির রূপকে। বাঙালি শ্রোতার মনে আবেগের উদ্রেক ঘটাতে এই 'পুরাণ-কোরাণ' প্রকল্পটি বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

৪

বাংলার প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্ব একমাত্রিক সময়, সংস্কৃতি বা ধর্মীয় উচ্চারণের পরিসর নয়। এই পর্বে বাংলায় ইসলামের প্রতিগ্রহণও বহুস্তরীয়। বাংলায় ইসলাম গ্রহণকারী কোনও সমরূপ জনগোষ্ঠী ছিল না। স্থানীয় মুসলমানদের একটা নিজস্ব নৃ-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। এরা বৌদ্ধিক স্তরে মুসলমান হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে এরা নিজেদের নৃ-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করেছে এবং ইসলামের কিছু সাংস্কৃতিক উপাদানকে গ্রহণ করেছে। এই সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম ছিল সাহিত্য। বাংলায় ইসলামের লোকপ্রিয়তার জায়গা থেকে এই সাহিত্যগুলি আঞ্চলিক শ্রোতৃবর্গের আবেগের পরিসরে স্থান পেয়েছিল। তুর্কি আক্রমণের পর বাংলায় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সমাজের একধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুবাদ শুরু হয়েছিল। বাঙালি তখন তাদের সাংস্কৃতিক নায়কের সন্ধান করছিল পুরাণ ও মহাকাব্যের জগতে। ফলত ইসলাম সমাজেও নবীদের জীবন-কথা পরিবেশনার একটা তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল সিরাত সাহিত্যের মাধ্যমে। তখন বাংলার বহুদেববাদী সমাজে অবতার বা সাধু-সন্তের চরিত্রের প্রতি যে সম্মানজনক অভিব্যক্তি ছিল সেই সমাজই ধীরে ধীরে ইসলামের পবিত্র চরিত্রদের গ্রহণ করেছে। এঁরা বঙ্গদেশের মননে স্থান পেয়েছেন। এমন চেনা ভাষা-কাঠামো এবং চেনা ধর্মীয় অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে এঁদের পবিত্র জীবন কাহিনি পেশ করা হয়েছিল যে বাংলার মানুষ তাঁদের অন্য সমাজভুক্ত মনে করেনি। আলেমদের নিষেধবাণী সত্ত্বেও ইসলামি কাব্যগুলিতে মূল থেকে প্রতিসরণ ও প্রতিস্থাপনের রূপরেখা দেখা যায়। কাব্যে অবলম্বিত পৌরাণিক আবহের মধ্য দিয়েই কোরাণের আদর্শ স্থান পেতে শুরু করে বঙ্গীয় মানসে। সুকৌশলে কবিরা তুল্য-মূল্য মানদণ্ডে একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্ম, আল্লা ও রসুলের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করেছেন কাব্যে, যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেও নায়কত্বের বিকল্প ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাব্যে। সিরাতগুলির মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন অনেক বেশি খুঁজে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ইসলামি প্রণয়োপাখ্যানগুলির মধ্যে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও সুফি ভক্তিবাদের সহাবস্থানের পরিসর প্রশস্ত। এ বিষয়টি আরও প্রকট হয় সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম এবং তার পরবর্তী লোকায়ত পর্যায়গুলির সঙ্গে সুফির অন্তর্লীন যোগাযোগের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলে। রাধা কৃষ্ণের ভক্তিবাদী চিন্তা সুফির মধ্যে অনুপ্রবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মীর আব্দুল ওয়াহিদ বিলগরামি তাঁর 'হকায়িক ই হিন্দি' গ্রন্থে। এখানে বিলগরামি কৃষ্ণ ও তৎকেন্দ্রিক অন্যান্য বিষয়গুলিকে সুফি ভাবনার রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বইতেই 'গীতগোবিন্দম্' সম্পর্কে বিলগরামির বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন –

> "(...) the love scenes and rhetorical graces of the poet are not to be understood in the sense that persons of civil minds are dispositions attached to them. Radhika the heroine is heavenly wisdom. The milkmaids, who divert Krishna from his allegiance to her, are the senses of smell, sight, touch, taste and hearing. Krishna represented as pursuing them is the human soul, which attaches itself to earthly pleasures. The return of Krishna to his first Love is the return of the repentant sinner to God, which give joy and heaven."[২৪]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সুফির চোখে শ্রীরাধা ধর্মীয় প্রজ্ঞা এবং শ্রীকৃষ্ণ মানবাত্মার পরম প্রকাশ। সুফির সমস্ত কাহিনিতেই সাধকের সাধনা মানে পুরুষের অভিযাত্রা। আমাদের আলোচ্য লাইলী-মজনুর কাহিনিতেও মজনুই কিন্তু লাইলীর দিকে ধাবিত হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের সাধনাতেও পুরুষই মুখ্যত অভিযাত্রী। ভারতে রাধাকৃষ্ণ ভক্তিবাদী ঘরানা নারীর অভিযাত্রাকে প্রধান করেছে। বৈষ্ণব সাধনা রাধার সাধনা, রাধার অভিযাত্রা। তাই রাধার মধ্যেই সুফি সাধক নিজেকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই তাত্ত্বিক এবং অনুভূতির সহাবস্থানের জায়গা থেকে ইসলামি প্রণয়োপাখ্যানগুলির মধ্যে 'পুরাণ–কোরাণ' প্রকল্পটি বিশেষ রূপ পেয়েছে।

সবশেষে বলা যায় বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক ধর্মান্তরণ এবং বহিরাগত ধর্ম ও স্থানীয় সংস্কৃতির যে বিরোধ ও ব্যবধান ছিল সেখানে বঙ্গীয় মুসলমানদের সাহিত্যচর্চায় 'পুরাণ-কোরাণ' প্রকল্পটি সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সমন্বয় ও স্বাতন্ত্র্যের সার্থক রূপ পরিগ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে উনবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সম্প্রদায়বোধ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এই সাহিত্যিক সমন্বয়বাদ কীভাবে ক্রমবিলুপ্ত হয়েছে সে প্রসঙ্গ একটি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

Reference:

১. Das, Sisir kumar. *A History of Indian Literature, 500-1399 : From Courtly to the Popular.* New Delhi: Sahitya Academy. 2005. P. 221

২. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760.* University of California Press. 1996. Page. 58

৩. সরকার, জগদীশ নারায়ণ. *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (মধ্য যুগ).* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ. ১৯১৪. পৃ. ৫

৪. রহমান, মমতাজুর. *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক.* ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ১৯৮১. পৃ. ৭৪

৫. রহমান, আর. হাবিব. (সম্পা.) *ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ.* অসীম রায়. কলকাতা : রেডিয়্যান্স. ২০১৫. পৃ. ৮৩২

৬. তদেব, পৃ. ৩৯

৭. শরীফ, আহমদ. *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতির রূপ.* ঢাকা: সময় প্রকাশন. ২০০৪. পৃ. ১৮২

৮. Bagchi, P.C. *Some Early Buddhist Missionaries at Persia in China.* The Calcutta Review. Third Series. Vol-XXIV. Kolkata : The University of Calcutta. July-September 1927. Page. 60 - 64

৯. শরীফ, আহমদ. *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতির রূপ,* ঢাকা: সময় প্রকাশন. ২০০৪. পৃ. ১৮৩-১৮৪

১০. তদেব. পৃ. ১৮৪

১১. তদেব. পৃ. ১৮০

১২. তদেব. পৃ. ২০১

১৩. তদেব. পৃ. ২৩৪

১৪. তদেব. পৃ. ২৩৪

১৫. তদেব. পৃ. ২১৯

১৬. তদেব. পৃ. ২১৪

১৭. তদেব. পৃ. ২১৮

১৮. শরীফ, আহমেদ (সম্পা.) *দৌলত উজীর বাহরাম খান বিরচিত লাইলী মজনু.* ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ১৩৯০. পৃ. ৮২

১৯. তদেব. পৃ. ৮৩

২০. তদেব. পৃ. ৩৪

২১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা). *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. ১৯৫৮. পৃ. ৬৩

২২. শরীফ, আহমেদ (সম্পা.) *দৌলত উজীর বাহরাম খান বিরচিত লাইলী মজনু.* ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ১৩৯০. পৃ. ৭৯

২৩. তদেব. পৃ. ৬৫

২৪. M.A. Macauliffe. *The Sikh Religion. Vi*. Oxford. 1909. Page. 10

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 1000 - 1007
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার স্বরূপ

মোসাম্মৎ রোজিনা খাতুন
গবেষক, ইসলামিক থিওলজি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID : mstrojinakhatun2018@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Islamic Literature, Al-Quran, Tafser, Muslim Influence. Cultural Integration, Middle Ages, Modern Era, Literary Evolution & Persian-Arabic Influence.

Abstract
The relationship between Bengali language and literature has been profoundly shaped by Islamic influences since the arrival of Islam in Bengal, which dates back to the Abbasid Caliphate during the 8th century. Although political dominance began in the 13th century with Ikhtiyaruddin Muhammad bin Bakhtiyar Khalji, Islam's cultural and literary integration preceded this period. Early Islamic influence was subtle, with direct contributions becoming apparent only by the medieval era. Notably, Syed Sultan initiated Islamic themes in Bengali poetry, inspiring a renewed cultural identity among Bengali Muslims. Medieval Islamic literature was heavily poetic, drawing from Persian and Hindi romantic traditions, with figures like Shah Muhammad Saghir and Alawal contributing to themes inspired by the Quran and Sunnah. The 15th to 19th centuries saw a flourish in Islamic Bengali poetry, including religious praise and mystical narratives. The advent of modern Islamic literature marked a shift towards prose, reflecting the socio-political changes brought by colonial policies. Prominent figure personality like, Mir Mosharraf Hossain and Syed Nuruddin enriched Islamic literature through works on the Prophet's life, historical narratives, and social commentaries, integrating modernity while preserving Islamic essence. In the 19th and early 20th centuries, Islamic literature adapted to address challenges posed by Christian missionary criticisms. Notable figures like Sheikh Abdur Rahim pioneered biographical and theological works, including Bengali translations of the Quran. This era marked a synthesis of traditional values and modern aspirations, underscoring the dynamic evolution of Islamic literary expression in Bengal.

Discussion

ভূমিকা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরমধ্যে এক নিগূঢ়সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান। আর এই সম্পর্কের সাথে জুড়ে আছে ইসলামী সাহিতের প্রসঙ্গটিও। বঙ্গভূমিতে বাঙালি মুসলমানদের আগমনের ইতিহাসটি ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের সাথে

সম্পর্কিত। প্রাচীন বিভিন্ন তত্ত্ব, উপাত্ত ও গবেষণা দ্বারা অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে, প্রাচীন বাংলায় প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামের প্রচারকগণ পৌঁছে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন যে - বাংলার মাটি মুসলিমদের করতলগত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় অর্থাৎ সন ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীবীর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী হিন্দুরাজ লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে।[১] আর বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে আরো অনেক আগে অর্থাৎ আধুনিক গবেষণা অনুসারে আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে (৭৮৬-৮০৯) এবং ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। ফলে মুসলিমদের রাজ্যাধিকারের সময় ইসলাম ছিল বংলার ঘাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।[২] এদিকে বাংলার বুকে আঠার শতকের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী সাহিত্যের মিশ্র সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রত্যক্ষ সাহিত্যে তেমন অগ্রগতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। মুসলিম শাসক ও ইসলাম প্রচারকরা বাংলাকে যেমন রাজনীতি এবং ধর্মপ্রচারের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছে, ঠিক তেমনি তাঁদের আন্তরিকতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন লেখকদের হাতে অবহেলিত বাংলা ভাষাও নবজীবন ফিরে পাই। কাব্যগ্রন্থ, গদ্যরীতি, গীতিকবিতা, শাস্ত্রীয় ইসলামের বিধান সম্বলিত ইত্যাদি গ্রন্থরচনায় মুসলিম সাহিত্য সাধনার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তারই নীতিদীর্ঘ আলোচনা সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয়বস্তু বোধগম্যের সুবিধার্থে আলোচ্য প্রবন্ধকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে নিম্নে আলোচনা প্রদত্ত করা হল।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের প্রত্যুষকাল : বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সাহিত্যের মধ্যে নিশ্চিতভাবে একটি যুগের সমাপ্তি ও অপরটির সূচনাকাল নির্নয় করা দুষ্কর। তা সত্ত্বেও সাহিত্যের ইতিহাস বিশারদগণ প্রয়োজনের তাগিদেই, বাংলা সাহিত্যের সহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে বিভক্ত করেছে। কালের দিক দিয়ে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হচ্ছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সর্বনিম্ন সীমারেখা।[৩] বঙ্গদেশে ইসলামের আবির্ভাব অষ্টম শতাব্দীতে ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব শুরু আরও কয়েক শতাব্দী পরে। প্রত্যেক সাহিত্যের সূচনা যেমন কবিতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অষ্টম শতকের কবি সরহপা-কেই বাংলাসাহিত্যের প্রথম কবি বলে ধরা হয়। তিনি বাংলা ভাষার আদিরূপ চর্যাগীতিতে দোহা রচনা করেন।[৪]

অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় ছয়/ সাত শত বছর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী ভাবধারায় প্রচলিত ছিল। বাংলাসাহিত্যের আদিপর্বে যেসব সাহিত্য পদবাচ্য কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেসবের মধ্যে ‘শূন্য পূরাণ’, ‘ধর্মমঙ্গল’, ‘মনসামঙ্গল’, ‘রামায়ন’, ‘মহাভারত’, ‘চণ্ডিমঙ্গল’, ‘গোরক্ষ বিজয়’ ইত্যাদি প্রধান। বঙ্গদেশের মুসলমানরা এসবই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) সম্ভবত সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে এক নবচেতনার সঞ্চার করেন। তাঁর সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ *‘নবীবংশ’* এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।[৫] সৈয়দ সুলতানের আগে জৈনুদ্দীন, সাবিরিদ খান প্রমুখ অবশ্য ‘রাসূল বিজয়’ কাব্য রচনা করেন তবে তাঁদের রচনা সৈয়দ সুলতানের মত সার্থক হয়নি। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বা অনেকের পূর্বপুরুষ বহিরাগত, এ কথা সত্য; কিন্তু এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা মূলত এদেশীয় অমুসলমানদের উত্তর পুরুষ।[৬]

মধ্যযুগে ইসলামী সাহিত্য চর্চা : ত্রয়োদশ শতাব্দীর উন্মেষের সাথে সাথে মধ্যযুগের সূচনা হয়। প্রথম দেড় শতকের সাহিত্যচর্চার স্বরূপ আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেলেও তারপরই সৃষ্টিপ্রাচুর্যে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধলাভ করেছে। ফার্সী ও হিন্দী-আওধী সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে মুসলমান বাংলা সাহিত্যের রুচিবদল করেছিল। জেনে রাখা ভালো যে, মধ্যযুগের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যম ছিল পদ্য-গদ্যরীতি তখনো বিকাশলাভ করেনি। পরবর্তীকালে শেখ চান্দ, শাহ মোহাম্মদ সগীর, আলাওল, মোহাম্মদ খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ মূর্তজা, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ হামজা, শাহ গরীবুল্লাহ, মোহাম্মদ দানেশ প্রমুখ মুসলিম কবিরা তাঁদের রচনায় পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী সাহিত্যের প্রভাব ঘটিয়েছেন।[৭] এমনকি আল্লাহ ও রাসূলের হামদ্, নাত-ধর্মী কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আলোকময় করেছেন। এরা মধ্যযুগের ইসালামী সাহিত্যের রুপকার বলে চিহ্নিত। এদের সময়সীমা ছিল পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত।[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আধুনিক যুগে ইসলামী সাহিত্য চর্চা : মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন হল এ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে যুগান্তরের কাল বলে নির্দেশ করেছেন। আবার কারো মতে, ইতিহাসে আধুনিক যুগ বলতে উনিশ শতকের সূচনা হতে অদ্যবধি সময়কে ধরা হয়। আধুনিক যুগে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ভাবনাকে দু'টি পর্বে ভাগ করে দেখা যেতে পারে - প্রাচীন ধারার অনুবর্তন এবং আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। আধুনিক পূর্ব সাহিত্য ধারার মধ্যে দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী শব্দবহুল কাব্যরচনার একটি ধারা মুসলমানের মধ্যে গড়ে ওঠে, যা সাধারনত মুসলমানি বাংলা কাব্য, বটতলার পুঁথি বা দোভাষী পুঁথি নামে পরিচিত। তাই এই ধারাকে ইসলামী সাহিত্যে মিশ্র সংস্করণ নামেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[৯] নিম্নে এই প্রসঙ্গে আলোচনা প্রদত্ত করা হল।

ইসলামী সাহিত্য চর্চায় মিশ্র সংস্করণ : মুঘল আমলে ফার্সী সংস্কৃতির আধিপত্যের সময়ে এই কাব্যধারা বিকাশ লাভ করে। তবে বিংশ শতাব্দীতেও এই রীতিতে কাব্য চর্চা হয়েছে যথেষ্ট পরিমানে।[১০] তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ফার্সী ভাষা শিখতেন সরকারী চাকরির সুবিধার্থে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে ফার্সী ভাষার প্রয়োগ হলেও শাস্ত্রালোচনায় আরবী ও সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্য ব্রিটিশ আমলের প্রথম পর্যায়ে অব্যহত ছিল। হিন্দু-মুসলিম আইনজ্ঞ কর্মচারী সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ওয়ারেন হেস্টিংস আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ দেখালেন।[১১] তার ফলে ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়, এ সম্পর্কে Indian Education commission Report (1822)এ বলা হয়েছে –

> "When in 1782 the Calcutta Madrassa was founded by Warren Hastings. It was designed to quality the Muhammadans of Bengal for the public service… and to enable them to complete, on more equal terms, with the Hindus for employment under Government."[১২]

১৭৮৪-তে এশিয়াটিক সোসাইটি ও ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সংস্কৃত কলেজের উদ্বোধন হয়। অষ্টদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে দু'জন মুসলিম কবি বর্তমান ছিলেন বলে মনে করা হয়, মির্জা হুসেন আলী ও সৈয়দ জাফর খাঁ।[১৩] কিন্তু ক্রান্তিকালে বাঙালি মুসলমানের হাতে প্রকৃত পক্ষে যে ধারাটি বিকাশলাভ করে, তা হল বিদেশী শব্দবহুল বাংলা কাব্য। সুতরাং বিদেশী শব্দ বাহুল্যের কথা বিবেচনা করে একে মিশ্র ভাষা বলা অসঙ্গত নয় এবং তার অনুসরণে এই কাব্য ধারাকেও মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[১৪] এই ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে – আরবী, ফার্সী, হিন্দি শব্দের বাহুল্য। যেমন -

> "কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
> আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম।।"[১৫]

এখানে এগারোটি শব্দের মধ্যে চারটি মাত্র বাংলা শব্দ, তার মধ্যে একটি 'আধা' উর্দু-হিন্দিতেও ব্যবহৃত হয়। বাংলা শব্দবিহীন উদ্ধৃতির উদাহরণও বিরল নয় -

> "ভেজ আর রব মেরে দরুদ ছালাম।
> আপ্পে পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।।"[১৬]

অনেক সময়ে প্রচলিত বাংলা শব্দের পরিবর্তেও অপ্রচলিত বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কতিপয় নমূনা হল - আখের, আজিম, আন্দেশা, আফতাব, আবদার, আসক, এিকন, কদ, কুন, খহেশ, গুমান, সূরাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধিকতর ব্যবহৃত উর্দু-হিন্দি শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় আওরাত, আবি, আঁসু, এয়সা, কাব, কাহে, খাতির, ঘড়ি, জান ইত্যাদি শব্দ। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যগুলোকে বিষয়বস্তর দিক দিয়ে কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা -

ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান : যেমন ইউসুফ-যুলেখা, লায়লী-মজনু, বেনজীর-বদরে মনীর, হুসনাবানু-মনীর শামী (হাতেম তাই) প্রভৃতি

খ. সাম্প্রদায়িক কাব্য : আমীর-হামজা, জঙ্গনামা, কাফের দলন কাহিনী, বনবিবির জহুরানামা, সত্য পীরের পুঁথি প্রভৃতি।

গ. ইসলামের শাস্ত্রীয় বিধান : ধর্ম, ইতিহাস, নবী-আউলিয়ার জীবনকথা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছন্দবদ্ধ রচনা, যেমন - কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আম্বিয়া, হাজার মসলা, শানে নুযূল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইসলাম কেন্দিক জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অতশয় আগ্রহের প্রকাশ ইসলামী সাহিত্যে মিশ্র সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী সাহিত্য চর্চায় আধুনিক যুগের ক্রমবিকাশ : বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য চর্চার নতুন পর্বের সূচনা হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে, যা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ নামে পরিচিত। এই সময় থেকে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৮৭০-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগ।[১৭] মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আমরা যা লক্ষ্য করেছি অর্থাৎ ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব বা সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন সচেতন না হয়েও নিজের সম্প্রদায় সম্পর্কে এক ধরনের মুগ্ধতা, মুসলমানিত্বের একটা অন্ধ গৌরব। আধুনিককালের লেখকদের মধ্যে এই আবেগ একটু উন্নত আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

এ যুগের প্রথম পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চট্টোগ্রামের সৈয়দ নূরউদ্দীন। শাস্ত্রকথা পর্যায়ের কতিপয় কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন। ১১৯৭ বঙ্গাব্দে তাঁর রচিত 'দাকায়েকুল হাকায়েক' ও 'রূহনামা মউতনামা' প্রকাশ পায়। ইমাম হাফিজউদ্দীন নফসী রচিত আরবী *কনজুদ দাকায়িকের* অনুবাদ এই গ্রন্থটিতে মৃত্যু-সম্পর্কীত নানারকম তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[১৮] এসব তথ্য সর্বদা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে গৃহীত নয়, বরঞ্চ কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ সূফী সাধকেরা রূপক দিয়ে যেসব কথা বলেছেন এর মধ্যে সেসব কোথাও বিবৃত হয়েছে। আধুনিক ধারায় বাংলার কবিতা যখন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, ঠিক সেই সময়ই পুরানো ধারার চরম অবনতি ঘটেছিল। এই অবস্থায় বাংলা ভাষায় মুষ্ঠিমেয় মুসলমানের মধ্যে মধ্যযুগের কাব্যদর্শ ফিরিয়ে আনার একটি প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। এই সময়েই বাঙালি মুসলমান লেখকদের গদ্যরচনা শুরু হয়। সেক্ষেত্রেও পথিকৃৎ ছিলেন এমন ব্যক্তিরা, যাঁরা মধ্যযুগীয় আদর্শে কাব্য রচনা করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি বলে এই নতুন গদ্যকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁদের বিলম্ব হয়েছিল। গদ্য রচনার মাধ্যমে যাঁরা আধুনিকতার অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী, তাঁর রচিত ভাবলাভ কাব্য ও উচিত শ্রাবন উল্লেখযোগ্য।[১৯] ১৮২৪ সালের মধ্যেই কলকাতায় বাঙালি মুসলমানের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয়। পরে এর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব ছাপাখানা থেকে অজস্র পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্য, গদ্য-পদ্য এইসব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত।

এ যুগের মুসলিম সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) নিঃসন্দেহে অন্যতম।[২০] তাঁর চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় প্রায় পঁচিশটি প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রে বিভিন্ন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে - উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রহসন, প্রবন্ধ, জীবনচরিত, ধর্মবিষয়ক রচনা। ১৮৪৮ খ্রি. নদীয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনীপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ইসলামী সাহিত্যে তাঁর প্রথম রচনা হল, 'মৌলুদ শরীফ'।[২১] উক্ত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ছন্দোবদ্ধ, টীকাগদ্যে লেখা। হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনকাহিনী ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এতে সংকলিত হয়েছে। এই পর্যায়ে তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'বিবি খোদেজার বিবাহে' (১৯০৫) খাদিজা রা. কে যতদূর সম্ভব কুমারী নায়িকার গৌরবদানের চেষ্টা আছে, একথা তিনি বলেছেন আর রাসূল সা. এর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় অনেক দিয়েছেন। এরপর তিনি রচনা করেন হযরত ওমরের ধর্মজীবনলাভ (১৯০৫), হযরত বেলাল রা. এর জীবনী (১৯০৫), মদীনার গৌরব (১৯০৬) প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ রচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্য রচনা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত। মোশাররফ হোসেনের মত এ যুগের ইসলামী সাহিত্য রচনার আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মুজাম্মেল হক। হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী, খাদিজা রা. এর কাহিনী প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। তাঁর পরবর্তী রচনা 'মাওলানা পরিচয়' (১৯১৪), 'কামার উল উলামা', 'খাজা মইনুদ্দীন চিশতী' (১৯১৮) ইত্যাদি।

তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সর্বধর্মের সমন্বয়ে তৎপর ছিল। রাজা রামমোহন রায় ইসলাম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অনেকটা এই প্রভাবেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত তিনি আচারনিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমানের প্রশংসা করেছিলেন।[২২] কেশবচন্দ্র সেন ইসলামের মর্মকথা অধ্যয়নের জন্য গিরিশচন্দ্র সেনকে (১৮৩৮-১৯১০) নিযুক্ত করেছিলেন। ভাই গিরিশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চন্দ্র সেনই প্রথম 'আল-কুরআন' ও 'আল-হাদীসে'র বাংলা অনুবাদ করেন (১৮৮৫) এবং হযরত মুহাম্মদ সা. ও সুফীপন্থি পীরদের জীবন চরিত রচনা করেন।[২৩] কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'মহাম্মদ চরিত' (১৮৮৬) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কীত রচনাবলীর মূলে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরূপ প্রচারণাও অনেকখানি কাজ করেছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের আক্রমন সবটুকু যে হিন্দু সমাজের মধ্যে পড়েছিল, তা নয়। ইসলামের মেরুদণ্ডেও তারা আঘাত হেনেছিল- রচনা, বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে। সাধু ভাষায় তাদের রচনার নমূনা, জে লঙ প্রণীত 'মহাম্মদের জীবনচরিত' (১৮৫৫)।[২৪] এতে হযরত মুহাম্মদ সা. কে মৃগীরোগী, কুরআন-রচয়িতা, সাংসারিক সুখান্বেষী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পাদ্রী এইচ, জি রাউসের অনূদিত '*ফোরকান*' (১৮৮৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন আল-কুরআন ঐশী রচনা নয়।[২৫]

মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে এবং ইসলাম সম্পর্কীত তত্ত্ব ও তথ্যমূলক গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে শেখ আবদুর রহিমকে (১৮৫৯-১৯৩১) একজন পথকৃৎ বলা যেতে পারে।[২৬] ইসালামী সাহিত্যে তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা 'হযরত মুহাম্মদ সা.এর জীবনচরতও ধর্ম্মনীতি' (ফাল্গুন, ১২৯৮/১৮৮৭)। তাঁর আগে আর কোন বাঙালি মুসলমান হযরতের সীরাত রচনা করেননি। এছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআনের সুবিখ্যাত 'সূরা ফীলের' বঙ্গানুবাদ করেন। আবদুর রহিম ও আরও একজন লেখক মেয়ারাজ উদ্দীনের সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন মাশহাদির যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এলে তাঁর সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘটে। এই সময় বাঙালি মুসলমানদের ধর্মান্তর গ্রহণের সমস্যা এদেরকে ভাবিয়ে তোলে। এঁরা উপলব্ধি করেন যে, এই ভাঙন রোধ করতে হলে বাংলা ভাষায় ইসলামের স্বরূপ প্রকাশ করে গ্রন্থ রচনা করা দরকার। এই ভাবনা-চিন্তাকে সামনে রেখে তাঁরা বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার সারকথা বাংলা ভাষায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। মেয়ারাজউদ্দীন মূলগ্রন্থ সংগ্রহ করতেন, আবদুর রহিম ও মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন অনুবাদ করতেন। 'এসলাম তত্ত্ব' নামে এই পরিকল্পিত পুস্তকটির দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৯৫ ও ১২৯৬ বংগাব্দে। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁরা যেসব পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ইমাম গাজ্জালীর 'ইহিয়া-উল-উলম', শাহ ওয়ালীউল্লাহর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ', সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর 'নেচার ও নেচারিয়া', চিরাগ আলীর 'জিহাদ' ও Reforms under Moslem Rule, গিবনের Decline and Fall of Roman Empire এবং কালাইলের Hero and Hero Worship, Hero as a Prophet - এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই বইতে আলোচ্য বিষয় হল – 'নাস্তিকতা', 'ইসলাম', 'বিশ্বাস' ও 'কুরআন শরীফ'।[২৭] এছাড়াও আবদুর রহিম এর ইসালামী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা মধ্যে রয়েছে - ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ (১৮৯০), ইসলাম (১৮৯৬), নামাজ তত্ত্ব (১৮৯৮), হজ ও বিধি (১৯০৩) প্রভৃতি।

ইসালামী সাহিত্য চর্চার স্বরূপ গবেষণা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মদ সা. এঁর জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে আমরা বহু মুসলিম-অমুসলিম মনীষীদের অবদান দেখতে পায়। তন্মধ্যে গিরিশ চন্দ্র সেন, শেখ আবদুর রহিম্, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মুনশী ময়েজুদ্দীন আহ্‌মদ ওরফে মধু মিঞা, সৈয়দ শারাফত আলী, মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মাওলানা তাহির, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুজাম্মেল হক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ রচনায় যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায়, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের প্রথম দশকে আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদের সূচনা হয় বাংলাদেশের রংপুর জেলার মুকুটপুর নিবাসী আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার মাধ্যমে।[২৮] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮১-১৮৮৫ খ্রি.) আল-কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার কৃতিত্ব ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভাই গিরিশ চন্দ্রের। তাঁর অনুবাদ সাহিত্যিক মূল্যায়নে প্রশংসার দাবি রাখলেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত মোটেই নয়। অত্যাধিক ভূল-ভ্রান্তির ফলে তাঁর অনুবাদ পাঠকের নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যার্থ হয়েছে। তবে সাহিত্যিক বিচারে এটি বাংলা ভাষায় কুরআনী সাহিত্যে একটি সংযোজন বটে। ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআনের যতো অনুবাদ হয়েছে সেগুলো ছিল আংশিক ও কাব্যানুবাদ। আর এটি হল বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদ।[২৯]

বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে মাওলানা নইমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৮ খ্রি.) সর্ব প্রথম পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদসহ তাফসীর রচনা করেন। ১ম থেকে ১০ম পারা/ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৮৭-১৯০৮ খ্রি. এর মধ্যে তা প্রকাশিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়। তারপর তাঁর পুত্রগন তাঁরই অনুসরণে ২৩ পারা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ সহ তাফসীর রচনা করে ১৯০৯ খ্রি. প্রকাশ করেন।[৩০] বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারত উপমহাদেশে ব্যাপক ভাবে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য চর্চা শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রি.পর্যন্ত অখণ্ড ভারতে আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও তফসীর চর্চায় যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন - মাওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২ খ্রি.), মাওলানা তাসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭খ্রি.), রেভারেন্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক (১৮৬১-১৯৫০ খ্রি.), আবুল ফজল আব্দুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭খ্রি.), মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম (১৮৮৭-১৯৫৭ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রি.), ফজলুর রহীম চৌধুরী (১৮৯৬-১৯২৯ খ্রি.) ও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬০ খ্রি.) প্রমুখ।[৩১] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম পন্ডিত, কবি, সাহিত্যিক দের অনেকেই বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের আংশিক অনুবাদ ও তাফসীর রচনায়ও অবদান রেখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.) অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'কোরআন শরীফ' ১ম, ২য়, ৩য় পারা ও আমপারা। এয়ার আহমদ এল. টি. (মৃ.১৯৪৪ খ্রি.) এঁর 'আমপারার বাঙ্গালা তফছির'। মোহাম্মদ গোলাম আকবরের (মৃ.১৯৫৬ খৃ.) 'আমপারার তাফসির'। মুফতি মুহাম্মদ ওয়াফী (মৃ.১৯৪৫ খ্রি.) এঁর 'তাফসীর পারা আম্ম' এবং মাওলানা যুলফিকার আলীর (মৃ.১৯৪৫ খ্রি.) 'কুরআন শরীফ : আমপারার তাফসীর', কাজী নজরুল ইসালাম 'কাব্য আমপারা' (১৯৩০) প্রভৃতি।[৩২]

ইসালামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে যাঁরা বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। 'ভারতের মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪) সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কেবল মুসলমানদের কীর্তিকাহিনী বিবৃত করে তিনি ক্ষান্ত হন নি। সাথে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ইতিহাস তিনি ব্যক্ত করেছেন।[৩৩] এ বিষয়ে আরও বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরিদপুর জেলার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যে এক নবসংস্কার সাধন করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি যেমন নিজ আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে, 'কুরআন আমার বর্ম/ ইসালাম আমার ধর্ম/ মুসলিম আমার পরিচয়', তেমনি বাংলা সাহিত্যকে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এমনকি ফার্সী কবিতা অনুবাদের মাধ্যমেও ইসলামের আদর্শ পরিস্ফুট করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে। নজরুল যেমন এক অনন্য প্রতিভা তেমনি সেই বহুমুখী প্রতিভার ছাপ তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র বিরাজমান।[৩৪] নজরুল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে একথা নির্দিধায় স্বীকার করতে হয় যে, ইসলামী সাহিত্যকে বাংলা ভাষায় আলোকিত করে রেখেছে কবি নজরুলের অবদান। এছাড়াও বাঙালি পণ্ডিত কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় আরও বহু রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্খায় আলোচনা পরিহার করা হল।

উপসংহার : আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের স্বরূপ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আলোচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত শিরোনামের বিষয়বস্তুর উপর কয়েকটি বৃহৎ অধ্যায় রচনা করা সম্ভব হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মে সংক্ষিপ্তাকারে তা বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের সঠিক সূচনাকাল নির্নয় করা দুষ্কর। মধ্যযুগে ইসলামী সাহিত্যের কয়েকটি খণ্ডীত রচনা পাওয়া গেলেও ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মূলত পুরানো আদর্শই অনুসৃত হয়, তারপরে দেখা দেয় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। ১৮৬০ সালকে বিশেষত আমরা যখন বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল হিসেবে ধরে নিয়েছি, তখন এই সময়টাকে বলা যেতে পারে কালান্তরের সীমারেখা। তবে ১৮৫৯ এর আগে ইসালামী সাহিত্যে প্রত্যক্ষ সূত্রপাত ঘটেনি। সুতরাং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দকে মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে গণ্য করা অত্যুক্ত নয়। এই পর্যায়ে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য। পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালি মনীষীদের মধ্যে দেখা যায় ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সমাজনীতি সম্পর্কে সগর্ব ব্যাখাদানের প্রচেষ্টা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহপূর্ণ মনোভাব। এই সময় ইসালামী সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছিল হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রচেষ্টা। সেইসাথে পবিত্র

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকবর্তিকা, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি এবং অদ্যাবধি এই ধারা বিকশিত হয়ে ইসলামী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

Reference:

১. মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ: ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, প্রসঙ্গকথা দ্রষ্টব্য।
২. মুজীবুর রহমান ড.মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, ১ম সংস্করণ, পৃ.২৮-২৯
৩. মতিউর রহমান মুহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ১৩-১৭ বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রহেলিকাময় চর্চাগীতি এ যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন।
৪. আবদুস সাত্তার, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, মশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ: ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, পৃ. ২৭৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৬. 'Bengal', Encyclopedia of Islam, I (Leyden, 1913). 696: "India", Encyclopedia of Islam II (Leyden, 1927) P. 479; আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা: বাংলাবাজার, চারুলিপি প্রকাশন৩৮/৪), ফেব্রুয়ারী, ২০১২, পৃ. ৩৯
৭. আবদুস সাত্তার, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, পৃ. ২৭৫
৮. আবদুস সাত্তার, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, পৃ. ২৭৬
৯. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৯
১০. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পৃ. ২৯
১১. Indian Education commission Report (1822) থেকে উদ্ধৃত, Sayed Mahmud, A history of English Education in India (Aligarh, 1895), P. 147
১২. প্রাগুক্ত
১৩. সেন, দীনেশ চন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সং. কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৩৬৫
১৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১১৪
১৫. গরীবুল্লাহ সাহা ও হামজা ছৈয়দ, আমির হামজা, কলকাতা, ১৩৩৬, দ্বিতীয় বালাম।
১৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১১৪
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১৮. আহমাদ শরীফ (সম্পাদিত), পুঁথি-পরিচিতি, পৃ. ২১১; আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৫৮
১৯. শহীদুল্লাহ মুহম্মদ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক, ছাত্রী সংঘ বার্ষিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৭
২০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, পৃ. ৩০১; আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৮৫
২১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২০২
২২. মুখোপাধ্যায় ভূদেব, জাতীয় ভাব-ভারতবর্ষে মুসলমান, সামাজিক প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ১০
২৩. মুজীবুর রহমান ড. মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৩৬
২৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৩৯
২৫. মুজীবুর রহমান ড. মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৫৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৪০, (চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত মুহম্মদপুর গ্রামে শেখ আবদুর রহিমের জন্ম হয়)

২৭. ইদ্রিস আলী মোহাম্মদ, এসলাম তত্ত্ব, মাহে নও, মে ও জুন ১৯৫৪

২৮. আবদুল অদুদড. মোহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা: বাংলাদেশ, আল-কুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১১৬

২৯. আবদুল অদুদড. মোহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৩০-১৩২

৩০. মুজীবুররহমান ড. মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৭৫

৩১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ৯৬

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৩৩. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৬১

৩৪. আব্দুল আজীজ আল্-আমান, নজরুল পরিক্রমা, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২৯ আষাঢ় ১৪০৭)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 1008 - 1013
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতের অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা এবং রাষ্ট্র নির্মাণ : একটি বিশ্লেষণ

আবির থানাদার
পিএইচডি স্কলার
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : abirju1997@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Colonialism, Cultural diversity, India, Nationalism, Nation building, Past tradition

Abstract
After World War II, non-european territories gradually began to free themselves from the grip of colonialism. Due to the diversity of social identities, non-Western societies faced complex issues related to the nation building process. India is a notable example of this. The process of nation-building always needs a political center which is formed under nationalism. In Europe, the diversity, variety, and contradictions among social identities are not as pronounced as in non-Western countries. Thus, the complexities associated with nation-building are less there. For instance, nation-building in Europe has often centered around a single identity, such as linguistic identity, or racial identity. For example, Germany formed on the basis of ethnic-racial identity.

However, in Eastern countries, the process of nation-state formation has become more complex due to significant differences in social identities. In this context, two tendencies are observed in the nation-state construction of India. Although both tendencies are modern in origin, the first has its roots in past traditions, while the second is politically constructed. In other words, the first tendency is related to India's 'cultural nationalism,' while the second is closely linked to India's 'political nationalism.'

This essay will primarily discuss how nationalism and national identity are constructed through India's past traditions, social and cultural values, historical elements, and mythological characters as the 'memory of the nation.' It will also explore how cultural aspects have combined with political processes to shape the Indian territory into a modern nation-state, despite its diverse characteristics.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

১. জাতিরাষ্ট্র কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক ধারণা ও বিতর্ক : পৃথিবীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন কৌম পরিচিতি গত বৈচিত্র্যতা ক্রমে কমে আসছে। সেটি ক্রমশ একমাত্রিক পৃথিবী নির্মাণের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। জাতি-রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার একটি একমাত্রিক অভিমুখ রয়েছে এবং যেটির চলমানতা নির্দিষ্ট সাল বা তারিখ দিয়ে বেঁধে দেয়া সম্ভব নয়। এটি একটি প্রবাহ, ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে পরিচিতি নির্মাণ, বিনির্মাণ এবং নবনির্মাণের মধ্যে দিয়ে। পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং জাতির রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে ১৬৪৮ সালের তাৎপর্যপূর্ণ 'ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তির' মধ্যে দিয়ে। এই রাজনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি ইউরোপে রাষ্ট্র কেন্দ্রিক চিন্তার বীজ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে Thomas Hobbes থেকে Friedrich Hegel - এর রাষ্ট্র দর্শনে। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে অইউরোপীয় ভূখণ্ড গুলি ক্রমশ স্বাধীন হতে থাকে উপনিবেশিকতাবাদের নিগড় থেকে। বিভিন্ন সামাজিক পরিচিতির বৈচিত্রের কারণে অপাশ্চাত্য সমাজে গড়ে ওঠে জাতি রাষ্ট্রের নির্মাণ কেন্দ্রিক জটিল সমস্যা। যাইহোক বিংশ শতকের শেষের দিকে জাতি এবং জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য ভাষ্য গুলি গড়ে উঠেছে সেগুলি এখানে আলোচিত হবে।

প্রথমটি হল জাতি রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া এবং জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে Ernest Gellner-এর ব্যাখ্যা। মধ্যযুগে ইউরোপের সমাজের মধ্যে একটি প্রকট বিভাজন রেখা ছিল। উচ্চ সংস্কৃতি এবং নিম্ন সংস্কৃতির মধ্যে এই বিভাজন রেখা মুছে ফেলার তাগিদ তাদের মধ্যে ছিল না। দুটি সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল খুবই সীমিত। Gellner-এর মতে আধুনিকতার হাত ধরে বা আধুনিক উন্নয়নের হাত ধরে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন রূপান্তর ঘটে। সামগ্রিকভাবে এই সঞ্চালনের ফলে শিল্পায়ন এবং শহরায়ন তৈরি হতে থাকে। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের সঞ্চালন ঘটে ব্যাপকভাবে। কিন্তু শহরে আসার পর মানুষের মধ্যে তেমন ঐক্য গড়ে ওঠেনি কারণ সংস্কৃতিক পরিচিতি গত বিভাজন থাকার দরুন। তাই আধুনিক সমাজে সহজাত ঐক্যের কোন ভিত্তি না থাকার কারণে 'কৃত্রিম জাতীয়তাবাদী গণসংস্কৃতির' প্রয়োজন গভীরভাবে দেখা দেয়। বলা বাহুল্য এই গণসংস্কৃতির উদ্ভবের পিছনে কাজ করেছিল মূলত শিক্ষা। এখান থকেই জন্ম নেয় একধরনের কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ। ফলস্বরূপ আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। আধুনিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে তিনি নাগরিক জাতীয়তাবাদের (Civic Nationalism) কথা উল্লেখ করেন। অন্যদিকে গ্রাম থেকে ফেলে আসা যে সামাজিক পরিচিতি গুলি মানুষ বহন করত সেই পরিচিতি গুলিকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে সেগুলি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী গত জাতীয়তাবাদ (Ethnic Nationalism) নামে পরিচিত। এই ব্যাখ্যাটি ছিল মূলত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার নির্ভর একটি ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। আশির দশকের প্রথম দিকে Benedict Anderson তার "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism" শীর্ষক গ্রন্থে জাতি এবং জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় তিনি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমটি ধারণাগত পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি বস্তুগত পরিবর্তন। ধারণাগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় তিনি দেখান যে অতীতে মানুষের মূল লক্ষ্য ছিল মৃত্যু কেন্দ্রিক চিন্তা। অর্থাৎ মৃত্যু ভয়কে অতিক্রম করাই ছিল মানুষের মূল লক্ষ্য। প্রথমে মানুষ ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল। আন্ডারশনের মতে ঈশ্বর বিশ্বাস ততদিন থাকে যতদিন মৃত্যু ভয় বর্তমান থাকে। রেনেসাঁর হাত ধরে আধুনিকতা এবং বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ গড়ে উঠতে থাকে ফলে পূর্বের প্রথাগত ধারণা এবং পরলোকগত ব্যাখ্যা ক্ষীন হয়ে ওঠে। এই ক্ষীন জায়গায় একটি শূন্যস্থান তৈরি হয়। শূন্যতা পূরণ করতে জাতীয়তাবাদের ধারণা এগিয়ে আসে। অবশেষে যে ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি হল: পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়টির প্রাধান্য না পেয়ে জাতির মধ্যে দিয়ে মানুষ অমরত্ব লাভ করবে কারণ জাতি শেষ নেই। দ্বিতীয়ত বস্তুগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি যে ব্যাখ্যাটি তুলে ধরেন সেটি হল ইউরোপে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানব জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আগে ইউরোপে ল্যাটিন ভাষাই ছিল মূল লেখ্য ভাষা। কিন্তু মুদ্রণ ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে স্প্যানিশ, ইংরেজি, ডাচ, ফরাসি ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষা দ্রুত প্রসার পেতে থাকে এবং সাধারন মানুষ নিজেদের মতামত চিন্তা ভাবনার আদান-প্রদান করতে পারে এই সকল ভাষার মাধ্যমে ফলে ইউরোপীয় সমাজে তাদের ভাষা কেন্দ্রিক এক ধরনের জাতীয় ঐক্য নির্মিত হয়। মৃত্যু এবং ঐশ্বরিক ধারণা থেকে সরে এসে ভাষা, পুঁজিবাদ এবং আধুনিকতা কিভাবে জাতীয়তাবোধ ও 'ইমাজিন কমিউনিটির' ধারণা নির্মাণ করেছিল সেটির ব্যাখ্যা তিনি এখানে করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তৃতীয় ব্যাখ্যাটি Tom Nairn-এর 'Faces of Nationalism' (১৯৯৭) শীর্ষক গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়। তিনি মূলত জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা উপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপট থেকে করেন। উপনিবেশিক কাঠামোয় বসবাসকারী পরাধীন মানুষ ক্রমে অনুভব করল যে তাদের শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো শ্বেতাঙ্গরা। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধুনিকতার প্রয়োগ করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই উপনিবেশিক মানুষ সহজেই বুঝতে পারল যে উপনিবেশিক শক্তিকে হারাতে হলে পুরানো বা সাবেকি ব্যবস্থার মাধ্যমে তার সম্ভব নয়; সেই জন্য তাদের প্রয়োজন আধুনিকীকরণ। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এই সময় তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার প্রসার ঘটতে থাকে। তারফলে মতবিনিময়ে অনেক সহজ হল। এরই মধ্যদিয়ে উপনিবেশিক সমাজে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসত্ত্বা নির্মিত হল। তিনি জাতীয়তাবাদের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উপনিবেশিকতাবাদকে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি জাতীয়তাবাদকে ফলাফল হিসেবে দেখে।[১]

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক চিন্তার স্রোতকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পার্থ চ্যাটার্জী। তার ব্যাখ্যাটি মূলত একটি সমালোচনাত্মক ব্যাখ্যা। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীর মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদের কথা উঠে এসেছে সেটির ব্যাখ্যা করেন যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিভাজনরেখা টেনে ছিলেন, বস্তু জগত এবং আধ্যাত্মিক জগতের দৃষ্টিকোণ থেকে। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের পর্ব অর্থাৎ গণসঞ্চালন বা রাজনৈতিক গণজোয়ারের বিষয়টি আলোচনা করেন সেখানে গান্ধীজীর 'রাম-রাজ্য' এবং গান্ধীজীর চিন্তা কিভাবে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিলছে সেটি ব্যাখ্যা করেন। তৃতীয়ত তিনি জহরলাল নেহেরুর আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের ধারণাটি তুলে ধরেন এবং সমালোচনাও করেন একটি 'এলিট মডেল' হিসেবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে Benedict Anderson-এর 'Imagined Communities' ধারণাটিকে সমালোচনার উত্তরে Partha Chatterjee লেখেন - "Whose Imagined Community?" অ্যান্ডারসন যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইউরোপের জাতীয়তাবাদ একটি 'মডিউলার ফর্মে' উপস্থিত হয়েছে অপশ্চিমী দেশগুলির কাছে এবং তারা এই রূপটিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে পার্থ চ্যাটার্জি একটি 'প্রাচ্যবাদী' ব্যাখ্যা খাড়া করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদকে একটি মডেল রূপে যদি প্রাচ্য দেশগুলির অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাহলে প্রাচ্য দেশগুলির স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তি ও স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের স্রোতকে অস্বীকার করা হয়। যেটি অ্যান্ডারসন করেছেন। উপনিবেশিক দেশ গুলির কোন স্বতন্ত্র চেতনা বা স্বাধীন সত্তা পূর্বে ছিল না, এমন ভাবাটা সম্পূর্ণ ভুল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভারতের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন একটি 'spiritual domain'-এর কথা। যেটি সর্বদাই স্বাধীন ক্ষেত্র হিসাবে বিরাজমান ছিল। যেখানে কলোনিয়াল শক্তিগুলির কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু কলোনিয়াল শক্তিগুলি মূলত তাদের (Material life) বস্তু জগতের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল।[২]

জাতি রাষ্ট্র এবং জাতিগোষ্ঠী (ethnicity) মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক এক্ষেত্রে। কোন জাতি রাষ্ট্র এবং জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে 'আমরা' এবং 'ওরা' এই ধরনের মানসিক একটা পার্থক্য গড়া প্রয়োজন। কিন্তু জাতির রাষ্ট্র এবং জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতি দুটি এক নয়। তাই Donald Horowitz কে অনসুরণ করে বলা যায় যে "ascriptive group identities are such as race, language, religion, tribe or caste can be called ethnic"। জাতিগোষ্ঠী বা এথনিক পরিচিতিগুলি মূলত সামাজিক পরিচিতির উপর নির্ভরশীল কিন্তু জাতি রাষ্ট্রের পরিচিতির নির্মাণ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ একটি সার্বিক রাজনৈতিক চেতনা সেখানে নির্মিত হয়।

২. নেশন পরিচিতি : সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সমসাময়িক প্রবণতা : ভারতীয় সমাজে বহু সামাজিক পরিচিতির অবস্থান রয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে পার্থক্যের অবস্থান ও বিস্তর। এই বৈচিত্রপূর্ণ পরিচিতি গুলিকে একটি সহবাসস্থানে আনা বা জাতীয় পরিচিতির মোড়কে অঙ্গীভূত করার কাজটি একটি আধুনিক রাজনৈতিক কাজ বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী গত পরিচিতি যেমন - ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, বেশভূষা, চেহারা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত পরিচিতি ইত্যাদির পার্থক্য থাকার সত্বেও রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসাবে ভারতের উত্থান ঘটেছে। এই নির্মাণের পেছনে কয়েকটি প্রবণতা উল্লেখ করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথম ব্যাখ্যাটি অবশ্যই ইতিহাসকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ইতিহাস এবং অতীত সংস্কৃতির গহ্বর থেকে জাতি পরিচিতি নির্মাণের মসলা সংগৃহীত হয়েছে।

(ক) ভূখণ্ডগত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার যে ব্যাখ্যাটি এখানে আসে সেটি হল - আজকের ভারত নামক যে সার্বভৌম ভূখণ্ডের ধারণাটি এসেছে সেটি কিন্তু আধুনিক কালের নয়। এর শিকড় ইতিহাসের গভীরে রয়েছে। ভূখণ্ডগত (spatial concept) একটি চেতনা ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিকভাবে চলে এসেছে এই ক্ষেত্রে। অর্থাৎ প্রাচীন গ্রন্থ গুলিতে যেমন রামায়ন এবং মহাভারতে ভারতবর্ষের একটি ভূখণ্ডগত ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈচিত্রতা থাকার সত্বেও ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে 'মহা চক্রবর্তী সম্রাট' হওয়ার সুপ্ত বাসনা ছিল। তারা এই বিশাল উপমহাদেশের বৈচিত্রপূর্ণ ভূখণ্ডকে একটি রাজনৈতিক ইউনিট বা মহা চক্রবর্তী সাম্রাজ্য হিসাবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সফল হিসাবে দুটি রাজার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন সম্রাট অশোক এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। অর্থাৎ এই যুক্তি থেকে যে নিষ্কর্ষটি বের হয়ে আসে সেটি হল ভারত ভূখণ্ডের চেতনা। ঐতিহাসিক ভাবে এই spatial ধারণাটি বিভিন্ন রাজ রাজাদের মধ্যে চলে এসেছিল এবং যেটা জাতি নির্মাণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে কাজ করেছে।

(খ) ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান, মিউজিয়াম, অতীত সংগ্রহশালা, আর্কিওলজিক্যাল বস্তু ইত্যাদি ভারতবর্ষের ইতিহাস-চেতনা নির্মাণ এবং জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক গঠনে সহায়তা করে।[৩] মানুষ তার অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা সেখানে পায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। যেমন সম্রাট অশোকের স্তম্ভ বা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান এবং মুঘল-সুলতানি যুগের স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক বস্তু সামগ্রী ইত্যাদি। শুধু তাই নয় ভারতের বিভিন্ন আধুনিক প্রতিষ্ঠান গুলি 'জাতি গঠনের মানসিক প্রক্রিয়াটি নির্মাণ' করে থাকে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতির মানুষ এসে জড়ো হয় এবং তাদের মধ্যে এক রকমের মানসিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন (cultural heritage) সংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিও এই জাতি নির্মাণের মানসিকতা গঠন করতে সাহায্য করে। সংগ্রহশালা গুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষজনের মধ্যেই একমাত্রিক বোধ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[৪] পাশাপাশি এ কথা অস্বীকারও করা যায় না ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা গুলি যেখানে তাদের আঞ্চলিক এবং নিজস্ব সংস্কৃতিগত উপাদান সংরক্ষিত থাকে সেগুলি সম্পূর্ণ নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে প্রকাশিত করে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংগ্রহশালাগুলি একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস চেতনার স্পন্দনকে জাগিয়ে তোলে।

(গ) ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠ্যসূচি নির্মাণ পেছনে একধরনের রাজনৈতিক প্রণোদনা বা উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ এটি কখনোই নির্মহভাবে নির্ধারিত হয় না। এই পাঠ্যসূচির ইতিহাসের মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্র কৈশোর কালে ভারতের অতীত ঐতিহ্য এবং গৌরব সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়, যার ফলে ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক না কেন – এটি একধরনের একমাত্রিক জাতি রাষ্ট্রের চেতনা নির্মাণের সহায়তা করে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোত রয়েছে এবং আঞ্চলিক স্রোতের সঙ্গে এই জাতীয় স্রোতের আদান-প্রদানের বিষয়টিও একটি জাতীয় স্তরের ধারণাকে নির্মাণ করে। এ থেকেই ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন স্বরের ঐতিহ্য উন্মোচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উপনিবেশিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সত্তা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে ভারতীয় এবং ইংরেজ এই দুটি বাইনারি বা দ্বৈত অবস্থানের মধ্যে ভারতের অন্যান্য বৈচিত্রময় পরিচিতি গুলি লঘু হয়ে ওঠে। এবং এটি থেকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম জাতি রাষ্ট্র নির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা ছিল যেমন গান্ধীজীর গণ আন্দোলন প্রভাব, সমাজতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলন, বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈপ্লবিক আন্দোলন ইত্যাদি। আর এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান ঘটে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীর একটি চিন্তার স্রোত প্রবাহিত ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক জগতে। যেমন সেটি দানা বেঁধে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে, রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রে এবং ঋষি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অরবিন্দ চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে। জাতি নির্মাণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি বৌদ্ধিক ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছিল এইভাবে। উপনিবেশিক সময়কালেই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ এবং জাতির রাষ্ট্রের ধারণাকে কেন্দ্র বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করা গেলেও তার মধ্যে প্রধান দুটি অবস্থান ছিল: প্রথমটি নেহেরুভিয়ান মডেল কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয়টি হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা।

(ক) জওহরলাল নেহেরুর ‘Composite nationalism’-এর ভিত্তি ছিল (unity in diversity) বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার যুক্তিটি। নেহেরুর এই চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর গভীর প্রভাব পড়েছিল। ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে তিনি লেখেন - ‘আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ভারত এমন এক সুন্দর দেশ যেখানে রয়েছে নানা রকম সংস্কৃতি, নানারকম অভ্যাস, প্রথা ও জীবনচর্যা। অর্থাৎ এই দেশটির বৈচিত্র্যের কোনও সীমা নেই এবং তাই ভারত একটি বিশেষ কোনও ধাঁচের মধ্যে ফেলে গড়ে তোলার চেষ্টার কোনও অর্থ হয় না।” অতএব, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আর জাতিগোষ্ঠী গত বিভিন্নতাকে জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধক হিসেবে না মনে করে বরং এগুলিকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বলেই দেখা হবে, যা কিনা জায়মান জাতি-রাষ্ট্রকে শক্তি জোগাবে। ফলে, স্বাধীন ভারতের সংহতি ঘটবে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই ধারণাটিকে ঘিরে। তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যতার গুরুত্বকে। এগুলিকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি দেখেছেন। ভারতীয়ত্বকে বিকশিত করতে হলে ভারতবাসীর পরিরচয়ের বহুত্বকে স্বীকার করতে হবে এবং বহুত্বকে উপযুক্ত স্থান করে দিতে হবে ভারতীয় রাষ্ট্র সত্তার মধ্যে।[৫]

(খ) ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনার আরো একটি প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেটি মূলত হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ নামে বর্তমানে পরিচিত।[৬] বর্তমানে এন.ডি.এ সরকারের মূল ভিত্তি রূপে এইরকম জাতীয়তাবাদকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই জাতীয়তাবাদের শেকড় খুঁজতে গেলে একটু পিছনে পিছিয়ে যেতে হবে। অবশ্যই এর উৎপত্তি উপনিবেশিক সময়কালে। সাভারকার, গোলওয়ালকার, হেডগেয়ার, দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখের দর্শন এবং লেখনীতে এইরকম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের মধ্যে দুই রকমের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় একটি ভূখণ্ডগত ধারণা এবং অন্যটি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার-সংস্কৃতির গত যুক্তি। ভূখণ্ডগত ধারণার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা সাভারকারের লেখনীর মধ্যে পেতে পারি। সাভারকার তার উল্লেখযোগ্য “Hindutva : Who is a Hindu?” (1923) শীর্ষক গ্রন্থে ‘হিন্দুত্ব’ রাজনীতির মূল তাত্ত্বিক কাঠামোটি উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে ‘হিন্দুত্ব’ শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়; একটি ইতিহাস। এটি শুধুমাত্র ভারতীয় জনসাধারণের ধর্মীয় অভ্যাসের ইতিহাস নয়। বরঞ্চ সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত। তিনি একটি ভূখণ্ডের ধারণা এখানে দিয়েছিলেন। সিন্ধু নদ থেকে দক্ষিনে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এই যে মূল ভূখণ্ডকে তিনি হিন্দু সভ্যতার পিঠস্থান, হিন্দুদের বাসভূমি বা পবিত্র ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেন। হিন্দু শব্দের শব্দকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে যেমন ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব এবং নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি এই শব্দটিকে বিদেশিদের দেওয়া অপমানকর শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ হিন্দু শব্দটি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে নিঃসৃত শব্দ নয় বলে তারা মনে করেন। যাইহোক হিন্দুত্বের মূল লক্ষ্য একটি হিন্দু নাগরিক সত্তা-কেন্দ্রিক জাতীয় চেতনা গঠন করা। তিনি এই চেতনাকে রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষাপটে আরোপ করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাইথোলজিক্যাল চরিত্রগুলি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে গুলি কিন্তু জাতি নির্মাণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেমন রামায়ণে ‘বীর হনুমানের’ চরিত্রকে ব্যাপকভাবে জনসমাজে ছড়িয়ে দেওয়া – এটি হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা বলে মনে করা হয়।

ভারতের জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটি পরস্পর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। দুটি প্রবণতার উৎপত্তি আধুনিক হলেও প্রথমটির শিকড় অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এবং অন্যদিকে দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে নির্মিত। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে প্রথম প্রবণতাটি ভারতের ‘cultural nationalism’ - এর কথা বলে এবং দ্বিতীয়টি ভারতের ‘political nationalism’ - এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।[৭]

১৯৪৭-এর পরবর্তীতে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় ভারতের সামনে গুরুতর সমস্যা রূপে দেখা দেয় জাতীয় ঐক্য বা নেশনের সংহতি সাধনের প্রশ্ন। তাই ভারতের বহুত্ববাদ বা বহুস্বরকে স্বীকার করে নিয়ে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির

পুনর্গঠনের উপর মনোনিবেশ করা হয়। ১৯৫০ সালে সংবিধানের যে-কাঠামো তৈরি হল তাতে একদিকে বৈচিত্র্যের দাবি, অন্যদিকে ঐক্যের প্রয়োজন – দুটিই সমন্বিত হল। সেখানে শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যবস্থা রইল, অন্যদিকে রাজ্যগুলিকে প্রচুর স্বাধিকারও দেওয়া হল। অন্যদিকে বিকেন্দ্রীকরণ আর ভাঙনের তফাত কী সেটি সংবিধান-প্রণেতারা মাথায় রেখেছিলেন। ভারতের এত বৈচিত্র্যতা – এই বৈচিত্র গুলিকে ধরে রাখার জন্য ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা একটি আধুনিক কাঠামো যুক্ত হয়েছিল – সেটি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছিল, ফলে বৈচিত্রতা গুলি এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা ঐক্যের সুরে বাঁধা পড়ে যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ভারতবর্ষের জাতি রাষ্ট্র প্রক্রিয়া থেমে নেই; এটি সর্বদাই সচল একটি প্রক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে জাতি রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তি পরিচিতিকেই বেশি জোর দেয়।[৮] অর্থাৎ ব্যক্তিকে জাতীয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। সেখানে গোষ্ঠীগত পরিচিতি গুলির লঘু হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে ভারতীয় নেশন-গঠনের দুটি দায়বদ্ধতা হল এক, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো। দুই জনগণকে নিয়েই গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

Reference:

১. Schnee, Walter. 'Nationalism: A Review of The Literature'. *Journal of Political & Military* 29.1 (2001): 1-18. https://www.jstor.org/stable/45292824

২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ. *ইতিহাসের উত্তরাধিকার.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০

৩. Smith, Monica L. 'Archaeology, Museum and The Creation of National Identity in The Indian Subcontinent.' *The Entangled Past: Integrating History and Archaeology – Proceedings of The 30th Annual Conference*. (2000)

৪. Kingsley, Maria. ''Art and Identity : the Creation of an 'Imagined Community' in India." *Global Tides* 1. 2 (2007): 1-10. https://digitalcommons.pepperdine.edu/globaltides

৫. Chandra, Bipan; Mukherjee, Mridula And Mukherjee, Aditya. *India After Independence: 1947-2000.* United Kingdom: Penguin, 2002, Print

৬. Varshney, Ashutosh. "Contested Meanings: India's National Identity, Hindu Nationalism, and the Politics of Anxiety. "*Summer* 122. 3 (1993) : 227-261. https://www.jstor.org/stable/20027190

৭. Nanda, Subrat K. "Cultural Nationalism in a Multi-national Context: The Case of India." *Sociological Bulletin* 55.1 (2006): 24-44. https://www.jstor.org/stable/23620521

৮. Parekh, Bhikhu. "Defining India's Identity." *India International Centre Quarterly* 33. 1 (2006):115. https://www.jstor.org/stable/23005931

OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 1014 - 1021
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হাইডেগারের দর্শনে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সঙ্গে মৃত্যু ও কালিকতার ধারণার সম্বন্ধ নিরূপণ

সন্তু ঘোষ
গবেষক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : santughoshdaspur@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Being, Existence, Fallenness, Dasein, Authentic, Facticity, Time, Inauthentic, Death.

Abstract

Martin Heidegger stands out as one of the greatest philosophers in the contemporary period. Martin Heidegger's 1927 publication, Sein und Zeit (translated as Being and Time, 1962), can plausibly be considered the most influential philosophical text of the twentieth century. Heidegger's philosophy develops through what is most characteristic in his style as well as in his subject matter—the repetition/revision that also characterizes the work of deconstruction. The entity which in Sein und Zeit anticipates the end of its existence and is thus capable of freely taking over its own being, now belongs together with being on the basis of an unfolding that withholds itself. In each case the relationship between Dasein and being eludes the conceptualizations that dominate metaphysics. Heidegger invented various terminologies in his existential analysis of human existence. The human existence posited for him two possible modes of existence: authentic and inauthentic modes of existence. In authentic existence, man fully attained consciousness of the self which leads to self-realization and eventual self-actualization and fulfilment. On the contrary, inauthentic existence cripples an individual person within the ambiance of "they" and the individual's ownmost potentiality-for-being remains in the "they". Being in the world is one of the constituent elements of 'dasein'. Care as the totality of the mode of man's existence in the world comprises three aspects, namely: Existentiality, Facticity and Fallenness. Inextricably relation with concept of being-in-the-world is the concept of temporality. In the context of the analytical article, authentic and inauthentic existence in relation with the concept of death and temporality in Heidegger's philosophy.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

দর্শনের ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই অস্তিত্ব ও সারধর্ম এই দুটি শব্দ ও ধারণা নিয়ে দার্শনিকরা অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে আসছেন। দর্শনের ইতিহাসে তাই দেখা যায় কখনো অস্তিত্বের প্রাধান্য, আবার কখনো বা সারধর্মের প্রাধান্য। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো বস্তু যা তাই হয়েছে, অন্যরকম হয়নি, তাকেই সেই বস্তুর সারধর্ম বলা হয়। কোন বস্তুর সারসত্তা হল তাই যা কিছু মূল বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত, এবং যা সেই বস্তুটিকে সেই বস্তুরূপেই উপস্থাপন করে, অন্যভাবে নয়। এই সারধর্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্লেটো থেকে শুরু করে সকল ভাববাদী দার্শনিকই সারধর্মকে দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন বা মুখ্য বলেছেন, এবং অস্তিত্বকে তুলনামুলক ভাবে অবজ্ঞা করেছেন।

দর্শনের ইতিহাস সযত্নে পাঠ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, চিন্তা-জগতে সারধর্মের একছত্র আধিপত্য চিরকাল বজায় থাকেনি। এর বিরুদ্ধে অস্তিত্বের বিদ্রোহ দেখা যায়। আধুনিক অস্তিবাদ হেগেলের সারধর্মবাদের (essentialism) বিরুদ্ধে অস্তিত্বের মূর্ততার বিদ্রোহকে বোঝায়। আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন সোরেন কিয়েরকেগার্ড। সকল অস্তিবাদী এই বিষয়ে একমত যে, অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী (Existence precedes Essence)। অস্তিবাদ অনুসারে, ব্যক্তি প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং পরে তার সারধর্ম বা প্রকৃতি সে তার অস্তিত্বের মাধ্যমে অর্জন করে। অস্তিত্বকে এইভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত করা যেতে পারে— ১. সেটি একটি মূর্ত ঘটনা (Concreteness), ২. বিশেষ কিছু (Perticularity), ৩. সেটি প্রদত্ত (Sheer givenness)। যেমন - ধরা যাক, আমার টেবিলের নীচে একটি রূপার মুদ্রা আছে – জগতের বিশেষ ঘটনা হিসেবে সেটি আছে এবং তার অস্তিত্ব আমার সামনে এমন ভাবে উপস্থিত হয় যে যেটি গ্রহন করা ছাড়া আমার অন্যথায় কোনো উপায় নেই। আমরা তাই অস্তিত্ব বিষয়ে কোনোরকম ইচ্ছাপ্রকাশ করতে পারি না। অর্থাৎ বিশেষপ্রকার বস্তুর অস্তিত্ব নস্যাত হয়ে যাক এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারি না। বরং আমরা যেটা ইচ্ছা করতে পারি সেটা হল – বস্তুটি যেভাবে অস্তিত্বশীল, সেই ভাবে না থেকে অন্যভাবে থাকতে পারে, অর্থাৎ তার আকারটাকে পরিবর্তন করতে পারি। এটাই অস্তিত্ব ও সারধর্মের মধ্যে মূল পার্থক্য। অস্তিত্বশীলতার অর্থই হল – স্বাধীনভাবে ও সক্রিয়ভাবে আমি কি হব তা নির্বাচন করা। অস্তিবাদ তাই সারধর্মের পূর্ববর্তী এবং সকলরকম নিয়ন্ত্রনবাদের বিরোধী।

'অস্তিত্ব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : অস্তিবাদীদের কাছে 'অস্তিত্ব' কথাটি বিশেষ অর্থবহ। তাদের মূল প্রশ্নই হল – 'অস্তিত্ব' বলতে কি বোঝায়? শূন্যতার পরিবর্তে কোনো কিছু আছে কেন? 'অস্তিত্ব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল – থাকা বা to 'exist' অথবা ex-sist (latin ex–sistere), যার অর্থ হল – উদ্ভব হওয়া বা তৈরি হওয়া (emerge or stand out)। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দার্শনিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে – শূন্যের পরিবর্তে বা বিপরীতে কোনো কিছুর উদ্ভব বা উৎপন্ন হওয়াই হল অস্তিত্ব। 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে একটি শিথিল অর্থে ব্যবহার করা হয় – কোথাও থাকা বা কোথাও উদ্ভব হওয়ার অর্থই হল অস্তিত্ব। অস্তিত্ব সম্পর্কে কিয়েরকেগার্ড এর বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র মানব অস্তিত্ব সম্পর্কেই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর কাছে বেঁচে থাকা ও অস্তিত্বশীল হওয়া এক ও অভিন্ন নয়।

হাইডেগারের দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্তিত্বের অর্থ : 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে কেন্দ্র করে যেসকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে দার্শনিক জগতে তাকে উপেক্ষা বা সমাধান করার জন্য তিনি ত্রিমাত্রিক শব্দ (threefold terminology) ব্যবহার করেছেন। জার্মান ডাজাইন (Dasein) শব্দটিকে প্রথাগতভাবে বিভিন্নপ্রকারের অস্তিত্ব নির্দেশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন– অনেক সময় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নির্দেশ করতেও এই ডাসাইন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, হাইডেগার কেবলমাত্র মানুষের অস্তিত্বকে বোঝানোর ক্ষেত্রেই ডাজাইন শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। কঠোর অর্থে ডাজাইন শব্দটি মানুষের সমার্থক বা প্রতিশব্দ নয়। ডাজাইন হল একটি সত্তামূলক শব্দ (ontological term)। এটি সত্তাসম্পৃক্ত যে মানুষ তাকে নির্দেশ করে (It designates man in respect of it's being)। যদি এইধরনের সত্তা মানবজাতির অতিরিক্ত কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও ডাজাইন (Dasein) শব্দের ব্যবহার হতে কোনো বাধা নেই। প্রথাগত শব্দ 'Existentia' – এর অর্থ হল বর্তমানে উপস্থিত (Presence at hand)। এই ধরনের অভিব্যক্তির অর্থ হল – এটি এমন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিছু যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি জগতে আবির্ভূত হয়। এটা being কে নির্দেশ করে, যা কেবলমাত্র ডাজাইনকে নির্দেশ করে। ডাজাইনের সত্তা নির্ভর করে আছে তার Existence এর ওপর। এবং একথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাইডেগার বলেন – ডাজাইনের সত্তা কোনো ধর্মের (characteristics) দ্বারা গঠিত নয়, বরং being – এর যে বিভিন্ন সম্ভাবনা আছে তার দ্বারা গঠিত হয়। মানুষের being হল সে সেখানে আছে (he is there)। এই বক্তব্যটিই being কে স্পষ্ট করছে। Being there – এটাই হল অস্তিত্বের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

হাইডেগারের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি : হাইডেগারের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Being and Time’-এ উনি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, কোনো কিছু থাকা বলতে ঠিক কি বোঝায়। তিনি প্রথমে বিভিন্ন বস্তুর থাকা কি প্রকার সেটা দেখিয়েছেন এবং তার থেকে মানুষের অস্তিত্ব বা থাকা যে ভিন্ন এবং বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের যে সম্পর্ক ও কালিকতার যে সম্পর্ক সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে। হাইডেগার দাবী করেন যে, এতদিন প্রাচীনকালের দার্শনিকগন মানুষকে (Human being) ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের ধারনা স্পষ্ট বিশ্লেষণ করাই ছিল ওনার মূল উদ্দেশ্য। তাই কেউ যদি তার নিজের সত্তা বুঝতে চান তার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থরূপে কাজ করবে। মানুষকে শুধুমাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে অ্যারিস্টটলের সময় থেকে দেখে আসা হচ্ছে। মানুষের বুদ্ধি আছে, সে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারেন, নিজের বিশ্বাস ও ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে কিছু কাজ করতে পারে।

কিন্তু হাইডেগার বলেন মানুষের সত্তা সম্পর্কে এরকম ভ্রান্ত ব্যাখ্যা জন্ম হয়েছে প্লেটোর তত্ত্ব প্রনয়ন করার আকাঙ্ক্ষা থেকে।

> “The traditional misunderstanding of human being starts with Plato’s fascination with theory.”[১]

জগতকে সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানা যায়, জগত সম্পর্কিত কয়েকটি নীতির দ্বারা যেগুলি জগতের অভ্যন্তরে নিহিত। কিন্তু প্লেটো এবং আমাদের পূর্বতন দার্শনিক ধারা যেটি ভুল ভেবেছিলেন সেটি হল একজন ব্যক্তির কাছে সব বিষয়ে তত্ত্ব বা মতবাদ থাকতে পারে এমনকি মানুষ ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত জগত সম্পর্কে। আপাতভাবে মনে হতে পারে হাইডেগার তত্ত্বের বা কোনোপ্রকার মতবাদ গঠনের বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনো মতবাদের বিরুদ্ধে নয়। তিনি মনে করেন তত্ত্বপ্রনয়ন একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু সীমিতভাবে। আসলে কোন শর্তাবলী যে তত্ত্বপ্রণয়ন সম্ভব করে এই বিষয়ে কোনো তত্ব নেই।

> “Basically he seeks to show that one cannot have a theory of what makes theory possible.”[২]

তার এই ধরনের আক্রমন দর্শনের জগতে প্লেটো থেকে শুরু করে দেকার্ত, সেখান থেকে কান্ট এমনকি তার নিজের গুরু হুসার্লের কাজকেও প্রশ্নের মুখে নিয়ে আসে। হাইডেগার হুসার্লের শিষ্য হয়েও তার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। পদ্ধতিগত দিক থেকে ভিন্নতা লক্ষণীয়। হাইডেগার Hermeneutic-কে পদ্ধতি রূপে ব্যবহার করেন। বিপরীতে হুসার্লের পদ্ধতি ছিল Trascendental। হুসার্লের দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল চেতনার আভিমুখ্যতা। মানুষের মন সর্বদা বস্তু অভিমুখে ধাবিত হয় এবং আমাদের সকল মানসিক অবস্থা সেই সকল বস্তুকে তুলে ধরে। তিনি মানুষকে একজন চেতন (যার আভিমুখ্যতা আছে, যেখান থেকে অর্থপ্রদান করা হয় সকল কিছুর) সত্তা হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন এই মানসিক বিষয়গুলিই ব্যক্তির সকল বোধগম্যতার সহায়ক হয়। হাইডেগার বিপরীতদিকে বলেন তার প্রতিভাসবিজ্ঞানে মনহীন একটি গ্রহন করার দক্ষতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় যা সকল বোধগম্যতার সহায়ক।

> “At the foundation of Heidegger’s new approach is a phenomenology of ‘mindless’ everyday coping skills as the basis of all intelligibility.”[৩]

দেকার্ত থেকে শুরু করে সকল দার্শনিক যে সমস্যা নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করেছেন সেটি মূলত একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন সেটি হল – আমাদের মনের ধারনাগুলি কিভাবে বাহ্যজগত বিষয়ে সত্য হয়। হাইডেগার দেখান এইধরনের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় – বিষয়ী দ্বৈততা একটি পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে যা গ্রহন করে সেটি হল একটি প্রেক্ষাপট ব্যবহারিক জীবনের যেখানে আমরা এই বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। আমাদের Being এর বোধই হল প্রাথমিক বোধ, যা অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বোধকে সম্ভব করে তোলে। তিনি দাবী করছেন যে তার গ্রন্থে মূলত তিনি সত্তাতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করছেন। সত্তার বোধের স্বরূপ অনুধাবন করাই তার লক্ষ্য, যে বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। Being আমাদের কোনো মানসিক অবস্থা বা প্রতিচ্ছবি নয় বরং আমরা স্বরূপতই তাই।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই কার্তেজিয়ান মতবাদ থেকে তার দর্শন আলাদা কোনজায়গায়। কার্তেজিয়ান ধারায় দার্শনিক প্রশ্নটি ছিল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন সেটি হল – জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধবিষয়ক। কিন্তু হাইডেগারের প্রশ্নটি একটি সত্তাতাত্ত্বিক প্রশ্ন – আমরা কি ধরনের সত্তা এবং আমাদের সত্তা কিভাবে জগতের বোধগম্যতার সঙ্গে যুক্ত। কিয়েরকেগার্ড বলেন, দেকার্ত এর বিখ্যাত উক্তির পরিবর্তন হয় এক্ষেত্রে –

"I am therefore I think."

হাইডেগারের Hermeneutic Phenomenology-তে দুটি বিষয়কেই সমালোচনা করেছেন – ১. প্লেটোর বিখ্যাত পূর্বস্বীকৃতি যে মানুষের সকল কার্যকলাপকেই তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, এবং ২. কার্তেজিয়ান ধারার চেতন কর্তার ধারনা।

হুসার্ল অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-এর (Transcendental ego) কথা বলেছেন। কিন্তু হাইডেগার বলেন অহং বলে কিছু নেই, আছে কেবল জগতে মধ্যে সত্তা। জগৎ বন্ধনীভুক্ত হলে তা ব্যক্তিসত্তা গঠনে অপারগ, তাই জগৎ আমাদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হুসার্ল মনে করেন যে অহং জগৎ গঠন করে, কিন্তু হাইডেগার মনে করেন এমন ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। হাইডেগার ক্রমশ তার দর্শনে চিৎউপাত্তবাদী পদ্ধতি অতিক্রম করে অস্তিবাদী চিৎউপাত্তবাদ গড়ে তোলেন।

যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সঙ্গে মৃত্যু ও কালিকতার ধারণার সম্বন্ধ নিরূপণ :

আমার পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয় হল – হাইডেগার অস্তিত্বের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন – যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব, এই ধারণাগুলির অর্থ স্পষ্টীকরণ এবং এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত তার যে মৃত্যু ও কালিকতার ধারণা তার স্বরূপ নিরূপণ করার চেষ্টা করব। এই আলোচনাটি শুরু করতে গেলে তার দর্শনের সমস্যা কি? এবং ডাজাইনের যে তিনটি অস্তিত্বমূলক কাঠামো (Esistential structure) আছে, তার আলোচনা পূর্বে করা প্রয়োজন তা হল – ১. সম্ভাবনা (Existenz), ২. বাস্তবাবস্থা (Facticity), ৩. পতিতাবস্থা (Fallenness)।

১। সম্ভাবনা (Existenz) : 'Being and Time' গ্রন্থে হাইডেগার বলেছেন অনন্ত সম্ভাবনাই ডাজাইনের সারধর্ম গঠন করে। তার মতে মানুষ সবসময়ই নিজের থেকে এগিয়ে, তার সত্তায় অপূর্ণ। এখনও যা নয় তার সামনে সে দাঁড়িয়ে, সে সম্ভাবনাকে অভিক্ষেপ করে। যেহেতু প্রতিক্ষেত্রে ডাজাইন তার নিজস্ব সম্ভাবনা, সেহেতু সে যথার্থ মনোনয়ন করে নিজেকে যথার্থ করে তুলতে পারে, অথবা যথার্থ মনোনয়ন না করে নিজেকে অযথার্থ হয়ে উঠতে পারে, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। হাইডেগার এভাবে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ডাজাইনের সর্বদাই সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সম্ভাবনা মানুষে মানুষে ভিন্ন হতে পারে। প্রথম কাঠামো সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্টাইনার বলেছেন, সম্ভাবনা হল – "সম্ভাবনাসমূহের অভিক্ষেপ"। বোধের সাহায্যেই একমাত্র সম্ভাবনার অভিক্ষেপ হয়। 'Being and Time' গ্রন্থে হাইডেগার বলেন, -

> "Dasein always understands in terms of its Existenz in terms of a possibility of itself to be itself or not itself. Dasein has either chosen these possibilities itself or got itself into them or grown up in them already. Only the particular Dasein decides its Existenz, whether it does so."[8]

২। বাস্তবাবস্থা (Facticity) : ডাজাইন নিজেকে জগতের মধ্যে দেখতে পায়। ডাজাইন কোনো এক বিশেষ জগতে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ে বাস করে। তার একটা স্থিতিকাল আছে। হাইডেগার বলেছেন যে, বিশেষ জগতে আমাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না দিয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি দিতে পারিনা। অহং – এর স্বতঃপ্রামান্য এবং জগতের সন্দেহজনক অস্তিত্বের কার্টেজিয় তত্বকে তিনি যেমন স্বীকার করেননি, তেমনি জগতকে বন্ধনীভুক্ত করা হুসার্লীয় প্রক্রিয়াকেও তিনি গ্রহন করেননি। এই বাস্তবাবস্থা কোনো সম্ভাবনা নয়, কেননা ডাজাইন তা মনোনয়ন বা নির্বাচন করার সুযোগ পায়নি। ডাজাইন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়। নিজেকে এক বিশেষ জগতে পাওয়াকে হাইডেগার বলেছেন – 'Thrownness'। হাইডেগার বলেন, সমগ্র অতীত আমার বাস্তবাবস্থা, বিশেষ দেহটাও আমার বাস্তবাবস্থা। কিন্তু আমি এই দেহটাকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মাতে পারি, কিন্তু আমি সেই অবস্থা থেকে উন্নত জীবনযাপন করতে পারি বা তার থেকে নিম্নতর জীবনযাপন করতে পারি। আমার বাস্তবাবস্থা সর্বদাই আমার কাছে প্রদত্ত বা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ঐ অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমার পরিকল্পনা ও মনোভাব অ–নিয়ন্ত্রিত। বাস্তবাবস্থা নির্দেশ করে অস্তিত্বে সীমিতকরণ উপাদানকে। সসীমতাকে বর্ণনা করার মৌল উপায় হল বাস্তবাবস্থা। বস্তুত, বাস্তবাবস্থা হল সম্ভাবনার বিপরীত।

৩। পতিতাবস্থা (Fallenness) : ডাজাইনের তৃতীয় কাঠামো হল পতিতাবস্থা। পতিতাবস্থা বলতে বোঝায়, 'নিজ সত্তা থেকে পতিত হওয়া'। সত্তা থেকে পতিত হওয়া বলতে বোঝায় সত্তাসম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করার ব্যর্থতা, বিশেষ করে নিজের সত্তাসম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করার ব্যর্থতা বা অক্ষমতা। হাইডেগার বলেছেন – যদিও ডাজাইনের অন্যতম অস্তিত্বমূলক কাঠামো সম্ভাবনা, তা সত্ত্বেও এটা সম্ভব যে, ডাজাইন তার নানাপ্রকার সভাবনাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হতে পারে। বস্তুত, পতিতাবস্থা হল নিজের সম্ভাবনাসমূহকে অবহেলা করার প্রবণতা। মানুষ কদাচিৎ তার সম্ভাবনাকে ধরতে পারে। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সাধারন সমস্যা ও কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সে তার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবার সময়ই পায় না। সম্ভাবনার প্রতি এই অবহেলাই পতিতাবস্থা এবং এটাই অযথার্থ অস্তিত্বের মূল কারণ। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে জনতা থেকে আলাদা করতে পারি না। নৈর্ব্যক্তিক জনতাকে হাইডেগার বলেছেন দাসম্যান (Dasmann)। নিজের সম্ভাবনাগুলিকে জনতা থেকে স্বতন্ত্র করে উপলব্ধি করার অক্ষমতা বা ব্যর্থতাই হল পতিতাবস্থা। 'Being and Time' গ্রন্থে হাইডেগার বলেন, -

> "Everyone is the other and no one is himself. Das Mann which supplies the answer to the question of the "who" or everyday Dasein has already surrendered itself in being-among-one- another."[৫]

অস্তিত্বের শ্রেণী বিভাগ : হাইডেগার যথার্থ ও অযথার্থ এইরূপে অস্তিত্বের দ্বিবিধ বিভাগ করেছেন। আমার পূর্বতন আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখলাম যে, হাইডেগারের অস্তিত্বের কাঠামোগুলির সঙ্গে তার এই যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব কীভাবে সম্পর্কিত বা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংক্ষেপে নীচে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব বলতে কি বুঝেছেন, তার আলোচনা করা হল।

যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব : মানুষের সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দুটির অধীনে অন্য সব সম্ভাবনাকেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই দুটি সম্ভাবনা হল যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সম্ভাবনা। সভাবনা, বাস্তবাবস্থা, পতিতাবস্থার সত্তা বিজ্ঞানসম্মত স্বীকৃতির ওপর যথার্থ অস্তিত্ব নির্ভর করে। অযথার্থ অস্তিত্ব সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে পতিতাবস্থায় বাস করে। যেহেতু প্রতিটা ক্ষেত্রে ডাজাইন অনিবার্যভাবে তার নিজস্ব সম্ভাবনা, সেহেতু সে যথার্থ মনোনয়ন করে নিজে যথার্থ হতে পারে, নিজেকে জয় করতে পারে। অথবা অযথার্থ মনোনয়ন করে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। মানুষের জগত – মধ্যে সত্তা এবং জগত পরিবৃত সত্তার মধ্যে পার্থক্য করেছেন হাইডেগার। মানুষ আবশ্যিকভাবে জগতে উপস্থিত। এই জগত থেকে মানুষ নিজেকে সরিয়ে এমন কোনো সত্তার স্বয়ং সম্পূর্ণ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেনা, যা বিশুদ্ধভাবে তার নিজেরই। অবশ্য এর জন্য এই জগতেই তার নিজেকে হারিয়ে ফেলে স্থূল ভৌত বিষয়সমূহের মধ্যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডুবে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। ভৌত বিষয়সমূহ আক্ষরিক অর্থেই জগতের মধ্যে আছে। এগুলি দেশগত সত্তা। কিন্তু মানুষ আক্ষরিক অর্থে জগতের মধ্যে নেই। জগত মধ্যে সত্তা জগতের কাছে নিছক উপস্থিতি।

বিপরীতে জগত পরিবৃত সত্তা হল পতিতাবস্থা বা অযথার্থ অস্তিত্ব। অযথার্থ পতিতাবস্থা নিজের সম্ভাবনাসমূহকে ধরতে অস্বীকার করে। এই স্তরে দৈনন্দিনতাই জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সে হয়ে পড়ে দাসম্যান। যা যথার্থ অস্তিত্বের শত্রু। অযথার্থ অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন কাজই ডাসাইনের নিজস্ব নয়। এই স্তরে মানুষ নিজেকে জনতা থেকে আলাদা করতে পারে না। এইধরনের অস্তিত্ব আসল অস্তিত্ব নয়। অযথার্থ অস্তিত্ব বা জগত পরিবৃত সত্তার দুটি প্রান্ত আছে – বিষয়ীগত ও বিষয়গত। পতিত হওয়ার অবস্থায় একপ্রকার মিথ্যা বা ছদ্ম-বিষয়ীগততা (Pseudo–Subjectivity) থাকে। যা ব্যক্তি-চেতনাকে চালিত করে। ব্যক্তি নিরন্তর এমন কিছু নির্দেশ মেনে কাজ করে যা সনাক্তকরণের অযোগ্য (Unidentifiable)। পতিত হওয়ার বিষয়গত প্রান্তটি হল – মানুষের তৈরি জগত, প্রযুক্তির দ্বারা পরিবর্তিত জগত। এই জগতে বস্তুসমূহ প্রায় পুরোপুরি সাধারণের বা জনতার সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র বা উপায়রূপে অস্তিত্বশীল।

হাইডেগার যথার্থ অস্তিত্ব ও অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে অভিনব যে দুটি ধারনার অন্তর্ভুক্তি ঘটায় সেগুলি হল – মৃত্যুর ধারনা ও কালিকতার ধারনা। তিনি বলেছেন, জগত সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে যে বিষয়টি অনিবার্যভাবে চিন্তা করা উচিত তা হল জগতের সব কিছুই পরস্পর থেকে ভিন্ন, বিশেষভাবে ডাজাইন থেকে ভিন্ন। জগতকে আমরা যেভাবেই বর্ণনা করি না কেন, আমাদের বর্ণনার মধ্যে নঞর্থক কিছু থেকেই যায়। এ জগতে আমরা অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনস্তিত্বের ধারনা পাই। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অনস্তিত্বের ধারনাটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তা হল আমরা মরণশীল। আমরা যে একসময় অস্তিত্বশীল থাকব না – এই উপলব্ধিই এক অকৃত্রিম সত্য। তার মতে, অস্তিত্বহীনতার উপলব্ধিই যথার্থ অস্তিত্বের পথে প্রথম পদক্ষেপ। 'Being and Time' গ্রন্থে তিনি বলেন – যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ হল সেইই যে নিজের সসীমত্বকে স্বীকার করে এবং সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যু নামক তথ্যের মুখোমুখি হয়ে দৈনন্দিন অস্তিত্বের অকিঞ্চিৎকর বা অর্থহীনতা থেকে মুক্তি পায়। এই প্রসঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক।

মৃত্যু (Death) : প্রত্যেক ব্যক্তির সত্তা হল মৃত্যুমুখী সত্তা (Being towards Death)। প্রত্যেক ব্যক্তি এই ঘটনাটির সঙ্গে পরিচিত। যদিও প্রকৃতই মৃত্যু সংঘটনের তারিখটি নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবুও এটি নিশ্চিত সম্ভাবনারূপে বর্তমানে উপস্থিত। সকল সম্ভাবনার থেকে মৃত্যুরূপ সম্ভাবনাটি সবচেয়ে নিশ্চিত। আমার অস্তিত্বটি সসীম অস্তিত্ব এবং যেকোন মুহূর্তে এটি অনস্তিত্বে মিলিয়ে যেতে পারে। প্রথমত, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যু হল মানুষের অস্তিত্বের সকল সম্ভাবনার মধ্যে চরম সম্ভাবনা (Supreme Possibility)। অবশিষ্ট সকল সম্ভাবনা তার অধীন। সম্ভাবনাগুলিকে উচ্চনীচ স্তরভেদে সাজাতে গেলে উচ্চস্থানে মৃত্যু রয়েছে। স্পষ্টত অন্যান্য সম্ভাবনার থেকে মৃত্যুর স্বরূপটি ভিন্ন। হাইডেগার মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন –

"Death is the possibility of the impossibility of any existence at all."

তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, হাইডেগার মৃত্যুকে সম্ভাবনারূপে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে আত্মহত্যা করাকে যথার্থ অস্তিত্ব বলেছেন। হাইডেগারকে এইভাবে বোঝাটা ভুল বা অপব্যাখ্যা করা হবে। হাইডেগার সেই অর্থে মৃত্যুকে সম্ভাবনা বলেননি। ব্যক্তিসত্তার বিশিষ্টতা রচনাকারী অনিবার্য মৃত্যু ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কাছে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ, সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় – সবই অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য বলে প্রমানিত হয়। এটা স্বাভাবিক যে, মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ভীতি জন্মাতে পারে। কিন্তু এটা সেই ভ্রান্ত ধারনা পোষণ থেকে ভিন্ন যে, মৃত্যু হল অসৎ কিছু, মৃত্যু সম্পর্কে যে ধারণা ভুলিয়ে দেয়। মৃত্যু হল মানুষের সসীমত্বের মহৎ চিহ্ন। এবং হাইডেগার বলেন, যে মানুষ তার মৃত্যুমুখী সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার যে সকল সম্ভাবনা আছে সেগুলিকে বাস্তবায়ন করে, সেই যথার্থ মানুষ।

কালিকতা (Temporality) **:** মানুষের সসীমত্বের প্রকাশ ঘটে কালিকতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্য দিয়েও। এই অনিত্যতার ধারনা ছাড়া এই জগত সম্পর্কে মানুষের কোনো উদ্বেগই থাকত না। আমরা আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

তিনটি ভিন্ন উপায়ে সচেতন। প্রথমত, আমরা আমাদের অতীতের ঘটনা যেমন আমাদের জন্ম, পিতা–মাতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন, দ্বিতীয়ত, বর্তমান মুহূর্ত অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ করছি বর্তমানে সেই সম্পর্কে সচেতন, আর তৃতীয়ত, আমাদের সম্ভাবনা, অর্থাৎ যা পূর্ণ করার জন্য আমরা কাজ করি, সেই সম্পর্কে সচেতন। সাধারন মানুষ, পতিত বা অযথার্থ মানুষ। সে শুধুমাত্র বর্তমান কালকে নিয়েই মগ্ন থাকে। অতীত তার কাছে আকর্ষণীয় নয়, আর ভবিষ্যৎ হল তা যা ঘটবে। কিন্তু একজন যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষের কাছে বর্তমান হল অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয়, কেননা সে জানে সে কি ছিল, এবং কি হবার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই আত্মজ্ঞানকে হাইডেগার বলেছেন বিবেক। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - অনিত্যতার এই তিন মুহূর্তের আলোকেই মানুষের অস্তিত্বকে বুঝতে হবে। ডাজাইন কালিকতা গঠন করে বা কালিকতা হল ডাজাইন। তিনি বলেন, সকল জগত মধ্যে সত্তার কালিকতা হিসেবে ডাজাইনে গ্রথিত। কালিকতা অনিবার্যভাবে ভাবাবেশকর। ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান হল কালিকতার ভাবাবেশকর মুহূর্ত। এবং ভবিষ্যৎ-ই মুখ্য মুহূর্ত। অস্তিত্ব যেহেতু মৃত্যুর প্রতি সত্তা তাই বাস্তব ভবিষ্যৎ নিজেকে সসীম হিসেবেই প্রকাশ করে। কালিকতার মানচিত্রে ডাজাইনকে বুঝলে বলতে হবে, এটা হল ভবিষ্যতের দিকে অভিক্ষেপ এবং কালের ঐক্যের ভিত্তিতেই তাকে বুঝতে হবে।

উপসংহার : হাইডেগারের অস্তিবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে তাঁর দর্শনের সার বক্তব্য নিহিত হয়ে আছে তার সত্তা বা ডাজাইনের আলোচনার মধ্যে। কারণ হাইডেগারের দর্শন মূলত সত্তাতাত্ত্বিক দর্শন এবং তার কাছে দর্শনের মূল সমস্যা হল সত্তার সমস্যা। তাই তিনি সত্তার সমস্যাটিকে সুত্রায়িত করতে চেয়েছেন। সত্তা বা ডাজাইনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জগত-মধ্যে-সত্তা। ফলত জগতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁর দর্শনে। এখানেই চিরাচরিত দার্শনিকদের সঙ্গে এবং দেকার্ত ও হুসার্ল – এর দর্শনের সঙ্গে তার পার্থক্য লক্ষণীয়। হাইডেগার বলেন আমরা জগতের যে-কোন বস্তুর অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু আমরা জগতকে সন্দেহ বা বন্ধনীভুক্ত করতে পারি না। জগত ও সত্তা স্বতন্ত্র নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। হাইডেগার ডাজাইন থেকে আলাদা করে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই ডাজাইনের তিনটি মূল ক্রিয়ার কথা বলেছেন – সম্ভাবনা, বাস্তবাবস্থা, পতিতাবস্থা। নিজের সম্ভাবনাকে বুঝে নিজের অবস্থার উন্নতিসাধন হল যথার্থ অস্তিত্ব, অন্যদিকে নিজের সম্ভাবনাকে না বুঝে তার বাস্তবায়ন না ঘটানোই হল অযথার্থ অস্তিত্ব। এই যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সঙ্গে তার মৃত্যু ও কালিকতার ধারণাটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কালিকতা হল ডাজাইনের একটি অন্যতম কাঠামো। যথার্থ সত্তার অনুসন্ধান করতে গেলে কালের অনুসন্ধান করতে হবে। মানুষ যতক্ষণ কালে থাকে কালই তার চরম দিগন্ত, তাই তার নিজের স্বার্থে কালের সন্ধান প্রয়োজন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কাল। এর মধ্যে তিনি ভবিষ্যতকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কারন যথার্থ অস্তিত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালের গুরুত্ব অপরিসীম। কালের শেষ আছে, কালের শেষ হয় মৃত্যুতে, তাই কাল সসীম। মানুষের অস্তিত্ব হল মৃত্যুমুখী সত্তা। মৃত্যু হাইডেগারের কাছে চরম সম্ভাবনা যার বাস্তবায়ন হবে নিশ্চিত কিন্তু কবে হবে সেই বিষয়ে অনিশ্চিত। যিনি মৃত্যুকে চরম সম্ভাবনারূপে উপলব্ধি করেন এবং জানেন আমাদের এই অস্তিত্ব মৃত্যুকালেই শেষ তিনি যথার্থরূপে অস্তিত্ববান। অপরদিকে যিনি মৃত্যুকে চরম সম্ভাবনারূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম, সর্বদা মৃত্যু থেকে ভয় পান ও পলায়ন করেন তার অস্তিত্ব অযথার্থ অস্তিত্ব। এইভাবে হাইডেগারের দর্শনে কালিকতা ও মৃত্যুর ধারণা এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে, তা চরম মাত্রায় বাস্তব। মৃত্যু এক চরম বাস্তব। অন্যদিকে কালে আমরা জীবনযাপন করিনা, কাল আমাদের থেকে বহির্ভূত কোন সত্তা নয়। কালই আমাদের যাপন। কালের বাইরে ডাজাইনের কোনো অর্থ নেই। ডাজাইন যেমন জগত-মধ্যে সত্তা তেমনি কাল-মধ্যে সত্তা।

Reference:

১. Hubert L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. 1995, 1

২. Hubert L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. 1995, 1

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. Hubert L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. 1995, 3

৪. Heidegger Martin, Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell publishers (UK), 1967, P. 33

৫. Heidegger Martin, Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell publishers (UK), 1967, P. 165

Bibliography:

Dreyfus, Hubert L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. MTT Press, Cambridge, 1995

Bhadra, Mrinalkanti. A Critical Survey of Phenomenology and Existentialism. Indian council of philosophical research in associated with attifiated publishers, new delhi, 1990

Heidegger, Martin. Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell publishers (UK), 1967

সরকার, স্বপ্না. অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩

Hannah Arendt, The Life of the Mind, 2 volumes (New York: Harcourt Brace Jovanovitch, 1977

Jeffrey Andrew Barash, Martin Heidegger and the Problem of Historical Meaning (Dordrecht: Nijhoff, 1985